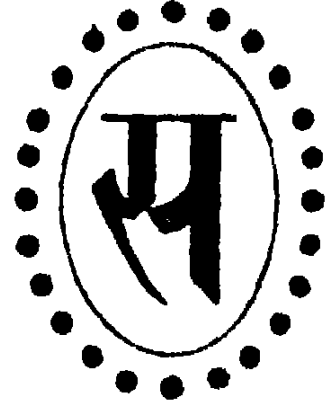




দ্বিতীয় খণ্ড

উপন্যাস ব্যতীত সমগ্র বাংলা রচনা

বঙ্কিম-সাহিত্যের পরিচয় সম্বন্ধিত



সাহিত্য সংসদ । ৩২এ আপার সারকুলার রোড । কলিকাতা



প্রথম প্রকাশ দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১
প্রকাশক। মহেন্দ্রনাথ দত্ত
শিশু-সাহিত্য সংসদ লিঃ
৩২এ আপার সারকুলার রোড। কলিকাতা ৯



মুদ্রক। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ
৩২ আপার সারকুলার রোড। কলিকাতা ৯
প্রচ্ছদপট। পীযুষ মিত্র
বাঁধাই। মেসার্স এ. বি. রায়
১২ হলওয়েল লেন। কলিকাতা ৯
পরিবেশক। দাশগুপ্ত এন্ড কোং লিঃ
৫৪।৩ কলেজ স্কোয়ার। কলিকাতা ১২

দাম ১২।।০

প্রকাশকের । নবেদন

বঙ্কিম রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। এই খণ্ডে উপন্যাস ব্যতিরেকে বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য সমুদয় বাংলা রচনা সন্নিবেশিত হইল। প্রথম খণ্ড প্রকাশকালে আমরা বাংলা পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট যে বাসনা জ্ঞাপন করিয়াছিলাম তাহা পূরণ করিতে পারিয়া নিজেদের কৃতার্থ মনে করিতেছি।

প্রথম খণ্ডের মত এ খণ্ডটিকেও যথাসম্ভব সূষ্ঠা করিয়া প্রকাশ করিতে আমরা প্রয়াস পাইয়াছি। পূর্বে বারেই আমরা বলিয়াছিলাম যে, সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসসমূহের বহু সংস্করণ বাজারে প্রচলিত থাকিলেও জনপ্রিয় সূষ্ঠা সংস্করণ প্রকাশের দিকে আদৌ দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। বর্তমান দুই খণ্ড প্রকাশ দ্বারা আমরা এই অভাব মিটাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি।

পুস্তকের মদ্রুণ পারিপাট্য, কাগজের স্থায়িত্ব, সূষ্ঠা ও মজবুত বাঁধাই, মনোরম আবরণী প্রভৃতি বিভিন্ন দিক হইতে এই খণ্ডটিকে একটি আদর্শ সংস্করণ করিতে যত্নের গ্রুটি করি নাই। প্রথম খণ্ড হইতে দ্বিতীয় খণ্ড আয়তনে অনেক বড় হওয়ায় আমরা উহার মূল্য বাড়াইতে বাধ্য হইয়াছি। ইহা সত্ত্বেও মনে হয় ইহা সাধারণ পাঠকের ক্রয়-ক্ষমতার বাহিরে যায় নাই। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থ আমরা যে আয়োজন করিতেছি তাহাতে বিদগ্ধ সূধীসমাজের সহায়তা ও সমর্থন ইতিমধ্যে লাভ করা গিয়াছে। তাঁহাদের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। বর্তমান খণ্ডটি প্রথম খণ্ডের ন্যায় যে তাঁহাদের সাগ্রহ অনুমোদন লাভ করিবে এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

এই খণ্ডে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ব্যতীত অন্যান্য সাহিত্যের পরিচয়সম্বিত একটি সুচিন্তিত তথ্যবহুল ভূমিকা সুসাহিত্যিক এবং ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় লিখিয়া দিয়াছেন। ইহার জন্য তিনি আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্থ।

বাংলা ক্লাসিক্স মাত্রেরই স্থায়িত্ব দান ও জনপ্রিয় করিবার পক্ষে এরূপ সূষ্ঠা ও শোভন সংস্করণ প্রকাশ আমাদের জাতীয় কর্তব্যের মধ্যে গণ্য হওয়া উচিত। বঙ্কিম রচনাবলীর ১ম ও ২য় খণ্ড কিরূপ আদরণীয় হইবে তাহার উপরই আমাদের পরবর্তী প্রয়াস নির্ভর করিবে।



সূচীপত্র

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

১১০—১৫০

প্রথম ভাগ

লোকরহস্য ১— ৪৮

ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল ১; ইংরাজস্তোত্র ৯; বাবু ১০; গন্দর্ভ ১২; দাম্পত্য
দণ্ডবিধির আইন ১৩; বসন্ত এবং বিরহ ২১; সুবর্ণ গোলক ২৩; রামায়ণের
সমালোচনা ২৭; বর্ষ সমালোচনা ২৯; কোন “স্পেশিয়ালের” পত্র ৩১;
Bransonism ৩৩; হনুমদ্বাবুসংবাদ ৩৭; গ্রাম্য কথা ৪০; বাঙ্গালা সাহিত্যের
আদর ৪৪; New Year’s Day ৪৭।

কমলাকান্ত ৪৯— ১১২

কমলাকান্তের দপ্তর : একা—“কে গায় ওই?” ৪৯; মনুষ্য ফল ৫১;
ইউটিলিটি বা উদর-দর্শন ৫৪; পতঙ্গ ৫৬; আমার মন ৫৮; চন্দ্রালোক ৬২;
বসন্তের কোকিল ৬৭; স্ত্রীলোকের রূপ ৬৯; ফুলের বিবাহ ৭৩; বড়
বাজার ৭৫; আমার দুর্গোৎসব ৭৯; একটি গীত ৮১; বিড়াল ৮৫;
চের্কি ৮৮।

কমলাকান্তের পত্র : কি লিখিব? ৯০; পলিটিক্স ৯২; বাঙ্গালির মনুষ্যত্ব ৯৪;
বুড়া বয়সের কথা ৯৬; কমলাকান্তের বিদায় ১০০।

কমলাকান্তের জোবানবন্দী : ১০১।

মদ্যচিরাম গুড়ের জীবনচরিত ১১৩— ১২৮

দ্বিতীয় ভাগ

বিজ্ঞানরহস্য অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধসংগ্রহ ১২৯— ১৫৮

Great Solar Eruption (আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত) ১২৯; Multitudes
of Stars (আকাশে কত তারা আছে?) ১৩২; Dust (ধূলা) ১৩৪;
Aerostation (গগনপর্যটন) ১৩৬; The Universe in motion
(চঞ্চল জগৎ) ১৪১; Antiquity of Man (কত কাল মনুষ্য?) ১৪৪;
Protoplasm (জৈবনিক) ১৪৮; Curiosities of Quantity and
Measure (পরিমাণ-রহস্য) ১৫২; The Moon (চন্দ্রলোক) ১৫৬।

বিবিধ প্রবন্ধ (প্রথম খণ্ড) ১৫৯— ২৫৬

উত্তরচরিত ১৫৯; গীতিকাব্য ১৮৬; প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত ১৮৮; বিদ্যাপতি
ও জয়দেব ১৮৯; আর্ষাজাতির সুক্ষ্ম শিল্প ১৯২; দ্রৌপদী ১৯৪; অনু-
করণ ২০০; শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্দিমোনা ২০৪; বাঙ্গালির
বাহুবল ২০৯; ভালবাসার অত্যাচার ২১৩; জ্ঞান ২১৭; সাংখ্যদর্শন ২২১;
ভারত-কলঙ্ক ২৩৪; ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা ২৪১; প্রাচীন
ভারতবর্ষের রাজনীতি ২৪৫; প্রাচীনা এবং নবীনা ২৪৯।

বিবিধ প্রবন্ধ (দ্বিতীয় খণ্ড) ... ২৫৭— ৩৮০

ধর্ম এবং সাহিত্য ২৫৭; চিত্তশুদ্ধি ২৫৯; গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার
ঝুলি ২৬০; কাম ২৭১; বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন ২৭২;
হিন্দুদের সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র কি বলে ২৭৩; বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনা ২৮০;
সঙ্গীত ২৮৪; বঙ্গদেশের কৃষক ২৮৭; বহুবিবাহ ৩১৪; বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার
৩১৯; বাঙ্গালা শাসনের কল ৩২৭; বাঙ্গালার ইতিহাস ৩৩০; বাঙ্গালার
কলঙ্ক ৩৩৩; বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ৩৩৬; বাঙ্গালার
ইতিহাসের ভগ্নাংশ ৩৪০; বাঙ্গালীর উৎপত্তি ৩৪৪; বাহুবল ও বাক্যবল
৩৬৩; বাঙ্গালা ভাষা ৩৬৮; মনুষ্য কি? ৩৭৪; লোকশিক্ষা ৩৭৬;
রামধন পোদ ৩৭৮।

সাম্য ... ৩৮১— ৪০৬

তৃতীয় ভাগ

কৃষ্ণচরিত্র ... ৪০৭— ৫৮৩

প্রথম খণ্ড (উপক্রমণিকা) : গ্রন্থের উদ্দেশ্য ৪০৭; কৃষ্ণের চরিত্র কিরূপ
ছিল, তাহা জানিবার উপায় কি? ৪০৮; মহাভারতের ঐতিহাসিকতা ৪১০;
মহাভারতের ঐতিহাসিকতা—ইউরোপীয়দিগের মত ৪১২; কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ
কবে হইয়াছিল ৪১৪; পাণ্ডবদিগের ঐতিহাসিকতা—ইউরোপীয় মত ৪১৭;
পাণ্ডবদিগের ঐতিহাসিকতা ৪২১; কৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা ৪২২; মহাভারতে
প্রক্ষিপ্ত ৪২৪; প্রক্ষিপ্তনির্বাচনপ্রণালী ৪২৭; নির্বাচনের ফল ৪২৮;
অনৈসর্গিক বা অতিপ্রকৃত ৪৩০; ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া কি
সম্ভব? ৪৩২; পুরাণ ৪৩৬; হরিবংশ ৪৪২; ইতিহাসদিগের পৌর্বাপর্য্য
৪৪৩।

দ্বিতীয় খণ্ড (বৃন্দাবন) : যদুবংশ ৪৪৭; কৃষ্ণের জন্ম ৪৪৮; শৈশব
৪৪৯; কৈশোর লীলা ৪৫০; ব্রজগোপী—বিষ্ণুপুরাণ ৪৫৩; ব্রজগোপী—
হরিবংশ ৪৫৯; ব্রজগোপী—ভাগবত—বন্দ্রহরণ ৪৬২; ব্রজগোপী—ভাগবত—
ব্রাহ্মণকন্যা ৪৬৫; ব্রজগোপী—ভাগবত—রাসলীলা ৪৬৫; শ্রীরাধা ৪৬৭;
বৃন্দাবনলীলার পরিসমাপ্তি ৪৭৫।

তৃতীয় খণ্ড (মথুরা-দ্বারকা) : কংসবধ ৪৭৭; শিক্ষা ৪৭৮; জরাসন্ধ ৪৮০;
কৃষ্ণের বিবাহ ৪৮২; নরকবধাদি ৪৮৪; দ্বারকাবাস—সামন্তক ৪৮৬; কৃষ্ণের
বহুবিবাহ ৪৮৮।

চতুর্থ খণ্ড (ইন্দ্রপ্রস্থ) : দ্রৌপদীস্বয়ংবর ৪৯৪; কৃষ্ণ-যুধিষ্ঠির সংবাদ
৪৯৫; স্বেদাহরণ ৪৯৮; খাণ্ডবদাহ ৫০৪; কৃষ্ণের মানবিকতা ৫০৬;
জরাসন্ধবধের পরামর্শ ৫০৮; কৃষ্ণ-জরাসন্ধ-সংবাদ ৫১৩; ভীম-জরাসন্ধের
যুদ্ধ ৫১৭; অর্ঘ্যভিহরণ ৫১৯; শিশুপালবধ ৫২৩; পাণ্ডবের বনবাস
৫২৬।

পঞ্চম খণ্ড (উপপ্লব্য) : মহাভারতের যুদ্ধের সেনোদ্যোগ ৫২৮; সঞ্জয়যান
৫৩১; যানসন্ধি ৫৩৪; শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনা-যাত্রার প্রস্তাব ৫৩৫; যাত্রা ৫৩৭;
হস্তিনায় প্রথম দিবস ৫৩৮; হস্তিনায় দ্বিতীয় দিবস ৫৪১; কৃষ্ণ-কর্ণসংবাদ
৫৪৩; উপসংহার ৫৪৫।

ষষ্ঠ খণ্ড (কুরুক্ষেত্র) : ভীষ্মের যুদ্ধ ৫৪৬; জয়দ্রথবধ ৫৪৮; দ্বিতীয় স্তরের
কবি ৫৫০; ঘটোৎকচবধ ৫৫২; দ্রোণবধ ৫৫৪; কৃষ্ণকথিত ধর্মতত্ত্ব
৫৬০; কর্ণবধ ৫৬৭; দুর্যোধনবধ ৫৬৯; যুদ্ধশেষ ৫৭৩; বিধি সংস্থাপন
৫৭৪; কামগীতা ৫৭৫; কৃষ্ণপ্রয়াণ ৫৭৭।

সপ্তম খণ্ড (প্রভাস) : যদুবংশধ্বংস ৫৭৯; উপসংহার ৫৮১।

ধর্মতত্ত্ব (অনুশীলন) ... ৫৮৪— ৬৭৯

দুঃখ কি? ৫৮৪; সুখ কি? ৫৮৬; ধর্ম কি? ৫৮৯; মনুষ্যত্ব কি? ৫৯০; অনুশীলন ৫৯৪; সামঞ্জস্য ৫৯৬; সামঞ্জস্য ও সুখ ৫৯৯; শারীরিক বৃত্তি ৬০৬; জ্ঞানার্জনী বৃত্তি ৬১২; মনুষ্যে ভক্তি ৬১৫; ঈশ্বরে ভক্তি ৬২০; ভক্তি : ঈশ্বরে ভক্তি—শাণ্ডিল্য ৬২৪; ভক্তি : ভগবদ্গীতা—স্কুল উদ্দেশ্য ৬২৬; ভক্তি : ভগবদ্গীতা—কর্ম ৬২৭; ভক্তি : ভগবদ্গীতা—জ্ঞান ৬২৯; ভক্তি : ভগবদ্গীতা—সন্ন্যাস ৬৩১; ভক্তি : ধ্যান বিজ্ঞানাদি ৬৩৩; ভক্তি : ভগবদ্গীতা—ভক্তিব্যোগ ৬৩৫; ভক্তি : ঈশ্বরে ভক্তি—বিষ্ণু-পূরণ ৬৩৬; ভক্তি : ভক্তির সাধন ৬৪৩; প্রীতি ৬৪৭; আত্মপ্রীতি ৬৫১; স্বজনপ্রীতি ৬৫৫; স্বদেশপ্রীতি ৬৬০; পশুপ্রীতি ৬৬১; দয়া ৬৬৩; চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি ৬৬৬; উপসংহার ৬৭০; ক্রোড়পত্র-ক ৬৭১; ক্রোড়পত্র-খ ৬৭২; ক্রোড়পত্র-গ ৬৭৬; ক্রোড়পত্র-ঘ ৬৭৮।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ... ৬৮০— ৭৭৫

দেহতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম ... ৭৭৬— ৮২২

চতুর্থ ভাগ

সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকা ... ৮২৩— ৮৬৯

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা ৮২৩; ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব ৮৩৫; বাঙ্গালা সাহিত্যে 'প্যারীচাঁদ' মিত্র ৮৬১; 'সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী ৮৬৩।

সাময়িক পত্রে প্রকাশিত ও পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা ... ৮৭০— ৯২১

নতুন গ্রন্থের সমালোচনা ৮৭০; Three Years in Europe ৮৭০; প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ৮৭৩; দুর্গা ৮৭৭; জন স্টুয়ার্ট মিল ৮৮০; মৃত মাইকেল মধুসূদন দত্ত ৮৮৩; জাতিবৈর ৮৮৪; মানস বিকাশ ৮৮৫; সর্ উইলিয়াম গ্রে ও সর্ জর্জ কাম্বেল ৮৮৮; বঙ্গ দেবপূজা ৮৯৩; কল্পতরু ৮৯৬; বৃহৎসংহার ৮৯৯; প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ৯০১; জ্ঞান সম্বন্ধে দার্শনিক মত ৯০১; কৃষ্ণচরিত্র ৯০২; ঋতুবর্ণন ৯০৬; পলাশির যুদ্ধ ৯০৭; বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ ৯০৯; বঙ্গদর্শন ৯১০; সূচনা ['প্রচার'] ৯১১; আদি ব্রাহ্ম সমাজ ও "নব হিন্দু সম্প্রদায়" ৯১৩; লর্ড রিপনের উৎসবের জমা-খরচ ৯১৯; আগামী বৎসর প্রচার যেরূপ হইবে ৯২০; মাসিক সংবাদ ৯২০।

গ্রন্থাবলী ... ৯২২— ৯২৭

পাঠ্যপুস্তক—সহজ রচনাশিক্ষা ... ৯২৮— ৯৪০

পঞ্চম ভাগ

গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক ... ৯৪১— ৯৬৪

পুস্তকনাটক ৯৪১; সংযুক্তা ৯৪৪; আকাঙ্ক্ষা ৯৪৭; অধঃপতন সঙ্গীত ৯৪৮; সার্বিকী ৯৪৯; আদর ৯৫১; বারু ৯৫২; আকবর শাহের খোষ রোজ ৯৫৩; মন এবং সুখ ৯৫৬; জলে ফুল ৯৫৬; ভাই ভাই ৯৫৭; দুর্গাৎসব ৯৫৮; রাজার উপর রাজা ৯৬০; মেঘ ৯৬১; বৃষ্টি ৯৬২; খদ্যোৎ ৯৬৩।

বাল্যরচনা ... ৯৬৫— ৯৯৪

ললিতা ৯৬৫; মানস ৯৭১।

পদ্যকাব্যে অপ্রকাশিত বাল্যরচনা : পদ্য ১৭৩; বিরলে বাস ১৭৩; জীবন ও সৌন্দর্য্য অনিত্য ১৭৪; হেমন্ত বর্ণনাছলে স্ত্রীর সহিত পতির কথোপকথন ১৭৪; শিশির বর্ণনাছলে স্ত্রী-পতির কথোপকথন ১৭৬; দূরদেশ গমনের বিদায় ১৭৮; কামিনীর প্রতি উক্তি ১৭৯; চন্দ্রদূত ১৮১; বসন্তের নিকট বিদায় ১৮৩; বিচিত্র নাটক ১৮৩; বর্ষা বর্ণনাছলে দম্পতির রসালাপ ১৮৫; বিষম বিচিত্র নাটক ১৮৭; বর্ষার মানভঞ্জন ১৯২; গদ্য ১৯৩; বর্ষাঋতু ১৯৪।

অসম্পূর্ণ রচনা ... ১৯৫—১০২২

রাজমোহনের স্ত্রী ১৯৫; নিশীথ রাক্ষসীর কাহিনী ১০১৪; ভিক্ষা ১০১৫; নাটিকা ১০১৭।

সংযোজনী ... ১০২৩—১০২৮

বিরহিণীর দশ দশা ১০২৩; ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভা ১০২৪।

পরিশিষ্ট ... ১০২৯—১০৩৬

প্রথম ভাগ : লোকরহস্য (বিজ্ঞাপন) ১০২৯; কমলাকান্ত (বিজ্ঞাপন) ১০২৯; মদীচরাম গুড়ের জীবনচরিত (বিজ্ঞাপন) ১০২৯।

দ্বিতীয় ভাগ : বিবিধ প্রবন্ধ (বিজ্ঞাপন) ১০৩০; সাম্য (বিজ্ঞাপন) ১০৩১।

তৃতীয় ভাগ : কৃষ্ণচরিত্র (বিজ্ঞাপন) ১০৩১; ধর্মতত্ত্ব (ভূমিকা) ১০৩৩; শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (ভূমিকা) ১০৩৩।

চতুর্থ ভাগ : রচনা শিক্ষা (Advertisement) ১০৩৪।

পঞ্চম ভাগ : গদ্য পদ্য বা কবিতাপদ্যুস্তক (বিজ্ঞাপন) ১০৩৫।



সাঁ- ৩-প্রসঙ্গ

প্রথম খণ্ডে বঙ্কিম-জীবনী সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাতে আমরা 'বঙ্গদর্শনের' কথাও বলিয়াছি। 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের তিন-চারি বৎসর পূর্বে হইতেই বিভিন্ন রচনা ও বক্তৃতায় বঙ্কিমচন্দ্র সাধারণভাবে বাঙালী সমাজের এবং বিশেষভাবে বাংলা সাহিত্যের উন্নতি করিতেছিলেন। বেঙ্গল সোস্যাল সায়েন্স এসোসিয়েশন বা বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভায় প্রদত্ত দুইটি বক্তৃতা এবং 'কলিকাতা রিভিউ'তে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ পাঠে এ বিষয় আমরা অবগত হই। প্রথম দুইটি বক্তৃতা ছিল যথাক্রমে বাংলার গালপাৰ্ব্বণ এবং বাংলা সাহিত্যের উপর। 'কলিকাতা রিভিউ'র প্রবন্ধটি বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা। সাহিত্যবিষয়ক দুইটি প্রবন্ধেই বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের উন্নতির অন্ততঃ তিনটি অন্তরায় নির্দেশ করেন, যথা— (১) ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের বাংলা সাহিত্য চর্চায় অননুরাগ ও অমনোযোগ, (২) সাহিত্য-পুস্তকের যথোপযুক্ত সমালোচনার অভাব এবং (৩) জ্ঞানগর্ভ ও বুদ্ধিগ্রাহ্য কঠিন বিষয়-সমূহ পুস্তকে প্রদত্ত হইলে তাহা বাঙালী পাঠক বুদ্ধিবে না এই ধারণা-বশে সহজ করিয়া বাংলা পুস্তক গ্রন্থন। এই অন্তরায়গুলি বিদূরণের নিমিত্ত বঙ্কিমচন্দ্র কয়েক বৎসর যাবৎ চিন্তা করিতেছিলেন; শূদ্ধ বক্তৃতায় বা প্রবন্ধে নহে, ঘরোয়া বৈঠকেও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে তিনি এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। এই সকল চিন্তা-ভাবনা-আলোচনার ফল বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ (বৈশাখ ১২৭১ বঙ্গাব্দ)।

'বঙ্গদর্শন' যে মনন-সাহিত্যে যুগান্তর সৃষ্টি করে, ইহার প্রকাশারম্ভ হইতেই তাহা উপলব্ধি হইতে থাকে। এই পত্রিকাখানির লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে নবীন প্রবীণ বহু ব্যক্তিই ছিলেন। নবীনদের মধ্যে পরবর্তী কালে অনেকে সুপরিচিত ও সুসাহিত্যিক বলিয়া প্রখ্যাতও হইয়াছিলেন। কিন্তু সকলের মূলে ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। 'বঙ্গদর্শন' সুপরিচালন ও সুষ্ঠু সম্পাদনে তিনি কঠোর পরিশ্রম করিতেন, বহু বিনীত রজনীও তাহাকে কাটাইতে হইত—তিনি নিজে এ কথা বলিয়া গিয়াছেন। মাসের পর মাস 'বঙ্গদর্শন'র বহুলংশ তিনি রচনা করিয়া পূরণ করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যক্ষেত্রে যে কঠোর সাধনায় লিপ্ত হইয়াছিলেন তাহাতে তাহার লেখনী সোনার কাঠি হইয়া দাঁড়ায়; যাহাই লিখিতেন এই সোনার কাঠির স্পর্শে তাহাই যেন সোনা হইয়া যাইত।

গত শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের একখানি ইংরেজী উপন্যাস (Rajmohan's Wife) এবং তিনখানি বাংলা উপন্যাস ('দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা' এবং 'মৃগালিনী') প্রকাশিত হইয়াছিল। 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশ হইবা মাত্র বঙ্কিমচন্দ্র যে প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন, অন্যান্য উপন্যাসগুলিও পর পর বাহির হইলে অনুরূপ অভিনন্দনই পাইতে থাকেন। ইংরেজী শিক্ষিত পাঠক-সমাজ বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব যুগের সূচনা এই উপন্যাসগুলির মধ্যে দেখিতে পাইলেন। বিশেষ বিশেষ ঘটনা এই সকল উপন্যাসের উপজীব্য হইলেও বঙ্কিমচন্দ্রকে বাঙালী সমাজ লইয়াই আলোচনা করিতে হইয়াছিল। বাঙালীর সুখ-দুঃখ, অভাব-অনটন, আচার-আচরণ, ইতিহাস-ঐতিহ্য এ সকল দিকেও তাহার লেখনী পরিচালিত হইতেছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য শিক্ষায় ব্যাপন্ন। 'উচ্চশিক্ষিত' হইয়াও, অন্য দশ জনের মত ইঙ্গ-বঙ্গীভূত না হইয়া কিরূপে তিনি বাঙালী তথা স্বদেশী ভাবাপন্ন হইয়া উঠিলেন, ইহা বাস্তবিকই অনুসন্ধান বিষয়। বঙ্কিমচন্দ্রের কলেজী শিক্ষা কলেজ পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই পরিসমাপ্ত না হইয়া ঐ সময়ের অগ্রগামী ভাবধারার সঙ্গে পরিচয়ের প্রকৃষ্ট পন্থা হইয়া দাঁড়ায়। আর এই ভাবধারার সঙ্গে পরিচয়লাভের ফলেই তিনি যে সমাজ তথা মানব-সেবায় উদ্বুদ্ধ এবং প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহাও সম্যক্ বুঝা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র 'সাম্য' প্রবন্ধে শাক্যসিংহ এবং যীশুখ্রীষ্টের সমান স্তরে 'সাম্যাবতার রূসো'কে স্থান দিয়াছেন। তিনি অবশ্য পরবর্তী কালে 'সাম্য' প্রকাশিত অভিমতসমূহ অনেকটা বর্জন করিয়াছিলেন, পুস্তকখানির প্রচুর চাহিদা থাকা সত্ত্বেও জীবিত-কালে আর প্রকাশিত করেন নাই। কিন্তু প্রথম জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য ভাবধারায় কতখানি প্রভাবিত হইয়াছিলেন, এই একটি

মাত্র দৃষ্টান্তই ইহা বুদ্ধিবাদ পক্ষে যথেষ্ট। ভলটেয়ার ও রুসো অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের চিন্তাধারায় আলোড়ন উপস্থিত করিয়াছিলেন এবং ইহার ফলেই ফরাসী বিপ্লব সম্ভব হইয়াছিল। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা—এই তিনটি বাণী বা slogan লইয়া ফরাসী বিপ্লব আরম্ভ হয়। এই বাণীত্রয় মূলে রাখিয়া ব্রিটেনে ও জার্মানীতেও একদল দার্শনিক পণ্ডিত স্ব স্ব মতবাদ প্রতিষ্ঠায় রত হইলেন। ইংলণ্ডে জেরেমি বেন্থাম (১৭৪৮-১৮৩২) হিতবাদ দর্শন প্রচার করেন। ‘হিতবাদ’-এর লক্ষ্য হইল অধিক সংখ্যক লোকের অধিক পরিমাণ হিত বা মঙ্গল সাধন (‘Greatest good of the greatest number’)। রাজা রামমোহন রায় বেন্থামের মতবাদের সঙ্গে সম্যক্ পরিচিত ছিলেন। বিলাতে অবস্থান কালে আলাপ পরিচয়ের ফলে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জন্মে। বেন্থামের হিতবাদ দর্শনের প্রভাবে ব্রিটেনের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বিশেষরূপে সংস্কৃত ও পরিশোধিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাংলার নব্য শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদের মধ্যে প্রথম প্রথম পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের প্রাধান্য দেখা দিলেও, তাহাদের ভিতরে উক্ত হিতবাদ দর্শনের মূল কথা ক্রমে প্রচারিত হইতে থাকে। তাহাদের মধ্যে অগ্রণী দল যে সমাজ-সেবায় ঐ যুগেই অতর্কিত অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহার মূলে বেন্থামের হিতবাদ দর্শন কম কার্য করে নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার মধ্যে ‘হিতবাদ’-এর প্রভাব সুস্পষ্ট। তিনি বেন্থাম বর্ণিত আনন্দ বা সুখের ব্যাখ্যাও পুরাপুরি গ্রহণ করিয়াছিলেন।* শেষ জীবনে বহু বিষয়ে তাঁহার মত পরিবর্তিত হইয়াছিল। ‘হিতবাদ’ সম্বন্ধেও তাঁহার ধারণার পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু হিতবাদের কার্যকারিতা ও গুণাগুণ সম্বন্ধে তিনি বরাবর সজাগ ছিলেন। ধর্মচর্চায় হিতবাদের স্থান নির্ণয় করিতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন :

“হিতবাদ মতটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার বস্তু নহে। হিতবাদীদের ভ্রম এই যে, তাঁহারা বিবেচনা করেন যে সমস্ত ধর্মতত্ত্বটা এই হিতবাদমতের ভিতরই আছে। তাহা না হইয়া, ইহা ধর্মতত্ত্বের সামান্য অংশ মাত্র। আমি যেখানে উহাকে স্থান দিলাম, তাহা আমার ব্যাখ্যাত অনুশীলনতত্ত্বের একটি কোণের কোণ মাত্র। তত্ত্বটা সত্যমূলক, কিন্তু ধর্মতত্ত্বের সমস্ত ক্ষেত্র আবৃত করে না। ধর্ম ভিত্তিতে, সর্বভূতে সমদৃষ্টিতে। সেই মহাশিখর হইতে যে সহস্র সহস্র নির্ঝরিণী নামিয়াছে—হিতবাদ ইহা তাহার একটি ক্ষুদ্রতম স্রোতঃ। ক্ষুদ্রতম হউক—ইহার জল পবিত্র। হিতবাদ ধর্ম—অধর্ম নহে” (ধর্মতত্ত্ব : ২২শ অধ্যায়—আত্মপ্রীতি)

এই যুগে ফ্রান্সে আগস্ট কোঁতের (১৭৯৮-১৮৫৭) আবির্ভাব জগতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। তিনি যে মতবাদ প্রচার করেন তাহা “Positive Philosophy” নামে আখ্যাত। বাংলায় অনেকে ইহার অনেক রকম তর্জমা করিয়াছেন, যেমন ধ্রুববাদ, প্রত্যক্ষবাদ, দৃষ্টবাদ, ইত্যাদি। আমরা এখানে ধ্রুববাদই বলিব। বঙ্কিমচন্দ্র আগস্ট কোঁতের ধ্রুববাদের সঙ্গে সম্যক্ পরিচিত তো ছিলেনই, উপরন্তু ইহা দ্বারা বিশেষ প্রভাবিতও হইয়াছিলেন। শেষ জীবনে হিন্দুধর্মের ভিতরেই জগতের যাবতীয় দার্শনিক ও ধর্মীয় চিন্তার পরাকাষ্ঠা দেখিলেও কোঁত-প্রবর্তিত ধ্রুববাদের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রদ্ধা কণামাত্রও হ্রাস পায় নাই। প্রথম জীবনে ‘বঙ্গদর্শনে’ প্রকাশিত তাঁহার বিভিন্ন রচনায় কোঁতের মতবাদ সুন্দরভাবে পরিষ্ফুট হইয়াছে। ১৮৭৪ সনে ধ্রুববাদ লইয়া যখন এদেশে বাদানুবাদ উপস্থিত হয় তখন তিনি সুহৃদ্বর সুপণ্ডিত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে দিয়া ‘কোমতি দর্শন’ নামে একটি সুপাঠ্য প্রবন্ধ রচনা করাইয়াছিলেন। প্রথম বৎসরের ‘বঙ্গদর্শনে’ও (শ্রাবণ ১২৭৯), ইংরেজী ১৮৭২ সনে, কোঁত-দর্শনের উপর একটি প্রবন্ধ বাহির হয়। বঙ্কিমচন্দ্র যে বঙ্গদেশে ধ্রুববাদ প্রচারের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন, পণ্ডিতপ্রবর কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের একটি কথা হইতেও তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। “কোঁতের দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনার সময় আইসে নাই, the time is not ripe for it”—কৃষ্ণকমল একদা একথা বলিলে, বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, “কেন? যেটা Truth তার আবার সময় অসময় কি?”† আগস্ট কোঁত সমাজকে “মানবদেবী” রূপে কল্পনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতবাদের নির্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের এই কথা কয়টির মধ্যে আছে। বলা বাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্রও ইহা পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন :

“সমাজকে ভক্তি করিবে। ইহা স্মরণ রাখিবে যে, মানুষের ষত গুণ আছে—সবই সমাজে আছে।

* ধর্মতত্ত্ব : অষ্টম অধ্যায়—শারীরিকী বৃত্তি।

† পুরাতন প্রসঙ্গ (প্রথম পর্যায়)—বিপিনবিহারী গুপ্ত, পৃঃ ৭২

সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা, দণ্ডপ্রণেতা, ভরণপোষণ এবং রক্ষাকর্তা। সমাজই রাজা সমাজই শিক্ষক। ভক্তিভাবে সমাজের উপকারে যত্নবান হইবে। এই তত্ত্বের সম্প্রসারণ করিয়া ওগন্থ কোম্ৎ 'মানবদেবীর' পূজার বিধান করিয়াছেন। সুতরাং এ বিষয়ে আর বেশী বলিবার প্রয়োজন নাই।”

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'ধর্মতত্ত্ব প্রথম ভাগ অনুশীলন'-এ (১১শ অধ্যায়—ঈশ্বরে ভক্তি) বঙ্কিমচন্দ্র এই উক্তি করিয়াছেন। ইহার অন্ততঃ পনের বৎসর পূর্বে হইতেই কোঁতের মতবাদ তাঁহার রচনায় প্রকটিত হইতে থাকে। 'কমলাকান্তের দপ্তর'—প্রথম সংখ্যায় ('বঙ্গদর্শন', ভাদ্র ১২৮০) বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন :

“প্রীতি সংসারে সর্বব্যাপিনী—ঈশ্বরই প্রীতি। প্রীতিই আমার কর্ণে এখনকার সংসারসঙ্গীত। অনন্ত কাল সেই মহাসঙ্গীত সহিত মনুষ্য-হৃদয়তন্ত্রী বাজিতে থাকুক। মনুষ্যজাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সূখ চাই না।”

বঙ্কিমচন্দ্র 'হিতবাদের' সমর্থক বটে, কিন্তু কোঁত-প্রদর্শিত ধ্রুববাদের মধ্যেই ইহা সমাহিত বলিয়া—শুধু অধিক সংখ্যক লোকের অধিক পরিমাণ হিতসাধন নহে, সমগ্র মানব-সমাজেরই কল্যাণসাধন ইহার আদর্শ বলিয়া—বঙ্কিমচন্দ্র ধ্রুববাদকে অতীব শ্রদ্ধার সঙ্গে মনেপ্রাণে প্রথম হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'দেবী চৌধুরাণী' (প্রকাশ কাল ১৮৮৪) অন্যতম 'মটো' রূপে কোঁতের 'Catechism of Positive Religion' হইতে এই উক্তিটি তিনি সমাদরের সহিত উদ্ধৃত করিয়াছেন—'The General Law of Man's Progress whatever the point of view chosen, consists in this that Man becomes more and more religious'। ১২৯২ ফাল্গুন সংখ্যা প্রচারে প্রকাশিত 'চিত্তশুদ্ধি' শীর্ষক প্রবন্ধেও বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন :

“চিত্তশুদ্ধি থাকিলে সকল মতই শুদ্ধ, চিত্তশুদ্ধির অভাবে সকল মতই অশুদ্ধ। যাহার চিত্তশুদ্ধি নাই, তাহার কোন ধর্মই নাই। চিত্তশুদ্ধি কেবল হিন্দুধর্মেরই সার, এমত নহে, ইহা সকল ধর্মের সার। ইহা হিন্দুধর্মের সার, খ্রিষ্টধর্মের সার, বৌদ্ধধর্মের সার, ইসলামধর্মের সার, নিরীশ্বর কোম্ৎ ধর্মেরও সার। যাহার চিত্তশুদ্ধি আছে, তিনি শ্রেষ্ঠ হিন্দু, শ্রেষ্ঠ খ্রিষ্টিয়ান, শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ, শ্রেষ্ঠ মুসলমান, শ্রেষ্ঠ পর্জিটিভিষ্ট।” (বিবিধ প্রবন্ধ—দ্বিতীয় ভাগ, “চিত্তশুদ্ধি” দ্রষ্টব্য)

'ধর্মতত্ত্ব'র বহু স্থলে কোঁতের মতবাদের সমর্থনসূচক উল্লেখ আছে। এখানে আরও কয়েকটি উদ্ধৃতি দিতেছি। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন-দর্শন যে ক্রমশঃ অন্তর্মুখী হইয়া হিন্দু-শাস্ত্রের উপর ভিত্তি গাড়িয়াছিল তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাই এই সকল উক্তির কোন কোনটির মধ্যে। শিষ্য যখন বলেন, 'শিক্ষা যে ধর্মের অংশ ইহা কোম্ৎের মত', তখন তাহার উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র গুরুর মুখ দিয়া বলাইয়াছেন, “হইতে পারে। এখন, হিন্দুধর্মের কোন অংশের সঙ্গে যদি কোম্ৎ মতের কোথাও কোন সাদৃশ্য ঘটিয়া থাকে, তবে যখনস্পর্শদোষ ঘটিয়াছে বলিয়া হিন্দু ধর্মের সেটুকু ফেলিয়া দিতে হইবে কি? খ্রিষ্ট ধর্ম ঈশ্বরোপাসনা আছে বলিয়া, হিন্দুদিগকে ঈশ্বরোপাসনা পরিত্যাগ করিতে হইবে কি?” (ধর্মতত্ত্ব : ৫ম অধ্যায়—অনুশীলন), ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার 'সর্বতত্ত্বদর্শী' হিন্দুধর্ম নারীর স্থান সম্পর্কে বলিতে গিয়াও বঙ্কিমচন্দ্র কোঁতের বিষয় এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন :

“হিন্দুধর্ম ইহাও বলে যে স্ত্রীরও স্বামীর ভক্তিপাত্র হওয়া উচিত, কেন না, হিন্দুধর্ম বলে যে স্ত্রীকে লক্ষ্মীরূপা মনে করিবে। কিন্তু এখানে হিন্দুধর্মের অপেক্ষা কোম্ৎ ধর্মের উক্তি কিছু স্পষ্ট এবং শ্রদ্ধার যোগ্য। যেখানে স্ত্রী স্নেহে, ধর্ম বা পবিত্রতায় শ্রেষ্ঠ সেখানে তাঁহারাও স্বামীর ভক্তির পাত্র হওয়া উচিত বটে। গৃহধর্ম ইহারা ভক্তির পাত্র; যাহারা ইহাদের স্থানীয় তাঁহারাও সেইরূপ ভক্তির পাত্র।” (ঐ : ১০ম অধ্যায়—মনুষ্যে ভক্তি)

আজ বিশ্বপ্রীতি, বিশ্বমানবতা, 'One World' বা 'এক জগৎ' কথাগুলি বড় চল। কিন্তু এই কথার মূল ভাব মোটেই নতন নহে। 'পৃথিবী আমার নহে, আমি পৃথিবী ভালবাসিব কেন?' এ প্রশ্নের এই উত্তর দিয়াছেন গুরু প্রমুখাৎ বঙ্কিমচন্দ্র :

“ইউরোপে হিতবাদীদের 'greatest good of the greatest number', কোম্ৎের Humanity পূজা, সর্বোপরি খ্রিষ্টের জাগতিক প্রীতিবাদ, মনুষ্য মনুষ্যে সকলেই এক ঈশ্বরের সন্তান, সুতরাং সকলেই ভাই ভাই, এই সকল উত্তর আছে।” (ঐ : ২১শ অধ্যায়—প্রীতি)

কি ঐহিক, কি পারমার্থিক, সকল বিষয়েই মনুষ্যজাতির জ্ঞানলাভ আবশ্যিক। এই বিষয়ে গুরু-শিষ্যের প্রশ্নোত্তরগুলো বঙ্কিমচন্দ্র কোঁতের ধুববাদের মূল কথাগুলো এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন :

“গুরু!.....জ্ঞানের দ্বারা সমুদায় ভূতকে আপানাতে এবং ঈশ্বরে দেখিতে পাওয়া যায়, ইতিবাক্যে কাহার কাহার পরস্পর সম্বন্ধ জেয় বলিয়া কথিত হইয়াছে?

শিষ্য। ভূত, আমি এবং ঈশ্বর।

গুরু। ভূতকে জানিবে কোন্ শাস্ত্রে?

শিষ্য। বহির্বিজ্ঞানে।

গুরু। অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীতে কোম্‌তের প্রথম চারি—Mathematics, Astronomy, Physics, Chemistry, গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থতত্ত্ব এবং রসায়ন। এই জ্ঞানের জন্য আজিকার দিনে পাশ্চাত্যদিগকে গুরু করিবে। তার পর আপনাকে জানিবে কোন্ শাস্ত্রে?

শিষ্য। বহির্বিজ্ঞানে এবং অন্তর্বিজ্ঞানে।

গুরু। অর্থাৎ কোম্‌তের শেষ দুই—Biology, Sociology, এ জ্ঞানও পাশ্চাত্যের নিকট যাচঞা করিবে।

শিষ্য। তার পর ঈশ্বর জানিবে কিসে?

গুরু। হিন্দুশাস্ত্রে, উপনিষদে, দর্শনে, পুরাণে, ইতিহাসে, প্রধানতঃ গীতায়। (ধর্মতত্ত্ব : পঞ্চদশ অধ্যায়—ভক্তি)

এই শেষোক্ত বাক্যে বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্টই বুঝাইতে চাহেন যে, হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যেই পরমার্থকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু এ সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্বে পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁহার যোগাযোগের কথা আরও একটু উল্লেখ করিতে হইবে। একথা খুবই সত্য যে, বঙ্কিমচন্দ্র সমসাময়িক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পণ্ডিতগণের চিন্তাধারার সঙ্গে সম্যক পরিচিত ছিলেন। জন ষ্টুয়ার্ট মিল, ম্যাথু আর্নল্ড, চার্লস ডারউইন, হার্বার্ট স্পেন্সারের মতবাদের আলোচনা তাঁহার বহু লেখায় তিনি করিয়াছেন। মিলের প্রভাব বঙ্কিমের উপর বিশেষভাবে পড়িয়াছিল। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার লিখিয়াছেন :

“জন ষ্টুয়ার্ট মিলের কথা উঠিল। বঙ্কিমবাবু বলিলেন, ‘এক সময় মিলের আমার উপর বড় প্রভাব ছিল। এখন সে সব গিয়াছে।’ (বঙ্কিম-প্রসঙ্গ, পৃ. ১৯৮)

ইহা ১৮৮৩-৮৪ সনের কথা। কিন্তু ইহার প্রায় দশ বৎসর পূর্বে, ১২৮০ (১৮৭৩ ইং) শ্রাবণ সংখ্যা ‘বঙ্গদর্শনে’ জন ষ্টুয়ার্ট মিলের মৃত্যু উপলক্ষ্য করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যে প্রবন্ধ লেখেন তাহাতে কোঁত সম্বন্ধে মিলের মত আলোচনা করিয়া এইরূপ বলেন :

“মিল ও কোম্‌তের ন্যায় মহামহোপাধ্যায়গণ যে সকল বিষয়ের ঐক্যমত সংস্থাপন করিতে পারেন নাই, তাহার কোন পক্ষের মত সমর্থন করা সামান্য লোকের পক্ষে অবশ্যই অসাধ্য। সুতরাং মতদ্বয় মধ্যে কোন্টি শ্রেষ্ঠ এবং কোন্টি নিকৃষ্ট তদ্বিষয়ে আমরা কোন কথা বলিতে পারি না। কিন্তু এই পর্যন্ত বলিতে ইচ্ছা করি যে মিল, কোম্‌ৎ দর্শন বিচার করিবার জন্য Auguste Comte and Positivism নামক যে পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাহাতে জনসমাজের কথঞ্চিৎ ক্ষতি হইয়াছে। কিন্তু তাহা মিলের অভিপ্রেত নহে বলিয়া তজ্জন্য মিলকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। অনেকে কোম্‌তের গ্রন্থ পাঠ করা দূর হইয়া মিলের গ্রন্থ হইতে তাঁহার মতের সার সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ইহার পরিণাম কেবল এই মাত্র হয় যে যেমন কিছুদিন পূর্বে খ্রিষ্টান মহাশয়েরা সকল কথা না বুঝিয়া কেবল হিন্দু-ধর্মের প্রতি ব্যঙ্গ করিতে পটু হইতেন, মিলকৃত কোম্‌ৎ-ভাষ্যের পাঠক মহাশয়েরাও তদ্রূপ কেবল ব্যঙ্গ করিবার ক্ষমতা লাভ করেন।”

তৎকালিক পাশ্চাত্য ভাবধারায় পুষ্ট এবং প্রথম জীবনে বিশেষভাবে তাঁহার পক্ষপাতী হইয়াও, বঙ্কিমচন্দ্র কিরূপে ‘স্বধর্ম’ ফিরিয়া পাইলেন—হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থাদির মধ্যে তাঁহার জিজ্ঞাসার সদুত্তর জানিতে পারিলেন তাহার আভাস আমরা একটু পূর্বেই পাইয়াছি। এই সম্বন্ধে, আসুন, আমরা এখন তাঁহার নিজের কথা শুনি। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন :

“অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদ্ভূত হইত, ‘এ জীবন লইয়া কি করিব?’ ‘লইয়া কি করিতে হয়?’ সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। অনেক প্রকার লোক-প্রচলিত উত্তর পাইয়াছি, তাহার সত্যাসত্য নিরূপণ জন্য অনেক ভোগ ভুগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি। যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক লিখিয়াছি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, দেশী বিদেশী শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি। জীবনের সার্থকতা সম্পাদন জন্য

প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিয়াছি। এই পরিশ্রম, এই কষ্টভোগের ফলে এইটুকু শিখিয়াছি যে, সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুভূতিতাই ভক্তি, এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই। ‘জীবন লইয়া কি করিব?’ এ প্রশ্নের এই উত্তর পাইয়াছি। ইহাই যথার্থ উত্তর, আর সকল উত্তর অযথার্থ। লোকের সকল জীবনের পরিশ্রমের এই শেষ ফল; এই একমাত্র সফল। তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, আমি এ তত্ত্ব কোথায় পাইলাম। সমস্ত জীবন ধরিয়া, আমার প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া এত দিনে পাইয়াছি। তুমি এক দিনে ইহার কি বুঝবে?” (ধর্মতত্ত্ব : একাদশ অধ্যায়—ঈশ্বরে ভক্তি)

বিষ্ণুমচন্দ্রের এই জীবনব্যাপী জিজ্ঞাসার একটি প্রধান সূত্র পাই ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে শোভা-বাজার রাজবাটীর শ্রাদ্ধ লইয়া অধ্যক্ষ পাদ্রী হেষ্টিংস সহিত তাঁহার বাদানুবাদ হইতে। ইহার পর হইতেই তিনি গভীরভাবে হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়নে অভির্নিবিষ্ট হইলেন। দেবী চৌধুরাণী, রাজসিংহ, সীতারাম—বিষ্ণুমচন্দ্রের এই জিজ্ঞাসারই এক একটি পরিণতি। সর্বশেষে হিন্দু-শাস্ত্রগ্রন্থসার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় তিনি এই জিজ্ঞাসার পূর্ণ উত্তর লাভ করেন। ধর্মতত্ত্ব, কৃষ্ণচরিত্র, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও অন্যান্য শাস্ত্রমূলক আলোচনার মধ্যে তাঁহার জীবনব্যাপী জিজ্ঞাসা ক্রমে সফূর্তি লাভ করে। বিষ্ণুম-সাহিত্যের মূল ধরিতে হইলে বিষ্ণুম জীবন-দর্শনের ক্রমিক অভিব্যক্তির সঙ্গেও আমাদের সম্যক্ পরিচিত হওয়া আবশ্যিক। বিষ্ণুমচন্দ্র হিন্দু ধর্মকেই জগতে ‘সম্পূর্ণ’ ধর্ম বলিয়া গণ্য করিতেন। তাঁহার এই সিদ্ধান্তের হেতুও তিনি এইরূপ দিয়া গিয়াছেন :

“ধর্ম যদি যথার্থ সুখের উপায় হয়, তবে মনুষ্যজীবনের সর্বাংশই ধর্ম কর্তৃক শাসিত হওয়া উচিত। ইহাই হিন্দুধর্মের প্রকৃত মর্ম। অন্য ধর্ম তাহা হয় না, এজন্য অন্য ধর্ম অসম্পূর্ণ; কেবল হিন্দুধর্ম সম্পূর্ণ ধর্ম। অন্য জাতির বিশ্বাস যে কেবল ঈশ্বর ও পরকাল লইয়াই ধর্ম। হিন্দুর কাছে, ইহকাল, পরকাল, ঈশ্বর, মনুষ্য, সমস্ত জীব, সমস্ত জগৎ—সকল লইয়া ধর্ম। এমন সর্বব্যাপী সর্বসুখময়, পবিত্র ধর্ম কি আর আছে?” (ধর্মতত্ত্ব : পঞ্চম অধ্যায়—অনুশীলন)

বিষ্ণুমচন্দ্রের এতাদৃশ মনোবিবর্তন লইয়া এ পর্যন্ত বিশেষ আলোচনা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এ বিষয়ে মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় খুব সম্ভব সর্বপ্রথম ধারাবাহিকভাবে কতকটা আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার এই আলোচনা ‘দার্শনিক বিষ্ণুমচন্দ্র’ পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বিষ্ণুম-সাহিত্য-রসিকের পক্ষে এ পুস্তকখানি অপরিহার্য। বিষ্ণুমের মনোবিবর্তন তথা তাঁহার জীবনের দার্শনিক দিক সম্বন্ধে এখানে খুব অল্পই বলা সম্ভব হইল। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার অবকাশ এখনও রহিয়াছে।

এখন, আমরা এখানে বিষয়বস্তুর বিভাগ সম্বন্ধে কিছু বলিব। বিষ্ণুমচন্দ্রের সাহিত্য-মূলক রচনা, মায় তাঁহার অল্প বয়সের রচনা, এখানে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। সূচী দৃষ্টে ইহা বুঝা যাইবে। এ প্রসঙ্গে একটি কথা আমাদের স্মরণ রাখা দরকার। কি উপন্যাস, কি অন্য পুস্তক—বিষ্ণুমচন্দ্র প্রায় প্রতি সংস্করণেই উহাদের বিস্তর অদলবদল করিতেন। এজন্য তাঁহার জীবিত কালে প্রকাশিত প্রথম ও শেষ সংস্করণের মধ্যে বিভিন্ন পুস্তকের অনেক পাঠভেদ লক্ষিত হয়। এখানে জীবিত কালে প্রকাশিত পুস্তকগুলির শেষ সংস্করণের পাঠই গৃহীত হইল।

প্রথম ভাগ

বাংলা সাহিত্যের পরিপূর্ণি এবং সমাজ-সেবা মূখ্যতঃ এই দুইটি উদ্দেশ্য লইয়া বিষ্ণুমচন্দ্র বঙ্গদর্শন সম্পাদনা ও পরিচালনা সুরু করিলেন। বঙ্গদর্শনের সূচনায় তৎকালীন কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত কৃতিবিদ্য ব্যক্তিকে* তিনি ইহার লেখকগোষ্ঠীভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। বিষ্ণুমচন্দ্রের অন্য কয়েকজন বন্ধু, এবং ঐ সময়ে তরুণ ও পরবর্তী কালে সুপরিচিত ও সুসাহিত্যিক বলিয়া পরিচিত কয়েকজনও ক্রমে ইহার নিয়মিত লেখক† হইয়াছিলেন। কিন্তু

* দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশনাথ রায়, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, রামদাস সেন, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি।

† রাজকৃষ্ণ মন্থোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, সঞ্জীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, (মহামহোপাধ্যায়) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি।

পত্রিকার মান ঠিক রাখিয়া সকল সময় লেখা প্রকাশ করা সুকঠিন ব্যাপার। বিশেষতঃ বঙ্কিমযুগে, যখন বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বলিতে গেলে উচ্চশিক্ষিত মহোদয়গণ বাংলা ভাষাকে কৃপার্মিশ্রিত অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন, সেইযুগে উৎকৃষ্ট রচনাদ্বারা 'বঙ্গদর্শন'ের মত প্রথম শ্রেণীর মাসিকের পৃষ্ঠাপূরণ যে কতদূর কষ্টসাধ্য ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। আবার পত্রিকাখানিকে সাধারণগ্রাহ্য করিয়া তুলিতে হইলে ব্যঙ্গ-কৌতুকপূর্ণ লঘু-রচনাও কিছু কিছু পরিবেশন করা আবশ্যিক। বঙ্কিমচন্দ্র সব্যসাচীর ন্যায় লঘু-গুরু উভয় প্রকার রচনা দ্বারাই 'বঙ্গদর্শন'-এর পৃষ্ঠা পূরণ করিতে লাগিলেন। আর ইহারই প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ আমরা এক চমৎকার সাহিত্য লাভ করিয়াছি। এই অংশের তিনখানি পুস্তক—লোকরহস্য, কমলাকান্ত ও মর্চিরাম গুড়ের জীবনচরিত লঘু অথচ শিক্ষাপ্রদ সাহিত্যের প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

লোকরহস্য : এই নামে 'বঙ্গদর্শন' হইতে সংকলিত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম ব্যঙ্গ-কৌতুকপূর্ণ রচনা-পুস্তক বাহির হয় ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। ইহার প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রে 'কৌতুক ও রহস্য' এইরূপ উল্লেখ ছিল। তখন ইহাতে আটটি মাত্র কৌতুক রচনা সন্নিবেশিত হয়। এ ক'টি প্রকাশিত হয় 'বঙ্গদর্শন' প্রথম সংখ্যা বৈশাখ ১২৭৯ হইতে চৈত্র ১২৮০ বঙ্গাব্দের মধ্যে। প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন :

বিজ্ঞাপন

“এই গ্রন্থে বঙ্গদর্শনের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড হইতে কয়েকটি প্রবন্ধ উদ্ধৃত হইয়া পুনর্মুদ্রিত হইল। এতৎ সম্বন্ধে একটি মাত্র কথা বলা আবশ্যিক। বঙ্গদেশের সাধারণ পাঠকের এইরূপ সংস্কার আছে যে, রহস্য মাত্র গালি; গালি ভিন্ন রহস্য নাই। সুতরাং তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, এই সকল প্রবন্ধে যে কিছু ব্যঙ্গ আছে, তাহা ব্যক্তিবিশেষকে গালি দেওয়া মাত্র। এই শ্রেণীর পাঠকদিগের নিকট নিবেদন যে, তাঁহাদের জন্য এ গ্রন্থ লিখিত হয় নাই—তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া পাঠ না করিলেই আমি কৃতার্থ হইব।

“সামাজিক যে সকল দোষ, তাহাতে রহস্য লেখকের অধিকার সম্পূর্ণ। ব্যক্তিবিশেষের যে দোষ, তাহাতে রহস্য লেখকের কোন অধিকার নাই—কদাচিৎ অবস্থাবিশেষে অধিকার জন্মে; যথা, ভ্রান্ত রাজ-পুরুষের দ্রাস্তিজনিত কার্যের প্রতি, অথবা মূর্খ গ্রন্থকর্তার গ্রন্থের প্রতি, রহস্য প্রযুক্ত। এ গ্রন্থের সে সকল উদ্দেশ্য নহে। এ গ্রন্থে শ্রেণী বিশেষ বা সাধারণ মনুষ্য ব্যতীত ব্যক্তিবিশেষের প্রতি কোন ইঙ্গিত নাই।”

'লোকরহস্য'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৮৮ সনে। ইহাতে বঙ্কিমচন্দ্র ও পরে তদীয় অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' হইতে চারিটি এবং প্রধানতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের অধ্যক্ষতায় পরিচালিত 'প্রচার' হইতে চারিটি একুনে আটটি অতিরিক্ত কৌতুক নিবন্ধ সংযোজিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রও পুস্তকখানির 'দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন'-এ এ বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। 'রামায়ণের সমালোচন' পুরাতন হইলেও এ সংস্করণে প্রায় নতুন করিয়া লিখিয়াছিলেন। এখানিই তাঁহার জীবিতকালের শেষ সংস্করণ।

'লোকরহস্য' সম্বন্ধে এ যাবৎ সুধীজনেরা তেমন আলোচনা করেন নাই। তবে অধ্যাপক ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রমুখ কয়েকজন সাহিত্য-সমালোচক এদিকে কিছু কিছু আলোকপাত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। 'লোকরহস্য' আলোচিত বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র দাসের উক্তি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :

“সামাজিক প্রবন্ধের মধ্যে 'লোকরহস্যই' বঙ্কিমচন্দ্রের অক্ষয় কীর্তি। ইহার অধিকাংশ প্রবন্ধে মানব-চরিত্র সম্বন্ধে লঘু-কৌতুকের মধ্য দিয়া যে বিদ্রুপ-বাণ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, উহা অনেক স্থলে Swift-এর তিক্ত-মধুর ব্যঙ্গের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। 'ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুলের' রস-উচ্ছলতা স্বার্থাক্ষ মানব-পশুর চরিত্রের উপর নিস্মর্মে কষাঘাত; 'গন্দভের' বাঙ্গোক্তিতে তাহাই আরও নিস্মর্ম। 'দাম্পত্য দণ্ডবিধি আইনে' তিনি যে লঘু কল্পনার ইন্দ্রজাল বুনিয়াছেন, তাহাই 'বসন্ত ও বিরহে' ও বিবিধ প্রবন্ধের 'প্রাচীনা ও নবীনা'য় কৌতুক-শ্লিষ্ট রূপ ধারণ করিয়াছে। শেষোক্ত প্রবন্ধে স্ত্রীপুরুষের পারস্পরিক সম্বন্ধটি বিতর্কের মধ্য দিয়া অমীমাংসিত পরিণতির রসচেতনার মধ্যে পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে। 'রামায়ণের সমালোচন'র বিদ্রুপ অতিশয়োক্তি সজ্ঞাত—এইখানে অযোগ্যের আশ্ফালন অযথা সম্মান ভারে লাঞ্চিত হইয়াছে। 'বাবু' প্রবন্ধটি 'লোকরহস্য' একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে। জনমেজয়-বৈশম্পায়ন প্রভৃতি মহাভারতোক্ত চরিত্রের মুখে প্রবন্ধটির বিস্তৃতি সাধন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ইহাকে একটি সুগম্ভীর প্রাচীনত্বের কাঠামে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। মানব-চরিত্র-ব্যাখ্যাতা বৈশম্পায়ন, তথা বঙ্কিমচন্দ্রের বুদ্ধির অত্যর্কিত স্ফূরণ, বিদ্রুপের আকস্মিক বিস্ময়-সৃষ্টি ও সর্বোপরি,

অসুন্দরীশ্চের সর্নিশ্চিত লক্ষ্য-ভেদই 'বাবুকে' চিরদিনের জন্য ধূল্যবলুণ্ঠিত করিয়াছে। আমরা যখন পড়ি—

‘বিষ্ণুর ন্যায় তাহাদিগের দশ অবতার—কেরাণী অবতारे বধ্য অসুর দপ্তরী; মাষ্টার অবতारे বধ্য ছাত্র; গেষ্টশ্যান মাষ্টার অবতारे বধ্য টিকেটহীন পথিক; ব্রাহ্মাবতारे বধ্য চালকলা-প্রত্যাশী পুরোহিত; মৎসুন্দরী অবতारे বধ্য বণিক ইংরাজ; ডাক্তার অবতारे বধ্য রোগী; উকিল অবতारे বধ্য মোয়াকল; হাকিম অবতारे বধ্য বিচারার্থী; জমিদার অবতारे বধ্য প্রজা; সম্পাদক অবতारे বধ্য ভদ্রলোক এবং নিষ্কর্মাবতारे বধ্য পুষ্করিণীর মৎস্য।’

—অমনি চমকিত হইয়া উঠি, পরস্পরের দিকে তাকাই। দেখি, বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের সকলের, এমন কি, তাঁহার নিজের দুর্বলতার উপরও আঘাত করিয়াছেন। তখন, বিদ্রুপের মৃদু আঘাতকেও আমরা সক্রতজ্ঞ হাস্য দ্বারা অভ্যর্থনা করি।” (“বঙ্কিম-স্মৃতি” : বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ-সাহিত্য, পৃ. ১৩২-৩)

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে মিরিয়ম এস্ নাইট ‘সুবর্ণ গোলকের’ অনুবাদ “The Globe of Gold” নামে লন্ডনস্থ “The Indian Magazine and Review”-র মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত করেন।

কমলাকান্ত : এই পুস্তকখানির তিনটি অংশ—কমলাকান্তের দপ্তর, কমলাকান্তের পত্র এবং কমলাকান্তের জোবানবন্দী। কমলাকান্তের সমুদয় রচনা ‘বঙ্গদর্শনে’ প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম অংশ অর্থাৎ কমলাকান্তের দপ্তর স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬২। ১২৮০-৮২ বঙ্গাব্দের মধ্যে ‘বঙ্গদর্শনে’ প্রকাশিত কমলাকান্ত সন্দর্ভগুলি, একুনে এগারটি, ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছিল। ইহার আখ্যাপত্রে ‘প্রথম ভাগ’ এইরূপ উল্লেখিত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ‘প্রথম বারের বিজ্ঞাপনে’ লিখিয়াছেন যে, দপ্তরের মোট চৌদ্দটি সন্দর্ভের মধ্যে ‘চন্দ্রালোকে’, ‘মশক’ এবং ‘স্বীলোকের রূপ’ তাঁহার প্রণীত নহে বলিয়া পুস্তকে এই তিনটি পুনর্মুদ্রিত করেন নাই। কমলাকান্তের দপ্তরের উৎসর্গপত্রে আছে : “উৎসর্গ|পণ্ডিতাগ্রণ্য| শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন মহাশয়কে|এই গ্রন্থ|প্রণয়োপহার স্বরূপ|অর্পিত|হইল।”

এই পুস্তকখানি পরিবর্তিত আকারে প্রকাশিত হয় ১২৯২ বঙ্গাব্দে (১৮৮৫?)। তখন ইহার নূতন নামকরণ হয় “কমলাকান্ত”। কারণ বঙ্কিমচন্দ্র ‘কমলাকান্তের দপ্তর’ ব্যতীত ‘কমলাকান্তের পত্র’ এবং ‘কমলাকান্তের জোবানবন্দী’ ইহাতে সংযোজিত করেন। এই সংস্করণে পুস্তকের পরিত্যক্ত ‘চন্দ্রালোকে’ এবং ‘স্বীলোকের রূপ’ সন্নিবিষ্ট হইল। এই দুইটির লেখক যথাক্রমে অক্ষয়চন্দ্র সরকার এবং রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। ‘মশক’ রচনাটিও অক্ষয়চন্দ্র সরকারের। এটি তাঁহার ‘মোতিকুমারী’তে প্রকাশিত হওয়ায় ‘কমলাকান্তে’ পরিত্যক্ত হইয়া থাকিবে। ‘কমলাকান্তের পত্র’ ও ‘কমলাকান্তের জোবানবন্দী’ শীর্ষক সংযোজনীর বিষয় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত ‘বিজ্ঞাপনে’ দ্রষ্টব্য। ‘কমলাকান্তে’ দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮৮৯) ‘ঢেঁকি’ নামক প্রবন্ধটি নূতন প্রদত্ত হয়।

‘কমলাকান্ত দর্শন’ ও ‘কমলাকান্তি ঢং’ লইয়া এষাবৎ কিছু কিছু আলোচনা হইয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণের সম্পাদকদ্বয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীসজনীকান্ত দাসও এ বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ ভূমিকা লিখিয়াছেন ‘কমলাকান্তে’। ‘কমলাকান্ত-জন্মের ইতিহাস’ বলিয়া ইহার যে উদ্ভব কাহিনী তাঁহারা বিবৃতি করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাঁহাদের মতে বঙ্কিমচন্দ্রের—

“স্বভাবতঃ রহস্যপ্রিয় মন প্রথমটা ‘লোকরহস্য’র সহজ পথে একটা মূর্ত্তির উপায় আবিষ্কার করিয়া কতক সান্থনা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু মাসের পর মাস নিছক রহস্য সৃষ্টি করিয়া তৃপ্ত থাকিবার মত পল্লবগ্রাহী মন বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল না। প্রবহমান সংসারস্রোতের উপরিভাগে আপাত মনোহর তরঙ্গভঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে তীক্ষ্ণধী বঙ্কিমচন্দ্র কখনও গভীর রহস্য-গহনে তলাইয়া যাইতেন, এবং মরণশীল মানবের, এবং বিশেষ করিয়া যে সকল হতভাগ্য জীব তাঁহার আশেপাশে চিন্তাহীন নিঃশঙ্কতায় ভাসমান, তাহাদের ভয়াবহ পরিণতির কথা আপন অন্তরে অনুভব করিয়া হালকা হাসির বৃদ্ধ-বিলাসে তাঁহার মন সায় দিত না। অর্দ্ধান্মাদ নেশাখোর কমলাকান্তের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া তখন তাঁহার উপায় ছিল না। সোজাসৃজি সজ্ঞানে যে সকল কথা বলিতে তিনি সঙ্কেচ বোধ করিতেন, কমলাকান্তের মুখ দিয়া সেই সকল কথা তিনি অসঙ্কেচে বলিতে পারিতেন, এবং এই রহস্যময় পাগলকে কেন্দ্র করিয়া মাসের পর মাস পাঠক ভুলাইতে তাঁহাকে বেগ পাইতে হইত না। এক আধারে ব্যঙ্গের শর্করামণ্ডিত কাব্য, পলিটিঙ্ক, সমাজ-বিজ্ঞান এবং দর্শন পরিবেশনের উপায় সৃষ্টি করিয়া সম্পাদক এবং প্রচারক বঙ্কিমচন্দ্র নিজের কাজ অনেকটা সহজ করিয়া লইলেন। কমলাকান্ত জন্মের ইহাই ইতিহাস।” (“কমলাকান্ত”—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণ, ভূমিকা ৯০)

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত 'কমলাকান্ত'র শাশ্বত রূপ এই ক' ছত্রে সুন্দর ফুটাইয়া তুলিয়াছেন : "কি ভাষার মাধুর্যে, কি ভাবের মনোহারিত্বে, কি শব্দ সংযত সরস রসিকতায়, কি অকৃত্রিম স্বদেশপ্রেমে কমলাকান্ত বঙ্গদর্শনের গৌরব। কমলাকান্ত একাধারে কবি, দার্শনিক, সমাজশিক্ষক, রাজনীতিজ্ঞ, ও স্বদেশপ্রেমিক; অথচ তাহাতে কবির অভিমান, দার্শনিকের আড়ম্বর, সমাজশিক্ষকের অরসজ্ঞতা, রাজনীতিকের কল্পনাহীনতা, স্বদেশপ্রেমিকের গোঁড়ামি নাই। হাসির সঙ্গে করুণের, অদ্ভুতের সঙ্গে সত্যের, তরলতার সহিত মর্মদাহিনী জ্বালার, নেশার সঙ্গে তত্ত্ববোধের, ভাবুকতার সহিত বস্তুতন্ত্রতার, শ্লেষের সহিত উদারতার এমন মনোমোহন সমন্বয় কে কবে দেখিয়াছে?" ("বঙ্কিমচন্দ্র," ১৩২৭, পৃ. ১৯৭)

'কমলাকান্ত' বঙ্কিমচন্দ্র কতখানি মৌলিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন—সে যুগে এ প্রশ্ন উঠিয়াছিল। ইদানিন্তন কালেও এ সম্বন্ধে কমবেশী আলোচনা হইয়াছে। এ সম্পর্কে অক্ষয়কুমারের মত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "কেহ কেহ এখনও জিজ্ঞাসা করে কমলাকান্তের দপ্তরের মৌলিকতা কতখানি? হায় রে অদৃষ্ট! 'মৌলিকতা' 'মৌলিকতা' করিয়া অথবা আপনাদের দেশের সৃষ্টিমাত্রেরই মৌলিকতা সন্দেহ করিতে করিতে দেশটা অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছে। কৈশোরে 'কমলাকান্ত' পাঠ করিবার পর যখন বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়াছিলাম, তখন ইংরেজী সাহিত্যে জ্ঞানার্ভমানী এক ব্যক্তি বড় গম্ভীরভাবে বলিয়াছিলেন, 'ওটা De Quincey's Confessions of an Opium Eater-এর অনূকরণ।' বড় হইয়া বৃদ্ধিয়াছি উহা পিণ্ডিতের যোগ্য উক্তি নয়। কমলাকান্তের দুই দশটা উক্তির অনূরূপ উক্তি বিশাল ইংরেজী সাহিত্যের কোথাও নাই এমন কথা বলিব না, কমলাকান্তের জোবানবন্দী Pickwick Papers-এর Sam-এর জোবানবন্দীর আদর্শে রচিত হইয়াছে তাহাও বিশ্বাস করি, তবু বলিব উহাতে কমলাকান্তের মৌলিকতার হানি হয় নাই।" (ঐ, পৃ. ১৯৭)

'কমলাকান্তের জোবানবন্দী' নাট্যীকৃত হইয়া একাধিকবার অভিনীত হইয়াছে। এই পুস্তকের অন্তর্গত 'কমলাকান্তের দপ্তর'—দ্বাদশ সংখ্যা—"একটি গীত"এর মূল "এসো এসো, বন্ধু এসো" সঙ্গীতটি সম্বন্ধে বঙ্কিমের কনিষ্ঠ সহোদর পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "বঙ্কিম-প্রসঙ্গে" (পৃ. ৫৪-৬৪) বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই কমলাকান্তী টং তাঁহার জীবিত কালে এবং পরেও বহুজন কর্তৃক অনুসৃত হইয়াছিল। চন্দননগরের চারুচন্দ্র রায় কমলাকান্তী চণ্ডে "কমলাকান্তের পত্র" প্রকাশিত করিলে শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর পুস্তকখানির সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি করিয়াছিলেন :

"বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত যদি একটি মানুষ হতো তো এতকাল ধরে সে বেঁচে থাকতেই পারতো না—কিন্তু সে নাকি একটা ধূমকেতুর মতো, তাই থেকে থেকে আসে এবং চলে যায় পৃথিবীর গায়ে আলোর ঝাঁটা বুলিয়ে দিয়ে। বঙ্কিমের যুগে এই ঝাঁটা একবার দেশের গায়ে পড়িছিল।" ("ভারতী"—ফাল্গুন ১৩৩০, পৃ. ১০৭৯)

মুর্চিরাম গুড়ের জীবনচরিত : ১২৮৭, আশ্বিন মাসের 'বঙ্গদর্শনে' (সেপ্টেম্বর ১৮৮০) 'মুর্চিরাম গুড়ের জীবনচরিত' প্রথম প্রকাশিত হয়। স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে গ্রথিত হয় ইহার তিন-চারি বৎসর পরে ১২৯০ বঙ্গাব্দে (ইং. ১৮৮৪)। বেঙ্গল গবর্নমেন্টের এসিষ্ট্যান্ট সেক্রেটারীর পদ লাভের প্রায় এক বৎসর পূর্বে ইহা রচিত হয়। সুতরাং এই পদ পরিত্যাগের বিরক্তিকর অবস্থার সঙ্গে উহার কোন সংস্রব থাকা সম্ভব নয়। সমাজে যে 'মুর্চিরাম গুড়' রহিয়াছে তাহাদের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি নিবন্ধ করাই বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল। বড়ই পরিতাপের বিষয়, বর্তমানে 'মুর্চিরাম গুড়ের' সংখ্যা যেন ক্রমে বাড়িয়াই চলিয়াছে। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত এ পুস্তকখানি সম্বন্ধে লেখেন :

"রাজপদে অনেক অযোগ্য ব্যক্তি সৌভাগ্যবলে অনূচিত সম্মান লাভ করে বটে এবং হয়ত যোগ্যতর অনেক ব্যক্তিও নানা ঘটনাচক্রে উপযুক্তরূপ সম্মান ও পদোন্নতি প্রাপ্ত হইতেন না, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র নিজ জীবনে সরকারের নিকট হইতে কখনও অনাদর পান নাই। এমত অবস্থায় মুর্চিরামের সৃষ্টি কেন এ প্রশ্ন অনেকেরই মনে উঠিতে পারে। তিনি নিজ সার্ব্বসে এবং হয়ত নিজ স্টেশনেই নিজের পার্শ্বে অনেক মুর্চিরাম, ঘটিরাম দেখিয়াছিলেন। তাহাদের ক্রিয়াকলাপ ও তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও সরকারে প্রতিপত্তি নিশ্চয়ই তাঁহার মনে হাস্যরসের উদ্বেক করিয়াছিল। মুর্চিরামে বঙ্কিম পাঠকগণকে সেই হাস্যরসের ভাগ দিয়াছেন। অবশ্য ইহাতে হাস্যরসের সঙ্গে যে বিদ্রূপের বিষজ্বালা মিশ্রিত আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। যাহা নিন্দাহ ও উপহাসযোগ্য বঙ্কিম তাহারই নিন্দা ও উপহাস

করিয়াছেন। মর্চিরাষ-ঘটিরাম ইত্যাদির সৃষ্টি একহিসাবে প্রকৃষ্ট সমাজসেবা.....(‘বঙ্কমচন্দ্র’, পৃ. ২৭৪)

বঙ্কমচন্দ্রের জীবিত কালে এ পুস্তকের একটি সংস্করণই মাত্র প্রকাশিত হয়।

পরিষৎ-সংস্করণ বঙ্কম-রচনাবলীর সম্পাদকদ্বয় ‘লোকরহস্য’র ভূমিকায় এই সকল কৌতুক ও রহস্যমূলক রচনা সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন তাহার কিয়দংশ এখানে উল্লেখ করি :

“বঙ্গদর্শনের সম্পাদক হিসাবে পৃষ্ঠাপূরণের এবং বিবিধ বিষয়ক আলোচনার দ্বারা পত্রিকার অঙ্গসৌষ্ঠব সম্পাদনের জন্য অর্থাৎ সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য সব্যসাচী বঙ্কমকে আপাত-দৃষ্টিতে অত্যন্ত লঘু বিষয় লইয়াও ব্যঙ্গ ও রসিকতার ভঙ্গীতে লেখনী ধারণ করিতে হইয়াছে— ‘কমলাকান্ত’, ‘লোকরহস্য’ ও ‘মর্চিরাষ গুড়ের’ জীবনচরিত’ বঙ্কমচন্দ্রের বিপরীত বা লঘুদিকের পরিচয়। কিন্তু গোপাল ভাঁড়ের গল্প অথবা ঈশ্বর গুপ্তের সমাজবিষয়ক কবিতাগুলি যে অর্থে লঘু, বঙ্কমচন্দ্রের এই সকল হালকা রচনা সে অর্থে লঘু নহে। তাঁহার হাসি বা ব্যঙ্গের অন্তরালে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপমান-লাঞ্ছনার জ্বালা ও বেদনার অশ্রু লুকাইয়া আছে। ‘বিবিধ প্রবন্ধে’ বঙ্কমচন্দ্র যে সকল চরম কথা বলিতে পারেন নাই, ‘লোকরহস্য’ ও ‘কমলাকান্তে’ বিদ্রুপের আবরণে সে সকল কথা অতি সহজেই বলিতে পারিয়াছেন। বাংলাদেশের চিরন্তন গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে হৃতোমের পরেই কমলাকান্তী বঙ্কমের এই বিদ্রোহ।”

দ্বিতীয় ভাগ

এই অংশে ‘বিজ্ঞানরহস্য’, ‘বিবিধ প্রবন্ধ’ এবং ‘সাম্য’ গ্রন্থিত হইয়াছে। মানবসেবা বঙ্কম-চন্দ্রের লক্ষ্য। কাজেই সমাজের উন্নতিমূলক কোন বিষয়ই তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। সকল দিকেই তিনি সব্যসাচীর মত লেখনী পরিচালনা করিয়াছিলেন। এই তিনখানি পুস্তকে তাহা সম্যক্ প্রকটিত হইতেছে।

বিজ্ঞানরহস্য : বঙ্কমচন্দ্র ভারতবর্ষের উন্নতিকল্পে বিবিজ্ঞান, অর্থাৎ পাশ্চাত্য ভূত-বিজ্ঞানের সেবা বা সাধনা যে অত্যাৱশ্যক তাহা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিতেন। এ প্রসঙ্গে তৎকৃত “ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা” প্রবন্ধটির (বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১২৭৯) প্রতি পাঠক-পাঠিকার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করি। ‘বঙ্গদর্শন’ দ্বিতীয় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১২৭৯) হইতে বঙ্কমচন্দ্র বিজ্ঞানবিষয়ক আলোচনার সূত্রপাত করেন। বিজ্ঞানের নবাবিষ্কৃত জটিল তত্ত্বসমূহ সরল ও সরস করিয়া বিভিন্ন প্রবন্ধে ‘বঙ্গদর্শন’ মারফত পরিবেশন করিতেন। এই সকল প্রবন্ধ ১৮৭৫ সনে ‘বিজ্ঞানরহস্য’ নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। তাঁহার জীবিত কালে ইহার আর একটি সংস্করণ মাত্র হইয়াছিল ১২৯১ বঙ্গাব্দে। বঙ্কমচন্দ্রের ষেরূপ ধারা, ‘বঙ্গদর্শন’ হইতে পুস্তকাকারে প্রকাশকালে প্রথম সংস্করণে, এবং দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশকালেও তিনি প্রবন্ধগুলির সংশোধন ও কতকটা রদবদল করেন। প্রথম সংস্করণে ১২৭৯।৮০ সালের ‘বঙ্গদর্শন’ হইতে উদ্ধৃত প্রবন্ধনিচয় মাত্র সংকলিত হয়। এই সংস্করণের বাংলা সূচীপত্রে এগুলির নাম ছিল—আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত, আকাশে কত তারা আছে, ধূলা, গগনপর্য্যটন, চণ্ডল জগৎ, কতকাল মনুষ্য, জৈবনিক, পরিমাণ রহস্য এবং সর্ উইলিয়াম টমাস্ কৃত জীবসৃষ্টির ব্যাখ্যা। প্রথম সংস্করণের ‘বিজ্ঞাপন’টি ছিল এইরূপ :

“বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত হইয়া এই কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। প্রবন্ধগুলি লেখকের সন্তোষজনক হয় নাই—কৃতিবিদ্যা পাঠকেরও হইবার সম্ভাবনা নাই। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আলোচনায় অনেক পুস্তকের সাহায্য প্রয়োজন করে; এ সকল প্রবন্ধ যেখানে লিখিত হইয়াছিল, সেখানে বৈজ্ঞানিক পুস্তক পাওয়া কষ্টকর। অনেক কথা কেবল স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া লিখিত হইয়াছে,—অথচ স্মৃতির ন্যায় বিশ্বাসঘাতিনী কেহ নাই। লিখিত বিষয়ের যথার্থ্য নিরূপণ জন্য অনেক সময় আবশ্যিক, লেখক সময়ভাবে নিতান্ত কাতর। অতএব এই সকল প্রবন্ধে যে অনেক ভ্রান্তি আছে, ইহা নিতান্ত সম্ভব। যিনি যেখানে যে ভ্রম দেখিবেন, অনুগ্রহ করিয়া তাহা লেখককে জানাইবেন, ভবিষ্যতে তাহা সংশোধন করা যাইবে।

“এই সকল প্রবন্ধ প্রধানতঃ হক্সলী, টিণ্ডল, প্রক্টর, লিকিয়র, লায়েল প্রভৃতি লেখকের মতাবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। কোনটিই অনুবাদ নহে। তবে টিণ্ডল সাহেবের ‘Dust and Disease’ নামক প্রবন্ধের সার মর্ম্ম, ‘ধূলা’, গ্লেসর সাহেবের গ্রন্থ হইতে ‘গগনপর্য্যটন’, হক্সলীর ‘Lay Sermons’ হইতে ‘জৈবনিক’, এবং লায়েল সাহেবের ‘Antiquity of Man’ হইতে ‘কতকাল মনুষ্য?’ নামক প্রবন্ধ সংকলিত হইয়াছে।

“লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, আলোচিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সকল সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক, বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীর বালকেরা, এবং আধুনিক শিক্ষিত বাঙ্গালী স্ত্রী, বুঝিতে পারেন। কতদূর এ উদ্দেশ্য সফল হইবে বলিতে পারি না।”

‘বিজ্ঞানরহস্য’র প্রথম সংস্করণে ‘ধূলা’ প্রবন্ধটি যে আকারে গ্রথিত হইয়াছে, ‘বঙ্গদর্শনে’ (ফাল্গুন ১২৭৯) ঠিক সে আকারে ছিল না। পুস্তকে ইহার গোড়ার অংশ পরিত্যক্ত হয়। সেই অংশটি এই :

“আমাদিগের দেশে অন্য যে বিষয়েরই অভাব থাকুক না কেন, কেবল এক বিষয়ের অভাব নাই— বড়ই বিষয়ে ক্ষুদ্রই প্রবন্ধ। আমাদের দেশে অল্প বস্তুর অভাব আছে; কিন্তু দর্শন, বিজ্ঞান, পুরাবৃত্ত, রাজনীতি, সমাজনীতি, ও ধর্মনীতি, এ সকলের অভাব নাই; চাঁদনীর চকে জুতা কিনিলে বিনামূল্যে অনায়াসে শিখিতে পারা যায়। জুতা বাঁধা কাগজ পড়িলেই হইল। স্কুলের ছেলে বিস্তর; উমেদারও অনেক; সকলের চাকরি জুটে না; কাগজ কলম ধার চাহিলে পাওয়া যায়, কেন না কেহ পরিশোধের প্রত্যাশা করে না; মূদ্রাঘণ্টা অতি সুলভ। লিখিতে হইলে ছোট বিষয়ে লেখা অযুক্তি— সুতরাং অল্প বস্তুর যাদৃশ অভাব— বড়ই বিষয়ে প্রবন্ধের তাদৃশ অভাব নাই। আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বিবেচনা হইয়াছিল যে, দর্শন বিজ্ঞানাদির কথা যাহাই হউক, কাব্য সমালোচনা কিছু কঠিন; কেন না দর্শনাদি শিখিলে তদ্বিষয়ে লেখা যায়, কিন্তু কাব্যের সমালোচনা কেবল শিক্ষার বশীভূত নহে। কিন্তু আমাদিগের দেশের সৌভাগ্য যে, তাহারই কিছু ছড়াছড়ি অধিক। মা সরস্বতীই অনুগ্রহ!

দেখিয়া শুনিয়া আমরা স্থির করিয়াছি, আমরা কোন গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিব না। আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধি এবং অল্পজ্ঞান, সুতরাং গুরুতর বিষয়ের সমালোচনায় অক্ষম। কোন সামান্য বিষয় অবলম্বন করিয়া একটি প্রস্তাব লিখিব। এই প্রতিজ্ঞা করিয়া সামান্য বিষয়ের অনুসন্ধান করিতেছিলাম। অনুসন্ধান কালে আমাদের সম্মুখে একজন ‘ঝাড়ুদার’ সম্মাজ্জর্নী হস্তে, রাজপথ পরিষ্কার করিতেছিল, বড় ধূলা উড়াইতেছিল। দেখিয়া আমরা স্থির করিলাম যে, যাহার তত্ত্ব করিতেছিলাম, তাহা পাইয়াছি— আমরা ধূলা সম্বন্ধেই লিখিব। ধূলার মত সামান্য পদার্থ আর সংসারে নাই।

ভাবিলাম যে, ধূলার সম্বন্ধে অনেক নতুন কথা লিখিতে পারিব, যথা; প্রথমতঃ, ধূলায় জল ঢালিলে কাদা হয়; দ্বিতীয়তঃ, ধূলা চক্ষে গেলে কর্কর করে; তৃতীয়তঃ, ধূলা দাঁতে গেলে কির্কির্ক করে; চতুর্থতঃ, রেইলে বড় ধূলা লাগে ইত্যাদি নানাবিধ নতুন এবং বিস্ময়জনক তত্ত্বের আবিষ্করণ করিব, ইচ্ছা করিয়াছিলাম। সকল স্থানে রাস্তা ঘাটে ভাল জল দেওয়া হয় না বলিয়া মিউনিসিপাল কর্মচারী-দিগকে কিঞ্চিৎ সুসভ্য গালিগালাজ করিব, এমতও ইচ্ছা ছিল। মনে করিয়াছিলাম, কাব্যালঙ্কারেও ধূলার প্রয়োজন দেখাইতে পারিব, যথা, ‘ধূলায় ধূসর অঙ্গ,’ ‘ধূলায় মিশাবে দেহ’ ইত্যাদি। বস্তুতঃ আমরা কম্পনা করিয়াছিলাম যে, কোন প্রকারে পাঠক মহাশয়ের ‘চক্ষে ধূলা’ দিব। পারি ত, আপনারাও কিছু ‘ধূলা বাকস পাতা’ উপাঞ্জর্ন করিব।

দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদিগের স্মরণ হইল যে, আচার্য্য টিঙলও ধূলা সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়াছেন। এবং তাহা পাঠ করিয়া ধূলা সামান্য তত্ত্ব বলিয়া বোধ হয় না, অতি গুরুতর এবং দুর্জয়ের বিষয় বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। আচার্য্য স্বয়ং এক জন ইউরোপের মান্য বিজ্ঞানবিৎ মহামহোপাধ্যায়। তিনি বহুদিন অবাধি পরিশ্রম করিয়া ধূলাতত্ত্বের কিয়দংশ জানিতে পারিয়াছেন। সুতরাং সামান্য বিষয় বলিয়া ধূলার উপর যে আদর হইয়াছিল, তাহার লাঘব হইল। আমাদিগের কপালক্রমে ধূলাও সামান্য বিষয় নহে।”

প্রথম সংস্করণের সর্বশেষ প্রবন্ধটি (সর উইলিয়াম টমসনকৃত জীবসৃষ্টির ব্যাখ্যা) পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে একেবারে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

বিবিধ প্রবন্ধ (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ) : এই পুস্তকদ্বয় সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে, ‘বঙ্গদর্শনে’র কথাই আমাদের মনে সর্বপ্রথম উদিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত ‘বঙ্গদর্শন’ বাংলা সাহিত্যে যে নবযুগ সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা আজ সর্বজনস্বীকৃত। ইহার পূর্বে ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’, ‘বিবিধার্থ সংগ্রহ’, ‘রহস্য সন্দর্ভ’, ‘শিক্ষা-দর্পণ প্রভৃতি মাসিক এবং সোমপ্রকাশ, অমৃত বাজার পত্রিকা প্রভৃতি সাপ্তাহিকে যে সকল ভাবধারার ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছিল বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বঙ্গদর্শনে’ যেন ঐসব একটি পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করিল। বিজ্ঞান, দর্শন, সংস্কৃতকাব্য, বাংলা সাহিত্য, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, অর্থনীতি, শিক্ষা, সঙ্গীত, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান, লোকশিক্ষা এমন কোন বিষয় ছিল না যাহা ‘বঙ্গদর্শনে’ প্রবন্ধাকারে আলোচিত না হইত। পুস্তক সমালোচনাও ‘সাহিত্য’ পর্য্যায়ে উল্লীত হইয়াছিল। আর এই সকলের এক বিরাট অংশ, প্রায় পনের আনার লেখক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং। এমনকি সঞ্জীবচন্দ্র-সম্পাদিত ‘বঙ্গদর্শনে’র পরেও ‘প্রচার’ এবং ‘নবজীবনে’ বঙ্কিমচন্দ্র এই সকল বিষয়ক প্রবন্ধের জের টানিয়াছিলেন। তবে

তাঁহার মন তখন হিন্দুধর্মের শাস্ত্র ভাবধারায় আন্দোলিত। ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনাদিই তখন এ সকল আলোচনার প্রধান উপজীব্য। যাহা হউক, বঙ্কিমচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' এবং বঙ্কিমচন্দ্রের অধ্যক্ষতায় পরিচালিত 'প্রচার' হইতে সংকলিত প্রবন্ধের সমষ্টি এই দুই খণ্ডে মোটামুটি সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

'বিবিধ প্রবন্ধ—প্রথম ভাগ' প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে। এখানি 'বিবিধ সমালোচন' (১৮৭৬) এবং 'প্রবন্ধ-পুস্তকে'র (১৮৭৯) সমাহার। 'বিবিধ সমালোচনে' মোট নয়টি প্রবন্ধ ছিল—(১) উত্তরচারিত, (২) গীতিকাব্য, (৩) প্রকৃত ও অতিপ্রকৃত, (৪) বিদ্যাপতি ও জয়দেব, (৫) আৰ্য্যজাতির স্ক্রুশিল্প, (৬) কৃষ্ণচরিত্র, (৭) দ্রৌপদী, (৮) সেকাল আর একাল, এবং (৯) শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেসুদিমোনা। এ সমুদয়ের মধ্যে 'কৃষ্ণচরিত্র' "বিবিধ প্রবন্ধ প্রথম ভাগে" স্থান পায় নাই। পরবর্তী কালে 'কৃষ্ণচরিত্র' সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মত বদলায় এবং তিনি এই শীর্ষে একখানি বিরাট নতুন গ্রন্থ লেখেন। "কৃষ্ণচরিত্র" প্রবন্ধটি 'বঙ্গদর্শন' হইতে অন্যত্র পরিবেশিত হইল। 'সেকাল আর এক কাল'ের নাম দেওয়া হইল 'অনুকরণ'। বঙ্কিমচন্দ্র 'বিবিধ সমালোচন' প্রকাশকালে এ সমুদয় সমালোচনার স্থানে স্থানে যথার্থীতি অদলবদল করিয়াছিলেন। পুস্তকের 'বিজ্ঞাপনে' তিনি লেখেন : "বঙ্গদর্শনে মৎপ্রণীত যে সকল গ্রন্থ-সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কতকগুলি পরিত্যাগ করিয়াছি। যে কয়টি প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত করিলাম, তাহার কিয়দংশ স্থানেই পরিত্যাগ করা হইয়াছে। আধুনিক গ্রন্থের দোষগুণ বিচার প্রায়ই পরিত্যাগ করা গিয়াছে। যে যে স্থানে সাহিত্যবিষয়ক মূলকথার বিচার আছে, সেই সকল অংশই পুনর্মুদ্রিত করা হইয়াছে।"

"প্রবন্ধ-পুস্তকে" মুদ্রিত হয় দশটি প্রবন্ধ—(১) বাঙ্গালীর বাহুবল, (২) ভালবাসার অত্যাচার, (৩) জ্ঞান, (৪) সাংখ্যদর্শন, (৫) হিন্দুধর্মের নৈসর্গিক মূল, (৬) ভারত কলঙ্ক, (৭) ভারত-বর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা, (৮) প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি, (৯) প্রাচীনা এবং নবীনা—তিন রকম, এবং (১০) বৃড়া বয়সের কথা। 'বৃড়া বয়সের কথা' পরে কমলাকান্তে স্থান পাইয়াছে। 'হিন্দুধর্মের নৈসর্গিক মূল' কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত ও সংশোধিত হইয়া "বিবিধ প্রবন্ধ—দ্বিতীয় ভাগে" প্রকাশিত হয় 'ঐদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র কি বলে' এই নামে। 'প্রবন্ধ-পুস্তকে'র বিজ্ঞাপনটি এই :

"এই গ্রন্থে যে কয়টি প্রবন্ধ সংগৃহীত হইল তাহা সকলই 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হইয়াছিল। কোন কোন প্রবন্ধের স্থানে স্থানে কিছু কিছু পরিত্যাগ করা গিয়াছে। কখনও বা প্রবন্ধের নাম পরিবর্তন করা গিয়াছে।

"এই জাতীয় আরও কয়েকটি মৎপ্রণীত প্রবন্ধ 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হইয়াছিল। নানা কারণে সেগুলি এক্ষণে পুনর্মুদ্রাক্ষকের অযোগ্য বিবেচনা করিলাম।"

এখন, 'বিবিধ প্রবন্ধ—দ্বিতীয় ভাগ' সম্বন্ধে আলোচ্য। এখানি প্রকাশিত হয় ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে। দ্বিতীয় ভাগে প্রবন্ধ-সংখ্যা মোট বাইশটি—ইহার অধিকাংশ 'বঙ্গদর্শনে' এবং অল্প ভাগ 'প্রচারে' প্রকাশিত হইয়াছিল। এই ভাগের 'বিজ্ঞাপনে' 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধটির প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র পাঠক-পাঠিকাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেন। ইহাতে তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, "মনুষ্য কি?" ইতি শীর্ষক প্রবন্ধ, জন্ স্টুয়ার্ট মিলের জীবনচরিতের সমালোচনার ভগ্নাংশ মাত্র। ধর্মতত্ত্ব নামক গ্রন্থে যে অনুশীলনধর্ম বঝাইয়াছি, তাহার বীজ ইহাতে আছে।" এই প্রবন্ধটি তিনি 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত করেন আশ্বিন ১২৮৪ বঙ্গাব্দে। এই ভাগের 'রামধন পোদ' শীর্ষক প্রবন্ধটির নাম ছিল "আহার versus বিবাহ"। এটি বাহির হয় ভাদ্র ১২৮৮ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে'। একটু আগে বলিয়াছি, "ঐদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র কি বলে?" শীর্ষক রচনা "বিবিধ প্রবন্ধ—দ্বিতীয় ভাগে" প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটি 'বঙ্গদর্শনে' কিন্তু বাহির হইয়াছিল "মিল, ডার্বিন এবং হিন্দুধর্ম" এই শিরোনামে। "প্রবন্ধ-পুস্তকে" প্রকাশিত এই প্রবন্ধের আরম্ভে নিম্নের অংশ ছিল :

"নব্য বাঙ্গালী সম্প্রদায় প্রচলিত হিন্দুধর্মকে উপধর্মপরিপূর্ণ এক বিষময় ফলের আধারস্বরূপ জানেন। যে পুর্ষপুরুষগণ ইহার উদ্ভাবন এবং সংস্করণ করিয়াছিলেন, এবং যাহারা ইহাতে বিশ্বাস করেন, তাহাদিগকে আমরা ঘোরতর মূর্খ মনে করি। এদিকে আবার সেই পুর্ষপুরুষগণের প্রণীত কাব্য ও দর্শনাদি দেখিয়া তাহাদিগকে মহাত্মা মনে করি। এরূপ মহাত্মা এবং মূর্খতা কি প্রকারে একত্র সংঘট হইল, এ প্রশ্ন একবারও আমাদের মনে উদয় হয় না। বাস্তবিক পৌরাণিক ধর্ম বিশ্বাস কি

এরূপ ঘোরতর মূর্খতা? যাহা তিন সহস্র বৎসর অবাধে কোটি কোটি মনুষ্যের ভক্তির বিষয় হইয়া আসিতেছে, সর্ববিজয়ী বৌদ্ধধর্ম যাহার নিকট পরাভূত হইল, তাহা কি কেবল মূর্খতার ফল? তাহার কি কোন নৈসর্গিক ভিত্তি নাই? না থাকিলে এত বল হইবে কেন?

“এই নৈসর্গিক ভিত্তির আমরা অনুসন্ধান প্রবৃত্ত হইব। কিন্তু পূর্বকালে এই ভিত্তি যে আকারে আর্ষ্যগণের চক্ষে দীপ্যমান হইয়াছিল, আমরা তাহা আর খুঁজিয়া পাইব না। তাহারা কি প্রকারে চিন্তা করিতেন, কি প্রণালীতে বিচার করিতেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। আমরা যাহা অনেক অনুসন্ধান করিয়া, অনেক বিচার করিয়া স্থির করি, তাহারা হয়ত তাহা কেবল আভ্যন্তরিক দৃষ্টিতে দেখিতে পাইতেন। আমরা সে পথে যাইব না—গেলে কিছু বুঝিতে পারিব না, কিছু বুঝাইতে পারিব না। এখন কোন তত্ত্বের নৈসর্গিক ভিত্তি বুঝাইতে গেলে, ইউরোপীয় বিজ্ঞানের আলোকে তাহা স্পষ্টীকৃত করিতে হইবে। নহিলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে কেহ বুঝিবে না। আমরা এ বিচারে একজন ইউরোপীয় দার্শনিক এবং একজন ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদের আশ্রয় গ্রহণ করিব। মিল ও ডার্বিন আমাদের পথ দেখাইয়া দিবেন।”

বঙ্কিমচন্দ্র ‘বিবিধ প্রবন্ধ’ প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ গ্রন্থন কালে প্রবন্ধগুলির কোন শ্রেণী-বিভাগ করেন নাই। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত পরিষ্কৃত-সংস্করণের জন্য উহার এইরূপ শ্রেণী বিভাগ করেন : সাহিত্য (৭টি প্রবন্ধ), প্রত্নতত্ত্ব (৪টি), ইতিহাস ও অর্থনীতি (১০টি), দর্শন ও ধর্ম (১০টি) এবং বিবিধ (৭টি)। প্রত্নতত্ত্ব এবং ঐতিহাসিক নিবন্ধগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্র যে কীরূপ অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সে সম্বন্ধে তাহাদের অভিমত লিখিয়া গিয়াছেন। ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলির সম্পর্কে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সূচীভিত্তিক মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :

“মৃগালিনী, দুর্গেশনন্দিনী, সীতারাম, রাজসিংহ প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপন্যাস ব্যতীত বঙ্গদেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রকাশিত কতকগুলি প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদেশে প্রথম ঐতিহাসিক আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছিলেন। এই সকল প্রবন্ধ সাধারণতঃ দুইটি বৃহৎ ভাগে বিভক্ত হইতে পারে—“ভারত-কলঙ্ক বা বাঙ্গালার কলঙ্ক” এবং “বাঙ্গালীর উৎপত্তি”। তখনও বিদেশীয় ঐতিহাসিকগণ ভারতের ইতিহাস-রচনায় আধুনিক বিজ্ঞানানুগোচিত প্রণালী অবলম্বন করেন নাই। যাহারা ভারতবর্ষে অবস্থান করিয়া ইতিহাস রচনা করিতেন, তাহারা তখনও এই প্রণালীর নাম পর্যন্ত শুনিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ।... এই যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী হইতে কতকগুলি ঐতিহাসিক সত্য নিঃসৃত হইয়াছিল, বিগত অষ্ট শতাব্দীর শত শত নূতন আবিষ্কারেও তাহাদিগের সত্যতা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র এই ঐতিহাসিক সত্যগুলি মহাজন উক্তির মতন বলিয়া যান নাই; এখন আমরা যেমন করিয়া ঐতিহাসিক সত্য প্রমাণ করিবার চেষ্টা করি, বহু সত্যাসত্যের মধ্য হইতে যেমন করিয়া ঐতিহাসিক সার সত্যটুকু বাছিয়া লইতে যত্ন করি, তিনিও তেমন করিয়া সেইরূপ প্রণালী অবলম্বনেই তাহার উক্তিগুলির সত্যতা প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। তাহার ‘ভারত-কলঙ্ক’ প্রবন্ধ প্রকাশের পর বিয়াল্লিশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে এবং ‘বাঙ্গালার কলঙ্ক’ প্রকাশের পরে ত্রিশ বৎসর অতীত হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাবধি যে সমস্ত প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার কোনটিই বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধবাদী বলিয়া বোধ হয় না। এখনও কোন লেখক এমন কথা বলিতে সাহস করেন নাই যে, মুসলমানগণ যত সহজে প্রাচীন সিরিয়া বা পারস্যদেশ অধিকার করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষও সেইরূপ অনায়াসে অধিকৃত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র মৃগালিনীতে লক্ষ্মণ সেনের নবদ্বীপ হইতে পলায়নের কথা বিবৃত করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনিই প্রথমে সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গবিজয়ের অসম্ভবতা প্রমাণের জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তখনও ‘তবকাৎ-ই-নাসিরি’র কোন বিশ্বাসযোগ্য সংস্করণ মূদ্রিত হয় নাই, ‘বাভার্ট’র অনুবাদ মূদ্রিত হয় নাই, তখন ইলিয়ট কর্তৃক প্রকাশিত ‘তাজ-উল-মাসি’র ও ‘তবকাৎ-ই-নাসিরি’র সারাংশমাত্রই এতদেশীয় লেখক ও পাঠকবর্গের একমাত্র অবলম্বন ছিল। আর সেই কালে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালার মুসলমান বিজয় সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রশ্ন করিয়াছিলেন তাহা শূন্যে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়।” (“নারায়ণ”—বৈশাখ ১৩২২, পৃ. ৫৯৭-৮)

“বাঙ্গালীর উৎপত্তি সম্বন্ধেও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য :

“ঐতিহাসিক বলিতে বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় কীর্তি বাঙ্গালীর বিশ্লেষণ। ১২৮৭ সালের পৌষ মাস হইতে ১২৮৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বাঙ্গালীর উৎপত্তি’ নামক প্রবন্ধ ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রন্থকার প্রতিপাদ্য বিষয় সাত ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন এবং সর্বশেষে প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালা দেশের অধিবাসিগণ বিশুদ্ধ আর্ষ্যবংশ-সম্ভূত নহেন। ‘বাঙ্গালার মধ্যে বিস্তর অনাৰ্য্য। অন্য কোন আর্ষ্যদেশে অনাৰ্য্য শোণিতের এত প্রবল স্রোত বহে না।’ তেত্রিশ বৎসর পূর্বে আর্ষ্যভাষিমানী বাঙ্গালা দেশে এই কথা বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যে সৎ সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা তাহার অসামান্য প্রতিভার প্রমাণ দান করে।” (ঐ. পৃ. ৬০৪-৫)

সাম্য : 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত তিনটি প্রস্তাব (জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ১২৮০ ও কার্তিক ১২৮২) এবং "বঙ্গদেশের কৃষক" নামীয় ধারাবাহিক প্রবন্ধের কয়দংশ লইয়া 'সাম্য' ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 'সাম্যে' প্রচারিত মত পরবর্তী কালে বঙ্কিমচন্দ্র 'ভুল' বিবেচনা করিতেন। এজন্য তিনি ইহা আর পুনর্মুদ্রণ করান নাই। 'সাম্যে' মিলের মতামত অনেক স্থান পাইয়াছিল।

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার লিখিয়াছেন :

"বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'এক সময়ে মিলের আমার উপর বড় প্রভাব ছিল, এখন সে সব গিয়াছে।' নিজের লিখিত প্রবন্ধের কথা উঠিলে বলিলেন, 'সাম্যটা সব ভুল, খুব বিক্রয় হয় বটে, কিন্তু আর ছাপাব না।' ("বঙ্কিম-প্রসঙ্গ," পৃ. ১৯৮)

সাম্য বিলুপ্ত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র "বিবিধ প্রসঙ্গ—দ্বিতীয় ভাগে" 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ সন্নিবিষ্ট করেন। 'সাম্যের' বিষয়বস্তুর আলোচনা প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত অন্যান্য কথার মধ্যে বলেন :

"সে যাহা হউক, বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত তিনটি প্রস্তাবের প্রথম প্রস্তাবে বঙ্কিম সাধারণভাবে সমাজে ছোট বড়, ধনী দরিদ্র, বিজিত বিজেতা, রাজপুরুষ ও সাধারণ প্রজা, সুন্দর অসুন্দর, বুদ্ধিমান মূর্খ প্রভৃতি নানাবিধ বৈষম্যের কথা আলোচনা করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে প্রাচীন ভারতে উৎকট বর্ণবৈষম্যজনিত সামাজিক মর্যাদা ও অধিকারের তারতম্য লোপের জন্য বুদ্ধদেব কর্তৃক চেষ্টার কথাও আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রস্তাবে রুসো ও তৎসমসাময়িক ফরাসী সমাজের অবস্থা এবং তৃতীয় প্রস্তাবে বঙ্গীয় সমাজে স্ত্রীপুরুষে অধিকারবৈষম্যের কথা বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল বৈষম্য প্রদর্শন করিবার সময় বঙ্কিমচন্দ্র অনেক স্থলেই সমর্চিত ধীরতা ও নিরপেক্ষতা রক্ষা করিতে পারেন নাই।" ("বঙ্কিমচন্দ্র", পৃ. ২২৬)

তৃতীয় ভাগ

এই ভাগে 'কৃষ্ণচরিত্র', 'ধর্মতত্ত্ব', শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' এবং 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম'—হিন্দুধর্ম-বিষয়ক এই গ্রন্থ চতুর্দশ সন্নিবেশিত হইল। বঙ্কিমচন্দ্রের মনোবিবর্তন ক্রমে ক্রমে কি ধারায় ঘটিতেছিল তাহার কিঞ্চিৎ আভাস আমরা আরম্ভে দিতে প্রয়াস পাইয়াছি। পাশ্চাত্য দর্শন ও ভাবধারার আলোচনায় তাঁহাকে ধীরে ধীরে অন্তর্মুখী করে এবং শেষে হিন্দু দর্শন ও শাস্ত্র, বিশেষ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় তিনি "সম্পূর্ণ" হিন্দুধর্ম উপলব্ধি করেন। তিনি 'নবজীবন' ও 'প্রচারে' ধারাবাহিকভাবে হিন্দুধর্মবিষয়ক তিনটি প্রবন্ধ লিখিতে শুরু করেন। এই তিনটি প্রবন্ধের একটি অনুশীলনধর্মবিষয়ক, দ্বিতীয়টি দেবতত্ত্ববিষয়ক এবং তৃতীয়টি কৃষ্ণচরিত্র।

কৃষ্ণচরিত্র : দুই বৎসরের মধ্যেও উক্ত প্রবন্ধের শেষ না হওয়ায়, বঙ্কিমচন্দ্র অগত্যা ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহার একটি 'কৃষ্ণচরিত্র—প্রথম ভাগ' শিরোনামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিলেন। ইহার 'বিজ্ঞাপনে' তিনি লেখেন, "আগে অনুশীলন ধর্ম পুনর্মুদ্রিত হইয়া তৎপরে কৃষ্ণচরিত্র পুনর্মুদ্রিত হইলেই ভাল হইত। কেননা 'অনুশীলন ধর্ম' যাহা তত্ত্ব মাত্র, কৃষ্ণচরিত্রে তাহা দেহবিশিষ্ট। অনুশীলনে যে আদর্শে উপস্থিত হইতে হয়, কৃষ্ণচরিত্র কস্মিক্ষেত্রস্থ সেই আদর্শ। আগে তত্ত্ব বুঝাইয়া, তারপর উদাহরণের দ্বারা তাহা স্পষ্টীকৃত করিতে হয়। কৃষ্ণচরিত্র সেই উদাহরণ।"

বঙ্কিমচন্দ্র ১২৮১ চৈত্র সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' অক্ষয়চন্দ্র সরকার কর্তৃক সম্পাদিত 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহের' আলোচনা কালে 'কৃষ্ণচরিত্র' সম্বন্ধে স্বীয় অনুসন্ধিৎসার পরিচয় প্রদান করেন। এই অনুসন্ধিৎসা কখনও ক্ষান্ত না হইয়া ক্রমশঃ চরিতার্থতাই খুঁজিতেছিল। ১২৯১ আশ্বিন সংখ্যা হইতে 'প্রচারে' কৃষ্ণচরিত্র ধারাক্রমে প্রকাশিত হইতে থাকে। 'কৃষ্ণচরিত্র, প্রথম ভাগে' ইহা গৃহীত হয় (ইং. ১৮৮৬)। প্রথম ভাগ গ্রন্থনের পরও, 'প্রচারে' পরবর্তী আরও কিছু অংশ বাহির হয়। ইহার পর একেবারে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে 'কৃষ্ণচরিত্র' সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। ইহার 'বিজ্ঞাপনে' বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন :

"আমি বলিতে বাধ্য যে, প্রথম সংস্করণে যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছিলাম, এখন তাহার কিছু কিছু পরিত্যাগ এবং কিছু কিছু পরিবর্তিত করিয়াছি। কৃষ্ণের বাল্যলীলা সম্বন্ধে বিশিষ্টরূপে এই কথা আমার বক্তব্য। এরূপ মত পরিবর্তন স্বীকার করিতে আমি লজ্জা করি না। আমার জীবনে

আমি অনেক বিষয়ে মত পরিবর্তন করিয়াছি—কে না করে? কৃষ্ণ বিষয়েই আমার মত পরিবর্তনের বিচিত্র উদাহরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ‘বঙ্গদর্শনে’ যে কৃষ্ণচরিত্র লিখিয়াছিলাম, আর এখন যাহা লিখিলাম, আলোক অন্ধকারে যতদূর প্রভেদ, এতদূর ভয়ে ততদূর প্রভেদ। মত পরিবর্তন, বয়োবৃদ্ধি, অনুসন্ধানের বিস্তার এবং ভাবনার ফল।”

বঙ্কিমচন্দ্র ‘কৃষ্ণচরিত্রে’ যে কিরূপ গভীর ও ব্যাপক গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা হীরেন্দ্রনাথ দত্ত “দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র” পুস্তকে ‘প্রত্নতাত্ত্বিক বঙ্কিমচন্দ্র’ এবং “বঙ্কিমচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ” এই দুটি অধ্যায়ে বিশেষভাবে দেখাইয়াছেন। হীরেন্দ্রনাথ বলেন :

“প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান অবদান—‘কৃষ্ণচরিত্র’। ‘কৃষ্ণচরিত্র’ একাধারে ধর্মতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব। ধর্মতত্ত্বের কথা এখানে কিছু বলিব না, কিন্তু কি প্রকারে ও প্রণালীতে প্রত্নতত্ত্বের আলোচনার প্রবৃত্তি হইতে হয়—পাঠক যদি তাহা শিখিতে চান, তবে নিবিড় ভাবে এই ‘কৃষ্ণচরিত্র’ অধ্যয়ন করুন।

“বঙ্কিমচন্দ্র ‘কৃষ্ণচরিত্রে’ প্রথমতঃ মহাভারতের ঐতিহাসিকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন—তিনি নিপুণভাবে দেখাইয়াছেন, মহাভারত কল্পনামূলক কাব্য নয়, অনেকাংশে প্রামাণিক ইতিহাস (History)। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, যে সকল প্রাচীন গ্রন্থে কৃষ্ণের বৃত্তান্ত পাওয়া যায়, তন্মধ্যে মহাভারতই প্রাচীনতম—তাহার পর হরিবংশ ও পুরাণ (ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি)। হরিবংশ মহাভারতের খিলপর্ষ—হরিবংশেই উল্লেখ আছে, উহা মহাভারতের পরিশিষ্টরূপে রচিত।” (“দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র”, পৃ. ১৫৮)

বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করিতেন এবং “ধর্মতত্ত্ব” চতুর্থ অধ্যায়ে তাহা স্পষ্টতঃ বিবৃতও করিয়াছেন। কিন্তু তিনি লিখিয়াছেন, “কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার মানবচরিত্র সমালোচন করাই আমার উদ্দেশ্য”। (“কৃষ্ণচরিত্র”—দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন)

ধর্মতত্ত্ব : ‘কৃষ্ণচরিত্র’ প্রসঙ্গে ‘অনুশীলনধর্মবিষয়ক’ আলোচনার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত ‘নবজীবনে’ প্রথম সংখ্যা (১২৯১, শ্রাবণ) হইতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে। ১২৯২, চৈত্র পর্য্যন্ত, কোন কোন সংখ্যা বাদ দিয়া ‘ধর্ম জিজ্ঞাসা’, ‘মনুষ্যতত্ত্ব’, ‘অনুশীলন’, ‘সুখ’, ‘ভক্তি’, ‘প্রীতি’, ‘দয়া’, এরূপ বিভিন্ন নামে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধ-নিচয় কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া এবং আরও কয়েকটি নতুন প্রবন্ধ সন্নিবেশিত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র “ধর্মতত্ত্ব। প্রথম ভাগ। অনুশীলন” এই নামে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র গুরু-শিষ্যের কথোপকথনচ্ছলে পুস্তকখানিতে ‘ধর্মতত্ত্ব’ বঝাইয়াছেন। বিষয় পুরাতন হইলেও বাচনভঙ্গী নতুন। তাঁহারই কথায়, “তোমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর লোক—ঊনবিংশ শতাব্দীর ভাষাতেই তোমাদিগকে বঝাইতে হয়। ভাষার প্রভেদ হইতেছে বটে, কিন্তু সত্য নিত্য” (“ধর্মতত্ত্ব” : একাদশ অধ্যায়—ঈশ্বরে ভক্তি)। দীর্ঘকাল যাবৎ প্রতীচ্য প্রাচ্য শাস্ত্র-গ্রন্থাদি পঠন, মনন ও অনুধ্যানের ফলে বঙ্কিমচন্দ্র যে সত্যে উপনীত হইয়াছিলেন তাহাই ‘ধর্মতত্ত্বে’ বর্ণিত হইয়াছে। তাই হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ‘দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র’ (পৃ. ৬১) এই উক্তি করিয়াছেন,—“বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বোত্তম দার্শনিক অবদান তাঁহার ‘ধর্মতত্ত্ব’।” বঙ্কিমচন্দ্র ‘ধর্মতত্ত্বে’ যে কয়টি বিষয় বঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা তাঁহারই ভাষায় সংক্ষেপে এই :

“১। মনুষ্যের কতকগুলি শক্তি আছে। আমি তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছি। সেইগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব।

২। তাহাই মনুষ্যের ধর্ম।

৩। সেই অনুশীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য।

৪। তাহাই সুখ।”

—“কৃষ্ণচরিত্র” ২য় সং. ১৮৯২—উপক্রমণিকা : ‘গ্রন্থের উদ্দেশ্য’।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত “দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র” পুস্তকে ‘বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব’ অধ্যায়ের পাঁচটি নিবন্ধে (পৃঃ ৬১-১২৪) এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ধর্মতত্ত্বের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইহাতেও অনেক পরিবর্তন দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং ইহার সংশোধন করেন। ‘ধর্মতত্ত্ব। প্রথম ভাগ’—হইতে মনে হয়, এখানির পরে আর কিছু লিখিয়া, অন্ততঃ আর একখণ্ড প্রকাশ করা বঙ্কিমচন্দ্রের অভিপ্রেত ছিল। কিন্তু জীবনের পরিমাপে তাহা হইয়া উঠে নাই।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা : বঙ্কিমচন্দ্র 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'কে পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মগ্রন্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম স্থান দিয়াছেন। কাজেই ধর্মশাস্ত্র আলোচনা কালে তিনি ইহার আলোচনাও যে লিপ্ত হইবেন তাহা সহজেই অনুমেয়। বস্তুতঃ ১২৯৩, শ্রাবণ সংখ্যা 'প্রচারে' তিনি ইহার ব্যাখ্যান আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। গীতার মাত্র দ্বিতীয় অধ্যায় পর্য্যন্ত ব্যাখ্যান ১২৯৫ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায় সমাপ্ত হয়। ইহার পর তৎকৃত গীতা-ব্যাখ্যা আর কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু চতুর্থ অধ্যায়ের ১৯শ শ্লোক পর্য্যন্ত ব্যাখ্যান পাণ্ডুলিপি অবস্থায় ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পরে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তাহার দৌহিত্র দিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রচারে' প্রকাশিত এবং পাণ্ডুলিপি অবস্থায় প্রাপ্ত অংশ কালীপ্রসন্ন সিংহকৃত অবশিষ্ট ভাগের মূল ও অনুবাদদ্বারা সম্পূর্ণ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। এখানে বঙ্কিমকৃত অংশই মূদ্রণপ্রমাদ সংশোধনান্তর প্রকাশিত হইল।

হীরেন্দ্রনাথ পূর্বেলিখিত পুস্তকে 'বঙ্কিমচন্দ্র ও ভগবদ্গীতা' এবং 'বঙ্কিমচন্দ্র ও গীতার ধর্ম' শীর্ষক দুইটি অধ্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র-ব্যাখ্যাত গীতাতত্ত্বের বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। যৌবনে হীরেন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখাৎ গীতা সম্বন্ধে যে সব মন্তব্য শুনিয়াছিলেন তাহা উক্ত পুস্তকের পরিশিষ্টে 'গীতার কথা'য় উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহা হইতে জানা যায় যে, বঙ্কিমচন্দ্রের দৃঢ় ধারণা ছিল দ্বাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দর্শনের পরই গীতার পরিসমাপ্তি, অবশিষ্ট ছয় অধ্যায় পরবর্তী কালের সংযোজন। দত্তজা বলেন, মূল ভগবদ্গীতার "অধ্যায় ও শ্লোক সংস্থান (arrangement) অন্যরূপ ছিল। গীতার বর্তমান আকারে পুনঃ সংস্থানের সময় কতকগুলি শ্লোক বিপর্য্যস্ত হইয়া দ্বাদশ হইতে অষ্টাদশ অধ্যায়ের স্থানে স্থানে নিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু তথাপি বঙ্কিমবাবুর একথা ঠিক যে বিশ্বরূপদর্শন অধ্যায়েই গীতার পরিসমাপ্তি।" ("দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র", (৫) পরিশিষ্ট, পৃ. ২১৫)

দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম : এখানি বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিত কালে পুস্তকাকারে তো গ্রথিত হয়ই নাই, সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণ প্রকাশের পূর্বে ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও কেহ কোনরূপ আলোচনা করেন নাই। অথচ "কৃষ্ণচরিত্রে"র 'প্রথমবারের বিজ্ঞাপনে' দেবতত্ত্ববিষয়ক রচনাটির সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে এই রচনাটি 'প্রচারে' প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষে ধারাক্রমে বঙ্কিমচন্দ্র প্রকাশিত করেন। ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের ২৯শে শ্রাবণ শ্রীরামপুর মহাকুমা বঙ্কিমশত-বার্ষিকী উৎসবের সভাপতির অভিভাষণে শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস সর্বপ্রথম বঙ্কিমচন্দ্রের এই রচনাটির অস্তিত্বের কথা সাধারণের গোচরে আনেন। এই পুস্তকের নামকরণও তাহারই।

বঙ্কিমচন্দ্র এই চারিখানি গ্রন্থে জীবদ্দশায় যতদূর সম্ভব ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন এবং ইহা করিয়াছেন সমসাময়িকদের ভাষায় তাহাদেরই উপযোগী করিয়া। বঙ্কিমচন্দ্রের শাস্ত্রালোচনা সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র দত্তের উক্তি উল্লেখ করিয়া বর্তমান আলোচনা শেষ করিব :

"জীবনের শেষ দশ বৎসর তিনি ধর্ম সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছিলেন।...তিনি হিন্দুধর্মের যেরূপ আলোচনা করিয়াছেন, তাহা আধুনিক সময়ের একটি লক্ষণ—একটি চিহ্নস্বরূপ। অনৈক্য স্থলে ঐক্য সংগঠন, অনুদার মত ও আচারের স্থলে উদার মত ও আচার সংস্থাপন, নিষ্কর্মেব অনুষ্ঠানের স্থলে প্রাচীন ধর্মের সঞ্জীবনী শক্তি প্রচারকরণ, অজ্ঞানতার ও মূর্খতার স্থলে হিন্দুধর্মের জ্ঞানবিতরণ, অবনতির স্থলে উন্নতির পথ প্রদর্শন,—এইরূপ ইচ্ছা, এইরূপ ভাব, এইরূপ আশা, আজি বঙ্গসমাজে কিছ্রু কিছ্রু অনুভূত হইতেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থগুলি এই ইচ্ছা, এই ভাব ও এই আশার বিকাশ মাত্র। বঙ্গদেশীয় হিন্দুগণ ক্রমশঃ ঐক্যলাভ করিতে শিখিতেছেন,—প্রাচীন ধর্মজ্ঞান এবং উদার আচার ও অনুষ্ঠান সেই ঐক্য সাধনের একমাত্র মন্ত্র।" ("সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা", ১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩০১)

চতুর্থ ভাগ

এই ভাগে "সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকা", "সাময়িক পত্রে প্রকাশিত ও পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা", "পত্রাবলী" এবং "সহজ রচনা শিক্ষা" সন্নিবেশিত হইয়াছে। বহু সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকা বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন, ইহার মধ্যে ইংরেজীও আছে। সূচীদৃষ্টে তাহা লক্ষণীয়। "দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী"র (সর্বপ্রথম প্রকাশকাল ১২৮৩ বঙ্গাব্দ) ভূমিকাটি স্বুত্রপুত্র পুস্তকাকারে "রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী" শিরোনামে ১২৮৪ সালে প্রকাশিত

হয়। বঙ্কিমচন্দ্র ইহার স্বল্প মিত্রজার পুত্রগণকে দান করেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে (১২৯৩ বঙ্গাব্দে) প্রকাশিত দীনবন্ধুর বাল্যরচনা-সম্বলিত গ্রন্থাবলীতে “দীনবন্ধু মিত্রের কবিত্ব” শীর্ষক একটি সমালোচনাও তিনি লিখিয়া দেন।

“সাময়িক পত্রে প্রকাশিত ও পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা” অংশে ‘বঙ্গদর্শন’, ‘সাধারণী’, ‘ভ্রমর’ ও ‘প্রচার’ হইতে কয়েকটি বেনামী রচনা পরিষৎ-সংস্করণের সম্পাদকদ্বয় বহু পরিশ্রম করিয়া সংগ্রহ করেন এবং এই শিরোনামে তৎসমুদয় প্রকাশ করেন। তাঁহাদের মতে “এগুলির কয়েকটি যে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা তাহা অনুমান, কিংবদন্তী ও স্মৃতিকথার উপর নির্ভর করিয়া স্থির করিতে হইয়াছে। কয়েকটি রচনা যে বঙ্কিমের তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে।” ১২৭৯, ভাদ্র মাসের ‘বঙ্গদর্শনে’ প্রকাশিত “ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভা” শীর্ষক প্রবন্ধ এবং ১২৯১, পৌষ সংখ্যা ‘প্রচারে’ প্রকাশিত “লর্ড রিপনের উৎসবের জমাখরচ” শীর্ষক নিবন্ধটিও আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা বলিয়া অনুমান করি। দ্বিতীয়টি এখানে সন্নিবেশিত হইল। প্রথমটি ‘সংযোজনী’তে দিলাম।

পত্রাবলী : এই অংশে সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণে প্রকাশিত আটখানি পত্রের সঙ্গে আমরা অতিরিক্ত আরও দুইখানি পত্র সন্নিবেশিত করিয়াছি। ইহার একখানি সঞ্জীবচন্দ্রকে এবং দ্বিতীয়খানি ভ্রাতৃপুত্র জ্যোতিষচন্দ্রকে লিখিত।

সহজ রচনা শিক্ষা : বঙ্কিমচন্দ্র শেষ জীবনে দুইখানি পাঠ্য পুস্তক রচনা করেন। “সহজ ইংরেজী শিক্ষা” পাওয়া যায় নাই। তবে জানা যায়, ইহার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৯৪ সনে। “সহজ রচনা শিক্ষার” প্রথম সংস্করণের কাল নির্ণীত হয় নাই। ইহার দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সংস্করণ বাহির হয় বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর। চতুর্থ সংস্করণের (১৮৯৮) পুস্তকখানি এখানে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

পঞ্চম ভাগ

এই অংশে “গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক,” “বাল্য রচনা” এবং “অসম্পূর্ণ রচনা” সংযোজিত হইল।

গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক : এখানি ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। শুধু “কবিতাপুস্তক” নামে বঙ্কিমচন্দ্র ইহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেন ১৮৭৮ সনে। কয়েকটি গদ্য নিবন্ধ সংযোজিত হইয়া ইহা উপরোক্ত নামে দ্বিতীয় বার মুদ্রিত হয়। বলা বাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্র এ সংস্করণে যথারীতি রচনাগুলির সংস্কার করিয়াছিলেন। পুস্তকের দুইটি বিজ্ঞাপনে এ সমুদয় প্রকাশের কারণ তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কবিতাগুলি নিজ ও সঞ্জীবচন্দ্র-সম্পাদিত ‘বঙ্গদর্শনে’, সঞ্জীবচন্দ্র-সম্পাদিত ‘ভ্রমরে’ এবং বঙ্কিমচন্দ্রের অধ্যক্ষতায় পরিচালিত ‘প্রচারে’ বাহির হইয়াছিল। এ সকলের গুণাগুণ বিচারে পরিষৎ-সংস্করণের সম্পাদকদ্বয়ের মতামত উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা বলেন :

“কাব্যরচনায় স্বীয় অক্ষমতা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র সজাগ ছিলেন। প্রথম সংস্করণের (‘কবিতাপুস্তক’—১৮৭৮) ‘বিজ্ঞাপনে’ কবিতাগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রণের যে কৈফিয়ৎ তিনি দিয়াছেন, তাহা পাঠে বুঝা যায় যে, নিজের এই রচনাগুলি সম্বন্ধে তাঁহার কোনও মোহ ছিল না।”

“বিরহিণীর দশ দশা” শীর্ষক কবিতাটি (বঙ্গদর্শন—ফাল্গুন ১২৭৯, পৃঃ ৫২১) উক্ত কবিতাপুস্তক হইতে বাদ পড়িয়াছিল। এটি ‘সংযোজনী’তে দেওয়া গেল।

উভয় সংস্করণেই বঙ্কিমচন্দ্র পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে রচিত এবং ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত প্রথম কবিতাপুস্তক (প্রথম পুস্তকও বটে) “ললিতা। পুরাকালিক গল্প। তথা মানস” সংশোধনান্তর সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনটি তাঁহার ঐ সময়কার গদ্য রচনার নিদর্শন হিসাবে এখানে প্রদত্ত হইল :

বিজ্ঞাপন

“সুকাব্যালোচক মাত্রেই অত্র কবিতাদ্বয় পাঠে প্রতীতি জন্মিবেক যে ইহা বঙ্গীয় কাব্য রচনা রীতি পরিবর্তনের এক পরীক্ষা বলিলে বলা যায়। তাহাতে গ্রন্থকার কতদূর উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহা পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন।

তিন বৎসর পূর্বে এই গ্রন্থ রচনাকালে গ্রন্থকার জানিতে পারেন নাই যে তিনি নূতন পদ্ধতির পরীক্ষা পদবীরূঢ় হইয়াছেন। এবং তৎকালে স্বীয়মানস মাত্র রঞ্জনাভিলাষজনিত এই কাব্যদ্বয়কে সাধারণ সমীপবর্তী করিবার কোন কল্পনা ছিল না কিন্তু কতিপয় সুরসজ্জ বন্ধুর মনোনীত হইবায় তাহাদিগের অনুরোধানুসারে এক্ষণে জনসমাজে প্রকাশিত হইল। গ্রন্থকার স্বকর্মার্জিত ফলভোগে অস্বীকার নহেন কিন্তু অপেক্ষাকৃত নবীন বয়সের অজ্ঞতা ও অববেচনাজনিত তাবৎ লিপিদোষের এক্ষণে দণ্ড লইতে প্রস্তুত নহেন। গ্রন্থকার।”

বাল্যরচনা : চতুর্দশ বৎসর বয়স হইতেই বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতে থাকে। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত নিজ ‘সংবাদ প্রভাকরে’ তরুণদের কবিতা ছাপিয়া তাহাদিগকে কবিতা রচনার বিশেষ উৎসাহ দান করিতেন। তরুণ ছাত্রদের কবিতার প্রাইজ দেওয়া হইত। তিনি তাহাদের কবিতার বাদপ্রতিবাদেও উৎসাহ দিতেন। ‘সংবাদ প্রভাকরে’র স্তম্ভে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র ও দ্বারিকানাথ অধিকারীর মধ্যে যে কবিতায় বাদ-প্রতিবাদ হইত তাহা কবিতার লড়াই বা কবিতা-যুদ্ধ নামে সেকালে প্রসিদ্ধ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সমুদয় পদ্য রচনা ‘সংবাদ প্রভাকরে’ স্থান পায়। তাহার একটি কবিতা মাত্র প্রকাশিত হয়—শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃক প্রকাশিত ‘সমাচার দর্পণে’। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের উৎসাহদান সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—“আমি নিজে প্রভাকরের নিকট বিশেষ ঋণী। আমার প্রথম রচনাগুলি প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। সে সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আমাকে বিশেষ উৎসাহ দান করেন।” (ভূমিকা : ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহ)

অসম্পূর্ণ রচনা : এই অংশে চারিটি অসম্পূর্ণ রচনা স্থান পাইয়াছে। “রাজমোহনের স্ত্রী” বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত *Rajmohan's Wife* নামক উপন্যাসের তাহারই অনূদিত কয়েকটি অধ্যায়। এ সমুদয় তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ‘বারিবাহিনী’ পুস্তকে নয়টি অধ্যায়ে (পৃঃ ১-৫০) সন্নিবেশিত করেন। *Rajmohan's Wife* কিশোরীচাঁদ মিত্র সম্পাদিত *Indian Field* সংবাদপত্রে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। অন্য রচনা তিনটি যে যে স্থান হইতে গৃহীত, রচনা-শেষে তাহার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

উপন্যাস ব্যতিরিক্ত বঙ্কিমচন্দ্রের যাবতীয় বাংলা রচনা (যতদূর এ পর্য্যন্ত জানা বা পাওয়া গিয়াছে) এই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। মনন-সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে—সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, সাহিত্য-সমালোচন, ধর্মতত্ত্বালোচনা—নানা দিকেই তাহার কৃতিত্ব অসামান্য। সত্যকার ক্লাসিক্স-এর যাবতীয় গুণ তাহার রচনার মধ্যে রহিয়াছে, কারণ তিনি পুরাতন হইয়াও নূতন। সত্তর-আশী বৎসর পূর্বে তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছেন, আজও তাহা বাসি হইয়া যায় নাই; পড়িলে আনকোড়া তাজা ঠেকিবে। আবার কত বিভিন্ন বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যুৎপত্তি ছিল, বঙ্কিম-সাহিত্য পাঠ করিলে তাহাও সহজেই উপলব্ধি হইবে। এ বিষয়ে মনস্বী বিপিনচন্দ্র পালের উক্তি বিশেষভাবে স্মরণীয় :

“বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী পড়িবার সময়, তিনি যে সে সময়ের কোন্ তত্ত্বটা জানিতেন না, এদেশের বা ইউরোপের কোন্ লেখকের বা পণ্ডিতের সঙ্গে যে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল না, ইহা ভাবিয়া উঠিতে পারি না। এ দেশের বেদ, উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র, শ্রোতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, মন্বাদিস্মৃতি, সাংখ্যবেদান্তাদি দর্শন, কালিদাস, মাঘ, ভারবী, ভবভূতি প্রভৃতির কাব্য, রামায়ণমহাভারতাদি ইতিহাস, ভাগবতাদি পুরাণ, নানাবিধ তন্ত্র, বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থ এ সকলের সঙ্গে তাঁর কতটা যে পরিচয় ছিল, তাঁর উপন্যাসে, প্রবন্ধাবলীতে, কৃষ্ণচরিত্রে, গীতাভাষ্যে ইহার বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়। অন্যদিকে ইউরোপীয় দার্শনিক ক্যান্ট, হেগেল, কুঞ্জো, কোম্‌টে এবং ইংরাজ চিন্তনায়ক স্পেন্সার, মিল, বেন্থাম, হক্সলি, টিউল, ফ্রেডারিক হ্যারিসন প্রভৃতি, আর একদিকে মেথু আর্নল্ড, রেনা প্রভৃতি, এমন কি আধুনিক প্রত্নতত্ত্ব বা spiritualism বা মেসমেরিজম (mesmerism) পর্য্যন্ত তাঁর কতটা কেবল জানা নয়, আয়ত্ত ছিল,—এ সকলের বিস্তর প্রমাণ তাঁর লেখার মধ্যে রহিয়াছে। অথচ কোথাও একটু অপপ্রয়োগ বা পণ্ডিত্য প্রকাশের চেষ্টা দেখা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা যে কত বড় ছিল, ইহাতেই আমরা তাহার একটা অতি প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হই। নিজের শক্তির উপরে যে দাঁড়াইতে পারে, নিজের প্রতিভার মৌলিকতা যে বুঝে, সে পরের বস্তু লইয়া বড়াই করিতে যাইবে কেন? স্বরাজ্যে যে প্রতিষ্ঠিত, সে পরের নিকট হইতে করই লইয়া থাকে, অপরের যশোভাতি বা জয়শ্রী ধার করিয়া আনিবার জন্য বাগ্ন হয় না। ইহাতে যে তাঁর ইজ্জৎ যায়।” (“নারায়ণ”—জ্যৈষ্ঠ ১৩২২, পৃ. ৬৮৫-৬)

বঙ্গসাহিত্যের মাধ্যমে 'সমাজদেবী'র পূজায় বঙ্কিমচন্দ্র শক্তি ও সময় যথোচিত বিনিয়োগ করিয়াছিলেন। সাহিত্যখণ্ড পাঠে এ কথাটি আমাদের সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইবে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

দ্রষ্টব্য : শেষ সংস্করণের বিভিন্ন পুস্তকের সঙ্গে মূদ্রিত বিজ্ঞাপন এবং আনুষঙ্গিক বিষয়-সমূহ পরিশিষ্টে দেওয়া হইল। এই প্রসঙ্গটি রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী—সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ, 'বঙ্কিম-জীবনী', 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ', 'বঙ্কিমচন্দ্র', 'বঙ্কিম-স্মৃতি', 'দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র' 'পুরাতন প্রসঙ্গ' (১ম পর্যায়) প্রভৃতি বহু পুস্তক এবং সাময়িকপত্রাদি হইতে সাহায্য লইয়াছি। যে সকল বন্ধুবান্ধবের নিকট হইতে পুস্তকগুলি সংগ্রহ ও অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য পাইয়াছি তাঁহাদের কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। য-চ-ব



প্রথম ভাগ

লোকবহস্য

ব্যাপ্তাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল

প্রথম প্রবন্ধ

একদা সুন্দরবন-মধ্যে ব্যাপ্তাদিগের মহাসভা সমবেত হইয়াছিল। নির্বিড় বনমধ্যে প্রশস্ত ভূমিখণ্ডে ভীমাকৃতি বহুতর ব্যাপ্ত লাঙ্গুলে ভর করিয়া, দংষ্ট্রাপ্রভায় অরণ্য প্রদেশ আলোকময় করিয়া, সারি সারি উপবেশন করিয়াছিল। সকলে একমত হইয়া অমিতোদর নামে এক অতি প্রাচীন ব্যাপ্তকে সভাপতি করিলেন। অমিতোদর মহাশয় লাঙ্গুলাসন গ্রহণপূর্ব্বক সভার কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তিনি সভ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন;—

“অদ্য আমাদিগের কি শুভ দিন! অদ্য আমরা যত অরণ্যবাসী মাংসাভিলাষী ব্যাপ্তকুলতিলক সকল পরস্পরের মঙ্গল সাধনার্থ এই অরণ্যমধ্যে একত্রিত হইয়াছি। আহা! কুৎসাকারী, খল-স্বভাব অন্যান্য পশুবর্গে রটনা করিয়া থাকে যে, আমরা বড় অসামাজিক, একা এক বনেই বাস করিতে ভালবাসি, আমাদের মধ্যে ঐক্য নাই। কিন্তু অদ্য আমরা সমস্ত সুসভ্য ব্যাপ্তমণ্ডলী একত্রিত হইয়া সেই অমূলক নিন্দাবাদের নিরাস করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি! এক্ষণে সভ্যতার ষেরূপ দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে আমার সম্পূর্ণ আশা আছে যে, শীঘ্রই ব্যাপ্তেরা সভ্যজাতির অগ্রগণ্য হইয়া উঠিবে। এক্ষণে বিধাতার নিকট প্রার্থনা করি যে, আপনারা দিন দিন এইরূপ জাতিহিতৈষিতা প্রকাশপূর্ব্বক পরম সুখে নানাবিধ পশুহনন করিতে থাকুন।” (সভামধ্যে লাঙ্গুল চট্‌চটারব।)

“এক্ষণে হে ভ্রাতৃবৃন্দ! আমরা যে প্রয়োজন সম্পাদনার্থ সমবেত হইয়াছি, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করি। আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, এই সুন্দরবনের ব্যাপ্তসমাজে বিদ্যার চর্চা ক্রমে লোপ পাইতেছে। আমাদিগের বিশেষ অভিলাষ হইয়াছে, আমরা বিদ্বান্ হইব। কেন না, আজিকালি সকলেই বিদ্বান্ হইতেছে। আমরাও হইব। বিদ্যার আলোচনার জন্য এই ব্যাপ্তসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে, আপনারা ইহার অনুমোদন করুন।”

সভাপতির এই বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে, সভ্যগণ হাউমাউ শব্দে এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। তখন যথারীতি কয়েকটি প্রস্তাব পঠিত এবং অনুমোদিত হইয়া সভ্যগণ কর্তৃক গৃহীত হইল। প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ বক্তৃতা হইল। সে সকল ব্যাকরণশুদ্ধ এবং অলঙ্কারবিশিষ্ট বটে, তাহাতে শব্দবিন্যাসের ছটা বড় ভয়ঙ্কর; বক্তৃতার চোটে সুন্দরবন কাঁপিয়া গেল।

পরে সভার অন্যান্য কার্য্য হইলে, সভাপতি বলিলেন, “আপনারা জানেন যে, এই সুন্দরবনে বৃহল্লাঙ্গুল নামে এক অতি পণ্ডিত ব্যাপ্ত বাস করেন। অদ্য রাত্রে তিনি আমাদিগের অনুরোধে মনুষ্যচরিত্র সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিতে স্বীকার করিয়াছেন।”

মনুষ্যের নাম শুনিয়া কোন কোন নবীন সভ্য ক্ষুধা বোধ করিলেন। কিন্তু তৎকালে পরিষ্ক ডিনরের সূচনা না দেখিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। ব্যাপ্তাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল মহাশয় সভাপতি কর্তৃক আহূত হইয়া, গজ্জর্জনপূর্ব্বক গাত্রোথান করিলেন। এবং পৃথকের ভীতিবিধায়ক স্বরে নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি পাঠ করিলেন;—

“সভাপতি মহাশয়! বাঘিনীগণ এবং ভদ্র ব্যাপ্তগণ! মনুষ্য একপ্রকার দ্বিপদ জন্তু। তাহার পক্ষবিশিষ্ট নহে, সুতরাং তাহাদিগকে পাখী বলা যায় না। বরং চতুষ্পদগণের সঙ্গে তাহাদিগের সাদৃশ্য আছে। চতুষ্পদগণের যে যে অঙ্গ, যে যে অস্থি আছে, মনুষ্যেরও সেইরূপ আছে। অতএব মনুষ্যদিগকে এক প্রকার চতুষ্পদ বলা যায়। প্রভেদ এই যে, চতুষ্পদের ষেরূপ গঠনের পারিপাট্য, মনুষ্যের তাদৃশ্য নাই। কেবল ঈদৃশ প্রভেদের জন্য আমাদিগের কর্তব্য নহে যে, আমরা মনুষ্যকে দ্বিপদ বলিয়া ঘৃণা করি।

বিক্রম রচনাবলী

চতুঃপদমধ্যে বানরদিগের সঙ্গে মনুষ্যগণের বিশেষ সাদৃশ্য। পণ্ডিতেরা বলেন যে, কালক্রমে পশুদিগের অবয়বের উৎকর্ষ জন্মিতে থাকে; এক অবয়বের পশু ক্রমে অন্য উৎকৃষ্টতর পশুর আকার প্রাপ্ত হয়। আমরাদিগের ভরসা আছে যে, মনুষ্য-পশুও কালপ্রভাবে লাঙ্গুলাদিবিশিষ্ট হইয়া ক্রমে বানর হইয়া উঠিবে।

মনুষ্য-পশু যে অত্যন্ত সুস্বাদু এবং সুভক্ষ্য, তাহা আপনারা বোধ হয়, সকলেই অবগত আছেন। (শুনিয়া সভ্যগণ সকলে আপন আপন মুখ চাটিলেন।) তাহারা সচরাচর অনায়াসেই মারা পড়ে। মৃগাদির ন্যায় তাহারা দ্রুত পলায়নে সক্ষম নহে, অথচ মহিষাদির ন্যায় বলবান বা শৃঙ্গাদি আয়ুধ-যুক্ত নহে। জগদীশ্বর এই জগৎ-সংসার ব্যাঘ্রজাতির সুখের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। সেই জন্য ব্যাঘ্রের উপাদেয় ভোজ্য পশুকে পলায়নের বা আত্মরক্ষার ক্ষমতা পর্য্যন্ত দেন নাই। বাস্তবিক মনুষ্যজাতি যেরূপ অরক্ষিত—নখ-দন্ত শৃঙ্গাদি বর্জিত, গমনে মন্থর এবং কোমলপ্রকৃতি, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয় যে, কি জন্য ঈশ্বর ইহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ব্যাঘ্র জাতির সেবা ভিন্ন ইহাদিগের জীবনের কোন উদ্দেশ্য দেখা যায় না।

এই সকল কারণে, বিশেষ তাহাদিগের মাংসের কোমলতা হেতু, আমরা মনুষ্য জাতিকে বড় ভালবাসি। দৃষ্টি মাত্রই ধরিয়া খাই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাহারাও বড় ব্যাঘ্রভক্ত। এই কথায় যদি আপনারা বিশ্বাস না করেন, তবে তাহার উদাহরণ স্বরূপ আমার যাহা ঘটিয়াছিল, তদ্ব্তান্ত বলি। আপনারা অবগত আছেন, আমি বহুকালাবধি দেশ ভ্রমণ করিয়া বহুদর্শী হইয়াছি। আমি যে দেশে প্রবাসে ছিলাম, সে দেশ এই ব্যাঘ্রভূমি সুন্দরবনের উত্তরে আছে। তথায় গো মনুষ্যাদি ক্ষুদ্রাশয় অহিংস পশুগণই বাস করে। তথাকার মনুষ্য দ্বিবিধ; এক জাতি কৃষ্ণবর্ণ, এক জাতি শ্বেতবর্ণ। একদা আমি সেই দেশে বিষয়কর্ম্মপলক্ষে গমন করিয়াছিলাম।”

শুনিয়া মহাদেবী নামে একজন উদ্ধতস্বভাব ব্যাঘ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—“বিষয়কর্ম্মটা কি?”

বহুল্লাঙ্গুল মহাশয় কহিলেন, “বিষয়কর্ম্ম, আহারান্বেষণ। এখন সভ্যলোকে আহারান্বেষণকে বিষয়কর্ম্ম বলে। ফলে সকলেই যে আহারান্বেষণকে বিষয়কর্ম্ম বলে, এমত নহে। সম্ভ্রান্ত লোকের আহারান্বেষণের নাম বিষয়কর্ম্ম, অসম্ভ্রান্তের আহারান্বেষণের নাম জুয়াচুরি, উজ্জ্বলিত্তি এবং ভিক্ষা। ধূর্তের আহারান্বেষণের নাম চুরি; বলবানের আহারান্বেষণ দস্যুতা; লোক-বিশেষে দস্যুতা শব্দ ব্যবহার হয় না; তৎপরিবর্ত্তে বীরত্ব বলিতে হয়। যে দস্যুর দণ্ডপ্রণেতা আছে, সেই দস্যুর কার্যের নাম দস্যুতা; যে দস্যুর দণ্ডপ্রণেতা নাই, তাহার দস্যুতার নাম বীরত্ব। আপনারা যখন সভ্যসমাজে অধিষ্ঠিত হইবেন, তখন এই সকল নামবৈচিত্র্য স্মরণ রাখিবেন, নচেৎ লোকে অসভ্য বলিবে। বস্তুতঃ আমার বিবেচনায় এত বৈচিত্র্যের প্রয়োজন নাই; এক উদর-পূজা নাম রাখিলেই বীরত্বাদি সকল বুঝাইতে পারে। সে যাহাই হউক, যাহা বলিতেছিলাম, শ্রবণ করুন। মনুষ্যেরা বড় ব্যাঘ্রভক্ত। আমি একদা মনুষ্যবসতি মধ্যে বিষয়-কর্ম্মপলক্ষে গিয়াছিলাম। শুনিয়াছেন, কয়েক বৎসর হইল, এই সুন্দরবনে পোর্ট ক্যানিং কোম্পানি স্থাপিত হইয়াছিল।”

মহাদেবী বক্তৃত্তা বন্ধ করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “পোর্ট ক্যানিং কোম্পানি কিরূপ জন্তু?”

বহুল্লাঙ্গুল কহিলেন, “তাহা আমি সবিশেষ অবগত নহি। ঐ জন্তুর আকার, হস্তপদাদি কিরূপ, জিঘাংসাই বা কেমন ছিল, ঐ সকল আমরা অবগত নহি। শুনিয়াছি, ঐ জন্তু মনুষ্যের প্রতিষ্ঠিত; মনুষ্যদিগেরই হৃদয়-শোণিত পান করিত; এবং তাহাতে বড় মোটা হইয়া মরিয়া গিয়াছে। মনুষ্যজাতি অত্যন্ত অপরিণামদর্শী। আপন আপন বধোপায় সর্ব্বদা আপনারাই সৃজন করিয়া থাকে। মনুষ্যেরা যে সকল অস্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া থাকে, সেই সকল অস্ত্রই এ কথার প্রমাণ। মনুষ্যবধই ঐ সকল অস্ত্রের উদ্দেশ্য। শুনিয়াছি, কখন কখন সহস্র সহস্র মনুষ্য প্রান্তরমধ্যে সমবেত হইয়া ঐ সকল অস্ত্রাদির দ্বারা পরস্পর প্রহার করিয়া বধ করে। আমার বোধ হয়, মনুষ্যগণ পরস্পরের বিনাশার্থ এই পোর্ট ক্যানিং কোম্পানি নামক রাক্ষসের সৃজন করিয়া-ছিল। সে যাহাই হউক, আপনারা স্থির হইয়া এই মনুষ্য-বক্তান্ত শ্রবণ করুন। মধ্যে মধ্যে রসভঙ্গ করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে বক্তৃত্তা হয় না। সভ্যজাতিদিগের এরূপ নিয়ম নহে। আমরা এক্ষণে সভ্য হইয়াছি, সকল কাজে সভ্যদিগের নিয়মানুসারে চলা ভাল।

আমি একদা সেই পোর্ট ক্যানিং কোম্পানির বাসস্থান মাতলায় বিষয়কর্ম্মপলক্ষে গিয়া-ছিলাম। তথায় এক বংশমণ্ডপ-মধ্যে একটা কোমল মাংসযুক্ত নৃত্যশীল ছাগবৎস দৃষ্টি করিয়া

তদাস্বাদনার্থ মণ্ডপ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। ঐ মণ্ডপ ভৌতিক—পশ্চাৎ জানিয়াছি, মনুষ্যেরা উহাকে ফাঁদ বলে। আমার প্রবেশ মাত্র আপনা হইতে তাহার দ্বার রুদ্ধ হইল। কতকগুলি মনুষ্য তৎপরে সেইখানে উপস্থিত হইল। তাহারা আমার দর্শন পাইয়া পরমানন্দিত হইল, এবং আহ্লাদসূচক চীৎকার, হাস্য, পরিহাসাদি করিতে লাগিল। তাহারা যে আমার ভূয়সী প্রশংসা করিতেছিল, তাহা আমি বৃষ্টিতে পারিয়াছিলাম। কেহ আমার আকারের প্রশংসা করিতেছিল, কেহ আমার দন্তের, কেহ নখের, কেহ লাঙ্গুলের গুণগান করিতে লাগিল। এবং অনেকে আমার উপর প্রীত হইয়া, পত্নীর সহোদরকে যে সম্বোধন করে, আমাকে সেই প্রিয়সম্বোধন করিল। পরে তাহারা ভক্তিভাবে আমাকে মণ্ডল-সমেত স্কন্ধে বহন করিয়া, এক শকটের উপর উঠাইল। দুই অমলশ্বেতকান্তি বলদ ঐ শকট বহন করিতেছিল। তাহাদিগকে দেখিয়া আমার বড় ক্ষুধার উদ্বেক হইল। কিন্তু তৎকালে ভৌতিক মণ্ডপ হইতে বাহির হইবার উপায় ছিল না, এ জন্য অর্দ্ধভুক্ত ছাগে তাহা পরিতৃপ্ত করিলাম। আমি সুখে শকটারোহণ করিয়া ছাগমাংস ভক্ষণ করিতে করিতে এক নগরবাসী শ্বেতবর্ণ মনুষ্যের আবাসে উপস্থিত হইলাম। সে আমার সম্মানার্থ স্বয়ং দ্বারদেশে আসিয়া আমার অভ্যর্থনা করিল। এবং লৌহদণ্ডাদিভূষিত এক সুরম্য গৃহমধ্যে আমার আবাসস্থান নির্দেশ করিয়া দিল। তথায় সজীব বা সদ্য হত ছাগ মেষ গবাদির উপাদেয় মাংস শোণিতের দ্বারা আমার সেবা করিত। অন্যান্য দেশবিদেশীয় বহুতর মনুষ্য আমাকে দর্শন করিতে আসিত, আমিও বৃষ্টিতে পারিতাম যে, উহারা আমাকে দেখিয়া চরিতার্থ হইত।

আমি বহুকাল ঐ লৌহজালাবৃত প্রকোষ্ঠে বাস করিলাম। ইচ্ছা ছিল না যে, সে সুখ ত্যাগ করিয়া আর ফিরিয়া আসি। কিন্তু স্বদেশ-বাৎসল্য প্রযুক্ত থাকিতে পারিলাম না। আহা! যখন এই জন্মভূমি আমার মনে পড়িত, তখন আমি হাউ হাউ করিয়া ডাকিতে থাকিতাম। হে মাতঃ সুন্দরবন! আমি কি তোমাকে কখন ভুলিতে পারিব? আহা! তোমাকে যখন মনে পড়িত, তখন আমি ছাগমাংস ত্যাগ করিতাম, মেষমাংস ত্যাগ করিতাম! (অর্থাৎ অস্থি এবং চর্ম মাত্র ত্যাগ করিতাম)—এবং সর্বদা লাঙ্গুলাঘাতের দ্বারা আপনার অন্তঃকরণের চিন্তা লোককে জানাইতাম। হে জন্মভূমি! যতদিন আমি তোমাকে দেখি নাই, ততদিন ক্ষুধা না পাইলে খাই নাই, নিদ্রা না আসিলে নিদ্রা যাই নাই। দুঃখের অধিক পরিচয় আর কি দিব, পেটে যাহা ধরিত, তাহাই খাইতাম, তাহার উপর আর দুই চারি সের মাত্র মাংস খাইতাম। আর খাইতাম না।”

তখন বৃহল্লাঙ্গুল মহাশয়, জন্মভূমির প্রেমে অভিভূত হইয়া অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। বোধ হইল, তিনি অশ্রুপাত করিতেছিলেন, এবং দুই এক বিন্দু স্বচ্ছ ধারা পতনের চিহ্ন ভূতলে দেখা গিয়াছিল। কিন্তু কতিপয় যুবা ব্যাঘ্র তর্ক করেন যে, সে বৃহল্লাঙ্গুলের অশ্রুপতনের চিহ্ন নহে। মনুষ্যালয়ের প্রচুর আহারের কথা স্মরণ হইয়া সেই ব্যাঘ্রের মুখে লাল পড়িয়াছিল।

লেক্চরর তখন ধৈর্য্য প্রাপ্ত হইয়া পুনর্নিপ বলিতে আরম্ভ করিলেন, “কি প্রকারে আমি সেই স্থান ত্যাগ করিলাম, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। আমার অভিপ্রায় বৃষ্টিয়াই হউক, আর ভুল-ক্রমেই হউক, আমার ভৃত্য একদিন আমার মন্দির-মাজ্জানাতে দ্বার মুক্ত রাখিয়া গিয়াছিল। আমি সেই দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া উদ্যানরক্ষককে মুখে করিয়া লইয়া চলিয়া আসিলাম।

এই সকল বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলার কারণ এই যে, আমি বহুকাল মনুষ্যালয়ে বাস করিয়া আসিয়াছি—মনুষ্যচরিত্র সবিশেষ অবগত আছি—শুনিয়া আপনারা আমার কথায় বিশেষ আস্থা করিবেন, সন্দেহ নাই। আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাই বলিব। অন্য পর্যটকদিগের ন্যায় অমূলক উপন্যাস বলা আমার অভ্যাস নাই। বিশেষ, মনুষ্যসম্বন্ধে অনেক উপন্যাস আমরা চিরকাল শুনিয়া আসিতেছি; আমি সে সকল কথায় বিশ্বাস করি না। আমরা পৃথ্বীপর শুনিয়া আসিতেছি যে, মনুষ্যেরা ক্ষুদ্রজীবী হইয়াও পৃথ্বীতাকার বিচিত্র গৃহ নিষ্কারণ করে। ঐরূপ পৃথ্বীতাকার গৃহে তাহারা বাস করে বটে, কিন্তু কখন তাহাদিগকে ঐরূপ গৃহ নিষ্কারণ করিতে আমি চক্ষে দেখি নাই। সুতরাং তাহারা যে ঐরূপ গৃহ স্বয়ং নিষ্কারণ করিয়া থাকে, ইহার প্রমাণাভাব। আমার বোধ হয়, তাহারা যে সকল গৃহে বাস করে, তাহা প্রকৃত পৃথ্বীত বটে, স্বভাবের সৃষ্টি; তবে তাহা বহু গৃহাবিশিষ্ট দেখিয়া বৃদ্ধিজীবী মনুষ্যপশু তাহাতে আশ্রয় করিয়াছে।*

* পাঠক মহাশয় বৃহল্লাঙ্গুলের ন্যায়শাস্ত্রে বৃৎপত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইবেন না। ঐরূপ তর্ক মাক্সমুলের স্থির করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা লিখিতে জানিতেন না। ঐরূপ তর্ক জেমস

বিক্রম রচনাবলী

মনুষ্য-জন্তু উভয়াহারী। তাহারা মাংসভোজী; এবং ফলমূলও আহার করে। বড় বড় গাছ খাইতে পারে না; ছোট ছোট গাছ সমূলে আহার করে। মনুষ্যেরা ছোট গাছ এত ভালবাসে যে, আপনারা তাহার চাষ করিয়া ঘোরিয়া রাখে। ঐরূপ রক্ষিত ভূমিকে ক্ষেত বা বাগান বলে। এক মনুষ্যের বাগানে অন্য মনুষ্য চরিতে পায় না।

মনুষ্যেরা ফল মূল লতা গুল্মাদি ভোজন করে বটে, কিন্তু ঘাস খায় কি না, বলিতে পারি না। কখন কোন মনুষ্যকে ঘাস খাইতে দেখি নাই। কিন্তু এ বিষয়ে আমার কিছন্দ সংশয় আছে। শ্বেতবর্ণ মনুষ্যেরা এবং কৃষ্ণবর্ণ ধনবান্ মনুষ্যেরা বহু যত্নে আপন আপন উদ্যানে ঘাস তৈয়ার করে। আমার বিবেচনায় উহারা ঐ ঘাস খাইয়া থাকে। নহিলে ঘাসে তাহাদের এত যত্ন কেন? ঐরূপ আমি একজন কৃষ্ণবর্ণ মনুষ্যের মুখে শুনিয়াছিলাম। সে বলিতেছিল, 'দেশটা উচ্ছন্ন গেল—যত সাহেব সুবো বড় মানুষ্যে বসে বসে ঘাস খাইতেছে।' সুতরাং প্রধান মনুষ্যেরা যে ঘাস খায়, তাহা এক প্রকার নিশ্চয়।

কোন মনুষ্য বড় ক্রুদ্ধ হইলে বলিয়া থাকে, 'আমি কি ঘাস খাই?' আমি জানি, মনুষ্যদিগের স্বভাব এই, তাহারা যে কাজ করে, অতি যত্নে তাহা গোপন করে। অতএব যেখানে তাহারা ঘাস খাওয়ার কথায় রাগ করে, তখন অবশ্য সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, তাহারা ঘাস খাইয়া থাকে।

মনুষ্যেরা পশু পূজা করে। আমার যে প্রকার পূজা করিয়াছিল, তাহা বলিয়াছি। অশ্বদিগেরও উহারা ঐরূপ পূজা করিয়া থাকে; অশ্বদিগকে আশ্রয় দান করে, আহার যোগায়, গাছ ধোত ও মার্জনা করিয়া দেয়। বোধ হয়, অশ্ব মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ পশু বলিয়াই মনুষ্যেরা তাহার পূজা করে।

মনুষ্যেরা ছাগ, মেষ, গবাদিও পালন করে। গো সম্বন্ধে তাহাদের এক আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গিয়াছে; তাহারা গোরুর দুগ্ধ পান করে। ইহাতে পূর্বকালের ব্যাঘ্র পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মনুষ্যেরা কোন কালে গোরুর বংশ ছিল। আমি তত দূর বলি না, কিন্তু এই কারণেই বোধ করি, গোরুর সঙ্গে মানুষ্যের বৃদ্ধিগত সাদৃশ্য দেখা যায়।

সে যাহাই হউক, মনুষ্যেরা আহারের সুবিধার জন্য গোরু, ছাগল এবং মেষ পালন করিয়া থাকে। ইহা এক সুরীতি, সন্দেহ নাই। আমি মানস করিয়াছি, প্রস্তাব করিব যে, আমরাও মানুষ্যের গোহাল প্রস্তুত করিয়া মনুষ্য পালন করিব।

গো, অশ্ব, ছাগ ও মেষের কথা বলিলাম। ইহা ভিন্ন হস্তী, উষ্ট্র, গন্দভ, কুক্কুর, বিড়াল, এমন কি, পক্ষী পর্যন্ত তাহাদের কাছে সেবা প্রাপ্ত হয়। অতএব মনুষ্য জাতিতে সকল পশুর ভৃত্য বলিলেও বলা যায়।

মনুষ্যালয়ে অনেক বানরও দেখিলাম। সে সকল বানর দ্বিবিধ; এক সলাঙ্গুল, অপর লাঙ্গুল-শূন্য। সলাঙ্গুল বানরেরা প্রায় ছাদের উপর, না হয় গাছের উপর থাকে। নীচেও অনেক বানর আছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ বানরই উচ্চপদস্থ। বোধ হয়, বংশমর্যাদা বা জাতিগোরব ইহার কারণ।

মনুষ্যচরিত্র অতি বিচিত্র। তাহাদের মধ্যে বিবাহের যে রীতি আছে, তাহা অত্যন্ত কোঁতুকাবহ। তন্মিন্ন তাহাদিগের রাজনীতিও অত্যন্ত মনোহর। ক্রমে ক্রমে তাহা বিবৃত করিতেছি।"

এই পর্যন্ত প্রবন্ধ পঠিত হইলে, সভাপতি অমিতোদর, দূরে একটি হরিণশিশু দেখিতে পাইয়া, চেয়ার হইতে লাফ দিয়া তদনুসরণে ধাবিত হইলেন। অমিতোদর এইরূপ দূরদর্শী বলিয়াই সভাপতি হইয়াছিলেন। সভাপতিকে অকস্মাৎ বিদ্যালোচনায় বিমুখ দেখিয়া, প্রবন্ধপাঠক কিছন্দ ক্ষুব্ধ হইলেন। তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া একজন বিজ্ঞ সভ্য তাহাকে কহিলেন, "আপনি ক্ষুব্ধ হইবেন না, সভাপতি মহাশয় বিষয়কস্মরণপলক্ষে দৌড়িয়াছেন। হরিণের পাল আসিয়াছে, আমি ঘাণ পাইতেছি।"

এই কথা শুনিবামাত্র মহাবিজ্ঞ সভ্যেরা লাঙ্গুলোচ্ছিত করিয়া, যিনি যে দিকে পারিলেন, সেই দিকে বিষয়কস্মরণ চেষ্টায় ধাবিত হইলেন। লেক্চররও এই বিদ্যাথীদিগের দৃষ্টান্তের অনুবৃত্তী হইলেন। এইরূপে সে দিন ব্যাঘ্রদিগের মহাসভা অকালে ভঙ্গ হইল।

মিল স্থির করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা অসভ্য জাতি, এবং সংস্কৃত ভাষা অসভ্য ভাষা। বস্তুতঃ এই ব্যাঘ্র পণ্ডিতে এবং মনুষ্য পণ্ডিতে অধিক বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না।

পরে তাঁহারা স্নান্য একদিন সকলে পরামর্শ করিয়া আহাৰাস্তে সভার অধিবেশন করিলেন। সে দিন নিৰ্ব্বিঘ্নে সভার কার্য সম্পন্ন হইয়া প্রবন্ধের অবশিষ্টাংশ পাঠিত হইল। তাহার বিজ্ঞাপনী প্রাপ্ত হইলে, আমরা প্রকাশ করিব।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ

সভাপতি মহাশয়, বাঘিনীগণ, এবং ভদ্র ব্যাঘ্রগণ!

আমি প্রথম বক্তৃতায় অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে, মানুষের বিবাহপ্রণালী এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলিব। ভদ্রের অঙ্গীকার পালনই প্রধান ধর্ম। অতএব আমি একবারেই আমার বিষয়ে প্রবেশ করিলাম।

বিবাহ কাহাকে বলে, আপনারা সকলেই অবগত আছেন। সকলেই মধ্যে মধ্যে অবকাশ মতে বিবাহ করিয়া থাকেন। কিন্তু মনুষ্যবিবাহে কিছু বৈচিত্র্য আছে। ব্যাঘ্র প্রভৃতি সভ্য পশুদিগের দারপরিগ্রহ কেবল প্রয়োজনাধীন, মনুষ্যপশুর সেরূপ নহে—তাহাদের মধ্যে অনেকেই এককালীন জন্মের মত বিবাহ করিয়া রাখে।

মনুষ্যবিবাহ দ্বিবিধ—নিত্য এবং নৈমিত্তিক। তন্মধ্যে নিত্য অথবা পৌরোহিত বিবাহই মান্য। পুরোহিতকে মধ্যবর্তী করিয়া যে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহাই পৌরোহিত বিবাহ।

মহাদেব! পুরোহিত কি?

বৃহল্লাঙ্গুল। অভিধানে লেখে, পুরোহিত চালকলাভোজী বণ্ডনাব্যবসায়ী মনুষ্যবিশেষ। কিন্তু এই ব্যাখ্যা দৃষ্ট। কেন না, সকল পুরোহিত চালকলাভোজী নহে, অনেক পুরোহিত মদ্য মাংস খাইয়া থাকেন; অনেক পুরোহিত সর্বভুক্। পক্ষান্তরে চালকলা খাইলেই পুরোহিত হয়, এমত নহে। বারাণসী নামক নগরে অনেকগুলিন ষাঁড় আছে—তাহারা চালকলা খাইয়া থাকে। তাহারা পুরোহিত নহে, তাহার কারণ, তাহারা বণ্ডক নহে। বণ্ডকে যদি চালকলা খায়, তাহা হইলেই পুরোহিত হয়।

পৌরোহিত বিবাহে এইরূপ একজন পুরোহিত বরকন্যার মধ্যবর্তী হইয়া বসে। বসিয়া কতকগুলি বকে। এই বক্তৃতাকে মন্ত্র বলে। তাহার অর্থ কি, আমি সবিশেষ অবগত নহি, কিন্তু আমি যেরূপ পণ্ডিত, তাহাতে ঐ সকল মন্ত্রের একপ্রকার অর্থ মনে মনে অনুভূত করিয়াছি। বোধ হয়, পুরোহিত বলে, “হে বরকন্যা! আমি আঞ্জা করিতেছি, তোমরা বিবাহ কর। তোমরা বিবাহ করিলে, আমি নিত্য চালকলা পাইব—অতএব তোমরা বিবাহ কর। এই কন্যার গর্ভাধানে, সীমন্তোন্নয়নে, সূতিকাগারে, চালকলা পাইব—অতএব তোমরা বিবাহ কর। সন্তানের ষষ্ঠী-পূজায়, অন্নপ্রাশনে, কর্ণবেধে, চূড়াকরণে বা উপনয়নে—অনেক চালকলা পাইব, অতএব তোমরা বিবাহ কর। তোমরা সংসারধর্ম প্রবৃত্ত হইলে, সর্ষদা ব্রত নিয়মে, পূজা পার্বণে, যাগ যজ্ঞে রত হইবে, সূতরাং আমি অনেক চালকলা পাইব, অতএব তোমরা বিবাহ কর। বিবাহ কর, কখন এ বিবাহ রহিত করিও না। যদি রহিত কর, তবে আমার চালকলার বিশেষ বিঘ্ন হইবে। তাহা হইলে এক এক চপেটাঘাতে তোমাদের মূণ্ডপাত করিব। আমাদের পূর্বপুরুষদিগের এইরূপ আঞ্জা।” বোধ হয়, এই শাসনের জন্যই পৌরোহিত বিবাহ কখন রহিত হয় না।

আমাদিগের মধ্যে যে বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে, তাহাকে নৈমিত্তিক বিবাহ বলা যায়। মনুষ্যমধ্যে এরূপ বিবাহও সচরাচর প্রচলিত। অনেক মনুষ্য এবং মানুষী, নিত্য নৈমিত্তিক উভয়বিধ বিবাহ করিয়া থাকে। কিন্তু নিত্য নৈমিত্তিক বিবাহে বিশেষ প্রভেদ এই যে, নিত্য বিবাহ কেহ গোপন করে না, নৈমিত্তিক বিবাহ সকলেই প্রাণপণে গোপন করে। যদি একজন মনুষ্য অন্য মনুষ্যের নৈমিত্তিক বিবাহের কথা জানিতে পারে, তাহা হইলে কখন কখন তাহাকে ধরিয়া প্রহার করে। আমার বিবেচনায় পুরোহিতরাই এই অনর্থের মূল। নৈমিত্তিক বিবাহে তাহারা চালকলা পায় না—সূতরাং ইহার দমনই তাহাদের উদ্দেশ্য—তাহাদের শিক্ষা মতে সকলেই নৈমিত্তিকবিবাহকারীকে ধরিয়া প্রহার করে। কিন্তু বিশেষ চমৎকার এই যে, অনেকেই গোপনে স্বয়ং নৈমিত্তিক বিবাহ করে, অথচ পরকে নৈমিত্তিক বিবাহ করিতে দেখিলে ধরিয়া প্রহার করে!

ইহাতে আমার বিবেচনা হইতেছে যে, অনেক মনুষ্যই নৈমিত্তিক বিবাহে সম্মত, তবে পুরোহিত প্রভৃতির ভয়ে মূখ ফুটিতে পারে না। আমি মনুষ্যালয়ে বাসকালীন জানিয়া

বিশ্বকম রচনাবলী

আসিয়াছ, অনেক উচ্চ শ্রেণীস্থ মনুষ্যের নৈমিত্তিক বিবাহে বিশেষ আদর। যাঁহারা আমাদের ন্যায় সুসভ্য, সুতরাং পশুবৃত্ত, তাঁহারা এই বিষয়ে আমাদের অনুকরণ করিয়া থাকেন। আমার এমনও ভরসা আছে যে, কালে মনুষ্যজাতি আমাদের ন্যায় সুসভ্য হইলে, নৈমিত্তিক বিবাহ তাহাদের মধ্যে সমাজসম্মত হইবে। অনেক মনুষ্যপণ্ডিত তৎপক্ষে প্রবৃত্তিদায়ক গ্রন্থাদি লিখিতেছেন। তাঁহারা স্বজাতিহিতৈষী, সন্দেহ নাই। আমার বিবেচনায়, সম্মানবর্ধনার্থ তাঁহাদিগকে এই ব্যাঘ্র-সমাজের অনরারি মেম্বর নিযুক্ত করিলে ভাল হয়। ভরসা করি, তাঁহারা সভাস্থ হইলে, আপনারা তাঁহাদিগকে জলযোগ করিবেন না। কেন না, তাঁহারা আমাদের ন্যায় নীতিজ্ঞ এবং লোকহিতৈষী।

মনুষ্যমধ্যে বিশেষ এক প্রকার নৈমিত্তিক বিবাহ প্রচলিত আছে, তাহাকে মৌদ্রিক বিবাহ বলা যাইতে পারে। এ প্রকার বিবাহ সম্পন্নার্থ মানুষ মদ্রার দ্বারা কোন মানুষীর করতল সংস্পর্শ করে। তাহা হইলেই মৌদ্রিক বিবাহ সম্পন্ন হয়।

মহাদেবী। মদ্রা কি?

বৃহস্পতি। মদ্রা মনুষ্যদিগের পূজ্য দেবতাবিশেষ। যদি আপনাদিগের কৌতূহল থাকে, তবে আমি সবিশেষ সেই মহাদেবীর গুণ কীর্তন করি। মনুষ্য যত দেবতার পূজা করে, তন্মধ্যে ইহার প্রতিই তাহাদের বিশেষ ভক্তি। ইনি সাকারা। স্বর্ণ, রৌপ্য এবং তাম্বে ইহার প্রতিমা নির্মিত হয়। লৌহ, টিন এবং কাষ্ঠে ইহার মন্দির প্রস্তুত করে। রেশম, পশম, কার্পাস, চর্ম প্রভৃতিতে ইহার সিংহাসন রচিত হয়। মানুষগণ রাত্রিদিন ইহার ধ্যান করে, এবং কিসে ইহার দর্শন প্রাপ্ত হইবে, সেই জন্য সর্বদা শশবাস্ত হইয়া বেড়ায়। যে বাড়ীতে টাকা আছে জানে, অহরহ সেই বাড়ীতে মনুষ্যেরা যাতায়াত করিতে থাকে,—এমনই ভক্তি, কিছুরূপেই সে বাড়ী ছাড়ে না—মারিলেও যায় না। যে এই দেবীর পুরোহিত, অথবা যাহার গৃহে ইনি অধিষ্ঠান করেন, সেই ব্যক্তি মনুষ্যমধ্যে প্রধান হয়। অন্য মনুষ্যেরা সর্বদাই তাঁহার নিকট যুক্তকরে শ্রুতি করিতে থাকে। যদি মদ্রাদেবীর অধিকারী একবার তাঁহাদের প্রতি কটাক্ষ করে, তাহা হইলে তাঁহারা চরিতার্থ হইয়েন।

দেবতাও বড় জাগ্রত। এমন কাজই নাই যে, এই দেবীর অনুগ্রহে সম্পন্ন হয় না। পৃথিবীতে এমন সামগ্রীই নাই যে, এই দেবীর বরে পাওয়া যায় না। এমন দৃষ্কম্মই নাই যে, এই দেবীর উপাসনায় সম্পন্ন হয় না। এমন দোষই নাই যে, ইহার অনুকম্পায় ঢাকা পড়ে না। এমন গুণই নাই যে, তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত গুণ বলিয়া মনুষ্যসমাজে প্রতিপন্ন হইতে পারে; যাহার ঘরে ইনি নাই—তাহার আবার গুণ কি? যাহার ঘরে ইনি বিরাজ করেন, তাহার আবার দোষ কি? মনুষ্যসমাজে মদ্রামহাদেবীর অনুগ্রহীত ব্যক্তিকেই ধার্মিক বলে—মদ্রাহীনতাকেই অধর্ম বলে। মদ্রা থাকিলেই বিদ্বান্ হইল। মদ্রা যাহার নাই, তাহার বিদ্যা থাকিলেও, মনুষ্য-শাস্ত্রানুসারে সে মূর্খ বলিয়া গণ্য হয়। আমরা যদি “বড় বাঘ” বলি, তবে অমিতোদর, মহাদেবী প্রভৃতি প্রকাণ্ডাকার মহাব্যাঘ্রগণকে বুঝাইবে। কিন্তু মনুষ্যালয়ে “বড় মানুষ” বলিলে সেরূপ অর্থ হয় না—আট হাত বা দশ হাত মানুষ বুঝায় না, যাহার ঘরে এই দেবী বাস করেন, তাহাকেই “বড় মানুষ” বলে। যাহার ঘরে এই দেবী স্থাপিতা নহেন, সে পাঁচ হাত লম্বা হইলেও তাহাকে “ছোট লোক” বলে।

মদ্রাদেবীর এইরূপ নানাবিধ গুণগান শ্রবণ করিয়া আমি প্রথমে সংকল্প করিয়াছিলাম যে, মনুষ্যালয় হইতে ইহাকে আনিয়া ব্যাঘ্রালয়ে স্থাপন করিব। কিন্তু পশ্চাৎ যাহা শুনিলাম, তাহাতে বিরত হইলাম। শুনিলাম যে, মদ্রাই মনুষ্যজাতির যত অনিষ্টের মূল। ব্যাঘ্রাদি প্রধান পশুরা কখন স্বজাতির হিংসা করে না, কিন্তু মনুষ্যেরা সর্বদা আত্মজাতির হিংসা করিয়া থাকে। মদ্রা-পূজাই ইহার কারণ। মদ্রার লোভে, সকল মনুষ্যই পরস্পরের অনিষ্ট চেষ্টায় রত। প্রথম বক্তৃতায় বলিয়াছিলাম যে, মনুষ্যেরা সহস্রে সহস্রে প্রান্তরমধ্যে সমবেত হইয়া পরস্পরকে হনন করে। মদ্রাই তাহার কারণ। মদ্রাদেবীর উত্তেজনায় সর্বদাই মনুষ্যেরা পরস্পরে হত, আহত, পীড়িত, অবরুদ্ধ, অপমানিত, তিরস্কৃত করে। মনুষ্যালোকে বোধ হয়, এমত অনিষ্টই নাই যে, এই দেবীর অনুগ্রহপ্রেরিত নহে। ইহা আমি জানিতে পারিয়া, মদ্রাদেবীর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া তাঁহার পূজার অভিলাষ ত্যাগ করিলাম।

কিন্তু মনুষ্যেরা ইহা বুঝে না। প্রথম বক্তৃতাতেই বলিয়াছি যে, মনুষ্যেরা অত্যন্ত অপরিণাম-

দর্শী—সর্বদাই পরস্পরের অমঙ্গল চেষ্টা করে। অতএব তাহারা অবিরত রূপার চাকি ও তামার চাকি সংগ্রহের চেষ্টায় কুমারের চাকের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায়।

মনুষ্যদিগের বিবাহতত্ত্ব যেমন কৌতুকবহু, অন্যান্য বিষয়ও তদ্রূপ। তবে, পাছে দীর্ঘ বক্তৃতা করিলে, আপনাদিগের বিষয়কস্মের সময় পুনরুপস্থিত হয়, এই জন্য অদ্য এইখানে সমাধা করিলাম। ভবিষ্যতে যদি অবকাশ হয়, তবে অন্যান্য বিষয়ে কিছু বলিব।”

এইরূপে বক্তৃতা সমাধা করিয়া পণ্ডিতবর ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল, বিপুল লাঙ্গুলচট্‌চটারব মধ্যে উপবেশন করিলেন। তখন দীর্ঘনথ নামে এক সুশিক্ষিত যুবা ব্যাঘ্র গাত্রোথান করিয়া, হাউ মাউ শব্দে বিতর্ক আরম্ভ করিলেন।

দীর্ঘনথ মহাশয় গজ্জর্নাস্তে বলিলেন, “হে ভদ্র ব্যাঘ্রগণ! আমি অদ্য বক্তার সঙ্কল্পতার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব করি। কিন্তু ইহা বলাও কৰ্তব্য যে, বক্তৃতাটি নিতান্ত মন্দ; মিথ্যাকথাপরিপূর্ণ, এবং বক্তা অতি গণ্ডমূর্খ।”

অমিতোদর। আপনি শান্ত হউন। সভ্যজাতীরে অত স্পষ্ট করিয়া গালি দেয় না। প্রচ্ছন্নভাবে আপনি আরও গুরুতর গালি দিতে পারেন।

দীর্ঘনথ। “যে আজ্ঞা। বক্তা অতি সত্যবাদী, তিনি যাহা বলিলেন, তাহার মধ্যে অধিকাংশ কথা অপ্রকৃত হইলেও, দুই একটা সত্য কথা পাওয়া যায়। তিনি অতি সুপণ্ডিত ব্যক্তি। অনেকেই মনে করিতে পারেন যে, এই বক্তৃতার মধ্যে বক্তব্য কিছুই নাই। কিন্তু আমরা যাহা পাইলাম, তাহার জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। তবে বক্তৃতার সকল কথায় সম্মতি প্রকাশ করিতে পারি না। বিশেষ, আদৌ মনুষ্যমধ্যে বিবাহ কাহাকে বলে, বক্তা তাহাই অবগত নহেন। ব্যাঘ্র জাতির কুলরক্ষার্থ যদি কোন বাঘ কোন বাঘিনীকে আপন সহচরী করে (সহচরী, সঙ্গে চরে) তাহাকেই আমরা বিবাহ বলি। মানুষের বিবাহ সেরূপ নহে। মানুষ স্বভাবতঃ দুর্বল এবং প্রভুভক্ত। সুতরাং প্রত্যেক মনুষ্যের এক একটি প্রভু চাই। সকল মনুষ্যই এক একজন স্ত্রীলোককে আপন প্রভু বলিয়া নিযুক্ত করে। ইহাকেই তাহারা বিবাহ বলে। যখন তাহারা কাহাকে সাক্ষী রাখিয়া প্রভু নিয়োগ করে, তখন সে বিবাহকে পোরোহিত বিবাহ বলা যায়। সাক্ষীর নাম পুরোহিত। বৃহল্লাঙ্গুল মহাশয় বিবাহমন্ত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অযথার্থ। সে মন্ত্র এইরূপ;—

পুরোহিত। বল, আমাকে কি বিষয়ের সাক্ষী হইতে হইবে?

বর। সাক্ষী থাকুন, আমি এই স্ত্রীলোকটিকে জন্মের মত আমার প্রভুত্বে নিযুক্ত করিলাম। পুরো। আর কি?

বর। আর আমি জন্মের মত ইঁহার শ্রীচরণের গোলাম হইলাম। আহা যোগানের ভার আমার উপর;—খাইবার ভার উঁহার উপর।

পুরো। (কন্যার প্রতি) তুমি কি বল?

কন্যা। আমি ইচ্ছাক্রমে এই ভৃত্যটিকে গ্রহণ করিলাম। যত দিন ইচ্ছা হইবে, চরণসেবা করিতে দিব। যে দিন ইচ্ছা না হইবে, সে দিন নাতি মারিয়া তাড়াইয়া দিব।

পুরো। শুভমস্তু।

এইরূপ আরও অনেক ভুল আছে। যথা, মদ্রাকে বক্তা মনুষ্যপূজিত দেবতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক উহা দেবতা নহে। মদ্রা একপ্রকার বিষচক্র। মনুষ্যেরা অত্যন্ত বিষপ্রিয়; এই জন্য সচরাচর মদ্রাসংগ্রহজন্য যত্নবান্। মনুষ্যগণকে মদ্রাভক্ত জানিয়া আমি পূর্বে বিবেচনা করিয়াছিলাম যে, ‘না জানি, মদ্রা কেমনই উপাদেয় সামগ্রী; আমাকে একদিন খাইয়া দেখিতে হইবে।’ একদা বিদ্যাধরী নদীর তীরে একটা মনুষ্যকে হত করিয়া ভোজন করিবার সময়ে, তাহার বস্ত্রমধ্যে কয়েকটা মদ্রা পাইলাম। পাইবামাত্র উদরসাৎ করিলাম। পর-দিবস উদরের পীড়া উপস্থিত হইল। সুতরাং মদ্রা যে এক প্রকার বিষ, তাহাতে সংশয় কি?”

দীর্ঘনথ এইরূপে বক্তৃতা সমাপন করিলে পর অন্যান্য ব্যাঘ্র মহাশয়েরা উঠিয়া বক্তৃতা করিলেন। পরে সভাপতি অমিতোদর মহাশয় বলিতে লাগিলেন;—

“এক্ষণে রাত্রি অধিক হইয়াছে, বিষয়কস্মের সময় উপস্থিত। বিশেষ, হরিণের পাল কখন আইসে, তাহার স্থিরতা কি? অতএব দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া কালহরণ কর্তব্য নহে। বক্তৃতা অতি উত্তম হইয়াছে—এবং বৃহল্লাঙ্গুল মহাশয়ের নিকট আমরা বড় বাধিত হইলাম। এক কথা এই

বঙ্কিম রচনাবলী

বলিতে চাহি যে, আপনারা দুই দিন যে বক্তৃতা শুনিলেন, তাহাতে অবশ্য বৃদ্ধিয়া থাকিবেন যে, মনুষ্য অতি অসভ্য পশু। আমরা অতি সভ্য পশু। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হইতেছে যে, আমরা মনুষ্যগণকে আমাদের ন্যায় সভ্য করি। বোধ করি, মনুষ্যদিগকে সভ্য করিবার জন্যই জগদীশ্বর আমাদেরকে এই সুন্দরবনভূমিতে প্রেরণ করিয়াছেন। বিশেষ, মানুষেরা সভ্য হইলে, তাহাদের মাংস আরও কিছু সুস্বাদ হইতে পারে, এবং তাহারাও আরও সহজে ধরা দিতে পারে। কেন না, সভ্য হইলেই তাহারা বৃদ্ধিতে পারিবে যে, ব্যাঘ্রদিগের আহারার্থ শরীরদান করাই মনুষ্যের কর্তব্য। এইরূপ সভ্যতাই আমরা শিখাইতে চাই। অতএব আপনারা এ বিষয়ে মনোযোগী হউন। ব্যাঘ্রদিগের কর্তব্য যে, মনুষ্যদিগকে অগ্রে সভ্য করিয়া পশ্চাৎ ভোজন করেন।”

সভাপতি মহাশয় এইরূপে বক্তৃতা সমাপন করিয়া লাঙ্গুলচট্টচারবন্ধে উপবেশন করিলেন, তখন সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদানান্তর ব্যাঘ্রদিগের মহাসভা ভঙ্গ হইল। তাহারা যে যথায় পারিলেন, বিষয়কন্মের প্রয়াণ করিলেন।

যে ভূমিখণ্ডে সভার অধিষ্ঠান হইয়াছিল, তাহার চারি পার্শ্বে কতকগুলি বড় বড় গাছ ছিল। কতকগুলি বানর তদুপরি আরোহণ করিয়া বৃক্ষপত্রমধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া ব্যাঘ্রদিগের বক্তৃতা শুনিতোছিল। ব্যাঘ্রেরা সভাভূমি ত্যাগ করিয়া গেলে, একটি বানর মুখ বাহির করিয়া অন্য বানরকে ডাকিয়া কহিল, “বলি ভায়া, ডালে আছ?”

দ্বিতীয় বানর বলিল, “আজ্ঞে, আছি।”

প্রথম বানর। আইস, আমরা এই ব্যাঘ্রদিগের বক্তৃতার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হই।

দ্বি, বা। কেন?

প্র, বা। এই বাঘেরা আমাদের চিরশত্রু। আইস, কিছু নিন্দা করিয়া শত্রুতা সাধা যাউক।

দ্বি, বা। অবশ্য কর্তব্য। কাজটা আমাদের জাতির উচিত বটে।

প্র, বা। আচ্ছা, তবে দেখ, বাঘেরা কেহ নিকটে নাই ত?

দ্বি, বা। না। তথাপি আপনি একটু প্রচ্ছন্ন থাকিয়া বলুন।

প্র, বা। সেই কথাই ভাল! নইলে কি জানি, কোন্ দিন কোন্ বাঘের সম্মুখে পড়িব, আর আমাকে ভোজন করিয়া ফেলিবে।

দ্বি, বা। বলুন। কি দোষ?

প্র, বা। প্রথম ব্যাকরণ অশুদ্ধ। আমরা বানরজাতি, ব্যাকরণে বড় পণ্ডিত। ইহাদের ব্যাকরণ আমাদের বাঁদুরের ব্যাকরণের মত নহে।

দ্বি, বা। তার পর?

প্র, বা। ইহাদের ভাষা বড় মন্দ।

দ্বি, বা। হাঁ, উহারা বাঁদুরের কথা কয় না!

প্র, বা। ঐ যে অমিতোদর বলিল, ‘ব্যাঘ্রদিগের কর্তব্য, অগ্রে মনুষ্যদিগকে সভ্য করিয়া পশ্চাৎ ভোজন করেন,’ ইহা না বলিয়া যদি বলিত, ‘অগ্রে মনুষ্যদিগকে ভোজন করিয়া পশ্চাৎ সভ্য করেন,’ তাহা হইলে সঙ্গত হইত।

দ্বি, বা। সন্দেহ কি—নইলে আমাদের বানর বলিবে কেন?

প্র, বা। কি প্রকারে বক্তৃতা হয়, তাহা উহারা জানে না। বক্তৃতায় কিছু কিচমিচ করিতে হয়, কিছু লক্ষ্যবাক্য করিতে হয়, দুই এক বার মুখ ভেঙ্গাইতে হয়, দুই এক বার কদলী ভোজন করিতে হয়; উহাদের কর্তব্য, আমাদের কাছে কিছু শিক্ষা লয়।

দ্বি, বা। আমাদের কাছে শিক্ষা পাইলে বানর হইত, ব্যাঘ্র হইত না।

এমত সময়ে আরো কয়েকটা বানর সাহস পাইয়া উঠিল। এক বানর বলিল, “আমার বিবেচনায় বক্তৃতার মহদোষ এই যে, বৃহল্লাঙ্গুল আপনার জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা আবিষ্কৃত অনেক-গুলি নতুন কথা বলিয়াছেন। সে সকল কথা কোন গ্রন্থেই পাওয়া যায় না। যাহা পূর্বে লেখকদিগের চর্চিতচর্ষণ নহে, তাহা নিতান্ত দূষ্য। আমরা বানর জাতি, চিরকাল চর্চিতচর্ষণ করিয়া বানরলোকের শ্রীবৃদ্ধি করিয়া আসিতোছি—ব্যাঘ্রাচার্য্য যে তাহা করেন নাই ইহা মহাপাপ।”

তখন একটি রূপী বানর বলিয়া উঠিল, “আমি এই সকল বক্তৃতার মধ্যে হাজার এক দোষ তালিকা করিয়া বাহির করিতে পারি। আমি হাজার এক স্থানে বৃদ্ধিতে পারি নাই। যাহা আমার বিদ্যাবুদ্ধির অতীত, তাহা মহাদোষ বই আর কি?”

আর একটি বানর কাঁহল, “আমি বিশেষ কোন দোষ দেখাইতে পারি না। কিন্তু আমি বায়ান্ন রকম মুখভঙ্গী করিতে পারি; এবং অশ্লীল গালিগালাজ দিয়া আপন সভ্যতা এবং রসিকতা প্রচার করিতে পারি।”

এইরূপে বানরেরা ব্যাঘ্রদিগের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত রহিল। দেখিয়া এক স্কুলোদর বানর বলিল যে, “আমরা যে রূপ নিন্দাবাদ করিলাম, তাহাতে বৃহল্লাঙ্গুল বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিবে। আইস, আমরা কদলী ভোজন করি।”

ইংরাজস্তোত্র

(মহাভারত হইতে অনূবাদিত)

হে ইংরাজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১ ॥

তুমি নানাগুণে বিভূষিত, সুন্দর কাঁতিবিশিষ্ট, বহুল সম্পদযুক্ত; অতএব হে ইংরাজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২ ॥

তুমি হস্তা—শত্রুদলের; তুমি কর্তা—আইনাদির; তুমি বিধাতা—চাকরি প্রভৃতির। অতএব হে ইংরাজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ৩ ॥

তুমি সমরে দিব্যাস্ত্রধারী, শিকারে বল্লমধারী, বিচারাগারে অর্দ্ধ ইণ্ড পরিমিত ব্যাসবিশিষ্ট বৈদ্যধারী, আহারে কাঁটা-চাম্বেধারী; অতএব হে ইংরাজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ৪ ॥

তুমি একরূপে রাজপুত্রী মধ্যে অধিষ্ঠান করিয়া রাজ্য কর; আর একরূপে পণ্যবীথিকা মধ্যে বাণিজ্য কর; আর একরূপে কাছাড়ে চার চাষ কর; অতএব হে ব্রহ্মদেব! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ৫ ॥

তোমার সত্ত্বগুণ তোমার প্রণীত গ্রন্থাদিতে প্রকাশ; তোমার রজোগুণ তোমার কৃত যুদ্ধাদিতে প্রকাশ; তোমার তমোগুণ তোমার প্রণীত ভারতবর্ষীয় সম্বাদপত্রাদিতে প্রকাশ।—অতএব হে ত্রিগুণাত্মক! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ৬ ॥

তুমি আছ, এই জন্য তুমি সৎ! তোমার শত্রুরা রণক্ষেত্রে চিৎ; এবং তুমি উমেদারবর্গের আনন্দ; অতএব হে সচ্চিদানন্দ! তোমাকে আমি প্রণাম করি। ৭ ॥

তুমি ব্রহ্মা—কেন না, তুমি প্রজাপতি; তুমি বিষ্ণু—কেন না, কমলা তোমার প্রতিই কৃপা করেন; এবং তুমি মহেশ্বর—কেন না, তোমার গৃহিণী গৌরী। অতএব হে ইংরাজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ৮ ॥

তুমি ইন্দ্র, কামান তোমার বজ্র; তুমি চন্দ্র, ইন্কম টেক্স তোমার কলঙ্ক; তুমি বায়ু, রেইলওয়ে তোমার গমন; তুমি বরুণ, সমুদ্র তোমার রাজ্য; অতএব হে ইংরাজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ৯ ॥

তুমিই দিবাকর, তোমার আলোকে আমাদের অজ্ঞানান্ধকার দূর হইতেছে; তুমিই অগ্নি—কেন না, সব খাও; তুমিই যম, বিশেষ আমলাবর্গের। ১০ ॥

তুমি বেদ, আর ঋক্‌ষজুসাদি মানি না; তুমি স্মৃতি—মন্বাদি ভুলিয়া গিয়াছ; তুমি দর্শন—ন্যায়, মীমাংসা প্রভৃতি তোমারই হাত। অতএব হে ইংরাজ! তোমাকে প্রণাম করি। ১১ ॥

হে শ্বেতকান্ত! তোমার অমল-ধবল দ্বিরদ-রদশূদ্র মহাশ্মশ্রুশোভিত মুখমণ্ডল দেখিয়া আমার বাসনা হইয়াছে, আমি তোমার স্তব করিব; অতএব হে ইংরাজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১২ ॥

তোমার হরিতকপিশ পিঙ্গললোহিত কৃষ্ণশূদ্রাদি নানা বর্ণশোভিত, অতিযত্নরিপিত, ভল্লুক-মেদমাঞ্জিত কুন্তলাবলি দেখিয়া আমার বাসনা হইয়াছে, আমি তোমার স্তব করিব; অতএব হে ইংরাজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৩ ॥

তুমি কলিকালে গৌরাজ্জবতার, তাহার সন্দেহ নাই। হ্যাট তোমার সেই গোপবেশের চূড়া; পেন্টুলন সেই ধড়া—আর হুইপ্ সেই মোহন মুরলী—অতএব হে গোপীবল্লভ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৪ ॥

হে বরদ! আমাকে বর দাও। আমি শামলা মাতায় বাঁধিয়া তোমার পিছ পিছ বেড়াইব—তুমি আমাকে চাকরি দাও। আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৫ ॥

বিশ্বকম রচনাবলী

হে শুভঙ্কর! আমার শুভ কর। আমি তোমার খোশামোদ করিব, তোমার প্রিয় কথা কহিব, তোমার মনরাখা কাজ করিব—আমায় বড় কর, আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৬॥

হে মানদ! আমায় টাইটল দাও, খেতাব দাও, খেলাত দাও;—আমাকে তোমার প্রসাদ দাও—
আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৭॥

হে ভক্তবৎসল! আমি তোমার পাগ্গাবশেষ ভোজন করিতে ইচ্ছা করি—তোমার করস্পর্শে
লোকমণ্ডলে মহামানাস্পদ হইতে বাসনা করি,—তোমার স্বহস্তলিখিত দুই একখানা পত্র বাস্ত-
মধ্যে রাখিবার স্পর্শ করি—অতএব হে ইংরাজ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও; আমি তোমাকে
প্রণাম করি। ১৮॥

হে অন্তর্যামিন্! আমি যাহা কিছু করি, তোমাকে ভুলাইবার জন্য। তুমি দাতা বলিবে
বলিয়া আমি দান করি; তুমি পরোপকারী বলিবে বলিয়া পরোপকার করি; তুমি বিদ্বান্ বলিবে
বলিয়া আমি লেখাপড়া করি। অতএব হে ইংরাজ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমি
তোমাকে প্রণাম করি। ১৯॥

আমি তোমার ইচ্ছামতে ডিস্‌পেন্সারি করিব; তোমার প্রীত্যর্থ স্কুল করিব; তোমার আজ্ঞামত
চাঁদা দিব; তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২০॥

হে সৌম্য! যাহা তোমার অভিমত, তাহাই আমি করিব। আমি বড়ট পাণ্টলুন পরিব, নাকে
চসমা দিব, কাঁটা চাম্‌চে ধরিব, টেবিলে খাইব—তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও! আমি তোমাকে
প্রণাম করি। ২১॥

হে মিষ্টভাষিন্! আমি মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া তোমার ভাষা কহিব; পৈতৃক ধর্ম ছাড়িয়া
ব্রাহ্মধর্মাবলম্বন করিব; বাবু নাম ঘুচাইয়া মিষ্টর লেখাইব; তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও!
আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২২॥

হে সুভোজক! আমি ভাত ছাড়িয়াছি, পাঁউরুটি খাই; নিষিক্ত মাংস নহিলে আমার ভোজন
হয় না; কুক্কট আমার জলপান। অতএব হে ইংরাজ! আমাকে চরণে রাখিও, আমি তোমাকে
প্রণাম করি। ২৩॥

আমি বিধবার বিবাহ দিব; কুলীনের জাতি মারিব, জাতিভেদ উঠাইয়া দিব—কেন না, তাহা
হইলে তুমি আমার সুখ্যাতি করিবে। অতএব হে ইংরাজ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। ২৪॥

হে সর্বদ! আমাকে ধন দাও, মান দাও, যশঃ দাও;—আমার সর্ববাসনা সিদ্ধ কর। আমাকে
বড় চাকরি দাও, রাজা কর, রায়বাহাদুর কর, কোর্নিসলের মেম্বর কর, আমি তোমাকে প্রণাম
করি। ২৫॥

যদি তাহা না দাও, তবে আমাকে ডিনরে আট্‌হোমে নিমন্ত্রণ কর; বড় বড় কমিটির মেম্বর
কর, সেনেটের মেম্বর কর, জুজিস্টস কর, অনরারী ম্যাজিস্ট্রেট কর, আমি তোমাকে প্রণাম
করি। ২৬॥

আমার স্পীচ শুন, আমার এশে পড়, আমায় বাহবা দাও,—আমি তাহা হইলে সমগ্র হিন্দু-
সমাজের নিন্দাও গ্রাহ্য করিব না। আমি তোমাকেই প্রণাম করি। ২৭॥

হে ভগবন্! আমি অকিঞ্চন। আমি তোমার দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকি, তুমি আমাকে মনে
রাখিও। আমি তোমাকে ডালি পাঠাইব, তুমি আমাকে মনে রাখিও। হে ইংরাজ! আমি
তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম করি। ২৮॥

বাবু

জনমেজয় কহিলেন, হে মহর্ষে! আপনি কহিলেন যে, কলিযুগে বাবু নামে এক প্রকার
মনুষ্যেরা পৃথিবীতে আবির্ভূত হইবেন। তাঁহারা কি প্রকার মনুষ্য হইবেন এবং পৃথিবীতে
জন্মগ্রহণ করিয়া কি কার্য করিবেন, তাহা শুনিতে বড় কৌতূহল জন্মিতেছে। আপনি অনুগ্রহ
করিয়া সবিস্তারে বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরবর! আমি সেই বিচিত্রবুদ্ধি, আহারনিদ্রাকুশলী বাবুগণকে
আখ্যাত করিব, আপনি শ্রবণ করুন। আমি সেই চসমাঅলঙ্কৃত, উদারচরিত্র, বহুভাষী, সন্দেহ-
প্রিয় বাবুদিগের চরিত্র কীর্ত্তিত করিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। হে রাজন্, যাঁহারা চিত্রবসনাবৃত,

বেগহস্ত, রঞ্জিতকুণ্ডল, এবং মহাপাদুক, তাঁহারাই বাবু। যাঁহারা বাক্যে অজেয়, পরভাষাপারদর্শী, মাতৃভাষাবিরোধী, তাঁহারাই বাবু। মহারাজ! এমন অনেক মহাবুদ্ধিসম্পন্ন বাবু জন্মিবেন যে, তাঁহারা মাতৃভাষায় বাক্যালাপে অসমর্থ হইবেন। যাঁহাদিগের দর্শেন্দ্রিয় প্রকৃতিস্থ, অতএব অপরি-
শুদ্ধ, যাঁহাদিগের কেবল রসেন্দ্রিয় পরজাতিনিষ্ঠীবনে পবিত্র, তাঁহারাই বাবু। যাঁহাদিগের চরণ
মাংসাস্থিবিহীন শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় হইলেও পলায়নে সক্ষম;—হস্ত দুর্বল হইলেও লেখনীধারণে
এবং বেতনগ্রহণে সুপটু;—চর্ম কোমল হইলেও সাগরপারনির্মিত দ্রব্যবিশেষের প্রহারসহিষ্ণু;
যাঁহাদিগের ইন্দ্রিয়মাণেরই ঐরূপ প্রশংসা করা যাইতে পারে, তাঁহারাই বাবু। যাঁহারা বিনা
উদ্দেশ্যে সঞ্চয় করিবেন, সঞ্চয়ের জন্য উপার্জন করিবেন, উপার্জনের জন্য বিদ্যাশয়ন করিবেন,
বিদ্যাশয়নের জন্য প্রশ্ন চুরি করিবেন, তাঁহারাই বাবু।

মহারাজ! বাবু শব্দ নানার্থ হইবে। যাঁহারা কলিযুগে ভারতবর্ষে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া,
ইংরাজ নামে খ্যাত হইবেন, তাঁহাদিগের নিকট “বাবু” অর্থে কেরাণী বা বাজারসরকার বুঝাইবে।
নির্ধনদিগের নিকটে “বাবু” শব্দে অপেক্ষাকৃত ধনী বুঝাইবে। ভূত্যের নিকট “বাবু” অর্থে
প্রভু বুঝাইবে। এ সকল হইতে পৃথক্, কেবল বাবুজন্মনির্ব্বাহাভিলাষী কতকগুলি মনুষ্য
জন্মিবেন; কেবল তাঁহাদিগেরই গুণকীর্তন করিতেছি। যিনি বিপরীতার্থ করিবেন, তাঁহার
এই মহাভারত শ্রবণ নিষ্ফল হইবে। তিনি গোজন্ম গ্রহণ করিয়া বাবুদিগের ভক্ষ্য হইবেন।

হে নরাধিপ! বাবুগণ দ্বিতীয় অগস্ত্যের ন্যায় সমুদ্ররূপী বরুণকে শোষণ করিবেন, স্ফাটিক
পাত্র ইঁহাদিগের গণ্ডুষ। অগ্নি ইঁহাদিগের আজ্ঞাবহ হইবেন—“তামাকু” এবং “চুরটু” নামক
দুইটি অভিনব খাণ্ডবকে আশ্রয় করিয়া রাত্রি দিন ইঁহাদিগের মুখে লাগিয়া থাকিবেন। ইঁহা-
দিগের যেমন মুখে অগ্নি, তেমনি জঠরেও অগ্নি জ্বলিবেন। এবং রাত্রি তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত
ইঁহাদিগের রথস্থ যুগল প্রদীপে জ্বলিবেন। ইঁহাদিগের আলোচিত সঙ্গীতে এবং কাব্যেও
অগ্নিদেব থাকিবেন। তথায় তিনি “মদন আগুন” এবং “মনাগুন” রূপে পরিণত হইবেন।
বারবিলাসিনীদিগের মতে ইঁহাদিগের কপালেও অগ্নিদেব বিরাজ করিবেন। বায়ুকেই ইঁহারা
ভক্ষণ করিবেন—ভদ্রতা করিয়া সেই দুর্দ্ধর্ষ কার্যের নাম রাখিবেন, “বায়ুসেবন”। চন্দ্র ইঁহাদের
গৃহে এবং গৃহের বাহিরে নিত্য বিরাজমান থাকিবেন—কদাপি অবগুণ্ঠনাবৃত। কেহ প্রথম
রাত্রে কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্র, শেষ রাত্রে শুক্লপক্ষের চন্দ্র দেখিবেন, কেহ তদ্বিপরীত করিবেন। সূর্য্য
ইঁহাদিগকে দেখিতে পাইবেন না। যম ইঁহাদিগকে ভুলিয়া থাকিবেন। কেবল অশ্বিনীকুমার-
দিগকে ইঁহারা পূজা করিবেন। অশ্বিনীকুমারদিগের মন্দিরের নাম হইবে “আস্তাবল”।

হে নরশ্রেষ্ঠ! যিনি কাব্যরসাদিতে বর্ণিত, সঙ্গীতে দক্ষ কোকিলাহারী, যাঁহার পাণ্ডিত্য
শৈশবভ্যস্ত গ্রন্থগত, যিনি আপনাকে অনন্তজ্ঞানী বিবেচনা করিবেন, তিনিই বাবু। যিনি কাব্যের
কিছুই বুঝিবেন না, অথচ কাব্যপাঠে এবং সমালোচনায় প্রবৃত্ত, যিনি বারযোষিতের চীৎকার
মাগ্নকেই সঙ্গীত বিবেচনা করিবেন, যিনি আপনাকে অভ্রান্ত বলিয়া জানিবেন, তিনিই বাবু। যিনি
রূপে কার্ত্তিকের কনিষ্ঠ, গুণে নির্গুণ পদার্থ, কস্মি জড় ভরত, এবং বাক্যে সরস্বতী, তিনিই
বাবু। যিনি উৎসবার্থ দুর্গাপূজা করিবেন, গৃহিণীর অনুরোধে লক্ষ্মীপূজা করিবেন, উপ-
গৃহিণীর অনুরোধে সরস্বতীপূজা করিবেন, এবং পাঁটার লোভে গঙ্গাপূজা করিবেন, তিনিই
বাবু। যাঁহার গমন বিচিত্র রথে, শয়ন সাধারণ গৃহে, পান দ্রাক্ষারস, এবং আহার কদলী দক্ষ,
তিনিই বাবু। যিনি মহাদেবের তুল্য মাদকপ্রিয়, ব্রহ্মার তুল্য প্রজাসিসৃক্ষ, এবং বিষ্ণুর তুল্য
লীলা-পটু, তিনিই বাবু। হে কুরুকুলভূষণ! বিষ্ণুর সহিত এই বাবুদিগের বিশেষ সাদৃশ্য
হইবে। বিষ্ণুর ন্যায় ইঁহাদের লক্ষ্মী এবং সরস্বতী উভয়ই থাকিবেন। বিষ্ণুর ন্যায় ইঁহারাও
অনন্তশয্যাশায়ী হইবেন। বিষ্ণুর ন্যায় ইঁহাদিগেরও দশ অবতার—যথা, কেরাণী, মাষ্টার, ব্রাহ্ম,
মুৎসুন্দী, ডাক্তার, উকিল, হাকিম, জমিদার, সম্বাদপত্রসম্পাদক এবং নিষ্কর্মা। বিষ্ণুর ন্যায়
ইঁহারা সকল অবতारेই অমিতবলপরাক্রম অসুরগণকে বধ করিবেন। কেরাণী অবতारे বধ্য
অসুর দপ্তরী; মাষ্টার অবতारे বধ্য ছাত্র; স্টেশ্যান মাষ্টার অবতारे বধ্য টিকেটহীন পথিক;
ব্রাহ্মাবতारे বধ্য চালকলাপ্রত্যাশী পুরোহিত; মুৎসুন্দী অবতारे বধ্য বণিক ইংরাজ; ডাক্তার
অবতारे বধ্য রোগী; উকিল অবতारे বধ্য মোয়াক্কল; হাকিম অবতारे বধ্য বিচারার্থী; জমিদার
অবতारे বধ্য প্রজা; সম্পাদক অবতारे বধ্য ভদ্রলোক এবং নিষ্কর্মা অবতारे বধ্য পুষ্করিণীর
মৎস্য।

বাঁকম রচনাবলী

মহারাজ! পুনশ্চ শ্রবণ করুন। যাঁহার বাক্য মনোমধ্যে এক, কথনে দশ, লিখনে শত এবং কলহে সহস্র, তিনিই বাবু। যাঁহার বল হস্তে একগুণ, মূখে দশগুণ, পৃষ্ঠে শতগুণ এবং কার্য-কালে অদৃশ্য, তিনিই বাবু। যাঁহার বুদ্ধি বাল্যে পুস্তকমধ্যে, যৌবনে বোতলমধ্যে, বাদ্যকো গৃহিণীর অঞ্চলে, তিনিই বাবু। যাঁহার ইষ্টদেবতা ইংরাজ, গুরু ব্রাহ্মধর্মবেত্তা, বেদ দেশী সম্বাদপত্র এবং তীর্থ “ন্যাশানেল থিয়েটার”, তিনিই বাবু। যিনি মিসনারির নিকট খ্রীষ্টিয়ান, কেশবচন্দ্রের নিকট ব্রাহ্ম, পিতার নিকট হিন্দু, এবং ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের নিকট নাস্তিক, তিনিই বাবু। যিনি নিজগৃহে জল খান, বন্ধুগৃহে মদ খান, বেশ্যাগৃহে গালি খান, এবং মূর্খের সাহেবের গৃহে গলাধাক্সা খান, তিনিই বাবু। যাঁহার স্নানকালে তৈলে ঘৃণা, আহারকালে আপন অঙ্গুলিকে ঘৃণা এবং কথোপকথনকালে মাতৃভাষাকে ঘৃণা, তিনিই বাবু। যাঁহার যত্ন কেবল পরিচ্ছদে, তৎপরতা কেবল উমেদারিতে, ভক্তি কেবল গৃহিণী বা উপগৃহিণীতে, এবং রাগ কেবল সদ-গ্রন্থের উপর, নিঃসন্দেহ তিনিই বাবু।

হে নরনাথ! আমি যাঁহাদিগের কথা বলিলাম, তাঁহাদিগের মনে মনে বিশ্বাস জন্মবে যে, আমরা তাম্বুল চর্ষণ করিয়া, উপাধান অবলম্বন করিয়া, দ্বৈভাষিকী কথা করিয়া, এবং তামাকু সেবন করিয়া ভারতবর্ষের পুনরুদ্ধার করিব।

জনমেজয় কাঁহিলেন, হে মূর্খপুঙ্গব! বাবুদিগের জয় হউক, আপনি অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ করুন।

গন্দর্ভ

হে গন্দর্ভ! আমার প্রদত্ত, এই নবীন তৃণ সকল ভোজন করুন।

আমি বহুযত্নে, গোবৎসাদির অগম্য প্রান্তর সকল হইতে, নবজলকর্ণানিষেকসুরভি তৃণাগ্রভাগ সকল আহরণ করিয়া আনিয়াছি, আপনি সুন্দর বদনমণ্ডলে গ্রহণ করিয়া, মনুজ্ঞানিন্দিত দস্তে ছেদনপূর্ব্বক আমার প্রতি কৃপাবান্ হউন।

হে মহাভাগ! আপনার পূজা করিব ইচ্ছা হইয়াছে; কেন না, আপনাকেই সর্ব্বত্র দেখিতে পাই। অতএব হে বিশ্বব্যাপিন্! আমার পূজা গ্রহণ করুন।

আমি পূজা ব্যক্তির অনুসন্ধান প্রবৃত্ত হইয়া, নানা দেশে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া দেখিলাম, আপনি সর্ব্বত্রই বসিয়া আছেন, সকলেই আপনার পূজা করিতেছে। অতএব হে দীর্ঘকর্ণ! আমারও পূজা গ্রহণ করুন।

হে গন্দর্ভ! কে বলে তোমার পদগুলি ক্ষুদ্র। যেখানে সেখানে তোমারই বড় পদ দেখিয়া থাকি। তুমি উচ্চাসনে বসিয়া, স্তাবকগণে পরিবৃত্ত হইয়া, মোটা মোটা ঘাসের আঁটি খাইয়া থাক। লোকে তোমার শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রশংসা করে।

তুমিই বিচারাসনে উপবেশন করিয়া, মহাকর্ণদ্বয় ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিতেছ। তাহার অগাধ গহ্বর দেখিতে পাইয়া, উকীল নামক কবিগণ নানাবিধ কাব্যরস তন্মধ্যে ঢালিয়া দিতেছে। তখন তুমি শ্রবণতৃপ্তসুখে অভিভূত হইয়া নিদ্রা গিয়া থাক।

হে বৃহস্পতি! তখন সেই কাব্যরসে আদ্রীভূত হইয়া, তুমি দয়াময় হইয়া, অসীম দয়ার প্রভাবে রামের সর্ব্বস্ব শ্যামকে দাও, শ্যামের সর্ব্বস্ব কানাইকে দাও; তোমার দয়ার পার নাই।

হে রজকগৃহভূষণ! কখনও দেখিয়াছি, তুমি লাজুল সঙ্গোপনপূর্ব্বক কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিয়া, সরস্বতীমণ্ডপমধ্যে বঙ্গীয় বালকগণকে গন্দর্ভলোক প্রাপ্তির উপায় বলিয়া দিতেছ। বালকেরা গন্দর্ভলোকে প্রবেশ করিলে, “প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হইল” বলিয়া, মহা গজ্জন করিয়া থাক। শূনিয়া আমরা ভয় পাই।

হে প্রকাণ্ডাদর! তুমিই চতুর্পাঠীমধ্যে কুশাসনে উপবেশন করিয়া তৈলনিষিক্ত ললাটপ্রান্তরে চন্দনে নদী অঙ্কিত করিয়া, তুলটহস্তে শোভা পাও। তোমার কৃত শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শূনিয়া আমরা ধন্য ধন্য করিতেছি। অতএব হে মহাপশো! আমার প্রদত্ত কোমল তৃণাঙ্কুর ভোজন কর।

তোমারই প্রতি লক্ষ্মীর কৃপা—তুমি নহিলে আর কাহারও প্রতি কমলার দয়া হয় না। তিনি তোমাকে কখনও ত্যাগ করেন না, কিন্তু তুমি তাঁহাকে বুদ্ধির গুণে সর্ব্বদাই ত্যাগ করিয়া থাক। এই জন্যই লক্ষ্মীর চাঞ্চল্য কলঙ্ক। অতএব হে সুপুঙ্গব! তৃণ ভোজন কর।

তুমিই গায়ক। ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার প্রভৃতি সপ্ত সুরই তোমার কণ্ঠে। অন্যে বহুকাল তোমার অনুকরণ করিয়া, দীর্ঘ শ্মশ্রু রাখিয়া, অনেক প্রকার কাশি অভ্যাস করিয়া, তোমার মত স্বর পাইয়া থাকে। হে ভৈরবকণ্ঠ! ঘাস খাও।

তুমি বহুকাল হইতে পৃথিবীতলে বিচরণ করিতেছ। তুমিই রামায়ণে রাজা দশরথ, নহিলে রাম বনে যাইবে কেন? তুমি মহাভারতে পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির, নহিলে পাণ্ডব পাশায় স্ত্রী হারিবে কেন? তুমি কর্ণযুগে বঙ্গদেশে বৃদ্ধ সেনরাজা ছিলে,—নহিলে বঙ্গদেশে মুসলমান কেন?

তুমি নানা রূপে, নানা দেশ আলো করিয়া যুগে যুগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ। এক্ষণে তপস্যা-বলে, ব্রহ্মার বরে, তুমি বঙ্গদেশে সমালোচক হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছ। হে লোমশাবতার! আমার সমাহৃত কোমল নবীন তৃণাঙ্কুর সকল ভক্ষণ কর, আমি আহুদিত হইব।

হে মহাপৃষ্ঠ! তুমি কখন রাজ্যের ভার বহ, কখন পুস্তকের ভার বহ, কখন ধোবার গাঁটির বহ। হে লোমশ! কোন্টি গুরুভার, আমায় বলিয়া দাও।

তুমি কখন ঘাস খাও, কখন ঠেঙ্গা খাও; কখন গ্রন্থকারের মাথা খাও; হে লোমশ! কোন্টি সুভক্ষ্য, অর্বাচীনকে বলিয়া দাও।

হে সুন্দর! তোমার রূপ দেখিয়া আমি মোহিত হইয়াছি। তুমি যখন গাছতলায় দাঁড়াইয়া, নববর্ষাসারসিক্ত হইতে থাক, দুই মহাকর্ণ উন্মেষিত করিয়া, মুখচন্দ্র বিনত করিয়া, চক্ষু দুটি ক্ষণে মূদ্রিত, ক্ষণে উন্মেষিত করিতে করিতে ভিজিতে থাক,—তোমার পৃষ্ঠে, মুণ্ডে এবং স্কন্ধে বসুধারা বহিতে থাকে—তখন তোমাকে আমি বড় সুন্দর দেখি। হে লোকমনোমোহন! কিছুর ঘাস খাও।

বিধাতা তোমায় তেজ দেন নাই, এজন্য তুমি শান্ত, বেগ দেন নাই, এজন্য সুধীর, বুদ্ধি দেন নাই, এজন্য তুমি বিদ্বান্; এবং মোট না বহিলে খাইতে পাও না, এজন্য তুমি পরোপকারী। আমি তোমার যশোগান করিতেছি; ঘাস খাইয়া সুখী কর।

দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন

আমরা স্ত্রীজাতি, নিরীহ ভালমানুষ বলিয়া আজি কালি আমাদের উপর বড় অত্যাচার হইতেছে। পুরুষের এক্ষণে বড় স্পর্ধা হইয়াছে, ভর্তৃগণ স্ত্রীকে আর মানে না, স্ত্রীলোকদিগের পুরাতন স্বভাব সকল লুপ্ত হইতেছে, কেহই আর স্ত্রীর আজ্ঞার বশবর্তী নহে। এই সকল বিষয়ের সুনিয়ম করিবার জন্য আমরা স্ত্রীস্বত্বরক্ষণী সভা সংস্থাপিত করিয়াছি। সে সভার পরিচয় যদি সাধারণে সর্বিশেষ অবগত না থাকেন, তবে তাহার বিজ্ঞাপনী পশ্চাৎ প্রকাশ করিব। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, আমাদের স্বত্বরক্ষার্থ সভা হইতে একটি বিশেষ সদুপায় হইয়াছে। আমরা এ বিষয়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টে আবেদনপত্র প্রেরণ করিয়াছি। এবং তৎসম্ভাব্যাহারে ভর্তৃ-শাসনার্থ একটি দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইনের পাণ্ডুলিপি প্রেরণ করিয়াছি।

সকলের স্বত্ব রক্ষার্থ যেখানে প্রত্যহ আইনের সৃষ্টি হইতেছে, সেখানে আমাদের চিরন্তন স্বত্ব রক্ষার্থ কোন আইন হয় না কেন? অতএব এই আইন সত্তরে পাস হইবে, এই কামনায় স্বামিগণকে অবগত করিবার জন্য আমি তাহা বঙ্গদর্শনে প্রচার করিলাম। অনেক বাবুলোক বাঙ্গালাতে আইন ভাল বুঝিতে পারেন না, বিশেষতঃ আইনের বাঙ্গালা অনুবাদ সচরাচর ভাল হয় না, এবং আইন আদৌ ইংরাজিতেই প্রণীত হইয়াছিল, এবং ইহার বাঙ্গালা অনুবাদটি ভাল হয় নাই, স্থানে স্থানে ইংরাজির সঙ্গে ইহার প্রভেদ আছে, অতএব আমরা ইংরাজি বাঙ্গালা দুই পাঠালাম। ভরসা করি, বঙ্গদর্শনকারক একবার আমাদের অনুরোধে ইংরাজির প্রতি বিরাগ ত্যাগ করিয়া ইংরাজিসমেত এই আইন প্রচার করিবেন। সকলেই দেখিবেন যে, এই আইনটিতে নতুন কিছু নাই; সাবেক Lex non scripta কেবল লিপিবদ্ধ হইয়াছে মাত্র।

শ্রীমতী অন্তসুন্দরী দাসী,
স্ত্রীস্বত্বরক্ষণী সভার সম্পাদিকা।

THE MATRIMONIAL PENAL CODE.

CHAPTER I.

INTRODUCTION.

Whereas it is expedient to provide a special Penal Code for the coercion of refractory husbands and others who dispute the supreme authority of Woman, it is hereby enacted as follows :

1. This Act shall be entitled the "Matrimonial Penal Code" and shall take effect on all natives of India in the married state.

CHAPTER II.

DEFINITIONS.

2. A husband is a piece of moving and moveable property at the absolute disposal of a woman.

ILLUSTRATIONS.

(a) A trunk or a workbox is not a husband, as it is not a moving, though a moveable piece of property.

(b) Cattle are not husbands, for though capable of locomotion, they cannot be at the absolute disposal of any woman, as they often display a will of their own.

(c) Men in the married state, having no will of their own, are husbands.

3. A wife is a woman having the right of property in a husband.

EXPLANATIONS.

The right of property includes the right of flagellation.

4. "The married state" is a state of penance into which men voluntarily enter for sins committed in a previous life.

দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন

প্রথম অধ্যায়

স্ত্রীদিগের অবাধ্য স্বামী প্রভৃতির সুশাসনের জন্য এক বিশেষ আইন করা উচিত, এই কারণে নিম্নের লিখিতমত আইন করা গেল।

১ ধারা। এই আইন "দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন" নামে খ্যাত হইবে। ভারতবর্ষীয় যে কোন দেশী বিবাহিত পুরুষের উপর ইহার বিধান খাটিবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাধারণ ব্যাখ্যা

২ ধারা। কোন স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ অধীন যে সচল অস্থাবর সম্পত্তি, তাহাকে স্বামী বলা যায়।

উদাহরণ

(ক) বাস্তব তোরঙ্গ প্রভৃতিতে স্বামী বলা যায় না, কেন না, যদিও সে সকল অস্থাবর সম্পত্তি বটে, তথাপি সচল নহে।

(খ) গোরু বাছুরও স্বামী নহে, কেন না, যদিও গোরু বাছুর সচল বটে, কিন্তু তাহাদের একটু স্বৈচ্ছামতে কার্য করিবার ক্ষমতা আছে। সুতরাং তাহারা কোন স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ অধীন নহে।

(গ) বিবাহিত পুরুষেরাই স্বৈচ্ছাধীন কোন কার্য করিতে পারেন না, এজন্য গোরু বাছুরকে স্বামী না বলিয়া তাহাদিগকেই স্বামী বলা যাইতে পারে।

৩ ধারা। যে স্বামীর উপর যে স্ত্রীলোকের সম্পত্তি বলিয়া স্বত্ত্ব আছে, সেই স্ত্রীলোক সেই স্বামীর পত্নী বা স্ত্রী।

অর্থের কথা

সম্পত্তি বলিয়া যাহার উপর স্বত্ত্বাধিকার থাকে, তাহাকে মারপিট করিবারও স্বত্ত্বাধিকার থাকিবে।

৪ ধারা। পূর্বজন্মকৃত পাপের জন্য পুরুষের প্রায়শ্চিত্তবিশেষকে বিবাহ বলে।

CHAPTER III.

OF PUNISHMENTS.

5. The punishments to which offenders are liable under the provisions of this Code are ;

FIRST, IMPRISONMENT.

Which may be either within the four walls of a bed-room, or within the four walls of a house.

Imprisonment is of two descriptions, namely,

(1) Rigorous, that is, accompanied by hard words.

(2) Simple.

SECONDLY, Transportation, that is to another bed-room.

THIRDLY, Matrimonial servitude.

FOURTHLY, Forfeiture of Pocket-money.

6. "Capital punishment" under this Code, means that the wife shall run away to her paternal roof, or to some other friendly house, with the intention of not returning in a hurry.

7. The following punishments are also provided for minor offences.

FIRST, Contemptuous silence on the part of the wife.

SECONDLY, Frowns.

THIRDLY, Tears and lamentation.

FOURTHLY, Scolding and abuse.

CHAPTER IV.

GENERAL EXCEPTIONS.

8. Nothing is an offence which is done by a wife.

9. Nothing is an offence which is done by a husband in obedience to the commands of a wife.

10. No person in the married state shall be entitled to plead any other circumstances as grounds of exemption from the provisions of the Matrimonial Penal Code.

বাংলা রচনাবলী

তৃতীয় অধ্যায়

দণ্ডের কথা

৫ ধারা। এই আইনের বিধানমতে অপরাধীদের নিম্নলিখিত দণ্ড হইতে পারে।
প্রথম। কয়েদ।

অর্থাৎ শয্যাগৃহের চারি ভিত্তির মধ্যে কয়েদ, অথবা বাটীর চারি ভিত্তির মধ্যে কয়েদ।
কয়েদ দুই প্রকার।

(১) কঠিন তিরস্কারের সহিত।

(২) বিনা তিরস্কার।

দ্বিতীয়। শয্যান্তর প্রেরণ বা শয্যাগৃহান্তর প্রেরণ।

তৃতীয়। পল্লীর দাসত্ব।

চতুর্থ। সম্পত্তিদণ্ড, অর্থাৎ নিজখরচের টাকা বন্ধ।

৬ ধারা। এই আইনে “প্রাণদণ্ড” অর্থে বুঝাইবে যে, স্ত্রী বাপের বাড়ী, কি ভাইয়ের বাড়ী
চলিয়া যাইবেন, শীঘ্র আসিতে চাহিবেন না।

৭ ধারা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপরাধের জন্য নিম্নলিখিত দণ্ড হইতে পারে।

প্রথম। মান।

দ্বিতীয়। দ্রুকুটী।

তৃতীয়। অশ্রুবর্ষণ বা উচ্চৈঃস্বরে রোদন।

চতুর্থ। গালি তিরস্কার।

চতুর্থ অধ্যায়

সাধারণ বর্জিত কথা

৮ ধারা। স্বীকৃত কোন ক্রিয়া অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

৯ ধারা। স্ত্রীর আজ্ঞানুসারে স্বামিকৃত কোন ক্রিয়া অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

১০ ধারা। ইহা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার ওজর করিয়া কোন বিবাহিত পুরুষ বলিতে
পারিবেন না যে, আমি দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইনানুসারে দণ্ডনীয় নই।

CHAPTER V.

OF ABETMENT.

11. A person abets the doing of a matrimonial offence who
FIRST, Instigates, persuades, induces, or encourages a husband to commit
that offence.

SECONDLY, Joins him in the commission of that offence, or keeps him
company during its commission.

EXPLANATION.

A man not in the married state or even a woman, may be an abettor.

ILLUSTRATIONS.

(a) A the husband of B, and C, an unmarried man, drink together.
Drinking is a matrimonial offence. C has abetted A.

(b) A the mother of B, the husband of C, persuades B to spend money
in other ways than those which C approves.

As spending money in such ways is a matrimonial offence, A has
abetted B.

12. When a man in the married state abets another man in the married state in a matrimonial offence, the abettor is liable to the same punishment as the principal. Provided that he can be so punished only by a competent court.

EXPLANATION.

A competent court means the wife having right of property in the offending husband.

13. Abettors who are females or male offenders not in the married state are liable to be punished only with scolding, abuse, frowns, tears and lamentations.

পঞ্চম অধ্যায়

অপরাধের সহায়তার বিধি

১১ ধারা। যে কোন ব্যক্তি—

প্রথম। অন্য ব্যক্তিকে কোন দাম্পত্য অপরাধ করিতে প্রবৃত্তি দেয় বা উৎসাহিত বা উদ্যুক্ত করে,

দ্বিতীয়। বা তৎসঙ্গে সেই অপরাধে লিপ্ত হয় বা সেই অপরাধ করার সময়ে তাহার সঙ্গে থাকে,

তবে বলা যায় যে, ঐ অপরাধের সহায়তা করিয়াছে।

অর্থের কথা

অবিবাহিত পুরুষ বা কোন স্ত্রীলোকও দাম্পত্য অপরাধের সহায়তা করিতে পারে।

উদাহরণ

(ক) রাম, কামিনীর স্বামী। যদু অবিবাহিত পুরুষ। উভয়ে একত্রে মদ্যপান করিল। মদ্যপান একটি দাম্পত্য অপরাধ। যদু, রামের সহায়তা করিয়াছে।

(খ) হরমণি, রামের মা। রাম কামিনীর স্বামী। কামিনী যেরূপে টাকা খরচ করিতে বলে, সেরূপে খরচ না করিয়া, রাম হরমণির পরামর্শে অন্য প্রকার খরচ করিল। স্ত্রীর অনাভিমত খরচ করা একটি দাম্পত্য অপরাধ। হরমণি তাহার সহায়তা করিয়াছে।

১২ ধারা। যদি কোন বিবাহিত পুরুষ কোন দাম্পত্য অপরাধে অন্য বিবাহিত পুরুষের সহায়তা করে, তবে সে আসল অপরাধীর সঙ্গে সমান দণ্ডনীয়। কিন্তু তাহার দণ্ড উপযুক্ত আদালত নাহিলে হইবে না।

অর্থের কথা

ঐ ব্যক্তি যে স্ত্রীর সম্পত্তি, সেই স্ত্রীকেই উপযুক্ত আদালত বলা যায়।

১৩ ধারা। স্ত্রীলোক বা অবিবাহিত পুরুষ দাম্পত্য অপরাধের সহায়তা করিলে, তিরস্কার, ভ্রুকুটী, এবং অশ্রুবর্ষণ ও রোদনের দ্বারা দণ্ডনীয় মাত্র।

CHAPTER VI.

OF OFFENCES AGAINST THE STATE.

14. "The State" shall in this Code mean the married state only.

15. Whoever wages war against his wife or attempts to wage such war or abets the waging of such war shall be punished capitally, that is by separation, or by transportation to another bed-room and shall forfeit all his pocket-money.

বিশ্বকর্ম রচনাবলী

16. Whoever induces friends or gains over children to side with him or otherwise prepares to wage war with the intention of waging war against the wife shall be punished by transportation to another bed-room and shall also be liable to be punished with scolding and with tears and lamentations.

17. Whoever shall render allegiance to any woman other than his wife shall be guilty of incontinence.

EXPLANATION.

(1) To show the slightest kindness to a young woman who is not the wife, is to render such young woman allegiance.

ILLUSTRATION.

A is the husband of B, and C is a young woman. A likes C's baby because he is a nice child and gives him buns to eat. A has rendered allegiance to C.

EXPLANATION.

(2) Wives shall be entitled to imagine offences under this section, and no husband shall be entitled to be acquitted on the ground that he has not committed the offence.

The simple accusation shall always be held to be conclusive proof of the offence.

EXPLANATION.

(3) The right of imagining offences under this section shall be held to belong in general to old wives, and to women with old and ugly husbands; and a young wife shall not be entitled to assume the right unless she can prove that she has a particularly cross temper, or was brought up a spoilt child or is herself supremely ugly.

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্ত্রী-বিদ্বেহিতার অপরাধ

১৪ ধারা। (অনুবাদক অক্ষম)

১৫ ধারা। যে কেহ স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ করে, কি বিবাদ করিতে উদ্যোগ করে, কি বিবাদ করায় সহায়তা করে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে (অর্থাৎ স্ত্রী তাহাকে ত্যাগ করিবেন) বা শয্যাগৃহ পৃথক্ হইবে এবং তাহার খরচের টাকা জব্দ হইবে।

১৬ ধারা। যে কেহ বন্ধুবর্গকে মূর্খাধরী বা সন্তানদিগকে বশীভূত করিয়া বা অন্য প্রকারে স্ত্রীর সহিত বিবাদ করিবার অভিপ্রায়ে বিবাদের উদ্যোগ করে, সে শয্যাগৃহান্তরে প্রেরিত হইবে, এবং তিরস্কার, অশ্রুবর্ষণ এবং রোদনের দ্বারা দণ্ডনীয় হইবে।

১৭ ধারা। যে কেহ আপন স্ত্রী ভিন্ন অন্য স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত, তাহার অপরাধের নাম লাম্পট্য।

অর্থের কথা

প্রথম। স্ত্রী ভিন্ন অন্য কোন যুবতী স্ত্রীলোকের প্রতি কিছুমাত্র দয়া বা আনুকূল্য করিলেই লাম্পট্য গণ্য হইবে।

উদাহরণ

রাম কামিনীর স্বামী। বামা অন্য এক যুবতী। বামার শিশু সন্তানটি দেখিতে সুন্দর বলিয়া রাম তাহাকে আদর করে বা তাহার হাতে মিঠাই দেয়। রাম বামার প্রতি আসক্ত।

অর্থের কথা

দ্বিতীয়। স্বামীদিগকে নিষ্কারণে এ অপরাধে অপরাধী বিবেচনা করা, স্ত্রীলোকদিগের অধিকার রহিল। আমি এ অপরাধ করি নাই বলিয়া কোন স্বামী খালাস পাইতে পারিবে না।

“অপরাধ করিয়াছে” বলিলেই এ অপরাধ সপ্রমাণ হইয়াছে বিবেচনা করিতে হইবে।

অর্থের কথা

তৃতীয়। নিষ্কারণে স্বামিগণকে এ অপরাধে অপরাধী বিবেচনা করিবার অধিকার, প্রাচীনা স্ত্রীদিগের পক্ষে বিশেষরূপে বর্তাবে, অথবা যাহাদিগের স্বামী কুৎসিত বা প্রাচীন, তাহাদিগের পক্ষে বর্তাবে। যদি কোন যুবতী স্ত্রী এ অধিকার চাহেন, তবে তাহাকে অগ্রে প্রমাণ করিতে হইবে যে, তিনি নিজে বদমেজাজি বা আদরে মেয়ে বা তিনি নিজে কদাকার।

18. Whoever is guilty of incontinence shall be liable to all the punishments mentioned in this Code and to other punishments not mentioned in the Code.

CHAPTER VII.

OF OFFENCES RELATING TO THE ARMY AND NAVY

19. The army and navy shall in this Code mean the sons and the daughters and daughters-in-law.

20. Whoever abets the committing of mutiny by a son or a daughter or a daughter-in-law shall be liable to be punished by scolding and tears and lamentations.

CHAPTER VIII.

OF OFFENCES AGAINST THE DOMESTIC TRANQUILLITY.

21. An assembly of two or more husbands is designated an unlawful assembly if the common object of such husbands is,

FIRST, To drink as defined below or to gamble or to commit any other matrimonial offence,

SECONDLY, To overawe by show of authority their wives from the exercise of the lawful authority of such wives,

THIRDLY, To resist the execution of a wife's order.

22. Whoever is a member of an unlawful assembly shall be punished by imprisonment with hard words and shall also be liable to contemptuous silence or to scolding.

OF DRINKING WINE AND SPIRITS.

23. Any liquid kept in a bottle and taken in a glass vessel is wine and spirits.

24. Whoever has in his possession wine and spirits as above defined is said to drink.

EXPLANATION.

He is said to drink even though he never touches the liquid himself.

বর্ষিক রচনাবলী

25. Whoever is guilty of drinking shall be punished with imprisonment of either description within the four walls of a bed-room during the evening hours and shall also be liable to scolding.

১৮ ধারা। যে কেহ লম্পট হইবে, সে এই আইনের লিখিত সকল প্রকার দণ্ডের দ্বারা দণ্ডনীয় হইবে এবং তাহার অন্য দণ্ডও হইতে পারিবে।

সপ্তম অধ্যায়

পল্টন এবং নাবিকসেনা সম্বন্ধীয় অপরাধ

১৯ ধারা। এ আইনে পল্টন অর্থে ছেলের দল। নাবিকসেনা ঝি বউ।

২০ ধারা। যে স্বামী, পুত্র বা কন্যা বা বধুকর্তৃক গৃহিণীর প্রতি বিদ্রোহিতার সহায়তা করিবে, সে তিরস্কার ও রোদনের দ্বারা দণ্ডনীয় হইবে।

অষ্টম অধ্যায়

গৃহমধ্যে শান্তি ভঙ্গনের অপরাধ

২১ ধারা। দুই, কি তাহার অধিক বিবাহিত ব্যক্তির জনতা হইলে যদি জনতাকারীদের নিম্নের লিখিত কোন অভিপ্রায় থাকে, তবে “বে আইন জনতা” বলা যায়।

প্রথম। যদি মদ্যপান করা, কি অন্য প্রকার দাম্পত্য অপরাধ করিবার অভিপ্রায় থাকে,

দ্বিতীয়। যদি আশ্ফালন দ্বারা পত্নীদিগকে আইন মত ক্ষমতা প্রকাশ করণে নিবৃত্ত করার জন্য ভয় প্রদর্শন করার অভিপ্রায় থাকে,

তৃতীয়। যদি কোন স্ত্রীর আজ্ঞামত কর্মের প্রতিবন্ধক হইবার অভিপ্রায় থাকে।

২২ ধারা। যে কেহ “বে আইন জনতার ব্যক্তি” হয়, সে কঠিন তিরস্কারের সহিত কয়েদ হইবে, অথবা মান অথবা তিরস্কারের সহিত দণ্ডনীয় হইবে।

মদ্যপানের কথা

২৩ ধারা। যে কোন জলবৎ দ্রব্য বোতলে থাকে, এবং কাচের পাত্রে পীত হয়, তাহা মদ্য।

২৪ ধারা। উক্তরূপ মদ্য যে ঘরে রাখে, সেই মদ্যপায়ী।

অর্থের কথা

সে ঐ দ্রব্য স্বহস্তে স্পর্শ না করিলেও মদ্যপায়ী।

২৫ ধারা। যে মদ্যপায়ী, সে প্রত্যহ সন্ধ্যার পর শয্যাগৃহের চারি ভিত্তির মধ্যে কয়েদ থাকিবে, এবং তিরস্কার প্রাপ্ত হইবে।

OF RIOTING.

26. Whoever shall speak in an ungentle voice to his wife shall be guilty of domestic rioting.

27. Whoever is guilty of domestic rioting shall be punished by contemptuous silence or by scolding or by tears and lamentations.

হাঙ্গামার কথা

২৬ ধারা। যে কেহ স্ত্রীর প্রতি ককর্শ স্বরে কথা কহে, সে হাঙ্গামা করে।

২৭ ধারা। যে কেহ গৃহমধ্যে হাঙ্গামা করিবে, তাহার সাজা মান বা তিরস্কার বা অশ্রুবর্ষণ ও রোদন।

বসন্ত এবং বিরহ

রামী। সখি, ঋতুরাজ বসন্ত আসিয়া ধরাতলে উদয় হইয়াছেন। আইস, আমরা বসন্ত বর্ণনা করি। বিশেষ আমরা উভয়েই বিরহিণী; পদ্বর্ষগামিনী বিরহিণীগণ চিরকাল বসন্তবর্ণনা করিয়া আসিয়াছেন, আইস আমরাও তাই করি।

বামী। সই, ভাল বলিয়াছ। আমরা বালিকা বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখিয়া কেবল কুটনো কুটিয়া মরিলাম, আইস অদ্য কাব্যলোচনা করি।

রামী। সই! তবে আরম্ভ করি। সখি! ঋতুরাজ বসন্তের সমাগম হইয়াছে। দেখ, পৃথিবী কেমন অনির্বচনীয় ভাব ধারণ করিয়াছেন। দেখ, চতুতলতা কেমন নব মুকুলিত—

বামী। বৃক্ষে বৃক্ষে শজিনা খাড়া বিলম্বিত—

রামী। মলয় মারুত মৃদু মৃদু প্রধাবিত—

বামী। তদ্বাহিত ধূলায় দস্ত কিচর্কিচিত।

রামী। দূর ছুঁড়ী—ও কি! শোন্। ভ্রমরগণ পদ্বর্ষের উপর গুণ্ গুণ্ করিতেছে—

বামী। মাছিগণ ভাতের উপর ভন্ ভন্ করিতেছে—

রামী। বৃক্ষোপরে কোকিলগণ পঞ্চমস্বরে কুহু কুহু করিতেছে—

বামী। গাজনতলায় ঢাকিগণ অষ্টমস্বরে চড় চড় করিতেছে।

রামী। না ভাই, তোকে নিয়ে বসন্ত বর্ণন হয় না। আমি শ্যামীকে ডাকি। আয় সই শ্যামি, আমরা বসন্ত বর্ণনা করি।

(শ্যামী আসিল)

শ্যামী। আমি ত সখি তোমাদের মত ভাল লেখা পড়া জানি না; একটু একটু জানি মাত্র, আমি সকল বুদ্ধিতে পারিব না—আমাকে মধ্যে মধ্যে বুঝাইয়া দিতে হবে।

রামী। আচ্ছা! দেখ সখি, বসন্ত কি অপূর্ষ সময়! কেমন চতুতলতা সকল নব মুকুলিত—

শ্যামী। সই, আঁবের গাছই দেখিয়াছি; আঁবের লতা কোন-গুলা?

রামী। আঁবের লতা আছে শুনিয়াছি, কিন্তু কখন চক্ষে দেখি নাই। দেখি না দেখি, চতুতলতা ভিন্ন চতুবৃক্ষ কখন পড়ি নাই। তবে চতুতলতাই বলিতে হইবে, চতুবৃক্ষ বলা হইবে না।

শ্যামী। তবে বল।

রামী। চতুতলতিকা নব মুকুলিত হইয়া—

শ্যামী। সই! এই বলিলে চতুতলতা—আবার লতিকা হইল কেন?

রামী। আরও কিছুর মিষ্ট হইল। চতুতলতিকা নব মুকুলিত হইয়া চারিদিকে সৌগন্ধ বিকীর্ণ করিতেছে—

বামী। ভাই, আঁবের বোল যে বসন্তকালে চুইয়ে গিয়া কড়িয়া ধরে।

শ্যামী। বলিলে কি হয়, কেমন মিষ্ট হইল দেখ দেখি।

রামী। তাহাতে ভ্রমরগণ মধুলোভে উন্মত্ত হইয়া ঝঙ্কার করিতেছে, শুনিয়া আমাদের প্রাণ বাহির হইতেছে।

শ্যামী। আহা! সখি, সত্যই বলিয়াছ। সই, ভ্রমর কাকে বলে?

রামী। মর্ নেকি, তাও জানিস্নে। ভ্রমর বলে ভোম্রাকে।

শ্যামী। ভোম্রা কোন্-গুলা ভাই?

রামী। ভোম্রা বলে ভিম্রুলকে।

শ্যামী। তা ভাই ভিম্রুল আঁবের বোল দেখে পাগল হয় কেন? ভিম্রুলের পাগলামি কেমনতর? ওরা কি আবোল তাবোল বকে?

রামী। কে বলেছে পাগল হয়?

শ্যামী। ঐ যে তুমি বলিলে “উন্মত্ত হইয়া ঝঙ্কার করিতেছে।”

রামী। কোন্-শালী আর তোদের কাছে বসন্ত বর্ণনা করিবে!

শ্যামী। ভাই, রাগ কর কেন? তুমি বেশী লেখা পড়া শিখেছ, আমি কম শিখেছি—আমায় বুঝাইয়া দিলেই ত হয়। সকলেই কি তোমার মত রসিকে?

বিশ্বকর্ম রচনাবলী

রামী। (সাহস্কারে) আচ্ছা, তবে শোন। ভ্রমরগণ মধুলোভে উন্মত্ত হইয়া ঝঙ্কার করিতেছে। তাহাদিগের গুণ্ গুণ্ রবে আমাদের প্রাণ বাহির হইতেছে।

শ্যামী। সই, ভোমরার ডাক “গুণ্ গুণ্” না “ভোঁ ভোঁ”?

রামী। কবিরা বলেন, “গুণ্ গুণ্”।

শ্যামী। তবে গুণ্ গুণ্ই বটে। তা উহাতে আমাদের প্রাণ বাহির হয় কেন? ভিম্বরুল কামড়াইলে প্রাণ বাহির হয় জানি, কিন্তু ভিম্বরুল ডাকিলেও কি মরিতে হইবে?

রামী। এ পর্য্যন্ত সকল বিরহিণীগণ গুণ্ গুণ্ রবে মরিয়া আসিতেছে, তুই কি পীর যে মর্বি না?

বামী। আচ্ছা ভাই, শাস্ত্রে যদি লেখে ত না হয় মরিব। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কেবল কি ভিম্বরুলের ডাকে মরিতে হইবে, না বোলতা মৌমাছি গুব্বরে পোকাকার ডাক শুনিলেও অন্তর্জলে শূইব?

রামী। কবিরা শূধু ভ্রমরের রবেই মরিতে বলেন।

বামী। কবিদের বড় অবিচার। কেন, গুব্বরে পোকা কি অপরাধ করেছে?

রামী। তোর মর্তে হয় মরিস্, এখন শোন।

বামী। বল।

রামী। কোকিলগণ বৃক্ষে বসিয়া পঞ্চম স্বরে গান করিতেছে।

শ্যামী। পঞ্চম স্বর কি ভাই?

রামী। কোকিলের স্বরের মত।

শ্যামী। আর কোকিলের স্বর কেমন?

রামী। পঞ্চম স্বরের মত।

শ্যামী। বন্ধিয়াছি। তার পর বল।

রামী। কোকিলগণ বৃক্ষে বসিয়া পঞ্চম স্বরে গান করিতেছে; তাহাতে বিরহিণীর অঙ্গ জ্বর জ্বর হইতেছে।

বামী। আর কুক্কড়োর পঞ্চম স্বরে অঙ্গ কেমন করে?

রামী। মরণ আর কি, কুক্কড়োর আবার পঞ্চম স্বর কি লো?

বামী। আমার তাতেই অঙ্গ জ্বর জ্বর হয়। কুক্কড়া ডাকিলেই মনে হয় যে, তিনি বাড়ী এলেই আমায় ঐ সর্ব্বনেশে পাকী রাঁধিয়া দিতে হবে।

রামী। তার পর মলয় সমীরণ। মৃদু মৃদু মলয় সমীরণে বিরহিণী শিহরিয়া উঠিতেছে।

শ্যামী। শীতে?

রামী। না—বিরহে। মলয় সমীরণ অন্যের পক্ষে শীতল, কিন্তু আমাদের পক্ষে অগ্নিতুল্য।

বামী। সই, তা সকলের পক্ষেই। এই চৈত্র মাসের দুপুরে রৌদ্রের বাতাস আগুনের হৃষ্কা বলিয়া কাহার বোধ হয় না?

রামী। ও লো, আমি সে বাতাসের কথা বলিতেছি না।

শ্যামী। বোধ হয়, তুমি উত্তরে বাতাসের কথা বলিতেছ। উত্তরে বাতাস যেমন ঠান্ডা, মলয় বাতাস তেমন নয়।

রামী। বসন্তানিলস্পর্শে অঙ্গ শিহরিয়া উঠে।

বামী। গায়ে কাপড় না থাকিলে উত্তরে বাতাসেও গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে।

রামী। মর্ ছুঁড়ী, বসন্তকালে কি উত্তরে বাতাস বয় যে, আমি বসন্তবর্ণনায় উত্তরে বাতাসের কথা বলিব?

বামী। উত্তরে বাতাসই এখন বয়। দেখ, এখনকার যত ঝড়, সব উত্তরে। আমার বোধ হয়, বসন্তবর্ণনে উত্তরে বাতাসের প্রসঙ্গ করাই উচিত। আইস, আমরা বঙ্গদর্শনে লিখিয়া পাঠাই যে, ভবিষ্যতে কবিগণ বসন্তবর্ণনে মলয় বাতাস ত্যাগ করিয়া উত্তরে ঝড়ের বর্ণনা করেন।

রামী। তাহা হইলে বিরহীদের কি উপায় হইবে? তাহারা কি লইয়া কাঁদবে?

শ্যামী। সখি, তবে থাক। এক্ষণে তোমার বসন্তবর্ণনা—উহঃ উহঃ সখি! মোলেম, মোলেম, গেলেম রে! গেলেম রে! [ভূমে পতন, চক্ষু মর্দিত]

রামী। কেন, কেন, সই, কি হয়েছে? হঠাৎ অমন হলে কেন?

শ্যামী। (চক্ষু বদ্বিজয়া) ঐ শুনিলে না? ঐ সেওড়া গাছে কোকিল ডাকিতেছে।

রামী। সখি, আশ্বস্তা হও, আশ্বস্তা হও, তোমার প্রাণকান্ত শীঘ্রই আসিবেন। সেই, আমারও ঐরূপ যন্ত্রণা হইতেছে। নাথের সন্দর্শন ভিন্ন আমার বাঁচা ভার হইয়া উঠিয়াছে। (চক্ষু মদ্বিজয়া) পাড়ার সকল পুকুরের যদি জল না শুকাইত, তবে এত দিন ডুবিয়া মরিতাম। হে হৃদয়-বল্লভ, জীবিতেশ্বর! হে রমণীজনমনোমোহন! হে নিশাশেষোন্মেষোন্মুখকমলকোরকোপমোত্তোজিত-হৃদয়সূর্য্য! হে অতলজলদলতলন্যস্তুরতুরাজিবন্মহামূল্যপদ্রুশরঙ্গ! হে কামিনীকণ্ঠবিলম্বিত-রত্নহারাদিক প্রাণাদিক! আর প্রাণ বাঁচে না। আমি অবলা, সরলা, চণ্ডলা, বিকলা, দীনা, হীনা, ক্ষীণা, পীনা, নবীনা, শ্রীহীনা,—আর প্রাণ বাঁচে না। আর কত দিন তোমার আশাপথ চাহিয়া থাকিব? যেমন সরোবরে সরোজিনী ভানুর আশা করে, যেমন কুমুদিনী কুমুদবাস্কবের আশা করিয়া থাকে, যেমন চাতক মেঘের জলের আশা করিয়া থাকে—আমি তেমনি তোমার আশা করিতেছি।

শ্যামী। (কাঁদিতে কাঁদিতে) যেমন রাখাল, হারাণ গোরুর আশায় দাঁড়াইয়া থাকে, যেমন বালকে ময়রার দোকান হইতে লোক ফিরবার আশায় দাঁড়াইয়া থাকে, যেমন অশ্ব তৃণাহরক গ্রাসকটের আশা করিয়া থাকে, হে প্রাণবন্ধো! আমি তেমনি তোমার আশা করিয়া আছি। যেমন মাছ ধুইতে গেলে পরিচারিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মাঞ্জুর গমন করে, তেমনি তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমার মন গিয়াছে। যেমন উচ্ছ্রষ্টাবশেষ ফেলিতে গেলে, বড়ুক্ষু কুক্ষুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায়, আমার অবশ চিত্ত তেমনি তোমার পশ্চাৎ গিয়াছে। যেমন কলুর ঘানিগাছে প্রকাণ্ডাকার বলদ ঘুরিতে থাকে, তেমনি আশা নামে আমার প্রকাণ্ড বলদ, তোমার প্রণয়রূপ ঘানিগাছে ঘুরিতেছে। যেমন লোহার চাটুতে তপ্ত তৈলে কৈমাছ ভাজে, তেমনি এই বিরহচাটুতে বসন্তরূপ তপ্ত তৈলে আমার হৃদয়রূপ কৈমাছকে অহরহ ভাজিতেছে। যেমন এই বসন্তকালের তাপে শজিনা খাড়া ফাটিতেছে, তোমার বিরহসস্তাপে তেমনি আমার হৃদয় খাড়া ফাটিতেছে। যেমন এক লাঙ্গলে যোড়া গোরু ঘুড়িয়া ক্ষেত্রকে চাষা ক্ষতবিক্ষত করে, তেমনি এক প্রেমলাঙ্গলে বিরহ এবং বারম্বারী-ভক্তিরূপ যোড়া গোরু ঘুড়িয়া আমার স্বামী চাষা আমার হৃদয়ক্ষেত্রকে ক্ষতবিক্ষত করিতেছেন। কথায় আর কি বলিব। বিরহের জ্বালায় আমার ডালে নুণ হয় না, পানে চুণ হয় না, ঝোলে ঝাল হয় না, ক্ষীরে মিষ্ট হয় না। সখি, বিরহের দুঃখ যে দিন মনে হয়, সে দিন আমি তিন বেলা বই খাইতে পারি না; আমার দুধের বাটি অম্নি পড়িয়া থাকে। (চক্ষু মদ্বিজয়া) সখি, তোমার বসন্তবর্ণনা সমাপ্ত কর, দুঃখের কথায় আর কাজ নাই।

রামী। আমার বসন্তবর্ণনা শেষ হইয়াছে। ভ্রমর, কোকিল, মলয় মারুত এবং বিরহ, এই চারিটির কথাই বলিয়াছি, আর বাকি কি?

বামী। দাঁড় আর কলসী।

সুবর্ণগোলক

কৈলাসশিখরে, নবমুকুলশোভিত দেবদারুতলায় শান্দুলচর্ম্মাসনে বসিয়া হরপার্বতী পাশা খেলিতেছিলেন। বাজি একটি স্বর্ণগোলক। মহাদেবের খেলায় দোষ এই—আড়ি মারিতে পারেন না—তাহা পারিলে সমুদ্রমন্থনের সময়ে বিষের ভাগটা তাঁহার ঘাড়ে পড়িত না। গৌরী আড়ি মারিতে পটু—প্রমাণ, পৃথিবীতে তাঁহার তিন দিন পূজা। আর খেলায় যত হউক না হউক, কান্নাইয়ে অধিতীয়া, কেন না, তিনিই আদ্যাশক্তি। মহাদেবের ভাল দান পড়িলে কাঁদিয়া হাট বাঁধান—আপনার যদি পড়ে পাঁচ দুই সাত, তবে হাঁকেন পোয়া বারো। হাঁকিয়া তিন চক্ষে মহাদেবের প্রতি কটাক্ষ করেন—যে কটাক্ষে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় হয়, তাহার গুণে মহাদেব দান দেখিয়াও দেখিতে পায়েন না। বলা বাহুল্য যে, দেবাদিদেবের হার হইল। ইহাই রীতি।

তখন মহাদেব পার্বতীকে স্বীকৃত কাণ্ডনগোলক প্রদান করিলেন। উমা তাহা গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিলেন। দেখিয়া, পঞ্চানন ভ্রুকুটি করিয়া কহিলেন, “আমার প্রদত্ত গোলক ত্যাগ করিলে কেন?”

উমা কহিলেন, “প্রভো, আপনার প্রদত্ত গোলক অবশ্য কোন অপূর্ব্ব শক্তিবিশিষ্ট এবং মঙ্গলপ্রদ হইবে। মনুষ্যের হিতার্থে তাহা প্রেরণ করিয়াছি।”

বিক্রম রচনাবলী

গিরিশ বলিলেন, “ভদ্রে! প্রজাপতি, বিষ্ণু, এবং আমি, এই তিন জনে যে সকল নিয়ম নিবন্ধ করিয়া সৃষ্টিস্থিতিলয় করিতেছি, তাহার ব্যতিক্রমে কখন মঙ্গল হয় না। যে মঙ্গল হইবার তাহা সেই সকল নিয়মাবলির বলেই ঘটিবে। কাণ্ডনগোলকের কোন প্রয়োজন নাই। যদি ইহার কোন মঙ্গলপ্রদ গুণ হয়, তবে নিয়মভঙ্গ দোষে লোকের অনিষ্ট হইবে। তবে তোমার অনুরোধে উহাকে একটি বিশেষ গুণযুক্ত করিলাম। বসিয়া উহার কার্য দর্শন কর।”

কালীকান্ত বসু বড় বাবু। বয়স বৎসর পঁয়ত্রিশ, দেখিতে সুন্দর পুরুষ, কয় বৎসর হইল, পুনর্বার দার পরিগ্রহ করিয়াছেন। তাহার স্ত্রী কামসুন্দরীর বয়ঃক্রম আঠার বৎসর। তাহার পত্নী তাহার পিতৃভবনে ছিল। কালীকান্তবাবু স্ত্রীর সম্ভাষণে শ্বশুরবাড়ী যাইতেছিলেন। শ্বশুর বিশেষ সম্পন্ন ব্যক্তি—গঙ্গাতীরবর্তী গ্রামে বাস। কালীকান্ত, ঘাটে নৌকা লাগাইয়া পদরজে যাইতেছিলেন, সঙ্গে রামা চাকর একটা পোর্টমাণ্টো বহিয়া যাইতেছিল। পথিমধ্যে কালীকান্তবাবু দেখিলেন, একটি স্বর্ণগোলক পড়িয়া আছে। বিস্মিত হইয়া তাহা উঠাইয়া লইলেন। দেখিলেন, সুবর্ণ বটে। প্রীত হইয়া তাহা ভৃত্য রামাকে রাখিতে দিলেন; বলিলেন, “এটা সোণার, কেহ হারাইয়া থাকিবে। কেহ খোঁজ করে, বাহির করিয়া দিব। নহিলে বাড়ী লইয়া যাইব। এখন রাখ।”

রামা বস্ত্রমধ্যে গোলকটি লুকাইয়া রাখিবার অভিপ্রায়ে, পথে পোর্টমাণ্টো নামাইল। পরে কালীকান্তবাবুর হস্ত হইতে গোলকটি গ্রহণ করিয়া বস্ত্রমধ্যে লুকাইল।

কিন্তু রামা আর পোর্টমাণ্টো মাথায় তুলিল না। কালীকান্তবাবু স্বয়ং তাহা উঠাইয়া মাথায় করিলেন। রামা অগ্রসর হইয়া চলিল, বাবু মোট মাথায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তখন রামা বলিল, “ওরে রামা।”

বাবু বলিলেন, “আজ্ঞা?”

রামা বলিল, “তুই বড় বেআদব, দেখিস্ যেন আমার শ্বশুরবাড়ী গিয়া বেআদবি করিস্ না। তাহারা ভদ্রলোক।”

বাবু বলিলেন, “আজ্ঞে তা কি পারি? আপনি হচ্ছেন মর্নিব—আপনার কাছে কি বেআদবি করিতে পারি?”

কৈলাসে গৌরী বলিলেন, “প্রভো, আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আপনার স্বর্ণগোলকের কি গুণ এ?”

মহাদেব বলিলেন, “গোলকের গুণ চিত্তবিনিময়। আমি যদি নন্দীর হাতে এই গোলক দিই, তবে নন্দী ভাবিবে, আমি মহাদেব, আমাকে ভাবিবে নন্দী; আমি ভাবিব, আমি নন্দী, নন্দীকে ভাবিব মহাদেব। রামা ভাবিতেছে, আমি কালীকান্ত বসু, কালীকান্তকে ভাবিতেছে, এ রামা চাকর। কালীকান্ত ভাবিতেছে, আমি রামা খানসামা, রামাকে ভাবিতেছে, কালীকান্তবাবু।”

কালীকান্তবাবু যখন শ্বশুরবাড়ী পৌঁছিলেন, তখন তাহার শ্বশুর অন্তঃপুরে। কিন্তু বাহিরে একটা গণ্ডগোল উঠিল। দ্বারবান্ রামদীন পাঁড়ে বলিতেছে, “আরে ও খানসামাজি, তোম হুঁয়া মৎ বইঠিও—তোম হামারা পাশ আও।” শুনিয়া রামা গরম হইয়া, চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিতেছে, “যা বেটা মেড়ুয়াবাদী যা—তোম আপনার কাজ করগে।”

দ্বারবান্ পোর্টমাণ্টো নামাইয়া নিল। কালীকান্ত বলিল, “দরওয়ানজি, বাবুকে অমন করিয়া অপমান করিও না। উনি রাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন।”

দ্বারবান্ জামাইবাবুকে চিনিত, খানসামাকে চিনিত না। কালীকান্তের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া মনে করিল, যেখানে জামাইবাবুই ইহাকে বাবু বলিতেছেন, সেখানে ইনি কোন ছদ্মবেশী বড় লোক হইবেন। দ্বারবান্ তখন ভক্তিতে রামাকে যুক্তকরে আশীর্বাদ করিয়া কহিল, “গোলামকি কসুর মাপ কিজিয়ে!” রামা কহিল, “আচ্ছা, তামাকু ভেজ দেও!”

শ্বশুরবাড়ীর খানসামা উদ্ধব, অতি প্রাচীন পুরাতন ভৃত্য। সেই বাঁধা হুকায় তামাকু সাজিয়া আনিল। রামা, তাকিয়ায় হেলান দিয়া, তামাকু খাইতে লাগিল। কালীকান্ত চাকরদের ঘরে গিয়া, কলিকায় তামাকু খাইতে লাগিল। উদ্ধব বিস্মিত হইয়া কহিল, “দাদা ঠাকুর, এ কি এ?” কালীকান্ত কহিল, “গুর সাক্ষাতে কি তামাকু খাইতে পারি?”

উদ্ধব গিয়া অন্তঃপুরে কত্তাকে সংবাদ দিল, “জামাইবাবু আসিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে একজন কে ছদ্মবেশী মহাশয় এসেছেন—জামাইবাবু তাঁকে বড় মানেন, তাঁর সাক্ষাতে তামাকু পর্য্যন্ত খান না।”

কত্তা নীলরতনবাবু শীঘ্র বাহির্বাটীতে আসিলেন। কালীকান্ত তাঁহাকে দেখিয়া দূর হইতে একটি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া সরিয়া গেল। রামা আসিয়া নীলরতনের পায়ে ধূলো লইয়া কোলাকুলি করিল। নীলরতন ভাবিল, “সঙ্গের লোকটা সভ্যভব্য বটে—তবে জামাই বাবাজিকে কেমন কেমন দেখিতেছি।”

নীলরতনবাবু রামাকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিতে বসিলেন, কিন্তু কথাবার্তা শুনিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। এদিকে অন্তঃপুর হইতে জলযোগের স্থান হইয়াছে বলিয়া পরিচারিকা কালীকান্তকে ডাকিতে আসিল। কালীকান্ত বলিল, “বাপ রে, আমি কি বাবুর আগে জল খেতে পারি! আগে বাবুকে জল খাওয়াও। তার পর আমার হবে এখন। আমি, মাঠাকুরগুণ, আপনাদের খাচ্ছি ত।”

“মাঠাকুরগুণ” শুনিয়া পরিচারিকা মনে করিল, “জামাইবাবু আমাকে একজন শাশুড়ী টাশুড়ী মনে করিয়াছেন—না করবেন কেন; আমাকে ভাল মানুষের মেয়ে বই ত আর ছোট লোকের মেয়ের মত দেখায় না। গুঁরা দশটা দেখেছেন—মানুষ চিন্তে পারেন—কেবল এই বাড়ীর পোড়া লোকেই মানুষ চেনে না।” অতএব বিন্দী চাকরাণী জামাইবাবুর উপর বড় খুসী হইয়া অন্তঃপুরে গিয়া বলিল, “জামাইবাবুর বিবেচনা ভাল—সঙ্গের মানুষটি না খেলে কি তিনি খেতে পারেন—তা আগে তাঁকে জল খাওয়াও, তবে জামাই খাবেন।”

বাড়ীর গৃহিণী মনে ভাবিলেন, “সে উপরি লোক, তাহাকে বাড়ীর ভিতর আনিয়া জল খাওয়ান হইতে পারে না। জামাইকেও বাহিরে খাওয়ান হইতে পারে না। তা, তার জায়গা হউক বাহিরে, আর জামাইয়ের জায়গা হউক ভিতরে।” গৃহিণী সেইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন। রামা বাহিরে জলযোগের উদ্যোগ দেখিয়া বড় ক্রুদ্ধ হইল, ভাবিল, “এ কি অলৌকিকতা?” এদিকে দাসী কালীকান্তকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া আনিল। ঘরের ভিতর স্থান হইয়াছে, কিন্তু কালীকান্ত উঠানে দাঁড়াইয়া বলিল, “আমাকে ঘরের ভিতর কেন? আমাকে এইখানে হাতে দুটো ছোলা গুড় দাও, খেয়ে একটু জল খাই।” শুনিয়া শালীরা বলিল, “বোসজা মশাই যে এবার অনেক রকম রসিকতা শিখে এয়েছ দেখতে পাই।” কালীকান্ত কাতর হইয়া বলিল, “আজ্ঞে, আমাকে ঠাট্টা করেন কেন, আমি কি আপনাদের তামাসার যোগ্য?” একজন প্রাচীনা ঠাকুরাণীদিদি বলিল, “আমাদের তামাসার যোগ্য কেন?—যার তামাসার যোগ্য, তার কাছে চল।” এই বলিয়া কালীকান্তের হাত ধরিয়া হড়হড় করিয়া টানিয়া ঘরের ভিতর লইয়া আসিল।

সেখানে কালীকান্তের ভার্য্যা কামসুন্দরী দাঁড়াইয়া ছিল। কালীকান্ত তাহাকে দেখিয়া প্রভুপত্নী মনে করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল।

কামসুন্দরী দেখিয়া, চন্দ্রবদনে মধুর হাসি হাসিয়া বলিল, “ওকি ও রঙ্গ—এ আবার কোন্ ঠাট্টা শিখিয়া আসিয়াছ?” শুনিয়া কালীকান্ত কাতর হইয়া কহিল, “আজ্ঞে, আমার সঙ্গে অমন সব কথা কেন—আমি আপনার চাকর—আপনি মুনব!”

রসিকা কামসুন্দরী বলিল, “তুমি চাকর, আমি মুনব, সে আজ না কাল? যত দিন আমার বয়স আছে, তত দিন এই সম্পর্কই থাকিবে। এখন জল খাও।”

কালীকান্ত মনে করিল, “বাবা, এঁর কথার ভাব যে কেমন কেমন। আমাদের বাবু যে একটা গেছো মেয়ের হাতে পড়েছেন দেখতে পাই। তা, আমার সবাই ভাল।” এই ভাবিয়া কালীকান্ত পুনর্বার ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া পলাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, দেখিয়া কামসুন্দরী আসিয়া তাঁহার গাত্রবস্ত্র ধরিল; বলিল, “ওরে আমার সোণার চাঁদ! আমার সাত রাজার ধন এক মাণিক! আমার কাছ থেকে আর পলাতে হয় না।” এই বলিয়া কামসুন্দরী স্বামীকে আসনের দিকে টানিতে লাগিল।

কালীকান্ত আন্তরিক কাতরতার সহিত হাত যোড় করিয়া বলিতে লাগিল, “দোহাই বোঁঠাকুরাণি, আপনার সাত দোহাই—আমাকে ছাড়িয়া দিন—আপনি আমার স্বভাব জানেন না—আমি সে চরিত্রের লোক নই।” কামসুন্দরী হাসিয়া বলিল, “তুমি যে চরিত্রের লোক, আমি বেশ জানি—এখন জল খাও।”

বিক্রম রচনাবলী

কালীকান্ত বলিল, “যদি আপনার কাছে কেহ আমার এমন নিন্দা করিয়া থাকে, তবে সে ঠক—ঠকাম করিয়াছে। আপনার কাছে হাতঘোড় করিতেছি, আপনি আমার গুরুজন—আমায় ছাড়িয়া দিন।”

কামসুন্দরী রসিকতাপ্রিয়; মনে করিল যে, এ একতর নতুন রসিকতা বটে। বলিল, “প্রাণাধিক, তুমি কত রসিকতা শিখিয়া আসিয়াছ, তাহা বুঝা যাইবে।” এই বলিয়া স্বামীর দুই হস্ত ধারণ করিয়া আসনে বসাইবার জন্য টানিতে লাগিল।

হস্তধারণ মাত্র কালীকান্ত সর্বনাশ হইল মনে করিয়া “বাবা রে, গেলাম রে, এগো রে, আমার মেরে ফেলে রে” বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল। চীৎকার শুনিয়া গৃহস্থ সকলে ভীত হইয়া দৌড়িয়া আসিল। মা, ভগিনী, পিসী প্রভৃতিকে দেখিয়া কামসুন্দরী স্বামীর হস্ত ছাড়িয়া দিল। কালীকান্ত অবসর পাইয়া উদ্ধ্বাসে পলায়ন করিল।

গৃহিণী কামসুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি লা কামি—জামাই অমন করে উঠলো কেন? তুই কি মেরেছিস্?”

বিস্মিতা কামসুন্দরী মস্মপীড়িতা হইয়া কহিল, “মারিব কেন? আমি মারিব কেন—আমার যেমন পোড়া কপাল!” ক্রমে ক্রমে সুর কাঁদনিতে চড়িতে লাগিল—“আমার যেমন পোড়া কপাল—কোন আবাগী আমার সর্বনাশ করেছে—কে ওষুধ করেছে—” বলিতে বলিতে কামসুন্দরী কাঁদিয়া হাট লাগাইল।

সকলেই বলিল, “হাঁ তুই মেরেছিস্; নহিলে অমন কাতরাবে কেন?” এই বলিয়া সকলে কামকে “পাপিষ্ঠা” “ডাইনী” “রাক্ষসী” ইত্যাদি কথায় ভৎসনা করিতে লাগিল। কামসুন্দরী বিনাপরাধে নিন্দিতা ও ভৎসিতা হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে গিয়া দ্বার দিয়া শূইয়া পড়িল।

এদিকে কালীকান্ত বাহিরে আসিয়া দেখিল যে, বড় একটা গোলযোগ বাধিয়া উঠিয়াছে। নীলরতনবাবু স্বয়ং এবং দ্বারবান্ ও উদ্ধব, সকলে পড়িয়া যে যেখানে পাইতেছে, সে সেইখানে রামাকে প্রহার করিতেছে; কিল, লাতি, চড়, চাপড়ের বৃষ্টির মধ্যে রামা চাকর কেবল বলিতেছে, “ছেড়ে দে রে, বাবা রে, জামাই মারে, এমন কখন শূনি নাই, আমার কি—তোদেরই মেয়েকে একাদশী করতে হবে।” নিকটে দাঁড়াইয়া তরঙ্গ চাকরাণী হাসিতেছে, সে সর্বদা কালীকান্তবাবুর বাড়ীতে যাতায়াত করিত, সে রামা চাকরকে চিনিত, সেই বলিয়া দিয়াছে। কালীকান্তবাবু মারপিট দেখিয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় উঠানময় বেড়াইতে লাগিল, বলিতে লাগিল, “কি সর্বনাশ হইল! বাবুকে মারিয়া ফেলিল।” ইহা দেখিয়া নীলরতনবাবু আরও কোপাবিষ্ট হইয়া রামাকে বলিতে লাগিলেন, “তুই বেটাই জামাইকে কি খাওয়াইয়া পাগল করিয়া দিয়াছিস্—মার বেটাকে জুতো।” এই কথা বলিয়া, যেমন শ্রাবণ মাসে বৃষ্টির উপর বৃষ্টি চাপিয়া আইসে, তেমনি নিন্দেয়া রামার উপর প্রহারবৃষ্টি চাপিয়া আসিল। মারপিটের চোটে বস্ত্রমধ্য হইতে লুকান স্বর্ণগোলকাটি পড়িয়া গেল। দেখিয়া তরঙ্গ চাকরাণী তাহা কুড়াইয়া লইয়া নীলরতনবাবুর হস্তে দিল। বলিল, “ও মিন্বে চোর! দেখুন, ও একটা সোণার তাল চুরি করিয়া রাখিয়াছে।” “দেখি” বলিয়া নীলরতনবাবু স্বর্ণগোলক হস্তে লইলেন,—অর্নি তিনি রামাকে ছাড়িয়া দিয়া, সরিয়া দাঁড়াইয়া কোঁচার কাপড় খুলিয়া মাথায় দিলেন; তরঙ্গও মাথার কাপড় খুলিয়া, কোঁচা করিয়া পরিয়া, পাদুকা হস্তে রামাকে মারিতে প্রবৃত্ত হইল।

উদ্ধব তরঙ্গকে বলিল, “তুই মাগি আবার এর ভিতর এলি কেন?”

তরঙ্গ বলিল, “কাকে মাগি বলিতেছিস্?”

উদ্ধব বলিল, “তোকে।”

“আমাকে ঠাট্টা?” এই বলিয়া তরঙ্গ মহাক্রোধে হস্তের পাদুকার দ্বারা উদ্ধবকে প্রহার করিল। উদ্ধবও ক্রুদ্ধ হইয়া, স্ত্রীলোককে মারিতে না পারিয়া, নীলরতনবাবুর দিকে চাহিয়া বলিল, “দেখুন দেখি কতটা মহাশয়, মাগির কত বড় স্পর্ধা, আমাকে জুতো মারে!” কতটা তখন একটুখানি ঘোমটা টানিয়া, একটু রসের হাসি হাসিয়া, মৃদুস্বরে কহিলেন, “তা মেরেছেন মেরেছেন, তুমি রাগ করিও না। মূনিব—মারেতে পারেন।”

শুনিয়া উদ্ধব আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, “ও আবার কিসের মূনিব—ওও চাকর, আমিও চাকর! আপনি এমনি আজ্ঞা করেন! আমি আপনারই চাকর, ওর চাকর কেন হব? আমি এমন চাকরি করি না।”

শুনিয়ে কতটা আবার একটু মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন, “মরণ আর কি! বৃদ্ধো বয়সে মিন্সের রস দেখ! আমার চাকর আবার তুমি কিসে হতে গেলে?”

উদ্ধব অবাক হইল, মনে করিল, “আজ কি পাগলের পাড়া পড়িয়াছে নাকি?” উদ্ধব বিস্মিত হইয়া রামাকে ছাড়িয়া দাঁড়াইল।

এমত সময়ে বাড়ীর গোরক্ষক গোবর্দ্ধন ঘোষ সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে তরঙ্গের স্বামী। সে তরঙ্গের অবস্থা ও কার্য দেখিয়া বিস্মিত হইল—তরঙ্গ তাহাকে গ্রাহ্যও করিল না। এদিকে কর্ত্তামহাশয় গোবর্দ্ধনকে দেখিয়া ঘোমটা টানিয়া এক পাশে দাঁড়াইলেন। গোবর্দ্ধনকে আড়ে আড়ে দেখিয়া চুপি চুপি বলিলেন, “তুমি উহার ভিতর যাইও না।” গোবর্দ্ধন তরঙ্গের আচরণ দেখিয়া অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছিল—সে কথা তাহার কাণে গেল না; সে তরঙ্গের চুল ধরিতে গেল। “নছার মাগি, তোর হাসি নেই” এই বলিয়া গোবর্দ্ধন অগ্রসর হইতেছিল, দেখিয়া তরঙ্গ বলিল, “গোবরা, তুইও কি পাগল হয়েছিস না কি? যা, গোরুর যাব দিগে যা।” শুনিয়ে গোবর্দ্ধন, তরঙ্গের কেশাকর্ষণ করিয়া উত্তম মধ্যম আরম্ভ করিল। দেখিয়া নীলরতনবাবু বলিলেন, “যা! পোড়াকপালে মিন্সে কতটাকে ঠেঙ্গিয়া খুন করলে।” এদিকে তরঙ্গও ক্রুদ্ধ হইয়া “আমার গায়ে হাত তুলিস” বলিয়া গোবর্দ্ধনকে মারিতে আরম্ভ করিল। তখন একটা বড় গোলযোগ হইয়া উঠিল। শুনিয়ে পাড়ার প্রতিবাসী রাম মন্থোপাধ্যায়, গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইল। রাম মন্থোপাধ্যায় একটা সুবর্ণ-গোলক পড়িয়া আছে দেখিয়া গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়ের হস্তে দিয়া বলিলেন, “দেখুন দেখি মহাশয়, এটা কি?”

কৈলাসে পার্বতী বলিলেন, “প্রভো! আপনার গোলক সম্বরণ করুন—ঐ দেখুন গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় বৃদ্ধ রাম মন্থোপাধ্যায়ের অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া রামের বৃদ্ধা ভার্য্যাকে পত্নী সম্বোধনে কোঁতুক করিতেছে। আর রাম মন্থোপাধ্যায়ের পরিচারিকা তাহার আচরণ দেখিয়া সম্মাজ্জনী প্রহার করিতেছে। এদিকে বৃদ্ধ রাম মন্থোপাধ্যায়, আপনাকে যুবা গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় মনে করিয়া, তাহার অন্তঃপুরে গিয়া তাহার ভার্য্যাকে টম্পা শুনাইতেছে। এ গোলক আর মন্থোপাধ্যায়ের পৃথিবীতে থাকিলে গৃহে গৃহে বিশৃঙ্খলা হইবে। অতএব আপনি ইহা সম্বরণ করুন।”

মহাদেব কহিলেন, “হে শৈলসুতে! আমার গোলকের অপরাধ কি? এ কাণ্ড কি আজ নতুন পৃথিবীতে হইল? তুমি কি নিত্য দেখিতেছ না যে, বৃদ্ধ যুবা সাজিতেছে, যুবা বৃদ্ধ সাজিতেছে, প্রভু ভৃত্যের তুল্য আচরণ করিতেছে, ভৃত্য প্রভু হইয়া বসিতেছে। কবে না দেখিতেছ যে, পুরুষ স্ত্রীলোকের ন্যায় আচরণ করিতেছে, স্ত্রীলোক পুরুষের মত ব্যবহার করিতেছে? এ সকল পৃথিবীতে নিত্য ঘটে, কিন্তু তাহা যে কি প্রকার হাস্যজনক, তাহা কেহ দেখিয়াও দেখে না। আমি তাহা একবার সকলের প্রত্যক্ষীভূত করাইলাম। এক্ষণে গোলক সম্বৃত করিলাম। আমার ইচ্ছায় সকলেই পুনর্বার স্ব স্ব প্রকৃতিস্থ হইবে, এবং যাহা যাহা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা কাহারও স্মরণ থাকিবে না। তবে, লোকহিতার্থে আমার বরে বঙ্গদর্শন এই কথা পৃথিবীমধ্যে প্রচারিত করিবে।”

রামায়ণের সমালোচনা

কোন বিলাতী সমালোচক প্রণীত

আমি রামায়ণ গ্রন্থখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইয়াছি। অনেক সময়ে রচনা প্রায় নিম্ন শ্রেণীর ইউরোপীয় কবিদিগের তুল্য। হিন্দু কবির পক্ষে ইহা সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। গ্রন্থকার যে আর কিছুদিন যত্ন করিলে একজন সুকবি হইতেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই কাব্যগ্রন্থখানির স্থূল তাৎপর্য, বানরদিগের মাহাত্ম্যবর্ণন। বানরেরা বোধ হয়, আধুনিক Bonerwal নামা হিমাচল প্রদেশবাসী অনার্য্য জাতিগণের পূর্বপুরুষ। অনার্য্য বানরগণ-কর্ত্তৃক লঙ্কাজয় ও রাক্ষসদিগের সবংশে নিধন, ইহার বর্ণনীয় বিষয়। তখন আর্য্যেরা অসভ্য ও অনার্য্যেরা সভ্য ছিল।

বাংকম রচনাবলী

রামায়ণে কিছু কিছু নীতিগত কথা আছে। বুদ্ধিহীনতার যে কত দোষ, তাহা কবি বৃথাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এক নিষেধ প্রাচীন রাজার চারিটি ভাষ্যা ছিল। বহু-বিবাহের বিষয় ফল সহজেই উৎপন্ন হইল। বুদ্ধিমতী কৈকেয়ী স্বীয় পুত্রের উন্নতির জন্য, অসভ্য বৃদ্ধকে ভুলাইয়া ছলক্রমে সপত্নীগতজাত রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বনবাসে প্রেরণ করিল। জ্যেষ্ঠ পুত্রও ভারতবর্ষীয়দিগের স্বভাবসিদ্ধ আলস্যবশতঃ আপন স্বত্বাধিকার বজায় রাখিবার কোন যত্ন না করিয়া বৃদ্ধ বাপের কথায় বনে গেল। ইহার সহিত মহাতেজস্বী তুর্কবংশীয় ঔরঙ্গজেবের তুলনা কর; মুসলমান কেন এতকাল হিন্দুর উপর প্রভুত্ব করিয়াছে বুদ্ধিতে পারিবে। রাম গমনকালে আপনার যুবতী ভাষ্যাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল। তাহাতে যাহা ঘটিবার ঘটিল।

ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোক যে স্বভাবতই অসতী, এই সীতার ব্যবহারই তাহার উত্তম প্রমাণ। সীতা যেমন গৃহের বাহির হইল, অমনই অন্য পুরুষ ভজনা করিল। রামকে ত্যাগ করিয়া রাবণের সঙ্গে লঙ্কায় রাজ্যভোগ করিতে গেল। নিষেধ রাম পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল। হিন্দুরা এই জন্যই স্ত্রীলোকদিগকে গৃহের বাহির করে না।

হিন্দুস্বভাবের জঘন্যতার লক্ষ্মণ আর একটি উদাহরণ। তাহার চরিত্র এরূপে চিত্রিত হইয়াছে যে, তন্দ্বারা লক্ষ্মণকে কৰ্মক্ষম বোধ হয়। অন্যজাতীয় হইলে সে একজন বড় লোক হইতে পারিত, কিন্তু তাহার এক দিনের জন্যও সে দিকে মন যায় নাই। সে কেবল রামের পিছু পিছু বেড়াইল, আপনার উন্নতির কোন চেষ্টা করিল না। ইহা কেবল ভারতবর্ষীয়দিগের স্বভাবসিদ্ধ নিশ্চেষ্টতার ফল।

আর একটি অসভ্য মূর্খ ভরত। আপন হাতে রাজ্য পাইয়া ভাইকে ফিরাইয়া দিল। ফলতঃ রামায়ণ অকৰ্ম্ম লোকের ইতিহাসেই পূর্ণ। ইহা গ্রন্থকারের একটি উদ্দেশ্য। রাম পত্নীকে হারাইলে অনাৰ্য্য (বানর) জাতি তাহার কাতরতা দেখিয়া দয়া করিয়া রাবণকে সবংশে মারিয়া সীতা কাড়িয়া আনিয়া দিল, কিন্তু বর্ষের জাতির নৃশংসতা কোথায় যাইবে? রাম স্ত্রীর উপর রাগ করিয়া তাহাকে একদিন পুড়াইয়া মারিতে গেল। দৈবে সে দিন সেটার রক্ষা হইল। পরে তাহাকে দেশে আনিয়া দুই চারি দিন মাত্র সুখে ছিল। পরে বর্ষেরজাতির স্বভাবসুলভ ক্রোধ-বশতঃ পরের কথা শুনিয়া স্ত্রীটাকে তাড়াইয়া দিল। কয়েক বৎসর পরে সীতা খাইতে না পারিয়া রামের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। রাম তাহাকে দেখিয়া রাগ করিয়া মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিল। অসভ্য জাতির মধ্যে এইরূপই ঘটে। রামায়ণের স্থূল তাৎপর্য এই।

ইহার প্রণেতা কে, তাহা সহজে স্থির করা যায় না। কিম্বদন্তী আছে যে, ইহা বাল্মীকি প্রণীত। বাল্মীকি নামে কোন গ্রন্থকার ছিল কি না, তদ্বিষয়ে সংশয়। বাল্মীকি হইতে বাল্মীকি শব্দের উৎপত্তি দেখা যাইতেছে, অতএব আমার বিবেচনায় কোন বাল্মীকিমধ্যে এই গ্রন্থখানি পাওয়া গিয়াছিল। ইহাতে কি সিদ্ধান্ত স্থির করা যায় দেখা যাউক।

রামায়ণ নামে একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ আমি দেখিয়াছি। ইহা কৃত্তিবাস প্রণীত। উভয় গ্রন্থে অনেক সাদৃশ্য আছে। অতএব ইহাও অসম্ভব নহে যে, বাল্মীকি রামায়ণ কৃত্তিবাসের গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত। বাল্মীকি রামায়ণ কৃত্তিবাস হইতে সঙ্কলিত, কি কৃত্তিবাস বাল্মীকি রামায়ণ হইতে সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহা মীমাংসা করা সহজ নহে; ইহা স্বীকার করি। কিন্তু রামায়ণ নামটিই এ বিষয়ের এক প্রমাণ। “রামায়ণ” শব্দের সংস্কৃতে কোন অর্থ হয় না, কিন্তু বাঙ্গালায় সদর্থ হয়। বোধ হয়, “রামায়ণ” শব্দটি “রামা যবন” শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। কেবল “ব”কার লুপ্ত হইয়াছে। রামা যবন বা রামা মুসলমান নামক কোন ব্যক্তির চরিত্র অবলম্বন করিয়া কৃত্তিবাস প্রথম ইহার রচনা করিয়া থাকিবেন। পরে কেহ সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়া বাল্মীকিমধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। পরে গ্রন্থ বাল্মীকিমধ্যে প্রাপ্ত হওয়ায় বাল্মীকি নামে খ্যাত হইয়াছে।

রামায়ণ গ্রন্থখানির আমরা কিছু প্রশংসা করিয়াছি, কিন্তু বিশেষ প্রশংসা করিতে পারি না। উহাতে অনেক গুরুতর দোষ আছে। আদ্যোপান্ত অশ্লীলতাঘটিত। সীতার বিবাহ, রাবণকর্তৃক সীতাহরণ, এ সকল অশ্লীলতাঘটিত না ত কি? রামায়ণে করুণরসের অতি বিরল প্রচার। বানরকর্তৃক সমুদ্রবন্ধন, কেবল এইটিই রামায়ণের মধ্যে করুণরসাসঞ্চিত বিষয়। লক্ষ্মণভোজনে কিঞ্চিৎ বীররস আছে। বিশিষ্ঠাদি ঋষিদিগের কিছু হাস্যরস আছে। ঋষিগণ বড় রসিক পুরুষ ছিলেন। ধর্মের কথা লইয়া অনেক হাস্য পরিহাস করিতেন।

রামায়ণের ভাষা যদিও প্রাজল এবং বিশদ বটে, তথাপি অত্যন্ত অশুদ্ধ বলিতে হইবে।

রামায়ণের একটি কাণ্ড যোদ্ধাদিগের কোন কথা না থাকায় তাহার নাম হইয়াছে “অযোদ্ধাকাণ্ড”। গ্রন্থকার তাহা “অযোদ্ধাকাণ্ড” না লিখিয়া “অযোধ্যাকাণ্ড” লিখিয়াছেন। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে এরূপ অশুদ্ধ সংস্কৃত প্রায় দেখা যায়। আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাই বিশুদ্ধ সংস্কৃতে অধিকারী।

বর্ষ সমালোচন

সম্বাদ পত্রের প্রথা আছে, নব বর্ষ প্রবৃত্ত হইলে গত বর্ষের ঘটনা সকল সমালোচনা করিতে হয়। বঙ্গদর্শন* সম্বাদ পত্র নহে, সুতরাং বঙ্গদর্শন বর্ষসমালোচনে বাধ্য নহে। কিন্তু আমাদের কি সাধ করে না? যেমন অনেকে রাজা না হইয়াও রাজকায়দায় চলেন, যেমন অনেকে কালা বাঙ্গালি হইয়াও সাহেব সাজিবার সাধে কোর্ট পেণ্টেলুন আঁটেন, আমরাও তেমনি ক্ষুদ্র মাসিক পত্রিকা হইয়াও, দোন্দণ্ড প্রচণ্ড প্রতাপশালী সম্বাদ পত্রের অধিকার গ্রহণ করিব, ইচ্ছা করিয়াছি।

কিন্তু মনুষ্যজাতির এমনই দুরদৃষ্ট যে, যে যখন যে সাধ করে, তাহার সেই সাধে তখন বিঘ্ন ঘটে। নূতন বৎসর গিয়াছে পৌষ মাসে, আমরা লিখিতেছি অগ্রহায়ণ মাসের বঙ্গদর্শন! সর্বনাশ, এ যে রাম না হইতে রামায়ণ! সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, বঙ্গদর্শন রচনাসম্বন্ধে কোন নিয়মই মানে না—অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী। অতএব আমরা মনের সাধ মনে না মিটাইয়া, সে সাধে বিষাদ ইত্যাদি অনুপ্রাসের লোভ সম্বরণ করিয়া অগ্রহায়ণ মাসেই ১৮৭৫ সালের সমালোচনা করিব। অতএব হে গত বর্ষ! সাবধান হও, তোমাকে সমালোচনা করিব।

গত বৎসরে রাজকার্য্য কিরূপে নিৰ্ব্বাহ প্রাপ্ত হইয়াছে, তদ্বশ্যে অনেক অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি যে, এই বৎসরে তিন শত পঁয়ষাট্টি দিবস ছিল, একদিনও কম হয় নাই। প্রতি দিবসে ২৪টি করিয়া ঘণ্টা, এবং প্রতি ঘণ্টায় ৬০টি করিয়া মিনিট ছিল। কোনটির আমরা একটিও কম পাই নাই। রাজপুরুষগণ ইহাতে কোন প্রকার হস্তক্ষেপণ করেন নাই। ইহাতে তাঁহাদিগের বিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায় বটে। অনেকে বলেন যে, এ বৎসরে গোটাকত দিন কমাইয়া দিলে ভাল হইত; আমরা এ কথার অনুমোদন করি না; দিন কমাইলে কেবল চাকুরিদিগের বেতন লাভ এবং সম্বাদপত্রলেখকদিগের শ্রমলাঘব; সাধারণের কোন লাভ নাই; (আমরা মাসিক, ১২ মাসে বারখানি কেহ ছাড়বে না।) তবে গ্রীষ্মকালটি একেবারে উঠাইয়া দিলে ভাল হয় বটে। আমরা কল্কপক্ষগণকে অনুরোধ করিতেছি, বার মাসই শীতকাল থাকে, এমন একটি আইন প্রচারের চেষ্টা দেখুন।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, এ বৎসর সকলেরই এক এক বৎসর পরমায়ু চুরি গিয়াছে। কথাটায় আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি না। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, আমাদের ৭১ বৎসর বয়স ছিল, এ বৎসর ৭২ হইয়াছে। যদি পরমায়ু চুরি গেল, তবে এক বৎসর বাড়িল কি প্রকারে? নিন্দক সম্প্রদায়ই এমত অর্থার্থ প্রবাদ রটাইয়াছে।

এ বৎসর যে সুবৎসর ছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ এই যে, এ বৎসর অনেকেরই সন্তান জন্মিয়াছে। টিষ্টমেন্টেল ডিপার্টমেন্টের সুদক্ষ কর্মচারিগণ বিশেষ তদন্তে জানিয়াছেন যে, কাহারও কাহারও পুত্র হইয়াছে, কাহারও কন্যা হইয়াছে, এবং কাহার গর্ভস্রাব হইয়া গিয়াছে। দুঃখের বিষয় এই যে, এ বৎসর কতকগুলি মনুষ্য, অধিক নহে রোগাদিতে মরিয়াছে। শুনিয়াছি যে, এদেশীয় কোন মহাসভা পার্লামেন্টে আবেদন করিবেন যে, এই পুণ্যভূম ভারতরাজ্যে মনুষ্য না মরিতে পায়। তাঁহারা এইরূপ প্রস্তাব করেন যে, যদি কাহারও নিতান্ত মরা আবশ্যিক হয়, তবে সে পুর্লিখে জানাইয়া অনুমতি লইয়া মরিবে।

এ বৎসরে ফাইন্যান্সিয়াল ডিপার্টমেন্টের কাণ্ড অতি বিচিত্র—আমরা শ্রুত হইয়াছি যে, গবর্ণমেন্টের আয়ও হইয়াছে, ব্যয়ও হইয়াছে। ইহা বিস্ময়কর হউক বা না হউক, বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, ইহাতে গবর্ণমেন্টের টাকা, হয় কিছু উদ্ধৃত হইয়াছে, নয় কিছু অকুলান হইয়াছে, নয় ঠিক ঠিক মিলিয়া গিয়াছে। আগামী বৎসর (৭৬ সালে) টেক্স বসিবে কি না, তাহা এক্ষণে বলা যায় না, কিন্তু ভরসা করি, ৭৭ সালের এপ্রিল মাসে আমরা এ কথা নিশ্চিত বলিতে পারিব।

* এই প্রবন্ধ প্রথম বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়।

বাংকম রচনাবলী

এবার বিচারালয় সকলের কার্যের আমরা বিশেষ সুখ্যাতি করিতে পারিলাম না। সত্য বটে যে, যে নালিশ করিয়াছে, তাহার বিচার হইয়াছে বা হইবে, এমন উদ্যোগ আছে, কিন্তু যাহারা নালিশ করে নাই, তাহাদের পক্ষে কোন বিচার হয় নাই। আমরা ইহা বন্ধিতে পারি না; যেখানে সাধারণ বিচারালয়, সেখানে নালিশ করুক বা না করুক, বিচার চাই। কেহ রোদ্দ চাহুক বা না চাহুক, সূর্য্যদেব সর্ব্বত্র রোদ্দ করিয়া থাকেন, কেহ বৃষ্টি চাহুক বা না চাহুক, মেঘ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে বৃষ্টি করিয়া থাকেন, এবং কেহ বিচার চাহুক বা না চাহুক, বিচারকের উচিত, গৃহে গৃহে ঢুকিয়া বিচার করিয়া আসেন। যদি কেহ বলেন যে, বিচারকগণ এরূপ বিচারার্থ গৃহে গৃহে প্রবেশ করিতে গেলে গৃহস্থগণের সম্মাজ্জনী সকল অকস্মাৎ বিঘ্ন ঘটাইতে পারে, তাহাতে আমাদের বক্তব্য যে, গবর্ণমেন্টের কর্মচারীগণ সম্মাজ্জনীকে তাদৃশ ভয় করেন না—সম্মাজ্জনীর সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর হাকিমদিগের বিলক্ষণ পূর্বরচয় আছে এবং প্রায় প্রত্যহ ইহার সঙ্গে তাহাদের আলাপ হইয়া থাকে। যেমন ময়ূর সর্পিপ্রিয়, ইহারও তেমনি সম্মাজ্জনীপ্রিয়—দেখিলেই প্রায় ভক্ষণ করিয়া থাকেন। আমরা এমনও শুনিয়াছি যে, গবর্ণমেন্টের কোন অধস্তন কর্মচারী প্রস্তাব করিয়াছেন যে, যেমন উচ্চশ্রেণীর কর্মচারীগণের পুরস্কারের জন্য “অর্ডার অব দি ষ্টার অব ইন্ডিয়া” সংস্থাপিত করা হইয়াছে, সেইরূপ নিম্নশ্রেণীর কর্মচারীগণের জন্য “অর্ডার অব দি ব্রুম্‌স্টিক্” সংস্থাপিত করা হউক। এবং বিশেষ বিশেষ গুণবান্ ডিপুটি এবং সবজ্জ প্রভৃতিকে বাছিয়া বাছিয়া লাকলাইনের দাঁড়িতে এই মহারত্নটিকে বাঁধিয়া তাহাদিগের গলদেশে লম্বমান করিয়া দেওয়া হউক। তাহাদের চাপকান চেন চাদরবিভূষিত সদাকম্পবান্ বক্ষে ইহা অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিবে। রাজপ্রসাদস্বরূপ প্রদত্ত হইলে ইহা যে সাদরে গৃহীত হইবে, তাহা আমরা শপথ করিয়া বলিতে পারি। আমাদের কেবল আশঙ্কা এই যে, এত উমেদওয়ার ঘটিবে যে, ঝাঁটার সঙ্কুলান করা ভার হইবে।

গত বৎসর সুবৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু সর্ব্বত্র সমান হয় নাই। ইহা মেঘদিগের পক্ষপাত বটে। যে সকল দেশে বৃষ্টি হয় নাই, সে সকল দেশের লোকে গবর্ণমেন্টে এই মর্মে আবেদন করিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে যাহাতে সর্ব্বত্র সমান বৃষ্টি হয়, এমন কোন উপায় উদ্ভূত হউক। আমাদের বিবেচনায় ইহার সদুপায় নিরূপণ জন্য একটি কমিটি সংস্থাপিত করা উচিত। কোন কোন মান্য সহযোগী বলেন যে, যদি সরকার হইতে মেঘদিগের বারবরদারি বরাদ্দ হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের কোন দেশেই যাইবার আর আপত্তি থাকে না। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ইহাতেও সুবিধা হইবে না—কেন না, বঙ্গদেশের মেঘ সকল অত্যন্ত সৌদামিনীপ্রিয়—সৌদামিনী-গণকে ছাড়িয়া টাকার লোভেও দেশদেশান্তরে যাইতে স্বীকার করিবে না। আমরা প্রস্তাব করি যে, মেঘ সকল এবালিশ করিয়া দিয়া, ভিস্তীর বন্দোবস্ত করা হউক। ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে একজন চাপরাশী বা সুযোগ্য ডিপুটি এক একজন ভিস্তীকে দীর্ঘ বংশখণ্ডে বাঁধিয়া উঁথিত করিয়া তুলিয়া ধরিবেক, ভিস্তী তথা হইতে ক্ষেত্রে জল ছড়াইয়া, পারে ত নামিয়া আসিবে। ভাল হয় না?

আমাদের দেশের কামিনীগণ যে দেশহিতৈষণী নন—নহিলে ভিস্তীর প্রয়োজন হইত না। তাহারা যদি প্রাত্যহিক সাংসারিক কালাটা মাঠে গিয়া কাঁদিয়া আসেন, তাহা হইলে অনায়াসেই কৃষিকার্যের সুবিধা হয় ও মেঘ ডিপার্টমেন্ট এবালিশ করা যাইতে পারে। তবে আমরা লোকের শারীরিক ও মানসিক মঙ্গলার্থ বলি যে, আকাশবৃষ্টির পরিবর্তে নারীনয়নাশ্রুর আদেশ করিতে গেলে, একটু পাকা রকম পূর্লিশের বন্দবস্ত করা চাই। মেঘের বিদ্যতে অধিক প্রাণী নাশ হয় না; কিন্তু রমণীনয়নমেঘের কটাক্ষ-বিদ্যতে, মাঠের মাঝখানে, চাষা-ভূষোর ছেলেদের কি হয় বলা যায় না—পূর্লিশ থাকা ভাল।

শুনিলাম, শিক্ষাবিভাগে বড় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। শুনিয়াছি, অনেক বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা এক একটা কাগমাপা কাঁটি প্রস্তুত করিয়াছে। তাহাদের মনে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে—তাহারা বলে, অধ্যাপকদিগের শ্রবণেন্দ্রিয়গুলি মাপিয়া দেখিব—নহিলে তাহাদিগের নিকট পড়িব না। আমরা ভরসা করি, মাপকাঁটি ছোট পড়িবে, এমত সম্ভাবনা কোথাও নাই।

যাহা হউক, দুর্বৎসর হউক, সুবৎসর হউক, তিনটি নিগূঢ় তত্ত্ব আমরা স্থির জানিতে পারিতেছি—তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

প্রথম, বৎসরটি চলিয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে মতান্তর নাই।

দ্বিতীয়, বৎসর গিয়াছে, আর ফিরবে না। ফিরাইবার জন্য কেহ কোন উদ্যোগ পাইবেন না। নিষ্ফল হইবে।

তৃতীয়, ফিরে আর না ফিরে, পাঠক! আপনার ও আমার পক্ষে সমান কথা, কেন না, আপনার ও আমার পঁচাত্তরেও ঘাস জল, ছিয়াত্তরেও ঘাস জল। আপনার মঙ্গল হউক, আপনি ঘাস জলের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

কোন “স্পেশিয়ালের” পত্র

যুবরাজের সঙ্গে যে সকল “স্পেশিয়াল” আসিয়াছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে একজন কোন বিলাতীয় সম্বাদপত্রে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, আমরা অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতেছি। সে বিলাতীয় সম্বাদপত্রের নামের জন্য যদি কেহ আমাদেরকে পীড়াপীড়ি করেন, তবে আমরা লাচার হইব। সম্বাদপত্রের নাম আমরা জানি না, এবং কোথায় দেখিয়াছিলাম, তাহা স্মরণ নাই। পত্রখানির মর্ম এই—

যুবরাজের সঙ্গে আসিয়া বাঙ্গালা দেশ যেরূপ দেখিলাম, তাহা এই অবকাশে বর্ণনা করিয়া আপনাদিগকে আশ্চর্য্যিত করিব ইচ্ছা আছে। আমি এদেশ সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছি, অতএব আমার কাছে যেরূপ ঠিক সম্বাদ পাইবেন, এমন অন্যের কাছে পাইবেন না। এদেশের নাম “বেঙ্গল”। এ নাম কেন হইল, তাহা দেশী লোকে বলিতে পারে না। কিন্তু দেশী লোকে এদেশের অবস্থা সবিশেষ অবগত নহে, তাহারা জানিবে কি প্রকারে? তাহারা বলে, পূর্বে ইহার এক প্রদেশকে বঙ্গ বলিত, তৎপ্রদেশের লোককে এখনও “বাঙ্গাল” বলে, এজন্য এদেশের নাম “বাঙ্গালা”। কিন্তু এদেশের নাম বাঙ্গালা নহে—ইহার নাম “বেঙ্গল”—তাহা আপনারা সকলেই জানেন। অতএব এ কথা কেবল প্রবণতা মাত্র। আমার বোধ হয়, বেঞ্জামিন গল (Benjamin Gall) সংক্ষেপতঃ বেন্ গল নামক কোন ইংরেজ এই দেশ পূর্বে আবিষ্কৃত এবং অধিকৃত করিয়া আপন নামে বিখ্যাত করিয়াছিলেন।

রাজধানীর নাম “কালকাটা” (Calcutta) “কাল” এবং “কাটা” এই দুইটি বাঙ্গালা শব্দে এই নামের উৎপত্তি। এই নগরীতে কাল কাটাইবার কোন কষ্ট নাই, এই জন্যই ইহার নাম “কালকাটা”।

এদেশের লোক কতকগুলি ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ, কতকগুলি কিষ্ণং গৌর। যাহারা কৃষ্ণবর্ণ, তাহাদিগের পূর্বপুরুষে বোধ হয়, আফ্রিকা হইতে আসিয়া বাস করিয়াছিল; কেন না, সেই কৃষ্ণবর্ণ বাঙ্গালিদিগের মধ্যে অনেকেরই কৃষ্ণত কেশ; নরতত্ত্ববিদেরা স্থির করিয়াছেন, কৃষ্ণত কেশ হইলেই কাফ্রি। আর যাহারা কিষ্ণং গৌরবর্ণ, বোধ হয় তাহারা উপরিকথিত বেন্ গল্ সাহেবের বংশসম্ভূত।

দেখিলাম, অধিকাংশ বাঙ্গালি মাণ্ডেটরের তন্তুপ্রসূত বস্ত্র পরিধান করে। অতএব স্পষ্টই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, ভারতবর্ষ মাণ্ডেটরের সংস্রবে আসিবার পূর্বে, বঙ্গদেশের লোক উলঙ্গ থাকিত। এক্ষণে মাণ্ডেটরের অনুকম্পায় তাহারা বস্ত্র পরিয়া বাঁচিতেছে। ইহারা সম্প্রতি মাত্র বস্ত্র পরিতে আরম্ভ করিয়াছে, কি প্রকারে বস্ত্র পরিধান করিতে হয়, তাহা এখনও ঠিক করিয়া উঠিতে পারে নাই। কেহ কেহ আমাদের মত পেণ্টুলন পরে, কেহ কেহ তুর্কিদিগের মত পায়-জামা পরে, এবং কেহ কেহ কাহার অনুকরণ করিবে, তাহার কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, বস্ত্রগুলি কেবল কোমরে জড়াইয়া রাখে।

অতএব দেখ, ব্রিটিশ রাজ্য বেঙ্গল দেশে এক শত বৎসর বৃদ্ধা হইয়াছে মাত্র, ইতিমধ্যেই অসভ্য জাতিকে বস্ত্র পরিধান করিতে শিখাইয়াছে। সুতরাং ইংলন্ডের যে কি অসীম মহিমা এবং তন্দ্বারা ভারতবর্ষের যে কি পরিমাণে ধন এবং ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা বলিয়া উঠা যায় না। তাহা ইংরেজেই জানে। বাঙ্গালিতে বৃদ্ধিতে পারে, এত বৃদ্ধি তাহাদিগের থাকা সম্ভব নহে।

দুঃখের বিষয় যে, আমি কর্যাদিনে বাঙ্গালিদিগের ভাষায় অধিক ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারি নাই; তবে কিছু কিছু শিখিয়াছি। এবং গোলেস্তান্ এবং বোস্তান্ নামে যে দুইখানি বাঙ্গালা পুস্তক আছে, তাহার অনুবাদ পাঠ করিয়াছি। ঐ দুইখানি পুস্তকের স্থূল মর্ম এই যে,

বিশ্বকম রচনাবলী

যুদ্ধিষ্ঠির নামে রাজা, রাবণ নামে আর একজন রাজাকে বধ করিয়া তাহার মহিষী মন্দোদরীকে হরণ করিয়াছিল। মন্দোদরী কিছুকাল বৃন্দাবনে বাস করিয়া কৃষ্ণের সঙ্গে লীলাখেলা করেন। পরিশেষে তাহার পিতা, কৃষ্ণের নিমন্ত্রণ না করায় তিনি দক্ষযজ্ঞে প্রাণত্যাগ করেন।

আমি কিছু কিছু বাঙ্গালা শিখিয়াছি। বাঙ্গালিরা হাইকোর্টকে হাইকোর্ট বলে, গবর্নমেন্টকে গবর্নমেন্ট বলে, ডিক্রীকে ডিক্রী বলে, ডিষ্টিমিশকে ডিষ্টিমিশ, রেলকে রেল, ডোরকে ডোর, ডবলকে ডবল, ইত্যাদি ইত্যাদি বলে। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, বাঙ্গালা ভাষা ইংরেজির একটি শাখা মাত্র।

ইহাতে একটি সন্দেহ উৎপন্ন হইতেছে। যদি বাঙ্গালা ইংরেজির শাখাই হইল, তবে ইংরেজেরা এদেশে আসিবার পূর্বে এদেশে কোন ভাষা ছিল কি না? দেখ, আমাদের খ্রীষ্টের নাম হইতে ইহাদিগের প্রধান দেবতা কৃষ্ণের নাম নীত হইয়াছে, এবং অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিতের* মতে ইহাদিগের প্রধান পুস্তক তৎপ্রণীত ভগবদ্গীতা বাইবেল হইতে অনুবাদিত। সুতরাং বাইবেলের পূর্বে যে ইহাদিগের কোন ভাষা ছিল না, ইহা একপ্রকার স্থির। তাহার পর কবে ইহাদিগের ভাষা হইল, বলা যায় না। বোধ করি, পণ্ডিতবর মক্ষমুলের মনোযোগ করিলে এ বিষয়ে মীমাংসা করিতে পারেন। যে পণ্ডিত মীমাংসা করিয়াছেন যে, অশোকের পূর্বে আর্যেরা লিখিতে জানিত না, সেই পণ্ডিতই এ কথার মীমাংসায় সক্ষম।

আর একটি কথা আছে। সর উইলিয়ম জোন্স হইতে মক্ষমুল পর্যন্ত প্রাচ্যবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, এদেশে সংস্কৃত নামে আর একটি ভাষা আছে। কিন্তু এদেশে আসিয়া আমি কাহাকেও সংস্কৃত কহিতে বা লিখিতে দেখি নাই। সুতরাং এদেশে সংস্কৃত ভাষা থাকার বিষয়ে আমার বিশ্বাস নাই। বোধ হয়, এটি সর উইলিয়ম জোন্স প্রভৃতির কারসাজি। তাহারা পশারের জন্য এ ভাষাটি সৃষ্টি করিয়াছেন।†

যাহা হোক, ইহাদিগের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলিব। তোমরা শুনিয়াছ যে, হিন্দুরা চারিটি জাতিতে বিভক্ত; কিন্তু তাহা নহে। ইহাদিগের মধ্যে অনেকগুলি জাতি আছে, তাহাদের নাম নিম্নে লিখিতোঁছি।

১। ব্রাহ্মণ, ২। কায়স্থ, ৩। শূদ্র, ৪। কুলীন, ৫। বংশজ, ৬। বৈষ্ণব, ৭। শাক্ত, ৮। রায়, ৯। ঘোষাল, ১০। টেগোর, ১১। মোল্লা, ১২। ফরাজি, ১৩। রামায়ণ, ১৪। মহাভারত, ১৫। আসাম গোয়ালপাড়া, ১৬। পারিয়া ডগস্।

বাঙ্গালিদিগের চরিত্র অত্যন্ত মন্দ। তাহারা অত্যন্ত মিথ্যাবাদী, বিনা কারণেও মিথ্যা কথা বলে। শুনিয়াছ, বাঙ্গালিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র। আমি অনেকগুলি বাঙ্গালিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, তিনি কোন জাতি? সকলেই বলিল, তিনি কায়স্থ। কিন্তু তাহারা আমাকে ঠকাইতে পারিল না; কেন না, আমি সেই পণ্ডিতবর মক্ষমুলের গ্রন্থ‡ পড়িয়াছি যে, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র ব্রাহ্মণ। দেখা যাইতেছে যে, "Mitra" শব্দ "Mitre" শব্দের অপভ্রংশ, অতএব মিত্র মহাশয়কে পুরোহিতজাতীয়ই বলা যায়।

বাঙ্গালিদিগের একটি বিশেষ গুণ এই যে, তাহারা অত্যন্ত রাজভক্ত। যেসকল লাখে লাখে তাহারা যুবরাজকে দেখিতে আসিয়াছিল, তাহাতে বোধ হইল যে, ঈদৃশ রাজভক্ত জাতি আর পৃথিবীতে কোথাও জন্মগ্রহণ করে নাই। ঈশ্বর আমাদের মঙ্গল করুন, তাহা হইলে তাহাদিগেরও কিছু মঙ্গল হইতে পারে।

বাঙ্গালিরা স্ত্রীলোকদিগকে পরদানিশীন করিয়া রাখে শূনা আছে। ইহা সত্য বটে, তবে সর্বত্র নয়।** যখন কোন লাভের কথা না থাকে, তখন স্ত্রীলোকদিগকে অন্তঃপুরে রাখে, লাভের সূচনা দেখিলেই বাহির করিয়া আনে। আমরা যেসকল ফোর্সিপিংস লইয়া ব্যবহার করি, বাঙ্গালিরা পৌরাজনা লইয়াও সেইরূপ করে; যখন প্রয়োজন নাই, তখন বাস্তবান্দি করিয়া রাখে,

* Dr. Lorinzer &c.

† সাবধান, কেহ হাসিবেন না। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ডুগাল্ড স্টুয়ার্ট যথার্থই এই মতাবলম্বী ছিলেন।

‡ Chips from a German Workshop.

** বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা কেহ কেহ অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া রাজপুত্রকে অভ্যর্থনা করিয়াছিল।

শিকার দেখলেই বাহির করিয়া তাহাতে বারুদ পোরে। বন্দুকের সিসের গুলিতে ছার পক্ষি-জাতির পক্ষচ্ছেদ হয়, বাঙ্গালির মেয়ের নয়নবাণে কাহার পক্ষচ্ছেদের আশা করে বলিতে পারি না। আমি বাঙ্গালির কন্যার অঙ্গভরণের যেরূপ গুণ দেখিয়াছি, তাহাতে আমার ইচ্ছা করে, আমারও ফোর্লিংপিসটিকে দুই একখানা সোণার গহনা পরাইব—দেখি, পাখী ঘুরিয়া আসিয়া বন্দুকের উপর পড়ে কি না।

তবু নয়নবাণে কেন, শুনিয়াছি বাঙ্গালির মেয়ে নাকি পুষ্পবাণ প্রয়োগেও বড় সুপটু। হিন্দু সাহিত্যোক্ত পুষ্পশরে, আর এই বঙ্গকামিনীগণের পরিত্যক্ত পুষ্পশরে কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা আমি জানি না; যদি থাকে, তবে বাঙ্গালির মেয়েকে দুরাকাঙ্ক্ষণী বলিতে হইবে। শুনিয়াছি, কোন বাঙ্গালি কবি নাকি লিখিয়াছিলেন, “কি ছার মিছার ধনু, ধরে ফুলবাণ”; এখন কথাটা একটু ফিরাইয়া বলিতে হইবে, “কি ছার মিছার ফুল, মারে ফুলবাণ”। যাহা হউক, ফুলবাণ সচরাচর প্রচলিত না হইয়া উঠে। বাঙ্গালায় ইংরেজ টেংকা ভার হইবে—আমার সম্বন্ধা ভয় করে, আমি এই গরিব দোকানদারের ছেলে, দু-টাকার লোভে সমুদ্র পার হইয়া আসিয়াছি—কে জানে, কখন বঙ্গকুলকামিনী-প্রেরিত কুসুমশর আসিয়া, এই ছেঁড়া তাম্বু ফুটা করিয়া, আমার হৃদয়ে আঘাত করিবে, আমি অমনি ধপাস্ করিয়া চিতপাত হইয়া পড়িয়া যাইব! হায়! তখন আমার কি হইবে! কে মুখে জল দিবে!

আমি এমত বলি না যে, সকল বাঙ্গালির মেয়ে এরূপ ফোর্লিংপিস, অথবা সকলেই এরূপ পুষ্পক্ষেপণী প্রেরণে সুচতুরা। তবে কেহ কেহ বটে, ইহা আমি জনরবে অবগত হইয়াছি। শুনিয়াছি, তাঁহারা নাকি ভর্তৃনিয়োগানুসারেই এরূপ কার্য্য প্রবৃত্ত। এই ভর্তৃগণ দেশীয় শাস্ত্রানুসারেই এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন। হিন্দুদিগের যে চারিটি বেদ আছে—তাহার মধ্যে চাণক্যশ্লোক নামক বেদে (আমি এ সকল শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছি) লেখা আছে যে,

আত্মানং সততং রক্ষণং দারৈরপি ধনৈরপি।

ইহার অর্থ এই, হে পদ্মপলাশলোচনে শ্রীকৃষ্ণ! আমি আপনার উন্নতির জন্য তোমাকে এই বনফুলের মালা দিতেছি, তুমি গলায় পর।

BRANSONISM*

জন ডিক্‌সন সাহেবকে ফোর্জদারী আদালতে ধরিয়া আনিয়াছে। সাহেব বড় কালো, তা হলে হয় কি, সাহেব ত বটে—পাড়াগেয়ে কাছারিতে বিচার দেখিতে অনেক রঙ্গদার লোক ছুটিয়া গেল। বিচার একটা দেশী ডেপুটি'র কাছে হইবে। তাহাতে সাহেবের কিছু কষ্ট; তবে মনে মনে ভরসা আছে যে, বাঙ্গালিটা ভয়ে আমাকে ছাড়িয়া দিবে। ডিপুটি মহাশয়ের রকম দেখিয়াও তাই বোধ হয়, একটা তেকেলে বড়ো—নিরীহ রকম ভাল মানুষ; জড়সড় হইয়া বসিয়া আছে।

এদিকে কনস্টেবল মহাশয়েরা কতকটা ভয়ে ভয়ে সাহেব মহাশয়কে ডকস্থ করিলেন। সাহেব ডকস্থ হইয়াই একটু গরম হইয়া হাকিমের পানে চাহিয়া চোখ ঘুরাইয়া একটু বাঁকা বাঁকা বুলিতে বলিলেন, “সে হামাকে টোমরা হেখানে কেন আনিলো?”

হাকিম বলিল, “কি জানি সাহেব! কেন আনিলো—তুমি কি করেছ?”

সাহেব। যা করে না কেন, টোমার সাথে হামার কোন বাট হোবে না।

হাকিম। কেন সাহেব?

সাহেব। টুমি কালা বাঙ্গালি আছে।

হাকিম। তার পর?

সাহেব। আমি সাহেব আছে।

হাকিম। তা ত দেখছি—তাতে কি হলো?

সাহেব। তোমার—কি বলে? সেটা লেই।

হাকিম। তবু ভাল—মাতৃভাষা ধরেছ, এতক্ষণ বাঁকা বাঁকা বুলি ধরেছিলে কেন? কি নেই?

সাহেব। সেই ঝাতে মোকদ্দমা করে—সে তুমি জানে না?

* Ilbert বিল সম্বন্ধীয় বিবাদকালে ইহা লিখিত হয়।

বাংকম রচনাবলী

হাকিম। সাহেব, আমি ভাল মানুষ—তোমায় এখনও কিছ্ বলি নাই—কিন্তু আর “তুমি” “তুমি” করিও না—জরিমানা করিব।

সাহেব। টুমি মোর জরিমানা করিতে পারে না—হামি সাহেব আছে—তোমার সেই সেটা—কি বলে—সেটা লেই।

হাকিম। কি নেই সাহেব?

সাহেব। সেই যে—জর্নিষ্টকেশন।

হাকিম। ওহো—Jurisdiction? বটে। তুমি কি বিলাতী সাহেব?

সা। হামি সাহেব আছে।

হা। রংটা এত কাল কেন?

সা। মূই কোয়লার কাম করেছিল।

হা। তোমার বাপের নাম কি?

সা। বাপের নামে কোটের কি কাম আছে?

হা। বলি সেটা জানা আছে কি?

সা। হামার বাপ বড় আদমি ছেলো—লেকেন লামটা এখন মনে পড়ছে না।

হাকিম। মনে কর না হয়। তোমার নামটা কি?

সাহেব। আমার নাম জান সাহেব—জান ডিক্সন্।

হা। বাপের নাম ডিক্সন্ নয়?

সা। হোবে—ডিক্সন্ হোতে পারে—লেকেন—

বাদীর মোক্তার এই সময়ে বলিল, “হুজুর, ওর বাপের নাম গোবর্দন সাহেব।”

সাহেব রাগ করিয়া বলিল, “গোবর্দন হইলো ত কি হইলো—তোমার বাপের নাম যে রামকান্ত—তোমার বাপ চুড়া বেঁচিত—আমার বাপ বড় আদমি ছেলো।”

হাকিম। তোমার বাপ কি করিত?

সাহেব। বড় লোকের সাদি দিত।

হাকিম। সে আবার কি? ঘটকালি করিত না কি?

মোক্তার। আজ্ঞে না—বিবাহের বাজনার জয়ঢাক ঘাড়ে করিত।

অনেকে হাসিল। হাকিম জুরিস্ ডিক্সনের আপত্তি নামজুর করিয়া, বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। ফরিয়াদীকে তলব করায় রূপার পৈছা হাতে নধর কালো কালো একজন স্ত্রীলোক উপস্থিত হইল। তাহাকে যেরূপ জিজ্ঞাসাবাদ করা হইল, আর সে যেরূপ উত্তর দিল, নিম্নে লিখিতোঁছি;—

প্রশ্ন। তোমার নাম কি?

উত্তর। রঞ্জিণী জেলেনী।

প্রশ্ন। তুমি কি কর?

উত্তর। বিল খালে মাছ ধরে বেঁচি।

আসামী সাহেব কহিল, “ঝুটা বাত! ও স্ফুটকি মাছ বেঁচে।”

জেলেনী বলিল, “তাও বেঁচি। তাইতেই ত তুমি মরেছ।”

প্রশ্ন। তোমার কিসের নালিশ?

উত্তর। চুরির নালিশ।

প্রশ্ন। কে চুরি করেছে?

উত্তর। (সাহেবকে দেখাইয়া) এই বাগদীর ছেলে।

সাহেব। মূই সাহেব আছে—মূই বাগদী লই।

প্রশ্ন। কি চুরি করেছে?

উত্তর। এই ত বলিলাম—এক মূঠা স্ফুটকি মাছ।

প্রশ্ন। কি রকমে চুরি করিল?

উত্তর। আমি ডালা পাতিয়া তাতে স্ফুটকি মাছ সাজাইয়া বেঁচিতোঁছিলাম—একজন খন্দের এলো—তা তার পানে ফিরে কথা কহিতোঁছিলাম—এমন সময়ে সাহেব ডালা থেকে এক মূঠা মাছ তুলে নিয়ে পাকেটে পুরিল।

প্রশ্ন। তার পর, তুমি টের পেলে কেমন ক'রে ?

উত্তর। পাকেটের যে আধখানা বই ছিল না—তা সাহেবের মনে ছিল না। সন্টকি মাছ সব ফুটো দিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

এই কথা শুনিয়া সাহেব রাগ করিয়া বলিল, “না বাবুজি! ওর চুপাড়াই ফুটো, তাই মাছ বেরইয়ে পড়েছিল।”

জেলেনী বলিল, “ওর পাকেটে দুই চারিটা মাছ পাওয়া গিয়াছিল।”

সাহেব বলিল, “সে মূই দাম দেবে বলে নিয়েছেলো।”

সাক্ষীর দ্বারা প্রমাণ হইল যে, ডিক্সন সাহেব সন্টকি মাছ চুরি করিয়াছেন। তখন হাকিম, সাহেবের জবাব লিখিতে বাসিলেন। সাহেব জবাবে কেবল এই কথা বলিলেন যে, কালা বাঙ্গালীর আমার উপর “জুষ্টিফিকেশন লেই।” সে আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া হাকিম তাহাকে এক হস্তা কয়েদের হুকুম দিলেন। দুই চারি দিন পরে এই কথাটা কলিকাতার একখানা ইংরেজি দৈনিক পত্রের সম্পাদকের কাণে গেল। পর দিন প্রভাতে সেই পত্রের সম্পাদকীয় উক্তি মধ্যে নিম্নোক্ত লীডর দেখা গেল।

THE WISDOM OF A NATIVE MAGISTRATE.—A story of lamentable failure of justice and race antipathy has reached us from the Mofussil. John Dickson, an English gentleman of good birth though at present rather in straightened circumstances had fallen under the displeasure of a clique of designing natives headed by one Rungini Jeliani, a person, as we are assured on good authority, of great wealth, and considerable influence in native society. He was hauled up before a native Magistrate on a charge of some petty larceny which, if the trial had taken place before a European magistrate, would have been at once thrown out as preposterous, when preferred against a European of Mr. Dickson's position and character. But Baboo Jaladhar Gangooly, the ebony-coloured Daniel before whose awful tribunal, Mr. Dickson had the misfortune to be dragged, was incapable of understanding that petty larcenies, however congenial to sharp intellects of his own country, have never been known to be perpetrated by men born and bred on English soil, and the poor man was convicted on evidence the trumpery character of which, was probably as well known to the magistrate as to the prosecutors themselves. The poor man pleaded his birth, and his rights as a European British subject, to be tried by a magistrate of his own race, but the plea was negatived for reasons we neither know nor are able to conjecture. Possibly the Babu was under the impression that Lord Ripon's cruel and nefarious Government had already passed into Law the Bill which is to authorize every man with a dark skin lawfully to murder and hang every man with a white one. May that day be distant yet! Meanwhile we leave our readers to conjecture from a study of the names *Jaladhar* and *Jaliani* whether the tie of kindred which obviously exists between prosecutor and magistrate has had no influence in producing this extraordinary decision.”

এই লীডর বাহির হইলে পর উহা পড়িয়া জেলার মাজিস্ট্রেট সাহেব জলধরবাবুকে চাপরাশি পাঠাইয়া তলব করিয়া আনিলেন। গরিব ব্রাহ্মণ নবমীর পাঠার মত কাঁপিতে কাঁপিতে হুজুরের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। তিনি সেলাম করিতে না করিতে, সাহেব গরম হইয়া বলিলেন, “What do you mean, Babu, by convicting a European British subject?”

ডিপার্ট। What European British subject, Sir ?

বিশ্বকম রচনাবলী

মাজিস্ট্রেট। Read here, I suppose you can do that. I am going to report you to the Government for this piece of folly.

এই বলিয়া সাহেব কাগজখানা বাবুর কাছে ফেলিয়া দিলেন, বাবু কুড়াইয়া লইয়া পড়িলেন। সাহেব বলিলেন, "Do you now understand?"

Deputy. Yes, Sir, but this man was not a European British subject.

Magistrate. How do you know that?

Deputy. He was very dark.

Magistrate. Do you find it laid down in the Law that a fair skin is the only evidence by which a man shall be adjudged to a European subject?

Deputy. No, Sir.

Magistrate. Well, what other evidence did you take?

এখন ডিপুটিবাবুটি বহুকালের ডিপুটি—জানিতেন যে, তর্কে তাঁহার জিত নিশ্চিত, কিন্তু তর্কে জিতিলেই বিপদ। অতএব সূচতুর দেশী চাকুরের যাহা কর্তব্য,—তাহা করিলেন, তর্ক ছাড়িয়া দিলেন। বলিলেন, "I do not presume to discuss the matter with you, Sir, I see I was wrong, and I am very sorry for it."

এখন মাজিস্ট্রেট সাহেব নিতান্ত বোকা নহেন, ভিতরে ভিতরে একটু ঝগ্দদার। এই কথা শুনিয়াই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "Very sorry for what?"

Deputy. For convicting a European British subject.

Magistrate. Why so?

Deputy. Because it is very wrong for a native to convict a European British subject.

Magistrate. Why very wrong?

ডিপুটিটি সাহেবকে এক হাতে কিনিতে আর এক হাতে বোঁচিতে পারে। অমনি উত্তর দিল, "Very wrong, because a European British subject cannot commit a crime and a native cannot judge honestly."

Magistrate. Do you admit that?

Deputy. I do not see why I should not. I try to do my duty to the best of my ability, but I speak of my countrymen generally.

Magistrate. You don't think your countrymen ought to try Europeans?

Deputy. Most certainly they should not. The glorious British Empire will come to an end if they do.

Magistrate. Well, Babu, I am glad to see you are so sensible. I wish all our countrymen were equally so; at least that all native magistrates were like you.

Deputy. Oh Sir! how can you expect it, when there are men at the top of our service who think differently.

Magistrate. Are you not yourself near the top? You must have served long.

Deputy. Unfortunately my claims to promotion have always been overlooked. I thought of speaking to you, Sir, on the subject.

Magistrate. You certainly deserve promotion. I will write to the Commissioner and see what can be done for you.

ডিপুটি তখন দুই হাতে সেলাম করিয়া উঠিয়া গেলেন। এই সময়ে জয়েন্ট সাহেব, বড় সাহেবের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ডিপুটি বাহির হইয়া গেল জয়েন্ট দেখিলেন। জয়েন্ট, বড় সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "What could you have been saying to this fellow?"

Magistrate. Oh! He is very amusing.

Joint. How so?

Magistrate. He is both fool and knave. He thinks of pleasing me by traducing his own countrymen.

Joint. And did you tell him your mind?

Magistrate. O no! I promised him promotion, which I will try to get for him. He has at least the merit of not being conceited. A conceited native is perfectly useless as a subordinate, and I prefer encouraging men to make a moderate estimate of their own merits.

এ দিকে, ডিপুটি ফিরিয়া আসিলে পর, আর এক ডিপুটি বাবুর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। দোশরা ডিপুটি জলধরকে বলিলেন, “সাহেবের কাছে গিয়াছিলেন না কি?”

জলধর। হাঁ। কি পাপে পড়েছি!

২রা ডিপুটি। কেন?

জলধর। সে দিনকার সেই বাগ্‌দী বেটাকে কয়েদ দিয়াছিলাম বলিয়া, সাহেব বলে, গবর্ণ-মেন্টে আমার নামে রিপোর্ট করিবে।

২রা ডিপুটি। তার পর?

জলধর। তার পর আর কি? প্রমোশানের রিপোর্ট করিয়ে এলেম।

২রা ডিপুটি। সে কি? কি মন্ত্রে?

জলধর। মন্ত্র আর কি? দুর্তো মন রাখা কথা।

হনুমান্দ্রাবাসংবাদ

একদা প্রাতঃসূর্য্যকিরণোদ্ভাসিত কদলীকুঞ্জে শ্রীমান্ হনুমান্ বায়ু সেবনার্থ পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। তাঁহার পরম রমণীয় লাঙ্গুলবল্লী চক্রে চক্রে কুণ্ডলীকৃত হইয়া কখন পৃষ্ঠে, কখন স্কন্ধে, কখন বৃক্ষশাখায় শোভিত হইতেছিল। চারি পাশে মর্ত্তমান, চাঁপা, কাঁঠালি প্রভৃতি নানাজাতীয় সুপক্ক এবং অপক্ক রস্তু বৃক্ষ হইতে থরে থরে, কাঁদিতে কাঁদিতে শোভা পাইয়া সুগন্ধে দিক্ আমোদিত করিয়াছিল। বীরবর, কখন কোন গাছ হইতে এক আধটা পাড়িয়া, কখন আঘ্রাণ, কখন চুম্বন, কখন লেহন এবং কদাচিৎ চর্চণ করিয়া কদলীজাতীয় ফলমাত্রের অনন্ত মাধুর্য্য সম্বন্ধে বহুতর মানসিক প্রশংসা করিতেছেন। এমত সময়ে দৈবযোগে বৃট্ট, কোট, পেণ্টালন, চেন, চসমা, চুরুট, চাবুকধারী টুপ্যাবৃত্তমস্তক এক নব্য বাবু তথায় উপস্থিত। হনুমান্‌চন্দ্র দূর হইতে এই অপূর্ষ মূর্ত্তি দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন, “কে এ? আকার ইঙ্গিতে বোধ হইতেছে, নিশ্চয় কিষ্কিন্দ্যা হইতে এ আসিতেছে। এরূপ পরানুকৃত বেশ, গমন, চাহনি প্রভৃতি অন্য কোন দেশে অসম্ভব। এ আমার স্বদেশী ও স্বজাতি, অতএব ইহাকে আমি অবশ্য আদর করিব।”

এই ভাবিয়া, মহাত্মা পবনাত্মজ এক সরস চম্পককদলীবৃক্ষ হইতে উজ্জ্বল হরিদ্রাবর্ণ এক গুলুছ সুপক্ক কদলী উন্মোচন করিয়া আঘ্রাণ করিলেন। এবং তাহার ঘ্রাণে পরিতুষ্ট হইয়া অতিথিসংকারে তৎপ্রয়োগ মনে মনে স্থির করিলেন। ইত্যবসরে সেই টুপি কোট পরিবৃত্ত মোহন মূর্ত্তি বীরবরের সম্মুখাগত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিল। বলিল—“Good morning Mr. Hanuman! how do you do? So glad to see you! Ah! I see you are at break-fast already.”

হনুমান্ কহিলেন, “কিমিদং? কিং বদসি?”

বাবু। What's that? I suppose that is the Kish-kinda patois? It is a glorious country—is it not? “There is a land of every land the pride.”—and so on, as you know.

হনু। কস্ত্বং! কস্মাঞ্জনপদাৎ আগতোসি?

বাবু। (জনাস্তিকে) It seems most barbarous gibberish—that precious lingo

বাংলা রচনাবলী

of his ; but I suppose I must put up with it. (প্রকাশ্যে) My dear Mr. Monkey, I am ashamed to confess that I am not quite familiar with your beautiful vernacular. I dare say it is a very polished language. I presume you can talk a little English.

তখন সেই মহাবীর পবননন্দন সহসা মহাচক্ষুর্দ্বয় ঘূর্ণিত করিয়া বৃহৎ লাজ্জুলপাশ বিস্তারণ পূর্বক তাহা বাবুর্জি মহাশয়ের গলদেশে অর্পিত করিলেন। এবং কুন্ডলী করিয়া জড়াইতে লাগিলেন। তখন বাবু মহাশয় হাঁ করিয়া ফেলিলেন, মূখের চুরট পড়িয়া গেল। বলিলেন, "I say—this seems somewhat—"

লেজের আর এক পেঁচ।

"Somewhat unmannerly—to say the least—"

আর এক পেঁচ।

"Dear Mr. Hanuman—you will hurt me."

আর এক পেঁচ।

"Kind—good Mr. Hanuman."

হনুমান্ তখন বাবু মহাশয়কে লেজে করিয়া উদ্বেদ তুলিয়া ফেলিলেন, বাবুর টুপি, চসমা, এবং চাবুক পড়িয়া গেল; কোট-পকেট হইতে ঘড়ি বাহির হইয়া চেনে ঝুলিতে লাগিল। তখন বাবুর মূখ শূকাইল—ডাকিলেন, "ও হনুমান্ মহাশয়, ঘাট হয়েছে, ছাড়! ছাড়! ছাড়! রক্ষা কর! গরিবের প্রাণ যায়।"

তখন হনুমান্, বাবুর প্রতি সদয় হইয়া তাঁহাকে ভূতলে স্থাপনপূর্বক লাজ্জুলপাশ হইতে তাঁহাকে বিমুক্ত করিলেন। অবসর পাইয়া বাবু টুপি, চসমা, চাবুক কুড়াইয়া পরিলেন। হনুমান্ বলিলেন, "মহাশয়! দ্রুত হইবেন না। আপনার বুলি ইংরেজি, বেশ কিঞ্চিকন্যা, এবং মূর্খতা পাহাড়ে-রকম দেখিয়া আপনার জাতি নিরূপণার্থ আপনাকে এতটা কষ্ট দিয়াছি। এক্ষণে—"

বাবু। এক্ষণে কি?

হনু। এক্ষণে বুঝিয়াছি যে, আপনার জন্ম বঙ্গদেশীয় কোন মহিলার গর্ভে। এখন আপনি ক্লান্ত আছেন—একটা কদলী ভোজন করিবেন?

এখন বাবুর্জির বেরূপ জিব শূকাইয়া আসিয়াছিল, তাহাতে একটু সরস কদলী ভোজন অতিশয় আবশ্যিক বলিয়া বোধ হইল—তিনি তখন প্রীত হইয়া উত্তর করিলেন, "With the greatest pleasure."

হনু। আপনার যে দেশে জন্ম, কদলী এবং বাতর্জি অনুসন্ধানে আমি মধ্যে মধ্যে সে দেশে গমন করিয়া থাকি; এবং তদ্দেশীয়া সুন্দরীগণ বড়ি নামে যে সুস্বাদু ভোজ্য প্রস্তুত করিয়া থাকে, তাহাও কদাপি বিনানুমতিতে রামানুচর-সেবায় নিষুক্ত করিয়াছি। অতএব আমি বাঙ্গালা উত্তম বুঝি। অতএব মাতৃভাষাতেই আমার সঙ্গে বাক্যালাপ কর।

বাবু। তার আশ্চর্য কি? আপনি কলা দিতে চাহিতেছেন? আমি অতিশয় আহ্লাদের সহিত আপনার কদলী ভক্ষণ করিব।

হনুমান্ তখন বাবু মহাশয়কে এক ছড়া কলা ফেলিয়া দিলেন। সে দেবদুল্লভ কদলী খাইয়া বাবু অতিশয় প্রীত হইলেন। হনুমান্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন কলা?"

বাবু। অতি মিষ্ট—delicious!

হনু। হে টুপ্যাবৃত মহাপুরুষ! মাতৃভাষায় কথা কও।

বাবু। ওটা আমার ভুল হইয়াছে, এইবার আমাকে Excuse করুন—

হনু। তাই বা কাকে বলে?

বাবু। আমাকে মাপ করুন—আমি বড়—কি বলব?—ইংরেজি কথাটা forgetful—তার বাঙ্গালা কি?

হনু। বৎস! তোমার কথোপকথনে আমি প্রীত হইয়াছি। তুমি আরও কলা খাইতে পার। যত ইচ্ছা তত খাইতে পার। গাছে আছে, পাড়িয়া দিতেছি। আর আমা হইতে তোমার যদি কোন কার্য সিদ্ধ হইতে পারে, তবে তাহাও আমাকে বল, আমি তৎসাধনে তৎপর হইব।

বাবু। ধন্যবাদ, হে আমার প্রিয় বানর মহাশয়! এক্ষণে আপনার প্রতি আমি অতিশয় বাধ্য বোধ করিব, আপনি যদি দয়ালুরূপে আমাকে একটি বিষয় বুঝাইয়া দেন।

হনু। কি বিষয়, হে বিদ্বন্?

বাবু। সেই বিষয়, হনুমন, যাহার অনুরোধে আপনার এখানে আসিয়াছি। আপনি রামরাজ্য দেখিয়াছেন। রামরাজ্যের মত রাজ্য না কি কখন হয় নাই—কেহ কেহ বলেন, সে সকল গল্প মাত্র, fable—

হনু। (চক্ষু আরক্ত, এবং দৃষ্টি বিমূর্ত) রামরাজ্য গল্প! বেটা, তবে আমিও গল্প? তবে আমার এ লাঙ্গুলও একটা গল্প? দেখ, তবে কেমন গল্প!

এ বলিয়া মহাক্রোধে হনুমান সেই অনন্ত কুণ্ডলীকৃত মহালাঙ্গুল আবার বাবু বেচারার স্কন্ধে স্থাপন করিলেন। তখন বাবু বিশুদ্ধকবদনে বলিলেন, “থাম থাম, হে মহালাঙ্গুল, তুমি গল্প নও—তোমার লাঙ্গুল ত নহেই—সে বিষয়ে আমি শপথ করিতে পারি। কাজে কাজেই তোমার রামরাজ্যও গল্প নহে—The proof of the pudding is in the eating thereof—কথাটা কি, তুমি রামের দাস—আমি ইংরেজের দাস। তোমার রাম বড়, কি আমার ইংরেজ বড়? আমার ইংরেজ রাজ্যে একটা নতুন জিনিস হইতেছে—তোমার রামরাজ্যে তা ছিল কি?

হনু। জিনিসটা কি? সুপক্ক কদলী?

বাবু। তা না। local self-government.

হনু। সে কি?

বাবু। স্থানীয় আত্মশাসন। ছিল তোমাদের?

হনু। ছিল না ত কি? স্থানীয় আত্মশাসন ত স্থানবিশেষে আত্মশাসন? তাহা আমরা সম্বাদাই করিতাম। আমার আত্মশাসন ছিল লাঙ্গুলে। লাঙ্গুলে আমি আত্মশাসন না করিলে ত্রেতাযুগের অর্দ্ধেক লোক সমুদ্রে চুবুনি খেয়ে মরিত। যখনই আমার লেজ সড় সড় করিত, ইচ্ছা হইত অম্বকের গলায় দিই; তখনই আমি লাঙ্গুল স্থানে আত্মশাসন করিতাম—লেজটাকে পদদ্বয়মধ্যে লুক্কায়িত করিতাম। এমন কি, যে দিন স্বয়ং রামচন্দ্র সীতা দেবীকে অগ্নিতে প্রবেশ করিতে বলেন, সে দিন আমার এই স্থানীয় আত্মশাসন না থাকিলে—এই লাঙ্গুল রামচন্দ্রের গলাতেই যাইত—আমার স্থানীয় আত্মশাসনগুণে লেজ পদদ্বয়মধ্যে বিন্যস্ত হইল। আরও আমরা যখন লঙ্কা অবরুদ্ধ করিয়া বসিয়াছিলাম, তখন আহারাভাবে আমাদের সকলেরই আত্মশাসন উদরে নিহিত হইয়া সে অঞ্চলে স্থানীয় হইয়া পড়িয়াছিল।

বাবু। মহাশয়ের বুদ্ধিব্যবহার ভুল হইতেছে—সেরূপ আত্মশাসনের কথা বলিতেছি না।

হনু। শোনই না, স্থানীয় আত্মশাসন বড় ভাল। যথা—স্ত্রীলোকের আত্মশাসন রসনায় হইলে উত্তম স্থানীয় আত্মশাসন হইল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আত্মশাসনে শূন্যিয়াছি না কি ছানা সন্দেশের হাঁড়িতে স্থানীয় হইলেই বড় ভাল হয়। তোমাদের আত্মশাসন—

বাবু। কোথায়? পৃষ্ঠে?

হনু। না। তোমাদের পৃষ্ঠ শাসনান্তরের ক্ষেত্র বটে—কিন্তু তোমাদের আত্মশাসনের যথার্থ ক্ষেত্র তোমাদের চক্ষু দুইটি।

বাবু। সে কি রকম?

হনু। তোমাদের কান্না পাইলেও তোমরা কাঁদ না। সে ভাল। রাত্রিদিন ঘ্যান ঘ্যান, প্যান প্যান করিলে, প্রভুগণ জ্বালাতন হইবার সম্ভাবনা।

বাবু। সে যাহাই হউক, আমি সে অর্থে স্থানীয় আত্মশাসনের কথা বলিতেছিলাম না।

হনু। তবে কি অর্থে?

বাবু। শাসন কাহাকে বলে, জানেন ত?

হনু। অবশ্য। তোমাকে চড় মারিলে তুমি শাসিত হইলে। এই ত শাসন?

বাবু। তা নয়, রাজশাসন জানেন না?

হনু। তা জানি। কিন্তু সে অর্থে, তুমি নিজে রাজা না হইলে আত্মশাসন করিবে কি প্রকারে?

বাবু। (স্বগত) একেই বলে বাঁদুরে বুদ্ধি! (প্রকাশ্যে) যদি রাজা দয়া করিয়া আপনার কাজ আমাদের কিছুর ছাড়িয়া দেন?

বিশ্বকম রচনাবলী

হনু। তা হলে সে রাজারই লাভ। তিনি আপনার কাজ পরের ঘাড়ে দিয়া পাটরাণী নিয়ে রঙ্গ করুন, আর আমরা তাঁর খাটুনি খেটে মরি! এই বৃষ্টি তোমাদের রামরাজ্য? হা রাম!

বাবু। কথাটা এখনও আপনার বোঝা হয় নাই। Freedom—liberty কাহাকে বলে জানেন?

হনু। কিষ্কন্ধ্যার কলেজে ওসব শেখায় না।

বাবু। Freedom বলে স্বাধীনতাকে। স্বাধীনতা কাহাকে বলে জানেন ত?

হনু। আমি বনের পশু, স্বাধীনতা জানি না ত কি তুমি জান?

বাবু। ভাল। তা যে পরিমাণে মনুষ্য স্বাধীন হইবে, সেই পরিমাণে মনুষ্য সুখী।

হনু। অর্থাৎ যে পরিমাণে মনুষ্য পশুভাব প্রাপ্ত হইবে, সেই পরিমাণে মনুষ্য সুখী।

বাবু। মহাশয়! রাগ করিবেন না। কিন্তু এ কথাগুলো নিতান্ত হনুমানের মত হইতেছে।

হনু। আমি ত তাহাই, বাবুর মত কথাগুলি কি শুনিনি।

বাবু। স্বাধীনতাশূন্য মনুষ্যজন্মই পশুজন্ম। পরাধীনেরা গো মহিষাদির ন্যায় রঞ্জুবদ্ধ হইয়া তাড়িত হয়। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের রাজপুরুষেরা আজন্ম স্বাধীন—free-born.

হনু। আমাদের মত।

বাবু। আত্মশাসন সেই স্বাধীনের লক্ষণ।

হনু। আমরাও সেই লক্ষণবিশিষ্ট। আমাদের মধ্যে আত্মশাসন ভিন্ন রাজশাসন নাই। আমরা পৃথিবীমধ্যে স্বাধীন জাতি। তোমরা কি আমাদের মত হইতে চাও?

বাবু। ছি! ছি! বৃষ্টিলাম, বাঁদরে আত্মশাসন বৃষ্টিতে পারে না।

হনু। ঠিক কথা ভাই! আইস, দুই জনে কদলী ভোজন করি।

গ্রাম্য কথা

প্রথম সংখ্যা—পাঠশালার পণ্ডিত মহাশয়

টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে; আমি ছাতি মাথায়, গ্রাম্য পথ দিয়া হাঁটতেছি। বৃষ্টিটা একটু চাপিয়া আসিল। তখন পথের ধারে একখানা আটচালা দেখিয়া, তাহার পরচালার নীচে আশ্রয় লইলাম। দেখিলাম, ভিতরে কতকগুলি ছেলে বই হাতে বসিয়া পড়িতেছে। একজন পণ্ডিত মহাশয় বাঙ্গালা পড়াইতেছেন। কাণ পাতিয়া একটু পড়ানটা শুনিলাম। দেখিলাম, পণ্ডিত মহাশয়ের ব্যাকরণের উপর বড় অনুরাগ। একটু উদাহরণ দিতেছি। পণ্ডিত মহাশয় একজন ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বল দেখি, ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় করিলে কি হয়?”

ছাত্রটি কিছু মোটা-বুদ্ধি, নাম শুনিলাম, “ভোঁদা।” ভোঁদা ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, “আজ্ঞা, ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত করিলে ভুক্ত হয়।”

পণ্ডিত মহাশয়, ছাত্রের মূর্খতা দেখিয়া চটিয়া উঠিলেন এবং তাহাকে “মূর্খ!” “গন্দভ!” প্রভৃতি নানাবিধ সংস্কৃত বাক্যে অসংস্কৃত করিলেন। ছাত্রও কিছু গরম হইয়া উঠিল, বলিল, “কেন পণ্ডিত মহাশয়! ভুক্ত শব্দ কি নাই?”

পণ্ডিত। থাকিবে না কেন? ভুক্ত কিসে হয়, তা কি জানিস্ না?

ছাত্র। তা জানিব না কেন? ভাল করিয়া চিবিয়া গিলিয়া ফেলিলেই ভুক্ত হয়।

পণ্ডিত। বোল্লিক! বানর! তাই কি জিজ্ঞাসা কর্ছি?

তখন ভোঁদার প্রতি বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়া তিনি তাহার পার্শ্ববর্তী ছাত্র রামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভাল, রাম, তুমিই বল দেখি, ভুক্ত শব্দ কি প্রকারে হয়?”

রাম বলিল, “আজ্ঞা, ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত করিয়া ভুক্ত হয়।”

পণ্ডিত মহাশয় ভোঁদাকে বলিলেন, “শুনি রে ভোঁদা? তোর কিছু হবে না।”

ভোঁদা রাগিয়া বলিল, “না হয় না হোক—আপনার যেমন পক্ষপাত!”

পণ্ডিত। পক্ষপাত আবার কি রে, হনুমান্!

ভোঁদা। ওর কপালে “ভুজো”, আমার কপালে ভু?

ছাত্র যে সুচর্চণীয় “ভুজো” এবং অদৃষ্টের তারতম্য স্মরণ করিয়া অভিমান করিয়াছে,

পাণ্ডিত মহাশয় তাহা বুঝিলেন না। রাগ করিয়া ভোঁদাকে এক ঘা প্রহার করিলেন, এবং আদেশ করিলেন, “এখন বল, ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত করিলে কি হয়?”

ভোঁদা। (চোখে জল) আজ্ঞে, তা জানি না।

পাণ্ডিত। জানিস্ নে? ভূত কিসে হয়, জানিস্ নে?

ভোঁদা। আজ্ঞে তা জানি। মলেই ভূত হয়।

পাণ্ডিত। শূওর! গাধা! ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত করে ভূত হয়।

ভোঁদা এতক্ষণে বুঝিল। মনে মনে স্থির করিল, মরিলেও যা হয়, ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত করিলেও তা হয়। তখন সে বিনীতভাবে পাণ্ডিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিল, “আজ্ঞে, ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত করিলে কি শ্রাদ্ধ করিতে হয়?”

পাণ্ডিত মহাশয় আর সহ্য করিতে পারিলেন না। বিরাশী সিক্কা ওজনে ছাত্তের গালে এক চপেটাঘাত করিলেন। ছাত্র পুস্তকাদি ফেলিয়া দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী চলিয়া গেল। তখন বৃষ্টি ধরিয়া আসিয়াছিল, রঙ্গ দেখবার জন্য আমিও সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। ভোঁদার মাতার গৃহ বিদ্যালয় হইতে বড় বেশী দূর নয়। ভোঁদা গৃহপ্রবেশকালে কান্নার স্বর দ্বিগুণ বাড়াইল, এবং আছাড়িয়া পড়িল। দেখিয়া ভোঁদার মা তার কাছে এসে সান্ত্বনায় প্রবৃত্ত হইল। জিজ্ঞাসা করিল, “কেন, কি হয়েছে, বাবা?”

ছেলে মাকে ভৈষ্ণাইয়া বলিল, “এখন কি হয়েছে, বাবা! এমন ইস্কুলে আমায় পাঠাইয়েছিলে কেন পোড়ারমুখী?”

মা। কেন, কি হয়েছে, বাবা?

ছেলে। পোড়ারমুখী এখন বলেন, কি হয়েছে, বাবা! শিগ্গির তোর ভূ ধাতুর পর ক্ত হোক। শিগ্গির হোক! আমি তোর শ্রাদ্ধ করি।

মা। সে আবার কি বাপ! কাকে বলে?

ছেলে। শিগ্গির তোর ভূ ধাতুর পর ক্ত হোক! শিগ্গির হোক।

মা। সে কি মরাকে বলে বাপ?

ছেলে। তা না ত কি? আমি তাই বলতে পারি নাই বলে পাণ্ডিত মশাই আমায় মেরেছে।

মা। অধঃপেতে মিন্‌সে! আক্কেল নেই! আমার এই এক রত্তি ছেলের আর কত বিদ্যা হবে! যে কথা কেউ জানে না, তাই বলতে পারে নি বলে ছেলেকে মারে! আজ মিন্‌সেকে আমি একবার দেখবো।

এই বলিয়া গাছকোমর বাঁধিয়া ভোঁদার মাতা পাণ্ডিত মহাশয়ের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় চলিলেন। আমিও পিছু পিছু চলিলাম। সেই সুপুত্রবতীকে অধিক দূর যাইতে হইল না। তখন পাঠশালা বন্ধ হইয়াছিল। পাণ্ডিত মহাশয় গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, পথিমধ্যেই উভয়ে সাক্ষাৎ হইল। তখন ভোঁদার মা বলিল, “হ্যাঁ গা পাণ্ডিত মহাশয়, যা কেউ জানে না, আমার ছেলে তাই বলতে পারে নি বলে কি এমনি মার মারতে হয়?”

পাণ্ডিত। ও গো, এমন কিছু শক্ত কথা জিজ্ঞাসা করি নাই। কেবল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। ভূত কেমন করে হয়।

ভোঁদার মা। ভূত হয় গঙ্গা না পেলেই। তা ও সব কথা ও ছেলেমানুষ কেমন করে জানবে গা? ও সব কথা আমাদের জিজ্ঞাসা কর।

পাণ্ডিত। ও গো, সে ভূত নয় গো।

ভোঁদার মা। তবে কি গোভূত?

পাণ্ডিত। সে সব কিছু নয় গো, তুমি মেয়েমানুষ কি বুঝবে? বলি, একটা ভূত শব্দ আছে।

ভোঁদার মা। ভূতের শব্দ আমি অমন কত শুনছি। তা ও ছেলেমানুষ, ওকে কি ও সব কথা বলে ভয় দেখাতে আছে?

আমি দেখিলাম যে, এ পাণ্ডিতে পাণ্ডিতে সমস্যা, শীঘ্র মিটিবে না। আমি এ রঙ্গের অংশ পাইবার আকাঙ্ক্ষায় অগ্রসর হইয়া পাণ্ডিত মহাশয়কে বলিলাম, “মহাশয়, ও স্ত্রীলোক, ওর সঙ্গে বিচার ছেড়ে দিন। আমার সঙ্গে বরং এ বিষয়ের কিছু বিচার করুন।”

বাঁকম রচনাবলী

পণ্ডিত মহাশয় আমাকে ব্রাহ্মণ দেখিয়া, একটু সম্ভ্রমের সহিত বলিলেন, “আপনি প্রশ্ন করুন।”

আমি বলিলাম, “আচ্ছা, ভূত ভূত করিতেছেন, বলুন দেখি ভূত কয়টি?”

পণ্ডিত সম্মুখ হইয়া বলিলেন, “ভাল, ভাল। পণ্ডিতে পণ্ডিতের মতই কথা কয়। শূন্য লি মাগী?” তার পর আমার দিকে ফিরিয়া, এমনই মূখখানা করিলেন, যেন বিদ্যার বোঝা নামাইতেছেন। বলিলেন, “ভূত পাঁচটি।”

তখন ভোঁদার মা গর্জিয়া উঠিয়া বলিল, “তবে রে মিন্‌সে? তুই এই বিদ্যায় আমার ছেলে মারিস্! ভূত পাঁচটা! পাঁচ ভূত, না বারো ভূত?”

পণ্ডিত। সে কি, বাছা! ও ঠাকুরটিকে জিজ্ঞাসা কর, ভূত পণ্ড। ক্ষিত্যপ্—

ভোঁদার মা। বারো ভূত নয় ত আমার এতটা বিষয় খেলে কে? আমি কি এমনই দুঃখী ছিলাম?

ভোঁদার মা তখন কাঁদিতে আরম্ভ করিল। আমি তখন তাহার পক্ষাবলম্বনপূর্বক বলিলাম, “উনি যা বলিলেন, তা হতে পারে। অনেক সময়েই শূনা যায়, অনেকের বিষয় লইয়া ভূতগণ আপনাদিগের পিতৃকৃত্য সম্পন্ন করে। কখন শোনে নাই, অম্বকের টাকাটায় ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ হইতেছে?”

কথাটা শুনিয়া, পণ্ডিত মহাশয় ঠিক বুদ্ধিতে পারিলেন না, আমি ব্যঙ্গ করিতেছি, কি সত্য বলিতেছি। কেন না, বুদ্ধিটা কিছু স্থূল। তাঁকে একটু ভেকাপানা দেখিয়া আমি বলিলাম, “মহাশয়, এ বিষয়ের প্রমাণ প্রয়োগ ত সকলই অবগত আছেন। মন্ব বলিয়াছেন,—

“কৃপণানাং ধনশ্চৈব পোষ্যকুশ্মাণ্ডপালিনাম্।

ভূতানাং পিতৃশ্রাদ্ধেষু ভবেন্শ্চৈং ন সংশয়ঃ ॥”*

পণ্ডিত মহাশয়ের সংস্কৃতজ্ঞান ঐ ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত পর্য্যন্ত। কিন্তু এ দিকে বড় ভয়, পাছে সেই শিষ্যমণ্ডলীর সম্মুখে, বিশেষতঃ ভোঁদার মার সম্মুখে আমার কাছে পরাস্ত হইয়েন—অতএব যেমন শুনিলেন, “ভূতানাং পিতৃশ্রাদ্ধেষু ভবেন্শ্চৈং ন সংশয়ঃ।” এমনই উত্তর করিলেন, “মহাশয়, যথার্থই আজ্ঞা করিয়াছেন। বেদেই ত আছে,—

“অস্মিত গোদাবরীতীরে বিশালঃ শাল্মলীতরুঃ”

শুনিয়া ভোঁদার মা বড় তৃপ্ত হইল। এবং পণ্ডিত মহাশয়ের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিল, “তা, বাবা! তোমার এত বিদ্যা, তবু আমার ছেলে মার কেন?”

পণ্ডিত। আরে বেঁটি, তোর ছেলেকে এমনই বিদ্বান্ করিব বলিয়াই ত মারি! না মারিলে কি বিদ্যা হয়?

ভোঁদার মা। বাবা! মারিলে যদি বিদ্যা হয়, তবে আমাদের বাড়ীর কর্তাটির কিছু হলো না কেন? ঝাঁটায় বল, কোঁস্তায় বল, আমি ত কিছুতেই কসুর করি না।

পণ্ডিত। বাছা! ও সব কি তোমাদের হাতে হয়? ও আমাদের হাতে।

ভোঁদার মা। বাবা! আমাদের হাতে কিছুই জোরের কসুর নাই। দেখিবে?

এই বলিয়া ভোঁদার মা একগাছা বাঁকারি কুড়াইয়া লইল। পণ্ডিত মহাশয়, এইরূপ হঠাৎ অধিক বিদ্যালভের সম্ভাবনা দেখিয়া, সেখান হইতে উদ্ধবশ্বাসে প্রস্থান করিলেন। শুনিয়াছি, সেই অবাধি পণ্ডিত মহাশয়, আর ভোঁদাকে কিছু বলেন নাই। ভূ ধাতু লইয়া পাঠশালায় আর গোল-যোগ হয় নাই। ভোঁদা বলে, “মা, এক বাঁকারিতে পণ্ডিত মহাশয়কে ভূতছাড়া করিয়াছে।”

দ্বিতীয় সংখ্যা—ধর্ম-শিক্ষা

I. THEORY.

“পড় বাবা, মাতৃবৎ পরদারেষু।”

ছেলে। সে কাকে বলে, বাবা?

* অস্মার্থ। কৃপণদিগের ধন আর যাঁহারা পোষ্যপুত্ররূপে কুশ্মাণ্ডগুলি প্রতিপালন করেন, তাঁহাদিগের ধন ভূতের বাপের শ্রাদ্ধে নষ্ট হইবে সন্দেহ নাই।

বাপ। এই যত স্ত্রীলোক পরের স্ত্রী, সবাইকে আপনার মা মনে করিতে হয়।
 ছেলে। তারা সবাই আমার মা?
 বাপ। হাঁ বাবা, তা বৈ কি।
 ছেলে। বাবা, তবে তোমার বড় জ্বালা হলো। আমার মা হ'লে তারা তোমার কে হলো,
 বাবা?
 বাপ। ছি! ছি! ছি! অমন কথা কি বলতে আছে! পড়,
 “মাতৃবৎ পরদারেষু, পরদ্রব্যেষু, লোষ্ট্রবৎ।”
 ছেলে। অর্থ কি হলো, বাবা?
 বাপ। পরের সামগ্রীকে লোষ্ট্রের মত দেখবে।
 ছেলে। লোষ্ট্র কি?
 বাপ। মাটির ঢেলা।
 ছেলে। বাবা, তবে ময়রা বেটাকে আর সন্দেশের দাম না দিলেও হয়—মাটির ঢেলার আর
 দাম কি?
 বাপ। তা নয়। পরের সামগ্রী মাটির মত দেখবে—নিতে যেন ইচ্ছা না হয়।
 ছেলে। বাবা, কুমারের ব্যবসা শিখলে হয় না?
 বাপ। ছি বাবা! তোমার কিছুর হবে না দেখছি। এখন পড়,
 “মাতৃবৎ পরদারেষু, পরদ্রব্যেষু, লোষ্ট্রবৎ।
 আত্মবৎ সর্বভূতেষু, যঃ পশ্যতি স পশ্চিতঃ ॥”
 ছেলে। আত্মবৎ সর্বভূতেষু কি, বাবা?
 বাপ। এই আপনার মত সকলকেই দেখবে।
 ছেলে। তা হলেই ত হলো। যদি পরকে আপনার মত ভাবি, তা হলে পরের সামগ্রীকে
 আপনারই সামগ্রী ভাবতে হবে, আর পরের স্ত্রীকেও আপনার স্ত্রী ভাবতে হবে।
 বাপ। দূর হ! পাজি বেটা, ছুঁচো বেটা। (ইতি চপেটাঘাত)

II. PRACTICE.

(১)

কাদম্বিনী নামে কোন প্রোঢ়া কলসীকক্ষে জল আনিতে যাইতেছে। তখন অর্ধীতশাস্ত্র সেই
 বালক, তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত।
 ছেলে। বলি, মা!
 কাদম্বিনী। কেন, বাছা! আহা, ছেলোটর কি মিষ্ট কথা গো! শব্দে কাণ জুড়ায়।
 ছেলে। মা, সন্দেশ খেতে একটি পয়সা দে না মা!
 কাদম্বিনী। বাবা, আমি দুঃখী মানুষ, পয়সা কোথা পাব, বাবা?
 ছেলে। দিবনে বেটি? মুখপুড়ি! হতভাগি! আঁটকুড়ি!
 কাদ। আ মলো! কাদের এমন পোড়ারমুখো ছেলে!
 ছেলে। দিবনে বেটি, (ইতি প্রহার এবং কলসী-ধবংস)
 (পরে ছেলের বাপ সেই রঙ্গভূমে উপস্থিত)
 বাপ। এ কি রে বাঁদর?
 ছেলে। কেন, বাবা! এ যে আমার মা। মার সঙ্গে যেমন করি, ওর সঙ্গেও তেমনি করেছি—
 “মাতৃবৎ পরদারেষু।” কই মাগি, বাবাকে দেখে তুই ঘোমটা দিলে নে?

(২)

ময়রা আসিয়া ছেলের বাপের কাছে নালিশ করিল যে, ছেলের জ্বালায় আর দোকান করা
 ভার, ছেলে দোকান লুঠ করিয়া সকল মিঠাই মণ্ডা লইয়া আসে। গোয়লা আসিয়া ক্ষীর ছানা
 সম্বন্ধে সেইরূপ নালিশ করিল।

বাপ তখন ছেলেকে ধরিয়া আনিয়া প্রহার আরম্ভ করিলেন। ছেলে বলিল, “মার কেন বাবা?”

বাংকম রচনাবলী

বাপ। মার্ব না? তুই পরের দ্রব্য সামগ্রী লুটে পুটে আনিস্।
ছেলে। বাবা, চোরের ভয় হয়েছে, তাই টিল কুড়িয়ে জমা করেছি—পরের সামগ্রী ত টিল।

(৩)

সরস্বতীপূজা উপস্থিত। বাপ প্রাতঃকালে ছেলেকে বলিলেন, “যা, একটা ডুব দিয়ে এসে অঞ্জলি দে—নাহলে খেতে পারবিনে।”

ছেলে। খেয়ে দেয়ে বিকেলে অঞ্জলি দিলে হয় না?

বাপ। তাও কি হয়? খেয়ে কি অঞ্জলি দেওয়া হয় রে পাগল?

ছেলে। তবে এ বছরের অঞ্জলি আর বছরে একেবারে দিলে হয় না? এবার বড় শীত।

বাপ। তা হয় না—সরস্বতীকে অঞ্জলি না দিলে কি বিদ্যা হয়?

ছেলে। একটা বছর কি ধারে বিদ্যা হয় না?

বাপ। দূর, মূর্খ! যা, ডুব দিয়ে আস্গে যা। অঞ্জলি দেওয়া হ'লে দুটো ভাল সন্দেশ দেব এখন।

“আচ্ছা” বলিয়া ছেলে নাচিতে নাচিতে ডুব দিতে গেল। বড় শীত—তেমনি বাতাস—জল কনকনে। তখন ছেলে ভাবিয়া চিন্তিয়া, ঘাটে একটা পাঁচ বছরের বাগ্দীর ছেলে রহিয়াছে দেখিয়া, তাহাকে ধরিয়া, গোটা দুই চুবানি দিল। তারপর তাকে জল হইতে তুলিয়া টানিয়া বাপের কাছে ধরিয়া আনিল। বলিল, “বাবা! নেয়ে এসেছি।”

বাপ। কই বাপু,—কই নেয়েছ?

ছেলে। এই যে বাগ্দী ছোঁড়াটাকে চুবিয়ে এনেছি।

বাপ। বড় কাজই করেছ—তুই নেয়ে এসেছিস্ কই?

ছেলে। বাবা, “আত্মবৎ সর্ষভূতেশু”—ওতে আমাতে কি তফাৎ আছে? ওর নাওয়াতেই আমার নাওয়া হয়েছে। এখন সন্দেশ দাও।

পিতা বেগহস্তে পুত্রের পিছু পিছু ছুটিলেন। পুত্র পলাইতে পলাইতে বলিতে লাগিল, “বাবা শাস্ত্র জানে না।”

কিছু পরে সেই সুশিক্ষিত বালকের পিতা শুনিলেন যে, সে ওপাড়ায় শিরোমণি ঠাকুরের টোলে গিয়া শিরোমণি ঠাকুরকে বিলক্ষণ প্রহার করিয়াছে। ছেলে ঘরে এলে পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, “আবার এ কি করেছিস?”

ছেলে। কি করি বাবা! তুমি ত ছাড়বে না—বেত মারিবেই মারিবে। তাই আপনা আপনি সেই বেত খেয়েছি।

পিতা। সে কি রে বেটা?—আপনা আপনি কি? শিরোমণি ঠাকুরকে মেরেছিস্ যে?

ছেলে। বাবা—আত্মবৎ সর্ষভূতেশু—শিরোমণি ঠাকুরে আর আমাতে কি আমি তফাৎ দেখি? পিতা প্রতিজ্ঞা করিলেন, ছেলেকে আর লেখাপড়া শিখাইবেন না।

বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর

DRAMATIS PERSONÆ

১। উচ্চদরের উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালী বাবু।

২। তস্য ভার্য্যা।

উচ্চশিক্ষিত। কি হয়?

ভার্য্যা। পড়ি শুন।

উচ্চ। কি পড়ি?

ভার্য্যা। যা পড়িতে জানি। আমি তোমার ইংরাজিও জানি না, ফরাশীও জানি না, ভাগ্যে যা আছে, তাই পড়ি।

উচ্চ। ছাই ভস্ম বাঙ্গলাগুনলো পড়ি কেন? ওর চেয়ে না পড়া ভাল যে।

ভার্য্যা। কেন?

উচ্চ। ওগুলো সব immoral, obscene, filthy.

ভাষ্যা। সে সব কাকে বলে?

উচ্চ। Immoral কাকে বলে জান—এই ইয়ে হয়—অর্থাৎ যা morality-র বিরুদ্ধ।

ভাষ্যা। সেটা কি চতুষ্পদ জন্তুবিশেষ?

উচ্চ। না না—এই কি জান—ওর আর বাঙ্গলা কোথা পাব? এই যা moral' নয়—তাই আর কি।

ভাষ্যা। মরাল কি? রাজহংস?

উচ্চ। ছি! ছি! O woman! thy name is stupidity.

ভাষ্যা। কাকে বলে?

উচ্চ। বাঙ্গলা কথায় ত আর অত বদ্বান যায় না—তবে আসল কথাটা এই যে, বাঙ্গলা বই পড়া ভাল নয়।

ভাষ্যা। তা, এই বইখানা নিতান্ত মন্দ নয়—গল্পটা বেশ।

উচ্চ। এক রাজা আর দুয়ো দুয়ো দুই রাণীর গল্প? না নল-দময়ন্তীর গল্প?

ভাষ্যা। তা ছাড়া আর কি গল্প হ'তে নেই?

উচ্চ। তা ছাড়া তোমার বাঙ্গলায় আর কিছুর আছে না কি?

ভাষ্যা। এটা তা নয়। এতে কাটলেট্ আছে, ব্রাণ্ড আছে, বিধবার বিবাহ আছে—বৈষ্ণবীর গীত আছে।

উচ্চ। Exactly. তাই ত বলছিলাম, ও ছাই ভস্মগুলো পড় কেন?

ভাষ্যা। কেন, পড়িলে কি হয়?

উচ্চ। পড়িলে demoralize হয়।

ভাষ্যা। সে আবার কি? ধেমোরাজা হয়?

উচ্চ। এমন পাপও আছে! Demoralize কি না—চরিত্র মন্দ হয়।

ভাষ্যা। স্বামী মহাশয়! আপনি বোতল বোতল ব্রাণ্ড মারেন, যাদের সঙ্গে বসিয়া ও কাজ হয়, তারা এমনই কুচরিত্রের লোক যে, তাদের মুখ দেখিলেও পাপ আছে। আপনার বন্ধুবর্গ ডিনরের পর যে ভাষায় কথাবার্তা কন—শুনিতে পাইলে খানসামারাও কাণে আঙ্গুল দেয়। আপনি যাদের বাড়ী মুরগি মাটনের শ্রাদ্ধ করিয়া আসেন, পৃথিবীতে এমন কুকাজ নেই যে, তাহারা ভিতরে ভিতরে করে না। তাহাতে আপনার চরিত্রের জন্য কোন ভয় নাই,—আর আমি গরিবের মেয়ে, একখানা বাঙ্গলা বই পড়িলেই গোল্লায় যাব?

উচ্চ। আমরা হলেম Brass pot ; তোমরা হলে Earthen pot.

ভাষ্যা। অত পট পট কর কেন? কইমাছ ছাঁকা তেলে পড়েছ নাকি? তা যা হোক, একবার এই বইখানা একটু পড় না।

উচ্চ। (শিহরিয়া ও পিছাইয়া) আমি ও সব ছুঁয়ে hand contaminate করি না।

ভাষ্যা। কাকে বলে?

উচ্চ। ও সব ছুঁয়ে হাত ময়লা করি না।

ভাষ্যা। তোমার হাত ময়লা হবে না, আমি ঝাড়িয়া দিতেছি।

(ইতি পুস্তকখানি আঁচল দিয়া ঝাড়িয়া মূছিয়া স্বামীর হস্তে প্রদান। মানসিক ময়লা ভয়ে ভীত উচ্চশিক্ষিতের হস্ত হইতে পুস্তকের ভূমে পতন।)

ভাষ্যা। ও কপাল! আচ্ছা, তুমি যে বইখানাকে অত ঘৃণা করচো, কই—তোমার ইংরেজরাও তত করে না। ইংরেজরা নাকি এই বইখানা তরজমা করিয়া পড়িতেছে।

উচ্চ। ক্ষেপেছ?

ভাষ্যা। কেন?

উচ্চ। বাঙ্গলা বই ইংরেজিতে তরজমা? এমন আশাঢ়ে গল্প তোমায় কে শোনায়? বইখানা seditious ত নয়? তা হলে government তরজমা করান সম্ভব। কি বই ওখানা?

ভাষ্যা। বিষবৃক্ষ।

উচ্চ। সে কাকে বলে?

ভাষ্যা। বিষ কাহাকে বলে জান না? তারই বৃক্ষ।

বাংলায় রচনা

উচ্চ। বিষ—এক কুড়ি।

ভাষ্য। তা নয়—আর এক রকমের বিষ আছে জান না? যা তোমার জ্বালায় আমি একদিন খাব।

উচ্চ। ওহো! Poison! Dear me! তারই গাছ—উপযুক্ত নাম বটে—ফেল! ফেল!

ভাষ্য। এখন, গাছের ইংরেজি কি বল দেখি?

উচ্চ। Tree.

ভাষ্য। এখন দুটো কথা এক কর দেখি?

উচ্চ। Poison Tree! ওহো! বটে বটে! Poison Tree বলিয়া একখানা ইংরেজি বইয়ের কথা কাগজে পড়িতোঁছিলাম বটে। তা সেখানা কি বাঙ্গলা বইয়ের তরজমা?

ভাষ্য। তোমার বোধ হয় কি?

উচ্চ। আমার Idea ছিল যে, Poison Tree একখানা ইংরেজি বই, তারই বাঙ্গলা তরজমা হয়েছে। তা যখন ইংরেজি আছে, তখন আর বাঙ্গলা পড়বো কেন?

ভাষ্য। পড়াটা ইংরেজি রকমেই ভাল—তা কেতাব নিয়েই হোক, আর গেলাস নিয়েই হোক। তা তোমাকে ইংরেজি রকমেই পড়িতে দিতোঁছি। এই বইখানা দেখ দেখি। এখানা ইংরেজির তরজমা—লেখক নিজে বলিয়াছেন।

উচ্চ। ও সব বরং পড়া ভাল। কি ইংরেজি বইয়ের তরজমা—Robinson Crusoe না Watt on the Improvement of the Mind?

ভাষ্য। ইংরেজি নাম আমি জানি না। বাঙ্গলা নাম ছায়াময়ী।

উচ্চ। ছায়াময়ী? সে আবার কি? দেখি (পুস্তক হস্তে লইয়া) Dante, by Jove.

ভাষ্য। (টিপ টিপ হাসিয়া) তা ওখানা ভাল বুঝিতে পারি না—পোড়া বাঙ্গালির মেয়ে, ইংরেজির তরজমা বুঝি এত বুঝি ত রাখেন—ওটা তুমি আমায় বুঝিয়ে দেবে?

উচ্চ। তার আর আশ্চর্য কি? Dante lived in the fourteenth century. অর্থাৎ তিনি fourteenth centuryতে flourish করেন।

ভাষ্য। ফুটন্ত সুন্দরীকে পালিশ করেন? এত বড় কবি?

উচ্চ। কি পাপ! fourteen মানে চৌদ্দ।

ভাষ্য। চৌদ্দ সুন্দরীকে পালিশ করেন? তা চৌদ্দই হোক, আর পনেরই হোক, সুন্দরীকে আবার পালিশ করা কেন?

উচ্চ। বলি চৌদ্দ সেগুরিতে বর্তমান ছিলেন।

ভাষ্য। তিনি চৌদ্দ সুন্দরীতে বর্তমান থাকুন আর চৌদ্দ শ সুন্দরীতেই বর্তমান থাকুন, বইখানা নিয়ে কথা।

উচ্চ। আগে অথরের লাইফটা জানতে হয়। তিনি Florence নগরে জন্মগ্রহণ করিয়া সেখানে বড় বড় appointment hold করিতেন।

ভাষ্য। পোর্টম্যান্টো হলদে করিতেন। আমাদের এই কালো পোর্টম্যান্টোটা হলদে হয় না?

উচ্চ। বলি বড় বড় চাকরি করিতেন। পরে Guelph ও Ghibellineদিগের বিবাদে—

ভাষ্য। আর হাড় জ্বালিও না। বইখানা একটু বুঝাও না।

উচ্চ। তাই বুঝিতোঁছিলাম। অথরের লাইফ না জানিলে বই বুঝিবে কি প্রকারে?

ভাষ্য। আমি দুঃখী বাঙ্গালির মেয়ে, আমার অত ঘটায় কাজ কি? বইখানার মস্মটা বুঝিয়া দাও না।

উচ্চ। দেখি, বইখানা কি রকম লিখেছে দেখি।

(পরে পুস্তক গ্রহণ করিয়া প্রথম ছত্র পাঠ)

“সন্ধ্যা গগনে নিবিড় কালিমা”

তোমার কাছে অভিধান আছে?

ভাষ্য। কেন, কোন্ কথাটা ঠেকিল?

উচ্চ। গগন কাকে বলে?

ভাষ্য। গগন বলে আকাশকে।

উচ্চ। “সন্ধ্যা গগনে নিবিড় কালিমা”—নিবিড় কাকে বলে?

ভাৰ্ঘ্যা। ও হরি! এই বিদ্যাতে তুমি আমাকে শিখাবে? নিবিড় বলে ঘনকে। এও জান না? তোমার মুখ দেখাতে লজ্জা করে না?

উচ্চ। কি জান—বাঙ্গলা ফাঙ্গলা ও সব ছোট লোকে পড়ে, ও সবেৰ আমাদের মাঝখানে চলন নেই। ও সব কি আমাদের শোভা পায়?

ভাৰ্ঘ্যা। কেন, তোমরা কি?

উচ্চ। আমাদের হলো polished society—ও সব বাজে লোকে লেখে—বাজে লোকে পড়ে—সাহেব লোকের কাছে ও সবেৰ দর নেই—polished societyতে কি ও সব চলে?

ভাৰ্ঘ্যা। তা মাতৃভাষার উপর পালিশ-ষষ্ঠীর এত রাগ কেন?

উচ্চ। আরে, মা মরে কবে ছাই হয়ে গিয়েছেন—তাঁর ভাষার সঙ্গে এখন আর সম্পর্ক কি?

ভাৰ্ঘ্যা। আমারও ত ঐ ভাষা—আমি ত মরে ছাই হই নাই।

উচ্চ। Yes for *thy* sake, my jewel, I shall do it—তোমার খাতিরে একখানা বাঙ্গলা বই পড়িব। কিন্তু mind একখানা বৈ আর নয়!

ভাৰ্ঘ্যা। তাই মন্দ কি?

উচ্চ। কিন্তু এই ঘরে দ্বার দিয়ে পড়িব—কেহ না টের পায়।

ভাৰ্ঘ্যা। আচ্ছা তাই।

(বাঁহিয়া বাঁহিয়া একখানি অপকৃষ্ট অশ্লীল এবং দূর্নীতিপূর্ণ অথচ সরস পুস্তক স্বামীর হস্তে প্রদান। স্বামীর তাহা আদ্যোপান্ত পাঠ সমাপন।)

ভাৰ্ঘ্যা। কেমন বই?

উচ্চ। বেড়ে। বাঙ্গলায় যে এমন বই হয়, তা আমি জানিতাম না।

ভাৰ্ঘ্যা। (ঘৃণার সহিত) ছি! এই বুকি তোমার পালিশ-ষষ্ঠী? তোমার পালিশ-ষষ্ঠীর চেয়ে আমার চাপড়া-ষষ্ঠী, শীতল-ষষ্ঠী অনেক ভাল।

NEW YEAR'S DAY DRAMATIS PERSONÆ

রামবাবু

শ্যামবাবু

রামবাবুর স্ত্রী (পাড়াগেয়ে মেয়ে)

রামবাবু ও শ্যামবাবুর প্রবেশ (রামবাবুর স্ত্রী অন্তরালে)

শ্যামবাবু। গুড্ মর্নিং রামবাবু—হা ডু ডু?

রামবাবু। গুড্ মর্নিং শ্যামবাবু—হা ডু ডু।

[উভয়ে প্রগাঢ় করমর্দন]

শ্যামবাবু। I wish you a happy new year, and many many returns of the same.

রামবাবু। The same to you.

[শ্যামবাবুর তথ্যবিধ কথাবার্তার জন্য অন্যত্র প্রস্থান। ও রামবাবুর অন্তঃপুর প্রবেশ]

রামবাবুর স্ত্রী। ও কে এসেছিল?

রামবাবু। ঐ ও বাড়ীর শ্যামবাবু।

স্ত্রী। তা, তোমাদের হাতাহাতি হিচ্ছিল কেন?

রামবাবু। সে কি? হাতাহাতি কখন হ'লো?

স্ত্রী। ঐ যে তুমি তার হাত ধ'রে ঝেঁক'রে দিলে, সে তোমার হাত ধ'রে ঝেঁক'রে দিলে? তোমায় লাগে নি ত?

রাম। তাই হাতাহাতি! কি পাপ! ওকে বলে shaking hands. ওটা আদরের চিহ্ন।

স্ত্রী। বটে! ভাগ্যে, আমি তোমার আদরের পরিবার নই! তা, তোমার লাগেনি ত?

রাম। একটু নোক'সা লেগেছে; তা কি ধর্তে আছে?

স্ত্রী। আহা তাই ত! ছ'ড়ে গেছে যে? অধঃপেতে ড্যাকরা মিন্‌সে! সকাল বেলা মরতে আমার বাড়ীতে হাত কাড়াকাড়ি করতে এয়েছেন! আবার নাকি হুটোহুটি খেলা হবে? অধঃপেতে মিন্‌সের সঙ্গে ও সব খেলা খেলিতে পাবে না।

বাংলা রচনাবলী

রাম। সে কি? খেলার কথা কখন হ'লো?

স্বামী। ঐ যে সেও ব'ল্লে, “হাঁড়ু ডু ডু!” তুমিও ব'ল্লে, “হাঁড়ু ডু ডু!” তা, হাঁ ডু ডু ডু খেলবার কি আর তোমাদের বয়স আছে?

রাম। আঃ, পাড়াগেঁয়ের হাতে প'ড়ে প্রাণটা গেল! ওগো, হাঁ ডু ডু ডু নয়; হা ডু ডু— অর্থাৎ How do ye do? উচ্চারণ করিতে হয়, “হা ডু ডু!”

স্বামী। তার অর্থ কি?

রাম। তার মানে, “তুমি কেমন আছ?”

স্বামী। তা কেমন ক'রে হবে? সে তোমায় জিজ্ঞাসা করলে, “তুমি কেমন আছ,” তুমি ত কৈ তার কোন উত্তর দিলে না,—তুমি সেই কথাই পালটিয়া বলিলে!

রাম। সেইটাই হইতেছে এখনকার সভ্য রীতি।

স্বামী। পাল্টে বলাই সভ্য রীতি? তুমি যদি আমার ছেলেকে বল, “লেখাপড়া করিসনে কেন রে ছুঁচো?” সেও কি তোমাকে পাল্টে বলবে, “লেখাপড়া করিসনে কেন রে ছুঁচো?” এইটা সভ্য রীতি?

রাম। তা নয় গো তা নয়। কেমন আছ জিজ্ঞাসা করিলে, উত্তর না দিয়ে পাল্টে জিজ্ঞাসা করিতে হয়, কেমন আছ। এইটা সভ্য রীতি।

স্বামী। (যোড়হাতে) আমার একটি ভিক্ষা আছে। তোমার দু বেলা অসুখ—আমায় দিনে পাঁচ বার তোমার কাছে খবর নিতে হয়, তুমি কেমন আছ; আমায় যেন তখন হা ডু ডু বলিয়া তাড়াইয়া দিও না। আমার কাছে সভ্য নাই হইলে!

রাম। না, না, তাও কি হয়? তবে এ সব তোমার জেনে রাখা ভাল।

স্বামী। তা ব'লে দিলেই জানতে পারি। বন্ধিয়ে দাও না? আচ্ছা, শ্যামবাবু এলো আর কি কিচির্মিচির ক'রে ব'ল্লে আর চলে গেল; যদি হাঁড়ু ডু ডু খেলার কথা বলতে আসেনি, তবে কি করতে এয়েছিল?

রাম। আজ নতুন বৎসরের প্রথম দিন, তাই সম্বৎসরের আশীর্বাদ করতে এয়েছিল।

স্বামী। আজ নতুন বৎসরের প্রথম দিন? আমার শ্বশুর শশুড়ী ত ১লা বৈশাখ থেকে নতুন বৎসর ধরিতেন।

রাম। আজ ১লা জানুয়ারী—আমরা আজ থেকে নতুন বৎসর ধরি।

স্বামী। শ্বশুর ধরিতেন ১লা বৈশাখ থেকে, তুমি ধর ১লা জানুয়ারী থেকে, আমার ছেলে বোধ করি ধরবে ১লা শ্রাবণ থেকে?

রাম। তাও কি হয়? এ যে ইংরেজের মূলুক—এখন ইংরেজি নতুন বৎসরে আমাদের নতুন বৎসর ধরিতে হয়।

স্বামী। তা, ভালই ত। তা, নতুন বৎসর ব'লে এতগুলো মদের বোতল আনিয়েছ কেন?

রামবাবু। সুখের দিন, বন্ধু বান্ধব নিয়ে ভাল ক'রে খেতে দেতে হয়।

স্বামী। তবু ভাল। আমি পাড়াগেঁয়ে মানুষ, আমি মনে করিয়াছিলাম, তোমাদের বৎসর কাবারে বন্ধু এই রকম কলসী উৎসর্গ করতে হয়। ভাবিছিলাম, বলি বারণ কর'ব যে, আমার শ্বশুর শশুড়ীর উদ্দেশে ও সব দিও না।

রাম। তুমি বড় নিষেধ!

স্বামী। তা ত বটে। তাই আরও কথা জিজ্ঞাসা করতে ভয় পাই।

রাম। আবার কি জিজ্ঞাসা করবে?

স্বামী। এত কাঁপ, সালগম, গাজর, বেদানা, পেস্তা, আঙ্গুর, ভেটকি মাছ সব আনিয়েছ কেন? খেতে কি এত লাগবে?

রাম। না। ও সব সাহেবদের ডালি সাজিয়ে দিতে হবে।

স্বামী। ছি, ছি, এমন কর্ম্ম করো না। লোকে বড় কুকথা বলবে।

রাম। কি কথা বলবে?

স্বামী। বলবে, এদের বৎসর কাবারে কলসী উৎসর্গও আছে, চোন্দ পুরুষকে ডুজি উৎসর্গ করাও আছে। [ইতি প্রহারভয়ে গৃহিণীর বেগে প্রস্থান। রামবাবুর উকীলের বাড়ী গমন এবং হিন্দুর Divorce হইতে পারে কি না, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা।]

কমলাকান্ত

কমলাকান্তের দপ্তর

অনেকে কমলাকান্তকে পাগল বলিত। সে কখন কি বলিত, কি করিত, তাহার স্থিরতা ছিল না। লেখাপড়া না জানিত, এমত নহে। কিছু ইংরেজি, কিছু সংস্কৃত জানিত। কিন্তু যে বিদ্যায় অর্থোপার্জন হইল না, সে বিদ্যা কি বিদ্যা? আসল কথা এই, সাহেব সুবোর কাছে যাওয়া আসা চাই। কত বড় বড় মূর্খ, কেবল নাম দস্তখত করিতে পারে,—তাহারা তালুক মূলুক করিল—আমার মতে তাহারাই পণ্ডিত। আর কমলাকান্তের মত বিদ্বান্, যাহারা কেবল কতকগুলো বাহি পড়িয়াছে, তাহারা আমার মতে গণ্ডমূর্খ।

কমলাকান্তের একবার চাকরি হইয়াছিল। একজন সাহেব তাহার ইংরেজি কথা শুনিয়া, ডাকিয়া লইয়া গিয়া একটি কেরাণীগিরি দিয়াছিলেন। কিন্তু কমলাকান্ত চাকরি রাখিতে পারিল না। আপসে গিয়া, আপসের কাজ করিত না। সরকারি বাহিতে কবিতা লিখিত—আপসের চিঠিপত্রের উপরে সেক্ষপীয়র নামক কে লেখক আছে, তাহার বচন তুলিয়া লিখিয়া রাখিত; বিলবাহির পাতায় ছবি আঁকিয়া রাখিত। একবার সাহেব তাহাকে মাস্কাবারের পে-বিল প্রস্তুত করিতে বলিয়াছিলেন। কমলাকান্ত বিলবাহি লইয়া একটি চিত্র আঁকিল যে, কতকগুলি নাগা ফকির সাহেবের কাছে ভিক্ষা চাহিতেছে, সাহেব দুই চারিটা পয়সা ছড়াইয়া ফেলিয়া দিতেছেন। নীচে লিখিয়া দিল “যথার্থ পে-বিল।” সাহেব নতুনতর পে-বিল দেখিয়া কমলাকান্তকে মানে মানে বিদায় দিলেন।

কমলাকান্তের চাকরি সেই পর্যন্ত। অর্থেরও বড় প্রয়োজন ছিল না। কমলাকান্ত কখন দারপরিগ্রহ করেন নাই। স্বয়ং যেখানে হয়, দুইটি অন্ন এবং আধ ভরি আফিম পাইলেই হইত। যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকিত। অনেক দিন আমার বাড়ীতে ছিল। আমি তাহাকে পাগল বলিয়া যত্ন করিতাম। কিন্তু আমিও তাহাকে রাখিতে পারিলাম না। সে কোথাও স্থায়ী হইত না। একদিন প্রাতে উঠিয়া রক্ষাচারীর মত গেরুয়া-বস্ত্র পরিয়া, কোথায় চলিয়া গেল। কোথায় গেল, আর তাহাকে পাইলাম না। সে এ পর্যন্ত আর ফিরে নাই।

তাহার একটি দপ্তর ছিল। কমলাকান্তের কাছে ছেঁড়া কাগজ পড়িতে পাইত না; দেখিলেই তাহাতে কি মাথা মূন্ড লিখিত, কিছু বুদ্ধিতে পারা যাইত না। কখন কখন আমাকে পড়িয়া শুনাইত—শুনিলে আমার নিদ্রা আসিত। কাগজগুলি একখানি মসীচিহ্নিত, পুরাতন, জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডে বাঁধা থাকিত। গমনকালে, কমলাকান্ত আমাকে সেই দপ্তরটি দিয়া গেল। বলিয়া গেল, তোমাকে ইহা বখ্শিশ করিলাম।

এ অমূল্য রত্ন লইয়া আমি কি করিব? প্রথমে মনে করিলাম, অগ্নিদেবকে উপহার দিই। পরে লোকহিতৈষিতা আমার চিন্তে বড় প্রবল হইল। মনে করিলাম যে, যে লোকের উপকার না করে, তাহার বৃথায় জন্ম। এই দপ্তরটিতে অনিদ্রার অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ আছে—যিনি পড়িবেন, তাহারই নিদ্রা আসিবে। যাহারা অনিদ্রারোগে পীড়িত, তাহাদিগের উপকারার্থে আমি কমলাকান্তের রচনাগুলি প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম।

শ্রীভীষ্মদেব খোশনবীস

প্রথম সংখ্যা—একা

“কে গায় ওই?”

বহুকাল বিস্মৃত সুখস্বপ্নের স্মৃতির ন্যায় ঐ মধুর গীতি কর্ণরঞ্জে প্রবেশ করিল। এত মধুর লাগিল কেন? এই সঙ্গীত যে অতি সুন্দর, এমত নহে। পৃথক পৃথক দিয়া, আপন মনে গায়িতে গায়িতে যাইতেছে। জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি দেখিয়া, তাহার মনের আনন্দ উছলিয়া উঠিয়াছে। স্বভাবতঃ তাহার কণ্ঠ মধুর;—মধুর কণ্ঠে, এই মধুমাসে, আপনার মনের সুখের মাধুর্য্য বিকীর্ণ

বাঁকম রচনাবলী

করিতে করিতে যাইতেছে। তবে বহুতন্ত্রীবিশিষ্ট বাদ্যের তন্ত্রীতে অঙ্গুলিস্পর্শের ন্যায়, ঐ গীতিধ্বনি আমার হৃদয়কে আলোড়িত করিল কেন?

কেন, কে বলিবে? রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী—নদী-সৈকতে কোমুদী হাসিতেছে। অর্দ্ধাবৃত্ত সুন্দরীর নীল বসনের ন্যায় শীর্ণ-শরীরী নীল-সলিলা তরঙ্গিণী, সৈকত বেষ্টিত করিয়া চলিয়াছেন; রাজপথে, কেবল আনন্দ—বালক, বালিকা, যুবক, যুবতী, পোড়া, বৃদ্ধা, বিমল চন্দ্র-কিরণে স্নাত হইয়া আনন্দ করিতেছে। আমিই কেবল নিরানন্দ—তাই ঐ সংগীতে আমার হৃদয়মন্ত্র বাজিয়া উঠিল।

আমি একা—তাই এই সংগীতে আমার শরীর কণ্টকিত হইল। এই বহুজনাকীর্ণ নগরীমধ্যে, এই আনন্দময়, অনন্ত জনস্রোতোমধ্যে, আমি একা। আমিও কেন ঐ অনন্ত জনস্রোতোমধ্যে মিশিয়া, এই বিশাল আনন্দতরঙ্গ-তাড়িত জলবহুদসমুদ্রের মধ্যে আর একটি বহুদ না হই? বিন্দু বিন্দু বারি লইয়া সমুদ্র; আমি বারিবিন্দু এ সমুদ্রে মিশাই না কেন?

তাহা জানি না—কেবল ইহাই জানি যে, আমি একা। কেহ একা থাকিও না। যদি অন্য কেহ তোমার প্রণয়ভাগী না হইল, তবে তোমার মনুষ্যজন্ম বৃথা। পুষ্প সুগন্ধি, কিন্তু যদি ঘ্রাণ-গ্রহণকর্তা না থাকিত, তবে পুষ্প সুগন্ধি হইত না—ঘ্রাণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট না থাকিলে গন্ধ নাই। পুষ্প আপনার জন্য ফুটে না। পরের জন্য তোমার হৃদয়-কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও।

কিন্তু বারেক মাত্র শ্রুত ঐ সংগীত আমার কেন এত মধুর লাগিল, তাহা বলি নাই। অনেক দিন আনন্দোখিত সংগীত শুনি নাই—অনেক দিন আনন্দানুভব করি নাই। যৌবনে, যখন পৃথিবী সুন্দরী ছিল, যখন প্রতি পুষ্পে সুগন্ধ পাইতাম, প্রতি পত্রমর্মরে মধুর শব্দ শুনিতাম, প্রতি নক্ষত্রে চিত্রা রোহিণীর শোভা দেখিতাম, প্রতি মনুষ্যমুখে সরলতা দেখিতাম, তখন আনন্দ ছিল। পৃথিবী এখনও তাই আছে, সংসার এখনও তাই আছে, মনুষ্য চরিত্র এখনও তাই আছে। কিন্তু এ হৃদয় আর তাই নাই। তখন সংগীত শুনিয়া আনন্দ হইত। আজি এই সংগীত শুনিয়া সেই আনন্দ মনে পড়িল। যে অবস্থায়, যে সুখে সেই আনন্দ অনুভূত করিতাম, সেই অবস্থা, সেই সুখ মনে পড়িল। মূহূর্ত্ত জন্য আবার যৌবন ফিরিয়া পাইলাম। আবার তেমনি করিয়া, মনে মনে, সমবেত বন্ধুমণ্ডলীমধ্যে বসিলাম; আবার সেই অকারণসঞ্জাত উচ্চ হাসি হাসিলাম, যে কথা নিষ্প্রয়োজনীয় বলিয়া এখন বলি না, নিষ্প্রয়োজনেও চিত্তের চাঞ্চল্য হেতু তখন বলিতাম, আবার সেই সকল বলিতে লাগিলাম; আবার অকৃত্রিম হৃদয়ে পরের প্রণয় অকৃত্রিম বলিয়া মনে মনে গ্রহণ করিলাম। ক্ষণিক ভ্রান্তি জন্মিল—তাই এ সংগীত এত মধুর লাগিল। শুধু তাই নয়। তখন সংগীত ভাল লাগিত,—এখন লাগে না—চিত্তের যে প্রফুল্লতার জন্য ভাল লাগিত, সে প্রফুল্লতা নাই বলিয়া ভাল লাগে না। আমি মনের ভিতর মন লুকাইয়া সেই গত যৌবনসুখ চিন্তা করিতেছিলাম—সেই সময়ে এই পূর্বস্মৃতিসূচক সংগীত কর্ণে প্রবেশ করিল, তাই এত মধুর বোধ হইল।

সে প্রফুল্লতা, সে সুখ, আর নাই কেন? সুখের সামগ্রী কি কমিয়াছে? অজর্জন এবং ক্ষতি, উভয়েই সংসারের নিয়ম। কিন্তু ক্ষতি অপেক্ষা অজর্জন অধিক, ইহাও নিয়ম। তুমি জীবনের পথ যতই অতিবাহিত করিবে, ততই সুখদ সামগ্রী সঞ্চয় করিবে। তবে বয়সে স্ফূর্ত্তি কমে কেন? পৃথিবী আর তেমন সুন্দরী দেখা যায় না কেন? আকাশের তারা আর তেমন জ্বলে না কেন? আকাশের নীলিমায় আর সে উজ্জ্বলতা থাকে না কেন? যাহা তৃণপল্লবময়, কুসুমসুবাসিত, স্বচ্ছ কল্লোলিনী-শীকর-সিক্ত, বসন্তপবনবিধৃত বলিয়া বোধ হইত, এখন তাহা বালুকাময়ী মরুভূমি বলিয়া বোধ হয় কেন? কেবল রঞ্জিল কাচ নাই বলিয়া। আশা সেই রঞ্জিল কাচ। যৌবনে অজর্জিত সুখ অল্প, কিন্তু সুখের আশা অপরিমিতা। এখন অজর্জিত সুখ অধিক, কিন্তু সেই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী আশা কোথায়? তখন জানিতাম না, কিসে কি হয়, অনেক আশা করিতাম। এখন জানিয়াছি, এই সংসারচক্রে আরোহণ করিয়া, যেখানকার আবার সেই-খানে ফিরিয়া আসিতে হইবে; যখন মনে ভাবিতেছি, এই অগ্রসর হইলাম, তখন কেবল আবর্তন করিতেছি মাত্র। এখন বুঝিয়াছি যে, সংসার-সমুদ্রে সন্তরণ আরম্ভ করিলে, তরঙ্গে তরঙ্গে আমাকে প্রহত করিয়া আবার আমাকে কূলে ফেলিয়া যাইবে। এখন জানিয়াছি যে, এ অরণ্যে পথ নাই; এ প্রান্তরে জলাশয় নাই, এ নদীর পার নাই, এ সাগরে দ্বীপ নাই, এ অন্ধকারে নক্ষত্র নাই। এখন জানিয়াছি যে, কুসুমে কীট আছে, কোমল পল্লবে কণ্টক আছে, আকাশে মেঘ আছে, নিশ্চল

নদীতে আবর্ত আছে, ফলে বিষ আছে, উদ্যানে সর্প আছে; মনুষ্য-হৃদয়ে কেবল আত্মদর আছে। এখন জানিয়াছি যে, বৃক্ষে বৃক্ষে ফল ধরে না, ফুলে ফুলে গন্ধ নাই, মেঘে মেঘে বৃষ্টি নাই, বনে বনে চন্দন নাই, গজে গজে মৌক্তিক নাই। এখন বৃক্ষিতে পারিয়াছি যে, কাচও হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল, পিত্তলও সুবর্ণের ন্যায় ভাস্বর, পঞ্চও চন্দনের ন্যায় স্নিগ্ধ, কাংস্যও রজতের ন্যায় মধুরনাদী।—কিন্তু কি বলিতেছিলাম, ভুলিয়া গেলাম। সেই গীতধ্বনি! উহা ভাল লাগিয়াছিল বটে, কিন্তু আর দ্বিতীয় বার শুনিতে চাই না। উহা যেমন মনুষ্যকণ্ঠজাত সংগীত, তেমনি সংসারের এক সংগীত আছে। সংসাররসে রসিকেরাই তাহা শুনিতে পায়। সেই সংগীত শুনিলেই আমার চিত্ত আকুল। সে সংগীত আর কি শুনিব না? শুনিব, কিন্তু নানাবাদ্যধ্বনিসংমিলিত বহুকণ্ঠপ্রসূত সেই পূর্বশ্রুত সংসারগীত আর শুনিব না। সে গায়কেরা আর নাই—সে বয়স নাই, সে আশা নাই। কিন্তু তৎপরিবর্তে যাহা শুনিতোঁছি, তাহা অধিকতর প্রীতিকর। অনন্যসহায় একমাত্র গীতধ্বনিতে কণ্ঠবিবর পরিপূরিত হইতেছে। প্রীতি সংসারে সর্বব্যাপিনী—ঈশ্বরই প্রীতি। প্রীতিই আমার কর্ণে এক্ষণকার সংসার-সংগীত। অনন্ত কাল সেই মহাসংগীত সহিত মনুষ্য-হৃদয়-তন্ত্রী বাজিতে থাকুক। মনুষ্যজাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাই না।

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী

দ্বিতীয় সংখ্যা—মনুষ্য ফল

আফিমের একটু বেশী মাত্রা চড়াইলে, আমার বোধ হয়, মনুষ্যসকল ফলবিশেষ—মায়াবৃত্তে সংসার-বৃক্ষে ঝুলিয়া রহিয়াছে, পাকিলেই পড়িয়া যাইবে। সকলগুলি পাকিতে পায় না—কতক অকালে ঝড়ে পড়িয়া যায়। কোনটি পোকায় খায়, কোনটিকে পাখীতে ঠোকরায়। কোনটি শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে। কোনটি সুপক্ব হইয়া, আহরিত হইলে গঙ্গাজলে ধোঁত হইয়া দেবসেবায় বা ব্রাহ্মণভোজনে লাগে—তাহাদিগেরই ফলজন্ম বা মনুষ্যজন্ম সার্থক। কোনটি সুপক্ব হইয়া, বৃক্ষ হইতে খসিয়া পড়িয়া মাটিতে পড়িয়া থাকে, শৃগালে খায়। তাহাদিগের মনুষ্যজন্ম বা ফলজন্ম বৃথা। কতকগুলি তিক্ত, কটু বা কষায়,—কিন্তু তাহাতে অমূল্য ঔষধ প্রস্তুত হয়। কতকগুলি বিষময়—যে খায়, সেই মরে। আর কতকগুলি মাকাল জাতীয়—কেবল দেখিতে সুন্দর।

কখন কখন বিম্বাইতে বিম্বাইতে দেখিতে পাই যে, পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায়ের মনুষ্য পৃথক্ জাতীয় ফল। আমাদের দেশের এক্ষণকার বড়মানুষদিগের মনুষ্যজাতিমধ্যে কাঁটাল বলিয়া বোধ হয়। কতকগুলি খাসা খাজা কাঁটাল, কতকগুলির বড় আটা, কতকগুলি কেবল ভুতুড়িসার, গরুর খাদ্য। কতকগুলি ইঁচোড়ে পাকে, কতকগুলি কেবল ইঁচোড়ই থাকে, কখন পাকে না। কতকগুলি পাকিলে পাকিতে পারে, কিন্তু পাকিতে পায় না, পৃথিবীর রাস্কস-রাস্কসীরা ইঁচোড়েই পড়িয়া দালনা রাঁধিয়া খাইয়া ফেলে। যদি পাকিল ত বড় শৃগালের দৌরাভ্যা। যদি গাছ ঘেরা থাকে ত ভালই। যদি কাঁটাল উঁচু ডালে ফলিয়া থাকে, ভালই; নহিলে শৃগালেরা কোনমতে উদরসাৎ করিবে। শৃগালেরা কেহ দেওয়ান, কেহ কারকুন, কেহ নাএব, কেহ গোমস্তা, কেহ মোছায়েব, কেহ কেবল আশীর্বাদক। যদি এ সকলের হাত এড়াইয়া, পাকা কাঁটাল ঘরে গেল, তবে মাছি ভন্ ভন্ করিতে আরম্ভ করিল। মাছির কাঁটাল চায় না, তাহারা কেবল একটু একটু রসের প্রত্যাশাপন্ন। এ মাছিটি কন্যাভারগ্ৰস্ত, উহাকে এক ফোঁটা রস দাও,—ওঁটির মাতৃদায়, একটু রস দাও। এটি একখানি পুস্তক লিখিয়াছে, একটু রস দাও,—সেটি পেটের দায়ে একখানি সম্বাদ-পত্র করিয়াছে, উহাকেও একটু রস দাও। এ মাছিটি কাঁটালের পিসীর ভাঙ্গুর-পুত্রের শ্যালার শ্যালীপুত্র—খাইতে পায় না, কিছু রস দাও;—সে মাছিটির টোলে পোনে চোঁন্দটি ছাত্র পড়ে, কিছু রস দাও। আবার এদিকে কাঁটাল ঘরে রাখাও ভাল না—পাচিয়া দুর্গন্ধ হইয়া উঠে। আমার বিবেচনায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া, উত্তম নিষ্কর্ষ দ্রবের ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া, কমলাকান্তের ন্যায় সুরাঙ্গকে ভোজন করানই ভাল।

এ দেশের সিবিল সার্ভিসের সাহেবদিগকে আমি মনুষ্যজাতিমধ্যে আয়ফল মনে করি। এ দেশে আম ছিল না, সাগরপার হইতে কোন মহাত্মা এই উপায়ে ফল এ দেশে আনিয়াছেন। আয়

বিক্রম রচনাবলী

দেখতে রাজা রাজা, ঝাঁকা আলো করিয়া বসে। কাঁচার বড় টক—পাকিলে সন্মিষ্ট বটে, কিন্তু তবু হাড়ে টক যায় না। কতকগুলো আম এমন কদর্য যে, পাকিলেও টক যায় না। কিন্তু দেখতে বড় বড় রাজা রাজা হয়, বিক্রমতা ফাঁকি দিয়া পঁচিশ টাকা শ' বিক্রয় করিয়া যায়। কতক-গুলি আম কাঁচারিটে আছে—পাকিলে পান্শে। কতকগুলো জাঁতে পাকা। সেগুলি কুটিয়া নুন মাখিয়া আমসী করাই ভাল।

সকলে আম খাইতে জানে না। সদ্য গাছ হইতে পাড়িয়া এ ফল খাইতে নাই। ইহা কিয়ৎক্ষণ সেলাম-জলে ফেলিয়া ঠাণ্ডা করিও—যদি জোটে, তবে সে জলে একটু খোশামোদ-বরফ দিও—বড় শীতল হইবে। তার পরে ছুরি চালাইয়া স্বচ্ছন্দে খাইতে পার।

স্ট্রীলোকদিগকে লৌকিক কথায় কলাগাছের সহিত তুলনা করিয়া থাকে। কিন্তু সে গেছো কথা। কদলীফলের সঙ্গে ভুবনমোহিনী জাতির আমি সৌসাদৃশ্য দেখি না। স্ট্রীলোক কি কাঁদি কাঁদি ফলে? যাহার ভাগ্যে ফলে ফলুক—কমলাকান্তের ভাগ্যে ত নয়। কদলীর সঙ্গে কামিনীগণের এই পর্য্যন্ত সাদৃশ্য আছে যে, উভয়েই বানরের প্রিয়। কামিনীগণের এ গুণ থাকিলেও কদলীর সঙ্গে তাঁহাদিগের তুলনা করিতে পারি না। পক্ষান্তরে কতকগুলো কটুভাষী আছেন, তাঁহারা ফলের মধ্যে মাকাল ফলকেই যুবতীগণের অনুরূপ বলেন। যে বলে, সে দুর্মুখ—আমি ইহাদিগের ভূতাস্বরূপ; আমি তাহা বলিব না।

আমি বলি, রমণীমণ্ডলী এ সংসারের নারিকেল। নারিকেলও কাঁদি কাঁদি ফলে বটে, কিন্তু (ব্যবসায়ী নহিলে) কেহ কখন কাঁদি কাঁদি পাড়ে না। কেহ কখন দ্বাদশীর পারণার অনুরোধে, অথবা বৈশাখ মাসে ব্রাহ্মণসেবার জন্য একাটি আধাটি পাড়ে। কাঁদি কাঁদি পাড়িয়া খাওয়ার অপরাধে যদি কেহ অপরাধী থাকে, তবে সে কুলীন ব্রাহ্মণেরা। কমলাকান্ত কখন সে অপরাধে অপরাধী নহে।

বৃক্ষের নারিকেলের ন্যায় সংসারের নারিকেলের বয়োভেদে নানাবস্থা। করকাঁচ বেলা উভয়েই বড় স্নিগ্ধকর—নারিকেলের জলে উদর স্নিগ্ধ হয়—কিশোরীর অকৃগ্রিম বিলাস-লক্ষণ-শূন্য প্রণয়ে হৃদয় স্নিগ্ধ হয়। কিন্তু দুই জাতীয়,—ফলজাতীয় এবং মনুষ্যজাতীয়, নারিকেলের ডাবই ভাল। তখন দেখিতে কেমন উজ্জ্বল শ্যাম—কেমন জ্যোতির্ময়, রৌদ্র তাহা হইতে প্রতিহত হইতেছে—যেন সে নবীন শ্যাম শোভায় জগতের রৌদ্র শীতল হইতেছে। গাছের উপর কাঁদি কাঁদি নারিকেল, আর গবাক্ষপথে কাঁদি কাঁদি যুবতী, আমার চক্ষে একই দেখায়—উভয়েই চতুর্দিক আলো করিয়া থাকে। কিন্তু দেখ—দেখিয়া ভুলিও না—এই চৈত্র মাসের রৌদ্র, গাছ হইতে পাড়িয়া ডাব কাঁটিও না—বড় তপ্ত। সংসারশিক্ষাশূন্য কামিনীকে সহসা হৃদয়ে গ্রহণ করিও না—তোমার কলিজা পুড়িয়া যাইবে। আমের ন্যায়, ডাবকেও বরফ-জলে রাখিয়া শীতল করিও—বরফ না যোটে, পুকুরের পাঁকে পুঁতিয়া রাখিয়া ঠাণ্ডা করিও—মিষ্ট কথায় না করিতে পার, কমলাকান্ত চক্রবর্তীর আঞ্জা, কড়া কথায় করিও।

নারিকেলের চারিটি সামগ্রী—জল, শস্য, মালা আর ছোবড়া। নারিকেলের জলের সঙ্গে স্ট্রীলোকের স্নেহের আমি সাদৃশ্য দেখি। উভয়েই বড় স্নিগ্ধকর। যখন তুমি সংসারের রৌদ্রে দগ্ধ হইয়া, হাঁপাইতে হাঁপাইতে, গৃহের ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম কামনা কর, তখন এই শীতল জল পান করিও—সকল যন্ত্রণা ভুলিবে। তোমার দারিদ্র্য-চৈত্রে বা বন্ধুবিরোগ-বৈশাখে—তোমার ষোঁবন-মধ্যাহ্ন বা রোগতপ্ত-বৈকালে, আর কিসে তোমার হৃদয় শীতল হইবে? মাতার আদর, স্ট্রীর প্রেম, কন্যার ভক্তি, ইহার অপেক্ষা জীবনের সন্তাপে আর কি সুখের আছে? গ্রীষ্মের তাপে ডাবের জলের মত আর কি আছে?

তবে, ঝুনো হইলে জল একটু ঝাল হইয়া যায়। রামার মা ঝুনো হইলে পর, রামার বাপ ঝালের চোটে বাড়ী ছাড়িয়াছিল। এই জন্য নারিকেলের মধ্যে ডাবেরই আদর।

নারিকেলের শস্য, স্ট্রীলোকের বুদ্ধি। করকাঁচ বেলায় বড় থাকে না; ডাবের অবস্থায় বড় সন্মিষ্ট, বড় কোমল; ঝুনোর বেলায় বড় কঠিন, দস্তফুট করে কার সাধ্য? তখন ইহাকে গৃহীণীপনা বলে। গৃহীণীপনা রসাল বটে, কিন্তু দাঁত বসে না। এক দিকে কন্যা বসিয়া আছেন, মায়ের অলঙ্কারের বাস্তু হইতে কিয়দংশ সংগ্রহ করিবেন,—কিন্তু ঝুনোর শস্য এমনি কঠিন যে, মায়ের দাঁত বসিল না—ঝুনো দয়া করিয়া একাটি মার্কাড়ি বাহির করিয়া দিল। হয়ত পুত্র বসিয়া আছেন, মায়ের নগদ পুঁজির উপর দাঁত বসাইবেন,—ঝুনো দয়া করিয়া নগদ সাত

সিকা বাহির করিয়া দিল। স্বামী প্রাচীন বয়সে একটি ব্যবসায় ফাঁদিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, কিন্তু শেষ বয়সে হাত খালি—টাকা নহিলে ব্যবসায় হয় না—ঝুঁকির পর্দার উপর দৃষ্টি। দুই চারিটি প্রবৃত্তিরূপ দস্ত ফুটাইয়া দিলেন—বুড়া বয়সের দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল। শেষ যদি দাঁত বসিল, নারিকেল জীর্ণ করিবার সাধ্য কি? যত দিন না টাকা ফিরাইয়া দেন, তত দিন অজীর্ণ রোগে রাগে নিদ্রা হয় না।

তার পরে মালা—এটি স্বীলোকের বিদ্যা—কখন আধখানা বৈ পুরা দেখিতে পাইলাম না। নারিকেলের মালা বড় কাজে লাগে না; স্বীলোকের বিদ্যাও বড় নয়। মেরি সমরবিলা বিজ্ঞান লিখিয়াছেন, জেন্ অষ্টেন্ বা জর্জ এলিয়ট উপন্যাস লিখিয়াছেন—মন্দ হয় নাই, কিন্তু দুই মালার মাপে।

ছোবুড়া, স্বীলোকের রূপ। ছোবুড়া যেমন নারিকেলের বাহ্যিক অংশ, রূপও স্বীলোকের বাহ্যিক অংশ। দুই বড় অসার;—পরিত্যাগ করাই ভাল। তবে ছোবুড়ায় একটি কাজ হয়—উত্তম রঞ্জক প্রস্তুত হয়, তাহাতে জাহাজ বাঁধা যায়। স্বীলোকের রূপের কাছিতেও অনেক জাহাজ বাঁধা গিয়াছে। তোমরা যেমন নারিকেলের কাছিতে জগন্নাথের রথ টান, স্বীলোকের রূপের কাছিতে কত ভারি ভারি মনোরথ টানে। যখন রথ-টানা বারণের আইন হইবে,—তখন তাহাতে এ রথ-টানা নিষেধের জন্য যেন একটা ধারা থাকে—তাহা হইলে অনেক নরহত্যা নিবারণ হইবে। আমি জানি না, নারিকেলের রঞ্জক গলায় বাঁধিয়া কেহ কখন প্রাণত্যাগ করিয়াছে কি না, কিন্তু রমণীর রূপরঞ্জক গলায় বাঁধিয়া কত লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে, কে তাহার গণনা করিবে?

বৃক্ষের নারিকেল এবং সংসারের নারিকেলের সঙ্গে আমার বিবাদ এই যে, আমি হতভাগা, দুইয়ের এককেও আহরণ করিতে পারিলাম না। অন্য ফল আকর্ষী দিয়া পাড়া যায়, কিন্তু নারিকেল গাছে না উঠিলে পাড়া যায় না। গাছে উঠিতে গেলেও হয় নিজের পায়ে দাঁড়ি বাঁধিতে হইবে, না হয় ডোমের খোশামোদ করিতে হইবে।*

ডোমের খোশামোদ করিতেও রাজি আছি। কিন্তু আমার ভাগ্যদোষে কপালে নারিকেল ঘোটে না। আমি যেমন মানুষ, তেমনি গাছে তেমনি রূপগণের আকর্ষী দিয়া নারিকেল পাড়িতে পারি। পারি, কিন্তু ভয়—পাছে নারিকেল ঘাড়ে পড়ে। এমন অনেক শ্যামী, বামী, রামী, কামিনী আছে যে, কমলাকান্তকেও স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু পরের মেয়ে ঘাড়ে করিয়া সংসারযাত্রা নিষ্বাহ করিতে, এ দীন অসমর্থ। অতএব এ যাত্রা, কমলাকান্ত ভক্তিভাবে, নারিকেল ফলটি বিশ্বেশ্বরকে দিলেন। তিনি একে শ্মশানবাসী, তাহাতে আবার বিষপান করিয়াছেন—ছাই ডাব নারিকলে তাঁহার কি করিবে?

এ দেশে এক জাতি লোক সম্প্রতি দেখা দিয়াছেন, তাঁহারা দেশহিতৈষী বলিয়া খ্যাত। তাঁহাদের আমি শিমূল ফুল ভাবি। যখন ফুল ফুটে, তখন দেখিতে শুনিতে বড় শোভা—বড় বড়, রাঙ্গা রাঙ্গা, গাছ আলো করিয়া থাকে। কিন্তু আমার চক্ষে নেড়া গাছে অত রাঙ্গা ভাল দেখায় না। একটু একটু পাতা ঢাকা থাকিলে ভাল দেখাইত; পাতার মধ্য হইতে যে অল্প অল্প রাঙ্গা দেখা যায়, সেই সুন্দর। ফুলে গন্ধ মাত্র নাই—কোমলতা নাই, কিন্তু তবু ফুল বড় বড়, রাঙ্গা রাঙ্গা। যদি ফুল ঘুঁচিয়া, ফল ধরিল, তখন মনে করিলাম, এইবার কিছুর লাভ হইবে। কিন্তু তাহা বড় ঘটে না। কালক্রমে চৈত্র মাস আসিলে রৌদ্রের তাপে, অন্তর্লঘু ফল, ফট করিয়া ফাটিয়া উঠে; তাহার ভিতর হইতে খানিক তুলা বাহির হইয়া বঙ্গদেশময় ছড়াইয়া পড়ে!

অধ্যাপক ব্রাহ্মগণ সংসারের ধুতুরা ফল। বড় বড় লম্বা লম্বা সমাসে, বড় বড় বচনে, তাঁহাদিগের অতি সুদীর্ঘ কুসুম সকল প্রস্ফুটিত হয়, ফলের বেলা কণ্টকময় ধুতুরা। আমি অনেক দিন হইতে মানস করিয়াছি যে, কুক্কুটমাংস ভোজন করিয়া হিন্দুজন্ম পবিত্র করিব—কিন্তু এই অধম ধুতুরাগুলার কাঁটার জ্বালায় পারিলাম না। গুণের মধ্যে এই যে, এই ধুতুরায় মাদকের মাদকতা বৃদ্ধি করে। যে গাঁজাখোরের গাঁজায় নেশা হয় না, তাহার গাঁজার সঙ্গে দুইটা ধুতুরার বীচ সাজিয়া দেয়—যে সিন্ধিখোরের সিন্ধিতে নেশা না হয়, তাহার সিন্ধির সঙ্গে দুইটা

* কমলাকান্ত বোধ হয়, পুরোহিতকে ডোম বলিতেছে; কেন না, পুরোহিতেই বিবাহ দেয়।
কি পাষণ্ড!—ভীষ্মদেব।

বিক্রম রচনাবলী

ধনুতরার বীচি বাটিয়া দেয়। বোধ হয়, এই হিসাবেই বঙ্গীয় লেখকেরা আপনাপন প্রবন্ধমধ্যে অধ্যাপকদিগের নিকট দুই-চারিটা বচন লইয়া গাঁথিয়া দেন। প্রবন্ধ-গাঁজার মধ্যে সেই বচন-ধনুতরার বীচিতে পাঠকের নেশা জমাইয়া তুলে। এই নেশায় বঙ্গদেশ আজি কালি মাতিয়া উঠিয়াছে।

আমাদের দেশের লেখকদিগকে আমি তেঁতুল বলিয়া গণি। নিজের সম্পত্তি খোলা আর সিতে, কিন্তু দক্ষকেও স্পর্শ করিলে দাঁধ করিয়া তোলেন। গুণের মধ্যে কেবল অম্লগুণ—তাও নিকৃষ্ট অম্ল। তবে এক গুণ মানি—ইহারা সাক্ষাৎ কাষ্ঠাবতার। তেঁতুল কাঠ নীরস বটে, কিন্তু সমালোচনার আগুনে পোড়েন ভাল। সত্য কথা বলিতে কি, তেঁতুলের মত কুসামগ্রী আমি সংসারে দেখিতে পাই না। যেই কিয়ৎপরিমাণে খায়, তাহারই অজীর্ণ হয়, সেই অম্ল উৎসার করে। যেই অধিক পরিমাণে খায়, সেই অম্লপিপ্তরোগে চিররুগ্ন। যাঁহারা সাহেব হইয়াছেন, টেবিলে বসিয়া, গ্যাসের আলোতে, বা আর্গান্ড জ্বালিয়া, ফয়জু খানসামার হাতের পাক, কাঁটা চামচে ধরিয়া খাইতে শিখিয়াছেন—তাঁহারা এক দায় এড়াইয়াছেন—তেঁতুলের অম্লের বড় ধার ধারিতে হয় না—আগাগোড়া তেঁতুলের মাছ দিয়া ভাত মারিতে হয় না। কিন্তু যাহাদিগকে চালা-ঘরে বসিয়া, মুঞ্জে পাতর কোলে করিয়া, পদী পিসীর রান্না খাইতে হয়, তাঁহাদের কি যন্ত্রণা! পদী পিসী কুলীনের মেয়ে, প্রাতঃস্নান করে, নামাবলী গায়ে দেয়, হাতে তুলসীর মালা, কিন্তু রাঁধবার বেলা কলাইয়ের দাল, আর তেঁতুলের মাছ ছাড়া আর কিছই রাঁধিতে জানেন না। ফয়জু জাতিতে নেড়ে, কিন্তু রাঁধে অমৃত।

আর একটি মনুষ্যফলের কথা বলা হইলেই অদ্য ক্ষান্ত হই। দেশী হাকিমেরা কোন্ ফল বল দেখি? যিনি রাগ করেন করুন, আমি স্পষ্ট কথা বলিব, ইঁহারা পৃথিবীর কুস্মাণ্ড। যদি চালে তুলিয়া দিলে, তবেই ইঁহারা উঁচুতে ফালিলেন—নাহিলে মাটিতে গড়াগড়ি যান। যেখানে ইচ্ছা, সেখানে তুলিয়া দাও, একটু ঝড় বাতাসেই লতা ছিঁড়িয়া ভূমে গড়াগড়ি। অনেকগুলি রূপেও কুস্মাণ্ড, গুণেও কুস্মাণ্ড।—তবে কুস্মাণ্ড এখন দুই প্রকার হইতেছে—দেশী কুমড়া ও বিলাতী কুমড়া। বিলাতী কুমড়া বলিলে এমত বুঝায় না যে, এই কুমড়াগুলি বিলাত হইতে আসিয়াছে। যেমন দেশী মূর্ছির তৈয়ারি জ্বতাকে ইংরেজি জ্বতা বলে, ইঁহারাও সেইরূপ বিলাতী। বিলাতী কুমড়ার যে গোরব অধিক, ইঁহা বলা বাহুল্য। সংসারোদ্যানে আরও অনেক ফল ফলে, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা অকর্মণ্য, কদর্য্য, টক—

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী

তৃতীয় সংখ্যা—ইউর্টিলিটি* বা উদর-দর্শন

বেংখাম হিতবাদ দর্শনের সৃষ্টি করিয়া ইউরোপে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

আমি এই হিতবাদমতে অমত করি না; বরং আমি ইঁহার অনুমোদক, তবে আপনারা জানেন কি না, বলিতে পারি না, আমি একজন সুযোগ্য দার্শনিক। আমি এই হিতবাদ দর্শন অবলম্বন করিয়া, কিছু ভাঙ্গিয়া, কিছু গাড়িয়া, একটি নতুন দর্শনশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে, তাহা বাঙ্গালায় প্রচলিত হিতবাদ দর্শনের নতুন ব্যাখ্যা মাত্র। তাহার স্থূল মর্ম্ম আমি সংক্ষেপতঃ লিপিবদ্ধ করিতেছি। প্রাচীন প্রথানুসারে দর্শনটি সূত্রাকারে লিখিত হইয়াছে। এবং আমি স্বয়ংই সূত্রের ভাষা করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়াছি। বাঙ্গালাতেই সূত্রগুলি লিখিত

* “ইউর্টিলিটি” শব্দের অর্থ কি? ইঁহার কি বাঙ্গালা নাই? আমি নিজে ইংরেজি জানি না—কমলাকান্তও কিছু বলিয়া দেয় নাই—অতএব অগত্যা আমার পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। আমার পুত্র, ডেক্সনারী দেখিয়া এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছে—“ইউ” শব্দে তুমি বা তোমরা, “টিল্” শব্দে চাষ করা, “ইট্” শব্দে খাওয়া, “ই” অর্থে কি, তাহা সে বলিতে পারিল না, কিন্তু বোধ করি কমলাকান্ত, “ইউ-টিল-ইট-ই” পদে ইঁহাই অভিপ্রেত করিয়াছেন যে, “তোমরা চাষ করিয়াই খাও।” কি পাষণ্ড! সকলকেই চাষা বলিল! ঈদৃশ দূর্ষ্বৃত্ত দশানন লম্বোদর গজাননের রচনা পাঠ করাতেও পাপ আছে। বোধ হয়, আমার পুত্রটি ইংরেজি লেখাপড়ায় ভাল হইয়াছে, নচেৎ এরূপ দূরহ শব্দের সদর্থ করিতে পারিত না।—শ্রীভীষ্মদেব খোশনবীস।

হইয়াছে। আমি যে অসংস্কৃতজ্ঞ, এমত কেহ মনে করিবেন না। তবে সংস্কৃতে সূত্রগুলি কয়জন বুদ্ধিতে পারিবে? অতএব, সাধারণ পাঠকের প্রতি অনুকূল হইয়া বাঙ্গালাতেই সমস্ত কার্য নিৰ্বাহ করিয়াছি। সে সূত্রগ্রন্থের সারাংশ এই;—

১। জীবশরীরস্থ বৃহৎ গহ্বরবিশেষকে উদর বলে।

ভাষ্য।—“বৃহৎ”—অর্থাৎ নাসিকা কর্ণাদি ক্ষুদ্র গহ্বরকে উদর বলা যায় না। বলিলে বিশেষ প্রত্যয় আছে।

“জীবশরীরস্থ বৃহৎ গহ্বর”—জীবশরীরস্থ বলিবার তাৎপর্য এই যে, নহিলে পৰ্ব্বতগুহা প্রভৃতিকে উদর বলিয়া পরিচয় দিয়া কেহ তাহার পূর্তির প্রত্যাশা করিতে পারেন।

“গহ্বর”—যদিও জীবশরীরস্থ গহ্বরবিশেষই উদর শব্দে বাচ্য, তথাপি অবস্থা বিশেষে অঞ্জলি প্রভৃতিও উদরমধ্যে গণ্য। কোন স্থানে উদর পুরাইতে হয়, কোন স্থানে অঞ্জলি পুরাইতে হয়।

২। উদরের ত্রিবিধ পূর্তিই পরম পূরুষার্থ।

ভাষ্য।—সাংখ্যেরও এই মত। আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক এবং আধিদৈবিক, এই ত্রিবিধ উদর-পূর্তি।

“আধিভৌতিক”—অন্ন ব্যঞ্জন সন্দেশ মিষ্টান্ন প্রভৃতি ভৌতিক সামগ্রীর দ্বারা উদরের যে পূর্তি হয়, তাহাই আধিভৌতিক পূর্তি।

“আধ্যাত্মিক”—যাঁহারা বড়লোকের বাক্যে লুদ্ধ হইয়া, কালযাপন করেন, তাঁহাদিগের আধ্যাত্মিক উদরপূর্তি হয়।

“আধিদৈবিক”—দৈবানুকম্পায় প্লীহা যকৃৎ প্রভৃতি দ্বারা যাঁহাদের উদর পূরিয়া উঠে, তাঁহাদিগের আধিদৈবিক উদরপূর্তি।

৩। এতন্মধ্যে আধিভৌতিক পূর্তিই বিহিত।

ভাষ্য।—“বিহিত”—বিহিত শব্দের দ্বারা অন্যান্য পূর্তির প্রতিষেধ হইল কি না, ভবিষ্যৎ ভাষ্যকারেরা মীমাংসা করিবেন।

এক্ষণে সিদ্ধ হইল, উদরনামক মহা-গহ্বরে লুচি সন্দেশ প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থের প্রবেশই পূরুষার্থ। অতএব এ গর্তের মধ্যে কি প্রকার ভূত প্রবেশ করান যাইতে পারে, তাহা নিৰ্বাচন করা যাইতেছে।

৪। বিদ্যা বুদ্ধি পরিশ্রম উপাসনা বল এবং প্রতারণা, এই ষড়্‌বিধ পূরুষার্থের উপায়, পূৰ্ব্বপণ্ডিতেরা নির্দেশ করিয়াছেন।

ভাষ্য।—১। “বিদ্যা”—বিদ্যা কি, তাহা অবধারণ করা কঠিন। কেহ কেহ বলেন, লিখিতে ও পড়িতে শিখাকে বিদ্যা বলে। কেহ কেহ বলেন, বিদ্যার জন্য বিশেষ লিখিতে বা পড়িতে শিখার প্রয়োজন নাই, গ্রন্থ লিখিতে, সম্বাদ পত্রাদিতে লিখিতে জানিলেই হইল। কেহ কেহ তাহাতে আপত্তি করেন যে, যে লিখিতে জানে না, সে পত্রাদিতে লিখিবে কি প্রকারে? আমার বিবেচনায় এরূপ তর্ক নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। কুম্ভীরশাবক ডিম্ব ভেদ করিবামাত্র জলে গিয়া সাঁতার দিয়া থাকে, শিখিতে হয় না। সেইরূপ বিদ্যা বাঙ্গালির স্বতঃসিদ্ধ, তজ্জন্য লেখা-পড়া শিখিবার প্রয়োজন নাই।

২। “বুদ্ধি”—যে আশ্চর্য্য শক্তিদ্বারা তুলাকে লৌহ, লৌহকে তুলা বিবেচনা হয়, সেই শক্তিকেই বুদ্ধি বলে। রূপণের সঞ্চিত ধনরাশির ন্যায় ইহা আমরা স্বয়ং সর্বদা দেখিতে পাই, কিন্তু পরে কখন দেখিতে পায় না। পৃথিবীর সকল সামগ্রীর অপেক্ষা বোধ হয়, জগতে ইহারই আধিক্য। কেন না, কখন কেহ বলিল না যে, ইহা আমি অল্প পরিমাণে পাইয়াছি।

৩। “পরিশ্রম”—উপযুক্ত সময়ে ঈষদ্ভক্ষ অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন, তৎপরে নিদ্রা, বায়ু সেবন, তামাকুর ধূমপান, গৃহিণীর সহিত সম্ভাষণ ইত্যাদি গুরুতর কার্যসম্পাদনের নাম পরিশ্রম।

৪। “উপাসনা”—কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে গেলে, হয় তাহার গুণানুবাদ, নয় দোষকীর্্তন করিতে হয়। কোন ক্ষমতামালী প্রধান ব্যক্তি সম্বন্ধে এরূপ কথা হইলে, যদি তিনি প্রকৃত দোষযুক্ত ব্যক্তি হইলেন, তবে তাঁহার দোষকীর্্তন করাকে নিন্দা বলে। আর তিনি যদি দোষযুক্ত না হইলেন, তবে তাঁহার দোষকীর্্তনকে স্পষ্টবক্তৃত্ব বা রসিকতা বলে। গুণ পক্ষে, তিনি যদি গুণহীন হইলেন, তবে তাঁহার গুণকীর্্তনকে ন্যায়নিষ্ঠতা বলে। আর যদি তিনি যথার্থ গুণবান্ হইলেন, তবে তাঁহার গুণকীর্্তনকে উপাসনা বলে।

বিক্রম রচনাবলী

৫। “বল”—দীর্ঘচ্ছন্দ বাক্য—মুখ চক্ষুর আরক্তভাব—ঘোরতর ডাক হাঁক,—মুখ হইতে অনর্গল হিন্দী, ইংরাজী এবং নিষ্ঠীবনের বৃষ্টি,—দূর হইতে ভঙ্গীদ্বারা কিল, চড়, ঘুসা এবং লাথি প্রদর্শন ও সাদর্ক তিম্পান্ন প্রকার অন্যান্য অঙ্গভঙ্গী—এবং বিপক্ষের কোন প্রকার উদ্যম দেখিলে অকালে পলায়ন ইত্যাদিকে বল বলে।

বল ষড়্‌বিধ, যথাঃ—

মৌখিক—অভিসম্পাত, গালি, নিন্দা প্রভৃতি।

হাস্ত—কিল চড় প্রদর্শন প্রভৃতি।

পাদ—পলায়নাদি।

চাক্ষুষ—রোদনাদি। যথা, চাণক্যপণ্ডিত,—“বালানাং রোদনং বলং” ইত্যাদি।

স্বাচ—প্রহারসহিষ্ণুতা ইত্যাদি।

মানস—দ্রোহ, ঈর্ষা, হিংসা প্রভৃতি।

৬। প্রতারণা—

নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের পৃথিবীমধ্যে প্রতারক বলিয়া জানিও।

এক, পণ্যাজীব। প্রমাণ—দোকানদার জিনিস বেচিয়া আবার মূল্য চাহিতে থাকে। মূল্য-দাতা মাত্রেরই মত যে, তিনি ক্রয়কালীন প্রতারিত হইয়াছেন।

দ্বিতীয়, চিকিৎসক। প্রমাণ—রোগী রোগ হইতে মুক্ত হইলে পরে যদি চিকিৎসক বেতন চায়, তবে রোগী প্রায় সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন যে, আমি নিজে আরাম হইয়াছি; এ বেটা অনর্থক ফাঁকি দিয়া টাকা লইতেছে।

তৃতীয়, ধর্ম্মোপদেশ্তা এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তি। ইহারা চিরপ্রথিত প্রতারক, ইহাদিগের নাম “ভণ্ড”। ইহারা যে প্রতারক, তাহার বিশেষ প্রমাণ এই যে, ইহারা অর্থাদির কামনা করেন না। ইত্যাদি।

৫। এই ষড়্‌বিধ উপায়ের দ্বারা উদরপূর্ত্তি বা পূরুষার্থ অসাধ্য।

ভাষ্য।—এই সূত্রের দ্বারা পূর্ষপণ্ডিতদিগের মত খণ্ডন করা যাইতেছে। বিদ্যাদি ষড়্‌বিধ উপায়ের দ্বারা যে উদরপূর্ত্তি হইতে পারে না, ক্রমে তাহার উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

“বিদ্যা”—বিদ্যাতে যদি উদরপূর্ত্তি হইত, তবে বাঙ্গালা সম্বাদপত্রের অম্মাভাব কেন?

“বুদ্ধি”—বুদ্ধিতে যদি উদরপূর্ত্তি হইত, তবে গন্দভ মোট বিহবে কেন?

“পরিশ্রম”—পরিশ্রমে যদি হইত, তবে বাঙ্গালি বাবুরা কেরণী কেন?

“উপাসনা”—উপাসনায় যদি হইত, তবে সাহেবগণ কমলাকান্তকে অনুগ্রহ করেন না কেন? আমি ত মন্দ পে-বিল লিখি নাই।

“বল”—বলে যদি হইত, তবে আমরা পাড়িয়া মার খাই কেন?

“প্রতারণা”—প্রতারণায় যদি হইত, তবে মদের দোকান কখন কখন ফেল হয় কেন?

৬। উদরপূর্ত্তি বা পূরুষার্থ কেবল হিতসাধনের দ্বারা সাধ্য।

ভাষ্য।—উদাহরণ। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা লোকের কাণে মন্ত্র দিয়া তাহাদের হিতসাধন করিয়া থাকেন। ইউরোপীয় জাতিগণ অনেক বন্য জাতির হিতসাধন করিয়াছেন, এবং রুসেরা এক্ষণে মধ্য-আসিয়ার হিতসাধনে নিযুক্ত আছেন। বিচারকগণ বিচার করিয়া দেশের হিতসাধন করিতেছেন। অনেকে সুবিক্রয় এবং অবিক্রয় পুস্তক ও পত্রাদি প্রণয়ন দ্বারা দেশের হিতসাধন করিতেছেন। এ সকলের প্রচুর পরিমাণে উদরপূর্ত্তি অর্থাৎ পূরুষার্থলাভ হইতেছে।

৭। অতএব সকলে দেশের হিতসাধন কর।

ভাষ্য।—এই শেষ সূত্রের দ্বারা হিতবাদ দর্শন, এবং উদর দর্শনের একতা প্রতিপাদিত হইল। সূত্রের এই স্থলে কমলাকান্তের সূত্র-গ্রন্থের সমাপ্তি হইল। ভরসা করি, ইহা ভারতবর্ষের সপ্তম দর্শনশাস্ত্র বলিয়া আদৃত হইবে।

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী

চতুর্থ সংখ্যা—পতঙ্গ

বাবুর বৈঠকখানায় সেজ জ্বলিতেছে—পাশে আমি, মোসায়োবি ধরণে বসিয়া আছি। বাবু দলাদলির গল্প করিতেছেন,—আমি আফিম চড়াইয়া বিমাইতেছি। দলাদলিতে চটিয়া মাত্রা

বেশী করিয়া ফেলিয়াছি। বিধিলিপি! এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অনাদি ক্রিয়াপরম্পরার একটি ফল এই যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে কমলাকান্ত চন্দ্রবর্তী জন্মগ্রহণ করিয়া অদ্য রাতে নসীরাম বাবুর বৈঠকখানায় বসিয়া মাত্রা বেশী করিয়া ফেলিবেন। সুতরাং আমার সাধ্য কি যে, তাহার অন্যথা করি।

ঝিমাইতে ঝিমাইতে দেখিলাম যে, একটা পতঙ্গ আসিয়া ফান্দুসের চারি পাশে শব্দ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। “চোঁ-ও-ও-ও” “বোঁ-ও-ও” করিয়া শব্দ করিতেছে। আফিমের বোঁকে মনে করিলাম, পতঙ্গের ভাষা কি বুঝিতে পারি না? কিছুক্ষণ কাণ পাতিয়া শুনিলাম—কিছু বুঝিতে পারিলাম না। মনে মনে পতঙ্গকে বলিলাম, “তুমি কি ও চোঁ বোঁ করিয়া বলিতেছ, আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।” তখন হঠাৎ আফিম প্রসাদাৎ দিব্য কণ্ঠ প্রাপ্ত হইলাম— শুনিলাম, পতঙ্গ বলিল, “আমি আলোর সঙ্গে কথা কহিতেছি—তুমি চুপ কর।” আমি তখন চুপ করিয়া পতঙ্গের কথা শুনিতে লাগিলাম। পতঙ্গ বলিতেছে—

দেখ, আলো মহাশয়, তুমি সেকালে ভাল ছিলে—পিতলের পিলসুজের উপর মেটে প্রদীপে শোভা পাইতে—আমরা স্বচ্ছন্দে পুড়িয়া মরিতাম। এখন আবার সেজের ভিতর ঢুকিয়াছ—আমরা চারিদিকে ঘুরে বেড়াই—প্রবেশ করিবার পথ পাই না, পুড়িয়া মরিতে পাই না।

দেখ, পুড়িয়া মরিতে আমাদের রাইট আছে—আমাদের চিরকালের হক্। আমরা পতঙ্গ-জাতি, পুর্বার আলোতে পুড়িয়া মরিয়া আসিতেছি—কখন কোন আলো আমাদের বারণ করে নাই। তেলের আলো, বাতির আলো, কাঠের আলো, কোন আলো কখন বারণ করে নাই। তুমি কাচ মূড়ি দিয়া আছ কেন, প্রভু? আমরা গরিব পতঙ্গ—আমাদের সহমরণ নিষেধের আইন জারি কেন? আমরা কি হিন্দুর মেয়ে যে, পুড়িয়া মরিতে পাব না?

দেখ, হিন্দুর মেয়ের সঙ্গে আমাদের অনেক প্রভেদ। হিন্দুর মেয়েরা আশা-ভরসা থাকিতে কখন পুড়িয়া মরিতে চাহে না—আগে বিধবা হয়, তবে পুড়িয়া মরিতে বসে। আমরাই কেবল সকল সময়ে আত্মবিসর্জনে ইচ্ছুক। আমাদের সঙ্গে স্ত্রীজাতির তুলনা?

আমাদিগের ন্যায়, স্ত্রীজাতিও রূপের শিখা জ্বলিতে দেখিলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে বটে। ফলও এক,—আমরাও পুড়িয়া মরি, তাহারাও পুড়িয়া মরে। কিন্তু দেখ, সেই দাহতেই তাদের সুখ,—আমাদের কি সুখ? আমরা কেবল পুড়িবার জন্য পুড়ি, মরিবার জন্য মরি। স্ত্রীজাতিতে পারে? তবে আমাদের সঙ্গে তাহাদের তুলনা কেন?

শুন, যদি জ্বলন্ত রূপে শরীর না ঢালিলাম, তবে এ শরীর কেন? অন্য জীবে কি ভাবে, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু আমরা পতঙ্গজাতি, আমরা ভাবিয়া পাই না, কেন এ শরীর?—স্নেহ কি করিব?—নিত্য নিত্য কুসুমের মধু চুম্বন করি, নিত্য নিত্য বিশ্ব-প্রফুল্লকর সূর্য্যকিরণে বিচরণ করি—তাহাতে কি সুখ? ফুলের সেই একই গন্ধ, মধুর সেই একই মিষ্টতা, সূর্য্যের সেই এক প্রকারই প্রতিভা। এমন অসার, পুরাতন বৈচিত্র্যশূন্য জগতে থাকিতে আছে? কাচের বাহিরে আইস, জ্বলন্ত রূপশিখায় গা ঢালিব।

দেখ, আমার ভিক্ষাটি বড় ছোট—আমার প্রাণ তোমাকে দিয়া যাইব, লইবে না? দিব বৈ ত গ্রহণ করিব না। তবে ক্ষতি কি? তুমি রূপ, পোড়াইতে জন্মিয়াছ, আমি পতঙ্গ, পুড়িতে জন্মিয়াছি; আইস, যার যে কাজ, করিয়া যাই। তুমি হাসিতে থাক, আমি পুড়ি।

তুমি বিশ্বধ্বংসক্ষম—তোমাকে রোধিতে পারে, জগতে এমন কিছু নাই—তুমি কাচের ভিতর লুকাইয়া আছ কেন? তুমি জগতের গতির কারণ—কার ভয়ে তুমি ডোমের ভিতর লুকাইয়াছ? কোন্ ডোমে এ ডোম গাঁড়িয়াছে? কোন্ ডোমে তোমাকে এ ডোমের ভিতর পুড়িয়াছে? তুমি যে বিশ্বব্যাপী, কাচ ভাঙ্গিয়া আমায় দেখা দিতে পার না?

তুমি কি? তা আমি জানি না—আমি জানি না—কেবল জানি যে, তুমি আমার বাসনার বস্তু—আমার জাগ্রতের ধ্যান—নিদ্রার স্বপ্ন—জীবনের আশা—মরণের আশ্রয়। তোমাকে কখন জানিতে পারিব না—জানিতে চাহিও না—যে দিন জানিব, সেই দিন আমার সুখ যাইবে। কাম্য বস্তুর স্বরূপ জানিলে কাহার সুখ থাকে?

তোমাকে কি পাইব না? কত দিন তুমি কাচের ভিতর থাকিবে? আমি কাচ ভাঙ্গিতে পারিব না? ভাল থাক—আমি ছাড়িব না—আবার আসিতেছি—বোঁ—ও—ও

পতঙ্গ উড়িয়া গেল।

বঙ্কিম রচনাবলী

নসীরাম বাবু ডাকিল, “কমলাকান্ত!” আমার চমক হইল—চাহিয়া দেখিলাম—বুঝি বড় ঢুলিয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু চাহিয়া দেখিয়া নসীরামকে চিনিতে পারিলাম না—দেখিলাম, মনে হইল, একটা বৃহৎ পতঙ্গ বালিশ ঠেসান দিয়া, তামাকু টানিতেছে। সে কথা কহিতে লাগিল—আমার বোধ হইতে লাগিল যে, সে চোঁ বোঁ করিয়া কি বলিতেছে। এখন হইতে আমার বোধ হইতে লাগিল যে, মনুষ্য মায়েই পতঙ্গ। সকলেরই এক একটা বহি আছে—সকলেই সেই বহিতে পড়াইয়া মরিতে চাহে, সকলেই মনে করে, সেই বহিতে পড়াইয়া মরিতে তাহার অধিকার আছে—কেহ মরে, কেহ কাচে বাধিয়া ফিরিয়া আসে। জ্ঞান-বহি, ধন-বহি, মান-বহি, রূপ-বহি, ধর্ম-বহি, ইন্দ্রিয়-বহি, সংসার বহুময়। আবার সংসার কাচময়। যে আলো দেখিয়া মোহিত হই—মোহিত হইয়া যাহাতে ঝাঁপ দিতে যাই—কই, তাহা ত পাই না—আবার ফিরিয়া বোঁ করিয়া চলিয়া যাই—আবার আসিয়া ফিরিয়া বেড়াই। কাচ না থাকিলে, সংসার এত দিন পড়াইয়া যাইত। যদি সকল ধর্মবিৎ চৈতন্যদেবের ন্যায় ধর্ম মানস-প্রত্যক্ষে দেখিতে পাইত, তবে কয় জন বাঁচিত? অনেকে জ্ঞান-বহির আবরণ-কাচে ঠেকিয়া রক্ষা পায়, সফ্রেতিস্, গেলিলিও তাহাতে পড়াইয়া মরিল। রূপ-বহি, ধন-বহি, মান-বহিতে নিত্য নিত্য সহস্র পতঙ্গ পড়াইয়া মরিতেছে,—আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি। এই বহির দাহ যাহাতে বর্ণিত হয়, তাহাকে কাব্য বলি। মহাভারতকার মান-বহি সৃজন করিয়া দুর্ব্যোধন পতঙ্গকে পোড়াইলেন;—জগতে অতুল্য কাব্যগ্রন্থের সৃষ্টি হইল। জ্ঞানবহিজাত দাহের গীত “Paradise Lost”। ধর্ম-বহির অদ্বিতীয় কবি, সেন্ট পল। ভোগবহির পতঙ্গ, “আণ্টনি, ক্লিপেত্র”। রূপ-বহির “রোমিও ও জুলিয়েত,” ঈর্ষা-বহির “ওথেলো”। গীতগোবিন্দ ও বিদ্যাসুন্দরে ইন্দ্রিয়-বহি জ্বলিতেছে। স্নেহ-বহিতে সীতাপতঙ্গের দাহ জন্য রামায়ণের সৃষ্টি। বহি কি, আমরা জানি না। রূপ, তেজ, তাপ, ক্রিয়া, গতি, এ সকল কথার অর্থ নাই। এখানে দর্শন হারি মানে, বিজ্ঞান হারি মানে। ধর্মপুস্তক হারি মানে, কাব্যগ্রন্থ হারি মানে। ঈশ্বর কি, ধর্ম কি, জ্ঞান কি, স্নেহ কি? তাহা কি, কিছু জানি না। তবে সেই অলৌকিক, অপরিজ্ঞাত পদার্থ বেড়াইয়া বেড়াইয়া ফিরি। আমরা পতঙ্গ না ত কি?

দেখ ভাই, পতঙ্গের দল, ঘুরিয়া ঘুরিয়া কোন ফল নাই। পার, আগুনে পড়াইয়া পড়াইয়া মর। না পার, চল, “বোঁ” করিয়া চলিয়া যাই।

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী

পঞ্চম সংখ্যা—আমার মন

আমার মন কোথায় গেল? কে লইল? কই, যেখানে আমার মন ছিল, সেখানে ত নাই। যেখানে রাখিয়াছিলাম, সেখানে নাই। কে চুরি করিল? কই, সাত পৃথিবী খুঁজিয়া ত আমার “মনচোর” কাহাকে পাইলাম না। তবে কে চুরি করিল?

একজন বন্ধু বলিলেন, দেখ, পাকশালা খুঁজিয়া দেখ, সেখানে তোমার মন পড়াইয়া থাকিতে পারে। মানি, পাকের ঘরে আমার মন পড়াইয়া থাকিত। যেখানে পোলাও, কাবাব, কোফ্তার সুগন্ধ, যেখানে ডেক্‌চী-সমারুটা অল্পপূর্ণার মৃদু মৃদু ফুটফুটবুটবুট-টকবকোথনি, সেইখানে আমার মন পড়াইয়া থাকিত। যেখানে ইলিস মৎস্য, সতেল অভিষেকের পর ঝোলগঙ্গায় স্নান করিয়া, মৃন্ময়, কাংস্যময়, কাচময় বা রজতময় সিংহাসনে উপবেশন করেন, সেইখানেই আমার মন প্রণত হইয়া পড়াইয়া থাকে, ভক্তিরসে অভিভূত হইয়া, সেই তীর্থস্থান আর ছাড়িতে চায় না। যেখানে ছাগ-নন্দন, দ্বিতীয় দধীচির ন্যায় পরোপকারার্থ আপন অস্থি সমর্পণ করেন, যেখানে মাংসসংযুক্ত সেই অস্থিতে কোরমা-রূপ বজ্র নির্মিত হইয়া, ক্ষুধারূপ বৃদ্রাসুর বধের জন্য প্রস্তুত থাকে, আমার মন সেইখানেই, ইন্দ্রত্বলাভের জন্য বসিয়া থাকে। যেখানে, পাচকরূপী বিষ্ণুকর্তৃক, লুচিরূপ সুদর্শন চক্র পরিত্যক্ত হয়, আমার মন সেইখানেই গিয়া বিষ্ণুভক্ত হইয়া দাঁড়ায়। অথবা যে আকাশে লুচি-চন্দ্রের উদয় হয়, সেইখানেই আমার মন-রাহু গিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে চায়। অন্যে যাহা বলে বলুক, আমি লুচিকেই অখণ্ড মণ্ডলাকার বলিয়া থাকি। যেখানে সন্দেশরূপ শালগ্রামের বিরাজ, আমার মন সেইখানেই পূজক। হালদারদিগের বাড়ীর রামমণি দেখিতে অতি কুৎসিতা, এবং তাহার বয়ঃক্রম ষাট্ বৎসর, কিন্তু রাঁধে ভাল এবং পরিবেশনে

মুগ্ধহস্তা বলিয়া, আমার মন তাহার সঙ্গে প্রসক্তি করিতে চাইয়াছিল। কেবল রামমাণির সজ্ঞানে গঙ্গালাভ হওয়ায় এটি ঘটে নাই।

সুহৃদের প্রবর্তনায়, পাকশালায় মনের সন্ধান করিলাম, সেখানে পাইলাম না। পলান্ন, কোফ্তা প্রভৃতি অধিষ্ঠাতৃদেবগণ জিজ্ঞাসায় বলিলেন, তাঁহারা কেহ আমার মন চুরি করেন নাই।

বন্ধু বলিলেন, একবার প্রসন্ন গোয়ালিনীর নিকট সন্ধান জান। প্রসন্নের সঙ্গে আমার একটু প্রণয় ছিল বটে, কিন্তু সে প্রণয়টা কেবল গব্যরসাত্মক। তবে প্রসন্ন দেখিতে শূন্যে মোটাসোটা, গোলগাল, বয়সে চল্লিশের নীচে, দাঁতে মিসি, হাসিভরা মুখ, কপালের একটি ছোট উল্কি টিপের মত দেখাইত; সে রসের হাসি পথে ছড়াইতে ছড়াইতে যাইত, আমি তাহা কুড়াইয়া লইতাম, এই জন্য লোকে আমার নিন্দা করিত। পূজারি বামণের জ্বালায় বাগানে ফুল ফুটিতে পায় না—আর নিন্দকের জ্বালায় প্রসন্নের কাছে আমার মুখ ফুটিতে পায় না—নচেৎ গব্যরসে ও কাব্যরসে বিলক্ষণ বিনিময় চলিত। ইহাতে আমার নিজের জন্য আমি যত দুঃখিত হই, না হই, প্রসন্নের জন্য আমি একটু দুঃখিত। কেন না, প্রসন্ন সতী, সাধবী, পতিব্রতা। এ কথাও আমি মুখ ফুটিয়া বলিতে পাই না। বলিয়াছিলাম বলিয়া, পাড়ার একটি নষ্টবুদ্ধি ছেলে ইহার বিপরীত অর্থ করিয়াছিল। সে বলিল যে, প্রসন্ন আছেন, এজন্য সৎ বা সতী বটে, তিনি সাধু ঘোষের স্ত্রী, এজন্য সাধবী; এবং বিধবাবস্থাতেও পতিছাড়া নহেন, এজন্য ঘোরতর পতিব্রতা। বলা বাহুল্য যে, যে অশিষ্ট বালক এই ঘৃণিত অর্থ মুখে আনিয়াছিল, তাহার শিক্ষার্থ, তাহার গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে আমার কলঙ্ক গেল না।

যখন লিখিতে বসিয়াছি, তখন স্পষ্ট কথা বলা ভাল—আমি প্রসন্নের একটু অনুরাগী বটে। তাহার অনেক কারণ আছে—প্রথমতঃ, প্রসন্ন যে দুঃখ দেয়, তাহা নিঃস্বর্জল, এবং দামে সস্তা; দ্বিতীয়, সে কখন কখন ক্ষীর, সর, নবনীত আমাকে বিনামূল্যে দিয়া যায়; তৃতীয়, সে একদিন আমাকে কহিয়াছিল, “দাদাঠাকুর, তোমার দপ্তরে ও কিসের কাগজ?” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “শূন্যবি?” সে বলিল, “শূন্যবি।” আমি তাহাকে কয়েকটি প্রবন্ধ পড়িয়া শুনাইলাম—সে বসিয়া শুনিল। এত গুণে কোন লিপিব্যবসায়ী ব্যক্তি বশীভূত না হয়? প্রসন্নের গুণের কথা আর অধিক কি বলিব—সে আমার অনুরোধে আফিম ধরিয়াছিল।

এই সকল গুণে আমার মন কখন কখন প্রসন্নের ঘরের জানেলার নীচে ঘুরিয়া বেড়াইত, ইহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু কেবল তাহার ঘরের জানেলার নীচে নয়, তাহার গোহালঘরের আগড়ের পাশেও উর্ধ্ব মারিত। প্রসন্নের প্রতি আমার যেরূপ অনুরাগ, তাহার মঙ্গলা নামে গাইয়ের প্রতিও তদ্রূপ। এক জন ক্ষীর সর নবনীতের আকর, দ্বিতীয়, তাহার দানকরী। গঙ্গা বিষ্ণুপদ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভগীরথ তাঁহাকে আনিয়াছেন; মঙ্গলা আমার বিষ্ণুপদ; প্রসন্ন আমার ভগীরথ; আমি দুই জনকেই সমান ভালবাসি। প্রসন্ন এবং তাহার গাই, উভয়েই সুন্দরী; উভয়েই স্থূলাঙ্গী, লাভণ্যময়ী, এবং ঘটোধারী। এক জন গব্যরস সৃজন করেন, আর এক জন হাস্যরস সৃজন করেন। আমি উভয়েরই নিকট বিনামূল্যে বিক্রীত।

কিন্তু আজ কালি সন্ধান করিয়া দেখিলাম, প্রসন্নের গবাস্কতলে, অথবা তাহার গোহালঘরে আমার মন নাই। আমার মন কোথা গেল?

কাঁদিতে কাঁদিতে পথে বাহির হইলাম। দেখিলাম, এক যুবতী জলের কলসী কক্ষে লইয়া যাইতেছে। তাহার মুখের উপর গভীর-কৃষ্ণ দোদুল্যমান কুণ্ডিতালকরাজি, গভীর-কৃষ্ণ ভ্রূয়ুগ, এবং গভীর-কৃষ্ণ চণ্ডল নয়নতারা দেখিয়া বোধ হইল, যেন পদ্মবনে কতকগুলো ভ্রমর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—বসিতেছে না, উড়িয়া বেড়াইতেছে। তাহার গমনে যেরূপ অঙ্গ দুর্লভেছিল, বোধ হইল, যেন লাভণ্যের নদীতে ছোট ছোট ডেউ উঠিতেছে; তাহার প্রতি পদক্ষেপে বোধ হইল, যেন পাঁজরের হাড় ভাঙ্গিয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছে। ইহাকে দেখিয়া আমার বোধ হইল, নিঃসন্দেহ এই আমার মন চুরি করিয়াছে। আমি তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। সে ফিরিয়া দেখিয়া ঈষৎ রুদ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করিল, “ও কি ও? সঙ্গে নিয়েছ কেন?”

আমি বলিলাম, “তুমি আমার মন চুরি করিয়াছ।”

যুবতী কটুক্তি করিয়া গালি দিল। বলিল, “চুরি করি নাই। তোমার ভাগিনী আমাকে যাচাই করিতে দিয়াছিল। দর কষিয়া আমি ফিরিয়া দিয়াছি।”

সেই অবধি শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া, মনের সন্ধান আর রসিকতা করিতে প্রয়াস পাই না, কিন্তু

বাঁধকম রচনাবলী

মনে মনে বুকিয়াছি যে, এ সংসারে আমার মন কোথাও নাই। রহস্য ছাড়িয়া সত্য কথা বলিতেছি, কিছুতেই আমার আর মন নাই। শারীরিক সুখ স্বচ্ছন্দতায় মন নাই, যে রহস্যলাপের আমি প্রিয় ছিলাম, সে রহস্যলাপে আমার মন নাই। আমার কতকগুলি ছেঁড়া পুঁথি ছিল—তাহাতে আমার মন থাকিত, তাহাতে আমার মন নাই। অর্থসংগ্রহে কখন ছিল না—এখনও নাই। কিছুতে আমার মন নাই—আমার মন কোথা গেল?

বুকিয়াছি, লঘুচেতাদিগের মনের বন্ধন চাই; নহিলে মন উড়িয়া যায়। আমি কখন কিছুতে মন বাঁধি নাই—এজন্য কিছুতেই মন নাই। এ সংসারে আমরা কি করিতে আসি, তাহা ঠিক বলিতে পারি না—কিন্তু বোধ হয়, কেবল মন বাঁধা দিতেই আসি। আমি চিরকাল আপনার রহিলাম—পরের হইলাম না, এই জন্যই পৃথিবীতে আমার সুখ নাই। যাহারা স্বভাবতঃ নিতান্ত আত্মপ্রিয়, তাহারাও বিবাহ করিয়া, সংসারী হইয়া, স্ত্রী পুত্রের নিকট আত্মসমর্পণ করে, এজন্য তাহারা সুখী। নচেৎ তাহারা কিছুতেই সুখী হইত না। আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেছি, পরের জন্য আত্মবিসর্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোন মূল নাই। ধন, যশঃ, ইন্দ্রিয়াদিলক্ক সুখ আছে বটে, কিন্তু তাহা স্থায়ী নহে। এ সকল প্রথম বারে যে পরিমাণে সুখদায়ক হয়, দ্বিতীয় বারে সে পরিমাণে হয় না, তৃতীয় বারে আরও অল্প সুখদায়ক হয়, ক্রমে অভ্যাসে তাহাতে কিছুই সুখ থাকে না। সুখ থাকে না, কিন্তু দুইটি অসুখের কারণ জন্মে; প্রথমতঃ, অভ্যস্ত বস্তুর ভাবে সুখ না হউক, অভাবে গুরুতর অসুখ হয়; এবং অপরিতোষণীয়া আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধিতে যন্ত্রণা হয়। অতএব পৃথিবীতে যে সকল বিষয় কাম্য বস্তু বলিয়া চিরপরিচিত, তাহা সকলই অতৃপ্তকর এবং দুঃখের মূল। সকল স্থানেই যশের অনুগামিনী নিন্দা, ইন্দ্রিয়সুখের অনুগামী রোগ, ধনের সঙ্গে ক্ষতি ও মনস্তাপ; কান্ত বপু জরাগ্রস্ত বা ব্যাধিদুষ্ট হয়; সুনামেও মিথ্যা কলঙ্ক রটে; ধন পত্নীজারেও ভোগ করে; মান সম্ভ্রম মেঘমালার ন্যায় শরতের পর আর থাকে না। বিদ্যা তৃপ্তিদায়িনী নহে, কেবল অন্ধকার হইতে গাঢ়তর অন্ধকারে লইয়া যায়, এ সংসারের তত্ত্বজিজ্ঞাসা কখন নিবারণ করে না। স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে বিদ্যা কখন সক্ষম হয় না। কখন শুনিয়াছ, কেহ বলিয়াছে, আমি ধনোপার্জন করিয়া সুখী হইয়াছি বা যশস্বী হইয়া সুখী হইয়াছি? যেই এই কয় ছত্র পড়িবে, সেই বেশ করিয়া স্মরণ করিয়া দেখুক, কখন এমন শুনিয়াছে কি না। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, কেহ এমত কথা কখন শুনেন নাই। ইহার অপেক্ষা ধনমানাদির অকার্যকারিতার গুরুতর প্রমাণ আর কি পাওয়া যাইতে পারে? বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এমন অকাট্য প্রমাণ থাকিতেও মনুষ্যমাগ্রেই তাহার জন্য প্রাণপাত করে। এ কেবল কুশিক্ষার গুণ। মাতৃস্তন্য দুগ্ধের সঙ্গে সঙ্গে ধনমানাদির সর্বসারবস্তায় বিশ্বাস শিশুর হৃদয়ে প্রবেশ করিতে থাকে—শিশু দেখে, রাত্রিদিন পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী গুরু ভৃত্য প্রতিবেশী শত্রু মিত্র সকলেই প্রাণপণে হা অর্থ, হা যশ, হা মান, হা সম্ভ্রম! করিয়া বেড়াইতেছে। সুতরাং শিশু কথা ফুটিবার আগেই সেই পথে গমন করিতে শিখে। কবে মনুষ্য নিত্য সুখের একমাত্র মূল অনুসন্ধান করিয়া দেখিবে? যত বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, দার্শনিক, সংসারতত্ত্ববিৎ, যে কেহ আশ্চর্যজনক কর, সকলে মিলিয়া দেখ, পরসুখবর্জন ভিন্ন মনুষ্যের অন্য সুখের মূল আছে কি না। নাই। আমি মরিয়া ছাই হইব, আমার নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হইবে, কিন্তু আমি মৃত্যুকণ্ঠে বলিতেছি, এক দিন মনুষ্যমাগ্রে আমার এই কথা বুকিবে যে, মনুষ্যের স্থায়ী সুখের অন্য মূল নাই। এখন যেমন লোকে উন্মত্ত হইয়া ধন মান ভোগাদির প্রতি ধাবিত হয়, এক দিন মনুষ্যজাতি সেইরূপ উন্মত্ত হইয়া পরের সুখের প্রতি ধাবমান হইবে। আমি মরিয়া ছাই হইব, কিন্তু আমার এ আশা এক দিন ফলিবে! ফলিবে, কিন্তু কত দিনে! হায়, কে বলিবে, কত দিনে!

কথাটি প্রাচীন। সান্দ্র দ্বিসহস্র বৎসর পূর্বে শাক্যসিংহ এই কথা কত প্রকারে বলিয়া গিয়াছেন। তাহার পর, শত সহস্র লোকশিক্ষক শত সহস্র বার এই শিক্ষা শিখাইয়াছেন। কিন্তু কিছুতেই লোকে শিখে না—কিন্তু তাহাদের ইন্দ্রজাল কাটাইয়া উঠিতে পারে না। আবার আমাদের দেশ ইংরেজি মূলুক হইয়া এ বিষয়ে বড় গণ্ডগোল বাধিয়া উঠিয়াছে। ইংরেজি শাসন, ইংরেজি সভ্যতা ও ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে “মোর্টারিয়েল্ প্রস্পেরিটির”* উপর অনুরাগ

* বাহ্য সম্পদ।

আসিয়া দেশ উৎসন্ন দিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইংরেজ জাতি বাহ্য সম্পদ বড় ভালবাসেন—ইংরেজ সভ্যতার এইটি প্রধান চিহ্ন—তাহারা আসিয়া এদেশের বাহ্য সম্পদ সাধনেই নিযুক্ত—আমরা তাহাই ভালবাসিয়া আর সকল বিস্মৃত হইয়াছি। ভারতবর্ষের অন্যান্য দেবমূর্ত্তিসকল মন্দিরচ্যুত হইয়াছে—সিদ্ধ হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত কেবল বাহ্য সম্পদের পূজা আরম্ভ হইয়াছে। দেখ, কত বাণিজ্য বাড়িতেছে—দেখ, কেমন রেলওয়েতে হিন্দু-ভূমি জালনিবন্ধ হইয়া উঠিল—দেখিতেছ, টেলিগ্রাফ কেমন বস্তু! দেখিতেছি, কিন্তু কমলাকান্তের জিজ্ঞাসা এই যে, তোমার রেলওয়ে টেলিগ্রাফে আমার কতটুকু মনের সুখ বাড়িবে? আমার এই হারান মন খুঁজিয়া আনিয়া দিতে পারিবে? কাহারও মনের আগুন নিবাইতে পারিবে? ঐ যে কৃপণ ধনতৃষায় মরিতেছে, উহার তৃষা নিবারণ করিবে? অপমানিতের অপমান ফিরাইতে পারিবে? রূপোন্মত্তের ফ্রোড়ে রূপসীকে তুলিয়া বসাইতে পারিবে? না পারে, তবে তোমার রেলওয়ে টেলিগ্রাফ প্রভৃতি উপাড়িয়া জলে ফেলিয়া দাও—কমলাকান্ত শর্মা তাতে ক্ষতি বিবেচনা করিবেন না।

কি ইংরেজ, কি বাঙ্গালা, যে সম্বাদ-পত্র, সাময়িক পত্র, স্পীচ, ডিবেট, লেক্চর, যাহা কিছু পড়ি বা শুন, তাহাতে এই বাহ্য সম্পদ ভিন্ন আর কোন বিষয়ের কোন কথা দেখিতে পাই না। হর হর বম্ বম্! বাহ্য সম্পদের পূজা কর। হর হর বম্ বম্! টাকার রাশির উপর টাকা ঢাল! টাকা ভক্তি, টাকা মূর্ত্তি, টাকা নতি, টাকা গতি! টাকা ধর্ম, টাকা অর্থ, টাকা কাম, টাকা মোক্ষ! ও পথে যাইও না, দেশের টাকা কমিবে, ও পথে যাও, দেশের টাকা বাড়িবে! বম্ বম্ হর হর! টাকা বাড়াও, টাকা বাড়াও, রেলওয়ে টেলিগ্রাফ অর্থ-প্রসূতি, ও মন্দিরে প্রণাম কর! যাতে টাকা বাড়ে, এমন কর; শূন্য হইতে টাকা বৃষ্টি হইতে থাকুক! টাকার ঋণবন্ধনিত ভারতবর্ষ পুরিয়া যাউক! মন! মন আবার কি? টাকা ছাড়া মন কি? টাকা ছাড়া আমাদের মন নাই; টাকশালে আমাদের মন ভাঙ্গে গড়ে। টাকাই বাহ্য সম্পদ। হর হর বম্ বম্! বাহ্য সম্পদের পূজা কর। এ পূজার তাম্রশ্মশ্রুধারী ইংরেজ নামে ঋষিগণ পুরোহিত; এডাম্ স্মিথ পুরাণ এবং মিল তন্ত্র হইতে এ পূজার মন্ত্র পড়িতে হয়; এ উৎসবে ইংরেজ সম্বাদ-পত্রসকল ঢাক ঢোল, বাঙ্গালা সম্বাদ-পত্র কাঁসিদার; শিক্ষা এবং উৎসাহ ইহাতে নৈবদ্য, এবং হৃদয় ইহাতে ছাগবলি। এ পূজার ফল, ইহলোকে ও পরলোকে অনন্ত নরক। তবে, আইস, সবে মিলিয়া বাহ্য সম্পদের পূজা করি। আইস, যশোগঙ্গার জলে ধৌত করিয়া, বণ্ডনা-বিল্বদলে মিষ্টকথা-চন্দন মাখাইয়া, এই মহাদেবের পূজা করি। বল, হর হর বম্ বম্! বাহ্য সম্পদের পূজা করি। বাজা ভাই ঢাক ঢোল,—ছ্যাড়্ ছ্যাড়্ ছ্যাড়্ ছ্যাড়্ ছ্যাড়্ ছ্যাড়্ ছ্যাড়্! বাজা ভাই কাঁসিদার,—ট্যাং ট্যাং ট্যাং নাট্যাং নাট্যাং! আসুন পুরোহিত মহাশয়! মন্ত্র বলুন। আমাদের এই বহু-কালের পুরাতন ঘৃতটুকু লইয়া স্বধা স্বহা বলিয়া আগুনে ঢালুন। কোথা ভাই ইউটিলিটেরিয়েন্ কামার! পাঁটা হাড়কাটে ফেলিয়াছি; একবার বাবা পণ্ডানন্দের* নাম করিয়া, এক কোপে পাচার কর! হর হর বম্ বম্! কমলাকান্ত দাঁড়াইয়া আছে, মূর্ড্টি দিও! তোমরা স্বচ্ছন্দে পূজা কর!

পূজা কর, ক্ষতি নাই, কিন্তু আমাকে গোটাকত কথা বঝাইয়া দাও। তোমার বাহ্য সম্পদে কয় জন অভদ্র ভদ্র হইয়াছে? কয় জন অশিষ্ট শিষ্ট হইয়াছে? কয় জন অধার্মিক ধার্মিক হইয়াছে? কয় জন অপবিত্র পবিত্র হইয়াছে? এক জনও না? যদি না হইয়া থাকে, তবে তোমার এই ছাই আমরা চাহি না—আমি হুকুম দিতেছি, এ ছাই ভারতবর্ষ হইতে উঠাইয়া দাও।

তোমাদের কথা আমি বুঝি। উদর নামে বহু গহ্বর, ইহা প্রত্যহ বৃজান চাই; নহিলে নয়। তোমরা বল যে, এই গর্ত্ত যাহাতে সকলেরই ভাল করিয়া বৃজে, আমরা সেই চেষ্টায় আছি। আমি বলি, সে মঙ্গলের কথা বটে, কিন্তু উহার অত বাড়াবাড়িতে কাজ নাই। গর্ত্ত বৃজাইতে তোমরা এমনই ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছ যে, আর সকল কথা ভুলিয়া গেলে। বরং গর্ত্তের এক কোণ খালি থাকে, সেও ভাল, তবু আর আর দিকে একটু মন দেওয়া উচিত। গর্ত্ত বৃজান হইতে মনের সুখ একটা স্বতন্ত্র সামগ্রী; তাহার বৃদ্ধির কি কোন উপায় হইতে পারে না? তোমরা

* পণ্ডানন নাম প্রসিদ্ধ নহে—পণ্ডানন্দই প্রসিদ্ধ। মদ্য, মাংস, গাড়িজুড়ি, পোষাক এবং বেশ্যা—এই পাঁচটি আনন্দে এই নূতন পণ্ডানন্দ।

বিশ্বকম রচনাবলী

এত কল করিতেছ, মনুষ্যে মনুষ্যে প্রণয় বৃদ্ধির জন্য কি একটা কিছুর কল হয় না? একটা বৃদ্ধি খাটাইয়া দেখ, নহিলে সকল বেকল হইয়া যাইবে।

আমি কেবল চিরকাল গর্ত বৃদ্ধাইয়া আসিয়াছি—কখন পরের জন্য ভাবি নাই। এই জন্য সকল হারাইয়া বসিয়াছি—সংসারে আমার সুখ নাই; পৃথিবীতে আমার থাকিবার আর প্রয়োজন দেখি না। পরের বোঝা কেন ঘাড়ে করিব, এই ভাবিয়া সংসারী হই নাই। তাহার ফল এই যে, কিছুরেই আমার মন নাই। আমি সুখী নহি। কেন হইব? আমি পরের জন্য দায়ী হই নাই, সুখে আমার অধিকার কি?

সুখে আমার অধিকার নাই, কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিও না যে, তোমরা বিবাহ করিয়াছ বলিয়া সুখী হইয়াছ। যদি পারিবারিক স্নেহের গুণে তোমাদের আত্মপ্রিয়তা লুপ্ত না হইয়া থাকে, যদি বিবাহনিবন্ধন তোমাদের চিত্ত মার্জিত না হইয়া থাকে, যদি আত্মপরিবারকে ভালবাসিয়া, তাবৎ মনুষ্যজাতিকে ভালবাসিতে না শিখিয়া থাক, তবে মিথ্যা বিবাহ করিয়াছ; কেবল ভূতের বোঝা বহিতেছ। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত বা পদ্রমুখ নিরীক্ষণের জন্য বিবাহ নহে। যদি বিবাহবন্ধে মনুষ্য-চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন না হইল, তবে বিবাহের প্রয়োজন নাই। ইন্দ্রিয়াদি অভ্যাসের বশ; অভ্যাসে এ সকল একেবারে শাস্ত থাকিতে পারে। বরং মনুষ্যজাতি ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া পৃথিবী হইতে লুপ্ত হউক, তথাপি যে বিবাহে প্রীতি শিক্ষা না হয়, সে বিবাহে প্রয়োজন নাই।

এক্ষণে কমলাকান্ত যুক্তকরে সকলের নিকট নিবেদন করিতেছে, তোমরা কেহ কমলাকান্তের একটি বিবাহ দিতে পার?

ষষ্ঠ সংখ্যা—চন্দ্রালোকে

এই তৃণ-শষ্প-শোভিত হরিৎক্ষেত্রে, এই কলবাহিনী ভাগীরথী-তীরে, এই স্ফুটচন্দ্রালোকে, আজি দপ্তরের শ্রীবৃদ্ধি, কলেবর-বৃদ্ধি করিব। এইরূপ চন্দ্রালোকেই না ট্রেলস্ শর্মা ট্রয়ের উচ্চ প্রাচীরে আরোহণ করিয়া, ক্রিসীদাকে স্মরণ করিয়া, উষ্ণ শ্বাস ত্যাগ করিতেন! এইরূপ চন্দ্রালোকেই না থিসবী সুন্দরী এইরূপ মৃদু শিশির-পাত-সিক্ত শষ্প মৃদু পদে দলিত করিয়া পিরামসের সঙ্কেতস্থানাভিমুখে অভিসারিণী হইতেন? অভিসারিণী শব্দটিতে অভি একটি উপসর্গ আছে, স্ একটি ধাতু আছে এবং স্ত্রীবাচক একটি 'ইনী' আছে; এই জীবনে কমলাকান্ত শর্মা কত উপসর্গ দেখিলেন, কত লোকের ধাতু ছাড়িল গঠিল দেখিলেন, কত ইনীও এলেন গেলেন, কিন্তু সোপসর্গ ধাতুবিশিষ্ট একটি ইনীও কখন দেখিলাম না। কমলাকান্ত উপসর্গে কোন ইনীর ধাতু বিগড়াইল না। কমলাভিসারিণী, এরূপ নায়িকা কখন হইল না। যাহারা দধি দুগ্ধ বিক্রয়ার্থ আগমন করে, তাহাদিগকে শ্রীমদ্ভাগবতে “পসারিণী” বলিয়াছে, কখন অভিসারিণী বলিয়াছে, এরূপ স্মরণ হয় না, তাহা যদি বলিত, তাহা হইলে অনেক অভিসারিণী দেখিয়াছি বলিতে পারিতাম।

চন্দ্র, তুমি হাস্য করিতেছ? হেসে হেসে ভেসে উঠিতেছ? তোমার সাতাইশ ইনী শূদ্র আমাকে দেখিয়া, আমার প্রতি চক্ষু টিপিয়া উপহাস করিতেছ? দক্ষ রাজার যেমন কৰ্ম— একেবারে সাতাইশটিকে এক চন্দ্রে সমর্পণ করিলেন, আর এখন কমলাকান্ত শর্মা বিবাহের জন্য লালায়িত! অমল-ধবল-কিরণরাশি সুধাংশো! আর সকল তোমার থাক, তুমি অন্ততঃ অশ্লেষা মঘাকে ছাড়িয়া দেও, আমি ওই দুইটিকে বড় ভালবাসি। আমার মত নিষ্কৰ্ম লোক উহাদের কল্যাণে অন্ততঃ দুই দিন গৃহবাসসুখ উপলব্ধি করিতে পারে। আমি ঐ ভাগিনীদ্বয়কে আমার ভবনে চিরকাল জন্য স্থান দান করিয়া, সুখে কাল কৰ্তন করিব। ইহাদিগের আরও অনেক গুণ আছে—লোকে নিজে অক্ষমতানিবন্ধন কোন কৰ্ম করিতে না পারিয়া, স্বচ্ছন্দে ইহাদিগের দোহাই দিয়া, লোকের কাছে আশ্ফালন করিতে পারে। আমিও নসীবাবুর কাপড় কিনিতে যদি নির্বুদ্ধিতাবশতঃ প্রতারণিত হইয়া আসি, তবে আমার সহধর্মিণীদ্বয়ের স্কন্ধে সমস্ত দোষ অর্পণ করিয়া সাফাই করিতে পারিব।

চন্দ্রদেব! তুমি আমার কথায় কর্ণপাত করিলে না? এখনও মন্দাকিনীর মন্দান্দোলিত বক্ষ-বসন করস্পর্শে প্রতিভাসিত করিতেছ? এখনও মন্দ সমীরণের সহ পরামর্শ করিয়া বৃক্ষের

অগ্রভাগে পলকে পলক বলক বর্ষণ করিবে? এখনও তৃণক্ষেত্রে মণি মন্ডা মরকত অকাতরে ছড়াইয়া দিবে? উলুবনে মন্ডা, আর কেহ ছড়াক আর না ছড়াক, দেখিতেছি তুমি ছড়াইয়া থাক। আর আজ আমি ছড়াইব!

এই সংসারের লোক, এই বল্লালসেনের প্র-পরা-অপ-পৌত্রেরা এবং তাঁহার নিরু-দুর্-বি-অধি-দৌহিত্রেরা আমাকে জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছে। আমার বন্ধের উপরি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। বি, এ, না হলে বিয়ে হয় না। এইবার সংসার ডুবিব। উচ্চ শিক্ষায় ফল কি? ছাপর খাট—রূপার কলসী, গরদের কাচা, এবং স্বর্ণালঙ্কার-ভূষিতা, পটু-বসনাবৃত্তা, একাট বংশখণ্ডিকা! হরি হরি বল, ভাই! তৃণগ্রাহী পাণ্ডিত্যাভিমাত্রী বি, এ, উপাধিধারী উচ্চাশিক্ষাপ্রাপ্ত নব বঙ্গবাসীর, কলসী বস্ত্র বংশ খটাসমেত সজ্জানে গঙ্গালাভ হইল!!!* প্রথমে উপাধি পাইয়াছিলেন, এবার সমাধি পাইলেন। তিনি বিলাতী বন্ধে লীন হইলেন। বঙ্গীয় যুবক সংসারী হইলেন। তাঁহার উচ্চাশিক্ষা তাঁহাকে তাঁহার চরমধামে পেরিঁছিয়া দিয়াছে। তিনি সহস্র তোলক পরিমিত রজতপাত্র, শত তোলক পরিমিত স্বর্ণালঙ্কার এবং সংসার-কুটীরের একমাত্র দাঁড়কা, একাট বংশ-খণ্ডিকা পাইয়াছেন, তিনি তাঁহার চিরবারিঁজিত হেমকট পর্বত নিকটস্থ কিষ্কিন্দ্যাপুরীর সরকারি ওকালতী পাইয়াছেন, হরি হরি বল, ভাই! তাঁহার এত দিনে সমাধি হইল!!! তিনি উচ্চাশিক্ষালাভার্থ বহু যত্নে কামস্কটকা দেশের নদীসকলের নাম কণ্ঠাগ্রে করিয়াছিলেন। এই উচ্চাশিক্ষার জন্য তিনি নিশীথপ্রদীপে অনন্যমনে শাহারা মরুভূমির বালুকাপুঞ্জের সংখ্যা অবধারণ করিয়াছিলেন। এই উচ্চাশিক্ষার জন্যই শার্লিমানের উদ্বেদ বায়ান্ন পুরুষ, নিম্নে সাড়ে তিপ্পান্ন পুরুষের কুলচি মুখস্থ করিয়াছেন। এই উচ্চাশিক্ষা-বলে তিনি শিখিয়াছেন যে, টাউনহলে বক্তৃতা করিতে পারিলেই পরম পুরুষার্থ; ইংরেজের নিন্দা যে কোন প্রকারে করিতে পারিলেই রাজনীতির একশেষ হইল। এবং বংশ-দাঁড়কার স্থাপন করিয়া উমেদার গোষ্ঠীর বৃদ্ধি করিয়া দেশ জঙ্গলময় করিতে পারিলেই কলির জীবধর্মের চরিতার্থতা হইল।

এরূপ বংশ-দাঁড়কা-প্রয়াসী আমি নহি; আমি উইল করিয়া যাইব, সাত পুরুষ বিবাহ করিতে না হয় তাও কর্তব্য, তথাপি এরূপ বংশদাঁড়কা আশ্রয়ে স্বর্গ-প্রাপ্তির বাজ্ঞাও কেহ না করে। যদি জীবপ্রবাহ বৃদ্ধি করাই বিবাহের উদ্দেশ্য হয়, তবে আমি মৎস্যাদি বিবাহ করিব, যদি টাকার জন্য বিবাহ করিতে হয়, তবে আমি টাকশালের অধ্যক্ষকে বিবাহ করিব; আর যদি সৌন্দর্য্যার্থে বিবাহ করিতে হয়, তবে—ঘোমটাটানা চাঁদবদনীদেব উদ্দেশে প্রণাম করিয়া ঐ আকাশের চাঁদকে বিবাহ করিব।

ভাগীরথি! যদি তুমি শান্তনুবন্ধে অথবা তদপেক্ষা উচ্চতর হিমালয়-ভবনে, অথবা আরো উচ্চতর ধূজ্জটিব জটা-কলাপে বিরাজ করিতে, তাহা হইলে কে আজ তোমার উপাসনা করিত? তুমি নীচগা হইয়া, মন্ত্ৰে অবতরণ করিয়া সহস্রধা হইয়া সাগরোদ্দেশে গমন করিয়াছিলে বলিয়াই সাগর-বংশের উদ্ধার হইয়াছে। সমীরণ! তুমি যদি অঞ্জনার অণ্ডল লইয়া চিরক্রীড়াসক্ত থাকিতে, অথবা মলয়াচলে স্বীয় প্রমোদভবনে চন্দন-শাখা নির্মিত করিয়া বা এলা লতা কম্পিত করিয়া পরিভ্রমণ করিতে, তাহা হইলে কে তোমাকে “তুমিই জগজ্জীবনং পালনং” বলিয়া আর তোমার স্তব-স্তুতি করিত? এই বাল-বসন্ত-বিহারী বিহঙ্গমকুলের কার্কাল যদি কেবল নন্দন-কাননেই প্রতিধ্বনিত হইত, তাহা হইলে কমলাকান্ত চক্রবর্তী তাহাদের নাম করিয়া এই রাত্রিকালে স্বীয় মসী লেখনীর অনর্থক ক্ষয় করিবে কেন? সুধাংশো! যদি তুমি ক্ষীরোদ-সাগর-তলে, অমৃত-ভাণ্ডারে, প্রবাল-পালঙ্কে মৌক্তিক-শয্যায় শয়িত থাকিতে, তাহা হইলে কে তোমার সহিত রমণী-মুখ-মণ্ডলের তুলনা করিত? অথবা তোমার ঐ সাতাইশটি ক্রমান্বয় ভক্তৃকা লইয়া খলু সার শ্বশুর-মন্দির দক্ষালয়ে বাস করিতে, তাহা হইলে আজি কমল শর্মা কি তোমার দর্শনাভিলাষী হইয়া—এই শ্মশাননিকট বটতলায় তীরস্থ হইয়া বাস করে?

শশী! যদি তোমার ব্যাকরণ পড়া থাকে, তবে আমাকে মাপ করিও, আমি প্রাণান্তেও শশিন্ বলিতে পারিব না—আমি এতক্ষণ তোমার গুণের অনুধ্যান করিতেছিলাম; শশী, তুমি অনাথার কুটীরদ্বারে প্রহরী রূপে অনিমেষনয়নে বসিয়া থাক, আধভাষী শিশু যখন নাচিতে নাচিতে

বোধ হয়, এই রাত্রি হইতেই কমলাকান্তের বাতিকের বড় বাড়াবাড়ি হইয়াছিল।

—শ্রীভীষ্মদেব খোশনবীস।

বাংকম রচনাবলী

তোমায় ধরিতে যায়, তুমি তাহার সঙ্গে নাচিতে নাচিতে খেলা কর, বালিকা যখন স্বচ্ছ সরোবর-হৃদয়ে তোমায় একবার দেখিতে পাইয়া, একবার না পাইয়া, তোমার সন্দর্শন লাভার্থ, ইতস্ততঃ সরোবরকূলে দৌড়িতে থাকে, তখন তুমি এক একবার ঈষৎ দেখা দিয়া তাহার সহিত কেবল লুকোচুরি খেলিতে থাক, নববধু যখন মন্দ বাত সহিত প্রাসাদোপরি একাকিনী দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে থাকে, তখন তুমি নারিকেলকুঞ্জান্তরাল হইতে অতি ধীরে ধীরে তাহার হৃদয় ভরিয়া অমৃত বর্ষণ করিয়া তাহাকে ক্রমে শীতল কর; যখন তরঙ্গিণী আশা-তরঙ্গিত-হৃদয়ে ধীর প্রবাহে মন্দগতিতে সিন্ধু-অভিগামিনী হয়, তখন তুমিই তাহাকে স্বর্ণ-ভূষণে ভূষিত করিয়া আশীর্বাদ করিয়া পথ প্রদর্শন করিয়া থাক; গোলাপ যখন বসন্ত-রাগে এক বৃন্তে চারিদিক্ দেখিয়া হেলিতে দুলিতে থাকে, তখন তুমিই তাহাকে মালতী লতাকে চুম্বন করিতে কাণে কাণে পরামর্শ দেও। আবার সেই তুমিই অসদাভিসন্ধিৎসু নর যখন কুলকামিনীর ধর্ম্মনাশে প্রবৃত্ত হয়, তখন তোমার কোমল মুখমণ্ডলে এমনি ভ্রুকুটি করিতে থাক যে, সে তোমার মুখ পানে আর দৃষ্টিক্ষেপ করিতে সমর্থ হয় না; তুমিই নরহত্যাকারীর তরবারফলকে বিদ্যুৎ চমকাইয়া দেও, তাহার পাপ শোণিত-বিন্দুতে চৌষটি রৌরব প্রতিফলিত করিয়া দেখাইয়া দেও।

তুমি ক্রীড়াশীল শিশুর চলৎ স্বর্ণস্থালী, তরুণের আশা-প্রদীপ; যুবক যুবতীর যামিনী-যাপনের প্রধান সম্ভোগ-পদার্থ; এবং স্থবিরের স্মৃতি-দর্পণ। তুমি অনাথার প্রহরী, স্থির দীপধারী; তুমি পৃথিবীর পথ-প্রদর্শক; গৃহীর নৈশ সূর্য্য; তুমি পাপীর পাপের সাক্ষী; পুণ্যাত্মার চক্ষে তাহার যশঃপতাকা। তুমি গগনের উজ্জ্বল মণি; জগতের শোভা। আর এই শ্মশানবিহারী শ্রীকমলাকান্তের একমাত্র সম্বল; তুমি ভালর ভাল, মন্দের মন্দ; রসে রস, বিরসে বিষ। তুমি কমলাকান্তের সহধর্ম্মিণী; শশী, আমি তোমায় বড় ভালবাসি, আমি তোমাকেই বিবাহ করিব। সকলে হরি হরি বল, ভাই! আজ এইখানে বাসর যাপন—সকলে একবার হরি হরি বল, ভাই!

বম্ ভোলানাথ! চন্দ্র যে পুরুষ! তবে ডবল মাত্রা চড়াইতে হইল।

চন্দ্র আমাদের মতে পুরুষ বটে, কিন্তু বিলাতীয় শর্ম্মাদিগের মতে ইনি কোমলাঙ্গী। আমাদের মতে চন্দ্র হি,* ইংরাজিতে চন্দ্র শী। এখন উপায়? হি কি শী, তাহা স্থির হইবে কি প্রকারে?

বাস্তবিক এই বিষয়ে সংসারের লোকের সঙ্গে আমার কখন মতের ঐক্য হইল না। আমার এ বিষয়ে নানা সন্দেহ হয়। যে ওয়াজিদালিশাহা লক্ষ্মী নগরী হইতে স্বচ্ছন্দে চতুর্দেউলা-রোহণে মর্দাচখোলায় আগমন করিয়া, হংস হংসী কপোত কপোতী লইয়া ক্রীড়া করেন, গোলাপ সহিত বারি-হৃদে নিত্য স্নান করিয়া, স্বীয়ানুরূপী পিঞ্জরস্থ বুলবুলিকে সম্বৃত পলায় প্রদান করেন, তিনি হি না শী? এবং যে মহিষী দেশ-বাৎসল্যে ঐহিক সুখ সম্পত্তি বিসর্জন করিয়া—রাজপুরুষগণের শরণাপন্ন হওয়াপেক্ষা ভিক্ষায় শ্রেয়ঃ বোধে, নেপালের পার্শ্বতীয় প্রদেশে আশ্রয় লইয়াছেন, তিনি শী না হি? তবে ত সাহসকে হি-শীর প্রভেদক করা যায় না। তবে যুদ্ধ-নৈপুণ্যে হি-শীর প্রভেদ হইবে? যে জোয়ান ওর্লিয়ান্স দুর্গ আক্রমণকালে সর্ব্বপ্রথমে পদার্পণ করিয়াছিল, যে ফ্রান্সের পুনরুদ্ধার করিয়াছিল, তাহাকে শী বলিব, না হি বলিব? আর যে বেড্‌ফোর্ড—তাহাকে পাকচক্রে ফেলবার জন্য সেই জোয়ানের কারাগারে পুরুষের বস্ত্র সংরক্ষণ করিয়াছিল, তাহাকেই বা হি বলিব, না শী বলিব? না, যুদ্ধ-কৌশলে বুদ্ধিতে পারিলাম না। তবে শূনা যায়, যে বলীয়ান্, সেই পুরুষ, আর যে জাতি দুর্ব্বল, তাহারাই স্ত্রীলোক। ভাল—কোমৎ আপনাকে নীতিরাজ্যের সর্ব্বসর্ব্বা স্থির করিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট কর যাত্রা করিয়াছিলেন, সেই অতুল প্রতাপশালীকে যে মাদম ক্রোতিলড দেবো স্বীয় প্রতাপের আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তাহাকে শী বলিব, না হি বলিব? রোমক পত্তনের কৈসরগণ এক একজন পৃথিবীর রাজা, যে মৈসরী রাজ্ঞী ক্রিওপেটরা এরূপ তিন জন কৈসরের উপর রাজত্ব করিয়াছেন, তাহাকে শী বলিব, না হি বলিব? বাস্তবিক জগতে কে হি, কে শী, তাহা স্থির করা যায় না। সে দিন কীর্ত্তন হইতেছিল, যখন কীর্ত্তন-গায়িকা বলিল—“সিংহিনী

হি শী কাহাকে বলে? শূনিয়াছি, দুইটি ইংরেজি সর্ব্বনাম—হি পুংলিঙ্গ—শী স্ত্রীলিঙ্গ।

—শ্রীভীষ্মদেব।

হইয়া শিবাপদ সেবিব?" এবং বঙ্গ নব্য-সম্প্রদায়েরা মন্ত্রস্তম্ভবৎ, চিত্তপুস্তলিকার ন্যায় তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, আমার বাস্তবিক সেই কীর্ত্তন-গায়িকাকে সিংহবৎ বোধ হইয়াছিল এবং সেই সমস্ত বাঙ্গালি যুবককেই আমি শিবাস্বরূপ মনে করিয়াছিলাম। তখন যদি আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিত, এর কোন-গুণি হি, আর কোন-গুণিই বা শী; তাহা হইলে আমি অবশ্য বলিতাম যে, সেই কীর্ত্তনকারিণীই হি এবং তাহার জড়বৎ শ্রোতৃবগই শী। বাস্তবিক বঙ্গীয় যুবকেরা কোথাও হি, কোথাও শী, এবং সর্বত্র বিকল্পে ইট্ হন। তাহার নিত্যবিধিও আছে। যথা—ইয়ারাকিতে হি, শয্যাগৃহে শী, এবং বিষয়কস্মে ইট্। তাহারা বক্তৃতার সময়ে হন হি, সাহেবের কাছে শী, মদ খাইলে হন ইট্। ফলে ইট্ যাহা হউক, হি, শীর বিষয়ে আমার আপনা আপনি অনেক সন্দেহ হয়। মধু চাটুয্যে আমার নাম সংযোগ করিয়া কি বিদ্রুপ করিয়াছিল বলিয়া, যে প্রসন্ন স্বচ্ছন্দে পূর্ণদুষ্ক-কুম্ভ তাহার মস্তকে নিক্ষেপ করিয়া, চাটুয্যের বক্ষ-কবাটের বল পরীক্ষা করণার্থ কোনরূপ বিশেষ আয়ুধ প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, সে প্রসন্ন সংসারের মতে হইল শী—আর আমি—নসীবাবু, কি না একদিন বলিয়াছিলেন যে,—“চক্রবর্তী” ঝিম্মতে ঝিম্মতে আজ বিছানাটা পোড়ালে, একদিন একটা লঙ্কাকাণ্ড করিবে দেখছি” —সেই ভয়ে আফিসের মাত্রা কমাইয়া দিলাম, সেই আমি হইলাম হি? এইরূপ বিচারের জন্যই সংসারের সঙ্গে আমার বিবাদ বিসম্বাদ। ফল কথা, যখন আমি নিজে হি, কি শী, তাহা নিশ্চয় করা দুষ্কর, তখন চন্দ্র হি কিম্বা শী, তাহার স্থিরতা কি প্রকারে হইবে? যদি চন্দ্র হি হইয়েন, ত আমি শী—কেন না, আমার সহিত চন্দ্রের ভালবাসা জন্মিয়াছে। এবং আমার চন্দ্রকে বিবাহ করিতেই হইবে। আর আমি যদি প্রকৃত একজন কমলাকান্ত চক্রবর্তী হই, তাহা হইলে চন্দ্র শী। চন্দ্র বিলাতীয় মতে শী। আমি তাহা হইলে চন্দ্রকে বিলাতীয় মতে পার্ণগ্হণ করিব।

এখন নানা মতে নানা কার্য হইতেছে; আমি বিলাতীয় মতে বিবাহ করিব। এখন দশাবতার দশকর্মান্বিত হইয়াছেন। মৎস্য, কুর্মা, বরাহ টেবিলের শোভা সম্বন্ধন করিতেছেন। নৃসিংহরাম কমলাকান্তরূপ দৈত্যকুলের প্রহ্লাদগণের আশ্রয়ীভূত হইয়াছেন। বামনাবতারে বঙ্গীয় যুবকগণ, আমার সোণারচাঁদ শশীকে স্পর্শ করিতে স্পর্শ করে। প্রথম রামের স্থানে ইংহারা মাতৃ-সেবা, দ্বিতীয় রামের স্থানে পত্নী-সেবা, এবং শেষ রামের নিকটে বারুণী-সেবা শিক্ষা করিয়াছেন। ইংহারা বৌদ্ধ-মতে সংসারের অনিত্যতা স্থির করিয়া, কলিকমতে সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। এখনকার কালে শাক্ত-মতে ভোজ্য প্রস্তুত হইয়া, তাহা শৈব ত্রিশূলে বিদ্ধ করিয়া গলাধঃকরণ করিতে হয়; তাহার পর সৌর পান সেবনীয়। আবার জিরুশালমের প্রথম গৌরাঙ্গের উপদেশ মত ভজনশালা করিতে হয়। মেজো গৌরাঙ্গ নবদ্বীপবাসীর মত হরি-সংকীর্ত্তন করিতে হয়, রাধানগরের ছোট গৌরাঙ্গের মত সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিতে হয়।

সুতরাং শশী, পূর্ণশশী, আজ আমি তোমাকে ইংরাজি মতে, শী স্থির করিয়া, হোস্ বাহালে সুস্থ শরীরে, খোস্ তবিয়তে ইচ্ছাপূর্ব্বক বিবাহ করিলাম। আমি পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে পরম সুখে অন্যের বিনা সারিকতে তোমাতে ভোগ দখল করিতে থাকিব। ইহাতে তুমি কিম্বা তোমার স্থলাভিষিক্ত কেহ কখন কোন আপত্তি কর বা করে, তাহা নামঞ্জুর হইবে। তোমার সাতাইশটিতে আজ হইতে আমার সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকার হইল।

আর অমন করিয়া, পা টিপিয়া, পা টিপিয়া, ঢলে পড়িয়া রোহিণীর সঙ্গে কথা কহিলে কি হইবে? আর অমন করে মূচ্কে হেসে পাতলা মেঘের ঘোমটা টেনে তর্ তর্ করিয়া কত দূর চলিয়া যাইবে? ইতি কোর্টশিপ্ সমাপ্তঃ—

এক্ষণে গান্ধর্ব্ব বিবাহ। আমি বরমাল্য প্রদান করিলাম, তুমি করমাল্য প্রদান কর।

কন্যাকর্ত্তা হৈল কন্যা, বরকর্ত্তা বর।

নিজ মন পুরোহিত, শ্মশানে বাসর॥

একবার হরি বল, ভাই! হরি হরি বোল।

আজ অবাধি আর চন্দ্রকে দেখিয়া কমল মূর্ছিত হইবে না। কমল ফুল্ল হইতে দেখিলে আর চন্দ্র ম্লান হইবে না। এইবার ভারতবর্ষীয় কবিগণের কবিত্ব লোপ হইল—পূর্ব্ব

কমল মূর্ছিত আঁখি চন্দ্রে হেরিলে,

বঙ্কিম রচনাবলী

এখন

চন্দ্রে দেখিতে দেখ কমল আঁখি মিলে।
চন্দ্রের হৃদয়ে কারি কলঙ্ক কেবল।

কিন্তু

কমল হৃদয়ে চন্দ্র কেবল উজ্জ্বল।

আহা! আমি আমার চন্দ্রকে হারাইয়া দিয়াছি। বর বড়, না ক'নে বড়, এই দেখ, বর বড়—
চন্দ্রে সবে ষোল কলা হাস বৃদ্ধি তায়,
চক্রবর্তী পরিপূর্ণ এক কাঁদি কলায়।
সেই কলা কভু লুপ্ত কভু বর্তমান।
কমলের বাগানের সব মর্তমান।

দেখ শশী, এখন নিজ্জর্ন হইল। তোমাকে গোটাকত কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

তুমি তোমার রূপ-গৌরবে গর্বিতা হইয়া যেখানে সেখানে ও রূপের ছড়াছড়ি করিও না। যখন পুত্র-শোকাতুরা মাতা বক্ষে করাঘাত করিয়া তোমার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ক্রন্দন করিতে থাকে, তখন তুমি তাহার কাছে রূপ দেখাইয়া কি করিবে? তখন কলঙ্কিনি! তোমার রূপরাশি গাঢ় মেঘাস্তুরালে লুক্কায়িত করিয়া রাখিও। যখন সংসারজ্বালাজালে লোকে দগ্ধ হইয়া তোমার দরবারে আসিয়া অভিযোগ করিবে, তখন তোমার সৌন্দর্য-বিকাশ তাহার কাছে করিও না; যে সংসারদগ্ধ, তাহার পক্ষে সে সৌন্দর্য তীর বিষ-ক্ষেপ-রূপ হইবে। বরং রক্তরাগে তাহার সহিত আলাপ করিও। যে সকলকে ঘৃণা করিয়াছে, কাহারও প্রীতি সে সহ্য করিতে পারে না। আর যে ঐহিক চরম সুখের সীমা উপলব্ধি করিয়া আত্মবিসর্জনে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাকে আর বৃথা আশা দিয়া সান্ধনা করিও না। তুমি এক্ষণে আমার এক-ভোগ্যা, তুমি আর কি দেখাইয়া অপরকে সান্ধনা করিবে? কিন্তু কমলাকান্তের সময় অসময় নাই, ঘটন বিঘটন নাই, সুখ দুঃখ নাই। তুমি সর্বদাই আমার নিকট আসিবে; তোমার নিজকথা আমাকে বলিবে, আমার কথা শুনিয়া যাইয়া, আপনার অন্তরে আপনার অস্থি-মজ্জার সহিত সেই কথা মিশাইয়া, রাখিয়া দিবে। তুমি জ্যেৎস্না রাগিতে আমার সহিত দেখা করিতে আসিও, ও কোমল কান্তি লইয়া অন্ধকারে বিচরণ করিও না। অদ্য আমাদের যে সুখের দিন, তাহা তুমি আমি ব্যতীত কে বৃদ্ধিতে পারিবে? অদ্য হইতে মাস গণনা করিয়া, প্রতি মাসের শেষে আমরা এই গঙ্গাতীরে শষ্প-বাসর সমাপন করিব। সকল পূর্ণ মাসেই তুমি হঠাৎ আমার কাছে আগমন করিও না; পঞ্জিকা-কারগণের সহিত দিন-ক্ষণের পরামর্শ করিয়া কমলাভিসারিণী হইও, নচেৎ একদিন রাহু তোমাকে পৃথিমধ্যে হঠাৎ মসীময়ী করিয়া ক্লিষ্ট করিবে। আর এই বিবাহ-রাগিতে নব বধুকে অধিক উপদেশ প্রদান করিতে গেলে ধর্ম-যাজকতার ভাণ হয়। সুতরাং অলমতিবিস্তরেণ।

এখন একবার,

কমল শশীর বাসর ঘরে,

ডাক রে কোকিল পঞ্চম স্বরে!

এখন শশী, একবার এই মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া তরঙ্গের উপর অপর-ছাঁদে নৃত্য কর দেখি! একবার কাল মেঘের ভিতর বেগে দৌড়াইয়া গিয়া, একবার অনন্ত গগনের অনন্ত পথে উল্টাইয়া পড় দেখি! একবার গভীর মেঘে ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া রক্তপথে এক চক্ষু দিয়া আমার দিকে মধুর দৃষ্টিপাত কর দেখি! একবার নক্ষত্রে নক্ষত্রে কলহ বাধাইয়া দিয়া, তাহারা যেমন পরস্পর সংগ্রাম করিতে আসিবে, অমনি তাহাদের উভয় দলের ব্যহ বিদীর্ণ করিয়া বেগে ধাবিত হও দেখি! একবার দ্রুত সঞ্চালনে শ্রান্তি বোধ করিয়া মৃত্তাবিনিন্দিত স্বেদবিন্দুসিক্ত কপালে ঘোমটা তুলিয়া দিয়া গগনগবাক্ষে স্থির দৃষ্টিতে বসিয়া বায়ু সেবন কর দেখি! একবার অজস্র সুধাবর্ষণ করিয়া চকোরচক্রের অপরিতৃপ্ত রসনার তৃপ্ত সাধন কর দেখি; একবার শূভক্ষণে কমলাকান্তের হৃদয়ে আবির্ভূত হও, কমলাকান্ত শয়ন করিল।

শশী, তুমি ক্ষীরোদ-সাগরজা ত্রিভুবন-বিহারিণী হইয়াও বালিকা-স্বভাব-সুলভ অভিমানের ভজনা করিলে? কমলাকান্ত কোন্ দোষে দোষী বলিতে পারি না—কখন একবার স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ-জটিলতা-জাল-ছেদনার্থ উদাহরণচ্ছলে প্রসন্নর নাম করিয়াছিলাম বলিয়া এত অভিমান

আজিকার রজনীতে ভাল দেখায় না। দেখ, তুমি কলঙ্কিনী, তবু আমি তোমাকে গ্রহণ করিলাম। তোমাকে বিবাহ করিয়াছি বলিয়া অদ্যবাধি Lunatic* নাম ধরিলাম। জ্যোতির্ষদেৱা বলিয়া থাকেন, তুমি পাষণী—তবু আমি তোমাকে বিবাহ করিলাম। তাঁহারা বলেন, তোমাতে মনুষ্যত্ব নাই, তবু আমি তোমাকে বিবাহ করিলাম। তবু রাগ?—তবে এই সংসার-গরল-খণ্ডন, এই গিরি-তরু-শিরসি-মণ্ডন, ঐ কর-লেখা আমার মাথায় তুলিয়া দাও। পার যদি, ঐ অনন্তনীল বৃন্দাবনে, মেঘের ঘোমটা একবার টানিয়া, একবার রাই মানিনী হইয়া বসো! আমি একবার স্ত্রীলোকের পায়ে ধরিয়া এ জড়জীবন সার্থক করিয়া লই।† আজ আমি শত দোষে দোষী হইলেও তোমা হইতেই আমার সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। তুমি আমার চান্দ্রায়ণের চন্দ্র-ফলক! আমার বৈতরণীর নবীন বৎস।

অমন করিলে আমি শত সহস্র বিবাহ করিব। এখন কমলাকান্ত নতন বিবাহের রীতি পদ্ধতি শিক্ষা করিয়াছে। কমল এখন স্বয়ং বর, কর্তা, পুরোহিত, ঘটক হইতে শিখিয়াছে। কমল এখন যেখানে সেখানে বিবাহ করিতে পারে। যখন দেখিব, নব পল্লবিকা শাখা-স্কন্ধ হইতে মুখ বাড়াইয়া করপত্র সঞ্চালনে আহ্বান করিতেছে, তখনই আমি তাহাকে বিবাহ করিব। যখন দেখিব, পদ্মমুখী স্বচ্ছ সরসী-দর্পণে আপনার মুখ বঙ্কিম গ্রীবায় নিরীক্ষণ করিয়া হাসিতেছে, তখনই আমি স্থলকমলে, জলকমলে মিশাইয়া দিব। যখন দেখিব, নিষ্কারণী রামধনুক ধরিয়া আনিয়া তাহাই লোফালুফি করিয়া খেলা করিতেছে, তখনই তাহাকে সেই ধনুঃ স্পর্শ করাইয়া শপথ দিয়া আমার সঙ্গিনী করিয়া লইব। যখন দেখিব, অনন্ত শয্যায় স্বর্ণাদী মণিভূষায় স্বেতাম্বরে ভূষিত হইয়া উত্তর দক্ষিণ শয়নে নিদ্রা যাইতেছে, তখনই তাহাকে পাণিগ্রহণে ধীরে ধীরে জাগরিত করিয়া অর্দ্ধাঙ্গের ভাগিনী করিব। যখন দেখিব, কুঞ্জলতা কাণে ঝুম্কা দোলাইয়া শ্যাম চিকুরাশি চারি দিকে ছড়াইয়া নিস্তরুভাবে মৃদু সৌর কিরণে ঈষত্তপ্ত হইতেছে, তখনই তাহার কেশগুচ্ছমধ্যে মস্তক সন্নিবেশিত করিয়া তাহার ঝুম্কা সরাইয়া দিয়া তাহার বরকে চিনাইয়া দিব। কমলাকান্ত চক্রবর্তী এখন বিবাহ করিতে শিখিল, ঘটকালী শিখিল, আর কাহারও উপাসনা করবে না। যদি তোমরা আমার পরামর্শে শ্রদ্ধা কর, ত আমার মত বিবাহ কর—আমি বেশ ঘটকালী জানি, তোমাদের মনের মত সামগ্রী মিলাইয়া দিব।

সপ্তম সংখ্যা—বসন্তের কোকিল

তুমি বসন্তের কোকিল, বেশ লোক। যখন ফুল ফুটে, দক্ষিণ বাতাস বহে, এ সংসার সুখের স্পর্শে শিহরিয়া উঠে, তখন তুমি আসিয়া রসিকতা আরম্ভ কর। আর যখন দারুণ শীতে জীবলোকে থরহরি কম্প লাগে, তখন কোথায় থাক, বাপু? যখন শ্রাবণের ধারায় আমার চালাঘরে নদী বহে, যখন বৃষ্টির চোটে কাক চিল ভিজিয়া গোময় হয়, তখন তোমার মাজা মাজা কালো কালো দুর্লাল ধরণের শরীরখানি কোথায় থাকে? তুমি বসন্তের কোকিল, শীত বর্ষার কেহ নও।

রাগ করিও না—তোমার মত আমাদের মাঝখানে অনেক আছেন। যখন নসী বাবুর তালুকের খাজনা আসে, তখন মানুষ-কোকিলে তাঁহার গৃহকুঞ্জ পুরিয়া যায়—কত টিকি, ফোঁটা, তেঁড়ি, চসমার হাট লাগিয়া যায়,—কত কবিতা, শ্লোক, গীত, হেটো ইংরেজি, মেটো ইংরেজি, চোরা ইংরেজি, ছেঁড়া ইংরেজিতে নসী বাবুর বৈঠকখানা পারাবত-কাকালি-সংকুল গৃহসৌধবৎ বিকৃত হইয়া উঠে। যখন তাঁহার বাড়ীতে নাচ, গান, যাত্রা, পর্বে উপস্থিত হয়, তখন দলে দলে মানুষ-কোকিল আসিয়া, তাঁহার ঘর বাড়ী আঁধার করিয়া তুলে—কেহ খায়, কেহ গায়, কেহ হাসে, কেহ কাশে, কেহ তামাক পোড়ায়, কেহ হাসিয়া বেড়ায়, কেহ মাত্রা চড়ায়, কেহ টেবিলের নীচে গড়ায়। যখন নসী বাবু বাগানে যান, তখন মানুষ-কোকিল, তাঁহার সঙ্গে পিপীড়ার সারি দেয়। আর যে রাতে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছিল, আর নসী বাবুর পত্রটির অকালে মৃত্যু

* চন্দ্রগ্রস্ত, চাঁদে পাওয়া বা পাগল।

† আমি জানি, কমলাকান্ত এক দিন প্রসন্ন গোয়ালার পায়ে ধরিয়াছেন। কিন্তু সে দৃষ্টির জন্য।

বিশ্বকম রচনাবলী

হইল, তখন তিনি একটি লোক পাইলেন না। কাহারও “অসুখ,” এজন্য আসিতে পারিলেন না; কাহারও বড় সুখ—একটি নাতি হইয়াছে, এজন্য আসিতে পারিলেন না; কাহারও সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হয় নাই, এজন্য আসিতে পারিলেন না; কেহ সমস্ত রাত্রি ঘোর নিদ্রায় অভিভূত, এজন্য আসিতে পারিলেন না। আসল কথা, সে দিন বর্ষা, বসন্ত নহে, বসন্তের কোকিল সে দিন আসিবে কেন?

তা ভাই, বসন্তের কোকিল, তোমার দোষ নাই, তুমি ডাক। ঐ অশোকের ডালে বসিয়া রাঙ্গা ফুলের রাশির মধ্যে কালো শরীর, জ্বলন্ত আগুনের মধ্যগত কালো বেগুনের মত, লুকাইয়া রাখিয়া, একবার তোমার ঐ পঞ্চম স্বরে, কু—উ বলিয়া ডাক। তোমার ঐ কু—উ রবটি আমি বড় ভালবাসি। তুমি নিজে কালো—পরান্নপ্রতিপালিত, তোমার চক্ষে সকলই “কু”—তবে যত পার, ঐ পঞ্চম স্বরে ডাকিয়া বল, “কু—উ”। যখন এ পৃথিবীতে এমন কিছু সুন্দর সামগ্রী দেখিবে যে, তাহাতে আমার ঘেঁষ, হিংসা, ঈর্ষার উদয় হয়, তখনই উচ্চ ডালে বসিয়া ডাকিয়া বলিও, “কু—উ”—কেন না, তুমি সৌন্দর্য্যশূন্য, পরান্নপ্রতিপালিত। যখনই দেখিবে, লতা সন্ধ্যার বাতাস পাইয়া, উপর্যুপরি বিন্যস্ত পুষ্প-স্তবক লইয়া দুলিয়া উঠিল, অর্মানি সুগন্ধের তরঙ্গ ছুটিল—তখনই ডাকিয়া বলিও, “কু—উঃ।” যখনই দেখিবে, অসংখ্য গন্ধরাজ এককালে ফুটিয়া আপনাদিগের গন্ধে আপনারা বিভোর হইয়া, এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে, তখনই তোমার সেই ডাল হইতে ডাকিয়া বলিও, “কু—উঃ।” যখন দেখিবে, বকুলের অতি ঘনবিন্যস্ত মধুরশ্যামল স্নিগ্ধোজ্জ্বল পত্ররাশির শোভা আর গাছে ধরে না—পূর্ণযৌবনা সুন্দরীর লাভ্যের ন্যায় হাসিয়া হাসিয়া, ভাসিয়া ভাসিয়া, হেলিয়া দুলিয়া, ভাসিয়া গলিয়া, উছলিয়া উঠিতেছে, তাহার অসংখ্য প্রস্ফুট কুসুমের গন্ধে আকাশ মাতিয়া উঠিতেছে—তখন তাহারই আশ্রয়ে বসিয়া, সেই পাতার স্পর্শে অঙ্গ শীতল করিয়া, সেই গন্ধে দেহ পবিত্র করিয়া, সেই বকুলকুঞ্জ হইতে ডাকিও, এ “কু—উঃ।” যখন দেখিবে, শূদ্র-মুখী, শূদ্রশরীরী, সুন্দরী নবমল্লিকা সন্ধ্যা-শিশিরে সিক্ত হইয়া, আলোক-প্রাথর্ব্যের হাস দেখিয়া, ধীরে ধীরে মুখখানি খুলিতে সাহস করিতেছে—স্তরে স্তরে অসংখ্য অকলঙ্ক দল-রাজি বিকসিত করিবার উপক্রম করিতেছে,—যখন দেখিবে যে, ভ্রমর সে রূপ দেখিয়া—“আদরেতে আগুসারি”—কণ্ঠভরা গুন্-গুন্ মধু ঢালিয়া দিতেছে—তখন, হে কালামুখ! আবার “কু—উঃ” বলিয়া ডাকিয়া মনের জ্বালা নিবাইও। আর যখনই গৃহস্থের গৃহপ্রাঙ্গণস্থ দাড়িম্বশাখায় বসিয়া দেখিবে, সেই গৃহপুষ্পরূপিণী কন্যাগণে সেই লতার দোলনি, সেই গন্ধরাজের প্রস্ফুটতা, সেই বকুলের রূপোচ্ছ্বাস, সেই মল্লিকার অমলতা, একাধারে মিলিত করিয়াছে, তখনই তাহাদের মুখের উপর, ঐ পঞ্চম-স্বরে, গৃহপ্রাচীর প্রতিধ্বনিত করিয়া, সবাইকে ডাকিয়া বলিও, এত রূপ, এত সুখ, এত পবিত্রতা—এ “কু—উঃ”! ঐটি তোমার জিত—ঐ পঞ্চম-স্বর! নহিলে তোমার ও কু—উ কেহ শুনিত না। এ পৃথিবীতে গ্লাডস্টোন, ডিস্ট্রেলি প্রভৃতির ন্যায়—তুমি কেবল গলাবাজিতে জিতিয়া গেলে—নহিলে অত কালো চলিত না; তোমার চেয়ে হাঁড়িচাঁচা ভাল। গলাবাজির এত গুণ না থাকিলে, যিনি বাজে নবেল লিখিয়াছেন, তিনি রাজমন্ত্রী হইবেন কেন? আর জন ষ্টুয়ার্ট মিল পার্লামেন্টে স্থান পাইলেন না কেন?

তবে, কোকিল, তুমি প্রকৃতির মহা-পার্লিয়ামেন্টে দাঁড়াইয়া নক্ষত্রময় নীলচন্দ্রাতপ-মণ্ডিত, গিরিনদীনগরকুঞ্জাদি বেগে সুসজ্জিত, ঐ মহাসভা-গৃহে, তোমার এ মধুর পঞ্চম-স্বরে—কু—উঃ বলিয়া ডাক—সিংহাসন হইতে হিষ্টিংস্ পর্য্যন্ত সকলেই কাঁপিয়া উঠুক। “কু—উঃ!” ভাল, তাই: ও কলকণ্ঠে কু বলিলে কু মানিব, সু বলিলে সু মানিব। কু বৈ কি? সব কু। লতায় কণ্টক আছে; কুসুমে কীট আছে; গন্ধে বিষ আছে; পত্র শূষ্ক হয়, রূপ বিকৃত হয়, স্ত্রীজাতি বণ্ডনা জানে। কু—উঃ বটে—তুমি গাও। কিন্তু তুমি ঐ পঞ্চম-স্বরে কু বলিলেই কু মানিব—নচেৎ কুকড়ো বাবাজি “কু কু কু কু” বলিয়া আমার সুখের প্রভাত নিদ্রাকে কু বলিলে আমি মানিব না। তার গলা নাই। গলাবাজিতে সংসার শাসিত হয় বটে, কিন্তু কেবল চেঁচাইলে হয় না; যদি শব্দ-মন্ত্রে সংসার জয় করিবে, তবে যেন তোমার স্বরে পঞ্চম লাগে—বে-পর্দা বা কড়িমধ্যমের কাজ নয়। সর্ জেমস্ মাকিণ্টশ্, তাহার বক্তৃতায় ফিলজফির* কড়িমধ্যম মিশাইয়া হারিয়া

* দর্শন।

গেলেন—আর মেকলে রেটারকের* পঞ্চম লাগাইয়া জিতিয়া গেলেন। ভারতচন্দ্র আদিরস পঞ্চমে ধরিয়া জিতিয়া গিয়াছেন—কবিকঙ্কণের ঋষভস্বর কে শূনে? দেখ, লোকের বৃদ্ধ পিতা-মাতার বেসুরো বকাবকিতে কোন্ ফল দর্শে? আর যখন বাবুর গৃহিণী বাবুর সুর বাঁধিয়া দিবার জন্য বাবুর কাণ টিপিয়া ধরিয়া পঞ্চমে গলার আওয়াজ দেন, তখন বাবু পিড়িং পিড়িং বলেন, কি না?

তবে তোমার স্বরকে পঞ্চম-স্বর কেন বলে, তাহা বুঝি না। যাহা মিষ্ট, তাহাই পঞ্চম? দুইটি পঞ্চম মিষ্ট বটে,—সুরের পঞ্চম, আর আল্‌তাপরা ছোট পায়ের গুজুরী পঞ্চম। তবে, সুর, পঞ্চমে উঠিলেই মিষ্ট; পায়ের পঞ্চম, পা হইতে নামাইলেই মিষ্ট।

কোন্ স্বর পঞ্চম, কোন্ স্বর সপ্তম, কে মধ্যম, কে গান্ধার, আমাকে কে বুঝাইয়া দিবে? এটি হাতীর ডাক, ওটি ঘোড়ার ডাক, সেটি ময়ূরের কেকা, ওটি বানরের কিচির্মিচি, এ বলিলে ত কিছু বুঝিতে পারি না। আমি আফিংখোর—বেসুরো শূনি, বেসুরো বুঝি, বেসুরো লিখি—ধৈবত গান্ধার নিষাদ পঞ্চমের কি ধার ধারি? যদি কেহ পাখোয়াজ তানপুরা দাড়ি দাঁত লইয়া আমাকে সপ্ত সুর বুঝাইতে আসে, তবে তাহার গজ্জন শূনিয়া, মঞ্জলা গাইয়ের সদ্যপ্রসূত বৎসের ধ্বনি আমার মনে পড়ে—তাহার পীতাবশিষ্ট নিজ্জল দুধের অনুধ্যানে মন ব্যস্ত হয়—সুর বুঝা হয় না। আমি গায়কের নিকট কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহাকে কায়মনোবাক্যে আশীর্বাদ করি, যেন তিনি জন্মান্তরে মঞ্জলার বৎস হন।

এখন আয়, পাখী! তোতে আমাতে একবার পঞ্চম গাই। তুইও যে, আমিও সে—সমান দুঃখের দুঃখী, সমান সুখের সুখী। তুই এই পুষ্পকাননে, বৃক্ষে বৃক্ষে আপনার আনন্দে গাইয়া বেড়াস্—আমিও এই সংসার-কাননে, গৃহে গৃহে, আপনার আনন্দে এই দপ্তর লিখিয়া বেড়াই—আয়, ভাই, তোতে আমাতে মিলে মিশে পঞ্চম গাই। তোরও কেহ নাই—আনন্দ আছে, আমারও কেহ নাই—আনন্দ আছে। তোর পুঁজিপাটা ঐ গলা; আমার পুঁজিপাটা এই আফিংগের ডেলা; তুই এ সংসারে পঞ্চম-স্বর ভালবাসিস্—আমিও তাই; তুই পঞ্চম-স্বরে কারে ডাকিস্? আমিই বা কারে? বল্ দেখি, পাখী, কারে?

যে সুন্দর, তাকেই ডাকি; যে ভাল, তাকেই ডাকি। যে আমার ডাক শূনে, তাকেই ডাকি। এই যে আশ্চর্য ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হইয়া আছি, ইহাকেই ডাকি। এই অনন্ত সুন্দর জগৎ-শরীরে যিনি আত্মা, তাঁহাকে ডাকি। আমিও ডাকি, তুইও ডাকিস্। জানিয়া ডাকি, না জানিয়া ডাকি, সমান কথা; তুইও কিছু জানিস্ না, আমিও জানি না; তোরও ডাক পের্ণিছেবে, আমারও ডাক পের্ণিছেবে। যদি সর্ব্বশব্দগ্রাহী কোন কণ্ঠ থাকে, তবে তোর আমার ডাক পের্ণিছেবে না কেন? আয়, ভাই, একবার মিলে মিশে দুই জনে পঞ্চম-স্বরে ডাকি।

তবে, কুহুরবে সাধা গলায়, কোকিল একবার ডাক্ দেখি রে! কণ্ঠ নাই বলিয়া, আমার মনের কথা কখন বলিতে পাইলাম না। যদি তোর ও ভুবন-ভুলান স্বর পাইতাম, ত বলিতাম। তুই আমার সেই মনের কথা প্রকাশ করিয়া দিয়া এই পুষ্পময় কুঞ্জবনে একবার ডাক্ দেখি রে! কি কথাটি বলিব বলিব মনে করি, বলিতে জানি না, সেই কথাটি তুই বল্ দেখি রে! কমলা-কান্তের মনের কথা, এ জন্মে বলা হইল না—যদি কোকিলের কণ্ঠ পাই—অমানুষী ভাষা পাই, আর নক্ষত্রদিগকে শ্রোতা পাই, তবে মনের কথা বলি। ঐ নীলাম্বরমধ্যে প্রবেশ করিয়া, ঐ নক্ষত্র-মণ্ডলীমধ্যে উড়িয়া, কখন কি কুহু বলিয়া ডাকিতে পাইব না? আমি না পাই, তুই কোকিল আমার হয়ে একবার ডাক্ দেখি রে?

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী

অষ্টম সংখ্যা—স্ত্রীলোকের রূপ

অনেক ভামিনী রূপের গৌরবে পা মাটিতে দেন না। ভাবেন, যে দিক্ দিয়া অঙ্গ দোলাইয়া চলিয়া যান, লাভণ্যের তরঙ্গে সে দিকের সংজ্ঞা ভুবিয়া যায়; নূতন জগতের সৃষ্টি হয়। তাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের রূপের ঝড় যে দিকে বয়, সে দিকে সকলের ধৈর্য্য-চালা উড়িয়া যায়, ধর্ম্ম-কোটা ভাঙ্গিয়া পড়ে; যখন পুরুষের মন-চড়ায় তাঁহাদের রূপের বান ডাকে, তখন তাঁহাদের

* অলঙ্কার।

বঙ্কিম রচনাবলী

কম্ম-জাহাজ, ধম্ম-পান্সী, বুদ্ধি-ডিঙ্গি, সব ভাসিয়া যায়। কেবল সৌন্দর্য্যভিমানিনী কামিনীকুলেরই এইরূপ প্রতীতি নহে; পদ্রুঘেরাও যখন মহিলাগণের মোহিনী শক্তির বশীভূত হইয়া তাঁহাদিগের রূপের মহিমা বর্ণনারম্ভ করেন, তখন যে তাঁহারাও কি বলেন, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। তখন গগনের জ্যোতিষ্ক, পৃথিবীর পর্বত, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, লতা-গুল্মাদি সকলকেই লইয়া উপমার জন্য টানাটানি পাড়ান—আবার অনেককেই অপমানিত করিয়া পাঠান। রূপসীর মুখমণ্ডলের সহিত তুলনা করিয়া তাঁহারা পূর্ণশশীকে নিমন্ত্রণ করিয়া আবার মসীবৎ ম্লান বলিয়া ফেরৎ পাঠান; গরিব চাঁদ, আপনার কলঙ্ক আপনি বৃকে করিয়া রাতারাতি আকাশের কাজ সারিয়া পলায়ন করে। সুন্দরীর ললাটের সিন্দূরবিন্দু দেখিয়া তাঁহারা উষার সীমস্ত-শোভা তরুণ তপনের নিন্দা করেন; রাগে সূর্য্যদেব, পৃথিবী দক্ষ করিয়া চলিয়া যান। রসময়ীর আস্যের হাস্যরাশি অবলোকন করিয়া প্রফুল্ল কমলে সৌর-রশ্মির লাস্য বা বিকসিত কুমুদে কোমুদীর নৃত্য তাঁহারা আর ভালবাসেন না; সেই অবধি কমল কুমুদে কীট-পতঙ্গের অধিকার। কামিনীর কণ্ঠহার নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহারা নিশার তারকামালার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন; বোধ করি, ভবিষ্যতে জ্যোতিষের অনুশীলন ত্যাগ করিয়া, তাঁহারা স্বর্ণকারের বিদ্যায় মন দিবেন। রঙ্গিণীর শরীরসঞ্চালনে তাঁহারা এত লাভগলীলা বিলোকন করেন যে, জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে মন্দ মন্দ আন্দোলিত বৃক্ষপত্র বা নিয়ত কম্পিত সিন্দূরহিল্লোলে চন্দ্রিকার খেলায় তাঁহাদিগের আর মন উঠে না। এই জন্যই বা, রাত্রে নিদ্রা যান, এবং নদীকে কলসী কলসী করিয়া শূষিতে থাকেন। আবার যখন রমণীর নয়ন বর্ণন করেন, তখন সরোবরের মলয়-মারুতে দৌদুল্যমান নীলোৎপল দূরে থাকুক, বিশ্বমণ্ডলের কিছুই তাঁহাদিগের ভাল লাগে না।

এই নারীমূর্ত্তির স্তাবককুলের উপমানভবশক্তির কিছু প্রশংসা করিতে হয়। এক চক্ষু, তাঁহাদিগের কল্পনাপ্রভাবে কখন পক্ষী, যথা খঞ্জন, চকোর; কখন মৎস্য, যথা সফরী; কখন উদ্ভিদ, যথা পদ্ম, পদ্মপলাশ, ইন্দীবর; কখন জড় পদার্থ, যথা আকাশের তারা। এক চন্দ্র, কখনও রমণীর মুখমণ্ডল, কখনও তাহার পায়ের নখর।* উচ্চ কৈলাস-শিখর, এবং ক্ষুদ্র কোমল কোরক, একেরই উপমানস্থল; কিন্তু ইহাতেও কুলায় না বলিয়া দাড়িম্ব, কদম্ব, করিকুম্ভ এই বিষম উপমাশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছে। জলচর ক্ষুদ্র পক্ষী হংস, এবং স্থলচর প্রকাণ্ড চতুষ্পদ হস্তী, ইহাদিগের গমনে বৈষম্য থাকাই স্বাভাবিক উপলব্ধি; কিন্তু কবিদিগের চক্ষে উভয়েই রমণী-কুল-চরণ-বিন্যাসের অনুকারী। আবার যে সে হাতীর গমনের সহিত, এই হংসগামিনীদিগের গমনসাদৃশ্য নির্দেশ করা বিধেয় নহে; যে হাতী হাতীর রাজা, সেই হাতীর সঙ্গেই গজেন্দ্র-গামিনীগণের গতি তুলনীয়। শূনিয়াছি, হাতী এক দিনে অনেক দূর যাইতে পারে; অশ্বাদি কোন পশু তত পারে না। যাঁহাদিগকে দূরে যাইতে হয়, তাঁহারা এই গজেন্দ্রগামিনীদিগের পিঠে চড়িয়া যান না কেন? যে দিকে রেলওয়ে হয় নাই, সে দিকে বাঁছিয়া বাঁছিয়া গজগামিনী মেয়ের ডাক বসাইলে কেমন হয়?

আমিও এক কালে কামিনীভক্ত কবিদলভুক্ত ছিলাম। আমি তখন এই অখিল সংসারে রমণীর ন্যায় সুন্দর বস্তু আর দেখিতে পাইতাম না। চম্পক, কমল, কুন্দ, বন্ধুজীব, শিরীষ, কদম্ব, গোলাপ প্রভৃতি পুষ্পচয় তখন কামিনী-কান্তি-গ্রথিত কুসুম-মালিকার ন্যায় মনোহর বোধ হইত না। বলিতে কি, বসন্তের কুসুমবতী বসুমতী অপেক্ষাও আমি কুসুমময়ী মহিলাকে ভালবাসিতাম; বর্ষার উচ্ছ্বাসিত-সলিলা চিররঙ্গিণী তরঙ্গিণী অপেক্ষাও রসবতী যুবতীর পক্ষপাতী ছিলাম। কিন্তু এক্ষণে আর আমার সে ভাব নাই। আমার দিব্যজ্ঞান হইয়াছে। আমি মায়াময়ী মানবীমণ্ডলের কুহক-জাল ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া পলায়ন করিয়াছি। জালিয়ার পচা জালে রাঘব বোয়াল পড়িলে, যেমন জাল ছিঁড়িয়া পলায়ন করে, আমি তেমন পলায়ন করিয়াছি; ক্ষুদ্র মাকড়সার জালে যেমন গুব্বরে পোকা পড়িলে জাল ছিঁড়িয়া পলায়ন করে, আমি তেমন পলায়ন করিয়াছি; দুরন্ত গোরু একবার দড়ি ছিঁড়িতে পারিলে যেমন উদ্ধর্শ্বাসে পলায়ন করে, আমি তেমন দৌড় মারিয়া পলায়ন করিয়াছি। সকলেই আফিমের প্রসাদে!

* আমার বিবেচনায় চন্দ্রের সহিত নখরের তুলনা অতি সুন্দর—কেন না, উত্তম পদবিন্যাস হইতে পারে—যথা, নখর-নিকর-হিমকর-করম্বিত কোকিল-কুঞ্জিত কুঞ্জকুটীরে।—এটি আমার নিজের রচনা।

হে মাতঃ আফিম দেবি! তোমার কোঁটা অক্ষয় হউক। তুমি বৎসর বৎসর সোণার জাহাজে চাঁড়িয়া চীনদেশে পূজা খাইতে যাও! জাপান, সাইবিরিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, সকলই তোমার অধিকারভুক্ত হউক; তোমার নামে দেশে দেশে দুর্গোৎসব হউক। কমলাকান্তকে পায়ে রাখিও। আমি তোমার কৃপায় সাধারণের উপকারার্থে নিজের মন খুলিয়া দুই চারিটি কথা বলিব।

কথা শুনিয়া কেবল স্ত্রীলোক কেন, অনেক পুরুষেও আমাকে পাগল বলিবেন। বলুন, ক্ষতি নাই। নূতন কথা যে বলে, সেই পাগল বলিয়া গণ্য হয়। গালিলিও* বলিলেন, পৃথিবী ঘুরিতেছে। ইতালীয় ভদ্র সমাজ, ধার্মিক সমাজ, বিদ্বান্ সমাজ শুনিয়া হাসিলেন; শুনিয়া স্থির করিলেন, গালিলিওর মতিভ্রম হইয়াছে। কালের স্রোত বহিয়া গেল। ইতালীর ভদ্র সমাজ, ধার্মিক সমাজ, বিদ্বান্ সমাজ আর পৃথিবী ঘুরিতেছে শুনিলে হাসেন না; গালিলিওকে আর মতিভ্রান্ত জ্ঞান করেন না।

সকলে সৌন্দর্য্য বিষয়ে স্ত্রীলোকের প্রাধান্য স্বীকার করেন। বিদ্যা, বুদ্ধি, বলে পুরুষের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার পাইয়াও, রূপের টিকা স্ত্রীলোকের মস্তকে দেন। আমার বিবেচনায় এটি মস্ত ভুল। আমি দিব্য চক্ষে দেখিয়াছি যে, পুরুষের রূপ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের রূপ অনেক দূর নিকৃষ্ট। হে মানময়ী মোহিনীগণ! কুটিল কটাক্ষে কালকট বর্ষণ করিয়া আমাকে এই দোষে দঙ্ক করিও না; কালসর্পি-বিনিন্দিত বেণীদ্বারা আমাকে বন্ধন করিও না, ভ্রু-ধনুতে কোপে তীক্ষ্ণ শর যোজনা করিয়া আমাকে বিদ্ধ করিও না। বলিতে কি, তোমাদের নিন্দা করিতে ভয় করে। পথ বুকিয়া যদি তোমরা নথ-ফাঁদ পাতিয়া রাখ, তবে কত হস্তী বন্ধচরণ হইয়া, তোমাদের নাকে ঝুলিতে পারে—কমলাকান্ত কোন্ ছার! তোমাদের নথের নোলক খসিয়া পড়িলে, মানুষ খুন হইবার অনেক সম্ভাবনা; চন্দ্রহারের একখানি চাঁদ যদি স্থানচ্যুত হইয়া কাহারও গায়ে লাগে, তবে তাহার হাত পা ভাঙ্গা বিচিত্র নহে। অতএব তোমরা রাগ করিও না। আর হে রমণীপ্রিয়, কম্পনাপ্রিয়, উপমাপ্রিয় কবিগণ, তোমাদিগের স্ত্রীদেবীর সুখময়ী সুবর্ণময়ী প্রতিমা ভাঙ্গিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি বলিয়া, তোমরা আমাকে মারিতে উদ্যত হইও না। আমি সপ্রমাণ করিয়া দিব যে, তোমরা কুসংস্কারাবিষ্ট পৌত্তলিক। তোমরা উপাস্য দেবতার প্রকৃত মূর্ত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিকৃত প্রতিমূর্ত্তির পূজা করিতেছ।

যাহার সুন্দর কেশপাশ আছে, সে আর পরচূলা ব্যবহার করে না। যাহার উজ্জ্বল ভাল দাঁত আছে, তাহার কৃগ্রিম দস্তুর প্রয়োজন হয় না। যাহার বর্ণে লোকের মন হরণ করে, তাহার আর রং মাখিয়া লাভণ্য বৃদ্ধি করিতে হয় না। যাহার নয়ন আছে, তাহার আর কাচের চক্ষুর আশ্রয় লইতে হয় না। যাহার চরণ আছে, তাহাকে আর কাষ্ঠপদ অবলম্বন করিতে হয় না। এইরূপ যাহার যে বস্তু আছে, সে তাহার জন্য লালিয়াত হয় না। যে বুকিতে পারে যে, প্রকৃতি কোন পদার্থে তাহাকে বর্ণিত করিয়াছেন, সেই তদ্বিষয়ে আপনার অভাব মোচনার্থে যত্ন করিয়া থাকে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমি স্থির করিয়াছি যে, স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সৌন্দর্য্যের অত্যন্ত অভাব। তাহারা সর্ব্বদা আপন আপন রূপ বাড়াইতে ব্যস্ত; কি উপায়ে আপনাকে সুন্দরী দেখাইবে, ইহা লইয়াই উন্মাদিনী; ভাল ভাল অলঙ্কার কিসে পাইবে, নিয়ত ইহাই তাহাদিগের ভাবনা, ইহাই তাহাদিগের চেষ্টা; এমন কি, বলা যাইতে পারে যে, অলঙ্কারই তাহাদিগের জপ, অলঙ্কারই তাহাদিগের তপ, অলঙ্কারই তাহাদিগের ধ্যান, অলঙ্কারই তাহাদিগের জ্ঞান। স্বীয় দেহ সজ্জিত করিতে এত যাহাদিগের যত্ন, তাহাদিগের প্রকৃত সৌন্দর্য্য যে অধিক আছে, এরূপ বোধ হয় না। যাহার নাক সুন্দর নহে, সেই নাকে নথরূপ রঞ্জুতে নোলক জগন্নাথকে দোলায়; যাহার কাণ সুন্দর নহে, সেই ঢাকাই-কানরূপ নানা ফলফুল পশুপক্ষিবিশিষ্ট বাগানের ঘোড়া কাণে ঝুলাইয়া দেয়। যাহার হৃদয় ভাল নহে, সেই সেখানে সাতনর ফাঁসির দাঁড়ি টাঙ্গাইয়া পুরুষজাতির, বিশেষতঃ স্তন্যপায়ী বালকদিগের ভীতি বিধান করে। যে অলঙ্কার বিনাও আপনাকে সুন্দরী বলিয়া জানে, সে কখন অলঙ্কারের বোঝা বহিতে এত ব্যগ্র হয় না। পুরুষে ভূষণ বিনা সম্ভূষ্ট থাকে; স্ত্রীলোক ভূষণ বিনা মনুষ্যসমাজে মুখ দেখাইতে লজ্জা পায়। অতএব স্ত্রীলোকদিগের নিজের ব্যবহার দ্বারা বৃদ্ধা যাইতেছে যে পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীজাতি সৌন্দর্য্যবিষয়ে নিকৃষ্ট।

* কাপার্নিকস্ P. D.

বিক্রম রচনাবলী

স্ত্রীজাতি অপেক্ষা যে পুরুষজাতির সৌন্দর্য্য অধিক; প্রকৃতির সৃষ্টি-পদ্ধতি সমালোচনা করিয়া দেখিলে আরও স্পষ্ট প্রীতি হইবে। যে বিস্তীর্ণ চন্দ্রকলাপ দেখিয়া জলদম্ভকুট ইন্দ্রধনু হারি মানে, সে চন্দ্রকলাপ ময়ূরের আছে; ময়ূরীর নাই। যে কেশরে সিংহের এত শোভা, তাহা সিংহীর নাই। যে ঝড়টিতে বৃষভের কাঁপ্তি বৃদ্ধি করে, গাভীর তাহা নাই। কুক্কটের যেমন সুন্দর তাম্বচুড়া ও পক্ষ সকল আছে, কুক্কটীর তেমন নাই। এইরূপ দেখিতে পাইবে যে, উচ্চ শ্রেণীর জীবদিগের মধ্যে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ সুশ্রী। মনুষ্য সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সৃষ্টিকর্তা যে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছেন, এমন বোধ হয় না। হে মূল “বিদ্যাসুন্দর”কার! তোমার মনে কি এই তত্ত্বটি উদ্ভূত হইয়াছিল? এজন্যই কি তুমি নায়কের নাম সুন্দর রাখিয়াছিলে? তুমি কি বুঝিয়াছিলে যে, স্ত্রীলোক যত কেন বিদ্যাবতী হউক না, পুরুষের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ও বৃদ্ধির নিকটে তাহাকে পরাভব স্বীকার করিতে হইবে।

সৌন্দর্য্যের বাহার যৌবনকালে। কিন্তু, রূপাঙ্ক ভামিনীগণ! তোমাদিগের যৌবন কতক্ষণ থাকে? জোয়ারের জলের মত আসিতে আসিতেই যায়। কুড়ি হইলেই তোমরা বৃড়ী হইলে। অল্প দিনের মধ্যেই তোমাদিগের অঙ্গ সকল শিথিল হইয়া পড়ে। বয়স আসিয়া শীঘ্রই তোমাদিগের গলার লাবণ্য-মালা ছিঁড়িয়া লয়। চল্লিশ পঁয়তাল্লিশে পুরুষের যে শ্রী থাকে, বিশ পঁচিশের উদ্বেদ তোমাদিগের তাহা থাকে না। তোমাদিগের রূপের স্থিতি সৌদামিনীর ন্যায়, ইন্দ্রধনুর ন্যায়, মুহূর্ত্তেক জন্য না হউক, অত্যল্প কালের জন্য সন্দেহ নাই। যাহারা রূপোপ-ভোগে উন্মত্ত, আমি আহায়ে বসিলেই তাহাদের যন্ত্রণা অনুভূত করিতে পারি;—আমার জীবনে ঘোর দুঃখ এই যে, অল্প ব্যঞ্জন পাতে দিতে দিতেই ঠাণ্ডা হইয়া যায়। তেমনি, স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্যরূপ বুকুড়ি চালের ভাত, প্রণয়-কলাপাতে ঢালিতে ঢালিতে ঠাণ্ডা হইয়া যায়—আর কাহার সাধ্য খায়? শেষে বেশভূষারূপ তেঁতুল মাখিয়া, একটু আদর-লবণের ছিটা দিয়া কোনরূপে গলাধঃকরণ করিতে হয়।

হে সৌন্দর্য্যগর্ষিত কামিনীকুল! সত্য করিয়া বল দেখি, এই রূপ ক্ষণস্থায়ী বলিয়াই কি তোমাদিগের রূপের এত আদর? ভাল করিয়া দেখিতে না দেখিতে, ভাল করিয়া উপভোগ করিতে না করিতে অন্তর্হিত হইয়া যায় বলিয়া। তোমাদিগের রূপের জন্য কি পুরুষেরা পিপাসিত চাতকের ন্যায় উন্মত্ত? অপরিজ্ঞাত হারাধন বলিয়াই কি তোমরা উহার প্রকৃত মূল্য-নির্ণয়ে অশক্ত? কেবল ক্ষণস্থায়ী পদার্থ বলিয়া নয়, অপর কারণেও স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করে। যে সকল গ্রন্থকারদিগের মত ভূমণ্ডলে গ্রাহ্য হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই পুরুষ, এ কারণে আমার বিবেচনায় অনুরাগনেত্র কামিনীকুলের রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কথাই আছে, “যার যাতে মজে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম।” যে রমণীগণ প্রণয়ের পদার্থ, তাহাদিগকে কে সহজ চক্ষুতে দেখিবে? সুন্দর মুকুরের প্রভাবে দৃষ্ট বস্তু কুৎসিত হইলেও সুন্দর দেখাইবে। মনোমোহিনীর রূপ নিরীক্ষণকালে তাহাকে প্রীতির অঞ্জে মাখাইয়া দেখিব। পুরুষাপেক্ষা তাহার মাধুর্য্য কেন না অধিক বোধ হইবে?

হে প্রণয়দেব, পাশ্চাত্য কবিরা তোমাকে অঙ্ক বলিয়াছেন। কথাটা মিথ্যা নয়। তোমার প্রভাবে লোকে প্রিয় বস্তুর দোষ দেখিতে পায় না। তোমার অঞ্জে যাহার নেত্র রঞ্জিত হইয়াছে, সে বিশ্ববিমোহন পদার্থ-পরম্পরায় পরিবৃত্ত থাকে। বিকট মূর্ত্তিকে সে মনোহর দেখে। ককর্শ স্বরকে সে মধুময় ভাবে। প্রেতিনীর অঙ্গ-ভঙ্গীকে মৃদু-মন্দ মলয়-মারুতে দৌদুল্যমানা ললিতলবঙ্গলতার লাবণ্যলীলা অপেক্ষাও সুখকরী জ্ঞান করে। এজন্যই চীনদেশে খাঁদা নাকের আদর। এজন্যই বিলাতী বিবিদের রাজা চুল ও বিড়াল চোকের আদর। এজন্যই কাফ্রিদেশে স্থূল ওষ্ঠাধরের আদর। এজন্যই বাঙ্গালদেশের উষ্ণ-চিহ্নিত মিশি-কলিষ্কিত চাঁদবদনের আদর। এজন্যই মানবসমাজে স্ত্রীরূপের আদর। আর যদি স্ত্রীলোকেরা পুরুষের ন্যায় মনের কথা মুখে আনিতেন, তাহা হইলে, হে প্রণয়দেব, নিজের গুণে হউক না হউক, অন্ততঃ তোমার গুণেও আমরা শূন্য হইতাম যে, পুরুষের সৌন্দর্য্যের কাছে স্ত্রীলোকের রূপ কিছু নয়। যদিও অন্তরের গুপ্ত ভাব বাক্যদ্বারা ব্যক্ত করিতে মহিলাগণ অত্যন্ত সঙ্কুচিতা, তথাপি কার্য্যদ্বারা তাহাদিগের আন্তরিক গুঢ় তত্ত্বগুলি কিয়ৎপরিমাণে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কে না দেখিয়াছে যে, সুন্দরীরা পরম্পরের সৌন্দর্য্য স্বীকার করিতে চাহেন না, অথচ পুরুষের ভক্ত হইয়া বসেন?

বিশ্বকম রচনাবলী

ভ্রমর ভেঁ করিয়া স্থলপদ্মের বৈঠকখানায় গিয়া রাজপদ্মের সঙ্গে ইয়ারকি করিতে বসিলেন। এদিকে মল্লিকার সন্ধ্যাঠাকুরাণী-দিদি আসিয়া তাহাকে কত বদ্বাইতে লাগিল—বলিল, “দিদি, একবার ঘোমটা খোল—নইলে, বর আসিবে না—লক্ষ্মী আমার, চাঁদ আমার, সোণা আমার, ইত্যাদি।” কলিকা কত বার ঘাড় নাড়িল, কত বার রাগ করিয়া মুখ ঘুরাইল, কত বার বলিল, “ঠান্দিদি, তুই যা!” কিন্তু শেষে সন্ধ্যার স্নিগ্ধ স্বভাবে মৃদু হইয়া মুখ খুলিল। তখন ঘটক মহাশয় ভেঁ করিয়া রাজবাড়ী হইতে নামিয়া আসিয়া ঘটকালীতে মন দিলেন। কন্যার পরিমলে মৃদু হইয়া বলিলেন, “গুণ্ গুণ্ গুণ্, গুণ্ গুণাগুণ্! কন্যা গুণবতী বটে। ঘরে মধু কত?”

কন্যাকর্তা বৃক্ষ বলিলেন, “ফন্দ দিবেন, কড়ায় গুড়ায় বদ্বাইয়া দিব।” ভ্রমর বলিলেন, “গুণ্ গুণ্, আপনার অনেক গুণ—ঘটকালীটা?”

কন্যাকর্তা শাখা নাড়িয়া সায় দিল, “তাও হবে।”

ভ্রমর—“বলি ঘটকালীর কিছুর আগাম দিলে হয় না? নগদ দান বড় গুণ—গুণ্ গুণ্ গুণ্।”

ক্ষুদ্র বৃক্ষটি তখন বিরক্ত হইয়া, সকল শাখা নাড়িয়া বলিল, “আগে বরের কথা বল—বর কে?”

ভ্রমর—“বর অতি সুপাত্র।—তাঁর অনেক গুণ-ন্ ন্।”

“কে তিনি?”

“গোলাবলাল গঙ্কোপাধ্যায়। তাঁর অনেক—গুণ্-ন-ন।”

এ সকল কথোপকথন মনুষ্যে শুনিতে পায় না, আমি কেবল আফিমপ্রসাদাৎ দিব্য কণ্ পাইয়াই এ সকল শুনিতোঁছিলাম। আমি শুনিতে লাগিলাম, কুলাচার্য মহাশয়, পাখা ঝাড়িয়া, ছয় পা ছড়াইয়া গোলাবের মহিমা কীর্তন করিতেছিলেন। বলিতোঁছিলেন যে, গোলাব বংশ বড় কুলীন; কেন না, ইহারা “ফুলে” মেল। যদি বল, সকল ফুলই ফুলে, তথাপি গোলাবের গৌরব অধিক; কেন না, ইহারা সাক্ষাৎ বাঞ্জামালীর সন্তান; তাহার স্বহস্তরোপিত। যদি বল, এ ফুলে কাঁটা আছে, কোন্ ফুলে বা কোন্ ফুলে নাই?

যাহা হউক, ঘটকরাজ কোনরূপে সম্বন্ধ স্থির করিয়া, বেঁ করিয়া উড়িয়া গিয়া, গোলাব বাবুর বাড়ীতে খবর দিলেন। গোলাব, তখন বাতাসের সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া, হাসিয়া হাসিয়া, লাফাইয়া লাফাইয়া খেলা করিতেছিল, বিবাহের নাম শুনিয়া আহুদিত হইয়া কন্যার বয়স জিজ্ঞাসা করিল। ভ্রমর বলিল, “আজি কালি ফুটিবে।”

গোধূলি লগ্ন উপস্থিত, গোলাব বিবাহে যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। উচ্চিঙ্গড়া নহবৎ বাজাইতে আরম্ভ করিল; মোমাছি সানাইয়ের বায়না লইয়াছিল, কিন্তু রাতকাণা বলিয়া সঙ্গে যাইতে পারিল না। খদ্যোতেরা ঝাড় ধরিল; আকাশে তারাভাজি হইতে লাগিল। কোকিল আগে আগে ফুকরাইতে লাগিল। অনেক বরযাত্র চলিল; স্বয়ং রাজকুমার স্থলপদ্ম দিবাবসানে অসুস্থকর বলিয়া আসিতে পারিলেন না, কিন্তু জবাগোষ্ঠী—শ্বেত জবা, রক্ত জবা, জরদ জবা প্রভৃতি সবংশে আসিয়াছিল। করবীরের দল, সেকেলে রাজাদিগের মত বড় উচ্চ ডালে চড়িয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। সেঁউতি নীতবর হইবে বলিয়া, সাজিয়া আসিয়া দুলিতে লাগিল। গরদের জোড় পরিয়া চাঁপা আসিয়া দাঁড়াইল—বেটা ব্রান্ড টানিয়া আসিয়াছিল, উগ্র গন্ধ ছুটিতে লাগিল। গন্ধরাজেরা বড় বাহার দিয়া, দলে দলে আসিয়া, গন্ধ বিলাইয়া দেশ মাতাইতে লাগিল। অশোক নেশায় লাল হইয়া আসিয়া উপস্থিত; সঙ্গে এক পাল পিপড়া মোসায়ের হইয়া আসিয়াছে; তাহাদের গুণের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, কিন্তু দাঁতের জ্বালা বড়—কোন্ বিবাহে না এরূপ বরযাত্র জোটে, আর কোন্ বিবাহে না তাহারা হুল ফুটাইয়া বিবাদ বাধায়? কুরুবক, কুটজ প্রভৃতি আরও অনেক বরযাত্র আসিয়াছিলেন, ঘটক মহাশয়ের কাছে তাঁহাদের পরিচয় শুনিলেন। সম্বরণই তিনি যাতায়াত করেন এবং কিছুর কিছুর মধু পাইয়া থাকেন।

আমারও নিমন্ত্রণ ছিল, আমিও গেলাম। দেখি, বরপক্ষের বড় বিপদ। বাতাস বাহকের বায়না লইয়াছিলেন; তখন হুঁ—হুঁ করিয়া অনেক মর্দানি করিয়াছিলেন, কিন্তু কাজের সময় কোথায় লুকাইলেন, কেহ খুঁজিয়া পায় না। দেখিলাম, বর বরযাত্র, সকলে অবাক হইয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। মল্লিকাদিগের কুল যায় দেখিয়া, আমিই বাহকের কার্য স্বীকার করিলাম। বর, বরযাত্র সকলকে তুলিয়া লইয়া মল্লিকাপদরে গেলাম।

সেখানে দেখিলাম, কন্যাকুল, সকল ভাগিনী, আহ্লাদে ঘোমটা খুলিয়া, মুখ ফুটাইয়া, পরিমল ছুটাইয়া, সুখের হাসি হাসিতেছে। দেখিলাম, পাতায় পাতায় জড়াজড়ি, গন্ধের ভাণ্ডারে ছড়াছড়ি পড়িয়া গিয়াছে—রূপের ভরে সকলে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। যুথি, মালতী, বকুল, রজনীগন্ধ প্রভৃতি এয়োগণ স্ত্রী-আচার করিয়া বরণ করিল। দেখিলাম, পুরোহিত উপস্থিত; নসী বাবুর নবমবর্ষীয়া কন্যা (জীবন্ত কুসুমরূপিনী) কুসুমলতা সূচ সূতা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে; কন্যাকর্তা কন্যা সম্প্রদান করিলেন; পুরোহিত মহাশয় দুই জনকে এক সূতায় গাঁথিয়া গাঁটছড়া বাঁধিয়া দিলেন।

তখন বরকে বাসর-ঘরে লইয়া গেল। কত যে রসময়ী মধুময়ী সুন্দরী সেখানে বরকে ঘেরিয়া বসিল, তাহা কি বলিব। প্রাচীনা ঠাকুরাণীদিদি টগর সাদা প্রাণে বাঁধা রসিকতা করিতে করিতে শূকাইয়া উঠিলেন। রঙ্গের রাঙ্গামুখে হাসি ধরে না। যুই, কন্যের সহ, কন্যের কাছে গিয়া শূইল; রজনীগন্ধকে বর তাড়কা রাক্ষসী বলিয়া কত তামাসা করিল; বকুল একে বালিকা, তাতে যত গুণ, তত রূপ নহে; এক কোণে গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; আর কুম্কা ফুল বড় মানুষের গৃহিণীর মত মোটা মাগী নীল শাড়ী ছড়াইয়া জমকাইয়া বসিল। তখন—

“কমলকাকা—ওঠ বাড়ী যাই—রাত হয়েছে, ও কি, ঢুলে পড়বে যে?”

কুসুমলতা এই কথা বলিয়া আমার গা ঠেলিতেছিল;—চমক হইলে, দেখিলাম কিছুই নাই। সেই পুষ্পবাসর কোথায় মিশিল?—মনে করিলাম, সংসার অনিত্যই বটে—এই আছে, এই নাই। সে রম্য বাসর কোথায় গেল,—সেই হাস্যমুখী শূভ্রস্মিতসুধাময়ী পুষ্পসুন্দরীসকল কোথায় গেল? যেখানে সব যাইবে, সেইখানে—স্মৃতির দর্পণতলে, ভূতসাগরগর্ভে। যেখানে রাজা প্রজা, পর্বত সমুদ্র, গ্রহ নক্ষত্রাদি গিয়াছে বা যাইবে, সেইখানে—ধ্বংসপুরে! এই বিবাহের ন্যায় সব শূন্যে মিশাইবে, সব বাতাসে গলিয়া যাইবে—কেবল থাকিবে—কি? ভোগ? না, ভোগ্য না থাকিলে ভোগ থাকিতে পারে না। তবে কি? স্মৃতি?

কুসুম বলিল, “ওঠ না—কি কচ্চো?”

আমি বলিলাম, “দূর পাগলি, আমি বিয়ে দিচ্ছিলাম।”

কুসুম ঘেঁষে এসে, হেসে হেসে কাছে দাঁড়াইয়া আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কার বিয়ে, কাকা?”

আমি বলিলাম, “ফুলের বিয়ে।”

“ওঃ পোড়া কপাল, ফুলের? আমি বলি কি! আমিও যে এই ফুলের বিয়ে দিয়েছি।”

“কই?”

“এই যে মালা গাঁথিয়াছি।” দেখিলাম, সেই মালায় আমার বর কন্যা রহিয়াছে।

দশম সংখ্যা—বড় বাজার

প্রসন্ন গোয়ালিনীর সঙ্গে আমার চিরবিচ্ছেদের সম্ভাবনা দেখিতেছি। আমি নসীরাম বাবুর গৃহে আসিয়া অবধি তাহার নিকট ক্ষীর সর, দধি দুগ্ধ এবং নবনীত খাইতেছি। আহারকালে মনে করিতাম, প্রসন্ন কেবল পরলোকে সঙ্গতির কামনায় অনন্ত পুণ্য সঞ্চয় করিতেছে:—জানিতাম, সংসারারণ্যে যাহারা পুণ্যরূপ মৃগ ধরিবার জন্য ফাঁদ পাতিয়া বেড়ায়, প্রসন্ন তন্মধ্যে সূচতুরা; ভোজনান্তে নিত্যই প্রসন্নের পরকালে অক্ষয় স্বর্গ, এবং ইহকালে মৌতাত বৃদ্ধির জন্য দেবতার কাছে প্রার্থনা করিতাম। কিন্তু এক্ষণে হায়! মানব-চরিত্র কি ভীষণ স্বার্থপরতায় কলঙ্কিত! এক্ষণে সে মূল্য চাহিতেছে!

সুতরাং তাহার সঙ্গে চিরবিচ্ছেদের সম্ভাবনা। প্রথম দিন সে যখন মূল্য চাহিল, রসিকতা করিয়া উড়াইয়া দিলাম—দ্বিতীয় দিনে বিস্মিত হইলাম—তৃতীয় দিনে গালি দিয়াছি। এক্ষণে সে দুধ দই বন্ধ করিয়াছে। কি ভয়ানক! এত দিনে জানিলাম, মনুষ্যজাতি নিতান্ত স্বার্থপর; এত দিনে জানিয়াছি যে, যে সকল আশা ভরসা সযত্নে হৃদয়ক্ষেত্রে রোপণ করিয়া বিশ্বাস-জলে পুষ্ট কর, সকলই বৃথা। এক্ষণে জানিয়াছি যে, ভক্তি প্রীতি স্নেহ প্রণয়াদি সকলই বৃথা গল্প—আকাশকুসুম! ছায়াবাজি! হায়! মনুষ্যজাতির কি হইবে! হায়, অর্থলব্ধ গোয়ালী জাতিকে কে নিস্তার করিবে! হায়! প্রসন্ন নামে গোয়ালীর কবে গোরু চুরি যাবে!

বিক্রম রচনাবলী

প্রসন্নের দুগ্ধ দধি আছে, সে দিবে, আমার উদর আছে, খাইব, তাহার সঙ্গে এই সম্বন্ধ, ইহাতে সে মূল্য চাহে কোন্ অধিকারে, তাহা আমি বন্ধিতে পারিলাম না। প্রসন্ন বলে, আমি অধিকার অনধিকার বন্ধি না; আমার গোরু, আমার দুগ্ধ, আমি মূল্য লইব। সে বুঝে না যে, গোরু কাহারও নহে; গোরু গোরুর নিজের; দুগ্ধ, যে খায় তারই।

তবে এ সংসারে মূল্য লওয়া একটা রীতি আছে, স্বীকার করি। কেবল খাদ্য সামগ্রী কেন, সকল সামগ্রীই মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয়। দুগ্ধ দই, চাল দাল, খাদ্য পেয়, পরিধেয় প্রভৃতি পণ্য দ্রব্য দূরে থাকুক, বিদ্যা বুদ্ধিও মূল্য দিয়া কিনিতে হয়। কালেজে মূল্য দিয়া বিদ্যা কিনিতে হয়। অনেকে ভাল কথা মূল্য দিয়া কিনিয়া থাকেন। হিন্দুরা সচরাচর মূল্য দিয়া ধর্ম কিনিয়া থাকেন। যশঃ মান অতি অল্প মূল্যেই ক্রীত হইয়া থাকে। ভাল সামগ্রী মূল্য দিয়া কিনিতে হইবে, ইহাও কতক বন্ধিতে পারি, কিন্তু মনুষ্য এমনই মূল্যপ্রিয় যে, বিনামূল্যে মন্দ সামগ্রীও কেহ কাহাকে দেয় না। যে বিষ খাইয়া মরিবার বাসনা কর, তাহাও তোমাকে বাজার হইতে মূল্য দিয়া কিনিয়া খাইতে হইবে।

অতএব এই বিশ্বসংসার একটি বৃহৎ বাজার—সকলেই সেখানে আপনাপন দোকান সাজাইয়া বসিয়া আছে। সকলেরই উদ্দেশ্য মূল্যপ্রাপ্তি। সকলেই অনবরত ডাকিতেছে, “আমার দোকানে ভাল জিনিষ—খরিদ্দার চলে আয়”—সকলেরই একমাত্র উদ্দেশ্য, খরিদ্দারের চোখে ধূলা দিয়া রদি মাল পাচার করিবে। দোকানদার খরিদ্দারে কেবল যুদ্ধ, কে কাকে ফাঁকি দিতে পারে। সস্তা খরিদের অবিরত চেষ্টাকে মনুষ্যজীবন বলে।

ভাবিয়া চিন্তিয়া, মনের দুঃখে আফিমের মাত্রা চড়াইলাম। তখন জ্ঞাননেষ্ট ফুটিল। সম্মুখে ভাবের বাজার সুবিস্তৃত দেখিলাম। দেখিলাম, অসংখ্য দোকানদার, দোকান সাজাইয়া বসিয়া আছে—অসংখ্য খরিদ্দারে খরিদ করিতেছে—দেখিলাম, সেই অসংখ্য দোকানদারে অসংখ্য খরিদ্দারে পরস্পরকে অসংখ্য অঙ্গুষ্ঠ দেখাইতেছে। আমি গামছা কাঁধে করিয়া, বাজার করিতে বাহির হইলাম। প্রথমেই রূপের দোকানে গেলাম। যে জিনিষ ঘরে নাই, সেই দোকানে আগে যাইতে হয়।—দেখিলাম যে, সংসারে সেই মেছো হাটা। পৃথিবীর রূপসীগণ মাছ হইয়া ঝুড়ি চুপড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়াছেন। দেখিলাম, ছোট বড় রুই, কাতলা, মগেল, ইলিস, চুনো পুঁটি, কই, মাগুর খরিদ্দারের জন্য লেজ আছড়াইয়া ধড়ফড় করিতেছে; যত বেলা বাড়িতেছে, তত বিক্রয়ের জন্য খাবি খাইতেছে।—মেছনীর ডাকিতেছে, “মাছ নেবে গো! কুল পুকুরের সস্তা মাছ, অমনি ছাড়বো—বোঝা বিক্রি হলেই বাঁচি।” কেহ ডাকিতেছে, “মাছ নেবে গো—ধন সাগরের মিঠা মাছ—যে কেনে, তার পুনর্জন্ম হয় না—ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ বিবির মূণ্ডে পরিণত হইয়া তার ঘর দ্বারে ছড়াছড়ি যায়, যার সাধ্য থাকে কিনিবে। সোণার হাঁড়িতে চোখের জলে সিদ্ধ করিয়া, হৃদয়-আগুনে কড়া জ্বাল দিয়া রাখিতে হয়—কে খরিদ্দার সাহস করিস্—আয়। সাবধান! হীরার কাঁটা—নারী কাঁটা—গলায় বাঁধলে শাশুড়ীরূপী বিড়ালের পায়ে পাড়িতে হয়—কাঁটার জ্বালায়, খরিদ্দার হলে কি পলায়!” কেহ ডাকিতেছে, “ওরে আমার সরম পুঁটি, বিক্রি হলেই উঠি। ঝোলে ঝালে অম্বলে, তেলে ঘিয়ে জলে, যাতে দিবে ফেলে, রান্না যাবে চলে,—সংসারের দিন সুখে কাটাবে, আমার এই সরম পুঁটির বলে।” কেহ বলিতেছে, “কাদা ছেঁচে চাঁদা এনেছি—দেখে খরিদ্দার পাগল হয়! কিনে নিয়ে ঘর আলো কর।”

এইরূপ দেখিয়া শূন্য মাছ কিনিতে প্রবৃত্ত হইলাম—কেন না, আমার নিরামিষ ঘরকরনা। দেখিলাম, মাছের দালাল আছে; নাম পুরোহিত। দালাল খাড়া হইলে দর জিজ্ঞাসা করিলাম—শূন্যলাল, দর “জীবন সর্বস্ব।” যে মাছ ইচ্ছা, সেই মাছ কেন, একই দর, “জীবন সর্বস্ব।” জিজ্ঞাসা করিলাম, “ভাল, এ মাছ কত দিন খাইব?” দালাল বলিল, “দু দিন চারি দিন, তার পর পচিয়া গন্ধ হইবে।” তখন “এত চড়া দরে, এমন নশ্বর সামগ্রী কেন কিনিব?” ভাবিয়া আমি মেছো হাটা হইতে পলায়ন করিলাম। দেখিয়া মেছনীর গামছা কাঁধে মিন্‌সেকে গালি পাড়িতে লাগিল।

রূপের বাজার ছাড়িয়া বিদ্যার বাজারে গেলাম। দেখিলাম, এখানে ফলমূল বিক্রয় হয়। এক স্থানে দেখিলাম, কতকগুলি ফোঁটা-কাটা টিকিওয়াল ব্রাহ্মণ তসর গরদ পরিয়া, নামাবলি গায়ে, ঝুনা নারিকেলের দোকান খুলিয়া বসিয়া খরিদ্দার ডাকিতেছেন—“বোঁচি আমরা ঘটু পটু ষড় গড়—ঘরে চাল থাকিলেই স্ব-ত্ব, নইলে ন-ত্ব। দ্রব্যত্ব জাতিত্ব গুণত্ব পদার্থ—বাপের শ্রাঙ্কে

বিদায় না দিলেই তুমি বেটা অপদার্থ। পদার্থতত্ত্ব নামে ঝুনা নারিকেল—খাইতে বড় কাঠন— তাহার প্রথম ছোবড়ায় লেখে যে, ব্রাহ্মণীই পরম পদার্থ। অভাব নামে নারিকেল চতুর্বিধ*— তোমার ঘরে ধন আছে, আমার ঘরে নাই, ইহা অন্যান্যভাব। যতক্ষণ না পাই, ততক্ষণ প্রাগভাগ; খরচ হইয়া গেলেই ধ্বংসভাব; আর আমাদের ঘরে সর্বদাই অত্যন্ত অভাব। অভাব নিত্য, কি অনিত্য, যদি সংশয় থাকে, তবে আমাদের ভাঙারে উর্গিক মার—দেখিবে, নিত্যই অভাব। অতএব আমাদের ঝুনা নারিকেল কেন। ব্যাপ্য, ব্যাপক, ব্যাপ্তি, এ নারিকেলের শাঁস, ব্রাহ্মণের হস্ত হইল ব্যাপ্য, রজত হইল ব্যাপক; আর তুমি দিলেই ঘটিল ব্যাপ্তি; এই ঝুনা নারিকেল কেন, এখনই বৃষ্টিবে। দেখ বাপু, কার্য কারণ সম্বন্ধ বড় গুরুতর কথা; টাকা দাও, এখনই একটা কার্য হইবে, কম দিলেই অকার্য। আর কারণ বুঝাইব কি, এই যে দুই প্রহর রৌদ্রে ঝুনা নারিকেল বেঁচিতে আসিয়াছি, ব্রাহ্মণীই তাহার কারণ—কিছু যদি না কেন, তবে নারিকেল বহা,—অকারণ। অতএব নারিকেল কেন, নহিলে এই ঝুনা নারিকেল মাথায় ঠুকিয়া মরিব।”

ব্রাহ্মণদিগের সেই প্রখর তপনতপ্ত ঘর্ম্মাক্ত ললাট এবং বাগ্‌বিত্তাজনিত অধরসুধাবৃষ্টি দেখিয়া দয়া হইল—জিজ্ঞাসা করিলাম, “হাঁ, ভট্টাচার্য মহাশয়! ঝুনা নারিকেল কিনিতে আপত্তি নাই, কিন্তু দোকানে দা আছে? ছুলিবে কি প্রকারে?”

“না বাপু, দা রাখি না।”

“তবে নারিকেল ছোল কিসে?”

“আমরা ছুলি না—আমরা কামড়াইয়া ছোবড়া খাই।”

শুনিয়া, আমি ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার করিয়া পাশের দোকানে গেলাম।

দেখিলাম, ইহাদিগের সম্মুখেই এক্সপেরিমেন্টেল সায়েন্সের দোকান। কতকগুলি সাহেব দোকানদার, ঝুনা নারিকেল, বাদাম, পেস্টা, সুপারি প্রভৃতি ফল বিক্রয় করিতেছেন। ঘরের উপরে বড় বড় পিতলের অঙ্করে লেখা আছে।

MESSRS BROWN JONES AND
ROBINSON
NUT SUPPLIERS
ESTABLISHED 1757
ON THE FIELD OF PLASSEY.
MESSRS BROWN JONES AND ROBINSON,
Offer to the Indian Public
A Large Assortment of
NUTS.
PHYSICAL, METAPHYSICAL,
LOGICAL, ILLOGICAL,
AND
SUFFICIENT TO BREAK THE JAWS
AND
DISLOCATE THE TEETH OF
ALL INDIAN YOUTHS
WHO STAND IN NEED OF HAVING THEIR
DENTAL SUPERFLUITIES CURTAILED.

দোকানদার ডাকিতেছেন,—“আয় কালা বালক, Experimental Science খাবি আয়। দেখ, ১ নম্বর এক্সপেরিমেন্ট—ঘৃষি; ইহাতে দাঁত উপড়ে, মাথা ফাটে এবং হাড় ভাঙ্গে। আমরা

* নৈয়ায়িকেরা বলেন, অভাব চতুর্বিধ; অন্যান্যভাব, প্রাগভাব, ধ্বংসভাব আর অত্যন্তভাব।

বিশ্বকম রচনাবলী

এ সকল এক্সপেরিমেন্ট বিনামূল্যে দেখাইয়া থাকি—পরের মাথা বা নরম হাড় পাইলেই হইল। আমরা স্থূল পদার্থের সংযোগ বিয়োগ সাধনে পটু—রাসায়নিক বলে বা বৈদ্যুতিক বলে বা চৌম্বক বলে, জড়পদার্থের বিশ্লেষণেই সুদক্ষ—কিন্তু সর্বাপেক্ষা মৃষ্টাঘাতের বলে মস্তকাদির বিশ্লেষণেই আমরা কৃতকার্য। মাধ্যাকর্ষণ, যৌগিকাকর্ষণ, চৌম্বকাকর্ষণ প্রভৃতি নানাবিধ আকর্ষণের কথা আমরা অবগত আছি, কিন্তু সর্বাপেক্ষা কেশাকর্ষণেই আমরা কৃতবিদ্য। এই সংসারে জড়পদার্থের নানাবিধ যোগ দেখা যায়; যথা—বায়ুতে অম্লজান ও যবক্ষারজানের সামান্য যোগ, জলে জলযান ও অম্লজানের রাসায়নিক যোগ, আর তোমাদিগের পৃষ্ঠে, আমাদের হস্তে, মৃষ্টিযোগ। অতএব এই সকল আশ্চর্য ব্যাপার দেখিবে যদি, মাথা বাড়াইয়া দাও; এক্সপেরিমেন্ট করিব। দেখিবে, গ্রাবিটেশ্যনের বলে এই সকল নারিকেলাদি তোমাদের মস্তকে পড়িবে; পর্কশন্ নামক অদ্ভুত শাব্দিক রহস্যেরও পরিচয় পাইবে, এবং দেখিবে, তোমার মস্তিষ্কস্থিত স্নায়ব পদার্থের গুণে তুমি বেদনা অনুভূত করিবে।

অগ্রিম মূল্য দিও; তাহা হইলে চারিটিতে এক্সপেরিমেন্ট খাইতে পারিবে।”

আমি এই সকল দেখিতে শুনিতোছিলাম, এমত সময়ে সহসা দেখিলাম যে, ইংরেজ দোকানদারেরা, লাঠি হাতে, দ্রুতবেগে ব্রাহ্মণদিগের ঝুনা নারিকেলের গাদার উপর গিয়া পড়িলেন, দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা নারিকেল ছাড়িয়া দিয়া, নামাবলি ফেলিয়া, মৃত্তকচ্ছ হইয়া উদ্ধবশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন সাহেবেরা সেই সকল পরিত্যক্ত নারিকেল দোকানে উঠাইয়া লইয়া আসিয়া, বিলাতী অস্ত্র ছেদন করিয়া, সুখে আহার করিতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, “এ কি হইল?” সাহেবরা বলিলেন, “ইহাকে বলে, Asiatic Researches.” আমি তখন ভীত হইয়া, আত্মশরীরে কোন প্রকার Anatomical Researches আশঙ্কা করিয়া, সেখান হইতে পলায়ন করিলাম।

সাহিত্যের বাজার দেখিলাম। দেখিলাম, বাঙ্গালীক প্রভৃতি ঋষিগণ অমৃত ফল বেচিতেছেন; বুদ্ধিলাভ, ইহা সংস্কৃত সাহিত্য। দেখিলাম, আর কতকগুলি মনুষ্য নিচু পীচ পেয়ারা আনারস আঙ্গুর প্রভৃতি সুস্বাদু ফল বিক্রয় করিতেছেন—বুদ্ধিলাভ, এ পাশ্চাত্য সাহিত্য। আরও একখানি দোকান দেখিলাম—অসংখ্য শিশুগণ এবং অবলাগণ তাহাতে ক্রয়-বিক্রয় করিতেছে—ভিড়ের জন্য তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলাম না—জিজ্ঞাসা করিলাম, “এ কিসের দোকান?”

বালকেরা বলিল, “বাঙ্গালা সাহিত্য।”

“বেচিতেছে কে?”

“আমরাই বেচি। দুই এক জন বড় মহাজনও আছেন। তন্মিহ্ন বাজে দোকানদারের পরিচয় পশ্চাবলী নামক গ্রন্থে পাইবেন।”

“কিনিতেছে কে?”

“আমরাই।”

বিক্রয় পদার্থ দেখিবার বাসনা হইল। দেখিলাম—খবরের কাগজ জড়ান কতকগুলি অপক্ক কদলী।

তাহার পরে কলু পটিতে গেলাম: দেখিলাম, যত উমেদার, মোসায়ের সকলে কলু সাজিয়া তেলের ভাঁড় লইয়া সারি সারি বসিয়া গিয়াছে। তোমার টাঁকে চাকরি আছে, শুনিতে পাইলেই পা টানিয়া লইয়া, ভাঁড় বাহির করিয়া, তেল মাখাইতে বসে। চাকরি না থাকিলেও—যদি থাকে, এই ভরসায়, পা টানিয়া লইয়া, তেল লোপিতে বসে। তোমার কাছে চাকরি নাই—নাই নাই—নগদ টাকা আছে ত—আচ্ছা, তাই দাও—তেল দিতোছি। কাহারও প্রার্থনা, তোমার বাগানে বসিয়া তুমি যখন ব্রান্ড খাইবে, আমি তোমার চরণে তৈল মাখাইব—আমার কন্যার বিবাহটি যেন হয়। কাহারও আন্দাশ, তোমার কাণে অবিরত খোশামোদের গন্ধ তৈল ঢালিব—বাড়ীর প্রাচীরটি যেন দিতে পারি। কাহারও কামনা, তোমার তোষাখানার বাতি জ্বালিয়া দিব—আমার খবরের কাগজখানি যেন চলে। শুনিয়াছি, কলুদিগের টানাটানিতে অনেকের পা খোঁড়া হইয়া গিয়াছে। আমার শঙ্কা হইল, পাছে কোন কলু আফিসের প্রার্থনায় আমার পায়ে তেল দিতে আরম্ভ করে। আমি পলায়ন করিলাম।

তার পরে যশের ময়রাপটী। সম্বাদপত্রলেখক নামে ময়রাগণ, গুড়ে সন্দেশের দোকান পাতিয়া, নগদ মূল্যে বিক্রয় করিতেছে—রাস্তার লোক ধরিয়া সন্দেশ গতাইয়া দিয়া, হাত

পাতিতেছে—মূল্য না পাইলেই কাপড় কাড়িয়া লইতেছে। এদিকে তাঁহাদের বিক্রয় যশের দুর্গন্ধে পৃথক নাসিকা আবৃত করিয়া পলায়ন করিতেছে। দোকানদারগণ বিনা ছানায়, শুধু গুড়ে, আশ্চর্য্য সন্দেশ করিয়া, সস্তা দরে বিক্রয় করিতেছেন। কেহ টাকাটা সিকেটায়, আনা দু' আনায়, কেহ কেবল খাতিরে—কেহ বা এক সাঁজ ফলাহার পেলেই ছাড়েন—কেহ বা বাবুর গাড়িতে চাড়িতে পেলেই যশোবিক্রয় করেন। অন্যত্র রাজপুরুষগণ মিঠাইওয়াল সাঁজিয়া, রায়বাহাদুর, রাজাবাহাদুর খেতাব, খেলাত, নিমন্ত্রণ, ধন্যবাদ প্রভৃতি মিঠাই লইয়া দোকান পাতিয়া বসিয়া আছেন,—চাঁদা, সেলাম, খোশামোদ, ডাক্তারখানা, রাস্তাঘাট, মূল্য লইয়া মিঠাই বেচিতেছেন। বিক্রয়ের বড় বেবন্দোবস্ত—কেহ সর্ব্বস্ব দিয়া এক ঠোঙ্গা পাইতেছে না—কেহ শুধু সেলামে দেড় মণ লইয়া যাইতেছে। এইরূপ অনেক দোকান দেখিলাম—কিন্তু সর্ব্বত্রই পচা মাল আধা দরে বিক্রয় হইতেছে—খাঁটি দোকান দেখিলাম না। কেবল একখানি দোকান দেখিলাম—তাহা অতি চমৎকার।

দেখিলাম, দোকানের মধ্যে নিবিড় অন্ধকার—কিছু দেখা যায় না। ডাকিয়া দোকানদারের উত্তর পাইলাম না—কেবল এক সর্ব্বপ্রাণিভীতিসাধক অনন্ত গজ্জন শুনিতে পাইলাম—অলপালোকে দ্বারে ফলক-লিপি পড়িলাম।

যশের পণ্যশালা।

বিক্রয়—অনন্ত যশ।

বিক্রেতা—কাল।

মূল্য—জীবন।

জীয়ন্তে কেহ এখানে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

আর কোথাও স্বেচ্ছা বিক্রয় হয় না।

পড়িয়া ভাবিলাম—আমার যশে কাজ নাই—কমলাকান্তের প্রাণ বাঁচিলে অনেক যশ হইবে।

বিচারের বাজারে গেলাম—দেখিলাম, সেটা কসাইখানা। টুপি মাথায়, শামলা মাথায়—ছোট বড় কসাইসকল, ছুরি হাতে গোরু কাটিতেছে। মহিষাদি বড় বড় পশুসকল শৃঙ্গ নাড়িয়া ছুটিয়া পলাইতেছে;—ছাগ মেষ এবং গোরু প্রভৃতি ক্ষুদ্র পশুসকল ধরা পড়িতেছে। আমাকে দেখিয়া গোরু বলিয়া একজন কসাই বলিল, “এও গোরু, কাটিতে হইবে।” আমি সেলাম করিয়া পলাইলাম।

আর বড় বাজার বেড়াইবার সাধ রহিল না—তবে প্রসন্নের উপর রাগ ছিল বলিয়া একবার দইয়েহাটা দেখিতে লাগিলাম—গিয়া প্রথমেই দেখিলাম যে, সেখানে খোদ কমলাকান্ত চক্রবর্তী নামে গোয়াল—দপ্তররূপ পচা ঘোলের হাঁড়ি লইয়া বসিয়া আছে—আপনি ঘোল খাইতেছে, এবং পরকে খাওয়াইতেছে।

তখন চমক হইল—চক্ষু চাহিলাম—দেখিলাম, নসী বাবুর বাড়ীতেই আছি। ঘোলের হাঁড়ি কাছে আছে বটে। প্রসন্ন এক হাঁড়ি ঘোল আনিয়া আমাকে সাধিতেছে—“চক্রবর্তী মশাই—রাগ করিও না। আজ আর দুধ দই নাই—এই ঘোলটুকু আনিয়াছি—ইহার দাম দিতে হইবে না।”

একাদশ সংখ্যা—আমার দুর্গোৎসব

সপ্তমীপূজার দিন কে আমাকে এত আফিস চড়াইতে বলিল! আমি কেন আফিস খাইলাম! আমি কেন প্রতিমা দেখিতে গেলাম! যাহা কখন দেখিব না, তাহা কেন দেখিলাম! এ কুহক কে দেখাইল!

দেখিলাম—অকস্মাৎ কালের স্রোত, দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রবলবেগে ছুটিতেছে—আমি ভেলায় চড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছি। দেখিলাম—অনন্ত, অকূল, অন্ধকারে, বাত্যাভিষ্কৃত তরঙ্গসঙ্কুল সেই

বিক্রম রচনাবলী

স্রোত—মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্রগণ উদয় হইতেছে, নিবিতেছে—আবার উঠিতেছে। আমি নিতান্ত একা—একা বলিয়া ভয় করিতে লাগিল—নিতান্ত একা—মাতৃহীন—মা! মা! করিয়া ডাকিতেছি। আমি এই কাল-সমুদ্রে মাতৃসন্ধানে আসিয়াছি। কোথা মা! কই আমার মা? কোথায় কমলাকান্ত-প্রসূতি বঙ্গভূমি! এ ঘোর কাল-সমুদ্রে কোথায় তুমি? সহসা স্বর্গীয় বাদ্যে কণরক্ত পরিপূর্ণ হইল—দিগ্‌মণ্ডলে প্রভাতারনুগোদয়বৎ লোহিতোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইল—স্নিগ্ধ মন্দ পবন বহিল—সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির উপরে, দূরপ্রান্তে দেখিলাম—সুবর্ণমণ্ডিতা, এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা! জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে! এই কি মা? হাঁ, এই মা। চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী—মৃত্তিকারূপিণী—অনন্তরত্ন-ভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশ ভুজ—দশ দিক্—দশ দিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শত্রু-বিমর্দিত বীরজন কেশরী শত্রু-নিষ্পীড়নে নিযুক্ত! এ মৃত্তিক এখনি দেখিব না—আজি দেখিব না, কাল দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু এক দিন দেখিব—দিগ্‌ভুজা, নানা প্রহরণপ্রহারিণী, শত্রুমর্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বিদ্যাবিজ্ঞানমৃত্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোতমধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা!

কোথায় ফুল পাইলাম, বলিতে পারি না—কিন্তু সেই প্রতিমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম—ডাকিলাম, “সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলো, শিবে, আমার সর্ব্বার্থসাধকে! অসংখ্যসন্তানকুলপালিকে! ধর্ম্ম, অর্থ, সুখ, দুঃখদায়িকে! আমার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ কর। এই ভক্তি প্রীতি বৃত্তি শক্তি করে লইয়া তোমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছি, তুমি এই অনন্তজলমণ্ডল ত্যাগ করিয়া এই বিশ্ব-বিমোহিনী মৃত্তিক একবার জগৎসমীপে প্রকাশ কর। এসো মা! নবরাগরঙ্গিণি নববলধারিণি, নবদর্পে দর্পিণি, নবস্বপ্নদর্শিণি!—এসো মা, গৃহে এসো—ছয় কোটি সন্তানে একত্রে, এক কালে, দ্বাদশ কোটি কর ঘোড় করিয়া, তোমার পাদপদ্ম পূজা করিব। ছয় কোটি মুখে ডাকিব, মা প্রসূতি অম্বিকে! ধাত্রি ধরিত্রি ধনধান্যদায়িকে! নগাঙ্কশোভিনি নগেন্দ্রবালিকে! শরৎসুন্দরি চারুপূর্ণচন্দ্রভালিকে! ডাকিব,—সিন্ধুসেবিত্রে সিন্ধু-পূজিতে সিন্ধু-মথনকারিণি! শত্রুবধে দশভুজে দশপ্রহরণধারিণি! অনন্তশ্রী অনন্তকালস্থায়িণি! শক্তি দাও সন্তানে, অনন্তশক্তিপ্রদায়িণি! তোমায় কি বলিয়া ডাকিব মা? ঐ ছয় কোটি মণ্ড ঐ পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত করিব—এই ছয় কোটি কণ্ঠে ঐ নাম করিয়া হুঙ্কার করিব,—এই ছয় কোটি দেহ তোমার জন্য পতন করিব—না পারি, এই দ্বাদশ কোটি চক্ষে তোমার জন্য কাঁদিব। এসো মা, গৃহে এসো—যাঁহার ছয় কোটি সন্তান—তাঁহার ভাবনা কি?

দেখিতে দেখিতে আর দেখিলাম না—সেই অনন্ত কাল-সমুদ্রে এই প্রতিমা ডুবিল! অন্ধকারে সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশি ব্যাপিল, জলকল্লোলে বিশ্বসংসার পূরিল! তখন যুক্ত করে, সজল নয়নে, ডাকিতে লাগিলাম, উঠ মা হিরণ্ময়ী বঙ্গভূমি! উঠ মা! এবার সুসন্তান হইব, সংপথে চলিব—তোমার মুখ রাখিব। উঠ মা, দেবী দেবানুগৃহীতে—এবার আপনা ভুলিব—দ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব—অধর্ম্ম, আলস্য, ইন্দ্রিয়ভক্তি ত্যাগ করিব—উঠ মা—একা রোদন করিতেছি, কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু গেল মা! উঠ উঠ, উঠ মা বঙ্গজননী!

মা উঠিলেন না। উঠিবেন না কি?

এস, ভাই সকল! আমরা এই অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দিই। এস, আমরা দ্বাদশ কোটি ভুজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া, ছয় কোটি মাথায় বহিয়া, ঘরে আনি। এস, অন্ধকারে ভয় কি? ঐ যে নক্ষত্রসকল মধ্যে মধ্যে উঠিতেছে, নিবিতেছে, উহারা পথ দেখাইবে—চল! চল! অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে, এই কাল-সমুদ্র তাড়িত, মথিত, ব্যস্ত করিয়া, আমরা সন্তরণ করি—সেই স্বর্ণপ্রতিমা মাথায় করিয়া আনি। ভয় কি? না হয় ডুবিব; মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি? আইস, প্রতিমা তুলিয়া আনি, বড় পূজার ধুম বাধিবে। দ্বৈষক ছাগকে হাড়িকাটে ফেলিয়া সংকীর্ণ খঞ্জে মায়ের কাছে বলি দিব—কত পুরাবৃত্তকার ঢাকী, ঢাক ঘাড়ে করিয়া, বঙ্গের বাজনা বাজাইয়া আকাশ ফাটাইবে—কত ঢোল, কাঁস, কাড়া, নাগরায় বঙ্গের জয় বাদিত হইবে। কত সানাই পৌঁ ধরিয়া গাইবে “কত নাচ গো।—” বড় পূজার ধুম বাধিবে। কত ব্রাহ্মণপণ্ডিত লুচি মণ্ডার লোভে বঙ্গপূজায় আসিয়া পাতড়া মারিবে—কত দেশী বিদেশী ভদ্রাভদ্র আসিয়া মায়ের চরণে

প্রণামি দিবে—কত দীন দুঃখী প্রসাদ খাইয়া উদর পূরবে। কত নর্তকী নাচবে, কত গায়কে মঙ্গল গায়বে, কত কোটি ভক্তে ডাকবে, মা! মা! মা!—

জয় জয় জয় জয়া জয়দাত্রি।
 জয় জয় জয় বঙ্গজগদ্ধাত্রি ॥
 জয় জয় জয় সুখদে অনন্দে।
 জয় জয় জয় বরদে শর্ম্মদে ॥
 জয় জয় জয় শূভে শূভঙ্করি।
 জয় জয় জয় শান্তি ক্ষেমঙ্করি ॥
 দ্বেষকদলনি, সন্তানপালিনি।
 জয় জয় দুর্গে দুর্গতিনাশিনি ॥
 জয় জয় লক্ষ্মি বারীন্দ্রবালিকে।
 জয় জয় কমলাকান্তপালিকে ॥
 জয় জয় ভক্তিশক্তিদায়িকে।
 পাপতাপভয়শোকনাশিকে ॥
 মৃদুল গম্ভীর ধীর ভাষিকে।
 জয় মা কালি করালি অম্বিকে ॥
 জয় হিমালয়নগবালিকে।
 অতুলিত পূর্ণচন্দ্রভালিকে ॥
 শূভে শোভনে সর্ব্বার্থসাধিকে।
 জয় জয় শান্তি শক্তি কালিকে ॥
 জয় মা কমলাকান্তপালিকে ॥
 নমোহস্তু তে দেবি বরপ্রদে শূভে।
 নমোহস্তু তে কামচরে সদা ধ্রুবে ॥
 ব্রহ্মাণীন্দ্রাণি রুদ্রাণি ভূতভব্যে যশস্বিনি।
 গ্রাহিং মাং সর্ব্বদুঃখেভ্যো দানবানাং ভয়ঙ্করি ॥
 নমোহস্তু তে জগন্নাথে জনার্দনি নমোহস্তু তে।
 প্রিয়দান্তে জগন্মাতঃ শৈলপুত্রি বসুন্ধরে ॥
 গ্রায়স্ব মাং বিশালাক্ষি ভক্তানামান্তিনাশিনি।
 নমামি শিরসা দেবীং বন্ধনোহস্তু বিমোচিতঃ ॥*

দ্বাদশ সংখ্যা—একটি গীত

“শোন্ প্রসন্ন, তোকে একটি গীত শুনাইব।”

প্রসন্ন গোয়ালিনী বলিল, “আমার এখন গান শুনবার সময় নয়—দুধ যোগাবার বেলা হলো।”

কমলাকান্ত। “এসো এসো বন্ধু এসো।”

প্রসন্ন। “ছি ছি ছি! আমি কি তোমার বন্ধু?”

কমলাকান্ত। “বালাই! ষাট, তুমি কেন বন্ধু হইতে যাইবে? আমার গীতে আছে”—

এসো এসো বন্ধু এসো আধ আঁচরে বসো—

সুর করিয়া আমি কীর্তন ধরাতে প্রসন্ন দুধের কেঁড়ে রাখিয়া বসিল, আমি গীতটি আদ্যোপান্ত গায়লাম।

“এসো এসো, বন্ধু এসো, আধ আঁচরে বসো,
 নয়ন ভরিয়ে তোমায় দেখি।

বাঁকম রচনাবলী

অনেক দিবসে, মনের মানসে,
তোমা ধনে মিলাইল বিধি।
মণি নও মাণিক নও যে হার ক'রে গলে পরি
ফুল নও যে কেশের করি বেশ।
নারী না করিত বিধি, তোমা হেন গুণনিধি,
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ॥
ব'ধু তোমায় যখন পড়ে মনে,
আমি চাই বৃন্দাবন পানে,
আলদইলে কেশ নাহি বাঁধি।
রক্ষনশালাতে যাই, তুয়া ব'ধু গুণ গাই,
ধ'য়ার ছলনা করি কাঁদি।”

মিল ত চমৎকার, “দেখি” আর “বিধি” মিলিল! কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায়, এইরূপ মোহ মন্ত্র আর একটি শূন্য, মনে বড় সাধ রহিয়াছে। যখনই এই গান প্রথম কণ্ঠ ভরিয়া শুনিয়াছিলাম, মনে হইয়াছিল, নীলাকাশতলে ক্ষুদ্র পক্ষী হইয়া এই গীত গাই—মনে হইয়াছিল, সেই বিচিত্র সৃষ্টিকুশলী কবির সৃষ্টি দৈববংশী লইয়া, মেঘের উপর যে বায়ুস্তর—শব্দশূন্য, দৃশ্যশূন্য, পৃথিবী যেখান হইতে দেখা যায় না, সেইখানে বসিয়া, সেই মুরলীতে, একা এই গীত গাই—এই গীত কখন ভুলিতে পারিলাম না; কখন ভুলিতে পারিব না।

“এসো এসো ব'ধু এসো”*

লোকের মনে কি আছে বলিতে পারি না, কিন্তু আমি কমলাকান্ত চক্রবর্তী, বৃষ্টিতে পারি না যে, ইন্দ্রিয়-পরিভূপ্তে কিছুর সুখ আছে। যে পশু ইন্দ্রিয়-পরিভূপ্ত জন্য পরসন্দর্শনের আকাঙ্ক্ষী, সে যেন কখন কমলাকান্ত শর্ম্মার দপ্তর-মুক্তাবলী পড়িতে বসে না। আমি বিলাস-প্রিয়ের মুখে “এসো এসো ব'ধু এসো” বৃষ্টিতে পারি না। কিন্তু ইহা বৃষ্টিতে পারি যে, মনুষ্য মনুষ্যের জন্য হইয়াছিল—এক হৃদয় অন্য হৃদয়ের জন্য হইয়াছিল—সেই হৃদয়ে হৃদয়ে সংঘাত, হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন, ইহা মনুষ্য-জীবনের সুখ। ইহাজন্মে মনুষ্যহৃদয়ে একমাত্র তৃষা, অন্যহৃদয়-কামনা। মনুষ্য-হৃদয় অনবরত হৃদয়ান্তরকে ডাকিতেছে, “এসো এসো ব'ধু এসো।” ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবৃত্তিসকল শরীর রক্ষার্থ—মহতী প্রবৃত্তিসকলের উদ্দেশ্য, “এসো এসো ব'ধু এসো।” তুমি চাকরি কর, খাইবার জন্য—কিন্তু যশের আকাঙ্ক্ষা কর, পরের অনুরাগ লাভ করিবার জন্য, জন-সমাজের হৃদয়কে তোমার হৃদয়ের সঙ্গে মিলিত করিবার জন্য। তুমি যে পরোপকার কর, সে পরের হৃদয়ের ক্রেশ আপন হৃদয়ে অনুভূত কর বলিয়া। তুমি যে রাগ কর, সে তোমার মনোমত কার্য হইল না বলিয়া; হৃদয় হৃদয়ে আসিল না বলিয়া। সর্বত্র এই রব—“এসো এসো ব'ধু এসো।” সর্বকর্ম্মের এই মন্ত্র, “এসো এসো ব'ধু এসো।” জড় জগতের নিয়ম আকর্ষণ। বৃহৎ গ্রহ উপগ্রহকে ডাকিতেছে, “এসো এসো ব'ধু এসো।” সৌরপিণ্ড বৃহৎ গ্রহকে ডাকিতেছে, “এসো এসো ব'ধু এসো।” জগৎ জগদন্তরকে ডাকিতেছে, “এসো এসো ব'ধু এসো।” পরমাণু পরমাণুকে অবিরত ডাকিতেছে, “এসো এসো ব'ধু এসো।” জড়পিণ্ডসকল, গ্রহ উপগ্রহ ধূমকেতু—সকলেই এই মোহমন্ত্রে বাঁধা পড়িয়া ঘুরিতেছে। প্রকৃতি পুরুষকে ডাকিতেছে, “এসো এসো ব'ধু এসো।” জগতের এই গম্ভীর অবিশ্রান্ত ধ্বনি—“এসো এসো ব'ধু এসো।” কমলাকান্তের ব'ধু কি আসিবে?

“আধ আঁচরে বসো।”

এই তৃণশষ্পসমাচ্ছন্ন, কণ্টকাদিতে ককর্শ সংসারারণ্যে, হে বাঞ্ছিত! তোমাকে আর কি আসন দিব, আমার এই হৃদয়াবরণের অর্ধেকে উপবেশন কর। কুশকণ্টকাদি হইতে তোমার আচ্ছাদন জন্য আমি এই আপন অঙ্গ অনাবৃত করিতেছি—আমার আঁচরে বসো। যাহাতে আমার লজ্জারক্ষা, মানরক্ষা, যাহাতে আমার শোভা, হে মিলিত! তুমিও তাহার অর্ধেক গ্রহণ কর—আধ আঁচরে বসো। হে পরের হৃদয়, হে সুন্দর, হে মনোরঞ্জন, হে সুখদ! কাছে এসো, আমাকে স্পর্শ কর, আমি তোমাতে সংলগ্ন হইব,—দূরে আসনগ্রহণ করিও না—এই আমার শরীরলগ্ন

* পাঠককে গীতের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতে হইবে।

অঞ্চলাঙ্কে বসো। হে কমলাকান্ত! হে দর্বির্ননীত! হে আজন্মবিবাহশূন্য! তুমি এতদর্থে শান্তিপদরে কঙ্কাদার আঁচলের আধখানা বঁধিও না। তুমি যে অঞ্চলাঙ্কে বসিবে, তাহার তাঁতি আজও জন্মে নাই। মনের নগ্নত্ব জ্ঞান-বস্ত্রে আবৃত; অঙ্কেকে তোমার হৃদয় আবৃত রাখ, অঙ্কেকে বাঞ্ছিতকে বসাও। তুমি মর্খ—তথাপি তোমার অপেক্ষা মর্খ যদি কেহ থাকে, তাহাকে ডাক—“এসো এসো বঁধু এসো—আধ আঁচরে বসো।”

“নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।”

কেহ কখন দেখিয়াছে? তুমি অনেক ধন উপার্জন করিয়াছ—কখন নয়ন ভরিয়া আত্মধন দেখিতে পাইয়াছ? তুমি যশস্বী হইবার জন্য প্রাণপাত করিয়াছ—কিন্তু আত্মযশোরামি দেখিয়া কবে তোমার নয়ন ভরিয়াছে? রূপতৃষ্ণায় তুমি ইহজীবন অতিবাহিত করিলে—যেখানে ফুলটি ফুটে, ফলটি দোলে, যেখানে পাখীটি উড়ে, যেখানে মেঘ ছুটে, গিরিশৃঙ্গ উঠে, নদী বহে, জল ঝরে, তুমি সেইখানে রূপের অনুসন্ধান করিয়াছ—যেখানে বালক, প্রফুল্ল মৃগমণ্ডল আন্দোলিত করিয়া হাসে, যেখানে যুবতী ব্রীড়াভাবে ভাঙ্গা ভাঙ্গা হইয়া শঙ্কিতগমনে যায়, যেখানে প্রৌঢ়া নিতাস্তম্ফুটিতা মধ্যাহ্নপাশ্চিমীবাৎ অকাতরে রূপের বিকাশ করে, তুমি সেইখানেই রূপের সন্ধান করিয়াছ, কখন নয়ন ভরিয়া রূপ দেখিয়াছ? দেখ নাই কি যে, কুসুম দেখিতে দেখিতে শুকায়, ফল দেখিতে দেখিতে পাকে, পড়ে, পচে, গলে; পাখী উড়িয়া যায়, মেঘ চলিয়া যায়, গিরি ধূমে লুকায়, নদী শুকায়, চাঁদ ডুবে, নক্ষত্র নিবিয়া যায়। শিশুর হাসি রোগে হরণ করে, যুবতীর ব্রীড়া—কিসে না যায়? প্রৌঢ়া বয়সে শুকাইয়া যায়। ইহা সংসারের দূরদৃষ্ট—কেহ কিছু নয়ন ভরিয়া দেখিতে পায় না। অথবা এই সংসারের শূভাদৃষ্ট—কেহ কিছু নয়ন ভরিয়া দেখিতে পায় না। গতিই সংসারের সুখ—চাঞ্চলাই সংসারের সৌন্দর্য্য। নয়ন ভরে না। সে নয়ন আমরা পাই নাই। পাইলেই সংসার দুঃখময় হইত; পরিভূপ্ত-রাক্ষসী আমাদের সকল সুখকে গ্রাস করিত। যে কারিগর এই পরিবর্তনশীল সংসার, আর এই অতৃপ্য নয়ন সৃজন করিয়াছেন, তাহার কারিগরির উপর কারিগরি, এই বাসনা, নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি। জগৎ পরিবর্তনশীল, নয়নও অতৃপ্য, অথচ বাসনা—নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।

হে রূপ! হে বাহ্য সৌন্দর্য্য! হে অন্তঃপ্রকৃতির সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট! কাছে আইস, নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি। দূরে বসিলে দেখা হইবে না; কেন না, দেখা কেবল নয়নে নহে। সংস্পর্শ বা নৈকট্য ব্যতীত মনের বৈদ্যুতী বহে না—আমরা সর্ব শরীরে দেখিয়া থাকি। মন হইতে মনে বৈদ্যুতী চলিলে তবে নয়ন ভরিবে! হায়! কিসেই বা নয়ন ভরিবে! নয়নে যে পলক আছে!

“অনেক দিবসে, মনের মানসে
তোমা ধনে মিলাইল বিধি হে!”

আমি কখন কখন মনে করিয়া থাকি, কেবল দুঃখের পরিমাণ জন্যই দয়া করিয়া বিধাতা দিবসের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। নাহিলে কাল অপরিমেয়, মনুষ্য-দুঃখ অপরিমিত হইত। আমরা এখন বলিতে পারি যে, আমি দুই দিন, দুই মাস বা দুই বৎসর দুঃখভোগ করিতেছি; কিন্তু দিন রাত্রির পরিবর্তন না থাকিলে, কালের পথ চিহ্নশূন্য হইলে, কে না বঁধিত যে, আমি অনন্ত কাল দুঃখভোগ করিতেছি? আশা তাহা হইলে দাঁড়াইবার স্থান পাইত না—এতদিন পরে আবার দুঃখান্ত হইবে, এ কথা কেহ ভাবিতে পারিত না—বৃক্ষাদিশূন্য অনন্ত প্রান্তরবৎ জীবনের পথ অনন্তীয় হইত—জীবনযাত্রা দুর্স্বপ্ন যন্ত্রণাস্বরূপ হইত। অতএব এই বৃহৎ জগৎকেন্দ্র সূর্য্যের পথ আমাদের সুখ দুঃখের মানদণ্ড। দিবস-গণনায় সুখ আছে। সুখ আছে বলিয়াই দুঃখী জন দিবস গণিয়া থাকে। দিবস-গণনা দুঃখবিনোদন। কিন্তু এমন দুঃখীও আছে যে, সে দিবস গণে না; দিবস-গণনা তাহার পক্ষে চিত্তবিনোদন নহে। আমি কমলাকান্ত চক্রবর্তী—পৃথিবীতে ভুলিয়া মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়াছি—সুখহীন, আশাহীন, উদ্দেশ্যশূন্য, আকাঙ্ক্ষাশূন্য আমি কি জন্য দিবস গণিব? এই সংসার-সমুদ্রে আমি ভাসমান তৃণ, সংসার-বাত্যায় আমি ঘূর্ণমান ধূলিকণা, সংসারারণ্যে আমি নিষ্ফল বৃক্ষ—সংসারাকাশে আমি বারিশূন্য মেঘ—আমি কেন দিবস গণিব?

গণিব। আমার এক দুঃখ, এক সন্তাপ, এক ভরসা আছে। ১২০৩ সাল হইতে দিবস গণি। যে দিন বঙ্গে হিন্দু নাম লোপ পাইয়াছে, সেই দিন হইতে দিন গণি। যে দিন সপ্তদশ

বাঁকম রচনাবলী

অস্বাভাবিক বঙ্গজয় করিয়াছিল, সেই দিন হইতে দিন গণি। হায়! কত গণিব! দিন গণিতে গণিতে মাস হয়, মাস গণিতে গণিতে বৎসর হয়, বৎসর গণিতে গণিতে শতাব্দী হয়, শতাব্দীও ফিরিয়া ফিরিয়া সাত বার গণি। কই, অনেক দিবসে মনের মানসে বিধি মিলাইল, কই? যাহা চাই, তাহা মিলাইল কই? মনুষ্যত্ব মিলিল কই? একজাতীয়ত্ব মিলিল কই? ঐক্য কই? বিদ্যা কই? গৌরব কই? শ্রীহর্ষ কই? ভট্টনারায়ণ কই? হলায়ুধ কই? লক্ষ্মণসেন কই? আর কি মিলিবে না? হায়! সবারই ঈপ্সিত মিলে, কমলাকান্তের মিলিবে না?

“মণি নও মাণিক নও যে, হার ক’রে গলে পরি—”

বিধাতা জগৎ জড়ময় করিয়াছেন কেন? রূপ জড়পদার্থ কেন? সকলই অশরীরী হইল না কেন? হইলে হৃদয়ে হৃদয়ে কেমন মিলিত! যদি রূপের শরীরে প্রয়োজন ছিল, তবে তোমার আমার বিধাতা এক শরীর করেন নাই কেন? তাহা হইলে আর ত বিচ্ছেদ হইত না। এখন কি এক শরীর হয় না? আমার শরীরে এত স্থান আছে—তোমাকে তাহাতে কোথাও কি রাখিতে পারি না? তোমাকে কণ্ঠলগ্ন করিয়া হৃদয়ে বিলম্বিত করিয়া রাখিতে পারি না? হায়! তুমি মণি নও, মাণিক নও যে, হার করিয়া গলে পরি।

আর বঙ্গভূমি! তুমিই বা কেন মণি-মাণিক্য হইলে না, তোমায় কেন আমি হার করিয়া, কণ্ঠে পরিতে পারিলাম না! তোমায় যদি কণ্ঠে পরিতাম, মুসলমান আমার হৃদয়ে পদাঘাত না করিলে তাহার পদরেণু তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। তোমায় সুবর্ণের আসনে বসাইয়া, হৃদয়ে দোলাইয়া দেশে দেশে দেখাইতাম। ইউরোপে, আমেরিকে, মিশরে, চীনে, দেখিত, তুমি আমার কি উজ্জ্বল মণি!

“আমায় নারী না করিত বিধি

তোমা হেন গুণনিধি

লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ!”

প্রথমে আহ্বান, “এসো এসো বন্ধু এসো,” পরে আদর, “আধ আঁচরে বসো,” পরে ভোগ “নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।” তখন সুখভোগকালীন পূর্বদুঃখস্মৃতি—“অনেক দিবসে, মনের মানসে, তোমা ধনে মিলাইল বিধি।” সুখ দ্বিবিধ, সম্পূর্ণ এবং অসম্পূর্ণ। অসম্পূর্ণ সুখ যথা,

“মণি নও মাণিক নও যে হার ক’রে গলে পরি।”

পরে সম্পূর্ণ সুখ,

“আমায় নারী না করিত বিধি,

তোমা হেন গুণনিধি,

লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ।”

সম্পূর্ণ অসহ্য সুখের লক্ষণ, শারীরিক চাঞ্চল্য, মানসিক অস্থৈর্য্য। এ সুখ কোথায় রাখিব, লইয়া কি করিব, আমি কোথায় যাইব, এ সুখের ভার লইয়া কোথায় ফেলিব? এ সুখের ভার লইয়া আমি দেশে দেশে ফিরিব; এ সুখ এক স্থানে ধরে না; যেখানে যেখানে পৃথিবীতে স্থান আছে, সেইখানে সেইখানে এ সুখ লইয়া যাইব, এ জগৎ সংসার এই সুখে পুরাইব। সংসার এ সুখের সাগরে ভাসাইব; মেরু হইতে মেরু পর্য্যন্ত সুখের তরঙ্গ নাচাইব, আপনি ডুবিয়া, উঠিয়া, ভাসিয়া, হেলিয়া, ছুটিয়া বেড়াইব। এ সুখে কমলাকান্তের অধিকার নাই—এ সুখে বাঙ্গালির অধিকার নাই। সুখের কথাতেই বাঙ্গালির অধিকার নাই। গোপীর দুঃখ, বিধাতা গোপীকে নারী করিয়াছেন কেন—আমাদের দুঃখ, বিধাতা আমাদের নারী করেন নাই কেন—তাহা হইলে এ দুঃখ দেখাইতে হইত না।

সুখের কথায় বাঙ্গালির অধিকার নাই—কিন্তু দুঃখের কথায় আছে। কাতরোক্তি যত গভীর, যতই হৃদয়বিদারক হউক না কেন, তাহা বাঙ্গালির মর্ম্মোক্তি।—আর কাতরোক্তি, কোথায় বা নাই? নবপ্রসূত পক্ষিশাবক হইতে মহাদেবের শঙ্কধ্বনি পর্য্যন্ত সকলই কাতরোক্তি। সম্পূর্ণ-সুখে সুখীও সুখকালে পূর্বদুঃখ স্মরণ করিয়া কাতরোক্তি করে। নহিলে সুখের সম্পূর্ণতা কি? দুঃখস্মৃতি ব্যতীত সুখের সম্পূর্ণতা কোথায়? সুখও দুঃখময়—

“তোমায় যখন পড়ে মনে,

আমি চাই বৃন্দাবন পানে,

আলুইলে কেশ নাহি বাঁধি।”

এই কথা সুখ দুঃখের সীমারেখা! যাহার নষ্ট সুখের স্মৃতি জাগরিত হইলে সুখের নিদর্শন এখনও দেখিতে পায়, সে এখনও সুখী—তাহার সুখ একেবারে লুপ্ত হয় নাই। তাহার বন্ধু, তাহার প্রিয়, বাঞ্ছিত—গিয়াছে, কিন্তু তাহার বৃন্দাবন আছে—মনে করিলে, সে সেই সুখভূমি পানে চাহিতে পারে। যাহার সুখ গিয়াছে—সুখের নিদর্শন গিয়াছে—বন্ধু গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে, এখন আর চাহিবার স্থান নাই—সেই দুঃখী, অনন্ত দুঃখে দুঃখী। বিধবা যুবতী, মৃত পতির যত্নরক্ষিত পাদুকা হারাইলে, যেমন দুঃখে দুঃখী হয়, তেমনিই দুঃখে দুঃখী।

আমার এই বঙ্গদেশের সুখের স্মৃতি আছে—নিদর্শন কই? দেবপালদেব, লক্ষ্মণসেন, জয়দেব, শ্রীহর্ষ,—প্রয়াগ পর্য্যন্ত রাজ্য, ভারতের অধীশ্বর নাম, গোড়ী রীতি, এ সকলের স্মৃতি আছে, কিন্তু নিদর্শন কই? সুখ মনে পড়িল, কিন্তু চাহিব কোন্ দিকে? সে গোড় কই? সে যে কেবল যবনলাঞ্ছিত ভগ্নাবশেষ! আৰ্য্য রাজধানীর চিহ্ন কই? আৰ্য্যের ইতিহাস কই? জীবনচরিত কই? কীর্ত্তি কই? কীর্ত্তিস্তম্ভ কই? সমরক্ষেত্র কই? সুখ গিয়াছে—সুখ-চিহ্নও গিয়াছে, বন্ধু গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে—চাহিব কোন্ দিকে?

চাহিবার এক শ্মশান-ভূমি আছে,—নবদ্বীপ। সেইখানে সপ্তদশ যবনে বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল। বঙ্গমাতাকে মনে পড়িলে, আমি সেই শ্মশান-ভূমি প্রতি চাই। যখন দেখি, সেই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম বেড়িয়া অদ্যাপি সেই কলধৌতবাহিনী গঙ্গা তর-তর রব করিতেছেন, তখন গঙ্গাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি—তুমি আছ, সে রাজলক্ষ্মী কোথায়? তুমি যাঁহার পা ধুয়াইতে, সেই মাতা কোথায়? তুমি যাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতে, সেই আনন্দরূপিণী কোথায়? তুমি যাঁহার জন্য সিংহল, বালী, আরব, সন্মিগ্রা হইতে বৃকে করিয়া ধন বহন করিয়া আনিতে, সে ধনেশ্বরী কোথায়? তুমি যাঁহার রূপের ছায়া ধরিয়া রূপসী সাজিতে, সে অনন্তসৌন্দর্য্যশালিনী কোথায়? তুমি যাঁহার প্রসাদি ফুল লইয়া ঐ স্বচ্ছ হৃদয়ে মালা পরিতে, সে পুষ্পাভরণা কোথায়? সে রূপ, সে ঐশ্বর্য্য কোথায় ধুইয়া লইয়া গিয়াছ? বিশ্বাসঘাতিন, তুমি কেন আবার শ্রবণমধুর কল কল তর তর রবে মন ভুলাইতেছ? বৃষ্টি তোমারই অতল গর্ভমধ্যে, যবনভয়ে ভীতা সেই লক্ষ্মী ডুবিয়াছেন, বৃষ্টি কুপত্রগণের আর মুখ দেখিবেন না বলিয়া ডুবিয়া আছেন। মনে মনে আমি সেই দিন কল্পনা করিয়া কাঁদি। মনে মনে দেখিতে পাই, মার্জিত বর্ষাফলক উন্নত করিয়া, অশ্বপদশব্দমাগ্রে নৈশ নীরব বিঘ্নিত করিয়া, যবনসেনা নবদ্বীপে আসিতেছে। কালপূর্ণ দেখিয়া নবদ্বীপ হইতে বাঙ্গালার লক্ষ্মী অন্তর্হিত হইতেছেন। সহসা আকাশ অন্ধকারে ব্যাপিল; রাজপ্রাসাদের চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। পৃথক ভীত হইয়া পথ ছাড়িল; নাগরীর অলঙ্কার খসিয়া পড়িল; কুঞ্জবনে পক্ষিগণ নীরব হইল; গৃহময়ূরকণ্ঠে অর্দ্ধব্যক্ত কেকার অপরাধ আর ফুটিল না। দিবসে নিশীথ উপস্থিত হইল, পণ্যবীথিকার দীপমালা নিবিয়া গেল, পূজাগৃহে বাজাইবার সময়ে শঙ্খ বাজিল না; পণ্ডিতে অশুদ্ধ মন্ত্র পড়িল; সিংহাসন হইতে শালগ্রামশিলা গড়াইয়া পড়িল। যুবরাজ সহসা বলক্ষয় হইল, যুবতী সহসা বৈধব্য আশঙ্কা করিয়া কাঁদিল; শিশু বিনারোগে মাতার ক্রোড়ে শূইয়া মরিল। গাঢ়তর, গাঢ়তর, গাঢ়তর অন্ধকারে দিক্ ব্যাপিল; আকাশ, অটালিকা, রাজধানী, রাজবর্ষ, দেবমন্দির, পণ্যবীথিকা, সেই অন্ধকারে ঢাকিল—কুঞ্জতীরভূমি, নদীসৈকত, নদীতরঙ্গ সেই অন্ধকারে—আঁধার, আঁধার, আঁধার হইয়া লুকাইল। আমি চক্ষু সব দেখিতেছি—আকাশ মেঘে ঢাকিতেছে—ঐ সোপানাবলী অবতরণ করিয়া রাজলক্ষ্মী জলে নামিতেছেন। অন্ধকারে নিব্বাণোন্মুখ আলোকবিন্দুবৎ, জলে ক্রমে ক্রমে সেই তেজোরশি বিলীন হইতেছে। যদি গঙ্গার অতল-জলে না ডুবিলেন, তবে আমার সেই দেশলক্ষ্মী কোথায় গেলেন?

ত্রয়োদশ সংখ্যা—বিড়াল

আমি শয়নগৃহে, চারপায়ীর উপর বসিয়া, হুঁকা হাতে ঝিমাইতেছিলাম। একটু মিট্ মিট্ করিয়া ক্ষুদ্র আলো জ্বলিতেছে—দেয়ালের উপর চণ্ডল ছায়া, প্রেতবৎ নাচিতেছে। আহার প্রস্তুত হয় নাই—এজন্য হুঁকা হাতে, নিম্নীলিতলোচনে আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমি যদি নেপোলিয়ন্ হইতাম, তবে ওয়াটার্ল্ জিতিতে পারিতাম কি না। এমত সময়ে একটি ক্ষুদ্র শব্দ হইল, “মেও!”

বিক্রম রচনাবলী

চাহিয়া দেখিলাম—হঠাৎ কিছু বৃষ্টিতে পারিলাম না। প্রথমে মনে হইল, ওয়েলিংটন হঠাৎ বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়া, আমার নিকট আফিস ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। প্রথম উদ্যমে, পাষণবৎ কঠিন হইয়া, বলিব মনে করিলাম যে, ডিউক মহাশয়কে ইতিপূর্বে যথোচিত পুরস্কার দেওয়া গিয়াছে, এক্ষণে আর অতিরিক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে না। বিশেষ অপরিমিত লোভ ভাল নহে। ডিউক বলিল, “মেও!”

তখন চক্ষু চাহিয়া ভাল করিয়া দেখিলাম যে, ওয়েলিংটন নহে। একটি ক্ষুদ্র মার্জার; প্রসন্ন আমার জন্য যে দুগ্ধ রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা নিঃশেষ করিয়া উদরসাৎ করিয়াছে, আমি তখন ওয়াটারের মাঠে বৃহৎ-রচনায় ব্যস্ত, অত দেখি নাই। এক্ষণে মার্জারসুন্দরী, নিজের দুগ্ধপানে পরিতৃপ্ত হইয়া আপন মনের সুখ এ জগতে প্রকটিত করিবার অভিপ্রায়ে, অতি মধুর স্বরে বলিতেছেন, “মেও!” বলিতে পারি না, বৃষ্টি, তাহার ভিতর একটু ব্যঙ্গ ছিল; বৃষ্টি, মার্জার মনে মনে হাসিয়া আমার পানে চাহিয়া ভাবিতোছিল, “কেহ মরে বিল ছেঁচে, কেহ খায় কই।” বৃষ্টি সে “মেও!” শব্দে একটু মন বৃষ্টিবার অভিপ্রায় ছিল। বৃষ্টি বিড়ালের মনের ভাব “তোমার দুগ্ধ ত খাইয়া বসিয়া আছি—এখন বল কি?”

বলি কি? আমি ত ঠিক করিতে পারিলাম না। দুগ্ধ আমার বাপেরও নয়। দুগ্ধ মঙ্গলার, দুহিয়াছে প্রসন্ন। অতএব সে দুগ্ধে আমারও যে অধিকার, বিড়ালেরও তাই; সুতরাং রাগ করিতে পারি না। তবে চিরাগত একটি প্রথা আছে যে, বিড়ালে দুগ্ধ খাইয়া গেলে, তাহাকে তাড়াইয়া মারিতে যাইতে হয়। আমি যে সেই চিরাগত প্রথার অবমাননা করিয়া মনুষ্যকুলে কুলাঙ্গার স্বরূপ পরিচিত হইব, ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে। কি জানি, এই মার্জারী যদি স্বজাতি-মণ্ডলে কমলাকান্তকে কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করে? অতএব পুরুষের ন্যায় আচরণ করাই বিধেয়। ইহা স্থির করিয়া, সকাতিরচিত্তে, হস্ত হইতে হুঁকা নামাইয়া, অনেক অন্দসন্ধানে এক ভগ্ন যষ্টি আবিষ্কৃত করিয়া সগর্বে মার্জারী প্রতি ধাবমান হইলাম।

মার্জারী কমলাকান্তকে চিনিত; সে যষ্টি দেখিয়া বিশেষ ভীত হওয়ার কোন লক্ষণ প্রকাশ করিল না। কেবল আমার দুগ্ধপানে চাহিয়া হাই তুলিয়া, একটু সরিয়া বসিল। বলিল, “মেও!” প্রশ্ন বৃষ্টিতে পারিয়া যষ্টি ত্যাগ করিয়া পুনরপি শয্যায় আসিয়া হুঁকা লইলাম। তখন দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হইয়া, মার্জারের বক্তব্যসকল বৃষ্টিতে পারিলাম।

বৃষ্টিলাম যে, বিড়াল বলিতেছে, “মারপিট কেন? স্থির হইয়া, হুঁকা হাতে করিয়া, একটু বিচার করিয়া দেখ দেখি? এ সংসারের ক্ষীর, সর, দুগ্ধ, দধি, মৎস্য, মাংস, সকলই তোমরা খাইবে, আমরা কিছুর পাইব না কেন? তোমরা মনুষ্য, আমরা বিড়াল, প্রভেদ কি? তোমাদের ক্ষুৎপিপাসা আছে—আমাদের কি নাই? তোমরা খাও, আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু আমরা খাইলেই তোমরা কোন্ শাস্ত্রানুসারে ঠেঙ্গা লাঠি লইয়া মারিতে আইস, তাহা আমি বহু অন্দসন্ধানে পাইলাম না। তোমরা আমার কাছে কিছুর উপদেশ গ্রহণ কর। বিজ্ঞ চতুষ্পদের কাছে শিক্ষালাভ ব্যতীত তোমাদের জ্ঞানোন্নতির উপায়ান্তর দেখি না। তোমাদের বিদ্যালয়সকল দেখিয়া আমার বোধ হয়, তোমরা এত দিনে এ কথাটি বৃষ্টিতে পারিয়াছ।

“দেখ, শয্যাশায়ী মনুষ্য! ধর্ম কি? পরোপকারই পরম ধর্ম। এই দুগ্ধটুকু পান করিয়া আমার পরম উপকার হইয়াছে। তোমার আহরিত দুগ্ধে এই পরোপকার সিদ্ধ হইল—অতএব তুমি সেই পরম ধর্মের ফলভাগী—আমি চুরিই করি, আর যাই করি, আমি তোমার ধর্মসংঘের মূলভূত কারণ। অতএব আমাকে প্রহার না করিয়া, আমার প্রশংসা কর। আমি তোমার ধর্মের সহায়।

“দেখ, আমি চোর বটে, কিন্তু আমি কি সাধ করিয়া চোর হইয়াছি? খাইতে পাইলে কে চোর হয়? দেখ, যাঁহারা বড় বড় সাধ, চোরের নামে শিহরিয়া উঠেন, তাঁহারা অনেকে চোর অপেক্ষাও অধার্মিক। তাঁহাদের চুরি করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই চুরি করেন না। কিন্তু তাঁহাদের প্রয়োজনাতীত ধন থাকিতেও চোরের প্রতি যে মূখ তুলিয়া চাহেন না, ইহাতেই চোরে চুরি করে। অধর্ম চোরের নহে—চোরে যে চুরি করে, সে অধর্ম কৃপণ ধনী। চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শত গুণে দোষী। চোরের দণ্ড হয়; চুরির মূল যে কৃপণ, তাহার দণ্ড হয় না কেন?

“দেখ, আমি প্রাচীরে প্রাচীরে মেও মেও করিয়া বেড়াই, কেহ আমাকে মাছের কাঁটাখানাও

ফেলিয়া দেয় না। মাছের কাঁটা, পাতের ভাত, নরদামায় ফেলিয়া দেয়, জলে ফেলিয়া দেয়, তথাপি আমাকে ডাকিয়া দেয় না। তোমাদের পেট ভরা, আমার পেটের ক্ষুধা কি প্রকারে জানিবে! হায়! দরিদ্রের জন্য ব্যথিত হইলে তোমাদের কি কিছু অর্গোরব আছে? আমার মত দরিদ্রের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া, লজ্জার কথা সন্দেহ নাই। যে কখন অন্ধকে মর্শ্চি-ভিক্ষা দেয় না, সেও একটা বড় রাজা ফাঁপরে পড়িলে রাগে ঘুমায় না—সকলেই পরের ব্যথায় ব্যথিত হইতে রাজি। তবে ছোটলোকের দৃঃখে কাতর! ছি! কে হইবে?

“দেখ, যদি অমুক শিরোমণি, কি অমুক ন্যায়ালঙ্কার আসিয়া তোমার দুধটুকু খাইয়া যাইতেন, তবে তুমি কি তাঁহাকে ঠেঙ্গা লইয়া মারিতে আসিতে? বরং ষোড়হাত করিয়া বলিতে, আর একটুকু কি আনিয়া দিব? তবে আমার বেলা লাঠি কেন? তুমি বলিবে, তাঁহারা অতি পণ্ডিত, বড় মান্য লোক। পণ্ডিত বা মান্য বলিয়া কি আমার অপেক্ষা তাঁহাদের ক্ষুধা বেশী? তা ত নয়—তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্যজাতির রোগ—দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বুঝে না। যে খাইতে বলিলে বিরক্ত হয়, তাহার জন্য ভোজের আয়োজন কর—আর যে ক্ষুধার জ্বালায় বিনা আহ্বানেই তোমার অন্ন খাইয়া ফেলে, চোর বলিয়া তাহার দণ্ড কর—ছি! ছি!

“দেখ, আমরাদিগের দশা দেখ, দেখ প্রাচীরে প্রাচীরে, প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে, প্রাসাদে প্রাসাদে, মেও মেও করিয়া আমরা চারি দিক্ দৃষ্টি করিতেছি—কেহ আমরাদিগকে মাছের কাঁটাখানা ফেলিয়া দেয় না। যদি কেহ তোমাদের সোহাগের বিড়াল হইতে পারিল—গৃহমাজ্জার হইয়া, বৃদ্ধের নিকট যুবতী ভার্য্যার সহোদর, বা মূর্খ ধনীর কাছে সতরণ খেলওয়ার স্থানীয় হইয়া থাকিতে পারিল—তবেই তাহার পুষ্টি। তাহার লেজ ফুলে, গায়ে লোম হয়, এবং তাহাদের রূপের ছটা দেখিয়া, অনেক মাজ্জার কবি হইয়া পড়ে।

“আর আমরাদিগের দশা দেখ—আহারাভাবে উদর কৃশ, অস্থি পরিদৃশ্যমান, লাঙ্গুল বিনত, দাঁত বাহির হইয়াছে—জিহ্বা ঝুলিয়া পড়িয়াছে—অবিরত আহারাভাবে ডাকিতেছি, “মেও! মেও! খাইতে পাই না!—” আমাদের কালো চামড়া দেখিয়া ঘৃণা করিও না! এ পৃথিবীর মৎসা মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে। খাইতে দাও—নাহলে চুরি করিব। আমাদের কৃষ্ণ চর্ম্ম, শূঙ্ক মুখ, ক্ষীণ স্কন্ধ মেও মেও শুনিয়া তোমাদিগের কি দৃঃখ হয় না? চোরের দণ্ড আছে, নিন্দ্যতার কি দণ্ড নাই? দরিদ্রের আহার সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন? তুমি কমলাকান্ত, দূরদর্শী, কেন না আফিংখোর, তুমিও কি দেখিতে পাও না যে, ধনীর দোষেই দরিদ্রে চোর হয়? পাঁচ শত দরিদ্রকে বণ্ডিত করিয়া একজনে পাঁচ শত লোকের আহাৰ্য্য সংগ্রহ করিবে কেন? যদি করিল, তবে সে তাহার খাইয়া যাহা বাহিয়া পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে; কেন না, অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।”

আমি আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলাম, “থাম! থাম মাজ্জারপণ্ডিতে! তোমার কথাগুলি ভারি সোশিয়ালিষ্টিক! সমাজবিশৃঙ্খলার মূল! যদি যাহার যত ক্ষমতা, সে তত ধনসঞ্চয় করিতে না পায়, অথবা সঞ্চয় করিয়া চোরের জ্বালায় নিষ্বিঘ্নে ভোগ করিতে না পায়, তবে কেহ আর ধনসঞ্চয়ে যত্ন করিবে না। তাহাতে সমাজের ধনবৃদ্ধি হইবে না।”

মাজ্জার বলিল, “না হইল ত আমার কি? সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধনবৃদ্ধি। ধনীর ধনবৃদ্ধি না হইলে দরিদ্রের কি ক্ষতি?”

আমি বুঝাইয়া বলিলাম যে, “সামাজিক ধনবৃদ্ধি ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই।” বিড়াল রাগ করিয়া বলিল যে, “আমি যদি খাইতে না পাইলাম, তবে সমাজের উন্নতি লইয়া কি করিব?”

বিড়ালকে বুঝান দায় হইল। যে বিচারক বা নৈয়ায়িক, কস্মিন্ কালে কেহ তাহাকে কিছু বুঝাইতে পারে না। এ মাজ্জার সুবিচারক, এবং সুতর্কিকও বটে, সুতরাং না বুঝিবার পক্ষে ইহার অধিকার আছে। অতএব ইহার উপর রাগ না করিয়া বলিলাম, “সমাজের উন্নতিতে দরিদ্রের প্রয়োজন না থাকিলে না থাকিতে পারে, কিন্তু ধনীদিগের বিশেষ প্রয়োজন, অতএব চোরের দণ্ডবিধান কর্তব্য।”

মাজ্জারী মহাশয়া বলিলেন, “চোরকে ফাঁসি দাও, তাহাতেও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে আর একটি নিয়ম কর। যে বিচারক চোরকে সাজা দিবেন, তিনি আগে তিন দিবস উপবাস করিবেন। তাহাতে যদি তাঁহার চুরি করিয়া খাইতে ইচ্ছা না করে, তবে তিনি স্বচ্ছন্দে

বিক্রম রচনাবলী

চোরকে ফাঁসি দিবেন। তুমি আমাকে মারিতে লাঠি তুলিয়াছিলে, তুমি অদ্য হইতে তিন দিবস উপবাস করিয়া দেখ। তুমি যদি ইতিমধ্যে নসীরাম বাবুর ভাণ্ডারঘরে ধরা না পড়, তবে আমাকে ঠেঙ্গাইয়া মারিও, আমি আপত্তি করিব না।”

বিজ্ঞ লোকের মত এই যে, যখন বিচারে পরাস্ত হইবে, তখন গন্তীরভাবে উপদেশ প্রদান করিবে। আমি সেই প্রথানুসারে মাজ্জারকে বলিলাম যে, “এ সকল অতি নীতিবিরুদ্ধ কথা, ইহার আন্দোলনেও পাপ আছে। তুমি এ সকল দূর্শ্চস্তা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মাচরণে মন দাও। তুমি যদি চাহ, তবে পাঠার্থে তোমাকে আমি নিউমান ও পার্করের গ্রন্থ দিতে পারি। আর কমলাকান্তের দপ্তর পড়িলেও কিছু উপকার হইতে পারে—আর কিছু হউক বা না হউক, আফিঙ্গের অসীম মহিমা বৃদ্ধিতে পারিবে। এক্ষণে স্বস্থানে গমন কর, প্রসন্ন কাল কিছু ছানা দিবে বলিয়াছে, জলযোগের সময় আসিও, উভয়ে ভাগ করিয়া খাইব। অদ্য আর কাহারও হাঁড়ি খাইও না; বরং ক্ষুধায় যদি নিতান্ত অধীর হও, তবে পুনর্বার আসিও, এক সরিষাভোর আফিঙ্গ দিব।”

মাজ্জার বলিল, “আফিঙ্গের বিশেষ প্রয়োজন নাই, তবে হাঁড়ি খাওয়ার কথা, ক্ষুধানুসারে বিবেচনা করা যাইবে।”

মাজ্জার বিদায় হইল। একটি পতিত আত্মাকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিয়াছি, ভাবিয়া কমলাকান্তের বড় আনন্দ হইল।

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী

চতুর্দশ সংখ্যা—ঢেঁকি

আমি ভাবি কি, যদি পৃথিবীতে ঢেঁকি না থাকিত, তবে খাইতাম কি? পাখীর মত দাঁড়ে বসিয়া ধান খাইতাম? না, লাঙ্গুলকর্ণদুলামানা গজেন্দ্রগামিনী গাভীর মত মরাইয়ে মুখ দিতাম? নিশ্চয় তাহা আমি পারিতাম না—নবযুবা কৃষ্ণকায় বস্ত্রশূন্য কৃষাণ আসিয়া আমার পঞ্জরে ঘণ্টিপাত করিত, আর আমি ফোঁস্ করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া শৃঙ্গ লাঙ্গুল লইয়া পলাইতাম। আর্ষ্যসভ্যতার অনন্ত মহিমায় সে ভয় নাই—ঢেঁকি আছে—ধান চাল হয়। আমি এই পরোপকার-নিরত ঢেঁকিকে আর্ষ্যসভ্যতার এক বিশেষ ফল মনে করি—আর্ষ্যসাহিত্য, আর্ষ্যদর্শন আমার মনে ইহার কাছে লাগে না—রামায়ণ, কুমারসম্ভব, পাণিনি, পতঞ্জলি, কেহ ধানকে চাল করিতে পারে না। ঢেঁকিই আর্ষ্যসভ্যতার মুখোজ্জ্বলকারী পুত্র,—শ্রাদ্ধাধিকারী,—নিত্য পিণ্ডদান করিতেছে। শুধু কি ঢেঁকিশালে? সমাজে, সাহিত্যে, ধর্ম্মসংস্কারে, রাজসভায়,—কোথায় না ঢেঁকি আর্ষ্যসভ্যতার মুখোজ্জ্বলকারী পুত্র,—শ্রাদ্ধাধিকারী,—নিত্য পিণ্ডদান করিতেছে। দুঃখের মধ্যে ইহাতেও আর্ষ্যসভ্যতা মূর্ত্তিলাভ করিল না, আজিও ভূত হইয়া রহিয়াছে। ভরসা আছে, কোন ঢেঁকি অচিরাৎ তাহার গয়া করিবে।

ঢেঁকির এই অপরিমেয় মাহাত্ম্যের কারণানুসন্ধানে আমি বড় সম্মুৎসুক হইলাম। এ ঊনবিংশ শতাব্দী, বৈজ্ঞানিক সময়—অবশ্য কারণ অনুসন্ধান করিতে হয়। কোথা হইতে ঢেঁকির এই কার্যদক্ষতা! এই পরোপকারে মতি! এই Public spirit? নাবস্তুনা বস্তুরিসিক্তিঃ?—বিনা কারণে কি ইহা জন্মে? অনুসন্ধানার্থ আমি ঢেঁকিশালে গেলাম।

দেখিলাম, ঢেঁকি খানায় পড়িতেছে। বিন্দুমাত্র মদ্যপান করে নাই, তথাপি পুনঃ পুনঃ খানায় পড়িতেছে, উঠিতেছে, বিরতি নাই। ভাবিলাম, মুহূর্ম্মুহুঃ খানায় পড়াই কি এত মাহাত্ম্যের কারণ? ঢেঁকি খানায় পড়ে বলিয়াই কি এত পরোপকারে মতি? এতটা Public spirit? ভাবিলাম—না, তাহা কখনই হইতে পারে না। কেন না, আমার রামচন্দ্র ভায়াও দুই বেলা খানায় পড়িয়া থাকেন—কিন্তু কই, তাহার ত কিছু মাত্র Public spirit নাই। শৌণ্ডিকালয়ের বাহিরে ত তাহার পরোপকার কিছু দেখি না। আরও—মনের কথা লুকাইলে কি হইবে? আমিও—আমি শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী স্বয়ং, একদিন খানায় পড়িয়াছিলাম। দ্রাক্ষারসের বিকার-বিশেষের সেবনে আমার এই গন্তলোক প্রাপ্তি ঘটে নাই—কারণান্তরে। প্রসন্ন গোয়ালিনী—গোপাঙ্গনাকুল-কল্যাণিনী,—এক দিন তাহার মঙ্গলা গাইকে ছাড়িয়া দিয়াছিল। ছাড়িবামাত্র মঙ্গলা, উদ্ধর্পুচ্ছে, প্রণতশৃঙ্গে ধাবমানা! কি ভাবিয়া মঙ্গলা ছুটিল তা বলিতে পারি না,—স্বীজাতি ও

গোজাতির মনের কথা কি প্রকারে বলিব? কিন্তু আমি ভাবিলাম, আমিই তাহার উভয় শৃঙ্গের একমাত্র লক্ষ্য। তখন আমি কটিদেশ দৃঢ়তর বন্ধ করিয়া, সদর্পে বন্ধপারিকর হইয়া, উদ্ধবশ্বাসে পলায়মান! পশ্চাতে সেই ভীষণা ঘটোখুণী রাক্ষসী! আমিও যত দৌড়াই, সেও তত দৌড়ায়। কাজেই, দৌড়ের চোটে ওচট খাইয়া, গড়াইতে গড়াইতে গড়াইতে, চন্দ্রসূর্য গ্রহনক্ষত্রের ন্যায় গড়াইতে গড়াইতে গড়াইতে—বিবরলোক প্রাপ্ত! “আলু থালু কেশ পাশ, মূখে না বহিছে শ্বাস”—হায়! তখন কি আমার হৃদয়-আকাশ মধ্যে Public spirit রূপ পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইয়াছিল? না হইয়াছিল এমত নহে। তখন আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম যে, বসুন্ধরা যদি গোশূন্যা হয়েন, আর নারিকেল, তাল, খজুর প্রভৃতি বৃক্ষ হইতে দ্রুক্ষনিঃসরণ হয়, তবে এই দ্রুক্ষপোষ্য বাঙ্গালি-জাতির বিশেষ উপকার হয়। তাহারা শৃঙ্গভীতিশূন্য হইয়া দ্রুক্ষ পান করিতে থাকে। সে দিন সেই বিবরপ্রাপ্ত হেতু আমার পরহিতকামনা এত দূর প্রবল হইয়াছিল যে, আমি প্রসন্নকে সময়ান্তরে বলিয়াছিলাম, “অয়ি দধিদ্রুক্ষক্ষীরনবনীত-পরিবেষ্টিতা গোপকন্যে! তুমি গোরুগর্দূল বিক্রয় করিয়া স্বয়ং লাউ ভূসি খাইতে থাক, তুমি স্বয়ং ঘটোখুণী হইয়া বহুতর দ্রুক্ষপোষ্য প্রতিপালন করিতে পারিবে,—কাহাকেও গুঁতাইও না।” প্রত্যুত্তরে প্রসন্ন হঠাৎ সম্মাজর্জনী হস্তে গ্রহণ করায়, সে দিন আমাকে পরহিতরত পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

অতএব পরহিতেচ্ছা, দেশবাৎসল্য “সাধারণ আত্মা” অর্থাৎ Public spirit, বিশেষতঃ কার্যদক্ষতা, এ সকল খানায় পড়িলে হয় কি না? যদি না হয়, তবে ঢেঁকির এ কার্যদক্ষতা এ মহাবল কোথা হইতে আসিল? আমি এই কূটতর্কের মীমাংসার জন্য সন্দিহানিচিন্তে ভাবিতে-ছিলাম, এমত সময়ে মধুরকণ্ঠে কে বলিল, “চক্রবর্তী মহাশয়! হাঁ করিয়া কি ভাবিতেছ? ঢেঁকি কখনও দেখ নাই?”

চাহিয়া দেখিলাম, তরঙ্গিণী মাতঙ্গিনী দুই ভাগিনী ঢেঁকিতে পাড় দিতেছে। সে দিকে এতক্ষণ চাহিয়া দেখি নাই। হাতী দেখিতে গিয়া অন্ধ কেবল শৃঙ্গ দেখিয়াছিল, আমিও ঢেঁকি দেখিতে গিয়া কেবল ঢেঁকির শৃঙ্গ দেখিতেছিলাম। পিছনে যে দুই জনের দুইখানি রাঙ্গা পা ঢেঁকির পিঠে পড়িতেছে, তাহা দেখিয়াও দেখি নাই! দেখিবামাত্র যেন কে আমার চোখের ঠুলি খুলিয়া লইল।

আমার দিব্য জ্ঞানের উদয় হইল—কার্যকারণসম্বন্ধপরম্পরা আমার চক্ষে প্রথর সূর্য্যকিরণে প্রভাসিত হইল। ঐ ত ঢেঁকির বল!—ঐ ত ঢেঁকির মাহাত্ম্যের মূল কারণ!—ঐ রমণীপাদপদ্ম! ধপাধপ পাদপদ্ম পিঠে পড়িতেছে, আর ঢেঁকি ধান ভানিয়া চাল করিতেছে। উঠিয়া পড়িয়া—ঢক ঢক কচ কচ! কত পরোপকারই করিতেছে! হায় ঢেঁকি! ও পায়ের কি এত গুণ! পিঠে পাইয়া তুমি এই সাত কোটি বাঙ্গালিকে অন্ন দিতেছ—তার উপর আবার দেবতার ভোগ দিতেছ! এস, মেয়েমানুষের শ্রীচরণ! তুমি ভাল করিয়া ঢেঁকির পিঠে পড়। আমি কৃতজ্ঞতাপাশে বন্ধ হইয়া তোমায়—হায়! কি করিব?—কাঁসার মল পরাই!

আর ভাই, ঢেঁকির দল! তোমাদের বিদ্যা বুদ্ধি বুদ্ধিয়ারি। যখনই পিঠে রমণীপাদপদ্ম ওরফে মেয়ে লাথি পড়ে, তখনই তোমরা ধান ভান,—নহিলে কেবল কাঠ—দারুময়—গর্তে শৃঙ্গ লুকাইয়া, লেজ উঁচু করিয়া, ঢেঁকিশালে পড়িয়া থাক। বিদ্যার মধ্যে খানায় পড়া, আনন্দের মধ্যে “ধান্য”; পুরস্কারের মধ্যে সেই রাঙ্গা পা। আবার শূন্যতে পাই, তোমাদের একটি বিশেষ গুণ আছে নাকি?—ঘরে থাকিয়া নাকি মধ্যে মধ্যে কুমীর হও? আর ভাই ঢেঁকি, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—মধ্যে মধ্যে স্বর্গে যাওয়া হয় শূন্যিয়াছি, সত্য সত্যই কি সেখানে গিয়াও ধান ভানিতে হয়? দেবতারা সকলে অমৃত খায়, পারিজাত লোফে, অম্বর লইয়া ক্রীড়া করে, মেঘে চড়ে, বিদ্যুৎ ধরে, রতি রতিপতির সঙ্গে লুকোচুরি খেলে—তুমি নাকি ততক্ষণ কেবল ঘেচর ঘেচর করিয়া ধান ভান? ধন্য সাধ্য ভাই তোমার!

ঢেঁকি কোন উত্তর দিল না, কেবলই ধান ভানে। রাগ করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলাম—একেবারে কমলাশ্রমে। কমলাশ্রমটা কি? ‘ননীবাবু সম্প্রতি ধান ভানিতে গিয়াছেন। নিপ্রত্যাশী নাপিতানী একখানি ভাঙ্গা চালা ঘর রাখিয়া উত্তরাধিকার-বিবাহিতা হইয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছে—ঘরখানির এমনি অবস্থা যে, আর কেহ তাহার কামনা করিল না—সুতরাং আমি তাহাতে কমলাশ্রম করিয়াছি—কেবল কমলাকাশের আশ্রম নহে—সাক্ষাৎ কমলার আশ্রম। আমি সেইখানে চারপাইর উপর পড়িয়া আফিস চড়াইলাম। তখন চক্ষু বুদ্ধিয়া আসিল। জ্ঞানের উদয় হইল।

বাংকম রচনাবলী

দেখিলাম, এ সংসার কেবল ঢেঁকিশাল। বড় বড় ইমারত, বৈঠকখানা, রাজপুরী সব ঢেঁকিশালা—তাহাতে বড় বড় ঢেঁকি, গড়ে নাক পুরিয়া খাড়া হইয়া রহিয়াছে। কোথাও জমিদাররূপ ঢেঁকি, প্রজাদিগের হৃৎপিণ্ড গড়ে পিষিয়া, নতন নিরিখ রূপ চাউল বাহির করিয়া সুখে সিদ্ধ করিয়া অন্ন ভোজন করিতেছেন। কোথাও আইনকারক ঢেঁকি, মিনিট রিপোর্টের রাশি গড়ে পিষিয়া, ভানিয়া বাহির করিতেছেন—আইন; বিচারক ঢেঁকি সেই আইনগুলি গড়ে পিষিয়া বাহির করিতেছেন—দারিদ্র্য, কারাবাস—ধনীর ধনাস্ত—ভাল মানুষের দেহান্ত। বাবু ঢেঁকি, বোতল গড়ে পিতৃধন পিষিয়া বাহির করিতেছেন—পিলে যকুৎ; তাঁর গৃহিণী ঢেঁকি একাদশীর গড়ে বাজার খরচ পিষিয়া বাহির করিতেছেন—অনাহার। সর্বাপেক্ষা ভয়ানক দেখিলাম লেখক ঢেঁকি—সাক্ষাৎ মা সরস্বতীর মূণ্ড ছাপার গড়ে পিষিয়া বাহির করিতেছেন—স্কুলবুক!

দেখিতে দেখিতে দেখিলাম—আমিও একটা মস্ত ঢেঁকি—কমলাশ্রমে লম্বমান হইয়া পড়িয়া আছি; নেশার গড়ে মনোদুঃখ ধান্য পিষিয়া দপ্তর চাউল বাহির করিতেছি। মনে মনে অহঙ্কার জন্মিল—এমন চাউল ত কাহারও গড়ে হইতেছে না। তখন ইচ্ছা হইল—এ চাউল মনুষ্য-লোকের উপযুক্ত নহে, আমি স্বর্গে গিয়া ধান ভানিব। তখনই স্বর্গে গেলাম—“অশ্বমেনোরথে।” স্বর্গে গিয়া, দেবরাজকে প্রণাম করিয়া বলিলাম, “হে দেবেন্দ্র! আমি শ্রীকমলাকান্ত ঢেঁকি—স্বর্গে ধান ভানিব।”

দেবেন্দ্র বলিলেন, “আপত্তি কি—পুরস্কার চাই কি?”

আমি। উর্ষ্বশী মেনকা রম্ভা।

দেবরাজ। উর্ষ্বশী মেনকা পাইবে না—আর যাহা চাহিলে, তাহা ত মর্ত্যলোকেও তুমি পাইয়া থাক,—আটটার হিসাবে।

আমি দুঃস্মৃৎ—বলিলাম, “কি ঠাকুর, অষ্টরম্ভা! সে কি আজকাল নরলোকের পাবার যো আছে? সে আজকাল দেবতাদেরই একচেটে।”

সন্তুষ্ট হইয়া দেবরাজ আমাকে বক্শিশ হুকুম করিলেন,—এক সের অমৃত, আর এক ঘণ্টার জন্য উর্ষ্বশীর সঙ্গীত। চৈতন্য হইয়া দেখিলাম, পাশে ঘটিতে এক সের দুগ্ধ,—আর প্রসন্ন, দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছে—“নেশাখোর!” “বিটলে!” “পেটাতী!” ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি উর্ষ্বশীকে বলিলাম, “বাইজি! এক ঘণ্টা হইয়াছে—এখন বন্ধ কর।”

কমলাকান্তের পত্র

প্রথম সংখ্যা—কি লিখিব?

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বঙ্গদর্শন* সম্পাদক মহাশয়

শ্রীচরণকমলেষু।

আমার নাম শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী, সাবেক নিবাস শ্রীশ্রীর্নাসিধাম, আপনাকে আমি প্রণাম করি। আপনার নিকট আমার সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচয় নাই, কিন্তু আপনি নিজগুণে আমার বিশেষ পরিচয় লইয়াছেন, দেখিতেছি। ভীষ্মদেব খোশ্‌নবীস, জুয়াচোর লোক আমি পূর্বেই বদ্বিষ্যাছিলাম—আমি দপ্তরটি তাহার নিকট গচ্ছিত রাখিয়া তীর্থদর্শনে যাত্রা করিয়াছিলাম; তিনি সেই অবসর পাইয়া সেইটি আপনাকে বিক্রয় করিয়াছেন। বিক্রয় কথাটি আপনি স্বীকার করেন নাই, কিন্তু আমি জানি, ভীষ্মদেব ঠাকুর বিনামূল্যে শালগ্রামকে তুলসী দেন না, বিনামূল্যে যে আপনাকে শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী প্রণীত দপ্তর দিবেন, এমত সম্ভাবনা অতি বিরল। এই জুয়াচুরির কথা আমি এত দিন জানিতাম না। দৈবাধীন একটি যোড়া জুতা কিনিয়া এ সন্ধান পাইলাম। একখানি ছাপার কাগজে জুতা যোড়াটি বান্ধা ছিল, দেখিয়া ভাবিতেছিলাম যে, কাহার এমন সৌভাগ্যের উদয় হইল যে, তাহার রচনা শ্রীমৎ কমলাকান্ত শর্ম্মার চরণযুগলের ব্যবহার্য্য

* “কমলাকান্তের দপ্তর” বঙ্গদর্শনে প্রথম প্রকাশিত হয়। যখন এই পত্রগুলি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়, তখন সঞ্জীব বাবু ইহার সম্পাদক।

পাদুকাদ্বয় মণ্ডন করিতেছে! মনে করিলাম, সার্থক তাহার লেখনীধারণ! সার্থক তাহার নিশীথ-তৈলদাহ! মূর্খের দ্বারা তাহার রচনা পঠিত না হইয়া সাধু জনের চরণের সঙ্গে যে কোন প্রকার সম্বন্ধযুক্ত হইয়াছে, ইহা বঙ্গীয় লেখকের সৌভাগ্য। এই ভাবিয়া কৌতূহলবিষ্ট হইয়া পড়িয়া দেখিলাম যে, কাগজখানি কি। পড়িলাম, উপরে লেখা আছে, “বঙ্গদর্শন”। ভিতরে লেখা আছে, “কমলাকান্তের দপ্তর”। তখন বুদ্ধিলাসে যে, আমার এ পূর্বজন্মজিজ্ঞাসিত সূকৃতির ফল।

আরও একটু কৌতূহল জন্মিল। বঙ্গদর্শন কি, তাহা জানিবার ইচ্ছা হইল। একজন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, “মহাশয়, বঙ্গদর্শনটা কি, তাহা বলিতে পারেন?” তিনি অনেকক্ষণ ভাবিলেন। অনেকক্ষণ পরে মস্তক উত্তোলন করিয়া বলিলেন, “বোধ হয় বঙ্গদেশ দর্শন করাই বঙ্গদর্শন।” আমি তাহার পাণ্ডিত্যের অনেক প্রশংসা করিলাম, কিন্তু অগত্যা অন্য বন্ধুকেও ঐ প্রশ্ন করিতে হইল। অন্য বন্ধু সিদ্ধান্ত করিলেন যে, শকারের উপর যে রেফার্ট আছে, বোধ হয়, তাহা মদ্রাকরের ভ্রম; শব্দটি “বঙ্গদর্শন,” অর্থাৎ বাঙ্গালার দাঁত। আমি তাহাকে চতুষ্পাঠী খুলিতে পরামর্শ দিয়া অন্য এক সুশিক্ষিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বঙ্গ শব্দে পূর্ব-বাঙ্গালা ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, “ইহার অর্থ পূর্ব বাঙ্গালা দর্শন করিবার বিধি”; অর্থাৎ “A Guide to Eastern Bengal.” এইরূপ বহু প্রকার অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে জানিতে পারিলাম যে, বঙ্গদর্শন একখানি মাসিক পত্রিকা এবং তাহাতে কমলাকান্ত শর্ম্মার মাসিক পিণ্ডদান হইয়া থাকে। এক্ষণে আবার শুনিতোছি, কোন ধনুর্ধর ঐ দপ্তরগুলি নিজপ্রণীত বলিয়া প্রচারিত করিয়াছেন। আরও কত হবে!

অতএব হে বঙ্গদর্শন-সম্পাদক মহাশয়! অবগত হউন যে, আমি শ্রীকমলাকান্ত শর্ম্মার সশরীরে ইহজগতে অদ্যাপি অধিষ্ঠান করিতেছি এবং আপনাদিগের বিশেষ আপত্তি থাকিলেও আরও কিছু দিন অধিষ্ঠান করিব এমত ইচ্ছা রাখি।

এক্ষণে কি জন্য আপনাকে অদ্য পত্র লিখিতেছি, তাহা অবগত হউন। উপরে দেখিতে পাইবেন, “শ্রীশ্রীনািসধাম” লিখিয়াছি। অর্থাৎ আমার নসিবাবু শ্রীশ্রী ঈশ্বরে বিলীন হইয়াছেন! ভরসা করি যে, তিনি সর্ব্বাশ্রয় শ্রীপাদপদ্মে পৌঁছিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহার গতি কোন্ পথে হইয়াছে, তাহার নিশ্চিত সম্বাদ আমি রাখি না। কেবল ইহাই জানি যে, ইহলোকে তিনি নাই। অতএব আমারও আশ্রয় নাই! অহিফেনের কিছু গোলযোগ হইয়া উঠিয়াছে। তাহার কিছু বন্দোবস্ত করিতে পারেন? আমার দপ্তরের জন্য আপনি খোশনবীস মহাশয়কে কি দিয়াছিলেন বলিতে পারি না; কিন্তু আমাকে এক আধ পোয়া আফিজ পাঠাইলেই (আমার মাত্রা কিছু বেশী) আমি এক একাটি প্রবন্ধ পাঠাইতে পারিব। আপনার মঙ্গল হউক! আপনি ইহাতে দ্বির্ভুক্তি করিবেন না।

কিন্তু আপনার সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত পাকাপাকি করিবার আগে, গোটা কত কথা জিজ্ঞাসা আছে। এ কমলাকান্ত কলে, ফরমাসে মত সকল রকমের রচনা প্রস্তুত হয়—আপনার চাই কি? নাটক নবেল চাই, না পলিটিক্সের দরকার? কিছু ঐতিহাসিক গবেষণা পাঠাইব, না সংক্ষিপ্ত সমালোচনার বাহার দিব? বিজ্ঞানশাস্ত্রে আপনার প্রসক্তি, না ভৌগোলিকতত্ত্ব রসে আপনি সুদীর্ঘকাল? স্থূল কথাটা, গুরু বিষয় পাঠাইব, না লঘু বিষয় পাঠাইব? আমার রচনার মূল্য, আপনি গজ দরে দিবেন, না মণ দরে দিবেন? আর যদি গুরু বিষয়েই আপনার অভিরুচি হয়, তবে বলিবেন, তাহার কি প্রকার অলঙ্কার সমাবেশ করিব। আপনি কোটেশ্যান ভালবাসেন, না ফুটনোটে আপনার অনুরাগ? যদি কোটেশ্যান বা ফুটনোটের প্রয়োজন হয়, তবে কোন ভাষা হইতে দিব, তাহাও লিখিবেন। ইউরোপ ও আশিয়ার সকল ভাষা হইতেই আমার কোটেশ্যান সংগ্রহ করা হইয়াছে—আফ্রিকা ও আমেরিকার কতকগুলি ভাষার সন্ধান পাই নাই। কিন্তু সেই সকল ভাষার কোটেশ্যান, আমি অচিরাৎ প্রস্তুত করিব, আপনি চিন্তিত হইবেন না।

যদি গুরু বিষয়ক রচনা আপনার নিতান্ত মনোনীত হয়, তবে কি প্রকার গুরু বিষয়ে আপনার আকাঙ্ক্ষা, তাহাও জানাইবেন। আমি স্বয়ং সে দিকে কিছু করিতে পারি না পারি, আমার এক বড় সহায় জুটিয়াছে। ভীষ্মদেব খোশনবীস মহাশয়ের পুত্র যিনি ইউর্টালিটি শব্দের আশ্চর্য ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, * তাহাকে আপনার স্মরণ থাকিতে পারে। তিনি এক্ষণে

* ইউ—টিল—ইটি—আই।

বিশ্বকম রচনাবলী

কৃতবিদ্যা হইয়াছেন। এম, এ, পাস করিয়া বিদ্যার ফাঁস গলায় দিয়াছেন। গুরু বিষয়ে তাহার সম্পূর্ণ অধিকার। ইস্কুলের বহি চাই কি? তিনি বর্ণপরিচয় হইতে রোমদেশের ইতিহাস পর্যন্ত সকলই লিখিতে পারেন। ন্যাচরল্ হিষ্টরির একশেষ করিয়া রাখিয়াছেন; পুরাতন পেনি-মেগেজিন্ হইতে অনেক প্রবন্ধের অনুবাদ করিয়া রাখিয়াছেন, এবং গোল্ডস্মিথ কৃত এনিমেটেড্ নেচরের সারাংশ সংকলন করিয়া রাখিয়াছেন। সে সব চাই কি? গুরুর মধ্যে গুরু যে পাটীগণিত এবং জ্যামিতি, তাহাতেও সাহসশূন্য নহেন। জ্যামিতি এবং ত্রিকোণমিতি চুলোয় যাক, চতুষ্কোণমিতিতেও তাহার অধিকার—দৈববিদ্যাবলে তিনি আপনার পৈতৃক চতুষ্কোণ পুরুটিও মাপিয়া ফেলিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, শূন্য লোকে ধন্য ধন্য করিয়াছিল। তাহার ঐতিহাসিক কীর্তির কথা কি বলিব? তিনি চিতোরের রাজা আলফ্রেড দি গ্রেটের একখানি জীবন-চরিত দশ-পনের পৃষ্ঠা লিখিয়া রাখিয়াছেন এবং বাঙ্গালা সাহিত্য-সমালোচন-বিষয়ক একখানি গ্রন্থ মহাভারত হইতে সংকলিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাতে কোমত ও হবট স্পেন্সরের মত খণ্ডন আছে; এবং ডারুইন যে বলেন, যে মাধ্যাকর্ষণের বলে পৃথিবী স্থির আছে, তাহারও প্রতিবাদ করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে মালতীমাধব হইতে চারি পাঁচটা শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে, সুতরাং এখানি মোটের উপরে ভারি রকমের গুরুবিষয়ক গ্রন্থ হইয়া উঠিয়াছে। ভরসা করি, সমালোচনাকালে আপনারা বলিবেন, বাঙ্গালা ভাষায় ইহা অদ্বিতীয়।

ভরসা করি, গুরু বিষয় ছাড়িয়া লঘু বিষয়ে আপনার অভিরুচি হইবে না। কেন না, সে সকলের কিছু অসুবিধা। খোশনবীসপুত্র একখানি নাটকের সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখিয়াছেন বটে; নায়িকার নাম চন্দ্রকলা কি শশিরম্ভা রাখিবেন স্থির করিয়াছেন,—তাঁহার পিতা বিজয়পুরের রাজা ভীমসিংহ; আর নায়ক আর একটা কিছু সিংহ; এবং শেষ অঙ্কে শশিরম্ভা নায়কের বন্ধু ছদ্ম মারিয়া আপনি হা হতোহস্মি করিয়া পুড়িয়া মরিবেন, এই সকল স্থির করিয়াছেন। কিন্তু নাটকের আদ্য ও মধ্যভাগ কি প্রকার হইবে, এবং অন্যান্য “নাটকোল্লিখিত ব্যক্তিগণ” কিরূপ করিবেন, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। শেষ অঙ্কের ছদ্ম-মারা সিনের কিছু লিখিয়া রাখিয়াছেন; এবং আমি শপথ পূর্বক আপনার নিকট বলিতে পারি যে, যে কুড়ি ছত্র লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে আটটা “হা, সখি!” এবং তেরটা “কি হলো! কি হলো!” সমাবেশ করিয়াছেন। শেষে একটি গীতও দিয়াছেন—নায়িকা ছদ্ম হস্তে করিয়া গায়িতেছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, নাটকের অন্যান্য অংশ কিছুই লেখা হয় নাই।

যদি নবেলে আপনার আকাঙ্ক্ষা হয়, তাহা হইলেও আমরা অর্থাৎ খোশনবীস কোম্পানী কিছু অপস্থত নহি। আমরা উত্তম নবেল লিখিতে পারি, তবে কি না ইচ্ছা ছিল যে, বাজে নবেল না লিখিয়া ডনকুইক্সোট বা জিলরার পরিশিষ্ট লিখিব। দুর্ভাগ্যবশতঃ দুইখানি পুস্তকের একখানিও এ পর্যন্ত আমাদের পড়া হয় নাই। সম্প্রতি মেকলের এসের পরিশিষ্ট লিখিয়া দিলে আপনার কার্য হইতে পারে কি? সেও নবেল বটে।

যদি কাব্য চাহেন, তবে মিত্রাক্ষর অমিত্রাক্ষর বিশেষ করিয়া বলিবেন। মিত্রাক্ষর আমাদের হইতে হইবে না—আমরা পয়ার মিলাইতে পারি না। তবে অমিত্রাক্ষর যত বলিবেন, তত পারিব। সম্প্রতি খোশনবীসের ছানা, জীমূতনাদবধ বলিয়া একখানি কাব্যের প্রথম খণ্ড লিখিয়া রাখিয়াছেন, ইহা প্রায় মেঘনাদবধের তুল্য—দুই চারিটা নামের প্রভেদ আছে মাত্র। চাই?

আর যদি লঘু গুরু সব ছাড়িয়া, খোশনবীসী রচনা ছাড়িয়া, সাফ কমলাকান্তি ঢঙ্গে আপনার রুচি হয়, তবে তাও বলুন, আমার প্রণীত ছাই ভস্ম যাহা কিছু লেখা থাকে, তাহা পাঠাই। মনে থাকে যেন, তাহার বিনিময়ে আফিস লইব! ওজন কড়ায় গুণ্ডায় বন্ধিয়া লইব—এক তিল ছাড়িব না!

আপনি কি রাজি? আপনি রাজি হউন বা না হউন, আমি রাজি।

দ্বিতীয় সংখ্যা—পলিটিক্‌স্

শ্রীচরণেশ্বর, আফিস পাইয়াছি। অনেকটা আফিস পাঠাইয়াছেন—শ্রীচরণকমলেষু। আপনার শ্রীচরণকমলেষুগলেষু—আরও কিছু আফিস পাঠাইবেন।

কিন্তু শ্রীচরণকমলেষুগল হইতে কমলাকান্তের প্রতি এমন কঠিন আঞ্জা কি জন্য হইয়াছে,

বুঝতে পারিলাম না। আপনি লিখিয়াছেন যে, এক্ষণে নয় আইনে অন্যত্র কিছু পলিটিক্‌স্‌ কম পড়িবে—তুমি কিছু পলিটিক্‌স্‌ ঝাড়িলে ভাল হয়। কেন মহাশয়? আমি কি দোষ করিয়াছি যে, পলিটিক্‌স্‌ সর্বেশ্বরপী আমা ইট মাথায় মারিব? কমলাকান্ত ক্ষুদ্রজীবী ব্রাহ্মণ, তাহাকে পলিটিক্‌স্‌ লিখবার আদেশ কেন করিয়াছেন? কমলাকান্ত স্বার্থপর নহে—আফিঙ্গ ভিন্ন জগতে আমার স্বার্থ নাই, আমার উপর পলিটিক্‌স্‌ চাপ কেন? আমি রাজা, না খোশামুদে, না জুয়াচোর, না ভিক্ষুক, না সম্পাদক, যে আমাকে পলিটিক্‌স্‌ লিখিতে বলেন? আপনি আমার দপ্তর পাঠ করিয়াছেন, কোথায় আমার এমন স্থূল বুদ্ধির চিহ্ন পাইলেন যে, আমাকে পলিটিক্‌স্‌ লিখিতে বলেন? আফিঙ্গের জন্য আমি আপনার খোশামুদে করিয়াছি বটে, কিন্তু তাই বলিয়া আমি এমন স্বার্থপর চাটুকার অদ্যাপি হই নাই যে, পলিটিক্‌স্‌ লিখি। ধিক্‌ আপনার সম্পাদকতায়! ধিক্‌ আপনার আফিঙ্গ দানে! আপনি আজও বুঝতে পারেন নাই যে, কমলাকান্ত শর্ম্মা উচ্চাশয় কবি, কমলাকান্ত ক্ষুদ্রজীবী পলিটিশ্যান নহে।

আপনার এই আদেশ প্রাপ্তে বড়ই মনঃক্ষুব্ধ হইয়া এক পতিত বৃক্ষের কান্ডোপরি উপবেশন করিয়া বঙ্গদর্শন-সম্পাদকের বুদ্ধিবৈপরীত্য ভাবিতোঁছিলাম। কি করি! ভরিটাক্‌ আফিঙ্গ গলদেশের অধোভাগে যেন তেন প্রকারেণ প্রেরণ করিলাম। সম্মুখে শিবে কল্লুর বাড়ী—বাড়ীর প্রাঙ্গণে দুই তিনটা বলদ বাঁধা আছে—মাটিতে পোঁতা নাদায় কল্পপত্রীর হস্তমিশ্রিত খিল-মিশান ললিত বিচারিচূর্ণ গোগণ মৃদিতনয়নে, সুখের আবেশে কবলে গ্রহণ করিয়া ভোজন করিতোঁছিল। আমি কতকটা স্থিরচিত্ত হইলাম—এখানে ত পলিটিক্‌স্‌ নাই। এই নাদার মধ্য হইতে গোগণ পলিটিক্‌স্‌-বিকার-শূন্য অকৃত্রিম সুখ পাইতেছে—দেখিয়া কিছু তৃপ্ত হইলাম। তখন অহিফেন-প্রসাদ-প্রসন্ন চিত্তে লোকের এই পলিটিক্‌স্‌প্রয়তা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমার তখন বিদ্যাসুন্দর যাত্রার একটি গান মনে পড়িল।

বোবার ইচ্ছা কথা ফুটে,
খোঁড়ার ইচ্ছা বেড়ায় ছুটে,
তোমার ইচ্ছা বিদ্যা ঘটে
ইচ্ছা বটে ইত্যাদি।

আমাদের ইচ্ছা পলিটিক্‌স্‌—হুপ্তায় হুপ্তায় রোজ রোজ পলিটিক্‌স্‌; কিন্তু বোবার বাক্‌-চাতুরীর কামনার মত, খঞ্জের দ্রুতগমনের আকাঙ্ক্ষার মত, অশ্বের চিত্রদর্শনলালসার মত, হিন্দু বিধবার স্বামিপ্রণয়াকাঙ্ক্ষার মত, আমার মনে আদরের আদারণী গৃহিণীর আদরের সাধের মত, হাস্যাস্পদ, ফলিবার নহে। ভাই পলিটিক্‌স্‌ওয়ালারা, আমি কমলাকান্ত চক্রবর্তী তোমাদিগের হিতবাক্য বলিতেছি, পিয়াদার শ্বশুরবাড়ী আছে, তবু সম্পদশ অশ্বারোহী মাত্র যে জাতিকে জয় করিয়াছিল, তাহাদের পলিটিক্‌স্‌ নাই। “জয় রাধে কৃষ্ণ! ভিক্ষা দাও গো!” ইহাই তাহাদের পলিটিক্‌স্‌! তদ্ভিন্ন অন্য পলিটিক্‌স্‌ যে গাছে ফলে, তাহার বীজ এ দেশের মাটিতে লাগিবার সম্ভাবনা নাই।

এইরূপ ভাবিতোঁছিলাম, ইত্যবসরে দেখিলাম, শিবু কল্লুর পৌত্র দশমবর্ষীয় বালক, এক কাঁসি ভাত আনিয়া উঠানে বসিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। দূর হইতে একটি শ্বেতকৃষ্ণ কুক্কুর তাহা দেখিল। দেখিয়া, একবার দাঁড়াইয়া, চাহিয়া চাহিয়া, ক্ষুণ্ণ মনে জিহবা নিষ্কৃত করিল। অমল-ধবল অন্নরাশি কাৎস্যপাত্রে কুসুমদামবৎ বিরাজ করিতেছে—কুকুরের পেটটা দেখিলাম, পড়িয়া আছে। কুক্কুর চাহিয়া, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, একবার আড়ামোড়া ভাঙ্গিয়া হাই তুলিল।

তার পর ভাবিয়া চিন্তিয়া ধীরে ধীরে এক এক পদ অগ্রসর হইল, এক এক বার কল্লুর পুত্রের অন্নপরিপূরিত বদন প্রতি আড়নয়নে কটাক্ষ করে, এক এক পা এগোয়। অকস্মাৎ অহিফেন-প্রসাদে দিব্য চক্ষুঃ লাভ করিলাম—দেখিলাম, এই ত পলিটিক্‌স্‌,—এই কুক্কুর ত পলিটিশ্যান! তখন মনোভিন্বেশ পূর্ব্বক দেখিতে লাগিলাম যে, কুক্কুর পাকা পলিটিক্‌স্‌ চাল চালিতে আরম্ভ করিল। কুক্কুর দেখিল—কল্পপত্র কিছু বলে না—বড় সদাশয় বালক কুক্কুর কাছে গিয়া, থাবা পাতিয়া বসিল। ধীরে ধীরে লাঙ্গুল নাড়ে, আর কল্লুর পোর মুখপানে চাহিয়া, হ্যা-হ্যা করিয়া হাঁপায়। তাহার ক্ষীণ কলেবর, পাতলা পেট, কাতর দৃষ্টি এবং ঘন ঘন নিঃশ্বাস দেখিয়া কল্পপুত্রের দয়া হইল, তাহার পলিটিক্‌স্‌ এজিটেশ্যান সফল হইল;—কল্পপুত্র একখানা মাছের কাঁটা উত্তম করিয়া চুষিয়া লইয়া, কুক্কুরের দিকে ফেলিয়া দিল। কুক্কুর আগ্রহ সহকারে

বিক্রম রচনাবলী

আনন্দে উন্মত্ত হইয়া, তাহা চর্ষণ, লেহন, গেলন এবং হজমকরণে প্রবৃত্ত হইল। আনন্দে তাহার চক্ষু বদ্বিজয়া আসিল।

যখন সেই মৎস্যকণ্টকসম্বন্ধে এই সুমহৎ কার্য উত্তমরূপে সমাপন হইল, তখন সেই সুচতুর পলিটিশ্যনের মনে হইল যে, আর একখানা কাঁটা পাইলে ভাল হয়। এইরূপ ভাবিয়া, পলিটিশ্যান আবার বালকের মূখপানে চাহিয়া রহিল। দেখিল, বালক আপনমনে গুড় তেঁতুল মাখিয়া ঘোর রবে ভোজন করিতেছে—কুকুর পানে আর চাহে না। তখন কুকুর একটি bold move অবলম্বন করিল—জাত পলিটিশ্যান, না হবে কেন? সেই রাজনীতিবিদ সাহসে ভর করিয়া আর একটু অগ্রসর হইয়া বসিলেন। আর এক বার হাই তুলিলেন। তাহাতেও কলুর ছেলে চাহিয়া দেখিল না। অতঃপর কুকুর মৃদু মৃদু শব্দ করিতে লাগিলেন। বোধ হয় বলিতেছিলেন, হে রাজাধিরাজ কলুপুত্র! কাঙ্গালের পেট ভরে নাই। তখন কলুর ছেলে তাহার পানে চাহিয়া দেখিল। আর মাছ নাই—এক মুষ্টি ভাত কুকুরকে ফেলিয়া দিল। পুরন্দর যে সুখে নন্দনকাননে বসিয়া সুধা পান করেন, কার্ডিনেল উল্‌সি বা কার্ডিনেল জেরেজ যে সুখে কার্ডিনেলের টুপি পরিয়াছিলেন, কুকুর সেই সুখে সেই অন্নমুষ্টি ভোজন করিতে লাগিল। এমত সময়ে, কলুগৃহিণী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। ছেলের কাছে একটা কুকুর ম্যাক্ ম্যাক্ করিয়া ভাত খাইতেছে—দেখিয়া কলুপত্নী রোষ-কষায়িত-লোচনে এক ইষ্টকখণ্ড লইয়া কুকুর প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। রাজনীতিজ্ঞ তখন আহত হইয়া, লাঙ্গুলসংগ্রহপূর্বক বহুবিধ রাগ রাগিণী আলাপচারী করিতে করিতে দ্রুতবেগে পলায়ন করিল।

এই অবসরে আর একটি ঘটনা দৃষ্টগোচর হইল। যতক্ষণ ক্ষীণজীবী কুকুর আপন উদরপূর্তির জন্য বহুবিধ কৌশল করিতেছিল, ততক্ষণ এক বৃহৎকায় বৃষ আসিয়া কলুর বলদের সেই খোলবিচারি-পরিপূর্ণ নাদায় মূখ দিয়া জাবনা খাইতেছিল—বলদ বৃষের ভীষণ শৃঙ্গ এবং স্থূলকায় দেখিয়া, মূখ সরাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া কাতরনয়নে তাহার আহারনৈপুণ্য দেখিতেছিল। কুকুরকে দুরীকৃত করিয়া, কলুগৃহিণী এই দস্যুতা দেখিতে পাইয়া এক বংশখণ্ড লইয়া বৃষকে গোভাগাড়ে যাইবার পরামর্শ দিতে দিতে তৎপ্রতি ধাবমানা হইলেন। কিন্তু ভাগাড়ে যাওয়া দূরে থাকুক—বৃষ এক পদও সরিল না—এবং কলুগৃহিণী নিকটবর্তিনী হইলে বৃহৎ শৃঙ্গ হেলাইয়া, তাহার হৃদয়মধ্যে সেই শৃঙ্গাগ্রভাগ প্রবেশের সম্ভাবনা জানাইয়া দিল। কলুপত্নী তখন রণে ভঙ্গ দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বৃষ অবকাশমতে নাদা নিঃশেষ করিয়া হেলিতে দুলিতে স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

আমি ভাবিলাম যে, এও পলিটিক্‌স্। দুই রকমের পলিটিক্‌স্ দেখিলাম—এক কুকুর-জাতীয়, আর এক বৃষজাতীয়। বিস্মার্ক এবং গর্শাকফ এই বৃষের দরের পলিটিশ্যান—আর উল্‌সি হইতে আমাদের পরমাত্মীয় রাজা মর্চরাম রায় বাহাদুর পর্যন্ত অনেকে এই কুকুরের দরের পলিটিশ্যান।

তৃতীয় সংখ্যা—বাজালির মনুষ্যত্ব

মহাশয়! আপনাকে পত্র লিখিব কি—লিখিবার অনেক অনেক শত্রু। আমি এখন যে কুণ্ডে ঘরে বাস করি, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার পাশে গোটা দুই তিন ফুলগাছ পুঁতিয়াছি। মনে করিয়াছিলাম, কমলাকান্তের কেহ নাই—এই ফুলগুলি আমার সখা সখী হইবে। খোশামোদ করিয়া ইহাদের ফুটাইতে হইবে না—টাকা ছড়াইতে হইবে না, গহনা দিতে হইবে না, মনযোগান গোছ কথা বলিতে হইবে না, আপনার সুখে উহারা আপনি ফুটিবে। উহাদের হাসি আছে—কান্না নাই; আমোদ আছে—রাগ নাই। মনে করিলাম, যদি প্রসন্ন গোয়ালিনী আমাকে ত্যাগ করিয়াছে, তবে এই ফুলের সঙ্গে প্রণয় করিব।

তা, ফুল ফুটিল—তারা হাসিল। মনে করিলাম—মহাশয় গো! কিছুর মনে করিতে না করিতে, ফুটন্ত ফুল দেখিয়া ভোমরার দল,—লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে, ভোমরা বোলতা মোমাছি—বহুবিধ রসক্ষেপা রসিকের দল, আসিয়া আমার দ্বারে উপস্থিত হইলেন। তখন গুন্ গুন্ ভন্ ভন্ ঝন্ ঝন্ ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিয়া হাড় জ্বালাইতে আরম্ভ করিলেন। তাহাদিগকে অনেক বদ্বাইয়া বলিলাম যে, হে মহাশয়গণ! এ সভা নহে, সমাজ নহে, এসোসিয়েশ্যান, লীগ, সোসাইটি,

ক্লব প্রভৃতি কিছুই নহে—কমলাকান্তের পর্ণকুটীর মাত্র, আপনাদিগের ঘ্যান্‌ঘ্যান্‌ করিতে হয়, অন্যত্র গমন করুন—আমি কোন রিজার্ভেডশ্যান্‌ই দ্বিতীয়ত করিতে প্রস্তুত নহি; আপনারা স্থানান্তরে প্রস্থান করুন। গুন্‌ গুনের দল, তাহাতে কোন মতে সম্মত নহে—বরং ফুলগাছ ছাড়িয়া আমার কুটীরের ভিতর হস্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই মাত্র আপনাকে এক পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছিলাম—(আফিস্ ফুরাইয়াছে)—এমত সময়ে এক ভ্রমর কুচকুচে কালো আসল বৃন্দাবনী কালচাঁদ, ভেঁ করিয়া ঘরের ভিতর উড়িয়া আসিয়া কাণের কাছে ঘ্যান্‌ ঘ্যান্‌ আরম্ভ করিলেন—লিখিব কি, মহাশয়?

ভ্রমর বাবাজি নিশ্চিত মনে করেন, তিনি বড় সুরসিক—বড় সঙ্গীত—তাহার ঘ্যান্‌-ঘ্যানানিতে আমার সর্বাঙ্গ জুড়াইয়া যাইবে। আমারই ফুলগাছের ফুলের পাপড়ি ছিঁড়িয়া আসিয়া আমারই কাণের কাছে ঘ্যান্‌ঘ্যান্‌? আমার রাগ অসহ্য হইয়া উঠিল; আমি তালবৃত্ত হস্তে ভ্রমরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম। তখন আমি ঘূর্ণন, বিঘূর্ণন, সংঘূর্ণন প্রভৃতি বহুবধ বক্রগতিতে তালবৃত্তাস্ত্র সঞ্চালন করিতে লাগিলাম; ভ্রমরও ডীন, উড্ডীন, প্রডীন, সমাডীন প্রভৃতি বহুবধ কৌশল দেখাইতে লাগিল। আমি কমলাকান্ত চক্রবর্তী—দপ্তর-মুক্তাবলীর প্রণেতা, কিন্তু হায়, মনুষ্যবীৰ্য্য! তুমি অতি অসার! তুমি চিরদিন মনুষ্যকে প্রতারিত করিয়া শেষ আপন অসারতা প্রমাণীকৃত কর! তুমি জামার ক্ষেত্রে হানিবলকে, পলটোবার ক্ষেত্রে চার্লসকে, ওয়াটলুর ক্ষেত্রে নেপোলিয়নকে, এবং আজ এই ভ্রমরসমরে কমলাকান্তকে বঞ্চিত করিলে! আমি যত পাখা ঘুরাইয়া বায়ু সৃষ্টি করিয়া ভ্রমরকে উড়াইতে লাগিলাম, ততই সে দুরাত্মা ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমার মাথামুণ্ড বোঁড়িয়া চোঁ বোঁ করিতে লাগিল। কখনও সে আমার বস্ত্রমধ্যে লুক্কায়িত হইয়া, মেঘের আড়াল হইতে ইন্দ্রজিতের ন্যায় রণ করিতে লাগিল, কখনও কুম্ভকর্ণনিপাতী রামসৈন্যের ন্যায় আমার বগলের নীচে দিয়া ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল; কখনও স্যাম্পসনের ন্যায় শিরোরুহমধ্যে আমার বীৰ্য্য সংন্যস্ত মনে করিয়া, আমার শরঙ্গীরদানিন্দিত কুণ্ডিত শ্বেতকৃষ্ণ কেশদামমধ্যে প্রবেশ করিয়া ভেরী বাজাইতে লাগিল। তখন দংশনভয়ে অস্থির হইয়া রণে ভঙ্গ দিলাম। ভ্রমর সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল। সেই সময়ে চোঁকাঠ পায়ে বাধিয়া কমলাকান্ত—“পপাত ধরণীতলে!!!” এই সংসার সমরে মহারথী শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী—যিনি দারিদ্র্য, চিরকোঁমার এবং অহিফেন প্রভৃতির দ্বারাও কখনও পরাজিত হইয়া নাই—হায়! তিনি এই ক্ষুদ্র পতঙ্গ কর্তৃক পরাজিত হইলেন।

তখন ধূল্যবলুণ্ঠিত শরীরে দ্বিরেফরাজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, “হে দ্বিরেফসত্তম! কোন অপরাধে দুঃখী ব্রাহ্মণ তোমার নিকট অপরাধী যে, তুমি তাহার লেখা পড়ার ব্যাঘাত করিতে আসিয়াছ? দেখ, আমি এই বঙ্গদর্শনে পত্র লিখিতে বসিয়াছি—পত্র লিখিলে আফিস্ আসিবে—তুমি কেন ঘ্যান্‌ঘ্যান্‌ করিয়া তাহার বিঘ্ন কর?” আমি প্রাতে একখানি বাঙ্গালা নাটক পড়িতেছিলাম—তখন অকস্মাৎ সেই নাটকীয় রাগগ্রস্ত হইয়া বলিতে লাগিলাম—“হে ভূঙ্গ! হে অনঙ্গরঙ্গতরঙ্গবিক্ষেপকারিন্! হে দুর্দান্ত পাষণ্ডভণ্ডাচিন্তলণ্ডভণ্ড-কারিন্! হে উদ্যানবিহারিন্—কেন তুমি ঘ্যান্‌ঘ্যান্‌ করিতেছ? হে ভূঙ্গ! হে দ্বিরেফ! হে ষট্পদ! হে অলে! হে ভ্রমর! হে ভোমরা! হে ভোঁ ভোঁ!—”

ভ্রমর ঝুপ করিয়া আসিয়া সামনে বসিল। তখন গুন্‌ গুন্‌ করিয়া গলা দুরন্ত করিয়া বলিতে লাগিল—আমি অহিফেনপ্রসাদে সকলেরই কথা বৃষ্টিতে পারি—আমি স্থিরচিত্তে শূন্যতে লাগিলাম।

ভূঙ্গরাজ বলিতে লাগিলেন, “হে বিপ্র! আমার উপর এত চোট কেন? আমি কি একাই ঘ্যান্‌ঘেনে! তোমার এ বঙ্গভূমে জন্মগ্রহণ করিয়া ঘ্যান্‌ঘ্যান্‌ করিব না ত কি করিব? বাঙ্গালী হইয়া কে ঘ্যান্‌ঘ্যানানি ছাড়া? কোন বাঙ্গালীর ঘ্যান্‌ঘ্যানানি ছাড়া অন্য ব্যবসা আছে। তোমাদের মধ্যে যিনি রাজা মহারাজা কি এমনি একটা কিছু মাথায় পাগড়ি ও হইলেন, তিনি গিয়া বেলে-ভিড়িয়ে ঘ্যান্‌ঘ্যান্‌ আরম্ভ করিলেন। যিনি হইবেন উমেদ রাখেন, তিনি গিয়া রাগ্রিদিবা রাজদ্বারে ঘ্যান্‌ঘ্যান্‌ করেন। যিনি কেবল একটি চাকরির উমেদওয়ার—তাঁর ঘ্যান্‌ঘ্যানানির ত আর অন্ত নাই। বাঙ্গালি বাবু যিনিই দুই চারিটা ইংরেজি বোল শিখিয়াছেন, তিনি অমনি উমেদওয়াররূপে পরিণত হইয়া, দরখাস্ত বা টিকিট হাতে দ্বারে দ্বারে ঘ্যান্‌ঘ্যান্‌—ডাঁশমাছির মত খাবার সময়ে, শোবার সময়ে, বসবার সময়ে, দাঁড়াবার সময়ে, দিনে, রাত্রে, প্রাতে, অপরাহ্নে,

বাংকম রচনাবলী

মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে—ঘ্যান্ ঘ্যান্ ঘ্যান্! যিনি উমেদওয়ারি ছাড়িয়া স্বাধীন হইয়া উকীল হইলেন, তিনি আবার সনদী ঘ্যান্ঘেনে। সত্যমিথ্যার সাগরসঙ্গমে প্রাতঃস্নান করিয়া উঠিয়া, যেখানে দেখেন, কাঠগড়ার ভিতর বিড়ে মাথায় সরকারি জুজু বসিয়া আছে—বড় জজ, ছোট জজ, সবজজ, ডিপুটি, মন্সেফ—সেইখানে গিয়া সেই পেশাদার ঘ্যান্ঘেনে, ঘ্যান্ঘ্যানানির ফোয়ারা খুলিয়া দেন। কেহ বা মনে করেন, ঘ্যান্ঘ্যানানির চোটে দেশোদ্ধার করিবেন—সভাতলে ছেলে বুড়া জমা করিয়া ঘ্যান্ঘ্যান্ করিতে থাকেন। কোন্ দেশে বৃষ্টি হয় নাই—এসো বাপু ঘ্যান্ঘ্যান্ করি; বড় চাকরি পাই না—এসো বাপু ঘ্যান্ঘ্যান্ করি—রামকান্তের মা মরিয়াছে—এসো বাপু স্মরণার্থ ঘ্যান্ঘ্যান্ করি। কাহারও বা তাতেও মন উঠে না—তাঁরা কাগজ কলম লইয়া, হস্তায় হস্তায়, মাসে মাসে, দিন দিন ঘ্যান্ঘ্যান্ করেন; আর তুমি যে বাপু আমার ঘ্যান্ঘ্যানানিতে এত রাগ করিতেছ, তুমি ও কি করিতে বসিয়াছ? বঙ্গদর্শন-সম্পাদকের কাছে কিছুর আফিসের যোগাড় করিবে বলিয়া ঘ্যান্ঘ্যান্ করিতে বসিয়াছ। আমার চোঁ বোঁই কি এত কটু?

“তোমায় সত্য বলিতেছি, কমলাকান্ত! তোমাদের জাতির ঘ্যান্ঘ্যানানি আর ভাল লাগে না। দেখ আমি যে ক্ষুদ্র পতঙ্গ, আমিও শুধু ঘ্যান্ঘ্যান্ করি না—মধু সংগ্রহ করি আর হুল ফুটাই। তোমরা না জান শুধু মধু সংগ্রহ করিতে, না জান হুল ফুটাইতে—কেবল ঘ্যান্ঘ্যান্ পার। একটা কাজের সঙ্গে খোঁজ নাই—কেবল কাঁদুনে মেয়ের মত দিব্যারাগি ঘ্যান্ঘ্যান্। একটু বকাবকি লেখালেখি কম করিয়া কিছুর কাজে মন দাও—তোমাদের শ্রীবৃদ্ধি হইবে। মধু করিতে শেখ—হুল ফুটাইতে শেখ। তোমাদের রসনা অপেক্ষা আমাদের হুল শ্রেষ্ঠ—বাক্যবাণে মানুষ মরে না; আমাদের হুলের ভয়ে জীবলোক সদা সর্শঙ্কিত! স্বর্গে ইন্দ্রের বজ্র, মর্ত্যে ইংরেজের কামান, আকাশমার্গে আমাদের হুল! সে যাক, মধু কর; কাজে মন দাও। নিতান্ত যদি দেখ, রসনাকণ্ডুয়ন রোগ জন্য কাজে মন যায় না—জিবে কাষ্টকি দিয়া ঘা কর—অগত্যা কাজে মন যাইতে পারে। আর শুধু ঘ্যান্ঘ্যান্ ভাল লাগে না।”

এই বলিয়া ভ্রমররাজ ভোঁ করিয়া উড়িয়া গেল।

আমি ভাবিলাম যে, এই ভ্রমর অবশ্য বিশেষ বিজ্ঞ পতঙ্গ। শূন্য আছে, মনুষ্যের পদবৃদ্ধি হইলেই সে বিজ্ঞ বলিয়া গণ্য হয়। এই জন্য দ্বিপদ মনুষ্য হইতে চতুষ্পদ পশু—পক্ষান্তরে যে সকল মনুষ্যের পদবৃদ্ধি হইয়াছে—তাহারা অধিক বিজ্ঞ বলিয়া গণ্য। এই ষট্পদের—একখানি না, দুখানি না—ছয় ছয়খানি পা! অবশ্য এ ব্যক্তি বিশেষ বিজ্ঞ হইবে—ইহার অসামান্য পদবৃদ্ধি দেখা যায়। এই বিজ্ঞ পতঙ্গের পরামর্শ অবহেলন করি কি প্রকারে? অতএব আপাততঃ ঘ্যান্-ঘ্যানানি বন্ধ করিলাম—কিন্তু মধুসংগ্রহের আশাটা রহিল। বঙ্গদর্শন পুস্তক হইতে অহিফেন মধু সংগ্রহ হইবে এই ভরসায় প্রাণ ধারণ করে—

আপনার আঞ্জাবহ
শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী।

চতুর্থ সংখ্যা—বুড়া বয়সের কথা

সম্পাদক মহাশয়! আফিস পেঁছে নাই, বড় কষ্ট গিয়াছে। আজ যাহা লিখিলাম, তাহা বিস্ময়িত লোচনে লেখা। নিজ বুদ্ধিতে, অহিফেন প্রসাদাৎ নহে। একটা মনের দুঃখের কথা লিখিব।

বুড়া বয়সের কথা লিখিব! লিখি লিখি মনে করিতেছি, কিন্তু লিখিতে পারিতেছি না। হইতে পারে যে, এই নিদারুণ কথা আমার কাছে বড় প্রিয়,—আপনার মর্মান্তিক দুঃখের পরিচয় আপনার কাছে বড় মিষ্ট লাগে, কিন্তু আমি লিখিলে পড়িবে কে? যে যুবা, কেবল সেই পড়ে; বুড়ায় কিছুর পড়ে না। বোধ হয়, আমার এই বুড়া বয়সের কথার পাঠক জুড়িবে না।

অতএব আমি ঠিক বুড়া বয়সের কথা লিখিব না। বলিতে পারি না; বৈতরণীর তরঙ্গাভিহত জীবনের সেই শেষ সোপানে আজিও পদার্পণ করি নাই; আজিও আমার পারের কাড়ি সংগ্রহ করা হয় নাই। আমার মনে মনে বিশ্বাস যে, সে দিন আজিও আসে নাই। তবে ঘোঁবনেও আমার আর দাবি দাওয়া নাই; মিয়াদি পাটুর মিয়াদ ফুরাইয়াছে। এক দিকে মিয়াদ অতীত হইল, কিন্তু বাকি বকেয়া আদায় উসুল করা হয় নাই, তাহার জন্য কিছুর পীড়াপীড়ি আছে;

যৌবনের আঁখির করিয়া ফারখতি লইতে পারি নাই। তাহার উপর মহাজনেরও কিছু ধারি; অনাবৃষ্টির দিনে অনেক ধার করিয়া খাইয়াছিলাম, শোধ দিতে পারি এমত সাধ্য নাই। তার উপর পার্টার কড়ি সংগ্রহ করিবার সময় আসিল। আমার এমন দুঃখের সময়ের দুটো কথা বলিব, তোমরা যৌবনের সুখ ছাড়িয়া কি একবার শুনবে না?

আগে আসল কথাটা মীমাংসা করা যাউক—আমি কি বৃদ্ধা? আমি আমার নিজের কথাই বলিতেছি এমত নহে, আমি বৃদ্ধা, না হয় যুবা, দুইয়ের এক স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু যাঁহারই বয়সটা একটু দোটা না রকম—যাঁরই ছায়া পৃথিবীদিকে হেলিয়াছে, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি, মীমাংসা করুন দেখি, আপনি কি বৃদ্ধা। আপনার কেশগুলি, হয়ত আজিও অনিন্দ্য ভ্রমরকৃষ্ণ, হয়ত আজিও দস্তসকল অবিচ্ছিন্ন মঞ্জামালার লজ্জাস্থল, হয়ত আপনার নিদ্রা অদ্যাপি এমন প্রগাঢ় যে, দ্বিতীয় পক্ষের ভার্যাও তাহা ভাঙিতে পারে না;—তথাপি, হয়ত আপনি প্রাচীন। নয়ত, আপনার কেশগুলি শাদা কালোয় গঙ্গা যমুনা হইয়া গিয়াছে, দশন মঞ্জাপাতি ছিঁড়িয়া গিয়াছে, দুই একটি মঞ্জা হারাইয়া গিয়াছে—নিদ্রা, চক্ষুর প্রতারণামাত্র, তথাপি আপনি যুবা। তুমি বলবে ইহার অর্থ, “বয়সেতে বিজ্ঞ নহে, বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে।” তাহা নহে—আমি বিজ্ঞতার কথা বলিতেছি না, প্রাচীনতার কথা বলিতেছি। প্রাচীনতা বয়সেরই ফল, আর কিছুই নহে। ধাতুবিশেষে কিছু তারতম্য হয়, কেহ চিল্লিশে বৃদ্ধা, কেহ বিয়াল্লিশে যুবা। কিন্তু তুমি কখন দেখবে না যে, বয়সের অধিক তারতম্য ঘটে। যে পয়তাল্লিশে যুবা বলাইতে চায়, সে হয় যম-ভয়ে নিতান্ত ভীত, নয় তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়াছে; যে পয়ত্রিশে বৃদ্ধা বলাইতে চায়, সে হয় বড়াই ভালবাসে, নয় পীড়িত, নয় কোন বড় দুঃখে দুঃখী।

কিন্তু এই অর্ধেক পথ অতিবাহিত করিয়া, প্রথম চসমাখানি হাতে করিয়া রুমাল দিয়া মুছিতে মুছিতে ঠিক বলা দায় যে, আমি বৃদ্ধা হইয়াছি কি না! বৃদ্ধি বা হইয়াছি। বৃদ্ধি হই নাই। মনে মনে ভরসা আছে, একটু চক্ষুর দোষ হউক, দুই এক গাছা চুল পাকুক, আজিও প্রাচীন হই নাই। কই, কিছু ত প্রাচীন হয় নাই! এই চিরপ্রাচীন ভূবনমণ্ডল ত আজিও নবীন; আমার প্রিয় কোকিলের স্বর প্রাচীন হয় নাই; আমার সৌন্দর্য্য-মাখা, হীরা বসান, গঙ্গার ক্ষুদ্র তরঙ্গভঙ্গ ত প্রাচীন হয় নাই; প্রভাতের বায়ু, বকুল কামিনীর গন্ধ, বৃক্ষের শ্যামলতা, এবং নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা, কেহ ত প্রাচীন হয় নাই—তেমনই সুন্দর আছে। আমি কেবল প্রাচীন হইলাম? আমি এ কথায় বিশ্বাস করিব না। পৃথিবীতে উচ্চ হাসি ত আজিও আছে, কেবল আমার হাসির দিন গেল? পৃথিবীতে উৎসাহ, ক্রীড়া, রঙ্গ, আজিও তেমনি অপৰ্য্যাপ্ত, কেবল আমারই পক্ষে নাই? জগৎ আলোকময়, কেবল আমারই রাত্রি আসিতেছে? সলমন কোম্পানির দোকানে বজ্রাঘাত হউক, আমি এ চসমা ভাঙিয়া ফেলিব, আমি বৃদ্ধা বয়স স্বীকার করিব না।

তবু আসে—ছাড়ান যায় না। ধীরে ধীরে দিনে দিনে পলে পলে বয়শ্চোর আসিয়া, এ দেহপুরে প্রবেশ করিতেছে—আমি যাহা মনে ভাবি না কেন, আমি বৃদ্ধা, প্রতি নিশ্বাসে তাহা জানিতে পারিতেছি। অন্যে হাসে, আমি কেবল ঠোঁট হেলাইয়া তাহাদিগের মন রাখি। অন্যে কাঁদে, আমি কেবল লোকলজ্জায় মুখ ভার করিয়া থাকি—ভাবি, ইহারা এ বৃথা কালহরণ করিতেছে কেন? উৎসাহ আমার কাছে পণ্ডশ্রম—আশা আমার কাছে আত্মপ্রতারণা। কই, আমার ত আশা ভরসা কিছু নাই! কই—দূর হউক, যাহা নাই তাহা আর খুঁজিয়া কাজ নাই।

খুঁজিয়া দেখিব কি? যে কুসুমদাম এ জীবনকানন আলো করিত, পৃথিপার্শ্বে একে একে তাহা খসিয়া পড়িয়াছে। যে মুখমণ্ডলসকল ভালবাসিতাম, একে একে অদৃশ্য হইয়াছে, না হয় রৌদ্রবিশুদ্ধ বৈকালের ফুলের মত শুকাইয়া উঠিয়াছে। কই, আর এ ভগ্নমন্দিরে, এ পরিত্যক্ত নাট্যশালায়, এ ভাঙ্গা মজলিসে সে উজ্জ্বল দীপাবলী কই? একে একে নিবিয়া যাইতেছে। কেবল মুখ নহে—হৃদয়। সে সরল, সে ভালবাসাপরিপূর্ণ, সে বিশ্বাসে দৃঢ়, সৌহার্দ্য স্থির, অপরাধেও প্রসন্ন, সে বন্ধুহৃদয় কই? নাই। কার দোষে নাই? আমার দোষে নহে। বন্ধুর দোষে নহে। বয়সের দোষে অথবা যমের দোষে।

তাতে ক্ষতি কি? একা আসিয়াছি, একা যাইব—তাহার ভাবনা কি? এ লোকালয়ের সঙ্গে আমার বনিয়া উঠিল না—আচ্ছা—রোখশোধ। পৃথিবী! তুমি তোমার নিয়মিত পথে আবর্তন করিতে থাক, আমি আমার অভীষ্ট স্থানে গমন করি—তোমায় আমার সম্বন্ধ রহিত হইল—তাহাতে, হে মৃগয়ি জড়পিণ্ডগোরব-পীড়িতে বসুন্ধরে! তোমারই বা ক্ষতি কি, আমারই বা

বাঁকম রচনাবল

ক্ষতি কি? তুমি অনন্তকাল শূন্যপথে ঘুরিবে, আমি আর অল্প দিন ঘুরিব মাত্র। পরে তোমার কপালে ছাইগর্দলি দিয়া, যাঁর কাছে সকল জ্বালা জুড়ায়, তাঁর কাছে গিয়া সকল জ্বালা জুড়াইব!

তবে, স্থির হইল এক প্রকার যে, বৃদ্ধা বয়সে পড়িয়াছি। এখন কর্তব্য কি? “পঞ্চাশোদ্ধেব বনং ব্রজেৎ?” এ কোন গন্ডমুর্খের কথা। আবার বন কোথা? এ বয়সে, এই অট্টালিকাময়ী লোকপূর্ণা আপনসমাকুলা নগরীই বন। কেন না, হে বর্ষীয়ান্ পাঠক! তোমার আমার সঙ্গে আর ইহার মধ্যে কাহারও সহৃদয়তা নাই। বিপদকালে কেহ কেহ আসিয়া বলিতে পারে যে, “বৃদ্ধা! তুমি অনেক দেখিয়াছ, এ বিপদে কি করিব বলিয়া দাও,—” কিন্তু, সম্পদকালে কেহই বলিবে না, “বৃদ্ধা! আজ আমার আনন্দের দিন, তুমি আসিয়া আমাদের উৎসব বৃদ্ধি কর!” বরং আমোদ-আহ্লাদ কালে বলিবে, “দেখ ভাই, যেন বৃদ্ধা বেটা জানিতে না পারে।” তবে আর অরণ্যের বাকি কি?

যেখানে আগে ভালবাসার প্রত্যাশা করিতে, এখন সেখানে তুমি কেবল ভয় বা ভীতির পাত্র। যে পুত্র তোমার যৌবনকালে, তাহার শৈশবকালে, তোমার সহিত এক শয্যায় শয়ন করিয়াও অর্দ্ধ-নিদ্রিত অবস্থাতেই, ক্ষুদ্র হস্ত প্রসারণ করিয়া, তোমার অননুসন্ধান করিত, সে এখন লোকমুখে সম্বাদ লয়, পিতা কেমন আছেন। পরের ছেলে, সুন্দর দেখিয়া যাহাকে কোলে তুলিয়া, তুমি আদর করিয়াছিলে, সে এখন কালক্রমে, বয়ঃপ্রাপ্ত, ককর্শকান্তি, হয়ত মহাপাপিষ্ঠ, পৃথিবীর পাপস্রোত বাড়াইতেছে, হয়ত, তোমারই দ্বেষক—তুমি কেবল কাঁদিয়া বলিতে পার, “ইহাকে আমি কোলে পিঠে করিয়াছি।” তুমি যাহাকে কোলে বসাইয়া ক, খ শিখাইয়াছিলে, সে হয়ত এখন লক্ষপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত, তোমার মুর্খতা দেখিয়া মনে মনে উপহাস করে। যাহারই স্কুলের বেতন দিয়া তুমি মানুষ করিয়াছিলে, সে হয়ত এখন তোমাকে টাকা ধার দিয়া, তোমারই কাছে সুদ খায়। তুমি যাহাকে শিখাইতে, হয়ত সে তোমায় শিখাইতেছে। যে তোমার অগ্রাহ্য ছিল, তুমি আজ তার অগ্রাহ্য। আর অরণ্যের বাকি কি?

অস্তর্জগৎ ছাড়িয়া বহির্জগতেও এইরূপ দেখিবে। যেখানে তুমি স্বহস্তে পুষ্পোদ্যান নিষ্কারণ করিয়াছিলে,—বাঁছিয়া বাঁছিয়া গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, বিগ্নোনিয়া, সাইপ্রেস, অরকেরিয়া আনিয়া পুষ্টিয়াছিলে, পাত্রহস্তে স্বয়ং জলসিঞ্চন করিয়াছিলে, সেখানে দেখিবে, ছোলা মটরের চাষ,—হারাধন পোদ গামছা কাঁধে, মোটা মোটা বলদ লইয়া, নিষ্বিঘ্নে লাঙ্গল দিতেছে—সে লাঙ্গলের ফাল তোমার হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। যে অট্টালিকা তুমি যৌবনে, অনেক সাধ মনে মনে রাখিয়া, অনেক সাধ পুরাইয়া, যত্নে নিষ্কারণ করিয়াছিলে, যাহাতে পালঙ্ক পাড়িয়া নয়নে নয়নে অধরে অধরে মিলাইয়া ইহ-জীবনের অনন্তর প্রণয়ের প্রথম পবিত্র সম্ভাষণ করিয়াছিলে, হয়ত দেখিবে, সে গৃহের ইষ্টকসকল দাম, খোষের আস্তাবলের সূর্যকির জন্য চূর্ণ হইতেছে; সে পালঙ্কের ভগ্নাংশ লইয়া কৈলাসীর মা পাঁচকা ভাতের হাঁড়িতে জ্বাল দিতেছে—আর অরণ্যের বাকি কি? সকল জ্বালার উপর জ্বালা, আমি সেই যৌবনে যাহাকে সুন্দর দেখিয়াছিলাম—এখন সে কুৎসিত। আমার প্রিয়বন্ধু দাসু মিত্র, যৌবনের রূপে ক্ষয়িতকণ্ঠ কপোতের ন্যায় সগর্বে বেড়াইত—কত মাগী গঙ্গার ঘাটে, স্নানকালে তাহাকে দেখিয়া নমঃ শিবায় নমঃ বলিয়া ফুল দিতে, “দাসু মিত্রায় নমঃ” বলিয়া ফুল দিয়াছে। এখন সেই দাসু মিত্র শূঙ্ককণ্ঠ, পলিতকেশ, দস্তহীন, লোলচর্ম্ম, শীর্ণকায়। দাসুর একটা ব্রান্ড আর তিনটা মুরগী জলপানের মধ্যে ছিল,—এখন দাসু নামাবলীর ভয়ে কাতর, পাতে মাছের ঝোল দিলে, পাত মূছিয়া ফেলে। আর অরণ্যের বাকি কি?

গদার মাকে দেখ। যখন আমার সেই পুষ্পোদ্যানে, তরঙ্গিণী নামে যুবতী ফুল চুরি করিতে যাইত, মনে হইত, নন্দনকানন হইতে সচল সপুষ্প পারিজাত বৃক্ষ আনিয়া কে ছাড়িয়া দিয়াছে। তাহার অলকদাম লইয়া উদ্যান-বায়ু ক্রীড়া করিত, তাহার অঞ্চলে কাঁটা বিধিয়া দিয়া, গোলাপ গাছ রসকেলি করিত। আর আজ গদার মাকে দেখ। বকাবাকি করিতে করিতে চাল ঝাড়িতেছে—মলিনবসনা, বিকটদশনা, তীররসনা—দীর্ঘাঙ্গী, কৃষ্ণাঙ্গী, কৃশাঙ্গী, লোলচর্ম্ম, পলিতকেশ, শূঙ্কবাহু, ককর্শ-কণ্ঠ। এই সেই তরঙ্গিণী—আর অরণ্যের বাকি কি?

তবে স্থির, বনে যাওয়া হবে না। তবে কি করিব? হিন্দুশাস্ত্রের বশবর্তী হইয়া কালিদাসও সর্ষগুণবান্ রঘুগণের বান্ধক্যে মূর্নিবৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমি নিশ্চিত বলিতে পারি—কালিদাস চণ্ডিশ পার হইয়া রঘুবংশ লিখেন নাই। তিনি যে রঘুবংশ যৌবনে

লিখিয়াছিলেন, এবং কুমারসম্ভব চল্লিশ পার করিয়া লিখিয়াছিলেন, তাহা আমি দুইটি কবিতা উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছি—

প্রথম অর্জাবলাপে,

“ইদমুচ্ছ্বাসিতালকং মুখং
তব বিশ্রান্তকথং দুনোতি মাম্।
নিশি সুপ্তিমিবৈকপঙ্কজং
বিরতভ্যন্তরষট্‌পদস্বনম্ ॥” *

এটি যৌবনের কান্না।

তার পর রতিবিলাপে,

“গত এব ন তে নিবর্ততে স সখা দীপ ইবানিলাহতঃ।
অহমস্য দশেব পশ্য মাম্বিসহ্যব্যসনেন ধুমিতাম্ ॥” †

এটি বৃদ্ধা বয়সের কান্না।—

তা যাই হউক, কালিদাস বৃদ্ধা বয়সের গৌরব বৃদ্ধিতেও কখনও বৃদ্ধের কপালে মূর্নিবৃত্তি লিখিতেন না। বিস্মার্ক, মোল্ট্‌কে ও ফ্রেডেরিক বৃদ্ধা; তাঁহারা মূর্নিবৃত্তি অবলম্বন করিলে—জার্মান ঐকজাত্য কোথা থাকিত? টিয়র প্রাচীন—টিয়র মূর্নিবৃত্তি অবলম্বন করিলে ফ্রান্সের স্বাধীনতা এবং সাধারণতন্ত্রাবলম্বন কোথা থাকিত? গ্লাডস্টোন এবং ডিশ্‌লেইল বৃদ্ধা—তাঁহারা মূর্নিবৃত্তি অবলম্বন করিলে পার্লামেন্টের রিফর্ম এবং আয়ারিশ্‌ চর্চের ডিসেপ্টারিশমেন্ট কোথা থাকিত?

প্রাচীন বয়সই বিষয়েবার সময়। আমি অন্ধ-দস্তহীন ত্রিকালের বৃদ্ধার কথা বলিতেছি না—তাঁহারা দ্বিতীয় শৈশবে উপস্থিত। যাঁহারা আর যুবা নাই বলিয়াই বৃদ্ধা, আমি তাঁহাদিগের কথা বলিতেছি। যৌবন কর্ম্মের সময় বটে, কিন্তু তখন কাজ ভাল হয় না। একে বৃদ্ধি অপরিপক্ব, তাহাতে আবার রাগ দ্বेष ভোগাসক্তি, এবং স্ত্রীগণের অনুসন্ধান তাহা সতত হীনপ্রভ; এজন্য মনুষ্য যৌবনে সচরাচর কার্যক্ষম হয় না। যৌবন অতীতে মনুষ্য বহুদর্শী, স্থিরবুদ্ধি, লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ, এবং ভোগাসক্তির অনধীন, এজন্য সেই কার্যকারিতার সময়। এই জন্য, আমার পরামর্শ যে, বৃদ্ধা হইয়াছি বলিয়া, কেহ স্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মূর্নিবৃত্তির ভান করিবে না। বান্ধক্যেও বিষয়চিন্তা করিবে।

তোমরা বলিবে, এ কথা বলিতে হইবে না; কেহই জীবন থাকিতে ও শক্তি থাকিতে বিষয়-চেষ্টা পরিত্যাগ করে না। মাতৃস্নানপান অর্থাৎ উইল করা পর্যন্ত আবার বৃদ্ধ কেবল বিষয়ান্বেষণে বিরত। সত্য, কিন্তু আমি সেরূপ বিষয়ানুসন্ধান বৃদ্ধকে নিযুক্ত করিতে চাহিতেছি না। যৌবনে যে কাজ করিয়াছি, সে আপনার জন্য; তার পর যৌবন গেলে যত কাজ করিবে, পরের জন্য। ইহাই আমার পরামর্শ। ভাবিও না যে, আজও আপনার কাজ করিয়া উঠিতে পারিলাম না—পরের কাজ করিব কি? আপনার কাজ ফুরায় না—যদি মনুষ্যজীবন লক্ষ বর্ষ পরিমিত হইত, তবে আপনার কাজ ফুরাইত না—মনুষ্যের স্বার্থপরতার সীমা নাই—অন্ত নাই। তাই বলি, বান্ধক্যে আপনার কাজ ফুরাইয়াছে, বিবেচনা করিয়া পরহিতে রত হও। এই মূর্নিবৃত্তি যথার্থ মূর্নিবৃত্তি। এই মূর্নিবৃত্তি অবলম্বন কর।

যদি বল, বান্ধক্যেও যদি আপনার জন্য হউক, পরের জন্য হউক, বিষয়-কার্যে নিরত থাকিব, তবে ঈশ্বরচিন্তা করিব কবে?—পরকালের কাজ করিব কবে? আমি বলি, আশৈশব পরকালের কাজ করিবে, শৈশব হইতে জগদীশ্বরকে হৃদয়ে প্রধান স্থান দিবে। যে কাজ সকল কাজের উপর কাজ, তাহা প্রাচীন কালের জন্য তুলিয়া রাখিবে কেন? শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে, বান্ধক্যে, সকল সময়েই ঈশ্বরকে ডাকিবে। ইহার জন্য বিশেষ অবসরের প্রয়োজন নাই—ইহার

* বায়ুবশে অলকাগর্দলিন চালিত হইতেছে—অথচ বাক্যহীন তোমার এই মুখ রাত্রিকালে প্রমুদিত, সুতরাং অভ্যন্তরে ভ্রমর-গুঞ্জন-রহিত একটি পদ্মের ন্যায় আমাকে ব্যথিত করিতেছে।

† তোমার সেই সখা বায়ুতাড়িত দীপের ন্যায় পরলোকে গমন করিয়াছেন, আর ফিরিবেন না। আমি নিষ্পরিপত দীপের দশাবৎ অসহ্য দুঃখে ধূমিত হইতেছি দেখ।

বাংলা রচনাবলী

জন্য অন্য কোন কার্যের ক্ষতি নাই। বরং দেখিবে, ঈশ্বরভক্তির সঙ্গে মিলিত হইলে সকল কার্যই মঙ্গলপ্রদ, যশস্কর এবং পরিশুদ্ধ হয়।

আমি বৃদ্ধিতে পারিতোঁছি, অনেকের এ সকল কথা ভাল লাগিতেছে না। তাঁহারা এতক্ষণ বলিতেছেন, তরঙ্গিণী যুবতীর কথা হইতোঁছিল—হইতে হইতে আবার ঈশ্বরের নাম কেন? এই মাত্র বৃদ্ধা বয়সের ঢেঁকি পাতিয়া, বঙ্গদর্শনের জন্য ধান ভানিতোঁছিলে—আবার এ শিবের গীত কেন? দোষ হইয়াছে স্বীকার করি, কিন্তু মনে মনে বোধ হয় যে, সকল কাজেই একটু একটু শিবের গীত ভাল।

ভাল হউক বা না হউক, প্রাচীরের জন্য উপায় নাই। তোমার তরঙ্গিণী হেমাঙ্গিনী সুরঙ্গিণী কুরঙ্গিণীর দল আর আমার দিকে ঘেঁষবে না। তোমার মিল, কোমত, স্পেন্সর, ফ্যুরবাক মনোরঞ্জন করিতে পারে না। তোমার দর্শন, বিজ্ঞান, সকলই অসার—সকলই অন্ধের মৃগয়া। আজিকার বর্ষার দুর্দিনে—আজি এ কালরাত্রির শেষ কুলগ্নে,—এ নক্ষত্রহীন অমাবস্যার নিশির মেঘাগমে,—আমায় আর কে রাখিবে? এ ভবনদীর তপ্ত সৈকতে, প্রথরবাহিনী বৈতরণীর আবর্ত-ভীষণ উপকূলে—এ দুস্তর পারাবারের প্রথম তরঙ্গমালার প্রঘাতে, আর আমায় কে রক্ষা করিবে? অতি বেগে প্রবল বাতাস বহিতেছে—অন্ধকার, প্রভো! চারি দিকেই অন্ধকার! আমার এ ক্ষুদ্র ভেলা দুষ্কৃতির ভরে বড় ভারি হইয়াছে। আমায় কে রক্ষা করিবে?

পঞ্চম সংখ্যা—কমলাকান্তের বিদায়

সম্পাদক মহাশয়!

বিদায় হইলাম, আর লিখিব না। বনিল না। আপনার সঙ্গে বনিল না, পাঠকের সঙ্গে বনিল না, এ সংসারের সঙ্গে আমার বনিল না। আমার আপনার সঙ্গে আর আমার বনিল না। আর কি লেখা হয়? বেসুরে কি এ বাঁশী বাজে? বাঁশী বাজি বাজি করে, তবু বাজে না—বাঁশী ফাটিয়াছে। আবার বাজ দেখি, হৃদয়ের বংশী! হায়! তুই কি আর তেমনি করিয়া বাজিতে জানিস? আর কি সে তান মনে আছে? না, তুই সেই আঁহিস—না আমি সেই আমি আঁহি। তুই ঘুনে ধরা বাঁশী—আমি ঘুনে ধরা—আমি ঘুনে ধরা কি, কি ছাই তা আমি জানি না। আমার সে স্বর নাই—আর বাজাইব কি? আর সে রস নাই, শুনবে কে? একবার বাজ দেখি, হৃদয়! এই জগৎ সংসারে—বধির, অর্থচিন্তায় বিব্রত, মূঢ় জগৎ সংসারে, সেইরূপ আবার মনের লুকান কথাগুলি তেমনি করিয়া বল দেখি? বলিলে কেহ শুনবে কি? তখন বয়স ছিল—কত কাল হইল সে দপ্তর লিখিয়াছিলাম—এখন সে বয়স, সে রস নাই—এখন সে রস ছাড়া কথা কেহ শুনবে কি? আর সে বসন্ত নাই—এখন গলা-ভাঙ্গা কোকিলের কুহুরব কেহ শুনবে কি?

ভাই, আর কথায় কাজ নাই—আর বাজিয়া কাজ নাই—ভাঙ্গা বাঁশে মোটা আওয়াজে আর কুক্কুর-রাগিণী ভাঁজিয়া কাজ নাই। এখন হাসিলে কেহ হাসবে না—কাঁদিলে বরং লোকে হাসবে। প্রথম বয়সের হাসিকান্নায় সুখ আছে—লোকে সঙ্গে সঙ্গে হাসে কাঁদে;—এখন হাসিকান্না। ছি!—কেবল লোক হাসান!

হে সম্পাদককুলশ্রেষ্ঠ! আপনাকে স্বরূপ বলিতেছি—কমলাকান্তের আর সে রস নাই। আমার সে নসী বাবু নাই—অঁহিফেনের অনাটন—সে প্রসন্ন কোথায় জানি না—তাহার সে মঙ্গলা গাভী কোথায় জানি না। সত্য বটে, আমি তখনও একা—এখনও একা—কিন্তু তখন আমি একায় এক সহস্র—এখন আমি একায় আধখানা। কিন্তু একার এত বন্ধন কেন? যে পাখীটি পুষিয়াছিলাম—কবে মরিয়া গিয়াছে—তাহার জন্য আজও কাঁদি; যে ফুলটি ফুটাইয়াছিলাম—কবে শুকাইয়াছে, তাহার জন্য আজও কাঁদি; যে জলবিম্ব, একবার জলস্রোতে সূর্য্যরশ্মি সম্প্রভাত দেখিয়াছিলাম—তাহার জন্য আজও কাঁদি। কমলাকান্ত অন্তরের অন্তরে সন্ন্যাসী—তাহার এত বন্ধন কেন? এ দেহ পাঁচিয়া উঠিল—ছাই ভস্ম মনের বাঁধনগুলো পচে না কেন? ঘর পুড়িয়া গেল—আগুন নিভে না কেন? পুকুর শুকাইয়া আসিল—এ পঙ্ক পঙ্কজ ফুটে কেন? ঝড় থামিয়াছে—দরিয়ায় তুফান কেন? ফুল শুকাইয়াছে—এখনও গন্ধ কেন? সুখ গিয়াছে—আশা কেন? স্মৃতি কেন? জীবন কেন? ভালবাসা গিয়াছে—যত্ন কেন? প্রাণ গিয়াছে—পিণ্ডদান কেন? কমলাকান্ত গিয়াছে—যে কমলাকান্ত চাঁদ বিবাহ করিত, কোকিলের সঙ্গে গায়িত, ফুলের বিবাহ

দিত, এখন আবার তার আফিসের বরান্দ কেন? বাঁশী ফাটিয়াছে—আবার সা, ঋ, গ, ম কেন? প্রাণ গিয়াছে ভাই, আর নিশ্বাস কেন? সুখ গিয়াছে, ভাই, আর কান্না কেন?

তবু কাঁদি। জন্মিবা মাত্র কাঁদিয়াছিলাম, কাঁদিয়া মরিব। এখন কাঁদিব, লিখিব না।

অনুগত, স্বগত এবং বিগত
শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী

কমলাকান্তের জীবনবন্দী

খোশনবীস জর্নিয়র প্রণীত

সেই আফিসখোর কমলাকান্তের অনেক দিন কোন সম্বাদ পাই নাই। অনেক সন্ধান করিয়াছিলাম, অকস্মাৎ সম্প্রতি একদিন তাহাকে ফৌজদারী আদালতে দেখিলাম। দেখি যে, ব্রাহ্মণ এক গাছতলায় বসিয়া, গাছের গুঁড়ি ঠেসান দিয়া, চক্ষু বুজিয়া ডাবায় তামাকু টানিতেছে। মনে করিলাম, আর কিছুর না, ব্রাহ্মণ লোভে পিড়িয়া কাহার ডিবিয়া হইতে আফিস চুরি করিয়াছে—অন্য সামগ্রী কমলাকান্ত চুরি করিবে না—ইহা নিশ্চিত জানি। নিকটে একজন কালোকোত্তী কনেষ্টবলও দেখিলাম। আমি বড় দাঁড়াইলাম না—কি জানি যদি কমলাকান্ত জামিন হইতে বলে। তফাতে থাকিয়া দেখিতে লাগিলাম যে, কান্ডটা কি হয়।

কিছুকাল পরে কমলাকান্তের ডাক হইল। তখন একজন কনেষ্টবল রুল ঘুরাইয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া এজলাসে লইয়া গেল। আমি পিছুর পিছুর গেলাম। দাঁড়াইয়া, দুই একটি কথা শুনিয়া, ব্যাপারখানা বুঝিতে পারিলাম।

এজলাসে, প্রথামত মাচানের উপর হাকিম বিরাজ করিতেছেন। হাকিমটি একজন দেশী ধর্মাবতার—পদে ও গৌরবে ডিপুটি। কমলাকান্ত আসামী নহে—সাক্ষী। মোকদ্দমা গরুচুরি। ফরিয়াদী সেই প্রসন্ন গোয়ালিনী।

কমলাকান্তকে সাক্ষীর কাটারায় পুরিয়া দিল। তখন কমলাকান্ত মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। চাপরাশী ধমকাইল—“হাস কেন?”

কমলাকান্ত ষোড়হাত করিয়া বলিল, “বাবা, কার ক্ষেতে ধান খেয়েছি—যে, আমাকে এর ভিতর পুরিলে?”

চাপরাশী মহাশয় কথাটা বুঝিলেন না। দাঁড়ি ঘুরাইয়া বলিলেন, “তামাসার জায়গা এ নয়—হলফ পড়।”

কমলাকান্ত বলিল, “পড়াও না বাপু।”

একজন মূহুরি তখন হলফ পড়াইতে আরম্ভ করিল। বলিল, “বল, আমি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া...”

কমলাকান্ত। (সবিস্ময়ে) কি বলিব?

মূহুরি। শুনতে পাও না—“পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে—”

কমলা। পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে! কি সর্বনাশ!

হাকিম দেখিলেন, সাক্ষীটা কি একটা গন্ডগোল বাধাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, “সর্বনাশ কি?”

কমলা। পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনেছি—এ কথাটা বলতে হবে?

হাকিম। ক্ষতি কি? হলফের ফারমই এই।

কমলা। হুজুর সর্বিচারক বটে। কিন্তু একটা কথা বলি কি, সাক্ষ্য দিতে দিতে দুই একটা ছোট রকম মিথ্যা বলি, না হয় বলিলাম—কিন্তু গোড়াতেই একটা বড় মিথ্যা বলিয়া আরম্ভ করিব, সেটা কি ভাল?

হাকিম। এর আর মিথ্যা কথা কি?

কমলাকান্ত মনে মনে বলিল, “তত বুদ্ধি থাকিলে তোমার কি এ পদবৃদ্ধি হইত?” প্রকাশ্যে বলিল, “ধর্মাবতার, আমার একটু একটু বোধ হইতেছে কি যে, পরমেশ্বর ঠিক প্রত্যক্ষের বিষয়

বিশ্বকম রচনাবলী

নয়। আমার চোখের দোষই হউক আর যাই হউক, কখনও ত এ পর্যন্ত পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম না। আপনারা বোধ হয় আইনের চসমা নাকে দিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পারেন—কিন্তু আমি যখন তাঁহাকে এ ঘরের ভিতর প্রত্যক্ষ পাইতোছি না—তখন কেমন করিয়া বলি—আমি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে—”

ফরিয়াদীর উকীল চটিলেন—তাঁহার মূল্যবান সময়, যাহা মিনিটে মিনিটে টাকা প্রসব করে, তাহা এই দারিদ্র সাক্ষী নষ্ট করিতেছে। উকীল তখন গরম হইয়া বলিলেন, “সাক্ষী মহাশয়! Theological Lectureটা ব্রাহ্মসমাজের জন্য রাখিলে ভাল হয় না? এখানে আইনের মতে চলিতে মন স্থির করুন।”

কমলাকান্ত তাঁহার দিকে ফিরিল। মৃদু হাসিয়া বলিল, “আপনি বোধ হইতেছে উকীল।”
উকীল। (হাসিয়া) কিসে চিনিলে?

কমলা। বড় সহজে। মোটা চেন আর ময়লা শামলা দেখিয়া। তা, মহাশয়! আপনাদের জন্য এ Theological Lecture নয়। আপনারা পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখেন স্বীকার করি—যখন মোয়াক্কেল আসে।

উকীল সরোষে উঠিয়া হাকিমকে বলিলেন, “I ask the protection of the Court against the insults of this witness.”

কোর্ট বলিলেন, “O Baboo! the witness is your own witness, and you are at liberty to send him away if you like.”

এখন কমলাকান্তকে বিদায় দিলে উকীল বাবুর মোকদ্দমা প্রমাণ হয় না—সুতরাং উকীল বাবু চুপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। কমলাকান্ত ভাবিলেন, এ হাকিমটা জাতিভ্রষ্ট—পালের মত নয়।

হাকিম গতক দেখিয়া, মৃদুরিকে আদেশ করিলেন যে, “ওখের প্রতি সাক্ষীর objection আছে—উহাকে simple affirmation দাও।” তখন মৃদুরি কমলাকান্তকে বলিল, “আচ্ছা, ও ছেড়ে দাও—বল, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি—বল।”

কমলা। কি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সেটা জানিয়া প্রতিজ্ঞাটা করিলে ভাল হয় না?

মৃদুরি হাকিমের দিকে চাহিয়া বলিল, “ধর্মাবতার! সাক্ষী বড় সেরুকশ্।”

উকীল বাবু হাকিলেন, “Very obstructive.”

কমলাকান্ত। (উকীলের প্রতি) শাদা কাগজে দস্তখত করিয়া লওয়ার প্রথাটা আদালতের বাহিরে চলে জানি—ভিতরেও চলবে কি?

উকীল। শাদা কাগজে কে তোমার দস্তখত লইতেছে?

কমলা। কি প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে, তাহা না জানিয়া, প্রতিজ্ঞা করা, আর কাগজে কি লেখা হয় তাহা না দেখিয়া, দস্তখত করা, একই কথা।

হাকিম তখন মৃদুরিকে আদেশ করিলেন যে, “প্রতিজ্ঞা আগে ইহাকে শুনাইয়া দাও—গোলমালে কাজ নাই।” মৃদুরি তখন বলিল, “শোন, তোমাকে বলিতে হইবে যে, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি যে সাক্ষ্য দিব, তাহা সত্য হইবে, আমি কোন কথা গোপন করিব না—সত্য ভিন্ন আর কিছু হইবে না।”

কমলা। ওঁ মধু মধু মধু।

মৃদুরি। সে আবার কি?

কমলা। পড়ান, আমি পড়িতেছি।

কমলাকান্ত তখন আর গোলযোগ না করিয়া প্রতিজ্ঞা পাঠ করিল। তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার জন্য উকীল বাবু গারোথান করিলেন, কমলাকান্তকে চোখ রাঙ্গাইয়া বলিলেন, “এখন আর বদ্‌মায়োশি করিও না—আমি যা জিজ্ঞাসা করি, তার যথার্থ উত্তর দাও। বাজে কথা ছাড়িয়া দাও।”

কমলা। আপনি যা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাই আমাকে বলিতে হইবে? আর কিছু বলিতে পাইব না?

উকীল। না।

কমলাকান্ত তখন হাকিমের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “অথচ আমাকে প্রতিজ্ঞা করাইলেন যে,

‘কোন কথা গোপন করিব না।’ ধর্মাবতার, বে-আদাবি মাফ হয়! পাড়ায় আজ একটা যাত্রা হইবে, শর্দীনতে যাইব ইচ্ছা ছিল; সে সাধ এইখানেই মিটল। উকীল বাবু, অধিকারী—আমি যাত্রার ছেলে, যা বলাইবেন, কেবল তাই বলিব; যা না বলাইবেন, তা বলিব না। যা না বলাইবেন, তা কাজেই গোপন থাকিবে। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের অপরাধ লইবেন না।”

হাকিম। যাহা আবশ্যিক বিবেচনা করিবে, তাহা না জিজ্ঞাসা হইলেও বলিতে পার।

কমলাকান্ত তখন সেলাম করিয়া বলিল, “বহৎ খুব।” উকীল তখন জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন, “তোমার নাম কি?”

কমলা। শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী।

উকীল। তোমার বাপের নাম কি?

কমলা। জোবানবন্দীর আভ্যুদয়িক আছে না কি?

উকীল গরম হইলেন, বলিলেন, “হুজুর! এ সব Contempt of Court.” হুজুর, উকীলের দুর্দশা দেখিয়া নিতান্ত অসন্তুষ্ট নন—বলিলেন, “আপনারই সাক্ষী।” সতরাং উকীল আবার কমলাকান্তের দিকে ফিরিলেন, বলিলেন, “বল। বলিতে হইবে।”

কমলাকান্ত পিতার নাম বলিল। উকীল তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি জাতি?”

কমলা। আমি কি একটা জাতি?

উকীল। তুমি কোন্ জাতীয়।

কমলা। হিন্দু জাতীয়।

উকীল। আঃ! কোন্ বর্ণ?

কমলা। ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ।

উকীল। দূর হোক ছাই! এমন সাক্ষীও আনে! বল তোমার জাত আছে?

কমলা। মারে কে?

হাকিম দেখিলেন, উকীলের কথায় হইবে না। বলিলেন, “ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কৈবর্ত, হিন্দুর নানা প্রকার জাতি আছে জান ত—তুমি তার কোন্ জাতির ভিতর?”

কমলা। ধর্মাবতার! এ উকীলেরই ধৃষ্টতা! দেখিতেছেন আমার গলায় যজ্ঞোপবীত, নাম বলিয়াছি চক্রবর্তী—ইহাতেও যে উকীল বুকেন নাই যে, আমি ব্রাহ্মণ, ইহা আমি কি প্রকারে জানিব?

হাকিম লিখিলেন, “জাতি ব্রাহ্মণ।” তখন উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার বয়স কত?”

এজলাসে একটা ক্লক ছিল—তাহার পানে চাহিয়া হিসাব করিয়া কমলাকান্ত বলিল, “আমার বয়স একাদশ বৎসর, দুই মাস, তের দিন, চারি ঘণ্টা, পাঁচ মিনিট—”

উকীল। কি জ্বালা! তোমার ঘণ্টা মিনিট কে চায়?

কমলা। কেন, এইমাত্র প্রতিজ্ঞা করাইয়াছেন যে, কোন কথা গোপন করিব না।

উকীল। তোমার যা ইচ্ছা কর! আমি তোমায় পারি না। তোমার নিবাস কোথা?

কমলা। আমার নিবাস নাই।

উকীল। বলি, বাড়ী কোথা?

কমলা। বাড়ী দূরে থাক্, আমার একটা কুঠারীও নাই।

উকীল। তবে থাক কোথা?

কমলা। যেখানে সেখানে।

উকীল। একটা আড্ডা ত আছে?

কমলা। ছিল, যখন নসী বাবু ছিলেন। এখন আর নাই।

উকীল। এখন আছ কোথা?

কমলা। কেন, এই আদালতে।

উকীল। কাল ছিলে কোথা?

কমলা। একখানা দোকানে।

হাকিম বলিলেন, “আর বকাবকিতে কাজ নাই—আমি লিখিয়া লইতেছি, নিবাস নাই। তারপর?”

উকীল। তোমার পেশা কি?

বঙ্কিম রচনাবলী

কমলা। আমার আবার পেশা কি? আমি কি উকীল না বেশ্যা যে, আমার পেশা আছে?
উকীল। বল, খাও কি করিয়া?

কমলা। ভাতের সঙ্গে ডাল মাখিয়া, দক্ষিণ হস্তে গ্রাস তুলিয়া, মুখে প্দরিয়া গলাধঃকরণ করি।

উকীল। সে ডাল ভাত জোটে কোথা থেকে?

কমলা। ভগবান্ জোটালেই জোটে, নইলে জোটে না।

উকীল। কিছ্ উপার্জন কর?

কমলা। এক পয়সাও না।

উকীল। তবে কি চুরি কর?

কমলা। তাহা হইলে ইতিপূর্বেই আপনার শরণাগত হইতে হইত। আপনি কিছ্ ভাগও পাইতেন।

উকীল তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া, আদালতকে বলিলেন, “আমি এ সাক্ষী চাহি না। আমি ইহার জোবানবন্দী করাইতে পারিব না।”

প্রসন্ন বাদিনী, উকীলের কোমর ধরিল; বলিল, “এ সাক্ষী ছাড়া হইবে না। এ বামন সত্য কথা বলবে, তাহা আমি জানি—কখনও মিছা বলে না। উহাকে তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে জান না—তাই ও অমন করিতেছে। ও বামনের আবার পেশা কি? ও এর বাড়ী ওর বাড়ী খেয়ে বেড়ায়, ওকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, উপার্জন কর! ও কি বলবে?”

উকীল তখন হাকিমকে বলিল, “লিখুন, পেশা ভিক্ষা।”

এবার কমলাকান্ত রাগিল, “কি? কমলাকান্ত চক্রবর্তী ভিক্ষোপজীবী? আমি মুক্তকণ্ঠে হৃদয়ের উপর বলিতেছি, আমি কখনও কাহারও কাছে এক পয়সা ভিক্ষা চাই না।”

প্রসন্ন আর থাকিতে পারিল না—সে বলিল, “সে কি ঠাকুর! কখন আফিঙ্গ চেয়ে খাও নাই?”

কমলা। দূর মাগি ধেমো গোয়ালার মেয়ে! আফিঙ্গ কি পয়সা! আমি কখন একটি পয়সাও কাহারও কাছে ভিক্ষা লই নাই।

হাকিম হাসিয়া বলিলেন, “কি লিখিব, কমলাকান্ত?”

কমলাকান্ত নরম হইয়া বলিল, “লিখুন, পেশা ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ-গ্রহণ।” সকলে হাসিল—হাকিম তাই লিখিয়া লইলেন।

তখন উকীল মহাশয় মোকদ্দমায় প্রবৃত্ত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি ফরিয়াদীকে চেন?”

কমলা। না।

প্রসন্ন হাঁকিল, “সে কি ঠাকুর! চিরটা কাল আমার দুধ দই খেলে, আজ বল চিনি না?”

কমলাকান্ত বলিল, “তোমার দুধ দই চিনি না, এমন কথা ত বলতেছি না—তোমার দুধ দই বিলক্ষণ চিনি। যখনই দেখি এক পোয়া দুধে তিন পোয়া জল, তখনই চিনিতে পারি যে, এ প্রসন্ন গোয়ালীর দুধ; যখনই দেখতে পাই যে, ঘোলের চেয়ে দই ফিকে, তখনই চিনিতে পারি যে, এ প্রসন্নময়ীর দধি। দুধ দই চিনি নে?”

প্রসন্ন নথ ঘুরাইয়া বলিল, “আমার দুধ দই চেন, আর আমায় চিনিতে পার না?”

কমলাকান্ত বলিল, “মেয়েমানুষকে কে কবে চিনিতে পেরেছে. দিদি? বিশেষ, গোয়ালার মেয়ের কাঁকালে যদি দুধের কেঁড়ে থাকিল, তবে কার বাপের সাধ্য তাকে চিনে উঠে?”

উকীল তখন আবার সওয়াল করিতে লাগিলেন, “বুঝা গেল: তুমি বাদিনীকে চেন—উহার সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ আছে?”

কমলা। মন্দ নয়—এত গুণ না থাকিলে কি উকীল হয়!

উকীল। তুমি আমার কি গুণ দেখিলে?

কমলা। বামনের ছেলে গোয়ালার মেয়েতেও আপনি একটা সম্বন্ধ খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন।

উকীল। এমন সম্বন্ধ কি হয় না? কে জানে তুমি ওর পোষ্যপুত্র কি না?

কমলা। ওর নয়, কিন্তু ওর গাইয়ের বটে।

উকীল। বুঝা গেল, তোমার সঙ্গে বাদিনীর একটা সম্বন্ধ আছে, একেবারে সাফ বলিলেই হইত—এত দুঃখ দাও কেন? এখন জিজ্ঞাসা করি, তুমি এ মোকদ্দমার কি জান?

কমলা। জানি যে, এ মোকদ্দমায় আপনি উকীল, প্রসন্ন ফরিয়াদী, আমি সাক্ষী, আর এই নেড়ে আসামী।

উকীল। তা নয়, গোরুচুরির কি জান?

কমলা। গোরুচুরি আমার বাপ-দাদাও জানে না। বিদ্যাটা আমায় শিখাইবেন?—আমার দুধ দধির বড় দরকার।

উকীল। আঃ—বলি গোরুচুরি দেখিয়াছ?

কমলা। একদিন দেখিয়াছিলাম। নসীবাবুর একটা বক্না—এক বেটা মূর্খি—

উকীল। কি যন্ত্রণা! বলি, প্রসন্ন গোয়ালিনীর গোরু যখন চুরি যায়, তখন তুমি দেখিয়াছ?

কমলা। না—চোর বেটার এত বুদ্ধি হয় নাই যে, আমাকে ডাকিয়া সাক্ষী রাখিয়া গোরুটা চুরি করে। তাহা হইলে আপনারও কাজের সুবিধা হইত, আমারও কাজের সুবিধা হইত।

প্রসন্ন দেখিল, উকীলকে টাকা দেওয়া সার্থক হয় নাই—তখন আপনার হাতে হাল লইবার ইচ্ছায়, উকীলের কাণে কাণে বলিয়া দিল, “ও বাবুন সব কিছুর সাক্ষী নয়—ও কেবল গোরু চেনে।”

উকীল মহাশয় তখন কুল পাইলেন। গঞ্জিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি গোরু চেন?”

কমলাকান্ত মধুর হাসিয়া বলিল, “আহা, চিনি বই কি—নহিলে কি আপনার সঙ্গে এত মিষ্টালাপ করি?”

হাকিম দেখিলেন, সাক্ষী বড় বাড়াবাড়ি করিতেছে—বলিলেন, “ও সব রাখ।” প্রসন্ন গোয়ালীর শামলা গাই আদালতের সম্মুখে মাঠে বাঁধা ছিল—দেখা যাইতেনি। ডিপুটি বাবু সেই দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি এই গোরুটিকে চেন?”

কমলাকান্ত ষোড়হাত করিয়া বলিল, “কোন গোরুটি, ধর্ম্মবতার?”

হাকিম বলিলেন, “কোন গোরুটি কি? একটি বই ত সামনে নাই?”

কমলা। আপনি দেখিতেছেন, একটি—আমি দেখিতেছি, অনেকগুলি।

হাকিম বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “দেখিতে পাইতেছ না—ঐ শামলা?”

কমলাকান্ত শামলা গাইয়ের দিকে না চাহিয়া উকীলের শামলার প্রতি চাহিল। বলিল, “এ শামলাও চুরির না কি?”

কমলাকান্তের নষ্টামি হাকিম আর সহ্য করিতে পারিলেন না—বলিলেন, “তুমি আদালতের কাজের বড় বিঘ্ন করিতেছ—Contempt of Court জন্য তোমার পাঁচ টাকা জরিমানা।”

কমলাকান্ত আভূমিপ্রণত সেলাম করিয়া ষোড়হাত করিয়া বলিল, “বহৎ খুব হুজুর! জরিমানা আদায়ের ভার কার প্রতি?”

হাকিম। কেন?

কমলা। কিরূপে আদায় করিবেন, সে বিষয়ে তাঁহাকে কিছু উপদেশ দিব।

হাকিম। উপদেশের প্রয়োজন কি?

কমলা। ইহলোকে ত আমার নিকট জরিমানা আদায়ের কোন সম্ভাবনা নাই—তিনি পরলোকে যাইতে প্রস্তুত কি না জিজ্ঞাসা করিব।

হাকিম। জরিমানা না দিতে পার, কয়েদ যাইবে।

কমলা। কত দিনের জন্য, ধর্ম্মবতার?

হাকিম। জরিমানা অনাদায়ে এক মাস কয়েদ।

কমলা। দুই মাস হয় না?

হাকিম। বেশী মিয়াদের ইচ্ছা কর কেন?

কমলা। সময়টা কিছু মন্দ পড়িয়াছে—ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ আর তেমন সুলভ নয়—জেলখানায় যাহাতে মাস দুই ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ হয়, সে ব্যবস্থা যদি আপনি করেন, তবে গরীব ব্রাহ্মণ উদ্ধার পায়।

বাঁকিম রচনাবলী

এরূপ লোককে জরিমানা বা কয়েদ করিয়া কি হইবে? হাকিম হাসিয়া বলিলেন, “আচ্ছা, তুমি যদি গোল না করিয়া সোজা জোবানবন্দী দাও, তবে তোমার জরিমানা মাপ করা যাইতে পারে। বল—ঐ গোরু তুমি চেন কি না?”

হাকিম তখন একজন কনস্টেবলকে আদেশ করিলেন যে, গোরুর নিকট গিয়া প্রসন্নের গাই দেখাইয়া দেয়। কনস্টেবল তাহাই করিল। বিষয় উকীল বাবু তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, “ঐ গোরু তুমি চেন?”

কমলা। সিংওয়লা গোরু—তাই বলুন।

উকীল। তুমি বল কি?

কমলা। আমি বলি শামলাওয়লা—তা যাক্—আমি সিংওয়লা গোরুটা চিনি। বিলক্ষণ আলাপ আছে।

উকীল। ও কার গোরু?

কমলা। আমার।

উকীল। তোমার!

কমলা। আমারই।

হরি হরি! প্রসন্নের মূখ শূকাইল! উকীল দেখিল, মোকদ্দমা ফাঁসিয়া যায়। প্রসন্ন তখন তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিল, “তবে রে বিট্লে! গোরু তোমার!”

কমলাকান্ত বলিল, “আমার না ত কার! আমি ওর দুধ খেয়েছি, ওর দই খেয়েছি—ওর ঘোল খেয়েছি, ওর ছানা খেয়েছি—ওর মাখন খেয়েছি, ওর ননী খেয়েছি—ও গোরু আমার হলো না, তুই বেটী পালিস্ ব’লে কি তোর বাবার গোরু হলো!”

উকীল অতটা বুঝিলেন না। বলিলেন, “ধর্ম্মাবতার, witness hostile! permission দিন, আমি ওকে cross করি।”

কমলা। কি? আমায় cross করিবে?

উকীল। হাঁ, করিব।

কমলা। নোকায়, না সাঁকো বেঁধে?

উকীল। সে আবার কি?

কমলা। বাবা! কমলাকান্ত-সাগর পার হও, এত বড় হনুমান্ তুমি আজও হও নাই।

এই বলিয়া কমলাকান্ত চক্রবর্তী রাগে গর্গ করিয়া কাটরা হইতে নামিয়া যায়—চাপরাশী ধরিয়া আবার কাটরায় পড়িল। তখন কমলাকান্ত আলু খালু হইয়া নিশেষ্ট হইল—বলিল, “কর বাবা ক্রস্ কর!—আমি অগাধ সমুদ্র পড়িয়া আছি—যে ইচ্ছা সে লক্ষ্য দাও—‘অপামিবাধারমনুত্ত-রঙ্গং!’—উকীল মহাশয়! এ প্রশান্ত মহাসমুদ্র তরঙ্গ বিক্ষেপ করে না, আপনি স্বচ্ছন্দে উল্লম্বন করুন।”

উকীল তখন কোর্টকে বলিলেন, “ধর্ম্মাবতার, দেখা যাইতেছে যে, এ ব্যক্তি বাতুল; ইহাকে আর ক্রস্ করিবার প্রয়োজন নাই। বাতুল বলিয়া ইহার জোবানবন্দী পরিত্যক্ত হইবে। ইহাকে বিদায় দেওয়া হউক।”

হাকিম কমলাকান্তের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলে বাঁচেন, বিদায় দিতে প্রস্তুত, এমত সময়ে প্রসন্ন হাত ষোড় করিয়া আদালতে নিবেদন করিল, “যদি হুকুম হয়, তবে আমি স্বয়ং উহাকে গোটা কত কথা জিজ্ঞাসা করি, তার পর বিদায় দিতে হয়, দিবেন।”

হাকিম কোঁতহলী হইয়া অনুমতি দিলেন। প্রসন্ন তখন কমলাকান্তের প্রতি চাহিয়া বলিল, “ঠাকুর! মোঁতাতের সময় হয়েছে না?”

কমলা। মোঁতাতের আবার সময় কি রে বেটী—“অজরামরবৎ প্রাজ্ঞঃ বিদ্যাং নেশাণ্ড চিন্তয়েৎ।”

প্রসন্ন। অং বং এখন রাখ—এখন মোঁতাত করিবে?

কমলা। দে!

প্রসন্ন। আচ্ছা, আগে আমার কথার উত্তর দাও—তার পর সে হবে।

কমলা। তবে জল্দি জল্দি বল—জল্দি জল্দি জবাব দিই।

প্রসন্ন। বলি, গোরু কার?

কমলা। গোরু তিন জনের; গোরু প্রথম বয়সে গুরুমহাশয়ের; মধ্যবয়সে স্ত্রীজাতির; শেষবয়সে উত্তরাধিকারীর; দাঁড় ছিঁড়বার সময়ে কারও নয়।

প্রসন্ন। বালি, ঐ শামলা-গাই কার?

কমলা। যে ওর দুধ খায় তার।

প্রসন্ন। ও গোরু আমার কি না?

কমলা। তুই বেটী কখন ওর এক বিন্দু দুধ খেলি নে, কেবল বেচে মর্লি. গোরু তোর হলো? ও গোরু যদি তোর হয়, তবে বাঙ্গাল বেঙ্কের টাকাও আমার। দে বেটী, গোরুচোরকে ছেড়ে দে—গরীবের ছেলে দুধ খেয়ে বাঁচুক।

হাকিম দেখিলেন, দুই জনে বড় বাড়াবাড়ি করিতেছে—আদালত মেছো-হাটা হইয়া উঠিল। তখন উভয়কে ধমক দিয়া, জিজ্ঞাসাবাদ নিজহস্তে লইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, “প্রসন্ন এই গোরুর দুধ বেচে?”

কমলা। আজ্ঞে, হাঁ।

“উহার গোহালে এই গোরু থাকে?”

কমলা। ও গোরুও থাকে, আমিও কখন কখন থাকি।

“ঐ খাওয়ায়?”

কমলা। উভয়কে।

বাদিনীর উকীল তখন বলিলেন, “আমার কার্য সিদ্ধ হইয়াছে—আমি উহাকে আর জিজ্ঞাসা করিতে চাই না।” এই বলিয়া তিনি উপবেশন করিলেন। তখন আসামীর উকীল গাত্রোথান করিলেন। দেখিয়া কমলাকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, “আবার তুমি কে?”

আসামীর উকীল বলিলেন, “আমি আসামীর পক্ষে তোমাকে ফ্রস্ করিব।”

কমলা। একজন ত ফ্রস্ করিয়া গেল, আবার তুমি কুমার বাহাদুর এলে না কি?

উকীল। কুমার বাহাদুর কে?

কমলা। রাজপুত্রকে চেন না? দ্রোতা যুগে আগে ফ্রস্ করিলেন, পবনাঙ্গজ মহাশয়। তার পর ফ্রস্ করিলেন, কুমার বাহাদুর।*

উকীল। ও সব রাখ—তুমি গোরু চেন বলেছ—কিসে চেন?

কমলা। কখন শিঙ্গে—কখন শামলায়!

উকীল রাগিয়া উঠিয়া, গজ্জন করিয়া, টেবিল চাপড়াইয়া বলিলেন, “তোমার পাগলামি রাখ—তুমি এই গোরু চিনিতে পারিতেছ কিসে?”

কমলা। ঐ হাম্বা-রবে।

উকীল হতাশ হইয়া বলিলেন, “Hopeless!” উকীল মহাশয় বসিয়া পড়িলেন—আর জেরা করিবেন না। কমলাকান্ত বিনীতভাবে বলিল, “দাঁড় ছেঁড় কেন, বাবা?”

উকীল আর জেরা করিবেন না দেখিয়া হাকিম কমলাকান্তকে বিদায় দিলেন। কমলাকান্ত উদ্ধ্বাসে পলাইল। আমি কিছু কাজ সারিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলাম যে, কমলাকান্ত থেলো হুঁকা হাতে করিয়া বসিয়া আছে—চারি দিকে লোক জমিয়াছে—প্রসন্নও সেখানে আসিয়াছে। কমলাকান্ত তাহাকে তিরস্কার করিতেছে আর বলিতেছে, “তোমার মঙ্গলার বাঁটের দিব্য, তোর দুধের কেঁড়ের দিব্য, তোর ঘোলমউনির দিব্য, তোর ফাঁদি-নথের দিব্য, তুই যদি চোরকে গোরু ছেড়ে না দিস!”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “চক্রবর্তী মহাশয়! চোরকে গোরু ছাড়িয়া দিবে কেন?”

কমলাকান্ত বলিল, “পূর্বেকালে মহারাজ শ্যোনজিৎকে এক ব্রাহ্মণ বলিয়াছিল যে, ‘বৎস, গোপস্বামী ও তস্কর, ইহাদের মধ্যে যে ধেনুর দুগ্ধ পান করে, সেই তাহার ষথার্থ অধিকারী। অন্যের তাহার উপর মমতা প্রকাশ করা বিড়ম্বনা মাত্র।’† এই হলো ভীষ্মদেব ঠাকুরের Hindu Law, আর ইহাই এখনকার ইউরোপের International Law। যদি সভ্য এবং উন্নত হইতে চাও, তবে কাড়িয়া খাইবে। গো শব্দে ধেনুই বৃষ আর পৃথিবীই বৃষ, ইনি তস্করভোগ্যা।

* অঙ্গদ।

† শান্তিপর্ষ, ১৭৪ অধ্যায়।

বীকম রচনাবলী

সেকন্দর হইতে রণজিৎ সিংহ পর্যন্ত সকল তস্করই ইহার প্রমাণ। Right of Conquest যদি একটা right হয়, তবে Right of theft, কি একটা right নয়? অতএব, হে প্রসন্ন নামে গোপকন্যে! তুমি আইনমতে কাৰ্য্য কর। ঐতিহাসিক রাজনীতির অনুবর্তী হও। চোরকে গোরু ছাড়িয়া দাও।”

এই বলিয়া কমলাকান্ত সেখান হইতে চলিয়া গেল। দেখিলাম, মানুষটা নিতান্ত ক্ষেপিয়া গিয়াছে।

খোশনবীস্ জুনিয়র।

পরিশিষ্ট

কাকাতুয়া

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী প্রণীত

মাস পাঁচ ছয় হইল, একদিন প্রাতে স্নানাদিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া কিঞ্চিৎ গুড় ছোলা খাইয়া বসিয়া তামাকু টানিতোছি, এমন সময় প্রসন্ন গোয়ালিনী আসিয়া উপস্থিত। সু-বামহস্ত কোমরস্থিত সুধাভাণ্ড জড়াইয়া রহিয়াছে, পোড়া ডান হাতে একটা পাখীর খাঁচা। খাঁচাটা অতি সাবধানে মাটিতে রাখিয়া প্রসন্ন বসিল। রকম দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কত রঙ্গই জান?

প্রসন্ন উত্তর করিল—কেন, রঙ্গ আবার কি দেখিলে?

আমি। তোমার সব দুধ দই আমাকে না দিয়া পাঁচজনকে বেঁচিয়া বেড়াও, এই ত এক রঙ্গ। আবার এতদিনের পর একটা নতুন পাখী কেন?

প্র। নতুন পুরাতন আবার কি? আমি ত আর কখন পাখী পুঁষি নাই।

আ। সে কি প্রসন্ন? আর কখন পাখী পোষি নাই কি? আমিই যে তোমার খাঁচার পাখী—তোমার ঐ পরম ভাণ্ডের মধ্যে আমি শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী ক্ষীরোদশয্যাশায়ী অনন্ত পুরুষের ন্যায় সদাই যোগমুগ্ধ। ঐ ক্ষীরাদার ভাণ্ড আমার অনন্তশয্যারূপী খাঁচা। আমি ঐ খাঁচার ক্ষীরপায়ী পক্ষী। তাই বলি, আবার একটা পাখী কেন?

প্র। দেখিলাম পাখীটা আর একটা পাখীর বাসায় ঢুকিতে গিয়া ঠোকর খাইয়া মাটিতে পড়িয়া ধড়ফড় করিতেছে। দেখিয়া বড় দুঃখ হইল; তাই পাখীটাকে খাঁচায় পুরিয়া আনিলাম।

আ। যে পরের বস্তু লইবার জন্য অনধিকার-প্রবেশের চেষ্টা করে, তাহার জন্য আবার দুঃখ কি? সে ত ঘোর অত্যাচারী! পিনাকোডের ৫১১ ধারানুসারে সে ষোল আনা চুরি এবং অনধিকার-প্রবেশের দায়ে দায়ী, তা জানিস্?

প্র। অমন কথা বল না! ওর কিছুর নাই বলিয়াই অমন অসাহসের কাজ করিতে গিয়াছিল। আহা! যার নাই, তাকে যদি লোকে না দেবে ত সে কোথায় যাবে—আমরা মেয়েমানুষ এই ত বঁধি।

প্রসন্নের মুখে দান দাতব্যের কথা বড়ই ভয়াবহ। আমার এককালে ভয় এবং রাগের সঞ্চার হইল। গরম হইয়া বলিলাম—

তবে বঁধি ওই পাখীটাকে তোর যথাসম্বল দিবি? আমি বঁধি আমার এই দুঃখপুষ্ট তনুখানি গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দিব?

প্র। ও কি রকম কথা? আমি কি তোমাকে তাই করতে বলছি?

আ। নয়ই বা কেন? ঐ পাখীটাই যদি তোর সব দুধ দই খেলে, তবে আমি কি বাতাস খেয়ে থাকব না Huxley সাহেবের protoplasm খেয়ে থাকব?

প্র। কেন, তুমিও খাবে, ও-ও খাবে।

আ। না, প্রসন্ন, কমলাকান্ত সরিকিতে নাই।

প্র। সে আবার কি?

আ। ভাগাভাগিতে আমি নাই। দায়ভাগের ভাগাভাগির ভয়ে আমি সংসারধম্মই করিলাম না। আবার তোর ভাঁড়েও ভাগাভাগি?

প্র। কেন, তুমিই ত সে দিন কত দান ধর্মের কথা, কত হোমান্টি মটরস্‌টির কথা বলছিলে?

আ। সে পরকে শেখাবার জন্য।

প্র। ও মা সে কি গো! আপনার বেলা লীলাখেলা পাপপুণ্য পরের বেলা!

আ। প্রসন্ন, কমলাকান্তের জাতিকে তুই এখনও চিনিস্‌ নাই। তা সে সব কথা যাক্‌। পাখীটাকে ছেড়ে দে।

প্র। তা হবে না। যাকে একবার ঠাই দিয়েছি তাকে তাড়াতে পার্‌ব না।

আ। সেটা ত তোদের জাতিরই ধর্ম নয়?

এবার প্রসন্ন রাগিল। বলিল—

কি, বামণ, তুমি ধর্ম ধর্ম কর? তোমার মতন দুর্মুখ ত ভূ-ভারতে নাই। তোমার কাছে আবার মানুষ আসে?

এই বলিয়া প্রসন্ন উঠিল। প্রত্যহ প্রাতে আমাকে যে দুধটুকু দেয় তাহা না দিয়াই চলিল। দুধ চলিয়া যায় দেখিয়া আমি রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলিলাম—আচ্ছা, আমিও একটা পাখী পুঁষিব, আমার যা কিছু আছে সব তাকে দিব। প্রসন্ন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া খাঁচাটা মাটীতে রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত নাড়িয়া আমাকে বলিল—আচ্ছা, আমিও এই বলে যাচ্ছি, যে দিন তুমি পাখীকে পোষমানাতে পার্‌বে, সেই দিন আমি আমার এই দুধের কেঁড়ে ভেঙ্গে ফেল্‌ব।

এই বলিয়া প্রসন্ন খাঁচাটা তুলিয়া লইয়া ঠিকুরে বোরিয়ে গেল। কেঁড়ের দুধ চল্‌কে কাপড় বাহিয়া পড়িতে লাগিল। O what a fall was there!

আমি ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া পাখীর সন্মানে বাহির হইলাম। অনেক ঘুরিলাম, অনেক পাখীর দোকানে গেলাম। কোথাও মনের মতন পাখী পাইলাম না। শেষে এক দোকানে একটি পাখী মনোনীত হইল, কিন্তু তখনই দামের কথা মনে পড়িল। আমি শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী, আমার ত একটি পয়সাও নাই; তবে কি বলিয়া পাখী কিনিতে আসিলাম? কিছু অবসন্ন হইলাম; কিন্তু তখনই মনে হইল যে কমলাকান্তের দেশে কয়জন সম্বলবিশিষ্ট লোক আছে? আর সম্বলহীন হইয়াও কে না বড় বড় সওদার চেষ্টায় ফিরিতেছে? কে না বড় বড় পদ, লম্বা লম্বা খেতাবের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছে? কিন্তু তাহারা কেহই ত লজ্জা, অপমান, ঘৃণা, কিছুই অনুভব করে না! তবে আমিই কেন লজ্জিত হই? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছি এমন সময় একটা ককর্শ শব্দ শুনিতে পাইলাম। শব্দটা এইরূপ—Plateetud, Plateetud, Plateetud, বারম্বার এই অশ্রুতপূর্বে শব্দ শুনিয়া কারণ জানিবার ইচ্ছা হইল। খুঁজিতে খুঁজিতে এক দরিদ্র মুসলমানের বাড়ীতে আসিলাম। উঁকি মারিয়া দেখিলাম উঠানে এক কচ্ছতর বীরপুরুষ কতকগুলো মৃগী জবাই করিতেছে—রক্তের স্রোত বাহিয়া যাইতেছে। একখানা ঘরের দাবায় একটা স্ত্রীলোক পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, এবং বিষম যন্ত্রণাসূচক চীৎকার করিতেছে। ঘরের চালে ডাঁড়ে বসিয়া একটা পাখী একবার সেই রক্তের স্রোত দেখিতেছে, একবার সেই স্ত্রীলোকটাকে দেখিতেছে এবং আহ্বাদে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছে। এক একবার স্ত্রীলোকটাকে ঠোকরাইবার চেষ্টা করিতেছে, এবং ঘুরিয়া ফিরিয়া Plateetud, Plateetud করিতেছে। আমি গৃহস্বামীকে ডাকিলাম। গৃহস্বামী বাহিরে আসিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—তোমার বাড়ীতে কাহার কোন পীড়া হইয়াছে?

গৃ-স্বা। হাঁ, আমার স্ত্রীর হাঁটুতে বড় একটা বেদনা হইয়াছে। আমি সেইজন্য বড় বিপাকে পড়িয়াছি। আমার বাড়ীতে আজ দশজন লোক থাকে, আর এই বিপদ।

আ। আমি একটা ঔষধ দিতেছি; জলে গুলিয়া হাঁটুতে মালিশ করিয়া দেও, শীঘ্র আরাম হইবে। কিন্তু আমাকে কি দিবে?

গৃ-স্বা। আপনি কি চান?

আ। ঐ পাখীটা।

গৃ-স্বা। এখনি লইয়া যান। ওটাকে আমি খুব যত্ন করিয়া আনিয়াছিলাম, কিন্তু মহাশয়, এখন ওটা আমার ছেলের পিলেকে ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে মারিয়া ফেলিতেছে। আপনি এখনই লইয়া যান।

তখন আমি বিষম গোলে পড়িলাম। আফিস দিই কেমন করিয়া? যে আফিস দেবাসুরে

বিক্রম রচনাবলী

সমুদ্র মন্থন করিয়া, সৃষ্টির সারভূত পদার্থ স্বরূপ লাভ করিয়া আমি লোভ-পরিশূন্য সংসার-বিরাগী বলিয়া আমার জিম্মায় রাখিয়াছেন, সে আফিজ দিই কেমন করিয়া? কিন্তু না দিলেও নয়। প্রসন্নের কাছে আগে মূখ রাখা চাই, সেই দুধ দেয়। দেবাসুরে আমাকে এক ছিলিম তামাকুও দেয় না। সুতরাং ক্ষণেক ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে চক্ষু বর্জিয়া ছোট্ট একটি গুলি গৃহস্বামীর হাতে দিয়া পাখীটা লইয়া চলিয়া আসিলাম। কাজটা মন্দ করিলাম কি? উপকার করিয়া তাহার মূল্য স্বরূপ পাখীটা লইলাম। কে না লয়? ডাক্তার মহাশয়েরা দরিদ্র রোগীর নিকট হইতে fee লয়েন না? উকিল মহাশয়েরা নিঃস্ব মোয়াক্কলের নিকট হইতে fee লয়েন না? রাজপুরুষেরা দরিদ্র গৃহস্থের নিকট হইতে টেক্স লয়েন না? কুলকামিনীরা দরিদ্র স্বামীর নিকট হইতে খোরপোষ লয়েন না? তবে আমিই কি এমন ভয়ানক কাজ করিলাম?

সেই দিন সন্ধ্যার পর আফিজ খাইয়া পাখীর ডাঁড়া সামনে ঝুলাইয়া তামাকু খাইতে বসিলাম। ক্রমে আফিজ চাড়িয়া উঠিল। তখন শুনিলাম পাখীটা বলিতেছে—আমাকে কেন তেমন জায়গা হইতে এখানে আনিলে? Plateetud, Plateetud।

আ। তুমি এই যে বেশ কথা কহিতে পার! তোমার নাম কি, বাড়ী কোথা?

পা। আমার নাম কাকাতুয়া, অর্থাৎ, তুয়া কাকা। তোমাদিগকে uncleship শিখাইবার নিমিত্ত আমার এ প্রদেশে আগমন। Plateetud, Plateetud।

আ। তুমি তবে এ দেশীয় নও? তোমার বাড়ী কোথা?

পা। আপাততঃ এখান হইতে অনেক পশ্চিমে।

আ। আগে কোথায় থাকতে?

পা। সে অনেক কথা। শুনবে কি?

আ। শুনব। আজ কাল অনেকে পুরাতত্ত্ব চর্চা করিয়া খুব সম্ভাদরে নাম কিন্চে, দেখি যদি আমিও কিছু করিতে পারি।

পা। শুনিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিবে বল?

আ। সে পরের কথা। আগে শুন।

পা। আমি পাখী নই। আমি পশু। বহুকাল পূর্বে কৃষ্ণসাগরের নিকট আমার বাস ছিল। তখন আমি শূকর ছিলাম। পাঁক ঘাঁটিতাম, পাঁক মাখিতাম, পাঁক খাইতাম। ক্রমে সেখানে মনুষ্যনামা এক প্রকার দ্বিপদবিশিষ্ট হিংস্রক জন্তু দেখা দিল। এবং পাঁকাল মাছ মনে করিয়া আমাদিগকে ধরিয়া খাইতে লাগিল।

আ। শূকরকে পাঁকাল মাছ মনে করিল কেমন করে?

পা। শূকরও পাঁক ঘাঁটে, পাঁকাল মাছও পাঁক ঘাঁটে। অতএব শূকর এবং পাঁকাল মাছ এক।

আমার Whately's Logic জানা ছিল, ফস্ করে বলিলাম—

ওটা যে fallacy of undistributed middle হল।

পা। Tut, fal-la-cy of un-dis-tri-bu-ted mid-dle! ও ত logic-এর কথা। Antiquities-এর সহিত Logic-এর সম্পর্ক কি? দিন কতক Antiquities চর্চা কর, Weber সাহেবের গ্রন্থ পড়, তাহা হইলে আর কিছু আটকাবে না, ও রকম খটকা হবে না। দ্বিপদগণের তাড়নায় আমরা পলাইতে লাগিলাম। যত পলাই ততই শীত, আর ততই আমাদের গায়ে বড় বড় লোম দেখা দিতে লাগিল। Plateetud; Plateetud.

আ। সেটা কি রকম করিয়া হইল?

পা। দেখ, কথায় কথায় ছল ধরিলে পুরাতত্ত্ব শেখা যায় না। শিবের কপালে চোক হইল কেমন করিয়া? গণেশের ঘাড়ে হাতীর মূণ্ড হইল কেমন করিয়া? হিমালয় পর্বতটা দুর্গার বাপ হইল কেমন করিয়া? কুমারী মেরীর গর্ভে যীশুখ্রীষ্টের জন্ম হইল কেমন করিয়া? এ সব পুরাণের কথা, কে না বিশ্বাস করে? তবে পুরাতত্ত্বের বেলা এত খটকা কেন? দেখ পুরাণ আর পুরাতত্ত্ব একই জিনিস। উভয়েই পুরা কবিত্বময়। এক্ষেত্রে কি চমৎকার প্রমাণ দেখ দেখি! তবে দুইটি শব্দের শেষ ভাগে যে একটা প্রভেদ দেখিতে পাও, সে কেবল প্রত্যয় ভেদে ঘটিয়াছে।

আ। তুমি যে সংস্কৃত ব্যাকরণও জান দেখিতেছি।

পা। আমি জানিব না ত কি তুমি জানিবে? সংস্কৃত ব্যাকরণ আমাদের পশ্চিমাঞ্চল হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছে তা জান? আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিতেছি না, বই কাছে নাই, কিন্তু আমার বোধ হয় Weber সাহেবের গ্রন্থে একথারও প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে।

আ। কোবিদবর! বলিয়া যান্!

পা। পলাইতে পলাইতে শেষে আমরা সমুদ্র মধ্যস্থিত একটা গিরিগুহায় ঢুকিয়া রক্ষা পাইলাম। সেখানে খুব শীত। সেই শীতে আমাদের ভূঁড়ো পেট কুকুড়ে গেল—আমরা সিংহ হইয়া গেলাম। এই দেখ সেই সিংহের কেশর আমার ঘাড়ে উচ্চ ষোটন আকারে বিরাজমান।

আ। আবার সেই রকম fallacy হল না?

পা। দেখ, এই মাত্র তোমাকে বঝাইয়া দিলাম, এ সকল পুরাতত্ত্ব, ইহাতে fallacy কোন ক্রমেই হইতে পারে না, তুমি সে সব কথা ইহারই মধ্যে ভুলিয়া গিয়াছ? তোমাকে আর শুনাইয়া কি করিব, আমি ক্ষান্ত হইলাম।

আ। দেখ, তুমি রাগ করিও না, আমি একটু একটু আফিস খাই বলিয়া সকল সময় আমার সব কথা মনে থাকে না।

পা। ওঃ! তুমি আফিস খাও। তবে ত আমি তোমার একজন পরম সূত্র, প্রধান শূভানুধ্যায়ী। আমি নিজে আফিস খাই না বটে, আফিস খেলে আমার পেট ফাঁপে, কিন্তু আফিসখোর মাত্রই আমার স্নেহের বস্তু, আমার পোষ্যপুত্র বলিলেও হয়। তবে শুন।

যখন সিংহ ছিলাম তখন মধ্যে মধ্যে গুহা হইতে নিষ্কাশিত হইয়া নিকটস্থ একটা দেশে আহার সংগ্রহ করিতে যাইতাম। কিন্তু শীঘ্রই সে দিকে কাঁটা পড়িল। একটা ভূতের মেয়ে এক দিন এমনি আমাদের লেজ মূচড়াইয়া দিয়াছিল যে লেজগুলো একেবারে চেপ্টা হইয়া গেল, আর সে দিকে যাইতে সাহস হইল না। কাজেই পেটের জ্বালায় আপনাপনি খাইতে আরম্ভ করিলাম। বোধ হয় এই রকম করিয়া সমস্ত সিংহকুল নিঃশেষিত হইয়া যাইত। কিন্তু “ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান্ বয়”; ভাগ্যবলে আমাদের গায় পালক দেখা দিল। আমরা সাদা সাদা ডানা বিস্তার করিয়া সমুদ্র পার হইয়া এ দেশে ও দেশে যাইতে লাগিলাম। যেখানে উত্তম আহারের সম্ভাবনা দেখিলাম, সেইখানে বাসা নিৰ্মাণ করিতে আরম্ভ করিলাম। যে প্রতিবাদী হইল, তাহাকে মারিয়া ফেলিলাম, অথবা তাড়াইয়া দিলাম। Plateetud, Plateetud।

আ। এদেশেও কি বাসা নিৰ্মাণ করিয়াছ?

পা। করিয়াছি, কিন্তু পাকা পোস্ত রকম নয়।

আ। নয় কেন?

পা। এখানে এত বেশী খাই যে শীঘ্র উদরাময় জন্মিয়া যায়, বাড়ীতে না গেলে সারে না। আর গুহার ভিতর সঞ্চিত আহার লুকাইবার সুবিধাও খুব।

আ। আচ্ছা, তোমার দুইটি বই পা দেখিতেছি না। আর দুইটি পা কি হইল?

পা। সে বড় দুঃখের কথা, কাহাকেও বলিও না। সংক্ষেপে বলি—ইচ্ছানন্দপুর নামক স্থানে একটা দ্বিপদবিশিষ্ট জন্তুর বাসায় আহারের লোভে প্রবেশ করিয়াছিলাম। জন্তুটা আমাকে ধরিয়া আমার একটা পা কাটিয়া দিল। এবং মহানন্দপুর নামক আর এক স্থানে ঐরূপ কারণে আর একটা পা কাটা গিয়াছে! অতএব আমি পক্ষীরূপে একটি পশু। Plateetud, Plateetud।

এই সময় প্রসন্ন গোয়ালিনী সেখানে না থাকায় আমার বড়ই আপসোস হইল। থাকিলে শুনাইয়া দিতাম, পরের ঘরে লুকোচুরি খেলা কি রকম লাভের কাজ। পরে পাখীটাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—তুমি কি ও Plateetud, Plateetud কর?

পা। এদেশে আসা অবধি আমি Plateetud বলিতে বড় ভালবাসি।

আ। কথাটার কোন অর্থ আছে কি?

পা। আছে বৈ কি। কথাটা plantain শব্দ হইতে উৎপন্ন।

আ। বঝিয়াছি, তুমি plantain খাইতে ভালবাস বলিয়া সর্বদা Plateetud, Plateetud কর।

পা। তা নয়; আমি এদেশের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠিয়া খাইতেছি। কাজেই দেশের দ্বিপদবিশিষ্ট

বিশ্বকম রচনাবলী

জন্মগুলার ভাগ্যে plantain বই আর কিছুই থাকে না। তাই তাহাদিগের edification-এর জন্য Plateetud বলি। বদ্বলে?

আ। আহা তুমি কি পরোপকারী!

পা। তার প্রমাণ ঐ নীচে দেখ।

দেখিলাম ডাঁড়ের নীচে, মেজের উপর পিপীলিকার ন্যায় অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তু কিল্ কিল্ করিয়া বেড়াইতেছে। পাখীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ও সব ত পিপীলিকা দেখিতেছি। ওখানে তোমার পরোপকারিত্বের প্রমাণ কই?

পা। উহারা পিপীলিকার ন্যায় ক্ষুদ্র বটে, দেখিতেও প্রায় পিপীলিকা, কিন্তু উহারা পিপীলিকা নয়। উহাদিগকে বঙ্গজ বলে। ঐ দেখ আমার ডাঁড় থেকে এক ফোঁটা দুধ পড়িল আর বঙ্গজগুলি কিল্ কিল্ করিয়া মারামারি ঠেলাঠেলি করিয়া ঐ দুধটুকু খাইতে আসিল। আমার ডাঁড় হইতে যে দুই এক ফোঁটা দুধ পড়ে তাই খাইয়া উহারা জীবনধারণ করে। আমি উহাদের উপকারক নই?

আ। শূদ্র উপকারক? যখন তুমি উহাদের উদর চালাইতেছ, তখন তুমি উহাদের প্রাণপূরুষ, জীবাত্মা, পরমাত্মা, প্রেতা, হত্যা, কত্যা, বিধাতা, সবই, কেন না উহারা উদরময় উদরস্বর্ষ। আচ্ছা, উহাদের মধ্যে ঐ যে কতকগুলার বড় বড় মাথা দেখিতেছি উহারা কে? উহাদের মাথা অত বড় কেন?

পা। মাথা বড় নয়। আমার কাছে মাথা খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া উহারা মাথা ফুলাইয়া ফেলিয়াছে। উহারাই প্রকৃত বুদ্ধিমান। দেখিতেছ না উহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শান্ত শিষ্ট স্বজাতীয়-দিগকে মারিয়া ধরিয়া, তাড়াইয়া দিয়া আমার ডাঁড়ের নীচে দাঁড়াইয়া মাথা নাড়িয়া আমাকে কত সেলাম করিতেছে এবং আমার প্রসাদের সারাংশ সংগ্রহ করিয়া দূরস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বঙ্গজের দলে প্রবেশ করিয়া মোটা মাথা উন্নত করিয়া বেড়াইতেছে?

আ। এ তোমার বড় অন্যায। তুমি ছোট ছোট কৃশাঙ্গগুলিকে যত্ন না করিয়া মোটা মোটা গুলাকে অনুগ্রহ কর?

পা। দেখ, আমি প্রকৃতপক্ষে কাহাকেও যত্ন কি অনুগ্রহ করি না। আমার সমস্ত যত্ন এবং অনুগ্রহ আমাতেই অর্পিত। তবে, মোটা মাথাগুলো আমাকে খুব সেলাম করে এবং বিভীষণের ন্যায় আপনাদের ঘরের সমস্ত কথা আমাকে বলিয়া দেয়, তাই উহাদিগকে দুধের উপর দুই একটা ছোলার খোসা দিয়া থাকি। Plateetud।

আ। ওরা কি দানা খেতে কিছু ভালবাসে?

পা। দানা নয়, খোসা, খোসা, খোসা, তার বেশী হজম করিবার ক্ষমতা উহাদের নাই। তবে এখন আমাকে ছাড়িয়া দাও। আমার ইতিহাস শুনিলে ত?

আ। কেন, তুমি কোথায় যাবে?

পা। আমি সেই মুসলমানের বাড়ীতে গিয়া থাকিব।

আ। কেন, এখানে তোমার কিসের কষ্ট?

পা। এখানে ত মৃগী জবাই দেখিতে পাইব না, ছোট ছেলের নেড়া মাথা ঠোকরাইতে পাইব না। এখানে কি সুখে থাকিব? আমাকে ছাড়িয়া দেও—আমি তোমাকে সর্বদা আফিস সরবরাহ করিব—Plateetud।

আ। সে ভাল কথা, কিন্তু দুই চারি দিন আমি তোমাকে ছাড়িব না—আমার একটু জিদ আছে।

প্রসন্ন বলিয়া উঠিল—কি ঠাকুর, ছাড়িবে না, পোষ মানাবে? ঐ দেখ তোমার পাখী কট করে শিকলি কেটে উড়ে গেল।

আমি চমকিয়া উঠিলাম। কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম—কে ও, প্রসন্নময়ি, কি মনে করে?

প্র। আর আদরে কাজ নাই। চল দুধ নেবে চল।

আ। এস। কিন্তু আগে একটা কাজ কর ত। ঐ ঝাঁটা গাছটা দিয়া বঙ্গজগুলোকে ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দেও ত।

গোয়ালিনী মাগী তাহাই করিল।

মুচিরাম গুড়ের জীবন-চরিত

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুচিরাম গুড় মহাশয় এই জগৎ পবিত্র করিবার জন্য, কোন শকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহা লেখে না। ইতিহাস এরূপ অনেকপ্রকার বদমাইশি করিয়া থাকে। এ দেশে ইতিহাসের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না, নচেৎ উচিত ব্যবস্থা করা যাইত।

যশোদা দেবীর গর্ভে সাফলরাম গুড়ের ঔরসে তাঁহার জন্ম। ইহা দৃঃখের বিষয় সন্দেহ নাই; কেন না, উচ্চবংশের কথা কিছই বলিতে পারা গেল না। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, তিনি ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব। গুড় শুনিয়া কেহ মনে না করেন যে, তিনি মিষ্টাবিশেষ হইতে জন্মিয়াছিলেন।

সাফলরাম গুড় কৈবর্তের ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার নিবাস সাধুভাষায় মোহনপল্লী, অপর ভাষায় মোনাপাড়া। মোহনপল্লী ওরফে মোনাপাড়ায় কেবল ঘর কতক কৈবর্তের বাস। গুড় মহাশয় মোনাপাড়ায় একমাত্র ব্রাহ্মণ—যেমন এক চন্দ্র রজনী আলোকময়ী করেন, যেমন এক সূর্য্যই দিনমণি, যেমন এক বার্তাকুদক্ষ গুড় মহাশয়ের অন্তরাশির উপর শোভা করিতেন, তেমনি সাফলরাম এক ব্রাহ্মণ মোহনপল্লী উজ্জ্বল করিতেন। শ্রাদ্ধশাস্তিতে কাঁচা পাকা কদলী, আতপ তণ্ডুল এবং দক্ষিণা, ষষ্ঠী মাকালের পূজায়, অন্নপ্রাশনাদিতে নারিকেল নাড়ু, ছোলা, কলা আদি তাঁহার লাভ হইত। স্নাতরাং যাজনক্রিয়ায় তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ছিল। তাঁহারই ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারী এবং তদর্জিত রস্তাভোজনের হক্‌দার হইয়া মুচিরাম শ্ৰুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করিলেন।

জন্মগ্রহণের পর মুচিরাম দিনে দিনে বাড়িতে লাগিলেন। দেখিয়া যশোদা, সেটা বালকের অসাধারণ পৌরুষের লক্ষণ বিবেচনা করিয়া, অতিশয় গর্বান্বিতা হইলেন। যথাকালে মুচিরামের অন্নপ্রাশন হইল। নামকরণ হইল মুচিরাম। এত নগেন্দ্র গজেন্দ্র চন্দ্রভূষণ বিধুভূষণ থাকিতে তাঁহার মুচিরাম নাম হইল কেন, তাহা আমি সবিশেষ জানি না, তবে দৃষ্ট লোকে বলিত যে, যশোদা দেবীর যৌবনকালে কোন কালো-কোলো কোঁকড়াচুল নধরশরীর মুচিরাম দাস নামা কৈবর্তপুত্র তাঁহার নয়নপথের পথিক হইয়াছিল, সেই অবধি মুচিরাম নামটি যশোদার কাণে মিষ্ট লাগিত।

যাহাই হউক, যশোদা নাম রাখিলেন মুচিরাম। নাম পাইয়া মুচিরাম শর্ম্মা দিনে দিনে বাড়িতে লাগিলেন। ক্রমে “মা”, “বাবা”, “দু”, “দে” ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করিতে শিখিলেন। তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তির বলে মিছাকান্নায় এক বৎসর পার হইতে না হইতেই সূপাণ্ডিত হইলেন। তিন বৎসর যাইতে না যাইতেই গুরুভোজনে দোষ উপস্থিত হইল এবং পাঁচ বৎসর যাইতে না যাইতেই মহামতি মুচিরাম মাকে পিতৃ উচ্চারণ করিতে এবং বাপকে শালা বলিতে শিখিলেন। যশোদা কাঁদিয়া বলিতেন, এমন গুণের ছেলে বাঁচলে হয়।

পাঁচ বৎসরে সাফলরাম গুড় মহাশয় কিছু গোলে পড়িলেন। যশোদা ঠাকুরাণীর সাধ, পাঁচ বৎসরে পুত্রের হাতে খড়ি হয়। স্বর্নাশ! সাফলরামের তিন পুরুষের মধ্যে সে কাজ হয় নাই। মাগী বলে কি? যে দিন কথা পড়িল, সে দিন সাফলরামের নিদ্রা হইল না।

যমুনার জল উজান বহিতে পারে, তবু গৃহিণীর বাক্য নড়িতে পারে না। স্নাতরাং সাফলরাম হাতে খড়ির উদ্যোগ দেখিতে লাগিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিন ক্রোশের মধ্যে পাঠশালা বা গুরু মহাশয় নাই। কে লেখাপড়া শিখাইবে? সাফলরাম বিষমবদনে বিনীতভাবে যশোদা দেবীর শ্রীপাদপদ্মে এই সম্বাদ-সুনিবেদিত হইলেন। যশোদা বলিলেন, “ভাল, তুমি কেন আপনাই হাতে খড়ি দিয়া ক, খ শিখাও না।” সাফলরাম একটু ম্লান হইয়া বলিলেন, “হাঁ, তা আমি পারি, তবে কি জান, শিষ্যসেবক যজমানের জ্বালায়—আজি কি রান্না হইল?” শুনিবামাত্র যশোদা দেবীর মনে পড়িল, আজি কৈবর্তেরা পাতিলেবু দিয়া গিয়াছে। বলিলেন, “অধঃপেতে মিন্‌স—” এই বলিয়া পতিপুত্রপ্রাণা যশোদা দেবী বিষমমনে সজলনয়নে পাতিলেবু দিয়া পান্তা ভাত খাইতে বসিলেন।

বীক্ষম রচনাবলী

অগত্যা মর্চিরাম অন্যান্য বিদ্যা অভ্যাসে সান্দ্রাগ হইলেন। অন্যান্য বিদ্যার মধ্যে—“পরা অপরা চ”—গাছে ওঠা, জলে ডোবা, এবং সন্দেশ চুরি। কৈবর্ত যজমানদিগের কল্যাণে গুড়ের ঘরে সন্দেশের অভাব নাই। নারিকেলসন্দেশ এবং অন্যান্য যে সকল জাতীয় সন্দেশের সঙ্গে ছানার সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাৎ কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই, যাহা সর্বদা মর্চিরামের ঘরে থাকিত, সে সকল মর্চিরামের বিদ্যাভ্যাসের কারণ হইল। কৈবর্তের ছেলেদের সঙ্গে মর্চিরামের প্রত্যহ একটি নতুন কোন্দল হইত—শুনা গিয়াছে, কৈবর্তদিগের ঘরেও খাবার চুরি যাইত।

নবম বৎসরে মর্চিরামের উপনয়ন হইল। তার পর সাফলরাম এক বৎসর প্রিয়তম পুত্রকে সন্ধ্যা আস্থিক শিখাইলেন। এক বৎসরে মর্চিরাম সন্ধ্যা আস্থিক শিখিয়াছিলেন কি না, আমরা জানি না। কেন না, প্রমাণাভাব। তার পর মর্চিরাম কখন সন্ধ্যা আস্থিক করেন নাই।

তৎপরে একদিন সাফলরাম গুড় অকস্মাৎ ওলাউঠারোগে প্রাণত্যাগ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যশোদার আর দিন যায় না। যজমানদিগের পৌরোহিত্য কে করে? কৈবর্তেরা আর এক ঘর বামন আনিল। যশোদা অল্পকণ্ঠে—ধান ভানিতে আরম্ভ করিলেন।

যখন মর্চিরামের বয়স দশ বৎসর, কৈবর্তেরা চাঁদা করিয়া একটা বারোইয়ারি পূজা করিল। যাত্রা দিবার জন্য বারোইয়ারি; কৈবর্তেরা শস্তা দরে হারাণ অধিকারীকে তিন দিনের জন্য বায়না করিয়া আনিয়া, কলাগাছের উপর সরা জ্বালিয়া, তিন রাত্রি যাত্রা শুনিল। মর্চিরাম এই প্রথম যাত্রা শুনিল। যাত্রার গান, যাত্রার গল্প অনেক শুনিয়াছিল—কিন্তু একটা আশু-যাত্রা এই প্রথম শুনিল; চুড়া ধড়া, ঠেঙ্গা লাঠি সহিত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ এই প্রথম দেখিল। আহ্লাদ উছলিয়া উঠিল। নিশ্চিত সম্বাদ রাখি যে, পরদিন মর্চিরাম, গালাগালি মারামারি বা চুরি বা মাতাকে প্রহার, এ সকলের কিছুই করে নাই।

মর্চিরামের একটা গুণ ছিল, মর্চিরাম সুকণ্ঠ। প্রথম দিন যাত্রা শুনিয়া বহু যত্নে একটা গানের মোহাড়াটা শিখিয়াছিল। পরদিন প্রভাত হইতে মাঠে মাঠে সেই গান গাইয়া ফিরিতে লাগিল। দৈবাৎ হারাণ অধিকারী লোটা হাতে, পুষ্করিণীতে হস্তমুখপ্রক্ষালনাদির অনুরোধে যাইতেছিলেন—প্রভাতবায়ুপরিচালিত হইয়া মর্চিরামের সুস্বর অধিকারী মহাশয়ের কাণের ভিতর গেল। কাণে যাইতে যাইতে মনের ভিতর গেল,—মনের ভিতর গিয়া, কল্পনার সাহায্যে টাকার সিদ্ধকের ভিতরেও প্রবেশ করিল। অধিকারী মহাশয়ের নিকট গলার আওয়াজ, টাকার আওয়াজে পরিণত হয়। সে দোষে অধিকারী মহাশয় একা দোষী নহেন—জিজ্ঞাসা করিলে অনেক উকীল মহাশয়েরা ইহার কিছু নিগূঢ় তত্ত্ব বলিয়া দিতে পারিবেন। তাঁহাদের কাছেও গলার আওয়াজ টাকার আওয়াজে পরিণত হয়। উকীলবাবুদেরই বা দোষ কি—*Glorious British Constitution!* হায়! গলাবাজি সার!

অধিকারী মহাশয়—মানুষের সঙ্গে প্রেম করেন না—ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মত এষণ্ড কুরঙ্গিণীসদৃশ, মনুষ্যকণ্ঠেই মুঞ্চ—অতএব তিনি হাত নাড়িয়া মর্চিরামকে ডাকিলেন। মর্চিরাম আসিল। তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, “তুমি আমার যাত্রার দলে থাকিবে?”

মর্চিরাম আহ্লাদে আটখানা। মাকে জিজ্ঞাসার অপেক্ষা রাখিল না—তখনই সঙ্গে যায়। কিন্তু অধিকারী মনে করিল যে, পরের ছেলে না বলিয়া লইয়া যাওয়া কিছু নয়। অতএব মর্চিরামকে সঙ্গে করিয়া তার মার নিকট গেল।

শুনিয়া যশোদা বড় কাঁদা কাটা আরম্ভ করিল—সবে একটি ছেলে—আর কেহ নাই—কি প্রকারে ছাড়িয়া দিবে? এদিকে আবার অল্প জুটে না—যদি একটা খাবার উপায় হইতেছে—কেমন করিয়াই বা না বলে? বিধাতা কি আর এমন সুযোগ করিয়া দিবেন? আমি না দেখিতে পাই, তবু ত মর্চিরাম ভাল খাইবে, ভাল থাকিবে, ভাল পরিবে। যশোদা যাত্রাওয়ালার দুঃখ জানিত না। অগত্যা পাঁচ টাকা মাসিক বেতন রফা করিয়া যশোদা মর্চিরামকে হারাণ অধিকারীর হস্তে সমর্পণ করিল। তার পর আছাড়িয়া পড়িয়া স্বামীর জন্য কাঁদিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুর্চিরাম অল্পদিনেই জানিল যে, যাত্রাওয়ালার জীবন সুখের নয়। যাত্রাওয়ালার কেবল কোকিলের মত গান করিয়া ডালে ডালে মনুকুল ভোজন করিয়া বেড়ায় না। অল্পদিনে মুর্চিরামের শরীর শীর্ণ হইল। এ গ্রাম ও গ্রাম ছুটাছুটি করিতে করিতে সকল দিন আহার হয় না; রাত্রি জাগিয়া প্রাণ ওষ্ঠাগত; চুলের ভারে মাথায় উকুনে ঘা করিল; গায়ে খড়ি উড়িতে লাগিল; অধিকারীর কাণমলায় কাণমলায় দুই কাণে ঘা হইল। শব্দ তাই নয়; অধিকারী মহাশয়ের পা টিপিতে হয়, তাঁকে বাতাস করিতে হয়, তামাক সাজিতে হয়, আরও অনেক রকম দাসত্ব করিতে হয়। অল্পদিনেই মুর্চিরামের সোণার মেঘ বাষ্পরাশিতে পরিণত হইল।

মুর্চিরামের আরও দুর্ভাগ্য এই যে, বুদ্ধিটা বড় তীক্ষ্ণ নহে। গীতের তাল যে, পুস্কারণী-তীরস্থ দীর্ঘ বৃক্ষে ফলে না, ইহা বুদ্ধিতে তাহার বহুকাল গেল। ফলে তালিমের সময়ে তালের কথা পড়িলে, মুর্চিরাম অন্যমনস্ক হইত—মনে পড়িত, মা কেমন তালের বড়া করে!—মুর্চিরামের চক্ষু দিয়া এবং রসনা দিয়া জল বহিয়া যাইত।

আবার গান মুখস্থ করা আরও দায়—কিছুতেই মুখস্থ হইত না—কাণমলায় কাণমলায় কাণ রাস্তা হইয়া গেল। •সুতরাং আসরে গায়বার সময়ে পিছন হইতে তাহাকে বলিয়া দিতে হইত। তাহাতে মধ্যে মধ্যে বড় গোল বাঁধিত—সকল সময়ে ঠিক শুনিত বা বুদ্ধিতে পারিত না। একদিন পিছন হইতে বলিয়া দিতেছে—

“নীরদকুন্তলা—লোচনচণ্ডলা
দধতি সুন্দররূপং”

মুর্চিরাম গায়িল—“নীরদ কুন্তলা—” থামিল—আবার পিছন হইতে বলিল, “লোচনচণ্ডলা—” মুর্চিরাম ভাবিয়া চিন্তিয়া গায়িল, “লুচি চিনি ছোলা”। পিছন হইতে বলিয়া দিল, “দধতি সুন্দররূপং”—মুর্চিরাম না বুদ্ধিয়া গায়িল, “দধিতে সন্দেশ রূপং”। সেদিন আর গায়িতে পাইল না।

মুর্চিরামকে কৃষ্ণ সাজিতে হইত—কিন্তু কৃষ্ণের বস্ত্রব্য সকল তাহাকে পিছন হইতে বলিয়া দিতে হইত—কেবল “আ—বা—আ—বা ধবলী”টি মুখস্থ ছিল। একদিন মানভঞ্জন যাত্রা হইতেছে—পিছন হইতে মুর্চিরামকে বক্তৃতা শিখাইয়া দিতেছে। কৃষ্ণকে বলিতে হইবে, “মানময়ি রাধে! একবার বদন তুলে কথা কও।” মুর্চিরাম সবটা শুনিত না পাইয়া কতক দূর বলিল, “মানময়ি রাধে, একবার বদন তুলে—” সেই সময়ে বেহালাওয়ালার মৃদঙ্গীর হাতে তামাকের কক্ষে দিয়া বলিতেছিল, “গুড়ক খাও—” শুনিয়া মুর্চিরাম বলিল, “রাধে—একবার বদন তুলে—গুড়ক খাও।” হাসির চোটে যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেল।

মুর্চিরাম প্রথমে বুদ্ধিতে পারিল না—হাসি কিসের—যাত্রা ভাঙ্গিল কেন? কিন্তু যখন দেখিল, অধিকারী সাজঘরে আসিয়া একগাছা বাঁক সাপাটিয়া ধরিয়া, তাহার দিকে ধাবমান হইলেন, তখন মুর্চিরাম হঠাৎ বুদ্ধিল যে, এই বাঁক তাহার পৃষ্ঠদেশে অবতীর্ণ হইবার কিছু গুরুতর সম্ভাবনা—অতএব কথিত পৃষ্ঠদেশ স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া আশু প্রয়োজন। এই ভাবিয়া মুর্চিরাম অকস্মাৎ নিষ্ক্রান্ত হইয়া নৈশ অন্ধকারে অন্তর্হিত হইল।

অধিকারী মহাশয় বাঁকহস্তে তৎপশ্চাৎ নিষ্ক্রান্ত হইয়া, তাহাকে না দেখিতে পাইয়া, তাহার ও তাহার পিতৃপিতামহ, মাতা ও ভগিনীর নানাবিধ অযশ কীর্ণন করিতে লাগিলেন। মুর্চিরামও এক বৃক্ষান্তরালে থাকিয়া অস্ফুটস্বরে অধিকারী মহাশয়ের পিতৃমাতৃ সম্বন্ধে তদ্রূপ অপবাদ রটনা করিতে লাগিল। অধিকারী মুর্চিরামের সন্ধান না পাইয়া, সাজঘরে গিয়া বেশ ত্যাগ করিয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন। দেখিয়া মুর্চিরাম বৃক্ষচ্ছায়া ত্যাগ করিয়া, রুদ্ধদ্বারসমীপে দাঁড়াইয়া অধিকারীকে নানাবিধ অবস্ত্রব্য কদর্য্য ভাষায় মনে মনে সম্বোধন করিতে লাগিল; এবং উভয় হস্তের অঙ্গুলি উঠিত করিয়া তাহাকে কদলীভোজনের অনুমতি করিল। তৎপরে রুদ্ধ কবাটকে বা কবাটের অন্তরালস্থিত অধিকারীর বদনচন্দ্রকে একটি লাঠি দেখাইয়া, মুর্চিরাম ঠাকুর-বাড়ীর মন্দিরের রোয়াকে গিয়া শয়ন করিয়া রহিল।

প্রভাতে উঠিয়া অধিকারী মহাশয় গ্রামান্তরে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। শুনিলেন,

বাঁকম রচনাবলী

মুচিরাম আইসে নাই—কেহ কেহ বলিল, তাহাকে খুঁজিয়া আনিব? অধিকারী মহাশয় গালি দিয়া বলিলেন, “জুটতে হয়, আপনি জুটবে, এখন আমি খুঁজে বেড়াতে পারি নে।” দয়ালুচিত্ত বেহালাওয়ালা বলিল, “ছেলেমানুষ—যদি নাই জুটতে পারে—আমি খুঁজে আনিব।” অধিকারী ধমকাইলেন—মনে মনে ইচ্ছা, মুচিরামের হাত হইতে উদ্ধার পান, এবং সেই সঙ্গে তাহার পাওনা টাকাগর্নালি ফাঁকি দেন। বেহালাওয়ালা ভাবিল—মুচিরাম কোনরূপে জুটিবে। আর কিছুর বলিল না।

যাত্রার দল চলিয়া গেল—মুচিরাম জুটিল না। রাত্রি জাগরণ—দেবালয়বরণে সে অকাতরে নিদ্রা যাইতেছিল। উঠিয়া দল চলিয়া গিয়াছে শুনিয়া, কাঁদিতে আরম্ভ করিল। এমন বুদ্ধি নাই যে, অধিকারী কোন পথে গিয়াছে, সন্ধান করিয়া সেই পথে যায়। কেবল কাঁদিতে লাগিল। পূজারি বামন অনুগ্রহ করিয়া বেলা তিন প্রহরে দুইটি ঠাকুরের প্রসাদ খাইতে দিল। খাইয়া, মুচিরাম কান্নার দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ করিল। যত রাত্রি নিকট হইতে লাগিল, তত ভাবিতে লাগিল—আমি কেন পালাইলাম! আমি কেন দাঁড়াইয়া মার খাইলাম না!

গ্রন্থকার ভনে, এবার যখন বাঁক উঠিতে দেখিবে, পিঠ পাতিয়া দিও। তোমার গোষ্ঠীর বাপচৌদ্দপুরুষ বড় সেনরাজার আমল হইতে কেবল পিঠ পাতিয়া দিয়াই আসিতেছে। তুমি পলাইবে কোথায়? এ সুসভ্য জগতের অধিকারীরা মুচিরাম দেখিলে বাঁকপেটাই করিয়া থাকে—মুচিরামেরা পিঠ পাতিয়াই দেয়। কেহ পলায় না—রাখাল ছাড়া কি গোরু থাকিতে পারে হে বাপু? ঘাস জলের প্রয়োজন হইলেই, তোমাদের যখন রাখাল ভিন্ন উপায় নাই, তখন পাঁচন-বাড়িকে প্রাতঃপ্রণাম করিয়া গোজন্ম সার্থক কর।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঈশানবাবু একজন সংকুলোদ্ভূত কায়স্থ। অতি ক্ষুদ্র লোক—কেন না, বেতন এক শত টাকা মাত্র—কোন জেলার ফৌজদারী আপিসের হেড কেরাণী। বাঙ্গলাদেশে মনুষ্যত্ব বেতনের ওজনে নিগীত হয়—কে কত বড় বাঁদর, তার লেজ মাপিয়া ঠিক করিতে হয়। এমন অধঃপতন আর কখন কোন দেশের হয় নাই। বন্দী চরণ-শৃঙ্খলের দৈর্ঘ্য দেখাইয়া বড়াই করে।

ঈশানবাবু ক্ষুদ্র ব্যক্তি—ল্যাজ খাটো, বানরছে খাটো—কিন্তু মনুষ্যত্বে নহে। যে গ্রামে হারাণ অধিকারী সেই অপূর্ব মানভঞ্জন যাত্রা করিয়াছিলেন, ঈশানবাবুর সেই গ্রামে বাস। যাত্রাটা যে সময়ে হইয়াছিল, সে সময়ে তিনি ছুটি লইয়া বাড়ীতে ছিলেন। যাত্রার ব্যাপার তিনি কিছু জানিতেন কি না বলিতে পারি না। যাত্রার পরদিন সন্ধ্যাকালে তিনি পথে বেড়াইতেছিলেন, দেখিলেন, একাটি ছেলে—শুদ্ধকরীর, দীর্ঘকেশ—অনুভবে যাত্রার দলের ছেলে—পথে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে!

ঈশানবাবু ছেলেটির হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কাঁদুছিস্ কেন বাবা?” ছেলে কথা কয় না। ঈশানবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কে?”

ছেলে বলিল, “আমি মুচিরাম।”

ঈশা। তুমি কাদের ছেলে?

মুচি। বামনদের।

ঈশা। কোন বামনদের?

মুচি। আমি গুড়ুদের ছেলে।

ঈশা। তোমার বাড়ী কোথায়?

মুচি। আমাদের বাড়ী মোনাপাড়া।

ঈশা। সে কোথা?

তা ত মুচিরামের বিদ্যার মধ্যে নহে। যাই হোক, ঈশানবাবু অল্প সময়ে মুচিরামের দুর্ঘটনা বুঝিয়া লইলেন। “তোমাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিব” এই বলিয়া মুচিরামকে আপনার বাড়ী লইয়া গেলেন। মুচিরাম হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইল। ঈশানবাবু তাহার আহারাদি ও অবস্থিতর উত্তম ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

কিন্তু মোনাপাড়ার ত কোন ঠিকানা হইল না। সুতরাং মুচিরাম ঈশানবাবুর গৃহে বাস

মুচিরাম গুড়ের জীবন-চরিত

করিতে লাগিল। সেখানে আহার পরিচ্ছদের ব্যবস্থা উত্তম, এবং কাণমলার অত্যন্তাভাব, দেখিয়া মুচিরাম বাড়ীর জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইল না।

এদিকে ঈশানবাবুর ছুটি ফুরাইল—সপরিবারে কর্মস্থানে যাইবেন। অগত্যা মুচিরামও সঙ্গে চলিল। কর্মস্থানে গিয়াও ঈশান মোনাপাড়ার অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোন সন্ধান পাইলেন না। অগত্যা মুচিরাম তাহার গলায় পড়িল। মুচিরামও, যেখানে আহারের ব্যবস্থা উত্তম, সেখানে গলায় পড়িতে নারাজ নহে—তবে ঈশানবাবুর একটা ব্যবস্থা মুচিরামের বড় ভাল লাগিল না। ঈশানবাবু বলিলেন, “বাপু, যদি গলায় পড়িলে, তবে একটু লেখা পড়া শিখিতে হইবে।” ঈশানবাবু তাহাকে পাঠশালায় পাঠাইয়া দিলেন।

এখানে মুচিরামের মা অনেক দিন হইতে ছেলের কোন সম্বাদ না পাইয়া, পাড়ায় পাড়ায় বিস্তর কাঁদাকাটি করিয়া বেড়াইয়া, শেষ আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিল। আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া রুগ্ন হইল। রুগ্ন হইয়া মরিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এদিকে, যশোদানন্দন শ্রীশ্রীমুচিরাম শর্মা—ঈশানমন্দিরে সুবিবরাজমান—সম্পূর্ণরূপে মাতৃবিষ্মৃত। যদি কখন মাকে মনে পড়িত, তবে সে আহারের সময়—ঈশানবাবুর ঘরের প্রফুল্ল-মল্লিকাসমিভ সিদ্ধান্ত, দানাদার গব্য ঘৃত, সুগন্ধি ঝোলে নিমগ্ন রোহিতমৎস্য, পৃথিবীর ন্যায় নিটোল গোলাকার সদ্যভিজ্জিত লুচির রাশি—এই সকল পাতে পাইলে মুচিরাম মনে করিতেন, “মা বেটী কি ছাই-ই আমাকে খাওয়াইত!” সে সময়ে মাকে মনে পড়িত—অন্য সময়ে নহে।

মুচিরামের পাঠশালার লেখা পড়া সমাপ্ত হইল—অর্থাৎ গুরু মহাশয় বলিল, সমাপ্ত হইয়াছে। মুচিরামের কোন গুণ ছিল না, এমত বলি না; তাহা হইলে এ ইতিহাস লিখিতে আমি প্রবৃত্ত হইতাম না। মুচিরামের কণ্ঠস্বর ভাল ছিল বলিয়াছি—গুণ নম্বর এক। গুণ নম্বর দুই, তাহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর হইল। আর কিছু হইল না। ঈশানবাবু মুচিরামকে ইংরেজি স্কুলে পাঠাইলেন।

মুচিরাম, খেড়ে ছেলে, স্কুলে ঢুকিয়া বড় বিপদগ্রস্ত হইল। মাষ্টারেরা তামাসা করে, ছোট ছোট ছেলেরা খিলখিল করিয়া হাসে। মুচিরাম রাগ করে, কিন্তু পড়ে না। সুতরাং মাষ্টারেরা হারাণ অধিকারীর পথে গেলেন। আবার কাণমলায় কাণমলায় মুচিরামের কাণ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। প্রথমে কাণমলা, তার পর বেদ্রাঘাত, মুষ্ট্যাঘাত, চপেটাঘাত, কীলাঘাত, এবং ঘুসাঘাত। ঈশানবাবুর ঘরের তপ্ত লুচির জোরে মুচিরাম নির্ব্বাদে সব হজম করিল।

এইরূপে মুচিরাম, তপ্ত লুচি ও বেত খাইয়া, স্কুলে পাঁচ-সাত বৎসর কাটাইল। কিছু হইল না। ঈশানবাবু তাহাকে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া লইলেন। ঈশানবাবুর দয়ার শেষ নাই—মার্জিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে তাহার বিশেষ প্রতিপত্তি—মুচিরামের হাতের লেখাও ভাল—ঈশানবাবু মুচিরামের একটি দশ টাকার মুহুরিগিরি করিয়া দিলেন। বলিয়া দিলেন, “ঘুস-ঘাস লইও না বাপু, তা হলে তাড়াইয়া দিব।” মুচিরাম শর্মা প্রথম দিনেই একটা হুকুমের চোরাও নকল দিয়া আট গুণ্ডা পয়সা হাত করিলেন, এবং সন্ধ্যার অল্পকাল পরেই তাহা প্রতিবাসিনীবিশেষের পাদপদ্মে উৎসর্গ করিলেন।

এদিকে ঈশানবাবুও প্রাচীন হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি ইহার পরেই পেন্সন লইয়া স্বকর্ম হইতে অবসৃত হইলেন এবং মুচিরামকে পৃথক বাসা করিয়া দিয়া, সপরিবারে স্বদেশে প্রস্থান করিলেন। মুচিরাম ঈশানবাবুকে একটু ভয় করিত—এক্ষণে তাহার পোয়া বারো পড়িয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পোয়া বারো—মুচিরাম জেলা লুঠিতে লাগিল। প্রথমে লোকের কাছে চাহিয়া চিন্তিয়া দুই চারি আনা লইত। তার পর দাঁও শিখিল। ফেলু সেখের ধানগুলি জমীদার জোর করিয়া কাটিয়া লইতে উদ্যত, সাহেব দয়া করিয়া পলিশকে হুকুম দিলেন, ফেলুর সম্পত্তি রক্ষা করিবে।

বঙ্কম রচনাবলী

সাহেব হুকুম দিলেন, কিন্তু পদলিশের নামে পরওয়ানাখানি লেখা আর হয় না। পরওয়ানা লেখা মর্চিরামের হাত। পরওয়ানা যাইতে যাইতে ধান থাকে না; ফেল্দ মর্চিরামকে এক টাকা, দুই টাকা, তিন টাকা, ক্রমে পাঁচ টাকা স্বীকার করিল—তৎক্ষণাৎ পরওয়ানা বাহির হইল। তখন মার্জিস্ট্রেটেরা স্বহস্তে জোবানবন্দী লইতেন না—এক কোণে বসিয়া এক একজন মূর্খুরি ফিস্‌ফিস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিত, আর যাহা ইচ্ছা তাহা লিখিত। সাক্ষীরা এক রকম বলিত, মর্চিরাম আর এক রকম জোবানবন্দী লিখিতেন, মোকদ্দমা বৃদ্ধিয়া ফি সাক্ষ্য-প্রতি চারি আনা, আট আনা, এক টাকা পাইতেন। মোকদ্দমা বৃদ্ধিয়া মর্চি দাঁও মারিতেন; অধিক টাকা পাইলে সব উল্টা লিখিতেন। এইরূপে নানাপ্রকার ফিকির ফন্দীতে মর্চিরাম অনেক টাকা উপার্জন করিতে লাগিলেন—তিনি একা নহেন, সকলেই করিত—তবে মর্চি কিছু অধিক নিলঞ্জ—কখন কখন লোকের টেক হইতে টাকা কাড়িয়া লইত।

যাই হোক, মর্চি শীঘ্রই বড়মানুষ হইয়া উঠিল—কোন মর্চি না হয়?—অচিরাৎ সেই অকৃতনাম্নী প্রতিবাসিনী স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা হইল। মদ, গাঁজা, গুলি, চরস, আফিস—যাহার নাম করিতে আছে এবং যাহার নাম করিতে নাই—সকলই মর্চিবাবুর গৃহকে অহর্নিশ আলোক ও ধূমময় করিতে লাগিল। মর্চিরামেরও চেহারা ফিরিতে লাগিল—গালে মাস লাগিল—হাড় ঢাকিয়া আসিল—বর্ণ জাপান লেদার ছাড়িয়া দিল্লীর নাগরায় পেঁপুঁছিল। পরিচ্ছদের বৈচিত্র্য জন্মিতে লাগিল—শাদা, কালো, নীল, জরদা, রাস্তা, গোলাপী প্রভৃতি নানা বর্ণের বস্ত্রে মর্চিরাম সর্বদা রঞ্জিত। রাত্রি দিন মাথায় তেড়ি কাটা, অধরে তাম্বুলের রাগ এবং কণ্ঠে নিধুর টম্পা। সন্তরাং মর্চিরামের পোয়া বারো।

দোষের মধ্যে সাহেব বড় খিটখিট করে। মর্চিরাম একে ঘোরতর বোকা, কোন কস্মই ভাল করিয়া করিতে পারিত না, তাহাতে আবার দুর্জয় লোভ,—সকল-তাতে মর্চিরাম গালি খাইত। সাহেবটাও বড় বদরাগী—অনেক সময়ে মর্চিরামকে কাগজপত্র ছুঁড়িয়া মারিত। সাহেবের ভিতরে ভিতরে হৃদয়ে দয়া ছিল—নচেৎ মর্চিরামের চাকরী অধিক কাল টিকিত না।

সৌভাগ্যক্রমে সে সাহেব বদলি হইয়া গেল—আর একজন আসিল।

এই নতুন সাহেবটির নাম (Grongerham) লিখিবার সময়ে লোকে লিখিত গঙ্গারহ্যাম—বলিবার সময়ে বলিত গঙ্গারাম সাহেব। গঙ্গারাম সাহেব অতি ভদ্রলোক, দয়ার সাগর, কাহারও কোন অনিষ্ট করিতেন না, মোকদ্দমা করিতে গিয়া, কেবল ডিসমিস করিতেন। তবে সাহেব কিছু অলস, কাজ কস্মে বড় মন দিতেন না, এবং নিজে সরল বলিয়া তাঁবেদারদিগের উপর বড় বিশ্বাস ছিল। সকল কস্মের ভার সেরেস্তাদার এবং হেড কেরাণীর উপর ছিল। যত দিন সাহেব ঐ জেলায় ছিলেন, একদিনের জন্য একখানি চিঠি স্বহস্তে মূর্খাবিদা করেন নাই—হেড কেরাণী সব করিত।

সাহেব প্রথম আসিয়া, মর্চিরামের কালোকালো নধর সূচিক্রম শরীরটি দেখিয়া, এবং তাহার আভূমিপ্রণত ডবল সেলাম দেখিয়া নিজের সরলচিত্তে একেবারে সিদ্ধান্ত করিলেন যে, আপিসের মধ্যে এই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত লোক। সে বিশ্বাস তাঁহার কিছুতেই গেল না। যাইবারও কোন কারণ ছিল না—কেন না, কাজ-কস্মের তিনি খবর রাখিতেন না। একদিন আপিসের মীর মুনসী, মিরজা গোলাম সফরদর খাঁ সাহেব, দুনিয়াদারি নামাফিক মনে করিয়া ফৌত করিলেন। সাহেব পরদিনেই মর্চিরামকে ডাকিয়া তৎপদে অভিষিক্ত করিলেন। মীর মুনসীর বেতন কুড়ি টাকা—কিন্তু বেতনে কি করে? পদটি রুধিরে পরিপ্লুত। অজরামরবৎপ্রাজ্ঞ মর্চিরাম শর্ম্মা রুধিরসণ্ড করিতে লাগিলেন।

দোষ কি? অজরামরবৎ প্রাজ্ঞ বিদ্যামর্থণ্ড চিন্তয়েৎ। দুইটা একজনে পারে না—মর্চিরাম বিদ্যাচিন্তা করিতে সক্ষম নহেন; কোষ্ঠীতে তাহা লেখে নাই—অতএব বিষ্ণুশর্ম্মার উপদেশানুসারে মৃত্যুভয় রহিত হইয়া তিনি অর্থচিন্তায় প্রবৃত্ত। যদি সেই “হিতোপদেশ” গুলি অধীত হইবার যোগ্য হয়—যদি সে গ্রন্থ এই উর্নবিংশ শতাব্দীতেও পূজার যোগ্য হয়—তবে মর্চিরামও প্রাজ্ঞ—আর এ দেশের সকল মর্চিই প্রাজ্ঞ।

বিষ্ণুশর্ম্মা ভারতবর্ষের মাকিয়াবেল্লি—চাগকা ভারতের রোশফুকল। যাহারা এইরূপ গ্রন্থ বিদ্যালয়ের বালকদিগকে পড়াইবার নিয়ম করিয়াছে, তাহাদিগের উচিত, আবার বিদ্যালয়ে প্রবেশ করা। তাহাদের শিক্ষা হয় নাই।

মুচিরাম গুড়ের জীবন-চরিত

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মুচিরাম দুই তিন বৎসর মীর মুনসীগিরি করিল—তার পর কালেক্টরীর পেস্কারি খালি হইল। পেস্কারিতে বেতন পঞ্চাশ টাকা—আর উপার্জনের ত কথাই নাই। মুচিরাম ভাবিল, কপাল ঠুকিয়া একখানা দরখাস্ত করিব।

তখন কালেক্টর ও মার্জিস্ট্রেট পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি হইত। সেখানে সে সময়ে হোম নামা এক সাহেব কালেক্টর ছিলেন। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান ও কস্মঠ লোক ছিলেন, কিন্তু একটা দোষ ছিল—কিছু মিষ্ট কথার বশ।

মুচিরাম একখানি ইংরেজি দরখাস্ত লিখাইয়া লইল—মুচিরামের নিজবিদ্যা দরখাস্ত পর্য্যন্ত কুলায় না। যে দরখাস্ত লিখিল, মুচিরাম তাহাকে বলিয়া দিলেন, “দেখিও যেন ভাল ইংরেজি না হয়। আর যা হোক না হোক, দরখাস্তের ভিতর যেন গোটা কুড়ি “মাই লার্ড” আর “ইওর লার্ডশিপ” থাকে।” লিপিকার সেই রকম দরখাস্ত লিখিয়া দিল। তখন শ্রীমুচিরাম বেশভূষায় প্রবৃত্ত হইলেন। আপনার চারখানির টিলা পায়জামা পরিত্যাগ করিয়া, থানের ধূতি শ্রীঅঙ্গে পরিধান করিলেন; চুড়িদার আস্তীন আল্পাকার চাপকান পরিত্যাগ পূর্ব্বক, বুকফাঁক বন্ধক-ওয়ালা টিলে আস্তীন লাংকুথের চাপকান গ্রহণ করিলেন। লাটুদার পাগড়ি ফেলিয়া দিয়া স্বহস্তে মাথায় বিড়া জড়াইলেন; এবং চাঁদনির আমদানি নূতন চক্চকে জুতা ত্যাগ করিয়া চটিতে চারুচরণদ্বয় মণ্ডন করিলেন। ইতিপূর্ব্ব গঙ্গারাম সাহেবকে হরিয়েক রকম সেলাম করিয়া, কাঁদো কাঁদো মুখ করিয়া, একখানা সুপারিস চিঠি বাহির করিয়া লইয়াছিলেন। এইরূপ চিঠি, দরখাস্ত ও বিহিত সজ্জাসহিত সেই শ্রীমুচিরামচন্দ্র, যথায় হোম সাহেব এজলাসে বসিয়া দুনিয়া জলুস করিতেছিলেন, তথায় গিয়া দর্শন দিলেন।

রেল দেওয়া কাটরার ভিতর, উঁচুতে হোম সাহেব এজলাস করিতেছেন। চারি দিকে অনেক মাথায় পাগড়ি ও বসিয়াছে—লোকে কথা কহিলেই চাপরাশী বাবাজিউরা দাড়ি ঘুরাইয়া গালি দিতেছেন—একটা স্প্যানিয়েল টেবিলের নীচে শুইয়া, অর্থাগণের নয়নপথে লাঙ্গুল-শোভা বিকাশ করিতেছে। এক ফোঁটা গুড় পড়িলে যেমন সহস্র সহস্র পিপীলিকা তাহা বেণ্টন করে, খালি চাকরিটির মালিক হোম সাহেবকে তেমনি উমেদওয়ার ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে। সাহেব উমেদওয়ারদিগের দরখাস্ত শুনিতেন। অনেক বড় বড় ইংরেজিবংশ আসিয়াছেন—সেকলে কেঁদো কেঁদো স্কলার্শিপ হোল্ডার। সাহেব তাহাদিগকে এক এক কথায় বিদায় করিলেন। “I dare say you are well up in Shakespeare and Milton and Bacon and so forth. Unfortunately we don't want quotations from Shakespeare and Milton and Bacon in the office. It is not the most learned man who is best fitted for this kind of work. So you can go, Baboo.” অনেকে শামলা মাথায় দিয়া, চেন ঝুলাইয়া, পরিপাটী বেশ করিয়া আসিয়াছিলেন; সাহেব দৃষ্টিমাত্র তাহাদিগকে বিদায় দিলেন। “You are very rich I see; I want a poor man who will work for his bread. You will throw up your place on the slightest quarrel. You can go.” শামলা চেনের দল, অভিনয়সম্মুখে কুরুসৈন্যের ন্যায় বিমুখ হইতে লাগিল। বাকি রহিল মুচিরাম, এবং তাহার সমকক্ষ জনকয়—বানর। সাহেব মুচিরামের দরখাস্ত পড়িলেন—হাসিয়া বলিলেন, “Why do you call me, my Lord? I am not a Lord.”

মুচিরাম ষোড়হাতে হিন্দীতে বলিল, “বান্দা কো মালুম থা কি হুজুর লার্ড-ঘরানা।”

এখন হোম সাহেবের সঙ্গে একটা লার্ড হোমের দরসম্বন্ধ ছিল। সেই জন্য তাহার মনে বংশমর্যাদা সর্ব্বদা জাগরুক ছিল; মুচিরামের উত্তর শুনিয়া আবার হাসিয়া বলিলেন, “হো সকতা; লার্ড ঘরানা হো সকতা; লার্ড ঘরানা হোনে সে হি লার্ড হোতা নেহি।”

সকলেই বুঝিল যে, মুচিরাম কার্য্য সিদ্ধ করিয়াছে। মুচিরাম ষোড়হাতে প্রত্যুত্তর করিল, “বান্দা লোক কে ওয়াস্তে হুজুর লার্ড হেয়।”

সাহেব মুচিরামকে আর দুই চারিটা কথা জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া তাহাকেই পেস্কারিতে বহাল করিলেন।

বাংকম রচনাবলী

Struggle for existence? Survival of the Fittest! মর্চির দলই এ পৃথিবীতে চিরজয়ী।

হোম সাহেবের কিছুর মাত্র দোষ নাই। দেশী, বিদেশী, সকল মনুষ্যই এইরূপ। সকলেই মিষ্ট কথার বশ। অবোধ বাঙ্গালীরা আজকাল মিষ্ট কথা ভুলিতেছে। হোম সাহেব একজন অতিশয় সুদক্ষ, সুবিজ্ঞ লোক। মর্খ মর্চিরামও তাঁহাকে ভুলাইতে পারিল—কেবল মিষ্ট কথার বলে।

• অষ্টম পরিচ্ছেদ

মর্চিরামবাবু—এখন তিনি একটা ভারি রকম বাবু, এখন তাঁহাকে শুধু মর্চিরাম বলা যাইতে পারে না—মর্চিরামবাবু পেস্কারি পাইয়া বড় ফাঁফরে পড়িলেন। বিদ্যাবুদ্ধিতে পেস্কারি পর্য্যন্ত কুলায় না—কাজ চলে কি প্রকারে? “ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়”—মর্চিরামবাবুর বোঝা বাহিত হইল। ভজগোবিন্দ চক্রবর্তী নামে একজন তাইদনবীশ সেই কালেষ্ঠরী আপিসে থাকে। ভজগোবিন্দ বার বৎসর তাইদনবীশ আছে। সে বুদ্ধিমান, কস্মঠ, কালেষ্ঠরীর সকল কস্ম কাজ বার বৎসর ধরিয়া শিখিয়াছে। কিন্তু মর্চিরাম নাই—ভাগ্য নাই—এ পর্য্যন্ত কিছুর হয় নাই। তাহার বাসাখরচ চলে না। মর্চিরাম তাহাকে অবলম্বন করিলেন। আপনার বাসায় লইয়া গিয়া রাখিলেন। ভজগোবিন্দ মর্চিরামের বাসায় থাকে, খায় পরে, গৃহকস্ম সহায়তা করে, রাত্রিকালে বাবুর ঘরে বাহিরে মোসাহেবী করে, এবং আপিসের সমস্ত কাজ কস্ম করিয়া দেয়। মর্চিরাম তাহাকে টাকাটা সিকেটা দেওয়াইয়া দেন। ভজগোবিন্দের সাহায্যে মর্চিরামের কস্ম কাজ রেলগাড়ির মত গড়গড় করিয়া চলিল। হোম সাহেব অনেক প্রশংসা করিতেন। বিশেষ মর্চিরাম বিশুদ্ধ প্রণালীতে সেলাম করিত, এবং “মাই লাড” এবং “ইওর অনার” কিছুরেই ছাড়িত না।

মর্চিরামবাবুর উপার্জনের আর সীমা রহিল না। হাতে অনেক টাকা জমিয়া গেল। ভজগোবিন্দ বলিল, “টাকা ফেলিয়া রাখবার প্রয়োজন নাই—তালুক মুলুক করুন।” মর্চিরাম সম্মত হইলেন, কিন্তু যে যে জেলায় কস্ম করে, সে জেলায় বিষয় খরিদ করা নিষেধ। ভজগোবিন্দ বলিল যে, বেনামীতে কিনুন। কাহার বেনামীতে? ভজগোবিন্দের ইচ্ছা, ভজগোবিন্দের নামেই বিষয় খরিদ হয়, কিন্তু সাহস করিয়া বলিতে পারিল না। এ দিকে মর্চিরাম কাহারও বাসায় গল্প শুনিয়া আসিলেন যে, স্ত্রীর অপেক্ষা আত্মীয় কেহ নাই। কথাটায় তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল কি না জানি না—কিন্তু মনে মনে ভাবিলেন যে, স্ত্রীর নামে বিষয় করাই বেনামীর শ্রেষ্ঠ। এই এখনকার দেবত্র। আগে লোকে বিষয় করিত ঠাকুরের নামে—এখন বিষয় করিতে হয় ঠাকুরদেবের নামে। উভয় স্থলেই বিষয়কর্তা “সেবাইত” মাত্র—পরম ভক্ত—পাদপদ্মে বিক্রীত। এইরূপ রাধাকান্ত জিউর স্থানে রাধামণি, শ্যামসুন্দরের স্থানে শ্যামসুন্দরী দেবী মালিক হওয়ায় ভাল হইয়াছে, কি মন্দ হইয়াছে, জানি না—তবে একটা কথা বলা যায়। বিষয় হস্তান্তরের কিছুর সুবিধা হইয়াছে। দধি ভোজনের পক্ষে নেপোর খুব সুযোগ হইয়াছে।

স্ত্রীর বেনামীতে বিষয় করা শ্রেয়ঃ, ইহা মর্চিরাম বুঝিলেন, কিন্তু এই সঙ্কল্পে একটা সামান্য রকম বিঘ্ন উপস্থিত হইল—মর্চিরামের স্ত্রী নাই। এ পর্য্যন্ত তাঁহার বিবাহ করা হয় নাই—অনুকল্পের অভাব ছিল না। কিন্তু এ স্থলে অনুকল্প চলিবে কি না, তদ্বিষয়ে পেস্কারি মহাশয় কিছুর সন্দেহ হইলেন। ভজগোবিন্দের সঙ্গে কিছুর বিচার হইল—কিন্তু ভজগোবিন্দ একপ্রকার বুঝাইয়া দিল যে, এ স্থলে অনুকল্প চলিবে না। অতএব মর্চিরাম দারগ্রহণে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। কোন্ কুল পবিত্র করিবেন, তাহার অন্বেষণ করিতেছিলেন, এমত সময়ে ভজগোবিন্দ জানাইল যে, তাহার একটি অবিবাহিতা ভগিনী আছে—ভজগোবিন্দের পিতৃকুল উজ্জ্বল করায় ক্ষতি নাই। অতএব মর্চিরাম একদিন সন্ধ্যার পর শুব লগ্নে মাথায় টোপের দিয়া, হাতে সূতা বাঁধিয়া, এবং পটুবস্ত্র পরিধান করিয়া ভদ্রকালী নাম্নী ভজগোবিন্দের সহোদরাকে সৌভাগ্যশালিনী করিলেন। তাহার পর হইতে ভদ্রকালীর নামে অনেক জমিদারী পত্তনি ছলে, বলে, কলে, কোশলে খরিদ হইতে লাগিল। ভদ্রকালী হঠাৎ জেলার মধ্যে একজন প্রধানা ভূম্যধিকারিণী হইয়া দাঁড়াইলেন।

মুচিরাম গুড়ের জীবন-চরিত

নবম পরিচ্ছেদ

ভদ্রকালীর দ্বাদশ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়—মুচিরামের এমনই অদৃষ্ট—বিবাহের পর দুই বৎসরের মধ্যেই ভদ্রকালী চৌন্দ বৎসরের হইল। চৌন্দ বৎসরের হইয়াই ভদ্রকালী ভজগোবিন্দের একটি চাকরির জন্য মুচিরামের উপর দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল, সুতরাং মুচিরাম চেষ্টা চরিত্র করিয়া ভজগোবিন্দের একটি মূহুরিগিরি করিয়া দিলেন।

ইহাতে মুচিরাম কিছু বিপন্ন হইলেন। এক্ষণে ভজগোবিন্দের নিজের কাজ হইল—সে মনোযোগ দিয়া নিজের কাজ করে; মুচিরামের কাজ করিয়া দিবার তাহার তত অবকাশ থাকে না। ভজগোবিন্দ সুপাত্র—শীঘ্রই হোম সাহেবের প্রিয়পাত্র হইল। মুচিরামের কাজের যে সকল গ্রুটি হইতে লাগিল, হোম সাহেব তাহা দেখিয়াও দেখিতেন না। আভূমিপ্রণত সেলাম এবং মাই লার্ড বুলির গুণে সে সকলের প্রতি অন্ধ হইয়া রহিলেন। মুচিরামের প্রতি তাহার দয়া অচলা রহিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ সময়ে হোম সাহেব বদলি হইয়া গেলেন, তাহার স্থানে রীড সাহেব আসিলেন। রীড অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি। অতি অল্প দিনেই বুঝিলেন—মুচিরাম একটি বৃক্ষশ্রুট বানর—অকস্মাৎ অথচ ভারি রকমের ঘুষখোর। মুচিরামকে আপিস হইতে বহিস্কৃত করা মনে স্থির করিলেন। কিন্তু রীড সাহেব যেমন বিচক্ষণ, তেমনি দয়াশীল ও ন্যায়বান্; সে কালের হেলীবারির সিবিলায়ান সাহেবরা বাঙ্গালীদিগকে পুত্রের মত স্নেহ করিতেন। মিছে ছুতাছলে কাহাকে অন্নহীন করিতে রীড সাহেব নিতান্ত অনিচ্ছুক; কাহাকে একেবারে অন্নহীন করিতে অনিচ্ছুক। মুচিরাম যে বিপুল ভূসম্পত্তি করিয়াছে—রীড সাহেব তাহা জানিতে পারেন নাই। রীড সাহেব মুচিরামকে দুই একবার ইস্তেফা দিতে বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মুচিরাম চোখে জল আনিয়া দুই চারি বার “গরীব খানা বেগর মারা যাবেগা” বলাতে তিনি নিরস্ত হইয়াছিলেন। তারপর, তাহাকে পেস্কারির তুল্য বেতনে আবকারির দারোগাই দিতে চাহিয়াছিলেন—অন্যান্য মফস্বলি চাকরি করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন,—কিন্তু আবার মুচিরাম চোখে জল আনিয়া বলে যে, আমার শরীর ভাল নহে, মফস্বলে গেলে মরিয়া যাইব—হুজুরের চরণের নিকট থাকিতে চাই। সুতরাং দয়ালুচিহ্ন রীড সাহেব নিরস্ত হইলেন। কিন্তু তাহাকে লইয়া আর কাজও চলে না। অগত্যা রীড সাহেব মুচিরামকে ডিপুটি কালেক্টর করিবার জন্য গবর্ণমেন্টে রিপোর্ট করিলেন। সেই সময়ে হোম সাহেব বাঙ্গাল আপিসে সেক্রেটারি ছিলেন—রিপোর্ট পেঁপাঁছিবামাত্র মুচিরাম ডিপুটি বাহাদুরিতে নিযুক্ত হইলেন।

রীড সাহেব ইহাতে বিজ্ঞ লোকের মতই কাজ করিয়াছিলেন। তিনি বিলক্ষণ জানিতেন যে, ভারি ঘুষখোরেও ডিপুটি হইলেই ঘুষ খাওয়া ত্যাগ করে; ডিপুটিগিরি এক প্রকারে আমলাদিগের বৈধব্য—বিধবা হইলে আর মাছ খাইতে নাই। আর মুচিরাম যে মূর্খ, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না; সেরূপ অনেক ডিপুটি আছে; ডিপুটিগিরিতে বিদ্যাবুদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায় না। অতএব রীড সাহেব লোকহিতার্থ মুচিরামকে ডিপুটি করিবার জন্য রিপোর্ট করিয়াছিলেন।

আপিসে সম্বাদ পেঁপাঁছিল যে, মুচিরামের উচ্চ পদ হইয়াছে। একজন বৃদ্ধা মূহুরি ছিল, সে বড় সাধুভাষা বুঝিত না। “উচ্চ পদ” শুনিয়া সে বলিল, “কি? ঠ্যাঙ্গ উঁচু করেছেন না কি? ভাগাড়ে দিয়া আইবা।”

দশম পরিচ্ছেদ

মুচিরামের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। তিনি পেস্কারিতে ঘুষ লইয়া অসংখ্য টাকা রোজগার করেন—আড়াই শত টাকার ডিপুটিগিরিতে তাহার কি হইবে? মুচিরাম সিদ্ধান্ত করিলেন—ডিপুটিগিরি অস্বীকার করিবেন। কিন্তু ভজগোবিন্দ বুঝাইলেন যে, অস্বীকার করিলে রীড সাহেব নিশ্চয় বুঝিবে যে, মুচিরাম ঘুষের লোভে পেস্কারি ছাড়িতেছে না—তাহা হইলে শীঘ্রই তাড়িয়া দিবে। তখন দুই দিক্ যাইবে। অগত্যা মুচিরাম ডিপুটিগিরি স্বীকার করিলেন।

মুচিরাম ডিপুটি হইয়া প্রথম রুবকারী দস্তখতকালীন পড়িয়া দেখিলেন, লেখা আছে,

বঙ্কিম রচনাবলী

শ্রীযুক্ত বাবু মর্চিরাম গুড় রায় বাহাদুর ডিপুটি কালেক্টর। প্রথমটা বড়ই আহ্লাদ হইল—কিন্তু শেষ কিছু লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। যে মর্চিরাম রুবকারী লিখিয়াছিল, তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, “ওহে—গুড়টা নাই লিখিলে। শুধু মর্চিরাম রায়বাহাদুর লেখায় ক্ষতি কি? কি জান, আমরা গুড় বটে, কিন্তু আমাদের খেতাব রায়। তবে যখন অবস্থা তেমন ছিল না, তখন রায় খেতাব আমরা লিখিতাম না। তা’ এখন গুড়েও কাজ নাই—রায়েও কাজ নাই, শুধু মর্চিরাম রায়বাহাদুর লিখিলেই হইবে।” মর্চিরাম ইঙ্গিত বঝিল, হাকিমের মন সবাই রাখিতে চায়। সে মর্চিরাম দ্বিতীয় রুবকারীতে লিখিল, “বাবু মর্চিরাম রায়, রায়বাহাদুর।” মর্চিরাম দেখিয়া কিছু বলিলেন না, দস্তখত করিয়া দিলেন। সেই অবধি মর্চিরাম “রায়” চলিতে লাগিল; কেহ লিখিত, “মর্চিরাম রায়, রায়বাহাদুর.” কেহ লিখিত, “রায় মর্চিরাম রায় বাহাদুর।” মর্চিরামের একটা যন্ত্রণা ঘুচিল—গুড় পদবীতে তিনি বড় নারাজ ছিলেন, এখন সে জ্বালা গেল। তবে লোকে অসম্মানে বলিত “গুড়ের পো”—অথবা “গুড়ে ডিপুটি।” আর স্কুলের ছেলেরা কবিতা শুনাইয়া শুনাইয়া বলিত,

“গুড়ের কলসীতে ডুবিয়ে হাত
বুঝতে নারি সার কি মাত?”

কেহ বলিত,

“সরা মালসায় খুঁসি নই।
ও গুড় তোর নাগরী কই?”

মর্চিরাম তাহাদের তাড়াইয়া মারিতে গেলেন, তাহারা তাহাকে মুখ ভেঙ্গাইয়া, উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠ সন্দর্শন করাইয়া, উচ্চৈঃস্বরে কবিতা আওড়াইতে আওড়াইতে পলাইল। লাভের মধ্যে মর্চিরাম লম্বা কোঁচা বাঁধিয়া আছাড় খাইলেন—ছেলেদের আনন্দের সীমা থাকিল না। শেষে মর্চিরাম স্কুলের ছেলেদের মাসে মাসে কিছু সন্দেশ বরাদ্দ করিয়া দিয়া কবিতা হইতে উদ্ধার পাইলেন। কিন্তু আর একটা নতুন গোল হইল। শীতকালে খেজুরে গুড়ের সন্দেশ উঠিল—ময়রারা তাহার নাম দিল ডিপুটি মণ্ডা।

বাজারে যাহা হউক, সাহেবমহলে মর্চিরামের বড় সুখ্যাতি হইল। বৎসর বৎসর রিপোর্ট হইতে লাগিল, এরূপ সুযোগ্য ডিপুটি আর নাই। এরূপ সুখ্যাতির কারণ—

প্রথম। সেই মিষ্ট কথা। একবার তিনি কমিশ্যনের সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সাহেব তখন মেমসাহেবের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া গরমমেজাজ ছিলেন, এতেলা হইবামাত্র বলিলেন, “নেকাল দেও শালাকো।” বাহির হইতে মর্চিরাম শুনিত পাইয়া সেইখান হইতে দুই হাতে সেলাম করিয়া বলিল, “বহৎ খুব হজুর। হামারা বহিনকো খোদা জিতা রাখে।”

দ্বিতীয়। মর্চিরাম ডিপুটির হাতে প্রায় হপ্তম পঞ্জমের কাজ ছিল—অন্য কাজ বড় ছিল না। হপ্তম পঞ্জমের মোকদ্দমায় একে সহজেই বড় বিচার আচারের প্রয়োজন হইত না—তাতে আবার মর্চিরাম বিচার আচারের বড় ধার ধারিতেন না—চোখ বুজিয়া ডিক্রী দিতেন—নিথর কাগজও বড় পড়িতেন না। সুতরাং মাস্কাবার দেখিয়া সাহেবরা ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। জনরব যে, মর্চিরামের একেবারে হঠাৎ সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে পদবৃদ্ধি হইবে। কতকগুলো চেঙ্গড়া ছোঁড়া শুনিয়া বলিল, “আরও পদবৃদ্ধি? ছটা পা হবে না কি?”

দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে চট্টগ্রামের কালেক্টরীতে কিছু গোলযোগ উপস্থিত হইল। গোল মিটাইবার জন্য সেখানকার কমিশ্যনের একজন ভারি বিচক্ষণ ডিপুটি কালেক্টর পাইবার প্রার্থনা করিলেন। বোর্ড বলিলেন—বিচক্ষণ ডিপুটি? সে ত মর্চিরাম ভিন্ন আর কাহাকে দেখি না—তাহাকেই চট্টগ্রাম পাঠান হোক। গবর্ণমেন্ট সেই কথা মঞ্জুর করিয়া মর্চিরামকে চাটিগাঁ বদলি করিলেন।

সম্বাদ পাইয়া মর্চিরাম বলিলেন, এইবার চাকরি ছাড়িতে হইল। তাহার শোনা ছিল, চাটিগাঁ গেলেই লোকে জ্বর প্লীহা হইয়া মরিয়া যায়। আরও শোনা ছিল যে, চাটিগাঁ যাইতে সমুদ্র পার হইতে হয়—একদিন এক রাত্রের পাড়ি—সুতরাং চাটিগাঁ যাওয়া কি প্রকারে হইতে পারে? বিশেষ ভদ্রকালী—ভদ্রকালী এখন পূর্ণযৌবনা—সে বলিল, “আমি কোন মতেই চাটিগাঁ যাইব না—কি তোমায় যাইতে দিব না। তুমি যদি যাও, তবে আমি বিষ খাইব।” এই

মুচিরাম গুড়ের জীবন-চরিত

বলিয়া ভদ্রকালী একটা বড় খোঁরা লইয়া তেঁতুল গুলিতে বসিলেন। ভদ্রকালী তেঁতুল ভালবাসিতেন—মুচিরাম বলিতেন, “ওতে ভারি অম্ল হয়—ও বিষ।” তাই ভদ্রকালী তেঁতুল গুলিতে বসিলেন—মুচিরাম হাঁ হাঁ করিয়া নিষেধ করিতে লাগিলেন—ভদ্রকালী তাহা না শুনিয়া “বিষ খাইব” বলিয়া সেই তেঁতুলগোলায় লবণ ও শর্করা সংযোগপূর্বক আধ সের চাউলের অন্ন মাখিয়া লইলেন। মুচিরাম অশ্রুপূর্ণলোচনে শপথ করিলেন যে, তিনি কখনই চাউটা খাইবেন না। ভদ্রকালী কিছুতেই শুনিল না—সমুদায় তেঁতুলমাথা ভাতগুলি খাইয়া বিষপান-কার্য সমাধা করিল। মুচিরাম তৎক্ষণাৎ চাকরিতে ইস্তেফা পাঠাইয়া দিলেন।

স্থূল কথা, মুচিরামের জমীদারীর আয় এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, ডিপার্টীমেন্টের সামান্য বেতন, তাঁহার ধর্তব্যের মধ্যে ছিল না। সুতরাং সহজে চাকরি ছাড়িয়া দিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

চাকরি ছাড়িয়া দিয়া মুচিরাম ভদ্রকালীকে বলিলেন, “প্রিয়ে!” (তিনি সে কালের যাত্রার বাছা বাছা সম্বোধন পদগুলি ব্যবহার করিতেন) “প্রিয়ে! বিষয় যেমন আছে—তেমনি একটা বাড়ী নাই। একটা বাড়ীর মত বাড়ী করিলে হয় না?”

ভদ্র। দাদা বলে, এখানে বড় বাড়ী করিলে, লোকে বলবে, ঘুষের টাকায় বড় মানুষ হয়েছে।

মুচি। তা, এখানেই বা বাড়ী করায় কাজ কি? এখানে বৃক পুরে বড়মানুষ করা যাবে না। চল, আর কোথাও গিয়া বাস করি।

ভদ্রকালী সম্মত হইলেন, কিন্তু নিজ পিত্রালয় যে গ্রামে, সেই গ্রামেই বাস করাই বিধেয় বলিয়া পরামর্শ দিলেন। ফলে ভদ্রকালী আর কোন গ্রামের নাম বড় জানিতেন না।

মুচিরাম বিনীতভাবে ইহাতে কিছু আপত্তি করিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন, যত বড়মানুষের বাড়ী কলিকাতায়—তিনিও বড়মানুষ, সুতরাং কলিকাতাই তাঁহার বাসযোগ্য, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। এখন ভদ্রকালীর এক মাতুল, একদা কালীঘাটে পূজা দিতে আসিয়া, এক কালে কলিকাতা বেড়াইয়া গিয়াছিলেন, এবং বাটী গিয়া গল্প করিয়াছিলেন যে, কলিকাতার কুলকামিনীগণ সজ্জতা হইয়া রাজপথ আলোকিত করে। ভদ্রকালীর সেই অবাধি কলিকাতাকে ভূতলস্থ স্বর্গ বলিয়া বোধ ছিল। তাঁহার অনেকগুলি অলঙ্কার হইয়াছে, পরিয়া সর্বজননয়নপথবর্তিনী হইতে পারিলে অলঙ্কারের সার্থকতা হয়—ভদ্রকালী তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় বাস করার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

তখন ভজগোবিন্দ ছুটি লইয়া, আগে কলিকাতায় বাড়ী কিনিতে আসিল। বাড়ীর দাম শুনিয়া, মুচিরামের বাবুগিরির সাধ কিছু কমিয়া আসিল—যাহা হউক, টাকার অভাব ছিল না, —অট্টালিকা ক্রীত হইল। যথাকালে মুচিরাম ও ভদ্রকালী কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইয়া নতুন গৃহে বিরাজমান হইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ভদ্রকালী কলিকাতায় আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কলিকাতার কুলকামিনী রাজপথ আলোকিত করা দূরে থাকুক, পল্লীগাম অপেক্ষা কঠিনতর কারাগারে নিবদ্ধ। যাহারা রাজপথ কলুষিত করিয়া দাঁড়ায়, তাহাদিগের শ্রেণীভুক্ত হইবার ইচ্ছা ভদ্রকালী রাখেন না—সুতরাং তাঁহার কলিকাতায় আসা বৃথা হইল। বিশেষ দেখিলেন, তাঁহার অঙ্গের অলঙ্কার দেখিয়া কলিকাতার স্ত্রীলোক হাসে। ভদ্রকালীর অলঙ্কারের গর্ষ ঘুচিয়া গেল।

মুচিরামের কলিকাতায় আসা বৃথা হইল না। তিনি প্রত্যহ গাড়ী করিয়া বাজার যাইতেন, এবং যাহা দেখিতেন, তাহাই কিনিতেন। বাবুটি নতুন আমদানি দেখিয়া বিক্রতবর্গ পাঁচ টাকার জিনিসে দেড় শত টাকা হাঁকিত, এবং নিতান্তপক্ষে পঞ্চাশ টাকা না পাইলে ছাড়িত না। হঠাৎ মুচিরামের নাম বাজিয়া গেল যে, বাবুটি মধুচক্রবিশেষ। পাড়ার যত বানর মধু লুণ্ঠিতে

বিক্রম রচনাবলী

ছুটিল। জুয়াচোর, বদমাশ, মাতাল, লম্পট, নিষ্কর্মা ভাল ধুতি চাদর, জুতা ও লাঠিতে অঙ্গ পরিশোভিত করিয়া, চুল ফিরাইয়া, বাবুকে সম্ভাষণ করিতে আসিল। মর্চিরাম তাহাদিগকে কলিকাতার বড় বড় বাবু মনে করিয়া তাহাদিগকে বিশেষ আদর করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহারাও আত্মীয়তা করিয়া তাঁহার বৈঠকখানায় আড্ডা করিল—তামাক পোড়ায়, খবরের কাগজ পড়ে, মদ খায়, তাস পেটে, বাজনা বাজায়, গান করে, পোলাও ধবংসায়, এবং বাবুর প্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী কিনিয়া আনে। টাকাটায় আপনার বার আনা মুনুফা রাখে, বলে, দাঁওয়ে যোওয়ে সিকি দামে কিনিয়াছি। উভয় পক্ষের সুখের সীমা রহিল না।

যে গলিতে মর্চিরাম বাড়ী লইয়াছিলেন, সেই গলিতে একজন প্রথমশ্রেণীর বাটপাড় বাস করিতেন। তাঁহার নাম রামচন্দ্র দত্ত। রামচন্দ্রবাবু প্রথমশ্রেণীর বাটপাড়—একটু ব্রান্ড বা একখানা কাটলেটের লোভে কাহারও আনুগত্য করিবার লোক নহেন। তাঁহার গ্রিতল গৃহ, প্রস্তুতমুকুর কাষ্ঠ কাচ কাপেটাদিতে স্কুসুম উদ্যানতুল্য রঞ্জিত; তাঁহার দরওয়াজায় অনেকগুলো দ্বারবান্ গালচাল্লা বাঁধিয়া সিঁদ্ধি ঘোঁটে; আস্তাবলে অনেকগুলি অশ্বের পদধ্বনি শুনায়—তিনখানা গাড়ি আছে, সোণাবাঁধা হুক্কা, হীরাবাঁধা গৃহিণী, হ্যান্ডনোটে বাঁধা ইংরেজ খাদক, এবং তাড়াবাঁধা ‘কাগজ’—সকলই ছিল। তথাপি তিনি জুয়াচোর,—জুয়াচুরিতেই এ সকল হইয়াছিল। তিনি যখন শুনিলেন, টাকার বোঝা লইয়া একটা গ্রাম্য গন্দভ পাড়ায় আসিয়া চরিয়া বেড়াইতেছে, তখন ভাবিলেন যে, গন্দভের পৃষ্ঠ হইতে টাকার বোঝাটি নামাইয়া লইয়া তাঁহার উপকার করিতে হইবে। আহা! অবোধ পশু! এত ভারি বোঝা বহিবে কি প্রকারে—বোঝাটি নামাইয়া লইয়া তাহার উপকার করি।

প্রথম প্রয়োজন, মর্চিরামের সঙ্গে আলাপ পরিচয়। রামচন্দ্রবাবু বড়লোক—মর্চিরামের বাড়ী আগে যাইবেন না। ইঙ্গিত পাইয়া একজন অনুচর মর্চিরামের কাণে তুলিয়া দিল, রামচন্দ্রবাবু কলিকাতার অতি প্রধান লোক, আর মর্চিরামের প্রতিবাসী—মর্চিরামের সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য অতি ব্যস্ত। সুতরাং মর্চিরাম গিয়া উপস্থিত।

এইরূপে উভয়ে উভয়ের নিকট পরিচিত হইলেন। উভয়ে উভয়ের বাড়ী যাতায়াত হইতে লাগিল। ঘন ঘন যাতায়াতে ক্রমে সৌহার্দ্য বৃদ্ধি। রামচন্দ্রবাবুর সেই ইচ্ছা! তিনি চতুর, মর্চিরাম নিষ্কর্মা; মর্চিরাম গ্রাম্য, তিনি নাগরিক। অল্প কালেই মর্চিরাম-মৎস্য ফাঁদে পড়িল—রামচন্দ্রের সঙ্গে বন্ধুতা করিল। রামচন্দ্র তাঁহার মুরদুর্ষ হইলেন—মর্চিরামের নাগরিক জীবনযাত্রানির্ব্বাহে শিক্ষাগুরু হইলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

তিনি নাগরিক জীবননির্ব্বাহে মর্চিরামের শিক্ষাগুরু—কলিকাতারূপ গোচারণভূমে তাঁহার রাখাল—কালীঘাট হইতে চিতপুর পর্য্যন্ত, তখন মর্চিরামবলদ সুখের গাড়ি টানিয়া যায়, রামবাবু তখন তাহার গাড়োয়ান; সুখের ছেকড়ায় এই খোঁড়া টাটুটি জুড়িয়া রামচন্দ্র পাকা কোচমানের মত মিঠাকড়া চাবুক লাগাইতেন। তাঁহার হস্তে ক্রমে গ্রাম্য বানর সহুরে বানরে পরিণত হইল। কি গতিকের বানর, তাহা নিম্নোক্ত পত্রাংশ পড়িলেই বুঝা যাইতে পারে। এই সময় তিনি ভজগোবিন্দকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে উদ্ধৃত করা গেল—

“তোমার পুত্রের বিবাহ শুনিয়া আহ্লাদ হইল। টাকার তেমন আনুকূল্য করিতে পারিলাম না—মাপ করিও। দুইখানা গাড়ি কিনিয়াছি—একখানা বেরুশ—একখানা ব্রৌনবোরি। একটা আরবের যুড়িতে ২২০০ টাকা পড়িয়াছে। ছবিতে, আয়নাতে, কারপেটে অনেক টাকা পড়িয়া গিয়াছে। কলিকাতার এত খরচ, তাহা জানিলে কখন আসিতাম না—সেখানে সাত সিকায় কাপড় ও মজুরিসমেত আমার একটা চাপকান তৈয়ার হইত—এখানে একটা চাপকানে ৮৫ টাকা পড়িয়াছে। এক সেট রূপার বাসনে অনেক টাকা লাগিয়াছে। থাল, বাটি, গেলাস, সে বাসনের কথা বলিতেছি না—এ সেট টেবিলের জন্য। বরকন্যাকে আমার হইয়া আশীর্ব্বাদ করিবে।”

এই হলো বানরামি নম্বর এক। তারপর, মর্চিরাম, কলিকাতায় যে কেহ একটু খ্যাতিযুক্ত, তাহারই বাড়ীতে, রামচন্দ্রবাবুর পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে আরম্ভ করিলেন। কোন নামজাদা বাবু তাঁহার বাড়ীতে আসিলে জন্ম সার্থক মনে করিতেন। কিসে আসে, সেই চেষ্টায় ফিরিতেন।

মুর্চিরাম গুড়ের জীবন-চরিত

এইরূপ আচরণে, রামবাবুর সাহায্যে, কলিকাতার সকল বর্দ্ধিষ্ণু লোকের সঙ্গে তাঁহার আলাপ হইল। টাকার মান সর্ব্বত্র; মুর্চিরামের টাকা আছে; সুতরাং সকলেরই কাছে তাঁহার মান হইল।

তারপর মুর্চিরাম কলিকাতার ইংরেজ মহল আক্রমণ করিলেন। রামবাবুর পরিচয়ে যত ছোট বড় ইংরেজের বাড়ী যাতায়াত করিলেন। অনেক যায়গাতেই কাঁটা লাথি খাইলেন। কোন কোন স্থানে মিষ্ট কথা পাইলেন। অনেক স্থানেই একজন মাতালো জমীদার বলিয়া পরিচিত হইলেন।

তারপর ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আসোসিয়েশ্যানে ঢুকিলেন। নাম লেখাইয়া বৎসর বৎসর টাকা দিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রবাবুর সঙ্গে প্রতি অধিবেশনে যাইতে আরম্ভ করিলেন। রামবাবু কথিত মহামহিমমহাসভার “একটি বড় কামান।” তিনি যখনই বড় কামান দাগিতে যাইতেন, এই ছোট মুর্চিপিস্তলটি সঙ্গে লইয়া যাইতেন—সুতরাং পিস্তলটি ক্রমে মুখ খুলিয়া পুটপাট করিতে আরম্ভ করিল। মুর্চিরামও ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সভায় একজন বক্তা হইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি বকিতেন মাথামুণ্ডু, কিন্তু ছাপার বিজ্ঞাপনীতে যাহা বাহির হইত, সে আর একপ্রকার। মুর্চিরাম নিজে তাহার কিছুই বর্দ্ধিতে পারিতেন না। যাহারা বুদ্ধে, তাহারা পড়িয়া নিন্দা করিত না। সুতরাং মুর্চিরাম ক্রমে একজন প্রসিদ্ধ বক্তা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিতে লাগিলেন। যেখানে লোকে বড়লোক বলিয়া গণ্য হয়, মুর্চিরাম তাহার কোন যায়গায় যাইতেই ছাড়িত না। গবর্ণমেন্ট হোসে ও বেলবিড়ীয়ে গেলে বড়লোক বলিয়া গণ্য হয়, সুতরাং সে গবর্ণমেন্ট হোসে ও বেলবিড়ীয়ে যাইত। যাইতে যাইতে সে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের নিকট সুপরিচিত হইল। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর তাহাকে একজন নয়, নিরহঙ্কারী, নিরীহ লোক বলিয়া জানিলেন। জমীদারী সভার একজন নায়ক বলিয়া পুর্বেই রামচন্দ্রের নিকট পরিচয় পাইয়াছিলেন।

সম্প্রতি বাঙ্গাল কোর্নিসলে একটি পদ খালি হইল। একজন জমীদারী সভার অধিনায়ককে তাহাতে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, ইহাই লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর স্থির করিলেন। বাছনি করিতে মনে মনে ভাবিলেন, “মুর্চিরামের ন্যায় এ পদের যোগ্য কে? নিরহঙ্কারী, নিরীহ—সেকেলে খাঁটি সোণা, একালের ঠন্ঠনে পিতল নয়। অতএব মুর্চিরামকে বহাল করিব।”

অচিরাৎ অনরেবল বাবু মুর্চিরাম রায় বাঙ্গাল কোর্নিসলে আসন গ্রহণ করিলেন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

বড় বাড়াবাড়িতে অনরেবল মুর্চিরাম রায়ের বৃদ্ধির শুকাইয়া আসিল। ভজগোবিন্দ ফিকিরফিন্দিতে অল্প দামে অধিক লাভের বিষয়গুলি কিনিয়া দিয়াছিলেন—তাঁহার কার্যদক্ষতায় ক্রীত সম্পত্তির আয় বাড়িয়াছিল—কিন্তু এখন তাহাতেও অনাটন হইয়া আসিল। দুই একখানি তালুক বাঁধা পড়িল—রামচন্দ্রবাবুর কাছে। রামচন্দ্রবাবুর সংকল্প এতদিনে সিদ্ধ হইয়া আসিতেছিল—এই জন্য তিনি আত্মীয়তা করিয়া মুর্চিরামকে এত বড় বাবু করিয়া তুলিয়াছিলেন। রামচন্দ্র অর্দ্ধেক মূল্যে তালুকগুলি বাঁধা রাখিলেন—জানেন যে, মুর্চিরাম কখনও শূধরাইতে পারিবে না—অর্দ্ধেক মূল্যে বিষয়গুলি তাঁহার হইবে। আরও তালুক বাঁধা পড়ে, এমন গতিক হইয়া আসিল। এই সময়ে ভজগোবিন্দ আসিয়া উপস্থিত হইল। সে শুনিয়াছিল যে, গবর্ণর প্রভৃতি বড় বড় সাহেব তাহার ভাগিনীপতির হাতধরা—এই সুযোগে একটা বড় চাকরি যোটাইয়া লইতে হইবে—এই ভরসায় ছুটি লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। আসিয়া শুনিলেন, মুর্চিরামের গতিক ভাল নহে। তাহার উদ্ধারের উপায় বলিয়া দিলেন।

বলিলেন, “মহাশয়, আপনি কখন তালুকে যান নাই। গেলেই কিছু পাওয়া যাইবে। তালুকে যান।”

মুর্চিরাম আনন্দিত হইল, ভাবিল, “তাই ত! এমন সোজা কথাটা আমার মনে আসিল না।” মুর্চিরাম খুশী হইয়া, ভজগোবিন্দের কথায় স্বীকৃত হইল।

চন্দনপুর নামে তালুক—সেইখানে বাবু গেলেন। প্রজাদিগের অবস্থা বড় ভাল। সে বৎসর নিকটবর্ত্তী স্থান সকলে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত—কিন্তু সে মহালে কিছু না। কখন মুর্চিরাম প্রজাদিগের নিকট মাজন মাথট লয়েন নাই। মুর্চিরাম নির্ব্বিরোধী লোক—তাহাদের উপর কোন অত্যাচার করিতেন না। আজ ভজগোবিন্দের পরামর্শে সশরীরে তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “আমার কন্যার বিবাহ উপস্থিত—বড় দায়গ্রস্ত হইয়াছি, কিছু ভিক্ষা দাও।” প্রজারা দয়া

বাংকম রচনাবলী

করিল—প্রজা সুখে থাকিলে জমীদারকে সকল সময়ে দয়া করিতে প্রস্তুত। জমীদার আসিয়াছে সম্বাদ পাইয়া, পালে পালে প্রজা, টেংকে টাকা লইয়া মূর্চিরাম-দর্শনে আসিতে আরম্ভ করিল। মূর্চিরামের চেষ্টা টাকায় পরিপূর্ণ হইতে লাগিল, কিন্তু ইহাতে আর একদিকে তাহার আর এক-প্রকার সৌভাগ্যের উদয় হইল।

প্রজারা দলে দলে মূর্চিরাম-দর্শনে আসে—কোন দিন পঞ্চাশ, কোন দিন ষাট, কোন দিন আশী, কোন দিন একশত এইরূপ। যাহাদের বাড়ী নিকট, তাহারা দর্শন করিয়া ফিরিয়া যায়, যাহাদের বাড়ী দূর, তাহারা দোকান হইতে খাদ্যসামগ্রী কিনিয়া একটা বাগানের ভিতর রাঁধিয়া বাড়িয়া খায়। মহালটি একে খুব বড়—মূর্চিরামের এত বড় জমীদারী আর নাই—তাহাতে গ্রামগুলির মধ্যে বিল খাল অনেক থাকায়, দুই চারিজন প্রজাকে প্রায় রাঁধিয়া খাইয়া যাইতে হইত। একদিন অনেক দূর হইতে প্রায় একশত প্রজা আসিয়াছে—তাহাদের বাড়ী একটা ভারি জলা পার; নিকাশ প্রকাশে তাহাদের বেলা গেল; তাহারা বাড়ী ফিরিতে পারিল না। বাগানে রাঁধাভাড়া করিতে লাগিল। রাত্রি থাকিয়া প্রাতে যাত্রা করিবে। তাহারা যখন খাইতে বসিল, সেই সময়ে নিকটস্থ মাঠ পার হইয়া অশ্বজানে একটি সাহেব যাইতেছিলেন।

সাহেবটির নাম মীনুওয়েল্। তিনি ঐ জেলার প্রধান রাজপুরুষ—মার্জিস্ট্রেট কালেক্টর। সাহেবটি ভাল লোক—ন্যায়বান্—হিতৈষী এবং পরিশ্রমী। কিসে এ দেশের লোকের মঙ্গল সাধন করিবেন, সেই জন্য সর্বদা চিন্তিত। পূর্বেই বলিয়াছি, সে বৎসর ঐ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল; সাহেব দুর্ভিক্ষ তদারকে বাহির হইয়াছিলেন। নিকটস্থ কোন গ্রামে তাহার তাম্বু পাড়িয়াছিল—তিনি এখন অশ্বারোহণে তাম্বুতে যাইতেছিলেন। যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলেন, একটা বাগানের ভিতর কতকগুলো লোক ভোজন করিতেছে।

দেখিয়াই সহজেই সিদ্ধান্ত করিলেন, ইহারা সকলে দুর্ভিক্ষপীড়িত উপবাসী দরিদ্র লোক, কোন বদান্য ব্যক্তি ইহাদের ভোজন করাইতেছে। সর্বিশেষ তত্ত্ব জানিবার জন্য, নিকটে একজন চাষাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন।

চাষা অবশ্য ইংরেজি জানে না। সাহেব উত্তম বাঙ্গালা জানেন, পরীক্ষা দিয়া পুরস্কার পাইয়াছেন; সুতরাং চাষার সঙ্গে বাঙ্গালার কথোপকথন আরম্ভ করিলেন।

সাহেব চাষাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “টোমাডিগের গুডামে* ডুড্বেক্কা† কেমন আছে?”

চাষা ত জানে না ডুড্বেক্কা কাকে বলে। সে ফাঁকরে পাড়িল। ডুড্বেক্কা কোন ব্যক্তি-বিশেষের নাম হইবে, ইহা একপ্রকার স্থির হইল। কিন্তু “কেমন আছে?” ইহার উত্তর কি দিবে? যদি বলে যে, সে ব্যক্তিকে আমি চিনি না, তাহা হইলে সাহেব হয়ত এক ঘা চাবুক দিবে, যদি বলে যে, ভাল আছে, তাহা হইলে সাহেব হয়ত ডুড্বেক্কা কে ডাকিয়া আনিতে বলিবে; তাহা হইলে কি করিবে? চাষা ভাবিয়া চিন্তিয়া উত্তর করিল, “বেমার আছে।”

“বেমার—Sick?” সাহেব ভাবিতে লাগিলেন, “Well, there may be much sickness without there being any scarcity—the fellow does not understand perhaps; these people are so dull—I say ডুড্বেক্কা কেমন আছে—অটিক আছে কিম্বা অল্প আছে?”

এখন চাষা কিছু ভাব পাইল। স্থির করিল যে, এ যখন সাহেব, তবে অবশ্য হাকিম। (সে দেশে নীলকর নাই) হাকিম যখন জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, ডুড্বেক্কা অধিক আছে, কি অল্প আছে—তখন ডুড্বেক্কা একটা টেক্সের নাম না হইয়া যায় না। ভাবিল, কই, আমরা ত ডুড্বেক্কার টেক্স দিই না; কিন্তু যদি বলি, আমাদের গ্রামে সে টেক্স নাই—তবে বেটা এখনই টেক্স বসাইয়া যাইবে। অতএব মিছা কথা বলাই ভাল। সাহেব পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, “টোমাডের গুডামে ডুড্বেক্কা অটিক কিম্বা অল্প আছে?”

চাষা উত্তর করিল, “হুজুর, আমাদের গাঁয়ে ভারি ডুড্বেক্কা আছে।”

সাহেব ভাবিলেন, “Hump! I thought as much—” পরে বাগানে যে সকল লোক খাইতেছিল, তৎপ্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে বোজন করিল?” (উদ্দেশ্য “ভোজন করাইল”)

* গ্রামে। † দুর্ভিক্ষ।

মুর্চিরাম গড়ের জীবন-চরিত

চাষা। প্রজারা ভোজন কোচ্ছে।

সাহেব, চটিয়া, “টাহা আমি জানে—They eat, that I see—but who pays?—
টাকা কাহাড়?”

এখন সে চাষা জানে যে, যত টাকা আসিতেছে, সকলই জমীদারের সিন্দুকে যাইতেছে; সে
নিজেও কিছু দিয়া আসিয়াছিল—অতএব এবার বিনা বিলম্বে উত্তর করিল “টাকা জমীদারের।”

সাহেব। Ah! there it is; they do their duty—how it is that some people
find pleasure in maligning them? জমীদারের নাম কি?

চাষা। মুর্চিরাম রায়।

সাহেব। কট ডিবস বোজন কড়িয়াছে?

চাষা। তা ধর্মাবতার, প্রজারা রোজ রোজ আসে, খাওয়া দাওয়া করে।

সাহেব। এ গড়ামের নাম কি?

চাষা। চন্ননপুর।

সাহেব নোটবুক বাহির করিয়া তাহাতে পেন্সিলে লিখিলেন,

For Famine Report

“Babu Muchiram Ray, Zemindar of Chinnapur—feeds every day a large
number of his ryots.”

সাহেব তখন ঘোড়ায় চাবুক মারিয়া টাপে চলিলেন। চাষা আসিয়া গ্রামে রটাইল, একটা
সাহেব টাকায় আট আনা হিসাবে টেক্স বসাইতে আসিয়াছিল, চাষা মহাশয়ের বুদ্ধিকৌশলে
বিমুখ হইয়াছে।

এ দিকে মীনুওয়েল্ সাহেব যথাকালে ফোর্মিন্ রিপোর্ট লিখিলেন। একটি পারাগ্রাফ শুধু
মুর্চিরাম রায় সম্বন্ধে। তাহাতে প্রতিপন্ন হইল যে, মুর্চিরাম জমীদারদিগের আদর্শস্থল। এই
দুঃসময়ে অন্নদান করিয়া সকল প্রজাগণের প্রাণরক্ষা করিয়াছে।

রিপোর্ট কমিশ্যনরীতে গেল। কমিশ্যনরের হস্ত হইতে কিছু উজ্জ্বলতর বর্ণে রঞ্জিত হইয়া
—কমিশ্যনর সাহেব লেখক ভাল—গবর্ণমেন্টে গেল। গবর্ণমেন্টের এই বিবেচনা—যে যার প্রজা,
সেই যদি দুর্ভিক্ষের সময়ে তাহাদের আহাৰ যোগায়, তাহা হইলেই “দুর্ভিক্ষ প্রশ্নের” উত্তম
মীমাংসা হয়। অতএব মুর্চিরামের ন্যায় বদান্য জমীদারদিগের সম্মানিত ও উৎসাহিত করা
নিতান্ত কর্তব্য। তজ্জন্য বাঙ্গালা গবর্ণমেন্ট ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নিকট অনুরোধ করিলেন যে,
বাবু মুর্চিরাম রায় মহাশয়কে—পাঠক একবার হরি হরি বল—রাজাবাহাদুর উপাধি দেওয়া যায়।

ইন্ডিয়ান গবর্ণমেন্ট বলিলেন, তথাস্তু। গেজেট হইল, রাজা মুর্চিরাম রায় বাহাদুর।
তোমরা সবাই আর একবার হরি বল।

দ্বিতীয় ভাগ

বিজ্ঞানরহস্য

অর্থাৎ

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধসংগ্রহ

আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত

১৮৭১ সালে সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকা-নিবাসী অদ্বিতীয় জ্যোতির্বিদ ইয়ঙ্ক সাহেব যে আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত দৃষ্টি করিয়াছিলেন, এরূপ প্রকাণ্ড কাণ্ড মনুষ্যচক্ষে প্রায় আর কখন পড়ে নাই। তত্ত্বলনায় এট'না বা বিসিউবিয়াসের অগ্নিবিপ্লব, সমুদ্রোচ্ছ্বাসের তুলনায় দৃষ্টি-কটাহে দৃষ্টিচ্ছ্বাসের তুল্য বিবেচনা করা যাইতে পারে।

যাঁহারা আধুনিক ইউরোপীয় জ্যোতির্বিদ্যার সবিশেষ অনুশীলন করেন নাই, এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার তাঁহাদের বোধগম্য করার জন্য সূর্য্যের প্রকৃতিসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যিক।

সূর্য্য অতি বৃহৎ তেজোময় গোলক। এই গোলক আমরা অতি ক্ষুদ্র দেখি, কিন্তু উহা বাস্তবিক কত বৃহৎ, তাহা পৃথিবীর পরিমাণ না বুঝিলে বুঝা যাইবে না। সকলে জানেন যে, পৃথিবীর ব্যাস ৭০৯১ মাইল। যদি পৃথিবীকে এক মাইল দীর্ঘ, এক মাইল প্রস্থ, এমত খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করা যায়, তাহা হইলে উনিশ কোটি, ছয়ষাট লক্ষ, ছাষ্বশ হাজার, এইরূপ বর্গ-মাইল পাওয়া যায়। এক মাইল দীর্ঘ, এক মাইল প্রস্থ এবং এক মাইল উচ্চ, এরূপ ২৫৯,৮০০,০০০,০০০ ভাগ পাওয়া যায়। আশ্চর্য্য বিজ্ঞানবলে পৃথিবীকে ওজন করাও গিয়াছে। ওজনে পৃথিবী ষত টন হইয়াছে, তাহা নিম্ন অক্ষের দ্বারা লিখিলাম। ৬,০৬৯,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০। এক টন সাতাশ মনের অধিক।

এই সকল অঙ্ক দেখিয়া মন অস্থির হয়: পৃথিবী যে কত বৃহৎ পদার্থ, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। এক্ষণে যদি বলি যে, এমত অন্য কোন গ্রহ বা নক্ষত্র আছে যে, তাহা পৃথিবী অপেক্ষা, প্রয়োদশ লক্ষ গুণে বৃহৎ, তবে কে না বিস্মিত হইবে? কিন্তু বাস্তবিক সূর্য্য পৃথিবী হইতে প্রয়োদশ লক্ষ গুণে বৃহৎ। প্রয়োদশ লক্ষটি পৃথিবী একত্র করিলে সূর্য্যের আয়তনের সমান হয়।

তবে আমরা সূর্য্যকে এত ক্ষুদ্র দেখি কেন? উহার দূরতাবশতঃ। পূর্বেতন গণনানুসারে সূর্য্য পৃথিবী হইতে সাক্ষর নয় কোটি মাইল দূরে স্থিত বলিয়া জানা ছিল। আধুনিক গণনায় স্থির হইয়াছে যে, ৯১,৬৭৮,০০০ মাইল অর্থাৎ এক কোটি, চতুর্দশ লক্ষ, উনসপ্ততি সহস্র সাক্ষর সপ্তদশ যোজন, পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত।* এই ভয়ঙ্কর দূরত অনুমেয় নহে। দ্বাদশ সহস্র পৃথিবী শ্রেণীপরিমিত বিন্যস্ত হইলে, পৃথিবী হইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত পায় না।

এই দূরত অনুভব করিবার জন্য একটি উদাহরণ দিই। অস্মদাদির দেশে রেলওয়ে ট্রেন ঘণ্টায় ২০ মাইল যায়। যদি পৃথিবী হইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত রেলওয়ে হইত, তবে কত কালে সূর্য্যালোকে যাইতে পারিতাম? উত্তর—যদি দিন রাত্রি ট্রেন অবিরত, ঘণ্টায় বিশ মাইল চলে, তবে ৫২০ বৎসর ৬ মাস ১৬ দিনে সূর্য্যালোকে পৌঁছান যায়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ট্রেনে চড়িবে, তাহার সপ্তদশ পুরুষ ঐ ট্রেনে গত হইবে।

এক্ষণে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, সূর্য্যমণ্ডলমধ্যে যাহা অণুবৎ ক্ষুদ্রাকৃতি দেখি, তাহাও বাস্তবিক অতি বৃহৎ। যদি সূর্য্যমধ্যে আমরা একটি বালির মত বিন্দুও দেখিতে পাই, তবে তাহাও লক্ষ ক্রোশ বিস্তার হইতে পারে।

নূতন গণনায় আরও কিছু বাড়িয়াছে।

বিক্রম রচনাবলী

কিন্তু সূর্য্য এমনি প্রচণ্ড রশ্মিময় যে, তাহার গায়ে বিন্দু বিসর্গ কিছু দেখিবার সম্ভাবনা নাই। সূর্য্যের প্রতি চাহিয়া দেখিলেও অন্ধ হইতে হয়। কেবল সূর্য্যগ্রহণের সময়ে সূর্য্যতেজঃ চন্দ্রাস্তুরালে লুক্কায়িত হইলে, তৎপ্রতি দৃষ্টি করা যায়। তখনও সাধারণ লোকে চক্ষুর উপর কালিমাখা কাচ না ধরিয়া, হততেজা সূর্য্য প্রতিও চাহিতে পারে না।

সেই সময়ে যদি কালিমাখা কাচ ত্যাগ করিয়া, উত্তম দূরবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা সূর্য্য প্রতি দৃষ্টি করা যায়, তবে কতকগুলি আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা যায়। পূর্ণ গ্রাসের সময়ে, অর্থাৎ যখন চন্দ্রাস্তুরালে সূর্য্যমণ্ডল লুক্কায়িত, তখন দেখা যায়, মণ্ডলের চারি পার্শ্বে, অপূর্ণ জ্যোতিষ্ময় কিরীটিমণ্ডল তাহাকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ইহাকে “করোনা” বলেন। কিন্তু এই কিরীটিমণ্ডল ভিন্ন, আর এক অদ্ভুত বস্তু কখন কখন দেখা যায়। কিরীটিমণ্ডলে, ছায়াবৃত সূর্য্যের অঙ্গের উপরে সংলগ্ন, অথচ তাহার বাহিরে, কোন দৃষ্টিপথ পদার্থ উদ্গত দেখা যায়। ঐ সকল উদ্গত পদার্থ দেখিতে এত ক্ষুদ্র যে, তাহা দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতিরেকে দেখা যায় না। কিন্তু দূরবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায় বলিয়াই তাহা বৃহৎ অনুমান করিতে হইতেছে। উহা কখন কখন অর্ধ লক্ষ মাইল উচ্চ দেখা গিয়াছে। ছয়টি পৃথিবী উপর্যুপরি সাজাইলে এত উচ্চ হয় না। এই সকল উদ্গত পদার্থের আকার কখন পর্ব্বতশৃঙ্গবৎ, কখন বা অন্য প্রকার, কখন সূর্য্য হইতে বিষদ্রুত দেখা গিয়াছে। তাহার বর্ণ কখন উজ্জ্বল রক্ত, কখন গোলাপী, কখন নীল কাঁপশ।

পণ্ডিতেরা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, এ সকল সূর্য্যের অংশ। প্রথমে কেহ কেহ বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, এ সকল সৌর পর্ব্বত; পরে সূর্য্য হইতে তাহার বিয়োগ দেখিয়া সে মত ত্যাগ করিলেন।

এক্ষণে নিঃসংশয় প্রমাণ হইয়াছে যে, এই সকল বৃহৎ পদার্থ সূর্য্যগর্ভ হইতে উৎক্ষিপ্ত। যেরূপ পার্থিব আগ্নেয়গিরি হইতে দ্রব বা বায়বীয় পদার্থসকল উৎপত্তি হইয়া, গিরিশৃঙ্গের উপরে মেঘাকারে দৃষ্ট হইতে পারে, এই সকল সৌর মেঘও তদ্রূপ। উৎক্ষিপ্ত বস্তু যতক্ষণ না সূর্য্যোপরি পুনঃ পতিত হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্তূপাকারে পৃথিবী হইতে লক্ষ্য হইতে থাকে।

এক্ষণে পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, এইরূপ একখানি সৌর মেঘ বা স্তূপ দূরবীক্ষণে দেখিলে কি বুদ্ধিতে হয়। বুদ্ধিতে হয় যে, এক প্রকাণ্ড প্রদেশ লইয়া এক বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। সেই সকল উৎপাতকালে সূর্য্যগর্ভনিষ্কিপ্ত পদার্থরাশি, এতাদৃশ বহুদূর-ব্যাপী হয় যে, তন্মধ্যে এই পৃথিবীর ন্যায় অনেকগুলি পৃথিবী ডুবিয়া থাকিতে পারে।

এইরূপ সৌরোৎপাত অনেকেই প্রফেসর ইয়ঙের পূর্বে দেখিয়াছেন; কিন্তু প্রফেসর ইয়ঙ যাহা দেখিয়াছেন, তাহা আবার বিশেষ বিস্ময়কর। বেলা দুই প্রহরের সময়ে তিনি সূর্য্যমণ্ডল দূরবীক্ষণ দ্বারা অবক্ষণ করিতেছিলেন। তৎকালে গ্রহগাি কিছু ছিল না। পূর্বে গ্রহণের সাহায্য ব্যতীত কেহ কখন এই সকল ব্যাপার নয়নগোচর করে নাই, কিন্তু ডাক্তার হার্গিন্স প্রথমে বিনা গ্রহণে এ সকল ব্যাপার দেখিবার উপায় প্রদর্শন করেন। প্রফেসর ইয়ঙ এরূপ বিজ্ঞান-কুশলী যে, তিনি সূর্য্যের প্রচণ্ড তেজের সময়েও ঐ সকল সৌরস্তূপের আতর্পাচিত্ত পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

কথিত সময়ে প্রফেসর ইয়ঙ দূরবীক্ষণে দেখিতেছিলেন যে, সূর্য্যের উপরি ভাগে একখানি মেঘবৎ পদার্থ দেখা যাইতেছে। অন্যান্য উপায় দ্বারা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, পৃথিবী যেরূপ বায়বীয় আবরণে বেষ্টিত, সূর্য্যমণ্ডলও তদ্রূপ। ঐ মেঘবৎ পদার্থ সৌর বায়ুর উপরে ভাসিতেছিল। পাঁচটি স্তম্ভের ন্যায় আধারের উপরে উহা আরুঢ় দেখা যাইতেছিল। প্রফেসর ইয়ঙ পূর্বাধিন বেলা দুই প্রহর হইতে ঐ রূপই দেখিতেছিলেন। তদবধি তাহার পরিবর্তনের কোন লক্ষণই দেখেন নাই। স্তম্ভগুলি উজ্জ্বল, মেঘখানি বৃহৎ—তন্তিন্ন মেঘের নিবিড়তা বা উজ্জ্বলতা কিছুই ছিল না। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূত্রাকার কতকগুলি পদার্থের সমষ্টির ন্যায় দেখাইতেছিল। এই অপূর্ণ মেঘ সৌর বায়ুর উপরে পঞ্চদশ সহস্র মাইল উচ্চের ভাসিতেছিল। ইহা বলা বাহুল্য যে, প্রফেসর ইয়ঙ ইহার দৈর্ঘ্য-প্রস্থও মাপিয়াছিলেন। তাহার দৈর্ঘ্য লক্ষ মাইল—প্রস্থ ৫৪,০০০ মাইল। বারটি পৃথিবী সারি সারি সাজাইলে, তাহার দৈর্ঘ্যের সমান হয় না—ছয়টি পৃথিবী সারি সারি সাজাইলে, তাহার প্রস্থের সমান হয় না।

দুই প্রহর বাজিয়া অর্ধ ঘণ্টা হইলে, মেঘ এবং তন্দ্রুলস্বরূপ স্তম্ভগুলির অবস্থা-পরিবর্তনের কিছ্রু কিছ্রু লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল। সেই সময়ে প্রফেসর ইয়ঙ্ সাহেবকে দূরবীক্ষণ রাখিয়া স্থানান্তরে যাইতে হইল। একটা বাজিতে পাঁচ মিনিট থাকিতে, যখন তিনি প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন দেখিলেন যে, চমৎকার! নিম্ন হইতে উৎক্ষিপ্ত কোন ভয়ঙ্কর বলের বেগে মেঘখণ্ড ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, তৎপরিবর্তে সৌর গগন ব্যাপিয়া ঘনবিকীর্ণ উজ্জ্বল সূত্রাকার পদার্থসকল উদ্ভেদ ধাবিত হইতেছে। ঐ সূত্রাকার পদার্থসকল অতি প্রবল বেগে উদ্ভেদ ধাবিত হইতেছিল।

সর্বাপেক্ষা এই বেগই চমৎকার। আলোক বা বৈদ্যুতীয় শক্তি প্রভৃতি ভিন্ন, গুরুত্ববিশিষ্ট পদার্থের এরূপ বেগ শ্রুতিগোচর হয় না। ইয়ঙ্ সাহেব যখন প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, ঐ সকল উজ্জ্বল সূত্রাকার পদার্থ লক্ষ মাইলের উদ্ভেদ উঠে নাই। পরে দশ মিনিটের মধ্যে যাহা লক্ষ মাইলে ছিল, তাহা দুই লক্ষ মাইলে উঠিল। দশ মিনিটে লক্ষ মাইল গতি হইলে, প্রতি সেকেন্ডে ১৬৫ মাইল গতি হয়। অতএব উৎক্ষিপ্ত পদার্থের দৃষ্ট গতি এই।

এই গতি কি ভয়ঙ্কর, তাহা মনেরও অচিন্ত্য। কামানের গোলা অতি বেগবান্ হইলেও কখন এক সেকেন্ডে অর্ধ মাইল যাইতে পারে না। সচরাচর কামানের গোলার বেগের বহু শত গুণ এই সৌর পদার্থের বেগ, এ কথা বলিলে অতু্যক্তি হইবে না।

দুই লক্ষ মাইল উদ্ভেদে এই বেগ দেখা গিয়াছিল। যে উৎক্ষিপ্ত পদার্থ দুই লক্ষ মাইল উদ্ভেদ এত বেগবান্, নিগমকালে তাহার বেগ কিরূপ ছিল? সকলেই জানেন যে, যদি আমরা একটা ইস্টক খণ্ড উদ্ভেদ নিষ্কিপ্ত করি, তাহা হইলে যে বেগে তাহা নিষ্কিপ্ত হয়, সেই বেগ শেষ পর্যন্ত থাকে না, ক্রমে মন্দীভূত হইয়া, পরিশেষে একবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, ইস্টক খণ্ডও ভূপতিত হয়। ইস্টকবেগের হ্রাসের দুই কারণ, প্রথম পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণী শক্তি, দ্বিতীয় বায়ুজনিত প্রতিবন্ধকতা। এই দুই কারণই সূর্যালোকে বর্তমান। যে বস্তু যত গুরু, তাহার মাধ্যাকর্ষণী শক্তি তত বলবতী। পৃথিবী অপেক্ষা সূর্যের মাধ্যাকর্ষণী শক্তি সূর্যের নাড়ীমণ্ডলে ২৮ গুণ অধিক। তদুল্লঙ্ঘন করিয়া লক্ষ ক্রোশ পর্যন্ত যদি কোন পদার্থ উঠিত হয়, তবে তাহা যখন সূর্যকে ত্যাগ করে, তৎকালে তাহার গতি প্রতি সেকেন্ডে অবশ্যই ১৬৬ মাইল ছিল। ইহা গণনা দ্বারা সিদ্ধ। কিন্তু যদিও এই বেগে উৎক্ষিপ্ত হইলে, ক্ষিপ্ত বস্তু লক্ষ ক্রোশ উঠিতে পারিবে, তাহা যে ঐ লক্ষ ক্রোশের শেষার্ধ্বে লঙ্ঘনকালে প্রতি সেকেন্ডে ১৬৬ মাইল ছুটিবে, এমত নহে। শেষার্ধ্বে বেগ গড়ে ৬৫ মাইল মাত্র হইবে। প্রক্টর সাহেব গুড্‌ওয়ার্ডসে লিখিয়াছেন যে, যদি বিবেচনা করা যায় যে, সূর্যালোকে বায়বীয় প্রতিবন্ধকতা নাই, তাহা হইলে এই উৎক্ষিপ্ত পদার্থ সূর্যমধ্য হইতে যে বেগে নির্গত হইয়াছিল, তাহা প্রতি সেকেন্ডে ২৫৫ মাইল। কর্ণহিলের একজন লেখক বিবেচনা করেন যে, এই পদার্থ প্রতি সেকেন্ডে ৫০০ মাইলের অধিক বেগে নিষ্কিপ্ত হইয়াছিল।

কিন্তু সূর্যালোকে যে বায়বীয় পদার্থ নাই, এমত কথা বিবেচনা করিতে পারা যায় না। সূর্য যে গাড় বাষ্পমণ্ডল-পরিবৃত্ত, তাহা নিশ্চিত হইয়াছে। প্রক্টর সাহেব সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, পৃথিবীতে বায়বীয় প্রতিবন্ধকতার ষেরূপ বল, সৌর বায়ুর প্রতিবন্ধকতার যদি সেইরূপ বল হয়, তাহা হইলে এই পদার্থ যখন সূর্য হইতে নির্গত হয়, তখন তাহার বেগ প্রতি সেকেন্ডে আনুমানিক সহস্র মাইল ছিল।

এই বেগ মনের অচিন্ত্য। এরূপ বেগে নিষ্কিপ্ত পদার্থ এক সেকেন্ডে ভারতবর্ষ পার হইতে পারে—পাঁচ সেকেন্ডে কলিকাতা হইতে বিলাত পহুঁছিতে পারে, এবং ২৪ সেকেন্ডে অর্থাৎ অর্ধ মিনিটের কমে, পৃথিবী বেষ্টিত করিয়া আসিতে পারে।

আর এক বিচিত্র কথা আছে, আমরা যদি কোন মৃৎপিণ্ড উদ্ভেদ নিষ্কিপ্ত করি, তাহা আবার ফিরিয়া আসিয়া পৃথিবীতে পড়ে। তাহার কারণ এই যে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণী শক্তির বলে, এবং বায়বীয় প্রতিবন্ধকতায়, ক্ষেপণীর বেগ ক্রমে বিনষ্ট হইয়া, যখন ক্ষেপণী একেবারে বেগহীন হয়, তখন মাধ্যাকর্ষণের বলে পুনর্বার তাহা ভূপতিত হয়। সূর্যালোকেও অবশ্য তাহাই হওয়া সম্ভব। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণী শক্তি বা বায়বীয় প্রতিবন্ধকতার শক্তি কখন অসীম নহে। উভয়েরই সীমা আছে। অবশ্য এমত কোন বেগবতী গতি আছে যে, তদ্বারা উভয় শক্তিই পরাভূত হইতে পারে। এই সীমা কোথায়, তাহাও গণনা দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। যে বস্তু নিগমকালে প্রতি

বাঁকম রচনাবলী

সেকেণ্ডে ৩৮০ মাইল গমন করে, তাহা মাধ্যাকর্ষণী শক্তি এবং বায়বীয় প্রতিবন্ধতার বল অতিক্রম করিয়া যায়। অতএব উপরিবর্ণিত বেগবান্ উৎক্ষিপ্ত পদার্থ, আর সূর্যালোকে ফিরিয়া আইসে না। সুতরাং প্রফেসর ইয়ঙ্ যে সৌরোৎপাত দৃষ্টি করিয়াছিলেন, তদুৎক্ষিপ্ত পদার্থ আর সূর্যালোকে ফিরে নাই। তাহা অনন্তকাল অনন্ত আকাশে বিচরণ করিয়া ধূমকেতু বা অন্য কোন খেচররূপে পরিগণিত হইবে কি, কি হইবে, তাহা কে বলিতে পারে!

প্রক্টর সাহেব সিদ্ধান্ত করেন যে, উৎক্ষিপ্ত বস্তু লক্ষ ক্রোশ পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল বটে, কিন্তু অদৃশ্যভাবে যে তদধিক দূর উদ্ধর্গত হয় নাই, এমত নহে। যতক্ষণ উহা উত্তপ্ত এবং জ্বালাবিশিষ্ট ছিল, ততক্ষণ তাহা দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, ক্রমে শীতল হইয়া অনুজ্জ্বল হইলে, আর তাহা দেখা যায় নাই। তিনি স্থির করিয়াছেন যে, উহা সাক্ষাৎ তিন লক্ষ মাইল উঠিয়াছিল। অতএব এই সৌরোৎপাতনিষ্কিপ্ত পদার্থ অদ্ভুত বটে—লক্ষযোজনব্যাপী মনোগতি, এক নতুন সৃষ্টির আদি।

আকাশে কত তারা আছে?

ঐ যে নীল নৈশ নভোমণ্ডলে অসংখ্য বিন্দু জ্বলিতেছে, ওগুন্নি কি?

ওগুন্নি তারা। তারা কি? প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে পাঠশালার ছাত্র মাষ্ট্রেই তৎক্ষণাৎ বলিবে যে, তারা সব সূর্য। সব সূর্য! সূর্য ত দেখিতে পাই বিশ্বদাহকর, প্রচণ্ডাকিরণমালার আকর; তৎপ্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবারও মনুষ্যের শক্তি নাই; কিন্তু তারা সব ত বিন্দু মাত্র; অধিকাংশ তাহাই নয়নগোচর হইয়া উঠে না। এমন বিসদৃশের মধ্যে সাদৃশ্য কোথায়? কোন প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বলিব যে, এগুন্নি সূর্য? এ কথা উত্তর পাঠশালার ছাত্রের দেয় নহে। এবং যাঁহারা আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রতি বিশেষ মনোযোগ করেন নাই, তাঁহারা এই কথাই অকস্মাৎ জিজ্ঞাসা করিবেন। তাঁহাদিগকে আমরা এক্ষণে ইহাই বলিতে পারি যে, এ কথা অলঙ্ঘ্য প্রমাণের দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে। সেই প্রমাণ কি, তাহা বিবৃত করা এস্থলে আমাদের উদ্দেশ্য নহে। যাঁহারা ইউরোপীয় জ্যোতির্বিদ্যার সম্যক্ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে সেই প্রমাণ এখানে বিবৃত করা নিষ্পয়োজন। যাঁহারা জ্যোতিষ সম্যক্ অধ্যয়ন করেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে সেই প্রমাণ বোধগম্য করা অতি দুরূহ ব্যাপার। বিশেষ দুইটি কঠিন কথা তাঁহাদিগকে বুঝাইতে হইবে; প্রথমতঃ কি প্রকারে নভঃস্থ জ্যোতিষ্কের দূরতা পরিমিত হয়; দ্বিতীয় আলোক-পরীক্ষক নামক আশ্চর্য যন্ত্র কি প্রকার, এবং কি প্রকারে ব্যবহৃত হয়।

সুতরাং সে বিষয়ে আমরা প্রবৃত্ত হইলাম না। সন্দিহান পাঠকগণের প্রতি আমাদের অনুরোধ, তাঁহারা ইউরোপীয় বিজ্ঞানের উপর বিশ্বাস করিয়া বিবেচনা করুন যে, এই আলোক-বিন্দুগুন্নি সকলই সৌর প্রকৃত। কেবল আত্যন্তিক দূরতাবশতঃ আলোকবিন্দুবৎ দেখায়।

এখন কত সূর্য এই জগতে আছে? এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করাই এখানে আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা পরিষ্কার চন্দ্রবিষয়ক নিশীথে নিম্নলিখিত নিরম্বদ আকাশমণ্ডল প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাই যে, আকাশে নক্ষত্র যেন আর ধরে না। আমরা বলি, নক্ষত্র অসংখ্য। বাস্তবিক কি নক্ষত্র অসংখ্য? বাস্তবিক শব্দ চক্ষে আমরা যে নক্ষত্র দেখিতে পাই, তাহা কি গণিয়া সংখ্যা করা যায় না?

ইহা অতি সহজ কথা। যে কেহ অধ্যবসায়রূঢ় হইয়া স্থিরাচিন্তে গণিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তিনিই সফল হইবেন। বস্তুতঃ দূরবীক্ষণ ব্যতীত যে তারাগুন্নি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অসংখ্য নহে—সংখ্যা এমন অধিকও নহে। তবে তারাসকল যে অসংখ্য বোধ হয়, তাহা উহার দৃশ্যতঃ বিশৃঙ্খলতাজন্য মাত্র। যাহা শ্রেণীবদ্ধ এবং বিন্যস্ত, তাহা অপেক্ষা যাহা শ্রেণীবদ্ধ নহে এবং অবিন্যস্ত, তাহা সংখ্যায় অধিক বোধ হয়। তারাসকল আকাশে শ্রেণীবদ্ধ এবং বিন্যস্ত নহে বলিয়াই আশু অসংখ্য বলিয়া বোধ হয়।

বস্তুতঃ যত তারা দূরবীক্ষণ ব্যতীত দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা ইউরোপীয় জ্যোতির্বিদ্যগণ কর্তৃক পুনঃ পুনঃ গণিত হইয়াছে। বার্লিন নগরে যত তারা ঐরূপে দেখা যায়, অর্গেলন্দর তাহার সংখ্যা করিয়া তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। সেই তালিকায় ৩২৫৬টি মাত্র তারা আছে।

পারিস নগর হইতে যত তারা দেখা যায়, হম্বোল্টের মতে তাহা ৪১৪৬টি মাত্র। গেলার্মির আকাশমণ্ডল নামক গ্রন্থে চক্ষুর্দৃশ্য তারার যে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা এই প্রকার;—

১ম শ্রেণী	২০
২য় শ্রেণী	৬৫
৩য় শ্রেণী	২০০
৫ম শ্রেণী	১১০০
৬ষ্ঠ শ্রেণী	৩২০০

৪৫৮৫

এই তালিকায় চতুর্থ শ্রেণীর তারার সংখ্যা নাই। তৎসমেত আন্দাজ ৫০০০ পাঁচ হাজার তারা শুধু চক্ষে দৃষ্ট হয়।

কিন্তু বিষুব রেখার যত নিকটে আসা যায়, তত অধিক তারা নয়নগোচর হয়। বার্লিন ও পারিস নগর হইতে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, এ দেশে তাহার অধিক তারা দেখা যায়, কিন্তু এ দেশেও ছয় সহস্রের অধিক দেখা যাওয়া সম্ভবপর নহে।

এককালীন আকাশের অর্দ্ধাংশ ব্যতীত আমরা দেখিতে পাই না। অপরাধ অধস্তলে থাকে। সুতরাং মনুষ্যচক্ষে এককালীন যত তারা দেখা যায়, তাহা তিন সহস্রের অধিক নহে।

এতক্ষণ আমরা কেবল শুধু চক্ষের কথা বলিতেছিলাম। যদি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আকাশমণ্ডল পর্যবেক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে বিস্মিত হইতে হয়। তখন অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে, তারা অসংখ্যই বটে। শুধু চোখে যেখানে দুই একটি মাত্র তারা দেখিয়াছি, দূরবীক্ষণে সেখানে সহস্র তারা দেখা যায়।

গেলার্মি এই কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য মিথুন রাশির একটি ক্ষুদ্রাংশের দুইটি চিত্র দিয়াছেন। ঐ স্থান বিনা দূরবীক্ষণে যে রূপ দেখা যায়, প্রথম চিত্রে তাহাই চিত্রিত আছে। তাহাতে পাঁচটি মাত্র নক্ষত্র দেখা যায়। দ্বিতীয় চিত্রে ইহা দূরবীক্ষণে যে রূপ দেখা যায়, তাহাই অঙ্কিত হইয়াছে। তাহাতে পাঁচটি তারার স্থানে তিন সহস্র দুই শত পাঁচটি তারা দেখা যায়।

দূরবীক্ষণের দ্বারাই বা কত তারা মনুষ্যের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার সংখ্যা ও তালিকা হইয়াছে। সুবিখ্যাত সর্ উইলিয়ম হর্শেল প্রথম এই কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বহুকালাবধি প্রতিরাতে আপন দূরবীক্ষণসমীপাগত তারাসকল গণনা করিয়া তাহার তালিকা করিতেন। এইরূপে ৩৪০০ বার আকাশ পর্যবেক্ষণের ফল তিনি প্রচার করেন। যতটা আকাশ চন্দ্র কর্তৃক ব্যাপ্ত হয়, তদ্রূপ আট শত গাগনিক খণ্ড মাত্র তিনি এই ৩৪০০ বারে পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। তাহাতে আকাশের ২৫০ ভাগের এক ভাগের অধিক হয় না। আকাশের এই ২৫০ ভাগের এক ভাগ মাত্র তিনি ১০০০০ অর্থাৎ প্রায় এক লক্ষ তারা গণনা করিয়াছেন। স্দুব নামা বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ গণনা করিয়াছেন যে, এইরূপে সমুদায় আকাশমণ্ডল পর্যবেক্ষণ করিয়া তালিকা নিবন্ধ করিতে অশীতি বৎসর লাগে।

তাহার পরে সর্ উইলিয়মের পুত্র সর্ জন হর্শেল ঐরূপ আকাশ সন্ধানে ব্রতী হইলেন। তিনি ২৩০০ বার আকাশ পর্যবেক্ষণ করিয়া আরও সম্প্রতি সহস্র তারা সংখ্যা করিয়াছিলেন।

অর্গেলন্ডর নবম শ্রেণী পর্যন্ত তারা স্বীয় তালিকাভুক্ত করিয়াছেন। তাহাতে সপ্তম শ্রেণীর ১৩০০০ তারা, অষ্টম শ্রেণীর ৪০০০০ তারা, এবং নবম শ্রেণীর ১৪২০০০ তারা। উচ্চতম শ্রেণীর সংখ্যা পূর্বে লিখিত হইয়াছে, কিন্তু এ সকল সংখ্যাও সামান্য। আকাশে পরিষ্কার রাতে এক স্থূল শ্বেত রেখা নদীর ন্যায় দেখা যায়। আমরা সচরাচর তাহাকে ছায়াপথ বলি। ঐ ছায়াপথ কেবল দৌরবীক্ষণিক নক্ষত্রসমষ্টি মাত্র। উহার অসীম দূরতাবশতঃ নক্ষত্রসকল দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু তাহার আলোকসমবায়ে ছায়াপথ শ্বেতবর্ণ দেখায়। দূরবীক্ষণে উহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারাময় দেখায়। সর্ উইলিয়ম হর্শেল গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, কেবল ছায়াপথমধ্যে ১৮,০০০,০০০ এক কোটি আশী লক্ষ তারা আছে।

স্দুব গণনা করেন যে, সমগ্র আকাশমণ্ডলে দুই কোটি নক্ষত্র আছে।

বিক্রম রচনাবলী

মস্‌র শাকোণাক্ বলেন, “সর্ উইলিয়ম হর্শেলের আকাশসন্ধান এবং রাশিচক্রের চিত্রাদি দেখিয়া, বেসেলের কৃত কটিবন্ধ সকলের তালিকার ভূমিকাতে যে রূপ গড়পড়তা করা আছে, তৎসম্বন্ধে উইসের কৃত নিয়মাবলম্বন করিয়া আমি ইহা গণনা করিয়াছি যে, সমুদায় আকাশে সাত কোটি সত্তর লক্ষ নক্ষত্র আছে।”

এই সকল সংখ্যা শুনিলে হতবুদ্ধি হইতে হয়। যেখানে আকাশে তিন হাজার নক্ষত্র দেখিয়া আমরা অসংখ্য নক্ষত্র বিবেচনা করি, সেখানে সাত কোটি সপ্ততি লক্ষের কথা দূরে থাকুক, দুই কোটিই কি ভয়ানক ব্যাপার।

কিন্তু ইহাতে আকাশের নক্ষত্রসংখ্যার শেষ হইল না। দূরবীক্ষণের সাহায্যে গগনাভ্যন্তরে কতকগুলি ক্ষুদ্র ধূম্রাকার পদার্থ দৃষ্ট হয়। উহাদিগকে নীহারিকা নাম প্রদত্ত হইয়াছে। যে সকল দূরবীক্ষণ অত্যন্ত শক্তিশালী, তাহার সাহায্যে এক্ষণে দেখা গিয়াছে যে, বহুসংখ্যক নীহারিকা কেবল নক্ষত্রপুঞ্জ। অনেক জ্যোতির্বিদ বলেন, যে সকল নক্ষত্র আমরা শুধু চক্ষু বা দূরবীক্ষণ দ্বারা গগনে বিকীর্ণ দেখিতে পাই, তৎসমুদায় একটি মাত্র নাক্ষত্রিক জগৎ। অসংখ্য নক্ষত্রময় ছায়াপথ এই নাক্ষত্রিক বিশ্বের অন্তর্গত। এমন অন্যান্য নাক্ষত্রিক জগৎ আছে। এই সকল দূর-দৃষ্ট তারাপুঞ্জময়ী নীহারিকা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাক্ষত্রিক জগৎ। সমুদ্রতীরে যেমন বালি, বনে যেমন পাতা, একটি নীহারিকাতে নক্ষত্ররাশি তেমনি অসংখ্য এবং ঘনবিন্যস্ত। এই সকল নীহারিকাসত্ত্ব নক্ষত্রসংখ্যা ধরিলে সাত কোটি সত্তর লক্ষ কোথায় ভাসিয়া যায়। কোটি কোটি নক্ষত্র আকাশমণ্ডলে বিচরণ করিতেছে বলিলে অত্যাশ্চর্য হইয়া উঠে। এই আশ্চর্য ব্যাপার ভাবিতে ভাবিতে মনুষ্যবুদ্ধি চিন্তায় অশক্ত হইয়া উঠে। চিত্ত বিস্ময়বিহ্বল হইয়া যায়। সর্বপ্রগামিনী মনুষ্যবুদ্ধিরও গগনসীমা দেখিয়া চিত্ত নিরস্ত হয়।

এই কোটি কোটি নক্ষত্র সকলই সূর্য। আমরা যে এক সূর্যকে সূর্য বলি, সে কত বড় প্রকাণ্ড বস্তু, তাহা সৌরবিপ্লব সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা পৃথিবী অপেক্ষা ত্রয়োদশ লক্ষ গুণ বৃহৎ। নাক্ষত্রিক জগৎমধ্যস্থ অনেকগুলি নক্ষত্র যে, এ সূর্য্যাপেক্ষাও বৃহৎ, তাহা এক প্রকার স্থির হইয়াছে। এমন কি, সিরিয়স (Sirius) নামে নক্ষত্র এই সূর্য্যের ২৬৬৮ গুণ বৃহৎ, ইহা স্থির হইয়াছে। কোন কোন নক্ষত্র যে, এ সূর্য্যাপেক্ষা আকারে কিছু ক্ষুদ্রতর, তাহাও গণনা দ্বারা স্থির হইয়াছে। এইরূপ ছোট বড় মহাভয়ঙ্কর আকারবিশিষ্ট, মহাভয়ঙ্কর তেজোময় কোটি কোটি সূর্য্য অনন্ত আকাশে বিচরণ করিতেছে। যেমন আমরা সৌরজগতের মধ্যবর্তী সূর্য্যকে ঘেরিয়া গ্রহ উপগ্রহাদি বিচরণ করিতেছে, তেমনি ঐ সকল সূর্য্যপার্শ্বে গ্রহ উপগ্রহাদি ভ্রমিতেছে, সন্দেহ নাই। তবে জগতে জগতে কত কোটি কোটি সূর্য্য, কত কোটি কোটি পৃথিবী, তাহা কে ভাবিয়া উঠিতে পারে? এ আশ্চর্য কথা কে বুদ্ধিতে ধারণা করিতে পারে? যেমন পৃথিবীর মধ্যে এক কণা বালুকা, জগৎমধ্যে এই সসাগরা পৃথিবী তদপেক্ষাও সামান্য, রেণুমাত্র,—বালুকাকার বালুকাও নহে। তদুপরি মনুষ্য কি সামান্য জীব! এ কথা ভাবিয়া কে আর আপন মনুষ্যত্ব লইয়া গর্ব করিবে?

ধূলা

ধূলার মত সামান্য পদার্থ আর সংসারে নাই। কিন্তু আচার্য্য টিন্ডল ধূলা সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়াছেন। আচার্য্যের ঐ প্রবন্ধটি দীর্ঘ এবং দূরূহ, তাহা সংক্ষেপে এবং সহজে বুঝান অতি কঠিন কর্ম্ম। আমরা কেবল টিন্ডল সাহেবকৃত সিদ্ধান্তগুলিই এ প্রবন্ধে সন্নিবেশিত করিব, যিনি তাহার প্রমাণ জিজ্ঞাসু হইবেন, তাহাকে আচার্য্যের প্রবন্ধ পাঠ করিতে হইবে।

১। ধূলা, এই পৃথিবীতে এক প্রকার সর্বব্যাপী। আমরা যাহা যত পরিষ্কার করিয়া রাখি না কেন, তাহা মূহূর্ত্ত জন্য ধূলা ছাড়া নহে। যত “বাবুগিরি” করি না কেন, কিছুতেই ধূলা হইতে নিষ্কৃতি নাই। যে বায়ু অত্যন্ত পরিষ্কার বিবেচনা করি, তাহাও ধূলায় পূর্ণ। সচরাচর ছায়ামধ্যে কোন রঙ্গ-নির্পতিত রোদ্রে দেখিতে পাই, যে বায়ু পরিষ্কার দেখাইতেছিল, তাহাতেও ধূলা চিক্‌চিক্ করিতেছে। সচরাচর বায়ু যে এরূপ ধূলাপূর্ণ, তাহা জানিবার জন্য আচার্য্য টিন্ডলের উপদেশের আবশ্যিকতা নাই, সকলেই তাহা জানে। কিন্তু বায়ু ছাঁকা যায়।

আচার্য্য বহুবিধ উপায়ের দ্বারা বায়ু অতি পরিপাটী করিয়া ছাঁকিয়া দেখিয়াছেন। তিনি অনেক চোঙ্গার ভিতর দ্রাবকাঁদি পুরিয়া তাহার ভিতর দিয়া বায়ু ছাঁকিয়া লইয়া গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, তাহাও ধূলায় পরিপূর্ণ। এইরূপ ধূলা অদৃশ্য; কেন না, তাহার কণাসকল অতি ক্ষুদ্র। রোঁদ্রেও উহা অদৃশ্য। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারাও অদৃশ্য, কিন্তু বৈদ্যুতিক প্রদীপের আলোক রোঁদ্রাপেক্ষাও উজ্জ্বল। উহার আলোক ঐ ছাঁকা বায়ুর মধ্যে প্রেরণ করিয়া তিনি দেখিয়াছেন যে, তাহাতেও ধূলা চিক্‌চিক্‌ করিতেছে। যদি এত যত্নপরিষ্কৃত বায়ুতেও ধূলা, তবে সচরাচর ধনী লোকে যে ধূলা নিবারণ করিবার উপায় করেন, তাহাতে ধূলা নিবারণ হয় না, ইহা বলা বাহুল্য। ছায়ামধ্যে রোঁদ্র না পড়িলে রোঁদ্রে ধূলা দেখা যায় না, কিন্তু রোঁদ্রমধ্যে উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকের রেখা প্রেরণ করিলে ঐ ধূলা দেখা যায়। অতএব আমরা যে বায়ু মূহূর্ত্তে মূহূর্ত্তে নিশ্বাসে গ্রহণ করিতেছি, তাহা ধূলিপূর্ণ। যাহা কিছু ভোজন করি, তাহা ধূলিপূর্ণ; কেন না, বায়ুস্থিত ধূলিরাশি দিবারাত্র সকল পদার্থের উপর বর্ষণ হইতেছে। আমরা যে কোন জল পরিষ্কৃত করি না কেন, উহা ধূলিপূর্ণ। কলিকাতার জল পলতার কলে পরিষ্কৃত হইতেছে বলিয়া তাহা ধূলিশূন্য নহে। ছাঁকিলে ধূলা যায় না।

২। এই ধূলা বাস্তবিক সমুদায়ংশই ধূলা নহে। তাহার অনেকাংশ জৈব পদার্থ। যে সকল অদৃশ্য ধূলিকণার কথা উপরে বলা গেল, তাহার অধিক ভাগ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব। যে ভাগ জৈব নহে, তাহা অধিকতর গুরুত্ববিশিষ্ট; এজন্য তাহা বায়ুপরি তত ভাসিয়া বেড়ায় না। অতএব আমরা প্রতি নিশ্বাসে শত শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব দেহমধ্যে গ্রহণ করিয়া থাকি; জলের সঙ্গে সহস্র সহস্র পান করি; রান্ধসবৎ অনেককে আহার করি। লন্ডনের আর্টটি কোম্পানীর কলে ছাঁকা পানীয় জল টিঙল সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন তিনি আরও অনেক প্রকার জল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। তিনি পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, জল সম্পূর্ণ-রূপে পরিষ্কার করা মনুষ্য-সাধ্যাতীত। যে জল স্ফাটিক পাত্রে রাখিলে বৃহৎ হীরকখণ্ডের ন্যায় স্বচ্ছ বোধ হয়, তাহাও সমল, কীটানুপূর্ণ। জৈনেরা একথা স্মরণ রাখিবেন।

৩। এই সর্বব্যাপী ধূলিকণা সংক্রামক পীড়ার মূল। অনতিপূর্বে সর্বত্র এই মত প্রচলিত ছিল যে, কোন এক প্রকার পচনশীল নিম্জীবি জৈব পদার্থ (Malaria) কর্তৃক সংক্রামক পীড়ার বিস্তার হইয়া থাকে। এ মত ভারতবর্ষে অদ্যাপি প্রবল। ইউরোপে এ বিশ্বাস এক প্রকার উচ্ছিন্ন হইতেছে। আচার্য্য টিঙল প্রভৃতির বিশ্বাস এই যে, সংক্রামক পীড়ার বিস্তারের কারণ সজীব পীড়াবীজ (Germ)। ঐ সকল পীড়াবীজ বায়ুতে এবং জলে ভাসিতে থাকে; এবং শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তথায় জীবজনক হয়। জীবের শরীরমধ্যে অসংখ্য জীবের আবাস। কেশে উৎকৃণ, উদরে কৃমি, ক্ষতে কীট, এই কয়টি মনুষ্য-শরীরে সাধারণ উদাহরণ। পশু মাত্রেই গাত্রমধ্যে কীটসমূহের আবাস। জীবতত্ত্ববিদেরা অবধারিত করিয়াছেন যে, ভূমে, জলে বা বায়ুতে যত জাতীয় জীব আছে, তদপেক্ষা অধিক জাতীয় জীব অন্য জীবের শরীরবাসী। যাহাকে উপরে “পীড়াবীজ” বলা হইয়াছে, তাহাও জীবশরীরবাসী জীব বা জীবোৎপাদক বীজ। শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তদুৎপাদ্য জীবের জন্ম হইতে থাকে। এই সকল শোণিতনিবাসী জীবের জনকতান্ত্র অতি ভয়ানক। যাহার শরীরমধ্যে ঐ প্রকার পীড়াবীজ প্রবিষ্ট হয়, সে সংক্রামক পীড়াগ্রস্ত হয়। ভিন্ন ভিন্ন পীড়ার ভিন্ন ভিন্ন বীজ। সংক্রামক জ্বরের বীজে জ্বর উৎপন্ন হয়; বসন্তের বীজে বসন্ত জন্মে; ওলাউঠার বীজে ওলাউঠা; ইত্যাদি।

৪। পীড়াবীজে কেবল সংক্রামক রোগ উৎপন্ন হয়, এমত নহে। ক্ষতাদি যে শুকায় না, ক্রমে পচে, দুর্গন্ধ হয়, দুরারোগ্য হয়, ইহাও অনেক সময়ে এই সকল ধূলিকণারূপী পীড়াবীজের জন্য। ক্ষতমুখে কখনই এমত আচ্ছন্ন রাখা যাইতে পারে না যে, অদৃশ্য ধূলা তাহাতে লাগিবে না। নিতান্ত পক্ষে তাহা ডাক্তারের অস্ত্র-মুখে ক্ষতমধ্যে প্রবেশ করিবে। ডাক্তার যতই অস্ত্র পরিষ্কার রাখুন না কেন, অদৃশ্য ধূলিপূঞ্জের কিছুতেই নিবারণ হয় না। কিন্তু ইহার একটি সুন্দর উপায় আছে। ডাক্তারেরা প্রায় তাহা অবলম্বন করেন। কার্বলিক আর্সিড নামক দ্রাবক বীজঘাতী; তাহা জল মিশাইয়া ক্ষতমুখে বর্ষণ করিতে থাকিলে প্রবিষ্ট বীজসকল মরিয়া যায়। ক্ষতমুখে পরিষ্কৃত তুলা বাঁধিয়া রাখিলেও অনেক উপকার হয়; কেন না, তুলা বায়ু পরিষ্কৃত করিবার একটি উৎকৃষ্ট উপায়।

গগনপর্যটন

পুরাণ ইতিহাসাদিতে কথিত আছে, পূর্বকালে ভারতবর্ষীয় রাজগণ আকাশ-মার্গে রথ চলাইতেন। কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষদিগের কথা স্বতন্ত্র, তাঁহারা সচরাচর এপাড়া ওপাড়ার ন্যায়, স্বর্গলোকে বেড়াইতে যাইতেন; কথায় কথায় সমুদ্রকে গন্ডুষ করিয়া ফেলিতেন; কেহ জগদীশ্বরকে অভিশপ্ত করিতেন, কেহ তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতেন। প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের কথা স্বতন্ত্র; সামান্য মনুষ্যদিগের কথা বলা যাউক।

সামান্য মনুষ্যের চিরকাল বড় সাধ গগন পর্যটন করে। কথিত আছে, তারস্তুম নগরবাসী আর্কাইতস নামক এক ব্যক্তি ৪০০ খ্রীষ্টাব্দে একটি কাষ্ঠের পক্ষী প্রস্তুত করিয়াছিল; তাহা কিয়ৎক্ষণ জন্য আকাশে উঠিতে পারিয়াছিল। ৬৬ খ্রীষ্টাব্দে, সাইমন নামক এক ব্যক্তি রোম নগরে প্রাসাদ হইতে প্রাসাদে উড়িয়া বেড়াইবার উদ্যোগ পাইয়াছিল। এবং তৎপরে কনস্টান্টিনোপল নগরে একজন মুসলমান ঐরূপ চেষ্টা করিয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে দান্তে নামক একজন গণিতশাস্ত্রবিৎ পক্ষ নিষ্কারণ করিয়া আপন অঙ্গে সমাবেশ করিয়া থ্রাসিমীন হুদের উপর উঠিয়া গগনমার্গে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ঐরূপ করিতে করিতে এক দিন এক উচ্চ অট্টালিকার উপর পড়িয়া তাঁহার পদ ভগ্ন হয়। মাম্-স্বরিনিবাসী অলিবর নামক একজন ইংরেজেরও সেই দশা ঘটে। ১৬৩৮ সালে গোল্ড্-উইন নামক এক ব্যক্তি শিক্ষিত হংসদিগের সাহায্যে উড়িতে চেষ্টা করেন। ১৬৭৮ সালে বেনিয়র নামক একজন ফরাসী পক্ষ প্রস্তুতপূর্বক হস্ত পদে বাঁধিয়া উড়িয়াছিল। ১৭১০ সালে লরেন্স দে গুজ্‌মান নামক একজন ফরাসী দারুনির্মিত বায়ুপূর্ণ পক্ষীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আকাশে উঠিয়াছিল। মাকুইস্ দে বার্কবিল নামক একজন আপন অট্টালিকা হইতে উড়িতে চেষ্টা করিয়া নদীগর্ভে পতিত হন। বানসার্ডেরও এই দশা ঘটিয়াছিল।

১৭৬৭ সালে বিখ্যাত রসায়নবিদ্যার আচার্য ডাক্তার বাক প্রচার করেন যে, জলজন বায়ু-পরিপূর্ণ পাত্র আকাশে উঠিতে পারে। আচার্য কাবালো ইহা পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণীকৃত করেন, কিন্তু তখনও ব্যোমযানের কল্পনা হয় নাই।

ব্যোমযানের সৃষ্টিকর্তা মোনগোল্‌ফীর নামক ফরাসী। কিন্তু তিনি জলজন বায়ুর সাহায্য অবলম্বন করেন নাই। তিনি প্রথমে কাগজের বা বস্ত্রের গোলক নিষ্কারণ করিয়া তন্মধ্যে উত্তপ্ত বায়ু পূরিতেন। উত্তপ্ত হইলে বায়ু লঘুতর হয়, সুতরাং তৎসাহায্যে গোলকসকল উদ্ধে উঠিত। আচার্য চার্লস প্রথমে জলজন বায়ুপূর্ণিত ব্যোমযানের সৃষ্টি করেন। গ্লোব নামক ব্যোমযানে উক্ত বায়ু পূর্ণ করিয়া প্রেরণ করেন; তাহাতে সাহস করিয়া কোন মনুষ্য আরোহণ করে নাই। রাজপুরুষেরাও প্রাণহত্যার ভয়প্রযুক্ত কাহাকেও আরোহণ করিতে দেন নাই। এই ব্যোমযান কিয়দ্দূর উঠিয়া ফাটিয়া যায়, জলজন বাহির হইয়া যাওয়ায়, ব্যোমযান তৎক্ষণাৎ ভূপতিত হয়। গোনেস নামক ক্ষুদ্র গ্রামে উহা পতিত হয়। অদৃষ্টপূর্বক খেচর দেখিয়া, গ্রাম্য লোকে ভীত হইয়া, মহা কোলাহল আরম্ভ করে।

অনেকে একত্রিত হইয়া গ্রাম্য লোকেরা দেখিতে আইল যে, কিরূপ জন্তু আকাশ হইতে নামিয়াছে। দুই জন ধর্ম্মযাজক বলিলেন যে, ইহা কোন অলৌকিক জীবের দেহাবশিষ্ট চর্ম্ম। শূনিয়া গ্রামবাসীগণ তাহাতে ঢিল মারিতে আরম্ভ করিল, এবং খোঁচা দিতে লাগিল। তন্মধ্যে ভূত আছে, বিবেচনা করিয়া, গ্রাম্য লোকেরা ভূত শাস্তির জন্য দলবদ্ধ হইয়া মন্ত্র পাঠপূর্বক গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল, পরিশেষে মন্ত্রবলে ভূত ছাড়িয়া পলায় কি না দেখিবার জন্য, আবার ধীরে ধীরে সেইখানে ফিরিয়া আসিল। ভূত তথাপি যায় না—বায়ুসংস্পর্শে নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী করে। পরে একজন গ্রাম্য বীর, সাহস করিয়া তৎপ্রতি বন্দুক ছাড়িল। তাহাতে ব্যোমযানের আবরণ ছিদ্রবিশিষ্ট হওয়াতে, বায়ু বাহির হইয়া, রাক্ষসের শরীর আরও শীর্ণ হইল। দেখিয়া সাহস পাইয়া, আর একজন বীর গিয়া তাহাতে অস্ত্রাঘাত করিল। তখন ক্ষতমুখ দিয়া বহুল পরিমাণে জলজন নির্গত হওয়ায়, বীরগণ তাহার দুর্গন্ধে ভয় পাইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। কিন্তু এ জাতীয় রাক্ষসের শোণিত ঐ বায়ু। তাহা ক্ষতমুখে নির্গত হইয়া গেলে, রাক্ষস ছিন্নমুণ্ড ছাগের ন্যায় “খড়ফড়” করিয়া মরিয়া গেল। তখন বীরগণ প্রত্যাগত হইয়া তাহাকে অশ্বপৃষ্ঠে বন্ধনপূর্বক লইয়া গেলেন। এদেশে হইলে সঙ্গে সঙ্গে একটি

রক্ষাকালী পূজা হইত, এবং ব্রাহ্মণেরা চণ্ডীপাঠ করিয়া কিছু লাভ করিতেন। তার পরে, মোনগোল্‌ফীর আবার আগ্নেয় ব্যোমযান (অর্থাৎ যাহাতে জলজন না পূরিয়া, উত্তপ্ত সামান্য বায়ু পূরিত হয়) বর্ষে ল হইতে প্রেরণ করিলেন। তাহাতে আধুনিক বেলুনের ন্যায় একখানি “রথ” সংযোজন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু সে বারও মনুষ্য উঠিল না। সেই রথে চড়িয়া একটি মেঘ, একটি কুর্কুট ও একটি হংস স্বর্গ পরিভ্রমণে গমন করিয়াছিল। পরে স্বচ্ছন্দে গগনবিহার করিয়া, তাহারা সশরীরে মর্ত্যধামে ফিরিয়া আসিয়াছিল। তাহারা পূণ্যবান্ সন্দেহ নাই।

এক্ষণে ব্যোমযানে মনুষ্য উঠিবার প্রস্তাব হইতে লাগিল। কিন্তু প্রাণহত্যার আশঙ্কায় ফ্রান্সের অধিপতি, তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় যে, যদি ব্যোমযানে মনুষ্য উঠে, তবে যাহারা বিচারালয়ে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞাধীন হইয়াছে, এমত দুই ব্যক্তি উঠুক—মরে মরিবে। শূনিয়া পিলাতর দে রোজীর নামক একজন বৈজ্ঞানিকের বড় রাগ হইল—“কি! আকাশ-মার্গে প্রথম ভ্রমণ করার যে গৌরব, তাহা দুর্ভাগ্য নরাদমদিগের কপালে ঘটিবে!” একজন রাজ-পুরুষের সাহায্যে রাজার মত ফিরাইয়া তিনি মাকুইস দালান্দের সমাভিব্যাহারে ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া আকাশপথে পর্যটন করেন। সে বার নির্ব্বিঘ্নে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার দুই বৎসর পরে—আবার ব্যোমযানে আরোহণপূর্ব্বক, সমুদ্র পার হইতে গিয়া, অধঃপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। যাহা হউক, তিনিই মনুষ্যমধ্যে প্রথম গগন-পর্যটক। কেন না, দুস্মন্ত, পুরুরবা, কৃষ্ণাজর্জন প্রভৃতিকে মনুষ্য বিবেচনা করা অতি ধৃষ্টের কাজ! আর যিনি জয় রাম বলিয়া পঞ্চমবায়ুপথে সমুদ্র পার হইয়াছিলেন, তিনিও মনুষ্য নহেন, নচেৎ তাঁহাকে এই পদে অভিষিক্ত করার আমাদিগের আপত্তি ছিল না।

দে রোজীরের পরেই চার্লস্ ও রবার্ট একত্রে, রাজভবন হইতে, ছয় লক্ষ দর্শকের সমক্ষে জলজনীয় ব্যোমযানে উড়ান হইলেন। এবং প্রায় ১৪০০০ ফিট উদ্ধে উঠেন।

ইহার পরে ব্যোমযানারোহণ বড় সচরাচর ঘটিতে লাগিল। কিন্তু অধিকাংশই আমোদের জন্য। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব পরীক্ষার্থ যাহারা আকাশ-পথে বিচরণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ১৮০৪ সালে গাই লুসাকের আরোহণই বিশেষ বিখ্যাত। তিনি একাকী ২৩০০০ ফিট উদ্ধে উঠিয়া নানাবিধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মীমাংসা করিয়াছিলেন। ১৮৩৬ সালে গ্রীন এবং হলন্ড সাহেব, পনের দিবসের খাদ্যাদি বেলুনে তুলিয়া লইয়া, ইংলন্ড হইতে গগনারোহণ করেন। তাঁহারা সমুদ্র পার হইয়া, আঠার ঘণ্টার মধ্যে জর্মানীর অন্তর্গত উইলবর্গ নামক নগরের নিকট অবতরণ করেন। গ্রীন অতি প্রসিদ্ধ গগন-পর্যটক ছিলেন। তিনি প্রায় চতুর্দশ শত বার গগনারোহণ করিয়াছিলেন। তিনবার, বায়ুপথে সমুদ্রপার হইয়াছিলেন—অতএব, কলিয়ুগেও রামায়ণের দৈববলসম্পন্ন কার্যসকল পুনঃ সম্পাদিত হইতেছে। গ্রীন দুইবার সমুদ্রমধ্যে পতিত হইলেন—এবং কোশলে প্রাণরক্ষা করেন। কিন্তু বোধ হয়, জেম্‌স্‌গ্লেসের অপেক্ষা কেহ অধিক উদ্ধে উঠিতে পারেন নাই। তিনি ১৮৬২ সালে উল্ভার্টাম্টন হইতে উড়ান হইয়া প্রায় সাত মাইল উদ্ধে উঠিয়াছিলেন। তিনি বহুশতবার গগনোপরি ভ্রমণপূর্ব্বক, বহুবিধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের পরীক্ষা করিয়াছিলেন। সম্প্রতি আমেরিকার গগন-পর্যটক ওয়াইজ সাহেব, ব্যোমযানে আমেরিকা হইতে আর্টল্যান্টিক মহাসাগর পার হইয়া ইউরোপে আসিবার কল্পনায়, তাহার যথাযোগ্য উদ্যোগ করিয়া যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু সমুদ্রোপরি আসিবার পূর্ব্ব বাত্যা মধ্যে পতিত হইয়া অবতরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু সাহস অতি ভয়ানক!

পাঠকদিগের অদৃষ্টে সহসা যে গগন-পর্যটন-সুখ ঘটিবে, এমত বোধ হয় না, এজন্য গগন-পর্যটকেরা আকাশে উঠিয়া কিরূপ দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহা তাঁহাদিগের প্রণীত পুস্তকাদি হইতে সংগ্রহ করিয়া এস্থলে সন্নিবেশ করিলে বোধ হয়, পাঠকেরা অসন্তুষ্ট হইবেন না। সমুদ্র নামটি কেবল জল-সমুদ্রের প্রতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে; কিন্তু যে বায়ু কর্তৃক পৃথিবী পরিবেষ্টিত, তাহাও সমুদ্রবিশেষ, জলসমুদ্র হইতে ইহা বৃহত্তর। আমরা এই বায়বীয় সমুদ্রের তলচর জীব। ইহাতেও মেঘের উপস্থাপ, বায়ুর স্রোতঃ প্রভৃতি আছে। তদ্বিষয়ে কিছু জানিলে ক্ষতি নাই।

ব্যোমযান অল্প উচ্চ গিয়াই মেঘসকল বিদীর্ণ করিয়া উঠে। মেঘের আবরণে পৃথিবী দেখা যায় না, অথবা কদাচিৎ দেখা যায়। পদতলে অচ্ছিন্ন, অনন্ত দ্বিতীয় বসুন্ধরাবৎ মেঘজাল বিস্তৃত। এই বাষ্পীয় আবরণে ভূগোলক আবৃত; যদি গ্রহান্তরে জ্ঞানবান্ জীব থাকে, তবে তাহারা

বাংকম রচনাবলী

পৃথিবীর বাষ্পীয়াবরণই দেখিতে পায়; পৃথিবী তাহাদিগের প্রায় অদৃশ্য। তদ্রূপ আমরাও বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহগণের রৌদ্রপ্রদীপ্ত, রৌদ্রপ্রতিঘাতী, বাষ্পীয় আবরণই দেখিতে পাই। আধুনিক জ্যোতির্বিদগণের এইরূপ অনুমান।

এইরূপ, পৃথিবী হইতে সম্বন্ধরহিত হইয়া, মেঘময় জগতের উপরে স্থিত হইয়া দেখা যায় যে, সর্বত্র জীবশূন্য, শব্দশূন্য, গতিশূন্য, স্থির, নীরব। মস্তকোপরে আকাশ অতি নিবিড় নীল—সে নীলিমা আশ্চর্য্য। আকাশ বস্তুতঃ চিরানুকর—উহার বর্ণ গভীর কৃষ্ণ। অমাবস্যার রাতে প্রদীপশূন্য গৃহমধ্যে সকল দ্বার ও গবাক্ষ রুদ্ধ করিয়া থাকিলে যে রূপ অন্ধকার দেখিতে পাওয়া যায়, আকাশের প্রকৃত বর্ণ তাহাই। তন্মধ্যে স্থানে স্থানে নক্ষত্রসকল প্রচণ্ড জ্বালাবিশিষ্ট। কিন্তু তদালোকে অনন্ত আকাশের অনন্ত অন্ধকার বিনষ্ট হয় না—কেন না, এই সকল প্রদীপ বহুদূরস্থিত। তবে যে আমরা আকাশকে অন্ধকারময় না দেখিয়া উজ্জ্বল দেখি, তাহার কারণ বায়ু। সকলেই জানেন, সূর্যালোক সম্পূর্ণময়। স্ফটিকের দ্বারা বর্ণগুলি পৃথক্ করা যায়—সপ্ত বর্ণের সংমিশ্রণে সূর্যালোক। বায়ু জড় পদার্থ, কিন্তু বায়ু আলোকের পথ রোধ করে না। বায়ু সূর্যালোকের অন্যান্য বর্ণের পথ ছাড়িয়া দেয়, কিন্তু নীলবর্ণকে রুদ্ধ করে। রুদ্ধ বর্ণ, বায়ু হইতে প্রতিহত হয়। সেই সকল প্রতিহত বর্ণাঙ্ক আলোক-রেখা আমাদের চক্ষুতে প্রবেশ করায়, আকাশ উজ্জ্বল নীলিমাবিশিষ্ট দেখি—অন্ধকার দেখি না।* কিন্তু যত উদ্ধেৰ্ উঠা যায়, বায়ুস্তর তত ক্ষীণতর হয়, গাগনিক উজ্জ্বল নীলবর্ণ ক্ষীণতর হয়; আকাশের কৃষ্ণ কিছু কিছু সেই আবরণ ভেদ করিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্য উদ্ধেৰ্লোকে গাঢ় নীলিমা।

শিরে এই গাঢ় নীলিমা—পদতলে, তুঙ্গ শৃঙ্গবিশিষ্ট পর্বতমালায় শোভিত মেঘলোক—সে পর্বতমালাও বাষ্পীয়—মেঘের পর্বত—পর্বতের উপর পর্বত, তদুপরি আরও পর্বত—কেহ বা কৃষ্ণমধ্য, পার্শ্বদেশ রৌদ্রের প্রভাবিশিষ্ট—কেহ বা রৌদ্রম্নাত, কেহ যেন শ্বেত প্রস্তর-নির্মিত, কেহ যেন হীরক-নির্মিত। এই সকল মেঘের মধ্য দিয়া ব্যোমযান চলে। তখন, নীচে মেঘ, উপরে মেঘ, দক্ষিণে মেঘ, বামে মেঘ, সম্মুখে মেঘ, পশ্চাতে মেঘ। কোথাও বিদ্যুৎ চমকিতেছে, কোথাও ঝড় বহিতেছে, কোথাও বৃষ্টি হইতেছে, কোথাও বরফ পড়িতেছে। মসুর ফন্‌বিল একবার একটি মেঘগর্ভস্থ রক্ত দিয়া ব্যোমযানে গমন করিয়াছিলেন; তাহার কৃত বর্ণনা পাঠ করিয়া বোধ হয়, যেমন মসুরের পথে পর্বতমধ্য দিয়া, বাষ্পীয় শকট গমন করে, তাহার ব্যোমযান মেঘমধ্য দিয়া সেইরূপ পথে গমন করিয়াছিল।

এই মেঘলোকে সূর্য্যোদয় এবং সূর্য্যাস্ত অতি আশ্চর্য্য দৃশ্য—ভুলোকে তাহার সাদৃশ্য অনুমিত হয় না। ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া অনেকে এক দিনে দুইবার সূর্য্যাস্ত দেখিয়াছেন। এবং কেহ কেহ এক দিনে দুইবার সূর্য্যোদয় দেখিয়াছেন। একবার সূর্য্যাস্তের পর রাত্রিসমাগম দেখিয়া, আবার ততোধিক উদ্ধেৰ্ উঠিলে দ্বিতীয় বার সূর্য্যাস্ত দেখা যাইবে এবং একবার সূর্য্যোদয় দেখিয়া, আবার নিম্নে নামিলে সেই দিন দ্বিতীয় বার সূর্য্যোদয় অবশ্য দেখা যাইবে।

ব্যোমযান হইতে যখন পৃথিবী দেখা যায়, তখন উহা বিস্তৃত মানচিত্রের ন্যায় দেখায়; সর্বত্র সমতল—অট্টালিকা, বৃক্ষ, উচ্চভূমি এবং অল্পোন্নত মেঘও, যেন সকলই অনুচ্চ, সকলই সমতল। ভূমিতে চিত্রিতবৎ দেখায়। নগরসকল যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গঠিত প্রতিকৃতি, চলিয়া যাইতেছে বোধ হয়। বৃহৎ জনপদ উদ্যানের মত দেখায়। নদী শ্বেত সূত্র বা উরগের মত দেখায়। বৃহৎ অর্ণব্যানসকল বালকের ক্রীড়ার জন্য নির্মিত তরণীর মত দেখায়। যাঁহারা লন্ডন বা পারিস নগরীর উপর উত্থান করিয়াছেন, তাঁহারা দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন,—তাঁহারা প্রশংসা করিয়া ফুরাইতে পারেন নাই। গ্লেশর সাহেব লিখিয়াছিলেন যে, তিনি লন্ডনের উপরে উঠিয়া এককালে গ্রিশ লক্ষ মনুষ্যের বাস-গৃহ নয়নগোচর করিয়াছিলেন। রাত্রিকালে মহানগরীসকলের রাজপথস্থ দীপমালাসকল অতি রমণীয় দেখায়।

যাঁহারা পর্বতে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, যত উদ্ধেৰ্ উঠা যায়, তত তাপের অল্পতা। শিমলা, দারজালং প্রভৃতি পার্বত্য স্থানের শীতলতার কারণ এই। এবং এই জন্য হিমালয় তুষারমণ্ডিত। (আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যে হিমকে ভারতবর্ষীয় কবি “একো হি দোষো

* কেহ কেহ বলেন যে, বায়ুমধ্যস্থ জলবাষ্প হইতে প্রতিহত নীল রশ্মিরেখাই আকাশের উজ্জ্বল নীলিমার কারণ।

গুণসম্মিপাতে” বিবেচনা করিয়াছিলেন, আধুনিক রাজপুরুষেরা, তাহাকেও গুণ বিবেচনা করিয়া তথায় রাজধানী সংস্থাপন করিয়াছেন।) ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া উদ্ভেদ উত্থান করিলেও ঐরূপ ক্রমে হিমের আতিশয্য অনুভূত হয়। তাপ, তাপমান যন্ত্রের দ্বারা মিত হইয়া থাকে। যন্ত্র ভাগে ভাগে বিভক্ত। মনুষ্যশোণিত কিছুর উষ্ণ, তাহার পরিমাণ ৯৮ ভাগ। ২১২ ভাগ তাপে জল বাষ্প হয়। ৩২ ভাগ তাপে জল তুষারস্থ প্রাপ্ত হয়। (তাপে জল তুষার হয়, এ কোন কথা? বাস্তবিক তাপে জল তুষার হয় না, তাপাভাবেই হয়। ৩২ ভাগ তাপ, জলের স্বাভাবিক তাপের অভাববাচক।)

পূর্বে বিজ্ঞানবিদগণের সংস্কার ছিল যে, উদ্ভেদ তিন শত ফিট প্রতি এক ভাগ তাপ কমে। অর্থাৎ তিন শত ফিট উঠিলে এক ভাগ তাপহানি হইবে—ছয় শত ফিট উঠিলে দুই ভাগ তাপ কমিবে—ইত্যাদি। কিন্তু গ্লেশর সাহেব বহুবার পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, উদ্ভেদ তাপহানি এরূপ একটি সরল নিয়মানুগামী নহে। অবস্থাবিশেষে তাপহানির লাঘব গৌরব ঘটিয়া থাকে। মেঘ থাকিলে, তাপহানি অল্প হয়—কারণ, মেঘ তাপরোধক এবং তাপগ্রাহক। আবার দিবাভাগে ঘেরূপ তাপহানি ঘটে, রাত্রে সেরূপ নহে। গ্লেশর সাহেবের পরীক্ষার ফল নিম্নলিখিত মত—

ভূমি হইতে হাজার ফিট পর্যন্ত মেঘাচ্ছন্নাবস্থায় তাপহানির পরিমাণ ৪.৫ ভাগ, মেঘ না থাকিলে ৬.২ ভাগ, দশ হাজার ফিট পর্যন্ত, মেঘাচ্ছন্নাবস্থায় ২.২ ভাগ, মেঘ না থাকিলে ২ ভাগ। বিশ হাজার ফিট উদ্ভেদ, মেঘাচ্ছন্নে ১.১ ভাগ; মেঘ শূন্যে ১.২ ভাগ। বিশ হাজার ফিট উদ্ভেদ মোট ৬.২ ভাগ তাপহাস পরীক্ষিত হইয়াছিল ইত্যাদি। তাপহাস হেতু উদ্ভেদ স্থানে স্থানে তুষার-কণা (Snow) দৃষ্ট হয়; এবং ব্যোমযান কখন কখন তন্মধ্যে পতিত হয়। উদ্ভেদ শীতাদিক্য, অনেক সময়ে যানারোহীদের কষ্টকর হইয়া উঠে—এমন কি, অনেক সময়ে হাত পা অবশ হয়, এবং চেতনা অপহৃত হয়।

উদ্ভেদ তাপাভাবের কারণ, তপ্ত বা তাপ্য সামগ্রীর অভাব। রৌদ্র ভূমে যেমন প্রখর, উদ্ভেদ বরং ততোধিক প্রখরতর বোধ হয়। কিন্তু তাহাতে কি তপ্ত হইবে? ভূমি অতি দূরে, বায়ু অতিক্ষীণ,—অল্পপরিমাণে। দশ বারটি তুলার বস্তা উপর্যুপরি রাখিয়া দেখিবেন—উপরিস্থ তুলার ভারে, নিম্নস্থ বস্তার তুলা গাঢ়তর হইয়াছে। তেমনি নিম্নস্থ বায়ুই গাঢ়—উপরিস্থ বায়ু ক্ষীণ। পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে—এক ইঞ্চি দীর্ঘ প্রস্থে, এরূপ ভূমির উপরে যে ভার, তাহার পরিমাণ সাড়ে সাত সের। আমরা মস্তকের উপর অহরহঃ এই ভার বহন করিতেছি—তজ্জন্য কোন পীড়া বোধ করি না কেন? উত্তর, “অগাধজলসঞ্চারী” মৎস্য উপরিস্থ বারিরাশির ভারে পীড়িত হয় না কেন? উপরিস্থ বায়ুস্তরসমূহের ভারে নিম্নস্থ বায়ুস্তরসকল ঘনীভূত—যত উদ্ভেদ যাওয়া যায়, বায়ু তত ক্ষীণ হইতে থাকে। গগনপর্যটকেরা ইহা পরীক্ষা করিয়া জানিয়াছেন, গুরুতা অনুসারে ৩৫০ মাইল উদ্ভেদের মধ্যেই অর্ধেক বায়ু আছে; এবং পাঁচ ছয় মাইলের মধ্যেই সমুদায় বায়ুর তিন ভাগের দুই ভাগ আছে। এই জন্য উদ্ভেদ উঠিতে গেলে, নিশ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য অত্যন্ত কষ্ট হয়। মসুর ফ্লোরিয়ার দশ সহস্র ফিট উদ্ভেদ উঠিয়া, প্রথম বারে, ঘেরূপ কষ্ট অনুভূত করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা এইরূপ করিয়াছেন, যথা—

“সাতটা বাজিতে এক পোয়া থাকিতে আমার শরীর মধ্যে এক অপূর্বে আভ্যন্তরিক শীতলতা অনুভূত করিতে লাগিলাম। তৎসহিত তন্দ্রা আসিল। কষ্টে নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলাম। কণ্ঠমধ্যে শোঁ শোঁ শব্দ হইতে লাগিল এবং আধ মিনিট কাল, আমার হৃদয় উপস্থিত হইল। কণ্ঠ শূন্য হইল। আমি এক পাত্র জল পান করিলাম—তাহাতে উপকার বোধ হইল। যে বোতলে জল ছিল—তাহা ছিপি খুলিবার সময়ে, যেমন শ্যাম্পেনের বোতলের ছিপি সশব্দে বেগে উঠিয়া পড়ে, জলের বোতলের ছিপি খুলিতে সেইরূপ হইল। ইহার কারণ সহজেই বুঝা যাইতে পারে। তখন আমাদের মস্তকের উপর বায়ু, এক ভাগ কম হইয়াছিল। যখন বোতলে ছিপি আঁটয়া গগনে যাত্রা করিয়াছিলাম, তখনকার অপেক্ষা এখনকার বায়ুর ভার এক ভাগ কম হইয়াছিল।”

দুই একবার গগন-মার্গে যাতায়াত করিলে এ সকল কষ্ট সহ্য হইয়া আইসে, কিন্তু অধিক উদ্ভেদ উঠিলে সহিষ্ণু ব্যক্তিরও কষ্ট হয়। গ্লেশর সাহেব এ সকল কষ্টে বিশেষ সহিষ্ণু ছিলেন, কিন্তু ছয় মাইল উদ্ভেদ উঠিয়া তিনিও চেতনাশূন্য ও মূমূর্ষ হইয়াছিলেন। ২১০০০ ফিট

বাংকম রচনাবলী

উপরে উঠিলে পর, তাঁহার দৃষ্টি অস্পষ্ট হইয়া আইসে। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি আর তাপমান যন্ত্রের পারদ-স্তম্ভ অথবা ঘড়ির কাঁটা দেখিতে সক্ষম হইলেন না। টেবিলের উপর এক হাত রাখিলেন। যখন টেবিলের উপর হাত রাখিলেন, তখন হস্ত সম্পূর্ণ সৰল; কিন্তু তখনই সে হাত আর উঠাইতে পারিলেন না—তাহার শক্তি অন্তর্হিত হইয়াছিল। তখন দেখিলেন, দ্বিতীয় হস্তও সেই দশাপন্ন হইয়াছে, অবশ। তখন একবার গাঢ়ালোড়ন করিলেন; গাঢ় চালনা করিতে পারিলেন, কিন্তু বোধ হইল, যেন হস্ত-পদাদি নাই। ক্রমে এইরূপে তাঁহার সকল অঙ্গ অবশ হইয়া পড়িল; ভগ্নগ্রীবের ন্যায় মস্তক লম্বিত হইয়া পড়িল, এবং দৃষ্টি একেবারে বিলুপ্ত হইল। এইরূপে তিনি অকস্মাৎ মৃত্যুর আশঙ্কা করিতেছিলেন, এমন সময়ে, হঠাৎ তাঁহার চৈতন্যও বিলুপ্ত হইল। পরে ব্যোমযানের “সারথি” রথ নামাইলে তিনি পুনর্বার জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন।

রথ নামাইল কি প্রকারে? ব্যোমযানের গতি দ্বিবিধ, প্রথম, উদ্ধর্ হইতে অধঃ বা অধঃ হইতে উদ্ধর্। দ্বিতীয়, দিগন্তরে; যেমন শকটাদি অভিলষিত দিকে যায়, সেইরূপ। ব্যোমযান অভিলষিত দিগন্তরে চালনা করা এ পর্য্যন্ত মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত হয় নাই—চালক মনে করিলে, উত্তরে, পশ্চিমে, বামে বা দক্ষিণে, সম্মুখে বা পশ্চাতে যান চালাইতে পারেন না। বায়ুই ইহার যথার্থ সারথি, বায়ুসারথি যে দিকে লইয়া যায়, ব্যোমযান সেই দিকে চলে। কিন্তু উদ্ধর্বাধঃ গতি মনুষ্যের আয়ত্ত। ব্যোমযান লঘু করিতে পারিলেই উদ্ধর্ উঠবে এবং পার্শ্ববর্তী বায়ুর অপেক্ষা গুরু করিতে পারিলেই নামবে। ব্যোমযানের “রথে” কতকটা বালুকা বোঝাই থাকে; তাহার কিয়দংশ নিষ্কিপ্ত করিলেই পূর্বাপেক্ষা লঘুতা সম্পাদিত হয়—তখন ব্যোমযান আরও উদ্ধর্ উঠে। এইরূপে ইচ্ছাক্রমে উদ্ধর্ উঠা যায়। আর যে লঘু বায়ু কর্তৃক বেলুন পরিপূর্ণিত থাকায় তাহা গগনমণ্ডলে উঠিতে সক্ষম, তাহার কিয়দংশ নিগত করিতে পারিলেই উহা নামে। ঐ বায়ু নিগত করিবার জন্য ব্যোমযানের শিরোভাগে একটি ছিদ্র থাকে। সেই ছিদ্র সচরাচর আবৃত থাকে, কিন্তু তাহার আবরণে একটি দাঁড়ি বাঁধা থাকে; সেই দাঁড়ি ধরিয়া টানিলেই লঘু বায়ু বাহির হইয়া যায়; ব্যোমযান নামিতে থাকে।

দিগন্তরে গতি মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে বটে, কিন্তু মনুষ্য বায়ুর সাহায্য অবলম্বন করিতে সক্ষম। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন দিগভিমুখে বায়ু বাহিতে থাকে। যখন ব্যোমারোহী ভূমির উপরে দক্ষিণ বায়ু দেখিয়া, যানারোহণ করিলেন, তখনই হয়ত, কিয়দ্দূর উঠিয়া দেখিলেন যে, বায়ু উত্তরে; আরও উঠিলে হয়ত দেখিবেন যে, বায়ু পূর্বে, কি পূর্ব দক্ষিণে ইত্যাদি। কোন্ স্তরে কোন্ সময়ে কোন্ দিকে বায়ু বহে, ইহা যদি মনুষ্যের জানা থাকিত, তাহা হইলে ব্যোমযান মনুষ্যের আজ্ঞাকারী হইত। যাঁহারা সূচতুর, তাঁহারা কখন কখন বায়ুর গতি অবধারিত করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে গগন পর্য্যটন করিয়াছেন। ১৮৬৮ সালের আগষ্ট মাসে মসুর তিসান্দর কালে নগর হইতে নেপ্তুন নামক বেলুনে গগনারোহণ করেন। চারি হাজার ফিট উদ্ধর্ উঠিয়া দেখিলেন যে, তাঁহাদিগের গতি উত্তর সমুদ্রে। অপরাহ্নে এইরূপ তাঁহারা অকস্মাৎ অনিচ্ছার সহিত, অনন্ত সাগরের উপর যাত্রা করিলেন। কিন্তু তখন উপায়ান্তর ছিল না। এই সঙ্কটে তাঁহারা দেখিলেন যে, নিম্নে মেঘসকল দক্ষিণগামী। তখন তাঁহারা নিশ্চিত হইয়া সমুদ্রবিহারে চলিলেন। এইরূপে তাঁহারা ২১ মাইল পর্য্যন্ত সমুদ্রোপরে বাহির হইয়া যান। তাহার পর লঘু বায়ু নিগত করিয়া দিয়া, নীচে নামেন। বায়ুর সেই নিম্ন স্তরে দক্ষিণ-বায়ু পাইয়া তৎকর্তৃক বাহিত হইয়া পুনর্বার ভূমির উপরে আসেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অবতরণ করেন না। তার পর সন্ধ্যা হইয়া অন্ধকার হইল। বাষ্পের গাঢ়তাবশতঃ নিম্নে ভূতল দেখা যাইতেছিল না। এমন অবস্থায় তাঁহারা কোথায় যাইতেছিলেন, তাহা জানিতে পারেন নাই। অকস্মাৎ নিম্ন হইতে গম্ভীর সমুদ্র-কল্লোল উঠিত হইল। তখন অন্ধকারে পুনর্বার অনন্ত সাগরোপরে বিচরণ করিতেছেন জানিতে পারিয়া, তাঁহারা আবার নিম্নে নামিলেন। আবার দক্ষিণ-বায়ুর সাহায্যে ভূমি প্রাপ্ত হইলেন।

উত্তরসমুদ্রে বিচরণকালে তাঁহারা কয়েকটি অদ্ভুত ছায়া দেখিয়াছিলেন। দেখিলেন যে, সমুদ্রে যে সকল বাষ্পীয়াদি জাহাজ চলিতেছিল, উদ্ধর্ মেঘমধ্যে তাহার প্রতিবিম্ব। মেঘমধ্যে তেমনি সমুদ্র চিত্রিত হইয়াছে—সেই চিত্রিত সমুদ্রে তেমনি প্রকৃত জাহাজের ন্যায় ছায়ার জাহাজ চলিতেছে। সেই সকল জাহাজের তলদেশ উদ্ধর্, মাসুর নিম্নে; বিপরীত ভাবে জাহাজ চলিতেছে। মেঘরাশি বৃহদর্পণস্বরূপ সমুদ্রকে প্রতিবিম্বিত করিয়াছিল।

মসূর ফ্লামারিয়* আর একটি আশ্চর্য্য প্রতিবিম্ব দেখিয়াছিলেন। দিবাভাগে, প্রায় পাঁচ সহস্র ফিট উদ্ধেব* আরোহণ করিয়া দেখিলেন, তাঁহাদিগের প্রায় শত ফিট মাত্র দূরে, দ্বিতীয় একটি বেলুন চলিয়াছে। আরও দেখিলেন যে, সেই দ্বিতীয় বেলুনের আকৃতি তাঁহাদিগের বেলুনেরই আকৃতি, যেমন তাঁহাদিগের বেলুনের নিম্নে “রথ” যুক্ত ছিল, এবং তাহাতে যাঁহারা দুই জন আরোহী বসিয়াছিলেন, দ্বিতীয় বেলুনেও সেইরূপ রথ, এবং সেইরূপ দুই জন আরোহী! আরও বিস্মিত হইয়া দেখিলেন যে, সেই দুই জন আরোহীর অবয়ব—তাঁহাদিগেরই অবয়ব! তাঁহারা সেই দ্বিতীয় বেলুনে বসিয়া আছেন। একটি বেলুনে যেখানে যাহা ছিল—যেখানে যে দাঁড়ি, যেখানে যে সূতা, যেখানে যে যন্ত্র, দ্বিতীয় বেলুনে ঠিক তাহাই আছে। ফ্লামারিয়* দক্ষিণ হস্তোত্তোলন করিলেন—ভৌতিক ফ্লামারিয়* বাম হস্তোত্তোলন করিল। তাঁহার সঙ্গী একটা পতাকা উড়াইলেন—ভৌতিক সঙ্গী একটা তদ্রূপ পতাকা উড়াইল।

আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সেই ভৌতিক ব্যোমযানের ভৌতিক রথের চতুঃপার্শ্বে অপূর্ব* জ্যোতিষ্ময় মণ্ডলসকল প্রতিভাত হইতেছিল। মধ্যে হরিৎ শ্বেতাভ মণ্ডল, তন্মধ্যে রথ। তৎপার্শ্বে ক্ষীণ নীল মণ্ডল; তাহার বাহিরে হরিদ্রাবর্ণ মণ্ডল; তৎপরে কপিশ রক্তাভ মণ্ডল, শেষে অতসীকুসুমবৎ বর্ণ; তাহা ক্রমে ক্ষীণতর হইয়া মেঘের সঙ্গে মিশাইয়া গিয়াছে।

এই বৃত্তান্ত বৃদ্ধাইবার স্থান এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধ্যে হইতে পারে না। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইহা জলবাষ্পের উপর প্রতিসৌরবিম্ব* মাত্র।

গগনপথে পার্থিব শব্দ সহজে গমন করে, কিন্তু সকল সময়ে নহে, এবং সকল শব্দের গতি তুল্যরূপ নহে। মেঘাচ্ছন্নে শব্দরোধ ঘটে। গ্লেশর সাহেব চারি মাইল উদ্ধেব* হইতে রেলওয়ে ট্রেনের শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলেন। এবং বিশ হাজার ফিট উপরে থাকিয়া কামানের শব্দ শুনিয়াছিলেন। একটি ক্ষুদ্র কুক্কুরের রব দুই মাইল উপর হইতে শুনিতে পাইয়াছিলেন, কিন্তু চারি হাজার ফিট উপরে থাকিয়া বহুসংখ্যক মনুষ্যের কোলাহল শুনিতে পান নাই। মসূর ফ্লামারিয়* আকাশ হইতে ভূমণ্ডলের বাদ্য শুনিতে পাইতেন। তাঁহার বোধ হইত, যেন মেঘমধ্যে কে সঙ্গীত করিতেছে।

অনেকেই অবগত আছেন যে, যখন পারিস অবরুদ্ধ হয়, তখন ব্যোমযানযোগে পারিস হইতে গ্রাম্য প্রদেশে ডাক যাইত। শিক্ষিত পারাবতসকল সেই সকল ব্যোমযানে চড়িয়া যাইত; তাহাদের পুচ্ছে উত্তর বাঁধিয়া দিলে লইয়া ফিরিয়া আসিত। লঘুতার অনুরোধে সেই সকল পত্র ফটোগ্রাফের সাহায্যে অতি ক্ষুদ্রাকারে লিখিত হইত—অতি বৃহৎ পত্র এক ইঞ্চির মধ্যে সমাবিষ্ট হইত। পড়িবার সময়ে অনুবীক্ষণ ব্যবহার করিতে হইত। স্থানাভাববশতঃ এই কৌতুকবহু তত্ত্ব আমরা সবিস্তারে লিখিতে পারিলাম না।

উপসংহারকালে বক্তব্য যে, ব্যোমযান এখনও সাধারণের গমনাগমনের উপযোগী বা যথেষ্ট বিহারের উপায়স্বরূপ হয় নাই। গ্লেশর সাহেব বলেন যে, বেলুনের দ্বারা সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না; যানান্তর ইহার দ্বারা সূচিত হইতে পারে; যানান্তর সূচিত না হইলে সে আশা পূর্ণ হইবে না। মনুষ্য কখন উড়িতে পারিবে কি না, মসূর ফ্লামারিয়* এই তত্ত্বের সবিস্তারে আলোচনা করিয়া নিস্কান্ত করিয়াছিলেন যে, এক দিন মনুষ্যগণ অবশ্য পক্ষীদিগের ন্যায় উড়িতে পারিবে; কিন্তু আত্মবলে নহে। যখন মনুষ্য, পক্ষ বা পক্ষবৎ যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া, বাষ্পীয় বা বৈদ্যুতিক বলে তাহা সঞ্চালন করিতে পারিবে, তখন মনুষ্যের বিহঙ্গপদপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। দেলোম নামক একজন ফরাসী একটি মৎস্যাকার বেলুন কল্পনা করিয়াছেন; তিনি বিবেচনা করেন, তৎসাহায্যে মনুষ্য যথেষ্ট আকাশ-পথে যাতায়াত করিতে পারিবে। কিন্তু সে যন্ত্র হইতে এ পর্য্যন্ত কোন ফলোদয় হয় নাই বলিয়া, আমরা তাহার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলাম না।

চণ্ডল জগৎ

সচরাচর মনুষ্যের বোধ এই যে, গতি জগতের বিকৃত অবস্থা; স্থিরতা জগতের স্বাভাবিক অবস্থা। কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিলে বৃদ্ধা যাইবে যে, গতিই স্বাভাবিক অবস্থা; স্থিরতা কেবল

* Ant' helia.

বাঁকম রচনাবলী

গতির রোধ মাত্র। যাহা গতিবিশিষ্ট, কারণবশতঃ তাহার গতির রোধ হইলে, তাহার অবস্থাকে আমরা স্থিরতা বা স্থিতি বলি। যে শিলাখণ্ড বা অট্টালিকাকে অচল বিবেচনা করিতেছি, বাস্তবিক তাহা মাধ্যাকর্ষণের বলে গতিবিশিষ্ট; নিম্নস্থ ভূমি তাহার গতি রোধ করিতেছে বলিয়া, তাহাকে স্থির বলিতেছি। এ স্থিরতাও কাল্পনিক; পৃথিবীতলস্থ অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে তুলনা করিয়া বলিতেছি যে, এই পৃথিবী বা এই অট্টালিকা অচল, গতিশূন্য—বস্তুতঃ উহার কেহই অচল বা গতিশূন্য নহে, পৃথিবীর উপরে থাকিয়া উহা পৃথিবীর সঙ্গে আবর্তন করিতেছে। সুক্ষ্ম বিবেচনা করিতে গেলে জগতে কিছুই গতিশূন্য নহে।

কিন্তু সে কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক্। যাহা পৃথিবীর গতিতে গতিবিশিষ্ট, তাহাকে চণ্ডল বলিবার প্রয়োজন করে না। তথাপিও পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নাই, যে মুহূর্ত্ত জন্য স্থির।

চারি পাশে চাহিয়া দেখ, বায়ু বাহিতেছে, বৃক্ষপত্রসকল নাচিতেছে, জল চলিতেছে, জীবসকল নিজ নিজ প্রয়োজন সম্পাদনার্থ বিচরণ করিতেছে। পরন্তু ইহার মধ্যেও কোন কোন বস্তু গতিশূন্য দেখা যাইতেছে। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণে বা অন্য প্রকারে রুদ্ধ বাহ্যিক গতি ভিন্ন, ঐ সকল বস্তুর অন্য গতি আছে। সেই সকল গতি আভ্যন্তরিক।

বস্তুমাত্রেরই ক্রিয়াপরিমাণে তাপ আছে। যাহাকে শীতল বলি, তাহা বস্তুতঃ তাপশূন্য নহে। তাপের অল্পতাকেই শীতলতা বলি, তাপের অভাব কিছুতেই নাই। যে তুষারখণ্ডের স্পর্শে অঙ্গচ্ছেদের ক্লেশানুভব করিতে হয়, তাহাতেও তাপের অভাব নাই—অল্পতা মাত্র।

যাহাকে তাপ বলি, তাহা পরমাণুগণের আন্দোলন মাত্র। কোন বস্তুর পরমাণুসকল পরস্পরের দ্বারা আকৃষ্ট এবং সস্তাড়িত হইলে, তাহা তরঙ্গবৎ আন্দোলিত হইতে থাকে। সেই ক্রিয়াই তাপ। যেখানে সকল বস্তুই তাপযুক্ত, সেখানে সকল বস্তুর পরমাণুই অহরহ পরস্পর কতৃক আকৃষ্ট, সস্তাড়িত এবং সঞ্চালিত। অতএব পৃথিবীস্থ সকল বস্তুই আভ্যন্তরিক গতিবিশিষ্ট।

আলোক সম্বন্ধেও সেই কথা। ইথর নামক বিশ্বব্যাপী আকাশীয় তরল পদার্থের পরমাণু-সমষ্টির তরঙ্গবৎ আন্দোলনই আলোক। সেই গতিবিশিষ্ট পরমাণুসকলের সঙ্গে নয়নেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আলোক অনুভূত হয়। সেই প্রকার তাপীয় তরঙ্গ সহিত স্বর্গেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে তাপ অনুভূত করি। এই সকল আন্দোলন-ক্রিয়া মনুষ্যের দৃষ্টির অগোচর—উহা তাপরূপে এবং আলোকরূপেই আমরা ইন্দ্রিয় কতৃক গ্রহণ করিতে পারি—অন্য রূপে নহে। তবে এই আন্দোলন-ক্রিয়ার অস্তিত্ব স্বীকার করিবার কারণ কি? ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদেরা তাহা স্বীকার করিবার বিশেষ কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা এস্থলে বর্ণনীয় নহে।

পৃথিবীতলে আলোক সর্বত্র দৈখিতে পাই। অতি অন্ধকার অমাবস্যার রাতে পৃথিবীতল একেবারে আলোকশূন্য নহে। অতএব সর্বত্রই সর্বদা আলোকীয় আন্দোলনের গতি বর্তমান।

বিজ্ঞানবিদেরা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, আলোক, তাপ এবং মাধ্যাকর্ষণ, তিনটিই পরমাণুর গতি মাত্র। অতএব পৃথিবীর সকল বস্তুই আভ্যন্তরিক গতিবিশিষ্ট। যৌগিক আকর্ষণের বলে সেই সকল গতি সত্ত্বেও কোন বস্তুর পরমাণুসকল বিম্লস্ত বা পৃথগ্ভূত হয় না।

পৃথিবীতলে এইরূপ। তারপর, পৃথিবীর বাহিরে কি?

পৃথিবী স্বয়ং অত্যন্ত প্রখর বেগবিশিষ্ট এবং অনন্তকাল আকাশমার্গে ধাবমানা। অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতি যাহা সৌর জগতের অন্তর্গত, তাহাও পৃথিবীর মত অবস্থাপন্ন সন্দেহ নাই। সেই সকল গ্রহ উপগ্রহে যে সকল পদার্থ আছে, তাহাও পার্থিব পদার্থের ন্যায় সর্বদা বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক গতিবিশিষ্ট। জ্যোতির্বিদগণের দৌরবীক্ষণিক অনুসন্ধানের সে কথার অনেক প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে।

সূর্য নামে যে বৃহৎ বস্তু এই সৌর জগতের কেন্দ্রীভূত, তাহা যে রূপে চাঞ্চল্যপূর্ণ, তাহা মনুষ্যের অনুভবশক্তির অতীত। যে সূর্যমণ্ডলের তাপ, আলোক, আকর্ষণ এবং বৈদ্যুতিক শক্তি পৃথিবীস্থ গতিমাত্রেরই কারণ, সেই সূর্যমণ্ডলোপরে বা তদভ্যন্তরে যে নানাবিধ ভয়ঙ্কর এবং অদ্ভুত গতি নিয়ত বর্তাবে, তাহা বলা বাহুল্য। সেই চাঞ্চল্যের একটি উদাহরণ “আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত” নামক প্রস্তাবে বর্ণিত হইয়াছিল।

কিন্তু সূর্যোপরে এবং সূর্যগর্ভে যে নিয়ত গতির আধিপত্য, কেবল ইহাই নহে; সূর্য স্বয়ং গতিবিশিষ্ট। বিজ্ঞানবিদেরা স্থির করিয়াছেন যে, সূর্য স্বয়ং এই তাবৎ সৌর জগৎ সঙ্গে লইয়া প্রতি সেকেন্ডে ৪৫০ মাইল অর্থাৎ ঘণ্টায় ১৭১০০ মাইল আকাশ-পথে ধাবিত হইতেছে।

এই ভয়ঙ্কর বেগে এই পদার্থরাশি কোথায় যাইতেছে? কেহ বলিতে পারে না কোথায় যাইতেছে। আকাশের একটি নাক্ষত্রিক প্রদেশকে ইউরোপীয়েরা হরক্যুলিজ বলেন। সূর্য্য তন্মধ্যস্থ লাম্‌ডা নামক নক্ষত্রাভিমুখে ধাবিত হইতেছে, কেবল এই পর্য্যন্ত নিশ্চিত হইয়াছে।

কিন্তু সূর্য্য এবং সৌর জগৎ ত বিশ্বের অতি ক্ষুদ্রাংশ। অন্ধকার রাতে অনন্ত আকাশমণ্ডল ব্যাপিয়া যে সকল জ্যোতিষ্ক জ্বলিতে থাকে, তাহারা সকলেই এক একটি সৌর জগতের কেন্দ্রীভূত। সে সকল কি গতিশূন্য? তাহাদিগেরও প্রাত্যহিক উদয়াস্তাদি দেখিতে পাই, সেও পৃথিবীর প্রাত্যহিক আবর্তজনিত চাক্ষুষ ভ্রান্তি মাত্র। নাক্ষত্রিক লোকের কি জগৎ চঞ্চল?

জ্যোতির্বিদ্যার দ্বারা যতদূর অনুসন্ধান হইয়াছে, ততদূর জানিতে পারা গিয়াছে যে, নক্ষত্রলোকেও গতি সর্ব্বময়ী। যত অনুসন্ধান হইয়াছে, ততই বুঝা গিয়াছে যে, সূর্য্যের যে প্রকৃতি, নক্ষত্রমাত্রেরই সেই প্রকৃতি। গ্রহ ভিন্ন অন্য তারাকে নক্ষত্র বলিতেছি।

কতকগুলি নক্ষত্র সৌর গ্রহগণের ন্যায় বর্ত্তনশীল। যেখানে আমরা চক্ষু একটি নক্ষত্র দেখিতে পাই, দূরবীক্ষণ সাহায্যে দেখিলে তথায় কখন কখন দুইটি, তিনটি বা ততোধিক নক্ষত্র দেখা যায়। কখন কখন ঐ দুই তিনটি নক্ষত্র পরস্পরের সহিত সম্বন্ধরহিত, এবং পরস্পর হইতে দূরস্থিত, অথচ দর্শক যেখান হইতে দেখিতেছেন, সেখান হইতে দেখিতে গেলে আকাশের একদেশে স্থিত দেখায়, এবং একটি সরল রেখার মধ্যবর্ত্তী হইয়া যুগ্ম নক্ষত্রের ন্যায় দেখায়। কিন্তু কখন কখন দেখা যায় যে, যে নক্ষত্রদ্বয় দেখিতে যুগ্ম, তাহা বাস্তবিক যুগ্মই বটে,— পরস্পরের নিকটবর্ত্তী এবং পরস্পরের সহিত নৈসর্গিক সম্বন্ধবিশিষ্ট। এই সকল যুগ্মাদি নক্ষত্র সম্বন্ধে আধুনিক জ্যোতির্বিদেরা পর্য্যবেক্ষণ ও গণনার দ্বারা স্থিরীকৃত করিয়াছেন যে, উহারা পরস্পরকে বেড়িয়া বর্ত্তন করিতেছে। অর্থাৎ যদি ক, খ, এই দুইটি নক্ষত্রে একটি যুগ্ম নক্ষত্র হয়, তবে ক, খ, উভয়ের মাধ্যাকর্ষণিক কেন্দ্রের চতুষ্পার্শ্বে ক, খ, উভয় নক্ষত্র বর্ত্তন করিতেছে। কখন কখন দেখা গিয়াছে যে, এইরূপ দুইটি কেন, বহু নক্ষত্রে এক একটি নাক্ষত্রিক জগৎ। তন্মধ্যস্থ বিভক্ত নক্ষত্রগুলি সকলেই ঐ প্রকার আবর্ত্তনকারী। বিচিত্র এই যে, নিউটন পৃথিবীতে বাসিয়া, পার্থিব পদার্থের গতি দেখিয়া, পার্থিব উপগ্রহ চন্দ্রের গতিকে উপলক্ষ্য করিয়া, যে সকল মাধ্যাকর্ষণিক গতির নিয়ম আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন, দূরবর্ত্তী এবং সৌর জগতের বহিঃস্থ এই সকল নক্ষত্রের গতিও সেই সকল নিয়মাধীন।

নক্ষত্রগণের প্রকৃতি এবং সূর্য্যের প্রকৃতি যে এক, তদ্বিষয়ে আর সংশয় নাই। ডাক্তার হুগিন্স্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা আলোক-পরীক্ষক যন্ত্রের সাহায্যে জানিয়াছেন যে, যে সকল বস্তুতে সূর্য্য নিম্মিত, অন্যান্য নক্ষত্রেও সেই সকল বস্তু লক্ষিত হয়। অতএব সূর্য্যোপরি ও সূর্য্যগর্ভে যে প্রকার ভয়ঙ্কর কোলাহল ও বিপ্লব নিত্য বর্ত্তমান বলিয়া বোধ হয়, তাহা গণেও সেইরূপ হইতেছে, সন্দেহ নাই। যে নক্ষত্র দূরবীক্ষণ সাহায্যেও অস্পষ্ট দৃষ্ট আলোকবিন্দু বলিয়া বোধ হয়, তাহাতে ক্ষণমাত্রে যে সকল উৎপাত ঘটিতেছে, পৃথিবীতে দশ বর্ষের নৈসর্গিক ক্রিয়া একত্রিত করিলেও তাহার তুল্য হইবে না। সূর্য্যমণ্ডলে সামান্য মাত্র কোন পরিবর্ত্তনে যে বিপ্লব ও নৈসর্গিক শক্তিবায় সূচিত হয়, তাহাতে পলকমাত্রে এই পৃথিবী ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে পারে। প্রচণ্ড বাত্যার কল্লোল অথবা কর্ণবিদারক অশনিসম্পাতশব্দ হইতে লক্ষ লক্ষ গুণে ভীমতর কোলাহল অনবরত সেই সৌরমণ্ডলে নির্যোষিত হইতেছে সন্দেহ নাই। আর এই যে সহস্র সহস্র, স্থির, শীতল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্কগণ দেখিতেছি, তাহাতেও সেইরূপ হইতেছে; কেন না, সকলেই সূর্য্যপ্রকৃতিবিশিষ্ট, বরং আমাদের সূর্য্য অনেক অনেক নক্ষত্রের অপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং হীনতেজা। সিরিয়স্ নামক অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র, আমাদের নয়ন হইতে যত দূরে আছে, আমাদের সূর্য্য তত দূরে প্রেরিত হইলে, উহা তৃতীয় শ্রেণীর ক্ষুদ্র নক্ষত্রের ন্যায় দেখাইত; আকাশের কত শত নক্ষত্র তদপেক্ষা উজ্জ্বল জ্বালায় জ্বলিত। কিন্তু যদি সূর্য্যকে অল্‌দেবরণ (রোহিণী?), কস্তুর, বেটেলগুস্ প্রভৃতি নক্ষত্রের স্থানে প্রেরণ করা যায়, তবে সূর্য্যকে দেখা যাইবে কি না সন্দেহ। প্রক্টর সাহেব বলেন যে, আকাশে যে সকল নক্ষত্র দেখিতে পাই, বোধ হয় তাহার মধ্যে পঞ্চাশটিও আমাদের সূর্য্যাপেক্ষা ক্ষুদ্র হইবে না। অতএব সূর্য্যমণ্ডলে যে রূপ চাঞ্চল্যের অস্তিত্ব অনুমান করা যায়, অধিকাংশ নক্ষত্রে ততোধিক চাঞ্চল্য বর্ত্তমান, সন্দেহ নাই।

কেবল তাহাই নহে, সূর্য্য যেমন অতি প্রচণ্ডবেগে, গ্রহগণ সহিত, আকাশ-পথে ধাবমান,

বিক্রম রচনাবলী

অন্যান্য নক্ষত্রগণও তদ্রূপ। বরং অনেক নক্ষত্রের বেগ সূর্য্যাপেক্ষা প্রচণ্ডতর। সিরিয়সের গতি প্রতি সেকেন্ডে ২০ মাইল, ঘণ্টায় ৭২০০০ মাইল। বেগা নামক উজ্জ্বল নক্ষত্রের বেগ প্রতি সেকেন্ডে ৫০ মাইল, ঘণ্টায় ১৮০০০০ মাইল, কস্তুর প্রতি সেকেন্ডে ২৫ মাইল, ঘণ্টায় ৯০০০০ মাইল। পোলাক্সের গতি সেকেন্ডে ৪৯ মাইল, প্রায় বেগার ন্যায়। সপ্তর্ষির মধ্যের পাঁচটির গতি সিরিয়সের ন্যায়, একটির গতি বেগার ন্যায়। এই বেগ অতি ভয়ঙ্কর, বিশেষ যখন মনে করা যায় যে, এই সকল প্রচণ্ডবেগশালী পদার্থের আকার অতি প্রকাণ্ড (সিরিয়স্ সূর্য্যাপেক্ষা সহস্র গুণ বৃহৎ), তখন বিস্ময়ের আর সীমা থাকে না।

নক্ষত্রসকল অদ্ভুত গতিবিশিষ্ট হইলেও, চারি সহস্র বৎসরেও তত্তাবতের স্থানভ্রংশ মনুষ্য-চক্ষে লক্ষিত হয় নাই। ঐ সকল নক্ষত্রের অসীম দূরতাই ইহার কারণ। উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ সাহায্যে, আশ্চর্য্য মান-যন্ত্র ও বিদ্যা-কৌশলের বলে আধুনিক জ্যোতির্বিদেরা কিঞ্চিৎ স্থানচ্যুতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। তাহাতেই ঐ সকল গতি স্থিরীকৃত হইয়াছে।

নাক্ষত্রিক গতিতত্ত্ব অতি আশ্চর্য্য। গগনের একদেশে স্থিত নক্ষত্রও এক দিকেই ধাবমান না হইয়াও নানা দিকে ধাবমান। কখন বা এক দিকেই ধাবমান। কোথায় ধাবমান? কেন ধাবমান? সে সকল তত্ত্বের আলোচনা এ স্থলে নিষ্প্রয়োজনীয়, এবং এক প্রকার অসাধ্য।

যাহা বলা গেল, তাহাতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, গতিই জাগতিক নিয়ম—স্থিতি নিয়ম রোধের ফলমাত্র। জগৎ সর্বত্র, সর্বদা চঞ্চল। সেই চঞ্চল্য বিশেষ করিয়া বুদ্ধিতে গেলে, অতি বিস্ময়কর বোধ হয়। জীবনাধারে শোণিতাদির চাঞ্চল্যই জীবন। হৃৎপিণ্ড বা শ্বাসযন্ত্রের চাঞ্চল্য রহিত হইলেই মৃত্যু উপস্থিত হয়। মৃত্যু হইলে পরেও, দৈহিক পুরমাণু মধ্যে রাসায়নিক চাঞ্চল্য সঞ্চার হইয়া, দেহ ধ্বংস হয়। যেখানে দৃষ্টিপাত করিব, সেইখানে চাঞ্চল্য, সেই চাঞ্চল্য মঙ্গলকর। যে বুদ্ধি চঞ্চলা, সেই বুদ্ধি চিন্তাশালিনী। যে সমাজ গতিবিশিষ্ট, সেই সমাজ উন্নতিশীল। বরং সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা ভাল, তথাপি স্থিরতা ভাল নহে।

কত কাল মনুষ্য?

জলে যে রূপ বৃদ্ধদ উঠিয়া তখনই বিলীন হয়, পৃথিবীতে মনুষ্য সেইরূপ জন্মিতেছে ও মরিতেছে। পুত্রের পিতা ছিল, তাহার পিতা ছিল, এইরূপ অনন্ত মনুষ্যশ্রেণীপরম্পরা সৃষ্টি এবং গত হইয়াছে, হইতেছে এবং যতদূর বুঝা যায়, ভবিষ্যতেও হইবে। ইহার আদি কোথা? জগদাদির সঙ্গে কি মনুষ্যের আদি, না পৃথিবীর সৃষ্টির বহু পরে প্রথম মনুষ্যের সৃষ্টি হইয়াছে? পৃথিবীতে মনুষ্য কত কাল আছে?

খ্রীষ্টানদিগের প্রাচীন গ্রন্থানুসারে মনুষ্যের সৃষ্টি এবং জগতের সৃষ্টি কালি পরস্পর হইয়াছে। যে দিন জগদীশ্বর কুম্ভকাররূপে কাদা ছানিয়া পৃথিবী গড়িয়া, ছয় দিনে তাহাতে মনুষ্যাদি পুস্তুল সাজাইয়াছিলেন, খ্রীষ্টানেরা অনুমান করেন যে, সে ছয় সহস্র বৎসর পূর্বে। এ কথা খ্রীষ্টানেরাও আর বিশ্বাস করেন না। আমাদিগের ধর্ম্ম-পুস্তকের কথাই প্রতি আমরাও সেইরূপ হতশ্রদ্ধ হইয়াছি। বিজ্ঞানের প্রবাহে সর্বত্রই ধর্ম্ম-পুস্তকসকল ভাসিয়া যাইতেছে। কিন্তু আমাদিগের ধর্ম্ম-গ্রন্থে এমন কোন কথা নাই যে, তাহাতে বুঝায় যে, আজি কালি বা ছয় শত বৎসর বা ছয় সহস্র বৎসর বা ছয় বৎসর পূর্বে এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন হইয়াছে। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে কোটি কোটি বৎসর পূর্বে, অথবা অনন্ত কাল পূর্বে জগতের সৃষ্টি। আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞানেরও সেই মত।

তবে জগতের আদি আছে কি না, কেহ কেহ এই তর্ক তুলিয়া থাকেন। সৃষ্টি অনাদি, এ জগৎ নিত্য; ও সকল কথায় বুঝায় যে, সৃষ্টির আরম্ভ নাই। কিন্তু সৃষ্টি একটি ক্রিয়া—ক্রিয়া মাত্র, কোন বিশেষ সময়ে কৃত হইয়াছে; অতএব সৃষ্টি কোন কালবিশেষে হইয়া থাকিবে। অতএব সৃষ্টি অনাদি বলিলে, অর্থ হয় না। যাহারা বলেন, সৃষ্টি হইতেছে, যাইতেছে, আবার হইতেছে, এইরূপ অনাদি কাল হইতে হইতেছে, তাহারা প্রমাণশূন্য বিষয়ে বিশ্বাস করেন। এ কথার নৈসর্গিক প্রমাণ নাই।

“অসৃজচ্ছ জগৎ সর্ব্বং সহ পুত্রৈঃ কৃতাত্মভিঃ” ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা সূচিত হয় যে, জগৎ-সৃষ্টি এবং মনুষ্য বা মনুষ্য-জনকদিগের সৃষ্টি এক কালেই হইয়াছিল। এরূপ বাক্য

হিন্দু-গ্রন্থে অতি সচরাচর দেখা যায়। যদি এ কথা যথার্থ হয়, তাহা হইলে, যতকাল চন্দ্র সূর্য্য, ততকাল মনুষ্য। বৈজ্ঞানিকেরা এ তত্ত্বে কি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাই সমালোচিত করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বিজ্ঞানের অদ্যাপি এমত শক্তি হয় নাই যে, জগৎ অনাদি, কি সাদি, তাহার মীমাংসা করেন। কোন কালে সে মীমাংসা হইবে কি না, তাহাও সন্দেহের স্থল। তবে এক কালে, জগতের যে এ রূপ ছিল না, বিজ্ঞান ইহা বলিতে সক্ষম। ইহা বলিতে পারে যে, এই পৃথিবী এইরূপ তৃণ-শস্য-বৃক্ষময়ী, সাগর-পর্ব্বতাদি পরিপূর্ণা, জীবসঙ্কুল, জীববাসোপযোগিনী ছিল না; গগন এককালে এরূপ সূর্য্যচন্দ্রনক্ষত্রাদি বিশিষ্ট ছিল না। একদিন—তখন দিন হয় নাই—এককালে জল ছিল না, ভূমি ছিল না—বায়ু ছিল না। কিন্তু যাহাতে এই চন্দ্র সূর্য্য তারা হইয়াছে, যাহাতে জল বায়ু ভূমি হইয়াছে—যাহাতে নদ নদী সিন্ধু—বন বিটপী বৃক্ষ—তৃণ লতা পুষ্প—পশু পক্ষী মানব হইয়াছে, তাহা ছিল। জগতের রূপান্তর ঘটিয়াছে, ইহা বিজ্ঞান বলিতে পারে। কবে ঘটিল, কি প্রকারে ঘটিল, তাহা বিজ্ঞান বলিতে পারে না। তবে ইহাই বলিতে পারে যে, সকলই নিয়মের বলে ঘটিয়াছে—ক্ষণিক ইচ্ছাধীন নহে। যে সকল নিয়মে অদ্যাপি জড় প্রকৃতি শাসিতা হইতেছে, সেই সকল নিয়মের ফলেই এই ঘোর রূপান্তর ঘটিয়াছে। সেই সকল নিয়মে? তবে আর সেরূপ রূপান্তর দেখি না কেন? দেখিতেছি। তিল তিল করিয়া, মূহুর্ত্তে মূহুর্ত্তে জগতের রূপান্তর ঘটিতেছে। কোটি কোটি বৎসর পরে, পৃথিবী কি ঠিক এইরূপ থাকিবে? তাহা নহে।

কিরূপে এই ঘোর রূপান্তর ঘটিল, এ প্রশ্নের একটি উত্তর অতি বিখ্যাত। আমরা লাপ্লাসের মতের কথা বলিতেছি। লাপ্লাসের মত ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ের ছাত্রেরাও জানেন—সংক্ষেপে বর্ণিত করিলেই হইবে। লাপ্লাস সৌর জগতের উৎপত্তি বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন, মনে কর, আদৌ সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহাদি নাই, কিন্তু সৌর জগতের প্রাপ্ত অতিক্রম করিয়া সর্ব্বত্র সমভাবে, সৌর জগতের পরমাণুসকল ব্যাপিয়া রহিয়াছে। জড় পরমাণুমাত্রেরই, পরস্পরাকর্ষণ, তাপক্ষয়, সঙ্কোচন প্রভৃতি যে সকল গুণ আছে, ঐ জগদ্ব্যাপী পরমাণুরও থাকিবে। তাহার ফলে, ঐ পরমাণুরাশি, পরমাণুরাশির কেন্দ্রকে বেষ্টিত করিয়া ঘূর্ণিত হইতে থাকিবে। এবং তাপক্ষতির ফলে ক্রমে সঙ্কুচিত হইতে থাকিবে। সঙ্কোচনকালে, পরমাণু-জগতের বহিঃপ্রদেশসকল মধ্যভাগ হইতে বিযুক্ত হইতে থাকিবে। বিযুক্ত ভগ্নাংশ পূর্ব্বসিঁড়ত বেগের গুণে মধ্য প্রদেশকে বেড়িয়া ঘূর্ণিতে থাকিবে। যে সকল কারণে বৃষ্টিবিন্দু গোলত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই সকল কারণে ঘূর্ণিতে ঘূর্ণিতে সেই ঘূর্ণিত বিযুক্ত ভগ্নাংশ, গোলাকার প্রাপ্ত হইবে। এইরূপে এক একটি গ্রহের উৎপত্তি। এবং তাহা হইতে উপগ্রহগণেরও ঐরূপে উৎপত্তি। অবশিষ্ট মধ্যভাগ, সঙ্কোচ প্রাপ্ত হইয়া বর্ত্তমান সূর্য্য পরিণত হইয়াছে।

যদি স্বীকার করা যায় যে, আদৌ পরমাণু মাত্র আকারশূন্য হইয়া জগৎ ব্যাপিয়া ছিল—জগতে আর কিছুই ছিল না—তাহা হইলে ইহা সিদ্ধ হয় যে, প্রচলিত নৈসর্গিক নিয়মের বলে জগৎ, সূর্য্য,* চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু বিশিষ্ট হইবে—ঠিক এখন যেরূপ, সেইরূপ হইবে। প্রচলিত নিয়ম ভিন্ন অন্য প্রকারে ঐশিক আজ্ঞার সাপেক্ষ নহে। এই গুরুতর তত্ত্ব, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বুঝাইবার সম্ভাবনা নহে—এবং ইহা সাধারণ পাঠকের বোধগম্য হইতেও পারে না। আমাদের সে উদ্দেশ্যও নহে। যাঁহারা বিজ্ঞানালোচনায় সক্ষম, তাঁহারা এই নৈসর্গিক উপপাদ্য সম্বন্ধে হর্বাট স্পেন্সরের বিচিত্র প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। দেখিবেন যে, স্পেন্সর কেবল আকারশূন্য পরমাণুসমষ্টির অস্তিত্ব মাত্র প্রতিজ্ঞা করিয়া, তাহা হইতে জাগতিক ব্যাপারের সমুদায়ই সিদ্ধ করিয়াছেন। স্পেন্সরের কথা প্রামাণিক না হইলে হইতে পারে, কিন্তু বুদ্ধির কৌশল আশ্চর্য্য।

এইরূপে যে, বিশ্ব সৃষ্টি হইয়াছে, এমত কোন নৈসর্গিক প্রমাণ নাই। অন্য কোন প্রকারে যে সৃষ্টি হয় নাই, তাহারও কোন নৈসর্গিক প্রমাণ নাই। তবে লাপ্লাসের মতে প্রমাণবিরুদ্ধও কিছু নাই।† অসম্ভব কিছু নাই। এ মত সম্ভব, সম্ভব—অতএব ইহা প্রমাণের অতীত হইলেও গ্রাহ্য।

* গতিশূন্য নক্ষত্র মাত্রই সূর্য্য। জগতে কোটি কোটি সূর্য্য।

† কোমৎ, মিল, স্পেন্সর প্রভৃতি এই মত অনুমোদন করেন। সর্ জন হর্শেল বলেন, এ মত প্রমাণবিরুদ্ধ।

বিক্রম রচনাবলী

এই মত প্রকৃত হইলে, স্বীকার করিতে হয় যে, আদৌ পৃথিবী ছিল না। সূর্য্যাজ হইতে পৃথিবী বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। পৃথিবী যখন বিক্ষিপ্ত হয়, তখন ইহা বাষ্পরাশি মাত্র—নহিলে বিক্ষিপ্ত হইবে না। অতএব পৃথিবীর প্রথমাবস্থা, উত্তপ্ত বাষ্পীয় গোলক।

একটি উত্তপ্ত বাষ্পীয় গোলক—আকাশ-পথে বহু কাল বিচরণ করিলে কি হইবে? প্রথমে তাহার তাপহানি হইবে। যেখানে তাপের আধার মাত্র নাই—সেখানে তাপ-লেশ নাই; তাহা অচিস্তনীয় শৈত্যবিশিষ্ট। আকাশে তাপাধার কিছু নাই—অতএব আকাশমার্গ অচিস্তনীয় শৈত্যবিশিষ্ট। এই শৈত্যবিশিষ্ট আকাশে বিচরণ করিতে করিতে তপ্ত বাষ্পীয় গোলকের অবশ্য তাপক্ষয় হইবে। তাপক্ষয় হইলে কি হইবে?

জলের উত্তপ্ত বাষ্প সকলেই দেখিয়াছেন। সকলেই দেখিয়াছেন যে, ঐ বাষ্প শীতল হইলে জল হয়। আরও শীতল হইলে, জল বরফ হয়। সকল পদার্থের এই নিয়ম। যাহা উত্তপ্ত অবস্থায় বাষ্পাকৃত, তাপক্ষয়ে তাহা গাঢ়তা এবং কঠিনত্ব প্রাপ্ত হয়। অতএব বাষ্পীয় গোলকাকৃতা পৃথিবীর তাপক্ষয় হইলে, কালে তাহা এক্ষণকার গাঢ়তা এবং কঠিনাবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

পৃথিবী কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইয়াও কিছুকাল অগ্নিতপ্ত ছিল, বিবেচনা হয়। অপেক্ষাকৃত শীতলতা ঘটিলেই কঠিনতা জন্মবে, কিন্তু কঠিনতা জন্মিলেই তাহার সঙ্গে জীবাবাসযোগ্য শীতলতা ছিল বিবেচনা করা যায় না। সেও কালে ঘটিয়াছিল। তাপক্ষতি হেতু যে শীতলতা, তাহা উপরিভাগেরই প্রথমে ঘটে, উপরিভাগ শীতল হইলেও, ভিতর তপ্ত থাকে। পৃথিবীর অভ্যন্তরে অদ্যাপি বিষম তাপ আছে। ভূতত্ত্ববিদেরা ইহা পুনঃ পুনঃ প্রমাণীকৃত করিয়াছেন।

সেই উত্তপ্ত আদিমাবস্থায়, পৃথিবীতলে কোন জীব বা উদ্ভিদের বাসের সম্ভাবনা ছিল না। উত্তপ্ত বাষ্পীয় গোলক জীবাবাসযোগ্য শীতলতা এবং কঠিনতা প্রাপ্ত হইতে লক্ষ লক্ষ যুগ অতিবাহিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই—কেন না, আমাদের দুধের বাটি জুড়াইতে যে কালবিলম্ব হয়, তাহাতেই আমাদের ধৈর্য্যচ্যুতি জন্মে। অতএব পৃথিবীর উৎপত্তির লক্ষ লক্ষ যুগ পরেও জীব বা উদ্ভিদের সৃষ্টি হয় নাই।

যাঁহারা ভূতত্ত্বের কিছুমাত্র জানেন, তাঁহারাও অবগত আছেন যে, পৃথিবীর উপরে নানাবিধ মৃত্তিকা এবং প্রস্তর স্তরে স্তরে সন্নিবেশিত আছে। এইরূপ স্তরসন্নিবেশ কিয়দ্দূর মাত্র পাওয়া যায়, তাহার পরে যে সকল প্রস্তর পাওয়া যায়, তাহা স্তরহীন।

নীচে স্তরহীন প্রস্তর, তদুপরি স্তরে স্তরে নানাবিধ প্রস্তর, গৈরিক বা মৃত্তিকা। এই সকল স্তরনিবন্ধ প্রস্তর, গৈরিক বা মৃত্তিকাভ্যন্তরে এমত অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তাহা এক কালে সমুদ্রতলে ছিল। এমন কি, অনেকগুলি স্তর কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমুদ্রচর জীবের শরীরের সমষ্টি মাত্র। চাখাড়ি নামে যে গৈরিক বা প্রস্তর প্রচলিত, তাহা ইউরোপখণ্ডের অধিকাংশের এবং আশিয়ার কিয়দংশের নিম্নে স্তরনিবন্ধ আছে। এক্ষণে বর্তমান অনেকগুলি পর্ব্বত কেবল চাখাড়ি। এই চাখাড়ি কেবল এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমুদ্রতলচর জীবের (Globigerinae) মৃত দেহের সমষ্টি মাত্র।

অতএব এই সকল গৈরিকস্তর এক কালে সমুদ্রতলস্থ ছিল। ভূভাগের কোন স্থান কখন সমুদ্রতলস্থ হইতেছে; আবার কাল সহকারে সমুদ্র সে স্থান হইতে সরিয়া যাইতেছে, সমুদ্রতল শুষ্ক ভূমিখণ্ড হইতেছে। ভূগর্ভস্থ রুদ্ধবায়ু বা অন্য কারণে কোথাও ভূমি কাল সহকারে উন্নত, কাল সহকারে অবনত হইতেছে। যেখানে ভূমি উন্নত হইল, সেখান হইতে সমুদ্র সরিয়া গেল, যেখানে অবনত হইল, তাহার উপরে সাগরজলরাশি আসিয়া পড়িল। তাহার উপরে সমুদ্রবাহিত মৃত্তিকা, জীবদেহাদি পতিত হইয়া একটি নতন স্তর সৃষ্টি হইল। মনে কর, আবার কালে সমুদ্র সরিয়া গেল—সমুদ্রের তল শুষ্ক ভূমি হইল—তাহার উপর বৃক্ষাদি জন্মিয়া—জীবসকল জন্মগ্রহণ করিয়া বিচরণ করিল। আবার যদি কখন উহা সমুদ্রগর্ভস্থ হয়, তবে তদুপরি নতন স্তর সংস্থাপিত হইবে, এবং তথায় যে সকল জীব বিচরণ করিত, তাহাদিগের দেহাবশেষ সেই স্তরে প্রোথিত হইবে। জীবের অস্থি ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না—কিন্তু অতি দীর্ঘকাল প্রোথিত থাকিলে একরূপ প্রস্তরত্ব প্রাপ্ত হয়। এইরূপ অস্থ্যাদিকে “ফসিল” বলা যায়। পাতুরিয়া কয়লা, ফসিল কাষ্ঠ।

যে কয়টি কথা উপরে বলিলাম, তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে—

১। সর্ব্বনিম্নে স্তরহীন প্রস্তর। তদুপরি অন্যান্য গৈরিকাদি স্তরে স্তরে সন্নিবেশিত।

২। স্তরপরম্পরা সাময়িক সম্বন্ধবিশিষ্ট। যে স্তরটি নিম্নে, সেটি আগে, যেটি তাহার উপরে, সেটি তাহার পরে হইয়াছে।

৩। যে স্তরে যে জীবের ফসিল অস্থি পাওয়া যায়, সেই স্তর যখন শুষ্ক ভূমি বা জলতল ছিল, তখন সেই জীব বর্তমান ছিল। যদি কোন স্তরে কোন জীববিশেষের ফসিল একবারে পাওয়া না যায়, তবে সেই স্তর সৃজনকালে সেই জীব ছিল না।

৪। যদি কোন স্তরে ক নামক জীবের ফসিল পাওয়া যায়, খ নামক জীবের ফসিল পাওয়া যায় না; তাহার উপরিস্থ কোন স্তরে যদি ঐ খ নামক জীবের ফসিল পাওয়া যায়, তবে সিদ্ধ হইতেছে, খ নামক জন্তু ক নামক জন্তুর পরে সৃষ্ট।

সর্বনিম্নস্থ স্তরত্বশূন্য প্রস্তরে কোন ফসিল ছিল না। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, পৃথিবীর প্রথম ভূমিতে কোন জীব বিচরণ করে নাই। তখন পৃথিবী জীবশূন্য ছিল।

যখন প্রথম স্তরমধ্যে জীবদেহের ফসিল দেখা যায়, তখন মনুষ্যের অবস্থানের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। মনুষ্য দূরে থাকুক, বৃহৎ বা ক্ষুদ্র চতুষ্পদ জন্তুর ফসিল পাওয়া যায় না। মৎস্য বা সরীসৃপের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। যে সকল ক্ষুদ্র কীটাদিবৎ জীবের দেহাবশেষ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে শম্বুকই সর্বোৎকৃষ্ট। অতএব আদিম জীবলোকে শম্বুকেরা প্রভু ছিল।

তৎপরে মৎস্য দেখা দিল। ক্রমে উপরে উঠিতে সরীসৃপ জাতীয়ের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। পূর্বকালীয় সরীসৃপ অতি ভয়ঙ্কর, তাদৃশ বিচিত্র, বৃহৎ এবং ভয়ঙ্কর সরীসৃপ এক্ষণে পৃথিবীতে নাই। সরীসৃপের রাজ্যের পরে, স্তন্যপায়ী জীবের দেখা পাওয়া যায়। ক্রমে নানাবিধ হস্তী, ঋক্ষ, গন্ডার, সিংহ, হরিণ জাতীয় প্রভৃতি দেখা যায়, তথাপি মনুষ্য দেখা যায় না। মনুষ্যের চিহ্ন কেবল সর্বোদ্ধর স্তরে, অর্থাৎ আধুনিক মৃত্তিকায়। তন্নিম্নস্থ অর্থাৎ দ্বিতীয় স্তরেও কদাচিৎ মনুষ্যের চিহ্ন পাওয়া যায়। অতএব মনুষ্যের সৃষ্টি সর্বশেষে; মনুষ্য সর্বাপেক্ষা আধুনিক জীব।*

“আধুনিক” শব্দে এ স্থলে কি বুঝায়, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। যে সকল স্তরের কথা বলিলাম, সেগুলির সম্বায়, পৃথিবীর ত্বকের স্বরূপ। একটি স্তরের উৎপত্তি ও সমাপ্তিতে কত লক্ষ বৎসর, কত কোটি বৎসর লাগিয়াছে, তাহা কে বলিবে? তাহা গণনা করিবার উপায় নাই। তবে কেবল ইহাই বলা যাইতে পারে যে, সে কাল অপরিমিত—বুদ্ধির ধারণার অতীত। সর্বোদ্ধর স্তরেই মনুষ্য-চিহ্ন, এই কথা বলিলে, এমত বুঝায় না যে, বহু সহস্র বৎসর মনুষ্য পৃথিবীবাসী নহে। তবে পৃথিবীর বয়ঃক্রমের সঙ্গে তুলনা করিলে বোধ হয়, মনুষ্যের উৎপত্তি এই মূহুর্তে হইয়াছে। এই জন্য মনুষ্যকে আধুনিক জীব বলা যাইতেছে।

মিসরদেশের রাজাবলীর যে সকল তালিকা প্রচলিত আছে, তাহাতে যদি বিশ্বাস করা যায়, তবে মিসরদেশে দশ সহস্র বৎসরাধি রাজশাসন প্রচলিত আছে। হোমর, খ্রীষ্টের নয় শত বৎসর পূর্বে পৃথিবীবিদিত মহাকাব্যদ্বয় রচনা করেন; ইহা সর্ববাদিসম্মত। হোমরের গ্রন্থে মিসরের রাজধানী শতদ্বারবিশিষ্টা থিব্‌স্‌ নগরীর মহিমা কীর্তিত হইয়াছে। মনুষ্যজাতি সভ্যাবস্থায় একবার উন্নতির পথে পদার্পণ করিলে, উন্নতি শীঘ্র শীঘ্র লাভ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু অসভ্যদিগের স্বতঃসম্পন্ন যে উন্নতি, তাহা অচিন্তনীয় কাল বিলম্বে ঘটিয়া থাকে। ভারতীয় বন্য জাতিগণ চারি সহস্র বৎসর সভ্য জাতির প্রতিবেশী হইয়াও বিশেষ কিছু উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। অতএব সহজে বুঝিতে পারা যায় যে, মিসরদেশে সভ্যতা স্বতঃ জন্মিয়া, যে কালে শতদ্বারবিশিষ্টা নগরী সংস্থাপনে সক্ষম হইয়াছিল, তাহার পরিমাণ বহু সহস্র বৎসর। মিসরতত্ত্বজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন যে, মেম্ফিজ প্রভৃতি নগরী থিব্‌স্‌ হইতে প্রাচীনা। এই সকল নগরীতে যে দেবালয়াদি অদ্যাপি বর্তমান আছে, তাহাতে যুদ্ধজয়াদির উৎসবের প্রতিকৃতি আছে। সর্ জর্জ কর্ণওয়াল লুইস বলেন, ঐতিহাসিক সময়ে মিসরদেশীয়দিগকে কখন যুদ্ধপরায়ণ দেখা যায় না। অথচ কোন কালে তাহারা যুদ্ধপরায়ণ না থাকিলে, তন্নির্মিত মন্দিরাদিতে যুদ্ধ জয়োৎসবের প্রতিকৃতি থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না। অতএব বিবেচনা করিতে হইবে যে, ঐতিহাসিক কালের পূর্বেই মিসরদেশীয়েরা এত দূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল যে, প্রকাণ্ড

* এ কথায় এমত বুঝায় না যে, মনুষ্যের পর কোন জীবের উৎপত্তি হয় না। বোধ হয়, বিড়াল মনুষ্যের কনিষ্ঠ।

বিশ্বকম রচনাবলী

মন্দিরাদি নিৰ্মাণ করিয়া জাতীয় কীর্তিসকল তাহাতে চিত্রিত করিত। অসভ্য জাতি কেবল আপন প্রতিভাকে সহায় করিয়া যে এত দূর উন্নতি লাভ করে, ইহা অনেক সহস্র বৎসরের কাজ। তাহার পর ঐতিহাসিক কাল অনেক সহস্র বৎসর। অতএব বহু সহস্র বৎসর হইতে মিসরদেশে মনুষ্যজাতি সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছে। সে দশ সহস্র বৎসর, কি ততোধিক, কি তাহার কিছূ ন্যূন, তাহা বলা যায় না।

মিসরদেশ নীলনদী-নিৰ্মিত। বৎসর বৎসর নীলনদের জলে আনীত কন্দমরাশিতে এই দেশ গঠিত হইয়াছে। থিব্‌স্, মেন্‌ফিস প্রভৃতি নগরী নীলনদের পলির উপর স্থাপিত হইয়াছিল। এই নদী-কন্দম-নিৰ্মিত প্রদেশ ১৮৫১ ও ১৮৫৪ সালে রাজব্যয়ে সুযোগ্য তত্ত্বাবধায়কের তত্ত্বাবধায়নায় নিখাত হইয়াছিল। নানা স্থানে খনন করা যায়। যেখানে খনন করা হইয়া গিয়াছিল, সেইখান হইতেই ভগ্ন মৃৎপাত্র, ইষ্টকাদি উঠিয়াছিল। এমন কি, ষাট ফিট নীচে হইতে ইষ্টক উঠিয়াছিল। সকল স্থানে এইরূপ ইষ্টকাদি পাওয়া গিয়াছিল, অতএব ঐ সকল ইষ্টক পূৰ্বতন কৃপাদিনিহিত বলিয়া বিবেচনা করা যায় না। এই সকল খনন-কার্য হেকেকিয়ান বে নামক একজন সুশিক্ষিত আরমাণিজাতীয় কৰ্মচারীর তত্ত্বাবধায়নায় হইয়াছিল। লিনাণ্টবে নামক অপর একজন কৰ্মচারী ৭২ ফিট নিম্নে ইষ্টক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মসূর গির্গার্ড অনুমান করেন যে, নীলের কন্দম, শত বৎসরে পাঁচ ইঞ্চি মাত্র নিষ্কিপ্ত হয়। যদি শত বৎসরে পাঁচ ইঞ্চিও ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে হেকেকিয়ান ৬০ ফিট নীচে যে ইট পাইয়াছিলেন, তাহার বয়ঃক্রম অন্ত্যন দ্বাদশ সহস্র বৎসর। মসূর রাজীর হিসাব করিয়া বলিয়াছেন যে, নীলের কাদা শত বৎসরে ২০ ইঞ্চি মাত্র জন্মে। যদি এ কথা সত্য হয়, তবে লিনাণ্টবের ইষ্টকের বয়স ত্রিশ হাজার বৎসর।

অতএব যদি কেহ বলেন যে, ত্রিশ হাজার বৎসরেরও অধিক কাল মিসরে মনুষ্যের বাস, তবে তাহার কথা নিতান্ত প্রমাণশূন্য বলা যায় না।

মিসরে যেখানে, যত দূর খনন করা গিয়াছে, সেইখানেই পৃথিবীস্থ বর্তমান জন্তুর অস্থ্যাদি ভিন্ন লুপ্ত জাতির অস্থ্যাদি কোথাও পাওয়া যায় নাই। অতএব যে সকল স্তরমধ্যে লুপ্ত জাতির অস্থ্যাদি পাওয়া যায়, তদপেক্ষা এই নীল-কন্দমস্তর অত্যন্ত আধুনিক। আর যদি সেই সকল লুপ্ত জন্তুর দেহাবশেষবিশিষ্ট স্তরমধ্যে মনুষ্যের তৎসহ সমসাময়িকতার চিহ্ন পাওয়া যায়, তবে কত সহস্র বৎসর পৃথিবীতল মনুষ্যের আবাসভূমি, কে তাহার পরিমাণ করিবে?

এরূপ সমসাময়িকতার চিহ্ন ফ্রান্স ও বেল্‌জ্যামে পাওয়া গিয়াছে।

জৈবনিক

ক্ষিত, অপ্, তেজঃ, মরুৎ এবং আকাশ, বহুকাল হইতে ভারতবর্ষে ভৌতিক সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। তাহারাই পঞ্চ ভূত—আর কেহ ভূত নহে। এক্ষণে ইউরোপ হইতে নূতন বিজ্ঞান-শাস্ত্র আসিয়া তাহাদিগকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়াছেন। ভূত বলিয়া আর কেহ তাহাদিগকে বড় মানে না। নূতন বিজ্ঞান-শাস্ত্র বলেন, আমি বিলাত হইতে নূতন ভূত আনিয়াছি, তোমরা আবার কে? যদি ক্ষিত্যাদি জড়সড় হইয়া বলেন যে, আমরা প্রাচীন ভূত, কণাদকপিলাদির দ্বারা ভৌতিক রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া প্রতি জীব-শরীরে বাস করিতেছি, বিলাতী বিজ্ঞান বলেন, তোমরা আদৌ ভূত নও। আমার “Elementary Substances” দেখ—তাহারাই ভূত; তাহার মধ্যে তোমরা কই! তুমি, আকাশ, তুমি কেহই নও—সম্বন্ধবাচক শব্দ মাত্র। তুমি, তেজঃ, তুমি কেবল একটি ক্রিয়া,—গতিবিশেষ মাত্র। আর, ক্ষিত, অপ্, মরুৎ, তোমরা এক একজন দুই তিন বা ততোধিক ভূতে নিৰ্মিত। তোমরা আবার কিসের ভূত?

যদি ভারতবর্ষ এমন সহজে ভূতছাড়া হইত, তবে ক্ষিত ছিল না। কিন্তু এখনও অনেকে পঞ্চ ভূতের প্রতি ভক্তিবিশিষ্ট। বাস্তবিক ভূত ছাড়াইলে একটু বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। ভূতবাদীরা বলিবেন যে, যদি ক্ষিত্যাদি ভূত নহে, তবে আমাদের এ শরীর কোথা হইতে? কিসে নিৰ্মিত হইল? নূতন বিজ্ঞান বলেন যে, “তোমাদের পুরাণ কথায় একেবারে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া এ প্রশ্নের উত্তর দিতে চাহি না। জীব-শরীরের একটি প্রধান ভাগ যে জল, ইহা অবশ্য স্বীকার করিব। আর মরুতের সঙ্গে শরীরের একটি বিশেষ সম্বন্ধ আছে,—এমন কি, শরীরের

বায়ুকোষে বায়ু না গেলে প্রাণের ধ্বংস হয়, ইহাও স্বীকার করি। তেজঃ সম্বন্ধে ইহা স্বীকার করিতে তোমাদের বৈশেষিকেরা যে জঠরাগ্নি কল্পনা করিয়াছেন, তাহার অস্তিত্ব আমার লিবিগ অতি স্নুকোশলে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আর যদি সম্ভাপকেই তেজঃ বল, তবে মানি যে, ইহা জীবদেহে অহরহঃ বিরাজ করে, ইহার লাঘব হইলে প্রাণের ধ্বংস হয়। সোডা পোতাস প্রভৃতি পৃথিবী বটে, তাহা অত্যল্প পরিমাণে শরীরমধ্যে আছে। আর আকাশ ছাড়া কিছুই নাই; কেন না, আকাশ সম্বন্ধজ্ঞাপক মাত্র। অতএব শরীরে পশু ভূতের অস্তিত্ব এ প্রকারে স্বীকার করিলাম। কিন্তু আমার প্রধান আপত্তি তিনটি। প্রথম, শরীরের সারাংশ এ সকলে নিশ্চিত নহে; এ সকল ভিন্ন অন্য অনেক প্রকার উপকরণ আছে। দ্বিতীয়, ইহাদের ভূত বল কেন? তৃতীয়, ইহার সঙ্গে প্রাণাপানাদি বায়ু প্রভৃতি যে কতকগুলি কথা বল, বোধ হয়, হিন্দু রাজাদিগের আমলে আবকারির আইন প্রচলিত থাকিলে, সে কথাগুলির প্রচার হইত না।”

“দেখ, এই তোমার সম্মুখে ইষ্টক-নিশ্চিত মনুষ্যের বাসগৃহ। ইহা ইষ্টক-নিশ্চিত, সুতরাং ইহাতে পৃথিবী আছে। গৃহস্থ ইহাতে পানাদির জন্য কলসী কলসী জল সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। পাকার্থ এবং আলোকের জন্য অগ্নি জ্বালিয়াছে, সুতরাং তেজঃও বর্তমান। আকাশ, গৃহমধ্যে সর্বত্রই বর্তমান। সর্বত্র বায়ু যাতায়াত করিতেছে। সুতরাং এ গৃহও পশুভূত-নিশ্চিত? তুমি যেমন বল, মনুষ্যের এ স্থানে প্রাণ বায়ু, ও স্থানে অপান বায়ু ইত্যাদি, আমিও তেমনি বলিতেছি, এই দ্বার-পথে যে বায়ু বহিতেছে, তাহা প্রাণ বায়ু ও বাতায়ন-পথে যাহা বহিতেছে, তাহা অপান বায়ু ইত্যাদি। তোমারও নিদ্দেশ যেমন অমূলক ও প্রমাণশূন্য, আমার নিদ্দেশও তেমনি প্রমাণশূন্য। তুমি জীব-শরীর সম্বন্ধে যাহা বলিবে, আমি এই অট্টালিকা সম্বন্ধে তাহাই বলিব। তুমি যদি আমার কথা অপ্রমাণ করিতে যাও, তোমার স্বপক্ষের কথাও অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে। তবে কি তুমি আমার এই অট্টালিকাটি জীব বলিয়া স্বীকার করিবে?”

প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রে এবং আধুনিক বিজ্ঞানে এই প্রকার বিবাদ। ভারতবর্ষবাসীরা মধ্যস্থ। মধ্যস্থেরা তিন শ্রেণীভুক্ত। এক শ্রেণীর মধ্যস্থেরা বলেন যে, “প্রাচীন দর্শন, আমাদের দেশীয়। যাহা আমাদের দেশীয়, তাহাই ভাল, তাহাই মান্য এবং যথার্থ। আধুনিক বিজ্ঞান বিদেশী, যাহারা খ্রীষ্টান হইয়াছে, সন্ধ্যা আঁহিক করে না, উহারাই তাহাকে মানে। আমাদের দর্শন সিদ্ধ ঋষি-প্রণীত, তাঁহাদিগের মনুষ্যাতীত জ্ঞান ছিল, দিব্য চক্ষুে সকল দেখিতে পাইতেন; কেন না, তাঁহারা প্রাচীন এবং এদেশীয়। আধুনিক বিজ্ঞান যাঁহাদিগের প্রণীত, তাঁহারা সামান্য মনুষ্য। সুতরাং প্রাচীন মতই মানিব।”

আর এক শ্রেণীর মধ্যস্থ আছেন, তাঁহারা বলেন, “কোনটি মানিতে হইবে, তাহা জানি না। দর্শনে কি আছে, তাহা জানি না, বিজ্ঞানে কি আছে, তাহাও জানি না। কালেজে তোতা পাখীর মত কিছু বিজ্ঞান শিখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা কর, কেন সে সব মানি, তবে আমার কোন উত্তর নাই। যদি দুই মানিলে চলে, তবে দুই মানি। তবে, যদি নিতান্ত পীড়াপীড়ি কর, তবে বিজ্ঞানই মানি; কেন না, তাহা না মানিলে, লোকে আজি কার্লি মূর্খ বলে। বিজ্ঞান মানিলে লোকে বলিবে, এ ইংরেজি জানে, সে গোরব ছাড়িতে পারি না। আর বিজ্ঞান মানিলে বিনা কষ্টে হিন্দুয়ানির বাঁধাবাঁধি হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। সে অল্প সুখ নহে। সুতরাং বিজ্ঞানই মানিব।”

তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যস্থেরা বলেন, “প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র দেশী বলিয়া তৎপ্রতি আমরাদিগের বিশেষ প্রীতি বা অপ্ৰীতি নাই। আধুনিক বিজ্ঞান সাহেবি বলিয়া তাহাকে ভক্তি বা অভক্তি করি না। যেটি যথার্থ হইবে, তাহাই মানিব—ইহাতে কেহ খ্রীষ্টান বা কেহ মূর্খ বলে, তাহাতে ক্ষতি বোধ করি না। কোনটি যথার্থ, কোনটি অযথার্থ, তাহা মীমাংসা করিবে কে? আমরা আপনার বুদ্ধিমত মীমাংসা করিব;—পরের বুদ্ধিতে যাইব না। দার্শনিকেরা আমরাদিগের দেশী লোক বলিয়া তাঁহাদিগকে সর্বজ্ঞ মনে করিব না—ইংরেজেরা রাজা বলিয়া তাঁহাদিগকে অদ্রাস্ত মনে করি না। “সর্বজ্ঞ” বা “সিদ্ধ” মানি না; আধুনিক মনুষ্যাপেক্ষা প্রাচীন ঋষিদিগের কোন প্রকার বিশেষ জ্ঞানের উপায় ছিল, তাহা মানি না—কেন না, যাহা অনৈসর্গিক, তাহা মানিব না। বরং ইহাই বলি যে, প্রাচীনাপেক্ষা আধুনিকদিগের অধিক জ্ঞানবস্তুর সম্ভাবনা। কেন না, কোন বংশে যদি পুরুষানুক্রমে সকলেই কিছু কিছু সঞ্চার করিয়া যায়, তবে প্রপিতামহ অপেক্ষা পুত্র

বাংকম রচনাবলী

ধনবান্ হইবে সন্দেহ নাই। তবে আপনার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এ সকল গুরুতর তত্ত্বের মীমাংসা করিব কি প্রকারে? প্রমাণানুসারে। যিনি প্রমাণ দেখাইবেন, তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিব। যিনি কেবল আনুমানিক কথা বলিবেন, তাহার কোন প্রমাণ দেখাইবেন না, তিনি পিতৃপিতামহ হইলেও তাঁহার কথায় অশ্রদ্ধা করিব। দার্শনিকেরা কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলেন, ক হইতে খ হইয়াছে, গর মধ্যে ঘ আছে ইত্যাদি। তাঁহারা তাহার কোন প্রমাণ নির্দেশ করেন না; কোন প্রমাণের অনুসন্ধান করিয়াছেন, এমত কথা বলেন না, সন্ধান করিলেও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। যদি কখন প্রমাণ নির্দেশ করেন, সে প্রমাণও আনুমানিক বা কাল্পনিক, তাহার আবার প্রমাণের প্রয়োজন; তাহাও পাওয়া যায় না। অতএব আজন্ম মূর্খ হইয়া থাকিতে হয়, সেও ভাল, তথাপি দর্শন মানিব না। এ দিকে বিজ্ঞান আমাদিগকে বলিতেছেন, “আমি তোমাকে সহসা বিশ্বাস করিতে বলি না, যে সহসা বিশ্বাস করে, আমি তাহার প্রতি অনুগ্রহ করি না; সে যেন আমার কাছে আইসে না। আমি যাহা তোমার কাছে প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিব, তুমি তাহাই বিশ্বাস করিও, তাহার তিলাঙ্ক অধিক বিশ্বাস করিলে তুমি আমার ত্যাজ্য। আমি যে প্রমাণ দিব, তাহা প্রত্যক্ষ। একজনে সকল কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিতে পারে না, এজন্য কতকগুলি তোমাকে অন্যের প্রত্যক্ষের কথা শুনিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। কিন্তু যেটিতে তোমার সন্দেহ হইবে, সেইটি তুমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিও। সন্দেহ আমার প্রতি সন্দেহ করিও। দর্শনের প্রতি সন্দেহ করিলেই, সে ভঙ্গ হইয়া যায়, কিন্তু সন্দেহেই আমার পুষ্টি। আমি জীব-শরীর সম্বন্ধে যাহা বলিতেছি, আমার সঙ্গে শবচ্ছেদ-গৃহে ও রাসায়নিক পরীক্ষাশালায় আইস। সকলই প্রত্যক্ষ দেখাইব।” এইরূপ অভিহিত হইয়া, বিজ্ঞানের গৃহে গিয়া সকলই প্রমাণ সহিত দেখিয়া আসিয়াছি। সুতরাং বিজ্ঞানেই আমাদের বিশ্বাস।”

যাঁহারা এই সকল কথা শুনিয়া কুতূহলবিশিষ্ট হইবেন, তাঁহারা বিজ্ঞান মাতার আহ্বানানুসারে তাঁহার শবচ্ছেদ-গৃহে এবং রাসায়নিক পরীক্ষাশালায় গিয়া দেখুন, পৃথ ভূতের কি দুন্দর্শা হইয়াছে। জীব-শরীরের ভৌতিক তত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা যদি দুই একটা কথা বলিয়া রাখি, তবে তাঁহাদিগের পথ একটু সুগম হইবে।

বিষয়বাহুল্য ভয়ে কেবল একটি তত্ত্বই আমরা সংক্ষেপে বুঝাইব। আমরা অনুমান করিয়া রাখিলাম যে, পাঠক জীবের শারীরিক নিষ্কাশন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। গঠনের কথা বলিব না—গঠনের সামগ্রীর কথা বলিব।

এক বিন্দু শোণিত লইয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা কর। তাহাতে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্রাকার বস্তু দেখিবে। অধিকাংশই রক্তবর্ণ এবং সেই চক্রাণুসমূহের বর্ণ হেতুই শোণিতের বর্ণ রক্ত, তাহাও দেখিবে। তন্মধ্যে মধ্যে মধ্যে, আর কতকগুলি দেখিবে, তাহা রক্তবর্ণ নহে,— বর্ণহীন, রক্ত-চক্রাণু হইতে কিঞ্চিৎ বড়, প্রকৃত চক্রাকার নহে—আকারের কোন নিয়ম নাই। শরীরভাঙ্গুরে যে তাপ, পরীক্ষ্যমাণ রক্তবিন্দু যদি সেইরূপ তাপসংযুক্ত রাখা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, এই বর্ণহীন চক্রাণুসকল সজীব পদার্থের ন্যায় আচরণ করিবে। আপনারা যথেষ্টা চলিয়া বেড়াইবে, আকার পরিবর্তন করিবে, কখন কোন অঙ্গ বাড়াইয়া দিবে, কখন কোন ভাগ সংকীর্ণ করিয়া লইবে। এইগুলি যে পদার্থের সমষ্টি, তাহাকে ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকেরা প্রোটোপ্লাস্ম বা বিওপ্লাস্ম বলেন। আমরা ইহাকে “জৈবনিক” বলিলাম। ইহাই জীব-শরীর নিষ্কাশনের একমাত্র সামগ্রী। যাহাতে ইহা আছে, তাহাই জীব; যাহাতে ইহা নাই, তাহা জীব নহে। দেখা যাউক, এই সামগ্রীটি কি।

এক্ষণকার বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা অনেকেই দেখিয়াছেন, আচার্যেরা বৈদ্যুতিক যন্ত্রসাহায্যে জল উড়াইয়া দেন। বাস্তবিক জল উড়িয়া যায় না; জল অন্তর্হিত হয় বটে, কিন্তু তাহার স্থানে দুইটি বায়বীয় পদার্থ পাওয়া যায়—পরীক্ষক সেই দুইটি পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে ধরিয়া রাখেন। সেই দুইটি পুনর্বার একত্রিত করিয়া আগুন দিলে আবার জল হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই দুইটি পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে জলের জন্ম। ইহার একটির নাম অম্লজান বায়ু; দ্বিতীয়টির নাম জলজান বায়ু।

যে বায়ু পৃথিবী ব্যাপিয়া রহিয়াছে, ইহাতেও অম্লজান আছে। অম্লজান ভিন্ন আর একটি বায়বীয় পদার্থও তাহাতে আছে। সেটি যবক্ষারেও আছে বলিয়া তাহার নাম যবক্ষারজান হইয়াছে। অম্লজান ও যবক্ষারজান সাধারণ বায়ুতে রাসায়নিক সংযোগে যুক্ত নহে। মিশ্রিত

মাত্র। যাঁহারা রসায়নবিদ্যা প্রথম শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তাঁহারা শূন্য চমৎকৃত হইলেন যে, হীরক ও অঙ্গার একই বস্তু। বাস্তবিক এ কথা সত্য এবং পরীক্ষাধীন। যে দ্রব্য উভয়ের সার, তাহার নাম হইয়াছে অঙ্গারজান। কাষ্ঠ তৃণ তৈলাদি যাহা দাহ করা যায়, তাহার দাহ্য ভাগ এই অঙ্গারজান। অঙ্গারজানের সহিত অম্লজানের রাসায়নিক যোগক্রিয়াকে দাহ বলে। এই চারিটি পদার্থ সর্বদা পরস্পরে রাসায়নিক যোগে সংযুক্ত হয়। যথা, অম্লজানে জলজানে জল হয়। অম্লজানে যবক্ষারজানে নাইট্রিক আসিড নামক প্রসিদ্ধ ঔষধ হয়। অম্লজানে, অঙ্গারজানে আঙ্গারিক অম্ল (কার্বনিক আসিড) হয়। যে বাষ্পের কারণ সোডা ওয়াটার উছলিয়া উঠে, সে এই পদার্থ। দীপশিখা হইতে এবং মনুষ্য-নিশ্বাসে ইহা বাহির হইয়া থাকে। যবক্ষারজান এবং জলজানে আমোনিয়া নামক প্রসিদ্ধ তেজস্বী ঔষধ হইয়া থাকে। অঙ্গারজান ও জলজানে তারপিন তৈল প্রভৃতি অনেকগুলি তৈলবৎ এবং অন্যান্য সামগ্রী হয়। ইত্যাদি।

এই চারিটি সামগ্রী যেমন পরস্পরের সহিত রাসায়নিক যোগে যুক্ত হয়, সেইরূপ অন্যান্য সামগ্রীর সহিত যুক্ত হয় এবং সেই সংযোগেই এই পৃথিবী নির্মিত। যথা, সডিয়মের সঙ্গে ও ক্লোরাইনের সঙ্গে অম্লজানের সংযোগবিশেষে লবণ; চূণের সঙ্গে অম্লজান ও অঙ্গারজানের সংযোগবিশেষে মর্মরাদি নানাবিধ প্রস্তর হয়; সিলিকন এবং আলুমিনার সঙ্গে অম্লজানের সংযোগে নানাবিধ মৃত্তিকা।

দুইটি সামগ্রীর রাসায়নিক সংযোগে যে এক ফল হয়, এমত নহে। নানা মাত্রায় নানা দ্রব্যের সংযোগে নানা দ্রব্য হইয়া থাকে।

জলজান, অম্লজান, অঙ্গারজান এবং যবক্ষারজান, এই চারিটিই একত্রে সংযুক্ত হইয়া থাকে। সেই সংযোগের ফল জৈবনিক। জৈবনিকে এই চারিটি সামগ্রীই থাকে, আর কিছুই থাকে না, এমত নহে; অম্লজানাদির সঙ্গে কখন কখন গন্ধক, কখন পোতাস ইত্যাদি সামগ্রী থাকে। কিন্তু যে পদার্থে এই চারিটিই নাই, তাহা জৈবনিক নহে; যাহাতে এই চারিটিই আছে, তাহাই জৈবনিক; জীবমাত্রই এই জৈবনিকে গঠিত; জীব ভিন্ন আর কিছুতেই জৈবনিক নাই। এই স্থলে জীব শব্দ কেবল প্রাণী বুঝাইতেছে এমত নহে। উদ্ভিদও জীব; কেন না, তাহাদিগের জন্ম, বৃদ্ধি, পুষ্টি ও মৃত্যু আছে। অতএব উদ্ভিদের শরীরও জৈবনিকে নির্মিত। কিন্তু সচেতন ও অচেতন জীবে এ বিষয়ে একটু বিশেষ প্রভেদ আছে।

জৈবনিক জীব-শরীরমধ্যেই পাওয়া যায়, অন্যত্র পাওয়া যায় না। জীব-শরীরে কোথা হইতে জৈবনিক আইসে? জৈবনিক জীব-শরীরে প্রস্তুত হইয়া থাকে। উদ্ভিদ জীব, ভূমি এবং বায়ু হইতে অম্লজানাদি গ্রহণ করিয়া আপন শরীরমধ্যে তৎসমুদায়ের রাসায়নিক সংযোগ সম্পাদন করিয়া জৈবনিক প্রস্তুত করে; সেই জৈবনিক আপন শরীর নির্মিত করে। কিন্তু নিষ্কর্ষ পদার্থ হইতে জৈবনিক পদার্থ প্রস্তুত করার যে শক্তি, তাহা উদ্ভিদেরই আছে। সচেতন জীবের এই শক্তি নাই; ইহারা স্বয়ং জৈবনিক প্রস্তুত করিতে পারে না; উদ্ভিদকে ভোজন করিয়া প্রস্তুত জৈবনিক সংগ্রহপূর্বক শরীর পোষণ করে। কোন সচেতন জীব মৃত্তিকা খাইয়া প্রাণ ধারণ করিতে পারে না, কিন্তু তৃণ ধান্য প্রভৃতি সেই মৃত্তিকার রস পান করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে; কেন না, উহারা তাহা হইতে জৈবনিক প্রস্তুত করে; বৃষ মৃত্তিকা খাইবে না, কিন্তু সেই তৃণ ধান্যাদি খাইয়া তাহা হইতে জৈবনিক গ্রহণ করিবে, ব্যাঘ্র আবার সেই বৃষকে খাইয়া জৈবনিক সংগ্রহ করিবে। যাঁহারা এদেশের জমীদারগণের দ্বেষক, তাঁহারা বলিতে পারেন যে, উদ্ভিদ জীবেরা এ জগতে চাষা, তাহারা উৎপাদন করে; অপরেরা জমীদার, তাহারা চাষার উপার্জন কাড়িয়া খায়, আপনারা কিছু করে না।

এখন দেখ, এক জৈবনিকে সর্বজীব নির্মিত। যে ধান ছড়াইয়া ভূমি পাখীকে খাওয়াইতেছ, সে ধান যে সামগ্রী, পাখীও সেই সামগ্রী, ভূমিও সেই সামগ্রী। যে কুসুম ঘ্রাণ মাত্র লইয়া, লোকমোহিনী সুন্দরী ফেলিয়া দিতেছেন, সুন্দরীও যাহা, কুসুমও তাই। কীটও যাহা, সন্মিটও তাই। যে হংসপুচ্ছলেখনীতে আমি লিখিতেছি, সেও যাহা, আমিও তাই। সকলই জৈবনিক। প্রভেদও গুরুতর। জয়পুরী শ্বেত প্রস্তরে তোমার জলপান-পাত্র বা ভোজন-পাত্র নির্মিত হইয়াছে; সেই প্রস্তরে তাজমহল এবং জুমা মসজিদও নির্মিত হইয়াছে। উভয়ে প্রভেদ নাই কে বলিবে? গোপ্পদেও জল, সমুদ্রেও জল, গোপ্পদে সমুদ্রে প্রভেদ নাই কে বলিবে?

কিন্তু স্থূল কথা বলিতে বাকি আছে। জৈবনিক ভিন্ন জীবন নাই, যেখানে জীবন, সেইখানে

বাঁকম রচনাবলী

জৈবনিক তাহার পূর্বাগামী। “অন্যথা সিদ্ধিশূন্যস্য নিয়তা পূর্বাভিত্তিতা কারণত্বং” এ কথা যদি সত্য হয়, তবে জৈবনিকই জীবনের কারণ। জৈবনিক ভিন্ন জীবন কুত্রাপি সিদ্ধ নহে, এবং জৈবনিক জীবনের নিয়ত পূর্বাভিত্তি বটে। অতএব আমাদের এই চঞ্চল, সুখদুঃখবহুল, বহু স্নেহাস্পদ জীবন, কেবল জৈবনিকের ক্রিয়া, রাসায়নিক সংযোগসমবেত জড় পদার্থের ফল। নিউটনের বিজ্ঞান, কালিদাসের কবিতা, হাম্বেল্ট বা শঙ্করাচার্যের পাণ্ডিত্য—সকলই জড় পদার্থের ক্রিয়া; শাক্যসিংহের ধর্মজ্ঞান, আকবরের শৌর্য, কোমতের দর্শনবিদ্যা সকলই জড়ের গতি। তোমার বনিতার প্রেম, বালকের অমৃত ভাষা, পিতার সদুপদেশ—সকলই জড় পদার্থের আকুণ্ঠন সম্প্রসারণ মাত্র—জৈবনিক ভিন্ন ভিতরে আর ঐন্দ্রজালিক কেহ নাই। যে যশের জন্য তুমি প্রাণপাত করিতেছ, সে এই জৈবনিকের ক্রিয়া—যেমন সমুদ্রগর্জন এক প্রকার জড়পদার্থকৃত কোলাহল, যশ তেমনি জড়পদার্থকৃত অন্য প্রকার কোলাহল মাত্র। এই সর্বকর্তা জৈবনিক অম্লজান, জলজান, অঙ্গারজান এবং যবক্ষারজানের রাসায়নিক সমষ্টি। অতএব এই চারিটি ভৌতিক পদার্থই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় সর্বকর্তা। ইহারা প্রকৃত ভূত, এবং এই ভূতের কাণ্ডসকল আশ্চর্য্য বটে। পাঠক দেখিবেন যে, আমরাদিগের পূর্বাভিত্তিত পণ্ড ভূত হইতে এই আধুনিক ভূতগণের যে প্রভেদ, তাহা কেবল প্রমাণগত। নচেৎ উভয়েরই ফল প্রকৃতিবাদ (Materialism), সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ হইতে আধুনিক প্রকৃতিবাদের প্রভেদ, প্রধানতঃ প্রমাণগত। তবে আধুনিক বলেন, ক্ষিত্যাদি ভূত নহে, আমরাদিগের পরিচিত এই ভূতগুলিই ভূত। যেই ভূত হউক, তাহাতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি নাই,—কেন না, মনুষ্যজাতি ভূত ছাড়া হইল না। নাই হউক—স্মরণ রাখিলেই হইল, ভূতের উপর সর্বভূতময় এক জন আছেন। তাহা হইতে ভূতের এ খেলা।

পরিমাণ-রহস্য

আমাদের সকল ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা চক্ষুর উপর বিশ্বাস অধিক। কিছুর্তে যাহা বিশ্বাস না করি, চক্ষে দেখিলেই তাহাতে বিশ্বাস হয়। অথচ চক্ষের ন্যায় প্রবণ্ডক কেহ নহে। যে সূর্যের পরিমাণ লক্ষ লক্ষ যোজনে হয় না, তাহাকে একখানি স্বর্ণখালির মত দেখি। প্রকাণ্ড বিশ্বকে একাটি ক্ষুদ্র নক্ষত্র দেখি। যে চন্দ্রের দূরতা সূর্যের দূরতার চারি শত ভাগের এক ভাগও নহে, তাহা সূর্যের সমদূরবর্তী দেখায়। যে পরমাণুতে এই জগৎ নিম্মিত, তাহার একাটিও দেখিতে পাই না। আণুবীক্ষণিক জীব জৈবনিকাদি কিছুর্তেই দেখিতে পাই না। এই অবিশ্বাস-যোগ্য চক্ষুকেই আমাদের বিশ্বাস।

দর্শনেন্দ্রিয়ের এইরূপ শক্তিহীনতার গতিকে আমরা জগতের পরিমাণবৈচিত্র্য কিছুর্তে বুঝিতে পারি না। জ্যোতিষ্কাদি অতি বৃহৎ পদার্থকে ক্ষুদ্র দেখি, এবং অতি ক্ষুদ্র পদার্থসকলকে একেবারে দেখিতে পাই না। ভাগ্যান্বে, মন বাহ্যেইন্দ্রিয় অপেক্ষা দূরদর্শী; অদর্শনীয়ও বিজ্ঞান দ্বারা মিত হইয়াছে। সে পরিমাণ অতি বিস্ময়কর। দুই একটা উদাহরণ দিতেছি।

সকলে জানেন যে, পৃথিবীর ব্যাস ৭০৯১ মাইল। যদি পৃথিবীকে এক মাইল দীর্ঘ, এক মাইল প্রস্থ, এমত খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করা যায়, তাহা হইলে উনিশ কোটি ছয়ষাট লক্ষ ছাব্বিশ হাজার এইরূপ বর্গমাইল পাওয়া যায়। এক মাইল দীর্ঘ, এক মাইল প্রস্থ, এবং এক মাইল উচ্চের এরূপ ২৫৯,৮০০,০০০,০০০ ঘন মাইল পাওয়া যায়। ওজনে পৃথিবী যত টন হইয়াছে, তাহা অঙ্কের দ্বারা লিখিলাম—৬,০৬৯,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০। এক টন সাতাইশ মণের অধিক।*

এই আকার কি ভয়ানক, তাহা মনে কল্পনা করা যায় না। সমগ্র হিমালয় পর্বত ইহার নিকট বালুকাকণার অপেক্ষাও ক্ষুদ্র। কিন্তু এই প্রকাণ্ড পৃথিবী সূর্যের আকারের সহিত তুলনায় বালুকামাত্র। চন্দ্র একাটি প্রকাণ্ড উপগ্রহ, উহা পৃথিবী হইতে ২৪০,০০০ মাইল দূরে অবস্থিত। সূর্য্য এ প্রকার প্রকাণ্ড পদার্থ যে, তাহা অন্তঃশূন্য করিয়া পৃথিবীকে চন্দ্রসমেত তাহার মধ্যস্থলে স্থাপিত করিলে, চন্দ্র এখন ষেরূপ দূরে থাকিয়া পৃথিবীর পার্শ্বে বর্তন করে,

* আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত দেখ।

সূর্য্যগণ্ডেও সেইরূপ করিতে পারে, এবং চন্দ্রের বর্তনপথ ছাড়াও এক লক্ষ ষাট হাজার মাইল বেশী থাকে।

সূর্য্যের দূরতা কত মাইল, তাহা বালকেও জানে, কিন্তু সেই দূরতা অনুভূত করিবার জন্য, নিম্নলিখিত গণনা উদ্ধৃত করিলাম।

“অস্মদাদির দেশে রেলওয়ে ট্রেন ঘণ্টায় ২০ মাইল যায়। যদি পৃথিবী হইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত রেলওয়ে হইত, তবে কত কালে সূর্য্যালোকে যাইতে পারিতাম? উত্তর—যদি দিন রাত্রি, ট্রেন অবিরত ঘণ্টায় বিশ মাইল চলে, তবে ৫২০ বৎসর ৬ মাস ১৬ দিনে সূর্য্যালোকে পৌঁছান যায়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ট্রেনে চড়িবে, তাহার সম্পদশ পুরুষ ঐ ট্রেনেই গত হইবে।*

আর বৃহস্পতি শনি প্রভৃতি গ্রহসকলের দূরতার সহিত তুলনায় এ দূরতাও সামান্য। বুধের গণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, রেল যদি ঘণ্টায় ৩৩ মাইল চলে, তবে সূর্য্যালোক হইতে কেহ রেলের যাত্রা করিলে, দিন রাত্রি চলিয়া বৃহস্পতি গ্রহে ১৭১২ বৎসরে, শনিগ্রহে ৩১১৩ বৎসরে, উরেনসে ৬২২৬ বৎসরে, নেপচ্যুনে ৯৬৮৫ বৎসরে পৌঁছিব।

আবার এ দূরতা নক্ষত্র সূর্য্যগণের দূরতার তুলনায় কেশের পরিমাণ মাত্র। সকল নক্ষত্রের অপেক্ষা আল্ফা সেন্টরাই আমাদের নিকটবর্তী; তাহার দূরতা ৬১ সিগনাই নামক নক্ষত্রের পাঁচ ভাগের চারি ভাগ। এই দ্বিতীয় নক্ষত্রের দূরতা ৬৩,৬৫০,০০০,০০০,০০০ মাইল। আলোকের গতি প্রতি সেকেন্ডে ১৯২,০০০ মাইল। সেই আলোক ঐ নক্ষত্র হইতে আসিতে দশ বৎসরের অধিক কাল লাগে। বেগা নামক নক্ষত্রের দূরতা ১৩০,০০০,০০০,০০০,০০০ মাইল; আলোক সেখান হইতে ২১ বৎসরে পৃথিবীতে পৌঁছে। ২১ বৎসর পূর্বে ঐ নক্ষত্রের যে অবস্থা ছিল, তাহা আমরা দেখিতেছি—উহার অদ্যকার অবস্থা আমাদের জানিবার সাধ্য নাই।

আবার নীহারিকাগণের দূরতার সঙ্গে তুলনায়, এ সকল নক্ষত্রের দূরতা সূত্র-পরিমিত বোধ হয়। বীণা (Lyra) নামক নক্ষত্রসমষ্টির বিটা ও গামা নক্ষত্রের মধ্যবর্তী অঙ্গুরীয়বৎ নীহারিকার দূরতা, সর্ উইলিয়াম হর্শেলের গণনানুসারে সিরিয়সের দূরতার ৯৫০ গুণ। ঐ বিটা নক্ষত্রের দক্ষিণপূর্বস্থিত গোলাকৃত নীহারিকা, ঐ মহাত্মার গণনানুসারে সৌর জগৎ হইতে ১,৩০০,০০০,০০০,০০০,০০০ মাইল। ত্রিকোণ নামক নক্ষত্রসমষ্টিস্থিত এক নীহারিকা, সিরিয়সের দূরতার ৩৪৪ গুণ দূরে অবস্থিত; এবং সুবৈশ্বিকর ঢাল নামক নক্ষত্রসমষ্টিতে ঘোড়ার লালের আকার যে এক নীহারিকা আছে, তাহার দূরতা উক্ত ভীষণ মানদণ্ডের নয় শত গুণ অর্থাৎ ৫০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ মাইলের কিছু ন্যূন।

পাদরি ডাক্তার স্কারেস্‌বি বলেন যে, যদি আমাদের সূর্য্যকে এত দূরে লইয়া যাওয়া যায় যে, তথা হইতে পঁচিশ হাজার বৎসরে উহার আলোক আমাদের চক্ষে আসিবে, উহা তথাপি লর্ড রসের বৃহৎ দূরবীক্ষণে দৃশ্য হইতে পারে। যদি তাহা সত্য হয়, তবে যে সকল নীহারিকা হইতে সহস্র সহস্র প্রচণ্ড সূর্য্যের রশ্মি একত্রিত হইয়া আসিলেও, নীহারিকাকে ঐ দূরবীক্ষণে ধূমরেখামাত্রবৎ দেখা যায়, না জানি যে, কত কোটি বৎসরে আলোক তথা হইতে আসিয়া আমাদের নয়নে লাগে। অথচ আলোক প্রতি সেকেন্ডে ১৯২,০০০ মাইল, অর্থাৎ পৃথিবীর পরিধির অষ্টগুণ যায়।

পণ্টন সাহেব জানিয়াছেন যে, রৌদ্রের আলোক, মডরেটর দীপের অপেক্ষা ৪৪৪ গুণ তীব্র। যদি কোন সামগ্রীর দুই ইঞ্চি দূরে ১৬০টা মোমবাতী রাখা যায়, তবে তাহাতে যে আলো পড়ে, সে রৌদ্রের মত উজ্জ্বল হয়। গণিত হইয়াছে যে, যদি সূর্য্য রশ্মিবিশিষ্ট পদার্থ না হইত, তবে তাহাকে মোমবাতীর সাত কোটি বিশ লক্ষ স্তরে আবৃত করিলে, অর্থাৎ নয় মাইল উচ্চ করিয়া বাতীতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ মর্দাড়াইয়া, সকল বাতী জ্বালিয়া দিলে রৌদ্রের ন্যায় আলো পৃথিবীতে পাওয়া যাইত। কি ভয়ঙ্কর তাপাধার! সিনসিনেটের ডাক্তার ভন স্থির করিয়াছেন যে, এক ফুট দূরে ১৪,০০০ বাতী রাখিলে যে তাপ পাওয়া যায়, রৌদ্রের সেই তাপ। আর সূর্য্য আমাদের নিকট হইতে যত দূরে আছে, তত দূরে থাকিলে ৩,৫০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ সংখ্যক বাতী এককালীন না পোড়াইলে রৌদ্রের ন্যায় তাপ হয় না। এ কথা অর্থ

বিক্রম রচনাবলী

এই হইতেছে যে, প্রত্যহ পৃথিবীর ন্যায় বৃহৎ দুই শত বাতীর গোলক পোড়াইলে যে তাপ সম্ভূত হয়, সূর্য্যদেব এক দিনে তত তাপ খরচ করেন। তাঁহার তাপ ঘেরূপ খরচ হয়, সেইরূপ নিত্য নিত্য উৎপন্ন হইয়া জমা হইয়া থাকে। তাহা না হইলে এই মহাতাপক্ষয়ে সূর্য্যও অল্পকালে অবশ্য তাপশূন্য হইতেন। কথিত হইয়াছে যে, সূর্য্য দাহ্যমান পদার্থ হইলে এই তাপ ব্যয় করিতে দশ বৎসরে আপনি দক্ষ হইয়া যাইতেন।

মসূর পুইলা গণনা করিয়াছেন যে, সতের মাইল উচ্চ কয়লার খনি পোড়াইলে যে তাপ জন্মে, এক বৎসরে সূর্য্য তত তাপ ব্যয় করেন। যদি সূর্য্যের তাপবাহিতা জলের ন্যায় হয়, তবে বৎসরে ২.৬ ডিগ্রী সূর্য্যের তাপ কমিবে। কুণ্ডন-ক্রিয়াতে তাপ সৃষ্টি হয়। সূর্য্যের ব্যাস তাহার দশ সহস্রাংশের একাংশ কমিলেই, দুই সহস্র বৎসরে ব্যয়িত তাপ সূর্য্য পুনঃ প্রাপ্ত হইবে।

সূর্য্যের তাপশালিতার যে ভয়ানক পরিমাণ লিখিত হইল, স্থির নক্ষত্রমধ্যে অনেকগুলি তদপেক্ষা তাপশালী বোধ হয়। সে সকলের তাপ পরিমিত হইবার উপায় নাই; কেন না, তাহার রৌদ্র পৃথিবীতে আসে না, কিন্তু তাহার আলোক পরিমিত হইতে পারে। কোন কোন নক্ষত্রের প্রভাশালিতা পরিমিত হইয়াছে। আলফা সেন্টরাই নামক নক্ষত্রের প্রভাশালিতা সূর্য্যের ২.৩২ গুণ। বেগা নক্ষত্র ষোড়শ সূর্য্যের প্রভাবিশিষ্ট এবং নক্ষত্ররাজ সিরিয়স দুই শত পঞ্চবিংশতি সূর্য্যের প্রভাবিশিষ্ট। এই নক্ষত্র আমাদের সৌর জগতের মধ্যবর্তী হইলে পৃথিব্যাদি গ্রহ-সকল অল্পকালমধ্যে বাষ্প হইয়া কোথায় উড়িয়া যাইত।

এই সকল নক্ষত্রের সংখ্যা অতি ভয়ানক। সর্ উইলিয়ম হর্শেল গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, কেবল ছায়াপথে ১৮,০০০,০০০ নক্ষত্র আছে। স্‌ব বলেন, আকাশে দুই কোটি নক্ষত্র আছে। মসূর শাকর্গাক বলেন, নক্ষত্রসংখ্যা সাত কোটি সত্তর লক্ষ। এ সকল সংখ্যার মধ্যে নীহারিকাভ্যন্তরবর্তী নক্ষত্রসকল গণিত হয় নাই। যেমন সমুদ্রতীরে বালুকা, নীহারিকা সেইরূপ নক্ষত্র। এখানে অঙ্ক হারি মানে।

যদি অতি প্রকাণ্ড জগৎসকলের সংখ্যা এইরূপ অননুমেষ, তবে ক্ষুদ্র পদার্থের কথা কি বলিব? ইহুগবর্গ বলেন যে, এক ঘন ইঞ্চি বিলিন্ শ্লেট প্রস্তরে চত্ব্বিশ হাজার Gallionella নামক আণুবীক্ষণিক শম্বুক আছে—তবে এই প্রস্তরের একটি পর্ষ্বতশ্রেণীতে কত আছে, কে মনে ধারণা করিতে পারে? ডাক্তার টমাস টম্‌সন্ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, সীসা, এক ঘন ইঞ্চির ৮৮৮,৪৯২,০০০,০০০,০০০ ভাগের এক ভাগ পরিমিত হইয়া বিভক্ত হইতে পারে। উহাই সীসার পরমাণুর পরিমাণ। তিনিই পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, গন্ধকের পরমাণু ওজনে এক গ্রেণের ২,০০০,০০০,০০০ ভাগের এক ভাগ।

(সমুদ্রের গভীরতার পরিমাণ)

লোকের বিশ্বাস আছে যে, সমুদ্র কত গভীর, তাহার পরিমাণ নাই। অনেকের বিশ্বাস, সমুদ্র “অতল।”

অনেক স্থানে সমুদ্রের গভীরতা পরিমিত হইয়াছে। আলেক্‌জান্দ্রানিবাসী প্রাচীন গণিত-ব্যবসায়ীগণ অনুমান করিতেন যে, নিকটস্থ পর্ষ্বতসকল যত উচ্চ, সমুদ্রও তত গভীর। ভূমধ্যস্থ (Mediterranean) সমুদ্রের অনেক স্থানে ইহার পোষক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তথায় এ পর্য্যন্ত ১৫,০০০ ফিটের অধিক জল পরিমিত হয় নাই—আল্‌পস পর্ষ্বত-শ্রেণীর উচ্চতাও ঐরূপ।

মিসর ও সাইপ্রাস দ্বীপের মধ্যে ছয় সহস্র ফিট, আলেক্‌জান্দ্রা ও রোড্‌শের মধ্যে নয় সহস্র নয় শত, এবং মালটায় পূর্বে ১৫,০০০ ফিট জল পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তদপেক্ষা অন্যান্য সমুদ্রে অধিকতর গভীরতা পাওয়া গিয়াছে। হম্বোল্টের কম্‌স্ গ্রন্থে লিখিত আছে যে, এক স্থানে ২৬,০০০ ফিট রিশ নামাইয়া দিয়াও তল পাওয়া যায় নাই—ইহা চারি মাইলের অধিক। ডাক্তার স্কারেস্‌বি লিখেন যে, সাত মাইল রিশ ছাড়াইয়া দিয়াও তল পাওয়া যায় নাই। পৃথিবীর সর্বোচ্চতম পর্ষ্বত-শৃঙ্গ পাঁচ মাইল মাত্র উচ্চ।

কিন্তু গড়ে, সমুদ্র কত গভীর, তাহা না মাপিয়াও গণিতবলে জানা যাইতে পারে। জলোচ্ছ্বাসের কারণ—সমুদ্রের জলের উপর সূর্য্য চন্দ্রের আকর্ষণ। অতএব জলোচ্ছ্বাসের

পরিমাণের হেতু, (১) সূর্য্য চন্দ্রের গুরুত্ব, (২) তদীয় দূরতা, (৩) তদীয় সম্বর্তনকাল, (৪) সমুদ্রের গভীরতা। প্রথম, দ্বিতীয়, এবং তৃতীয় তত্ত্ব আমরা জ্ঞাত আছি; চতুর্থ আমরা জানি না, কিন্তু চারিটির সমবায়ের ফল, অর্থাৎ জলোচ্ছ্বাসের পরিমাণ, আমরা জ্ঞাত আছি। অতএব অজ্ঞাত চতুর্থ সমবায়ী কারণ অনায়াসেই গণনা করা যাইতে পারে। আচার্য্য হটন এই প্রকারে গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, সমুদ্র গড়ে, ৫.১২ মাইল, অর্থাৎ পাঁচ মাইলের কিছু অধিক মাত্র গভীর। লাপ্লাস ব্রেস্ট নগরে জলোচ্ছ্বাস পর্য্যবেক্ষণের বলে যে “Ratio of Semi-diurnal Coefficients” স্থির করিয়াছিলেন, তাহা হইতেও এইরূপ উপলব্ধি করা যায়।

(শব্দ)

সচরাচর শব্দ প্রতি সেকেন্ডে ১০৩৮ ফিট গিয়া থাকে বটে, কিন্তু বেথেম ও ব্রেগেট নামক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বৈদ্যুতিক তারে প্রতি সেকেন্ডে, ১১,৪৫৬ ফিট বেগে শব্দ প্রেরণ করিয়াছিলেন। অতএব তাহা কেবল পত্র প্রেরণ হয়, এমত নহে; বৈজ্ঞানিক শিল্প আরও কিছু উন্নতি প্রাপ্ত হইলে মনুষ্য তাহা কথোপকথন করিতে পারিবে।*

মনুষ্যের কণ্ঠস্বর কত দূর যায়? বলা যায় না। কোন কোন যুবতীর ব্রীড়ারুদ্ধ কণ্ঠস্বর শূন্যের সময়ে, বিরক্তিক্রমে ইচ্ছা করে যে, নাকের চসমা খুলিয়া কাণে পরি, কোন কোন প্রাচীনার চীৎকারে বোধ হয়, গ্রামান্তরে পলাইলেও নিষ্কৃতি নাই। বিজ্ঞানবিদেরা এ বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, দেখা যাউক।

প্রাচীন মতে আকাশ শব্দবহ; আধুনিক মতে বায়ু শব্দবহ। বায়ুর তরঙ্গে শব্দের সৃষ্টি ও বহন হয়। অতএব যেখানে বায়ু তরল ও ক্ষীণ, সেখানে শব্দের অস্পষ্টতা সম্ভব। রাঙ্ক শব্দোপরি শব্দ অস্পষ্টশ্রাব্য বলিয়া শস্যের বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, তথায় পিস্তল ছুড়িলে পটকার মত শব্দ হয়; এবং শ্যাম্পেন খুলিলে কাকের শব্দ প্রায় শূন্যেতে পাওয়া যায় না। কিন্তু মার্শ্যস বলেন যে, তিনি সেই শব্দোপরেই ১৩৪০ ফিট হইতে মনুষ্য-কণ্ঠ শূন্যিয়াছিলেন। এ বিষয় “গগনপর্য্যটন” প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ লেখা হইয়াছে।

যদি শব্দবহ বায়ুকে চোঙ্গার ভিতর রুদ্ধ করা যায়, তবে মনুষ্য-কণ্ঠ যে অনেক দূর হইতে শূন্য যাইবে, ইহা বিচিত্র নহে। কেন না, শব্দ-তরঙ্গসকল ছড়াইয়া পড়িবে না।

স্থির জল, চোঙ্গার কাজ করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উচ্চতায় বায়ু প্রতিহত হইতে পায় না—এজন্য শব্দ-তরঙ্গসকল, ভগ্ন হইয়া নানা দিক্ দিগন্তরে বিকীর্ণ হয় না। এই জন্য প্রশস্ত নদীর এপার হইতে ডাকিলে ওপারে শূন্যেতে পায়। বিখ্যাত হিমকেন্দ্রানুসারী পর্য্যটক পারির সমভিব্যাহারী লেপ্টেনাণ্ট ফণ্টের লিখেন যে, তিনি পোর্ট বোয়েনের এপার হইতে পরপারে স্থিত মনুষ্যের সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন। উভয়ের মধ্যে ১১০ মাইল ব্যবধান। ইহা আশ্চর্য্য বটে।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার ডাক্তার ইয়ং কর্তৃক লিখিত হইয়াছে। তিনি বলেন যে, জিব্রল্টরে দশ মাইল হইতে মনুষ্য-কণ্ঠ শূন্য গিয়াছে। কথা বিশ্বাসযোগ্য কি?

(জ্যোতিস্তরঙ্গ)

প্রবন্ধান্তরে কথিত হইয়াছে যে, আলোক ইথর নামপ্রাপ্ত বিশ্বব্যাপী জাগতিক তরল পদার্থের আন্দোলনের ফল মাত্র। সূর্যালোক সপ্ত বর্ণের সমবায়; সেই সপ্ত বর্ণ ইন্দ্রধনু অথবা স্ফাটিক প্রেরিত আলোকে লক্ষিত হয়। প্রত্যেক বর্ণের তরঙ্গসকল পৃথক্ পৃথক্; তাহাদিগের প্রাকৃতিক সমবায়ের ফলে, স্বেত রোদ্দ। এই সকল জ্যোতিস্তরঙ্গ-বৈচিত্র্যই জগতের বর্ণবৈচিত্র্যের কারণ। কোন কোন পদার্থ, কোন কোন বর্ণের তরঙ্গসকল রুদ্ধ করিয়া, অবশিষ্টগুলি প্রতিহত করে। আমরা সে সকল দ্রব্যকে প্রতিহত তরঙ্গের বর্ণবিশিষ্ট দেখি।

তবে তরঙ্গেরই বা বর্ণ-বৈষম্য কেন? কোন তরঙ্গ রক্ত, কোন তরঙ্গ পীত, কোন তরঙ্গ নীল কেন? ইহা কেবল তরঙ্গের বেগের তারতম্য। প্রতি ইঞ্চি স্থান মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যার তরঙ্গের উৎপত্তি হইলে, তরঙ্গ রক্তবর্ণ, অন্য নির্দিষ্ট সংখ্যায় তরঙ্গ পীতবর্ণ, ইত্যাদি।

যে জ্যোতিস্তরঙ্গ এক ইঞ্চি মধ্যে ৩৭,৬৪০ বার প্রক্ষিপ্ত হয়, এবং প্রতি সেকেন্ডে

এই প্রবন্ধ লিখিত হওয়ার পরে টেলিফোনের আবিষ্করণ।

বীক্ষক রচনাবলী

৪৫৮,০০০,০০০,০০০,০০০ বার প্রক্ষিপ্ত হয়, তাহা রক্তবর্ণ। পীত তরঙ্গ, এক ইঞ্চিতে ৪৪,০০০ বার, এবং প্রতি সেকেন্ডে ৫৩৫,০০০,০০০,০০০,০০০ বার প্রক্ষিপ্ত হয়। এবং নীল তরঙ্গ প্রতি ইঞ্চিতে ৫১,১১০ বার এবং প্রতি সেকেন্ডে ৬২২,০০০,০০০,০০০,০০০ বার প্রক্ষিপ্ত হয়। পরিমাণের রহস্য ইহা অপেক্ষা আর কি বলিব? এমন অনেক নক্ষত্র আছে যে, তাহার আলোক পৃথিবীতে পঞ্চাশ বৎসরেও পৌঁছে না। সেই নক্ষত্র হইতে যে আলোকরেখা আমাদের নয়নে আসিয়া লাগে, তাহার তরঙ্গসকল কতবার প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে? এবার যখন রাত্রে আকাশ প্রতি চাহিবে, তখন এই কথাটি একবার মনে করিও।

(সমুদ্র-তরঙ্গ)

এই অচিন্ত্য বেগবান্ স্ফুল্ভ হইতে স্ফুল্ভ জ্যোতিস্তরঙ্গের আলোচনার পর, পার্থিব জলের তরঙ্গমালার আলোচনা অবিধেয় নহে। জ্যোতিস্তরঙ্গের বেগের পরে, সমুদ্রের ঢেউকে অচল মনে করিলেও হয়। তথাপি সাগর-তরঙ্গের বেগ মন্দ নহে। ফিণ্ডলে সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন যে, অতি বৃহৎ সাগরোন্মিসকল ঘণ্টায় ২০ মাইল হইতে ২৭১০ মাইল পর্যন্ত বেগে ধাবিত হয়। স্কারেসবি সাহেব গণনা করিয়াছেন যে, আটলান্টিক সাগরের তরঙ্গ ঘণ্টায় প্রায় ৩৩ মাইল চলে। এই বেগ ভারতবর্ষীয় বাষ্পীয় রথের বেগের অপেক্ষা ক্ষিপ্ততর।

যাঁহারা বাঙ্গালার নদীবর্গে নৌকারোহণ করিতে ভীত, সাগরোন্মির পরিমাণ সম্বন্ধে তাঁহাদের কিরূপ অনুমান, তাহা বলিতে পারি না। উপকথায় “তালগাছপ্রমাণ ঢেউ” শূন্য যায়—কিন্তু কেহ তাহা বিশ্বাস করে না। সমুদ্রে তদপেক্ষা উচ্চতর ঢেউ উঠিয়া থাকে। ফিণ্ডলে সাহেব লিখেন, ১৮৪৩ অব্দে কম্বালের নিকট ৩০০ ফিট অর্থাৎ ২০০ হাত উচ্চ ঢেউ উঠিয়াছিল। ১৮২০ সালে নরওয়ে প্রদেশের নিকট ৪০০ ফিট পরিমিত ঢেউ উঠিয়াছিল।

সমুদ্রের ঢেউ অনেক দূর চলে। উত্তমাশা অন্তরীপে উদ্ভূত মগ্ন তরঙ্গ তিন সহস্র মাইল দূরস্থ উপদ্বীপে প্রহত হইয়া থাকে। আচার্য্য বাচ বলেন যে, জাপান দ্বীপাবলীর অন্তর্গত সৈমোদা নামক স্থানে একটা ভূমিকম্প হয়; তাহাতে ঐ স্থানসমীপস্থ “পোতাশ্রয়ে” এক বৃহৎ উন্মি প্রবেশ করিয়া, সরিয়া আসিলে পোতাশ্রয় জলশূন্য হইয়া পড়ে। সেই ঢেউ প্রশান্ত মহাসাগরের পরপারে, সানফ্রান্সিস্কা নগরের উপকূলে প্রহত হয়। সৈমোদা হইতে ঐ নগর ৪৮০০ মাইল। তরঙ্গরাজ ১২ ঘণ্টা ১৬ মিনিটে পার হইয়াছিলেন অর্থাৎ মিনিটে ৬১০ মাইল চলিয়াছিলেন।

চন্দ্রলোক

এই বঙ্গদেশের সাহিত্যে চন্দ্রদেব অনেক কাব্য করিয়াছেন। বর্ণনায়, উপমায়,—বিচ্ছেদে, মিলনে,—অলঙ্কারে খোশামোদে,—তিনি উলটি পালটি খাইয়াছেন। চন্দ্রবদন, চন্দ্ররশ্মি, চন্দ্রকরলেখা শশী মসি ইত্যাদি সাধারণ ভোগ্য সামগ্রী অকাতরে বিতরণ করিয়াছেন; কখন স্ত্রীলোকের স্কন্ধোপরি ছড়াছড়ি, কখন তাঁহাদিগের নখরে গড়াগড়ি গিয়াছেন; সুধাকর হিমকরকরনিকর, মৃগাঙ্ক, শশাঙ্ক, কলঙ্ক প্রভৃতি অনুপ্রাসে, বাঙ্গালী বালকের মনোমুগ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু এই উর্নাবংশ শতাব্দীতে এইরূপ কেবল সাহিত্য-কুঞ্জ লীলা খেলা করিয়া, কার সাধ্য নিস্তার পায়? বিজ্ঞান-দৈত্য সকল পথ ঘোরিয়া বাসিয়া আছে। আজি চন্দ্রদেবকে বিজ্ঞানে ধরিয়াছে, ছাড়াছাড়ি নাই। আর সাধের সাহিত্য-বন্দাবনে লীলা খেলা চলে না—কুঞ্জধারে, সাহেব অফুর রথ আনাইয়া দাঁড়াইয়া আছে: চল, চন্দ্র, বিজ্ঞান-মথুরায় চল; একটা কংস বধ করিতে হইবে।

যখন অভিমন্যু-শোকে ভদ্রাজ্জুন অত্যন্ত কাতর, তখন তাঁহাদিগের প্রবোধার্থ কথিত হইয়াছিল যে, অভিমন্যু চন্দ্রলোকে গমন করিয়াছেন। আমরাও যখন নীলগগন-সমুদ্রে এই সুবর্ণের দ্বীপ দেখি, আমরাও মনে করি, বৃদ্ধি এই সুবর্ণময় লোকে সোণার মানুষ সোণার থালে সোণার মাছ ভাজিয়া সোণার ভাত খায়, হীরার সরবত পান করে, এবং অপূর্ব পদার্থের শয্যায় শয়ন করিয়া স্বপ্নশূন্য নিদ্রায় কাল কাটায়। বিজ্ঞান বলে, তাহা নহে—এ পোড়া লোকে যেন কেহ যায় না—এ দক্ষ মরুভূমি মাত্র। এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিব।

বালকেরা শৈশবে পড়িয়া থাকে, চন্দ্র উপগ্রহ। কিন্তু উপগ্রহ বলিলে, সৌরজগতের সঙ্গে চন্দ্রের প্রকৃত সম্বন্ধ নির্দিষ্ট হইল না। পৃথিবী ও চন্দ্র যুগল গ্রহ। উভয়ে এক পথে, একত্র সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতেছে—উভয়েই উভয়ের মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্রের বশবর্তী—কিন্তু পৃথিবী গুরুত্বে চন্দ্রের একাশী গুণ, এজন্য পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি চন্দ্রাপেক্ষা এত অধিক যে, সেই যুক্ত আকর্ষণে কেন্দ্র পৃথিবীস্থিত; এজন্য চন্দ্রকে পৃথিবীর প্রদক্ষিণকারী উপগ্রহ বোধ হয়। সাধারণ পাঠকে বুঝিবেন যে, চন্দ্র একটি ক্ষুদ্রতর পৃথিবী; ইহার ব্যাস ১০৫০ ক্রোশ; অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসের চতুর্থাংশের অপেক্ষা কিছু বেশী। যে সকল কবিগণ নায়িকাদিগকে আর প্রাচীন প্রথামত চন্দ্রমুখী বলিয়া সম্বোধন করেন—নতন উপমার অনুসন্ধান করেন—তাহাদিগকে আমরা পরামর্শ দিই যে, এক্ষণ অর্থাৎ নায়িকাগণকে পৃথিবীমুখী বলিতে আরম্ভ করিবেন। তাহা হইলে অলঙ্কারের কিছু গৌরব হইবে। বুঝাইবে যে, সুন্দরীর মুখমণ্ডলের ব্যাস কেবল সহস্র ক্রোশ নহে—কিন্তু কম চারি সহস্র ক্রোশ।

এই ক্ষুদ্র পৃথিবী আমাদের পৃথিবী হইতে এক লক্ষ বিংশতি সহস্র ক্রোশ মাত্র—ত্রিশ হাজার যোজন মাত্র। গাগনিক গণনায় এ দূরতা অতি সামান্য—এপাড়া ওপাড়া। ত্রিশটি পৃথিবী গায় গায় সাজাইলে চন্দ্র গিয়া লাগে। চন্দ্র পর্য্যন্ত রেলওয়ে যদি থাকিত, তাহা হইলে ঘণ্টায় বিশ মাইল গেলে, দিন রাত্র চলিলে, পঞ্চাশ দিনে পৌঁছান যায়।

সুতরাং আধুনিক জ্যোতির্বিদগণ চন্দ্রকে অতি নিকটবর্তী মনে করেন। তাহাদিগের কৌশলে এক্ষণে এমন দূরবীক্ষণ নির্মিত হইয়াছে যে, তদ্বারা চন্দ্রাদিকে ২৪০০ গুণ বৃহত্তর দেখা যায়। ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, চন্দ্র যদি আমাদের নেত্র হইতে পঞ্চাশ ক্রোশ মাত্র দূরবর্তী হইত, তাহা হইলে আমরা চন্দ্রকে যেমন স্পষ্ট দেখিতাম, এক্ষণেও ঐ সকল দূরবীক্ষণ সাহায্যে সেইরূপ স্পষ্ট দেখিতে পারি।

এরূপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে চন্দ্রকে কিরূপ দেখা যায়? দেখা যায় যে, তিনি হস্তপদাদিবিশিষ্ট দেবতা নহেন, জ্যোতির্ময় কোন পদার্থ নহেন, কেবল পাষণময়, আগ্নেয় গিরিপরিপূর্ণ, জড়পিণ্ড। কোথাও অত্যন্ত পর্বতমালা—কোথাও গভীর গহ্বররাজি। চন্দ্র যে উজ্জ্বল, তাহা সূর্যালোকের কারণে। আমরা পৃথিবীতেও দেখি যে, যাহা রৌদ্রপ্রদীপ্ত, তাহাই দূর হইতে উজ্জ্বল দেখায়। চন্দ্রও রৌদ্রপ্রদীপ্ত বলিয়া উজ্জ্বল। কিন্তু যে স্থানে রৌদ্র না লাগে, সে স্থান উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয় না। সকলেই জানে যে, চন্দ্রের কলায় কলায় হাস বৃদ্ধি এই কারণেই ঘটিয়া থাকে। সে তত্ত্ব বুঝাইয়া লিখিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইহা সহজেই বুঝা যাইবে, যে স্থান উন্নত, সেই স্থানে রৌদ্র লাগে—সেই স্থান আমরা উজ্জ্বল দেখি—যে স্থানে গহ্বর অথবা পর্বতের ছায়া, সে স্থানে রৌদ্র প্রবেশ করে না—সে স্থলগুলি আমরা কালিমাপূর্ণ দেখি। সেই অনুজ্জ্বল রৌদ্রশূন্য স্থানগুলিই “কলঙ্ক”—অথবা “মৃগ”—প্রাচীনাদিগের মতে সেইগুলিই “কদম-তলায় বড়ী চরকা কাটিতেছে।”

চন্দ্রের বহির্ভাগের এরূপ সুক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অনুসন্ধান হইয়াছে যে, তাহায় চন্দ্রের উৎকৃষ্ট মানচিত্র প্রস্তুত হইয়াছে; তাহার পর্বতাবলী ও প্রদেশসকল নাম প্রাপ্ত হইয়াছে—এবং তাহার পর্বতমালার উচ্চতা পরিমিত হইয়াছে। বেয়র ও মাল্লর নামক সুপরিচিত জ্যোতির্বিদদ্বয় অন্যান্য ১০৯৫টি চন্দ্র পর্বতের উচ্চতা পরিমিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে মনুষ্যে যে পর্বতের নাম রাখিয়াছে “নিউটন”, তাহার উচ্চতা ২২,৮২০ ফিট। এতাদৃশ উচ্চ পর্বত-শিখর, পৃথিবীতে আন্দিস ও হিমালয়শ্রেণী ভিন্ন আর কোথাও নাই। চন্দ্র পৃথিবীর পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ মাত্র এবং গুরুত্বে একাশী ভাগের এক ভাগ মাত্র; অতএব পৃথিবীর তুলনায়, চন্দ্র পর্বতসকল অত্যন্ত উচ্চ। চন্দ্রের তুলনায় নিউটন যেমন উচ্চ, চিম্বারোজা নামক বৃহৎ পার্থিব শিখরের অবয়ব আর পঞ্চাশ গুণে বৃদ্ধি পাইলে পৃথিবীর তুলনায় তত উচ্চ হইত।

চন্দ্র পর্বত কেবল যে আশ্চর্য্য উচ্চ, এমত নহে; চন্দ্রলোকে আগ্নেয় পর্বতের অত্যন্ত আধিক্য। অগণিত আগ্নেয় পর্বতশ্রেণী অগ্ন্যাদ্গারী বিশাল রন্ধ্রসকল প্রকাশিত করিয়া রহিয়াছে—যেন কোন তপ্ত দ্রবীভূত পদার্থ কটাহে জ্বাল প্রাপ্ত হইয়া কোন কালে টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়া জমিয়া গিয়াছে। এই চন্দ্রমণ্ডল, সহস্রধা বিভিন্ন, সহস্র সহস্র বিবরবিশিষ্ট,—কেবল পাষণ, বিদীর্ণ, ভগ্ন, ছিন্নভিন্ন, দধ্ব, পাষণময়। হায়! এমন চাঁদের সঙ্গে কে সুন্দরী-দিগের মুখের তুলনা করার পদ্ধতি বাহির করিয়াছিল?

বাঁকম রচনাবলী

এই ত পোড়া চন্দ্রলোক! এক্ষণে জিজ্ঞাসা, এখানে জীবের বসতি আছে কি? আমরা যত দূর জানি, জল বায়ু ভিন্ন জীবের বসতি নাই; যেখানে জল বা বায়ু নাই, সেখানে আমাদের জ্ঞানগোচরে জীব থাকিতে পারে না। যদি চন্দ্রলোকে জল বায়ু থাকে, তবে সেখানে জীব থাকিতে পারে; যদি জল বায়ু না থাকে, তবে জীব নাই, এক প্রকার সিদ্ধ করিতে পারি। এক্ষণে দেখা যাউক, তদ্বিষয়ে কি প্রমাণ আছে।

মনে কর, চন্দ্র পৃথিবীর ন্যায় বায়বীয় মণ্ডলে বেষ্টিত। মনে কর, কোন নক্ষত্র, চন্দ্রের পশ্চাদ্ভাগ দিয়া গতি করিবে। ইহাকে জ্যোতিষে সমাবরণ (Occultation) বলা যাইতে পারে। নক্ষত্র চন্দ্র কর্তৃক সমাবৃত হইবার কালে প্রথমে, বায়ুস্তরের পশ্চাদ্ভাগ হইবে; তৎপরে চন্দ্র-শরীরের পশ্চাতে লুকাইবে। যখন বায়বীয় স্তরের পশ্চাতে নক্ষত্র যাইবে, তখন নক্ষত্র পূর্বমত উজ্জ্বল বোধ হইবে না; কেন না, বায়ু আলোকের কিয়ৎপরিমাণে প্রতিরোধ করিয়া থাকে। নিকটস্থ বস্তু আমরা যত স্পষ্ট দেখি, দূরস্থ বস্তু আমরা তত স্পষ্ট দেখিতে পাই না—তাহার কারণ, মধ্যবর্তী বায়ুস্তর। অতএব সমাবরণীয় নক্ষত্র ক্রমে হ্রস্বতেজা হইয়া পরে চন্দ্রান্তরালে অদৃশ্য হইবে। কিন্তু এরূপ ঘটিয়া থাকে না। সমাবরণীয় নক্ষত্র একেবারেই নিবিয়া যায়—নিবিবার পূর্বে তাহার উজ্জ্বলতার কিছুমাত্র হ্রাস হয় না। চন্দ্রে বায়ু থাকিলে কখন এরূপ হইত না।

চন্দ্রে যে জল নাই, তাহারও প্রমাণ আছে, কিন্তু সে প্রমাণ অতি দূরদূর—সাধারণ পাঠককে অল্পে বুঝান যাইবে না। এবং এই সকল প্রমাণ বর্ণ-রেখা পরীক্ষক (Spectroscope) যন্ত্রের বিচিত্র পরীক্ষায় দূরীকৃত হইয়াছে; চন্দ্রলোকে জলও নাই, বায়ুও নাই। যদি জল বায়ু না থাকে, তবে পৃথিবীবাসী জীবের ন্যায় কোন জীব তথায় নাই।

আর একটি কথা বলিয়াই আমরা উপসংহার করিব। চান্দ্রিক উত্তাপও এক্ষণে পরিমিত হইয়াছে। চন্দ্র এক পক্ষকালে আপন মেরুদণ্ডের উপর সম্বর্তন করে, অতএব আমাদের এক পক্ষকালে এক চান্দ্রিক দিবস। এক্ষণে স্মরণ করিয়া দেখ যে, পৌষ মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসে আমরা এত তাপাধিক্য ভোগ করি, তাহার কারণ—পৌষ মাসে দিন ছোট, জ্যৈষ্ঠ মাসের দিন তিন চারি ঘণ্টা বড়। যদি দিনমান তিন চারি ঘণ্টা মাত্র বড় হইলেই, এত তাপাধিক্য হয়, তবে পাক্ষিক চান্দ্র দিবসে না জানি, চন্দ্র কি ভয়ানক উত্তপ্ত হয়। তাতে আবার পৃথিবীতে জল, বায়ু, মেঘ আছে—তজ্জন্য পার্থিব সস্তাপ বিশেষ প্রকারে শমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু জল বায়ু মেঘ ইত্যাদি চন্দ্রে কিছুই নাই। তাহার উপর আবার চন্দ্র পাষণময়। অতি সহজে উত্তপ্ত হয়। অতএব চন্দ্রলোক অত্যন্ত তপ্ত হইবারই সম্ভাবনা। বিখ্যাত দূরবীক্ষণ নিৰ্মাণকারীর পুত্র লর্ড রস চন্দ্রের তাপ পরিমিত করিয়াছেন। তাহার অনুসন্ধানে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, চন্দ্রের কোন কোন অংশ এত উষ্ণ, তন্তুলনায় যে জল অগ্নিসংস্পর্শে ফুটিতেছে, তাহাও শীতল। সে সস্তাপে কোন পার্থিব জীব রক্ষা পাইতে পারে না—মুহূর্ত্ত জন্যও রক্ষা পাইতে পারে না। এই কি শীতরশ্মি, হিমকর, সুধাংশু? হায়! হায়! অন্ধ পুত্রকে পদ্মলোচন আর কেমন করিয়া বলিতে হয়!*

অতএব সুখের চন্দ্রলোক কি প্রকার, তাহা এক্ষণে আমরা একপ্রকার বুদ্ধিতে পারিয়াছি। চন্দ্রলোক পাষণময়,—বিদীর্ণ, ভগ্ন, ছিন্ন-ভিন্ন, বন্ধুর, দক্ষ, পাষণময়! জলশূন্য, সাগরশূন্য, নদীশূন্য, তড়াগশূন্য, বায়ুশূন্য, মেঘশূন্য, বৃষ্টিশূন্য,—জনহীন, জীবহীন, তরুহীন, তৃণহীন, শব্দহীন, † উত্তপ্ত, জ্বলন্ত, নরককুণ্ডতুল্য এই চন্দ্রলোক!

এই জন্য বিজ্ঞানকে কাব্য আঁটিয়া উঠিতে পারে না। কাব্য গড়ে—বিজ্ঞান ভাঙ্গে।

* যদি কেহ বলেন যে, চন্দ্র স্বয়ং উত্তপ্ত হউন, আমরা তাহার আলোকের শৈত্য স্পর্শের প্রত্যক্ষ দ্বারা জানিয়া থাকি। বাস্তবিক এ কথা সত্য নহে—আমরা স্পর্শ দ্বারা চন্দ্রলোকের শৈত্য বা উষ্ণতা কিছুই অনুভূত করি না। অন্ধকার-রাত্রের অপেক্ষা জ্যোৎস্না রাত্রি শীতল, এ কথা যদি কেহ মনে করেন, তবে সে তাহার মনের বিকার মাত্র। বরং চন্দ্রলোকে কিঞ্চিৎ সস্তাপ আছে; সেটুকু এত অল্প যে, তাহা আমাদের স্পর্শের অনুভবনীয় নহে। কিন্তু জাভেদেশী, মেলনি, পিয়াজি প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষার দ্বারা তাহা সিদ্ধ করিয়াছেন।

† কেন না, বায়ু নাই।

বিবিধ প্রবন্ধ

প্রথম খণ্ড

উত্তরচারিত

উত্তরচারিতের উপাখ্যানভাগ রামায়ণ হইতে গৃহীত। ইহাতে রামকর্তৃক সীতার প্রত্যাখ্যান ও তৎসঙ্গে পুনর্নির্মালন বর্ণিত হইয়াছে। স্থূল বৃত্তান্ত রামায়ণ হইতে গৃহীত বটে, কিন্তু অনেক বিষয় ভবভূতির স্বকপোলকল্পিত। রামায়ণে যেরূপ বাল্মীকির আশ্রমে সীতার বাস, এবং যেরূপ ঘটনায় পুনর্নির্মালন, এবং মিলনান্তেই সীতার ভূতলপ্রবেশ ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে, উত্তরচারিতে সে সকল সেরূপ বর্ণিত হয় নাই। উত্তরচারিতে সীতার রসাতলবাস, লবের যুদ্ধ এবং তদন্তে সীতার সহিত রামের পুনর্নির্মালন ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ ভিন্ন পন্থায় গমন করিয়া, ভবভূতি রসজ্ঞতার এবং আত্মশক্তিজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। কেন না, যাহা একবার বাল্মীকিকর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, পৃথিবীর কোন্ কবি তাহা পুনর্বার্ণন করিয়া প্রশংসাভাজন হইতে পারেন? যেমন ভবভূতি এই উত্তরচারিতের উপাখ্যান অন্য কবির গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, তেমনি সেক্ষপীয়র তাঁহার রচিত প্রায় সকল নাটকের উপাখ্যানভাগ অন্য গ্রন্থকারের গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি ভবভূতির ন্যায় পূর্বেকবিগণ হইতে ভিন্ন পথে গমন করেন নাই। ইহারও বিশেষ কারণ আছে। সেক্ষপীয়র অদ্বিতীয় কবি। তিনি স্বীয় শক্তির পরিমাণ বিলক্ষণ বুঝিতেন—কোন্ মহাত্মা না বুঝেন? তিনি জানিতেন যে যে সকল গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থ হইতে তিনি আপন নাটকের উপাখ্যানভাগ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই তাঁহার সঙ্গে কবিত্বশক্তিতে সমকক্ষ নহেন। তিনি যে আকাশে আপন কবিত্বের প্রোজ্জ্বল কিরণমালা বিস্তার করিবেন, সেখানে পূর্বেগামী নক্ষত্রগণের কিরণ লোপ পাইবে। এজন্য ইচ্ছাপূর্বেকই পূর্বেলেখকদিগের অনুবর্তী হইয়াছিলেন। তথাপি ইহাও বক্তব্য যে, কেবল একখানি নাটকের উপাখ্যানভাগ তিনি হোমর হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং সেই ট্রেলস্ ও ক্রেসিদা নাটক প্রণয়নকালে, ভবভূতি যেরূপ রামায়ণ হইতে ভিন্ন পথে গমন করিয়াছেন, তিনিও তেমনি ইলিয়দ হইতে ভিন্ন পথে গিয়াছেন।

ভবভূতিও সেক্ষপীয়রের ন্যায় আপন ক্ষমতার পরিমাণ জানিতেন। তিনি আপনাকে, সীতানির্বাসন বৃত্তান্ত অবলম্বনপূর্বেক একখানি অত্যুৎকৃষ্ট নাটক প্রণয়নে সমর্থ বলিয়া, বিলক্ষণ জানিতেন। তিনি ইহাও বুঝিতেন যে, কবিগুরু বাল্মীকির সহিত কদাচ তিনি তুলনাকাঙ্ক্ষী হইতে পারেন না। অতএব তিনি কবিগুরু বাল্মীকিকে প্রণাম* করিয়া তাঁহা হইতে দূরে অবস্থিতি করিয়াছেন। ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, অস্মন্দেশীয় নাটকে মৃত্যুর প্রয়োগ নিষিদ্ধ† বলিয়া, ভবভূতি স্বীয় নাটকে সীতার পৃথিবীপ্রবেশ বা তদ্বৎ শোকাবহ ব্যাপার বিন্যস্ত করিতে পারেন নাই।

উত্তরচারিতের চিত্রদর্শন নামে প্রথমাঙ্ক বঙ্গীয় পাঠকসমীপে বিলক্ষণ পরিচিত; কেন না, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই অঙ্ক অবলম্বন করিয়া, স্বপ্রণীত সীতার বনবাসের প্রথম অধ্যায় লিখিয়াছেন। এই চিত্রদর্শন কবিসুলভকৌশলময়। ইহাতে চিত্রদর্শনোপলক্ষে রামসীতার পূর্বেবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। ইহার উদ্দেশ্য এমত নহে যে, কবি সংক্ষেপে পূর্বেঘটনার সকল বর্ণন করেন। রামসীতার অলৌকিক, অসীম, প্রগাঢ় প্রণয় বর্ণন করাই ইহার উদ্দেশ্য। এই প্রণয়ের স্বরূপ অনুভব করিতে না পারিলে, সীতানির্বাসন যে কি ভয়ানক ব্যাপার, তাহা হৃদয়ঙ্গম হয় না। সীতার নির্বাসন সামান্য স্ত্রীবিয়োগ নহে। স্ত্রীবিসর্জন মাত্রই ক্লেশকর—মর্মাভেদী। যে কেহ আপন স্ত্রীকে বিসর্জন করে, তাহারই

* ইদং গুরুভ্যঃ [কবিভ্যঃ] পূর্বেভ্যো নমোবাকং প্রশাস্মহে।—প্রস্তাবনা।

† দুরাহ্বানং বধো যুদ্ধং রাজ্যদেশাদিবিপ্লবঃ।

বিবাহো ভোজনং শাপোৎসর্গেী মৃত্যুরতস্তথা ॥—সাহিত্যদর্পণে।

বাংকম রচনাবলী

হৃদয়োন্মত্ত হয়। যে বাল্যকালের ক্রীড়ার সঙ্গিনী, কৈশোরে জীবনসুখের প্রথম শিক্ষাদাত্রী, যৌবনে যে সংসারসৌন্দর্যের প্রতিমা, বার্কাক্যে যে জীবনাবলম্বন—ভাল বাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারে? গৃহে যে দাসী, শয়নে যে অপ্সরা, বিপদে যে বন্ধু, রোগে যে বৈদ্য, কার্যে যে মন্ত্রী, ক্রীড়ায় যে সখী, বিদ্যায় যে শিষ্য, ধর্ম্মে যে গুরু;—ভাল বাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে সহজে বিসর্জন করিতে পারে? আশ্রমে যে আরাম, প্রবাসে যে চিন্তা,—স্বাস্থ্যে যে সুখ, রোগে যে ঔষধ,—অর্জনে যে লক্ষ্মী, ব্যয়ে যে যশঃ,—বিপদে যে বুদ্ধি, সম্পদে যে শোভা—ভাল বাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে সহজে বিসর্জন করিতে পারে? আর যে ভাল বাসে, পত্নী বিসর্জন তাহার পক্ষে কি ভয়ানক দুর্ঘটনা! আবার যে রামের ন্যায় ভাল বাসে? যে পত্নীর স্পর্শমাত্রে অস্থিরচিত্ত,—জানে না যে,

—“সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা,
প্রবোধো নিদ্রা বা কিম্বা বিষবিষপঃ কিম্বা মদঃ।
তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পরিমৃঢ়েন্দ্রিয়গণো,
বিকারশ্চৈতন্যাং ভ্রময়তি সমুন্মীলয়তি চ॥”*

যাহার পক্ষে—

“ম্লানস্য জীবকুসুমস্য বিকাশনানি,
সস্তপর্ণানি সকলেন্দ্রিয়মোহনানি।
এতানি তে সুবচনানি সরোরুহাঙ্কি,
কর্ণামৃতানি মনসশ্চ রসায়নানি॥†

যাহার বাহু সীতার চিরকালের উপাধান,—

“আবিবাহসময়াদ্গৃহে বনে,
শৈশবে তদনু যৌবনে পুনঃ।
স্বাপহেতুরনুপাশ্রিতোহন্যয়া,
রামবাহুরনুপধানমেষ তে॥‡

যার পত্নী—

—“গেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্তিনয়নয়োরসাবস্যাঃ স্পর্শো বপুষি বহুলশ্চন্দনরসঃ।
অয়ং কণ্ঠে বাহুঃ শিশিরমসৃণো মৌক্তিকসরঃ।”§

তাহার কি কষ্ট, কি সর্বনাশ, কি জীবনসর্বস্বধ্বংসসাধিক যন্ত্রণা! তৃতীয়াঙ্কে সেই যন্ত্রণার উপযুক্ত চিত্র প্রণয়নের উদ্যোগেই প্রথমাঙ্কে কবি এই প্রণয় চিত্রিত করিয়াছেন। এই প্রণয় সর্বপ্রফুল্লকর মধ্যাহ্নসূর্য্য—সেই বিরহযন্ত্রণা ইহার ভাবী করালকাদম্বিনী,—যদি সে মেঘের কালিমা অনুভব করিবে, তবে আগে এই সূর্য্যের প্রখরতা দেখ। যদি সেই অনন্ত

* “এক্ষণে আমি সুখভোগ করিতেছি, কি দুঃখভোগ করিতেছি; নিদ্রিত আছি, কি জাগরিত আছি; কিম্বা কোন বিষপ্রবাহে দেহে রক্তপ্রবাহের সহিত মিশ্রিত হইয়া, আমার এরূপ অবস্থা ঘটাইয়া দিয়াছে, অথবা মদ (মাদক দ্রব্য সেবন) জনিত মত্ততাবশতঃ এরূপ হইতেছে, ইহার কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।” নৃসিংহবাবুর অনুবাদ, ৩০ পৃষ্ঠা।

এই প্রবন্ধ নৃসিংহবাবুর অনুবাদের সমালোচনা উপলক্ষে লিখিত হইয়াছিল। অতএব সে অনুবাদ সর্বক্ষে সম্পূর্ণ না হইলেও তাহাই উদ্ধৃত হইবে।

† “কমলনয়নে! তোমার এই বাক্যগুলি, শোকাবিসস্তপ্ত জীবনরূপ কুসুমের বিকাশক, ইন্দ্রিয়গণের মোহন ও সস্তপর্ণস্বরূপ, কর্ণের অমৃতস্বরূপ, এবং মনের গ্লানিপরিহারক (রসায়ন) ঔষধস্বরূপ।” ঐ ৩১ পৃষ্ঠা।

‡ “রামবাহু বিবাহের সময় হইতে, কি গৃহে, কি বনে, সর্বত্রই শৈশবাবস্থায় এবং পরে যৌবনাবস্থাতেও তোমার উপাধানের (মাথায় দিবার বালিসের) কার্য্য করিয়াছে।” ঐ ৩১ পৃষ্ঠা।

§ “ইনিই আমার গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপ, ইনিই আমার নয়নের অমৃতশলাকাস্বরূপ, ইহারই এই স্পর্শ গাত্রলগ্ন চন্দনস্বরূপ সুখপ্রদ, এবং ইহারই এক বাহু আমার কণ্ঠস্থ শীতল এবং কোমল মৃদুস্বরূপ।” ঐ ৩১ পৃষ্ঠা।

বিস্তৃত অন্ধকারময় দুঃখসাগরের ভীষণ স্বরূপ অনুভব করিবে, তবে এই সুন্দর উপকূল,— প্রাসাদশ্রেণীসমুজ্জল, ফলপুষ্পপরিশোভিত বৃক্ষবাটিকাপরিমণ্ডিত এই সর্বসুখময় উপকূল দেখ। এই উপকূলেশ্বরী সীতাকে রামচন্দ্র নিদ্রিতাবস্থায় ঐ অতলস্পর্শী অন্ধকারসাগরে ডুবাইলেন।

আমরা সেই মনোমোহিনী কথার ক্রমশঃ সমালোচনা করিব।

অঙ্কমুখে, লক্ষ্যুণ রাম সীতাকে একখানি চিত্র দেখাইতেছেন। জনকাদির বিচ্ছেদে দুর্ম্মনায়মানা গর্ভিণী সীতার বিনোদনার্থ এই চিত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহাতে সীতার অগ্নিশুদ্ধি পর্য্যন্ত রামসীতার পূর্ষ্ববৃত্তান্ত চিত্রিত হইয়াছিল। এই “চিত্রদর্শন” কেবল প্রেমপরিপূর্ণ—স্নেহ যেন আর ধরে না। কথায় কথায় এই প্রেম। যখন অগ্নিশুদ্ধির কথার প্রসঙ্গমাত্রে রাম, সীতাবমাননা ও সীতার পীড়ন জন্য আত্মতিরস্কার করিতেছিলেন—তখন সীতার কেবল “হোদু অজ্জউত্ত হোদু—এহি পেকখক্ষ দাব দে চরিদং”—এই কথাতেই কত প্রেম! যখন মিথিলাবৃত্তান্তে সীতা রামের চিত্র দেখিলেন, তখন কত প্রেম উছলিয়া উঠিল! সীতা দেখিলেন,

“অন্ধাহে দল্লবণীলুপ্পলসামলসিগন্ধমসিগসোহমাগমংসলেন দেহসোহগ্গেণ বিক্ষঅথি-
মিদতাদদীসমাগসোম্মসুন্দরসিরী অনাদরখুংডিদসঙ্করসরাসগো সিহুডমুন্ধমুহমুডলো অজ্জ-
উত্তো আলিহিদো।”*

যখন রাম, সীতার বধূবেশ মনে করিয়া বলিলেন,

প্রতনুবিরলৈঃ প্রান্তোন্মীলন্মনোহরকুন্তলৈ-
দর্শনমুকুলৈর্মুঙ্কালোকং শিশুদধতী মুখম্।
ললিতললিতৈর্জ্যেৎনাপ্রায়ৈরকৃত্রিমবিভ্রমৈ-
রকৃত মধুরৈরস্বানাং মে কুতহলমঙ্গকৈঃ ॥—†

যখন গোদাবরীতীর স্মরণ করিয়া কহিলেন,

কিমপি কিমপি মন্দং মন্দমাসিত্রিযোগা-
দবিরলিতকপোলং জল্পতোরক্রমেণ।
অর্শিখিলপরিরন্তব্যাপ্তৈকৈকদোষো-
রবিদিতগতযামা রাত্রিরেব ব্যরংসীৎ ॥ ‡

যখন যমুনাটস্থ শ্যামবট স্মরণ করিয়া কহিলেন,

অলসললিতমুঙ্কান্যধবসজাতখেদা-
দর্শিখিলপরিরন্তৈদন্তসংবাহনানি।
পরিমৃদিতমৃগালীদুর্ষ্বলান্যঙ্গকানি,
ত্বমুরসি মম কৃত্বা যত্র নিদ্রামবাপ্তা ॥ §

* আহা! আর্ষ্যপুত্রের কি সুন্দর চিত্র! প্রফুল্লপ্রায় নবনীলোৎপলবৎ শ্যামলগ্নিষ্ক কোমল শোভাবিশিষ্ট কি দেহ-সৌন্দর্য্য! কেমন অবলীলাক্রমে হরধনু ভাঙ্গিতেছেন, মুখমণ্ডল কেমন শিখণ্ডে শোভিত! পিতা বিস্মিত হইয়া এই সুন্দর শোভা দেখিতেছেন! আহা কি সুন্দর!

† “মাতৃগণ তৎকালে বালা জানকীর অঙ্গসৌষ্ঠবাদি দেখিয়া কি সুখীই হইয়াছিলেন, এবং ইনিও অতি সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম ও অনতি-নিবিড় দন্তগুলি, তাহার উভয়পার্শ্বস্থ মনোহর কুন্তলমনোহর মুখশ্রী, আর সুন্দর চন্দ্রিকিরণ-সদৃশ নির্ম্মল এবং কৃত্রিমবিলাসরহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্ত-পদাদি অঙ্গদ্বারা তাঁহাদের আনন্দের একশেষ করিয়াছিলেন।” নৃসিংহবাবুর অনুবাদ। এই কবিতাটি বালিকা বধুর বর্ণনার চূড়ান্ত।

‡ “একত্র শয়ন করিয়া পরস্পরের কপোলদেশ পরস্পরের কপোলের সহিত সংলগ্ন করিয়া এবং উভয়ে এক এক হস্ত দ্বারা গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া অনবরত মৃদুস্বরে ও যদৃচ্ছাক্রমে বহুবিধ গল্প করিতে করিতে অজ্ঞাতসারে রাত্রি অতিবাহিত করিতাম।”

§ “যেখানে তুমি পথজনিত পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া ঈষৎ কম্পবান্, তথাপি মনোহর এবং গাঢ় আলিঙ্গনকালে অত্যন্ত মন্দর্নদায়ক, আর দলিত মৃগালিনীর ন্যায় স্নান ও দুর্ষ্বল হস্তাদি অঙ্গ আমার বক্ষঃস্থলে রাখিয়া নিদ্রা গমন করিয়াছিলে।” নৃসিংহবাবুর অনুবাদ।

বাংকম রচনাবলী

যখন নিদ্রাভঙ্গান্তে রামকে দেখিতে না পাইয়া কৃষ্ণিম কোপে সীতা বলিলেন,—

ভোদু, কুবিস্মং, জই তং পেক্খমাণা অন্তণো পহিবিস্মং।*

তখন কত প্রেম উছলিয়া উঠিতেছে! কিন্তু এই অতি বিচিত্র কবিত্বকৌশলময় চিত্রদর্শনে আরও কতই সুন্দর কথা আছে! লক্ষ্মণের সঙ্গে সীতার কৌতুক, “বচ্ছ ইঅং বি অবরা কা?”—মিথিলা হইতে বিবাহ করিয়া আসিবার কথায় দশরথকে রামের স্মরণ—“স্মরামি! হস্ত স্মরামি!” মন্থরার কথায় রামের কথা অন্তরিতকরণ ইত্যাদি। সুপর্ণখার চিত্র দেখিয়া সীতার ভয় আমাদের অতি মিষ্ট লাগে,—

সীতা। হা অজ্জউত্ত এত্তিঅং দে দংসণং।

রামঃ। অয়ি বিপ্রয়োগত্তন্তে! চিত্রমেতৎ।

সীতা। যধাতথা হোদু দুজ্জণো অসুহং উম্পাদেই।†

স্ট্রীচরিত্ত সম্বন্ধে এটি অতি সুমিষ্ট ব্যঙ্গ; অথচ কেবল ব্যঙ্গ নহে।

কালিদাসের বর্ণনাশক্তি অতি প্রসিদ্ধ, কিন্তু ভবভূতির বর্ণনাশক্তিও উত্তম। কালিদাসের বর্ণনা তাঁহার অতুল উপমাপ্রয়োগের দ্বারা অত্যন্ত মনোহারিণী হয়। ভবভূতির উপমাপ্রয়োগ অতি বিরল; কিন্তু বর্ণনীয় বস্তু তাঁহার লেখনীমুখে স্বাভাবিক শোভার অধিক শোভা ধারণ করিয়া বসে। কালিদাস, একাটি একাটি করিয়া বাছিয়া বাছিয়া সুন্দর সামগ্রীগুণিল একত্রিত করেন; সুন্দর সামগ্রীগুণিলের সঙ্গে তদীয় মধুর ক্রিয়া সকল সুচিত করেন, তাহার উপর আবার উপমাচ্ছলে আরও কতকগুণিল সুন্দর সামগ্রী আনিয়া চাপাইয়া দেন। এজন্য তাঁহার কৃত বর্ণনা, যেমন স্বভাবের অবিকল অনুরূপ, তেমনি মাধুর্য্যপরিপূর্ণ হয়; বীভৎসাদি রসে কালিদাস সেই জন্য সফল হয়েন না। ভবভূতি বাছিয়া বাছিয়া মধুর সামগ্রী সকল একত্রিত করেন না; যাহা বর্ণনীয় বস্তুর প্রধানাংশ বলিয়া বোধ করেন, তাহাই অঙ্কিত করেন। দুই চারিটা স্থূল কথায় একটা চিত্র সমাপ্ত করেন—কালিদাসের ন্যায় কেবল বসিয়া বসিয়া তুলি ঘষেন না। কিন্তু সেই দুই চারিটা কথায় এমন একটু রস ঢালিয়া দেন যে, তাহাতে চিত্র অত্যন্ত সমৃদ্ধজ্বল, কখন মধুর, কখন ভয়ঙ্কর, কখন বীভৎস হইয়া পড়ে। মধুরে কালিদাস অদ্বিতীয়—উৎকটে ভবভূতি।

উপরে উত্তরচরিতের প্রথমাঙ্ক হইতে উদাহরণস্বরূপ কতকগুণিল বর্ণনা উদ্ধৃত হইয়াছে,—যথা রামচন্দ্র ও জানকীর পরস্পরের বর্ণিত বরকন্যা রূপ। ভবভূতির বর্ণনাশক্তির বিশেষ পরিচয়—দ্বিতীয় ও তৃতীয়াঙ্কে জনস্থান এবং পঞ্চবটী এবং ষষ্ঠাঙ্কে কুমারদিগের যুদ্ধ। প্রথমাঙ্ক হইতে আমরা আর একটি সংক্ষিপ্ত উদাহরণ উদ্ধৃত করি।

“বচ্ছ, এসো কুসুমিদকঅম্বতরুত্তণ্ডবিদবরহিণো কিণ্ণামহেআ গিরী, জত্থ অনুভাব-সোহগ্গমেত্তপারিসেসধুসরিসরী ম্হহত্তং ম্হচ্ছন্তো তুএ পরুদিএণ অবলম্বিদো তরুঅলে অজ্জউত্তো আলিহিদো।”‡

দুইটিমাত্র পদে কবি কত কথাই ব্যক্ত করিলেন! কি করুণরসচরমস্বরূপ চিত্র সৃজিত করিলেন!

চিত্র দর্শনান্তে সীতা নিদ্রা গেলেন। ইত্যবসরে দুস্মৃখ আসিয়া সীতাপবাদ সম্বাদ রামকে শুনাইল। রাম সীতাকে বিসজ্জন করিবার অভিপ্রায় করিলেন।

রামচন্দ্রের চরিত্র নির্দোষ, অকলঙ্ক, দেবোপম বলিয়া ভারতে খ্যাত, কিন্তু বস্তুতঃ বাঙ্গালী কখন রামচন্দ্রকে নির্দোষ বা সর্বগুণবিভূষিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে ইচ্ছা করেন নাই। রামায়ণগীত শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রের অনেক দোষ, কিন্তু সে সকল দোষ গুণাতিরেকমাত্র। এই জন্য

* হৌক—আমি রাগ করিব—যদি তাঁহাকে দেখিয়া না ভুলিয়া যাই।

† সীতা। হা আর্ষ্যপুত্র, তোমার সঙ্গে এই দেখা।

রাম। বিরহের এত ভয়—এ যে চিত্র।

সীতা। যাহাই হউক না—দুস্মৃখ হলেই মন্দ ঘটায়।

‡ বৎস, এই যে পর্বত, যদুপরে কুসুমিত কদম্ব ময়ূরেরা পুচ্ছ ধরিতেছে—উহার নাম কি? দেখিতেছি, তরুতলে আর্ষ্যপুত্র লিখিত—তাঁহার পূর্বসৌন্দর্যের পরিশেষমাত্র ধূসর শ্রীতে তাঁহাকে চেনা যাইতেছে। তিনি ম্হহত্তং ম্হচ্ছাঁ যাইতেছেন—কাঁদিতে কাঁদিতে তুমি তাঁহাকে ধরিয়া আছ।

তাঁহার দোষগুলিনও মনোহর। কিন্তু গুণাতিরেকে যে সকল দোষ, তাহা মনোহর হইলেও দোষ বটে। পরশুরাম অতিরিক্ত পিতৃভক্ত বলিয়া মাতৃহত্যা, তাহা বলিয়া কি মাতৃবধ দোষ নহে? পাণ্ডবেরা মাতৃ-কথার অতিরিক্ত বশ বলিয়া এক পত্নীর পণ্ড স্বামী, তাই বলিয়া কি অনেকের একপত্নীত্ব দোষ নয়?

রামচন্দ্রও অনেক নিন্দনীয় কৰ্ম্ম করিয়াছেন।—যথা বালিবধ। কিন্তু তিনি যে সকল অপরাধে অপরাধী, তন্মধ্যে এই সীতা বিসজ্জনাপরাধ সৰ্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। শ্রীরামের চরিত্র কোন্ দোষে কলুষিত করিয়া কবি তাঁহাকে এই অপরাধে অপরাধী করিয়াছেন, তাহার আলোচনা করা যাউক।

যাঁহারা সাম্রাজ্য শাসনে ব্রতী হইলেন, প্রজারঞ্জন তাঁহাদিগের একটি মহৎকৰ্ম্ম। গ্রীক ও রোমক ইতিবৃত্তে ইহার অনেক উদাহরণ প্রকাশিত আছে। কিন্তু ইহার সীমাও আছে। সেই সীমা অতিক্রম করিলে, ইহা দোষরূপে পরিণত হয়। যে রাজা প্রজার হিতার্থ আপনার অহিত করেন, সে রাজার প্রজারঞ্জনপ্রবৃত্তি গুণ। ব্রুটস কৃত আত্মপুত্রের বধদণ্ডাজ্ঞা এই গুণের উদাহরণ। যে রাজা প্রজার প্রিয় হইবার জন্য হিতাহিত সকল কার্যেই প্রবৃত্ত, সেই রাজার প্রজারঞ্জনপ্রবৃত্তি দোষ। নাপোলেয়নাদিগের যুদ্ধে প্রবৃত্তি ইহার উদাহরণ। রোবস্পীর ও দাতোকৃত বহু প্রজাবধ ইহার নিকৃষ্টতর উদাহরণ।

ভবভূতির রামচন্দ্র এই প্রজারঞ্জনপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া সীতাকে বিসজ্জন করেন। অনেকে স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রজারঞ্জন ছিলেন। কিন্তু রামচন্দ্রের চরিত্রে স্বার্থপরতামাত্র ছিল না। সুতরাং তিনি স্বার্থ জন্য প্রজারঞ্জে ব্রতী ছিলেন না। প্রজারঞ্জন রাজাদিগের কর্তব্য বলিয়াই, এবং ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের কুলধৰ্ম্ম বলিয়াই তাহাতে তাঁহার এতদূর দাৰ্ঢ্য। তিনি অষ্টাবক্রের সমক্ষে পুষ্করিণী বলিয়াছিলেন,

স্নেহং দয়াং তথা সৌখ্যং যদি বা জানকীমপি।

আরাধনায় লোকস্য মৃগুতো নাস্তি মে ব্যথা ॥ *

এবং দক্ষ্মুখের মুখে সীতার অপবাদ শুনিয়া বলিলেন,

সত্যং কেনাপি কার্যেণ লোকস্যারাধনম্ ব্রতং।

যৎ পূজিতং হি তাতেন মাণ্ড প্রাণাংশ্চ মৃগুতা ॥ †

ভবভূতির রামচন্দ্র এই বিষম ভ্রমে ভ্রান্ত হইয়া কুলধৰ্ম্ম এবং রাজধৰ্ম্ম পালনার্থ, ভার্য্যাকে পবিত্রা জানিয়াও ত্যাগ করিলেন। রামায়ণের রামচন্দ্র সেরূপ নহেন। তিনিও জানিতেন যে, সীতা পবিত্রা,—

অন্তরাত্মা চ মে বেত্তি সীতাং শূদ্ধাং যশস্বিনীম্।

তিনি কেবল রাজকুলসুলভ অকীর্ত্তিশঙ্কাবশতঃ পবিত্রা পতিমাত্রজীবিতা পত্নীকে ত্যাগ করিলেন। “আমি রাজা শ্রীরামচন্দ্র ইক্ষ্বাকুবংশীয়, লোকে আমার মহিষীর অপবাদ করে! আমি এ অকীর্ত্তি সহিব না—যে স্ত্রীর লোকাপবাদ, আমি তাহাকে ত্যাগ করিব।” এইরূপ রামায়ণের রামচন্দ্রের গর্ষিত চিত্তভাব।

বাস্তবিক সৰ্ব্বত্রই, রামায়ণের রামচন্দ্র হইতে ভবভূতির রামচন্দ্র অধিকতর কোমলপ্রকৃতি। ইহার এক কারণ এই, উভয় চরিত্র, গ্রন্থ রচনার সময়োপযোগী। রামায়ণ প্রাচীন গ্রন্থ। কেহ কেহ বলেন যে, উত্তরকাণ্ড বাল্মীকিপ্রণীত নহে। তাহা হউক বা না হউক, ইহা যে প্রাচীন রচনা, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। তখন আৰ্য্যজাতি বীরজাতি ছিলেন। আৰ্য্য রাজগণ বীরস্বভাবসম্পন্ন ছিলেন। রামায়ণের রাম মহাবীর, তাঁহার চরিত্র গাম্ভীর্য্য এবং ধৈর্য্যপরিপূর্ণ। ভবভূতি যৎকালে কবি—তখন ভারতবর্ষীয়েরা আর সে চরিত্রের নহেন। ভোগাকাঙ্ক্ষা, অলসাদির দ্বারা, তাঁহাদের

* “প্রজারঞ্জনের অনুরোধে স্নেহ, দয়া, আত্মসুখ, কিম্বা জানকীকে বিসজ্জন করিতে হইলেও আমি কোনরূপ ক্লেশ বোধ করিব না।” নৃসিংহবাবুর অনুবাদ।

† “লোকের আরাধনা করা সাধু ব্যক্তিদের পক্ষে সৰ্ব্বতোভাবেই বিধেয়, এবং এইটি তাঁহাদের পক্ষে মহৎব্রতস্বরূপ। কারণ, পিতা আমাকে এবং প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও তাহা প্রতিপালন করিয়াছিলেন।”—ঐ

বাঁকম রচনাবলী

চরিত্র কোমলপ্রকৃত হইয়াছিল। ভবভূতির রামচন্দ্রও সেইরূপ। তাঁহার চরিত্রে বীরলক্ষণ কিছুই নাই। গাভীর্য্য এবং ধৈর্য্যের বিশেষ অভাব। তাঁহার অধীরতা দেখিয়া কখন কখন কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণা হয়। সীতার অপবাদ শুনিয়া ভবভূতির রামচন্দ্র যে প্রকার বালিকাসুলভ বিলাপ করিলেন, তাহাই ইহার উদাহরণ স্থল। তিনি শুনিয়াই মূর্ছিত হইলেন। তাহার পর দুর্মুখের কাছে অনেক কাঁদাকাটা করিলেন। অনেক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। তন্মধ্যে অনেক স্করণ কথা আছে বটে, কিন্তু এত বাগাড়ম্বরে স্করণসের একটু বিঘ্ন হয়। এত বালিকার মত কাঁদিলে রামচন্দ্রের প্রতি কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণা হয়। উদাহরণ;—

“হা দেবি দেবযজনসম্ভবে! হা স্বজন্মানুগ্রহপরিব্রিতবসুন্ধরে! হা নিমিজনকবংশনন্দিনি! হা পাবকবিশিষ্টারুদ্ধতীপ্রশস্তশীলশালিনি! হা রামময়জীবিতে! হা মহারণ্যবাসিপ্রিয়সখি! হা প্রিয়স্নোকবাদিনি! কথমেবংবিধায়ান্তবায়মীদৃশঃ পরিণামঃ!”*

এইরূপ স্থলে রামায়ণের রামচন্দ্র কি করিয়াছেন? কত কাঁদিয়াছেন? কিছুই না। মহাবীর-প্রকৃত শ্রীরাম সভামধ্যে সীতাপবাদের কথা শুনিলেন। শুনিয়া সভাসদগণকে কেবল এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন, সকলে কি এইরূপ বলে?” সকলে তাহাই বলিল। তখন ধীরপ্রকৃতি রাজা আর কাহাকে কিছু না বলিয়া সভা হইতে উঠিয়া গেলেন। মূর্ছিতও গেলেন না,—মাথাও কুটিলেন না—ভূমেও গড়াগড়ি দিলেন না। পরে নিভৃত হইয়া, কাতরতাশূন্য ভাষায় ভ্রাতৃবর্গকে ডাকিলেন। ভ্রাতৃগণ আসিলে, পর্ষতবৎ অবিচলিত থাকিয়া, তাহাদিগকে আপন অভিপ্রায় জানাইলেন। বলিলেন, “আমি সীতাকে পবিত্রা জানি—সেই জন্যই গ্রহণ করিয়াছিলাম—কিন্তু এক্ষণে এই লোকাপবাদ! অতএব আমি সীতাকে ত্যাগ করিব।” স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া লক্ষ্মণের প্রতি রাজাজ্ঞা প্রচার করিলেন, “তুমি সীতাকে বনে দিয়া আইস।” যেমন অন্যান্য নিত্যনৈমিত্তিক রাজ-কার্য্যে রাজানুচরকে রাজা নিযুক্ত করেন, সেইরূপ লক্ষ্মণকে সীতাবিসর্জনে নিযুক্ত করিলেন। চক্ষে জল, কিন্তু একটিও শোক-সূচক কথা ব্যবহার করিলেন না। “মর্ম্মাণি কৃন্ততি” ইত্যাদি বাক্য সীতাবিয়োগাশঙ্কায় নহে—অপবাদ সম্বন্ধে। তথাপি তাঁহার এই কয়টি কথায় কত দুঃখই আমরা অনুভূত করিতে পারি! এই স্থল উত্তরকান্ড হইতে উদ্ধৃত এবং অনুবাদিত করিলাম।

তসৌবং ভাষিতং শ্রুত্বা রাঘবঃ পরমাত্ত্ববৎ।

উবাচ সুহৃদঃ সর্বান্ কথমেতদ্বদন্তু মাম্ ॥

সর্ষে তু শিরসা ভূমাবভিবাদ্য প্রণম্য চ।

প্রত্যাচ্ছ রাঘবং দীনমেবমেতন্ন সংশয়ঃ ॥

শ্রুত্বা তু বাক্যং কাকুৎস্থঃ সর্ষেষাং সমুদীরিতম্।

বিসর্জয়ামাস তদা বয়স্যান্ শত্রুসুদনঃ ॥

বিসৃজ্য তু সুহৃদ্বর্গং বুদ্ধ্যা নিশ্চিত্য রাঘবঃ।

সমীপে দ্বাস্থ্যমাসীনমিদং বচনমব্রবীৎ ॥

শীঘ্রমানয় সৌমিত্রিং লক্ষ্মণং শূভলক্ষণং।

ভরতং চ মহাভাগং শত্রুঘ্নমপরাজিতং ॥

* * *

তে তু দৃষ্ট্বা দুঃখং তস্য সগ্রহং শশিনং যথা।

সন্ধ্যাগতমিবাদিত্যং প্রভয়া পরিবর্জিতং ॥

বাষ্পপূর্ণে চ নয়নে দৃষ্ট্বা রামস্য ধীমতঃ।

হতশোভং যথা পদ্মং মূখম্বীক্ষ্য চ তস্য তে ॥

ততোহভিবাদ্য স্বরিতাঃ পাদৌ রামস্য মূর্ছার্ভিঃ।

তস্তুঃ সমাহিতাঃ সর্ষে রামস্তশ্রুণ্যবস্তুয়ৎ ॥

* “হা দেবি যজ্ঞভূমিসম্ভবে! হা জন্মগ্রহণপরিব্রিতবসুন্ধরে! হা নিমি এবং জনকবংশের আনন্দদাত্রি! হা অগ্নি বিশিষ্টদেব এবং অরুদ্ধতীসদৃশ প্রশংসনীয়চরিতে! হা রামময়জীবিতে! হা মহাবনবাসিপ্রিয়সহচরি! হা মধুরভাষিণি! হা মিতবাদিনি! এইরূপ হইয়াও শেষে তোমার অদৃষ্টে এই ঘটিল।”—নৃসিংহবাবুর অনুবাদ।

তান্ পরিষ্বজ্য বাহুভ্যামুথাপ্য চ মহাবলঃ ।
 আসনেস্বাসতেতুস্ত্বা ততো বাক্যং জগাদ হ ॥
 ভবন্তো মম সৰ্বস্বং ভবন্তো জীবিতং মম ।
 ভবাঙ্কশ্চ কৃতং রাজ্যং পালয়ামি নরেশ্বরাঃ ।
 ভবন্তঃ কৃতশাস্ত্রার্থা বুদ্ধ্যা চ পরিনিষ্ঠিতাঃ ।
 সংভূয় চ মদর্থোহয়মবেষ্টব্যো নরেশ্বরাঃ ॥
 তথা বদতি কাকুৎস্থে অবধানপরায়ণাঃ ।
 উদ্বিগ্নমনসঃ সৰ্বে কিল্ন্ রাজাভিধাস্যতি ॥
 তেষাং সমুপবিষ্টানাং সৰ্বেষাং দীনচেতসাম্ ।
 উবাচ বাক্যং কাকুৎস্থো মূখেন পরিশূষ্যতা ॥
 সৰ্বে শৃণুত ভদ্রং বো মা কুরুধ্বং মনোহন্যথা ।
 পৌরাণাং মম সীতায়ী যাদৃশী বর্ততে কথা ॥
 পৌরাপবাদঃ সুমহান্ তথা জনপদস্য চ ।
 বর্ততে ময়ি বীভৎসা সা মে মৰ্ম্মাণি কৃন্ততি ॥
 অহং কিল কুলে জাত ইক্ষ্বাকুগাং মহাত্মনাম্ ।
 সীতাপি সৎকুলে জাতা জনকানাং মহাত্মনাম্ ॥

* * *

অন্তরাত্মা চ মে বেত্তি সীতাং শূদ্ধাং যশস্বিনীম্ ।
 ততো গৃহীত্বা বৈদেহীমযোধ্যামহমাগতঃ ॥
 অয়ং তু মে মহান্ বাদঃ শোকশ্চ হৃদি বর্ততে ।
 পৌরাপবাদঃ সুমহাংস্তথা জনপদস্য চ ।
 অকীর্তির্ষস্য গীয়েত লোকে ভূতস্য কস্যাচিৎ ॥
 পততেবাধমাল্লোকান্ যাবচ্ছব্দঃ প্রকীর্ত্যতে ।
 অকীর্তির্নিন্দ্যতে দেবৈঃ কীর্তির্লোকেষু পূজ্যতে ॥
 কীর্ত্যর্থং তু সমারম্ভঃ সৰ্বেষাং সুমহাত্মনাম্ ।
 অপ্যহং জীবিতং জহ্যাং যুজ্মান্ বা পুরুষষভাঃ ॥
 [অপবাদভয়ান্বিতঃ কিং পুনর্জনকাত্মজাম্ ।]
 তস্মাদ্ভবন্তঃ পশ্যন্তু পতিতং শোকসাগরে ॥
 নহি পশ্যাম্যহং ভূতে কিঞ্চিদ্দুঃখমতোহধিকং ।
 স ত্বং প্রভাতে সৌমিত্রে সুমন্ত্রাধিষ্ঠিতং রথং ॥
 আরুহ্য সীতামারোপ্য বিষয়ান্তে সমুৎসজ ।
 গঙ্গায়ান্তু পরে পারে বাস্মীকেষু মহাত্মনঃ ॥
 আশ্রমো দিব্যসংকাশস্তমসাতীরমাশ্রিতঃ ।
 তত্রৈনাম্বিজনে দেশে বিসৃজ্য রঘুনন্দন ॥
 শীঘ্রমাগচ্ছ সৌমিত্রে কুরুষ্ব বচনং মম ।
 ন চাস্মিন্ প্রতিবক্তব্যঃ সীতাং প্রতি কথংন ॥
 তস্মাত্ত্বং গচ্ছ সৌমিত্রে নাত্র কার্ষ্যা বিচারণা ।
 অপ্ৰীতির্হি পরা মহ্যং ত্বয়েতং প্রতিবারিতে ॥
 শাপিতা হি ময়া যুয়ং পাদাভ্যাং জীবনে চ ।
 যে মাং বাক্যান্তরে ব্ৰূয়ুরনুনেতুং কথংন ।
 অহিতানাম তে নিত্যং মদভীষ্টবিঘাতনাৎ ॥
 মানয়ন্তু ভবন্তো মাং যদি মচ্ছাসনে স্থিতাঃ ।
 ইতোহদ্য নীয়তাং সীতা কুরুষ্ব বচনং মম ॥*

* অনুবাদ । তাহার এই মত কথা শুনিয়া রাম, পরম দুঃখিতের ন্যায় সূহৃৎ সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন, এইরূপ কি আমাকে বলে?” সকলে ভূমিতে মস্তক নত করিয়া অভিবাদন ও প্রণাম

বাংকম রচনাবলী

এই রচনা অতি মনোমোহিনী। রামায়ণের রাম ক্ষত্রিয়, মহোজ্জ্বলকুলসম্ভূত, মহাতেজস্বী। তিনি পৌরাণবাদ শ্রবণে, হৃদ্বিক সিংহের ন্যায় রোষে দ্রুখে গজ্জন করিয়া উঠিলেন। ভবভূতির রামচন্দ্র তৎপরিবর্তে স্ত্রীলোকের মত পা ছড়াইয়া কাঁদতে বসিলেন। তাঁহার চন্দনের কিয়দংশ পৃথ্বী উদ্ধৃত করিয়াছি। রামায়ণের সঙ্গে তুলনা করিবার জন্য অবশিষ্টাংশও উদ্ধৃত করিলাম।

রাম। হা কষ্টমতিবীভৎসকর্মা নৃশংসোহস্মি সংবৃত্তঃ
শৈশবাৎ প্রভৃতি পৌষিতাং প্রিয়াং
সৌহৃদাদপৃথগাশয়ামিমাম্।
ছদ্মনা পরিদদামি মৃত্যবে
সৌনিকো গৃহশকুন্তিকামিব ॥
তৎ কিমস্পর্শনীয়ঃ পাতকী দেবীং দুষ্যামি।
[সীতায়ঃ শিরঃ স্বেবরম্নময্য বাহুমাকর্ষন্]
অপৃথ্বকর্মাচাণ্ডালময়ি মুঞ্চে বিমুণ্ড মাম্।
শ্রিতাসি চন্দনভ্রাতৃয়া দৃষ্ট্বপাকং বিষদ্রুমম্ ॥

করিয়া, দ্রুখিত রাঘবকে প্রত্যুত্তরে কহিল, “এইরূপই বটে—সংশয় নাই।” তখন শত্রুদমন রামচন্দ্র সকলের এই কথা শুনিয়া বয়সাবর্গকে বিদায় দিলেন। বন্ধুবর্গকে বিদায় দিয়া, বুদ্ধির দ্বারা অবধারিত করিয়া সমীপে আসীন দৌবারিককে এই কথা বলিলেন যে, শত্ৰুলক্ষণ সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণকে ও মহাভাগ ভরতকে ও অপরািজিত শত্রুঘ্নকে শীঘ্র আন। * * * তাঁহারা রামের মুখ, রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় এবং সন্ধ্যাকালীন আদিত্যের ন্যায় প্রভাহীন দেখিলেন। ধীমান্ রামচন্দ্রের নয়নযুগল বাষ্পপূর্ণ এবং মুখ হতশোভ পদ্মের ন্যায় দেখিলেন। তাঁহারা হ্রিত তাঁহার অভিবাদন করিয়া এবং তাঁহার পদযুগল মস্তকে ধারণ করিয়া সকলে সমাহিত হইয়া রহিলেন। রাম অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। পরে বাহুযুগলের দ্বারা তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন ও উত্থানপৃথ্বক মহাবল রামচন্দ্র তাঁহাদিগকে “আসনে উপবেশন কর” এই বলিয়া কহিতে লাগিলেন, “হে নরেশ্বরগণ! আমার সর্বস্ব তোমরা; তোমরা আমার জীবন; তোমাদিগের কৃত রাজ্য আমি পালন করি। তোমরা শাস্ত্রার্থ অবগত; এবং তোমাদের বুদ্ধি পরিমার্জিত করিয়াছ। হে নরেশ্বরগণ, তোমরা মিলিত হইয়া, যাহা বলি তাহার অর্থানুসন্ধান কর।” রামচন্দ্র এই কথা বলিলে অবধানপরায়ণ ভ্রাতৃগণ, “রাজা কি বলেন” ইহা ভাবিয়া উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া রহিলেন।

তখন সেই দীনচেতা উপবিষ্ট ভ্রাতৃগণকে পরিশুদ্ধমুখে রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন, “তোমাদিগের মঙ্গল হউক! আমার সীতার সম্বন্ধে পৌরজনমধ্যে যেসকল কথা বর্ত্তিয়াছে, তাহা শুন—মন অন্যথা করিও না। জনপদে এবং পৌরজনমধ্যে আমার সুমহান্ অপবাদরূপ বীভৎস কথা রটিয়াছে, আমার তাহাতে মর্ম্মচ্ছেদ করিতেছে। আমি মহাত্মা ইক্ষ্বাকুদিগের কুলে জন্মিয়াছি, সীতাও মহাত্মা জনকরাজের সংকুলে জন্মিয়াছেন। আমার অন্তরাগ্নাও জানে যে, যশস্বিনী সীতা শুদ্ধচরিত্রা।

* * *

তখন আমি বৈদেহীকে গ্রহণ করিয়া অযোধ্যায় আসিলাম। এক্ষণে এই মহান্ অপবাদে আমার হৃদয়ে শোক বর্ত্তিতেছে। পৌরজনমধ্যে এবং জনপদে সুমহান্ অপবাদ হইয়াছে। লোকে যাহার অকীর্্তিগান করে, যাবৎ সেই অকীর্্তি লোকে প্রকীর্্তিত হইবে, তাবৎ সে অধমলোকে পতিত থাকিবে। দেবতারা অকীর্্তির নিন্দা করেন, এবং কীর্্তিই সকল লোকে পূজনীয়া। সকল মহাত্মা ব্যক্তির যত্ন কীর্্তিরই জন্য। হে পুরুষর্ষভগণ, আমি অপবাদভয়ে ভীত হইয়া জীবন ত্যাগ করিতে পারি, সীতার ত কথাই নাই।

অতএব তোমরা দেখ, আমি কি শোকসাগরে পতিত হইয়াছি! আমি ইহার অধিক দ্রুখ জগতে আর দেখি না। অতএব হে সৌমিত্রে! তুমি কল্য প্রভাতে সুমন্ত্রার্থিষ্ঠিত রথে সীতাকে আরোপণ করিয়া স্বয়ং আরোহণ করিয়া, তাঁহাকে দেশান্তরে ত্যাগ করিয়া আইস। গঙ্গার অপর পারে তমসা নদীর তীরে মহাত্মা বাল্মীকি মূনির স্বর্গতুল্য আশ্রম। হে রঘুনন্দন! সেই বিজনদেশে তুমি ইহাকে ত্যাগ করিয়া শীঘ্র আইস,—আমার বচন রক্ষা কর—সীতাপরিত্যাগ বিষয়ে তুমি ইহার প্রতিবাদ কিছুই করিও না। অতএব হে সৌমিত্রে! যাও—এ বিষয়ে আর কিছু বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। তুমি যদি ইহার বারণ কর, তবে আমার পরমাপ্রীতিকর হইবে। আমি চরণের স্পর্শে এবং জীবনের দ্বারা তোমাদিগকে শপথ করাইতেছি যে, যে ইহাতে আমাকে অনুনয় করিবার জন্য কোনরূপ কোন কথা বলিবে, আমার অভীষ্টহানি হেতুক তাহার শত্রু খ্যাতি নিত্য বর্ত্তিবে। যদি আমার আজ্ঞাবহ থাকিয়া, তোমরা আমাকে সম্মান করিতে চাও, তোমরা তবে আমার বচন রক্ষা কর, অদ্য সীতাকে লইয়া যাও।

বিবিধ প্রবন্ধ—উত্তরচারিত

উথায়। হস্ত বিপর্যাস্তঃ সম্প্রতি জীবলোকঃ, অদ্য পর্য্যবসিতং জীবিতপ্রয়োজনং রামস্য, শূন্যমধুনা জীর্ণারণ্যং জগৎ, অসারঃ সংসারঃ, কষ্টপ্রায়ং শরীরং, অশরণোহস্মি, কিং করোমি, কা গতিঃ। অথবা

দুঃখসংবেদনায়ৈব রামে চৈতন্যমাহিতম্।
মর্মেপঘাতিভিঃ প্রাগৈর্ষ্বজ্রকীলায়িতং স্থিরৈঃ ॥

হা অম্ব অরুক্ষতি, হা ভগবন্তো বশিষ্ঠবিশ্বামিত্রো, হা ভগবন্ পাবক, হা দেবি ভূতধাত্রি, হা তাত জনক, হা তাত, হা মাতরঃ, হা পরমোপকারিন্ লঙ্কাপতে বিভীষণ, হা প্রিয়সখ মহারাজ সুগ্রীব, হা সৌম্য হনুমন্, হা সখি ত্রিজটে, দৃষিতাঃ স্থঃ পরিভূতাঃ স্থঃ রামহতকেন। অথবা কোনামাহমেতেষামাহবানে।

তে হি মন্যে মহাত্মনঃ কৃতঘ্নেন দুরাত্মনা।
ময়া গৃহীতনামানঃ স্পৃশ্যন্ত ইব পাপনা ॥

যোহহম্।

বিস্রস্তাদুরসি নিপত্য লঙ্কানিদ্রা-
মুন্মুচ্য প্রিয়গৃহীণীং গৃহস্য শোভাম্।
• আতঙ্কস্ফুরিতকঠোরগর্ভগুর্ষীং
ক্রব্যাদ্যো বলিমিব নিঘর্ষণঃ ক্ষিপ্যামি ॥
সীতায়ঃ পাদৌ শিরসি কৃৎস্না। দেবি দেবি, অয়ং
পশ্চিমস্তে রামস্য শিরসি পাদপঙ্কজস্পর্শঃ
ইতি রোদতি।*

ইহার অনেকগুলিন কথা সক্রমণ বটে, কিন্তু ইহা আর্থ্যবীর্ষ্যপ্রতিম মহারাজ রামচন্দ্রের মুখ হইতে নিগত না হইয়া, আধুনিক কোন বাঙ্গালি বাবুর মুখ হইতে নিগত হইলে উপযুক্ত হইত। কিন্তু ইহাতেও কোন মান্য আধুনিক লেখকের মন উঠে নাই। তিনি স্বপর্ণীত

* হায় কি কষ্ট! নিষ্ঠুরের মত, কি ঘৃণাজনক কর্ম্মই করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি! বাল্যাবস্থা হইতে যাঁহাকে প্রিয়তমা বলিয়া প্রতিপালিত করিয়াছি; যিনি গাঢ় প্রণয়বশতঃ কোন রূপেই আপনাকে আমা হইতে ভিন্ন বোধ করেন না, আজি আমি সেই প্রিয়াকে মাংসবিক্রয়ী যেমন গৃহপালিতা পক্ষিণীকে অনায়াসে বধ করে, সেইরূপ ছলক্রমে করাল কালগ্রাসে নিপাতিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অতএব পাতকী সূতরাং অস্পৃশ্য আমি দেবীকে আর কেন কলঙ্কিত করি? (ক্রমে ক্রমে সীতার মস্তক আপনার বক্ষঃস্থল হইতে নামাইয়া বাহু আকর্ষণ পূর্ব্বক) অয়ি মূর্খ! এ অভাগাকে পরিত্যাগ কর। আমি অদৃষ্টচর এবং অশ্রুতপূর্ব্ব পাপ কর্ম্ম করিয়া চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি! হায়! তুমি চন্দনবৃক্ষভ্রমে এই ভয়ানক বিষবৃক্ষকে (কি কুক্ষণেই) আশ্রয় করিয়াছিলে? (উঠিয়া) হায় এক্ষণে জীবলোক উচ্ছিন্ন হইল। রামেরও আর জীবিত থাকিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে পৃথিবী শূন্য এবং জীর্ণ অরণ্য সদৃশ নীরস বোধ হইতেছে। সংসার অসার হইয়াছে। জীবন কেবলমাত্র ক্লেশের নিদানস্বরূপ বোধ হইতেছে। হায়! এতদিনে আশ্রয়বিহীন হইলাম। এখন কি করি (কোথায় যাই) কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। (চিন্তা করিয়া) উঃ! আমার এখন কি গতি হইবে? অথবা (সে চিন্তায় আর কি হইবে?) যাবজ্জীবন দুঃখভোগ করিবার নিমিত্তই (হতভাগ্য) রামের দেহে প্রাণবায়ুর সঞ্চার হইয়াছিল, নতুবা নিজ জীবন পর্য্যন্তেও কেন বজ্রের ন্যায় মর্ম্মভেদ করিতে থাকিবে? হা মাতঃ অরুক্ষতি! হা ভগবন্ বশিষ্ঠদেব! হা মহাত্মন্ বিশ্বামিত্র! হা ভগবন্ অগ্নে! হা নিখিল ভূতধাত্রি ভগবতি বসুন্ধরে! হা তাত জনক! হা পিতঃ (দশরথ)! হা কোশল্যা প্রভৃতি মাতৃগণ! হা পরমোপকারিন্ লঙ্কাপতি বিভীষণ! হা প্রিয়বন্ধো সুগ্রীব! হা সৌম্য হনুমন্! হা সখি ত্রিজটে! আজি হতভাগ্য পাপিষ্ঠ রাম তোমাদিগের সর্ব্বনাশ (সর্ব্বস্বাপহরণ) এবং অবমাননা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। (চিন্তা করিয়া) অথবা এই হতভাগ্য এখন তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিবার উপযুক্ত নহে। কারণ, এই পাপাত্মা কৃতঘ্না পামর কেবলমাত্র সেই সকল মহাত্মাদিগের নাম গ্রহণ করিলেও তাঁহারা পাপস্পৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা। যেহেতুক আমি দৃঢ়বিশ্বাস বশতঃ বক্ষঃস্থলে নিদ্রিতা প্রেয়সীকে স্বপ্লাবস্থায় উদ্বিগ্ন বশতঃ ঈষৎ কম্পিত গর্ভভরে মন্থরা দৈখিয়াও অনায়াসেই উন্মোচন পূর্ব্বক নিন্দয় হৃদয়ে মাংসাশী রাক্ষসদিগকে উপহারের ন্যায় নিষ্ক্ষেপ করিতে সমর্থ হইয়াছি। (সীতার চরণদ্বয় মস্তকদ্বারা গ্রহণপূর্ব্বক) দেবি! দেবি! রামের দ্বারা তোমার পদপঙ্কজের এই শেষ স্পর্শ হইল! (এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।)

বিশ্বকম রচনাবলী

বাস্তালা গ্রন্থে আরও কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, তাহা পাঠকালে রামের কাহ্না পড়িয়া আমাদিগের মনে হইয়াছিল যে, বাস্তালির মেয়েরা স্বামী বা পুত্রকে বিদেশে চাকরি করিতে পাঠাইয়া এইরূপ করিয়া কাঁদে বটে।

ভবভূতির পক্ষে ইহা বক্তব্য যে, উত্তরচরিত নাটক; নাটকের উদ্দেশ্য হৃদয়; রামায়ণ প্রভৃতি উপাখ্যান কাব্যের উদ্দেশ্য ভিন্নপ্রকার। সে উদ্দেশ্য কার্যপরিপূরার সরস বিবৃতি। কে কি করিল, তাহাই উপাখ্যান কাব্যে লেখকেরা প্রতীয়মান করিতে চাহেন; সে সকল কার্য করিবার সময়ে কে কি ভাবিল, তাহা স্পষ্টীকৃত করিবার প্রয়োজন তাদৃশ বলবৎ নহে। কিন্তু নাটকে সেই প্রয়োজনই বলবৎ। নাটককারের নিকট আমরা নায়কের হৃদয়ের প্রকৃত চিত্র চাই। সুতরাং তাহাকে চিত্তভাব অধিকতর স্পষ্টীকৃত করিতে হয়। অনেক বাগাড়ম্বর আবশ্যিক হয়। কিন্তু তথাপি উত্তরচরিতের প্রথমাঙ্কের রামবিলাপ মনোহর নহে। সে কথাগুলিন বীরবাক্য নহে—নবপ্রেমমুগ্ধ অসারবান্ যুবকের কথা।

প্রথমাঙ্ক ও দ্বিতীয়াঙ্কের মধ্যে দ্বাদশবৎসর কাল ব্যবধান। উত্তরচরিতের একটি দোষ এই যে, নাটকবর্ণিত ক্রিয়া সকলের পরস্পর কালগত নৈকট্য নাই। এই সম্বন্ধে উইন্টস টেল নামক সেক্ষপীয়রকৃত বিখ্যাত নাটকের সঙ্গে ইহার বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

এই দ্বাদশবৎসর মধ্যে সীতা যমল সন্তান প্রসব করিয়া স্বয়ং পাতালে অবস্থান করিলেন, তাহার পুত্রেরা বাস্মীকির আশ্রমে প্রতিপালিত এবং সুশিক্ষিত হইতে লাগিল। রামচন্দ্রের পূর্বপ্রদত্ত বরে দিব্যাস্ত্র তাহাদের স্বতঃসিদ্ধ হইল। এদিকে রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণের পুত্র চন্দ্রকেতু সৈন্য লইয়া যজ্ঞের অশ্বরক্ষণে প্রেরিত হইলেন। কোন দিন রামচন্দ্র দৈবদেশে জানিলেন যে, শম্বুক নামক কোন নীচজাতীয় ব্যক্তি তাহার রাজ্যমধ্যে তপশ্চরণ করিতেছে। ইহাতে তাহার রাজ্যমধ্যে অকালমৃত্যু উপস্থিত হইতেছে। রামচন্দ্র ঐ শূদ্র তপস্বীর শিরচ্ছেদ মানসে সশস্ত্রে তাহার অনুসন্ধানে নানা দেশ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। শম্বুক পঞ্চবটীর বনে তপঃ করিতেছিল।

দ্বিতীয়াঙ্কের বিষ্কম্বকে মূর্নিপত্তী আত্রেয়ী এবং বনদেবতা বাসন্তীর প্রমুখাৎ এই সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ হইয়াছে। যেমন প্রথমাঙ্কের পূর্বে প্রস্তাবনা, সেইরূপ অন্যান্য অঙ্কের পূর্বে একটি একটি বিষ্কম্বক আছে। এগুলি অতি মনোহর। কখন বিদুষী ঋষিপত্নী, কখন প্রেমময়ী বনদেবী, কখন তমসা মূরলা নদী, কখন বিদ্যাধর বিদ্যাধরী, এইরূপে সৌন্দর্যময়ী সৃষ্টির দ্বারা ভবভূতি বিষ্কম্বক সকল অতি রমণীয় করিয়াছেন। দ্বিতীয়াঙ্কের আরম্ভেই সুন্দর। যথা:—

অধ্বগবেশা তাপসী। অয়ে, বনদেবতেয়ং ফলকুসুমপল্লবার্ঘেণ মামুপতিষ্ঠতে। (১)

শিক্ষা সম্বন্ধে আত্রেয়ীর কথা বড় সুন্দর—

বিতরতি গুরুঃ প্রাজ্ঞে বিদ্যাং যথৈব তথা জড়ে
নচ খলু তয়োজ্ঞানে শক্তিং করোত্যপহন্তি বা।
ভবতি চ তয়োভূয়ান্ ভেদঃ ফলং প্রতি তদ্যথা
প্রভবতি শূচির্বিম্বাদ্গ্ৰাহে মণিন্ মৃদাং চয়ঃ ॥ (২)

হরেস্ হেমান উইলসন্ বলেন যে, উত্তরচরিতে কতকগুলি এমত সুন্দর ভাব আছে যে, তদপেক্ষা সুন্দর ভাব কোন ভাষাতেই নাই। উপরে উদ্ধৃত কবিতা এই কথার উদাহরণস্বরূপ তিনি উল্লেখ করিয়াছেন।

রামচন্দ্র শম্বুকের সন্ধান করিতে করিতে পঞ্চবটীর বনে শম্বুককে পাইলেন, এবং খজাধারা তাহাকে প্রহার করিলেন। শম্বুক দিব্য পুরুষ; রামের প্রহারে শাপমুক্ত হইয়া রামকে

(১) অহো! এই বনদেবতা ফলপুষ্পপল্লবার্ঘের দ্বারা আমার অভ্যর্থনা করিতেছেন।

(২) গুরু, বুদ্ধিমানকে যেমন শিক্ষা দেন, জড়কেও তদ্রূপ দিয়া থাকেন। কাহারও জ্ঞানের বিশেষ সাহায্য বা ক্ষতি করেন না। কিন্তু তথাপি তাহাদের মধ্যে ফলের তারতম্য ঘটে। কেবল নিম্নলি মণিই প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে পারে; মৃত্তিকা তাহা পারে না।

বিবিধ প্রবন্ধ—উত্তরচরিত

প্রাণপাত করিল। এবং জনস্থানাঙ্গি রামচন্দ্রের পূর্বাঙ্গি পরিচিত স্থান সকল দেখাইতে লাগিল।
উভয়ের কথোপকথনে বনবর্ণনা অতি মনোহর।

শ্লিষ্ণশ্যামাঃ ক্ৰীচদপরতো ভীষণাভোগরুক্ষাঃ
স্থানে স্থানে মূখরককুভো ঝাঙ্কুতৈর্নির্ঝরাণাম্ ।
এতে তীর্থাশ্রমাগিরিসরিঙ্গর্ভকান্তারমিশ্রাঃ
সন্দৃশ্যন্তে পরিচিতভুবো দণ্ডকারণ্যভাগাঃ ॥

এতানি খলু সর্বভূতলোমহর্ষণানি উন্মত্তচণ্ডস্থাপদকুলসঙ্কুলগিরিগহবরাণি জনস্থানপর্য্যন্ত-
দীর্ঘারণ্যানি দক্ষিণাং দিশর্মাভিবর্ত্তন্তে ।

তথাহি

নিষ্কৃজ্জস্তুমিতাঃ ক্ৰীচৎ ক্ৰীচদাপি প্রোচণ্ডসত্ৰুস্বনাঃ
স্বেচ্ছাসুপ্তগভীরভোগভূজগম্বাসপ্রদীপ্তাগ্নয়ঃ ।
সীমানঃ প্রদরোদরেষু বিলসৎস্বলপান্তসো যাস্বয়ং
তৃষ্যান্তিঃ প্রতিসূর্য্যকৈরজগরস্বেদদ্রবঃ পয়তে ॥
* * * *

অথৈতানি মদকলময়ুরকণ্ঠকোমলচ্ছবিভরবকীর্ণানি পর্য্যন্তৈরবিবরলনিবিষ্টনীলবহলচ্ছায়-
তরুণতরুশৃঙ্গমণ্ডিতানি অসম্ভ্রান্তবিবিধমৃগযুথানি । পশ্যতু মহানুভাবঃ প্রশান্তগম্ভীরানি মধ্য-
মারণ্যকানি ।

ইহ সমদশকুস্ত্রাশ্রান্তবানীরবীরুৎ-
প্রসবসূরভিশীতস্বচ্ছতোয়া বহন্তি ।
ফলভরপরিণামশ্যামজম্বুনিকুঞ্জ-
স্বলনমূখরভূরিস্রোতসো নির্ঝরিণ্যঃ ॥

অপিচ

দধতি কুহরভাজামহ ভল্লুকযুনা-
মনুরসিতগুরূণি স্ত্যানমস্বকৃতানি ।
শিশিরকটুকষায়ঃ স্ত্যায়তে শল্লকীনা-
মিভদলিতাবিকীর্ণগ্রন্থিনিষ্যন্দগন্ধঃ ॥ (১)

প্রবন্ধের অসহ্য দৈর্ঘ্যশঙ্কায় আর অধিক উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

শম্বুক বিদায়ের পর পুনরাগমনপূর্বক রামকে জানাইলেন যে, অগস্ত্য রামাগমন শূন্যিয়া
তাঁহাকে আশ্রমে আমন্ত্রিত করিতেছেন। শূন্যিয়া রাম তথায় চলিলেন। গমনকালীন ক্রৌঞ্চাবত

(১) এই যে পরিচিতভূমি দণ্ডকারণ্য ভাগ দেখা যাইতেছে। কোথাও শ্লিষ্ণশ্যাম, কোথাও ভয়ঙ্কর
রুক্ষদৃশ্য, কোথাও বা নির্ঝরিণের ঝরঝরশব্দে দিক্ সকল শব্দিত হইতেছে; কোথাও পূণ্যতীর্থ,
কোথাও মূনিগণের আশ্রমপদ, কোথাও পর্বত, কোথাও নদী এবং মধ্যে মধ্যে অরণ্য।

ঐ যে জনস্থান পর্য্যন্ত দীর্ঘ অরণ্য সকল দক্ষিণদিকে চলিতেছে। এ সকল সর্বলোকলোমহর্ষণ—
অহ গিরিগহবর উন্মত্ত প্রচণ্ড হিংস্র পশুগণে সমাকুল। কোথাও বা একেবারে নিঃশব্দ; কোথাও
পশুদিগের প্রচণ্ড গর্জনপরিপূর্ণ; কোথাও বা স্বেচ্ছাসুপ্ত গভীর গর্জনকারী ভূজঙ্গের নিঃশ্বাসে অগ্নি
প্রজ্বলিত। কোথাও গর্তে অল্প জল দেখা যাইতেছে। তৃষিত কুকলাসেরা অজগরের ঘর্ম্বিন্দু পান
করিতেছে।

* * * দেখুন, এই মধ্যারণ্য সকল কেমন প্রশান্ত গম্ভীর! মদকল ময়ুরের কণ্ঠের ন্যায়
কোমলচ্ছবি পর্বতে অবকীর্ণ; ঘননিবিষ্ট, নীলপ্রধান কান্দি, অনতিপ্রোঢ় বৃক্ষসমূহে শোভিত; এবং
ভয়শূন্য বিবিধ মৃগযুথে পরিপূর্ণ। স্বচ্ছতোয়া নির্ঝরিণীসকল বহুস্রোতে বহিতেছে, আনন্দিত পক্ষী
সকল তরুস্ব বেতসলতার উপর বসিতেছে, তাহাতে বেতসের কুসুম বৃত্তচ্যুত হইয়া সেই জলে পড়িয়া
জলকে সুগন্ধি এবং সুশীতল করিতেছে; স্রোতঃ পরিপক্কফলময় শ্যামজম্বুনাস্তে স্থলিত হওয়াতে
শব্দিত হইতেছে। গিরিবিবরবাসী যুবা ভল্লুকদিগের থুৎকারশব্দ প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এবং
গজগণের দ্বারা ভগ্ন শল্লকী বৃক্ষের বিক্ষিপ্ত গ্রন্থি হইতে শীতল কটু কষায় সুগন্ধ বাহির হইতেছে।

বিক্রম রচনাবলী

পর্ষতাদির বর্ণনা অতি মনোহর। আমরা সচরাচর অনুপ্রাসালঙ্কারের প্রশংসা করি না, কিন্তু এরূপ অনুপ্রাসের উপর বিরক্ত হওয়াও যায় না।

গুঞ্জকুঞ্জকুটীরকৌশিকঘটাঘুৎকারবৎকীচক-
স্বভাভ্রম্বরমুকমৌকুলিকুলঃ ক্রৌঞ্চাবতোহয়ং গিরিঃ।
এতস্মিন্ প্রচলাকিনাং প্রচলতামুদ্বৈজিতাঃ কুর্জিতৈ-
রুদ্বৈল্লভি পুরাণরোহিণতরুস্কন্ধেষু কুস্তীনসাঃ ॥
এতে তে কুহরেষু গঙ্গদনদঙ্গোদাবরীবারয়ো
মেঘালঙ্কৃতমৌলিনীলশিখরাঃ ক্ষৌণ্ডীভূতো দক্ষিণাঃ।
অন্যোপ্রতিঘাতসঙ্কুলচলৎ কল্লোলকোলাহলে-
রুত্তালাস্ত ইমে গভীরপয়সঃ পুণ্যাঃ সরিৎসঙ্গমাঃ ॥ (১)

তৃতীয়াঙ্ক অতি মনোহর। সত্য বটে যে, এই উৎকৃষ্ট নাটকে ক্রিয়াপারম্পর্য বড় মনোহর নহে, এবং তৃতীয়াঙ্ক সেই দোষে বিশেষ দুর্ভট। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম অঙ্ক যেরূপ বিস্তৃত, তদনুরূপ বহুল ক্রিয়াপারম্পরা নায়ক-নায়িকাগণ কর্তৃক সম্পন্ন হয় নাই। যিনি মাক্বেথ পাঠ করিয়াছেন, তিনি জানেন যে, নাটকে বর্ণিত ক্রিয়া সকলের বাহুল্য, পারম্পর্য এবং শীঘ্র সম্পাদন, কি প্রকার চিত্তকে মন্ত্রমুগ্ধ করে। কার্যগত এই গুণ নাটকের একটি প্রধান গুণ। উত্তরচারিতে তাহার বিরলপ্রচার; বিশেষতঃ প্রথম ও তৃতীয়াঙ্কে। তথাপি ইহাতে কবি যে অপূর্ব কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, সেই গুণে আমরা সে সকল দোষ বিস্মৃত হই।

দ্বিতীয়াঙ্কের বিস্কম্বক যেমন মধুর, তৃতীয়াঙ্কের বিস্কম্বক ততোধিক। গোদাবরী সংমিলিতা, তমসা ও মুরলা নাম্নী দুইটি নদী রূপ ধারণ করিয়া রামসীতাবিষয়িণী কথা কহিতেছে।

অদ্য দ্বাদশ বৎসর হইল, রামচন্দ্র সীতাকে বিসর্জন করিয়াছেন। প্রথম বিরহে তাহার যে গুরুতর শোক উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। কালসহকারে সে শোকের লাঘব জন্মবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তাহা ঘটে নাই; সর্বসম্ভাপহর্তা কাল এই সম্ভাপের শমতা সাধিতে পারে নাই।

অনির্ভ্রমো গভীরহৃদস্তর্গচ্ছনব্যথঃ।

পুটপাকপ্রতীকাশো রামস্য করুণো রসঃ ॥ (২)

এইরূপ মর্ম্মমধ্যে রুদ্ধ সম্ভাপে দক্ষ হইয়া রাম, পরিষ্কীর্ণ শরীরে রাজকর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন। রাজকর্ম্ম ব্যাপ্ত থাকিলে, সে কষ্টের তাদৃশ বাহ্য প্রকাশ পায় না; কিন্তু আজ পঞ্চবটীতে আসিয়া রামের ধৈর্য্যাবলম্বনের সে উপায়ও নাই। এ আবার সেই জনস্থান; পদে পদে সীতাসহবাসের চিত্তপরিপূর্ণ। এই জনস্থানে কত কাল, কত সুখে, সীতার সহিত বাস করিয়াছিলেন, তাহা পদে পদে মনে পড়িতেছে। রামের সেই দ্বাদশ বৎসরের রুদ্ধ শোকপ্রবাহ ছুটিয়াছে—সে প্রবাহবলে, এই গোদাবরীস্রোতঃস্থলিত শিলাচয়ের ন্যায় রামের হৃদয়পাষণ আজি কোথায় যাইবে, কে বলিতে পারে?

জনস্থানবাহিনী করুণাদ্রাবিতা নদীগূলিন্ দেখিল যে, আজি বড় বিপদ। তখন মুরলা কলকল করিয়া গোদাবরীকে বলিতে চলিল, “ভগবতি! সাবধান থাকিও—আজ রামের বড় বিপদ। দেখিও, রাম যদি মূর্ছা যান, তবে তোমার জলকণাপূর্ণ শীতল তরঙ্গের বাতাসে মৃদু মৃদু তাহার মূর্ছা ভঙ্গ করিও।” রঘুকুলদেবতা ভাগীরথী এই শোকতপনাতপসম্ভাপ

(১) এই পর্ষত ক্রৌঞ্চাবত। এখানে অব্যক্তনাদী কুঞ্জকুটীরবাসী পেচককুলের ঘুৎকারশব্দিত বায়ুযোগধ্বনিত বংশবিশেষের গুচ্ছে ভীত হইয়া কাকেরা নিঃশব্দে আছে। এবং ইহাতে সর্পেরা, চণ্ডল ময়ূরগণের কেকারবে ভীত হইয়া পুরাতন বটবৃক্ষের স্কন্ধে লুকাইয়া আছে। আর এই সকল দক্ষিণ পর্ষত। পর্ষতকুহরে গোদাবরীবারিরাশি গঙ্গদনিনাদ করিতেছে; শিরোদেশ মেঘমালায় অলঙ্কৃত হইয়া নীল শোভা ধারণ করিয়াছে; আর এই গভীরজলশালিনী পবিত্রা নদীগণের সঙ্গম পরম্পরের প্রতিঘাতসঙ্কুল চণ্ডল তরঙ্গকোলাহলে দুর্ধ্ব হইয়া রহিয়াছে।

(২) অবিচলিত গভীরহৃদেতুক হৃদয়মধ্যে রুদ্ধ, এ জন্য গাঢ়ব্যথ রামের সম্ভাপ মুখবন্ধ পাত্ৰমধ্যে পাকের সম্ভাপের ন্যায় বাহিরে প্রকাশ পায় না।

হইতে রামকে রক্ষা করিবার জন্য এক সর্বসম্ভাপসংহারিণী ছায়াকে জনস্থানে পাঠাইলেন। সেই ছায়ার স্নিগ্ধতায় অদ্যাপি ভারতবর্ষ মুগ্ধ রহিয়াছে। সেই ছায়া হইতে কবি এই তৃতীয়াঙ্কের নাম রাখিয়াছিলেন “ছায়া।”—এই ছায়া, সেই বহুকালবিস্মৃতা, পাতালপ্রবিষ্টা, শীর্ণদেহমাত্র-বিশিষ্টা হতভাগিনী রামমোহিনী সীতার ছায়া।

সীতা লবকুশকে প্রসব করিলে পর, ভাগীরথী এবং পৃথিবী বালক দুইটিকে বাঙ্মণীকর আশ্রমে রাখিয়া সীতাকে পাতালে লইয়া গিয়া রাখিয়াছিলেন। অদ্য কুশলবের জন্মতিথি—সীতাকে স্বহস্তাবচিত কুসুমাজল দিয়া পতিকুলাদিপদরুশ সূর্য্যদেবের পূজা করিতে ভাগীরথী এই জনস্থানে পাঠাইলেন। এবং আপন দৈবশক্তিপ্রভাবে রঘুকুলবধুকে অদর্শনীয়া করিলেন। ছায়ারূপিণী সীতা সকলকে দেখিতে পাইতোছিলেন। সীতাকে কেহ দেখিতে পাইতোছিল না।

সীতা তখন জানেন না যে, রাম জনস্থানে আসিয়াছেন। সীতাও আসিয়া জনস্থানে প্রবেশ করিলেন। তখন তাঁহার আকৃতি কিরূপ? তাঁহার মুখ “পরিপাণ্ডুদুর্ব্বল কপোলসুন্দর”—কবরী বিলোল—শারদাতপসম্প্রু কেতকীকুসুমাস্তর্গত পত্রের ন্যায়, বন্ধনবিচ্যুত কিসলয়ের মত সীতা সেই অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। জনস্থানে তাঁহার গভীর প্রেম! পদ্ব্বসুখের স্থান দেখিয়া বিস্মৃতি জন্মিল—আবার সেই দিন মনে পড়িল। যখন সীতা রামসহবাসে এই বনে থাকিতেন, তখন জুনস্থানবনদেবতা বাসন্তীর সহিত তাঁহার সখিত্ব হইয়াছিল। তখন সীতা একটি করিশাবককে স্বহস্তে শল্লকীর পল্লবাগ্রভাগ ভোজন করাইয়া পত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছিলেন। এখন সেই করিশাবকও ছিল। এইমাত্র সে বধুসঙ্গে জলপানে গিয়াছে। এক মন্ত যুথপতি আসিয়া অকস্মাৎ তৎপ্রতি আক্রমণ করিল। সীতা তাহা দেখেন নাই। কিন্তু অন্যত্রস্থিতা বাসন্তী দেখিতে পাইয়াছিলেন। বাসন্তী তখন উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন, “স্বর্নাশ হইল, সীতার পালিত করিকরভকে মারিয়া ফেলিল!” রব সীতার কর্ণে গেল। সেই জনস্থান, সেই পঞ্চবটী! সেই বাসন্তী! সেই করিকরভ! সীতার ভ্রান্তি জন্মিল। পদ্ব্বীকৃত হস্তিশাবকের বিপদে বিহ্বলচিত্ত হইয়া তিনি ডাকিলেন, “আর্য্যপুত্র! আমার পুত্রকে বাঁচাও!” কি ভ্রম! আর্য্যপুত্র! কোথায় আর্য্যপুত্র? আজি বার বৎসর সে নাম নাই! অর্মানি সীতা মূর্ছিতা হইয়া পড়িলেন। তমসা তাঁহাকে আশ্বস্তা করিতে লাগিলেন। এ দিকে রামচন্দ্র লোপামুদ্রার আহ্বানানুসারে অগস্ত্যাশ্রমে যাইতেছিলেন। পঞ্চবটী বিচরণ করিবার মানসে সেইখানে বিমান রাখিতে বলিলেন। রামের কণ্ঠস্বর মূর্ছিতা সীতার কাণে গেল। অর্মানি সীতার মূর্ছাভঙ্গ হইল—সীতা ভয়ে, আহ্বাদে, উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন, “একি এ? জলভরা মেঘের স্তনিতগন্তীর মহাশব্দের মত কে কথা কহিল? আমার কর্ণবিবর যে ভরিয়া গেল! আজি কে আমা হেন মন্দভাগিনীকে সহসা আহ্বাদিত করিল?” দেখিয়া তমসার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। তমসা বলিলেন, “কেন বাছা, একটা অপরিষ্কৃত শব্দ শুনিয়া মেঘের ডাকে ময়ূরীর মত চমকিয়া উঠিলি?” সীতা বলিলেন, “কি বলিলে ভগবতি? অপরিষ্কৃত? আমি যে স্বরেই চিনেছি, আমার সেই আর্য্যপুত্র কথা কহিতেছেন।” তমসা তখন দেখিলেন, আর লুকান বৃথা—বলিলেন, “শুনিয়াছি, মহারাজ রামচন্দ্র কোন শূদ্র তাপসের দণ্ড জন্য এই জনস্থানে আসিয়াছেন।” শুনিয়া সীতা কি বলিলেন? বার বৎসরের পর স্বামী নিকটে, নয়নের পদ্ব্বলীর অধিক প্রিয়, হৃদয়ের শোণিতেরও অধিক প্রিয়, সেই স্বামী আজি বার বৎসরের পর নিকটে, শুনিয়া সীতা কি বলিলেন? শুনিয়া সীতা কিছই আহ্বাদ প্রকাশ করিলেন না—“কই স্বামী—কোথায় সে প্রাণাধিক?” বলিয়া দেখিবার জন্য তমসাকে উৎপীড়িতা করিলেন না, কেবল বলিলেন—

“দিঠ্ঠিআ অপরিহীনরাঅধম্মো ক্খু সো রাআ”—“সৌভাগ্যক্রমে সে রাজার রাজধম্ম পালনে হুঁটি হইতেছে না।”

যে কোন ভাষায় যে কোন নাটকে যাহা কিছ আছে, এতদংশ সৌন্দর্য্য তাহার তুল্য, সন্দেহ নাই। “দিঠ্ঠিআ অপরিহীনরাঅধম্মো ক্খু সো রাআ।” এইরূপ বাক্য কেবল সেক্ষপীয়রেই পাওয়া যায়। রাম আসিয়াছেন শুনিয়া সীতা আহ্বাদের কথা কিছই বলিলেন না, কেবল বলিলেন, “সৌভাগ্যক্রমে সে রাজার রাজধম্ম পালনে হুঁটি হইতেছে না।” কিন্তু দূর হইতে রামের সেই বিরহক্রিষ্ট প্রভাতচন্দ্রমণ্ডলবৎ আকার দেখিয়া “সখি, আমায় ধর” বলিয়া তমসাকে ধরিয়া বসিয়া পড়িলেন। এ দিকে রাম পঞ্চবটী দেখিতে দেখিতে, সীতাবিরহপ্রদীপ্তানে পড়িতে

বিক্রম রচনাবলী

পড়িতে, “সীতে! সীতে!” বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। দেখিয়া সীতাও উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া তমসার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া ডাকিলেন, “ভগবতি তমসে’ রক্ষা কর! রক্ষা কর! আমার স্বামীকে বাঁচাও!”

তমসা বলিলেন, “তুমিই বাঁচাও। তোমার স্পর্শে উনি বাঁচিতে পারেন!” শুনিয়া সীতা বলিলেন, “যা হউক তা হউক, আমি তাহাই করিব!” এই বলিয়া সীতা রামকে স্পর্শ করিলেন। (১) রাম চেতনা প্রাপ্ত হইলেন।

পরে সীতার পূর্বকালের প্রিয়সখী, বনদেবতা বাসন্তী সীতার পুত্রীকৃত করিশাবকের সহায়ান্বেষণ করিতে করিতে সেইখানে উপস্থিত হইলেন। রামের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হওয়ায়, রাম করিশবুর রক্ষার্থ গেলেন। সে হস্তিশিশু স্বয়ং শত্রুজয় করিয়া করিণীর সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিল। তদ্বর্ণনা অতি মধুর।

যেনোঙ্গচ্ছদ্বিসকিশলয়ান্নিক্কাদস্তাঙ্কুরেণ
ব্যাকৃষ্টস্তে স্নতনু লবলীপল্লবঃ কর্ণপূরাৎ।
সোহয়ং পুত্রস্তব মদমুচাং বারণানাং বিজেতা
যৎকল্যাণং বর্যসি তরুণে ভাজনং তস্য জাতঃ ॥

সখি বাসন্তি, পশ্য পশ্য, কান্তানুবৃত্তিচাতুর্যমপি অনর্শিক্ষিতং যৎসেন।

লীলোৎখাতমৃগালকাণ্ডকবলচ্ছেদেষু সম্পাতিতাঃ
পুষ্পপুষ্করবাসিতস্য পয়সো গণ্ডুষসংক্রান্তয়ঃ।
সেকঃ শীকরিণা করেণ বিহিতঃ কামং বিরামে পুন-
র্যৎনেহাদনরালনালনালিনীপত্রাতপত্রং ধৃতম্ ॥ (২)

এদিকে পুত্রীকৃত করী দেখিয়া সীতার গর্ভজ পুত্রদিগকে মনে পড়িল। কেবল স্বামিদর্শনে বিগ্ৰহতা নহেন,—পুত্রমুখ দর্শনেও বিগ্ৰহতা। সেই মাতৃমুখনির্গত পুত্রমুখস্মৃতিবাক্য উদ্ধৃত করিতেছি।

মম পুত্রকাণ্ডং ইসিবিরলকোমলধঅলদসগুঞ্জলকবোলং অণুবন্ধমুন্ধকাঅলিবিহসিদং গিবন্ধ-
কার্কসিহুণ্ডঅং অমলমুহপুণ্ডরীঅজুঅলং গ পরিচুম্বিদং অঞ্জউত্তেণ। (৩)

(১) “যা হউক তা হউক।” এই কথার কত অর্থগাম্ভীৰ্য্য! বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বাক্যের টীকায় লিখিয়াছেন যে, “আমার পাণিস্পর্শে আৰ্য্যপুত্র বাঁচবেন কি না, জানি না, কিন্তু ভগবতী বলিতেছেন বলিয়া আমি স্পর্শ করিব।” ইহাতে এই বুদ্ধিতে হইতেছে যে, পাণিস্পর্শে সফল হইবে কি না, এই সন্দেহেই সীতা বলিলেন, “যা হউক তা হউক!” কিন্তু আমাদের গুরু বুদ্ধিতে বোধ হয় যে, সে সন্দেহে সীতা বলেন নাই যে, “যা হবার হউক!” সীতা ভাবিয়াছিলেন, “রামকে স্পর্শ করিবার আমার কি অধিকার? রাম আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি আমাকে বিনাপরাধে বিসর্জন করিয়াছেন,—বিসর্জন করিবার সময়ে একবার আমাকে ডাকিয়াও বলেন নাই যে, আমি তোমাকে ত্যাগ করিলাম—আজি বার বৎসর আমাকে ত্যাগ করিয়া সম্বন্ধ রহিত করিয়াছেন, আজি আবার তাহার প্রিয়পত্নীর মত তাহার গাত্রস্পর্শ করিব কোন্ সাহসে? কিন্তু তিনি ত মৃতপ্রায়! যা হউক তা হউক, আমি তাহাকে স্পর্শ করিব।” তাই ভাবিয়া সীতাস্পর্শে রাম চেতনাপ্রাপ্ত হইলে, সীতা বলিলেন, “ভগবতি তমসে! ওসরন্ধ, জই দাব মং পেক্খিস্মদি তদো অণব্ভগুগ্লাদসান্নিধাণেণ অহিঅদরং মম মহারাও কুবিষ্মদি।” তবু “মম মহারাও!”

(২) যে নবোদগত মৃগালপল্লবের ন্যায় কোমল দন্ত দ্বারা তোমার কর্ণদেশ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লবলী-পল্লব টানিয়া লইত, সেই তোমার পুত্র মদমন্ত বারণগণকে জয় করিল, স্নতরাং এখনই সে যুবাবয়সের কল্যাণভাজন হইয়াছে। * * সখি বাসন্তি, দেখ, বাছা কেমন নিজ কান্তার মনোরঞ্জননৈপুণ্যও শিখিয়াছে। খেলা করিতে করিতে মৃগালকাণ্ড উপাটিত করিয়া তাহার গ্রাসের অংশে স্নুগন্ধি পদ্মসুবাসিত জলের গণ্ডুষ মিশাইয়া দিতেছে; এবং শূণ্ডের দ্বারা পর্য্যাপ্ত জলকণায় তাহাকে সিক্ত করিয়া, স্নেহে অবরুদণ্ড নলিনীপত্রের আতপত্র ধরিতেছে।

(৩) আমার সেই পুত্র দুর্দটির অমলমুখপদ্মযুগল, যাহাতে কপোলদেশ ঈষদ্বিরল এবং কোমল ধবল দশনে উজ্জ্বল, যাহাতে মৃদুমধুর হাসির অব্যক্তধ্বনি অবিরল লাগিয়া রহিয়াছে, যাহাতে কাকপক্ষ নিবন্ধ আছে, তাহা আৰ্য্যপুত্র কর্তৃক পরিচুম্বিত হইল না!

সেই গোদাবরীশীকরশীতল পঞ্চবটী বনে, রাম, বাসন্তীর আহ্বানে উপবেশন করিলেন। দূরে, গিরিগহ্বর গোদাবরীর বারিরাশির গদগদ নিনাদ শূন্য যাইতেছে। সম্মুখে পরস্পর প্রতিঘাতসঙ্কুল উত্তালতরঙ্গ সরিৎসঙ্গম দেখা যাইতেছে। দক্ষিণে শ্যামচ্ছবি অনন্ত কাননশ্রেণী চলিয়া গিয়াছে। চারি দিকে সীতার পূর্বসহবাসচিহ্ন সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। তথায় একটি কদলীবনমধ্যবর্তী শিলাতলে, পূর্বপ্রবাসকালে, রাম সীতার সঙ্গে শয়ন করিতেন; সেইখানে বসিয়া সীতা হরিণশিশুগণকে তৃণ খাওয়াইতেন; এখনও হরিণেরা সেই প্রেমে সেইখানে ফিরিয়া বেড়াইতেছে। বাসন্তী সেইখানে রামকে বসিতে বলিলেন। রাম সেখানে না বসিয়া, অন্যত্র উপবেশন করিলেন। সীতা, পূর্ব পঞ্চবটীবাসকালে একটি ময়ূরশিশু প্রতিপালন করিয়াছিলেন। একটি কদম্ববৃক্ষ সীতা স্বহস্তে রোপণ করিয়া, স্বয়ং বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। রাম দেখিলেন যে, সেই কদম্ববৃক্ষে দুই একটি নবকুসুমোদ্গম হইয়াছে। তদুপরি আরোহণ করিয়া সীতাপালিত সেই ময়ূরটি নৃত্যাস্তে ময়ূরী সঙ্গে রব করিতেছিল। বাসন্তী রামকে সেই ময়ূরটি দেখাইলেন। দেখিয়া রামের মনে পড়িল, সীতা তাহাকে করতালি দিয়া নাচাইতেন, নাচাইবার সময়ে তালের সহিত সীতার চক্ষুও পল্লবমধ্যে ঘূরিত। এইরূপে বাসন্তী রামকে পূর্বস্মৃতি-পীড়িত করিয়া,—সখীনির্ব্বাসনজনিত রাগেই এইরূপ পীড়িত করিয়া, প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহারাজ! কুমার লক্ষ্মণ ভাল আছেন ত?” কিন্তু সে কথা রামের কাণে গেল না—তিনি সীতাকরকমলবিকীর্ণ জলে পরিবর্দ্ধিত বৃক্ষ, সীতাকরকমলবিকীর্ণ নীবারে পুষ্ট পক্ষী, সীতাকরকমলবিকীর্ণ তৃণে প্রতিপালিত হরিণগণকেই দেখিতেছিলেন। বাসন্তী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহারাজ! কুমার লক্ষ্মণ কেমন আছেন?” এবার রাম কথা শুনিতো পাইলেন, কিন্তু ভাবিলেন, বাসন্তী “মহারাজ!” বলিয়া সম্বোধন করিলেন কেন? এ ত নিষ্প্রণয় সম্বোধন। আর কেবল কুমার লক্ষ্মণের কথাই জিজ্ঞাসিলেন, তবে বাসন্তী সীতাবিসর্জনবৃত্তান্ত জানেন। রাম প্রকাশ্যে কেবল বলিলেন, “কুমারের কুশল,” এই বলিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন। বাসন্তী তখন মূক্তকণ্ঠা হইয়া কহিলেন, “দেব! এত কঠিন হইলে কি প্রকারে?”

ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং
ত্বং কোমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে।

তুমি আমার জীবন, তুমি আমার দ্বিতীয় হৃদয়, তুমি নয়নের কোমুদী, অঙ্গে তুমি আমার অমৃত,—এইরূপ শত শত প্রিয় সম্বোধনে যাহাকে ভুলাইতে, তাহাকে—” বলিতে বলিতে সীতা-স্মৃতিমুগ্ধা বাসন্তী আর বলিতে পারিলেন না; অচেতন হইলেন। রাম তাহাকে আশ্বস্তা করিলেন। চেতনা পাইয়া বাসন্তী কহিলেন, “আপনি কেমন করিয়া এ কাজ করিলেন?”

রাম। লোকে বুঝে না বলিয়া।

বাসন্তী। কেন বুঝে না?

রাম। তাহারাই জানে।

তখন বাসন্তী আর সহিতে পারিলেন না। বলিলেন, “নিষ্ঠুর! দেখিতেছি, কেবল যশঃ তোমার অত্যন্ত প্রিয়।”

এই কথোপকথনের সমুচিত প্রশংসা করা দুঃসাধ্য। সীতাবিসর্জন জন্য বাসন্তী রামপ্রতি ক্রোধযুক্তা হইয়াছিলেন, তিনি মানসিক যন্ত্রণারূপ সেই অপরাধের দণ্ড প্রণীত করিলেন, সহজেই রামের শোকসাগর উছলিয়া উঠিল। রামের যে একমাত্র শোকোপশমের উপায় ছিল—আত্মপ্রসাদ, তাহাও বিনষ্ট করিলেন। রাম জানিতেন যে, তিনি প্রজারঞ্জনরূপ কুলধর্মের রক্ষার্থেই সীতাবিসর্জনরূপ মর্মচ্ছেদী কার্য করিয়াছেন।—মর্মচ্ছেদ হউক, ধর্ম রক্ষা হইয়াছে। বাসন্তী দেখিলেন যে, সে ধর্মরক্ষা কেবল স্বার্থপরতার পৃথক্ একটি নামমাত্র। সে কুলধর্ম রক্ষার বাসনা কেবল রূপান্তরিত যশোলিপ্সা মাত্র। কেবল যশোলাভের স্বার্থপর বাসনার বশবর্তী হইয়া রাম এই কাজ করিয়াছেন। বাসন্তী আরও দেখিলেন যে, যে যশের আকাঙ্ক্ষায় তিনি এই নিষ্ঠুর কার্য করিয়াছিলেন, সে আকাঙ্ক্ষাও ফলবতী হয় নাই। তিনি এই প্রকার যশের লাভ লালসায় পত্নীবধরূপ গুরুতর অপযশের ভাগী হইয়াছেন। বনমধ্যে সীতার কি হইল, তাহার স্থিরতা কি? ইহার অপেক্ষা গুরুতর অপযশ আর কি হইতে পারে?

বাঁকম রচনাবলী

তখন রামের শোকপ্রবাহ আবার অসম্বরণীয় বেগে ছুটিল। সীতার সেই জ্যোৎস্নাময়ী মৃদুমৃদুমৃগালকল্প দেহলীতিকা কোন হিংস্র পশু কর্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে, সন্দেহ নাই। এই ভাবিয়া রাম “সীতে! সীতে!” বলিয়া সেই অরণ্যমধ্যে রোদন করিতে লাগিলেন। কখন বা যে কলঙ্ককুৎসাকারক পৌরজনের কথায় সীতা বিসজ্জন করিয়াছিলেন, তাহাদিগের উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন, “আমি অনেক সহ্য করিয়াছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হও।” বাসন্তী ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে বলিলেন। রাম বলিলেন, “সখি, আবার ধৈর্য্যের কথা কি বল? আজি দ্বাদশ বৎসর সীতাশূন্য জগৎ—সীতা নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে—তথাপি বাঁচিয়া আছি—আবার ধৈর্য্য কাহাকে বলে?” রামের অত্যন্ত যন্ত্রণা দেখিয়া বাসন্তী তাঁহাকে জনস্থানের অন্যান্য প্রদেশ দেখিতে অনুরোধ করিলেন। রাম উঠিয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বাসন্তীর মনে সখীবিসজ্জনদুঃখ জ্বলিতোছিল—কিছুতেই ভুলিলেন না। বাসন্তী দেখাইলেন;—

অস্মিন্বেব লতাগৃহে স্বমভবস্তন্মাগদত্তেক্ষণঃ
সা হংসৈঃ কৃতকৌতুকা চিরমভূদ্গোদাবরীসৈকতে।
আয়াস্ত্যা পরিদুর্ম্মনায়িতমিব ত্বাং বীক্ষ্য বন্ধস্তয়া
কাতর্য্যাদরবিন্দকুটুলনিভো মৃক্ষঃ প্রণামাজ্জলিঃ।(১)

আর রাম সহ্য করিতে পারিলেন না। ভ্রান্তি জন্মিতে লাগিল। তখন উচ্চৈঃস্বরে রাম ডাকিতে লাগিলেন, “চাঁড় জানকি, এই যে চারি দিকে তোমাকে দেখিতেছি—কেন দয়া কর না? আমার বুক ফাটিতেছে; দেহবন্ধ ছিঁড়িতেছে; জগৎ শূন্য দেখিতেছি; নিরন্তর অন্তর জ্বলিতেছে; আমার বিকল অন্তরাত্মা অবসন্ন হইয়া অন্ধকারে ডুবিতেছে; মোহ আমাকে চারি দিক্ হইতে আচ্ছন্ন করিতেছে; আমি মন্দভাগ্য—এখন কি করিব?” বলিতে বলিতে রাম মূর্চ্ছিত হইলেন।

ছায়ারূপিণী সীতা তমসার সঙ্গে আদ্যোপান্ত নিকটে ছিলেন। বাসন্তী রামকে পীড়িত করিতেছেন দেখিয়া, সীতা পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে তিরস্কার করিতেছিলেন—কত বার রামের রোদন শুনিয়া আপনি মর্ম্মপীড়িত হইতেছিলেন, আবার সীতা রামচন্দ্রের দুঃখের কারণ হইলেন বলিয়া, কত কাতরোক্তি করিতেছিলেন। আবার রামকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া সীতা কাঁদিয়া উঠিলেন, “আর্ষ্যপুত্র! তুমি যে সকল জীবলোকের মঙ্গলাধার! তুমি এ মন্দভাগিনীকে মনে করিয়া বার বার সংশয়িতজীবন হইতেছ? আমি যে মলেম।” এই বলিয়া সীতাও মূর্চ্ছিতপ্রায়! তমসা এবং বাসন্তী তাঁহাকে উঠাইলেন। সীতা সসম্ভ্রমে রামের ললাট স্পর্শ করিলেন। কি স্পর্শসুখ! রাম যদি মূর্চ্ছিত হইয়া থাকিতেন, তাহা হইলেও তাঁহার চেতনা হইত। আনন্দ-নির্মীলিতলোচনে স্পর্শসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন, তাঁহার শরীরধাতু অন্তরে বাহিরে অমৃত-ময় প্রলেপে যেন লিপ্ত হইল—জ্ঞান লাভ করিলেও আনন্দেতে আর এক প্রকার মোহ তাঁহাকে অভিভূত করিল। রাম বাসন্তীকে বলিলেন, “সখি বাসন্তি! বুঝি অদৃষ্ট প্রসন্ন হইল!”

বাসন্তী। কিসে?

রাম। আর কি সখি! সীতাকে পাইয়াছি।

বাসন্তী। কৈ তিনি?

রাম। এই যে আমার সম্মুখেই রহিয়াছেন।

বাসন্তী। মর্ম্মভেদী প্রলাপ বাক্যে আমি একে প্রিয়সখীর দুঃখে জ্বলিতোছি, তাহাতে আবার এমনতর এ হতভাগিনীকে কেন জ্বলাইতেছেন?

রাম বলিলেন, “সখি, প্রলাপ কই? বিবাহকালে বৈবাহিক মঙ্গলসূত্রযুক্ত যে হাত আমি ধরিয়াছিলাম—আর যে হাতের অমৃতশীতল স্বেচ্ছালব্ধ সুখস্পর্শে চিনিতে পারিতেছি, এ ত সেই হাত! সেই তুহিনসদৃশ, বর্ষাশীকরতুল্য শীতল, কোমল লবলীবৃক্ষের নবাঙ্কুরতুল্য হস্তই আমি পাইয়াছি।”

(১) সীতা গোদাবরীসৈকতে হংস লইয়া কৌতুক করিতে করিতে বিলম্ব করিতেন; তখন তুমি এই লতাগৃহে থাকিয়া তাঁহার পথ চাহিয়া রহিতে। সীতা আসিয়া তোমাকে বিশেষ দুর্ম্মনায়মান দেখিয়া, তোমাকে প্রণাম করিবার জন্য পশ্মকলিকা তুল্য অঙ্গুলির দ্বারা কি সুন্দর অঞ্জলিবন্ধ করিতেন!

বিবিধ প্রবন্ধ—উত্তরচারিত

এই বলিয়া রাম তাঁহার ললাটস্থ অদৃশ্য সীতা-হস্ত গ্রহণ করিলেন। সীতা ইতিপূর্বেই রামের আনন্দমোহ দেখিয়া অপসৃত হইবেন বিবেচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু সেই চিরসম্ভাবসৌম্য-শীতল স্বামিস্পর্শে তিনিও মুগ্ধ হইলেন; অতি যত্নে সেই রামললাটস্থিত হস্তকে ধরিয়া রাখিলেও সে হস্ত কাঁপিতে লাগিল, ঘামিতে লাগিল, এবং জড়বৎ হইয়া অবশ হইয়া আসিতে লাগিল! যখন রাম, সীতার হস্তের চিরপরিচিত অমৃতশীতল সুখস্পর্শের কথা বলিলেন, সীতা মনে মনে বলিলেন, “আর্য্যপুত্র, আজও তুমি সেই আর্য্যপুত্রই আছ!” শেষে যখন রাম সীতার কর গ্রহণ করিলেন, তখন সীতা দেখিলেন, স্পর্শমোহে প্রমাদ ঘটিল। কিন্তু রাম সে হাত ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না; আনন্দে তাঁহার ইন্দ্রিয়সকল অবশ হইয়া আসিয়াছিল, তিনি বাসন্তীকে বলিলেন, “সখি, তুমি একবার ধর।” সীতা সেই অবকাশে হাত ছাড়াইয়া লইলেন; লইয়া, স্পর্শসুখজনিত স্বেদরোমাঞ্চকল্পিতকলেবরা হইয়া পবনকম্পিত নবজলকণাসিক্ত স্ফুটকোরক কদম্বের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। মনে করিলেন, “কি লজ্জা, তমসা দেখিয়া কি মনে করিতেছেন। ভাবিতেছেন, এই ইঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন, আবার ইঁহার প্রতি এই অনুরাগ।”

রাম ক্রমে জানিতে পারিলেন যে, কই, কোথা সীতা—সীতা ত নাই। তখন রামের শোক-প্রবাহ দ্বিগুণ ছুটিল। রোদন করিয়া, ক্রমে শান্ত হইয়া বাসন্তীকে বলিলেন, “আর কতক্ষণ তোমাকে কাঁদাইব? আমি এখন যাই।” শুনিয়া সীতা উদ্বেগের সহিত তমসাকে অবলম্বন করিয়া বলিতে লাগিলেন, “ভগবতি তমসে! আর্য্যপুত্র যে চলিলেন?” তমসা বলিলেন, “চল, আমরাও যাই।” সীতা বলিলেন, “ভগবতি, ক্ষমা কর! আমি ক্ষণকাল এই দুর্লভ জনকে দেখিয়া লই।” কিন্তু বলিতে বলিতে এক বজ্রতুল্য কঠিন কথা সীতার কাণে গেল। রাম বাসন্তীর নিকট বলিতেছেন, “অশ্বমেধের জন্য আমার এক সহধর্ম্মিণী আছে—” সহধর্ম্মিণী! সীতা কম্পিতকলেবরা হইয়া মনে মনে বলিলেন, “আর্য্যপুত্র! কোথায় সে?” এই অবসরে রামও কথা সমাপ্ত করিলেন, “সে সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি।” শুনিয়া সীতার চক্ষুর জল পড়িতে লাগিল; বলিলেন, “আর্য্যপুত্র! এখন তুমি তুমি হইলে। এতদিনে আমার পরিত্যাগ-লজ্জাশল্য বিমোচন করিলে!” রাম বলিতেছেন, “তাহারই দ্বারা আমার বাস্পদিগ্ধ চক্ষুর বিনোদন করি।” শুনিয়া সীতা বলিলেন, “তুমি যার এত আদর কর, সেই ধন্য। তোমার যে বিনোদন করে, সেই ধন্য। সে জীবলোকের আশানিবন্ধন হইয়াছে।”

রাম চলিলেন। দেখিয়া সীতা করযোড়ে, “গমো গমো অপূর্ব্বপুঞ্জগণদদংসাণং অজ্জউত্তচরণকমলাণং” এই বলিয়া প্রণাম করিতে মূচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তমসা তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন। সীতা বলিলেন, “আমার এ মেঘান্তরে ক্ষণকাল জন্য পূর্ণিমাচন্দ্র দেখামাত্র।”

তৃতীয়াঙ্কের সার মর্ম্ম এই। এই অঙ্কের অনেক দোষ আছে। ইহা নাটকের পক্ষে নিতান্ত অনাবশ্যিক। নাটকের যাহা কার্য্য, বিসর্জনাতে রাম সীতার পুনর্ম্মিলন, তাহার সঙ্গে ইহার কোন সংস্রব নাই। এই অঙ্ক পরিত্যক্ত হইলে নাটকের কার্য্যের কোন হানি হয় না। সচরাচর এরূপ একটি সুদীর্ঘ নাটকাঙ্ক নাটকমধ্যে সন্নিবেশিত হওয়া, বিশেষ রসভঙ্গের কারণ হয়। যাহা কিছু নাটকে প্রতিকৃত হইবে, তাহা উপসংহতির উদ্যোজক হওয়া উচিত। এই অঙ্ক কোন অংশে তদ্রূপ নহে। বিশেষ, ইহাতে রামবিলাপের দৈর্ঘ্য এবং পৌনঃপুন্য অসহ্য। তাহাতে রচনাকৌশলের বিপর্য্যয় হইয়াছে। কিন্তু সকলেই মূক্তকণ্ঠে বলিবেন যে, অন্য অনেক নাটক একবারে বিলুপ্ত হয়, বরং তাহাও স্বীকর্তব্য, তথাপি উত্তরচারিতের এই তৃতীয়াঙ্ক ত্যাগ করা যাইতে পারে না। কাব্যংশে ইহার তুল্য রচনা অতি দুর্লভ।

উত্তরচারিত সমালোচন ক্রমে এত দীর্ঘায়ত হইয়া উঠিয়াছে যে, আর ইহাতে অধিক স্থান নিয়োগ করা কর্তব্য নহে। অতএব অবশিষ্ট কয় অঙ্কের সমালোচনা অতি সংক্ষেপে করিব।

এ দিকে বাস্মীকি প্রচার করিলেন যে, তিনি এক অভিনব নাটক রচনা করিয়াছেন। তদভিনয় দর্শন জন্য সকল লোককে নিমন্ত্রিত করিলেন। তন্দর্শনার্থ বশিষ্ঠ, অরুন্ধতী, কৌশল্যা, জনক প্রভৃতি বাস্মীকির আশ্রমে আসিয়া সমবেত হইলেন। তথায় লবের সুন্দর কান্দি এবং রামের সহিত সাদৃশ্য দেখিয়া কৌশল্যা অত্যন্ত ঔৎসুক্যপরবশ হইয়া, তাঁহার সহিত আলাপ করিলেন। দূহিতৃবিয়োগে জনকের শোকক্লিষ্ট দশা, কৌশল্যার সহিত তাঁহার আলাপ,

বিক্রম রচনাবলী

লবের সহিত কোশল্যার আলাপ, ইত্যাদি অতি মনোহর, কিন্তু সে সকল উদ্ধৃত করিবার আর অবকাশ নাই।

চন্দ্রকেতু, অশ্বমেধের অশ্বরক্ষক সৈন্য লইয়া, বাস্মীকির আশ্রম সন্নিধানে উপনীত হইলেন। তাহার অবর্তমানে সৈন্যদিগের সহিত লবের বচসা হওয়ায় লব অশ্ব হরণ করিলেন এবং যুদ্ধে চন্দ্রকেতুর সৈন্যদিগকে পরাস্ত করিলেন। চন্দ্রকেতু আসিয়া তাহাদিগের রক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। চন্দ্রকেতু এবং লব পরস্পরের প্রতি বিপক্ষতাচরণকালে এত দূর উভয়ে উভয়ের প্রতি সৌজন্য এবং সদ্ব্যবহার করিলেন যে, ইহা—নাটকের এতদংশ পাড়িয়া বোধ হয় যে, সভ্যতার চূড়াপদবাচ্য কোন ইউরোপীয় জাতি কর্তৃক প্রণীত হইয়াছে। ভবভূতির সময়ে ভারতবর্ষীয়েরা সামাজিক ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, ইহা তাহার এক প্রমাণ।

আকাশে ঘেরূপ নক্ষত্র ছড়ান, ভবভূতির রচনামধ্যে সেইরূপ কবিত্বরঞ্জ ছড়ান আছে। চতুর্থ এবং পঞ্চম অঙ্ক হইতে এই সকল রঙ্গ আহরণ করিতে পারিলাম না। তথাপি পঞ্চম হইতে দুই একটি উদাহরণ না দিয়া থাকিতে পারা যায় না। লব চন্দ্রকেতুর সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে ছিলেন, এমন সময়ে চন্দ্রকেতু তাহাকে যুদ্ধে আহ্বান করাতে তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া চন্দ্রকেতুর দিকে ধাবমান হইলেন, “স্তুনিয়ন্ত্রুরবাদিভাবলীনামবমন্দাদিব দৃপ্তসিংহশাবঃ।” (১) তিনি চন্দ্রকেতুর দিকে আসিতেছেন, পরাজিত সৈন্যগণ তখন তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে;—

দর্পেণ কৌতুকবতা ময়ি বদ্ধলক্ষ্যঃ
পশ্চাদ্বেলরনুসূতোহয়মদীর্ঘধন্বা।
দেধাসমুদ্রতমরুত্তরলস্য ধন্তে
মেঘস্য মাঘবতচাপধরস্য লক্ষ্মীম্ ॥ (২)

নিঃসহায় পাদচারী বালকের প্রতি বহু সেনা ধাবমান দেখিয়া চন্দ্রকেতু তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। দেখিয়া লব ভাবিলেন, “কথমনুকম্পতে নাম?” ভারতবর্ষীয় কোন গ্রন্থে এরূপ বাক্য প্রযুক্ত আছে, এ কথা অনেক ইউরোপীয় সহজে বিশ্বাস করিবেন না।

লব কর্তৃক জুস্তকাস্ত্র প্রয়োগ বর্ণনা অস্বাভাবিক, অতিপ্রকৃত, এবং অস্পষ্ট হইলেও, আমরা তাহা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না;—

পাতালোদরকুঞ্জপূর্জিততমঃশ্যামৈর্নভোজুস্তকৈ-
রুত্তপ্তস্ফুরদারকূটকপিলজ্যোতিজ্জ্বলন্দীপ্তিভিঃ।
কল্পাক্ষেপকঠোরভৈরবমরুদ্ব্যস্তৈরবাকীর্ষ্যতে
মীলন্মেঘতর্ডিৎকড়ারকুহরৈর্বিষ্ক্যাদ্রিকূটৈরিব ॥ (৩)

লবের সহিত রামের রূপসাদৃশ্য দেখিয়া, সুমন্ত্রের মনে একবার আশা জন্মিয়াই, সীতা নাই, এই কথা মনে পড়াতে সে আশা তখনই নিবারণিত হইল। ভাবিলেন, “লতায়্যাং পুর্ষ্বলুনায়াং প্রসূনস্যাগমঃ কুতঃ!” বৃদ্ধ সুমন্ত্রের মুখে এই বাক্য শুনিয়া, সহৃদয় পাঠকের রোমিও সম্বন্ধে বৃদ্ধ মন্টাগুর মুখে কীটদংশিত কুসুমকোরকের উপমা মনে পাড়বে।

ষষ্ঠাঙ্কের বিষ্কম্বকটি বিশেষ মনোহর! বিদ্যাধরমিথুন গগনমার্গে থাকিয়া লব-চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ দেখিতেছিলেন। যুদ্ধ তাহাদিগের কথোপকথনে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়াছেন যে, ভবভূতির কাব্যের “মধ্যে মধ্যে সংস্কৃতে এবং প্রাকৃতে এমত দীর্ঘ সমাসঘটিত রচনা আছে, তাহাতে অর্থ বোধ ও রসগ্রহ সম্বন্ধে ব্যাঘাত ঘটিয়া উঠে।” ভবভূতির অসাধারণ দোষ নির্বাচনকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় এই কথা বলিয়াছেন। আমরা

(১) যেমন মেঘের শব্দ শুনিয়া, দৃপ্ত সিংহ-শিশুও হস্তি-বিনাশ হইতে নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ।

(২) সকৌতুক দর্পে আমার প্রতি বদ্ধলক্ষ্য হইয়া ধনু উখিত করিয়া, সৈন্যের দ্বারা পশ্চাতে অনুসৃত হইয়া, ইনি দুই দিক্ হইতে বায়ুসঞ্চালিত এবং ইন্দ্রধনুশোভিত মেঘের মত দেখাইতেছেন।

(৩) পাতালাভাস্তরবস্ত্রী কুঞ্জমধ্যে রাশীকৃত অঙ্ককারের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ এবং উত্তপ্ত, প্রদীপ্ত পিত্তলের পিঙ্গলবৎ জ্যোতির্বির্শিষ্ট জুস্তকাস্ত্রগুলির দ্বারা আকাশমণ্ডল ব্রহ্মাণ্ডপ্রলয়কালীন দুর্নিবার ভৈরব বায়ুর দ্বারা বিষ্কম্ব এবং মেঘমিলিত বিদ্যুৎকর্তৃক পিঙ্গলবর্ণ এবং গুহাযুক্ত বিষ্ক্যাদ্রিশিখরব্যাপ্তবৎ দেখাইতেছে।

বিবিধ প্রবন্ধ—উত্তরচারিত

পূর্বে যাহা উত্তরচারিত হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি, তন্মধ্যে এইরূপ দীর্ঘ সমাসের অনেক উদাহরণ পাওয়া যাইবে। এই বিষ্কম্ভকমধ্যে ঐরূপ দীর্ঘ সমাসের বিশেষ আধিক্য। আমরা কয়েকটি উদ্ধৃত করিতেছি, যথা পুষ্পবৃষ্টি;—

“অবিরললল্লিতবিকচকনককমলকমনীয়সন্ততিঃ অমরতরুতরুণমণিমুকুলানিকরমকরন্দ-
সুন্দরঃ পুষ্পনিপাতঃ।”

পুনশ্চ, বাণসৃষ্ট অগ্নি;—

“উচ্চাডবজ্রখণ্ডাবস্ফোটপটুতরস্ফুল্লিঙ্গবিকৃতিঃ উত্তালতুমুললেলিহানজ্বালাসস্তারভৈরবো
ভগবান্ উষস্বধঃ।”

পুনশ্চ, বারুণাস্ত্রসৃষ্ট মেঘ;—

“অবিরলবিলোলধূলুস্তবিজ্জ্বলদাবিলাসমণ্ডিহিং মত্তমোরকণ্ঠসামলেহিং জলহরেহিং।”

এবং তৎকালে সৃষ্টির অবস্থা;—

“প্রবলবাতাবলিক্షোভগস্তীরগুণগুণায়মানমেঘমেদুরাক্ষকারনীরঙ্কনিবন্ধম্ একবারবিশ্বগ্রসন-
বিকটবিকরালকালকণ্ঠমুখকন্দরবিবর্তমানমিব যুগান্তযোগনিদ্রানিরুদ্ধসর্বদ্বারনারায়ণোদরনিবৃষ্টি-
মিব ভূতজাতং প্রবেপতে।”

ঐদৃশ দীর্ঘ সমাস যে রচনা-দোষমধ্যে গণ্য, তাহা আমরা স্বীকার করি। যাহা কিছুতে অর্থবোধের বিঘ্ন হয়, তাহাই দোষ। ঐদৃশ সমাসে অর্থবোধের হানি, সুতরাং ইহা দোষ। নাটকে ইহা বিশেষ যে দোষ, তাহাও স্বীকার করি; কেন না, ইহাতে নাটকের অভিনয়োপযোগিতার হানি হয়। তথাপি এই সমাসগুলি কবিত্বপূর্ণ, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

লব ও চন্দ্রকেতু যুদ্ধ করিতেছিলেন, এমন সময়ে রাম সেই স্থানে উপনীত হইলেন। তিনি উভয়কে যুদ্ধ হইতে নিরস্ত করিলেন। লব তাঁহাকে রাজা রামচন্দ্র বলিয়া জানিতে পারিয়া, ভক্তিভাবে প্রণাম ও নম্রভাবে তাঁহার সহিত আলাপ করিলেন। কুশও যুদ্ধসম্বাদ শুনিয়া সে স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং লব কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া রামের সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিলেন। রাম উভয়কে স্নেহে আলিঙ্গন এবং পিতৃযোগ্য প্রণয়সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। পরে সকলে, বাল্মীকির আশ্রমে, তৎপ্রণীত নাটক অভিনয় দেখিতে গেলেন।

তথায় রামানুজগ্রামে লক্ষ্মণ দৃষ্টবর্গকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, পৌরগণ, জনপদবাসী প্রজা ও দেবাসুর এবং ইতর জীব, স্থাবর জঙ্গম সকলে ঋষি-প্রভাববলে সমাগত হইয়া, লক্ষ্মণকর্তৃক যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইলেন। পরে অভিনয় আরম্ভ হইল। রাম ও লবকুশ দৃষ্টবর্গমধ্যে ছিলেন।

সীতা বিসর্জন বৃত্তান্তই এই অদ্ভুত নাটকের প্রথমাংশ। সীতা লক্ষ্মণকর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে, তাঁহার কাতরতা, গঙ্গাপ্রবাহে দেহসমর্পণ, তন্মধ্যে যমলসন্তান প্রসব, গঙ্গা এবং পৃথিবী কর্তৃক তাঁহার ও শিশুদিগের রক্ষা ও তৎসঙ্গে সীতার প্রস্থান ইত্যাদি অভিনীত হইল। দেখিয়া রাম মর্ছিত হইলেন। তখন লক্ষ্মণ উচ্চৈঃস্বরে বাল্মীকিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, “ভগবন্! রক্ষা করুন! আপনার কাব্যের কি মর্ম?” নটদিগকে বলিলেন, “তোমরা অভিনয় বন্ধ কর।”

তখন সহসা দেবীর্ষ কর্তৃক অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত হইল! গঙ্গার বারিরাশি মথিত হইল। ভাগীরথী এবং পৃথিবীর সহিত জলমধ্য হইতে উঠিলেন—কে? স্বয়ং সীতা। দেখিয়া লক্ষ্মণ বিস্মিত এবং আহু্যাদিত হইয়া রামকে ডাকিলেন, “দেখুন! দেখুন!” কিন্তু রাম তখনও অচেতন। তখন সীতা অরুণতীকর্তৃক আদিষ্টা হইয়া রামকে স্পর্শ করিলেন। বলিলেন, “উঠ, আর্ষ্যপুত্র!”

রাম চেতনাপ্রাপ্ত হইলেন। পরে যাহা ঘটিল, বলা বাহুল্য। সেই সর্বলোকসমারোহ সমক্ষে সীতার সতীত্ব দেবগণকর্তৃক স্বীকৃত হইল। দেববাক্যে প্রজাগণ বুকিল। সীতা লবকুশকেও পাইলেন। রামও তাঁহাদিগকে পুত্র বলিয়া চিনিলেন। পরে সপুত্রা ভার্য্যা গৃহে লইয়া গিয়া সুখে রাজ্য করিতে লাগিলেন।

নাটকের ভিতর এই নাটকখানি যিনি অভিনীত দেখিবেন বা পাঠ করিবেন, তিনিই যে অশ্রুপাত করিবেন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু আমরা এতদংশ উদ্ধৃত করিলাম না। এই

বাংকম রচনাবলী

উপসংহার অপেক্ষা রামায়ণের উপসংহার অধিকতর মধুর এবং করুণ রসপূর্ণ। আমরা পাঠকের প্রীত্যর্থ তাহাই উদ্ধৃত করিতে বাসনা করি। বাল্মীকি কর্তৃক সীতা অযোধ্যায় আনীত হইলেন। যে সূচনায় ঋষি সীতাকে আনয়ন করেন, তদ্বিশেষ বঙ্গীয় পাঠকমাত্রেই “সীতার বনবাস” পাঠ করিয়া অবগত আছেন।—সতীত্ব সম্বন্ধে শপথ করিলে সীতাকে গ্রহণ করিবেন, রাম এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই কথা প্রচার হইলে পর, সীতা-শপথ দর্শনার্থ বহু লোকের সমাগম হইল।

১০৯ সর্গ।

তস্যাং রজন্যাং বদ্যুষ্টিয়াং যজ্ঞবাটং গতো নৃপঃ ।
ঋষীন্ সৰ্ব্বান্ মহাতেজাঃ শব্দাপয়তি রাঘবঃ ॥
বিশিষ্টো বামদেবশ্চ জাবালিরথ কাশ্যপঃ ।
বিশ্বামিত্রো দীর্ঘতপা দুৰ্ব্বাসাশ্চ মহাতপাঃ ॥
পুলস্ত্যোহপি তথা শক্তিভাগবশ্চৈব বামনঃ ।
মার্কণ্ডেয়শ্চ দীর্ঘায়ুস্মেীদগল্যশ্চ মহাযশাঃ ॥
গর্গশ্চ চ্যবনশ্চৈব শতানন্দশ্চ ধর্মবিৎ ।
ভরদ্বাজশ্চ তেজস্বী অগ্নিপুত্রশ্চ সুপ্রভঃ ॥
নারদঃ পর্বতশ্চৈব গোতমশ্চ মহাযশাঃ ।
এতে চান্যে চ বহবো মনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥
কৌতুহলসমাবিষ্টাঃ সৰ্ব্ব এব সমাগতাঃ ।
রাক্ষসাস্চ মহাবীৰ্য্যা বানরাশ্চ মহাবলাঃ ॥
সৰ্ব এব সমাজগ্নুর্মহাত্মানঃ কুতুহলাৎ ।
ক্ষত্রিয়া যে চ শূদ্রাশ্চ বৈশ্যাশ্চৈব সহস্রশঃ ॥
নানাদেশাগতশ্চৈব রাক্ষণাঃ সংশিতব্রতাঃ ।
সীতাশপথবীক্ষার্থং সৰ্ব এব সমাগতাঃ ॥
তদা সমাগতং সৰ্বমশ্মভূতমিবাচলং ।
শ্রুত্বা মূনিবরস্তুর্গং সসীতঃ সমুপাগমৎ ॥
তর্ষিৎ পৃষ্ঠতঃ সীতা অন্বগচ্ছদবাঙ্মুখী ।
কৃতাজলির্বাষ্পকলা কৃত্বা রামং মনোগতং ॥
তাং দৃষ্ট্বা শ্রুতিমায়াতীং ব্রহ্মাণমনুগামিনীং ।
বাল্মীকেঃ পৃষ্ঠতঃ সীতাং সাধুবাদো মহানভূৎ ॥
ততো হলহলাশব্দঃ সর্বেষামেবমাবভৌ ।
দুঃখজন্মবিশালেন শোকেনাকুলিতাত্মনাং ॥
সাধু রামেতি কেচিত্তু সাধু সীতেতি চাপরে ।
উভাবেব চ তদ্রান্যে প্রেক্ষকাঃ সংপ্রচুক্ষুঃ ।
ততো মध्ये জনৌঘস্য প্রবিশ্য মূনিপুঙ্গবঃ ।
সীতাসহায়ো বাল্মীকিরিতিহোবাচ রাঘবং ॥
ইয়ং দাশরথে সীতা সুরতা ধর্মচারিণী ।
অপবাদাৎ পরিত্যক্তা মমাশ্রমসমীপতঃ ॥
লোকাপবাদভীতস্য তব রাম মহাব্রত ।
প্রত্যয়ং দাস্যতে সীতা তামনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥
ইমৌ তু জানকীপুত্রাবুভৌ চ যমজাতকৌ ।
সুতো তবৈব দুর্দ্ধর্ষেী সত্যমেতদ্রবীমি তে ॥
প্রচেতসোহহং দশমঃ পুত্রো রাঘবনন্দন ।
ন স্মরাম্যনুতং বাক্যমিমৌ তু তব পুত্রকৌ ॥

বহুবর্ষসহস্রাণি তপশ্চর্যা ময়া কৃত।
নোপাশ্নীয়াং ফলন্তস্যা দৃষ্টেয়ং যদি মৈথিলী ॥
মনসা কস্মিণা বাচা ভূতপদ্বর্ষং ন কিম্বিষং।
তস্যাহং ফলমশ্নামি অপাপা মৈথিলী যদি ॥
অহং পণ্ডসু ভূতেষু মনঃষষ্ঠেষু রাঘব।
বিচিন্ত্য সীতা শুদ্ধোতি জগ্রাহ বর্ননির্ঝরে ॥
ইয়ং শুদ্ধসমাচারা অপাপা পতিদেবতা।
লোকাপবাদভীতস্য প্রত্যয়ং তব দাস্যতি ॥
তস্মাদিয়ং নরবরাভ্রজ শুদ্ধভাবা
দিব্যেন দৃষ্টিবিষয়েণ ময়া প্রদীষ্টা।
লোকাপবাদকলুষীকৃতচেতসা যা
ত্যক্তা ত্বয়া প্রিয়তমা বিদিতাপি শুদ্ধা ॥

১১০ সর্গ।

বাল্মীকেনৈবমুক্তস্তু রাঘবঃ প্রত্যভাষত।
প্রাঞ্জলির্জগতো মধ্যে দৃষ্ট্বা তাং দেববর্গিনীং ॥
এবমেতন্মহাভাগ যথা বদসি ধর্মবিৎ।
প্রত্যয়ন্তু মম ব্রহ্মংস্তব বাক্যৈরকল্মষৈঃ ॥
প্রত্যয়শ্চ পুরা দত্তো বৈদেহ্যা সুরসন্নিধৌ।
শপথশ্চ কৃতস্তত্র তেন বৈশম প্রবেশিতা ॥
লোকাপবাদো বলবান্ যেন ত্যক্তা হি মৈথিলী।
সেয়ং লোকভয়াদ্ ব্রহ্মলিপাপেত্যভিজানতা ॥
পরিত্যক্তা ময়া সীতা তদ্বদ্বান্ ক্ষন্তুমর্হতি।
জানামি চেমৌ পুরৌ মে যমজাতৌ কুশীলবৌ ॥
শুদ্ধায়াং জগতো মধ্যে বৈদেহ্যাং প্রীতিরন্তু মে।
অভিপ্রায়ন্তু বিজ্ঞায় রামস্য সুরসন্তমাঃ ॥
সীতায়ঃ শপথে তস্মিন্ সর্ষ্ব এব সমাগতাঃ।
পিতামহং পুরস্কৃত্য সর্ষ্ব এব সমাগতাঃ ॥
আদিত্যা বসবো রুদ্রা বিশ্বদেবা মরুদ্গণাঃ।
সাধ্যাশ্চ দেবাঃ সর্ষ্ব তে সর্ষ্ব চ পরমর্ষয়ঃ ॥
নাগাঃ সুপর্ণাঃ সিদ্ধাশ্চ তে সর্ষ্ব হৃষ্টমানসাঃ।
দৃষ্ট্বা দেবান্ ষীংশৈব রাঘবঃ পুনরব্রবীৎ ॥
প্রত্যয়ো মে মূনিশ্রেষ্ঠ ঋষিবাক্যৈরকল্মষৈঃ।
শুদ্ধায়াং জগতো মধ্যে বৈদেহ্যাং প্রীতিরন্তু মে ॥
সীতাশপথসংভ্রান্তাঃ সর্ষ্ব এব সমাগতাঃ।
ততো বায়ুঃ শূভঃ পুণ্যো দিব্যগন্ধো মনোরমঃ ॥
তং জনৌঘং সুরশ্রেষ্ঠো হৃদয়ামাস সর্ষ্বতঃ।
তদন্তু তমিবাচিন্ত্যং নিরৈক্ষন্তু সমাহিতাঃ।
মানবাঃ সর্ষ্বরাষ্ট্রেভ্যঃ পদ্বর্ষং কৃতযুগে যথা ॥
সর্ষ্বান্ সমাগতান্ দৃষ্ট্বা সীতা কাষায়বাসিনী।
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বা কামধোদৃষ্টিরবাঙ্মুখী ॥
যথাহং রাঘবাদন্যাং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥
মনসা কস্মিণা বাচা যথা রামং সমর্চয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥

বঙ্কিম রচনাবলী

যথৈতৎ সত্যমুজ্জ্বলং মে বেদীম্ রামাৎ পরং ন চ।
 তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমহঁতি ॥
 তথা শপন্ত্যাং বৈদেহ্যাং প্রাদুরাসীত্তদভুতং।
 ভূতলাদুর্খিতং দিব্যং সিংহাসনমনুত্তমং ॥
 ধ্বিয়মানং শিরোভিস্তু নাগৈরমিত্তিবক্রমৈঃ।
 দিব্যং দিব্যেন বপুশ্চা দিব্যরত্নবিভূষিতৈঃ ॥
 তস্মিন্স্থু ধরণীদেবী বাহুভ্যাং গৃহ্য মৈথিলীং।
 স্বাগতেনাভিনন্দ্যেনামাসনে চোপবেশয়ৎ ॥
 তামাসনগতাং দৃষ্ট্বা প্রবিশন্তীং রসাতলং।
 পুত্ৰপৃষ্ঠির্বিচ্ছিন্না দিব্যা সীতামবাকিরৎ ॥
 সাধুকারণ্যে সন্মহান্দেবানাং সহসোথিতঃ।
 সাধু সাধির্দাত বৈ সীতে যস্যাস্তে শীলমীদৃশং ॥
 এবং বহুবিধা বাচো হ্যন্তরীক্ষগতাঃ সুরাঃ।
 ব্যাজহুঃপৃষ্ঠমনসো দৃষ্ট্বা সীতাপ্রবেশনং ॥
 যজ্ঞবাটগতাশ্চাপি মুনয়ঃ সৰ্ব্ব এব তে।
 রাজানশ্চ নরব্যাস্তা বিস্ময়ান্নোপরেমিরে ॥
 অন্তরীক্ষে চ ভূমৌ চ সৰ্ব্বে স্থাবরজঙ্গমাঃ।
 দানবাশ্চ মহাকায়াঃ পাতালে পল্লগাধিপাঃ ॥
 কোর্চিদ্ধিনেদুঃ সংহৃষ্টাঃ কোর্চিক্যানপরায়ণাঃ।
 কোর্চিদ্রামং নিরীক্ষন্তে কোর্চিৎ সীতামচেতসঃ ॥
 সীতাপ্রবেশনং দৃষ্ট্বা তেষামাসীৎ সমাগমঃ।
 তন্মহুর্গুর্মিবাত্যর্থং সমং সম্মোহিতং জগৎ ॥ (১)

(১) সেই রজনী অতিবাহিত হইলে, মহাতেজা রাজা রামচন্দ্র যজ্ঞস্থল গমনপূর্বক ঋষিসকলকে আহ্বান করাইলেন। অনন্তর বশিষ্ঠ, বামদেব, কশ্যপবংশোদ্ভব জাবালি, দীর্ঘতপা বিশ্বামিত্র, মহাতপা দূর্বাসা, পুন্ড্রিত্য, শক্তি, ভার্গব, বামন, দীর্ঘায়ু, মার্কণ্ডেয়, মহাযশা মৌঙ্গল্য, গর্গ, চ্যবন, ধর্মজ্ঞ শতানন্দ, তেজস্বী ভরদ্বাজ, অগ্নিপুত্র সুপ্রভ, নারদ, পর্বত ও মহাযশা গোতম, এবং অন্যান্য সংশিতব্রত মুনিগণ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সকলেই সমাগত হইলেন। মহাবীর্ষ্য রাক্ষসগণ ও মহাবল বানরগণ, মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণ, এবং সহস্র সহস্র বৈশ্য ও শূদ্রগণ এবং নানা দেশাগত ব্রতধারী ব্রাহ্মণসকল কুতূহল-বশতঃ সীতাশপথ দর্শন জন্য সকলেই সমাগত হইলেন।

মহর্ষি বাল্মীকি, তৎকালে সমাগত জনমণ্ডলী কৌতুকদর্শনার্থ পর্বতবৎ নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান, ইহা শ্রবণ করিয়া সীতাসহিত শীঘ্র আগমন করিলেন। সীতাও কৃতাজ্জলি, বাস্পাকুলনয়না এবং অধোমুখী হইয়া মনোমধ্যে রামকে চিন্তা করিতে করিতে সেই ঋষির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মের অনুগামিনী শ্রুতির ন্যায় বাল্মীকির পশ্চাদ্বর্তিনী সেই সীতাকে দেখিবামাত্র সেই স্থলে অতি মহৎ সাধুবাদ হইতে লাগিল। তৎপরে দুঃখজ অতিমহৎ শোক হেতু ব্যথিতান্তঃকরণ জন-সকলের বিপুল হলহলা শব্দ উথিত হইল। দর্শকবৃন্দমধ্যে কতকগুলি সাধু রাম, কতকগুলি সাধু জানকী ও কতকগুলি উভয়ই সাধু, এই প্রকার কহিতে লাগিল।

তদনন্তর মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি সীতা সহিত জনবৃন্দমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রামকে এইরূপ বলিতে লাগিলেন। হে দাশরথি! ধর্মচারিণী, সুব্রতা এই সীতা লোকাপবাদ হেতু আমার আশ্রম সমীপে পরিত্যক্তা হইয়াছিলেন। হে মহাব্রত রাম! ইনি এক্ষণে লোকাপবাদভীত তোমার নিকট প্রত্যয় প্রদান করিবেন; তুমি অনুজ্ঞা কর। এই দুঃকর্ষ যমল জানকীপুত্র তোমারই পুত্র, ইহা আমি তোমাকে সত্য বলিতেছি। হে রাঘবনন্দন! আমি প্রচেতার দশম পুত্র, আমি মিথ্যা বাক্য স্মরণও করি না; ইহারা তোমারই পুত্র। আমি বহু সহস্র বর্ষ তপস্যা করিয়াছি; যদিও এই জানকী দৃশ্চারিণী হইলেন, তাহা হইলে আমি যেন তাহার ফল প্রাপ্ত না হই। কায়মনে এবং কৰ্ম্মদ্বারা আমি পূর্ব কখনই পাপাচরণ করি নাই; যদিও জানকী নিষ্পাপা হইলেন, তবে আমি যেন তাহার ফলভোগ করিতে পারি। হে রাঘব! আমি পশু ভূত ও বৃষ্টস্থানীয় মনেতে সীতাকে বিশুদ্ধ বিবেচনা করিয়াই বর্নিনর্করে গ্রহণ করিয়াছিলাম। এই অপাপা পতিপরায়ণা শূদ্ধচারিণী, লোকাপবাদভীত তোমার নিকট প্রত্যয় প্রদান করিবেন।

বিবিধ প্রবন্ধ—উত্তরচারিত

আমরা উত্তরচারিত নাটকের প্রকৃত সমালোচনা করি নাই। পাঠকের সহিত আনুপূর্ব্বিক নাটক পাঠ করিয়া যেখানে যেখানে ভাল লাগিয়াছে, তাহাই দেখাইয়া দিয়াছি। গ্রন্থের প্রত্যেক অংশ পৃথক্ পৃথক্ করিয়া পাঠককে দেখাইয়াছি। এরূপে গ্রন্থের প্রকৃত দোষগুণের ব্যাখ্যা হয় না। এক একখানি প্রস্তর পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেখিলে তাজমহলের গৌরব বৃদ্ধিতে পারা যায় না। একটি একটি বৃক্ষ পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেখিলে উদ্যানের শোভা অনুভূত করা যায় না। এক একটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বর্ণনা করিয়া মনুষ্যমূর্ত্তির অনির্বচনীয় শোভা বর্ণন করা যায় না। কোটি কলস জলের আলোচনায় সাগরমাহাত্ম্য অনুভূত করা যায় না। সেইরূপ কাব্যগ্রন্থের। এ স্থান ভাল রচনা, এই স্থান মন্দ রচনা, এইরূপ তাহার সর্ব্বাংশের পর্যালোচনা করিলে প্রকৃত গুণাগুণ বৃদ্ধিতে পারা যায় না। যেমন অট্টালিকার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিতে গেলে সমুদয় অট্টালিকাটি এককালে দেখিতে হইবে, সাগরগৌরব অনুভূত করিতে হইলে, তাহার

হে রাজনন্দন! যেহেতু তুমি তোমার এই প্রিয়তমাকে বিশুদ্ধা জানিয়াও লোকাপবাদ ভয়ে পরিত্যাগ করিয়াছিলে, তজ্জন্যই দিব্যজ্ঞানে বিশুদ্ধা জানিয়াও এই শপথার্থ আদেশ করিয়াছি।

রাম বাস্মীক কর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া এবং সেই দেববর্ণিনী জানকীকে দেখিয়া, কৃতাজলি-পূর্ব্বক জগৎস্থ জনগণের সমীপে এইরূপ বলিতে লাগিলেন। হে ধর্ম্মজ্ঞ! হে মহাভাগ! আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহাই সত্য। হে ব্রহ্মন্! আপনার পবিত্র বাক্যেই আমার প্রত্যয় হইয়াছে, এবং বৈদেহীও লঙ্কামধ্যে পূর্ব্বকালে দেবগণ সমীপে প্রত্যয় প্রদান ও শপথ করিয়াছেন, তজ্জন্যই আমি ইহাকে গৃহে প্রবিষ্ট করাইয়াছিলাম। হে ব্রহ্মন্! এই জানকীকে আমি পবিত্রা জানিয়াও শুদ্ধ লোকাপবাদভয়ে ত্যাগ করিয়াছি। আর যমল কুশীলব আমারই পুত্র, আমি তাহা জানি; কিন্তু আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি যে কারণে জানকীকে ত্যাগ করিয়াছি, সেই লোকাপবাদ আমার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। জগন্মধ্যে পবিত্রা জানকীতে আমার প্রীতি থাকুক।

অনন্তর সীতা-শপথ বিষয়ে রামের অভিপ্রায় জানিয়া দেবগণ ব্রহ্মাকে পুরোবর্তী করিয়া সেই স্থলে সমাগত হইলেন এবং আদিত্যগণ বসুগণ রুদ্রগণ বিশ্বদেবগণ বায়ুগণ সকল সাধাগণ দেবগণ সকল পরমর্ষিগণ নাগগণ পক্ষিগণ সকলেই হৃষ্টান্তঃকরণ হইয়া সে স্থলে আগমন করিলেন। রাম সমাগত সেই সকল দেবগণ ঋষিগণকে দেখিয়া পূর্ব্ববার বাস্মীককে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন।

হে মূর্নিশ্চেষ্ট! পবিত্র ঋষিবাক্যে আমার প্রত্যয় আছে। জগতে বিশুদ্ধশালিনী সীতার প্রতি আমার প্রীতি থাকুক; কিন্তু সীতাশপথ দর্শনজন্য কোতূহলাক্রান্ত হইয়া সকলে সমাগত হইয়াছেন।

তখন দিব্য গন্ধর্বিশিষ্ট মনোহর এবং সর্ব্বপাপপুণ্য-সাক্ষী পবিত্র বায়ু প্রবাহিত হইয়া সেই জনবৃন্দকে আহ্বাদিত করিল। পূর্ব্বকালে সত্যযুগের ন্যায় সেই আশ্চর্য্য অচিন্তনীয় ব্যাপার, সকল রাষ্ট্র হইতে সমাগত জনমণ্ডলী সমাহিত হইয়া দেখিতে লাগিল। কাষায়-বস্ত্রপরিধানা সীতা সকলকে সমাগত দেখিয়া অধোমুখী, অধোদৃষ্টি এবং কৃতাজলি হইয়া এইরূপ কহিতে লাগিলেন। যদি আমি মনেতেও রাম ভিন্ন অন্য চিন্তা না করিয়া থাকি, তবে পৃথিবীদেবী আমাকে বিবর প্রদান করুন। যদি আমি কায়মনোবাক্যে রামাচর্ন করিয়া থাকি, তবে পৃথিবীদেবী আমাকে বিবর প্রদান করুন। “আমি রাম ভিন্ন জানি না,” আমার এই বাক্য যদি সত্য হয়, তবে পৃথিবীদেবী আমাকে বিবর প্রদান করুন।

বৈদেহী এইরূপ শপথ করিলে, তখন অমিতবিক্রম, দিব্য রত্নালঙ্কৃত নাগগণ কর্তৃক মস্তকে বাহিত, দিব্যকাস্তি, দিব্য সিংহাসন রসাতল হইতে সহসা আবির্ভূত হইল এবং সেই স্থলে পৃথিবীদেবী দুই বাহুদ্বারা সীতাকে গ্রহণ করিয়া এবং স্বাগত প্রশ্নে অভিনন্দন করিয়া সেই উত্তমাসনে উপবেশন করাইলেন।

সিংহাসনারূঢ়া সেই সীতাকে রসাতলে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তদুপরি স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল এবং দেবগণের অতি বিপুল সাধুবাদ হঠাৎ উথিত হইল। সীতার রসাতল প্রবেশ দেখিয়া অন্তরীক্ষগত দেবগণ হৃষ্টান্তঃকরণ হইয়া, “সীতা সাধু সীতা সাধু যাঁহার এইরূপ চরিত্র” ইত্যাদি নানাপ্রকার বাক্য কহিতে লাগিলেন। যজ্ঞস্থলগত সেই সকল মূর্নিগণ ও মনুষ্যশ্রেষ্ঠ রাজগণ এই অদ্ভুত ঘটনাহেতু বিস্ময় হইতে বিরত হইতে পারিলেন না। তৎকালে আকাশে, ভূতলে স্থাবর জঙ্গম পদার্থ ও মহাকায় দানবগণ এবং পাতালে নাগগণ সকলেই হৃষ্টান্তঃকরণ হইয়াছিলেন। তাঁহারা হৃষ্টমনে শব্দ করিতে লাগিলেন; কাহারো বা ধ্যানস্থ হইলেন, কাহারো বা রামকে দেখিতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ বা নিঃসংজ্ঞ হইয়া সীতাকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সমাগত সেই সকল ঋষি প্রভৃতির সীতার রসাতল প্রবেশ দেখিয়া এই প্রকার সমাগম হইয়াছিল এবং সেই মহত্ত্ব সমুদায় জগৎ সমকালেই মোহিত হইয়াছিল।

বাঁকম রচনাবলী

অনন্তবিস্তার এককালে চক্ষে গ্রহণ করিতে হইবে, কাব্য নাটক সমালোচনও সেইরূপ। মহাভারত এবং রামায়ণের অনেকাংশ এমন অপকৃষ্ট যে, তাহা কেহই পড়িতে পারে না। যে আণুবীক্ষণিক সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবে, সে কখনই এই দুই ইতিহাসের বিশেষ প্রশংসা করিবে না। কিন্তু মোটের উপর দেখিতে গেলে বলিতে হইবে যে, এই দুই ইতিহাসের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কাব্য পৃথিবীতে আর নাই।

সুতরাং উত্তরচারিত সম্বন্ধে মোটের উপর দুই চারিটা কথা না বলিলে নয়। অধিক বলিবার স্থান নাই।

কবির প্রধান গুণ, সৃষ্টিক্ষমতা। যে কবি সৃষ্টিক্ষম নহেন, তাহার রচনায় অন্য অনেক গুণ থাকিলেও বিশেষ প্রশংসা নাই। কালিদাসের ঋতুসংহার, এবং টমসনের তদ্বিষয়ক কাব্যে উৎকৃষ্ট বাহ্য প্রকৃতির বর্ণনা আছে। উভয় গ্রন্থই আদ্যোপান্ত সুমধুর, প্রসাদগুণবিশিষ্ট, এবং স্বভাবানুকারী। তথাপি এই দুই কাব্য প্রধান কাব্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না—কেন না, তদুভয়মধ্যে সৃষ্টিচাতুর্য কিছুই নাই।

সৃষ্টিক্ষমতা মাত্রই প্রশংসনীয় নহে। অনেক ইংরাজি আখ্যায়িকালেখকের রচনামধ্যে নূতন সৃষ্টি অনেক আছে। তথাপি ঐ সকলকে অপকৃষ্ট গ্রন্থমধ্যে গণনা করিতে হয়। কেন না, সেই সকল সৃষ্টি স্বভাবানুকারণী এবং সৌন্দর্য্যবিশিষ্টা নহে। অতএব কবির সৃষ্টি স্বভাবানুকারণী এবং সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট না হইলে, কোন প্রশংসা নাই।

সৌন্দর্য্য এবং স্বভাবানুকারণিতা, এই দুয়ের একটি গুণ থাকিলেই কবির সৃষ্টির কিছু প্রশংসা হইল বটে, কিন্তু উভয় গুণ না থাকিলে কবিকে প্রধান পদে অভিষিক্ত করা যায় না। আরব্য উপন্যাস বলিয়া যে বিখ্যাত আরব্য গ্রন্থের প্রচার হইয়াছে, তল্লেকের সৃষ্টির মনো-হারিষ আছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতে স্বভাবানুকারণিতা না থাকায় “আলেফ লয়লা” পৃথিবীর অতুৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থমধ্যে গণ্য নহে।

কেবল স্বভাবানুকারণী সৃষ্টিরও বিশেষ প্রশংসা নাই। যেমন জগতে দেখিয়া থাকি, কবির রচনার মধ্যে তাহারই অবিকল প্রতিকৃতি দেখিলে কবির চিত্রনৈপুণ্যের প্রশংসা করিতে হয়, কিন্তু তাহাতে চিত্রনৈপুণ্যেরই প্রশংসা, সৃষ্টিচাতুর্য্যের প্রশংসা কি? আর তাহাতে কি উপকার হইল? যাহা বাহিরে দেখিতেছি, তাহাই গ্রন্থে দেখিলাম; তাহাতে আমার লাভ হইল কি? যথার্থ প্রতিকৃতি দেখিয়া আমোদ আছে বটে—কেবল স্বভাব-সঙ্গত গুণবিশিষ্টা সৃষ্টিতে সেই আমোদ মাত্র জন্মিয়া থাকে। কিন্তু আমোদ ভিন্ন অন্য লাভ যে কাব্যে নাই, সে কাব্য সামান্য বলিয়া গণিতে হয়।

অনেকে এই কথা বিস্ময়কর বলিয়া বোধ করিবেন। কি এ দেশে, কি সুসভ্য ইউরোপীয় জাতিমধ্যে, অনেক পাঠকেরই এইরূপ সংস্কার যে, ক্ষণিক চিত্তরঞ্জন ভিন্ন কাব্যের অন্য উদ্দেশ্য নাই। বস্তুতঃ অধিকাংশ কাব্যে (বিশেষতঃ গদ্য কাব্যে বা আধুনিক নবেলে) এই চিত্তরঞ্জন প্রবৃত্তিই লক্ষিত হয়—তাহাতে চিত্তরঞ্জন ভিন্ন গ্রন্থকারের অন্য উদ্দেশ্য থাকে না; এবং তাহাতে চিত্তরঞ্জনোপযোগিতা ভিন্ন আর কিছু থাকেও না। কিন্তু সে সকলকে উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া গণা যাইতে পারে না।

যদি চিত্তরঞ্জনই কাব্যের উদ্দেশ্য হইল, তবে বেন্থামের তর্ক দোষ কি?* কাব্যেও চিত্তরঞ্জন হয়, শতরঞ্জ খেলায়ও চিত্তরঞ্জন হয়। বরং অনেকেরই ঐবান্হো অপেক্ষা একবার্জি শতরঞ্জ খেলায় অধিক আমোদ হয়। তবে তাহাদের পক্ষে কাব্য হইতে শতরঞ্জ উৎকৃষ্ট বস্তু? এবং স্কট্ কালিদাসাদি অপেক্ষা একজন পাকা খেলোয়াড় বড় লোক? অনেকে বলিবেন যে, কাব্যপ্রদত্ত আনন্দ বিশুদ্ধ আনন্দ—সেই জন্য কাব্যের ও কবির প্রাধান্য। শতরঞ্জের আমোদ অবিশুদ্ধ কিসে?

এরূপ তর্ক যদি অযথার্থ না হয়, তবে চিত্তরঞ্জন ভিন্ন কাব্যের মূখ্য উদ্দেশ্য আর কিছু অবশ্য আছেই আছে। সেটি কি?

অনেকে উত্তর দিবেন, “নীতিশিক্ষা।” যদি তাহা সত্য হয়, তবে “হিতোপদেশ” রঘুবংশ

* বেন্থাম বলেন, আমোদ সমান হইলে কাব্যের এবং ‘পদ্বিপন’ খেলার একই দর।

হইতে উৎকৃষ্ট কাব্য। কেন না, বোধ হয়, হিতোপদেশে রঘুবংশ হইতে নীতিবাহুল্য আছে। সেই হিসাবে কথামালা হইতে শকুন্তলা কাব্যংশে অপকৃষ্ট।

কেহই এ সকল কথা স্বীকার করিবেন না। যদি তাহা না করিলেন, তবে কাব্যের মূখ্য উদ্দেশ্য কি? কি জন্য শতরঞ্জ খেলা ফেলিয়া শকুন্তলা পড়িব?

কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে—কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গোণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষ সাধন—চিত্তশুদ্ধি জনন। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা—কিন্তু নীতিব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। কথাছলেও নীতিশিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন। এই সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি কাব্যের মূখ্য উদ্দেশ্য। প্রথমোক্তটি গোণ উদ্দেশ্য, শেষোক্তটি মূখ্য উদ্দেশ্য।

কথাটা পরিষ্কার হইল না। যদিও উত্তরচারিত সমালোচন পক্ষে এ কথা আর অধিক পরিষ্কার করিবার প্রয়োজন নাই, তথাপি প্রস্তাবের গৌরবানুরোধে আমরা তাহাতে প্রবৃত্ত হইলাম।

চোর চুরি করে। রাজা তাহাকে বলিলেন, “তুমি চুরি করিও না; আমি তাহা হইলে তোমাকে অবরুদ্ধ করিব।” চোর ভয়ে প্রকাশ্য চুরি হইতে নিবৃত্ত হইল, কিন্তু তাহার চিত্তশুদ্ধি জন্মিল না। সে যখনই বৃষ্টিবে, চুরি করিলে রাজা জানিতে পারিবেন না, তখনই চুরি করিবে।

তাহাকে ধর্মোপদেশক বলিলেন, “তুমি চুরি করিও না—চুরি ঈশ্বরাজ্যবিরুদ্ধ।” চোর বলিল, “তাহা হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর যখন আমার আহারের অপ্রতুল করিয়াছেন, তখন আমি চুরি করিয়াই খাইব।” ধর্মোপদেশক বলিলেন, “তুমি চুরি করিলে নরকে যাইবে।” চোর বলিল, “তদ্বিষয়ে প্রমাণাভাব।”

নীতিবেত্তা কহিতেছেন, “তুমি চুরি করিও না; কেন না, চুরিতে সকল লোকের অনিষ্ট, যাহাতে সকল লোকের অনিষ্ট, তাহা কাহারও কর্তব্য নহে।” চোর বলিবে, “যদি সকল লোক আমার জন্য ভাবিত, আমি তাহা হইলে সকলের জন্য ভাবিতে পারিতাম। লোকে আমায় খেতে দিক্, আমি চুরি করিব না। কিন্তু যেখানে লোকে আমায় কিছু দেয় না, সেখানে তাহাদের অনিষ্ট হয় হউক, আমি চুরি করিব।”

কবি চোরকে কিছু বলিলেন না, চুরি করিতে নিষেধ করিলেন না। কিন্তু তিনি এক সর্বজনমনোহর পবিত্র চরিত্র সৃজন করিলেন। সর্বজনমনোহর, তাহাতে চোরেরও মন মুগ্ধ হইবে। মনুষ্যের স্বভাব, যে যাহাতে মুগ্ধ হয়, পুনঃ পুনঃ চিত্ত প্রীত হইয়া তদালোচনা করে। তাহাতে আকাঙ্ক্ষা জন্মে—কেন না, লাভাকাঙ্ক্ষার নামই অনুরাগ। এইরূপে পবিত্রতার প্রতি চোরের অনুরাগ জন্মে। সুতরাং চুরি প্রভৃতি অপবিত্র কার্যে সে বীরাগ হয়।

“আত্মপরায়ণতা মন্দ—তুমি আত্মপরায়ণ হইও না।” এই নৈতিক উক্তি রামায়ণ নহে। কথাছলে এই নীতি প্রতিপন্ন করিবার জন্য রামায়ণের প্রণয়ন হয় নাই। কিন্তু রামায়ণ হইতে ভারতবর্ষের আত্মপরায়ণতা দোষ যতদূর পরিহার হইয়াছে, ততদূর, কোন নীতিবেত্তা, ধর্মবেত্তা, সমাজকর্তা বা রাজা বা রাজকর্মচারিকর্তৃক হয় নাই। সুবিবেচক পাঠকের এতক্ষণ বোধ হইয়া থাকিবেক যে, উদ্দেশ্য এবং সফলতা উভয় বিবেচনা করিলে, রাজা, রাজনীতিবেত্তা, ব্যবস্থাপক, সমাজতত্ত্ববেত্তা, ধর্মোপদেশক, নীতিবেত্তা, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক সর্বাপেক্ষাই কবির শ্রেষ্ঠত্ব। কবিত্ব পক্ষে যেরূপ মানসিক ক্ষমতা আবশ্যিক, তাহা বিবেচনা করিলেও কবির সেইরূপ প্রাধান্য। কবিরা জগতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা, এবং উপকারকর্তা, এবং সর্বাপেক্ষা অধিক মানসিক শক্তিসম্পন্ন।

কি প্রকারে কাব্যকারেরা এই মহৎ কার্য সিদ্ধ করেন? যাহা সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করিবে, তাহার সৃষ্টির দ্বারা। সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করে, সে কি? সৌন্দর্য; অতএব সৌন্দর্য সৃষ্টিই কাব্যের মূখ্য উদ্দেশ্য। সৌন্দর্য অর্থে কেবল বাহ্য প্রকৃতির বা শারীরিক সৌন্দর্য নহে। সকল প্রকারের সৌন্দর্য বৃষ্টিতে হইবেক। যাহা স্বভাবানুকারী নহে, তাহাতে কুসংস্কারাবিষ্ট লোক ভিন্ন কাহারও মন মুগ্ধ হয় না। এ জন্য স্বভাবানুকারিতা সৌন্দর্যের একটি গুণ মাত্র—স্বভাবানুকারিতা ছাড়া সৌন্দর্য জন্মে না। তবে যে আমরা স্বভাবানুকারিতা

বিশ্বকম রচনাবলী

এবং সৌন্দর্য্য দৃষ্টি পৃথক্ গুণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি, তাহার কারণ, সৌন্দর্য্যের অনেক অর্থ প্রচলিত আছে।

আর একটি কথা বঝাইলেই হয়। এই জগৎ ত সৌন্দর্য্যময়—তাহার প্রতিকৃতি মাত্রই সৌন্দর্য্যময় হইবে। তবে কেন আমরা উপরে বলিয়াছি যে, যাহা প্রকৃতির প্রতিকৃতি মাত্র, সে সৃষ্টিতে কবির তাদৃশ গৌরব নাই? তাহার কারণ, সে কেবল প্রতিকৃতি—অনুলিপি মাত্র—তাহাকে “সৃষ্টি” বলা যায় না। যাহা সতের প্রতিকৃতি মাত্র নহে—তাহাই সৃষ্টি। যাহা স্বভাবানুকারী, অথচ স্বভাবাতিরিক্ত, তাহাই কবির প্রশংসনীয় সৃষ্টি। তাহাতেই চিত্ত বিশেষ-রূপে আকৃষ্ট হয়। যাহা প্রকৃত, তাহাতে তাদৃশ চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। কেন না, তাহা অসম্পূর্ণ, দোষসংস্পৃষ্ট, পুরাতন, এবং অনেক সময়ে অস্পষ্ট। কবির সৃষ্টি তাহার স্বৈচ্ছাধীন—সুতরাং সম্পূর্ণ, দোষশূন্য, নবীন, এবং স্পষ্ট হইতে পারে।

এইরূপ যে সৌন্দর্য্যসৃষ্টি কবির সর্বপ্রধান গুণ—সেই অভিনব, স্বভাবানুকারী, স্বভাবাতিরিক্ত সৌন্দর্য্যসৃষ্টি-গুণে, ভারতবর্ষীয় কবিদিগের মধ্যে বাঙ্গালীক এবং মহাভারত-কার প্রধান। এক এক কাব্যে ঐদৃশ সৃষ্টিবৈচিত্র্য প্রায় জগতে দুর্লভ।

এ সম্বন্ধে ভবভূতির স্থান কোথায়? তাহা তাহার তিনখানি নাটক পর্যালোচিত না করিলে অবধারিত করা যায় না। তাহা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। কেবল উত্তরচারিত দেখিয়া তাহাকে অতি উচ্চাসন দেওয়া যায় না। উত্তরচারিতে ভবভূতি অনেক দূর পর্য্যন্ত খাল্মীকির অনুবর্তী হইতে বাধ্য হইয়াছেন, সুতরাং তাহার সৃষ্টিমধ্যে নবীনত্বের অভাব, এবং সৃষ্টিচাতুর্য্যের প্রচার করিবার পথও পান নাই। চরিত্র সৃজন সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে, রাম ও সীতা ভিন্ন কোন নায়ক নায়িকার প্রাধান্য নাই। সীতা, রামায়ণের সীতার প্রতিকৃতি মাত্র। রামের চরিত্র, রামায়ণের রামের চরিত্রের উৎকৃষ্ট প্রতিকৃতিও নহে—ভবভূতির হস্তে সে মহচ্চিত্র যে বিকৃত হইয়া গিয়াছে, তাহা পূর্বেই প্রতিপন্ন করা গিয়াছে। সীতাও তাহার কাছে, অপেক্ষাকৃত পরসাময়িক স্ত্রীলোকের চরিত্র কতক দূর পাইয়াছেন।

তাই বলিয়া এমত বলা যায় না যে, উত্তরচারিতে চরিত্রসৃষ্টি-চাতুর্য্য কিছুই লক্ষিত হয় না। বাসন্তী ভবভূতির অভিনব সৃষ্টি বটে, এবং এ চরিত্র অত্যন্ত মনোহর। আমরা বাসন্তীর চরিত্রের সবিশেষ পরিচয় দিয়াছি, সুতরাং তৎসম্বন্ধে আর বিস্তারের আবশ্যক নাই। এই পরদুঃখকাতরহৃদয়া, স্নেহময়ী, বনচারিণী যে অবাধি প্রথম দেখা দিলেন, সেই অবাধিই তাহার প্রতি পাঠকের প্রীতি সঞ্চার হইতে থাকিল।

তদ্বিন্ন চন্দ্রকেতু ও লবের চিত্রও প্রশংসনীয়। প্রাচীন কবিদিগের ন্যায় ভবভূতিও জড় পদার্থকে রূপবান্ করণে বিলক্ষণ সুচতুর। তমসা, মুরলা, গঙ্গা, এবং পৃথিবী এই নাটকে মানবীরূপিণী। সেই রূপগুলিন যে মনোহর হইয়াছে, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি।

কবির সৃষ্টি—চরিত্র, রূপ, স্থান, অবস্থা, কার্যাদিতে পরিণত হয়। ইহার মধ্যে কোন একটির সৃষ্টি কবির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে। সকলের সংযোগে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টিই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য। চরিত্র, রূপ, স্থান, অবস্থা, কার্য, এ সকলের সমবায়ে যাহা দাঁড়াইল, তাহা যদি সুন্দর হইল, তবেই কবি সিদ্ধকাম হইলেন।

ভবভূতির চরিত্রসৃজনের ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছি। অন্যান্য বিষয়ে তাহার সৃজনকৌশলের পরিচয় ছায়া নামে উত্তরচারিতের তৃতীয়াঙ্ক। আমাদের পরিশ্রম যদি নিষ্ফল না হইয়া থাকে, তবে পাঠক সেই ছায়ার মোহিনী শক্তি অনুভূত করিয়াছেন। ঐদৃশ রমণীয়া সৃষ্টি অতি দুর্লভ।

সৃষ্টি-কৌশল কবির প্রধান গুণ। কবির আর একটি বিশেষ গুণ রসোদ্ভাবন। রসোদ্ভাবন কাহাকে বলে, আমরা বঝাইতে বাসনা করি, কিন্তু রস শব্দটি ব্যবহার করিয়াই আমরা সে পথে কাঁটা দিয়াছি। এ দেশীয় প্রাচীন আলঙ্কারিকদিগের ব্যবহৃত শব্দগুলি একালে পরিহার্য্য। ব্যবহার করিলেই বিপদ ঘটে। আমরা সাধ্যানুসারে তাহা বর্জন করিয়াছি, কিন্তু এই রস-শব্দটি ব্যবহার করিয়া বিপদ ঘটিল। নয়টি বৈ রস নয়, কিন্তু মনুষ্যচিত্তবৃত্তি অসংখ্য। রতি, শোক, ক্রোধ, স্থায়ী ভাব; কিন্তু হর্ষ, অমর্ষ প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব। স্নেহ, প্রণয়, দয়া, ইহাদের কোথাও স্থান নাই;—না স্থায়ী, না ব্যভিচারী—কিন্তু একটি কাব্যানুপযোগী কদর্য্য মানসিক বৃত্তি আদিরসের আকারস্বরূপ স্থায়ী ভাবে প্রথমে স্থান পাইয়াছে। স্নেহ, প্রণয়, দয়াদিপরি-

জ্ঞাপক রস নাই; কিন্তু শান্তি একটি রস। সুতরাং এবম্বিধ পারিভাষিক শব্দ লইয়া সমালোচনার কার্য সম্পন্ন হয় না। আমরা যাহা বলিতে চাই, তাহা অন্য কথায় বুঝাইতেছি—আলঙ্কারিক-দিগকে প্রণাম করি।

মনুষ্যের কার্যের মূল তাহাদিগের চিত্তবৃত্তি। সেই সকল চিত্তবৃত্তি অবস্থানসারে অত্যন্ত বেগবতী হয়। সেই বেগের সমুচিত বর্ণনাদ্বারা সৌন্দর্যের সৃজন, কাব্যের উদ্দেশ্য। অস্মন্দেশীয় আলঙ্কারিকেরা সেই বেগবতী মনোবৃত্তিগণকে “স্থায়ী ভাব” নাম দিয়া এ শব্দের এরূপ পরিভাষা করিয়াছেন যে, প্রকৃত কথা বুঝা ভার। ইংরাজি আলঙ্কারিকেরা তাহাকে (Passions) বলেন। আমরা তাহার কাব্যগত প্রতিকৃতিকে রসোদ্ভাবন বলিলাম।

রসোদ্ভাবনে ভবভূতির ক্ষমতা অপারিসীম। যখন সে রস উদ্ভাবনের ইচ্ছা করিয়াছেন, তখনই তাহার চরম দেখাইয়াছেন। তাহার লেখনী-মুখে স্নেহ উছলিতে থাকে—শোক দহিতে থাকে, দস্ত ফুলিতে থাকে। ভবভূতির মোহিনী শক্তিপ্রভাবে আমরা দেখিতে পাই যে, রামের শরীর ভাঙ্গিতেছে; মর্ম ছিঁড়িতেছে; মস্তক ঘুরিতেছে; চেতনা লুপ্ত হইতেছে—দেখিতে পাই, সীতা কখন বিস্ময়স্থিমিতা; কখন আনন্দোখিতা; কখন প্রেমাভিভূতা; কখন অভিমানকুণ্ঠিতা; কখন আত্মাবমাননাসঙ্কুচিতা; কখন অনুতাপবিবশা; কখন মহাশোকে ব্যাকুলা। কবি যখন যাহা দেখাইয়াছেন, একেবারে নায়ক নায়িকার হৃদয় যেন বাহির করিয়া দেখাইয়াছেন। যখন সীতা বলিলেন, “অন্ধহে—জলভরিদমেহখণ্ডগস্তীরমংসলো কুদোগ্ন এসো ভারদীর্ঘগ্ঘোসো! ভরিজ্জমাণকর্ণবিবরণং মং বি মন্দভাইর্ঘং ঝন্তি উস্মাবেদি!” তখন বোধ হইল, জগৎ সংসার সীতার প্রেমে পরিপূর্ণ হইল। ফলে রসোদ্ভাবনী শক্তিতে ভবভূতি পৃথিবীর প্রধান কবিদিগের সহিত তুলনীয়। একটি মাত্র কথা বলিয়া মানবমনোবৃত্তির সমুদ্রবৎ সীমাশূন্যতা চিত্রিত করা, মহাকাবির লক্ষণ। ভবভূতির রচনা সেই লক্ষণাক্রান্ত। পরিতাপের বিষয় এই যে, সে শক্তি থাকিতেও ভবভূতি রামবিলাপের এত বাহুল্য করিয়াছেন। ইহাতে তাহার যশের লাঘব হইয়াছে।

আমাদিগের ইচ্ছা ছিল যে, এই রামবিলাপের সহিত, আর কয়খানি প্রসিদ্ধ নাটকের কয়েকটি স্থান তুলিত করিয়া তারতম্য দেখাই। কিন্তু স্থানাভাবে পারিলাম না। সহৃদয় পাঠক, শকুন্তলার জন্য দুঃস্বপ্নের বিলাপ, দেস্দিমোনার জন্য ওথেলোর বিলাপ, এবং ইউরিপিদিসের নাটকে আলকেষ্টিসের জন্য আদমিতসের বিলাপ, এই রামবিলাপের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিবেন।

দাহ্য প্রকৃতির শোভার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ভবভূতির আর একটি গুণ। সংসারে যেখানে যাহা সুদৃশ্য, সুগন্ধ বা সুখকর, ভবভূতি অনবরত তাহার সন্ধানে ফিরেন। মালাকার যেমন পুষ্পোদ্যান হইতে সুন্দর সুন্দর কুসুমগুলি তুলিয়া সভামণ্ডপ রঞ্জিত করে, ভবভূতি সেইরূপ সুন্দর বস্তু অবকীর্ণ করিয়া এই নাটকখানি শোভিত করিয়াছেন। যেখানে সুদৃশ্য বৃক্ষ, প্রফুল্ল কুসুম, সুশীতল সুবাসিত বারি,—যেখানে নীল মেঘ, উত্তুঙ্গ পর্বত, মৃদুনির্নাদিনী নিব্বরিণী, শ্যামল কানন, তরঙ্গসঙ্কুলা নদী—যেখানে সুন্দর বিহঙ্গ, ক্রীড়াশীল করিশাবক, সরলস্বভাব কুরঙ্গ—সেইখানে কবি দাঁড়াইয়া একবার তাহার সৌন্দর্য দেখাইয়াছেন। কবিদিগের মধ্যে এই গুণটি সেক্ষপীয়র ও কালিদাসের বিশেষ লক্ষণীয়। ভবভূতিরও সেই গুণ বিশেষ প্রকাশমান।

ভবভূতির ভাষা অতিচমৎকারিণী। তাহার রচনা সমাসবহুলতা ও দুষ্প্রাধান্যাদোষে কলঙ্কিতা বলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় কতৃক নিন্দিত হইয়াছে। সে নিন্দা সমূলক হইলেও সাধারণতঃ যে ভবভূতির ব্যবহৃত সংস্কৃত ও প্রাকৃত অতিমনোহর, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। উইলসন বলিয়াছেন যে, কালিদাস ও ভবভূতির ভাষার ন্যায় মহতী ভাষা কোন দেশের লেখকেই দৃষ্ট হয় না।

উত্তরচরিতের যে সকল দোষ, তাহা আমরা যথাস্থানে বিবৃত করিয়াছি—পুনরুল্লেখের আবশ্যক নাই। আমরা এই নাটকের সমালোচনা সমাপন করিলাম। অন্যান্য দোষের মধ্যে দৈর্ঘ্য দোষে এই সমালোচন বিশেষ দূষিত হইয়াছে। এজন্য আমরা কুণ্ঠিত নহি। যে দেশে তিন ছত্রে সচরাচর গ্রন্থসমালোচনা সমাপ্ত করা প্রথা, সে দেশে একখানি প্রাচীন গ্রন্থের সমালোচন দীর্ঘ হইলে দোষটি মার্জনাভীত হইবে না। যদি ইহার দ্বারা একজন পাঠকেরও কাব্যানুরাগ বর্দ্ধিত হয় বা তাহার কাব্যরসগ্রাহিণী শক্তির কিঞ্চিৎমাত্র সহায়তা হয়, তাহা হইলেই এই দীর্ঘ প্রবন্ধ আমরা সফল বিবেচনা করিব।

গীতিকাব্য*

কাব্য কাহাকে বলে, তাহা অনেকে বুঝাইবার জন্য যত্ন করিয়াছেন, কিন্তু কাহারও যত্ন সফল হইয়াছে কি না সন্দেহ। ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, দুই ব্যক্তি কখন এক প্রকার অর্থ করেন নাই। কিন্তু কাব্যের যথার্থ লক্ষণ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও কাব্য একই পদার্থ সন্দেহ নাই। সেই পদার্থ কি, তাহা কেহ বুঝাইতে পারুন বা না পারুন, কাব্যপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেই এক প্রকার অনুভব করিতে পারেন।

কাব্যের লক্ষণ যাহাই হউক না কেন, আমরাদিগের বিবেচনায় অনেকগুলিন গ্রন্থ, যাহার প্রতি সচরাচর কাব্য নাম প্রযুক্ত হয় না, তাহাও কাব্য। মহাভারত, রামায়ণ ইতিহাস বলিয়া খ্যাত হইলেও তাহা কাব্য; শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ বলিয়া খ্যাত হইলেও তাহা অংশবিশেষে কাব্য; স্কটের উপন্যাসগুলিকে আমরা উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া স্বীকার করি; নাটককে আমরা কাব্যমধ্যে গণ্য করি, তাহা বলা বাহুল্য।

ভারতবর্ষীয় এবং পাশ্চাত্য আলঙ্কারিকেরা কাব্যকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তাহার মধ্যে অনেকগুলিন বিভাগ অনর্থক বলিয়া বোধ হয়। তাহাদিগের কথিত তিনটি শ্রেণী গ্রহণ করিলেই যথেষ্ট হয়, যথা, ১ম দৃশ্যকাব্য, অর্থাৎ নাটকাদি; ২য়, আখ্যানকাব্য অথবা মহাকাব্য; রঘুবংশের ন্যায় বংশাবলীর উপাখ্যান, রামায়ণের ন্যায় ব্যক্তিবিশেষের চরিত, শিশু-পালবধের ন্যায় ঘটনাবিশেষের বিবরণ, সকলই ইহার অন্তর্গত; বাসবদত্তা, কাদম্বরী প্রভৃতি গদ্য কাব্য ইহার অন্তর্গত, এবং আধুনিক উপন্যাস সকল এই শ্রেণীভুক্ত। ৩য়, খণ্ডকাব্য। যে কোন কাব্য প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত নহে, তাহাকেই আমরা খণ্ডকাব্য বলিলাম।

দেখা যাইতেছে যে, এই ত্রিবিধ কাব্যের রূপগত বিলক্ষণ বৈষম্য আছে। কিন্তু রূপগত বৈষম্য প্রকৃত বৈষম্য নহে। দৃশ্যকাব্য সচরাচর কথোপকথনেই রচিত হয়, এবং রঙ্গঙ্গনে অভিনীত হইতে পারে, কিন্তু যাহাই কথোপকথনে গ্রন্থিত, এবং অভিনয়োপযোগী, তাহাই যে নাটক বা তচ্ছিন্নীস্থ, এমত নহে। এদেশের লোকের সাধারণতঃ উপরোক্ত ভ্রান্তিমূলক সংস্কার আছে। এই জন্য নিত্য দেখা যায় যে, কথোপকথনে গ্রন্থিত অসংখ্য পুস্তক নাটক বলিয়া প্রচারিত, পঠিত, এবং অভিনীত হইতেছে। বাস্তবিক তাহার মধ্যে অনেকগুলিই নাটক নহে। পাশ্চাত্য ভাষায় অনেকগুলিন উৎকৃষ্ট কাব্য আছে, যাহা নাটকের ন্যায় কথোপকথনে গ্রন্থিত, কিন্তু বস্তুতঃ নাটক নহে। “Comus,” “Manfred,” “Faust” ইহার উদাহরণ। অনেকে শকুন্তলা ও উত্তররামচরিতকেও নাটক বলিয়া স্বীকার করেন না। তাহারা বলেন, ইংরাজি ও গ্রীক ভাষা ভিন্ন কোন ভাষায় প্রকৃত নাটক নাই। পক্ষান্তরে গেটে বলিয়াছেন যে, প্রকৃত নাটকের পক্ষে, কথোপকথনে গ্রন্থন বা অভিনয়ের উপযোগিতা নিতান্ত আবশ্যিক নহে। আমরাদিগের বিবেচনায় “Bride of Lammermoor”কে নাটক বলিলে অন্যায় হয় না। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, আখ্যানকাব্যও নাটকাকারে প্রণীত হইতে পারে; অথবা গীতপরিম্পরায় সন্নিবেশিত হইয়া গীতিকাব্যের রূপ ধারণ করিতে পারে। বাঙ্গালা ভাষায় শেষোক্ত বিষয়ের উদাহরণের অভাব নাই। পক্ষান্তরে দেখা গিয়াছে, অনেক খণ্ডকাব্য মহাকাব্যের আকারে রচিত হইয়াছে। যদি কোন একটি সামান্য উপাখ্যানের সূত্রে গ্রন্থিত কাব্যমালাকে আখ্যানকাব্য বা মহাকাব্য নাম দেওয়া বিধেয় হয়, তবে “Excursion” এবং “Childe Harold”কে ঐ নাম দিতে হয়। কিন্তু আমরাদিগের বিবেচনায় ঐ দুই কাব্য খণ্ডকাব্যের সংগ্রহ মাত্র।

খণ্ডকাব্য মধ্যে আমরা অনেক প্রকার কাব্যের স্থান করিয়াছি। তন্মধ্যে এক প্রকার কাব্য প্রধান্য লাভ করিয়া ইউরোপে গীতিকাব্য (Lyric) নামে খ্যাত হইয়াছে। অদ্য সেই শ্রেণীর কাব্যের কথা আমরাদিগের প্রয়োজন।

ইউরোপে কোন বস্তু একটি পৃথক্ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া, আমরাদিগের দেশেও যে একটি পৃথক্ নাম দিতে হইবে, এমত নহে। যেখানে বস্তুগত কোন পার্থক্য নাই, সেখানে নামের পার্থক্য অনর্থক এবং অনিষ্টজনক। কিন্তু যেখানে বস্তুগুলি পৃথক্, সেখানে নামও

* অবকাশরঞ্জিনী। কলিকাতা।

বিবিধ প্রবন্ধ—গীতিকাব্য

পৃথক্ হওয়া আবশ্যিক। যদি এমন কোন বস্তু থাকে যে, তাহার জন্য গীতিকাব্য নামটি গ্রহণ করা আবশ্যিক, তবে অবশ্য ইউরোপের নিকট আমাদিগকে ঋণী হইতে হইবে।

গীত মনুষ্যের এক প্রকার স্বভাবজাত। মনের ভাব কেবল কথায় ব্যক্ত হইতে পারে, কিন্তু কণ্ঠভঙ্গীতে তাহা স্পষ্টীকৃত হয়। “আঃ” এই শব্দ কণ্ঠভঙ্গীর গুণে দুঃখবোধক হইতে পারে, বিরক্তিবাচক হইতে পারে, এবং ব্যঙ্গোক্তিও হইতে পারে। “তোমাকে না দেখিয়া আমি মরিলাম!” ইহা শূদ্ধ বলিলে, দুঃখ বুঝাইতে পারে, কিন্তু উপযুক্ত স্বরভঙ্গীর সহিত বলিলে দুঃখ শতগুণ অধিক বুঝাইবে। এই স্বরবৈচিত্র্যের পরিণামই সঙ্গীত। সুতরাং মনের বেগ প্রকাশের জন্য আগ্রহাতিশয্যপ্রযুক্ত, মনুষ্য সঙ্গীতাপ্রিয়, এবং তৎসাধনে স্বভাবতঃ যত্নশীল।

কিন্তু অর্থযুক্ত বাক্য ভিন্ন চিত্তভাব ব্যক্ত হয় না, অতএব সঙ্গীতের সঙ্গে বাক্যের সংযোগ আবশ্যিক। সেই সংযোগোৎপন্ন পদকে গীত বলা যায়।

গীতের জন্য বাক্যবিন্যাস করিলে দেখা যায় যে, কোন নিয়মাধীন বাক্যবিন্যাস করিলেই গীতের পারিপাট্য হয়। সেই সকল নিয়মগুলির পরিজ্ঞানেই ছন্দের সৃষ্টি।

গীতের পারিপাট্যজন্য আবশ্যিক দুইটি—স্বরচাতুর্য্য এবং শব্দচাতুর্য্য। এই দুইটি পৃথক্ পৃথক্ দুইটি ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। দুইটি ক্ষমতাই একজনের সচরাচর ঘটে না। যিনি সুকবি, তিনিই সুগায়ক, ইহা অতি বিরল।

কাজে কাজেই, একজন গীত রচনা করেন, আর একজন গান করেন। এইরূপে গীত হইতে গীতিকাব্যের পার্থক্য জন্মে। গীত হওয়াই গীতিকাব্যের আদিম উদ্দেশ্য; কিন্তু যখন দেখা গেল যে, গীত না হইলেও কেবল ছন্দোবিশিষ্ট রচনায়ই আনন্দদায়ক, এবং সম্পূর্ণ চিত্তভাব-ব্যঞ্জক, তখন গীতোদ্দেশ্য দূরে রহিল; অগেয়ে গীতিকাব্য রচিত হইতে লাগিল।

অতএব গীতের যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য, তাহাই গীতিকাব্য। বস্তুর ভাবোচ্ছ্বাসের পরিষ্ফুটতামাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের রচনা, ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরী, মাইকেল মধুসূদন দত্তের ব্রজাঙ্গনা কাব্য, হেমবাবুর কবিতাবলী, ইহাই বাঙ্গালা ভাষায় উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য*। অবকাশরঞ্জিনী আর একখানি উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য।

যখন হৃদয়, কোন বিশেষ ভাবে আচ্ছন্ন হয়,—স্নেহ, কি শোক, কি ভয়, কি যাহাই হউক, তাহার সমুদায়াংশ কখন ব্যক্ত হয় না। কতকটা ব্যক্ত হয়, কতকটা ব্যক্ত হয় না। যাহা ব্যক্ত হয়, তাহা ক্রিয়ার দ্বারা বা কথা দ্বারা। সেই ক্রিয়া এবং কথা নাটককারের সামগ্রী। যেটুকু অব্যক্ত থাকে, সেইটুকু গীতিকাব্যপ্রণেতার সামগ্রী। যেটুকু সচরাচর অদৃষ্ট, অদর্শনীয়, এবং অন্যের অননুমোদিত অথচ ভাবাপন্ন ব্যক্তির রুদ্ধ হৃদয়মধ্যে উচ্ছ্বাসিত, তাহা তাঁহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে। মহাকাব্যের বিশেষ গুণ এই যে, কবির উভয়বিধ অধিকার থাকে; ব্যক্তব্য এবং অব্যক্তব্য, উভয়ই তাঁহার আয়ত্ত। মহাকাব্য, নাটক এবং গীতিকাব্যে এই একটি প্রধান প্রভেদ বলিয়া বোধ হয়। অনেক নাটককর্তা তাহা বুঝেন না, সুতরাং তাঁহাদিগের নায়ক নায়িকার চরিত্র অপ্রাকৃত এবং বাগাডম্বরবিশিষ্ট হইয়া উঠে। সত্য বটে যে, গীতিকাব্যলেখককেও বাক্যের দ্বারাই রসোদ্ভাবন করিতে হইবে; নাটককারেরও সেই বাক্য সহায়। কিন্তু যে বাক্য ব্যক্তব্য, নাটককার কেবল তাহাই বলাইতে পারেন। যাহা অব্যক্তব্য, তাহাতে গীতিকাব্যকারের অধিকার।

উদাহরণ ভিন্ন ইহা অনেকে বুঝিতে পারিবেন না। কিন্তু এ বিষয়ের একটি উত্তম উদাহরণ উত্তরচরিত সমালোচনায় উদ্ধৃত হইয়াছে। সীতাবিসর্জনকালে ও তৎপরে রামের ব্যবহারে যে তারতম্য ভবভূতির নাটকে এবং বাল্মীকির রামায়ণে দেখা যায়, তাহার আলোচনা করিলে এই কথা হৃদয়ঙ্গম হইবে। রামের চিত্তে যখন যে ভাব উদয় হইতেছে, ভবভূতি তৎক্ষণাৎ তাহা লেখনীমুখে ধৃত করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; ব্যক্তব্য এবং অব্যক্তব্য উভয়ই তিনি স্বকৃত নাটকমধ্যগত করিয়াছেন। ইহাতে নাটকোচিত কার্য্য না করিয়া গীতিকাব্যকারের অধিকারে প্রবেশ করিয়াছেন। বাল্মীকি তাহা না করিয়া কেবল রামের কার্য্যগুলিই বর্ণিত করিয়াছেন, এবং তত্তৎ কার্য্য সম্পাদনার্থ যতখানি ভাবব্যক্তি আবশ্যিক, তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। ভবভূতি-

* যখন এই প্রবন্ধ লিখিত হয়, তখন রবীন্দ্রবাবুর কাব্য সকল প্রকাশিত হয় নাই।

বাংলা রচনাবলী

কৃত ঐ রামবিলাপের সঙ্গে ডেসিডিমোনা বধের পর ওথেলোর বিলাপের বিশেষ করিয়া তুলনা করিলেও এ কথা বৃদ্ধা যাইবে। সেক্ষপীয়র এমত কোন কথাই তৎকালে ওথেলোর মূখে ব্যক্ত করেন নাই, যাহা তৎকালীন কাব্যার্থ বা অন্যের কথার উত্তরে ব্যক্ত করা প্রয়োজন হইতেছে না। ব্যক্তব্যের অতিরেকে তিনি এক রেখাও যান নাই। তিনি ভবভূতির ন্যায় নায়কের হৃদয়ানু-সন্ধান করিয়া, ভিতর হইতে এক একটি ভাব টানিয়া আনিয়া, একে একে গণনা করিয়া, সারি দিয়া সাজান নাই। অথচ কে না বলিবে যে, রামের মূখে যে দুঃখ ভবভূতি ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার সহস্র গুণ দুঃখ সেক্ষপীয়র ওথেলোর মূখে ব্যক্ত করাইয়াছেন।

সহজেই অনুমেয় যে, যাহা ব্যক্তব্য, তাহা পর সম্বন্ধীয় বা কোন কার্যোদ্দেশ্য, যাহা অব্যক্তব্য, তাহা আত্মচিত্ত সম্বন্ধীয়; উক্তি মাত্র তাহার উদ্দেশ্য। এরূপ কথা যে নাটকে একেবারে সন্নিবেশিত হইতে পারে না, এমত নহে, বরং অনেক সময়ে হওয়া আবশ্যিক। কিন্তু ইহা কখন নাটকের উদ্দেশ্য হইতে পারে না, নাটকের যাহা উদ্দেশ্য, তাহার আনুষঙ্গিকতাবশতঃ প্রয়োজন মত কদাচিৎ সন্নিবেশিত হয়।

প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত

কাব্যরসের সামগ্রী মনুষ্যের হৃদয়। যাহা মনুষ্যহৃদয়ের অংশ, অথবা যাহা তাহার সঞ্চালক, তদ্ব্যতীত আর কিছুই কাব্যোপযোগী নহে। কিন্তু কখনও কখনও মহাকাব্যেরা, যাহা অতিমানুষ, তাহারও বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তন্মধ্যে অধিকাংশই মনুষ্যচরিত্রের আনুষঙ্গিক মাত্র। মহাভারত, ইলিয়দ প্রভৃতি প্রাচীন কাব্যসকল, এই প্রকার পার্থিব নায়ক নায়িকার চিত্রানুষঙ্গিক দেবচরিত্র বর্ণনায় পরিপূর্ণ। দেবচরিত্র বর্ণনায় রসহানির বিশেষ কারণ এই যে, যাহা মনুষ্য-চরিত্রানুকারী নহে, তাহার সঙ্গে মনুষ্য লেখক বা মনুষ্য পাঠকের সহৃদয়তা জন্মিতে পারে না। যদি আমরা কোথাও পড়ি যে, কোন মনুষ্য যমুনার এক বহুজলবিশিষ্ট হৃদমধ্যে নিমগ্ন হইয়া অজগর সর্প কর্তৃক জলমধ্যে আক্রান্ত হইয়াছে, তবে আমরাইগের মনে ভয়সঞ্চার হয়; আমরাইগের জানা আছে যে, এমন বিপদাপন্ন মনুষ্যের মৃত্যুরই সম্ভাবনা; অতএব তাহার মৃত্যুর আশঙ্কায় আমরা ভীত ও দুঃখিত হই; কবির অভিপ্রেত রস অবতারিত হয়, তাহার যত্নের সফলতা হয়। কিন্তু যদি আমরা পূর্বে হইতে জানিয়া থাকি যে, নিমগ্ন মনুষ্য বস্তুতঃ মনুষ্য নহে, দেবপ্রকৃত, জল বা সর্পের শক্তির অধীন নহে, ইচ্ছাময় এবং সর্বশক্তিমান, তখন আর আমাদের ভয় বা কুতূহল থাকে না; কেন না, আমরা আগেই জানি যে, এই অজেয়, অবিদ্যমান পুরুষ এখনই কালিয় দমন করিয়া জল হইতে পুনরুত্থান করিবেন।

এমত অবস্থাতেও যে পূর্বেকবিগণ দৈব বা অতিমানুষ চরিত্র সৃষ্ট করিয়া লোকরঞ্জে সক্ষম হইয়াছেন, তাহার একটি বিশেষ কারণ আছে। তাঁহারা দেবচরিত্রকে মনুষ্যচরিত্রানুকৃত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; সুতরাং সে সকলের সঙ্গে পাঠক বা শ্রোতার সহৃদয়তার অভাব হয় না। মনুষ্যগণ যে সকল রাগদ্বৈষাদির বশীভূত; মনুষ্য যে সকল সুখের অভিলাষী, দুঃখের অপ্রিয়; মনুষ্য যে সকল আশায় লুক্ক, সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ, অনুতাপে তপ্ত, এই মনুষ্যপ্রকৃত দেবতারাও তাই। শ্রীকৃষ্ণ, জগদীশ্বরের আংশিক বা সম্পূর্ণ অবতারস্বরূপ কল্পিত হইলেও মনুষ্যের ন্যায় মানবধর্ম্মাবলম্বী। মানবচরিত্রগত এমন একটি উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি নাই যে, তাহা ভাগবতকারকৃত শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে অঙ্কিত হয় নাই। এই মানুষিক চরিত্রের উপর অতিমানুষ বল এবং বুদ্ধির সংযোগে চিত্রের কেবল মনোহারিত্ব বৃদ্ধি হইয়াছে; কেন না, কবি মানুষিক বলবুদ্ধিসৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সৃজন করিয়াছেন। কাব্যে অতিপ্রকৃতির সংস্থানের উদ্দেশ্য এবং উপকার এই এবং তাহার নিয়ম এই যে, যাহা প্রকৃত, তাহা যে সকল নিয়মের অধীন, কবির সৃষ্ট অতি-প্রকৃতও সেই সকল নিয়মের অধীন হওয়া উচিত।

সংস্কৃতে এমন একখানি এবং ইংরাজিতে একখানি মহাকাব্য আছে যে, দৈব এবং অতিপ্রকৃত চরিত্র তাহার আনুষঙ্গিক বিষয় নহে, মূল বিষয়। আমরা কুমারসম্ভব এবং Paradise Lost নামক কাব্যের কথা বলিতেছি। মিল্টনের নায়ক দেবপ্রকৃত ঈশ্বরবিদ্রোহী সয়তান, এবং তাঁহার অনুচরবর্গ। জগদীশ্বরের সহিত তাহাদিগের বিবাদ, জগদীশ্বর এবং তাঁহার অনুচরের সহিত তাহাদিগের যুদ্ধ। মিল্টন কোন পক্ষকেই সম্যক্ প্রকারে মানবপ্রকৃতিবিশিষ্ট করেন নাই।

বিবিধ প্রবন্ধ—বিদ্যাপতি ও জয়দেব

সুতরাং তিনি কাব্যরসের অত্যুৎকৃষ্ট অবতারণায় কৃতকার্য হইয়াও, লোকমনোরঞ্জে তাৎসুকৃতকার্য হইয়েন নাই। Paradise Lost অত্যুৎকৃষ্ট মহাকাব্য হইলেও, প্রায় কেহ তাহা আনুপদ্বর্ষিক পাঠ করেন না। আনুপদ্বর্ষিক পাঠ কষ্টকর হইয়া উঠে। মিল্টনের ন্যায় প্রথম শ্রেণীর কবির রচনা না হইয়া যদি ইহা মধ্যম শ্রেণীর কোন কবির রচনা হইত, তবে বোধ হয়, কেহই পড়িত না। ইহার কারণ, মনুষ্যচরিত্রের অননুকারী দৈবচরিত্রে মনুষ্যের সহৃদয়তা হয় না। এই কাব্যে যেখানে আদম ও ইবের কথা আছে, সেইখানেই অধিকতর সুখদায়ক। কিন্তু ইহারা এ কাব্যের প্রকৃত নায়ক নায়িকা নহে—তাহাদের উল্লেখ আনুষঙ্গিক মাত্র। আদম ও ইব প্রকৃত মনুষ্যপ্রকৃত; তাহারা প্রথম মনুষ্য, পার্থিব সুখ দুঃখের অনধীন, নিষ্পাপ; যে সকল শিক্ষার গুণে মনুষ্য মনুষ্য, সে সকল শিক্ষা পায় নাই। অতএব এই কাব্যে প্রকৃত মনুষ্যচরিত্র বর্ণিত হয় নাই।

কুমারসম্ভবে একটিও মনুষ্য নাই। যিনি প্রধান নায়ক, তিনি স্বয়ং পরমেশ্বর। নায়িকা পরমেশ্বরী। তন্মিত্ত পর্বত, পর্বতমহিষী, ঋষি, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, কাম, রতি ইত্যাদি দেব দেবী। বাস্তবিক এই কাব্যের তাৎপর্য অতি গূঢ়। সংসারে দুই সম্প্রদায়ের লোক সর্বদা পরস্পরের সহিত বিবাদ করে দেখা যায়। এক, ইন্দ্রিয়পরবশ, ঐহিক সুখমাত্রাভিলাষী, পারত্রিক চিন্তাবিরত; দ্বিতীয়, বিষয়বিরত সাংসারিক সুখমাত্রের বিদ্বেষী, ঈশ্বরচিন্তামগ্ন। এক সম্প্রদায় কেবল শারীরিক সুখ সার করেন; আর এক সম্প্রদায় শারীরিক সুখের অনুচিত বিদ্বেষ করেন। বস্তুতঃ উভয় সম্প্রদায়ই ভ্রান্ত। যাঁহারা ঈশ্বরবাদী, ঈশ্বরপ্রদত্ত ইন্দ্রিয় অমঙ্গলকর বা অশ্রদ্ধেয় মনে করা তাঁহাদের অকর্তব্য। শারীরিক ভোগাতিশয্যই দুঃখ; নচেৎ পরিমিত শারীরিক সুখ সংসারের নিয়ম, সংসাররক্ষার কারণ, ঈশ্বরাদিষ্ট, এবং ধর্ম্মের পূর্ণতাজনক। এই শারীরিক এবং পারত্রিকের পরিণয় গীত করাই কুমারসম্ভব কাব্যের উদ্দেশ্য। পার্থিব পর্বতোৎপন্ন উমা শরীররূপিনী, তপস্চারী মহাদেব পারত্রিক শান্তির প্রতিমা। শান্তির প্রাপণাকাঙ্ক্ষায় উমা প্রথমে মদনের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু নিষ্ফল হইলেন। ইন্দ্রিয়সেবার দ্বারা শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পরিশেষে আপন চিত্ত বিশুদ্ধ করিয়া, ইন্দ্রিয়াসক্তি সমলতা চিত্ত হইতে দূর করিয়া, যখন শান্তির প্রতি মনোভিন্বেশ করিলেন, তখনই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেন। সাংসারিক সুখের জন্য আবশ্যিক চিত্তশুদ্ধি; চিত্তশুদ্ধি থাকিলে ঐহিক ও পারত্রিক পরস্পর বিরোধী নহে; পরস্পরে পরস্পরের সহায়।

এইরূপে কবি, মনোবৃত্তি প্রভৃতি লইয়া নায়ক নায়িকা গঠন করিয়া, লোকপ্রীত্যর্থ লৌকিক দেবতাদিগের নামে তাহা পরিচিত করিয়াছেন। কিন্তু দেবচিত্র প্রণয়নে তিনি মিল্টন অপেক্ষা অধিক কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। কবিত্ব ধরিতে গেলে, Paradise Lost হইতে কুমারসম্ভব অনেক উচ্চ। আমরাদিগের বিবেচনায় কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গের কবিত্বের ন্যায় কবিত্ব, কোন ভাষার কোন মহাকাব্যে আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু কবিত্বের কথা ছাড়িয়া দিয়া, কেবল কৌশলের কথা ধরিতে গেলে মিল্টন অপেক্ষা কালিদাসকে অধিক প্রশংসা করিতে হয়। Paradise Lost পাঠে শ্রম বোধ হয়; কুমারসম্ভব আদ্যোপান্ত পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়াও পরিতৃপ্ত জন্মে না। ইহার কারণ এই যে, কালিদাস কয়েকটি দেবচরিত্র মনুষ্যচরিত্রানুকৃত করিয়া অশেষ মাধুর্য্যবিশিষ্ট করিয়াছেন। উমা স্বয়ং আদ্যোপান্ত মানুসী, কোথাও তাঁহার দেবত্ব লক্ষিত হয় না। তাঁহার মাতা মেনা, মানুসী মাতার ন্যায়। “পদং সহৈত ভ্রমরস্য পেলবং” ইত্যাদি কবিতাদ্বয়ের সঙ্গে মণ্টাগুর উচ্চারিত “Like the bud bit by an envious worm” &c. ইতি উপমার তুলনা করুন। দেখিবেন, উমার মাতা এবং রোমিওর পিতা একই প্রকৃতি—হাড়ে হাড়ে মানব। মেনা পাষণরাণী, কিন্তু কুলবতী মানবীদিগের ন্যায় তাঁহার হৃদয় কুসুমসুকুমার।

বিদ্যাপতি ও জয়দেব

বঙ্গালা সাহিত্যের আর যে দুঃখই থাকুক, উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যের অভাব নাই। বরং অন্যান্য ভাষার অপেক্ষা বঙ্গালায় এই জাতীয় কবিতার আধিক্য। অন্যান্য কবির কথা না ধরিলেও, একা বৈষ্ণব কবিগণই ইহার সমুদ্রবিশেষ। বঙ্গালার প্রাচীন কবি—জয়দেব—গীতিকাব্যের প্রণেতা।

বাংকম রচনাবলী

পরবর্তী বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, এবং চণ্ডীদাসই প্রসিদ্ধ, কিন্তু আরও কতকগুলি এই সম্প্রদায়ের গীতিকাব্যপ্রণেতা আছেন; তাঁহাদের মধ্যে অন্যান্য চারি পাঁচ জন উৎকৃষ্ট কবি বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীকে এই শ্রেণীর কাব্য বলিতে হয়। রামপ্রসাদ সেন আর একজন প্রসিদ্ধ গীতি-কবি। তৎপরে কতকগুলি “কবিওয়ালার” প্রাদুর্ভাব হয়, তন্মধ্যে কাহারও কাহারও গীত অতি সুন্দর। রাম বসু, হরু ঠাকুর, নিতাই দাসের এক একটি গীত এমত সুন্দর আছে যে, ভারতচন্দ্রের রচনার মধ্যে ততুল্য কিছুই নাই। কিন্তু কবিওয়ালাদিগের অধিকাংশ রচনা অশ্রদ্ধেয় ও অশ্রাব্য সন্দেহ নাই।

সকলই নিয়মের ফল। সাহিত্যও নিয়মের ফল। বিশেষ বিশেষ কারণ হইতে, বিশেষ বিশেষ নিয়মানুসারে, বিশেষ বিশেষ ফলোৎপত্তি হয়। জল উপরিস্থ বায়ু এবং নিম্নস্থ পৃথিবীর অবস্থানুসারে, কতকগুলি অলংঘ্য নিয়মের অধীন হইয়া, কোথাও বাষ্প, কোথাও বৃষ্টিবিন্দু, কোথাও শিশির, কোথাও হিমকণা বা বরফ, কোথাও কুজ্ঝটিকারূপে পরিণত হয়। তেমনি সাহিত্যও দেশভেদে, দেশের অবস্থাভেদে, অসংখ্য নিয়মের বশবর্তী হইয়া রূপান্তরিত হয়। সেই সকল নিয়ম অত্যন্ত জটিল, দুর্জয়, সন্দেহ নাই; এ পর্য্যন্ত কেহ তাহার সর্বশেষ তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারেন নাই। কোমৎ বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে রূপ তত্ত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছেন, সাহিত্য সম্বন্ধে কেহ তদ্রূপ করিতে পারেন নাই। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র। যে সকল নিয়মানুসারে দেশভেদে, রাজ-বিপ্লবের প্রকারভেদ, সমাজবিপ্লবের প্রকারভেদ, ধর্মবিপ্লবের প্রকারভেদ ঘটে, সাহিত্যের প্রকারভেদ সেই সকল কারণেই ঘটে। কোন কোন ইউরোপীয় গ্রন্থকার সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের আভ্যন্তরিক সম্বন্ধ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। বকল্ ভিন্ন কেহ বিশেষ রূপে পরিশ্রম করেন নাই, এবং হিতবাদ মতপ্রিয় বকলের সঙ্গে কাব্যসাহিত্যের সম্বন্ধ কিছু অল্প। মনুষ্যচরিত্র হইতে ধর্ম এবং নীতি মুছিয়া দিয়া, তিনি সমাজতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত। বিদেশ সম্বন্ধে যাহা হউক, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এ তত্ত্ব কেহ কখন উত্থাপন করিয়াছিলেন, এমত আমাদের স্মরণ হয় না। সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে মক্ষমূলরের গ্রন্থ বহুমূল্য বটে, কিন্তু প্রকৃত সাহিত্যের সঙ্গে সে গ্রন্থের সামান্য সম্বন্ধ।

ভারতবর্ষীয় সাহিত্যের প্রকৃত গতি কি? তাহা জানি না, কিন্তু তাহার গোটাকত স্থূল স্থূল চিহ্ন পাওয়া যায়। প্রথম ভারতীয় আর্ষ্যগণ অনার্য্য আদিমবাসীদিগের সহিত বিবাদে ব্যস্ত; তখন ভারতবর্ষীয়েরা অনার্য্যকুলপ্রমথনকারী, ভীতিশূন্য, দিগন্তবিচারী, বিজয়ী বীর জাতি। সেই জাতীয় চরিত্রের ফল রামায়ণ। তার পর ভারতবর্ষের অনার্য্য শত্রুসকল ক্রমে বিজিত, এবং দূরপ্রস্থিত; ভারতবর্ষ আর্ষ্যগণের করস্থ, আয়ত্ত, ভোগ্য এবং মহা সমৃদ্ধিশালী। তখন আর্ষ্যগণ বাহ্য শত্রুর ভয় হইতে নিশ্চিন্ত, আভ্যন্তরিক সমৃদ্ধি সম্পাদনে সচেষ্ট, হস্তগত অনন্ত রত্নপ্রসাবিনী ভারতভূমি অংশীকরণে ব্যস্ত। যাহা সকলে জয় করিয়াছে, তাহা কে ভোগ করিবে? এই প্রশ্নের ফল আভ্যন্তরিক বিবাদ। তখন আর্ষ্য পৌরুষ চরমে দাঁড়াইয়াছে—অন্য শত্রুর অভাবে সেই পৌরুষ পরস্পরের দমনার্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সময়ের কাব্য মহাভারত। বল যাহার, ভারত তাহার হইল। বহু কালের রক্তবৃষ্টি শমিত হইল। স্থির হইয়া, উন্নতপ্রকৃতি আর্ষ্যকুল শান্তিসুখে মন দিলেন। দেশের ধনবৃদ্ধি, শ্রীবৃদ্ধি ও সভ্যতাবৃদ্ধি হইতে লাগিল। রোমক হইতে যবদ্বীপ ও চৈনিক পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের বাণিজ্য ছুটিতে লাগিল; প্রতি নদীকূলে অনন্তসৌধমালাশোভিত মহানগরী সকল মস্তক উত্তোলন করিতে লাগিল। ভারতবর্ষীয়েরা সুখী হইলেন। সুখী এবং কৃতী। এই সুখ ও কৃতিত্বের ফল ভক্তিশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র, এ অবস্থা কাব্যে তাদৃশ পরিস্ফুট হয় নাই। কিন্তু লক্ষ্মী বা সরস্বতী কোথাও চিরস্থায়িনী নহেন; উভয়েই চঞ্চলা। ভারতবর্ষ ধর্মশৃঙ্খলে এরূপ নিবদ্ধ হইয়াছিল যে, সাহিত্যরসগ্রাহিণী শক্তিও তাহার বশীভূতা হইল। প্রকৃতপ্রকৃত বোধ বিলুপ্ত হইল। সাহিত্যও ধর্মনিরূপকারী হইল। কেবল তাহাই নহে, বিচারশক্তি ধর্মমোহে বিকৃত হইয়াছিল—প্রকৃত ত্যাগ করিয়া অপ্রকৃত কামনা করিতে লাগিল। ধর্মই তৃষ্ণা, ধর্মই আলোচনা, ধর্মই সাহিত্যের বিষয়। এই ধর্মমোহের ফল পুরাণ। কিন্তু যেমন এক দিকে ধর্মের স্রোতঃ বহিতে লাগিল, তেমনি আর এক দিকে বিলাসিতার স্রোতঃ বহিতে লাগিল। তাহার ফল কালিদাসের কাব্য নাটকাদি।

বিবিধ প্রবন্ধ—বিদ্যাপতি ও জয়দেব

ভারতবর্ষীয়েরা শেষে আসিয়া একটি এমন প্রদেশ অধিকার করিয়া বসতি স্থাপন করিয়া-
ছিলেন যে, তথাকার জল বায়ুর গুণে তাঁহাদিগের স্বাভাবিক তেজ লুপ্ত হইতে লাগিল।
তথাকার তাপ অসহ্য, বায়ু জল বাষ্পপূর্ণ, ভূমি নিম্না এবং উর্ধ্বা, এবং তাহার উৎপাদ্য
অসার, তেজোহানিকারক ধান্য। সেখানে আসিয়া আৰ্য্যতেজ অন্তর্হিত হইতে লাগিল, আৰ্য্য-
প্রকৃতি কোমলতাময়ী, আলস্যের বশবর্তিনী, এবং গৃহসুখাভিলাষিণী হইতে লাগিল। সকলেই
বুঝিতে পারিতেছেন যে, আমরা বাঙ্গালার পরিচয় দিতেছি। এই উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস,
নিশ্চেষ্ট, গৃহসুখপরায়ণ চরিত্রের অনুকরণে এক বিচিত্র গীতিকাব্য সৃষ্ট হইল। সেই
গীতিকাব্যও উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, ভোগাসক্ত, গৃহসুখপরায়ণ। সে কাব্যপ্রণালী অতিশয়
কোমলতাপূর্ণ, অতি সুমধুর, দম্পতীপ্রণয়ের শেষ পরিচয়। অন্য সকল প্রকারের সাহিত্যকে
পশ্চাতে ফেলিয়া, এই জাতিচরিত্রানুকারী গীতিকাব্য সাত আট শত বৎসর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে
জাতীয় সাহিত্যের পদে দাঁড়াইয়াছে। এই জন্য গীতিকাব্যের এত বাহুল্য।

বঙ্গীয় গীতিকাব্যলেখকদিগকে দুই দলে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক দল, প্রাকৃতিক
শোভার মধ্যে মনুষ্যকে স্থাপিত করিয়া তৎপ্রতি দৃষ্টি করেন; আর এক দল, বাহ্য প্রকৃতিকে
দূরে রাখিয়া কেবল মনুষ্যহৃদয়কেই দৃষ্টি করেন। এক দল মানবহৃদয়ের সন্মানে প্রবৃত্ত হইয়া
বাহ্যপ্রকৃতিকে দীপ করিয়া তদালোকে অন্বেষ্য বস্তুকে দীপ্ত এবং প্রস্ফুট করেন; আর এক দল,
আপনাদিগের প্রতিষ্ঠাতেই সকল উজ্জ্বল করেন, অথবা মনুষ্যচরিত্র-খনিতে যে রত্ন মিলে,
তাহার দীপ্তির জন্য অন্য দীপের আবশ্যক নাই, বিবেচনা করেন। প্রথম শ্রেণীর প্রধান জয়দেব,
দ্বিতীয় শ্রেণীর মুখপাত্র বিদ্যাপতিকে ধরিয়া লওয়া যাউক। জয়দেবদিগের কবিতায় সতত
মাধবী যামিনী, মলয়সমীর, ললিতলতা, কুবলয়দলশ্রেণী, স্ফুটিত কুসুম, শরচ্চন্দ্র, মধুকরবৃন্দ,
কোকিলকুজিত কুঞ্জ, নবজলধর, এবং তৎসঙ্গে, কামিনীর মুখমণ্ডল, ব্রুবল্লী, বাহুলতা, বিম্বোষ্ঠ,
সরসীরুহলোচন, অলসনিমেষ, এই সকলের চিত্র, বাতোন্মথিত তটিনীতরঙ্গবৎ সতত চাকাচক্য
সম্পাদন করিতেছে। বাস্তবিক এই শ্রেণীর কবিদের কবিতায় বাহ্য প্রকৃতির প্রাধান্য। বিদ্যাপতি
যে শ্রেণীর কবি, তাঁহাদিগের কাব্যে বাহ্য প্রকৃতির সম্বন্ধ নাই, এমত নহে—বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে
মানবহৃদয়ের নিত্য সম্বন্ধ, সুতরাং কাব্যেরও নিত্য সম্বন্ধ; কিন্তু তাঁহাদিগের কাব্যে বাহ্য প্রকৃতির
অপেক্ষাকৃত অস্পষ্টতা লক্ষিত হয়, তৎপরিবর্তে মনুষ্যহৃদয়ের গঢ় তলচারী ভাবসকল প্রধান
স্থান গ্রহণ করে। জয়দেবদিগে বহিঃপ্রকৃতির প্রাধান্য, বিদ্যাপতি প্রভৃতিতে অন্তঃপ্রকৃতির রাজ্য।
জয়দেব, বিদ্যাপতি উভয়েই রাধাকৃষ্ণের প্রণয়কথা গীত করেন। কিন্তু জয়দেব যে প্রণয় গীত
করিয়াছেন, তাহা বহিঃপ্রকৃতির অনুগামী। বিদ্যাপতি প্রভৃতির কবিতা, বিশেষতঃ চণ্ডীদাসদিগের
কবিতা বহিঃপ্রকৃতির অতীত। তাহার কারণ কেবল এই বাহ্য প্রকৃতির শক্তি। স্থূল প্রকৃতির
সঙ্গে স্থূল শরীরেরই নিকট সম্বন্ধ, তাহার আধিক্যে কবিতা একটু ইন্দ্রিয়ানুসারিণী হইয়া পড়ে।
বিদ্যাপতির দল মনুষ্যহৃদয়কে বহিঃপ্রকৃতি ছাড়া করিয়া, কেবল তৎপ্রতি দৃষ্টি করেন; সুতরাং
তাঁহার কবিতা, ইন্দ্রিয়ের সংস্রবশূন্য, বিলাসশূন্য পবিত্র হইয়া উঠে। জয়দেবের গীত, রাধাকৃষ্ণের
বিলাসপূর্ণ; বিদ্যাপতির গীত রাধাকৃষ্ণের প্রণয়পূর্ণ। জয়দেব ভোগ; বিদ্যাপতি আকাঙ্ক্ষা ও
স্মৃতি। জয়দেব সুখ, বিদ্যাপতি দুঃখ। জয়দেব বসন্ত, বিদ্যাপতি বর্ষা। জয়দেবের কবিতা,
উৎফুল্লকমলজালশোভিত, বিহঙ্গমাকুল, স্বচ্ছ বারিবিশিষ্ট সুন্দর সরোবর; বিদ্যাপতির কবিতা
দূরগামিনী বেগবতী তরঙ্গসঙ্কুল নদী। জয়দেবের কবিতা স্বর্ণহার, বিদ্যাপতির কবিতা
রুদ্রাঙ্কমালা। জয়দেবের গান, মুরজবীণাসঙ্গিনী স্ত্রীকণ্ঠগীতি; বিদ্যাপতির গান, সায়াহ-
সমীরণের নিশ্বাস।

আমরা জয়দেব ও বিদ্যাপতির সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাঁহাদিগকে এক এক ভিন্নশ্রেণীর
গীতিকবির আদর্শস্বরূপ বিবেচনা করিয়া তাহা বলিয়াছি। যাহা জয়দেব সম্বন্ধে বলিয়াছি,
তাহা ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে বর্তে, যাহা বিদ্যাপতি সম্বন্ধে বলিয়াছি, তাহা গোবিন্দদাস চণ্ডীদাস
প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের সম্বন্ধে বেশী খাটে, বিদ্যাপতি সম্বন্ধে তত খাটে না।

আধুনিক বাঙ্গালি গীতিকাব্যলেখকগণকে একটি তৃতীয়শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে।
তাঁহারা আধুনিক ইংরাজি গীতিকবিদিগের অনুগামী। আধুনিক ইংরাজি কবি ও আধুনিক
বাঙ্গালি কবিগণ সভ্যতা বৃদ্ধির কারণে স্বতন্ত্র একটি পথে চলিয়াছেন। পূর্ব-কবিগণ, কেবল
আপনাকে চিনিতেন, আপনার নিকটবর্তী যাহা, তাহা চিনিতেন। যাহা আভ্যন্তরিক বা নিকটস্থ,

বিক্রম রচনাবলী

তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ সন্ধান জানিতেন, তাহার অননুকরণীয় চিত্রসকল রাখিয়া গিয়াছেন। এক্ষণকার কবিগণ জ্ঞানী—বৈজ্ঞানিক, ইতিহাসবেত্তা, আধ্যাত্মিকতত্ত্ববিৎ। নানা দেশ, নানা কাল, নানা বস্তু তাঁহাদিগের চিত্তমধ্যে স্থান পাইয়াছে। তাঁহাদিগের বুদ্ধি বহুবিষয়িণী বলিয়া তাঁহাদিগের কবিতা বহুবিষয়িণী হইয়াছে। তাঁহাদিগের বুদ্ধি দূরসম্বন্ধগ্রাহিণী বলিয়া তাঁহাদিগের কবিতাও দূরসম্বন্ধপ্রকাশিকা হইয়াছে। কিন্তু এই বিস্তৃতিগুণ হেতু প্রগাঢ়তাগুণের লাঘব হইয়াছে। বিদ্যাপতি প্রভৃতির কবিতার বিষয় সঙ্কীর্ণ, কিন্তু কবিত্ব প্রগাঢ়; মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের কবিতার বিষয় বিস্তৃত, কিন্তু কবিত্ব তাদৃশ প্রগাঢ় নহে। জ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কবিত্বশক্তি হ্রাস হয় বলিয়া যে প্রবাদ আছে, ইহা তাহার একটি কারণ। যে জল সঙ্কীর্ণ কূপে গভীর, তাহা তড়াগে ছড়াইলে আর গভীর থাকে না।

কাব্যে অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে যথার্থ সম্বন্ধ এই যে, উভয়ে উভয়ের প্রতিবিম্ব নিপতিত হয়। অর্থাৎ বহিঃপ্রকৃতির গুণে হৃদয়ের ভাবান্তর ঘটে, এবং মনের অবস্থাবিশেষে বাহ্য দৃশ্য সুখকর বা দুঃখকর বোধ হয়—উভয়ে উভয়ের ছায়া পড়ে। যখন বহিঃপ্রকৃতি বর্ণনীয়, তখন অন্তঃপ্রকৃতির সেই ছায়া সহিত চিত্রিত করাই কাব্যের উদ্দেশ্য। যখন অন্তঃপ্রকৃতি বর্ণনীয়, তখন বহিঃপ্রকৃতির ছায়া সমেত বর্ণনা তাহার উদ্দেশ্য। যিনি ইহা পারেন, তিনিই সুকবি। ইহার ব্যতিক্রমে এক দিকে ইন্দ্রিয়পরতা, অপর দিকে আধ্যাত্মিকতা দোষ জন্মে। এ স্থলে শারীরিক ভোগাসক্তিকেই ইন্দ্রিয়পরতা বলিতেছি না, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে আনন্দরক্তিকে ইন্দ্রিয়পরতা বলিতেছি। ইন্দ্রিয়পরতা দোষের উদাহরণ, জয়দেব। আধ্যাত্মিকতার উদাহরণ, Wordsworth.

আর্য্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প*

একদল মনুষ্য বলেন যে, এ সংসারে সুখ নাই, বনে চল, ভোগাভোগ সমাপ্ত করিয়া মুক্তি বা নিস্বর্ণ লাভ কর। আর একদল বলেন, সংসার সুখময়, বণ্ডকের বণ্ডনা অগ্রাহ্য করিয়া, খাও, দাও, ঘুমাও। যাঁহারা সুখাভিলাষী, তাঁহাদিগের মধ্যে নানা মত। কেহ বলেন ধনে সুখ, কেহ বলেন মনে সুখ; কেহ বলেন ধর্মে, কেহ বলেন অধর্মে; কাহার সুখ কার্য্যে, কাহারও সুখ জ্ঞানে। কিন্তু প্রায় এমন মনুষ্য দেখা যায় না, যে সৌন্দর্য্যে সুখী নহে। তুমি সুন্দরী স্ত্রীর কামনা কর; সুন্দরী কন্যার মুখ দেখিয়া প্রীত হও; সুন্দর শিশুর প্রতি চাহিয়া বিমুগ্ধ হও; সুন্দরী পুত্রবধুর জন্য দেশ মাথায় কর। সুন্দর ফুলগুলি বাছিয়া শয্যায় রাখ, ঘর্ষ্মাক্ত ললাটে যে অর্থ উপার্জন করিয়াছ, সুন্দর গৃহ নিস্বর্ণ করিয়া, সুন্দর উপকরণে সাজাইতে, তাহা ব্যয়িত করিয়া ঋণী হও; আপনি সুন্দর সাজিবে বলিয়া, সর্ব্বস্ব পণ করিয়া, সুন্দর সজ্জা খুঁজিয়া বেড়াও—ঘটী বাটী পিত্তল কাঁসাও যাহাতে সুন্দর হয়, তাহার যত্ন কর। সুন্দর দেখিয়া পাখী পোষ, সুন্দর বৃক্ষে সুন্দর উদ্যান রচনা কর, সুন্দর মুখে সুন্দর হাসি দেখিবার জন্য, সুন্দর কাণ্ডন রঙ্গে সুন্দরীকে সাজাও। সকলেই অহরহ সৌন্দর্য্যতৃষায় পীড়িত, কিন্তু কেহ কখন এ কথা মনে করে না বলিয়াই এত বিস্তারে বলিতেছি।

এই সৌন্দর্য্যতৃষা যেরূপ বলবতী, সেইরূপ প্রশংসনীয় এবং পরিপোষণীয়। মনুষ্যের যত প্রকার সুখ আছে, তন্মধ্যে এই সুখ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট; কেন না, প্রথমতঃ ইহা পবিত্র, নিস্বর্ণ, পাপসংস্পর্শশূন্য; সৌন্দর্য্যের উপভোগ কেবল মানসিক সুখ, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ইহার সংস্পর্শ নাই। সত্য বটে, সুন্দর বস্তু অনেক সময়ে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট; কিন্তু সৌন্দর্য্যজনিত সুখ ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হইতে ভিন্ন। রত্নখচিত স্বর্ণ জলপাত্রে জলপানে তোমার যেরূপ তৃষা নিবারণ হইবে, কুগঠন মৃৎপাত্রেও তৃষা নিবারণ সেইরূপ হইবে; স্বর্ণপাত্রে জলপান করায় যেটুকু অতিরিক্ত সুখ, তাহা সৌন্দর্য্যজনিত মানসিক সুখ। আপনার স্বর্ণপাত্রে জল খাইলে অহঙ্কারজনিত সুখ তাহার সঙ্গে মিশে বটে, কিন্তু পরের স্বর্ণপাত্রে জলপান করিয়া তৃষা নিবারণাতিরিক্ত যে সুখ, তাহা সৌন্দর্য্যজনিত মাত্র বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ,

* সূক্ষ্ম শিল্পের উৎপত্তি ও আর্য্যজাতির শিল্পচাতুরী, শ্রীশ্যামাচরণ শ্রীমানি প্রণীত। কলিকাতা।

বিবিধ প্রবন্ধ—আর্য্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প

ভীরতায় এই সুখ সর্বসুখাপেক্ষা গুরুতর; যাঁহারা নৈসর্গিক শোভাদর্শনপ্রিয় বা কাব্যমোদী, তাঁহারা ইহার অনেক উদাহরণ মনে করিতে পারিবেন; সৌন্দর্যের উপভোগজনিত সুখ, অনেক সময়ে ভীরতায় অসহ্য হইয়া উঠে। তৃতীয়তঃ, অন্যান্য সুখ পৌনঃপুন্যে অপ্রীতিকর হইয়া উঠে, সৌন্দর্য্যজনিত সুখ চিরনূতন, এবং চিরপ্রীতিকর।

অতএব যাঁহারা মনুষ্যজাতির এই সুখবর্দ্ধন করেন, তাঁহারা মনুষ্যজাতির উপকারকদিগের মধ্যে সর্বোচ্চ পদ প্রাপ্তির যোগ্য। যে ভিখারী খঞ্জনী বাজাইয়া নেড়ার গীত গাইয়া মূর্ছিতভিক্ষা লইয়া যায়, তাহাকে কেহ মনুষ্যজাতির মহোপকারী বলিয়া স্বীকার করিবে না বটে, কিন্তু যে বাঙ্গালী, চিরকালের জন্য কোটি কোটি মনুষ্যের অক্ষয় সুখ এবং চিত্তোৎকর্ষের উপায় বিধান করিয়াছেন, তিনি যশের মন্দিরে নিউটন, হার্বি, ওয়াট্ বা জেনরের অপেক্ষা নিম্ন স্থান পাইবার যোগ্য নহেন। অনেকে লোক, মেক্লে প্রভৃতি অসারগ্রাহী লেখকদিগের অনুবর্তী হইয়া কবির অপেক্ষা পাদুকাকারকে উপকারী বলিয়া উচ্চাসনে বসান; এই গণ্ডমূর্খ দলের মধ্যে আধুনিক অর্দ্ধশিক্ষিত কতকগুলি বাঙ্গালি বাবু অগ্রগণ্য। পক্ষান্তরে ইংলণ্ডের রাজপুরুষ-চুড়ামণি গ্লাডষ্টোন, স্কটলণ্ডজাত মনুষ্যদিগের মধ্যে হিউম্, আদম স্মিথ, হণ্টর, কল্‌ইল থাকিতে ওয়ল্টর স্কটকে সর্বোপরি স্থান দিয়াছেন।

যেমন মনুষ্যের অন্যান্য অভাব পূরণার্থ এক একটি শিল্পবিদ্যা আছে, সৌন্দর্য্যাকাঙ্ক্ষা পূরণার্থও বিদ্যা আছে। সৌন্দর্য্য সৃজনের বিবিধ উপায় আছে। উপায়ভেদে সেই বিদ্যা পৃথক্ পৃথক্ রূপ ধারণ করিয়াছে।

আমরা যে সকল সুন্দর বস্তু দেখিয়া থাকি, তন্মধ্যে কতকগুলির কেবল বর্ণ মাত্র আছে—আর কিছু নাই; যথা আকাশ।

আর কতকগুলির, বর্ণ ভিন্ন, আকারও আছে; যথা পুষ্প।

কতকগুলির, বর্ণ ও আকার ভিন্ন, গতিও আছে; যথা উরগ।

কতকগুলির, বর্ণ, আকার, গতি ভিন্ন, রব আছে; যথা কোকিল।

মনুষ্যের বর্ণ, আকার, গতি ও রব ব্যতীত অর্থযুক্ত বাক্য আছে।

অতএব সৌন্দর্য্য সৃজনের জন্য, এই কয়টি সামগ্রী—বর্ণ, আকার, গতি, রব ও অর্থযুক্ত বাক্য।

যে সৌন্দর্য্যজননী বিদ্যার বর্ণমাত্র অবলম্বন, তাহাকে চিত্রবিদ্যা কহে।

যে বিদ্যার অবলম্বন আকার, তাহা দ্বিবিধ। জড়ের আকৃতিসৌন্দর্য্য যে বিদ্যার উদ্দেশ্য, তাহার নাম স্থাপত্য। চেতন বা উদ্ভিদের সৌন্দর্য্য যে বিদ্যার উদ্দেশ্য, তাহার নাম ভাস্কর্য্য।

যে সৌন্দর্য্যজনিকা বিদ্যার সিদ্ধি গতির দ্বারা, তাহার নাম নৃত্য।

রব যাহার অবলম্বন, সে বিদ্যার নাম সঙ্গীত।

বাক্য যাহার অবলম্বন, তাহার নাম কাব্য।

কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য এবং চিত্র, এই ছয়টি সৌন্দর্য্যজনিকা বিদ্যা। ইউরোপে এই সকল বিদ্যার যে জাতিবাচক নাম প্রচলিত আছে, তাহার অনুবাদ করিয়া “সূক্ষ্মশিল্প” নাম দেওয়া হইয়াছে।

সৌন্দর্য্যপ্রসূতি এই ছয়টি বিদ্যায় মনুষ্যজীবন ভূষিত ও সুখময় করে। ভাগ্যহীন বাঙ্গালির কপালে এ সুখ নাই। সূক্ষ্ম শিল্পের সঙ্গে তাহার বড় বিরোধ। তাহাতে বাঙ্গালির বড় অনাদর, বড় ঘৃণা। বাঙ্গালি সুখী হইতে জানে না।

স্বীকার করি, সকল দোষটুকু বাঙ্গালির নিজের নহে। কতকটা বাঙ্গালির সামাজিক রীতির দোষ;—পূর্বপুরুষের ভদ্রাসন পরিত্যাগ করা হইবে না, তাতেই অসংখ্য সন্তান-সন্ততি লইয়া গর্ত্মধ্যে পিপীলিকার ন্যায়, পিল্ পিল্ করিতে হইবে—সুতরাং স্থানাভাববশতঃ পরিষ্কৃতি এবং সৌন্দর্য্যসাধন সম্ভবে না। কতকটা বাঙ্গালির দারিদ্র্যজন্য। সৌন্দর্য্য অর্থসাধ্য—অনেকের সংসার চলে না। তাহার উপর সামাজিক রীত্যানুসারে আগে পৌরশ্রীগণের অলঙ্কার, দোলদুর্গোৎসবের ব্যয়, পিতৃশ্রাদ্ধ, মাতৃশ্রাদ্ধ, পুত্র-কন্যার বিবাহ দিতে অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় করিতে হইবে—সে সকল ব্যয় সম্পন্ন করিয়া, শূকরশালা তুল্য কদর্য্য স্থানে বাস করিতে হইবে, ইহাই সামাজিক রীতি। ইচ্ছা করিলেও সমাজশৃঙ্খলে বদ্ধ বাঙ্গালি, সে রীতির বিপরীতাচরণ করিতে পারেন

বাংকম রচনাবলী

না। কতকটা হিন্দুধর্মের দোষ; যে ধর্ম্মানুসারে উৎকৃষ্ট মর্ম্মরপ্রস্থত হর্ম্ম্যও গোময় লেপনে পরিষ্কৃত করিতে হইবে, তাহার প্রসাদে সূক্ষ্ম শিল্পের দুর্দশারই সম্ভাবনা।

এ সকল স্বীকার করিলেও দোষক্ষালন হয় না। যে ফির্নিজি কেরাণীগিরি করিয়া শত মূদ্রায় কোন মতে দিনপাত করে, তাহার সঙ্গে বৎসরে বিংশতি সহস্র মূদ্রার অধিকারী গ্রাম্য ভূস্বামীর গৃহপারিপাট্য বিষয়ে তুলনা কর। দেখিবে, এ প্রভেদটি অনেকটাই স্বাভাবিক। দুই চারি জন ধনাঢ্য বাবু, ইংরেজদিগের অনুকরণ করিয়া, ইংরেজের ন্যায় গৃহাদির পারিপাট্য বিধান করিয়া থাকেন এবং ভাস্কর্য্য ও চিত্রাদির দ্বারা গৃহ সজ্জিত করিয়া থাকেন। বাঙ্গালি নকলনিবিশ ভাল, নকলে শৈথিল্য নাই। কিন্তু তাঁহাদিগের ভাস্কর্য্য এবং চিত্রসংগ্রহ দেখিলেই বোধ হয় যে, অনুকরণ-স্পৃহাতেই ঐ সকল সংগ্রহ ঘটিয়াছে—নচেৎ সৌন্দর্য্য তাঁহাদিগের আন্তরিক অনুরাগ নাই। এখানে ভাল-মন্দের বিচার নাই, মহাঘ্য হইলেই হইল; সন্নিবেশের পারিপাট্য নাই, সংখ্যায় অধিক হইলেই হইল। ভাস্কর্য্য চিত্র দুই থাকুক, কাব্য সম্বন্ধেও বাঙ্গালির উত্তমাদম বিচারশক্তি দেখা যায় না। এ বিষয়ে সুশিক্ষিত অশিক্ষিত সমান—প্রভেদ অতি অল্প। নৃত্য গীত—সে সকল বৃষ্টি বাঙ্গালা হইতে উঠিয়া গেল। সৌন্দর্য্যবিচারশক্তি, সৌন্দর্য্যরসাস্বাদনসুখ, বৃষ্টি বিধাতা বাঙ্গালির কপালে লিখেন নাই।

দ্রোপদী

(প্রথম প্রস্তাব)

কি প্রাচীন, কি আধুনিক, হিন্দুকব্য সকলের নায়িকাগণের চরিত্র এক ছাঁচে ঢালা দেখা যায়। পতিপরায়ণা, কোমলপ্রকৃতিসম্পন্ন, লজ্জাশীলা, সহিষ্ণুতা গুণের বিশেষ অধিকারিণী—ইনিই আৰ্য্যসাহিত্যের আদর্শস্থলাভিষিক্তা। এই গঠনে বৃদ্ধ বাঙ্গালীক বিশ্বমনোমোহিনী জনক-দুহিতাকে গড়িয়াছিলেন। সেই অর্বাধি আৰ্য্য নায়িকা সেই আদর্শে গঠিত হইতেছে। শকুন্তলা, দময়ন্তী, রত্নাবলী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নায়িকাগণ—সীতার অনুকরণ মাত্র। অন্য কোন প্রকৃতির নায়িকা যে আৰ্য্যসাহিত্যে দেখা যায় না, এমত কথা বলিতেছি না—কিন্তু সীতানুবর্তিনী নায়িকারই বাহুল্য। আজও যিনি সস্তা ছাপাখানা পাইয়া নবেল নাটকাদিতে বিদ্যা প্রকাশ করিতে চাহেন, তিনিই সীতা গড়িতে বসেন।

ইহার কারণও দূরনুমেয় নহে। প্রথমতঃ সীতার চরিত্রটি বড় মধুর, দ্বিতীয়তঃ এই প্রকার স্ত্রীচরিত্রই আৰ্য্যজাতির নিকট বিশেষ প্রশংসিত, এবং তৃতীয়তঃ আৰ্য্যস্ত্রীগণের এই জাতীয় উৎকর্ষই সচরাচর আয়ত্ত।

একা দ্রোপদী সীতার ছায়াও স্পর্শ করেন নাই। এখানে মহাভারতকার অপদূর্ষ নূতন সৃষ্টি প্রকাশিত করিয়াছেন। সীতার সহস্র অনুকরণ হইয়াছে, কিন্তু দ্রোপদীর অনুকরণ হইল না।

সীতা সতী, পণ্ডপতিকা দ্রোপদীকেও মহাভারতকার সতী বলিয়াই পরিচিতা করিয়াছেন; কেন না, কবির অভিপ্রায় এই যে, পতি এক হোক, পাঁচ হোক, পতিমাত্র ভজনাই সতীত্ব। উভয়েই পত্নী ও রাজ্ঞীর কর্তব্যানুষ্ঠানে অক্ষুণ্ণমতি, ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং গুরুজনের বাধ্য। কিন্তু এই পর্য্যন্ত সাদৃশ্য। সীতা রাজ্ঞী হইয়াও প্রধানতঃ কুলবধু, দ্রোপদী কুলবধু হইয়াও প্রধানতঃ প্রচণ্ড তেজস্বিনী রাজ্ঞী। সীতায় স্ত্রীজাতির কোমল গুণগর্ভিন পরিষ্কৃত, দ্রোপদীতে স্ত্রীজাতির কঠিন গুণসকল প্রদীপ্ত। সীতা রামের যোগ্যা জায়া, দ্রোপদী ভীমসেনেরই সুযোগ্য বীরেন্দ্রাণী। সীতাকে হরণ করিতে রাবণের কোন কষ্ট হয় নাই, কিন্তু রক্ষোবাজ লঙ্কেশ যদি দ্রোপদীহরণে আসিতেন, তবে বোধ হয়, হয় কীচকের ন্যায় প্রাণ হারাইতেন, নয় জয়দ্রথের ন্যায়, দ্রোপদীর বাহুবলে ভূমে গড়াগড়ি দিতেন।

দ্রোপদীচরিত্রের রীতিমত বিশ্লেষণ দূরতঃ; কেন না, মহাভারত অনন্ত সাগরতুল্য, তাহার অজস্র তরঙ্গাভিঘাতে একটি নায়িকা বা নায়কের চরিত্র তৃণবৎ কোথায় যায়, তাহা পর্য্যবেক্ষণ কে করিতে পারে! তথাপি দুই একটা স্থানে বিশ্লেষণে যত্ন করিতেছি।

দ্রোপদীর স্বয়ম্বর। দ্রুপদরাজার পণ যে, যে সেই দুর্বেধনীয় লক্ষ্য বিধিবে, সেই দ্রোপদীর পাণিগ্রহণ করিবে। কন্যা সভাতলে আনীতা। পৃথিবীর রাজগণ, বীরগণ, ঋষিগণ সমবেত। এই মহাসভার প্রচণ্ড প্রতাপে কুমারীকুমুম শূকাইয়া উঠে; সেই বিশোষমাণা কুমারী লাভার্থ

বিবিধ প্রবন্ধ—দ্রৌপদী

দুর্যোধন, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি ভুবনপ্রথিত মহাবীরসকল লক্ষ্য বির্ণিতে যত্ন করিতেছেন। একে একে সকলেই বিক্রমে অক্ষম হইয়া ফিরিয়া আসিতেছেন। হায়! দ্রৌপদীর বিবাহ হয় না।

অন্যান্য রাজগণমধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গাধিপতি কর্ণ লক্ষ্য বির্ণিতে উঠিলেন। ক্ষুদ্র কাব্যকার এখানে কি করিতেন বলা যায় না—কেন না, এটি বিষম সঙ্কট। কাব্যের প্রয়োজন, পাণ্ডবের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিবাহ দেওয়াইতে হইবে। কর্ণ লক্ষ্য বির্ণিতে তাহা হয় না। ক্ষুদ্র কবি বোধ হয়, কর্ণকেও লক্ষ্য বিক্রমে অশক্ত বলিয়া পরিচিত করিতেন। কিন্তু মহাভারতের মহাকবি জাজ্বল্যমান দেখিতে পাইতেছেন যে, কর্ণের বীর্য, তাহার প্রধান নায়ক অর্জুনের বীর্যের মানদণ্ড। কর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বী এবং অর্জুনহস্তে পরাভূত বলিয়াই অর্জুনের গৌরবের এত আধিক্য; কর্ণকে অন্যের সঙ্গে ক্ষুদ্রবীর্য করিলে অর্জুনের গৌরব কোথা থাকে? এরূপ সঙ্কট, ক্ষুদ্র কবিকে বুঝাইয়া দিলে তিনি অবশ্য স্থির করিবেন যে, তবে অত হাস্যমায় কাজ নাই—কর্ণকে না তুলিলেই ভাল হয়। কাব্যের যে সর্বাঙ্গসম্পন্নতার ক্ষতি হয়, তাহা তিনি বুঝিবেন না—সকল রাজাই যেখানে সর্বাঙ্গসুন্দরী লোভে লক্ষ্য বির্ণিতে উঠিতেছেন, সেখানে মহাবলপরাক্রান্ত কর্ণই যে কেন একা উঠিবেন না, এ প্রশ্নের কোন উত্তর নাই।

মহাকবি আশ্চর্য্য কৌশলময়, এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশালী। তিনি অবলীলাক্রমে কর্ণকে লক্ষ্য-বিক্রমে উত্থিত করিলেন, কর্ণের বীর্যের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিলেন, এবং সেই অবসরে, সেই উপলক্ষে, সেই একই উপায়ে, আর একটি গুরুতর উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করিলেন। দ্রৌপদীর চরিত্র পাঠকের নিকটে প্রকটিত করিলেন। যে দিন জয়দ্রথ দ্রৌপদী কর্তৃক ভূতলশায়ী হইবে, যে দিন দুর্যোধনের সভাতলে দ্যুতজিতা অপমানিতা মহিষী স্বামী হইতেও স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনে উন্মুখিনী হইবেন, সে দিন দ্রৌপদীর যে চরিত্র প্রকাশ পাইবে, অদ্য সেই চরিত্রের পরিচয় দিলেন। একটি ক্ষুদ্র কথায় এই সকল উদ্দেশ্য সফল হইল। বলিয়াছি, সেই প্রচণ্ডপ্রতাপ-সম্মানিতা মহাসভায় কুমারীকুমুম শূকাইয়া উঠে। কিন্তু দ্রৌপদী কুমারী, সেই বিষম সভাতলে রাজমণ্ডলী, বীরমণ্ডলী, ঋষিমণ্ডলীমধ্যে, দ্রুপদরাজতুল্য পিতার, ধৃষ্টদ্যুম্নতুল্য ভ্রাতার অপেক্ষা না করিয়া, কর্ণকে বিক্রমোদ্যত দেখিয়া বলিলেন, “আমি সূতপুত্রকে বরণ করিব না।” এই কথা শ্রবণমাত্র কর্ণ সামর্থ্য হ্যাস্যে সূর্য্যসন্দর্শনপূর্ব্বক শরাসন পরিত্যাগ করিলেন।

এই কথায় যতটা চরিত্র পরিস্ফুট হইল, শত পৃষ্ঠা লিখিয়াও ততটা প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। এস্থলে কোন বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন হইল না—দ্রৌপদীকে তেজস্বিনী বা গর্ভিতা বলিয়া ব্যাখ্যাত করিবার আবশ্যিকতা হইল না। অথচ রাজদুহিতার দুন্দর্মনীয় গর্ভ নিঃসঙ্কেচে বিস্ফারিত হইল।

ইহার পর দ্যুতক্রীড়ায় বিজিতা দ্রৌপদীর চরিত্র অবলোকন কর। মহাগর্ভিত, তেজস্বী, এবং বলধারী ভীমার্জুন দ্যুতমুখে বিসর্জিত হইয়াও কোন কথা কহেন নাই, শত্রুর দাসত্ব নিঃশব্দে স্বীকার করিলেন। এস্থলে তাহাদিগের অনুগামিনী দাসীর কি করা কর্তব্য? স্বামি-কর্তৃক দ্যুতমুখে সমর্পিত হইয়া স্বামিগণের ন্যায় দাসীত্ব স্বীকার করাই আর্থ্যনারীর স্বভাবসিদ্ধ। দ্রৌপদী কি করিলেন? তিনি প্রাতিকামীর মুখে দ্যুতবার্তা এবং দুর্যোধনের সভায় তাহার আহ্বান শুনিয়া বলিলেন,

“হে সূতনন্দন! তুমি সভায় গমন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি অগ্রে আমাকে, কি আপনাকে দ্যুতমুখে বিসর্জন করিয়াছেন। হে সূতাত্মজ! তুমি যুধিষ্ঠিরের নিকট এই বৃত্তান্ত জানিয়া এস্থানে আগমনপূর্ব্বক আমাকে লইয়া যাইও। ধর্ম্মরাজ কিরূপে পরাজিত হইয়াছেন, জানিয়া আমি তথায় গমন করিব।” দ্রৌপদীর অভিপ্রায়, দাসত্ব স্বীকার করিবেন না।

দ্রৌপদীর চরিত্রে দুইটি লক্ষণ বিশেষ স্পষ্ট—এক ধর্ম্মাচরণ, দ্বিতীয় দর্প। দর্প, ধর্ম্মের কিছুর বিরোধী, কিন্তু এই দুইটি লক্ষণের একাধারে সমাবেশ অপ্রকৃত নহে। মহাভারতকার এই দুই লক্ষণ অনেক নায়কে একত্রে সমাবেশ করিয়াছেন; ভীমসেনে, অর্জুনে, অশ্বথামায়, এবং সচরাচর ক্ষত্রিয়চরিত্রে এতদুভয়কে মিশ্রিত করিয়াছেন। ভীমসেনে দর্প পূর্ণমাত্রায়, এবং অর্জুনে ও অশ্বথামায় অর্ধমাত্রায় দেখা যায়। দর্প শব্দে এখানে আত্মশ্লাঘাপ্রিয়তা নির্দেশ করিতেছি না; মানসিক তেজস্বিতাই আমাদের নির্দেশ্য। এই তেজস্বিতা দ্রৌপদীতেও পূর্ণমাত্রায় ছিল। অর্জুনে এবং অভিমন্যুতে ইহা আত্মশক্তি নিশ্চয়তায় পরিণত হইয়াছিল; ভীমসেনে ইহা বলবৃদ্ধির কারণ হইয়াছিল; দ্রৌপদীতে ইহা ধর্ম্মবৃদ্ধির কারণ হইয়াছে।

বাংকম রচনাবলী

সভাতলে দ্রৌপদীর দর্প ও তেজস্বিতা আরও বর্ধিত হইল। তিনি দুর্যোধনকে বলিলেন, “যদি ইন্দ্রাদি দেবগণও তোর সহায় হন, তথাপি রাজপুত্রেরা তোকে কখনই ক্ষমা করিবেন না।” স্বামিকুলকে উপলক্ষ করিয়া সর্বসমীপে মনুজ্ঞকণ্ঠে বলিলেন, “ভরতবংশীয়গণের ধর্ম্মে ধিক্! ক্ষত্রধর্ম্মজ্ঞগণের চরিত্র একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে।” ভীষ্মাদি গুরুজনকে মুখের উপর তিরস্কার করিয়া বলিলেন, “বৃদ্ধিলাভ—দ্রোণ, ভীষ্ম ও মহাত্মা বিদুরের কিছুমাত্র স্বভাব নাই।” কিন্তু অবলার তেজ কতক্ষণ থাকে! মহাভারতের কবি, মনুষ্যচরিত্র-সাগরের তল পর্য্যন্ত নখদর্পণবৎ দেখিতে পাইতেন। যখন কর্ণ দ্রৌপদীকে বেশ্যা বলিল, দুর্যোধন তাঁহার পরিধেয় আকর্ষণ করিতে গেল, তখন আর দর্প রহিল না—ভয়াধিক্যে হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তখন দ্রৌপদী ডাকিতে লাগিলেন, “হা নাথ! হা রমানাথ! হা রজনাত্ম! হা দুর্যোধন! আমি কৌরবসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি—আমাকে উদ্ধার কর!” এস্থলে কবিত্বের চরমোৎকর্ষ।

দ্রৌপদী স্ত্রীজাতি বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে দর্প প্রবল, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞানও অসামান্য—যখন তিনি দর্পিতা রাজমহিষী হইয়া না দাঁড়ান, তখন জনমণ্ডলে তাদৃশী ধর্ম্মানুরাগিনী আছে বোধ হয় না। এই প্রবল ধর্ম্মানুরাগই, প্রবলতর দর্পের মানদণ্ডের স্বরূপ। এই অসামান্য ধর্ম্মানুরাগ, এবং তেজস্বিতার সহিত সেই ধর্ম্মানুরাগের রমণীয় সামঞ্জস্য, ধৃতরাষ্ট্রের নিকট তাঁহার বরগ্রহণ কালে অতি সুন্দররূপে পরিষ্ফুট হইয়াছে। সে স্থানটি এত সুন্দর যে, যিনি তাহা শতবার পাঠ করিয়াছেন, তিনি তাহা আর একবার পাঠ করিলেও ‘অসুখী হইবেন না। এজন্য সেই স্থানটি আমরা উদ্ধৃত করিলাম।

“হিতৈষী রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে এইরূপ তিরস্কার করিয়া সান্ত্বনাবাক্যে দ্রৌপদীকে কহিলেন, হে দুঃপদতনয়ে! তুমি আমার নিকট স্বীয় অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, তুমি আমার সমুদায় বধুগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

“দ্রৌপদী কহিলেন, হে ভরতকুলপ্রদীপ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন যে, সর্বধর্ম্মযুক্ত শ্রীমান্ যুধিষ্ঠির দাসত্ব হইতে মুক্ত হউন। আপনার পুত্রগণ যেন ঐ মনস্বীকে পুনরায় দাস না বলে, আর আমার পুত্র প্রতিবিন্দ্য যেন দাসপুত্র না হয়; কেন না, প্রতিবিন্দ্য রাজপুত্র, বিশেষতঃ ভূপতিগণকর্তৃক লালিত, উহার দাসপুত্রতা হওয়া নিতান্ত অবিধেয়। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে কল্যাণি! আমি তোমার অভিলাষানুরূপ এই বর প্রদান করিলাম; এক্ষণে তোমাকে আর এক বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করি; তুমি একমাত্র বরের উপযুক্ত নহ।

“দ্রৌপদী কহিলেন, হে মহারাজ! সরথ সশরাসন ভীম, ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেবের দাসত্ব মোচন হউক। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে নন্দিনি! আমি তোমার প্রার্থনানুরূপ বর প্রদান করিলাম; এক্ষণে তৃতীয় বর প্রার্থনা কর। এই দুই বর দান দ্বারা তোমার যথার্থ সৎকার করা হয় নাই, তুমি ধর্ম্মচারিণী, আমার সমুদায় পুত্রবধুগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

“দ্রৌপদী কহিলেন, হে ভগবন্! লোভ ধর্ম্মনাশের হেতু, অতএব আমি আর বর প্রার্থনা করি না। আমি তৃতীয় বর লইবার উপযুক্ত নহি; যেহেতু, বৈশ্যের এক বর, ক্ষত্রিয়পত্নীর দুই বর, রাজার তিন বর ও ব্রাহ্মণের শত বর লওয়া কর্তব্য। এক্ষণে আমার পতিগণ দাসত্বরূপ দারুণ পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া পুনরায় উদ্ধৃত হইলেন, উঁহারা পুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবেন।”

এইরূপ ধর্ম্ম ও গর্বের সুসামঞ্জস্যই দ্রৌপদীচরিত্রের রমণীয়তার প্রধান উপকরণ। যখন জয়দ্রথ তাঁহাকে হরণ মানসে কাম্যকবনে একাকিনী প্রাপ্ত হইলেন, তখন প্রথমে দ্রৌপদী তাঁহাকে ধর্ম্মচারসঙ্গত অতিথিসমুচিত সৌজন্যে পরিতৃপ্ত করিতে বিলক্ষণ যত্ন করেন; পরে জয়দ্রথ আপনার দুর্ভিক্ষি ব্যক্ত করায়, ব্যাঘ্রীর ন্যায় গর্জন করিয়া আপনার তেজোরশি প্রকাশ করেন। তাঁহার সেই তেজোগর্ষ বচনপরম্পরা পাঠে মন আনন্দসাগরে ভাসিতে থাকে। জয়দ্রথ তাহাতে নিরস্ত না হইয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে গিয়া তাহার সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হইলেন; যিনি ভীষ্মজ্ঞানের পত্নী, এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের ভাগিনী, তাঁহার বাহুবলে ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় মহাবীর সিন্ধুসৌবীর্যধিপতি ভূতলে পতিত হইলেন।

পরিশেষে জয়দ্রথ পুনর্বার বল প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে রথে তুলেন; তখন দ্রৌপদী যে আচরণ করিলেন, তাহা নিতান্ত তেজস্বিনী বীরনারীর কাব্য। তিনি বৃথা বিলাপ ও চীৎকার

কিছুই করিলেন না; অন্যান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় একবারও অনবধান এবং বিলম্বকারী স্বামীগণের উদ্দেশ্যে ভৎসনা করিলেন না; কেবল কুলপদুরোহিত ধোম্যের চরণে প্রণিপাতপূর্বক জয়দ্রথের রথে আরোহণ করিলেন। পরে যখন জয়দ্রথ দৃশ্যমান পাণ্ডবদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তখন তিনি জয়দ্রথের রথস্থা হইয়াও যেরূপ গর্ষিত বচনে ও নিঃশঙ্কাচিত্তে অবলীলাক্রমে স্বামীদিগের পরিচয় দিতে লাগিলেন, তাহা পুনঃ পুনঃ পাঠের যোগ্য।

দ্রোপদী

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

দশ বৎসর হইল, বঙ্গদর্শনে আমি দ্রোপদী-চরিত্র সমালোচনা করিয়াছিলাম। অন্যান্য আৰ্যনারী-চরিত্র হইতে দ্রোপদীর-চরিত্রের যে গুরুতর প্রভেদ, তাহা যথাসাধ্য দেখান গিয়াছিল। কিন্তু দ্রোপদীর চরিত্রের মধ্যগ্রন্থি যে তত্ত্ব, তাহার কোন কথা সে সময়ে বলা হয় নাই। বলিবার সময় তখন উপস্থিত হয় নাই। এখন বোধ হয়, সে কথাটা বলা যাইতে পারে।

সে তত্ত্বটার বহির্বিকাশ বড় দীপ্তমান—এক নারীর পণ্ড স্বামী অথচ তাঁহাকে কুলটা বলিয়া বিবেচনা করিবার কোন উপায় দেখা যায় না। এমন অসামঞ্জস্যের সামঞ্জস্য কোথা হইতে হইল?

আমাদিগের ইউরোপীয় শিক্ষকেরা ইহার বড় সোজা উত্তর দিয়া থাকেন। ভারতবর্ষীয়েরা বর্ষের জাতি—তাহাদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের বহুবিবাহ পদ্ধতি পূর্বকালে প্রচলিত ছিল, সেই কারণে পণ্ড পাণ্ডবের একই পত্নী। ইউরোপীয় আচার্যবর্গের আর কোন সাধ্য থাকুক আর না থাকুক, এ দেশ সম্বন্ধে সোজা কথাগুলো বলিতে বড় মজবুত।

ইউরোপীয়েরা এদেশীয় প্রাচীন গ্রন্থ সকল কিরূপ বুঝেন, তদ্বিষয়ে আমাকে সম্প্রতি কিছু অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল। আমার এই বিশ্বাস হইয়াছে যে, সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে তাঁহারা যাহা লিখিয়াছেন, তাঁহাদের কৃত বেদ স্মৃতি দর্শন পুরাণ ইতিহাস কাব্য প্রভৃতির অনুবাদ, টীকা, সমালোচন পাঠ করার অপেক্ষা গুরুতর মহাপাতক সাহিত্যজগতে আর কিছুই হইতে পারে না; আর মুখতা উপস্থিত করিবার এমন সহজ উপায়ও আর কিছুই নাই। এখনও অনেক বাঙ্গালি তাহা পাঠ করেন, তাঁহাদিগের সতর্ক করিবার জন্য এ কথাটা কতক অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আমি লিখিতে বাধ্য হইলাম।

সংস্কৃত গ্রন্থের সংখ্যা নাই বলিলেও হয়। যত অনুসন্ধান হইতেছে, তত নূতন নূতন গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইতেছে। সংস্কৃত গ্রন্থগুলির তুলনায়, অন্ততঃ আকারে, ইউরোপীয় গ্রন্থগুলিকে গ্রন্থ বলিতে ইচ্ছা করে না। যেমন হস্তীর তুলনায় টেরিয়র, যেমন বটবৃক্ষের তুলনায় উইলো, কি সাইপ্রেস, যেমন গঙ্গা সিন্ধু গোদাবরীর তুলনায় গ্রীক কবিদিগের প্রিয় পার্শ্বতী নিব্বরিণী, মহাভারত বা রামায়ণের তুলনায় একখানি ইউরোপীয় কাব্য সেইরূপ গ্রন্থ। বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ, গৃহ্যসূত্র, শ্রোতসূত্র, ধর্মসূত্র, দর্শন, এই সকলের ভাষা, তার টীকা, তার ভাষা, পুরাণ, ইতিহাস, স্মৃতি, কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, গণিত, জ্যোতিষ, অভিধান, ইত্যাদি নানাবিধ সংস্কৃত গ্রন্থে আজিও ভারতবর্ষ সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে। এই লিপিবদ্ধ অনুত্তরণীয় প্রাচীন তত্ত্বসমুদ্র মধ্যে কোথাও ঘূর্ণস্করে এমন কথা নাই যে, প্রাচীন আৰ্যদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের বহুবিবাহ ছিল। তথাপি পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা একা দ্রোপদীর পণ্ড স্বামীর কথা শুনিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। এই জাতীয় একজন পণ্ডিত (Fergusson সাহেব) ভগ্ন অট্টালিকার প্রাচীরে গোটাকত বিবস্ত্রা স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকেরা কাপড় পরিত না—সীতা, সাবিত্রী, দ্রোপদী, দময়ন্তী প্রভৃতি শব্দর ভাস্করের সম্মুখে নগ্নাবস্থায় বিচরণ করিত! তাই বলিতেছিলাম—এই সকল পণ্ডিতদিগের রচনা পাঠ করার অপেক্ষা মহাপাতক সাহিত্যসংসারে দুর্লভ।

দ্রোপদীর পণ্ড স্বামী হইবার স্থূল তাৎপর্য কি, এ কথার মীমাংসা করিবার আগে বিচার করিতে হয় যে, এ কথাটা আদৌ ঐতিহাসিক, না কেবল কবিকল্পনা মাত্র? সত্য সত্যই দ্রোপদীর

বঙ্গীয় রচনাবলী

পঞ্চ স্বামী ছিল, না কবি এইরূপ সাজাইয়াছেন? মহাভারতের যে ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে, তাহা প্রবন্ধান্তরে আমি স্বীকার করিয়াছি ও বদ্বাইয়াছি। কিন্তু মহাভারতের ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলিয়াই যে উহার সকল কথাই ঐতিহাসিক, ইহা সিদ্ধ হয় না। যাহা স্পষ্টতঃ প্রক্ষিপ্ত, তাহা ঐতিহাসিক নহে—এ কথা ত স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু দ্রোপদী-চরিত্র প্রক্ষিপ্ত বলা যায় না—দ্রোপদীকে লইয়াই মৌলিক মহাভারত! তা হউক—কিন্তু মৌলিক মহাভারতে যত কথা আছে, সকলই যে ঐতিহাসিক এবং সত্য, ইহা বলাও দঃসাহসের কাজ। যে সময়ে কবিই ইতিহাসবেত্তা, ইতিহাসবেত্তাও কবি, সে সময়ে কাব্যেও ইতিহাস বিমিশ্রণ বড় সহজ। সত্য কথাকে কবির স্বকপোলকল্পিত ব্যাপারে রঞ্জিত করা বিচিত্র নহে। দ্রোপদী যুধিষ্ঠিরের মহিষী ছিলেন, ইহা না হয় ঐতিহাসিক বলিয়া স্বীকার করা গেল—তিনি যে পঞ্চ পাণ্ডবের মহিষী, ইহাও কি ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে?

এই দ্রোপদীর বহুবিবাহ ভিন্ন ভারতবর্ষীয় গ্রন্থসমুদ্রে মধ্যে ভারতবর্ষীয় আৰ্যদিগের মধ্যে স্ত্রীগণের বহুবিবাহের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। বিধবা হইলে স্ত্রীলোক অন্য বিবাহ করিত, এমন প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এক কালে কেহ একাধিক পতির ভার্য্যা ছিল, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কখন দেখা গিয়াছে যে, কোন মনুষ্যের প্রতি হস্তে ছয়টি করিয়া দুই হস্তে দ্বাদশ অঙ্গুলি আছে; কখন দেখা গিয়াছে যে, কোন মনুষ্য চক্ষুহীন হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। এমন একটি দৃষ্টান্ত দেখিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, মনুষ্যজাতির হাতের অঙ্গুলি বারটি, অথবা মনুষ্য অন্ধ হইয়া জন্মে। তেমনি কেবল দ্রোপদীর বহুবিবাহ দেখিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, পুর্বে আৰ্যনারীগণ-মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। আর মহাভারতেই প্রকাশ যে, এরূপ প্রথা ছিল না; কেন না, দ্রোপদী সম্বন্ধে এমন অলৌকিক ব্যাপার কেন ঘটিল, তাহার কৈফিয়ৎ দিবার জন্য মহাভারতকার পুর্বে জন্মঘটিত নানাবিধ অসম্ভব উপন্যাস রচনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

এখন, যাহা সমাজ মধ্যে একেবারে কোথাও ছিল না, যাহা তাদৃশ সমাজে অত্যন্ত লোক-নিন্দার কারণ স্বরূপ হইত সন্দেহ নাই, তাহা পাণ্ডবদিগের ন্যায় লোকবিখ্যাত রাজবংশে ঘটবার সম্ভাবনা ছিল না। তবে কবির এমন একটা কথা, তত্ত্ববিশেষকে পরিষ্কৃত করিবার জন্য গড়িয়া লওয়া বিচিত্র নহে।

গড়া কথার মত অনেকটা লক্ষণ আছে। দ্রোপদীর পঞ্চ স্বামীর ঔরসে পঞ্চ পুত্র ছিল। কাহারও ঔরসে দুইটি, কি তিনটি হইল না। কাহারও ঔরসে কন্যা হইল না। কাহারও ঔরসে নিষ্ফল গেল না। সেই পাঁচটি পুত্রের মধ্যে কেহ রাজ্যাধিকারী হইল না। কেহই বাঁচিয়া রহিল না। সকলেই এক সময়ে অশ্বখামার হস্তে নিধন পাইল। কাহারও কোন কার্যকারিতা নাই। সকলেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে এক একবার আসিয়া একত্রে দল বাঁধিয়া যুদ্ধ করিয়া চলিয়া যায়। আর কিছুই করেন না। পঞ্চান্তরে অভিমন্যু, ঘটোৎকচ, বভ্রুবাহন, কেমন জীবন্ত।

জিজ্ঞাসা হইতে পারে, যদি দ্রোপদীর পঞ্চ বিবাহ গড়া কথাই হইল, যদি দ্রোপদী একা যুধিষ্ঠিরের ভার্য্যা ছিলেন, তবে কি আর চারি পাণ্ডব অবিবাহিত ছিলেন? ইহার উত্তর কঠিন বটে।

ভীম ও অর্জুনের অন্য বিবাহ ছিল, ইহা আমরা জানি। কিন্তু নকুল সহদেবের অন্য বিবাহ ছিল, এমন কথা মহাভারতে পাই না। পাই না বলিয়াই যে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, তাঁহাদের অন্য বিবাহ ছিল না, এমন নহে। মহাভারত প্রধানতঃ প্রথম তিন পাণ্ডবের অর্থাৎ যুধিষ্ঠির ও ভীমার্জুনের জীবনী; অন্য দুই পাণ্ডব তাঁহাদের ছায়া মাত্র—কেবল তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া কাজ করে। তাহাদের অন্য বিবাহ থাকিলে সেটা প্রয়োজনীয় কথা নহে বলিয়া মহাভারতকার ছাড়িয়াও যাইতে পারেন। কথাটা তাদৃশ মারাত্মক নহে। দ্রোপদীর পঞ্চ স্বামী হওয়ার পক্ষে আমরা উপরে যে আর্পিত দেখাইয়াছি, তাহা অপেক্ষাকৃত অনেক গুরুতর।

এখন, যদি দ্রোপদীর পঞ্চবিবাহ কবিরই কল্পনা বিবেচনা করা যায়, তবে কবি কি অভিপ্রায়ে এমন বিস্ময়করী কল্পনার অনুবর্তী হইলেন? বিশেষ কোন গুঢ় অভিপ্রায় না থাকিলে এমন কুটীল পথে যাইবেন কেন। তাঁহার অভিপ্রায় কি? পাঠক যদি ইংরেজদিগের মত বলেন “Tut! clear case of polyandry!” তবে সব ফুরাইল। আর তা যদি না বলেন, তবে ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে হইবে।

বিবিধ প্রবন্ধ—দ্রোপদী

সেই তত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার আগে কোন বিজ্ঞ ও শ্রদ্ধাস্পদ লোকের একটি উক্তি আমি উদ্ধৃত করিব। কথাটা প্রচারে প্রকাশিত “কৃষ্ণচরিত্রকে” লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে—

“শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্য শরীর ধারণ পূর্বেক ইহলোকে বিচরণ করিয়াছিলেন, এ কথা আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু মহাভারতপ্রণয়নের পূর্বেকাল হইতেও যে, শ্রীকৃষ্ণে একটি অতিমানুষ ঐশী শক্তির আবির্ভাব লোকের বিশ্বাসিত হইয়াছিল, তাহাও প্রমাণিত বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং প্রথম হইতেই মহাভারতগ্রন্থেও যে সেই বোধের একটি অপূর্বে প্রতিবিম্ব পড়িবে, তাহা আশ্চর্যের বিষয় নহে; বস্তুতঃ তাহাই সম্ভবপর। তবে আমাদের বোধ হয়, মহাভারতরচয়িতা কৰ্মকাণ্ড বেদব্যাখ্যা প্রভৃতি তাঁহার বহুবিধ উদ্দেশ্যের মধ্যে অর্জুন এবং ভদ্রাকে আদর্শ নর-নারী করিয়া বর্ণন করিয়াছেন, এবং ঈশ্বরে অচল ভক্তি এবং তজ্জাত ঈশ্বরের নেতৃত্বে প্রতীতিই যে আদর্শ পুরুষের প্রকৃত বল, তাহাও প্রদর্শনার্থ নরোত্তম শ্রীকৃষ্ণে একটি বিশেষ ঐশী শক্তিকে মূর্ত্তিমতী করিয়া দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। সে ঐশী শক্তিটি কোন পার্থিব পাত্র কোন দেশের কোন কবি কর্তৃকই কখন ধৃত হয় নাই। আদি কবি বাল্মীকিও তাহা ধরিবার চেষ্টা করেন নাই—মহাভারতকার সেই কাজে অধ্যবসায় করিয়াছিলেন, এবং তাহা যতদূর সম্পন্ন হইতে পারে, ততদূর সম্পন্ন করিয়াছিলেন বলিয়াই, মহাভারত গ্রন্থখানি পঞ্চম বেদ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ঐ ঐশী শক্তির নাম ‘নির্লিপ্ততা’। শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যরূপী ‘নির্লেপ’।”*

এই “নির্লেপ” ঐব্রাগ্য নহে অথবা সাধারণে যাহাকে “বৈরাগ্য” বলে, তাহা নহে। আমি ইহার মর্ম যতদূর বুঝি, গীতা হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহা বুঝাইতেছি।

রাগদ্বৈষবিমুক্তৈশ্চ বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।

আত্মবশৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥

আসক্তি বিদ্বেষ রহিত এবং আত্মার বশীভূত ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা (ইন্দ্রিয়ের) বিষয় সকল উপভোগ করিয়া সংযতাত্মা পুরুষ শান্তি প্রাপ্ত হইয়েন।

অতএব নির্লিপ্তের পক্ষে ইন্দ্রিয় বিষয়ের উপভোগ বর্জন নিষ্প্রয়োজন। এবং বর্জনে সংলিপ্তই বুঝায়। বর্জনের প্রয়োজন আছে, ইহাতেই বুঝায় যে, ইন্দ্রিয়ে এখন আত্মা লিপ্ত আছে—বর্জন ভিন্ন বিচ্ছেদ এখনও অসাধ্য। কিন্তু যিনি ইন্দ্রিয় বিষয়ের উপভোগী থাকিয়াও তাহাতে অনুরাগশূন্য, যিনি সেই সকল ইন্দ্রিয়কে বিজিত করিয়া অনুষ্ঠেয় কৰ্ম সম্পাদনার্থ বিষয়ের উপভোগ করেন, তিনিই নির্লিপ্ত। তাঁহার আত্মার সঙ্গে ভোগ্য বিষয় আর সংশ্লিষ্ট নহে। তিনি পাপ ও দুঃখের অতীত।

এইরূপ “নির্লেপ” বা “অনাসক্ত” পরিষ্ফুট করিবার জন্য হিন্দুশাস্ত্রকারেরা একটা কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকেন—নির্লিপ্ত বা অনাসক্তকে অধিকমাত্রায় ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের দ্বারা পরিবেষ্টিত করেন। এই জন্য মহাভারতের পরবর্তী পুরাণকারেরা শ্রীকৃষ্ণকে অসংখ্য বরাহনামধাবর্তী করিয়াছেন। এই জন্য তান্ত্রিকদিগের সাধন প্রণালীতে এত বেশী ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর আবির্ভাব। যে এই সকল মধ্যে যথেষ্ট বিচরণ করিয়া তাহাতে অনাসক্ত রহিল, সেই নির্লিপ্ত। দ্রোপদীর বহু স্বামীও এই জন্য। দ্রোপদী স্ত্রীজাতির অনাসক্ত ধর্মের মূর্ত্তি-স্বরূপিণী। তৎস্বরূপে তাঁহাকে স্থাপন করাই কবির উদ্দেশ্য। তাই গণিকার ন্যায় পণ্ড পুরুষের সংসর্গযুক্ত হইয়াও দ্রোপদী সাধবী, পাতিব্রতের পরাকাষ্ঠা। পণ্ড পতি দ্রোপদীর নিকট এক পতি মাত্র, উপাসনার এক বস্তু, এবং ধর্মাচরণের একমাত্র অভিন্ন উপলক্ষ্য। যেমন প্রকৃত ধর্মাচার নিকট বহু দেবতাও এক ঈশ্বর মাত্র—ঈশ্বরই জ্ঞানীর নিকট এক মাত্র অভিন্ন উপাস্য, তেমনি পণ্ড স্বামী অনাসক্তযুক্তা দ্রোপদীর নিকট এক মাত্র ধর্মাচরণের স্থল। তাঁহার পক্ষাপক্ষ, ভেদাভেদ, ইতরবিশেষ নাই; তিনি গৃহধর্ম নিষ্কাম, নিশ্চল, নির্লিপ্ত হইয়া অনুষ্ঠেয় কৰ্ম প্রবৃত্ত। ইহাই দ্রোপদী-চরিত্রে অসামঞ্জস্যের সামঞ্জস্য। তবে ঈদৃশ ধর্ম অতিদুঃসাধনীয়। মহাভারতকার মহাপ্রাস্থানিক পর্বে সেটুকুও বুঝাইয়াছেন। তথায় কথিত হইয়াছে যে, দ্রোপদীর অর্জুনের দিগে কিঞ্চিৎ পক্ষপাত ছিল বলিয়া তিনি সেই পাপফলে সশরীরে স্বর্গারোহণ করিতে পারিলেন না—সর্বাগ্রেই পৃথিমধ্যে পতিতা হইলেন।

বোধ হয়, এখন বুঝিতে পারা যায় যে, দ্রোপদীর পাঁচ স্বামীর ঔরসে কেবল এক একটি

* এডুকেশন গেজেট, ১৮ বৈশাখ ১২৯৩।

বাংকম রচনাবলী

পুত্র কেন? হিন্দু শাস্ত্রানুসারে পুত্রোৎপাদন ধর্ম; গৃহীর তাহাতে বিরতি অধর্ম। পুত্র উৎপন্ন হইলে বিবাহ সফল হইল; না হইলে, ধর্ম অসম্পূর্ণ রহিল। কিন্তু ধর্মের যে প্রয়োজন, এক পুত্রেই তাহা সিদ্ধ হয়। একাধিক পুত্রের উৎপাদন ধর্মার্থে নিষ্প্রয়োজনীয়—কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ফল মাত্র। কিন্তু দ্রোপদী ইন্দ্রিয়সুখে নির্লিপ্ত; ধর্মের প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে, স্বামিগণের সঙ্গে তাহার ঐন্দ্রিয়িক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল। স্বামীর ধর্মার্থ দ্রোপদী সকল স্বামীর ঔরসে এক এক পুত্র গর্ভে ধারণ করিলেন; তৎপরে নির্লেপবশতঃ আর সন্তান গর্ভে ধারণ করিলেন না। কবির কল্পনার এই তাৎপর্য।

এই সকল কথার তাৎপর্য বোধ করি, কেহই এমন বুঝিবেন না যে, যে স্ত্রীলোক অনাসঙ্গ ধর্ম গ্রহণ করিবে, সেই পাঁচ ছয়টি মনুষ্যকে স্বামিত্বে বরণ করিবে—তাহা নহিলে ধর্মের সাধন হইবে না। তাৎপর্য এই মাত্র যে, যাহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, মহাপাতকে পড়িলেও পাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। দ্রোপদীর অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছিল, স্ত্রীলোকের পক্ষে তেমন মহাপাপ আর কিছুই নাই। কিন্তু দ্রোপদীর চিত্তশুদ্ধি জন্মিয়াছিল বলিয়া, তিনি সেই মহাপাপকেও ধর্ম পরিণত করিয়াছিলেন।

আমি প্রথম প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, দ্রোপদী ধর্মবলে অত্যন্ত দৃষ্টা; সে দর্প কখন কখন ধর্মকেও অতিক্রম করে। সেই দর্পের সঙ্গে এই ইন্দ্রিয়জয়ের কোন অসামঞ্জস্য নাই। তবে তাহার নিষ্কাম ধর্ম সর্বঙ্গীণ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল কি না, সে স্কতন্ত্র কথা।

অনুকরণ *

জগদীশ্বরকৃপায়, ঊনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক বাঙ্গালি নামে এক অদ্ভুত জন্তু এই জগতে দেখা গিয়াছে। পশুতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, এই জন্তু বাহ্যতঃ মনুষ্য-লক্ষণাক্রান্ত; হস্তে পদে পাঁচ পাঁচ অঙ্গুলি, লাঙ্গুল নাই, এবং অস্থি ও মস্তিষ্ক, “বাইমেনা” জাতির সদৃশ বটে। তবে অন্তঃস্বভাব সম্বন্ধে, সেরূপ নিশ্চয়তা এখনও হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, ইহারা অন্তঃস্বন্ধেও মনুষ্য বটে, কেহ কেহ বলেন, ইহারা বাহিরে মনুষ্য, এবং অন্তরে পশু। এই তত্ত্বের মীমাংসা জন্য, শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু ১৭৯৪ শকের চৈত্র মাসে বক্তৃতা করেন। এক্ষণে তাহা মূদ্রিত করিয়াছেন। তিনি এ বক্তৃতায় পশুপক্ষই সমর্থন করিয়াছেন।

আমরা কোন্ মতাবলম্বী? আমরাও বাঙ্গালির পশুতত্ত্ববাদী। আমরা ইংরেজী সম্বাদপত্র হইতে এ পশুতত্ত্ব অভ্যাস করিয়াছি। কোন কোন তাম্রশ্মশ্রু ঋষির মত এই যে, যেমন বিধাতা ত্রিলোকের সুন্দরীগণের সৌন্দর্য্য তিল তিল সংগ্রহ করিয়া তিলোত্তমার সৃজন করিয়াছিলেন; সেইরূপ পশুবৃতির তিল তিল করিয়া সংগ্রহপূর্বক এই অপূর্ব নব্য বাঙ্গালিচরিত্র সৃজন করিয়াছেন। শৃগাল হইতে শঠতা, কুক্কুর হইতে তোষামদ ও ভিক্ষানুরাগ, মেষ হইতে ভীরুতা, বানর হইতে অনুকরণপটুতা, এবং গর্দভ হইতে গর্জন—এই সকল একত্র করিয়া, দিগ্‌মণ্ডল উজ্জ্বলকারী, ভারতবর্ষের ভরসার বিষয়ীভূত, এবং ভট্ট মক্ষমূলরের আদরের স্থল, নব্য বাঙ্গালিকে সমাজাকাশে উদ্ভিত করিয়াছেন। যেমন সুন্দরীমণ্ডলে তিলোত্তমা, গ্রন্থমধ্যে রিচার্ডসন্স সিলেক্‌সন্স, যেমন পোষাকের মধ্যে ফকিরের জামা, মদ্যের মধ্যে পণ্ড, খাদ্যের মধ্যে খিচুড়ি, তেমনি এই মহাত্মাদিগের মতে মনুষ্যের মধ্যে নব্যবাঙ্গালি। যেমন ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন করিলে চন্দ্র উঠিয়া জগৎ আলো করিয়াছিল—তেমনি পশুচরিত্রসাগর মন্থন করিয়া, এই অনিন্দনীয় বাবু চাঁদ উঠিয়া ভারতবর্ষ আলো করিতেছেন। রাজনারায়ণবাবুর ন্যায়, যে সকল অমূল্য লোক রাহু হইয়া এই কলঙ্কশূন্য চাঁদকে গ্রাস করিতে যান, আমরা তাহাদের নিন্দা করি। বিশেষতঃ রাজনারায়ণবাবুকে বলি যে, আপনিই এই গ্রন্থমধ্যে গোমাংসভোজন নিষেধ করিয়াছেন, তবে বাঙ্গালির মূণ্ড খাইতে বসিয়াছেন কেন?—গোরু হইতে বাঙ্গালি কিসে অপকৃষ্ট? গোরুও যেমন উপকারী, নব্য বাঙ্গালিও সেইরূপ। ইহারা সম্বাদপত্ররূপ, ভাণ্ড ভাণ্ড সুস্বাদু দুগ্ধ দিতেছে; চাকরি-লাঙ্গল কাঁধে লইয়া, জীবনক্ষেত্র কর্ষণ পূর্বক ইংরেজ

* সকাল আর একাল। শ্রীরাজনারায়ণ বসু প্রণীত।

চাষার ফসলের যোগাড় করিয়া দিতেছে; বিদ্যার ছালা পিঠে করিয়া কালেজ হইতে ছাপাখানায় আনিয়া ফেলিয়া, চিনির বলদের নাম রাখিতেছে; সমাজ সংস্কারের গাড়িতে বিলাতি মাল বোঝাই দিয়া, রসের বাজারে ঢোলাই করিতেছে; এবং দেশহিতের ঘানিগাছে স্বার্থসর্ষপ পেষণ করিয়া, যশের তেল বাহির করিতেছে। এত গুণের গোরুকে কি বধ করিতে আছে?

কিন্তু যিনি বাঙ্গালির যত নিন্দা করুন, বাঙ্গালি তত নিন্দনীয় নহে। রাজনারায়ণবাবুও বাঙ্গালির যত নিন্দা করিয়াছেন, বাঙ্গালি তত নিন্দনীয় নহে। অনেক স্বদেশবৎসল যে অভিপ্রায়ে বাঙ্গালির নিন্দা করেন, রাজনারায়ণবাবুও সেই অভিপ্রায়ে বাঙ্গালির নিন্দা করিয়াছেন—বাঙ্গালির হিতার্থ। সেকালে আর একালে নিরপেক্ষ ভাবে তুলনা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে—একালের দোষ-নির্বাচনই তাঁহার উদ্দেশ্য। একালের গুণগুলির প্রতি তিনি বিশেষ দৃষ্টিক্ষেপ করেন নাই—করাও নিষ্প্রয়োজন; কেন না, আমরা আপনাদিগের গুণের প্রতি পলকের জন্য সন্দেহযুক্ত নাই।

নব্য বাঙ্গালির অনেক দোষ। কিন্তু সকল দোষের মধ্যে, অনুকরণানুরাগ সর্ব্ববাদিসম্মত। কি ইংরেজ, কি বাঙ্গালি, সকলেই ইহার জন্য বাঙ্গালি জাতিকে অহরহ তিরস্কৃত করিতেছেন। তদ্বশয়ে রাজনারায়ণবাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিবার আবশ্যিকতা নাই—সে সকল কথা আজিকালি সকলেরই মুখে শুনিতে পাওয়া যায়।

আমরা সে সকল কথা স্বীকার করি, এবং ইহাও স্বীকার করি যে, রাজনারায়ণবাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহার অনেকগুলিই সঙ্গত। কিন্তু অনুকরণসম্বন্ধে দুই একটি সাধারণ ভ্রম আছে।

অনুকরণ মাত্র কি দৃশ্য? তাহা কদাচ হইতে পারে না। অনুকরণ ভিন্ন প্রথম শিক্ষার উপায় কিছুই নাই। যেমন শিশু বয়ঃপ্রাপ্তের বাক্যানুকরণ করিয়া কথা কহিতে শিখে, যেমন সে বয়ঃপ্রাপ্তের কার্য্য সকল দেখিয়া কার্য্য করিতে শিখে, অসভ্য এবং অশিক্ষিত জাতি সেইরূপ সভ্য এবং শিক্ষিত জাতির অনুকরণ করিয়া সকল বিষয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। অতএব বাঙ্গালি যে ইংরেজের অনুকরণ করিবে, ইহা সঙ্গত ও যুক্তিসিদ্ধ। সত্য বটে, আদিম সভ্যজাতি বিনানুকরণে স্বতঃশিক্ষিত এবং সভ্য হইয়াছিল; প্রাচীন ভারতীয় ও মিশরীয় সভ্যতা কাহারও অনুকরণলব্ধ নহে। কিন্তু যে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা সর্ব্বজাতীয় সভ্যতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাহা কিসের ফল? তাহাও রোম ও যুনানী সভ্যতার অনুকরণের ফল। রোমক সভ্যতাও যুনানী সভ্যতার অনুকরণফল। যে পরিমাণে বাঙ্গালি, ইংরেজের অনুকরণ করিতেছে, পূর্বাভুঞ্জ জানেন যে, ইউরোপীয়েরা প্রথমাবস্থাতে তদপেক্ষা অল্প পরিমাণে যুনানীয়ে, বিশেষতঃ রোমকীয়ে অনুকরণ করেন নাই। প্রথমাবস্থাতে অনুকরণ করিয়াছিলেন বলিয়াই এখন এ উচ্চসোপানে দাঁড়াইয়াছেন। শৈশবে পরের হাতে ধরিয়া যে জলে নামিতে না শিখিয়াছে, সে কখনই সাঁতার দিতে শিখে নাই; কেন না, ইহ জন্মে তাহার জলে নামাই হইল না। শিক্ষকের লিখিত আদর্শ দেখিয়া যে প্রথমে লিখিতে না শিখিয়াছে, সে কখনই লিখিতে শিখে নাই। বাঙ্গালি যে ইংরেজের অনুকরণ করিতেছে, ইহাই বাঙ্গালির ভরসা।

তবে লোকের বিশ্বাস এই যে, অনুকরণের ফলে কখন প্রথম শ্রেণীর উৎকর্ষ প্রাপ্তি হয় না। কিসে জানিলে?

প্রথম, সাহিত্য সম্বন্ধে দেখ। পৃথিবীর কতকগুলি প্রথম শ্রেণীর কাব্য, কেবল অনুকরণ মাত্র। ড্রাইডেন এবং বোয়ালোর অনুকারী পোপ, পোপের অনুকারী জন্সন। এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লেখকদিগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আমরা এ কথা সপ্রমাণ করিতে চাই না। বার্জিলের মহাকাব্য, হোমরের প্রসিদ্ধ মহাকাব্যের অনুকরণ। সমুদয় রোমকসাহিত্য, যুনানীয় সাহিত্যের অনুকরণ। যে রোমকসাহিত্য বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি, তাহা অনুকরণ মাত্র। কিন্তু বিদেশীয় উদাহরণ দূরে থাকুক। আমাদের স্বদেশে দুইখানি মহাকাব্য আছে—তাহাকে মহাকাব্য বলে না, গৌরবার্থ ইতিহাস বলে—তাহা পৃথিবীর সকল কাব্যের শ্রেষ্ঠ। গুণে উভয়ে প্রায় তুল্য; অল্প তারতম্য। একখানি আর একখানির অনুকরণ।

মহাভারত যে রামায়ণের পরকালে প্রণীত, তাহা হুইলর সাহেব ভিন্ন বোধ হয় আর কেহই সহজ অবস্থায় অস্বীকার করিবেন না। অন্যান্য অনুকৃত এবং অনুকরণের নায়কসকলে যতটা প্রভেদ দেখা যায়, রামে ও যুধিষ্ঠিরে তাহার অপেক্ষা অধিক প্রভেদ নহে। রামায়ণের অমিত-বলধারী বীর, জিতেন্দ্রিয়, দ্রাঘবৎসল লক্ষ্মণ মহাভারতে অজ্ঞানে পরিণত হইয়াছেন, এবং ভরত শত্রুঘ্ন নকুল সহদেব হইয়াছেন। ভীম, নতন সৃষ্টি, তবে কুস্তকর্ণের একটু ছায়ায়

বিশ্বকম রচনাবলী

দাঁড়াইয়াছেন। রামায়ণে রাবণ, মহাভারতে দুর্যোধন; রামায়ণে বিভীষণ, মহাভারতে বিদুর; অভিমন্যু, ইন্দ্রজিতের অস্থিমজ্জা লইয়া গঠিত হইয়াছে। এদিকে রাম ভ্রাতা ও পত্নী সহিত বনবাসী; যুধিষ্ঠিরও ভ্রাতা ও পত্নী সহিত বনবাসী। উভয়েই রাজ্যচ্যুত। একজনের পত্নী অপহৃত, আর একজনের পত্নী সভামধ্যে অপমানিতা; উভয় মহাকাব্যের সারভূত সমরানলে সেই অগ্নি জ্বলন্ত; একে স্পষ্টতঃ, অপরে অস্পষ্টতঃ। উভয় কাব্যের উপন্যাসভাগ এই যে, যুবরাজ রাজ্যচ্যুত হইয়া, ভ্রাতা ও পত্নীসহ বনবাসী, পরে সমরে প্রবৃত্ত, পরে সমরবিজয়ী হইয়া পুনর্বার স্বরাজ্যে স্থাপিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাতেই সেই সাদৃশ্য আছে; কুশীলবের পালা মণিপুত্রে বদ্রবাহন কর্তৃক অভিনীত হইয়াছে; মিথিলায় ধনুর্ভঙ্গ, পাণ্ডালে মৎস্যবিধানে পরিণত হইয়াছে; দশরথকৃত পাপে এবং পাণ্ডুকৃত পাপে বিলক্ষণ ঐক্য আছে। মহাভারতকে রামায়ণের অনুকরণ বলিতে ইচ্ছা না হয়, না বলুন; কিন্তু অনুকরণীয়ে এবং অনুকৃতে ইহার অপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অতি বিরল। কিন্তু মহাভারত অনুকরণ হইয়াও কাব্যমধ্যে পৃথিবীতে অন্যত্র অতুল—একা রামায়ণই তাহার তুলনীয়। অতএব অনুকরণ মাত্র হয় নহে।

পরে, সমাজ সম্বন্ধে দেখ। যখন রোমকেরা যুনানীয় সভ্যতার পরিচয় পাইলেন, তখন তাঁহারা কায়মনোবাক্যে যুনানীয়দিগের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার ফল, কিকিরোর বাগ্মিতা, তাসিতসের ইতিবৃত্তগ্রন্থ, বর্জিলের মহাকাব্য, প্লতস ও টেবেন্সের নাটক, হরেস ও ওবিদের গীতিকাব্য, পেপিণিয়নের ব্যবস্থা, সেনেকার ধর্মনীতি, আন্তোনিদিগের রাজধর্ম, লুকালসের ভোগাসক্তি, জনসাধারণের ঐশ্বর্য্য, এবং সম্রাটগণের স্থাপত্য কীর্তি। আধুনিক ইউরোপীয়দিগের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে; ইতালীয়, ফরাসি-সাহিত্য, গ্রীক ও রোমীয় সাহিত্যের অনুকরণ; ইউরোপীয় ব্যবস্থা-শাস্ত্র, রোমক ব্যবস্থা-শাস্ত্রের অনুকরণ; ইউরোপীয় শাসন-প্রণালী, রোমকীয়ের অনুকরণ। কোথাও সেই ইম্পারেটর, কোথাও সেই সেনেট, কোথাও সেই প্লেবের শ্রেণী; কোথাও ফোরম, কোথাও সেই মিউনিসিপিয়ম্। আধুনিক ইউরোপীয় স্থাপত্য ও চিত্রবিদ্যাও যুনানী ও রোমক মূলবিশিষ্ট। এই সকলই প্রথমে অনুকরণ মাত্রই ছিল; এক্ষণে অনুকরণাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া পৃথগ্ভাবাপন্ন ও উন্নত হইয়াছে। প্রতিভা থাকিলেই এরূপ ঘটে, প্রথম অনুকরণ মাত্র হয়; পরে অভ্যাসে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে শিশু প্রথম লিখিতে শিখে, তাহাকে প্রথমে গুরুর হস্তাক্ষরের অনুকরণ করিতে হয়—পরিণামে তাহার হস্তাক্ষর স্বতন্ত্র হয়, এবং প্রতিভা থাকিলে সে গুরুর অপেক্ষা ভাল লিখিয়াও থাকে।

তবে প্রতিভাশূন্যের অনুকরণ বড় কদর্য্য হয় বটে। যাহার যে বিষয়ে নৈসর্গিক শক্তি নাই, যে চিরকালই অনুকারী থাকে, তাহার স্বাতন্ত্র্য কখন দেখা যায় না। ইউরোপীয় নাটক ইহার বিশিষ্ট উদাহরণ। ইউরোপীয় জাতি মাত্রেরই নাটক আদৌ যুনানী নাটকের অনুকরণ। কিন্তু প্রতিভার গুণে স্পেনীয় এবং ইংলণ্ডীয় নাটক শীঘ্রই স্বাতন্ত্র্য লাভ করিল—এবং ইংলণ্ড এ বিষয়ে গ্রীসের সমকক্ষ হইল। এদিকে এতদ্বিষয়ে স্বাভাবিক শক্তিশূন্য রোমীয়, ইতালীয়, ফরাসি এবং জর্ম্মনীয়গণ অনুকারীই রহিলেন। অনেকেই বলেন যে, শেষোক্ত জাতিসকলের নাটকের অপেক্ষাকৃত অনুৎকর্ষ তাঁহাদিগের অনুচিকীর্ষার ফল। এটি ভ্রম। ইহা নৈসর্গিক ক্ষমতার অপ্রতুলেরই ফল। অনুচিকীর্ষাও সেই অপ্রতুলের ফল। অনুচিকীর্ষাও কাব্য, কারণ নহে।

অনুকরণ যে গালি বলিয়া আজি কালি পরিচিত হইয়াছে, তাহার কারণ প্রতিভাশূন্য ব্যক্তির অনুকরণে প্রবৃত্তি। অক্ষম ব্যক্তির কৃত অনুকরণ অপেক্ষা ঘণাকর আর কিছুই নাই; একে মন্দ, তাহাতে অনুকরণ। নচেৎ অনুকরণ মাত্র ঘণ্য নহে; এবং বাঙ্গালির বর্তমান অবস্থায় তাহা দোষের নহে। বরং এরূপ অনুকরণই স্বভাবসিদ্ধ। ইহাতে যে বাঙ্গালির স্বভাবের কিছু বিশেষ দোষ আছে, এমন বোধ করিবার কারণ নির্দেশ করা কঠিন। ইহা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ দোষ বা গুণ। যখন উৎকৃষ্ট এবং অপকৃষ্ট একত্রিত হয়, তখন অপকৃষ্ট স্বভাবতই উৎকৃষ্টের সমান হইতে চাহে। সমান হইবার উপায় কি? উপায়, উৎকৃষ্ট যেরূপ করে, সেইরূপ কর, সেইরূপ হইবে। তাহাকেই অনুকরণ বলে। বাঙ্গালি দেখে, ইংরেজ সভ্যতায়, শিক্ষায়, বলে, ঐশ্বর্য্য, সুখে, সর্বাংশে বাঙ্গালি হইতে শ্রেষ্ঠ। বাঙ্গালি কেন না ইংরেজের মত হইতে চাহিবে? কিন্তু কি প্রকারে সেরূপ হইবে? বাঙ্গালি মনে করে, ইংরেজ যাহা যাহা করে, সেইরূপ সেইরূপ করিলে, ইংরেজের মত সভ্য, শিক্ষিত, সম্পন্ন, সুখী হইবে। অন্য যে কোন

জাতি হউক না কেন, ঐ অবস্থাপন্ন হইলে ঐরূপ করিত। বাঙ্গালির স্বভাবের দোষে এ অনুকরণপ্রবৃত্তি নহে। অস্ততঃ বাঙ্গালির তিনটি প্রধান জাতি—ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, আৰ্য্যবংশ-সম্ভূত; আৰ্য্যশোণিত তাহাদের শরীরে অদ্যাপি বহিতেছে; বাঙ্গালি কখনই বানরের ন্যায় কেবল অনুকরণের জন্যই অনুকরণপ্রিয় হইতে পারে না। এ অনুকরণ স্বাভাবিক, এবং পরিণামে মঙ্গলপ্রদ হইতে পারে। যাঁহারা আমাদিগের কৃত ইংরেজের আহার ও পরিচ্ছদের অনুকরণ দেখিয়া রাগ করেন, তাঁহারা ইংরেজকৃত ফরাসিদিগের আহার পরিচ্ছদের অনুকরণ দেখিয়া কি বলিবেন? এ বিষয়ে বাঙ্গালির অপেক্ষা ইংরেজেরা অল্পাংশে অনুকারী? আমরা অনুকরণ করি, জাতীয় প্রভুর; ইংরেজরা অনুকরণ করেন—কাহার?

ইহা আমরা অবশ্য স্বীকার করি যে, বাঙ্গালি যে পরিমাণে অনুকরণে প্রবৃত্ত, ততটা বাঞ্ছনীয় না হইতে পারে। বাঙ্গালির মধ্যে প্রতিভাশূন্য অনুকারীরই বাহুল্য; এবং তাঁহাদিগকে প্রায় গুণভাগের অনুকরণে প্রবৃত্ত না হইয়া দোষভাগের অনুকরণেই প্রবৃত্ত দেখা যায়। এইটি মহা দুঃখ। বাঙ্গালি গুণের অনুকরণে তত পটু নহে; দোষের অনুকরণে ভূমুণ্ডলে অধিতীয়। এই জন্যই আমরা বাঙ্গালির অনুকরণপ্রবৃত্তিকে গালি পাড়ি, এবং এই জন্যই রাজনারায়ণবাবু যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহার অনেকগুলিকে যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিতেছি।

যেখানে অনুকারী প্রতিভাশালী, সেখানেও অনুকরণের দুইটি মহৎ দোষ আছে। একটি বৈচিত্র্যের বিঘ্ন। ঐ সংসারে একটি প্রধান সুখ, বৈচিত্র্য-ঘটিত। জগতীতলস্থ সর্ব পদার্থ যদি এক বর্ণের হইত, তবে জগৎ কি এত সুখদৃশ্য হইত? সকল শব্দ যদি এক প্রকার হইত—মনে কর, কোকিলের স্বরের ন্যায় রব ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য কোন প্রকার শব্দ না থাকিত, তবে কি সে শব্দ সকলের কর্ণজ্বালাকর হইত না? আমরা সেরূপ স্বভাব পাইলে, না হইতে পারিত। কিন্তু এক্ষণে আমরা যে প্রকৃতি লইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে বৈচিত্র্যই সুখ। অনুকরণে এই সুখের ধ্বংস হয়। মাকবেথ উৎকৃষ্ট নাটক, কিন্তু পৃথিবীর সকল নাটক মাকবেথের অনুকরণে লিখিত হইলে, নাটকে আর কি সুখ থাকিত? সকল মহাকাব্য রঘুবংশের আদর্শে লিখিত হইলে, কে আর কাব্য পড়িত?

দ্বিতীয়, সকল বিষয়েই যল্পপৌনঃপুন্যে উৎকর্ষের সম্ভাবনা। কিন্তু পরবর্তী কার্য্য পূর্ষবর্তী কার্য্যের অনুকরণ মাত্র হইলে, চেষ্টা কোন প্রকার নতন পথে যায় না; সুতরাং কার্য্যের উন্নতি ঘটে না। তখন ধারাবাহিকতা প্রাপ্ত হইতে হয়। ইহা কি শিক্ষণ সাহিত্য বিজ্ঞান, কি সামাজিক কার্য্য, কি মানসিক অভ্যাস, সকল সম্বন্ধেই সত্য।

মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকলেরই সমকালিক যথোচিত স্ফূর্তি এবং উন্নতি মনুষ্যদেহ ধারণের প্রধান উদ্দেশ্য। তবে যাহাতে কতকগুলির অধিকতর পরিপূষ্টি, এবং কতকগুলির প্রতি তাচ্ছল্য জন্মে, তাহা মনুষ্যের অনিষ্টকর। মনুষ্য অনেক, এবং একজন মনুষ্যের সুখও বহুবিধ। তত্তাবৎ সাধনের জন্য বহুবিধ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের কার্য্যের আবশ্যিকতা। ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোকের দ্বারা ভিন্ন সম্পন্ন হইতে পারে না। এক শ্রেণীর চরিত্রের লোকের দ্বারা, বহু প্রকারের কার্য্য সাধিত হইতে পারে না। অতএব সংসারে চরিত্রবৈচিত্র্য, কার্য্যবৈচিত্র্য, এবং প্রবৃত্তির বৈচিত্র্য প্রয়োজন। তদ্ব্যতীত সমাজের সকল বিষয়ে মঙ্গল নাই। অনুকরণপ্রবৃত্তিতে ইহাই ঘটে যে, অনুকারীর চরিত্র, তাহার প্রবৃত্তি, এবং তাহার কার্য্য, অনুকরণীয়ের ন্যায় হয়, পথান্তরে গমন করিতে পারে না। যখন সমাজস্থ সকলেই বা অধিকাংশ লোক বা কার্য্যক্ষম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ, একই আদর্শের অনুকারী হইয়েন, তখন এই বৈচিত্র্যহানি অতি গুরুতর হইয়া উঠে। মনুষ্য-চরিত্রের সর্বাপ্রাণ স্ফূর্তি ঘটে না; সর্ব-প্রকারের মনোবৃত্তি সকলের মধ্যে, যথোচিত সামঞ্জস্য থাকে না, সর্বপ্রকারের কার্য্য সম্পাদিত হয় না, মনুষ্যের কপালে সকল প্রকার সুখ ঘটে না—মনুষ্যত্ব অসম্পূর্ণ থাকে, সমাজ অসম্পূর্ণ থাকে, মনুষ্যজীবন অসম্পূর্ণ থাকে।

আমরা যে কয়টি কথা বলিয়াছি, তাহাতে নিম্নলিখিত তত্ত্বসকলের উপলব্ধি হইতে পারে—

১। সামাজিক সভ্যতার আদি দুই প্রকার: কোন কোন সমাজ স্বতঃ সভ্য হয়, কোন কোন সমাজ অন্যত্র হইতে শিক্ষা লাভ করে। প্রথমোক্ত সভ্যতালাভ বহুকালসাপেক্ষ; দ্বিতীয়োক্ত আশু সম্পন্ন হয়।

২। যখন কোন অপেক্ষাকৃত অসভ্য জাতি, সভ্যতর জাতির সংস্পর্শ লাভ করে, তখন

বীক্ষম রচনাবলী

দ্বিতীয় পথে সভ্যতা অতি দ্রুতগতিতে আসিতে থাকে। সে স্থলে সামাজিক গতি এইরূপ হয় যে, অপেক্ষাকৃত অসভ্য সমাজ সভ্যতর সমাজের সর্বাঙ্গীণ অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম।

৩। অতএব বঙ্গীয় সমাজের দৃশ্যমান অনুকরণপ্রবৃত্তি অস্বাভাবিক বা বাঙ্গালির চরিত্র-দোষজনিত নহে।

৪। অনুকরণ মাত্রই অনিষ্টকারী নহে, কখন কখন তাহাতে গুরুতর সুফলও জন্মে; প্রথমাবস্থায় অনুকরণ, পরে স্বাতন্ত্র্য আপনাই আসে। বঙ্গীয় সমাজের অবস্থা বিবেচনা করিলে, এই অনুকরণপ্রবৃত্তি যে ভাল নহে, এমত নিশ্চয় বলা যাইতে পারে না। ইহাতে ভরসার স্থলও আছে।

৫। তবে অনুকরণে গুরুতর কুফলও আছে। উপযুক্ত কাল উত্তীর্ণ হইলেও অনুকরণ-প্রবৃত্তি বলবতী থাকিলে অথবা অনুকরণের যথার্থ সময়েই অনুকরণপ্রবৃত্তি অব্যবহিতরূপে স্ফূর্তি পাইলে, সর্বনাশ উপস্থিত হইবে।

শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা

প্রথম, শকুন্তলা ও মিরন্দা

উভয়েই ঋষিকন্যা; প্রম্পেরো ও বিশ্বামিত্র উভয়েই রাজর্ষি। উভয়েই ঋষিকন্যা বলিয়া, অমানুষিক সাহায্যপ্রাপ্ত। মিরন্দা এরিয়ল-রক্ষিতা, শকুন্তলা অপ্সরোরক্ষিতা।

উভয়েই ঋষি-পালিতা। দুইটিই বনলতা—দুইটিরই সৌন্দর্য্য উদ্যানলতা পরাভূতা। শকুন্তলাকে দেখিয়া, রাজাবরোধবাসিনীগণের ম্লানীভূত রূপলাবণ্য দৃষ্টিস্তের স্মরণ-পথে আসিল;

শুদ্ধাস্তদুল্লভমিদং বপুরাশ্রমবাসিনো যদি জনস্য।

দুরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ ॥

ফর্দানন্দও মিরন্দাকে দেখিয়া সেইরূপ ভাবিলেন,

Full many a lady

I have eyed with best regard, and many a time
The harmony of their tongues hath into bondage
Brought my too diligent ear : for several virtues
Have I liked several women ;

—————but you, O you,

So perfect and so peerless, are created
Of every creature's best !

উভয়েই অরণ্যমধ্যে প্রতিপালিতা; সরলতার যে কিছু মোহমন্ত্র আছে, উভয়েই তাহাতে সিদ্ধ। কিন্তু মনুষ্যালয়ে বাস করিয়া, সুন্দর, সরল, বিশুদ্ধ রমণীপ্রকৃতি, বিকৃতি প্রাপ্ত হয়—কে আমায় ভালবাসিবে, কে আমায় সুন্দর বলিবে, কেমন করিয়া পুরুষ জয় করিব, এই সকল কামনায়, নানা বিলাস বিভ্রমাদিতে, মেঘাবিলুপ্ত চন্দ্রমাবৎ, তাহার মাধুর্য্য কালিমাপ্রাপ্ত হয়। শকুন্তলা এবং মিরন্দায় এই কালিমা নাই; কেন না, তাঁহারা লোকালয়ে প্রতিপালিতা নহেন। শকুন্তলা বক্ষল পরিধান করিয়া ক্ষুদ্র কলসী হস্তে আলবালে জলসিঞ্জন করিয়া, দিনপাত করিয়াছেন—সিঞ্চিত জলকণাবিধৌত নব মল্লিকার মত নিজেও শুভ্র, নিস্কলঙ্ক, প্রফুল্ল, দিগন্ত-সুগন্ধবিকীর্ণকারিণী। তাঁহার ভগিনীশ্লেহ, নব মল্লিকার উপর; ভ্রাতৃশ্লেহ, সহকারের উপর; পুত্রশ্লেহ, মাতৃহীন হরিণশিশুর উপর; পতিগৃহ গমনকালে ইহাদিগের কাছে বিদায় হইতে গিয়া, শকুন্তলা অশ্রুদুখী, কাতরা, বিবশা। শকুন্তলার কথোপকথন তাহাদিগের সঙ্গে; কোন বৃক্ষের সঙ্গে বাঙ্গ, কোন বৃক্ষকে আদর, কোন লতার পরিণয় সম্পাদন করিয়া শকুন্তলা সুখী। কিন্তু শকুন্তলা সরলা হইলেও অশিক্ষিতা নহেন। তাঁহার শিক্ষার চিহ্ন, তাঁহার লজ্জা। লজ্জা তাঁহার চরিত্রে বড় প্রবলা; তিনি কথায় কথায় দৃষ্টিস্তের সম্মুখে লজ্জাবনতমুখী হইয়া থাকেন

বিবিধ প্রবন্ধ—শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা

—লজ্জার অনুরোধে আপনার হৃদ্যত প্রণয় সখীদের সম্মুখেও সহজে ব্যক্ত করিতে পারেন না। মিরন্দার সেরূপ নহে। মিরন্দা এত সরলা যে, তাহার লজ্জাও নাই। কোথা হইতে লজ্জা হইবে? তাহার জনক ভিন্ন অন্য পুরুষকে কখন দেখেই নাই। প্রথম ফর্দিনন্দকে দেখিয়া মিরন্দা বুদ্ধিতেই পারিল না যে, কি এ?

Lord, how it looks about! Believe me, sir,
It carries a brave form. But 'tis a spirit.

সমাজপ্রদত্ত যে সকল সংস্কার, শকুন্তলার তাহা সকলই আছে, মিরন্দার তাহা কিছুই নাই। পিতার সম্মুখে ফর্দিনন্দের রূপের প্রশংসায় কিছুমাত্র সঙ্কেচ নাই—অন্য যেমন কোন চিত্রাদির প্রশংসা করে, এ তেমনি প্রশংসা;

I might call him
A thing divine, for nothing natural
I ever saw so noble.

অথচ স্বভাবদত্ত স্ত্রীচরিত্রের যে পবিত্রতা, যাহা লজ্জার মধ্যে লজ্জা, তাহা মিরন্দায় অভাব নাই, এজন্য শকুন্তলার সরলতা অপেক্ষা মিরন্দার সরলতায় নবীনত্ব এবং মাধুর্য্য অধিক। যখন পিতাকে ফর্দিনন্দের পীড়নে প্রবৃত্ত দেখিয়া মিরন্দা বলিতেছে,

O dear father,
Make not too rash a trial of him, for
He's gentle and not fearful.

যখন পিতৃমুখে ফর্দিনন্দের রূপের নিন্দা শুনিয়া মিরন্দা বলিল,

My affections
Are then most humble: I have no ambition
To see a goodlier man.

তখন আমরা বুদ্ধিতে পারি যে, মিরন্দা সংস্কারবিহীনা, কিন্তু মিরন্দা পরদুঃখকাতরা, মিরন্দা স্নেহশালিনী; মিরন্দার লজ্জা নাই। কিন্তু লজ্জার সারভাগ যে পবিত্রতা, তাহা আছে। যখন রাজপুত্রের সঙ্গে মিরন্দার সাক্ষাৎ হইল, তখন তাহার হৃদয় প্রণয়সংস্পর্শশূন্য ছিল; কেন না, শৈশবের পর পিতা ও কালিবন ভিন্ন আর কোন পুরুষকে তিনি কখন দেখেন নাই। শকুন্তলাও যখন রাজাকে দেখেন, তখন তিনিও শূন্যহৃদয়, ঋষিগণ ভিন্ন পুরুষ দেখেন নাই। উভয়েই তপোবনমধ্যে—এক স্থানে কণ্ঠের তপোবন—অপর স্থানে প্রস্পেরোর তপোবন—অনুরূপ নায়ককে দেখিবামাত্র প্রণয়শালিনী হইলেন। কিন্তু কবিদিগের আশ্চর্য্য কৌশল দেখ; তাহারা পরামর্শ করিয়া শকুন্তলা ও মিরন্দা-চরিত্র প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইলেন নাই, অথচ একজনে দুইটি চিত্র প্রণীত করিলে সেরূপ হইত, ঠিক সেইরূপ হইয়াছে। যদি একজনে দুইটি চরিত্র প্রণয়ন করিতেন, তাহা হইলে কবি শকুন্তলার প্রণয়লক্ষণে ও মিরন্দার প্রণয়লক্ষণে কি প্রভেদ রাখিতেন? তিনি বুদ্ধিতেন যে, শকুন্তলা, সমাজপ্রদত্ত সংস্কারসম্পন্ন, লজ্জাশীলা, অতএব তাহার প্রণয় মুখে অব্যক্ত থাকিবে, কেবল লক্ষণেই ব্যক্ত হইবে; কিন্তু মিরন্দা সংস্কারশূন্য, লৌকিক লজ্জা কি, তাহা জানে না, অতএব তাহার প্রণয়লক্ষণ বাক্যে অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত হইবে। পৃথক্ পৃথক্ কবিপ্রণীত চিত্রদ্বয়ে ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। দুঃস্বপ্নকে দেখিয়াই শকুন্তলা প্রণয়াসক্তা; কিন্তু দুঃস্বপ্নের কথা দূরে থাক্, সখীদ্বয় যত দিন তাহাকে ক্রিষ্টা দেখিয়া, সকল কথা অনুভবে বুদ্ধিয়া পীড়াপীড়ি করিয়া কথা বাহির করিয়া না লইল, ততদিন তাহাদের সম্মুখেও শকুন্তলা এই নূতন বিকারের একটি কথাও বলেন নাই, কেবল লক্ষণেই সে ভাব ব্যক্ত—

স্নিগ্ধং বীক্ষিতমন্যতোহপি নয়নে যৎ প্রেরয়ন্ত্যা তয়া,
যাতং যচ্চ নিতম্বয়োগরুতয়া মন্দং বিলাসাদিব।
মাগা ইত্যুপরুদ্ধয়া যদিপি তৎ সাসুয়মুক্তা সখী,
সস্বং তৎ কিল মৎপরায়ণমহো! কামঃ স্বতাং পশ্যতি ॥

বঙ্কিম রচনাবলী

শকুন্তলা দৃষ্টিশক্তিকে ছাড়িয়া যাইতে গেলে গাছে তাহার বন্ধল বাঁধিয়া যায়, পদে কুশাঙ্কুর বিঁধে। কিন্তু মিরন্দার সে সকলের প্রয়োজন নাই—মিরন্দা সে সকল জানে না; প্রথম সন্দর্শন-কালে মিরন্দা অসংকীর্ণচিত্তে পিতৃসমক্ষে আপন প্রণয় ব্যক্ত করিলেন,

This

Is the third man that e'er I saw, the first
That e'er I sigh'd for :

এবং পিতাকে ফর্দীনন্দের পীড়নে উদ্যত দেখিয়া, ফর্দীনন্দকে আপনার প্রিয়জন বলিয়া, পিতার দয়ার উদ্বেকের যত্ন করিলেন। প্রথম অবসরেই ফর্দীনন্দকে আত্মসমর্পণ করিলেন।

দৃষ্টিশক্তির সঙ্গে শকুন্তলার প্রথম প্রণয়সম্ভাষণ, এক প্রকার লুকাচুরি খেলা। “সখি, রাজাকে ধরিয়া রাখিস্ কেন?”—“তবে, আমি উঠিয়া যাই”—“আমি এই গাছের আড়ালে লুকাই”—শকুন্তলার এ সকল “বাহানা” আছে; মিরন্দার সে সকল নাই। এ সকল লজ্জাশীলা কুলবালার বিহিত, কিন্তু মিরন্দা লজ্জাশীলা কুলবালা নহে—মিরন্দা বনের পাখী—প্রভাতরুণোদয়ে গাইয়া উঠিতে তাহার লজ্জা করে না; বৃক্ষের ফুল—সন্ধ্যার বাতাস পাইলে মৃদু ফুটাইয়া ফুটাইয়া উঠিতে তাহার লজ্জা করে না। নায়ককে পাইয়াই, মিরন্দার বলিতে লজ্জা করে না যে—

But my modesty,

The Jewel in my dower, I would not wish
Any companion in the world but you ;
Nor can imagination form a shape,
Besides yourself, to like of.

পদ্যশ্লোকঃ—

Hence, bashful cunning !

And prompt me, plain and holy innocence !
I am your wife, if you will marry me ;
If not, I'll die your maid : to be your fellow
You may deny me ; but I'll be your servant,
Whether you will or no.

আমাদিগের ইচ্ছা ছিল যে, মিরন্দা ফর্দীনন্দের এই প্রথম প্রণয়লাপ, সমুদায় উদ্ধৃত করি, কিন্তু নিঃপ্রয়োজন। সকলেরই ঘরে সেক্ষপীয়র আছে, সকলেই মূল গ্রন্থ খুলিয়া পড়িতে পারিবেন। দেখিবেন, উদ্যানমধ্যে রোমিও জুলিয়েটের যে প্রণয়সম্ভাষণ জগতে বিখ্যাত, এবং পূর্বে কালেজের ছাত্রমাত্রের কণ্ঠস্থ, ইহা কোন অংশে তদপেক্ষা নূনকল্প নহে। যে ভাবে জুলিয়েট বলিয়াছিলেন যে, “আমার দান সাগরতুল্য অসীম, আমার ভালবাসা সেই সাগরতুল্য গভীর,” মিরন্দাও এই স্থলে সেই মহান্ চিত্তভাবে পরিপ্লুত। ইহার অনুরূপ অবস্থায়, লতা-মণ্ডপতলে, দৃষ্টিশক্তি শকুন্তলায় যে আলাপ,—যে আলাপে শকুন্তলা চিরবন্ধ হৃদয়কোরক প্রথম অভিমত সূর্যাসমীপে ফুটাইয়া হাসিল—সে আলাপে তত গৌরব নাই—মানবচরিত্রের কুল-প্রাপ্তপর্ষ্যন্তপ্রঘাতী সেরূপ টল টল চঞ্চল বীচিমাল্য তাহার হৃদয়মধ্যে লক্ষিত হয় না। যাহা বলিয়াছি, তাই—কেবল ছি ছি, কেবল যাই যাই, কেবল লুকাচুরি—একটু একটু চাতুরী আছে—যথা “অন্ধপথে সূর্য্যিঅ এদম্ম হথব্ভংসিগো মিনালবলঅস্ম কদে পিড়িণিবুত্তিঙ্কি।” ইত্যাদি। একটু অগ্রগামিনীত্ব আছে, যথা দৃষ্টিশক্তির মুখে—

“নন্দ কমলস্য মধুকরঃ সন্তুষ্যতি গন্ধমাত্রেন।” এই কথা শুনিয়া শকুন্তলার জিজ্ঞাসা, “অসন্তোষে উণ কিং করেদি?”—এই সকল ছাড়া আর বড় কিছুই নাই। ইহা কবির দোষ নহে—বরং কবির গুণ। দৃষ্টিশক্তির চরিত্র-গৌরবে ক্ষুদ্রা শকুন্তলা এখানে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। ফর্দীনন্দ বা রোমিও ক্ষুদ্র ব্যক্তি, নায়িকার প্রায় সমবয়স্ক, প্রায় সমযোগ্য অকৃতকীর্ত্তি—অপ্রতিভাশাঃ, কিন্তু সসাগরা পৃথিবীপতি মহেন্দ্রসখ দৃষ্টিশক্তির কাছে শকুন্তলা কে? দৃষ্টিশক্তি মহাবৃক্ষের বৃহচ্ছায়া এখানে শকুন্তলা-কলিকাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে—সে ভাল করিয়া মৃদু খুলিয়া ফুটিতে পারিতেছে না। এ প্রণয়সম্ভাষণ নহে—রাজক্রীড়া, পৃথিবীপতি কুঞ্জবনে বসিয়া

বিবিধ প্রবন্ধ—শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা

সাধ করিয়া প্রেম করারূপ খেলা খেলিতে বসিয়াছেন; মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় শকুন্তলা-নলিনী-কোরককে শব্দে তুলিয়া, বনক্রীড়ার সাধ মিটাইতেছেন, নলিনী তাতে ফুটিবে কি?

যিনি এ কথাগুলি স্মরণ না রাখিবেন, তিনি শকুন্তলা-চরিত্র বর্ণিতে পারিবেন না; যে জলনিষেকে মিরন্দা ও জুলিয়েট ফুটিল, সে জলনিষেকে শকুন্তলা ফুটিল না; প্রণয়াসক্তা শকুন্তলায় বালিকার চাঞ্চল্য, বালিকার ভয়, বালিকার লজ্জা দেখিলাম; কিন্তু রমণীর গাভীর্য, রমণীর স্নেহ কই? ইহার কারণ কেহ কেহ বলিবেন, লোকাচারের ভিন্নতা; দেশভেদ। বস্তুতঃ তাহা নহে। দেশী কুলবধু বলিয়া শকুন্তলা লজ্জায় ভাঙ্গিয়া পড়িল,—আর মিরন্দা বা জুলিয়েট বেহায়া বিলাতী মেয়ে বলিয়া মনের গ্রন্থি খুলিয়া দিল, এমত নহে। ক্ষুদ্রাশয় সমালোচকেরাই বদ্বান না যে, দেশভেদে বা কালভেদে কেবল বাহ্যভেদ হয় মাত্র; মনুষ্যহৃদয় সকল দেশেই সকল কালেই ভিতরে মনুষ্যহৃদয়ই থাকে। বরং বলিতে গেলে—তিন জনের মধ্যে শকুন্তলাকেই বেহায়া বলিতে হয়—“অসন্তোষে উণ কিং করোদি?” তাহার প্রমাণ। যে শকুন্তলা, ইহার কয় মাস পরে, পোরবের সভাতলে দাঁড়াইয়া দ্বন্দ্বস্তুকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিল—“অনার্য! আপন হৃদয়ের অনুমানে সকলকে দেখ?”—সে শকুন্তলা যে, লতামণ্ডপে বালিকাই রহিল, তাহার কারণ, কুলকন্যাসুলভ লজ্জা নহে। তাহার কারণ—দ্বন্দ্বস্তুর চরিত্রের বিস্তার। যখন শকুন্তলা সভাতলে পরিত্যক্তা, তখন শকুন্তলা পত্নী, রাজমহিষী, মাতৃপদে আরোহণোদ্যতা, সুতরাং তখন শকুন্তলা রমণী; এখানে তপোবনে,—তপস্বিকন্যা, রাজপ্রসাদের অনুচিত অভিলাষিণী,—এখানে শকুন্তলা কে? করিশব্দে পদ্মমাত্র। শকুন্তলার কবি যে টেম্পেষ্টের কবি হইতে হীনপ্রভ নহেন, ইহাই দেখাইবার জন্য এস্থলে আয়াস স্বীকার করিলাম।

দ্বিতীয়, শকুন্তলা ও দেস্‌দিমোনা

শকুন্তলার সঙ্গে মিরন্দার তুলনা করা গেল—কিন্তু ইহাও দেখান গিয়াছে যে, শকুন্তলা ঠিক মিরন্দা নহে। কিন্তু মিরন্দার সহিত তুলনা করিলে শকুন্তলা-চরিত্রের এক ভাগ বুঝা যায়। শকুন্তলা-চরিত্রের আর এক ভাগ বর্ণিতে বাকি আছে। দেস্‌দিমোনার সঙ্গে তুলনা করিয়া সে ভাগ বুঝাইব ইচ্ছা আছে।

শকুন্তলা এবং দেস্‌দিমোনা, দুই জনে পরস্পর তুলনীয়, এবং অতুলনীয়। তুলনীয়—কেন না, উভয়েই গুরুজনের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। গোতমী শকুন্তলা সম্বন্ধে দ্বন্দ্বস্তুকে যাহা বলিয়াছেন, ওথেলোকে লক্ষ্য করিয়া দেস্‌দিমোনা সম্বন্ধে তাহা বলা যাইতে পারে—

গাবেক্‌খিদো গুরুঅণো ইমিএ গ তুএবি পুচ্ছিদো বন্ধু।

একক্সমঅ চরিএ ভগাদু কিং একএক্সিমং ॥

৷—কেন না, উভয়েই বীরপুরুষ দেখিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছেন—উভয়েরই হৃণী আশালতা” মহামহীরুহ অবলম্বন করিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু বীরমন্ত্রের যে মোহ, তাহা দেস্‌দিমোনায় যাদৃশ পরিস্ফুট, শকুন্তলায় তাদৃশ নহে। ওথেলো কৃষ্ণকায়, সুতরাং সুপুরুষ বলিয়া ইতালীয় বালার কাছে বিচার্য্য নহে, কিন্তু রূপের মোহ হইতে বীর্যের মোহ নারীহৃদয়ের উপর বলবন্তর। যে মহাকবি, পঞ্চপতিকা দ্রোপদীকে অজ্জুনে অধিকতম অনুরক্তা করিয়া, তাহার সশরীরে স্বর্গারোহণপথ রোধ করিয়াছিলেন, তিনি এ তত্ত্ব জানিতেন, এবং যিনি দেস্‌দিমোনার সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি ইহার গুঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

তুলনীয়—কেন না, দুই নায়িকারই “দুরারোহিণী আশালতা” পরিশেষে ভগ্না হইয়াছিল—উভয়েই স্বামিকর্তৃক বিসর্জিত হইয়াছিলেন। সংসার অনাদর, অত্যাচারপরিপূর্ণ। কিন্তু ইহাই অনেক সময়ে ঘটে যে, সংসারে যে আদরের যোগ্য, সেই বিশেষ প্রকারে অনাদর অত্যাচারে প্রপীড়িত হয়। ইহা মনুষ্যের পক্ষে নিতান্ত অশুভ নহে; কেন না, মনুষ্যপ্রকৃতিতে যে সকল উচ্চাশয় মনোবৃত্তি আছে, এই সকল অবস্থাতেই তাহা সম্যক্ প্রকারে স্ফূর্তিপ্ৰাপ্ত হয়। ইহা মনুষ্যালোকে সৃষ্টিশক্তির বীজ—কাব্যের প্রধান উপকরণ। দেস্‌দিমোনার অদৃষ্টদোষে বা গুণে সে সকল মনোবৃত্তি স্ফূর্তিপ্ৰাপ্ত হইবার অবস্থা তাহার ঘটিয়াছিল, শকুন্তলারও তাহাই ঘটিয়াছিল। অতএব দুই চরিত্র যে পরস্পর তুলনীয় হইবে, ইহার সকল আয়োজন আছে।

বিক্রম রচনাবলী

এবং দুইজনে তুলনীয়া—কেন না, উভয়েই পরম স্নেহশালিনী—উভয়েই সতী। স্নেহশালিনী এবং সতী ত যে সে। আজকাল রাম, শ্যাম, নিধু, বিধু, যাদু, মাধু যে সকল নাটক উপন্যাস নবন্যাস প্রেতন্যাস লিখিতেছেন, তাহার নায়িকামাত্রই স্নেহশালিনী সতী। কিন্তু এই সকল সতীদিগের কাছে একটা পোষা বিড়াল আসিলে, তাঁহারা স্বামীকে ভুলিয়া যান, আর পতিচিন্তা-মগ্না শকুন্তলা দুর্ভাসার ভয়ঙ্কর “অয়মহস্তোঃ” শুনিতে পান নাই! সকলেই সতী, কিন্তু জগৎসংসারে অসতী নাই বলিয়া, স্বর্গলোকে অসতী হইতেই পারে না বলিয়া দেস্‌দিমোনার যে দৃঢ় বিশ্বাস, তাহার মস্মের ভিতর কে প্রবেশ করিবে? যদি স্বামীর প্রতি অবিচলিত ভক্তি—প্রহারে, অত্যাচারে, বিসর্জনে, কলঙ্কেও যে ভক্তি অবিচলিত, তাহাই যদি সতীত্ব হয়, তবে শকুন্তলা অপেক্ষা দেস্‌দিমোনা গরীয়সী। স্বামিকর্তৃক পরিত্যক্তা হইলে শকুন্তলা দলিতফণা সর্পের ন্যায় মস্তক উন্নত করিয়া স্বামীকে ভৎসনা করিয়াছিলেন। যখন রাজা শকুন্তলাকে অশিক্ষা সত্ত্বেও চাতুর্য্যাপটু বলিয়া উপহাস করিলেন, তখন শকুন্তলা ক্রোধে, দস্তে, পুষ্কের বিনীত, লজ্জিত, দুঃখিত ভাব পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, “অনার্য্য, আপনার হৃদয়ের ভাবে সকলকে দেখ?” যখন তদন্তরে রাজা, রাজার মত, বলিলেন, “ভদ্রে! দুঃস্বপ্নের চরিত্র সবাই জানে,” তখন শকুন্তলা ঘোর ব্যঙ্গ বলিলেন,

তুম্হে জ্জিব পমাণং জাণথ ধম্মার্থাদিণ্ড লোঅস্ম।
লজ্জাবিণিঞ্জদাও জাণন্তি ণ কিম্পি মহিলাও ॥

এ রাগ অভিমান, এ ব্যঙ্গ দেস্‌দিমোনায় নাই। যখন ওথেলো দেস্‌দিমোনাকে সর্ব্বসমক্ষে প্রহার করিয়া দূরীভূত করিলেন, তখন দেস্‌দিমোনা কেবল বলিলেন, “আমি দাঁড়াইয়া আপনাকে আর বিরক্ত করিব না।” বলিয়া খাইতৌছিলেন, আবার ডাকিতেই “প্রভু!” বলিয়া নিকটে আসিলেন। যখন ওথেলো অকৃতাপরাধে তাঁহাকে কুলটা বলিয়া অপমানের একশেষ করিয়াছিলেন, তখনও দেস্‌দিমোনা “আমি নিরপরাধিনী, ঈশ্বর জানেন,” ঈদৃশ উক্তি ভিন্ন আর কিছুই বলেন নাই। তাহার পরেও পতিস্নেহে বর্ণিত হইয়া, পৃথিবী শূন্য দেখিয়া, ইয়োগেকে ডাকিয়া বলিয়াছেন,

O good Iago,

What shall I do to win my lord again?

Good friend, go to him; for, by this light of heaven,

I know not how I lost him. Here I kneel:

ইত্যাদি। যখন ওথেলো ভীষণ রাক্ষসের ন্যায় নিশীথশয্যাশায়িনী সুপ্তা সুন্দরীর সম্মুখে “বধ করিব!” বলিয়া দাঁড়াইলেন, তখনও রাগ নাই—অভিমান নাই—অবিনয় বা অস্নেহ নাই—দেস্‌দিমোনা কেবল বলিলেন, “তবে ঈশ্বর আমায় রক্ষা করুন।” যখন দেস্‌দিমোনা, মরণ-ভয়ে নিতান্ত ভীতা হইয়া, একদিনের জন্য, এক রাত্রির জন্য, এক মূহূর্ত্তজন্ম জীবন ভিক্ষা চাহিলেন, মূঢ় তাহাও শুনিল না, তখনও রাগ নাই, অভিমান নাই, অবিনয় নাই, অস্নেহ নাই। মৃত্যুকালেও যখন ইমিলিয়া আসিয়া তাঁহাকে মূমূর্ষু দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “এ কার্য্য কে করিল?” তখনও দেস্‌দিমোনা বলিলেন, “কেহ না, আমি নিজে। চলিলাম! আমার প্রভুকে আমার প্রণাম জানাইও। আমি চলিলাম।” তখনও দেস্‌দিমোনা লোকের কাছে প্রকাশ করিল না যে, আমার স্বামী আমাকে বিনাপরাধে বধ করিয়াছে।

তাই বলিতেছিলাম যে, শকুন্তলা দেস্‌দিমোনার সঙ্গে তুলনীয়া এবং তুলনীয়াও নহে। তুলনীয়া নহে—কেন না, ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বস্তুতে তুলনা হয় না। সেক্ষপীয়রের এই নাটক সাগরবৎ, কালিদাসের নাটক নন্দনকাননতুল্য। কাননে সাগরে তুলনা হয় না। যাহা সুন্দর, যাহা সুদৃশ্য, যাহা সুগন্ধ, যাহা সুবব, যাহা মনোহর, যাহা সুখকর, তাহাই এই নন্দনকাননে অপর্ষ্যাপ্ত, সুপীকৃত, রাশি রাশি, অপরিমেয়। আর যাহা গভীর, দুস্তর, চঞ্চল, ভীমনাদী, তাহাই এই সাগরে। সাগরবৎ সেক্ষপীয়রের এই অনুপম নাটক, হৃদয়োখিত বিলোল তরঙ্গমালায় সংক্ষুব্ধ; দুরন্ত রাগ দ্বেষ ঈর্ষ্যা বাতায় সস্তাড়িত; ইহার প্রবল বেগ, দুরন্ত কোলাহল, বিলোল উর্ম্মিলীলা,—আবার ইহার মধুর নীলিমা, ইহার অনন্ত আলোকচূর্ণপ্রক্ষেপ, ইহার জ্যোতিঃ, ইহার ছায়া, ইহার রঞ্জরাজ, ইহার মৃদু গীত—সাহিত্যসংসারে দুর্লভ।

বিবিধ প্রবন্ধ—বাজালির বাহুবল

তাই বলি, দেস্‌দিমোনা শকুন্তলায় তুলনীয় নহে। ভিন্ন জাতীয়ে ভিন্ন জাতীয়ে তুলনীয় নহে। ভিন্ন জাতীয় কেন বলিতেছি, তাহার কারণ আছে।

ভারতবর্ষে যাহাকে নাটক বলে, ইউরোপে ঠিক তাহাকেই নাটক বলে না। উভয় দেশীয় নাটক দৃশ্যকাব্য বটে, কিন্তু ইউরোপীয় সমালোচকেরা নাটকার্থে আর একটু অধিক বুঝেন। তাঁহারা বলেন যে, এমন অনেক কাব্য আছে—যাহা দৃশ্যকাব্যের আকারে প্রণীত, অথচ প্রকৃত নাটক নহে। নাটক নহে বলিয়া যে এ সকলকে নিকৃষ্ট কাব্য বলা যাইবে, এমত নহে—তন্মধ্যে অনেকগুলি অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য, যথা গেটে-প্রণীত ফণ্ট এবং বাইরণ-প্রণীত মানফ্রেড—কিন্তু উৎকৃষ্ট হউক, নিকৃষ্ট হউক—ঐ সকল কাব্য, নাটক নহে। সেক্ষপীয়রের টেম্পেষ্ট এবং কার্লিদাসকৃত শকুন্তলা, সেই শ্রেণীর কাব্য, নাটকাকারে অত্যুৎকৃষ্ট উপাখ্যান কাব্য; কিন্তু নাটক নহে। নাটক নহে বলিলে এতদুভয়ের নিন্দা হইল না; কেন না, এইরূপ উপাখ্যান কাব্য পৃথিবীতে অতি বিরল—অতুল্য বলিলে হয়। আমরা ভারতবর্ষে উভয়কেই নাটক বলিতে পারি; কেন না, ভারতীয় আলঙ্কারিকদিগের মতে নাটকের যে সকল লক্ষণ, তাহা সকলই এই দুই কাব্যে আছে। কিন্তু ইউরোপীয় সমালোচকদিগের মতে নাটকের যে সকল লক্ষণ, এই দুই নাটকে তাহা নাই। ওথেলো নাটকে তাহা প্রচুর পরিমাণে আছে। ওথেলো নাটক—শকুন্তলা এ হিসাবে উপাখ্যান কাব্য। ইহার ফল এই ঘটিয়াছে যে, দেস্‌দিমোনা-চরিত্র যত পরিষ্ফুট হইয়াছে—মিরন্দা বা শকুন্তলা তেমন হয় নাই। দেস্‌দিমোনা সজীব, শকুন্তলা ও মিরন্দা ধ্যানপ্রাপ্য। দেস্‌দিমোনার বাক্যেই তাহার কাতর, বিকৃত কণ্ঠস্বর আমরা শুনিতে পাই, চক্ষুর জল ফোঁটা ফোঁটা গুণ্ড বহিয়া বক্ষে পড়িতেছে দেখিতে পাই—ভুলগজানু সুন্দরীর স্পন্দিততার লোচনের উদ্ধর্দ দৃষ্টি আমাদের হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করে। শকুন্তলার আলোহিত চক্ষুরাদি আমরা দৃষ্টিমগ্নের মুখে না শুনিলে বুঝিতে পারি না—যথা

ন তিষ্ঠ্যগবলোকিতং, ভবতি চক্ষুরালোহিতং,
বচোহতিপরুষাক্ষরং ন চ পদেষু সংগচ্ছতে।
হিমাত্ত্ব ইব বেপতে সকল এব বিম্বাধরঃ
প্রকার্মবিনতে ভ্রুবৌ যুগপদেব ভেদং গতে ॥

শকুন্তলার দুঃখের বিস্তার দেখিতে পাই না, গতি দেখিতে পাই না, বেগ দেখিতে পাই না; সে সকল দেস্‌দিমোনায় অত্যন্ত পরিষ্ফুট। শকুন্তলা চিত্রকরের চিত্র; দেস্‌দিমোনা ভাস্করের গঠিত সজীবপ্রায় গঠন। দেস্‌দিমোনার হৃদয় আমাদের সম্মুখে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত এবং সম্পূর্ণ বিস্তারিত; শকুন্তলার হৃদয় কেবল ইঙ্গিতে ব্যক্ত।

সুতরাং দেস্‌দিমোনার আলেখ্য অধিকতর প্রোঞ্জ্বল বলিয়া দেস্‌দিমোনার কাছে শকুন্তলা দাঁড়াইতে পারে না। নতুবা ভিতরে দুই এক। শকুন্তলা অর্দ্ধেক মিরন্দা, অর্দ্ধেক দেস্‌দিমোনা। পরিণীতা শকুন্তলা দেস্‌দিমোনার অনুরূপিণী, অপরিণীতা শকুন্তলা মিরন্দার অনুরূপিণী।

বাজালির বাহুবল

বাজালির এক্ষণে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে। বাজালি সর্বদা উন্নতির জন্য বস্তু। অনেকে তর্কিয়ায় বিশেষ গুরুতর আশা করেন না। কেন না, বাজালির বাহুবল নাই। বাহুবল ভিন্ন উন্নতি নাই, ইহা তাঁহাদিগের বিশ্বাস।

বাজালির বাহুবল নাই, ইহা সত্য কথা। কখন হইবে কি না, এ কথার মীমাংসা প্রবন্ধান্তরে করা গিয়াছে। থাক্ বা না থাক্, ইহা জানা আছে যে, মৌর্যবংশীয় ও গুপ্তবংশীয় সম্রাটেরা হিমাচল হইতে নর্মদা পর্য্যন্ত একচ্ছত্রে শাসিত করিয়াছিলেন; জানা আছে, দিগ্বিজয়ী গ্রীক জাতি শতদ্রু অতিক্রম করিতে সক্ষম হয় নাই; জানা আছে, সেই বীরেরা আসিয়ার মধ্যে ভারতবাসীরই বীরত্বের প্রশংসা করিয়াছিলেন; জানা আছে যে, তাঁহারা চন্দ্রগুপ্ত দ্বারা ভারতভূমি হইতে উন্মূলিত হইয়াছিলেন; জানা আছে, হর্ষবর্দ্ধনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বহুশত করপ্রদ রাজা অনুসরণ করিতেন; জানা আছে, দিগ্বিজয়ী আরবেরা তিন শত বৎসরে পশ্চিম ভারতবর্ষ

বাংকম রচনাবলী

অধিকার করিতে পারে নাই। এইরূপ আরও অনেক কথা জানা গিয়াছে। পশ্চিম ভারতবর্ষীয়দিগের বীর্যবন্তার অনেক চিহ্ন অদ্যাপি ভারতভূমে আছে।

বাঙ্গালির পূর্বাধিকার, পূর্বাধিকারের কি জানা আছে? কেবল ইহাই জানি যে, যখন পশ্চিমভারতে বেদ সৃষ্টি ও অধীত হইতছিল, উপনিষদ্ সকল প্রণীত হইতছিল, অযোধ্যার ন্যায় সর্বসম্পদশালিনী নগরীসকল স্থাপিতা এবং অলঙ্কৃত হইতছিল—বাঙ্গালা তখন অনার্যভূমি, আর্যগণের বাসের অযোগ্য বলিয়া পরিত্যক্ত (১)। কেবল ইহাই জানি যে, যখন উত্তরভারতে, সমস্ত আর্য বীরগণ একত্রিত হইয়া কুরুক্ষেত্রজিত রাজ্যখণ্ডসকল বিভাগ করিতেছিলেন, যখন পশ্চিমে মন্বাদি অমর অক্ষয় ধর্মশাস্ত্রসকল প্রণীত হইতছিল, তখন বঙ্গদেশে পৌণ্ড্রপ্রভৃতি অনার্যজাতির বাস। প্রাচীন কাল দূরে থাকুক, যখন মধ্যকালে চৈনিক পরিব্রাজক হোয়েন্থ সাঙ বঙ্গদেশপর্যটনে আসেন, তখন দেখিয়াছিলেন যে, এই প্রদেশে গৌরবশূন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। বঙ্গদেশের পূর্বাধিকার কোথায়?

তবে, ইহার পরে শূন্য যায় যে, পালবংশীয় ও সেনবংশীয় রাজগণ বৃহৎ রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং গোড়নগরী বড় সমৃদ্ধিশালিনী হইয়াছিল। কিন্তু এমন কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না যে, তাঁহারা এই বাহুবলশূন্য বাঙ্গালিজাতি এবং তাঁহাদিগের প্রতিবাসী তদ্রূপ দুর্বল অনার্যজাতিগণ ভিন্ন অন্য কাহাকে আপন অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। এই মাত্র প্রমাণ আছে বটে যে, মুঙ্গের পর্যন্ত তাঁহাদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। অন্যত্র তাঁহাদিগের অধিকার বিস্তার সম্বন্ধে তিনটি মাত্র কথা আছে, তিনটিই অমূলক।

প্রথম। কিম্বদন্তী আছে যে, দিল্লীতে বল্লালসেনের অধিকার ছিল। এ কথা একখানি দেশী গ্রন্থে লিখিত থাকিলেও নিতান্ত অমূলক, এবং জেনেরল কনিঙহাম সাহেব তাহার অমূলকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বঙ্গেশ্বর বল্লালসেনের অধিকার দিল্লী পর্যন্ত বিস্তৃত হইলে এরূপ বৃহৎ ব্যাপার ঘটিত যে, অবশ্য একখানি সামান্য গ্রন্থে উল্লেখ ভিন্ন তাহার অন্য প্রমাণ কিছু পাওয়া যাইত। বঙ্গ হইতে দিল্লীর মধ্যে যে বহুবিস্তৃত প্রদেশ, তথায় বঙ্গপ্রভুত্বের কোন কিম্বদন্তী, কোন উল্লেখ, কোন চিহ্ন অবশ্য থাকিত। কিছু নাই।

দ্বিতীয়। ১৭৯৪ শালে গোড়েশ্বর মহীপালরাজের একখানি শাসন কাশীতে পাওয়া গিয়াছিল। তাহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন, কাশীপ্রদেশ মহীপালের রাজ্যভুক্ত ছিল। এক্ষণে সে মত পরিত্যক্ত হইতেছে (২)।

তৃতীয়। লক্ষ্মণসেনের দুই একখানি তাম্রশাসনে তাঁহাকে প্রায় সর্বদেশজেতা বলিয়া বর্ণনা করা আছে। পড়িলেই বুঝা যায় যে, সে সকল কথা চাটুকার কবির কল্পনা মাত্র।

অতএব পূর্বাধিকারে বাঙ্গালিরা যে বাহুবলশালী ছিলেন, এমত কোন প্রমাণ নাই। পূর্বাধিকারে ভারতবর্ষস্থ অন্যান্য জাতি যে বাহুবলশালী ছিলেন, এমত প্রমাণ অনেক আছে, কিন্তু বাঙ্গালিদিগের বাহুবলের কোন প্রমাণ নাই। হোয়েন্থ সাঙ সমতট-রাজ্যবাসীদিগের যে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা পড়িয়া বোধ হয়, পূর্বে বাঙ্গালিরা এইরূপ খর্বাকৃত, দুর্বল-গঠন ছিল।

বাঙ্গালিদিগের বাহুবল কখন ছিল না, কিন্তু কখন হইবে কি?

বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যৎ উক্তির নিয়ম এই যে, যেদ্রুপ যে অবস্থায় হইয়াছে, সেই অবস্থায় সেইদ্রুপ আবার হইবে। যে যে কারণে বাঙ্গালি চিরকাল দুর্বল, সেই সেই কারণ যত দিন বর্তমান থাকিবে, তত দিন বাঙ্গালিরা বাহুবলশূন্য থাকিবে। সে সকল কারণ কি?

আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদিগের মতে, সকলই বাহ্য প্রাকৃতিক ফল। বাঙ্গালির দুর্বলতাও বাহ্য প্রাকৃতিক ফল। ভূমি, জলবায়ু এবং দেশাচারের ফলে বাঙ্গালিরা দুর্বল, ইহাই প্রচলিত মত। সেই সকল মতগুলির সংক্ষেপতঃ উল্লেখ করিতেছি।

কেহ কেহ বলেন, এদেশের ভূমি অত্যন্ত উর্বরা—অল্প পরিশ্রমেই শস্যোৎপাদন হইতে

(১) বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় খণ্ডে “বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার” দেখ।

(২) See Introduction to Sherring's Sacred City of the Hindus, by F. E. Hall, p. xxxv. Note 2.

পারে। সুতরাং বাজালিকে অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না। পরিশ্রম অধিক না করিলে শরীরে বলাধান হয় না। বঙ্গভূমির উর্ধ্বরতা বঙ্গবাসীর দুর্দ্বলতার কারণ।

তাঁহারা আরও বলেন যে, ভূমি উর্ধ্বরা হইলে আহারের জন্য মৃগয়া পশুহননাদির আবশ্যিকতা হয় না। পশুহনন ব্যবসায়, বল, সাহস ও পরিশ্রমের কার্য, মনুষ্যকে সর্বদা পরিশ্রমে নিরত রাখে, এবং তাহাতে ঐ সকল গুণ অভ্যস্ত এবং স্ফূর্তিপ্ৰাপ্ত হয়।

দেখা যাইতেছে যে, বঙ্গদেশ ভিন্ন আরও উর্ধ্বর দেশ আছে। ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক অংশ বঙ্গদেশাপেক্ষায় উর্ধ্বরতায় ন্যূন নহে। সে সকল দেশের লোক দুর্দ্বল নহে।

অনেকে বলেন, জলবায়ুর দোষে বাজালিরা দুর্দ্বল। যে দেশের বায়ু আর্দ্র অথচ তাপযুক্ত, সে দেশের লোক দুর্দ্বল। কেন হয়, তাহা শারীরতত্ত্ববিদেরা ভাল করিয়া বুঝান নাই। বায়ুর আর্দ্রতা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত টীকা পাঠ করিলেই সংশয় দূর হইতে পারে (৩)। আর যাঁহারা আরব প্রভৃতি জাতির বীর্য জানেন, তাঁহারা তাপকে দৌর্দ্বল্যের কারণ বলিয়া স্বীকার করিবেন না।

অনেকে মোটামুটি বলেন যে, জলসিক্ত তাপযুক্ত বায়ু অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর, তন্নিবন্ধন বাজালিরা নিত্য রুগ্ন, এবং তাহাই বাজালির দুর্দ্বলতার কারণ।

অনেকে বলেন, অন্নই অনর্থের মূল। এ দেশের ভূমির প্রধান উৎপাদ্য চাউল, এবং এ দেশের লোকের খাদ্য ভাত। ভাত অতি অসার খাদ্য, তাহাতেই বাজালির শরীর গঠে না। এজন্য “ভেতো বাজালি” বলিয়া বাজালির কলঙ্ক হইয়াছে।

শারীরতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, খাদ্যের রাসায়নিক বিশ্লেষণ সম্পাদন করিলে দেখা যায় যে, তাহাতে স্টার্চ, গ্লুটেন প্রভৃতি কয়েকটি সামগ্রী আছে। গ্লুটেন নাইট্রোজেন-প্রধান সামগ্রী। তাহাতেই শরীরের পুষ্টি। মাংসপেশী প্রভৃতির পুষ্টির জন্য এই সামগ্রীর বিশেষ প্রয়োজন। ভাতে ইহা অতি অল্প পরিমাণে থাকে। মাংসে বা গমে ইহা অধিক পরিমাণে থাকে। এই জন্য মাংসভোজী এবং গোধূমভোজীদিগের শরীর অধিক বলবান্—“ভেতো” জাতির শরীর দুর্দ্বল। ময়দায় গ্লুটেন শতভাগে দশভাগ থাকে (৪); মাংসে (Fibrin বা Musculine) ১৯ ভাগ (৫); এবং ভাতে ৭ কি ৮ ভাগ মাত্র থাকে (৬)। সুতরাং বাজালি দুর্দ্বল হইবে বৈ কি!

কেহ কেহ বলেন, বাল্যবিবাহই বাজালির পরমশত্রু—বাল্যবিবাহের কারণেই বাজালির শরীর দুর্দ্বল। যে সন্তানের মাতা পিতা অপ্রাপ্তবয়ঃ, তাহাদের শরীর ও বল চিরকাল অসম্পূর্ণ থাকিবে, এবং যাহারা অল্পবয়স হইতে ইন্দ্রিয়সুখে নিরত, তাহারা বলবান্ হইবার সম্ভাবনা কি?

বাজালি মনুষ্যেরই কি, বাজালি পশুরই কি, দুর্দ্বলতা যে জলবায়ু বা মৃত্তিকার গুণ, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু জলের বা বায়ুর বা মৃত্তিকার কোন দোষের এই কুফল, তাহা কোন পণ্ডিতে অবধারিত করেন নাই।

(৩) The high humidity of the atmosphere in Bengal, and more especially in its eastern districts, has become proverbial: and if the term be used in reference to the quantity of vapour in the air as measured by its tension, the popular belief is justified by observations. But if used in the more usual sense of relative humidity, that is, as referring to the percentage of vapour in the air in proportion to that which would saturate it, the average annual humidity of a large part of Bengal is sensibly lower than that of England.

The quantity of vapour in the air of Calcutta, relative to the dry air, is on the average of the year, about twice as great as in that of London; but the relative humidity of the former equals that of the latter only in the three first months of the rains, which are among the driest months of an European climate.—Bengal Administration Report, 1872-73, Statistical Summary.—page 5-6.

(৪) Johnstone's *Chemistry of Common Life*, Vol. 1, p. 100.

(৫) Ibid, p. 125.

(৬) Ibid, p. 101.

বিক্রম রচনাবলী

কিন্তু এই দুর্বলতার যে সকল কারণ নির্দিষ্ট হইয়াছে বা উল্লিখিত হইল, তাহাতে এমত ভরসা করা যায় না যে, অল্পকালে সে দুর্বলতা দূর হইবে। তবে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, এমত কোন নিশ্চয়তা নাই যে, কোন কালে এ সকল কারণ অপনীত হইতে পারে না। বাল্য-বিবাহই যদি এ দুর্বলতার কারণ হয়, তবে এমন ভরসা করা যাইতে পারে যে, সামাজিক রীতির পরিবর্তনে এ কুপ্রথা সমাজ হইতে দূর হইবে; এবং বাঙ্গালির শরীরে বলসঞ্চার হইবে। যদি চাল এ অনিষ্টের কারণ হয়, তবে এমন ভরসা করা যাইতে পারে যে, গোধূমাদির চাষ এ দেশে বৃদ্ধি করাইলে, বাঙ্গালি ময়দা খাইয়া বলিষ্ঠ হইবে। এমন কি, কালে জলবায়ুরও পরিবর্তন হইতে পারে। এক্ষণে মনুষ্যবাসের অযোগ্য যে সুন্দরবন, তাহা এককালে বহুজনাকীর্ণ ছিল, এমত প্রমাণ আছে। ভূতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, ইউরোপীয় অনেক প্রদেশ, এক্ষণকার অপেক্ষা উষ্ণতর ছিল, এবং তথায় সিংহ হস্তী প্রভৃতি উষ্ণদেশবাসী জীবের আবাস ছিল। আবার এককালে সেই সকল প্রদেশ হিমশিলায় নিমগ্ন ছিল। সে সকল যুগান্তরের কথা—সহস্র সহস্র যুগে সে সকল পরিবর্তন ঘটিতে পারে। কিন্তু ঐতিহাসিক কালের মধ্যেও জলবায়ু শীততাপের পরিবর্তনের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্বকালে রোমনগরীর নিম্নে টেবের নদের মধ্যে বরফ জমিয়া যাইত। এবং এক সময়ে ক্রমাগত চা্লিশ দিন তাহাতে বরফ জমিয়া ছিল। কৃষ্ণসাগরে (Euxine Sea) অবিদ নামক কবির জীবনকালে প্রতি বৎসর শীত ঋতুতে বরফ জমিয়া যাইত। এবং রীণ এবং রণ নামক নদীদ্বয়ের উপরে তৎসময়ে বরফ এরূপ গাঢ় জমিত যে, তাহার উপর দিয়া বোঝাই গাড়ি চলিত। এক্ষণে রোমে বা কৃষ্ণসাগরে বা উক্ত নদীদ্বয়ে বরফের নামমাত্র নাই। কেহ কেহ বলেন, কৃষিকার্যের আধিক্যে, বন কাটায়, মৃত্তিকা ভগ্ন করায়, এবং ঝিল ঝিল শূষ্ক করায় এ সকল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। যদি কৃষিকার্যের আধিক্যে শীতপ্রদেশ উষ্ণ হয়, তবে উষ্ণপ্রদেশ শীতল হইবার কারণ কি? গ্রীনলন্ড এককালে এরূপ তাপযুক্ত প্রদেশ ছিল যে, ইহাতে উদ্ভিদের বিশেষ আধিক্য এবং শোভা ছিল, এবং সেই জন্য উহার নাম গ্রীনলন্ড হইয়াছিল। এক্ষণে সেই গ্রীনলন্ড সর্বদা এবং সর্বত্র হিমশিলায় মণ্ডিত! এই দ্বীপের পূর্ব উপকূলে বহুসংখ্যক ঐশ্বর্যশালী উপনিবেশ ছিল,—এক্ষণে সে উপকূলে কেবল বরফের রাশি, এবং সেই সকল উপনিবেশের চিহ্নমাত্র নাই। লারাডর এক্ষণে শৈত্যধিকোর জন্য বিখ্যাত—কিন্তু যখন সহস্র খ্রীষ্টাব্দে নর্ম্মানেরা তথায় গমন করেন, তখন ইহারও শীতের অল্পতা দেখিয়া তাহারা প্রীত হইয়াছিলেন, এবং ইহাতে দ্রাক্ষা জন্মিত বলিয়া ইহার দ্রাক্ষাভূমি নাম দিয়াছেন (৭)।

এ সকল পরিবর্তনের অতি দূর সম্ভাবনা। না ঘটিবারই সম্ভাবনা। বাঙ্গালির শারীরিক বল চিরকাল এইরূপ থাকিবে, ইহা এক প্রকার সিদ্ধ; কেন না, দুর্বলতার নিবার্য কারণ কিছু দেখা যায় না।

তবে কি বাঙ্গালির ভরসা নাই? এ প্রশ্নে আমাদের দুইটি উত্তর আছে।

প্রথম উত্তর। শারীরিক বলই অদ্যাপি পৃথিবী শাসন করিতেছে বটে। কিন্তু শারীরিক বল পশুর গুণ; মনুষ্য অদ্যাপি অনেকাংশে পশুপ্রকৃতিসম্পন্ন, এজন্য শারীরিক বলের আর্জিও এতটা প্রাদুর্ভাব। শারীরিক বল উন্নতি নহে। উন্নতির উপায় মাত্র। এ জগতে বাহুবল ভিন্ন কি উন্নতির উপায় নাই?

বাহুবলকে উন্নতির উপায়ও বলিতে পারি না। বাহুবলে কাহারও উন্নতি হয় না। যে তাতার ইউরোপ আসিয়া জয় করিয়াছিল, সে কখন উন্নতাবস্থায় পদার্পণ করিল না। তবে বাহুবল উন্নতির পক্ষে এই জন্য আবশ্যিক যে, যে সকল কারণে উন্নতির হানি হয়, সে সকল উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষা করা চাই। সেই জন্য বাহুবলের প্রয়োজন। কিন্তু যেখানে সে প্রয়োজন নাই, সেখানে বাহুবল ব্যতীতও উন্নতি ঘটে।

দ্বিতীয় উত্তরে আমরা যাহা বলিতেছি, বাঙ্গালার সর্বত্র, সর্ব নগরে, সর্ব গ্রামে সকল বাঙ্গালির হৃদয়ে তাহা লিখিত হওয়া উচিত। বাঙ্গালি শারীরিক বলে দুর্বল—তাহাদের বাহুবল হইবার সম্ভাবনা নাই—তবে কি বাঙ্গালির ভরসা নাই? এ প্রশ্নে আমাদের উত্তর এই যে, শারীরিক বল বাহুবল নহে।

(৭) *The Scientific American.*

বিবিধ প্রবন্ধ—ভালবাসার অত্যাচার

মনুষ্যের শারীরিক বল অতি তুচ্ছ। তথাপি হস্তী অশ্ব প্রভৃতি মনুষ্যের বাহুবলে শাসিত হইতেছে। মনুষ্যে মনুষ্যে তুলনা করিয়া দেখ। যে সকল পার্শ্বতা বন্য জাতি হিমালয়ের পশ্চিমভাগে বাস করে, পৃথিবীতে তাহাদের ন্যায় শারীরিক বলে বলবান্ কে? এক একজন মেওয়াওয়ালার চপেটাঘাতে অনেক সেলর গোরাকে ঘৃণ্যমান হইয়া আঙ্গুর পেশ্তার আশা পরিত্যাগ করিতে দেখা গিয়াছে। তবে গোরা সমুদ্র পার হইয়া আসিয়া ভারত অধিকার করিল—কাবুলির সঙ্গে ভারতের কেবল ফলবিফ্রয়ের সম্বন্ধ রহিল কেন? অনেক ভারতীয় জাতি হইতে ইংরেজেরা শারীরিক বলে লঘু। শারীরিক বলে শীকেরা ইংরেজ অপেক্ষা বলিষ্ঠ। তথাপি শীক ইংরেজের পদানত। শারীরিক বল বাহুবল নহে।

উদ্যম, ঐক্য, সাহস এবং অধ্যবসায়, এই চারিটি একত্রিত করিয়া শারীরিক বল ব্যবহার করার যে ফল, তাহাই বাহুবল। যে জাতির উদ্যম, ঐক্য, সাহস এবং অধ্যবসায় আছে, তাহাদের শারীরিক বল যেমন হউক না কেন, তাহাদের বাহুবল আছে। এই চারিটি বাঙ্গালির কোন কালে নাই, এজন্য বাঙ্গালির বাহুবল নাই।

কিন্তু সামাজিক গতির বলে এ চারিটি বাঙ্গালিচারিত্রে সমবেত হওয়ার অসম্ভাবনা কিছুই নাই।

বেগবৎ অভিলাষ হৃদয়মধ্যে থাকিলে উদ্যম জন্মে। অভিলাষ মাগ্রেই কখন উদ্যম জন্মে না। যখন অভিলাষ এরূপ বেগ লাভ করে যে, তাহার অপূর্ণাবস্থা বিশেষ ক্লেশকর হয়, তখন অভিলষিতের প্রাপ্তির জন্য উদ্যম জন্মে। অভিলাষের অপূর্ণিত্বজন্য যে ক্লেশ, তাহার এমন প্রবলতা চাহি যে, নিশ্চেষ্টতা এবং আলস্যের যে সুখ, তাহা তদভাবে সুখ বলিয়া বোধ না হয়। এরূপ বেগযুক্ত কোন অভিলাষ বাঙ্গালির হৃদয়ে স্থান পাইলে, উদ্যম জন্মবে। ঐতিহাসিক কালমধ্যে এরূপ কোন বেগযুক্ত অভিলাষ বাঙ্গালির হৃদয়ে কখন স্থান পায় নাই।

যখন বাঙ্গালির হৃদয়ে সেই এক অভিলাষ জাগরিত হইতে থাকিবে, যখন বাঙ্গালি মাগ্রেই হৃদয়ে সেই অভিলাষের বেগ এরূপ গুরুতর হইবে যে, সকল বাঙ্গালিই তজ্জন্য আলস্যসুখ তুচ্ছ বোধ করিবে, তখন উদ্যমের সঙ্গে ঐক্য মিলিত হইবে।

সাহসের জন্য আর একটু চাই। চাই যে, সেই জাতীয় সুখের অভিলাষ আরও প্রবলতর হইবে। এত প্রবল হইবে যে, তজ্জন্য প্রাণ বিসর্জনও শ্রেয়ঃ বোধ হইবে। তখন সাহস হইবে।

যদি এই বেগবৎ অভিলাষ কিছুকাল স্থায়ী হয়, তবে অধ্যবসায় জন্মবে।

অতএব যদি কখন (১) বাঙ্গালির কোন জাতীয় সুখের অভিলাষ প্রবল হয়, (২) যদি বাঙ্গালি মাগ্রেই হৃদয়ে সেই অভিলাষ প্রবল হয়, (৩) যদি সেই প্রবলতা এরূপ হয় যে, তদর্থে লোকে প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত হয়, (৪) যদি সেই অভিলাষের বল স্থায়ী হয়, তবে বাঙ্গালির অবশ্য বাহুবল হইবে।

বাঙ্গালির এরূপ মানসিক অবস্থা যে কখন ঘটিবে না, এ কথা বলিতে পারা যায় না। যে কোন সময়ে ঘটিতে পারে।

ভালবাসার অত্যাচার

লোকের বিশ্বাস আছে যে, কেবল শত্রু, অথবা স্নেহ-দয়া-দাক্ষিণ্যশূন্য ব্যক্তিই আমাদিগের উপর অত্যাচার করিয়া থাকে। কিন্তু তদপেক্ষা গুরুতর অত্যাচারী যে আর এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহা সকল সময়ে আমাদের মনে পড়ে না। যে ভালবাসে, সেই অত্যাচার করে। ভালবাসিলেই অত্যাচার করিবার অধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমি যদি তোমাকে ভালবাসি, তবে তোমাকে আমার মতাবলম্বী হইতে হইবে, আমার কথা শুনিতে হইবে; আমার অনুরোধ রাখিতে হইবে। তোমার ইষ্ট হউক, অনিষ্ট হউক, আমার মতাবলম্বী হইতে হইবে। অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, যে ভালবাসে, সে যে কার্যে তোমার অমঙ্গল, জানিয়া শুনিয়া তাহাতে তোমাকে অনুরোধ করিবে না। কিন্তু কোন কার্য মঙ্গলজনক, কোন কার্য অমঙ্গলজনক, তাহার মীমাংসা কঠিন; অনেক সময়েই দুই জনের মত এক হয় না। এমত অবস্থায় যিনি কার্যকর্তা, এবং তাহার ফলভোগী, তাহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে যে, তিনি আত্মমতানুসারেই কার্য করেন; এবং তাহার মতের বিপরীত কার্য করাইতে রাজা ভিন্ন কেহই অধিকারী নহেন। রাজাই কেবল অধিকারী, এই জন্য যে, তিনি সমাজের হিতাহিতবেত্তাম্বরূপ প্রতিষ্ঠিত

বিশ্বকম রচনাবলী

হইয়াছেন; কেবল তাঁহারই সদস্য বিবেচনা অদ্রাস্ত বলিয়া তাঁহাকে আমাদিগের প্রবৃত্তি দমনের অধিকার দিয়াছি; যে অধিকার তাঁহাকে দিয়াছি, সে অধিকার অনুসারে তিনি কার্য্য করাতে কাহারও প্রতি অত্যাচার হয় না। এবং সকল সময়ে এবং সকল বিষয়ে আমাদিগের প্রবৃত্তি দমন করিবার তাঁহারও অধিকার নাই; যে কার্য্য অন্যের অনিষ্ট ঘটবে বিবেচনা করেন, তৎপ্রতি প্রবৃত্তির নিবারণেই তাঁহার অধিকার; যাহাতে আমার কেবল আপনারই অনিষ্ট ঘটবে বিবেচনা করেন, সে প্রবৃত্তি নিবারণে তিনি অধিকারী নহেন।* যাহাতে কেবল আমার নিজের অনিষ্ট, তাহা হইতে বিরত হইবার পরামর্শ দিবার জন্য মনুষ্য মাগ্রেই অধিকারী; রাজাও পরামর্শ দিতে পারেন, এবং যে আমাকে ভালবাসে, সেও পারে। কিন্তু পরামর্শ ভিন্ন আমাকে তদ্বিপরীত পথে বাধ্য করিতে কেহই অধিকারী নহেন। সমাজস্থ সকলেরই অধিকার আছে যে, সকল কার্য্যই, পরের অনিষ্ট না করিয়া আপনাপন প্রবৃত্তিমত সম্পাদন করে। পরের অনিষ্ট ঘটিলেই ইহা স্বেচ্ছাচারিতা; পরের অনিষ্ট না ঘটিলেই ইহা স্বানুবর্তিতা। যে এই স্বানুবর্তিতার বিষয় করে, যে পরের অনিষ্ট না ঘটবার স্থানেও আমার মতের বিরুদ্ধে আপন মত প্রবল করিয়া তদনুসারে কার্য্য করায়, সেই অত্যাচারী। রাজা ও সমাজ ও প্রণয়ী, এই তিন জনে এরূপ অত্যাচার করিয়া থাকেন।

রাজার অত্যাচার নিবারণের উপায় বহুকাল উদ্ভূত হইয়াছে। সমাজের এই অত্যাচার নিবারণ জন্য কোন কোন পুর্ষ পণ্ডিত ধৃতাস্ত্র হইয়াছেন, এবং তদ্বিষয়ে 'জন ষ্টুয়ার্ট' মিলের যত্ন ও বিচারদক্ষতা, তাঁহার মাহাত্ম্যের পরিচয় দিবে। কিন্তু ভালবাসার অত্যাচার নিবারণের জন্য যে কেহ কখন যত্নশীল হইয়াছেন, এমত আমাদিগের স্মরণ হয় না। কবিগণ সর্ব্বতত্ত্বদর্শী এবং অনন্ত জ্ঞানবিশিষ্ট, তাঁহাদের কাছে কিছুই বাদ পড়ে না। কৈকেয়ীর অত্যাচারে দশরথকৃত রামের নির্ব্বাসনে, দ্যুতাসক্ত যুধিষ্ঠির কর্তৃক দ্রাভৃগণের নির্ব্বাসনে, এবং অন্যান্য শত শত স্থানে কবিগণ এই মহতী নীতি প্রতিপাদিতা করিয়াছেন। কিন্তু কবিরা নীতিবেত্তা নহেন: নীতিবেত্তারা এ বিষয়ে প্রকাশ্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। যিনিই লৌকিক ব্যাপার সকল মনোভিনিবেশপুর্ষক পর্য্যবেক্ষণ করিবেন, তিনিই এ তত্ত্বের সমালোচনা যে বিশেষ প্রয়োজনীয়, তদ্বিষয়ে নিঃসংশয় হইবেন। কেন না, এ অত্যাচারে প্রবৃত্ত অত্যাচারী অনেক। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র, কন্যা, ভাৰ্য্যা, স্বামী, আত্মীয়, কুটুম্ব, সুহৃৎ, ভৃত্য, যেই ভালবাসে, সেই একটু অত্যাচার করে, এবং অনিষ্ট করে। তুমি সুলক্ষণান্বিতা, সদ্গুণজা, সচ্চরিত্রা কন্যা দেখিয়া, তাহার পাণিগ্রহণ করিবে বাসনা করিয়াছ, এমন সময়ে তোমার পিতা আসিয়া বলিলেন, অমুক বিষয়াপন্ন লোক, তাহার কন্যার সঙ্গেই তোমার বিবাহ দিব। তুমি যদি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া থাক, তবে তুমি এ বিষয়ে পিতার আজ্ঞাপালনে বাধ্য নহ, কিন্তু পিতৃপ্রেমে বশীভূত হইয়া, সেই কাল-কুটুম্বপণী ধনিকন্যা বিবাহ করিতে হইল। মনে কর, কেহ দারিদ্র্যপীড়িত, দৈবানুকম্পায় উত্তম পদস্থ হইয়া দূরদেশে যাইয়া, দারিদ্র্য মোচনের উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে মাতা, তাহাকে দূরদেশে রাখিতে পারিবেন না বলিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন, তাহাকে যাইতে দিলেন না, সে মাতৃপ্রেমে বদ্ধ হইয়া নিরস্ত হইল, মাতার ভালবাসার অত্যাচারে সে আপনাকে চিরদারিদ্র্যে সমর্পণ করিল। কৃতী সহোদরের উপার্জিত অর্থ, অকর্ম্মী অপদার্থ সহোদর নষ্ট করে, এটি নিতান্তই ভালবাসার অত্যাচার, এবং হিন্দুসমাজে সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকে। ভাৰ্য্যার ভালবাসার অত্যাচারের কোন উদাহরণ নববঙ্গবাসীদিগের কাছে প্রযুক্ত করা আবশ্যিক কি? আর স্বামীর অত্যাচার সম্বন্ধে, ধর্ম্মতঃ এটুকু বলা কর্তব্য যে, কতকগুলি ভালবাসার অত্যাচার বটে, কিন্তু অনেকগুলিই বাহুবলের অত্যাচার।

যাহা হউক, মনুষ্যজীবন ভালবাসার অত্যাচারে পরিপূর্ণ। চিরকাল মনুষ্য অত্যাচার পীড়িত। প্রথমাবস্থায় বাহুবলের অত্যাচার; অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে যেই বলিষ্ঠ, সেই পরপীড়ন করে। কালে এই অত্যাচার, রাজার অত্যাচার এবং অর্থের অত্যাচারে পরিণত হয়;

* যদি রাজার এমন অধিকার আছে, স্বীকার করা যায়, তবে স্বীকার করিতে হয় যে, যে আপনার চিকিৎসা করিবে না বা যে অল্প বয়সে বা বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিবে, রাজা তাহার দণ্ড করিতে অধিকারী। আর রাজার যদি এরূপ অধিকার স্বীকার করা না যায়, তবে চড়ক বন্ধ, সতীদাহ বন্ধ প্রভৃতি আইনের সমর্থন করা যায় না।

বিবিধ প্রবন্ধ—ভালবাসার অত্যাচার

কোন সমাজে কখন একেবারে লুপ্ত হয় নাই। দ্বিতীয়াবস্থায় ধর্মের অত্যাচার; তৃতীয়াবস্থায় সামাজিক অত্যাচার; এবং সকল অবস্থাতেই ভালবাসার অত্যাচার। এই চতুর্দিক পীড়নের মধ্যে, প্রণয়ের পীড়ন কাহারও পীড়ন অপেক্ষা হীনবল বা অল্পানিষ্টকারী নহে। বরং ইহা বলা যাইতে পারে যে, রাজা, সমাজ বা ধর্মবেত্তা, কেহই প্রণয়ীর অপেক্ষা বলবান্ নহেন বা কেহ তেমন সদা সর্বাঙ্গ সাক্ষর কাজে আসিয়াই হস্তক্ষেপ করেন না—সুতরাং প্রণয়ের পীড়ন যে সর্বাঙ্গ অপেক্ষা অনিষ্টকারী, ইহা বলা যাইতে পারে। আর অন্য অত্যাচারকারীকে নিবারণ করা যায়, অন্য অত্যাচারের সীমা আছে। কেন না, অন্যান্য অত্যাচারকারীর বিরোধী হওয়া যায়। প্রজা, প্রজাপীড়ক রাজাকে রাজচ্যুত করে; কখনও মস্তকচ্যুত করে। লোকপীড়ক সমাজকে পরিত্যাগ করা যায়। কিন্তু ধর্মের পীড়নে এবং স্নেহের পীড়নে নিষ্কৃতি নাই—কেন না, ইহাদিগের বিরোধী হইতে প্রবৃত্তিই জন্মে না। হরিদাস বাবাজি পাঁটার বাটি দেখিলে কখন কখন লাল ফেলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু কখন গোশ্বামীর সম্মুখে মাংসভোজনের ঔচিত্য বিচার করিতে ইচ্ছা করেন না—কেন না, জানেন যে, ইহলোকে যতই কষ্ট পান না কেন, বাবাজি পরলোকে গোলোক প্রাপ্ত হইবেন।

মনুষ্য যে সকল অত্যাচারের অধীন, সে সকলের ভিত্তিমূল মনুষ্যের প্রয়োজনে। জড়-পদার্থকে আয়ত্ত না করিতে পারিলে মনুষ্যজীবন নিস্বার্থ হয় না, এজন্য বাহুবলের প্রয়োজন। এবং সেই জন্যই বাহুবলের অত্যাচারও আছে। বাহুবলের ফল বৃদ্ধি করিবার জন্য সমাজের প্রয়োজন; এবং সমাজের অত্যাচারও সঙ্গে সঙ্গে। যেমন পরস্পরে সমাজবন্ধনে বন্ধ না হইলে, মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন হয় না, তেমনি পরস্পরে আন্তরিক বন্ধনে বন্ধ না হইলে, মনুষ্যজীবনের সুনিস্বার্থ হয় না। অতএব সমাজের যে রূপ প্রয়োজন, প্রণয়েরও তদ্রূপ বা ততোধিক প্রয়োজন। এবং বাহুবলের বা সমাজের অত্যাচার আছে বলিয়াই যেমন বাহুবল বা সমাজ মনুষ্যের ত্যাজ্য বা অনাদরণীয় হইতে পারে না, প্রণয়ের অত্যাচার আছে বলিয়াই তাহাও ত্যাজ্য বা অনাদরণীয় হইতে পারে না। অপিচ যেমন বাহুবল বা সমাজবলকে অত্যাচারী দেখিয়া তাহাকে পরিত্যক্ত বা অনাদৃত না করিয়া, মনুষ্য ধর্মের দ্বারা তাহার শমতার চেষ্টা পাইয়াছে, প্রণয়ের অত্যাচারও সেইরূপ ধর্মের দ্বারা শমিত করিতে যত্ন করা কর্তব্য। ধর্মেরও অত্যাচার আছে বটে, এবং ধর্মের অত্যাচার শমতার জন্য যদি আরও কোন শক্তি প্রযুক্ত হয়, তাহারও অত্যাচার ঘটিবে; কেন না, অত্যাচার শক্তির স্বভাবসিদ্ধ। যদি ধর্মের অত্যাচার শমতায় সক্ষম কোন শক্তি থাকে, তবে জ্ঞান সেই শক্তি। কিন্তু জ্ঞানেরও অত্যাচার আছে। তাহার উদাহরণ, হিতবাদ এবং প্রত্যক্ষবাদ। এতদুভয়ের বেগে মনুষ্যহৃদয়সাগরে অনঙ্গ ভাগ চড়া পড়িয়া যাইতেছে। বোধ হয়, জ্ঞান ব্যতীত জ্ঞানের অত্যাচার শাসনের জন্য অন্য কোন শক্তি যে মনুষ্য-কর্তৃক ব্যবহৃত হইবে, এক্ষণে এমন বিবেচনা হয় না।

সেইরূপ ইহাও বলা যাইতে পারে যে, প্রণয়ের দ্বারাই প্রণয়ের অত্যাচার শমিত হওয়াই সম্ভব। এ কথা যথার্থ, স্বীকার করি। স্নেহ যদি স্বার্থপরতাশূন্য হয়, তবে তাহা ঘটিতে পারে। কিন্তু সাধারণ মনুষ্যের প্রকৃতি এইরূপ যে, স্বার্থপরতাশূন্য স্নেহ দুর্লভ। এই কথার প্রকৃত তাৎপর্য গ্রহণ না করিয়া, অনেকেই মনে মনে ইহার প্রতিবাদ করিতে পারেন। তাঁহারা বলিতে পারেন যে, যে মাতা স্নেহবশতঃ পুত্রকে অর্থান্বেষণে যাইতে দিল না—সে কি স্বার্থপর? বরং যদি স্বার্থপর হইত, তাহা হইলে পুত্রকে অর্থান্বেষণে দূরদেশে যাইতে নিষেধ করিত না; কেন না, পুত্র অর্থোপার্জন করিলে কোন্ না মাতা তাহার ভাগিনী হইবেন?—অতএব ঐরূপ দর্শনমাত্র আকাঙ্ক্ষী স্নেহকে অনেকেই অস্বার্থপর স্নেহ মনে করেন। বাস্তবিক সে কথা সত্য নহে—এ স্নেহ অস্বার্থপর নহে। যাঁহারা ইহা অস্বার্থপর মনে করেন, তাঁহারা অর্থপরতাকে স্বার্থপরতা মনে করেন; যে ধনের কামনা করে না, তাহাকে স্বার্থপরতাশূন্য মনে করেন। ধনলাভ ভিন্ন পৃথিবীতে যে অন্যান্য সুখ আছে, এবং তন্মধ্যে কোন কোন সুখের আকাঙ্ক্ষা ধনাকাঙ্ক্ষা হইতে অধিকতর বেগবতী, তাহা তাঁহারা বুদ্ধিতে পারেন না। যে মাতা অর্থের মায়া পরিত্যাগ করিয়া পুত্রমুখদর্শনসুখের বাসনায় পুত্রকে দারিদ্র্যে সমর্পণ করিল, সেও আত্মসুখ খুঁজিল। সে অর্থজনিত সুখ চায় না, কিন্তু পুত্রসন্দর্শনজনিত সুখ চায়। সে সুখ মাতার, পুত্রের নহে; মাতৃদর্শনজনিত পুত্রের যদি সুখ থাকে, থাক;—সে স্বতন্ত্র, পুত্রের প্রবৃত্তিদায়ক, মাতার নহে। মাতা এখানে আপনার একটি সুখ খুঁজিল—নিত্য পুত্রমুখদর্শন; তাহার অভিলাষিণী হইয়া

বাঁকম রচনাবলী

পুত্রকে দারিদ্র্যদুঃখে দুঃখী করিতে চাইল; এখানে মাতা স্বার্থপর; কেন না, আপনার সুখের অভিপ্রায়ে অন্যকে দুঃখী করিল।

মনুষ্যের স্নেহ অধিকাংশই এইরূপ প্রণয়ী প্রণয়ভাজন উভয়েরই চিত্তসুখকর, কিন্তু স্বার্থপর, পশুবৃত্ত। কেবল, প্রণয়ী অন্য সুখাপেক্ষা প্রণয়সুখের অভিলাষী, এই জন্য লোকে এইরূপ স্নেহকে অস্বার্থপর বলে। কিন্তু স্নেহের যে সুখ, সে স্নেহযুক্তের; স্নেহযুক্ত আপন সুখের আকাঙ্ক্ষী বলিয়া, সাধারণ মনুষ্যস্নেহকে স্বার্থপর বৃত্তি বলিতে হইবে।

কিন্তু স্বার্থসাধন জন্য স্নেহ মনুষ্যহৃদয়ে স্থাপিত নহে। মানুষের যতগুলি বৃত্তি আছে, বোধ হয়, সর্বাপেক্ষা এইটি পবিত্র ও মঙ্গলকর। মনুষ্যের চরিত্র এ পর্যন্ত তাদৃশ উৎকর্ষ লাভ করে নাই বলিয়াই মনুষ্যস্নেহ অদ্যাপি পশুবৎ। পশুবৎ, কেন না, পশুদিগেরও বৎসস্নেহ, দাম্পত্যপ্রণয় এবং বাৎসল্য, দাম্পত্য ব্যতীত পরস্পর অন্যবিধ প্রণয় আছে। প্রথমটি মানুষের অপেক্ষা অল্প পরিমাণে নহে।

স্নেহের যথার্থ স্বরূপই অস্বার্থপরতা। যে মাতা পুত্রের সুখের কামনায়, পুত্রমুখ দর্শন কামনা পরিত্যাগ করিলেন, তিনিই যথার্থ স্নেহবতী। যে প্রণয়ী, প্রণয়ের পাত্রের মঙ্গলার্থ আপনার প্রণয়জনিত সুখভোগও ত্যাগ করিতে পারিল, সেই প্রণয়ী।

যত দিন না সাধারণ মনুষ্যের প্রেম, এইরূপ বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হইবে, তত দিন মানুষের ভালবাসা হইতে স্বার্থপরতা কলঙ্ক ঘূঁচবে না। এবং স্নেহের যথার্থ 'স্বর্দীপ্তি' ঘটিবে না। যেখানে ভালবাসা এইরূপ বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হইবে বা যাহার হৃদয়ে হইয়াছে, সেইখানে ভালবাসার দ্বারায় ভালবাসার অত্যাচার নিবারণ হইতে পারে, এবং হইয়াও থাকে। এরূপ বিশুদ্ধ প্রণয়-বিশিষ্ট মনুষ্য দুর্লভ নহে। কিন্তু এ প্রবন্ধে তাঁহাদিগের কথা বলিতেছি না—তাঁহারা অত্যাচারীও নহেন। অন্যত্র, ধর্ম্মের শাসনে প্রণয় শাসিত করাই ভালবাসার অত্যাচার নিবারণের একমাত্র উপায়। সে ধর্ম্ম কি?

ধর্ম্মের যিনি যে ব্যাখ্যা করুন না, ধর্ম্ম এক। দুইটি মাত্র মূলসূত্রে সমস্ত মনুষ্যের নীতিশাস্ত্র কথিত হইতে পারে। তাহার মধ্যে একটি আত্মসম্বন্ধীয়, দ্বিতীয়টি পরসম্বন্ধীয়। যাহা আত্মসম্বন্ধীয়, তাহাকে আত্মসংস্কারনীতির মূল বলা যাইতে পারে,—এবং আত্মচিন্তের স্বর্দীপ্তি এবং নির্ম্মলতা রক্ষাই তাহার উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়টি, পরসম্বন্ধীয় বলিয়াই তাহাকে যথার্থ ধর্ম্মনীতির মূল বলা যাইতে পারে। “পরের অনিষ্ট করিও না; সাধ্যানুসারে পরের মঙ্গল করিও।” এই মহতী উক্তি জগতীয় তাবদ্ধর্ম্মশাস্ত্রের একমাত্র মূল, এবং একমাত্র পরিণাম। অন্য যে কোন নৈতিক উক্তি বল না কেন, তাহার আদি ও চরম ইহাতেই বিলীন হইবে। আত্মসংস্কারনীতির সকল তত্ত্বের সহিত, এই মহানীতিতত্ত্বের ঐক্য আছে। এবং পরহিতনীতি এবং আত্মসংস্কারনীতি একই তত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা মাত্র। পরহিতরীতি এবং পরের অহিতে বিরতি, ইহাই সমগ্র নীতিশাস্ত্রের সার উপদেশ।

অতএব এই ধর্ম্মনীতির মূল সূত্রাবলম্বন করিলেই ভালবাসার অত্যাচার নিবারণ হইবে। যখন স্নেহশালী ব্যক্তি স্নেহের পাত্রের কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন তাঁহার মনে দৃঢ় সংকল্প করা উচিত যে, আমি কেবল আপন সুখের জন্য হস্তক্ষেপ করিব না; আপনার ভাবিয়া, যাহার প্রতি স্নেহ করি, তাহার কোন প্রকার অনিষ্ট করিব না। আমার যতটুকু কষ্ট সহ্য করিতে হয়, করিব; তথাপি তাহার কোন প্রকার অহিতে তাহাকে প্রবৃত্ত করিব না।

এ কথা শুনিলে অতি ক্ষুদ্র, এবং পুরাতন জনশ্রুতির পুনরুজ্জ্বলিত বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু ইহার প্রয়োগ সকল সময়ে তত সহজ বোধ হইবে না। উদাহরণ স্বরূপ, দশরথকৃত রামনির্ধ্বাসন মীমাংসার্থ গ্রহণ করিব; তদ্বারা এই সামান্য নিয়মের প্রয়োগের কঠিনতা অনেকের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে। এস্থলে কৈকেয়ী এবং দশরথ উভয়েই ভালবাসার অত্যাচারে প্রবৃত্ত; কৈকেয়ী দশরথের উপরে; দশরথ রামের উপরে। ইহার মধ্যে কৈকেয়ীর কার্য স্বার্থপর এবং নৃশংস বলিয়া চিরপরিচিত। কৈকেয়ীর কার্য স্বার্থপর ও নৃশংস বটে, তবে তৎপ্রতি যতটা কটুভক্তি হইয়া আসিতেছে, ততটা বিহিত কি না বলা যায় না। কৈকেয়ী আপনার কোন ইচ্ছা কামনা করে নাই; আপনার পুত্রের শুভ কামনা করিয়াছিল। সত্য বটে, পুত্রের মঙ্গলেই মাতার মঙ্গল; কিন্তু যে বঙ্গীয় পিতা-মাতা স্বীয় জাতিপাতের ভয়ে পুত্রকে শিক্ষার্থ ইংলণ্ডে যাইতে দেন না, কৈকেয়ীর কার্য তদপেক্ষা যে শতগুণে অস্বার্থপর, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

সে কথা যাউক, কৈকেয়ীর দোষ গুণ বিচারে আমরা প্রবৃত্ত নহি। দশরথ সত্যপালনার্থ রামকে বনপ্রেরণ করিয়া ভারতকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। তাহাতে তাঁহার নিজের প্রাণবিয়োগ হইল। তিনি সত্যপালনার্থ আত্মপ্রাণ বিয়োগ এবং প্রাণাধিক পুত্রের বিরহ স্বীকার করিলেন, ইহাতে ভারতবর্ষীয় সাহিত্যোতিহাস তাঁহার যশঃ কীর্তনে পরিপূর্ণ। কিন্তু উৎকৃষ্ট ধর্মনীতির বিচারে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, দশরথ পুত্রকে স্বাধিকারচ্যুত এবং নিষ্বাসিত করিয়া, সত্যপালন করায়, ঘোরতর অধর্ম করিয়াছিলেন।

জিজ্ঞাসা করি, সত্যমাত্র কি পালনীয়? যদি সতী কুলবতী, কুচরিত্র পুরুষের কাছে ধর্ম-ত্যাগে প্রতিশ্রুতা হয়, তবে সে সত্য কি পালনীয়? যদি কেহ দস্যুর প্ররোচনায় সুহৃদকে বিনাদোষে বধ করিতে সত্য করে, তবে সে সত্য কি পালনীয়? যে কেহ ঘোরতর মহাপাতক করিতে সত্য করে, তাহার সত্য কি পালনীয়?

যেখানে সত্য লঙ্ঘনাপেক্ষা সত্য রক্ষায় অধিক অনিষ্ট, সেখানে সত্য রাখিবে, না সত্য ভঙ্গ করিবে? অনেকে বলিবেন, সেখানেও সত্য পালনীয়; কেন না, সত্য নিত্যধর্ম, অবস্থাভেদে তাহা পুণ্যত্ব পাপত্ব প্রাপ্ত হয় না। যদি পাপ পুণ্যের এমন নিয়ম কর যে, যখন যাহা কর্মকর্তার বিবেচনায় ইষ্টকারক, তাহাই কর্তব্য; যাহা তাঁহার তাত্কালিক বিবেচনায় অনিষ্টকারক, তাহা অকর্তব্য, তবে পুণ্য পাপের প্রভেদ থাকে না—লোকে পুণ্য বলিয়া ঘোরতর মহাপাতকে প্রবৃত্ত হইতে পারে। আমরা এ তত্ত্বের মীমাংসা এ স্থলে করিব না—কেন না, হিতবাদীরা ইহার এক প্রকার মীমাংসা করিয়া রাখিয়াছেন। স্থূল কথা উত্তর দিব।

যখন এরূপ মীমাংসার গোলযোগ হইবে, তখন ধর্মনীতির যে মূল সূত্র সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার দ্বারা পরীক্ষা কর।

সত্য কি সর্বত্র পালনীয়? এ কথা মীমাংসা করিবার আগে জিজ্ঞাস্য, তাহা পালনীয় কেন? সত্য পালনের একটি মূল ধর্মনীতিতে, একটি মূল আত্ম-সংস্কারনীতিতে। আমরা আত্ম-সংস্কারনীতিকে ধর্মনীতির অংশ বলিয়া পরিগণিত করিতে অস্বীকার করিয়াছি; ধর্মনীতির মূলই দেখিব। বিশেষ উভয়ের ফল একই। ধর্মনীতির মূল সূত্র, পরের অনিষ্ট যাহাতে হয়, তাহা অকর্তব্য। সত্যভঙ্গে পরের অনিষ্ট হয়, এজন্য সত্য পালনীয়। কিন্তু যখন এমন ঘটে যে, সত্য পালনে পরের গুরুতর অনিষ্ট, সত্য ভঙ্গে তত দূর নহে, তখন সত্য পালনীয় নহে। দশরথের সত্যপালনে রামের গুরুতর অনিষ্ট; সত্য ভঙ্গে কৈকেয়ীর তাদৃশ কোন অনিষ্ট নাই। দৃষ্টান্তজনিত জনসমাজের যে অনিষ্ট, তাহা রামের স্বাধিকারচ্যুতিতেই গুরুতর। উহা দস্যুতার রূপান্তর। অতএব এমত স্থলে দশরথ সত্যপালন করিয়াই মহাপাপ করিয়াছিলেন।

এখানে দশরথ স্বার্থপরতাশূন্য নহেন। সত্য ভঙ্গে জগতে তাঁহার কলঙ্ক ঘোষিত হইবে, এই ভয়েই তিনি রামকে অধিকারচ্যুত এবং বহিষ্কৃত করিলেন; অতএব যশোরক্ষারূপ স্বার্থের বশীভূত হইয়া রামের অনিষ্ট করিলেন। সত্য বটে, তিনি আপনার প্রাণহানিও স্বীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার কাছে প্রাণাপেক্ষা যশ প্রিয়, অতএব আপনার ইষ্টই খুঁজিয়াছিলেন। এজন্য তিনি স্বার্থপর। স্বার্থপরতা-দোষযুক্ত যে অনিষ্ট, তাহা ঘোরতর পাপ।

অস্বার্থপর প্রেম, এবং ধর্ম, ইহাদের একই গতি, একই চরম। উভয়ের সাধ্য, অন্যের মঙ্গল। বস্তুতঃ প্রেম, এবং ধর্ম একই পদার্থ। সর্ব সংসার প্রেমের বিষয়ীভূত হইলেই ধর্ম নাম প্রাপ্ত হয়। এবং ধর্ম যত দিন না সার্বজনীন প্রেমস্বরূপ হয়, তত দিন সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু মনুষ্যাগণ, কার্যতঃ স্নেহকে ধর্ম হইতে পৃথগ্ভূত রাখিয়াছে, এজন্য ভালবাসার অত্যাচার নিবারণ জন্য ধর্মের দ্বারা স্নেহের শাসন আবশ্যিক।

জ্ঞান

ভারতবর্ষে দর্শন কাহাকে বলে? ইহার উত্তর দিতে গেলে প্রথমে বুঝিতে হইবে যে, ইউরোপে যে অর্থে “ফিলসফি” শব্দ ব্যবহৃত হয়, দর্শন সে অর্থে ব্যবহৃত হয় না। বাস্তবিক ফিলসফি শব্দের অর্থের স্থিরতা নাই,—কখন ইহার অর্থ অধ্যাত্ত্ব, কখন ইহার অর্থ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, কখন ইহার অর্থ ধর্মনীতি, কখন ইহার অর্থ বিচারবিদ্যা। ইহার একটিও দর্শনের ব্যাখ্যার অনুরূপ নহে। ফিলসফির উদ্দেশ্য, জ্ঞানবিশেষ; তদতিরিক্ত অন্য উদ্দেশ্য নাই।

বিশ্বকম রচনাবলী

দর্শনেরও উদ্দেশ্য জ্ঞান বটে, কিন্তু সে জ্ঞানের উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্য নিঃশ্রেয়স, মুক্তি, নিৰ্ব্বাণ বা তদ্বৎ নামান্তরবিশিষ্ট পারলৌকিক অবস্থা। ইউরোপীয় ফিলসফিতে জ্ঞানই সাধনীয়; দর্শনে জ্ঞান সাধন মাত্র। ইহা ভিন্ন আর একটি গুরুতর প্রভেদ আছে। ফিলসফির উদ্দেশ্য, জ্ঞানবিশেষ,—কখন আধ্যাত্মিক, কখন ভৌতিক, কখন নৈতিক বা সামাজিক জ্ঞান। কিন্তু সর্বত্র পদার্থ মাত্রেরই জ্ঞান দর্শনের উদ্দেশ্য। ফলতঃ সকল প্রকার জ্ঞানই দর্শনের অন্তর্গত।

সংসার দুঃখময়। প্রাকৃতিক বল, সর্বদা মনুষ্য-সুখের প্রতিদ্বন্দ্বী। তুমি যাহা কিছু সুখভোগ কর, সে বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া লাভ কর। মনুষ্যজীবন, প্রকৃতির সঙ্গে দীর্ঘ সময় মাত্র—যখন তুমি সময়জয়ী হইলে, তখনই কিঞ্চিৎ সুখলাভ করিলে। কিন্তু মনুষ্যবল হইতে প্রাকৃতিক বল অনেক গুণে গুরুতর। অতএব মনুষ্যের জয় কদাচিৎ—প্রকৃতির জয়ই প্রতিনিয়ত ঘটিয়া থাকে। তবে জীবন যন্ত্রণাময়। আৰ্য্য মতে ইহার আবার পৌনঃপুন্য আছে। ইহজন্মে, অনন্ত দুঃখ কোনরূপে কাটাইয়া, প্রাকৃতিক রণে শেষে পরাস্ত হইয়া, যদি জীব দেহত্যাগ করিল—তথাপি ক্ষমা নাই—আবার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, আবার সেই অনন্ত দুঃখভোগ করিতে হইবে—আবার মরিতে হইবে,—আবার জন্মিতে হইবে,—আবার দুঃখ। এই অনন্ত দুঃখের কি নিবৃত্তি নাই? মনুষ্যের নিস্তার নাই?

ইহার দুই উত্তর আছে। এক উত্তর ইউরোপীয়, আর এক উত্তর ভারতবর্ষীয়। ইউরোপীয়েরা বলেন, প্রকৃতি জেয়; যাহাতে প্রকৃতিকে জয় করিতে পারি, সেই চেষ্টা দেখ। এই জীবন-রণে প্রকৃতিকে পরাস্ত করিবার জন্য আয়ুধ সংগ্রহ কর। সেই আয়ুধ, প্রকৃতিকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিজেই বলিয়া দিবেন। প্রাকৃতিক তত্ত্ব অধ্যয়ন কর—প্রকৃতির গুপ্ত তত্ত্ব সকল অবগত হইয়া, তাহারই বলে তাহাকে বিজিত করিয়া, মনুষ্যজীবন সুখময় কর। এই উত্তরের ফল—ইউরোপীয় বিজ্ঞানশাস্ত্র।

ভারতবর্ষীয় উত্তর এই যে, প্রকৃতি অজেয়—যত দিন প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ থাকিবে, তত দিন দুঃখ থাকিবে। অতএব প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধবিচ্ছেদই দুঃখ নিবারণের একমাত্র উপায়। সেই সম্বন্ধবিচ্ছেদ কেবল জ্ঞানের দ্বারাই হইতে পারে। এই উত্তরের ফল ভারতবর্ষীয় দর্শন।

সেই জ্ঞান কি? আকাশকুসুম বলিলেও একটি জ্ঞান হয়—কেন না, আকাশ কি, তাহা আমরা জানি, এবং কুসুম কি, তাহাও জানি, মনের শক্তির দ্বারা উভয়ের সংযোগ করিতে পারি। কিন্তু সে জ্ঞান, দর্শনের উদ্দেশ্য নহে। তাহা ভ্রমজ্ঞান। যথার্থ জ্ঞানই দর্শনের উদ্দেশ্য। এই যথার্থ জ্ঞানকে প্রমাজ্ঞান বা প্রমা প্রতীতি বলে। সেই যথার্থ জ্ঞান কি?

যাহা জানি, তাহাই জ্ঞান। যাহা জানি, তাহা কি প্রকারে জানিয়াছি?

কতকগুলি বিষয় ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ সংযোগে জানিতে পারি। ঐ গৃহ, এই বৃক্ষ, ঐ নদী, এই পর্বত আমার সম্মুখে রহিয়াছে; তাহা আমি চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, এজন্য জানি যে, ঐ গৃহ, এই বৃক্ষ, ঐ নদী, এই পর্বত আছে। অতএব জ্ঞাতব্য পদার্থের সঙ্গে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগে আমাদের এই জ্ঞান লব্ধ হইল (১)। ইহাকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ বলে। এইরূপ, গৃহমধ্যে থাকিয়া শুনিতে পাইলাম, মেঘ গর্জিতেছে, পক্ষী ডাকিতেছে; এখানে মেঘের ডাক, পক্ষীর রব আমরা কর্ণের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিলাম। ইহা শ্রাবণ প্রত্যক্ষ। এইরূপ চাক্ষুষ, শ্রাবণ, ঘ্রাণজ, স্পর্শ, এবং রাসন, পশ্চাদ্ভ্রিয়ের সাধ্য পাঁচ প্রত্যক্ষ। মনও একটি ইন্দ্রিয় বলিয়া আৰ্য্য দার্শনিকেরা গণিয়া থাকেন, অতএব তাহারা মানস প্রত্যক্ষের কথা বলেন। মন বহিরিন্দ্রিয় নহে। অন্তরিন্দ্রিয়ের সঙ্গে বহির্বিষয়ের সাক্ষাৎসংযোগ অসম্ভব। অতএব মানস প্রত্যক্ষে বহির্বিষয় অবগত হওয়া যায় না; কিন্তু অন্তর্জ্ঞান, মানস প্রত্যক্ষের দ্বারাই হইবে।

যে পদার্থ প্রত্যক্ষ হয়, তদ্বিষয়ে আমাদের জ্ঞান জন্মে, এবং তদ্ব্যতিরিক্ত বিষয়ের জ্ঞানও সূচিত হয়। আমি রুদ্ধদ্বার গৃহমধ্যে শয়ন করিয়া আছি, এমত সময়ে মেঘের ধ্বনি শুনিলাম, ইহাতে শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হইল। কিন্তু সে প্রত্যক্ষ ধ্বনির, মেঘের নহে। মেঘ এখানে আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। অথচ আমরা জানিতে পারিলাম যে, আকাশে মেঘ আছে। ধ্বনির

(১) গৃহ, পর্বতাদি দূরে রহিয়াছে—আমাদের চক্ষে সংলগ্ন নহে, তবে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইল কি প্রকারে? দৃষ্ট পদার্থবিক্ষিপ্ত রশ্মির দ্বারা। ঐ রশ্মি আমাদের নয়নাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে দৃষ্টি হয়।

বিবিধ প্রবন্ধ—জ্ঞান

প্রত্যক্ষে মেঘের অস্তিত্ব জ্ঞান হইল কোথা হইতে? আমরা পূর্বে পূর্বে দেখিয়াছি, আকাশে মেঘ ব্যতীত কখন এরূপ ধ্বনি হয় নাই। এমন কখনও ঘটে নাই যে মেঘ নাই, অথচ এরূপ ধ্বনি শূন্য গিয়াছে। অতএব রুদ্ধদ্বার গৃহমধ্যে থাকিয়াও আমরা বিনা প্রত্যক্ষে জানিলাম যে, আকাশে মেঘ হইয়াছে। ইহাকে অনুমিতি বলে। মেঘধ্বনি আমরা প্রত্যক্ষ জানিয়াছি, কিন্তু মেঘ অনুমিতির দ্বারা।

মনে কর, ঐ রুদ্ধদ্বার গৃহ অন্ধকার, এবং তুমি সেখানে একাকী আছ। এমত কালে তোমার দেহের সহিত মনুষ্যশরীরের স্পর্শ অনুভূত করিলে। তুমি তখন কিছুর না দেখিয়া, কোন শব্দও না শুনিয়া জানিতে পারিলে যে, গৃহমধ্যে মনুষ্য আসিয়াছে। সেই স্পর্শজ্ঞান হ্রাচ প্রত্যক্ষ; কিন্তু গৃহমধ্যে মনুষ্য-জ্ঞান অনুমিতি। ঐ অন্ধকার গৃহে তুমি যদি যুথিকা পুষ্পের গন্ধ পাও, তবে তুমি বুঝিবে যে, গৃহে পুষ্পাদি আছে; এখানে গন্ধই প্রত্যক্ষের বিষয়; পুষ্প অনুমিতির বিষয়।

মনুষ্য অল্প বিষয়ই স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতে পারে। অধিকাংশ জ্ঞানই অনুমিতির উপর নির্ভর করে। অনুমিতি সংসার চালাইতেছে। আমরাদিগের অনুমানশক্তি না থাকিলে আমরা প্রায় কোন কার্যই করিতে পারিতাম না। বিজ্ঞান, দর্শনাদি অনুমানের উপরেই নির্মিত।

কিন্তু যেমন কোন মনুষ্যই সকল বিষয় স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না, তেমনি কোন ব্যক্তি সকল তত্ত্ব স্বয়ং অনুমান করিয়া সিদ্ধ করিতে পারেন না। এমন অনেক বিষয় আছে যে, তাহা অনুমান করিয়া জানিতে গেলে যে পরিশ্রম আবশ্যিক, তাহা একজন মনুষ্যের জীবনকালের মধ্যে সাধ্য নহে। এমন অনেক বিষয় আছে যে, তাহা অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ করার জন্য যে বিদ্যা বা যে জ্ঞান, বা যে বুদ্ধি বা যে অধ্যবসায় প্রয়োজনীয়, তাহা অধিকাংশ লোকেরই নাই। অতএব এমন অনেক নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় আছে যে, তাহা অনেকে স্বয়ং প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বারা জ্ঞাত হইতে পারেন না। এমন স্থলে আমরা কি করিয়া থাকি? যে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছে বা যে স্বয়ং অনুমান করিয়াছে, তাহার কথা শুনিয়া বিশ্বাস করি। ইতালীর উত্তরে যে আল্প নামে পর্বতশ্রেণী আছে, তাহা তুমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ কর নাই। কিন্তু যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের প্রণীত পুস্তক পাঠ করিয়া তুমি সে জ্ঞান লাভ করিলে। পরমাণুমাত্র যে অন্য পরমাণুমাত্রের দ্বারা আকৃষ্ট হয়, ইহা প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না এবং তুমিও ইহা গণনার দ্বারা সিদ্ধ করিতে পার নাই, এজন্য তুমি নিউটনের কথায় বিশ্বাস করিয়া সে জ্ঞান লাভ করিলে।

ন্যায়, সাংখ্যাদি আর্ষ্যদর্শনশাস্ত্রে ইহা একটি তৃতীয় প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ইহার নাম শব্দ। তাঁহাদিগের বিবেচনায় বেদাদি এই প্রমাণের উপর নির্ভর করে। আপ্তবাক্য বা গুরুপদেশ, স্থূলতঃ যে বিশ্বাসযোগ্য, তাহার উপদেশ,—আর্ষ্যমতে ইহা একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ। তাহারই নাম শব্দ।

কিন্তু চার্ব্বাগাদি কোন কোন আর্ষ্য দার্শনিক ইহাকে প্রমাণ বলিয়াই স্বীকার করেন না। ইউরোপীয়েরাও ইহাকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না।

দেখা যাইতেছে, সকলের কথায় বিশ্বাস অকর্তব্য। যদি একজন বিখ্যাত মিথ্যাবাদী আসিয়া বলে যে, সে জলে অগ্নি জ্বলিতে দেখিয়া আসিয়াছে, তবে এ কথা কেহই বিশ্বাস করিবে না। তাহার উপদেশে প্রমাজ্ঞানের উৎপত্তি নাই। ব্যক্তিবিশেষের উপদেশই প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য। তবে সেই জ্ঞানলাভের পূর্বে আদৌ মীমাংসা আবশ্যিক যে, কে বিশ্বাসযোগ্য, কে নহে। কোন প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এ মীমাংসা করিব? কোন প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া, মন্বাদির কথা আপ্তবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিব, এবং রাম শ্যামুর কথা অগ্রাহ্য করিব? দেখা যাইতেছে যে, অনুমানের দ্বারা ইহা সিদ্ধ করিতে হইবে। মনুর সঙ্গে পল্লীর পাদরি সাহেবের মতভেদ। তুমি চিরকাল শুনিয়া আসিয়াছ যে, মনু অদ্রাস্ত ঋষি, এবং পাদরি সাহেব স্বার্থপর সামান্য মনুষ্য; এজন্য তুমি অনুমান করিলে যে, মনুর কথা গ্রাহ্য, পাদরির কথা অগ্রাহ্য। মনুর ন্যায় অদ্রাস্ত ঋষি গোমাংসভোজন নিষেধ করিয়াছেন বলিয়া তুমি অনুমান করিলে গোমাংস অভক্ষ্য। অতএব শব্দকে একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ না বলিয়া, অনুমানের অন্তর্গত বল না কেন?

শুদ্ধ তাহাই নহে। যে ব্যক্তির কতকগুলি উপদেশ গ্রাহ্য কর, তাহারই আর কতকগুলি অগ্রাহ্য করিয়া থাক। মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে নিউটনের যে মত, তাহা তুমি শিরোধার্য কর, কিন্তু আলোক সম্বন্ধে তাহার যে মত, তাহা পরিত্যাগ করিয়া তুমি ক্ষুদ্রতর বুদ্ধিজীবী ইয়ঙ ও

বাঁকম রচনাবলী

ফ্রেনেলের মত গ্রহণ কর, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ সন্ধান করিলে, তলে অনুমিতিকেই পাওয়া যাইবে। অনুমানের দ্বারা তুমি জানিয়াছ যে, মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে নিউটনের যে মত, তাহা সত্য, আলোক সম্বন্ধে তাঁহার যে মত, তাহা অসত্য। যদি শব্দ একটি পৃথক্ প্রমাণ হইত, তবে তাঁহার সকল মতই তুমি গ্রাহ্য করিতে।

ভারতবর্ষে তাহাই ঘটিয়া থাকে। ভারতবর্ষে যাহার মত গ্রাহ্য বলিয়া স্থির হয়, তাহার সকল মতই গ্রাহ্য। ইহার কারণ, শব্দ একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া গণ্য—আপ্তবাক্য মাত্র গ্রাহ্য, ইহা আৰ্য্য দর্শনশাস্ত্রের আজ্ঞা। এইরূপ বিশেষ বিচার ব্যতীত ঋষি ও পণ্ডিতদিগের মতমাত্রই গ্রহণ করা, ভারতবর্ষের অবনতির একটি যে কারণ, ইহা বলা বাহুল্য। অতএব দার্শনিকদিগের এই একটি ক্ষুদ্র ভ্রান্তিতে সামান্য কুফল ফলে নাই।

প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ ভিন্ন নৈয়ায়িকেরা উপমিতিকেও একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ বিবেচনা করেন। বিচার করিয়া দেখিলে সিদ্ধ হইবে যে, উপমিতি, অনুমিতির প্রকারভেদ মাত্র, এবং সেই জন্য সাংখ্যাদি দর্শনে উপমিতি স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয় নাই। অতএব উপমিতির বিস্তারিত উল্লেখ প্রয়োজনীয় বোধ হইল না। বস্তুতঃ প্রত্যক্ষ এবং অনুমানই জ্ঞানের মূল।

তাহার পর দেখিতে হইবে যে, অনুমানও প্রত্যক্ষমূলক। যে জাতীয় প্রত্যক্ষ কখন হয় নাই, সে বিষয়ে অনুমান হয় না। তুমি যদি কখন পৃথক্ মেঘ না দেখিতে বা আর কেহ কখন না দেখিত, তবে তুমি রুদ্ধদ্বার গৃহমধ্যে মেঘগজ্জর্জন শুনিয়া কখন মেঘানুমান করিতে পারিতে না। তুমি যদি কখন যুথিকা-গন্ধ প্রত্যক্ষ না করিতে, তবে অন্ধকার গৃহে থাকিয়া যুথিকা-ঘ্রাণ পাইয়া তুমি কখন অনুমান করিতে পারিতে না যে, গৃহমধ্যে যুথিকা আছে। এইরূপ অন্যান্য পদার্থ সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে। তবে অনেক সময়ে দেখা যাইবে যে, একটি অনুমানের মূল, বহুতর বহুজাতীয় পৃথক্-প্রত্যক্ষ। এক একটি বৈজ্ঞানিক নিয়ম সহস্র সহস্র জাতীয় প্রত্যক্ষের ফল।

অতএব প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র মূল—সকল প্রমাণের মূল (১)। অনেকে দেখিয়া বিস্মিত হইবেন যে, দর্শনশাস্ত্র দুই তিন সহস্র বৎসরের পর, ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবার সেই চার্ব্বাকের মতে আসিয়া পড়িতেছে। ধন্য আৰ্য্যবৃদ্ধি! যাহা এত কালে হুম, মিল, বেন প্রভৃতির দ্বারা সংস্থাপিত হইয়াছে—দুই সহস্রাধিক বৎসর পৃথক্ বৃহস্পতি তাহা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। কেহ না ভাবেন যে, আমরা এমন বলিতেছি যে, প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রমাণ নাই—আমরা বলিতেছি যে, সকল প্রমাণের মূল প্রত্যক্ষ। বৃহস্পতি ঠিক তাহাই বলিয়াছিলেন কি না, তাঁহার গ্রন্থ সকল লুপ্ত হওয়ায় নিশ্চয় করা কঠিন।

প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র মূল, কিন্তু এই তত্ত্বের মধ্যে ইউরোপীয় দার্শনিকদিগের মধ্যে একটি ঘোরতর বিবাদ আছে। কেহ কেহ বলেন যে, আমরাদিগের এমন অনেক জ্ঞান আছে যে, তাহার মূল প্রত্যক্ষে পাওয়া যায় না। যথা,—কাল, আকাশ, ইত্যাদি।

কথারিট বৃদ্ধা কঠিন। আকাশ সম্বন্ধে একটি সহজ কথা গ্রহণ করা যাউক.—যথা, দুইটি সমানান্তরাল রেখা যতদূর টানা যাউক, কখন মিলিত হইবে না, ইহা আমরা নিশ্চিত জানি। কিন্তু এ জ্ঞান আমরা কোথা পাইলাম? প্রত্যক্ষবাদী বলিবেন, “প্রত্যক্ষের দ্বারা! আমরা যত সমানান্তরাল রেখা দেখিয়াছি, তাহা কখন মিলিত হয় নাই।” তাহাতে বিপক্ষেরা প্রত্যুত্তর করেন যে, “জগতে যত সমানান্তরাল রেখা হইয়াছে, সকল তুমি দেখ নাই,—তুমি যাহা দেখিয়াছ, তাহা মিলে নাই বটে, কিন্তু তুমি কি প্রকারে জানিলে যে, কোন কালে কোথায় এমন দুইটি সমানান্তরাল রেখা হয় নাই বা হইবে না যে, তাহা টানিতে টানিতে এক স্থানে মিলিবে না? যাহা মনুষ্যের প্রত্যক্ষ হইয়াছে, তাহা হইতে তুমি কি প্রকারে অপত্যক্ষীভূতের নিশ্চয় করিলে? অথচ আমরা জানিতেছি যে, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সত্য;—কস্মিন্ কালে কোথাও এমন দুইটি সমানান্তরাল রেখা হইতে পারে না যে, তাহা মিলিবে। তবে প্রত্যক্ষ ব্যতীত তোমার আর কোন জ্ঞানমূল আছে—নাহিলে তুমি এই প্রত্যক্ষের অতিরিক্ত জ্ঞানটুকু কোথায় পাইলে?”

এই কথা বলিয়া, বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক কান্ট, লক ও হুমের প্রত্যক্ষবাদের প্রতিবাদ করেন। এই অতিরিক্ত জ্ঞানের মূল তিনি এই নির্দেশ করেন যে, যেখানে বহির্বিষয়ের জ্ঞান আমরাদিগের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হইয়া থাকে, সেখানে বহির্বিষয়ের প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন তত্ত্বের

(১) এই সকল মত আমি এক্ষণে পরিত্যাগ করিয়াছি।

নিত্য আমাদের জ্ঞানের অতীত হইলেও, আমাদের ইন্দ্রিয় সকলের প্রকৃতির নিত্য আমাদের জ্ঞানের আয়ত্ত বটে। আমাদের ইন্দ্রিয় সকলের প্রকৃতি অনুসারে আমরা বর্হিবর্ষয় কতকগুলি নির্দিষ্ট অবস্থাপন্ন বলিয়া পরিজ্ঞাত হই। ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি সর্বত্র একরূপ, এজন্য বর্হিবর্ষয়ের তত্ত্ব অবস্থাও আমাদের নিকট সর্বত্র একরূপ। এই জন্য আমাদের কাল, আকাশাদির সমবায়ের নিত্য জ্ঞানিতে পারি। এই জ্ঞান আমাদেরই আছে—এজন্য কান্ত ইহাকে স্বতোলক বা আভ্যন্তরিক জ্ঞান বলেন।

পাঠক আবার দেখিবেন যে, আধুনিক ইউরোপীয় দর্শন, ফিরিয়া ফিরিয়া সেই প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে মিলিতেছে। যেমন চার্ব্বাকের প্রত্যক্ষবাদে, মিল ও বেনের প্রত্যক্ষবাদের সাদৃশ্য দেখা গিয়াছে, তেমনি বেদান্তের মায়াবাদের সঙ্গে কান্তের এই প্রত্যক্ষ প্রতিবাদের সাদৃশ্য দেখা যায়। আধ্যাত্মিক তত্ত্বে, প্রাচীন আর্ষ্যগণ কতৃক সূচিত হয় নাই, এমন তত্ত্ব অল্পই ইউরোপে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

কান্তীয় আভ্যন্তরিক মতের প্রধানতম প্রতিদ্বন্দ্বী জন স্টুয়ার্ট মিল। তিনি কার্যকারণ-সম্বন্ধের নিত্যত্বের উপর নির্ভর করেন। তিনি বলেন যে, আমরা প্রত্যক্ষের দ্বারা একটি অকাটা সংস্কার এই লাভ করিয়াছি যে, যেখানে কারণ বর্তমান আছে, সেইখানেই তাহার কার্য বর্তমান থাকিবে। যেখানে পূর্বে দেখিয়াছি যে, ক বর্তমান আছে, সেইখানে দেখিয়াছি যে, খ আছে। পুনর্বার যদি কোথাও ক দেখি, তবে আমরা জানিতে পারি যে, খও এখানে আছে; কেন না, আমরা প্রত্যক্ষের দ্বারা জানিয়াছি, যেখানে কারণ থাকে, সেইখানেই তাহার কার্য থাকে। সমানান্তরালতা কারণ, এবং সংমিলনবিহীন তাহার কার্য; কেন না, আমরা যেখানে যেখানে সমানান্তরালতা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সেইখানে সেইখানে দেখিয়াছি, মিল হয় নাই, অতএব সমানান্তরালতা, সংমিলনবিহীন নিয়ত পূর্ববর্তী। কাজেই আমরা জানিতোছি যে, যখন যেখানে দুইটি সমানান্তরাল রেখা থাকিবে, সেইখানেই আর তাহাদের মিলন হইবে না। অতএব এ জ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক।

শেষ মত হবার্ট স্পেন্সরের। তিনিও প্রত্যক্ষবাদী, কিন্তু তিনি বলেন যে, এই প্রত্যক্ষমূলক জ্ঞান সকলটুকু আমাদের নিজ প্রত্যক্ষজাত নহে। প্রত্যক্ষজাত সংস্কার পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমার পূর্বপুরুষদের যে প্রত্যক্ষজাত সংস্কার, আমি তাহা কিয়দংশ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি যে সেই সকল সংস্কার লইয়া জন্মিয়াছি, এমন নহে—তাহা হইলে সদ্যঃপ্রসূত শিশুও সংস্কারবিশিষ্ট হইত, কিন্তু তাহার বীজ আমার শরীরে (মন শরীরের অন্তর্গত) আছে: প্রয়োজনমত সময়ে জ্ঞানে পরিণত হইবে। এইরূপে, যাহা কান্তীয় মতে আভ্যন্তরিক বা সহজ জ্ঞান, স্পেন্সরের মতে তাহা পূর্বপুরুষপরম্পরাগত প্রত্যক্ষজাত জ্ঞান।

এই কথা আপাততঃ অপ্রামাণিক বোধ হইতে পারে, কিন্তু স্পেন্সর এরূপ দক্ষতার সহিত ইহার সমর্থন করিয়াছেন যে, ইউরোপে এই মতই এক্ষণে প্রচলিত হইয়া উঠিতেছে (১)।

সাংখ্যদর্শন

প্রথম পরিচ্ছেদ—উপক্রমণিকা

এ দেশীয় প্রাচীন দর্শন সকলের মধ্যে বঙ্গদেশে ন্যায়ের প্রাধান্য। দেশীয় পণ্ডিতেরা সচরাচর সাংখ্যের প্রতি তাদৃশ মনোযোগ করেন না। কিন্তু ভারতবর্ষে সাংখ্য যে কীর্ত্তি করিয়াছে, তাহা অন্য দর্শন দূরে থাকুক, অন্য কোন শাস্ত্রের দ্বারা হইয়াছে কি না, সন্দেহ। বহুকাল হইল, এই দর্শনের প্রকাশ হয়। কিন্তু অদ্যাপি হিন্দুসমাজের হৃদয়মধ্যে ইহার নানা

(১) অনেকে কোমতের "Positive Philosophy" নামক দর্শনশাস্ত্রের নামানুবাদে প্রত্যক্ষবাদ লিখিয়া থাকেন। আমাদের বিবেচনায় সেটি ভ্রম। যাহাকে "Empirical Philosophy" বলে, অর্থাত্ লক, হুম, মিল ও বেনের মতকেই প্রত্যক্ষবাদ বলা যায়। আমরা সেই অর্থেই প্রত্যক্ষবাদ শব্দ এই প্রবন্ধে ব্যবহার করিয়াছি।

বিশ্বকম রচনাবলী

মুক্তি বিরাজ করিতেছে। যিনি হিন্দুদিগের পুরাবৃত্ত অধ্যয়ন করিতে চাহেন, সাংখ্যদর্শন না বদ্বিলে তাঁহার সম্যক্ জ্ঞান জন্মিবে না; কেন না, হিন্দুসমাজের পূর্বকালীয় গতি অনেক দূর সাংখ্যপ্রদর্শিত পথে হইয়াছিল। যিনি বর্তমান হিন্দুসমাজের চরিত্র বদ্বিতে চাহেন, তিনি সাংখ্য অধ্যয়ন করুন। সেই চরিত্রের মূল সাংখ্যে অনেক দেখিতে পাইবেন। সংসার যে দুঃখময়, দুঃখ নিবারণমাত্র আমাদের পদার্থ, এ কথা যেমন হিন্দুজাতির হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে, এমন বোধ হয়, পৃথিবীর আর কোন জাতির মধ্যে হয় নাই। তাহার বীজ সাংখ্যদর্শনে। তন্ত্রবন্ধন ভারতবর্ষে যে পরিমাণে বৈরাগ্য বহুকাল হইতে প্রবল, তেমন আর কোন দেশেই নহে। সেই বৈরাগ্য প্রাবল্যের ফল বর্তমান হিন্দুচরিত্র। যে কার্যপরতন্ত্রতার অভাব আমাদের প্রধান লক্ষণ বলিয়া বিদেশীয়েরা নির্দেশ করেন, তাহা সেই বৈরাগ্যের সাধারণতা মাত্র। যে অদৃষ্টবাদিত্ব আমাদের দ্বিতীয় প্রধান লক্ষণ, তাহা সাংখ্যজাত বৈরাগ্যের ভিন্ন মুক্তি মাত্র। এই বৈরাগ্যসাধারণতা এবং অদৃষ্টবাদিত্বের রূপাতেই ভারতবর্ষীয়দিগের অসীম বাহুবল সত্ত্বেও আর্ষ্যভূমি মুসলমান-পদানত হইয়াছিল। সেই জন্য অদ্যাপি ভারতবর্ষ পরাধীন। সেই জন্যই বহুকাল হইতে এ দেশে সমাজোন্নতি মন্দ হইয়া শেষে অবরুদ্ধ হইয়াছিল।

আবার সাংখ্যের প্রকৃতি পদার্থ লইয়া তন্ত্রের সৃষ্টি। সেই তান্ত্রিককান্ডে দেশ ব্যাপ্ত হইয়াছে। সেই তন্ত্রের রূপায় বিক্রমপুরে বসিয়া নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ঠাকুর অপরিমিত মদিরা উদরস্থ করিয়া, ধর্ম্মাচরণ করিলাম বলিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিতেছেন। সেই তন্ত্রের প্রভাবে প্রায় শত যোজন দূরে, ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশে কাগফোঁড়া যোগী উলঙ্গ হইয়া কদর্য উৎসব করিতেছে। সেই তন্ত্রের প্রসাদে আমরা দুর্গোৎসব করিয়া এই বাঙ্গালা দেশের ছয় কোটি লোক জীবন সার্থক করিতেছি। যখন গ্রামে গ্রামে, নগরে মাঠে জঙ্গলে শিবালয়, কালীর মন্দির দেখি, আমাদের সাংখ্য মনে পড়ে; যখন দুর্গা কালী জগদ্ধাত্রী পূজার বাদ্য শুনি, আমাদের সাংখ্য-দর্শন মনে পড়ে।

সহস্র বৎসর কাল বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষের প্রধান ধর্ম্ম ছিল। ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত মধ্যে যে সময়টি সর্বাপেক্ষা বিচিত্র এবং সৌষ্ঠব-লক্ষণযুক্ত, সেই সময়টিতেই বৌদ্ধধর্ম্ম এই ভারত-ভূমির প্রধান ধর্ম্ম ছিল। ভারতবর্ষ হইতে দূরীকৃত হইয়া সিংহলে, নেপালে, তিব্বতে, চীনে, ব্রহ্মে, শ্যামে এই ধর্ম্ম অদ্যাপি ব্যাপিয়া রহিয়াছে। সেই বৌদ্ধধর্ম্মের আদি এই সাংখ্যদর্শনে। বেদে অবজ্ঞা, নিস্বাণ, এবং নিরীশ্বরতা, বৌদ্ধধর্ম্ম এই তিনটি নতন; এই তিনটিই ঐ ধর্ম্মের কলেবর। উপস্থিত লেখক কর্তৃক ১০৬ সংখ্যক কলিকাতা রিবিউতে “বৌদ্ধধর্ম্ম এবং সাংখ্য-দর্শন” ইতি প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, এই তিনটিরই মূল সাংখ্যদর্শনে। নিস্বাণ, সাংখ্যের মুক্তির পরিমাণ মাত্র। বেদের অবজ্ঞা সাংখ্যে প্রকাশ্যে কোথাও নাই, বরং আড়ম্বর অনেক। কিন্তু সাংখ্যপ্রবচনকার বেদের দোহাই দিয়া শেষে বেদের করিয়াছেন।*

কথিত হইয়াছে যে, যত লোক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, তত সংখ্যক অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বী লোক পৃথিবীতে নাই। সংখ্যা সম্বন্ধে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা তৎপরবর্তী। সুতরাং যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, পৃথিবীতে অবতীর্ণ মনুষ্যমধ্যে কে সর্বাপেক্ষা অধিক লোকের জীবনের উপর প্রভুত্ব করিয়াছেন, তখন আমরা প্রথমে শাক্যসিংহের, তৎপরে খ্রীষ্টের নাম করিব। কিন্তু শাক্যসিংহের সঙ্গে সঙ্গে কপিলেরও নাম করিতে হইবে।

অতএব স্পষ্টাক্ষরে বলা যাইতে পারে যে, পৃথিবীতে যে সকল দর্শনশাস্ত্র অবতীর্ণ হইয়াছে, সাংখ্যের ন্যায় কেহ বহু ফলোৎপাদক হয় নাই।

সাংখ্যের প্রথমোক্ত কোন কালে হইয়াছিল, তাহা স্থির করা অতি কঠিন। সম্ভবতঃ উহা বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্বে প্রচারিত হইয়াছিল। কিম্বদন্তী আছে যে, কপিল উহার প্রণেতা। এ কিম্বদন্তীর প্রতি অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু তিনি কে, কোন কালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। কেবল ইহাই বলা যাইতে পারে যে, তাদৃশ বুদ্ধিশালী ব্যক্তি পৃথিবীতে অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। পাঠক স্মরণ রাখিবেন যে, আমরা

* বৌদ্ধধর্ম্ম যে সাংখ্যমূলক, তাহার প্রমাণ সর্বিস্তারে দিবার স্থান এ নহে।

বিবিধ প্রবন্ধ—সাংখ্যদর্শন

“নিরীশ্বর সাংখ্যকেই” সাংখ্য বলিতেছি। পতঞ্জলি-প্রণীত যোগশাস্ত্রকে সেশ্বর সাংখ্য বলিয়া থাকে। এ প্রবন্ধে তাহার কোন কথা নাই।

সাংখ্যদর্শন অতি প্রাচীন হইলেও, বিশেষ প্রাচীন সাংখ্যগ্রন্থ দেখা যায় না। সাংখ্যপ্রবচনকে অনেকেই কাপিল সূত্র বলেন, কিন্তু তাহা কখনই কাপিলপ্রণীত নহে। উহা যে বৌদ্ধ, ন্যায়, মীমাংসা প্রভৃতি দর্শনের প্রচারের পরে প্রণীত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ ঐ গ্রন্থমধ্যে আছে। ঐ সকল দর্শনের মত সাংখ্যপ্রবচনে খণ্ডন করা দেখা যায়। তদ্বিত্ত সাংখ্যকারিকা, তত্ত্বসমাস, ভোজবার্ত্তিক, সাংখ্যসার, সাংখ্যপ্রদীপ, সাংখ্যাতত্ত্বপ্রদীপ ইত্যাদি গ্রন্থ এবং এই সকল গ্রন্থের ভাষ্য টীকা প্রভৃতি বহুল গ্রন্থ অপেক্ষাকৃত অভিনব। কাপিল অর্থাৎ সাংখ্যদর্শনের প্রথম অধ্যাপকের যে মত, তাহাই আমরা দিগের আদরণীয় ও সমালোচ্য; এবং যাহা কাপিল সূত্র বলিয়া চলিত, তাহাই আমরা অবলম্বন করিয়া, অতি সংক্ষেপে সাংখ্যদর্শনের স্থূল উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিবার যত্ন করিব। আমরা যাহা কিছু বলিতেছি, তাহাই যে সাংখ্যের মত, এমত বিবেচনা কেহ না করেন। যাহা কিছু বলিলে সাংখ্যের মত ভাল করিয়া বুঝা যায়, আমরা তাহাই বলিব।

কতকগুণি বিজ্ঞ লোকে বলেন, এ সংসার সুখের সংসার। আমরা সুখের জন্য এ পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছি। যাহা কিছু দেখি, জীবের সুখের জন্য সৃষ্টি হইয়াছে। জীবের সুখ বিধান করিবার জন্যই সৃষ্টিকর্ত্তা জীবকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সৃষ্টি জীবের মঙ্গলার্থ সৃষ্টিমধ্যে কত কৌশল কে না দেখিতে পায়?

আবার কতকগুণি লোক আছেন, তাঁহারাও বিজ্ঞ—তাঁহারাও বলেন, সংসারে সুখ ত কই দেখি না—দুঃখেরই প্রাধান্য। সৃষ্টিকর্ত্তা কি অভিপ্রায়ে জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না—তাহা মনুষ্যবুদ্ধির বিচার্য্য নহে—কিন্তু সে অভিপ্রায় যাহাই হউক, সংসারে জীবের সুখের অপেক্ষা অসুখ অধিক। তুমি বলিবে, ঈশ্বর যে সকল নিয়ম অবধারিত করিয়া দিয়াছেন, সেগুণি রক্ষা করিয়া চলিলেই কোন দুঃখ নাই, নিয়মের লঙ্ঘনপৌনঃপুন্যেই এত দুঃখ। আমি বলি, যেখানে ঈশ্বর এমন সকল নিয়ম করিয়াছেন যে, তাহা অতি সহজেই লঙ্ঘন করা যায়, এবং তাহা লঙ্ঘনের প্রবৃত্তিও অতি বলবতী করিয়া দিয়াছেন, তখন নিয়ম লঙ্ঘন ব্যতীত নিয়ম রক্ষা যে তাঁহার অভিপ্রায়, এ কথা কে বলিবে? মাদকসেবন পরিণামে মনুষ্যের অত্যন্ত দুঃখদায়ক—তবে মাদক সেবনের প্রবৃত্তি মনুষ্যের হৃদয়ে রোপিত হইয়াছে কেন? এবং মাদকসেবন এত সুসাধ্য এবং আশুসুখকর কেন? কতকগুণি নিয়ম এত সহজে লঙ্ঘনীয় যে, তাহা লঙ্ঘন করিবার সময় কিছুই জানিতে পারা যায় না। ডাক্তার আঙ্গুস স্মিথের পরীক্ষায় সপ্রমাণ হইয়াছে যে, অনেক সময়ে মহৎ অনিষ্টকারী কার্ব্বণিক আসিড-প্রধান বায়ু নিশ্বাসে গ্রহণ করিলে আমাদের কোন কষ্ট হয় না। বসন্তাদি রোগের বিষবীজ কখনই আমাদের শরীরে প্রবেশ করে, তাহা আমরা জানিতেও পারি না। অনেকগুণি নিয়ম এমন আছে যে, তাহার উল্লঙ্ঘনে আমরা সর্ব্বদা কষ্ট পাইতেছি; কিন্তু সে নিয়ম কি, তাহা আমাদের জানিবার শক্তি নাই। ওলাউঠা রোগ কেন জন্মে, তাহা আমরা এ পর্য্যন্ত জানিতে পারিলাম না। অথচ লক্ষ লক্ষ লোক প্রতি বৎসর ইহাতে কত দুঃখ পাইতেছে। যদি নিয়মটি লঙ্ঘনের ক্ষমতা দিয়া নিয়মটি জানিতে দেন নাই, তবে জীবের মঙ্গল কামনা কোথা? পণ্ডিত পিতার পুত্র গণ্ডমূর্খ; তাহার মূর্খতার যন্ত্রণায় পিতা রাত্রি দিন যন্ত্রণা পাইতেছেন। মনে কর, শিক্ষার অভাবে সে মূর্খতা জন্মে নাই। পুত্রটি স্থূলবুদ্ধি লইয়াই ভূমিষ্ট হইয়াছিল। কোন নিয়ম লঙ্ঘন করায় পুত্রের মস্তিষ্ক অসম্পূর্ণ, এ নিয়ম কি কখন মনুষ্যবুদ্ধির আয়ত্ত হইবে? মনে কর, ভবিষ্যতে হইবে। তবে যত দিন সে নিয়ম আবিষ্কৃত না হইল, তত দিন যে মনুষ্যজাতি দুঃখ পাইবে, ইহা সৃষ্টিকর্ত্তার অভিপ্রেত নহে, কেমন করিয়া বলিব?

আবার, আমরা সকল নিয়ম রক্ষা করিতে পারিলেও দুঃখ পাইব না, এমত দেখি না। একজন নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছে, আর একজন দুঃখভোগ করিতেছে। আমার প্রিয়বন্ধু আপনার কর্ত্তব্য সাধনার্থ রণক্ষেত্রে গিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, আমি তাঁহার বিরহযন্ত্রণা ভোগ করিলাম। আমার জন্মবার পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে যে মন্দ আইন বা মন্দ রাজশাসন হইয়াছে, আমি তাহার ফলভোগ করিতেছি। কাহারও পিতামহ ব্যাধিগ্রস্ত ছিলেন, পৌত্র কোন নিয়ম লঙ্ঘন না করিয়াও ব্যাধিগ্রস্ত হইতে পারে।

আবার গোটাকত এমন গুরুতর বিষয় আছে যে, স্বাভাবিক নিয়মানুবর্ত্তী হওয়াতেও দুঃখ।

বাঁকম রচনাবলী

লোকসংখ্যাবৃদ্ধি বিষয়ে মাল্‌থসের মত, ইহার একটি প্রমাণ। এক্ষণে সুবিবেচকেরা সকলেই স্বীকার করেন যে, মনুষ্য সাধারণতঃ নৈসর্গিক নিয়মানুসারে আপন আপন স্বভাবের পরিতোষ করিলেই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া মহৎ অনিষ্ট ঘটয়া থাকে।

অতএব সংসার কেবল দুঃখময়, ইহা বলিবার যথেষ্ট কারণ আছে। সাংখ্যকারও তাহাই বলেন। সেই কথাই সাংখ্যদর্শন ও বৌদ্ধধর্মের মূল।

কিন্তু পৃথিবীতে যে কিছু সুখ আছে, তাহাও অস্বীকার্য নহে। সাংখ্যকার বলেন যে, সুখ অল্প। কদাচ কেহ সুখী (৬ অধ্যায়, ৭ সূত্র), এবং সুখ, দুঃখের সহিত এরূপ মিশ্রিত যে, বিবেচকেরা তাহা দুঃখপক্ষে নিষ্ক্ষেপ করেন (ঐ, ৮)। দুঃখ হইতে তাদৃশ সুখাকাঙ্ক্ষা জন্মে না (ঐ, ৬)। অতএব দুঃখেরই প্রাধান্য।

সুতরাং মনুষ্যজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য দুঃখমোচন। এই জন্য সাংখ্যপ্রবচনের প্রথম সূত্র “অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপদ্রুসার্থঃ।”

এই পদ্রুসার্থ কি প্রকারে সিদ্ধ হয়, তাহারই পর্যালোচনা সাংখ্যদর্শনের উদ্দেশ্য। দুঃখে পড়িলেই লোকে তাহার একটা নিবারণের উপায় করে। ক্ষুধায় কষ্ট পাইতেছ, আহার কর। পুত্রশোক পাইয়াছ, অন্য বিষয়ে চিত্ত নিবিষ্ট কর। কিন্তু সাংখ্যকার বলেন যে, এ সকল উপায়ে দুঃখনিবৃত্তি নাই; কেন না, আবার সেই সকল দুঃখের অনবৃত্তি আছে। তুমি আহার করিলে, তাহাতে তোমার আজিকার ক্ষুধা নিবৃত্তি হইল, কিন্তু আবার কালি ক্ষুধা পাইবে। বিষয়ান্তরে চিত্ত রত করিয়া, তুমি এবার পুত্রশোক নিবারণ করিলে, কিন্তু আবার অন্য পুত্রের জন্য তোমাকে হয় ত সেইরূপ শোক পাইতে হইবে। পরন্তু এরূপ উপায় সর্বত্র সম্ভবে না। তোমার হস্ত পদ ছিন্ন হইলে আর লগ্ন হইবে না। যেখানে সম্ভবে, সেখানেও তাহা সদুপায় বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। অন্য বিষয়ে নিরত হইলেই পুত্রশোক বিস্মৃত হওয়া যায় না (১ অধ্যায়, ৪ সূত্র)।

তবে এ সকল দুঃখ নিবারণের উপায় নহে। আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ কোম্বলের শিষ্য বলিবেন, তবে আর দুঃখ নিবারণের কি উপায় আছে? আমরা জানি যে, জলসেক করিলেই অগ্নি নিব্বাণ হয়, কিন্তু শীতল ইন্ধন পুনঃজ্বলিত হইতে পারে বলিয়া যদি জলকে অগ্নিনাশক না বল, তবে কথা ফুরাইল। তাহা হইলে দেহধ্বংস ভিন্ন আর জীবের দুঃখনিবৃত্তি নাই।

সাংখ্যকার তাহাও মানেন না। তিনি জন্মান্তর মানেন, এবং লোকান্তরে জন্মপৌনঃপুন্য আছে ভাবিয়া, এবং জরামরণাদি জ দুঃখ সমান ভাবিয়া তাহাও দুঃখ নিবারণের উপায় বলিয়া গণ্য করেন না (৩ অধ্যায়, ৫২-৫৩ সূত্র)। আত্মা বিশ্বকারণে বিলীন হইলেও তদবস্থাকে দুঃখনিবৃত্তি বলেন না; কেন না, যে জলমগ্ন, তাহার আবার উত্থান আছে (ঐ, ৫৪)।

তবে দুঃখ নিবারণ কাহাকে বলি? অপবর্গই দুঃখনিবৃত্তি।

অপবর্গই বা কি? “দ্বয়োরেকতরস্য বৌদাসীন্যমপবর্গঃ।” (তৃতীয় অধ্যায়, ৬৫ সূত্র)। সেই অপবর্গ কি, এবং কি প্রকারে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা পরপরিচ্ছেদে বিবেচনা করিব। “অপবর্গ” ইত্যাদি প্রাচীন কথা শুনিয়া পাঠক ঘৃণা করিবেন না। যাহা প্রাচীন, তাহাই যে উপধর্মকলিঙ্কিত বা সর্বজনপরিজ্ঞাত, এমন মনে করিবেন না। বিবেচক দেখিবেন, সাংখ্যদর্শনে একটু সারও আছে। অসার বৃক্ষে এমন স্থায়ী ফল ফলিবে কেন?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—বিবেক

আমি যত দুঃখ ভোগ করি—কিন্তু আমি কে? বাহ্যপ্রকৃতি ভিন্ন আর কিছুই আমাদের ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে। তুমি বলিতেছ, আমি বড় দুঃখ পাইতেছি,—আমি বড় সুখী। কিন্তু একটি মনুষ্যদেহ ভিন্ন “তুমি” বলিব, এমন কোন সামগ্রী দেখিতে পাই না। তোমার দেহ এবং দৈহিক প্রক্রিয়া, ইহাই কেবল আমার জ্ঞানগোচর। তবে কি তোমার দেহেরই এই সুখ-দুঃখ ভোগ বলিব?

তোমার মৃত্যু হইলে, তোমার সেই দেহ পড়িয়া থাকিবে; কিন্তু তৎকালে তাহার সুখ দুঃখ ভোগের কোন লক্ষণ দেখা যাইবে না। আবার মনে কর, কেহ তোমাকে অপমান করিয়াছে; তাহাতে দেহের কোন বিকার নাই, তথাপি তুমি দুঃখী। তবে তোমার দেহ দুঃখভোগ করে না। যে দুঃখ ভোগ করে, সে স্বতন্ত্র। সেই তুমি। তোমার দেহ তুমি নহে।

এইরূপ সকল জীবের। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই জগতের কিয়দংশ অনুমেয় মাত্র, ইন্দ্রিয়গোচর নহে, এবং সুখ দুঃখাদির ভোগকর্তা। যে সুখ দুঃখাদির ভোগকর্তা, সেই আত্মা। সাংখ্যে তাহার নাম পুরুষ। পুরুষ ভিন্ন জগতে আর যাহা কিছু আছে, তাহা প্রকৃতি।

আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদেরা কহেন যে, আমরাদিগের সুখ দুঃখ মানসিক বিকারমাত্র। সেই সকল মানসিক বিকার কেবল মস্তিস্কের ক্রিয়া মাত্র। তুমি আমার অঙ্গে কণ্টক বিদ্ধ করিলে, বিদ্ধ স্থানস্থিত স্নায়ু তাহাতে বিচলিত হইল—সেই বিচলন মস্তিস্ক পর্য্যন্ত গেল। তাহাতে মস্তিস্কের যে বিকৃতি হইল, তাহাই বেদনা। সাংখ্য-মতাবলম্বীরা বলিতে পারেন, “মানি, তাহাই ব্যথা। কিন্তু ব্যথা ভোগ করিল সেই আত্মা।” এক্ষণকার অন্য সম্প্রদায়ের মনস্তত্ত্ববিদেরাও প্রায় সেইরূপ বলেন। তাঁহারা বলেন, মস্তিস্কের বিকারই সুখ দুঃখ বটে, কিন্তু মস্তিস্ক আত্মা নহে। ইহা আত্মার ইন্দ্রিয় মাত্র। এ দেশীয় দার্শনিকেরা যাহাকে অন্তরিন্দ্রিয় বলেন, উঁহারা মস্তিস্ককে তাহাই বলেন।

শরীরাদি ব্যতিরিক্ত পুরুষ। কিন্তু দুঃখ ত শরীরাদিক। শরীরাদিতে যে দুঃখের কারণ নাই, এমন দুঃখ নাই। যাহাকে মানসিক দুঃখ বলি, বাহ্য পদার্থই তাহার মূল। আমার বাক্যে তুমি অপমানিত হইলে; আমার বাক্য প্রাকৃতিক পদার্থ। তাহা শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা তুমি গ্রহণ করিলে, তাহাতে তোমার দুঃখ। অতএব প্রকৃতি ভিন্ন কোন দুঃখ নাই। কিন্তু প্রকৃতি-ঘটিত দুঃখ পুরুষকে বর্ত্তে কেন? “অসঙ্গোহয়ম্পুরুষঃ।” পুরুষ একা, কাহারও সংসর্গবিশিষ্ট নহে (১ অধ্যায়, ১৫ সূত্র)। অবস্থাদি সকল শরীরের, আত্মার নহে (ঐ, ১৪ সূত্র)। “ন বাহ্যাস্তরয়োৰূপরজ্যোপরঞ্জকভাবোহপি দেশব্যবধানাৎ শ্রুয়াম্হুপাটলিপদ্রুয়োরিব।” বাহ্য এবং অন্তরিকের মধ্যে উপরজ্য এবং উপরঞ্জক ভাব নাই; কেন না, তাহা পরস্পর সংলগ্ন নহে; দেশব্যবধানবিশিষ্ট। যেমন একজন পাটলীপত্র নগরে থাকে, আর একজন শ্রুয়ানগরে থাকে, ইহাদিগের পরস্পরের ব্যবধান তদ্রূপ। পুরুষের দুঃখ কেন?

প্রকৃতির সহিত সংযোগই পুরুষের দুঃখের কারণ। বাহ্যে অন্তরিকে দেশব্যবধান আছে বটে, কিন্তু কোন প্রকার সংযোগ নাই, এমত নহে। যেমন স্ফাটিকপাত্রের নিকট জবা কুসুম রাখিলে, পাত্র পুষ্পের বর্ণবিশিষ্ট হয় বলিয়া, পুষ্প এবং পাত্রে একপ্রকার সংযোগ আছে বলা যায়, এ সেইরূপ সংযোগ। পুষ্প এবং পাত্রমধ্যে ব্যবধান থাকিলেও পাত্রের বর্ণ বিকৃত হইতে পারে, ইহাও সেইরূপ। এ সংযোগ নিত্য নহে, দেখা যাইতেছে। সুতরাং তাহার উচ্ছেদ হইতে পারে। সেই সংযোগ উচ্ছেদ হইলেই, দুঃখের কারণ অপনীত হইল। অতএব এই সংযোগের উচ্ছিন্নিই দুঃখনিবারনের উপায়। সুতরাং তাহাই পুরুষার্থ। “যদ্বা তদ্বা তদুচ্ছিন্নিঃ পুরুষার্থস্তদুচ্ছিন্নিঃ পুরুষার্থঃ (৬. ৭০)।

সাংখ্যের মত এই। যদি আত্মা শরীর হইতে পৃথক্ হয়, যদি আত্মাই সুখ-দুঃখভোগী হয়, যদি আত্মা দেহনাশের পরেও থাকে, যদি দেহ হইতে বিযুক্ত আত্মার সুখ-দুঃখাদি ভোগের সম্ভাবনা থাকে, তবে সাংখ্যদর্শনের এ সকল কথা যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু এই “যদি”গুলি অনেক। আধুনিক পিজিটিবিষ্ট এখনই বলিবেন,—

১ম। আত্মা শরীর হইতে পৃথক্ কিসে জানিতেছ? শরীর তত্ত্বে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শরীরই বা শরীরের অংশবিশেষই আত্মা।

২য়। আত্মাই যে সুখদুঃখভোগী, তাহারই বা প্রমাণ কি? প্রকৃতি সুখদুঃখভোগী নহে কেন?

৩য়। দেহনাশের পর যে আত্মা থাকিবে, তাহা ধর্ম্মপুস্তকে বলে; কিন্তু তদ্বিন্ন অণুমাত্র প্রমাণ নাই। আত্মার নিত্যত্ব যদি মানিতে হয়, তবে ধর্ম্মপুস্তকের আজ্ঞানুসারে; দর্শনশাস্ত্রের আজ্ঞানুসারে মানিব না।

৪র্থ। দেহধ্বংসের পর আত্মা থাকিলে, তাহার যে আবার জরামরণাদিজ দুঃখের সম্ভাবনা আছে, তাহার কিছুমাত্র প্রমাণ নাই।

অতএব যাহারা আত্মার পার্থক্য ও নিত্যত্ব মানেন, তাঁহারাও সাংখ্য মানিবেন না। এবং এ সকল মত যে, এ কালে গ্রাহ্য হইবে, এমত বিবেচনায় আমরা সাংখ্যদর্শন বুঝাইতে প্রবৃত্ত হই নাই। কিন্তু এক্ষণে যাহা অগ্রাহ্য, দুই সহস্র বৎসর পূর্বে তাহা আশ্চর্য্য আবিষ্কিয়া। সেই আশ্চর্য্য আবিষ্কিয়া কি, ইহাই বুঝান আমরাদিগের অভিপ্রায়।

বাঁকম রচনাবলী

প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগের উচ্ছ্রিতই অপবর্গ বা মোক্ষ। তাহা কি প্রকারে প্রাপ্ত হওয়া যায়?

সাংখ্যকার বলেন, বিবেকের দ্বারা। কিন্তু কোন্ প্রকার বিবেকের দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়? প্রকৃতিবিষয়ে যে অব্যবহা, সকল অব্যবহা তাহার অন্তর্গত। অতএব প্রকৃতি-পুরুষসম্বন্ধীয় জ্ঞানদ্বারাই মোক্ষ লাভ হয়।

অতএব জ্ঞানেই মুক্তি। পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল কথা, “জ্ঞানেই শক্তি” (knowledge is power); হিন্দুসভ্যতার মূল কথা, “জ্ঞানেই মুক্তি”। দুই জাতি দুইটি পৃথক্ উদ্দেশ্যানুসন্ধানে এক পথেই যাত্রা করিলেন। পাশ্চাত্যেরা শক্তি পাইয়াছেন—আমরা কি মুক্তি পাইয়াছি? বস্তুতঃ এক যাত্রার যে পৃথক্ ফল হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইউরোপীয়েরা শক্তি-অনুসারী, ইহাই তাঁহাদিগের উন্নতির মূল। আমরা শক্তির প্রতি যত্নহীন, ইহাই আমাদের অবনতির মূল। ইউরোপীয়দিগের উদ্দেশ্য ঐহিক; তাঁহারা ইহকালে জয়ী। আমাদের উদ্দেশ্য পারত্রিক—তাই ইহকালে আমরা জয়ী হইলাম না। পরকালে হইব কি না, তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে।

কিন্তু জ্ঞানেই মুক্তি, এ কথা সত্য হইলেও ইহার দ্বারা ভারতবর্ষের পরম লাভ হইয়াছে বলিতে হইবে। প্রাচীন বৈদিক ধর্ম ক্রিয়াক্রম; প্রাচীন আর্যেরা প্রাকৃতিক শক্তির পূজা একমাত্র মঙ্গলোপায় বলিয়া জানিতেন। প্রাকৃতিক শক্তিসকল অতি প্রবল, স্থির, অশাসনীয়, কখন মহামঙ্গলকর, কখন মহৎ অমঙ্গলের কারণ দেখিয়া প্রথম জ্ঞানীরা তাহাদিগকে ইন্দ্র, বরুণ, মরুৎ, অগ্নি প্রভৃতি দেবতা কল্পনা করিয়া তাঁহাদিগের স্তুতি এবং উপাসনা করেন। ক্রমে তাঁহাদিগের প্রীত্যর্থ যাগ যজ্ঞাদির বড় প্রবলতা হইল। অবশেষে সেই সকল যাগ যজ্ঞাদিই মনুষ্যের প্রধান কার্য এবং পারত্রিক সুখের একমাত্র উপায় বলিয়া, লোকের একমাত্র অনুষ্ঠেয় হইয়া পড়িল। শাস্ত্রসকল কেবল তৎসমুদায়ের আলোচনার্থ সৃষ্ট হইল—প্রকৃত জ্ঞানের প্রতি আর্যজাতির তাদৃশ মনোযোগ হইল না। বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ, আরণ্যক এবং সূত্রগ্রন্থসকল কেবল ক্রিয়াকলাপের কথায় পরিপূর্ণ। যে কিছু প্রকৃত জ্ঞানের চর্চা হইত, তাহা কেবল বেদের আনুষঙ্গিক বলিয়াই। সে সকল শাস্ত্র বেদাঙ্গ বলিয়া খ্যাত হইল। জ্ঞান এইরূপে ক্রিয়ার দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হওয়াতে তাহার উন্নতি হইল না। কর্মজন্য মোক্ষ, এই বিশ্বাস ভারতভূমে অপ্রতিহত থাকতেই এরূপ ঘটিয়াছিল। প্রকৃত জ্ঞানের আলোচনার অভাবে বেদভক্তি আরও প্রবল হইল। মনুষ্যাচিন্তের স্বাধীনতা একবারে লুপ্ত হইতে লাগিল। মনুষ্য বিবেকশূন্য মন্ত্রমুগ্ধ শৃঙ্খলবদ্ধ পশুবৎ হইয়া উঠিল।

সাংখ্যকার বলিলেন, কর্ম অর্থাৎ হোম যাগাদির অনুষ্ঠান পুরুষার্থ নহে। জ্ঞানই পুরুষার্থ। জ্ঞানই মুক্তি। কর্মপীড়িত ভারতবর্ষ সে কথা শুনিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—সৃষ্টি

অতি প্রাচীন কাল হইতে দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য, জগতের আদি কি, তাহা নিরূপিত হয়। আধুনিক ইউরোপীয় দার্শনিকেরা সে তত্ত্ব নিরূপণীয় নহে বলিয়া এক প্রকার ত্যাগ করিয়াছেন।

জগতের আদি সম্বন্ধে প্রথম প্রশ্ন এই যে, জগৎ সৃষ্ট, কি নিত্য। অনাদিকাল এইরূপ আছে, না কেহ তাহার সৃজন করিয়াছেন?

অধিকাংশ লোকের মত এই যে, জগৎ সৃষ্ট, জগৎকর্তা একজন আছেন। সামান্য ঘট-পর্টার দি একটি কর্তা ব্যতীত হয় না; তবে এই অসীম জগতের কর্তা নাই, ইহা কি সম্ভবে?

আর এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন; তাঁহারা বলেন যে, এই জগৎ যে সৃষ্ট বা ইহার কেহ কর্তা আছেন, তাহা বিবেচনা করিবার কারণ নাই। ইহাদের সচরাচর নাস্তিক বলে; কিন্তু নাস্তিক বলিলেই মূঢ় বুঝায় না। তাঁহারা বিচারের দ্বারা আপন পক্ষ সমর্থন করিতে চেষ্টা করেন। সেই বিচার অত্যন্ত দুরূহ, এবং এ স্থলে তাহার পরিচয় দিবার কোন প্রয়োজন নাই।

তবে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব একটি পৃথক্ তত্ত্ব, সৃষ্টিক্রিয়া আর একটি পৃথক্ তত্ত্ব। ঈশ্বরবাদীও বলিতে পারেন যে, “আমি ঈশ্বর মানি, কিন্তু সৃষ্টিক্রিয়া

মানি না। ঈশ্বর জগতের নিয়ন্তা, তাঁহার কৃত নিয়ম দেখিতেছি, নিয়মতিরিক্ত সৃষ্টির কথা আমি বলিতে পারি না।”

এক্ষণকার কোন কোন খ্রীষ্টীয়ান এই মতাবলম্বী। ইহার মধ্যে কোন মত অযথার্থ, কোন মত যথার্থ, তাহা আমরা কিছুই বলিতেছি না। যাঁহার যাহা বিশ্বাস, তদ্বিরুদ্ধ আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই। আমাদের বলিবার কেবল এই উদ্দেশ্য যে, সাংখ্যকারকে প্রায় এই মতাবলম্বী বলিয়া বোধ হয়। সাংখ্যকার ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানে না, তাহা পশ্চাৎ বলিব। কিন্তু তিনি “সর্ববিৎ সর্বকর্তা” পুরুষ মানে, এইরূপ পুরুষ মানিয়াও তাঁহাকে সৃষ্টিকর্তা বলেন না; সৃষ্টিই মানে না। এই জগৎ প্রাকৃতিক দ্বিয়ামাত্র বলিয়া স্বীকার করেন।

(ক)র কারণ (খ); (খ)র কারণ (গ); (গ)র কারণ (ঘ); এইরূপ কারণপরম্পরা অনুসন্ধান করিতে করিতে অবশ্য এক স্থানে অন্ত পাওয়া যাইবে; কেন না, কারণশ্রেণী কখন অনন্ত হইতে পারে না। আমি যে ফলটি ভোজন করিতেছি, ইহা অমুক বৃক্ষে জন্মিয়াছে; সেই বৃক্ষ একটি বীজে জন্মিয়াছে; সেই বীজ অন্য বৃক্ষের ফলে জন্মিয়াছিল; সেই বৃক্ষও আর একটি বীজে জন্মিয়াছিল। এইরূপে অনন্তানুসন্ধান করিলেও অবশ্য একটি আদিম বীজ মানিতে হইবে। এইরূপ জগতে যাহা আদিম বীজ, যেখানে কারণানুসন্ধান বন্ধ হইবে, সাংখ্যকার সেই আদিম কারণকে মূল প্রকৃতি বলেন (১৭৪)।

জগদুৎপত্তি সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, মূল কারণ যাহাই হউক, সেই কারণ হইতে এই বিশ্বসংসার কি প্রকারে এই রূপাবয়বাদি প্রাপ্ত হইল? সাংখ্যকারের উত্তর এই;—

এই জাগতিক পদার্থ পঞ্চবিংশতি প্রকার,—

১। পুরুষ।

২। প্রকৃতি।

৩। মহৎ।

৪। অহঙ্কার।

৫, ৬, ৭, ৮, ৯। পঞ্চ তন্মাত্র।

১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০। একাদশেন্দ্রিয়।

২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫। স্থূল ভূত।

ক্ষিতি, জল, তেজ, মরুৎ এবং আকাশ স্থূল ভূত। পাঁচটি কস্মেন্দ্রিয়, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয়, এই একাদশ ইন্দ্রিয়। শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ পাঁচটি তন্মাত্র। “আমি” জ্ঞান অহঙ্কার। মহৎ মন।*

স্থূল ভূত হইতে পঞ্চ তন্মাত্রের জ্ঞান। আমরা শূন্যতে পাই, এ জন্য শব্দ আছে। আমরা দেখিতে পাই, এই জন্য দৃশ্য অর্থাৎ রূপ আছে ইত্যাদি।

অতএব শব্দস্পর্শাদির অস্তিত্ব নিশ্চিত, কিন্তু শব্দ আমি শূন্য, রূপ আমি দেখি। তবে “আমিও” আছি। অতএব তন্মাত্র হইতে অহঙ্কারের অস্তিত্ব অনুভূত হইল।

আমি আছি কেন বলি? আমার মনে ইহা উদয় হইয়াছে, সেই জন্যে। তবে মনও আছে (Cogito ergo Sum.) অতএব অহঙ্কার হইতে মনের অস্তিত্ব স্থিরীকৃত হইল।

মনের সুখ-দুঃখ আছে। সুখ-দুঃখের কারণ আছে। অতএব মূল কারণ প্রকৃতি আছে।

সাংখ্যকার বলেন, প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র এবং একাদশেন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র হইতে স্থূল ভূত।

এ তত্ত্বের আর বিস্তারের আবশ্যক নাই। একালে ইহা বড় সঙ্গত বা অর্থযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু অস্মদেশীয় পুরাণসকলে যে সৃষ্টিক্রিয়া বর্ণিত আছে, তাহা এই সাংখ্যের মতে ব্রহ্মাণ্ডের কথার সংযোগ মাত্র।

বেদে কোথাও সাংখ্যদর্শনানুযায়ী সৃষ্টি কথিত হয় না। ঋগ্বেদে, অথর্ববেদে, শতপথ ব্রাহ্মণে সৃষ্টিকথন আছে, কিন্তু তাহাতে মহাদাদির কোন উল্লেখ নাই। মনুতেও সৃষ্টিকথন আছে, তাহাতেও নাই, রামায়ণেও ঐরূপ। কেবল পুরাণে আছে। অতএব বেদ, মনু, রামায়ণের পরে ও অন্ততঃ বিষ্ণু, ভাগবত এবং লিঙ্গপুরাণের পূর্বে সাংখ্যদর্শনের সৃষ্টি।

বিশ্বকম রচনাবলী

মহাভারতেও সাংখ্যের উল্লেখ আছে, কিন্তু মহাভারতের কোন্ অংশ নূতন, কোন্ অংশ পুরাতন, তাহা নিশ্চিত করা ভার। কুমারসম্ভবের দ্বিতীয় সর্গে যে ব্রহ্মস্তোত্র আছে, তাহা সাংখ্যানুকারী।

সাংখ্য-প্রবচনে বিষ্ণু, হরি, রুদ্রাদির উল্লেখ নাই। পুরাণে আছে, পৌরাণিকেরা নিরীশ্বর সাংখ্যকে আপন মনোমত করিয়া গড়িয়া লইয়াছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—নিরীশ্বরতা

সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বর বলিয়া খ্যাত; কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, সাংখ্য নিরীশ্বর নহে। ডাক্তার হল একজন এই মতাবলম্বী। মক্ষমূল্যর এই মতাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার মত পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা গিয়াছে। কুসুমাজলিকর্তা উদয়নাচার্য্য বলেন যে, সাংখ্যমতাবলম্বীরা আদিবিদ্বানের উপাসক। অতএব তাঁহার মতেও সাংখ্য নিরীশ্বর নহে। সাংখ্যপ্রবচনের ভাষ্যকর বিজ্ঞানভিক্ষুও বলেন যে, ঈশ্বর নাই, এ কথা বলা কাপিল সূত্রের উদ্দেশ্য নহে। অতএব সাংখ্যদর্শনকে কেন নিরীশ্বর বলা যায়, তাহার কিছু বিস্তারিত লেখা যাউক।

সাংখ্যপ্রবচনের প্রথমাধ্যায়ের বিখ্যাত ৯২ সূত্র এই কথার মূল। সে সূত্র এই—
“ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ।” প্রথম এই সূত্রটি বুঝাইব।

সূত্রকার প্রমাণের কথা বলিতেছিলাম। তিনি বলেন, প্রমাণ ত্রিবিধ; প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ। ৮৯ সূত্রে প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলিলেন, “যৎ সম্বন্ধসিদ্ধং তদাকারোল্লোখি বিজ্ঞানং তৎ প্রত্যক্ষম্।” অতএব যাহা সম্বন্ধ নহে, তাহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। এই লক্ষণ প্রতি দুইটি দোষ পড়ে। যোগগণ যোগবলে অসম্বন্ধও প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। ৯০।৯১ সূত্রে সূত্রকার সে দোষ অপনীত করিলেন। দ্বিতীয় দোষ, ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ নিত্য, তৎসম্বন্ধে সম্বন্ধ কথাটি ব্যবহার হইতে পারে না। সূত্রকার তাহার এই উত্তর দেন যে, ঈশ্বরই সিদ্ধ নহেন—ঈশ্বর আছেন, এমত কোন প্রমাণ নাই; অতএব তাঁহার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে না বর্তিলে এই লক্ষণ দুষ্ট হইল না। তাহাতে ভাষ্যকার বলেন যে, দেখ, ঈশ্বর অসিদ্ধ, ইহা উক্ত হইয়াছে, কিন্তু ঈশ্বর নাই, এমত কথা বলা হইল না।

না হউক, তথাপি এই দর্শনকে নিরীশ্বর বলিতে হইবে। এমত নাস্তিক বিরল, যে বলে যে, ঈশ্বর নাই। যে বলে যে, ঈশ্বর আছেন, এমত কোন প্রমাণ নাই, তাহাকেও নাস্তিক বলা যায়।

যাহার অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, এবং যাহার অনস্তিত্বের প্রমাণ আছে, এই দুইটি পৃথক বিষয়। রক্তবর্ণ কাকের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই, কিন্তু তাহার অনস্তিত্বেরও কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু গোলাকার ও চতুষ্কোণের অনস্তিত্বের প্রমাণ আছে। গোলাকার চতুষ্কোণ মানিব না, ইহা নিশ্চিত; কিন্তু রক্তবর্ণ কাক মানিব কি না? তাহার অনস্তিত্বেরও প্রমাণ নাই বটে, কিন্তু তাহার অস্তিত্বেরও প্রমাণ নাই। যেখানে অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, সেখানে মানিব না। অনস্তিত্বের প্রমাণ নাই থাক, যতক্ষণ অস্তিত্বের প্রমাণ না পাইব, ততক্ষণ মানিব না। অস্তিত্বের প্রমাণ পাইলে তখন মানিব। ইহাই প্রত্যয়ের প্রকৃত নিয়ম। ইহার ব্যত্যয়ে যে বিশ্বাস, তাহা ভ্রান্তি। “কোন পদার্থ আছে, এমত প্রমাণ নাই বটে, কিন্তু থাকিলে থাকিতে পারে,” ইহা ভাবিয়া যে সেই পদার্থের অস্তিত্ব কল্পনা করে, সে ভ্রান্ত।

অতএব নাস্তিকেরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন। যাঁহারা কেবল ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণাভাববাদী,—তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর থাকিলে থাকিতে পারেন,—কিন্তু আছেন, এমত কোন প্রমাণ নাই।

অপর শ্রেণীর নাস্তিকেরা বলেন যে, ঈশ্বর আছেন, শুধু ইহারই প্রমাণাভাব, এমত নহে, ঈশ্বর যে নাই, তাহারও প্রমাণ আছে। আধুনিক ইউরোপীয়েরা কেহ কেহ এই মতাবলম্বী। একজন ফরাসিস লেখক বলিয়াছেন, তোমরা বল, ঈশ্বর নিরাকার, অথচ চেতনাদি মানসিক বৃত্তিবিশিষ্ট। কিন্তু কোথায় দেখিয়াছ যে, চেতনাদি মানসিক বৃত্তিসকল শরীর হইতে বিষুক্ত? যদি তাহা কোথাও দেখ নাই, তবে হয় ঈশ্বর সাকার, নয় তিনি নাই। সাকার ঈশ্বর, এ কথা তোমরা মানিবে না, অতএব ঈশ্বর নাই, ইহা মানিতে হইবে। ইনি দ্বিতীয় শ্রেণীর নাস্তিক।

বিবিধ প্রবন্ধ—সাংখ্যদর্শন

“ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ।” শুধু এই কথার উপরে নির্ভর করিলে, সাংখ্যকারকে প্রথম শ্রেণীর নাস্তিক বলা যাইত। কিন্তু তিনি অন্যান্য প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে যত্ন করিয়াছেন যে, ঈশ্বর নাই।

সে প্রমাণ কোথাও দুই একটি সূত্রের মধ্যে নাই। অনেকগুলি সূত্র একত্র করিয়া, সাংখ্য-প্রবচনে ঈশ্বরের অনাস্তিত্বসম্বন্ধে যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহার মর্ম্ম সবিস্তারে বঝাইতেছি।

তিনি বলেন যে, ঈশ্বর অসিদ্ধ (১, ৯২), প্রমাণ নাই বলিয়াই অসিদ্ধ (প্রমাণাভাবাৎ ন তৎসিদ্ধিঃ। ৫, ১০)। সাংখ্যমতে প্রমাণ তিন প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ। প্রত্যক্ষের ত কথাই নাই। কোন বস্তুর সঙ্গে যদি অন্য বস্তুর নিত্য সম্বন্ধ থাকে, তবে একটিকে দেখিলে আর একটিকে অনুমান করা যায়। কিন্তু কোন বস্তুর সঙ্গে ঈশ্বরের কোন নিত্য সম্বন্ধ দেখা যায় নাই; অতএব অনুমানের দ্বারা ঈশ্বরের সিদ্ধি হয় না (সম্বন্ধাভাবান্নানুমানম্। ৫, ১১)।

যদি এই সূত্র পাঠক না বঝিয়া থাকেন, তবে আর একটু বঝাই। পর্ষতে ধূম দেখিয়া তুমি সিদ্ধ কর যে, তথায় অগ্নি আছে। কেন এ সিদ্ধান্ত কর? তুমি যেখানে যেখানে ধূম দেখিয়াছ, সেইখানে অগ্নি দেখিয়াছ বলিয়া। অর্থাৎ অগ্নির সহিত ধূমের নিত্য সম্বন্ধ আছে বলিয়া।

যদি তোমার জিজ্ঞাসা করি, তোমার পিতামহের পিতামহের কয়টি হাত ছিল, তুমি বলিবে দুইটি। তুমি তাঁহাকে কখন দেখ নাই—তবে কি প্রকারে জানিলে তাঁহার দুইটি হাত ছিল? বলিবে, মানুষমাত্রেরই দুই হাত, এই জন্য। অর্থাৎ মানুষত্বের সহিত দ্বিভূজতার নিত্য সম্বন্ধ আছে, এই জন্য।

এই নিত্য সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তিই অনুমানের একমাত্র কারণ। যেখানে এ সম্বন্ধ নাই, সেখানে পদার্থান্তর অনুমিত হইতে পারে না। এক্ষণে, জগতে কিসের সঙ্গে ঈশ্বরের নিত্য সম্বন্ধ আছে যে, তাহা হইতে ঈশ্বরানুমান করা যাইতে পারে? সাংখ্যকার বলেন, কিছুই সঙ্গে না।

তৃতীয় প্রমাণ—শব্দ। আপ্তবাক্য শব্দ। বেদেই আপ্তোপদেশ। সাংখ্যকার বলেন, বেদে ঈশ্বরের কোন প্রসঙ্গ নাই, বরং বেদে ইহাই আছে যে, সৃষ্টি প্রকৃতিরই ক্রিয়া, ঈশ্বরকৃত নহে (শ্রুতিরপি প্রধান-কার্যত্বস্য। ৫, ১২); কিন্তু যিনি বেদ পাঠ করিবেন, তিনি দেখিবেন, এ অতি সঙ্গত কথা। এই আশঙ্কায় সাংখ্যকার বলেন যে, বেদে ঈশ্বরের যে উল্লেখ আছে, তাহা হয় মূল্যাত্মার প্রশংসা, নয় প্রামাণ্য দেবতার (সিদ্ধস্য) উপাসনা (মূল্যাত্মনঃ প্রশংসা উপাসা সিদ্ধস্য বা। ১, ৯৫)।

ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, এইরূপে দেখাইয়াছেন। ঈশ্বরের অনাস্তিত্ব সম্বন্ধে যে প্রমাণ দেখাইয়াছেন, নিম্নে তাহার সম্প্রসারণ করা গেল।

ঈশ্বর কাহাকে বল? যিনি সৃষ্টিকর্তা এবং পাপপুণ্যের ফলবিধাতা। যিনি সৃষ্টিকর্তা, তিনি মুক্ত না বদ্ধ? যদি মুক্ত হইলেন, তবে তাঁহার সৃজনের প্রবৃত্তি হইবে কেন? আর যিনি মুক্ত নহেন—বদ্ধ, তাঁহার পক্ষে অনন্ত জ্ঞান ও শক্তি সম্ভবে না। অতএব একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন, ইহা অসম্ভব। মুক্তবদ্ধয়োজন্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ (১, ৯৩); উভয়থাপ্যসৎকরত্বম্ (১, ৯৪)।

সৃষ্টিকর্তৃত্ব সম্বন্ধে এই। পাপপুণ্যের দণ্ডবিধাতৃত্ব সম্বন্ধে মীমাংসা করেন যে, যদি ঈশ্বর কর্ম্মফলের বিধাতা হইলেন, তবে তিনি অবশ্য কর্ম্মানুযায়ী ফলনিষ্পত্তি করিবেন, পুণ্যের শুভ ফল, পাপের অশুভ ফল অবশ্য প্রদান করিবেন। যদি তিনি তাহা না করেন, স্বেচ্ছামত ফল-নিষ্পত্তি করেন, তবে কি প্রকারে ফলবিধান করিতে পারেন? যদি সর্বিচার করিয়া ফল বিধান না করেন, তবে আত্মোপকারের জন্য করাই সম্ভব। তাহা হইলে তিনি সামান্য লৌকিক রাজার ন্যায় আত্মোপকারী, এবং সুখ দুঃখের অধীন। যদি তাহা না হইয়া কর্ম্মানুযায়ী ফলনিষ্পত্তি করেন, তবে কেন কর্ম্মকেই ফলবিধাতা বল না? ফলনিষ্পত্তির জন্য আবার কর্ম্মের উপর ঈশ্বরানুমানের প্রয়োজন কি?

অতএব সাংখ্যকার দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘোরতর নাস্তিক। অথচ তিনি বেদ মানেন।

ঈশ্বর না মানিয়াও কেন বেদ মানেন, তাহা আমরা পরপরিচ্ছেদে দেখাইব। সাংখ্যের এই নিরীশ্বরতা বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্বসূচনা বলিয়া বোধ হয়।

ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে সাংখ্যদর্শনের একটি কথা বাকি রহিল। পূর্বেই বলিয়াছি, অনেকে বলেন, কার্পিল দর্শন নিরীশ্বর নহে। এ কথা বলিবার কিছু একটু কারণ আছে। ত, অ, ৫৭

বাঁকম রচনাবলী

সূত্রে সূত্রকার বলেন, “ঐদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা।” সে কি প্রকার ঐশ্বর? “স হি সর্বাং সর্বাংকর্তা,” ৩, ৫৬। তবে সাংখ্য নিরীশ্বর হইল কই?

বাস্তবিক এ কথা ঐশ্বর সম্বন্ধে উক্ত হয় নাই। সাংখ্যকার বলেন, জ্ঞানেই মুক্তি, আর কিছতেই মুক্তি নাই। পুণ্যে, অথবা সত্ত্ববিশাল উদ্ধারলোকেও মুক্তি নাই; কেন না, তথা হইতে পুনর্জন্ম আছে, এবং জরামরণাদি দুঃখ আছে। শেষ এমনও বলেন যে, জগৎকারণে লয় প্রাপ্ত হইলেও মুক্তি নাই; কেন না, তাহা হইতে জলমগ্নের পুনরুত্থানের ন্যায় পুনরুত্থান আছে (৩, ৫৪)। সেই লয়প্রাপ্ত আত্মা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি “সর্বাং এবং সর্বাংকর্তা।” ইহাকে যদি ঐশ্বর বলিতে চাও, তবে ঐদৃশেশ্বর সিদ্ধ। কিন্তু ইনি জগৎস্রষ্টা বা বিধাতা নহেন। “সর্বাংকর্তা” অর্থে সর্বাংশক্তিমান্, সর্বাংসৃষ্টকারক নহে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—বেদ

আমরা পূর্বে বলিয়াছি, সাংখ্যপ্রবচনকার ঐশ্বর মানেন না, বেদ মানেন। বোধ হয়, পৃথিবীতে আর কোন দর্শন বা অন্য শাস্ত্র নাই, যাহাতে ধর্মপুস্তকের প্রামাণ্য স্বীকার করে অথচ ধর্মপুস্তকের বিষয়ীভূত এবং প্রণেতা জগদীশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। এই বেদভক্তি ভারতবর্ষে অতিশয় বিস্ময়কর পদার্থ। আমরা এ বিষয়টি কিঞ্চিৎ সবিস্তারে লিখিতে ইচ্ছা করি।

মনু বলেন, বেদশব্দ হইতে সকলের নাম, কর্ম, এবং অবস্থা নির্মিত হইয়াছিল। বেদ, পিতৃ, দেবতা এবং মনুষ্যের চক্ষু; অশক্য, অপ্রেয়; যাহা বেদ হইতে ভিন্ন, তাহা পরকালে নিষ্ফল, বেদ ভিন্ন গ্রন্থ মিথ্যা। ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান, শব্দ স্পর্শ রূপ গন্ধ, চতুর্দিক, ত্রিলোক, চতুরাশ্রম, সকলই বেদ হইতে প্রকাশ; বেদ মনুষ্যের পরম সাধন; যে বেদজ্ঞ, সেই সৈন্যপতা, রাজা, দণ্ডনেতৃত্ব এবং সর্বাংলোকাধিপত্যের যোগ্য। যে বেদজ্ঞ, সে যে আশ্রমেই থাকুক না কেন, সেই ব্রহ্মে লীন হওয়ার যোগ্য। যাহারা ধর্ম-জিজ্ঞাসু, বেদই তাহাদের পক্ষে পরম প্রমাণ। বেদ অজ্ঞের শরণ, জ্ঞানীদেরও শরণ। যাহারা স্বর্গ বা আনন্দ্য কামনা করে, ইহাই তাহাদিগের শরণ। যে ব্রাহ্মণ তিন লোক হত্যা করে, যেখানে সেখানে খায়, তাহার যদি ঋগ্বেদ মনে থাকে, তবে তাহার কোন পাপ হয় না।

শতপথ ব্রাহ্মণ বলেন, বেদান্তর্গত সর্বাংভূত। বেদ, সকল ছন্দঃ, স্তোত্র, প্রাণ, এবং দেবতা-গণের আত্মা। বেদই আছে। বেদ অমৃত। যাহা সত্য, তাহাও বেদ।

বিষ্ণুপুরাণে আছে, দেবাদের রূপ, নাম, কর্ম, প্রবর্তন, বেদশব্দ হইতে সৃষ্ট হইয়াছিল। অন্যত্র ঐ পুরাণে বিষ্ণুকে বেদময় ও ঋগ্-যজুঃসামাংক বলা হইয়াছে।

মহাভারতে শান্তিপর্বেও আছে যে, বেদশব্দ হইতে সর্বাংভূতের রূপ নাম কর্মাদির উৎপত্তি।

ঋক্-সংহিতার ও তৈত্তিরীয় সংহিতার মঙ্গলাচরণে সায়নাচার্য্য ও মাধবাচার্য্য লিখিয়াছেন, “বেদ হইতে অখিল জগতের নির্মারণ হইয়াছে।”

এইরূপ সর্বাং বেদের মাহাত্ম্য। কোন দেশে কোন ধর্মগ্রন্থের, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি কিছুরই ঐদৃশ মাহিমা কীর্তিত হয় নাই।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, যে বেদ এইরূপ সকলের পূর্বাংগামী বা উৎপত্তির মূল, তাহা কোথা হইতে আসিল। এ বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, বেদের কর্তা কেহ নাই।— এ গ্রন্থ কাহারও প্রণীত নহে, ইহা নিত্য এবং অপৌরুষেয়। অন্যে বলেন যে, ইহা ঐশ্বরপ্রণীত, সূতরাং সৃষ্ট এবং পৌরুষেয়। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রের কি আশ্চর্য্য বৈচিত্র্য! সকলেই বেদ মানেন, কিন্তু বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন দুইখানি শাস্ত্রীয় গ্রন্থের ঐক্য নাই। যথা—

- (১) ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে আছে, বেদপুরুষ যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন।
- (২) অথর্ষবেদে আছে, স্তম্ভ হইতে ঋগ্-যজুষ্-সাম অপাঙ্কিত হইয়াছিল।
- (৩) অথর্ষবেদে অন্যত্র আছে যে, ইন্দ্র হইতে বেদের জন্ম।
- (৪) ঐ বেদের অন্যত্র আছে, ঋগ্বেদ কাল হইতে উৎপন্ন।
- (৫) ঐ বেদে অন্যত্র আছে, বেদ গায়ত্রীমধ্যে নিহিত।

বিবিধ প্রবন্ধ—সাংখ্যদর্শন

(৬) শতপথ ব্রাহ্মণে আছে যে, অগ্নি হইতে ঋচ্, বায়ু হইতে যজুষ্, এবং সূর্য্য হইতে সামবেদের উৎপত্তি; ছান্দোগ্য উপনিষদেও ঐরূপ আছে। এবং মনুতেও তদ্রূপ আছে।

(৭) শতপথ ব্রাহ্মণের অন্যত্র আছে, বেদ প্রজাপতি কর্তৃক সৃষ্টি হইয়াছিল।

(৮) শতপথ ব্রাহ্মণের সেই স্থানেই আছে যে, প্রজাপতি বেদসহিত জলমধ্যে প্রবেশ করেন। জল হইতে অণ্ডের উৎপত্তি হয়। অণ্ড হইতে প্রথমে তিন বেদের উৎপত্তি।

(৯) শতপথ ব্রাহ্মণের অন্যত্র আছে যে, বেদ মহাভূতের (ব্রহ্মার) নিশ্বাস।

(১০) তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আছে, প্রজাপতি সোমকে সৃষ্টি করিয়া তিন বেদের সৃষ্টি করিয়াছেন।

(১১) বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, প্রজাপতি বাক্ সৃষ্টি করিয়া তদ্বারা বেদাদি সকল সৃষ্টি করিয়াছেন।

(১২) শতপথ ব্রাহ্মণে পুনশ্চ আছে যে, মনঃসমুদ্র হইতে বাক্ রূপ সাবলের দ্বারা দেবতারা বেদ খুঁড়িয়া উঠাইয়াছিলেন।

(১৩) তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আছে যে, বেদ প্রজাপতির শ্মশ্রু।

(১৪) উক্ত ব্রাহ্মণে পুনশ্চ আছে, বাগ্ দেবী বেদমাতা।

(১৫) বিষ্ণুপুরাণে আছে, বেদ ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন। ভাগবত পুরাণে ও মার্কণ্ডেয় পুরাণেও ঐরূপ।

(১৬) হরিবংশে আছে, গায়ত্রীসমুদ্র ব্রহ্মতেজোময় পুরুষের নেত্র হইতে ঋচ্ ও যজুষ্, জিহ্বাগ্র হইতে সাম, এবং মূর্ধ্ব হইতে অথর্ষের সৃজন হইয়াছিল।

(১৭) মহাভারতের ভীষ্মপর্বে আছে যে, সরস্বতী এবং বেদ, বিষ্ণু মন হইতে সৃজন করিয়াছিলেন। শান্তিপর্বে সরস্বতীকে বেদমাতা বলা হইয়াছে।

(১৮) অথর্ষবেদান্তর্গত আয়ুর্ষেদে আছে যে, আয়ুর্ষেদ ব্রহ্মা মনে মনে জানিয়াছিলেন। আয়ুর্ষেদ অথর্ষবেদান্তর্গত বলিয়া অথর্ষবেদের ঐরূপ উৎপত্তি বৃষ্টিতে হইবে।

বেদের মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ্ এং আরণ্যকে, এবং স্মৃতি, পুরাণ ও ইতিহাসে বেদোৎপত্তি বিষয়ে এইরূপ আছে। দেখা যাইতেছে যে, এ সকলে বেদের সৃষ্টি এবং পৌরুষেয় প্রায় সর্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে—কদাচিৎ অপৌরুষেয়ও কথিত আছে। কিন্তু পরবর্তী টীকাকার ও দার্শনিকেরা প্রায় অপৌরুষেয়বাদী। তাহাদিগের মত নিম্নে লিখিত হইতেছে।

(১৯) সায়নাচার্য্য বেদার্থপ্রকাশ নামে ঋগ্বেদের টীকা করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলেন যে, বেদ অপৌরুষেয়। কিন্তু বেদ মনুষ্যকৃত নহে বলিয়াই অপৌরুষেয় বলেন।

(২০) সায়নাচার্য্যের ভ্রাতা মাধবাচার্য্যও বেদার্থপ্রকাশ নামে তৈত্তিরীয় যজুর্ষেদের টীকা করিয়াছেন। তিনি বলেন, বেদ নিত্য। তবে তিনি এই অর্থে নিত্য বলেন যে, কাল আকাশাদি যেমন নিত্য, সেইরূপ বেদ। ব্যবহারকালে কালিদাসাদিবাক্যবৎ পুরুষবির্ভূত নহে বলিয়া নিত্য। এবং তিনি ব্রহ্মাকে বেদবত্তা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

(২১) মীমাংসকেরা বলেন, বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয়। শব্দ নিত্য বলিয়া বেদ নিত্য। শঙ্করাচার্য্য এই মতাবলম্বী।

(২২) নৈয়ায়িকেরা তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন, বেদ পৌরুষেয়।—মন্ত্র ও আয়ুর্ষেদের ন্যায়, জ্ঞানী ব্যক্তির কথা প্রামাণ্য বলিয়াই বেদও প্রামাণ্য বোধ হয়। গোতমসূত্রের ভাবে বেদকে মনুষ্যপ্রণীত বলিয়া নির্দেশ করা তাহার ইচ্ছা কি না, নিশ্চিত বঝা যায় না।

(২৩) বৈশেষিকেরা বলেন, বেদ ঈশ্বরপ্রণীত। কুসুমাজলিকর্তৃ উদয়নাচার্য্যের এই মত।

এই সমস্ত শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া দেখা যায় যে, কেহ বলেন, বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয়; কেহ বলেন, বেদ সৃষ্টি এবং ঈশ্বরপ্রণীত। ইহা ভিন্ন তৃতীয় সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। কিন্তু সাংখ্য-প্রবচনকারের মত সৃষ্টিছাড়া। তিনি প্রথমতঃ বলেন যে, বেদ কদাপি নিত্য হইতে পারে না; কেন না, বেদেই তাহার কার্য্যত্বের প্রমাণ আছে—যথা “স তপোহতপাত তস্মাৎ তপস্তেপানা হ্রয়ো বেদা অজায়ন্ত।” যেখানে বেদেই বলে যে, এই এই রূপে বেদের জন্ম হইয়াছিল, সেখানে বেদ কদাপি নিত্য এবং অপৌরুষেয় হইতে পারে না। কিন্তু যাহা অপৌরুষেয় নহে, তাহা অবশ্য পৌরুষেয় হইবে। কিন্তু সাংখ্যকারের মতে বেদ অপৌরুষেয় নহে, পৌরুষেয়ও নহে। পুরুষ অর্থাৎ ঈশ্বর নাই বলিয়া তাহা পৌরুষেয় নহে। সাংখ্যকার

বাংকম রচনাবলী

আরও বলেন যে, বেদ করিতে যোগ্য যে পুরুষ তিনি হয় মূক্ত, নয় বদ্ধ। যিনি মূক্ত, তিনি প্রবৃত্তির অভাবে বেদসৃজন করিবেন না; যিনি বদ্ধ, তিনি অস্বর্জিত বলিয়া তৎপক্ষে অক্ষম।

তবে পৌরুষেয় নহে, অপৌরুষেয়ও নহে। তাহা কি কখন হইতে পারে? সাংখ্যকার বলেন, হইতে পারে, যথা—অঙ্কুরাদি (৫, ৮৪)। যাঁহারা হিন্দু-দর্শনশাস্ত্রের নাম শুনিলেই মনে করেন, তাহাতে সর্বত্রই আশ্চর্য্য বুদ্ধির কৌশল, তাঁহাদিগের ভ্রম নিবারণার্থ এই কথার বিশেষ উল্লেখ করিলাম। সাংখ্যকারের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতাও বিচিত্রা, ভ্রান্তিও বিচিত্রা। সাংখ্যকার যে এমন রহস্যজনক ভ্রান্তিতে অনবধানতাপ্রযুক্ত পতিত হইয়াছিলেন, আমরা এমত বিবেচনা করি না। আমরা দিগের বিবেচনায় সাংখ্যকার অন্তরে বেদ মানিতেন না, কিন্তু তাৎকালিক সমাজে ব্রাহ্মণে এবং দার্শনিকে কেহ সাহস করিয়া বেদের অবজ্ঞা করিতে পারিতেন না। এজন্য তিনি মৌখিক বেদভক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং যদি বেদ মানিতে হইল, তবে আবশ্যিকমত প্রতিবাদীদিগকে নিরস্ত করিবার জন্য স্থানে স্থানে বেদের দোহাই দিয়াছেন। কিন্তু তিনি অন্তরে বেদ মানিতেন বোধ হয় না। বেদ পৌরুষেয় নহে, অপৌরুষেয়ও নহে, এ কথা কেবল ব্যঙ্গ মাত্র। সূত্রকারের এই কথা বলিবার অভিপ্রায় বুঝা যায় যে, “দেখ, তোমরা যদি বেদকে সর্বজ্ঞানযুক্ত বলিতে চাহ, তবে বেদ না পৌরুষেয়, না অপৌরুষেয় হইয়া উঠে। বেদ অপৌরুষেয় নহে, ইহার প্রমাণ বেদে আছে। তবে ইহা যদি পৌরুষেয় হয়, তবে ইহাও বলিতে হইবে যে, ইহা মনুষ্যকৃত; কেন না, সর্বজ্ঞ পুরুষ কেহ নাই, তাহা প্রতিপন্ন করা গিয়াছে।” যদি এ সকল সূত্রের এরূপ অর্থ করা যায়, তবে অদ্বিতীয় দূরদর্শী দার্শনিক সাংখ্যকারকে অল্পবুদ্ধি বলিতে হয়। তাহা কদাপি বলা যাইতে পারে না।

বেদ যদি পৌরুষেয় নহে, অপৌরুষেয়ও নহে, তবে বেদ মানিব কেন? সাংখ্যকার এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আবশ্যিক বিবেচনা করিয়াছিলেন। আজি কালিকার কথা ধরিতে গেলে বোধ হয়, এত বড় গুরুতর প্রশ্ন ভারতবর্ষে আর কিছুই নাই। এক দল বলিতেছেন, সনাতন ধর্ম বেদমূলক, তোমরা এ সনাতন ধর্মে ভিত্তিহীন কেন? তোমরা বেদ মান না কেন? আর এক দল বলিতেছেন, আমরা বেদ মানিব কেন? সমুদায় ভারতবর্ষ এই দুই দলে বিভক্ত। এই দুই প্রশ্নের উত্তর লইয়া বিবাদ হইতেছে। ভারতবর্ষের ভাবী মঙ্গলামঙ্গল এই প্রশ্নের মীমাংসার উপর নির্ভর করে। হিন্দুগণ সকলেরই কি স্বধর্মে থাকা উচিত? না সকলেরই স্বধর্ম ত্যাগ করা উচিত? অর্থাৎ আমরা বেদ মানিব? না মানিব না? যদি মানি, তবে কেন মানিব?

আর একবার এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল। যখন ধর্মশাস্ত্রের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া ভারতবর্ষ গ্রাহি গ্রাহি করিয়া ডাকিতোছিল, তখন শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন, “তোমরা বেদ মানিবে কেন? বেদ মানিও না।” এই কথা শুনিয়া বেদবিৎ, বেদভক্ত, দার্শনিকমণ্ডলী এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন। জৈমিনি, বাদরায়ণ, গোতম, কণাদ, কপিলা, যাঁহারা যেমন ধারণা, তিনি তেমনি উত্তর দিয়াছিলেন। অতএব প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রে এই প্রশ্নের উত্তর থাকাতে দুইটি কথা জানা যাইতেছে। প্রথম, আজি কালি ইংরেজি শিক্ষার দোষেই লোকে বেদের অলঙ্ঘনীয়তার প্রতি নূতন সন্দেহ করিতেছে, এমত নহে। এ সন্দেহ অনেক দিন হইতে। প্রাচীন দার্শনিকদিগের পরে শঙ্করাচার্য্য, মাধবাচার্য্য, সায়নাচার্য্য প্রভৃতি নবোরাও ঐ প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয়, দেখা যায় যে, এ প্রশ্ন বৌদ্ধেরা প্রথম উত্থাপিত করেন, এবং প্রাচীন দার্শনিকেরা প্রথম তাহার উত্তর দান করেন। অতএব বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনশাস্ত্রের উৎপত্তি সমকালিক বলা যাইতে পারে।

বেদ মানিব কেন? এই প্রশ্নের বিচারসমরে মহারথী মীমাংসক জৈমিনি। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী নৈয়ায়িক গোতম। নৈয়ায়িকেরা বেদ মানেন না, এমত নহে। কিন্তু যে সকল কারণে মীমাংসকেরা বেদ মানেন, নৈয়ায়িকেরা তাহা অগ্রাহ্য করেন। মীমাংসকেরা বলেন, বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয়। নৈয়ায়িকেরা বলেন, বেদ আপ্তবাক্য মাত্র। নৈয়ায়িকেরা মীমাংসকের মত খণ্ডন জন্য যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, মাধবাচার্য্য-প্রণীত সর্বদর্শনসংগ্রহ হইতে তাহার সারমর্ম নিম্নে সংক্ষেপে লেখা গেল।

মীমাংসকেরা বলেন যে, সম্প্রদায়বিচ্ছেদে বেদকর্তা অস্মর্য্যমান। সকল কথা লোকপরম্পরা স্মৃত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু কাহারও স্মরণ নাই যে, কেহ বেদ করিয়াছেন। ইহাতে নৈয়ায়িকেরা আপত্তি করেন যে, প্রলয়কালে সম্প্রদায় বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। এক্ষণে যে বেদ প্রণয়ন

স্মরণে নাই, ইহাতে এমন প্রমাণ হইতেছে না যে, প্রলয়পদার্থে বেদ প্রণীত হয় নাই। আর ইহাও তোমরা প্রমাণ করিতে পারিবে না যে, বেদকর্তা কাহা কর্তৃক কখন স্মৃত ছিলেন না। নৈয়ায়িকেরা আরও বলেন যে, বেদবাক্যসকল, যেমন কালিদাসাদিবাক্য, তেমনি বাক্য, অতএব বেদবাক্যও পৌরুষেয় বাক্য। বাক্যত্বহেতু, মন্বাদির বাক্যের ন্যায়, বেদবাক্যকেও পৌরুষেয় বালিতে হইবে। আর মীমাংসকেরা বলিয়া থাকেন যে, যেই বেদাধ্যয়ন করে, তাহার পদার্থে তাহার গুরু অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহার পদার্থে তাঁহার গুরু অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহার পদার্থে তাঁহার গুরু; এইরূপ যেখানে অনন্ত পারম্পর্য আছে, সেখানে বেদ অনাদি। নৈয়ায়িক বলেন যে, মহাভারতাদি সম্বন্ধেও ঐরূপ বলা যাইতে পারে। যদি বল যে, মহাভারতের কর্তা যে ব্যাস, ইহা স্মর্যমান, তবে বেদ সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে যে, “ঋচঃ সামানি যজ্ঞরে। ছন্দাংসি যজ্ঞরে তস্মাৎ যজ্ঞস্তুস্মাদজায়ত।” ইতি পদার্থসদৃশে বেদকর্তাও নির্দিষ্ট আছেন। আর মীমাংসকেরা বলেন যে, শব্দ নিত্য, এজন্য বেদ নিত্য। কিন্তু শব্দ নিত্য নহে; কেন না, শব্দসামান্যত্ববশতঃ ঘটৎ অস্মদাদির বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্য। মীমাংসকেরা উত্তর করেন যে, গকারাদির শব্দ শূন্যে পাইলেই আমরাই প্রত্যভিজ্ঞান জন্মে যে, ইহা গকার, অতএব শব্দ নিত্য। নৈয়ায়িক বলেন যে, সে প্রত্যভিজ্ঞা সামান্য বিষয়ত্ববশতঃ, যেমন ছিল, তৎপরে পুনর্জাত কেশ, এবং দলিত কুন্দ। মীমাংসকেরা আরও বলিয়া থাকেন যে, বেদ অপৌরুষেয়, তাহার এক কারণ যে, পরমেশ্বর অশরীরী, তাঁহার তাল্লাদি বর্ণোচ্চারণ-স্থান নাই। নৈয়ায়িকেরা উত্তর করেন যে, পরমেশ্বর স্বভাবতঃ অশরীরী হইলেও ভক্তানুগ্রহার্থ তাঁহার শরীর গ্রহণ অসম্ভব নহে।

মীমাংসকেরা এ সকল কথা উত্তর দিয়াছেন, কিন্তু তাহার বিবরণ লিখিতে গেলে প্রবন্ধ বড় দীর্ঘ এবং কটমট হইয়া উঠে। ফলে বেদ মানিবে কেন? এই তর্কের তিনটি মাত্র উত্তর প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র হইতে পাওয়া যায়—

প্রথম। বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয়, সুতরাং ইহা মান্য। কিন্তু বেদেই আছে যে, ইহা অপৌরুষেয় নহে। যথা “ঋচঃ সামানি যজ্ঞরে” ইত্যাদি।

দ্বিতীয়। বেদ ঈশ্বরপ্রণীত, এই জন্য মান্য। প্রতিবাদীরা বলিবেন যে, বেদ যে ঈশ্বরপ্রণীত, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ নাই। বেদে আছে, বেদ ঈশ্বরসম্বৃত, কিন্তু যেখানে তাঁহারা বেদ মানিতেছেন না, তখন তাঁহারা বেদের কোন কথা মানিবেন না। এবিষয়ে যে বাদানুবাদ হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়, এবং তাহা সবিস্তারে লিখবার আবশ্যিকতা নাই। যাঁহারা ঈশ্বর মানে না, তাঁহারা ঈশ্বরপ্রণীত বলিয়া যে স্বীকার করিবেন না, তাহা বলা বাহুল্য।

তৃতীয়। বেদের নিজ শক্তির অভিব্যক্তির দ্বারাই বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হইতেছে। সাংখ্যকার এই উত্তর দিয়াছেন। সায়নাচার্য্য বেদার্থপ্রকাশে এবং শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে ঐরূপ নির্দেশ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে কেবল ইহাই বক্তব্য যে, যদি বেদের এরূপ শক্তি থাকে, তবে বেদ অবশ্য মান্য। কিন্তু সে শক্তি আছে কি না, এই এক স্বতন্ত্র বিচার আবশ্যিক হইতেছে। অনেকে বলিবেন যে, আমরা এরূপ শক্তি দেখিতেছি না। বেদের অর্গোরব হিন্দুশাস্ত্রেও আছে। বেদ মানিতে হইবে কি না, তাহা সকলেই আপনাপন বিবেচনামত মীমাংসা করিবেন, কিন্তু আমরা পক্ষপাতশূন্য হইয়া যেখানে লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এবং যখন বেদের গোরব নির্বাচনাত্মক তত্ত্ব লিখিয়াছি, তখন হিন্দুশাস্ত্রে কোথায় কোথায় বেদের অর্গোরব আছে, তাহাও আমরাই নির্দেশ করিতে হয়।

১। মৃগুৎকোপনিষদের আরম্ভে “দ্বৈ বিদ্যে বেদিতব্যে ইতিহ স্ম যদ্ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোহথর্ষবেদঃ শিক্ষাকল্পব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।”

অর্থাৎ বেদাদি শ্রেষ্ঠতর বিদ্যা।

২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়, ২।৪২. বেদপরায়ণদিগের নিন্দা আছে, যথা

যমিমাং পদ্বীপতাং বাচস্প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।

বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥

কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্মফলপ্রদাম্।

ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥

বীক্ষম রচনাবলী

ভোগৈশ্বৰ্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্ ।
ব্যবসায়িত্বিকা বৃদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ।
ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ বেদাঃ নিশ্চৈগুণ্যো ভবাজ্জর্দন ॥

৩। ভাগবতপুরাণে নারদ বলিতেছেন যে, পরমেশ্বর যাহাকে অনুগ্রহ করেন, সে বেদ ত্যাগ করে। ৪।২৯, ৪২।

শব্দব্রহ্মাণি দৃশ্যপারে চরন্ত উরুবিস্তরে ।
মন্ত্রলিঙ্গব্যবচ্ছিন্নং ভজন্তো ন বিদুঃ পরম্ ॥
যদা যস্যানুগ্রহাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্ ॥

৪। কঠোপনিষদে আছে যে, বেদের দ্বারা আত্মা লভ্য হয় না।—যথা

“নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।”

শাস্ত্রানুসন্ধান করিলে এরূপ কথা আরও পাওয়া যায়। পাঠক দেখিবেন, বেদ মানিবে কেন? এ প্রশ্নের আমরা কোন উত্তর দিই নাই। দিবারও আমাদের ইচ্ছা নাই। যাঁহারা সক্ষম, তাঁহারা সে মীমাংসা করিবেন। আমরা পূর্বেগামী পণ্ডিতদিগের প্রদর্শিত পথে পরিভ্রমণ করিয়া যাহা দেখিয়াছি, তাহাই পাঠকের নিকট নিবেদিত হইল।*

ভারত-কলঙ্ক

ভারতবর্ষ পরাধীন কেন?

ভারতবর্ষ এতকাল পরাধীন কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে সকলে বলিয়া থাকেন, ভারতবর্ষীয়েরা হীনবল, এইজন্য। “Effeminate Hindoos” ইউরোপীয়দিগের মুখে সর্বদাই আছে। ইহাই ভারতের কলঙ্ক। কিন্তু আবার ইউরোপীয়দিগের মুখেই ভারতবর্ষীয় সিপাহীদিগের বল ও সাহসের প্রশংসা শুন্য যায়। সেই স্ত্রীস্বভাব হিন্দুদিগের বাহুবলেই কাবুল জিত হইল। বলিতে গেলে সেই স্ত্রীস্বভাব হিন্দুদিগের সাহায্যেই তাঁহারা ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন। তাঁহারা স্বীকার করুন বা না করুন, সেই স্ত্রীস্বভাব হিন্দুদিগের কাছে—মহারাষ্ট্র এবং শীকের কাছে অনেক রণক্ষেত্রে তাঁহারা পরাস্ত হইয়াছেন।

আধুনিক হিন্দুদিগের বলবীৰ্য্য এখন যাহাই হউক, প্রাচীন হিন্দুদিগের অপেক্ষা যে তাহা ন্যূন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। শত শত বৎসরের অধীনতায় তাহার হ্রাস অবশ্য ঘটিয়া থাকিবে। প্রাচীন ভারতবর্ষীয়গণ পরজাতি কর্তৃক বিজিত হইবার পূর্বে যে বিশেষ বলশালী ছিলেন, এমত বিবেচনা করিবার অনেক কারণ আছে—দুর্বল বলিয়া তাঁহারা পরাধীন হইলেন নাই।

আমরা স্বীকার করি যে, এই পক্ষ সমর্থন করা সহজ নহে, এবং এতদ্বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রমাণ-প্রাপ্তি দুঃসাধ্য। এই তর্ক কেবল পুরাবৃত্ত অবলম্বন করিয়া মীমাংসা করা সম্ভব, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অন্যান্য জাতীয়দিগের ন্যায় ভারতবর্ষীয়েরা আপনাদিগের কীর্তিকলাপ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। প্রাচীন ভারতবর্ষীয় পুরাবৃত্ত নাই। সুতরাং ভারতবর্ষীয়দিগের যে শ্লাঘনীয় সমর-কীর্তি ছিল, তাহাও লোপ হইয়াছে। যে গ্রন্থগুলি “পুরাণ” বলিয়া খ্যাত আছে, তাহাতে প্রকৃত পুরাবৃত্ত কিছুই নাই। যাহা কিছু আছে, তাহা অনৈসর্গিক এবং অতিমানুষ উপন্যাসে এরূপ আচ্ছন্ন যে, প্রকৃত ঘটনা কি, তাহা কোন রূপেই নিশ্চিত হয় না।

ভাগ্যক্রমে ভিন্নদেশীয় ইতিহাস-বেত্তাদিগের গ্রন্থে দুই স্থানে প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের যুদ্ধাদির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম, মার্কিনীয় আলেকজান্ডার বা সেকন্দের দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। রচনাকুশল যবন-লেখকেরা তাহা পরিকীর্তিত করিয়াছেন। দ্বিতীয়, মুসলমানেরা ভারতবর্ষ জয়ার্থে যে সকল উদ্যম করিয়াছিলেন,

* এই প্রবন্ধে বেদ পুরাণাদি হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা মূলের সাহেবকৃত বিখ্যাত সংগ্রহ হইতে নীত হইয়াছে।

বিবিধ প্রবন্ধ—ভারত-কলঙ্ক

তাহা মুসলমান ইতিবৃত্ত-লেখকেরা বিবর্তিত করিয়াছেন। কিন্তু প্রথমেই বক্তব্য যে, এরূপ সাক্ষীর পক্ষপাতিত্বের গুরুতর সম্ভাবনা। মনুষ্য চিত্রকর বাঁলিয়াই চিত্রে সিংহ পরাজিতস্বরূপ লিখিত হয়। যে সকল ইতিহাসবেত্তা আত্মজাতির লাঘব স্বীকার করিয়া, সত্যের অনুরোধে শত্রুপক্ষের যশঃকীর্তন করেন, তাঁহারা অতি অল্পসংখ্যক। অপেক্ষাকৃত মূঢ়, আত্মগরিমাপরায়ণ মুসলমান-দিগের কথা দূরে থাকুক, কৃতবিদ্য, সত্যনিষ্ঠাভিমানী ইউরোপীয় ইতিহাসবেত্তারা এই দোষে এরূপ কলঙ্কিত যে, তাঁহাদের রচনা পাঠ করিতে কখন কখন ঘৃণা করে। এই জন্য দেশীয় এবং বিপক্ষদেশীয়, উভয়বিধ ইতিহাসবেত্তাদিগের লিপির সাহায্য না পাইলে, কোন ঘটনারই যথার্থ্য নির্ণীত হয় না। কেবল আত্মগরিমাপরবশ, পর-ধর্মদ্বেষী, সত্যভীত মুসলমান লেখকদিগের কথার উপর নির্ভর করিয়া, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের রণনৈপুণ্য মীমাংসা করা যাইতে পারে না। সে যাহাই হউক, নিম্নলিখিত দুইটি কথা মুসলমান পুরাবৃত্ত হইতেই বিচারের দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে।

প্রথম, আরব-দেশীয়েরা এক প্রকার দিগ্বিজয়ী। যখন যে দেশ আক্রমণ করিয়াছে, তখনই তাহারা সেই দেশ জয় করিয়া পৃথিবীতে অতুল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। তাহারা কেবল দুই দেশ হইতে পরাভূত হইয়া বহিস্কৃত হয়। পশ্চিমে ফ্রান্স, পূর্বে ভারতবর্ষ। আরবেরা মিশর ও শিরিয় দেশ মহম্মদের মৃত্যুর পর ছয় বৎসর মধ্যে, পারস্য দশ বৎসরে, আফ্রিকা ও স্পেন এক এক বৎসরে, কাবুল অষ্টাদশ বৎসরে, তুর্কস্থান আট বৎসরে সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত করে। কিন্তু তাহারা ভারতবর্ষ জয়ের জন্য তিন শত বৎসর পর্যন্ত যত্ন করিয়াও ভারতবর্ষ হস্তগত করিতে পারে নাই। মহম্মদ বিনকাসিম সিন্ধুদেশ অধিকৃত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি রাজপুতানা হইতে পরাভূত হইয়া বহিস্কৃত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পরে সিন্ধু রাজপুতগণ কর্তৃক পুনরধিকৃত হইয়াছিল। ভারত জয় দিগ্বিজয়ী আরব্যদিগের সাধ্য হয় নাই। এলফিন্‌টোন বলেন যে, হিন্দুদিগের দেশীয় ধর্মের প্রতি দৃঢ়ানুরাগই এই অজেয়তার কারণ। আমরা বলি রণনৈপুণ্য,—যোধশক্তি। হিন্দুদিগের আত্মধর্মানুরাগ অদ্যাপি ত বলবৎ। তবে কেন হিন্দুরা সাত শত বৎসর পরজাতি-পদানত?

দ্বিতীয়, যখন কোন প্রাচীন দেশের নৈকট্যে নবাভ্যুদয়বিশিষ্ট এবং বিজয়াভিলাষী জাতি অবস্থিত করে, তখন প্রাচীন জাতি প্রায় নবীনের প্রভুত্বাধীন হইয়া যায়। এইরূপ সর্বাঙ্গকারী বিজয়াভিলাষী জাতি প্রাচীন ইউরোপে রোমকেরা, আসিয়ায় আরব্য ও তুরকীয়েরা। যে যে জাতি ইহাদিগের সংস্রবে আসিয়াছে, তাহারা হই পরাভূত হইয়া ইহাদিগের অধীন হইয়াছে। কিন্তু তন্মধ্যে হিন্দুরা যত দূর দূর্জেয় হইয়াছিল, এতদূর আর কোন জাতিই হয় নাই। আরব্যগণ কর্তৃক যত অল্পকালমধ্যে মিশর, উত্তর আফ্রিকা, স্পেন, পারস্য, তুরক, এবং কাবুলরাজ্য উচ্ছিন্ন হইয়াছিল, তাহা পূর্বেই কথিত হইয়াছে। তদপেক্ষা সুবিখ্যাত কতিপয় সাম্রাজ্যের উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। রোমকেরা প্রথম ২০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে গ্রীস আক্রমণ করে। তদবধি ৫২ বৎসর মধ্যে ঐ রাজ্য একেবারে নিঃশেষ বিজিত হয়। সুবিখ্যাত কার্থেজ রাজ্য ২৬৪ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে প্রথম রোমকদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। ১৪৬ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে, অর্থাৎ এক শত বিশ বৎসর মধ্যে সেই রাজ্য রোমকগণ কর্তৃক ধ্বংসিত হয়। পূর্ব রোমক বা গ্রীক সাম্রাজ্য চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তুরকীয়গণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ পঞ্চাশৎ বৎসর মধ্যে তুরকী দ্বিতীয় মহম্মদের হস্তে বিলুপ্ত হয়। পশ্চিম রোমক, যাহার নাম অদ্যাপি জগতে বীরদর্পের পতাকাস্বরূপ, তাহাই ২৮৬ খ্রীষ্টাব্দে উত্তরীয় বর্ষরজাতি কর্তৃক প্রথম আক্রান্ত হইয়া ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ প্রথম বর্ষের বিপ্লবের ১৯০ বৎসর মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ভারতবর্ষ ৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে আরব্য মুসলমানগণ কর্তৃক প্রথম আক্রান্ত হয়। তদব্দ হইতে পাঁচ শত ঊনত্রিশ বৎসর পরে শাহাবুদ্দীন ঘোরী কর্তৃক উত্তরভারত অধিকৃত হয়। শাহাবুদ্দীন বা তাঁহার অনুচরেরা আরব্যজাতীয় ছিলেন না। আরবেরা যেরূপ বিফলযত্ন হইয়াছিল, গজনী নগরাধিষ্ঠাতা তুরকীয়েরা তদ্রূপ। যাহারা পৃথ্বীরাজ, জয়চন্দ্র এবং সেনরাজ্য প্রভৃতি হইতে উত্তরভারতরাজ্য অপহরণ করে, তাহারা পাঠান বা আফগান। আরব্যদিগের প্রথম ভারতাক্রমণের ৫২৯ বৎসর ও তুরকীদিগের প্রথম ভারতাক্রমণের ২১৩ বৎসর পরে, তৎস্থানীয় পাঠানেরা ভারতরাজ্যাধিকার করিয়াছিল। পাঠানেরা কখনই আরব্য বা তুরকীবংশীয়দিগের ন্যায় সমৃদ্ধিসম্পন্ন বা প্রতাপান্বিত নহে। তাহারা কেবল পূর্বগত আরব্য ও তুরকীদিগের সূচিত

বাংকম রচনাবলী

কার্য সম্পন্ন করিয়াছিল। আরব্য, তুরকী, এবং পাঠান, এই তিন জাতির যত্ন-পারম্পর্যে সাক্ষী পাঁচ শত বৎসরে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লুপ্ত হয়।*

মুসলমান সাক্ষীরা এইরূপ বলে। ইহাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, ইহাদের নিকট হিন্দুরা যখন পরিচিত হইয়াছিলেন, তখন হিন্দুদিগের সুসময় প্রায় অতীত হইয়াছিল,—রাজলক্ষ্মী ক্রমে ক্রমে মালিনা হইয়া আসিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় অব্দের পূর্বেগত হিন্দুরা অধিকতর বলবান্ ছিলেন, তদ্বশয়ে সন্দেহ নাই।

সেই সময়ে গ্রীকদিগের সহিত পরিচয়। তাহারা নিজে অদ্বিতীয় বলবান্। তাহারা ভূয়োভূয়ঃ ভারতবর্ষীয়দিগের সাহস ও রণনৈপুণ্যের প্রশংসা করিয়াছে। মাকিদনীয় বিপ্লব বর্ণনাকালে তাহারা এইরূপ পুনঃ পুনঃ নির্দেশ করিয়াছে যে, আসিয়া প্রদেশে এইরূপ রণ-পাণ্ডিত দ্বিতীয় জাতি তাহারা দেখে নাই। এবং হিন্দুগণ কর্তৃক যে রূপ গ্রীকসৈন্যহানি হইয়াছিল, এরূপ অন্য কোন জাতি কর্তৃক হয় নাই। প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের রণদক্ষতা সম্বন্ধে যদি কাহারও সংশয় থাকে, তবে তিনি ভারতবর্ষের বৃত্তান্তলেখক গ্রীকদিগের গ্রন্থ পাঠ করিবেন।

ভারতভূমি সর্ব্বরত্নপ্রসবিনী, পররাজগণের নিতান্ত লোভের পাত্রী। এই জন্য সর্ব্বকালে নানা জাতি আসিয়া উত্তর পশ্চিমে পার্শ্বত্যাগে প্রবেশ লাভ পূর্বেক ভারতাদিকারের চেষ্টা পাইয়াছে। পারসীক, যোন, বাহুক, শক, হুন, আরব্য, তুরকী সকলেই আসিয়াছে, এবং সিন্ধুপারে বা তদুভয় তীরে স্বল্প প্রদেশ কিছু দিনের জন্য অধিকৃত করিয়া, পরে বিহঙ্কৃত হইয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দী কাল পর্য্যন্ত আর্ষেরা সকল জাতিকে শীঘ্র বা বিলম্বে দুরীকৃত করিয়া আত্মদেশ রক্ষা করিয়াছিল। পঞ্চদশ শত বৎসর পর্য্যন্ত প্রবল জাতি মাত্রেরই আক্রমণ-স্থলীভূত হইয়া এতকাল যে স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়াছে, এরূপ অন্য কোন জাতি পৃথিবীতে নাই, এবং কখন ছিল কি না সন্দেহ। অতি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত যে হিন্দুদিগের সমৃদ্ধি অক্ষয় হইয়াছিল, তাহাদিগের বাহুবলই ইহার কারণ, সন্দেহ নাই। অন্য কারণ দেখা যায় না।

এই সকল প্রমাণ সত্ত্বেও সর্ব্বদা শূনা যায় যে, হিন্দুরা চিরকাল রণে অপারগ। অদূরদর্শী-দিগের নিকট ভারতবর্ষের এই চিরকলঙ্কের তিনটি কারণ আছে।

প্রথম,—হিন্দু ইতিবৃত্ত নাই;—আপনার গুণগান আপনি না গায়িলে কে গায়? লোকের ধর্ম্ম এই যে, যে আপনাকে মহাপুরুষ বলিয়া পরিচিত না করে, কেহ তাহাকে মানুষের মধ্যে গণ্য করে না। কোন জাতির সুখ্যাতি কবে অপর জাতি কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছে? রোমকদিগের রণ-পাণ্ডিত্যের প্রমাণ—রোমকলিখিত ইতিহাস। গ্রীকদিগের যোদ্ধগুণের পরিচয়,—গ্রীকলিখিত গ্রন্থ। মুসলমানেরা যে মহারণকুশল, ইহাও কেবল মুসলমানের কথাতেই বিশ্বাস করিয়া জানিতে পারিতেছি। কেবল সে গুণে হিন্দুদিগের গৌরব নাই—কেন না, সে কথার হিন্দু সাক্ষী নাই।

দ্বিতীয় কারণ—যে সকল জাতি পররাজ্যাপহারী, প্রায় তাহারা ই রণপাণ্ডিত বলিয়া অপর জাতির নিকট পরিচিত হইয়াছে। যাহারা কেবল আত্মরক্ষা মাত্রে সন্তুষ্ট হইয়া, পররাজ্য লাভের কখন ইচ্ছা করে নাই, তাহারা কখনই বীরগৌরব লাভ করে নাই। ন্যায়নিষ্ঠা এবং বীরগৌরব একাধারে সচরাচর ঘটে না। অদ্যপি এ দেশীয় ভাষায় “ভাল মানুষ” শব্দের অর্থ—ভীরু-স্বভাবের লোক, অকর্ম্মা। “হরি নিতান্ত ভাল মানুষ।” অর্থ—হরি নিতান্ত অপদার্থ!

হিন্দুরাজগণ যে একেবারে পররাজ্যে লোভশূন্য ছিলেন, এমত আমরা বলি না। তাহারা পরস্পরকে আক্রমণ করিতে কখন ব্রুটি করিতেন না। কিন্তু ভারতবর্ষ, হিন্দুরাজ্যকালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্ডলে বিভক্ত ছিল। ভারতবর্ষ এতাদৃশ বিস্তৃত প্রদেশ যে, ক্ষুদ্র মন্ডলাধিকারী রাজগণ কখন কেহ তাহার বাহিরে দেশজয়ে যাইবার বাসনা করিতেন না; কোন হিন্দু রাজা কস্মিন্ কালে সমগ্র ভারত সাম্রাজ্যভুক্ত করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, হিন্দুরা যখন ম্লেচ্ছ প্রভৃতি অপর ধর্ম্মাবলম্বী জাতিগণকে বিশেষ ঘৃণা করিতেন; তাহাদিগের উপর প্রভুত্ব করিবার কোন প্রয়াস করিতেন, এমত সম্ভাবনা নহে; বরং তদ্দেশ-জয়ে যাত্রা করিলে আপন জাতি-ধর্ম্ম বিনাশের শঙ্কা করিবারই সম্ভাবনা। অতএব সক্ষম হইলেও হিন্দুর ভারতবর্ষের বাহিরে বিজয়াকাঙ্ক্ষায়

* পশ্চিমাংশে আরব্য ও তুরকীয়েরা কিছু ভূমি অধিকার করিয়াছিল মাত্র।

বিবিধ প্রবন্ধ—ভারত-কলঙ্ক

যাইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সত্য বটে, এক্ষণকার কাবুল রাজ্যের অধিকাংশ পূর্বেকালে হিন্দুরাজ্যভুক্ত ছিল, কিন্তু সে প্রদেশ তৎকালে ভারতবর্ষের একাংশ বলিয়া গণ্য হইত।

প্রাচীন হিন্দুদিগের এ কলঙ্কের তৃতীয় কারণ—হিন্দুরা বহুদিন হইতে পরাধীন। যে জাতি বহুকাল পরাধীন, তাহাদিগের আবার বীরগৌরব কি? কিন্তু এক্ষণকার হিন্দুদিগের বীর্য-লাঘব, প্রাচীন হিন্দুদিগের অবমাননার উপযুক্ত কারণ নহে। প্রায় অনেক দেশেই দেখা যায় যে, প্রাচীন এবং আধুনিক লোকের মধ্যে চরিত্রগত সাদৃশ্য অধিক নহে। ইটালি ও গ্রীস, ভারতবর্ষের ন্যায় এই কথাই উদাহরণস্থল। মধ্যকালিক ইটালীয়, এবং বর্তমান গ্রীকদিগের চরিত্র হইতে প্রাচীন রোমক ও গ্রীকদিগকে কাপুরুষ বলিয়া সিদ্ধ করা যাদৃশ অন্যায়, আধুনিক ভারতবর্ষীয়দিগের পরাধীনতা হইতে প্রাচীনদিগের বললাঘব সিদ্ধ করা তাদৃশ অন্যায়।

আমরা এমতও বলি না যে, আধুনিক ভারতবর্ষীয়েরা নিতান্ত কাপুরুষ, এবং সেই জন্য এতকাল পরাধীন। এ পরাধীনতার অন্য কারণ আছে। আমরা তাহার দুইটি কারণ সবিস্তারে এ স্থলে নির্দিষ্ট করি।

প্রথম, ভারতবর্ষীয়েরা স্বভাবতই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষারহিত। স্বদেশীয়, স্বজাতীয় লোকে আমাদিগকে শাসিত করুক, পরজাতীয়দিগের শাসনাধীন হইব না, এরূপ অভিপ্রায় ভারতবর্ষীয়দিগের মনে আইসে না। স্বজাতীয়ের রাজশাসন মঙ্গলকর বা সুখের আকর, পরজাতীয়ের রাজদণ্ড পীড়াদায়ক বা লাঘবের কারণ, এ কথা তাহাদের বড় হৃদয়ঙ্গত নহে। পরতন্ত্রতা অপেক্ষা স্বতন্ত্রতা ভাল, এরূপ একটা তাহাদিগের বোধ থাকিলে থাকিতে পারে, কিন্তু সেটি বোধমাত্র—সে জ্ঞান আকাঙ্ক্ষায় পরিণত নহে। অনেক বস্তু আমাদিগের ভাল বলিয়া জ্ঞান থাকিতে পারে, কিন্তু সে জ্ঞানে তৎপ্রতি সকল স্থানে আকাঙ্ক্ষা জন্মে না। কে না হর্ষচন্দ্রের দাতৃত্ব বা কাশ্মীরসের দেশবাৎসল্যের প্রশংসা করে? কিন্তু তাহার মধ্যে কয়জন হর্ষচন্দ্রের ন্যায় সর্বত্যাগী বা কাশ্মীরসের ন্যায় আত্মঘাতী হইতে প্রস্তুত? প্রাচীন বা আধুনিক ইউরোপীয় জাতীয়দিগের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা বলবতী আকাঙ্ক্ষায় পরিণত। তাহাদিগের বিশ্বাস যে, স্বতন্ত্রতা ত্যাগের অগ্রে প্রাণ এবং সর্বস্ব ত্যাগ কর্তব্য। হিন্দুদের মধ্যে তাহা নহে। তাহাদিগের বিবেচনা “যে ইচ্ছা রাজা হউক, আমাদের কি?” স্বজাতীয় রাজা, পরজাতীয় রাজা, উভয় সমান। স্বজাতীয় হউক, পরজাতীয় হউক, সুশাসন করিলে দুই সমান। স্বজাতীয় রাজা সুশাসন করিবে, পরজাতীয় সুশাসন করিবে না, তাহার স্থিরতা কি? যদি তাহার স্থিরতা নাই, তবে কেন স্বজাতীয় রাজার জন্য প্রাণ দিব? রাজ্য রাজার সম্পত্তি। তিনি রাখিতে পারেন রাখুন। আমাদিগের পক্ষে উভয় সমান। কেহই আমাদিগের ষষ্ঠ ভাগ ছাড়িবে না, কেহই চোরকে পুরস্কৃত করিবে না। যে রাজা হয় হউক, আমরা কাহারও জন্য অঙ্গুলি ক্ষত করিব না।*

আমরা এক্ষণে স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ ইংরেজদিগের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া এই সকল কথার ভ্রম দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু ইহা অস্বাভাবিক নহে, এবং ইহার ভ্রান্তি সহজে অনুমেয়ও নহে। স্বভাববশতঃ কোন জাতি অসভ্যকাল হইতেই স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়; স্বভাববশতঃ কোন জাতি সুসভ্য হইয়াও তৎপ্রতি আস্থাশূন্য। এই সংসারে অনেকগুলিন স্পৃহনীয় বস্তু আছে; তন্মধ্যে সকলেই সকল বস্তুর জন্য যত্নবান্ হয় না। ধন এবং যশঃ উভয়েই স্পৃহনীয়। কিন্তু আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, এক ব্যক্তি ধনসম্পত্তয়েই রত, যশের প্রতি তাহার অনাদর; অন্য ব্যক্তি যশোলিপ্সু, ধনে হতাদর। রাম ধনসম্পত্তয়ে একরত হইয়া কাপর্ণ্য, নীচাশয়তা প্রভৃতি দোষে যশোহানি করিতেছে; যদু অমিত ধনরাশি নষ্ট করিয়া দাতৃত্বাদি গুণে যশঃ সম্পন্ন করিতেছে। রাম ভ্রান্ত,

* আমরা এমত বলি না যে, ভারতবর্ষে কখন কোন স্বাতন্ত্র্যভুক্ত জাতি ছিল না। মীবাররাজপুত্রদিগের অপূর্বে কাহিনী যাঁহারা টডের গ্রন্থে অবগত হইয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, ঐ রাজপুত্রগণ হইতে স্বাতন্ত্র্যভুক্ত জাতি কখন পৃথিবীতে দেখা দেয় নাই। সেই স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তার ফলও চমৎকার। মীবার ক্ষুদ্র রাজ্য হইয়াও ছয় শত বৎসর পর্যন্ত মুসলমান সাম্রাজ্যের মধ্যস্থলে স্বাধীন হিন্দু রাজপতাকা উড়াইয়াছে। আকবর বাদসাহের বাহুবলও মীবার ধ্বংসে সক্ষম হয় নাই। অদ্যাপি উদয়পুরের রাজবংশ পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীন রাজবংশ বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু এক্ষণে আর সে দিন নাই। সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। উপরে আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহা সাধারণ হিন্দুসম্বন্ধে যথার্থ।

বাংকম রচনাবলী

কি যদু দ্রাস্ত, তাহার মীমাংসা নিতাস্ত সহজ নহে। অন্ততঃ ইহা স্থির যে, উভয়মধ্যে কাহারও কার্য স্বভাববিবুদ্ধ নহে। সেইরূপ গ্রীকেরা স্বাধীনতাপ্রিয়; হিন্দুরা স্বাধীনতাপ্রিয় নহে, শান্তিসুখের অভিলাষী; ইহা কেবল জাতিগত স্বভাববৈচিত্র্যের ফল, বিস্ময়ের বিষয় নহে।

কিন্তু অনেকে এ কথা মনে করেন না। হিন্দুরা যে পরাধীন, স্বাধীনতালাভের জন্য উৎসুক নহে, ইহাতে তাঁহারা অনুমান করেন যে, হিন্দুরা দুর্বল, রণভীরু, স্বাধীনতা লাভে অক্ষম; এ কথা তাঁহাদের মনে পড়ে না যে, হিন্দুরা সাধারণতঃ স্বাধীনতা লাভে অভিলাষী বা যত্নবান্ নহে। অভিলাষী বা যত্নবান্ হইলেই লাভ করিতে পারে।

স্বাতন্ত্র্যে অনাস্থা, কেবল আধুনিক হিন্দুদিগের স্বভাব, এমত আমরা বলি না; ইহা হিন্দুজাতির চিরস্বভাব বোধ হয়। যিনি এমত বিবেচনা করেন যে, হিন্দুরা সাত শত বৎসর স্বাতন্ত্র্যহীন হইয়া, এক্ষণে তদ্বিষয়ে আকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়াছে, তিনি অযথার্থ অনুমান করেন। সংস্কৃত সাহিত্যাদিতে কোথাও এমন কিছু পাওয়া যায় না যে, তাহা হইতে পূর্বতন হিন্দুগণকে স্বাধীনতাপ্রয়াসী বলিয়া সিদ্ধ করা যাইতে পারে। পুরাণোপপুরাণ কাব্য নাটকাদিতে কোথাও স্বাধীনতার গুণগান নাই। মীবার ভিন্ন কোথাও দেখা যায় না যে, কোন হিন্দুসমাজ স্বাতন্ত্র্যের আকাঙ্ক্ষায় কোন কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। রাজার রাজ্য সম্পত্তি রক্ষায় যত্ন, বীরের বীরদর্প, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধপ্রয়াস, এ সকলের ভূরি ভূরি উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য লাভাকাঙ্ক্ষা সে সকলের মধ্যগত নহে। স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা, এ সকল নূতন কথা।

ভারতবর্ষীয়দিগের এইরূপ স্বভাবসিদ্ধ স্বাতন্ত্র্যে অনাস্থার কারণানুসন্ধান করিলে তাহাও দুর্জয়ের নহে। ভারতবর্ষের ভূমির উর্বরতাশক্তি এবং বায়ুর তাপাতিশয্য প্রভৃতি ইহার গৌণ কারণ। ভূমি উর্বরা, দেশ সর্বসামগ্রী-পরিপূর্ণ, অলপায়াসে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয়। লোককে অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না, এ জন্য অবকাশ যথেষ্ট। শারীরিক পরিশ্রম হইতে অধিক অবকাশ হইলে, সহজেই মনের গতি আভ্যন্তরিক হয়; ধ্যানের বাহুল্য ও চিন্তার বাহুল্য হয়। তাহার এক ফল কবিত্ব, জগত্তত্তে পাণ্ডিত্য। এই জন্য হিন্দুরা অলপকালে অদ্বিতীয় কবি এবং দার্শনিক হইয়াছিলেন। কিন্তু মনের আভ্যন্তরিক গতির দ্বিতীয় ফল বাহ্য সুখে অনাস্থা। বাহ্য সুখে অনাস্থা হইলে সুতরাং নিশ্চেষ্টতা জন্মবে। স্বাতন্ত্র্যে অনাস্থা এই স্বাভাবিক নিশ্চেষ্টতার এক অংশ মাত্র। আর্ষ্য ধর্মতত্ত্বে, আর্ষ্য দর্শনশাস্ত্রে এই অশেষ-পরতা সর্বত্র বিদ্যমান। কি বৈদিক, কি বৌদ্ধ, কি পৌরাণিক ধর্ম, সকলেই এই নিশ্চেষ্টতারই সম্বন্ধনাপরিপূর্ণ। বেদ হইতে বেদান্ত সাংখ্যাদি দর্শনের উৎপত্তি; তদনুসারে লয় বা ভোগক্ষান্তিই মোক্ষ; নিষ্কামত্বই পুণ্য। বৌদ্ধধর্মের সার,—নির্ব্বাণই মুক্তি।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, হিন্দুজাতি যদি চিরকাল স্বাতন্ত্র্যে হতাদর, তবে মুসলমানকৃত জয়ের পূর্বে সাদর্শ সহস্র বৎসর তাহারা কেন যত্ন করিয়া পুনঃ পুনঃ পরজাতি বিমুখ পূর্বক স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল? পরজাতিগণ সহজে কখন বিমুখ হয় নাই, অনেক কষ্টে হইয়া থাকিবে। যে সুখের প্রতি আস্থা নাই, সে সুখের জন্য হিন্দুসমাজ কেন এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছিল?

উত্তর, হিন্দুসমাজ যে কখন শক যবনপ্রভৃতিকে বিমুখীকরণ জন্য বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ কোথাও নাই। হিন্দুরাজগণ আপনার রাজ্যসম্পত্তি রক্ষার জন্য যত্ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সংগৃহীত সেনায় যুদ্ধ করিত; যখন পারিত, শত্রু বিমুখ করিত, তাহাতেই দেশের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা হইত; তদ্বিন্ম যে “আমাদের দেশে ভিন্নজাতীয় রাজা হইতে দিব না” বলিয়া সাধারণ জনগণ কখন উৎসাহযুক্ত বা উদ্যমশালী হইয়াছিল, ইহার প্রমাণ কোথাও নাই। বরং তদ্বিপরীতই প্রকৃত বলিয়া বিবেচনা হয়। যখনই সমরলক্ষ্মীর কোপদৃষ্টিপ্রভাবে হিন্দু রাজা বা হিন্দু সেনাপতি রণে হত হইয়াছেন, তখনই হিন্দুসেনা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছে, আর যুদ্ধে সমবেত হয় নাই। কেন না, আর কাহার জন্য যুদ্ধ করিবে? যখনই রাজা নিধনপ্রাপ্ত বা অন্য কারণে রাজ্য রক্ষায় নিশ্চেষ্ট হইয়াছেন, তখনই হিন্দুযুদ্ধ সমাধা হইয়াছে। আর কেহ তাহার স্থানীয় হইয়া স্বাতন্ত্র্য পালনের উপায় করে নাই; সাধারণ সমাজ হইতে অরক্ষিত রাজ্যরক্ষার কোন উদ্যম হয় নাই। যখন বিধির বিপাকে যবন বা পারসীক, শক বা বাহিক, কোন প্রদেশখণ্ডের রাজাকে রণে পরাজিত করিয়া তাঁহার সিংহাসনে বসিয়াছে, প্রজাগণ তখনই তাহাকে পূর্বপ্রভুর

তুল্য সমাদর করিয়াছে, রাজ্যাপহরণে কোন আপত্তি করে নাই। তিন সহস্র বৎসরের অধিক কাল ধারিয়া, আৰ্যের সঙ্গে আৰ্য্যজাতীয়, আৰ্য্যজাতীয়দের সঙ্গে ভিন্নজাতীয়, ভিন্নজাতীয়ের সঙ্গে ভিন্নজাতীয়;—মগধের সঙ্গে কান্যকুব্জ, কান্যকুব্জের সঙ্গে দিল্লী, দিল্লীর সঙ্গে লাহোর, হিন্দুর সঙ্গে পাঠান, পাঠানের সঙ্গে মোগল, মোগলের সঙ্গে ইংরেজ;—সকলের সঙ্গে সকলে বিবাদ করিয়া, চিরপ্রজ্বলিত সমরানলে দেশ দক্ষ করিয়াছে। কিন্তু সে সকল কেবল রাজায় রাজায় যুদ্ধ; সাধারণ হিন্দুসমাজ কখন কাহারও হইয়া কাহারও সহিত যুদ্ধ করে নাই। হিন্দুরাজগণ অথবা হিন্দুস্থানের রাজগণ, ভূয়োভূয়ঃ ভিন্ন জাতিকর্তৃক জিত হইয়াছে, কিন্তু সাধারণ হিন্দুসমাজ যে কখন কোন পরজাতি কর্তৃক পরাজিত হইয়াছে, এমত বলা যাইতে পারে না; কেন না, সাধারণ হিন্দুসমাজ কখন কোন পরজাতির সঙ্গে যুদ্ধ করে নাই।

এই বিচারে হিন্দুজাতির দীর্ঘকালগত পরাধীনতার দ্বিতীয় কারণ আসিয়া পড়িল। সে কারণ,—হিন্দুসমাজের অনৈক্য, সমাজমধ্যে জাতি-প্রতিষ্ঠার অভাব, জাতি-হিতৈষার অভাব, অথবা অন্য যাহাই বলুন। আমরা সবিস্তারে তাহা বুঝাইতেছি।

আমি হিন্দু, তুমি হিন্দু, রাম হিন্দু, যদু হিন্দু, আরও লক্ষ লক্ষ হিন্দু আছে। এই লক্ষ লক্ষ হিন্দুমাত্রেরই যাহাতে মঙ্গল, তাহাতেই আমার মঙ্গল। যাহাতে তাহাদের মঙ্গল নাই, আমারও তাহাতে মঙ্গল নাই। অতএব সকল হিন্দুর যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহাই আমার কর্তব্য। যাহাতে কোন হিন্দুর অমঙ্গল হয়, তাহা আমার অকর্তব্য। যেমন আমার এইরূপ কর্তব্য আর এইরূপ অকর্তব্য, তোমারও তদ্রূপ, রামের তদ্রূপ, যদুরও তদ্রূপ, সকল হিন্দুরই তদ্রূপ। সকল হিন্দুরই যদি এইরূপ কার্য্য হইল, তবে সকল হিন্দুর কর্তব্য যে একপরামর্শী, একমতাবলম্বী, একত্র মিলিত হইয়া কার্য্য করে, এই জ্ঞান জাতিপ্রতিষ্ঠার প্রথম ভাগ; অর্দ্ধাংশ মাত্র।

হিন্দুজাতি ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য অনেক জাতি আছে। তাহাদের মঙ্গলমাত্রেরই আমাদের মঙ্গল হওয়া সম্ভব নহে। অনেক স্থানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল। যেখানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল, সেখানে তাহাদের মঙ্গল যাহাতে না হয়, আমরা তাহাই করিব। ইহাতে পরজাতিপীড়ন করিতে হয়, করিব। অপিচ, যেমন তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল ঘটিতে পারে, তেমনি আমাদের মঙ্গলে তাহাদের অমঙ্গল হইতে পারে। হয় হউক, আমরা সে জন্য আত্মজাতির মঙ্গল সাধনে বিরত হইব না; পরজাতির অমঙ্গল সাধন করিয়া আত্মমঙ্গল সাধিতে হয়, তাহাও করিব। জাতিপ্রতিষ্ঠার এই দ্বিতীয় ভাগ।

দেখা যাইতেছে যে, এইরূপ মনোবৃত্তি নিষ্পাপ পরিশুদ্ধ ভাব বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। ইহার গুরুতর দোষাবহ বিকার আছে। সেই বিকারে, জাতিসাধারণের এরূপ ভ্রান্তি জন্মে যে, পরজাতির মঙ্গলমাত্রেরই স্বজাতির অমঙ্গল, পরজাতির অমঙ্গলমাত্রেরই স্বজাতির মঙ্গল বলিয়া বোধ হয়। এই কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া ইউরোপীয়েরা অনেক দুঃখ ভোগ করিয়াছে। অনর্থক ইহার জন্য অনেকবার সমরানলে ইউরোপ দক্ষ করিয়াছে।

স্বজাতি-প্রতিষ্ঠা ভালই হউক বা মন্দই হউক, যে জাতিমধ্যে ইহা বলবতী হয়, সে জাতি অন্য জাতি অপেক্ষা প্রবলতা লাভ করে। আজি কালি এই জ্ঞান ইউরোপে বিশেষ প্রধান, এবং ইহার প্রভাবে তথায় অনেক বিষম রাজ্যবিপ্লব ঘটিতেছে। ইহার প্রভাবে ইটালি এক রাজ্যভুক্ত হইয়াছে। ইহারই প্রভাবে বিষম প্রতাপশালী নতুন জার্মান সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে। আরও কি হইবে বলা যায় না।

এমত বলি না যে, ভারতবর্ষে এই জাতিপ্রতিষ্ঠা কিস্মিন্ কালে ছিল না। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আৰ্য্যজাতীয়েরা চিরকাল ভারতবর্ষবাসী নহে। অন্যত্র হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া, তদ্দেশ অধিকার করিয়াছিল। প্রথম আৰ্য্যজয়ের সময়ে বেদাদির সৃষ্টি হয়, এবং সেই সময়কেই পণ্ডিতেরা বৈদিক কাল কহেন। বৈদিক কালে এবং তাহার অব্যবহিত পরেই জাতিপ্রতিষ্ঠা যে আৰ্য্যগণের মধ্যে বিশেষ বলবতী ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ বৈদিক মন্ত্রাদিমধ্যে পাওয়া যায়। তৎকালিক সমাজ-নিয়ন্তা ব্রাহ্মণেরা যে রূপে সমাজ বিধিবদ্ধ করিয়াছিল, তাহাও ঐ জ্ঞানের পরিচয়স্থল। আৰ্য্য বর্ণে এবং শূদ্রে যে বিষম বৈলক্ষণ্য বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাও ইহার ফল। কিন্তু ক্রমে আৰ্য্যবংশ বিস্তৃত হইয়া পড়িলে আর সে জাতিপ্রতিষ্ঠা রহিল না। আৰ্য্যবংশীয়েরা বিস্তৃত ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ অধিকৃত করিয়া স্থানে স্থানে এক এক খণ্ড সমাজ স্থাপন করিল। ভারতবর্ষ এরূপ বহুসংখ্যক খণ্ড সমাজে বিভক্ত হইল।

বাঁকম রচনাবলী

সমাজভেদ, ভাষার ভেদ, আচার ব্যবহারের ভেদ, নানা ভেদ, শেষে জাতিভেদে পরিণত হইল। বাহ্যিক হইতে পৌণ্ড্র পর্য্যন্ত, কাশ্মীর হইতে চোলা ও পাণ্ড্য পর্য্যন্ত সমস্ত ভারত-ভূমি মক্ষিকা-সমাকুল মধুচক্রের ন্যায় নানা জাতি, নানা সমাজে পরিপূর্ণ হইল। পরিশেষে, কর্ণিলবাস্তুর রাজকুমার শাক্যসিংহের হস্তে এক অভিনব ধর্মের সৃষ্টি হইলে, অন্যান্য প্রভেদের উপর ধর্মভেদ জন্মিল। ভিন্ন দেশ, ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন রাজ্য, ভিন্ন ধর্ম; আর একজাতীয়ত্ব কোথায় থাকে? সাগরমধ্যস্থ মীনদলবৎ ভারতবর্ষীয়েরা একতাদ্বন্দ্ব হইল। পরে আবার মুসলমান আসিল। মুসলমানদিগের বংশবৃদ্ধি হইতে লাগিল। কালে, সাগরোচ্ছিন্ন উপর সাগরোচ্ছিন্ন নূতন নূতন মুসলমান সম্প্রদায়, পাশ্চাত্য পর্বতপার হইতে আসিতে লাগিল। দেশীয় লোকে সহস্রে সহস্রে রাজানুকম্পার লোভে বা রাজপীড়নে মুসলমান হইতে লাগিল। অতএব ভারতবর্ষ-বাসিগণ মুসলমান হিন্দু মিশ্রিত হইল। হিন্দু, মুসলমান, মোগল, পাঠান, রাজপুত, মহারাষ্ট্র, একত্র কর্ম করিতে লাগিল। তখন জাতির ঐক্য কোথায়? ঐক্যজ্ঞান কিসে থাকিবে?

এই ভারতবর্ষে নানা জাতি। বাসস্থানের প্রভেদে, ভাষার প্রভেদে, বংশের প্রভেদে, ধর্মের প্রভেদে, নানা জাতি। বাঙ্গালি, পঞ্জাবী, তৈলঙ্গী, মহারাষ্ট্রী, রাজপুত, জাঠ, হিন্দু, মুসলমান, ইহার মধ্যে কে কাহার সঙ্গে একতাদ্বন্দ্ব হইবে? ধর্মগত ঐক্য থাকিলে বংশগত ঐক্য নাই, বংশগত ঐক্য থাকিলে ভাষাগত ঐক্য নাই, ভাষাগত ঐক্য থাকিলে নিবাসগত ঐক্য নাই। রাজপুত জাঠ, এক ধর্মাবলম্বী হইলে, ভিন্নবংশীয় বলিয়া ভিন্ন জাতি; বাঙ্গালি বেহারী একবংশীয় হইলে, ভাষাভেদে ভিন্ন জাতি; মৈথিলি কনোজী একভাষী হইলে, নিবাসভেদে ভিন্ন জাতি। কেবল ইহাই নহে। ভারতবর্ষের এমনই অদৃষ্ট, যেখানে কোন প্রদেশীয় লোক সর্ব্বাংশে এক; যাহাদের এক ধর্ম, এক ভাষা, এক জাতি, এক দেশ, তাহাদের মধ্যেও জাতির একতাজ্ঞান নাই। বাঙ্গালির মধ্যে বাঙ্গালিজাতির একতা বোধ নাই, শীকের মধ্যে শীকজাতির একতা বোধ নাই। ইহারও বিশেষ কারণ আছে। বহুকাল পর্য্যন্ত বহুসংখ্যক ভিন্ন জাতি এক বৃহৎ সাম্রাজ্যভুক্ত হইলে ক্রমে জাতিজ্ঞান লোপ হইতে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন নদীর মুখনির্গত জলরাশি যেমন সমুদ্রে আসিয়া পড়িলে, আর তন্মধ্যে ভেদজ্ঞান করা যায় না, বৃহৎ সাম্রাজ্যভুক্ত ভিন্ন জাতিগণের সেইরূপ ঘটে। তাহাদিগের পার্থক্য যায়, অথচ ঐক্য জন্মে না। রোমক সাম্রাজ্যমধ্যগত জাতিদিগের এইরূপ দশা ঘটিয়াছিল। হিন্দুদিগেরও তাহাই ঘটিয়াছে। জাতি-প্রতিষ্ঠা নানা কারণে ভারতবর্ষে অনেক দিন হইতে লোপ হইয়াছে। লোপ হইয়াছে বলিয়া কখন হিন্দুসমাজ কর্তৃক কোন জাতীয় কার্য সমাধা হয় নাই। লোপ হইয়াছে বলিয়া, সকল জাতীয় রাজাই হিন্দুরাজ্যে বিনা বিবাদে সমাজ কর্তৃক অভিষিক্ত হইয়াছেন। এই জন্যই স্বাতন্ত্র্যক্ষার কারণ হিন্দুসমাজ কখন তর্জনির বিক্ষেপও করে নাই।

ইতিহাসকীর্তিত কালমধ্যে কেবল দুইবার হিন্দুসমাজমধ্যে জাতিপ্রতিষ্ঠার উদয় হইয়াছিল। একবার, মহারাষ্ট্রে শিবজী এই মহামন্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার সিংহনাদে মহারাষ্ট্র জাগরিত হইয়াছিল। তখন মহারাষ্ট্রীয়ে মহারাষ্ট্রীয়ে ভ্রাতৃভাব হইল। এই আশ্চর্য মন্ত্রের বলে অজিতপূর্বে মোগল সাম্রাজ্য মহারাষ্ট্রীয় কর্তৃক বিনষ্ট হইল। চিরজয়ী মুসলমান হিন্দু কর্তৃক বিজিত হইল। সমুদায় ভারতবর্ষ মহারাষ্ট্রের পদাবনত হইল। অদ্যাপি মাহাট্টা, ইংরেজের সঙ্গে ভারতবর্ষ ভাগে ভাগ করিতেছে।

দ্বিতীয় বারের ঐন্দ্রজালিক রণজিৎ সিংহ; ইন্দ্রজাল খালসা। জাতীয় বন্ধন দৃঢ় হইলে পাঠানদিগের স্বদেশেরও কিয়দংশ হিন্দুর হস্তগত হইল। শতদ্রুপারে সিংহনাদ শুনিয়া, নিভীক ইংরেজও কম্পিত হইল! ভাগ্যক্রমে ঐন্দ্রজালিক মরিল। পটুতর ঐন্দ্রজালিক ডালহৌসির হস্তে খালসা ইন্দ্রজাল ভাঙ্গিল। কিন্তু রামনগর এবং চিলিয়ানওয়ালী ইতিহাসে লেখা রহিল।

যদি কদাচিৎ কোন প্রদেশখণ্ড জাতিপ্রতিষ্ঠার উদয়ে এতদূর ঘটিয়াছিল, তবে সমুদায় ভারত একজাতীয় বন্ধনে বদ্ধ হইলে কি না হইতে পারিত?

ইংরেজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী। ইংরেজ আমাদিগকে নূতন কথা শিখাইতেছে। যাহা আমরা কখন জানিতাম না, তাহা জানাইতেছে; যাহা কখন দেখি নাই, শুনি নাই, বুঝি নাই, তাহা দেখাইতেছে, শুনাইতেছে, বুঝাইতেছে; যে পথে কখন চলি নাই, সে পথে কেমন করিয়া চলিতে হয়, তাহা দেখাইয়া দিতেছে। সেই সকল শিক্ষার মধ্যে অনেক শিক্ষা অমূল্য। যে

বিবিধ প্রবন্ধ—ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা

সকল অমূল্য রত্ন আমরা ইংরেজের চিত্তভাণ্ডার হইতে লাভ করিতেছি, তাহার মধ্যে দুইটির আমরা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম—স্বাভিন্দ্ৰ্যাপ্ৰয়তা এবং জাতিপ্ৰতিষ্ঠা।* ইহা কাহাকে বলে, তাহা হিন্দু জানিত না।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা

মানুষের এমন দুঃস্থ কখন হইতে পারে না যে, তাহাতে শুভ কিছুই দেখা যায় না। আমাদের গুরুতর দুঃভাগ্যেও কিছু না কিছু মঙ্গল খুঁজিয়া পাওয়া যায়। যে অশুভের মধ্যে শুভের অনুসন্ধান করিয়া তাহার আলোচনা করে, সেই বিজ্ঞ। দুঃখও যে কেবল দুঃখ নহে, দুঃখের দিনে এ কথার আলোচনায় কিছু সুখ আছে।

ভারতবর্ষ পূর্বে স্বাধীন ছিল—এখন অনেক শত বৎসর হইতে পরাধীন। নব্য ভারতবর্ষীয়েরা ইহা ঘোরতর দুঃখ মনে করেন। আমাদের ইচ্ছা যে, সেই প্রাচীন স্বাধীনতায় এবং আধুনিক পরাধীনতায় একবার তুলনা করিয়া দেখি। দেখি যে, দুঃখই বা কি, সুখ কি।

কিন্তু স্বাধীনতা ও পরাধীনতা, এই সকল কথার তাৎপৰ্য্য কি, তাহা একবার বিবেচনা করা আবশ্যিক হইতেছে। আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষের সঙ্গে আধুনিক ভারতবর্ষের তুলনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। তুলনার উদ্দেশ্য তারতম্য নির্দেশ। কিন্তু কোন্ বিষয়ের তারতম্য আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়? প্রাচীন ভারত স্বাধীন, আধুনিক ভারত পরাধীন, এ কথা বলিয়া কি উপকার? আমাদের বিবেচনায়, এরূপ তুলনায় একটি মাত্র উদ্দেশ্য এই হওয়া আবশ্যিক যে, প্রাচীন ভারতে মানুষ সুখী ছিল, কি আধুনিক ভারতবর্ষে অধিক সুখী?

এতক্ষণে অনেকে আমাদের প্রতি খড়াহস্ত হইয়াছেন। স্বাধীনতায় যে সুখ, তাহাতে সংশয় কি? যে সংশয় করে, সে পাষণ্ড, নরাধম, ইত্যাদি। স্বীকার করি। কিন্তু স্বাধীনতা পরাধীনতা অপেক্ষা কিসে ভাল, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে, ইহার সদুত্তর পাওয়া ভার।

বাল্গালি ইংরেজি পড়িয়া এ বিষয়ে দুইটি কথা শিখিয়াছেন—“Liberty” “Independence”, তাহার অনুবাদে আমরা স্বাধীনতা এবং স্বতন্ত্রতা দুইটি কথা পাইয়াছি। অনেকেরই মনে বোধ আছে যে, দুইটি শব্দে এক পদার্থকে বুঝায়। স্বজাতির শাসনাধীন অবস্থাকেই ইহা বুঝায়, এইটি সাধারণ প্রতীতি। রাজা যদি ভিন্নদেশীয় হইলে, তবে তাহার প্রজাগণ পরাধীন, এবং সেই রাজ্য পরতন্ত্র। এই হেতু, এক্ষণে ইংরেজের শাসনাধীন ভারতবর্ষকে পরাধীন ও পরতন্ত্র বলা গিয়া থাকে। এই জন্য মোগলদিগের শাসিত ভারতবর্ষকে বা সেরাজদ্দৌল্লাহর শাসিত বাঙ্গালাকে পরাধীন বা পরতন্ত্র বলা গিয়া থাকে। এইরূপ সংস্কারের সমূলকতা বিবেচনা করা যাউক।

মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে ইংরেজকন্যা বলা যাইতে পারে, কিন্তু তাহার পূর্বপুরুষ প্রথম বা দ্বিতীয় জর্জ ইংরেজ ছিলেন না। তাহার জার্মান। তৃতীয় উইলিয়াম ওলন্দাজ ছিলেন। বোনাপার্ট কসিকার ইতালীয় ছিলেন। স্পেনের ভূতপূর্ব প্রাচীন বুর্বোবংশীয় রাজারা ফরাশী ছিলেন। রোমসাম্রাজ্যের সিংহাসনে অনেক বর্বরজাতীয় সম্রাট্ আরোহণ করিয়াছিলেন। এইরূপ শত শত ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। দেখা যাইতেছে, এই সকল রাজ্যে তত্তদবস্থায় রাজা ভিন্নজাতীয় ছিলেন। ঐ সকল রাজ্য তৎকালে পরাধীন বা পরতন্ত্র ছিল, বলা যাইতে পারে কি না? কেহই বলিবেন না, বলা যাইতে পারে। যদি প্রথম জর্জ-শাসিত ইংলন্ডকে বা গ্রেজান-শাসিত রোমকে পরাধীন বলা না গেল, তবে শাহজাহা-শাসিত ভারতবর্ষকে বা আলীবর্দী-শাসিত বাঙ্গালাকে পরাধীন বলি কেন?

দেখা যাইতেছে যে, শাসনকর্তা ভিন্নজাতীয় হইলেই, রাজ্য পরতন্ত্র হইল না। পক্ষান্তরে, শাসনকর্তা স্বজাতীয় হইলেই রাজ্য যে স্বতন্ত্র হয় না, তাহারও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ওয়াশিংটনের কৃত যুদ্ধের পূর্বে আমেরিকার শাসনকর্তৃগণ স্বজাতীয় ছিল। উপনিবেশ মাত্রেই প্রথমাবস্থায় শাসনকর্তা স্বজাতীয় হইয়া থাকে, কিন্তু সে অবস্থায় উপনিবেশ সকলকে কদাচ স্বতন্ত্র বলা যায় না।

* এই প্রবন্ধে জাতি শব্দে Nationality বা Nation বুঝিতে হইবে।

বাংকম রচনাবলী

তবে পরতন্ত্র কাহাকে বলি ?

ইহা নিশ্চিত যে, ইংরেজের অধীন আধুনিক ভারত পরতন্ত্র রাজ্য বটে। রোমকাজিত, ব্রিটেন হইতে সিরিয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রসকল পরতন্ত্র ছিল বটে। আলজিয়াস বা জামেকা পরতন্ত্র রাজ্য বটে। কিসে এই সকল রাজ্য পরতন্ত্র? এ সকল এক একটি পৃথক রাজ্য নহে, ভিন্ন-দেশবাসী রাজার রাজ্যের অংশ মাত্র। ভারতেশ্বরী ভারতবর্ষে থাকেন না—ভারতবর্ষের রাজা ভারতবর্ষে নাই। অন্য দেশে। যে দেশের রাজা অন্য দেশের সিংহাসনারূঢ় এবং অন্যদেশবাসী, সেই দেশ পরতন্ত্র।

দুইটি রাজ্যের এক রাজা হইলে তাহার একটি পরতন্ত্র, একটি স্বতন্ত্র। যে দেশে রাজা বাস করেন, সেইটি স্বতন্ত্র, যে দেশে বাস করেন না, সেইটি পরতন্ত্র।

এইরূপ পরিভাষায় কতকগুলি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। ইংলণ্ডের প্রথম জেমস্, স্কটলণ্ড ও ইংলণ্ড দুই রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া, স্কটলণ্ড ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে বাস করিলেন। স্কটলণ্ড কি ইংলণ্ডকে রাজা দিয়া পরতন্ত্র হইল? বাবরশাহ, ভারত জয় করিয়া, দিল্লীতে সিংহাসন স্থাপনপূর্বক, তথা হইতে পৈতৃক রাজ্য শাসিত করিতে লাগিলেন—তাঁহার স্বদেশ কি ভারতবর্ষের অধীন হইল? প্রথম জর্জ ইংলণ্ডের সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া, তথায় অধিষ্ঠান করিয়া, পৈতৃক রাজ্য হানোবর শাসিত করিতে লাগিলেন;—হানোবর কি তখন পরতন্ত্র হইয়াছিল?

পরিভাষার অনুরোধে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, প্রথম জেমস্ বা প্রথম জর্জ বা প্রথম মোগলের পূর্বরাজ্যের পরতন্ত্রতা ঘটিয়াছিল। কিন্তু পরতন্ত্র্য ঘটিয়াছিল মাত্র, পরাধীনতা ঘটে নাই। আমরা Independence শব্দের পরিবর্তে স্বতন্ত্রতা, এবং Liberty শব্দের স্থানে স্বাধীনতা শব্দ এবং তত্তদভাব স্থানে তত্তদভাবসূচক শব্দ ব্যবহার করিতেছি।

তবে পরতন্ত্র্য এবং পরাধীনতায় প্রভেদ কি? অথবা, স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতায় প্রভেদ কি?

ইংলণ্ডে রাজনৈতিক স্বাধীনতার একটি বিশেষ প্রয়োগ প্রচলিত আছে, আমরা সে অর্থ অবলম্বন করিতে বাধ্য নহি। কেন না, সে অর্থ এই উপস্থিত বিচারের উপযোগী নহে। যে অর্থ ভারতবর্ষীয়েরা বুঝেন, আমরাও সেই অর্থ বুঝাইব।

ভিন্নদেশীয় লোক, কোন দেশে রাজা হইলে একটি অত্যাচার ঘটে। যাঁহারা রাজার স্বজাতি, দেশীয় লোকপেক্ষা তাঁহাদিগের প্রাধান্য ঘটে। তাহাতে প্রজা পরজাতিপীড়িত হয়। যেখানে দেশীয় প্রজা, এবং রাজার স্বজাতীয় প্রজার এইরূপ তারতম্য, সেই দেশকে পরাধীন বলিব। যে রাজ্য পরজাতিপীড়নশূন্য, তাহা স্বাধীন।

অতএব পরতন্ত্র রাজ্যকেও কখন স্বাধীন বলা যাইতে পারে। যথা, প্রথম জর্জের সময়ে হানোবর, মোগলদিগের সময়ে কাবুল। পক্ষান্তরে কখন স্বতন্ত্র রাজ্যকেও পরাধীন বলা যাইতে পারে; যথা, নর্ম্মানদিগের সময়ে ইংলণ্ড, ঔরঞ্জের সময়ে ভারতবর্ষ। আমরা কুতবউদ্দিনের অধীন উত্তর-ভারতবর্ষকে পরতন্ত্র ও পরাধীন বলি, আকবরের শাসিত ভারতবর্ষকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বলি।

সে যাহাই হউক, প্রাচীন ভারত স্বতন্ত্র ও স্বাধীন; আধুনিক ভারতবর্ষ পরতন্ত্র ও পরাধীন। প্রথমে স্বাতন্ত্র্য-পারতন্ত্র্যজন্য যে বৈষম্য ঘটিতেছে, তাহার আলোচনা করা যাউক—পশ্চাৎ স্বাধীনতা ও পরাধীনতার কথা বিবেচনা করা যাইবে। রাজা অন্যদেশবাসী হইলে দুইটি অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা; প্রথম, রাজা দূরে থাকিলে সুশাসনের বিঘ্ন হয়। দ্বিতীয়, রাজা যে দেশে অধিষ্ঠান করেন, সেই দেশের প্রতি তাঁহার অধিক আদর হয়, তাহার মঙ্গলার্থ দূরস্থ রাজ্যের অমঙ্গলও করিয়া থাকেন। এই দুইটি দোষ যে আধুনিক ভারতবর্ষে ঘটিতেছে না, এমত নহে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসন দিল্লী বা কলিকাতায় স্থাপিত হইলে, ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী উৎকৃষ্টতর হইত, তাহার সন্দেহ নাই; কেন না, যাহা রাজার নিকটবর্তী, তাহার প্রতি রাজপুরুষদিগের অধিক মনোযোগ হয়। দ্বিতীয় দোষটিও ঘটিতেছে। ইংলণ্ডের গৌরবার্থ আর্বিসনিয়ায় যুদ্ধ হইল, ব্যয়ের দায়ী ভারতবর্ষ। “হোমচার্জেস” বলিয়া যে ব্যয় বজেটভুক্ত হয়, তাহার মধ্যে অনেকগুলিই এইরূপ ইংলণ্ডের মঙ্গলের জন্য ভারতবর্ষের ক্ষতি স্বীকার। এইরূপ অনেক আছে।

বিবিধ প্রবন্ধ—ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা

রাজা দূরস্থিত বলিয়া আধুনিক ভারতবর্ষের সুশাসনের বিষয় ঘটে বটে, কিন্তু তেমন রাজা স্বেচ্ছাচারী বলিয়া সুশাসনের যে সকল বিষয় ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহা ঘটে না। কোন রাজা ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র,—অন্তঃপুরেই বাস করেন, রাজ্য দূর্দর্শাগ্রস্ত হইল। কোন রাজা নিষ্ঠুর, কোন রাজা অর্থগৃধ্রু। প্রাচীন ভারতবর্ষে এ সকলে গুরুতর ক্ষতি জন্মিত। আধুনিক ভারতবর্ষে দূরস্থিত রাজা বা রাজ্যীর কোন প্রকার দোষ ঘটিলে, তাহার ফল ভারতবর্ষে ফলিবার সম্ভাবনা নাই।

দ্বিতীয়, যেমন আধুনিক ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের মঙ্গলের জন্য ভারতবর্ষের মঙ্গল কখন কখন নষ্ট হয়, তেমন প্রাচীন ভারতে রাজার আত্মসুখের জন্য রাজ্যের মঙ্গল নষ্ট হইত। পৃথ্বীরাজ জয়চন্দ্রের কন্যা হরণ করিয়া আত্মসুখ বিধান করিলেন, তাহাতে উভয় মধ্যে সমরাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া, উভয়ের অপ্রীতি ও তেজোহানি ঘটিতে লাগিল। তন্নিবন্ধন উভয়েই মুসলমানের হস্তে পরিত হইলেন। আধুনিক ভারতবর্ষে দূরবাসী রাজার আত্মসুখের অনুরোধে কোন অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা নাই।

কিন্তু এটি কেবল পরতন্ত্রতা সম্বন্ধে উক্ত হইল, আমরা পরাধীনতা ও পরতন্ত্রতায় প্রভেদ করিয়াছি। ভারতবর্ষে ইংরেজের প্রাধান্য, এবং দেশীয় প্রজাসকল তাহাদিগের নিকট অবনত, তাহাদিগের সুখের জন্য কিয়দংশে যে ভারতবাসীদিগের সুখের লাঘব ঘটয়া থাকে, তাহা এ দেশীয় কোন লোকই অস্বীকার করিবেন না। এরূপ জাতির উপর জাতির প্রাধান্য প্রাচীন ভারতে ছিল না। ছিল না বটে, কিন্তু তত্তুল্য বর্ণপীড়ন ছিল। ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না যে, চিরকালই ভারতবর্ষের সাধারণ প্রজা শূদ্র; উৎকৃষ্ট বর্ণগ্রন্থ শূদ্রের তুলনায় অল্পসংখ্যক ছিলেন। সেই বর্ণগ্রন্থের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় দেশের শাসনকর্তা। কিন্তু এ সকল কথা একটু সবিস্তারে লেখা আবশ্যিক হইল।

লোকের বিশ্বাস আছে যে, প্রাচীন ভারতে কেবল ক্ষত্রিয়ই রাজা ছিলেন। বাস্তবিক তাহা নহে, রাজকার্য্য দুই অংশে বিভক্ত ছিল। যুদ্ধাদির ভার ক্ষত্রিয় জাতির প্রতি ছিল; রাজব্যবস্থা নিষ্পাচন, বিচার ইত্যাদি কার্য্যের ভার ব্রাহ্মণের উপর ছিল। এক্ষণে যেমন সিবিল ও মিলিটারি, এই দুই অংশে রাজকার্য্য বিভক্ত, তখনকার কৰ্ম্মভাগ কতকটা সেইরূপই ছিল। ব্রাহ্মণেরা সিবিল কৰ্ম্মচারী, ক্ষত্রিয়েরা মিলিটারি। এখনও যেমন মিলিটারি অপেক্ষা সিবিল কৰ্ম্মচারীদিগের প্রাধান্য, তখনও সেইরূপ ছিল; রাজপুরুষদিগের মধ্যে ক্ষত্রিয়েরাই রাজা নাম ধারণ করিতেন, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহাদিগের উপরেও ব্রাহ্মণের প্রাধান্য ছিল। প্রাচীন ভারতে ক্ষত্রিয়েরাই সর্ব্বদা রাজা ছিলেন, এমত নহে। বোধ হয়, আদ্যকালে ক্ষত্রিয়েরাই রাজা ছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধকালে মোর্য্য প্রভৃতি সংকরজাতীয় রাজবংশ দেখা যায়। চীনপরিব্রাজক হোয়েন্থ সাঙ সিন্ধুপারে ব্রাহ্মণ রাজা দেখিয়া গিয়াছিলেন। অন্যত্রও ব্রাহ্মণেরা রাজা নাম ধারণ করিয়াছিলেন। মধ্যকালে অধিকাংশ রাজাই রাজপুত্র। রাজপুত্রেরা ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত সংকরজাতি মাত্র। ক্ষত্রিয়দিগের প্রাধান্য, প্রাচীন ভারতে চিরকাল অপ্রতিহত ছিল না, ব্রাহ্মণদিগের গৌরব এক দিনের জন্য লঘু হয় নাই। বেদদেষ্টী বৌদ্ধদিগের সময়েও রাজকার্য্য ব্রাহ্মণদিগের হস্ত হইতে অন্য হস্তে যায় নাই—কেন না, তাহারা পণ্ডিত, সুশিক্ষিত, এবং কার্য্যক্ষম। অতএব প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণেরাই প্রকৃতরূপে রাজপুরুষপদে বাচ্য। সুবিজ্ঞ লেখক বাবু তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বেঙ্গল মাগাজিনে একটি প্রবন্ধে যথার্থই লিখিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মণেরাই প্রাচীন ভারতের ইংরেজ ছিলেন।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে, আধুনিক ভারতবর্ষে দেশী বিলাতিতে যে বৈষম্য, তাহা প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ শূদ্রের বৈষম্যের অপেক্ষা কি গুরুতর?

রাজা ভিন্নজাতীয় হইলে যে জাতিপীড়া জন্মে, তাহা দুই প্রকারে ঘটে। এক রাজব্যবস্থাজনিত; আইনে বিধি থাকে যে, রাজার স্বজাতীয়গণের পক্ষে এই এই রূপ ঘটিবেক, দেশীয় লোকের পক্ষে অন্য প্রকার ঘটিবেক। দ্বিতীয়, স্বজাতিপক্ষপাতী রাজার ইচ্ছাজনিত; রাজপ্রসাদ রাজা স্বজাতিকে দিয়া থাকেন এবং তিনি স্বজাতিপক্ষপাতী বলিয়া রাজ্যের কার্য্য স্বজাতিকেই নিযুক্ত করিয়া থাকেন। ইংরেজ-শাসিত ভারতে, এবং ব্রাহ্মণ-শাসিত ভারতে এই দুইটি দোষ কি প্রকার বর্তমান ছিল দেখা যাউক।

১ম। ইংরেজদিগের কৃত রাজব্যবস্থানুসারে, দেশী অপরাধীর জন্য এক বিচারালয়, বিলাতি

বিক্রম রচনাবলী

অপরাধীর জন্য অন্য বিচারালয়। দেশী লোক ইংরেজ কর্তৃক দণ্ডিত হইতে পারে, কিন্তু ইংরেজ দেশী বিচারক কর্তৃক দণ্ডিত হইতে পারে না। ইহা ভিন্ন ব্যবস্থাগত বৈষম্য আর বড় নাই। কিন্তু ইহা অপেক্ষা কত গুরুতর বৈষম্য ব্রাহ্মণরাজ্যে দেখা যায়! ইংরেজের জন্য পৃথক্ বিচারালয় হউক, কিন্তু আইন পৃথক্ নহে। যেমন একজন দেশীয় লোক ইংরেজ বধ করিলে বধার্হ, ইংরেজ দেশী লোককে বধ করিলে আইন অনুসারে সেইরূপ বধার্হ। কিন্তু ব্রাহ্মণরাজ্যে শূদ্রহস্তা ব্রাহ্মণের এবং ব্রাহ্মণহস্তা শূদ্রের দণ্ডের কত বৈষম্য! কে বলিবে, এ বিষয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষ হইতে আধুনিক ভারতবর্ষ নিকৃষ্ট?

ইংরেজের রাজ্যে যেমন ইংরেজ দেশী লোক কর্তৃক দণ্ডিত হইতে পারে না, প্রাচীন ভারতেও সেইরূপ ব্রাহ্মণ শূদ্র কর্তৃক দণ্ডিত হইতে পারিত না। বাবু দ্বারকানাথ মিত্র প্রধানতম বিচারালয়ে বসিয়া আধুনিক ভারতবর্ষের মূখোজ্জ্বল করিয়াছেন—“রামরাজ্যে” তিনি কোথা থাকিতেন?

২য়। ইংরেজের রাজ্যে রাজপ্রসাদ প্রায় ইংরেজেরই প্রাপ্য, কিন্তু কিয়ৎপরিমাণে দেশীয়েরাও উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত। ব্রাহ্মণরাজ্যে শূদ্রদিগের ততটা ঘটিত কি না সন্দেহ। কিন্তু যখন শূদ্র, কখন কখন রাজসিংহাসনারোহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তখন অন্যান্য উচ্চ পদও যে শূদ্রেরা সময়ে সময়ে অধিকৃত করিত, তাহার সন্দেহ নাই। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, আধুনিক ভারতে প্রাথমিক বিচারকার্য প্রায় দেশীয় লোকের দ্বারাই হইয়া থাকে,—প্রাচীন ভারতে কি প্রাথমিক বিচারকার্য শূদ্রের দ্বারা হইত? আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এত অল্পই জানি যে, এ কথা স্থির বলিতে পারি না। অনেক বিচারকার্য গ্রাম্য সমাজের দ্বারা নিষ্পাহ হইত বোধ হয়। কিন্তু সাধারণতঃ কি বিচার, কি সৈন্যপত্য, কি অন্যান্য প্রধান পদসকল যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের হস্তে ছিল, তাহা প্রাচীন গ্রন্থাদি পাঠে বোধ হয়।

অনেকেই বলিবেন, ইংরেজের প্রাধান্য এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্যে সাদৃশ্য কম্পনা সূক্ষ্মকম্পনা নহে; কেন না, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্রপীড়ক হইলেও স্বজাতি—ইংরেজেরা ভিন্ন জাতি। ইহার এইরূপ উত্তর দিতে ইচ্ছা করে যে, যে পীড়িত হয়, তাহার পক্ষে স্বজাতির পীড়ন ও ভিন্ন জাতির পীড়ন, উভয়ই সমান। স্বজাতীয়ের হস্তে পীড়া কিছু মিষ্ট, পরজাতীয়ের কৃত পীড়া কিছু তিক্ত লাগে, এমত বোধ হয় না। কিন্তু আমরা সে উত্তর দিতে চাহি না। যদি স্বজাতীয়ের কৃত পীড়ায় কাহারও প্রীতি থাকে, তাহাতে আমরা দিগের আপত্তি নাই। আমরা দিগের এইমাত্র বলিবার উদ্দেশ্য যে, আধুনিক ভারতের জাতিপ্রাধান্যের স্থানে প্রাচীন ভারতে বর্ণপ্রাধান্য ছিল। অধিকাংশ লোকের পক্ষে উভয়ই সমান।

তবে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, পরাধীন ভারতবর্ষে উচ্চশ্রেণীস্থ লোকে স্বীয় বুদ্ধি, শিক্ষা, বংশ, এবং মর্যাদানুসারে প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন না। যাহার বিদ্যা এবং বুদ্ধি আছে, তাহাকে যদি বুদ্ধিসম্ভালনের এবং বিদ্যার ফলোৎপত্তির স্থল না দেওয়া যায়, তবে তাহার প্রতি গুরুতর অত্যাচার করা হয়। আধুনিক ভারতবর্ষে এরূপ ঘটতেছে। প্রাচীন ভারতবর্ষে, বর্ণবৈষম্য গুণে তাহাও ছিল, কিন্তু এ পরিমাণে ছিল না। আর এক্ষণে রাজকার্যাদি সকল ইংরেজের হস্তে—আমরা পরহস্তরক্ষিত বলিয়া নিজে কোন কার্য করিতে পারিতেছি না। তাহাতে আমরা দিগের রাজ্যরক্ষা ও রাজ্যপালনবিদ্যা শিক্ষা হইতেছে না—জাতীয় গুণের স্ফূর্তি হইতেছে না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, পরাধীনতা এদিকে উন্নতিরোধক। তেমন আমরা ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানে শিক্ষালাভ করিতেছি। ইউরোপীয় জাতির অধীন না হইলে আমরা দিগের কপালে এ সুখ ঘটিত না। অতএব আমরা দিগের পরাধীনতায় যেমন এক দিকে ক্ষতি, তেমন আর এক দিকে উন্নতি হইতেছে।

অতএব ইহাই বুঝা যায় যে, আধুনিক অপেক্ষা প্রাচীন ভারতবর্ষে উচ্চ শ্রেণীর লোকের স্বাধীনতাজনিত কিছু সুখ ছিল। কিন্তু অধিকাংশ লোকের পক্ষে প্রায় দুই তুল্য, বরং আধুনিক ভারতবর্ষ ভাল।

তুলনায় আমরা যাহা পাইলাম, তাহা সংক্ষেপে পুনরুক্ত করিতেছি, অনেকের বুদ্ধিব্যবহার সুবিধা হইবে।

১। ভিন্নজাতীয় রাজা হইলেই রাজ্য পরতন্ত্র বা পরাধীন হইল না।

ভিন্নজাতীয় রাজার অধীন রাজ্যকেও স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বলা যাইতে পারে।

বিবিধ প্রবন্ধ—প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি

২। স্বতন্ত্রতা ও স্বাধীনতা, পরতন্ত্রতা ও পরাধীনতা, ইহার আমরা ভিন্ন ভিন্ন পারিভাষিক অর্থ নির্দেশ করিয়াছি।

বিদেশনিবাসী রাজশাসিত রাজ্য পরতন্ত্র। যেখানে ভিন্ন জাতির প্রাধান্য, সেই রাজ্য পরাধীন। অতএব কোন রাজ্য পরতন্ত্র অথচ পরাধীন নহে। কোন রাজ্য স্বতন্ত্র অথচ স্বাধীন নহে। কোন রাজ্য পরতন্ত্র এবং পরাধীন।

৩। কিন্তু তুলনার উদ্দেশ্য উৎকর্ষাপকর্ষ। যে রাজ্যে লোক সুখী, তাহাই উৎকৃষ্ট, যে রাজ্যে লোক দুঃখী, তাহাই অপকৃষ্ট। স্বাতন্ত্র্য ও পরাধীনতায় আধুনিক ভারতে প্রজা কি পরিমাণে দুঃখী, তাহাই বিবেচ্য।

৪। প্রথমতঃ স্বাতন্ত্র্য ও পরতন্ত্র্য। ইহার অন্তর্গত দুইটি তত্ত্ব। প্রথম, রাজা বিদেশস্থিত বলিয়া ভারতবর্ষের সুশাসনের বিঘ্ন হইতেছে কি না? স্বদেশের মঙ্গলার্থ শাসনকর্তৃগণ এদেশের অমঙ্গল ঘটাইয়া থাকেন কি না? স্বীকার করিতে হইবে যে, তত্ত্বৎকারণে সুশাসনের বিঘ্ন ঘটিতেছে বটে এবং ভারতবর্ষে অমঙ্গল ঘটিতেছে বটে।

কিন্তু রাজার চরিত্রদোষে যে সকল অনিষ্ট ঘটিত, আধুনিক ভারতবর্ষে তাহা ঘটে না। অতএব প্রাচীন বা আধুনিক ভারতবর্ষে এ সম্বন্ধে বিশেষ তারতম্য লক্ষিত হয় না।

৫। দ্বিতীয়তঃ স্বাধীনতা ও পরাধীনতা। আধুনিক ভারতবর্ষ প্রভুগণপীড়িত বটে, কিন্তু প্রাচীন ভারতও বড় ব্রাহ্মণপীড়িত ছিল। সে বিষয়ে বড় ইতরবিশেষ নাই। তবে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের একটু সুখ ছিল।

৬। আধুনিক ভারতে কার্যগত জাতীয় শিক্ষা লোপ হইতেছে, কিন্তু বিজ্ঞান ও সাহিত্য-চর্চার অপূর্ব স্ফূর্তি হইতেছে।

অনেকে রাগ করিয়া বলিবেন, তবে কি স্বাধীনতা পরাধীনতা তুল্য? তবে পৃথিবীর তাবজ্জাতি স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ করে কেন? যাঁহারা এরূপ বলিবেন, তাঁহাদের নিকট আমাদের এই নিবেদন যে, আমরা সে তত্ত্বের মীমাংসায় প্রবৃত্ত নহি। আমরা পরাধীন জাতি—অনেক কাল পরাধীন থাকিব—সে মীমাংসায় আমাদের প্রয়োজন নাই। আমাদের কেবল ইহাই উদ্দেশ্য যে, প্রাচীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার হেতু তদ্বাসিগণ সাধারণতঃ আধুনিক ভারতীয় প্রজাদিগের অপেক্ষা সুখী ছিল কি না? আমরা এই মীমাংসা করিয়াছি যে, আধুনিক ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীস্থ লোকের অবনতি ঘটিয়াছে, শূদ্র অর্থাৎ সাধারণ প্রজার একটু উন্নতি ঘটিয়াছে।

প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি

নারদবাক্য

মহাভারতের সভাপর্বে দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্নচ্ছলে কতকগুলি রাজনৈতিক উপদেশ দিয়াছেন। প্রাচীন ভারতে রাজনীতি কত দূর উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, উহা তাহার পরিচয়। মুসলমানদিগের অপেক্ষা হিন্দুরা যে রাজনীতিতে বিজ্ঞতর ছিলেন, উহা পাঠ করিলে সংশয় থাকে না। প্রাচীন রোমক এবং আধুনিক ইউরোপীয়গণ ভিন্ন আর কোন জাতি তাদৃশ উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষীয় রাজারা যে অন্যান্য সকল জাতির অপেক্ষা অধিক কাল আপনাদিগের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন, এই রাজনীতিজ্ঞতা তাহার এক কারণ। হিন্দুদিগের ইতিবৃত্ত নাই; এক একটি শাসনকর্তার গুণগান করিয়া শত শত পৃষ্ঠা লিখিবার উপায় নাই। কিন্তু তাঁহাদিগের কৃত কার্যের যে কিছু পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতেই অনেক কথা বলা যাইতে পারে। চন্দ্রগুপ্ত মোর্ঘ্যের সহিত পৃথিবীর যে কোন রাজপুরুষের তুলনা করা যায়। চন্দ্রগুপ্ত আলেকজান্ডরের বিজিত ভারতংশের পুনরুদ্ধার করিয়া, তক্ষশিলা হইতে তাম্রলিপ্ত পর্যন্ত সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিয়া, মহতী কীর্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন। ভুবনবিখ্যাত যবনরাজাধিরাজ সিলিউকসকে লাঘব স্বীকার করাইয়া তাঁহার কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। (হিন্দু হইয়া ঠিক বিবাহ করিয়াছিলেন, এমনও বোধ হয় না।) ইতিহাসে তিন জন সাম্রাজ্য-নির্মাতা বিশেষ পরিচিত—শালমান, দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক, প্রথম পিটার। আলেকজান্ডর,

বাংকম রচনাবলী

নাপোলিয়ন বা ক্রম্বেল সে শ্রেণীমধ্যে আসন পান নাই; কেন না, তাঁহাদের কীর্তি তাঁহাদের মৃত্যু পর্যন্ত স্থায়ী বা তাহাও নহে। গজনবী মহম্মদের প্রায় সেইরূপ। আরবসাম্রাজ্য ও মোগল-সাম্রাজ্য এক এক জনের নিৰ্মিত নহে। কিন্তু মগধসাম্রাজ্য একা চন্দ্রগুপ্তের নিৰ্মিত। এবং পদ্রুমানক্রমে স্থায়ী বটে। তিনি শালমান, ফ্রেডেরিক ও পিটারের সঙ্গে উচ্চাসনে বসিতে পারেন।

নারদের যে উপদেশবাক্যের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে এমত তত্ত্ব অনেক আছে যে, রাজনীতিবিদগণ ইংরেজেরও তাহা গ্রহণ করিয়া তদনুসারে চলিলে, তাঁহাদিগের উপকার হয়। এমত কদাচ বক্তব্য নহে যে, হিন্দুরা এই সকল নৈতিক উক্তি অনুসারী হইয়া সর্বত্র সর্ব-প্রকারে চলিতেন। কিন্তু ঐদৃশ নৈতিক তত্ত্ব যে তাঁহাদিগের দ্বারা উদ্ভূত হইয়াছিল, ইহা অল্প প্রশংসার কথা নহে। যেখানে উদ্ভূত হইয়াছিল, সেখানে যে উহা কিয়দংশে কার্যে পরিণত হইয়াছিল, তাঁদ্বয়ে সংশয় করা অনায়াস। প্রাচীন ভারতবর্ষে রাজনীতির কত দূর উন্নতি হইয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে ক্ষতি নাই। এ জন্য আমরা উল্লিখিত নারদবাক্য হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিব। ঐ কথা পাঠকেরা অনেকেই পড়িয়াছেন, তথাপি উহার পুনঃপাঠে কষ্ট বোধ হইবে, এমন বিবেচনা হয় না।

নারদ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “মহারাজ! কৃষি, বাণিজ্য, দুর্গসংস্কার, সেতুনিৰ্মাণ, আয়ব্যয় শ্রবণ, পৌরকার্য দর্শন ও জনপদ পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি অষ্টবিধ রাজকার্য ত সম্যক্ প্রকারে সম্পাদিত হয়?*** নিঃশঙ্কচিত্ত কপট দূতগণ ত তোমার বা তোমার অমাত্যদিগের গুঢ় মন্ত্রণাসকল ভেদ করিতে পারে না? মিত্র, উদাসীন ও শত্রুদিগের অভিসন্ধি সমস্ত আপনি ত বুঝিয়া থাকেন? যথাকালে সন্ধিস্থাপনে ও বিগ্রহবিধানে প্রবৃত্ত হইবেন? উদাসীন ও মধ্যমের প্রতি ত মাধ্যস্থ ভাব অবলম্বন করিয়া থাকেন? আত্মানুরূপ, বৃদ্ধ, বিশুদ্ধস্বভাব, সম্বোধনক্ষম, সংকুলজাত, অনুরক্ত ব্যক্তিগণ মন্ত্রিপদে ত অভিষিক্ত হইয়া থাকেন?”

সর জর্জ কাম্বেল সাহেব “আত্মানুরূপ” ব্যক্তিকে স্বীয় মন্ত্রিত্বে বরণ করিয়াছেন বলিয়া দেশের লোক তাঁহার উপর রাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বলিতে পারিতেন যে, নারদবাক্য আমার পক্ষে। আধুনিক ভারতীয় শাসনকর্তাদিগের দূরদৃষ্ট এই যে, বৃদ্ধ মন্ত্রী তাঁহাদিগের কপালে প্রায় ঘটে না। কিন্তু ইউরোপে নারদীয় বাক্য প্রতিপালিত হইয়া থাকে—বিস্মার্ক, গ্লাডষ্টোন, ডিস্ট্রেলি, টায়র প্রভৃতি উদাহরণ। পরে,—

“একাকী বা বহুজনপরিবৃত্ত হইয়া ত মন্ত্রণা করেন না? মন্ত্র ত জনপদমধ্যে অপ্রচলিত থাকে?”

ইংরেজেরা এই নীতির বশবর্তী হইয়া কার্য করেন, কেবল অতিরিক্ত এই বলেন যে, “মন্ত্রণাবিশেষ জনপদমধ্যে প্রচার হওয়াই ভাল। অতএব সেইগুলি বাছিয়া বাছিয়া গেজেটে ছাপাই।” পরে—

“স্বল্পপায়াসসাধ্য মহোদয় বিষয় সকল ত শীঘ্রই সম্পন্ন করিয়া থাকেন?”

আমাদিগের অনুরোধ যে, প্রাচীন ঋষির এই বাক্য ইংরেজেরা স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া কার্যালয়ে প্রকটিত করুন। তৎপরে,—

“কৃষীবলেরা আপনার পরোক্ষে প্রকৃত ব্যবহার করিয়া থাকে? কারণ, প্রভুর প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ না থাকিলে এরূপ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব সন্দেহ নাই।”

বিলাতী শাসনকর্তা কিম্বা তাঁহাদিগের দেশী সমালোচক, কেহই অদ্যাপি এ কথার সারবত্তা অনুভূত করিতে সক্ষম হইলেন না। তৎপরে—

“অনারদ্ধ কার্যের পরীক্ষার্থে ধর্মজ্ঞ শাস্ত্রকোবিদ বিচক্ষণ পরীক্ষকসকল ত নিযুক্ত করিয়া থাকেন?”

ইংরেজেরা এই কথার সম্যক্ প্রকারে অনুবর্তী। সকল কার্যের পূর্বেই কর্মিট নিযুক্ত হইয়া থাকে। সকল কার্য করিবার পূর্বে ইংরেজেরা এক একটা কর্মিট নিযুক্ত করেন কেন? এ কথা যিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, তাঁহাকে দেয় উত্তর উল্লিখিত নারদবাক্যে আছে। তৎপরে—

“সহস্র মূর্খ বিনিময় দ্বারা এক জন পণ্ডিতকে ত ক্রয় করিয়া থাকেন?”

আমরা এই কথাটির অনুমোদন করি না। মূর্খের দ্বারাই পৃথিবীর কার্য নিৰ্বাহ হইতেছে—পণ্ডিত কোন্ কাজে লাগে? মিল পার্লামেন্টে কৃতকার্য হইতে পারিলেন না,—ওয়েস্ট-মিনস্টার কতৃক পরিত্যক্ত হইলেন। লাঙ্গাসকে বোনাপার্টি পণ্ডিত দেখিয়া উচ্চ পদে অভিষিক্ত

বিবিধ প্রবন্ধ—প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি

করিয়াছিলেন—কিন্তু লাপ্লাস কার্য সম্পাদনে অক্ষম হইয়া দুরীভূত হইলেন। প্রবাদ আছে, একজন ভট্টাচার্য্য বক্ষ্যা ভার্য্যার বিনিময়ে দুঃখবতী গো লইয়া আসিয়াছিলেন। সেইরূপ রাজপুরুষেরা অপ্রিয়বাদী, আত্মতত্ত্ব, পণ্ডিতের বিনিময়ে আঞ্জাকারী মূর্খই গ্রহণ করিয়া থাকেন। নারদ বলিয়াছেন বটে যে, “কোন প্রকার বিপদ উপস্থিত হইলে পণ্ডিত ব্যক্তি অনায়াসে তাহার প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হইবেন।” এ কথা সত্য বটে, অতএব বিপদকালে পণ্ডিতের আশ্রয় লইবে। সুখের দিনে মূর্খ;—দুঃখের দিনে পণ্ডিত।

পরে নারদ বলিতেছেন, “দুর্গসকল ত ধন ধান্য উদকযন্ত্রে পরিপূর্ণ রাখিয়াছেন। তথায় শিল্পীগণ ও ধনুর্কার পুরুষসকল ত সর্বদা সতর্কতাপূর্ব্বক কালযাপন করে?”

মিউর্টিনের পূর্ব্ব ইংরেজেরা যদি এই কথা স্মরণ রাখিতেন, তবে তাদৃশ বিপদ ঘটিত না। সর হেনারি লরেন্স এই কথা বুঝিতেন বলিয়া লক্ষ্মীর রেসিডেন্সির রক্ষা হইয়াছিল।

“প্রচণ্ড দণ্ডবিধান দ্বারা প্রজাদিগকে ত অত্যন্ত উদ্বেজিত করেন না?”

ইউরোপীয়েরা অতি অল্পকাল হইল, এ কথা শিখিয়াছেন। এক পয়সা চুরীর জন্য প্রাণদণ্ড প্রভৃতি প্রচণ্ড দণ্ড, অতি অল্পকাল হইল, ইংলণ্ড হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে।

“নির্দিষ্ট সময়ে সেনাদিগের বেতনাদি প্রদানে ত বিমুখ হইলেন না? তাহা হইলে সুচারুরূপে কার্য্য নিব্বাহ হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত তাহাদিগের দ্বারা পদে পদে অনিষ্ট ঘটনা ও বিদ্রোহের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়া উঠে।”

এই নীতির বিপরীতাচরণ কার্থেজ রাজ্য লোপের মূল। একা রোম কার্থেজ ধ্বংস করে নাই।

“সৎকুলজাত প্রধান প্রধান লোক ত তোমার প্রতি অনুরক্ত রহিয়াছে? তাহারা ত তোমার নিমিত্ত রণক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও সম্মত আছে?”

এই নীতির অবজ্ঞায় ষ্টুয়ার্ট বংশ নষ্ট হইল। ভারতবর্ষীয় ইংরেজ রাজপুরুষেরা ইহা বিলক্ষণ বুঝেন। বুঝিয়া, কর্ণওয়ালিশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন ও কানিং ভারতীয় রাজগণকে পোষ্যপুত্র লইতে অনুমতি দিয়াছেন। লর্ড লিটন আর কিছু করিতে না পারিয়া উপাধি বিতরণ করিয়াছেন।

পরে নারদ পেনশ্যান দেওয়ার পরামর্শ দিতেছেন,

“মহারাজ! যাহারা কেবল আপনার উপকারের নিমিত্ত কালকবলে নিপতিত ও যৎপরোনাস্তি দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, তাহাদিগের পুত্র কলত্র প্রভৃতিকে ত ভরণপোষণ করিতেছেন?”

ক্ষিপ্ৰকারিতার বিষয়ে—

“শত্রুকে ব্যসনাসক্ত দেখিয়া স্বীয় মন্ত্র, কোষ ও ভৃত্য, ত্রিবিধ বল সম্যক্ বিবেচনা করিয়া, অবিলম্বে তাহাকে ত আক্রমণ করেন?”

অতি প্রধান রাজ্যাধ্যক্ষেরা এ তত্ত্ব সম্যক্ বুঝিয়াছিলেন। “অবিলম্বে” কাহাকে বলে, প্রথম নাপোলিয়ন বুঝিতেন। তাহার রণজয় সেই বুদ্ধির ফল। তৃতীয় নাপোলিয়ন “অবিলম্বে” প্রুসীয়দিগকে আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রথম নাপোলিয়নের মত “মন্ত্র, কোষ ও ভৃত্য” ত্রিবিধ বলের সম্যক্ বিচার না করিয়াই আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি নারদবাক্যে অবহেলা করিয়া নষ্ট হইলেন।

পরে সমদৃষ্টি পক্ষে,—

“যেমন পিতা মাতা সকল সন্তানকে সমান স্নেহ করেন, তদ্রূপ আপনি ত সমদৃষ্টিতে সমুদ্র-মেখলা সমুদয় পৃথিবী অবলোকন করিতেছেন?”

ইংরেজেরা ভারতবর্ষে এই নারদীয় বাক্য মনোযোগপূর্ব্বক অধ্যয়ন করুন।

নিম্নলিখিত কথাটি বিস্মার্কের যোগ্য:—

“সৈন্যাদিগের ব্যবসায় ও জয়লাভসামর্থ্য বুঝিয়া, তাহাদিগকে ত অগ্রিম বেতন প্রদানপূর্ব্বক উপযুক্ত সময়ে যাত্রা করিয়া থাকেন?”

নিম্নলিখিত কথাটির আমরা অনুমোদন করি না, কিন্তু চতুর্দশ লুই শুনিলে অনুমোদন করিতেন,—

“পরস্পরের ভেদ উপস্থিত করিবার নিমিত্ত শত্রুপক্ষীয় প্রধান প্রধান সৈন্যাদিগকে ত যথাযোগ্য ধনদান করেন?”

বিক্রম রচনাবলী

নিম্নলিখিত কথাগুলি গ্রেগরি বা ইগ্নেশ্যাস লয়লার যোগ্য—

“স্বয়ং জিতেন্দ্রিয় হইয়া আত্মপরাজয়পূর্বক, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র প্রমত্ত বিপক্ষদিগকে ত পরাজয় করিতেছেন?”

পরে—

“বিপক্ষের রাজ্য আক্রমণকালে আপন অধিকার ত দৃঢ়রূপে সুরক্ষিত করেন?”

পৃথিবীতে যত সৈনিক জন্মিয়াছেন, তন্মধ্যে হানিবল একজন অত্যাৎকৃষ্ট। কিন্তু তিনি এই কথা বিস্মৃত হওয়াতে সব হারাইয়াছিলেন। তিনি যখন ইতালিতে অনিবার্য, সিপিও তখন আফ্রিকাতে সৈন্য লইয়া গিয়া তাহার কৃত রণজয়সকল বিফল করিয়াছিলেন।

“এবং তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া পুনর্বার স্ব স্ব পদে ত প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন?”

রোমকেরা ইহা করিতেন, এবং ভারতবর্ষে ইংরেজেরা ইহা করেন। এই জন্য এতদুভয় সাম্রাজ্য ঈদৃশ বিস্তার লাভ করিয়াছে।

নিম্নলিখিত তিনটি বাক্যে সমুদায় রাজকার্য নিঃশেষে বর্ণিত হইয়াছে—

“আপনি ত আভ্যন্তরিক ও বাহ্য জনগণ হইতে আপনাকে, আত্মীয় লোক হইতে তাহাদিগকে, এবং পরস্পর হইতে পরস্পরকে রক্ষা করিয়া থাকেন?”

তাহার পর বজেট ও এন্টিমেটের কথা—

“আয়ব্যয়নিযুক্ত গণক ও লেখকবর্গ আপনার আয়সকল পূর্বাহ্নে ত নিরূপণ করিতেছে?”
আমরা জানিতাম, এটি ভারতবর্ষে উইলসন সাহেবের সৃষ্টি; কিন্তু তাহা নহে।

পরে—

“রাজ্যস্থ কৃষকেরা ত সন্তুষ্টিচিন্তে কালযাপন করিতেছে?”

এই কথা নারদ যেমন যুর্ধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমরা তেমনি ভারতবর্ষীয় রাজপ্রতিনিধিকে জিজ্ঞাসা করি।

অনেকের বোধ আছে, “ইরিগেশ্যান ডিপার্টমেন্ট”টি ভারতবর্ষে একটি নূতন কাণ্ড দেখাইতেছে। তাহা নহে। নারদ বলিতেছেন—

“রাজ্যমধ্যে স্থানে স্থানে সালিলপূর্ণ বৃহৎ বৃহৎ তড়াগ ও সরোবরসকল ত নিখাত হইয়াছে? কৃষিকার্য ত বৃষ্টিরনিরপেক্ষ হইয়া সম্পন্ন হইতেছে?”

এ কথা ইংরেজদিগের মনে থাকিলে উড়িয়াদিতে দুর্ভিক্ষ ঘটিত না।

নিম্নলিখিত বাক্যটির প্রতি ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট মনোযোগ করিলে আমাদিগের বিবেচনায় ভাল হয়।

“কৃষকদিগের গৃহে বীজ ও অন্নাদির ত অসম্ভাব নাই? আবশ্যিক হইলে ত পাদিক বৃদ্ধিতে অননুগ্রহস্বরূপ শতসংখ্যক ঋণ দান করিয়া থাকেন?”

এক্ষণে এই নিয়মের অভাবে এ দেশের কৃষকেরা মহাজনের নিকট বিক্রীত। মহাজনের নিকটেও সকলে সকল সময়ে পায় না—অনেকেই অন্নাভাবে শীর্ণ—বীজাভাবে ভরসাশূন্য। যে পায়, সেও দ্বিপাদ বৃদ্ধিতে নহিলে পায় না। অনেকে বলিবেন যে, যে অর্থশাস্ত্র অনবগত, সেই রাজাকে মহাজনি করিতে পরামর্শ দিবে—রাজার ব্যবসায়, সমাজের অনিষ্টকারক। অর্থশাস্ত্রঘটিত যে আপত্তি, তাহা আমরা অবগত আছি এবং মহাভারতকারও অবগত ছিলেন। এই জনাই নারদের ঐ বাক্যমধ্যেই তিনটি গুরুতর নিয়ম সন্নিবিষ্ট আছে। প্রথম—“আবশ্যিক হইলে” ঋণ দিতে বলিতেছেন—ইহার অর্থ যে, যাহাকে না দিলে চলে না, তাহাকেই দিবেন। অতএব যে মহাজনের নিকট ঋণ পাইতে পারিবে, তাহাকে ঋণ দেওয়া এই কথায় প্রতিষেক হইল। সুতরাং রাজা ব্যবসায়ী হইলেন না। যাহাকে রাজা না দিলে সে দুর্দর্শাগ্রস্ত হইবে, তাহাকেই দিবেন। দ্বিতীয়তঃ “অননুগ্রহস্বরূপ” দিবেন—অর্থাৎ ব্যবসায়ীর ন্যায় লাভাঙ্কায় দিবেন না। তবে পাদিক বৃদ্ধির কথা কেন? এ নিয়ম না করিলে যে সে নিঃপ্রয়োজনেও ঋণ লইবার সম্ভাবনা—বণ্ডক জাতি সর্বগ্রহই আছে। আর ঋণ দিলেই কতক আদায় হয়, কতক আদায় হয় না। যদি বৃদ্ধির নিয়ম না থাকে, তবে রাজাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। ক্ষতি স্বীকার করিয়া রাজকোষ হইতে ঋণ দিতে হইলে রাজ্য চলা ভার। তৃতীয়তঃ “শতসংখ্যক” ঋণ দিবে—ইহার উদ্ধার দিবে না—অর্থাৎ প্রজার জীবননির্ব্বাহার্থে যে পর্য্যন্ত প্রয়োজন, তাহাই রাজা ঋণস্বরূপ

বিবিধ প্রবন্ধ—প্রাচীনা এবং নবীনা

দিতে পারেন। ততোধিক ঋণদান ব্যবসায়ীর কাজ। এই তিনটি নিয়মের দ্বারা অর্থশাস্ত্র-বেত্তাদিগের আপত্তির মীমাংসা হইতেছে। প্রাচীন হিন্দুরা অর্থশাস্ত্র বিলক্ষণ বুদ্ধিতেন।

নিম্নোক্ত নীতি, ইংরেজেরা এ পর্যন্ত শিখিলেন না। না শিখাতে তাহাদিগের ক্ষতি হইতেছে;—

“হে মহারাজ! যথাকালে গাত্রোথানপূর্বক বেশভূষা সমাধান করিয়া, কালজ্ঞ মন্ত্রিগণে পরিবৃত্ত হইয়া, দর্শনাথী প্রজাগণকে ত দর্শন প্রদান করেন?”

যে রাজাকে প্রজাগণ কখন দেখিতে পায় না—তাহার প্রতি প্রজাদিগের অনুরাগ সঞ্চার হয় না; বিশেষতঃ এদেশের লোকের স্বভাব এই। আর রাজদর্শন প্রজাগণের দুর্লভ হইলে, তাহাদিগের সকলপ্রকার দুঃখ ও প্রকৃত অবস্থা রাজা বা রাজপুরুষেরা কখন জানিতে পারেন না।

হিন্দুরাজাদিগের ন্যায় মুসলমানেরাও এ কথা বুদ্ধিতেন। এখন যেখানে সম্বৎসরে একটা দরবার বা “লেবী” হয়, সেখানে হিন্দু ও মুসলমানদিগের প্রাত্যহিক দরবার হইত।

পরে,—

“দুর্বল শত্রুকে ত বলপ্রকাশপূর্বক সাতিশয় পীড়িত করেন না?”

তাহা হইলে দুর্বল শত্রুও বলবান্ হইয়া উঠে। এই দোষে স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপ “নিম্নদেশ” অর্থাৎ হলান্ড হইতে বহিস্কৃত হইয়াছিলেন। ইংলন্ড যে আমেরিক উপনিবেশ হইতে বহিস্কৃত হইয়াছিলেন, তাহারও কারণ প্রায় এইরূপ।

তৎপরে,

“দুষ্ট অহিতকারী কদর্যস্বভাব দণ্ডাহ তস্কর লোপ্তসহ গৃহীত হইয়াও তাহাদিগের নিকটে ত ক্ষমা লাভ করিয়া থাকে না?”

যে দেশে জুরির বিচার আছে, সে দেশের রাজপুরুষদিগকে আমরাও এ কথা জিজ্ঞাসা করি।

নারদ যে চতুর্দশ রাজদোষ কীর্তন করিয়াছেন, তাহাও শ্রবণযোগ্য,—যথা,

“নাস্তিক্য, অন্ত, ক্রোধ, প্রমাদ, দীর্ঘসূত্রতা, জ্ঞানবান্ ব্যক্তিদিগের সাক্ষাৎকার ত্যাগ, আলস্য, চিত্তচাপল্য, নিরন্তর অর্থচিন্তা, অনর্থক ব্যক্তির সহিত পরামর্শ, নিশ্চিত বিষয়ের অনারম্ভ, মন্ত্রণার অপরিরক্ষণ, মঙ্গল কার্যের অপয়োগ ও প্রত্যাখ্যান, এই চতুর্দশ রাজদোষ।”

আর একটি বাক্যমাত্র উদ্ধৃত করিয়া আমরা নিরন্ত হইব—

অন্ধ, মূক, পঙ্গু, বিকলাঙ্গ, বন্ধুবিহীন, প্রব্রজিত ব্যক্তিদিগকে ত পিতার ন্যায় প্রতিপালন করেন?”

এই প্রকার সারবান্ এবং একালেও আদরণীয় কথা আরও অনেক আছে।

প্রাচীনা এবং নবীনা

আমাদিগের সমাজসংস্কারকেরা নূতন কীর্তি স্থাপনে যাদৃশ ব্যগ্র, সমাজের গতি পর্যবেক্ষণায় তাদৃশ মনোযোগী নহেন। “এই হইলে ভাল হয়, অতএব এই কর,” ইহাই তাহাদিগের উক্তি, কিন্তু কি করিতে কি হইতেছে, তাহা কেহ দেখেন না। বাঙ্গালিরা যে ইংরেজি শিখে, ইহাতে সকলেরই উৎসাহ। কিন্তু ইহার ফল কি, তাহার সমালোচনা কেবল আজিকালি হইতেছে। এক শ্রেণীর লোক বলেন, ইহার ফল মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতি; দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক বলেন, দুই একটি ফল সুপুরু এবং সুমধুর বটে, কিন্তু অধিকাংশ তিস্ত ও বিষময়; উদাহরণ—মাতালের দল এবং সাধারণ বাঙ্গালি লেখকের পাল। আবার দিনকত ধূম পড়িল, স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার সংস্কার কর, স্ত্রীশিক্ষা দাও, বিধবাবিবাহ দাও, স্ত্রীলোককে গৃহপিঞ্জর হইতে বাহির করিয়া উড়াইয়া দাও, বহুবিবাহ নিবারণ কর; এবং অন্যান্য প্রকারে পাঁচী রামী মাধীকে বিলাতি মেম করিয়া তুল। ইহা করিতে পারিলে যে ভাল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু পাঁচী যদি কখন বিলাতি মেম হইতে পারে, তবে আমাদিগের শালতরুও একদিন ওক্‌বৃক্ষে পরিণত হইবে, এমন ভরসা করা যাইতে পারে। যে রীতিগুণের চলন আপাততঃ অসম্ভব, সেগুণ চলিত হইল না; স্ত্রীশিক্ষা সম্ভব, এ জন্য তাহা এক প্রকার প্রচলিত হইয়া উঠিতেছে। পুস্তক হইতে এক্ষণে বাঙ্গালি স্ত্রীগণ যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহা অতি সামান্য; পরিবর্তনশীল সমাজে অবস্থিতি জন্য অর্থাৎ শিক্ষিত এবং ইংরেজের অনুকরণ-

বিশ্বকম রচনাবলী

কারী পিতা ভ্রাতা স্বামী প্রভৃতির সংসর্গে থাকায় তাহারা যে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়, তাহা প্রবলতর। এই দ্বিবিধ শিক্ষার ফল কিরূপ দাঁড়াইতেছে? বাঙ্গালি যুবকের চরিত্রে যে রূপ পরিবর্তন দেখা যাইতেছে, বাঙ্গালি যুবতীগণের চরিত্রে সে রূপ লক্ষণ কিছুরূপে দেখা যাইতেছে কি না? যদি দেখা যাইতেছে, সেগুলি ভাল, না মন্দ? তাহার উৎসাহ দান বিধেয়, না তাহার দমন আবশ্যিক? এ সকল প্রশ্ন সাধারণ লেখকদিগকে আলোচনা করিতে আমরা প্রায় দেখিতে পাই না, অথচ ইহার অপেক্ষা গুরুতর সামাজিক তত্ত্বও আর নাই। তাই বলিতেছিলাম যে, আমাদের সমাজ-সংস্কারকেরা নতুন কীর্তি স্থাপনে যাদৃশ ব্যগ্র, সমাজের বর্তমান গতির আলোচনায় তাদৃশ মনোযোগী নহেন।

বিষয়টি অতি গুরুতর। সমাজে স্ত্রীজাতির যে বল, তাহা বর্ণিত করিবার প্রয়োজন নাই। মাতা বাল্যকালে শিক্ষাদাত্রী, স্ত্রী বয়ঃপ্রাপ্তের মন্ত্রী, ইত্যাদি প্রাচীন কথা পুনরুক্ত করিবার প্রয়োজন নাই। সকলেই জানেন, স্ত্রীলোকের সম্মতি এবং সাহায্য ব্যতীত সংসারের কোন গুরুতর কার্য সম্পন্ন হয় না। গহনা গড়ান ও গোরু কেনা হইতে ফরাসিস্ রাজ্যবিপ্লব এবং লুথরের ধর্মবিপ্লব পর্যন্ত সকলেই স্ত্রীসাহায্যসাপেক্ষ। ফরাসিস্ স্ত্রীগণ ফরাসিস্ রাজ্য-বিপ্লবে মহারথী ছিলেন। আন বলীন হইতে ইংলন্ড প্রটেষ্ট্যান্ট—

—Gospel light first dawned

From Bullen's eyes—

ইহা বলা যাইতে পারে যে, আমাদের শূভাশুভের মূল আমাদের কর্ম, কর্মের মূল প্রবৃত্তি; এবং অনেক স্থানেই আমাদের প্রবৃত্তিসকলের মূল আমাদের গৃহীণীগণ। অতএব স্ত্রীজাতি আমাদের শূভাশুভের মূল। স্ত্রীজাতির মহত্ত্ব কীর্তন কালে এই সকল কথা বলা প্রাচীন প্রথা আছে, এজন্য আমরাও এ কথা বলিলাম; কিন্তু এ কথাগুলি বাঁহারা ব্যবহার করেন, তাঁহাদিগের আন্তরিক ভাব এই যে, পুরুষই মনুষ্যজাতি; যাহা পুরুষের পক্ষে শূভাশুভ বিধান করিতে সক্ষম, তাহাই গুরুতর বিষয়; স্ত্রীগণ পুরুষের শূভাশুভবিধায়িনী বলিয়াই তাঁহাদিগের উন্নতি বা অবনতির বিষয় গুরুতর বিষয়। বাস্তবিক আমরা সে রূপ কথা বলি না। আমাদের প্রধান কথা এই যে, স্ত্রীগণ সংখ্যায় পুরুষগণের তুল্য বা অধিক; তাঁহারা সমাজের অর্দ্ধাংশ। তাঁহারা পুরুষগণের শূভাশুভবিধায়িনী হউন বা না হউন, তাঁহাদিগের উন্নতিতে সমাজের উন্নতি; যেমন পুরুষদিগের উন্নতিতে সমাজের উন্নতি, ঠিক সেই পরিমাণে স্ত্রীজাতির উন্নতিতে সমাজের উন্নতি; কেন না, স্ত্রীজাতি সমাজের অর্দ্ধেক ভাগ। স্ত্রী পুরুষের সমান ভাগের সমষ্টিতে সমাজ বলে; উভয়ের সমান উন্নতিতে সমাজের উন্নতি। এক ভাগের উন্নতি সমাজসংস্কারের মূখ্য উদ্দেশ্য, তাহার উন্নতিসহায় বলিয়াই অন্য ভাগের উন্নতি গোণ উদ্দেশ্য, এ কথা নীরতিবিরুদ্ধ।

কিন্তু সমাজের নিয়ন্তৃবর্গ সর্বকালে সর্বদেশে এই ভ্রমে পতিত। তাঁহারা বিধান করেন যে, স্ত্রীলোকেরা এইরূপ এইরূপ আচরণ করিবে।—কেন করিবে? উত্তর, তাহা হইলে পুরুষের অম্লক মঙ্গল ঘটিবে বা অম্লক অমঙ্গল নিবারণ হইবে। সমাজবিধাতৃদিগের সর্বত্র এইরূপ উক্তি; কোথাও এ উদ্দেশ্য স্পষ্ট, কোথাও অস্পষ্ট, কিন্তু সর্বত্রই বিদ্যমান। এই জন্যই সর্বত্র স্ত্রীজাতির সতীত্বের জন্য এত পীড়াপীড়ি; পুরুষের সেই ধর্মের অভাব, কোথাও তত বড় গুরুতর দোষ বলিয়া গণনীয় নহে। বাস্তবিক নীতিশাস্ত্রের স্বাভাবিক মূল ধরিতে গেলে এমত কোন বিষয়ই পাওয়া যায় না, যদ্বারা স্ত্রীকৃত ব্যাভিচার পুরুষকৃত পরদারগ্রহণ অপেক্ষা গুরুতর দোষ বিবেচনা করা যায়। পাপ দুই সমান; একপুরুষভাগিনী স্ত্রীতে পুরুষের যে স্বাভাবিক অধিকার, একস্ত্রীভাগী পুরুষে স্ত্রীলোকের ঠিক সেইই স্বাভাবিক অধিকার, কিছুরূপে মাত্র ন্যূন নহে। তথাপি পুরুষে এ নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, তাহা বাবুর্গিরির মধ্যে গণ্য; স্ত্রীলোক এ দোষ করিলে, সংসারের সকল সুখ তাহার পক্ষে বিলুপ্ত হয়; সে অধমের মধ্যে অধম বলিয়া গণ্য হয়, কুষ্ঠগ্রস্তের অধিক অস্পৃশ্য হয়। কেন? পুরুষের সুখের পক্ষে স্ত্রীর সতীত্ব আবশ্যিক। স্ত্রীজাতির সুখের পক্ষেও পুরুষের ইন্দ্রিয়সংযম আবশ্যিক, কিন্তু পুরুষই সমাজ, স্ত্রীলোক কেহ নহে। অতএব স্ত্রীর পাতিত্রত্যাচারি গুরুতর পাপ বলিয়া সমাজে বিহিত হইল; পুরুষের পক্ষে নৈতিক বন্ধন শিথিল রহিল।

বিবিধ প্রবন্ধ—প্রাচীনা এবং নবীনা

সকল সমাজেই স্ত্রীজাতি পুরুষাপেক্ষা অনুন্নত; পুরুষের আত্মপক্ষপাতিতাই ইহার কারণ; পুরুষ বলিষ্ঠ, সুতরাং পুরুষই কার্যকর্তা; স্ত্রীজাতিকে কাজে কাজেই তাঁহাদিগের বাহুবলের অধীন হইয়া থাকিতে হয়। আত্মপক্ষপাতী পুরুষগণ, যতদূর আত্মসুখের প্রয়োজন, ততদূর পর্য্যন্ত স্ত্রীগণের উন্নতির পক্ষে মনোযোগী; তাহার অতিরেকে তিলার্দ্ধ নহে। এ কথা অন্যান্য সমাজের অপেক্ষা আমাদের দেশে বিশেষ সত্য। প্রাচীন কালের কথা বলিতে চাহি না; তৎকালীন স্ত্রীজাতির চিরাধীনতার বিধি; কেবল অবস্থা বিশেষ ব্যতীত স্ত্রীগণের ধনাধিকারে নিষেধ; স্ত্রী ধনাধিকারিণী হইলেও স্ত্রীর দান বিক্রয়ে ক্ষমতার অভাব; সহমরণ বিধি; বহুকাল-প্রচলিত বিধবার বিবাহ নিষেধ; বিধবার পক্ষে প্রচলিত কঠিন নিয়মসকল, স্ত্রীপুরুষে গুরুতর বৈষম্যের প্রমাণ। তৎপরে মধ্যকালেও স্ত্রীজাতির অবনতি আরও গুরুতর হইয়াছিল। পুরুষ প্রভু, স্ত্রী দাসী; স্ত্রী জল তুলে, রন্ধন করে, বাটনা বাটে, কুটনা কোটে। বরং বেতনভাগিনী দাসীর কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা আছে, কিন্তু বনিতা দূহিতা স্বসার তাহাও ছিল না। আজকাল পুরুষের শিক্ষার গুণে হউক, স্ত্রীশিক্ষার গুণে হউক বা ইংরাজের দৃষ্টান্তের গুণে হউক, অবস্থার পরিবর্তন হইতেছে। কিন্তু বেরূপ পরিবর্তন হইতেছে, তাহার সর্ব্বাংশই কি উন্নতি-সূচক? বঙ্গীয় যুবকদিগের যে অবস্থান্তর ঘটিতেছে, তাহার বিশেষ আন্দোলন শূন্যে পাই; কিন্তু বঙ্গীয় যুবতীগণের যে অবস্থান্তর ঘটিয়াছে, তাহা কি উন্নতি?

এ প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্বে পূর্ব্বকালে বঙ্গীয়া যুবতী কি ছিলেন, এক্ষণে কি হইতেছেন, তাহা স্মরণ করা আবশ্যিক। প্রাচীনার সহিত নবীনার তুলনা আবশ্যিক। পূর্ব্বকালের যুবতীগণের নাম করিতে গেলে, আগে শাঁখা শাড়ী সিন্দূরকোঁটা মনে পড়িবে; বাঁকমলের মূটাম হাত উপরে মনসাপেড়ে শাড়ীর রাঙ্গা পাড় আসিয়া পড়িয়াছে; হাতে পৈছা, কঙ্কণ, এবং শঙ্খ (যাহার জুঁটিল, তাহার বাউটি নামে সোনার শঙ্খ)—মুষ্টিমধ্যে দৃঢ়তর সম্মাজ্জর্নী বা রন্ধনের বেড়ি; কপালে কলা-বউয়ের মত সিন্দূরের রেখা, নাকে চন্দ্রমণ্ডলের মত নথ; দাঁতে অমাবস্যার মত মিশি; এবং মস্তকের ঠিক মধ্যভাগে, পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় তুঙ্গ কবরীশিখর। আমরা স্বীকার করি যে, সেকালে মেয়ে যখন গাছকোমর বাঁধিয়া, ঝাঁটা হাতে, খোঁপা খাড়া করিয়া, নথ নাড়িয়া দাঁড়াইত, তখন অনেক পুরুষের হৃৎকম্প হইত। যাহারা এবম্বিধা প্রাঙ্গণবিহারিণী রসবতীর সঙ্গে বাদানুবাদ সাহস করিতেন, তাঁহারা একটু সতর্ক হইয়া দূরে দাঁড়াইতেন। ইঁহারা কোন্দলে বিশেষ পরিপক্ব ছিলেন, পরস্পরের পৃষ্ঠভ্রগের সঙ্গে তাঁহাদের হস্তের সম্মাজ্জর্নীর বিশেষ কোন সম্বন্ধ ছিল। তাঁহাদিগের ভাষাও যে বিশেষ প্রকারে অভিধানসম্মত ছিল, এমত বলিতে পারি না; কেন না, তাঁহারা “পোড়ারমুখো” “ডেক্‌রা” ইত্যাদি নিপাতনসাধ্য শব্দ আধুনিক প্রাণনাথ প্রাণকান্তাদির স্থলে ব্যবহার করিতেন, এবং “আবাগী” “শতেক খুয়ারী” প্রভৃতি শব্দ আধুনিক “সখী” “ভগিনী” স্থলে প্রয়োগ করিতেন।

এক্ষণে যে সুন্দরীকুল চরণালন্তকে বঙ্গভূমিকে উজ্জ্বলা করিতেছেন, তাঁহারা ভিন্নপ্রকৃতি। সে শাঁখা শাড়ী সিন্দূর মিশি মল মাদুলী, কিছুই নাই; অনাভিধানিক প্রিয় সম্বোধনসকল সুন্দরীগণের রসনা ত্যাগ করিয়া বাঙ্গলা নাটকে আশ্রয় লইয়াছে; যেখানে আগে মোটা মনসাপেড়ে শাড়ী মেয়ে মোড়া গনিক্লাথ ছিল, এক্ষণে তাহার স্থানে শান্তিপুর্বে ডুরে, রূপের জাহাজের পাল হইয়া সোহাগ-বাতাসে ফরফর করিয়া উড়িতেছে। হাতা বেড়ি ঝাঁটা কলসীর পরিবর্তে, সূচ সূতা কাপেট কেতাব হইয়াছে; পরিধেয় আটু ছাড়িয়া চরণে নামিয়াছে; কবরী মুর্দ্ধা ছাড়িয়া স্কন্ধে পড়িয়াছে; এবং অঙ্গের সুবর্ণ পিণ্ড ছাড়িয়া অলঙ্কারে পরিণত হইতেছে। ধূলিকন্দর্মরঞ্জিনীগণ সাবান সুগন্ধাদির মহিমা বৃদ্ধি করিয়াছেন; কলকণ্ঠধ্বনি পাঁপয়ার মত গগনপ্লাবী না হইয়া মাজ্জারের মত অস্ফুট হইয়াছে। পতির নাম এক্ষণে আর ডেক্‌রা সর্ব্বনেশে নহে; তত্তৎস্থানে সম্বোধনপদসকল দীনবন্ধুবাবুর গ্রন্থ হইতে বাছিয়া বাছিয়া নীত হইয়া ব্যবহৃত হইতেছে। স্থূল কথা এই, প্রাচীনার অপেক্ষা নবীনার রুচি কিছু ভাল। স্ত্রীজাতির রুচির কিছু সংস্কার হইয়াছে।

কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে তাদৃশ উন্নতি হইয়াছে কি না, বলিতে পারি না। কয়েকটি বিষয়ে নবীনাগণকে আমরা নিন্দনীয় বিবেচনা করি। তাঁহাদিগের কোন প্রকারে নিন্দা করা আমাদের ঘোরতর বেআদবি। তবে চন্দের সঙ্গে তাঁহাদিগের সাদৃশ সম্পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাদিগের কিঞ্চিৎ কলঙ্করটনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

বাঁকম রচনাবলী

১। তাঁহাদের প্রথম দোষ আলস্য। প্রাচীনা অত্যন্ত শ্রমশালিনী এবং গৃহকর্মে সুপটু ছিলেন; নবীনা ঘোরতর বাবু; জলের উপর পদ্মের মত স্থিরভাবে বসিয়া স্বচ্ছ দর্পণে আপনার রূপের ছায়া আপনি দেখিয়া দিন কাটান। গৃহকর্মের ভার, প্রায় পরিচারিকার প্রতি সমর্পিত। ইহাতে অনেক অনিষ্ট জন্মিতেছে;—প্রথম, শারীরিক পরিশ্রমের অল্পতায় যুবতীগণের শরীর বলশূন্য এবং রোগের আগার হইয়া উঠিতেছে। প্রাচীনাদিগের, অর্থাৎ পূর্বকালের যুবতীগণের শরীর স্বাস্থ্যজনিত এক অপূর্ব লাভ্যাবিশিষ্ট ছিল, এক্ষণে তাহা কেবল নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকের মধ্যে দেখা যায়। নবীনাদিগের প্রাত্যহিক রোগভোগে তাহাদিগের স্বামী পিতা পুত্র প্রভৃতি সর্বদা জ্বালাতন এবং অসুখী; এবং সংসারও কাজে কাজেই বিশৃঙ্খলাযুক্ত এবং দুঃখময় হইয়া উঠে। গৃহিণী রুগ্নশয্যাশায়িনী হইলে গৃহের শ্রী থাকে না; অর্থের ধ্বংস হইতে থাকে; শিশুগণের প্রতি অযত্ন হয়; সুতরাং তাহাদিগের স্বাস্থ্যক্ষতি ও কুশিক্ষা হয়; এবং গৃহমধ্যে সর্বত্র দুর্নীতির প্রচার হয়। যাহারা ভালবাসে, তাহারাও নিত্য রুগ্নের সেবার দুঃখ সহ্য করিতে পারে না; সুতরাং দম্পতিপ্রীতিরও লাঘব হইতে থাকে। এবং মাতার অকালমৃত্যুতে শিশুগণের এমত অনিষ্ট ঘটে যে, তাহাদিগের মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাহারা উহার ফলভোগ করে। সত্য বটে, ইংরেজজাতীয় স্ত্রীগণকে আলস্যপরবশ দেখিতে পাই, কিন্তু তাহারা অশ্বারোহণ, বায়ুসেবন, ইত্যাদি অনেকগুলি স্বাস্থ্যরক্ষক ক্রিয়া নিয়মিতরূপে সম্পাদন করে। আমাদিগের গৃহপিঞ্জরের বিহঙ্গিনীগণের সে সকল কিছুই হয় না।

দ্বিতীয়, স্ত্রীগণের আলস্যের আর একটি গুরুতর কুফল এই যে, সন্তান দুর্বল এবং ক্ষীণজীবী হয়। শিশুদিগের নিত্য রোগ এবং অকালমৃত্যু অনেক সময়েই জননীর শ্রমে অনুরাগশূন্যতার ফল। অনেকে বলেন, আগে এত রোগ ছিল না; এখন নিত্য পীড়া; আগে লোকে দীর্ঘজীবী ছিল; এক্ষণে অল্পবয়সে মরে। অনেকের বিশ্বাস আছে, এ সকল কালমহিমা; কলিতে অনৈসর্গিক ব্যাপার ঘটিতেছে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি জানেন যে, নৈসর্গিক নিয়ম কখন কালমাহাত্ম্যে পরিবর্তিত হয় না; যদি আধুনিক বাঙ্গালীরা বহুরোগী এবং অল্পায়ু হইয়া থাকে, তবে তাহার অবশ্য নৈসর্গিক কারণ আছে সন্দেহ নাই। আধুনিক প্রসূতিগণের শ্রমে বিরতিই সেই সকল নৈসর্গিক কারণের মধ্যে অগ্রগণ্য। যে বঙ্গদেশের ভরসা লোকের শারীরিক বলোন্নতির উপর বর্তিয়াছে, সেই বঙ্গদেশে জননীগণের আলস্যবশ্যতার এরূপ বৃদ্ধি যে অতি শোচনীয় ব্যাপার, তাহার সন্দেহ নাই।

আলস্যের তৃতীয় কুফল এই যে, নবীনাগণ গৃহকর্মে নিতান্ত অশিক্ষিতা এবং অপটু। কখনও সে সকল কাজ করেন না, এজন্য শিখেনও না; ইহাতে অনেক অনিষ্ট ঘটে। প্রাচীনারা নিতান্ত ধনী না হইলে জল তুলিতেন, বাসন মাজিতেন, উঠান ঝাঁট দিতেন; রন্ধন তাঁহাদের জীবনের প্রধান কার্য ছিল। এ কিছু বাড়াবাড়ি; নবীনাদিগের এতদূর করিতে আমরা অনুরোধ করি না; যাহার যেমন অবস্থা, সে তদনুসারে কার্য করিলেই যথেষ্ট; কেবল কাপেট তুলিয়া কাল কাটাইলে, অতি ঘৃণিতরূপে জীবননির্ব্বাহ করা হয় বিবেচনা করি। পরস্পরের সুখবর্দ্ধন জন্য সকলেরই জন্ম; যে স্ত্রী, ভূমণ্ডলে আসিয়া, শয্যায় গড়াইয়া, দর্পণসম্মুখে কেশরঞ্জন করিয়া, কাপেট তুলিয়া, সীতার বনবাস পড়িয়া, এবং সন্তান প্রসব করিয়া কাল কাটাইলেন, আপনার ভিন্ন কাহারও সুখ বৃদ্ধি করিলেন না, তিনি পশুজাতির অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ভাল হইলে হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার স্ত্রীজন্ম নিরর্থক। এ শ্রেণীর স্ত্রীলোকগণকে আমরা গলায় দাড়ি দিয়া মরিতে পরামর্শ দিই; পৃথিবী তাহা হইলে অনেক নিরর্থক ভারবহনযন্ত্রণা হইতে বিমুক্ত হইবেন।

গৃহিণী গৃহকর্ম না জানিলে রুগ্নগৃহিণীর গৃহের ন্যায় সকলই বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে; অর্থ উপকার হয় না; অর্থ অনর্থক ব্যয় হয়; দ্রব্য সামগ্রী লুপ্ত যায়; অর্দ্ধেক দাস-দাসী এবং অপর লোক চুরি করে। বহু ব্যয়েও খাদ্যাদির অপ্রতুল ঘটে; ভাল সামগ্রীর খরচ দিয়া মন্দ সামগ্রী ব্যবহার করিতে হয়; ভাল সামগ্রী গৃহস্থের কপালে ঘটে না। পৌরজনে পৌরজনে অপ্রণয় এবং কলহ ঘটিয়া উঠে। অতিথি অভ্যাগতের উপযুক্ত সম্মান হয় না। সংসার কণ্টকময় হয়।

২। নবীনাদিগের দ্বিতীয় দোষ ধর্ম সম্বন্ধে। আমরা এক্ষণকার বঙ্গাঙ্গনাগণকে অধার্মিক বলিতেছি না.—বঙ্গীয় যুবকদিগের তুলনায় তাঁহারা ধর্মভক্ত এবং বিশুদ্ধাত্মা বটেন, কিন্তু

বিবিধ প্রবন্ধ—প্রাচীনা এবং নবীনা

প্রাচীনাগণের সম্প্রদায়ের তুলনায় তাঁহারা ধর্ম লঘু সন্দেহ নাই। বিশেষ যে সকল ধর্ম গৃহস্থের ধর্ম বলিয়া পরিচিত, সেইগুলিতে এক্ষণকার যুবতীগণের লাঘব দেখিয়া কষ্ট হয়।

স্ত্রীলোকের প্রথম ধর্ম পাতিত্রতা। অদ্যাপি বঙ্গমহিলাগণ পৃথিবীতলে পাতিত্রতা-ধর্ম তুলনারহিতা। কিন্তু যাহা ছিল তাহা কি আর আছে? এ প্রশ্নের উত্তর শীঘ্র দেওয়া যায় না। প্রাচীনাগণের পাতিত্রতা যেরূপ দৃঢ়গ্রন্থির দ্বারা হৃদয়ে নিবদ্ধ ছিল, পাতিত্রতা যেরূপ তাহাদিগের অস্থি মজ্জা শোণিতে প্রবিষ্ট ছিল, নবীনাগণেরও কি তাই? অনেকের বটে, কিন্তু অধিকাংশের কি তাই? নবীনাগণ পাতিত্রতা বটে, কিন্তু যত লোকনিন্দাভয়ে, তত ধর্মভয়ে নহে।

তাহার পর, দানাদিতে প্রাচীনাগণের যেরূপ মনোনিবেশ ছিল, নবীনাগণের সেরূপ দেখা যায় না। প্রাচীনাগণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, দানে পরমার্থের কাজ হয়। যে দান করে, সে স্বর্গে যায়। এক্ষণকার যুবতীগণের স্বর্গে বিশ্বাস তত দৃঢ় নহে; তাহাদের পরলোকে স্বর্গপ্রাপ্তিকামনা তত বলবতী নহে। ইংরেজি সভ্যতার ফলে দেশে নানাবিধ সামগ্রীর প্রাচুর্য হওয়াতে সকলেরই অর্থের প্রয়োজন বাড়িয়াছে, স্ত্রীলোকদিগেরও বাড়িয়াছে; এজন্য দানে তাদৃশ অনুরাগ আর নাই। তত দান করিলে আর কুলায় না। টাকায় যে সকল সুখ কেনা যায়, তাহার সংখ্যা এবং বৈচিত্র্য বাড়িয়াছে; দানের আধিক্য করিলে, এখন অনেক বাঞ্ছনীয় সুখে বঞ্চিত হইতে হয়। সুতরাং স্ত্রীলোকে (এবং পুরুষে) আর তত দানশালী নহে।

হিন্দুদিগের একটি প্রধান ধর্ম অতিথিসংকার। যে গৃহে আসে, তাহাকে আহাঙ্গার দ্বারা পরিতুষ্ট করণ পক্ষে এতদ্দেশীয় লোকের তুল্য কোন জাতি ছিল না। প্রাচীনাগণ এই গুণে বিশেষ গুণশালিনী ছিলেন। নবীনাগণের মধ্যে সে ধর্ম একেবারে বিলুপ্ত হইতেছে। গৃহে অতিথি অভ্যাগত আসিলে প্রাচীনারা কৃতার্থ হইতেন, নবীনাগণ বিরক্ত হইতেন। লোককে আহাঙ্গার করান প্রাচীনাগণের প্রধান সুখ ছিল, নবীনাগণ ইহাকে ঘোরতর বিপদ মনে করেন।

ধর্ম যে নবীনাগণ প্রাচীনাগণের অপেক্ষা নিকৃষ্ট, তাহার একটি বিশেষ কারণ অসম্পূর্ণ শিক্ষা। লেখাপড়া বা অন্য প্রকারের শিক্ষা তাঁহারা যাহা কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হইতেন, তাহাতেই বুদ্ধিতে পারেন যে, প্রাচীন ধর্মের শাসন অমূলক। অতএব তাহাতে বিশ্বাস হারাইয়া, ধর্মের যে বন্ধন ছিল, তাহা হইতে বিমুক্ত হইতেন। তাহার স্থানে আর নতুন বন্ধন কিছুই গ্রন্থিবদ্ধ হইতেছে না। আমরা লেখাপড়ার নিন্দা করিতেছি না। ধর্ম ভিন্ন বিদ্যার অপেক্ষা মূল্যবান বস্তু যে পৃথিবীতে কিছুই নাই, ইহা আমরা ভুলিয়া যাইতেছি না। তবে বিদ্যার ফল, ইহা সর্বত্র ঘটিয়া থাকে যে, তাহাতে চক্ষু ফুটে, মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়, সত্যকে সত্য বলিয়া জানা যায়। বিদ্যার ফলে লোকে, প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রঘটিত ধর্মের মূলের অলীকত্ব দেখিতে পায়; প্রাকৃতিক যে সত্য ধর্ম, তাহা সত্য বলিয়া চিনিতে পারে। অতএব বিদ্যায় ধর্মের ক্ষতি নাই, বরং বৃদ্ধি আছে। সচরাচর পণ্ডিতে যাদৃশ ধর্মশাস্ত্র, মূর্খে তাদৃশ পাপিষ্ঠ হয়। কিন্তু অল্প বিদ্যার দোষ এই যে, ধর্মের মিথ্যা মূল তদ্বারা উচ্ছিন্ন হয়; অথচ সত্য ধর্মের প্রাকৃতিক মূল সংস্থাপিত হয় না। সেটুকু কিছু অধিক জ্ঞানের ফল। পরোপকার করিতে হইবে, এটি যথার্থ ধর্মনীতি বটে। মূর্খেও ইহা জানে, এবং মূর্খদিগের মধ্যে ধর্ম যাহাদের মতি আছে, তাহারাও ইহার বশবর্তী হয়। তাহার কারণ এই যে, এই নৈতিক আজ্ঞা প্রচলিত ধর্মশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে; মূর্খের তাহাতে দৈবাজ্ঞা বলিয়া বিশ্বাস আছে। দৈববিধি লঙ্ঘন করিলে ইহলোকে ও পরলোকে ক্ষতিপ্রাপ্ত হইতে হইবে বলিয়া মূর্খ সে নীতির বশবর্তী; পণ্ডিতও সে নীতির বশবর্তী, কিন্তু তিনি ধর্মশাস্ত্রোক্ত বলিয়া তদুক্তির অনুসরণ করেন না। তিনি জানেন যে, ধর্মের কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়ম আছে, তাহা অবশ্য পালনীয়; এবং পরোপকারবিধি সেই সকল নিয়মের ফল। অতএব এ স্থলে ধর্মের ক্ষতি হইল না। কিন্তু যদি কেহ ঈদৃশ পরিমাণে মাত্র বিদ্যার আলোচনা করে যে, তদ্বারা প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র বিশ্বাস বিনষ্ট হয়, অথচ যতদূর বিদ্যার আলোচনায় প্রাকৃতিক ধর্ম বিশ্বাস জন্মে, ততদূর না যায়, তবে তাহার পক্ষে ধর্মের কোন মূল থাকে না। লোকনিন্দাভয়ই তাহাদিগের একমাত্র ধর্ম-বন্ধন হইয়া উঠে। সে বন্ধন অতি দুর্বল। আধুনিক অলপশিক্ষিত যুবক যুবতীগণ কিয়দংশে এই অবস্থাপন্ন; এজন্য ধর্মশাস্ত্রে তাঁহারা প্রাচীনাগণের সমকক্ষ নহেন। যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষায়

বঙ্কিম রচনাবলী

ব্যতিব্যস্ত, তাঁহাদিগের আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, আপনারা বালিকাদিগের হৃদয় হইতে প্রাচীন ধর্মবন্ধন বিষদ্বন্দ্ব করিতেছেন, তাহার পরিবর্তে কি সংস্থাপন করিতেছেন?*

তিন রকম

নং ১

বঙ্গদর্শনে “নবীনা এবং প্রাচীনা” কে লিখিল? যিনি লিখুন, তিনি মনে করিয়াছেন, অবলা স্ত্রীজাতি কিছুর কথা কহিবে না, অতএব যাহা ইচ্ছা, তাহা লিখি। জানেন না যে, সম্মাজ্জনী স্ত্রীলোকেরই আয়ুধ।

ভাল, নবীন মহাশয়, আপনারা নবীনা প্রাচীনার গুণ দোষের তুলনা করিয়াছেন, নবীন ও প্রাচীনে কি তুলনা হয় না? তুলনা করিলে দোষের ভাগ কোন্ দিকে ভারি হইবে?

প্রাচীনের অপেক্ষা নবীনের গুণের মধ্যে দেখি, তোমরা একটু ইংরেজি শিখিয়াছ। কিন্তু ইংরেজি শিখিয়া কাহার কি উপকার করিয়াছ? ইংরেজি শিখিয়া কেরণীগিরি শিখিয়াছ দেখিতে পাই। কিন্তু মনুষ্যত্ব? শুন, প্রাচীনে নবীনে প্রভেদ কি, বলি। প্রাচীনেরা পরোপকারী ছিলেন; তোমরা আত্মোপকারী। প্রাচীনেরা সত্যবাদী ছিলেন; তোমরা কেবল প্রিয়বাদী। প্রাচীনেরা ভক্তি করিতেন পিতা-মাতাকে; নবীনের ভক্তি করা'পত্নী বা উপপত্নীকে। প্রাচীনেরা দেবতা ব্রাহ্মণের পূজা করিতেন; তোমাদের দেবতা টেম ফিরিঙ্গী, তোমাদের ব্রাহ্মণ সোণার বেনে। সত্য বটে, তাঁহারা পৌত্তলিক ছিলেন, কিন্তু তোমরা বোতলিক। জগদীশ্বরীর স্থানে তোমরা অনেকেই ধানেশ্বরীকে স্থাপনা করিয়াছ; ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের স্থানে ব্রাণ্ড, রম, জিন। বিয়র, সেরি তোমাদের ষষ্ঠী মনসার মধ্যে। বঙ্গীয় বাবুর ভ্রাতৃশ্নেহ সম্বন্ধীর উপর বর্তিয়াছে, অপত্যশ্নেহ ঘোড়া কুকুরের উপর বর্তিয়াছে; পিতৃভক্তি আপিসের সাহেবের উপর বর্তিয়াছে, আর মাতৃভক্তি? পাচিকার উপরে। আমরা অতিথি অভ্যাগত দেখিলে মহা বিপদ মনে করি বটে, তোমরা তাহাদিগকে গলা ধাক্কা দাও। আমরা অলস; তোমরা শূন্য অলস নও—তোমরা বাবু! তবে ইংরেজ বাহাদুর নাকে দড়ি দিয়া তোমাদের ঘানিগাছে ঘুরায়, বল নাই বলিয়া ঘোর। আর আমরাও নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাই, বুদ্ধি নাই বলিয়া ঘোর। আমরা লেখাপড়া শিখি নাই বলিয়া আমাদের ধর্মের বন্ধন নাই, আর তোমাদের? তোমাদের ধর্মের বন্ধন বড় দৃঢ়, কেন না, তোমাদের সে বন্ধনের দড়ি একদিকে শৃঙ্গি, আর একদিকে বারস্ত্রী টানিয়া আঁটিয়া দিতেছে; তোমরা ধর্ম-দড়িতে মদের কলসী গলায় বাঁধিয়া, প্রেমসাগরে ঝাঁপ দিতেছ—গরিব “নবীনা” খুনের দায়ে ধরা পড়িতেছে। তোমাদের আবার ধর্মের ভয় কি? তোমরা কি মান? ঠাকুর দেবতা? যিশুখ্রীষ্ট? ধর্ম মান? পাপ পুণ্য মান? কিছুর না—কেবল আমাদের এই আলতা-পরা মল-বেড়া শ্রীচরণ মান; সেও নাথির জ্বালায়।

শ্রীচাঁডকাসুন্দরী দেবী।

নং ২

সম্পাদক মহাশয়! আপনাদের শ্রীচরণে এ কিঙ্করীকুল কোন্ দোষে দোষী? আমরা কি জানি?—আপনারা শিখাইবেন, আমরা শিখিব—আপনারা গুরুর, আমরা শিষ্য,—কিন্তু শিক্ষাদান এক, নিন্দা আর। বঙ্গদর্শনে “নবীনার” প্রতি এত কটুক্তি কেন?

আমাদের সহস্র দোষ আছে স্বীকার করি। একে স্ত্রীজাতি, তাতে বাঙ্গালির মেয়ে, জাতিতে কাঠমাল্লিকা, তাহাতে মরুভূমে জন্মিয়াছে—দোষ না থাকিবে কেন? তবে কতকগুলি দোষ আপনাদেরই গুণে জন্মিয়াছে। আপনাদের গুণে, দোষে নহে। আপনারা আমাদের এত ভাল না বাসিলে, আমাদের এত দোষ ঘটিত না। আপনারা আমাদের সুখী করিয়াছেন, এজন্য আমরা অলস। মাথার ফুলটি খসিয়া পড়িলে, আপনারা তুলিয়া পরান। আপনারা জল হইয়া যে

* “নবীনা ও প্রাচীনা।” এই প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইলে পর, স্ত্রীলোকের পক্ষ হইতে যে উত্তর আছে, তাহা নিম্নলিখিত কৃত্রিম পত্র তিনখানিতে লিখিত হইয়াছিল।

বিবিধ প্রবন্ধ—প্রাচীনা এবং নবীনা

নালিনী হৃদয়ে ধারণ করেন, সে কেন স্বচ্ছ সলিলে আপনার রূপের ছায়া দেখিয়া দিন না কাটাইবে?

আমরা অতিথি অভ্যাগতের প্রতি অমনোযোগী—তাহার কারণ, আমরা স্বামী পুত্রের প্রতি অধিক মনোযোগী। আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ে আপনারা এত স্থান গ্রহণ করিয়াছেন যে, অন্য ধর্মের আর স্থান নাই।

আর—শেষ কথা, আমরা কি ধর্মভীতা নহি? ছি! ধর্মভীতা বলিয়াই, আপনাদিগকে আর কিছু বলিতে পারিলাম না। তোমরাই আমাদের ধর্ম। তোমাদের ভয়ে ভীতা বলিয়া, অন্য ধর্মের ভয় করি না। সকল ধর্ম কর্ম আমরা স্বামী পুত্রে সমর্পণ করিয়াছি—অন্য ধর্ম জানি না। লেখাপড়া শিখাইয়া আমাদেরকে কোন্ ধর্ম বাঁধিবেন? যত শিখান না কেন—আমরা বাঙ্গালির মেয়ে, সকল বন্ধন ছিঁড়িয়া এই পাতিত্রত্য বন্ধনে আপনা আপনি বাঁধা পড়িব। যদি ইহাতে অধর্ম হয়, সে আপনাদের দোষ, আপনাদেরই গুণ। আর যদি আমার ন্যায় মুখেরা বালিকার কথায় রাগ না করেন, তবে জিজ্ঞাসা করি, আপনারা গুরু, আমরা শিষ্য—আপনারা আমাদের কোন ধর্ম শিখাইয়া থাকেন?

লেখাপড়া শিখিব? কেন? তোমাদের মুখচন্দ্র দেখিয়া যে সুখ, লেখাপড়ায় কি তত? তোমাদের সুখসাধনে যে ধর্মশিক্ষা, লেখাপড়ায় কি তত? দেখ, তোমাদের দেখিয়া আমরা আত্মবিসর্জন শিখিয়াছি, লেখাপড়ায় কি তাহা শিখাইবে? আর লেখাপড়া শিখিব কখন? তোমাদের মুখ ভাবিতে ভাবিতে দিন যায়, ছাই লেখাপড়া শিখিব কখন?

ছি! দাসীদিগের নিন্দা!

শ্রীলক্ষ্মীমণি দেবী।

নং ৩

ভাল, কোন্ রসিকচুড়ামণি “নবীনা এবং প্রবীণা” লিখিলেন?

লেখক মহাশয়! তুমি যা বলিয়াছ, সব সত্য—একটি মিথ্যা নহে। আমরা অলস বটে,—কিন্তু আমরা অলস না হইয়া, কাজ করিয়া বেড়াইলে, তোমাদের দশা কি হইত? এ বিজারি তোমাদের হৃদয়াকাশে স্থির না থাকিলে, কাহার প্রতি চাহিয়া, এ দীর্ঘ দুঃখদারিদ্র্যময় জীবন কাটাইতে? এ সৌদামিনী স্থির না থাকিলে, তোমরা এ সংসারাক্রকারে কোথায় আলো পাইতে? আমরা কাজ করিব? করিব, ক্ষতি কি, কিন্তু দেখ যেন, আমাদের তিলেক না দেখিয়া, তোমরা তৈলশূন্য প্রদীপের মত হঠাৎ নিবিয়া বসিও না; জলশূন্য মাছের মত বার বার পুচ্ছ আছড়াইতে থাকিও না; আর রাখালশূন্য বাছুরের মত হাম্বারবে তোমাদের গৃহগোহাল পরিপূর্ণ করিও না। আমরা কাজ করিতে যাইব, কিন্তু তোমরা এ ঢল ঢল চঞ্চল রূপতরঙ্গ যে দেখিতে পাইবে না! এ কলকণ্ঠধ্বনি ক্ষণেক না শুনিলে যে গীতিমুগ্ধ হরিণের ন্যায় সংসারারণ্যে শব্দান্বেষণ করিয়া বেড়াইবে!—কপালখানা! আবার বলেন কি না, কাজ করে না!

আমরা অতিথি অভ্যাগতকে খাইতে দিই না;—দিব কি, তোমরা যে ঘরে কিছু রাখ না। ইংরেজের আপিসের কি গুণ বলিতে পারি না—যাইবার সময় যাও যেন নন্দদুলাল—ফিরে এস যেন কুম্ভকর্ণ! নিজের নিজের উদর—এর একটি আধমণি বস্তা—আমরা যেই হিন্দুর মেয়ে, তাই তাহাতে কোন মতে ত্রিশ সের ঠাসিয়া দিই—তার উপর আবার অতিথি অভ্যাগত!

ধর্মের বন্ধনে বাঁধিবেন? ক্ষতি নাই, কিন্তু যে একাদশী নিরামিষের বাঁধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, তার উপর এ বন্ধনে আর কাজ কি? আপনারা একাদশীর ভার নিন, আমরা লেখাপড়া শিখিয়া,—ধর্মের বন্ধন আঁটো করিয়া বাঁধিতে রাজি আছি। আমার মনে বড় সাধ, একবার আপনাদিগের সঙ্গে অবস্থার বিনিময় করি। গালিগালাজ দিবার আগে, একবার কত সুখ দুঃখ বঝিয়া লউন। আমরা মরিলে আপনারা একাদশী করিবেন, নিরামিষ খাইবেন, ঠেঁটি পরিবেন; আপনারা স্বর্গারোহণ করিলে আমরা “দ্বিতীয় সংসার” করিব—জীয়েন্তে আপনারা সন্তান প্রসব করিবেন, রক্ষনশালার তত্ত্বাবধারণ করিবেন,—বাড়ীতে বিবাহ উপস্থিত হইলে, গোঁপের উপর ঘোমটা টানিয়া বরণডালা মাথায় করিয়া, স্ত্রী আচার করিবেন, বাসর ঘরে রসের হাসি হাসিয়া বাসর জাগিবেন, সুখের সীমা থাকিবে না।—আমরা যৌবনে বহি হাতে করিয়া কালেজে যাইব—

বীকম রচনাবলী

বয়সকালে ফিরিঙ্গী খোঁপার উপর, পাগড়ী তেড়া করিয়া বাঁধিয়া আপসে যাইব—টোনহলে নথ নাড়িয়া স্পীচ করিব,—চসমার ভিতর হইতে এই চোখের বিলোল কটাক্ষে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিব—সাধের ধর্মের দড়ি গলায় বাঁধিয়া সংসার গোহালে খোল বিচারি খাইব।—ক্ষতি কি! তোমরা বিনিময় করিবে? কিন্তু একটা কথা সাবধান করিয়া দিই—তোমরা যখন মানে বসিবে—আমরা যখন মান ভাঙ্গিতে বসিব—মুখখানি কাঁদো কাঁদো করিয়া, কণ্ঠভূষা একটু ঈষৎ রসের দোলনে দোলাইয়া, এই সভ্রমর সরোজনয়নে একবার চোরা চাহনি চাহিয়া, যখন গহনা পরা হাতখানি, তোমাদের পায়ে দিব—তখন? তখন কি তোমরা, আমাদের মত মানের মান রাখিতে পারিবে?

বড়াই ছাড়িয়া তাই কর; তোমরা অন্তঃপুরে এস—আমরা আপসে যাই। যাহারা সাত শত বৎসর পরের জুতা মাথায় বহিতেছে, তাহারা আবার পুরুষ! বলিতে লজ্জা করে না?

শ্রীরসময়ী দাসী।

দ্বিতীয় খণ্ড

ধর্ম এবং সাহিত্য*

আমি প্রচারের একজন লেখক। তাহা জানিয়া প্রচারের একজন পাঠক আমাকে বলিলেন, “প্রচারে অত ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ ভাল লাগে না। দুই একটা আমোদের কথা না থাকিলে পড়িতে পারা যায় না।”

আমি বলিলাম, “কেন, উপন্যাসেও কি তোমার আমোদ নাই? প্রতি সংখ্যায় একটি উপন্যাস প্রকাশিত হইয়া থাকে।”

তিনি বলিলেন, “ঐ একটু বৈ ত নয়।”

তিন ফর্ম প্রচার, তাহার কখন এক ফর্ম উপন্যাস, কখন বেশী, কখন কম। তাহাও অপ্রচুর! তারপর তিন ফর্মের যেটুকু থাকে, তাহারও কিয়দংশ কবিতা ইত্যাদিতে কতকটা ভরিয়া যায়, ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ এক কোণে এক আধটা পড়িয়া থাকে। তথাপি এই পাঠকের তাহা ভাল লাগে না। বোধ হয়, আরও অনেক পাঠক আছেন, যাঁহাদিগকে ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ তিত্ত লাগে। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা, ধর্ম কেন তিত্ত লাগে, উপন্যাস রঙ্গরস কেন ভাল লাগে?

আমাদিগের ইচ্ছা, পাঠক আপনি একটু চিন্তা করিয়া ইহার উত্তর স্থির করেন। আপন আপনি উত্তর স্থির করিলে তাঁহাদিগের যত উপকার হইবে, কেহ কোন প্রকার শিক্ষা দিয়া সেরূপ উপকার করিতে পারিবে না। তবে আমরা তাঁহাদের কিছুর সাহায্য করিতে পারি।

সাধারণ ধর্মশিক্ষকের দ্বারা ধর্ম যে মূর্তিতে পৃথিবীতে সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহা অপ্রীতিকর বটে। এদেশের আধুনিক ধর্মের আচার্যেরা যে হিন্দুধর্ম ব্যাখ্যাত ও রক্ষিত করেন, তাহার মূর্তি ভয়ানক। উপবাস, প্রায়শ্চিত্ত, পৃথিবীর সমস্ত সুখে বৈরাগ্য, আত্মপীড়ন, ইহাই অধ্যাপক ও পুরোহিত মহাশয়ের নিকট ধর্ম। গ্রীষ্মকালে অতিশয় উত্তপ্ত ও তৃষাপীড়িত হইয়া যদি এক পাত্র বরফজল খাইলাম, তবে আমার ধর্ম নষ্ট হইল! জ্বরবিকারের রুগ্ন শয্যায় কষ্টে প্রাণ যায় যায় হইয়াছে, ডাক্তার আমার প্রাণরক্ষার্থে যদি ঔষধের সঙ্গে আমায় পাঁচ ফোঁটা ব্রান্ডী খাওয়াইলেন, তবেই আমার ধর্ম গেল!† আট বৎসরের কুমারী কন্যা বিধবা হইয়াছে, যে ব্রহ্মচর্যের সে কিছুর জানে না, যাহা ষাট বৎসরের বড়ারও দুরাচরণীয়, সেই ব্রহ্মচর্যের পীড়নে পীড়িত করিয়া তাহাকে কাঁদাইতে হইবে, আপনি কাঁদিতে হইবে, পরিবারবর্গকে কাঁদাইতে হইবে, নহিলে ধর্ম থাকে না। ধর্মপার্জনের জন্য কেবল পুরোহিত মহাশয়কে দাও, গুরুঠাকুরকে দাও, নিষ্কর্মা, স্বার্থপর, লোভী, কুকর্মা সত্ত্বে ভিক্ষাপজীবী ব্রাহ্মণদিগকে দাও, আপনার প্রাণপতনে উপার্জিত ধন সব অপাত্রে ন্যস্ত কর। এই মূর্তি ধর্মের মূর্তি নহে—একটা পৈশাচিক কল্পনা। অথচ আমরা বাল্যকাল হইতে ইহাকে ধর্ম নামে অভিহিত হইতে শুনিয়া আসিতেছি। পাঠক যে ইহাকে পিশাচ বা রাক্ষসের ন্যায় ভয় করিবেন, এবং নাম শুনিবামাত্র পরিত্যাগ করিবেন, ইহা সঙ্গত বটে।

যাঁহারা “শিক্ষিত” অর্থাৎ যাঁহারা ইংরেজি পড়িয়াছেন, তাঁহারা এটাকে ধর্ম বলিয়া মানেন না, কিন্তু তাঁহারা আর এক বিপদে পড়িয়াছেন। তাঁহারা ইংরেজির সঙ্গে খ্রীষ্টীয় ধর্মটাও শিখিয়াছেন। সে জন্য বাইবেল পড়িতে হয় না, বিলাতী সাহিত্য সেই ধর্ম পরিপ্লুত। আমরা খ্রীষ্টীয় ধর্ম গ্রহণ করি না করি, ধর্ম নাম হইলে সেই ধর্মই মনে করি। কিন্তু সে আর এক ভয়ঙ্কর মূর্তিবিশেষ। পরমেশ্বরের নাম হইলে সেই খ্রীষ্টানের পরমেশ্বরকে মনে পড়ে। সে পরমেশ্বর এই পবিত্র নামের সম্পূর্ণ অযোগ্য। তিনি বিশ্বসংসারের রাজা বটে, কিন্তু এমন প্রজাপীড়ক অত্যাচারী বিচারশূন্য রাজা কোন নরপিশাচেও হইতে পারে না। তিনি ক্ষণকৃত অতি ক্ষুদ্র অপরাধে মনুষ্যকে অনন্তকালস্থায়ী দণ্ডের বিধান করেন। ছোট বড় সকল পাপেই অনন্ত নরক। নিষ্পাপেরও অনন্ত নরক—যদি সে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ না করে। যে কখন খ্রীষ্ট

* প্রচার, ১২৯২, পৌষ।

† অনেক হিন্দু এই জন্য ডাক্তারি ঔষধ খান না।

বিশ্বকম রচনাবলী

নাম শূন্যে নাই, সুতরাং ত্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করা যাহার সাধ্য নহে, তাহারও সেই অপরাধে অনন্ত নরক। যে হিন্দুর ঘরে জন্মিয়াছে, তার সেই হিন্দুজন্ম তাহার দোষ নহে, পরমেশ্বর স্বয়ং তাহাকে যেখানে প্রেরণ করিয়াছেন, সেইখানেই সে আসিয়াছে, যদি দোষ থাকে, তবে সে পরমেশ্বরের দোষ, তথাপি সে দোষে সে গরিবের অনন্ত নরক। যে ত্রীষ্টের পূর্বে জন্মিয়াছে বলিয়াই ত্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে নাই, তাহার সে ঈশ্বরকৃত জন্মদোষে তাহারও অনন্ত নরক। এই অত্যাচারকারী বিশ্বেশ্বরের একটি কাজ এই যে, ইনি রাত্রিদিন প্রজাবর্গের মনের ভিতর উর্পক মারিয়া দেখিতেছেন, কে কি পাপসঙ্কল্প করিল। যাহার একটুকু ব্যতিক্রম দেখিলেন, তাহার অদৃষ্টে তখনই অনন্ত নরক বিধান করিলেন। যাহারা এই ধর্মের আবর্তমধ্যে পড়িয়াছে, তাহারা চিরদিন সেই মহাবিষাদের ভয়ে জড়সড় ও জীবন্ত হইয়া দিন কাটায়। পৃথিবীর কোন সুখই তাহাদের কাছে আর সুখ নহে। যাঁহারা এই পৈশাচিক ধর্মকে ধর্ম বলিতে শিখিয়াছেন, ধর্মের নামে যে তাঁহাদের গায়ে জ্বর আসবে, ইহা সঙ্গত।

সাধারণ ধর্মপ্রচারকদিগের এই সকল দোষেই ধর্মালোচনার প্রতি সাধারণ লোকের এত অননুরাগ জন্মিয়াছে। নহিলে ধর্মের সহজ মূর্তি যেরূপ মনোহারিণী, সকল ত্যাগ করিয়া সাধারণ লোকের ধর্মালোচনাতেই অধিক অনুরাগ সম্ভব। আমারও বিশ্বাস যে, জগতে তাহাই হইয়া থাকে; কেবল এখনকার বিকৃতরূচি পাঠকদিগের সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, সেগুলি ধর্ম বলিয়া হিন্দু ত্রীষ্টীয়ানের দোষে তাঁহাদের নিকট পরিচিত হইয়াছে, সেগুলি ধর্ম নহে—অধর্ম। ধর্মের মূর্তি বড় মনোহর। ঈশ্বর প্রজাপীড়ক নহেন—প্রজাপালক। ধর্ম আত্মপীড়ন নহে,—আপনার উন্নতিসাধন, আপনার আনন্দবর্ধনই ধর্ম। ঈশ্বরে ভক্তি, মনুষ্যে প্রীতি, এবং হৃদয়ে শান্তি, ইহাই ধর্ম। ভক্তি, প্রীতি, শান্তি, এই তিনটি শব্দে যে বস্তু চিত্রিত হইল, তাহার মোহিনী মূর্তির অপেক্ষা মনোহর জগতে আর কি আছে? তাহা ত্যাগ করিয়া আর কোন্ বিষয়ের আলোচনা করিতে ইচ্ছা করে?

যিনি নাটক নবেল পড়িতে বড় ভালবাসেন, তিনি একবার মনে বিচার করিয়া দেখিবেন, কিসের আকাঙ্ক্ষায় তিনি নাটক নবেল পড়েন? যদি সেই সকলে যে বিস্ময়কর ঘটনা আছে, তাহাতেই তাঁহার চিত্তবিনোদন হয়, তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, বিশ্বেশ্বরের এই বিশ্বসৃষ্টির অপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার কোন্ সাহিত্যে কথিত হইয়াছে? একটি তৃণে বা একটি মাছির পাখায় যত আশ্চর্য্য কৌশল আছে, কোন্ উপন্যাস-লেখকের লেখায় তত কৌশল আছে? আর ইহার অপেক্ষা যাঁহারা উচ্চদরের পাঠক, যাঁহারা কবির সৃষ্ট পদার্থের লোভে সাহিত্যে অনুরক্ত, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, ঈশ্বরের সৃষ্টির অপেক্ষা কোন্ কবির সৃষ্টি সুন্দর? বস্তুতঃ কবির সৃষ্টি, সেই ঈশ্বরের সৃষ্টির অনুকারী বলিয়াই সুন্দর। নকল কখন আসলের সমান হইতে পারে না। ধর্মের মোহিনী মূর্তির কাছে সাহিত্যের প্রভাব বড় খাটো হইয়া যায়।

পাঠক বলিবেন, “এ কথা সত্য হইতে পারে না; কেন না, আমার নাটক নবেল পড়িতে ইচ্ছা হয়, পড়িয়াও আনন্দ পাই। কই, ধর্মপ্রবন্ধ পড়িতে ত ইচ্ছা হয় না, পড়িয়াও কোন আনন্দ পাই না।” ইহার উত্তর বড় সহজ। তুমি সাহিত্য পাঠে অনুরক্ত এবং তাহাতে আনন্দ লাভ কর, তাহার কারণ এই যে, যে সকল বৃত্তির অনুশীলন করিলে সাহিত্যের মর্ম গ্রহণ করা যায়, তুমি চিরকাল সেই সকল বৃত্তিগুলির অনুশীলন করিয়াছ, কাজেই তাহাতে আনন্দ লাভ কর। যে সকল বৃত্তির অনুশীলনে ধর্মের মর্ম গ্রহণ করা যায়, তুমি সেগুলির অনুশীলন কর নাই, এজন্য তাহার আলোচনায় তুমি আনন্দ লাভ কর না। কিন্তু এখন সেগুলির আলোচনা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে। কেন না, তাহাতেই সুখ। সাহিত্যের আলোচনায় সুখ আছে বটে, কিন্তু যে সুখ তোমার উদ্দেশ্য এবং প্রাপ্য হওয়া উচিত, সাহিত্যের সুখ তাহার ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। সাহিত্যও ধর্ম ছাড়া নহে। কেন না, সাহিত্য সত্যমূলক। যাহা সত্য, তাহা ধর্ম। যদি এমন কুসাহিত্য থাকে যে, তাহা অসত্যমূলক ও অধর্মময়, তবে তাহার পাঠে দুঃখ বা বিকৃতরূচি পাঠক ভিন্ন কেহ সুখী হয় না। কিন্তু সাহিত্যে যে সত্য ও যে ধর্ম, সমস্ত ধর্মের তাহা এক অংশ মাত্র। অতএব কেবল সাহিত্য নহে, যে মহত্ত্বের অংশ এই সাহিত্য, সেই ধর্মই এইরূপ আলোচনীয় হওয়া উচিত। সাহিত্য ত্যাগ করিও না, কিন্তু সাহিত্যকে নিম্ন সোপান করিয়া ধর্মের মণ্ডে আরোহণ কর।

কিন্তু ইহাও যেন স্মরণ থাকে যে, গোড়ায় কিছু দুঃখ কষ্ট না করিয়া কোন সুখই লাভ করা

যায় না। বিলাসী ও পাপিষ্ঠ, যে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকেই সুখ মনে করে, তাহারও উপাদান যত্নে ও কষ্টে আহরণ করিতে হয়। ধর্মালোচনার যে অসীম অনির্বচনীয় আনন্দ, তাহার উপভোগের জন্য প্রয়োজনীয় যে ধর্মমন্দিরের নিম্ন সোপানে যে সকল কঠিন ও ককর্শ তত্ত্বগুলি বন্ধুর প্রস্তরের মত আছে, সেগুলিকে আগে আপনার আয়ত্ত কর। অতএব আপাততঃ ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ ককর্শ বোধ হইলেও তাহার প্রতি অনাদর করা অনর্চিত।

চিত্তশুদ্ধি*

হিন্দুধর্মের সার চিত্তশুদ্ধি। যাহারা হিন্দুধর্মের বিশেষ অনুরাগী অথবা হিন্দুধর্মের যথার্থ মর্মের অনুসন্ধানের ইচ্ছুক, তাহাদিগকে এই তত্ত্বের প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিবার জন্য অনুরোধ করি। হিন্দুধর্মাস্তর্গত আর কোন তত্ত্বই ইহার ন্যায় মর্মগত নহে। সাকারের উপাসনা বা নিরাকারের উপাসনা, একেশ্বরবাদ বা বহুদেবে ভক্তি, দ্বৈতবাদ বা অদ্বৈতবাদ, জ্ঞানবাদ, কর্মবাদ বা ভক্তিবাদ, সকলই ইহার নিকট অর্কিণ্ডকর। চিত্তশুদ্ধি থাকিলে সকল মতই শুদ্ধ, চিত্তশুদ্ধির অভাবে সকল মতই অশুদ্ধ। যাহার চিত্তশুদ্ধি নাই, তাহার কোন ধর্মই নাই। যাহার চিত্তশুদ্ধি আছে, তাহার আর কোন ধর্মই প্রয়োজন নাই। চিত্তশুদ্ধি কেবল হিন্দুধর্মেরই সার, এমত নহে, ইহা সকল ধর্মের সার। ইহা হিন্দুধর্মের সার, খ্রীষ্টধর্মের সার, বৌদ্ধধর্মের সার, ইসলামধর্মের সার, নিরীশ্বর কোমণ্ডধর্মেরও সার। যাহার চিত্তশুদ্ধি আছে, তিনি শ্রেষ্ঠ হিন্দু, শ্রেষ্ঠ খ্রীষ্টীয়ান, শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ, শ্রেষ্ঠ মুসলমান, শ্রেষ্ঠ পর্জিটিভিষ্ট। যাহার চিত্তশুদ্ধি নাই, তিনি কোন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ধার্মিক বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। চিত্তশুদ্ধিই ধর্ম। তবে প্রধানতঃ হিন্দুধর্মই ইহা প্রবল। যাহার চিত্তশুদ্ধি নাই, তিনি হিন্দু নহেন। মন্বাদি ধর্মশাস্ত্রের সমস্ত বিধি-বিধানানুসারে কার্য করিলেও তিনি হিন্দু নহেন।

এই চিত্তশুদ্ধি কি, তাহা দুই একটা লক্ষণের দ্বারা বুঝাইতেছি। চিত্তশুদ্ধির প্রথম লক্ষণ ইন্দ্রিয়ের সংযম। “ইন্দ্রিয় সংযম” ইতি বাক্যের দ্বারা এমন বুঝিতে হইবে না যে, ইন্দ্রিয়সকলের একেবারে উচ্ছেদ বা ধ্বংস করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিতে হইবে, কেবল ইহাই বুঝিতে হইবে। উদাহরণ, ঔদারিকতা একজাতীয় ইন্দ্রিয়পরতা, কিন্তু এ ইন্দ্রিয়ের সংযম-বিধিতে এমন বুঝিতে হইবে না যে, পেটে কখন খাইবে না বা কেবল বায়ু ভক্ষণ করিবে বা কদর্য আহার করিয়া থাকিবে। শরীররক্ষার জন্য এবং স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যে পরিমাণ এবং যে প্রকার আহারের প্রয়োজন, তাহা অবশ্য করিতে হইবে, তাহাতে ইন্দ্রিয়সংযমের কোন বিঘ্ন হয় না। ইন্দ্রিয়সংযম তত কঠিন ব্যাপার নহে। ইহাও বলা যাইতে পারে যে, সংযতেইন্দ্রিয়ের পক্ষে উত্তম আহারাদিও অবিধেয় নহে, যদি তাহাতে স্পৃহা না থাকে।† স্থূল কথা এই যে, ইন্দ্রিয়ে আসক্তির অভাবই ইন্দ্রিয়সংযম। আত্মরক্ষার্থে বা ধর্মরক্ষার্থে অর্থাৎ ঐশিক নিয়মরক্ষার্থে যতটুকু ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা আবশ্যিক, তাহার অতিরিক্ত যে ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির অভিলাষ করে, তাহারই ইন্দ্রিয় সংযত হয় নাই; যে না করে, তাহার হইয়াছে। যাহার ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তিতে সুখ নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, কেবল ধর্মরক্ষা আছে, তাহারই ইন্দ্রিয় সংযত হইয়াছে।

এমন অনেক লোক দেখা যায় যে, ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তিতে একেবারে বিমুখ, কিন্তু মনের কলুষ ক্ষালিত করে নাই। লোকলজ্জায় বা লোকের নিকট প্রতিপত্তির জন্য কিম্বা ঐহিক উন্নতির জন্য অথবা ধর্মের ভাণ্ডে পীড়িত হইয়া তাহারা সংযতেইন্দ্রিয়ের ন্যায় কার্য করে, কিন্তু ভিতরে ইন্দ্রিয়ের দাহ বড় প্রবল। আজন্ম মৃত্যু পর্যন্ত তাহারা কখনও স্থলিতপদ না হইলেও তাহারা

* প্রচার, ১২৯২, ফাল্গুন।

† রাগদ্বৈষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন।

আত্মবশ্যস্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ গীতা। ২য় অ। ৬৪।

অর্থ। রাগ দ্বৈষ হইতে বিমুক্ত আত্মবশ্য যে ইন্দ্রিয়গণ, তদ্বারা বিষয়সকল উপভোগ করিয়া বিধেয়াত্মা ব্যক্তি শান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

বাংকম রচনাবলী

ইন্দ্রিয়সংযম হইতে অনেক দূরে। যাঁহারা মূহূর্মূহূঃ ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তিতে উদ্যোগী ও কৃতকার্য, তাঁহাদিগের হইতে এই ধর্ম্মাঙ্গদের প্রভেদ বড় অল্প। উভয়েই তুল্যরূপে ইহলোকের নরকের অগ্নিতে দক্ষ। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত কর বা না কর, যখন ভ্রমেও মনে ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির কথা আসিবে না—যখন রক্ষার্থ বা ধর্ম্মার্থ ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে হইলেও তাহা দুঃখের বিষয় ব্যতীত সুখের বিষয় বোধ হইবে না, তখনই ইন্দ্রিয়ের সংযম হইয়াছে। তদভাবে যোগ তপস্যা কঠোর সকলই বৃথা। এই কথা স্পষ্টীকৃত করিবার জন্য হিন্দু পুরাণেতিহাসে ঋষিদিগের সম্বন্ধে ভূরি ভূরি রহস্যোপন্যাস আছে। স্বর্গ হইতে একজন অপ্সরা আসিল, আর অর্মানি ঋষি ঠাকুরের যোগ ভঙ্গ হইল, তিনি অর্মানি নানাবিধ গোলযোগ উপস্থিত করণে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সকল উপন্যাস হইতে আমরা এই কয়টি চমৎকার শিক্ষা প্রাপ্ত হই যে, যোগে বা তপস্যায় ইন্দ্রিয়সংযম পাওয়া যায় না। কার্যক্ষেত্রেই, সংসারধর্মেই ইন্দ্রিয়সংযম লাভ করা যায়। প্রত্যহ অরণ্যে বাস করিয়া, ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উপাদানসকল হইতে দূরে থাকিয়া, সকল বিষয়ে নির্লিপ্ত হইয়া, মনে করা যায় বটে যে, আমি ইন্দ্রিয়জয়ী হইয়াছি; কিন্তু যে মৎপাত্রে অগ্নি-সংস্কৃত হয় নাই, সে যেমন স্পর্শমাত্রে টিকে না, এই ইন্দ্রিয়সংযমও তেমনি লোভের স্পর্শমাত্র টিকে না। যে প্রত্যহ ইন্দ্রিয়চরিতার্থের উপযোগী উপাদানসমূহের সংসর্গে আসিয়াছে, তাহাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া কখন জয়ী, কখন বিজিত হইয়াছে, সেই পরিশেষে ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারিয়াছে। বিশ্বামিত্র বা পরাশর ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারেন নাই। ভীষ্ম বা লক্ষ্মণ পারিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের এই একটি অতি নিগূঢ় কথা কহিলাম।

কিন্তু ইন্দ্রিয়সংযম অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ কথা। চিত্তশুদ্ধির তাহার অপেক্ষা গুরুতর লক্ষণ আছে। অনেকের ইন্দ্রিয় সংযত, কিন্তু অন্য কারণে তাঁহাদিগের চিত্ত শুদ্ধ নয়। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করিব না, কিন্তু আমি ভাল থাকিব, আমারগুলি ভাল থাকিবে, এই বাসনা তাঁহাদের মনে বড় প্রবল। আমার ধন হউক, আমার মান হউক, আমার সম্পদ হউক, আমার যশ হউক, আমার সৌভাগ্য হউক, আমি বড় হই, আর সবাই আমার অপেক্ষা ছোট হউক, তাঁহারা এইরূপ কামনা করেন। এই সকল অভীষ্ট যাহাতে সিদ্ধ হয়, চিরকাল অনূর্দিন সেই চেষ্টায়, সেই উদ্যোগে ব্যস্ত থাকেন। সে জন্য না করেন এমন কাজ নাই, তন্ত্ৰ মন দেন, এমন বিষয় নাই। যাহারা ইন্দ্রিয়াসক্ত, তাহাদের অপেক্ষাও ইঁহারা নিকৃষ্ট। ইঁহাদের নিকট ধর্ম্ম কিছই নহে, কর্ম্ম কিছই নহে, জ্ঞান কিছই নহে, ভক্তি কিছই নহে। তাঁহারা ঈশ্বর মানিলেও কার্যতঃ তাঁহাদের কাছে ঈশ্বর নাই, জগৎ থাকিলেও তাঁহাদের কাছে জগৎ নাই, কেবল আপনিই আছেন, আপনি ভিন্ন আর কিছই নাই। ইন্দ্রিয়াসক্তির অপেক্ষাও এই আত্মাদর, এই স্বার্থপরতা, চিত্তশুদ্ধির গুরুতর বিঘ্ন। পরার্থপরতা ভিন্ন চিত্তশুদ্ধি নাই। যখন আপনি যেমন, পর তেমন, এই কথা বুঝিব, যখন আপনার সুখ যেমন খুঁজিব, পরের সুখ তেমনি খুঁজিব, যখন আপনা হইতে পরকে ভিন্ন ভাবিব না, যখন আপনার অপেক্ষাও পরকে আপনার ভাবিব, যখন ক্রমশঃ আপনাকে ভুলিয়া গিয়া, পরকে সর্বস্ব জ্ঞান করিতে পারিব, যখন পরেতে আপনাকে নির্মজ্জিত রাখিতে পারিব, যখন আমার আত্মা এই বিশ্বব্যাপী বিশ্বময় হইবে, তখনই চিত্তশুদ্ধি হইবে। তাহা না হইলে ডোরকোপীন ধারণ করিয়া সমস্ত সংসার পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক দ্বারে দ্বারে হরিনাম করিয়া ফিরিলে চিত্তশুদ্ধি হইবে না। পক্ষান্তরে, রাজসিংহাসনে হীরক-মণ্ডিত হইয়া বসিয়াও যে রাজা জনৈক ভিক্ষুক প্রজার দুঃখ আপনার দুঃখের মত ভাবে, তাহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে। যে ঋষি, বিশ্বামিত্রকে একটি গাভীদান করিতে পারিলেন না, তাঁহার চিত্তশুদ্ধি হয় না। যে রাজা, অঙ্কগত কপোতের বিনিময়ে আপনার মাংস কাটিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহারই চিত্তশুদ্ধি হইয়াছিল।

ইহা অপেক্ষাও চিত্তশুদ্ধির গুরুতর লক্ষণ আছে। যিনি সকল শুদ্ধির স্রষ্টা, যিনি শুদ্ধিময়, যাঁহার কৃপায় শুদ্ধি, যাঁহার চিন্তায় শুদ্ধি, যাঁহার অনুকম্পা ব্যতীত শুদ্ধি নাই, তাঁহাতে গাঢ় ভক্তি চিত্তশুদ্ধির প্রধান লক্ষণ। ইন্দ্রিয়সংযমই বল, আর পরার্থপরতাই বল, তাঁহার সম্পূর্ণ স্বভাবের চিন্তা এবং তৎপ্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ব্যতীত কখনই লক্ষ হইতে পারে না। এই ভক্তি চিত্তশুদ্ধির মূল এবং ধর্ম্মের মূল।

চিত্তশুদ্ধির প্রথম লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহার স্থূল তাৎপর্য হৃদয়ে শান্তি। দ্বিতীয় লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহার স্থূল তাৎপর্য মনুষ্যে প্রীতি। তৃতীয় লক্ষণ,

বিবিধ প্রবন্ধ—চিত্তশুদ্ধি

ঈশ্বরে ভক্তি। অতএব চিত্তশুদ্ধির স্থূল লক্ষণ ঈশ্বরে ভক্তি, মনুষ্যে প্রীতি এবং হৃদয়ে শান্তি। ইহাই হিন্দুধর্মের মর্মকথা।

ভক্তি-প্রীতি-শান্তি-লক্ষণাক্রান্ত এই চিত্তশুদ্ধি হিন্দু শাস্ত্রকারেরা কিরূপে বুঝাইয়াছেন, তাহার উদাহরণস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত, তৃতীয় স্কন্ধ হইতে নিম্নলিখিত ভগবদুক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

“লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নিগূণস্য হৃদাহতং ।
 অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥ ১০ ॥
 সালোক্য-সার্শ্টি-সামীপ্য-সারূপৈকত্বমপ্যত ।
 দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ ১১ ॥
 স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহতঃ ।
 যেনাতিরজ্য ত্রিগুণান্মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১২ ॥
 নিষেবিতানিমিত্তেন সধর্মেণ মহীয়সা ।
 ক্রিয়াযোগেন শস্তেন নার্তিহিংস্রেন নিত্যশঃ ॥ ১৩ ॥
 মাদ্বিষ্যদর্শনস্পর্শপূজাস্তুত্যাভিবন্দনৈঃ ।
 ভূতেষু মদ্ভাবনয়া সত্বেনাসঙ্গমেন চ ॥
 মহতাং বহুমানেন দীনানামনুকম্পয়া ।
 মৈত্র্যা চৈবাত্মতুল্যেষু যমেন নিয়মেন চ ॥
 আধ্যাত্মিকানুশ্রবণান্নামসংকীর্ণনাচ্চ মে ।
 আর্জ্জবৈনার্যসঙ্গেন নিরহংক্রিয়য়া তথা ॥ ১৪ ॥
 মদ্বর্মাণো গুণৈরেতৈঃ পরিসংশুদ্ধাশয়ঃ ।
 পুরুষস্যাজসাত্ত্যোতি শ্রুতমাত্রগুণং হি মাম্ ॥ ১৫ ॥
 যথা বাতরথো ঘ্রাণমাবুঙ্তে গন্ধ আশয়াৎ ।
 এবং যোগরতং চেত আত্মানমবিকারি যৎ ॥ ১৬ ॥
 অহং সর্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা ।
 তমবজ্জায় মাং মর্ত্যঃ কুরুতেহর্চাবিড়ম্বনম্ ॥ ১৭ ॥
 যো মাং সর্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং ।
 হিত্বার্চ্যাং ভজতে মোঢ়্যাত্মস্মন্যেব জুহোতি সঃ ॥
 দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ ।
 ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমর্চ্ছতি ॥ ১৮ ॥
 অহমুচ্চাবচৈর্দ্রবৈঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়ানঘে ।
 নৈব তুষোচ্চীতোহর্চ্যায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ ॥ ১৯ ॥
 অর্চাদাবর্চয়েত্তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্মকুৎ ।
 যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্বভূতেশ্ববাস্থিতম্ ॥ ২০ ॥
 আত্মনশ্চ পরস্যাপি যঃ করোত্যন্তরোদরং ।
 তস্য ভিন্নদর্শো মৃত্যুর্বিদধে ভয়মূল্বণম্ ॥ ২১ ॥
 অথ মাং সর্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্ ।
 অহংয়েন্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিনেন চক্ষুষা ॥ ২২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত, ৩য় স্কন্ধ, ২৯শ অধ্যায়।

ইহার অর্থ

“মা! নিগূণ ভক্তিযোগ কিরূপ, তাহাও বলি, শ্রবণ করুন। আমার গুণ শ্রবণমাত্রে সর্বাস্তুর্যামী যে আমি, আমাতে অর্থাৎ পুরুষোত্তমে সমুদ্রগামী গঙ্গাসলিলের ন্যায় অবিচ্ছিন্না ও ফলানুসন্ধানরহিতা এবং ভেদদর্শনবর্জিতা মনের গতিরূপ যে ভক্তি, তাহাই নিগূণ ভক্তি-যোগের লক্ষণ। ১০ । যে সকল ব্যক্তির এইরূপ ভক্তিযোগ হয়, তাহাদের কোনই কামনা থাকে না, অধিক কি, তাহাদিগকে সালোক্য (আমার সহিত এক লোকে বাস), সার্শ্টি (আমার

বিশ্বকম রচনাবলী

তুল্য ঐশ্বর্য), সামীপ্য (সমীপবর্তিত্ব), সারূপ্য (সমানরূপত্ব) এবং একত্ব অর্থাৎ সাযুজ্য, এই সকল মনুষ্টি দিতে চাহিলেও তাঁহারা আমার সেবা ব্যতিরেকে কিছুই গ্রহণ করিতে চাহেন না। ১১। মা! ঐ প্রকার ভক্তিযোগকেই আত্যন্তিক বলা যায়, উহা হইতে পরমপুরুষার্থ আর নাই। মানবি! ত্রেগুণ্য ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তি পরম ধন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে সত্য, কিন্তু তাহা আমার ঐ ভক্তির আনুষ্ঠানিক ধন, ভক্তিযোগেই ত্রেগুণ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। ১২। মা! ঐ প্রকার ভক্তির সাধন বলি, শ্রবণ করুন। ধনাভিসন্ধি পরিত্যাগপূর্বক নিত্যনৈমিত্তিক স্ব স্ব ধর্মের অনুষ্ঠান এবং নিত্য শ্রদ্ধাদিযুক্ত হইয়া নিষ্কামে অনতিহিংস্র অর্থাৎ একবারে হিংসাদি বর্জন না করিয়া পঞ্চরাত্রাদিযুক্ত পূজাপ্রকরণ দ্বারা। ১৩। আমার প্রতিমাদি দর্শন, স্পর্শন, পূজন, শ্রবণ, বন্দন, সকল প্রাণীতে আমার ভাব চিন্তাকরণ, ধৈর্য, বৈরাগ্য, মহৎ ব্যক্তিদিকে বহু সম্মানকরণ, দীনের প্রতি অনুকম্পা, আত্মতুল্য ব্যক্তিতে মৈত্রতা, যম অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, নিয়ম অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয় দমন, আত্মবিষয়ক শ্রবণ, আমার নাম সংকীর্তন, সরলতাচরণ, সতের সঙ্গকরণ এবং নিরহঙ্কারিতা প্রদর্শন। ১৪। ঐ সকল গুণ দ্বারা ভগবৎস্মানুষ্ঠানকারী পুরুষের চিত্ত সর্বতোভাবে শুদ্ধ হয়, এবং সেই পুরুষ আমার গুণ শ্রবণ মাত্রে বিনা প্রযত্নে আমাকে প্রাপ্ত হয়। ১৫। ফলতঃ যেমন গন্ধ বায়ুযোগে স্বস্থান হইতে আসিয়া ঘাণকে আশ্রয় করে, তাহার ন্যায় ভক্তিযোগযুক্ত অধিকারী চিত্ত বিনা প্রযত্নেই পরমাত্মাকে আত্মসাৎ করে। ১৬। এই প্রকার চিত্তশুদ্ধি সর্বপ্রাণীতে আত্মদৃষ্টি দ্বারাই হয়, আমি সকল ভূতের আত্মস্বরূপ হইয়া সর্বপ্রাণীতেই সতত অবস্থিত আছি, অথচ কোন কোন ব্যক্তি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া প্রতিমাদিতে পূজারূপ বিভ্রম্বনা করিয়া থাকে। ১৭। পরন্তু আমি সর্বপ্রাণীতে বর্তমান ও সকলের আত্মা এবং ঈশ্বর; যে ব্যক্তি মৃত্যুপ্রযুক্ত আমাকে উপেক্ষা করিয়া প্রতিমা পূজা করে, তাহার কেবল ভস্ম আহুতি প্রদান করা হয়। সে পরদেহে আমাকে দ্বেষ করে এবং অভিমানী ভিন্নদর্শী ও সকল প্রাণীর সহিত বন্ধবৈর হয়, সুতরাং তাহার মন শান্তি প্রাপ্ত হয় না। ১৮। হে অনঘে! যে ব্যক্তি প্রাণসমূহের নিন্দাকারী, সে যদি বিবিধ দ্রব্য ও বিবিধ দ্রব্যে উৎপন্নাদি ক্রিয়া দ্বারা আমার প্রতিমাতে আমার পূজা করে, তথাচ আমি তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হই না। ১৯। মা! এমত বিবেচনা করিবেন না যে, প্রতিমাদিতে অর্চনা করা বিফল। পুরুষ যে পর্যন্ত সর্বপ্রাণীতে অবস্থিত যে আমি, আমাকে আপনার হৃদয়মধ্যে জানিতে না পারে, তাবৎ পর্যন্ত স্বকর্মে রত হইয়া প্রতিমাদিতে অর্চনা করিবে। ২০। পরন্তু যে মৃত্ত আপনার ও পরের মধ্যে অত্যল্পও ভেদ দর্শন করে অর্থাৎ যাহার আপনার দঃখের তুল্য পরের দঃখ অনুভব হয় না, আমি সেই ভিন্নদর্শী ব্যক্তির প্রতি মৃত্যুস্বরূপ হইয়া ঘোরতর ভয় বিধান করি। ২১। অতএব পুরুষের কর্তব্য যে, আমাকে সর্বভূতের অন্তর্যামী এবং সকল প্রাণীতে অবস্থিত জানিয়া দান, মান ও সকলের সহিত মিত্রতা এবং সমদৃষ্টি দ্বারা সকলকে অর্চনা করে। ২২।”*

চিত্তশুদ্ধি সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি হিন্দুধর্মের সকল গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, বাহুল্যে প্রয়োজন নাই। হিন্দুদিগের স্মরণ থাকে যেন যে, চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত প্রতিমাদি পূজায় কোন ধর্ম নাই। সে স্থলে প্রতিমাদির পূজা বিভ্রম্বনা মাত্র।

এই চিত্তশুদ্ধি মনুষ্যদিগের সকল বৃত্তিগুলির সম্যক্ স্ফূর্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্যের ফল। ভক্তি ও প্রীতি কার্যকারিণী বৃত্তি। কিন্তু কেবল কার্যকারিণী বৃত্তির অনুশীলনে ধর্মলাভ হইতে পারে না। জ্ঞানার্জনী বৃত্তির অনুশীলন ব্যতীত ধর্মের স্বরূপজ্ঞান হইতে পারে না। চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলির অনুশীলন ব্যতীত ধর্মের মাহাত্ম্য এবং সৌন্দর্য্য সম্যক্রূপ উপলব্ধ হয় না, এবং চিত্তশুদ্ধির সকল পথ পরিষ্কার হয় না। শারীরিক বৃত্তিসকলের সমুচিত অনুশীলন ব্যতীত ধর্মানুমোদিত কার্যের উপযোগী ক্ষমতা জন্মে না এবং হৃদয়ও শান্তিলাভ করে না। অতএব চিত্তশুদ্ধি, সকল বৃত্তিগুলির সম্যক্ অনুশীলন ও সামঞ্জস্যেরই ফল।

* শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ বিদ্যারত্নকৃত অনুবাদ। অনুবাদে মূলভিত্তিক দুই একটা শব্দ আছে।

বিবিধ প্রবন্ধ—গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার ঝড়ালি

গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার ঝড়ালি

১। রামবল্লভবাবুর ভিক্ষাদান*

আমি বাবাজির চেলা, এবং ভিক্ষার ঝড়ালির বর্তমান অধিকারী। বাবাজির গোলোকপ্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি ভিক্ষা করিয়া নানা রত্ন আহরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি ভিন্ন আর কেহ তাঁহার উত্তরাধিকারী না থাকায়, আমাকে সেগড়ালি দিয়া গিয়াছেন। আমিও খয়রাৎ করিব ইচ্ছা করিয়াছি। আগে নমুনা দেখাই।

একদা বাবাজির সঙ্গে রামবল্লভবাবুর বাড়ী ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। আমরা “রাধে গোবিন্দ” বলিয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইলাম। রামবল্লভবাবু ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, “বাবাজি! একবার হরিনাম কর!”

আমি মনে মনে ভাবিতোঁছিলাম, রামবল্লভবাবু হরিনামের কি ধার ধারেন! কিন্তু হরিপ্রেমে গদগদ বাবাজি তখন একতারা বাজাইয়া আরম্ভ করিলেন, “তুমি কোথায় হে! দয়াময় হরি! একবার দেখা দাও হরি!—”

গীত আরম্ভ হইতেই সেই বাবু মহাশয় রঙ্গ করিয়া বাবাজিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার হরি কোথায়, বাবাজি?”

আমি মনে করিলাম, প্রহ্লাদের মত উত্তর দিই, “এই স্তম্ভে।” ইচ্ছা করিলাম, প্রভু স্তম্ভ হইতে নিগত হইয়া দ্বিতীয় হিরণ্যকশিপুর মত এই বাবুটাকে ফাড়িয়া ফেলুন—নরসিংহের হস্তে নরবানরের ধ্বংস দেখিয়া চক্ষু তৃপ্ত করি। কিন্তু আমি প্রহ্লাদ নহি, চূপ করিয়া রহিলাম। বাবাজি বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, “হরি কোথায়! তা আমি কি জানি! জানিলে কি তোমার কাছে আসি? তাঁহারই কাছে যাইতাম।”

রামবল্লভ। তবু তাঁর একটা থাকবার যায়গা কি নাই? হরির একটা বাড়ী ঘর নাই?

বাবাজি। আছে বৈ কি? তিনি বৈকুণ্ঠে থাকেন।

বাবু। বৈকুণ্ঠ এখান থেকে কত দূর, বাবাজি?

বাবাজি। তোমার আমার নিকট হইতে অনেক দূর।

বাবু। নিকট তবে কার?

বাবাজি। যাহার কুণ্ঠা নাই।

বাবু। কুণ্ঠা কি?

বাবাজি। বুঝেছি—কালেজের সাহেবেরা টাকাগড়লো ঠকাইয়া লইয়াছে। আমাকে দিলে বেশী উপকার হইত, হরিনাম শিখাইতাম। এখন অভিধান খোল।

বাবু। ঘরে অভিধান নাই। এক জন চাহিয়া লইয়া গিয়াছে।

বাবাজি। অভিধান তোমার কখন ছিল না, এ কথা স্বীকার করিতে অত কুণ্ঠিত হইতেছ কেন?

বাবু। অহো—সেই কুণ্ঠা! কুণ্ঠা—কুণ্ঠিত। যেখানে কেহ কুণ্ঠিত হয় না, সেই বৈকুণ্ঠ?† এমনি স্থান কি আছে?

বাবাজি। বাহিরে নাই—ভিতরে আছে।

বাবু। ভিতরে—কিসের ভিতরে?

বাবাজি। মনের ভিতরে। যখন তোমার মনের এরূপ অবস্থা হইবে যে, ইহজগতে আর কিছুতেই কুণ্ঠিত হইবে না—যখন চিন্ত বশীভূত, ইন্দ্রিয় দমিত, ঈশ্বরে ভক্তি, মনুষ্যে প্রীতি, হৃদয়ে শান্তি উপস্থিত হইবে, যখন সকলেই বৈরাগ্য, সকলেই সমান সুখ,—তখন তুমি পৃথিবীতে থাক বা না থাক, সংসারে থাক বা না থাক, তুমি তখন বৈকুণ্ঠে।

* প্রচার, ১২৯১, পৌষ।

† বাবাজির ব্যাকরণ অভিধানে কত দূর দখল, বলিতে পারি না। বৈকুণ্ঠ বিষ্ণুর একটি নাম। পণ্ডিতেরা বলেন, বিবিধা কুণ্ঠা ময়া যস্য স বৈকুণ্ঠঃ। কিন্তু বাবাজি যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাও শাস্ত্রসম্মত।

বাঁকম রচনাবলী

বাবু। তবে বৈকুণ্ঠ একটা শহর টহর কিছন্ন নয়—কেবল মনের অবস্থা মাত্র। তবে না বিষ্ণু সেখানে বাস করেন?

বাবাজি। কুণ্ঠাশূন্য নির্বিকার যে চিত্ত, তিনি সেইখানে বাস করেন। বৈরাগীর হৃদয়ে তাঁহার বাসস্থান—এই জন্য তিনি বৈকুণ্ঠনাথ।

বাবু। সে কি? তিনি যে শরীরী। যাঁর শরীর আছে, তাঁর একটা বাসস্থান চাই।

বাবাজি। শরীরটা কি রকম বল দেখি?

বাবু। তাঁকে তোমরা চতুর্ভুজ বল।

বাবাজি। তা বটে। তাঁহার চারি হাত বলি। মনে কর দেখি, চারি হাতে কি কি আছে!

বাবু। শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম।

বাবাজি। একে একে। আগে পদ্মটা বুঝ। কিন্তু বুঝিবার আগে মনে কর, ঈশ্বর করেন কি?

বাবু। কি করেন?

বাবাজি। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়। সৃষ্টি-বাদ দুই রকম আছে। এক মত এই যে, আদৌ জগতের উপাদান মাত্র ছিল না, ঈশ্বর আদৌ উপাদান সৃষ্টি করিয়া, পরে তাহাকে রূপাদি দিয়াছেন। আর এক মত এই যে, জগতের উপাদান নিত্য, ঈশ্বর কল্পে কল্পে তাহা রূপাদি-বিশিষ্ট করেন। এই দ্বিতীয়বিধ সৃষ্টির শক্তি জগতের কেন্দ্রে। শূন্যই, সাহেবদেরও না কি এমনই একটা মত আছে।* সৃষ্টির মূলীভূত এই জগৎকেন্দ্র হিন্দুশাস্ত্রে নারায়ণের নাভিপদ্ম বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। বিষ্ণুর হাতে যে পদ্ম, তাহা সৃষ্টিক্রিয়ার প্রতিমা।

বাবু। আর তিনটা?

বাবাজি। গদা লয়ক্রিয়ার প্রতিমা। শঙ্খ ও চক্র স্থিতিক্রিয়ার প্রতিমা। জগতের স্থিতি স্থানে ও কালে। স্থান, আকাশ। আকাশ শব্দবহু, শব্দময়। তাই শব্দময় শঙ্খ আকাশের প্রতিমাস্বরূপ বিষ্ণুহস্তে স্থাপিত হইয়াছে।

বাবু। আর চক্র?

বাবাজি। উহা কালের চক্র। কল্পে কল্পে, যুগে যুগে, মন্বন্তরে মন্বন্তরে কাল বিবর্তনশীল। তাই কাল ঈশ্বর-হস্তে চক্রাকারে আছে। আকাশ, কাল, শক্তি ও সৃষ্টি, জগদীশ্বর চারি ভুজে এই চারিটি ধারণ করিতেছেন। এখন বুঝিলে, বিষ্ণুর শরীর নাই। বিষ্ণু বৈকুণ্ঠেশ্বর, ইহার তাৎপর্য এই যে, কুণ্ঠাশূন্য ভয়মুক্ত বৈরাগী, ঈশ্বরকে স্রষ্টা, পাতা, হস্তী বলিয়া অনুক্ষণ হৃদয়ে ধ্যান করে।

বাবু। তাই বলিলেই ত ফুরাইত। সবাই ত তা স্বীকার করে, আবার এ রূপকল্পনা কেন?

বাবাজি। সবাই স্বীকার করিবে, কলিকাতা ইংরেজের; তবে আবার একটা মাসুল খাড়া করিয়া তাতে ইংরেজের নিশান উড়াইবার দরকার কি? পৃথিবীর সবই এইরূপ কল্পনাতে চলিতেছে: তবে আমার মত মূর্খের ভক্তির পথে কাঁটা দিবার এত চেষ্টা কেন?

বাবু। আচ্ছা, যথার্থই যদি বিষ্ণু অশরীরী, তবে নীল বর্ণ কার? অশরীরীর আবার বর্ণ কি?

বাবাজি। আকাশের ত নীল বর্ণ দেখ—আকাশ কি শরীরী? ভাল, তোমাদের ইংরেজি শাস্ত্রে কি বলে? জগৎ অঙ্ককার, না আলো?

বাবু। জগৎ অঙ্ককার।

বাবাজি। তাই বিশ্বরূপ বিষ্ণু নীলবর্ণ।

বাবু। কিন্তু জগতে মাঝে মাঝে সূর্য্যও আছে—আলোও আছে।

বাবাজি। বিষ্ণুর হৃদয়ে কৌস্তুভ মণি আছে। কৌস্তুভ—সূর্য্য; বনমালা—গ্রহ-নক্ষত্রাদি।

বাবু। ভাল, জগৎই কি বিষ্ণু?

বাবাজি। না। যিনি জগতে সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট, তিনিই বিষ্ণু। জগৎ শরীর, তিনি আত্মা।

বাবু। ভাল, যিনি অশরীরী জগদীশ্বর, তাঁর আবার দুইটা বিয়ে কেন? বিষ্ণুর দুই পরিবার, লক্ষ্মী আর সরস্বতী।

* La Placian hypothesis.

বিবিধ প্রবন্ধ—গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার ঝুলি

বাবাজি। অভিধান কিনিয়া পড়িয়া দেখ, লক্ষ্মী অর্থে সৌন্দর্য্য। শ্রী, রমা প্রভৃতি লক্ষ্মীর আর আর নামেরও সেই অর্থ। সরস্বতী জ্ঞান। বিষ্ণু সৎ, সরস্বতী চিৎ, আর লক্ষ্মী আনন্দ। অতএব রে মূর্খ! এই সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মকে প্রণাম কর।

সর্বনাশ! রামবল্লভবাবুকে, তাঁহার স্বভবনে, “রে মূর্খ!” সম্বোধন! রামবল্লভবাবু তখনই দ্বারবানকে হুকুম দিলেন, “মারো বদজাতকো!”

আমি বাবাজির ঝুলি ধরিয়া তাঁহাকে টানিয়া বাহির করিয়া দুই জনে সরিয়া পড়িলাম। বাহিরে আসিয়া বাবাজিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “বাবাজি! আজিকার ভিক্ষায় পেলে কি?”

বাবাজি বলিলেন, “বদ পুস্কক জন ধাতুর উত্তর স্ত করিয়া যা হয়, তাই। ভিক্ষার ধনটা ঝুলির ভিতর লুকাইয়া রাখ।”

শ্রীহরিদাস বৈরাগী।

২। পূজাবাড়ীর ভিক্ষা*

নবমী পূজার দিন বাবাজিকে খুঁজিয়া পাইলাম না। অবশ্য ইহা সম্ভব যে, তিনি পূজাবাড়ীতে হরিনাম করিয়া বেড়াইতেছেন। ইহাও অসম্ভব নহে যে, সেই অমূল্য অমৃতময় নামের বিনিময়ে তিনি সনদেশাদি লোষ্ট্র গ্রহণপুস্কক, বৈষ্ণবদিগের বদান্যতা এবং মাহাত্ম্য সপ্রমাণ করিবেন। এক মুঠা চাউল লইয়া যে হরিনাম শুনায়, তার চেয়ে আর দাতা কে? এই সকল কথার সর্বশেষ আলোচনা মনে মনে করিয়া, আমি পূজাপাদ গৌরদাস বাবাজির সন্মানে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। যেখানে পূজাবাড়ীতে দ্বারদেশে ভিক্ষুকশ্রেণী দাঁড়াইয়া আছে, সেইখানেই সন্ধান করিলাম, সে পাকা দাড়ির নিশান উড়িতে ত কোথাও দেখিলাম না। পরিশেষে এক বাড়ীতে দেখিলাম, বাবাজি ভোজনে বসিয়া আছেন।

দেখিয়া বড় সন্তোষ লাভ করিলাম না। বৈষ্ণব হইয়া শক্তির প্রসাদ ভক্ষণ তেমন প্রশস্ত মনে করিলাম না। নিকটে গিয়া বাবাজিকে বলিলাম, “প্রভু! ক্ষুধায় ধর্ম্মের উদারতা বৃদ্ধি করিয়া থাকে, বোধ হয়।”

বাবাজি বলিলেন, “তাহা হইলে চোরের ধর্ম্ম বড় উদার। এ কথা কেন হে বাপু?”

আমি। শক্তির প্রসাদে বৈষ্ণবের সেবা!

বাবাজি। দোষটা কি?

আমি। আমরা কৃষ্ণের উপাসক—শক্তির প্রসাদ খাইব কেন?

বাবাজি। শক্তিটা কি হে বাপু?

আমি। দেবতার শক্তি, দেবতার স্ত্রীকে বলে। যেমন নারায়ণের শক্তি লক্ষ্মী, শিবের শক্তি দুর্গা, ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী, এই রকম।

বাবাজি। দূর হ! পাঁপুষ্ট! উঠিয়া যা! তোর মুখ দেখিয়া আহার করিলে আহারও পণ্ড হয়। দেবতা কি তোর মত বৈষ্ণবী কাড়িয়া ঘরকন্না করে নাকি? দূর হ।

আমি। তবে শক্তি কি?

বাবাজি। এই জলের ঘটিটা তোল দেখি।

আমি জলপূর্ণ ঘটিটা তুলিলাম।

বাবাজি একটা জলের জালা দেখাইয়া বলিলেন, “এটা তোল দেখি!”

আমি। তাও কি পারা যায়?

বাবাজি। তোমার ঘটিটা তুলিবার শক্তি আছে, জালাটা তুলিবার শক্তি নাই। ভাত খাইতে পার?

আমি। কেন পারিব না? রোজ খাই।

বাবাজি। এই জ্বলন্ত কাঠখানা খাইতে পার?

আমি। তাও কি পারা যায়?

* প্রচার, ১২৯২, বৈশাখ।

বিক্রম রচনাবলী

বাবাজি। তোমার ভাত খাইবার শক্তি আছে, আগুন খাইবার শক্তি নাই। এখন বুঝিলে দেবতার শক্তি কি?

আমি। না।

বাবাজি। দেবতা আপন ক্ষমতার দ্বারা আপনার করণীয় কাজ নিৰ্ব্বাহ করেন, সেই ক্ষমতার নাম শক্তি। অগ্নির দাহ করিবার ক্ষমতাই তাঁর শক্তি, তাহার নাম স্বাহা। ইন্দ্র বৃষ্টি করেন, বৃষ্টিকারিণী শক্তির নাম ইন্দ্রাণী। পবন বায়ু-দেবতা, বহনশক্তির নাম পবনানী। রুদ্র সংহারকারী দেবতা, তাঁহার সংহারশক্তির নাম রুদ্রাণী।

আমি। এ সব কি কথা? যে শক্তিতে আমি ঘটি তুলিলাম বা ভাত খাই, তাহা আমি ত চক্ষে কখন দেখি না। কই, আমার সে শক্তি এই দুর্গাঠাকুরাণীর মত সাজিয়া গুঁজিয়া গহনা পরিয়া আমার কাছে আসিয়া বসুক দেখি? আমার বৈষ্ণবী তাহা করিয়া থাকে, সুতরাং আমার বৈষ্ণবীকেই আমার শক্তি বলিতে পারি।

বাবাজি। গন্ডমুখেরা তাই ভাবে। তুমি শরীরী, তোমার শক্তি তোমার শরীরে আছে। তাহা ছাড়া তোমার শক্তি কোথাও থাকিতে পারে না।

আমি। দেবতার কি? শরীরী? তবে তাহাদিগের শক্তিও নিরাকার?

বাবাজি। শরীরী এবং অশরীরী, উভয়েরই শক্তি নিরাকার। কিন্তু একটা একটা করিয়া কথা বুঝ। প্রথমে বুঝ যে, ইন্দ্রাদি দেবতা সকলেই অশরীরী।

আমি। সে কি? ইন্দ্র যদি অশরীরী, তবে স্বর্গের সিংহাসনে বসিয়া অপ্সরাদিগের নৃত্যগীত দেখে কে?

বাবাজি। এ সকল রূপক। তাহার গুঢ়ার্থ না হয় আর একদিন বুঝাইব। এখন বুঝ, যাহা হইতে বৃষ্টি হয়, তাহাই ইন্দ্র। যাহা দাহ করে, তাহাই অগ্নি। যাহা হইতে জীবের বা বস্তুর ধ্বংস হয়, তাহাই রুদ্র।

আমি। বুঝিলাম না। কেহ ব্যামোতে মরে, কেহ ডুবিয়া মরে, কেহ পুড়িয়া মরে, কেহ পাড়িয়া মরে, কেহ কাটিয়া মরে। কোন জীব কাহাকে খাইয়া ফেলে, কেহ কাহাকে মারিয়া ফেলে। কোন বস্তু গলিয়া ধ্বংস হয়, কোন বস্তু শুকাইয়া ধ্বংস হয়, কোন বস্তু গুঁড়া হইয়া যায়, কেহ শুষিয়া যায়। ইহার মধ্যে কে রুদ্র?

বাবাজি। সকলের যে সমষ্টিভাব অর্থাৎ সব একত্রে ভাবিলে যাহা ভাবি, তাই রুদ্র।

আমি। তবে রুদ্র একজন, না অনেক?

বাবাজি। এক। যেমন এই ঘটিতে যে জল আছে, আর এই জালায় যে জল আছে, আর গঙ্গায় যে জল আছে, সব একই জল, তেমন যেখানেই ধ্বংসকারীকে দেখিবে, সর্বত্রই একই রুদ্র জানিবে।

আমি। তিনি অশরীরী?

বাবাজি। তা ত বলিলাম।

আমি। তবে মহাদেবমূর্ত্তি গড়িয়া তাঁহাকে উপাসনা করি কেন? সে কি তাঁর রূপ নয়?

বাবাজি। উপাসনার জন্য উপাস্যের স্বরূপ চিন্তা চাই, নহিলে মনোনিবেশ হয় না। তুমি এই নিরাকার বিশ্বব্যাপী রুদ্রের স্বরূপ চিন্তা করিতে পার?

আমি চেষ্টা করিলাম—পারিলাম না। সে কথা স্বীকার করিলাম। বাবাজি বলিলেন, “যাহারা সেরূপ চিন্তা করিতে শিখিয়াছে, তাহারা পারে। কিন্তু তার জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন। কিন্তু যাহার জ্ঞান নাই, সে কি উপাসনা হইতে বিরত হইবে? তাহা উচিত নহে। যাহার জ্ঞান নাই, সে যেভাবে রুদ্রকে চিন্তা করিতে পারে, সেরূপ করিয়া উপাসনা করিবে। এসব স্থলে রূপ কল্পনা করিয়া চিন্তা করা, সহজ উপায়। তুমি যদি এমন একটা মূর্ত্তি কল্পনা কর যে, তন্দ্বারা সংহারকারিতার আদর্শ বুঝায়, তবে তাহাকে রুদ্রের মূর্ত্তি বলিতে পার। তাই রুদ্রের কালভৈরব রূপ কল্পনা। নচেৎ রুদ্রের কোন রূপ নাই।

আমি। এ ত বুঝিলাম। কিন্তু যেমন আমার শক্তি আমাতেই আছে, রুদ্রের শক্তি অর্থাৎ রুদ্রাণী রুদ্রেই আছে। শিব দুর্গা পৃথক্ পৃথক্ করিয়া গড়িয়া পূজা করে কেন?

বাবাজি। তোমাকে ভাবিলেই তোমার শক্তি জানিলাম না। অগ্নিতে যে কখন হাত দেয়

বিবিধ প্রবন্ধ—গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার ঝড়ালি

নাই, সে অগ্নি দেখিলেই বৃষ্টিতে পারে না যে, অগ্নিতে হাত পুড়িয়ে যাইবে। পাঁজা পুড়িতেছে দেখিয়া, যে আর কখন অগ্নি দেখে নাই, সে বৃষ্টিতে পারে না যে, আগুনের আলো করিবার শক্তি আছে। অতএব শক্তি এবং শক্তির আলোচনা পৃথক্ করিয়া না করিলে শক্তিকে বৃষ্টিতে পারিবে না। রুদ্রও নিরাকার, রুদ্রের শক্তিও নিরাকার। যে অজ্ঞান এবং নিরাকারের স্বরূপ-চিন্তায় অক্ষম, তাহাকে উপাসনার্থ উভয়েরই রূপ-কল্পনা করিতে হয়।

আমি। কিন্তু বৈষ্ণব বিষ্ণুরই উপাসনা করিয়া থাকে, রুদ্রের উপাসনা করে না। অতএব রুদ্রাণীর প্রসাদ ভোজন আপনার পক্ষে অকর্তব্য।

বাবাজি। বিষ্ণু আমাকে যে উদর দিয়াছেন, রুদ্রাণীর প্রসাদে যে তাহা পূরিবে না, এমন আদেশ কিছুর করেন নাই। কিন্তু সে কথা থাক। রুদ্রাণী বিষ্ণুরই শক্তি।

আমি। সে কি? রুদ্রাণী ত রুদ্রের শক্তি?

বাবাজি। বিষ্ণুই রুদ্র।

আমি। এ সব অতি অশ্রদ্ধেয় কথা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর বা রুদ্র, তিন জন পৃথক্। একজন সৃষ্টি করেন, একজন পালন করেন, একজন লয় করেন। তবে বিষ্ণু রুদ্র হইলেন কি প্রকারে?

বাবাজি। যে বাবুর বাড়ী বসিয়া আমি ভোজন করিতেছি, ইনি করেন কি জান?

আমি। জানি। ইনি জমিদারি করেন।

বাবাজি। আর কিছুর করেন না?

আমি। পাটের ব্যবসাও আছে।

বাবাজি। আর কিছুর করেন?

আমি। টাকা ধার দিয়া সুদ খান।

বাবাজি। ভাল। এখন আমি যদি বাহিরে গিয়া রামকে বলি যে, আমি আজ একজন জমিদারের বাড়ী খাইয়াছি, শ্যামকে বলি যে, আমি একজন ব্যবসাদারের বাড়ী খাইয়াছি, আর গোপালকে বলি যে, আমি একজন মহাজনের বাড়ী খাইয়াছি, তাহা হইলে তিন জনের কথা বলা হইবে? না একজনেরই কথা বলা হইবে?

আমি। একজনেরই কথা। তিন একই।

বাবাজি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, তিনই এক। একজনই সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং সংহারকর্তা। হিন্দুধর্মের এক ঈশ্বর ভিন্ন তিন ঈশ্বর নাই।

আমি। তবে তিন জনকে পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা করে কেন?

বাবাজি। তুমি যদি এই বাবুকে বিশেষ করিয়া জানিতে চাও, তবে তাঁর সকল কাজগুলি পৃথক্ পৃথক্ করিয়া বৃষ্টিতে হইবে। তিনি জমিদার হইয়া কিরূপে জমিদারি করেন, তাহা বৃষ্টিতে হইবে, তিনি ব্যবসাদার হইয়া কি প্রণালীতে ব্যবসা করেন, তাহা বৃষ্টিতে হইবে, আর তিনি মহাজনিত্যে কি করেন, তাহাও বৃষ্টিতে হইবে। তেমনি ঈশ্বরোপাসনায় তাঁহার কৃত সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় পৃথক্ পৃথক্ বৃষ্টিতে হইবে। এই জন্য ত্রিদেবের উপাসনা। এক জনেরই কার্য্যানুসারে তিনটি পৃথক্ পৃথক্ নাম দেওয়া হইয়াছে। তিন জনের তিনটি নাম নহে।

আমি। বৃষ্টিলাভ। কিন্তু গোল মিটিতেছে না। বৃষ্টি হইল, তাহাতে শস্য জন্মিল, খাইয়া সবাই বাঁচলাম। বাঁচাইল কে—পালনকর্তা বিষ্ণু—না বৃষ্টিকর্তা ইন্দ্র?

বাবাজি। যাহা বলিয়াছি, তাহা যদি বৃষ্টিয়া থাক, তবে অবশ্য বৃষ্টিয়াছ যে, ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি নামে কোন স্বতন্ত্র দেবতা নাই। যিনি সৃষ্টি করেন, তিনিই যেমন পালন করেন ও ধ্বংস করেন, তিনিই আবার বৃষ্টি করেন, তিনিই দাহ করেন, তিনিই ঝড় বাতাস করেন, তিনিই আলো করেন, তিনিই অন্ধকার করেন। যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই অগ্নি, তিনিই সর্বদেবতা। তবে যেমন আমাদের বৃষ্টিবার সৌকর্য্যার্থ এক জলকে কোথাও নদী বলি, কোথাও সমুদ্র বলি, কোথাও বিল বলি, কোথাও পুকুর বলি, কোথাও ডোবা বলি, কোথাও গোম্পদ বলি, তেমনি উপাসনার জন্য তাঁহাকে কখন ইন্দ্র, কখন অগ্নি, কখন ব্রহ্মা, কখন বিষ্ণু ইত্যাদি নানা নাম দিই।

আমি। তবে তাঁহার যথার্থ নাম কি?

বাবাজি। তাঁহাকে দুই ভাবে চিন্তা করা যায়। যখন তাঁহাকে অব্যক্ত, অচিন্ত্য, নিগূর্ণ, এবং

বাঁকম রচনাবলী

সর্ব-জগতের আধার বলিয়া চিন্তা করি, তখন তাঁহার নাম ব্রহ্ম বা পরব্রহ্ম বা পরমাত্মা। আর যখন তাঁহাকে ব্যক্ত, উপাস্য, সেই জন্য চিন্তনীয়, সগুণ, এবং সমস্ত জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-কর্তৃস্বরূপ চিন্তা করি, তখন তাঁহার নাম সাধারণ কথায় ঈশ্বর, বেদে প্রজাপতি, পুরাণেতিহাসে বিষ্ণু বা শিব। আর যখন এককালীন তাঁহার উভয়বিধ লক্ষণ চিন্তা করিতে পারি, অর্থাৎ যখন তিনি আমার হৃদয়ে সম্পূর্ণ স্বরূপে উদ্ভিত হয়, তখন তাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণ।

আমি। কেন, তখনই শ্রীকৃষ্ণ নাম কেন?

বাবাজি। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে এই উভয় লক্ষণযুক্ত স্বরূপে ধ্যেয় বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন, এই জন্য আমি তাঁহার দাসানুদাস, সেই নামেই তাঁহাকে অভিহিত করি। একবার তোমরা কৃষ্ণনাম কর! বল কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হরি! হরি!

বাবাজি তখন হরিবোল দিয়া উঠিলেন। এক ব্রাহ্মণ পরিবেশন করিতেছিল, সে হরিবোল শুনিয়া বলিল, “বাবাজি! অত হরিবোলের ধুম কেন? পাঁটাটা রান্না বড় ভাল হয়েছে, বটে!”

তাই ত! সর্বনাশ! এতক্ষণ কথাবার্তায় অন্যমনা ছিলাম, দেখি নাই যে, বাবাজি এক রাশি ছাগমাংস উদরসাৎ করিয়া দ্বিতীয় তৈমুরলঙ্গের ন্যায় অস্থির স্তূপ সাজাইয়া রাখিয়াছেন! কুদ্ধ হইয়া বলিলাম, “বাবাজি! এই তোমার হরিবোল! এই তোমার বৈষ্ণবধর্ম! তুমি কণ্ঠী ছিঁড়িয়া ফেল। আমরা কেহ তোমার সঙ্গে আহারাদি করিব না।”

বাবাজি। কেন, কি হয়েছে বাপু!

আমি। আমার মাথা হয়েছে! তুমি বৈষ্ণব নামের কলঙ্ক! এক রাশি, যাহার নাম করিতে নাই, তাই খেয়ে পার করিলে, আবার জিজ্ঞাসা কর কি হয়েছে?

বাবাজি। পাঁটা খেয়েছি? বাপু, ভগবান, কোথায় বলেছেন যে, পাঁটা খাইও না? যদি পুরাণ ইতিহাসের দোহাই দিতে চাও, তবে পশুপুত্র খোল, দেখাইব যে, মাংস দিয়া বিষ্ণুর ভোগ দিবার ব্যবস্থা আছে। ভগবান্ স্বয়ং ক্ষত্রিয়কূলে জন্মগ্রহণ করিয়া, অন্যান্য ক্ষত্রিয়ের ন্যায় মাংসেই নিত্যসেবা করিতেন। তিনি পাপাচরণের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বটে? তুই বেটা আবার বৈষ্ণব?

আমি। তবে অহিংসা পরম ধর্ম বলে কেন?

বাবাজি। অহিংসা যথার্থ বৈষ্ণব-কন্যা বটে, কিন্তু কুলত্যাগ করিয়া বৌদ্ধঘরে গিয়া জাত হারাইয়াছে।

আমি। ছেঁদো কথা বুদ্ধিতে পারি না।

বাবাজি। দেখ, বাপু! বৈষ্ণব নাম গ্রহণ করিবার আগে বৈষ্ণব ধর্ম কি, বোঝ। তোমার কণ্ঠীতে বৈষ্ণব হয় না, কুঁড়োজালিতেও নয়, নিরামিষেও নয়, পশুসংস্কারেও নয়, দেড় কাহন বৈষ্ণবীতেও নয়। জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কে বল দেখি?

আমি। নারদ, ধ্রুব, প্রহ্লাদ।

বাবাজি। প্রহ্লাদই সর্বশ্রেষ্ঠ। প্রহ্লাদ বৈষ্ণবধর্মের কি ব্যাখ্যা করিয়াছেন, শুন।

সর্বত্র দৈত্যাঃ সমতামুপেত

সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য।

অর্থাৎ “হে দৈত্যগণ! তোমরা সর্বত্র সমদর্শী হও। সমত্ব, অর্থাৎ সকলকে আত্মবৎ জ্ঞান করাই বিষ্ণুর যথার্থ উপাসনা।” কণ্ঠী, কুঁড়োজালি, কি দেখাস্ রে মূর্খ! এই যে সমদর্শিতা, ইহাই সেই অহিংসা-ধর্মের যথার্থ তাৎপর্য। সমদর্শী হইলে আর হিংসা থাকে না। এই সমদর্শিতা থাকিলেই মনুষ্য, বিষ্ণু নাম জানুক না জানুক, যথার্থ বৈষ্ণব হইল। যে খ্রীষ্টীয়ান, কি মুসলমান মনুষ্যমাত্রকে আপনার মত দেখিতে শিখিয়াছে, সে যিশুরই পূজা করুক আর পীর প্যাগম্বরেরই পূজা করুক, সে-ই পরম বৈষ্ণব। আর তোমার কণ্ঠী কুঁড়োজালির নিরামিষের দলে, যাহারা তাহা শিখে নাই, তাহারা কেহই বৈষ্ণব নহে।

আমি। মাছ পাঁটা খেয়ে কি তবে বৈষ্ণব হওয়া যায়?

বাবাজি। মূর্খ! তোকে বুঝাইলাম কি?

আমি। তবে আমাকেও একখানা পাতা দিতে বলুন।

তখন পাতা, এবং কিঞ্চিৎ অন্ন এবং মহাপ্রসাদ পাইয়া আমিও ভোজনে বসিলাম। পাকের কার্যটা অতি পরিপাটিরূপে হইয়াছিল। ছাগমাংস ভোজনে আমার ক্ষুধা বৃদ্ধির লক্ষণ দেখিয়া

বিবিধ প্রবন্ধ—গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার বর্নালি

বাবাজি বলিলেন, “বাপু হে! কল্পনা করিয়াছি, পরামর্শ দিয়া আগামী বৎসর সেথকে দিয়া দুর্গোৎসব করাইব!”

আমি। ফল কি?

বাবাজি। ছাগমাংস কিছু, গরুপাক। মুরগী বড় লঘুপাক, অতএব বৈষ্ণবের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

আমি। মুসলমানের বাড়ী খাইতে আছে?

বাবাজি। এ কাণ দিয়ে শুনিস্ ও কাণ দিয়ে ভুলিস্? যখন সর্বত্র সমান জ্ঞান, সকলকে আত্মবৎ জ্ঞানই বৈষ্ণবধর্ম, তখন হিন্দু ও মুসলমান, এ ছোট জাতি, ও বড় জাতি, এরূপ ভেদ-জ্ঞান করিতে নাই। যে এরূপ ভেদ-জ্ঞান করে, সে বৈষ্ণব নহে।

আজ তোমাকে বৈষ্ণবধর্ম কিছু বুঝাইলাম। আর একদিন তোমাকে ব্রহ্মোপাসনা এবং কৃষ্ণোপাসনা বুঝাইব। ধর্মের প্রথম সোপান, বহু দেবের উপাসনা; দ্বিতীয় সোপান, সকাম ঈশ্বরোপাসনা; তৃতীয় সোপান, নিষ্কাম ঈশ্বরোপাসনা বা বৈষ্ণবধর্ম অথবা জ্ঞানযুক্ত ব্রহ্মোপাসনা। ধর্মের চরম কৃষ্ণোপাসনা।

৩। রাধাকৃষ্ণ*

আমি একটা প্রাচীন গীত আপন মনে গায়িতেছিলাম।

“ব্রজ তেজে যেও না, নাথ,—

এইটুকু গায়িতে না গায়িতে, বাবাজি “অহঃ” বলিয়া, একেবারে কাঁদিয়া অজ্ঞান। আমি থাকিতে পারিলাম না, হাসিয়া ফেলিলাম। ক্রুদ্ধ হইয়া বাবাজি বলিলেন, “হাসিল কেন রে বেটা?”

আমি বলিলাম, “তুমি হাঁ কর্তেই কাঁদ, তাই আমি হাসি।”

বাবাজি। হাঁ ক’রে যা বলেছিষ্, সে কথাটা কিছু বুঝেছিষ্? না শালিক পাখির মত কিচির কিচির করিস্?

আমি। বুঝ না কেন? রাধা কৃষ্ণকে বল্ছেন যে, তুমি আমাদের ব্রজ ছেড়ে যেও না।

বাবাজি। ব্রজ কি বল্ দেখি?

আমি। কৃষ্ণ যেখানে গোরু চরাতেন আর গোপীদের নিয়ে বাঁশী বাজাতেন।

বাবাজি। অধঃপাতে যাও। ‘ব্রজ’ ধাতু কি অর্থে বল্ দেখি?

আমি। ব্রজ ধাতু! অষ্ট ধাতুই ত জানি। আবার ব্রজ ধাতু কি?

বাবাজি। ব্রজ গমনে। ব্রজ, অর্থাৎ যা যায়।

আমি। যা যায়, তাই ব্রজ? গোরু যায়, বাছুর যায়, আমি যাই, তুমি যাও—সব ব্রজ?

বাবাজি। সব ব্রজ। জগৎ কাকে বলে, বল্ দেখি?

আমি। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জগৎ।

বাবাজি। ‘জগৎ’ কোন্ ধাতু হইতে হইয়াছে?

আমি। ধাতু ছাড়া যা জিজ্ঞাসা করিবেন বলিব, ও কথাটা শুনিলেই কেমন ভয় করে।

বাবাজি। গম ধাতু হইতে জগৎ শব্দ হইয়াছে। যা যায়, তাই জগৎ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নশ্বর, তাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জগৎ। ব্রজ শব্দ আর জগৎ শব্দ একার্থবাচক।

আমি। ব্রজ তবে একটা জায়গা নয়? আমি বলি, বৃন্দাবনই ব্রজ।

বাবাজি। বৃন্দাবন নামে যে শহর এখন আছে, তাহা বাঙ্গালার বৈষ্ণব ঠাকুরেরা তৈয়ার করিয়াছেন।

আমি। তবে পুরাণে বৃন্দাবন কাকে বলিয়াছে?

বাবাজি। “বৃন্দা যত্র তপস্তুপে তত্ত্ব বৃন্দাবনং স্মৃতম্” যে স্থানে বৃন্দা তপস্যা করিয়াছিলেন (‘করেন’ বলিলেই ঠিক হয়), সেই বৃন্দাবন।

বাঞ্চিকম রচনাবলী

আমি। বৃন্দা কে?
বাবাজি।

রাধাষোড়শনাম্নাং চ বৃন্দা নাম শ্রুতো শ্রুতম্।
তস্যাঃ ক্রীড়াবনং রম্যং তেন বৃন্দাবনং স্মৃতম্ ॥

রাধাই বৃন্দা।

আমি। রাধা কে?

বাবাজি। রাধ ধাতু—

আমি। ধাতু ছাড় বাবাজি।

বাবাজি। রাধ ধাতু সাধনে, প্রাপ্তো, তোষে, পূজায়াং বা। যে ঈশ্বরের সাধন করে, যে তাঁহাকে পায়, যে তাঁহার পূজা (বা আরাধনা) করে, সেই রাধা। ঈশ্বরভক্ত মাত্রেই রাধা। তুমি ঈশ্বরভক্ত হইলে রাধা হইবে।

আমি। তবে তিনি গোপিনীবিশেষ নন?

বাবাজি। গোপিনী শব্দ হয় না—গোপী শব্দ। কাকে বলে?

আমি। গোপের স্ত্রী গোপী।

বাবাজি। গো শব্দে পৃথিবী। যাঁহারা ধর্ম্মাশ্রয়, তাঁহারা পৃথিবীর রক্ষক। তাঁহারা গোপ। স্ত্রীলিঙ্গে তাঁহারা গোপী।

আমি। গোলোক কি তবে?

বাবাজি। এই পৃথিবীগোলক—ভুলোক।

আমি। আপনি সব গোল বাধাইলেন। ভাল, সবই যদি রূপক হইল, তবে নন্দ কি?

বাবাজি। নন্দ ধাতু হর্ষে, আনন্দে। আমরা উপসর্গ ভিন্ন কথা ব্যবহার করি না, এই একটা উপসর্গ। যাহাকে আনন্দ বলি, তাই নন্দ।

আমি। ভগবান্ কি আনন্দে জন্মেন যে, তিনি নন্দনন্দন?

বাবাজি। কৃষ্ণ যে নন্দপুত্র, এ কথা কেহ বলে না। তিনি বসুদেবের পুত্র, নন্দালয়ে ছিলেন, এই মাত্র।

আমি। সে কথারই বা অর্থ কি?

বাবাজি। পরমানন্দ-ধামই ঈশ্বরের বাস। অর্থাৎ তিনি আনন্দেই বিদ্যমান।

আমি। তবে যশোদা কোথায় যায়? যশোদা যে কৃষ্ণকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, তাহার তাৎপর্য কি?

বাবাজি। ঈশ্বরের যশঃ অর্থাৎ মহিমা কীর্ত্তন দ্বারা তাঁহাকে হৃদয়ে পরিবর্দ্ধিত করিতে হয়।

আমি। সবই রূপক দেখিতেছি। কৃষ্ণও কি রূপক নন?

বাবাজি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, জগদীশ্বর সশরীরে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া জগতে ধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি রূপক নহেন। কিন্তু পুরাণকার তাঁহাকে মাঝখানে স্থাপিত করিয়া, এই ধর্ম্মার্থক রূপকাট গঠন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের নামের আর একটা অর্থ আছে, তাহাতে ইহার একটা সুবিধা হইয়াছিল। কৃষ্ণ ধাতু কর্ষণে বা আকর্ষণে। যিনি মনুষ্যের চিত্ত কর্ষণ বা আকর্ষণ করেন, তিনি কৃষ্ণ।

আমি। এটা বাবাজি কষ্টকল্পনা।

বাবাজি। তা'ত বটেই। কৃষ্ণ রূপক নহেন, কাজেই এ অর্থ কষ্টকল্পে ঘটাইতে হয়। তিনি শরীরী, অন্যান্য মনুষ্যের সঙ্গে কর্ম্মক্ষেত্রে বিদ্যমান ছিলেন। এবং তিনি অশরীরী জগদীশ্বর। তাঁহাকে নমস্কার কর।

আমি। কিন্তু রূপকের কি হইবে? রাধাকৃষ্ণের উপাসনা করিব কি?

বাবাজি। জগদীশ্বরের সঙ্গে তাঁহার ভক্তের উপাসনা করিবে। কেন না, ভক্ত তন্ময়, ভক্তও ঈশ্বরের অংশ হইয়াছে। জগৎ ঈশ্বর-ভক্ত। জগৎ ঈশ্বরময়। জগতের ঈশ্বরের সঙ্গে জগতেরও উপাসনা করিবে। অতএব বল, শ্রীরাধাবল্লভায় নমো নমঃ।

আমি। শ্রীরাধাবল্লভায় নমো নমঃ।

শ্রীহরিদাস বৈরাগী।

কাম*

হিন্দুধর্মগ্রন্থসকলে “কাম” শব্দটি সর্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে কামাত্মা বা কামার্থী, তাহার পুনঃ পুনঃ নিন্দা আছে। কিন্তু সাধারণ পাঠক এই “কাম” শব্দের অর্থ বুঝিতে বড় গোল করেন, এই জন্য সকল স্থানে তাঁহারা শাস্ত্রার্থ বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা সচরাচর ইন্দ্রিয়বিশেষের পরিতৃপ্তির ইচ্ছার্থে ঐ শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন, এবং শাস্ত্রেও ঐ অর্থে ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহাই তাঁহারা বুঝেন। সেটা ভ্রান্তি। মহাভারত হইতে দুই একটা কথা উদ্ধৃত করিয়া আমরা কাম শব্দের অর্থ বুঝাইতেছি।

“পঞ্চ ইন্দ্রিয়, মন ও হৃদয় স্ব স্ব বিষয়ে বর্তমান থাকিয়া যে প্রীতি উপভোগ করে, তাহারই নাম কাম।” (বনপর্ব, ৩৩ অধ্যায়)। ইহা একেবারে নিন্দনীয় বিষয় বলিয়া স্থির হইতেছে না। “মন ও হৃদয়” এই কথা না বলিয়া কেবল যদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কথা বলা হইত, তাহা হইলে বুঝা যাইত যে, ইন্দ্রিয়বশ্যতা (Sensuality) এই দুষ্প্রবৃত্তিরই নাম কাম। কিন্তু “মন” ও “হৃদয়” থাকতে সে কথা খাটিতেছে না। স্থানান্তরে বলা হইতেছে যে, “স্নক্চন্দনাদিরূপ দ্রব্য স্পর্শ বা স্বেদাদিরূপ অর্থ লাভ হইলে মনুষ্যের যে প্রীতি জন্মে, তাহারই নাম কাম।”

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, প্রথমতঃ উহা কোন প্রকার প্রবৃত্তি বা বৃত্তি নহে; প্রবৃত্তি বা বৃত্তির পরিতৃপ্তাবস্থা মাত্র। দ্বিতীয়তঃ দেখা যাইতেছে যে, উহা সকল সময়ে নিন্দনীয় বা জঘন্য সুখ নহে। উহা সদস্য কর্মের ফল। এই জন্য পশ্চাৎ কথিত হইতেছে যে, “উহা কর্মের এক উৎকৃষ্ট ফল। মনুষ্য এইরূপে ধর্ম, অর্থ ও কাম, এই তিনের উপর পৃথক্ পৃথক্ রূপে দৃষ্টিপাতপূর্বক কেবল ধর্মপর বা কামপর হইবে না। সতত সম-ভাবে এই ত্রিবর্গের অনুশীলন করিবে। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, পূর্বাহ্নে ধর্মানুষ্ঠান, মধ্যাহ্নে অর্থচিন্তা ও অপরাহ্নে কামানুশীলন করিবে।”

“কেবল ধর্মপর হইবে না।” এমন একটা কথা শুনিলে হঠাৎ মনে হয়, যে ব্যক্তি এ উপদেশ দিতেছে, সে ব্যক্তি হয় ঘোরতর অধার্মিক, নয় সে ধর্ম শব্দ কোন বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিতেছে। এখানে দুই কথাই কিঞ্চিৎ পরিমাণে সত্য। এখানে বক্তা খোদ ভীমসেন; তিনি অধার্মিক নহেন, কিন্তু তিনি যুধিষ্ঠির বা অর্জুনের ন্যায় ধর্মের সর্বোচ্চ সোপানে উঠেন নাই। এবং ধর্ম শব্দও তিনি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিতেছেন। তাঁহার একটা কথাতেই তাহা বুঝা যায়। তিনি পরে বলিতেছেন, “দান, যজ্ঞ, সাধুগণের পূজা, বেদাধ্যয়ন ও আর্জব, এই কয়েকটি প্রধান ধর্ম।”

বস্তুতঃ আমরা এখন যাহাকে ধর্ম বলি, তাহা দ্বিবিধ; এক আত্ম-সম্বন্ধী, আর এক পর-সম্বন্ধী। পরসম্বন্ধী ধর্মই ধর্মের প্রধান অংশ; কিন্তু আত্মসম্বন্ধী ধর্মও আছে, এবং তাহা একেবারে পরিহার্য নয়। আমি পরকে সুখে রাখিয়া যদি আপনিও সুখে থাকিতে পারি, তবে তাহা না করিয়া, ইচ্ছাপূর্বক কষ্ট সহিব কেন? ইচ্ছাপূর্বক নিষ্ফল কষ্ট পাওয়া অধর্ম। এখানে ভীমসেন সেই পর-সম্বন্ধী ধর্মকেই ধর্ম বলিতেছেন, এবং আত্ম-সম্বন্ধী ধর্মের ফল-ভোগকে কাম বলিতেছেন। তাহা বুঝিলে, “কেবল ধর্মপর হইবে না” এ কথা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

বস্তুতঃ ধর্মকে আত্মসম্বন্ধী, এবং পরসম্বন্ধী, এরূপ বিভাগ করা উচিত নহে। ধর্ম এক; ধর্ম মাত্র আত্মসম্বন্ধী ও পরসম্বন্ধী। অনেকে বলেন যে, ধর্ম কেবল পরসম্বন্ধী হওয়াই উচিত। আবার অনেকে বলেন, যথা খ্রীষ্টীয়ানেরা, যে যাহাতে আমি পরকালে সম্ভোগ লাভ করিব, তাহাই ধর্ম। অর্থাৎ তাঁহাদের মত, ধর্ম কেবল আত্মসম্বন্ধী।

স্থূলকথা, ধর্ম আত্মসম্বন্ধীও নহে, পরসম্বন্ধীও নহে। সমস্ত বৃত্তিগুলির উচিত অনুশীলন ও পরিণতিই ধর্ম। তাহা আপনার জন্যও করিবে না, পরের জন্যও করিবে না। ধর্ম বলিয়াই করিবে। সেই বৃত্তিগুলি নিজ-সম্বন্ধিনী, ও পর-সম্বন্ধিনী; তাহার অনুশীলনে স্বার্থ ও পরার্থ একত্রে সিদ্ধ হয়। ফলতঃ ধর্ম এই ভাবে বুঝিলে স্বার্থে এবং পরার্থে প্রভেদ

বাংকম রচনাবলী

উঠাইয়া দেওয়া অনুশীলনবাদের একটি উদ্দেশ্য। “ধর্মতত্ত্বে” এই অনুশীলনবাদ বৃদ্ধান গিয়াছে।

বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন*

১। যশের জন্য লিখিবেন না। তাহা হইলে যশও হইবে না, লেখাও ভাল হইবে না। লেখা ভাল হইলে যশ আপনি আসিবে।

২। টাকার জন্য লিখিবেন না। ইউরোপে এখন অনেক লোক টাকার জন্যই লেখে, এবং টাকাও পায়; লেখাও ভাল হয়। কিন্তু আমাদের এখনও সে দিন হয় নাই। এখন অর্থের উদ্দেশ্যে লিখিতে গেলে, লোক-রঞ্জন-প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া পড়ে। এখন আমরাইগের দেশের সাধারণ পাঠকের রুচি ও শিক্ষা বিবেচনা করিয়া লোক-রঞ্জন করিতে গেলে রচনা বিকৃত ও অনিষ্টকর হইয়া উঠে।

৩। যদি মনে এমন বৃদ্ধিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন। যাঁহারা অন্য উদ্দেশ্যে লেখেন, তাঁহাদিগকে যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীদিগের সঙ্গে গণ্য করা যাইতে পারে।

৪। যাহা অসত্য, ধর্মবিরুদ্ধ; পরনিন্দা বা পরপীড়ন বা স্বার্থসাধন যাহার উদ্দেশ্য, সে সকল প্রবন্ধ কখনও হিতকর হইতে পারে না, সুতরাং তাহা একেবারে পরিহার্য্য। সত্য ও ধর্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অন্য উদ্দেশ্যে লেখনী-ধারণ মহাপাপ।

৫। যাহা লিখিবেন, তাহা হঠাৎ ছাপাইবেন না। কিছু কাল ফেলিয়া রাখিবেন। কিছু কাল পরে উহা সংশোধন করিবেন। তাহা হইলে দেখিবেন, প্রবন্ধে অনেক দোষ আছে। কাব্য নাটক উপন্যাস দুই এক বৎসর ফেলিয়া রাখিয়া তার পর সংশোধন করিলে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। যাঁহারা সাময়িক সাহিত্যের কার্য্যে ব্রতী, তাঁহাদের পক্ষে এই নিয়ম রক্ষাটি ঘটিয়া উঠে না। এজন্য সাময়িক সাহিত্য, লেখকের পক্ষে অবনতিকর।

৬। যে বিষয়ে যাহার অধিকার নাই, সে বিষয়ে তাহার হস্তক্ষেপণ অকর্তব্য। এটি সোজা কথা, কিন্তু সাময়িক সাহিত্যে এ নিয়মটি রক্ষিত হয় না।

৭। বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা করিবেন না। বিদ্যা থাকিলে, তাহা আপনিই প্রকাশ পায়, চেষ্টা করিতে হয় না। বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা পাঠকের অতিশয় বিরক্তিকর, এবং রচনার পারিপাট্যের বিশেষ হানিজনক। এখনকার প্রবন্ধে ইংরাজি, সংস্কৃত, ফরাসি, জার্মান কোটেশন্ বড় বেশী দেখিতে পাই। যে ভাষা আপনি জানেন না, পরের গ্রন্থের সাহায্যে সে ভাষা হইতে কদাচ উদ্ধৃত করিবেন না।

৮। অলঙ্কার-প্রয়োগ বা রসিকতার জন্য চেষ্টিত হইবেন না। স্থানে স্থানে অলঙ্কার বা ব্যঙ্গের প্রয়োজন হয় বটে; লেখকের ভাণ্ডারে এ সামগ্রী থাকিলে, প্রয়োজন মতে আপনিই আসিয়া পেরাঁছবে—ভাণ্ডারে না থাকিলে মাথা কুটিলেও আসিবে না। অসময়ে বা শূন্য ভাণ্ডারে অলঙ্কার প্রয়োগের বা রসিকতার চেষ্টার মত কদর্য্য আর কিছুই নাই।

৯। যে স্থানে অলঙ্কার বা বাঙ্গ বড় সুন্দর বলিয়া বোধ হইবে, সেই স্থানটি কাটিয়া দিবে। এটি প্রাচীন বিধি। আমি সে কথা বলি না। কিন্তু আমার পরামর্শ এই যে, সে স্থানটি বন্ধুবর্গকে পুনঃ পুনঃ পড়িয়া শুনাইবে। যদি ভাল না হইয়া থাকে, তবে দুই চারি বার পড়িলে লেখকের নিজেরই আর উহা ভাল লাগিবে না—বন্ধুবর্গের নিকট পড়িতে লজ্জা করিবে। তখন উহা কাটিয়া দিবে।

১০। সকল অলঙ্কারের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সরলতা। যিনি সোজা কথায় আপনার মনের ভাব সহজে পাঠককে বৃদ্ধাইতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক। কেন না, লেখার উদ্দেশ্য পাঠককে বৃদ্ধান।

১১। কাহারও অনুকরণ করিও না। অনুকরণে দোষগুলি অনুকৃত হয়, গুণগুলি হয়

* প্রচার, ১২৯১, মাঘ।

বিবিধ প্রবন্ধ—ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র কি বলে

না। অমুক ইংরাজি বা সংস্কৃত বা বাঙ্গালা লেখক এইরূপ লিখিয়াছেন, আমিও এরূপ লিখিব, এ কথা কদাপি মনে স্থান দিও না।

১২। যে কথার প্রমাণ দিতে পারিবে না, তাহা লিখিও না। প্রমাণগুলি প্রযুক্ত করা সকল সময়ে প্রয়োজন হয় না, কিন্তু হাতে থাকা চাই।

বাঙ্গালা সাহিত্য, বাঙ্গালার ভরসা। এই নিয়মগুলি বাঙ্গালা লেখকদিগের দ্বারা রক্ষিত হইলে, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি বেগে হইতে থাকিবে।

ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র কি বলে*

প্রচলিত হিন্দুধর্মের শিরোভাগ এই যে, ঈশ্বর এক, কিন্তু তিনটি পৃথক্ পৃথক্ মূর্তিতে তিনি বিভক্ত। এক সৃজন করেন, এক পালন করেন, এবং এক ধ্বংস করেন। এই ত্রিদেব লোক-প্রথিত।

জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের মৃত্যুর পর, ধর্মসম্বন্ধে তৎপ্রণীত তিনটি প্রবন্ধ প্রচারিত হইয়াছে। তাহার একটির উদ্দেশ্য, ঈশ্বরের অস্তিত্বের মীমাংসা করা। মিলের মত যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ ঈশ্বরবাদীরা প্রয়োগ করেন, তাহার মধ্যে একটিই সারবান্। জগতের নিষ্কারণ-কৌশল হইতে তাহার মতে, নিষ্কারণের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। এটি প্রাচীন কথা, এবং অখণ্ডনীয়ও নহে। ডার্বিনের মত প্রচারের পূর্বেও ইহার সদুত্তর ছিল; এক্ষণে ডার্বিন্ দেখাইয়াছেন যে, এই নিষ্কারণ-কৌশল স্বতঃই ঘটে। মিল্ ও ডার্বিনের এই মত অনবগত ছিলেন, এমত নহে; তিনি স্বীয় প্রবন্ধ-মধ্যে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন যে, যদি এই মতটি প্রকৃত হয়, তবে উপরিকথিত নিষ্কারণ-কৌশল ঈশ্বরের অস্তিত্ব-প্রতিপাদক হয় না। কিন্তু ডার্বিনের মত প্রচারের অল্পকাল পরেই মিলের প্রস্তাব লিখিত হয়। সে মতের সত্যাসত্য পরীক্ষিত এবং নিষ্পাচিত হওয়ার পক্ষে কালবিলম্বের প্রয়োজন। কালবিলম্বের সে ফল তিনি পান নাই। অতএব তিনি এই মতের উপর দৃঢ়রূপে নির্ভর করিতে পারেন নাই। নির্ভর করিতে পারিলে তাহাকে স্বীকার করিতে হইত যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুই প্রমাণ নাই।

এখনও অনেকে ডার্বিনের প্রতিবাদী আছেন—কিন্তু বহুতর পণ্ডিতগণ কর্তৃক তাহার মত আদৃত এবং স্বীকৃত। অধিকাংশ বিজ্ঞানবিদ্ এবং দর্শনবিদ্ পণ্ডিতেরা এক্ষণে ডার্বিনের মতাবলম্বী। কিন্তু ডার্বিনের মত প্রকৃত হইলেও ঈশ্বর নাই, এ কথা সিদ্ধ হইল না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণাভাব ঈশ্বরের অনস্তিত্বের প্রমাণ নহে। কোন পদার্থের অস্তিত্বের প্রমাণাভাবে তাহার অনস্তিত্ব প্রমাণ হইবে, যদি বিচারের এরূপ নিয়ম সংস্থাপন করা যায়, তাহা হইলে অনেক স্থানে প্রমাদ ঘটে।

ঈশ্বর আছেন, এ কথা সত্য হউক না হউক, কথা অসঙ্গত কেহ বলিতে পারিবে না। প্রায় এইরূপ ভাবেই মিল্ ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন। ডার্বিন্ স্বয়ং স্পষ্টতঃ ঈশ্বর স্বীকার করেন।

অতএব প্রমাণ থাক বা না থাক, ঈশ্বর স্বীকার করা যাউক। কিন্তু যদি ঈশ্বর আছেন, তবে তাহার প্রকৃতি কি প্রকার? এ বিষয়ে একটি প্রভেদ এ স্থলে স্পষ্টীকরণ আবশ্যিক। কতকগুলি ঈশ্বরবাদী আছেন, তাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও তৎপ্রতি স্রষ্টা বিধাতা ইত্যাদি পদ ব্যবহার করেন না। অন্যে বলেন, ঈশ্বর ইচ্ছাপ্রবৃত্তাদিবিশিষ্ট—এই জগতের নিষ্কারণ; ইচ্ছাক্রমে এই জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। উপরিকথিত দার্শনিকেরা বলেন, আমরা সে সকল কথা জানি না, জানিবার উপায়ও নাই; ইহাই কেবল জানি যে, সেই জগৎ-কারণ অজ্ঞেয়। হর্বর্ট্ স্পেন্সর্ এই সম্প্রদায়ের মূখপাত্র।† তাহার দর্শনে ঈশ্বর জগদ্ব্যাপক জ্ঞানাতীত শক্তি মাত্র।

* বঙ্গদর্শন, ১২৮২, বৈশাখ। বঙ্গদর্শনে এই প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল, “মিল্, ডার্বিন্ এবং হিন্দুধর্ম।” বর্তমান শিরোনামে বিজ্ঞান শব্দের অর্থে “Science” বসিতে হইবে।

† The consciousness of an Inscrutable Power manifested to us through all phenomena has been growing ever clearer.—*First Principles*, p. 108. ইহা লেখার পর হর্বর্ট্ স্পেন্সরের মতের কিছু পরিবর্তন দেখা যায়।

বাংকম রচনাবলী

মিল্ যে ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন, তিনি এরূপ অজ্ঞেয় নহেন। মিল্ ইচ্ছাবিশিষ্ট, জগন্নির্মাতা স্বীকার করিয়াছেন। স্বীকার করিয়া ঐশিক স্বভাবের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ঈশ্বরবাদীরা সচরাচর ঈশ্বরের তিনটি গুণ বিশেষরূপে নিৰ্বাচন করিয়া থাকেন— শক্তি, জ্ঞান এবং দয়া। তাহাদিগের মতে ঈশ্বরের গুণ মাত্র সীমাহীন—অনন্ত। অতএব ঈশ্বরের শক্তি, জ্ঞান এবং দয়াও অনন্ত। ঈশ্বর সৰ্বশক্তিমান্, সৰ্বজ্ঞ, এবং দয়াময়।

মিল্ এই মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যেখানে জগতের নিৰ্মাণ-কৌশল দেখিয়াই আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছি, সেইখানেই তাহার শক্তি যে অনন্ত নহে, তাহা স্বীকৃত হইতেছে। কেন না, যিনি সৰ্বশক্তিমান্, তাহার কৌশলের প্রয়োজন কি? কৌশল কোথায় প্রয়োজন হয়? যেখানে কৌশল ব্যতীত ইষ্টসিদ্ধি হয় না, সেইখানেই কৌশল প্রয়োজন হয়—যিনি সৰ্বশক্তিমান্, ইচ্ছায় সকলই করিতে পারেন, তাহার কৌশলের প্রয়োজন হয় না। কেবল ইচ্ছা বা আঞ্জামাত্রে কৌশলের উদ্দষ্ট কৰ্ম সিদ্ধ হইতে পারে। যদি মনুষ্যের এরূপ শক্তি থাকিত যে, সে কেবল ঘাড়ের ডায়ল্ প্লেটের উপর কাঁটা বসাইয়া দিলেই কাঁটা নিয়মমত চলিত, তবে কখন মনুষ্য কৌশলাবলম্বন করিয়া ঘাড়ের স্প্রিংয়ের উপর স্প্রিঞ্জ্ এবং হুইলের উপর হুইল্ গড়িত না। অতএব ঈশ্বর যে সৰ্বশক্তিমান্ নহেন, ইহা সিদ্ধ।

এ কথার দুই একটা উত্তর আছে, কিন্তু হিন্দুধর্মের নৈসর্গিক ভিত্তির অনুসন্ধান আমাদের মূখ্য উদ্দেশ্য, অতএব সে সকল কথা আমরা ছাড়িয়া যাইতে পারি। সে সকল আপত্তিও মিল্ সম্যক্ প্রকারে খণ্ডন করিয়াছেন।

সৰ্বজ্ঞতা সম্বন্ধে মিল্ বলেন যে, ঈশ্বর সৰ্বজ্ঞ কি না, তাহা বয়ে সন্দেহ। যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া মনুষ্যের কৃত কৌশলের বিচার করা যায়, সে প্রণালী অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরকৃত কৌশল সকলের সমালোচনা করিলে অনেক দোষ বাহির হয়। এই মনুষ্যদেহের নিৰ্মাণে কত কৌশল, কত শক্তি ব্যয়িত হইয়াছে, কত যত্ন তাহা রক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু যাহাতে এত কৌশল, এত শক্তিব্যয়, এত যত্ন, তাহা ক্ষণভঙ্গুর—কখন অধিক কাল থাকে না। যিনি এত কৌশল করিয়া ক্ষণভঙ্গুরতা বারণ করিতে পারেন নাই, তিনি সকল কৌশল জানেন না—সৰ্বজ্ঞ নহেন। দেখ, জীবশরীর কোন স্থানে ছিন্ন হইলে, তাহা পুনঃসংযুক্ত হইবার কৌশল আছে; উহাতে বেদনা হয়, প্ৰদ্য হয়, এবং সেই ব্যাধির ফলে পুনঃসংযোগ ঘটে। কিন্তু সেই ব্যাধি পীড়াদায়ক। যাহার প্রণীত কৌশল, উপকারার্থ প্রণীত হইয়াও পীড়াদায়ক, তাহার কৌশলে অসম্পূর্ণতা আছে। যাহার কৌশলে অসম্পূর্ণতা আছে, তাহাকে কখন সৰ্বজ্ঞ বলা যাইতে পারে না।

ইহাও মিল্ স্বীকার করেন যে, এমতও হইতে পারে যে, এই অসম্পূর্ণতা শক্তির অভাবের ফল—অসৰ্বজ্ঞতার ফল নহে। অতএব ঈশ্বর সৰ্বজ্ঞ হইলেও হইতে পারেন।

যদি ইহাই বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর সৰ্বজ্ঞ, কিন্তু সৰ্বশক্তিমান্ নহেন, তবে এই এক প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, কে ঈশ্বরের শক্তির প্রতিবন্ধকতা করে? মনুষ্যাদি যে সৰ্বশক্তিমান্ নহে, তাহার কারণ, তাহাদিগের শক্তির প্রতিবন্ধক আছে। তুমি যে হিমালয় পর্বত উৎপাটন করিয়া সাগর-পারে নিক্ষেপ করিতে পার না—তাহার কারণ, মাধ্যাকর্ষণ তোমার শক্তির প্রতিবন্ধকতা করিতেছে। শক্তির প্রতিবন্ধক না থাকিলে, সকলেই সৰ্বশক্তিমান্ হইত। ঈশ্বর সৰ্বশক্তিমান্ নহেন, এই কথায় প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তাহার শক্তির প্রতিবন্ধক কেহ বা কিছ্ আছে। সেই প্রতিবন্ধক কি? কোন্ বিঘোর জন্য সৰ্বজ্ঞ তাহার অভিপ্রেত কৌশল নিৰ্দ্দেশ্য করিতে পারেন নাই?

এই সম্বন্ধে দুইটি উত্তর হইতে পারে। কেহ বলিতে পারেন যে, দেখ, ঈশ্বর নিৰ্মাতা মাত্র; তিনি যে স্রষ্টা, এমত প্রমাণ তুমি কিছ্ই পাও নাই। তুমি তাহার নিৰ্মাণপ্রণালী দেখিয়াই তাহার অস্তিত্ব সিদ্ধ করিতেছ; কিন্তু নিৰ্মাণপ্রণালী হইতে কেবল নিৰ্মাতাই সিদ্ধ হইতে পারেন, স্রষ্টা সিদ্ধ হইতে পারেন না। ঘটের নিৰ্মাণ দেখিয়া তুমি কুস্তকারের অস্তিত্ব সিদ্ধ করিতে পার; কিন্তু কুস্তকারকে মৃত্তিকার সৃষ্টিকারক বলিয়া তুমি সিদ্ধ করিতে পার না। অতএব এমন হইতে পারে যে, ঈশ্বর স্রষ্টা নহেন, কেবল নিৰ্মাতা। ইহার অর্থ এই, যে সামগ্রীকে গঠন দিয়া তিনি বর্তমানাবস্থাপন্ন করিয়াছেন, সে সামগ্রী পূৰ্ব হইতে ছিল—ঈশ্বরের সৃষ্ট নহে। ঘট দেখিয়া কেবল ইহাই সিদ্ধ হয় যে, কোন কুস্তকার মৃত্তিকা লইয়া

বিবিধ প্রবন্ধ—ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র কি বলে

ঘট নিৰ্মাণ করিয়াছে। মৃত্তিকা তাহার পূৰ্ব্ব হইতে ছিল, কুম্ভকারের সৃষ্ট নহে, এ কথা বলা বিচারসঙ্গত হইবে। সেই অসৃষ্ট সামগ্রীই বোধ হয়, ঐশী শক্তির সীমানিন্দ্দেশক—তাঁহার শক্তির প্রতিবন্ধক। সেই জাগতিক জড় পদার্থের এমন কোন দোষ আছে যে, তজ্জন্য উহা ঈশ্বরেরও সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত নহে। সেই কারণে বহুকৌশলময় এবং বহুশক্তিসম্পন্ন ঈশ্বরও আপনকৃত কার্যসকল সম্পূর্ণ এবং দোষশূন্য করিতে পারেন নাই।

আর একটি উত্তর এই যে, ঈশ্বরবিরোধী দ্বিতীয় কোন চৈতন্যই তাঁহার শক্তির প্রতিবন্ধক। যদি নিৰ্মাতার কার্য দেখিয়া নিৰ্মাতাকে সিদ্ধ করিলে, তবে তাঁহার কার্যের প্রতিবন্ধকতার চিহ্ন দেখিয়াও প্রতিকূলাচারী চৈতন্যেরও কল্পনা করিতে পার। পারসিকদিগের প্রাচীন দ্বৈত ধৰ্ম্ম এইরূপ—তাঁহারা বলেন যে, একজন ঈশ্বর জগতের মঙ্গলে নিযুক্ত—আর এক ঈশ্বর জগতের অমঙ্গলে নিযুক্ত। খ্রীষ্টধৰ্ম্মে ঈশ্বর ও সয়তানে এই দ্বৈত মত পরিণত।

ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে মিল্ প্রথমোক্ত মতটি অবলম্বন করারই কারণ দর্শাইয়াছেন। কিন্তু তৎপূৰ্ব্বপ্রণীত “প্রকৃততত্ত্ব” সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে তিনি দ্বিতীয় মতের পৃষ্ঠরক্ষা করিয়াছেন। সংসার যে অনিষ্টময়, তাহা কোন মনুষ্যকে কষ্ট করিয়া বুঝাইবার কথা নহে—সকলেই অবিরত দুঃখভোগ করিতেছেন—এবং পরের দুঃখভোগ দেখিতেছেন। জীবের কার্য মাত্রই কেবল দুঃখমোচনের চেষ্টা। যিনি কেবল জীবের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তৎকর্তৃক এরূপ দুঃখময় সংসার সৃষ্ট হওয়া অসম্ভব। এ সম্বন্ধে কথিত প্রবন্ধ হইতে কয়েক পংক্তির মৰ্ম্মানুবাদ করিতেছি। মিল্ বলেন—

“যদি এমন হয় যে, ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিতে পারেন, তবে জীবের দুঃখ যে ঈশ্বরের অভিপ্রেত, এ সিদ্ধান্ত হইতে নিস্তার নাই।* যাঁহারা মনুষ্য প্রতি ঈশ্বরের আচরণের

* তৎসম্বন্ধে মিলের কয়েকটি কথা ইংরেজিতেই উদ্ধৃত করিতেছি।

“Next to the greatness of these Cosmic Forces, the quality which most forcibly strikes everyone who does not avert his eyes from it is their perfect and absolute recklessness. They go straight to their end, without regarding what and whom they crush on the road. In sober truth, nearly all things for which men are hanged or imprisoned for doing to one another are nature's everyday performances. Killing the most criminal act recognised by human laws, Nature does once to every being that lives; and in a large proportion of cases, after protracted tortures such as only the greatest monsters whom we read of ever purposely inflicted on their living fellow-creatures. If, by an arbitrary reservation we refuse to account any thing murder but what abridges a certain term supposed to be allotted to human life, nature does also this to all but a small percentage of lives, and does it in all the modes, violent or insidious, in which the worst human beings take the lives of one another. Nature impales men, breaks them as if on the wheel, casts them to be devoured by wild beasts, burns them to death, crushes them with stones like the first Christian Martyr, starves them with hunger, freezes them with cold, poisons them by the quick or slow venom of her exhalations and has hundreds of other hideous deaths, such as the ingenious cruelty of a Nabis or a Domitian never surpassed. All this Nature does with the most supercilious disregard both of mercy and of justice, emptying her shafts upon the best and noblest indifferently with the meanest and worst; upon those who are engaged in the highest and worthiest enterprise, and often as the direct consequence of the noblest acts; and it might almost be imagined as a punishment for them. She mows down those on whose existence hangs the well-being of a whole people, perhaps of the prospects of the human race for generations to come, with as little compunction as those whose death is a relief to themselves and to those under their noxious influence. Such are nature's dealings with

বাংকম রচনাবলী

পক্ষ সমর্থন করিতে আপনাদিগকে যোগ্য বিবেচনা করিয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে যাঁহারা মতবৈপরীত্যশূন্য, তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য, হৃদয়কে কঠিনভাবাপন্ন করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, দুঃখ অশুভ নহে। তাঁহারা বলেন যে, ঈশ্বরকে দয়াময় বলায় এমত বুঝায় না যে, মনুষ্যের সুখ তাঁহার অভিপ্রেত; তাহাতে বুঝায় যে, মনুষ্যের ধর্মই তাঁহার অভিপ্রেত; সংসার সুখের হউক না হউক, ধর্মের সংসার বটে। এইরূপ ধর্মনীতির বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে, তাহা পরিত্যাগ করিয়াও ইহা বলা যাইতে পারে যে, শূন্য কথার মীমাংসা ইহাতে কই হইল? মনুষ্যের সুখ, সৃষ্টিকর্তার যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে সে উদ্দেশ্য যেমন সম্পূর্ণরূপে বিফলীকৃত হইয়াছে, মনুষ্যের ধর্ম তাঁহার যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে সে উদ্দেশ্যও সেইরূপ সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছে। সৃষ্টিপ্রণালী লোকের সুখের পক্ষে যেরূপ অনুপযোগী, লোকের ধর্মের পক্ষে বরং তদধিক অনুপযোগী। যদি সৃষ্টির নিয়ম ন্যায়মূলক হইত এবং সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান হইতেন, তবে সংসারে যেটুকু সুখ দুঃখ আছে, তাহা ব্যক্তিবিশেষের ভাগ্যে তাহাদের ধর্মধর্মের তারতম্য অনুসারে পড়িত; কেহ অন্যাপেক্ষা অধিকতর দুঃখিয়াকারী না হইলে অধিকতর দুঃখভাগী হইত না; অকারণ ভাল মন্দ বা অন্যায়ানুগ্রহ সংসারে স্থান পাইত না; সর্বঙ্গসম্পন্ন নৈতিক উপাখ্যানবৎ গঠিত নাটকের অভিনয়তুল্য মনুষ্যজীবন অতিবাহিত হইত। আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি, তাহা যে উপরিকথিত রীতিযুক্ত নহে, এ বিষয়ে কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না; এবং এইরূপ ইহলোকে যে ধর্মধর্মের সমুচিত ফল বাকি থাকে, লোকান্তরে তাহার পরিশোধন আবশ্যিক, পরকালের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইহাই গুরুতর প্রমাণ বলিয়া প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এরূপ প্রমাণ প্রয়োগ করায় অবশ্য স্বীকৃত হয় যে, এই জগতের পদ্ধতি অবিচারের পদ্ধতি, সদিচারের পদ্ধতি নহে। যদি বল যে, ঈশ্বরের কাছে সুখ দুঃখ এমন গণনীয় নহে যে, তিনি তাহা পুণ্যাত্মার পুরস্কার এবং পাপাত্মার দণ্ড বলিয়া ব্যবহার করেন, বরং ধর্মই পরমার্থ এবং অধর্মই পরম অনর্থ, তাহা হইলেও নিতান্ত পক্ষে এই ধর্মধর্ম যাঁহার যেমন কর্ম, তাহাকে সেই পরিমাণে দেওয়া কর্তব্য ছিল। তাহা না হইয়া, কেবল জন্মদোষেই* বহু লোকে সর্বপ্রকার পাপাসক্ত হয়; তাহাদিগের পিতৃ-মাতৃ-দোষে, সমাজের দোষে, নানা অলঙ্ঘ্য ঘটনার দোষে এরূপ হয়;— তাহাদের নিজদোষে নহে। ধর্মপ্রচারক বা দার্শনিকদিগের ধর্মাত্মাদে শুভাশুভ সম্বন্ধে যে

life. Even when she does not intend to kill, she inflicts the same tortures in apparent wantonness. In the clumsy provision which she has made for that perpetual renewal of animal life, rendered necessary by the prompt termination she puts to it in every individual instance, no human being ever comes into the world but another human being is literally stretched on the rack for hours or days, not unfrequently issuing in death. Next to taking life (equal to it according to a high authority) is taking the means by which we live; and nature does this too on the largest scale, and with the most callous indifference. A single hurricane destroys the hopes of a season, a flight of locusts or an inundation desolates a district, a trifling chemical change in an edible root starves a million of people. The waves of the sea, like banditti, seize and appropriate the wealth of the rich and the little all of the poor with the same accompaniments of stripping, wounding, and killing as their human prototypes. Every thing in short which the worst men commit either against life or property is perpetrated on a large scale by natural agents. Nature has Noyades more fatal than those of Carrier; her explosions of fire damp are as destructive as human artillery; her plague and cholera far surpass the poison cups of the Borgias. Anarchy and the Reign of Terror are overmatched in injustice, ruin, and death by a hurricane and a pestilence."—*Mill on Nature*, pp. 28-31.

* খ্রীষ্টান্ ইউরোপে এ কথার উত্তর নাই। পুনর্জন্মবাদী হিন্দুর হাতে মিল্ তত সহজে নিস্তার পাইতেন না।

বিবিধ প্রবন্ধ—ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র কি বলে

কোন প্রকার সঙ্কীর্ণ বা বিকৃত মত প্রচার হইয়া থাকুক না কেন, কোন প্রকার মতানুসারেই প্রাকৃতিক শাসনপ্রণালী দয়াবান্ ও সর্বশক্তিমানের কৃত কার্য্যানুরূপ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারিবে না।”*

এই সকল কথা বলিয়া মিল্ যাহা বলিয়াছেন, তাহার এমত অর্থ করা যায় যে, এই জগতের নিষ্পত্তা বা পালনকর্তা হইতে পৃথক্ শক্তির দ্বারা জীবের ধ্বংস বা অনিষ্ট সম্পন্ন হইতেছে। এরূপ মত সুসঙ্গত। মিল্ এরূপ মত ইঙ্গিতেও ব্যক্ত করিয়াছেন কি না, তাহা তাহার জীবন-চরিত যে না পড়িয়াছে, তাহার সংশয় হইতে পারে। এজন্য ইংরেজি হইতে আমরা কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।

“The only admissible moral theory of Creation is that the principle of good cannot at once and altogether subdue the powers of evil, either physical or moral; could not place mankind in a world free from the necessity of an incessant struggle with the maleficent powers, or make them victorious in that struggle, but could and did make them capable of carrying on the fight with vigour and with progressively increasing success. Of all the religious explanations of the order of nature, this alone is neither 'contradictory to itself, nor to the facts for which it attempts to account.' †

যদি এ কথার কোন অর্থ থাকে, তবে সে অর্থ এই যে, জগতের পালনকর্তা এবং সংহারকর্তা স্বতন্ত্র, এমত কথা অসঙ্গত নহে। ইহার উপর যদি একজন পৃথক্ সৃষ্টিকর্তা পাওয়া যায়, তাহা হইলে ত্রিদেবের নৈসর্গিক ভিত্তি পাওয়া গেল।

মিলে তাহা পাওয়া যাইবে না; মিল্ হিন্দু নহেন, হিন্দুর পক্ষসমর্থন জন্য লিখেন নাই। তিনি নিষ্পত্তা-কৌশল হইতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন, নিষ্পত্তা ভিন্ন সৃষ্টিকর্তা মানেন না। কিন্তু বিজ্ঞানে বলে, জীবের জন্ম নিষ্পত্তা মাত্র; ভৌতিক পদার্থের সমবায়বিশেষ জীবিত্ব। এই পৃথিবীতে যাহা কিছু দেখি—জীব উদ্ভিদ বায়ু বারি মৃৎপ্রসূরাদি, সকলই সেই-রূপে নিষ্পত্তা; পৃথিবীও তাই; সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, নক্ষত্র, নীহারিকা, সকলই নিষ্পত্তা। অতএব সকলই সেই নিষ্পত্তাতার কীর্ত্তি—তাঁহার হস্তপ্রসূত। সচরাচর সৃষ্টিকর্তা যাহাকে বলা যায়, ঈদৃশ নিষ্পত্তাতার সঙ্গে তাঁহার প্রভেদ অল্প। যে আকারশূন্য, শক্তিবিশিষ্ট, পরমাণুসমষ্টিতে এই বিশ্ব গঠিত, তাহা নিষ্পত্তা কি না—নিষ্পত্তাতার হস্তপ্রসূত কি না—তাঁহার কেহ স্রষ্টা আছেন কি না, তদ্বিষয়ে প্রমাণাভাব। এইটুকু স্মরণ রাখিয়া, সৃষ্টিকর্তা শব্দের প্রচলিত অর্থে নিষ্পত্তাতাকে সৃষ্টিকর্তা বলা যাইতে পারে। তাহা হউক বা না হউক, ঈদৃশ স্রষ্টার সঙ্গেই ধর্ম্ম এবং বিজ্ঞানের নিকট সম্বন্ধ। অতএব তাঁহাকে পাইলেই আমাদের গৌরব অধিক হইল।

মিল্ বলেন, তাঁহার অস্তিত্ব প্রমাণীকৃত। তবে মিল্, নিষ্পত্তা এবং পালন বা রক্ষাকর্তার মধ্যে প্রভেদ করেন না। ইউরোপে কেহ এরূপ প্রভেদ স্বীকার করে না। এরূপ স্বীকার না করিবার কারণ ইহাই দেখা যায় যে, জন্মও জাগতিক নিয়মাবলীর ফল, রক্ষাও জাগতিক নিয়মাবলীর ফল; যে নিয়মাবলীর ফল জন্ম বা সৃজন, সেই নিয়মাবলীর ফল রক্ষা। অতএব যিনি জন্ম, নিষ্পত্তা বা সৃষ্টির নিয়ন্তা, তিনিই রক্ষা বা পালনেরও নিয়ন্তা ইহা সিদ্ধ।

কিন্তু ধ্বংস সম্বন্ধেও সেইরূপ বলা যাইতে পারে। রক্ষাও জাগতিক নিয়মাবলীর ফল; সংহারও জাগতিক নিয়মাবলীর ফল। যে সকল নিয়মের ফল রক্ষা, সেই সকল নিয়মেরই ফল ধ্বংস। যে রাসায়নিক সংযোজন বিশ্লেষণে জীবের দেহ রক্ষিত হয়, সেই রাসায়নিক সংযোজন বিশ্লেষণেই জীবের দেহ লয়প্রাপ্ত হয়। যে অম্লজানের সংযোগে জীবের দেহ প্রত্যহ গঠিত ও পরিপুষ্ট হইতেছে—শেষ দিনে সেই অম্লজান সংযোগেই তাহা নষ্ট হইবে। অতএব যিনি পালনের নিয়ন্তা, তিনিই যে সংহারের নিয়ন্তা, ইহাও সিদ্ধ।

* *Mill on Nature*, pp. 37-38.

† *Mill on Nature*, pp. 38-39.

বাংকম রচনাবলী

আমাদিগের দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, এই ত্রিদেবোপাসনার নৈসর্গিক ভিত্তি আছে বটে, কিন্তু আমরা এমত কিছুর লিখি নাই এবং বিচারেও এমত কোন কথাই পাওয়া যায় না যে, তন্ম্বারা এই ত্রিদেবের অস্তিত্ব বিজ্ঞানের দ্বারা প্রমাণীকৃত বলিয়া স্বীকার করা যায়। প্রমাণে দুইটি গুরুতর ছিদ্র লক্ষিত হয়।

প্রথম এই যে, জগতের নিষ্কারণকৌশলে চৈতন্যযুক্ত নিষ্কর্তার অস্তিত্ব প্রমাণ হইতেছে, এই কথা স্বীকার করাতেই ত্রিদেবের অস্তিত্ব সঙ্গত বলিয়া সংস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু প্রথম সূত্রটি ভ্রান্তিজনিত; প্রাকৃতিক নিষ্কারণের ফলকেই নিষ্কারণকৌশল বলিয়া আমাদিগের ভ্রম হয়; সেই ভ্রান্তি জ্ঞানেই আমরা নিষ্কর্তাকে সিদ্ধ করিয়াছি, নচেৎ নিষ্কর্তার অস্তিত্বের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই। নিষ্কর্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই আমরা সংহারকর্তা, এবং পৃথক্ পৃথক্ স্রষ্টা পাতা পাইয়াছি। যদি নিষ্কর্তার অস্তিত্বের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই, তবে ত্রিদেবের মধ্যে কাহারও অস্তিত্বের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই।

দ্বিতীয় দোষ, সৃজন পালন সংহার, একই নিয়মাবলীর ফল। বিজ্ঞান ইহাই শিখাইতেছে যে, যে যে নিয়মের ফলে সৃজন, সেই সেই নিয়মের ফলে পালন, সেই সেই নিয়মের ফলে ধ্বংস। নিয়ম যেখানে এক, নিয়ন্তা সেখানে পৃথক্ সঙ্কল্প করা প্রামাণ্য নহে। আমরা কোথাও বলি নাই যে, তাহা প্রামাণ্য। আমরা কেবল বলিয়াছি যে, তাহা অপ্রামাণ্য বা অসঙ্গত নহে, সঙ্গত। যাহা প্রমাণবিরুদ্ধ নহে বা যাহা কেবল সঙ্গত, তাহা সূত্ররূপে প্রামাণিক, ইহা বলা যাইতে পারে না।

আমাদিগের তৃতীয় বক্তব্য এই যে, ত্রিদেবের অস্তিত্বের যৌক্তিকতা স্বীকার করিলেও, তাহাদিগকে সাকার বলিয়া স্বীকার করা যায় না। পুরাণেতিহাসে যে সকল আনুষ্ঠানিক কথা আছে, তৎপোষকে কিছুমাত্র বৈজ্ঞানিক যুক্তি পাওয়া যায় না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রত্যেকেই কতকগুলি অদ্ভুত উপন্যাসের নায়ক। সেই সকল উপন্যাসের তিলমাত্র নৈসর্গিক ভিত্তি নাই। যিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে বিশ্বাস করেন, তাহাকে নিষ্কর্তা বলিতে পারি না; কিন্তু তাই বলিয়া পুরাণেতিহাসে বিশ্বাসের কোন কারণ আমরা নির্দেশ করি নাই।

চতুর্থ, ত্রিদেবের অস্তিত্বের কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই, ইহা যথার্থ, কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, মহাবিজ্ঞানকুশলী ইউরোপীয় জাতির অবলম্বিত খ্রীষ্টধর্ম্মাপেক্ষা, হিন্দুদিগের এই ত্রিদেবোপাসনা বিজ্ঞানসঙ্গত এবং নৈসর্গিক। ত্রিদেবোপাসনা বিজ্ঞানমূলক না হউক, বিজ্ঞানবিরুদ্ধ নহে। কিন্তু খ্রীষ্টীয় সর্বশক্তিমান্, সর্বজ্ঞ, এবং দয়াময় ঈশ্বরে বিশ্বাস যে বিজ্ঞানবিরুদ্ধ, তাহা উপরেকথিত মিল্-কৃত বিচারে সপ্রমাণ হইয়াছে। হিন্দুদিগের মত কর্ম্মফল মানিলে বা হিন্দুদিগের মায়াবাদে তাহা বিজ্ঞানসম্মত হয়।

বিজ্ঞানে ইহা পদে পদে প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, এই জগৎ ব্যাপিয়া সর্বত্র, সর্বকার্যে, এক অনন্ত, অচিন্তনীয়, অজ্ঞেয় শক্তি আছে—ইহা সকলের কারণ, বহির্জগতের অন্তরাত্মা-স্বরূপ। সেই মহাবলের অস্তিত্ব অস্বীকার করা দূরে থাকুক, আমরা তদুদ্দেশে ভিত্তিভাবে কোটি কোটি কোটি প্রণাম করি।

বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনা*

যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার গ্রন্থ বা সাময়িক পত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহাদিগের বিশেষ দূরদৃষ্ট। তাহারা যত যত্ন করুন না কেন, দেশীয় কৃতবিদ্য সম্প্রদায় প্রায়ই তাহাদিগের রচনা পাঠে বিমুগ্ধ। ইংরাজিপ্রিয় কৃতবিদ্যাগণের প্রায় স্থিরজ্ঞান আছে যে, তাহাদের পাঠের যোগ্য কিছুই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইতে পারে না। তাহাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা ভাষার লেখক-মাত্রেরই হয় ত বিদ্যাবুদ্ধিহীন, লিপিকৌশলশূন্য; নয় ত ইংরাজি গ্রন্থের অনুবাদক। তাহাদের বিশ্বাস যে, যাহা কিছু বাঙ্গালা ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়, তাহা হয়ত অপাঠ্য; নয়ত কোন ইংরাজি গ্রন্থের ছায়ামাত্র; ইংরাজিতে যাহা আছে, তাহা আর বাঙ্গালায় পড়িয়া আত্মাবমাননার প্রয়োজন

* এই প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত করিবার কারণ এই, ইহার মধ্যে যে সকল কথা আছে, তাহার পুনর্মুদ্রিত এখনও প্রয়োজনীয়। ১২৭৯ বৈশাখে বঙ্গদর্শন প্রথম প্রকাশিত হয়।

বিবিধ প্রবন্ধ—বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনা

কি? সহজে কালো চামড়ার অপরাধে ধরা পড়িয়া আমরা নানারূপ সাফাইয়ের চেষ্টায় বেড়াইতেছি, বাঙ্গালা পড়িয়া কবুলজবাব কেন দিব?

ইংরাজিভক্তাদিগের এই রূপ। সংস্কৃতজ্ঞ পাণ্ডিত্যাভিমানীদিগের “ভাষায়” যে রূপ শ্রদ্ধা, তদ্বিষয়ে লিপিবাহুল্যের আবশ্যিকতা নাই। যাঁহারা “বিষয়ী লোক”, তাঁহাদিগের পক্ষে সকল ভাষাই সমান। কোন ভাষার বাহি পড়িবার তাঁহাদের অবকাশ নাই। ছেলে স্কুলে দিয়াছেন, বাহি পড়া আর নিমন্ত্রণ রাখার ভার ছেলের উপর। সুতরাং বাঙ্গালা গ্রন্থাদি এক্ষণে কেবল নশ্বাল স্কুলের ছাত্র, গ্রাম্য বিদ্যালয়ের পাণ্ডিত, অপ্ৰাপ্তবয়ঃ-পৌর-কন্যা, এবং কোন কোন নিষ্কর্মা রসিকতা-ব্যবসায়ী পুরুষের কাছেই আদর পায়। কদাচিৎ দুই একজন কৃতিবিদ্য সদাশয় মহাত্মা বাঙ্গালা গ্রন্থের বিজ্ঞাপন বা ভূমিকা পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া বিদ্যোৎসাহী বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন।

লেখাপড়ার কথা দূরে থাক্, এখন নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কাজই বাঙ্গালায় হয় না। বিদ্যালোচনা ইংরাজিতে। সাধারণের কাব্য, মিটিং, লেক্‌চর্, এড্রেস্, প্রোসিডিংস্, সমুদায় ইংরাজিতে। যদি উভয় পক্ষ ইংরাজি জানেন, তবে কথোপকথনও ইংরাজিতেই হয়, কখন ষোল আনা, কখন বার আনা ইংরাজি। কথোপকথন যাহাই হউক, পত্র লেখা কখনই বাঙ্গালায় হয় না। আমরা কখন দেখি নাই যে, যেখানে উভয় পক্ষ ইংরাজির কিছু জানেন, সেখানে বাঙ্গালায় পত্র লেখা হইয়াছে। আমরাদিগের এমনও ভরসা আছে যে, অর্গোণে দুর্গোৎসবের মন্ত্রাদি ইংরাজিতে পঠিত হইবে।

ইহাতে কিছুই বিস্ময়ের বিষয় নাই। ইংরাজি একে রাজভাষা, অর্থোপার্জনের ভাষা, তাহাতে আবার বহু বিদ্যার আধার, এক্ষণে আমাদের জ্ঞানোপার্জনের একমাত্র সোপান; এবং বাঙ্গালীরা তাহার আশৈশব অনুশীলন করিয়া দ্বিতীয় মাতৃভাষার স্থলভুক্ত করিয়াছেন। বিশেষ, ইংরাজিতে না বলিলে ইংরাজে বুঝে না; ইংরাজে না বুঝিলে ইংরাজের নিকট মান মর্যাদা হয় না; ইংরাজের কাছে মান মর্যাদা না থাকিলে কোথাও থাকে না, অথবা থাকা না থাকা সমান। ইংরাজ যাহা না শুনিল, সে অরণ্যে রোদন; ইংরাজ যাহা না দেখিল, তাহা ভস্মে ঘৃত।

আমরা ইংরাজি বা ইংরাজের দ্বেষক নহি। ইহা বলিতে পারি যে, ইংরাজ হইতে এ দেশের লোকের যত উপকার হইয়াছে, ইংরাজি শিক্ষাই তাহার মধ্যে প্রধান। অনন্তরঙ্গপ্রসূতি ইংরাজি ভাষার যতই অনুশীলন হয়, ততই ভাল। আরও বলি, সমাজের মঙ্গল জন্য কতকগুলি সামাজিক কার্য রাজপুরুষদিগের ভাষাতেই সম্পন্ন হওয়া আবশ্যিক। আমরাদিগের এমন অনেক-গুলিন কথা আছে, যাহা রাজপুরুষদিগকে বুঝাইতে হইবে। সে সকল কথা ইংরাজিতেই বক্তব্য। এমন অনেক কথা আছে যে, তাহা কেবল বাঙ্গালীর জন্য নহে; সমস্ত ভারতবর্ষ তাহার শ্রোতা হওয়া উচিত। সে সকল কথা ইংরাজিতে না বলিলে, সমগ্র ভারতবর্ষ বুঝিবে কেন? ভারতবর্ষীয় নানা জাতি একমত, একপরামর্শী, একোদ্যোগী না হইলে, ভারতবর্ষের উন্নতি নাই। এই মতৈক্য, একপরামর্শিত্ব, একোদ্যম, কেবল ইংরাজির দ্বারা সাধনীয়; কেন না, এখন সংস্কৃত লুপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালী, মহারাষ্ট্রী, তৈলঙ্গী, পঞ্জাবী, ইহাদিগের সাধারণ মিলনভূমি ইংরাজি ভাষা। এই রঞ্জুতে ভারতীয় ঐক্যের গ্রন্থি বাঁধিতে হইবে।* অতএব যতদূর ইংরাজি আবশ্যিক, ততদূর চলুক। কিন্তু একেবারে ইংরাজ হইয়া বসিলে চলিবে না। বাঙ্গালী কখন ইংরাজ হইতে পারিবে না। বাঙ্গালী অপেক্ষা ইংরাজ অনেক গুণে গুণবান্, এবং অনেক সুখে সুখী; যদি এই তিন কোটি বাঙ্গালী হঠাৎ তিন কোটি ইংরাজ হইতে পারিত, তবে সে মন্দ ছিল না। কিন্তু তাহার কোন সম্ভাবনা নাই; আমরা যত ইংরাজি পড়ি, যত ইংরাজি কহি বা যত ইংরাজি লিখি না কেন, ইংরাজি কেবল আমরাদিগের মৃত সিংহের চর্ম্মস্বরূপ হইবে মাত্র। ডাক ডাকিবার সময়ে ধরা পড়িব। পাঁচ সাত হাজার নকল ইংরাজি ভিন্ন তিন কোটি সাহেব কখনই হইয়া উঠিবে না। গিল্‌টি পিতল হইতে খাঁটি রূপা ভাল। প্রস্তুতময়ী সুন্দরী মূর্ত্তি অপেক্ষা, কুৎসিতা বন্যনারী জীবনযাত্রার সুসহায়। নকল ইংরাজি অপেক্ষা খাঁটি বাঙ্গালী স্পৃহণীয়। ইংরাজি লেখক, ইংরাজি বাচক সম্প্রদায় হইতে নকল ইংরাজি ভিন্ন কখন খাঁটি

* এখানে যাহা কথিত হইয়াছে, কংগ্রেস্ এখন তাহা সিদ্ধ।

বিশ্বকম রচনাবলী

বাস্তবতার সমুদ্রের সম্ভাবনা নাই। যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবস্ত্ত বাস্তবতার ভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন বাস্তবতার উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।

এ কথা কৃতবিদ্য বাস্তবতার কেন যে বুঝেন না, তাহা বলিতে পারি না। যে উক্তি ইংরাজিতে হয়, তাহা কয়জন বাস্তবতার হৃদয়ঙ্গম হয়? সেই উক্তি বাস্তবতায় হইলে কে তাহা হৃদয়ঙ্গম না করিতে পারে? যদি কেহ এমত মনে করেন যে, সুশিক্ষিতদিগের উক্তি কেবল সুশিক্ষিতদিগেরই বুঝা প্রয়োজন, সকলের জন্য সে সকল কথা নয়, তবে তাঁহারা বিশেষ ভ্রান্ত। সমস্ত বাস্তবতার উন্নতি না হইলে দেশের কোন মঙ্গল নাই। সমস্ত দেশের লোক ইংরাজি বুঝে না, কম্পিন্ কালে বুঝিবে, এমত প্রত্যাশা করা যায় না। সুতরাং বাস্তবতায় যে কথা উক্ত না হইবে, তাহা তিন কোটি বাস্তবতার কখন বুঝিবে না বা শুনবে না। এখনও শূনে না, ভবিষ্যতে কোন কালেও শুনবে না। যে কথা দেশের সকল লোকে বুঝে না বা শূনে না সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই।

এক্ষণে একটা কথা উঠিয়াছে, এডুকেশন্ “ফিল্টর্ ডোন্” করিবে।* এ কথার তাৎপর্য এই যে, কেবল উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা সুশিক্ষিত হইলেই হইল, অধঃশ্রেণীর লোকদিগকে পৃথক্ শিখাইবার প্রয়োজন নাই; তাহারা কাজে কাজেই বিদ্বান্ হইয়া উঠিবে। যেমন শোষক পদার্থের উপরি ভাগে জলসেক করিলেই নিম্ন স্তর পর্য্যন্ত সিক্ত হয়, তেমনি বিদ্যারূপ জল, বাস্তবতার জাতীরূপ শোষক-মুক্তিকার উপরিস্তরে ঢালিলে, নিম্ন স্তর অর্থাৎ ইতর লোক পর্য্যন্ত ভিজিয়া উঠিবে! জল থাকাতে কথাটা একটু সরস হইয়াছে বটে। ইংরাজিশিক্ষার সঙ্গে এরূপ জলযোগ না হইলে আমাদের দেশের উন্নতির এত ভরসা থাকিত না। জলও অগাধ, শোষকও অসংখ্য। এতকাল শূঙ্ক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা দেশ উৎসন্ন দিতেছিল, এক্ষণে নব্য সম্প্রদায় জলযোগ করিয়া দেশ উদ্ধার করিবেন। কেন না, তাঁহাদিগের ছিদ্রগুণে ইতর লোক পর্য্যন্ত রসাদ্ হইয়া উঠিবে। ভরসা করি, বোর্ডের মণি সাহেব এবারকার আবকার রিপোর্ট্ লিখিবার সময়ে এই জলপানা কথাটা মনে রাখিবেন।

সে যাহাই হউক, আমাদের দেশের লোকের এই জলময় বিদ্যা যে এতদূর গড়াইবে, এমত ভরসা আমরা করি না। বিদ্যা, জল বা দুগ্ধ নহে যে, উপরে ঢালিলে নীচে শোষিবে। তবে কোন জাতীর একাংশ কৃতবিদ্য হইলে তাহাদিগের সংসর্গগুণে অন্যান্যশ্রেণীরও শ্রীবৃদ্ধি হয় বটে। কিন্তু যদি ঐ দুই অংশের ভাষার এরূপ ভেদ থাকে যে, বিদ্বানের ভাষা মূর্খে বুঝিতে পারে না, তবে সংসর্গের ফল ফলিবে কি প্রকারে?

প্রধান কথা এই যে, এক্ষণে আমাদের ভিতরে উচ্চ শ্রেণী এবং নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পর সহৃদয়তা কিছুমাত্র নাই। উচ্চ শ্রেণীর কৃতবিদ্য লোকেরা, মূর্খ দরিদ্র লোকদিগের কোন দুঃখে দুঃখী নহেন। মূর্খ দরিদ্রেরা, ধনবান্ এবং কৃতবিদ্যাদিগের কোন সুখে সুখী নহে। এই সহৃদয়তার অভাবই দেশোন্নতির পক্ষে সম্প্রতি প্রধান প্রতিবন্ধক। ইহার অভাবে, উভয় শ্রেণীর মধ্যে দিন দিন অধিক পার্থক্য জন্মিতেছে। উচ্চ শ্রেণীর সহিত যদি পার্থক্য জন্মিল, তবে সংসর্গ-ফল জন্মিবে কি প্রকারে? যে পৃথক্, তাহার সহিত সংসর্গ কোথায়? যদি শক্তিমন্ত ব্যক্তির অশক্তদিগের দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী না হইল, তবে কে আর তাহাদিগকে উদ্ধার করিবে? আর যদি আপামর সাধারণ উদ্ধৃত না হইল, তবে যাহারা শক্তিমন্ত, তাহাদিগেরই উন্নতি কোথায়? এরূপ কখন কোন দেশে হয় নাই যে, ইতর লোক চিরকাল এক অবস্থায় রহিল, ভদ্র লোকদিগের অবিরত শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। বরং যে যে সমাজের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, সেই সেই সমাজে উভয় সম্প্রদায় সমকক্ষ, বিমিশ্রিত এবং সহৃদয়তা-সম্পন্ন। যতদিন এই ভাব ঘটে নাই—যতদিন উভয়ে পার্থক্য ছিল, ততদিন উন্নতি ঘটে নাই। যখন উভয় সম্প্রদায়ের সামঞ্জস্য হইল, সেই দিন হইতে শ্রীবৃদ্ধি আরম্ভ। রোম্, এথেন্স্, ইংলন্ড্ এবং আমেরিকা ইহার উদাহরণস্থল। সে সকল কাহিনী সকলেই অবগত আছেন। পক্ষান্তরে সমাজমধ্যে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে পার্থক্য থাকিলে সমাজের যেরূপ অনিষ্ট হয়, তাহার উদাহরণ স্পার্টা, ফ্রান্স্, মিশর এবং ভারতবর্ষ। এথেন্স্ এবং স্পার্টা দুই

* উচ্চ শিক্ষা উঠাইয়া দিবার কথাটা এই সময়ে উঠিয়াছিল। তদুপলক্ষে এই কথাটা উঠিয়াছিল। উচ্চ শিক্ষাপক্ষীয় লোক এই কথা বলিতেন।

বিবিধ প্রবন্ধ—বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনা

প্রতিযোগিনী নগরী। এথেন্সে সকলে সমান; স্পার্টায় এক জাতি প্রভু, এক জাতি দাস ছিল। এথেন্সে হইতে পৃথিবীর সভ্যতার সৃষ্টি হইল—যে বিদ্যাপ্রভাবে আধুনিক ইউরোপের এত গৌরব, এথেন্সে তাহার প্রসূতি। স্পার্টা কুলক্ষয়ে লোপ পাইল। ফ্রান্সে পার্থক্য হেতু ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে যে মহাবিপ্লব আরম্ভ হয়, অদ্যাপি তাহার শেষ হয় নাই। যদিও তাহার চরম ফল মঙ্গল বটে, কিন্তু অসাধারণ সমাজপীড়ার পর সে মঙ্গল সিদ্ধ হইতেছে। হস্তপদাদিচ্ছেদ করিয়া, যেরূপ রোগীর আরোগ্যসাধন, এ বিপ্লবে সেইরূপ সামাজিক মঙ্গলসাধন। সে ভয়ানক ব্যাপার সকলেই অবগত আছেন। মিশর দেশে সাধারণের সহিত ধর্ম-যাজকদিগের পার্থক্য-হেতুক, অকালে সমাজোন্নতি লোপ। প্রাচীন ভারতবর্ষে বর্ণগত পার্থক্য। এই বর্ণগত পার্থক্যের কারণ, উচ্চ বর্ণ এবং নীচ বর্ণে যেরূপ গুরুতর ভেদ জন্মিয়াছিল, এরূপ কোন দেশে জন্মে নাই, এবং এত অনিষ্টও কোন দেশে হয় নাই। সে সকল অমঙ্গলের সর্বিস্তার বর্ণনা এখানে করার আবশ্যিকতা নাই। এক্ষণে বর্ণগত পার্থক্যের অনেক লাঘব হইয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে শিক্ষা এবং সম্পত্তির প্রভেদে অন্যপ্রকার বিশেষ পার্থক্য জন্মিতেছে।

সেই পার্থক্যের এক বিশেষ কারণ ভাষাভেদ। সুশিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের অভিপ্রায়সকল সাধারণতঃ বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত না হইলে, সাধারণ বাঙ্গালী তাহাদিগের মর্ম বুঝিতে পারে না, তাহাদিগকে চিনিতে পারে না, তাহাদিগের সংস্রবে আসে না। আর, পাঠক বা শ্রোতাদিগের সহিত সহৃদয়তা, লেখকের বা পাঠকের স্বতঃসিদ্ধ গুণ। লিখিতে গেলে বা কহিতে গেলে, তাহা আপনা হইতে জন্মে। যেখানে লেখক বা বক্তার স্থির জানা থাকে যে, সাধারণ বাঙ্গালী তাহার পাঠক বা শ্রোতার মধ্যে নহে, সেখানে কাজে কাজেই তাহাদিগের সহিত তাহার সহৃদয়তার অভাব ঘটিয়া উঠে।

যে সকল কারণে সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর উক্তি বাঙ্গালা ভাষাতেই হওয়া কর্তব্য, তাহা আমরা সর্বিস্তারে বিবৃত করিলাম। কিন্তু রচনা-কালে সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার করার একটি বিশেষ বিঘ্ন আছে। সুশিক্ষিতে বাঙ্গালা পড়ে না। সুশিক্ষিতে যাহা পড়িবে না, তাহা সুশিক্ষিতে লিখিতে চাহে না।

“আপারিতোষাদ্বিদ্‌ষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।”

আমরা সকলেই স্বার্থাভিলাষী। লেখক মাত্রেই যশের অভিলাষী। যশঃ, সুশিক্ষিতের মুখে। অন্য সদস্য বিচারসক্ষম নহে; তাহাদের নিকট যশঃ হইলে, তাহাতে রচনার পরিশ্রমের সার্থকতা বোধ হয় না। সুশিক্ষিতে না পড়িলে সুশিক্ষিত ব্যক্তি লিখিবে না।

এদিকে কোন সুশিক্ষিত বাঙ্গালীকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, “মহাশয়, আপনি বাঙ্গালী— বাঙ্গালা গ্রন্থ বা পত্রাদিতে আপনি এত হতাদর কেন?” তিনি উত্তর করেন, “কোন বাঙ্গালা গ্রন্থ বা পত্রে আদর করিব? পাঠ্য রচনা পাইলে অবশ্য পড়ি।” আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে, এ কথার উত্তর নাই। যে কয়খানি বাঙ্গালা রচনা পাঠ্যযোগ্য, তাহা দুই তিন দিনের মধ্যে পড়িয়া শেষ করা যায়। তাহার পর দুই তিন বৎসর বসিয়া না থাকিলে আর একখানি পাঠ্য বাঙ্গালা রচনা পাওয়া যায় না।

এইরূপ বাঙ্গালা ভাষার প্রতি বাঙ্গালীর অনাদরেই বাঙ্গালার অনাদর বাড়িতেছে। সুশিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা রচনায় বিমুখ বলিয়া সুশিক্ষিত বাঙ্গালী বাঙ্গালা রচনা পাঠে বিমুখ। সুশিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা পাঠে বিমুখ বলিয়া, সুশিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা রচনায় বিমুখ।

আমরা এই পত্রকে সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর পাঠোপযোগী করিতে যত্ন করিব। যত্ন করিব, এই মাত্র বলিতে পারি। যত্নের সফলতা ক্ষমতাধীন। এই আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়, এই পত্র আমরা কৃতিবিদ্য সম্প্রদায়ের হস্তে, আরও এই কামনায় সমর্পণ করিলাম যে, তাহারা ইহাকে আপনাদিগের বাস্তবহস্তরূপ ব্যবহার করুন। বাঙ্গালী সমাজে ইহা তাহাদিগের বিদ্যা, কল্পনা, লিপিকৌশল, এবং চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় দিক। তাহাদিগের উক্তি বহন করিয়া, ইহা বঙ্গ-মধ্যে জ্ঞানের প্রচার করুক। অনেক সুশিক্ষিত বাঙ্গালী বিবেচনা করেন যে, এরূপ বাস্তবহস্তের কতক দূর অভাব আছে। সেই অভাব নিরাকরণ এই পত্রের এক উদ্দেশ্য। আমরা যে কোন বিষয়ে, যে কাহারও রচনা, পাঠোপযোগী হইলে সাদরে গ্রহণ করিব। এই পত্র, কোন বিশেষ পক্ষের সমর্থন জন্য বা কোন সম্প্রদায়বিশেষের মঙ্গলসাধনার্থ সৃষ্ট হয় নাই।

আমরা কৃতিবিদ্যাদিগের মনোরঞ্জনার্থ যত্ন পাইব বলিয়া, কেহ এরূপ বিবেচনা করিবেন না

বিক্রম রচনাবলী

যে, আমরা আপামর সাধারণের পাঠোপযোগিতা-সাধনে মনোযোগ করিব না। বাহাতে এই পত্র সর্বজনপাঠ্য হয়, তাহা আমাদের বিশেষ উদ্দেশ্য। বাহাতে সাধারণের উন্নতি নাই, তাহাতে কাহারই উন্নতি সিদ্ধ হইতে পারে না, ইহা বলিয়াছি। যদি এই পত্রের দ্বারা সর্বসাধারণের মনোরঞ্জন সঙ্কল্প না করিতাম, তবে এই পত্র প্রকাশ বৃথা কার্য মনে করিতাম।

অনেকে বিবেচনা করেন যে, বালকের পাঠোপযোগী অতি সরল কথা ভিন্ন, কিছুই সাধারণের বোধগম্য বা পাঠ্য হয় না। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া যাঁহারা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তাঁহাদের রচনা কেহই পড়ে না। যাহা সুশিক্ষিত ব্যক্তির পাঠোপযোগী নহে, তাহা কেহই পড়িবে না। যাহা উত্তম, তাহা সকলেই পড়িতে চাহে; যে না বুঝিতে পারে, সে বুঝিতে যত্ন করে। এই যত্নই সাধারণের শিক্ষার মূল। সে কথা আমরা স্মরণ রাখিব।

তৃতীয়, বাহাতে নব্য সম্প্রদায়ের সহিত আপামর সাধারণের সহৃদয়তা সম্বন্ধিত হয়, আমরা তাহার সাধ্যানুসারে অনুমোদন করিব। আরও অনেক কাজ করিব বাসনা করি। কিন্তু যত গজ্জ, তত বর্ষে না। গজ্জনকারী মাত্রেরই পক্ষে এ কথা সত্য। বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের পক্ষে বিশেষ। আমরা যে এই কথার সত্যতার একটি নূতন উদাহরণস্বরূপ হইব না, এমত বলি না। আমাদের পূর্বতনের এইরূপ এক এক বার অকালগজ্জন করিয়া, কালে লয়প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমাদের অদৃষ্টে যে সেরূপ নাই, তাহা বলিতে পারি না। যদি তাহাই হয়, তথাপি আমরা ক্ষতি বিবেচনা করিব না। এ জগতে কিছুই নিষ্ফল নহে। একখানি সাময়িক পত্রের ক্ষণিক জীবনও নিষ্ফল হইবে না। যে সকল নিয়মের বলে, আধুনিক সামাজিক উন্নতি সিদ্ধ হইয়া থাকে, এই সকল পত্রের জন্ম, জীবন, এবং মৃত্যু তাহারই প্রক্রিয়া। এই সকল সামান্য ক্ষণিক পত্রেরও জন্ম, অলঙ্ঘ্য সামাজিক নিয়মাধীন, মৃত্যু ঐ নিয়মাধীন, জীবনের পরিণাম ঐ অলঙ্ঘ্য নিয়মের অধীন। কালস্রোতে এ সকল জলবৃদ্ধ মাত্র। এই বঙ্গদর্শন কালস্রোতে নিয়মাধীন জলবৃদ্ধস্বরূপ ভাসিল; নিয়মবলে বিলীন হইবে। অতএব ইহার লয়ে আমরা পরিতাপযুক্ত বা হাস্যাস্পদ হইব না। ইহার জন্ম কখনই নিষ্ফল হইবে না। এ সংসারে জলবৃদ্ধও নিষ্কারণ বা নিষ্ফল নহে।

সঙ্গীত

[১২৭৯ সালের বঙ্গদর্শনে সঙ্গীতবিষয়ক তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাহার কিয়দংশ 'জগদীশ-নাথ রায়ের রচিত। অবশিষ্ট অংশ আমার রচনা। যতটুকু আমার রচনা, তাহাই আমি পুনর্মুদ্রিত করিলাম। ইহা প্রবন্ধের ভগ্নাংশ হইলেও পাঠকের বুঝিবার কষ্ট হইবে না।]

সঙ্গীত কাহাকে বলে? সকলেই জানেন যে, সুস্বরবিশিষ্ট শব্দই সঙ্গীত। কিন্তু সুস্বর কি?

কোন বস্তুতে অপর বস্তুর আঘাত হইলে, শব্দ জন্মে; এবং আহত পদার্থের পরমাণু মধ্যে কম্পন জন্মে। সেই কম্পনে, তাহার চারি পার্শ্বস্থ বায়ুও কম্পিত হয়। যেমন সরোবর মধ্যে জলের উপরি ইষ্টকখণ্ড নিক্ষেপ করিলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমালা সমুদ্ভূত হইয়া চারি দিকে মণ্ডলাকারে ধাবিত হয়, সেইরূপ কম্পিত বায়ুর তরঙ্গ চারি দিকে ধাবিত হইতে থাকে। সেই সকল তরঙ্গ কর্ণমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। কর্ণমধ্যে একখানি সুক্ষ্ম চর্ম আছে। ঐ সকল বায়বীয় তরঙ্গপরম্পরা সেই চর্মের উপর প্রহত হয়; পরে তৎসংলগ্ন অস্থি প্রভৃতি দ্বারা শ্রাবণ স্নায়ুতে নীত হইয়া মস্তিস্কমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। তাহাতে আমরা শব্দানুভব করি।

অতএব বায়ুর প্রকম্প শব্দজ্ঞানের মুখ্য কারণ। বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করিয়াছেন যে, যে শব্দে প্রতি সেকেন্ডে ৪৮,০০০ বার বায়ুর প্রকম্প হয়, তাহা আমরা শুনিতে পাই, তাহার অধিক হইলে শুনিতে পাই না। সুস্বর সর্বাতি অবধারিত করিয়াছেন যে, প্রতি সেকেন্ডে ১৪ বারের ন্যূনসংখ্যক প্রকম্প যে শব্দে, সে শব্দ আমরা শুনিতে পাই না। এই প্রকম্পের সমান মাত্রা সুস্বরের কারণ। দুইটি প্রকম্পের মধ্যে যে সময় গত হয়, তাহা যদি সকল বারে সমান থাকে, তাহা হইলেই সুস্বর জন্মে। গীতে তাল ষেরূপ, মাত্রার সমতা মাত্র—শব্দপ্রকম্পে সেইরূপ থাকিলেই সুস্বর জন্মে। যে শব্দে সেই সমতা নাই, তাহা সুস্বররূপে পরিণত হয় না। সে শব্দ “বেস্বর” অর্থাৎ গন্ডগোল মাত্র। তালই সঙ্গীতের সার।

এই সুরের একতা বা বহুত্বই সঙ্গীত। বাহ্য নিসর্গতত্ত্বে সঙ্গীত এইরূপ, কিন্তু তাহাতে মানসিক সুখ জন্মে কেন? তাহা বলি।

সংসারে কিছুই সম্পূর্ণরূপে উৎকৃষ্ট হয় না। সকলেরই উৎকর্ষের কোন অংশে অভাব বা কোন দোষ আছে। কিন্তু নিন্দোঁষ উৎকর্ষ আমরা মনে কল্পনা করিয়া লইতে পারি—এবং এক বার মনোমধ্যে তাহার প্রতিমা স্থাপিত করিতে পারিলে, তাহার প্রতিমূর্ত্তির সৃজন করিতে পারি। যথা, সংসারে কখন নিন্দোঁষ সুন্দর মনুষ্য পাওয়া যায় না; যত মনুষ্য দেখি, সকলেরই কোন না কোন দোষ আছে, কিন্তু সে সকল দোষ ত্যাগ করিয়া, আমরা সুন্দরকান্তিমাত্রেরই সৌন্দর্য্য মনে রাখিয়া, এক নিন্দোঁষ মূর্ত্তির কল্পনা করিতে পারি। এবং তাহা মনে কল্পনা করিয়া নিন্দোঁষ প্রতিমা প্রস্তুত গঠিত করা যায়। এইরূপ উৎকর্ষের চরম সৃষ্টিই কাব্য, চিত্রাদির উদ্দেশ্য।

যেমন সকল বস্তুরই উৎকর্ষের একটা চরম সীমা আছে, শব্দেরও তদ্রূপ। বালকের কথা মিষ্ট লাগে। যুবতীর কণ্ঠস্বর মৃদুস্বর; বক্তার স্বরভঙ্গীই বক্তৃতার সার। বক্তৃতা শুনিয়া যত ভাল লাগে, পাঠ করিয়া তত ভাল লাগে না; কেন না, সে স্বরভঙ্গী নাই। সে কথা সহজে বলিলে তাহাতে কোন রস পাওয়া যায় না, রসিকের কণ্ঠভঙ্গীতে তাহা অত্যন্ত সরস হয়। কখন কখন একটি মাত্র সামান্য কথায়, এত শোক, এত প্রেম বা এত আহ্লাদ ব্যক্ত হইতে শূন্য গিয়াছে যে, শোক বা প্রেম বা আহ্লাদ জানাইবার জন্য রচিত সুদীর্ঘ বক্তৃতায় তাহার শতাংশ পাওয়া যায় না। কিসে এরূপ হয়? কণ্ঠভঙ্গীর গুণে। সেই কণ্ঠভঙ্গীর অবশ্য একটা চরমোৎকর্ষ আছে। সে চরমোৎকর্ষ অত্যন্ত সুখকর হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? কেন না, সামান্য কণ্ঠভঙ্গীতেও মনকে চঞ্চল করে। কণ্ঠভঙ্গীর সেই চরমোৎকর্ষই সঙ্গীত। কণ্ঠভঙ্গী মনের ভাবের চিহ্ন। অতএব সঙ্গীতের দ্বারা সকল প্রকার মনের ভাব প্রকাশ করা যায়।

ভক্তি, প্রেম ও আহ্লাদ-বাচক সঙ্গীত, সকল সময়ে, সকল দেশে, সর্বলোকমধ্যে আছে। কেবল খলতা-ব্যঞ্জক সঙ্গীত নাই। যাহাতে রাগদ্বेषাদি প্রকাশ পায়, সে সকল শব্দ গীতমধ্যে নহে। রণবাদ্য প্রভৃতি আছে সত্য, কিন্তু ঐ সকল বাদ্য হিংসা-প্রবাচক নহে; কেবল উৎসাহ-বর্দ্ধক মাত্র। কল্পনার দ্বারা আমরা রাগ অহঙ্কার প্রভৃতি খলভাবের বর্ণনা গীতে ভাবসিদ্ধ করিতে চেষ্টা করি, কিন্তু সে বর্ণনা কল্পনা-প্রতিষ্ঠিত মাত্র; বুদ্ধাইয়া না দিলে, বুদ্ধা যায় না। অতএব এ সকল গীত স্বভাবসঙ্গত নহে। শোকপ্রকাশক গীত আছে, গীতমধ্যে তাহা অতি মনোহর। কিন্তু শোক কুরভাব নহে; ভক্তি ও প্রেমবাচক।

অতঃপর রাগ রাগিণী সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। যেমন তেঁত্রিশটি আদি দেবতা হইতে তেঁত্রিশ কোটী দেবতা হইয়াছেন, সেইরূপ আদিম ছয় রাগ এবং ছত্রিশ রাগিণী হইতে অদ্ভুত কল্পনার প্রভাবে, অসংখ্য উপরাগ উপরাগিণী পুত্রপৌত্রাদির সহিত হিন্দু সঙ্গীতে বিরাজমান হইয়াছে। এ বড় রহস্য। হিন্দুদিগের বুদ্ধি অত্যন্ত কল্পনা-কুতূহলিনী। শব্দার্থমাগ্নকেই মানব-চরিত্রবিশিষ্ট করিয়া পরিণত করিয়াছে। প্রাকৃতিক বস্তু বা শক্তিমাগ্নেরই দেবত্ব। পৃথিবী দেবী; আকাশ, ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু—সকলেই দেব; নদ, নদী, দেব, দেবী। দেব দেবী সকলেই মনুষ্যের ন্যায় রূপবিশিষ্ট; তাহাদের সকলেরই স্ত্রী, স্বামী, পুত্র, পৌত্রাদি আছে। তর্ক দ্বারা প্রথম সিদ্ধ হইল যে, এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা একজন আছেন। তিনি ব্রহ্মা। দেখা যাইতেছে যে, ঘটপটাদির সৃষ্টিকর্ত্তা, সাকার, হস্তপদাদিবিশিষ্ট। সুতরাং ব্রহ্মাও সাকার, হস্তপদাদিবিশিষ্ট, বেশির ভাগ চতুর্মুখ। তবে তাঁহার একটি ব্রহ্মাণীও থাকা চাই। একটি ব্রহ্মাণীও হইল। ঋষিগণ তাঁহার পুত্র হইলেন। হংস তাঁহার বাহন হইলেন, নহিলে—গতিবিধি হয় কি প্রকারে—ব্রহ্মলোকে গাড়ি পালকির অভাব। কেবল ইহাতেই কল্পনাকারীর সন্তুষ্টি নহে। মনুষ্যেরা কামক্রোধাদিপরবশ, মহাপাপী। ব্রহ্মাও তাই। তিনি কন্যাহারী।

যেখানে সৃষ্টিকর্ত্তা প্রভৃতি অপ্রমেয় পদার্থ,—আকাশ, নক্ষত্র, গিরি, নদী প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদার্থ,—অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক ক্রিয়া,—কামাদি মনোবৃত্তি,—এ সকল মূর্ত্তিবিশিষ্ট, পুত্রকলত্রাদিব্যক্ত, সর্ব বিষয়ে মনুষ্যপ্রকৃতিসম্পন্ন হইলেন, সেখানে সুরসমষ্টি রাগই বা বাদ পড়ে কেন? সুতরাং তাহারাও সাকার, সংসারী, গৃহী হইল। রাগের সঙ্গে সঙ্গে রাগিণী হইল। কেবল যে এক একটি রাগিণী, এমত নহে। রাগেরা কুলীন ব্রাহ্মণ—পলিগেমিস্ট, এক এক রাগের ছয় ছয় রাগিণী। সঙ্গীতবিদেরা ইহাতেও সন্তুষ্টি নহেন। রাগগুলিকে “বাবু”

বিক্রম রচনাবলী

করিয়া তুলিলেন। তাহাদের রাগিণীর উপর উপরাগিণীও হইল। যদি উপরাগিণী হইল, উপরাগ না হয় কেন? তাহাও হইল। তখন রাগ রাগিণী, উপরাগ উপরাগিণী সকলে সুখে ঘরকন্না করিতে লাগিলেন। তাহাদের পুত্রপৌত্রাদি জন্মিল।

কিন্তু এ কেবল রহস্য নহে। এই রহস্যের ভিতর বিশেষ সার আছে। রাগ-রাগিণীকে আকারবিশিষ্ট করা, কেবল রসিকতামাত্র নহে। শব্দশক্তি কে না জানে? কোন একটি শব্দ-বিশেষ শ্রবণে মনের একটি বিশেষ ভাব উদয় হইয়া থাকে, ইহা সকলেই জানে। আবার কোন দৃশ্য বস্তু দেখিয়াও সেই ভাব উদয় হইতে পারে। মনে কর, আমরা কখন কোন পুত্রশোকাতুরা মাতার ক্রন্দনধ্বনি শুনিলাম। মনে কর, এস্থলে আমরা রোদনকারিণীকে দেখিতে পাইতৈছি না, কেবল ক্রন্দনধ্বনিই শুনিতৈছি। সেই ধ্বনি শুনিয়া আমাদের মনে শোকের আবির্ভাব হইল। আবার যখন সেইরূপ রোদনানুকারী স্বর শুনিব—আমাদের সেই শোক মনে পড়িবে—সেইরূপ শোকের আবির্ভাব হইবে।

মনে কর, আমরা অন্যত্র দেখিলাম যে, এক পুত্রশোকাতুরা মাতা বসিয়া আছেন। কাঁদিতেন না—কিন্তু তাহার মুখাবয়ব দেখিয়াই, তাহার উৎকট মানসিক যন্ত্রণা অনুভব করিতে পারিলাম। সেই সস্তাপক্লিষ্ট ম্লান মুখমণ্ডলের আধিব্যক্তি আমাদের হৃদয়ে অধিকতর রহিল। সেই অবধি, যখন আবার সেইরূপ ক্লিষ্ট মুখমণ্ডল দেখিব, তখন আমাদের সেই শোক মনে পড়িবে—হৃদয়ে সেই শোকের আবির্ভাব হইবে।

অতএব সেই ধ্বনি, এবং সেই মুখের ভাব, উভয়ই আমাদের মনে শোকের চিহ্নস্বরূপ। সেই ধ্বনিতে সেই শোক মনে পড়ে। মানস প্রকৃতির নিয়মানুসারে ইহার আর একটি চমৎকার ফল জন্মে। শব্দ, এবং মুখকান্তি, উভয়ই শোকের চিহ্ন বলিয়া পরস্পরকে স্মৃতিপথে উদ্দীপ্ত করে। সেইরূপ শব্দ শুনিলেই, সেইরূপ মুখকান্তি মনে পড়ে; সেইরূপ মুখ দেখিলেই, সেইরূপ শব্দ মনে পড়ে। এইরূপ ভূয়োভূয়ঃ উভয়ে একত্র স্মৃতিগত হওয়াতে, উভয়ে উভয়ের প্রতিমাস্বরূপে পরিণত হয়। সেই শোকব্যঞ্জক মুখাবয়বকে সেই শোকসূচক ধ্বনির সাকার প্রতিমা বলিয়া বোধ হয়।

ধ্বনি এবং মূর্তির এইরূপ পরস্পর সম্বন্ধাবলম্বন করিয়াই প্রাচীনেরা রাগ রাগিণীকে সাকার কল্পনা করিয়া, তাহাদিগের ধ্যান রচনা করিয়াছেন। সেই সকল ধ্যান, প্রাচীন আৰ্য্যদিগের আশ্চর্য্য কবিত্বশক্তি ও কল্পনাশক্তির পরিচয়স্থল। আমরা পুর্বপুর্বাধিগের কীর্ত্তি যতই আলোচনা করি, ততই তাহাদিগের মহানুভাব দেখিয়াই চমৎকৃত হই।

দুই একটি উদাহরণ দিই। অনেকেই টোড়ি রাগিণী শুনিয়াছেন। সহৃদয় ব্যক্তির তচ্ছব্রণে যে একটি অনির্বচনীয় ভাবে অভিভূত হইয়েন, তাহা সহজে বক্তব্য নহে। সচরাচর যাহাকে কবিরা “আবেশ” বলিয়া থাকেন, তাহা ঐ ভাবের একাংশ—কিন্তু একাংশমাত্র। তাহার সঙ্গে ভোগাভিলাষ মিলিত কর। সে ভোগাভিলাষ নীচপ্রবৃত্ত নহে। যাহা কিছু নিস্মল সুখকর, অন্য জনের অসাপেক্ষ, কেবল আধ্যাত্মিক, সেই ভোগেরই অভিলাষ। কিন্তু সে ভোগাভিলাষের সীমা নাই, তৃপ্তি নাই, রোধ নাই, শাসন নাই। ভোগে এবং ভোগসুখে অভিলাষ আপনি উছলিয়া উঠিতেছে। আকাঙ্ক্ষা বাড়িতেছে। প্রাচীনেরা এই টোড়ি রাগিণীর মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন, সে পরমসুন্দরী যুবতী, বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা, কিন্তু বিরহিণী। আকাঙ্ক্ষার অনির্বৃত্তিহেতুই তাহাকে বিরহিণী কল্পনা করিতে হইয়াছে। এই বিরহিণী সুন্দরী বন-বিহারিণী, বনমধ্যে নিঃসর্জনে একাকিনী বসিয়া মধুপানে উন্মাদিনী হইয়াছে, বীণা বাজাইয়া গান করিতেছে, তাহার বসন ভূষণ সকল স্থলিত হইয়া পড়িতেছে, বনহারিণীসকল আসিয়া, তাহার সম্মুখে তটস্থভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

এই চিত্র অনির্বচনীয় সুন্দর—কিন্তু সৌন্দর্য্য ভিন্ন ইহার আর এক চমৎকার গুণ আছে। ইহা টোড়ি রাগিণীর যথার্থ প্রতিমা। টোড়ি রাগিণী শ্রবণে মনে যে ভাবের উদয় হয়, এই প্রতিমা দর্শনে ঠিক সেই ভাব জন্মিবে।

এইরূপ অন্যান্য রাগ রাগিণীর ধ্যান। মূলতানী, দীপক রাগের সহধর্ম্মিণী, দীপকের পার্শ্ববর্ত্তিনী, রক্তবস্ত্রাবৃত্তা গৌরাজী সুন্দরী। ভৈরবী শুক্লাম্বরপরিধানা নানালঙ্কারভূষিতা—ইত্যাদি।

এই সকল ধ্যান সম্বন্ধে যে মতভেদ আছে, তাহার সন্দেহ নাই। যখন বৈজ্ঞানিক বৃত্তান্তেই

বিবিধ প্রবন্ধ—বঙ্গদেশের কৃষক

পণ্ডিতদিগের মতের অনৈক্য, তখন কল্পনামাত্রপ্রসূত ব্যাপারে নানা মূর্খির নানা মত না হইবে কেন? কেবল চক্ষু মূর্খিয়া, ভাবিয়া, মন হইতে অলঙ্কারের সৃষ্টি করিতে থাকিলে, অলঙ্কার-সম্বন্ধে মতভেদ হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? কিন্তু কতকগুলিন শব্দ দ্বারা যে কতকগুলিন ভাবের উদয় হয়, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। তর্কিকেরা বলিতে পারেন যে, কোমল সুরে যদি শোকও বৃঝায়, প্রেমও বৃঝায়, উন্মাদও বৃঝায়, তবে স্বরভেদ দ্বারা একটি ভাবই কি প্রকারে উপলব্ধ হইতে পারে? উত্তর, সে উপলব্ধি কেবল সংস্কারাধীন। আমাদের সঙ্গীতবিদ্যায় সুরের বাহুল্য এবং প্রভেদ অসীম, কিন্তু কেবল শিক্ষা এবং অভ্যাসেই তাহার তারতম্য উপলব্ধ হইতে পারে। সামান্য অভ্যাসে, বালকেরা সানাই শুনিলে নাচে, হাইলন্ডরেরা বাগ্‌পাইপে গা ফুলায়, এবং প্রাচীন হিন্দুরা আগমনী শুনিলে কাঁদেন। এই অভ্যাস বন্ধমূল এবং সুশিক্ষায় পরিণত হইলে, ভাবসম্পদের আধিক্য জন্মে, পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুভব করিতে পারা যায়। শিক্ষাহীন মূর্খেরা যাহাতে হাসে, ভাবকেরা তাহাতে কাঁদেন। অতএব লোকের যে সাধারণ সংস্কার আছে যে, সঙ্গীতসুখানুভব মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ, তাহা ভ্রমাত্মক। কতক দূর মাত্র ইহা সত্য বটে যে, সুস্বর সকলেরই ভাল লাগে—স্বাভাবিক ভাল বোধ সকলেরই আছে। কিন্তু উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীতের সুখানুভব, শিক্ষা ভিন্ন সম্ভবে না। অভ্যাসশূন্য ব্যক্তি যেমন পলাণ্ডুভোজনে বিরক্ত, অশিক্ষিত ব্যক্তি তেমন উৎকৃষ্টতর সঙ্গীতে বিরক্ত। কেন না, উভয়ই অভ্যাসাধীন। সংস্কারহীন ব্যক্তি রাগ-রাগিণী-পরিপূর্ণ কালোয়ার্ণাতি গান শুনিলে চাহেন না, এবং বহুমিলনবিশিষ্ট ইউরোপীয় সঙ্গীত বাঙ্গালীর কাছে অরণ্যে রোদন। কিন্তু উভয় স্থানেই, অনাদরটি অসভ্যতার চিহ্ন বলিতে হইবে। যেমন রাজনীতি, ধর্মনীতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি সকল মনুষ্যেরই জানা উচিত, তেমন শরীরার্থ স্বাস্থ্যকর ব্যায়াম, এবং চিত্ত-প্রসাদার্থ মনোমোহিনী সঙ্গীতবিদ্যাও সকল ভদ্রলোকের জানা কর্তব্য। শাস্ত্র রাজকুমার রাজকুমারীদিগের অভ্যাসোপযোগী বিদ্যার মধ্যে সঙ্গীত প্রধান স্থান পাইয়াছে। বাঙ্গালীর মধ্যে ভদ্র পৌরকন্যাগণের সঙ্গীত শিক্ষা যে নিষিদ্ধ বা নিন্দনীয়, তাহা আমাদের অসভ্যতার চিহ্ন। কুলকামিনীরা সঙ্গীতনিপুণ হইলে, গৃহমধ্যে এক অত্যন্ত বিমলানন্দের আকর স্থাপিত হয়। বাবুদের মদ্যাসক্তি এবং অন্য একটি গুরুতর দোষ অনেক অপনীত হইতে পারে। এতদ্দেশে নিম্মল আনন্দের অভাবই অনেকের মদ্যাসক্তির কারণ—সঙ্গীতপ্রিয়তা হইতেই অনেকের বারম্বারব্যাধি জন্মে।

বঙ্গদেশের কৃষক

[“বঙ্গদেশের কৃষকে” এ দেশীয় কৃষকদিগের যে অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আর নাই। জমীদারের আর সেরূপ অত্যাচার নাই। নূতন আইনে তাঁহাদের ক্ষমতাও কমিয়া গিয়াছে। কৃষকদিগের অবস্থারও অনেক উন্নতি হইয়াছে। অনেক স্থলে এখন দেখা যায়, প্রজাই অত্যাচারী, জমীদার দুর্বল। এই সকল কারণে আমি এতদিন এ প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত করি নাই। এক্ষণে যে আমি ইহা পুনর্মুদ্রিত করিতেছি, তাহার অনেকগুলি কারণ আছে। (১) ইহাতে পঁচিশ বৎসর পূর্বে দেশের যে অবস্থা ছিল, তাহা জানা যায়। ভবিষ্যৎ ইতিহাসবেত্তার ইহা কার্য্য লাগিতে পারে। (২) ইহার পর হইতে কৃষকদিগের অবস্থা সমাজে আন্দোলিত হইতে লাগিল। এক্ষণে যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে, ইহাতে তাহার প্রথম সূত্রপাত, সুতরাং পুনর্মুদ্রিত হইবার এ প্রবন্ধ একটু দাবি দাওয়া রাখে। (৩) ইহাতে কৃষকদিগের যে অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এখনও অনেক প্রদেশে অপরিবর্তিতই আছে। যতগুলি উপাত্তের কথা আছে, তাহা সব কোন স্থানেই এখনও অন্তর্হিত হয় নাই। (৪) এ প্রবন্ধ যখন প্রকাশিত হয়, তখন কিছু যশোলাভ করিয়াছিল, এবং (৫) আমি বঙ্গদর্শনে “সাম্য” নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করিয়া পশ্চাৎ তাহা পুনর্মুদ্রিত করিয়াছিলাম। “বঙ্গদেশের কৃষক” আর পুনর্মুদ্রিত করিব না, বিবেচনায় তাহার কিয়দংশ “সাম্য”-মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করিয়াছিলাম। এক্ষণে সেই “সাম্য”শীর্ষক পুস্তকখানি বিলুপ্ত করিয়াছি। সুতরাং “বঙ্গদেশের কৃষক” পুনর্মুদ্রিত করার আর একটা কারণ হইয়াছে।

অর্থশাস্ত্রঘটিত ইহাতে কয়েকটা কথা আছে, তাহা আমি এক্ষণে ভ্রান্তিশূন্য মনে করি না। কিন্তু অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে কোন কথা ভ্রান্তি, আর কোন কথা ধ্রুব সত্য, ইহা নিশ্চিত করা দুঃসাধ্য। অতএব কোন প্রকার সংশোধনের চেষ্টা করিলাম না।]

বাঁকম রচনাবলী

প্রথম পরিচ্ছেদ—দেশের শ্রীবৃদ্ধি

আজি কালি বড় গোল শূনা যায় যে, আমাদের দেশের বড় শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। এত কাল আমরাইগের দেশ উৎসন্ন যাইতেছিল, এক্ষণে ইংরাজের শাসনকৌশলে আমরা সভ্য হইতেছি। আমাদের দেশের বড় মঙ্গল হইতেছে।

কি মঙ্গল, দেখিতে পাইতেছ না? ঐ দেখ, লোহবর্ষে লোহতুরঙ্গ, কোটি উচ্চৈঃশ্রবাকে বলে অতিক্রম করিয়া, এক মাসের পথ এক দিনে যাইতেছে। ঐ দেখ, ভাগীরথীর যে উত্তাল তরঙ্গ-মালায় দিগ্গজ ভাসিয়া গিয়াছিল, অগ্নিময়ী তরণি ক্রীড়াশীল হংসের ন্যায় তাহাকে বিদীর্ণ করিয়া বাণিজ্য দ্রব্য বহিয়া ছুটিতেছে। কাশীধামে তোমার পিতার অদ্য প্রাতে সাংঘাতিক রোগ হইয়াছে—বিদ্যুৎ আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়া তোমাকে সংবাদ দিল, তুমি রাগিমধ্যে তাহার পদপ্রান্তে বসিয়া তাহার শূশ্রূষা করিতে লাগিলে। যে রোগ পূর্বে আরাম হইত না, এখন নবীন চিকিৎসাশাস্ত্রের গুণে ডাক্তারে তাহা আরাম করিল। যে ভূমিখণ্ড, নক্ষত্রময় আকাশের ন্যায় অট্টালিকাময় হইয়া এখন হাসিতেছে, আগে উহা ব্যাঘ্র ভল্লুকের আবাস ছিল। ঐ যে দেখিতেছ রাজপথ, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ঐ স্থানে সন্ধ্যার পর, হয় কাদার পিছলে পা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া থাকিতে, না হয় দস্যুহস্তে প্রাণত্যাগ করিতে; এখন সেখানে গ্যাসের প্রভাবে কোটি চন্দ্র জ্বলিতেছে। তোমার রক্ষার জন্য পাহারা দাঁড়াইয়াছে, তোমাকে বহনের জন্য গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে। যেখানে বসিয়া আছ, তাহা দেখ। যেখানে আগে ছেঁড়া কাঁথা, ছেঁড়া সপ ছিল, এখন সেখানে কার্পেট, কোচ্, ঝাড়, কাণ্ডেলারা, মার্বেল, আলাবাস্টার,—কত বলিব? যে বাবু দূরবীণ কষিয়া বৃহস্পতি গ্রহের উপগ্রহগণের গ্রহণ পর্যবেক্ষণ করিতেছে, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে জন্মিলে উনি এত দিন চাল কলা ধূপ দীপ দিয়া বৃহস্পতির পূজা করিতেন। আর আমি যে হতভাগা, চেয়ারে বসিয়া ফুলিস্কেপ্ কাগজে বঙ্গদর্শনের জন্য সমাজতত্ত্ব লিখিতে বসিলাম, এক শত বৎসর পূর্বে হইলে, আমি এতক্ষণ ধরাসনে পশুবিশেষের মত বসিয়া ছেঁড়া তুলট্ নাকের কাছে ধরিয়া নবমীতে লাউ খাইতে আছে কি না, সেই কচ্‌কিচিতে মাথা ধরাইতাম। তবে কি দেশের বড় মঙ্গল হইতেছে না? দেশের বড় মঙ্গল—তোমরা একবার মঙ্গলের জন্য জয়ধ্বনি কর!

এই মঙ্গল ছড়াছড়ির মধ্যে আমার একটি কথা জিজ্ঞাসার আছে, কাহার এত মঙ্গল? হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত দুই প্রহরের রোদ্রে, খালি মাথায়, খালি পায়ে, এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটা অস্থিচর্ম্মবিশিষ্ট বলদে, ভোঁতা হাল ধার করিয়া আনিয়া চাষিতেছে, উহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? উহাদের এই ভাদ্রের রোদ্রে মাথা ফাটিয়া যাইতেছে, তুষায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, তাহার নিবারণজন্য অঞ্জলি করিয়া মাঠের কন্দর্ম পান করিতেছে; ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে, কিন্তু এখন বাড়ী গিয়া আহার করা হইবে না, এই চাষের সময়। সন্ধ্যাবেলা গিয়া উহারা ভাঙ্গা পাতরে রাঙ্গা রাঙ্গা বড় বড় ভাত, লুন, লঙ্কা দিয়া আধপেটা খাইবে। তাহার পর ছেঁড়া মাদুরে, না হয় ভূমে, গোহালের এক পাশে শয়ন করিবে—উহাদের মশা লাগে না। তাহারা পরদিন প্রাতে আবার সেই এক হাঁটু কাদায় কাজ করিতে যাইবে—যাইবার সময়, হয় জমীদার, নয় মহাজন, পথ হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়া দেনার জন্য বসাইয়া রাখিবে, কাজ হইবে না। নয় ত চাষবার সময় জমীদার জমীখানি কাড়িয়া লইবেন, তাহা হইলে সে বৎসর কি করিবে? উপবাস—সপরিবারে উপবাস। বল দেখি চসমা-নাকে বাবু! উহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? তুমি লেখাপড়া শিখিয়া ইহাদিগের কি মঙ্গল সাধিয়াছ? আর তুমি, ইংরাজ বাহাদুর! তুমি যে মেজের উপরে এক হাতে হংসপক্ষ ধরিয়া বিধির সৃষ্টি ফিরাইবার কল্পনা করিতেছ, আর অপর হস্তে ভ্রমরকৃষ্ণ শ্মশ্রুগুচ্ছ কণ্ডুয়িত করিতেছ—তুমি বল দেখি যে, তোমা হইতে এই হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্তের কি উপকার হইয়াছে?

আমি বলি, অণুমাত্র না, কণামাত্রও না। তাহা যদি না হইল, তবে আমি তোমাদের সঙ্গে মঙ্গলের ঘটায় হুল্লুধ্বনি দিব না। দেশের মঙ্গল? দেশের মঙ্গল, কাহার মঙ্গল? তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি, কিন্তু তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয় জন? আর এই কৃষিজীবী কয় জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয় জন থাকে? হিসাব করিলে তাহারা

দেশ—দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। তোমা হইতে আমা হইতে কোন কার্য হইতে পারে? কিন্তু সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে? কি না হইবে? যেখানে তাহাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোন মঙ্গল নাই।

দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, স্বীকার কর। আমরা এই প্রবন্ধে একটি উদাহরণের দ্বারা প্রথমে দেখাইব যে, দেশের কি প্রকারে শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। পরে দেখাইব যে, কৃষকেরা সে শ্রীবৃদ্ধির ভাগী নহে। পরে দেখাইব যে, তাহা কাহার দোষ।

ব্রিটিশ অধিকারে রাজ্য সুশাসিত। পরজাতীয়েরা জনপদপীড়া উপস্থিত করিয়া যে দেশের অর্থাপহরণ করিবে, সে আশঙ্কা বহুকাল হইতে রহিত হইয়াছে। আবার স্বদেশীয়, স্বজাতীয়ের মধ্যে পরস্পরে যে সঞ্চিতার্থ অপহরণ করিবে, সে ভয়ও অনেক নিবারণ হইয়াছে। দস্যুভীতি, চোরভীতি, বলবৎকর্তৃক দুর্বলের সম্পত্তিহরণের ভয়, এ সকলের অনেক লাঘব হইয়াছে। আবার রাজা বা রাজপুরুষেরা প্রজার সঞ্চিতার্থ সংগ্রহ-লালসায় যে বলে ছলে কৌশলে লোকের স্বর্গস্বাপহরণ করিবেন, সে দিনও নাই। অতএব যদি কেহ অর্থসঞ্চয়ের ইচ্ছা করে, তবে তাহার ভরসা হয় যে, সে তাহা ভোগ করিতে পারিবে, এবং তাহার উত্তরাধিকারীরাও তাহা ভোগ করিতে পারিবে। যেখানে লোকের এরূপ ভরসা থাকে, সেখানে লোকে সচরাচর সংসারী হয়। যেখানে পরিবারপ্রতিপালনশক্তি সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা, সেখানে লোকে সংসারধর্মের বিরাগী। পরিণয়াদিতে সাধারণ লোকের অনুরাগের ফল প্রজাবৃদ্ধি। অতএব, ব্রিটিশ শাসনে প্রজাবৃদ্ধি হইয়াছে। প্রজাবৃদ্ধির ফল, কৃষিকার্যের বিস্তার। যে দেশে লক্ষ লোকের মাত্র আহারোপযোগী শস্যের আবশ্যক, সে দেশে বাণিজ্যের প্রয়োজন বাদে কেবল তদুপযুক্ত ভূমিই কৃষিত হইবে,—কেন না, অনাবশ্যক শস্য—যাহা কেহ খাইবে না, ফেলিয়া দিতে হইবে,—তাহা কে পরিশ্রম স্বীকার করিয়া উৎপাদন করিতে যাইবে? দেশের অবশিষ্ট ভূমি পতিত বা জঙ্গল বা তদ্রূপ অবস্থাবিশেষে থাকিবে। কিন্তু প্রজাবৃদ্ধি হইয়া যখন সেই এক লক্ষ লোকের স্থানে দেড় লক্ষ লোক হয়, তখন আর বেশী ভূমি আবাদ না করিলে চলে না। কেন না, যে ভূমির উৎপাদনে লক্ষ লোকমাত্র প্রতিপালিত হইত, তাহার শস্যে দেড় লক্ষ কখন চিরকাল জীবনধারণ করিতে পারে না। সুতরাং প্রজাবৃদ্ধি হইলেই চাষ বাড়িবে। যাহা পূর্বে পতিত বা জঙ্গল ছিল, তাহা ক্রমে আবাদ হইবে। ব্রিটিশ শাসনে প্রজাবৃদ্ধি হওয়াতে সেইরূপ হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে অসংখ্য এলাকায় অনেক ভূমি কৃষিত হইতেছে।

আর এক কারণে চাষের বৃদ্ধি হইতেছে। সেই দ্বিতীয় কারণ বাণিজ্যবৃদ্ধি। বাণিজ্য বিনিময় মাত্র। আমরা যদি ইংলণ্ডের বস্তাদি লই, তবে তাহার বিনিময়ে আমাদের কিছু সামগ্রী ইংলণ্ডে পাঠাইতে হইবে, নহিলে আমরা বস্ত্র পাইব না। আমরা কি পাঠাই? অনেকে বলিবেন, “টাকা”; তাহা নহে, সেটি আমাদের দেশীয় লোকের একটি গুরুতর ভ্রম। সত্য বটে, ভারতবর্ষের কিছু টাকা ইংলণ্ডে যায়,—সেই টাকটি ভারতব্যাপারে ইংলণ্ডের মুনফা। সে টাকা ইংলণ্ড হইতে প্রাপ্ত সামগ্রীর কোন অংশের মূল্য নহে, যদি বিবেচনা কর; তাহাতেও হানি নাই। অধিকাংশের বিনিময়ে আমরা কৃষিজাত দ্রব্যসকল পাঠাই—যথা, চাউল, রেশম, কার্পাস, পাট, নীল ইত্যাদি। ইহা বলা বাহুল্য যে, যে পরিমাণে বাণিজ্যবৃদ্ধি হইবে, সেই পরিমাণে এই সকল কৃষিজাত সামগ্রীর আধিক্য আবশ্যিক হইবে। সুতরাং দেশে চাষও বাড়িবে। ব্রিটিশ রাজ্য হইয়া পর্যন্ত এ দেশের বাণিজ্য বাড়িতেছে—সুতরাং বিদেশে পাঠাইবার জন্য বৎসর বৎসর অধিক কৃষিজাত সামগ্রীর আবশ্যিক হইতেছে, অতএব এ দেশে প্রতি বৎসর চাষ বাড়িতেছে।

চাষ বৃদ্ধির ফল কি? দেশের ধনবৃদ্ধি শ্রীবৃদ্ধি। যদি পূর্বে ১০০ বিঘা জমী চাষ করিয়া বার্ষিক ১০০ টাকা পাইয়া থাকি, তবে ২০০ বিঘা চাষ করিলে, ন্যূনতম* ২০০ টাকা পাইব, ৩০০ শত বিঘা চাষ করিলে, ৩০০ টাকা পাইব। বঙ্গদেশে দিন দিন চাষের বৃদ্ধিতে দেশের কৃষিজাত ধন বৃদ্ধি পাইতেছে।

আর একটা কথা আছে। সকলে মহাদুঃখিত হইয়া বলিয়া থাকেন, এলাকায় দিনপাত করা

* সমাজতত্ত্ববিদেরা বলিবেন, এখানে “ন্যূনতম” শব্দটি ব্যবহার করিবার বিশেষ তাৎপর্য আছে, ই সাধারণপাঠ্য এই প্রবন্ধে তাহা বুঝাইবার প্রয়োজন নাই।

বিশ্বকম রচনাবলী

ভার—দ্রব্য সামগ্রী বড় দক্ষিণ হইয়া উঠিতেছে। এই কথা নির্দেশ করিয়া অনেকেই প্রমাণ করিতে চাহেন যে, বর্তমান সময় দেশের পক্ষে বড় দক্ষিণ, ইংরাজের রাজ্য প্রজাপীড়ক রাজ্য, এবং কলিযুগ অত্যন্ত অধর্মক্রান্ত যুগ—দেশ উৎসন্ন গেল! ইহা যে গুরুতর ভ্রম, তাহা সুশিক্ষিত সকলেই অবগত আছেন। বাস্তবিক, দ্রব্যের বর্তমান সাধারণ দক্ষিণ দেশের অমঙ্গলের চিহ্ন নহে, বরং একটি মঙ্গলের চিহ্ন। সত্য বটে, যেখানে আগে আট আনায় এক মণ চাউল পাওয়া যাইত, সেখানে এখন আড়াই টাকা লাগে; যেখানে টাকায় তিন সের ঘৃত ছিল, সেখানে টাকায় তিন পোয়া পাওয়া ভার। কিন্তু ইহাতে এমত বদলায় না যে, বস্তুতঃ চাউল বা ঘৃত দক্ষিণ হইয়াছে। টাকা সস্তা হইয়াছে, ইহাই বদলায়। সে যাহাই হউক, এক টাকার ধান এখন যে দুই তিন টাকার ধান হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইহার ফল এই যে, যে ভূমিতে কৃষক এক টাকা উৎপন্ন করিত, সে ভূমিতে দুই তিন টাকা উৎপন্ন হয়। যে ভূমিতে দশ টাকা হইত, তাহাতে ২০ কি ৩০ টাকা হয়। বঙ্গদেশের সর্বত্রই বা অধিকাংশ স্থানে এইরূপ হইয়াছে, সুতরাং এই এক কারণে বঙ্গদেশের কৃষিজাত বার্ষিক আয়ের বৃদ্ধি হইয়াছে।

আবার পূর্বেই সপ্রমাণ করা গিয়াছে, কৃষিত ভূমিরও আধিক্য হইয়াছে। তবে দুই প্রকারে কৃষিজাত আয়ের বৃদ্ধি হইয়াছে; প্রথম, কৃষিত ভূমির আধিক্যে, দ্বিতীয়, ফসলের মূল্য-বৃদ্ধিতে। যেখানে এক বিঘা ভূমিতে তিন টাকার ফসল হইত, সেখানে সেই এক বিঘায় ছয় টাকা জন্মে, আবার আর এক বিঘা জঙ্গল পরিত আবাদ হইয়া, আর ছয় টাকা; মোটে তিন টাকার স্থানে বার টাকা জন্মিতেছে।

এইরূপে বঙ্গদেশের কৃষিজাত আয় যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে এ পর্যন্ত তিন চারিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহা বলিলে অত্যাঙ্ক হইবে না। এই বেশী টাকাটা কার ঘরে যায়? কে লইতেছে?

এ ধন কৃষিজাত—কৃষকেরই প্রাপ্য—পাঠকেরা হঠাৎ মনে করিবেন, কৃষকেরাই পায়। বাস্তবিক তাহারা পায় না। কে পায়, আমরা দেখাইতেছি।

কিছু রাজভাণ্ডারে যায়। গত সন ১৮৭০।৭১ সালের যে বিজ্ঞাপনী কলিকাতা রেভিনিউ বোর্ড হইতে প্রচার হইয়াছে, তাহাতে কার্য্যাধ্যক্ষ সাহেব লিখেন, ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে যে প্রদেশে ২,৮৫,৮৭,৭২২ টাকা রাজস্ব ধার্য ছিল, সেই প্রদেশ হইতে এক্ষণে ৩,৫০,৪১,২৪৮ টাকা রাজস্ব আদায় হইতেছে। অনেকে অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, যে কর চিরকালের জন্য অবধারিত হইয়াছে, তাহার আবার বৃদ্ধি কি? শক্ সাহেব বৃদ্ধির কারণ সকলও নির্দেশ করিয়াছেন—যথা, তোর্ফির বন্দোবস্ত, লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত, নতুন “পর্যন্ত” ভূমির উপর কর সংস্থাপন, খাসমহলের কর বৃদ্ধি ইত্যাদি। অনেকে বলিবেন, ঐ সকল বৃদ্ধি যাহা হইবার হইয়াছে, আর বড় অধিক হইবে না। কিন্তু শক্ সাহেব দেখাইয়াছেন, এই বৃদ্ধি নিয়মিতরূপে হইতেছে। পূর্বাধারিত করের উপর বেশী যাহা এক্ষণে গবর্ণমেন্ট পাইতেছেন—সাড়ে বার্ষিক লক্ষ টাকা—তাহা কৃষিজাত ধন হইতেই পাইতেছেন।

এ ধন অন্যান্য পথেও রাজভাণ্ডারে যাইতেছে। আফিমের আয়ের অধিকাংশই কৃষিজাত। কণ্টম্ হোসের দ্বার দিয়াও রাজভাণ্ডারে কৃষিজাত অনেক ধন যায়।

শক্ সাহেব বলেন, এই কৃষিজাত ধনবৃদ্ধি অধিকাংশই বণিক্ এবং মহাজনদিগের হস্তগত হইয়াছে। বণিক্ এবং মহাজন সম্প্রদায় যে ইহার কিয়দংশ হস্তগত করিতেছে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। কৃষকের সংখ্যা বাড়িয়াছে, সুতরাং মহাজনের লাভও বাড়িয়াছে। এবং যে বণিকেরা মাঠ হইতে ফসল আনিয়া বিক্রয়ের স্থানে বিক্রয় করে, কৃষিজাত ধনের কিয়দংশ যে তাহাদের লাভস্বরূপে পরিণত হয়, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু কৃষিজাত ধনের বৃদ্ধির অধিকাংশই যে তাহাদের হস্তগত হয়, ইহা শক্ সাহেবের ভ্রমমাত্র। এ ভ্রম কেবল শক্ সাহেবের একার নহে। “ইকনমিষ্ট” এই মতাবলম্বী। “ইকনমিষ্টের” ভ্রম “ইন্ডিয়ান অবজর্ভরের” নিকট ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। সে তর্ক এখানে উত্থাপনের আবশ্যিক নাই।

অধিকাংশ টাকাটা ভূস্বামীরই হস্তে যায়। ভূমিতে অধিকাংশ কৃষকেরই অধিকার অস্থায়ী: জমীদার ইচ্ছা করিলেই তাহাদের উঠাইতে পারেন। দখলের অধিকার অনেক স্থানেই অদ্যাপি আকাশকুসুম মাত্র। যেখানে আইন অনুসারে প্রজার অধিকার আছে, সেখানে কার্য্য নাই।

অধিকার থাক্ বা না থাক্, জমীদার উঠিতে বলিলেই উঠিতে হয়। কয়জন প্রজা জমীদারের সঙ্গে বিবাদ করিয়া ভিটায় থাকিতে পারে? সুতরাং যে বেশী খাজানা স্বীকৃত হইবে, তাহাকেই জমীদার বসাইবেন। পূর্বেই কথিত হইয়াছে, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ নাই বটে,* কিন্তু ইহা অনুভবের দ্বারা সিদ্ধ। প্রজাবৃদ্ধি হইলেই জমীর খাজানা বাড়বে। যে ভূমির আগে এক জন প্রার্থী ছিল, প্রজাবৃদ্ধি হইলে তাহার জন্য দুই জন প্রার্থী দাঁড়াইবে। যে বেশী খাজানা দিবে, জমীদার তাহাকেই জমী দিবেন। রামা কৈবর্তের জমীটুকু ভাল, সে এক টাকা হারে খাজানা দেয়। হাসিম শেখ সেই জমী চায়—সে দেড় টাকা হার স্বীকার করিতেছে। জমীদার রামাকে উঠিতে বলিলেন। রামার হয় ত দখলের অধিকার নাই, সে অর্মানি উঠিল। নয় ত অধিকার আছে, কিন্তু কি করে? কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করিয়া জলে বাস করিবে কি প্রকারে? অধিকার বিসর্জন দিয়া সেও উঠিল। জমীদার বিধা পিছু আট আনা বেশী পাইলেন।

এইরূপে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর কোন সময়ে না কোন সময়ে, কোন সুযোগে না কোন সুযোগে, দেশের অধিকাংশ ভূমির হার বৃদ্ধি হইয়াছে। আইন আদালতের আবশ্যিক করে নাই—বাজারে যেরূপ গ্রাহকবৃদ্ধি হইলে বিজ্ঞা পটলের দর বাড়ে, প্রজাবৃদ্ধিতে সেইরূপ জমীর হার বাড়িয়াছে। সেই বৃদ্ধি, জমীদারের উদরেই গিয়াছে।

অনেকেই রাগ করিয়া এ সকল কথা অস্বীকার করিবেন। তাঁহারা বলিবেন, আইন আছে, নিরিখ আছে, জমীদারের দয়া ধর্ম আছে। আইন—সে একটা তামাসা মাত্র—বড় মানুষেই খরচ করিয়া সে তামাসা দেখিয়া থাকে। নিরিখ পূর্বেবর্ণিত প্রণালীতে বাড়িয়া গিয়াছে। আর জমীদারের দয়া ধর্ম—যখন আর স্কু ফিরে না, তখন লোকের দয়া ধর্মের আবির্ভাব হয়।† স্কু ফিরাইয়া ফিরাইয়া, বঙ্গদেশের অধিকাংশ বর্দ্ধিত ধার্য আয় ভূস্বামিগণ আপনাদিগের হস্তগত করিয়াছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে জমীদারের যে হস্তবুদ ছিল, অনেক স্থানেই তাহার ত্রিগুণ চতুর্গুণ হইয়াছে। কোথাও দশগুণ হইয়াছে। কিছু না বাড়িয়াছে, এমন জমীদারী অতি অল্প।

আমরা দেখাইলাম, এই ঈশ্বরপ্রেরিত কৃষিকর্মের বৃদ্ধির ভাগ, রাজা পাইয়া থাকেন, ভূস্বামী পাইয়া থাকেন, বণিক্ পায়েন, মহাজন পায়েন,—কৃষী কি পায়? যে এই ফসল উৎপন্ন করে, সে কি পায়?

আমরা এমত বলি না যে, সে কিছুই পায় না। বিন্দু বিসর্গমাত্র পাইয়া থাকে। যাহা পায়, তাহাতে তাহার কিছু অবস্থার পরিবর্তন হয় নাই। অদ্যাপি ভূমির উৎপন্নে তাহার দিন চলে না। অতএব যে সামান্য ভাগ কৃষকসম্প্রদায় পায়, তাহা না পাওয়ারই মধ্যে। যার ধন, তার ধন নয়। যাহার মাথার কালঘাম ছুটিয়া ফসল জন্মে, লাভের ভাগে সে কেহ হইল না।

আমরা দেখাইলাম যে, দেশের অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। অসাধারণ কৃষিলক্ষ্মী দেশের প্রতি সুপ্রসন্না। তাঁহার কৃপায় অর্থবর্ষণ হইতেছে। সেই অর্থ রাজা, ভূস্বামী, বণিক্, মহাজন সকলেই কুড়াইতেছে। অতএব সেই শ্রীবৃদ্ধিতে রাজা, ভূস্বামী, বণিক্, মহাজন সকলেরই শ্রীবৃদ্ধি। কেবল কৃষকের শ্রীবৃদ্ধি নাই। সহস্র লোকের মধ্যে কেবল নয় শত নিরানন্দই জনের তাহাতে শ্রীবৃদ্ধি নাই। এমত শ্রীবৃদ্ধির জন্য যে জয়ধ্বনি তুলিতে চাহে, তুলুক; আমি তুলিব না। এই নয় শত নিরানন্দই জনের শ্রীবৃদ্ধি না দেখিলে, আমি কাহারও জয় গান করিব না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—জমীদার

জীবের শত্রু জীব; মনুষ্যের শত্রু মনুষ্য; বাঙ্গালী কৃষকের শত্রু বাঙ্গালী ভূস্বামী। ব্যাঘ্রাদি বৃহৎজন্তু, ছাগাদি ক্ষুদ্র জন্তুগণকে ভক্ষণ করে; রোহিতাদি বৃহৎ মৎস্য, সফরীদিগকে ভক্ষণ করে; জমীদার নামক বড় মানুষ, কৃষক নামক ছোট মানুষকে ভক্ষণ করে। জমীদার প্রকৃত

* যখন এ প্রবন্ধ লিখিত হয়, তখন census হয় নাই।

† আমরা মনুস্কণ্ঠে স্বীকার করি, সকল ভূস্বামী এ চরিত্রের নহেন। অনেকের যথার্থ দয়া ধর্ম আছে।

বিক্রম রচনাবলী

পক্ষে কৃষকদিগকে ধরিয়া উদরস্থ করেন না বটে, কিন্তু যাহা করেন, তাহা অপেক্ষা হৃদয়শোণিত পান করা দয়ার কাজ। কৃষকদিগের অন্যান্য বিষয়ে যেমন দুর্দর্শা হউক না কেন, এই সর্ব্বরত্ন-প্রসাবিনী বসুমতী কৃষক করিয়া তাহাদিগের জীবনোপায় যে না হইতে পারিত, এমত নহে। কিন্তু তাহা হয় না; কৃষকে পেটে খাইলে জমীদার টাকার রাশির উপর টাকার রাশি ঢালিতে পারেন না। সুতরাং তিনি কৃষককে পেটে খাইতে দেন না।

আমরা জমীদারের দ্বেষক নহি। কোন জমীদার কর্তৃক কখন আমাদের অনিষ্ট হয় নাই। বরং অনেক জমীদারকে আমরা বিশেষ প্রশংসাভাজন বিবেচনা করি। যে সুহৃদগণের প্রীতি আমরা এ সংসারের প্রধান সুখের মধ্যে গণনা করি, তাহাদিগের মধ্যে অনেকে জমীদার। জমীদারেরা বাঙ্গালী জাতির চুড়া, কে না তাহাদিগের প্রীতিভাজন হইবার বাসনা করে? কিন্তু আমরা যাহা বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহাতে প্রীতিভাজন হওয়া দূরে থাকুক, যিনি আমাদের কথা ভাল করিয়া না বুঝিবেন, হয় ত তাহার বিশেষ অপ্ৰীতিপাত্র হইবে। তাহা হইলে, আমরা বিশেষ দুঃখিত হইব। কিন্তু কর্তব্য কার্য্যানুরোধে তাহাও আমাদের স্বীকার করিতে হইতেছে। বঙ্গীয় কৃষকেরা নিঃসহায়, মনুষ্যমধ্যে নিতান্ত দুর্দর্শাপন্ন, এবং আপনাদিগের দুঃখ সমাজমধ্যে জানাইতেও জানে না। যদি মূকের দুঃখ দেখিয়া তাহা নিবারণের ভরসায় একবার বাক্যব্যয় না করিলাম, তবে মহাপাপ স্পর্শে। আমরা এই প্রবন্ধের জন্য হয় ত সমাজশ্রেষ্ঠ ভূস্বামিমন্ডলীর বিরাগভাজন হইব—অনেকের নিকট তিরস্কৃত, ভৎসিত, উপহাসিত, অমর্যাদাপ্রাপ্ত হইব—বন্ধুবর্গের অপ্ৰীতিভাজন হইব। কাহারও নিকট মূর্খ, কাহারও নিকট দ্বেষক, কাহারও নিকট মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন হইব। সে সকল ঘটে, ঘটুক। যদি সেই ভয়ে বঙ্গদর্শন, কাতরের হইয়া কাতরোক্তি না করে,—পীড়িতের পীড়া নিবারণের জন্য যত্ন না করে,—যদি কোন প্রকার অনুরোধের বশীভূত হইয়া সত্য কথা বলিতে পরাভ্রমুখ হয়, তবে যত শীঘ্র বঙ্গদর্শন বঙ্গভূমি হইতে লুপ্ত হয়, ততই ভাল। যে কণ্ঠ হইতে কাতরের জন্য কাতরোক্তি নিঃসৃত না হইল, সে কণ্ঠ রুদ্ধ হউক। যে লেখনী আন্তের উপকারার্থ না লিখিল, সে লেখনী নিষ্ফলা হউক। যাঁহারা নীচ, তাঁহারা যাহা ইচ্ছা বলিবেন, আমরা ক্ষতি বিবেচনা করিব না। যাঁহারা মহৎ, তাঁহারা আমাদের ভ্রান্ত বলিয়া মার্জনা করিবেন,—এই ভিক্ষা। আমরা জানিয়া শূন্য কখন অযথার্থোক্তি করিব না। বরং আমাদের ভ্রম দেখাইয়া দিলে, কৃতজ্ঞ হইয়া তাহা স্বীকার করিব। যতক্ষণ না সে ভ্রম দেখিব, ততক্ষণ যাহা বলিব, মূক্তকণ্ঠেই বলিব।

আমাদের বিশেষ বক্তব্য এই, আমরা যাহা বলিতেছি, তাহা 'জমীদার সম্প্রদায়' সম্বন্ধে বলিতেছি না। যদি কেহ বলেন, জমীদার মাত্রেই দুর্ভাষা বা অত্যাচারী, তিনি নিতান্ত মিথ্যাবাদী। অনেক জমীদার সদাশয়, প্রজাবৎসল, এবং সত্যনিষ্ঠ। সুতরাং তাহাদিগের সম্বন্ধে এই প্রবন্ধপ্রকাশিত কথাগুলি বর্ত্তে না। কতকগুলি জমীদার অত্যাচারী; তাঁহারা এই প্রবন্ধের লক্ষ্য। আমরা সংক্ষেপের জন্য এ কথা আগেই বলিয়া রাখিলাম। যেখানে জমীদার বলিয়াছি বা বলিব, সেইখানে ঐ অত্যাচারী জমীদারগুলিই বুঝাইবে। পাঠক মহাশয় 'জমীদার সম্প্রদায়' বুঝিবেন না।

বাঙ্গালী কৃষক যাহা ভূমি হইতে উৎপন্ন করে, তাহা কিছু অধিক নহে। তাহা হইতে প্রথমতঃ চাষের খরচ কুলাইতে হয়। তাহা অল্প নহে। বীজের মূল্য পোষাইতে হইবে, কৃষকের বেতন দিতে হইবে, গোরুর খোরাক আছে; এ প্রকার অন্যান্য খরচও আছে। তাহা বাদে যাহা থাকে, তাহা প্রথমে মহাজন আটক করে। বর্ষাকালে ধার করিয়া খাইয়াছে, মহাজনকে তাহা পরিশোধ করিতে হইবে। কেবল পরিশোধ নহে, দেড়ী সুদ দিতে হইবে। শ্রাবণ মাসে দুই বিশ ধান লইয়াছে বলিয়া, পৌষ মাসে তিন বিশ দিতে হইবে। যাহা রহিল, তাহা অল্প। তাহা হইতে জমীদারকে খাজানা দিতে হইবে। তাহা দিল। পরে যাহা বাকি রহিল—অল্পাবশিষ্ট, অল্প খুদের খুদ, চর্বিবর্ত ইক্ষুর রস, শুষ্ক পল্লবের মৃত্তিকাগত বারি—তাহাতে অতি কষ্টে দিনপাত হইতে পারে, অথবা দিনপাত হইতে পারে না। তাহাই কি কৃষকের ঘরে যায়? পাঠক মহাশয় দেখুন।—

পৌষ মাসে ধান কাটিয়াই কৃষকে পৌষের কিস্তি খাজানা দিল। কেহ কিস্তি পরিশোধ করিল—কাহারও বাকি রহিল। ধান পালা দিয়া, আছড়াইয়া, গোলায় তুলিয়া, সময়মতে হাটে লইয়া গিয়া, বিক্রয় করিয়া কৃষক সম্বৎসরের খাজানা পরিশোধ করিতে চৈত্র মাসে জমীদারের কাছারিতে

বিবিধ প্রবন্ধ—বঙ্গদেশের কৃষক

আসিল। পরাগ মন্ডলের পোষের কিস্তি পাঁচ টাকা; চারি টাকা দিয়াছে, এক টাকা বাকি আছে। আর চৈত্রের কিস্তি তিন টাকা। মোটে চারি টাকা সে দিতে আসিয়াছে। গোমস্তা হিসাব করিতে বসিলেন। হিসাব করিয়া বলিলেন, “তোমার পোষের কিস্তি তিন টাকা বাকি আছে।” পরাগ মন্ডল অনেক চীৎকার করিল—দোহাই পাড়িল—হয় ত দাখিলা দেখাইতে পারিল, নয় ত না। হয় ত গোমস্তা দাখিলা দেয় নাই, নয় ত চারি টাকা লইয়া, দাখিলায় দুই টাকা লিখিয়া দিয়াছে। যাহা হউক, তিন টাকা বাকি স্বীকার না করিলে সে আর্থারি কবচ পায় না। হয় ত তাহা না দিলে গোমস্তা সেই তিন টাকাকে তের টাকা করিয়া নালিশ করিবে। সুতরাং পরাগ মন্ডল তিন টাকা বাকি স্বীকার করিল। মনে কর, তিন টাকাই তাহার যথার্থ দেনা। তখন গোমস্তা সুদ করিল। জমীদারী নিরিখ টাকায় চারি আনা। তিন বৎসরেও চারি আনা, এক মাসেও চারি আনা। তিন টাকা বাকির সুদ ৫০ আনা। পরাগ তিন টাকা বার আনা দিল। পরে চৈত্র কিস্তি তিন টাকা দিল। তাহার পর গোমস্তার হিসাবানা। তাহা টাকায় দুই পয়সা। পরাগ মন্ডল ৩২ টাকার জমা রাখে। তাহাকে হিসাবানা ১ টাকা দিতে হইল। তাহার পর পার্বণী। নাএব গোমস্তা, তহশীলদার, মুহুরি, পাইক, সকলেই পার্বণীর হকদার। মোটের উপর পড়তা গ্রাম হইতে এত টাকা আদায় হইল। সকলে ভাগ করিয়া লইলেন। পরাগ মন্ডলকে তজ্জন্য আর দুই টাকা দিতে হইল।

এ সকল দৌরাখ্য জমীদারের অভিপ্রায়ানুসারে হয় না, তাহা স্বীকার করি। তিনি ইহার মধ্যে ন্যায্য খাজানা এবং সুদ ভিন্ন আর কিছুই পাইলেন না, অবশিষ্ট সকল নাএব গোমস্তার উদরে গেল। সে কাহার দোষ? জমীদার যে বেতনে দ্বারবান রাখেন, নাএবেরও সেই বেতন; গোমস্তার বেতন খানসামার বেতন অপেক্ষা কিছু কম। সুতরাং এ সব না করিলে তাহাদের দিনপাত হয় কি প্রকারে? এ সকল জমীদারের আজ্ঞানুসারে হয় না বটে, কিন্তু তাঁহার কার্পণ্যের ফল। প্রজার নিকট হইতে তাঁহার লোকে আপন উদরপূর্তির জন্য অপহরণ করিতেছে, তাহাতে তাঁহার ক্ষতি কি? তাঁহার কথা কহিবার কি প্রয়োজন আছে?

তাহার পর আষাঢ় মাসে নববর্ষের শুভ পুণ্যাহ উপস্থিত। পরাগ পুণ্যাহের কিস্তিতে দুই টাকা খাজানা দিয়া থাকে। তাহা ত সে দিল, কিন্তু সে কেবল খাজানা। শুভ পুণ্যাহের দিনে জমীদারকে কিছু নজর দিতে হইবে। তাহাও দিল। হয় ত জমীদারেরা অনেক শরিক, প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ নজর দিতে হয়। তাহাও দিল। তাহার পর নাএব মহাশয় আছেন—তাঁহাকেও কিছু নজর দিতে হইবে। তাহাও দিল। পরে গোমস্তা মহাশয়েরা, তাঁহাদের ন্যায্য পাওনা তাঁহারা পাইলেন। যে প্রজার অর্থ নজর দিতে দিতে ফুরাইয়া গেল—তাহার কাছে বাকি রহিল। সময়ান্তরে আদায় হইবে।

পরাগ মন্ডল সব দিয়া থুইয়া ঘরে গিয়া দেখিল, আর আহারের উপায় নাই। এদিকে চাষের সময় উপস্থিত। তাহার খরচ আছে। কিন্তু ইহাতে পরাগ ভীত নহে। এ ত প্রতি বৎসরই ঘটিয়া থাকে। ভরসা মহাজন। পরাগ মহাজনের কাছে গেল। দেড়ী সুদে ধান লইয়া আসিল, আবার আগামী বৎসর তাহা সুদ সমেত শোধিয়া নিঃস্ব হইবে। চাষা চিরকাল ধার করিয়া খায়, চিরকাল দেড়ী সুদ দেয়। ইহাতে রাজার নিঃস্ব হইবার সম্ভাবনা, চাষা কোন ছার! হয় ত জমীদার নিজেই মহাজন। গ্রামের মধ্যে তাঁহার ধানের গোলা ও গোলাবাড়ী আছে। পরাগ সেইখান হইতে ধান লইয়া আসিল। এরূপ জমীদারের ব্যবসায় মন্দ নহে। স্বয়ং প্রজার অর্থাপহরণ করিয়া, তাহাকে নিঃস্ব করিয়া, পরিশেষে কজ্জ দিয়া, তাহার কাছে দেড়ী সুদ ভোগ করেন। এমত অবস্থায় যত শীঘ্র প্রজার অর্থ অপহৃত করিতে পারেন, ততই তাঁহার লাভ।

সকল বৎসর সমান নহে। কোন বৎসর উত্তম ফসল জন্মে, কোন বৎসর জন্মে না। অতিবৃষ্টি আছে, অনাবৃষ্টি আছে, অকালবৃষ্টি আছে, বন্যা আছে, পঙ্গপালের দৌরাখ্য আছে, অন্য কীটের দৌরাখ্যও আছে। যদি ফসলের সুলক্ষণ দেখে, তবেই মহাজন কজ্জ দেয়; নচেৎ দেয় না। কেন না, মহাজন বিলক্ষণ জানে যে, ফসল না হইলে কৃষক ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে না। তখন কৃষক নিরুপায়। অস্বাভাবে সপরিবারে প্রাণে মারা যায়। কখন ভরসার মধ্যে বন্যা অথবা ফলমূল, কখন ভরসা “রিলিফ,” কখন ভিক্ষা, কখন ভরসা কেবল জগদীশ্বর। অল্পসংখ্যক মহাত্মা ভিন্ন কোন জমীদারই এমন দুঃসময়ে প্রজার ভরসার স্থল নহে। মনে কর, সে বার সুবৎসর। পরাগ মন্ডল কজ্জ পাইয়া দিনপাত করিতে লাগিল।

বাঁকম রচনাবলী

পরে ভাদ্রের কিস্তি আসিল। পরাণের কিছু নাই, দিতে পারিল না। পাইক, পিয়াদা, নগদী, হালশাহানা, কোটাল বা তদ্রূপ কোন নামধারী মহাত্মা তাগাদায় আসিলেন। হয় ত কিছু করিতে না পারিয়া, ভাল মানুষের মত ফিরিয়া গেলেন। নয় ত পরাণ কৰ্জ্ব করিয়া টাকা দিল। নয় ত পরাণের দুর্বুদ্ধি ঘটিল—সে পিয়াদার সঙ্গে বচসা করিল। পিয়াদা ফিরিয়া গিয়া গোমস্তাকে বলিল, “পরাণ মণ্ডল আপনাকে শালা বলিয়াছে।” তখন পরাণকে ধরিতে তিন জন পিয়াদা ছুটিল। তাহারা পরাণকে মাটি ছাড়া করিয়া লইয়া আসিল। কাছারিতে আসিয়াই পরাণ কিছু সুসভ্য গালিগালাজ শুনিল—শরীরেও কিছু উত্তম মধ্যম ধারণ করিল। গোমস্তা তাহার পাঁচ গুণ জরিমানা করিলেন। তাহার উপর পিয়াদার রোজ। পিয়াদাদিগের প্রতি হুকুম হইল, উহাকে বসাইয়া রাখিয়া আদায় কর। যদি পরাণের কেহ হিতৈষী থাকে, তবে টাকা দিয়া খালাস করিয়া আনিল। নচেৎ পরাণ এক দিন, দুই দিন, তিন দিন, পাঁচ দিন, সাত দিন কাছারিতে রহিল। হয় ত পরাণের মা কিম্বা ভাই থানায় গিয়া এজেহার করিল। সব ইন্স্পেক্টর মহাশয় কয়েদ খালাসের জন্য কন্স্টেবল পাঠাইলেন। কন্স্টেবল সাহেব—দিন দুনিয়ার মালিক—কাছারিতে আসিয়া জাঁকিয়া বসিলেন। পরাণ তাঁহার কাছেই বসিয়া—একটু কাঁদা কাটা আরম্ভ করিল। কন্স্টেবল সাহেব একটু ধুমধাম করিতে লাগিলেন—কিন্তু “কয়েদ খালাসের” কোন কথা নাই। তিনিও জমীদারের বেতনভুক্—বৎসরে দুই তিন বার পার্শ্বণী পান, বড় উড়িবার বল নাই। সে দিনও সৰ্বসুখময় পরমপবিত্রমূর্ত্তি রৌপ্যচক্রের দর্শন পাইলেন। এই আশ্চর্য্য চক্র দৃষ্টিমাত্রেই মানুষের হৃদয়ে আনন্দরসের সঞ্চার হয়—ভক্তি প্রীতির উদয় হয়। তিনি গোমস্তার প্রতি প্রীতি হইয়া থানায় গিয়া প্রবেশ করিলেন, “কেহ কয়েদ ছিল না। পরাণ মণ্ডল ফেরেশ্বাজ লোক—সে পুকুর-ধারে তালতলায় লুকাইয়াছিল—আমি ডাক দিবা মাত্র সেইখান হইতে আসিয়া আমাকে দেখা দিল।” মোকদ্দমা ফাঁসিয়া গেল।

প্রজা ধরিয়া লইয়া গিয়া, কাছারিতে আটক রাখা, মারপিট করা, জরিমানা করা, কেবল খাজানা বাকির জন্য হয়, এমত নহে। যে সে কারণে হয়। আজ গোপাল মণ্ডল গোমস্তা মহাশয়কে কিঞ্চিৎ প্রণামী দিয়া নালিশ করিয়াছে যে, “পরাণ আমাকে লইয়া খায় না”—তখনই পরাণ ধৃত হইয়া আসিল। আজ নেপাল মণ্ডল ঐরূপ মঙ্গলাচরণ করিয়া নালিশ করিল যে, “পরাণ আমার ভাগিনীর সঙ্গে প্রসক্তি করিয়াছে”—অর্নি পরাণ গ্রেপ্তার হইয়া আবদ্ধ হইল। আজ সম্বাদ আসিল, পরাণের বিধবা ভ্রাতৃবধূ গর্ভবতী হইয়াছে—অর্নি পরাণকে ধরিতে ছুটিল। আজ পরাণ জমীদারের হইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে নারাজ, অর্নি তাহাকে ধরিতে লোক ছুটিল।

গোমস্তা মহাশয়, পরাণের কাছে টাকা আদায় করিয়াই হউক বা জামিন লইয়াই হউক বা কিস্তিবন্দী করিয়াই হউক বা সময়ান্তরে বিহিত করিবার আশায়ই হউক, পুনর্বার পুর্লিশ আসার আশঙ্কায়ই হউক বা বহুকাল আবদ্ধ রাখায় কোন ফল হয় নাই বলিয়াই হউক, পরাণ মণ্ডলকে ছাড়িয়া দিলেন। পরাণ ঘরে গিয়া চাষ আবাদে প্রবৃত্ত হইল। উত্তম ফসল জন্মিল। অগ্রহায়ণ মাসে জমীদারের দৌহিত্রীর বিবাহ বা ভ্রাতৃপুত্রের অন্নপ্রাশন। বরান্দ দুই হাজার টাকা, মহালে মাঙ্গন চড়িল। সকল প্রজা টাকার উপর ১০ দিবে। তাহাতে পাঁচ হাজার টাকা উঠিবে, দুই হাজার অন্নপ্রাশনের খরচ লাগিবে—তিন হাজার জমীদারের সিদ্ধকে উঠিবে।

যে প্রজা পারিল, সে দিল—পরাণ মণ্ডলের আর কিছুই নাই—সে দিতে পারিল না। জমীদারী হইতে পুরা পাঁচ হাজার টাকা আদায় হইল না। শুনিয়া জমীদার স্থির করিলেন, একবার স্বয়ং মহালে পদার্পণ করিবেন। তাঁহার আগমন হইল—গ্রাম পবিত্র হইল।

তখন বড় বড় কালো কালো পাঁটা আনিয়া, মণ্ডলের কাছারির দ্বারে বাঁধিয়া যাইতে লাগিল। বড় বড় জীবন্ত রুই, কাতলা, মৃগাল, উঠানে পড়িয়া ল্যাজ আছড়াইতে লাগিল। বড় বড় কালো কালো বাস্তাকু, গোল আলু, কর্পি, কলাইসুঁটিতে ঘর পুঁরিয়া যাইতে লাগিল। দধি দুগ্ধ ঘৃত নবনীতের ত কথা নাই। প্রজাদিগের ভক্তি অচলা, কিন্তু বাবুর উদর তেমন নহে। বাবুর কথা দূরে থাকুক, পাইক-পিয়াদার পর্য্যন্ত উদরাময়ের লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল।

কিন্তু সে সকল ত বাজে কথা। আসল কথা, জমীদারকে “আগমনী,” “নজর” বা “সেলামি” দিতে হইবে। আবার টাকার অঙ্ক ১০ বসিল। কিন্তু সকলে এত পারে না। যে পারিল, সে দিল। যে পারিল না, সে কাছারিতে কয়েদ হইল, অথবা তাহার দেনা বাকির সামিল হইল।

বিবিধ প্রবন্ধ—বঙ্গদেশের কৃষক

পরাণ মণ্ডল দিতে পারিল না। কিন্তু তাহার ক্ষেত্রে উত্তম ফসল হইয়াছে। তাহাতে গোমস্তার চোখ পড়িল। তিনি আট আনার ষ্ট্যাম্প খরচ করিয়া, উপযুক্ত আদালতে “ক্রোক সহায়তার” প্রার্থনায় দরখাস্ত করিলেন। দরখাস্তের তাৎপর্য এই, “পরাণ মণ্ডলের নিকট খাজানা বাকি, আমরা তাহার ধান্য ক্রোক করিব। কিন্তু পরাণ বড় দাঙ্গাবাজ লোক, ক্রোক করিলে দাঙ্গা হাঙ্গামা খুন জখম করিবে বলিয়া লোক জমায়েত করিয়াছে। অতএব আদালত হইতে পিয়াদা মোকরর হউক।” গোমস্তা নিরীহ ভাল মানুষ, কেবল পরাণ মণ্ডলেরই যত অত্যাচার। সুতরাং আদালত হইতে পিয়াদা নিযুক্ত হইল। পিয়াদা ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াই মায়াময় রৌপ্যচক্রের মায়ায় অভিভূত হইল। দাঁড়াইয়া থাকিয়া পরাণের ধানগুলিন কাটাইয়া জমীদারের কাছারিতে পাঠাইয়া দিল। ইহার নাম “ক্রোক সহায়তা”।

পরাণ দেখিল, স্বর্স্ব গেল। মহাজনের ঋণও পরিশোধ করিতে পারিব না, খাজানাও দিতে পারিব না, পেটেও খাইতে পাইব না। এত দিন পরাণ সর্পি সঙ্গে বাদ করিয়া জলে বাস করা চলে না। পরাণ মণ্ডল শুনিল যে, ইহার জন্য নালিশ চলে। পরাণ নালিশ করিয়া দেখিবে। কিন্তু সে ত সোজা কথা নহে। আদালত এবং বারান্দার মন্দির তুল্য; অর্থ নহিলে প্রবেশের উপায় নাই। ষ্ট্যাম্পের মূল্য চাই; উকীলের ফিস চাই; আসামী সাক্ষীর তলবানা চাই; সাক্ষীর খোরাকি চাই; সাক্ষীদের পারিতোষিক আছে; হয় ত আমীন-খরচা লাগিবে; এবং আদালতের পিয়াদা ও আমলাবর্গ কিছুর প্রত্যাশা রাখেন। পরাণ নিঃস্ব।—তথাপি হাল বলদ ঘটি বাটি বেঁচিয়া আদালতে নালিশ করিল। ইহা অপেক্ষা তাহার গলায় দাঁড়ি দিয়া মরা ভাল ছিল।

অমনি জমীদারের পক্ষ হইতে পাল্টা নালিশ হইল যে, পরাণ মণ্ডল ক্রোক অদুল করিয়া সকল ধান কাটিয়া লইয়া বিক্রয় করিয়াছে। সাক্ষীরা সকল জমীদারের প্রজা—সুতরাং জমীদারের বশীভূত—স্নেহে নহে—ভয়ে বশীভূত। সুতরাং তাঁহার পক্ষেই সাক্ষ্য দিল। পিয়াদা মহাশয় রৌপ্যমন্ত্রে সেই পথবর্তী। সকলেই বলিল, পরাণ ক্রোক অদুল করিয়া ধান কাটিয়া বেঁচিয়াছে। জমীদারের নালিশ ডিক্রী হইল, পরাণের নালিশ ডিসমিস হইল। ইহাতে পরাণের লাভ প্রথমতঃ, জমীদারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইল, দ্বিতীয়তঃ, দুই মোকদ্দমাতেই জমীদারের খরচা দিতে হইল, তৃতীয়তঃ, দুই মোকদ্দমাতেই নিজের খরচা ঘর হইতে গেল।

পরাণের আর এক পয়সা নাই, কোথা হইতে এত টাকা দিবে? যদি জমী বেঁচিয়া দিতে পারিল, তবে দিল, নচেৎ জেলে গেল, অথবা দেশত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

আমরা এমত বলি না যে, এই অত্যাচারগুলিন সকলই এক জন প্রজার প্রতি এক বৎসর মধ্যে হইয়া থাকে বা সকল জমীদারই এরূপ করিয়া থাকেন। তাহা হইলে, দেশ রক্ষা হইত না। পরাণ মণ্ডল কল্পিত ব্যক্তি—একটি কল্পিত প্রজাকে উপলক্ষ করিয়া প্রজার উপর সচরাচর অত্যাচার-পরায়ণ জমীদারেরা যত প্রকার অত্যাচার করিয়া থাকেন, তাহা বিবৃত করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আজ এক জনের উপর একরূপ, কাল অন্য প্রজার উপর অন্যরূপ পীড়ন হইয়া থাকে।

জমীদারদিগের সকল প্রকার দৌরাণ্যের কথা যে বলিয়া উঠিতে পারিয়াছি, এমত নহে। জমীদারবিশেষে, প্রদেশবিশেষে, সময়বিশেষে যে কত রকমে টাকা আদায় করা হয়, তাহার তালিকা করিয়া সমাপ্ত করা যায় না। স্বর্স্ব এক নিয়ম নহে; এক স্থানে সকলের এক নিয়ম নহে; অনেকের কোন নিয়মই নাই, যখন যাহা পারেন, আদায় করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা একটি যথার্থ ঘটনা বিবৃত করিয়া একখানি তালিকা উদ্ধৃত করিব।

যে প্রদেশ গত বৎসর* ভয়ানক বন্যায় ডুবিয়া গিয়াছিল, সেই প্রদেশের একখানি গ্রামে এই ঘটনা হইয়াছিল। গ্রামের নাম যিনি জানিতে চাহেন, তিনি গত ৩১ আগস্টের অব্জর্স্বরের ১৩১ পৃষ্ঠা পাঠ করিবেন। বন্যায় অত্যন্ত জলবৃদ্ধি হইল। গ্রামখানি সমুদ্রমধ্যস্থ দ্বীপের ন্যায় জলে ভাসিতে লাগিল। গ্রামস্থ প্রজাদিগের ধান সকল ডুবিয়া গেল। গোরু সকল অনাহারে মরিয়া যাইতে লাগিল। প্রজাগণ শশব্যস্ত। সে সময়ে জমীদারের কর্তব্য, অর্থদানে, খাদ্যদানে প্রজাদিগের সাহায্য করা। তাহা দূরে থাক, খাজানা মাপ করিলেও অনেক উপকার হয়। তাহাও

* সন ১২৭৮।

বিক্রম রচনাবলী

দূরে থাক, খাজানাটা দুদিন রহিয়া বসিয়া লইলেও কিছু উপকার হয়। কিন্তু রহিয়া বসিয়া খাজানা লওয়া দূরে থাক, গোমস্তা মহাশয়েরা সেই সময়ে পাইক পিয়াদার সঙ্গে বাজে আদায়ের জন্য আসিয়া দলবল সহ উপস্থিত হইলেন। গ্রামে মোটে ১২।১৪ জন খোদকান্ত প্রজা, এবং ১২।১৪ জন কৃষাণ প্রভৃতি অপর লোক। একটি তালিকা করিয়া ইহাদের নিকট ৫৪০ আদায় করিতে বসিলেন। সে তালিকা এই;—

নায়েবের পুণ্যাহের নজর	৬
জমীদারদিগের পাঁচ শরিকের নজর	৫
গোমস্তাদিগের নজর	২
পুণ্যাহের পিয়াদার তলবানা	২
গোপালনগরে বাঁশ ঢোলাইয়ের খরচ	২
আষাঢ় কিস্তির পিয়াদার তলবানা	৬/০
ভাদ্রের কিস্তির পিয়াদার তলবানা	১১/০
নৌকা ভাড়া	১১০
সদর আমলার পুজার পার্শ্বণী	৬১০
কাছারির জমাদার	২
ঐ হালশাহানা	২
পাঁচ শরিকের পার্শ্বণী	৫
শ্রীরাম সেন, হেড্ মূহুরি	২
জমীদারের পুরোহিতের ভিক্ষা	২
গোমস্তাদের ভিক্ষা	১২
মূহুরিদের ভিক্ষা	৩
বরকন্দাজদিগের দোলের পার্শ্বণী	২
ডাকটেঞ্চ	৩

৫৪০

এই দুঃখের সময়ে প্রজাদিগের উপর টাকায় তিন আনা করিয়া বাজে আদায় পড়তা পড়িল। আদায় করা অসাধ্য; কিন্তু গোমস্তারা অসাধ্যও সাধন করিয়া থাকেন। প্রজারা কায়ক্লেশে মেঙ্গেপেতে, বেচে কিনে, হাওলাত বরাত করিয়া, ঐ টাকা দিল। লোকে মনে করবে, মনুষ্যদেহে সহ্য অত্যাচারের চরম হইয়াছে। কিন্তু গোমস্তা মহাশয়েরা তাহা মনে করিলেন না। তাঁহারা জানেন, একটি একটি প্রজা একটি একটি কুবের। যে দিন টাকায় তিন আনা হারে ৫৪০ আদায় করিয়া লইয়া গেলেন, তাহার ৪।৫ দিন মধ্যেই আবার উপস্থিত। বাবুদের কন্যার বিবাহ। আর ৪০ টাকা তুলিয়া দিতে হইবে।

প্রজারা নিরুপায়। তাহারা একখানা নৌকা সংগ্রহ করিয়া নীলকুঠীতে গিয়া কজ্জর্ চাহিল। কজ্জর্ পাইল না। মহাজনের কাছে হাত পাতিল—মহাজনও বিমুখ হইল।

তখন অগত্যা প্রজারা শেষ উপায় অবলম্বন করিল—ফৌজদারিতে গিয়া নালিশ করিল। মাজিস্ট্রেট সাহেব আসামীদিগকে সাজা দিলেন। আসামীরা আপিল করিল, জজ সাহেব বলিলেন, “প্রজাদিগের উপর অত্যন্ত অত্যাচার হইয়াছে বটে, কিন্তু আইন অনুসারে আমি আসামীদিগকে খালাস দিলাম।” সুবিচার হইল। কে না জানে, বিচারের উদ্দেশ্য আসামী খালাস?

এটি উপন্যাস নহে। আমরা ইন্ডিয়ান অব্জার্ভার হইতে ইহা উদ্ধৃত করিলাম। দৃষ্ট লোক সকল সম্প্রদায়মধ্যেই আছে, দুই একজন দৃষ্ট লোকের দুষ্কর্ম উদাহরণ-স্বরূপ উল্লেখ করিয়া সম্প্রদায়ের প্রতি দোষারোপ করা অবিচার। যদি এ উদাহরণ সেরূপ হইত, তাহা হইলে ইহা আমরা প্রয়োগ করিতাম না। এ তাহা নহে—এরূপ ঘটনা সচরাচর ঘটিতেছে। যাঁহারা ইহা অস্বীকার করেন, তাঁহারা পল্লীগ্রামের অবস্থা কিছুই জানেন না।

উপরে লিখিত তালিকার শেষ বিষয়টির উপর পাঠক একবার দৃষ্টিপাত করিবেন,—

বিবিধ প্রবন্ধ—বঙ্গদেশের কৃষক

“ডাকটেক্স”। গবর্ণমেন্ট নানাবিধ কর বসাইতেছেন, জমীদারেরা তাহা লইয়া মহা কোলাহল করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা সকলেই কি ঘর হইতে টেক্স দিয়া থাকেন? ঐ “ডাকটেক্স” কথাটি তাহার প্রমাণ। গবর্ণমেন্ট বিধান করিলেন, মফঃস্বলে ডাক চলিবে, জমীদারেরা তাহার খরচা দিবেন। জমীদারেরা মনে মনে বলিলেন, “ভাল, দিতে হয় দিব, কিন্তু ঘরে থেকে দিব না। আমরাও প্রজাদের উপর টেক্স বসাইব। যদি বসাইতে হইল, তবে একটু চাপাইয়া বসাই, যেন কিছু মুনফা থাকে।” তাহাই করিলেন। প্রজার খরচে ডাক চলিতে লাগিল—জমীদারেরা মাঝে থাকিয়া কিছু লাভ করিলেন। গবর্ণমেন্ট যখন টেক্স বসান, একবার যেন ভাবিয়া দেখেন, কাহার ঘাড়ে পড়ে।

ইনকম্‌টেক্সও ঐরূপ। প্রজারা জমীদারের ইনকম্‌টেক্স দেয়। এবং জমীদার তাহা হইতে কিছু মুনফা রাখেন।

খাস মহল যাঁহারা গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে রোড্ ফন্ড্ দিতে হয়। ঐ রোড্ ফন্ড্ আমরা ভূস্বামীর জমাওয়াশীল বাকিভুক্ত দেখিয়াছি।

রোড্‌সেস্ এই প্রবন্ধ লিপির সময় পর্য্যন্ত গবর্ণমেন্ট্ কোথাও হইতে আদায় করেন নাই। কিন্তু জমীদারেরা কেহ কেহ আদায় করিতেছেন। আদায় করিবার অধিকার আছে, কিন্তু তাহা টাকায় এক পয়সার অধিক হইতে পারে না। এক জেলায় এক জন জমীদার ইহার মধ্যে টাকায় চারি আনা আদায় করিতে আরম্ভ করিলেন। এক জন প্রজা দিতে স্বীকৃত না হওয়াতে, তাহাকে ধরিয়া আনিয়া পীড়ন আরম্ভ করিলেন। প্রজা নালিশ করিলে, এবার আসামী “আইন অনুসারে” খালাস পাইল না। জমীদার মহাশয় এক্ষণে শ্রীঘরে বাস করিতেছেন।

সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নলিখিত “হাস্পাতালির” বৃত্তান্তটি কোঁতুকাবহ। সর্ভ্‌ডিবিসনের হাকিমেরা স্কুল, ডিস্পেন্সারি করিতে বড় মজবুত। ২৪ পরগণার কোন আর্সিস্ট্যান্ট্ মাজিস্ট্রেট্ স্বীয় সর্ভ্‌ডিবিসনে একটি ডিস্পেন্সারি করিবার জন্য তৎপ্রদেশীয় জমীদারগণকে ডাকাইয়া সভা করিলেন। সকলে কিছু কিছু মাসিক চাঁদা দিতে স্বীকৃত হইয়া গেলেন। একজন বাটী গিয়া হুকুম প্রচার করিলেন যে, “আমাকে মাসে মাসে এত টাকা হাস্পাতালের জন্য চাঁদা দিতে হইবে, অতএব আজি হইতে প্রজাদিগের নিকট টাকায় ১০ আনা হাস্পাতালি আদায় করিতে থাকিবে।” গোমস্তারা তদ্রূপ আদায় করিতে লাগিল। এদিকে ডিস্পেন্সারির সকল যোগাড় হইয়া উঠিল না—তাহা সংস্থাপিত হইল না। সুতরাং ঐ জমীদারকে কখন এক পয়সা চাঁদা দিতে হইল না। কিন্তু প্রজাদিগের নিকট চিরকাল টাকায় এক আনা হাস্পাতালি আদায় হইতে লাগিল। কয়েক বৎসর পরে জমীদার ঐ প্রজাদিগের খাজনার হার বাড়াইবার জন্য ১৮৫৯ সালের দশ আইনের নালিশ করিলেন। প্রজারা জবাব দিল যে, “আমরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে এক হারে খাজনা দিয়া আসিতেছি—কখন হার বাড়ে কমে নাই—সুতরাং আমাদের খাজনা বাড়িতে পারে না।” জমীদার তাহার প্রত্যুত্তর এই দিলেন যে, উহারা অমুক সন হইতে হাস্পাতালি বলিয়া ১০ খাজনা বেশী দিয়া আসিতেছে। সেই হেতুতে আমি খাজনা বৃদ্ধি করিতে চাই।

এক্ষণে জমীদারদিগের পক্ষে কয়েকটি কথা বলিবার প্রয়োজন আছে।

প্রথমতঃ, আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, সকল জমীদার অত্যাচারী নহেন। দিন দিন অত্যাচারপরায়ণ জমীদারের সংখ্যা কমিতেছে। কলিকাতাস্থ সুশিক্ষিত ভূস্বামীদিগের কোন অত্যাচার নাই—যাহা আছে, তাহা তাঁহাদিগের অজ্ঞাতে এবং অভিমর্ত্যবিরুদ্ধে, নায়েব গোমস্তাগণের দ্বারায় হয়। মফঃস্বলেও অনেক সুশিক্ষিত জমীদার আছেন, তাঁহাদিগেরও প্রায় ঐরূপ। বড় বড় জমীদারদিগের অত্যাচার তত অধিক নহে;—অনেক বড় বড় ঘরে অত্যাচার একবারে নাই। সামান্য সামান্য ঘরেই অত্যাচার অধিক। যাঁহার জমীদারী হইতে লক্ষ টাকা আইসে—অধর্ম্মাচরণ করিয়া প্রজাদিগের নিকট আর ২৫ হাজার টাকা লইবার জন্য তাঁহার মনে প্রবৃত্তি দর্শলা হইবারই সম্ভাবনা, কিন্তু যাঁহার জমীদারী হইতে বার মাসে বার শত টাকা আসে না, অথচ জমীদারী চাল-চলনে চলিতে হইবে, মারপিট করিয়া আর কিছু সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা তাঁহাতে সুতরাং বলবতী হইবে। আবার যাঁহারা নিজে জমীদার, আপন প্রজার নিকট খাজনা আদায় করেন, তাঁহাদের অপেক্ষা পত্তনীদার, দরপত্তনীদার, ইজারাদারের দৌরাণ্য অধিক। আমরা সংক্ষেপানুরোধে উপরে কেবল জমীদার শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। জমীদার অর্থে

বিশ্বকম রচনাবলী

করগ্রাহী বৃদ্ধিতে হইবে। ইহারা জমীদারকে জমীদারের লাভ দিয়া, তাহার উপর লাভ করিবার জন্য ইজারা পত্রনি গ্রহণ করেন, সুতরাং প্রজার নিকট হইতেই তাহাদিগকে লাভ পোষাইয়া লইতে হইবে। মধ্যবর্তী তালুকের সৃজন প্রজার পক্ষে বিষম অনিষ্টকর।

দ্বিতীয়তঃ, আমরা যে সকল অত্যাচার বিবৃত করিয়াছি, তাহার অনেকই জমীদারের অজ্ঞাতে, কখন বা অভিমর্ত্যবিরুদ্ধে, নায়েব গোমস্তা প্রভৃতি দ্বারা হইয়া থাকে। প্রজার উপর যে কোনরূপ পীড়ন হয়, অনেকেই তাহা জানেন না।

তৃতীয়তঃ, অনেক জমীদারীর প্রজাও ভাল নহে। পীড়ন না করিলে খাজানা দেয় না। সকলের উপর নালিশ করিয়া খাজানা আদায় করিতে গেলে জমীদারের সর্বনাশ হয়। কিন্তু এতৎসম্বন্ধে ইহাও বক্তব্য যে, প্রজার উপর আগে অত্যাচার না হইলে, তাহারা বিরুদ্ধভাব ধারণ করে না।

যাঁহারা জমীদারদিগকে কেবল নিন্দা করেন, আমরা তাহাদিগের বিরোধী। জমীদারদের দ্বারা অনেক সৎকার্য্য অনর্ঘিত হইতেছে। গ্রামে গ্রামে যে এক্ষণে বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইতেছে, আপামর সাধারণ সকলেই যে আপন আপন গ্রামে বাসিয়া বিদ্যোপার্জন করিতেছে, ইহা জমীদারদিগের গুণে। জমীদারেরা অনেক স্থানে চিকিৎসালয়, রথ্যা, অর্থাশালা ইত্যাদির সৃজন করিয়া সাধারণের উপকার করিতেছেন। আমরাই দেশের লোকের জন্য যে ভিন্নজাতীয় রাজপুরুষদিগের সমক্ষে দুটো কথা বলে, সে কেবল জমীদারদের ব্রিটিশ্ ইন্ডিয়ান্ এসোসিএশন্—জমীদারদের সমাজ। তদ্বারা দেশের যে মঙ্গল সিদ্ধ হইতেছে, তাহা অন্য কোন সম্প্রদায় হইতে হইতেছে না বা হইবারও সম্ভাবনা দেখা যায় না। অতএব জমীদারদিগের কেবল নিন্দা করা অতি অন্যায়পরতার কাজ। এই সম্প্রদায়ভুক্ত কোন কোন লোকের দ্বারা যে প্রজাপীড়ন হয়, ইহাই তাহাদের লজ্জাজনক কলঙ্ক। এই কলঙ্ক অপনীয় করা জমীদারদিগেরই হাত। যদি কোন পরিবারে পাঁচ ভাই থাকে, তাহার মধ্যে দুই ভাই দূর্চারিত্র হয়, তবে আর তিন জনে দূর্চারিত্র ভ্রাতৃদ্বয়ের চরিত্রসংশোধনজন্য যত্ন করেন। জমীদারসম্প্রদায়ের প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, তাহারাও সেইরূপ করুন। সেই কথা বলিবার জন্যই আমাদের এ প্রবন্ধ লেখা। আমরা রাজপুরুষদিগকে জানাইতেছি না—জনসমাজকে জানাইতেছি না। জমীদারদিগের কাছেই আমাদের নালিশ। ইহা তাহাদিগের অসাধ্য নহে। সকল দণ্ড অপেক্ষা, আপন সম্প্রদায়ের বিরাগ, আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে অপমান সর্বপেক্ষা গুরুতর, এবং কার্য্যকরী। যত কুলোক চুরি করিতে ইচ্ছুক হইয়া চৌর্ষ্য বিরত, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রতিবাসীদিগের মধ্যে চোর বলিয়া ঘৃণিত হইবার ভয়ে চুরি করে না। এই দণ্ড যত কার্য্যকরী, আইনের দণ্ড তত নহে। জমীদারের পক্ষে এই দণ্ড জমীদারেরই হাত। অপর জমীদারদিগের নিকট ঘৃণিত, অপমানিত, সমাজচ্যুত হইবার ভয় থাকিলে, অনেক দুর্ভাগ্য জমীদার দুর্ভাগ্য ত্যাগ করিবে। এ কথার প্রতি মনোযোগ করিবার জন্য আমরা ব্রিটিশ্ ইন্ডিয়ান্ এসোসিএশন্কে অনুরোধ করি। যদি তাহারা কুচারিত্র জমীদারগণকে শাসিত করিতে পারেন, তবে দেশের যে মঙ্গল সিদ্ধ হইবে, তজ্জন্য তাহাদিগের মাহাত্ম্য অনন্ত কাল পর্য্যন্ত ইতিহাসে কীর্তিত হইবে। এবং তাহাদিগের দেশ উচ্চতর সভ্যতার পদবীতে আরোহণ করিবে। এ কাজ না হইলে, বাঙ্গালা দেশের মঙ্গলের কোন ভরসা নাই। যাঁহা হইতে এই কার্য্যের সূত্রপাত হইবে, তিনি বাঙ্গালীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পূজিত হইবেন। কি উপায়ে এই কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা অবধারিত করা কঠিন, ইহা স্বীকার করি। কঠিন, কিন্তু অসাধ্য নহে। উক্ত সমাজের কার্য্যাধ্যক্ষগণ যে এ বিষয়ে অক্ষম, আমরা এমত বিশ্বাস করি না। তাহারা সুশিক্ষিত, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বহুদর্শী, এবং কার্য্যক্ষম। তাহারা ঐকান্তিকচিত্তে যত্ন করিলে অবশ্য উপায় স্থির হইতে পারে। আমরা যাহা কিছু এ বিষয়ে বলিতে পারি, তদপেক্ষা তাহাদিগের দ্বারা সুচারু প্রণালী আবিষ্কৃত হইতে পারিবে বলিয়াই আমরা সে বিষয়ে কোন কথা বলিলাম না। যদি আবশ্যক হয়, আমরাই দেশের সামান্য বুদ্ধিতে যাহা আইসে, তাহা বলিতে প্রস্তুত আছি। এক্ষণে কেবল এই বক্তব্য যে, তাহারা যদি এ বিষয়ে অনুরাগহীনতা দেখাইতে থাকেন, তাহা হইলে তাহাদিগেরও অখ্যাতি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—প্রাকৃতিক নিয়ম

আমরা জমীদারের দোষ দিই বা রাজার দোষ দিই, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, বঙ্গদেশের কৃষকের দুর্দর্শা আজি কালি হয় নাই। ভারতবর্ষীয় ইতর লোকের অবনতি ধারাবাহিক; যত দিন হইতে ভারতবর্ষের সভ্যতার সৃষ্টি, প্রায় তত দিন হইতে ভারতবর্ষীয় কৃষকদিগের দুর্দর্শার সূত্রপাত। পাশ্চাত্যেরা কথায় বলেন, একদিনে রোমনগরী নির্মিতা হয় নাই। এদেশের কৃষকদিগের দুর্দর্শাও দুই এক শত বৎসরে ঘটে নাই। আমরা পূর্বে পরিচ্ছেদে বলিয়াছি, হিন্দুরাজার রাজ্যকালে রাজা কর্তৃক প্রজাপীড়ন হইত না; কিন্তু তাহাতে এমন বৃদ্ধায় না যে, তৎকালে প্রজাদিগের বিশেষ সৌষ্ঠব ছিল। এখন রাজার প্রতিনিধিস্বরূপ অনেক জমীদারে প্রজাপীড়ন করেন; তখন আর এক শ্রেণীর লোকে পীড়িত করিত। তাহারা কে, তাহা পশ্চাৎ বলিতেছি। কি কারণে ভারতবর্ষের প্রজা চিরকাল উন্নতিহীন, অদ্য আমরা তাহার অনুসন্ধান প্রবৃত্ত হইব। বঙ্গদেশের কৃষকের অবস্থানুসন্ধানই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু অদ্য যে সকল ঐতিহাসিক বিবরণে আমরা প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহা যত দূর বঙ্গদেশের প্রতি বর্তে, সমুদায় ভারতবর্ষের প্রতি তত দূর বর্তে। বঙ্গদেশে তৎসমুদায়ের যে ফল ফলিয়াছে, সমগ্র ভারতে সেই ফল ফলিয়াছে। বঙ্গদেশ ভারতের একটি খণ্ডমাত্র বলিয়া তথায় সেই ফল ফলিয়াছে। এবং সেই ফল কেবল কৃষিজীবীর কপালেই ফলিয়াছে, এমত নহে; শ্রমজীবী-মাত্রই সমভাগে সে ফলভোগী। অতএব আমরাদিগের এই প্রস্তাব, ভারতীয় শ্রমজীবী প্রজামাত্র সম্বন্ধে অভিপ্রেত বিবেচনা করিতে হইবে। কিন্তু ভারতীয় শ্রমজীবীর মধ্যে কৃষিজীবী এত অধিক যে, অন্য শ্রমজীবীর অস্তিত্ব এ সকল আলোচনার কালে স্মরণ রাখা না রাখা সমান।

জ্ঞানবৃদ্ধিই যে সভ্যতার মূল এবং পরিমাণ, ইহা বকল কর্তৃক সপ্রমাণ হইয়াছে। বকল বলেন যে, জ্ঞানিক উন্নতি ভিন্ন নৈতিক উন্নতি নাই। সে কথায় আমরা অনুমোদন করি না। কিন্তু জ্ঞানিক উন্নতি যে সভ্যতার কারণ, এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। জ্ঞানের উন্নতি না হইলে সভ্যতার উন্নতি হইবে না। জ্ঞান আপনি জন্মে না; অতিশয় শ্রমলভ্য। কেহ যদি বিদ্যালোচনায় রত না হয়, তবে সমাজমধ্যে জ্ঞানের প্রকাশ হইবে না। কিন্তু বিদ্যালোচনার পক্ষে অবকাশ আবশ্যিক। বিদ্যালোচনার পূর্বে উদরপোষণ চাই; অনাহারে কেহই জ্ঞানালোচনা করিবে না। যদি সকলকেই আহারাবেষণে ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়, তবে কাহারও জ্ঞানালোচনার অবকাশ হয় না। অতএব সভ্যতার সৃষ্টির পক্ষে প্রথমে আবশ্যিক যে, সমাজমধ্যে একটি সম্প্রদায় শারীরিক শ্রম ব্যতীত আত্মভরণপোষণে সক্ষম হইবেন। অন্যে পরিশ্রম করিবে, তাঁহারা বাঁসিয়া বিদ্যালোচনা করিবেন। যদি শ্রমজীবীরা সকলেই কেবল আত্মভরণপোষণের যোগ্য খাদ্যোৎপন্ন করে, তাহা হইলে এরূপ ঘটিবে না। কেন না, যাহা জন্মিবে, তাহা শ্রমোপজীবীদের সেবায় যাইবে, আর কাহারও জন্য থাকিবে না। কিন্তু যদি তাহারা আত্মভরণপোষণের প্রয়োজনীয় পরিমাণের অপেক্ষা অধিক উৎপাদন করে, তবে তাহাদিগের ভরণপোষণ বাদে কিছু সঞ্চিত হইবে। তদ্বারা শ্রমবিরত ব্যক্তিরা প্রতিপালিত হইয়া বিদ্যানুশীলন করিতে পারেন। তখন জ্ঞানের উদয় সম্ভব। উৎপাদকের খাইয়া পরিয়া যাহা রহিল, তাহাকে সঞ্চয় বলা যাইতে পারে। অতএব সভ্যতার উদয়ের পূর্বে প্রথমে আবশ্যিক—সামাজিক ধনসঞ্চয়।

কোন দেশে সামাজিক ধনসঞ্চয় হয়, কোন দেশে হয় না। যেখানে হয়, সে দেশ সভ্য হয়। যে দেশে হয় না, সে দেশ অসভ্য থাকে। কি কি কারণে দেশবিশেষে আদিম ধনসঞ্চয় হইয়া থাকে? দুইটি কারণ সংক্ষেপে নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে। প্রথম কারণ, ভূমির উর্বরতা। যে দেশের ভূমি উর্বরা, সে দেশে সহজে অধিক শস্য উৎপন্ন হইতে পারে। সূত্রাং শ্রমোপজীবীদিগের ভরণপোষণের পর আরও কিছু অবশিষ্ট থাকিয়া সঞ্চিত হইবে। দ্বিতীয় কারণ, দেশের উষ্ণতা বা শীতলতা। শীতোষ্ণতার ফল দ্বিবিধ। প্রথমতঃ, যে দেশ উষ্ণ, সে দেশের লোকের অল্পাহার আবশ্যিক, শীতল দেশে অধিক আহার আবশ্যিক। এই কথা কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়মের উপর নির্ভর করে, তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লিখিবার স্থান নাই। আমরা এতদংশ বকলের গ্রন্থের অনুবর্তী হইয়া লিখিতেছি: কৌতূহলবিষ্ট পাঠক সেই গ্রন্থে দেখিবেন যে, যে দেশের লোকের সাধারণতঃ অল্প খাদ্যের প্রয়োজন, সে দেশে শীঘ্র যে সামাজিক

বিক্রম রচনাবলী

ধনসঞ্চয় হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। উষ্ণতার দ্বিতীয় ফল, বক্ল্ এই বলেন যে, তাপাধিক্য হেতু লোকের শারীরিক তাপজনক খাদ্যের তত আবশ্যিকতা হয় না। যে দেশ শীতল, সে দেশে শারীরিক তাপজনক খাদ্য অধিক আবশ্যিক। শারীরিক তাপ শ্বাসগত বায়ুর অম্লজানের সঙ্গে শরীরস্থ দ্রব্যের কার্বনের রাসায়নিক সংযোগের ফল। অতএব যে খাদ্যে কার্বন্ অধিক আছে, তাহাই তাপজনক ভোজ্য। মাংসাদিতেই অধিক কার্বন্। অতএব শীতপ্রধান দেশের লোকের মাংসাদির বিশেষ প্রয়োজন। উষ্ণদেশে মাংসাদি অপেক্ষাকৃত অনাবশ্যিক—বনজের অধিক আবশ্যিক। বনজ সহজে প্রাপ্য—কিন্তু পশুহনন কষ্টসাধ্য, এবং ভোজ্য পশু দুর্লভ। অতএব উষ্ণ দেশের খাদ্য অপেক্ষাকৃত সুলভ। খাদ্য সুলভ বলিয়া শীঘ্র ধনসঞ্চয় হয়।

ভারতবর্ষ উষ্ণদেশ এবং তথায় ভূমিও উর্বরা। সুতরাং ভারতবর্ষে অতি শীঘ্র ধনসঞ্চয় হওয়াই সম্ভব। এই জন্য ভারতবর্ষে অতি পূর্বকালেই সভ্যতার অভ্যুদয় হইয়াছিল। ধনাধিক্য হেতু একাট সম্প্রদায় কার্যিক পরিশ্রম হইতে অবসর লইয়া জ্ঞানালোচনায় তৎপর হইতে পারিয়াছিলেন। তাহাদিগের অর্জিত ও প্রচারিত জ্ঞানের কারণেই ভারতবর্ষের সভ্যতা। পাঠক বুঝিয়াছেন যে, আমরা ব্রাহ্মণদিগের কথা বলিতেছি।

কিন্তু এইরূপ প্রথমকালিক সভ্যতাই ভারতীয় প্রজার দুর্দৃষ্টির মূল। যে যে নিয়মের বশে অকালে সভ্যতা জন্মিয়াছিল, সেই সেই নিয়মের বশেই তাহার অধিক উন্নতি কোন কালেই হইতে পারিল না,—সেই সেই নিয়মের বশেই সাধারণ প্রজার দুর্দর্শা ঘটিল। প্রভাতেই মেঘাচ্ছন্ন। বালতরু ফলবান্ হওয়া ভাল নহে।

যখন জনসমাজে ধনসঞ্চয় হইল, তখন কাজে কাজেই সমাজ দ্বিভাগে বিভক্ত হইল। এক ভাগ শ্রম করে; এক ভাগ শ্রম করে না। এই দ্বিতীয় ভাগের শ্রম করিবার আবশ্যিকতা নাই বলিয়া তাহারা করে না; প্রথম ভাগের উৎপাদিত অতিরিক্ত খাদ্যে তাহাদের ভরণপোষণ হয়। যাহারা শ্রম করে না, তাহারাই কেবল সাবকাশ; সুতরাং চিন্তা, শিক্ষা ইত্যাদি তাহাদিগেরই একাধিকার। যে চিন্তা করে, শিক্ষা পায়, অর্থাৎ যাহার বুদ্ধি অর্জিত হয়, সে অন্যাপেক্ষা যোগ্য, এবং ক্ষমতামালা হয়। সুতরাং সমাজমধ্যে ইহাদিগেরই প্রধানত্ব হয়। যাহারা শ্রমোপ-জীবী, তাহারা ইহাদিগের বশবর্তী হইয়া শ্রম করে। তাহাদিগের জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা শ্রমোপজীবীরা উপকৃত হয়, পুরস্কারস্বরূপ উহারা শ্রমোপজীবীর অর্জিত ধনের অংশ গ্রহণ করে; শ্রমোপজীবীর ভরণপোষণের জন্য যাহা প্রয়োজনীয়, তাহার অতিরিক্ত যাহা জন্মে, তাহা উহাদেরই হাতে জমে। অতএব সমাজের যে অতিরিক্ত ধন, তাহা ইহাদেরই হাতে সঞ্চিত হইতে থাকে। তবে দেশের উৎপন্ন ধন দুই ভাগে বিভক্ত হয়,—এক ভাগ শ্রমোপজীবীর, এক ভাগ বুদ্ধ্যুপজীবীর। প্রথম ভাগ, “মজুরির বেতন”, দ্বিতীয় ভাগ ব্যবসায়ের “মুনাফা”।* আমরা “বেতন” ও “মুনাফা”, এই দুইটি নাম ব্যবহার করিতে থাকিব। “মুনাফা” বুদ্ধ্যুপজীবীদের ঘরেই থাকিবে। শ্রমোপজীবীরা “বেতন” ভিন্ন “মুনাফা”র কোন অংশ পায় না। শ্রমোপ-জীবীরা সংখ্যায় যতই হউক না কেন, উৎপন্ন ধনের যে অংশটি “বেতন”, সেইটিই তাহাদের মধ্যে বিভক্ত হইবে, “মুনাফা”র মধ্য হইতে এক পয়সাও তাহারা পাইবে না।

মনে কর, দেশের উৎপন্ন কোটি মুদ্রা; তন্মধ্যে পঞ্চাশ লক্ষ “বেতন”, পঞ্চাশ লক্ষ “মুনাফা”। মনে কর, দেশে পঁচিশ লক্ষ শ্রমোপজীবী। তাহা হইলে এই পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা “বেতন”, পঁচিশ লক্ষ লোকের মধ্যে ভাগ হইবে, প্রত্যেক শ্রমোপজীবীর ভাগে দুই মুদ্রা পড়িবে। মনে কর, হঠাৎ ঐ পঁচিশ লক্ষ শ্রমোপজীবীর উপর আর পঁচিশ লক্ষ লোক কোথা হইতে আসিয়া পড়িল। তখন পঞ্চাশ লক্ষ শ্রমোপজীবী হইল। সেই পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রাই ঐ পঞ্চাশ লক্ষ লোকের মধ্যে বিভক্ত হইবে। যাহা “মুনাফা”, তাহার এক পয়সাও উহাদের প্রাপ্য নহে, সুতরাং ঐ পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রার বেশী এক পয়সাও তাহাদের মধ্যে বিভাজ্য নহে। সুতরাং এক্ষণে প্রত্যেক শ্রমোপ-জীবীর ভাগ দুই মুদ্রার পরিবর্তে এক মুদ্রা হইবে। কিন্তু দুই মুদ্রাই ভরণপোষণের জন্য আবশ্যিক বলিয়াই তাহা পাইত। অতএব এক্ষণে তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্টে বিশেষ দুর্দর্শা হইবে।

* “ভূমির কর” এবং “সুদ” ইহার অন্তর্গত এ স্থলে বিবেচনা করিতে হইবে। সংক্ষেপার্থপ্রায়ে আমরা কর বা সুদের উল্লেখ করিলাম না।

বিবিধ প্রবন্ধ—বঙ্গদেশের কৃষক

যদি ঐ লোকাগমের সঙ্গে সঙ্গে আর কোটি মদ্রা দেশের ধনবৃদ্ধি হইত, তাহা হইলে এ কষ্ট হইত না। পঞ্চাশ লক্ষ মদ্রা বেতন ভাগের স্থানে কোটি মদ্রা বেতন ভাগ হইত। তখন লোক বেশী আসাতেও সকলের দুই টাকা করিয়া কুলাইত।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি শ্রমোপজীবীদের মহৎ অনিষ্টের কারণ। যে পরিমাণে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হয়, যদি সেই পরিমাণে দেশের ধনও বৃদ্ধি পায়, তবে শ্রমোপজীবীদের কোন অনিষ্ট নাই। যদি লোকসংখ্যা বৃদ্ধির অপেক্ষাও ধনবৃদ্ধি গুরুতর হয়, তবে শ্রমোপজীবীদের শ্রীবৃদ্ধি—যথা, ইংলণ্ড ও আমেরিকায়। আর যদি এই দুইয়ের একও না ঘটিয়া, ধনবৃদ্ধির অপেক্ষা লোকসংখ্যাবৃদ্ধি অধিক হয়, তবে শ্রমোপজীবীদের দুর্দশা। ভারতবর্ষে প্রথমোদ্যমেই তাহাই ঘটিল।

লোকসংখ্যা বৃদ্ধি স্বাভাবিক নিয়ম। এক পুরুষ ও এক স্ত্রী হইতে অনেক সন্তান জন্মে। তাহার একটি একটি সন্তানের আবার অনেক সন্তান জন্মে। অতএব মনুষ্যের দুর্দশা এক প্রকার স্বভাবের নিয়মাদিষ্ট। সকল সমাজেই এই অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা। কিন্তু ইহার সদুপায় আছে। প্রকৃত সদুপায় সঙ্গে সঙ্গে ধনবৃদ্ধি। পরন্তু যে পরিমাণে প্রজাবৃদ্ধি, সে পরিমাণে ধনবৃদ্ধি প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না। ঘটিবার অনেক বিঘ্ন আছে। অতএব উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হয়। উপায়ান্তর দুইটি মাত্র। এক উপায় দেশীয় লোকের কিয়দংশের দেশান্তরে গমন। কোন দেশে লোকের অল্পে কুলায় না, অন্য দেশে অল্প খাইবার লোক নাই। প্রথমোক্ত দেশের লোক কতক শেষোক্ত দেশে যাউক,—তাহা হইলে প্রথমোক্ত দেশের লোকসংখ্যা কমিবে, এবং শেষোক্ত দেশেরও কোন অনিষ্ট ঘটিবে না। এইরূপে ইংলণ্ডের মহদুপকার হইয়াছে। ইংলণ্ডের লোক আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং পৃথিবীর অন্যান্য ভাগে বাস করিয়াছে। তাহাতে ইংলণ্ডের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, উপনিবেশসকলেরও মঙ্গল হইয়াছে।

দ্বিতীয় উপায়, বিবাহপ্রবৃত্তির দমন। এইটি প্রধান উপায়। যদি সকলেই বিবাহ করে, তবে প্রজাবৃদ্ধির সীমা থাকে না। কিন্তু যদি কতক লোক অবিবাহিত থাকে, তবে প্রজাবৃদ্ধির লাঘব হয়। যে দেশে জীবনের স্বচ্ছন্দ লোকের অভ্যস্ত, যেখানে জীবিকানির্বাহের সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে আবশ্যিক, এবং কষ্টে আহরণীয়, সেখানকার লোকে বিবাহপ্রবৃত্তি দমন করে। পরিবার প্রতিপালনের উপায় না দেখিলে বিবাহ করে না।

ভারতবর্ষে এই দুইটির একটি উপায়ও অবলম্বিত হইতে পারে নাই। উষ্ণতা শরীরের শৈথিল্যজনক, পরিশ্রমে অপ্ৰবৃত্তিদায়ক। দেশান্তরে গমন উৎসাহ, উদ্যোগ, এবং পরিশ্রমের কাজ। বিশেষ, প্রকৃতিও তাহার প্রতিকূলতাচরণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষকে অলঙ্ঘ্য পর্বত, এবং বাতাসাঙ্কুল সমুদ্রমধ্যস্থ করিয়া বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। যবদ্বীপ, এবং বালি উপদ্বীপ ভিন্ন আর কোন হিন্দু উপনিবেশের কথা শুন্য যায় না। ভারতবর্ষের ন্যায় বৃহৎ এবং প্রাচীন দেশের এইরূপ সামান্য উপনিবেশিক ক্রিয়া গণনীয় নহে।

বিবাহপ্রবৃত্তির দমন বিষয়ে ভারতবর্ষের আরও মন্দাবস্থা। মাটি আঁচড়াইলেই শস্য জন্মে, তাহার ষৎকিঞ্চিৎ ভোজন করিলেই শরীরের উপকার হউক, না হউক, ক্ষুধানিবৃত্তি এবং জীবনধারণ হয়। বায়ুর উষ্ণতাপ্রযুক্ত পরিচ্ছদের বাহুল্যের আবশ্যিকতা নাই। সুতরাং অপকৃষ্ট জীবিকা অতি সুলভ। এমত অবস্থায় পরিবার প্রতিপালনে অক্ষমতাভয়ে কেহ ভীত নহে। সুতরাং বিবাহপ্রবৃত্তিদমনে প্রজা পরাঙ্মুখ হইল। প্রজাবৃদ্ধির নিবারণের কোন উপায়ই অবলম্বিত না হওয়াতে তাহার বেগ অপ্রতিহত হইল। কাজে কাজেই সভ্যতার প্রথম অভ্যুদয়ের পরেই ভারতীয় শ্রমোপজীবীর দুর্দশা আরম্ভ হইল। যে ভূমির উর্বরতা ও বায়ুর উষ্ণতা-হেতুক সভ্যতার উদয়, তাহাতেই জনসাধারণের দুরবস্থার কারণ সৃষ্টি হইল। উভয়ই অলঙ্ঘ্য নৈসর্গিক নিয়মের ফল।

শ্রমোপজীবীর এই কারণে দুর্দশার আরম্ভ। কিন্তু একবার অবনতি আরম্ভ হইলেই, সেই অবনতিরই ফলে আরও অবনতি ঘটে। শ্রমোপজীবীদের যে পরিমাণে দুরবস্থা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, সেই পরিমাণে তাহাদিগের সহিত সমাজের অন্য সম্প্রদায়ের তারতম্য অধিকতর হইতে লাগিল। প্রথম, ধনের তারতম্য—তৎফলে অধিকারের তারতম্য। শ্রমোপজীবীরা হীন হইল বলিয়া তাহাদের উপর বুদ্ধিপূজীদের প্রভুত্ব বাড়িতে লাগিল। অধিক প্রভুত্বের ফল অধিক অত্যাচার। এই প্রভুত্বই শূদ্রপীড়ক স্মৃতিশাস্ত্রের মূল।

বিশ্বকম রচনাবলী

আমরা যে সকল কথা বলিলাম, তাহার তিনটি গুরুতর তাৎপর্য দেখা যায়।

১। শ্রমোপজীবীদিগের অবনতির যে সকল কারণ দেখাইলাম, তাহার ফল ত্রিবিধ।

প্রথম ফল, শ্রমের বেতনের অল্পতা। ইহার নামান্তর দরিদ্রতা।

দ্বিতীয় ফল, বেতনের অল্পতা হইলেই পরিশ্রমের আধিক্যের আবশ্যিক হয়; কেন না, যাহা কমিল, তাহা খাটিয়া পোষাইয়া লইতে হইবে। তাহাতে অবকাশের ধ্বংস। অবকাশের অভাবে বিদ্যালোচনার অভাব। অতএব দ্বিতীয় ফল মূর্খতা।

তৃতীয় ফল, বুদ্ধ্যুপজীবীদিগের প্রভুত্ব এবং অত্যাচার বৃদ্ধি। ইহার নামান্তর দাসত্ব।

দারিদ্র্য, মূর্খতা, দাসত্ব।

২। ঐ সকল ফল একবার উৎপন্ন হইলে ভারতবর্ষের ন্যায় দেশে প্রাকৃতিক নিয়মগুণে স্থায়িত্ব লাভ করিতে উন্মুখ হয়।

দেখান গিয়াছে যে, ধনসঞ্চয়ই সভ্যতার আদিম কারণ। যদি বলি যে, ধর্নালিপ্সা সভ্যতা-বৃদ্ধির নিত্য কারণ, তাহা হইলে অত্যাঙ্কি হইবে না। সামাজিক উন্নতির মূলীভূত মনুষ্যহৃদয়ের দুইটি বৃত্তি; প্রথম জ্ঞানালিপ্সা, দ্বিতীয় ধর্নালিপ্সা। প্রথমোক্তটি মহৎ এবং আদরণীয়, দ্বিতীয়টি স্বার্থসাধক এবং নীচ বলিয়া খ্যাত। কিন্তু "History of Rationalism in Europe" নামক গ্রন্থে লেঙ্কি সাহেব বলেন যে, দুইটি বৃত্তির মধ্যে ধর্নালিপ্সাই মনুষ্যজাতির অধিকতর মঙ্গলকর হইয়াছে। বস্তুতঃ জ্ঞানালিপ্সা কাদাচিতক, ধর্নালিপ্সা সর্বসাধারণ; এ জন্য অপেক্ষাকৃত ফলোপধায়ক। দেশের উৎপন্ন ধনে জনসাধারণের গ্রাস আচ্ছাদনের কুলান হইতেছে বলিয়া সামাজিক ধর্নালিপ্সা কমে না। সর্বদাই নতন নতন সুখের আকাঙ্ক্ষা জন্মে। পূর্বে যাহা নিষ্প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইত, পরে তাহা আবশ্যিক বোধ হয়। তাহা পাইলে আবার অন্য সামগ্রী আবশ্যিক বোধ হয়। আকাঙ্ক্ষায় চেষ্টা, চেষ্টায় সফলতা জন্মে। সুতরাং সুখ এবং মঙ্গল বৃদ্ধি হইতে থাকে। অতএব সুখস্বচ্ছন্দের আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধি সভ্যতা বৃদ্ধির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। বাহ্য সুখের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইয়া আসিলে জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা, সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা, তৎসঙ্গে কাব্যসাহিত্যাদির প্রিয়তা এবং নানাবিধ বিদ্যার উৎপত্তি হয়। যখন লোকের সুখলালসার অভাব থাকে, তখন পরিশ্রমের প্রবৃত্তি দুর্ব্বলা হয়। উৎকর্ষ লাভের ইচ্ছাও থাকে না, তৎপ্রতি যত্নও হয় না। তন্নিবন্ধন যে দেশে খাদ্য সুলভ, সে দেশের প্রজাবৃদ্ধির নিবারণকারিণী প্রবৃত্তিসকলের অভাব হয়। অতএব যে "সন্তোষ" কবিদিগের অশেষ প্রশংসার স্থান, তাহা সমাজোন্নতির নিতান্ত অনিষ্টকারক; কবিগীতা এই প্রবৃত্তি সামাজিক জীবনের হলাহল।

লোকের অনিষ্টপূর্ণ সন্তুষ্টিভাব, ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক নিয়মগুণে সহজেই ঘটিল। এ দেশে তাপের কারণ অধিককাল ধরিয়া এককালীন পরিশ্রম অসহ্য। তৎকারণ পরিশ্রমে অনিচ্ছা অভ্যাসগত হয়। সেই অভ্যাসের আরও কারণ আছে। উষ্ণদেশে শরীরমধ্যে অধিক তাপের সমৃদ্ধভবের আবশ্যিকতা হয় না বলিয়া, তথাকার লোকে যে মৃগয়াদিতে তাদৃশ রত হয় না, ইহা পূর্বে কথিত হইয়াছে। বন্য পশু হনন করিয়া খাইতে হইলে পরিশ্রম, সাহস, বল এবং কার্যতৎপরতা অভ্যস্ত হয়। ইউরোপীয় সভ্যতার একটি মূল, পূর্বকালীন তাদৃক্ অভ্যাস। অতএব একে শ্রমের অনাবশ্যিকতা, তাহাতে শ্রমে অনিচ্ছা, ইহার পরিণাম আলস্য এবং অনুৎসাহ। অভ্যাসগত আলস্য এবং অনুৎসাহেরই নামান্তর সন্তোষ। অতএব ভারতীয় প্রজার একবার দুর্দর্শা হইলে, সেই দশাতেই তাহারা সন্তুষ্টি রহিল। উদ্যমভাবে আর উন্নতি হইল না। সুপ্ত সিংহের মুখে আহাৰ্য পশু স্বতঃপ্রবেশ করে না।

ভারতবর্ষের পুরাবৃত্তালোচনায় সন্তোষ সম্বন্ধে অনেকগুলিন বিচিত্র তত্ত্ব পাওয়া যায়। ঐহিক সুখে নিষ্পৃহতা, হিন্দুধর্ম এবং বৌদ্ধধর্ম উভয়কর্তৃক অনুজ্ঞাত। কি ব্রাহ্মণ, কি বৌদ্ধ, কি স্মার্ত্ত, কি দার্শনিক, সকলেই প্রাণপণে ভারতবাসীদিগকে শিখাইয়াছেন যে, ঐহিক সুখ অনাদরণীয়। ইউরোপেও ধর্মযাজকগণ কর্তৃক ঐহিক সুখে অনাদরতত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছিল। ইউরোপে যে রোমীয় সভ্যতা লোপের পর সহস্র বৎসর মনুষ্যের ঐহিক অবস্থা অনুন্নত ছিল, এইরূপ শিক্ষাই তাহার কারণ। কিন্তু যখন ইতালিতে প্রাচীন যুনানী সাহিত্য, যুনানী দর্শনের পুনরুদয় হইল, তখন তৎপ্রদত্ত শিক্ষানিবন্ধন ঐহিকে বিরক্তি ইউরোপে ক্রমে মন্দীভূত হইল। সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতারও বৃদ্ধি হইল। ইউরোপে ঐ প্রবৃত্তি বন্ধমূল হইতে পারে নাই। ভারতবর্ষে ইহা মনুষ্যের দ্বিতীয় স্বভাব স্বরূপে পরিণত হইয়াছে। যে ভূমি

বিবিধ প্রবন্ধ—বঙ্গদেশের কৃষক

যে বৃক্ষের উপযুক্ত, সেইখানেই তাহা বদ্ধমূল হয়। এ দেশের ধর্মশাস্ত্রকর্তৃক যে নিবৃত্তি-জনক শিক্ষা প্রচারিত হইল, দেশের অবস্থাই তাহার মূল; আবার সেই ধর্মশাস্ত্রের প্রদত্ত শিক্ষায় প্রাকৃতিক অবস্থাজন্যা নিবৃত্তি আরও দৃঢ়ীভূত হইল।

৩। এই সকল কারণে শ্রমোপজীবীদিগের দুরবস্থা যে চিরস্থায়ী হয়, কেবল তাহাই নহে। তাঁহাদের সমাজের অন্য সম্প্রদায়ের লোকের গৌরবের ধ্বংস হয়। যেমন এক ভাণ্ড দুধে দুই এক বিন্দু অম্ল পড়িলে সকল দুধ দাঁধ হয়, তেমন সমাজের এক অধঃশ্রেণীর দুর্দর্শায় সকল শ্রেণীরই দুর্দর্শা জন্মে।

(ক) উপজীবিকানুসারে প্রাচীন আর্যেরা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। শূদ্র অধস্তন শ্রেণী; তাহাদিগেরই দুর্দর্শার কথা এতক্ষণ বলিতেছিলাম। বৈশ্য বাণিজ্যব্যবসায়ী। বাণিজ্য, শ্রমোপজীবীর শ্রমোৎপন্ন দ্রব্যের প্রাচুর্যের উপর নির্ভর করে। যে দেশে দেশের আবশ্যিক সামগ্রীর অতিরিক্ত উৎপন্ন না হয়, সে দেশে বাণিজ্যের উন্নতি হয় না। বাণিজ্যের উন্নতি না হইলে, বাণিজ্যব্যবসায়ীদিগের সৌষ্ঠবের হানি। লোকের অভাব-বৃদ্ধি, বাণিজ্যের মূল। যদি আমাদের অন্যান্যদেশোৎপন্ন সামগ্রী গ্রহণেচ্ছা না থাকে, তবে কেহ অন্যান্যদেশোৎপন্ন সামগ্রী আমাদের কাছে আনিয়া বিক্রয় করিবে না। অতএব যে দেশের লোক অভাবশূন্য, নিজশ্রমোৎপন্ন সামগ্রীতে সন্তুষ্ট, সে দেশে বাণিজ্যদিগের শ্রীহানি অবশ্য হইবে। কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, তবে কি ভারতবর্ষে বাণিজ্য ছিল না? ছিল বৈ কি। ছিল, কিন্তু ভারতবর্ষের তুল্য বিস্তৃত উর্বরভূমিবিশিষ্ট বহুধনের আকরস্বরূপ দেশে যে রূপ বাণিজ্য-বাহুল্য হওয়ার সম্ভাবনা ছিল,—অতি প্রাচীন কালেই যে সম্ভাবনা ছিল,—তাহার কিছুই হয় নাই। অদ্য কয়েক বৎসর তাহার সূত্রপাত হইয়াছে মাত্র। বাণিজ্য হানির অন্যান্য কারণও ছিল, যথা—ধর্মশাস্ত্রের প্রতিবন্ধকতা, সমাজের অভ্যস্ত অনুৎসাহ ইত্যাদি। এ প্রবন্ধে সে সকলের উল্লেখের আবশ্যিক নাই।

(খ) ক্ষত্রিয়েরা রাজা বা রাজপুরুষ। যদি পৃথিবীর পুরাবৃত্তে কোন কথা নিশ্চিত প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, তবে সে কথাটি এই যে, সাধারণ প্রজা সতেজঃ এবং রাজপ্রতিদ্বন্দ্বী না হইলে রাজপুরুষদিগের স্বভাবের উন্নতি হয় না, অবনতি হয়। যদি কেহ কিছু না বলে, রাজপুরুষেরা সহজেই স্বেচ্ছাচারী হইলেন। স্বেচ্ছাচারী হইলেই আত্মসুখরত, কার্যে শিথিল এবং দুষ্ক্রিয়ান্বিত হইতে হয়। অতএব যে দেশের প্রজা নিস্তেজ, নম্র, অনুৎসাহী, অবিরোধী, সেইখানেই রাজপুরুষদিগের এরূপ স্বভাবগত অবনতি হইবে। যেখানে প্রজা দৃঃখী, অন্নবস্ত্রের কাঙ্গাল, আহারোপার্জনে ব্যগ্র, এবং সন্তুষ্টস্বভাব, সেইখানেই তাহারা নিস্তেজ, নম্র, অনুৎসাহী, অবিরোধী। ভারতবর্ষে তাই। সেই জন্য ভারতবর্ষের রাজগণ, মহাভারতকীর্তিত বলশালী, ধর্মিষ্ঠ, ইন্দ্রিয়জয়ী রাজচরিত্র হইতে মধ্যকালের কাব্যনাটকাদিচিত্রিত বলহীন, ইন্দ্রিয়পরবশ, স্ত্রীপুত্র, অকর্ম্মঠ দশাপ্রাপ্ত হইয়া শেষে মুসলমান-হস্তে লুপ্ত হইলেন। যে দেশে সাধারণ প্রজার অবস্থা ভাল, সে দেশে রাজপুরুষদিগের এরূপ দুর্গতি ঘটে না। তাহারা রাজার দুর্গতি দেখিলে, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে এবং হইয়া থাকে। বিরোধেই উভয় পক্ষের উন্নতি। রাজপুরুষগণ অনর্থক বিরোধের ভয়ে সতর্ক থাকেন। কিন্তু বিরোধে কেবল যে এই উপকার, ইহা নহে। নিত্য মল্লযুদ্ধে বল বাড়ে। বিরোধে মানসিক গুণসকলের সৃষ্টি এবং পুষ্টি হয়। নিষ্করোধে তৎসমুদায়ের লোপ। শূদ্রের দাসত্বে ক্ষত্রিয়ের ধন এবং ধর্মের লোপ হইয়াছিল। রোমে প্লিনিয়ান্দিগের বিবাদে, ইংলণ্ডের কমন্দিগের বিবাদে প্রভূদিগের স্বাভাবিক উৎকর্ষ জন্মিয়াছিল।

(গ) ব্রাহ্মণ। যেমন অধঃশ্রেণীর প্রজার অবনতিতে ক্ষত্রিয়দিগের প্রভুত্ব বাড়িয়া পরিশেষে লুপ্ত হইয়াছিল, ব্রাহ্মণদিগেরও তদ্রূপ। অপর তিন বর্ণের অনুন্নতিতে ব্রাহ্মণের প্রথমে প্রভুত্ব বৃদ্ধি হয়। অপর বর্ণের মানসিক শক্তিহানি হওয়াতে তাহাদিগের চিত্ত উপধর্মের বিশেষ বশীভূত হইতে লাগিল। দৌর্ভাগ্য থাকিলেই ভয়াধিক্য হয়। উপধর্ম ভীতিজাত; এই সংসার বলশালী অথচ অনিষ্টকারক দেবতাপূর্ণ, এই বিশ্বাসই উপধর্ম। অতএব অপর বর্ণগ্রন্থ, মানসিকশক্তিবিহীন হওয়াতে অধিকতর উপধর্মপীড়িত হইল; ব্রাহ্মণেরা উপধর্মের যাজক; সুতরাং তাঁহাদের প্রভুত্ব বৃদ্ধি হইল। ব্রাহ্মণেরা কেবল শাস্ত্রজাল, ব্যবস্থাজাল বিস্তারিত করিয়া ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রকে জড়িত করিতে লাগিলেন। মক্ষিকাগণ জড়াইয়া পড়িল—নাড়বার শক্তি

বিক্রম রচনাবলী

নাই। কিন্তু তথাপি উর্গনাভের জাল ফুরায় না। বিধানের অন্ত নাই। এ দিকে রাজশাসন-প্রণালী দৃষ্টবিধি দায় সন্ধিবিশিষ্ট প্রভৃতি হইতে আচমন, শয়ন, বসন, গমন, কথোপকথন, হাস্য, রোদন, এই সকল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের রচিত বিধির দ্বারা নিয়মিত হইতে লাগিল। “আমরা যেদ্রুপে বলি, সেইদ্রুপে শইবে, সেইদ্রুপে খাইবে, সেইদ্রুপে বসিবে, সেইদ্রুপে হাঁটিবে, সেইদ্রুপে কথা কহিবে, সেইদ্রুপে হাসিবে, সেইদ্রুপে কাঁদিবে; তোমার জন্মমৃত্যু পর্য্যন্ত আমাদের ব্যবস্থার বিপরীত হইতে পারিবে না; যদি হয়, তবে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, আমাদিগকে দক্ষিণা দিও।” জালের এইরূপ সূত্র* কিন্তু পরকে ভ্রান্ত করিতে গেলে আপনিও ভ্রান্ত হইতে হয়; কেন না, ভ্রান্তির আলোচনায় ভ্রান্তি অভ্যস্ত হয়। যাহা পরকে বিশ্বাস করাইতে চাই, তাহাতে নিজের বিশ্বাস দেখাইতে হয়; বিশ্বাস দেখাইতে দেখাইতে যথার্থ বিশ্বাস ঘটিয়া উঠে। যে জালে ব্রাহ্মণেরা ভারতবর্ষকে জড়াইলেন, তাহাতে আপনারাও জড়িত হইলেন। পৌরাণিক প্রমাণে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, মানুষের স্বেচ্ছানুভূতির প্রয়োজনান্বিতরিত্ত রোধ করিলে সমাজের অবনতি হয়। হিন্দুসমাজের অবনতির অন্য যত কারণ নির্দেশ করিয়াছি, তন্মধ্যে এইটি বোধ হয় প্রধান, অদ্যাপি জাজ্বল্যমান। ইহাতে রুদ্ধ এবং রোধকারী সমান ফলভোগী। নিয়ম-জালে জড়িত হওয়াতে ব্রাহ্মণদিগের বুদ্ধিস্বর্ভা লুপ্ত হইল। যে ব্রাহ্মণ রামায়ণ, মহাভারত, পাণিনি ব্যাকরণ, সাংখ্যদর্শন প্রভৃতির অবতারণা করিয়াছিলেন, তিনি বাসবদত্তা, কাদম্বরী, প্রভৃতির প্রণয়নে গৌরববোধ করিতে লাগিলেন। শেষে সে ক্ষমতাও গেল। ব্রাহ্মণদিগের মানস ক্ষেত্র মরুভূমি হইল।

আমরা দেখাইলাম যে, দুইটি প্রাকৃতিক কারণে ভারতবর্ষের শ্রমোপজীবীদের চিরদুর্দশা। প্রথম ভূমির উর্বরতাহীনতা, দ্বিতীয় বায়ুদ্বার তাপাহীনতা। এই দুই কারণে অতি পূর্বকালেও ভারতবর্ষে সভ্যতার উদয় হইয়াছিল। কিন্তু সেই সকল কারণে বেতন অল্প হইয়া উঠিল। এবং গুরুতর সামাজিক তারতম্য উপস্থিত হইল। ইহার পরিণাম, প্রথম, শ্রমোপজীবীদিগের (১) দারিদ্র্য, (২) মূর্খতা, (৩) দাসত্ব। দ্বিতীয়, এই দশা একবার উপস্থিত হইলে প্রাকৃতিক নিয়মবলেই স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইল। তৃতীয়, সেই দুর্দশা ক্রমে সমাজের অন্য সকল সম্প্রদায়কে প্রাপ্ত হইল। এক স্রোতে আরোহণ করিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, একত্রে নিম্নভূমে অবতরণ করিতে লাগিলেন।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যদি এ সকল অলঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক নিয়মের ফল, তবে বঙ্গদেশের কৃষকের জন্য চীৎকার করিয়া ফল কি? রাজা ভাল আইন করিলে কি ভারতবর্ষ শীতল দেশ হইবে, না জমীদার প্রজাপীড়নে ক্ষান্ত হইলে ভূমি অনুর্বরা হইবে? উত্তর, আমরা যে সকল ফল দেখাইতেছি, তাহা নিত্য নহে। অথবা এইরূপ নিত্য যে, যদি অন্য নিয়মের বলে প্রতিরুদ্ধ না হয়, তবেই তাহার উৎপত্তি হয়। কিন্তু ঐ সকল ফলোৎপত্তি কারণান্তরে প্রতিষিদ্ধ হইতে পারে। সে সকল কারণ, রাজা ও সমাজের আয়ত্ত। যদি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বা তৎপরে ইতালিতে গ্রীক সাহিত্যাদির আবিষ্করণ না হইত, তবে এক্ষণকার অবস্থা হইতে ইউরোপের অবস্থা ভিন্ন হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু জলবায়ুর শীতোষ্ণতা বা ভূমির উর্বরতা বা অন্য বাহ্য প্রকৃতির কোন কারণের কিছু পরিবর্তন হইত না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—আইন

বঙ্গদেশের কৃষকেরা যে দরিদ্র—অন্নবস্ত্রের কাঙ্গাল, তাহা কেবল জমীদারের দোষ নহে। কেবল প্রাকৃতিক নিয়মের ফলে নহে। জমীদারের দোষ, প্রাকৃতিক নিয়মের ফল, রাজবিধির দ্বারা সংশোধিত হইতে পারে। দুর্বলের উপর পীড়ন করা বলবানের স্বভাব। সেই পীড়ন নিবারণ জন্যই রাজত্ব। রাজা বলবান হইতে দুর্বলকে রক্ষা করেন, ইহারই জন্য মনুষ্যের রাজশাসনশৃঙ্খলে বন্ধ হইবার আবশ্যিকতা। যদি কোন রাজ্যে দুর্বলকে বলবানে পীড়ন করে, তবে তাহা রাজারই দোষ। সে রাজ্যে রাজা আপন কর্তব্য সাধনে হয় অক্ষম, নয় পরাঞ্জু। যদি এ দেশে জমীদারে কৃষককে পীড়িত করেন, ইহা সত্য হয়, তবে তাহাতে ইংরাজ

* টাকাটার উল্টা পিঠ আমি ধর্মতত্ত্বে দেখাইয়াছি। উভয় মতই সত্যমূলক।

বিবিধ প্রবন্ধ—বঙ্গদেশের কৃষক

রাজপুরুষদিগের অবশ্য দোষ আছে। দেখা যাউক, তাঁহারা আপন কর্তব্য সাধন পক্ষে কি করিয়াছেন।

প্রাচীন হিন্দুরাজ্যে জমীদার ছিল না। প্রজারা ষষ্ঠাংশ রাজাকে দিয়া নিশ্চিত হইত; কেহ তাহাদিগকে মাঙ্গন মাথট পার্বণীর জন্য জ্বালাতন করিত না। হিন্দুরা স্বজাতির রাজ্যকালের পুরাবৃত্ত লিখিয়া যান নাই বটে, কিন্তু অসংখ্য অন্যবিষয়ক গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন। সেই সকল গ্রন্থ হইতে ভারতবর্ষের প্রাচীন অবস্থা সম্যক্রূপে অবগত হওয়া যায়। তদ্বারা জানা যায় যে, হিন্দুরাজ্যকালে প্রজাপীড়ন ছিল না। যাঁহারা মুসলমান ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের সময়ের প্রজাপীড়ন এবং বিশৃঙ্খলা দেখিয়া বিবেচনা করেন যে, প্রাচীন হিন্দুরাজগণও এইরূপ প্রজাপীড়ক ছিলেন, তাঁহারা বিশেষ দ্রান্ত। অসংখ্য সংস্কৃত গ্রন্থমধ্যে প্রজাপীড়নের পরিচয় কোথাও পাওয়া যায় না। যদি প্রজাপীড়নের প্রাবল্য থাকিত, তবে অবশ্য দেশীয় প্রাচীন সাহিত্যাদিতে তাহার চিহ্ন থাকিত; কেন না, সাহিত্য এবং স্মৃতি সমাজের প্রতিকৃতি মাত্র। প্রজাপীড়ন দূরে থাকুক, বরং সেই প্রতিকৃতিতে দেখা যায় যে, হিন্দু রাজারা বিশেষ প্রজাবৎসল ছিলেন। রাজা পিতার ন্যায় প্রজাপালন করেন, এই কথা সংস্কৃত গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ কথিত আছে। সুতরাং অন্যান্য জাতীয় রাজাদিগের অপেক্ষা এ বিষয়ে তাঁহাদের গৌরব। যুনানী রাজগণের নামই ছিল "Tyrant", সে শব্দের আধুনিক অর্থ প্রজাপীড়ক। ইংলণ্ডীয় রাজগণ প্রজাপীড়ক বলিয়া প্রজাদিগের সহিত তাঁহাদিগের বিবাদ হইত; একজন রাজা প্রজাকর্তৃক পদচ্যুত, অন্য একজন নিহত হন। ফ্রান্স্ প্রজাপীড়নের জন্যই বিখ্যাত, এবং অসহ্য প্রজাপীড়নের জন্যই ফরাসীবিপ্লবের সৃষ্টি। ভারতবর্ষে উত্তরগামী মুসলমান এবং মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রজাপীড়নের উল্লেখ মাত্র যথেষ্ট। কেবল প্রাচীন হিন্দু রাজগণের এ বিষয়ে বিশেষ গৌরব। তাঁহারা কেবল ষষ্ঠাংশ লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন।

মুসলমানদিগের সময়ে প্রথম জমীদারের সৃষ্টি। তাঁহারা রাজ্যশাসনে সুপারগ ছিলেন না। যেখানে হিন্দু রাজগণ অবলীলাক্রমে প্রজাদিগের নিকট হইতে কর সংগ্রহ করিতেন, মুসলমানেরা সেখানে কর সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইলেন। তাঁহারা পরগণায় পরগণায় এক এক ব্যক্তিকে করসংগ্রাহক নিযুক্ত করিলেন। তাহারা এক প্রকার কর-সংগ্রহের কণ্ট্রাক্টর হইল। রাজার রাজস্ব আদায় করিয়া দিবেন, তাহার বেশী যাহা আদায় করিতে পারিবেন, তাহা তাঁহাদিগের লাভ থাকিবে। ইহাতেই জমীদারীর সৃষ্টি, এবং ইহাতেই বঙ্গদেশে প্রজাপীড়নের সৃষ্টি। এই কণ্ট্রাক্টরেরাই জমীদার। রাজার রাজস্বের উপর যত বেশী আদায় করিতে পারেন, ততই তাঁহাদের লাভ। সুতরাং তাঁহারা প্রজার স্বর্স্বাস্ত করিয়া বেশী আদায় করিতে লাগিলেন। প্রজার যে স্বর্স্বনাশ হইতে লাগিল, তাহা বলা বাহুল্য।

তাহার পর ইংরাজেরা রাজা হইলেন। তাঁহারা যখন রাজ্য গ্রহণ করেন, তখন তাহাদিগের সেই অবস্থা। তাহাদিগের দুরবস্থা মোচন করিবার জন্য ইংরাজদিগের ইচ্ছার চূড়ি ছিল না; কিন্তু লর্ড্ কর্ণওয়ালিস্ মহাত্ম্যে পরিত হইয়া প্রজাদিগের আরও গুরুতর স্বর্স্বনাশ করিলেন। তিনি বলিলেন যে, জমীদারদিগের জমীদারীতে চিরস্থায়ী স্বত্ত্ব নাই বলিয়াই জমীদারীতে তাঁহাদিগের যত্ন হইতেছে না। জমীদারীতে তাঁহাদিগের স্থায়ী অধিকার হইলে পর, তাহাতে তাঁহাদের যত্ন হইবে। সুতরাং তাঁহারা প্রজাপীড়ক না হইয়া প্রজাপালক হইবেন। এই ভাবিয়া তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সৃজন করিলেন। রাজস্বের কণ্ট্রাক্টর্দিগকে ভূস্বামী করিলেন।

তাহাতে কি হইল? জমীদারেরা যে প্রজাপীড়ক, সেই প্রজাপীড়ক রহিলেন। লাভের পক্ষে, প্রজাদিগের চিরকালের স্বত্ত্ব একেবারে লোপ হইল। প্রজারাই চিরকালের ভূস্বামী; জমীদারেরা কস্মিন্ কালে কেহ নহেন—কেবল সরকারী তহশীলদার। কর্ণওয়ালিস্ যথার্থ ভূস্বামীর নিকট হইতে ভূমি কাড়িয়া লইয়া তহশীলদারকে দিলেন। ইহা ভিন্ন প্রজাদিগের আর কোন লাভ হইল না। ইংরাজ-রাজ্যে বঙ্গদেশের কৃষকদিগের এই প্রথম কপাল ভাঙ্গিল। এই "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" বঙ্গদেশের অধঃপাতের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মাত্র—কস্মিন্ কালে ফিরিবে না। ইংরাজদিগের এ কলঙ্ক চিরস্থায়ী; কেন না, এই বন্দোবস্ত "চিরস্থায়ী"।

কর্ণওয়ালিস্ প্রজাদিগের হাত পা বান্ধিয়া জমীদারের গ্রাসে ফেলিয়া দিলেন—জমীদার কর্তৃক তাহাদিগের প্রতি কোন অত্যাচার না হয়, সেই জন্য কোন বিধি ও নিয়ম করিলেন না।

বাংকম রচনাবলী

কেবল বলিলেন যে, “প্রজা প্রভৃতির রক্ষার্থ ও মঙ্গলার্থ গবর্ণর জেনারেল্ যে সকল নিয়ম আবশ্যিক বিবেচনা করিবেন, তাহা যখন উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিবেন, তখনই বিধিবদ্ধ করিবেন। তজ্জন্য জমীদার প্রভৃতি খাজানা আদায় করার পক্ষে কোন আপত্তি করিতে পারিবেন না।”*

“বিধিবদ্ধ করিবেন” আশা দিলেন, কিন্তু করিলেন না। প্রজারা পুরুষানুক্রমে জমীদার কর্তৃক পীড়িত হইতে লাগিল, কিন্তু ইংরাজ কিছুই করিলেন না। প্রজাদিগের দ্বিতীয়বার অশুভগ্রহ। ১৮১৯ সালে কোর্ট্ অব্ ডিরেক্টরস্ লিখিলেন, “যদিও সেই বন্দোবস্তের পর এত বৎসর অতীত হইয়াছে, তথাপি আমরা তৎকালে প্রজাদিগের স্বত্ব নিরূপণ এবং সামঞ্জস্য করিবার যে অধিকার হাতে রাখিয়াছিলাম, তদনুযায়ী অদ্যাপি কিছুই করা হইল না।” এই আক্ষেপ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন। ১৮৩২ সালে কাম্বেল্ নামক একজন বিচক্ষণ রাজকর্মচারী লিখিলেন, “এ অঙ্গীকার অদ্যাপি রাজকীয় ব্যবস্থামালার শিরোভাগে বর্তমান রহিয়াছে, কিন্তু গবর্ণমেন্ট্ ভ্রাম্য ভূস্বামী(প্রজা)দিগের অগ্রে জমীদারকে দাঁড় করাইয়া, তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ উচ্ছেদ করিয়াছেন। সুতরাং সে অঙ্গীকার মত কর্ম করেন নাই।”

বরং তাঁদ্বিপরীতই করিলেন। দুর্ব্বলকে আরও দুর্ব্বল করিলেন, বলবান্কে আরও বলবান্ করিলেন। ১৮১২ সালের ৫ আইনের দ্বারা প্রজার যে কিছু স্বত্ব ছিল, তাহা লোপ করিলেন। এই বিধি হইল যে, জমীদার প্রজাকে যে কোন হারে পাট্টা দিতে পারিবেন। ইহার অর্থ এই হইল যে, জমীদার যে কোন প্রজার নিকট, যে কোন হারে খাজানা আদায় করিতে পারিবেন। ডিরেক্টরেরা স্বয়ং এই অর্থ করিলেন,† সুতরাং কৃষককে ভূমিতে রাখা না রাখা জমীদারের ইচ্ছাধীন হইল। ভূমির সঙ্গে কৃষকের কোন সম্বন্ধ রহিল না। কৃষক মজদুর হইল। এই তৃতীয় কুগ্রহ।

এই ১৮১২ সালের ৫ আইন পূর্ব্বকালের বিখ্যাত “পঞ্জম”। যদি কেহ প্রজার সম্বন্ধ লুটিয়া লইতে চাহিত, সে “পঞ্জম” করিত। এখনও আইন তাই আছে, কেবল সে নামটি নাই। “কোরোক” কি চমৎকার ব্যাপার, তাহা আমরা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লিখিয়াছি। সন ১৮১২ সালের ৫ আইনও কোরোকের প্রথম আইন নহে। যে বৎসর জমীদার প্রথম ভূস্বামী হইলেন, সেই বৎসর কোরোকের আইনও প্রথম বিধিবদ্ধ হইল।‡ জমীদার চিরকালই প্রজার ফসল কাড়িয়া লইতেন, কিন্তু ইংরাজেরা প্রথমে সে দস্যুবৃত্তিকে আইনসঙ্গত করিলেন। অদ্যাপি এই দস্যুবৃত্তি আইনসঙ্গত। প্রজাদিগের এই চতুর্থ কপালের দোষ।

পরে ১৮১২ সালের ১৮ আইন। ৫ আইন তদ্বারা আরও স্পষ্টীকৃত হইল। ডিরেক্টরেরা লিখিলেন যে, এই আইন অনুসারে জমীদারেরা কদিমী প্রজাদিগকেও নিরিকের বিবাদচ্ছলে তাহাদিগের পৈতৃক সম্পত্তি হইতে উচ্ছেদ করিতে পারেন।§

তাহার পর সন ১৮৫৯ সাল পর্য্যন্ত আর কোন দিকে কিছু হইল না। ১৮৫৯ সালে বিখ্যাত দশ আইনের সৃষ্টি হইল। ইংরাজ কর্তৃক প্রজার উপকারার্থ এই প্রথম নিয়ম-সংস্থাপন হইল। ১৭৯৩ সালে কর্ণওয়ালিস্ যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, প্রায় ৭০ বৎসর পরে প্রাতঃস্মরণীয় লর্ড্ কানিঙ্ হইতে প্রথম তাহার কিঞ্চিৎমাত্র পূরণ হইল। সেই পূরণ প্রথম, সেই পূরণই শেষ।¶ তাহার পর আর কিছু হয় নাই। সন ১৮৬৯ সালের ৮ আইন দশ আইনের অনুলিপিমাত্র।**

১৮৫৯ সালের দশ আইনও যে প্রজাদিগের বিশেষ মঙ্গলকর, এমত আমরা বলি না। প্রজাদিগের যাহা ছিল, তাহা তাহারা আর পাইল না। তাহাদিগের উপর যে সকল অত্যাচার

* ১৭৯৩ সালের ১ আইনের ৮ ধারা।

† Revenue Letter to Bengal, 9th May, 1821, para 54.

‡ সন ১৭৯৩ সালের ১৮ আইনের ২ ধারা।

§ Revenue Letter, 9th May, 1821, para 54.

¶ যখন এই প্রবন্ধ লিখিত হয়, তখন নূতন Tenancy Act প্রচারিত হয় নাই।

** এই সকল তত্ত্ব যাঁহারা সবিস্তারে অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত বাবু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত “বঙ্গীয় প্রজা” (Bengal Ryot) নামক গ্রন্থ পাঠ করিবেন। আমরা এ প্রবন্ধের এ অংশের কতক কতক সেই গ্রন্থ হইতে সংকলিত করিয়াছি।

বিবিধ প্রবন্ধ—বঙ্গদেশের কৃষক

হইয়া থাকে, তাহা নিবারণের বিশেষ কোন উপায়, এই আইন বা অন্য কোন আইনের দ্বারা হয় নাই। কোরোক-লুটের বিধি সেই প্রকারই আছে। বেশীর ভাগ, প্রজার খাজানা বাড়াইবার বিশেষ সুপথ হইয়াছে। এ আইনের সাহায্যে যাহার হার বেশী করা যাইতে পারে না, বঙ্গদেশে এমত কৃষক অতি অল্পই আছে।

তথাপি এইটুকু মাত্র প্রজার পক্ষতা দেখিয়া প্রজাদেশী, স্বার্থপর কোন কোন জমীদার কতই কোলাহল করিয়াছিলেন! অদ্যাপি করিতেছেন!

আমরা দেখাইলাম যে, ব্রিটিশ রাজ্যকালে ভূমিসংক্রান্ত যে সকল আইন হইয়াছে, তাহাতে পদে পদে প্রজার অনিষ্ট হইয়াছে। প্রতি বারে দুর্বল প্রজার বল হরণ করিয়া আইনকারক বলবান্ জমীদারের বলবৃদ্ধি করিয়াছেন। তবে জমীদার প্রজাপীড়ন না করিবেন কেন?

ইচ্ছাপূর্বক ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা প্রজার অনিষ্ট করেন নাই। তাঁহারা প্রজার পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। দেওয়ানী পাইয়া অর্থাৎ এ পর্য্যন্ত কিসে সাধারণ প্রজার হিত হয়, ইহাই তাঁহাদিগের অভিপ্রায়, এবং ইহাই তাঁহাদিগের চেষ্টা। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহারা বিদেশী; এ দেশের অবস্থা সবিশেষ অবগত নহেন, সুতরাং পদে পদে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ভ্রমে পতিত হইয়া এই মহৎ অনিষ্টকর বিধি সকল প্রচারিত করিয়াছেন। কিন্তু ভ্রমবশতঃই হউক, আর যে কারণেই হউক, প্রজাপীড়ন হইলেই রাজার দোষ দিতে হয়।

কিন্তু ইহা অপেক্ষা আর একটি গুরুতর কথা আছে। ইংরাজের দোন্দু প্রতাপ—সে প্রতাপে সমগ্র আসিয়াখণ্ড সংকুচিত; তবে ক্ষুদ্রজীবী জমীদারের দৌরাণ্য নিবারণ হয় না কেন? বহুদূরবাসী আর্বিসনিয়ার রাজা জন কয়েক ইংরাজকে পীড়ন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার রাজ্য লোপ হইল। আর রাজপ্রতিনিধির অট্টালিকার ছায়াতলে লক্ষ লক্ষ প্রজার উপর পীড়ন হইতেছে, তাহার কোন প্রতীকার হয় না কেন? জমীদার প্রজা ধরিয়া আনিতেছেন, কয়েদ করিতেছেন, মারিয়া টাকা আদায় করিতেছেন, তাহার ফসল লুটতেছেন, ভূমি কাড়িয়া লইতেছেন, সর্বস্বান্ত করিতেছেন, তাহার প্রতীকার হয় না কেন? কেহ বলিবেন, তাহার জন্য রাজপুরুষেরা আইন করিয়াছেন, আদালত করিয়াছেন, তবে গবর্ণমেন্টের ঘৃণা কি? আমরাও সেই কথা জিজ্ঞাসা করি। আইন আছে—সে আইনে অপরাধী জমীদার দণ্ডনীয় হন না কেন? আদালত আছে—সে আদালতে দোষী জমীদার চিরজয়ী কেন? ইহার কি কোন উপায় হয় না? যে আইনে কেবল দুর্বলই দণ্ডিত হইল, যাহা বলবানের পক্ষে খাটিল না—সে আইন কিসে? যে আদালতের বল কেবল দুর্বলের উপর, বলবানের উপর নহে, সে আদালত আদালত কিসে? শাসনদক্ষ ইংরাজেরা কি ইহার কিছু সুবিধি করিতে পারেন না? যদি না পারেন, তবে কেন শাসনদক্ষতার গর্ভ করেন? যদি পারেন, তবে মুখ্য কর্তব্য সাধনে অবহেলা করেন কেন? আমরা এই দীন হীন ছয় কোটি বাঙ্গালী কৃষকের জন্য তাঁহাদের নিকট যুক্তকরে রোদন করিতেছি—তাঁহাদের মঙ্গল হউক!—ইংরাজরাজ্য অক্ষয় হউক!—তাঁহারা নিরুপায় কৃষকের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।

কেন যে আইন আদালতে কৃষকের উপকার নাই, তাহার একটি কারণ আমরা সংক্ষেপে নির্দেশ করিব।

প্রথমতঃ, মোকদ্দমা অতিশয় ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। কি প্রকার ব্যয়, তাহার উদাহরণ আমরা দ্বিতীয় সংখ্যায় দিয়াছি, পুনরুল্লেখের আবশ্যিক নাই। যাহা ব্যয়সাধ্য, তাহা দরিদ্র কৃষকদিগের আয়ত্ত নহে। সুতরাং তাহারা তদ্বারা সচরাচর উপকৃত হয় না; বরং তদ্বিপরীতই ঘটিয়া থাকে। জমীদার ধনী, আদালতের খেলা তিনি খেলিতে পারেন। দোষে হউক, বিনা দোষে হউক, তিনি ইচ্ছা করিলেই কৃষককে আদালতে উপস্থিত করেন। তথায় ধনবানেরই জয়, সুতরাং কৃষকের দুন্দুর্দশা ঘটে, অতএব আইন আদালত, কৃষককে পীড়িত করিবার, ধনবানের হস্তে আর একটি উপায় মাত্র।

দ্বিতীয়তঃ, আদালত প্রায় দূরস্থিত। যাহা দূরস্থ, তাহা কৃষকের পক্ষে উপকারী হইতে পারে না। কৃষক ঘর বাড়ী চাষ প্রভৃতি ছাড়িয়া দূরে গিয়া বাস করিয়া মোকদ্দমা চলাইতে পারে না। বায়ের কথা দূরে থাকুক, তাহাতে ইহাদের অনেক কার্য ক্ষতি হয়, এবং অনেক অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা। কৃষক গোমস্তার নামে নালিশ করিতে গেল, সেই অবসরে গোমস্তার বাধ্য লোকে তাহার ধান চুরি করিয়া লইয়া গেল, না হয় আর একজন কৃষক গোমস্তার

বাংলা রচনাবলী

নিকট হইতে পাড়া লইয়া তাহার জমীখানি দখল করিয়া লইল। তাঁহাদের আর্মানীদগের দেশের লোক, বিশেষ ইতর লোক অত্যন্ত আলস্যপরবশ। শীঘ্র নড়ে না, সহজে উঠে না, কোন কার্যেই তৎপরতা নাই। দূরে যাইতে চাহে না। কৃষক বরং জমীদারের অত্যাচার নীরবে সহ্য করিবে, তথাপি দূরে গিয়া তাহার প্রতীকার করিতে চাহে না। যাঁহারা বিচারকার্যে নিযুক্ত, তাঁহারা জানেন যে, তাঁহাদের বিচারালয়ের নিকটবর্তী স্থানেরই মোকদ্দমা অনেক; দূরের মোকদ্দমা প্রায় হয় না। অতএব বিচারক নিকটে থাকিলে যে অত্যাচারের শাসন হইত, দূরে থাকায় সে অত্যাচারের শাসন হয় না। ইহার আর একটি ফল এই হইয়া উঠিতেছে যে, অত্যাচারী গোমস্তারাই বিচারকের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে। যখন একজন কৃষক অপরের উপর দৌরাখ্য করে, তখন তাহার নালিশ জমীদারের গোমস্তার কাছে হয়। যখন গোমস্তা নিজে অত্যাচার করে, তাহার নালিশ হয় না। যে ব্যক্তি স্বয়ং পরপীড়ক, এবং চারি পয়সার লোভে সকল প্রকার অত্যাচার করিতে প্রস্তুত, তাহার হাতে বিচারকার্য থাকায় দেশের কি অনিষ্ট হইতেছে, তাহা বৃদ্ধিমান্বে বৃদ্ধিবেন।

তৃতীয়তঃ, বিলম্ব। সকল আদালতেই মোকদ্দমা নিষ্পন্ন হইতে বিলম্ব হয়। বিলম্বে যে প্রতীকার, সে প্রতীকারকে প্রতীকার বলিয়া বোধ হয় না। গোমস্তায় কৃষকের ধান উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে, কৃষক আদালতে ক্ষতিপূরণের জন্য নালিশ করিল। যদি বড় কপাল-জোরে সে ডিক্রী পাইল, তবে সে এক বৎসরে। আপীলে আর এক বৎসর। যদি আত্যন্তিক সৌভাগ্য-গুণে আপীলে ডিক্রী টিকিল, এবং ডিক্রীজারিতে টাকা আদায় হইল, তবে সে আর এক বৎসরে। বাদীর কুড়ি টাকার ধান ক্ষতি হইয়াছিল, ডিক্রীজারি করিয়া খরচ খরচা বাদে তিন বৎসর পরে পাঁচ টাকা আদায় হইল। এরূপ প্রতীকারের আশায় কোন কৃষক জমীদারের নামে নালিশ করিবে?

বিলম্বে বিচারকের দোষ নাই। আদালতের সংখ্যা অল্প—যেখানে তিন জন বিচারক হইলে ভাল হয়, সেখানে একজন বৈ নাই। সুতরাং মোকদ্দমা নিষ্পন্ন করিতে বিলম্ব ঘটিয়া যায়। আর প্রচলিত আইন অত্যন্ত জটিল। বিচারপ্রণালীতে অত্যন্ত লিপিবাহুল্যের এবং অত্যন্ত কার্যবাহুল্যের আবশ্যিকতা। আজ এ মোকদ্দমার প্রতিপক্ষের উকীলের জেরার বাহুল্যে একটি মোকদ্দমার একটি সাক্ষী মাত্র বিদায় হইল; সুতরাং আর পাঁচটি মোকদ্দমার কিছু হইল না, আর এক মাস বাদে তাহার দিন পড়িল। কাল নিষ্পন্নযোগ্য মোকদ্দমার একটি নিষ্পয়োজনীয় সাক্ষী অনুপস্থিত, তাহার উপর দস্তক করিতে হইল। সুতরাং মোকদ্দমা আর এক মাস পিছাইয়া গেল। এ সকল না করিলে বিচার আইনসঙ্গত হয় না। নিষ্পত্তি আপীলে টিকে না। বিচারে বিলম্ব হয়, তাহাও স্বীকার,—অবিচার হয়, তাহাও স্বীকার, তথাপি কলিকাতার তৈয়ারি আইন ঘৃণাক্ষরে লঙ্ঘন করা যাইতে পারে না। ইংরাজি আইনের মর্ম্ম এই।

আমরা যে সভ্য হইতেছি, দিন দিন যে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, ইহা তাহার একটি পরিচয়। আর্মানীদগের দেশে ভাল আইন ছিল না, বিলাত হইতে এখন ভাল আইন আসিয়াছে। জাহাজে আমদানি হইয়া, চাঁদপালের ঘাটে ঢোলাই হইয়া, কলিকাতার কলে গাঁটবন্দী হইয়া, দেশে দেশে কিছু চড়া দামে বিকাইতেছে। তাহাতে ওকালতি, হাকিমি, আমলাগিরি প্রভৃতি অনেকগুলি আধুনিক ব্যবসায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। ব্যাপারীরা আপন আপন পণ্যদ্রব্যের প্রশংসা করিতে করিতে অধীর হইতেছেন। গলাবাজার জোরে, আগে যাঁহাদের অন্ন হইত না, এখন তাঁহারা বড় লোক হইতেছেন। দেশের শ্রীবৃদ্ধির আর সীমা নাই, সর্বত্র আইনমত বিচার হইতেছে। আর কেহ বেআইনি করিয়া সুবিচার করিতে পারে না। তাহাতে দীন দুঃখী লোকের একটু কষ্ট, তাহারা আইনের গৌরব বৃদ্ধি না, সুবিচার চায়। সে কেবল তাহাদিগের মূর্খতাজনিত ভ্রম মাত্র।

মনে কর, গোমস্তা, কি অপার কেহ কোন দুঃখী প্রজার উপর কোন গুরুতর দৌরাখ্য করিল। গোমস্তা সেশ্যানের বিচারে অর্পিত হইল। সেশ্যানের বিচারে সাক্ষীদিগের সত্য কথায় প্রতিবাদীর অপরাধ প্রমাণ হইল। কিন্তু বিচার জুরির হাতে। জুরির মহাশয়েরা এ কাজে নূতন ব্রতী: প্রমাণ অপ্রমাণ কিছু বৃদ্ধি না। যখন সাক্ষীর জোবানবন্দী হইতেছিল, তখন তাঁহারা কেহ কড়ি গণিতেছিলেন, কেহ দোকানের দেনা পাওনা মনে মনে নিকাশ করিতেছিলেন, কেহ বা অল্প তন্দ্রাভিত্ত। উকীল যখন বক্তৃতা করিতেছিলেন, তখন তাঁহারা কিঞ্চিৎ ক্ষুধাতুর, গৃহে

বিবিধ প্রবন্ধ—বঙ্গদেশের কৃষক

গৃহিণী কিরূপ জলযোগের আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাই ভাবিতোছিলেন। জজ সাহেব যখন দুর্বোধ্য বাঙ্গালায় “চার্য্য” দিতোছিলেন, তখন তাঁহারা মনে মনে জজ সাহেবের দাড়ির পাকা চুলগুলিন গণিতোছিলেন। জজ সাহেব যে শেষে বলিলেন, “সন্দেহের ফল প্রতিবাদী পাইবে,” তাহাই কেবল কাণে গেল। জুরর মহাশয়দিগের সকলই সন্দেহ—কিছুই শুনেন নাই, কিছুই বুঝেন নাই; শুনিয়া বুঝিয়া একটা কিছু স্থির করা অভ্যাস নাই, হয় ত সে শক্তিও নাই, সুতরাং সন্দেহের ফল প্রতিবাদীকেই দিলেন। গোমস্তা মহাশয় খালাস হইয়া আবার কাছারিতে গিয়া জমকিয়া বসিলেন। ভয়ে বাদী সবংশে ফেরার হইল। যাহারা দোষীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়াছিল, গোমস্তা তাহাদের ভিটামার্ট লোপ করিলেন। আমরা বড় সম্মুগ্ধ হইলাম—কেন না, জুরর বিচার হইয়াছে—বিলাতি প্রধানসারে বিচার হইয়াছে—আমরা বড় সভ্য হইয়া উঠিয়াছি।

বর্তমান আইনের এইরূপ অর্থোক্তিকতা এবং জটিলতা অবিচারের চতুর্থ কারণ।

পঞ্চম কারণ, বিচারকবর্গের অযোগ্যতা। এদেশের প্রধানতম বিচারকেরা সকলেই ইংরাজ। ইংরাজেরা সচরাচর কার্য্যদক্ষ, সুশিক্ষিত, এবং সদনুষ্ঠাতা। কিন্তু তাহা হইলেও বিচারকার্য্যে তাঁহাদিগের তাদৃশ যোগ্যতা নাই। কেন না, তাঁহারা বিদেশী, এ দেশের অবস্থা তাদৃশ অবগত নহেন, এ দেশের লোকের চরিত্র বুঝেন না, তাহাদিগের সহিত সহৃদয়তা নাই, এবং অনেকে এ দেশের ভাষাও ভাল করিয়া বুঝেন না। সুতরাং সুবিচার করিতে পারেন না। বিচারকার্য্যের জন্য যে বিশেষ শিক্ষা আবশ্যিক, তাহা অনেকেরই হয় নাই।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, অধিকাংশ মোকদ্দমাই অধস্তন বিচারকের দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, এবং অধিকাংশ অধস্তন বিচারকই এ দেশীয়,—তবে উপরিস্থ জন কতক ইংরাজ বিচারকের দ্বারা অধিক বিচারহানি সম্ভবে না। ইহার উত্তর, প্রথমতঃ, সকল বাঙ্গালী বিচারকই বিচারকার্য্যের যোগ্য নহেন। বাঙ্গালী বিচারকের মধ্যে অনেকে মূর্খ, স্থূলবুদ্ধি, অশিক্ষিত, অথবা অসৎ। এ সম্প্রদায়ের বিচারক সৌভাগ্যক্রমে দিন দিন অল্পসংখ্যক হইতেছেন। তথাপি বিশেষ সুযোগ্য বাঙ্গালীরা বিচারক শ্রেণীভুক্ত নহেন। ইহার কারণ, এ দেশীয় বিচারকের উন্নতি নাই, পদবৃদ্ধি নাই; যাহারা ওকালতি করিয়া অধিক উপার্জনে সক্ষম, সে সকল ক্ষমতালী লোক বিচারকের পদের প্রার্থী হইয়েন না। সুতরাং সচরাচর মধ্যম শ্রেণীর লোক এবং অধম শ্রেণীর লোকই ইহাতে প্রবৃত্ত হইয়েন। দ্বিতীয়তঃ, অধস্তন বিচারকে সুবিচার করিলে কি হইবে? আপীলে চড়াস্ত বিচার ইংরাজের হাতে। নীচে সুবিচার হইলেও উপরে অবিচার হয়, এবং সেই অবিচারই চড়াস্ত। অনেক বিচারক সুবিচার করিতে পারিলেও আপীলের ভয়ে করেন না; যাহা আপীলে থাকিবে, তাহাই করেন। এ বিষয়ে হাইকোর্ট্ অনেক সময় বিশেষ অনিষ্টকর। তাঁহারা অধস্তন বিচারকবর্গকে বিচারপদ্ধতি দেখাইয়া দেন, আইন বুঝাইয়া দেন;—বলেন, এইরূপে বিচার করিও, এই আইনের অর্থ এইরূপ বুঝিও। অনেক সময়ে এই সকল বিধি ভ্রমাত্মক—কখন কখন হাস্যাস্পদও হইয়া উঠে। কিন্তু অধস্তন বিচারকদিগকে তদনুবর্তী হইয়া চলিতে হয়। হাইকোর্টের জজদিগের অপেক্ষা ভাল বুঝেন, এমন সুবর্ডিনেট্ জজ্, ম্যুসেসফ্ ও ডেপুটি মার্জিস্ট্রেট্ অনেক আছেন; কিন্তু তাঁহাদিগকে অপেক্ষাকৃত অবিজ্ঞদিগের নির্দেশবর্তী হইয়া চলিতে হয়।

এই প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ হইলে পর “সমাজদর্পণ” নামে একখানি অভিনব সংবাদপত্র দৃষ্টি করিলাম। তাহাতে “বঙ্গদর্শন ও জমীদারগণ” এই শিরোনামে একটি প্রস্তাব আছে, আমাদের এই প্রবন্ধের পূর্বপরিচ্ছেদের উপলক্ষে উহা লিখিত হইয়াছে। তাহা হইতে দুই একটি কথা উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করি; কেন না, লেখক যেরূপ বিবেচনা করিয়াছেন, অনেকেই সেইরূপ বিবেচনা করেন বা করিতে পারেন। তিনি বলেন,—

“একেই ত দশশালা বন্দোবস্তের চতুর্দিকে গর্ত খনন করা হইয়াছে, তাহাতে বঙ্গদর্শনের মত দুই এক জন সম্ভ্রান্ত বিচক্ষণ বাঙ্গালীর অনুমোদন বুঝিলে কি আর রক্ষা আছে?”

আমরা পরিষ্কার করিয়া বলিতে পারি যে, দশশালা বন্দোবস্তের ধ্বংস আমাদের কামনা নহে বা তাহার অনুমোদনও করি না। ১৭৯৩ সালে যে ভ্রম ঘটিয়াছিল, এক্ষণে তাহার সংশোধন সম্ভবে না। সেই ভ্রান্তির উপরে আধুনিক বঙ্গসমাজ নির্মিত হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ধ্বংসে বঙ্গসমাজের ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। আমরা সামাজিক

বাংকম রচনাবলী

বিপ্লবের অনুমোদক নহি। বিশেষ যে বন্দোবস্ত ইংরাজেরা সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া চিরস্থায়ী করিয়াছেন, তাহার ধ্বংস করিয়া তাঁহারা এই ভারতমণ্ডলে মিথ্যাবাদী বলিয়া পরিচিত হইলেন, প্রজাবর্গের চিরকালের অবিশ্বাসভাজন হইলেন, এমত কুপরামর্শ আমরা ইংরাজদিগকে দিই না। যে দিন ইংরাজের অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইব, সমাজের অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইব, সেই দিন সে পরামর্শ দিব। এবং ইংরাজেরাও এমন নিষেধ নহেন যে, এমত গর্হিত এবং অনিষ্টজনক কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। আমরা কেবল ইহাই চাই যে, সেই বন্দোবস্তের ফলে যে সকল অনিষ্ট ঘটিতেছে, এখন সুনিয়ম করিলে তাহার যত দূর প্রতীকার হইতে পারে, তাহাই হউক। কথিত লেখক লিখিয়াছেন যে, “যাহাতে দশশালা বন্দোবস্তের কোনরূপ ব্যাঘাত না হইয়া জমীদার ও প্রজা, উভয়েরই অনুকূলে এরূপ সুব্যবস্থা সকল স্থাপিত হয় যে, তদ্বারা উভয়েরই উন্নতি হইয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে, তদ্বিষয়ে পরামর্শ দেওয়াই কত্তব্য।” আমরা তাহাই চাই।

ইহাও বক্তব্য যে, আমরা কর্ণওয়ালিসের বন্দোবস্তকে ভ্রমাত্মক, অন্যায, এবং অনিষ্টকারক বলিয়াছি বটে, কিন্তু ইংরাজেরা যে, ভূমিতে স্বত্ব ত্যাগ করিয়া এ দেশীয় লোকদিগকে তাহাতে স্বত্ববান করিয়াছেন, এবং করবৃদ্ধির অধিকার ত্যাগ করিয়াছেন, ইহা দৃশ্য বিবেচনা করি না। তাহা ভালই করিয়াছেন। এবং ইহা সুবিবেচনার কাজ, ন্যাযসঙ্গত, এবং সমাজের মঙ্গলজনক। আমরা বলি যে, এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমীদারের সহিত না হইয়া প্রজার সঙ্গে হওয়াই উচিত ছিল। তাহা হইলেই নির্দোষ হইত। তাহা না হওয়াতেই ভ্রমাত্মক, অন্যায এবং অনিষ্টজনক হইয়াছে।

লেখক আরও বলেন;—

“আমরা দেখিতেছি, বাঙ্গালা দেশ নিতান্ত নির্ধন হইয়া পড়িয়াছে। ** সকলেই বলে, আমাদের দেশের টাকা আমাদের দেশে থাকিতেছে না, বিদেশীয় বণিক্ ও রাজপুরুষেরা প্রায়ই লইয়া যাইতেছেন। যদি মহাত্মা কর্ণওয়ালিস্ জমীদারদিগের বর্তমান শ্রীর উপায় না করিয়া যাইতেন, তবে দেশ এত দিন আরও দরিদ্র হইয়া পড়িত। দেশে যাহা কিছু অর্থ সম্পত্তি আছে, তাহা এই কয়েক জন জমীদারের ঘরেই দেখিতে পাওয়া যায়।”

সাধারণতঃ অনেকেই এই কথা বলেন, সুতরাং ইহার মধ্যে আমাদের বিবেচনায় যে কয়েকটি ভ্রম আছে, তাহা দেখাইতে বাধ্য হইলাম।

১। ইউরোপীয় কোন রাজ্যের সহিত তুলনা করিতে গেলে, বাঙ্গালা দেশ নির্ধন বটে, কিন্তু পূর্বাপেক্ষা বাঙ্গালা যে এক্ষণে নির্ধন, এরূপ বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। বর্তমান কাল অপেক্ষা ইতিপূর্বেকালে যে বাঙ্গালা দেশে অধিক ধন ছিল, তাহার কিছু মাত্র প্রমাণ নাই। বরং এক্ষণে যে পূর্বাপেক্ষা দেশের ধন বৃদ্ধি হইতেছে, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। “বঙ্গদেশের কৃষকের” প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা কোন কোন প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছি। তদতিরিক্ত এক্ষণে বলিবার আবশ্যিক নাই।

২। বিদেশী বণিক্ ও রাজপুরুষে দেশের টাকা লইয়া যাইতেছে বলিয়া যে দেশে টাকা থাকিতেছে না, এই প্রসঙ্গের মধ্যে প্রথমে বিদেশীয় বণিক্দিগের বিষয় আলোচনা করা যাউক।

যাঁহারা এ কথা বলেন, তাঁহাদের সচরাচর তাৎপর্য বোধ হয়, এই যে, বণিকেরা এই দেশে আসিয়া অর্থ উপার্জন করিতেছেন, সুতরাং এই দেশের টাকা লইতেছেন বৈ কি? যে টাকাটা তাঁহাদের লাভ, সে টাকা, এ দেশের টাকা। বোধ হয়, ইহাই তাঁহাদের বলিবার উদ্দেশ্য।

বিদেশীয় বণিকেরা যে লাভ করেন, তাহা দুই প্রকারে; এক আমদানিতে, আর এক রপ্তানিতে। এদেশের দ্রব্য লইয়া গিয়া দেশান্তরে বিক্রয় করেন, তাহাতে তাঁহাদের কিছু মুনোফা থাকে। দেশান্তরের দ্রব্য আনিয়া এ দেশে বিক্রয় করেন, তাহাতেও তাঁহাদের কিছু মুনোফা থাকে। তদ্বিষয়ে অন্য কোন প্রকার লাভ নাই।

এ দেশের সামগ্রী লইয়া গিয়া বিদেশে বিক্রয় করিয়া যে মুনোফা করেন, সহজেই দেখা যাইতেছে যে, সে মুনোফা এ দেশের লোকের নিকট হইতে লয়েন না। যে দেশে তাহা বিক্রয় হয়, সেই দেশের টাকা হইতে তাহার মুনোফা পান। এখানে তিন টাকা মণ চাউল কিনিয়া, বিলাতে পাঁচ টাকা মণ বিক্রয় করিলেন; যে দুই টাকা মুনোফা করিলেন, তাহা এ দেশের লোককে দিতে হইল না; বিলাতের লোকে দিল। বরং এ দেশের লোকে আড়াই টাকা পড়তার চাউল

তাঁহাদের কাছে তিন টাকায় বিক্রয় করিয়া কিছু মুনুফা করিল। অতএব বিদেশীয় বণিকেরা এদেশীয় সামগ্রী বিদেশে বিক্রয় করিয়া এ দেশের টাকা ঘরে লইয়া যাইতে পারিলেন না। বরং কিছু দিয়া গেলেন।

তবে ইহাই স্থির যে, তাঁহারা যদি কিছু এ দেশের টাকা ঘরে লইয়া যান, তবে সে দেশান্তরের জিনিস এ দেশে বিক্রয় করিয়া তাহার মুনুফায়। বিলাতে চারি টাকার থান কিনিয়া এ দেশে ছয় টাকায় বিক্রয় করিলেন; যে দুই টাকা মুনুফা হইল, তাহা এ দেশের লোকে দিল। সুতরাং আপাততঃ বোধ হয় বটে যে, এ দেশের টাকাটা তাঁহাদের হাত দিয়া বিদেশে গেল। দেশের টাকা কমিল। এই ভ্রমটি কেবল এ দেশের লোকের নহে। ইউরোপের সকল দেশেই ইহাতে অনেক দিন পর্যন্ত লোকের মন আচ্ছন্ন ছিল, এবং তথায় কৃতবিদ্য ব্যক্তি ভিন্ন সাধারণ লোকের মন হইতে ইহা অদ্যাপি দূর হয় নাই। ইহার যথার্থ তত্ত্ব এত দূর হইবে যে, অল্পকাল পূর্বে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরাও তাহা বুঝিতে পারিতেন না। রাজগণ ও রাজমন্ত্রীগণ এই ভ্রমে পতিত হইয়া, বিদেশের সামগ্রী স্বদেশে যাহাতে না আসিতে পারে, তাহার উপায় অনুসন্ধান করিতেন। এবং সেই প্রবৃত্তির বশে বিদেশ হইতে আনীত সামগ্রীর উপর গুরুতর শুল্ক বাসাইতেন। এই মহাপ্রমাত্মক সমাজনীতিসূত্র ইউরোপে (Protection) নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। তদুচ্ছেদপূর্বক আধুনিক অনর্গল বাণিজ্য-প্রণালী (Free Trade) সংস্থাপন করিয়া রাইট্ ও কব্‌ডেন চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। ফ্রান্সে তাহা বিশেষরূপে বন্ধমূল করিয়া, তৃতীয় নাপোলিয়নও প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছেন। তথাপি এখনও ইউরোপে অনেকের এ ভ্রম দূর হয় নাই। আমাদের দেশের সাধারণ লোকের যে সে ভ্রম থাকিবে, তাহার আশ্চর্য কি? Protection হইতে ইউরোপে কি অনিষ্ট ঘটিয়াছিল, তাহা যিনি জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বকলের গ্রন্থ পাঠ করিবেন। যিনি তাহার অসত্যতা বুঝিতে চাহেন, তিনি মিল্ পাঠ করিবেন। ঈদৃশ দূর হইতে তত্ত্ব বুঝাইবার স্থান, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের শেষভাগে হইতে পারে না। আমরা কেবল গোটাঁকত দেশী কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইব।

আমরা ছয় টাকা দিয়া বিলাতি থান কিনিলাম। টাকা ছয়টি কি অমনি দিলাম? অমনি দিলাম না,—তাহার পরিবর্তে একটি সামগ্রী পাইলাম। সেই সামগ্রীটি যদি আমরা উচিত মূল্যের উপর একটি পয়সা বেশী দাম দিয়া লইয়া থাকি, তবে সেই পয়সাটি আমাদের ক্ষতি। কিন্তু যদি একটি পয়সাও বেশী না দিয়া থাকি, তবে আমাদের কোন ক্ষতি নাই। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন, ছয় টাকার থানটি কিনিয়া একটি পয়সাও বেশী মূল্য দিয়াছি কি না। দেখা যাইতেছে যে, ছয় টাকার এক পয়সা কমে সে থান আমরা কোথাও পাই না, পাইলে তাহা সাধারণ লোকে ছয় টাকায় কেন কিনিবে? যদি ছয় টাকার এক পয়সা কমে ঐ থান কোথাও পাই না, তবে ঐ মূল্য অনুচিত নহে। যে ছয় টাকায় থান কিনিল, সে উচিত মূল্যেই কিনিল। যদি উচিত মূল্যে সামগ্রীটি কেনা হইল, তবে ক্রেতাদিগের ক্ষতি কি? কি প্রকারে তাহাদিগের টাকা অপহরণ করিয়া বিদেশীয় বণিক বিদেশে পলায়ন করিল? তাহারা দুই টাকা মুনুফা করিল বটে, কিন্তু ক্রেতাদিগের কোন ক্ষতি করিয়া লয় নাই; কেন না, উচিত মূল্য লইয়াছে। যদি কাহারও ক্ষতি না করিয়া মুনুফা করিয়া থাকে, তবে তাহাতে আমাদের অনিষ্ট কি? যেখানে কাহারও ক্ষতি নাই, সেখানে দেশের অনিষ্ট কি?

আপত্তির মীমাংসা এখনও হয় নাই। আপত্তিকারকেরা বলিবেন যে, ঐ ছয়টি টাকায় দেশী তাঁতির কাছে থান কিনিলে টাকা ছয়টা দেশে থাকিত। ভালই। কিন্তু দেশী তাঁতির কাছে থান কই? সে যদি থান বুঝিতে পারিত, ঐ মূল্যে ঐরূপ থান দিতে পারিত, তবে আমরা তাহারই কাছে থান কিনিতাম—বিদেশীর কাছে কিনিতাম না। কেন না, বিদেশীও আমাদের কাছে থান লইয়া বেঁচিতে আসিত না। কারণ, দেশীয় বিক্রেতা যেখানে সমান দরে বেঁচিতেছে, সেখানে তাহার লভ্য হইত না। এ কথাটি সমাজনীতির আর একটি দুর্ভেদ্য নিয়মের উপর নির্ভর করে, তাহা এক্ষণে থাক। স্থূল কথা, ঐ ছয় টাকা যে দেশী তাঁতি পাইল না, তাহাতে কাহারও ক্ষতি নাই। ক্রেতাদিগের যে ক্ষতি নাই, তাহা দেখাইয়াছি। দেশী তাঁতিরও ক্ষতি নাই। সে থান বুঝে না, কিন্তু অন্য কাপড় বুঝিতেছে। যে সময়ে ঐ ছয় টাকার জন্য থান বুঝিত, সে সময়ে সে অন্য কাপড় বুঝিতেছে। সে কাপড় সকলই বিক্রয় হইতেছে। অতএব তাহার যে উপার্জন হইবার, তাহা হইতেছে। থান বুঝিয়া সে আর অধিক উপার্জন করিতে

বাণিক্য রচনাবলী

পারিত না; ধান বুনতে গেলে ততক্ষণ অন্য কাপড় বুন্য স্থগিত থাকিত। যেমন খানের মূল্য ছয় টাকা পাইত, তেমনি ছয় টাকা মূল্যের অন্য কাপড় বুন্য হইত না; সুতরাং লাভে লোকসানে পদ্বিষয়া যাইত। অতএব তাঁতির তাহাতে কোন ক্ষতি নাই।

তাকিঁক বলিবেন, তাঁতির ক্ষতি আছে। এই খানের আমদানির জন্য তাঁতির ব্যবসায় মারা গেল। তাঁতি ধান বুন্য না, ধুঁতি বুন্য। ধুঁতির অপেক্ষা ধান সস্তা, সুতরাং লোকে ধান পরে, ধুঁতি আর পরে না। এজন্য অনেক তাঁতির ব্যবসায় লোপ হইয়াছে।

উত্তর। তাহার তাঁতবুন্য ব্যবসায় লোপ পাইয়াছে বটে, কিন্তু সে অন্য ব্যবসা করুক না কেন? অন্য ব্যবসায়ের পথ রহিত হয় নাই। তাঁত বুনিয়া আর খাইতে পায় না, কিন্তু ধান বুনিয়া খাইবার কোন বাধা নাই। সকল ব্যবসায়ের পরিণাম সমান লাভ, ইহা সমাজতত্ত্ববেত্তারা প্রমাণ করিয়াছেন। যদি তাঁত বুনিয়া মাসে পাঁচ টাকা লাভ হইত, তবে সে ধান বুনিয়া সেই পাঁচ টাকা লাভ করিবে। খানে বা ধুঁতিতে সে ছয় টাকা পাইত, ধানে সে সেই ছয় টাকা পাইবে। তবে তাঁতির ক্ষতি হইল কৈ?

ইহাতেও এক তর্ক উঠিতে পারে। তুমি বলিতেছ, তাঁত বুনিয়া খাইতে না পাইলেই ধান বুনিয়া খাইবে, কিন্তু ধান বুনবার অনেক লোক আছে। আরও লোক সে ব্যবসায়ে গেলে ঐ ব্যবসায়ের লভ্য কমিয়া যাইবে; কেন না, অনেক লোক গেলে অনেক ধান হইবে, সুতরাং ধান সস্তা হইবে। যদি ধান্যকারক কৃষকদিগের লাভ কমিল, তবে দেশের টাকা কমিল বই কি?

উত্তর। বাণিজ্য বিনিময় মাত্র। এক পক্ষে বাণিজ্য হয় না। যেমন আমরা বিলাতের কতক সামগ্রী লই, তেমনি বিলাতের লোকে আমাদের দেশের কতক সামগ্রী লয়। যেমন আমরা কতকগুলি বিলাতি সামগ্রী লওয়াতে, আমাদের দেশে প্রস্তুত সেই সেই সামগ্রীর প্রয়োজন কমে, সেইরূপ বিলাতীয়েরা আমাদের দেশের কতকগুলি সামগ্রী লওয়াতে আমাদের দেশের সেই সেই সামগ্রীর প্রয়োজন বাড়ে। যেমন ধুঁতির প্রয়োজন কমিতেছে, তেমনি চাউলের প্রয়োজন বাড়িতেছে। অতএব যেমন কতকগুলি তাঁতির ব্যবসায়হানি হইতেছে, তেমনি কৃষি ব্যবসায় বাড়িতেছে, দেশী লোকের চাষ করিবার আবশ্যিক হইতেছে। অতএব চাষীর সংখ্যা বাড়িলে তাহাদের লাভ কমিবে না।

অতএব বাণিজ্য হেতু তাহাদের পূর্ষ্বব্যবসায়ের হানি হয়, নতুন ব্যবসায়াবলম্বনে তাহাদের ক্ষতি পূরণ হয়। তাহা হইলে বিলাতি ধান খরিদে তাঁতির ক্ষতি নাই। তাঁতিরও ক্ষতি নাই, ক্রেতাদিগেরও ক্ষতি নাই। তবে কাহার ক্ষতি? কাহারও নহে। যদি বণিক্ খান বোঁচিয়া যে লভ্য করিল, তাহাতে এ দেশীয় কাহারও অর্থক্ষতি হইল না, তবে তাহারা এ দেশের অর্থ-ভাণ্ডার লুঠ করিল কিসে? তাহার লভ্যের জন্য এ দেশের অর্থ কমিতেছে কিসে?

আমরা তাঁতির উদাহরণের সাহায্যে বক্তব্য সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু সে উদাহরণে একটি দোষ ঘটে। তাঁতির ব্যবসায় লোপ হইতেছে, তথাপি অনেক তাঁতি অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতেছে না। আমাদের দেশের লোক জাতীয় ব্যবসায় ছাড়িয়া সহজে অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতে চাহে না। ইহা তাঁতিদের দুর্ভাগ্য বটে, কিন্তু তাহাতে দেশের ধনক্ষতি নাই; কেন না, খানের পরিবর্তে যে চাউল যায়, তদুৎপাদন জন্য যে কৃষিজাত আয়ের বৃদ্ধি, তাহা হইবেই হইবে। তবে তাঁতি সেই ধন না পাইয়া, অন্য লোকে পাইবে। তাঁতি খাইতে পায় না বলিয়া দেশের ধন কমিতেছে না।

অনেকের এইরূপ বোধ আছে যে, বিদেশীয় বণিকেরা এ দেশে অর্থ সঞ্চয় করিয়া নগদ টাকা বস্তাবন্দী করিয়া জাহাজে তুলিয়া পলায়ন করেন। এরূপ যাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহাদের প্রতি বক্তব্য,—

প্রথমতঃ, নগদ টাকা লইয়া গেলেই দেশের অর্থহানি হইল না। নগদ টাকাই ধন নহে। যত প্রকার সম্পত্তি আছে, সকলই ধন। নগদ টাকা এক প্রকার ধন মাত্র। তাহার বিনিময়ে আমরা যদি অন্য প্রকার ধন পাই, তবে নগদ টাকা যাওয়ায় নির্ধন হই না।

নগদ টাকাই যে ধন নহে, এ কথা বুঝান কঠিন নহে। একজনের এক শত টাকা নগদ আছে, সে সেই এক শত টাকার ধান কিনিয়া গোলা-জাত করিল। তাহার আর নগদ টাকা নাই, কিন্তু এক শত টাকার ধান গোলায় আছে। সে কি পূর্ষ্বাপেক্ষা গরিব হইল?

বিবিধ প্রবন্ধ—বঙ্গদেশের কৃষক

দ্বিতীয়তঃ, বাস্তবিক বিদেশীয় বাণিকেরা এ দেশ হইতে নগদ টাকা জাহাজে তুলিয়া লইয়া যান না। বাণিজ্যের মূল্য হ্রাসিত হইতে চলে। সঞ্চিত অর্থ দলিলে থাকে। অতি অল্পমাত্র নগদ টাকা বিলাতে যায়।

তৃতীয়তঃ, যদি নগদ টাকা গেলেই ধনহানি হইত, তাহা হইলে বিদেশীয় বাণিজ্যে আমাদিগের ধনহানি নাই, বরং বৃদ্ধি হইতেছে। কেন না, যে পরিমাণে নগদ টাকা বা রূপা আমাদিগের দেশ হইতে অন্য দেশে যায়, তাহার অনেক গুণ বেশী রূপা অন্য দেশ হইতে আমাদের দেশে আসিতেছে, এবং সেই রূপায় নগদ টাকা হইতেছে। নগদ টাকাই যদি ধন হইত, তবে আমরা অন্য দেশকে নিধন করিয়া নিজের ধন বৃদ্ধি করিতোঁছি, নিজে নিধন হইতোঁছি না।

এ সকল তত্ত্ব যাঁহারা বুঝিতে যত্ন করিবেন, তাঁহারা দেখিবেন যে, কি আমদানিতে, কি রপ্তানিতে, বিদেশীয় বাণিকেরা আমাদের টাকা লইয়া যাইতেছেন না, এবং তন্নিবন্ধন আমাদিগের দেশের টাকা কমিতেছে না। বরং বিদেশীয় বাণিজ্য কারণ আমাদিগের দেশের ধন বৃদ্ধি হইতেছে। যাঁহারা মোটামুটি ভিন্ন বুঝিবেন না, তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখিবেন, বিদেশ হইতে কত অর্থ আসিয়া এ দেশে ব্যয় হইতেছে। যে বিপুল রেল্‌ওয়েগুলি প্রস্তুত হইয়াছে, সে অর্থ কাহার?

বিদেশীয় বাণিকদিগের সম্বন্ধে শেষে যাহা বলিয়াছি, রাজপুরুষদিগের সম্বন্ধেও তাহা কিছু কিছু বক্তে। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার্য যে, রাজকর্মচারীদিগের জন্য এ দেশের কিছু ধন বিলাতে যায়, এবং তাহার বিনিময়ে আমরা কোন প্রকার ধন পাই না। কিন্তু সে সামান্য মাত্র।* বাণিজ্য জন্য এ দেশে যে ধন বৃদ্ধি হইতেছে, এবং প্রথম পরিচ্ছেদের পরিচয় মত কৃষি জন্য যে ধন বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে সে ক্ষতি পূরণ হইয়া আরও অনেক ফাজিল থাকিতেছে। অতএব আমাদের ধন বৎসর বৎসর বাড়িতেছে, কমিতেছে না।

৩। লেখক বলিতেছেন, “যদি মহাত্মা কর্ণওয়ালিস্ জমীদারদিগের বর্তমান শ্রীর উপায় না করিয়া যাইতেন, তবে দেশ এত দিন আরও দরিদ্র হইয়া পড়িত। দেশে যাহা কিছু অর্থ সম্পত্তি আছে, তাহা এই কয়েকজন জমীদারের ঘরেই দেখিতে পাওয়া যায়।”

এ কথাও সকলে বলেন, এ ভ্রমও সাধারণের। আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই যে, জমীদারী বন্দোবস্তে যদি দেশে ধন আছে—তবে প্রজাওয়ারি বন্দোবস্তে ধন থাকিত না কেন? যে ধন এখন জমীদারদিগের হাতে আছে, সে ধন তখন দেশে থাকিত না ত কোথায় যাইত?

জমীদারের ঘরে ধন আছে, তাহার একমাত্র কারণ যে, তাঁহারা ভূমির উৎপন্ন ভোগ করেন। প্রজাওয়ারি বন্দোবস্ত হইলে, প্রজারা সেই উৎপন্ন ভোগ করিত, সুতরাং সেই ধনটা তাহাদের হাতে থাকিত। সে বিষয়ে দেশের কোন ক্ষতি হইত না। কেবল দুই চারি ঘরে তাহা রাশীকৃত না হইয়া লক্ষ লক্ষ প্রজার ঘরে ছড়াইয়া পড়িত। সেইটাই এই ভ্রান্ত বিবেচকদিগের আশঙ্কার বিষয়। ধন দুই এক জায়গায় কাঁড়ি বাঁধিলে তাঁহারা ধন আছে বিবেচনা করেন; কাঁড়ি না দেখিতে পাইলে তাঁহারা ধন আছে বিবেচনা করেন না। লক্ষ লক্ষ টাকা এক জায়গায় গাদা করিলে অনেক দেখায়; কিন্তু আধ ফ্রোশ অন্তর একটি একটি ছড়াইলে টাকা দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু উভয় অবস্থাতেই লক্ষ টাকার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। এখন বিবেচনা করা কৰ্তব্য, ধনের কোন অবস্থা দেশের পক্ষে ভাল, দুই এক স্থানে কাঁড়ি ভাল, না ঘরে ঘরে ছড়ান ভাল? পূর্বেপরিচিতির বলিয়াছেন যে, ধন গোময়ের মত, এক স্থানে অধিক জমা হইলে দুর্গন্ধ এবং অনিষ্টকারক হয়, মাঠময় ছড়াইলে উর্বরতাজনক, সুতরাং মঙ্গলকারক হয়। সমাজ-তত্ত্ববিদেরাও এ তত্ত্বের আলোচনা করিয়া সেইরূপই স্থির করিয়াছেন। এবং তাঁহাদের অনুসন্ধানানুসারে ধনের সাধারণতাই সমাজোন্নতির লক্ষণ বলিয়া স্থির হইয়াছে। ইহাই ন্যায়সঙ্গত। পাঁচ সাত জন টাকার গাদায় গড়াগড়ি দিবে, আর ছয় কোটি লোক অন্নাভাবে মারা যাইবে, ইহা অপেক্ষা অন্যায় আর কিছু কি সংসারে আছে? সেই জন্যই কর্ণওয়ালিসের বন্দোবস্ত অতিশয় দুষ্য। প্রজাওয়ারি বন্দোবস্ত হইলে, এই দুই চারি জন অতিধনবান্ ব্যক্তির পরিবর্তে আমরা ছয় কোটি সুখী প্রজা দেখিতাম। দেশশুদ্ধ অন্নের কাঙ্গাল, আর পাঁচ সাত জন টাকা খরচ করিয়া ফুরাইতে পারে না, সে ভাল, না—সকলেই সুখ স্বচ্ছন্দে আছে, কাহারও

এই কথাটাই বড় বেশী ভুল। এ সকল বিচারে ভুল আছে, গোড়ায় স্বীকার করিয়াছি।

বাংলা রচনাবলী

নিঃপ্রয়োজনীয় ধন নাই, সে ভাল? দ্বিতীয় অবস্থা যে প্রথমোক্ত অবস্থা হইতে শতগুণে ভাল, তাহা বুদ্ধিমানের অস্বীকার করিবেন না। প্রথমোক্ত অবস্থায় কাহারও মঙ্গল নাই। যিনি টাকার গাদায় গড়াগড়ি দেন, এ দেশে প্রায় তাঁহার গর্দভজন্ম ঘটিয়া উঠে। আর যাহারা নিতান্ত অল্পবস্ত্রের কাঙ্গাল, তাহাদের কোন শক্তি হয় না। কেহ অধিক বড় মানুষ না হইয়া, জনসাধারণের স্বচ্ছন্দাবস্থা হইলে সকলেই মনুষ্যপ্রকৃত হইত। দেশের উন্নতির সীমা থাকিত না। এখন যে জন পাঁচ ছয় বাবুতে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশ্যনের ঘরে বসিয়া মৃদু মৃদু কথা কহেন, তৎপরিবর্তে তখন এই ছয় কোটি প্রজার সমুদ্রগর্জনগন্তীর মহানিনাদ শূন্য হইত।

আমরা দেখাইলাম যে, যাঁহারা বিবেচনা করেন যে, জমীদার দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় বা উপকারী, তাঁহাদের তদ্রূপ বিশ্বাসের কোন কারণ নাই।

বহুবিবাহ *

[স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারা প্রবর্তিত বহুবিবাহবিষয়ক আন্দোলনের সময়ে বঙ্গদর্শনে এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়প্রণীত বহুবিবাহ সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় পুস্তকের কিছুর তীর সমালোচনায় আমি কণ্ঠব্যানুরোধে বাধ্য হইয়াছিলাম। তাহাতে তিনি কিছু বিরক্তও হইয়াছিলেন। তাই আমি এ প্রবন্ধ আর পুনর্মুদ্রিত করি নাই। এই আন্দোলন ভ্রান্তিজনিত, ইহাই প্রতিপন্ন করা আমার উদ্দেশ্য ছিল, সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল। অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবদ্দশায় ইহা পুনর্মুদ্রিত করিয়া দ্বিতীয় বার তাঁহার বিরক্তি উৎপাদন করিতে আমি ইচ্ছা করি নাই। এক্ষণে তিনি অনুরক্তি বিরক্তির অতীত। তথাপি দেশস্থ সকল লোকেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে, এবং আমিও তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করি, এজন্য ইহা এক্ষণে পুনর্মুদ্রিত করার উচিত্য বিষয়ে অনেক বিচার করিয়াছি। বিচার করিয়া যে অংশে সেই তীর সমালোচনা ছিল, তাহা উঠাইয়া দিয়াছি। কোন না কোন দিন কথাটা উঠিবে, দোষ তাঁহার, না আমার। সুবিচার জন্য প্রবন্ধটির প্রথমংশ পুনর্মুদ্রিত করিলাম। ইচ্ছা ছিল যে, এ সময়ে উহা পুনর্মুদ্রিত করিব না, কিন্তু তাহা না করিলে আমার জীবদ্দশায় উহা আর পুনর্মুদ্রিত হইবে কি না সন্দেহ। উহা বিলুপ্ত করাও অবৈধ; কেন না, ভাল হউক, মন্দ হউক, উহা আমাদের দেশে আধুনিক সমাজসংস্কারের ইতিহাসের অংশ হইয়া পড়িয়াছে—উহার দ্বারাই বহুবিবাহবিষয়ক আন্দোলন নিষ্পত্তি পাইয়াছে, এইরূপ প্রসিদ্ধি। আর এখনও Malabari সম্প্রদায় প্রবল—তাঁহারা না পারেন, এমন কাজ নাই।]

প্রায় দুই বৎসর হইল, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রচার করেন। তদন্তরে শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি, এবং অন্যান্য কয়জন পণ্ডিত যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিতে যত্ন পাইয়াছিলেন। প্রত্যুত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় দ্বিতীয় পুস্তক প্রচার করিয়াছেন। ইহার বিচার্য বিষয় এই যে, যদৃচ্ছাক্রমে বহুবিবাহ হিন্দুশাস্ত্রসম্মত কি না। আমরা প্রথমেই বলিতে বাধ্য হইলাম যে, আমরা ধর্মশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অজ্ঞ; সুতরাং এ বিচারে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিবাদীদের মত খণ্ডন করিয়া জয়ী হইয়াছেন কি না, তাহা আমরা জানি না। এবং সে বিষয়ে কোন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে অক্ষম। তবে এ বিষয়ে অশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরও কিছু বক্তব্য থাকিতে পারে। আমরা দিগের যাহা বক্তব্য, তাহা অতি সংক্ষেপে বলিব।

বহুবিবাহ যে সমাজের অনিষ্টকারক, সকলের বর্জনীয়, এবং স্বাভাবিক নীতিবিরুদ্ধ, তাহা বোধ হয় এ দেশের জনসাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। সুশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত, এ দেশে এমত লোক বোধ হয় অল্পই আছে, যে বলিবে, “বহুবিবাহ অতি সুপ্রথা, ইহা ত্যাজ্য নহে।” যাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তকের প্রতিবাদ করিয়াছেন, বোধ হয়, তাঁহাদেরও এই মাত্র উদ্দেশ্য যে, তাঁহারা আপন আপন জ্ঞানমত বহুবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করেন। তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থ আমরা সর্বিশেষ পড়ি নাই, কিন্তু বোধ হয় তাঁহারা কেহই বলেন না যে, বহুবিবাহ সুপ্রথা, ইহা তোমরা ত্যাগ করিও না। যদি কেহ এমত কথা বলিয়া থাকেন, তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার মত কুসংস্কারবিশিষ্ট লোক এক্ষণে অতি অল্প। যাঁহারা স্বয়ং

* বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার। দ্বিতীয় পুস্তক। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। কলিকাতা, শ্রীপীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত।

বিবিধ প্রবন্ধ—বহুবিবাহ

বহুবিবাহ করিয়া থাকেন, তাহাদিগেরই মুখে বহুবিবাহপ্রথার ভয়সী নিন্দা এবং কোলীন্যের উপর ধিক্কার আমরা শতবার শুনিয়াছি। তবে যে তাহারা কেন এত বিবাহ করেন, সে স্বতন্ত্র কথা। এমত চোর কেহই নাই যে, জিজ্ঞাসা করিলে, চুরিকে অসৎকর্ম বলিয়া স্বীকার করিবে না—কিন্তু অসৎকর্ম বলিয়া স্বীকার করিয়াও সে আবার চুরি করে। কুলীন্যেরাও বহুবিবাহ নিন্দনীয় বলিয়া স্বীকার করিয়াও বহুবিবাহ করেন। কিন্তু সে যাহাই হউক, বহুবিবাহ যে কুপ্রথা, তদ্বিষয়ে বাঙ্গালীর মতৈক্য সম্বন্ধে আমাদের কোন সংশয় নাই।

এই ঐকমত্য যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃত বহুবিবাহবিষয়ক প্রথম পুস্তক প্রচারের পর হইয়াছে, এমত নহে। অনেক দিন হইতেই ইহা সংস্থাপিত হইয়া আসিতেছে। ইহা দেশের মধ্যে সুশিক্ষা প্রচার বা ইউরোপীয় নীতির প্রচার বা সাধারণ উন্নতির ফল। তথাপি তাহার প্রথম পুস্তকের জন্য আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ। যাহা কিছু সর্দভিপ্ৰায়ে অনুষ্ঠিত, তাহা সার্থক হউক বা নিরর্থক হউক, প্রয়োজনবিশিষ্ট হউক বা নিঃপ্রয়োজনীয় হউক, তাহাই প্রশংসনীয় এবং কৃতজ্ঞতার স্থল। বিশেষ বহুবিবাহ সম্বন্ধে লোকের মত যাহাই হউক, বহুবিবাহপ্রথা দেশ হইতে একেবারে উচ্ছিন্ন হয় নাই। তবে বহুবিবাহ এ দেশে যতদূর প্রবল বলিয়া বিদ্যাসাগর প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, বাস্তবিক ততটা প্রবল নহে। আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হৃদয় জেলায় যতদূর বহুবিবাহপরায়ণ ব্রাহ্মণ আছেন, বিদ্যাসাগর প্রথম পুস্তকে তাহাদিগের তালিকা দিয়াছেন। অনেকের মুখে শুনিয়াছি যে, তালিকাটি প্রমাদশূন্য নহে। কেহ কেহ বলেন যে, মৃত ব্যক্তির নাম সন্নিবেশ দ্বারা তালিকাটি স্ফীত হইয়াছে। আমরা স্বয়ং যে দুই একটির কথা সর্বিশেষ জানি, তাহা তালিকার সঙ্গে মিলে নাই। যাহা হউক, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের খ্যাতির অনুরোধে আমরা সেই তালিকাটি যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিলাম। তাহা করিলেও হুগলি জেলার সমুদায় লোকের মধ্যে কয়জন বহুবিবাহপরায়ণ পাওয়া যায়? এই বাঙ্গালায় এক কোটি আশী লক্ষ হিন্দু বাস করে; ইহার মধ্যে আঠার শত জন ব্যক্তিও যে অধিবেদনপরায়ণ নহে, ইহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ দশ সহস্র হিন্দুর মধ্যে একজনও অধিবেদনপরায়ণ কি না সন্দেহ। এই অল্পসংখ্যকদিগের সংখ্যাও যে দিন দিন কমিতেছে, স্বতঃই কমিতেছে, তাহাও সকলে জানেন। কাহারও কোন উদ্যোগ করিতে হইতেছে না—কোন রাজব্যবস্থার আবশ্যক হইতেছে না—কোন পণ্ডিতের ব্যবস্থার আবশ্যক হইতেছে না, আপনা হইতেই কমিতেছে। ইহা দেখিয়া অনেকেই ভরসা করেন যে, এই কুপ্রথার যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহা আপনা হইতেই কমিবে। এমত অবস্থায় বহুবিবাহরূপ রক্ষসবধের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় মহারথীকে ধৃতাস্ত্র দেখিয়া অনেকেরই ডনকুইক্কোটকে মনে পড়িবে।

কিন্তু সে রক্ষস বধ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। মূর্খ হইলেও বধ্য। আমরা দেখিয়াছি, এক এক জন বীরপুরুষ, মৃত সর্প বা মৃত কুক্কুর দেখিলেই তাহার উপর দুই এক ঘা লাঠি মারিয়া যান; কি জানি, যদি ভাল করিয়া না মারিয়া থাকে। আমরা বিবেচনায় ইহারা বড় সাবধান এবং পরোপকারী। যিনি এই মূর্খ রক্ষসের মৃত্যুকালে দুই এক ঘা লাঠি মারিয়া যাইতে পারিবেন, তিনি ইহলোকে পূজ্য এবং পরলোকে সঙ্গতি প্রাপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই।

কিন্তু একটা কথায় একটু গোলযোগ বোধ হয়। আমরা স্বীকার করিলাম, বহুবিবাহ এ দেশে বড়ই চলিত—আপামর সাধারণ সকলেই বহুপত্নীক। জিজ্ঞাস্য এই, এ প্রথা কি প্রকারে নিবারণিত হওয়া সম্ভব? বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সকল উপায় অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক, বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করা তাহার একটি প্রধান। বাস্তবিক এই প্রথা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না; কেন না, পূর্বজন্মান্বিত পুণ্যবলে ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে আমরা ঘোরতর মূর্খ। দেখা যাইতেছে যে, এ বিষয়ে মতভেদ আছে। তবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্যম, পুস্তকের আকার, এবং স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত বচনের আড়ম্বর দেখিয়া আমরা তাহার পক্ষ অবলম্বন করিতে প্রস্তুত আছি। মনে করুন, দেশশুদ্ধ লোক সকলেই স্বীকার করিল যে, বহুবিবাহ প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র-বিরুদ্ধ। তাহাতে কি বহুবিবাহ প্রথা নিবারণিত হইবে? আমরা সে বিষয়ে বিশেষ সংশয়বিশিষ্ট। বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে যে সকল সামাজিক প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা সকলই শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রচলিত, এমত নহে। সে সমাজমধ্যে ধর্মশাস্ত্রাপেক্ষা লোকাচার প্রবল। যাহা লোকাচারসম্মত, তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও প্রচলিত; যাহা লোকাচার-বিরুদ্ধ, তাহা শাস্ত্রসম্মত হইলে প্রচলিত হইবে না। বিদ্যাসাগর মহাশয় পূর্বে একবার

বিক্রম রচনাবলী

শাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিয়াছেন; প্রমাণসম্বন্ধে কৃতকার্যও হইয়াছেন; অনেকেই তাঁহার মতাবলম্বী; কিন্তু কয় জন, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা বা অনুষ্ঠেয়তা অনুভূত করিয়া আপন পরিবারস্থা বিধবাদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ দিয়াছেন? কোন একজন বিশেষ শাস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণ লইয়া বসুন। এবং তৎসঙ্গে মন্বাদি স্মৃতি-শাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ লইয়া এক একটি বচন ধরিয়া তাঁহার আচার ব্যবহারের সহিত মিলাইয়া লউন। কয়টি বচনের সঙ্গে তাঁহার কৃতানুষ্ঠান মিলিবে? শাস্ত্রজ্ঞ মাত্রেই বলিবেন, অতি অল্প। যদি শাস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণদিগের এই দশা, তবে আপামর সাধারণের কথায় আর কাজ কি? বাস্তবিক মানবাদিধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত বিধিসকলের সম্পূর্ণ চলন, কোন সমাজমধ্যে সম্ভব নহে। কস্মিন্ কালে, কোন সমাজে, ঐ সকল বিধি সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত ছিল কি না সন্দেহ। সকল বিধিগুলি চলিবার নহে। অনেকগুলি অসাধ্য। অনেকগুলি সাধ্য হইলেও মনুষ্যের এতদূর ক্লেশকর যে, তাহা স্বতই পরিত্যক্ত হয়। অনেকগুলি পরম্পরাবিরোধী। এই বিধিগুলি সম্যক্ প্রচলিত রাখা যদি কোন সমাজের অদৃষ্টে কখন ঘটিয়া থাকে বা কখন ঘটে, তবে সে সমাজের অদৃষ্ট বড় মন্দ সন্দেহ নাই। অনেকেরই বিশ্বাস আছে, প্রাচীন ভারতে এই ধর্ম্মশাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত ছিল, কেবল এখনই কালমাহাত্ম্যে লুপ্ত হইতেছে। যাঁহারা এরূপ বিবেচনা করেন, তাঁহাদের সহিত আমরা বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। কিন্তু ইহা স্বীকার করি যে, পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে এই সকল বিধি কতক দূর প্রচলিত ছিল, এখনও কতক দূর প্রচলিত আছে। প্রচলিত ছিল, এবং প্রচলিত আছে বলিয়াই ভারতবর্ষের এ অধোগতি। যাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্র-ব্যবসায়ী, তাঁহাদিগকে এ কথা বলা বৃথা। কিন্তু অনেক হিন্দু আমাদের কথার অনুমোদন করিবেন, ভরসা আছে। আমরা হিন্দুধর্ম্মবিরোধী নহি; হিন্দুধর্ম্ম পরিশুদ্ধ হইয়া প্রচলিত থাকে, ইহাই আমাদের কামনা। তাই বলিয়া যাহা কিছু ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া পরিচিত, তাহাই যে হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত অংশ, এবং সমাজের মঙ্গলকারক, এ কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না।

আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বৃদ্ধিতে পারিয়াছি কি না, বলিতে পারি না। যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ, সেই কারণেই বহুবিবাহ হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিলে একটি দোষ ঘটে। বহুবিবাহপরায়ণ পক্ষেরা বলিতে পারেন, “যদি আপনি আমাদের শাস্ত্রানুসারে কার্য করিতে বলেন, তবে আমরা সম্মত আছি। কিন্তু যদি শাস্ত্র মানিতে হয়, তবে আপনার ইচ্ছামত, তাহার একটি বিধি গ্রহণ করা, অপরগুলি ত্যাগ করা যাইতে পারে না। আপনি কতকগুলি বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন, এই এই বচনানুসারে তোমরা যদৃচ্ছাক্রমে বহুবিবাহ করিতে পারিবে না। ভাল, আমরা তাহা করিব না। কিন্তু সেই সেই বিধিতে যে যে অবস্থায় অধিবেদনের অনুমতি আছে, আমরা এই দুই কোটি হিন্দু সকলেই সেই সেই বিধানানুসারে প্রয়োজনমত অধিবেদনে প্রবৃত্ত হইব—কেন না, সকলেরই শাস্ত্রানুমত আচরণ করা কর্তব্য। আমরা যত ব্রাহ্মণ আছি—রাঢ়ীয়, বৈদিক, বারেন্দ্র, কান্যকুব্জ প্রভৃতি—সকলেই অগ্রে সর্বণা বিবাহ করিয়া কামতঃ স্ক্রিয়কন্যা, বৈশ্যকন্যা, এবং শূদ্রকন্যা বিবাহ করিব। আমাদের মধ্যে যখনই কাহারও স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে বচসা করিয়া বাপের বাড়ী যাইবে, আমরা তখনই বিবাহের উদ্দেশ্য অসিদ্ধ বলিয়া, ছোট জাতির মেয়ে খুঁজিব। গৃহিণী যখন ঝগড়া করিয়াছেন, তখন রাগের মাথায় সম্মতি দিবেন, সন্দেহ নাই। এই দুই কোটি বাঙ্গালীর মধ্যে যাহারই স্ত্রী বন্ধা,* সেই আর একটি বিবাহ করুক—যাহারই স্ত্রী মৃতপ্রজা, সেই আর একটি বিবাহ করুক—যে হতভাগিনীকে বিধাতা বর্ষে বর্ষে মনঃপীড়া দিয়া থাকেন, স্বামীও তাহার মর্ম্মান্তিক পীড়ার বিধান করুন; কেন না, ইহা শাস্ত্রসম্মত। তন্মিহ্ন যাহার কন্যা ভিন্ন পুত্র জন্মে নাই, এই দুই কোটি হিন্দুর মধ্যে এমত যত লোক আছে, সকলেই আর এক এক দার-পরিগ্রহ করুন। আমাদের ভরসা আছে যে, এই সকল কারণে হিন্দুগণ শাস্ত্রানুসারে অধিবেদনে প্রবৃত্ত হইলে, এখন যেখানে একজন কুলীন ব্রাহ্মণ বহুবিবাহপরায়ণ, সেখানে সহস্র সহস্র কুলীন, অকুলীন, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, বহু পত্নী লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে শাস্ত্রানুসারে সংসারধর্ম্ম করিতে থাকিবেন।”

* “বন্ধাষ্টমেহাধিবেদ্যাদ্বে দশমে তু মৃতপ্রজা। একাদশে স্ত্রীজননী সদ্যস্বপ্নপ্রিয়বাদিনী ॥”-
বহুবিবাহ, দ্বিতীয় পুস্তক, ১৪৩।

বিবিধ প্রবন্ধ—বহুবিবাহ

কিন্তু এখনও শাস্ত্রের মাহিমা শেষ হয় নাই। ধর্মশাস্ত্রের প্রধান বিধির উল্লেখ করিতে বাকি আছে। “সদ্যস্বর্গপ্রিয়বাদিনী!”—ভাষ্যা অপ্রিয়বাদিনী হইলে, সদ্যই অধিবেদন করিবে। আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ যে, যাঁহার যাঁহার ভাষ্যা অপ্রিয়বাদিনী, তাঁহারা হিন্দুশাস্ত্রের গৌরববর্দ্ধনার্থ সদ্যই পুনর্বার বিবাহ করুন। স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ মুখরা, দ্বিতীয় ভাষ্যাও অপ্রিয়বাদিনী হইলে হইতে পারে,—তাহা হইলে আবার তৃতীয় বিবাহ করিবেন; তৃতীয়াও যদি অপ্রিয়বাদিনী হয় (বাপ্পালীর মেয়ের মুখ ভাল নহে), তবে আবার বিবাহ করিবেন—এরূপ “লোকহিতৈষী নিরীহ শাস্ত্রকারদিগের”* অনুকম্পায় আপনারা অনন্ত গৃহিণীশ্রেণীতে পুরী শোভিতা করিতে পারিবেন। এমন বাপ্পালীই নাই, যাহাকে একদিন না একদিন স্ত্রীর কাছে “মুখঝামটা” খাইতে না হয়। অতএব আমাদিগের ধর্মশাস্ত্রের অনন্ত মাহিমার গুণে সকলেই অনন্তসংখ্যক গৃহিণীকর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া জীবনযাত্রা নিব্বাহ করিতে পারিবে। যাঁহারই স্ত্রী, নন্দার সহিত বচসা করিয়া আসিয়া স্বামীর উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করিবেন, তিনিই তৎক্ষণাৎ অন্য বিবাহ করিতে পারিবেন। যাঁহারই স্ত্রী, যা তার অঙ্গে নতুন অলঙ্কার দেখিয়া আসিয়া স্বামীকে বলিবেন, “তোমার হাতে পড়িয়া আমার কোন সুখ হইল না”, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই রাতে ঘটক ডাকাইয়া সম্বন্ধ স্থির করিয়া সদ্যই অন্য দার গ্রহণ করিবেন। যাঁহার স্ত্রী, স্বামীর মুখে স্বকৃত পাকের নিন্দা শুনিয়া বলিবেন, “কিছুতেই তোমার মন যোগাইতে পারিলাম না—আমার মরণ হয় ত বাঁচ”—তিনি তখনই চেলির কাপড় পরিয়া, সোলার টোপের মাথায় দিয়া, প্রতিবাসীর দ্বারে গিয়া দাঁড়াইয়া বলিবেন, “মহাশয়, কন্যাদান করুন।” এত দিনে বাপ্পালীর ঘরে জন্মগ্রহণ করা সার্থক হইল,—অমূল্যধন স্ত্রীরূপ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লাভ করা যাইতে পারিবে। বঙ্গসুন্দরীগণ বোধ হয় ধর্মশাস্ত্রপ্রচারের এই নবোদ্যম দেখিয়া তত সন্তুষ্ট হইবেন না। কিন্তু তাঁহাদিগের শাসনের যে একটা সদুপায় হইতে পারিবে, ইহাতে আমরা বড় সুখী। আমাদের এমত ভরসা হইয়াছে যে, অনেক ভদ্রলোক নিখুঁত মন্ত্রা খুঁজিয়া বেড়াইবার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন—কেন না, নথনাড়া দিবার দিন কাল গেল। বিধুমুখী ঘোষ, সৌদামিনী মিত্র, কামিনী গাঙ্গুলী প্রভৃতি দেশের শ্রীবৃদ্ধির পতাকাবাহিনীগণ, বোধ হয় পতাকা ফেলিয়া দিয়া, ফিরে বাপ্পালীর মেয়ে সাজিয়া, স্বামীর শ্রীচরণ মাত্র ভরসা মনে করিয়া, বিবিয়ানা চাল খাট করিয়া আনিবেন। কালভুজঙ্গিনী কুলকামিনীগণ এখন হইতে মুখের বিষ হৃদয়ে লুকাইয়া, কেবল কটাক্ষ-বিষকে সংসারজয়ের একমাত্র সম্বল করিবেন। তাঁহাদিগের মনে থাকে যেন, “সদ্যস্বর্গপ্রিয়বাদিনী!”—বিদ্যাসাগর মহাশয়-প্রণীত বহুবিবাহ নিবারণবিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকে এ ব্যবস্থা খুঁজিয়া পাইয়াছি। বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুবিবাহ নিবারণ জন্য এই পুস্তক লিখিয়াছিলেন, কিন্তু বাপ্পালীর অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন!—আমাদিগের পূর্বজন্মান্বিত পুণ্য অনন্ত! সেই পুস্তকোদ্ধৃত ধর্মশাস্ত্রের বলে বাপ্পালী মাত্রেই অসংখ্য বিবাহ করিতে পারিবেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে শাস্ত্রকারদিগকে “লোকহিতৈষী” বলিয়াছেন, তাহা সার্থক বটে।

এরূপ শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কি ফল! এ শাস্ত্রানুসারে লোককে কার্য্য করিতে বলিলে বহুবিবাহ নিবারণ হয়, না বৃদ্ধি হয়?

কিন্তু বোধ হয়, শাস্ত্রাবলম্বনপূর্ব্বক বহুবিবাহ পরিত্যাগ করিতে বলা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং তাঁহার সহিত যাঁহারা একমতাবলম্বী, তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে, বহুবিবাহ নিবারণ জন্য রাজব্যবস্থা প্রচার হউক। দ্বিতীয় পুস্তকে সে কথা কিছুই নাই, কিন্তু প্রথম পুস্তকে আছে। সেই উদ্দেশ্যে প্রবৃত্তিদায়কস্বরূপ বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিবার জন্য যত্ন করিয়াছেন। নচেৎ শাস্ত্রের নামে ভয় পাইয়া হিন্দু বহুবিবাহ বা কোন চিরপ্রচলিত প্রথা হইতে নিবৃত্ত হইবেক, এমত ভরসা বিদ্যাসাগর মহাশয় করিবেন, বোধ হয় না। কিন্তু রাজব্যবস্থার পক্ষে প্রবৃত্তিদায়ক বলিয়াও এ বিষয়ে ধর্মশাস্ত্রের সাহায্য অবলম্বন করা আমাদিগের উপযুক্ত বোধ হয় না। এ বিষয়ে রাজবিধি প্রণীত করিতে গেলে, তাহা কি শাস্ত্রানুমত হওয়া আবশ্যিক? না শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও ক্ষতি নাই? যদি তাহা শাস্ত্রানুমত হওয়া আবশ্যিক হয়, তবে “সদ্যস্বর্গপ্রিয়বাদিনী”, “ক্ষত্রবিট্শুদ্ধকন্যাস্তু * * * বিবাহ্যঃ ক্ৰচিদেব তু” প্রভৃতি কথাগুলিও বিধিবদ্ধ করিতে হইবে। আর যদি তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও

* বহুবিবাহ, দ্বিতীয় পুস্তক, ২৫২ পৃঃ।

বিশ্বকম রচনাবলী

চলে, তবে বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাওয়া, নিষ্প্রয়োজনে পরিশ্রম করা মাত্র।

আর একটি কথা এই যে, এ দেশে অর্ধেক হিন্দু, অর্ধেক মুসলমান। যদি বহুবিবাহ নিবারণ জন্য আইন হওয়া উচিত হয়, তবে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্বন্ধেই সে আইন হওয়া উচিত। হিন্দুর পক্ষে বহুবিবাহ মন্দ, মুসলমানের পক্ষে ভাল, এমত নহে। কিন্তু বহুবিবাহ হিন্দুশাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া, মুসলমানের পক্ষেও তাহা কি প্রকারে দণ্ডবিধি দ্বারা নিষিদ্ধ হইবে? রাজব্যবস্থাবিধাতৃগণ কি প্রকারে বলিবেন যে, “বহুবিবাহ হিন্দুশাস্ত্রবিরুদ্ধ, অতএব যে মুসলমান বহুবিবাহ করিবে, তাহাকে সাত বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ হইতে হইবে।” যদি তাহা না বলেন, তবে অবশ্য বলিতে হইবে যে, “আমরা বড় প্রজাহিতৈষী ব্যবস্থাপক বটে; প্রজার হিতার্থ আমরা বহুবিবাহ কুপ্রথা উঠাইব; কিন্তু আমরা অর্ধেক প্রজাদিগের মাত্র হিত করিব। হিন্দুদিগের শাস্ত্র ভাল, তাহাদের ব্যাকরণের গুণে এক স্থানে “ক্রমশো বরা” ও “ক্রমশোহবরা” উভয় পাঠ চলিতে পারে, সুতরাং তাহাদিগেরই হিত করিব। আমাদিগের অর্ধশিষ্ট প্রজা তাহাদিগের ভাগ্যদোষে মুসলমান, তাহাদিগের শাস্ত্রপ্রণেতৃগণ সুচতুর নহে, আরবী কায়দা হেলে দোলে না, বিশেষ মুসলমানের মধ্যে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় কেহ পণ্ডিত নাই, অতএব বাকি অর্ধেক প্রজাগণের হিত করিবার আবশ্যিকতা নাই।” আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধ হয় যে, ব্যবস্থাপক সমাজ এই দ্বিবিধ উক্তিগণের মধ্যে কোন উক্তিই ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা করিবেন না।

অতএব আমাদিগের সামান্য বিবেচনায় ধর্মশাস্ত্রের দোহাই দিয়া কোন দিকে কোন ফল নাই। তবে ইহা অবশ্য স্বীকার্য যে, যদি ধর্মশাস্ত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশ্বাস ও ভক্তি থাকে, এবং যদি বহুবিবাহ সেই শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া তাহার বিশ্বাস থাকে, তবে তিনি আত্মপক্ষ-সমর্থনে অধিকারী বটে, এবং তাহার পুস্তক, একজন সদনুষ্ঠাতার সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্তির প্রমাণস্বরূপ সকলের নিকট আদরণীয়। আর যদি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শাস্ত্রে বিশ্বাস ও ভক্তি না থাকে, তবে সেই শাস্ত্রের দোহাই দেওয়া কপটতা মাত্র। যিনি বলিবেন যে, সদনুষ্ঠানের অনুরোধে এইরূপ কপটতা প্রশংসনীয়, আমরা তাহাকে বলিব যে, সদনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যেই হউক বা অসদনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যেই হউক, যিনি কপটাচার করেন, তাহাকে কপটাচারী ভিন্ন আর কিছুই বলিব না। আপনার ক্ষুধানিবারণার্থে যে চুরি করে, সেও যেমন চোর, পরকে বিতরণার্থে যে চুরি করে, সেও তেমনি চোর। বরং দাতা চোরের অপেক্ষা ক্ষুধাতুর চোর মার্জ্জনীয়; কেন না, সে কাতরতাবশতঃ, এবং অলঙ্ঘ্য প্রয়োজনের বশীভূত হইয়া চুরি করিয়াছে। তেমনি যে ব্যক্তি আত্মরক্ষার্থে কপটতা করে, তাহার অপেক্ষা যে নিষ্প্রয়োজনে কপটতা করে, সেই অধিকতর নিন্দনীয়। যিনি এই পাপপুণ্য, মিথ্যাপরায়ণ মনুষ্যজাতিতে এমত শিক্ষা দেন যে, সদনুষ্ঠানের জন্য প্রতারণা এবং কপটাচারও অবলম্বনীয়, তাহাকে আমরা মনুষ্যজাতির পরম শত্রু বিবেচনা করি। তিনি কুশিক্ষার পরম গুরু।

আমরা এ কথা বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বলিতেছি না। আমরা এমত বলিতেছি না যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় ধর্মশাস্ত্রে স্বয়ং বিশ্বাসবিহীন বা ভক্তিশূন্য। তিনি ধর্মশাস্ত্রের প্রতি গম্গদাচিত্ত হইয়া তৎপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা ইহাও বলিতেছি যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় উদার চরিত্রে কপটাচরণ কখনই স্পর্শ করিতে পারে না—তিনি স্বয়ং ধর্মশাস্ত্রে অবিচলিত ভক্তিবিশিষ্ট সন্দেহ নাই। কেবল আমাদিগের কপালদোষে বহুবিবাহ নিবারণের সদুপায় কি, তৎসম্বন্ধে তিনি কিছু ভ্রান্ত। ইহার অধিক আর কিছুই আমাদিগের বলিবার নাই।

যে কয়েকটি কথা বলা আমাদিগের উদ্দেশ্য, তাহা সংক্ষেপে পুনরুক্ত করিতেছি।

১। বহুবিবাহ অতি কুপ্রথা: যিনি তাহার বিরোধী, তিনিই আমাদিগের কৃতজ্ঞতার ভাজন।

২। বহুবিবাহ এ দেশে স্বতঃই নিবারণিত হইয়া আসিতেছে; অল্প দিনে একেবারে লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা; তজ্জন্য বিশেষ আড়ম্বর আবশ্যিক বোধ হয় না। সুশিক্ষার ফলে উহা অবশ্য লুপ্ত হইবে।

৩। এ কথা যদিও সত্য বলিয়া স্বীকার না করা যায়, তবে ইহার অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিয়া কোন ফললাভের আকাঙ্ক্ষা করা যাইতে পারে না।

বিবিধ প্রবন্ধ—বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার

৪। আমরাদিগের বিবেচনায় বহুবিবাহ নিবারণের জন্য আইনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু যদি প্রজার হিতার্থ আইনের আবশ্যিকতা আছে, ইহা স্থির হয়, তবে ধর্মশাস্ত্রের মূখ্য চাহিবার আবশ্যিক নাই।

উপসংহার কালে আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। তিনি বিজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, দেশহিতৈষী, এবং সুলেখক, ইহা আমরা বিস্মৃত হই নাই। বঙ্গদেশ তাঁহার নিকট অনেক ঋণে বদ্ধ। এ কথা যদি আমরা বিস্মৃত হই, তবে আমরা কৃতঘ্ন। আমরা যাহা লিখিয়াছি, তাহা কর্তব্যানুরোধেই লিখিয়াছি। তিনি যদি কর্তব্যানুরোধে বহুবিবাহের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তবে আমাদের এ কথা সহজে বুঝিবেন।

বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার*

প্রথম প্রস্তাব

বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার কত দিন হইতে? চিরকাল নহে। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এক প্রকার স্থির করিয়াছেন যে, আৰ্য্যজাতীয়েরা ভারতবর্ষের আদিমবাসী নহে। তাঁহারা বলেন যে, ইরান বা তৎসম্বন্ধিত কোন স্থানে আৰ্য্যজাতীয়দিগের আদিম বাস। তথা হইতে তাঁহারা নানা দেশে গিয়া বসতি করিয়াছেন। এবং তথা হইতেই ভারতবর্ষে আসিয়া বসতি করিয়াছিলেন। প্রথম কালে আৰ্য্য জাতি কেবল পঞ্জাবमध्ये বসতি করিতেন। তথা হইতে ক্রমে পূর্বদেশ জয় করিয়া অধিকার করিয়াছেন।

যে সকল প্রমাণের উপর এই সকল কথা নির্ভর করে, তাহা সুশিক্ষিত মাত্রেরই অবগত আছেন, এবং সুশিক্ষিত মাত্রেরই নিকট সে সকল প্রমাণ গ্রাহ্য হইয়াছে। অতএব তাহার কোন বিচারে আমরা প্রবৃত্ত হইব না। যদি আৰ্য্যজাতীয়েরা উত্তর পশ্চিম হইতে ক্রমে ক্রমে পূর্ব-ভাগে আসিয়াছিলেন, তবে ইহা অবশ্য স্বীকর্তব্য যে, অনেক পরে বঙ্গদেশে আৰ্য্যজাতীয়েরা আসিয়া বৈদিক ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

“সরস্বতীদৃষদ্বতোদেবনদ্যোষদন্তরম্ ।
তং দেবনির্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্তং প্রচক্ষতে ॥
তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্যক্রমাগতঃ ।
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে ॥”

এই বচন মনুসংহিতোক্ত। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, যৎকালে মানবধর্মশাস্ত্র সংগৃহীত হইয়াছিল, তৎকালে বঙ্গদেশ শুদ্ধাচারবিশিষ্ট পুণ্য প্রদেশের মধ্যে গণ্য হইত না। অথচ আৰ্য্যবর্তের একাংশ বলিয়া গণিত হইত। কেন না, ঐ বচনদ্বয়ের কিছু পরেই মনুতে আছে যে—

“আসমুদ্রান্ত বৈ পূর্বদাসমুদ্রান্ত পশ্চিমাং ।
তয়োরেবান্তরং গির্যো† আৰ্য্যবর্তং বিদুবুধাঃ ॥”

কিন্তু বঙ্গদেশ তৎকালে আৰ্য্যবর্তের অংশमध्ये গণনীয় হইলেও, তথায় আৰ্য্যধর্ম প্রচলিত ছিল, এমত বোধ হয় না। কেন না, মনুসংহিতায় অন্যত্র আছে,—

“শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ ।
বৃষলভ্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনে চ ॥
পৌণ্ড্রকাশেচাঁড়বিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ ।
পারদাঃ পহুবর্ষৈচনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ ॥”

এক্ষণে যাহাকে বঙ্গদেশ বলা যায়, তাহার দক্ষিণ পশ্চিমাংশ পৌণ্ড্র নামে খ্যাত ছিল। যে

* বঙ্গদর্শন, ১২৮০।

† বিষ্ণুচল ও হিমবৎ।

বঙ্গীয় রচনাবলী

অংশমধ্যে কলিকাতা, বঙ্গবন্দ, মুরশিদাবাদ, তাহা সেই অংশের অন্তর্গত। যাঁহারা সর্বিশেষ অবগত হইতে চাহেন, তাঁহারা উইল্‌সন্ কৃত বিষ্ণুপুরাণানুবাদের প্রদেশতত্ত্ববিষয়ক পরিচ্ছেদটি দেখিবেন। বঙ্গ, পুণ্ড্র হইতে একটি পৃথক্ রাজ্য ছিল। এক্ষণে বাঙ্গালীতে ঢাকা বিষ্ণুপুর অঞ্চলকেই “বঙ্গদেশ” বলে—সেই প্রদেশকেই প্রাচীন কালে বঙ্গদেশ বলিত। কিন্তু অগ্রে পুণ্ড্র, পরে বঙ্গ। মহাভারতের সভাপর্বে আছে, ভীম দিগ্বিজয়ে আসিয়া পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব এবং কোশিকীকচ্ছবাসী মনোজা রাজা, এই দুই মহাবল মহাবীরকে পরাজয় করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। চৈনিক পরিব্রাজক হোয়েন্থ সাঙ্ ভারতবর্ষে এই পুণ্ড্র বা পোণ্ড্র দেশে আসিয়াছিলেন। সেই দেশের রাজধানীর নাম পোণ্ড্রবর্ধন। জেনেরল্ কানিংহাম্ বলেন যে, আধুনিক পাবনাই প্রাচীন রাজধানী পোণ্ড্রবর্ধন। বোধ হয়, মালদহের অন্তঃপাতী পাণ্ডুয়া নামক গ্রামের অস্তিত্ব তিনি অবগত নহেন। এই পাণ্ডুয়াই যে প্রাচীন পোণ্ড্রবর্ধন, এমত বিবেচনা করিবার বিশেষ কারণ আছে।

অতএব আধুনিক বঙ্গদেশের প্রধানাংশকে পুর্বে পোণ্ড্রদেশ বলিত। মনুর শেষোক্ত বচনে বোধ হইতেছে যে, তখন এ দেশে ব্রাহ্মণের আগমন হয় নাই বা আৰ্য্যজাতি আইসে নাই। ইহা বলা যাইতে পারে যে, যেখানে পোণ্ড্রদিগকে লুপ্তক্রিয় ক্ষত্রিয় মাত্র বলা হইতেছে, সেখানে এমত বুদ্ধায় না যে, যখন মনুসংহিতা সঙ্কলন হয়, তখন বঙ্গদেশে আৰ্য্যজাতি আইসে নাই। বরং ইহাই বলা যাইতে পারে, তাহার বহু পুর্বে ক্ষত্রিয়েরা এ দেশে আসিয়া আচারভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন। যদি তাহা বলা যায়, তবে চীন, তাতার, পারস্য, এবং গ্রীস্ সম্বন্ধেও তাহা বলিতে হইবে। কেন না, পোণ্ড্রগণ সম্বন্ধে যাহা কথিত হইয়াছে, চৈন, শক, পহ্লব, এবং যবন সম্বন্ধেও তাহা কথিত হইয়াছে। মনু, শক, যবন, পহ্লব, (কেহ লিখেন পহুব) এবং চৈনদিগকে যে শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন, এতদ্দেশবাসী পোণ্ড্রদিগকে সেই শ্রেণীতে ফেলিয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে যে, মনুসংহিতাসঙ্কলনকালে বঙ্গদেশ ব্রাহ্মণবিহীন, অনাৰ্য্য জাতির বাসস্থান ছিল।

সমুদ্রতীর হইতে পদ্মাপর্য্যন্ত প্রদেশে এক্ষণে বহুসংখ্যক পুড়া ও পোদ জাতীয়ের বাস আছে। পুড়া শব্দটি পুণ্ড্র শব্দের অপভ্রংশ বোধ হয়; পোদ শব্দও তাহাই বোধ হয়। অতএব এই পুড়া ও পোদ জাতীয়দিগকে সেই পোণ্ড্রদিগের বংশ বিবেচনা করা যাইতে পারে। ইহাদিগের মস্তকাদির গঠন তুরাণী ককেশীয় নহে। তবে ককেশীয়দিগের সহিত মিশিয়া কতক কতক তদনুরূপ হইয়াছে। জাতিবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, ভারতবর্ষের আদিমবাসীরা সকলেই তুরাণীয় ছিল; আৰ্য্যেরা তাহাদিগকে পরাস্ত করায় তাহারা কতক কতক বন্য ও পার্শ্বত্যা প্রদেশ আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছে। আধুনিক কোল, ভীল, সাঁওতাল প্রভৃতি সেই আদিম জাতি। আর কতকগুলিন, জেতাদিগের আশ্রয়েই তাহাদিগের নিকট অবনত হইয়া রহিল। আধুনিক অনেক অপবিদ্র হিন্দুজাতি তাহাদিগেরই বংশ। পুড়া এবং পোদগণকে সেই সম্প্রদায়ভুক্ত বোধ হয়।

শতপথ ব্রাহ্মণে আছে,—

“বিদেঘোহ মাথবোহগ্নিঃ বৈশ্বানরং মুখে বভার। তস্য গোতমো রাহুগণ ঋষিঃ পুরোহিত আস। তস্মৈ স্মামন্ত্র্যমানো ন প্রতিশৃণোতি নৈন্মৈহগ্নি বৈশ্বানরো মুখান্নিপদ্যাতে ইতি তম্গাভিহর্দয়িতুং দধে। বীতিহোত্রং ত্বা কবে দ্যুমস্তং সমিধীমহি। অগ্নে বৃহস্তুমধরু বিদেঘোতি। স ন প্রতিশৃশ্রাব।—উদগ্নে শূচয়স্তব শূক্রা ভ্রাজস্ত ইরতে। তব জ্যোতিংষ্যচ্চর্যো বিদেঘা ইতি। সহ নৈব প্রতিশৃশ্রাব। তং ত্বা ধৃত স্নবীমহে ইত্যেবাভিব্যাহারদথাস্য ধৃত-কীর্ত্ত্বাবেবাগ্নি বৈশ্বানরো মুখাদুজ্জ্বল তং ন শশাক ধারয়িতুম্। সোহস্য মুখান্নিপেদে স ইমাং পৃথিবীং প্রাপাদঃ। তির্হি বিদেঘো মাথব আস সরস্বত্যাম্। স তত এব প্রাণ্ডহন্ন-ভীয়ায়েমাং পৃথিবীম্। তং গোতমশ্চ রাহুগণো বিদেঘশ্চ মাথবঃ পশ্চাদ্ দহন্তম্ভবীয়তুঃ। স ইমাঃ সর্ষা নদীরতিদদাহ। সদানীরেত্যুত্তরাদ্ গিরের্নিধাবতি তাং হৈব নাতিদদাহ তাং হ স্ম তাং পুরা ব্রাহ্মণা ন তরন্তি অনতিদক্ষা অগ্নিনা বৈশ্বানরেণেতি। তত এতির্হি প্রাচীনং বহবো ব্রাহ্মণাঃ। তদ্ হ অক্ষেরতরমিবাস স্রাবিতরমিব অস্বদিতমগ্নিনা বৈশ্বানরেণেতি। তদুহৈতির্হি ক্ষেরতরমিব ব্রাহ্মণা উ হি নুনমেতদ্ যজ্ঞেরসিস্বিদন্। সাপি জঘন্যে নৈদাঘে সর্মিবৈব কোপয়তি তাবৎ সীতাহনতি দক্ষা হাগ্নিনা বৈশ্বানরেণ। স হোবাচ বিদেঘো মাথবঃ ক্বাহং ভবানি ইতি। অতএব তে প্রাচীনং ভুবনমিতি হোবাচ। সৈষাপ্যেতির্হি কোশলবিদেহানাং মর্যাদা তেহি মাথবাঃ।”

বিবিধ প্রবন্ধ—বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার

এক্ষণে সদানীরা নামে কোন নদী নাই। কিন্তু হেমচন্দ্রাভিধানে এবং অমরকোষে করতোয়া নদীর নাম সদানীরা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, সে এ সদানীরা নদী নহে; কেন না, শতপথ ব্রাহ্মণেই কথিত হইয়াছে যে, এই নদী কোশল (অযোধ্যা) এবং বিদেহ রাজ্যের (মিথিলা) মধ্যসীমা।

ইহাতে এই নিশ্চিত হইতেছে যে, অতি পূর্বেকালে মিথিলাতে ব্রাহ্মণ আসে নাই, কিন্তু যখন শতপথ ব্রাহ্মণ (ইহা বেদান্তগর্ভ) সংকলিত হয়, তখন মিথিলায় ব্রাহ্মণ বাস করিত। শতপথ ব্রাহ্মণ প্রণয়নের বহুকাল পূর্বে হইতেই আর্য্যগণ মিথিলাতে বাস করিত, সন্দেহ নাই; কেন না, ঐ ব্রাহ্মণে বিদেহাধিপতি জনক সম্রাট্ বলিয়া বাচ্য হইয়াছেন। নবীন রাজ্যের রাজা প্রাচীনদিগের নিকট সম্রাট্ নাম লাভ করিবার সম্ভাবনা কি? যখন মিথিলায় এতকাল হইতে ব্রাহ্মণের বাস, তখন যে ব্রাহ্মণেরা তথা হইতে আধুনিক বাঙ্গালার উত্তরাংশে বিস্তৃত হইয়াছেন নাই, এমত বোধও হয় না। তবে সে সময়ে বঙ্গদেশ স্পৃহণীয় বাসস্থান ছিল না, অথবা একেবারেই বা বাসযোগ্য ছিল না, এমত কেহ কেহ বলিতে পারেন। ভূতত্ত্ববিদেরা প্রমাণ করিয়াছেন যে, অতি পূর্বেকালে বঙ্গদেশ ছিল না; হিমালয়ের মূল পর্য্যন্ত সমুদ্র ছিল। অদ্যাপি সমুদ্রবাসী জীবের দেহাবশেষ হিমালয় পর্বতে পাওয়া গিয়া থাকে। কি প্রকারে গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্রের মুখানীত কন্দর্মে বঙ্গদেশ সৃষ্টি, তাহা সর্ চার্লস্ লয়েল্ প্রণীত "Principles of Geology" নামক গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

শতপথ ব্রাহ্মণ হইতে যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেই আছে, সদানীরা নদীর পরপারস্থিত প্রদেশ জলপ্লাবিত। "স্রাবিতর" শব্দে প্লবনীয় ভূমিই বুঝায়। যদি তখন ত্রিহুং প্রদেশের এই দশা, তবে অপেক্ষাকৃত নবীন বঙ্গভূমি সুন্দরবনের মত অবস্থাপন্ন ছিল। কিন্তু সে সময়ে যে এ দেশে মনুষ্যের বাস ছিল, ঐ শতপথ ব্রাহ্মণেই তাহার প্রমাণ আছে। ঐ পৌণ্ড্ররায়ী তথায় বাস করিত। যথা, "অন্তান্ বঃ প্রজা তক্ষিষ্ট ইতি। ত এতে অন্ধ্যাঃ পুণ্ড্রাঃ শবরাঃ পুর্লিন্দাঃ মূতিবাঃ ইতি উদন্ত্যাঃ বহবো ভবন্তি।" মহাভারতে সভাপর্বে প্রাগুক্ত স্থানেই আছে যে, ভীম পুণ্ড্র বঙ্গাদি জয় করিয়া তাম্বলিপ্ত, এবং সাগরকূলবাসী ম্লেচ্ছদিগকে জয় করিলেন।* অতএব তৎকালে এ দেশ আসমুদ্র জনাকীর্ণ ছিল। কিন্তু তথায় যে আর্য্যজাতির বাস ছিল, এমত প্রমাণ মহাভারতে নাই। পুণ্ড্ররাজের নাম বাসুদেব। আর্য্যবংশীয় নাহিলে এ নাম সম্ভবে না। কিন্তু নাম কবির কল্পিত বলিয়া বোধ করাই উচিত। যদি বল, ঐ স্থলেই অনার্য্যজাতিগণকে সমুদ্রতীরবাসী ম্লেচ্ছ বলা হইয়াছে, সেখানে বৃষ্ণিতে হইবে যে, পুণ্ড্রাদি জাতি ম্লেচ্ছ নহে; সুতরাং তাহারা আর্য্যজাতি। ইহার উত্তর এই যে, ম্লেচ্ছ না হইলে আর্য্যজাতি হইল, এমত নহে। ম্লেচ্ছ একটি অনার্য্যজাতি মাত্র; যবনাদি আর আর জাতি তাহা হইতে ভিন্ন। যথা মহাভারতের আদিপর্বে,—

“যদোস্তু যাদবা জাতাস্তুর্ষসৌর্ষবনাঃ স্মৃতাঃ।
দ্রুহোয়াঃ স্দতাস্তু বৈ ভোজাঃ অনোস্তু ম্লেচ্ছজাতয়ঃ ॥

বরং ঐ মহাভারতেই পুণ্ড্র অনার্য্যজাতিমধ্যে গণিত হইয়াছে, যথা—

“যবনাঃ কিরাতাঃ গান্ধারাইচনাঃ শাবরবর্ষরাঃ।
শকাস্তুষারাঃ কঙ্কশ্চ পহ্লাবাস্চন্দ্রমদ্রকাঃ ॥
পৌণ্ড্রাঃ পুর্লিন্দা রমঠাঃ কাম্বোজাইচব সর্ষশঃ।”

অতএব এই পর্য্যন্ত সিদ্ধ যে, যখন শতপথ ব্রাহ্মণ প্রণীত হয়, তখন এ দেশে আর্য্য জাতির অধিকার হয় নাই, যখন মনুসংহিতা সংকলিত হয়, তখনও হয় নাই, এবং যখন মহাভারত প্রণীত হয়, তখনও হয় নাই। ইহার কোনখানি কোন কালে সংকলিত বা প্রণীত হয়, তাহা পণ্ডিতেরা এ পর্য্যন্ত নিশ্চিত করিতে পারেন নাই। কিন্তু ইহা সিদ্ধ যে, যখন ভারতে বেদ, স্মৃতি এবং ইতিহাস সংকলিত হইতেছিল, তখন এ দেশ ব্রাহ্মণশূন্য অনার্য্যভূমি। খ্রীষ্টের

* মহাভারতের যুদ্ধে বঙ্গাধিপতি গজসৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বঙ্গেরা ম্লেচ্ছ ও অনার্য্যগণ-মধ্যে গণ্য হইয়াছে।

বাংকম রচনাবলী

ছয় শত বৎসর পূর্বে বা তদুৎ কোন কালে এ দেশে আৰ্য্য জাতির অধিকার হইয়াছিল বলিলে কি অন্যায়ে হইবে?* তাহা বলা যায় না।

মহাবংশ নামক সিংহলীয় ঐতিহাসিক গ্রন্থে প্রকাশ যে, বঙ্গদেশ হইতে একজন রাজপুত্র গিয়া সিংহলে উপনিবেশ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। আমরা যে সিদ্ধান্ত করিলাম, মহাবংশের এ কথায় তাহার খণ্ডন হইতেছে না। বরং ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বঙ্গীয় আৰ্য্যগণ অতি অল্পকাল মধ্যে বিশেষ উন্নতিশীল হইয়াছিলেন। হণ্টর সাহেব, প্রাচীন বঙ্গীয়দিগের নৌগমনপটুতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, একথা তাহার পোষক হইতেছে। এ বিষয়ে আমরাদিগের অনেক কথা বাকি রহিল, অবকাশ হয় ত পশ্চাৎ বলিব।

বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার †

দ্বিতীয় প্রস্তাব ‡

বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার সম্বন্ধে প্রথম প্রস্তাব লিখিবার সময়ে আমরা অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে, আমরা পুনর্বার এই বিষয়ের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। অনেক দিন আমরা তাহাতে হস্তক্ষেপণ করিতে পারি নাই। এক্ষণে নিম্নপরিচিত গ্রন্থখানির সাহায্যে প্রোক্ত বিষয়ের পুনরালোচনায় সাহসিক হইলাম।

বিদ্যানিধি মহাশয় যে পরিমাণে বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা পুস্তকে দুর্লভ; বাঙ্গালী লেখক কেহই এত পরিশ্রম করিয়া প্রমাণ সংগ্রহ করে না। আমরা সেই সকল বিষয় বা প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ সম্বন্ধে কিছু বলিব।

সম্বন্ধনির্ণয় কেবল ব্রাহ্মণগণের ইতিবৃত্তবিষয়ক নহে। কায়স্থাদি শূদ্রগণ ও বৈদ্যগণের বিবরণ ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের বিবরণ বিশেষ পর্যালোচনীয়; অন্য জাতির বিবরণ তাহার আনুষঙ্গিক মাত্র।

আমরা “বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার” প্রথম প্রস্তাবে যে বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাহার ফল এই দাঁড়াইতেছে যে, উত্তর ভারতে অন্যান্যাংশে যতকাল ব্রাহ্মণের অধিকার, এ দেশে ততকাল নহে—সে অধিকার অপেক্ষাকৃত আধুনিক। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর বহু শত বৎসর পূর্বে যে বঙ্গে ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, এমত বিবেচনা না করিবার অনেক কারণ আছে।

মনুসংহিতাদি-প্রদত্ত প্রমাণে, এবং ভাষাতত্ত্ববিদগণের বিচারে ইহাই স্থির হইয়াছে যে, আৰ্য্যগণ প্রথমে পশ্চিম প্রদেশ অধিকার ও তথায় অবস্থান করিয়া কালসাহায্যে ক্রমে পূর্বদিকে আগমন করেন। সর্বশেষে বঙ্গদেশে আগমন করেন, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু সে আগমন কিরূপ, তাহার একটু বিচার আবশ্যিক হইয়াছে।

প্রথমতঃ, একজাতিকৃত অন্য জাতির দেশাধিকার দ্বিবিধ।

(১) আমরা দেখিতে পাই, আমেরিকা ইংরেজ কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। ইংরেজগণ আমেরিকা কেবল অধিকৃত করেন, এমত নহে, তথায় বাস করিয়াছিলেন। ইংরেজসন্তৃত বংশেরাই এখন আমেরিকার অধিবাসী; আমেরিকা এখন তাহাদিগের দেশ।

পুনশ্চ, সাক্ষন্ জাতি ইংলণ্ড জয় করিয়াছিল। তাহারাও ইংলণ্ডের অধিবাসী হইয়াছিল।

আর্য্যোরাও পশ্চিমাঞ্চল—আমরা যাহাকে পশ্চিমাঞ্চল বলি—বিজিত করিয়া তথাকার অধিবাসী হইয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজের অধিকৃত আমেরিকা ও সাক্ষন্দিগের অধিকৃত ইংলণ্ডের সঙ্গে আৰ্য্যাধিকৃত পশ্চিম ভারতের প্রভেদ এই যে, আমেরিকা ও ইংলণ্ডের আদিম অধিবাসিগণ, জেতুগণ কর্তৃক একেবারে উচ্ছিন্ন হইয়াছিল, আৰ্য্যবিজিত আদিম অধিবাসিগণ জেতুবশীভূত হইয়া শূদ্র নাম গ্রহণ করিয়া, তাহাদিগের সমাজভুক্ত হইয়া রহিল।

* এক্ষণে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এই মতে উপস্থিত হইয়াছেন।

† সম্বন্ধনির্ণয়। বঙ্গদেশীয় আদিম জাতিসমূহের সামাজিক বৃত্তান্ত শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

‡ বঙ্গদর্শন, ১২৮২।

বিবিধ প্রবন্ধ—বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার

(২) পক্ষান্তরে, ইংরেজেরা ভারত অধিকৃত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা ভারতের অধিবাসী নহেন। কতকগুলি ভারতবর্ষে বাস করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহারা এ দেশে বিদেশী। ভারতবর্ষ ইংরেজের রাজ্য, কিন্তু ইংরেজের বাসভূমি নহে।

সেইরূপ রোমকবিজিত রাষ্ট্রনিচয় রোমকদিগের রাজ্যভুক্ত ছিল, কিন্তু রোমকদিগের বাসভূমি নহে। গল, আফ্রিকা, গ্রীস, মিশর প্রভৃতি দেশ তত্ত্বদেশীয় প্রাচীন অধিবাসিগণেরই বাসস্থল রহিল; অনেক রোমক তত্ত্বদেশে বাস করিলেন বটে, কিন্তু রোমকেরা তথাকার অধিবাসী হইলেন না।

অতএব আমেরিকাকে ইংরেজভূমি, উত্তর ভারতকে আৰ্য্যভূমি বলা যাইতে পারে। আধুনিক ভারতকে ইংরেজভূমি বলা যাইতে পারে না, মিশর প্রভৃতিতে রোমকভূমি বলা যাইতে পারে না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, বঙ্গদেশকে আৰ্য্যভূমি বলা যাইতে পারে? মগধ, মথুরা, কাশী প্রভৃতি যেরূপ আৰ্য্যগণের বাসস্থান, বঙ্গদেশ কি তাই?

ভারতীয় আৰ্য্যজাতি চতুর্বর্ণ। যেখানে আৰ্য্যগণ অধিবাসী হইয়াছেন, সেইখানেই চতুর্বর্ণের সহিত তাঁহারা বিদ্যমান। কিন্তু বাঙ্গালায় ক্ষত্রিয় নাই, বৈশ্য নাই।

ক্ষত্রিয় দুই চারি ঘর, যাহা স্থানে স্থানে দেখা যায়, তাঁহারা ঐতিহাসিক কালে অধিকাংশই মুসলমানদিগের সময়ে আসিয়াছেন। দুই একটি রাজবংশ অতি প্রাচীন কালে আসিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু রাজাদিগের কথা আমরা বলিতেছি না, সামাজিক লোকদিগের কথা বলিতেছি।

বৈশ্য সম্বন্ধেও ঐরূপ। মূর্শিদাবাদে যখন মুসলমান রাজধানী, তখন জনকয় বৈশ্য আসিয়া তাহার নিকটে বাণিজ্যার্থে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের বংশ আছে। এইরূপ অন্যত্রও অল্পসংখ্যক বৈশ্যগণ আছেন—তাঁহারা আধুনিক কালে আসিয়াছেন। সুবর্ণবাণিক্-দিগকে বৈশ্য বলিলেও বৈশ্যরা সংখ্যায় অল্প। বাণিজ্যস্থানেই কতকগুলি সুবর্ণবাণিক্ আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, ইহা ভিন্ন অন্য সিদ্ধান্ত করিবার কারণ নাই।

যখন আদিশূর পঞ্চ ব্রাহ্মণকে কান্যকুব্জ হইতে আনয়ন করেন, তখন বঙ্গদেশে সাড়ে সাত শত ঘর মাত্র ব্রাহ্মণ ছিলেন, এই প্রবাদ আছে। অদ্যাপি সেই আদিম ব্রাহ্মণদিগের সন্ততিগণকে সপ্তশতী বলে। আদিশূর পঞ্চ ব্রাহ্মণকে ৯৯৯ সম্বতে আনয়ন করেন। সে খ্রীঃ ৯৪২ শাল। অতএব দেখা যাইতেছে যে, দশম শতাব্দীতে গোড় রাজ্যে সাড়ে সাত শত ঘরের অধিক ব্রাহ্মণ ছিল না। এ সংখ্যা অতি অল্প; এক্ষণে অতি সামান্য পল্লীগ্ৰামে ইহার অধিক ব্রাহ্মণ বাস করেন। এক্ষণে যে ইংরেজেরা বঙ্গদেশে বাস করেন, তাঁহারা এই দশম শতাব্দীর ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অনেক বেশী।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিনটি আৰ্য্যজাতি। ইহারাই উপবীত ধারণ করে। শূদ্র অনার্য্য জাতি। যেখানে দেখিতেছি, বাঙ্গালায় ক্ষত্রিয় আইসে নাই, বৈশ্যগণ কদাচিৎ বাণিজ্যার্থ আসিয়াছিল, এবং ব্রাহ্মণও একাদশ শতাব্দীতে অতি বিরল, তখন বলা যাইতে পারে যে, এই বাঙ্গালা নয় শত বৎসর পূর্বে আৰ্য্যভূমি ছিল না, অনার্য্যভূমি ছিল, এবং এক্ষণে ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংরেজদিগের যে সম্বন্ধ, বাঙ্গালার সহিত আৰ্য্যদিগের সেই সম্বন্ধ ছিল।

এক্ষণে দেখা যাউক, কতকাল হইল, বাঙ্গালায় প্রথম ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন। তজ্জন্য আদিশূর ও বল্লালসেনে যে কত বৎসরের ব্যবধান, তাহা দেখা আবশ্যিক।

আদিশূর যে পঞ্চ ব্রাহ্মণকে কান্যকুব্জ হইতে আনয়ন করেন, তাঁহাদিগের বংশসম্ভূত কয়েক ব্যক্তিকে বল্লালসেনে কোলীন্য প্রদান করেন। প্রবাদ আছে যে, বল্লালসেনে আদিশূরের অব্যবহিত পরবর্তী রাজা। কিন্তু এ কিম্বদন্তী যে অমূলক এবং সত্যের বিরোধী, ইহা বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র পূর্বেই সপ্রমাণীকৃত করিয়াছেন। এক্ষণে পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি তাহা পুনঃ-প্রমাণিত করিয়াছেন। ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে একজন শ্রীহর্ষ। তিনি মুখোপাধ্যায়দিগের আদিপুরুষ। বল্লালসেনে তাঁহার বংশে উৎসাহকে কোলীন্য প্রদান করেন। উৎসাহ শ্রীহর্ষ হইতে দ্বয়োদশ পুরুষ।* আদিশূরের পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে দক্ষ একজন। দক্ষ চট্টোপাধ্যায়দিগের

* (১) শ্রীহর্ষ, (২) শ্রীগর্ভ, (৩) শ্রীনিবাস, (৪) আরব, (৫) ত্রিবিক্রম, (৬) কাক, (৭) ধাঁধ, (৮) জলাশয়, (৯) বাণেশ্বর, (১০) গৃহ, (১১) মাধব, (১২) কোলাহল, (১৩) উৎসাহ।

বাংকম রচনাবলী

আদিপুরুষ। তাঁহার বংশোদ্ভূত বহুরূপকে বল্লালসেন কোলীন্য প্রদান করেন। বহুরূপ দক্ষ হইতে অষ্টম পুরুষ।* ভট্টনারায়ণ, ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের একজন। বল্লালসেন তদ্বংশীয় মহেশ্বরকে কোলীন্য প্রদান করেন। মহেশ্বর ভট্টনারায়ণ হইতে দশম পুরুষ, ইত্যাদি।

আদিশূর ষাঁহাদিগকে কান্যকুব্জ হইতে আনিয়াছিলেন, বল্লাল তাঁহার পরবর্তী রাজা হইলে, কখনও তাঁহাদিগের অষ্টম, দশম বা ত্রয়োদশ পুরুষ দেখিতে পাইতেন না। বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন, বারেন্দ্রদিগের কুলশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, বল্লাল আদিশূরের দৌহিত্র হইতে অধস্তন সপ্তম পুরুষ। ইহাই সম্ভব।

ক্ষিতীশবংশাবলীতে লিখিত আছে যে, ৯৯৯ অব্দে আদিশূর পঞ্চ ব্রাহ্মণকে আনয়ন করেন। বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন যে, এই অব্দ শকাব্দ নহে—সংবৎ। কিন্তু সম্বতের সঙ্গে খ্রীষ্টাব্দের হিসাব করিতে গিয়া তিনি একটি বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তিনি লেখেন—

“আদিশূর খ্রীঃ দশম শতাব্দীর শেষভাগে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন; এবং খ্রীঃ একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অর্থাৎ ১০৫৬ অব্দে পুত্রোষ্ঠি যাগ করেন।

প্রমাণ,	এক্ষণে	সংবৎ—	১৯০২
	—খ্রীষ্টীয়	শক—	১৮৭৫

সংবতের সহিত খ্রীঃ অন্তর ৫৭

এখন দেখা যাইতেছে যে ৯৯৯ সংবৎ, অর্থাৎ যে বর্ষে পুত্রোষ্ঠি যাগ হয়, সে বৎসর খ্রীঃ ১০৫৬।—১৬১ পৃষ্ঠা।

বিদ্যানিধি মহাশয়ের ভুল এই যে, সংবতে ৫৭ বৎসর যোগ করিয়া খ্রীষ্টাব্দ বাহির করিতে হয় না; কেন না, খ্রীঃ অব্দ হইতে সংবৎ পূর্বাঙ্গামী, সংবৎ হইতে ৫৭ বৎসর বাদ দিয়া খ্রীঃ অব্দ পাইতে হইবে। যোগ করিলে, এখন ১৯০২ + ৫৭ = ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দ হয়। বাদ দিলেই ১৯০২ - ৫৭ = ১৮৪৫ খ্রীঃ অব্দ পাওয়া যায়। সেইরূপ ৯৯৯ সংবতে, ৯৯৯ - ৫৭ = ৯৪২ খ্রীষ্টাব্দ। এই ভুল বিদ্যানিধি মহাশয় স্থানান্তরে সংশোধিতও করিয়াছেন, কিন্তু তন্নিবন্ধন তাঁহাকে অনেক অনর্থক পরিশ্রম করিতে হইয়াছে।

ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে “সামান্যাকারে অব্দ শব্দ লিখিত আছে। সুতরাং ঐ অব্দ পদের শক্তি শক ও সংবৎ উভয়েতেই যাইতে পারে।” বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন, উহা সংবৎ ধরিতে হইবে, কিন্তু তিনি এইরূপ অভিপ্রায় করার যে কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা তত পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত না হইলেও, কথাটি ন্যায্য বোধ হয়। এ স্থলে আমরা বিজ্ঞ পুরাণতত্ত্ববিৎ বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, বিচার নির্দেশ হইতে পারে।

বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন, সময়প্রকাশ গ্রন্থে লিখিত আছে যে, বল্লালসেন দানসাগর নামক গ্রন্থের ১০১৯ শকে রচনা সমাপ্ত করেন। ১০১৯ শকাব্দ—১০৯৭ খ্রীঃ অব্দ। তাদৃশ বৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়নে অনেক দিন লাগিয়া থাকিবে। অতএব বল্লালসেন তাহার পূর্বে অনেক বৎসর হইতে জীবিত ছিলেন, এমত বিবেচনা করা যায়। আইন আকবরীতে যাহা লেখা আছে, তাহাতে জানা যায়, বল্লালসেন ১০৬৬ খ্রীঃ অব্দে রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। আইন আকবরীর কথা ও রাজেন্দ্রলাল বাবুর কথায় ঐক্য দেখা যাইতেছে।

আদিশূরের সময়, রাজেন্দ্রলাল বাবু নিজবংশের পর্য্যায় হিসাব করিয়া, নিরূপণ করিয়াছেন। তাঁহার গণনায় ৯৬৪ হইতে ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ আদিশূরের সময় নিরূপিত হইয়াছে। এ গণনা ক্ষিতীশবংশাবলীর ৯৯৯ সঙ্গে ঠিক মিলিতেছে না। অন্ততঃ ২২ বৎসরের প্রভেদ হইতেছে: কেন না, ৯৯৯ সংবতে ৯৪২ খ্রীষ্টাব্দ। এ প্রভেদ অতি অল্প। এ দিকে শকাব্দ ধরিলে ৯৯৯ শকাব্দে ১০৭৭ খ্রীষ্টাব্দ পাই। তখন বল্লাল সিংহাসনারূঢ়, ইহা উপরে দেখা গিয়াছে। সুতরাং শক নহে—সংবৎ।

অতএব আদিশূরের পুত্রোষ্ঠিযাগার্থ পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমন হইতে, বল্লালের গ্রন্থসমাপন

* (১) দক্ষ, (২) সুসেন, (৩) মহাদেব, (৪) হলধর, (৫) কৃষ্ণদেব, (৬) বরাহ, (৭) (৮) বহুরূপ।

বিবিধ প্রবন্ধ—বংশে ব্রাহ্মণাধিকার

পর্যন্ত ১৫৫ বৎসর পাওয়া যাইতেছে। উপরে বলা হইয়াছে যে, বল্লাল আদিশূরের দ্রোহিত্রের অধস্তন সপ্তম পুরুষ; তাহা হইলে আদিশূর হইতে বল্লাল নবম পুরুষ। আদিশূরের সমকালবর্তী দক্ষ হইতে তদ্বংশজাত, এবং বল্লালের সমকালবর্তী বহুরূপ অষ্টম পুরুষ। আদিশূরের সমকালবর্তী বেদগর্ভ হইতে তদ্বংশজাত, এবং বল্লালের সমকালবর্তী শিশু ৮ম পুরুষ; তদ্রূপ ভট্টনারায়ণ হইতে মহেশ্বর ১০ম পুরুষ; এবং শ্রীহর্ষ হইতে উৎসাহ ১৩শ পুরুষ। কেবল ছান্দড় হইতে কান্দ ৪র্থ পুরুষ। গড়ে আদিশূর হইতে বল্লাল পর্যন্ত নয় পুরুষই পাওয়া যায়।

প্রচলিত রীতি এই যে, ভারতবর্ষীয় ঐতিহাসিক গণনায় এক পুরুষে ১৮ বৎসর পড়তা করা হইয়া থাকে। তাহা হইলে নয় পুরুষে ১৬২ বৎসর পাওয়া যায়। আমরা অন্য হিসাবে বল্লাল ও আদিশূরে ১৫৫ বৎসরের প্রভেদ পাইয়াছি। এ গণনার সঙ্গে, সে গণনা মিলিতেছে। অতএব এ ফল গ্রাহ্য। বল্লাল আদিশূরের সাক্ষ্যে শতাব্দী পরগামী।

বিদ্যানিধি মহাশয়ের গ্রন্থে জানা যায় যে, যখন বল্লাল কোলীনিয় সংস্থাপন করেন, তখন আদিশূরানীত পঞ্চ ব্রাহ্মণগণের বংশে একাদশ শত ঘর ব্রাহ্মণ ছিল। দেড় শত বৎসরে ঈদৃশ বংশবৃদ্ধি বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু যদি বিবেচনা করা যায় যে, তৎকালে বহুবিবাহপ্রথা বিশেষ প্রকারে প্রচলিত ছিল, তাহা হইলে ইহা বিস্ময়কর বোধ হইবে না। বহুবিবাহ যে বিশেষরূপেই প্রচলিত ছিল, তাহা ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের পুত্রসংখ্যার পরিচয় লইলেই বিশেষ প্রকারে বুঝা যাইবে। বিদ্যানিধি মহাশয়ের ধৃত মিশ্র গ্রন্থের বচনে দেখা যায় যে, ভট্টনারায়ণের ১৬ পুত্র, দক্ষের ১৬ পুত্র, বেদগর্ভের ১২ পুত্র, শ্রীহর্ষের ৪ পুত্র, এবং ছান্দড়ের ৮ পুত্র। মোটে পাঁচ জনে বাঙ্গালায় ৫৬ পুত্র রাখিয়া পরলোকগমন করিয়াছিলেন। এই ৫৬ পুত্র ৫৬টি গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া তথায় বাস করেন, সেই ৫৬ গ্রাম হইতে রাঢ়ীয়দিগের ৫৬টি গাঁই। যখন দেখা যাইতেছে যে, একপুরুষ মধ্যে ৫ ঘর হইতে ৫৬ ঘর অর্থাৎ ১১ গুণ বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল, তখন নয় পুরুষের শতগুণ বৃদ্ধি নিতান্ত সম্ভব। বরং অধিক; কেন না, পঞ্চ ব্রাহ্মণ অধিক বয়সে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন, অতএব তাঁহারা বাঙ্গালায় সুব্রাহ্মণ বৃদ্ধি করিবার তাদৃশ সময় পান নাই, কিন্তু তাঁহাদিগের বংশাবলী কৈশোর হইতে পিতৃ স্বীকার করিতেন, ইহা সহজে অনুমেয়।

সুবিখ্যাত ফুলের মুখটি নীলকণ্ঠ ঠাকুরের বংশ বাঙ্গালায় কত বিস্তৃত, তাহা রাঢ়ীয় কুলীনগণ জানেন। এক একখানি ক্ষুদ্র গ্রামেও পাঁচ সাত ঘর পাওয়া যায়; কোন কোন বড় গ্রামে তাঁহাদিগের সংখ্যা অগণ্য। যে বলিবে যে, সমগ্র বাঙ্গালায় একাদশ শত ঘর মাত্র নীলকণ্ঠ ঠাকুরের সন্তান বাস করে, সে অন্যায় বলিবে না। কিন্তু কয় পুরুষ মধ্যে এই বংশবৃদ্ধি হইয়াছে? বহুসংখ্যক নীলকণ্ঠ ঠাকুরের সন্তানের সঙ্গে বর্তমান লেখকের পরিচয়, বন্ধুত্ব এবং কুটুম্বিতা আছে। তাঁহারা নীলকণ্ঠ হইতে কেহ সপ্তম, কেহ অষ্টম, কেহ নবম পুরুষ। যদি সাত আট পুরুষে এরূপ সংখ্যাবৃদ্ধি, একজন হইতে হইতে পারে, তবে দেড় শত বৎসরে ৫ জন হইতে একাদশ শত ঘর হওয়া নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় কথা নহে।

এক্ষণে বোধ হয় চারিটি বিষয় বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া স্থির হইতেছে।

১ম। আদিশূর পঞ্চ ব্রাহ্মণকে আনিবার পূর্বে এতদ্দেশে সাড়ে সাত শত ঘর ব্যতীত ব্রাহ্মণ ছিল না।

২য়। ৯৪২ খ্রীঃ অব্দে আদিশূর ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণকে আনয়ন করেন।

৩য়। তাহার দেড় শত বৎসর পরে বল্লালসেন ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশসম্বৃত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কোলীনিয় প্রচলিত করেন।

৪র্থ। এ দেড় শত বৎসরে ঐ পাঁচ ঘর ব্রাহ্মণে এগার শত ঘর হইয়াছিল।

যদি দেড় শত বৎসরে পাঁচ জন ব্রাহ্মণের বংশে একাদশ শত ঘর হইয়াছিল, তবে কত কালে বঙ্গদেশের আদিম ব্রাহ্মণগণের বংশ সাড়ে সাত শত ঘর হইয়াছিল।

যদি সপ্তশতাব্দীদিগের আদিপুরুষও পাঁচ জন ছিলেন এবং যদি তাঁহারাও কান্যকুব্জীয়দিগের ন্যায় বহুবিবাহপরায়ণ ছিলেন, ইহা বিবেচনা করা যায়, তবে বাঙ্গালায় প্রথম ব্রাহ্মণদিগের আগমনকাল হইতে শত বৎসর মধ্যে তাঁহাদের বংশে এই সাড়ে সাত শত ঘর ব্রাহ্মণের জন্ম অসম্ভব নহে।

বঙ্কিম রচনাবলী

সপ্তশতীদিগের পূর্বপুরুষগণও বহুবিবাহপরায়ণ ছিলেন, ইহা অনুমানে দোষ হয় না। কেন না, বহুবিবাহ তৎকালে বিলক্ষণ প্রচলিত দেখা যাইতেছে। তবে এমন হইতে পারে যে, কান্যকুব্জীয়গণ বিশেষ সুরাক্ষণ বলিয়া সপ্তশতীগণও তাঁহাদিগকে কন্যাদানে উৎসুক হইতেন, এই জন্য তাঁহারা অনেক বিবাহ করিয়াছিলেন; সপ্তশতীগণের পূর্বপুরুষের তত বিবাহ করিবার কোন কারণ ছিল না। তেমন এদিকে পাঁচ জন মাত্র যে তাঁহাদিগের আদিপুরুষ, ইহা অসম্ভব। বরং ব্রাহ্মণ আসিতে একবার আরম্ভ হইলে, ক্রমে ক্রমে, একত্রে বা একে একে রাজগণের প্রয়োজনানুসারে বা রাজপ্রসাদ লাভাকাঙ্ক্ষায় অধিকসংখ্যক আসাই সম্ভব।

অতএব কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আসিবার পূর্বে দুই এক শত বৎসরের মধ্যেই বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণদিগের প্রথম বাস, বিচারসঙ্গত বোধ হইতেছে। অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে বাঙ্গালা ব্রাহ্মণশূন্য অনার্যভূমি ছিল। পূর্বে কদাচিত্ কোন ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে যদি আসিয়া বাস করিয়া থাকেন, তাহা গণনীয়ের মধ্যে নহে। অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণসমাজ ছিল না।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, আদিশূরের সময়ে যে কেবল সাড়ে সাত শত ঘর মাত্র ব্রাহ্মণ দেখিতেছি, তাহার কারণ এমত নহে যে, ব্রাহ্মণেরা স্বল্পদিন মাত্র বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্যই ব্রাহ্মণসংখ্যার অল্পতার কারণ। কিন্তু বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের সেরূপ প্রাবল্য ছিল, মগধ কান্যকুব্জাদি দেশেও তদ্রূপ বা তদধিক ছিল। বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্য হেতু যদি বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণসংখ্যা স্বল্পীভূত হইয়াছিল, তবে সমগ্র ভারতবর্ষেও সেই কারণে ব্রাহ্মণবংশ লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, স্বীকার করিতে হইবে। কোন কোন আপত্তিকারী তাহাও স্বীকার করিতে পারেন। বলিতে পারেন যে, তখন সমস্ত ভারতেই অল্প ব্রাহ্মণ ছিল—এক্ষণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, যদি পূর্বে হইতে বঙ্গে ব্রাহ্মণের বাস ছিল, তবে আদিশূরের পূর্বকালজাত কোন গ্রন্থে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় না কেন? বরং প্রাচীন গ্রন্থাদিতে তথায় ব্রাহ্মণের বাস না থাকারই নিদর্শন পাওয়া যায় কেন? আমরা পাঠকদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে, অষ্টম শতাব্দীর বা আদিশূরের পূর্ববর্তী কোন বঙ্গবাসী গ্রন্থকারের নাম তাঁহারা স্মরণ করিয়া বলিতে পারেন? কুল্লুকভট্ট, জয়দেব, গোবর্দ্ধনাচার্য, হলায়ুধ, উদয়নাচার্য প্রভৃতি যাহার নাম করিবেন, সকলই আদিশূরের পরবর্তী। ভট্টনারায়ণ ও শ্রীহর্ষ তাঁহার সমকালিক। প্রাচীন আর্ষ্যজাতি যেখানে বাস করিয়াছেন, সেইখানেই ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগের পাণ্ডিত্যের চিহ্নস্বরূপ গ্রন্থাদি রাখিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালায় যখন ব্রাহ্মণ ছিলেন না, তখনকার প্রণীত পুস্তকাদিও নাই।

আমরা অবশ্য ইহা স্বীকার করি যে, অষ্টম শতাব্দীর পূর্বেও আর্ষ্য রাজকুল বাঙ্গালায় ছিল, এবং তাঁহাদিগের আনুষঙ্গিক ব্রাহ্মণও থাকিতে পারেন। সেরূপ অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণ আমাদের আলোচনার বিষয় নহে। সেরূপ সকল জাতিই সকল দেশে থাকে। কালিফার্নিয়াতেও অনেক চীন আছে।

আমরা যে কথা সপ্রমাণ করিবার জন্য যত্ন পাইয়াছি, তাহা যদি সত্য হয়, তবে অনেকেই মনে করিবেন যে, বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর বড় লাঘব হইল। আমরা আধুনিক বলিয়া বাঙ্গালী-জাতির অগৌরব করা হইল; আমরা প্রাচীন জাতি বলিয়া আধুনিক ইংরেজদিগের সম্মুখে স্পর্ধা করি—তা না হইয়া আমরাও আধুনিক হইলাম।

আমরা দেখিতেছি না যে, অগৌরব কিছুর হইল। আমরা সেই প্রাচীন আর্ষ্যজাতিসম্ভূতই রহিলাম—বাঙ্গালায় যখন আসি না কেন, আমাদের পূর্বপুরুষগণ সেই গৌরবান্বিত আর্ষ্য। বরং গৌরবের বৃদ্ধিই হইল। আর্ষ্যগণ বাঙ্গালায় তাদৃশ কিছু মহৎ কীর্তি রাখিয়া যান নাই—আর্ষ্যকীর্তিভূমি উত্তর পশ্চিমাঞ্চল। এখন দেখা যাইতেছে যে, আমরা সে কীর্তি ও যশেরও উত্তরাধিকারী। সেই কীর্তিমন্ত পুরুষগণই আমাদের পূর্বপুরুষ। দোবে, চোবে, পাঁড়ে, তেওয়ারীর মত আমরাও ভারতীয় আর্ষ্যগণের প্রাচীন যশের ভাগী বটে।

আমাদের আর একটি কলঙ্কের লাঘব হইতেছে। আদিশূরের সময়ে মোটে সাড়ে সাত শত ঘর ব্রাহ্মণ ছিল। বঙ্গালের সময় সেই সাড়ে সাত শত ঘরের বংশ এবং পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশ একাদশ

* বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার প্রথম প্রস্তাব দেখ।

বিবিধ প্রবন্ধ—বাঙ্গালা শাসনের কল

শত ঘর ছিল। ক্ষত্রিয় বৈশ্য এখনও যখন অতি অল্পসংখ্যক, তবে তখন যে আরও অল্পসংখ্যক ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বল্লালের দেড় শত বৎসর পরে মুসলমানগণ বঙ্গজয় করেন। তখন বঙ্গীয় আর্ষাগণের সংখ্যা অধিক সহস্র নহে, ইহা অনুমেয়। তখনও তাঁহারা এদেশে ঔপনিবেশিক মাত্র। সুতরাং সম্পদশ অশ্বারোহী কত্বেক বঙ্গজয়ের যে কলঙ্ক, তাহা আর্ষাদিগের কিছুর কমিতেছে বটে।

তখনও বঙ্গীয় আর্ষাগণের অভ্যুদয়ের সময় হয় নাই। এখন সে সময় বোধ হয় উপস্থিত। বাহুবলে না হউক, বুদ্ধিবলে যে বাঙ্গালী অচিরে পৃথিবীমধ্যে যশস্বী হইবে, তাহার সময় আসিতেছে।

আমরা উপরে ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, কায়স্থগণ সম্বন্ধেও তাহা বর্তে। বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন, কায়স্থগণ সংশুদ্ধ অর্থাৎ বর্ণসঙ্কর নহে। আমাদিগের বিবেচনায় তাহারা বর্ণসঙ্কর বটে। তদ্বিষয়ে বঙ্গদর্শনে ইতিপূর্বে অনেক বলা হইয়াছে। এক্ষণে আর কিছুরই বলিবার প্রয়োজন নাই। সঙ্করতা হেতু কায়স্থগণ আর্ষাবংশসম্ভূত বটে। আদিশূরের সময় পণ্ড ব্রাহ্মণের সঙ্গে পাঁচ জন কায়স্থও কান্যকুব্জ হইতে আসিয়াছিলেন। তৎপূর্বে যেমন বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ ছিল, সেইরূপ কায়স্থও ছিল, কিন্তু অল্পসংখ্যক। এক্ষণে কায়স্থগণ বঙ্গদেশের অলঙ্কারস্বরূপ।

বাঙ্গালা শাসনের কল*

পূর্ববঙ্গবাসী কোন বয়, কলিকাতানিবাসী একটি কন্যা বিবাহ করিয়া গৃহে লইয়া যান। কন্যাটি পরমাসুন্দরী, বুদ্ধিমতী, বিদ্যাবতী, কম্মিষ্ঠা এবং সুশীলা। তাঁহার পিতা মহা ধনী, নানা রঙ্গে ভূষিতা করিয়া কন্যাকে স্বশূরগৃহে পাঠাইলেন। গনে ভাবিলেন, আমার মেয়ের কোন দোষ কেহ বাহির করিতে পারিবে না। সঙ্গে লোক ফিরিয়া আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন হে! বাঙ্গালেরা মেয়ের কোন দোষ বাহির করিতে পারিয়াছে?” সঙ্গে লোক বলিল, “আজ্ঞে হাঁ—দোষ লইয়া বড় গণ্ডগোল গিয়াছে।” বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—“সে কি? কি দোষ?” ভৃত্য বলিল, “বাঙ্গালেরা বড় নিন্দা করিয়াছে, মেয়ের কপালে উল্কি নাই।” আমরা এই বঙ্গদর্শনে কখনও সর্ জর্জ্ কাম্বেল্ সাহেব সম্বন্ধে কোন কথা বলি নাই। যাঁহার নিন্দা তিন বৎসরকাল বাঙ্গালাপত্রের জীবনস্বরূপ ছিল, তাঁহার কোন উল্লেখ না থাকাতে আমাদের ভয় করে যে, পাছে কেহ বলে যে, বঙ্গদর্শনের উল্কি নাই। আমরা অদ্য বঙ্গদর্শনকে উল্কি পরাইতে প্রবৃত্ত হইলাম।

তবে এই উল্কি বড় সামান্য নহে। যে পত্র বা পত্রিকা (কোন্‌গুঁলি পত্র আর কোন্‌গুঁলি পত্রিকা, তাহা আমরা ঠিক জানি না—কি করিলে পত্র পত্রিকা হইয়া যায়, তাহাও অবগত নহি) একবার কপালে এই উল্কি পরিয়াছেন, তিনি বঙ্গদেশ মোহিয়াছেন, মুগ্ধ হইয়া বঙ্গীয় পাঠকগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছে এবং সাম্বৎসরিক অগ্রিম গুল্যে বরণ করিয়া তাঁহাকে ঘরে তুলিয়াছে। যে এই উল্কি পরে, তাহার অনেক সুখ।

এক্ষণে সর্ জর্জ্ কাম্বেল্ এতদ্দেশ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন—ইহাতে সকলেই দুঃখিত। এ পৃথিবীতে পরিনিন্দা প্রধান সুখ—বিশেষ যদি নিন্দিত ব্যক্তি উচ্চশ্রেণীস্থ এবং গুণবান্ হয়, তবে আরও সুখ। সর্ জর্জ্ কাম্বেল্ গুণবান্ হউন বা না হউন, উচ্চশ্রেণীস্থ বটে। তাঁহার নিন্দায় যে সুখ, তাহাতে এক্ষণে বঙ্গদেশের লোক বিপ্লিত হইল। ইহার অপেক্ষা আর গুরূতর দুর্ঘটনা কি হইতে পারে। এই যে গুরূতর দর্ভিক্ষবহিতে দেশ দগ্ধ হইতেছিল, তাহাতেও আমরা কোন মতে প্রাণ ধারণ করিতেছিলাম, খবরের কাগজ চলিতেছিল, বাঙ্গালী বাবু গল্পের মজলিসে অশ্লীল গল্প ছাড়িয়া, সর্ জর্জ্‌র নিন্দা করিয়া বোতল শেষ করিতেছিলেন। কিন্তু এক্ষণে? হায়! এক্ষণে কি হইবে!

এইরূপ সর্বজননিন্দাহঁ হওয়া সচরাচর দেখা যায় না। অনেকে বলিবেন, সর্ জর্জ্

* “সর্ উইলিয়ম্ গ্রে ও সর্ জর্জ্ কাম্বেল্” ইতি শীর্ষক একটি প্রবন্ধ ১২৮২ সালের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার এক অংশ মাত্র এখানে গৃহীত হইল।

বাংকম রচনাবলী

কাম্বেলের অসাধারণ দোষ ছিল, এই জন্যই তিনি এইরূপ অসাধারণ নিন্দনীয় হইয়াছিলেন। আমাদের বিশ্বাস আছে, যে এইরূপ সর্বজননিন্দনীয় হয়, যাহার নিন্দায় সকলের তুষ্টি জন্মে, সে হয় অসাধারণ দোষে দোষী বা অসাধারণ গুণে গুণবান্—নয় ত দুইই। জিজ্ঞাস্য, সর্ জর্জ্ কাম্বেল্, অসাধারণ দোষে দোষী, না অসাধারণ গুণে গুণবান্ বলিয়া তাঁহার এই নিন্দাতিশয়া হইয়াছিল?

তাঁহার পূর্বগামী শাসনকর্তা সর্ উইলিয়ম্ গ্রে। সর্ উইলিয়ম্ গ্রে'র ন্যায় কোন লেঃ গবর্ন'র প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়েন নাই। সর্ জর্জ্ কাম্বেল্ ও সর্ উইলিয়ম্ গ্রে'র এই ভাগ্য-তারতম্য কোন্ দোষে বা কোন্ গুণে? কোন্ গুণে সর্ উইলিয়ম্ সকলের প্রিয়, কোন্ দোষে সর্ জর্জ্ সকলের অপ্রিয়?

যাঁহারা এই কথার মীমাংসা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে একটা কথা বুঝাইতে হয়। এই ব্রিটিশভারতীয় শাসনপ্রণালী দূর হইতে দেখিতে বড় জাঁক, শূন্যে ভয়ানক, বৃষ্টিতে বড় গোল—ইহার প্রকৃতি কি প্রকার? এক লেঃ গবর্ন'র কর্তব্য যে এই বৃহৎ রাজ্য শাসিত হয়, সে কোন্ রীতি অবলম্বন করিয়া?

সে রীতি দুই প্রকার। একটি রীতি একটি সামান্য উদাহরণের দ্বারা বুঝাইব। মনে কর, বাঁধের কথা উপস্থিত। কমিশ্যনরের রিপোর্টে হউক, বোর্ডের রিপোর্টে হউক, ইঞ্জিনিয়ারদিগের রিপোর্টে হউক, সম্বাদপত্রে হউক, লেঃ গবর্ন'র জানিলেন যে, নদীতীরস্থ প্রাচীন বাঁধসকল রক্ষিত হইতেছে না—তাহার উপায় করা কর্তব্য। তখন লেঃ গবর্ন'রের হুকুম হইল যে, রিপোর্ট তলব কর। এই হুকুমে যদি কোন বিশেষ গুণশালিত্ব বা যোগ্যতা থাকে, তবে সে গুণশালিত্ব বা যোগ্যতা লেঃ গবর্ন'রের। সেক্রেটারি সাহেব হুকুম পাইয়া, বোর্ডে চিঠি লিখিলেন—তাঁহার চিঠিতে কথাটা একটু বিস্তৃতি পাইল—তিনি বলিলেন, ইহার বিশেষ অবস্থা জানিবে—অধীনস্থ কর্মচারীদের অভিপ্রায় কি, তাহা লিখবে, ইহার কিরূপ উপায় হইতে পারে, তাহা লিখবে। বোর্ড, ঐ পত্রখানির একাদশ খণ্ড অতি পরিষ্কার অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া, একাদশ কমিশ্যনরের নিকট পাঠাইলেন। একাদশ কমিশ্যনর অনুলিপি প্রাপ্ত হইয়া, তাহার কোণে পেন্সিলে প্রাপ্তির তারিখ লিখিয়া বাঞ্ছা ফেলিলেন, তাঁহার গুরুতর কর্তব্য কার্য সমাপ্ত হইল। বাঞ্ছা প্রাচীন প্রথানুসারে যথাসময়ে চাপরাশি-স্কন্ধে আরোহণ করিয়া, কেরাণীর নিকট পৌঁছিল। কেরাণী তাহার আর এক এক খণ্ড পরিষ্কার অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া, সাত দিনের মিয়াদ লিখিয়া দিয়া, কালেক্টরদিগের নিকট পাঠাইলেন। যে পথে মহাজন যায়, সেই পথে—দোন্দু প্রচণ্ড প্রতাপান্বিত শ্রীল শ্রীযুক্ত কালেক্টর বাহাদুর, চুরট খাইতে খাইতে চিঠির কোণে লিখিলেন “সব্‌ডিভিসন্ ও ডেপুটিগণ বরাবর।” চিঠি এইরূপে বড় ডাকঘর হইতে মেজো ডাকঘরে, মেজো ডাকঘর হইতে ছোট ডাকঘরে, এবং তথা হইতে শেষে আটচালানিবাসী বোতামশূন্য চাপকানধারী কাল-কোল নাদুস-নাদুস ডিপুটি বাহাদুরের ছিন্নপাদুকামণ্ডিত শ্রীপাদপদ্মযুগলে মধুলুদ্ধ ভ্রমরের ন্যায় আসিয়া পড়িল। ডিপুটি বাহাদুরের উপরস্থ মহাত্মাদিগের অনুকরণ করিয়া, ইংরেজি চিঠির বাঙ্গালা পরওয়ানা করিয়া সব্‌ইন্স্পেক্টরগণের নিকট ফেলফোর রিপোর্ট তলব করিলেন—সব্‌ইন্স্পেক্টর পরওয়ানা কনস্টেবলের হাওয়লা করিল—কনস্টেবল যে গ্রামে বাঁধ, সেইখানে কাল কোর্তা, কাল দাড়ি এবং মোটা রুল লইয়া দর্শন দিয়া এক অশ্রুভাবে শীর্ণ ক্লিষ্ট চৌকিদারকে ধরিল। ধরিয়াই জিজ্ঞাসা করিল যে, “তোদের গাঁয়ের বাঁধ থাকে না কেন রে?” চৌকিদার ভীত হইয়া বলিল, “আজ্ঞা, জমীদারে মেরামত করে না, আমি গরিব মানুষ কি করিব?” কনস্টেবল তখন জমীদারী কাছারিতে পদরেণু অর্পণ করিয়া গোমস্তাকে কিছু তম্বী করিলেন। গোমস্তা জমীদারী খাতায় পাঁচ টাকা খরচ লিখিয়া কনস্টেবল বাবুকে দেড় টাকা পারিতোষিক দিয়া বিদায় করিলেন। কনস্টেবল আসিয়া সব্‌ইন্স্পেক্টর সমক্ষে রিপোর্ট করিলেন, “বাঁধ সব বেমেরামত—জমীদার মেরামত করে না—জমীদার মেরামত করিলেই মেরামত হইতে পারে।” ডিপুটি বাহাদুর লিখিলেন, “বাঁধ সব বেমেরামত,—জমীদারেরা মেরামত করে না—তাঁহারা মেরামত করিলেই হয়।” কালেক্টর বাহাদুর সেই সকল কথা লিখিলেন, অধিকন্তু “এক্ষণে জমীদারদিগকে বাঁধ মেরামত করিতে বাধ্য করা উচিত।” কমিশ্যনর সেই সকল কথা লিখিয়া বোর্ডে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এক্ষণে কি প্রকারে জমীদার বাঁধ মেরামত করিতে বাধ্য হইতে পারে?” বোর্ড, তত্তদুক্তি পুনরুক্তি করিয়া,

বিবিধ প্রবন্ধ—বঙ্গালা শাসনের কল

একটা যাহা হয় উপায় নির্দিষ্ট করিলেন। সেক্রেটারি সাহেব সেই সকল কথা সাজাইয়া লিখিয়া এক রিজলিউসনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া পাঠাইলেন, লেঃ গবর্নর সাহেব সম্মত হইয়া তাহাতে দস্তখত করিয়া দিলেন। আজ্ঞা দেশে প্রচারিত হইল; লেঃ গবর্নর বাহাদুরের যশ দেশবিদেশে ঘোষিল। যাহারা মিত্রপক্ষ, তাহারা গবর্নর বাহাদুরের প্রশংসা করিতে লাগিল—শত্রুপক্ষ নানাজাতীয় ইংরেজী বাঙ্গালায় তাহাকে গালি পাড়িতে লাগিল। নষ্টের গোড়া চোর্কিদার নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে কোদালি পাড়িতে লাগিল।

বাস্তবিক যে এইরূপ কোন প্রকৃত ঘটনা ঘটিয়াছে, এমত নহে। একটি কল্পিত ঘটনা অবলম্বন করিয়াই এ সকল কথা লিখিলাম। এইরূপ যে সচরাচরই ঘটিয়া থাকে, এমত নহে। কিন্তু অনেক সময়ে ঘটে। সৌভাগ্যক্রমে যাহারা সুযোগ্য শাসনকর্তা, তাহারা এ প্রথা অবলম্বন করেন না, অযোগ্যেরা করিয়া থাকেন। এইরূপ কার্যপ্রণালীকে “কলে শাসন” বলা যাইতে পারে। ধর্ম্মের কলের ন্যায় শাসনের কলও বাতাসে নড়িয়া থাকে; কোন দিক্ হইতে কোন কর্ম্মচারীর রিপোর্টের বাতাস বা অন্য প্রকার ফাপি উঠিয়া কলে লাগিলে কল চলিতে আরম্ভ করে; তদন্তের হুকুম হইতে কলের দম আরম্ভ হইয়া বোর্ড কমিশ্যনর প্রভৃতি অধোধঃ পর্য্যায়ক্রমে ঘুরিয়া আবার লেঃ গবর্নর পর্য্যন্ত আসিয়া সহি মোহরের মঞ্জুরি মর্দিত করিয়া দিয়া বন্ধ হয়। যেমন কলের ধূতি, কলের সূতা প্রভৃতি সামগ্রী আছে, তেমনি কলের তৈয়ারি রাজাজ্ঞাও আছে।

যে লেঃ গবর্নর এইরূপ কলে শাসন করেন, তিনি সুমানুষ হইলে হইতে পারেন; তন্মিত্ত তাহার বুদ্ধিমত্তা, যোগ্যতা বা অন্য কোন গুণের প্রশংসার কারণ দেখা যায় না। তিনি কখন আপন বুদ্ধির চালনা করেন না, কোন বিষয়ের সিদ্ধিবেচনা করিবার জন্য তাহাকে নিজে কণ্ট পাইতে হয় না। তিনি পরিশ্রম স্বীকার করিয়া কখনও কোন নূতন বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবেন না; পরিশ্রম স্বীকার করিয়া কোন বিষয়ের যথার্থ স্বয়ং মীমাংসা করেন না। তিনি শাসনযন্ত্রের একটি অংশ মাত্র—যখন রাজ্যের কল বাতাসে নড়িল, তখন তিনিও নড়িলেন, কলে চালিত হইয়া মঞ্জুরিলিপি সমেত সহিমোহর করিয়া দিয়া কলে থামিলেন। সেইরূপ ঘণ্টা পূর্ণ হইলে, ঘড়ির মূরদ, বাহির হইয়া, ঠংঠং করিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া আবার কলে মিশিয়া যায়।

সর্ উইলিয়ম্ গ্রে ও সর্ জর্জ্ কাম্বেলে প্রধান প্রভেদ এই যে, সর্ উইলিয়ম্ গ্রে কলে শাসন করিতেন, সর্ জর্জ্ কাম্বেল্ তাহা করিতেন না।

কলে শাসনের অনেক গুণ আছে। তাহার ফল ভাল হউক, মন্দ হউক, লোকের অসন্তোষের সম্ভাবনা অতি অল্প। যাহা পূর্বাপর চলিয়া আসিতেছে, তাহা নিতান্ত অনিষ্টকর হইলেও লোকে তাহাতে সন্তুষ্ট; পূর্বাপ্রচলিত রীতি অত্যন্ত অনিষ্টকারী হইলেও লোকে তাহার সংশোধনে অসন্তুষ্ট। পুরাতনের মন্দও ভাল, নূতনের ভালও মন্দ। কলের শাসন শাসনই নহে; যিনি কলে শাসন করেন, তিনি কিছু করেন না বলিলেই হয়। অতএব কলের শাসনে পুরাতনের কিঞ্চিৎমাত্র সংস্করণ ভিন্ন নূতন কখন ঘটে না। যাহা আছে, তাহাই প্রায় বজায় থাকে, যাহা নাই অথচ আবশ্যিক, প্রায় তাহা ঘটিয়া উঠে না। এজন্য লোকেরও অসন্তোষ জন্মে না; বিশেষ এদেশীয় লোক পুরাতনের অত্যন্ত অনুরাগী, নূতনে অত্যন্ত বিরক্ত।

সর্ উইলিয়ম্ গ্রে, কলে শাসন করিতেন, সূতরাং লোকের বড় প্রিয় ছিলেন। সর্ জর্জ্ কাম্বেল্ কলে শাসন করিতেন না, এজন্য লোকের বড় অপ্ৰিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। রাজ্যশাসন উভয়েরই উদ্দেশ্য; কিন্তু সর্ উইলিয়ম্ গ্রে উদ্দেশ্য ছিল কেবল শাসনের কল চালান; সর্ জর্জ্ কাম্বেলের উদ্দেশ্য, শাসনের উদ্দেশ্য সফল করা। এমত বলিতেছি না যে, সর্ জর্জ্ কাম্বেল্ সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার শাসনে সুফল ফলিয়াছে, সর্ উইলিয়ম্ গ্রে শাসনে কুফল ফলিয়াছে, এ কথা বলাও আমাদের অভিপ্রায় নহে। কেবল বলিতে চাই যে, সর্ জর্জ্ কাম্বেল্ আপন বুদ্ধিতে চলিতেন, এ বৃহৎ রাজ্যশাসন জন্য চিন্তা করিতেন; উদ্দেশ্যগুলি স্থির করিয়া, তাহার সাধনে প্রাণপণে যত্ন করিতেন; যে কার্য কর্তব্য এবং সাধ্য বলিয়া বুদ্ধিতেন, কিছুতেই তাহা হইতে বিরত হইতেন না। সর্ উইলিয়ম্ গ্রে এ সকল কিছুই করিতেন না। যাহা হয়, আপনি হউক; কেহ কল টিপিয়া দেয় ত কল চলুক,—আমি কিছুই করিতেন না। নিজের বুদ্ধি, গ্রে সাহেব প্রায় খরচ করিতেন না; জমার অঙ্কে কিছু ছিল কি না বলা যায় না। নিজের যত্ন প্রায় তাহার কোন বিষয়ে ছিল না। তাহার দ্বারা যে

বিশ্বকম রচনাবলী

কিছু সংকার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে—তাহা কলে; তাহার দ্বারা যে কিছু অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহা কলে। তিনি উচ্চ শিক্ষার পোষক ছিলেন বলিয়া বাঙ্গালীমহলে বড় প্রশংসিত; কিন্তু বাঙ্গালীবাবুদিগের মত, আসল কথাটা কি, তাহা বুঝেন নাই; কেবল আর্টকিন্সন্ সাহেব কল টিপিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া কলের পুস্তলী সর্ উইলিয়ম্ গ্রে উচ্চশিক্ষার পোষকতা করিয়াছিলেন, ঘাড়ির মুরদ ঘাড়ি পিটিয়া দিয়া কলে লুকাইয়াছিলেন।

এমন নহে যে, সর্ জর্জ্ কাম্বেলের সময় কলে শাসন একেবারে ছিল না। শাসনের কল চিরকাল বজায় আছে, যিনি ইচ্ছা, তিনি শাসনকর্ত্তা হউন, সে কল মধ্যে মধ্যে বাতাসে নড়িবে; সকল শাসনকর্ত্তাকেই শাসনের কল চালাইয়া কতকগুলি কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। তবে সর্ জর্জ্ কাম্বেল্ কলে সিদ্ধ তত্ত্বগুলি অবশ্যগ্রাহ্য মনে করিতেন না; ইচ্ছানুসারে তাহা ত্যাগ করিতেন; ইচ্ছানুসারে তত্ত্বস্থানে নূতন সিদ্ধান্ত আদিষ্ট করিতেন। সর্ জর্জ্ কাম্বেল্ কল নিজে চালাইতেন, স্বয়ং কলের অংশ ছিলেন না।

বাঙ্গালার ইতিহাস*

সাহেবেরা যদি পাখী মারিতে যান, তাহারও ইতিহাস লিখিত হয়, কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাস নাই। গ্রীন্লণ্ডের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, মাওরি জাতির ইতিহাসও আছে, কিন্তু যে দেশে গোড়, তাম্বুলিাপ্ত, সপ্তগ্রামাদি নগর ছিল, যেখানে নৈষধচারিত ও গীতগোবিন্দ লিখিত হইয়াছে, যে দেশ উদয়নাচার্য্য, রঘুনাথ শিরোমণি ও চৈতন্যদেবের জন্মভূমি, সে দেশের ইতিহাস নাই। মার্শম্যান্, ষ্টুয়ার্ট্ প্রভৃতি প্রণীত পুস্তকগুলিকে আমরা সাধ করিয়া ইতিহাস বলি; সে কেবল সাধ-পুরাণ মাত্র।

ভারতবর্ষীয়দিগের যে ইতিহাস নাই, তাহার বিশেষ কারণ আছে। কতকটা ভারতবর্ষীয় জড়প্রকৃতির বলে প্রপীড়িত হইয়া, কতকটা আদৌ দস্যুজাতীয়দিগের ভয়ে ভীত হইয়া ভারতবর্ষীয়েরা ঘোরতর দেবভক্ত। বিপদে পড়িলেই দেবতার প্রতি ভয় বা ভক্তি জন্মে। যে কারণেই হউক, জগতের যাবতীয় কস্ম' দৈবানুকম্পায় সাধিত হয়, ইহা তাহাদিগের বিশ্বাস। ইহলোকের যাবতীয় অমঙ্গল দেবতার অপসন্নতায় ঘটে, ইহাও তাহাদিগের বিশ্বাস। এজন্য শূভের নাম "দৈব," অশূভের নাম "দুন্দৈব।" এরূপ মানসিক গতির ফল এই যে, ভারতবর্ষীয়েরা অত্যন্ত বিনীত; সাংসারিক ঘটনাবলীর কর্ত্তা আপনাদিগকে মনে করেন না; দেবতাই সর্ব্বত্র সাক্ষাৎ কর্ত্তা বিবেচনা করেন। এজন্য তাহারা দেবতাদিগেরই ইতিহাস কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত; পুরাণেতিহাসে কেবল দেবকীর্ত্তিই বিবৃত করিয়াছেন। যেখানে মনুষ্যকীর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে, সেখানে সে মনুষ্যগণ হয় দেবতার আংশিক অবতার, নয় দেবতানুগৃহীত; সেখানে দৈবের সংকীর্ত্তনই উদ্দেশ্য। মনুষ্য কেহ নহে, মনুষ্য কোন কার্য্যেরই কর্ত্তা নহে, অতএব মনুষ্যের প্রকৃত কীর্ত্তিবর্ণনে প্রয়োজন নাই। এ বিনীত মানসিক ভাব ও দেবভক্তি অস্মজ্জাতির ইতিহাস না থাকার কারণ। ইউরোপীয়েরা অত্যন্ত গর্বিত; তাহারা মনে করেন, আমরা যাহা করিতেছি, ইহা আমরাই কীর্ত্তি, আমরা যদি হাই তুলি, তাহাও বিশ্বসংসারে অক্ষয় কীর্ত্তি-স্বরূপ চিরকাল আখ্যাত হওয়া কর্ত্তব্য, অতএব তাহাও লিখিয়া রাখা যাউক। এই জন্য গর্বিত জাতির ইতিহাসের বাহুল্য; এই জন্য আমাদের ইতিহাস নাই।

অহঙ্কার অনেক স্থলে মনুষ্যের উপকারী; এখানেও তাই। জাতীয় গর্বে'র কারণ লৌকিক ইতিহাসের সৃষ্টি বা উন্নতি; ইতিহাস সামাজিক বিজ্ঞানের এবং সামাজিক উচ্চাশয়ের একটি মূল। ইতিহাসবিহীন জাতির দুঃখ অসীম। এমন দুই একজন হতভাগ্য আছে যে, পিতৃ-পিতামহের নাম জানে না; এবং এমন দুই এক হতভাগ্য জাতি আছে যে, কীর্ত্তিমন্ত পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তি অবগত নহে। সেই হতভাগ্য জাতিদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য বাঙ্গালী। উড়িয়াদিগেরও ইতিহাস আছে।

এক্ষণে বাঙ্গালার ইতিহাসের উদ্ধার কি অসম্ভব? নিতান্ত অসম্ভব নহে। কিন্তু সে কার্য্য

* প্রথমশিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস। শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, এম এ, বি এল, বিরিচিত।
জে জি চাট্টার্য্য এন্ড কোং কলিকাতা। বঙ্গদর্শন ১২৮১।

ক্ষমবান্ বাঙ্গালী অতি অল্প। কি বাঙ্গালী, কি ইংরেজ, সকলের অপেক্ষা যিনি এই দূরদূর কার্যের যোগ্য, তিনি ইহাতে প্রবৃত্ত হইলেন না। বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মনে করিলে স্বদেশের পুরাবৃত্তের উদ্ধার করিতে পারিতেন। কিন্তু এক্ষণে তিনি যে এ পরিশ্রম স্বীকার করিবেন, আমরা এত ভরসা করিতে পারি না। বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট আমরা অন্ততঃ এমন একখানি ইতিহাসের প্রত্যাশা করিতে পারি যে, তন্ম্বারা আমাদের মনোদুঃখ অনেক নিবৃত্তি পাইবে। রাজকৃষ্ণবাবুও একখানি বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে আমাদের দুঃখ মিটিল না। রাজকৃষ্ণবাবু মনে করিলে বাঙ্গালার সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিতে পারিতেন; তাহা না লিখিয়া তিনি বালকশিক্ষার্থ একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াছেন। যে দাতা মনে করিলে অর্দ্ধেক রাজ্য এক রাজকন্যা দান করিতে পারে, সে মূর্খতাভিষ্কা দিয়া ভিক্ষুককে বিদায় করিয়াছে।

মূর্খতাভিষ্কা হউক, কিন্তু সুবর্ণের মূর্খি। গ্রন্থখানি মোটে ১০ পৃষ্ঠা, কিন্তু ঈদৃশ সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ বাঙ্গালার ইতিহাস বোধ হয় আর নাই। অল্পের মধ্যে ইহাতে যত বৃত্তান্ত পাওয়া যায়, তত বাঙ্গালা ভাষায় দুর্লভ। সেই সকল কথার মধ্যে অনেকগুলি নূতন; এবং অবশ্যজ্ঞাতব্য। ইহা কেবল রাজগণের নাম ও যুদ্ধের তালিকা মাত্র নহে; ইহা প্রকৃত সামাজিক ইতিহাস। বালকশিক্ষার্থ যে সকল পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় নিত্য নিত্য প্রণীত হইতেছে, তন্মধ্যে ইহার ন্যায় উত্তম গ্রন্থ অল্প। ইংরেজিতেও যে সকল ক্ষুদ্র ইতিহাস বালকশিক্ষার্থ প্রণীত হয়, তন্মধ্যে এরূপ ইতিহাস দেখা যায় না। কেবল বালক নহে, অনেক বৃদ্ধ ইহাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে পারেন। যাঁহারা বালপাঠ্য পুস্তক বলিয়া ঘৃণা করিয়া ইহা পড়িবেন না, তাঁহাদিগের জন্য এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিকে উপলক্ষ করিয়া আমরা বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে গুটিকত কথা বলিব। সকলই অধ্যয়নীয় তত্ত্ব ইহাতে পাওয়া যায় বলিয়া আমরা এ ক্ষুদ্র গ্রন্থের বিস্তারিত সমালোচনায় প্রবৃত্ত, নচেৎ বালপাঠ্য পুস্তক আমরা সমালোচনা করি না।

প্রথম। কাম্বেল সাহেব যখন বাঙ্গালীর প্রতি সদয় হইয়াছিলেন, তখন বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালীরা আসিয়াখণ্ডের মধ্যে এখিনীয় জাতিসদৃশ। বাস্তবিক একদিন বাঙ্গালীরা আর কিছুতে হউক না হউক, ঔপনিবেশিকতায় এখিনীয়দিগের তুল্য ছিল। সিংহল বাঙ্গালী কর্তৃক পরাজিত, এবং পুরুষানুক্রমে অধিকৃত ছিল। যবদ্বীপ ও বালিদ্বীপ বাঙ্গালীর উপনিবেশ, ইহাও অনেকে অনুমিত করেন। তাম্রলিপ্ত ভারতবর্ষীর সমুদ্রযাত্রার স্থান ছিল। ভারতবর্ষীর আর কোন জাতি এরূপ ঔপনিবেশিকতা দেখান নাই।

দ্বিতীয়। বাঙ্গালী রাজগণ অনেক সময়ে উত্তরভারতে বহুৎ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। পালবংশীয় দেবপালদেব ভারতবর্ষের সম্রাট্ বলিয়া কীর্তিত। লক্ষ্মণসেনের জয়স্তু বারানসী, প্রয়াগ ও শ্রীক্ষেত্রে সংস্থাপিত হইয়াছিল। অতএব তিনি অন্ততঃ ভারতবর্ষের তৃতীয়াংশের অধীশ্বর ছিলেন। বাঙ্গালীরা গঙ্গাবংশ পরিচয়ে বহুকাল পর্য্যন্ত উড়িষ্যার অধীশ্বর ছিলেন। যে জাতি মিথিলা, মগধ, কাশী, প্রয়াগ, উৎকলাদি জয় করিয়াছিল, যাহার জয়পতাকা হিমালয়মূলে, যমুনাতটে, উৎকলের সাগরোপকূলে, সিংহলে, যবদ্বীপে, এবং বালিদ্বীপে উড়িত, সে জাতি কখন ক্ষুদ্র জাতি ছিল না।

তৃতীয়। সপ্তদশ পাঠান কর্তৃক বঙ্গজয় হইয়াছিল, এ কলঙ্ক মিথ্যা। সপ্তদশ পাঠান কর্তৃক কেবল নবদ্বীপের রাজপুরী বিজিত হইয়াছিল। তৎসঙ্গী সেনা কর্তৃক কেবল মধ্যবঙ্গ বিজিত হইয়াছিল। ইহার পরেও বহুদিন পর্য্যন্ত সেনবংশীয়েরা পূর্বে ও দক্ষিণ বাঙ্গালার অধিপতি থাকিয়া স্বাধীনভাবে সপ্তগ্রামে ও সুবর্ণগ্রামে রাজত্ব করিয়াছিলেন। “পাঠানেরা ৩৭২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, তথাপি কোন কালে সমুদায় বাঙ্গালার অধিপতি হয়েন নাই। পশ্চিমে বিষ্ণুপুর ও পঞ্চকোট তাঁহাদিগের ক্ষমতা প্রবিষ্ট হয় নাই; দক্ষিণে সুন্দরবনসন্নিহিত প্রদেশে স্বাধীন হিন্দুরাজা ছিল; পূর্বে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি এবং ত্রিপুরা, আরাকানরাজ ও ত্রিপুরাধিপতির হস্তে ছিল; এবং উত্তরে কুচবেহার স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতেছিল। সতরাং পাঠানেরা যে সময়ে উড়িষ্যা জয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, যে সময়ে তাঁহারা ১,৪০,০০০ পদাতিক, ৪০,০০০ অশ্বারোহী এবং ২০,০০০ কামান দেখাইতে পারিতেন, সে সময়েও বাঙ্গালার অনেকাংশ তাঁহাদিগের হস্তগত হয় নাই।” * বাঙ্গালার অধঃপতন একদিনে ঘটে নাই।

* বাঙ্গালার ইতিহাস, ২৯ পৃষ্ঠা।

বঙ্কিম রচনাবলী

চতুর্থ। পরাধীন রাজ্যের যে দুর্দর্শা ঘটে, স্বাধীন পাঠানদিগের রাজ্যে বাঙ্গালার সে দুর্দর্শা ঘটে নাই। রাজা ভিন্নজাতীয় হইলেই রাজ্যকে পরাধীন বলিতে পারা যায় না। সে সময়ের জমীদারদিগের যেরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহাদিগকেই রাজা বলিয়া বোধ হয়; তাঁহারা করদ ছিলেন মাত্র। পরাধীনতার একটি প্রধান ফল ইতিহাসে এই শূন্যায় যে, পরাধীন জাতির মানসিক স্ফূর্তি নিবিয়া যায়। পাঠানশাসনকালে বাঙ্গালীর মানসিক দীপ্তি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছিল। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কবিদ্বয় এই সময়েই আবির্ভূত; এই সময়েই অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক, ন্যায়শাস্ত্রের নূতন সৃষ্টিকর্তা রঘুনাতথ শিরোমণি; এই সময়ে স্মার্ত্তিতলক রঘুনন্দন; এই সময়েই চৈতন্যদেব; এই সময়েই বৈষ্ণব-গোস্বামীদিগের অপূর্ব গ্রন্থাবলী;—চৈতন্যদেবের পরগামী অপূর্ব বৈষ্ণবসাহিত্য। পঞ্চদশ ও ষোড়শ খ্রীষ্টশতাব্দীর মধ্যেই ইহাদিগের সকলেরই আবির্ভাব। এই দুই শতাব্দীতে বাঙ্গালীর মানসিক জ্যোতিতে বাঙ্গালার যেরূপ মন্থোজ্জ্বল হইয়াছিল, সেদৃশ্য তৎপূর্ব বা তৎপরে আর কখনও হয় নাই।

সেই সময়ের বাহ্য সৌষ্ঠব সম্বন্ধে রাজকৃষ্ণবাবু কি বলিতেছেন, তাহাও শুনুন।

“লিখিত আছে যে, হোসেন শাহার রাজ্যরস্ত্র সময়ে এতদ্দেশীয় ধনিগণ স্বর্ণপাত্র ব্যবহার করিতেন, এবং যিনি নিম্নতসভায় যত স্বর্ণপাত্র দেখাইতে পারিতেন, তিনি তত মর্যাদা পাইতেন। গোড় ও পাণ্ডুয়া প্রভৃতি স্থানে যে সকল সম্পূর্ণ বা ভগ্ন অট্টালিকা লক্ষিত হয়, তদ্বারাও তাৎকালিক বাঙ্গালার ঐশ্বর্য্য শিল্পনৈপুণ্যের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। বাস্তবিক তখন এ দেশে স্থাপত্যবিদ্যার আশ্চর্য্যরূপ উন্নতি হইয়াছিল এবং গোড়ে যেখানে সেখানে মৃত্তিকা খনন করিলে যেরূপ ইষ্টক দৃষ্ট হয়, তাহাতে অনুমান হয় যে, নগরবাসী বহুসংখ্যক ব্যক্তি ইষ্টকনির্মিত গৃহে বাস করিত।* দেশে অনেক ভূম্যধিকারী ছিলেন এবং তাঁহাদিগের বিস্তর ক্ষমতা ছিল; পাঠানরাজ্য ধ্বংসের কিয়ৎকাল পরে সংকলিত আইন আকবরিতে লিখিত আছে যে, বাঙ্গালার জমীদারেরা...২৩,৩৩০ অশ্বারোহী, ৮,০১,১৫৮ পদাতিক, ১৮০ গজ, ৪,২৬০ কামান এবং ৪,৪০০ নৌকা দিয়া থাকেন। এরূপ যুদ্ধের উপকরণ যাহাদিগের ছিল, তাহাদিগের পরাক্রম নিতান্ত কম ছিল না।”

পঞ্চম। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে আকবর বাদশাহের আমরা শতমুখে প্রশংসা করিয়া থাকি, তিনিই বাঙ্গালার কাল। তিনিই প্রথম প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালাকে পরাধীন করেন। সেই দিন হইতে বাঙ্গালার শ্রীহানির আরম্ভ। মোগল পাঠানের মধ্যে আমরা মোগলের অধিক সম্পদ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া মোগলের জয় গাইয়া থাকি, কিন্তু মোগলই আমাদের শত্রু, পাঠান আমাদের मित्र। মোগলের অধিকারের পর হইতে ইংরেজের শাসন পর্য্যন্ত একখানি ভাল গ্রন্থ বঙ্গদেশে জন্মে নাই। যে দিন হইতে দিল্লীর মোগলের সাম্রাজ্যে ভুক্ত হইয়া বাঙ্গালা দুরবস্থা প্রাপ্ত হইল, সেই দিন হইতে বাঙ্গালার ধন আর বাঙ্গালায় রহিল না, দিল্লীর বা আগ্রার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ প্রেরিত হইতে লাগিল। যখন আমরা তাজমহলের আশ্চর্য্য রমণীয়তা দেখিয়া আহ্লাদসাগরে ভাসি, তখন কি কোন বাঙ্গালীর মনে হয় যে, যে সকল রাজ্যের রক্তশোষণ করিয়া এই রত্নমন্দির নির্মিত হইয়াছে, বাঙ্গালা তাহার অগ্রগণ্য? তক্তাউসের কথা পড়িয়া যখন মোগলের প্রশংসা করি, তখন কি মনে হয়, বাঙ্গালার কত ধন তাহাতে লাগিয়াছে? যখন জুমা মসজিদ, সেকন্দরা, ফতেপুরসিকরি বা বৈজয়ন্ততুল্য শাহা জাহানাবাদের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া মোগলের জন্য দুঃখ হয়, তখন কি মনে হয় যে, বাঙ্গালার কত ধন সে সবে ক্ষয় হইয়াছে? যখন শূনি যে, নাদের শাহা বা মহারাষ্ট্রীয় দিল্লী লুণ্ঠ করিল, তখন কি মনে হয়, বাঙ্গালার ধনও তাহারা লুণ্ঠ করিয়াছে? বাঙ্গালার ঐশ্বর্য্য দিল্লীর পথে গিয়াছে; সে পথে বাঙ্গালার ধন ইরান তুরান পর্য্যন্ত গিয়াছে। বাঙ্গালার সৌভাগ্য মোগল কর্তৃক বিলুপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালায় হিন্দুর অনেক

* গোড়ের ইষ্টক লইয়া, মালদহ, ইংরেজবাজার, ভোলাহাট, রাইপুর, গিলাবাড়ী, কাসিমপুর প্রভৃতি অনেকগুলি নগর নির্মিত হইয়াছে। এই সকল নগর অট্টালিকাপূর্ণ, কিন্তু তথায় অন্য কোন ইষ্টক ব্যবহৃত হয় নাই। গোড়ের ইষ্টক মুরশিদাবাদের ও রাজমহলের নির্মাণেও লাগিয়াছে। এখনও যাহা আছে, তাহাও অপরিমিত। গোড়ের ভগ্নাবশেষের বিস্তার দেখিয়া বোধ হয় যে, কলিকাতা অপেক্ষা গোড় অনেক বড় ছিল।

বিবিধ প্রবন্ধ—বাঙ্গালার কলঙ্ক

কীর্ত্তির চিহ্ন আছে, পাঠানের অনেক কীর্ত্তির চিহ্ন পাওয়া যায়, শত বৎসর মাত্র ইংরেজ অনেক কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু বাঙ্গালায় মোগলের কোন কীর্ত্তি কেহ দেখিয়াছে? কীর্ত্তির মধ্যে “আসল তুমার জমা।” কীর্ত্তি কি অকীর্ত্তি বলিতে পারি না, কিন্তু তাহাও একজন হিন্দুকৃত।

বাঙ্গালার কলঙ্ক*

যখন বঙ্গদর্শন প্রথম বাহির হয়, তখন প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধে মঙ্গলাচরণস্বরূপ ভারতের চিরকলঙ্ক অপনোদিত হইয়াছিল। আজ প্রচার সেই দৃষ্টান্তানুসারে প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধে বাঙ্গালার চিরকলঙ্ক অপনোদনে উদাত। জগদীশ্বর ও বাঙ্গালার সুসন্তানমাত্রেই আমাদের সহায় হউন।

যাহা ভারতের কলঙ্ক, বাঙ্গালারও সেই কলঙ্ক। এ কলঙ্ক আরও গাঢ়। এখানে আরও দুর্ভেদ্য অন্ধকার। কদাচিৎ অন্যান্য ভারতবাসীর বাহুবলের প্রশংসা শুনায়, কিন্তু বাঙ্গালীর বাহুবলের প্রশংসা কেহ কখন শুনেন নাই। সকলেরই বিশ্বাস, বাঙ্গালী চিরকাল দুর্বল, চিরকাল ভীরু, চিরকাল স্ত্রীস্বভাব, চিরকাল ঘৃসি দেখিলেই পলাইয়া যায়। মেকলে বাঙ্গালীর চরিত্র সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, এরূপ জাতীয় নিন্দা কখনও কোন লেখক কোন জাতি সম্বন্ধে কলমবন্দ করে নাই। ভিন্নদেশীয় মাত্রেরই বিশ্বাস যে, সে সকল কথা অন্ধরে অন্ধরে সত্য। ভিন্নজাতীয়ের কথা দূরে থাকুক, অধিকাংশ বাঙ্গালীরও এইরূপ বিশ্বাস। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর চরিত্র সমালোচনা করিলে, কথাটা কতকটা যদি সত্য বোধ হয়, তবে বলা যাইতে পারে, বাঙ্গালীর এখন এ দুর্দশা হইবার অনেক কারণ আছে। মানুষকে মারিয়া ফেলিয়া তাহাকে মরা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয় না। কিন্তু যে বলে যে, বাঙ্গালীর চিরকাল এই চরিত্র, বাঙ্গালী চিরকাল দুর্বল, চিরকাল ভীরু, স্ত্রীস্বভাব, তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হউক, তাহার কথা মিথ্যা।

এ নিন্দার কোন মূল ইতিহাসে কোথাও পাই না। সত্য বটে, বাঙ্গালী মুসলমান কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিল, কিন্তু পৃথিবীতে কোন জাতি পরজাতি কর্তৃক পরাজিত হয় নাই? ইংরেজ নর্ম্মানের অধীন হইয়াছিল, জর্ম্মানি প্রথম নেপোলিয়নের অধীন হইয়াছিল। ইতিহাসে দেখি, ষোড়শ শতাব্দীর স্পেনীয়দিগের মত তেজস্বী জাতি, রোমকদিগের পর আর কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই। যখন সেই স্পেনীয়েরা আট শত বৎসর মুসলমানের অধীন ছিল, তখন বাঙ্গালী পাঁচ শত বৎসর মুসলমানের অধীন ছিল বলিয়া, সে জাতিতে চিরকাল অসার বলা যাইতে পারে না। ইংরেজ ইতিহাস-লেখক উপহাস করিয়া বলেন, সপ্তদশ মুসলমান অশ্বারোহী আসিয়া বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল। বঙ্গদর্শনে পূর্বে দেখান হইয়াছে যে, সে কথার কোন মূল নাই; বালক-মনোরঞ্জনের যোগ্য উপন্যাস মাত্র। সুতরাং আমরা আর সে কথার কিছু প্রতিবাদ করিলাম না।

বাঙ্গালীর চিরদুর্বলতা এবং চিরভীরুতার আমরা কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাই নাই। কিন্তু বাঙ্গালী যে পূর্বকালে বাহুবলশালী, তেজস্বী, বিজয়ী ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাই। অধিক নয়, আমরা এক শত বৎসর পূর্বের বাঙ্গালী পহলয়ানের, বাঙ্গালী লাঠি শড়কওয়ালার যে সকল বলবীর্যের কথা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, তাহা শুনিয়া মনে সন্দেহ হয় যে, সে কি এই বাঙ্গালী জাতি? কিন্তু সে সকল ঐতিহাসিক কথা, তাহা আমরা ছাড়িয়া দিই। আমরা দুই একটা ঐতিহাসিক প্রমাণ দিতেছি।

পণ্ডিতবর ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র পালবংশীয় এবং সেনবংশীয় রাজাদিগের সম্বন্ধে যে সকল ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছেন, আমাদের মতে তাহা অখণ্ডনীয়। কোন ইউরোপীয় বা এতদ্দেশীয় পণ্ডিত এ বিষয়ে এতটা মনোযোগী হন নাই। কেহই তাহার মতের সৎপ্রতিবাদ করিতে পারেন নাই। আমরা জানি যে, তাহার মত সকলের গ্রাহ্য হয় নাই; কিন্তু যাহারা তাহার প্রতিবাদী, তাহারা এমন কোন কারণ নির্দিষ্ট করিতে পারেন নাই, যাহাতে সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মত অগ্রাহ্য করিতে সম্মত হইতে পারেন।

* প্রচার, ১২৯১, শ্রাবণ।

বাংকম রচনাবলী

গথ্ কত্বক্ রোম ধ্বংস হইয়াছিল, বজাজেৎ ও দ্বিতীয় মহম্মদ গ্রীক সাম্রাজ্য বিজিত করিয়াছিল, এ সকল কথা যেমন নিশ্চিত ঐতিহাসিক, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্রকত্বক্ আবিষ্কৃত সেন-পাল-সম্বাদ আমরা তেমন নিশ্চিত ঐতিহাসিক মনে করি। সে কথাগুলি এই—

ঐতিহাসিকদিগের বিশ্বাস যে, আগে পালবংশীয়েরা বাঙ্গালার রাজা ছিলেন। তার পর সেনবংশীয়েরা বাঙ্গালার রাজা হন। ঠিক তাহা নহে। এককালে এক সময়েই পাল এবং সেন-বংশীয়েরা রাজত্ব করিতেন, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে। তার পর সেনবংশীয়েরা পালবংশীয়দিগের রাজ্যে আসিয়া তাহাদিগকে রাজ্যচ্যুত করিলেন, উভয় রাজ্যের একেশ্বর হইলেন। সেনবংশীয়েরা পূর্বাঙ্গালায় সুবর্ণগ্রামে রাজা ছিলেন। আর পালবংশীয়েরা মুর্গাগিরিতে অর্থাৎ আধুনিক মুঙ্গেরে রাজা ছিলেন। এখনকার বাঙ্গালীরা গবর্ণমেন্টের সিপাহি পলটনে প্রবেশ করিতে পারেন না, কিন্তু বেহারীদিগের পক্ষে অব্যাহত দ্বার, এবং বেহারীরা এখনকার উৎকৃষ্ট সিপাহিমধ্যে গণ্য। অথচ আমরা রাজেন্দ্রবাবুর আবিষ্কৃত ঐতিহাসিক তত্ত্ব দেখিতে পাইতেছি, পূর্বাঙ্গলবাসী বাঙ্গালীরা বেহার জয় করিয়াছিল। সেনবংশীয়েরা বাঙ্গালী রাজা হইয়াও বেহারের অধিকাংশের রাজা ছিলেন, ইহা ঐতিহাসিক কথা। সেনগণের আক্রমণে বেহারসী পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, ইহারও ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। যে গুপ্তবংশীয়দিগের মগধরাজ্য ভারতীয় সকল সাম্রাজ্য অপেক্ষা প্রতাপান্বিত ছিল, সেই মগধরাজ্য বাঙ্গালী কত্বক্ই বিজিত এবং অধিকৃত হইয়াছিল, বোধ হয়। কিন্তু সে আন্দাজ কথা না হয় ছাড়িয়া দিই।

মগধের অধীশ্বর চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় বিখ্যাত গ্রীক ইতিহাসবেত্তা মেগাস্থিনিস্, গাঙ্গারিডি Gangaridae নামে এক জনপদ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ঐ জনপদের স্থাননির্ণয়ে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন যে, যেখানে গঙ্গা উত্তর হইতে দক্ষিণবাহিনী, সেইখানে গঙ্গা ঐ জনপদের পূর্বা সীমা। তাহা হইলেই এক্ষণে যে প্রদেশকে রাঢ়দেশ বলা যায়, বাঙ্গালার সেই দেশ ইহা দ্বারা বুঝাইতেছে। বাস্তবিক অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, মেগাস্থিনিসের ঐ Gangaridae শব্দ গঙ্গারাঢ়ী শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। গঙ্গার উপকূলবর্ত্তী রাষ্ট্রকে লোকের গঙ্গারাষ্ট্র বলাই সম্ভব—সুরাষ্ট্র (সুরট), মধ্যরাষ্ট্র (মেবাড়), গুর্জররাষ্ট্র (গুজরাট) প্রভৃতি দেশের নাম যেরূপ রাষ্ট্র শব্দ সংযোগে নিষ্পন্ন হইয়াছে, ইহাও সেইরূপ দেখা যাইতেছে। গঙ্গারাষ্ট্র শব্দের অপভ্রংশে ক্রমে গঙ্গারাট্ বা গঙ্গারাঢ় হইবে। ক্রমে সংক্ষেপার্থ গঙ্গা শব্দ পরিত্যক্ত হইয়া রাট্ শব্দ বা রাঢ় শব্দ প্রচলিত থাকিবে। সংক্ষেপার্থ গঙ্গা শব্দ এরূপ পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। উদাহরণ, “গঙ্গাতীরস্থ” শব্দের পরিবর্ত্তে অনেকে “তীরস্থ” বলে। গ্রিহুতের প্রাচীন সংস্কৃত নাম “তীরভুক্তি”। এ স্থলেও গঙ্গাশব্দ পরিত্যক্ত হইয়া কেবল “তীর” শব্দ আছে। গঙ্গারাঢ়ও সেই জন্য এখন “রাঢ়” শব্দে দাঁড়াইয়াছে। মেগাস্থিনিসের কথায় আমরা ইহাই বুঝিতে পারি যে, তৎকালে এই রাঢ়দেশ একটি পৃথগ্ৰাজ্য ছিল। মেগাস্থিনিস্ বলেন যে, এই রাজ্য এরূপ প্রতাপান্বিত ছিল যে, ইহা কখন কোন শত্রু কত্বক্ পরাজিত হয় নাই এবং অন্যান্য রাজগণ গঙ্গারাঢ়ীদিগের হস্তি-সৈন্যের ভয়ে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতেন না। তিনি ইহাও লিখিয়াছেন যে, স্বয়ং সর্ব্বজয়ী আলেকজান্ডার গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়া গঙ্গারাঢ়ীদিগের প্রতাপ শূন্যিয়া, সেইখান হইতে প্রস্থান করিলেন। বাঙ্গালীর বলবীর্যের ভয়ে আলেকজান্ডার যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, এ কথা কেহ বিশ্বাস করুন বা না করুন, ইহার সাক্ষী স্বয়ং মেগাস্থিনিস্। আমরা নূতন সাক্ষী শিখাইয়া আনিতেছি না।

অনেকে বলিবেন যে, কৈ, প্রবলপ্রতাপান্বিত গঙ্গারাঢ়ীদিগের নাম তখন আমরা কেহ পূর্বে শূন্য নাই। যখন মার্সমান্ প্রভৃতি ইংরেজ ইতিহাসবেত্তাদিগের কাছে আমরা স্বদেশের ইতিহাস শিখি, তখন গঙ্গারাঢ়ীর নাম আমাদের শূন্যবাবু সস্তাবনা কি? কিন্তু গঙ্গারাঢ়ী নাম আমরা নূতন গড়িলাম না, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ দিতেছি। যেখানে দেখিতেছি যে, যে প্রদেশবাসীদিগকে মেগাস্থিনিস্ Gangaridae বলেন, সেই প্রদেশবাসীদিগকেই লোকে এখন রাঢ়ী বলে, আমাদের বিবেচনায় গঙ্গারাঢ়ী নামের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ। কিন্তু আমরা কেবল সে প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এ নাম ব্যবহার করিতেছি না। অনেকে অবগত আছেন, মাকেঞ্জির সংগ্রহ (Mackenzie's Collection) নামে কতকগুলি দুর্লভ ভারতবর্ষীয় পুস্তকের সংগ্রহ আছে। সেগুলি মূদ্রাঙ্কিত হইয়া প্রচার হইবার সস্তাবনা নাই এবং সকলের প্রাপ্যও নহে। অথচ তাহাতে মধ্যে মধ্যে বিচিত্র নূতন ঐতিহাসিক তত্ত্ব প্রাপ্ত

বিবিধ প্রবন্ধ—বঙ্গালার কলঙ্ক

হওয়া যায়। সেই সকল গ্রন্থের একটি তালিকা উইল্‌সন্ সাহেব প্রচারিত করিয়াছেন, এবং তৎসঙ্গে উহা হইতে কতকগুলি ঐতিহাসিক তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের ৮২ পৃষ্ঠায় দেখিবেন, লিখিত আছে যে, গঙ্গারাঢ়ীর অধীশ্বর অনন্তবর্মা বা কোলাহল করিলঙ্গ জয় করিয়াছিলেন। এ কথা প্রস্তর-শাসনে লিখিত আছে, আমরা গঙ্গারাঢ়ী নাম নতুন গাড়ি নাই। তবে অনাভিজ্ঞ ইংরাজেরা বঙ্গালার ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হওয়ায় আর সেই সকল গ্রন্থ প্রচলিত হওয়ায়, বঙ্গালার পূর্বগৌরব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

এই যে অনন্তবর্মা বা কোলাহল রাজার উল্লেখ করিলাম, ইনিও বঙ্গালীর পূর্বগৌরবের এক চিরস্মরণীয় প্রমাণ। উড়িষ্যার বিখ্যাত গঙ্গাবংশ নামে যে রাজবংশ, ইনিই তাহার আদিপুরুষ। কেহ কেহ বলেন যে, গঙ্গাবংশীয়েরা দক্ষিণদেশ হইতে উড়িষ্যায় আসিয়াছিল এবং চোরঙ্গ বা চোরগঙ্গা নামে একজন দক্ষিণাত্য রাজা এই বংশ সংস্থাপন করেন। এ কথাটি মিথ্যা। এই প্রবল প্রতাপশালী মহাশাহিমমর রাজবংশীয়েরা যে বঙ্গালী ছিলেন,* এই কথা যাহারা বিশ্বাস করিতে আনচ্ছুক্য হারাই সে পক্ষ সমর্থন করেন। উইল্‌সন্ সাহেবের কথিত গ্রন্থে কথিত পৃষ্ঠাতেই যে একখানি শাসনের উল্লেখ আছে, তাহাতে লিখিত আছে, রাঢ়ী কোলাহলই উড়িষ্যাবিজিতা এবং গঙ্গাবংশের আদিপুরুষ। তাম্রফলক বা প্রস্তর এ বিষয়ে মিথ্যা কথা বলিবে না।

ঐতিহাসিক ভারতবর্ষে এই সকল রাজবংশের আবির্ভাব হইয়াছিল, এই বঙ্গালী গঙ্গাবংশীয়দিগের প্রতাপ ও সাহস কাহারও অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। পুরীর মন্দির ও কোণার্কের আশ্চর্য্য প্রাসাদাবলী তাহাদিগেরই গঠিত। বঙ্গালার পাঠানেরা যত বার তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধে উদ্যত হইয়াছিল, তত বার পরাভূত, তাড়িত এবং অপমানিত হইয়াছিল। বরং গঙ্গাবংশীয়েরা তাহাদিগকে প্রহার করিতে করিতে পশ্চাৎকারিত হইয়া তাড়াইয়া লইয়া যাইত। একদা লাঙ্গলীয় নরসিংহ নামে একজন গঙ্গাবংশীয় রাজা বঙ্গালার মুসলমান সুলতানের ঐরূপ পশ্চাৎকারিত হইয়া, পাঠানদিগের রাজধানী গোড় এবং নগর আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠপাঠ করিয়া পাঠানের স্বর্গস্ব লইয়া ঘরে ফিরিয়া যান। উক্ত মুসলমানদিগকে গঙ্গাবংশীয়েরা তিন শত বৎসর ধরিয়া ধেরূপ শাসিত রাখিয়াছিলেন, সেরূপ চিতোরের রাজবংশ ভিন্ন আর কোন হিন্দুরাজবংশ পারেন নাই। তাহারা যেমন বঙ্গালায় মুসলমানদিগকে শাসনে রাখিয়াছিলেন, দক্ষিণাত্যের হিন্দুরাজাদিগকেও তেমনি শাসিত রাখিয়াছিলেন।

এই সকল কথা পর্যালোচনা করিয়া, হণ্টর্ সাহেব সেকালের উড়িয়া-সৈন্যের অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। সে প্রশংসা উড়িয়া-সৈন্যের প্রাপ্য নহে, গঙ্গাবংশীয়দিগের স্বদেশী রাঢ়ী-সৈন্যের প্রাপ্য। সকলেই জানেন যে, উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয়দিগের সাম্রাজ্য গোদাবরী হইতে সরস্বতী পর্য্যন্ত অর্থাৎ বঙ্গালায় ত্রিবেণী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এক্ষণে যাহা মেদিনীপুর জেলা এবং হাবড়া জেলা, তাহার সমুদায় এবং যাহা বর্ধমান ও হুগলি জেলার অন্তর্গত, তাহার কিয়দংশ ঐ সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। ইহাই গঙ্গাবংশীয়দিগের পৈতৃক রাজ্য। যেমন নর্ম্মান্ উইলিয়ম্ ইংলণ্ড জয় করিয়া নর্ম্মান্ডির রাজধানী পরিত্যাগপূর্বক ইংলণ্ডের রাজধানীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন, তেমনি গঙ্গাবংশীয়েরা উড়িষ্যা জয় করিয়া, আপনাদিগের প্রাচীন রাজধানী পরিত্যাগপূর্বক উড়িষ্যায় বাস করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তাহারা পৈতৃক রাজ্য ছাড়েন নাই। উহাও তাহাদিগের রাজ্যভুক্ত রহিল, ইহাই সম্ভব। সেই জন্যই ত্রিবেণী পর্য্যন্ত উড়িষ্যার অধিকার ছিল। বঙ্গালার মুসলমানেরা গঙ্গাবংশীয়দিগকে আক্রমণ করিলে, কাজেই প্রথমে এই রাঢ়দেশ আক্রমণ করিত, এবং এই রাঢ়ীগণ কতকই পুনঃ পুনঃ পরাভূত হইত।

এক্ষণে অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, রাঢ়ী বঙ্গালীরা যদি এত বলবিক্রমযুক্ত ছিল, তবে অন্যান্য বঙ্গালীরা এত হীনবীর্য্য কেন? আমাদের উত্তর যে, অন্য বঙ্গালীরা রাঢ়ীদিগের অপেক্ষা হীনবীর্য্য ছিল, এমন বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। বরং এই রাঢ়ীরাও অন্য বঙ্গালীদিগের দ্বারা পরাভূত হইয়াছিল, ইহাও বিবেচনা করিবার কারণ আছে। রাঢ়দেশের

* “বর্মা” শব্দ বুঝাইতেছে যে, উহারা ক্ষত্রিয় ছিলেন। ক্ষত্রিয় হইলে বঙ্গালী হইল না, ভরসা করি, এ আপত্তি কেহ করিবেন না। বঙ্গালার ক্ষত্রিয়কে বঙ্গালী বলিব না, তবে বঙ্গালার ব্রাহ্মণকেই বা বঙ্গালী বলিব কেন?

বাংকম রচনাবলী

কিয়দংশ সেনরাজাদিগের রাজ্যভুক্ত ছিল,* এবং সেনরাজারা যে উহা গঙ্গাবংশীয়দিগের নিকট কাড়িয়া লইয়াছিলেন, এমন বিবেচনা করা অসঙ্গত হয় না। অন্য বাঙ্গালীদিগকে অপেক্ষাকৃত হীনবীৰ্য্য মনে করিবার একমাত্র কারণ এই যে, মুসলমানেরা অতি সহজে বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল। বস্তুতঃ মুসলমানেরা সহজে বাঙ্গালা জয় করে নাই—কেবল লক্ষ্মণাবতীই সহজে জয় করিয়াছিল। তাহারা তিন শত বৎসরেও সমস্ত বাঙ্গালা জয় করিতে পারে নাই। মুসলমানেরা স্পেন্ হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত কালে সমস্ত অধিকার করিয়াছিল বটে; কিন্তু ভারতবর্ষ জয় করা তাহাদিগের পক্ষে যেরূপ দুরূহ হইয়াছিল, এমন আর কোন দেশই হয় নাই, “ভারতকলঙ্ক” শীর্ষক প্রবন্ধে প্রমাণীকৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষের মধ্যে আবার পাঁচটি জনপদে তাহারা বড় ঠেকিয়াছিল, এমন আর কোথাও না। ঐ পাঁচটি প্রদেশ—(১) পঞ্জাব, (২) সিন্ধুসোবীর, (৩) রাজস্থান, (৪) দাক্ষিণাত্য, (৫) বাঙ্গালা। বাঙ্গালা জয় যে সহজে হয় নাই, ইহার প্রমাণ দিতে আমরা প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমরা যতটুকু লিখিয়াছি, তাহাই এ ক্ষুদ্র পত্রের পক্ষে দীর্ঘ প্রবন্ধ হইয়াছে।

বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা†

যে জাতির পূর্বমহাত্ম্যের ঐতিহাসিক স্মৃতি থাকে, তাহারা মহাত্ম্যরক্ষার চেষ্টা পায়, হারাইলে পুনঃপ্রাপ্তির চেষ্টা করে। ফ্রেসী ও আর্জিন্‌কুরের স্মৃতির ফল রেন্‌হিম্ ও ওয়াটল্—ইতালি অধঃপতিত হইয়াও পুনরুত্থিত হইয়াছে। বাঙ্গালী আজকাল বড় হইতে চায়,—হায়! বাঙ্গালীর ঐতিহাসিক স্মৃতি কই?

বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না। যাহার মনে থাকে যে, এ বংশ হইতে কখন মানুষের কাজ হয় নাই, তাহা হইতে কখন মানুষের কাজ হয় না। তাহার মনে হয়, বংশে রক্তের দোষ আছে। তিন্তু নিম্ব বৃক্ষের বীজে তিন্তু নিম্বই জন্মে—মাকালের বীজে মাকালই ফলে। যে বাঙ্গালীরা মনে জানে যে, আমাদের পূর্ব-পুরুষ চিরকাল দুর্বল—অসার, আমাদের পূর্ব-পুরুষদিগের কখন গৌরব ছিল না, তাহারা দুর্বল অসার গৌরবশূন্য ভিন্ন অন্য অবস্থা প্রাপ্তির ভরসা করে না—চেষ্টা করে না। চেষ্টা ভিন্ন সিদ্ধিও হয় না।

কিন্তু বাস্তবিক বাঙ্গালীরা কি চিরকাল দুর্বল, অসার, গৌরবশূন্য? তাহা হইলে গণেশের রাজ্যাধিকার; চৈতন্যের ধর্ম; রঘুনাথ, গদাধর, জগদীশের ন্যায়; জয়দেব বিদ্যাপতি মুকুন্দদেবের কাব্য কোথা হইতে আসিল? দুর্বল অসার গৌরবশূন্য আরও ত জাতি পৃথিবীতে অনেক আছে। কোন্ দুর্বল অসার গৌরবশূন্য জাতি কথিতরূপ অবিংশ্র কীর্তি জগতে স্থাপন করিয়াছে। বোধ হয় না কি যে, বাঙ্গালার ইতিহাসে কিছু সার কথা আছে?

সেই সার কথা কোথা পাইব? বাঙ্গালার ইতিহাস আছে কি? সাহেবেরা বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে ভূরি ভূরি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। গ্টুয়ার্ট্ সাহেবের বই, এত বড় ভারী বই যে, ছুঁড়িয়া মারিলে জোয়ান মানুষ খুন হয়, আর মার্শ্‌মান্ লেথ্‌রিজ্ প্রভৃতি চুট্‌কিতালে বাঙ্গালার ইতিহাস লিখে, অনেক টাকা রোজগার করিয়াছেন।

কিন্তু এ সকলে বাঙ্গালার ঐতিহাসিক কোন কথা আছে কি? আমাদের বিবেচনায় একখানি ইংরেজি গ্রন্থেও বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস নাই। সে সকলে যদি কিছু থাকে, তবে যে সকল মুসলমান বাঙ্গালার বাদসাহ, বাঙ্গালার সুবাদার ইত্যাদি নিরর্থক উপাধিধারণ করিয়া, নিরুদ্ধেগে শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিত, তাহাদিগের জন্ম মৃত্যু গৃহবিবাদ এবং খিচুড়ীভোজন মাত্র। ইহা বাঙ্গালার ইতিহাস নয়, ইহা বাঙ্গালার ইতিহাসের এক অংশও নয়। বাঙ্গালার ইতিহাসের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধও নাই। বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস ইহাতে কিছুই নাই। যে বাঙ্গালী এ সকলকে বাঙ্গালার ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করে, সে বাঙ্গালী নয়। আত্মজাতি-গৌরবাক্ষ, মিথ্যাবাদী, হিন্দুদ্বেষী মুসলমানের কথা যে বিচার না করিয়া ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করে, সে বাঙ্গালী নয়।

* এই জনাই কায়স্থ প্রভৃতি জাতির মধ্যে উত্তররাঢ়ী ও দক্ষিণরাঢ়ী বলিয়া প্রভেদ আছে। রাজ্য পৃথক্ হওয়াতে সমাজও পৃথক্ হইয়াছিল।

† বঙ্গদর্শন, ১২৮৭, অগ্রহায়ণ।

বিবিধ প্রবন্ধ—বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

সতের জন অশ্বারোহীতে বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, এ উপন্যাসের ঐতিহাসিক প্রমাণ কি? মিন্‌হাজ্ উদ্দীন বাঙ্গালা জয়ের ষাট বৎসর পরে এই এক উপকথা লিখিয়া গিয়াছেন। আমি যদি আজ বলি যে, কাল রাতে আমি ভূত দেখিয়াছি, তোমরা তাহা কেহ বিশ্বাস কর না। কেন না, অসম্ভব কথা। আর মিন্‌হাজ্ উদ্দীন তাহা অপেক্ষাও অসম্ভব কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তোমরা অম্লানবদনে বিশ্বাস কর। আমি জীবিত লোক, তোমাদের কাছে পরিচিত, আমার কথা বিশ্বাস কর না, কিন্তু সে সাত শত বৎসর মরিয়া গিয়াছে, সে বিশ্বাসী কি অবিশ্বাসী কিছুই জান না, তথাপি তুমি তাহার কথায় বিশ্বাস কর। আমি বলিতেছি, আমি নিজে ভূত দেখিয়াছি, আমার কথায় বিশ্বাস করিবে না, অথচ ভূত আমার প্রত্যক্ষদৃষ্ট বলিয়া বলিতেছি! আর মিন্‌হাজ্ উদ্দীনের প্রত্যক্ষদৃষ্ট নহে, জনশ্রুতি মাত্র। জনশ্রুতি কি স্বকপোলকল্পিত, তাহাতেও অনেক সন্দেহ। আমার প্রত্যক্ষদৃষ্টিতে তোমার বিশ্বাস নাই, কিন্তু সেই গোহত্যাকারী, ক্ষৌরিতীচকুর, মুসলমানের স্বকপোলকল্পনের উপর তোমার বিশ্বাস। এ বিশ্বাসের আর কোন কারণ নাই, কেবল এই মাত্র কারণ যে, সাহেবরা সেই মিন্‌হাজ্ উদ্দীনের কথা অবলম্বন করিয়া ইংরেজিতে ইতিহাস লিখিয়াছেন। তাহা পাড়িলে চাকরী হয়! বিশ্বাস না করিবে কেন?

তুমি বলিবে যে, তোমার ভূতের গল্প বিশ্বাস করি না, তাহার কারণ এই যে, ভূত প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধ। আরিস্টটল্ হইতে মিল্ পর্যন্ত সকলে প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে বিশ্বাস করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ভাই বাঙ্গালি! তোমায় জিজ্ঞাসা করি, সতের জন লোকে লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীকে বিজিত করিল, এইটাই কি প্রাকৃতিক নিয়মের অন্তর্ভুক্ত। যদি তাহা না হয়, তবে হে চাকরীপ্রিয়! তুমি কেন এ কথায় বিশ্বাস কর।

বাস্তবিক সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখ্‌তিয়ার খিলিজি যে বাঙ্গালা জয় করেন নাই, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। সপ্তদশ অশ্বারোহী দূরে থাকুক, বখ্‌তিয়ার খিলিজি বহুতর সৈন্য লইয়া বাঙ্গালা সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে পারে নাই। বখ্‌তিয়ার খিলিজির পর সেনবংশীয় রাজগণ পূর্ববাঙ্গালায় বিরাজ করিয়া অর্দ্ধেক বাঙ্গালা শাসন করিয়া আসিলেন। তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। উত্তরবাঙ্গালা, দক্ষিণবাঙ্গালা, কোন অংশই বখ্‌তিয়ার খিলিজি জয় করিতে পারে নাই। লক্ষ্মণাবতী নগরী এবং তাহার পরিপার্শ্বস্থ প্রদেশ ভিন্ন বখ্‌তিয়ার খিলিজি সমস্ত সৈন্য লইয়াও কিছু জয় করিতে পারে নাই। সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখ্‌তিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, এ কথা যে বাঙ্গালীতে বিশ্বাস করে, সে কুলাঙ্গার।

বাঙ্গালার ইতিহাসের ক্ষেত্রে এইরূপ সর্বত্র। ইতিহাসে কথিত আছে, পলাশির যুদ্ধে জন দুই চারি ইংরেজ ও তৈলঙ্গসেনা সহস্র সহস্র দেশী সৈন্য বিনষ্ট করিয়া অদ্ভূত রণজয় করিল। কথাটি উপন্যাসমাত্র। পলাশিতে প্রকৃত যুদ্ধ হয় নাই। একটা রঙ তামাসা হইয়াছিল। আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, গোহত্যাকারী ক্ষৌরিতীচকুর মুসলমানের লিখিত সএর মদুতাখ্‌রীন্ নামক গ্রন্থ পাড়িয়া দেখ।

নীতিকথায় বাল্যকালে পড়া আছে, এক মনুষ্য এক চিত্র লিখিয়াছিল। চিত্রে লেখা আছে, মনুষ্য সিংহকে জুতা মারিতেছে। চিত্রকর মনুষ্য এক সিংহকে ডাকিয়া সেই চিত্র দেখাইল। সিংহ বলিল, সিংহেরা যদি চিত্র করিতে জানিত, তাহা হইলে চিত্র ভিন্নপ্রকার হইত। বাঙ্গালীরা কখন ইতিহাস লেখে নাই। তাই বাঙ্গালীর ঐতিহাসিক চিত্রের এ দশা হইয়াছে।

বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, যাহা আছে, তাহা ইতিহাস নয়, তাহা কতক উপন্যাস, কতক বাঙ্গালার বিদেশী বিধর্মী অসার পরপীড়কদিগের জীবনচরিতমাত্র। বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে?

তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী, তাহাকেই লিখিতে হইবে। মা যদি মরিয়া যান, তবে মার গল্প করিতে কত আনন্দ। আর এই আমাদিগের সর্বসাধারণের মা জন্মভূমি বাঙ্গালাদেশ, ইহার গল্প করিতে কি আমাদিগের আনন্দ নাই?

আইস, আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি। যাহার যত দূর সাধ্য, সে তত দূর করুক; ক্ষুদ্র কীট যোজনব্যাপী দ্বীপ নিষ্কাশন করে। একের কাজ নয়, সকলে মিলিয়া করিতে হইবে।

অনেকে না বৃষ্টিতে না বৃষ্টিতে পারেন যে, কোথায় কোন পথে অনুসন্ধান করিতে হইবে। অতএব আমরা তাহার দুই একটা উদাহরণ দিতেছি।

বঙ্কিম রচনাবলী

বঙ্গালীজাতি কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? অনেকে মুখে বলেন, বঙ্গালীরা আৰ্য্যজাতি। কিন্তু সকল বঙ্গালীই কি আৰ্য্য? ব্রাহ্মণাদি আৰ্য্যজাতি বটে, কিন্তু হাড়ি, ডোম, মুঁচ, কাওরা, ইহারাও কি আৰ্য্যজাতি? যদি না হয়, তবে ইহারা কোথা হইতে আসিল? ইহারা কোন্ অনাৰ্য্যজাতির বংশ, ইহাদিগের পূৰ্ব্বপুরুষেরা কবে বঙ্গালায় আসিল? আৰ্য্যেরা আগে, না অনাৰ্য্যেরা আগে? আৰ্য্যেরা কবে বঙ্গালায় আসিল? কোন্ গ্রন্থে কোন্ সময়ে আৰ্য্যদিগের প্রাথমিক উল্লেখ আছে? পুরাণ, ইতিহাস খুঁজিয়া বঙ্গ, মৎস্য, তাম্রলিপ্তি প্রভৃতি প্রদেশের অনেক উল্লেখ পাইবে। কিন্তু কোথাও এমন পাইবে না যে, আদিশুরের পূৰ্ব্ব বঙ্গালায় বিশিষ্ট পরিমাণে আৰ্য্যাদিকার হইয়াছিল। কেবল কোথাও আৰ্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা, কোথাও আৰ্য্যবংশীয় ব্রাহ্মণ তাহার পুরোহিত। আদিশুরের পূৰ্ব্ব বঙ্গালী ব্রাহ্মণপ্রণীত কোন গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় না। যদি এমন কোন প্রমাণ পাও যে, আদিশুরের পূৰ্ব্ব বঙ্গালায় আৰ্য্যাদিকার হইয়াছিল, প্রকাশ কর। নহিলে বঙ্গালী আধুনিক জাতি।

মধ্যকালে অর্থাৎ আদিশুরের কিছু পূৰ্ব্ব, বঙ্গালা যে খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল, তাহা চৈনিক পরিব্রাজকদিগের গ্রন্থের দ্বারা এক প্রকার প্রমাণীকৃত হইতেছে। কয়টি রাজ্য ছিল, কোন্ কোন্ রাজ্য, প্রজারা কোন্ জাতীয়, তাহাদিগের অবস্থা কি, মগধের সঙ্গে তাহাদিগের সম্বন্ধ কি, রাজা কে?

মুসলমানদিগের সমাগমের পূৰ্ব্ব পালরাজ্য ও সেনরাজ্য যে একীকৃত হইয়াছিল, তাহা ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র একপ্রকার প্রমাণ করিয়াছেন। সন্ধান কর, কি প্রকারে দুই রাজ্য একীকৃত হইল। একীকৃত হইলে পর, মুসলমান কর্তৃক জয় পর্য্যন্ত এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের কিরূপ অবস্থা ছিল? রাজশাসন-প্রণালী কিরূপ ছিল, শান্তিরক্ষা কিরূপে হইত? রাজসৈন্য কত ছিল, কি প্রকার ছিল, তাহাদিগের বল কি, বেতন কি, সংখ্যা কি? রাজস্ব কি প্রকার আদায় করিত, কে আদায় করিত, কি প্রকারে ব্যয়িত হইত, কে হিসাব রাখিত? কতপ্রকার রাজকর্মচারী ছিল, কে কোন্ কার্য্য করিত, কি প্রকারে বেতন পাইত, কোন্রূপে কার্য্য সমাধা করিত? কে বিচার করিত, বিচারের নিয়ম কি ছিল, বিচারের সার্থকতা কিরূপ ছিল, দণ্ডের পরিমাণ কিরূপ ছিল, প্রজার সুখ কিরূপ ছিল? ধান্য কিরূপ হইত, রাজা কি লইতেন, মধ্যবর্তীরা কি লইতেন, প্রজারা কি পাইত, তাহাদিগের সুখ দুঃখ কিরূপ ছিল? চৌর্য্য, পুর্জ, স্বাস্থ্য, এ সকল কিরূপ ছিল? কোন্ কোন্ ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল,—বৈদিক, বৌদ্ধ, পৌরাণিক, চার্ব্বাক, বৈষ্ণব, শৈব, অনাৰ্য্য, কোন্ ধর্ম্ম কত দূর প্রচলিত ছিল? শিক্ষা, শাস্ত্রালোচনা কত দূর প্রবল ছিল? কোন্ কোন্ কবি, কে কে দার্শনিক,—স্মার্ত্ত, নৈয়ায়িক, জ্যোতিষী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? কি কি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন? তাহাদিগের জীবনবৃত্তান্ত কি? তাহাদিগের গ্রন্থের দোষ গুণ কি কি? তাহাদিগের গ্রন্থ হইতে কি শুভাশুভ ফল জন্মিয়াছে? বঙ্গালীর চরিত্র কি প্রকারে তন্দ্বারা পরিবর্তিত হইয়াছে? তখনকার লোকের সামাজিক অবস্থা কিরূপ? সমাজভয় কিরূপ? ধর্ম্মভয় কিরূপ? ধনাঢ্যের অশনপ্রথা, বসন-প্রথা, শয়নপ্রথা কিরূপ? বিবাহ, জাতিভেদ কিরূপ? বাণিজ্য কিরূপ, কি কি শিল্পকার্য্যে পারিপাট্য ছিল? কোন্ কোন্ দেশোৎপন্ন শিল্প কোন্ কোন্ দেশে পাঠাইত? বিদেশযাত্রার পদ্ধতি কিরূপ ছিল? সমুদ্রপথে বিদেশে যাইত কি? যদি যাইত, তবে জাহাজ বা নৌকার আকারপ্রকার কিরূপ ছিল। কোন্ প্রদেশীয় লোকেরা নাবিক হইত? কোম্পাস্ ও লগ্‌বুক্ ভিন্ন কি প্রকারে নৌযাত্রা নিৰ্ব্বাহ করিত? বালী ও যবদ্বীপ সত্য সত্যই কি বঙ্গালীর উপনিবেশ? প্রমাণ কি? ভিন্নদেশ হইতে কি কি সামগ্রী আমদানি হইত, পণ্যকার্য্য কি প্রকারে নিৰ্ব্বাহ হইত?

তার পর মুসলমান আসিল। সপ্তদশ অশ্বারোহীতে বঙ্গালা যে জয় করিয়াছিল, তাহা ত মিথ্যা কথা সহজেই দেখা যাইতেছে। বখ্তিয়ার খিলিজি কতটুকু বঙ্গালা জয় করিয়াছিল, কি প্রকারে জয় করিয়াছিল? লক্ষ্মণাবতী জয়ের পর বঙ্গালার অবশিষ্টাংশ কি অবস্থায় ছিল? সে সকল দেশে কে রাজা ছিল? অবশিষ্ট অংশের কি প্রকারে স্বাধীনতা লুপ্ত হইল? কবে লুপ্ত হইল?

পরে স্বাধীন পাঠান-সাম্রাজ্য। পাঠানেরা কতটুকু বঙ্গালা অধিকার করিয়াছিলেন? সেটুকু অধিকার করিয়াছিলেন, সেটুকুর সঙ্গে তাহাদিগের কি সম্বন্ধ ছিল। সেটুকু কিপ্রকারে

বিবিধ প্রবন্ধ—বাঙ্গালা ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

শাসন করিতেন। আমি যতদূর ঐতিহাসিক অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহাতে আমার এই বিশ্বাস আছে যে, পাঠানেরা কস্মিন্ কালে প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালা অধিকার করেন নাই। স্থানে স্থানে তাঁহারা সৈনিক উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া উপনিবেশের পার্শ্ববর্তী স্থান সকল শাসন করিতেন মাত্র। তাঁহাদিগের আমলে বাঙ্গালীই বাঙ্গালা শাসন করিত। হিন্দুরাজগণের অধিকার-সময় হইতে ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের সময় পর্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দুরাজগণ বাঙ্গালাদেশ অধিকার করিত; যেমন বিষ্ণুপুরের রাজা, বর্ধমানের রাজা, বীরভূমের রাজা ইত্যাদি। ইঁহারা দীনদুনিয়ার মালিক ছিলেন। ইঁহারা রাজস্ব আদায় করিতেন, শান্তিরক্ষা করিতেন, দণ্ডবিধান করিতেন এবং সর্বপ্রকার রাজ্যশাসন করিতেন। মুসলমান সম্রাটেরা বড় বড় লড়াই পড়িলে লড়াই করিতেন অথবা করিতেন না। অধীনস্থ রাজগণের নিকট কর লইতেন অথবা পাইতেন না। ইউরোপের মধ্যকালে ফ্রান্সরাজ্যের রাজার সহিত বর্গুণ্ডী, আঁজু প্রবেন্স্ প্রভৃতি পারিপার্শ্বিক প্রদেশের রাজগণের যে সম্বন্ধ, মুসলমানের সহিত বাঙ্গালার রাজগণের সেই সম্বন্ধ ছিল। অর্থাৎ তাহারা একজন Suzerain মানিত। কখন কখন মানিত না। তাদ্বিন্ন স্বাধীন ছিল। এ বিষয়ে যত দূর অনুসন্ধান করিতে পারি, করি। কোন্ রাজবংশ কোন্ কোন্ প্রদেশ কত কাল শাসন করিয়াছিলেন, তাহার সন্ধান করি। তাঁহাদিগের সুবিস্তৃত ইতিহাস লেখ।

ইউরোপ সভ্য কত দিন? পঞ্চদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ চারি শত বৎসর পূর্বে ইউরোপ আমাদিগের অপেক্ষাও অসভ্য ছিল। একটি ঘটনায় ইউরোপ সভ্য হইয়া গেল। অকস্মাৎ বিনষ্ট বিস্মৃত অপরিজ্ঞাত গ্রীকসাহিত্য ইউরোপ ফিরিয়া পাইল। ফিরিয়া পাইয়া যেমন বর্ষার জলে শীর্ণা স্রোতস্বতী কুলপরিপ্লাবিনী হয়, যেমন মূর্ধ্বা রোগী দৈব ঔষধে যৌবনের বলপ্রাপ্ত হয়, ইউরোপের অকস্মাৎ সেইরূপ অভ্যুদয় হইল। আজ পেত্রাক্, কাল লুথর, আজ গেলিলাও, কাল বেকন্; ইউরোপের এইরূপ অকস্মাৎ সৌভাগ্যোচ্ছ্বাস হইল। আমাদিগেরও একবার সেই দিন হইয়াছিল। অকস্মাৎ নবদ্বীপে চৈতন্যচন্দ্রোদয়; তার পর রূপসনাতন প্রভৃতি অসংখ্য কবি ধর্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত। এ দিকে দর্শনে রঘুনাথ শিরোমণি, গদাধর, জগদীশ; স্মৃতিতে রঘুনন্দন, এবং তৎপরগামিগণ। আবার বাঙ্গালা কাব্যের জলোচ্ছ্বাস। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, চৈতন্যের পূর্বগামী। কিন্তু তাহার পরে চৈতন্যের পরবর্তিনী যে বাঙ্গালা কৃষ্ণ-বিষয়িণী কবিতা, তাহা অপরিমেয় তেজস্বিনী, জগতে অতুলনীয়; সে কোথা হইতে?

আমাদের এই Renaissance কোথা হইতে? কোথা হইতে সহসা এই জাতির এই মানসিক উদ্দীপ্তি হইল? এ রোশনাইয়ে কে কে মশাল ধরিয়াছিল? ধর্মবেত্তা কে? শাস্ত্রবেত্তা কে, দর্শনবেত্তা কে? ন্যায়বেত্তা কে? কে কবে জন্মিয়াছিল? কে কি লিখিয়াছিল? কাহার জীবনচরিত কি? কাহার লেখায় কি ফল? এ আলোক নিবিল কেন? নিবিল বুঝি মোগলের শাসনে। হিন্দু রাজা তোড়লমল্লের আসলে তুমার জমার দোষে। সকল কথা প্রমাণ কর।

প্রমাণ করিবার আগে বল যে, যে বাঙ্গালা ভাষা, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাসের কবিতায় এ ভাস্বতী কিরণমালা বিকীর্ণ করিয়াছিল, এ বাঙ্গালা ভাষা কোথা হইতে আসিল। বাঙ্গালা ভাষা আত্মপ্রসূতা নহে। সকলে শুনিয়াছি, তিনি সংস্কৃতের কন্যা; কুললক্ষণ কথায় কথায় পরিষ্ফুট। কেহ কেহ বলেন, সংস্কৃতের দৌহিত্রী মাত্র। প্রাকৃতই এঁর মাতা। কথাটায় আমার বড় সন্দেহ আছে। হিন্দী, মারহাটা প্রভৃতি সংস্কৃতের দৌহিত্রী হইলে হইতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালা যেন সংস্কৃতের কন্যা বলিয়া বোধ হয়। প্রাকৃতে কার্যের স্থানে কজ্জ বলিত। আমাদের চাষার মেয়েরাও কার্যের স্থানে কাঁষা বলে। বিদ্যুতের স্থলে বিজ্জুলও বলি না, বিজুলিও বলি না। চাষার মেয়েরাও বিদ্যুৎ বলে। অধিকাংশ শব্দই প্রাকৃতের অননুগামী। অতএব বিচার করা আবশ্যিক—প্রথম, বাঙ্গালার অনার্য ভাষা কি ছিল? দ্বিতীয়, কি প্রকারে তাহা সংস্কৃতমূলক ভাষার দ্বারা কত দূর স্থানচ্যুত হইল? তৃতীয়, সংস্কৃতমূলক যে ভাষা তাহা একেবারে সংস্কৃত হইতে প্রাপ্ত, না প্রাকৃত হইতে প্রাপ্ত? বোধ হয় খৃঃজিয়া ইঁহাই পাইবে যে, কিয়দংশ সংস্কৃত হইতে প্রাপ্ত, কিয়দংশ প্রাকৃত হইতে প্রাপ্ত। চতুর্থ, সেই সংস্কৃতমূলক ভাষার সঙ্গে অনার্য ভাষা কত দূর মিশ্রিত হইয়াছে। ঢেঁকি, কুলো ইত্যাদি শব্দ কোথা হইতে আসিল? পঞ্চম, ফারসী, আরবী, ইংরেজি কোন্ সময়ে কত দূর মিশিয়াছে?

মোগল বাঙ্গালা জয় করিয়া শাসন একটু কঠিনতর করিয়াছিল, সেটুকু কত দূর? রাজ্যও একটু অধিক দূর বিস্তৃত করিয়াছিল, সেটুকুই বা কত দূর? তোড়লমল্লের রাজস্ববন্দোবস্ত

বাংকম রচনাবলী

ব্যাপারটা কি? তাহার আগে কি ছিল? তোড়লমল্লের রাজস্ব-বন্দোবস্তের ফল কি হইল? মুরশীদ কুলি খাঁ তাহার উপর কি উন্নতি বা অবনতি করিয়াছিল? জমীদারদিগের উৎপত্তি কবে? কিসে উৎপত্তি হইল? মোগলসাম্রাজ্যের সময় তাহাদিগের কি প্রকার অবস্থা ছিল? মোগলসাম্রাজ্যের সময় বাঙ্গালার রাজস্ব কিরূপ ছিল? কোন্ সময়ে কি প্রকারে বৃদ্ধি পাইল? মুসলমানেরা দেশের রাজা ছিল, কিন্তু জমীদারী সকল তাহাদিগের করগত না হইয়া হিন্দু-দিগের করগত হইল কি প্রকারে? জমীদারদিগের কি ক্ষমতা ছিল? তখনকার জমীদারদিগের সঙ্গে ওয়ারেন্ হেস্টিংসের সময়ের জমীদারদিগের এবং বর্তমান জমীদারদিগের কি প্রভেদ?

মোগলজয়ের পরে বাঙ্গালার অধঃপতন হইয়াছিল। বাঙ্গালার অর্থ বাঙ্গালায় না থাকিয়া দিল্লীর পথে গিয়াছিল। বাঙ্গালা স্বাধীন প্রদেশ না হইয়া পরাধীন বিভাগমাত্র হইয়াছিল। কিন্তু উভয় সময়ের সামাজিক চিত্র চাই। সামাজিক চিত্রের মধ্যে প্রথম তত্ত্ব ধর্মবল। এখন ত দেখিতে পাই, বাঙ্গালার অর্ধেক লোক মুসলমান। ইহার অধিকাংশই যে ভিন্ন দেশ হইতে আগত মুসলমানদিগের সন্তান নয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কেন না, ইহারা অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর লোক—কৃষিজীবী। রাজার বংশাবলী কৃষিজীবী হইবে, আর প্রজার বংশাবলী উচ্চশ্রেণী হইবে, ইহা অসম্ভব। দ্বিতীয় অল্পসংখ্যক রাজানুচরবর্গের বংশাবলী এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বিস্তৃতি লাভ করিবে, ইহাও অসম্ভব। অতএব দেশীয় লোকেরা যে স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হইয়াছে, ইহাই সিদ্ধ। দেশীয় লোকের অর্ধেক অংশ কবে মুসলমান হইল? কেন স্বধর্ম ত্যাগ করিল? কেন মুসলমান হইল? কোন্ জাতীয়েরা মুসলমান হইয়াছে? বাঙ্গালার ইতিহাসে ইহার অপেক্ষা গুরুতর তত্ত্ব আর নাই।

বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ*

কামরূপ—রঙ্গপুর

কোন দেশের ইতিহাস লিখিতে গেলে সেই দেশের ইতিহাসের প্রকৃত যে ধ্যান, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা চাই। এই দেশ কি ছিল? আর এখন এ দেশ যে অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে, কি প্রকারে—কিসের বলে এ অবস্থান্তর প্রাপ্তি, ইহা আগে না বুঝিয়া ইতিহাস লিখিতে বসি অনর্থক কালহরণ মাত্র। আমাদের কথা দূরে থাক, ইংরেজ ইতিহাসবেত্তাদিগের মধ্যে এই ভ্রান্তির বাড়াবাড়ি হইয়াছে। “বাঙ্গালার ইতিহাস” ইহার এক প্রমাণ। বাঙ্গালার ইতিহাস পড়িতে বসিয়া আমরা পড়িয়া থাকি, পালবংশ সেনবংশ বাঙ্গালার রাজা ছিলেন, বখ্‌তিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা জয় করিলেন, পাঠানেরা বাঙ্গালায় রাজা হইলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সকলই ভ্রান্তি; কেন না, সেন, পাল ও বখ্‌তিয়ারের সময় বাঙ্গালা বলিয়া কোন রাজ্য ছিল না। এখনকার এই বাঙ্গালা দেশের কোন নামান্তরও ছিল না। সেন ও পাল গোড়ের রাজা ছিলেন, বখ্‌তিয়ার খিলিজি লক্ষ্মণাবতী জয় করিয়াছিলেন। গোড় বা লক্ষ্মণাবতী বাঙ্গালার প্রাচীন নাম নহে। বাঙ্গালী বলিয়া কোন জাতি তথাকার অধিবাসী ছিল না। যাহাকে এখন বাঙ্গালা বলি, গোড় বা লক্ষ্মণাবতী তাহার এক অংশ মাত্র। সে দেশে যাহারা বাস করিত, তাহারা অন্য জাতির সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া আধুনিক বাঙ্গালী হইয়াছে। যেমন গোড় বা লক্ষ্মণাবতী একটা রাজ্য ছিল, তেমনি আরও অনেকগুলি পৃথক্ রাজ্য ছিল। সেগুলি বাঙ্গালার অংশ ছিল না; কেন না, বাঙ্গালাই তখন ছিল না। সেগুলি কোন একটা রাজ্যের অংশ ছিল না—সকলই পৃথক্ পৃথক্, স্বস্বপ্রধান। সকলেই ভিন্ন ভিন্ন অনাৰ্য্যজাতির বাসভূমি। ভিন্ন দেশে ভিন্ন জাতি। কিন্তু সর্বত্র প্রায় আৰ্য্য প্রধান; এই আৰ্য্যরাই এই ভিন্ন দেশগুলি একীভূত করিবার মূল কারণ। যে দেশে যে জাতি থাকুক না কেন, তাহারা আৰ্য্যদিগের ভাষা গ্রহণ করিল, আৰ্য্যদিগের ধর্ম গ্রহণ করিল। আগে একধর্ম, একভাষা, তার পর শেষে একচ্ছত্রাধীন হইয়া আধুনিক বাঙ্গালায় পরিণত হইল।

কিন্তু সেই একচ্ছত্রাধীনত্ব সম্প্রতি হইয়াছে মাত্র, ইংরেজের সময়ে। বাঙ্গালীর দেশ,

* বঙ্গদর্শন, ১২৮৯, জ্যৈষ্ঠ।

বিবিধ প্রবন্ধ—বঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ

মুসলমানেরা কখনই একচ্ছত্রাধীন করিতে পারেন নাই। মোগলেরা অনেক দূর করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারাও আধুনিক বঙ্গালার অধীশ্বর হইতে পারেন নাই।

অতএব যে অর্থে গ্রীসের ইতিহাস আছে, রোমের ইতিহাস আছে, সে অর্থে বঙ্গালার ইতিহাস নাই। যেমন আধুনিক ফ্লোরেন্সের ইতিহাস লিখিলে বা মিলানের ইতিহাস লিখিলে বা নেপুলসের ইতিহাস লিখিলে আধুনিক ইতালির ইতিহাস লেখা হয় না, বঙ্গালারও কতক তেমনি। কিন্তু ইতালি বলিয়া দেশ ছিল; বঙ্গালা বলিয়া দেশ ছিল না। বঙ্গালার ইতিহাস আরম্ভ মোগলের সময় হইতে।

আমরা বঙ্গালার ঐতিহাসিক ধ্যান এখন আর পরিষ্কৃত না করিয়া, যাহা বলিতেছি বা বলিব, আগে তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইব। প্রথমে উত্তর পূর্ব বঙ্গালার কথা বলিব। দেখা যাউক, কবে এ অংশ বঙ্গালাভুক্ত হইয়াছে, কবেই বা বঙ্গালার সংস্পর্শে আসিয়াছে।

যেমন এখন যাহাকে বঙ্গালা বলি, আগে তাহা বঙ্গালা ছিল না, তেমনি এখন যাহাকে আসাম বলি, তাহা আসাম ছিল না। অতি অল্পকাল হইল, আহম নামে অনার্য্য জাতি আসিয়া ঐ দেশ জয় করিয়া বাস করাতে উহার নাম আসাম হইয়াছিল। সেখানে, যথায় এখন কামরূপ, তথায় অতি প্রাচীন কালে এক আৰ্য্যরাজ্য ছিল। তাহাকে প্রাগ্‌জ্যোতিষ বলিত। বোধ হয়, এই রাজ্য পূর্বাঞ্চলের অনার্য্যভূমিমধ্যে একা আৰ্য্য জাতির প্রভা বিস্তার করিত বলিয়া ইহার এই নাম। মহাভারতের যুদ্ধে প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত, দুর্যোধনের সাহায্যে গিয়াছিলেন। বঙ্গালার অধিবাসী, তাম্বলিপ্ত, পোণ্ড্র, মৎস্য প্রভৃতি সে যুদ্ধে উপস্থিত ছিল। তাহারা অনার্য্য-মধ্যে গণ্য হইয়াছে। বঙ্গালা যে সময়ে অনার্য্যভূমি, সে সময়ে আসাম যে আৰ্য্যভূমি হইবে, ইহা এক বিষম সমস্যা। কিন্তু তাহা অঘটনীয় নহে। মুসলমানদিগের সময়ে ইংরেজদিগের এক আড্ডা মান্দ্রাজে, আর আড্ডা পিম্পলী ও কলিকাতায়, মধ্যবর্তী প্রদেশ সকলের সঙ্গে তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। ইহার ইতিহাস আছে বলিয়া বৃষ্টিতে পারি। তেমনি প্রাগ্‌জ্যোতিষের আৰ্য্যদিগের ইতিহাস থাকিলে, তাহাদিগের দূর গমনের কথাও বৃষ্টিতে পারিতাম। বোধ হয়, তাহারা প্রথমে বঙ্গালায় আসিয়া বঙ্গালার পশ্চিম ভাগেই বাস করিয়াছিল। তার পর আৰ্য্যেরা দাক্ষিণাত্যজয়ে প্রবৃত্ত হইলে, সেখানকার অনার্য্য জাতি সকল দূরীকৃত হইয়া, ঠেলিয়া উত্তরপূর্বমুখে আসিয়া বঙ্গালা দখল করিয়াছিল। তাহাদেরই ঠেলাঠেলিতে অল্পসংখ্যক আৰ্য্য ঔপনিবেশিকেরা সরিয়া সরিয়া ক্রমে ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল।

এক সময়ে এই কামরূপ রাজ্য অতি বিস্তৃত হইয়াছিল। পূর্বে করতোয়া ইহার সীমা ছিল; আধুনিক আসাম, মণিপুর, জয়ন্তা, কাছাড়, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি ইহার অন্তর্গত ছিল। আইন আকবরীতে লেখে যে, ভগদত্তের বংশের ২৩ জন রাজা এখানে রাজত্ব করেন। যাহাই হউক, পৃথু নামা রাজার পূর্বে কোন রাজার নামের নির্দেশ পাওয়া যায় না। পৃথু রাজার রাজধানী তল্মানামে নদীতীরে, চাকলা ও বোদা পরগণা বৈকুণ্ঠপুরের মধ্যস্থলে ছিল, অদ্যাপি তাহার ভগ্নাবশেষ আছে। কথিত আছে, কীচক নামে এক ম্লেচ্ছজাতির দ্বারা পৃথু রাজা আক্রান্ত হইলেন। ম্লেচ্ছের স্পর্শের ভয়ে তিনি এক সরোবরের জলে অবগাহন করেন। তথায় নিমজ্জনে তাঁহার প্রাণ বিনষ্ট হয়।

তারপর পালবংশীয়েরা রঙ্গপুরে রাজা হইলেন। ইতিপূর্বে রঙ্গপুর কামরূপ হইতে কিয়ৎকালজন্য পৃথক্ রাজ্য হইয়াছিল। বোধ হয়, রঙ্গপুরে পালবংশের প্রথম রাজা ধর্মপাল। এই পালেরা ইউরোপের বুর্বা বংশের আর আসিয়ার তৈমুরবংশের ন্যায় নানা দেশে রাজা ছিলেন। গোঁড়ে পাল রাজা, মৎস্য পাল রাজা, রঙ্গপুরে পাল রাজা, কামরূপে পাল রাজা ছিল। বোধ হয়, এই রাজবংশ অতিশয় প্রতাপশালী ছিল। ধর্মপালের রাজধানীর ভগ্নাবশেষ, ডিমলার দক্ষিণে আজিও আছে। তাহার ক্রোশেক দূরে, রাণী মীনাবতীর গড় ছিল। রাণী মীনাবতী ধর্মপালের ভ্রাতৃজয়া। মীনাবতী অতি তেজস্বিনী ছিলেন—বড় দুর্দান্তপ্রতাপ। গোপীচন্দ্র নামে তাঁহার পুত্র ছিল। মীনাবতী ধর্মপালকে বলিলেন, “আমার পুত্র রাজা হইবে, তুমি কে?” ধর্মপাল রাজ্য না দেওয়াতে মীনাবতী সৈন্য লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন, এবং যুদ্ধে তাঁহাকে পরাভূত করিয়া গোপীচন্দ্রকে সিংহাসনে স্থাপিত করিলেন। কিন্তু গোপীচন্দ্র নামমাত্র রাজা হইলেন, রাজমাতা তাঁহাকে রাজা করিতে দিবেন না, স্বয়ং রাজ্য

বঙ্কিম রচনাবলী

করিবেন ইচ্ছা। পুত্রকে ভুলাইবার জন্য তাঁহার এক শত মহিষী করিয়া দিলেন, কিন্তু পুত্র ভুলিল না। তখন মাতা পুত্রকে ধর্ম্মে মতি দিতে লাগিলেন। এইবার পুত্র ভুলিয়া, যোগধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, বনে গমন করিলেন।

গোপীচন্দ্রের পর তাঁহার পুত্র ভবচন্দ্র রাজা হইলেন। পাঠক হবচন্দ্র রাজা, গবচন্দ্র পাত্রেয় কথা শুনিয়াছেন? এই সেই হবচন্দ্র। নাম হবচন্দ্র নয়—ভবচন্দ্র, আর একটি নাম উদয়চন্দ্র। ভবচন্দ্র গবচন্দ্রের বুদ্ধিবিদ্যার পরিচয় লোকপ্রবাদে এত আছে যে, তাহার পুনরুত্তি না করিলেও হয়। লোকে গল্প করে, গবচন্দ্র, বুদ্ধি বাহির হইয়া যাইবে ভয়ে, টিপ্পলে দিয়া নাক কাণ বন্ধ করিয়া রাখিতেন। তাহাতেও সন্তুষ্ট নন, পাছে বুদ্ধি বাহির হইয়া যায় ভয়ে সিন্ধুক গিয়া লুকাইয়া থাকিতেন, রাজার কোন বিপদ আপদ পড়িলে, সিন্ধুক হইতে বাহির হইয়া, নাক কাণের পুঁটলি খুলিয়া বুদ্ধি বাহির করিতেন। একদিন রাজার এইরূপ বিপদ উপস্থিত, নগরে একটা শূকর দেখা দিয়াছে। শূকর রাজসমীপে আনীত হইলে রাজা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না যে, এ কি জন্তু। বিপদ আশঙ্কা করিয়া মন্ত্রীকে সিন্ধুক হইতে বাহির করিলেন। মন্ত্রী টিপ্পলে খুলিয়া অনেক চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, এটা অবশ্য হস্তী, না খাইয়া রোগা হইয়াছে, নচেৎ ইন্দুর, খাইয়া বড় মোটা হইয়াছে। আর একদিন দুই জন পথিক আসিয়া সায়াছে এক পুষ্কারিণীতীরে উত্তীর্ণ হইল। রাতে পাকশাক করিবার জন্য সরোবরতীরে স্থান পরিষ্কার করিয়া চুলা কাটিতে আরম্ভ করিল। নগরের রক্ষিবর্গ দেখিয়া মনে করিল যে, যখন পুকুর থাকিতেও তার কাছে আবার খানা কাটিতেছে, তখন অবশ্য ইহাদের অসৎ অভিপ্রায় আছে। রক্ষিগণ পথিক দুই জনকে গ্রেপ্তার করিয়া রাজসম্মিলানে লইয়া গেল। রাজা স্বয়ং এরূপ গুরুতর সমস্যার কিছু মীমাংসা করিতে না পারিয়া, পরম ধীমান্ পাত্র মহাশয়কে সিন্ধুকের ভিতর হইতে বাহির করিলেন। তিনি নাক কাণের টিপ্পলে খুলিয়াই দিব্যচক্ষু কাণ্ডখানা দর্পণের মত পরিষ্কার দেখিলেন। তিনি আজ্ঞা করিলেন, “নিশ্চিত ইহারা চোর! পুকুরটা চুরি করিবার জন্য পাড়ের উপর সিঁধ কাটিতেছিল। ইহাদিগকে শূলে দেওয়া বিধেয়।” রাজা ভবচন্দ্র, মন্ত্রীর বুদ্ধিপ্ৰাথর্যে মুগ্ধ হইয়া তৎক্ষণেই পুষ্কারিণীচোরদ্বয়ের প্রতি শূলে যাইবার বিধি প্রচার করিলেন।

কথা এখনও ফুরায় নাই। পুকুরচোরেরা শূলে যাইবার পূর্বে পরামর্শ করিয়া হঠাৎ পরস্পর ঠেলাঠেলি মারামারি আরম্ভ করিল। রাজা ও রাজমন্ত্রী এই বিচিত্র কাণ্ড দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ব্যাপার কি? তখন একজন চোর নিবেদন করিল যে, “হে মহারাজ! দেখুন, দুই শূলের মধ্যে একটি বড়, একটি ছোট। আমরা জ্যোতিষ জানি। আমরা গণনা করিয়া জানিয়াছি যে, আজ যে ব্যক্তি এই দীর্ঘ শূলে আরোহণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবে, সে পুনর্জন্মে চক্রবর্তী রাজা হইয়া সঙ্গীপা সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইবে, আর যে এই ছোট শূলে মরিবে, সে তাহার মন্ত্রী হইয়া জন্মিবে। মহারাজ! তাই আমি দীর্ঘ শূলে চড়িতে যাইতেছিলাম, এই হতভাগা আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছে, আপনি বড় শূলে মরিয়া সম্রাট হইতে চায়।” তখন দ্বিতীয় চোর যোড় হাত করিয়া বলিল, “মহারাজ! ও কে যে, ও চক্রবর্তী রাজা হইবে? আমি কেন না হইব? আজ্ঞা হউক, ও ছোট শূলে চড়ুক, আমি সম্রাট হইব, ও আমার মন্ত্রী হইবে।” তখন রাজা ভবচন্দ্র ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়া বলিলেন, “কি এত বড় স্পর্ধা! তোরা চোর হইয়া জন্মান্তরে চক্রবর্তী রাজা হইতে চাহিস্! সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইবার উপযুক্ত পাত্র যদি কেহ থাকে, তবে সে আমি। আমি থাকিতে তোরা!!” এই বলিয়া রাজা ভবচন্দ্র তখন দ্বারিগণকে আজ্ঞা দিলেন যে, এই পাপাত্মাদিগকে তাড়াইয়া বাহির করিয়া দাও। এবং মন্ত্রিবরকে আহ্বানপূর্বক সঙ্গীপা সসাগরা পৃথিবীর সাম্রাজ্যের লোভে স্বয়ং উচ্চ শূলে আরোহণ করিলেন। মন্ত্রী মহাশয়ও আগামী জন্মে তাদৃশ চক্রবর্তী রাজার মন্ত্রী হইবার লোভে ছোট শূলে গিয়া চড়িলেন। এইরূপে তাঁহাদের মানবলীলা সমাপ্ত হইল।

এ ইতিহাস নহে—এ সত্যও নহে—এ পিতামহীর উপন্যাস মাত্র। তবে এ ঐতিহাসিক প্রবন্ধে এই অমূলক গালগল্পকে স্থান দিলাম কেন? এই কথাগুলি রাজার ইতিহাস নহে, লোকের ইতিহাস বটে। ইহাতে দেখা যায়, সে রাজপুরুষদিগের সম্বন্ধে এতদূর নিব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক গল্প বাঙ্গালীর মধ্যে প্রচার লাভ করিয়াছে। ভবচন্দ্র রাজা ও গবচন্দ্র পাত্রেয় দ্বারাও বাঙ্গালায় রাজ্য চলিতে পারে, ইহা বাঙ্গালীর বিশ্বাস। যে দেশে এই সকল প্রবাদ চলিত, সে

বিবিধ প্রবন্ধ—বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ

দেশের লোকের বিবেচনা এই যে, রাজা রাজ্জা সচরাচর ঘোরতর গন্ডমূর্খ হইয়া থাকে, হইলেও বিশেষ ক্ষতি নাই। বাস্তবিক এই কথাই সত্য। বাঙ্গালায় চিরকাল সমাজই সমাজকে শাসিত ও রক্ষিত করিয়া আসিয়াছে। রাজারা হয় সেই বাঙ্গালা কবিকুলরত্ন শ্রীহর্ষ দেবের চিত্রিত বৎস-রাজের ন্যায় মমের পুতুল, নয় এই ভবচন্দ্র হবচন্দ্রের ন্যায় বারোইয়ারির সং। আজকালের রাজপুরুষদের কথা বালতোঁছ না; তাঁহারা অতিশয় দক্ষ। কথাটা এই যে, আমাদের এ নিরীহ জাতির শাসনকর্তা বটবৃক্ষকে করিলেও হয়।

ভবচন্দ্রের পর কামরূপ রঙ্গপুর রাজ্যে আর একজন মাত্র পালবংশীয় রাজা রাজ্য করিয়া ছিলেন। তাঁহার পর মেছ গারো কোছ লেপ্চা প্রভৃতি অনার্য জাতিগণ রাজ্যমধ্যে ঘোরতর উপদ্রব করে। কিন্তু তারপর আবার আর্য্যজাতীয় নূতন রাজবংশ দেখা যায়। তাঁহারা কি প্রকারে রাজা হইলেন, তাহার কিছু কিম্বদন্তী নাই। এই বংশের প্রথম রাজা নীলধ্বজ। নীলধ্বজ কমতাপুর নামে নগরী নিৰ্ম্মাণ করেন, তাহার ভগ্নাবশেষ আজও কুচবেহার রাজ্যে আছে। ইহার পরিধি ৯১০ ফ্রেস, অতএব নগরী অতি বৃহৎ ছিল সন্দেহ নাই। ইহার মধ্যে সাত ফ্রেস বেড়িয়া নগরীর প্রাচীর ছিল, আর ২১০ ফ্রেস একটি নদীর দ্বারা রক্ষিত। প্রাচীরের ভিতর প্রাচীর; গড়ের ভিতর গড়—মধ্যে রাজপুরী। সে কালের নগরীসকলের সচরাচর এইরূপ গঠন ছিল। শতশতাব্দী হইতে আধুনিক বাঙ্গালী খোলা সহরে বাস করে, বাঙ্গালার সে কালের সহর-সকলের গঠন কিছুই অনুভব করিতে পারে না।

এই বংশের তৃতীয় রাজা নীলাম্বরের সময়ে রাজ্য পুনর্বার সুবিস্তৃত হইয়াছিল দেখা যায়। কামরূপ, ঘোড়াঘাট পর্য্যন্ত রঙ্গপুর, আর মৎস্যের কিয়দংশ তাঁহার ছত্রাধীন ছিল। এই সময়ে বাঙ্গালার স্বাধীন পাঠান রাজারা দিল্লীর বাদশাহের সঙ্গে সর্বাঙ্গী যুদ্ধে প্রবৃত্ত, অতএব অবসর পাইয়া নীলাম্বর তাঁহাদের কিছু কাড়িয়া লইয়াছিলেন বোধ হয়। কমতাপুর হইতে ঘোড়াঘাট পর্য্যন্ত তিনি এক বৃহৎ রাজবর্ষ নিৰ্ম্মিত করেন, অদ্যাপি সে বর্ষ সেই প্রদেশের প্রধান রাজবর্ষ। তিনি বহুতর দুর্গ নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বোধ হয়, তিনি নিষ্ঠুরস্বভাব ছিলেন, তাহাতেই তাঁহার রাজ্য ধ্বংস হইল। শচীপুর নামে তাঁহার এক ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ছিল। শচীপুরের পুত্র কোন গুরুতর অপরাধ করিয়াছিল। নীলাম্বর তাহাকে বধ করিলেন। কিন্তু কেবল বধ করিয়াই সন্তুষ্ট নহেন, তাহার মাংস রাঁধাইয়া শচীপুরকে কৌশলে ভোজন করাইলেন। শচীপুর জানিতে পারিয়া দেশত্যাগ করিয়া গোড়ের পাঠান রাজার দরবারে উপস্থিত হইল। শচীপুরের দেখান প্রলোভনে লুন্ধ হইয়া, পাঠানরাজ (আমি কখনই গোড়ের পাঠানরাজদিগকে বাঙ্গালার রাজা বলিব না।) নীলাম্বরকে আক্রমণ করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন। নীলাম্বর আর যাই হউন—বাঙ্গালার সেনকুলাজ্ঞারের মত ছিলেন না। খড়্গীদ্বার দিয়া পলায়ন না করিয়া সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করিলেন। যুদ্ধে মুসলমানকে পরাজিত করিলেন। তখন সেই ক্ষৌরিতমুণ্ড প্রতারক, যে পথে ট্রয় হইতে আজিকালিকার অনেক রাজ্য পর্য্যন্ত নীত হইয়াছে, চোরের মত সেই অন্ধকারপথে গেল। হার মানিল; সন্ধি চাহিল। সন্ধি হইল। ক্ষৌরিতমুণ্ড বলিল, “মুসলমানের বিবিরা মহারাণীজিকে সেলাম করিতে যাইবে।” মহারাজা তখনই সম্মত হইলেন। কিন্তু যে সকল দোলা বিবিদের লইয়া আসিল, তাহারা রাজপুরমধ্যে পেঁপীছিল। তাহার ভিতর হইতে একটিও পাঠানকন্যা বা কোন জাতীয় কন্যা বাহির হইল না—যাহারা বাহির হইল, তাহারা শ্মশ্রুগুম্ফশোভিত সশস্ত্র যুবা পাঠান। তাহারা তৎক্ষণাৎ রাজপুরী আক্রমণ করিয়া নীলাম্বরকে পিঞ্জরের ভিতর পুরিয়া গোড়ে পাঠাইল। নীলাম্বর পথে পিঞ্জর হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু বোধ হয়, অধিক দিন জীবিত ছিলেন না; কেন না, কেহ তাঁহাকে আর দেখে নাই।

এ দেশে রাজা গেলেই রাজ্য যায়। নীলাম্বর গেলেন ত তাঁহার রাজ্য পাঠানের অধীন হইল। ইহার পূর্বে মুসলমান কখন এ দেশে আইসে নাই। কিন্তু যখন নীলাম্বরের পর আর্য্যবংশীয় রাজার কথা শূন্য যায় না, তখন ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, রঙ্গপুররাজ্য এই সময় পাঠানের করকবলিত হইল।

এই সময়ে—কিন্তু কোন সময়ে সেই আসল কথা! সন তারিখশূন্য যে ইতিহাস—সে পথশূন্য অরণ্যতুল্য—প্রবেশের উপায় নাই—এমত বিবেচনা করিবার অনেক কারণ আছে যে, বিখ্যাত পাঠানরাজ হোসেন শাহাই রঙ্গপুরের জয়কর্তা। হোসেন শাহা ইং ১৪৯৭ সন হইতে ১৫২১ সন পর্য্যন্ত রাজ্য করেন। মুসলমানেরা রঙ্গপুরের কিয়দংশ মাত্র অধিকৃত করিয়াছিলেন।

বাংকম রচনাবলী

কামরূপ কোচেরা অধিকৃত করিয়াছিল। তাহারা রঙ্গপুরের অবশিষ্ট অংশ অধিকৃত করিয়া কোচবিহার রাজ্য স্থাপন করিল।

বাঙ্গালীর উৎপত্তি

প্রথম পরিচ্ছেদ*

অনেকে, বাঙ্গালীর উৎপত্তি কি? এই প্রশ্ন শুনিয়া বিস্মিত হইতে পারেন। অনেকের ধারণা আছে যে, বাঙ্গালায় চিরকাল বাঙ্গালী আছে, তাহাদিগের উৎপত্তি আবার খুঁজিয়া কি হইবে? তাহাদিগের অপেক্ষা শিক্ষার যাহারা একটু উন্নত, তাহারা বিবেচনা করেন, বাঙ্গালীর উৎপত্তি ত জানাই আছে; আমরা প্রাচীন হিন্দুগণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। যে জাতি বেদপাঠ করিত, সংস্কৃতভাষায় কথা কহিত, যে জাতি মহাভারত ও রামায়ণ, পুরাণ ও দর্শন, পাণিনির ব্যাকরণ, কালিদাসের কাব্য, মনুর স্মৃতি ও শাক্যসিংহের ধর্ম সৃষ্টি করিয়াছিল, আমরা সেই জাতির সন্তান; এ কথা ত জানাই আছে। তবে আবার বাঙ্গালীর উৎপত্তি খুঁজিয়া কি হইবে?

এ কথা সত্য, কিন্তু বড় পরিষ্কার নহে। লোকসংখ্যা গণনায় স্থির হইয়াছে যে, যাহাদিগকে বাঙ্গালী বলা যায়, যাহারা বাঙ্গালাদেশে বাস করে, বাঙ্গালাভাষায় কথা কয়, তাহাদিগের মধ্যে অর্ধেক মুসলমান। ইহারা বাঙ্গালী বটে, কিন্তু ইহারাও কি সেই প্রাচীন বৈদিকধর্মাবলম্বী জাতির সন্ততি? হাড়ি, কাওরা, ডোম ও মূর্চি; কৈবর্ত, জেলে, কোঁচ, পলি, ইহারাও কি তাহাদিগের সন্ততি? তাহা যদি নিশ্চিত না হয়, তবে অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। কেবল ব্রাহ্মণ কায়স্থে বাঙ্গালা পরিপূর্ণ নহে, ব্রাহ্মণ কায়স্থ বাঙ্গালীর অতি অল্পভাগ। বাঙ্গালীর মধ্যে যাহারা সংখ্যায় প্রবল, তাহাদিগেরই উৎপত্তিতত্ত্ব অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন।

যে প্রাচীন হিন্দুজাতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া আমরা মনে মনে স্পর্ধা করি, তাহারা বেদে আপনাদিগকে আৰ্য্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এখন ত অনেক দিনের পর ইউরোপ হইতে 'আৰ্য্য' শব্দ আসিয়া আবার ব্যবহৃত হইতেছে। প্রাচীন হিন্দুরা আৰ্য্য ছিলেন; অথবা তাহাদিগের সন্তান। এজন্য আমরা আৰ্য্যবংশ। কিন্তু এই আৰ্য্য শব্দ আর বেদের আৰ্য্য শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বৈদিক ঋষিরা বলেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিনটি আৰ্য্যবর্ণ। এখনকার পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এবং তাহাদিগের অনুবর্তী হইয়া ভারতীয় আধুনিকেরাও বলিয়া থাকেন, ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান, রুষ, যবন, পারসিক, রোমক, হিন্দু, সকলই আৰ্য্য। আবার ভারতবর্ষের সকল অধিবাসী এ নামের অধিকারী হয় না: হিন্দুরা আৰ্য্য বলিয়া খ্যাত, কিন্তু কোল, ভীল, সাঁওতাল আৰ্য্য নহে। তবে আৰ্য্য শব্দের অর্থ কি?

এই প্রভেদের কারণ কি? কতকগুলি দেশীয় লোক আৰ্য্যবংশীয়, কতকগুলি অনাৰ্য্য-বংশীয়, এরূপ বিবেচনা করিবার কারণ কি? আৰ্য্য কাহারা,—কোথা হইতেই বা আসিল? অনাৰ্য্য কাহারা, কোথা হইতেই বা আসিল? এক দেশে দুইপ্রকার মনুষ্যবংশ কেন? আৰ্য্যের দেশে অনাৰ্য্য আসিয়া বাস করিয়াছে, না অনাৰ্য্যের দেশে আৰ্য্য আসিয়া বাস করিয়াছে? বাঙ্গালার ইতিহাসের এই প্রথম কথা।

ইহার মীমাংসাজন্য ভাষাবিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। অতএব ভাষাবিজ্ঞানের মূলতত্ত্বের ব্যাখ্যা এইখানে আবশ্যিক হইল।

ভাষা কিরূপে উৎপন্ন হইল, তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, ইহা ঈশ্বরপ্রদত্ত। সকলই ত ঈশ্বরপ্রদত্ত। ঈশ্বর বৃক্ষের সৃষ্টিকর্তা, কিন্তু গাছ গাড়া কাহারও বাগানে পুঁতিয়া দিয়া যান না। তেমনি তিনিই ভাষার সৃষ্টিকর্তা, কিন্তু তিনি যে ভাষাগুলি তৈয়ারি করিয়া—বিভক্তি, লিঙ্গ, কারকাদিবিশিষ্ট করিয়া—দেশে দেশে মনুষ্যকে শিখাইয়া বেড়ান নাই, ইহা অনায়াসেই অনুমিত হইতে পারে। দ্বিতীয় মত এই যে, মনুষ্যগণ সমবেত হইয়া পরামর্শ করিয়া ভাষাসৃষ্টি করিয়াছে। এ মত গ্রহণ করিতে হইলে অনুমান করিতে হয় যে, দশজন একত্র বসিয়া যুক্তি করিয়াছে যে, এসো, আমরা ফুলফলযুক্ত পদার্থগুলিকে বৃক্ষ বলিতে আরম্ভ

* বঙ্গদর্শন, ১২৮৭, পৌষ।

বিবিধ প্রবন্ধ—বাঙ্গালীর উৎপত্তি

করি—যাহারা উড়িয়া যায়, তাহাদের পাখী বলিতে আরম্ভ করি। এরূপ যুক্তির জন্য ভাষার প্রয়োজন, এ মতে ভাষা না থাকিলে ভাষার সৃষ্টি হইতে পারে না। সুতরাং এ মতও অবৈজ্ঞানিক ও অগ্রাহ্য। তৃতীয় মত এই যে, ভাষা অনুকৃতিমূলক। এই মতই এখন প্রচলিত। প্রাকৃতিক বস্তুসকল শব্দ করে। নদী কল কল করে, মেঘ গর গর করে, সিংহ হুঙ্কার করে, সর্প ফোঁস্ ফোঁস্ করে। আমরাও যে সকল কাজ করি, তাহারও শব্দ আছে। বাঙ্গালী “সপ্ সপ্” করিয়া খায়, “গপ্ গপ্” করিয়া গেলে; “হন্ হন্” করিয়া চলিয়া যায়, “দপ্ দপ্” করিয়া লাফায়। এইরূপ নৈসর্গিক শব্দানুকৃতিই ভাষার প্রথম সূত্র। গাছের ডাল প্রভৃতি ভাঙ্গার শব্দ হইতে “ম্”; মন্দগমনের সময়ে ঘর্ষণজনিত শব্দ হইতে “স্”; নিশ্বাসের শব্দ হইতে “অস্”। সত্য বটে, অনেক সামগ্রী আছে যে, তাহার কোন শব্দ নাই; কিন্তু সে সকল স্থলে মনুষ্যের শব্দানুকরণ-প্রবৃত্তি বিমুখ হয় না। আলোর শব্দ নাই, কিন্তু আমরা আজও বলি, “আলো ঝক্ ঝক্ করিতেছে।” পরিষ্কার ঘরের শব্দ নাই, কিন্তু আমরা বলি যে, “ঘরটি ঝর্ঝর্ করিতেছে”।

“ম্” “স্” “অস্” প্রভৃতি যেন এইরূপে পাওয়া গেল, কিন্তু তাহাতে বিবিধ ভাব ব্যক্ত হইল কৈ? শুধু “ম্” বলিলে কি প্রকারে “মারিলাম” “মারিল” “মারিব” “মারিয়াছি” “মারামারি” “মরণ” “মার”—এত প্রকার কথা ব্যক্ত হয়? অতএব প্রয়োজন মতে ম্ ধাতুর সঙ্গে অন্য প্রকার শব্দের যোগ আবশ্যিক হইল। সেই সংযোগের কাজকে ভাষার গঠন বলা যাইতে পারে। সেই সংযোগের কাজ সর্বত্র একরূপ হয় নাই; এজন্য ভাষার গঠন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার আছে। কি প্রকারে সেই সকল গঠন বর্তমান অবস্থায় পরিণত হইল, তাহার আলোচনায় আমরাই প্রয়োজন নাই। এখন পৃথিবীর ভাষাসকলের যে প্রকারের গঠন দেখা যায়, তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে।

একজাতীয় ভাষায়, ধাতুর সঙ্গে যোগমাত্রের দ্বারা বাক্যের গঠন হয়; কোন ধাতুর কোন প্রকার রূপান্তর হয় না। এ সকল ভাষায় বিভক্তি নাই, ইহাদিগকে “সংযোগের অসাপেক্ষ” (Isolating) ভাষা বলা যায়। চৈনিক, শ্যামদেশীয়, আনাম দেশীয় বা ব্রহ্মদেশীয় ভাষা এইরূপ। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাষাতেও বিভক্তি নাই, কিন্তু উপসর্গ প্রত্যয়াদি ধাতু দ্বারা রূপান্তর হয়। ইহার ধাতুতে ধাতুতে বা ধাতু ও সর্বনামে একপ্রকার সংযোগ হয়। এই সকল ভাষাকে সংযোগসাপেক্ষ (compounding) ভাষা বলে। দক্ষিণের তামিল প্রভৃতি ভাষা, তাতার ভাষা, আমেরিকার আদিমজাতীয় ভাষা এই জাতীয়। তৃতীয় শ্রেণীর ভাষাতেই প্রকৃষ্টরূপে বিভক্তি আছে, সংযোগকালে ধাতুর ও সর্বনামের রূপান্তর ঘটে। ইহাদিগকে বিভক্তিসম্পন্ন ভাষা (inflecting) বলে। পৃথিবীর যত শ্রেষ্ঠ ভাষা, সকলই এই শ্রেণীর অন্তর্গত।* আরবী, ইহুদী, গ্রীক্, ল্যাটিন্, ইংরেজী, ফরাসি, সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দি, ফারসী প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

দেখা গিয়াছে যে, এই তৃতীয় শ্রেণীর ভাষাগর্ভিত ধাতু এবং বিভক্তিচিহ্ন লইয়া গঠিত। ধাতুর পর বিভক্তি ও প্রত্যয়বিশেষের আদেশে শব্দ ও ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। তাহা ছাড়া ভাষায় আর যাহা আছে, তাহাকে সাধারণতঃ সর্বনাম বলা যাইতে পারে। সর্বনামগর্ভিত যে অবস্থাদ্রষ্ট ধাতু ইহাও বিবেচনা করিবার কারণ আছে। কিন্তু তাহা হোক বা না হোক, ধাতু, বিভক্তিচিহ্ন ও সর্বনাম লইয়া ভাষা। যদি কোন দুইটি ভাষায় দেখা যায় যে, ভাষার মূলীভূত ধাতু, বিভক্তি ও সর্বনাম একই, কেবল দেশকালভেদে কিছু রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে, তবে অবশ্য অনুমান করিতে হইবে যে, ঐ দুইটি ভাষা উভয়েই একটি আদিম ভাষা হইতে উৎপন্ন। ভাষাবিজ্ঞানের অতি বিস্ময়কর আবিষ্করণ এই। তৃতীয় শ্রেণীর ভাষাগর্ভিত মধ্য অনেকগর্ভিত প্রাচীন ও আধুনিক ভাষাতেই ভাষার মূলগত ধাতু, বিভক্তিচিহ্ন ও সর্বনাম এক। অতএব সেই সকল ভাষা যে একটি প্রাচীন মূলগত হইতে উৎপন্ন, ইহা সিদ্ধ হইয়াছে। সেই সকল ভাষাগর্ভিত একপরিবারভুক্ত।

* এই শ্রেণীবিভাগ অগস্ত শ্লেচর নামক জার্মান লেখককৃত। মক্ষ্মুলর্ প্রভৃতি ভাষার যেরূপ শ্রেণীভাগ করেন, তাহা আর এক প্রকার। তাহারা তৃতীয় শ্রেণীকে দুইটি স্বতন্ত্র শ্রেণীতে পরিণত করেন—শেমীয় ও আর্ষ্য। কিন্তু শেমীয় ও আর্ষ্য যখন উভয়েই তৃতীয় শ্রেণীর লক্ষণাক্রান্ত, তখন তাহাদিগকে স্বতন্ত্র শ্রেণী বলিয়া দাঁড় করান, কিছু বৈজ্ঞানিক-নীতি-বিরুদ্ধ।

বাংকম রচনাবলী

ভারতবর্ষের সংস্কৃত এবং সংস্কৃতমূলক পালিপ্রভৃতি প্রাচীন ভাষা; বাঙ্গালা হিন্দী প্রভৃতি সংস্কৃতমূলক আধুনিক ভাষা; জেন্দ, অর্থাৎ প্রাচীন পারস্যের অধিবাসীদিগের ভাষা ও আধুনিক পারসী; প্রাচীন গ্রীক্ ও ল্যাটিন্; ল্যাটিন্-সম্ভূত ফরাশী, ইতালীয়, স্পেনীয় প্রভৃতি, রোমান্স-জাতীয় ভাষা, টিউটন-বংশীয়দিগের ভাষা, অর্থাৎ জার্মান্, ওলন্দাজ্, ইংরেজ্; ব্রিটেনীয় আদিমবাসীদিগের কেল্টিক্ ভাষা, স্কটল্যান্ডের পার্শ্বত্যাদেশের গেলিক্, দিনেমারি, সুইডেনি, নরওয়ের ভাষা, রুস্-প্রভৃতি স্লাবনিক্ ভাষা,—সকলই সেই এক প্রাচীন ভাষা হইতে উৎপন্ন,—সকলেই সেই এক বৃদ্ধা মাতার দুহিতা। সেই বহুভাষার জননী প্রাচীন ভাষা এখন আর নাই—কিন্তু একদিন ছিল। যেমন কোন গৃহে, কতকগুলি মাতৃহীন ভ্রাতা ও ভগিনী বাস করিতেছে দেখিয়া অনুমান করি যে, ইহাদের একজন জননী ছিল, তেমনি এই একবংশীয়া বহুতর ভাষা দেখিয়া মনে করি যে, এক প্রাচীন মূল ভাষা ছিল। যে জাতি ঐ ভাষা ব্যবহার করিতেন, তাঁহারা আৰ্য্যজাতি বলিয়া অধুনা নামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই ভাষাসমুৎপন্ন ভাষাগুলি আৰ্য্যভাষা নামপ্রাপ্ত হইয়াছে। যে সকল জাতির ভাষা আৰ্য্যভাষা, তাঁহারা আৰ্য্যবংশীয় বলিয়া অনুমিত এবং বর্ণিত হইয়া থাকে। যাহারা আৰ্য্যবংশসম্ভূত নহে, তাঁহারা অনার্য্যজাতি।

এখন কোল, সাঁওতাল, কোঁচ, কাছাড়ি প্রভৃতি জাতিদিগের ভাষা যাঁহারা অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে, এই সকল ভাষা প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত—এ সকল ভাষায় বিভক্তি নাই। অতএব এই সকল ভাষা অনার্য্যভাষা। যে সকল জাতির মাতৃভাষা অনার্য্যভাষা, সে সকল জাতি অনার্য্যজাতি। কোল, সাঁওতাল, মেছ কাছাড়ি অনার্য্যজাতি। আৰ্য্য ও অনার্য্য, এ ভেদের তাৎপর্য্য এই। এখন আৰ্য্যদিগের সম্বন্ধে একটা কথা বলিব।

সে কথা এই যে, প্রাচীন আৰ্য্যজাতি—যাঁহারা পৃথিবীর সকল শ্রেষ্ঠ জাতির এবং আমাদের পূর্বপুরুষ—তাঁহারা কোথায় বাস করিতেন? ভারতবর্ষীয়েরা বলিতে পারেন—ভারতই আৰ্য্যভূমি—ভারতবর্ষের সংস্কৃতভাষা সকল আৰ্য্যভাষা হইতে প্রাচীনা দেখা যাইতেছে। তবে আৰ্য্যবংশের আদিম বাস ভারতবর্ষ; ভারতবর্ষ হইতে তাঁহারা দলে দলে অন্য দেশে গিয়াছেন, এ কথা না বলিব কেন? অতি প্রাচীন কালেও মনু, যবনপ্রভৃতি জাতিকে ভ্রষ্টশাস্ত্রিয় বলিয়াছেন।

কর্জননামা একজন পাশ্চাত্য লেখকের এই মত*—এবং বিখ্যাত ভারতইতিহাসবেত্তা এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্‌ও কতক সেই দিকে টানেন।† কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে যাঁহারা আৰ্য্যভাষা সকলের বিশেষ সমালোচন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মত এই যে, আৰ্য্যেরা ভারতবর্ষের আদিমবাসী নহেন—অন্যত্র হইতে আসিয়াছেন। তাঁহারা যখন আসেন, তখন ভারতবর্ষে অনার্য্য জাতি বাস করিত। আৰ্য্যেরা অনার্য্যদিগকে জয় করিয়া বশীভূত অথবা বন্য এবং পার্শ্বত্যাদেশে দূরীকৃত করিয়াছিলেন। এই স্থলে সেই সকল কথার প্রমাণের সন্নিবেশ বর্ণনা নিম্নপ্রয়োজন। শ্লেগেল্, লাসেন্, বেন্‌ফী, মোক্ষ্‌মূলর্, স্পিজেল, রেনা, পিন্তা, মূর্ প্রভৃতির এই মত। এই মতও এক্ষণে সকল পণ্ডিত কর্তৃক আদৃত।‡

অতএব আৰ্য্যেরা দেশান্তর হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে, হিন্দুকুশ পর্বতমালার উত্তরে, আসিয়ার মধ্যভাগে প্রাচীন আৰ্য্যভূমি ছিল, সেইখান হইতে তাঁহারা দলে দলে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। ডাক্তার মূর্ বিবেচনা করেন, ঐ হিমালয়ান্তরপ্রদেশই ভারতীয় আৰ্য্যদিগের মধ্যে উত্তরকুরু খ্যাত ছিল। একদল ইউরোপের এক প্রান্তে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া, হেলেনিক্ নামধারণ করিয়া, জগতে অতুল্য সাহিত্য শিল্প দর্শনাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। আর একদল ইতালীর নীলাকাশতলে সপ্তর্গিরিশিখরে নগরী নিৰ্মাণ করিয়া পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াছিলেন। আর একদল বহুকাল জার্মানীর অরণ্যরাজ্যমধ্যে বিহার করিয়া এখনকার দিনে পৃথিবীর নেতা ও শিক্ষাদাতা হইয়াছেন। আর একদল ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া অনন্তমাহিমায় কীর্তি স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের

* Journal, Roy. Asiat. Soc. Vol XVI, pp. 172-200 ডাক্তার মূর্ কর্তৃক উদ্ধৃত Sanskrit Texts, part II, p. 299.

† History of India, Vol. I.

‡ ডাক্তার মূর্ সাহেবের Sanskrit Texts দ্বিতীয় খণ্ডে ইহার সমালোচনা দেখ।

বিবিধ প্রবন্ধ—বঙ্গালীর উৎপত্তি

শোণিত বাঙ্গালীর শরীরে আছে। যে রক্তের তেজে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিসকল শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালীর শরীরেও সেই রক্ত বহিতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—অনার্য*

আর্যেরা উত্তর-পশ্চিম হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। তাহা হইলে তাহাদিগকে প্রথমে সম্প্রসিক্কুশোভিত পঞ্জাব প্রদেশে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। বস্তুতঃ তাহাদিগের প্রথম বাস যে সেই সম্প্রসিক্কুবিধৌত পুণ্যভূমি, তাহার প্রমাণ আর্যদিগের বেদাদি প্রাচীন গ্রন্থাদিতে আছে। আচার্য্য রোথ্ বলেন, ঋগ্বেদসংহিতায় সিক্কুনদের ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে, কিন্তু গঙ্গার নাম একবার মাত্র গৃহীত হইয়াছে। পঞ্জাবের নদী সকল ও পঞ্জাবের নিকটস্থ গান্ধারাদি দেশই বেদ-প্রণেতৃগণের নিকট সুপরিচিত। ইত্যাদি বহুতর প্রমাণ আছে।†

যদি তাহারা উত্তর-পশ্চিম হইতে আসিয়া প্রথমে পঞ্জাবে বাস করিয়া থাকেন, তবে ইহা অবশ্য সিদ্ধ যে, তাহারা পঞ্জাবে আসিবার পরে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। প্রথমে ব্রহ্মাবর্ত, তার পর ব্রহ্মর্ষিদেশ, তার পর মধ্যদেশ, সর্বশেষে তাহারা সমগ্র আর্য্যাবর্তব্যাপী হইয়াছিলেন।‡ বাঙ্গালা, ব্রহ্মাবর্ত বা ব্রহ্মর্ষিদেশ বা মধ্যদেশের মধ্যগত নহে, বাঙ্গালা আর্য্যাবর্তের শেষভাগ। প্রথম কোন সময়ে আর্যেরা বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন, তাহা নিরূপণ করিবার চেষ্টা স্থানান্তরে করিব, অথবা চেষ্টার নিষ্ফলতা প্রতিপন্ন করিব—এক্ষণে আমাদের আলোচ্য এই যে, যখন আর্যেরা বাঙ্গালায় আসেন নাই, তখন বাঙ্গালায় কে বাস করিত?

এ প্রশ্নের সচরাচর উত্তর এই যে, আর্যের পূর্বে অনার্যেরা বাঙ্গালায় বাস করিত। এ উত্তর সত্য কি না, তাহার কিছু বিচার আবশ্যিক। এক্ষণে বাঙ্গালায় আর্য ও অনার্য, উভয়ে বাস করিতেছে। যদি আর্য এখানকার আদিমবাসী না হইল, যদি ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, তাহারা কোন ঐতিহাসিক কালে বাঙ্গালায় আসিয়াছে, তবে অবশ্য অনার্যেরা তৎপূর্বে এখানে বাস করিত—কেবল এইরূপ বিচার অনেক করিয়া থাকেন। কিন্তু এ বিচার অসম্পূর্ণ। এমন কি হইতে পারে না যে, যখন আর্যেরা প্রথম বাঙ্গালায় আসেন, তখন অনার্যেরা বা কোন জাতীয় মনুষ্য বাঙ্গালায় বাস করিত না? এমন কি হইতে পারে না যে, আর্যেরা বাঙ্গালাকে শূন্য ভূমি পাইয়া তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন, তাহার পর অনার্যেরা আসিয়া বন্য ও পার্শ্বত্যা প্রভৃতি প্রদেশ খালি পাইয়া তাহাতে বাস করিতে লাগিল? আর্যেরা ঐতিহাসিক কালে বাঙ্গালায় আসিয়াছিল বলিয়া অনার্যেরা যে তাহার পরে আসেন নাই, এমত সিদ্ধ হইল না। দেশ থাকিলেই যে লোক থাকিবে, এমত কথা নহে। সত্য বটে, এখনকার দিনে বাঙ্গালার

* বঙ্গদর্শন, ১২৮৭, মাঘ।

† Vide Muir's Sanskrit Texts, Part II, Chapter II, Sect. XI & Chapter III, Sect. III.

‡ সরস্বতীদ্বীপতোদ্যে বনদোষ্যদন্তরং ।
তং দেবনির্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্তং প্রচক্ষতে ॥
তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্যক্রমাগতঃ ।
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে ॥
কুরুক্ষেত্রশ্চ মৎস্যশ্চ পণ্ডালাঃ শূরসেনকাঃ ।
এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ ব্রহ্মাবর্তাদনন্তরং ॥
এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদ্ অগ্রজন্মনঃ ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্বমানবাঃ ॥
হিমবদিঙ্কায়োর্মধ্যং যৎ প্রাগ্ বিনশনাদপি ।
প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীর্তিতঃ ॥
আসমুদ্রাত্ত্ব বৈ পূর্বাদাসমুদ্রাত্ত্ব পশ্চিমাৎ ।
তয়োরনন্তরং গির্য্যোরাব্যবর্তং বিদ্বদ্বধাঃ ॥

মনু ২।১৭—২২

বাংকম রচনাবলী

ন্যায় বিস্তৃত ও উর্ষ্বর এবং জীবননির্বাহের নানাবিধ সুখকর উপাদানবাঁশষ্ট দেশ জনশূন্য থাকে না। কিন্তু অতি প্রাচীন কালে যখন পৃথিবীর লোকসংখ্যা এত বাড়ে নাই, যখন জাতিতে জাতিতে বড় ঠেলাঠেলি হয় নাই, তখন বাঙ্গালাও বসতিহীন থাকা বিচিত্র নহে। অতএব প্রশ্ন মীমাংসার আর কি প্রমাণ আছে, দেখা যাউক।

যদি ভারতীয় অনার্যদিগের এখনকার বাসস্থান ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম বা উত্তরপূর্ব প্রদেশ হইত, তাহা হইলে অবশ্য বলিতাম যে, তাহারা বাহির হইতে আসিয়া ঐ সকল স্থান খালি পাইয়া বাস করিয়াছে। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের প্রান্তভাগে, বিশেষ উত্তরপূর্বভাগে কতকগুলি অনার্যজাতির বাস আছে; এবং তাহারাও যে আর্যদিগের আসার পরে আসিয়াছিল, তাহাও ঐতিহাসিক কথা। সে সকল কথা পরে বলিব। অধিকাংশ অনার্যজাতি এরূপ সংস্থানবাঁশষ্ট নহে। তাহারা কোথাও মধ্যভারতে, কোথাও দক্ষিণে, যেখানে সেখানে বসতি করিতেছে। তাহাদের চারিপাশে আর্যনিবাস। ভারতে প্রবেশের পথ আর তাহাদিগের বর্তমান বসতিস্থলের মধ্যে আর্যনিবাস। এ অবস্থা দেখিয়া যিনি বলিবেন যে, আর্যের পরে এই অনার্যেরা আসিয়াছিল, তাঁহাকে বলিতে হইবে যে, অনার্যেরা আর্যদিগকে জয় করিয়া, আর্যনিবাস ভেদ করিয়া, তাহাদের এখনকার বাসে আসিয়াছে। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে যে সকল স্থান উত্তম, মনুষ্যবাসের যোগ্য, সেই সকল স্থানে তাহারা বাস করিত। কদর্য স্থান সকলে পরাজিতেরা যাইত। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা সেরূপ নহে। আনুগঙ্গ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বাসভূমিতেই আর্যনিবাস, কদর্য স্থানেই অনার্যনিবাস। বিষ্ণোত্তর ভারতে যে সকল সুখের স্থান, সেখানে তাহাদের বাস নাই। ইচ্ছা করিয়া যে সকল স্থানে বাস করিতে হয়, সে সকল স্থানে তাহাদের বাস নাই। যেখানে ভূমি উর্ষ্বরা, পৃথ্বী সমতলা, নদী নৌবাহিনী, এবং ধনধান্য প্রচুর, সেখানে তাহারা নাই। যেখানে ভূমি অনূর্ষ্বরা, পর্বতে পথ বন্ধুর, পৃথিবী অরণ্যময়ী, মনুষ্যভাণ্ডার ধনশূন্য, সেই সকল স্থানে তাহাদের বাস। যাহারা বিজয়ী, তাহারা কদর্য স্থান সকল বাছিয়া লইবে—যাহারা বিজিত, তাহাদিগকে ভাল স্থান ছাড়িয়া দিবে, ইহা অঘটনীয়। অতএব আর্যের পর অনার্য আসিয়াছে, এ পক্ষ সমর্থন করা যায় না। কাজেই স্বীকার করিতে হইবে যে, আগে অনার্য ছিল, তার পর আর্য আসিয়াছে।

দেখা যাউক, এই পূর্ববর্তী অনার্য কাহারা। দেশী বিদেশী সকলেই স্বীকার করেন, বেদ প্রাচীন। দেশীয়েরা বলেন, বেদ অপৌরুষেয়। অপৌরুষেয়ত্ববাদ ছাড়িয়া দিয়া, বিদেশীয়দিগের ন্যায় বলা যাউক যে, বেদের ন্যায় প্রাচীন আর্যরচনা আর কিছুই নাই। প্রতীচ্যদিগের মত বেদের মধ্যে ঋগ্বেদসংহিতাই প্রাচীন। সেই ঋগ্বেদসংহিতায় “বিজানীহি আর্য্যান্ যে চ দস্যবঃ,” “অয়মেতি বিচাকশদ্ বিচিন্বন্ দাস আর্যাম্”* ইত্যাদি বাক্যে আর্য হইতে একটি পৃথক্ জাতি পাওয়া যায়। তাহারা দাস বা দস্যু নামে বেদে বর্ণিত। দস্যু শব্দের এখন প্রচলিত অর্থ—ডাকাত, দাসের প্রচলিত অর্থ চাকর। কিন্তু এ অর্থে দস্যু বা দাস শব্দ ঋগ্বেদে ব্যবহৃত নহে। দাসদিগের স্বতন্ত্র নগর, সূতরাং স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল।† তাহারা আর্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিত—তাহাদিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আর্যেরাও ইন্দ্রাদির পূজা করিতেন। দাস বা দস্যুরা কৃষ্ণবর্ণ—আর্যেরা গৌর। তাহারা “বহিঃজান্”—যজ্ঞ করে না—আর্যেরা যজমান—যজ্ঞ করে। তাহারা “অবত”—আর্যেরা সবত—সূতরাং হে ইন্দ্র, হে অগ্নি, তাহাদের মার, আর্যদের বশীভূত কর! আর্যদের এই কথা। তাহারা “অদেব”—সূতরাং ‘বয়ং তান্ বনুয়াম সঙ্গমে’—তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিতে চাই। তাহারা “অন্যবত”—“অমানুষ”—“অযজমান”—তাহারা “মৃধ্বাচ”—কথা কহিতেও জানে না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইরূপ বর্ণনায় নিশ্চিত বলা যায় যে, যাহাদিগের কথা হইতেছে, তাহারা আর্য হইতে ভিন্নজাতীয়, ভিন্নধর্মী, ভিন্নদেশী এবং ভিন্নভাষী—এবং আর্যদিগের পরমশত্রু। আর্যেরা ভারতবর্ষে প্রথম আসিয়া ইহাদিগের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। ইহারা অবশ্য অনার্য।

* ঋচ ১। ৫১। ৮—৯। মূরধৃত। মঙ্গলমূলরধৃত। Sanskrit Texts, Part II, Chap. III. Sect. I.

† ঋচ। ১০। ৮৬। ১৯। মূরধৃত। Ib.

বিবিধ প্রবন্ধ—বাঙ্গালীর উৎপত্তি

বেদের অনেক পরে মন্বাদি স্মৃতি। মনুতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মনুসংহিতা সংকলন-কালে আর্যদিগের চারি পার্শ্বে অনার্যেরা ছিল। মনুতে তাহারা দ্রষ্টব্যক্রিয় বলিয়া বর্ণিত আছে। আচারভ্রংশ হেতু বৃষলত্ব প্রাপ্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে। যথা—

“শনকৈশ্চু ক্রিয়ালোপাৎ ইমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনে চ ॥
পৌণ্ড্রকাশেচাঁদ্ভ্রুবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদা পহুবর্ষেচনাঃ কিরাতা দরদাঃ খসাঃ ॥”

ইহাদিগের মধ্যে যবন পহুবর্ষ আর্য, অবশিষ্ট অনার্য। ইহা ভাষাতত্ত্ব-প্রদত্ত প্রমাণদ্বারা স্থাপিত হইয়াছে।

মনু ও মহাভারত হইতে এইরূপ অনেক অনার্যজাতির তালিকা বাহির করা যাইতে পারে। তাহাতে অন্ধ্র, পুন্ড্র, সবার, মূর্তিব ইত্যাদি অনার্যজাতির নাম পাওয়া যায়। এবং মহাভারতের সভাপর্বে উহারাই দস্যু নামে বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

“দস্যুনাং শশিরস্রাগৈঃ শিরোভিল্বনমৃদ্ধজৈঃ।
দীর্ঘকৃচ্চৈর্মহী কীর্ণা বিবহৈর্নুজৈরিব ॥”

ইহারা যে পরিশেষে আর্যের নিকট পরাজিত হইয়াছিল, তাহাও নিশ্চিত। পরাজিত হইয়াই উহারা, যে যেখানে বন্য ও পার্শ্বত্যা প্রদেশ পাইয়াছিল, সে সেইখানেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল। সেই সকল প্রদেশ দুর্ভেদ্য,—আর্যেরাও সে সকল কুদেশ অধিকারে তাদৃশ ইচ্ছুক হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না; সুতরাং সেখানে আত্মরক্ষা সাধ্য হইল। কোন কোন স্থান—যথা দ্রাবিড়, আর্যের অধিকৃত হইলেও অনার্যেরা তথায় বাস করিতে লাগিল, আর্যেরা কেবল প্রভু হইয়া রহিলেন।* আর্যবর্তের সাধারণ লোক আর্য—দাক্ষিণাত্যে সাধারণ লোক অনার্য। আর্যবর্ত ও দাক্ষিণাত্য তুল্যরূপে আর্য্যধিকৃত দেশ, তবে আর্যবর্তের ও দাক্ষিণাত্যের ভিন্ন অবস্থা কেন ঘটিল, এ প্রস্তাবে সে কথার আলোচনা নিম্নপ্রয়োজনীয়।† ভারতবর্ষে আর্য ও অনার্যের সামঞ্জস্য একরকমে ঘটে নাই। আমরা তিন প্রকার অবস্থা দেখিতে পাই।

প্রথম। ভারতবর্ষে কোশ কোন অংশ আর্য্যাজিত নহে—অনার্যেরা সেখানে প্রধান; কতকগুলি আর্যও সেখানে বাস করে, কিন্তু তাহারা অপ্রধান। ইহার উদাহরণ সিংহভূম।

দ্বিতীয়। অবশিষ্ট আর্য্যাজিত প্রদেশের মধ্যে কোন কোন প্রদেশ এরূপ আর্য্যভূত যে, সে দেশে আর্যবংশ কেবল প্রাধান্যবিশিষ্ট, এমত নহে—লোকের মাতৃভাষাও আর্য্যভাষা। উত্তরপশ্চিম, মধ্যদেশ ইহার উদাহরণ।

তৃতীয়। কোন কোন আর্য্যাজিত দেশ এরূপ অল্প পরিমাণে আর্য্যভূত যে, সে সকল স্থানে লোকের মাতৃভাষা আজিও অনার্য্য। দ্রাবিড় কর্ণাট প্রভৃতিতে আর্য্যধর্ম্মের বিশেষ গৌরব ও সংস্কৃতির বিশেষ চর্চা থাকিলেও, সে সকল দেশ এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

বাঙ্গালা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্তু তাহা হইলেও বাঙ্গালার মধ্যে বিস্তর অনার্য্য। অন্য কোন আর্য্যদেশে অনার্য্যশোণিতের এত প্রবল স্রোতঃ বহে না। সেই কথা এক্ষণে আমরা স্পষ্টীকৃত করিব।

* “Though by this superior civilization and energy they placed themselves at the head of the Dravidian communities, they must have been so inferior in numbers to the Dravidian inhabitants as to render it impracticable to dislodge the primitive speech of the country, and to replace it by their own language. They would therefore be compelled to acquire the Dravidian dialects.” *Muir's Sanskrit Texts, Part II.*

† মূরের দ্বিতীয় খণ্ডে তৃতীয় পরিচ্ছেদে ধৃত মন্ত্রসকল দেখ—ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাইবে। এখানে সে সকল উদ্ধৃত করা নিম্নপ্রয়োজন মনে করি।

বিক্রম রচনাবল

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—অনার্যের দুই বংশ, দ্বাবিড়ী ও কোল*

আমরা বুঝাইয়াছি যে, ভারতবর্ষে আগে অনার্যের বাস ছিল—তার পর আর্যেরা আসিয়া তাহাদিগকে জয় করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। অনার্যেরা বন্য ও পার্শ্বত্যা প্রদেশে গিয়া বাস করিতেছে। ভারতবর্ষে অন্যত্র যাহা ঘটিয়াছে—বঙ্গালাতেও তাই, ইহা সহজে অনুমেয়। কিন্তু বঙ্গালার সঙ্গে মধ্যদেশাদির একটা গুরুতর প্রভেদ আছে। মধ্যদেশাদির ন্যায় বঙ্গালার অনার্য-গণ সকলেই বিজয়ী আর্যদিগের ভয়ে পলায়ন করে নাই। কেহ কেহ পলাইয়াছে—কেহ কেহ ঘরেই আছে।

জয় দ্বিবিধ, কখন কখন কোন প্রবল জাতি জাত্যন্তরকে বিজিত করিয়া তাহাদিগের দেশ অধিকৃত করিয়া আদিমবাসীদিগকে দেশ হইতে দূরীকৃত করে। আদিমবাসীরা সকলে হয় জেতুগণের হস্তে প্রাণ হারায়, নয় দেশ ছাড়িয়া দেশান্তরে পলাইয়া বাস করে। টিউটন-গণকর্তৃক ব্রিটেন্ জয়ের ফল এইরূপ হইয়াছিল। সাক্সনেরা ব্রিটেন্ জয় করিয়া পূর্বাধিবাসীদিগকে নিঃশেষে ধ্বংস করিয়াছিলেন। কেবল যাহারা ওয়েল্‌স্, কর্নওয়াল্ বা ব্রিটানী প্রদেশে গিয়া পলাইয়া বাস করিয়া রহিল, তাহারাই রক্ষা পাইল। ইংলণ্ড আর বৃটেন্ রহিল না। ইংলণ্ড কেবল টিউটনের দেশ হইল। দ্বিতীয় প্রকারে দেশজয়ে পূর্বাধিবাসীরা বিনষ্ট বা তাড়িত হয় না। বিজয়ীদিগের সঙ্গে মিশিয়া যায়। নর্মান্-গণকর্তৃক ইংলণ্ড জয় ইহার উদাহরণ। আর্যগণ বঙ্গালা জয় করিয়াছিলেন। তাহারা টিউটনদিগের মত অনার্যদিগকে নিঃশেষে ধ্বংস বা বিদূরিত করিয়াছিলেন বা নর্মান্-বিজিত সাক্সনের মত অনার্যেরা বঙ্গজেতা আর্যদিগের সহিত মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছিল, তাহা আমাদের দেখিতে হইবে। যদি দেখি যে, বঙ্গালার বর্তমান অধিবাসীদিগের মধ্যে অনার্যবংশ এখনও আছে, তবে বুঝিতে হইবে যে, অনার্যেরা আর্যদিগের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল।

প্রথমে দেখা যাউক, বঙ্গালার কোথায় কোন্ কোন্ অনার্যজাতি আছে। সে গণনার পূর্বে প্রথমে বুঝিতে হইবে, বঙ্গালা কাহাকে বলিতেছি। কেন না, বঙ্গালা নাম অনেক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক অর্থে পেশোর পর্য্যন্ত বঙ্গালার অন্তর্গত—যথা “বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি” “বেঙ্গল আর্মি”। আর এক অর্থে বঙ্গালা তত দূর বিস্তৃত না হইক, মগধ, মিথিলা, উড়িষ্যা, পালার্মো উহার অন্তর্গত—এই সকল প্রদেশ বঙ্গালার লেফটেনেন্ট্ গবর্নরের অধীন। এই দুই অর্থের কোন অর্থেই “বঙ্গালা” শব্দ এ প্রবন্ধে ব্যবহার করিতেছি না। যে দেশের লোকের মাতৃভাষা বঙ্গালা, সেই বঙ্গালী; আমরা সেই বঙ্গালীর উৎপত্তির অনুসন্ধান প্রবৃত্ত। তাহার বাহিরে যাহারা আছে, তাহাদের ইতিহাস লিখিব না—সাঁওতাল বা নাগা এ প্রবন্ধের কেহ নহে। তবে এখানে বঙ্গালার বাহিরে দৃষ্টিপাত না করিলে, আমরা কৃতকার্য হইতে পারিব না। যে সকল অনার্যজাতি বঙ্গালার আর্য কর্তৃক দূরীভূত হইয়াছে, তাহারা অবশ্য বঙ্গালার বাহিরে আছে। বঙ্গালার ভিতরে ও বঙ্গালার পার্শ্বে কোন্ কোন্ অনার্যজাতি বাস করিতেছে—দুইই দেখিতে হইবে।

উত্তরসীমায় ব্রহ্মদেশের সম্মুখে দেখিতে পাই, খাম্‌টি, সিংফো, মিশ্‌মি, চুলকাটা মিশ্‌মি। তার পর অপর জাতি, তাহাও অনেক প্রকার। যথা—পাদম্ মিরী দফ্‌লা ইত্যাদি। তার পর আসামপ্রদেশের নাগা, কুকি, মণিপূরী; কোঁপয়ী, তাহার বাহিরে মিকির, জয়ন্তীয়া, খাসিয়া ও গারো জাতি। আসামের মধ্যে ব্রহ্মপুত্রতীরে দেখিতে পাই, কাছাড়ি বা বোড়ো, মেচ্ ও ধিমালজাতি এবং বঙ্গালার মধ্যে তাহাদিগের নিকটকূটম্ব কোচজাতি। তৎপরে উত্তরে, হিমালয়পর্বতের ভিতরে বাস করে, ভোট, লেপ্‌ছা, লিম্বু, কিরাস্তী বা কিরাতী (প্রাচীন কিরাত)। তার পর বঙ্গালার পূর্বদক্ষিণ সীমায় মগ, লুসাই, কুকি, কারেন্, তালাইন্ প্রভৃতি জাতি। ত্রিপুরার ভিতরেই রাজবংশী নওয়ারিয়া প্রভৃতি জাতি আছে; বঙ্গালার পশ্চিম দিকে কোল, সাঁওতাল, খাড়িয়া, মুন্ড, কোঁড়োয়া ওঁরাও বা ধাঙ্গড় প্রভৃতি অনার্যজাতি বাস করে। এই শেষোক্ত কয়েকটি জাতির সম্বন্ধেই আমাদের অনেকগুলি কথা বলিতে হইবে। উত্তর

* বঙ্গদর্শন, ১২৮৭, ফাল্গুন

বিবিধ প্রবন্ধ—বাঙ্গালীর উৎপত্তি

ও পুর্বেই অনার্যদিগের সঙ্গে আমাদিগের ততটা সম্বন্ধ নাই, তাহারা অনেকেই হালের আমদানী।

আমরা কেবল কয়েকটি প্রধান জাতির নাম করিলাম—জাতির ভিতর উপজাতি আছে এবং অন্যান্য জাতি আছে। প্রসঙ্গক্রমে তাহাদের কথাও বলিতে হইবে।

এখন প্রথম জিজ্ঞাস্য এই যে, ইহারা সকলে কি একবংশসম্ভূত? আৰ্যেরা সকলেই এক-বংশসম্ভূত—আৰ্য শব্দের অর্থই তাই। কিন্তু “অনার্য” বলিলে কেবল ইহাই বুঝায় যে, ইহারা আৰ্য নহে। যাহারা আৰ্য নহে, তাহারা সকলেই যে একজাতীয়, এমত বুঝায় না। যদি এমত প্রমাণ থাকে যে, ইহারা একবংশসম্ভূত, তবে সহজে অনুমান করিতে পারা যায় যে, ইহারা সকলেই বাঙ্গালার প্রথম অধিবাসী—আৰ্যগণকর্তৃক তাড়িত হইয়া নানাপ্রানে ছড়াইয়া পড়িয়া নানাদেশে নানা নাম ধারণ করিয়াছে; কিন্তু যদি সে প্রমাণ না থাকে—বরং তদ্বিরুদ্ধে প্রমাণ থাকে যে, তাহারা নানাবংশীয়, তবে আবার বিচার করিতে হইবে, এইগুলির মধ্যে কাহারা কাহারা বাঙ্গালার প্রথম অধিবাসী।

প্রামাণ্য ইতিহাসের অভাবে ভাষাবিজ্ঞানের আবিষ্কৃত্য এ সকল বিষয়ে গুরুতর প্রমাণ। আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে যে তিন শ্রেণীর ভাষার কথা বলিয়াছি, তাহার মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীর ভাষার অন্তর্গত আৰ্যভাষা ও সেমীয়ভাষা (আরবী, হিব্রু প্রভৃতি)। প্রথম শ্রেণীর ভাষাগুলি—যাহা সংযোগনিরপেক্ষ অথবা বিভক্তিবিশিষ্ট নহে—সেই সকল ভাষাকে ইউরোপীয়েরা ভারত-চৈনিক বলিয়া থাকেন। নামটি আমাদিগের ব্যবহারের অযোগ্য—আমরা ঐ ভাষাগুলি চৈনিকীয়ভাষা বলিব। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাষার সাধারণ নাম তুরাণী। বাঙ্গালার মধ্য বা প্রান্তস্থিত অনার্যজাতিসকলের ভাষা এই দ্বিবিধ—কতকগুলি জাতির ভাষা চৈনিকীয়—ইহা-দিগের বাস প্রায় আসামে বা বাঙ্গালার পুর্বসীমায়। তাহারা অনেকেই আৰ্যদিগের পরে আসিয়াছে, এমত ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। তার পর অবশিষ্ট যে সকল অনার্যজাতি—তাহাদিগের সকলেরই ভাষা তুরাণীশ্রেণীস্থ।

কিন্তু সেই সকল অনার্যভাষার মধ্যেও জাতিগত পার্থক্য দেখা যায়। পুর্বেই কাথিত হইয়াছে, দ্রাবিড়ভাষা তুরাণীশ্রেণীস্থ। বাঙ্গালার অনার্যভাষার মধ্যে কতকগুলি জাতির ভাষার শব্দ সমাস ও ব্যাকরণ সমালোচন করিয়া পণ্ডিতেরা দেখিয়াছেন যে, ঐ সকল ভাষা দ্রাবিড়ী ভাষার সঙ্গে সম্বন্ধবিশিষ্ট। আর কতকগুলি অনার্যভাষাতে দ্রাবিড়ী ভাষার সঙ্গে কোন প্রকার সাদৃশ্য নাই। ইহাতে সিদ্ধ হইয়াছে যে, বাঙ্গালার কতকগুলি অনার্যজাতি দ্রাবিড়ীদিগের জাতি—কতকগুলি তাহাদিগের হইতে ভিন্ন জাতি।

যাহারা অদ্রাবিড়ী, তাহাদিগের মধ্যে ভাষাগত ঐক্য আছে। কোল বা হো, সাঁওতাল, মন্ড প্রভৃতি এখন ভিন্ন ভিন্ন স্থানবাসী ভিন্ন ভিন্ন জাতি বটে, কিন্তু যেমন সকল আৰ্যভাষাই পরস্পরের সহিত সাদৃশ্য ও সম্বন্ধবিশিষ্ট, কোল, মন্ড, সাঁওতাল প্রভৃতির ভাষাও সেইরূপ সাদৃশ্য ও সম্বন্ধবিশিষ্ট। অতএব ইহারা সকলেই একজাতীয় বলিয়া বোধ হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—আর্য্যিকরণ*

(১) সাঁওতাল, (২) হো, (৩) ভূমিজ, (৪) মন্ড, (৫) বীরহোড়, (৬) কড়ুয়া, (৭) কুর্ বা কুকুর্ বা মূয়ার্শি, (৮) খাড়িয়া, (৯) জুয়াং, এই কয়টি কোলবংশীয় বাঙ্গালার লেঃ গবর্ণরের শাসন-অধীনে পাওয়া যায়।

জুয়াঙ্গেরা উড়িষ্যার চেংকানান ও কেংওন্ড প্রদেশে বাস করে। কুর্ বা মূয়ার্শির সঙ্গে এ ইতিহাসের কোন সম্বন্ধ নাই। খাড়িয়ারা সিংহভূমের অতিশয় বনাকীর্ণপ্রদেশে বাস করে; মানভূমের পাহাড়েও তাহাদের পাওয়া যায়। বীর বীরহোড়েরা হাজারিবাগের জঙ্গলে থাকে। কড়ুয়ারা সরগুজা, যশপুর ও পালার্মো অঞ্চলে থাকে। উহাদিগের সঙ্গে মিশ্রিত “অসূর” নামে আর একটি কোলবংশীয় জাতি পাওয়া যায়। কুকুর্ জাতি আরও পশ্চিমে।

সাঁওতালেরা গঙ্গাতীর হইতে উড়িষ্যায় বৈতরণীতীর পর্য্যন্ত ৩৫০ মাইল ব্যাপ্ত করিয়া

* বঙ্গদর্শন, ১২৮৭, চৈত্র।

বঙ্গীয় রচনাবলী

বাস করে—কোথাও কম, কোথাও বেশী। যে প্রদেশ এখন “সাঁওতাল পরগণা” বলিয়া খ্যাত, তাহা ভিন্ন ভাগলপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া, হাজারিবাগ, মানভূম, মেদিনীপুর, সিংহভূম, বালেশ্বর, এই কয় জেলায় ও ময়ূরভঞ্জে সাঁওতালদিগের বাস আছে।

হো, ভূমিজ এবং মন্ডের সাধারণ নাম কোল। হো জাতিকে লড়্কা বা লড়াইয়া কোল বলে। ভূমিজেরা কাঁসাই ও সুবর্ণরেখা নদীদ্বয়ের মধ্যে মানভূম জেলা প্রভৃতি প্রদেশে বাস করে। মন্ড বা মন্ডারীরা চুটিয়া নাগপুর অঞ্চলে বাস করে।

হরিবংশে আছে যে, যযাতির কনিষ্ঠ পুত্র তুর্বসুর বংশে কোল নামে রাজা ছিলেন। উত্তর-ভারতে তাঁহার রাজ্য ছিল; তাঁহারই বংশে কোলদিগের উৎপত্তি।* মনুতে “কোলি সর্প”দিগের পুনঃ পুনঃ প্রসঙ্গ দেখা যায়। ভারতবর্ষে কোলেরা এককালে প্রধান ছিল, এমত বিবেচনা করিবার অনেক কারণ আছে। হন্টর্ সাহেব প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ভারতবর্ষে সর্বত্রই হো নামক কোন আদিম জাতির বাসের চিহ্ন পাওয়া যায়।† তিনি যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশে অধিক শ্রদ্ধা করা যায় না; কিন্তু হো বা কোলজাতি যে একদিন বহুদূরবিস্তৃত দেশের অধিবাসী ছিল, তাহাও সম্ভব বোধ হয়। হো শব্দেই কোল ভাষায় মনুষ্য বুঝায়। এক সময়ে ইহারা স্বজাতি ভিন্ন অন্য কোন জাতির অস্তিত্ব জ্ঞাত ছিল না।

কর্ণেল্ ডাল্টন্ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, কোলেরাই পূর্বে মগধাদি অনঙ্গ প্রদেশের অধিবাসী ছিল—যাহা এখন বাঙ্গালা ও বেহার, সে প্রদেশে তখন কোলভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষা প্রচলিত ছিল না। মগধ প্রদেশে, বিশেষতঃ শাহাবাদ জেলায় অনেক ভগ্নমন্দির অট্টালিকা আছে। প্রবাদ আছে যে, সে সকল চেরো এবং কোলজাতীয়দিগের নিশ্চিত। কিম্বদন্তী এইরূপ যে, ঐ প্রদেশে সাধারণ লোক কোল ছিল, রাজারা চেরো ছিল।

কথিত আছে যে, কোলেরা সবার নামক দ্রাবিড়ী অনার্যজাতি কর্তৃক মগধ হইতে বিহ্বৃত হইয়াছিল। সবারেরা মনু ও মহাভারতে অনার্যজাতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সবার অদ্যাপি উড়িষ্যার নিকটবর্তী প্রদেশে বর্তমান আছে।

দ্রাবিড়ীয়গণ বাঙ্গালার উপাস্তভাগ সকলে কোলবংশীয়দিগের অপেক্ষা বিরল। হাজারিবাগের ওঁরাও (ধাঙ্গর) ও রাজমহলের পাহাড়ীরা ভিন্ন আর কেহ নিকটে নাই। গোন্দেরা দ্রাবিড়ী বটে, কিন্তু তাহারা আমাদিগের নিকটবাসী নহে। কিন্তু বাঙ্গালার ভিতরেই এমন অনেক জাতি বাস করে যে, তাহারা দ্রাবিড়বংশীয় হইলে হইতে পারে। কর্নেল্ ডাল্টন্ বলেন যে, কোচেরা অনঙ্গবিজয়ী দ্রাবিড়ীয়গণ হইতে উৎপন্ন। বহুতর কোচ বাঙ্গালার ভিতরেই বাস করিতেছে। দিনাজপুর, মালদহ, রাজসাহী, রঙ্গপুর, বগুড়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় কোচদিগকে পাওয়া যায়। বাঙ্গালার ভিতর প্রায় এক লক্ষ কোচের বাস আছে। এই লক্ষ লোককে বাঙ্গালী বলা যাইবে কি না?‡ কেহ কেহ বলেন, ইহাদিগকেও বাঙ্গালীর সামিল ধরিতে হইবে। আমরা সে বিষয়ে সন্দেহান। কোচেরা বাঙ্গালী হউক বা না হউক, বাঙ্গালার ভিতরে অনার্য আছে কি না, এ কথার আমাদিগের একবার আলোচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন।

কে আর্য্য, কে অনার্য্য? ইহা নিরূপণ করিবার জন্য ভাষাতত্ত্বই প্রধান উপায়, ইহা দেখান গিয়াছে। যাহার ভাষা আর্য্যজাতীয় ভাষা, সেই আর্য্যবংশীয়। যাহার ভাষা অনার্য্যভাষা, সেই অনার্য্যজাতীয়, ইহা স্থির করা গিয়াছে। পরে দেখান গিয়াছে যে, যে অনার্য্যের ভাষা দ্রাবিড়-জাতীয় ভাষা, সেই দ্রাবিড়বংশীয় অনার্য্য; যাহার ভাষা কোলজাতীয়ভাষা, সেই কোলবংশীয় অনার্য্য। কিন্তু এমন কি হইতে পারে না যে, ভাষা একজাতীয়, বংশ অন্যজাতীয় একাধারে সমাবিষ্ট হইয়াছে? এমন কি হইতে পারে না যে, পরাজিত জাতি জেতুগণের ধর্ম্ম, জেতুগণের ভাষা গ্রহণ করিয়া জেতুদিগের জাতিভুক্ত হইয়াছে?

এমন উদাহরণ ইতিহাসে অনেক পাওয়া যায়। ফ্রান্সের বর্তমান ভাষা ল্যাটিন-মূলক, কিন্তু

* Asiatic Researches, Vol. IX, P. 91 & 92.

† Non-Aryan Dictionary. Linguistic Dissertation, P. 25 &c.

‡ “The proud Brahman who traces his lineage back to the palmy days of Kanauj and the half civilized Koch of Palya of Dinagepore may both be fitly spoken as Bengali. *Bengal Census Report*, 1871.

বিবিধ প্রবন্ধ—বাঙ্গালীর উৎপত্তি

ফরাসি জাতির অস্থিমজ্জা কেল্টীয় শোণিতে নিম্মিত। প্রাচীন গলেরা রোমগণ কর্তৃক পরাজিত ও রোমকরাজ্যভুক্ত হইলে পর রোমীয় সভ্যতা গ্রহণ করে। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে রোমীয় ভাষা অর্থাৎ ল্যাটিনভাষা গ্রহণ করে। যখন পশ্চিম রোমকসাম্রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তখন গলদিগের মধ্যে ল্যাটিনভাষাই প্রচলিত ছিল, পরে তাহারই অপভ্রংশে বর্তমান ফরাসি ভাষা দাঁড়াইয়াছে। আইবিরিয়াতেও (স্পেন ও পর্তুগল্) ঐরূপ ঘটিয়াছিল। আমেরিকার কাফ্রি দাসদিগের বংশ প্রভূদিগের ভাষা অবলম্বন করিয়াছে, জাতীয় ভাষার পরিবর্তে ইংরেজি বা ফরাসি ব্যবহার করিয়া থাকে।* অতএব ভাষা আর্ষ্যভাষা হইলেই আর্ষ্যবংশীয় বলা যাইতে পারে না—অন্য প্রমাণ আবশ্যিক।

সকলেই জানে যে, আর্ষ্যেরা ককেশীয়বংশীয়। ককেশীয় বংশের মধ্যে আর্ষ্য ভিন্ন অন্য বংশও আছে, কিন্তু ককেশীয় বংশের অন্তর্গত নহে, এমন আর্ষ্যজাতি নাই। ককেশীয়দিগের লক্ষণ—গোরবর্ণ, দীর্ঘ শরীর, মস্তক সুগঠন, হৃদয় অনুন্নত। মোঙ্গল বংশ ককেশীয়দিগের হইতে পৃথক্। মোঙ্গলীয়েরা খর্ষ্বাকার, মস্তকের গঠন চতুষ্কোণ, হৃদয় অত্যন্নত। যদি কোন জাতিকে এমন পাওয়া যায় যে, তাহাদিগের শারীরিক গঠন মোঙ্গলীয়, তবে সে জাতিকে কখন আর্ষ্য বলা যাইবে না। যদি দেখিতে পাই, সে জাতীয়ের ভাষা আর্ষ্যভাষা, তাহা হইলে এইরূপ বিবেচনা করিতে হইবে যে, তাহারা আদৌ অনাৰ্য্যজাতি, আর্ষ্যদিগের সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া আর্ষ্যদিগের ভাষা গ্রহণ করিয়াছে। আবার যদি দেখি যে, সেই অনাৰ্য্য-জাতি কেবল আর্ষ্যভাষা নহে, আর্ষ্যধর্ম পর্যন্ত গ্রহণ করিয়া আর্ষ্যসমাজভুক্ত হইয়াছে—তখন বুঝিতে হইবে যে, এক জাতি অপর জাতিকে বিজিত করিয়া একত্র বাস করায় একের সঙ্গে অন্য মিশিয়া গিয়াছে। যদি আবার দেখি যে, এই বিমিশ্র জাতিদ্বয়ের মধ্যে আর্ষ্য উন্নত—অনাৰ্য্য অবনত, তবে বিবেচনা করিতে হইবে যে, আর্ষ্যেরা জয়কারী, অনাৰ্য্যেরাই বিজিত হইয়া আর্ষ্য-সমাজের নিম্ন স্তরে প্রবেশ করিয়াছে।

ইহাতে এই এক আপত্তি হইতে পারে যে, হিন্দুধর্ম অহিন্দুর পক্ষে গ্রহণীয় নহে। যে কেহ ইচ্ছা করিলে খ্রীষ্টীয়, কি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া খ্রীষ্টীয়ান বা মুসলমান হইতে পারেন। কিন্তু যে হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করে নাই—সে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু হইয়া হিন্দুসমাজে মিশিতে পারে না। অতএব যে অনাৰ্য্য আদৌ হিন্দুকুলজাত নহে, সে কখনও হিন্দু হইয়া হিন্দুসমাজে মিশিয়াছে, এ কথা কেহ বিশ্বাস করিবে না।

এই আপত্তি ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে বলবৎ বটে। কিন্তু এক একটি বৃহৎ জাতির পক্ষে ইহা খাটিতে পারে না। বিশেষতঃ বন্য অনাৰ্য্য জাতিদিগের পক্ষে খাটিতে পারে না। মুসলমান বা খ্রীষ্টীয়ান কখনও হিন্দু হইতে পারে না; কেন না, যে সকল আচার হিন্দুত্ব ধ্বংসকারক, তাহারা পুরুষানুক্রমে সেই সকল আচার করিয়া পুরুষানুক্রমে পতিত। কিন্তু এ প্রদেশের বন্য অনাৰ্য্য জাতিদিগের মধ্যে হিন্দুত্ববিনাশক এমন কোন আচার ব্যবহার নাই যে, তাহা হিন্দুদিগের অতি নিকৃষ্ট জাতিদিগের মধ্যে—হাড়ি ডোম মূচি কাওরা প্রভৃতির মধ্যে পাওয়া যায় না। মনে কর, যেখানে হিন্দু প্রবল, এমন কোন প্রদেশের সন্নিকটে অথবা হিন্দুদিগের অধীনে কোন অসভ্য অনাৰ্য্য জাতি বাস করে। এমন স্থলে ইহা অবশ্যই ঘটিবে যে, আর্ষ্যেরা সমাজের বড়, অনাৰ্য্যেরা সমাজের ছোট থাকিবে। মনুষ্যের স্বভাব এই যে, যে বড়, ছোট তাহার

* ভারতবর্ষেও এই আর্ষ্য অনাৰ্য্য জাতিদিগের মধ্যে আজিকার দিনেই আর্ষ্যদিগের প্রত্যক্ষগোচরে এইরূপ ভাষাপরিবর্তন ঘটিতেছে। এখনও অনেক স্থানে অনাৰ্য্যেরা দিনে দিনে আপন মাতৃভাষা পরিত্যাগ করিয়া আর্ষ্যভাষা গ্রহণ করিতেছে। কর্ণেল্ ডাল্টন্ বলেন যে, তিনি ১৮৮৬ সালে কোড়বা জাতীয়গণের ভাষা সম্বন্ধে কতকগুলি তত্ত্বের অনুসন্ধান করিবার অভিপ্রায়ে কোড়বাদিগের বাসভূমি যশপুর রাজ্যে গমন করিয়াছিলেন। তাহার তলবমতে বহুসংখ্যক অসভ্য কোড়বা আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে কেহই কোড়বা ভাষার এক বর্ণও বলিতে পারিল না। তাহারা বলিল, তাহারা ডিহি কোড়বা—অর্থাৎ পার্শ্বতা প্রদেশ পরিত্যাগ পূর্বক সমতল প্রদেশে বাস করিয়া চাষ আবাদ করিতেছে। দেশ ও সমাজ পরিত্যাগের সঙ্গে ভাষাও ত্যাগ করিয়াছে। উদাহরণের স্বরূপ কর্ণেল্ ডাল্টন্ আরও বলেন যে, চুটীয়া নাগপুর প্রদেশে ও'রাওদিগের যে সকল গ্রাম আছে, তাহার মধ্যে অনেক অনেক গ্রামের ও'রাওয়েরা জাতীয় ভাষা বলিতে পারে না, হিন্দু বা মুন্ডিদিগের ভাষায় কথা কহে। *Ethnology of Bengal*, p. 115.

বিশ্বকম রচনাবলী

অনুকরণ করে। কাজে কাজেই এমত স্থলে অনার্যেরা হিন্দুদিগের সর্বাঙ্গীণ অনুকরণে প্রবৃত্ত হইবে। আমরা এখন ইংরেজদিগের অনুকরণ করিতেছি, পূর্বে মুসলমানদিগের অনুকরণ করিতাম। আমরাদিগের একটি প্রাচীন ধর্ম আছে, চারি হাজার বৎসর হইতে সেই ধর্ম নানাবিধ কাব্য দর্শন ও উচ্চ নৈতিক তত্ত্বের দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া লোকমনোমোহন হইয়াছে, তাহার কাছে নিরাভরণ ইসলাম বা খ্রীষ্টীয় ধর্ম অনুরাগভাজন হয় না। এই জন্য আমরা এখন সর্বথা ইংরেজদিগের অনুকরণ করিয়াও, ধর্ম সম্বন্ধে তাহাদের ততটা অনুগমন করি না। কতকটা না করিতেছি, এমনও নহে। কিন্তু অনার্যদিগের মধ্যে তেমন উজ্জ্বল বা শোভাবিশিষ্ট কোন জাতীয় ধর্ম নাই। অনেক স্থলে একেবারে কোন প্রকার জাতীয় ধর্ম নাই। এমত অবস্থায় অধীন অনার্যসমাজ প্রভু আর্যদিগের অন্য বিষয়ে যেমন অনুকরণ করিবে, ধর্মসম্বন্ধেও সেইরূপ অনুকরণ করিবে। হিন্দুরা যে ঠাকুরের পূজা করে, তাহারাও সেই ঠাকুরের পূজা করিতে আরম্ভ করিবে। হিন্দুরা যে সকল উৎসব করে, তাহারাও সেই সকল উৎসব করিতে আরম্ভ করিবে। জীবননির্ব্বাহের নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম সকলে হিন্দুদিগের ন্যায় আচার ব্যবহার করিতে থাকিবে। সমগ্র জাতি এইরূপ ব্যবহার করিতে থাকিলে কালক্রমে তাহারাও হিন্দু নাম ধারণ করিবে। অন্য হিন্দু কেহ কখন তাহাদিগের অন্ন খাইবে না। তাহাদিগের সহিত কন্যা আদান-প্রদান করিবে না, অথবা অন্য কোন প্রকারে তাহাদিগের সহিত মিশিবে না—হয় ত তাহাদিগের স্পৃষ্ট জল পর্যন্তও গ্রহণ করিবে না। অতএব তাহারাও একটি পৃথক্ হিন্দুজাতি বলিয়া গণ্য হইবে। তাহারা আগে যেমন পৃথক্ জাতি ছিল, এখনও তেমন পৃথক্ জাতি রহিল, কেবল হিন্দুদিগের আচার ব্যবহারের অনুকরণ গ্রহণ করিয়া হিন্দুজাতি বলিয়া খ্যাত হইল। পাশ্চাত্যদিগের মধ্যে একটি বিবাদের কথা আছে। কেহ কেহ বলেন যে, হিন্দু ধর্ম “proselytizing” নহে, অর্থাৎ যে জন্মাবধি হিন্দু নয়, হিন্দুরা তাহাকে হিন্দু করে না। আর এক সম্প্রদায় বলেন যে, হিন্দু ধর্ম proselytizing, অর্থাৎ অহিন্দুও হিন্দু হয়। এ বিবাদের স্থূলমর্ম উপরে বদ্বান গেল। খ্রীষ্টান বা মুসলমানদিগের proselytism এইরূপ যে, তাহারা অন্যকে ভজায়, “তুমি খ্রীষ্টান হও, তুমি মুসলমান হও।” আহুত ব্যক্তি খ্রীষ্টান বা মুসলমান হইলে তাহার সঙ্গে আহার ব্যবহার, কন্যা আদান প্রদান প্রভৃতি সামাজিক কার্য সকলেই করিয়া থাকে বা করিতে পারে। হিন্দুদিগের proselytization সেইরূপ নহে। হিন্দুরা কাহাকেও ডাকে না, “তুমি স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া আসিয়া হিন্দু হও।” যদি কেহ স্বেচ্ছাক্রমে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে, তাহার সঙ্গে আহার ব্যবহার বা কোন প্রকার সামাজিক কার্য করে না, কিন্তু যে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহার বংশে হিন্দুধর্ম বজায় থাকিলে, তাহার হিন্দু নামও লোপ করিতে পারে না। একটা সম্পূর্ণ জাতি এইরূপে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া পুরুষানুক্রমে হিন্দুধর্ম পালন করিলে, সকলেই তাহাকে হিন্দুজাতি বলিয়া স্বীকার করে। হিন্দুদিগের proselytism এই প্রকার। ঐ শব্দ মুসলমান বা খ্রীষ্টান সম্বন্ধে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, হিন্দুদিগের সম্বন্ধে সে অর্থে ব্যবহৃত হয় না। প্রকৃতপ্রস্তাবে হিন্দুদিগের মধ্যে proselytism নাই এবং তদর্থবাচক ভারতীয় কোন আর্যভাষায় কোন শব্দও নাই।

যে অর্থে অহিন্দু হিন্দু হইতে পারে বলা গিয়াছে, সে অর্থে এখনও অনেক অনার্য জাতি হিন্দু হইতেছে।

অনার্যজাতি যে আপনাদিগের অনার্যভাষা পরিত্যাগ করিয়া আর্যভাষা ও আর্যধর্ম গ্রহণপূর্ব্বক হিন্দু হইয়াছে, তাহার কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি।

প্রথম। হাজারিবাগ প্রদেশে বিদ্যা নামে একটি জাতি বাস করে। বেদিয়া হইতে তাহারা পৃথক্। বিদ্যামাহাত্ম্য নাম তাহারা কখন কখন ধারণ করিয়া থাকে। ইহারা হিন্দি ভাষা কয় এবং হিন্দুমধ্যে গণ্য; কিন্তু এই বিদ্যাগণ মূন্ডজাতীয় কোল, তাহাতে কোন সংশয় নাই। চুটিয়া নাগপুরের মূন্ডদিগের যেরূপ আকৃতি, ইহাদিগেরও সেইরূপ আকৃতি। মূন্ডদিগের মধ্যে পহন নামে এক একজন পুরোহিত বা গ্রাম্য কর্মচারী সর্বত্র দেখা যায়, বিদ্যাগণের মধ্যেও ঐরূপ গ্রামে গ্রামে পহন আছে। মূন্ডেরা লোহা প্রস্তুত করিতে সুদক্ষ এবং সেই ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া থাকে। বিদ্যাগণও সেই কাজে সুদক্ষ ও সুব্যবসায়ী। আর মূন্ডদিগের মধ্যে কিলী অর্থাৎ জাতিবিভাগ আছে, ইহাদিগেরও সেইরূপ আছে। মূন্ডদিগের কিলীর যে যে

বিবিধ প্রবন্ধ—বঙ্গালীর উৎপত্তি

নাম, বিদ্যাগণের কিলীরও সেই সেই নাম। অতএব ইহা এক প্রকার নিশ্চয় করা যাইতে পারে যে, বিদ্যাগণ মন্ড কোল। কিন্তু এখন তাহারা হিন্দীভাষা বলে ও হিন্দুধর্ম অবলম্বন করিয়া চলে।*

দ্বিতীয়। আসামে চুটীয়া নামে একটি জাতি আছে। তাহাদের মুখাবয়ব অনার্যের ন্যায়। কোন আসামী বুরুঞ্জীতে কর্ণেল্ ডাল্টন্ দেখিয়াছেন যে, উত্তরপ্রদেশস্থ পর্বত হইতে তাহারা উপর আসামে প্রবেশ করিয়া, সুবলেশ্বরী পার হইয়া সদীয়াপ্রদেশে বাস করে। লকিমপুরপ্রদেশে দিকু নদীর উপরে, এবং উপর আসামের অন্যত্র দেউরী চুটীয়া নামে এক চুটীয়াজাতি পাওয়া গিয়াছে। তাহাদিগের ভাষা সমালোচন করিয়া স্থির হইয়াছে যে, ঐ চুটীয়া ভাষা গারো ও বোড়াদিগের ভাষার সঙ্গে একজাতীয়। অতএব চুটীয়ারা যে অনার্যজাতি, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু এক্ষণে আসামের অধিকাংশ চুটীয়া হিন্দু বলিয়া গণ্য। এবং তাহারা আপনারাও হিন্দু চুটীয়া বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেয়। হিন্দু চুটীয়া বলিলেই বুঝাইবে যে, ম্লেচ্ছ চুটীয়া ছিল বা আছে।†

তৃতীয়। কাছাড়িরা অনার্যবংশ। তাহাদের অবয়ব মোঙ্গলীয়। কিন্তু আসাম প্রদেশীয় কাছাড়িরা হিন্দু হইয়াছে। এবং এক্ষণেও অনেকে হিন্দু হইতেছে।

চতুর্থ। কোচেরা আর একটি অনার্যজাতি। আসল কোচভাষা মেছ কাছাড়িভাষা সদৃশ, কিন্তু ঐতিহাসিক সময়েই কোচবেহারের রাজাদিগের আদিপুরুষ হজুর পৌত্র বিসু সিং হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে কোচবেহারের যত ভদ্রলোক হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহারা রাজবংশী নাম গ্রহণ করিলেন। ইতর কোচেরা মুসলমান হইল।‡

পঞ্চম। ত্রিপুরার পাহাড়ি লোক অনার্যজাতি। কিন্তু তাহারাও হিন্দুধর্ম অবলম্বন করিয়াছে।§

ষষ্ঠ। খাড়োয়ার নামক অনার্যজাতি কালীপূজা করিয়া থাকে।**

সপ্তম। পহেয়া নামে পালামোতে এক জাতি আছে, তাহারা হিন্দীভাষা কয় এবং কতকগুলি আচার ব্যবহার তাহাদের হিন্দুদিগের ন্যায়। তাহাদের অনার্যত্ব নিঃসন্দেহ।

অষ্টম। সগুঁজায় কিসান বলিয়া এক জাতি আছে, তাহারাও অনার্য এবং তাহাদিগের আচার ব্যবহার সব কোলের ন্যায়, তাহাদেরও ভাষা হিন্দী এবং তাহারা কতক কতক হিন্দু আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছে।¶

নবম। “বুনো” কুলি সকলেই দেখিয়াছেন। তাহারা জাতিতে সাঁওতাল, কোল বা ধাঙ্গড় (ওবাঁও), কিন্তু এ দেশে যত “বুনো” দেখা যায়, সকলেই হিন্দু।

এরূপ আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। যাহা দেওয়া গেল, তাহাতেই যথেষ্ট হইবে। এই কয়েকটি উদাহরণ দ্বারাই উত্তমরূপে প্রমাণ হইতেছে যে, বঙ্গালার বাহিরে এমন অনেক অনার্যবংশ পাওয়া যায় যে, তাহারা আৰ্যভাষা গ্রহণ করিয়া ও হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দুজাতি বলিয়া গণ্য হইয়াছে। যদি বঙ্গালার বাহিরে অনার্য হিন্দু পাওয়া যাইতেছে, তবে বঙ্গালার ভিতরে বঙ্গালীর মধ্যে এরূপ অনার্য হিন্দু থাকাও সম্ভব। বাস্তবিক আছে কি না, তাহার বিচার করার প্রয়োজন।

এইখানে বলা উচিত যে, পাশ্চাত্যদিগের সাধারণ মত এই যে, প্রাচীন চতুর্দর্শের মধ্যে শূদ্রদিগের উৎপত্তি এইরূপই ঘটিয়াছিল। জাতিভেদ সম্বন্ধে অনেকে অনেক মত প্রচার করিয়াছেন। আমরাদিগের মতে জাতিভেদ তিন প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রথম, আৰ্যগণের

* Statistical Account of Bengal, Vol. VII, p. 213.

† Statistical Account of Bengal, Vol. XVI, p. 82-83.

‡ Dalton's Ethnology, p. 78.

§ Buchanan Hamilton—Rungpur, Vol. III, p. 419. Hodgson I. A. S. B. XXXI. July 1849.

**Dalton's Ethnology, p. 130.

¶ Dalton's Ethnology, p. 132.

বাংকম রচনাবলী

মধ্যে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যভেদ। এটি ব্যবসায়ভেদেই উৎপন্ন হইয়াছিল। এখন আমরা ইউরোপে দেখিতে পাই যে, কোন কোন কুলীনবংশ পুরুষানুক্রমে রাজকাৰ্য্যে লিপ্ত। কোন সম্প্রদায় পুরুষানুক্রমে বাণিজ্য করিতেছে। কোন সম্প্রদায় পুরুষানুক্রমে কৃষিকাৰ্য্য বা মজুরী করিতেছে। কিন্তু ইউরোপে এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়ের ব্যবসায় গ্রহণ করার পক্ষে কোন বিঘ্ন নাই। এবং সচরাচর এরূপ ব্যবসায়ান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাচীন আৰ্য্যেরা বিবেচনা করিতেন যে, যাহার পিতৃপিতামহ যে ব্যবসায় করিয়াছে, সে সেই ব্যবসাতেই সুদক্ষ হয়। তাহাতে সুবিধা আছে বলিয়া লোকে প্রথমতঃ ইচ্ছা করিয়া পৈতৃ-পিতামহিক ব্যবসায় অবলম্বন করিত। শেষ উচ্চব্যবসায়ীদিগের নিকট নীচব্যবসায়ীরা ঘৃণ্য হওয়াতেই হউক অথবা ব্রাহ্মণদিগের প্রণীত দৃঢ়বদ্ধ সমাজনীতির বলেই হউক, বিদ্যাব্যবসায়ী যুদ্ধব্যবসায়ীর সঙ্গে মিশিল না। যুদ্ধব্যবসায়ী বাণিকের সঙ্গে মিশিল না। এইরূপে তিনটি আৰ্য্যবর্ণের সৃষ্টি। জাতিভেদ উৎপত্তির দ্বিতীয় রূপ শূদ্রদিগের বিবরণে দেখা যায়। তাহা উপরে বুঝাইয়াছি। শ্রেষ্ঠ ব্যবসায় সকল আৰ্য্যেরা আপনার হাতে রাখিল, নীচব্যবসায় শূদ্রের উপর পড়িল। বোধ হয়, প্রথম কেবল আৰ্য্য ও শূদ্রে ভেদ জন্মে; কেন না, এ ভেদ স্বাভাবিক। শূদ্রেরা যেমন নূতন নূতন আৰ্য্যসমাজভুক্ত হইতে লাগিল, তেমনি পৃথক্ বর্ণ বলিয়া, আৰ্য্য হইতে তফাত রহিল। বর্ণ শব্দই ইহার প্রমাণ। বর্ণ অর্থে রঙ। পূর্বেই দেখাইয়া আসিয়াছি যে, আৰ্য্যেরা গোর, অনাৰ্য্যেরা “কৃষ্ণত্বচ্”। তবে গোর কৃষ্ণ দুইটি বর্ণ পাওয়া গেল। সেই প্রভেদে প্রথম আৰ্য্য ও শূদ্র, এই দুইটি বর্ণ ভিন্ন হইল। একবার সমাজের মধ্যে থাক আরম্ভ হইলে, আৰ্য্যদিগের হস্তে ক্রমেই থাক বাড়িতে থাকিবে। তখন আৰ্য্যদিগের মধ্যে ব্যবসায়ভেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, তিনটি শ্রেণী পৃথক্ হইয়া পড়িল, সেই ভেদ বুঝাইবার জন্য পূর্বে পরিচিত “বর্ণ” নামই গৃহীত হইল। তার পর আৰ্য্য আৰ্য্য, আৰ্য্য অনাৰ্য্য বৈধ বা অবৈধ সংসর্গে সংকরজাতিসকল উৎপন্ন হইতে লাগিল। সংকরে সংকরে মিলিয়া আরও জাতিভেদ বাড়িল। জাতিভেদের তৃতীয় উৎপত্তি এইরূপ।

এক্ষণে আমরা বাঙ্গালী শূদ্রদিগের মধ্যে অনাৰ্য্যত্বের অনুসন্ধান করিব।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—অনাৰ্য্য বাঙ্গালী জাতি *

বাঙ্গালার মধ্যে মাল ও মালো বলিয়া দুইটি জাতি আছে। রাজমহল জেলার অন্তর্গত মালপাহাড়িয়া বলিয়া একটি অনাৰ্য্য জাতি আছে; তাহারা কোন আৰ্য্যভাষা কহে না। কিন্তু বাঙ্গালী মালেরা বাঙ্গালা কথা কয় এবং বাঙ্গালী বলিয়া গণ্য। জেনেরল্ কনিংহ্যাম্ প্রাচীন রোমীয় লেখক প্লিনি হইতে দুইটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তখনও মালো বা বলিয়া জাতি ভারতবর্ষে ছিল। পুরাণাদিতে মালবের প্রসঙ্গ ভূয়োভূয়ঃ দেখা যায় এবং মেঘদূতে মালবদিগের নাম উল্লেখ আছে। অতএব এখন যেমন মালজাতি আছে, প্রাচীন মালজাতিও সেইরূপ ছিল। কিন্তু প্লিনি যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় যে, মালেরা আৰ্য্যজাতি হইতে একটি পৃথক্ জাতি ছিল। জেনারেল্ কনিংহ্যাম্ বলেন, এই প্লিনির লিখিত মালেরা টলেমিপ্রণীত মণ্ডলজাতি। টলেমিলিখিত মণ্ডলজাতি আধুনিক মণ্ড কোলজাতি বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। বিভার্লি সাহেব অনুমান করেন যে, ঐ প্লিনির লিখিত মালজাতি এখনকার বাঙ্গালী মাল। এখন বাঙ্গালার বাহিরে যেখানে মাল নাম পাই, সেইখানে সেইখানে অনাৰ্য্যদিগকেই দেখিতে পাই। কান্দু নামক অতি অসভ্য অনাৰ্য্যজাতির দেশের বিভাগকে মাল বা মালো বা মালিয়া বলে।† অনাৰ্য্যপ্রধান মানভূম প্রদেশকে মালভূম বা মল্লভূম বলে। রাজমহলের দ্রাবিড়বংশীয় অনাৰ্য্য পাহাড়দিগকে মালের জাতি বলে। উড়িষ্যার কিউঝড় নামক আরণ্য রাজ্যে ভুইয়া নামক এক অনাৰ্য্যজাতি আছে, তাহাদের একটি থাকের নাম মালভুইয়া।‡ বুকানন্ হ্যামিলটন্ ভাগলপুর জেলার ভিতরে বন্য জাতির মধ্যে মালো

* বঙ্গদর্শন, ১২৮৮, বৈশাখ।

† Dalton, p. 299.

‡ Dalton, p. 145.

বিবিধ প্রবন্ধ—বাল্লীর উৎপত্তি

বাল্লী একটি অনার্য্যজাতি দেখিয়াছিলেন। কাঁধদিগের মালিয়া বাল্লী একটি জাতি আছে।* রাজমহলীর মাল পাহাড়দিগের কথা পূর্বেই বাল্লীরাছি। পক্ষান্তরে আর্য্যদিগের মধ্যে মল্ল শব্দ আছে—অনেকে বলেন, এই মালেরা আর্য্যমল্ল। আর্য্যমল্ল হইতে মালজাতির উৎপত্তি, না অনার্য্য মল্লগণ বাহুবুদ্ধে কুশলী বাল্লী আর্য্যভাষায় বাহুবুদ্ধার নাম মল্ল হইয়াছে? মালেরা যে অনার্য্যজাতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা এক প্রকার স্থির বলা যাইতে পারে।

সাঁওতালদিগের পাহাড়মধ্যে ডম নামে একটি অনার্য্যজাতি আছে। তাহাদিগের হইতে বাঙ্গালার ডোমজাতির উৎপত্তি হইয়াছে, হন্টের সাহেব এমন অনুমান করেন।† ইহা সত্য বটে যে, অন্যান্য নীচ হিন্দুজাতির ন্যায় ডোমেরা ব্রাহ্মণদিগের পৌরোহিত্য গ্রহণ করে না। তাহাদিগের পৃথক্ ধর্ম্মযাজক আছে। ঐ ধর্ম্মযাজকদিগের নাম পণ্ডিত। এইরূপ ডোমের পণ্ডিত আমি স্বয়ং অনেক দেখিয়াছি। নেপালের নিকটে ডুমী নামে এক অনার্য্যজাতি আজিও বাস করে।‡

হন্টের সাহেব দেখাইয়াছেন যে, অনেক অনার্য্যজাতির নাম অনার্য্যভাষায় মনুষ্যবাচক শব্দ-বিশেষ হইতে হইয়াছে। হো শব্দ ইহার পূর্বে উদাহরণ দেওয়া গিয়াছে। সাঁওতালী ভাষায় হাড় শব্দে মনুষ্য। ইহা হইতে তিনি অনুমান করেন যে, হাড় অনার্য্যবংশ।

পূর্বে বাল্লীরাছি যে, ককেশীয় ও মোঙ্গলীয় ভিন্ন আরও অনেক মনুষ্যজাতি আছে, তাহার মধ্যে কোন কোন জাতি স্বভাবতঃই অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ। আফ্রিকার নিগ্রোরা ইহার উদাহরণ। কেবল রৌদ্রের উত্তাপে তাহারা এত কৃষ্ণবর্ণ, এমত নহে; যেমন তপ্ত দেশে কার্ফির বাস আছে, তেমনি তপ্ত দেশে গৌরবর্ণ আর্য্য বা মোঙ্গলের বাস আছে। আমেরিকার যে প্রদেশে ইণ্ডিয়ানদিগের বর্ণ লোহিত, সেই প্রদেশেই সাক্সন্ বংশীয়দিগের বর্ণ গৌর; তিন শত বৎসরে কিছুমাত্র কৃষ্ণতাপ্রাপ্ত হয় নাই। ভারতবর্ষে এক প্রদেশেই শ্যামবর্ণ আর্য্যেরা এবং মসীবর্ণ অনার্য্যেরা একত্র বাস করিতেছে। রৌদ্রসন্তাপে কতক দূর কৃষ্ণতা জন্মিতে পারে বটে। ভারতীয় আর্য্যদের তাহা কিছু দূর জন্মিয়াছে সন্দেহ নাই। তাহাদের মধ্যে কেহ গৌর, কেহ শ্যামল, কিন্তু বিদ্যাপর্ব্বতের নিকটবাসী কতকগুলি অনার্য্যজাতি একেবারে মসীকৃষ্ণ। বিষুপূরণে তাহাদিগের বর্ণনা আছে। কথিত আছে যে, বেণ রাজার উরুদেশ হইতে দক্ষ কাষ্ঠের ন্যায় খর্ব্বকায় অট্রাস্য এক পুরুষ জন্মে। এই বর্ণনায় মধ্যভারতের খর্ব্বকায় অট্রাস্য কৃষ্ণকায় অনার্য্যদিগকে পাওয়া যায়। ঐ পুরুষ নিষাদ নামে সংজ্ঞাত হইয়াছে।‡ ইহারই বংশে নিষাদাখ্য অনার্য্যজাতির উৎপত্তি।** হরিবংশে বেণের উপাখ্যানে ঐরূপ লিখিত হইয়া, ঐ পুরুষকে নিষাদ ও ধীবর জাতির আদিপুরুষ বাল্লী বর্ণনা আছে।‡ মনু বাল্লীরাছেন যে, আয়োগবি অর্থাৎ শূদ্র হইতে বৈশ্যাতে উৎপাদিতা স্ত্রীর গর্ভে নিষাদের গুণসে মার্গব বা দাস জন্মে। আর্য্যবর্ত্তে তাহাদিগকে কৈবর্ত্ত বলে।§§ অমরকোষাভিধানে কৈবর্ত্তদিগের নাম কৈবর্ত্ত, দাস, ধীবর। পূর্বেই দেখান গিয়াছে যে, ঋগ্বেদ সমালোচনায় দাস নামে অনার্য্যজাতি পাওয়া যায়। দাস, ধীবর, কৈবর্ত্ত তিনই এক। যদি দাস ও ধীবর অনার্য্য হইল, তবে কৈবর্ত্তও অনার্য্যজাতি। এক্ষণে বাঙ্গালায় কৈবর্ত্তের মধ্যে কতকগুলি চাষা কৈবর্ত্ত; কতকগুলি জেলে কৈবর্ত্ত। পূর্বে সকলেই মৎস্যব্যবসায়ী ধীবর ছিল, সন্দেহ নাই। তাহাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে কতকগুলি

* Dalton, p. 293.

† Non-Aryan Dictionary, p. 29.

‡ Non-Aryan Dictionary, p. 29.

§ “কিং করোমীতি তান্ সর্বান্ বিপ্রান্ আহ স চাতুরঃ।

নিষীদেতি তম্চুস্তে নিষাদস্তেন সোহভবৎ ॥”

** “তেন দ্বারেন নিষ্ক্রান্তং তৎ পাপং তস্য ভূপতেঃ।

নিষাদাস্তে তথা যাতা বেণকল্মষসন্তবাঃ ॥”

‡ “নিষাদবংশকর্ত্তাসৌ বভূব বদতাং বরঃ।

ধীবরানসৃজচ্চাপি বেণকল্মষসন্তবান্ ॥”

§§ “নিষাদো মার্গবং সূতে দাসং নৌকল্মর্জীবিনং।

কৈবর্ত্তমীতি যং প্রাহুরার্য্যাবর্ত্তনিবাসিনঃ ॥”

মনুসংহিতা, দশম অধ্যায়, ৩৪ শ্লোক।

বঙ্গীয় রচনাবলী

কৃষিব্যবসায় অবলম্বন করিল, তাহারাই চাষা কৈবর্ত। ধোপারা ঐরূপ কেহ কেহ চাষ করিয়া চাষাধোপা বলিয়া পৃথক্ জাতি হইয়াছে।

পুন্ড্র বা পৌন্ড্র নামে প্রাচীন জাতির উল্লেখ মন্বাদিতে পাওয়া যায়। মনু লিখিয়াছেন যে, পৌন্ড্রক প্রভৃতি জাতি ক্রিয়ালোপহেতু বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। পৌন্ড্রকদিগের সঙ্গে আর যে সকল জাতি গণনা করিয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে যবন ও পহ্লব ভারতবর্ষের বাহিরে। ভিতরে সকলগুণিই অনার্য্য; যথা—

“পৌন্ড্রকাশেচৌদ্ভবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খসাঃ ॥”

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে, “অন্ধ্রা পুন্ড্রা সবরা পুন্ড্রিন্দা মূর্তিবা ইত্যুদন্তা বহবো ভবন্তি।” মহাভারতেও এই পুন্ড্রদিগের কথা আছে। সভাপর্বে আছে যে, ভীম দিগ্বিজয়ে আসিয়া পুন্ড্রাধিপতি বাসুদেব এবং কোর্শিককচ্ছবাসী মনোজা রাজা, এই দুই মহাবলপরাক্রান্ত বীরকে পরাজয় করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। বঙ্গ আধুনিক বাঙ্গালার পূর্বভাগকে বলিত। এখনও সাধারণ লোকে সেই প্রদেশকেই বঙ্গদেশ বলে। ভীম পশ্চিম হইতে আসিয়া যে দেশ জয় করিয়া বাঙ্গালার পূর্বভাগে প্রবেশ করিলেন, সে দেশ অবশ্য বাঙ্গালার পশ্চিমভাগে। উইল্‌সন্ সাহেবও স্বকৃত বিষ্ণুপুরাণানুবাদে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক তত্ত্ব নিরূপণকালে বাঙ্গালার পশ্চিমাংশেই পুন্ড্রজাতিকে সংস্থাপন করিয়াছেন।* তারপর খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হিয়েন্ট্ সাঙ্‌ নামক চীন পরিব্রাজক এ প্রদেশে আসিয়া পুন্ড্রদিগের রাজধানী পৌন্ড্রবর্ধন

* “*Pundras* the western Provinces of Bengal, or as sometimes used in a more comprehensive sense, it includes the following district : Rajshahi, Dinagepore, and Rungpore ; Nadiya, Beerbhoom, Burdwan, part of Mindnapoor and the Jungle Mehals ; Ramghur, Pacheti, Palamow, and part of Chunar. See an account of Pundra translated from what is said to be part of Brahmanda Section of the Bhavishyat Purana in the Quarterly Oriental Magazine, Decr. 1824. *Wilson's Vishnu Puranas.*”

আমাদিগের প্রিয়বন্ধু পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ভবিষ্যপুরাণখানি সন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন (ভবিষ্যপুরাণ, ভবিষ্যৎ পুরাণ নহে; ব্রহ্মাখণ্ড, ব্রহ্মাণ্ডখণ্ড নহে; এগুণি ছোট ছোট সাহেবী ভুল)। উহার এক কাপি সংস্কৃত কলেজে আছে। পুণ্ড্রখানি খণ্ডিত, আসাম মণিপুর হইতে আরম্ভ করিয়া কাশী পর্য্যন্ত সমস্ত দেশের বিশেষ বিবরণ উহাতে দেওয়া আছে; কিন্তু গ্রন্থখানি পড়িয়া ভক্তি হয় না। গ্রন্থখানিতে বিদ্যাসুন্দরের গল্প আছে। মানসিংহ কর্তৃক যশোরের আক্রমণ বর্ণিত আছে। যবনাধিকারের চারি শত বৎসর পরে চম্পারণের ও নেপালী রাজার যে যুদ্ধ হয়, তাহার বর্ণনা আছে। বিশেষ, গ্রন্থকারের বঙ্গদেশমধ্যে আসাম, চাটল এবং মণিপুর পর্য্যন্ত অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এতদূর ত গ্রন্থের পরিচয় গেল। তাহাতে আছে যে, পৌন্ড্রদেশ সাত ভাগে বিভক্তঃ—গোড়দেশ, বারেন্দ্রভূমি, নীবৃত, বরাহভূমি, বর্ধমান, নারীখণ্ড ও বিক্রাপাশ্ব। এই সকল দেশের লোকে দুষ্ট, চোর, পরদার্নিরত ইত্যাদি ইত্যাদি। গোড়দেশের প্রধান নগরসমূহের মধ্যে মৌরিসধাবাদ (মুরশিদাবাদ নামের সংস্কৃত ফরম; মুরশিদাবাদ নাম ১৭০৪ সালে হয়, তাহার আগে উহাকে মুকশুধাবাদ বলিত বলিয়া ষ্ট্র্যাটের হিষ্টারি অব্ বেঙ্গলে উক্ত আছে); সুতরাং গ্রন্থখানি ২০০ বৎসরের মধ্যে লিখিত বলিয়া বোধ হয়। গৌরদেশে গোড়নগরের উল্লেখ নাই। পাণ্ডুয়ারও উল্লেখ নাই। বারেন্দ্রভূমির প্রধান নগর পুটুলা, নটারো, চপলা (যেখানকার রাজা ব্রাহ্মণ), কাকমারী। নীবৃত দেশের প্রধান নগর কচ্ছপ, নসর, শ্রীরঙ্গপুর ও বিহার। রঙ্গপুরে বান্দী রাজা। নারীখণ্ডের প্রধান নগর বৈদ্যনাথ, দেবগড়, করা, সোণামুখী ইত্যাদি। বরাহভূমির প্রধান নগর রঘুনাথপুর, ধবল ইত্যাদি। বর্ধমানের প্রধান নগর বর্ধমান, নবদ্বীপ, মায়াপুর, কৃষ্ণনগর ইত্যাদি। বিক্রাপাশ্বের প্রধান নগর সুদর্শন, পুষ্পগ্রাম ও বদরী কুড়ক গ্রাম। এই সকল দেশের আচার ব্যবহার ও চতুঃসীমা আছে। আমাদের যতদূর মানচিত্র বোধ আছে, তাহাতে বোধ হয়, চতুঃসীমা অনেক ভিজবে না। গোড়দেশের উত্তরে পদ্মাবতী ও দক্ষিণে বর্ধমান। আসল গোড়নগর ইহার মধ্যে পড়িল না।

উইল্‌সন্ সাহেব ঐ স্থলে আরও লিখিয়াছেন যে, রামায়ণের কিষ্কিন্দাকাণ্ডে একচত্বারিংশৎ অধ্যায়ে দ্বাদশ শ্লোকে পুন্ড্র দাক্ষিণাত্যে স্থাপিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ঐ শ্লোকটি আমরা উদ্ধৃত করিতেছি—

“নদীং গোদাবরীং চৈব সর্বমেবানুপশ্যতঃ।

তথৈবান্ধ্রাংশ্চ পুন্ড্রাংশ্চ চোলান্ পাণ্ড্রাংশ্চ কেরলান্ ॥”

বিবিধ প্রবন্ধ—বঙ্গালীর উৎপত্তি

দেখিয়া গিয়াছেন। জেনারেল্ কানিংহাম্ সাহেব ঐ চীন পরিব্রাজকের লিখিত দিক্ ও দূরতা লইয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধন কোথায় ছিল, তাহা নিরূপণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। তিনি কিছ্ ইতস্ততঃ করিয়া আধুনিক পাবনাকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। পাবনা না হইয়া বঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী মালদহ জেলার অন্তর্গত ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরী পাণ্ডুরী বলিলে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের প্রকৃত সংস্থান ঘটিত। তারপর দশকুমারচরিতে লেখা আছে, “অনুজায় বিষাগবর্ষ্মাণে দণ্ডচক্রং চ পুণ্ড্রাভিযোগায় বিরোচেয়ং।” অর্থাৎ পুণ্ড্রদেশ আক্রমণের জন্য কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিষাগবর্ষ্মাকে দণ্ড চক্র অর্থাৎ সৈন্যাদি দিতে ইচ্ছা করিয়াছি।* দশকুমারচরিত আধুনিক সংস্কৃত গ্রন্থ। উপরির্লিখিত উক্তি কোন মৈথিল রাজার উক্তি, অতএব দশকুমার যখন প্রণীত হয়, তখনও পুণ্ড্রেরা মৈথিলার নিকটবাসী।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মণ, ইতিহাস, স্মৃতি, এ সকলের সময় হইতে অর্থাৎ অতি পূর্বেকাল হইতে দশকুমারচরিত ও হিরেন্থ্ সাঙের সময় পর্যন্ত পুণ্ড্রনামে প্রবল জাতি বঙ্গালার পশ্চিমাংশে বাস করিত। এক্ষণে বঙ্গালায় বা বঙ্গালার নিকট বা ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে পুণ্ড্র নামে কোন জাতি নাই। এই পুণ্ড্রজাতি তবে কোথায় গেল?

সংস্কৃত শব্দে “ণ্ড” থাকিলে, বঙ্গালার প্রচলিত ভাষায় ড-কার, ড়-কার হইয়া যায়। আর গ-কার লুপ্ত হইয়া পূর্বেবর্তী হ্রস্ববর্ণে চন্দ্রবিন্দুরূপে পরিণত হয়। যথা—ভাণ্ডের স্থলে ভাঁড়, ষণ্ডের স্থলে ষাঁড়, শূণ্ডের স্থলে শূঁড়। আর সংস্কৃত হইতে অপভ্রংশপ্রাপ্ত হইয়া বঙ্গালাদিতে পরিণত হইতে গেলে শব্দের র-কারাদির সচরাচর লোপ হয়,—যথা—তাম্র স্থলে তামা, আম্র স্থলে আম ইত্যাদি। অতএব পুণ্ড্র শব্দ লৌকিক ভাষায় চলিত হইলে প্রথমে রেফ লুপ্ত করিয়া পুণ্ড শব্দ পরিণত হইবে। তারপর যেমন ভাণ্ড স্থলে ভাঁড় হয়, শূণ্ড স্থলে শূঁড় হয়, তেমনি পুণ্ড স্থলে পুঁড় বা পুঁড়ো হইবে। পুঁড়ো বঙ্গালায় একাধি সংখ্যায় প্রধান জাতি।

আমরা পূর্বে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ও মনুতে পুণ্ড্রেরা অনার্য্যজাতির সঙ্গে গণিত হইয়াছে। অতএব পুঁড়ো আর একাধি অনার্য্যবংশোদ্ভূত বঙ্গালী জাতি।

শব্দের অপভ্রংশ এক প্রকার হয় না। প্রাচীন ভাষার কোন শব্দ ভাষান্তরে অপভ্রষ্ট হইয়া প্রবেশ করিলে দুই তিন রূপ ধারণ করে। এক সংস্কৃত ‘স্থান’ শব্দ বঙ্গালা ভাষায় কোথাও থান, কোথাও ঠাঁই। ‘চন্দ্র’ শব্দ কখন চন্দর, কখন চাঁদ। যেমন চন্দ্র শব্দ বঙ্গালীর উচ্চারণে চন্দর হয়, ভদ্র শব্দ ভন্দর হয়, তন্ত্র শব্দ তন্তর হয়, তেমনি পুণ্ড্র শব্দ স্থানবিশেষে পুণ্ডর হইবে। জাতিবাচক অর্থে কখন কখন বঙ্গালীর শব্দের পরে একটা ঙ্কার বেশীর ভাগ যোগ করিয়া দিয়া থাকে; যেমন সাঁওতাল সাঁওতালী, গয়াল গয়ালী, দেশওয়াল হইতে দেশওয়ালী। এইরূপ ঙ্কার যোগে পুণ্ড্র শব্দ পুণ্ডর হইয়া পুণ্ডরীতে পরিণত হয়। পুণ্ডরী বলিয়া একাধি বহুসংখ্যক বঙ্গালী জাতি আছে, পুণ্ড্রেরা এবং পুঁড়োররা যদি অনার্য্য, তবে পুণ্ডরীরেও অনার্য্যজাতি।

পোদ শব্দ পুণ্ড্র শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইতে পারে। এবং পুণ্ড্র শব্দ হইতেই পোদ নাম জন্মিয়াছে, ইহা আমার বিশ্বাস হয়।

যে সকল কথা বলা গেল, তাহাতে বোধ হয় প্রতীতি জন্মিয়া থাকিবে যে, পুঁড়ো, পুণ্ডরী এবং পোদ, তিনটি আদৌ এক জাতি এবং তিনটি আদি প্রাচীন পুণ্ড্রজাতির সন্তান। পুণ্ড্রেরা অনার্য্যজাতি ছিল, অতএব বঙ্গালী সমাজের ভিতর আর তিনটি অনার্য্যজাতি পাওয়া যাইতেছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—আর্য্য শব্দ †

পূর্বেপরিচ্ছেদে আমরা যে কয়টি উদাহরণ দিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় ইহা স্থির হইয়াছে যে, বঙ্গালীর মধ্যে অনেকগুলি জাতি অনার্য্যবংশ। আমরা যে কয়টি উদাহরণ দিয়াছি, সকল

* দশকুমারচরিত, তৃতীয় উচ্ছ্বাস।

† বঙ্গদর্শন, ১২৮৮, জ্যৈষ্ঠ।

বাংকম রচনাবলী

কয়টি এক্ষণে বাঙ্গালী শব্দ বলিয়া গণিত। অতএব ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, বাঙ্গালী শব্দে সকল না হউক, কেহ কেহ অনার্যবংশ। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, আমরা পূর্বে পরিচ্ছেদে যে সকল প্রমাণ দিয়াছি, তাহা সবগদুলি ছিদ্রশূন্য নহে। তাহা আমরা কতক স্বীকার করি, কিন্তু এক প্রমাণ অচ্ছিন্ন, অখণ্ডনীয় আছে। যেখানে বর্ণ ও আকৃতি আর্ষ্য-জাতীয় নহে, সেখানে যে অনার্যশোণিত বর্তমান, তাহা নিশ্চিত। আমরা যে কয়টি উদাহরণ দিয়াছি, সকল কয় জাতি সম্বন্ধেই অন্যান্য প্রমাণের উপর এই আকারগত প্রমাণ বিদ্যমান; অতএব ঐ কয়টি জাতির অনার্যত্ব সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হওয়া যাইতে পারে।

আমরা মনে করিলে এরূপ উদাহরণ অনেক দিতে পারিতাম। দিনাজপুর ও মালদহে পলি বা পলিয়াদিগের কথা লিখিতে পারিতাম। পলিয়ারা ভাষায় বাঙ্গালী ও ধর্ম্মে হিন্দু, সুতরাং তাহারা বাঙ্গালী বলিয়া গণ্য। কিন্তু তাহাদের আকার ও আচার অনার্যের ন্যায়। তাহারা কৃষ্ণকায়, খর্ষাকৃত, শূকর পালে এবং শূকর খায়। সুতরাং তাহাদিগের অনার্যত্বে কোন সংশয় নাই। মনু, মহাভারতাদির পূর্লন্দ জাতি বর্তমান পলিদিগের পূর্বে পুরুষ, এমন অনুমান কতদূর সঙ্গত, তাহা আমি এক্ষণে বলিতে পারিলাম না।

কোন আর্ষ্যবংশীয় জাতি যে শূকর পালন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিবে, ইহা সম্ভব নহে। কেন না, শূকর আর্ষ্যশাস্ত্রানুসারে অতি অপবিত্র জন্তু; বাঙ্গালাজয়কারী আর্ষ্যেরা ঐ সকল ব্যবসায় যে অনার্যদিগের হাতে রাখিবেন, ইহাই সম্ভব। বিশেষ, শূকর বা শূকরমাংস আর্ষ্যদিগের কোন কাজে লাগে না। যদি এইরূপে শূকরপালক জাতিদিগকে অনার্য বলিয়া স্থির করা যায়, তাহা হইলে দক্ষিণবাঙ্গালার কাওয়ারারাও অনার্য বলিয়া বোধ হয়। কাওরা-দিগের জাতীয় আকারও অনার্যদিগের ন্যায়। কাওয়ারা কোন অনার্যজাতিসম্মত, তাহা নিরূপণ করা যায় না। কিন্তু কতকগুলি অনার্য জাতির সঙ্গে ইহাদিগের নামের সাদৃশ্য আছে। যথা কোড়োয়া, খাড়োয়া, খাড়িয়া, কোঁর ইত্যাদি। কিরাত শব্দ প্রাকৃততে কিরাও হইবে। কিরাও শব্দের অপভ্রংশে কাওরাও হওয়া অসম্ভব নহে। বাঙ্গালার উত্তরে কিরাতেরা কিরাতি বা কিরাস্তি নামে অদ্যাপি বর্তমান আছে।

পাশ্চাত্যেরা বাগ্‌দীদিগকেও অনার্যবংশ বলিয়া ধরিয়া থাকেন। বাস্তবিক বাগ্‌দীদিগের আকার ও বর্ণ হইতে অনার্যবংশ অনুমান করা অসঙ্গত বোধ হয় না। অনেক বাগ্‌দী ও বাউরী এক আদিম জাতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া থাকেন।

আমাদিগের এমত ইচ্ছা নহে যে, বাঙ্গালার হিন্দুজাতিদিগের মধ্যে কোন কোন জাতি অনার্যবংশ, তাহা একে একে নিঃশেষ করিয়া মীমাংসা করি। বাঙ্গালার শব্দদিগের মধ্যে অনেকাংশ যে অনার্যবংশ, ইহাই দেখান আমাদিগের উদ্দেশ্য। এবং পূর্বে পরিচ্ছেদে যে সকল উদাহরণ দিয়াছি, তাহাতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বাঙ্গালী শব্দের মধ্যে অনার্যবংশ অতিশয় প্রবল। কিন্তু কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, শব্দ মাত্রই অনার্যবংশ। প্রথম বর্ণভেদ উৎপত্তির সময়ে সকল শব্দই অনার্য ছিল বোধ হয়। কিন্তু ক্রমে আর্ষ্যসম্মত সঙ্কীর্ণ বর্ণ ও অসঙ্কীর্ণ আর্ষ্যবর্ণ যে এখন শব্দের মধ্যে মিশিয়াছে, ইহা আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস। এখনকার সকল শব্দই অনার্য, এই কথার অমূলকতা প্রতিপাদন করিতে এক্ষণে প্রবৃত্ত হইব।

প্রথম, কে আর্ষ্য আর কে অনার্য, ইহা মীমাংসা করিবার দুইটি মাত্র উপায়। এক ভাষা, দ্বিতীয় আকার। দেখা যাইতেছে যে, কেবল ভাষার উপর নির্ভর করিয়া বাঙ্গালার ভিতরে ইহার মীমাংসা হইতে পারে না। কেন না, সকল বাঙ্গালী শব্দই আর্ষ্যভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে। তবে আকারই একমাত্র সহায় রহিল। কিন্তু ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, কায়স্থ প্রভৃতি অনেক শব্দের আকার আর্ষ্যপ্রকৃত। কায়স্থ ও ব্রাহ্মণে আকার বা বর্ণগত কোন বৈসদৃশ্য নাই। আকারে প্রমাণ হইতেছে, কতকগুলি শব্দ আর্ষ্যবংশীয়।

দ্বিতীয়, পূর্বে অনুলোম প্রতিলোম বিবাহের রীতি ছিল; ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কন্যাকে, ক্ষত্রিয় বৈশ্যকন্যাকে বিবাহ করিতে পারিত। ইহাকে অনুলোম বিবাহ বলিত। এইরূপ অধঃস্থজাতীয় পুরুষ শ্রেষ্ঠজাতীয় কন্যাকে বিবাহ করিলে, প্রতিলোম বিবাহ বলিত। ইহার বিধি মন্বাদিতে আছে। যেখানে বিবাহ বিধি ছিল, সেখানে অবশ্য বৈধ বিবাহ ব্যতীতও অসবর্ণ সংযোগে সন্তানাদি জন্মিত। তাহারা চতুর্বর্ণের মধ্যে স্থান পাইত না। মনু বলিয়াছেন, চতুর্বর্ণ ভিন্ন

বিবিধ প্রবন্ধ—বাস্তালীর উৎপত্তি

পঞ্চম বর্ণ নাই।* টীকাকার কুল্লুক ভট্ট তাহাতে লেখেন যে, সঙ্কীর্ণ জাতিগণ অশ্বতরবৎ মাতা বা পিতার জাতি হইতে ভিন্ন; তাহারা জাত্যন্তর বলিয়া তাহাদিগের বর্ণন নাই।† এইরূপ অসবর্ণ পরিণয়াদিতে কাহারা জন্মিত, তাহা দেখা যাউক।

“ব্রাহ্মণাৎ বৈশ্যকন্যায়াম্ভবষ্ঠো নাম জায়তে।

নিষাদঃ শূদ্রকন্যয়াং যঃ পারশব উচ্যতে ॥”

মনু, ১০ম অধ্যায়, ৮ শ্লোক।

অর্থাৎ বৈশ্যকন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণ হইতে অম্বষ্ঠের জন্ম, আর শূদ্রকন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণ হইতে নিষাদ বা পারশবের জন্ম। পুনশ্চ

“শূদ্রাদায়োগবঃ ক্ষত্রা চন্ডালশচাধমো নৃণাং।

বৈশ্যরাজন্যবিপ্রাসু জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ ॥” মনু, ১০ম অ, ১২।

অর্থাৎ বৈশ্যার গর্ভে শূদ্র হইতে আয়োগব, ক্ষত্রিয়ার গর্ভে শূদ্র হইতে ক্ষত্রা, আর ব্রাহ্মণ-কন্যার গর্ভে শূদ্র হইতে চন্ডালের জন্ম।

যে সকল ব্রাহ্মণাদি দ্বিজ অরত হইয়া পতিত হয়, মনু তাহাদিগকে ব্রাত্য বলিয়াছেন। এবং ব্রাহ্মণ ব্রাত্য, ক্ষত্রিয় ব্রাত্য এবং বৈশ্য ব্রাত্য হইতে নীচজাতির উৎপত্তির কথা লিখিয়াছেন। মহাভারতে অনুশাসন পর্বের ব্রাত্যাদিগকে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে শূদ্র হইতে জাত বলিয়া বর্ণিত আছে।

এই সকল সংকরবর্ণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যমধ্যে স্থান পায় নাই, ইহা একরূপ নিশ্চিত। এবং ইহারা যে শূদ্রদিগের মধ্যে স্থান পাইয়াছিল, তাহাও স্পষ্ট দেখা গিয়াছে। আয়োগব বা ব্রাত্য এক্ষণে বাঙ্গালায় নাই; কখন ছিল কি না সন্দেহ; কেন না, ক্ষত্রিয় বৈশ্য বাঙ্গালায় কখন আইসে নাই। কিন্তু চন্ডালেরা বাঙ্গালায় অতিশয় বহুল; বাঙ্গালী শূদ্রের তাহা একটি প্রধান ভাগ। চন্ডালেরা অন্ততঃ মাতৃকুলে আৰ্য্যবংশীয়। বাঙ্গালায় শূদ্রজাতি অনেকেরই সংকরবর্ণ; সংকরবর্ণ হইলেই যে তাহাদের শরীরে আৰ্য্যশোণিত, হয় পিতৃকুল, নয় মাতৃকুল হইতে আগত হইয়া বাহিত হইবে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। বাঙ্গালায় অম্বষ্ঠ আছে, তাহারা যে উভয় কুলে বিশুদ্ধ আৰ্য্য, তাহার প্রমাণ উপরে দেওয়া গিয়াছে। কেন না, ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য উভয়েই বিশুদ্ধ আৰ্য্য।

তৃতীয়, আমরা শেষ তিন পরিচ্ছেদে যাহা বলিলাম, তাহা হইতে উপলব্ধি হইতেছে যে, বাঙ্গালায় শূদ্রমধ্যে কতকগুলি বিশুদ্ধ আৰ্য্যবংশীয় এবং কতকগুলি আৰ্য্য অনাৰ্য্য মিশ্রিত, পিতৃমাতৃকুলের মধ্যে এক কুলে আৰ্য্য, আর কুলে অনাৰ্য্য।

চতুর্থতঃ, কতকগুলি শূদ্রজাতি প্রাচীন কাল হইতে আৰ্য্যজাতিমধ্যে গণ্য, কিন্তু আধুনিক বাঙ্গালায় তাহারা শূদ্র বলিয়া পরিচিত; যথা বণিক্। বণিকেরা বৈশ্য; তাহার প্রমাণ প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। বোধ হয়, কেহই তাহাদিগের বৈশ্যত্ব অস্বীকার করিবেন না। বাঙ্গালায় শূদ্রমধ্যে যে বৈশ্য আছে, তাহার ইহাই এক অখণ্ডনীয় প্রমাণ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ—শূদ্র কথাস্ত

বাস্তালী জাতির উৎপত্তির অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা যাহা পাইয়াছি, তাহার পুনরুক্তি করিতেছি।

ভাষাবিজ্ঞানের সাহায্যে ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ভারতীয় এবং ইউরোপীয় প্রধান

* “ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্তয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।

চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ ॥”

মনু, ১০ম অধ্যায়, ৪।

† “পঞ্চমঃ পুনর্বর্ণো নাস্তি। সংকীর্ণজাতীনাং স্বশ্বতরবৎ মাতাপিতৃজাতিব্যতিরিক্তজাত্যন্তরত্বাৎ ন বর্ণনং ॥”

‡ বঙ্গদর্শন, ১২৮৮, জ্যৈষ্ঠ।

বিক্রম রচনাবলী

জাতিসকল এক প্রাচীন আৰ্য্যবংশ হইতে উৎপন্ন। যাহার ভাষা আৰ্য্যভাষা, সেই আৰ্য্যবংশীয়। বাঙ্গালীর ভাষা আৰ্য্যভাষা, এজন্য বাঙ্গালী আৰ্য্যবংশীয় জাতি।

কিন্তু বাঙ্গালী অমিশ্রিত বা বিশুদ্ধ আৰ্য্য নহে। ব্রাহ্মণ অমিশ্রিত এবং বিশুদ্ধ আৰ্য্য সন্দেহ নাই; কেন না, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ হইতেই উৎপত্তি ভিন্ন সঞ্চার সম্ভবে না, সঞ্চার ঘটিলে ব্রাহ্মণ হয়। বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সম্বন্ধে ঐরূপ হইলে হইতে পারে, কিন্তু ক্ষত্রিয় বৈশ্য বাঙ্গালায় নাই বলিলেই হয়। অতি অল্পসংখ্যক বৈদ্য ও বণিকগণকে বাদ দিলে দেখা যায় যে, বাঙ্গালী কেবল দুই ভাগে বিভক্ত, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ আৰ্য্য, কিন্তু শূদ্রদিগকে বিশুদ্ধ আৰ্য্য, কি বিশুদ্ধ অনাৰ্য্য বিবেচনা করিব, কি মিশ্রিত বিবেচনা করিব, ইহারই বিচার আমরা এতদূর বিস্তারিত করিয়াছি। কেন না, বাঙ্গালী জাতির মধ্যে সংখ্যায় শূদ্রই প্রধান।*

অনুসন্ধানে ইহাও পাওয়া গিয়াছে যে, আৰ্য্যেরা দেশান্তর হইতে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। তখন আমরা এই তত্ত্ব উত্থাপন করিয়াছিলাম যে, তাঁহারা আসিবার পূর্বে বাঙ্গালায় বসতি ছিল কি না?

বিচারে পাওয়া গিয়াছে যে, আৰ্য্যেরা বাঙ্গালায় আসিবার পূর্বে বাঙ্গালায় অনাৰ্য্যদিগের বাস ছিল। তারপর দেখিয়াছি যে, সেই অনাৰ্য্যগণ একবংশীয় নহে। কতকগুলি কোলবংশীয়, আর কতকগুলি দ্রাবিড়বংশীয়। দ্রাবিড়বংশের পূর্বে কোলবংশীয়েরা বাঙ্গালার অধিকারী ছিল। তারপর দ্রাবিড়বংশীয়েরা আইসে। পরে আৰ্য্যগণ আসিয়া বাঙ্গালা অধিকার করিলে কোলীয় ও দ্রাবিড়ী অনাৰ্য্যগণ তাঁহাদিগের তাড়নায় পলায়ন করিয়া বন্য ও পার্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে।

কিন্তু সকল অনাৰ্য্যই আৰ্য্যের তাড়নায় বাঙ্গালা হইতে পলাইয়া বন্য ও পার্বত্য দেশে আশ্রয় লইয়াছিল, এমত নহে; আমরা দেখিয়াছি যে, অনাৰ্য্যগণ আৰ্য্যের সংঘর্ষে পড়িলে আৰ্য্যধর্ম ও আৰ্য্যভাষা গ্রহণ করিয়া হিন্দুজাতি বলিয়া গণ্য হইয়া হিন্দুসমাজভুক্ত হইতে পারে, হইয়াছিল ও হইতেছে। অতএব বাঙ্গালী শূদ্রদিগের মধ্যে এইরূপে হিন্দুপ্রাপ্ত অনাৰ্য্য থাকা অসম্ভব নহে। আছে কি না—তাহার প্রমাণ খুঁজিয়া দেখিয়াছি।

দেখিয়াছি যে, বাঙ্গালা ভাষার এমন একটি ভাগ আছে যে, অনাৰ্য্যভাষাই তাহার মূল বলিয়া বোধ হয়। আরও দেখিয়াছি যে, বাঙ্গালী শূদ্রদিগের মধ্যে এমন অনেকগুলি জাতি আছে যে, অনাৰ্য্যগণকে তাহাদের পূর্বপুরুষ বলিয়া বোধ হয়।

পরিশেষে ইহাও প্রমাণ করা গিয়াছে যে, বাঙ্গালী শূদ্রের কিয়দংশ অনাৰ্য্যসম্ভূত হইলেও অপরাংশ আৰ্য্যবংশীয়। কেহ বিশুদ্ধ আৰ্য্য, যেমন অম্বষ্ঠ, কায়স্থ; কেহ আৰ্য্য অনাৰ্য্য উভয়কুলজাত, যেমন চন্দাল।

এক্ষণে এই বাঙ্গালী জাতি কি প্রকারে উৎপন্ন হইল, তাহা আমরা বুঝিয়াছি। প্রথম কোলবংশীয় অনাৰ্য্য, তারপর দ্রাবিড়বংশীয় অনাৰ্য্য, তারপর আৰ্য্য; এই তিনে মিশিয়া আধুনিক বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। সাক্সন্, ডেন্ ও নর্মান্ মিশিয়া ইংরেজ জন্মিয়াছে। কিন্তু ইংরেজের গঠন ও বাঙ্গালীর গঠনে দুইটি বিশেষ প্রভেদ আছে। টিউটন্ হউক বা নর্মান্ হউক, যতগুলি জাতির সংমিশ্রণে ইংরেজ জাতি প্রস্তুত হইয়াছে, সকলগুলিই আৰ্য্যবংশীয়। বাঙ্গালী যে কয়েকটি জাতিতে গঠিত হইয়াছে, তাহার কেহ আৰ্য্য, কেহ অনাৰ্য্য। দ্বিতীয় প্রভেদ এই যে, ইংলণ্ডে টিউটন্ ও ডেন্ ও নর্মান্, এই তিন জাতির রক্ত একত্রে মিশিয়াছে। পরস্পরের সহিত বিবাহাদি সম্বন্ধের দ্বারা মিলিত হইয়া তাহাদিগের পার্থক্য লুপ্ত হইয়াছে। তিনে এক জাতি দাঁড়াইয়াছে, বাছিয়া তিনটি পৃথক্ করিবার উপায় নাই। মোটের উপর এক ইংরেজজাতি কেবল পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতীয় আৰ্য্যদিগের বর্ণধর্মত্বহেতু বাঙ্গালায় তিনটি পৃথক্ স্রোত মিশিয়া একটি প্রবল প্রবাহে পরিণত হয় নাই; আৰ্য্যসম্ভূত ব্রাহ্মণ অনাৰ্য্যসম্ভূত অন্য জাতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ রহিয়াছেন। যদি কোন স্থানে আৰ্য্য অনাৰ্য্য বৈধ বিবাহ বা অবৈধ সংসর্গের দ্বারা সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, সেখানে সেই

* ৭১ সালের লোকসংখ্যাগণনায় স্থির হইয়াছে যে, বাঙ্গালার যে অংশে বাঙ্গালাভাষা প্রচলিত, তাহাতে ৩০৬০০০০০ লোক বসতি করে—তন্মধ্যে ১১ লক্ষ মাত্র ব্রাহ্মণ।

বিবিধ প্রবন্ধ—বাহুবল ও বাক্যবল

সংমিশ্রণে উৎপন্ন সন্তানেরা আৰ্য্য অনাৰ্য্য হইতে আর একটি পৃথক্ জাতি হইয়া রহিয়াছে। চণ্ডালেরা ইহার উদাহরণ। ইংরেজ একজাতি, বাঙ্গালীরা বহুজাতি। বাস্তবিক এক্ষণে যাহাদিগকে আমরা বাঙ্গালী বলি, তাহাদিগের মধ্যে চারি প্রকার বাঙ্গালী পাই। এক আৰ্য্য, দ্বিতীয় অনাৰ্য্য হিন্দু, তৃতীয় আৰ্য্যানাৰ্য্য হিন্দু, আর তিনের বার এক চতুর্থ জাতি বাঙ্গালী মুসলমান। চারি ভাগ পরস্পর হইতে পৃথক্ থাকে। বাঙ্গালীসমাজের নিম্নস্তরেই বাঙ্গালী অনাৰ্য্য বা মিশ্রিত আৰ্য্য ও বাঙ্গালী মুসলমান; উপরের স্তরে প্রায় কেবলই আৰ্য্য। এই জন্যে দূর হইতে দেখিতে বাঙ্গালীজাতি অমিশ্রিত আৰ্য্যজাতি বলিয়াই বোধ হয় এবং বাঙ্গালার ইতিহাস এক আৰ্য্যবংশীয় জাতির ইতিহাস বলিয়া লিখিত হয়।

বাহুবল ও বাক্যবল*

সামাজিক দুঃখ নিবারণের জন্য দুইটি উপায় মাত্র ইতিহাসে পরিকীর্তিত—বাহুবল ও বাক্যবল। এই দুই বল সম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার আছে, তাহা বলিবার পূর্বে সামাজিক দুঃখের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যিক।

মনুষ্যের দুঃখের কারণ তিনটি। (১) কতকগুলি দুঃখ জড়পদার্থের দোষগুণঘটিত। বাহ্য জগৎ কতকগুলি নিয়মাধীন হইয়া চলিতেছে; কতকগুলি শক্তিকর্তৃক শাসিত হইতেছে। মনুষ্যও বাহ্য জগতের অংশ; সুতরাং মনুষ্যও সেই সকল শক্তিকর্তৃক শাসিত। নৈসর্গিক নিয়মসকল উলঙ্ঘন করিলে রোগাদিতে কষ্ট ভোগ করিতে হয়, ক্ষুণ্ণপিপাসায় পীড়িত হইতে হয়, এবং নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক দুঃখভোগ করিতে হয়।

(২) বাহ্য জগতের ন্যায় অন্তর্জগৎও আরও একটি মনুষ্যদুঃখের কারণ। কেহ পরশ্রী দেখিয়া সুখী, কেহ পরশ্রীতে দুঃখী। কেহ ইন্দ্রিয়সংযমে সুখী, কাহারও পক্ষে ইন্দ্রিয়সংযম ঘোরতর দুঃখ। পৃথিবীর কাব্যগ্রন্থসকলের, এই দ্বিতীয় শ্রেণীর দুঃখই আধার।

(৩) মনুষ্যদুঃখের তৃতীয় মূল, সমাজ। মনুষ্য সুখী হইবার জন্য সমাজবদ্ধ হয়; পরস্পরের সহায়তায় পরস্পরে অধিকতর সুখী হইবে বলিয়া, সকলে মিলিত হইয়া বাস করে। ইহাতে বিশেষ উন্নতিসাধন হয় বটে, কিন্তু অনেক অমঙ্গলও ঘটে। সামাজিক দুঃখ আছে। দারিদ্র্য দুঃখ সামাজিক দুঃখ। যেখানে সমাজ নাই, সেখানে দারিদ্র্য নাই।

কতকগুলি সামাজিক দুঃখ, সমাজ সংস্থাপনেরই ফল—যথা দারিদ্র্য। যেমন আলো হইলে, ছায়া তাহার আনুষঙ্গিক ফল আছেই আছে—তেমনি সমাজবদ্ধ হইলেই দারিদ্র্যাদি কতকগুলি সামাজিক দুঃখ আছেই আছে।† এ সকল সামাজিক দুঃখের উচ্ছেদ কখনও সম্ভবে না। কিন্তু আর কতকগুলি সামাজিক দুঃখ আছে, তাহা সমাজের নিত্যফল নহে; তাহা নিবার্য্য, এবং তাহার উচ্ছেদ সামাজিক উন্নতির প্রধান অংশ। সামাজিক মনুষ্য সেই সকল সামাজিক দুঃখের উচ্ছেদজন্য বহুকাল হইতে চেষ্টিত। সেই চেষ্টার ইতিহাস সভ্যতার ইতিহাসের প্রধান অংশ, এবং সমাজনীতি ও রাজনীতি, এই দুইটি শাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য।

এই দ্বিবিধ সামাজিক দুঃখ, আমি কয়েকটি উদাহরণের দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। স্বাধীনতার হানি, একটি দুঃখ সন্দেহ নাই। কিন্তু সমাজে বাস করিলে অবশ্যই স্বাধীনতার ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। যতগুলি মনুষ্য সমাজসম্মুক্ত, আমি, সমাজে বাস করিয়া, ততগুলি মনুষ্যেরই কিয়দংশে অধীন—এবং সমাজের কর্তৃগণের বিশেষ প্রকারে অধীন। অতএব স্বাধীনতার হানি একটি সামাজিক নিত্যদুঃখ।

স্বানুবর্তিতা একটি পরম সুখ। স্বানুবর্তিতার ক্ষতি পরম দুঃখ। জগদীশ্বর আমাদের কাছে যে সকল শারীরিক এবং মানসিক বৃত্তি দিয়াছেন, তাহার স্ফূর্তিতেই আমাদের

* বঙ্গদর্শন, ১২৮৪, জ্যৈষ্ঠ।

† আলোকছায়ার উপমাটি সম্পূর্ণ ও শুদ্ধ। ইহা সত্য যে, এমত জগৎ আমরা মনোমধ্যে কল্পনা করিতে পারি যে, সে জগতে আলোকদায়ী সূর্য্য ভিন্ন আর কিছুই নাই—সুতরাং আলোক আছে, ছায়া নাই। তেমনি আমরা এমন সমাজ মনে মনে কল্পনা করিতে পারি যে, তাহাতে সুখ আছে—দুঃখ নাই। কিন্তু এই জগৎ আর এই সমাজ কেবল মনঃকল্পিত, অস্তিত্বশূন্য।

বাংকম রচনাবলী

মানসিক ও শারীরিক সুখ। যদি আমাকে চক্ষু দিয়া থাকেন, তবে যাহা কিছু দেখিবার আছে, তাহা দেখিয়াই আমার চক্ষু সুখ। চক্ষু পাইয়া যদি আমি চক্ষু চিরমুদ্রিত রাখিলাম—তবে চক্ষু সম্বন্ধে আমি চিরদুঃখী। যদি আমি কখনও কখনও বা কোন কোন বস্তুসম্বন্ধে চক্ষু মুদ্রিত করিতে বাধ্য হইলাম—দৃশ্য বস্তু দেখিতে পাইলাম না—তবে আমি কিয়দংশে চক্ষু সম্বন্ধে দুঃখী। আমি বুদ্ধিবৃত্তি পাইয়াছি—বুদ্ধির স্ফূর্তিই আমার সুখ। যদি আমি বুদ্ধির মার্জ্জনে ও স্বেচ্ছামত পরিচালনে চিরনিষিদ্ধ হই, তবে বুদ্ধিসম্বন্ধে আমি চিরদুঃখী। যদি বুদ্ধির পরিচালনে আমি কোন দিকে নিষিদ্ধ হই, তবে আমি সেই পরিমাণে বুদ্ধিসম্বন্ধে দুঃখী। সমাজে থাকিলে আমি সকল দৃশ্য বস্তু দেখিতে পাই না—সকল দিকে বুদ্ধি পরিচালনা করিতে পাই না। মনুষ্য কাটিয়া বিজ্ঞান শিখিতে পাই না—অথবা রাজপুরুষীমধ্যে প্রবেশ করিয়া দিদৃক্ষা পরিতৃপ্ত করিতে পারি না। এগুলা সমাজের মঙ্গলকর হইলেও, স্বানুবর্তিতার নিষেধক বটে। অতএব এগুলা সামাজিক নিত্যদুঃখ।

দারিদ্র্যের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। অসামাজিক অবস্থায় কেহই দরিদ্র নহে—বনের ফল-মূল, বনের পশু, সকলেরই প্রাপ্য; নদীর জল, বৃক্ষের ছায়া, সকলেরই ভোগ্য। আহাৰ্য্য, পেষ, আশ্রয় শরীরধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজনীয়, তাহার অধিক কেহ কামনা করে না, কেহ আবশ্যকীয় বিবেচনা করে না, কেহ সংগ্রহ করে না। অতএব একের অপেক্ষা অন্যে ধনী নহে, একের অপেক্ষা অন্যে কাজে কাজেই দরিদ্র নহে। কাজে কাজেই অসামাজিক অবস্থা দারিদ্র্যশূন্য। দারিদ্র্য তারতম্যঘটিত কথা; সে তারতম্য সামাজিকতার নিত্যফল। দারিদ্র্য সামাজিকতার নিত্য কুফল।

সামাজিকতার এই এক জাতীয় ফল। যতদিন মনুষ্য সমাজবদ্ধ থাকিবে, ততদিন এ সকল ফল নিবার্য্য নহে। কিন্তু আর কতকগুলি সামাজিক দুঃখ আছে, তাহা অনিত্য এবং নিবার্য্য। এদেশে বলে, বিধবাগণ যে বিবাহ করিতে পারে না, ইহা সামাজিক কুপ্রথা, সামাজিক দুঃখ—নৈসর্গিক নহে। সমাজের গতি ফিরিলেই এ দুঃখ নিবারিত হইতে পারে। হিন্দুসমাজ ভিন্ন অন্য সমাজে এ দুঃখ নাই। স্ত্রীগণ যে সম্পত্তির অধিকারিণী হইতে পারে না, ইহা বিলাতী সমাজের একটি সামাজিক দুঃখ; ব্যবস্থাপক সমাজের লেখনীনির্গত এক ছত্রে ইহা নিবার্য্য, অনেক সমাজে এ দুঃখ নাই। ভারতবর্ষীয়েরা যে স্বদেশে উচ্চতর রাজকার্য্য নিযুক্ত হইতে পারে না, ইহা আর একটি নিবার্য্য সামাজিক দুঃখের উদাহরণ।

যে সকল সামাজিক দুঃখ নিত্য ও অনিবার্য্য, তাহারও উচ্ছেদের জন্য মনুষ্য যত্নবান্ হইয়া থাকে। সামাজিক দরিদ্রতা নিবারণ জন্য যাহারা চেষ্টিত, ইউরোপে সোশিয়ালিস্ট, কম্যুনিষ্ট, প্রভৃতি নামে তাহারা খ্যাত। স্বানুবর্তিতার সঙ্গে সমাজের যে বিরোধ, তাহার লাঘব জন্য, মিল “Liberty” নামক অপূৰ্ব্ব গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন—অনেকের কাছে এই গ্রন্থ দৈবপ্রসাদ বাক্যস্বরূপ গণ্য। যাহা অনিবার্য্য, তাহার নিবারণ সম্ভবে না; কিন্তু অনিবার্য্য দুঃখও মাত্রায় কমান যাইতে পারে। যে রোগ সাংঘাতিক, তাহারও চিকিৎসা আছে—যন্ত্রণা কমান যাইতে পারে। সুতরাং যাঁহারা সামাজিক নিত্য দুঃখ নিবারণের চেষ্টায় ব্যস্ত, তাঁহাদিগকে বৃথা পরিশ্রমে রত মনে করা যাইতে পারে না।

নিত্য এবং অপরিহার্য্য সামাজিক দুঃখের উচ্ছেদ সম্ভবে না, কিন্তু অপর সামাজিক দুঃখগুলির উচ্ছেদ সম্ভব এবং মনুষ্যসাধ্য। সেই সকল দুঃখ নিবারণ জন্য মনুষ্যসমাজ সর্বদাই ব্যস্ত। মনুষ্যের ইতিহাস সেই ব্যস্ততার ইতিহাস।

বলা হইয়াছে, সামাজিক নিত্য দুঃখসকল, সমাজ সংস্থাপনেরই অপরিহার্য্য ফল—সমাজ হইয়াছে বলিয়াই সেগুলি হইয়াছে। কিন্তু অপর সামাজিক দুঃখগুলি কোথা হইতে আইসে? সেগুলি সমাজের অপরিহার্য্য ফল না হইয়াও কেন ঘটে? তাহার নিবারণ পক্ষে, এই প্রশ্নের মীমাংসা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

এগুলি সামাজিক অত্যাচারজনিত। বোধ হয়, প্রথমে অত্যাচার কথাটি বুঝাইতে হইবে—নহিলে অনেকে বলিতে পারিবেন, সমাজের আবার অত্যাচার কি? শক্তির অবিহিত প্রয়োগকে অত্যাচার বলি। দেখ, মাধ্যাকর্ষণাদি যে সকল নৈসর্গিক শক্তি, তাহা এক নিয়মে চলিতেছে, তাহার কখনও আধিক্য নাই, কখনও অল্পতা নাই; বিধিবদ্ধ অনুপ্রাণিত নিয়মে তাহা চলিতেছে। কিন্তু যে সকল শক্তি মানুষ্যের হস্তে, তাহার এরূপ স্থিরতা নাই। মনুষ্যের হস্তে

শক্তি থাকিলেই, তাহার প্রয়োগ বিহিত হইতে পারে এবং অবহিত হইতে পারে। যে পরিমাণে শক্তির প্রয়োগ হইলে উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ হইবে, অথচ কাহারও কোন অনিষ্ট হইবে না, তাহাই বিহিত প্রয়োগ। তাহার অতিরিক্ত প্রয়োগ অবিহিত প্রয়োগ। বারুদের যে শক্তি, তাহার বিহিত প্রয়োগে শত্রুবধ হয়, অবিহিত প্রয়োগে কামান ফাটিয়া যায়। শক্তির এই অতিরিক্ত প্রয়োগই অত্যাচার।

মনুষ্য শক্তির আধার। সমাজ মনুষ্যের সমবায়, সুতরাং সমাজও শক্তির আধার। সে শক্তির বিহিত প্রয়োগে মনুষ্যের মঙ্গল—দৈনন্দিন সামাজিক উন্নতি। অবিহিত প্রয়োগে সামাজিক দুঃখ। সামাজিক শক্তির সেই অবিহিত প্রয়োগ, সামাজিক অত্যাচার।

কথাটি এখনও পরিষ্কার হয় নাই। সামাজিক অত্যাচার ত বঝা গেল, কিন্তু কে অত্যাচার করে? কাহার উপর অত্যাচার হয়? সমাজ মনুষ্যের সমবায়। এই সমবেত মনুষ্যাগণ কি আপনাদিগেরই উপর অত্যাচার করে? অথবা পরস্পরের রক্ষার্থে যাহারা সমাজসম্বন্ধ হইয়াছে, তাহারাই পরস্পরে উৎপীড়ন করে? তাই বটে, অথচ, ঠিক তাই নহে। মনে রাখিতে হইবে যে, শক্তিরই অত্যাচার; যাহার হাতে সামাজিক শক্তি, সেই অত্যাচার করে। যেমন গ্রহাদি জড়পিণ্ডমাত্রের মাধ্যাকর্ষণশক্তি কেন্দ্রনিহিত, তেমনি সমাজেরও একটি প্রধান শক্তি কেন্দ্রনিহিত। সেই শক্তি—শাসনশক্তি; সামাজিক কেন্দ্র—রাজা বা সামাজিক শাসনকর্তৃগণ। সমাজরক্ষার জন্য, সমাজের শাসন আবশ্যিক। সকলেই শাসনকর্তা হইলে, অনিয়ম এবং মতভেদ হেতু শাসন অসম্ভব। অতএব শাসনের ভার, সকল সমাজেই এক বা ততোধিক ব্যক্তির উপর নিহিত হইয়াছে। তাহারাই সমাজের শাসনশক্তিদধর—সামাজিক কেন্দ্র। তাহারাই অত্যাচারী। তাহারাই মনুষ্য; মনুষ্যমাত্রেরই ভ্রান্তি এবং আত্মদর আছে। ভ্রান্ত হইয়া তাহারাই সেই সমাজ-প্রদত্ত শাসনশক্তি, শাসিতব্যের উপরে অবিহিত প্রয়োগ করেন। আত্মদরের বশীভূত হইয়াও তাহারাই উহার অবিহিত প্রয়োগ করেন।

তবে এক সম্প্রদায় সামাজিক অত্যাচারীকে পাইলাম। তাহারাই রাজপুরুষ—অত্যাচারের পাত্র সমাজের অর্বাশিষ্টাংশ। কিন্তু বাস্তবিক এই সম্প্রদায়ের অত্যাচারী কেবল রাজা বা রাজপুরুষ নহে। যিনিই সমাজের শাসনকর্তা, তিনিই এই সম্প্রদায়ের অত্যাচারী। প্রাচীন ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণগণ, রাজপুরুষ বলিয়া গণ্য হইলেন না, অথচ তাহারাই সমাজের প্রধান শাসনকর্তা ছিলেন। আর্ষ্যসমাজকে তাহারাই যে দিকে ফিরাইতেন ঘুরাইতেন, আর্ষ্যসমাজ সেই দিকে ফিরিত ঘুরিত। আর্ষ্যসমাজকে তাহারাই যে শিকল পরাইতেন, অলঙ্কার বলিয়া আর্ষ্যসমাজ সেই শিকল পরিত। মধ্যকালিক ইউরোপের ধর্মযাজকগণ সেইরূপ ছিলেন—রাজপুরুষ নহেন, অথচ ইউরোপীয় সমাজের শাসনকর্তা, এবং ঘোরতর অত্যাচারী। পোপগণ ইউরোপের রাজা ছিলেন না, এক বিন্দু ভূমির রাজা মাত্র, কিন্তু তাহারাই সমগ্র ইউরোপের উপর ঘোরতর অত্যাচার করিয়া গিয়াছেন। গ্রেগরি বা ইনোসেন্ট, লিও বা আদ্রিয়ান্ ইউরোপে যতটা অত্যাচার করিয়া গিয়াছেন, দ্বিতীয় ফিলিপ বা চতুর্দশ লুই, অষ্টম হেনরি বা প্রথম চার্লস্ ততদূর করিতে পারেন নাই।

কেবল রাজপুরুষ বা ধর্মযাজকের দোষ দিয়া ক্ষান্ত হইব কেন? ইংলণ্ডে এক্ষণে রাজা (রাজ্ঞী) কোন প্রকার অত্যাচারে ক্ষমতালশালী নহেন—শাসনশক্তি তাহার হস্তে নহে। এক্ষণে প্রকৃত শাসনশক্তি ইংলণ্ডে সংবাদপত্রলেখকদিগের হস্তে। সুতরাং ইংলণ্ডের সংবাদপত্রলেখকগণ অত্যাচারী। যেখানে সামাজিক শক্তি, সেইখানেই সামাজিক অত্যাচার।

কিন্তু সমাজের কেবল শাসনকর্তা এবং বিধাতৃগণ অত্যাচারী, এমত নহে। অন্য প্রকার সামাজিক অত্যাচারী আছে। যে সকল বিষয়ে রাজশাসন নাই, ধর্মশাসন নাই, কোন প্রকার শাসনকর্তার শাসন নাই—সে সকল বিষয়ে সমাজ কাহার মতে চলে? অধিকাংশের মতে। যেখানে সমাজের এক মত, সেখানে কোন গোলই নাই—কোন অত্যাচার নাই। কিন্তু এরূপ ঐকমত্য অতি বিরল। সচরাচরই মতভেদ ঘটে। মতভেদ ঘটিলে, অধিকাংশের যে মত, অল্পাংশকে সেই মতে চলিতে হয়। অল্পাংশ ভিন্নমতাবলম্বী হইলেও, অধিকাংশের মতানুসারে কার্যকে ঘোরতর দুঃখ বিবেচনা করিলেও, তাহাদিগকে অধিকাংশের মতে চলিতে হইবে। নহিলে অধিকাংশ অল্পাংশকে সমাজবিহিস্কৃত করিয়া দিবে—বা অন্য সামাজিক দণ্ডে পীড়িত করিবে। ইহা ঘোরতর সামাজিক অত্যাচার। ইহা অল্পাংশের উপর অধিকাংশের অত্যাচার বলিয়া কথিত হইয়াছে।

বাংকম রচনাবলী

এদেশে অধিকাংশের মত যে, কেহ হিন্দুবংশজ হইয়া বিধবার বিবাহ দিতে পারিবে না বা কেহ হিন্দুবংশজ হইয়া সমুদ্র পার হইবে না। অল্পাংশের মত, বিধবার বিবাহ দেওয়া অবশ্য কৰ্তব্য এবং ইংলণ্ডদর্শন পরম ইষ্টসাধক। কিন্তু যদি এই অল্পাংশ আপনাদিগের মতানুসারে কার্য্য করে—বিধবা কন্যার বিবাহ দেয় বা ইংলণ্ডে যায়, তবে তাহারা অধিকাংশকর্তৃক সমাজ-বহিষ্কৃত হয়। ইহা অধিকাংশকর্তৃক অল্পাংশের উপর সামাজিক অত্যাচার।

ইংলণ্ডে অধিকাংশ লোক খ্রীষ্টভক্ত এবং ঈশ্বরবাদী। যে অনীশ্বরবাদী বা খ্রীষ্টধর্মের ভক্তিশূন্য, সে সাহস করিয়া আপনার অবিশ্বাস ব্যক্ত করিতে পারে না। ব্যক্ত করিলে, নানা প্রকার সামাজিক পীড়ায় পীড়িত হয়। মিল্ জন্মবাচ্ছমে আপনার অভক্তি ব্যক্ত করিতে পারিলেন না; ব্যক্ত না করিয়াও, কেবল সন্দেহের পাত্র হইয়াও, পার্লামেন্টে অভিষেক-কালে অনেক বিঘ্নবিবর্ত হইয়াছিলেন। এবং মৃত্যুর পর অনেক গালি খাইয়াছিলেন। ইহা ঘোরতর সামাজিক অত্যাচার।

অতএব সামাজিক অত্যাচারী দুই শ্রেণীভুক্ত; এক, সমাজের শাস্তা এবং বিধাতৃগণ; দ্বিতীয়, সমাজের অধিকাংশ লোক। ইহাদিগের অত্যাচারে সামাজিক দুঃখের উৎপত্তি। সেই সকল সামাজিক দুঃখ, সমাজের অবনতির কারণ। তাহার নিরাকরণ মনুষ্যের সাধ্য এবং অবশ্য কৰ্তব্য। কি কি উপায়ে, সেই সকল অত্যাচারের নিরাকরণ হইতে পারে?

দুই উপায়; বাহুবল এবং বাক্যবল।

বাহুবল কাহাকে বলি, এবং বাক্যবল কাহাকে বলি, তাহা প্রথমে বুঝাইব। তৎপরে এই বলের প্রয়োগ বুঝাইব। এবং এই দুই বলের প্রভেদ ও তারতম্য দেখাইব।

কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না যে, যে বলে ব্যাঘ্র হরিণশিশুকে হনন করিয়া ভোজন করে, আর যে বলে অস্তলিজ্ বা সেডান্ জিত হইয়াছিল, তাহা একই বল;—দুইই বাহুবল। আমি লিখিতে লিখিতে দেখিলাম, আমার সম্মুখে একটা টিকিটিকি একটা মক্ষিকা ধরিয়া খাইল—সিস্‌স্‌স্‌ হইতে আলেক্‌জণ্ডর্ রমানফ্ পর্য্যন্ত যে যত সাম্রাজ্য স্থাপিত করিয়াছে—রোমান্ বা মার্কিনীয়, খস্রু বা খলিফা, রুস্ বা প্রুস্ যিনি যে সাম্রাজ্য সংস্থাপিত বা রক্ষিত করিয়াছেন, তাহার বল, আর এই ক্ষুধার্ত টিকিটিকির বল, একই বল—বাহুবল। সুলতান মহম্মদ সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠ করিয়া লইয়া গেল—আর কালামুখী মার্জ্জারী ইন্দুর মুখে করিয়া পলাইল—উভয়েই বীর—বাহুবলে বীর। সোমনাথের মন্দিরে, আর আমার বস্ত্রচ্ছেদক ইন্দুরে প্রভেদ অনেক স্বীকার করি;—কিন্তু মহম্মদের লক্ষ সৈনিকে, আর একা মার্জ্জারীতেও প্রভেদ অনেক। সংখ্যা ও শরীরে প্রভেদ—বীর্য্য প্রভেদ বড় দেখি না। সাগরও জল—শিশিরবিন্দুও জল। মহম্মদের বীর্য্য ও টিকিটিকি বিড়ালের বীর্য্য, একই বীর্য্য। দুইই বাহুবলের বীর্য্য। পৃথিবীর বীরপুরুষগণ ধন্য! এবং তাহাদিগের গুণকীর্তনকারী ইতিবৃত্ত-লেখকগণ—হেরডোটস্ হইতে কে ও কিঙ্কলেক্ সাহেব পর্য্যন্ত—তাহারাও ধন্য।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, কেবল বাহুবলে কখনও কোন সাম্রাজ্য স্থাপিত হয় নাই—কেবল বাহুবলে পাণিপাত সেডান্ জিত হয় নাই—কেবল বাহুবলে নাপোলেয়ন্ বা মার্লবার বীর নহে। স্বীকার করি, কিছু কৌশল—অর্থাৎ বুদ্ধিবল—বাহুবলের সঙ্গে সংযুক্ত না হইলে কার্য্যকারিতা ঘটে না। কিন্তু ইহা কেবল মনুষ্যবীরের কার্য্য নহে—কেহ কি মনে কর যে, বিনা কৌশলে টিকিটিকি মাছি ধরে, কি বিড়াল ইন্দুর ধরে? বুদ্ধিবলের সহযোগ ভিন্ন বাহুবলের সফলতা নাই—এবং বুদ্ধিবল ব্যতীত জীবের কোন বলেরই সফলতা নাই।

অতএব ইহা স্বীকার করিতে হইতেছে যে, যে বলে পশুগণ এবং মনুষ্যগণ উভয়ে প্রধানতঃ স্বার্থসাধন করে, তাহাই বাহুবল। প্রকৃত পক্ষে ইহা পশুবল, কিন্তু কার্য্য স্বর্কক্ষম, এবং স্বর্কগ্রহই শেষ নিষ্পত্তিস্থল। যাহার আর কিছুতেই নিষ্পত্তি হয় না—তাহার নিষ্পত্তি বাহুবলে। এমন গ্রন্থি নাই যে, ছুরিতে কাটা যায় না—এমত প্রস্তর নাই যে, আঘাতে ভাঙ্গে না। বাহুবল ইহজগতের উচ্চ আদালত—সকল আপীলের উপর আপীল এইখানে; ইহার উপর আর আপীল নাই। বাহুবল—পশুর বল; কিন্তু মনুষ্য অদ্যাপি কিয়দংশে পশু, এজন্য বাহুবল মনুষ্যের প্রধান অবলম্বন।

কিন্তু পশুগণের বাহুবলে এবং মনুষ্যের বাহুবলে একটু গুরুতর প্রভেদ আছে। পশুগণের বাহুবল নিত্য ব্যবহার করিতে হয়—মনুষ্যের বাহুবল নিত্য ব্যবহারের প্রয়োজন নাই।

বিবিধ প্রবন্ধ—বাহুবল ও বাক্যবল

ইহার কারণ দুইটি। বাহুবল অনেক পশুগণের একমাত্র উদরপূর্তির উপায়। দ্বিতীয় কারণ, পশুগণ প্রযুক্ত বাহুবলের বশীভূত বটে, কিন্তু প্রয়োগের পূর্বে প্রয়োগ-সম্ভাবনা বুঝিয়া উঠে না। এবং সমাজবন্ধ নহে বলিয়া বাহুবলপ্রয়োগের প্রয়োজন নিবারণ করিতে পারে না। উপন্যাসে কথিত আছে যে, এক বনের পশুগণ, কোন সিংহ কর্তৃক বন্য পশুগণ নিত্য হত হইতেছে দেখিয়া, সিংহের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিল যে, প্রত্যহ পশুগণের উপর পীড়ন করিবার প্রয়োজন নাই—একটি একটি পশু প্রত্যহ তাহার আহারজন্য উপস্থিত হইবে। এস্থলে পশুগণ সমাজনিবন্ধ মনুষ্যের ন্যায় আচরণ করিল—সিংহকর্তৃক বাহুবলের নিত্য প্রয়োগ নিবারণ করিল। মনুষ্য বুদ্ধি দ্বারা বুঝিতে পারে যে, কোন অবস্থায় বাহুবল প্রযুক্ত হইবার সম্ভাবনা। এবং সামাজিক শৃঙ্খলের দ্বারা তাহার নিবারণ করিতে পারে। রাজা মাত্রই বাহুবলে রাজা, কিন্তু নিত্য বাহুবলপ্রয়োগের দ্বারা তাহাদিগকে প্রজাপীড়ন করিতে হয় না। প্রজাগণ দেখিতে পায় যে এই এক লক্ষ সৈনিক পুরুষ রাজার আজ্ঞাধীন; রাজাজ্ঞার বিরোধ তাহাদের কেবল ধ্বংসের কারণ হইবে। অতএব প্রজা বাহুবল প্রয়োগ সম্ভাবনা দেখিয়া, রাজাজ্ঞাবিরোধী হয় না। বাহুবলও প্রযুক্ত হয় না। অথচ বাহুবল প্রয়োগের যে উদ্দেশ্য, তাহা সিদ্ধ হয়। এ দিকে এই এক লক্ষ সৈন্য যে রাজার আজ্ঞাধীন, তাহারও কারণ প্রজার অর্থ অথবা অনুগ্রহ। প্রজার অর্থ যে রাজার কোষগত বা প্রজার অনুগ্রহ যে তাহার হস্তগত, সেটুকু সামাজিক নিয়মের ফল। অতএব এ স্থলে বাহুবল যে প্রযুক্ত হইল না, তাহার মূখ্য কারণ মনুষ্যের দূরদৃষ্টি, গোণ কারণ সমাজবন্ধন।

আমরা এ প্রবন্ধে গোণ কারণটি ছাড়িয়া দিলেও দিতে পারি। সামাজিক অত্যাচার যে যে বলে নিরাকৃত হয়, তাহার আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত। সমাজনিবন্ধ না হইলে সামাজিক অত্যাচারের অস্তিত্ব নাই। সমাজবন্ধন সকল সামাজিক অবস্থার নিত্য কারণ। যাহা নিত্য কারণ, বিকৃতির কারণানুসন্ধানে তাহা ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে।

ইহা বুঝিতে পারা গিয়াছে যে, এইরূপ করিলে আমাদিগের শাসনের জন্য বাহুবল প্রযুক্ত হইবে—এই বিশ্বাসই বাহুবল প্রয়োগ নিবারণের মূল। কিন্তু মনুষ্যের দূরদৃষ্টি সকল সময়ে সমান নহে—সকল সময়ে বাহুবল প্রয়োগের আশঙ্কা করে না। অনেক সময়েই যাহারা সমাজের মধ্যে তীক্ষ্ণদৃষ্টি, তাহারাই বুঝিতে পারেন যে, এই এই অবস্থায় বাহুবল প্রয়োগের সম্ভাবনা। তাহারা অন্যকে সেই অবস্থা বুঝাইয়া দেন। লোকে তাহাতে বুঝে। বুঝে যে, যদি আমরা এই সময়ে কর্তব্য সাধন না করি, তবে আমাদিগের উপর বাহুবলপ্রয়োগের সম্ভাবনা। বুঝে যে, বাহুবল প্রয়োগে কতকগুলি অশুভ ফলের সম্ভাবনা। সেই সকল অশুভ ফল আশঙ্কা করিয়া যাহারা বিপরীত পথগামী, তাহারা গন্তব্য পথে গমন করে।

অতএব যখন সমাজের এক ভাগ অপর ভাগকে পীড়িত করে, তখন সেই পীড়ন নিবারণের দুইটি উপায়। প্রথম, বাহুবল প্রয়োগ। যখন রাজা প্রজাকে উৎপীড়ন করিয়া সহজে নিরস্ত হইয়া না, তখন প্রজা বাহুবল প্রয়োগ করে। কখনও কখনও রাজাকে যদি কেহ বুঝাইতে পারে যে, এইরূপ উৎপীড়নে প্রজাগণ কর্তৃক বাহুবল প্রয়োগের আশঙ্কা, তবে রাজা অত্যাচার হইতে নিরস্ত হইয়া থাকে।

ইংলণ্ডের প্রথম চার্লস্ যে প্রজাগণের বাহুবলে শাসিত হইয়াছিলেন, তাহা সকলে অবগত আছেন। তাহার পুত্র দ্বিতীয় জেমস্, বাহুবল প্রয়োগের উদ্যম দেখিয়াই দেশ পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু এরূপ বাহুবল প্রয়োগের প্রয়োজন সচরাচর ঘটে না। বাহুবলের আশঙ্কাই যথেষ্ট। অসীম প্রতাপশালী ভারতীয় ইংরেজগণ যদি বুঝেন যে, কোন কার্যে প্রজাগণ অসন্তুষ্ট হইবে, তবে সে কার্য হস্তক্ষেপ করেন না। ১৮৫৭।৫৮ সালে দেখা গিয়াছে, ভারতীয় প্রজাগণ বাহুবলে তাহাদিগের সমকক্ষ নহে। তথাপি প্রজার সঙ্গে বাহুবলের পরীক্ষা সুখদায়ক নহে। অতএব তাহারা বাহুবল প্রয়োগের আশঙ্কা দেখিলে বাঞ্ছিত পথে গতি করেন না।

অতএব কেবল ভাবী ফল বুঝাইতে পারিলেই, বিনা প্রয়োগে বাহুবলের কার্য সিদ্ধ হয়। এই প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিদায়িনী শক্তি আর একটি দ্বিতীয় বল। কথায় বুঝাইতে হয়। এই জন্য আমি ইহাকে বাক্যবল নাম দিয়াছি।

এই বাক্যবল অতিশয় আদরণীয় পদার্থ। বাহুবল মনুষ্যসংহার প্রভৃতি বিবিধ অনিষ্ট

বাংকম রচনাবলী

সাধন করে, কিন্তু বাক্যবল বিনা রক্তপাতে, বিনা অস্বাধাতে, বাহুবলের কার্য্য সিদ্ধ করে। অতএব এই বাক্যবল কি, এবং তাহার প্রয়োগ লক্ষণ ও বিধান কি প্রকার, তাহা বিশেষ প্রকারে সমালোচিত হওয়া কৰ্ত্তব্য। বিশেষতঃ এতদ্দেশে। অস্মদ্দেশে বাহুবল প্রয়োগের কোন সম্ভাবনা নাই—বর্ত্তমান অবস্থায় অকৰ্ত্তব্যও বটে। সামাজিক অত্যাচার নিবারণের বাক্যবল একমাত্র উপায়। অতএব বাক্যবলের বিশেষ প্রকারে উন্নতির প্রয়োজন।

বস্তুতঃ বাহুবল অপেক্ষা বাক্যবল সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ। এ পর্য্যন্ত বাহুবলে পৃথিবীর কেবল অবনতিই সাধন করিয়াছে—যাহা কিছুর উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা বাক্যবলে। সভ্যতার যাহা কিছুর উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা বাক্যবলে। সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্মনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, যাহারই উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা বাক্যবলে। যিনি বক্তা, যিনি কবি, যিনি লেখক—দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, নীতিবেত্তা, ধর্মবেত্তা, ব্যবস্থাবেত্তা, সকলেই বাক্যবলেই বলী।

ইহা কেহ মনে না করেন যে, কেবল বাহুবলের প্রয়োগ নিবারণই বাক্যবলের পরিণাম বা তদর্থই বাক্যবল প্রযুক্ত হয়। মনুষ্য কতক দূর পশুচরিত্র পরিত্যাগ করিয়া উন্নতাবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। অনেক সময়ে মনুষ্য ভয়ে ভীত না হইয়াও, সংকর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত। যদি সমগ্র সমাজের কখনও এক কালে কোন বিশেষ সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মে, তবে সে সংকর্ষ্য অবশ্য অনুষ্ঠিত হয়। এই সংপথে জনসাধারণের প্রবৃত্তি কখনও কখনও জ্ঞানীর উপদেশ ব্যতীত ঘটে না। সাধারণ মনুষ্যগণ অজ্ঞ, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ তাহাদিগকে শিক্ষা দেন। সেই শিক্ষাদায়িনী উপদেশমালা যদি যথাবিহিত বলশালিনী হয়, তবেই তাহা সমাজের হৃদয়ঙ্গত হয়। যাহা সমাজের একবার হৃদগত হয়, সমাজ আর তাহা ছাড়ে না—তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। উপদেশবাক্যবলে আলোড়িত সমাজ বিপ্লুত হইয়া উঠে। বাক্যবলে এইরূপ যাদৃশ সামাজিক ইচ্ছা সাধিত হয়, বাহুবলে তাদৃশ কখনও ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

মুসা, ইসা, শাক্যসিংহ প্রভৃতি বাহুবলে বলী নহেন—বাক্যবীর মাত্র। কিন্তু ইসা, শাক্যসিংহ প্রভৃতির দ্বারা পৃথিবীর যে ইচ্ছা সাধিত হইয়াছে, বাহুবলবীরগণ কৰ্ত্তব্য তাহার শতাংশ নহে। বাহুবলে যে কখনও কোন সমাজের ইচ্ছা সাধন হয় না, এমত নহে। আত্মরক্ষার জন্য বাহুবলই শ্রেষ্ঠ। আমেরিকায় প্রধান উন্নতিসাধনকর্ত্তা বাহুবলবীর ওয়াশিংটন। হলন্ড্বেলজিয়মের প্রধান উন্নতিসাধনকর্ত্তা বাহুবলবীর অরেঞ্জের উইলিয়ম্। ভারতবর্ষের আধুনিক দুর্গতির প্রধান কারণ—বাহুবলের অভাব। কিন্তু মোটের উপর দেখিতে গেলে, দেখা যাইবে যে, বাহুবল অপেক্ষা বাক্যবলেই জগতের ইচ্ছা সাধিত হইয়াছে। বাহুবল পশুর বল—বাক্যবল মনুষ্যের বল। কিন্তু কতকগুলো বকিতে পারিলে বাক্যবল হয় না।—বাক্যের বলকে আমি বাক্যবল বলিতেছি না। বাক্যে যাহা ব্যক্ত হয়, তাহারই বলকে বাক্যবল বলিতেছি। চিন্তাশীল চিন্তার দ্বারা জাগতিক তত্ত্বসকল মনোমধ্য হইতে উন্মূত করেন—বক্তা তাহা বাক্যে লোকের হৃদয়ঙ্গত করান। এতদ্ভয়ের বলের সমবায়কে বাক্যবল বলিতেছি।

অনেক সময়েই এই বল একাধারে নিহিত—কখন কখন বলের আধার পৃথক্ভূত। একত্রিত হউক, পৃথক্ভূত হউক, উভয়ের সমবায়ই বাক্যবল।

(অসম্পূর্ণ)

বঙ্গালা ভাষা*

লিখিত ভাষা

প্রায় সকল দেশেই লিখিত ভাষা এবং কথিত ভাষায় অনেক প্রভেদ। যে সকল বাঙ্গালী ইংরেজি সাহিত্যে পারদর্শী, তাঁহারা একজন লন্ডনী কক্‌নী বা একজন কৃষকের কথা সহজে বুঝিতে পারেন না, এবং এতদ্দেশে অনেক দিন বাস করিয়া বাঙ্গালীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে যে ইংরেজেরা বাঙ্গালা শিখিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় একখানিও বাঙ্গালাগ্রন্থ বুঝিতে পারেন

* বঙ্গদর্শন, ১২৮৫, জ্যৈষ্ঠ।

বিবিধ প্রবন্ধ—বঙ্গালা ভাষা

না। প্রাচীন ভারতেও সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে, আদৌ বোধ হয়, এইরূপ প্রভেদ ছিল, এবং সেই প্রভেদ হইতে আধুনিক ভারতবর্ষীয় ভাষাসকলের উৎপত্তি।

বঙ্গালার লিখিত এবং কথিত ভাষায় যতটা প্রভেদ দেখা যায়, অন্যত্র তত নহে। বালিতে গেলে, কিছু কাল পূর্বে দুইটি পৃথক্ ভাষা বঙ্গালায় প্রচলিত ছিল। একটির নাম সাধুভাষা; অপরটির নাম অপর ভাষা। একটি লিখিবার ভাষা, দ্বিতীয়টি কহিবার ভাষা। পুস্তকে প্রথম ভাষাটি ভিন্ন, দ্বিতীয়টির কোন চিহ্ন পাওয়া যাইত না। সাধুভাষায় অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ-সকল বঙ্গালা ক্রিয়াপদের আদিম রূপের সঙ্গে সংযুক্ত হইত। যে শব্দ আভাঙ্গা সংস্কৃত নহে, সাধুভাষায় প্রবেশ করিবার তাহার কোন অধিকার ছিল না। লোকে বুদ্ধুক বা না বুদ্ধুক, আভাঙ্গা সংস্কৃত চাহি। অপর ভাষা সে দিকে না গিয়া, যাহা সকলের বোধগম্য, তাহাই ব্যবহার করে।

গদ্য* গ্রন্থাদিতে সাধুভাষা ভিন্ন আর কিছু ব্যবহার হইত না। তখন পুস্তকপ্রণয়ন সংস্কৃত ব্যবসায়ীদের হাতে ছিল। অন্যের বোধ ছিল যে, যে সংস্কৃত না জানে, বঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়নে তাহার কোন অধিকার নাই, সে বঙ্গালা লিখিতে পারেই না। যাঁহারা ইংরেজিতে পণ্ডিত, তাঁহারা বঙ্গালা লিখিতে পড়িতে না জানা গোরবের মধ্যে গণ্য করিতেন। সুতরাং বঙ্গালায় রচনা ফোঁটা-কাটা অনুস্বারবাদীদের একচেটিয়া মহল ছিল। সংস্কৃতেই তাঁহাদের গোরব। তাঁহারা ভাবিতেন, সংস্কৃতেই তবে বুদ্ধি বঙ্গালা ভাষার গোরব; যেমন গ্রাম্য বঙ্গালী স্ত্রীলোক মনে করে যে, শোভা বাড়ুক না বাড়ুক, ওজনে ভারি সোনা অঙ্গে পরিলেই অলঙ্কার পরার গোরব হইল, এই গ্রন্থকর্তারা তেমনি জানিতেন, ভাষা সুন্দর হউক বা না হউক, দুর্ভাষ্য সংস্কৃতবাহুল্য থাকিলেই রচনার গোরব হইল।

এইরূপ সংস্কৃতিপ্রিয়তা এবং সংস্কৃতানুকারিতা হেতু বঙ্গালা সাহিত্য অত্যন্ত নীরস, শ্রীহীন, দুর্ভাষ্য, এবং বঙ্গালা সমাজে অপরিচিত হইয়া রহিল। টেকচাঁদ ঠাকুর প্রথমে এই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। তিনি ইংরেজিতে সুশিক্ষিত। ইংরেজিতে প্রচলিত ভাষার মাহিমা দেখিয়াছিলেন এবং বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি ভাবিলেন, বঙ্গালার প্রচলিত ভাষাতেই বা কেন গদ্যগ্রন্থ রচিত হইবে না? যে ভাষায় সকলে কথোপকথন করে, তিনি সেই ভাষায় “আলালের ঘরের দুলাল” প্রণয়ন করিলেন। সেই দিন হইতে বঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি। সেই দিন হইতে শূন্য তরুর মূলে জীবনবারি নিষিক্ত হইল।

সেই দিন হইতে সাধুভাষা, এবং অপর ভাষা, দুই প্রকার ভাষাতেই বঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়ন হইতে লাগিল, ইহা দেখিয়া সংস্কৃতব্যবসায়ীরা জ্বালাতন হইয়া উঠিলেন; অপর ভাষা, তাঁহাদের বড় ঘৃণ্য। মদ্য, মুরগী, এবং টেকচাঁদ বঙ্গালা এককালে প্রচলিত হইয়া ভট্টাচার্য-গোষ্ঠীকে আকুল করিয়া তুলিল। এক্ষণে বঙ্গালা ভাষার সমালোচকেরা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছেন। এক দল খাঁটি সংস্কৃতবাদী—যে গ্রন্থে সংস্কৃতমূলক শব্দ ভিন্ন অন্য শব্দ ব্যবহার হয়, তাহা তাঁহাদের বিবেচনায় ঘৃণার যোগ্য। অপর সম্প্রদায় বলেন, তোমাদের ও কচকচি বঙ্গালা নহে। উহা আমরা কোন গ্রন্থে ব্যবহার করিতে দিব না। যে ভাষা বঙ্গালা সমাজে প্রচলিত, যাহাতে বঙ্গালার নিত্য কার্য সকল সম্পাদিত হয়, যাহা সকল বঙ্গালীতে বুদ্ধে, তাহাই বঙ্গালা ভাষা—তাহাই গ্রন্থাদির ব্যবহারের যোগ্য। অধিকাংশ সুশিক্ষিত ব্যক্তি এক্ষণে এই সম্প্রদায়ভুক্ত। আমরা উভয় সম্প্রদায়ের এক এক মূখপাত্রের উক্তি এই প্রবন্ধে সমালোচিত করিয়া স্থূল বিষয়ের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব।

সংস্কৃতবাদী সম্প্রদায়ের মূখপাত্রস্বরূপ আমরা রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়কে গ্রহণ করিতেছি।

* পদ্য সম্বন্ধে ভিন্ন রীতি। আদৌ বঙ্গালা কাব্যে কথিত ভাষাই অধিক পরিমাণে ব্যবহার হইত—এখনও হইতেছে। বোধ হয়, আজি কালি সংস্কৃত শব্দ বঙ্গালা পদ্যে পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রবেশ করিতেছে; চণ্ডিদাসের গীত এবং রজাঙ্গনা কাব্য, অথবা কৃষ্ণবাসি রামায়ণ এবং বৃহৎসংহার তুলনা করিয়া দেখিলেই বুদ্ধিতে পারা যাইবে। এ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইল, তাহা কেবল বঙ্গালা গদ্য সম্বন্ধেই বক্তব্য। যাঁহারা সাহিত্যের ফলাফল অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, পদ্যাপেক্ষা গদ্য শ্রেষ্ঠ, এবং সভ্যতার উন্নতি পক্ষে পদ্যাপেক্ষা গদ্যই কার্যকরী। অতএব পদ্যের রীতি ভিন্ন হইলেও, এই প্রবন্ধের প্রয়োজন কমিল না।

বাংকম রচনাবলী

বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত থাকিতে আমরা ন্যায়রত্ন মহাশয়কে এই সম্প্রদায়ের মূখ্যপাত্রস্বরূপ গ্রহণ করিলাম, ইহাতে সংস্কৃতবাদীদের প্রতি কিছু অবিচার হয়, ইহা আমরা স্বীকার করি। ন্যায়রত্ন মহাশয় সংস্কৃতে সর্বাশিক্ষিত, কিন্তু ইংরেজি জানেন না—পাশ্চাত্য সাহিত্য তাঁহার নিকট পরিচিত নহে। তাঁহার প্রণীত বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে ইংরেজি বিদ্যার একটু পরিচয় দিতে গিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় কিছু লোক হাসাইয়াছেন।* আমরা সেই গ্রন্থ হইতে সিদ্ধ করিতেছি যে, পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুশীলনে যে সুফল জন্মে, ন্যায়রত্ন মহাশয় তাহাতে বঞ্চিত। যিনি এই সুফলে বঞ্চিত, বিচার্য বিষয়ে তাঁহার মত তাঁহার নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেই যে অধিক গোরব প্রাপ্ত হইবে, এমত বোধ হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যে সকল সংস্কৃতবাদী পণ্ডিতদের মত অধিকতর আদরণীয়, তাঁহারা কেহই সেই মত, স্বপ্রণীত কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। সুতরাং তাঁহাদের কাহারও নাম উল্লেখ করিতে আমরা সক্ষম হইলাম না। ন্যায়রত্ন মহাশয় স্বপ্রণীত উক্ত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে আপনার মতগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। এই জন্যই তাঁহাকে এ সম্প্রদায়ের মূখ্যপাত্রস্বরূপ ধরিতে হইল। তিনি “আলালের ঘরের দুলাল” হইতে কিয়ৎদশ উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন যে, “এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, সর্ববিধ গ্রন্থরচনায় এইরূপ ভাষা আদর্শস্বরূপ হইতে পারে কি না?—আমাদের বিবেচনায় কখনই না। আলালের ঘরের দুলাল বল, হুতোমপেচা বল, মৃগালিনী বল—পত্নী বা পাঁচ জন বয়স্যের সহিত পাঠ করিয়া আমোদ করিতে পারি—কিন্তু পিতাপুত্রে একত্র বসিয়া অসঙ্কুচিতমুখে কখনই ও সকল পড়িতে পারি না। বর্ণনীয় বিষয়ের লজ্জাজনকতা উহা পড়িতে না পারিবার কারণ নহে, ঐ ভাষারই কেমন একরূপ ভঙ্গী আছে, যাহা গুরুজনসমক্ষে উচ্চারণ করিতে লজ্জা বোধ হয়। পাঠকগণ! যদি আপনাদের উপর বিদ্যালয়ের পুস্তকনির্বাচনের ভার হয়, আপনারা আলালী ভাষায় লিখিত কোন পুস্তককে পাঠ্যরূপে নির্দেশ করিতে পারিবেন কি?—বোধ হয়, পারিবেন না। কেন পারিবেন না?—ইহার উত্তরে অবশ্য এই কথা বলিবেন যে, ওরূপ ভাষা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ নয় এবং উহা সর্বসমক্ষে পাঠ করিতে লজ্জা বোধ হয়। অতএব বলিতে হইবে যে, আলালী ভাষা সম্প্রদায়বিশেষের বিশেষ মনোরঞ্জিকা হইলেও, উহা সর্ববিধ পাঠকের পক্ষে উপযুক্ত নহে। যদি তাহা না হইল, তবে আবার জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, ঐরূপ ভাষায় গ্রন্থরচনা করা উচিত কি না?—আমাদের বোধে অবশ্য উচিত। যেমন ফলারে বসিয়া অনবরত মিঠাই মণ্ডা খাইলে জিহ্বা একরূপ বিকৃত হইয়া যায়—মধ্যে মধ্যে আদার কুচি ও কুমড়ার খাড়া মুখে না দিলে সে বিকৃতির নিবারণ হয় না, সেইরূপ কেবল বিদ্যাসাগরী রচনা শ্রবণে কর্ণের যে একরূপ ভাব জন্মে, তাহার পরিবর্তন করণার্থ মধ্যে মধ্যে অপরবিধ রচনা শ্রবণ করা পাঠকদিগের আবশ্যিক।”

আমরা ইহাতে বুঝিতেছি যে, প্রচলিত ভাষা ব্যবহারের পক্ষে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রধান আপত্তি যে, পিতা পুত্রে একত্র বসিয়া এরূপ ভাষা ব্যবহার করিতে পারে না। বুঝিলাম যে, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বিবেচনায় পিতা পুত্রে বড় বড় সংস্কৃত শব্দে কথোপকথন করা কৰ্তব্য; প্রচলিত ভাষায় কথাবার্তা হইতে পারে না। এই আইন চলিলে বোধ হয়, ইহার পর শুনিব যে, শিশু মাতার কাছে খাবার চাহিবার সময় বলিবে, “হে মাতঃ, খাদ্যং দোহি মে” এবং ছেলে বাপের কাছে জুতার আবদার করিবার সময় বলিবে, “ছিন্বেয়ং পাদুকা মদীয়া।” ন্যায়রত্ন মহাশয় সকলের সম্মুখে সরল ভাষা ব্যবহার করিতে লজ্জা বোধ করেন, এবং সেই ভাষাকে শিক্ষাপ্রদ বিবেচনা করেন না, ইহা শুনিয়া তাঁহার ছাত্রদিগের জন্য আমরা বড় দুঃখিত হইলাম। বোধ হয়, তিনি স্বীয় ছাত্রগণকে উপদেশ দিবার সময়ে লজ্জাবশতঃ দেড়গজী সমাসপরম্পরা বিন্যাসে তাহাদিগের মাথা ঘুরাইয়া দেন। তাহারা যে এবংবিধ শিক্ষায় অধিক বিদ্যা উপার্জন করে,

* যে, যে গ্রন্থ পড়ে নাই, যাহাতে যাহার বিদ্যা নাই, সেই গ্রন্থে ও সেই বিদ্যায় বিদ্যাবত্তা দেখান, বাঙ্গালী লেখকদিগের মধ্যে একটি সংক্রামক রোগের স্বরূপ হইয়াছে। যিনি একছত্র সংস্কৃত কখন পড়েন নাই, তিনি ঝড়ি ঝড়ি সংস্কৃত কবিতা তুলিয়া স্বীয় প্রবন্ধ উজ্জ্বল করিতে চাহেন; যিনি এক বর্ণ ইংরেজি জানেন না, তিনি ইংরেজি সাহিত্যের বিচার লইয়া হুলস্থূল বাঁধাইয়া দেন। যিনি ক্ষুদ্র গ্রন্থ ভিন্ন পড়েন নাই—তিনি বড় বড় গ্রন্থ হইতে অসংলগ্ন কোটেশান করিয়া হাড় জ্বালান। এ সকল নিতান্ত কুরূচির ফল।

বিবিধ প্রবন্ধ—বাঙ্গালা ভাষা

এমত বোধ হয় না। কেন না, আমাদের স্থূল বুদ্ধিতে ইহাই উপলব্ধি হয় যে, যাহা বুদ্ধিতে না পারা যায়, তাহা হইতে কিছু শিক্ষালাভ হয় না। আমাদের এইরূপ বোধ আছে যে, সরল ভাষাই শিক্ষাপ্রদ। ন্যায়রত্ন মহাশয় কেন সরল ভাষাকে শিক্ষাপ্রদ নহে বিবেচনা করিয়াছেন, তাহা আমরা অনেক ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। বোধ হয়, বাল্যসংস্কার ভিন্ন আর কিছুই সরল ভাষার প্রতি তাঁহার বীতরাগের কারণ নহে। আমরা আরও বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইলাম যে, তিনি স্বয়ং যে ভাষায় বাঙ্গালাসাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব লিখিয়াছেন, তাহাও সরল প্রচলিত ভাষা। টেকচাঁদী ভাষার সঙ্গে এবং তাঁহার ভাষার সঙ্গে কোন প্রভেদ নাই, প্রভেদ কেবল এই যে, টেকচাঁদে রঙ্গরস আছে, ন্যায়রত্নে কোন রঙ্গরস নাই। তিনি যে বলিয়াছেন যে, পিতাপুত্রে একত্র বসিয়া অসঙ্কুচিত মুখে টেকচাঁদী ভাষা পড়িতে পারা যায় না, তাহার প্রকৃত কারণ টেকচাঁদে রঙ্গরস আছে। বাঙ্গালাদেশে পিতা-পুত্রে একত্র বসিয়া রঙ্গরস পড়িতে পারে না। সরলচিত্ত অধ্যাপক অতটুকু বুদ্ধিতে না পারিয়াই বিদ্যাসাগরী ভাষার মহিমা কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ভাষা হইতে রঙ্গরস উঠাইয়া দেওয়া যদি ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের মত হয়, তবে তাঁহারা সেই বিষয়ে যত্নবান্ হউন। কিন্তু তাহা বলিয়া অপ্রচলিত ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা করিতে চেষ্টা করিবেন না।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মত সমালোচনায় আর অধিক কাল হরণ করিবার আমাদের ইচ্ছা নাই। আমরা এক্ষণে সুশিক্ষিত অথবা নব্য সম্প্রদায়ের মত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। এই সম্প্রদায়ের সকলের মত একরূপ নহে। ইহার মধ্যে এক দল এমন আছেন যে, তাঁহারা কিছু বাড়াবাড়ি করিতে প্রস্তুত। তন্মধ্যে বাবু শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় গত বৎসর কলিকাতা রিভিউতে বাঙ্গালা ভাষার বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। প্রবন্ধটি উৎকৃষ্ট। তাঁহার মতগুলি অনেক স্থলে সুসঙ্গত এবং আদরণীয়। অনেক স্থলে তিনি কিছু বেশী গিয়াছেন। বহুবচন জ্ঞাপনে গণ শব্দ ব্যবহার করার প্রতি তাঁহার কোপদৃষ্টি। বাঙ্গালায় লিঙ্গভেদ তিনি মানেন না। পৃথিবী যে বাঙ্গালায় স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ, ইহা তাঁহার অসহ্য। বাঙ্গালায় সন্ধি তাঁহার চক্ষুঃশূল। বাঙ্গালায় তিনি 'জনৈক' লিখিতে দিবেন না। ত্ব প্রত্যয়ান্ত এবং য প্রত্যয়ান্ত শব্দ ব্যবহার করিতে দিবেন না। সংস্কৃত সংখ্যাবাচক শব্দ, যথা—একাদশ বা চত্বারিংশৎ বা দুই শত ইত্যাদি বাঙ্গালায় ব্যবহার করিতে দিবেন না। ভ্রাতা, কল্যা, কর্ণ, স্বর্ণ, তাম্র, পত্র, মস্তক, অশ্ব ইত্যাদি শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহার করিতে দিবেন না। ভাই, কাল, কাণ, সোণা, কেবল এই সকল শব্দ ব্যবহার হইবে। এইরূপ তিনি বাঙ্গালাভাষার উপর অনেক দৌরাত্ম্য করিয়াছেন। তথাপি তিনি এই প্রবন্ধে বাঙ্গালাভাষা সম্বন্ধে অনেকগুলি সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন। বাঙ্গালা লেখকেরা তাহা স্মরণ রাখেন, ইহা আমাদের ইচ্ছা।

শ্যামাচরণবাবু বলিয়াছেন এবং সকলেই জানেন যে, বাঙ্গালা শব্দ ত্রিবিধ। প্রথম, সংস্কৃত-মূলক শব্দ, যাহার বাঙ্গালায় রূপান্তর হইয়াছে, যথা—গৃহ হইতে ঘর, ভ্রাতা হইতে ভাই। দ্বিতীয়, সংস্কৃতমূলক শব্দ, যাহার রূপান্তর হয় নাই। যথা—জল, মেঘ, সূর্য্য। তৃতীয়, যে সকল শব্দের সংস্কৃতের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই।

প্রথম শ্রেণীর শব্দ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, রূপান্তরিত প্রচলিত সংস্কৃতমূলক শব্দের পরিবর্তে কোন স্থানেই অরূপান্তরিত মূল সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করা কর্তব্য নহে, যথা—মাথার পরিবর্তে মস্তক, বামনের পরিবর্তে ব্রাহ্মণ ইত্যাদি ব্যবহার করা কর্তব্য নহে। আমরা বলি যে, এক্ষণে বামনও যেমন প্রচলিত, ব্রাহ্মণ সেইরূপ প্রচলিত। পাতাও যেইরূপ প্রচলিত, পত্র ততদূর না হউক, প্রায় সেইরূপ প্রচলিত। ভাই যেইরূপ প্রচলিত, ভ্রাতা ততদূর না হউক, প্রায় সেইরূপ প্রচলিত। যাহা প্রচলিত হইয়াছে, তাহার উচ্ছেদে কোন ফল নাই এবং উচ্ছেদ সম্ভবও নহে। কেহ যত্ন করিয়া মাতা, পিতা, ভ্রাতা, গৃহ, তাম্র বা মস্তক ইত্যাদি শব্দকে বাঙ্গালা ভাষা হইতে বহিস্কৃত করিতে পারিবেন না। আর বহিস্কৃত করিয়াই বা ফল কি? এ বাঙ্গালা দেশে কোন্ চাষা আছে যে, ধান্য, পুষ্করিণী, গৃহ বা মস্তক ইত্যাদি শব্দের অর্থ বুঝে না। যদি সকলে বুঝে, তবে কি দোষে এই শ্রেণীর শব্দগুলি বর্জিত? বরং ইহাদের পরিত্যাগে ভাষা কিয়দংশে ধনশূন্য হইবে মাত্র। নিষ্কারণ ভাষাকে ধনশূন্য করা কোন ক্রমে বাঞ্ছনীয় নহে। আর কতকগুলি এমত শব্দ আছে যে, তাহাদের রূপান্তর ঘটিয়াছে আপাতত বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক রূপান্তর ঘটে নাই, কেবল সাধারণের উচ্চারণের বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। সকলেই উচ্চারণ

বাংকম রচনাবলী

করে “খেউরি”, কিন্তু ক্ষৌরী লিখলে সকলে বুঝে যে, এই সেই “খেউরি” শব্দ। এ স্থলে ক্ষৌরীকে পরিত্যাগ করিয়া খেউরি প্রচলিত করায় কোন লাভ নাই। বরং এমত স্থলে আদিম সংস্কৃত রূপটি বজায় রাখিলে ভাষার স্থায়িত্ব জন্মে। কিন্তু এমন অনেকগুলি শব্দ আছে যে, তাহার আদিম রূপ সাধারণের প্রচলিত বা সাধারণের বোধগম্য নহে—তাহার অপভ্রংশই প্রচলিত এবং সকলের বোধগম্য। এমত স্থলেই আদিম রূপ কদাচ ব্যবহার্য্য নহে।

যদিও আমরা এমন বলি না যে, “ঘর” প্রচলিত আছে বলিয়া গৃহশব্দের উচ্ছেদ করিতে হইবে, অথবা মাথা শব্দ প্রচলিত আছে বলিয়া মস্তক শব্দের উচ্ছেদ করিতে হইবে; কিন্তু আমরা এমত বলি যে, অকারণে ঘর শব্দের পরিবর্তে গৃহ, অকারণে মাথার পরিবর্তে মস্তক, অকারণে পাতার পরিবর্তে পত্র এবং তামার পরিবর্তে তাম্র ব্যবহার উচিত নহে। কেন না, ঘর, মাথা, পাতা, তামা বাঙ্গালা; আর গৃহ, মস্তক, পত্র, তাম্র সংস্কৃত। বাঙ্গালা লিখিতে গিয়া অকারণে বাঙ্গালা ছাড়িয়া সংস্কৃত কেন লিখিব? আর দেখা যায় যে, সংস্কৃত ছাড়িয়া বাঙ্গালা শব্দ ব্যবহার করিলে রচনা অধিকতর মধুর, সুস্পষ্ট ও তেজস্বী হয়। “হে ভ্রাতঃ” বলিয়া যে ডাকে, বোধ হয় যেন সে যাত্রা করিতেছে; “ভাই রে” বলিয়া যে ডাকে, তাহার ডাকে মন উছলিয়া উঠে। অতএব আমরা ভ্রাতা শব্দ উঠাইয়া দিতে চাই না বটে, কিন্তু সচরাচর আমরা ভাই শব্দটি ব্যবহার করিতে চাই। ভ্রাতা শব্দ রাখিতে চাই, তাহার কারণ এই যে, সময়ে সময়ে তদ্ব্যবহারে বড় উপকার হয়। “ভ্রাতৃভাব” এবং “ভাইভাব”, “ভ্রাতৃত্ব” এবং “ভাইগিরি” এতদুভয়ের তুলনায় বুঝা যাইবে যে, কেন ভ্রাতৃ শব্দ বাঙ্গালায় বজায় রাখা উচিত। এই স্থলে বলিতে হয় যে, আজিও অকারণে প্রচলিত বাঙ্গালা ছাড়িয়া সংস্কৃত ব্যবহারে, ভাই ছাড়িয়া অকারণে ভ্রাতৃ শব্দের ব্যবহারে অনেক লেখকের বিশেষ আনন্দরঞ্জিত আছে। অনেক বাঙ্গালা রচনা যে নীরস, নিস্তেজ এবং অস্পষ্ট, ইহাই তাহার কারণ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর শব্দ, অর্থাৎ যে সকল সংস্কৃত শব্দ রূপান্তর না হইয়াই বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে, তৎসম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। তৃতীয় শ্রেণী অর্থাৎ যে সকল শব্দ সংস্কৃতের সাহিত্য সম্বন্ধশূন্য, তৎসম্বন্ধে শ্যামাচরণবাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত সারগর্ভ এবং আমরা তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। সংস্কৃতপ্রিয় লেখকদিগের অভ্যাস যে, এই শ্রেণীর শব্দ সকল তাঁহারা রচনা হইতে একেবারে বাহির করিয়া দেন। অন্যের রচনায় সে সকল শব্দের ব্যবহার শেলের ন্যায় তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করে। ইহার পর মূর্খতা আমরা আর দেখি না। যদি কোন ধনবান্ ইংরেজের অর্থভাণ্ডারে হালি এবং বাদশাহী দুই প্রকার মোহর থাকে, এবং সেই ইংরেজ যদি জাত্যাভিমানের বশ হইয়া বিবির মাথাওয়ালা মোহর রাখিয়া, ফার্সি লেখা মোহরগুলি ফেলিয়া দেয়, তবে সকলেই সেই ইংরেজকে ঘোরতর মূর্খ বলিবে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে, এই পণ্ডিতেরা সেই মত মূর্খ।

তাহার পরে অপপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দকে বাঙ্গালা ভাষায় নূতন সন্নিবেশিত করার ঔচিত্য বিচার্য্য। দেখা যায়, লেখকেরা ভূরি ভূরি অপপ্রচলিত নূতন সংস্কৃত শব্দ প্রয়োজনে বা নিঃপ্রয়োজনে ব্যবহার করিয়া থাকেন। বাঙ্গালা আজিও অসম্পূর্ণ ভাষা, তাহার অভাব পূরণ জন্য অন্য অন্য ভাষা হইতে সময়ে সময়ে শব্দ কর্জ করিতে হইবে। কর্জ করিতে হইলে, চিরকালে মহাজন সংস্কৃতের কাছেই ধার করা কর্তব্য। প্রথমতঃ, সংস্কৃত মহাজনই পরম ধনী; ইহার রত্নময় শব্দভাণ্ডার হইতে যাহা চাও, তাহাই পাওয়া যায়; দ্বিতীয়তঃ, সংস্কৃত হইতে শব্দ হইলে, বাঙ্গালার সঙ্গে ভাল মিশে। বাঙ্গালার অস্থি, মজ্জা, শোণিত, মাংস সংস্কৃতেই গঠিত। তৃতীয়তঃ, সংস্কৃত হইতে নূতন শব্দ লইলে, অনেকে বুঝিতে পারে; ইংরেজি বা আরবী হইতে লইলে কে বুঝিবে? “মাধ্যাকর্ষণ” বলিলে কতক অর্থ অনেক অনভিজ্ঞ লোকেও বুঝে। “গ্রাবিটেশ্যান্” বলিলে ইংরেজি যাহারা না বুঝে, তাহারা কেহই বুঝিবে না। অতএব যেখানে বাঙ্গালা শব্দ নাই, সেখানে অবশ্য সংস্কৃত হইতে অপপ্রচলিত শব্দ গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু নিঃপ্রয়োজনে অর্থাৎ বাঙ্গালা শব্দ থাকিতে তদ্ব্যচক অপপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার যাঁহারা করেন, তাঁহাদের কিরূপ রুচি, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

স্থূল কথা, সাহিত্য কি জন্য? গ্রন্থ কি জন্য? যে পড়িবে, তাহার বুঝিবার জন্য। না বুঝিয়া, বহি বন্ধ করিয়া, পাঠক গ্রাহি গ্রাহি করিয়া ডাকিবে, বোধ হয় এ উদ্দেশ্যে কেহ গ্রন্থ লিখে না। যদি এ কথা সত্য হয়, তবে যে ভাষা সকলের বোধগম্য—অথবা যদি সকলের বোধ-

বিবিধ প্রবন্ধ—বঙ্গালা ভাষা

গম্য কোন ভাষা না থাকে, তবে যে ভাষা অধিকাংশ লোকের বোধগম্য—তাহাতেই গ্রন্থ প্রণীত হওয়া উচিত। যদি কোন লেখকের এমন উদ্দেশ্য থাকে যে, আমার গ্রন্থ দুই চারি জন শব্দ-পাণ্ডিতে বুদ্ধক, আর কাহারও বুদ্ধিব্যবহার প্রয়োজন নাই, তবে তিনি গিয়া দূর হু ভাষায় গ্রন্থপ্রণয়নে প্রবৃত্ত হউন। যে তাঁহার যশ করে করুক, আমরা কখন যশ করিব না। তিনি দুই একজনের উপকার করিলে করিতে পারেন, কিন্তু আমরা তাঁহাকে পরোপকারকাতর খলস্বভাব পাষণ্ড বলিব। তিনি জ্ঞানবিতরণে প্রবৃত্ত হইয়া, চেষ্টা করিয়া অধিকাংশ পাঠককে আপনার জ্ঞানভাণ্ডার হইতে দূরে রাখেন। যিনি যথার্থ গ্রন্থকার, তিনি জানেন যে, পরোপকার ভিন্ন গ্রন্থপ্রণয়নের উদ্দেশ্য নাই; জনসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধি বা চিন্তোন্নতি ভিন্ন রচনার অন্য উদ্দেশ্য নাই; অতএব যত অধিক ব্যক্তি গ্রন্থের মর্ম গ্রহণ করিতে পারে, ততই অধিক ব্যক্তি উপকৃত—ততই গ্রন্থের সফলতা। জ্ঞানে মনুষ্যমাত্রেরই তুল্যাধিকার। যদি সে সর্ব্বজনের প্রাপ্য ধনকে, তুমি এমত দূর হু ভাষায় নিবন্ধ রাখ যে, কেবল যে কয়জন পরিশ্রম করিয়া সেই ভাষা শিখিয়াছে, তাহারা ভিন্ন আর কেহ তাহা পাইতে পারিবে না, তবে তুমি অধিকাংশ মনুষ্যকে তাহাদিগের স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিলে। তুমি সেখানে বঞ্চক মাত্র।

তাই বলিয়া আমরা এমত বলিতেছি না যে, বঙ্গালার লিখন পঠন হুতোমি ভাষায় হওয়া উচিত। তাহা কখন হইতে পারে না। যিনি যত চেষ্টা করুন, লিখনের ভাষা এবং কথনের ভাষা চিরকাল স্বতন্ত্র থাকিবে। কারণ, কথনের এবং লিখনের উদ্দেশ্য ভিন্ন। কথনের উদ্দেশ্য কেবল সামান্য জ্ঞাপন, লিখনের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, চিন্তসঞ্চালন। এই মহৎ উদ্দেশ্য হুতোমি ভাষায় কখনও সিদ্ধ হইতে পারে না। হুতোমি ভাষা দরিদ্র, ইহার তত শব্দধন নাই; হুতোমি ভাষা নিস্তেজ, ইহার তেমন বাঁধন নাই; হুতোমি ভাষা অসুন্দর এবং যেখানে অশ্লীল নয়, সেখানে পবিত্রতাশূন্য। হুতোমি ভাষায় কখন গ্রন্থ প্রণীত হওয়া কৰ্তব্য নহে। যিনি হুতোমিপেঁচা লিখিয়াছিলেন, তাঁহার রুচি বা বিবেচনার আমরা প্রশংসা করি না।

টেকচাঁদি ভাষা, হুতোমি ভাষার এক পৈঠা উপর। হাস্য ও করুণরসের ইহা বিশেষ উপযোগী। স্কচ্ কবি বর্ণস্ হাস্য ও করুণরসাত্মিকা কবিতায় স্কচ্ ভাষা ব্যবহার করিতেন, গম্ভীর এবং উন্নত বিষয়ে ইংরেজি ব্যবহার করিতেন। গম্ভীর এবং উন্নত বা চিন্তাময় বিষয়ে টেকচাঁদি ভাষায় কুলায় না। কেন না, এ ভাষাও অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, দুর্বল এবং অপরিমার্জিত।

অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইতেছে যে, বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত। রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন, সরলতা এবং স্পষ্টতা। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে, এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা। তাহার পর ভাষার সৌন্দর্য, সরলতা এবং স্পষ্টতার সহিত সৌন্দর্য মিশাইতে হইবে। অনেক রচনার মূখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য—সে স্থলে সৌন্দর্যের অনুরোধে শব্দের একটু অসাধারণতা সহ্য করিতে হয়। প্রথমে দেখিবে, তুমি যাহা বলিতে চাও, কোন ভাষায় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হয়। যদি সরল প্রচলিত কথাবার্তার ভাষায় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট এবং সুন্দর হয়, তবে কেন উচ্চভাষার আশ্রয় লইবে? যদি সে পক্ষে টেকচাঁদি বা হুতোমি ভাষায় সকলের অপেক্ষা কার্য সুসিদ্ধ হয়, তবে তাহাই ব্যবহার করিবে। যদি তদপেক্ষা বিদ্যাসাগর বা ভূদেববাবুপ্রদর্শিত সংস্কৃতবহুল ভাষায় ভাবের অধিক স্পষ্টতা এবং সৌন্দর্য হয়, তবে সামান্য ভাষা ছাড়িয়া সেই ভাষার আশ্রয় লইবে। যদি তাহাতেও কার্য সিদ্ধ না হয়, আরও উপরে উঠিবে; প্রয়োজন হইলে তাহাতেও আপত্তি নাই—নিঃপ্রয়োজনেই আপত্তি। বলিবার কথাগুলি পরিষ্ফুট করিয়া বলিতে হইবে—যতটুকু বলিবার আছে, সবটুকু বলিবে—তজ্জন্য ইংরেজি, ফার্সি, আরবি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য, যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিবে, অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না। তার পর সেই রচনাকে সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট করিবে—কেন না, যাহা অসুন্দর, মনুষ্যচিন্তের উপরে তাহার শক্তি অল্প। এই উদ্দেশ্যগুলি যাহাতে সরল প্রচলিত ভাষায় সিদ্ধ হয়, সেই চেষ্টা দেখিবে—লেখক যদি লিখিতে জানেন, তবে সে চেষ্টা প্রায় সফল হইবে। আমরা দেখিয়াছি, সরল প্রচলিত ভাষা অনেক বিষয়ে সংস্কৃতবহুল ভাষার অপেক্ষা শক্তিমতী। কিন্তু যদি সে সরল প্রচলিত ভাষায় সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, তবে কাজে কাজেই সংস্কৃতবহুল ভাষার আশ্রয় লইতে হইবে। প্রয়োজন হইলে নিঃসঙ্কাচে সে আশ্রয় লইবে।

বাঁকম রচনাবলী

ইহাই আমাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা রচনার উৎকৃষ্ট রীতি। নব্য ও প্রাচীন উভয় সম্প্রদায়ের পরামর্শ ত্যাগ করিয়া, এই রীতি অবলম্বন করিলে, আমাদের বিবেচনায় ভাষা শক্তিশালিনী, শব্দশ্রুত পুঁটা এবং সাহিত্যালঙ্কারে বিভূষিত হইবে।

মনুষ্য কি? *

মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়া কি করিতে হইবে, আজও মনুষ্য তাহা বুঝিতে পারে নাই। অনেক লোক আছে, তাঁহারা জগতে ধর্মাত্মা বলিয়া আত্মপরিচয় দেন; তাঁহারা মুখে বলিয়া থাকেন যে, পরকালের জন্য পুণ্যসঞ্চয়ই ইহজন্মে মনুষ্যের উদ্দেশ্য। কিন্তু অধিকাংশ লোকই, বাক্যে না হউক, কার্যে এ কথা মানে না; অনেক লোক পরকালের অস্তিত্বই স্বীকার করে না। পরকাল সর্ববাদিসম্মত, এবং পরকালের জন্য পুণ্যসঞ্চয় ইহলোকের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া সর্বজনস্বীকৃত হইলেও, পুণ্য কি, সে বিষয়ে বিশেষ মতভেদ। এই বঙ্গদেশেই এক সম্প্রদায়ের মত—মদ্যপান পরকালের ঘোর বিপদের কারণ; আর এক সম্প্রদায়ের মত—মদ্যপান পরকালের জন্য পরম কার্য। অথচ উভয় সম্প্রদায়ই বাঙ্গালী এবং উভয় সম্প্রদায়ই হিন্দু। যদি সত্য সত্যই পরকালের জন্য পুণ্যসঞ্চয় মনুষ্যজন্মের প্রধান কার্য হয়, তবে সে পুণ্যই বা কি, কি প্রকারে তাহা অর্জিত হইতে পারে, তাহার স্থিরতা কিছই এ পর্যন্ত হয় নাই।

মনে কর, তাহা স্থির হইয়াছে; মনে কর, ব্রাহ্মণে ভক্তি, গঙ্গাপান, তুলসীর মালা ধারণ, এবং হরিনামসঙ্কীর্তন ইত্যাদি পুণ্যকর্ম। ইহাই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য। অথবা মনে কর, রবিবারে কার্যত্যাগ, গির্জায় বসিয়া নয়ন নিমীলন, এবং খ্রীষ্টধর্ম ভিন্ন ধর্মাস্তরে বিদ্বেষ, ইহাই পুণ্যকর্ম। যাহা হউক, একটা কিছ, আর কিছ হউক না হউক, দান দয়া সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি পুণ্যকর্ম বলিয়া সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু তাই বলিয়া, ইহা দেখা যায় না যে, দান দয়া সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতিকে অধিক লোক জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া অভ্যস্ত এবং সাধিত করে। অতএব পুণ্য যে জীবনের উদ্দেশ্য, তাহা সর্ববাদিস্বীকৃত নহে; যেখানে স্বীকৃত, সেখানে সে বিশ্বাস মৌখিক মাত্র।

বাস্তবিক জীবনের উদ্দেশ্য কি, এ তত্ত্বের প্রকৃত মীমাংসা লইয়া মনুষ্যালোকে আজও বড় গোল আছে। লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে, অনন্ত সমুদ্রের অতলস্পর্শ জলমধ্যে যে আগ্নেয়গণিক জীব বাস করিত, তাহার দেহতত্ত্ব লইয়া মনুষ্য বিশেষ ব্যস্ত—আপনি এ সংসারে আসিয়া কি করিবে, তাহা সম্যক্ প্রকারে স্থিরীকরণে তাদৃশ চেষ্টিত নহে। যে প্রকার হউক, আপনার উদরপূর্তি, এবং অপরাপর বাহ্যেন্দ্রিয়সকল চরিতার্থ করিয়া, আত্মীয় স্বজনেরও উদরপূর্তি সংসাধিত করিতে পারিলেই অনেকে মনুষ্যজন্ম সফল বলিয়া বোধ করেন। তাহার উপর কোন প্রকারে অন্যের উপর প্রাধান্যলাভ উদ্দেশ্য। উদরপূর্তির পর, ধনে হউক বা অন্য প্রকারে হউক, লোকমধ্যে যথাসাধ্য প্রাধান্য লাভ করাকে মনুষ্যগণ আপনাদিগের জীবনের উদ্দেশ্য বিবেচনা করিয়া কার্য করে। এই প্রাধান্যলাভের উপায়, লোকের বিবেচনায় প্রধানতঃ ধন, তৎপরে রাজপদ ও যশঃ। অতএব ধন, পদ ও যশঃ মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া মুখে স্বীকৃত হউক বা না হউক, কার্যতঃ মনুষ্যালোকে সর্ববাদিসম্মত। এই তিনটির সমবায়, সমাজে সম্পদ বলিয়া পরিচিত। তিনটির একত্রীকরণ দুর্লভ, অতএব দুই একটি, বিশেষতঃ ধন থাকিলেই সম্পদ বর্তমান বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। এই সম্পদাকাঙ্কাই সমাজমধ্যে লোকজীবনের উদ্দেশ্যস্বরূপ অগ্রবর্তী, এবং ইহাই সমাজের ঘোরতর অনিষ্টের কারণ। সমাজের উন্নতির গতি যে এত মন্দ, তাহার প্রধান কারণই এই যে, বাহ্য সম্পদ মনুষ্যের জীবনের উদ্দেশ্যস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।† কেবল সাধারণ মনুষ্যদিগের কাছে নহে, ইউরোপীয় প্রধান পণ্ডিত এবং রাজপুরুষগণের কাছেও বটে।

কদাচিৎ কখনও এমন কেহ জন্মগ্রহণ করেন যে, তিনি সম্পদকে মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য-

* বঙ্গদর্শন, ১২৮৪, আশ্বিন।

† স্বীকার করি, ক্রয়পরিমাণে ধনাকাঙ্কা সমাজের মঙ্গলকর। ধনের আকাঙ্কা মাত্র অমঙ্গলজনক, এ কথা বলি না, ধন মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য হওয়াই অমঙ্গলকর।

বিবিধ প্রবন্ধ—মনুষ্য কি?

মধ্যে গণ্য করা দূরে থাকুক, জীবনোদ্দেশ্যের প্রধান বিষয় বলিয়া ভাবিয়া থাকেন। যে রাজ্যসম্পদকে অপর লোকে জীবনসফলকর বিবেচনা করে, শাক্যসিংহ তাহা বিঘ্নকর বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে বা ইউরোপে এমন অনেকেই মূর্খবৃত্ত মহাপুরুষ জন্মিয়াছেন যে, তাঁহারা বাহ্য সম্পদকে ঐরূপ ঘৃণা করিয়াছেন। ইঁহারা প্রকৃত পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, এমত কথা বলিতে পারিতোঁছি না। শাক্যসিংহ শিখাইলেন যে, ঐহিক ব্যাপারে চিন্তনবিশেষ মাত্র অনিষ্টপ্রদ, মনুষ্য সর্বত্যাগী হইয়া নিৰ্বাণাকাঙ্ক্ষী হউক। ভারতে এই শিক্ষার ফল বিষময় হইয়াছে। এইরূপ আরও অনেকানেক মূর্খবৃত্ত মহাপুরুষ মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত হওয়াতে, ঐহিক সম্পদে অননুরক্ত হইয়াও, সমাজের ইষ্টসাধনে বিশেষ কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। সামান্যতঃ সন্ন্যাসী প্রভৃতি সর্বদেশীয় বৈরাগীসম্প্রদায় সকলকে উদাহরণ স্বরূপ নির্দিষ্ট করিলেই, একথা যথেষ্ট প্রমাণীকৃত হইবে।

স্থূল কথা এই যে, ধনসম্ভারাদির ন্যায় সুখশূন্য, শুভফলশূন্য, মহত্বশূন্য ব্যাপার প্রয়োজনীয় হইলেও কখনই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। এ জীবন ভবিষ্যৎ পারলৌকিক জীবনের জন্য পরীক্ষা মাত্র—পৃথিবী স্বর্গলাভের জন্য কৰ্মভূমি মাত্র—এ কথা যদি যথার্থ হয়, তবে পরলোকে সুখপ্রদ কার্যের অনুষ্ঠানই জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত বটে। কিন্তু প্রথমতঃ সেই সকল কার্য কি, তদ্বিষয়ে মতভেদ, নিশ্চয়তার একেবারে উপায়াভাব; দ্বিতীয়তঃ, পরলোকের আন্তঃত্বেরই প্রমাণাভাব।

তৃতীয়তঃ, পরলোক থাকিলে, এবং ইহলোক পরীক্ষাভূমিমাত্র হইলেও ঐহিক এবং পারত্রিক শূভের মধ্যে ভিন্নতা হইবার কোন কারণ দেখা যায় না। যদি পরলোক থাকে, তবে যে ব্যবহারে পরলোকে শূভ নিষ্পত্তির সম্ভাবনা, সেই কার্যই ইহলোকেও শূভ নিষ্পত্তির সম্ভাবনা কেন নহে, তাহার যথার্থ হেতুনির্দেশ এ পর্যন্ত কেহ করিতে পারে নাই। ধর্মাচরণ যদি মঙ্গলপ্রদ হয়, তবে যে উহা কেবল পরলোকে মঙ্গলপ্রদ, ইহলোকে মঙ্গলপ্রদ নহে, এ কথা কিসে সপ্রমাণীকৃত হইতেছে? ঈশ্বর স্বর্গে বসিয়া কাজির মত বিচার করিতেছেন, পাপীকে নরক-কুণ্ডে ফেলিয়া দিতেছেন, পুণ্যাত্মাকে স্বর্গে পাঠাইয়া দিতেছেন, এ সকল প্রাচীন মনোরঞ্জন উপন্যাসকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। যাঁহারা বলেন যে, ইহলোকে অধাৰ্মিকের শূভ, এবং ধাৰ্মিকের অশূভ দেখা গিয়া থাকে, তাঁহাদিগের চক্ষে কেবল ধনসম্পদাদিই শূভ। তাঁহাদিগের বিচার এই মূল ভ্রান্তিতে দূষিত। যদি পুণ্যকৰ্ম পরকালে শূভপ্রদ হয়, তবে ইহলোকেও পুণ্যকৰ্ম শূভপ্রদ। কিন্তু বাস্তবিক কেবল পুণ্যকৰ্ম কি পরলোকে, কি ইহলোকে শূভপ্রদ হইতে পারে না। যে প্রকার মনোবৃত্তির ফল পুণ্যকৰ্ম, তাহাই উভয় লোকে শূভপ্রদ হওয়াই সম্ভব। কেহ যদি কেবল মার্জিষ্ট্রেট সাহেবের তাড়নার বশীভূত হইয়া, অথবা যশের লালসায় অপ্রসন্নচিত্তে দুর্ভিক্ষনিবারণের জন্য লক্ষ মুদ্রা দান করে, তবে তাহার পারলৌকিক মঙ্গলসম্ভব হইল কি? দান পুণ্যকৰ্ম বটে, কিন্তু এরূপ দানে পরলোকের কোন উপকার হইবে, ইহা কেহই বলিবে না। কিন্তু যে অর্থাভাবে দান করিতে পারিল না, কিন্তু দান করিতে পারিল না বলিয়া কাতর, সে ইহলোকে, এবং পরলোক থাকিলে পরলোকে, সুখী হওয়া সম্ভব।

অতএব মনোবৃত্তিসকল যে অবস্থায় পরিণত হইলে পুণ্যকৰ্ম তাহার স্বাভাবিক ফলস্বরূপ স্বতঃ নিষ্পাদিত হইতে থাকে, পরলোক থাকিলে, তাহাই পরলোকে শূভদায়ক বলিলে কথা গ্রাহ্য করা যাইতে পারে। পরলোক থাকুক বা না থাকুক, ইহলোকে তাহাই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য বটে। কিন্তু কেবল তাহাই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। যেমন কতকগুলি মানসিক বৃত্তির চেষ্টা কৰ্ম, এবং যেমন সে সকলগুলি সম্যক্ মার্জিত ও উন্নত হইলে, স্বভাবতঃ পুণ্যকৰ্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মে, তেমনি আর কতকগুলি বৃত্তি আছে, তাহাদের উদ্দেশ্য কোন প্রকার কার্য নহে—জ্ঞানই তাহাদিগের ফিয়া। কার্যকারিণী বৃত্তিগুলির অনুশীলন যেমন মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য, জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলিরও সেইরূপ অনুশীলন জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। বস্তুতঃ সকল প্রকার মানসিক বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন, সম্পূর্ণ স্ফূর্তি ও যথোচিত উন্নতি ও বিশুদ্ধিই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য।

এই উদ্দেশ্যমাত্র অবলম্বন করিয়া, সম্পদাদিতে উপযুক্ত ঘৃণা দেখাইয়া, জীবন নিৰ্বাহ করিয়াছেন, এরূপ মনুষ্য কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই, এমত নহে। তাঁহাদিগের সংখ্যা অতি

বাংকম রচনাবলী

অল্প হইলেও, তাঁহাদিগের জীবনবৃত্ত মনুষ্যগণের অমূল্য শিক্ষাস্থল। জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এরূপ শিক্ষা আর কোথাও পাওয়া যায় না। নীতিশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি সর্বাপেক্ষা এই প্রধান শিক্ষা। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহাদিগের জীবনের গুঢ় তত্ত্ব সকল অপরিষ্কৃত। কেবল দুই জন আপন আপন জীবন-বৃত্ত লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। একজন গেটে, দ্বিতীয় জন স্টুয়ার্ট মিল।

লোকশিক্ষা*

লোকসংখ্যা গণনা করিয়া জানা গিয়াছে যে, বাঙ্গালা দেশে না কি ছয় কোটি ষাট লক্ষ মনুষ্য আছে। ছয় কোটি ষাট লক্ষ মনুষ্যের দ্বারা সিদ্ধ না হইতে পারে, বৃষ্টি পৃথিবীতে এমন কোন কার্যই নাই। কিন্তু বাঙ্গালীর দ্বারা কোন কার্যই সিদ্ধ হইতেছে না। ইহার অবশ্য কোন কারণ আছে। লৌহ অস্ত্রে পরিণত হইলে তদ্বারা প্রস্তর পর্যন্ত বিভিন্ন করা যায়, কিন্তু লৌহমাত্রেরই ত সে গুণ নাই। লৌহকে নানাবিধ উপাদানে প্রস্তুত, গঠিত, শাণিত করিতে হয়। তবে লৌহ ইম্পাত হইয়া কাটে। মনুষ্যকে প্রস্তুত, উত্তেজিত, শিক্ষিত করিতে হয়, তবে মনুষ্যের দ্বারা কার্য হয়। বাঙ্গালার ছয় কোটি ষাট লক্ষ লোকের দ্বারা যে কোন কার্য হয় না, তাহার কারণ এই যে, বাঙ্গালায় লোকশিক্ষা নাই। যাঁহারা বাঙ্গালার নানাবিধ উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত, তাঁহারা লোকশিক্ষার কথা মনে করেন না, আপন আপন বিদ্যাবুদ্ধিপ্রকাশেই প্রমত্ত। ব্যাপার বড় অল্প আশ্চর্য্য নহে।

ইহা কখনও সম্ভব নহে যে, বিদ্যালয়ে পুস্তক পড়াইয়া, ব্যাকরণ সাহিত্য জ্যামিতি শিখাইয়া, সম্পূর্ণকোটি লোকের শিক্ষাবিধান করা যাইতে পারে। সে শিক্ষা শিক্ষাই নহে, এবং সে উপায়ে এ শিক্ষা সম্ভবও নহে। চিত্তবৃত্তি সকলের প্রকৃত অবস্থা, স্ব স্ব কার্যে দক্ষতা, কর্তব্য কার্যে উৎসাহ, এই শিক্ষাই শিক্ষা। আমাদিগের এমনি একটুকু বিশ্বাস আছে যে, ব্যাকরণ জ্যামিতিতে সে শিক্ষা হয় না এবং রামমোহন রায় হইতে ফটিকচাঁদ স্কেয়ারার পর্যন্ত দেখিলাম না যে, কোন ইংরেজী-নবীশ সে বিষয়ে কোন কথা কহিয়াছেন।

ইউরোপে এইরূপ লোকশিক্ষা নানাবিধ উপায়ে হইয়া থাকে। বিদ্যালয়ে প্রুসিয়া প্রভৃতি অনেক দেশে আপামর সাধারণ সকলেরই হয়। সংবাদপত্র সে সকল দেশে লোকশিক্ষার একটি প্রধান উপায়। সংবাদপত্র লোকশিক্ষার যে কিরূপ উপায়, তাহা এদেশীয় লোক সহজে অনুভব করিতে পারেন না।

এদেশে এক এক ভাষায় খান দশ পোনের সংবাদপত্র; কোনখানির গ্রাহক দুই শত, কোন-খানির গ্রাহক পাঁচ শত, পড়ে পাঁচ সাত হাজার লোক। ইউরোপে এক এক দেশে সংবাদপত্র শত শত, সহস্র সহস্র। এক একখানির গ্রাহক সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ। পড়ে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি লোক। তারপর নগরে নগরে সভা, গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা। যাহার কিছু বলিবার আছে, সেই প্রতিবাসী সকলকে সমবেত করিয়া সে কথা বলিয়া শিখাইয়া দেয়। সেই কথা আবার শত শত সংবাদপত্রে প্রচারিত হইয়া শত শত ভিন্ন গ্রামে, ভিন্ন নগরে প্রচারিত, বিচারিত এবং অধীত হয়; লক্ষ লক্ষ লোকে সে কথায় শিক্ষিত হয়। এক একটা ভোজের নিমন্ত্রণেই স্বাদু খাদ্য চর্ষণ করিতে করিতে ইউরোপীয় লোকে যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, আমাদের তাহার কোন অনুভবই নাই। আমাদিগের দেশের যে সংবাদপত্র সকল আছে, তাহার দুর্দর্শার কথা ত পূর্বেই বলিয়াছি: বক্তৃতা সকল ত লোকশিক্ষার দিক্ দিয়াও যায় না; তাহার বহু কারণের মধ্যে একটি প্রধান কারণ এই যে, তাহা কখনও দেশীয় ভাষায় উক্ত হয় না। অতি অল্প লোকে শুনেন, অতি অল্প লোকে পড়ে, আর অল্প লোকে বুদ্ধি: আর বক্তৃতাগুলি অসার বলিয়া আরও অল্প লোকে তাহা হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়।

এক্ষণকার অবস্থা এইরূপ হইয়াছে বটে। কিন্তু চিরকাল যে এদেশে লোকশিক্ষার উপায়ের অভাব ছিল, এমত নহে। লোকশিক্ষার উপায় না থাকিলে শাক্যসিংহ কি প্রকারে সমগ্র ভারতবর্ষকে বৌদ্ধধর্ম শিখাইলেন? মনে করিয়া দেখ, বৌদ্ধধর্মের কূট তর্কসকল বুদ্ধিতে

* বঙ্গদর্শন, ১২৮৫, অগ্রহায়ণ।

আমাদিগের আধুনিক দার্শনিকদিগের মস্তকের ঘর্ষ চরণকে আর্দ্র করে; মক্ষমূলর যে তাহা বৃষ্টিতে পারেন নাই, কলিকাতা রিবিউতে তাহার প্রমাণ আছে। সেই কটুতত্ত্বময়, নিস্বর্ণবাদী, অহিংসাত্মা, দুর্ভোধ্য ধর্ম, শাক্যসিংহ এবং তাঁহার শিষ্যগণ সমগ্র ভারতবর্ষকে—গৃহস্থ, পরিব্রাজক, পণ্ডিত, মূর্খ, বিষয়ী, উদাসীন, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, সকলকে শিখাইয়াছিলেন। লোকশিক্ষার কি উপায় ছিল না? শঙ্করাচার্য্য সেই দৃঢ়বদ্ধমূল দিগ্বিজয়ী সাম্যময় বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্ত করিয়া আবার সমগ্র ভারতবর্ষকে শৈবধর্ম শিখাইলেন—লোকশিক্ষার কি উপায় ছিল না? সে দিনও চৈতন্যদেব সমগ্র উৎকল বৈষ্ণব করিয়া আসিয়াছেন। লোকশিক্ষার কি উপায় হয় না? আবার এ দিকে দেখি, রামমোহন রায় হইতে কালেজের ছেলের দল পর্য্যন্ত সাড়ে তিন পুরুষ ব্রাহ্মধর্ম ঘৃষিতেছেন। কিন্তু লোকে ত শিখে না। লোকশিক্ষার উপায় ছিল, এখন আর নাই।

একটা লোকশিক্ষার উপায়ের কথা বলি—সে দিনও ছিল—আজ আর নাই। কথকতার কথা বলিতেছি। গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, বেদী পিণ্ডির উপর বসিয়া, ছেঁড়া তুলট, না দেখিবার মানসে সম্মুখে পাতিয়া, সুগন্ধি মল্লিকামালা শিরোপরে বেষ্টিত করিয়া, নাদুস্ ন্দুস্ কালো কথক সীতার সতীত্ব, অর্জুনের বীরধর্ম, লক্ষ্মণের সত্যব্রত, ভীষ্মের ইন্দ্রিয়জয়, রামসীর প্রেমপ্রবাহ, দধীচির আত্মসমর্পণবিষয়ক সুসংস্কৃতির সদ্ব্যাখ্যা সুকণ্ঠে সদলংকার সংযুক্ত করিয়া আপামর সাধারণ সমক্ষে বিবৃত করিতেন। যে লাঙ্গল চষে, যে তুলা পেঁজে, যে কাটনা কাটে, যে ভাত পায় না পায়, সেও শিখিত—শিখিত যে ধর্ম নিত্য, যে ধর্ম দৈব, যে আত্মান্বেষণ অশ্রদ্ধেয়, যে পরের জন্য জীবন, যে ঈশ্বর আছেন, বিশ্ব সৃজন করিতেছেন, বিশ্ব পালন করিতেছেন, বিশ্ব ধ্বংস করিতেছেন, যে পাপ পুণ্য আছে, যে পাপের দণ্ড পুণ্যের পুরস্কার আছে, যে জন্ম আপনার জন্য নহে, পরের জন্য, যে অহিংসা পরম ধর্ম, যে লোকহিত পরম কার্য—সে শিক্ষা কোথায়? সে কথক কোথায়? কেন গেল? বঙ্গীয় নব্য যুবকের কুরুচির দোষে। গুল্কি কাওরাণী শূয়ার চরাইতে অপারগ হইয়া কুপথ অবলম্বন করিয়াছে। তাহার গান বড় মিষ্ট লাগে, কথকের কথা শুনিয়া কি হবে? দক্ষযজ্ঞে, বিশ্বযজ্ঞে, ঈশ্বরের জন্য ঈশ্বরীর আত্মসমর্পণ শুনিয়া কি হইবে? চল ভাই, ব্রাণ্ড টানিয়া থিয়েটারে গিয়া কাওরাণীর টম্পা শুনিয়া আসি। এই অল্প ইংরেজিতে শিক্ষিত স্বধর্মভ্রষ্ট, কদাচার, দুরাশয়, অসার, অনালাপ্য, বঙ্গীয় যুবকের দোষে লোকশিক্ষার আকর কথকতা লোপ পাইল। ইংরেজ শিক্ষার গুণে লোকশিক্ষার উপায় ক্রমে লুপ্ত ব্যতীত বর্ধিত হইতেছে না।

কিন্তু আসল কথা বলি। কেন যে এ ইংরেজি শিক্ষা সত্ত্বেও দেশে লোকশিক্ষার উপায় হ্রাস ব্যতীত বৃদ্ধি পাইতেছে না, তাহার স্থূল কারণ বলি—শিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা নাই। শিক্ষিত, অশিক্ষিতের হৃদয় বৃক্ণে না। শিক্ষিত, অশিক্ষিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। মরুক্ রামা লাঙ্গল চষে, আমার ফাউল্কারি সুসিদ্ধ হইলেই হইল। রামা কিসে দিনযাপন করে, কি ভাবে, তার কি অসুখ, তার কি সুখ, তাহা নদের ফটিকচাঁদ তিলার্ক মনে স্থান দেন না। বিলাতে কাণা ফসেট্ সাহেব, এ দেশে সার অস্‌লি ইডেন্ ইঁহারা তাঁহার বক্তৃত্তা পড়িয়া কি বলিবেন, নদের ফটিকচাঁদের সেই ভাবনা। রামা চুলোয় যাক্, তাহাতে কিছ্ আসিয়া যায় না। তাঁহার মনের ভিতর যাহা আছে, রামা এবং রামার গোষ্ঠী—সেই গোষ্ঠী ছয় কোটি ষাট লক্ষের মধ্যে ছয় কোটি ঊনষাট লক্ষ নব্বই হাজার নয় শ—তাহারা তাঁহার মনের কথা বৃক্ণিল না। যশ লইয়া কি হইবে? ইংরেজে ভাল বলিলে কি হইবে? ছয় কোটি ষাট লক্ষের ক্রন্দন-ধ্বনিতে আকাশ যে ফাটিয়া যাইতেছে—বাস্তালায় লোক যে শিখিল না। বাস্তালায় লোক যে শিক্ষিত নাই, ইহা সুশিক্ষিত বৃক্ণেন না।

সুশিক্ষিত যাহা বৃক্ণেন, অশিক্ষিতকে ডাকিয়া কিছ্ কিছ্ বৃঝাইলেই লোক শিক্ষিত হয়। এই কথা বাস্তালার সর্বত্র প্রচারিত হওয়া আবশ্যিক। কিন্তু সুশিক্ষিত, অশিক্ষিতের সঙ্গে না মিশিলে তাহা ঘটবে না। সুশিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা চাই।

রামধন পোদ*

বাঙ্গালার সাহিত্যারণ্যে একই রোদন শুনিতে পাই—বাঙ্গালীর বাহুতে বল নাই। এই অভিনব অভ্যুত্থানকালে বাঙ্গালীর ভগ্ন কণ্ঠে একই অক্ষুট বোল—“হায়! বাঙ্গালীর বাহুতে বল নাই।” বাঙ্গালীর যত দুঃখ, তার একই মূল—বাহুতে বল নাই।

যদি অনুসন্ধান করা যায়, বাঙ্গালীর বাহুতে বল নাই কেন? তাহার একই উত্তর পাইব—বাঙ্গালী খাইতে পায় না—বাঙ্গালায় অন্ন নাই। যেমন এক মার গর্ভে বহু সন্তান হইলে কেহই উদর পূরিয়া স্তন্য পায় না, তেমনি আমাদের জন্মভূমি বহুসন্তানপ্রসবিনী বলিয়া তাহার শরীরোৎপন্ন খাদ্যে সকলের কুলায় না। পৃথিবীর কোন দেশই বৃষ্টি বাঙ্গালার মত প্রজাবহুল্য নহে। বাঙ্গালার অতিশয় প্রজাবৃদ্ধিই বাঙ্গালার প্রজার অবনতির কারণ। প্রজাবাহুল্য হইতে অন্নভাব, অন্নভাব হইতে অপুষ্টি, শীর্ণশরীরত্ব, জ্বরাদি পীড়া এবং মানসিক দৌর্বল্য।

অনেকে বলিবেন—দেখ, দেশে অনেক বড় মানুষের ছেলে আছে—তাহাদের আহারের কোন কষ্ট নাই, কিন্তু কই, তাহারা ত অনাহারী চণ্ডাল পোদের অপেক্ষাও দুর্বল—বড় মানুষের ছেলেরাই প্রকৃত মর্কটাকার। সত্য বটে, কিন্তু এক পুরুষে অন্নভাবের দোষ খণ্ডে না। যাহারা পুরুষানুক্রমে মর্কটাকার, দুই এক পুরুষ তাহারা পেট ভরিয়া খাইতে পাইলেই মনুষ্যাকার ধারণ করে না। বিশেষ বড়মানুষের ছেলের কথা ছাড়িয়া দাও—তাঁহারা নিড়িয়া বসেন না—সুতরাং ক্ষুধাভাবে প্রস্তুত আহার খাইতে পান না—ভুক্ত আহার জীর্ণ করিতে পারেন না। সকল দেশেই বাবুর দল মর্কটসম্প্রদায়বিশেষ। শ্রমজীবী, সাধারণ দরিদ্র লোকের বাহুবলই দেশের বাহুবল।

আবার অনেকে রাগ করিয়া বলিবেন, “এ রকম কঠিনহৃদয় মাল্‌থাস বুলি রাখিয়া দাও! ও ছাই আমরা অনেকবার শুনিয়াছি। কেন, যদি দেশে খাবার কুলায় না, তবে ভিন্ন দেশে এত চাউল গম রপ্তানি হয় কি প্রকারে?” এ সম্প্রদায়ের লোকে বুঝেন না যে, দেশে অকুলান থাকিলেও বিদেশে জিনিষ রপ্তানি হইতে পারে। যে আমায় বেশী টাকা দিবে, তাহাকেই আমি জিনিষ বেচিব।

যদি এ দেশে কোন খাদ্য কুলান হয়, তবে সে চাউল। চাউল জুটিল না বলিয়া খাইতে পাইল না—এরূপ দুরবস্থা যে সকল লোকের ঘটে, তাহাদের সংখ্যা এদেশে নিতান্ত অল্প। অধিকাংশ লোকের আর যাহারই অভাব থাক না কেন, চাউলের অপ্রতুল নাই। পেট ভরিয়া প্রায় সকলেই ভাত খাইতে পায়। কিন্তু পেট ভরিয়া ভাত খাইতে পাইলেই আহার হইল না। শুধু ভাতে জীবন রক্ষা হইলেই হইতে পারে—কিন্তু সে জীবনরক্ষা মাত্র। শরীরের পুষ্টি হয় না। চাউলে বলকারক সার পদার্থ শতাংশে সাত ভাগ আছে মাত্র। চর্বি—যাহা শরীরপুষ্টির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, চাউলে তাহা কিছুমাত্র নাই।

শুধু ভাত খায়, এমন লোক অতি অল্প না হউক, বেশীও নয়। বাঙ্গালার অধিকাংশ লোকে ভাতের সঙ্গে একটু ডালের ছিটা, একটু মাছের বিন্দু, শাক বা আলু কাঁচকলার কর্ণিকা দিয়া ভোজন করে। ইহার নাম “ভাত ব্যঞ্জন”। এই ভাত ব্যঞ্জনের মধ্যে ভাতের ভাগ পনের আনা সাড়ে উনিশ গুণ্ডা—ব্যঞ্জনের ভাগ দুই কড়া। সুতরাং ইহাকেও শুধু ভাত বলা যাইতে পারে। বাঙ্গালার চৌদ্দ আনা লোক এইরূপ শুধু ভাত খায়। তাহাতে কোন উপসর্গ না থাকিলে জীবনরক্ষা হইতে পারে—হইয়াও থাকে। কিন্তু এরূপ শরীরে রোগ অতি সহজেই প্রাধান্য স্থাপন করে,—(সাক্ষী ম্যালেরিয়া জ্বর)—আর এরূপ শরীরে বল থাকে না। সেই জন্য বাঙ্গালীর বাহুতে বল নাই।

এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া অনেকে বলেন, যতদিন না বাঙ্গালী সাধারণতঃ মাংসাহার করে, ততদিন বাঙ্গালীর বাহুতে বল হইবে না। আমরা সে কথা বলি না। মাংসের প্রয়োজন নাই, দুগ্ধ, ঘৃত, ময়দা, ডাল, ছোলা, ভাল শব্জী, ইহাই উত্তম আহার। দৃষ্টান্ত—পশ্চিমে হিন্দুস্থানী। নৈবদ্যে বিশ্বপত্নের মত ভাতের সঙ্গে ইহাদের সংস্পর্শমাত্রের পরিবর্তে, অন্নের

* বঙ্গদর্শন, ১২৮৮, ভাদ্র।

বিবিধ প্রবন্ধ—রামধন পোদ

সঙ্গে ইহাদের যথোচিত সমাবেশ হইলেই বলকারক আহার হইল। বাঙ্গালী যদি ভাতের মাত্রা কমাইয়া দিয়া এই সকলের মাত্রা বাড়াইতে পারে, তবে এক পুরুষে নীরোগ, দুই তিন পুরুষে বলিষ্ঠকায় হইতে পারে।

আমি এই সকল কথা রামধন পোদকে বুঝাইতেছিলাম—কেন না, রামধন পোদের সাতগোষ্ঠী বড় রোগা। রামধন আমার কাছে হাত ষোড় করিয়া বলিল, “মহাশয় যা আজ্ঞা করলেন, তা সবই যথার্থ—কিন্তু ঘি, ময়দা, ডাল, ছোলা! বাবা, এ সকল পাব কোথায়? এমনই যে শুধু ভাতের খরচ জুটিয়ে উঠিতে পারি না।”

কথাটা দেখিলাম সত্য। আমি রামধনের ঢেঁকিশালে ঢেঁকির উপর বসিয়াছিলাম—উঠানে একটা ঘেও কুকুর পাড়িয়াছিল বলিয়া আর আগু হইতে পারি নাই—সেইখান হইতেই রামধনের বংশাবলীর পরিচয় পাইতেছিলাম। রামধন একটি একটি করিয়া দেখাইল যে, তাহার চারিটি ছেলে, পাঁচটি মেয়ে; একটি ছেলে আর তিনটি মেয়ের বিবাহ দিতে বাকি আছে—পোদজেতের ছেলের বিয়েতেও কাড়ি খরচা, মেয়ের বিয়েতেও বটে—তবে কম। পোদ বলিল যে, “মহাশয় গা! একটু পরিবার ছেঁড়া নেক্ড়া জুটাইতে পারি না—আবার ঘি, ময়দা, ডাল, ছোলা!” আমি বুঝিলাম, কথাটা বড় অসঙ্গত হইয়াছে। বোধ হইল, যেন প্রাঙ্গণশায়ী রুগ্ন কুকুরটিও আমার উপর রাগ করিয়া তর্জন গর্জন করিবার উদ্যোগী—বোধ হইল, যেন সে বলিতেছে, “একমুঠা ফেলা ভাত পাই না, আবার উনি বৃত্ত পায়ে দিয়া ঢেঁকির উপর বসিয়া ঘি ময়দার বাহানা আরম্ভ করিলেন।” একটি রোমশূন্য গৃহমাজ্জার আমার দিকে পিছন ফিরিয়া, লেজ উচু করিয়া চলিয়া গেল—সেই নীরস রামধনালয়ে ঘৃত, দুগ্ধ, নবনীতের কথা শুনিয়া সে আমাকে উপহাস করিয়া গেল সন্দেহ নাই।

আমি রামধনকে বলিলাম, “চারিটি ছেলে—তিনটি মেয়ে! আবার তার উপর দুইটি পুত্রবধু বাড়িয়াছে?” রামধন হাত ষোড় করিয়া বলিল, “আজ্ঞা হাঁ, আপনার আশীর্বাদে দুইটি পুত্রবধু হইয়াছে।”

আমি বলিলাম, “তাহাদের সম্ভান সম্ভতিও হইয়াছে?”

রামধন বলিল, “আজ্ঞা একটির দুইটি মেয়ে, একটির একটি ছেলে।”

আমি বলিলাম, “রামধন! শত্রুর মুখে ছাই দিয়া অনেকগুলি পরিবার বাড়িয়াছে। বহু পরিবার বলিয়া তোমার আগেই খাইবার কষ্ট ছিল, এখন আরও কষ্ট হইয়াছে বোধ হয়।”

রামধন বলিল, “এখন বড় কষ্ট হইয়াছে।”

আমি তখন রামধনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “রামধন! কেন এত পরিবার বাড়াইলে?”

রামধন কিছু বিস্মিত হইল। বলিল, “সে কি মহাশয়! আমি কি পরিবার বাড়াইলাম! বিধাতা বাড়াইয়াছেন।”

আমি বলিলাম, “গরিব বিধাতাকে অনর্থক দোষ দিও না। ছেলের বিয়ে তুমি দিয়াছ—সুতরাং তুমিই দুইটি পুত্রবধু বাড়াইয়াছ। আর ছেলের বিয়ে দিয়েছ বলিয়াই তিনটি নাতি নাতিনী বাড়াইয়াছ।”

রামধন কাতর হইয়া বলিল, “মহাশয়, আমাকে অমন করিয়া খুঁড়িবেন না, যমদণ্ডে সে দিন আমার আর একটি নাতি নষ্ট হয়েছে।”

আমি দুঃখপ্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “সেটি কিসে গেল রামধন!”

রামধন কিছু উত্তর দেয় না। পীড়াপীড়ি করিয়া, কতকগুলি জেরার সওয়াল করিয়া, বাহির করিলাম যে, সেটি অনাহারে মরিয়াছে। মাতা পীড়িত হওয়ায় মাতৃস্বনে দুধ ছিল না। রামধনের গোরু মরিয়া গিয়াছিল—দুধ কিনিবার সাধ্য নাই। ছেলেটি না খাইয়া পেটের পীড়ায় ভুগিয়া* মরিয়া গিয়াছিল।

আমি তখন রামধনকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, “তারপর ছোট ছেলেটির বিয়ে দিবে?”

রামধন বলিল, “টাকার যোগাড় করিতে পারিলেই দিই।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “এই যোগাড় জুটিয়েছ, তাই খেতে দিতে পার না—আবার বাড়াবে কেন? বিয়ে দিলেই ত আপাততঃ বোঁমা আসবেন—তাঁর আহার চাই। তারপর তাঁর

* অনাহারের একটি ফল পেটের পীড়া, ইহা সকলের জানা না থাকিতে পারে।

বঙ্কিম রচনাবলী

পেটে দুটি চারিটি হবে—তাদেরও আহার চাই। এখনই কুলায় না—আবার বিয়ে?”

রামধন চাটল। বলিল, “বেটার বিয়ে কে না দেয়? যে খেতে পায়, সেও দেয়, যে না খেতে পায়, সেও দেয়।”

আমি বলিলাম, “যে না খেতে পায়, তার বেটার বিয়েটা কি ভাল?”

রামধন বলিল, “জগৎ শুদ্ধ এই হতেছে।”

আমি বলিলাম, “জগৎ শুদ্ধ নয় রামধন, কেবল এই দেশে। এমন নিষেধ জাতি আর কোন দেশে নাই।”

রামধন উত্তর করিল, “দেশশুদ্ধ লোক যখন করিতেছে, তখন আমাতেই কি এত দোষ হইল?”

এমন নিষেধকে কিরূপে বুঝাইব? বলিলাম, “রামধন! দেশশুদ্ধ লোক যদি গলায় দাড়ি দেয়, তুমিও কি দিবে?”

রামধন চেঁচাইতে আরম্ভ করিল, “তুমি বল কি মশাই? গলায় দাড়ি আর বেটার বিয়ে দেওয়া সমান?”

আমিও রাগিলাম, বলিলাম, “সমান কে বলে রামধন! এরূপ বেটার বিয়ে দেওয়ার চেয়ে গলায় দাড়ি দেওয়া অনেক ভাল। আপনার গলায় না পার, ছেলের গলায় দিও।”

এই বলিয়া আমি ঢেঁকি হইতে উঠিয়া চলিয়া আসিলাম। ঘরে আসিয়া রাগ পড়িয়া গেলে ভাবিয়া দেখিলাম, গরিব রামধনের অপরাধ কি? বাঙ্গালা শুদ্ধ এইরূপ রামধনে পরিপূর্ণ। এ ত গরিব পোদের ছেলে—বিদ্যা বুদ্ধির কোন এলাকা রাখে না। যাঁহারা কৃতবিদ্য বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেন, তাঁহারাও ঘোরতর রামধন। ঘরে খাবার থাক বা না থাক—আগে ছেলের বিয়ে। শুদ্ধ ভাতে ডালের ছিটা দিয়া খাইয়া সাত গোষ্ঠী পোড়া কাঠের আকার—জ্বর প্লীহার ব্যতিব্যস্ত—তবু সেই কদম খাইবার জন্য—সেই অনাহারের ভাগ লইবার জন্য—সে জ্বর প্লীহার সাথী হইবার জন্য টাকা খরচ করিয়া পরের মেয়ে আনিতে হইবে! মনুষ্যজন্মে তাহাই তাঁহাদের সুখ। যে বাঙ্গালী হইয়া ছেলের বিয়ে না দিতে পারিল, তাহার বাঙ্গালীজন্মই বৃথা। কিন্তু ছেলের বিয়ে দিলে, ছেলে বেচারি বউকে খাওয়াইতে পারিবে কি না, সেটা ভাবিবার কোন প্রয়োজন আছে, এমত বিবেচনা করেন না। এ দিকে ছেলে ইস্কুল ছাড়িতে না ছাড়িতে একটি ক্ষুদ্র পল্টনের বাপ—রশদের যোগাড়ে বাপ পিতামহ অস্থির। গরিব বিবাহিত তখন স্কুল ছাড়িয়া পুঁথি পাঁজি টানিয়া ফেলিয়া দিয়া উমেদওয়ারিতে প্রাণ সমর্পণ করিল। যোড় হাত করিয়া ইংরেজের দ্বারে দ্বারে হা চাকরি! হা চাকরি! করিয়া কাতর। হয়ত সে ছেলে একটা মানুষের মত মানুষ হইতে পারিত। হয়ত সে সময়ে আপনার পথ চিনিয়া জীবনক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারিলে, জীবন সার্থক করিতে পারিত। কিন্তু পথ চিনিবার আগেই সে সকল ভরসা ফুরাইল, উমেদওয়ারির যন্ত্রণায় আর চাকরির পেষণে—সংসারধর্মের জ্বালায়—অস্তুর ও শরীর বিকল হইয়া উঠিল। বিবাহ হইয়াছে—ছেলে হইয়াছে, আর পথ খুঁজিবার অবসর নাই—এখন সেই একমাত্র পথ খোলা—উমেদওয়ারি। আর লোকের উপকার করিবার কোন সম্ভাবনা নাই—কেন না, আপনার স্ত্রীকন্যা পুত্রের উপকার করিতে কুলায় না—তাহারা রাগিদিন দোহি দোহি করিতেছে। আর দেশের হিতসাধনের ক্ষমতা নাই, স্ত্রীপুত্রের হিতের জন্য সর্বস্ব পণ! লেখাপড়া, ধর্মচিন্তা—এ সকলের সঙ্গে আর সম্বন্ধ নাই—ছেলের কান্না থামাইতেই দিন যায়। যে টাকাটা পেট্রিয়টিক্ আসোসিয়েশ্যনে চাঁদা দিতে পারিত, ছেলে এখন তাহা বধুঠাকুরাণীর বালা গড়াইয়া দিল। অথচ বাঙ্গালার রামধনেরা শৈশবে ছেলের বিবাহ দিতে না পারিলে মনে করেন, ছেলেরও সর্বনাশ—নিজেরও সর্বনাশ করিলেন। ছেলে থাকিলেই তাহার বিবাহ দিতেই হইবে, মনুষ্যমাত্রকেই বিবাহ করিতে হইবে, আর বাপ মার প্রধান কার্য—শৈশবে ছেলের বিবাহ দেওয়া—এরূপ ভয়ানক ভ্রম যে দেশে সর্বব্যাপী, সে দেশের মঙ্গল কোথায়? যে দেশে বাপ মা, ছেলে সাঁতার শিখিতে না শিখিতে বধুরূপ পাতর গলায় বাঁধিয়া দিয়া, ছেলেকে এই দুস্তর সংসারসমুদ্রে ফেলিয়া দেয়, সে দেশের উন্নতি হইবে?

সাম্য

প্রথম পরিচ্ছেদ

এই সংসারে একটি শব্দ সর্বদা শুনতে পাই—“অমুক বড় লোক—অমুক ছোট লোক।” এটি কেবল শব্দ নহে। লোকের পরস্পর বৈষম্য জ্ঞান মনুষ্যমণ্ডলীর কার্যের একটি প্রধান প্রবৃত্তির মূল। অমুক বড় লোক, পৃথিবীর যত ক্ষীর সর নবনীত সকলই তাঁহাকে উপহার দাও। ভাষার সাগর হইতে শব্দরত্নগুলি বাছিয়া বাছিয়া তুলিয়া হার গাঁথিয়া তাঁহাকে পরাও, কেন না তিনি বড় লোক। যেখানে ক্ষুদ্র অদৃশ্যপ্রায় কণ্টকটি পথে পড়িয়া আছে, উহা যত্নসহকারে উঠাইয়া সরাইয়া রাখ—এ বড় লোক আসিতেছেন, কি জানি যদি তাঁহার পায়ে ফুটে। এই জীবনপথের ছায়ানিষ্ক পার্শ্ব ছাড়িয়া রৌদ্রে দাঁড়াও, বড় লোক যাইতেছেন। সংসারের আনন্দকুসুম সকল, সকলে মিলিয়া চয়ন করিয়া শয্যারচনা করিয়া রাখ, বড় লোক উহাতে শয়ন করুন। আর তুমি—তুমি বড় লোক নহ—তুমি সরিয়া দাঁড়াও, এ পৃথিবীর সামগ্রী কিছই তোমার জন্য নয়। কেবল এই তীরঘাতী লোলায়মান বেগ তোমার জন্য—বড় লোকের চিত্তরঞ্জনার্থ তোমার পৃষ্ঠের সঙ্গে মধ্য মধ্য ইহার আলাপ হইবে।

বড় লোকে ছোট লোকে এ প্রভেদ কিসে? রাম বড় লোক, যদু ছোট লোক কিসে? তাহা নিন্দক লোকে এক প্রকার বুঝাইয়া দেয়। যদু চুরি করিতে জানে না, বণ্ডনা করিতে জানে না, পরের স্বর্স্ব শঠতা করিয়া গ্রহণ করিতে জানে না, সুতরাং যদু ছোট লোক; রাম চুরি করিয়া, বণ্ডনা করিয়া, শঠতা করিয়া ধন সঞ্চয় করিয়াছে, সুতরাং রাম বড় লোক। অথবা রাম নিজে নিরীহ ভাল মানুষ, কিন্তু তাহার প্রপিতামহ চৌর্য্যবণ্ডনাদিতে সুদক্ষ ছিলেন; মূনিবের স্বর্স্বাপহরণ করিয়া বিষয় করিয়া গিয়াছেন, রাম জুয়াচোরের প্রপৌত্র, সুতরাং সে বড় লোক। যদুর পিতামহ আপনি আনিয়া আপনার খাইয়াছে—সুতরাং সে ছোট লোক। অথবা রাম কোন বণ্ডকের কন্যা বিবাহ করিয়াছে, সেই সম্বন্ধে বড় লোক। রামের মাহাত্ম্যের উপর পূজপব্টি কর।

অথবা রাম সেলাম করিয়া, গালি খাইয়া, কদাচিত পদাঘাত সহ্য করিয়া, অথবা ততোধিক কোন মহৎ কার্য করিয়া, কোন রাজপুরুষের নিকট প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছে। রাম চাপরাশ গলায় বাঁধিয়াছে—চাপরাশের বলে বড় লোক হইয়াছে। আমরা কেবল বাঙ্গালীর কথা বলিতেছি না—পৃথিবীর সকল দেশেরই চাপরাশবাহকের একই চরিত্র—প্রভুর নিকট কীটাণ্ডকীট, কিন্তু অন্যের কাছে?—ধর্ম্মাবতার!! তুমি যে হও, দুই হাতে সেলাম কর, ইনি ধর্ম্মাবতার। ইহার ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নাই, অধর্ম্মই আসক্তি,—তাহাতে ক্ষতি কি? রাজকটাক্ষে ইনি ধর্ম্মাবতার। ইনি গণ্ডমূর্খ, তুমি স্বর্স্বশাস্ত্রবিৎ—সে কথা এখন মনে করিও না, ইনি বড় লোক, ইহাকে প্রণাম কর।

আর এক প্রকারের বড় লোক আছে। গোপাল ঠাকুর, “কন্যাভারগ্ৰস্ত—কন্যাভারগ্ৰস্ত” বলিয়া দুই চারি পয়সা ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে—এও বড় লোক। কেন না গোপাল ব্রাহ্মণ জাতি! তুমি শূদ্র—যত বড় লোক হও না কেন, তোমাকে উহার পায়ের ধুলো লইতে হইবে। দুই প্রহর বেলা ঠাকুর রাগ করিয়া না যান—ভাল করিয়া আহার कराও, যাহা চাহেন, দিয়া বিদায় কর। গোপাল দরিদ্র, মূর্খ, নরাধম, পাঁপুষ্ট, কিন্তু সেও বড় লোক।

অতএব সংসার বৈষম্যপরিপূর্ণ।—সকল বিষয়েই বৈষম্য জন্মে। রাম এ দেশে না জন্মিয়া, ও দেশে জন্মিল, সে একটি বৈষম্যের কারণ হইল; রাম পাঁচির গর্ভে না জন্মিয়া, জাঁদির গর্ভে জন্মিল, সে একটি বৈষম্যের কারণ হইল। তোমার অপেক্ষা আমি কথায় পটু বা আমার শক্তি অধিক বা আমি বণ্ডনায় দক্ষ,—এ সকলই সামাজিক বৈষম্যের কারণ। সংসার বৈষম্যপূর্ণ।

সংসারে বৈষম্য থাকাই উচিত। প্রকৃতিই অনেক বৈষম্যের নিয়ম করিয়া আমাদেরকে এই সংসার-রঙ্গে পাঠাইয়াছেন। তোমার অপেক্ষা আমার হাড়গুলি মোটা মোটা, বড় কঠিন—তোমার অপেক্ষা আমার বাহুতে অধিক বল আছে—আমি তোমাকে এক ঘূষিতে ভূতলশায়ী করিয়া তোমার অপেক্ষা বড় লোক হইতেছি। কুমুদিনীর অপেক্ষা সৌদামিনী সুন্দরী; সুতরাং

বিক্রম রচনাবলী

সৌদামিনী জমীদারের স্ত্রী, কুমুদিনী পাট কাটে। রামের মস্তিস্কের অপেক্ষা যদুর মস্তিস্ক দশ আউন্স ওজনে ভারি, সুতরাং যদু সংসারে মান্য, রাম ঘৃণিত।

অতএব বৈষম্য সাংসারিক নিয়ম। জগতের সকল পদার্থেই বৈষম্য। মনুষ্যে মনুষ্যে প্রকৃত বৈষম্য আছে। যেমন প্রকৃত বৈষম্য আছে—প্রকৃত বৈষম্য অর্থাৎ যে বৈষম্য প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে,—তেমনি অপ্রকৃত বৈষম্য আছে। ব্রাহ্মণ শব্দে অপ্রাকৃত বৈষম্য। ব্রাহ্মণবধে গুরু পাপ,—শত্রুবধে লঘু পাপ; ইহা প্রাকৃতিক নিয়মানুকৃত নহে। ব্রাহ্মণ অবধ্য—শত্রু বধ্য কেন? শত্রুই দাতা, ব্রাহ্মণই কেবল গৃহীতা কেন? তৎপরিবর্তে যাহার দিবার শক্তি আছে, সেই দাতা, যাহার প্রয়োজন, সেই গৃহীতা, এ বিধি হয় নাই কেন?

দেশী বিলাতীর মধ্যে সেইরূপ আর একটি অপ্রাকৃত বৈষম্য। কিন্তু সে কথার অধিক আন্দোলন করিতে পারি না।

সর্বাপেক্ষা অর্থগত বৈষম্য গুরুতর। তাহার ফলে কোথাও কোথাও দুই একজন লোক টাকার খরচ খুঁজিয়া পায়েন না—কিন্তু লক্ষ লোক অনাভাবে উৎকট রোগগ্রস্ত হইতেছে!

সমাজের উন্নতিরোধ বা অবনতির যে সকল কারণ আছে, অপ্রাকৃতিক বৈষম্যের আধিক্যই তাহার প্রধান। ভারতবর্ষের যে এতদিন হইতে এত দুর্দশা, সামাজিক বৈষম্যের আধিক্যই তাহার বিশিষ্ট কারণ।

ভারতবর্ষেই যে বৈষম্যের আধিক্য ঘটিয়াছে, এমত নহে। এই সংসার বৈষম্যময়, সকল দেশই বৈষম্যজালে আচ্ছন্ন। উন্নতিশীল সমাজে, সামাজিকেরা পরস্পরে সংঘর্ষ হইয়া সেই বৈষম্যকে অপনীত করিয়াছেন। সেই সকল রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। রোম ইহার প্রধান উদাহরণ। রোমরাজ্যের প্রথমকালিক বৈষম্য—প্রেত্রিয় ও প্লিবীয়দিগের সম্প্রদায় ভেদ—তাহা এক প্রকার সামাজিক সামঞ্জস্যে লয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। তদ্রাজ্যের যে পশ্চাত্তালিক বৈষম্য—নাগরিকত্ব এবং অনাগরিকত্ব; তাহাও শাসনকর্তৃপক্ষের অলৌকিক রাজনীতিদক্ষতার গুণে অপনীত হইয়াছিল। সুতরাং রোম পৃথিবীশ্বরী হইয়াছিল।

অন্যত্র এরূপ ঘটে নাই। আমেরিকার চিরদাসত্বের উচ্ছেদ জন্য সৈদিন ঘোরতর আভ্যন্তরিক সমর হইয়া গেল—অস্ট্রাঘাতে ক্ষতচিকিৎসার ন্যায় সামাজিক অনিষ্টের দ্বারা সামাজিক ইষ্টসাধন করিতে হইল। এই চিকিৎসার বড় ডাক্তার দাঁতো এবং রোবস্পীর। বৈষম্যের পরিবর্তে সাম্য সংস্থাপনই প্রথম ও দ্বিতীয় ফরাসিস বিপ্লবের উদ্দেশ্য।

কিন্তু সর্বত্র এই কঠোর চিকিৎসার প্রয়োজন হয় নাই। অধিকাংশ দেশেই উপদেষ্টার উপদেশেই সাম্য আদৃত এবং সংস্থাপিত হইয়াছে। অস্ববল অপেক্ষা বাক্যবল গুরুতর—সমরাপেক্ষা শিক্ষা অধিকতর ফলোপধায়িনী। খ্রীষ্টধর্ম এবং বৌদ্ধধর্ম বাক্যে প্রচারিত হয়—ইসলামের ধর্ম শস্ত্রসাহায্যে প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু পৃথিবীতে মুসলমান অল্পসংখ্যক—বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয়ানই অধিক।

পৃথিবীতে তিনবার আশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়াছে। বহুকালান্তর, তিন দেশে তিন জন মহাশুদ্ধাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া ভূমণ্ডলে মঙ্গলময় এক মহামন্ত্র প্রচার করিয়াছেন। সেই মহামন্ত্রের স্থূল মর্ম, “মনুষ্য সকলেই সমান।” এই স্বর্গীয় মহাপবিত্র বাক্য ভূমণ্ডলে প্রচার করিয়া, তাঁহারা জগতে সভ্যতা এবং উন্নতির বীজ বপন করিয়াছিলেন। যখনই মনুষ্যজাতি, দুর্দশাপন্ন, অবনতির পথারুঢ় হইয়াছে, তখনই এক মহাত্মা মহাশব্দে কহিয়াছেন, “তোমরা সকলেই সমান—পরস্পর সমান ব্যবহার কর।” তখনই দুর্দশা ঘূচিয়া সুদশা হইয়াছে, অবনতি ঘূচিয়া উন্নতি হইয়াছে।

প্রথম, শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব। যখন বৈদিকধর্মসম্প্রদায় বৈষম্যে ভারতবর্ষ পীড়িত, তখন ইনি জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষের উদ্ধার করিয়াছিলেন। পৃথিবীতে যত প্রকার সামাজিক বৈষম্যের উৎপত্তি হইয়াছে, ভারতবর্ষের পূর্বকালিক বর্ণবৈষম্যের ন্যায় গুরুতর বৈষম্য কখন কোন সমাজে প্রচলিত হয় নাই। অন্য বর্ণ অবস্থানুসারে বধ্য—কিন্তু ব্রাহ্মণ শত অপরাধেও অবধ্য। ব্রাহ্মণে তোমার সর্বপ্রকার অনিষ্ট করুক। তুমি ব্রাহ্মণের কোন প্রকার অনিষ্ট করিতে পারিবে না। তোমরা ব্রাহ্মণের চরণে লুটাইয়া তাঁহার চরণরেণু শিরোদেশে গ্রহণ কর—কিন্তু শত্রু অস্পৃশ্য। শত্রুস্পৃষ্ট জল পর্যাণ্ড অব্যবহার্য। এ পৃথিবীর কোন সূত্রে শত্রু অধিকারী নহে, কেবল নীচবৃত্তি তাহার অবলম্বনীয়। জীবনের জীবন যে বিদ্যা, তাহাতে তাহার অধিকার নাই। সে

শাস্ত্রে বন্ধ, অথচ শাস্ত্র যে কি, তাহা তাহার স্বচক্ষে দেখিবার অধিকার নাই, তাহার নিজ পরকালও ব্রাহ্মণের হাতে। ব্রাহ্মণ যাহা বলিবেন, তাহা করিলেই পরকালে গতি, নহিলে গতি নাই। ব্রাহ্মণ যাহা করাইবেন, তাহা করিলেই পরকালে গতি, নহিলে গতি নাই। ব্রাহ্মণকে দান করিলেই পরকালে গতি, কিন্তু শূদ্রের সেই দান গ্রহণ করিলেও ব্রাহ্মণ পতিত। ব্রাহ্মণের সেবা করিলেই শূদ্রের পরকালে গতি। অথচ শূদ্রও মনুষ্য, ব্রাহ্মণও মনুষ্য। প্রাচীন ইউরোপের, বন্দী এবং প্রভু মধ্যে যে বৈষম্য, তাহাও এমন ভয়ানক নহে। অদ্যাপি ভারতবর্ষবাসীরা কোন গুরুতর বৈষম্যের কথা উদাহরণস্বরূপ বলে, “বামন শূদ্র তফাৎ।”

এই গুরুতর বর্ণবৈষম্যের ফলে ভারতবর্ষ অবনতির পথে দাঁড়াইল। সকল উন্নতির মূল জ্ঞানোন্নতি। পশ্চাদিবেং ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ভিন্ন পৃথিবীর এমন কোন একটি সুখ তুমি নির্দেশ করিয়া বলিতে পারিবে না, যাহার মূল জ্ঞানোন্নতি নহে। বর্ণবৈষম্যে জ্ঞানোন্নতির পথরোধ হইল। শূদ্র জ্ঞানালোচনার অধিকারী নহে; একমাত্র ব্রাহ্মণ তাহার অধিকারী। ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক ব্রাহ্মণের বর্ণ। অতএব অধিকাংশ লোক মূর্খ হইল। মনে কর, যদি ইংলণ্ডে এরূপ নিয়ম থাকিত যে, রসেল, কাবেন্ডিশ, স্তান্‌লি প্রভৃতি কয়েকটি নির্দিষ্ট বংশের লোক ভিন্ন আর কেহ বিদ্যার আলোচনা করিতে পারিবে না, তাহা হইলে ইংলণ্ডের এ সভ্যতা কোথায় থাকিত? কবি, দার্শনিক, বিজ্ঞানবিৎ দূরে থাকুক, ওয়াট্‌, গিটাবিন্সন, আক'রাইট, কোথায় থাকিত? ভারতবর্ষে প্রায় তাহাই ঘটিয়াছিল। কিন্তু কেবল তাহাই নহে। অনন্যসহায় ব্রাহ্মণেরা যে বিদ্যার আলোচনা একাধিকার করিলেন, তাহাও বর্ণবৈষম্য দোষে কুফলপ্রদা হইয়া উঠিল। সকল বর্ণের প্রভু হইয়া, তাঁহারা বিদ্যাকে প্রভুত্বরক্ষণীরূপে নিষ্কৃত করিলেন। বিদ্যার যে রূপ আলোচনায় সেই প্রভুত্ব বজায় থাকে, যাহাতে তাহার আরও বৃদ্ধি হয়, যাহাতে অন্য বর্ণ আরও প্রগত হইয়া ব্রাহ্মণপদরজ ইহজন্মের সারভূত করে, সেইরূপ আলোচনা করিতে লাগিলেন। আরও যাগযজ্ঞের সৃষ্টি কর, আরও মন্ত্র, দান, দক্ষিণা, প্রায়শ্চিত্ত বাড়াও, আরও দেবতার মহিমাপূর্ণ মিথ্যা ইতিহাস কল্পনা করিয়া এই অপসরান্দুরনিষ্কণনিন্দিত মধুর আর্থ্যাভাষায় গ্রন্থিত কর, ভারতবাসীদের মূর্খতাবন্ধন আরও আঁটয়া বাঁধ। দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সে সবে কাজ কি? সোঁদিকে মন দিও না। অমুক ব্রাহ্মণখানির কলেবর বাড়াও—নতন উপনিষদ-খানি প্রচার কর—ব্রাহ্মণের উপর ব্রাহ্মণ, উপনিষদের উপর উপনিষদ, আরণ্যকের উপর আরণ্যক, সূত্রের উপর সূত্র, তার উপর ভাষ্য, তার টীকা, তার টীকা; তার ভাষ্য অনন্তশ্রেণী—বৈদিক ধর্মের গ্রন্থে ভারতবর্ষ আচ্ছন্ন কর। বিদ্যা?—তাহার নাম ভারতবর্ষে লুপ্ত হউক!

লোক বিষন্ন, ব্যস্ত, শঙ্কিত হইল। ব্রাহ্মণেরা লেখেন, সকল কাজেই পাপ—সকল পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত করি। তবে কি বিপ্রেতবর্ণের পাপ হইতে মুক্তি নাই—পারিত্রিক সুখ কি এতই দুর্লভ? লোক কোথায় যাইবে? কি করিবে? এ ধর্মশাস্ত্রপীড়া হইতে কে উদ্ধার করিবে? স্বর্গসুখনিরোধকারী ব্রাহ্মণের হাত হইতে কে রক্ষা করিবে? ভারতবাসীকে কে জীবন দান করিবে?

তখন বিশুদ্ধাশ্রম শাক্যসিংহ অনন্তকালস্থায়ী মহিমা বিস্তার পূর্বক, ভারতাকাশে উদ্ভিত হইয়া, দিগন্তপ্রধাবিত রবে বলিলেন, “আমি উদ্ধার করিব। আমি তোমাদিগের উদ্ধারের বীজমন্ত্র দিতেছি, তোমরা সেই মন্ত্র সাধন কর। তোমরা সবই সমান। ব্রাহ্মণ শূদ্র সমান। মনুষ্যে মনুষ্যে সকলেই সমান। সকলেই পাপী, সকলেরই উদ্ধার সদাচরণে। বর্ণবৈষম্য মিথ্যা। যাগ যজ্ঞ মিথ্যা। বেদ মিথ্যা, সূত্র মিথ্যা, ঐহিক সুখ মিথ্যা, কে রাজা, কে প্রজা, সব মিথ্যা। ধর্মই সত্য। মিথ্যা ত্যাগ করিয়া সকলেই সত্যধর্ম পালন কর।”

বৈষম্য-পীড়িত ভারত এ মহামন্ত্র শুনিয়া হিমগিরি হইতে মহাসমুদ্র পর্য্যন্ত বিচলিত হইল। বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষে প্রচলিত হইল—বর্ণবৈষম্য কতক দূর বিলুপ্ত হইল। প্রায় সহস্র বৎসর ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত রহিল। পুরাবৃত্ত ব্যক্তির জ্ঞানেন যে, সেই সহস্র বৎসরই ভারতবর্ষের প্রকৃত সৌষ্ঠবের সময়। যে সকল সম্রাট হিমালয় হইতে গোদাবরী পর্য্যন্ত যথার্থই একচ্ছত্রে শাসিত করিয়াছেন—অশোক, চন্দ্রগুপ্ত, শিলাদিত্য প্রভৃতি—এই কালমধ্যেই তাঁহাদিগের অভ্যুদয়। এই সময়েই তক্ষশিলা হইতে তাম্রলিপ্তি পর্য্যন্ত, বহুজনসমাকীর্ণ মহাসমৃদ্ধিশালিনী সহস্র সহস্র নগরীতে ভারতবর্ষ পরিপূর্ণিত হইয়াছিল। এই সময়েই ভারতবর্ষের গৌরব পশ্চিমে রোমকে, পূর্বে চীনে গীত হইয়াছিল—তন্দ্রেশীয় রাজারা ভারতবর্ষীয় সম্রাটদিগের

বিক্রম রচনাবলী

সহিত রাজনৈতিক সখে বন্ধ হইয়াছিলেন। এই সময়ে ভারতবর্ষীয় ধর্মপ্রচারকেরা ধর্মপ্রচারে যাত্রা করিয়া অন্ধ্রক আশিয়া ভারতীয় ধর্ম দীক্ষিত করিয়াছিলেন। শিল্পবিদ্যার যে এই সময়ে বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ আছে। দর্শনশাস্ত্রের বিশেষ অনুশীলন বৌদ্ধোদয়ের আনুষ্ঠানিক বলিয়া বোধ হয়। বিজ্ঞান সাহিত্যের বিশেষ অনুশীলনের কাল-নিরূপণ করা কঠিন, কিন্তু শাক্যসিংহের সম্পাদিত ধর্মবিপ্লবের সহিত যে, সে সকলের বিশেষ সম্বন্ধ আছে, তাহা প্রমাণ করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় সাম্যাবতার যীশুখ্রীষ্ট। যে সময়ে খ্রীষ্টধর্মের প্রচার আরম্ভ হয়, তখন ইউরোপ ও পশ্চিম আশিয়া রোমক রাজ্যভুক্ত। রোমের সৌষ্ঠবদিবসের অপরাহ্ন উপস্থিত। তখন রোম আর যুদ্ধবিশারদ বীরপ্রসাবিনী নহে, অমিত ধনশালী ভোগাসক্ত ইন্দ্রিয়পরবশ “বাবু”দিগের আবাস। যাঁহাদিগের আমোদ কেবল রণক্ষেত্রেই ছিল, তাঁহারা এক্ষণে কেবল আহারে, দাসীসংসর্গে, এবং রঙ্গভূমির কৃত্রিম যুদ্ধে আমোদ প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। যে দেশবাৎসল্যগুণে রোম নাম জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিল, তাহা অন্তর্হিত হইয়াছিল। যে সমসামাজিকতার জন্য আমরা রোমের প্রশংসা করিয়াছি, যে সমসামাজিকতার গুণে রোম পৃথিবীশ্বরী হইয়াছিল, তাহা লুপ্ত হইতে লাগিল। আমরা পূর্বে রোমনগরীর কথা বলিয়াছি—এক্ষণে রোমক সাম্রাজ্যের কথা বলিতেছি। রোমকসাম্রাজ্যে চিরদাসত্বজনিত বৈষম্য সাংঘাতিক রোগস্বরূপ প্রবেশ করিয়াছিল। এক এক ব্যক্তির সহস্র সহস্র চিরদাস থাকিত। প্রভুর অকরণীয় সমুদায় কার্য সেই সকল দাসের দ্বারা হইত। ভূমিকর্ষণ, গার্হস্থ্য ভূতের কার্য, শিল্পকার্যাদি চিরদাসগণের দ্বারা নিষ্পন্ন হইত। তাহারা গোরু বাছুরের ন্যায় ক্রীত বিক্রীত হইত। গোরু বাছুরের উপর প্রভুর যেরূপ অধিকার, দাসের উপরও সেইরূপ অধিকার ছিল। প্রভু মারিলে মারিতে পারিতেন, কাটিলে কাটিতে পারিতেন, বধ করিলেও দণ্ডনীয় হইতেন না। প্রভুর আজ্ঞায় দাস রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইয়া সিংহ ব্যাঘ্রাদি পশুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ হারাইত—প্রভু তামাসা দেখিতেন। রোমক সাম্রাজ্যের লোক দুই ভাগে বিভক্ত—প্রভু এবং দাস। এক ভাগ অনন্তভোগাসক্ত—আর এক ভাগ অনন্ত দুর্দশাপন্ন।

কেবল এই বৈষম্য নহে। সম্রাট্ স্বেচ্ছাচারী। তাঁহার ক্ষমতা ও প্রতাপের সীমা ছিল না। নীরো, নগরে অগ্নি লাগাইয়া বীণাবাদনপূর্বক রঙ্গ দেখিয়াছিলেন। কালিগুলা আপন অশ্বকে কনসলের পদে বরণ করিলেন। ইলিয়গেবলসের স্বেচ্ছাচারিতা বর্ণনা করিতে লজ্জা করে। যে হুক না কেন, যত বড় লোক হউন না কেন, সম্রাটের ইচ্ছামাত্রে তিনি বধ্য—বিনা কারণে, বিনা প্রয়োজনে, বিনা বিচারে, তিনি বধ্য। আবার সেই সম্রাটের উপর সম্রাট্ প্রেটরীয় সৈনিক। তাহারা আজ যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে সম্রাট্ করে—কাল সে সম্রাট্কে বধ করিয়া অন্যকে রাজা করে। রোমক সাম্রাজ্য তাহারা আলু পটলের মত ক্রয় বিক্রয় করে। রোমকে তাহারা যাহা মনে করে, তাহাই করে। সুবায় সুবায় সুবাদারেরা স্বেচ্ছাচারী। যাহার শক্তি আছে, সেই স্বেচ্ছাচারী। যেখানে স্বেচ্ছাচার প্রবল, সেখানে বৈষম্যও প্রবল।

এই সময়ে খ্রীষ্ট ধর্ম রোমক সাম্রাজ্য মধ্যে প্রচারিত হইতে লাগিল। খ্রীষ্টের উচ্চারিত মহতী বাণী লোকের মর্মভেদ করিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল। তিনি বলিয়াছিলেন, মনুষ্যে মনুষ্যে দ্রাতৃসম্বন্ধ। সকল মনুষ্যই ঈশ্বরসমক্ষে তুল্য। বরং যে পীড়িত, দুঃখী, কাতর, সেই ঈশ্বরের অধিক প্রিয়। এই মহাবাক্যে বড় মানুষের গর্ব খর্ব হইল—প্রভুর গর্ব খর্ব হইল—অঙ্গহীন ভিক্ষুকও সম্রাটের অপেক্ষা বড় হইল। তিনি বলিয়াছিলেন, ইহলোকে আমার রাজত্ব নহে—ঐহিক সুখ সুখ নহে—ঐহিক প্রাধান্য, প্রাধান্য নহে। পৃথিবীতে দুইবার দুইটি বাক্য উক্ত হইয়াছে,—তাহাই নীতিশাস্ত্রের সার—তদতিরিক্ত নীতি আর কিছুই নাই। একবার আর্ঘ্যবংশীয় ব্রাহ্মণ গঙ্গাতীরে বলিয়াছিলেন, “আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পিণ্ডিতঃ।” দ্বিতীয়বার জেরুসালেমের পর্বতশিখরে দাঁড়াইয়া যীহুদাবংশীয় যীশু বলিলেন, “অন্যের নিকট তুমি যে ব্যবহারের কামনা কর, অন্যের প্রতি তুমি সেই ব্যবহার করিও।” এই দুইটি বাক্যের ন্যায় মহৎ বাক্য ভূমণ্ডলে আর কখন উক্ত হইয়াছে কি না সন্দেহ। এই বাক্য সাম্যতত্ত্বের মূল।

এই সকল তত্ত্ব ধর্মশাস্ত্রোক্ত বলিয়া পরিগৃহীত হইতে লাগিলে, দাসের বন্ধনশৃঙ্খল মোচন হইতে লাগিল। ভোগাভিলাষী ভোগাভিলাষ ত্যাগ করিতে লাগিল। তৎপ্রসাদে রোমকে বর্ষেরে

মিলিত হইয়া, মহাতেজস্বী, উন্নতিশীল, যুদ্ধদুর্মদ জাতি সকল সঞ্জাত হইল। তাহারা ই আধুনিক ইউরোপীয়দিগের পূর্বাধিপত্য। আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার ন্যায় লৌকিক উন্নতি পৃথিবীতে কখন হয় নাই বা হইবে এমত ভরসা পূর্বাধিপত্য মনুষ্যেরা কখন করেন নাই। ইহা যে কেবল খ্রীষ্ট ধর্মের ফল, এমত নহে; ইহার অনেক কারণ আছে—কিন্তু প্রধান কারণ খ্রীষ্টীয় নীতি এবং গ্রীক সাহিত্য এবং দর্শন। এবং খ্রীষ্ট ধর্ম যে কেবল সুফলই ফলিয়াছে, এমত নহে। ইষ্ট এবং অনিষ্ট উভয়বিধ ফলই ফলিয়াছিল। খ্রীষ্ট ধর্ম সাম্যাত্মক হইলেও পরিণামে তৎফলে একটি গুরুতর বৈষম্য জন্মিয়াছিল। ধর্মযাজকদিগের অত্যন্ত প্রভুত্ব বৃদ্ধি হইয়াছিল। স্পেন, ফ্রান্স প্রভৃতি কয়েকটি ইউরোপীয় রাজ্যে এই বৈষম্য বড় গুরুতর হইয়াছিল। বিশেষ ফ্রান্সে তৎসহিত উচ্চ শ্রেণী এবং অধঃশ্রেণীর মধ্যে ঈদৃশ গুরুতর বৈষম্য জন্মিয়াছিল যে, সেই বৈষম্যের ফলে ফরাসী মহাবিপ্লব ঘটিয়াছিল। সেই মথিত সাগরের একজন মন্থনকর্তা ছিলেন— তিনিই তৃতীয় বারের সাম্যাত্ত্ব প্রচারকর্তা। তৃতীয় সাম্যাবতার রুসো।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্স রাজ্যের যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা বর্ণনীয় নহে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধ্যে তাহার বর্ণনার স্থান নাই—প্রয়োজনও নাই। জগদ্বিখ্যাত, বাক্যবিশারদ, পুরাবৃত্তজ্ঞ, সুক্ষ্মদর্শী বহুসংখ্যক লেখক তাহার পুঞ্জ পুঞ্জ বর্ণনা করিয়াছেন; সেই সকল বর্ণনা সকলেরই অনায়াসপাঠ্য। দুই একটা বলিলেই আমাদের উদ্দেশ্য সাধন হইবে।

কার্লাইল ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছেন যে, “যে আইন অনুসারে একজন ভূম্যধিকারী মৃগয়া হইতে আসিয়া দুই জন দাস বধ করিয়া তাহাদিগের রক্তে পদ প্রক্ষালন করিতে পারিতেন, সে আইন ইদানীং আর প্রচলিত ছিল না।” ইদানীং প্রচলিত ছিল না! তবে পূর্বে ছিল! “পঞ্চাশৎ-বৎসরমধ্যে শারলোয়ার ন্যায় কোন ব্যক্তি স্থপতিদিগকে গুলি করিয়া তাহারা কি প্রকারে ছাদের উপর হইতে গড়াইয়া পড়ে, দেখিয়া আনন্দ লাভ করে নাই!” সেরাজউদ্দৌল্লা দেশের অধিপতি ছিলেন; শারলোয়া উচ্চশ্রেণীর প্রজা মাত্র।

এই ব্যঙ্গোক্তিহে তাৎকালিক ফরাসীদিগের মধ্যে কি অচিন্তনীয় বৈষম্য জন্মিয়াছিল, তাহা বুঝা যাইবে। পঞ্চদশ লুই প্রমোদানুরক্ত, বৃথাভোগাসক্ত, ব্যয়শোণ্ড, স্বার্থপর রাজা ছিলেন। তাহার উপপত্নীগণের পরিতুষ্টির জন্য অনন্ত ধনরাশির আবশ্যক। মাদাম পোম্পাদুর ও মাদাম দুবারি যে ঐশ্বর্য ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা পরিণীতা রাজমহিষীর নিষ্কলঙ্ক কপালেও ঘটে না। মাদাম দুবারির একটি বানরবৎ কাফি খানসামা ছিল; সে এক স্থানে শাসনকর্তৃত্বপদে নিযুক্ত হইয়াছিল—মাদামের আজ্ঞা! লুইর বিলাসভবনের বর্ণনা শুনিলে ইন্দ্রপ্রস্থের দৈবশক্তি নিম্মিতা পাণ্ডবীয়া পুরীর সঙ্গে তুলনা করা যায়—সেই সকল প্রমোদমন্দিরে যে উৎসব হইত, কিসের সঙ্গে তাহার তুলনা করিব? জলবৎ অর্থব্যয়,—এদিকে রাজকোষ শূন্য! রাজকোষ শূন্য, এবং প্রজাবর্গমধ্যে অস্বাভাব হাহাকার রব আকাশমধ্যে উঠিতেছিল। রাজকোষ শূন্য—প্রজামধ্যে অস্বাভাব হাহাকার রব—তবে এ সভাপর্ষের রাজসূয়, এ নন্দনকাননে ঐন্দ্র বিলাস—এ সকল অর্থসাধ্য ব্যাপার সম্পন্ন হয় কোথা হইতে? সেই অস্বাভাবপীড়িত প্রজার জীবনোপায় অপহরণ করিয়া। পিষ্টকে পেষণ করিয়া—শুককে শোষণ করিয়া, দধিকে দাহন করিয়া দুবারি কুলকলঙ্কিনীর অলকদাম রত্নরাজিতে শোভিত হয়। আর বড় মানুষেরা? তাহারা এক কপর্দক রাজকোষে অর্পণ করে না—কেবল রাজপ্রসাদ ভোগ করে। রাজপ্রসাদ, অজস্র, অনন্ত, অপরিমিত—যে যত পায়, গ্রহণ করে, কেন না তাহা পিষ্টপেষণলব্ধ। কিন্তু রাজপ্রসাদভোগীরা কপর্দক মাত্র রাজকোষে দেয় না। বড় মানুষেরা কর দেয় না, ধর্মযাজকেরা কর দেয় না, রাজপুরুষেরা কর দেয় না—কেবল দীন দুঃখী কৃষকেরা কর দেয়। তাহার উপর করসংগ্রাহকদিগের অত্যাচার। মিশালা বলেন, “কর আদায় এক প্রকার প্রণালীবদ্ধ যুদ্ধের ন্যায় ছিল। তাহার দ্বারা দুই লক্ষ নিষ্কর্মী ভূমিকে প্রপীড়িত করিত। এই পঙ্গপালের রাশি, সর্বগ্রাস, সর্বনাশ করিত। এই প্রকারে পরিশোধিত প্রজাদিগের নিকট আরও আদায় করিতে হইলে, সুতরাং নিষ্ঠুর রাজব্যবস্থা, ভয়ঙ্কর দণ্ডবিধি, নাবিক দাসত্ব, ফাঁসিকাঠ, পীড়নযন্ত্র প্রভৃতির আবশ্যক হইল।” রাজকর ইজারা বন্দোবস্ত ছিল; ইজারাদারের এমন অধিকার ছিল যে,

বিশ্বকম রচনাবলী

শস্ত্রাঘাতাদির দ্বারা রাজস্ব আদায় করে। তাহারা তজ্জন্য প্রজাবধ পর্য্যন্ত করিত। এক দিকে রম্যোদ্যান, বনবিহার, নৃত্যগীত, পরস্পরী সহিত প্রণয়, হাস্যপরিহাস, অনন্ত প্রমোদ, চিন্তা-শূন্যতা;—আর এক দিকে দারিদ্র্য, অনাহার, পীড়া, নিরপরাধে নাবিক দাসত্ব, ফাঁসিকাঠ, প্রাণবধ! পঞ্চদশ লুইর রাজ্যকালে ফ্রান্সদেশে এইরূপ গুরুতর বৈষম্য। এই বৈষম্য কদর্য্য, অপরিশুদ্ধ রাজশাসনপ্রণালীজনিত। রুসোর গুরুতর প্রহারে সেই রাজ্য ও রাজশাসনপ্রণালী ভগ্নমূল হইল। তাহার মানস শিষ্যেরা তাহা চূর্ণীকৃত করিল।

শাক্যসিংহ এবং যীশুখ্রীষ্ট পবিত্র সত্য কথা জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। এজন্য মনুষ্য-লোকে তাহারা যে দেবতা বলিয়া পূজিত, ইহা যথাযোগ্য। রুসো তাহাদের সমকক্ষ ব্যক্তি নহেন। অবিমিশ্র বিমল সত্যই যে তাহা কর্তৃক ভূমণ্ডলে প্রচারিত হইয়াছিল, এমত নহে। তিনি মহিমাময় লোকহিতকর নৈতিক সত্যের সহিত অনিষ্টকারক মিথ্যা মিশাইয়া, সেই মিশ্র পদার্থকে আপনার অদ্ভুত বাগিন্দ্রজালের গুণে লোকবিমোহিনী শক্তি দিয়া, ফরাসীদিগের হৃদয়াদিকারে প্রেরণ করিয়াছিলেন। একে কথাগুলি কালোপযোগিনী, তাহাতে রুসো বাক্শক্তিযে যথার্থ ঐন্দ্রজালিক, তাহার প্রেরিত সংকথানুসারিণী ভ্রান্তিও ফরাসীদিগের জীবনযাত্রার একমাত্র বীজমন্ত্র বলিয়া গৃহীত হইল। সকল ফরাসী তাহার মানস শিষ্য হইল। তাহারা সেই শিক্ষার গুণে ফরাসীবিপ্লব উপস্থিত করিল।

রুসোরও মূল কথা, সাম্য প্রাকৃতিক নিয়ম। স্বাভাবিক অবস্থায় সকল মনুষ্য সমান। সভ্যতার ফলে বৈষম্য জন্মে, কিন্তু বৈষম্য জন্মে বলিয়া, রুসো সভ্যতাকে মনুষ্যজাতির গুরুতর অমঙ্গল বিবেচনা করেন। তিনি ইহাও স্বীকার করেন যে, মনুষ্যে মনুষ্যে নৈসর্গিক বৈষম্য দোষিত পোয়া যায়, কিন্তু সেও সভ্যতার দোষে—সভ্যতাজনিত ভোগাসক্তি পাপানুরক্তি এবং সুক্ষ্মাসুক্ষ্ম বিচারের ফল। অসভ্যাবস্থায় সকল মনুষ্যের সমভাবে শারীরিক পরিশ্রমের আবশ্যিক হয়; এজন্য সকলেরই সমভাবে শরীরপুষ্টি হয়; নীরোগ শরীরের ফল নীরোগ মন। যখন মনুষ্যগণ বন্যাবস্থায়, কাননে কাননে মৃগয়া করিয়া বেড়াইত, বৃক্ষতলে বৃক্ষতলে নিদ্রা যাইত—অল্পমাত্র ভাষাশক্তিসম্পন্ন, এজন্য বাণীবদন্য জানিত না; যে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি নাই, যে লোভের তৃপ্তি নাই, যে বাসনার পূরণ নাই, তাহার কিছুই জানিত না; ইহাকে ভালবাসিব, উহাকে বাসিব না; এ আপন, ও পর, এ স্ত্রী, ও পরস্পরী, এ সকল বৃক্ষিত না—সেই অবস্থাকে স্বর্গীয় সুখ মনে করিয়া, মনুষ্যজাতিকে ডাকিয়া বলিয়াছেন, “এই অপূর্ষ চিত্র দেখ! ইহার সহিত এখনকার দুঃখপূর্ণ, পাপপূর্ণ সভ্যাবস্থার তুলনা কর!”

যেই মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করে, সেই মনুষ্যমাত্রের সমান—নৈসর্গিক প্রকৃতিতে সমান, এবং সম্পত্তির অধিকারিত্বেও সমান। এই পৃথিবীর ভূমিতে রাজার যে প্রাকৃতিক অধিকার, ভিক্ষকেরও সেই অধিকার। ভূমি সকলেরই—কাহারও নিজস্ব নহে। যখন বলবানে দুর্ষলকে অধিকারচ্যুত করিতে লাগিল, তখনই সমাজ সংস্থাপনের আরম্ভ হইল। সেই অপহরণের স্থায়িত্ববিধানের নাম আইন।

যে ব্যক্তি সর্বদো, কোন ভূমিখণ্ড চিহ্নিত করিয়া বলিয়াছিল, “ইহা আমার,” সেই সমাজকর্তা। যদি কেহ তাহাকে উঠাইয়া দিয়া বলিত, “এ ব্যক্তি বণ্ডক, তোমরা উহার কথা শুনিও না, বসুন্ধরা কাহারও নহেন; তৎপ্রসূত শস্য সকলেরই।” সে মানবজাতির অশেষ উপকার করিত।

রুসোর এই সকল কথা অতি ভয়ানক। বল্টের শুনিয়া বলিয়াছিলেন, এ সকল বদমায়েসের দর্শনশাস্ত্র। এই সকল কথার অনুবর্তী হইয়া রুসোর মানস শিষ্য প্রুধোঁ বলিয়াছেন যে, অপহরণেরই নাম সম্পত্তি।

জগদ্বিখ্যাত Le Contrat Social নামক গ্রন্থে রুসো এই সকল মতের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়াছিলেন। সভ্যাবস্থার তাদৃশ দোষকীর্ণনে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন যে, অসভ্যাবস্থায় যেখানে সহজ জ্ঞানে ধর্ম নিগীত হয়, সভ্যাবস্থায় তৎপরিবর্তে ন্যায়ানুভাবকতা সন্নিবেশিত হয়। সম্পত্তি সম্বন্ধে তিনি প্রথমাদিকারীকে অধিকারী বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু অবস্থা বিশেষে মাত্র—প্রথম, যদি ভূমি পূর্বে অধিকৃত না হইয়া থাকে; দ্বিতীয়, অধিকারী যদি আত্মভরণপোষণের উপযোগী মাত্র ভূমি অধিকার করে, তাহার অধিক না লয়, তৃতীয়, যদি নাম-মাত্র দখল না লইয়া, কর্ণাদির দ্বারা দখল লওয়া হয়, তবে অধিকৃত ভূমি অধিকারীর সম্পত্তি।

Le Contrat Social গ্রন্থের শুলোদ্দেশ্য এই যে, সমাজ সমাজভুক্তাদিগের সম্মতিসূত্রে। যেমন পাঁচ জন ব্যবসাদার মিলিয়া, পরস্পরে কতকগুলি নিয়মের দ্বারা বন্ধ হইয়া, একাট জয়েন্ট স্টক কোম্পানি সৃষ্ট করেন, রুসোর মতে সমাজ, রাজ্য, শাসন, এ সকল সেইরূপে লোকের মঙ্গলার্থে লোকের দ্বারা সৃষ্ট। এ কথার ফল অতি গুরুতর। তোমায় আমায় চুক্তি হইয়াছে যে, তুমি আমার জমী চাষিয়া দিবে, আমি তোমাকে খাইতে পরিতে দিব, এবং গৃহে স্থান দিব। তুমি যে দিন আমার ভূমিকর্ষণ বন্ধ করিলে, সেই দিন আমি তোমার গলদেশে হস্তার্পণ করিয়া গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিলাম এবং গ্রাসাচ্ছাদন বন্ধ করিলাম। এই কার্য্য ন্যায়সঙ্গত হইল। তেমনি যদি রাজা প্রজার সম্বন্ধ কেবল চুক্তিমাত্র হয়, তবে প্রজা অত্যাচারী রাজাকে বলিতে পারে, “তুমি চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছ। প্রজার মঙ্গল করিবে এই অঙ্গীকারে তুমি রাজা; তোমার কার্য্য আমাদের মঙ্গল করা, আমাদের কার্য্য তোমাকে করদান ও তোমার আঞ্জাপালন। তুমি এখন আর আমাদের মঙ্গল কর না, অতএব আমরাও তোমাকে কর দিব না বা তোমার আঞ্জাপালন করিব না। তুমি রক্তসিংহাসন হইতে অবতরণ কর।”

অতএব যে দিন Le Contrat Social প্রচারিত হইল, সেই দিন ফরাসী রাজার হস্তের রাজদণ্ড ভগ্ন হইল। Le Contrat Social গ্রন্থের চরম ফল ষোড়শ লুইর সিংহাসনচ্যুতি, এবং প্রাগদণ্ড। ফরাসীবিপ্লবে যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, তাহার মূল এই গ্রন্থে। সেই যজ্ঞে বেদমন্ত্র, এই গ্রন্থোক্ত বাণী।

সেই ফরাসীবিপ্লবে, রাজা গেল, রাজকুল গেল, রাজপদ গেল, রাজনাম লুপ্ত হইল; সম্ভ্রান্ত লোকের সম্প্রদায় লুপ্ত হইল; পুরাতন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গেল, ধর্ম্মযাজকসম্প্রদায় গেল; মাস, বার প্রভৃতির নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হইল—অনন্তপ্রবাহিত শোণিতস্রোতে সকল ধুইয়া গেল। কালে আবার সকলই হইল, কিন্তু যাহা ছিল, তাহা আর হইল না। ফ্রান্স নূতন কলেবর প্রাপ্ত হইল। ইউরোপে নূতন সভ্যতার সৃষ্টি হইল—মনুষ্যজাতির স্থায়ী মঙ্গল সিদ্ধ হইল। রুসোর দ্রান্ত বাক্যে অনন্তকালস্থায়িনী কীর্ত্তি সংস্থাপিতা হইল। কেন না, সেই দ্রান্ত বাক্য সাম্যাত্মক—সেই দ্রান্তির কায়া অর্দ্ধেক সত্যে নির্ম্মিত।

ফরাসীবিপ্লব শমিত হইল, তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। কিন্তু “ভূমি সাধারণের” এই কথা বলিয়া রুসো যে মহাবৃক্ষের বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহার নিত্য নূতন ফল ফলিতে লাগিল। অদ্যাপি তাহার ফলে ইউরোপ পরিপূর্ণ। “কম্যুনিজম্” সেই বৃক্ষের ফল। “ইন্টারন্যাশনল” সেই বৃক্ষের ফল। এ সকলের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিব।

এ দেশে এবং অন্য দেশে সচরাচর সম্পত্তি ব্যক্তি বিশেষের। আমার বাড়ী, তোমার ভূমি, তাহার বৃক্ষ। কিন্তু ইহা ভিন্ন আর কোন প্রকার সম্পত্তি হইতে পারে না, এমত নহে। ব্যক্তি-বিশেষের সম্পত্তি না হইয়া, সর্বলোকসাধারণের সম্পত্তি হইতে পারে। এই সর্বলোকপালিকা বসুন্ধরা কাহারও একার জন্য সৃষ্ট হয় নাই বা দশ পনের জন ভূম্যধিকারীর জন্য সৃষ্ট হয় নাই। অতএব ভূমির উপর সকলেরই সমান অধিকার থাকা কর্তব্য। সর্ববিঘ্নাবিনাশিনী বাক্শক্তির বলে, এই কথা রুসো পৃথিবীর মধ্যে আদ্যুত করাইয়াছিলেন। ক্রমে বিজ্ঞ, বিবেচক পণ্ডিতেরা সেই ভিত্তির উপর সম্পত্তিমাত্রেরই সাধারণতা স্থাপন করিবার মত সকল প্রচার করিতে লাগিলেন।

প্রথম মত এই যে, ভূমি এবং মূলধন, যাহার দ্বারা অন্য ধনের উৎপত্তি হইবে, তাহা সামাজিক সর্বলোকের সাধারণ সম্পত্তি হউক। যাহা উৎপন্ন হইবে, তাহা সর্বলোকে সমভাগে বণ্টন করিয়া লউক। ইহাতে বড় লোক ছোট লোক কোন প্রভেদ রহিল না; সকলেই সমান ভাবে পরিশ্রম করিবে। সকলেই সমান ভাগে ধনের অধিকারী। ইহাই প্রকৃত কম্যুনিজম্। ইহার প্রচারকর্ত্তা ওয়েন, লুই ব্রাং, এবং কাবে। কিন্তু সাধারণ কম্যুনিষ্ট, বহুশ্রমী এবং অল্পশ্রমী, কর্ম্মিষ্ঠ এবং অকর্ম্মিষ্ঠ, সকলকেই যে রূপ ধনের সমানভাগী করিতে চাহেন, লুই ব্রাং সে মতাবলম্বী নহেন। তিনি বলেন, শ্রমানুসারে ধনের ভাগ হওয়া কর্তব্য। যে মত সেন্টসাইমনিজম্ বলিয়া বিখ্যাত, তাহারও অভিপ্রায় এই যে, সকলেই যে সমভাবে ধনভোগী হইবে বা সকলেই এক প্রকার পরিশ্রম করিবে বা সকলেই সমান পরিশ্রম করিবে এমত নহে। যে যেমন পরিশ্রমের উপযুক্ত ও যে যে কার্য্যের উপযুক্ত, সে তেমনি পরিশ্রম করিবে ও সেইরূপ কার্য্য নিষ্পন্ন হইবে। কার্য্যের গুরুত্ব, এবং কর্ম্মকারকের গুণানুসারে বেতন প্রদত্ত হইবে।

বাস্কম রচনাবলী

যে যাহার যোগ্য, তাহাতে তাহাকে নিযুক্ত করিবার জন্য, যে প্রকারে পুত্রস্কৃত হইবে তাহা নিরূপণ এবং সর্বপ্রকার তত্ত্বাবধারণ জন্য কতকগুলি কৰ্তৃপক্ষ থাকিবেন। ভূমি ও ধনোৎপাদক সামগ্রী সকল সাধারণের। ইত্যাদি।

ফরীরজম্ আর এক প্রকার সাধারণ সম্পত্তির পক্ষতা। কিন্তু এ সম্প্রদায়ের এমন মত নহে যে, ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি থাকিতে পারিবে না। সম্পত্তির বৈশেষিকতা, এবং উত্তরাধিকারিতাও ইহাদের অনুমত। ইহারা বলেন যে, দুই সহস্র বা তদুপ সংখ্যক লোক একতন্ত্র হইয়া ধনোৎপাদন করিবে। এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায়ের দ্বারা ধনোৎপত্তি হইতে থাকিবে। তাহারা আপনাদিগের কৰ্তৃপক্ষ আপনারা মনোনীত করিবে। মূলধনের পার্থক্য থাকিবে। উৎপন্ন ধনের মধ্য হইতে প্রথমে কিয়দংশ সমভাবে সকলকে বিতরিত হইবে। যে শ্রমে অপারগ, সেও তাহা পাইবে। যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, শ্রমকারী, মূলধনাধিকারী, এবং কৰ্ম্মনিপুণদিগের মধ্যে কোন নিয়মিত পরিমাণে তাহা বিভক্ত হইবে। যে যেমন গুণবান্, সে তদুপযুক্ত পাইবে। ইত্যাদি।

ভূসম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব সম্বন্ধে মৃত মহাত্মা জন ষ্টুয়ার্ট মিল যাহা বলিয়াছেন, তাহারও উল্লেখ করা আবশ্যিক, কেন না, তাহাও সাম্যতত্ত্বের অন্তর্গত। যিনি উপার্জনকর্তা, উপার্জিত সম্পত্তিতে তাহার যে সম্পূর্ণ অধিকার, ইহা মিল স্বীকার করেন। যে যাহা আপন পরিশ্রমে বা গুণে উপার্জন করিয়াছে, তাহা অপৰ্য্যাপ্ত হইলেও তাহার যাবজ্জীবন ভোগ্য এবং তাহার জীবনান্তেও যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে দিয়া যাইবার তাহার অধিকার আছে। কিন্তু যদি আপন জীবনান্তে সে কাহাকেও না দিয়া যায়, তবে তাহার তত্ত্ব সম্পত্তি একা ভোগ করিবার অধিকার কাহারও নাই। রাম যে সম্পত্তি উপার্জন করিয়াছে, তাহাতে দশ সহস্র লোক প্রতিপালিত হইতে পারে; কিন্তু রাম উপার্জন করিয়াছে বলিয়া সে নয় সহস্র নয় শত নিরানব্বই জনকে বঞ্চিত করিয়া, একা ভোগের অধিকারী বটে। জীবনান্তে স্বেচ্ছাক্রমে আপনার পুত্রকে বা অপরকে তাহাতে স্বত্ববান্ করিবারও তাহার অধিকার আছে। কিন্তু সে যদি কাহাকেও দিয়া না গেল, তবে কেবল ব্যবস্থার বলে, তাহার পুত্রও কেন একা অধিকারী হয়? অধিকার উপার্জনকর্তার, তাহার পুত্রের নহে। যেখানে অধিকারী বলিয়া যায় নাই যে, আমার পুত্র সকল ভোগ করিবে, সেখানে পুত্র অধিকারী নহে, সামাজিক লোক সকলেই সমান ভাবে অধিকারী।

তবে পিতা পুত্রকে এই দুঃখময় সংসারে আনিয়াছেন, এজন্য যাহাতে সে কষ্ট না পায়, সুশিক্ষিত হইয়া, অভাবাপন্ন না হইয়া, যাহাতে সে সুখে জীবনযাত্রা নিৰ্ব্বাহ করিতে পারে, পিতার এরূপ উপায় করিয়া যাওয়া কৰ্ত্তব্য। পিতৃসম্পত্তির যে অংশ রাখিলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, পুত্রের তাহা বিনা দানেও প্রাপ্য। কিন্তু তদধিক এক কড়াও তাহার প্রাপ্য নহে। মিল বলেন, জারজ পুত্রের অপেক্ষা অন্য পুত্রের কিছুমাত্র অধিকার নাই,—উভয়েই কেবল আত্মরক্ষার উপায়ের অধিকারী। কিন্তু এরূপ যাহা কিছু অধিকার, তাহা সম্ভানের। পুত্রের অবর্ত্তমানে জ্ঞাতি প্রভৃতি মৃতের সর্বসম্পত্তিতে একাধিকারী হওয়ার কিছুমাত্র ন্যায়সঙ্গত কারণ নাই। যাহার সম্ভান আছে, তাহার তত্ত্ব সম্পত্তি হইতে সম্ভানের আবশ্যকীয় ধন রাখিয়া, অবশিষ্ট জনসাধারণের অধিকার হওয়া কৰ্ত্তব্য। যাহার সম্ভান নাই, তাহার সমুদায় সম্পত্তিতেই জনসাধারণের অধিকার হওয়া কৰ্ত্তব্য। বাস্তবিক উত্তরাধিকারিত্বসম্বন্ধে ন্যায়ানুযায়ী ব্যবস্থা পৃথিবীর কোন রাজ্যে এ পর্য্যন্ত হয় নাই। বিলাতী ব্যবস্থার অপেক্ষা, আমাদের ধৰ্ম্মশাস্ত্র কিছু ভাল; হিন্দুধৰ্ম্মশাস্ত্র অপেক্ষা সরা আরও ভাল। কিন্তু সকলই অন্যায়পূর্ণ। এক্ষণে এ সকল কথা অধিকাংশের অগ্রাহ্য, এবং মূর্খের নিকট হাস্যের কারণ। কিন্তু একদিন এইরূপ বিধি পৃথিবীর সর্বত্র চলিবে।

সাম্যতত্ত্বের শেষাংশও এই চিরস্মরণীয় মহাত্মার প্রচারিত। স্ত্রী পুরুষে সমান। এক্ষণে সুশিক্ষায়, বিজ্ঞানে, রাজকাৰ্য্যে, বিবিধ ব্যবসায়ে একা পুরুষেই অধিকারী—স্ত্রীলোক অনাধিকারিণী থাকিবে কেন? মিল বলেন, নারীজাতিও এ সকলের অধিকারী। তাহারা যে পারিবে না, উপযুক্ত নহে, এ সকল চিরপ্রচলিত লৌকিক ভ্রান্তি মাত্র। মিলের এ মত ইউরোপে গ্রাহ্য হইয়া, ফলে পরিণত হইতেছে। আমরাইগের দেশে এ সকল কথা প্রচারিত হইবার এখনও অনেক বিলম্ব আছে।

সাম্যতত্ত্বসম্বন্ধে সার কথা পুনৰ্ব্বার উক্ত করিতে হইল। মনুষ্যে মনুষ্যে সমান। কিন্তু এ

কথার এমত উদ্দেশ্য নহে যে, সকল অবস্থার সকল মনুষ্যই, সকল অবস্থার সকল মনুষ্যের সঙ্গে সমান। নৈসর্গিক তারতম্য আছে; কেহ দুর্বল, কেহ বলিষ্ঠ; কেহ বুদ্ধিমান, কেহ বুদ্ধিহীন। নৈসর্গিক তারতম্যে সামাজিক তারতম্য অবশ্য ঘটিবে; যে বুদ্ধিমান এবং বলিষ্ঠ, সে আজ্ঞাদাতা; যে বুদ্ধিহীন এবং দুর্বল, সে আজ্ঞাকারী অবশ্য হইবে। রুসোও এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সাম্যতত্ত্বের তাৎপর্য এই যে, সামাজিক বৈষম্য, নৈসর্গিক বৈষম্যের ফল, তাহার অতিরিক্ত বৈষম্য ন্যায়বিরুদ্ধ, এবং মনুষ্যজাতির অনিষ্টকর। যে সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাহা অনেকগুলি এইরূপ অপ্রাকৃত বৈষম্যের কারণ। সেই ব্যবস্থাগুলির সংশোধন না হইলে, মনুষ্যজাতির প্রকৃত উন্নতি নাই। মিল এক স্থানে বলিয়াছেন, এক্ষণকার যত সুব্যবস্থা, তাহা পূর্বতন কুব্যবহারসংশোধক মাত্র। ইহা সত্য কথা। কিন্তু সম্পূর্ণ সংশোধন কালসাপেক্ষ। তাই বলিয়া কেহ না মনে করেন যে, আমি জন্মগুণে বড় লোক হইয়াছি, অন্যে জন্মগুণে ছোট লোক হইয়াছে। তুমি যে উচ্চ কুলে জন্মিয়াছ, সে তোমার কোন গুণে নহে; অন্য যে নীচ কুলে জন্মিয়াছে, সে তাহার দোষে নহে। অতএব পৃথিবীর সুখে তোমার যে অধিকার, নীচকুলোৎপন্নেরও সেই অধিকার। তাহার সুখের বিঘ্নকারী হইও না; মনে থাকে যেন যে, সেও তোমার ভাই—তোমার সমকক্ষ। যিনি ন্যায়বিরুদ্ধ আইনের দোষে পিতৃসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া, দোন্দুন্ডু প্রচণ্ড প্রতাপান্বিত মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি উপাধি ধারণ করেন, তাঁহারও যেন সম্মরণ থাকে যে, বঙ্গদেশের কৃষক পরাণ মন্ডল তাঁহার সমকক্ষ, এবং তাঁহার ভ্রাতা। জন্ম, দোষগুণের অধীন নহে। তাহার অন্য কোন দোষ নাই। যে সম্পত্তি তিনি একা ভোগ করিতেছেন, পরাণ মন্ডলও তাহার ন্যায়সঙ্গত অধিকারী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আমরা যদি পরাণ মন্ডলের কথা পাড়িলাম, তবে তাহার দুঃখের পরিচয় কিঞ্চিৎ সবিস্তারে না দিয়া থাকিতে পারি না। জমীদারের ঐশ্বর্য্য সকলেই জানেন, কিন্তু যাঁহারা সম্বাদপত্র লিখিয়া, বক্তৃতা করিয়া বঙ্গসমাজের উদ্ধারের চেষ্টা করিয়া বেড়ান, তাঁহারা সকলে কৃষকের অবস্থা সবিশেষ অবগত নহেন। সাম্যতত্ত্ব বুঝাইতে গিয়া সে বৈষম্য না দেখাইলে কথা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। যে বসুন্ধরা কাহারও নহে, তাহা ভূম্যাধিকারিবর্গ বণ্টন করিয়া লওয়াতে কি ফল ফলিতেছে, তাহা কিছুর বলিতে হইল।

যতক্ষণ জমীদার বাবু সাড়ে সাত মহল পুরীর মধ্যে রঞ্জিল সাসীপ্রেবিত স্নিঙ্কালোকে শ্রী কন্যার গৌরকান্তির উপর হীরকদামের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন, ততক্ষণ পরাণ মন্ডল, পুত্রসহিত দুই প্রহরের রোদ্রে, খালি মাথায়, খালি পায়, এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটা অস্থিচর্ম্মাবিশিষ্ট বলদে ভোঁতা হালে তাঁহার ভোগের জন্য চাষকর্ম্ম নিব্বাহ করিতেছে। উহাদের এই ভাদ্রের রোদ্রে মাথা ফাটিয়া যাইতেছে, তুষায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, তাহার নিবারণ জন্য অঞ্জলি করিয়া মাঠের কন্দর্ম পান করিতেছে; ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে, কিন্তু এখন বাড়ী গিয়া আহার করা হইবে না, এই চাষের সময়। সন্ধ্যাবেলা গিয়া উহারা ভাঙ্গা পাতরে রাঙ্গা রাঙ্গা বড় বড় ভাত, লুণ লুণকা দিয়া আধপেটা খাইবে। তাহার পর ছেঁড়া মাদুরে, না হয়, ভূমে, গোহালের এক পাশে শয়ন করিবে—উহাদের মশা লাগে না। তাহার পরদিন প্রাতে আবার সেই একহাঁটু কাদায় কাজ করিতে যাইবে—যাইবার সময়, হয় জমীদার, নয় মহাজন, পথ হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়া দেনার জন্য বসাইয়া রাখিবে, কাজ হইবে না। নয়ত, চাষবার সময় জমীদার জমীখানি কাড়িয়া লইবে, তাহা হইলে সে বৎসর কি করিবে? উপবাস—সপরিবারে উপবাস!

পৌষ মাসে ধান কাটিয়াই কৃষকে পৌষের কিস্তি খাজনা দিল। কেহ কিস্তি পরিশোধ করিল—কাহার বাকি রহিল। ধান পালা দিয়া, আছড়াইয়া, গোলায় তুলিয়া, সময়মত হাটে লইয়া গিয়া, বিক্রয় করিয়া, কৃষক সম্বৎসরের খাজনা পরিশোধ করিতে চৈত্র মাসে জমীদারের কাছারিতে আসিল। পরাণ মন্ডলের পৌষের কিস্তি পাঁচ টাকা, চারি টাকা দিয়াছে, এক টাকা বাকি আছে। আর চৈত্রের কিস্তি তিন টাকা। মোটে চারি টাকা সে দিতে আসিয়াছে। গোমস্তা হিসাব করিতে বসিলেন। হিসাব করিয়া বলিলেন, “তোমার পৌষের কিস্তির তিন টাকা বাকি

বিক্রম রচনাবলী

আছে।” পরাগ মন্ডল অনেক চীৎকার করিল—দোহাই পাড়িল—হয় ত দাখিলা দেখাইতে পারিল, নয় ত না। হয় ত গোমস্তা দাখিলা দেয় নাই, নয় ত চারি টাকা লইয়া, দাখিলায় দুই টাকা লিখিয়া দিয়াছে। যাহা হউক, তিন টাকা বাকি স্বীকার না করিলে সে আর্থিক কবচ পায় না। হয় ত তাহা না দিলে গোমস্তা সেই তিন টাকাকে তের টাকা করিয়া নালিশ করিবে। সুতরাং পরাগ মন্ডল তিন টাকা বাকি স্বীকার করিল। মনে কর, তিন টাকাই তাহার যথার্থ দেনা। তখন গোমস্তা সুদ কমিল। জমিদারী নিরিক টাকায় চারি আনা। তিন বৎসরেও চারি আনা, এক মাসেও চারি আনা। তিন টাকা বাকির সুদ ৫০ আনা। পরাগ তিন টাকা বার আনা দিল। পরে চৈত্রের কিস্তি তিন টাকা দিল। তাহার পর গোমস্তার হিসাবানা। তাহা টাকায় দুই পয়সা। পরাগ মন্ডল ৩২ টাকার জমা রাখে। তাহাকে হিসাবানা ১ টাকা দিতে হইল। তাহার পর পার্শ্বণী। নাএব, গোমস্তা, তহশীলদার, মুহুরি, পাইক, সকলেই পার্শ্বণীর হকদার। মোটের উপর পড়তা গ্রাম হইতে এত টাকা আদায় হইল। সকলে ভাগ করিয়া লইলেন। পরাগ মন্ডলকে তজ্জন্য আর দুই টাকা দিতে হইল।

এ সকল দৌরাণ্য জমীদারের অভিপ্রায়ানুসারে হয় না, তাহা স্বীকার করি। তিনি ইহার মধ্যে ন্যায্য খাজানা এবং সুদ ভিন্ন আর কিছুই পাইলেন না, অবশিষ্ট সকল নায়েব গোমস্তার উদরে গেল। সে কাহার দোষ? জমীদার যে বেতনে দ্বারবান রাখেন, নায়েবেরও সেই বেতন; গোমস্তার বেতন খানসামার বেতন অপেক্ষা কিছু কম। সুতরাং এসব না করিলে তাহাদের দিনপাত হয় কি প্রকারে? এ সকল জমীদারের আজ্ঞানুসারে হয় না বটে, কিন্তু তাঁহার কার্পণ্যের ফল। প্রজার নিকট হইতে তাঁহার লোকে আপন উদরপূর্তির জন্য অপহরণ করিতেছে, তাহাতে তাঁহার ক্ষতি কি? তাঁহার কথা কহিবার কি প্রয়োজন আছে?

তাহার পর আষাঢ় মাসে নববর্ষের শুভ পূণ্যাহ উপস্থিত। পরাগ পূণ্যাহের কিস্তিতে দুই টাকা খাজানা দিয়া থাকে। তাহা ত সে দিল, কিন্তু সে কেবল খাজানা। শুভ পূণ্যাহের দিনে জমীদারকে কিছু নজর দিতে হইবে। তাহাও দিল। হয় ত জমীদারেরা অনেক শরিক, প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ নজর দিতে হয়। তাহাও দিল। তাহার পর নায়েব মহাশয় আছেন—তাঁহাকেও কিছু নজর দিতে হইবে। তাহাও দিল। পরে গোমস্তা মহাশয়েরা। তাঁহাদের ন্যায্য পাওনা—তাঁহারাও পাইলেন। যে প্রজার অর্থ নজর দিতে দিতে ফুরাইয়া গেল—তাঁহার কাছে বাকি রহিল। সময়ান্তরে আদায় হইবে।

পরাগ মন্ডল সব দিয়া থুইয়া ঘরে গিয়া দেখিল, আর আহারের উপায় নাই। এদিকে চাষের সময় উপস্থিত। তাহার খরচ আছে। কিন্তু ইহাতে পরাগ ভীত নহে। এ ত প্রতি বৎসরেই ঘটিয়া থাকে। ভরসা, মহাজন। পরাগ মহাজনের কাছে গেল। দেড়ী সুদে ধান লইয়া আসিল। আবার আগামী বৎসর তাহা সুদ সমেত শূন্য নিঃস্ব হইবে। চাষা চিরকাল ধার করিয়া খায়, চিরকাল দেড়ী সুদ দেয়। ইহাতে রাজার নিঃস্ব হইবার সম্ভাবনা, চাষা কোন ছার! হয় ত জমীদার নিজেই মহাজন। গ্রামের মধ্যে তাঁহার ধানের গোলা ও গোলাবাড়ী আছে। পরাগ সেইখান হইতে ধান লইয়া আসিল। এরূপ জমীদারের ব্যবসায় মন্দ নহে। স্বয়ং প্রজার অর্থাপহরণ করিয়া, তাহাকে নিঃস্ব করিয়া, পরিশেষে কজ্জ দিয়া তাহার কাছে দেড়ী সুদ ভোগ করেন। এমত অবস্থায় যত শীঘ্র প্রজার অর্থ অপহৃত করিতে পারেন, ততই তাঁহার লাভ।

সকল বৎসর সমান নহে। কোন বৎসর উত্তম ফসল জন্মে, কোন বৎসর জন্মে না। অতিবৃষ্টি আছে, অনাবৃষ্টি আছে, অকালবৃষ্টি আছে, বন্যা আছে, পঙ্গপালের দৌরাণ্য আছে, অন্য কীটের দৌরাণ্যও আছে। যদি ফসলের সুলক্ষণ দেখে, তবেই মহাজন কজ্জ দেয়; নচেৎ দেয় না। কেন না, মহাজন বিলক্ষণ জানে যে, ফসল না হইলে কৃষক ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে না। তখন কৃষক নিরুপায়। অস্বাভাবে সপরিবারে প্রাণে মারা যায়। কখন ভরসার মধ্যে বন্যা অথবা ফলমূল, কখন ভরসা “রির্লিফ”, কখন ভিক্ষা, কখন ভরসা কেবল জগদীশ্বর। অল্পসংখ্যক মহাত্মা ভিন্ন কোন জমীদারই এমন দুঃসময়ে প্রজার ভরসামূল্য নহে। মনে কর, সে বার সুবৎসর। পরাগ মন্ডল কজ্জ পাইয়া দিনপাত করিতে লাগিল।

পরে ডান্ডের কিস্তি আসিল। পরাগের কিছু নাই, দিতে পারিল না। পাইক, পিয়াদা, নগদী, হালশাহানা, কোর্টাল বা তদ্রূপ কোন নামধারী মহাত্মা তাগাদায় আসিলেন। হয় ত

কিছু করিতে না পারিয়া, ভাল মানুষের মত ফিরিয়া গেলেন। নয় ত পরাণ কজ্জ করিয়া টাকা দিল। নয় ত পরাণের দুর্ভিক্ষ ঘটিল—সে পিয়াদার সঙ্গে বচসা করিল। পিয়াদা ফিরিয়া গিয়া গোমস্তাকে বলিল, “পরাণ মন্ডল আপনাকে শ্যালা বলিয়াছে।” তখন পরাণকে ধরিতে তিন জন পিয়াদা ছুটিল। তাহারা পরাণকে মাটি ছাড়া করিয়া লইয়া আসিল। কাছারিতে আসিয়াই পরাণ কিছু সুসভ্য গালিগালাজ শুনিল—শরীরেও কিছু উত্তম মধ্যম ধারণ করিল। গোমস্তা তাহার পাঁচগুণ জরিমানা করিলেন। তাহার উপর পিয়াদার রোজ। পিয়াদাদিগের প্রতি হুকুম হইল, উহাকে বসাইয়া রাখিয়া আদায় কর। যদি পরাণের কেহ হিতৈষী থাকে, তবে টাকা দিয়া খালাস করিয়া আনিল। নচেৎ পরাণ একদিন, দুই দিন, তিন দিন, পাঁচ দিন, সাত দিন, কাছারীতে রহিল। হয় ত, পরাণের মা কিম্বা ভাই, থানায় গিয়া এজেহার করিল। সব ইন্স্পেক্টর মহাশয় কয়েদ খালাসের জন্য কনস্টেবল পাঠাইলেন। কনস্টেবল সাহেব—দিন দুনিয়ার মালিক—কাছারিতে আসিয়া জাঁকিয়া বসিলেন। পরাণ তাহার কাছেই বসিয়া—একটু কাঁদাকাটা আরম্ভ করিল। কনস্টেবল সাহেব একটু ধূমপান করিতে লাগিলেন—কিন্তু “কয়েদ খালাসের” কোন কথা নাই। তিনিও জমীদারের বেতনভুক্—বৎসরে দুই তিন বার পার্শ্বণী পান, বড় উড়বার বল নাই। সে দিনও সর্বসুখময় পরমপবিত্রমূর্ত্তি রৌপ্যচক্রের দর্শন পাইলেন। এই আশ্চর্য চক্র দৃষ্টিমাত্রেই মনুষ্যের হৃদয়ে আনন্দরসের সঞ্চার হয়—ভক্তি প্রীতির উদয় হয়। তিনি গোমস্তার প্রতি প্রীত হইয়া থানায় গিয়া প্রকাশ করিলেন, “কেহ কয়েদ ছিল না। পরাণ মন্ডল ফেরেশ্বাজ লোক—সে পুকুর ধারে তালতলায় লুকাইয়া ছিল—আমি ডাক দিবামাত্র সেখান হইতে আসিয়া আমাকে দেখা দিল।” মোকদ্দমা ফাঁসিয়া গেল।

প্রজা ধরিয়া লইয়া গিয়া, কাছারিতে আটক রাখা, মারপিট করা, জরিমানা করা, কেবল খাজানা বাকির জন্য হয়, এমত নহে। যে সে কারণে হয়। আজ গোপাল মন্ডল গোমস্তা মহাশয়কে কিঞ্চৎ প্রণামী দিয়া নালিশ করিয়াছে যে, “পরাণ আমাকে লইয়া খায় না”—তখনই পরাণ ধৃত হইয়া আসিল। আজ নেপাল মন্ডল ঐরূপ মঙ্গলাচরণ করিয়া নালিশ করিল যে, “পরাণ আমার ভাগিনীর সঙ্গে প্রসক্তি করিয়াছে”—অর্নি পরাণ গ্রেপ্তার হইয়া আবদ্ধ হইল। আজ সংবাদ আসিল, পরাণের বিধবা ভ্রাতৃবধূ গর্ভবতী হইয়াছে—অর্নি পরাণকে ধরিতে লোক ছুটিল। আজ পরাণ জমীদারের হইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে নারাজ, অর্নি তাহাকে ধরিতে লোক ছুটিল।

গোমস্তা মহাশয়, পরাণের কাছে টাকা আদায় করিয়াই হুক বা জামিন লইয়াই হুক বা কিম্বন্দী করিয়াই হুক বা সময়ান্তরে বিহিত করিবার আশায়ই হুক বা পুনর্বার পালিশ আসার আশঙ্কায়ই হুক বা বহুকাল আবদ্ধ রাখার কোন ফল নাই বলিয়াই হুক, পরাণ মন্ডলকে ছাড়িয়া দিলেন। পরাণ ঘরে গিয়া চাষ-আবাদে প্রবৃত্ত হইল। উত্তম ফসল জন্মিল। অগ্রহায়ণ মাসে জমীদারের দৌহিত্রীর বিবাহ বা ভ্রাতৃপুত্রের অন্তপ্রাশন। বরাদ্দ দুই হাজার টাকা। মহলে মাঙ্গন চড়িল। সকল প্রজা টাকার উপর ১০ আনা দিবে। তাহাতে পাঁচ হাজার টাকা উঠিবে। দুই হাজার অন্তপ্রাশনের খরচ লাগিবে—তিন হাজার জমীদারের সিন্দুকে উঠিবে।

যে প্রজা পারিল, সে দিল—পরাণ মন্ডলের আর কিছুই নাই—সে দিতে পারিল না। জমীদারী হইতে পূরা পাঁচ হাজার টাকা আদায় হইল না। শুনিয়া জমীদার স্থির করিলেন, একবার স্বয়ং মহালে পদার্পণ করিবেন। তাহার আগমন হইল—গ্রাম পবিত্র হইল।

তখন বড় বড় কালো কালো পাঁটা আনিয়া, মন্ডলের কাছারির দ্বারে বাঁধিয়া যাইতে লাগিল। বড় বড় জীবন্ত রুই, কাতলা, মৃগাল উঠানে পড়িয়া ল্যাজ আছড়াইতে লাগিল। বড় বড় কালো কালো বাস্ত্রাকু, গোল আলু, কর্পি, কলাইসুঁটিতে ঘর পুরিয়া যাইতে লাগিল। দধি দুগ্ধ ঘট নবনীতের ত কথা নাই। প্রজাদিগের ভক্তি অচলা, কিন্তু বাবুর উদর তেমন নহে। বাবুর কথা দূরে থাকুক, পাইক পিয়াদার পর্য্যন্ত উদরাময়ের লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল।

কিন্তু সে সকল ত বাজে কথা। আসল কথা, জমীদারকে “আগমনী”, “নজর” বা “সেলামী” দিতে হইবে। আবার টাকার অঙ্কে ৯০ বসিল। কিন্তু সকলে এত পারে না। যে পারিল, সে দিল। যে পারিল না, সে কাছারিতে কয়েদ হইল, অথবা তাহার দেনা বাকির সামিল হইল।

পরাণ মন্ডল দিতে পারিল না। কিন্তু তাহার ক্ষেত্রে উত্তম ফসল হইয়াছে। তাহাতে

বাংকম রচনাবলী

গোমস্তার চোখ পড়িল। তিনি আট আনার ষ্ট্যাম্প খরচ করিয়া, উপযুক্ত আদালতে “ক্রোক সহায়তার” প্রার্থনায় দরখাস্ত করিলেন। দরখাস্তের তাৎপর্য এই, “পরাণ মন্ডলের নিকট খাজানা বাকি, আমরা তাহার ধান্য ক্রোক করিব। কিন্তু পরাণ বড় দাঙ্গাবাজ লোক, ক্রোক করিলে দাঙ্গা হাঙ্গামা খুন জখম করিবে বলিয়া লোক জমায়ত করিয়াছে। অতএব আদালত হইতে পিয়াদা মোকরর হউক।” গোমস্তা নিরীহ ভাল মানুষ, কেবল পরাণ মন্ডলের যত অত্যাচার। সুতরাং আদালত হইতে পিয়াদা নিষুক্ত হইল। পিয়াদা ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াই মায়াময় রৌপ্যচক্রের মায়ায় অভিভূত হইল। দাঁড়াইয়া থাকিয়া পরাণের ধানগুলিন কাটাইয়া জমীদারের কাছারিতে পাঠাইয়া দিল। ইহার নাম “ক্রোক সহায়তা”।

পরাণ দেখিল সর্বস্ব গেল। মহাজনের ঋণও পরিশোধ করিতে পারিব না, জমীদারের খাজানাও দিতে পারিব না, পেটেও খাইতে পাইব না। এত দিন পরাণ সহিয়াছিল—কুমীরের সঙ্গে বাদ করিয়া জলে বাস করা চলে না। পরাণ মন্ডল শুনিল যে, ইহার জন্য নালিশ চলে। পরাণ নালিশ করিয়া দেখিবে। কিন্তু সে ত সোজা কথা নহে। আদালত এবং বারাঙ্গনার মন্দির তুল্য; অর্থ নহিলে প্রবেশের উপায় নাই। ষ্ট্যাম্পের মূল্য চাই; উকীলের ফিস্ চাই; আসামী সাক্ষীর তলবানা চাই; সাক্ষীর খোরাকি চাই; সাক্ষীদের পারিতোষিক আছে; হয়ত আমীন খরচা লাগিবে। এবং আদালতের পিয়াদা ও আমলাবর্গ কিছু কিছু প্রত্যাশা রাখেন। পরাণ নিঃস্ব।—তথাপি হাল বলদ ঘটি বাটি বেচিয়া আদালতে নালিশ করিল। ইহার অপেক্ষা তাহার গলায় দড়ি দিয়া মরা ভাল ছিল।

অর্নি জমীদারের পক্ষ হইতে পালটা নালিশ হইল যে, পরাণ মন্ডল ক্রোক অদুল করিয়া সকল ধান কাটিয়া লইয়া বিক্রয় করিয়াছে। সাক্ষীরা সকল জমীদারের প্রজা—সুতরাং জমীদারের বশীভূত; স্নেহে নহে—ভয়ে বশীভূত। সুতরাং তাঁহার পক্ষেই সাক্ষ্য দিল। পিয়াদা মহাশয় রৌপ্যমন্ডের সেই পথবত্তী। সকলেই বলিল, পরাণ ক্রোক অদুল করিয়া ধান কাটিয়া বেচিয়াছে। জমীদারের নালিশ ডিক্রী হইল, পরাণের নালিশ ডিস্‌মিস্ হইল। ইহাতে পরাণের লাভ প্রথমতঃ, জমীদারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইল, দ্বিতীয়তঃ, দুই মোকদ্দমাতেই জমীদারের খরচা দিতে হইল, তৃতীয়তঃ, দুই মোকদ্দমাতেই নিজের খরচা ঘর হইতে গেল।

পরাণের আর এক পয়সা নাই, কোথা হইতে এত টাকা দিবে? যদি জরিমি বেচিয়া দিতে পারিল, তবে দিল; নচেৎ জেলে গেল; অথবা দেশত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

আমরা এমত বলি না যে, এই অত্যাচারগুলিন সকলই একজন প্রজার প্রতি এক বৎসর মধ্যে হইয়া থাকে বা সকল জমীদারই এরূপ করিয়া থাকেন। তাহা হইলে দেশ রক্ষা হইত না। পরাণ মন্ডল কল্পিত ব্যক্তি—একটি কল্পিত প্রজাকে উপলক্ষ্য করিয়া, প্রজার উপর সচরাচর অত্যাচার-পরায়ণ জমীদারেরা যত প্রকার অত্যাচার করিয়া থাকেন, তাহা বিবৃত করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আজ একজনের উপর একরূপ, কাল অন্য প্রজার উপর অনুরূপ পীড়ন হইয়া থাকে।

জমীদারদিগের সকল প্রকার দৌরাখোর কথা যে বলিয়া উঠিতে পারিয়াছি, এমত নহে। জমীদারবিশেষে, প্রদেশবিশেষে, সময়বিশেষে যে কত রকমে টাকা আদায় করা হয়, তাহার তালিকা করিয়া সমাপ্ত করা যায় না। সর্বত্র এক নিয়ম নহে; এক স্থানে সকলের এক নিয়ম নহে; অনেকের কোন নিয়মই নাই, যখন যাহা পারেন, আদায় করেন।

এক্ষণে জমীদারদিগের পক্ষে কয়েকটি কথা বলিবার প্রয়োজন আছে।

প্রথমতঃ আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, সকল জমীদার অত্যাচারী নহেন। দিন দিন অত্যাচারপরায়ণ জমীদারের সংখ্যা কমিতেছে। কলিকাতাস্থ সুশিক্ষিত ভূস্বামীদিগের কোন অত্যাচার নাই—যাহা আছে, তাহা তাঁহাদিগের অজ্ঞাতে এবং অভিমতবিরুদ্ধে, নায়েব গোমস্তা-গণের দ্বারায় হয়। মফঃস্বলেও অনেক সুশিক্ষিত জমীদার আছেন, তাঁহাদিগেরও প্রায় ঐরূপ। বড় বড় জমীদারদিগের অত্যাচার তত অধিক নহে;—অনেক বড় বড় ঘরে অত্যাচার একেবারে নাই। সামান্য সামান্য ঘরেই অত্যাচার অধিক। যাঁহার জমীদারী হইতে লক্ষ টাকা আইসে—অধর্মচরণ করিয়া প্রজাদিগের নিকট আর পঁচিশ হাজার টাকা লইবার জন্য তাঁহার মনে প্রবৃত্তি দুর্ভালা হইবারই সম্ভাবনা, কিন্তু যাঁহার জমীদারী হইতে বার মাসে বার শত আসে না, অথচ জমীদারী চাল চলনে চলিতে হইবে, তাঁহার মারপিট করিয়া আর কিছু সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা

সুতরাং বলবতী হইবে। আবার যাঁহারা নিজে জমীদার, আপন প্রজার নিকট খাজানা আদায় করেন, তাঁহাদের অপেক্ষা পত্তনীদার, দরপত্তনীদার, ইজারাদারের দৌরাণ্ড্য অধিক। আমরা সংক্ষেপানুরোধে উপরে কেবল জমীদার শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। জমীদার অর্থে করগ্রাহী বুদ্ধিতে হইবে। ইহারা জমীদারকে জমীদারের লাভ দিয়া তাহার উপর লাভ করিবার জন্য ইজারা পত্তনি গ্রহণ করেন, সুতরাং প্রজার নিকট হইতেই তাঁহাদিগকে লাভ পোষাইয়া লইতে হইবে। মধ্যবর্তী তালুকের সৃজন প্রজার পক্ষে বিষম অনিষ্টকর।

দ্বিতীয়তঃ, আমরা যে সকল অত্যাচার বিবৃত করিয়াছি, তাহার অনেকই জমীদারের অজ্ঞাতে, কখন বা অভিমতবিরুদ্ধে, নায়েব গোমস্তা প্রভৃতি দ্বারা হইয়া থাকে। প্রজার উপর যে কোনরূপ পীড়ন হয়, অনেকেই তাহা জানেন না।

তৃতীয়তঃ, অনেক জমীদারীর প্রজাও ভাল নহে। পীড়ন না করিলে খাজানা দেয় না। সকলের উপর নালিশ করিয়া খাজানা আদায় করিতে গেলে জমীদারের সর্বনাশ হয়। কিন্তু এতৎসম্বন্ধে ইহাও বক্তব্য যে, প্রজার উপর আগে অত্যাচার না হইলে, তাহারা বিরুদ্ধভাব ধারণ করে না।

যাঁহারা জমীদারদিগকে কেবল নিন্দা করেন, আমরা তাঁহাদিগের বিরোধী। জমীদারদিগের দ্বারা অনেক সংকার্য্য অনর্দীষ্ট হইতেছে। গ্রামে গ্রামে যে এক্ষণে বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইতেছে, আপামর সাধারণ সকলেই যে আপন আপন গ্রামে বসিয়া বিদ্যোপার্জন করিতেছে, ইহা জমীদারদিগের গুণে। জমীদারেরা অনেক স্থানে চিকিৎসালয়, রথ্যা, অতিথিশালা ইত্যাদি সৃজন করিয়া সাধারণের উপকার করিতেছেন। আমাদের দেশে লোকের জন্য যে ভিন্ন জাতীয় রাজপুরুষদিগের সমক্ষে দুটো কথা বলে, সে কেবল জমীদারের ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশ্যান—জমীদারদের সমাজ। অতএব জমীদারদিগের কেবল নিন্দা করা, অতি অন্যায়পরতার কাজ। এই সম্প্রদায়ভুক্ত কোন কোন লোকের দ্বারা যে প্রজাপীড়ন হয়, ইহাই তাঁহাদের লজ্জাজনক কলঙ্ক। এই কলঙ্ক অপনীত করা, জমীদারদিগের হাত। যদি কোন পরিবারে পাঁচ ভাই থাকে, তাহার মধ্যে দুই ভাই দূর্শচারিত্র হয়, তবে আর তিন জনে দূর্শচারিত্র ভ্রাতৃদ্বয়ের চরিত্র সংশোধন জন্য যত্ন করেন। জমীদার সম্প্রদায়ের প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, তাঁহারাও সেইরূপ করুন। সেই কথা বলিবার জন্যই আমাদের এ প্রবন্ধ লেখা। আমরা রাজপুরুষদিগকে জানাইতেছি না—জনসমাজকে জানাইতেছি না। জমীদারদিগের কাছেই আমাদের নালিশ। ইহা তাঁহাদিগের অসাধ্য নহে। সকল দণ্ড অপেক্ষা আপন সম্প্রদায়ের বিরাগ, আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে অপমান সর্বাপেক্ষা গুরুতর, এবং কার্য্যকরী। যত কুলোক চুরি করিতে ইচ্ছুক হইয়া চৌর্য্যে বিরত, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রতিবাসীদিগের মধ্যে চোর বলিয়া ঘৃণিত হইবার ভয়ে চুরি করে না। এই দণ্ড যত কার্য্যকরী, আইনের দণ্ড তত নহে। জমীদারের পক্ষে এই দণ্ড জমীদারেরই হাত। অপর জমীদারের নিকট ঘৃণিত, অপমানিত ও সমাজচ্যুত হইবার ভয় থাকিলে অনেক দুর্ভাগ্য জমীদার দুর্ভাগ্য ত্যাগ করিবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এ দেশীয় কৃষকদিগের এ দুর্দর্শা কিসে হইল? এ ঘোরতর সামাজিক বৈষম্য কোথা হইতে জন্মিল? সাম্য নীতি বুদ্ধিবিহার জন্য আমরা তাহা সন্নিহিত বালিতেছি।

ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, বঙ্গদেশের কৃষকের দুর্দর্শা আজি কালি হয় নাই। ভারতবর্ষীয় ইতর লোকের অনুন্নতি ধারাবাহিক; যতদিন হইতে ভারতবর্ষে সভ্যতার সৃষ্টি, প্রায় ততদিন হইতে ভারতবর্ষীয় কৃষকদিগের দুর্দর্শার সূত্রপাত। পাশ্চাত্যেরা কথায় বলেন, একদিনে রোমনগরী নিশ্চিন্ত হয় নাই। এদেশের কৃষকদিগের দুর্দর্শাও দুই এক শত বৎসরে ঘটে নাই। কি কারণে ভারতবর্ষের প্রজা চিরকাল উন্নতিহীন, অদ্য আমরা তাহার অনুসন্ধান প্রবৃত্ত হইব।

জ্ঞানবৃদ্ধিই যে সভ্যতার মূল এবং পরিমাণ, ইহা বকুল সাহেবের স্থূল কথা। বকুল বলেন যে, জ্ঞানিক উন্নতি ভিন্ন নৈতিক উন্নতি নাই। সে কথায় আমরা অনুমোদন করি না, কিন্তু জ্ঞানিক উন্নতি যে সভ্যতার কারণ, এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। জ্ঞানের উন্নতি না হইলে

বিক্ষম রচনাবলী

সভ্যতার উন্নতি হইবে না। জ্ঞান আপনি জন্মে না; অতিশয় শ্রমলভ্য। কেহ যদি বিদ্যালোচনার রত না হয়, তবে সমাজমধ্যে জ্ঞানের প্রকাশ হইবে না। কিন্তু বিদ্যালোচনার পক্ষে অবকাশ আবশ্যিক। বিদ্যালোচনার পূর্বে উদরপোষণ চাই; অনাহারে কেহ জ্ঞানালোচনা করিবে না। যদি সকলকেই আহারান্বেষণে ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়, তবে কাহারও জ্ঞানালোচনার অবকাশ হয় না। অতএব সভ্যতার সৃষ্টির পক্ষে প্রথমে আবশ্যিক যে, সমাজমধ্যে একটি সম্প্রদায় শারীরিক শ্রম ব্যতীত আত্মভরণপোষণে সক্ষম হইবে। অন্যো পরিশ্রম করিবে, তাঁহারা বসিয়া বিদ্যালোচনা করিবেন। যদি শ্রমোপজীবীরা সকলেই কেবল আত্মভরণপোষণের যোগ্য খাদ্য উৎপন্ন করে, তাহা হইলে এরূপ ঘটিবে না; কেন না, যাহা জন্মিবে, তাহা শ্রমোপজীবীদের সেবায় যাইবে, আর কাহারও জন্য থাকিবে না। কিন্তু যদি তাহারা আত্মভরণপোষণের প্রয়োজনীয় পরিমাণের অপেক্ষা অধিক উৎপাদন করে, তবে তাহাদিগের ভরণপোষণ বাদে কিছু সঞ্চিত হইবে। তদ্বারা শ্রমবিরত ব্যক্তিরা প্রতিপালিত হইয়া বিদ্যানুশীলন করিতে পারেন। তখন জ্ঞানের উদয় সম্ভব। উৎপাদকের খাইয়া পরিয়া যাহা রহিল, তাহাকে সঞ্চয় বলা যাইতে পারে। অতএব সভ্যতার উদয়ের পূর্বে প্রথমে আবশ্যিক—সামাজিক ধনসঞ্চয়ন।

কোন দেশে সামাজিক ধনসঞ্চয় হয়, কোন দেশে হয় না। যেখানে হয়, সে দেশ সভ্য হয়। যে দেশে হয় না, সে দেশ অসভ্য থাকে। কি কি কারণে দেশবিশেষে আদিম ধনসঞ্চয় হইয়া থাকে? দুইটি কারণ সংক্ষেপে নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে। প্রথম কারণ, ভূমির উর্বরতা। যে দেশের ভূমি উর্বরা, সে দেশে সহজে অধিক শস্য উৎপন্ন হইতে পারে। সুতরাং শ্রমোপজীবীদিগের ভরণপোষণের পর আরও কিছু অবশিষ্ট থাকিয়া সঞ্চিত হইবে। দ্বিতীয় কারণ, দেশের উষ্ণতা বা শীতলতা। শীতোষ্ণতার ফল দ্বিবিধ। প্রথমতঃ, যে দেশ উষ্ণ, সে দেশের লোকের অল্পাহার আবশ্যিক, শীতল দেশে অধিক আহার আবশ্যিক। এই কথা কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়মের উপর নির্ভর করে, তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লিখিবার স্থান নাই; আমরা এতদংশ বক্তার গ্রন্থের অনুবর্তী হইয়া লিখিতেছি; কোতূহলবিশিষ্ট পাঠক সেই গ্রন্থ দেখিবেন। যে দেশের লোকের সাধারণতঃ অল্প খাদ্যের প্রয়োজন, সে দেশে শীঘ্র যে সামাজিক ধনসঞ্চয় হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। উষ্ণতার দ্বিতীয় ফল, বকল্ এই বলেন যে, তাপাধিক্য হেতু লোকের শারীরিক তাপজনক খাদ্যের তত আবশ্যিক হয় না। যে দেশ শীতল, সে দেশে শারীরিক তাপজনক খাদ্যের অধিক আবশ্যিক। শারীরিক তাপ শ্বাসগত বায়ুর অম্ল-জানের সঙ্গে শরীরস্থ দ্রব্যের কার্বনের রাসায়নিক সংযোগের ফল। অতএব যে খাদ্যে কার্বন অধিক আছে, তাহাই তাপজনক ভোজ্য। মাংসাদিতেই অধিক কার্বন। অতএব শীতপ্রধান দেশের লোকের মাংসাদির বিশেষ প্রয়োজন। উষ্ণদেশে মাংসাদি অপেক্ষাকৃত অনাবশ্যিক—বনজের অধিক আবশ্যিক। বনজ সহজে প্রাপ্য—কিন্তু পশুহনন কষ্টসাধ্য, এবং ভোজ্য পশু দুর্লভ। অতএব উষ্ণদেশের খাদ্য অপেক্ষাকৃত সুলভ। খাদ্য সুলভ বলিয়া শীঘ্র ধনসঞ্চয় হয়।

ভারতবর্ষ উষ্ণদেশ, এবং তথায় ভূমিও উর্বরা। সুতরাং ভারতবর্ষে অতি শীঘ্র ধনসঞ্চয় হওয়াই সম্ভব। এই জন্য ভারতবর্ষে অতি পূর্বকালেই সভ্যতার অভ্যুদয় হইয়াছিল। ধনাধিক্য হেতু, একটি সম্প্রদায় কার্যিক পরিশ্রম হইতে অবসর লইয়া, জ্ঞানালোচনায় তৎপর হইতে পারিয়াছিলেন। তাহাদিগের অজির্জিত ও প্রচারিত জ্ঞানের কারণেই ভারতবর্ষের সভ্যতা। পাঠক বুঝিয়াছেন যে, আমরা ব্রাহ্মণদিগের কথা বলিতেছি।

কিন্তু এইরূপ প্রথমকালিক সভ্যতাই ভারতীয় প্রজার দুর্দৃষ্টির মূল। যে যে নিয়মের বশে অকালে সভ্যতা জন্মিয়াছিল, সেই সেই নিয়মের বশেই তাহার অধিক উন্নতি কোন কালেই হইতে পারিল না;—সেই সেই নিয়মের বশেই সাধারণ প্রজার দুর্দর্শা ঘটিল। প্রভাতেই মেঘাচ্ছন্ন। বালতরু ফলবান্ হওয়া ভাল নহে।

যখন জনসমাজে ধনসঞ্চয় হইল, তখন কাজে কাজেই সমাজ দ্বিভাগে বিভক্ত হইল। এক ভাগ শ্রম করে; এক ভাগ শ্রম করে না। এই দ্বিতীয় ভাগের শ্রম করিবার আবশ্যিকতা নাই বলিয়া তাহারা করে না; প্রথম ভাগের উৎপাদিত অতিরিক্ত খাদ্যে তাহাদের ভরণপোষণ হয়। যাহারা শ্রম করে না, তাহারাই কেবল সাবকাশ; সুতরাং চিন্তা, শিক্ষা ইত্যাদিতে তাহাদিগেরই একাধিকার। যে চিন্তা করে, শিক্ষা পায়, অর্থাৎ যাহার বুদ্ধি মার্জিত হয়, সে অন্যাপেক্ষা যোগ্য, এবং ক্ষমতামালী হয়। সুতরাং সমাজমধ্যে ইহাদিগেরই প্রধানত্ব হয়। যাহারা

শ্রমোপজীবী, তাহারা ইহাদিগের বশবর্তী হইয়া শ্রম করে। অতএব প্রথমেই বৈষম্য উপস্থিত হইল। কিন্তু এ বৈষম্য প্রাকৃতিক, ইহার উচ্ছেদ সম্ভবে না। এবং উচ্ছেদ মঙ্গলকরও নহে।

বুদ্ধ্যুপজীবীর জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা শ্রমোপজীবীরা উপকৃত হয়, পুরস্কারস্বরূপ উহারা শ্রমোপজীবীর অর্জিত ধনের অংশ গ্রহণ করে; শ্রমোপজীবীর ভরণপোষণের জন্য যাহা প্রয়োজনীয়, তাহার অতিরিক্ত যাহা জন্মে, তাহা উহাদেরই হাতে জন্মে। অতএব সমাজের যে অতিরিক্ত ধন, তাহা ইহাদেরই হাতে সঞ্চিত হইতে থাকে। তবে, দেশের উৎপন্ন ধন দুই ভাগে বিভক্ত হয়, এক ভাগ শ্রমোপজীবীর, এক ভাগ বুদ্ধ্যুপজীবীর। প্রথম ভাগ, “মজুরির বেতন,” দ্বিতীয় ভাগ ব্যবসায়ের “মুনাফা”।* আমরা, “বেতন” ও “মুনাফা” এই দুইটি নাম ব্যবহার করিতে থাকিব। “মুনাফা” বুদ্ধ্যুপজীবীদের ঘরেই থাকিবে। শ্রমোপজীবীরা “বেতন” ভিন্ন মুনাফার কোন অংশ পায় না। শ্রমোপজীবীরা সংখ্যায় যতই হউক না কেন, উৎপন্ন ধনের যে অংশটি বেতন, সেইটিই তাহাদের মধ্যে বিভক্ত হইবে, “মুনাফার” মধ্য হইতে এক পয়সাও তাহারা পাইবে না।

মনে কর, দেশের উৎপন্ন কোটি মুদ্রা; তন্মধ্যে পঞ্চাশ লক্ষ “বেতন,” পঞ্চাশ লক্ষ “মুনাফা”। মনে কর, দেশে পঁচিশ লক্ষ শ্রমোপজীবী। তাহা হইলে এই পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা “বেতন,” পঁচিশ লক্ষ লোকের মধ্যে ভাগ হইবে, প্রত্যেক শ্রমোপজীবীর ভাগে দুই মুদ্রা পড়িবে। মনে কর, হঠাৎ ঐ পঁচিশ লক্ষ শ্রমোপজীবীর উপর আর পঁচিশ লক্ষ লোক কোথা হইতে আসিয়া পড়িল। তখন পঞ্চাশ লক্ষ শ্রমোপজীবী হইল। সেই পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রাই ঐ পঞ্চাশ লক্ষ লোকের মধ্যে বিভক্ত হইবে। যাহা “মুনাফা,” তাহার এক পয়সাও উহাদের প্রাপ্য নহে, সুতরাং ঐ পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রার বেশী এক পয়সাও তাহাদের মধ্যে বিভাজ্য নহে। সুতরাং এক্ষণে প্রত্যেক শ্রমোপজীবীর ভাগ দুই মুদ্রার পরিবর্তে এক মুদ্রা হইবে। কিন্তু দুই মুদ্রাই ভরণপোষণের জন্য আবশ্যিক বলিয়াই, তাহা পাইত। অতএব এক্ষণে তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্টে বিশেষ দুন্দর্শা হইবে।

যদি ঐ লোকাগমের সঙ্গে সঙ্গে আর কোটি মুদ্রা দেশের ধনবৃদ্ধি হইত, তাহা হইলে এ কষ্ট হইত না। পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা বেতন ভাগের স্থানে লক্ষ মুদ্রা বেতন ভাগ হইত। তখন লোক বেশী আসাতেও সকলের দুই টাকা করিয়া কুলাইত।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি শ্রমোপজীবীদের মহৎ অনিষ্টের কারণ। যে পরিমাণে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হয়, যদি সেই পরিমাণে দেশের ধনবৃদ্ধি পায়, তবে শ্রমোপজীবীদের কোন অনিষ্ট নাই। যদি লোকসংখ্যা বৃদ্ধির অপেক্ষাও ধনবৃদ্ধি গুরুতর হয়, তবে শ্রমোপজীবীদের শ্রীবৃদ্ধি—যথা ইংলন্ড ও আমেরিকায়। আর যদি এই দুইয়ের একও না ঘটিয়া, ধনবৃদ্ধির অপেক্ষা লোকসংখ্যা বৃদ্ধি অধিক হয়, তবে শ্রমোপজীবীদের দুন্দর্শা। ভারতবর্ষে প্রথমোদ্যমেই তাহাই ঘটিল।

লোকসংখ্যা বৃদ্ধি স্বাভাবিক নিয়ম। এক পুরুষ ও এক স্ত্রী হইতে অনেক সন্তান জন্মে। তাহার আর একটি সন্তানের আবার অনেক সন্তান জন্মে। অতএব মনুষ্যের দুন্দর্শা এক প্রকার স্বভাবের নিয়মাদিষ্ট। সকল সমাজেই এই অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা। কিন্তু ইহার সদুপায় আছে। প্রকৃত সদুপায় সঙ্গে সঙ্গে ধনবৃদ্ধি। পরন্তু যে পরিমাণে প্রজাবৃদ্ধি, সে পরিমাণে ধনবৃদ্ধি প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না। ঘটিবার অনেক বিঘ্ন আছে। অতএব উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হয়। উপায়ান্তর দুইটি মাত্র। এক উপায়ে দেশীয় লোকের কিয়দংশের দেশান্তরে গমন। কোন দেশে লোকের অল্পে কুলায় না, অন্য দেশে অল্প খাইবার লোক নাই। প্রথমোক্ত কতক দেশের লোক শেষোক্ত দেশে যাউক, তাহা হইলে প্রথমোক্ত দেশের লোকসংখ্যা কমিবে। এবং শেষোক্ত দেশেরও কোন অনিষ্ট ঘটিবে না। এইরূপে ইংলন্ডের মহদুপকার হইয়াছে। ইংলন্ডের লোক আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং পৃথিবীর অন্যান্য ভাগে বাস করিয়াছে। তাহাতে ইংলন্ডের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, উপনিবেশ সকলেরও মঙ্গল হইয়াছে।

দ্বিতীয় উপায় বিবাহপ্রবৃত্তির দমন। এইটি প্রধান উপায়। যদি সকলেই বিবাহ করে, তবে

* “ভূমির কর” এবং “সুদ” ইহার অন্তর্গত এ স্থলে বিবেচনা করিতে হইবে। সংক্ষেপাভিপ্রায়ে আমরা কর বা সুদের উল্লেখ করিলাম না।

বিক্রম রচনাবলী

প্রজাবৃদ্ধির সীমা থাকে না। কিন্তু যদি কতক লোক অবিবাহিত থাকে, তবে প্রজাবৃদ্ধির লাঘব হয়। যে দেশে জীবনের স্বচ্ছন্দতা লোকের অভ্যস্ত, যেখানে জীবিকানির্ব্বাহের সামগ্রী প্রচুর-পরিমাণে আবশ্যিক, এবং কষ্টে আহরণীয়, সেখানকার লোকে বিবাহপ্রবৃত্তি দমন করে। পরিবার প্রতিপালনের উপায় না দেখিলে বিবাহ করে না।

ভারতবর্ষে এই দুইটির একটি উপায়ও অবলম্বিত হইতে পারে নাই। উষ্ণতা শরীরের শৈথিল্যজনক, পরিশ্রমে অপবৃত্তিদায়ক। দেশান্তরে গমন, উৎসাহ, উদ্যোগ এবং পরিশ্রমের কাজ। বিশেষতঃ প্রকৃতিও তাহার প্রতিকূলতাচরণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষকে অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত এবং বাতাসকুল সমুদ্রমধ্যস্থ করিয়া বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। যবদ্বীপ এবং বালি উপদ্বীপ ভিন্ন আর কোন হিন্দু উপনিবেশের কথা শুনায় না। ভারতবর্ষের ন্যায় বৃহৎ এবং প্রাচীন দেশের এইরূপ সামান্য উপনিবেশিকা ক্রিয়া গণনীয় নহে।

বিবাহপ্রবৃত্তির দমনবিষয়ে ভারতবর্ষের আরও গন্দাবস্থা। মাটি আঁচড়াইলেই শস্য জন্মে, তাহার যৎকিঞ্চিৎ ভোজন করিলেই শরীরের উপকার হউক না হউক, ক্ষুধানিবৃত্তি এবং জীবন-ধারণ হয়। বায়ুর উষ্ণতাপ্রযুক্ত পরিচ্ছদের বাহুল্যের আবশ্যিকতা নাই। সুতরাং অপকৃষ্ট জীবিকা অতি সুলভ। এমত অবস্থায় পরিবার প্রতিপালনে অক্ষমতাভয়ে কেহ ভীত নহে। সুতরাং বিবাহপ্রবৃত্তি দমনে প্রজা পরাঙ্মুখ হইল। প্রজাবৃদ্ধির নিবারণের কোন উপায়ই অবলম্বিত না হওয়াতে তাহার বেগ অপ্রতিহত হইল। কাজে কাজেই সভ্যতার প্রথম অভ্যুদয়ের পরেই, ভারতীয় শ্রমোপজীবীর দুর্দশা আরম্ভ হইল। যে ভূমির উর্ব্বরতা ও বায়ুর উষ্ণতাহেতুক সভ্যতার উদয়, তাহাতেই জনসাধারণের দুর্দবস্থার কারণ সৃষ্ট হইল। উভয়ই অলঙ্ঘ্য নৈসর্গিক নিয়মের ফল।

শ্রমোপজীবীর এই কারণে দুর্দশার আরম্ভ। কিন্তু একবার অবনতি আরম্ভ হইলেই, সেই অবনতিরই ফলে আরও অবনতি ঘটে। শ্রমোপজীবীদিগের যে পরিমাণে দুর্দবস্থা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, সেই পরিমাণে তাহাদিগের সহিত সমাজের অন্য সম্প্রদায়ের তারতম্য অধিকতর হইতে লাগিল। প্রথম ধনের তারতম্য—তৎফলে অধিকারের তারতম্য। শ্রমোপজীবীরা হীন হইল বলিয়া তাহাদের উপর বুদ্ধ্যপজীবীদিগের প্রভুত্ব বাড়িতে লাগিল। অধিক প্রভুত্বের ফল অধিক অত্যাচার। এই প্রভুত্বই শূদ্রপীড়ক স্মৃতিশাস্ত্রের মূল। এই বৈষম্যই অস্বাভাবিক। ইহাই অমঙ্গলের কারণ।

আমরা যে সকল কথা বলিলাম, তাহার তিনটি গুরুতর তাৎপর্য দেখা যায়।

১। শ্রমোপজীবীদিগের অবনতির যে সকল কারণ দেখাইলাম, তাহার ফল ত্রিবিধ।

প্রথম ফল, শ্রমের বেতনের অল্পতা। ইহার নামান্তর দারিদ্র্য। ইহা বৈষম্যবর্দ্ধক।

দ্বিতীয় ফল, বেতনের অল্পতা হইলেই পরিশ্রমের আধিক্যের আবশ্যিক হয়; কেন না, যাহা কমিল, তাহা খাটিয়া পোষাইয়া লইতে হইবে। তাহাতে অবকাশের ধ্বংস। অবকাশের অভাবে বিদ্যালোচনার অভাব। অতএব দ্বিতীয় ফল মূর্খতা। ইহাও বৈষম্যবর্দ্ধক।

তৃতীয় ফল, বুদ্ধ্যপজীবীদিগের প্রভুত্ব এবং অত্যাচার বৃদ্ধি। ইহার নামান্তর দাসত্ব। ইহা বৈষম্যের পরাকাষ্ঠা।

দারিদ্র্য, মূর্খতা, দাসত্ব।

২। ঐ সকল ফল একবার উৎপন্ন হইলে ভারতবর্ষের ন্যায় দেশে প্রাকৃতিক নিয়মগুণে স্থায়িত্ব লাভ করিতে উন্মুখ হয়।

দেখান গিয়াছে যে, ধনসম্পন্নই সভ্যতার আদিম কারণ। যদি বলি যে, ধনলিপ্সা সভ্যতা-বৃদ্ধির নিত্য কারণ, তাহা হইলে অত্যাঙ্কি হইবে না। সামাজিক উন্নতির মূলীভূত, মনুষ্যহৃদয়ে দুইটি বৃত্তি: প্রথম জ্ঞানলিপ্সা, দ্বিতীয় ধনলিপ্সা। প্রথমোক্তটি মহৎ এবং আদরণীয়, দ্বিতীয়টি স্বার্থসাধক এবং নীচ বলিয়া খ্যাত। কিন্তু "History of Rationalism in Europe" নামক গ্রন্থে লৌকি সাহেব বলেন যে, দুইটি বৃত্তির মধ্যে ধনলিপ্সাই মনুষ্যজাতির অধিকতর মঙ্গলকর হইয়াছে। বস্তুতঃ জ্ঞানলিপ্সা কদাচিৎক, ধনলিপ্সা সর্ব্বসাধারণ; এজন্য অপেক্ষাকৃত ফলোপধায়ক। দেশের উৎপন্ন ধনে জনসাধারণের গ্রাসাচ্ছাদনের কুলান হইতেছে বলিয়া সামাজিক ধনলিপ্সা কমে না। সর্ব্বদা নূতন নূতন সুখের আকাঙ্ক্ষা জন্মে। পূর্বে যাহা নিষ্প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইত, পরে তাহা আবশ্যকীয় বোধ হয়। তাহা পাইলে আবার

অন্য সামগ্রী আবশ্যিক বোধ হয়। আকাঙ্ক্ষায় চেষ্টা, চেষ্টায় সফলতা জন্মে। সুতরাং সুখ এবং মঙ্গল বৃদ্ধি হইতে থাকে। অতএব সুখ স্বচ্ছন্দতার আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধি সভ্যতাবৃদ্ধির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। বাহ্য সুখের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যক্ত হইয়া আসিলে জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা, সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা, তৎসঙ্গে কাব্যসাহিত্যাদির প্রিয়তা এবং নানাবিধ বিদ্যার উৎপত্তি হয়। যখন লোকের সুখলালসার অভাব থাকে, তখন পরিশ্রমের প্রবৃত্তি দুর্বল হয়। উৎকর্ষলাভের ইচ্ছাও থাকে না, তৎপ্রতি যত্নও হয় না। তন্নিবন্ধন যে দেশে খাদ্য সুলভ, সে দেশের প্রজাবৃদ্ধির নিবারণকারিণী প্রবৃত্তি সকলের অভাব হয়। অতএব যে “সন্তোষ” কবিদিগের অশেষ প্রশংসার স্থান, তাহা সমাজোন্নতির নিতান্ত অনিষ্টকারক; কবিগীতা এই প্রবৃত্তি সামাজিক জীবনের হলাহল।

লোকের অনিষ্টপূর্ণ সন্তুষ্টভাব, ভারতবর্ষে প্রাকৃতিক নিয়মগুণে সহজেই ঘটিত। এ দেশে, তাপের কারণ অধিক কাল ধরিয়া এককালীন পরিশ্রম অসহ্য। তৎকারণ পরিশ্রমে অনিচ্ছা অভ্যাসগত হয়। সেই অভ্যাসের আরও কারণ আছে। উষ্ণদেশে শরীরমধ্যে অধিক তাপের সমৃদ্ধাবের আবশ্যিক হয় না বলিয়া তথাকার লোকে যে মৃগয়াদিতে তাদৃশ রত হয় না, ইহা পূর্বে কথিত হইয়াছে। বন্য পশু হনন করিয়া খাইতে হইলে পরিশ্রম, সাহস, বল এবং কার্যতৎপরতা অভ্যস্ত হয়। ইউরোপীয় সভ্যতার একটি মূল, পূর্বকালীন তাদৃক্ অভ্যাস। অতএব একে শ্রমের অনাবশ্যিকতা, তাহাতে শ্রমে অনিচ্ছা, ইহার পরিণাম আলস্য এবং অনুৎসাহ। অভ্যাসগত আলস্য এবং অনুৎসাহেরই নামান্তর সন্তোষ। অতএব ভারতীয় প্রজার একবার দুর্দর্শা হইলে, সেই দশাতেই তাহারা সন্তুষ্ট রহিল। উদ্যমভাবে আর উন্নতি হইল না। সুপ্ত সিংহের মুখে আহাৰ্য পশু স্বতঃপ্রবেশ করে না।

ভারতবর্ষের পুরাবৃত্তালোচনায় সন্তোষ সম্বন্ধে অনেকগুলি বিচিত্র তত্ত্ব পাওয়া যায়। ঐহিক সুখে নিম্পৃহতা, হিন্দুধর্ম এবং বৌদ্ধধর্ম উভয় কর্তৃক অনুজ্ঞাত। কি ব্রাহ্মণ, কি বৌদ্ধ, কি স্মার্ত্ত, কি দার্শনিক, সকলেই প্রাণপণে ভারতবাসীদিগকে শিখাইয়াছেন যে, ঐহিক সুখ অনাদরণীয়। ইউরোপেও ধর্মযাজকগণকর্তৃক ঐহিক সুখে অনাদরতত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছিল। ইউরোপে যে রোমীয় সভ্যতা লোপের পর সহস্র বৎসর মনুষ্যের ঐহিক অবস্থা অনুন্নত ছিল, এইরূপ শিক্ষাই তাহার কারণ। কিন্তু যখন ইতালিতে প্রাচীন গ্রীক্ সাহিত্য, গ্রীক্ দর্শনের পুনরুদয় হইল, তখন তৎপ্রদত্ত শিক্ষানিবন্ধন ঐহিকে বিরক্তি ইউরোপে ক্রমে মন্দীভূত হইল। সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতারও বৃদ্ধি হইল। ইউরোপে এ প্রবৃত্তি বন্ধমূল হইতে পারে নাই। ভারতবর্ষে ইহা মনুষ্যের দ্বিতীয় স্বভাব স্বরূপে পরিণত হইয়াছে। যে ভূমি যে বৃক্ষের উপযুক্ত, সেইখানেই তাহা বন্ধমূল হয়। এ দেশের ধর্মশাস্ত্র কর্তৃক যে নিবৃত্তিজনক শিক্ষা প্রচারিত হইল, দেশের অবস্থাই তাহার মূল; আবার সেই ধর্মশাস্ত্রের প্রদত্ত শিক্ষায় প্রাকৃতিক অবস্থা জন্য নিবৃত্তি আরও দৃঢ়ীভূত হইল।

এতন্নিবন্ধন ইউরোপে এবং ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন ফল ফলিল। সুপ্তোখিত ইউরোপীয় প্রজাগণ, ঐহিক সুখে রত হইয়া সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণে চেষ্টিত হইল। ইহার ফল সুখ, সমৃদ্ধি, সভ্যতাবৃদ্ধি। ভারতবর্ষীয় প্রজাগণ নিদ্রিত রহিল; সামাজিক বৈষম্য ধারাবাহিক হইয়া চলিল। ইহার ফল অবনতি।

৩। শ্রমোপজীবীদিগের দুরবস্থা যে চিরস্থায়ী হয়, কেবল তাহাই নহে। তন্নিবন্ধন সমাজের অন্য সম্প্রদায়ের লোকের গোরবের ধ্বংস হয়। যেমন এক ভাণ্ড দুক্ষে এক বিন্দু অম্ল পড়িলে, সকল দুগ্ধ দাধি হয়, তেমনি সমাজের এক অধঃশ্রেণীর দুর্দর্শায় সকল শ্রেণীরই দুর্দর্শা জন্মে।

(ক) উপজীবিকানুসারে, প্রাচীন আর্ষেরা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। বৈষম্যের উপর বৈষম্য। শূদ্র অধস্তন শ্রেণী; তাহাদিগেরই দুর্দর্শার কথা এতক্ষণ বলিতেছিলাম। বৈশ্য বাণিজ্যব্যবসায়ী। বাণিজ্য, শ্রমোপজীবীর শ্রমোৎপন্ন দ্রব্যের প্রাচুর্যের উপর নির্ভর করে। যে দেশে দেশের আবশ্যকীয় সামগ্রীর অতিরিক্ত উৎপন্ন না হয়, সে দেশে বাণিজ্যের উন্নতি হয় না। বাণিজ্যের উন্নতি না হইলে, বাণিজ্যব্যবসায়ীদিগের সৌষ্ঠবের হানি। লোকের অভাববৃদ্ধি, বাণিজ্যের মূল। যদি আমরাদিগের অন্য দেশোৎপন্ন সামগ্রী গ্রহণেচ্ছা না থাকে, তবে কেহ অন্য দেশোৎপন্ন সামগ্রী আমাদের কাছে আনিয়া বিক্রয়

বাংকম রচনাবলী

করিবে না। অতএব যে দেশের লোক অভাবশূন্য, নিজ শ্রমোৎপন্ন সামগ্রীতে সন্তুষ্ট, সে দেশে বর্ণিকদিগের শ্রীহানি অবশ্য হইবে। কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, তবে কি ভারতবর্ষে বর্ণিজ্য ছিল না? ছিল বৈ কি। ছিল, কিন্তু ভারতবর্ষের তুল্য বিস্তৃত উর্ধ্বরা ভূমিবিশিষ্ট বহুধনের আকরস্বরূপ দেশে যে রূপ বর্ণিজ্যবাহুল্য হওয়ার সম্ভাবনা ছিল,—অতি প্রাচীন কালেই যে সম্ভাবনা ছিল, তাহার কিছুই হয় নাই। বর্ণিজ্যহানির অন্যান্য কারণও ছিল, যথা—ধর্মশাস্ত্রের প্রতিবন্ধকতা, সমাজের অভ্যস্ত অনুৎসাহ ইত্যাদি। এ প্রবন্ধে সে সকলের উল্লেখের আবশ্যিক নাই।

(খ) ক্ষত্রিয়েরা রাজা বা রাজপুরুষ। যদি পৃথিবীর পুরাবৃত্তে কোন কথা নিশ্চিত প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, তবে সে কথাটি এই যে, সাধারণ প্রজা সতেজ এবং রাজনিয়ন্তা না হইলে, রাজপুরুষদিগের স্বভাবের উন্নতি হয় না, অবনতি হয়। যদি কেহ কিছু না বলে, রাজপুরুষেরা সহজেই স্বেচ্ছাচারী হইলেন। স্বেচ্ছাচারী হইলেই, আত্মসুখরত, কার্যে শিথিল, এবং দক্ষিণ্যাবিত হইতে হয়। অতএব যে দেশের প্রজা নিস্তেজ, নম্র, অনুৎসাহী, অলস, সেইখানেই রাজপুরুষদিগের ঐরূপ স্বভাবগত অবনতি হইবে। যেখানে প্রজা দৃঃখী, অন্নবস্ত্রের কাঙ্গাল, আহারোপার্জনে ব্যস্ত, এবং সন্তুষ্টস্বভাব, সেইখানেই তাহারা নিস্তেজ, নম্র, অনুৎসাহী, অবিরোধী। ভারতবর্ষে বৈষম্যপীড়িত হীন বর্ণেরা তাই। সেই জন্য ভারতবর্ষের রাজগণ, মহাভারতকীর্তিত বলশালী, ধর্মিষ্ঠ, ইন্দ্রিয়জয়ী রাজচরিত্র হইতে মধ্যকালের কাব্যনাটকাদিচর্চিত বলহীন, ইন্দ্রিয়পরবশ, স্ত্রীপণ, অকর্মঠ দশাপ্রাপ্ত হইয়া শেষে মুসলমান-হস্তে লুপ্ত হইলেন। যে দেশে সাধারণ প্রজার অবস্থা ভাল, সে দেশে রাজপুরুষদিগের এরূপ দুর্গতি ঘটে না। তাহারা রাজার দক্ষিণ্যিত দেখিলে তাহার প্রতি রুষ্ট হইতে পারে, এবং হইয়া থাকে। পরম্পরের উপরোধেই উভয় পক্ষের উন্নতি। রাজপুরুষগণ অনর্থক অসন্তোষের ভয়ে সতর্ক থাকেন। কিন্তু ইহাতে কেবল যে এই উপকার, ইহা নহে। রাজকার্যের অপক্ষপাতী সমালোচনায় মানসিক গুণসকলের সৃষ্টি এবং পূর্ন হয়। তদভাবে তৎসমুদায়ের লোপ। শূদ্রের দাসত্বে ক্ষত্রিয়ের ধন এবং ধর্মের লোপ হইয়াছিল। রোমে, প্লিনিয়ানদিগের বিবাদে, ইংলন্ডের কমর্নদিগের বিবাদে প্রভূদিগের স্বাভাবিক উৎকর্ষ জন্মিয়াছিল।

(গ) ব্রাহ্মণ। যেমন, অধঃশ্রেণীর প্রজার অবনতিতে ক্ষত্রিয়দিগের প্রভুত্ব বাড়িয়া, পরিশেষে লুপ্ত হইয়াছিল, ব্রাহ্মণদিগেরও তদ্রূপ। অপর তিন বর্ণের অনুন্নতিতে বর্ণগত ঘোরতর বৈষম্যে ব্রাহ্মণের প্রথমে প্রভুত্ব বৃদ্ধি হয়। অপর বর্ণের মানসিক শক্তির হানি হওয়াতে, তাহাদিগের চিত্ত উপধর্মের বিশেষ বশীভূত হইতে লাগিল। দৌর্ভাগ্য থাকিলেই ভয়াধিক্য হয়। উপধর্ম ভীতিজাত; এই সংসার বলশালী অথচ অনিষ্টকারক দেবতাপূর্ণ, এই বিশ্বাসই উপধর্ম। অতএব অপর বর্ণগ্রয়, মানসিক শক্তিবিহীন হওয়াতে অধিকতর উপধর্মপীড়িত হইল; ব্রাহ্মণেরা উপধর্মের যাজক, সুতরাং তাহাদের প্রভুত্ব বৃদ্ধি হইল। বৈষম্য বৃদ্ধি হইল। ব্রাহ্মণেরা কেবল শাস্ত্রজাল, ব্যবস্থাজাল বিস্তারিত করিয়া ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রকে জড়িত করিতে লাগিলেন। মক্ষিকাগণ জড়াইয়া পড়িল—নাড়বার শক্তি নাই। কিন্তু তথাপি উর্গনাভের জাল ফুরায় না। বিধানের অন্ত নাই। এদিকে রাজশাসনপ্রণালী দণ্ডবিধি দায় সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতি হইতে আচমন, শয়ন, বসন, গমন, কথোপকথন, হাস্য, রোদন, এই সকল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের রচিত বিধির দ্বারা নিয়মিত হইতে লাগিল। “আমরা যে রূপে বালি, সেইরূপে শূইবে, সেইরূপে খাইবে, সেইরূপে বসিবে, সেইরূপে হাঁটিবে, সেইরূপে কথা কহিবে, সেইরূপে হাসিবে, সেইরূপে কাঁদিবে, তোমার জন্ম মৃত্যু পর্য্যন্ত আমাদের ব্যবস্থার বিপরীত হইতে পারিবে না, যদি হয়, তবে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, আমাদের দক্ষিণ্য দিও।” জালের এইরূপ সূত্র। কিন্তু পরকে ভ্রান্ত করিতে গেলে আপনিও ভ্রান্ত হইতে হয়; কেন না, ভ্রান্তির আলোচনায় ভ্রান্তি অভ্যস্ত হয়। যাহা পরকে বিশ্বাস করাইতে চাহি, তাহাতে নিজের বিশ্বাস দেখাইতে হয়; বিশ্বাস দেখাইতে দেখাইতে যথার্থ বিশ্বাস ঘটিয়া উঠে। যে জালে ব্রাহ্মণেরা ভারতবর্ষকে জড়াইলেন, তাহাতে আপনারাও জড়িত হইলেন। পৌরাণিক প্রমাণে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, মানুষের স্বেচ্ছানুভূতির প্রয়োজনানতিরিক্ত রোধ করিলে, সমাজের অবনতি হয়। হিন্দুসমাজের অবনতির অন্য যত কারণ নির্দেশ করিয়াছি, তন্মধ্যে এইটি বোধ হয় প্রধান, অদ্যাপি জাজ্বল্যমান। ইহাতে রুদ্ধ এবং রোধকারী সমান ফলভোগী। নিয়মজালে জড়িত হওয়াতে ব্রাহ্মণদিগের বৃদ্ধি ক্ষুণ্ণ হইল। যে

ব্রাহ্মণ রামায়ণ মহাভারত, পার্গনি ব্যাকরণ, সাংখ্যদর্শন প্রভৃতির অবতারণা করিয়াছিলেন, তাঁহারা বাসবদত্তা, কাদম্বরী প্রভৃতির প্রণয়নে গৌরব বোধ করিতে লাগিলেন। শেষে সে ক্ষমতাও গেল। ব্রাহ্মণদিগের মানসক্ষেত্র মরুভূমি হইল।

অতএব বৈষম্যবিষয় ভারতীয় প্রজার দুর্দর্শার একটি মূল কারণ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মনুষ্যে মনুষ্যে সমানাধিকারবিশিষ্ট—ইহাই সাম্যনীতি। কৃষকে ও ভূম্যাধিকারীতে যে বৈষম্য, সাম্যনীতিভ্রংশের প্রথম উদাহরণ স্বরূপ তাহার উল্লেখ করিয়াছি। দ্বিতীয় উদাহরণ স্বরূপ স্ত্রীপুরুষে যে বৈষম্য, তাহার উল্লেখ করিব।

মনুষ্যে মনুষ্যে সমানাধিকারবিশিষ্ট। স্ত্রীগণও মনুষ্যজাতি, অতএব স্ত্রীগণও পুরুষের তুল্য অধিকারশালিনী। যে যে কার্যে পুরুষের অধিকার আছে, স্ত্রীগণেরও সেই সেই কার্যে অধিকার থাকা ন্যায়সঙ্গত। কেন থাকিবে না? কেহ কেহ উত্তর করিতে পারেন যে, স্ত্রী পুরুষে প্রকৃতিগত বৈষম্য আছে; পুরুষ বলবান্, স্ত্রী অবলা; পুরুষ সাহসী, স্ত্রী ভীরু; পুরুষ ক্রেশসহিষ্ণু, স্ত্রী কোমলা; ইত্যাদি ইত্যাদি; অতএব যেখানে স্বভাবগত বৈষম্য আছে, সেখানে অধিকারগত বৈষম্য থাকাও বিধেয়। কেন না, যে যাহাতে অশক্ত, সে তাহাতে অধিকারী হইতে পারে না।

ইহার দুইটি উত্তর সংক্ষেপে নির্দেশ করিলেই আপাততঃ যথেষ্ট হইবে। প্রথমতঃ স্বভাবগত বৈষম্য থাকিলেই যে অধিকারগত বৈষম্য থাকা ন্যায়সঙ্গত, ইহা আমরা স্বীকার করি না। এ কথাটি সাম্যতত্ত্বের মূলোচ্ছেদক। দেখ, স্ত্রীপুরুষে যেস্বরূপ স্বভাবগত বৈষম্য, ইংরেজ বাঙ্গালিতেও সেইস্বরূপ। ইংরেজ বলবান্, বাঙ্গালি দুর্বল; ইংরেজ সাহসী, বাঙ্গালি ভীরু; ইংরেজ ক্রেশসহিষ্ণু, বাঙ্গালি কোমল; ইত্যাদি ইত্যাদি। যদি এই সকল প্রকৃতিগত বৈষম্য হেতু অধিকারবৈষম্য ন্যায্য হইত, তবে আমরা ইংরেজ বাঙ্গালি মধ্যে সামান্য অধিকারবৈষম্য দেখিয়া এত চীৎকার করি কেন? যদি স্ত্রী দাসী, পুরুষ প্রভু, ইহাই বিচারসঙ্গত হয়, তবে বাঙ্গালি দাস, ইংরেজ প্রভু, এটিও বিচারসঙ্গত হইবে।

দ্বিতীয় উত্তর এই, যে সকল বিষয়ে স্ত্রীপুরুষে অধিকারবৈষম্য দেখা যায়, সে সকল বিষয়ে স্ত্রীপুরুষে যথার্থ প্রকৃতিগত বৈষম্য দেখা যায় না। যতটুকু দেখা যায়, ততটুকু কেবল সামাজিক নিয়মের দোষে। সেই সকল সামাজিক নিয়মের সংশোধনই সাম্যনীতির উদ্দেশ্য। বিখ্যাতনামা জন স্টুয়ার্ট মিলকৃত এতদ্বিষয়ক বিচারে, এই বিষয়টি সুন্দররূপে প্রমাণীকৃত হইয়াছে। সে সকল কথা এখানে পুনরুক্ত করা নিষ্প্রয়োজন।*

স্ত্রীগণ সকল দেশেই পুরুষের দাসী। যে দেশে স্ত্রীগণকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া না রাখে, সে দেশেও স্ত্রীগণকে পুরুষের উপর নির্ভর করিতে হয়, এবং সর্বপ্রকারে আজ্ঞানুবর্তী হইয়া মন যোগাইয়া থাকিতে হয়।

এই প্রথা সর্বদেশে এবং সর্বকালে চিরপ্রচলিত থাকিলেও, এক্ষণে আমেরিকা ও ইংলণ্ডে এক সম্প্রদায় সমাজতত্ত্ববিদ ইহার বিরোধী। তাঁহারা সাম্যবাদী। তাঁহাদের মত এই যে, স্ত্রী ও পুরুষে সর্বপ্রকারে সাম্য থাকাই উচিত। পুরুষগণের যাহাতে যাহাতে অধিকার, স্ত্রীগণের তাহাতে তাহাতেই অধিকার থাকাই উচিত। পুরুষে চাকরি করিবে, বাবসায় করিবে, স্ত্রীগণে কেন করিবে না? পুরুষে রাজসভায়, ব্যবস্থাপক সভায় সভ্য হইবে, স্ত্রীলোকে কেন হইবে না? নারী পুরুষের পত্নী মাত্র, দাসী কেন হইবে?

আমাদের দেশে যে পরিমাণে স্ত্রীগণ পুরুষাধীন, ইউরোপে বা আমেরিকায় তাহার শতাংশও নহে। আমাদের দেশ অধীনতার দেশ, সর্বপ্রকার অধীনতা ইহাতে বীজমাত্রে অঙ্কুরিত হইয়া, উর্বরা ভূমি পাইয়া বিশেষ বৃদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। এখানে প্রজা যেমন রাজার নিতান্ত অধীন, অন্যত্র তেমন নহে; এখানে অশিক্ষিত যেমন শিক্ষিতের আজ্ঞাবহ, অন্যত্র তেমন নহে; এখানে যেমন শূদ্রাদি ব্রাহ্মণের পদানত, অন্যত্র কেহই ধর্ম্মযাজকের তাদৃশ

* Subjection of women.

বিক্রম রচনাবলী

বশবত্তী নহে। এখানে যেমন দরিদ্র ধনীর পদানত, অন্যত্র তত নহে। এখানে স্ত্রী যেমন পুরুষের আজ্ঞানুবর্তিনী, অন্যত্র তত নহে।

এখানে রমণী পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিনী; যে বুলি পড়াইবে, সেই বুলি পড়িবে। আহাৰ দিলে খাইবে, নচেৎ একাদশী করিবে। পতি অর্থাৎ পুরুষ দেবতাস্বরূপ; দেবতাস্বরূপ কেন, সকল দেবতার প্রধান দেবতা বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে। দাসীত্ব এত দূর যে, পত্নীদিগের আদর্শ-স্বরূপা দ্রোপদী সত্যভামার নিকট আপনার প্রশংসা স্বরূপ বলিয়াছিলেন যে, তিনি স্বামীর সন্তোষার্থ সপত্নীগণেরও পরিচর্যা করিয়া থাকেন।

এই আৰ্য্য পাতিব্রত ধর্ম অতি সুন্দর; ইহার জন্য আৰ্য্যগৃহ স্বর্গতুল্য সুখময়। কিন্তু পাতিব্রতের কেহ বিরোধী নহে; স্ত্রী যে পুরুষের দাসীমাত্র, সংসারের অধিকাংশ ব্যাপারে স্ত্রীলোক অধিকারশূন্য, সাম্যবাদীরা ইহারই প্রতিবাদী।

অস্মদদেশে স্ত্রীপুরুষে যে ভয়ঙ্কর বৈষম্য, তাহা এক্ষণে আমাদের দেশীয়গণের কিছুর কিছুর হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, এবং কয়েকটি বিষয়ে বৈষম্য বিনাশ করিবার জন্য সমাজমধ্যে অনেক আন্দোলন হইতেছে। সে কয়টি বিষয় এই—

১ম। পুরুষকে বিদ্যাশিক্ষা, অবশ্য করিতে হয়; কিন্তু স্ত্রীগণ অশিক্ষিতা থাকে।

২য়। পুরুষের স্ত্রীবিয়োগ হইলে, সে পুনর্বার দারপরিগ্রহ করিতে অধিকারী। কিন্তু স্ত্রীগণ বিধবা হইলে, আর বিবাহ করিতে অধিকারিণী নহে; বরং সর্বভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়া চিরকাল ব্রহ্মচর্যানুষ্ঠানে বাধ্য।

৩য়। পুরুষে যেখানে ইচ্ছা, সেখানে যাইতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোকে গৃহপ্রাচীর অতিক্রম করিতে পারে না।

৪র্থ। স্ত্রীগণ স্বামীর মৃত্যুর পরেও অন্য স্বামিগ্রহণে অধিকারী নহে, কিন্তু পুরুষগণ স্ত্রী বর্তমানেই, যথেষ্ট বহুবিবাহ করিতে পারেন।

১। প্রথম তত্ত্ব সম্বন্ধে, সাধারণ লোকেরও একটু মত ফিরিয়াছে। সকলেই এখন স্বীকার করেন, কন্যাগণকে একটু লেখাপড়া শিক্ষা করান ভাল। কিন্তু কেহই প্রায় এখনও মনে ভাবেন না যে, পুরুষের ন্যায় স্ত্রীগণও নানাবিধ সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি কেন শিখিবে না? যাঁহারা, পুত্রটি এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে বিষপান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাই কন্যাটি কথামালা সমাপ্ত করিলেই চরিতার্থ হন। কন্যাটিও কেন যে পুত্রের ন্যায় এম-এ পাশ করিবে না, এ প্রশ্ন বারেক মাত্রও মনে স্থান দেন না। যদি কেহ, তাঁহাদিগকে এ কথা জিজ্ঞাসা করে, তবে অনেকেই প্রশ্নকর্তাকে বাতুল মনে করিবেন। কেহ প্রতিপ্রশ্ন করিবেন, মেয়ে অত লেখাপড়া শিখিয়া কি করিবে? চাকরি করিবে না কি? যদি সাম্যবাদী সে প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে বলেন, “কেনই বা চাকরি করিবে না?” তাহাতে বোধ হয়, তাঁহারা হরিবোল দিয়া উঠিবেন। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি উত্তর করিতে পারেন, ছেলের চাকরিই যোটেইতে পারি না, আবার মেয়ের চাকরি কোথায় পাইব? যাঁহারা বুদ্ধেন যে, বিদ্যোপার্জন কেবল চাকরির জন্য নহে, তাঁহারা বলিতে পারেন, “কন্যাদিগকে পুত্রের ন্যায় লেখাপড়া শিখাইবার উপায় কি? তেমন স্ত্রীবিদ্যালয় কই?”

বাস্তবিক, বঙ্গদেশে, ভারতবর্ষে বলিলেও হয়, স্ত্রীগণকে পুরুষের মত লেখাপড়া শিখাইবার উপায় নাই। এতদ্দেশীয় সমাজমধ্যে সাম্যতত্ত্বাস্তর্গত এই নীতিটি যে অদ্যাপি পরিস্ফুট হয় নাই—লোকে যে স্ত্রীশিক্ষার কেবল মৌখিক সমর্থন করিয়া থাকে, ইহাই তাহার প্রচুর প্রমাণ। সমাজে কোন অভাব হইলেই তাহার পূরণ হয়—সমাজ কিছুর চাহিলেই তাহা জন্মে। বঙ্গবাসীগণ যদি স্ত্রীশিক্ষায় যথার্থ অভিলাষী হইতেন, তাহা হইলে তাহার উপায়ও হইত।

সেই উপায় দ্বিবিধ। প্রথম, স্ত্রীলোকদিগের জন্য পৃথক্ বিদ্যালয়—দ্বিতীয়, পুরুষ-বিদ্যালয়ে স্ত্রীগণের শিক্ষা।

দ্বিতীয়টির নামমাত্র, বঙ্গবাসীগণ জ্বলিয়া উঠিবেন। তাঁহারা নিঃসন্দেহ মনে বিবেচনা করিবেন যে, পুরুষের বিদ্যালয়ে স্ত্রীগণ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলে, নিশ্চয়ই কন্যাগণ বারাজ্ঞনাবৎ আচরণ করিবে। মেয়েগুলো ত অধঃপাতে যাইবেই; বেশীর ভাগ ছেলেগুলোও যথেষ্টাচারী হইবে।

প্রথম উপায়টি উদ্ভাবিত করিলে, এ সকল আপত্তি ঘটে না বটে, কিন্তু আপত্তির অভাব

নাই। মেয়েরা মেয়েকালেজে পড়িতে গেলে পর, শিশুপালন করিবে কে? বালককে স্তন্যপান করাইবে কে? বঙ্গীয় বালিকা চতুর্দশ বৎসর বয়সে মাতা ও গৃহিণী হয়। দ্বয়োদশ বৎসরের মধ্যে যে লেখাপড়া শিখা যাইতে পারে, তাহাই তাহাদের সাধ্য। অথবা তাহাও সাধ্য নহে— কেন না, দ্বয়োদশ বর্ষেই বা কুলবধু বা কুলকন্যা, গৃহের বাহির হইয়া বই হাতে করিয়া কালেজে পড়িতে যাইবে কি প্রকারে?

আমরা এ সকল আপত্তির মীমাংসায় এক্ষণে প্রবৃত্ত নই। আমরা দেখাইতে চাই যে, যদি তোমরা সাম্যবাদী হও, তাহা হইলে যতদিন না সম্পূর্ণরূপে সর্ববিষয়ক সাম্যের ব্যবস্থা করিতে পার, ততদিন কেবল আংশিক সাম্যের বিধান করিতে পারিবে না। সাম্যতত্ত্বান্তর্গত সমাজনীতি সকল পরস্পরে দৃঢ় সূত্রে গ্রন্থিত, যদি স্ত্রী পুরুষ সর্বত্র সমানাধিকারবিশিষ্ট হয়, তবে ইহা স্থির যে, কেবল শিশুপালন ও শিশুকে স্তন্যপান করান স্ত্রীলোকের ভাগ নহে, অথবা একা স্ত্রীরই ভাগ নহে। যাহাকে গৃহকর্ম বলে, সাম্য থাকিলে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই তাহাতে সমান ভাগ। একজন গৃহকর্ম লইয়া বিদ্যাশিক্ষায় বঞ্চিত হইবে, আর একজন গৃহকর্মের দৃষ্টিতে অব্যাহতি পাইয়া বিদ্যাশিক্ষায় নিষিদ্ধ হইবে, ইহা স্বভাবসঙ্গত হউক বা না হউক, সাম্যসঙ্গত নহে। অপরূপ পুরুষগণ নিষিদ্ধে যেখানে সেখানে যাইতে পারে, এবং স্ত্রীগণ কোথাও যাইতে পারিবে না, ইহা কদাচ ন্যায়সঙ্গত নহে। এই সকল স্থানে বৈষম্য আছে বলিয়াই বিদ্যাশিক্ষাতেও বৈষম্য ঘটিতেছে। বৈষম্যের ফল বৈষম্য। যে একবার ছোট হইবে, তাহাকে ক্রমে ছোট হইতে হইবে।

কথাটি আর এক প্রকারে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে।

স্ত্রীশিক্ষা বিধেয় কি না? বোধ হয় সকলেই বলিবেন, “বিধেয় বটে।”

তারপর জিজ্ঞাস্য, কেন বিধেয়? কেহ বলিবেন না যে, চাকরির জন্য* বোধ হয়, এতদেশীয় সচরাচর সুশিক্ষিত লোকে উত্তর দিবেন যে, স্ত্রীগণের নীতিশিক্ষা, জ্ঞানোপার্জন এবং বুদ্ধি মার্জিত করিবার জন্য, তাহাদিগকে লেখাপড়া শিখান উচিত।

তারপর, জিজ্ঞাস্য যে, পুরুষগণকে বিদ্যাশিক্ষা করাইতে হয় কেন? দীর্ঘকর্ণ দেশীয় গন্দভ্রংশ্রণী বলিবেন, চাকরির জন্য, কিন্তু তাহাদিগের উত্তর গণনীয়ের মধ্যে নহে। অন্যো বলিবেন, নীতিশিক্ষা, জ্ঞানোপার্জন, এবং বুদ্ধি মার্জনের জন্যই পুরুষের লেখাপড়া শিক্ষা প্রয়োজন। অন্য যদি কোন প্রয়োজন থাকে, তবে তাহা গৌণ প্রয়োজন, মূখ্য প্রয়োজন নহে। গৌণ প্রয়োজনও স্ত্রীপুরুষ উভয়ের পক্ষেই সমান।

অতএব বিদ্যাশিক্ষাসম্বন্ধে স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই অধিকারের সাম্য স্বীকার করিতে হইল। এ সাম্য সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, নচেৎ উপরিকথিত বিচারে অবশ্য কোথাও ভ্রম আছে। যদি এখানে সাম্য স্বীকার কর, তবে অন্যত্র সে সাম্য স্বীকার কর না কেন? শিশুপালন, যথেষ্ট ভ্রমণ, বা গৃহকর্ম সম্বন্ধে সে সাম্য স্বীকার কর না কেন? সাম্য স্বীকার করিতে গেলে, সর্বত্র সাম্য স্বীকার করিতে হয়।

উপরে যে চারিটি সামাজিক বৈষম্যের উল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যে দ্বিতীয়টি বিধবাবিবাহ সম্বন্ধীয়। বিধবাবিবাহ ভাল কি মন্দ, এটি স্বতন্ত্র কথা। তাহার বিবেচনার স্থল এ নহে। তবে ইহা বলিতে পারি যে, কেহ যদি আমাদের জিজ্ঞাসা করেন, স্ত্রীশিক্ষা ভাল কি মন্দ? সকল স্ত্রীলোক শিক্ষিত হওয়া উচিত কি না, আমরা তখনই উত্তর দিব, স্ত্রীশিক্ষা অতিশয় মঙ্গলকর; সকল স্ত্রীলোক শিক্ষিত হওয়া উচিত; কিন্তু বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে আমাদের কেহ সেরূপ প্রশ্ন করিলে আমরা সেরূপ উত্তর দিব না। আমরা বলিব, বিধবাবিবাহ ভালও নহে, মন্দও নহে; সকল বিধবার বিবাহ হওয়া কদাচ ভাল নহে, তবে বিধবাগণের ইচ্ছামত বিবাহে অধিকার থাকা ভাল। যে স্ত্রী সাধবী, পুরুষপিতাকে আন্তরিক ভাল বাসিয়াছিল, সে কখনই পুনর্বার পরিণয় করিতে ইচ্ছা করে না; যে জাতিগণের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে, সে সকল জাতির মধ্যেও পবিত্রস্বভাববিশিষ্টা, স্নেহময়ী, সাধবীগণ বিধবা হইলে কদাপি আর বিবাহ করে না। কিন্তু যদি কোন বিধবা, হিন্দুই হউন, আর যে জাতীয়া হউন, পতির লোকান্তর পরে পুনঃপরিণয়ে ইচ্ছাবতী হইয়েন, তবে তিনি অবশ্য তাহাতে অধিকারিণী। যদি পুরুষ

* সাম্যবাদী বলেন, চাকরির জন্যও বটে।

বিক্রম রচনাবলী

পত্নীবিয়োগের পর পুনর্বার দারপরিগ্রহে অধিকারী হয়, তবে সাম্যনীতির ফলে স্ত্রী পতি-বিয়োগের পর অবশ্য, ইচ্ছা করিলে, পুনর্বার পতিগ্রহণে অধিকারিণী। এখানে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, “যদি” পুরুষ পুনর্বারে অধিকারী হয়, তবেই স্ত্রী অধিকারিণী, কিন্তু পুরুষেরই কি স্ত্রী বিয়োগান্তে দ্বিতীয় বার বিবাহ উচিত? উচিত, অনুচিত, স্বতন্ত্র কথা; ইহাতে ঔচিত্যানৌচিত্য কিছুই নাই। কিন্তু মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার আছে যে, যাহাতে অন্যের অনিষ্ট নাই, এমত কার্যমাত্রই প্রবৃত্তি অনুসারে করিতে পারে। সুতরাং পত্নীবিয়ুক্ত পতি, এবং পতিবিয়ুক্ত পত্নী ইচ্ছা হইলে পুনঃপরিণয়ে উভয়েই অধিকারী বটে।

অতএব বিধবা, বিবাহে অধিকারিণী বটে। কিন্তু এই নৈতিক তত্ত্ব অদ্যাপি এ দেশে সচরাচর স্বীকৃত হয় নাই। যাঁহারা ইংরেজি শিক্ষার ফলে, অথবা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বা ব্রাহ্ম ধর্মের অনুরোধে, ইহা স্বীকার করেন, তাঁহারা ইহাকে কার্যে পরিণত করেন না। যিনি যিনি বিধবাকে বিবাহে অধিকারিণী বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদেরই গৃহস্থা বিধবা বিবাহার্থ ব্যাকুলা হইলেও তাঁহারা সে বিবাহে উদ্যোগী হইতে সাহস করেন না। তাহার কারণ, সমাজের ভয়। তবেই, এই নীতি সমাজে প্রবেশ করে নাই। অন্যান্য সাম্যাত্মক নীতি সমাজে প্রবিষ্ট না হওয়ার কারণ বুঝা যায়; বিধানের কর্তা পুরুষজাতি সে সকলের প্রচলনে আপনাদিগকে অনিষ্টগ্রস্ত বোধ করেন, কিন্তু এই নীতি এ সমাজে কেন প্রবেশ করিতে পারে না, তাহা তত সহজে বুঝা যায় না। ইহা আয়াসসাধ্য নহে, কাহারও অনিষ্টকর নহে, এবং অনেকের সুখবৃদ্ধিকর। তথাপি ইহা সমাজে পরিগৃহীত হইবার লক্ষণ দেখা যায় না। ইহার কারণ, সমাজে লোকাচারের অলঙ্ঘনীয়তাই বোধ হয়।

আর একটি কথা আছে। অনেকে মনে করেন যে, চিরবৈধব্য বন্ধনে, হিন্দু মহিলাদিগের পাতিত্রত্য এরূপ দৃঢ়বদ্ধ যে, তাহার অন্যথা কামনা করা বিধেয় নহে। হিন্দু স্ত্রীমাত্রেই জানেন যে, এই এক স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সকল সুখ যাইবে, অতএব তিনি স্বামীর প্রতি অনন্ত ভক্তিমতী। এই সম্প্রদায়ের লোকের বিবেচনায় এই জন্যই হিন্দুগৃহে দাম্পত্যসুখের এত আধিক্য। কথাটি সত্য বলিয়াই না হয় স্বীকার করিলাম। যদি তাই হয়, তবে নিয়মটি একতরফা রাখ কেন? বিধবার চিরবৈধব্য যদি সমাজের মঙ্গলকর হয়, তবে মৃতভার্য্য পুরুষের চিরপত্নীহীনতা বিধান কর না কেন? তুমি মরিলে, তোমার স্ত্রীর আর গতি নাই, এজন্য তোমার স্ত্রী অধিকতর প্রেমশালিনী; সেইরূপ তোমার স্ত্রী মরিলে, তোমারও আর গতি হইবে না, যদি এমন নিয়ম হয়, তবে তুমিও অধিকতর প্রেমশালী হইবে। এবং দাম্পত্য সুখ, গার্হস্থ্য সুখ দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু তোমার বেলা সে নিয়ম খাটে না কেন? কেবল অবলা স্ত্রীর বেলা সে নিয়ম কেন?

তুমি বিধানকর্তা পুরুষ, তোমার সুতরাং পোয়া বারো। তোমার বাহুবল আছে, সুতরাং তুমি এ দৌরাভ্যা করিতে পার। কিন্তু জানিয়া রাখ যে, এ অতিশয় অন্যায়, গুরুতর, এবং ধর্মবিরুদ্ধ বৈষম্য।

৩য়। কিন্তু পুরুষের যত প্রকার দৌরাভ্যা আছে, স্ত্রীপুরুষে যত প্রকার বৈষম্য আছে, তন্মধ্যে আমরাদিগের উল্লিখিত তৃতীয় প্রস্তাব, অর্থাৎ স্ত্রীগণকে গৃহমধ্যে বন্য পশুর ন্যায় বদ্ধ রাখার অপেক্ষা নিষ্ঠুর, জঘন্য, অধর্মপ্রসূত বৈষম্য আর কিছুই নাই। আমরা চাতকের ন্যায় স্বর্গমর্ত্য বিচরণ করিব, কিন্তু ইহারা দেড় কাঠা ভূমির মধ্যে, পিঞ্জরে রক্ষিতার ন্যায় বদ্ধ থাকিবে। পৃথিবীর আনন্দ, ভোগ, শিক্ষা, কৌতুক, যাহা কিছু জগতে ভাল আছে, তাহার অধিকাংশে বঞ্চিত থাকিবে। কেন? হুকুম পুরুষের।

এই প্রথার ন্যায়বিরুদ্ধতা এবং অনিষ্টকারিতা অধিকাংশ সুশিক্ষিত ব্যক্তিই এক্ষণে স্বীকার করেন, কিন্তু স্বীকার করিয়াও তাহা লঙ্ঘন করিতে প্রবৃত্ত নন। ইহার কারণ, অমর্যাদা ভয়। আমার স্ত্রী, আমার কন্যাকে, অন্যে চর্মচক্ষে দেখিবে! কি অপমান! কি লজ্জা! আর তোমার স্ত্রী, তোমার কন্যাকে যে পশুর ন্যায় পশ্বালয়ে বদ্ধ রাখ, তাহাতে কিছু অপমান নাই? কিছু লজ্জা নাই? যদি না থাকে, তবে তোমার মানাপমান বোধ দেখিয়া, আমি লজ্জায় মরি!

জিজ্ঞাসা করি, তোমার অপমান, তোমার লজ্জার অনুরোধে, তাহাদিগের উপর পীড়ন করিবার তোমার কি অধিকার? তাহারা কি তোমারই মানরক্ষার জন্য, তোমারই তৈজসপত্রাদিমধ্যে

গণ্য হইবার জন্য, দেহ ধারণ করিয়াছিল? তোমার মান অপমান সব, তাহাদের সুখ দুঃখ কিছই নহে?

আমি জানি, তোমরা বঙ্গাঙ্গনাগণকে এরূপ তৈয়ার করিয়াছ যে, তাহারা এখন আর এই শাস্তিকে দুঃখ বলিয়া বোধ করে না। বিচিত্র কিছই নহে। যাহাকে অর্দ্ধভোজনে অভ্যস্ত করিবে, পরিশেষে সে সেই অর্দ্ধভোজনেই সন্তুষ্ট থাকিবে, অন্নাভাবে দুঃখ মনে করিবে না। কিন্তু তাহাতে তোমার নিষ্ঠুরতা মার্জ্জনীয় হইল না। তাহারা সম্মত হউক, অসম্মতই হউক, তুমি তাহাদিগের সুখ ও শিক্ষার লাঘব করিলে, এজন্য তুমি অনন্ত কাল মহাপাপী বলিয়া গণ্য হইবে।

আর কতকগুলি মূর্খ আছেন, তাহাদিগের শূন্য এইরূপ আপত্তি নহে। তাহারা বলেন যে, স্ত্রীগণ সমাজমধ্যে যথেষ্ট বিচরণ করিলে দুষ্টস্বভাব হইয়া উঠিবে, এবং কুচরিত্র পুরুষগণ অবসর পাইয়া তাহাদিগকে ধর্মভ্রষ্ট করিবে। যদি তাহাদিগকে বলা যায় যে, দেখ, ইউরোপাদি সভ্যসমাজে কুলকামিনীগণ যথেষ্ট সমাজে বিচরণ করিতেছে, তন্নিবন্ধন কি ক্ষতি হইতেছে? তাহাতে তাহারা উত্তর করেন যে, সে সকল সমাজের স্ত্রীগণ, হিন্দু মহিলাগণ অপেক্ষা ধর্মভ্রষ্ট এবং কলুষিতস্বভাব বটে।

ধর্মরক্ষার্থে যে স্ত্রীগণকে পিঞ্জরনিবদ্ধ রাখা আবশ্যিক, হিন্দু মহিলাগণের এরূপ কুৎসা আমরা সহ্য করিতে পারি না। কেবল সংসারে লোকসহবাস করিলেই তাহাদিগের ধর্ম বিলুপ্ত হইবে, পুরুষ পাইলেই তাহারা কুলধর্ম জলাঞ্জলি দিয়া তাহার পিছ পিছ ছুটিবে, হিন্দু স্ত্রীর ধর্ম এরূপ বন্দাবিত বারিবৎ নহে। যে ধর্ম এরূপ বন্দাবিত বারিবৎ, সে ধর্ম থাকা না থাকা সমান—তাহা রাখিবার জন্য এত যত্নের প্রয়োজন কি? তাহার বন্ধনভিত্তি উন্মূলিত করিয়া নতন ভিত্তির পত্তন কর।

৪র্থ। আমরা চতুর্থ বৈষম্যের উল্লেখ করিয়াছি, অর্থাৎ পুরুষগণের বহুবিবাহে অধিকার, তৎসম্বন্ধে অধিক লিখিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে বঙ্গবাসী হিন্দুগণ বিশেষরূপে বুঝিয়াছেন যে, এই অধিকার নীতিবিরুদ্ধ। সহজেই বুঝা যাইবে যে, এ স্থলে স্ত্রীগণের অধিকার বৃদ্ধি করিয়া সাম্য সংস্থাপন করা সমাজসংস্কারকদিগের উদ্দেশ্য হইতে পারে না; পুরুষগণের অধিকার কর্তন করাই উদ্দেশ্য; কারণ, মনুষ্যজাতিমধ্যে কাহারই বহুবিবাহে অধিকার নীতি-সঙ্গত হইতে পারে না।* কেহই বলিবে না যে, স্ত্রীগণও পুরুষের ন্যায় বহুবিবাহে অধিকারিণী হউন; সকলেই বলিবে, পুরুষেরও স্ত্রীর ন্যায় একমাত্র বিবাহে অধিকার। অতএব, যেখানে অধিকারিণী নীতিসঙ্গত, সেইখানেই সাম্য অধিকারকে সম্প্রসারিত করে, যেখানে কার্য্যধিকারিণী অর্নৈতিক, সেখানে উহাকে কর্তিত এবং সঙ্কীর্ণ করে। সাম্যের ফল কদাচ অর্নৈতিক হইতে পারে না। সাম্য এবং স্বানুবর্তিতা, এই দুই তত্ত্বমধ্যে সমুদায় নীতিশাস্ত্র নিহিত আছে।

এই চারিটি বৈষম্যের উপর আপাততঃ বঙ্গীয় সমাজের দৃষ্টি পড়িয়াছে। যাহা অতি গর্হিত, তাহারই যখন কোন প্রতিবিধান হইতেছে না, তখন যে অন্যান্য বৈষম্যের প্রতি কটাক্ষ করিলে কোন উপকার হইবে, এমত ভরসা করা যায় না। আমরা আর দুই একটি কথার উত্থাপন করিয়া ক্ষান্ত হইব।

স্ত্রীপুরুষে যে সকল বৈষম্য প্রায় সর্বসমাজে প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় বিধিগুলি অতি ভয়ানক ও শোচনীয়। পুত্র পৈতৃক সম্পত্তিতে সম্পূর্ণ অধিকারী, কন্যা কেহই নহে। পুত্র কন্যা, উভয়েরই এক গুণে, এক গর্ভে জন্ম; উভয়েরই প্রতি পিতা মাতার এক প্রকার যত্ন, এক প্রকার কর্তব্য কর্ম; কিন্তু পুত্র পিতৃত্বের পর পিতার কোটি মূদ্রা সুরাপানাদিতে ভস্মসাৎ করুক, কন্যা বিশেষ প্রয়োজনের জন্যও তন্মধ্যে এক কপর্দক পাইতে পারে না। এই নীতির কারণ হিন্দুশাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে যে, যেই শ্রাদ্ধাধিকারী, সেই উত্তরাধিকারী; সেটি এরূপ অসঙ্গত এবং অযথার্থ যে, তাহার যৌক্তিকতা

* কদাচিৎ হইতে পারে বোধ হয়। যথা, অপদ্রক রাজা, অথবা যাহার ভার্য্যা কুষ্ঠাদি রোগগ্রস্ত। বোধ হয় বলিতেছি, কেন না, ইহা স্বীকার করিলে পুরুষের বিপক্ষেও সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হয়। বস্তুতঃ বহুবিবাহ পক্ষে বলিবার দুই একটা কথা আছে, কিন্তু আমার বিবেচনায় বহুবিবাহ এমন কদর্য্য প্রথা যে, সে সকল কথার উল্লেখ মাত্রও অর্নিস্ট আছে।

বিশ্বকম রচনাবলী

নির্বাচন করাই নিষ্প্রয়োজন। দেখা যাউক, এরূপ নিয়মের স্বভাবসঙ্গত অন্য কোন মূল আছে কি না। ইহা কথিত হইতে পারে যে, স্ত্রী স্বামীর ধনে স্বামীর ন্যায়ই অধিকারিণী; এবং তিনি স্বামিগৃহে গৃহিণী, স্বামীর ধনৈশ্বৰ্য্যে কণ্ঠী, অতএব তাঁহার আর পৈতৃক ধনে অধিকারিণী হইবার প্রয়োজন নাই। যদি ইহাই এই ব্যবস্থানীতির মূলস্বরূপ হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, বিধবা কন্যা বিষয়াধিকারিণী হয় না কেন? যে কন্যা দরিদ্রে সমর্পিত হইয়াছে, সে উত্তরাধিকারিণী হয় না কেন? কিন্তু আমরা এ সকল ক্ষুদ্রতর আপত্তি উপস্থিত করিতে ইচ্ছুক নহি। স্ত্রীকে স্বামী বা পুত্র বা এবাস্বিধ কোন পুরুষের আশ্রিত হইয়াই ধনভাগিনী হইতে হইবে, ইহাতেই আমাদের আপত্তি। অন্যের ধনে নহিলে স্ত্রীজাতি ধনাধিকারিণী হইতে পারিবে না—পরের দাসী হইয়া ধনী হইবে—নচেৎ ধনী হইবে না, ইহাতেই আপত্তি। পতির পদসেবা কর, পতি দৃষ্ট হউক, কুভাষী, কদাচার হউক, সকল সহ্য কর—অবাধ্য, দুর্মুখ, কৃতঘ্ন, পাপাত্মা পুত্রের বাধ্য হইয়া থাক—নচেৎ ধনের সঙ্গে স্ত্রীজাতির কোন সম্বন্ধ নাই। পতি পুত্র তাড়াইয়া দিল ত সব ঘুঁচল। স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিবার উপায় নাই—সহিষ্ণুতা ভিন্ন অন্য গতিই নাই। এদিকে পুরুষ, সর্বাধিকারী—স্ত্রীর ধনও তাঁর ধন। ইচ্ছা করিলেই স্ত্রীকে সর্বস্বচ্যুত করিতে পারেন। তাঁহার স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনে কোন বাধ্য নাই। এ বৈষম্য গুরুতর, ন্যায়বিরুদ্ধ, এবং নীতিবিরুদ্ধ।

অনেকে বলিবেন, এ অতি উত্তম ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থাপ্রভাবে স্ত্রী স্বামীর বশবর্তিনী থাকে। বটে, পুরুষকৃত ব্যবস্থাবলির উদ্দেশ্যই তাই; যত প্রকার বন্ধন আছে, সকল প্রকার বন্ধনে স্ত্রীগণের হস্তপদ বাঁধিয়া পুরুষপদমূলে স্থাপিত কর—পুরুষগণ স্বেচ্ছাক্রমে পদাঘাত করুক, অধম নারীগণ বাঙ নিষ্পত্তি করিতে না পারে। জিজ্ঞাসা করি, স্ত্রীগণ পুরুষের বশবর্তিনী হয়, ইহা বড় বাঞ্ছনীয়; পুরুষগণ স্ত্রীজাতির বশবর্তী হয়, ইহা বাঞ্ছনীয় নহে কেন? যত বন্ধন আছে, সকল বন্ধনে স্ত্রীগণকে বাঁধিয়াছ, পুরুষজাতির জন্য একাট বন্ধনও নাই কেন? স্ত্রীগণ কি পুরুষাপেক্ষা অধিকতর স্বভাবতঃ দৃশ্চারিত্র? না রজ্জুটি পুরুষের হাতে বলিয়া, স্ত্রীজাতির এত দৃঢ় বন্ধন? ইহা যদি অধর্ম না হয়, তবে অধর্ম কাহাকে বলে, বলিতে পারি না।

হিন্দুশাস্ত্রানুসারে কদাচিৎ স্ত্রী বিষয়াধিকারিণী হয়, যথা—পতি অপুত্রক মরিলে। এইটুকু হিন্দুশাস্ত্রের গৌরব। এইরূপ বিধি দুই একটা থাকাতেই আমরা প্রাচীন আৰ্য্য-ব্যবস্থাশাস্ত্রকে কোন কোন অংশে আধুনিক সভ্য ইউরোপীয় ব্যবস্থাশাস্ত্রাপেক্ষাও উৎকৃষ্ট বলিয়া গৌরব করি। কিন্তু এটুকু কেবল মন্দের ভাল মাত্র। স্ত্রী বিষয়াধিকারিণী বটে, কিন্তু দানবিক্রয়াদির অধিকারিণী নহে। এ অধিকার কতটুকু? আপনার ভরণপোষণ মাত্র পাইবেন, আর তাঁহার জীবনকালমধ্যে আর কাহাকেও কিছু দিবেন না, এই পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার। পাপাত্মা পুত্র সর্বস্ব বিক্রয় করিয়া হিন্দ্রিয়সুখ ভোগ করুক, তাহাতে শাস্ত্রের আপত্তি নাই, কিন্তু মহারাণী স্বর্ণময়ীর ন্যায় ধর্মনিষ্ঠা স্ত্রী কাহারও প্রাণরক্ষার্থেও এক বিঘা হস্তান্তর করিতে সমর্থ নহেন। এ বৈষম্য কেন? তাহার উত্তরেরও অভাব নাই—স্ত্রীগণ অল্পবুদ্ধি, অস্থিরমতি, বিষয়রক্ষণে অশক্ত। হঠাৎ সর্বস্ব হস্তান্তর করিবে, উত্তরাধিকারীর ক্ষতি হইবে, এ জন্য তাহারা বিষয় হস্তান্তর করিতে অশক্ত হওয়াই উচিত। আমরা এ কথা স্বীকার করি না। স্ত্রীগণ বুদ্ধি, স্থৈর্য্য, চতুরতায় পুরুষাপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। বিষয়রক্ষার জন্য যে বৈষয়িক শিক্ষা, তাহাতে তাহারা নিকৃষ্ট বটে, কিন্তু সে পুরুষেরই দোষ। তোমরা তাহাদিগকে পুরুষমধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া, বিষয়কর্ম হইতে নির্লিপ্ত রাখ, সুতরাং তাহাদিগের বৈষয়িক শিক্ষা হয় না। আগে বৈষয়িক ব্যাপারে লিপ্ত হইতে দাও, পরে বৈষয়িক শিক্ষার প্রত্যাশা করিও। আগে মর্দি রাখিয়া পরে পাঁটা কাটা যায় না। পুরুষের অপরাধে স্ত্রী অশিক্ষিতা—কিন্তু সেই অপরাধের দণ্ড স্ত্রীগণের উপরেই বর্তাইতেছে। বিচার মন্দ নয়!

স্ত্রীগণের বিষয়াধিকার সম্বন্ধে একটি কোঁতুকাবহ ব্যাপার মনে পড়িল। কয় বৎসর পূর্বে হাইকোর্টে একটি মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। বিচার্য্য বিষয় এই—অসতী স্ত্রী, বিষয়াধিকারিণী হইতে পারে কি না। বিচারক অনুমতি করিলেন, পারে। শুনিয়া দেশে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। যা! এতকালে হিন্দুস্ত্রীর সতীত্বধর্ম লুপ্ত হইল! আর কেহ সতীত্বধর্ম রক্ষা করিবে না! বাঙ্গালি সমাজ পয়সা খরচ করিতে চাহে না—রাজাজ্ঞা নহিলে চাঁদায় সহি করে না, কিন্তু

এ লাঠি এমনি মস্মস্থানে বাজিয়াছিল যে, হিন্দুগণ আপনা হইতেই চাঁদাতে সহি করিয়া, প্রিবিকোর্নিসলে আপীল করিতে উদ্যত! প্রধান প্রধান সম্বাদপত্র, “হা সতীত্ব! কোথায় গেলি” বলিয়া ইংরেজি বাঙ্গালা সুরে রোদন করিয়া, “ওরে চাঁদা দে!” বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। শেষটা কি হইয়াছে জানি না; কেন না, দেশী সম্বাদপত্র পাঠসুখে আমরা ইচ্ছাক্রমে বঞ্চিত। কিন্তু যাহাই হউক, যাঁহারা এই বিচার অতি ভয়ঙ্কর ব্যাপার মনে করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে আমরাইগের একটি কথা জিজ্ঞাস্য আছে। স্বীকার করি, অসতী স্ত্রী বিষয়ে বঞ্চিত হওয়াই বিধেয়, তাহা হইলে অসতীত্ব পাপ বড় শাসিত থাকে; কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটি বিধান হইলে ভাল হয় না, যে লম্পট পুরুষ অথবা যে পুরুষ পত্নী ভিন্ন অন্য নারীর সংসর্গ করিয়াছে, সেও বিষয়াধিকারে অক্ষম হইবে? বিষয়ে বঞ্চিত হইবার ভয় দেখাইয়া স্ত্রীদিগের সতী করিতে চাও—সেই ভয় দেখাইয়া পুরুষগণকে সৎপথে রাখিতে চাও না কেন? ধর্মভ্রষ্টা স্ত্রী বিষয় পাইবে না; ধর্মভ্রষ্ট পুরুষ বিষয় পাইবে কেন? ধর্মভ্রষ্ট পুরুষ,—যে লম্পট, যে চোর, যে মিথ্যাবাদী, যে মদ্যপায়ী, যে কৃতঘ্ন, সে সকলেই বিষয় পাইবে; কেন না, সে পুরুষ; কেবল অসতী বিষয় পাইবে না; কেন না, সে স্ত্রী! ইহা যদি ধর্মশাস্ত্র, তবে অধর্মশাস্ত্র কি? ইহা যদি আইন, তবে বেআইন কি? এই আইন রক্ষার্থ চাঁদা তোলা যদি দেশবাৎসল্য, তবে মহাপাতক কেমনতর?

স্ত্রীজাতির সতীত্বধর্ম সর্বতোভাবে রক্ষণীয়, তাহার রক্ষার্থ যত বাঁধন বাঁধিতে পার, ততই ভাল, কাহারও আপত্তি নাই। কিন্তু পুরুষের উপর কোন কথা নাই কেন? পুরুষ বারস্ট্রীগমন করুক, পরদারনিরত হউক, তাহার কোন শাসন নাই কেন? শাস্ত্র ভূরি ভূরি নিষেধ আছে; সকলেই বলিবে, পুরুষের পক্ষেও এ সকল অতি মন্দ কর্ম, লোকেও একটু একটু নিন্দা করিবে—কিন্তু এই পর্য্যন্ত। স্ত্রীলোকদিগের উপর যেরূপ কঠিন শাসন, পুরুষদিগের উপর সেরূপ কিছুই নাই। কথায় কিছু হয় না; ভ্রষ্ট পুরুষের কোন সামাজিক দণ্ড নাই। একজন স্ত্রী সতীত্ব সম্বন্ধে কোন দোষ করিলে সে আর মুখ দেখাইতে পারে না; হয়ত আত্মীয় স্বজন তাহাকে বিষ প্রদান করেন; আর একজন পুরুষ প্রকাশ্যে সেইরূপ কার্য করিয়া, রোশনাই করিয়া, জুড়ি হাঁকাইয়া রাত্রিশেষে পত্নীকে চরণরেণু স্পর্শ করাইতে আসেন; পত্নী পুলাকিত হইল; লোকে কেহ কষ্ট করিয়া অসাধুবাদ করে না; লোকসমাজে তিনি যেরূপ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেইরূপ প্রতিষ্ঠিত থাকেন, কেহ তাঁহার সহিত কোন প্রকার ব্যবহারে সঙ্কুচিত হয় না; এবং তাঁহার কোন প্রকার দাবি দাওয়া থাকিলে স্বচ্ছন্দে তিনি দেশের চুড়া বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারেন। এই আর একটি গুরুতর বৈষম্য।

আর একটি অনর্চিত বৈষম্য এই যে, সর্বনিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোক ভিন্ন, এদেশীয় স্ত্রীগণ উপার্জন করিতে পারে না। সত্য বটে, উপার্জনকারী পুরুষেরা আপন আপন পরিবারস্থা স্ত্রীগণকে প্রতিপালন করিয়া থাকে। কিন্তু এমন স্ত্রী অনেক এ দেশে আছে যে, তাহাদিগকে প্রতিপালন করে, এমন কেহই নাই। বাঙ্গালার বিধবা স্ত্রীগণকে বিশেষতঃ লক্ষ্য করিয়াই আমরা লিখিতেছি। অনাথা বঙ্গবিধবাদিগের অল্পকষ্ট লোকবিখ্যাত, তাহার বিস্তারে প্রয়োজন নাই। তাহারা উপার্জন করিয়া দিনপাত করিতে পারে না, ইহা সমাজের নিতান্ত নিষ্ঠুরতা। সত্য বটে, দাসীত্ব বা পাঁচকাবৃত্তি করিবার পক্ষে কোন বাধা নাই, কিন্তু ভদ্রলোকের স্ত্রী কন্যা এ সকল বৃত্তি করিতে সক্ষম নয়—তদপেক্ষা মৃত্যুতে যন্ত্রণা অল্প। অন্য কোনপ্রকারে ইহারা যে উপার্জন করিতে পারে না, তাহার তিনটি কারণ আছে। প্রথমতঃ, তাহারা দেশী সমাজের রীতনুসারে গৃহের বাহির হইতে পারে না। গৃহের বাহির না হইলে উপার্জন করার অল্প সম্ভাবনা। দ্বিতীয়, এ দেশীয় স্ত্রীগণ লেখাপড়া বা শিল্পাদিতে সুশিক্ষিতা নহে; কোনপ্রকার বিদ্যায় সুশিক্ষিত না হইলে কেহ উপার্জন করিতে পারে না। তৃতীয়, বিদেশী উমেদওয়ার এবং বিদেশী শিল্পীরা প্রতিযোগী; এ দেশী পুরুষেই চাকরি, ব্যবসায়, শিল্প বা বাণিজ্যে অল্প করিয়া সঙ্কুলান করিয়া উঠিতে পারিতেছে না, তাহার উপর স্ত্রীলোক প্রবেশ করিয়া কি করিবে?

এই তিনটি বিষয় নিরাকরণের একই উপায়—শিক্ষা। লোকে সুশিক্ষিত হইলে, বিশেষতঃ স্ত্রীগণ সুশিক্ষিত হইলে, তাহারা অনায়াসেই গৃহমধ্যে গৃপ্ত থাকার পদ্ধতি অতিক্রম করিতে পারিবে। শিক্ষা থাকিলেই, অর্থোপার্জনে নারীগণের ক্ষমতা জন্মিবে। এবং এ দেশী স্ত্রীপুরুষ সকল প্রকার বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইলে, বিদেশী ব্যবসায়ী, বিদেশী শিল্পী বা

বঙ্কিম রচনাবলী

বিদেশী বণিক্, তাহাদিগের অন্ন কাড়িয়া লইতে পারিবে না। শিক্ষাই সকল প্রকার সামাজিক অমঙ্গল নিবারণের উপায়।

আমরা যে সকল কথা এই প্রবন্ধে বলিয়াছি, তাহা যদি সত্য হয়, তবে আমাদের দেশীয় স্ত্রীগণের দশা বড়ই শোচনীয়। ইহার প্রতিকার জন্য কে কি করিয়াছেন? পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ব্রাহ্মসম্প্রদায় অনেক যত্ন করিয়াছেন—তাহাদিগের যশঃ অক্ষয় হউক; কিন্তু এই কয় জন ভিন্ন সমাজ হইতে কিছুই হয় নাই। দেশে অনেক এসোসিয়েশন, লীগ, সোসাইটি, সভা, ক্লাব ইত্যাদি আছে—কাহারও উদ্দেশ্য রাজনীতি, কাহারও উদ্দেশ্য সমাজনীতি, কাহারও উদ্দেশ্য ধর্মনীতি, কাহারও উদ্দেশ্য দর্শনীতি, কিন্তু স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য কেহ নাই। পশুগণকে কেহ প্রহার না করে, এজন্যও একটি সভা আছে, কিন্তু বাঙ্গালার অর্ধেক অধিবাসী, স্ত্রীজাতি—তাহাদিগের উপকারার্থ কেহ নাই। আমরা কয় দিনের ভিতর অনেক পাঠশালা, চিকিৎসাশালা এবং পশুশালার জন্য বিস্তর অর্থব্যয় দেখিলাম, কিন্তু এই বঙ্গসংসাররূপ পশুশালার সংস্কারার্থ কিছু করা যায় না কি?

যায় না; কেন না, তাহাতে রঙ্ তামাসা কিছু নাই। কিছু করা যায় না; কেন না, তাহাতে রায় বাহাদুরি, রাজা বাহাদুরি, ষ্টার অব্ ইণ্ডিয়া প্রভৃতি কিছু নাই। আছে কেবল মূর্খের করতালি। কে অগ্রসর হইবে?

উপসংহার

এ দেশের বর্তমান সমাজের তৃতীয় দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইলে জাতিগত বৈষম্যের উল্লেখ করিতে হয়। আমরা বর্ণ-বৈষম্যের কথা বলিতেছি না। প্রাচীন ভারতের বর্ণ-বৈষম্যের ফলের পরিচয় দিয়াছি। তাহার ফলে যে সামাজিক বৈষম্য জন্মিয়াছে, তাহা কৃষকের উদাহরণে বুঝাইয়াছি। এক্ষণে বর্ণগত বৈষম্যের সঙ্গে অধিকারগত বৈষম্য নাই; যাহা আছে, তাহা সামান্য। জাতিগত যে বৈষম্য বলিতেছি, তাহা জেতা ও বিজিতের মধ্যে। যে জাতি রাজা ও যে জাতি প্রজা, তাহাদিগের মধ্যে এ দেশে অধিকারগত বৈষম্য আছে। সেই বৈষম্যে এতদ্দেশীয়গণ কর্তৃক সর্বদা বিচারিত হইয়া থাকে, সুতরাং এ গ্রন্থে তাহার সর্বিস্তারে বিচার করিবার প্রয়োজন দেখা যায় না।

উপসংহারে আমরা কেবল ইহাই বুঝাইতে চাই যে, আমরা সাম্যনীতির এরূপ ব্যাখ্যা করি না যে, সকল মনুষ্য সমানাবস্থাপন্ন হওয়া আবশ্যিক বলিয়া স্থির করিতে হইবে। তাহা কখন হইতে পারে না। যেখানে বুদ্ধি, মানসিক শক্তি, শিক্ষা, বল প্রভৃতির স্বাভাবিক তারতম্য আছে, সেখানে অবশ্য অবস্থার তারতম্য ঘটিবে—কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না। তবে অধিকারের সাম্য আবশ্যিক—কাহারও শক্তি থাকিলে অধিকার নাই, বলিয়া বিমুখ না হয়। সকলের উন্নতির পথ মূক্ত চাহি।

তৃতীয় ভাগ

কৃষ্ণচরিত্র

প্রথম খণ্ড

উপক্রমণিকা

মহতস্তুমসঃ পারে পদরুৎ হ্যতিতেজসম্ ।

যং জ্ঞাত্বা মৃত্যুমতোতি তস্মৈ জেয়াত্নে নমঃ ॥

মহাভারত, শান্তিপর্ষ, ৪৭ অধ্যায়ঃ ।

প্রথম পরিচ্ছেদ—গ্রন্থের উদ্দেশ্য

ভারতবর্ষের অধিকাংশ হিন্দুর, বাঙ্গালা দেশের সকল হিন্দুর বিশ্বাস যে, শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার। কৃষ্ণভু ভগবান্ স্বয়ং—ইহা তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস। বাঙ্গালা প্রদেশে, কৃষ্ণের উপাসনা প্রায় সর্বব্যাপক। গ্রামে গ্রামে কৃষ্ণের মন্দির, গৃহে গৃহে কৃষ্ণের পূজা, প্রায় মাসে মাসে কৃষ্ণোৎসব, উৎসবে উৎসবে কৃষ্ণযাত্রা, কণ্ঠে কণ্ঠে কৃষ্ণগীতি, সকল মুখে কৃষ্ণনাম। কাহারও গায়ে দিবার বস্ত্রে কৃষ্ণনামাবলি, কাহারও গায়ে কৃষ্ণনামের ছাপ। কেহ কৃষ্ণনাম না করিয়া কোথাও যাত্রা করেন না; কেহ কৃষ্ণনাম না লিখিয়া কোন পত্র বা কোন লেখাপড়া করেন না; ভিখারী “জয় রাধে কৃষ্ণ” না বলিয়া ভিক্ষা চায় না। কোন ঘৃণার কথা শুনিলে “রাধে কৃষ্ণ!” বলিয়া আমরা ঘৃণা প্রকাশ করি; বনের পাখী পৃথিলে তাহাকে “রাধে কৃষ্ণ” নাম শিখাই। কৃষ্ণ এদেশে সর্বব্যাপক।

কৃষ্ণভু ভগবান্ স্বয়ং। যদি তাহাই বাঙ্গালীর বিশ্বাস, তবে সর্বসময়ে কৃষ্ণারাধনা, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকথা ধর্মেরই উন্নতিসাধক। সকল সময়ে ঈশ্বরকে স্মরণ করার অপেক্ষা মনুষ্যের মঙ্গল আর কি আছে? কিন্তু ইহারা ভগবান্কে কি রকম ভাবেন? ভাবেন, ইনি বাল্যে চোর—ননী মাখন চুরি করিয়া খাইতেন; কৈশোরে পারদারিক—অসংখ্য গোপনারীকে পাতিতব্যধর্ম হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছিলেন; পরিণত বয়সে বণ্ডক ও শঠ—বণ্ডনার দ্বারা দ্রোণাদির প্রাণহরণ করিয়াছিলেন।—ভগবচ্চরিত্র কি এইরূপ? যিনি কেবল শুদ্ধসত্ত্ব, যাঁহা হইতে সর্বপ্রকার শুদ্ধি, যাঁহার নামে অশুদ্ধি, অপূণ্য দূর হয়, মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া সমস্ত পাপাচরণ কি সেই ভগবচ্চরিত্রসঙ্গত?

ভগবচ্চরিত্রের এইরূপ কল্পনায় ভারতবর্ষের পাপস্রোত বৃদ্ধি পাইয়াছে, সনাতনধর্মবৈষিণ্য বলিয়া থাকেন। এবং সে কথার প্রতিবাদ করিয়া জয়শ্রী লাভ করিতেও কখনও কাহাকে দেখি নাই। আমি নিজেও কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করি; পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিণাম আমার এই হইয়াছে যে, আমার সে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ কিরূপ চরিত্র পুরাণেতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য, আমার যতদূর সাধ্য, আমি পুরাণ ইতিহাসের আলোচনা করিয়াছি। তাহার ফল এই পাইয়াছি যে, কৃষ্ণসম্বন্ধীয় যে সকল পাপোপাখ্যান জনসমাজে প্রচলিত আছে, তাহা সকলই অমূলক বলিয়া জানিতে পারিয়াছি, এবং উপন্যাসকারকৃত কৃষ্ণসম্বন্ধীয় উপন্যাস সকল বাদ দিলে যাহা বাকি থাকে, তাহা অতি বিশুদ্ধ, পরমপবিত্র, অতিশয় মহৎ, ইহাও জানিতে পারিয়াছি। জানিয়াছি—ঈদৃশ সর্বগুণান্বিত, সর্বপাপসংস্পর্শশূন্য, আদর্শ চরিত্র আর কোথাও নাই। কোন দেশীয় ইতিহাসেও না, কোন দেশীয় কাব্যেও না।

কি প্রকার বিচারে আমি এরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছি, তাহা বঝান এই গ্রন্থের একটি উদ্দেশ্য। কিন্তু সে কথা ছাড়িয়া দিলেও এই গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমার নিজের যাহা বিশ্বাস, পাঠককে তাহা গ্রহণ করিতে বলি না, এবং কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব সংস্থাপন করাও আমার উদ্দেশ্য নহে। এ গ্রন্থে আমি তাঁহার কেবল মানবচরিত্রেরই সমালোচনা করিব। তবে এখন

বিক্রম রচনাবলী

হিন্দুধর্মের আলোচনা কিছন্ন প্রবলতা লাভ করিয়াছে। ধর্মোন্দোলনের প্রবলতার এই সময়ে কৃষ্ণচরিত্রের সবিস্তারে সমালোচনা প্রয়োজনীয়। যদি পুরাতন বজায় রাখিতে হয়, তবে এখানে বজায় রাখিবার কি আছে না আছে, তাহা দেখিয়া লইতে হয়। আর যদি পুরাতন উঠাইতে হয়, তাহা হইলেও কৃষ্ণচরিত্রের সমালোচনা চাই; কেন না, কৃষ্ণকে না উঠাইয়া দিলে পুরাতন উঠান যাইবে না।

ইহা ভিন্ন আমার এক গুরুতর উদ্দেশ্য আছে। ইতিপূর্বে* “ধর্মতত্ত্ব” নামে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছি। তাহাতে যে কয়টি কথা বুদ্ধাইবার চেষ্টা করিয়াছি, সংক্ষেপে তাহা এইঃ—

“১। মনুষ্যের কতকগুলি শক্তি আছে। আমি তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছি। সেইগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব।

২। তাহাই মনুষ্যের ধর্ম।

৩। সেই অনুশীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য।

৪। তাহাই সুখ।”

এক্ষণে আমি স্বীকার করি যে, সমস্ত বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ অনুশীলন, প্রস্ফুরণ, চরিতার্থতা ও সামঞ্জস্য একাধারে দুর্লভ। এ সম্বন্ধে ঐ গ্রন্থেই যাহা বলিয়াছি, তাহাও উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

“শিষ্য।... জ্ঞানে পাণ্ডিত্য, বিচারে দক্ষতা, কার্যে তৎপরতা, চিত্তে ধর্মান্বিতা এবং সুরসে রসিকতা, এই সকল হইলে, তবে মানসিক সর্বাঙ্গীণ পরিণতি হইবে। আবার তাহার উপর শারীরিক সর্বাঙ্গীণ পরিণতি আছে অর্থাৎ শরীর বলিষ্ঠ, সুস্থ, এবং সর্ববিধ শারীরিক ক্রিয়ায় সুদক্ষ হওয়া চাই।

*

*

*

এরূপ আদর্শ কোথায় পাইব? এরূপ মনুষ্য ত দেখি না।

গুরু। মনুষ্য না দেখ, ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বরই সর্বাঙ্গীণ স্ফূর্তির ও চরম পরিণতির একমাত্র উদাহরণ।”

পুনশ্চঃ—

“অনন্তপ্রকৃতি ঈশ্বর উপাসকের প্রথমাবস্থায় তাহার আদর্শ হইতে পারেন না, ইহা সত্য, কিন্তু ঈশ্বরের অনুকারী মনুষ্যেরা, অর্থাৎ যাঁহাদিগের গুণাধিক্য দেখিয়া ঈশ্বরাংশ বিবেচনা করা যায়, অথবা যাঁহাদিগকে মানবদেহধারী ঈশ্বর মনে করা যায়, তাঁহারা ইহা সেখানে বাঞ্ছনীয় আদর্শ হইতে পারেন। এই জন্য যীশুখৃষ্ট খ্রীষ্টীয়ানের আদর্শ, শাক্যসিংহ বৌদ্ধের আদর্শ। কিন্তু এরূপ ধর্মপরিবর্ধক আদর্শ যেরূপ হিন্দুশাস্ত্রে আছে, এমন আর পৃথিবীর কোন ধর্ম-পুস্তকে নাই—কোন জাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ নাই। জনকাদি রাজর্ষি, নারদাদি দেবর্ষি, বিশিষ্টাদি ব্রহ্মর্ষি, সকলেই অনুশীলনের চরমাদর্শ। তাহার উপর শ্রীরামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, অর্জুন, লক্ষ্মণ, দেবব্রত ভীষ্ম প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ আরও সম্পূর্ণতা-প্রাপ্ত আদর্শ। খ্রীষ্ট ও শাক্যসিংহ কেবল উদাসীন, কোপীনধারী নিম্মল ধর্মবেত্তা। কিন্তু ইঁহারা তা নয়। ইঁহারা সর্বগুণবিশিষ্ট—ইঁহাদিগেতেই সর্ববৃত্তি সর্বাঙ্গসম্পন্ন স্ফূর্তি পাইয়াছে। ইঁহারা সিংহাসনে বসিয়াও উদাসীন; কাম্মর্কহস্তেও ধর্মবেত্তা; রাজা হইয়াও পাণ্ডিত; শক্তিমান্ হইয়াও সর্বজনে প্রেমময়। কিন্তু এই সকল আদর্শের উপর হিন্দুর আর এক আদর্শ আছে, যাঁহার কাছে আর সকল আদর্শ খাটো হইয়া যায়—যুধিষ্ঠির যাঁহার কাছে ধর্ম শিক্ষা করেন, স্বয়ং অর্জুন যাঁহার শিষ্য, রাম ও লক্ষ্মণ যাঁহার অংশমাত্র, যাঁহার তুলা মহামহিমাময় চরিত্র কখন মনুষ্যভাষায় কীর্তিত হয় নাই।”

এই তত্ত্বটা প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিবার জন্যেও শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—কৃষ্ণের চরিত্র কিরূপ ছিল, তাহা জানিবার উপায় কি?

আদৌ এখানে দুইটি গুরুতর আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে। যাঁহারা দৃঢ় বিশ্বাস করেন যে, কৃষ্ণ ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা এখন ছাড়িয়া দিই। আমার সকল

* ধর্মতত্ত্ব, কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম সংস্করণের পরে এবং এই দ্বিতীয় সংস্করণের পূর্বে প্রচারিত হইয়াছিল।

পাঠক সেরূপ বিশ্বাসযুক্ত নহেন। যাঁহারা সেরূপ বিশ্বাসযুক্ত নহেন, তাঁহারা বলিবেন, কৃষ্ণ-চরিত্রের মৌলিকতা কি? কৃষ্ণ নামে কোন ব্যক্তি পৃথিবীতে কখনও বিদ্যমান ছিলেন, তাহার প্রমাণ কি? যদি ছিলেন, তবে তাঁহার চরিত্র যথার্থ কি প্রকার ছিল, তাহা জানিবার কোন উপায় আছে কি?

আমরা প্রথমে এই দুই সন্দেহের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইব।

কৃষ্ণের বৃত্তান্ত নিম্নলিখিত প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায় :—

- (১) মহাভারত।
- (২) হরিবংশ।
- (৩) পুরাণ।

ইহার মধ্যে পুরাণ আঠারখানি। সকলগুলিতে কৃষ্ণবৃত্তান্ত নাই। নিম্নলিখিতগুলিতে আছে :—

- (১) ব্রহ্মপুরাণ।
- (২) পদ্মপুরাণ।
- (৩) বিষ্ণুপুরাণ।
- (৪) বায়ুপুরাণ।
- (৫) শ্রীমদ্ভাগবত।
- (১০) ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ।
- (১৩) স্কন্দপুরাণ।
- (১৪) বামনপুরাণ।
- (১৫) কদ্ম্বপুরাণ।

মহাভারত, আর উপরিলিখিত অন্য গ্রন্থগুলির মধ্যে কৃষ্ণজীবনী সম্বন্ধে একটি বিশেষ প্রভেদ আছে। যাহা মহাভারতে আছে, তাহা হরিবংশে ও পুরাণগুলিতে নাই। যাহা হরিবংশ ও পুরাণে আছে, তাহা মহাভারতে নাই। ইহার একটি কারণ এই যে, মহাভারত পাণ্ডবদিগের ইতিহাস; কৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের সখা ও সহায়; তিনি পাণ্ডবদিগের সহায় হইয়া বা তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া যে সকল কার্য করিয়াছেন, তাহাই মহাভারতে আছে, ও থাকিবার কথা। প্রসঙ্গক্রমে অন্য দুই একটা কথা আছে মাত্র। তাঁহার জীবনের অবশিষ্টাংশ মহাভারতে নাই বলিয়াই হরিবংশ রচিত হইয়াছিল, ইহা হরিবংশে আছে। ভাগবতেও ঐরূপ কথা আছে। ব্যাস নারদকে মহাভারতের অসম্পূর্ণতা জানাইলেন। নারদ ব্যাসকে কৃষ্ণচরিত্র রচনার উপদেশ দিলেন। অতএব মহাভারতে যাহা আছে, এই ভাগবতে বা হরিবংশে বা অন্য পুরাণে তাহা নাই; মহাভারতে, যাহা নাই—পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহাই আছে।

অতএব মহাভারত সর্বপূর্ববর্তী। হরিবংশাদি ইহার অভাব পূরণার্থ মাত্র। যাহা সর্বাগ্রে রচিত হইয়াছিল, তাহাই সর্বাপেক্ষায় মৌলিক, ইহাই সম্ভব। কথিত আছে যে, মহাভারত, হরিবংশ, এবং অষ্টাদশ পুরাণ একই ব্যক্তির রচিত। সকলই মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত। এ কথা সত্য কি না, তাহার বিচারে এক্ষণে প্রয়োজন নাই। আগে দেখা যাউক, মহাভারতের কোন ঐতিহাসিকতা আছে কি না। যদি তাহা না থাকে, তবে হরিবংশে ও পুরাণে কোন ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধান বৃথা।

এক্ষণে যে বিচারে প্রবৃত্ত হইব, তাহাতে দুই দিকে দুই ঘোর বিপদ। এক দিকে, এ দেশীয় প্রাচীন সংস্কার যে, সংস্কৃতভাষায় যে কিছুর রচনা আছে, যে কিছুরে অনুস্মার আছে, সকলই অভ্রান্ত ঋষি-প্রণীত; সকলই প্রতিবাদ বা সন্দেহের অতীত যে সত্য, তাহাই আমাদের কাছে আনিয়া উপস্থিত করে। বেদবিভাগ, লক্ষ্মণোক্ত্যক মহাভারত, হরিবংশ, অষ্টাদশ পুরাণ, সকল একজনে করিয়াছেন; সকলই কলিযুগের আরম্ভে হইয়াছে; সেও পাঁচ হাজার বৎসর হইল; আর এই সকল বেদব্যাস যেমন করিয়াছিলেন, ঠিক তেমনই আছে। অনেক লোকে, এ সংস্কারের প্রতিবাদ শুনা দূরে যাউক, যে প্রতিবাদ করিবে, তাহাকে মহাপাতকী নারকী এবং দেশের সর্বনাশে প্রস্তুত মনে করেন।

এই এক দিকের বিপদ। আর দিকে গুরুতর বিপদ, বিলাতী পাণ্ডিত্য। ইউরোপ ও আমেরিকার কতকগুলি পাণ্ডিত সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ

বিশ্বকম রচনাবলী

হইতে ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদ্ভূত করিতে নিষ্কৃত, কিন্তু তাঁহাদের এ কথা অসহ্য যে, পরাধীন দুর্বল হিন্দুজাতি, কোন কালে সভ্য ছিল, এবং সেই সভ্যতা অতি প্রাচীন। অতএব দুই চারি জন ভিন্ন তাঁহারা সচরাচর প্রাচীন ভারতবর্ষের গৌরব খর্ব করিতে নিষ্কৃত। তাঁহারা যত্নপূর্বক ইহাই প্রমাণ করিতে চাহেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষীয় গ্রন্থ সকলে যাহা কিছু আছে—হিন্দুধর্মবিরোধী বৌদ্ধগ্রন্থ ছাড়া—সকলই আধুনিক, আর হিন্দুগ্রন্থে যাহাই আছে, তাহা হয় সম্পূর্ণ মিথ্যা, নয় অন্য দেশ হইতে চুরি করা। কোন মহাত্মা বলেন, রামায়ণ হোমরের কাব্যের অনুকরণ; কেহ বা বলেন, ভগবদ্গীতা বাইবেলের ছায়ামাত্র। হিন্দুর জ্যোতিষ চীন, যবন বা কাল্‌ডীয় হইতে প্রাপ্ত; হিন্দুর গণিতও পরের কাছে পাওয়া; লিখিত অক্ষরও কোন সীমীয় জাতীয় হইতে প্রাপ্ত। এ সকল কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাঁহাদের বিচারপ্রণালীর মূল সূত্র এই যে, ভারতবর্ষীয় গ্রন্থে ভারতপক্ষে যাহা পাওয়া যায়, তাহা মিথ্যা বা প্রক্ষিপ্ত, যাহা ভারতবর্ষের বিপক্ষে পাওয়া যায়, তাহাই সত্য। পাণ্ডবদিগের ন্যায় বীরচারিত্র ভারতবর্ষীয় পুরুষের কথা মিথ্যা, পাণ্ডব কাব্যকল্পনা মাত্র, কিন্তু পাণ্ডবপত্নী দ্রৌপদীর পণ্ড পতি সত্য, কেন না, তন্দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, প্রাচীন ভারতবাসীয়েরা চূয়াড় জাতি ছিল, তাহাদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। ফর্গাসন্ সাহেব অটালিকার ভগ্নাবশেষে কতকগুলো বিবস্ত্রা স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকেরা কাপড় পরিত না; এদিকে মথুরা প্রভৃতি স্থানের অপূর্ব ভাস্কর্য্য দেখিয়া বিলাতী পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, এ শিল্প গ্রীক্ মিস্ত্রীর। বেবর (Weber) সাহেব, কোন মতে হিন্দুদিগের জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রাচীনতা উড়াইয়া দিতে না পারিয়া স্থির করিলেন, হিন্দুরা চান্দ্র নক্ষত্রমণ্ডল বাবিলনীয়দিগের নিকট হইতে পাইয়াছে। বাবিলনীয়দিগের যে চান্দ্র নক্ষত্রমণ্ডল আদৌ কখনও ছিল না, তাহা চাপিয়া গেলেন। প্রমাণের অভাবেও Whitney সাহেব বলিলেন, তাহা হইতে পারে, কেন না, হিন্দুদের মানসিক স্বভাব তেমন তেজস্বী নয় যে, তাহারা নিজবুদ্ধিতে এত করে।

এই সকল মহাপুরুষগণের মতের সমালোচনায় আমার কোন প্রয়োজন ছিল না। কেন না, আমি স্বদেশীয় পাঠকের জন্য লিখি, হিন্দুদেষীদিগের জন্য লিখি না। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, আমার স্বদেশীয় শিক্ষিতসম্প্রদায়মধ্যে অনেকে তাঁহাদের মতের অনুবর্ত্তী। অনেকেই নিজে কিছু বিচার আচার না করিয়াই, কেবল ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মত বলিয়াই, সেই সকল মতের অনুবর্ত্তী। আমার দুঃখাঙ্ক্ষা যে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও কেহ কেহ এই গ্রন্থ পাঠ করেন। তাই, আমি ইউরোপীয় মতেরও প্রতিবাদে প্রবৃত্ত। যাঁহাদের কাছে বিলাতী সবই ভাল, যাঁহারা ইস্তক বিলাতী পণ্ডিত, লাগায়েৎ বিলাতী কুকুর, সকলেরই সেবা করেন, দেশী গ্রন্থ পড়া দূরে থাক, দেশী ভিখারীকেও ভিক্ষা দেন না, তাঁহাদের আমি কিছু করিতে পারিব না। কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই সত্যপ্রিয় এবং দেশবৎসল। তাঁহাদের জন্য লিখিব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—মহাভারতের ঐতিহাসিকতা

বলিয়াছি যে, কৃষ্ণচারিত্র যে সকল গ্রন্থে পাওয়া যায়, মহাভারত তাহার মধ্যে সর্বপূর্ববর্ত্তী। কিন্তু মহাভারতের উপর কি নির্ভর করা যায়? মহাভারতের ঐতিহাসিকতা কিছু আছে কি? মহাভারতকে ইতিহাস বলে, কিন্তু ইতিহাস বলিলে কি Historyই বুঝাইল? ইতিহাস কাহাকে বলে? এখনকার দিনে শৃগাল কুকুরের গল্প লিখিয়াও লোকে তাহাকে “ইতিহাস” নাম দিয়া থাকে। কিন্তু বস্তুতঃ যাহাতে পুরাবৃত্ত, অর্থাৎ পূর্বে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার আবৃত্তি আছে, তাহা ভিন্ন আর কিছুকেই ইতিহাস বলা যাইতে পারে না—

“ধর্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসম্বিতম্।

পূর্ববৃত্তকথায়ুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে ॥”

এখন, ভারতবর্ষের প্রাচীন গ্রন্থ সকলের মধ্যে কেবল মহাভারতই অথবা কেবল মহাভারত ও রামায়ণ ইতিহাস নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। যেখানে মহাভারত ইতিহাস পদে বাচ্য, যখন অন্ততঃ

রামায়ণ ভিন্ন আর কোন গ্রন্থই এই নাম প্রাপ্ত হয় নাই, তখন বিবেচনা করিতে হইবে যে, ইহার বিশেষ ঐতিহাসিকতা আছে বলিয়াই এরূপ হইয়াছে।

সত্য বটে যে, মহাভারতে এমন বিস্তর কথা আছে যে, তাহা স্পষ্টতঃ অলীক, অসম্ভব, অনৈতিহাসিক। সেই সকল কথাগুলি অলীক ও অনৈতিহাসিক বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারি। কিন্তু যে অংশে এমন কিছুই নাই যে, তাহা হইতে ঐ অংশ অলীক বা অনৈতিহাসিক বিবেচনা করা যায়, সে অংশগুলি অনৈতিহাসিক বলিয়া কেন পরিত্যাগ করিব? সকল জাতির মধ্যে, প্রাচীন ইতিহাসে এইরূপ ঐতিহাসিকে ও অনৈতিহাসিকে, সত্যে ও মিথ্যায়, মিশিয়া গিয়াছে। রোমক ইতিহাসবেত্তা লিবি প্রভৃতি, যখন ইতিহাসবেত্তা হেরোডোটস্ প্রভৃতি, মুসলমান ইতিহাসবেত্তা ফেরেশতা প্রভৃতি এইরূপ ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের সঙ্গে অনৈসর্গিক এবং অনৈতিহাসিক বৃত্তান্ত মিশাইয়াছেন। তাহাদিগের গ্রন্থ সকল ইতিহাস বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে—মহাভারতই অনৈতিহাসিক বলিয়া একেবারে পরিত্যক্ত হইবে কেন?

আমি জানি যে, আধুনিক ইউরোপীয়েরা এই সকল ইতিহাসবেত্তাদিগকে (Livy, Herodotus প্রভৃতিকে) আদর করেন না। কিন্তু তাহারা এমন বলেন না যে, ইহাদের গ্রন্থ অনৈসর্গিক ব্যাপারে পরিপূর্ণ, এই জন্যই ইহারা পরিত্যক্ত। তাহারা বলেন যে, ইহারা যে সকল সময়ের ইতিহাস লিখিয়াছেন, সে সকল সময়ে ইহারা নিজেও বর্তমান ছিলেন না, কোন সমসাময়িক লেখকেরও সাহায্য পান নাই; অতএব তাহাদের গ্রন্থের উপর, প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া নির্ভর করা যায় না। এ কথা যথার্থ, কিন্তু লিবি বা হেরোডোটস্ অপেক্ষা মহাভারতের সমসাময়িকতা সম্বন্ধে দাবি দাওয়া কিছু বেশী, তাহা এই গ্রন্থে সময়ান্তরে প্রমাণীকৃত হইবে। এই পর্য্যন্ত এখন বলিতে ইচ্ছা করি যে, আধুনিক ইউরোপীয় সমালোচকেরা যাহাই বলুন, প্রাচীন রোমক বা গ্রীক লিবি বা হেরোডোটস্‌দের গ্রন্থকে কখন অনৈতিহাসিক বলিতেন না। পক্ষান্তরে এমন দিনও উপস্থিত হইতে পারে যে, Gibbon বা Froude অসমসাময়িক বলিয়া পরিত্যক্ত হইবেন। আর আধুনিক সমালোচকের দল যাই বলুন, লিবি বা হেরোডোটস্‌কে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া রোম বা গ্রীসের কোন ইতিহাস আজিও লিখিত হয় না।

পাঠক মনে রাখিবেন যে, অনৈসর্গিকতার বাহুল্যঘটিত যে দোষ, তাহারই বিচার হইতেছে। এ বিষয়ে ইউরোপীয়দিগের পদাচ্ছিন্নসরণই যদি বিদ্যাবুদ্ধির পরাকাষ্ঠার পরিচয় হয়, তবে আমরা এখানে সে গৌরবে বঞ্চিত নহি। তাহারা স্থির করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের পূর্বতন অবস্থা জানিবার জন্য দেশীয় গ্রন্থ সকল হইতে কোন সাহায্য পাওয়া যায় না, কেন না, সে সকল অতিশয় অবিশ্বাসযোগ্য, কিন্তু গ্রীক লেখক Megasthenes এবং Ktesias এ বিষয়ে অতিশয় বিশ্বাসযোগ্য,—সে জন্য ইহারাই সে বিষয় ইউরোপীয় লেখকদিগের অবলম্বন। কিন্তু এই লেখকদিগের ক্ষুদ্র গ্রন্থগুলিতে যে রাশি রাশি অদ্ভুত, অলীক, অনৈসর্গিক উপন্যাস পাওয়া যায়, তাহা মহাভারতের লক্ষ শ্লোকের ভিতরও পাওয়া যায় না। এ গ্রন্থগুলি বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস, আর মহাভারত অবিশ্বাসযোগ্য কাব্য!! কি অপরাধে?

এখন ইহাও স্বীকার করা যাউক যে, ঐ সকল ভিন্নদেশীয় ইতিহাসগ্রন্থের অপেক্ষা মহাভারতে অনৈসর্গিক ঘটনার বাহুল্য অধিক। তাহাতেও, যেটুকু নৈসর্গিক ও সম্ভব ব্যাপারের ইতিবৃত্ত, সেটুকু গ্রহণ করিবার কোন আপত্তি দেখা যায় না। মহাভারতে যে অন্য দেশের প্রাচীন ইতিহাসের অপেক্ষা কিছু বেশী কাল্পনিক ব্যাপারের বাহুল্য আছে, তাহার বিশেষ কারণও আছে। ইতিহাসগ্রন্থে দুই কারণে অনৈসর্গিক বা মিথ্যা ঘটনা সকল স্থান পায়। প্রথম, লেখক জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া, সেই সকলকে সত্য বিবেচনা করিয়া তাহা গ্রন্থভুক্ত করেন। দ্বিতীয়, তাহার গ্রন্থ প্রচারের পর, পরবর্তী লেখকেরা আপনাদিগের রচনা পূর্ববর্তী লেখকের রচনামধ্যে প্রক্ষিপ্ত করে। প্রথম কারণে সকল দেশের প্রাচীন ইতিহাস কাল্পনিক ব্যাপারের সংস্পর্শে দূষিত হইয়াছে—মহাভারতেও সেইরূপ ঘটিয়া থাকিবে।

কিন্তু দ্বিতীয় কারণটি অন্য দেশের ইতিহাসগ্রন্থে সেরূপ প্রবলতা প্রাপ্ত হয় নাই—মহাভারতকেই বিশেষ প্রকারে অধিকার করিয়াছে। তাহার তিনটি কারণ আছে।

প্রথম কারণ এই যে, অন্যান্য দেশে যখন ঐ সকল প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রণীত হয়, তখন প্রায়ই সে সকল দেশে গ্রন্থ সকল লিখিত করিবার প্রথা চলিয়াছে। গ্রন্থ লিখিত হইলে, তাহাতে পরবর্তী লেখকেরা স্বীয় রচনা প্রক্ষিপ্ত করিবার বড় সুবিধা পান না—লিখিত গ্রন্থে

বাংকম রচনাবলী

প্রক্ষিপ্ত রচনা শীঘ্র ধরা পড়ে। কেন না, প্রাচীন একথানা কাপির দ্বারা অন্য কাপির শুদ্ধাশুদ্ধি নিশ্চিত করা যায়। প্রাচীন ভারতবর্ষে গ্রন্থ সকল প্রণীত হইয়া মৃখে মৃখে প্রচারিত হইত, লিপিবিন্দ্যা প্রচলিত হইলে পরেও গ্রন্থ সকল পূর্বপ্রথানুসারে গুরু-শিষ্য-পরম্পরা মৃখে মৃখেই প্রচারিত হইত। তাহাতে প্রক্ষিপ্ত রচনা প্রবেশ করিবার বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছিল।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, রোম, গ্রীস বা অন্য কোন দেশে কোন ইতিহাসগ্রন্থ মহাভারতের ন্যায় জনসমাজে আদর বা গৌরব প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং ভারতবর্ষীয় লেখকদিগের পক্ষে মহাভারতে স্বীয় রচনা প্রক্ষিপ্ত করিবার যে লোভ ছিল, অন্য কোন দেশীয় লেখকদিগের সে রূপ ঘটে নাই।

তৃতীয় কারণ এই যে, অন্য দেশের লেখকেরা আপনার যশ বা তাদৃশ অন্য কোন কামনার বশীভূত হইয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেন। কাজেই আপনার নামে আপনার রচনা প্রচার করাই তাহাদিগের উদ্দেশ্য ছিল, পরের রচনার মধ্যে আপনার রচনা ডুবাইয়া দিয়া আপনার নাম লোপ করিবার অভিপ্রায় তাহাদের কখনও ঘটিত না। কিন্তু ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণেরা নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম হইয়া রচনা করিতেন। লোকহিত ভিন্ন আপনাদিগের যশ তাহাদিগের অভিপ্রেত ছিল না। অনেক গ্রন্থে তৎপ্রণেতার নামমাত্র নাই। অনেক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এমন আছে যে, কে তাহার প্রণেতা, তাহা আজ পর্য্যন্ত কেহ জানে না। ঈদৃশ নিষ্কাম লেখক, যাহাতে মহাভারতের ন্যায় লোকায়ত গ্রন্থের সাহায্যে তাহার রচনা লোকমধ্যে বিশেষ প্রকারে প্রচারিত হইয়া লোকহিত সাধন করে, সেই চেষ্টায় আপনার রচনা সকল তাদৃশ গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত করিতেন।

এই সকল কারণে মহাভারতে কাল্পনিক বৃত্তান্তের বিশেষ বাহুল্য ঘটিয়াছে। কিন্তু কাল্পনিক বৃত্তান্তের বাহুল্য আছে বলিয়া এই প্রসিদ্ধ ইতিহাসগ্রন্থে যে কিছুই ঐতিহাসিক কথা নাই, ইহা বলা নিতান্ত অসঙ্গত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—মহাভারতের ঐতিহাসিকতা

ইউরোপীয়দিগের মত

অসঙ্গতই হউক আর সঙ্গতই হউক, মহাভারতের ঐতিহাসিকতা অস্বীকার করেন, এমন অনেক আছেন। বলা বাহুল্য যে, ইংহারা ইউরোপীয় পণ্ডিত, অথবা তাহাদিগের শিষ্য। তাহাদিগের মতের সংক্ষেপতঃ উল্লেখ করিব।

বিলাতী বিদ্যার একটা লক্ষণ এই যে, তাহারা স্বদেশে যাহা দেখেন, মনে করেন বিদেশে ঠিক তাই আছে। তাহারা Moor ভিন্ন অগৌরবর্ণ কোন জাতি জানিতেন না, এজন্য এদেশে আসিয়া হিন্দুদিগকে “Moor” বলিতে লাগিলেন। সেইরূপ স্বদেশে Epic কাব্য ভিন্ন পদ্যে রচিত আখ্যানগ্রন্থ দেখেন নাই, সুতরাং ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা মহাভারত ও রামায়ণের সন্ধান পাইয়াই ঐ দুই গ্রন্থ Epic কাব্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। যদি কাব্য, তবে আর উহার ঐতিহাসিকতা কিছুরিহিল না, সব এক কথায় ভাসিয়া গেল।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এ বোল কিয়ৎ পরিমাণে ছাড়িয়াছেন, কিন্তু তাহাদের দেশী শিষ্যেরা ছাড়েন নাই।

কেন, মহাভারতকে সাহেবেরা কাব্যগ্রন্থ বলেন, তাহা তাহারা ঠিক বুঝান নাই। উহা পদ্যে রচিত বলিয়া এরূপ বলা হয়, এমত হইতে পারে না, কেন না, সর্বপ্রকার সংস্কৃত গ্রন্থই পদ্যে রচিত:—বিজ্ঞান, দর্শন, অভিধান, জ্যোতিষ, চিকিৎসা শাস্ত্র, সকলই পদ্যে প্রণীত হইয়াছে। তবে এমন হইতে পারে, মহাভারতে কাব্যংশ বড় সুন্দর:—ইউরোপীয়েরা যে প্রকার সৌন্দর্য্য Epic কাব্যের লক্ষণ বলিয়া নির্দেশ করেন, সেই জাতীয় সৌন্দর্য্য উহাতে বহুল পরিমাণে আছে বলিয়া, উহাকে Epic বলেন। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐ জাতীয় সৌন্দর্য্য অনেক ইউরোপীয় মৌলিক ইতিহাসেও আছে। ইংরেজের মধ্যে মেকলে, কার্লাইল্ ও ফ্রুদের গ্রন্থে, ফরাসীদিগের মধ্যে লামাতীন্ ও মিশালার গ্রন্থে, গ্রীকদিগের মধ্যে থুকিডিসের গ্রন্থে, এবং অন্যান্য ইতিহাসগ্রন্থে আছে। মানব-চরিত্রই কাব্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান; ইতিহাসবেত্তাও মনুষ্যচরিত্রের বর্ণন করেন; ভাল করিয়া তিনি যদি আপনার কার্য সাধন করিতে পারেন, তবে

কাজেই তাঁহার ইতিহাসে কাব্যের সৌন্দর্য্য আসিয়া উপস্থিত হইবে। সৌন্দর্য্যহেতু ঐ সকল গ্রন্থ অনৈতিহাসিক বলিয়া পরিত্যক্ত হয় নাই—মহাভারতও হইতে পারে না। মহাভারতে যে সে সৌন্দর্য্য অধিক পরিমাণে ঘটিয়াছে, তাহার বিশেষ কারণও আছে।

মুর্খের মতের বিশেষ আন্দোলনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু পণ্ডিতে যদি মুর্খের মত কথা কয়, তাহা হইলে কি কর্তব্য? বিখ্যাত Weber সাহেব পণ্ডিত বটে, কিন্তু আমার বিবেচনায় তিনি যে ক্ষণে সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের পক্ষে সে অতি অশুভক্ষণ। ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরব সেদিনকার জর্মানির অরণ্যনিবাসী বর্ষদিগের বংশধরের পক্ষে অসহ্য। অতএব প্রাচীন ভারতবর্ষের সভ্যতা অতি আধুনিক, ইহা প্রমাণ করিতে তিনি সর্বদা যত্নশীল। তাঁহার বিবেচনায় যিশুখ্রীষ্টের জন্মের পূর্বে যে মহাভারত ছিল, এমন বিবেচনা করিবার মুখ্য প্রমাণ কিছদ্ব নাই। এতটুকু প্রাচীনতার কথা স্বীকার করিবারও একমাত্র কারণ এই যে, Chrysostom নামা একজন ইউরোপীয় ভারতবর্ষে আসিয়া দাঁড়ী-মাঝির মুখে মহাভারতের কথা শুনিয়া গিয়াছিলেন। পাণিনির সূত্রে মহাভারত শব্দও আছে, যুধিষ্ঠিরাদিরও নাম আছে। কিন্তু তাহাতে তাঁহার বিশ্বাস হয় না, কেন না, পাণিনিও তাঁহার মতে “কালকের ছেলে”। তবে একজন ইউরোপীয়ের পবিত্র কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট নাভিকবাক্যের কোন প্রকার অবহেলা করিতে তিনি সক্ষম নহেন। অতএব মহাভারত যে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ছিল, ইহা তিনি কায়ক্লেশে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আর একজন ইউরোপীয় লেখক (Megasthenes) যিনি খ্রীষ্ট-পূর্ব তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীর লোক, এবং ভারতবর্ষে আসিয়া চন্দ্রগুপ্তের রাজধানীতে বাস করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার গ্রন্থে মহাভারতের কথা লেখেন নাই। কাজেই বেবর সাহেবের বিবেচনায় তাঁহার সময় মহাভারত ছিল না।* এখানে জর্মানি পণ্ডিতটি জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছাপূর্বক জুয়াচুরি করিয়াছেন। কেন না, তিনি বেশ জানেন যে, মিগাস্থেনিসের ভারতসম্বন্ধীয় গ্রন্থ বিদ্যমান নাই, কেবল অন্যান্য গ্রন্থকার তাহা হইতে যে সকল অংশ তাঁহাদিগের নিজ নিজ পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, তাহাই সংকলনপূর্বক ডাক্তার শ্বানবেক (Dr. Schwanbeck) নামক একজন আধুনিক পণ্ডিত একখানি গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন; তাহাই এখন মিগাস্থেনিসকৃত ভারতবৃত্তান্ত বলিয়া প্রচলিত। তাঁহার গ্রন্থের অধিকাংশ বিলুপ্ত; সুতরাং তিনি মহাভারতের কথা বলিয়াছিলেন কি না বলা যায় না। ইহা জানিয়া শুনিয়াও কেবল ভারতবর্ষের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধিবশতঃ বেবর সাহেব এরূপ কথা লিখিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত ভারত-সাহিত্যের ইতিবৃত্ত-বিষয়ক গ্রন্থে আদ্যোপান্ত ভারতবর্ষের গৌরব লাঘবের চেষ্টা ভিন্ন, অন্য কোন উদ্দেশ্য দেখা যায় না। ইহার পর বলা বাহুল্য যে, মিগাস্থেনিস মহাভারতের নাম করেন নাই, ইহা হইতেই এমন বুঝায় না যে, তাঁহার সময়ে মহাভারত ছিল না। অনেক হিন্দু জর্মানি বেড়াইয়া আসিয়াছেন, গ্রন্থও লিখিয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও গ্রন্থে ত বেবর সাহেবের নাম দেখিলাম না। সিদ্ধান্ত করিতে হইবে কি যে, বেবর সাহেব কখনও ছিলেন না?

অন্যান্য পণ্ডিতেরা, বেবর সাহেবের মত, সব উঠাইয়া দিতে চাহেন না। তাঁহারা যে আপত্তি করেন, তাহা দুই প্রকার;—

(১) মহাভারত প্রাচীন গ্রন্থ বটে, কিন্তু খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ কি পঞ্চম শতাব্দীতে প্রণীত হইয়াছিল, তাহার পূর্বে এরূপ গ্রন্থ ছিল না।

(২) আদিম মহাভারতে পাণ্ডবদিগের কোন কথা ছিল না। পাণ্ডব ও কৃষ্ণ প্রভৃতি কবিকল্পনা মাত্র।

দেশী মত আবার বিপরীত সীমান্তে গিয়াছে। দেশীয়েরা বলেন, কালির আরম্ভের ঠিক

* Since Megasthenes says nothing of this epic, it is not an improbable hypothesis that its origin is to be placed in the interval between his time and that of Chrysostom; for what ignorant sailors took note of would hardly have escaped his observation.

History of Sanskrit Literature, English Translation, p. 186. Trubner & Co., 1882.

বাংকম রচনাবলী

পূর্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল। সে সময়ে বেদব্যাস বসুন্ধর ছিলেন। কালির প্রবৃত্তিমাতে পাণ্ডবেরা স্বর্গারোহণ করেন। অতএব কালির আরম্ভেই অর্থাৎ অদ্য হইতে ৪৯৯২ বৎসর পূর্বে, মহাভারত প্রণীত হইয়াছিল।

দুইটি মতই ঘোরতর ভ্রমপরিপূর্ণ। দুই দলের মতেরই খণ্ডন আবশ্যিক। তজ্জন্য প্রথম প্রয়োজনীয় তত্ত্ব এই যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কবে হইয়াছিল, ইহার নির্ণয়। তাহা নির্ণীত হইলেই কতক বৃদ্ধিতে পারিব, মহাভারত কবে প্রণীত হইয়াছিল, এবং পাণ্ডবাদি কবিকল্পনা মাত্র কি না? তাহা হইলেই জানিতে পারিব, মহাভারতের উপর নির্ভর করা যায় কি না?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কবে হইয়াছিল

প্রথমে, দেশী মতেরই সমালোচনা আবশ্যিক। ৪৯৯২ বৎসর পূর্বে যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল, এ কথাটা সত্য নহে; ইহা আমি দেশী গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই প্রমাণ করিব। রাজতরঙ্গিণীকার বলেন, কালির ৬৫৩ বৎসর গতে গোনন্দ কাশ্মীরে রাজা হইয়াছিলেন। আরও বলেন, গোনন্দ যুদ্ধাশ্রিতের সমকালবর্তী রাজা। তিনি ৩৫ বৎসর রাজত্ব করেন। অতএব প্রায় সাত শত বৎসর আরও বাদ দিতে হয়। তাহা হইলে ২৪০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ পাওয়া যায়।

কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে আছে—

সপ্তর্ষীগাণ্ড যো পূর্বে দৃশ্যতে উদিতৌ দিবি।

তয়োস্তু মধ্যনক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমং নিশি ॥

তেন সপ্তর্ষয়ো যুক্তান্তিস্ত্যক্ত্যব্দশতং নৃগাম্।

তে তু পারিক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন্ দ্বিজোত্তম ॥

তদা প্রবৃত্তশ্চ কালিদ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ।—৪ অংশঃ, ২৪ অ, ৩৩-৩৪

অর্থ। সপ্তর্ষিমণ্ডলের মধ্যে যে দুইটি তারা আকাশে পূর্বদিকে উদিত দেখা যায়, ইহাদের সমসূত্রে যে মধ্যনক্ষত্র দেখা যায়, সেই নক্ষত্রে সপ্তর্ষি শত বৎসর অবস্থান করেন।* সপ্তর্ষি পরীক্ষিতের সময়ে মঘা নক্ষত্রে ছিলেন, তখন কালির দ্বাদশ শত বৎসর প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

অতএব এই কথা মতে কালির দ্বাদশ শত বৎসরের পর পরীক্ষিতের সময়; তাহা হইলে উপরি উদ্ধৃত ৩৪ শ্লোক অনুসারে ১৯০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল।

কিন্তু ৩৩ শ্লোকে যাহা পাওয়া যায়, তাহার সঙ্গে এ গণনা মিলে না। ঐ ৩৩ শ্লোকের তাৎপর্য অতি দুর্গম—সবিস্তারে বুঝাইতে হইল। সপ্তর্ষিমণ্ডল কতকগুলি স্থিরনক্ষত্র, উহার বিলাতী নাম Great Bear বা Ursa Major. মঘা নক্ষত্রও কতকগুলি স্থিরতারা। সকলেই জানেন, স্থিরতারার গতি নাই। তবে বিষুবের একটু সামান্য গতি আছে—ইংরেজ জ্যোতির্বিদেরা তাহাকে বলেন “Precession of the Equinoxes.” এই গতি হিন্দু মতে প্রতি বৎসর ৫৪ বিকলা। এক এক নক্ষত্রে ১৩৬° অংশ। এ হিসাবে কোন স্থিরতারার এক নক্ষত্র পরিভ্রমণ করিতে সহস্র বৎসর লাগে—শত বৎসর নয়। তাহা ছাড়া, সপ্তর্ষিমণ্ডল কখনও মঘা নক্ষত্রে থাকিতে পারে না। কারণ মঘা নক্ষত্র সিংহরাশিতে। দ্বাদশ রাশি রাশিচক্রের ভিতর। সপ্তর্ষিমণ্ডল রাশিচক্রের বাহিরে। যেমন ইংলন্ড ভারতবর্ষে কখনও থাকিতে পারে না, তেমনি সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘা নক্ষত্রে থাকিতে পারে না।

পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তবে পুরাণকার ঋষি কি গাঁজা খাইয়া এই সকল কথা লিখিয়াছিলেন? এমন কথা আমরা বলিতেছি না, আমরা কেবল ইহাই বলিতেছি যে, এই প্রাচীন উক্তির তাৎপর্য আমাদের বোধগম্য নহে। কি ভাবিয়া পুরাণকার লিখিয়াছিলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। পাশ্চাত্য পণ্ডিত বেণ্টলি সাহেব তাহা এইরূপ বুঝিয়াছেনঃ—

“The notion originated in a contrivance of the astronomers to show the quantity of the precession of the equinoxes : This was by assuming an imaginary line, or great circle, passing through the poles of the ecliptic

* নক্ষত্র এখানে অশ্বিন্যাতি।

and the beginning of the fixed Magha, which circle was supposed to cut some of the stars in the Great Bear. * * * The seven stars in the Great Bear being called the Rishis, the circle so assumed was called the line of the Rishis; and being invariably fixed to the beginning of the lunar asterism Magha, the precession would be noted by stating the degree &c. of any moveable lunar mansion cut by that fixed line or circle as an index."

Historical View of the Hindu Astronomy, p. 65.

এইরূপ গণনা করিয়া বেন্টলি যুধিষ্ঠিরকে ৫৭৫ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে আনিয়া ফেলিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার মতে যুধিষ্ঠির শাক্যসিংহের অল্প পূর্ববর্তী। আমেরিকার পণ্ডিত Whitney সাহেব বলেন, হিন্দুদিগের জ্যোতিষিক গণনা এত অশুদ্ধ যে, তাহা হইতে কোন কালাবধারণচেষ্টা বৃথা। কিন্তু যে কোন প্রকারে হউক, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কালাবধারণ হইতে পারে, দেখাইতেছি।

প্রথমতঃ পুরাণকার ঋষির অভিপ্রায় অনুসারেই গণনা করা যাউক। তিনি বলেন যে, যুধিষ্ঠিরের সময়ে সপ্তর্ষি মঘায় ছিলেন, নন্দ মহাপদ্মের সময় পূর্বাষাঢ়ায়।

প্রযাস্যন্তি যদা চৈতে পূর্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ ।

তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বর্দ্ধিং গমিষ্যতি ॥ ৪।২৪।৩৯

তার পর, শ্রীমদ্ভাগবতেও ঐ কথা আছে—

যদা মঘাভ্যো যাস্যন্তি পূর্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ ।

তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বর্দ্ধিং গমিষ্যতি ॥ ১২।২।৩২

মঘা হইতে পূর্বাষাঢ়া দশম নক্ষত্র; যথা—মঘা, পূর্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্বাষাঢ়া। অতএব যুধিষ্ঠির হইতে নন্দ ১০ × ১০০ = সহস্র বৎসর অন্তর।

এখন, আর এক প্রকার গণনা যাহা সকলেই বুঝিতে পারে, তাহা দেখা যাউক। বিষ্ণু-পুরাণের যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার পূর্বশ্লোক এইঃ—

যাবৎ পরিষ্কিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্ ।

এতদ্বর্ষসহস্রস্তু জেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্ ॥ ৪।২৪।৩২

নন্দের পুরা নাম নন্দ মহাপদ্ম। বিষ্ণুপুরাণে ঐ ৪ অংশের ২৪ অধ্যায়েই আছে—

“মহাপদ্মঃ তৎপুত্রাশ্চ একবর্ষশতমবনীপত্যো ভবিষ্যন্তি। নবৈব তান্ নন্দান্ কোটিল্যো ব্রাহ্মণঃ সমুদ্বারিষ্যতি। তেষামভাবে মোর্ষ্যাশ্চ পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি। কোটিল্য এব চন্দ্রগুপ্তং রাজ্যেহভিষেক্ষ্যতি।”

ইহার অর্থ—মহাপদ্ম এবং তাঁহার পুত্রগণ একশতবর্ষ পৃথিবীপতি হইবেন। কোটিল্য* নামে ব্রাহ্মণ নন্দবংশীয়গণকে উন্মূলিত করিবেন। তাঁহাদের অভাবে মোর্ষ্যাগণ পৃথিবী ভোগ করিবেন। কোটিল্য চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যভিষিক্ত করিবেন।

তবেই যুধিষ্ঠির হইতে চন্দ্রগুপ্ত ১১১৫ বৎসর। চন্দ্রগুপ্ত অতি বিখ্যাত সম্রাট—ইনিই মার্কিনীয় যবন আলেকজন্দর ও সিলিউকস্ নৈকটরের সমসাময়িক। ইনি বাহুবলে মার্কিনীয় যবনদিগকে ভারতবর্ষ হইতে দূরীকৃত করিয়াছিলেন, এবং প্রবলপ্রতাপ সিলিউকস্কে পরাভূত করিয়া তাঁহার কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার মত দৌর্দণ্ডপ্রতাপ তখন কেহই পৃথিবীতে ছিলেন না। কথিত আছে, তিনি অকুতোভয়ে আলেকজন্দরের শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। আলেকজন্দর ৩২৫ খ্রীঃ পূর্বাব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন।

চন্দ্রগুপ্ত ৩১৫ খ্রীঃ পূর্বাব্দে রাজ্যপ্রাপ্ত হইলেন। অতএব ঐ ৩১৫ অঙ্কের সহিত উপরিলিখিত ১১১৫ যোগ করিলেই যুধিষ্ঠিরের সময় পাওয়া যাইবে। ৩১৫+১১১৫= ১৪৩০ খ্রীঃ পূঃ তবে মহাভারতের যুদ্ধের সময়।

অন্যান্য পুরাণেও ঐরূপ কথা আছে। তবে মৎস্য ও বায়ু পুরাণে ১১১৫ স্থানে ১১৫০ লিখিত আছে। তাহা হইলে ১৪৬৫ পাওয়া যায়।

* বিখ্যাত চাণক্য।

বিক্রম রচনাবলী

কুরক্ষের যুদ্ধ যে ইহার বড় বেশি পূর্বে হয় নাই, বরং কিছু পরেই হইয়াছিল, তাহার এক অখণ্ডনীয় প্রমাণ পাওয়া যায়। সকল প্রমাণ খণ্ডন করা যায়—গণিত জ্যোতিষের প্রমাণ খণ্ডন করা যায় না—“চন্দাকৌ যত্র সাক্ষিণো।”

সকলেই জানে যে, বৎসরের দুইটি দিনে দিবারাত্র সমান হয়। সেই দুইটি দিন একের ছয় মাস পরে আর একটি উপস্থিত হয়। উহাকে বিষুব বলে। আকাশের যে যে স্থানে ঐ দুই দিনে সূর্য থাকেন, সেই স্থান দুইটিকে ক্রান্তিপাতবিন্দু (Equinoctial point) বলে। উহার প্রত্যেকটির ঠিক ৯০ অংশ (90 degrees) পরে অয়ন পরিবর্তন হয় (Solstice)। ঐ ৯০ অংশে উপস্থিত হইলে সূর্য দক্ষিণায়ন হইতে উত্তরায়ণে বা উত্তরায়ণ হইতে দক্ষিণায়নে যান।

মহাভারতে আছে, ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু। তিনি শরশয্যাশায়ী হইলে বলিয়াছিলেন যে, আমি দক্ষিণায়নে মরিব না, (তাহা হইলে সদর্গতির হানি হয়); অতএব শরশয্যায় শূন্য উত্তরায়ণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মাঘ মাসে উত্তরায়ণ হইলে তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। প্রাণত্যাগের পূর্বে ভীষ্ম বলিতেছেন,—

“মাঘোহয়ং সমনুপ্রাপ্তো মাসঃ সৌম্যো যুর্ধিষ্ঠির।”

তবে, তখন মাঘ মাসেই উত্তরায়ণ হইয়াছিল। অনেকে মনে করেন, এখনও মাঘ মাসেই উত্তরায়ণ হয়, কেন না, ১লা মাঘকে উত্তরায়ণ দিন এবং তৎপূর্বাদিনকে মকর-সংক্রান্তি বলে। কিন্তু তাহা আর হয় না। যখন অশ্বিনী নক্ষত্রের প্রথম অংশে ক্রান্তিপাত হইয়াছিল, তখন অশ্বিনী প্রথম নক্ষত্র বলিয়া গণিত হইয়াছিল; তখন আশ্বিন মাসে বৎসর আরম্ভ করা হইত, এবং তখনই ১লা মাঘে উত্তরায়ণ হইত। এখনও গণনা সেইরূপ চলিয়া আসিতেছে, এখন ফসলী সন ১লা আশ্বিনে আরম্ভ হয়, কিন্তু এখন আর অশ্বিনী নক্ষত্রে ক্রান্তিপাত হয় না; এবং এখন ১লা মাঘে পূর্বের মত উত্তরায়ণ হয় না। এখন ৭ই পৌষ বা ৮ই পৌষ (২১শে ডিসেম্বর) উত্তরায়ণ হয়। ইহার কারণ এই যে, ক্রান্তিপাত-বিন্দুর একটা গতি আছে, ঐ গতিতে ক্রান্তিপাত, সূত্রাং অয়নপরিবর্তনস্থানও, বৎসর বৎসর পিছাইয়া যায়। ইহাই পূর্বকথিত Precession of the Equinoxes—হিন্দু নাম “অয়নচলন”। কত পিছাইয়া যায়, তাহারও পরিমাণ স্থির আছে। হিন্দুরা বলেন, বৎসরে ৫৪ বিকলা, ইহাও পূর্বে কথিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে সামান্য ভুল আছে। ১৭২ খ্রীঃ-পূর্বাঙ্কে হিপার্কস্‌নামা গ্রীক জ্যোতির্বিদ ক্রান্তিপাত হইতে ১৭৪ অংশে চিত্রা নক্ষত্রকে দেখিয়াছিলেন। মাস্কলাইন্ ১৮০২ খ্রীঃ অব্দে চিত্রাকে ২০১ অংশে ৪ কলা ৪ বিকলায় দেখিয়াছিলেন। ইহা হইতে হিসাব করিয়া পাওয়া যায়, ক্রান্তিপাতের বার্ষিক গতি সাড়ে পঞ্চাশ বিকলা। বিখ্যাত ফরাসী জ্যোতির্বিদ Leverrier ঐ গতি অন্য কারণ হইতে ৫০.২৪ বিকলা স্থির করিয়াছেন, এবং সর্বশেষে Stockwell গণিয়া ৫০.৪৩৮ বিকলা পাইয়াছেন। এই গণনা প্রথম গণনার সঙ্গে মিলে। অতএব ইহাই গ্রহণ করা যাউক।

ভীষ্মের মৃত্যুকালেও মাঘ মাসে উত্তরায়ণ হইয়াছিল, কিন্তু সৌর মাঘের* কোন দিনে, তাহা লিখিত নাই। পৌষ মাঘে সচরাচর ২৮ কি ২৯ দিন দেখা যায়। এই দুই মাসে ৫৭ দিনের বেশী প্রায় দেখা যায় না। কিন্তু এমন হইতে পারে না যে, তখন মাঘ মাসের শেষ দিনেই উত্তরায়ণ হইয়াছিল। কেন না, তাহা হইলে “মাঘোহয়ং সমনুপ্রাপ্তঃ” কথাটি বলা হইত না। ২৮শে মাঘে উত্তরায়ণ ধরিলেও এখন হইতে ৪৮ দিন তফাৎ। ৪৮ দিনে রবির গতি মোটামুটি ৪৮ অংশ ধরা যাইতে পারে; কিন্তু ইহা ঠিক বলা যায় না, কেন না, রবির শীঘ্রগতি ও মন্দগতি আছে। ৭ই পৌষ হইতে ২৯শে মাঘ পর্যন্ত রবিফুট বাঙ্গালা পঞ্জিকা ধরিয়া গণিলে ৪৪ অংশ ৪ কলা মাত্র গতি পাওয়া যায়। ঐ ৪৪ অংশ ৪ কলা লইলে খ্রীঃ পূঃ ১২৬৩ বৎসর পাওয়া যায়। ৪৮ অংশ পূরা লইলে খ্রীঃ পূঃ ১৫৩০ বৎসর পাওয়া যায়। ইহা কোন মতেই হইতে পারে না যে, ইহার পূর্বে কুরক্ষের যুদ্ধ হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণ হইতে যে খ্রীঃ পূঃ ১৪৩০ পাওয়া গিয়াছে, তাহাই ঠিক বোধ হয়। ভরসা করি, এই সকল প্রমাণের পর আর কেহই বলিবেন না যে, মহাভারতের যুদ্ধ দ্বাপরের শেষে, পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে হইয়াছিল। তাহা যদি হইত, তবে সৌর চৈত্রে উত্তরায়ণ হইত। চান্দ্র মাঘও কখনও সৌর চৈত্রে হইতে পারে না।

* সে কালেও সৌর মাসের নামই প্রচলিত ছিল, ইহা আমি প্রমাণ করিতে পারি। ছয় ঋতুর কথা আছে। বার মাস নহিলে ছয় ঋতু হয় না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—পান্ডবদিগের ঐতিহাসিকতা

ইউরোপীয় মত

মহাভারতের যুদ্ধকাল সম্বন্ধে ইউরোপীয়দিগের সঙ্গে আমাদের কোন মারাত্মক মতভেদ হইতেছে না। কোলরুক্ সাহেব গণনা করিয়াছেন, খ্রীঃ পূঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে এই যুদ্ধ হইয়াছিল। উইলসন সাহেবও সেই মতাবলম্বী। এলফিন্‌ষ্টোন তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। উইলফোর্ড সাহেব বলেন, খ্রীঃ পূঃ ১৩৭০ বৎসরে ঐ যুদ্ধ হয়। বুকাননের মত গ্রয়োদশ শতাব্দীতে। প্রাট সাহেব গণনা করিয়াছেন, খ্রীঃ পূঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। প্রতিবাদের কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। কিন্তু পূর্বে বলিয়াছি যে, ইউরোপীয়দিগের মত এই যে, মহাভারত খ্রীষ্ট-পূর্ব চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। এবং আদিম মহাভারতে পান্ডবদিগের কোন কথা ছিল না—ও সব পশ্চাত্তরী কবিদিগের কল্পনা, এবং মহাভারতে প্রসিক্ত।

যদি এই দ্বিতীয় কথাটা সত্য হয়, তবে মহাভারত কবে প্রণীত হইয়াছিল, সে কথা মীমাংসার কিছু প্রয়োজন থাকে না। তাহা হইলে, যবেই মহাভারত প্রণীত হউক না কেন—কৃষ্ণঘটিত কথা যাহা কিছু এখন মহাভারতে পাওয়া যায়, সবই মিথ্যা। কেন না, কৃষ্ণঘটিত মহাভারতীয় সমস্ত কথাই প্রায় পান্ডবদিগের সঙ্গে সম্বন্ধবিশিষ্ট। অতএব আগে দেখা উচিত যে, এই শেষোক্ত আপত্তির কোন প্রকার ন্যায্যতা আছে কি না।

প্রথমতঃই লাসেন্ সাহেবকে ধরিতে হয়—কেন না, তিনি বড় লক্ষপ্রতিষ্ঠ জার্মান পণ্ডিত। মহাভারত যবেই প্রণীত হউক, তিনি স্বীকার করেন যে, ইহার কিছু ঐতিহাসিকতা আছে। কিন্তু তিনি সেটুকু স্বীকার করেন, সেটুকু এই মাত্র যে, মহাভারতে যে যুদ্ধ বর্ণিত আছে, তাহা কুরুপাণ্ডালের যুদ্ধ—পান্ডবগণকে অনৈতিহাসিক কবিকল্পনাপ্রসূত বলিয়া উড়াইয়া দেন। বেবর সাহেবও সে মত গ্রহণ করেন। সর মনিয়র উইলিয়ম্‌স্, বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি অনেকেই সেই মতের অবলম্বী। মতটা কি, তাহা সংক্ষেপে বুঝাইতেছি।

কুরু নামে একজন রাজা ছিলেন। আমরা পুরাণেতিহাসে শূর্য্যন, তদ্বংশীয় রাজগণকে কুরু বা কোঁরব বলা যায়। তাহাদিগের অধিকৃত দেশবাসীগণকেও ঐ নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। তাহা হইলে কুরু শব্দ কোঁরবাধিকৃত জনপদবাসীদিগকে বুঝাইল। পাণ্ডালেরা দ্বিতীয় জনপদবাসী। এই অর্থেই পাণ্ডাল শব্দ মহাভারতে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই দুই জনপদ পরস্পর সম্বন্ধিত। উত্তর পশ্চিমে যে সকল জনপদ ছিল, মহাভারতীয় যুদ্ধের পূর্বে এই দুই জনপদ তন্মধ্যে সর্বাধিক প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। বোধ হয়, এককালে এই দুই জনপদবাসীগণ মিলিতই ছিল। কেন না, কুরু-পাণ্ডাল পদ বৈদিক গ্রন্থে পাওয়া যায়। পরে তাহাদিগের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। বিরোধের পরিণাম মহাভারতের যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে কুরুগণ পাণ্ডালগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিল।

এতদূর পর্য্যন্ত আমরা কোন আপত্তি করি না, এবং এ কথায় আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। বস্তুতঃ কুরুগণের প্রকৃত বিপক্ষগণ পাণ্ডালগণই বটে। মহাভারতে কোঁরবদিগের প্রতিযুদ্ধকারী সেনা পাণ্ডাল সেনা, অথবা পাণ্ডাল ও সঞ্জয়গণ* বলিয়া বর্ণিত হইয়াছিল। পাণ্ডালরাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নই সেই সেনার সেনাপতি। পাণ্ডালরাজপুত্র শিখণ্ডীই কোঁরবপ্রধান ভীষ্মকে নিপাতিত করেন। পাণ্ডালরাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন কোঁরবাচার্য্য দ্রোণকে নিপাতিত করেন। যদি এ যুদ্ধ প্রধানতঃ ধৃতরাষ্ট্রপুত্র ও পান্ডুপুত্রদিগের যুদ্ধ হইত, তাহা হইলে ইহাকে কুরু-পান্ডবের যুদ্ধ কখনই বলিত না, কেন না, পান্ডবেরাও কুরু; তাহা হইলে ইহাকে ধার্ত্তরাষ্ট্র-পান্ডবদিগের যুদ্ধ বলিত। ভীষ্ম, এবং কোঁরবাচার্য্য দ্রোণ ও কৃপের সঙ্গে ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের যে সম্বন্ধ, পান্ডবদিগের সঙ্গেও সেই সম্বন্ধ, স্নেহও তুল্য। যদি এ যুদ্ধ ধার্ত্তরাষ্ট্র-পান্ডবের যুদ্ধ হইত, তবে তাহারা কখনই দুর্য্যোধনপক্ষ অবলম্বন করিয়া পান্ডবদিগের অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হইতেন না—কেন না, তাহারা ধর্ম্মাত্মা ও ন্যায়পর। কুরুপাণ্ডালের বিরোধ পান্ডবগণ

* সঞ্জয়েরা পাণ্ডালভুক্ত—তাহাদিগের জ্ঞাতি।

বাংকম রচনাবলী

বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্বে হইতেই প্রচলিত ছিল, ইহা মহাভারতেই আছে। মহাভারতেই আছে যে, পাণ্ডব ও ধর্ত্তরাষ্ট্রগণ প্রভৃতি সকল কোরব মিলিত এবং দ্রোণাচার্য্য কর্তৃক অভিরক্ষিত হইয়া, পাণ্ডালরাজ্য আক্রমণ করে। এবং পাণ্ডালরাজকে পরাজিত করিয়া তাঁহার অতিশয় লাঞ্ছনা করেন।

অতএব এই যুদ্ধ যে প্রধানতঃ কুরুপাণ্ডালের যুদ্ধ, স্বীকার করি। স্বীকার করিয়া, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ, যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন, আমি তাহা গ্রহণ করিতে পারি না। তাঁহারা বলেন যে, যুদ্ধটা কুরুপাণ্ডালের, পাণ্ডবেরা কেহ নহেন, পাণ্ডু বা পাণ্ডব কেহ ছিলেন না। এ সিদ্ধান্তের অন্য হেতুও তাঁহারা নির্দেশ করেন। সে সকল হেতুর সমালোচনা আমি পশ্চাৎ করিব। এখন ইহা বুঝাইতে চাই যে, কুরু-পাণ্ডালের যুদ্ধ বলিয়া যে পাণ্ডবদিগের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে হইবে, ইহা সঙ্গত নহে। পাণ্ডবের স্বশুর পাণ্ডালাধিপতি ধর্ত্তরাষ্ট্রদিগের উপর আক্রমণ করিলে, পাণ্ডবেরা তাঁহার সহায় হইয়া, তাঁহার পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, ইহাই সম্ভব। পাণ্ডবদিগের জীবনবৃত্তান্ত এই;—কোরবাধিপতি বিচিত্রবীর্ষের দুই পুত্র, ধর্ত্তরাষ্ট্র ও পাণ্ডু।* ধর্ত্তরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ, কিন্তু অন্ধ। অন্ধ বলিয়া রাজ্যশাসনে অনধিকারী বা অক্ষম। রাজ্য পাণ্ডুর হস্তগত হইল। পরিশেষে পাণ্ডুকেও রাজ্যচ্যুত ও অরণ্যচারী দেখি—ধর্ত্তরাষ্ট্রের রাজ্য আবার ধর্ত্তরাষ্ট্রের হাতে গেল। তাহার পর পাণ্ডুপুত্রেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, রাজ্য পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিল, কাজেই ধর্ত্তরাষ্ট্র ও ধর্ত্তরাষ্ট্রগণ তাঁহাদিগকে নিস্বাসিত করিলেন। তাঁহারা বনে বনে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে পাণ্ডালরাজের কন্যা বিবাহ করিয়া পাণ্ডালদিগের সহিত আত্মীয়তা সংস্থাপন করিলেন। পাণ্ডালরাজের সাহায্যে এবং তাঁহাদিগের মাতুলপুত্র ও প্রবলপ্রতাপ যাদবদিগের নেতা কৃষ্ণের সাহায্যে তাঁহারা ইন্দ্রপ্রস্থে নূতন রাজ্য সংস্থাপিত করিলেন। পরিশেষে সে রাজ্যও ধর্ত্তরাষ্ট্রদিগের করকবলিত হইল।

পাণ্ডবেরা পুনর্বার বনচারী হইলেন। এই অবস্থায় বিরাটের সঙ্গে সখ্য ও সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন। পরে পাণ্ডালেরা কোরবদিগকে আক্রমণ করিল। পূর্ববৈর প্রতিশোধজন্য এ আক্রমণ, এবং পাণ্ডবদিগের রাজ্যাধিকার উপলক্ষ্য মাত্র কি না, স্থির করিয়া বলা যায় না। যাই হোক, পাণ্ডালেরা যুদ্ধে বন্ধপরিষ্কার হইলে পাণ্ডবেরা তাঁহাদের পক্ষ থাকিয়া ধর্ত্তরাষ্ট্রগণের সহিত যুদ্ধ করাই সম্ভব।

বলিয়াছি যে, পাণ্ডব ছিল না, এ কথা বলিবার, উপরির্লিখিত পণ্ডিতেরা অন্য কারণ নির্দেশ করেন। একটি কারণ এই যে, সমসাময়িক কোন গ্রন্থে পাণ্ডব নাম পাওয়া যায় না। উত্তরে হিন্দু বলিতে পারেন, এই মহাভারতই ত সমসাময়িক গ্রন্থ—আবার চাই কি? সে কালে ইতিহাস লেখার প্রথা ছিল না যে, কতকগুলো গ্রন্থে তাঁহাদের নাম পাওয়া যাইবে। তবে ইউরোপীয়েরা বলিতে পারেন যে, শতপথব্রাহ্মণ একখানি অনল্পপরবর্ত্তী গ্রন্থ। তাহাতে ধর্ত্তরাষ্ট্র, পরিষ্কিৎ এবং জনমেজয়ের নাম আছে, কিন্তু পাণ্ডবদিগের নামগন্ধ নাই—কাজেই পাণ্ডবেরাও ছিল না।

এরূপ সিদ্ধান্ত ভারতবর্ষীয় প্রাচীন রাজগণ সম্বন্ধে হইতে পারে না। কোন ভারতবর্ষীয় গ্রন্থে মাকিদনের আলেক্জন্দরের নামগন্ধ নাই—অথচ তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া যে কাণ্ডটা উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা কুরুক্ষেত্রের ন্যায় গুরুতর ব্যাপার। সিদ্ধান্ত করিতে হইবে কি, আলেক্জন্দর নামে কোন ব্যক্তি ছিলেন না, এবং গ্রীক ইতিহাসবেত্তা তদ্ব্তান্ত যাহা লিখিয়াছেন, তাহা কবিকল্পনামাত্র? কোন ভারতবর্ষীয় গ্রন্থে গজনবী মহম্মদের নামগন্ধ নাই—সিদ্ধান্ত করিতে হইবে, ইনি মুসলমান লেখকদিগের কল্পনাপ্রসূত ব্যক্তি মাত্র? বাঙ্গালার সাহিত্যে বখ্‌তিয়ার খিলিজির নামমাত্র নাই—সিদ্ধান্ত করিতে হইবে কি যে, ইনি মিন্‌হাজদ্দিনের কল্পনাপ্রসূত মাত্র? যদি তাহা না হয়, তবে একা মিন্‌হাজদ্দিনের বাক্য বিশ্বাসযোগ্য হইল, কিসে, আর মহাভারতের কথা অবিশ্বাসযোগ্য কিসে?

বেবর সাহেব বলেন, শতপথব্রাহ্মণে অজ্জর্ন শব্দ আছে, কিন্তু ইহা ইন্দ্রার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে—কোন পাণ্ডবকে বুঝায়, এমন অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। এজন্য তিনি বুঝিয়াছেন যে, পাণ্ডব অজ্জর্ন মিথ্যাকল্পনা, ইন্দ্রস্থানে ইনি আদিষ্ট হইয়াছেন মাত্র। এ বুদ্ধির ভিতর প্রবেশ

* বিদুর বৈশ্যাজাত।

করিতে আমরা অক্ষম। ইন্দ্রার্থে অজ্জর্ন শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, এজন্য অজ্জর্ন নামে কোন মনুষ্য ছিল না, এ সিদ্ধান্ত বদ্বিধিতে আমরা অক্ষম।

কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিলে চলিত, কিন্তু বেবর সাহেব মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, বেদ ছাপাইয়াছেন; আর আমরা বাঙ্গালী, তাতে গণ্ডমূর্খ, তাঁহাকে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া বড় ধৃষ্টতার কাজ হয়। তবে, কথাটা একটু বদ্বাই। শতপথরাক্ষণে, অজ্জর্ন নাম আছে, ফাল্গুন নামও আছে। যেমন অজ্জর্ন ইন্দ্র ও মধ্যম পাণ্ডব উভয়ের নাম, ফাল্গুনও তেমনই ইন্দ্র ও মধ্যম পাণ্ডব উভয়ের নাম। ইন্দ্রের নাম ফাল্গুন, কেন না, ইন্দ্র ফাল্গুনী নক্ষত্রের অধিষ্ঠাতৃদেবতা;* অজ্জর্নের নাম ফাল্গুন, কেন না, তিনি ফাল্গুনী নক্ষত্রে জন্মিয়াছিলেন। হয়ত ইন্দ্রাধিষ্ঠিত নক্ষত্রে জন্ম বলিয়াই তিনি ইন্দ্রপুত্র বলিয়া খ্যাত; ইন্দ্রের ঔরসে তাঁহার জন্ম, এ কথা কোন শিক্ষিত পাঠকই বিশ্বাস করিবেন না। আবার অজ্জর্ন শব্দে শুরু। মেঘদেবতা ইন্দ্রও শুরু নহে, মেঘবর্ণ অজ্জর্নও শুরুবর্ণ নহে। উভয়ে নিম্মলকর্মকারী, শূদ্র, পবিত্র; এজন্য উভয়েই অজ্জর্ন। ইন্দ্রের নাম যে অজ্জর্ন, শতপথরাক্ষণে সে কথাটা এইরূপে আছে—“অজ্জর্নো বৈ ইন্দ্রো বদস্য গৃহ্যনাম”†; অজ্জর্ন, ইন্দ্র; সেটি ইঁহার গৃহ্য নাম। ইহাতে কি বদ্বায় না যে, অজ্জর্ন নামে অন্য ব্যক্তি ছিল, তাঁহার মহিমাবৃদ্ধির অভিপ্রায়ে ইন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার ঐক্য-স্থাপনজন্য, অজ্জর্নের নাম, ইন্দ্রের একটা লুকানো নাম বলিয়া প্রচারিত করিতেছেন? বেবর সাহেব “গৃহ্য” অর্থে “mystic” বদ্বিয়া, লোককে বোকা বদ্বাইয়াছেন।

আর একটি রহস্যের কথা বলি। কুরাচি গাছের নামও অজ্জর্ন। আবার কুরাচি গাছের নামও ফাল্গুন। এ গাছের নাম অজ্জর্ন, কেন না, ফুল শাদা; ইঁহার নাম ফাল্গুন, কেন না, ইঁহা ফাল্গুন মাসে ফুটে। এখন আমার বিনীত নিবেদন যে, ইন্দ্রের নামও অজ্জর্ন ও ফাল্গুন বলিয়া আমরা দিগকে বলিতে হইবে যে, কুরাচি গাছ নাই, ও কখনও ছিল না? পাঠকেরা সেইরূপ অনুমতি করুন, আমি মহামহোপাধ্যায় Weber সাহেবের জয় গাই।

এই সকল পণ্ডিতেরা বলেন যে, কেবল ললিতবিস্তরে, পাণ্ডবদিগের নাম পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সে পাণ্ডবেরা পার্শ্বত্যা দস্য মাত্র। আমাদের বিবেচনা, তাহা হইতে এমন বদ্বা যায় না যে, পাণ্ডুপুত্র পাণ্ডব পাঁচ জন কখন জগতে বর্তমান ছিলেন না। বাঙ্গালা সাহিত্যে “ফিরিঙ্গী” শব্দ যে দুই একখানা গ্রন্থে পাওয়া যায়, সে সকল গ্রন্থে ইঁহার অর্থ হয়, “Eurasian”, নয় “European”—“Frank” শব্দ কোথাও পাওয়া যায় না, বা এ অর্থে “ফিরিঙ্গী” শব্দ কোথাও ব্যবহৃত হয় নাই। ইঁহা হইতে যদি আমরা সিদ্ধ করি যে, “Frank” জাতি কখন ছিল না, তাহা হইলে ইউরোপীয় পণ্ডিত ও তাঁহাদের শিষ্যগণ যে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, আমরাও সেই ভ্রমে পতিত হইব।†

* এখনকার দৈবজ্ঞেরা এ কথা বলেন না, কিন্তু শতপথরাক্ষণেই এ কথা আছে। ২ কান্ড, ১ অধ্যায়, ২ ব্রাহ্মণ, ১১, দেখ।

† “বৌদ্ধ-গ্রন্থকারেরা পাণ্ডব নামে পর্বত-বাসী একটি জাতির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন; তাহারা উজ্জয়িনী ও কোশলবাসীদের শত্রু ছিল। (Weber's H. I. Literature, 1878, p. 185.) মহাভারতে পাণ্ডবদিগকে হস্তিনাপুরবাসী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু ঐ গ্রন্থেরও স্থলবিশেষে লিখিত আছে, প্রথমে তাঁহারা হিমালয় পর্বতে থাকিয়া পরিবর্তিত হন।

এবং পাণ্ডাঃ সূতাঃ পণ্ড দেবদত্তা মহাবলাঃ।**

* * বিবর্তমানান্তে তত্র পুণ্যে হৈমবতে গিরৌ ॥

আদিপর্ব। ১২৪। ২৭-২৯।

এইরূপে পাণ্ডুর দেব-দত্ত পাঁচটি মহাবল পুত্র *** সেই পবিত্র হিমালয় পর্বতে পরিবর্তিত হইতে থাকেন।

প্লিনি ও সলিনস্ নামে গ্রীক গ্রন্থকারেরা ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্তর দিকে বাহ্যিক দেশের উত্তরাংশে সোগ্‌ডিয়ানা দেশের একটি নগরের নাম পাণ্ড্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং সিন্ধু নদীর মূখ সমীপস্থ জাতিবিশেষকেও পাণ্ড্য বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। ভূগোলবিৎ টলেমি পাণ্ড্য-নাম লোকবিশেষকে বিতস্তা নদীর সমীপস্থ বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। কাত্যায়ন একটি পার্গনিস্‌ত্রে বার্তিককে পাণ্ডু হইতে পাণ্ড্য শব্দ নিষ্পন্ন করিয়াছেন।* লক্ষ্মীধর স্বকৃত ষড়্‌ভাষাচন্দ্রিকার মধ্যে কেকয় বাহ্যিকাদি উত্তর-

* পাণ্ড্যর্ড্যন্ বক্তব্যঃ—বার্তিক।

বঙ্গীয় রচনাবলী

এখনও লাসেন সাহেবের মতের সমালোচনা বাকি আছে। তিনি বলেন, কুরুপাণ্ডালের যুদ্ধ ঐতিহাসিক ব্যাপার; মহাভারতের ততটুকু ঐতিহাসিকতা আছে। কিন্তু তিনি পাণ্ডব-প্রভৃতি নায়কনায়িকাদিগের প্রতি অবিশ্বাসযুক্ত। তিনি বলেন, অর্জুনাদি সব রূপকমাত্র। যথা—অর্জুন শব্দের অর্থ শ্বেতবর্ণ, এজন্য যাহা আলোকময়, তাহাই অর্জুন। যিনি অন্ধকার, তিনি কৃষ্ণ। কৃষ্ণাও তদ্রূপ। পাণ্ডবাদিগের অবস্থানকালে যিনি রাজ্যধারণ করিয়াছিলেন, তিনি ধৃতরাষ্ট্র। পণ্ড পাণ্ডব পাণ্ডালের পাঁচটি জাতি, এবং পাণ্ডালীর সহিত তাঁহাদিগের বিবাহ ঐ পণ্ড জাতির একীকরণ-সূচক মাত্র। যিনি ভদ্র অর্থাৎ মঙ্গল আনয়ন করেন, তিনি সুভদ্রা। অর্জুনের সঙ্গে যাদবাদিগের সৌহান্দ্যই এই সুভদ্রা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি স্বীকার করি, হিন্দুদিগের শাস্ত্রগ্রন্থ সকলে—বেদে, ইতিহাসে, পুরাণে, কাব্যেও রূপকের অতিশয় প্রাবল্য। অনেক রূপক আছে। এই গ্রন্থে আমরাদিগকেও অনেকগুলি রূপকের প্রসঙ্গ উপস্থাপিত করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া এমন স্বীকার করিতে পারি না যে, হিন্দুশাস্ত্রে যাহা কিছু আছে, সবই রূপক—যে রূপক ছাড়া শাস্ত্রগ্রন্থে আর কিছুই নাই।

আমরা ইহাও জানি যে, সংস্কৃত সাহিত্যে বা শাস্ত্রে যাহা কিছু আছে, তাহা রূপক হউক বা না হউক, রূপক বলিয়া উড়াইয়া দিতে অনেকেই ভালবাসেন। রামের নামের ভিতর 'রম্' ধাতু পাওয়া যায়, এবং সীতার নামের ভিতর 'সি' ধাতু পাওয়া যায়, এই জন্য রামায়ণ কৃষিকার্যের রূপকে পরিণত হইয়াছে। জন্মন্ পণ্ডিতেরা এমনই দুই চারিটা ধাতু আশ্রয় করিয়া ঋগ্বেদের সকল সূক্তগুলিকে সূর্য্য ও মেঘের রূপক করিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। চেষ্টা করিলে, বোধ করি, পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, তাহা এইরূপে উড়াইয়া দেওয়া যায়। আমরাদিগের মনে পড়ে, এক সময় রহস্যচ্ছলে আমরা বিখ্যাত নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রকে এইরূপ রূপক করিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলাম। তোমরা বলিবে, তিনি সে দিনের মানুষ—তাঁহার রাজধানী, রাজপুত্রী, রাজবংশ, সকলই আজও বিদ্যমান আছে, তিনিও ইতিহাসে কীর্তিত হইয়াছেন। তাহার উত্তরে বলা যায় যে, কৃষ্ণ অর্থে অন্ধকার, তমোরূপী। কৃষ্ণনগরে অর্থাৎ অন্ধকারপূর্ণ স্থানে তাঁহার রাজধানী। তাঁহার ছয় পুত্র, অর্থাৎ তমোগুণ হইতে ছয় রিপুত্র উৎপত্তি। একজন বালক পলাসির যুদ্ধ সম্বন্ধে এইরূপ রূপক করিয়াছিল যে, পলমাত্র উদ্ভাসিত যে অসি, তাহা ক্লীবগুণযুক্ত ক্লীব (Clive) কর্তৃক প্রযুক্ত হওয়ায় সুরাজা অর্থাৎ যিনি উত্তম রাজা ছিলেন, তিনি পরাভূত হইয়াছিলেন। অতএব রূপকের অভাব নাই। আর এই বালকরচিত

দিক্‌স্থ কতকগুলি জনপদের সহিত পাণ্ড্য দেশের নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং সে সমুদয়কে পিশাচ অর্থাৎ অসভ্য দেশবিশেষ বলিয়া কীর্তন করিয়া গিয়াছেন।

“পাণ্ড্যকেকয়বাহরীক *** এতে পৈশাচদেশাঃ সূঃ।”

হরিবংশে দক্ষিণদিক্‌স্থ চোল কেরলাদির সহিত পাণ্ড্য দেশের নাম উল্লিখিত আছে। (হরিবংশ, ৩২ অ, ১২৪ শ্লো।) অতএব উহা দক্ষিণাপথের অন্তর্গত পাণ্ড্য দেশ। শ্রীমান্ উইলসন্ বিবেচনা করেন, ঐ জাতীয় লোক প্রথমে সোগ্‌ডিয়েনা দেশের অধিবাসী ছিল; তথা হইতে ক্রমশঃ ভারতবর্ষে আসিয়া বাস করে এবং উত্তরোত্তর ঐ সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অধিবাস করিয়া পশ্চাৎ হিন্দুনাগর-বাসী হয়, ও অবশেষে দক্ষিণাপথে গিয়া পাণ্ড্যরাজ্য সংস্থাপন করে। Asiatic Researches, Vol. XV. pp. 95 and 96.

রাজতরঙ্গিণীর মতে, কাশ্মীর রাজ্যের প্রথম রাজারা কুরুবংশীয়। অতএব তৎপ্রদেশ হইতে পাণ্ডব-দের হিন্দুনাগ আসিয়া উপনিবেশ করা সম্ভব। তাঁহারা মধ্যদেশবাসী অথচ কিরূপে পাণ্ডব বলিয়া পরিচিত হইলেন, এই সমস্যা পরগাথেই কি পাণ্ডুপুত্র পাণ্ডব বলিয়া ক্রমশঃ একটি জনপ্রবাদ প্রচারিত হইল? তাঁহাদের জন্মবৃত্তান্তঘটিত গোলযোগ প্রসিদ্ধই আছে। লোকেও তাহাতে সংশয় প্রকাশ করিয়াছিল, তাহারও নিদর্শন পাওয়া যায়।

যদা চিরমৃতঃ পাণ্ডুঃ কথং তস্যোতি চাপরে।

আদিপর্ব্ব। ১। ১১৭।

অন্য অন্য লোকে বলিল, “বহুকাল অতীত হইল, পাণ্ডু প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; অতএব ইঁহারা কিরূপে তদীয় পুত্র হইতে পারেন?”

ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়, অক্ষয়কুমার দত্ত-প্রণীত, দ্বিতীয় ভাগ, উপক্রমণিকা, ১০৫ পৃঃ। অক্ষয় বাবু, সচরাচর ইউরোপীয়দিগের মতের অবলম্বী।

রূপকের সঙ্গে লাসেন্‌রচিত রূপকের বিশেষ প্রভেদ দেখা যায় না। আমরা ইচ্ছা করিলে, 'লস্' ধাতু খোদ লাসেন্‌ সাহেবের নামের ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ করিয়া, তাঁহার ঐতিহাসিক গবেষণা ফীড়াকোঁতুক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি।

ভারতবর্ষের ইতিহাসলেখক Talboys Wheeler সাহেবেরও একটা মত আছে। যখন হস্তী অশ্ব তলগামী, তখন মেঘের জলপরিমাণেচ্ছার প্রতি বেশী শ্রদ্ধা করা যায় না। তিনি বলেন,—হাঁ, ইহার কিছু ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বটে, কিন্তু তাহা অতি সামান্য মাত্র—

"The adventures of the Pandavas in the jungle, and their encounters with Asuras and Rakshasas are all palpable fictions, still they are valuable as traces which have been left in the minds of the people of the primitive wars of the Aryans against the Aborigines.

টল্‌বয়স্‌ হুইলার সাহেব সংস্কৃত জানেন না, মহাভারত কখনও পড়েন নাই। তাঁহার অবলম্বন বাবু অবিনাশচন্দ্র ঘোষ নামে কোন ব্যক্তি। তিনি অবিনাশ বাবুকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, মূল মহাভারত অনুবাদ করিয়া তাঁহাকে দেন। অবিনাশ বাবু রহস্যপ্রিয় লোক সন্দেহ নাই, কাশীদাসের মহাভারত হইতে কত দূর অনুবাদ করিয়াছিলেন বলিতে পারি না, কিন্তু হুইলার সাহেব চন্দ্রহাস ও বিষয়ার উপাখ্যান প্রভৃতি সামগ্রী মূল মহাভারতের অংশ বলিয়া পাচার করিয়াছেন। যে বর্ষীয়সী মাণিকপীরের গান শুনিয়া রামায়ণভ্রমে অশ্রুমোচন করিতেছিল, বোধ হয়, সেও এই পণ্ডিতবরের অপেক্ষা উপহাস্যপদ নহে। ঈদৃশ লেখকের মতের প্রতিবাদ করা পাঠকের সময় বৃথা নষ্ট করা বিবেচনা করি। ফলে, মহাভারতের যে অংশ মৌলিক, তাহার লিখিত বৃত্তান্ত ও পাণ্ডবাদি নায়ক সকল কল্পনাপ্রসূত, এরূপ বিবেচনা করিবার কোন উপযুক্ত কারণ এ পর্য্যন্ত নির্দিষ্ট হয় নাই। যাহা নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার সকলই এইরূপ অকিঞ্চিৎকর। সকলগুলির প্রতিবাদ করিবার এ গ্রন্থে স্থান হয় না। মহাভারতের অনেক ভাগ প্রক্ষিপ্ত, ইহা আমি স্বীকার করিয়াছি। কিন্তু পাণ্ডবাদের সকল কথা প্রক্ষিপ্ত নহে। ইহা প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। তাঁহারা ঐতিহাসিক, ইহা বিবেচনা করিবার কারণ যাহা বলিয়াছি, তাহা যদি যথেষ্ট না হয়, তবে পরপরিচ্ছেদে আরও কিছু বলিতেছি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ—পাণ্ডবদিগের ঐতিহাসিকতা

পাণিনি সূত্র করিয়াছেন,—

মহান্‌ ব্রীহ্যপরাহুগ্‌ষ্ঠীষ্বাসজাবালভারভারতহৈলিহিলরৌরবপ্রব্‌ন্ধেধু। ৬।২।৩৮

অর্থাৎ ব্রীহি ইত্যাদি শব্দের পূর্বে মহৎ শব্দ প্রযুক্ত হয়। তাহার মধ্যে একটি শব্দ 'ভারত'। অতএব পাণিনিতে মহাভারত শব্দ পাওয়া গেল। প্রসিদ্ধ ইতিহাসগ্রন্থ ভিন্ন আর কোন বস্তু "মহাভারত" নামে কখনও অভিহিত হইয়াছিল, এমন প্রমাণ নাই। Weber সাহেব বলেন, এখানে মহাভারত অর্থে ভারতবংশ। এটা কেবল তাঁহার গায়ের জোর। এমন প্রয়োগ কোথাও নাই।

পুনশ্চ, পাণিনিসূত্র—

"গবিযুধিভ্যাং স্থিরঃ।" ৮।৩।৯৫

গবি ও যুধি শব্দের পর স্থির শব্দের স স্থানে ষ হয়। যথা—গবিষ্ঠিরঃ, যুধিষ্ঠিরঃ।

পুনশ্চ,—

"বহুচ ইজঃ প্রাচ্যভরতেষু।" ২।৪।৬৬

ভরতগোত্রের উদাহরণ "যুধিষ্ঠিরঃ।" *

পুনশ্চ,—

"স্মিয়ামবাস্তিকুস্তিকুরুভ্যশ্চ।" ৪।১।১৭৬

পাওয়া গেল "কুস্তী"।

* উদাহরণটি সিদ্ধান্তকোমুদীর, ইহা বলা কর্তব্য।

বিশ্বকম রচনাবলী

পদনশ্চ,—

“বাসুদেবাজ্জর্নানাভ্যাং বদ্বন্।” ৪।৩।৯৮

অর্থাৎ, বাসুদেব ও অজ্জর্ন শব্দের পর ষষ্ঠ্যর্থো বদ্বন্ হয়।

পদনশ্চ,—

“নভ্রাণ্ণপান্নবেদানাসত্যানমুচিনকুলনখনপুংসকনক্ষণনক্রনাকেষু।” ৬।৩।৭৫

ইহাতে “নকুল” পাওয়া গেল।

দ্রোণপর্ষ্বতজীবন্তাদন্যতরস্যাম্। ৪।১।১০৩

“দ্রোণায়ন” শব্দ পাওয়া গেল। ইহাতে অশ্বথামা ভিন্ন আর কিছুই বদ্বায় না। এইরূপ পাঁচটি পাণ্ডবের নামই এবং কুন্তী, দ্রোণ, অশ্বথামা প্রভৃতির নাম পাণিনি সূত্রে পাওয়া যায়।

যদি মহাভারত গ্রন্থের নাম এবং সেই গ্রন্থের নামকর্দিগের নাম পাওয়া গেল, তবে পাণিনির সময়েও মহাভারত পাণ্ডবদিগের ইতিহাস। এখন দেখিতে হইবে, পাণিনি কবেকার লোক।

ভারতদ্বেষী Weber সাহেব তাঁহাকেও আধুনিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এখানে তাঁহার মত চলে নাই,—স্বয়ং গোল্ডস্ট্রুকের পাণিনির অভ্যুদয়কাল নির্ণীত করিয়াছেন। তিনি যাহা বলেন, তাহার বিস্তারিত বিবরণ লিখিবার স্থান এ নহে; কিন্তু বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত তাঁহার গ্রন্থের সারাংশ বাঙ্গালায় সংকলন করিয়াছেন, অতএব না বলিলেও চলিবে। যাহারা বাঙ্গালা গ্রন্থ পাড়িতে ঘৃণা করেন, তাহারা গোল্ডস্ট্রুকের গ্রন্থই ইংরাজিতে পাড়িতে পারেন। তাঁহার বিচারে পাণিনি অতি প্রাচীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, এজন্য Weber সাহেব অতিশয় দুঃখিত। তিনি গোল্ডস্ট্রুকের প্রতিবাদও করিয়াছেন, এবং লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া বলিয়াছেন, জয়পতাকা আমিই উড়াইয়াছি। কিন্তু আর কেহ তাহা বলে না।

গোল্ডস্ট্রুকের প্রমাণ করিয়াছেন যে, পাণিনির সূত্র যখন প্রণীত হয়, তখন বুদ্ধদেবের* আবির্ভাব হয় নাই। তবেই পাণিনি অন্ততঃ খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক। কিন্তু কেবল তাহাই নহে, তখন ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্ প্রভৃতি বেদাংশ সকলও প্রণীত হয় নাই। ঋক্, যজুঃ, সামসংহিতা ভিন্ন আর কিছুই হয় নাই। আশ্বলায়ন, সাংখ্যায়ন প্রভৃতি অভ্যুদিত হন নাই। মক্ষমূলের বলেন, ব্রাহ্মণ-প্রণয়ন-কাল খ্রীঃ পূঃ সহস্র বৎসর হইতে আরম্ভ। ডাক্তার মার্টিন হোগ বলেন, ঐ শেষ; খ্রীঃ পূঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে আরম্ভ। অতএব পাণিনির সময় খ্রীঃ পূঃ দশম বা একাদশ শতাব্দী বলিলে বেশী বলা হয় না।

Max Muller, Weber প্রভৃতি অনেকেই এ বিচারে প্রবৃত্ত, কিন্তু কাহারও কথায় গোল্ডস্ট্রুকের মত খণ্ডিত হইতেছে না। অতএব আচার্য্যের এ মত গ্রহণ করা যাইতে পারে। তবে ইহা স্থির যে, খ্রীষ্টের সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে যুধিষ্ঠিরাদির বৃত্তান্তসংযুক্ত মহাভারত গ্রন্থ প্রচলিত ছিল। এমন প্রচলিত যে, পাণনিকে মহাভারত ও যুধিষ্ঠিরাদির ব্যুৎপত্তি লিখিতে হইয়াছে। আর ইহাও সম্ভব যে, তাঁহার অনেক পূর্বেই মহাভারত প্রচলিত হইয়াছিল। কেন না, “বাসুদেবাজ্জর্নানাভ্যাং বদ্বন্” এই সূত্রে ‘বাসুদেবক’ ও ‘অজ্জর্নক’ শব্দ এই অর্থে পাওয়া যায়, বাসুদেবের উপাসক, অজ্জর্নের উপাসক। অতএব পাণিনিসূত্রপ্রণয়নের পূর্বেই কৃষ্ণাজ্জর্ন দেবতা বলিয়া স্বীকৃত হইতেন। অতএব মহাভারতের যুদ্ধের অনল্প পরেই আদিম মহাভারত প্রণীত হইয়াছিল বলিয়া যে প্রসিদ্ধি আছে, তাহার উচ্ছেদ করিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

এক্ষণে ইহাও বক্তব্য যে, কেবল পাণিনির নয়, আশ্বলায়ন ও সাংখ্যায়ন গৃহ্যসূত্রেও মহাভারতের প্রসঙ্গ আছে। অতএব মহাভারতের প্রাচীনতা সম্বন্ধে বড় গোলযোগ করার কাহারও অধিকার নাই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ—কৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা

কৃষ্ণের নাম পাণিনির কোন সূত্রে থাক না থাক, তাহাতে আশিয়া যায় না। কেন না, ঋগ্বেদসংহিতায় কৃষ্ণ শব্দ অনেক বার পাওয়া যায়। প্রথম মণ্ডলের ১১৬ সূক্তের ২৩ ঋকে এবং

* মহাভারতে ‘বৌদ্ধ’ শব্দ পাওয়া যায়, কিন্তু ঐ অংশ যে প্রক্ষিপ্ত, তাহাও অনায়াসে প্রমাণ করা যাইতে পারে।

† কৃষ্ণ শব্দ আমি পাণিনির অষ্টাধ্যায় খুঁজিয়া পাই নাই—আছে কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু কৃষ্ণ শব্দ যে পাণিনির পূর্বে প্রচলিত ছিল, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। কেন না, ঋগ্বেদ-সংহিতায়

১১৭ সূক্তের ৭ ঋকে এক কৃষ্ণের নাম আছে। সে কৃষ্ণ কে, তাহা জানিবার উপায় নাই। সম্ভবতঃ তিনি বসুদেবনন্দন নহেন। তাহার পর দেখিতে পাই, ঋগ্বেদসংহিতার অনেকগুলি সূক্তের ঋষি একজন কৃষ্ণ। তাহার কথা পরে বলিতেছি। অথর্বসংহিতায় অসুর কৃষ্ণকেশীর নিধনকারী কৃষ্ণের কথা আছে। তিনি বসুদেবনন্দন সন্দেহ নাই। কোশনিধনের কথা আমি পশ্চাৎ বলিব।

পার্গিনির সূত্রে 'বাসুদেব' নাম আছে—সে সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছি। কৃষ্ণ মহাভারতে বাসুদেব নামে সচরাচর অভিহিত হইয়াছেন। বসুদেবের পুত্র বলিয়াই বাসুদেব নাম নহে, সে কথা স্থানান্তরে বলিব। বসুদেবের পুত্র না হইলেও বাসুদেব নাম হয়। এই মহাভারতেই পাওয়া যায়—পদ্মভ্রাধিপতিরও নাম ছিল বাসুদেব। বসুদেবকে কবিকল্পনা বলিতে হয়, বল—কিন্তু বাসুদেব কবিকল্পনা নহেন।

ইউরোপীয়দিগের মত এই যে, কৃষ্ণ আদৌ মহাভারতে ছিলেন না, পরে মহাভারতে তাহাকে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এরূপ বিবেচনা করিবার যে সকল কারণ তাহারা নির্দেশ করেন, তাহা নিতান্তই অর্কিণ্ডকর। কেহ বলেন, কৃষ্ণকে মহাভারত হইতে উঠাইয়া দিলে মহাভারতের কোন ক্ষতি হয় না। এক হিসাবে নয় বটে। গত ফরাসীপুস্তকের যুদ্ধ হইতে মোল্টকেকে উঠাইয়া দিলে কোন ক্ষতি হয় না। Gravelotte, Woerth Metz, Sedan, Paris প্রভৃতি রণজয় সবই বজায় থাকে; কেন না, Moltke হাতে হাতিয়ারে এ সকলের কিছুই করেন নাই। তাহার সেনাপতিত্ব তারে তারে বা পরে পরে নিষ্পন্ন হইয়াছিল। মহাভারত হইতে কৃষ্ণকে উঠাইয়া দিলে সেইরূপ ক্ষতি হয় না। তাহার বেশী ক্ষতি হয় কি না, এ গ্রন্থ পাঠ করিলেই পাঠক জানিতে পারিবেন।

হুইলর সাহেবেরও এ বিষয়ে একটা মত আছে। তাহার যেরূপ পরিচয় দিয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, তাহার মতের প্রতিবাদের বিশেষ প্রয়োজন নাই। তথাপি মতটা কিয়ৎপরিমাণে চলিয়াছে বলিয়া, তাহার প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিলাম। তিনি বলেন, দ্বারকা হস্তিনাপুর হইতে সাত শত ক্রোশ ব্যবধান। কাজেই কৃষ্ণের সঙ্গে পাণ্ডবদিগের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ মহাভারতে কথিত হইয়াছে, তাহা অসম্ভব। কেন অসম্ভব, আমরা তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, কাজেই উত্তর করিতে পারিলাম না। বাঙ্গালার মুসলমান রাজপুরুষদিগের সঙ্গে দিল্লীর পাঠান মোগল রাজপুরুষদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যিনিই স্মরণ করিবেন, তিনিই বোধ হয়, হুইলর সাহেবের এই অশ্রাব্য কথায় কণ্ঠপাত করিবেন না।

বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত Bournouf বলেন যে, বৌদ্ধশাস্ত্রে কৃষ্ণ নাম না পাইলে, ঐ শাস্ত্র প্রচারের উত্তরকালে কৃষ্ণোপাসনা প্রবর্তিত হয়, বিবেচনা করিতে হইবে। কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্রের মধ্যে ললিতবিস্তরে কৃষ্ণের নাম আছে। বৌদ্ধশাস্ত্র মধ্যে সূত্রপিটক সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ। তাহাতেও কৃষ্ণের নাম আছে। ঐ গ্রন্থে কৃষ্ণকে অসুর বলা হইয়াছে। কিন্তু নাস্তিক ও হিন্দু-ধর্ম্মবিরোধী বৌদ্ধেরা কৃষ্ণকে যে অসুর বিবেচনা করিবে, ইহা বিচিত্র নয়। আর ইহাও বক্তব্য, বেদাদিতে ইন্দ্রাদি দেবগণকে মধ্যে মধ্যে অসুর বলা হইয়াছে। বৌদ্ধেরা ধর্ম্মের প্রধান শত্রু যে প্রবৃত্তি, তাহার নাম দিয়াছেন "মার"। কৃষ্ণপ্রচারিত অপূর্ব্ব নিষ্কামধর্ম্ম, তৎকৃত সনাতন ধর্ম্মের অপূর্ব্ব সংস্কার, স্বয়ং কৃষ্ণের উপাসনা বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারের প্রধান বিঘ্ন ছিল সন্দেহ নাই। অতএব তাহারা কৃষ্ণকেই অনেক সময়ে মার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

এ সকল কথা থাক। ছান্দোগ্যোপনিষদে একটি কথা আছে; সেইটি উদ্ধৃত করিতেছি। কথাটি এই—

“তন্ধৈতদ্দেঘার আঞ্জিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায় উক্ত্বা, উবাচ। অপিপাস এব স বভূব। সোহস্তবেলায়ামেতন্নয়ং প্রতিপদ্যত অক্ষিতমসি, অচ্যুতমসি, প্রাণসংশিতমসীতি।”

কৃষ্ণ শব্দ পুনঃ পুনঃ পাওয়া যায়। কৃষ্ণনামা বৈদিক ঋষির কথা পশ্চাৎ বলিতেছি। তদন্তিম অষ্টম মণ্ডলে ৯৬ সূক্তে কৃষ্ণনামা একজন অনার্য্য রাজার কথা পাওয়া যায়। এই অনার্য্য কৃষ্ণ অংশুমতী-নদীতীরনিবাসী; সুতরাং ইনি যে বাসুদেব কৃষ্ণ নহেন, তাহা নিশ্চিত। পাঠক ইহাতে বুঝিতে পারিবেন যে, পার্গিনির কোন সূত্রে “কৃষ্ণ” শব্দ থাকিলে তাহা বাসুদেব কৃষ্ণের ঐতিহাসিকতার প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয় না। কিন্তু পার্গিনিসূত্রে “বাসুদেব” নাম যদি পাওয়া যায়, তবে তাহা প্রমাণ বলিয়া গণ্য। ঠিক তাহাই আছে।

বাংকম রচনাবলী

ইহার অর্থ। আঙ্গিরসবংশীয় ঘোর (নামে ঋষি) দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে এই কথা বলিয়া বলিলেন, (শুনিয়া তিনিও পিপাসাশূন্য হইলেন) যে অন্তকালে এই তিনটি কথা অবলম্বন করিবে, “তুমি অক্ষিত, তুমি অচ্যুত, তুমি প্রাণসংশিত।”

এই ঘোর ঋষির পুত্র কণ্ব*। ঘোরপুত্র কণ্ব ঋগ্বেদের কতকগুলি সূক্তের ঋষি। যথা, প্রথম মণ্ডলে ৩৬ সূক্ত হইতে ৪৩ সূক্ত পর্য্যন্ত; এবং কণ্বের পুত্র মেধার্থি ঐ মণ্ডলের ১২শ হইতে ২৩শ পর্য্যন্ত সূক্তের ঋষি। এবং কণ্বের অন্য পুত্র প্রক্ষণ্ব ঐ মণ্ডলের ৪৪ হইতে ৫০ পর্য্যন্ত সূক্তের ঋষি। এখন নিরুক্তকার যাম্বক বলেন, “যস্য বাক্যং স ঋষিঃ।” অতএব ঋষিগণ সূক্তের প্রণেতা হউন বা না হউন, বক্তা বটে। অতএব ঘোরের পুত্র এবং পৌত্র-গণ ঋগ্বেদের কতকগুলি সূক্তের বক্তা। তাহা যদি হয়, তবে ঘোরশিষ্য কৃষ্ণ তাহাদিগের সমসাময়িক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখন আগে বেদের সূক্তগুলি উক্ত হইয়াছিল, তাহার পর বেদবিভাগ হইয়াছিল, এ সিদ্ধান্তের কোনও মতেই প্রতিবাদ করা যায় না। অতএব কৃষ্ণ বেদবিভাগকর্তা বেদব্যাসের সমসাময়িক লোক, উপন্যাসের বিষয়মাত্র নহেন, তদ্বিষয়ে কোনও সংশয় করা যায় না।

ঋগ্বেদসংহিতায় অষ্টম মণ্ডলে ৮৫।৮৬।৮৭ সূক্ত এবং দশম মণ্ডলের ৪২।৪৩।৪৪ সূক্তের ঋষি কৃষ্ণ। এই কৃষ্ণ দেবকীনন্দন কৃষ্ণ কি না, তাহার নির্ণয় করা দুরূহ। কিন্তু কৃষ্ণ ঋগ্বেদে বলিয়াই বলা যাইতে পারে না যে, তিনি এই সকল সূক্তের ঋষি নহেন; কেন না, রুসদস্য, গ্র্যরুণ, পুরুমীঢ়, অজমীঢ়, সিন্ধুদ্বীপ, সুদাস, মাকাতা, সিবি, প্রতর্দন, কক্ষীবান্ প্রভৃতি রাজর্ষি যাহারা ঋগ্বেদে বলিয়া পরিচিত, তাহারাও ঋগ্বেদ-সূক্তের ঋষি, ইহা দেখা যায়। দুই এক স্থানে শূদ্র ঋষির উল্লেখও পাওয়া যায়। কবষ নামে দশম মণ্ডলে একজন শূদ্র ঋষি আছেন; অতএব ঋগ্বেদে বলিয়া কৃষ্ণের ঋষিত্বে আপত্তি হইতে পারে না। তবে ঋগ্বেদসংহিতার অনু-ক্রমিকায় শৌনক কৃষ্ণ আঙ্গিরস ঋষি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

উপনিষদ্ সকল বেদের শেষভাগ, এই জন্য উপনিষদকে বেদান্তও বলে। বেদের যে সকল অংশকে ব্রাহ্মণ বলে, তাহা উপনিষদ্ হইতে প্রাচীনতর বলিয়া বোধ হয়। অতএব ছান্দোগ্যোপ-নিষদ্ হইতে কৌষীতিকব্রাহ্মণ আরও প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। তাহাতেও এই আঙ্গিরস ঘোরের নাম আছে, এবং কৃষ্ণেরও নাম আছে। কৃষ্ণ তথায় দেবকীপুত্র বলিয়া বর্ণিত হইলে নাই; আঙ্গিরস বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কিন্তু কতকগুলি ঋগ্বেদেও আঙ্গিরস বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তদ্বিষয়ে বিষ্ণুপুরাণে একটি প্রাচীন শ্লোক ধৃত হইয়াছে।

এতে ক্ষত্রপ্রসূতা বৈ পুনশ্চাঙ্গিরসঃ স্মৃতাঃ।

রথীতরাণাং প্রবরাঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ ॥—৪ অংশ, ২।২

কিন্তু এই রথীতর রাজা সূর্য্যবংশীয়। কৃষ্ণের পূর্ব্বপুরুষ যদু, যযাতির পুত্র, কাজেই চন্দ্রবংশীয়। এই কথাই সকল পুরাণেতিহাসে লেখে, কিন্তু হরিবংশে বিষ্ণুপূর্ব্ব পাওয়া যায় যে, মথুরার যাদবেরা ইক্ষ্বাকুবংশীয়।

এবং ইক্ষ্বাকুবংশাঙ্কি যদুবংশো বিনিঃসৃতঃ।—১৫ অধ্যায়ে, ৫২৯ শ্লোকঃ।

কথাটাও খুব সম্ভব, কেন না, রামায়ণে পাওয়া যায় যে, ইক্ষ্বাকুবংশীয় রামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শত্রুঘ্ন মথুরাজয় করিয়াছিলেন।

সে যাহাই হউক, “বাসুদেবাজ্জর্নাত্যং বৃন্” এই সূত্র আমরা পাণিনি হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি। কৃষ্ণ এত প্রাচীন কালের লোক যে, পাণিনির সময়ে উপাস্য বলিয়া আর্ষ্যসমাজে গৃহীত হইয়াছিলেন। ইহাই যথেষ্ট।

নবম পরিচ্ছেদ—মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত

আমরা এতক্ষণ যাহা বলিলাম, তাহার স্থূলমর্ম্ম এই যে, মহাভারতের ঐতিহাসিকতা আছে, এবং মহাভারতে কৃষ্ণপান্ডব সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক কথা পাওয়া যায়। কিন্তু এখন জিজ্ঞাস্য

* এই কণ্ব শকুন্তলার পালকপিতা কণ্ব নহেন। সে কণ্ব কাশ্যপ; ঘোরপুত্র কণ্ব আঙ্গিরস।

হইতে পারে যে, মহাভারতে কৃষ্ণপান্ডব সম্বন্ধে যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহাই কি ঐতিহাসিক তত্ত্ব ?

মহাভারতের ঐতিহাসিকতা, বা মহাভারতে কথিত কৃষ্ণপান্ডবসম্বন্ধীয় বৃত্তান্তের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে ইউরোপীয়গণের যে প্রতিকূল ভাব, তাহার মূলে এই কথা আছে যে, প্রাচীন কালে মহাভারত ছিল বটে, কিন্তু সে এ মহাভারত নহে। ইহার অর্থ যদি এমন বৃত্তান্তে হয় যে, প্রচলিত মহাভারতে সেই প্রাচীন মহাভারতের কিছুই নাই, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদের কথা যথার্থ বলিয়া স্বীকার করি না; এবং এরূপ স্বীকার করি না বলিয়াই, তাঁহাদের কথার এত প্রতিবাদ করিয়াছি। আর তাঁহাদের কথার মর্মার্থ যদি এই হয় যে, সে প্রাচীন মহাভারতের উপর অনেক প্রক্ষিপ্ত উপন্যাসাদি চাপান হইয়াছে, প্রাচীন মহাভারত তাহার ভিতর ডুবিয়া আছে, তবে তাঁহাদের সঙ্গে আমার কোন মতভেদ নাই।

আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি যে, পরবর্ত্তী প্রক্ষিপ্তকারদিগের রচনাবাহুল্যে আদিম মহাভারত প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ঐতিহাসিকতা যদি কিছু থাকে, তবে সে আদিম মহাভারতের। অতএব বর্ত্তমান মহাভারতের কোন অংশ আদিমমহাভারতভুক্ত, তাহাই প্রথমে আমাদের বিচার্য বিষয়। তাহাতে কৃষ্ণকথা যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহারই কিছু ঐতিহাসিক মূল্য থাকিলে থাকিতে পারে। তাহাতে যাহা নাই, অন্য গ্রন্থে থাকিলেও, তাহার ঐতিহাসিক মূল্য অপেক্ষাকৃত অল্প। কেন না, মহাভারতই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ।

প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই বলিবেন, মহাভারতের কোন অংশই যে প্রক্ষিপ্ত, তাহারই বা প্রমাণ কি? এই পরিচ্ছদে তাহার কিছু প্রমাণ দিব।

আদিপর্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়। মহাভারতে যে যে বিষয় বর্ণিত বা বিবৃত আছে, ঐ পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে তাহার গণনা করা হইয়াছে। উহা এখনকার গ্রন্থের সূচিপত্র বা Table of Contents সদৃশ। অতি ক্ষুদ্র বিষয়ও ঐ পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ের গণনাভুক্ত হইয়াছে। এখন যদি দেখা যায় যে, কোন একটা গুরুতর বিষয় ঐ পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ভুক্ত নহে, তবে অবশ্য বিবেচনা করিতে হইবে যে, উহা প্রক্ষিপ্ত। একটা উদাহরণ দিতেছি। আশ্বমেধিক পর্ব্বের অনঙ্গীতা ও ব্রাহ্মণগীতা পর্ব্বাধ্যায় পাওয়া যায়। এই দুইটি ক্ষুদ্র বিষয় নয়, ইহাতে ছত্রিশ অধ্যায় গিয়াছে। কিন্তু পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে উহার কিছু উল্লেখ নাই, সুতরাং বিবেচনা করিতে হইবে যে, অনঙ্গীতা ও ব্রাহ্মণগীতা সমস্তই প্রক্ষিপ্ত।

২য়,—অনুক্রমণিকাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, মহাভারতের লক্ষ শ্লোক, এবং পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে কোন পর্ব্ব কত শ্লোক, তাহা লিখিত হইয়াছে। যথা—

আদি	৮৮৮৮
সভা	২৫১১
বন	১১৬৬৮
বিরাট	২০৫০
উদ্যোগ	৬৬৯৮
ভীষ্ম	৫৮৮৮
দ্রোণ	৮৯০৯
কর্ণ	৪৯৬৮
শল্য	৩২২০
সৌপ্তিক	৮৭০
স্ত্রী	৭৭৫
শান্তি	১৪৭৩২
অনুশাসন	৮০০০
আশ্বমেধিক	৩৩২০
আশ্রমবাসিক	১৫০৬
মৌসল	৩২০
মাহাপ্রস্থানিক	৩২০
স্বর্গারোহণ	২০৯

বাংকম রচনাবলী

ইহাতে কিন্তু লক্ষ শ্লোক হয় না; মোট ৮৪,৮৩৬ হয়। অতএব লক্ষ শ্লোক পুরাইবার জন্য পর্বাধ্যায়সংগ্রহকার লিখিলেনঃ—

“অষ্টাদশৈবমুক্তানি পর্বাণ্যেতান্যশেষতঃ।
খিলেষু হরিবংশে ভবিষ্যৎ প্রকীর্তিতম্ ॥
দশশ্লোকসহস্রাণি বিংশশ্লোকশতানি চ।
খিলেষু হরিবংশে চ সংখ্যাতানি মহর্ষিণা ॥”

অর্থাৎ “এইরূপে অষ্টাদশপর্ব সবিস্তারে উক্ত হইয়াছে। ইহার পর হরিবংশ ভবিষ্যৎপর্ব কথিত হইয়াছে। মহর্ষি হরিবংশে দ্বাদশ সহস্র শ্লোকসংখ্যা করিয়াছেন।” পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে এইটুকু ভিন্ন হরিবংশের আর কোন প্রসঙ্গ নাই। ইহাতে ৯৬,৯৩৬ শ্লোক হইল। এক্ষণে প্রচলিত মহাভারতের শ্লোক গণনা করিয়া নিম্নলিখিত সংখ্যা সকল পাওয়া যায়ঃ—

আদি	৮৪৭৯
সভা	২৭০৯
বন	১৭,৪৭৮
বিরাত	২৩৭৬
উদ্যোগ	৭৬৫৬॥
ভীষ্ম	৫৮৫৬
দ্রোণ	৯৬৪৯
কর্ণ	৫০৪৬
শল্য	৩৬৭৯
সৌপ্তিক	৮১১
স্বপ্নী	৮২৭॥
শান্তি	১৩,৯৪৩
অনুশাসন	৭৭৯৬
আশ্বমেধিক	২৯০০
আশ্রমবাসিক	১১০৫
মৌসল	২৯২
মাহাপ্রস্থানিক	১০৯
স্বর্গারোহণ	৩১২
খিল হরিবংশ	১৬,৩৭৪

মোট ১০৭৩৯০। ইহাতে দেখা যায় যে, প্রথমতঃ মহাভারতে লক্ষ শ্লোক কখনই ছিল না। পর্বসংগ্রহের পর হরিবংশ লইয়া মোটের উপর প্রায় এগার হাজার শ্লোক বাড়িয়াছে, অর্থাৎ প্রস্কিপ্ত হইয়াছে।

৩য়.—এইরূপ হাসবৃদ্ধির উদাহরণস্বরূপ অনুক্রমণিকাধ্যায়ে গ্রহণ করা যাইতে পারে। অনুক্রমণিকাধ্যায়ে ১০২ শ্লোকে লিখিত আছে যে, ব্যাসদেব সাদর্শত শ্লোকময়ী অনুক্রমণিকা লিখিয়াছিলেন।

“ততোহধ্যাক্ষতং ভূয়ঃ সংক্ষেপং কৃতবান্‌র্ষিঃ।
অনুক্রমণিকাধ্যায়ং বৃত্তান্তানাং সপর্বণাম্ ॥”

এক্ষণে বর্তমান মহাভারতের অনুক্রমণিকাধ্যায়ে ২৭২ শ্লোক পাওয়া যায়। অতএব পর্বসংগ্রহাধ্যায় লিখিত হওয়ার পরে এই অনুক্রমণিকাতেই ১২২ শ্লোক বেশি পাওয়া যায়।

৪র্থ,—পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে ৮৪,৮৩৬ শ্লোক পাওয়া যায়। কিন্তু সহজেই বুঝা যাইতে পারে যে, পর্বসংগ্রহাধ্যায় আদিম মহাভারতকার কর্তৃক সংকলিত নয় এবং আদিম মহাভারত রচিত হইবার সময়েও সংকলিত হয় নাই। মহাভারতেই আছে যে, মহাভারত বৈশম্পায়ন জনমেজয়ের নিকট কহিয়াছিলেন। তাহাই উগ্রশ্রবাঃ নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষিগণের নিকট কহিতেছেন। পর্বাধ্যায়সংগ্রহকার এই সংগ্রহ উগ্রশ্রবার উক্তি বলিয়া বর্ণিত করিয়াছেন। বৈশম্পায়নের উক্তি

নহে, কাজেই ইহা আদিম বা বৈশম্পায়নের মহাভারতের অংশ নহে। অনুক্রমণিকাধ্যায়েই আছে যে, কেহ কেহ প্রথমাৰ্ঘ্য, কেহ বা আস্তীকপর্ষ্যর্ঘ্য, কেহ বা উপরিচর রাজার উপাখ্যানার্ঘ্য মহাভারতের আরম্ভ বিবেচনা করেন। সুতরাং যখন এই মহাভারত উগ্রশ্রবাঃ ঋষিদিগকে শুনাইতেছিলেন, তখনই পর্ষ্যসংগ্রহাধ্যায় দূরে থাক, প্রথম ৬২ অধ্যায়, সমস্ত* প্রক্ষিপ্ত বলিয়া প্রবাদ ছিল। এই পর্ষ্যসংগ্রহাধ্যায় পাঠ করিলেই বিবেচনা করা যায় যে, প্রক্ষিপ্তাংশ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়াতে ভবিষ্যতে তাহার নিবারণের জন্য এই পর্ষ্যসংগ্রহাধ্যায় সংকলনপূর্ব্বক অনুক্রমণিকাধ্যায়ের পর কেহ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। অতএব এই পর্ষ্যসংগ্রহাধ্যায় সংকলিত হইবার পূর্ব্বো যে অনেক অংশ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহাই অনুমেয়।

৫ম,—ঐ অনুক্রমণিকাধ্যায়ে আছে যে, মহাভারত প্রথমতঃ উপাখ্যান ত্যাগ করিয়া চতুর্বিংশতি সহস্র শ্লোকে বিরচিত হয় এবং বেদব্যাস তাহাই প্রথমে স্বীয় পুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করান।

চতুর্বিংশতিসাহস্রীং চক্রে ভারতসংহিতাম্।

উপাখ্যানৈর্ষ্বিনা তাবদ্রাতং প্রোচ্যতে বৃধৈঃ ॥

ততোহধ্যাক্ষতং ভূয়ঃ সংক্ষেপং কৃতবানৃষিঃ।

অনুক্রমণিকাধ্যায়ং বৃত্তান্তানাং সপর্ষ্যগাম্ ॥

ইদং বৈপায়নঃ পূর্ব্বং পুত্রমধ্যাপয়ং শুকম্।

ততোহন্যোভ্যোহনুরূপেভ্যঃ শিষ্যেভ্যঃ প্রদদৌ বিভূঃ ॥—আদিপর্ষ্য, ১০১-১০৩।

শুকদেবের নিকট বৈশম্পায়ন মহাভারতশিক্ষা করিয়াছিলেন। অতএব এই চতুর্বিংশতি-সহস্রশ্লোকাত্মক মহাভারতই জনমেজয়ের নিকট পাঠিত হইয়াছিল। এবং আদিম মহাভারতে চতুর্বিংশতি সহস্র মাত্র শ্লোক ছিল। পরে ক্রমে নানা ব্যক্তির রচনা উহাতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া মহাভারতের আকার চারিগুণ বাড়িয়াছে। সত্য বটে, ঐ অনুক্রমণিকাতেই লিখিত আছে যে, তাহার পর বেদব্যাস ষষ্টিলক্ষশ্লোকাত্মক মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন, এবং তাহার কিয়দংশ দেবলোকে, কিয়দংশ পিতৃলোকে, কিয়দংশ গন্ধর্বলোকে ও এক লক্ষ মাত্র মনুষ্যলোকে পাঠিত হইয়া থাকে। এই অনৈসর্গিক ব্যাপারঘটিত কথাটা যে আদিম অনুক্রমণিকাধ্যায়ের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোনও সংশয় থাকিতে পারে না। দেবলোকে বা পিতৃলোকে বা গন্ধর্বলোকে মহাভারতপাঠ, অথবা বেদব্যাসই হউন বা যেই হউন, ব্যক্তিবিশেষের ষষ্টি লক্ষ শ্লোক রচনা করা আমরা সহজেই অবিশ্বাস করিতে পারি। আমি পূর্ব্বোই দেখাইয়াছি যে, ২৭২ শ্লোকাত্মক উপক্রমণিকার মধ্যে ১২২ শ্লোক প্রক্ষিপ্ত। এই ষষ্টি লক্ষ শ্লোক এবং লক্ষ শ্লোকের কথা প্রক্ষিপ্তের অন্তর্গত, তাহাতে কোন সংশয় নাই।

দশম পরিচ্ছেদ—প্রক্ষিপ্তনির্বাচনপ্রণালী

আমাদিগের বিচার্য বিষয় যে, মহাভারতের কোন কোন অংশ প্রক্ষিপ্ত। ইহা পূর্ব্বপরিচ্ছেদে স্থির হইয়াছে। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, এই বিচার সম্পন্ন করিবার কোন উপায় আছে কি না। অর্থাৎ কোন অংশ প্রক্ষিপ্ত এবং কোন অংশ প্রক্ষিপ্ত নহে, তাহা স্থির করিবার কোন লক্ষণ পাওয়া যায় কি না?

মনুষ্যজীবনে যে সকল কার্য সম্পন্ন হয়, সকলই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া নির্বাহ করা যায়। তবে বিষয়ভেদে প্রমাণের অল্প বা অধিক বলবত্তা প্রয়োজনীয় হয়। যে প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া আমরা সচরাচর জীবনযাত্রার কার্য নির্বাহ করি, তাহার অপেক্ষা গুরুতর প্রমাণ ব্যতীত আদালতে একটা মোকদ্দমা নিষ্পন্ন হয় না, এবং আদালতে ঘেরূপ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বিচারক একটা নিষ্পত্তিতে উপস্থিত হইতে পারেন, তাহার অপেক্ষা বলবান্ প্রমাণ ব্যতীত বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন না। এই জন্য বিষয়ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রমাণশাস্ত্র সৃষ্ট হইয়াছে। যথা,—আদালতের জন্য প্রমাণসম্বন্ধীয় আইন (Law of Evidence), বিজ্ঞানের জন্য অনুমানতত্ত্ব (Logic বা Inductive Philosophy)

* অবশ্য অনুক্রমণিকাধ্যায়ের ১৫০ শ্লোক ভিন্ন।

বিশ্বকম রচনাবলী

এবং ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিরূপণ জন্য এইরূপ একটি প্রমাণশাস্ত্রও আছে। উপস্থিত তত্ত্ব নিরূপণ জন্য সেইরূপ কতকগুলি প্রমাণের নিয়ম সংস্থাপন করা যাইতে পারে; যথা—

১ম,—আমরা পদুর্বে পদুর্বে সংগ্রহাধ্যায়ের কথা বলিয়াছি। যাহার প্রসঙ্গ সেই পদুর্বে-সংগ্রহাধ্যায়ে নাই, তাহা যে নিশ্চিত প্রক্ষিপ্ত, ইহাও বুঝাইয়াছি। এইটাই আমাদের প্রথম সূত্র।

২য়,—অনুক্রমণিকাধ্যায়ে লিখিত আছে যে, মহাভারতকার ব্যাসদেবই হউন, আর যিনিই হউন, তিনি মহাভারত রচনা করিয়া সাদৃশ্যত শ্লোকময়ী অনুক্রমণিকায় ভারতীয় নিখিল বৃত্তান্তের সার সঙ্কলন করিলেন। ঐ অনুক্রমণিকাধ্যায়ের ৯৩ শ্লোক হইতে ২৫১ শ্লোক পর্যন্ত এইরূপ একটি সারসঙ্কলন আছে। যদিও ইহাতে সাদৃশ্যতের অপেক্ষা ৯টি শ্লোক বেশি হইল, তাহা না ধরিলেও চলে। এমনও হইতে পারে যে, ৯টি শ্লোক ইহারই মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এখন এই ১৫৯ শ্লোকের মধ্যে যাহার প্রসঙ্গ না পাইব, তাহা আমরা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বিবেচনা করিতে বাধ্য।

৩য়,—যাহা পরস্পর বিরোধী, তাহার মধ্যে একটি অবশ্য প্রক্ষিপ্ত। যদি দেখি যে, কোন ঘটনা দুই বার বা ততোধিক বার বিবৃত হইয়াছে, অথচ দুটি বিবরণ ভিন্নপ্রকার বা পরস্পর বিরোধী, তবে তাহার মধ্যে একটি প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করা উচিত। কোন লেখকই অনর্থক পুনরুক্তি, এবং অনর্থক পুনরুক্তি দ্বারা আত্মবিরোধ উপস্থিত করেন না। অনবধানতা বা অক্ষমতাবশতঃ যে পুনরুক্তি বা আত্মবিরোধ হয়, সে স্বতন্ত্র কথা। তাহাও অনায়াসে নির্বাচন করা যায়।

৪র্থ,—সুর্কবিদিগের রচনাপ্রণালীতে প্রায়ই কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ থাকে। মহাভারতের কতকগুলি এমন অংশ আছে যে, তাহার মৌলিকতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ হইতে পারে না—কেন না, তাহার অভাবে মহাভারতে মহাভারতত্ব থাকে না, দেখা যায় যে, সেগুলির রচনাপ্রণালী সর্বত্র এক প্রকার লক্ষণবিশিষ্ট। যদি আর কোন অংশের রচনা এরূপ দেখা যায় যে, সেই সেই লক্ষণ তাহাতে নাই, এবং এমন সকল লক্ষণ আছে যে, তাহা পদুর্বে লক্ষণ সকলের সঙ্গে অসঙ্গত, তবে সেই অসঙ্গতলক্ষণযুক্ত রচনাকে প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করিবার কারণ উপস্থিত হয়।

৫ম,—মহাভারতের কবি একজন শ্রেষ্ঠ কবি, তদ্বিশয়ে সংশয় নাই। শ্রেষ্ঠ কবিদিগের বর্ণিত চরিত্রগুলির সর্বত্র পরস্পর সুসঙ্গত হয়। যদি কোথাও তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়, তবে সে অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করা যাইতে পারে। মনে কর, যদি কোন হস্তলিখিত মহাভারতের কাপিতে দেখি যে, স্থানবিশেষে ভীষ্মের পরদারপরায়ণতা বা ভীমের ভীরুতা বর্ণিত হইতেছে, তবে জানিব যে, ঐ অংশ প্রক্ষিপ্ত।

৬ষ্ঠ,—যাহা অপ্রাসঙ্গিক, তাহা প্রক্ষিপ্ত হইলেও হইতে পারে, না হইলেও হইতে পারে। কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে যদি পদুর্বে পাঁচটি লক্ষণের মধ্যে কোন লক্ষণ দেখিতে পাই, তবে তাহা প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করিবার কারণ আছে।

৭ম,—যদি দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বিবরণের মধ্যে একটিকে তৃতীয় লক্ষণের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত বোধ হয়, যেটি অন্য কোন লক্ষণের অন্তর্গত হইবে, সেইটিকেই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে।

এখন এই পর্য্যন্ত বুঝান গেল। নির্বাচনপ্রণালী ক্রমশঃ স্পষ্টতর করা যাইবে।

একাদশ পরিচ্ছেদ—নির্বাচনের ফল

মহাভারত পুনঃ পুনঃ পড়িয়া এবং উপরিলিখিত প্রণালীর অনুবর্তী হইয়া বিচারপদুর্বেক আমি এইটুকু বুঝিয়াছি যে, এই গ্রন্থের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে। প্রথম, একটি আদিম কাল; তাহাতে পাণ্ডবদিগের জীবনবৃত্ত এবং আনুষঙ্গিক কৃষ্ণকথা ভিন্ন আর কিছুই নাই। ইহা বড় সংক্ষিপ্ত। বোধ হয়, ইহাই সেই চতুর্বিংশতিসহস্রশ্লোকাত্মকা ভারতসংহিতা। তাহার পর আর এক স্তর আছে, তাহা প্রথম স্তর হইতে ভিন্নলক্ষণাক্রান্ত; অথচ তাহার অংশ সমুদায় এক লক্ষণাক্রান্ত। আমরা দেখিব যে, মহাভারতের কোন কোন অংশের রচনা অতি উদার, বিকৃতিশূন্য, অতি উচ্চ কবিত্বপূর্ণ। অন্য অংশ অনুদার, কিন্তু পারমার্থিক দার্শনিকতত্ত্বের

সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত, সুতরাং কাব্যংশে কিছু বিকৃতিপ্রাপ্ত; কবিত্বশূন্য নহে, কিন্তু যে কবিত্ব আছে, সে কবিত্বের প্রধান অংশ অঘটনঘটনকৌশল, তদ্বিষয়ে সৃষ্টিচাতুর্য্য। প্রথম শ্রেণীর লক্ষণাক্রান্ত যে সকল অংশ, সেগুলি এক জনের রচনা; দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট যে সকল রচনা, তাহা দ্বিতীয় ব্যক্তির রচনা বলিয়া বোধ হয়। প্রথম শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট অংশই প্রাথমিক, বা আদিম; এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণযুক্ত অংশগুলি পরে রচিত হইয়া, তাহার উপর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে। কেন না, প্রথম কথিত অংশ উঠাইয়া লইলে, মহাভারত থাকে না; যাহা থাকে, তাহা কঙ্কালবিচ্যুতমাংসপিণ্ডের ন্যায় বন্ধন-শূন্য এবং প্রয়োজনশূন্য নিরর্থক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট যাহা, তাহা উঠাইয়া লইলে, মহাভারতের কিছু ক্ষতি হয় না, কেবল কতকগুলি নিষ্প্রয়োজনীয় অলঙ্কার বাদ যায়; পাণ্ডবদিগের জীবনবৃত্ত অখণ্ড থাকে। অতএব প্রথম শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট অংশগুলিকে আমি প্রথম স্তর, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট রচনাগুলিকে দ্বিতীয় স্তর বিবেচনা করি। প্রথম স্তরে, ও দ্বিতীয় স্তরে, আর একটা গুরুতর প্রভেদ এই দেখিব যে, প্রথম স্তরে কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার বা বিষ্ণুর অবতার বলিয়া সচরাচর পরিচিত নহেন; নিজে তিনি আপনার দেবত্ব স্বীকার করেন না; এবং মানুষী ভিন্ন দৈবী শক্তি দ্বারা কোন কৰ্ম্ম সম্পন্ন করেন না। কিন্তু দ্বিতীয় স্তরে, তিনি স্পষ্টতঃ বিষ্ণুর অবতার বা নারায়ণ বলিয়া পরিচিত এবং অর্চিত; নিজেও নিজের ঈশ্বরত্ব ঘোষিত করেন; কবিও তাহার ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য বিশেষ প্রকারে যত্নশীল।

ইহা ভিন্ন মহাভারতে আরও এক স্তর আছে। তাহাকে তৃতীয় স্তর বলিতেছি।

তৃতীয় স্তর অনেক শতাব্দী ধরিয়া গঠিত হইয়াছে। যে যাহা যখন রচিয়া “বেশ রচিয়াছি” মনে করিয়াছে, সে তাহাই মহাভারতে পুরিয়া দিয়াছে। মহাভারত পঞ্চম বেদ। এ কথা একটি গুরুত্বপূর্ণ আশঙ্কা আছে। চারি বেদে শূদ্র এবং স্ত্রীলোকের অধিকার নাই, কিন্তু Mass Education লইয়া তর্কবিতর্ক আজ নূতন ইংরেজের আমলে হইতেছে না। অসাধারণ প্রতিভাশালী ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিরা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে, বিদ্যা ও জ্ঞানে স্ত্রীলোকের ও ইতর লোকের, উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গে সমান অধিকার। তাহারা বুঝিয়াছিলেন যে, আপামর সাধারণ সকলেরই শিক্ষা ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই। কিন্তু তাহারা আধুনিক হিন্দুদিগের মত প্রতিভাশালী পুর্ষপুরুষদিগকে অবজ্ঞা করিতেন না। তাহারা “অতীতের সহিত বর্তমানের বিচ্ছেদকে” বড় ভয় করিতেন। পুর্ষপুরুষেরা বলিয়া গিয়াছেন যে, বেদে শূদ্র ও স্ত্রীলোকের অধিকার নাই—ভাল, সে কথা বজায় রাখা যাউক। তাহারা ভাবিলেন, যদি এমন কিছু উপায় করা যায় যে, যাহা শিখিবার, তাহা স্ত্রীলোকে ও শূদ্রে বেদ অধ্যয়ন না করিয়াও এক স্থানে পাইবে, তবে সে কথা বজায় রাখিয়া চলা যায়। বরং যাহা সর্বজনমনোহর, এমন সামগ্রীর সঙ্গে যুক্ত হইয়া সর্বলোকের নিকট সে শিক্ষা বড় আদরণীয় হইবে। তিন স্তরে সম্পূর্ণ যে মহাভারত এখন আমরা পড়ি, তাহা ব্রাহ্মণদিগের লোক-শিক্ষার উদ্দেশ্যে অক্ষয় কীর্ত্তি।* কিন্তু এই কারণে ভালমন্দ অনেক কথাই ইহার ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে। শান্তিপর্ব্ব ও অনুশাসনিক পর্ব্বের অধিকাংশ, ভীষ্মপর্ব্বের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পর্ব্বাধ্যায়, বনপর্ব্বের মার্কণ্ডেয়সমস্যা পর্ব্বাধ্যায়, উদ্যোগপর্ব্বের প্রজাগর পর্ব্বাধ্যায়, এই তৃতীয় স্তর-সময়-কালে রচিত বলিয়া বোধ হয়। পঞ্চাস্তরে আদিপর্ব্বের শকুন্তলোপাখ্যানের পুর্ষের যে অংশ এবং বনপর্ব্বের তীর্থযাত্রা পর্ব্বাধ্যায় প্রভৃতি অপকৃষ্ট অংশও এই স্তর-গত।

এই তিন স্তরের, নিম্ন অর্থাৎ প্রথম স্তরই প্রাচীন, এই জন্যই তাহাই মৌলিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। যাহা সেখানে নাই, তাহা দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরে দেখিলে, তাহা কবিকল্পিত অর্নৈতিহাসিক বৃত্তান্ত বলিয়া আমরাদিগের পরিত্যাগ করা উচিত।

স্বীশুদ্রাঈজবন্ধনাং গ্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।

কৰ্ম্মশ্রেয়সি মূঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ।

ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মূর্নিনা কৃতং।—শ্রীমদ্ভাগবত। ১ স্ক। ৪ অ। ২৫।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ—অনৈসর্গিক বা অতিপ্রকৃত

এত দূরে আমরা যে কথা পাইলাম, তাহা স্থূলতঃ এইঃ—যে সকল গ্রন্থে কৃষ্ণকথা আছে, তাহার মধ্যে মহাভারত সর্বপূর্ববর্তী। তবে, আমাদের মধ্যে যে মহাভারত প্রচলিত, তাহার তিন ভাগ প্রক্ষিপ্ত; এক ভাগ মাত্র মৌলিক। সেই এক ভাগের কিছ্ ঐতিহাসিকতা আছে। কিন্তু, সেই ঐতিহাসিকতা কতটুকু?

এই প্রশ্নের উত্তরে কেহ কেহ বলিবেন যে, সে বিচারে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। কেন না, মহাভারত ব্যাসদেবপ্রণীত; ব্যাসদেব মহাভারতের যুদ্ধের সমকালিক ব্যক্তি; মহাভারত সমসাময়িক আখ্যান,—Contemporary History, ইহার মৌলিক অংশ অবশ্য বিশ্বাসযোগ্য।

এখন যে মহাভারত প্রচলিত, তাহাকে ঠিক সমসাময়িক গ্রন্থ বলিতে পারি না। আদিম মহাভারত ব্যাসদেবের প্রণীত হইতে পারে, কিন্তু আমরা কি তাহা পাইয়াছি? প্রক্ষিপ্ত বাদ দিলে যাহা থাকে, তাহা কি ব্যাসদেবের রচনা? যে মহাভারত এখন প্রচলিত, তাহা উগ্রশ্রবাঃ সৌতি নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষিদিগের নিকট বলিতেছেন। তিনি বলেন যে, জনমেজয়ের সপসনে বৈশম্পায়নের নিকট যে মহাভারত শুনিয়াছিলেন, তাহাই তিনি ঋষিদিগের শুনাইবেন। স্থানান্তরে কথিত হইয়াছে যে, উগ্রশ্রবাঃ সৌতি তাহার পিতার কাছেই বৈশম্পায়ন-সংহিতা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এক্ষণে মহাভারতে ব্যাসের জন্মবৃত্তান্তের পর, ৬৩ অধ্যায়ে, বৈশম্পায়ন কতৃকই কথিত হইয়াছে যে—

বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারতপণ্ডমান্ ।

সুমন্তুং জৈমিনিং পৈলং শুকশ্রেণিব স্বমাত্মজম্ ॥

প্রভূর্বারিষ্ঠো বরদো বৈশম্পায়নমেব চ ।

সংহিতাস্তৈঃ পৃথক্স্থেন ভারতস্য প্রকাশিতাঃ ॥—আদিপর্ব্ব। ৬৩অ। ৯৫-৯৬।

অর্থাৎ ব্যাসদেব, বেদ এবং পণ্ডম বেদ মহাভারত সুমন্তু, জৈমিনি, পৈল, স্বীয় পুত্র শুক, এবং বৈশম্পায়নকে শিখাইলেন। তাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ ভারতসংহিতা প্রকাশিতা করিলেন।*

তাহা হইলে, প্রচলিত মহাভারত বৈশম্পায়ন প্রণীত ভারতসংহিতা। ইহা জনমেজয়ের সভায় প্রথম প্রচারিত হয়। জনমেজয়, পাণ্ডবদিগের প্রপৌত্র।

সে যাহা হউক, উপস্থিত মহাভারত আমরা বৈশম্পায়নের নিকটও পাইতেছি না। উগ্রশ্রবাঃ বলিতেছেন যে, আমি ইহা বৈশম্পায়নের নিকট পাইয়াছি। অথবা তাঁহার পিতা বৈশম্পায়নের নিকট পাইয়াছিলেন, তিনি তাঁহার পিতার নিকট পাইয়াছিলেন। উগ্রশ্রবাঃ যাহা বলিতেছেন, তাহা আমরা আর এক ব্যক্তির নিকট পাইতেছি। সেই ব্যক্তিই বর্তমান মহাভারতের প্রথম অধ্যায়ের প্রণেতা, এবং মহাভারতের অনেক স্থানে তিনিই বক্তা।

তিনি বলিতেছেন, নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষি উপস্থিত; সেখানে উগ্রশ্রবাঃ আসিলেন, এবং ঋষিগণের সঙ্গে উগ্রশ্রবাঃর এই ভারত সম্বন্ধে ও অন্যান্য বিষয়ে যে কথোপকথন হইল, তাহাও তিনি বলিতেছেন।

তবে ইহা স্থির যে, (১) প্রচলিত মহাভারত আদিম বৈয়াসিকী সংহিতা নহে। (২) ইহা বৈশম্পায়ন-সংহিতা বলিয়া পরিচিত, কিন্তু আমরা প্রকৃত বৈশম্পায়ন-সংহিতা পাইয়াছি কি না, তাহা সন্দেহ। তার পর প্রমাণ করিয়াছি যে, (৩) ইহার প্রায় তিন ভাগ প্রক্ষিপ্ত। অতএব আমাদের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যিক যে, মহাভারতকে কৃষ্ণচরিত্রের ভিত্তি করিতে গেলে অতি সাবধান হইয়া এই গ্রন্থের ব্যবহার করিতে হইবে।

সেই সাবধানতার জন্য আবশ্যিক যে, যাহা অতিপ্রকৃত বা অনৈসর্গিক, তাহাতে আমরা বিশ্বাস করিব না।

* জৈমিনিভারতের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। ইহার অশ্বমেধ-পর্ব্ব বেবর সাহেব দেখিয়াছেন। আর সকল বিলুপ্ত হইয়াছে। আশ্বলায়ন গৃহসূত্রে আছে—“সুমন্তুজৈমিনিবৈশম্পায়নপৈল-সুত্র-ভারত-মহাভারত-ধর্ম্মাচার্য্যাঃ”। তাহা হইলে সুমন্তু সূত্রকার, জৈমিনি ভারতকার, বৈশম্পায়ন মহাভারতকার, এবং পৈল ধর্ম্মশাস্ত্রকার।

আমি এমন বলি না যে, আমরা যাহাকে অনৈসর্গিক বলি, তাহা কাজে কাজেই মিথ্যা। আমি জানি যে, এমন অনেক নৈসর্গিক নিয়ম আছে, যাহা আমরা অবগত নাই। যেমন একজন বন্যজাতীয় মনুষ্য, একটা ঘড়ি, কি বৈদ্যুতিক সংবাদতন্ত্রীকে অনৈসর্গিক ব্যাপার মনে করিতে পারে, আমরাও অনেক ঘটনাকে সেইরূপ ভাবি। আপনাদিগের এরূপ অজ্ঞতা স্বীকার করিয়াও বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত, কোন অনৈসর্গিক ঘটনায় বিশ্বাস করিতে পারি না। কেন না, আপনার জ্ঞানের অতিরিক্ত কোন ঐশিক নিয়ম প্রমাণ ব্যতীত কাহারও স্বীকার করা কর্তব্য নহে। যদি তোমাকে কেহ বলে, আমগাছে তাল ফলিতেছে দেখিয়াছি, তোমার তাহা বিশ্বাস করা কর্তব্য নহে। তোমাকে বলিতে হইবে, হয় আমগাছে তাল দেখাও, নয় বুঝাইয়া দাও কি প্রকারে ইহা হইতে পারে। আর যে ব্যক্তি বলিতেছে যে, আমগাছে তাল ফলিয়াছে, সে ব্যক্তি যদি বলে, 'আমি দেখি নাই—শুনিয়াছি,' তবে অবিশ্বাসের কারণ আরও গুরুতর হয়। কেন না, এখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণও পাওয়া গেল না। মহাভারতও তাই। অতিপ্রকৃতির প্রত্যক্ষ প্রমাণও পাইতেছি না।

বলিয়াছি যে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলেও অতিপ্রকৃত হঠাৎ বিশ্বাস করা যায় না। নিজে চক্ষে দেখিলেও হঠাৎ বিশ্বাস করা যায় না। কেন না, বরং আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ভ্রান্তি সম্ভব, তথাপি প্রাকৃতিক নিয়মলঙ্ঘন সম্ভব নহে। বুঝাইয়া দাও যে, যাহাকে অতিপ্রকৃত বলিতেছি, তাহা প্রাকৃতিক নিয়মসঙ্গত, তবে বুঝিব। বন্যজাতীয়কে ঘড়ি বা বৈদ্যুতিক সংবাদতন্ত্রী বুঝাইয়া দিলে, সে ইহা অনৈসর্গিক ব্যাপার বলিয়া বিশ্বাস করিবে না।

আর ইহাও বক্তব্য যে, যদি শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকার করা যায় (আমি তাহা করিয়া থাকি), তাহা হইলে, তাঁহার ইচ্ছায় যে কোন অনৈসর্গিক ব্যাপার সম্পাদিত হইতে পারে না, ইহা বলা যাইতে পারে না। তবে যতক্ষণ না শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারা যায়, এবং যতক্ষণ না এমন বিশ্বাস করা যায় যে, তিনি মনুষ্য-দেহ ধারণ করিয়া ঐশী শক্তি দ্বারা তাঁহার অভিপ্রেত কার্য সম্পাদন করিতেন, ততক্ষণ আমি অনৈসর্গিক ঘটনা তাঁহার ইচ্ছা দ্বারা সিদ্ধ বলিয়া পরিচিত করিতে পারি না বা বিশ্বাস করিতে পারি না।

কেবল তাহাই নহে। যদি স্বীকার করা যায় যে, কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার, তিনি স্বেচ্ছাক্রমে অতিপ্রকৃত ঘটনাও ঘটাইতে পারেন, তাহা হইলেও গোল মিটে না। যাহা তাঁহার দ্বারা সিদ্ধ, তাহাতে যেন বিশ্বাস করিলাম, কিন্তু যাহা তাঁহার দ্বারা সিদ্ধ নহে, এমন সকল অনৈসর্গিক ব্যাপারে বিশ্বাস করিব কেন? সাল্ব অসুর অন্তরীক্ষে সৌভনগর স্থাপিত করিয়া যুদ্ধ করিল; বাণের সহস্র বাহু; অশ্বখামা ব্রহ্মাশিরা অস্ত্র ত্যাগ করিলে তাহাতে ব্রহ্মাণ্ড দক্ষ হইতে লাগিল; এবং পরিশেষে অশ্বখামার আদেশানুসারে, উত্তরার গর্ভস্থ বালককে গর্ভমধ্যে নিহত করিল, ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্বাস করিব কেন?

তার পর কৃষ্ণের নিজ-কৃত অনৈসর্গিক কৰ্ম্মও অবিশ্বাস করিবার কারণ আছে। তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকার করিলেও অবিশ্বাস করিবার কারণ আছে। তিনি মানবশরীর ধারণ করিয়া যদি কোন অনৈসর্গিক কৰ্ম্ম করেন, তবে তাহা তাঁহার দৈবী বা ঐশী শক্তির দ্বারা। কিন্তু দৈবী বা ঐশী শক্তি দ্বারা যদি কৰ্ম্ম সম্পাদন করিবেন, তবে তাঁহার মানব-শরীরধারণের প্রয়োজন কি? যিনি সৰ্ব্বকর্তা, সৰ্ব্বশক্তিমান, ইচ্ছাময়—যাঁহার ইচ্ছায় এই সমস্ত জীবের সৃষ্টি ও ধ্বংস হইয়া থাকে, তিনি মনুষ্যশরীর ধারণ না করিয়াও কেবল তাঁহার ঐশী শক্তির প্রয়োগের দ্বারা, যে কোন অসুরের বা মানুষের সংহার বা অন্য যে কোন অভিপ্রেত কার্য সম্পাদন করিতে পারেন। যদি দৈবী শক্তি দ্বারা বা ঐশী শক্তি দ্বারা কার্য নিৰ্ব্বাহ করিবেন, তবে তাঁহার মনুষ্যশরীরধারণের প্রয়োজন নাই। যদি ইচ্ছাময় ইচ্ছাপূৰ্ব্বক মানুষের শরীর ধারণ করেন, তবে দৈবী বা ঐশী শক্তির প্রয়োগ তাঁহার উদ্দেশ্য বা অভিপ্রেত হইতে পারে না।

তবে শরীরধারণের প্রয়োজন কি? এমন কোন কৰ্ম্ম আছে কি যে, জগদীশ্বর শরীরধারণ না করিলে সিদ্ধ হয় না?

ইহার উত্তরের প্রথমে এই আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, জগদীশ্বরের মানবশরীরধারণ কি সম্ভব?

প্রথমে ইহার মীমাংসা করা যাইতেছে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ—ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া কি সম্ভব?

বস্তুতঃ কৃষ্ণচরিত্রের আলোচনার প্রথমেই কাহারও কাহারও কাছে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় যে, ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া কি সম্ভব? এ দেশের লোকের বিশ্বাস, কৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার। শিক্ষিতের বিশ্বাস যে, কথাটা অতিশয় অবৈজ্ঞানিক, এবং আমরাইগের খ্রীষ্টান উপদেশকারীদের মতে অতিশয় উপহাসের যোগ্য বিষয়।

এখানে একটা নহে, দুইটি প্রশ্ন হইতে পারে—(১) ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব কি না, (২) তাহা হইলে কৃষ্ণ ঈশ্বরবতার কি না। আমি এই দ্বিতীয় প্রশ্নের কোন উত্তর দিব না। প্রথম প্রশ্নের কিছু উত্তর দিতে ইচ্ছা করি।

সৌভাগ্যক্রমে আমরাইগের খ্রীষ্টীয়ান গুরুরদের সঙ্গে আমরাইগের এই স্থূল কথা লইয়া মতভেদ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহাদিগকে ঈশ্বরের অবতার সম্ভব বলিয়া মানিতে হয়, নহিলে যিশু টিকেন না। আমরাইগের প্রধান বিবাদ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে।

ইহাদিগের মধ্যে অনেকে এই আপত্তি করিবেন, যেখানে আদৌ ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণাভাব, সেখানে আবার ঈশ্বরের অবতার কি? যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, আমরা তাহাদিগের সঙ্গে কোন বিচার করি না। তাহাদের ঘৃণা করিয়া বিচার করি না, এমত নহে। তবে জানা আছে যে, এ বিচারে কোন পক্ষের উপকার হয় না। তাহারা আমাদের ঘৃণা করেন, তাহাতে আপত্তি নাই।

তাহার পর আর কতকগুলি লোক আছেন যে, তাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু তাহারা বলিবেন, ঈশ্বর নিগূণ। সগুণেরই অবতার সম্ভব। ঈশ্বর নিগূণ, সুতরাং তাহার অবতার অসম্ভব।

এ আপত্তিরও আমাকে বড় সোজা উত্তর দিতে হয়। নিগূণ ঈশ্বর কি, তাহা আমি বঝিতে পারি না, সুতরাং এ আপত্তির মীমাংসা করিতে সক্ষম নহি। আমি জানি যে, বিস্তর পণ্ডিত ও ভাবুক ঈশ্বরকে নিগূণ বলিয়াই মানেন। আমি পণ্ডিতও নহি, ভাবুকও নহি, কিন্তু আমার মনে মনে বিশ্বাস যে, এই ভাবুক পণ্ডিতগণও আমার মত, নিগূণ ঈশ্বর বঝিতে পারেন না, কেন না, মনুষ্যের এমন কোন চিত্তবৃত্তি নাই, যদ্বারা আমরা নিগূণ ঈশ্বর বঝিতে পারি। ঈশ্বর নিগূণ হইলে হইতে পারেন, কিন্তু আমরা নিগূণ বঝিতে পারি না, কেন না, আমাদের সে শক্তি নাই।* মুখে বলিতে পারি বটে যে, ঈশ্বর নিগূণ, এবং এই কথার উপর একটা দর্শনশাস্ত্র গড়িতে পারি, কিন্তু যাহা কথায় বলিতে পারি, তাহা যে মনে বঝি, ইহা অনিশ্চিত। “চতুষ্কোণ গোলক” বলিলে আমাদের রসনা বিদীর্ণ হয় না বটে, কিন্তু “চতুষ্কোণ গোলক” মানে ত কিছুই বঝিলাম না। তাই হবর্ট স্পেন্সর এত কাল পরে নিগূণ ঈশ্বর ছাড়িয়া দিয়া সগুণেরও অপেক্ষা যে সগুণ ঈশ্বর (“Something higher than personality”) তাহাতে আসিয়া পড়িয়াছেন। অতএব আইস, আমরাও নিগূণ ঈশ্বরের কথা ছাড়িয়া দিই। ঈশ্বরকে নিগূণ বলিলে স্রষ্টা, বিধাতা, পাতা, দ্রাণকর্তা কাহাকেও পাই না। এমন ঝক্‌ঝকিতে কাজ কি?

যাঁহারা সগুণ ঈশ্বর স্বীকার করেন, তাহাদেরও ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা স্বীকার পক্ষে অনেকগুলি আপত্তি আছে। এক আপত্তি এই যে, ঈশ্বর সগুণ হউন, কিন্তু নিরাকার। যিনি নিরাকার, তিনি আকার ধারণ করিবেন কি প্রকারে?

উত্তরে, জিজ্ঞাসা করি, যিনি ইচ্ছাময় এবং সর্বশক্তিমান্, তিনি ইচ্ছা করিলে নিরাকার হইলেও আকার ধারণ করিতে পারেন না কেন? তাহার সর্বশক্তিমান্‌তার এ সীমান্বদেশ কর কেন? তবে কি তাহাকে সর্বশক্তিমান্ বলিতে চাও না? যিনি এই জড় জগৎকে আকার প্রদান করিয়াছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে নিজে আকার গ্রহণ করিতে পারেন না কেন?

* “Our conception of the Deity is then bounded by the conditions which bound all human knowledge and therefore we cannot represent the Deity as he is, but as he appears to us.”—Mansel, Metaphysics, p. 384.

যাঁহারা এ আপত্তি না করেন, তাঁহারা বলিতে পারেন ও বলেন যে, যিনি সর্বশক্তিমান্, তাঁহার জগৎ-শাসনের জন্য, জগতের হিত জন্য, মনুষ্যকলেবর ধারণ করিবার প্রয়োজন কি? যিনি ইচ্ছাক্রমেই কোটি কোটি বিশ্ব সৃষ্ট ও বিধ্বস্ত করিতেছেন, রাবণ কুম্ভকর্ণ কি কংস শিশুপাল-বধের জন্য তাঁহাকে নিজে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, বালক হইয়া মাতৃস্তন্য পান করিতে হইবে, ক, খ, গ, ঘ শিখিয়া শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে হইবে, তাহার পর দীর্ঘ মনুষ্য জীবনের অপার দুঃখ ভোগ করিয়া শেষে স্বয়ং অস্ত্রধারণ করিয়া, আহত বা কখন পরাজিত হইয়া, বহুদায়সে দুঃখাদির বধসাধন করিতে হইবে, ইহা অতি অশ্রদ্ধেয় কথা।

যাঁহারা এইরূপ আপত্তি করেন, তাঁহাদের মনের ভিতর এমনি একটা কথা আছে যে, এই মনুষ্য-জন্মের যে সকল দুঃখ—গর্ভে অবস্থান, জন্ম, স্তন্যপান, শৈশব, শিক্ষা, জয়, পরাজয়, জরা, মরণ, এ সকলে আমরাও যেমন কষ্ট পাই, ঈশ্বরও বৃষ্টি সেইরূপ। তাহাদিগের স্থূল বুদ্ধিতে এটুকু আসে না যে, তিনি সুখদুঃখের অতীত,—তাঁহার কিছুতেই দুঃখ নাই, কষ্ট নাই। জগতের সৃজন, পালন, লয়, যেমন তাঁহার লীলা (Manifestation), এ সকল তেমনি তাঁহার লীলামাত্র হইতে পারে। তুমি বলিতেছ, তিনি মনুষ্য-জীবন-পরিমিত কাল ব্যাপিয়া আয়াস পাইবেন কেন? তুমি ভুলিয়া যাইতেছ যে, যাঁহার কাছে অনন্ত কালও পলক মাত্র, তাঁহার কাছে মনুষ্য-জীবন-পরিমিত কালে প্রভেদ কি?

তবে এই যে অসম্ভব কথাটা আমরা বিষ্ণুর অবতার সম্বন্ধে অনেক দিন হইতে পুরাণাদিতে শুনিয়া আসিতেছি, এ কথা শুনিয়া অনেকের অবতার সম্বন্ধে অনাস্থা হইতে পারে বটে। কেবল একটা কংস বা শিশুপাল মারিবার জন্য যে স্বয়ং ঈশ্বরকে ভূতলে মানবরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, ইহা অসম্ভব কথা বটে। যিনি অনন্তশক্তিমান্, তাঁহার কাছে কংস শিশুপালও যে, এক ক্ষুদ্র পতঙ্গও সে। বাস্তবিক যাঁহারা হিন্দুধর্মের প্রকৃত মর্ম গ্রহণ করিতে না পারে, তাহারাই মনে করে যে, অবতারের উদ্দেশ্য দৈত্য বা দুঃখাবিশেষের নিধন। আসল কথাটা, ভগবদ্গীতায় অতি সংক্ষেপে বলা হইতেছেঃ—

“পরিব্রাজ্য সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।

ধর্মসংরক্ষণার্থায় সন্তবামি যুগে যুগে ॥”

এ কথাটা অতি সংক্ষিপ্ত। “ধর্মসংরক্ষণ” কি কেবল দুই একটা দুঃখ বধ করিলেই হয়? ধর্ম কি? তাহার সংরক্ষণ কি কি প্রকারে হইতে পারে?

আমাদিগের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকলের সর্বাঙ্গীণ স্ফূর্তি ও পরিণতি, সামঞ্জস্য ও চরিতার্থতা ধর্ম। এই ধর্ম অনুশীলনসাপেক্ষ, এবং অনুশীলন কর্মসাপেক্ষ।* অতএব কর্মই ধর্মের প্রধান উপায়। এই কর্মকে স্বধর্মপালন (Duty) বলা যায়।

মনুষ্য কতকটা নিজ রক্ষা, ও বৃত্তি সকলের বশীভূত হইয়া স্বতঃই কর্ম প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু যে কর্মের দ্বারা সকল বৃত্তির সর্বাঙ্গীণ স্ফূর্তি ও পরিণতি, সামঞ্জস্য ও চরিতার্থতা ঘটে, তাহা দুঃখ। যাহা দুঃখ, তাহার শিক্ষা কেবল উপদেশে হয় না—আদর্শ চাই। সম্পূর্ণ ধর্মের সম্পূর্ণ আদর্শ ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ নাই। কিন্তু নিরাকার ঈশ্বর আমাদের আদর্শ হইতে পারেন না। কেন না, তিনি প্রথমতঃ অশরীরী, শারীরিকবৃত্তিশূন্য; আমরা শরীরী, শারীরিক বৃত্তি আমাদের ধর্মের প্রধান বিঘ্ন। দ্বিতীয়তঃ তিনি অনন্ত, আমরা সান্ত, অতি ক্ষুদ্র। অতএব যদি ঈশ্বর স্বয়ং সান্ত ও শরীরী হইয়া লোকালয়ে দর্শন দেন, তবে সেই আদর্শের আলোচনায় যথার্থ ধর্মের উন্নতি হইতে পারে। এই জন্যই ঈশ্বরবতারের প্রয়োজন। মনুষ্য কর্ম জানে না; কর্ম কিরূপে করিলে ধর্ম পরিণত হয়, তাহা জানে না; ঈশ্বর স্বয়ং অবতার হইলে সে শিক্ষা হইবার বেশী সম্ভাবনা। এমত স্থলে ঈশ্বর জীবের প্রতি করুণা করিয়া শরীর ধারণ করিবেন, ইহার অসম্ভাবনা কি?

এ কথা আমি গাড়িয়া বলিতেছি না। ভগবদ্গীতায় ভগবদুক্তির তাৎপর্যও এই প্রকার।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম সমাচর।

অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতিপুরুষঃ ॥ ১৯ ।

* মৎকৃত এই ধর্মের ব্যাখ্যা ধর্মতত্ত্বে দেখ।

বাঁকম রচনাবলী

কৰ্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাশ্ৰিতা জনকাদয়ঃ ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যান্ কৰ্ত্ত্বমহঁসি ॥ ২০ ।
যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ২১ ।
ন মে পার্থাস্তি কৰ্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন ।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বৰ্ত্ত এব চ কৰ্ম্মণি ॥ ২২ ।
যদি হাহং ন বৰ্ত্তেয়ং জাতু কৰ্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ ।
মম বৰ্ত্তানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সৰ্ব্বশঃ ॥ ২৩ ।
উৎসীদেয়ুর্নিমে লোকা ন কুৰ্য্যাৎ কৰ্ম্ম চেদহম্
সঙ্করস্য চ কৰ্ত্তা স্যাম্ পহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪ । গীতা, ৩ অ ।

“পুরুষ আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিলে মোক্ষলাভ করেন; অতএব তুমি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কৰ্ম্মানুষ্ঠান কর, জনক প্রভৃতি মহাত্মাগণ কৰ্ম্ম দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে আচরণ করেন, ইতর ব্যক্তির তাহা করিয়া থাকে, এবং তিনি যাহা মানা করেন, তাহারা তাহারই অনুষ্ঠান অনুবর্ত্তী হয়। অতএব তুমি লোকদিগের ধৰ্ম্মরক্ষণার্থ কৰ্ম্মানুষ্ঠান কর। দেখ, ত্রিভুবনে আমার কিছুই অপ্রাপ্য নাই, সুতরাং আমার কোন প্রকার কৰ্ত্তব্যও নাই, তথাপি আমি কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি*। যদি আমি আলস্যহীন হইয়া কখন কৰ্ম্মানুষ্ঠান না করি, তাহা হইলে, সমুদায় লোকে আমার অনুবর্ত্তী হইবে, অতএব আমি কৰ্ম্ম না করিলে এই সমস্ত লোক উৎসন্ন হইয়া যাইবে, এবং আমি বর্ণসঙ্কর ও প্রজাগণের মলিনতার হেতু হইব।”

কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ।

সেশ্বর বৈজ্ঞানিকদিগের শেষ ও প্রধান আপত্তির কথা এখনও বলি নাই। তাহারা বলেন যে, ঈশ্বর আছেন সত্য, এবং তিনি স্রষ্টা ও নিয়ন্তা, ইহাও সত্য। কিন্তু তিনি গাড়ীর কোচমানের মত স্বহস্তে রাশ ধরিয়া বা নৌকার কর্ণধারের মত স্বহস্তে হাল ধরিয়া এই বিশ্বসংসার চালান না। তিনি কতকগুলি অচল নিয়ম সংস্থাপন করিয়া দিয়াছেন, জগৎ তাহারই বশবর্ত্তী হইয়া চলিতেছে। এই নিয়মগুলি অচলও বটে, এবং জগতের স্থিতিপক্ষে যথেষ্টও বটে। অতএব ইহার মধ্যে ঈশ্বরের স্বয়ং হস্তক্ষেপণ করিবার স্থানও নাই ও প্রয়োজন নাই। সুতরাং ঈশ্বর মানব-দেহ ধারণ করিয়া যে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইবেন, ইহা অশ্রদ্ধেয় কথা।

ঈশ্বর যে কতকগুলি অচল নিয়ম সংস্থাপন করিয়া দিয়াছেন, জগৎ তাহারই বশবর্ত্তী হইয়া চলে, এ কথা মানি। সেইগুলি জগতের রক্ষা ও পালন পক্ষে যথেষ্ট, এ কথাও মানি। কিন্তু সেগুলি আছে বলিয়া যে ঈশ্বরের নিজের কোন কাজের স্থান ও প্রয়োজনও নাই, এ কথা কি প্রকারে সিদ্ধ হয়, বুঝিতে পারি না। জগতের কিছুই এমন উন্নত অবস্থায় নাই যে, যিনি সৰ্ব্বশক্তিমান, তিনি ইচ্ছা করিলেও তাহার আর উন্নতি হইতে পারে না। জাগতিক ব্যাপার আলোচনা করিয়া, বিজ্ঞানশাস্ত্রের সাহায্যে ইহাই বুঝিতে পারি যে, জগৎ ক্রমে অসম্পূর্ণ ও অপরিণতাবস্থা হইতে সম্পূর্ণ ও পরিণতাবস্থায় আসিতেছে। ইহাই জগতের গতি এবং এই গতিই জগৎকর্ত্তার অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয়। তার পর, জগতের বর্ত্তমান অবস্থাতে এমন কিছু দেখি না যে, তাহা হইতে বিবেচনা করিতে পারি যে, জগৎ চরম উন্নতিতে পৌঁছিয়াছে। এখনও জীবের সুখের অনেক বাকি আছে, উন্নতির বাকি আছে। যদি তাই বাকি আছে, তবে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপণের বা কার্যের স্থান বা প্রয়োজন নাই কেন? সৃজন, রক্ষা, পালন, ধ্বংস ভিন্ন জগতের আর একটা নৈসর্গিক কার্য আছে,—উন্নতি। মনুষ্যের উন্নতির মূল, ধর্ম্মের উন্নতি। ধর্ম্মের উন্নতিও ঐশিক নিয়মে সাধিত হইতে পারে, ইহাও স্বীকার করি। কিন্তু কেবল নিয়মফলে যত দূর তাহার উন্নতি হইতে পারে, ঈশ্বর কোন কালে স্বয়ং অবতীর্ণ হইলে তাহার অধিক উন্নতি সিদ্ধ হইতে পারে না, এমত বুঝিতে পারি না। এবং এরূপ অধিক উন্নতি যে তাহার অভিপ্রেত নহে, তাহাই বা কি প্রকারে বলিব?

* কৃষ্ণ অর্থাৎ যিনি শরীরধারী ঈশ্বর, তিনি এই কথা বলিতেছেন।

আপত্তিকারকেরা বলেন যে, নৈসর্গিক যে সকল নিয়ম, তাহা ঈশ্বরকৃত হইলেও তাহা অতি-ক্রমপূর্ষক জগতে কোন কাজ হইতে দেখা যায় নাই। এজন্য এ সকল অতিপ্রকৃত ক্রিয়া (Miracle) মানিতে পারি না। ইহার ন্যায্যতা স্বীকার করি; তাহার কারণও পূর্ষপরিচ্ছেদে নির্দিষ্ট করিয়াছি। আমাকে ইহাও বলিতে হয় যে, এরূপ অনেক ঈশ্বরাবতারের প্রবাদ আছে যে, তাহাতে অবতার অতিপ্রকৃতির সাহায্যেই স্বকাৰ্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। খ্রীষ্ট অবতারের এরূপ অনেক কথা আছে। কিন্তু খ্রীষ্টের পক্ষসমর্থনের ভার খ্রীষ্টানদিগের উপরই থাকুক। আরও, বিষ্ণুর অবতারের মধ্যে মৎস্য, কৃষ্ণ, বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতির এইরূপ কাৰ্য্য ভিন্ন অবতারের উপাদান আর কিছুই নাই। এখন, বুদ্ধিমান পাঠককে ইহা বলা বাহুল্য যে, মৎস্য, কৃষ্ণ, বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতি উপন্যাসের বিষয়ীভূত পশুগণের, ঈশ্বরাবতারের যথার্থ দাবি দাওয়া কিছুই নাই। গ্রন্থান্তরে দেখাইব যে, বিষ্ণুর দশ অবতারের কথাটা অপেক্ষাকৃত আধুনিক, এবং সম্পূর্ণরূপে উপন্যাস-মূলক। সেই উপন্যাসগুলিও কোথা হইতে আসিয়াছে, তাহাও দেখাইব। সত্য বটে, এই সকল অবতার পুরাণে কীর্তিত আছে, কিন্তু পুরাণে যে অনেক অলীক উপন্যাস স্থান পাইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। প্রকৃত বিচারে শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কাহাকেও ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।

কৃষ্ণের যে বৃত্তান্তটুকু মৌলিক, তাহার ভিতর অতিপ্রকৃতির কোন সহায়তা নাই। মহাভারত ও পুরাণসকল, প্রাক্ষিপ্ত ও আধুনিক নিষ্কর্মা ব্রাহ্মণদিগের নিরর্থক রচনায় পরিপূর্ণ, এজন্য অনেক স্থলে কৃষ্ণের অতিপ্রকৃতির সাহায্য গ্রহণ করা উক্ত হইয়াছে। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, সেগুলি মূল গ্রন্থের কোন অংশ নহে। আমি ক্রমে সে বিচারে প্রবৃত্ত হইব, এবং যাহা বলিতেছি, তাহা সপ্রমাণ করিব। দেখাইব যে, কৃষ্ণ অতিপ্রকৃত কাৰ্য্যের দ্বারা, বা নৈসর্গিক নিয়মের বিলম্বন দ্বারা, কোন কাৰ্য্য সম্পন্ন করেন নাই। অতএব সে আপত্তি কৃষ্ণ সম্বন্ধে খাটিবে না।

আমরা যাহা বলিলাম, কেবল তাহা আমাদের মত, এমন নহে। পুরাণকার ঋষিদিগেরও সেই মত, তবে লোকপরম্পরাগত কিম্বদন্তীর সত্যমিথ্যানির্বাচন-পদ্ধতি সে কালে ছিল না বলিয়া অনেক অনৈসর্গিক ঘটনা পুরাণেতিহাসভুক্ত হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণে আছে,—

মনুষ্যধর্মশীলস্য লীলা সা জগতঃ পতেঃ ।
 অস্প্রাণ্যনেকরূপাণি যদরাতিষু মূর্খতি ॥
 মনসৈব জগৎসৃষ্টিং সংহারণ করোতি যঃ ।
 তস্যারিপক্ষক্ষপণে কোহয়মদ্যম্বিস্তরঃ ॥
 তথাপি যো মনুষ্যাণাং ধর্মস্তমনুবর্ততে ।
 কুর্বন্ বলবতা সন্ধিং হীনৈষুদ্ধং করোত্যসৌ ॥
 সাম চোপপ্রদানণ তথা ভেদং প্রদর্শয়ন্ ।
 করোতি দণ্ডপাতণ কচ্চিদেব পলায়নম্ ॥
 মনুষ্যদেহিনাং চেষ্টামিত্যেবমনুবর্ততঃ ।
 লীলা জগৎপতেস্তস্য ছন্দতঃ সংপ্রবর্ততে ॥—৫ অংশ, ২২ অধ্যায়, ১৪-১৮

“জগৎপতি হইয়াও যে তিনি শত্রুদিগের প্রতি অনেক অস্প্রাণ্যনেকপ করিলেন, ইহা তিনি মনুষ্যধর্মশীল বলিয়া তাঁহার লীলা। নহিলে যিনি মনের দ্বারাই জগতের সৃষ্টি ও সংহার করেন, অরিস্কয় জন্য তাঁহার বিস্তর উদ্যম কেন? তিনি মনুষ্যদিগের ধর্মের অনুবর্তী, এজন্য তিনি বলবানের সঙ্গে সন্ধি এবং হীনবলের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, সাম, দান, ভেদ প্রদর্শনপূর্ষক দণ্ডপাত করেন, কখনও পলায়নও করেন। মনুষ্যদেহীদিগের ক্রিয়ার অনুবর্তী সেই জগৎপতির এইরূপ লীলা তাঁহার ইচ্ছানুসারে ঘটিয়াছিল।”

আমি ঠিক এই কথাই বলিতেছিলাম। ভরসা করি, ইহার পর কোন পাঠক বিশ্বাস করিবেন না যে, কৃষ্ণ মনুষ্যদেহে অতিমানুষশক্তির দ্বারা কোন কাৰ্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।*

* “It is true that in the Epic poems Rama and Krishna appear as incarnations of Vishnu, but they at the same time come before us as human heroes,

বাঞ্চকম রচনাবলী

অতএব বিচারের তৃতীয় নিয়ম সংস্থাপিত হইল।

বিচারের নিয়ম তিনটি পুনর্বার স্মরণ করাইঃ—

১। যাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া প্রমাণ করিব, তাহা পরিত্যাগ করিব।

২। যাহা অতিপ্রকৃত, তাহা পরিত্যাগ করিব।

৩। যাহা প্রক্ষিপ্ত নয়, বা অতিপ্রকৃত নয়, তাহা যদি অন্য প্রকারে মিথ্যার লক্ষণযুক্ত দেখি, তবে তাহাও পরিত্যাগ করিব।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ—পুরাণ

মহাভারতের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তার পর পুরাণ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে।

পুরাণ সম্বন্ধেও দুই রকম ভ্রম আছে,—দেশী ও বিলাতী। দেশী ভ্রম এই যে, সমস্ত পুরাণগুলিই এক ব্যক্তির রচনা। বিলাতী ভ্রম এই যে, এক একখানি পুরাণ এক ব্যক্তির রচনা। আগে দেশী কথাটার সমালোচনা করা যাউক।

অষ্টাদশ পুরাণ যে এক ব্যক্তির রচিত নহে, তাহার কতকগুলি প্রমাণ দিতেছি;—

১ম,—এক ব্যক্তি এক প্রকার রচনাই করিয়া থাকে। যেমন এক ব্যক্তির হাতের লেখা পাঁচ রকম হয় না, তেমনি এক ব্যক্তির রচনার গঠন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয় না। কিন্তু এই অষ্টাদশ পুরাণের রচনা আঠার রকম। কখনও তাহা এক ব্যক্তির রচনা নহে। যিনি বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতপুরাণ পাঠ করিয়া বলিবেন, দুইই এক ব্যক্তির রচনা হইতে পারে, তাঁহার নিকট কোন প্রকার প্রমাণ প্রয়োগ করা বিড়ম্বনা মাত্র।

২য়,—এক ব্যক্তি এক বিষয়ে অনেকগুলি গ্রন্থ লেখে না। যে অনেকগুলি গ্রন্থ লেখে, সে এক বিষয়ই পুনঃ পুনঃ গ্রন্থ হইতে গ্রন্থান্তরে বর্ণিত বা বিবৃত করিবার জন্য গ্রন্থ লেখে না। কিন্তু অষ্টাদশ পুরাণে দেখা যায় যে, এক বিষয়ই পুনঃ পুনঃ ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে সর্বিস্তারে কথিত হইয়াছে। এই কৃষ্ণচরিত্রই ইহার উদাহরণ স্বরূপ লওয়া যাইতে পারে। ইহা ব্রহ্মপুরাণের পূর্বভাগে আছে, আবার বিষ্ণুপুরাণের ৫ম অংশে আছে, বায়ুপুরাণে আছে, শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম ও ১১শ স্কন্ধে আছে, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের ৩য় খণ্ডে আছে, এবং পদ্ম ও বামনপুরাণে

and these two characters (the divine and the human) are so far from being inseparably blended together, that both of these heroes are for the most part exhibited in no other light than other highly gifted men—acting according to human motives and taking no advantage of their divine superiority. It is only in certain sections which have been added for the purpose of enforcing their divine character that they take the character of Vishnu. It is impossible to read either of these two poems with attention, without being reminded of the later interpolation of such sections as ascribe a divine character to the heroes, and of the unskilful manner in which these passages are often introduced and without observing how loosely they are connected with the rest of the narrative, and how unnecessary they are for its progress.” Lassen’s *Indian Antiquities* quoted by Muir.

“In other places (অর্থাৎ ভগবদ্গীতা পর্ব্বাধ্যায় ভিন্ন) the divine nature of Krishna is less decidedly affirmed, in some it is disputed or denied; and in most of the situations he is exhibited in action, as a prince and warrior, not as a divinity. He exercises no superhuman faculties in defence of himself, or his friends, or in the defeat and destruction of his foes. The Mahabharata, however, is the work of various periods, and requires to be read through carefully and critically, before its weight as an authority can be accurately appreciated.” Wilson, *Preface to the Vishnu Purana*.

ও কৰ্ম্মপুৰাণে সংক্ষেপে আছে। এইরূপ অন্যান্য বিষয়েরও বর্ণনা পুনঃ পুনঃ কখন ভিন্ন ভিন্ন পুৰাণে আছে। এক ব্যক্তির লিখিত ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকের এরূপ ঘটনা অসম্ভব।

৩য়,—আর যদিও এক ব্যক্তি এই অষ্টাদশ পুৰাণ লিখিয়া থাকে, তাহা হইলে, তন্মধ্যে গুরুতর বিরোধের সম্ভাবনা কিছু থাকে না। কিন্তু অষ্টাদশ পুৰাণের মধ্যে, মধ্যে মধ্যে, এইরূপ গুরুতর বিরুদ্ধ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এই কৃষ্ণচরিত্র ভিন্ন ভিন্ন পুৰাণে ভিন্ন প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। সেই সকল বর্ণনা পরস্পর সঙ্গত নহে।

৪র্থ,—বিষ্ণুপুৰাণে আছে;—

আখ্যানৈশ্চাপ্যপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্পশুদ্ধিভিঃ ।
পুৰাণসংহিতাং চক্রে পুৰাণার্থবিশারদঃ ॥
প্রখ্যাতো ব্যাসশিষ্যোভূৎ সূতো বৈ লোমহর্ষণঃ ।
পুৰাণসংহিতাং তস্মৈ দদৌ ব্যাসো মহামুনিঃ ॥
সুর্মতিশ্চাগ্নিবর্চাশ্চ মিত্রায়ুঃ শাংশপায়নঃ ।
অকৃতব্রণোহথ সার্বর্গিঃ ষট্ শিষ্যান্তস্য চাভবন্ ॥
কাশ্যপঃ সংহিতাকর্তা সার্বর্গিঃ শাংশপায়নঃ ।
লোমহর্ষণিকা চান্যা তিসূনাং মূলসংহিতা ॥

বিষ্ণুপুৰাণ, ৩ অংশ, ৬ অধ্যায়, ১৬-১৯ শ্লোক।

পুৰাণার্থবিৎ (বেদব্যাস) আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও কল্পশুদ্ধি দ্বারা পুৰাণসংহিতা করিয়াছিলেন। লোমহর্ষণ নামে সূত বিখ্যাত ব্যাসশিষ্য ছিলেন। ব্যাস মহামুনি তাঁহাকে পুৰাণসংহিতা দান করিলেন। সুর্মতি, অগ্নিবর্চা, মিত্রায়ু, শাংশপায়ন, অকৃতব্রণ, সার্বর্গি— তাঁহার এই ছয় শিষ্য ছিল। (তাহার মধ্যে) কাশ্যপ, সার্বর্গি ও শাংশপায়ন সেই লোমহর্ষণিকা মূল সংহিতা হইতে তিনখানি সংহিতা প্রস্তুত করেন।

পুনশ্চ ভাগবতে আছে;—

ব্রহ্মারুণিঃ কশ্যপশ্চ সার্বর্গিরকৃতব্রণঃ ।
শিংশপায়নহারীতো ষড়ৈর্ পৌরাণিকা ইমে ॥
অধীযন্ত ব্যাসশিষ্যাং সংহিতাং মণিপতুমুখাৎ ।*
একৈকামহমেতেষাং শিষ্যঃ সর্ব্বাঃ সমধ্যগাম্ ॥
কশ্যাপোহহং সার্বর্গী রামশিষ্যোহকৃতব্রণঃ ।
অধীমহি ব্যাসশিষ্যাচ্ছারো মূলসংহিতাঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত, ১২ স্কন্ধ, ৭ অধ্যায়, ৪-৬ শ্লোক।

ব্রহ্মারুণি, কাশ্যপ, সার্বর্গি, অকৃতব্রণ, শিংশপায়ন, হারীত, এই ছয় পৌরাণিক।
বায়ুপুৰাণে নামগুণি কিছু ভিন্ন,—

আদ্রেয়ঃ সুর্মতিধীমান্ কাশ্যাপোহং কৃতব্রণঃ ।

পুনশ্চ অগ্নিপুৰাণে;—

প্রাপ্য ব্যাসাং পুৰাণাদি সূতো বৈ লোমহর্ষণঃ ।
সুর্মতিশ্চাগ্নিবর্চাশ্চ মিত্রায়ুঃ শাংশপায়নঃ ॥
কৃতব্রতোহথ সার্বর্গিঃ ষট্ শিষ্যান্তস্য চাভবন্ ।
শাংশপায়নাদয়শ্চকুঃ পুৰাণানান্তু সংহিতাঃ ॥

এই সকল বচনে জানিতে পারা যাইতেছে যে, এক্ষণকার প্রচলিত অষ্টাদশ পুৰাণ বেদব্যাস-প্রণীত নহে। তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণ পুৰাণ-সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহাও এক্ষণে প্রচলিত নাই। যাহা প্রচলিত আছে, তাহা কাহার প্রণীত, কবে প্রণীত হইয়াছিল, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই।

ভাগবতের বক্তা ব্যাসপুত্র শুকদেব। “বৈশম্পায়নহারীতো” ইতি পাঠান্তরও আছে।

বাংকম রচনাবলী

এক্ষণে ইউরোপীয়দিগের যে সাধারণ ভ্রম, তাহার বিষয়ে কিছু বলা যাউক। ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের ভ্রম এই যে, তাঁহারা মনে করেন যে, একও খানি পুরাণ একও ব্যক্তির লিখিত। এই ভ্রমের বশীভূত হইয়া তাঁহারা বর্তমান পুরাণ সকলের প্রণয়নকাল নিরূপণ করিতে বসেন। বস্তুতঃ কোনও পুরাণান্তর্গত সকল বৃত্তান্তগুলি এক ব্যক্তির প্রণীত নহে। বর্তমান পুরাণ সকল সংগ্রহ মাত্র। যাহা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা ভিন্ন ভিন্ন সময়ের রচনা। কথাটা একটু সবিস্তারে বুঝাইতে হইতেছে।

‘পুরাণ’ অর্থে, আদৌ পুরাতন; পশ্চাৎ পুরাতন ঘটনার বিবৃতি। সকল সময়েই পুরাতন ঘটনা ছিল, এই জন্য সকল সময়েই পুরাণ ছিল। বেদেও পুরাণ আছে। শতপথব্রাহ্মণে, গোপথব্রাহ্মণে, আশ্বলায়ন সূত্রে, অথর্বসংহিতায়, বৃহদারণ্যকে, ছান্দোগ্যোপনিষদে, মহাভারতে, রামায়ণে, মানবধর্মশাস্ত্রে সর্বত্রই পুরাণ প্রচলিত থাকার কথা আছে। কিন্তু ঐ সকল কোনও গ্রন্থেই বর্তমান কোনও পুরাণের নাম নাই। পাঠকের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে লিপিবিন্দ্য অর্থাৎ লেখা পড়া প্রচলিত থাকিলেও গ্রন্থ সকল লিখিত হইত না; মূখে মূখে রচিত, অধীত এবং প্রচারিত হইত। প্রাচীন পৌরাণিক কথা সকল ঐরূপ মূখে মূখে প্রচারিত হইয়া অনেক সময়েই কেবল কিম্বদন্তী মাত্রে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। পরে সময়বিশেষে ঐ সকল কিম্বদন্তী এবং প্রাচীন রচনা একত্রে সংগৃহীত হইয়া এক একখানি পুরাণ সংকলিত হইয়াছিল। বৈদিক সূক্ত সকল ঐরূপে সংকলিত হইয়া ঋক্ যজুঃ সাম সংহিতারূপে বিভক্ত হইয়াছিল, ইহা প্রসিদ্ধ। যিনি বেদবিভাগ করিয়াছিলেন, তিনি এই বিভাগজন্য ‘ব্যাস’ এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ‘ব্যাস’ তাঁহার উপাধিমাত্র—নাম নহে। তাঁহার নাম কৃষ্ণ এবং দ্বীপে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলিত। এ স্থানে পুরাণসংকলনকর্তার বিষয়ে দুইটি মত হইতে পারে। একটি মত এই যে, যিনি বেদবিভাগকর্তা, তিনিই যে পুরাণসংকলনকর্তা ইহা না হইতে পারে, কিন্তু যিনি পুরাণসংকলনকর্তা, তাঁহারও উপাধি ব্যাস হওয়া সম্ভব। বর্তমান অষ্টাদশ পুরাণ এক ব্যক্তি কর্তৃক অথবা এক সময়ে যে বিভক্ত ও সংকলিত হইয়াছিল, এমন বোধ হয় না। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সংকলিত হওয়ার প্রমাণ ঐ সকল পুরাণের মধ্যেই আছে। তবে যিনিই কতকগুলি পৌরাণিক বৃত্তান্ত বিভক্ত করিয়া একখানি সংগ্রহ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তিনিই ব্যাস নামের অধিকারী। হইতে পারে যে, এই জনাই কিম্বদন্তী আছে যে, অষ্টাদশ পুরাণই ব্যাসপ্রণীত। কিন্তু ব্যাস যে এক ব্যক্তি নহেন, অনেক ব্যক্তি ব্যাস উপাধি পাইয়াছিলেন, এরূপ বিবেচনা করিবার অনেক কারণ আছে। বেদবিভাগকর্তা ব্যাস, মহাভারতপ্রণেতা ব্যাস, অষ্টাদশপুরাণপ্রণেতা ব্যাস, বেদান্ত-সূত্রকার ব্যাস, এমন কি—পাতঞ্জল দর্শনের টীকাকার একজন ব্যাস। এ সকলই এক ব্যাস হইতে পারেন না। সে দিন কাশীতে ভারত মহামন্ডলের অধিবেশন হইয়াছিল, সংবাদপত্রে পড়িলাম, তাহাতে দুই জন ব্যাস উপস্থিত ছিলেন। এক জনের নাম হরেকৃষ্ণ ব্যাস, আর এক জনের নাম শ্রীযুক্ত অম্বিকা দত্ত ব্যাস। অনেক ব্যক্তি যে ব্যাস উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ বেদবিভাগকর্তা ব্যাস, মহাভারতপ্রণেতা ব্যাস, এবং অষ্টাদশ পুরাণের সংগ্রহকর্তা আঠারটি ব্যাস যে এক ব্যক্তি নন, ইহাই সম্ভব বোধ হয়।

দ্বিতীয় মত এই হইতে পারে যে, কৃষ্ণদ্বৈপায়নই প্রাথমিক পুরাণসংকলনকর্তা। তিনি যেমন বৈদিক সূক্তগুলি সংকলিত করিয়াছিলেন, পুরাণ সম্বন্ধেও সেইরূপ একখানি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বিষ্ণু, ভাগবত, অগ্নি প্রভৃতি পুরাণ হইতে যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে সেইরূপই বুঝায়। অতএব আমরা সেই মতই অবলম্বন করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তাহাতেও প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, বেদব্যাস একখানি পুরাণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, আঠারখানি নহে। সেখানি নাই। তাঁহার শিষ্যেরা তাহা ভাঙ্গিয়া তিনখানি পুরাণ করিয়াছিলেন, তাহাও নাই। কালক্রমে, নানা ব্যক্তির হাতে পড়িয়া তাহা আঠারখানি হইয়াছিল।

ইহার মধ্যে যে মতই গ্রহণ করা যাউক, পুরাণবিশেষের সময় নিরূপণ করিবার চেষ্টায় কেবল এই ফলই পাওয়া যাইতে পারে যে, কবে কোন পুরাণ সংকলিত হইয়াছিল, তাহারই ঠিকানা হয়। কিন্তু তাও হয় বলিয়াও আমার বিশ্বাস হয় না। কেন না, সকল গ্রন্থের রচনা বা সংকলনের পর নূতন রচনা প্রসিদ্ধ হইতে পারে ও পুরাণ সকলে তাহা হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। অতএব কোন অংশ ধরিয়া সংকলনসময় নিরূপণ করিব? একটা উদাহরণের দ্বারা ইহা বুঝাইতেছি।

মৎস্যপুরাণে, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ সম্বন্ধে এই দুইটি শ্লোক আছে;—

“রথন্তরস্য কল্পস্য বৃত্তান্তমধিকৃত্য যৎ।
সার্বাণীনা নারদায় কৃষ্ণমাহাত্ম্যসংযুতম্ ॥
যত্র ব্রহ্মবরাহস্য চরিতং বর্ণ্যতে মদুহঃ।
তদষ্টাদশসাহস্রং ব্রহ্মবৈবর্তমুচ্যতে ॥”

অর্থাৎ যে পুরাণে রথন্তর কল্পবৃত্তান্তমধিকৃত কৃষ্ণমাহাত্ম্যসংযুক্ত কথা নারদকে সার্বাণী বালিতেছেন এবং যাহাতে পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মবরাহচরিত কথিত হইয়াছে, সেই অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকসংযুক্ত ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ।

এক্ষণে যে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ প্রচলিত আছে, তাহা সার্বাণী নারদকে বালিতেছেন না। নারায়ণ নামে অন্য ঋষি নারদকে বালিতেছেন। তাহাতে রথন্তরকল্পের প্রসঙ্গমাত্র নাই, এবং ব্রহ্মবরাহ-চরিতের প্রসঙ্গমাত্র নাই। এখনকার প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্তে প্রকৃতিখণ্ড ও গণেশখণ্ড আছে, যাহার কোন প্রসঙ্গ দুই শ্লোকে নাই। অতএব প্রাচীন ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ এক্ষণে আর বিদ্যমান নাই। যাহা ব্রহ্মবৈবর্ত নামে চলিত আছে, তাহা নূতন গ্রন্থ। তাহা দেখিয়া ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ-সঙ্কলন-সময় নিরূপণ করা অপূর্ণ রহস্য বলিয়াই বোধ হয়।

উইল্‌সন্ সাহেব পুরাণ সকলের এইরূপ প্রণয়নকাল নিরূপিত করিয়াছেন:—

ব্রহ্মপুরাণ	খ্রীষ্টীয়	ত্রয়োদশ কি চতুর্দশ	শতাব্দী।
পদ্মপুরাণ	„	ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ	শতাব্দীর মধ্যে।*
বিষ্ণুপুরাণ	„	দশম	শতাব্দী।
বায়ুপুরাণ		সময় নিরূপিত হয় নাই,	প্রাচীন বলিয়া লিখিত হইয়াছে।
ভাগবত পুরাণ	খ্রীষ্টীয়	ত্রয়োদশ	শতাব্দী।
নারদপুরাণ	„	ষোড়শ কি সপ্তদশ	শতাব্দী, অর্থাৎ দুই শত বৎসরের গ্রন্থ।
মার্কণ্ডেয় পুরাণ	„	নবম কি দশম	শতাব্দী।
অগ্নিপুর্নাগ		অনিশ্চিত;	অতি অভিনব।
ভবিষ্যপুরাণ		ঠিক হয় নাই।	
লিঙ্গপুরাণ	খ্রীষ্টীয়	অষ্টম কি নবম	শতাব্দীর এদিক্ ওদিক্।
বরাহপুরাণ	„	দ্বাদশ	শতাব্দী।
স্কন্দপুরাণ		ভিন্ন ভিন্ন সময়ের	পাঁচখানি পুরাণের সংগ্রহ।
বামনপুরাণ		৩।৪ শত	বৎসরের গ্রন্থ।
কুর্মাপুরাণ		প্রাচীন	নহে।
মৎস্যপুরাণ		পদ্মপুরাণেরও	পর।
গারুড় পুরাণ	}	প্রাচীন	পুরাণ নাই। বর্তমান গ্রন্থ পুরাণ নয়।
ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ			
ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ			

পাঠক দেখিবেন, ইংহার মতে (এই মতই প্রচলিত) কোনও পুরাণই সহস্র বৎসরের অধিক প্রাচীন নয়। বোধ হয়, ইংরাজি পাড়িয়া যাঁহার নিতান্ত বুদ্ধিবিপৰ্য্যয় না ঘটিয়াছে, তিনি ভিন্ন এমন কোন হিন্দুই নাই, যিনি এই সময়নির্ধারণ উপযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিবেন। দুই একটা কথার দ্বারাই ইংহার অর্থোক্তিকতা প্রমাণ করা যাইতে পারে।

এ দেশের লোকের বিশ্বাস যে, কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক লোক এবং বিক্রমাদিত্য খ্রীঃ পূঃ ৫৬ বৎসরে জীবিত ছিলেন। কিন্তু সে সকল কথা এখন উড়িয়া গিয়াছে। ডাক্তার ভাও দার্জি স্থির করিয়াছেন যে, কালিদাস খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর লোক। এখন ইউরোপ শূদ্ধ এবং ইউরোপীয়দিগের দেশী শিষ্যগণ সকলে উচ্চৈঃস্বরে সেই ডাক ডাকিতেছেন। আমরাও এ মত অগ্রাহ্য করি না। অতএব কালিদাস ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক হউন। সকল পুরাণই তাঁহার

* তাহা হইলে, এই পুরাণ দুই তিন, কি চারি শত বৎসরের গ্রন্থ।

বাংকম রচনাবলী

অনেক পরে প্রণীত হইয়াছিল, ইহাই উইল্‌সন্ সাহেবের উপরিলিখিত বিচারে স্থির হইয়াছে। কিন্তু কার্লিদাস মেঘদূতে লিখিয়াছেন—

“যেন শ্যামং বপূরতিতরাং কার্ণামালপস্যতে তে
বহেঁগেব স্ফুরিতরুচিনা গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ।” —১৫ শ্লোকঃ।

যে পাঠক সংস্কৃত না জানেন, তাঁহাকে শেষ ছত্রের অর্থ বুঝাইলেই হইবে। ময়ূরপুচ্ছের দ্বারা উজ্জ্বল বিষ্ণুর গোপবেশের সহিত ইন্দ্রধনুশোভিত মেঘের উপমা হইতেছে। এখন, বিষ্ণুর গোপবেশ নাই, বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণেরই গোপবেশ ছিল। ইন্দ্রধনুর সঙ্গে উপমেয় কৃষ্ণচূড়াস্থিত ময়ূরপুচ্ছ। আমি বিনীতভাবে ইউরোপীয় মহামহোপাধ্যায়দিগের নিকট নিবেদন করিতেছি, যদি ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে কোন পুরাণই ছিল না, তবে কৃষ্ণের ময়ূরপুচ্ছচূড়ার কথা আসিল কোথা হইতে? এ কথা কি বেদে আছে, না মহাভারতে আছে, না রামায়ণে আছে?—কোথাও না। পুরাণ বা তদনুবর্তী গীতগোবিন্দাদি কাব্য ভিন্ন আর কোথাও নাই। আছে, হরিবংশে বটে; কিন্তু হরিবংশও ত উইল্‌সন্ সাহেবের মতে বিষ্ণুপুরাণেরও পরবর্তী। অতএব ইহা নিশ্চিত যে, কার্লিদাসের পূর্বে অর্থাৎ অন্ততঃ ষষ্ঠ শতাব্দী পূর্বে হরিবংশ অথবা কোন বৈষ্ণব পুরাণ প্রচলিত ছিল।

আর একটা কথা বলিয়াই এ বিষয়ের উপসংহার করিব। এখন যে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ প্রচলিত, তাহা প্রাচীন ব্রহ্মবৈবর্ত না হইলেও, অন্ততঃ একাদশ শতাব্দীর অপেক্ষাও প্রাচীন গ্রন্থ। কেন না, গীতগোবিন্দকার জয়দেব গোস্বামী গোড়াধিপতি লক্ষ্মণ সেনের সভাপণ্ডিত। লক্ষ্মণ সেন দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশের লোক। ইহা বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রমাণীকৃত, এবং ইংরেজদিগের দ্বারাও স্বীকৃত। আমরা পরে দেখাইব যে, এই ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ তখন প্রচলিত ও অতিশয় সম্মানিত না থাকিলে, গীতগোবিন্দ লিখিত হইত না, এবং বর্তমান ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডের পঞ্চদশ অধ্যায় তখন প্রচলিত না থাকিলে গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক “মেঘৈর্মেদুরম্‌বরম্” ইত্যাদি কখনও রচিত হইত না। অতএব এই দ্রষ্ট ব্রহ্মবৈবর্তও একাদশ শতাব্দীর পূর্বেগামী। আদিম ব্রহ্মবৈবর্ত না জানি আরও কত কালের। অথচ উইল্‌সন্ সাহেবের বিবেচনায় ইহা দুই শত মাত্র বৎসরের গ্রন্থ হইতে পারে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ—পুরাণ

আঠারখানি পুরাণ মিলাইলে অনেক সময়ই ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনেকগুলি শ্লোক কতকগুলি পুরাণে একই আছে। কোনখানে কিঞ্চিৎ পাঠান্তর আছে। কোনখানে তাহাও নাই। এই গ্রন্থে এইরূপ কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে বা হইবে। নন্দ মহাপদ্মের সময়-নিরূপণ জন্য যে কয়টি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা এ কথার উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহার অপেক্ষা আর একটা গুরুতর উদাহরণ দিতেছি। ব্রহ্মপুরাণের উত্তরভাগে শ্রীকৃষ্ণচরিত বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, ও বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে শ্রীকৃষ্ণচরিত বিস্তারিত-রূপে বর্ণিত হইয়াছে। উভয়ে কোন প্রভেদ নাই; অক্ষরে অক্ষরে এক। এই পঞ্চম অংশে আটাশটি অধ্যায়। বিষ্ণুপুরাণের এই আটাশ অধ্যায়ে যতগুলি শ্লোক আছে, ব্রহ্মপুরাণের কৃষ্ণচরিতে সে সকলগুলিই আছে, এবং ব্রহ্মপুরাণের কৃষ্ণচরিতে যে শ্লোকগুলি আছে, বিষ্ণুপুরাণের কৃষ্ণচরিতে সে সকলগুলিই আছে। এই দুই পুরাণে এই সম্বন্ধে কোন প্রকার প্রভেদ বা তারতম্য নাই। নিম্নলিখিত তিনটি কারণের মধ্যে কোন একটি কারণে এরূপ ঘটা সম্ভব।

১ম,—ব্রহ্মপুরাণ হইতে বিষ্ণুপুরাণ চুরি করিয়াছেন।

২য়,—বিষ্ণুপুরাণ হইতে ব্রহ্মপুরাণ চুরি করিয়াছেন।

৩য়,—কেহ কাহারও নিকট চুরি করেন নাই; এই কৃষ্ণচরিতবর্ণনা সেই আদিম বৈয়্যাসিকী পুরাণসংহিতার অংশ। ব্রহ্ম ও বিষ্ণু উভয় পুরাণেই এই অংশ রক্ষিত হইয়াছে।

প্রথম দুইটি কারণ যথার্থ কারণ বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। কেন না, এরূপ প্রচলিত গ্রন্থ হইতে আটাশ অধ্যায় স্পষ্ট চুরি অসম্ভব, এবং অন্য কোনও স্থলেও এরূপ দেখাও যায় না।

যে এরূপ চূরি করিবে, সে অন্ততঃ কিছুর পরিবর্তন করিয়া লইতে পারে এবং রচনাও এমন কিছুর নয় যে, তাহার কিছুর পরিবর্তন হয় না। আর কেবল এই আটাশ অধ্যায় দুইখানি পুরাণে একরূপ দেখিলেও, না হয়, চূরির কথা মনে করা যাইত, কিন্তু বলিয়াছি যে, অনেক ভিন্ন ভিন্ন পুরাণের অনেক শ্লোক পরস্পরের সহিত ঐক্যবিশিষ্ট। এবং অনেক ঘটনা সম্বন্ধে পুরাণে পুরাণে বিরোধ থাকিলেও অনেক ঘটনা সম্বন্ধে আবার পুরাণে পুরাণে বিশেষ ঐক্য আছে। এ স্থলে, পুর্নকথিত একখানি আদিম পুরাণসংহিতার অস্তিত্বই প্রমাণীকৃত হইতেছে। সেই আদিম সংহিতা কৃষ্ণদ্বৈপায়নব্যাসরচিত না হইলেও হইতে পারে। তবে সে সংহিতা যে অতি প্রাচীন কালে প্রণীত হইয়াছিল, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কেন না, আমরা পরে দেখিব যে, পুরাণকথিত অনেক ঘটনার অখণ্ডনীয় প্রমাণ মহাভারতে পাওয়া যায়, অথচ সে সকল ঘটনা মহাভারতে বিবৃত হয় নাই। সুতরাং এমন কথা বলা যাইতে পারে না যে, পুরাণকার তাহা মহাভারত হইতে লইয়াছেন।

যদি আমরা বিলাতী ধরণে পুরাণ সকলের সংগ্রহসময় নিরূপণ করিতে বাসি, তাহা হইলে কিরূপ ফল পাই দেখা যাউক। বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে চতুর্বিংশাধ্যায়ে মগধ রাজাদিগের বংশাবলী কীর্তিত আছে। বিষ্ণুপুরাণে যে সকল বংশাবলী কীর্তিত হইয়াছে, তাহা ভবিষ্যদ্বাণীর আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। অর্থাৎ বিষ্ণুপুরাণ বেদব্যাসের পিতা পরাশরের দ্বারা কলিকালের আরম্ভসময়ে কথিত হইয়াছিল বলিয়া পুরাণকার ভূমিকা করিতেছেন। সে সময়ে নন্দবংশীয়াদি আধুনিক রাজগণ জন্মগ্রহণ করেন নাই। কিন্তু উক্ত রাজগণের সমকাল বা পরকালবত্তী প্রক্ষেপকারকের ইচ্ছা যে, উক্ত রাজগণের নাম ইহাতে থাকে। কিন্তু তাহাদিগের নামের উল্লেখ করিতে গেলে, ভবিষ্যদ্বাণীর আবরণ রচনার উপর প্রক্ষিপ্ত না করিলে, পরাশরকথিত বলিয়া পাচার করা যায় না। অতএব সংগ্রহকার বা প্রক্ষেপকারক এই সকল রাজার কথা লিখিবার সময় বলিয়াছেন, অমুক রাজা হইবেন, তাহার পর অমুক রাজা হইবেন, তাহার পর অমুক রাজা হইবেন। তিনি যে সকল রাজাদিগের নাম করিয়াছেন, তাহার মধ্যে অনেকেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং তাহাদিগের রাজত্ব সম্বন্ধে বৌদ্ধগ্রন্থ, যবনগ্রন্থ, সংস্কৃতগ্রন্থ, প্রস্তরলিপি ইত্যাদি বহুবিধ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

যথা:—নন্দ, মহাপদ্ম, মৌর্য, চন্দ্রগুপ্ত, বিন্দুসার, অশোক, পুষ্পমিত্র, পুলিমান, শক-রাজগণ, অন্ধ্ররাজগণ, ইত্যাদি ইত্যাদি। পরে লেখা আছে,—“নব নাগাঃ পদ্মাবত্যাং কান্তিপূর্যাং মথুরায়ামনুগঙ্গাপ্রয়াগং মাগধা গুপ্তাশ্চ ভোক্ষ্যন্তি।* এই গুপ্তবংশীয়দিগের সময় Fleet সাহেবের কল্যাণে নিরূপিত হইয়াছে। এই বংশের প্রথম রাজাকে মহারাজগুপ্ত বলে। তার পর ঘটোৎকচ ও চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য। তার পর সমুদ্রগুপ্ত। ইংহারা খ্রীঃ চতুর্থ শতাব্দীর লোক। তার পর দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য, কুমারগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত, বুদ্ধগুপ্ত—ইংহারা খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর লোক। এই সকল গুপ্তগণ রাজা হইয়াছিলেন বা রাজত্ব করিতেছেন, ইহা না জানিলে, পুরাণসংগ্রহকার কখনই এরূপ লিখিতে পারিতেন না। অতএব ইনি গুপ্তদিগের সমকাল বা পরকালবত্তী। তাহা হইলে, এই পুরাণ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত বা প্রণীত হইয়াছিল। কিন্তু এমন হইতে পারে যে, এই গুপ্তরাজাদিগের নাম বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। অথবা এমনও হইতে পারে যে, এই চতুর্থাংশ এক সময়ের রচনা, এবং অন্যান্য অংশ অন্যান্য সময়ের রচনা; সকলগুলিই কোনও অনির্দিষ্ট সময়ে একত্রিত হইয়া বিষ্ণুপুরাণ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। আজিকার দিনেও কি ইউরোপে, কি এদেশে, সচরাচর ঘটিতেছে যে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ের রচনা একত্রিত হইয়া একখানি সংগ্রহগ্রন্থে নিবদ্ধ হয়, এবং ঐ সংগ্রহের একটি বিশেষ নাম দেওয়া হয়। যথা, “Percy Reliques,” অথবা “রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় সংকলিত ফলিত জ্যোতিষ।” আমার বিবেচনায় সকল পুরাণই এইরূপ সংগ্রহ। উপরি-উক্ত দুইখানি পুস্তকই আধুনিক সংগ্রহ; কিন্তু যে সকল বিষয় ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা প্রাচীন। সংগ্রহ আধুনিক বলিয়া সেগুলি আধুনিক হইল না।

তবে এমন অনেক সময়েই ঘটিয়া থাকিতে পারে যে, সংগ্রহকার নিজে অনেক নূতন রচনা করিয়া সংগ্রহের মধ্যে প্রবেশিত করিয়াছেন অথবা প্রাচীন বৃত্তান্ত নূতন কম্পনাসংযুক্ত এবং

* বিষ্ণুপুরাণ, ৪ অংশ, ২৪ অ—১৮।

বাক্য রচনাবলী

অত্যাঙ্কি অলঙ্কারে রঞ্জিত করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণ সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না, কিন্তু ভাগবত সম্বন্ধে ইহা বিশেষ প্রকারে বক্তব্য।

প্রবাদ আছে যে, ভাগবত পুরাণ বোপদেবপ্রণীত। বোপদেব দেবর্গির রাজা হেমাঙ্গির সভাসদ। বোপদেব ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক। কিন্তু অনেক হিন্দুই উহা বোপদেবের রচনা বলিয়া স্বীকার করেন না। বৈষ্ণবেরা বলেন, ভাগবতদ্বেষী শাক্তেরা এইরূপ প্রবাদ রটাইয়াছে।

বাস্তবিক ভাগবতের পুরাণত্ব লইয়া অনেক বাদবিতণ্ডা ঘটিয়াছে। শাক্তেরা বলেন, ইহা পুরাণই নহে,—বলেন, দেবীভাগবতই ভাগবত পুরাণ। তাঁহারা বলেন, “ভগবত ইদং ভাগবতং” এইরূপ অর্থ না করিয়া “ভগবত্যা ইদং ভাগবতং” এই অর্থ করিবে।

কেহ কেহ এইরূপ শঙ্কা করে বলিয়া শ্রীধর স্বামী ইহার প্রথম শ্লোকের টীকাতে লিখিয়াছেন—“ভাগবতং নামান্যাদিত্যপি নাশঙ্কনীয়ম্”। ইহাতে বুদ্ধিতে হইবে যে, ইহা পুরাণ নহে—দেবীভাগবতই প্রকৃত পুরাণ, এরূপ আশঙ্কা শ্রীধর স্বামীর পূর্বে হইতেই প্রচলিত ছিল; এবং তাহা লইয়া বিবাদও হইত। বিবাদকালে উভয় পক্ষে যে সকল পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, তাহার নামগুলি বড় মার্জিত রুচির পরিচায়ক। একখানির নাম “দুর্জর্নমুখচপেটিকা,” তাহার উত্তরের নাম “দুর্জর্নমুখমহাচপেটিকা” এবং অন্য উত্তরের নাম “দুর্জর্নমুখপদ্মপাদুকা”। তার পর “ভাগবত-স্বরূপ-বিষয়শঙ্কানিরাসত্রয়োদশঃ” ইত্যাদি অন্যান্য পুস্তকও এ বিষয়ে প্রণীত হইয়াছিল। আমি এই সকল পুস্তক দেখি নাই, কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা দেখিয়াছেন এবং Bournouf সাহেব “চপেটিকা”, “মহাচপেটিকা” এবং “পাদুকা”র অনুবাদও করিয়াছেন। Wilson সাহেব তাঁহার বিষ্ণুপুরাণের অনুবাদে ভূমিকায় এই বিবাদের সারসংগ্রহ লিখিয়াছেন। আমাদের সে সকল কথায় কোন প্রয়োজন নাই। যাঁহার কৌতূহল থাকে, তিনি Wilson সাহেবের গ্রন্থ দেখিবেন। আমার মতের স্থূল মর্ম এই যে, ভাগবত পুরাণেও অনেক প্রাচীন কথা আছে। কিন্তু অনেক নূতন উপন্যাসও তাহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এবং প্রাচীন কথা যাহা আছে, তাহাও নানাপ্রকার অলঙ্কারবিশিষ্ট এবং অত্যাঙ্কি দ্বারা অতিরঞ্জিত হইয়াছে। এই পুরাণখানি অন্য অনেক পুরাণ হইতে আধুনিক বোধ হয়, তা না হইলে ইহার পুরাণত্ব লইয়া এত বিবাদ উপস্থিত হইবে কেন?

পুরাণের মধ্যে যে সকল পুরাণে কৃষ্ণচরিত্রের প্রসঙ্গ নাই, সে সকলের আলোচনায় আমাদের কোনও প্রয়োজন নাই। যে সকল গ্রন্থে কৃষ্ণচরিত্রের কোনও প্রসঙ্গ আছে, তাহার মধ্যে ব্রহ্ম, বিষ্ণু, ভাগবত এবং ব্রহ্মবৈবর্ত, এই চারিখানিতেই বিস্তারিত বৃত্তান্ত আছে। তাহার মধ্যে আবার ব্রহ্মপুরাণ বিষ্ণুপুরাণে একই কথা আছে। অতএব এই গ্রন্থে বিষ্ণু, ভাগবত এবং ব্রহ্মবৈবর্ত ভিন্ন অন্য কোন পুরাণের ব্যবহার প্রয়োজন হইবে না। এই তিন পুরাণ সম্বন্ধে যাহা আমাদের বক্তব্য, তাহা বলিয়াছি। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ সম্বন্ধে আরও কিছু সময়ান্তরে বলিব। এক্ষণে কেবল আমাদের হরিবংশ সম্বন্ধে কিছু বলিতে বাকি আছে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ—হরিবংশ

হরিবংশেই আছে যে, মহাভারত কথিত হইলে পর উগ্রশ্রবাঃ সৌতি শৌনকাদি ঋষির প্রার্থনানুসারে হরিবংশ কীর্তন করিতেছেন। অতএব উহা মহাভারতের পরবর্তী গ্রন্থ। কিন্তু মহাভারতের কত পরে এই গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল, ইহা নিরূপণ আবশ্যিক। মহাভারতের পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে হরিবংশের প্রসঙ্গ কেবল শেষ শ্লোকে আছে, তাহা ২৯।৩০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়াছি। কিন্তু মহাভারতের অষ্টাদশ পর্বের অন্তর্গত বিষয় সকল ঐ পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে সংক্ষেপে যে রূপে কথিত হইয়াছে, হরিবংশের অন্তর্গত বিষয় সম্বন্ধে সেখানে সে রূপে কিছু কথিত হয় নাই। ঐ শ্লোক পাঠ করিয়া এমনই বোধ হয় যে, যখন প্রথম ঐ পর্বসংগ্রহাধ্যায় সংকলিত হইয়াছিল, তখন হরিবংশের কোন প্রসঙ্গই ছিল না। পরিশেষে লক্ষ শ্লোক মিলাইবার জন্য কেহ ঐ শ্লোকটি যোজনা করিয়া দিয়াছেন। হরিবংশে এক্ষণে তিন পর্ব পাওয়া যায়;— হরিবংশপর্ব, বিষ্ণুপর্ব ও ভবিষ্যপর্ব। কিন্তু পূর্বেদিত মহাভারতের শ্লোকে কেবল হরিবংশপর্ব ও ভবিষ্যপর্বের নাম আছে, বিষ্ণুপর্বের নাম মাত্র নাই, হরিবংশপর্ব ও ভবিষ্যপর্ব ১২,০০০ শ্লোক ইহাই লিখিত আছে। এক্ষণে তিন পর্ব ১৬,০০০ শ্লোকের

উপর पाওয়া যায়। অতএব নিশ্চিতই মহাভারতে ঐ শ্লোক প্রবিষ্ট হইবার পরে বিষ্ণুপর্ষ হরিবংশে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় অষ্টাদশপর্ষ মহাভারত অনুবাদ করিয়া হরিবংশের অনুবাদ সেই সঙ্গে প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক হইয়াছিলেন। তাহার কারণ তিনি এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন,—

“অষ্টাদশপর্ষ মহাভারতের অতিরিক্ত হরিবংশ নামক গ্রন্থকে অনেকে ভারতের অন্তর্ভূত একটী পর্ষ বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন এবং উহাকে আশ্চর্য্য পর্ষ বা উর্নবিংশ পর্ষ বলিয়া উল্লেখ করেন, কিন্তু বস্তুতঃ হরিবংশ ভারতান্তর্গত একটী পর্ষ নহে। উহা মূল মহাভারত রচনার বহুকাল পরে পরিশিষ্টরূপে উহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। হরিবংশের রচনাপ্রণালী ও তাৎপর্য্য পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে বিচক্ষণ ব্যক্তি অনায়াসেই উহার আধুনিকত্ব অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন। যদিও মূল মহাভারতের স্বর্গারোহণপর্ষ হরিবংশশ্রবণের ফলশ্রুতি বর্ণিত আছে, কিন্তু তাহাতে হরিবংশের প্রাচীনত্ব প্রমাণ না হইয়া বরং ঐ ফলশ্রুতিবর্ণনেরই আধুনিকত্ব প্রতিপন্ন হয়। মূল মহাভারত গ্রন্থের সহিত হরিবংশ অনুবাদিত করিলে লোকের মনে পূর্বাঙ্ক ভ্রম দৃঢ়ীভূত হইবে, আশঙ্কা করিয়া উহা এক্ষণে অনুবাদ করিতে ক্ষান্ত রহিলাম।”

হরেন্দ্ৰ হেমন্ট উইলসন্ সাহেবও হরিবংশের সম্বন্ধে ঐ কথা বলেন। তিনি বলেন;—

“The internal evidence is strongly indicative of a date considerably subsequent to that of the major portion of the Mahabharat.”*

আমারও সেইরূপ বিবেচনা হয়। আর হরিবংশ মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ষের অপকাল-পরবর্তী হইলেও এমন সন্দেহ করিবার কারণও আছে যে, বিষ্ণুপর্ষ তাহাতে অনেক পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এ সকল কথা নিশ্চয়তা সম্পাদন অতি দুঃসাধ্য।

সুবঙ্করুত বাসবদত্তায় হরিবংশের পূর্ষকরপ্রাদুর্ভাব নামক বৃত্তান্তের উল্লেখ আছে। ইউরোপীয় বিচারে স্থির হইয়াছে, সুবঙ্করু ত্রীঃ সপ্তম শতাব্দীর লোক। অতএব তখনও হরিবংশ প্রচলিত গ্রন্থ। কিন্তু কবে ইহা প্রণীত হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, উহা মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণের পরবর্তী, এবং ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্তের পূর্ষবর্তী।

কোন প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এ কথা বলিতে সাহসী হই, সেটি অতি গুরুতর কথা, এবং এই কৃষ্ণচরিত্রবিচারের মূলসূত্র বলিলেও হয়। আমরা পরপরিচ্ছেদে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ—ইতিহাসাদির পৌর্ষাপর্ষ্য

উপনিষদে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া এইরূপ কথিত হইয়াছে যে, জগদীশ্বর এক ছিলেন, বহু হইতে ইচ্ছা করিয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিলেন।† ইহা প্রসিদ্ধ অদ্বৈতবাদের মূলকথা। ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকেরা অনেক সন্ধানের পর, সেই অদ্বৈতবাদের নিকটে আসিতেছেন। তাহারা বলেন, জগতের সমস্তই আদৌ এক, ক্রমশঃ বহু হইয়াছে। ইহাই প্রসিদ্ধ Evolution বাদের মূলকথা। এক হইতে বহু বলিলে, কেবল সংখ্যায় বহু বুঝায় না—একাক্ষিত্ব এবং বহুবাক্ষিত্ব বুঝিতে হইবে। যাহা অভিন্ন ছিল, তাহা ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে পরিণত হয়। যাহা “Homogeneous” ছিল, তাহা পরিণতিতে “Heterogeneous” হয়। যাহা “Uniform” ছিল, তাহা “Multifarious” হয়। কেবল জড়জগৎ সম্বন্ধে এই নিয়ম সত্য, এমন নহে। জড়জগতে, জীবজগতে, মানসজগতে, সমাজজগতে সর্বত্র ইহা সত্য। সমাজজগতের অন্তর্গত যাহা, সে সকলেরই পক্ষে ইহা খাটে। সাহিত্য ও বিজ্ঞান সমাজজগতের অন্তর্গত, তাহাতেও খাটে। উপন্যাস বা আখ্যান সাহিত্যের অন্তর্গত, তাহাতেও ইহা সত্য। এমন কি, বাজারের

* Horace Hayman Wilson's *Essays Analytical, Critical and Philosophical on subjects connected with Sanskrit Literature*, Vol. I. Dr. Reinhold Rost's Edition.

† সোহকাময়ত। বহুঃ স্যাং প্রজায়েষেতি।—তৈত্তিরীয়োপনিষদ্, ২ বঙ্গী, ৬ অনুবাক্।

বিশ্বকম রচনাবলী

গল্প সম্বন্ধে ইহা সত্য। রাম যদি শ্যামকে বলে, “আমি কাল রাতে অন্ধকারে শুইয়াছিলাম, কি একটা শব্দ হইল, আমার বড় ভয় করিতে লাগিল”, তবে নিশ্চয়ই শ্যাম যদুর কাছে গিয়া গল্প করিবে, “রামের ঘরে কাল রাতে ভূতে কি রকম শব্দ করিয়াছিল।” তারপর ইহাই সম্ভব যে, যদু গিয়া মধুর কাছে গল্প করিবে যে, “কাল রাতে রাম ভূত দেখিয়াছিল,” এবং মধুও নিধুর কাছে বলিবে যে, “রামের বাড়ীতে বড় ভূতের দৌরাণ্ড্য হইয়াছে।” এবং পরিশেষে বাজারে রাষ্ট্র হইবে যে, ভূতের দৌরাণ্ড্যে রাম সপরিবারে বড় বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

এ গেল বাজারে গল্পের কথা। প্রাচীন উপাখ্যান সম্বন্ধে এরূপ পরিণতির একটা বিশেষ নিয়ম দেখিতে পাই। প্রথমাবস্থায় নামকরণ,—যেমন বিষ্ণু ধাতু হইতে বিষ্ণু। দ্বিতীয়াবস্থায়, রূপক—যেমন বিষ্ণুর তিন পাদ, কেহ বলেন, সূর্যের উদয়, মধ্যাহ্নস্থিতি, এবং অস্ত; কেহ বলেন, ঈশ্বরের ত্রিলোকব্যাপিতা, কেহ বলেন, ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ। তারপর তৃতীয়াবস্থায় ইতিহাস—যেমন বলিবামনবৃত্তান্ত। চতুর্থাবস্থায় ইতিহাসের অতিরঞ্জন। পুরাণাদিতে তাহা দেখা যায়।

এ কথার উদাহরণান্তর স্বরূপ, আমরা উর্ষ্বশী-পুরুষের উপাখ্যান লইতে পারি। ইহার প্রথমাবস্থা, যজুর্বেদসংহিতায়। তথায় উর্ষ্বশী, পুরুষ, দুইখানি অরণিকাক্ষমাত্র। বৈদিক কালে দিয়াশালাই ছিল না: চকমকি ছিল না: অন্ততঃ যজ্ঞাগ্নি জন্য এ সকল ব্যবহৃত হইত না। কাণ্ঠে কাণ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া যাজ্ঞিক অগ্নির উৎপাদন করিতে হইত। ইহাকে বলিত, “অগ্নিচয়ন”। অগ্নিচয়নের মন্ত্র ছিল। যজুর্বেদসংহিতার (মাধ্যন্দিনী শাখায়) পঞ্চম অধ্যায়ের ২ কর্ণিকায় সেই মন্ত্র আছে। ইহার তৃতীয় মন্ত্রে একখানি অরণিকে, পঞ্চমে অপরখানিকে পূজা করিতে হয়। সেই দুই মন্ত্রের বাঙ্গালা অনুবাদ এইঃ—

“হে অরণে! অগ্নির উৎপত্তির জন্য আমরা তোমাকে স্ত্রীরূপে কল্পনা করিলাম। অদ্য হইতে তোমার নাম উর্ষ্বশী”। ৩ ।

(উৎপত্তির জন্য, কেবল স্ত্রী নহে, পুরুষও চাই। এজন্য উক্ত স্ত্রীকল্পিত অরণির উপর দ্বিতীয় অরণি স্থাপিত করিয়া বলিতে হইবে)

“হে অরণে! অগ্নির উৎপত্তির জন্য আমরা তোমাকে পুরুষরূপে কল্পনা করিলাম। অদ্য হইতে তোমার নাম পুরুষ”। ৫ ।*

চতুর্থ মন্ত্রে অরণিস্পর্শ আজ্যের নাম দেওয়া হইয়াছে আর।

এই গেল প্রথমাবস্থা। দ্বিতীয়াবস্থা ঋগ্বেদসংহিতার ১০ মণ্ডলের ৯৫ সূক্তে। এখানে উর্ষ্বশী পুরুষ আর অরণিকাক্ষ নহে; ইহারা নায়ক নায়িকা। পুরুষ উর্ষ্বশীর বিরহ-শঙ্কিত। এই রূপকাবস্থা। রূপকে উর্ষ্বশী (৫ম ঋকে) বলিতেছেন, “হে পুরুষ, তুমি প্রতিদিন আমাকে তিন বার রমণ করিতে।” যজ্ঞের তিনটি অগ্নি ইহার দ্বারা সূচিত হইতেছে। ‡ পুরুষকে উর্ষ্বশী “ইলাপুত্র” বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। ইলা শব্দের অর্থ পৃথিবী§। পৃথিবীরই পুত্র অরণিকাক্ষ।

* সত্যরত সামগ্রমী কৃত অনুবাদ।

† সাহেবেরা বলেন, ঋগ্বেদসংহিতা আর সকল সংহিতা হইতে প্রাচীন। ইহার অর্থ এমন নয় যে, ঋক্ সংহিতার সকল সূক্তগুলি সাম ও যজুঃসংহিতার সকল মন্ত্র হইতে প্রাচীন। যদি এ অর্থে এ কথা কেহ বলিয়া থাকেন বা বুঝিয়া থাকেন, তবে তিনি অতিশয় ভ্রান্ত। এ কথার প্রকৃত তাৎপর্য এই যে, ঋক্ সংহিতায় এমন কতকগুলি সূক্ত আছে যে, সেগুলি সকল বেদমন্ত্র অপেক্ষা প্রাচীন। নচেৎ ঋক্ সংহিতায় এমন অনেক সূক্ত পাওয়া যায় যে, তাহা স্পষ্টতঃ আধুনিক বলিয়া সাহেবেরাই স্বীকার করেন। অনেকগুলি ঋক্ সামবেদসংহিতাতেও আছে, ঋগ্বেদসংহিতাতেও আছে। সংহিতা কেহ কাহারও অপেক্ষা প্রাচীন নহে, তবে কোন মন্ত্র অন্য মন্ত্রের অপেক্ষা প্রাচীন। এরূপ প্রাচীন মন্ত্র ঋক্ সংহিতায় বেশী আছে, কিন্তু ঋক্ সংহিতায় এমন অনেক মন্ত্রও আছে যে, তাহা যজুঃ সামের অনেক মন্ত্রের অপেক্ষা আধুনিক। দশম মণ্ডলের ৯৫ সূক্ত ইহার একটি উদাহরণ।

‡ মক্ষমূলের প্রভৃতি এই রূপকের অর্থ করেন, উর্ষ্বশী উষা, পুরুষ সূর্য। Solar myth এই পণ্ডিতেরা কোন মতেই ছাড়িতে পারেন না। যজুর্মন্ত্র যাহা উদ্ধৃত করিলাম, তাহাতে এবং তিন বার সংসর্গের কথায় পাঠক বুঝিবেন যে, এই রূপকের প্রকৃত অর্থই উপরে লিখিত হইল।

§ সপ্তমাংসাৎ পশু ব্যাড়া গোভূবাচস্বিড়া ইলা ইত্যমরঃ ।

মহাভারতে পুরুরবা ঐতিহাসিক চন্দ্রবংশীয় রাজা। চন্দ্রের পুত্র বৃধ, বৃধের পুত্র ইলা, ইলার পুত্র পুরুরবা। উর্ষ্বশীর গর্ভে ইহার পুত্র হয়; তাহার নাম আয়ু।* যজুর্মন্ত্র যাহা উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা দেখিলে পাঠক দেখিতে পাইবেন, আয়ু সেই অরণিস্পৃষ্ট আজ্য। মহাভারতে এই আয়ুর পুত্র বিখ্যাত নহু। নহুষের পুত্র বিখ্যাত যযাতি। যযাতির পুত্রের মধ্যে দুই জনের নাম যদু ও পুরু। যদু, যাদবদিগের আদিপুরুষ; পুরু, কুরুপাণ্ডবের আদিপুরুষ। এই তৃতীয়াবস্থা। তৃতীয়াবস্থায় অরণিকাষ্ঠ ঐতিহাসিক সন্নাট।

চতুর্থ অবস্থা, বিষ্ণু, পদ্ম প্রভৃতি পুরাণে। পুরাণ সকলে তৃতীয় অবস্থার ইতিহাস নতুন উপন্যাসে রঞ্জিত হইয়াছে, তাহার দুইটি নমুনা দিতেছি। একটি এই,—

উর্ষ্বশী ইন্দ্রসভায় নৃত্য করিতে করিতে মহারাজ পুরুরবাকে দেখিয়া মোহিত হওয়ায় নৃত্যের তালভঙ্গ হওয়াতে ইন্দ্রের অভিশাপে পঞ্চপঞ্চাশৎ বর্ষ স্বর্গভ্রষ্টা হইয়া পুরুরবার সহিত বাস করিয়াছিলেন।

আর একটি এইরূপঃ—

পূর্বেকালে কোন সময়ে ভগবান্ বিষ্ণু ধর্মপুত্র হইয়া গন্ধমাদন পর্বতে বিপুল তপস্যা করিয়াছিলেন। ইন্দ্র তাঁহার উগ্র তপস্যায় ভীত হইয়া তাঁহার বিষ্মার্থ কতিপয় অম্সরার সহিত বসন্ত ও কামদেবকে প্রেরণ করেন। সেই সকল অম্সরা যখন তাঁহার ধ্যানভঙ্গে অশক্তা হইল, তখন কামদেব অম্সরাগণের উরু হইতে ইঁহাকে সৃজন করিলেন। ইনিই তাঁহার তপোভঙ্গে সমর্থ হন। ইহাতে ইন্দ্র অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং ইঁহার রূপে মোহিত হইয়া ইঁহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। ইনিও সম্মত হইলেন। পরে মিত্র ও বরুণ তাঁহাদিগের ঐরূপ মনোভাব জ্ঞাপন করিলে ইনি প্রত্যাখ্যান করেন। তাহাতে তাঁহাদের শাপে ইনি মনুষ্যভোগ্যা (অর্থাৎ পুরুরবার পত্নী) হন।

এই সকল কথার আলোচনায় আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে, যজুর্বেদসংহিতার ৫ অধ্যায়ের সেই মন্ত্রগুলি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। তাহার পর, ঋগ্বেদসংহিতার দশম মণ্ডলের ৯৫ সূক্ত। তারপর মহাভারত। তারপর পদ্মাদি পুরাণ।

আমরা যে সকল গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া কৃষ্ণচরিত্র বুঝিতে চেষ্টা করিব, তাহারও পৌর্বাপর্য্য এই নিয়মের অনুবর্তী হইয়া নির্ধারিত করা যাইতে পারে। দুই একটা উদাহরণের দ্বারা ইহা বুঝাইতেছি।

প্রথম উদাহরণ স্বরূপ পুতনাবধবৃত্তান্ত দেওয়া যাউক।

ইহার প্রথমাবস্থা কোন গ্রন্থে নাই, কেবল অভিধানেই আছে, যেমন বিষ্ণু ধাতু হইতে বিষ্ণু। পরে দেখি, পুতনা যথার্থতঃ সূতিকাগারস্থ শিশুর রোগ। কিন্তু পুতনা শকুনিকেও বলে; অতএব মহাভারতে পুতনা শকুনি। বিষ্ণুপুরাণে আর এক সোপান উঠিল; রূপকে পরিণত হইল। পুতনা “বালঘাতিনী” অর্থাৎ বালহত্যা যাহার ব্যবসায়: “অতিভীষণা”; তাহার কলেবর “মহৎ”; নন্দ দেখিয়া হাসযুক্ত ও বিস্মিত হইলেন। তথাপি এখনও সে মানবী।† হরিবংশে দুইটা কথাই মিলান হইল। পুতনা মানবী বটে, কংসের ধাত্রী। কিন্তু সে কামরূপিনী পক্ষিণী হইয়া রজে আসিল। রূপকত্ব আর নাই; এখন আখ্যান বা ইতিহাস; তৃতীয়াবস্থা এইখানে প্রথম প্রবেশ করিল। পরিশেষে ভাগবতে ইহার চূড়ান্ত হইল। পুতনা রোগও নয়, পক্ষিণীও নয়, মানবীও নহে। সে ঘোররূপা রাক্ষসী। তাহার শরীর ছয় ক্রোশ বিস্তৃত হইয়া পতিত হইয়াছিল, দাঁতগুলো এক একটা লাঙ্গল-দণ্ডের মত, নাকের গর্ভ গিরিকন্দের তুল্য, স্তন দুইটা গণ্ডশৈল অর্থাৎ ছোট রকমের পাহাড়, চক্ষু অক্ষকূপের তুল্য, পেটটা জলশূন্য হৃদের সমান, ইত্যাদি ইত্যাদি। একটা পীড়া ক্রমশঃ এত বড় রাক্ষসীতে পরিণত হইল, দেখিয়া পাঠক আনন্দ লাভ করিবেন আমরা ভরসা করি, কিন্তু মনে রাখেন যে, ইহা চতুর্থ অবস্থা।

ইহাতে পাই, অগ্রে মহাভারত; তারপর বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চম অংশ; তারপর হরিবংশ; তারপর ভাগবত।

* কখন কখন এই নাম “আয়ুঃ” লিখিত হইয়াছে।

† কোন অনুবাদকার অনুবাদে “রাক্ষসী” কথাটা বসাইয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণের মূলে এমন কথা নাই।

বঙ্কিম রচনাবলী

আর একটা উদাহরণ লইয়া দেখা যাউক। কাল শব্দের পর ইয় প্রত্যয় করিলে কালিয় শব্দ পাওয়া যায়। কালিয়ের নাম মহাভারতে নাই। বিষ্ণুপুরাণে কালিয়বৃত্তান্ত পাই। পড়িয়া জানিতে পারা যায় যে, ইহা কাল, এবং কালভয়নিবারণ কৃষ্ণপাদপদ্ম সম্বন্ধীয় একটি রূপক। সাপের একটি মাত্র ফণা থাকে, কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে “মধ্যম ফণার” কথা আছে। মধ্যম বলিলে তিনটি বুদ্ধায়। বুদ্ধিলাভ যে, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানাভিমুখী কালিয়ের তিনটি ফণা। কিন্তু হরিবংশকার রূপকের প্রকৃত তাৎপর্য নাই বুদ্ধিতে পারুন, বা তাহাতে নূতন অর্থ দিবার অভিপ্রায় রাখুন, তিনি দুইটি ফণা বাড়াইয়া দিলেন। ভাগবতকার তাহাতে সন্তুষ্ট নহেন— একেবারে সহস্র ফণা করিয়া দিলেন।

এখন বলিতে পারি কি না যে, আগে মহাভারত, পরে বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চম অংশ, পরে হরিবংশ, পরে ভাগবত।

এখন আর উদাহরণ বাড়াইবার প্রয়োজন নাই, কৃষ্ণচরিত্র লিখিতে লিখিতে অনেক উদাহরণ আপনি আসিয়া পড়িবে। স্থূল কথা এই যে, যে গ্রন্থে অমৌলিক, অনৈসর্গিক, উপন্যাসভাগ যত বাড়িয়াছে, সেই গ্রন্থ তত আধুনিক। এই নিয়মানুসারে, আলোচ্য গ্রন্থ সকলের পৌর্বাপর্য্য এইরূপ অবধারিত হয়।

প্রথম। মহাভারতের প্রথম স্তর।

দ্বিতীয়। বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চম অংশ।

তৃতীয়। হরিবংশ।

চতুর্থ। শ্রীমদ্ভাগবত।

ইহা ভিন্ন আর কোন গ্রন্থের ব্যবহার বিধেয় নহে। মহাভারতের দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তর অমৌলিক বলিয়া অব্যবহার্য্য, কিন্তু তাহার অমৌলিকতা প্রমাণ করিবার জন্য, ঐ সকল অংশের কোথাও কোথাও সমালোচনা করিব। ব্রহ্মপুরাণ ব্যবহারের প্রয়োজন নাই, কেন না, বিষ্ণুপুরাণে যাহা আছে, ব্রহ্মপুরাণেও তাহা আছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ পরিত্যাজ্য, কেন না, মৌলিক ব্রহ্মবৈবর্ত লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। তথাপি শ্রীরাধার বৃত্তান্ত জন্য একবার ব্রহ্মবৈবর্ত ব্যবহার করিতে হইবে। অন্যান্য পুরাণে কৃষ্ণকথা অতি সংক্ষিপ্ত, এজন্য সে সকলের ব্যবহার নিষ্ফল। বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশ ভিন্ন চতুর্থাংশও কদাচিত্ত ব্যবহার করার প্রয়োজন হইবে—যথা স্যামন্তক মণি, সত্যভামা, ও জাম্ববতীবৃত্তান্ত।

পুরাণ সকলের প্রক্ষিপ্তবিচার দুর্ঘট। মহাভারতে যে সকল লক্ষণ পাইয়াছি, তাহা হরিবংশে ও পুরাণে লক্ষ্য করা ভার। কিন্তু মহাভারত সম্বন্ধে আর যে দুইটা* নিয়ম করিয়াছি যে, যাহা অনৈসর্গিক, তাহা অনৈতিহাসিক ও অতিপ্রকৃত বলিয়া পরিত্যাগ করিব; আর যাহা নৈসর্গিক, তাহাও যদি মিথ্যার লক্ষণাক্রান্ত হয়, তবে তাহাও পরিত্যাগ করিব; এই দুইটি নিয়ম পুরাণ সম্বন্ধেও খাটিবে।

এক্ষণে আমরা কৃষ্ণচরিত্রকথনে প্রস্থিত।

* ৪৬ পৃষ্ঠা দেখ।

দ্বিতীয় খণ্ড

বন্দাবন

যো মোহয়তি ভূতানি স্নেহপাশানুবন্ধনৈঃ ।

সর্গস্য রক্ষণার্থায় তস্মৈ মোহাত্মনে নমঃ ॥

—শান্তিপর্ব, ৪৭ অধ্যায় ।

প্রথম পরিচ্ছেদ—যদুবংশ

প্রথম খণ্ডে আমরা পুরুরবার পুত্র আয়ুর কথা বলিয়াছি। আয়ুর যজুর্বেদে যজ্ঞের ঘট মাত্র। কিন্তু ঋগ্বেদসংহিতার ১০ম মণ্ডলে তিনি ঐতিহাসিক রাজা। ১০ম মণ্ডলের ৪৯ সূক্তের ঋষি বৈকুণ্ঠ ইন্দ্র। ইন্দ্র বলিতেছেন, “আমি বেশকে আয়ুর বশীভূত করিয়া দিয়াছি।”

আয়ুর পুত্র নহুষ। নহুষের পুত্র যযাতি। এই নহুষ ও যযাতির নামও ঋগ্বেদসংহিতায় আছে। যযাতির পাঁচ পুত্র ইতিহাস পুরাণে কথিত হইয়াছে। জ্যেষ্ঠ যদু, কনিষ্ঠ পুরু। আর তিন জনের নাম তুর্বসু, দ্রুহ্য, অণু। ইহার মধ্যে পুরু, যদু এবং তুর্বসুর নাম ঋগ্বেদ-সংহিতায় আছে (১০ম, ৪৮।৪৯ সূক্ত)। কিন্তু ইহারা যে যযাতির পুত্র বা পরম্পরের ভাই, এমন কথা ঋগ্বেদসংহিতায় নাই।

কথিত আছে, যযাতির জ্যেষ্ঠ চারি পুত্র তাঁহার আঞ্জাপালন না করায় তিনি ঐ চারি পুত্রকে অভিশপ্ত করিয়া, কনিষ্ঠ পুরুকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন। এই পুরুর বংশে দ্রুহ্মন্ত, ভরত, কুরু এবং অজমীড় ইত্যাদি ভূপতির জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরাদি কোরবেরা এই পুরুর বংশ। এবং কৃষ্ণ প্রভৃতি যাদবেরা যদুর বংশ। অন্ততঃ পুরাণে ইতিহাসে সচরাচর ইহাই পাওয়া যায় যে, যযাতিপুত্র যদু হইতে মথুরাবাসী যাদবদিগের উৎপত্তি।

কিন্তু হরিবংশে আর এক কথা পাওয়া যায়। হরিবংশের হরিবংশপর্ব্বে যে যদুবংশকথন আছে, তাহাতে যযাতিপুত্র যদুরই বংশকথন। কিন্তু বিষ্ণুপর্ব্বে ভিন্ন প্রকার আছে। তথায় আছে যে, হর্যশ্ব নামে একজন ইক্ষ্বাকুবংশীয়, অযোধ্যায় রাজা ছিলেন। তিনি মধুবনাধিপতি মধুর কন্যা মধুমতীকে বিবাহ করেন। এই মধুবনই মথুরা। হর্যশ্ব অযোধ্যা হইতে কোন কারণে বিদূরিত হইলে, শ্বশুরবাড়ী আসিয়া বাস করেন। ইহারই পুত্র যদু। হর্যশ্বের লোকান্তরে ইনি রাজা হইলেন। যদুর পুত্র মাধব, মাধবের পুত্র সত্ত্বত, সত্ত্বতের পুত্র ভীম। মধুর পুত্র লবণকে রামের ভ্রাতা শত্রুঘ্ন বিজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য হস্তগত করিয়া মথুরানগর নিষ্কারণ করেন। হরিবংশে বলে, রাঘবেরা মথুরা ত্যাগ করিয়া গেলে, ভীম তাহা পুনর্বার অধিকার করেন, এবং এই যদুসম্ভূত বংশই মথুরাবাসী যাদবগণ।

ঋগ্বেদসংহিতার দশম মণ্ডলের ৬২ সূক্তে যদু ও তুর্বা (তুর্বসু) এই দুই জনের নাম আছে (১০ ঋক্), কিন্তু তথায় ইহাদিগকে দাসজাতীয় রাজা বলা হইয়াছে।

কিন্তু ঐ মণ্ডলের ৪৯ সূক্তে ইন্দ্র বলিতেছেন, “তুর্বসু ও যদু এই দুই ব্যক্তিকে আমি বলবান্ বলিয়া খ্যাতিাপন্ন করিয়াছি (৮ ঋক্)।” ঐ সূক্তের ৩ ঋকে আছে, “আমি দস্যুজাতিকে ‘আর্য্য’ এই নাম হইতে বর্ণিত করিয়াছি।”* তবে দাসজাতীয় রাজাকে যে তিনি খ্যাতিাপন্ন করিয়াছিলেন, ইহাতে কি বর্ণিতে পারা যায়? এই যদু আর্য্য, না অনার্য্য? ইহা ঠিক বলা গেল না।

পদনশ্চ, প্রথম মণ্ডলের ৩৬ সূক্তে ১৮ ঋকের অর্থ এইরূপ—“অগ্নির দ্বারা তুর্বসু, যদু ও উগ্রদেবকে দূর হইতে আমরা আহ্বান করি।” অনার্য্য রাজ সম্বন্ধে আর্য্য ঋষির এরূপ উক্তি সম্ভব কি?

যাহা হউক, তিন জন যদুর কথা পাই।

(১) যযাতিপুত্র।

* এই কয়টি ঋকের অনুবাদ রমেশ বাবুর অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত করা গেল।

বাংকম রচনাবলী

(২) ইক্ষ্বাকুবংশীয়।

(৩) অনার্য্য রাজা।

কৃষ্ণ, কোন্ যদুর বংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাহা মীমাংসা করা দুর্ঘট। যখন তাঁহাদের মথুরায় ভিন্ন পাই না, এবং ঐ মথুরা ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের নির্ম্মিত, তখন এই যাদবেরা ইক্ষ্বাকুবংশীয় নহে, ইহা জোর করিয়া বলা যায় না।

যে যদুবংশেই কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করুন, তদ্বংশে মধু সত্ত্বত বৃষ্ণ, অন্ধক, কুকুর ও ভোজ প্রভৃতি রাজগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বৃষ্ণ অন্ধক কুকুর ও ভোজবংশীয়েরা, একত্রে মথুরায় বাস করিতেন। কৃষ্ণ বৃষ্ণবংশীয়, কংস ও দেবকী ভোজবংশীয়। কংস ও দেবকীর এক পিতামহ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—কৃষ্ণের জন্ম

কংসের পিতা উগ্রসেন যাদবদিগের অধিপতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কৃষ্ণের পিতা বসুদেব, দেবকীর স্বামী।

বসুদেব দেবকীকে বিবাহ করিয়া যখন গৃহে আনিতেছিলেন, তখন কংস প্রীতিপূর্ব্বক, তাঁহাদের রথের সারথ্য গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদিগকে লইয়া যাইতেছিলেন। এমন সময়ে দৈববাণী হইল যে, ঐ দেবকীর অষ্টমগর্ভজাত পুত্র কংসকে বধ করিবে। তখন আপদের শেব করিবার জন্য কংস দেবকীকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। বসুদেব তাঁহাকে শাস্ত করিয়া অঙ্গীকার করিলেন যে, তাঁহাদের যতগুলি পুত্র হইবে, তিনি স্বয়ং সকলকে কংসহস্তে সমর্পণ করিবেন। ইহাতে আপাততঃ দেবকীর প্রাণরক্ষা হইল, কিন্তু কংস বসুদেব ও দেবকীকে অবরুদ্ধ করিলেন। এবং তাঁহাদের প্রথম ছয় সন্তান বধ করিলেন। সপ্তমগর্ভস্থ সন্তান গর্ভেই বিনষ্ট হইয়াছিল। পুরাণে কথিত হইয়াছে, বিষ্ণুর আজ্ঞানুসারে যোগনিদ্রা সেই গর্ভ আকর্ষণ করিয়া বসুদেবের অন্য পত্নীর গর্ভে স্থাপিত করিয়াছিলেন।

সেই অন্য পত্নী রোহিণী। মথুরার অদূরে, ঘোষপল্লীতে নন্দ নামে গোপব্যবসায়ীর বাস। তিনি বসুদেবের আত্মীয়। রোহিণীকে বসুদেব সেই নন্দের গৃহে রাখিয়া গিয়াছিলেন। সেইখানে রোহিণী পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। এই পুত্র, বলরাম।

দেবকীর অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইলেন। এবং যথাকালে রাতে ভূমিষ্ঠ হইলেন। বসুদেব তাঁহাকে সেই রাতেই নন্দালয়ে লইয়া গেলেন। সেই রাতে নন্দপত্নী যশোদা একটি কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন। পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, ইনি সেই বৈষ্ণবী শক্তি যোগনিদ্রা। ইনি যশোদাকে মূদ্ধ করিয়া রাখিলেন, ইত্যবসরে বসুদেব পুত্রটিকে সূতিকাগারে রাখিয়া কন্যাটি লইয়া স্বভবনে আসিলেন। সেই কন্যাকে তিনি কংসকে আপন কন্যা বলিয়া সমর্পণ করিলেন। কংস তাঁহাকে বিনষ্ট করিতে পারিলেন না। যোগনিদ্রা আকাশপথে চলিয়া গেলেন, এবং বলিয়া গেলেন যে, কংসের নিধনকারী কোন স্থানে জন্মিয়াছেন। কংস তারপর ভাগিনীকে কারামুক্ত করিল। কৃষ্ণ নন্দালয়ে রহিলেন।

এ সকল অনৈসর্গিক ব্যাপার; আমরা পূর্ব্বকৃত নিয়মানুসারে ত্যাগ করিতে বাধ্য। তবে ইহার মধ্যে একটু ঐতিহাসিক তত্ত্বও পাওয়া যায়। কৃষ্ণ মথুরায় যদুবংশে, দেবকীর গর্ভে, বসুদেবের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতি শৈশবে তাঁহাকে তাঁহার পিতা নন্দালয়ে* রাখিয়া আসিয়াছিলেন। নন্দালয়ে পুত্রকে লুকাইয়া রাখার জন্য তাঁহাকে কংসনাশবিষয়িণী দৈববাণীর বা কংসের প্রাণভয়ের আশ্রয় লইতে হয় নাই। ভাগবত পুরাণে এবং মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তিতেই আছে যে, কংস এই সময়ে অতিশয় দুরাচারী হইয়া উঠিয়াছিল। সে ঔরঙ্গজের

* কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম সংস্করণে আমি কৃষ্ণের নন্দালয়ে বাসের কথা অবিশ্বাস করিয়াছিলাম। এবং তাহার পোষকতায় মহাভারত হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। সেই সকল কথা আমি পুনশ্চ উপযুক্ত স্থানে উদ্ধৃত করিব। এক্ষণে আমার ইহাই বক্তব্য যে, এক্ষণে পুনর্বার বিশেষ বিচার করিয়া সে মত কিয়দংশে পরিত্যাগ করিয়াছি। আপনার ভ্রান্তি স্বীকার করিতে আমার আপত্তি নাই—ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্যক্তির ভ্রান্তি সচরাচরই ঘটিয়া থাকে।

মত, আপনার পিতা উগ্রসেনকে পদচ্যুত করিয়া, আপনি রাজ্যাধিকার করিয়াছিল। যাদবদিগের উপর এরূপ পীড়ন আরম্ভ করিয়াছিল যে, অনেক যাদব ভয়ে মথুরা হইতে পলায়ন করিয়া অন্য দেশে গিয়া বাস করিতেছিলেন। বসুদেবও আপনার অন্য পত্নী রোহিণীকে ও তাঁহার পুত্রকে নন্দালয়ে রাখিয়াছিলেন। এখন কৃষ্ণকেও কংসভয়ে সেই নন্দালয়ে লুকাইয়া রাখিলেন। ইহা সম্ভব এবং ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—শৈশব

কৃষ্ণের শৈশব সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ অনৈসর্গিক কথা পুরাণে কথিত হইয়াছে। একে একে তাহার পরিচয় দিতেছি।

১। পদতনাবধ। পদতনা কংসপ্রেরিতা রাক্ষসী। সে পরমরূপবতীর বেশ ধারণ করিয়া নন্দালয়ে কৃষ্ণবধার্থ প্রবেশ করিল। তাহার স্তনে বিষ বিলোপিত ছিল। সে শ্রীকৃষ্ণকে স্তন্যপান করাইতে লাগিল। কৃষ্ণ তাহাকে এরূপ নিপীড়িত করিয়া স্তন্যপান করিলেন যে, পদতনার প্রাণ বহির্গত হইল। সে তখন নিজ রূপ ধারণ করিয়া ছয় ক্রোশ ভূমি ব্যাপিয়া নিপতিত হইল।

মহাভারতেও শিশুপালবধ-পর্বাধ্যায়ে পদতনাবধের প্রসঙ্গ আছে। শিশুপাল, পদতনাকে শকুনি বলিতেছেন। শকুনি বলিলে, গধু, চীল এবং শ্যামাপক্ষীকেও বুঝায়। বলবান্ শিশুর একটা ক্ষুদ্র পক্ষী বধ করা বিচিত্র নহে।

কিন্তু পদতনার আর একটা অর্থ আছে। আমরা যাহাকে “পেঁচোয় পাওয়া” বলি, সূতিকাগারস্থ শিশুর সেই রোগের নাম পদতনা। সকলেই জানে যে, শিশু বলের সহিত স্তন্যপান করিতে পারিলে এ রোগ আর থাকে না। বোধ হয়, ইহাই পদতনাবধ।

২। শকটবিপর্যায়। যশোদা, কৃষ্ণকে একখানা শকটের নীচে শূয়াইয়া রাখিয়াছিলেন। কৃষ্ণের পদাঘাতে শকট উল্টাইয়া পড়িয়াছিল। ঋগ্বেদসংহিতায় ইন্দ্রকৃত উষার শকটভঙ্গনের একটা কথা আছে। এই কৃষ্ণকৃত শকটভঙ্গন, সে প্রাচীন রূপকের নূতন সংস্কারমাত্র হইতে পারে। অনেকগুলি বৈদিক উপাখ্যান কৃষ্ণলীলাসুগত হইয়াছে, এমন বিবেচনা করিবার কারণ আছে।

৩। তাহার পর মাতৃক্রোড়ে কৃষ্ণের বিশ্বস্তরমূর্ত্তিধারণ, এবং স্বীয় ব্যাদিতানন-মধ্যে যশোদাকে বিশ্বরূপ দেখান। এটা প্রথম ভাগবতে দেখিতে পাই। ভাগবতকারেরই রচিত উপন্যাস বোধ হয়।

৪। তৃণাবর্ত্ত। তৃণাবর্ত্ত নামে অসুর কৃষ্ণকে একদা আকাশমার্গে তুলিয়া লইয়া গিয়াছিল। ইহার ষেরূপ বর্ণনা দেখা যায়, তাহাতে বোধ হয়, ইহা চক্রবায়ু মাত্র। চক্রবায়ুর রূপ ধরিয়াই অসুর আসিয়াছিল, ভাগবতে এইরূপ কথিত হইয়াছে। এই উপখ্যানও প্রথম ভাগবতেই দেখিতে পাই। সুতরাং ইহাও অমৌলিক সন্দেহ নাই। চক্রবায়ুতে ছেলে তুলিয়া ফেলাও বিচিত্র নহে।

৫। কৃষ্ণ একদা মৃত্তিকা ভোজন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ সে কথা অস্বীকার করায়, যশোদা তাঁহার মূখের ভিতর দেখিতে চাহিলেন। কৃষ্ণ হাঁ করিয়া বদনমধ্যে বিশ্বরূপাঙ্ক দেখাইলেন। এটিও কেবল ভাগবতীয় উপন্যাস।

৬। ভাগবতকার আরও বলেন, কৃষ্ণ হাঁটিয়া বেড়াইতে শিখিলে তিনি গোপীদিগের গৃহে অত্যন্ত দৌরাভ্য করিতেন। অন্যান্য দৌরাভ্যমধ্যে, ননী মাখন চুরি করিয়া খাইতেন। বিষ্ণু-পুরাণেও এ কথা নাই; মহাভারতেও নাই।

হরিবংশে ননী মাখন চুরির কথা প্রসঙ্গক্রমে আছে। ভাগবতেই ইহার বাড়াবাড়ি। যে শিশুর ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান জন্মবার সময় হয় নাই, সে খাদ্য চুরি করিলে কোন দোষ হইল না। যদি বল যে, কৃষ্ণকে তোমরা ঈশ্বরাবতার বল; তাঁহার কোন বয়সেই জ্ঞানের অভাব থাকিতে পারে না। তাহার উত্তরে কৃষ্ণোপাসকেরা বলিতে পারেন যে, ঈশ্বরের চুরি নাই। জগতই যাঁহার—সব ঘট নবনীত মাখন যাঁহার সৃষ্ট—তিনি কার ধন লইয়া চোর হইলেন? সবই ত তাঁহার। আর যদি বল, তিনি মানবধর্ম্মাবলম্বী—মানবধর্ম্ম চুরি অবশ্য পাপ, তাহার উত্তর এই যে, মানব-ধর্ম্মাবলম্বী শিশুর পাপ নাই, কেন না, শিশুর ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নাই। কিন্তু এ সকল বিচারে

বিক্রম রচনাবলী

আমাদের কোন প্রয়োজনই নাই—কেন না, কথাটাই অমূলক। যদি মৌলিক কথা হয়, তবে ভাগবতকার, এ কথা যে ভাবে বলিয়াছেন, তাহা বড় মনোহর।

ভাগবতকার বলিয়াছেন যে, ননী মাখন ভগবান্ নিজের জন্য বড় চুরি করিতেন না; বানরদিগকে খাওয়াইতেন। বানরদিগকে খাওয়াইতে না পাইলে শূইয়া পড়িয়া কাঁদিতেন। ভাগবতকার বলিতে পারেন যে, কৃষ্ণ সর্বভূতে সমদর্শী; গোপীরা যথেষ্ট ক্ষীর নবনীত খায়,—বানরেরা পায় না, এজন্য গোপীদিগের লইয়া বানরদিগকে দেন। তিনি সর্বভূতের ঈশ্বর, গোপী ও বানর তাঁহার নিকট ননী মাখনের তুল্যাধিকারী।

এই শিশু সর্বজনের জন্য সহৃদয়তাপরবশ, সর্বজনের দুঃখমোচনে উদ্যুক্ত। তিৰ্য্যক্জাতি বানরদিগের জন্য তাঁহার কাতরতার এই পরিচয় দিয়াছেন। আর একটি দুঃখিনী ফলবিক্রেত্রীর কথা বলিয়াছেন। কৃষ্ণের নিকট সে ফল লইয়া আসিলে কৃষ্ণ অঞ্জলি ভরিয়া তাহাকে রত্ন দিলেন। কথাগুলির ভাগবত ব্যতীত প্রমাণ কিছু নাই; কিন্তু আমরা পরে দেখিব, পরহিতই কৃষ্ণের জীবনের ব্রত।

৭। যমলাঞ্জর্নভঙ্গ। একদা কৃষ্ণ বড় “দুরন্তপনা” করিয়াছিলেন বলিয়া, যশোদা তাঁহার পেটে দাড়ি বাঁধিয়া, একটা উদুখলে বাঁধিয়া রাখিলেন। কৃষ্ণ উদুখল টানিয়া লইয়া চলিলেন। যমলাঞ্জর্ন নামে দুইটা গাছ ছিল। কৃষ্ণ তাহার মধ্য দিয়া চলিলেন। উদুখল, গাছের মূলে বাঁধিয়া গেল। কৃষ্ণ তথাপি চলিলেন। গাছ দুইটা ভাঙ্গিয়া গেল।

এ কথা বিষ্ণুপুরাণে এবং মহাভারতের শিশুপালের তিরস্কারবাক্যে আছে। কিন্তু ব্যাপারটা কি? অঞ্জর্ন বলে কুরিচ গাছকে; যমলাঞ্জর্ন অর্থে জোড়া কুরিচ গাছ। কুরিচ গাছ সচরাচর বড় হয় না, এবং অনেক গাছ ছোট দেখা যায়। যদি চারাগাছ হয়, তাহা হইলে বলবান্ শিশুর বলে ঐরূপ অবস্থায় তাহা ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে।

কিন্তু ভাগবতকার পূর্বপ্রচলিত কথার উপর, অতিরঞ্জন চেষ্টা করিতে হ্রুটি করেন নাই। গাছ দুইটি কুবেরপুত্র; শাপনিবন্ধন গাছ হইয়াছিল, কৃষ্ণস্পর্শে মৃত্ত হইয়া স্বধামে গমন করিল। কৃষ্ণকে বন্ধন করিবার কালে গোকুলে যত দাড়ি ছিল, সব যোড়া দিয়াও কাঁচ ছেলের পেট বাঁধা গেল না। শেষে কৃষ্ণ দয়া করিয়া বাঁধা দিলেন।

বিষ্ণুর একটি নাম দামোদর। বহির্নিদ্রয়নিগ্রহকে দম বলে। উদ্ উপর, ঋ গমনে, এজন্য উদর অর্থে উৎকৃষ্ট গতি। দমের দ্বারা যিনি উচ্চস্থান পাইয়াছেন, তিনিই দামোদর। বেদে আছে, বিষ্ণু তপস্যা করিয়া বিষ্ণুত্ব লাভ করিয়াছেন, নহিলে তিনি ইন্দ্রের কনিষ্ঠ মাত্র। শঙ্করাচার্য্য দামোদর শব্দের এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, “দমাদিসাধনে উদরা উৎকৃষ্টা গতির্য্য তয়া গম্যত ইতি দামোদরঃ।” মহাভারতেও আছে, “দমাদামোদরং বিদুঃ।”

কিন্তু দামন্ শব্দে গোরুর দাড়িও বুঝায়। যাহার উদর গোরুর দাড়িতে বাঁধা হইয়াছিল, সেও দামোদর। গোরুর দাড়ির কথাটা উঠিবার আগে দামোদর নামটা প্রচলিত ছিল। নামটি পাইয়া ভাগবতকার দাড়ি বাঁধার উপন্যাসটি গড়িয়াছেন, এই বোধ হয় না কি?

এক্ষণে নন্দাদি গোপগণ পূর্ববাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে চলিলেন। কৃষ্ণ নানাবিধ বিপদে পড়িয়াছিলেন, এইরূপ বিবেচনা করিয়াই তাঁহারা বৃন্দাবন গেলেন, এইরূপ পুরাণে লিখিত আছে। বৃন্দাবন অধিকতর সুখের স্থান, এজন্যও হইতে পারে। হরিবংশে পাওয়া যায়, এই সময়ে ঘোষনিবাসে বড় বৃকের ভয় হইয়াছিল। গোপেরা তাই সেই স্থান ত্যাগ করিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—কৈশোর লীলা

এই বৃন্দাবন কাব্যজগতে অতুল্য সৃষ্টি। হরিৎপুষ্পশোভিত পুলিনশালিনী কলনাদিনী কার্ণালন্দীকূলে কোকিল-ময়ূর-ধ্বনিত-কুঞ্জবনপরিপূর্ণা, গোপবালকগণের শৃঙ্গবেগুর মধুর রবে শব্দময়ী, অসংখ্যকুসুমামোদসুবাসিতা, নানাভরণভূষিতা বিশালায়তলোচনা ব্রজসুন্দরীগণ-সমলঙ্কৃতা বৃন্দাবনস্থলী, স্মৃতিমাত্র হৃদয় উৎফুল্ল হয়। কিন্তু কাব্যরস আশ্বাদন জন্য কালবিলম্ব করিবার আমাদের সময় নাই। আমরা আরও গুরুতর তত্ত্বের অন্বেষণে নিযুক্ত।

ভাগবতকার বলেন, বৃন্দাবনে আসার পর কৃষ্ণ ক্রমশঃ তিনটি অসুর বধ করিলেন,—(১) বৎসাসুর, (২) বকাসুর, (৩) অঘাসুর। প্রথমটি বৎসরূপী, দ্বিতীয়টি পক্ষিরূপী, তৃতীয়টি

সপর্নুপী। বলবান্ বালক, ঐ সকল জন্তু গোপালগণের অনিষ্টকারী হইলে, তাহাদিগকে বধ করা বিচিত্র নহে। কিন্তু ইহার একটিও কথা বিষ্ণুপুরাণে বা মহাভারতে, এমন কি, হরিবংশেও পাওয়া যায় না। সুতরাং অমৌলিক বলিয়া তিনটি অসুরের কথাই আমাদের পরিত্যাজ্য।

এই বৎসাসুর, বকাসুর এবং অঘাসুরবধোপাখ্যান মধ্যে সেরূপ তত্ত্ব খুঁজিলে না পাওয়া যায়, এমত নহে। বদ্ ধাতু হইতে বৎস; বন্ক্ ধাতু হইতে বক, এবং অঘ্ ধাতু হইতে অঘ। বদ্ ধাতু প্রকাশে, বন্ক্ কোঁটিল্যে, এবং অঘ্ পাপে। যাহারা প্রকাশ্যবাদী বা নিন্দক, তাহারা বৎস, কুঁটিল শত্রুপক্ষ বক, এবং পাপীরা অঘ। কৃষ্ণ অপ্রাপ্তকৈশোরেই এই ত্রিবিধ শত্রু পরাস্ত করিলেন। যজুর্বেদের মাধ্যন্দিনী শাখার একাদশ অধ্যায়ে অগ্নিচয়নমন্ত্রের ৮০ কণ্ডিকায় যে মন্ত্র, তাহাতেও এইরূপ শত্রুদিগের নিপাতনের প্রার্থনা দেখা যায়। মন্ত্রটি এই;—

“হে অগ্নে! যাহারা আমাদের অরতি, যাহারা দ্বেষী, যাহারা নিন্দক এবং যাহারা জিঘাংসু, এই চারি প্রকার শত্রুকেই ভস্মসাৎ কর।”*

এই মন্ত্রে বেশির ভাগ অরতি অর্থাৎ যাহারা ধন দেয় না (ভাষায় জুয়াচোর), তাহাদের নিপাতেরও কথা আছে। কিন্তু ভাগবতকার এই রূপক রচনাকালে এই মন্ত্রটি যে স্মরণ করিয়াছিলেন, এমত বোধ হয়। অথবা ইহা বলিলেই যথেষ্ট হয় যে, ঐ রূপকের মূল ঐ মন্ত্রে আছে।

তার পর ভাগবতে আছে যে, ব্রহ্মা, কৃষ্ণকে পরীক্ষা করিবার জন্য একদা মায়ার দ্বারা সমস্ত গোপাল ও গোবৎসগণকে হরণ করিলেন। কৃষ্ণ আর এক সেট্ রাখাল ও গোবৎসের সৃষ্টি করিয়া পূর্বে বিহার করিতে লাগিলেন। কথাটার তাৎপর্য এই যে, ব্রহ্মাও কৃষ্ণের মহিমা বুঝিতে অক্ষম। তার পর একদিন, কৃষ্ণ দাবানলের আগুন সকলই পান করিলেন। শৈবদিগের নীলকণ্ঠের বিষপানের উপন্যাস আছে। বৈষ্ণবচুড়ামণি তাহার উত্তরে কৃষ্ণের অগ্নিপানের কথা বলিলেন।

এই বিখ্যাত কালিয়দমনের কথা বলিবার স্থান। কালিয়দমনের কথাপ্রসঙ্গমাত্র মহাভারতে নাই। হরিবংশে ও বিষ্ণুপুরাণে আছে। ভাগবতে বিশিষ্টরূপে সম্প্রসারিত হইয়াছে। ইহা উপন্যাসমাত্র—অনৈসর্গিকতায় পরিপূর্ণ। কেবল উপন্যাস নহে—রূপক। রূপকও অতি মনোহর।

উপন্যাসটি এই। যমুনার এক হুদে বা আবর্তে কালিয় নামে এক বিষধর সর্প সপরিবারে বাস করিত। তাহার বহু ফণা। বিষ্ণুপুরাণের মতে তিনটি,† হরিবংশের মতে পাঁচটি, ভাগবতে সহস্র। তাহার অনেক স্ত্রী পুত্র পৌত্র ছিল। তাহাদিগের বিষে সেই আবর্তের জল এমন বিষময় হইয়া উঠিয়াছিল যে, তজ্জন্য নিকটে কেহ তিষ্ঠিতে পারিত না। অনেক ব্রজবালক ও গোবৎস সেই জল পান করিয়া প্রাণ হারাইত। সেই বিষের জ্বালায়, তীরে কোন তৃণলতা বৃক্ষাদিও বাঁচিত না। পক্ষিগণও সেই আবর্তের উপর দিয়া উড়িয়া গেলে বিষে জর্জরিত হইয়া জলমধ্যে পতিত হইত। এই মহাসর্পের দমন করিয়া বৃন্দাবনস্থ জীবগণের রক্ষাবিধান, শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রেত হইল। তিনি উল্লম্বনপূর্বেক হুদমধ্যে নিপতিত হইলেন। কালিয় তাহাকে আক্রমণ করিল। তাহার ফণার উপর আরোহণ করিয়া, বংশীধর গোপবালক নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভূজঙ্গ সেই নৃত্যে নিপীড়িত হইয়া রুধিরবমনপূর্বেক মূমূর্ষু হইল। তখন তাহার বনিতাগণ কৃষ্ণকে মনুষ্যভাষায় শ্রব করিতে লাগিল। ভাগবতকার তাহাদিগের মুখে যে শ্রব বসাইয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া ভূজঙ্গমাঙ্গনাগণকে দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা বলিয়া বোধ হয়। বিষ্ণুপুরাণে তাহাদের মুখনির্গত শ্রব বড় মধুর; পড়িয়া বোধ হয়, মনুষ্যপত্নীগণকে কেহ গরলোঙ্গারিণী মনে করেন করুন, নাগপত্নীগণ সুধাবর্ষণী বটে। শেষ কালিয় নিজেও কৃষ্ণস্থূতি আরম্ভ করিল। শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া কালিয়কে পরিত্যাগ করিয়া, যমুনা পরিত্যাগপূর্বেক সমুদ্রে গিয়া বাস করিতে তাহাকে আদেশ করিলেন। কালিয় সপরিবারে পলাইল। যমুনা প্রসন্নসলিলা হইলেন।

এই গেল উপন্যাস। ইহার ভিতর যে রূপক আছে, তাহা এই। এই কলবাহিনী কৃষ্ণসলিলা কালিন্দী অন্ধকারময়ী ঘোরনাদিনী কালস্রোতস্বতী। ইহার অতি ভয়ঙ্কর আবর্ত আছে।

* সামগ্রমীকৃত অনুবাদ।

† “মধ্যমং ফণং” ইহাতে তিনটি বুঝায়।

বঙ্কিম রচনাবলী

আমরা যে সকলকে দৃঃসময় বা বিপৎকাল মনে করি, তাহাই কালস্রোতের আবর্ত। অতি ভীষণ বিষময় মনুষ্যশত্রু সকল এখানে লুক্কায়িত ভাবে বাস করে। ভুজঙ্গের ন্যায় তাহাদের নিভৃত বাস, ভুজঙ্গের ন্যায় তাহাদের কুটিল গতি, এবং ভুজঙ্গের ন্যায় অমোঘ বিষ। আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক, এবং আধিদৈবিক, এই ত্রিবিধবিশেষে এই ভুজঙ্গের তিন ফণা। আর যদি মনে করা যায় যে, আমাদের ইন্দ্রিয়রতিই সকল অনর্থের মূল, তাহা হইলে, পণ্ডেইন্দ্রিয়ভেদে ইহার পাঁচটি ফণা, এবং আমাদের অমঙ্গলের অসংখ্য কারণ আছে, ইহা ভাবিলে, ইহার সহস্র ফণা। আমরা ঘোর বিপদাবর্তে এই ভুজঙ্গের বশীভূত হইলে জগদীশ্বরের পাদপদ্ম ব্যতীত, আমাদের উদ্ধারের উপায়ান্তর নাই। কৃপাপরবশ হইলে তিনি এই বিষধরকে পদদালিত করিয়া মনোহর মূর্ত্তিবিকাশপদ্বর্ষক অভয়বংশী বাদন করেন, শূন্যতে পাইলে জীব আশান্বিত হইয়া সুখে সংসারযাত্রা নিষ্বাহ করে। করালনাদিনী কালতরঙ্গিণী প্রসন্নসলিলা হয়। এই কৃষ্ণসলিলা ভীমনাদিনী কালস্রোতস্বতীর আবর্তমধ্যে অমঙ্গলভুজঙ্গের মস্তকারুট এই অভয়বংশীধর মূর্ত্তি, পুরাণকারের অপদ্বর্ষ সৃষ্টি! যে গড়িয়া পূজা করিবে, কে তাহাকে পৌত্তলিক বলিয়া উপহাস করিতে সাহস করিবে?

আমরা ধেনুকাসুর (গন্দভ) এবং প্রলম্বাসুরের বধবৃত্তান্ত কিছুর বলি না, কেন না, উহা বলরামকৃত—কৃষ্ণকৃত নহে। বন্দ্রহরণ সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য, তাহা আমরা অন্য পরিচ্ছেদে বলিব, এখন কেবল গিরিযজ্ঞবৃত্তান্ত বলিয়া এ পরিচ্ছেদের উপসংহার করিব।

বৃন্দাবনে গোবর্দ্ধন নামে এক পর্বত ছিল, এখনও আছে। গোঁসাই ঠাকুরেরা এক্ষণে যেখানে বৃন্দাবন স্থাপিত করিয়াছেন, সে এক দেশে, আর গিরিগোবর্দ্ধন আর এক দেশে। কিন্তু পুরাণাদিতে পড়ি, উহা বৃন্দাবনের সীমান্তস্থিত। ঐ পর্বত এক্ষণে যে ভাবে আছে, তাহা দেখিয়া বোধ হয় যে উহা কোন কালে, কোন প্রাকৃতিক বিপ্লবে উৎক্ষিপ্ত হইয়া পুনঃস্থাপিত হইয়াছিল। বোধ হয়, অনেক সহস্র বৎসর ঐ ক্ষুদ্র পর্বত ঐ অবস্থাতেই আছে, এবং ইহার উপর সংস্থাপিত হইয়া উপন্যাস রচিত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ ঐ গিরি তুলিয়া সপ্তাহ ধারণ করিয়া পুনর্বার সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

উপন্যাসটা এই। বর্ষান্তে নন্দাদি গোপগণ বৎসর বৎসর একটা ইন্দ্রযজ্ঞ করিতেন। তাহার আয়োজন হইতছিল। দেখিয়া কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কেন ইহা হইতেছে? তাহাতে নন্দ বলিলেন, ইন্দ্র বৃষ্টি করেন, বৃষ্টিতে শস্য জন্মে, শস্য খাইয়া আমরা ও গোপগণ জীবনধারণ করি, এবং গোসকল দুঃখবতী হয়। অতএব ইন্দ্রের পূজা করা কর্তব্য। কৃষ্ণ বলিলেন, আমরা কৃষী নহি। গাভীগণই আমাদের অবলম্বন, অতএব গাভীগণের পূজা, অর্থাৎ তাহাদিগকে উত্তম ভোজন করানই আমাদের বিধেয়। আর আমরা এই গিরির আশ্রিত, ইহার পূজা করুন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষুদ্রাধিকারকে উত্তমরূপে ভোজন করান। তাহাই হইল। অনেক দীনদরিদ্র ক্ষুদ্রাধিকার এবং ব্রাহ্মণগণ (তাঁহারা দরিদ্রের মধ্যে) ভোজন করিলেন। গাভীগণ খুব খাইল। গোবর্দ্ধনও মূর্ত্তিমান হইয়া রাশি রাশি অন্নব্যঞ্জন খাইলেন। কথিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণ নিজেই এই মূর্ত্তিমান গিরি সাজিয়া খাইয়াছিলেন।

ইন্দ্রযজ্ঞ হইল না। এখন পাঠক জানিতে পারেন যে, আমরাইগের পুরাণেতিহাসোক্ত দেবতা ও ব্রাহ্মণ সকল ভারি বদ্রাগী। ইন্দ্র বড় রাগ করিলেন। মেঘগণকে আজ্ঞা দিলেন, বৃষ্টি করিয়া বৃন্দাবন ভাসাইয়া দাও। মেঘসকল তাহাই করিল। বৃন্দাবন ভাসিয়া যায়। গোবৎস ও ব্রজবাসিগণের দৃঃখের আর সীমা রহিল না। তখন শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন উপাড়িয়া বৃন্দাবনের উপর ধরিলেন। সপ্তাহ বৃষ্টি হইল, সপ্তাহ তিনি পর্বত এক হাতে তুলিয়া ধরিয়া রাখিলেন। বৃন্দাবন রক্ষা পাইল। ইন্দ্র হার মানিয়া, কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ ও সন্ধি স্থাপন করিলেন।

মহাভারতে শিশুপালবাক্যে এই গিরিযজ্ঞের কিঞ্চিৎ প্রসঙ্গ আছে। শিশুপাল বলিতেছে যে, কৃষ্ণ যে বল্মীকতুল্য গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিল, তাই কি একটা বিচিত্র কথা? কৃষ্ণের প্রভূত অন্নব্যঞ্জনভোজন সম্বন্ধেও একটু বাঙ্গ আছে। এই পর্য্যন্ত। কিন্তু গোবর্দ্ধন আজিও বিদ্যমান, —বল্মীক নয়, পর্বত বটে। কৃষ্ণ কি এই পর্বত সাত দিন এক হাতে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন? যাহারা তাহাকে ঈশ্বরবতার বলেন, তাহারা বলিতে পারেন, ঈশ্বরের অসাধ্য কি? স্বীকার করি—কিন্তু সেই সঙ্গে জিজ্ঞাসাও করি, ঈশ্বরবতারের পর্বতধারণের প্রয়োজন কি? যাহার ইচ্ছা ব্যতীত মেঘ এক ফোঁটাও বৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় না, সাত দিন পাহাড় ধরিয়া বৃষ্টি হইতে

বৃন্দাবন রক্ষা করিবার তাঁহার প্রয়োজন কি? যাঁহার ইচ্ছামাত্রে সমস্ত মেঘ বিদূরিত, বৃষ্টি উপশান্ত, এবং আকাশ নিশ্চল হইতে পারিত, তাঁহার পর্বত তুলিয়া ধরিয়া সাত দিন খাড়া থাকিবার প্রয়োজন কি?

ইহার উত্তরে কেহ বলিতে পারেন, ইহা ভগবানের লীলা। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা, আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিব কি? ইহাও সত্য, কিন্তু আগে বুঝিব যে, ইনি ভগবান্, তাহার পর গিরিধারণ তাঁহার ইচ্ছাবিস্তারিত লীলা বলিয়া স্বীকার করিব। এখন, ইনি ভগবান্, ইহা বুঝিব কি প্রকারে? ইহার কার্য দেখিয়া। যে কার্যের অভিপ্রায় বা সুসঙ্গতি বুঝিতে পারিলাম না, সেই কার্যের কর্তা ঈশ্বর, এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় কি? না বুঝিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায় কি? যদি তাহা না যায়, তবে অনৈসর্গিক পরিত্যাগের যে নিয়ম আমরা সংস্থাপন করিয়াছি, তাহারই অনুবর্তী হইয়া এই গিরিধারণবৃত্তান্তও উপন্যাসমধ্যে গণনা করাই বিধেয়। তবে এতটুকু সত্য থাকিতে পারে যে, কৃষ্ণ গোপগণকে ইন্দ্রযজ্ঞ হইতে বিরত করিয়া গিরিযজ্ঞে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। তার পর বাকি অনৈসর্গিক ব্যাপারটা গোবর্দ্ধনের উৎখাত ও পুনঃস্থাপিত অবস্থা অনুসারে গঠিত হইয়াছে।

এরূপ কার্যের একটা নিগূঢ় তাৎপর্যও দেখা যায়। যেমন বুঝিয়াছি, তেমনই বুঝাইতেছি। এই জগতের একই ঈশ্বর। ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই। ইন্দ্র বলিয়া কোন দেবতা নাই। ইন্দ্র ধাতু বর্ষণে, তাহার পর রক্ প্রত্যয় করিলে ইন্দ্র শব্দ পাওয়া যায়। অর্থ হইল যিনি বর্ষণ করেন। বর্ষণ করে কে? যিনি সর্বকর্তা, সর্বত্র বিধাতা, তিনিই বৃষ্টি করেন,—বৃষ্টির জন্য একজন পৃথক্ বিধাতা কল্পনা করা বা বিশ্বাস করা যায় না। তবে ইন্দ্রের জন্য যজ্ঞ বা সাধারণ যজ্ঞে ইন্দ্রের ভাগ প্রচলিত ছিল বটে। এরূপ ইন্দ্রপূজার একটা অর্থও আছে। ঈশ্বর অনন্ত প্রকৃতি, তাঁহার গুণ সকল অনন্ত, কার্য অনন্ত, শক্তি সকলও সংখ্যায় অনন্ত। এরূপ অনন্তের উপাসনা কি প্রকারে করিব? অনন্তের ধ্যান হয় কি? যাহাদের হয় না, তাহারা তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন শক্তির পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা করে। এরূপ শক্তি সকলের বিকাশস্থল জড়জগতে বড় জাজ্বল্যমান। সকল জড়পদার্থে তাঁহার শক্তির পরিচয় পাই। তৎ-সাহায্যে অনন্তের ধ্যান সুসাধ্য হয়। এই জন্য প্রাচীন আর্ষ্যগণ তাঁহার জগৎপ্রসবিত্ব স্মরণ করিয়া সূর্য্যে, তাঁহার সর্বাধিকতা স্মরণ করিয়া বরুণে, তাঁহার সর্বতেজের আধারভূতি স্মরণ করিয়া অগ্নিতে, তাঁহাকে জগৎপ্রাণ স্মরণ করিয়া বায়ুতে, এবং তদ্রূপে অন্যান্য জড়পদার্থে তাঁহার আরাধনা করিতেন।* ইন্দ্র এইরূপ তাঁহার বর্ষণকারিণী শক্তির উপাসনা করিতেন। কালে, লোকে উপাসনার অর্থ ভুলিয়া গেল, কিন্তু উপাসনার আকারটা বলবান্ রহিল। কালে এইরূপই ঘটয়া থাকে; ব্রাহ্মণের ত্রিসংখ্যা সম্বন্ধে তাহাই ঘটিয়াছে; ভগবদ্গীতায় এবং মহাভারতের অন্যত্র দেখিব যে, কৃষ্ণ ধর্ম্মের এই মৃতদেহের সংকারে প্রবৃত্ত—তৎপরিবর্তে অতি উচ্চ ঈশ্বরোপাসনাতে লোককে প্রবৃত্ত করিতে যত্নবান্। যাহা পরিণত বয়সে প্রচারিত করিয়াছিলেন, এই গিরিযজ্ঞ তাহার প্রবর্তনায় তাঁহার প্রথম উদ্যম। জগদীশ্বর সর্বভূতে আছেন; মেঘেও যেমন আছেন, পর্বতে ও গোবৎসেও সেইরূপ আছেন। যদি মেঘের বা আকাশের পূজা করিলে তাঁহার পূজা করা হয়, তবে পর্বত বা গোগণের পূজা করিলেও তাঁহারই পূজা করা হইবে। বরং আকাশাদি জড়পদার্থের পূজা অপেক্ষা দরিদ্রদিগের এবং গোবৎসের সপরিতোষ ভোজন করান অধিকতর ধর্ম্মানুমত। গিরি-যজ্ঞের তাৎপর্যটা এইরূপ বুঝি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—ব্রজগোপী—বিষ্ণুপূরণ

কৃষ্ণদ্বৈষীদিগের নিকট যে কথা কৃষ্ণচরিত্রের প্রধান কলঙ্ক, এবং আধুনিক কৃষ্ণ-উপাসকদিগের নিকট যাহা কৃষ্ণভক্তির কেন্দ্রস্বরূপ, আমি এক্ষণে সেই তত্ত্বে উপস্থিত। কৃষ্ণের সহিত ব্রজ-

* যখন আমি প্রথম “প্রচার” নামক পত্রে এই মত প্রকাশিত করি, তখন অনেকে অনেক কথা বলিয়াছিলেন। অনেকে ভাবিয়াছিলেন, আমি একটা নূতন মত প্রচার করিতেছি। তাঁহারা জানেন না যে, এ আমার মত নহে, স্বয়ং নিরন্তকার যাস্কের মত। আমি যাস্কের বাক্য নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

“মাহাত্ম্যাদ্ দেবতায় এক আত্মা বহুধা স্তুষ্যতে। একস্যাত্মনোহন্যে দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি।** আত্মা এব এষাং রথো ভবতি, আত্মা অশ্বাঃ, আত্মা আরুধম্, আত্মা ইষবঃ, আত্মা সর্বদেবস্যা।”

বাঁকম রচনাবলী

গোপীদিগের সম্বন্ধের কথা বলিতেছি। কৃষ্ণচরিত্র সমালোচনায় এই তত্ত্ব অতিশয় গুরুতর। এই জন্য এ কথা আমরা অতিশয় বিস্তারের সহিত কহিতে বাধ্য হইব।

মহাভারতে ব্রজগোপীদিগের কথা কিছুই নাই। সভাপর্বে শিশুপালবধ-পর্বাধ্যায়ে শিশুপালকৃত সবিস্তার কৃষ্ণনিন্দা আছে। যদি মহাভারতপ্রণয়নকালে ব্রজগোপীগণঘটিত কৃষ্ণের এই কলঙ্ক থাকিত, তাহা হইলে, শিশুপাল অথবা যিনি শিশুপালবধবৃত্তান্ত প্রণীত করিয়াছেন, তিনি কখনই কৃষ্ণনিন্দাকালে তাহা পরিত্যাগ করিতেন না। অতএব নিশ্চিত যে, আদিম মহাভারত প্রণয়নকালে এ কথা চলিত ছিল না—তাহার পরে গঠিত হইয়াছে।

মহাভারতে কেবল ঐ সভাপর্বে দ্রৌপদীবন্দনকালে, দ্রৌপদীকৃত কৃষ্ণস্তবে 'গোপীজর্নাপ্রয়' শব্দটা আছে, যথা—

“আকৃষ্যমাণে বসনে দ্রৌপদ্যা চিন্তিতো হরিঃ।
গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্ কৃষ্ণ গোপীজর্নাপ্রয়!!”

বৃন্দাবনে গোপীদিগের বাস। গোপ থাকিলেই গোপী থাকিবে। কৃষ্ণ অতিশয় সুন্দর, মাধুর্যময় এবং ক্রীড়াশীল বালক ছিলেন, এজন্য তিনি গোপ গোপী সকলেরই প্রিয় ছিলেন। হরিবংশে আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ বালিকা যুবতী বৃন্দা সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন। এবং যমলাজ্জর্নভঙ্গ প্রভৃতি উৎপাতকালে শিশু কৃষ্ণকে বিপন্ন দেখিয়া গোপরমণীগণ রোদন করিত এরূপ লেখা আছে। অতএব এই 'গোপীজর্নাপ্রয়' শব্দে সুন্দর শিশুর প্রতি স্ত্রীজনসুলভ স্নেহ ভিন্ন আর কিছুই বুঝায় না।

আমরা পূর্বে যে নিয়ম করিয়াছি, তদনুসারে মহাভারতের পর বিষ্ণুপুরাণ দেখিতে হয়, এবং পূর্বে যেমন দেখিয়াছি, এখনও তেমনই দেখিব যে, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ এবং ভাগবত পুরাণে উপন্যাসের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। এই ব্রজগোপীতত্ত্ব মহাভারতে নাই, বিষ্ণুপুরাণে পবিত্রভাবে আছে, হরিবংশে প্রথম কিঞ্চৎ বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছে, তাহার পর ভাগবতে আদিরসের অপেক্ষাকৃত বিস্তার হইয়াছে, শেষ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে তাহার স্রোত বহিয়াছে।

এই সকল কথা সবিস্তারে বুঝাইবার জন্য আমরা বিষ্ণুপুরাণে যতটুকু গোপীদিগের কথা আছে, তাহা সমস্ত উদ্ধৃত করিতেছি। দুই একটা শব্দ এরূপ আছে যে, তাহার দুই রকম অর্থ হইতে পারে, এজন্য আমি মূল সংস্কৃত উদ্ধৃত করিয়া পশ্চাৎ তাহা অনুবাদিত করিলাম।

“কৃষ্ণস্তু বিমলং ব্যোম শরচ্চন্দ্রস্য চন্দ্রিকাম্।
তথা কুমুদিনীং ফুল্লমামোদিতিদগন্তরাম্ ॥ ১৪ ॥
বনরাজিং তথা কৃষ্ণভৃঙ্গমালাং মনোরমাম্।
বিলোক্য সহ গোপীভিস্মর্নশচক্রে রতিং প্রতি ॥ ১৫ ॥
সহ রামেণ মধুরমতীং বনিতাপ্রিয়ম্।
জগৌ কলপদং শৌরিনর্নাতন্দ্রী কৃত-রতম্ ॥ ১৬ ॥
রম্যং গীতধ্বনিং শ্রুত্বা সন্ত্যজ্যাবসথাংস্তদা।
আজগ্মসুস্মরিতা গোপ্যা যত্রাস্তে মধুসুদনঃ ॥ ১৭ ॥
শনৈঃ শনৈর্জগৌ গোপী কাচিৎ তস্য লয়ানুগম্।
দস্তাবধানা কাচিত্তু তমেব মনসা স্মরন্ ॥ ১৮ ॥
কাচিৎ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি প্রোক্ত্বা লজ্জামুপাগতা।
যযৌ চ কাচিৎ প্রেমাঙ্কা তৎপার্শ্বমবিলজ্জিতা ॥ ১৯ ॥
কাচিদাবসথস্যাস্তঃস্থিতা দৃষ্ট্বা বহির্গুরুন্।
তন্ময়ত্বেন গোবিন্দং দধ্যৌ মীলিতলোচনা ॥ ২০ ॥
তচ্ছিত্তাবিপুলাহ্লাদ-ক্ষীণপুণ্যচয়া তথা।
তদপ্রাপ্তমহাদঃখবিলীনাশেষপাতকা ॥ ২১ ॥
চিন্তয়ন্তী জগৎসুতিং পরব্রহ্মস্বরূপিণম্।
নিরুচ্ছ্বাসতয়া মনুজিৎ গতান্যা গোপকন্যকা ॥ ২২ ॥
গোপীপরিবৃত্তো রাত্রিৎ শরচ্চন্দ্রমনোরমাম্।
মানয়ামাস গোবিন্দো রাসারসুরসোৎসুকঃ ॥ ২৩ ॥

গোপ্যশ্চ বৃন্দশঃ কৃষ্ণচেষ্ঠাম্বায়ত্তমুত্তরঃ ।
 অন্যদেশং গতে কৃষ্ণে চেরুবৃন্দাবনান্তরম্ ॥ ২৪ ॥
 কৃষ্ণে নিরুদ্ধহৃদয়া ইদমুচ্চুঃ পরস্পরম্ ।
 কৃষ্ণোহহমেতল্ললিতং ব্রজাম্যালোক্যতাং গতিঃ ।
 অন্য্য ব্রবীতি কৃষ্ণস্য মম গীতির্নিশাম্যতাম্ ॥ ২৫ ॥
 দৃষ্ট কালিয়! তিষ্ঠাত্র কৃষ্ণোহহমিতি চাপরা ।
 বাহুমাস্ফেট্য কৃষ্ণস্য লীলাসর্বস্বমাদদে ॥ ২৬ ॥
 অন্য্য ব্রবীতি ভো গোপা নিঃশঙ্কৈঃ স্থীয়তামিহ ।
 অলং বৃষ্টিভয়েনাত্র ধৃতো গোবর্দ্ধনো ময়া ॥ ২৭ ॥
 ধেনুকোহয়ং ময়া ক্ষিপ্তো বিচরন্তু যথেষ্টয়া ।
 গোপী ব্রবীতি বৈ চান্যা কৃষ্ণলীলানুকারণী ॥ ২৮ ॥
 এবং নানাপ্রকারাসু কৃষ্ণচেষ্ঠাসু তাস্তদা ।
 গোপ্যো ব্যগ্রাঃ সমশ্চেরু রম্যং বৃন্দাবনং বনম্ ॥ ২৯ ॥
 বিলোক্যৈকা ভুবং প্রাহ গোপী গোপবরাজনা ।
 পুলাকাণ্ডিতসর্বাঙ্গী বিকাশিনয়নোৎপলা ॥ ৩০ ॥
 ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাঙ্ক-রেখাবস্ত্যালি! পশ্যত ।
 পদান্যেতানি কৃষ্ণস্য লীলালঙ্কৃতগামিনঃ ॥ ৩১ ॥
 কাপি তেন সমং যাতা কৃতপুণ্যা মদালসা ।
 পদানি তস্যশৈচিত্তানি ঘনান্যল্পতনুনি চ ॥ ৩২ ॥
 পুষ্পাবচয়মত্রোচ্চৈশ্চক্রে দামোদরো ধুবম্ ।
 যেনাগ্রাক্রান্তিমাগ্রাণি পদান্যত্র মহাত্মনঃ ॥ ৩৩ ॥
 অত্রোপবিশ্য সা তেন কাপি পুষ্পৈরলঙ্কৃত্য ।
 অন্যজন্মনি সর্বাঙ্গা বিষ্ণুরভ্যর্চিত্তো যয়া ॥ ৩৪ ॥
 পুষ্পবন্ধনসম্মান-কৃতমানামপাস্য তাম্ ।
 নন্দগোপসুতো যাতো মার্গেণানেন পশ্যত ॥ ৩৫ ॥
 অনুযানেহসমর্থান্যা নিতম্বভরমন্তরা ।
 যা গন্তব্যে দ্রুতং য়াতি নিম্নপাদাগ্রসংস্থিতিঃ ॥ ৩৬ ॥
 হস্তন্যস্তাগ্রহস্তেয়ং তেন য়াতি তথা সখি ।
 অন্যায়ত্তপদন্যাসা লক্ষ্যতে পদপদ্ধতিঃ ॥ ৩৭ ॥
 হস্তসংস্পর্শমাত্রেন ধুত্তে নৈষা বিমানিতা ।
 নৈরাশ্যমন্দগামিন্যা নিবৃত্তং লক্ষ্যতে পদম্ ॥ ৩৮ ॥
 নুনমুত্তা ত্বরামীতি পুনরেষ্যামি তেহস্তিকম্ ।
 তেন কৃষ্ণেন যেনৈষা ত্বরিতা পদপদ্ধতিঃ ॥ ৩৯ ॥
 প্রবিষ্টো গহনং কৃষ্ণঃ পদমত্র ন লক্ষ্যতে ।
 নিবৃত্তধ্বং শশাঙ্কস্য নৈতন্দীধিতিগোচরে ॥ ৪০ ॥
 নিবৃত্তাস্তাস্ততো গোপ্যো নিরাশাঃ কৃষ্ণদর্শনে ।
 যমুনাতীরমাগত্য জগুস্তচ্চারিতং তদা ॥ ৪১ ॥
 ততো দদৃশুঃরায়ান্তং বিকাশি-মুখপঙ্কজম্ ।
 গোপ্যস্ট্রৈলোক্যগোপ্তারং কৃষ্ণমক্লিষ্ট-চেষ্টিতম্ ॥ ৪২ ॥
 কাচিদালোক্য গোবিন্দমায়ান্তমতিহর্ষিতা ।
 কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি প্রাহ নান্যদুদৈরয়ং ॥ ৪৩ ॥
 কাচিদ্ভ্রুভঙ্গুরং কৃষ্ণা ললাটফলকং হরিম্ ।
 বিলোক্য নেত্রভৃঙ্গাভ্যাং পর্পো তন্মুখপঙ্কজম্ ॥ ৪৪ ॥
 কাচিদালোক্য গোবিন্দং নিমীলিত-বিলোচনা ।
 তসৌব রূপং ধ্যায়ন্তী যোগারুঢ়েব চাবভৌ ॥ ৪৫ ॥
 ততঃ কাশিচৎ প্রিয়ালপৈঃ কাশিচদ্ভ্রুভঙ্গ-বীক্ষণৈঃ ।

বিক্রম রচনাবলী

নিন্যেহনুনয়মন্যাশ্চ করস্পর্শেন মাধবঃ ॥ ৪৬ ॥
 তাভিঃ প্রসন্নচিত্তাভির্গোপীভিঃ সহ সাদরম্ ।
 ররাম রাসগোষ্ঠীভিরদার-চরিতো হরিঃ ॥ ৪৭ ॥
 রাসমণ্ডল-বন্ধোহপি কৃষ্ণপার্শ্বমনুজ্বতা ।
 গোপীজনেন নৈবাভূদেকস্থানিস্থিরাশ্রনা ॥ ৪৮ ॥
 হস্তে প্রগৃহ্য চৈকৈকাং গোপিকাং রাসমণ্ডলীম্ ।
 চকার তৎকরস্পর্শনিমীলিতদৃশাং হরিঃ ॥ ৪৯ ॥
 ততঃ স ববৃতে রাসশ্চলদ্বলয়ানিস্বনঃ ।
 অনুযাতশরৎকাব্য-গেয়গীতিরনুক্ৰমাৎ ॥ ৫০ ॥
 কৃষ্ণঃ শরচ্চন্দ্রমসং কোমুদীং কুমুদাকরম্ ।
 জগৌ গোপীজনস্বেকং কৃষ্ণনাম পুনঃ পুনঃ ॥ ৫১ ॥
 পরিবর্ত্তশ্রমেণৈকা চলদ্বলয়লাপিনীম্ ।
 দদৌ বাহুলতাং স্কন্ধে গোপী মধুনিঘাতিনঃ ॥ ৫২ ॥
 কাচিৎ প্রবিলসদ্বাহুঃ পরিরভ্য চুচুম্ব তম্ ।
 গোপী গীতস্থুতিব্যাজ-নিপুণা মধুসুদনম্ ॥ ৫৩ ॥
 গোপীকপোলসংশ্লেষমভিপত্য হরেভূজৌ ।
 পুলাকোঙ্গমশস্যায় স্বেদাম্বু ঘনতাং গতো ॥ ৫৪ ॥
 রাসগেয়ং জগৌ কৃষ্ণা যাবৎ তারতরধ্বনিঃ ।
 সাধু কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি তাবৎ তা দ্বিগুণং জগুঃ ॥ ৫৫ ॥
 গতে তু গমনং চক্ষুর্বলনে সংমুখং যযুঃ ।
 প্রতিলোমানুলোমাভ্যাং ভেজুর্গোপাঙ্গনা হরিম্ ॥ ৫৬ ॥
 স তথা সহ গোপীভী ররাম মধুসুদনঃ ।
 যথাব্দকোটিপ্রমিতঃ ক্ষণস্তেন বিনাভবৎ ॥ ৫৭ ॥
 তা বার্ষ্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃভিস্থতা ।
 কৃষ্ণং গোপাঙ্গনা রাত্নৌ রময়ন্তি রতিপ্রিয়াঃ ॥ ৫৮ ॥
 সোহপি কৈশোরকবয়ো মানয়ন্ মধুসুদনঃ ।
 রেমে তাভিরমেয়াত্মা ক্ষপাসু ক্ষপিতাহিতঃ ॥ ৫৯ ॥

বিষ্ণুপুরাণম্, পঞ্চমাংশঃ, ১৩ অঃ

“নির্ম্মলাকাশ, শরচ্চন্দ্রের চন্দ্রিকা, ফুল্লকুমুদিনী, দিক্ সকল গন্ধামোদিত, ভূঙ্গমালাশব্দে
 বনরাজ মনোরম, দেখিয়া কৃষ্ণ গোপীদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে মানস করিলেন। বলরামের
 সহিত সৌরি অতীব মধুর স্ত্রীজনপ্রিয় নানাতন্ত্রীসম্মিলিত অক্ষুটপদ সঙ্গীত গান করিলেন।
 রম্য গীতধ্বনি শুনিয়া তখন গৃহপরিত্যাগপূর্ব্বক যথা মধুসুদন আছেন, সেইখানে গোপীগণ
 ছরান্বিতা হইয়া আসিল। কোন গোপী তাহার লয়ানুগমনপূর্ব্বক ধীরে ধীরে গায়িতে লাগিল।
 কেহ বা কৃষ্ণকে মনোমধ্যে স্মরণপূর্ব্বক তাহাতে একমনা হইল। কেহ বা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া
 লজ্জিতা হইল। কেহ বা লজ্জাহীনা ও প্রেমাস্কা হইয়া তাহার পার্শ্বে আসিল। কেহ বা
 গৃহমধ্যে থাকিয়া বাহিরে গুরুজনকে দেখিয়া নিমীলিতলোচনা হইয়া গোবিন্দকে তন্ময়ত্বের
 সহিত ধ্যান করিতে লাগিল। অন্য গোপকন্যা কৃষ্ণচিত্তাজনিত বিপুলাহ্বাদে ক্ষীণপুণ্যা হইয়া
 এবং কৃষ্ণকে অপরাধিত হইতে যে মহাদুঃখ, তদ্বারা তাহার অশেষ পাতক বিলীন হইলে, পরব্রহ্ম-
 স্বরূপ জগৎকারণকে চিন্তা করিয়া পরোক্ষার্থ জ্ঞানহেতু মুক্তিলাভ করিল। গোবিন্দ শরচ্চন্দ্র-
 মনোরম রাগিতে গোপীজন কর্তৃক পরিবৃত্ত হইয়া রাসারম্ভরসে* সমুৎসুক হইলেন। কৃষ্ণ অন্যত্র
 চলিয়া গেলে গোপীগণ কৃষ্ণচেষ্টার অনুকারিণী হইয়া দলে দলে বৃন্দাবনমধ্যে ফিরিয়া বেড়াইতে
 লাগিল; এবং কৃষ্ণে নিরুদ্ধহৃদয়া হইয়া পরস্পরকে এইরূপ বলিতে লাগিল, ‘আমি কৃষ্ণ, এই
 ললিতগতিতে গমন করিতেছি, তোমরা আমার গমন অবলোকন কর।’ অন্য বলিল, ‘আমি

* রাস অর্থে নৃত্যবিশেষঃ—“অন্যোন্യാব্যতিষক্তহস্তানাং স্ত্রীপুংসাং গায়তাং মণ্ডলীরূপেণ ভ্রমতাং
 নৃত্যবিনোদঃ রাসো নাম” ইতি শ্রীধরঃ।

কৃষ্ণ, আমার গান শ্রবণ কর।’ অপরা বলিল, ‘দৃষ্ট কালিয়! এইখানে থাক, আমি কৃষ্ণ,’ এবং বাহু আক্ষেপাটন-পূর্ব্বক কৃষ্ণলীলার অনুকরণ করিল। আর কেহ বলিল, ‘হে গোপগণ! তোমরা নিভয়ে এইখানে থাক, বৃথা বৃষ্টির ভয় করিও না, আমি এইখানে গোবর্দ্ধন ধরিয়া আছি।’ অন্য কৃষ্ণলীলানুকারিণী গোপী বলিল, ‘এই ধেনুককে আমি নিষ্কিপ্ত করিয়াছি, তোমরা যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণ কর।’ এইরূপে সেই সকল গোপী তৎকালে নানাপ্রকার কৃষ্ণচেষ্টানুবর্ত্তিনী হইয়া ব্যগ্রভাবে রম্য বৃন্দাবন বনে সঞ্চারণ করিতে লাগিল। এক গোপবরাজনা গোপী ভূমি দেখিয়া সর্ব্বাঙ্গ পুলকরোমাঞ্চিত হইয়া এবং নয়নোৎপল বিকশিত করিয়া বলিতে লাগিল, ‘হে সখি! দেখ, এই ধ্বজবজ্রাঙ্কুশরেখাবস্ত পদাচিহ্নসকল লীলালঙ্কৃতগামী কৃষ্ণের। কোন পুণ্যবতী মদালসা তাহার সঙ্গে গিয়াছে; তাহারই এই সকল ঘন এবং ক্ষুদ্র পদাচিহ্নগুলি। সেই মহাত্মার (কৃষ্ণের) পদাচিহ্নের অগ্রভাগ মাত্র এখানে দেখা যাইতেছে, অতএব নিশ্চিত দামোদর এইখানে উচ্চ পুষ্পসকল অর্বাচিত করিয়াছেন। তিনি কোনও গোপীকে এইখানে বসিয়া পুষ্পের দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সে জন্মান্তরে সর্ব্বাঙ্গ বিষ্ণুকে অর্চিত করিয়া থাকিবে। পুষ্পবন্ধনসম্মানে সে গর্বিতা হইয়া থাকিবে, তাই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া নন্দগোপসুত এই পথে গমন করিয়াছেন দেখ। আর এই পাদাচিহ্ন সকলের নিম্নতা দেখিয়া (বোধ হইতেছে) নিতম্বভারমন্তরা কেহ তাহার সঙ্গে গমনে অসমর্থ হইয়া গন্তব্যে দ্রুত গমনের চেষ্টা করিয়াছিল। হে সখি, আর এইখানে পদাচিহ্ন সকল দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, সেই অনায়ত্তপদন্যাসা গোপীকে তিনি হস্তে গ্রহণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। সে হস্তসংস্পর্শ পরেই সেই ধূর্তের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছিল; কেন না, এ পদাচিহ্ন দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, সে নৈরাশ্যহেতু মন্দগামিনী হইয়া প্রতিনিবৃত্তা হইয়াছিল। আর সেই কৃষ্ণ নিশ্চিত ইহাকে বলিয়াছিলেন যে, শীঘ্রই গিয়া আমি তোমার নিকট পুনর্ব্বার আসিতেছি। সেই জন্য ইহার পদপঙ্কতি আবার ঘুরিত হইয়াছে। এখন গহনে কৃষ্ণ প্রবেশ করিয়াছেন বোধ হয়, কেন না, আর পদাচিহ্ন দেখা যায় না। এখানে আর চন্দ্রিকরণ প্রবেশ করে না। আইস ফিরিয়া যাই।’

“অনন্তর গোপীগণ দেখিল, বিকশিতমুখপঙ্কজ ত্রৈলোক্যের রক্ষাকর্ত্তা অক্লিষ্টকর্মা কৃষ্ণ আসিলেন। কেহ গোবিন্দকে আগত দেখিয়া অত্যন্ত হর্ষিত হইয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে লাগিল, আর কিছুই বলিতে পারিল না। কোন গোপী ললাটফলকে ভ্রূভঙ্গ করিয়া, হরিকে দেখিয়া, তাহার মুখপঙ্কজ নেত্রভঙ্গদ্বয়ের দ্বারা পান করিতে লাগিল। কেহ গোবিন্দকে দেখিয়া নিমীলিত লোচনে যোগারূঢ়ার ন্যায় শোভিত হইয়া তাহার রূপ ধ্যান করিতে লাগিল। অনন্তর মাধব তাহাদিগকে অনুনয়নীয় বিবেচনায় কাহাকে বা প্রিয়ালোপের দ্বারা, কাহাকে বা ভ্রূভঙ্গ-বীক্ষণের দ্বারা, কাহাকে বা করস্পর্শের দ্বারা সান্ত্বনা করিলেন। পরে উদারচরিত হরি প্রসন্নচিত্তা গোপীদিগের সহিত সাদরে রাসমণ্ডলমধ্যে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহারা কৃষ্ণের পার্শ্ব ছাড়ে না, এক স্থানে স্থির থাকে, এজন্য সেই গোপীদিগের সহিত রাসমণ্ডলবন্ধও হইল না। পরে একে একে গোপীদিগকে হস্তের দ্বারা গ্রহণ করিলে তাহারা তাহার করস্পর্শে নিমীলিতচক্ষু হইলে কৃষ্ণ রাসমণ্ডলী প্রস্তুত করিলেন। অতঃপর গোপীদিগের চঞ্চলবলয়শব্দিত এবং গোপী-গণগীত শরৎকাব্যগানের দ্বারা অনুযাত রাসক্রীড়ায় তিনি প্রবৃত্ত হইলেন। কৃষ্ণ শরচ্ন্দ্র ও কোমুদী ও কুমুদ সম্বন্ধীয় গান করিলেন। গোপীগণ পুনঃ পুনঃ এক কৃষ্ণনামই গায়িতে লাগিল। এক গোপী নর্ত্তনজনিত শ্রমে শ্রান্ত হইয়া চঞ্চলবলয়ধর্মানির্বিশিষ্ট বাহুলতা মধুসূদনের স্কন্ধে স্থাপিত করিল। কপটতায় নিপুণা কোন গোপী কৃষ্ণগীতের স্তুতিচ্ছলে বাহুদ্বারা তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া মধুসূদনকে চম্বিত করিল। কৃষ্ণের ভুজদ্বয় কোন গোপীর কপোলসংশ্লেষপ্রাপ্ত হইয়া পুলকোৎসাহরূপ শস্যোৎপাদনের জন্য স্বেদাম্বুমেঘত্ব প্রাপ্ত হইল। তারতর ধর্নিত কৃষ্ণ যাবৎকাল রাসগীত গায়িতে লাগিলেন, তাবৎকাল গোপীগণ ‘সাধু কৃষ্ণ, সাধু কৃষ্ণ’ বলিয়া দ্বিগুণ গায়িল। কৃষ্ণ গেলে তাহারা গমন করিতে লাগিল, কৃষ্ণ আবর্ত্তন করিলে তাহারা সম্মুখে আসিতে লাগিল, এইরূপ প্রতিলোম অনুলোম গতির দ্বারা গোপাঙ্গনাগণ হরিকে ভজনা করিল। মধুসূদন গোপীদিগের সহিত সেইখানে ক্রীড়া করিলেন। তাহারা তাহাকে বিনা, ক্ষণমাত্রকে কোটি বৎসর মনে করিতে লাগিল। ক্রীড়ানুরাগিণী গোপাঙ্গনাগণ পতির দ্বারা, পিতার দ্বারা, ভ্রাতার দ্বারা নিবারণিত হইয়াও রাত্রিকালে কৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া করিল। শত্রুধ্বংসকারী অমেয়াত্মা মধুসূদনও আপনাকে কিশোরবয়স্ক জানিয়া, রাত্রে তাহাদিগের সহিত ক্রীড়া করিলেন।”

বিক্রম রচনাবলী

এই অনুবাদ সম্বন্ধে একটি কথা বক্তব্য এই যে, “রম্”-ধাতুনিষ্পন্ন শব্দের অর্থে আমি ক্রীড়ার্থে “রম্” ধাতু ব্ৰুঝিয়াছি; যথা, “রতিপ্রয়া” অর্থে আমি ‘ক্রীড়ানুরাগিণী’ ব্ৰুঝিয়াছি। আদৌ “রম্” ধাতু ক্রীড়ার্থেই ব্যবহৃত। উহার যে অর্থান্তর আছে, তাহা ক্রীড়ার্থ হইতেই পশ্চাৎ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ‘রতি’ ও ‘রতিপ্রয়’ শব্দ এই অর্থে যে কৃষ্ণলীলায় সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহার অনেক উদাহরণ আছে। পাঠক হরিবংশের সপ্তষষ্টিতম, পুস্তকান্তরে অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়ে এইরূপ প্রয়োগ দেখিবেন।* তথায় ক্রীড়াশীল গোপালগণকে ‘রতিপ্রয়’ গোপাল বলা হইয়াছে। আর এই অর্থই এখানে সঙ্গত, কেন না, ‘রাস’ একটি ক্রীড়াবিশেষ। অদ্যাপি ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে ঐরূপ ক্রীড়া বা নৃত্য প্রচলিত আছে। রাসের অর্থ কি, তাহা শ্রীধর স্বামী ব্ৰুঝাইতেছেন। তিনি বলেন—

“অন্যোন্য়ব্যতিষক্তহস্তানাং স্ত্রীপদংসাং গায়তাং মন্ডলীরূপেণ ভ্রমতাং নৃত্যবিনোদো রাসো নাম।”

অর্থাৎ স্ত্রীপদরূপে পরস্পরের হাত ধরিয়া গায়িতে গায়িতে এবং মন্ডলীরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে যে নৃত্য করে, তাহার নাম রাস। বালকবালিকায় এরূপ নৃত্য করে আমরা দেখিয়াছি, এবং যাহারা বাল্য অতিক্রম করিয়াছে, তাহারাও দেশবিশেষে এরূপ নৃত্য করে শুনিয়াছি। ইহাতে আদিরসের নামগন্ধও নাই।

‘রাস’ একটা খেলা, এবং ‘রতি’ শব্দে খেলা। অতএব রাসবর্ণনে ‘রতি’ শব্দ ব্যবহৃত হইলে অনুবাদকালে তৎপ্রতিশব্দস্বরূপ ‘ক্রীড়া’ শব্দই ব্যবহার করিতে হয়।

এই রাসলীলাবৃত্তান্ত কিয়ৎপরিমাণে দুর্ভেদ্য। ইহার ভিতরে যে গুঢ় তাৎপর্য আছে, তাহা আমি গ্রন্থান্তরে পরিষ্ফুট করিয়াছি। কিন্তু এখানে এ তত্ত্ব অসম্পূর্ণ রাখা অনর্চিত, এজন্য যাহা বলিয়াছি, তাহা পুনরুক্ত করিতে বাধ্য হইতেছি।

আমি “ধর্মতত্ত্ব” গ্রন্থে বলিয়াছি যে, মনুষ্যত্বই মনুষ্যের ধর্ম। সেই মনুষ্যত্ব বা ধর্মের উপাদান আমাদের বৃত্তিগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতা। সেই বৃত্তিগুলিকে শারীরিকী, জ্ঞানাজ্জর্ননী, কার্যকারিণী এবং চিত্তরঞ্জিনী এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছি। যে সকল বৃত্তির দ্বারা সৌন্দর্য্যাদির পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা নিম্মল এবং অতুলনীয় আনন্দ অনুভূত করি, সেই সকলের নাম দিয়াছি চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি। তাহার সম্যক্ অনুশীলনে, সচ্চিদানন্দময় জগৎ এবং জগন্ময় সচ্চিদানন্দের সম্পূর্ণ স্বরূপানুভূতি হইতে পারে। চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তির অনুশীলন অভাবে ধর্মের হানি হয়। যিনি আদর্শ মনুষ্য, তাঁহার কোন বৃত্তিই অননুশীলিত বা স্ফূর্তিহীন থাকিবার সম্ভাবনা নাই। এই রাসলীলা কৃষ্ণ এবং গোপীগণ-কৃত সেই চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তি অনুশীলনের উদাহরণ।

কৃষ্ণপক্ষে ইহা উপভোগমাত্র, কিন্তু গোপী-পক্ষে ইহা ঈশ্বরোপাসনা। এক দিকে অনন্ত-সুন্দরের সৌন্দর্য্যবিকাশ, আর এক দিকে অনন্তসুন্দরের উপাসনা। চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তির চরম অনুশীলন সেই বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করা। প্রাচীন ভারতে স্ত্রীগণের জ্ঞানমার্গ নিষিদ্ধ; কেন না, বেদাদির অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। স্ত্রীলোকের পক্ষে কর্মমার্গ কণ্ঠসাধ্য, কিন্তু ভক্তিতে তাদের বিশেষ অধিকার। ভক্তি, কথিত হইয়াছে, “পরানুরক্তিরীশ্বরে”। অনুরাগ নানা কারণে জন্মিতে পারে। কিন্তু সৌন্দর্য্যের মোহঘটিত যে অনুরাগ, তাহা মনুষ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। অতএব অনন্তসুন্দরের সৌন্দর্য্যের বিকাশ ও তাহার আরাধনাই স্ত্রীজাতির জীবনসার্থকতার মুখ্য উপায়। এই তত্ত্বাত্মক রূপকই রাসলীলা। জড়প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য্য তাহাতে বস্তুমান।

* স তত্র বয়সা তুল্যৈর্বৎসপালৈঃ সহানঘঃ ।
রেমে বৈ দিবসং কৃষ্ণঃ পুরা স্বর্গগতো যথা ॥
তং ক্রীড়মানং গোপালাঃ কৃষ্ণং ভান্ডীরবাসিনম্ ।
রময়ন্তি স্ম বহবো বন্যোঃ ক্রীড়নকৈস্তদা ॥
অন্যে স্ম পরিগায়ন্তি গোপামৃদিতমানসাঃ ।
গোপালাঃ কৃষ্ণমেবান্যে গায়ন্তি স্ম রতিপ্রয়া ॥”

এই তিন শ্লোকে “রম্” ধাতু হইতে নিষ্পন্ন শব্দ তিন বার ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা, “রেমে”, “রময়ন্তি”, “রতিপ্রয়া”; তিন বারই ক্রীড়ার্থে, অর্থান্তর কোন মতেই ঘটান যায় না। কেন না, গোপালদিগের কথা হইতেছে।

শরৎকালের পূর্ণচন্দ্র, শরৎপ্রবাহপরিপূর্ণা শ্যামলসালিলা যমুনা, প্রস্ফুটিতকুসুমসুবাসিত কুঞ্জবিহঙ্গমকুঞ্জিত বৃন্দাবন-বনস্থলী, এবং তন্মধ্যে অনন্তসুন্দরের স্বশরীরে বিকাশ। তাহার সহায় বিশ্ববিমোহিনী কৃষ্ণগীতি। এইরূপ সর্বপ্রকার চিত্তরঞ্জনের দ্বারা গোপীগণের ভক্তি উদ্ভক্ত হইলে, তাহারা কৃষ্ণানুরাগিণী হইয়া আপনাদিগকেই কৃষ্ণ বলিয়া জানিতে লাগিল, কৃষ্ণের কথিতব্য কথা কহিতে লাগিল, এবং কেবল জগদীশ্বরের সৌন্দর্যের অনুরাগিণী হইয়া জীবাত্মা পরমাত্মায় যে অভেদ জ্ঞান, যাহা যোগীর যোগের এবং জ্ঞানীর জ্ঞানের চরমোদ্দেশ্য, তাহা প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরে বিলীন হইল।

ইহাও আমাকে স্বীকার করিতে হয়, যুবক যুবতী একত্র হইয়া নৃত্যগীত করা আমাদের আধুনিক সমাজে নিন্দনীয়। অন্যান্য সমাজে—যথা ইউরোপে—নিন্দনীয় নহে। বোধ হয়, যখন বিষ্ণুপুরাণ প্রণীত হইয়াছিল, তখনও সমাজের এইরূপ অবস্থা ছিল, এবং পুরাণকারেরও মনে মনে বিশ্বাস ছিল যে, কাব্যটা নিন্দনীয়। সেই জন্যই তিনি লিখিয়া থাকিবেন যে,—

“তা বাৰ্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভিঃ ভ্রাতৃভিস্তথা।”

এবং সেই জন্যই অধ্যায়শেষে কৃষ্ণের দোষক্ষালন জন্য লিখিয়াছেন,—

“তদভূত্বম্ তথা তাসু সৰ্বভূতেষু চেশ্বরঃ।
আত্মস্বরূপরূপোহসৌ ব্যাপ্য বায়ুরিব স্থিতঃ ॥
যথা সমস্তভূতেষু নভোহগ্নিঃ পৃথিবী জলম্।
বায়ুশ্চাত্মা তথৈবাসৌ ব্যাপ্য সৰ্বমবস্থিতঃ ॥”

তিনি তাহাদিগের ভূত্বগণে এবং তাহাদিগেতে ও সর্বভূতেতে, ঈশ্বর ও আত্মস্বরূপরূপে সকলই বায়ুর ন্যায় ব্যাপিয়া আছেন। যেমন সমগ্র ভূতে, আকাশ, অগ্নি, পৃথিবী, জল এবং বায়ু, তেমনি তিনিও সর্বভূতে আছেন।

এইরূপ দোষক্ষালনের কোন প্রয়োজন ছিল না। যুবক যুবতীর একত্রে নৃত্য করায় ধর্মতঃ কোন দোষ ঘটে না, কেবল এই সমাজে সামাজিক দোষ ঘটে এবং কৃষ্ণের সময়ে, বোধ হয়, সে সামাজিক দোষও ছিল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—ব্রজগোপী

হরিবংশ

বিষ্ণুপুরাণ হইতে পূর্ষপরিচ্ছেদে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা পঞ্চম অংশের ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে। ঐ অধ্যায় ব্যতীত ব্রজগোপীদিগের কথা বিষ্ণুপুরাণে আর কোথাও নাই। কেবল কৃষ্ণ মথুরাগমনকালে তাহাদের খেদোক্তি আছে।

সেইরূপ হরিবংশেও ব্রজগোপীদিগের কথা বিষ্ণুপূর্ষের ৭৭ অধ্যায়, গ্রন্থান্তরে ৭৬ অধ্যায় ভিন্ন আর কোথাও নাই। যাহা আছে, সে সমস্তই উদ্ধৃত করিতেছি। কিন্তু উদ্ধৃত করিবার আগে বক্তব্য যে, “রাস” শব্দ হরিবংশে ব্যবহৃত হয় নাই। তৎপরিবর্তে “হল্লীষ” শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের নাম “হল্লীষক্রীড়নম্”। যথা—“ইতি শ্রীমহাভারতে খিলেষু হরিবংশে বিষ্ণুপূর্ষিণি হল্লীষক্রীড়নে সপ্তসপ্ততোহধ্যায়ঃ।” হেমচন্দ্রাভিধানে, “হল্লীষ” অর্থ এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

“মন্ডলেন তু যম্নত্যং স্ত্রীণাং হল্লীষকস্তু তৎ।”

বাচস্পত্যে তারানাথ লিখিয়াছেন—

“স্ত্রীণাং মন্ডলিকাকারনৃত্যে।”

অতএব ‘হল্লীষ’ এবং ‘রাস’ একই কথা—নৃত্যবিশেষ।

এক্ষণে হরিবংশের কথা তুলিতেছি।

“কৃষ্ণস্তু যৌবনং দৃষ্ট্বা নিশি চন্দ্রমসৌ নবং।
শারদীণ্ড নিশাং রম্যাং মনশ্চক্রে রতিস্প্রতি ॥
স করীষাঙ্গরাগাসু ব্রজরথ্যাসু বীর্যবান্।
বৃষাণাং জাতদর্পাণাং যুদ্ধানি সমযোজয়ৎ ॥

সেই বাক্যলাপী কৃষ্ণের বিচিত্র চরিত্র দেখিয়া ঘোষমধ্যে গোপকন্যাগণ তখন তাঁহাকে দামোদর বলিত; পয়োধরস্থিতিহেতু উদ্ধর্মুখ হৃদয়ের দ্বারা নিপীড়িত করিয়া সেই বরাজনাগণ ভ্রামিত-চক্ষু বদনের দ্বারা তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। ক্রীড়ানুরাগিণী গোপাজনাগণ পিতা, ভ্রাতা ও মাতা কর্তৃক নিবারণিত হইয়াও রায়ে কৃষ্ণের নিকট গমন করিল। তাহারা সকলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সাজিয়া, মনোহর ক্রীড়া করিল; এবং যুগ্মে যুগ্মে কৃষ্ণচরিত গান করিল। বরাজনা তরুণীগণ কৃষ্ণলীলানুকারিণী, কৃষ্ণে প্রণিহিতলোচনা, এবং কৃষ্ণের গমনানুগামিনী হইল। কোন কোন ব্রজবাল্য হস্তাগ্রে তালকুটনপূর্বক কৃষ্ণচরিত আচারিত করিতে লাগিল। ব্রজযোষিদ্গণ, কৃষ্ণের নৃত্য, গীত, বিলাসস্মিতবীক্ষণ অনুকরণপূর্বক, সানন্দে ক্রীড়া করিতে লাগিল। কৃষ্ণপরায়ণা বরাজনাগণ ভাবনিসান্দমধুর গান করত ব্রজে গিয়া সুখে বিচরণ করিতে লাগিল। সম্প্রমত্ত হস্তীকে করেণুগণ ঘেরুপ ক্রীড়া করায়, শূঙ্ক গোময় দ্বারা দিক্কাঙ্গ সেই গোপীগণ সেইরূপ কৃষ্ণের অনুবর্তন করিল। সহাস্যবদনা কৃষ্ণমৃগলোচনা অন্যা বনিতাগণ ভাবোৎফুল্ল লোচনের দ্বারা কৃষ্ণকে অতৃপ্ত হইয়া পান করিতে লাগিল। ক্রীড়ালীলাসাতৃষিতা গোপকন্যাগণ রাগিতে অনন্যক্রীড়াসক্ত হইয়া অজস্রকাল কৃষ্ণমুখমণ্ডল পান করিতে লাগিল। কৃষ্ণ হা হা ইতি শব্দ করিয়া গান করিলে কৃষ্ণমুখনিঃসৃত সেই বাক্য, বরাজনাগণ আহ্লাদিত হইয়া গ্রহণ করিল। সেই গোপযোষিঙ্গণের ক্রীড়াশ্রান্তিপ্রযুক্ত আকুলীকৃত সীমন্তগ্রথিত কেশদাম কুচাগ্রে আব্রস্তু হইতে লাগিল। চক্রবাল্যকৃত শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ সচন্দ্রা শারদী নিশাতে সুখে গোপীদিগের সহিত আনন্দ করিতে লাগিলেন।”

বিষ্ণুপুরাণ হইতে রাসলীলাতত্ত্ব অনুবাদ কালে ‘রম্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন শব্দ সকলের ঘেরুপ ক্রীড়ার্থে অনুবাদ করিয়াছি, এই অনুবাদেও সেই সকল কারণে ঐ সকল শব্দের ক্রীড়ার্থ প্রতিশব্দ ব্যবহার করিয়াছি। জোর করিয়া বলা যাইতে পারে যে, অন্য কোনরূপ প্রতিশব্দ ব্যবহার হইতেই পারে না। যথা—

“তাস্তু পংস্তীকৃতাঃ সর্বা রময়ন্তি মনোরমম্।”

এখানে ক্রীড়ার্থে ভিন্ন রত্যাথে ‘রময়ন্তি’ শব্দ কোন রকমেই বৃথা যায় না। যাঁহারা অনুবাদ করিয়াছেন, তাঁহারা পূর্বপ্রচলিত কুসংস্কারবশতঃই করিয়াছেন।

এই হস্তীক্রীড়াবর্ণনা বিষ্ণুপুরাণকৃত রাসবর্ণনার অনুগামী। এমন কি, এক একটি শ্লোক উভয় গ্রন্থে প্রায় একই। যথা, বিষ্ণুপুরাণে আছে—

“তা বাৰ্যমাণাঃ পিতৃভিঃ পিতৃভিঃ ভ্রাতৃভিস্তথা।

কৃষ্ণং গোপাজনা রাত্রৌ মৃগয়ন্তে রতিপ্রিয়াঃ ॥”

হরিবংশে আছে—

“তা বাৰ্যমাণাঃ পিতৃভিঃ ভ্রাতৃভিস্তথা।

কৃষ্ণং গোপাজনা রাত্রৌ রময়ন্তি রতিপ্রিয়াঃ ॥”

তবে বিষ্ণুপুরাণের অপেক্ষা হরিবংশের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত। অন্যান্য বিষয়ে সচরাচর সেইরূপ দেখা যায় না। সচরাচর দেখা যায়, বিষ্ণুপুরাণে যাহা সংক্ষিপ্ত, হরিবংশে তাহা বিস্তৃত এবং নানা প্রকার নতন উপন্যাস ও অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। হরিবংশে রাসলীলার এইরূপ সংক্ষেপ-বর্ণনার একটু কারণও আছে। উভয় গ্রন্থে সবিস্তারে তুলনা করিয়া দেখিলে বৃথা যায় যে, কবিভে, গান্ধীর্ষ্যে, পান্ডিত্যে এবং ঔদার্যে হরিবংশকার বিষ্ণুপুরাণকারের অপেক্ষা অনেক লঘু। তিনি বিষ্ণুপুরাণের রাসবর্ণনার নিগূঢ় তাৎপর্য এবং গোপীগণকৃত ভক্তিযোগ দ্বারা কৃষ্ণে একাত্মতা প্রাপ্তি বৃদ্ধিতে পারেন নাই। তাহা না বৃদ্ধিতে পারিয়াই সেখানে বিষ্ণুপুরাণকার লিখিয়াছেন,—

“কাচিৎ প্রবিলসদ্বাহুঃ পরিরভ্য চুচুম্ব তম্।”

সেখানে হরিবংশকার লিখিয়া বসিয়াছেন,

“তাস্তং পয়োধরোত্তানৈরুরোভিঃ সমপীড়য়ন্।” ইত্যাদি

প্রভেদটুকু এই যে, বিষ্ণুপুরাণের চপলা বালিকা আনন্দে চঞ্চলা, আর হরিবংশের এই গোপীগণ বিলাসিনীর ভাব প্রকাশ করিতেছে। হরিবংশকারের অনেক স্থলে বিলাসপ্রিয়তার মাত্রাধিক্য দেখা যায়।

বাঁকম রচনাবলী

আর আর কথা বিষ্ণুপুরাণের রাসলীলা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, হরিবংশের এই হল্লীষক্রীড়া সম্বন্ধেও বর্তে ।

উপরির্লিখিত শ্লোকগুলি ভিন্ন হরিবংশে ব্রজগোপীদের সম্বন্ধে আর কিছুই নাই ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ—ব্রজগোপী—ভাগবত

বন্দনহরণ

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রজগোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ কেবল রাসনৃত্যে পর্য্যাপ্ত হয় নাই । ভাগবতকার গোপীদের সহিত কৃষ্ণলীলার বিশেষ বিস্তার করিয়াছেন । সময়ে সময়ে তাহা আধুনিক রুচির বিরুদ্ধ । কিন্তু সেই সকল বর্ণনার বাহ্যদৃশ্য এখনকার রুচিবর্গহিত হইলেও, অভ্যন্তরে অতি পবিত্র ভক্তিতত্ত্ব নিহিত আছে । হরিবংশকারের ন্যায় ভাগবতকার বিলাস-প্রিয়তা-দোষে দূষিত নহেন । তাঁহার অভিপ্রায় অতিশয় নিগূঢ় এবং অতিশয় বিশুদ্ধ ।

দশম স্কন্ধের ২১ অধ্যায়ে প্রথমতঃ গোপীদের পদ্বর্ষরাগ বর্ণিত হইয়াছে । তাহারা শ্রীকৃষ্ণের বেগুরব শ্রবণ করিয়া মোহিতা হইয়া পরস্পরের নিকট কৃষ্ণানুরাগ ব্যক্ত করিতেছে । সেই পদ্বর্ষানুরাগ বর্ণনায় কবি অসাধারণ কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন । তার পর তাহা স্পষ্টীকৃত করিবার জন্য একটি উপন্যাস রচনা করিয়াছেন । সেই উপন্যাস “বন্দনহরণ” বলিয়া প্রসিদ্ধ । বন্দনহরণের কোন কথা মহাভারতে, বিষ্ণুপুরাণে বা হরিবংশে নাই, সুতরাং উহা ভাগবতকারের কল্পনাপ্রসূত বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে । বৃত্তান্তটা আধুনিক রুচিবিরুদ্ধ হইলেও আমরা তাহা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না, কেন না, ভাগবতব্যখ্যাত রাসলীলাকথনে আমরা প্রবৃত্ত, এবং সেই রাসলীলার সঙ্গে ইহার বিশেষ সম্বন্ধ ।

কৃষ্ণানুরাগবিবশা ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণকে পতিভাবে পাইবার জন্য কাত্যায়নীরত করিল । রতের নিয়ম এক মাস । এই এক মাস তাহারা দলবদ্ধ হইয়া আসিয়া প্রত্যুষে যমুনাসলিলে অবগাহন করিত । স্ত্রীলোকদিগের জলাবগাহন বিষয়ে একটা কুৎসিত প্রথা এ কালেও ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশে প্রচলিত আছে । স্ত্রীলোকেরা অবগাহনকালে নদীতীরে বন্দনগুলি ত্যাগ করিয়া, বিবস্ত্রা হইয়া জলমগ্না হয় । সেই প্রথানুসারে এই ব্রজাঙ্গনাগণ কূলে বসন রক্ষা করিয়া বিবস্ত্রা হইয়া অবগাহন করিত । মাসান্তে যে দিন রত সম্পূর্ণ হইবে, সে দিনও তাহারা ঐরূপ করিল । তাহাদের কর্মফল (উভয়ার্থে) দিবার জন্য সেই দিন শ্রীকৃষ্ণ সেইখানে উপস্থিত হইলেন । তিনি পরিত্যক্ত বন্দনগুলি সংগ্রহ করিয়া তীরস্থ কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিলেন ।

গোপীগণ বড় বিপন্ন হইল । তাহারা বিনাবস্ত্র উঠিতে পারে না; এ দিকে প্রাতঃসমীরণে জলমধ্যে শীতে প্রাণ যায় । তাহারা কণ্ঠ পর্য্যন্ত নিমগ্না হইয়া, শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে, কৃষ্ণের নিকট বন্দনভিক্ষা করিতে লাগিল । কৃষ্ণ সহজে বন্দন দেন না—গোপীদের “কর্মফল” দিবার ইচ্ছা আছে । তার পর যাহা ঘটিল, তাহা আমরা স্ত্রীলোক বালক প্রভৃতির বোধগম্য বাঙ্গালা ভাষায় কোন মতেই প্রকাশ করিতে পারি না । অতএব মূল সংস্কৃতই বিনানুবাদে উদ্ধৃত করিলাম ।

ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণকে বলিতে লাগিল:—

মাহনয়ং ভোঃ কৃথাস্ত্বাস্তু নন্দগোপসুতং প্রিয়ম্ ।
জানীমোহঙ্গ ব্রজশ্লাঘ্যং দোহি বাসাংসি বোপিতাঃ ॥
শ্যামসুন্দর তে দাস্যঃ করবাম তবোদিতম্ ।
দোহি বাসাংসি ধর্মজ্ঞ নোচেদ্রাজ্ঞে বুবাম হে ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

ভবত্যো যদি মে দাস্যো ময়োক্তং করিষ্যথ ।
অত্রাগত্য স্ববাসাংসি প্রতীচ্ছত শূচীস্মিতাঃ ।
নোচেন্নাহং প্রদাস্যে কিং কুদ্ধো রাজা করিষ্যতি ॥
ততো জলাশয়াৎ সর্ষা দারিকাঃ শীতবোপিতাঃ ।
পাণিভ্যাং * * আচ্ছাদ্য প্রোক্তেরুঃ শীতকর্ষিতাঃ ॥

ভগবানাহ তা বীক্ষ্য শূদ্ধভাবপ্রসাদিতঃ ।
 স্কন্ধে নিধায় বাসাংসি প্রীতঃ প্রোবাচ সস্মিতম্ ॥
 যদ্বয়ং বিবস্ত্রা যদপো ধৃতব্রতা ব্যগাহতৈতত্তদু দেবহেলনম্ ।
 বন্ধাজলিং মৃদ্ধার্গাপনুত্তয়েহংহসঃ কৃতা নমো* বসনং প্রগৃহ্যতাম্ ॥
 ইত্যচ্যুতেনাভিহিতং ব্রজাবলা নহা বিবস্ত্রাপ্লবনং ব্রতচ্যুতিম্ ।
 তৎপূর্ভিকামাস্তদশেষকস্মরণাং সাক্ষাৎকৃতং নেমুরবদ্যাম্গ্ যতঃ ॥
 তাস্তথাবনতা দৃষ্ট্বা ভগবান্ দেবকীসুতঃ ।
 বাসাংসি তাভ্যঃ প্রাযচ্ছৎ করুণস্তেন তোষিতঃ ॥
 শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১০ম স্কন্দঃ, ২২ অধ্যায় ।

অন্তর্নিহিত ভক্তিতত্ত্বটা এই । ঈশ্বরকে ভক্তি দ্বারা পাইবার প্রধান সাধনা, ঈশ্বরে সর্ব্বার্পণ ।
 ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

“যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।
 যত্তপস্যসি কোত্তেয় তৎ কুরুস্ব মদর্পণম্ ॥”

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বার্পণ করিল। স্ত্রীলোক, যখন সকল পরিত্যাগ করিতে পারে, তখনও লজ্জা ত্যাগ করিতে পারে না। ধন ধর্ম্ম কর্ম্ম ভাগ্য—সব যায়, তথাপি স্ত্রীলোকের লজ্জা যায় না। লজ্জা স্ত্রীলোকের শেষ রত্ন। যে স্ত্রীলোক, অপরের জন্য লজ্জা পরিত্যাগ করিল, সে তাহাকে সব দিল। এই স্ত্রীগণ শ্রীকৃষ্ণে লজ্জাও অর্পিত করিল। এ কামাতুরার লজ্জার্পণ নহে—লজ্জাবিবশার লজ্জার্পণ। অতএব তাহারা ঈশ্বরে সর্ব্বস্বার্পণ করিল। কৃষ্ণও তাহা ভক্ত্যুপহার বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তিনি বলিলেন, “আমাতে যাহাদের বুদ্ধি আরোপিত হইয়াছে, তাহাদের কামনা কামার্থে কল্পিত হয় না। যব ভর্জিত এবং ক্রাথিত হইলে, বীজক্ষে সমর্থ হয় না।” অর্থাৎ যাহারা কৃষ্ণকামিনী, তাহাদিগের কামাবশেষ হয়। আরও বলিলেন, “তোমরা যে জন্য ব্রত করিয়াছ, আমি তাহা রাতে সিদ্ধ করিব।”

এখন গোপীগণ কৃষ্ণকে পতিস্বরূপ পাইবার জন্যই ব্রত করিয়াছিল। অতএব কৃষ্ণ, তাহাদের কামনাপূরণ করিতে স্বীকৃত হইয়া, তাহাদের পতিত্ব স্বীকার করিলেন। কাজেই বড় নৈতিক গোলযোগ উপস্থিত। এই গোপাঙ্গনাগণ পরপত্নী, তাহাদের পতিত্ব স্বীকার করায়, পরদারাত্মমর্ষণ স্বীকার করা হইল। কৃষ্ণে এ পাপারোপণ কেন?

ইহার উত্তর আমার পক্ষে অতি সহজ। আমি ভূরি ভূরি প্রমাণের দ্বারা বুঝিয়াছি যে, এ সকল পুরাণকারকল্পিত উপন্যাসমাত্র, ইহার কিছু মাত্র সত্যতা নাই। কিন্তু পুরাণকারের পক্ষে উত্তর তত সহজ নহে। তিনিও পরিক্ষিতের প্রশ্নানুসারে শূকমুখে একটা উত্তর দিয়াছেন। যথাস্থানে তাহার কথা বলিব। কিন্তু আমাকেও এখানে বলিতে হইবে যে, হিন্দু-ধর্ম্মের ভক্তিবাদানুসারে, কৃষ্ণকে এই গোপীগণপতিত্ব অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। ভগবদ্গীতায় কৃষ্ণ নিজে বলিয়াছেন,—

“যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তুথৈব ভজাম্যহম্ ।”

“যে, যে ভাবে আমাকে ভজনা করে, আমি তাহাকে সেই ভাবে অনুগ্রহ করি।” অর্থাৎ যে আমার নিকট বিষয়ভোগ কামনা করে, তাহাকে আমি তাহাই দিই। যে মোক্ষ কামনা করে, তাহাকে মোক্ষ দিই। বিষ্ণুপুরাণে আছে, দেবমাতা অর্দিত কৃষ্ণ(বিষ্ণু)কে বলিতেছেন যে, আমি তোমাকে পুত্রভাবে কামনা করিয়াছিলাম, এজন্য তোমাকে পুত্রভাবেই পাইয়াছি। এই ভাগবতেই আছে যে, বসুদেব দেবকী জগদীশ্বরকে পুত্রভাবে কামনা করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাকে পুত্রভাবে পাইয়াছেন। অতএব গোপীগণ তাঁহাকে পতিভাবে পাইবার জন্য যথোপযুক্ত সাধনা করিয়াছিল বলিয়া কৃষ্ণকে তাহারা পতিভাবে পাইল।

যদি তাই হইল, তবে তাহাদের অধর্ম্ম কি? ঈশ্বরপ্রাপ্তিতে অধর্ম্ম আবার কি? পাপের দ্বারা, পুণ্যময়, পুণ্যের আদিভূত স্বরূপ জগদীশ্বরকে কি পাওয়া যায়? পাপ-পুণ্য কি? যাহার দ্বারা জগদীশ্বরের সন্নিধি উপস্থিত হইতে পারি, তাহাই পুণ্য—তাহাই ধর্ম্ম, তাহার বিপরীত যাহা, তাহাই পাপ—তাহাই অধর্ম্ম।

পুরাণকার এই তত্ত্ব বিশদ করিবার জন্য পাপসংস্পর্শের পথমাত্র রাখেন নাই। তিনি

বিক্রম রচনাবলী

২৯ অধ্যায়ে বলিয়াছেন, যাহারা পতিভাবে কৃষ্ণকে কামনা না করিয়া উপপতিভাবে তাঁহাকে কামনা করিয়াছিল, তাহারা তাঁহাকে সশরীরে পাইল না; তাহাদের পতিগণ তাহাদিগকে আসিতে দিল না; কৃষ্ণচিন্তা করিয়া তাহারা প্রাণত্যাগ করিল।

“তমেব পরমাখ্যানাং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ ।

জহগুণগময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ ॥” ১০।২৯।১০

কৃষ্ণপতি ভিন্ন অন্য পতি যাহাদের স্মরণ মাত্রে ছিল, কাজেই তাহারা কৃষ্ণকে উপপতি ভাবিল। কিন্তু অন্য পতি স্মৃতিমাত্রে থাকায়, তাহারা কৃষ্ণ সম্বন্ধে অনন্যচিন্তা হইতে পারিল না। তাহারা সিদ্ধ, বা ঈশ্বরপ্রাপ্তির অধিকারিণী হইল না। যতক্ষণ জারবুদ্ধি থাকিবে, ততক্ষণ পাপবুদ্ধি থাকিবে, কেন না, জারানুগমন পাপ। যতক্ষণ জারবুদ্ধি থাকিবে, ততক্ষণ কৃষ্ণে ঈশ্বরজ্ঞান হইতে পারে না—কেন না, ঈশ্বরে জারজ্ঞান হয় না—ততক্ষণ কৃষ্ণকামনা, কামকামনা মাত্র। ঈদৃশী গোপী কৃষ্ণপরায়ণা হইলেও সশরীরে কৃষ্ণকে পাইতে অযোগ্যা।

অতএব এই পতিভাবে জগদীশ্বরকে পাইবার কামনায় গোপীদিগের পাপমাত্র রহিল না। গোপীদিগের রহিল না, কিন্তু কৃষ্ণের? এই কথার উত্তরে বিষ্ণুপুরাণকার যাহা বলিয়াছেন, ভাগবতকারও তাহাই বলিয়াছেন। ঈশ্বরের আবার পাপপুণ্য কি? তিনি আমাদের মত শরীরী নহেন, শরীরী ভিন্ন ইন্দ্রিয়পরতা বা তজ্জনিত দোষ ঘটে না। তিনি সর্বভূতে আছেন, গোপীগণেও আছেন, গোপীগণের স্বামীতেও আছেন। তাঁহার কর্তৃক পরদারাভিমর্ষণ সম্ভবে না।

এ কথায় আমাদের একটা আপত্তি আছে। ঈশ্বর এখানে শরীরী, এবং ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট। যখন ঈশ্বর ইচ্ছাক্রমে মানবশরীর গ্রহণ করিয়াছেন, তখন মানবধর্মাবলম্বী হইয়া কার্য্য করিবার জন্যই শরীর গ্রহণ করিয়াছেন। মানবধর্মীর পক্ষে গোপবধুগণ পরম্পরী, এবং তদভিগমন পরদারপাপ। কৃষ্ণই গীতায় বলিয়াছেন, লোকশিক্ষার্থ তিনি কর্ম করিয়া থাকেন। লোকশিক্ষক পারদারিক হইলে, পাপাচারী ও পাপের শিক্ষক হইলেন। অতএব পুরাণকারকৃত দোষক্ষালন খাটে না। এইরূপ দোষক্ষালনের কোন প্রয়োজনও নাই। ভাগবতকার নিজেই কৃষ্ণকে এই রাসমণ্ডলমধ্যে জিতেন্দ্রিয় বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। যথা—

এবং শশাঙ্কাংশুর্বিরাজিতা নিশাঃ স সত্যকামোহনরতাবলাগণঃ ।

সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ সর্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১০ স্ক, ৩৩ অঃ, ২৬।

তবে, বিষ্ণুপুরাণকারের অপেক্ষাও ভাগবতকার প্রগাঢ়তায় এবং ভক্তিতত্ত্বের পারদর্শিতায় অনেক শ্রেষ্ঠ। স্ত্রীজাতি, জগতের মধ্যে পতিকেকেই প্রিয়বস্তু বলিয়া জানে; যে স্ত্রী, জগদীশ্বরে পরমভক্তিমতী, সে সেই পতিভাবেই তাঁহাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিল—ইংরেজি পড়িয়া আমরা যাই বলি—কথাটা অতি রমণীয়!—ইহাতে কত মনুষ্যহৃদয়ভিজ্ঞতার এবং ভগবন্তক্তির সৌন্দর্য্য-গ্রাহিতার পরিচয় দেয়। তারপর যে পতিভাবে তাঁহাকে দেখিল, সেই পাইল,—যাহার জারবুদ্ধি রহিল, সে পাইল না, এ কথাও ভক্তির ঐকান্তিকতা বুঝাইবার কি সুন্দর উদাহরণ! কিন্তু আর একটা কথায় পুরাণকার বড় গোলযোগের সূত্রপাত করিয়াছেন। পতিত্বে একটা ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ আছে। কাজে কাজেই সেই ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ ভাগবতোক্ত রাসবর্ণনের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। ভাগবতোক্ত রাস, বিষ্ণুপুরাণের ও হরিবংশের রাসের ন্যায় কেবল নৃত্যগীত নয়। যে কৈলাসশিখরে তপস্বী কপন্দীর রোষানলে ভস্মীভূত, সে বৃন্দাবনে কিশোর রাসবিহারীর পদাশ্রয়ে পুনর্জীব-নার্থ ধূমিত। অনঙ্গ এখানে প্রবেশ করিয়াছেন। পুরাণকারের অভিপ্রায় কদর্য্য নয়; ঈশ্বরপ্রাপ্ত-জনিত মুক্ত জীবের যে আনন্দ, যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ইতি বাক্য স্মরণ রাখিয়া, তাহাই পরিস্ফুট করিতে গিয়াছেন। কিন্তু লোকে তাহা বুঝিল না। তাঁহার রোপিত ভগবন্তক্তিপঙ্কজের মূল, অতল জলে ডুবিয়া রহিল—উপরে কেবল বিকশিত কামকুসুমদাম ভাসিতে লাগিল। যাহারা উপরে ভাসে—তলায় না, তাহারা কেবল সেই কুসুমদামের মালা গাঁথিয়া, ইন্দ্রিয়পরতাময় বৈষ্ণবধর্ম প্রস্তুত করিল। যাহা ভাগবতে নিগূঢ় ভক্তিতত্ত্ব, জয়দেব গোস্বামীর হাতে তাহা মদনধর্মোৎসব। এত কাল, আমাদের জন্মভূমি সেই মদনধর্মোৎসবভারাক্রান্ত। তাই কৃষ্ণচরিত্রের অভিনব ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইয়াছে। কৃষ্ণচরিত্র, বিশুদ্ধিতার, সর্বগুণময়ত্বে জগতে অতুল্য। আমার ন্যায় অক্ষম, অধম ব্যক্তি সেই পবিত্র চরিত্র গীত করিলেও লোকে তাহা শুনিলে, তাই এই অভিনব কৃষ্ণগীতি রচনায় সাহস করিয়াছি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ—ব্রজগোপী—ভাগবত

ব্রাহ্মণকন্যা

বসন্তহরণের নিগড় তাৎপর্য আমি ষেরূপ বুঝাইয়াছি, তৎসম্বন্ধে একটা কথা বাকি আছে।

“যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্বপস্যাসি কোন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥”

ইতি বাক্যের অনুবর্তী হইয়া যে জগদীশ্বরে সর্বস্ব অর্পণ করিতে পারে, সেই ঈশ্বরকে পাইবার অধিকারী হয়। বসন্তহরণকালে ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণে সর্বস্বাৰ্পণ ক্ষমতা দেখাইল, এজন্য তাহারা কৃষ্ণকে পাইবার অধিকারিণী হইল। আর একটি উপন্যাস রচনা করিয়া ভাগবত-কার এই তত্ত্ব আরও পরিষ্কৃত করিয়াছেন। সে উপন্যাস এই,—

একদা গোচারণকালে বনমধ্যস্থ গোপালগণ অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হইয়া কৃষ্ণের নিকট আহাৰ্য্য প্রার্থনা করিল। অদূরবর্তী কোন স্থানে কতকগুলি ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করিতেছিলেন। কৃষ্ণ গোপালগণকে উপদেশ করিলেন যে, সেইখানে গিয়া আমার নাম করিয়া অন্নভিক্ষা চাও। গোপালেরা যজ্ঞস্থলে গিয়া কৃষ্ণের নাম করিয়া অন্নভিক্ষা চাহিল। ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে কিছু না দিয়া তাড়াইয়া দিল। গোপালগণ কৃষ্ণের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া সেই সকল কথা জানাইল। কৃষ্ণ তখন বলিলেন যে, তোমরা পুনর্বার যজ্ঞস্থলে গিয়া অন্তঃপুরবাসিনী ব্রাহ্মণকন্যাগণের নিকট আমার নাম করিয়া অন্নভিক্ষা চাও। গোপালেরা তাহাই করিল। ব্রাহ্মণকন্যাগণ কৃষ্ণের নাম শুনিয়া গোপালদিগকে প্রভূত অন্নব্যঞ্জন প্রদান করিল, এবং কৃষ্ণ অদূরে আছেন শুনিয়া তাঁহার দর্শনে আসিল। তাহারা কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া জানিয়াছিল। তাহারা কৃষ্ণকে দর্শন করিলে কৃষ্ণ তাহাদিগকে গৃহে যাইতে অনুমতি করিলেন। ব্রাহ্মণকন্যাগণ বলিলেন, “আমরা আপনার ভক্ত, আমরা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্রাদি ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি—তাঁহারা আর আমাদের গৃহণ করিবেন না। আমরা আপনার পাদাগ্রে পতিত হইতেছি, আমাদের অন্য গতি আপনি বিধান করুন।” কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে গৃহণ করিলেন না, বলিলেন, “দেখ, অঙ্গসঙ্গই কেবল অনুরাগের কারণ নহে। তোমরা আমাতে চিত্ত নিবিষ্ট কর, আমাকে অর্চরে প্রাপ্ত হইবে। আমার শ্রবণ, দর্শন, ধ্যান, অনুকীর্ণনে আমাকে পাইবে—স্নিকর্ষে সেরূপ পাইবে না। অতএব তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও।” তাহারা ফিরিয়া গেল।

এখন এই ব্রাহ্মণকন্যাগণ কৃষ্ণকে পাইবার যোগ্য কি করিয়াছিলেন? কেবলমাত্র পিতাদি স্বজন ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। কুলটাগণ সামান্য জারানুগমনার্থেও তাহা করিয়া থাকে। ভগবানে সর্বস্বাৰ্পণ তাঁহাদিগের হয় নাই, সিদ্ধ হইবার তাঁহারা অধিকারিণী হন নাই। অতএব সিদ্ধ হইবার প্রথম সোপান শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাদির জন্য তাঁহাদিগকে উপদিষ্ট করিয়া কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। পবিত্রব্রাহ্মণকুলোদ্ভূতা সাধনাভাবে যাহাতে অধিকারিণী হইল না, সাধনাপ্রভাবে গোপকন্যাগণ তাহাতে অধিকারিণী হইল। পূর্বারাগবর্গনস্থলে, ভাগবত-কার গোপকন্যাগণের শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন সবিস্তারে বুঝাইয়াছেন।

এক্ষণে আমরা ভাগবতে বিখ্যাত রাসপঞ্চাধ্যায়ে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কিন্তু এই রাসলীলাতত্ত্ব বসন্তহরণোপলক্ষে আমি এত সবিস্তারে বুঝাইয়াছি যে, এই রাসপঞ্চাধ্যায়ের কথা অতি সংক্ষেপে বলিলেই চলিবে।

নবম পরিচ্ছেদ—ব্রজগোপী—ভাগবত

রাসলীলা

ভাগবতের দশম স্কন্ধে ২৯।৩০।৩১।৩২।৩৩ এই পাঁচ অধ্যায় রাসপঞ্চাধ্যায়। প্রথম অর্থাৎ ঊনত্রিংশ অধ্যায়ে শারদ পূর্ণিমা-রজনীতে শ্রীকৃষ্ণ মধুর বেণুবাদন করিলেন। পাঠকের স্মরণ হইবে যে, বিষ্ণুপুরাণে আছে, তিনি কলপদ অর্থাৎ অক্ষুটপদ গীত করিলেন। ভাগবতকার সেই ‘কল’ শব্দ রাখিয়াছেন, যথা “জগৌ কলম্”। টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এই ‘কল’ শব্দ হইতে

বিক্রম রচনাবলী

কৃষ্ণমন্ত্রের 'ক্লীং' শব্দ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। তিনি উহাকে কামগীত বলিয়াছেন। টীকাকারদিগের মাহিমা অনন্ত! পুরাণকার স্বয়ং ঐ গীতকে 'অনঙ্গবর্জনম্' বলিয়াছেন।

বংশীধ্বনি শুনিয়া গোপাঙ্গনাগণ কৃষ্ণদর্শনে ধাবিতা হইল। পুরাণকার তাহাদিগের ভ্রা এবং বিভ্রম যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া কালিদাসকৃত পুরস্ট্রীগণের ভ্রা এবং বিভ্রম-বর্ণনা মনে পড়ে। কে কাহার অনুকরণ করিয়াছে, তাহা বলা যায় না।

গোপীগণ সমাগতা হইলে, কৃষ্ণ যেন কিছুই জানেন না, এই ভাবে তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমাদিগের মঙ্গল ত? তোমাদিগের প্রিয় কার্য কি করিব? ব্রজের কুশল ত? তোমরা কেন আসিয়াছ?" এই বলিয়া আবার বলিতে লাগিলেন যে, "এই রজনী ঘোররূপা, ভীষণ পশু সকল এখানে আছে, এ স্ত্রীলোকদিগের থাকিবার যোগ্য স্থান নয়। অতএব তোমরা ব্রজে ফিরিয়া যাও। তোমাদের মাতা পিতা পুত্র ভ্রাতা পতি তোমাদিগকে না দেখিয়া তোমাদিগের অন্ত্রবিশেষণ করিতেছে। বন্ধুগণের ভয়োৎপত্তির কারণ হইও না। রাক্ষসবিরাজিত যমুনাসমীরণলীলাকম্পিত তরুপল্লব-শোভিত কুসুমিত বন দেখিলে ত? এখন হে সতীগণ, অচিরে প্রতিগমন করিয়া পতিসেবা কর। বালক ও বৎস সকল কাঁদিতেছে, তাহাদিগকে দুঃখপান করাও। অথবা আমার প্রতি স্নেহ করিয়া, স্নেহের বশীভূতবৃদ্ধি হইয়া আসিয়া থাকিবে। সকল প্রাণীই আমার প্রতি এইরূপ প্রীতি করিয়া থাকে। কিন্তু হে কল্যাণীগণ! পতির অকপট শূদ্রা এবং বন্ধুগণের ও সন্তানগণের অনুপোষণ, ইহাই স্ত্রীলোকদিগের প্রধান ধর্ম। পতি দুঃশীলই হউক, দুঃভাগই হউক, জড় হউক, রোগী বা অধনী হউক, যে স্ত্রীগণ অপাতকী হইয়া উভয় লোকের মঙ্গল কামনা করে, তাহাদিগের দ্বারা সে পতি পরিত্যাজ্য নয়। কুলস্ট্রীদিগের ঔপত্য অস্বর্গ্য, অযশস্কর, অতি তুচ্ছ, ভয়াবহ এবং সর্বত্র নিন্দিত। শ্রবণে, দর্শনে, ধ্যানে, অনুকীর্ণনে মন্তাবোধ হইতে পারে, কিন্তু সন্নিকর্ষে নহে। অতএব তোমরা ঘরে ফিরিয়া যাও।"

কৃষ্ণের মুখে এই উক্তি সন্নিবিষ্ট করিয়া পুরাণকার দেখাইতেছেন যে, পাতিত্যধর্মের মাহাত্ম্যের অনভিজ্ঞতা অথবা তৎপ্রতি অবজ্ঞাবশতঃ তিনি কৃষ্ণগোপীর ইন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় বর্ণনে প্রবৃত্ত নহেন। তাহার অভিপ্রায় পুঙ্খবুৎ বঝাইয়াছি। কৃষ্ণ ব্রাহ্মণকন্যাগণকেও ঐরূপ কথা বলিয়াছিলেন। শুনিয়া তাহারা ফিরিয়া গিয়াছিল। কিন্তু গোপীগণ ফিরিল না। তাহারা কাঁদিতে লাগিল। তাহারা বলিল, "এমন কথা বলিও না, তোমার পাদমূলে সর্ববিষয় পরিত্যাগ করিয়াছি। আদিপুরুষদেব যেমন মৃগমুগ্ধকে পরিত্যাগ করেন না, তেমনি আমরা দূরবগ্রহ হইলেও, আমাদিগকে ত্যাগ করিও না। তুমি ধর্মজ্ঞ, পতি অপত্য সহুৎ প্রভৃতির অনুবর্তন স্ত্রীলোকদিগের স্বধর্ম বলিয়া যে উপদেশ দিতেছ, তাহা তোমাতেই বর্তিত হউক। কেন না, তুমি ঈশ্বর। তুমি দেহধারীদিগের প্রিয় বন্ধু এবং আত্মা। হে আত্মন! যাহারা কুশলী, তাহারা নিত্যপ্রিয় যে তুমি, সেই তোমাতেই রতি (আত্মরতি) করিয়া থাকে। দুঃখদায়ক পতিসুতাদির দ্বারা কি হইবে?" ইত্যাদি। এই সকল বাক্যে পুরাণকার বঝাইয়াছেন যে, গোপীগণ কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া ভজনা করিয়াছিল, এবং ঈশ্বরার্থেই স্বামিত্যাগ করিয়াছিল। তার পর আরও কতকগুলি কথা আছে, যাহা দ্বারা কবি বঝাইতেছেন যে, কৃষ্ণের অনন্ত সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াই, গোপীগণ কৃষ্ণানুসারিণী। তাহার পরে পুরাণকার বলিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আত্মারাম অর্থাৎ আপনাতে ভিন্ন তাহার রতি বিরতি আর কিছুতেই নাই, তথাপি এই গোপীগণের বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া তিনি তাহাদিগের সহিত ক্রীড়া করিলেন; এবং তাহাদিগের সহিত গান করতঃ যমুনাপুলিনে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ভাগবতোক্ত রাসলীলায় ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ কিছু নাই। যদি এ কথা প্রকৃত হইত, তাহা হইলে আমি এ রাসলীলার অর্থ যেরূপ করিয়াছি, তাহা কোন রকমেই খাটিত না। কিন্তু এই কথা যে প্রকৃত নহে, ইহার প্রমাণার্থ এই স্থান হইতে একটা শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

“বাহুপ্রসারপরিব্রজ-করালকোরুনীবীপ্তনালভননশ্মনখাগ্রপাতেঃ ।
ক্ষেত্রল্যাবলোকহসিতৈরজসুন্দরীগামুত্তমভয়ন্ রতিপতিং রময়াণকার ॥” ৪১ ॥

অন্যান্য স্থান হইতেও আরও দুই চারিটি এরূপ প্রমাণ উদ্ধৃত করিব। এ সকলের বাঙ্গালা অনুবাদ দেওয়া অবিধেয় হইবে।

তার পর কৃষ্ণসঙ্গ লাভ করিয়া ব্রজগোপীগণ অত্যন্ত মানিনী হইলেন। তাহাদিগের সৌভাগ্যমদ দেখিয়া তদুপশমনার্থে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন। এই গেল উনত্রিংশ অধ্যায়।

ত্রিংশ অধ্যায়ে গোপীগণকৃত কৃষ্ণান্বেষণবৃত্তান্ত আছে। তাহা স্থূলতঃ বিষ্ণুপুরাণের অনুরণ। তবে ভাগবতকার কাব্য আরও ঘোরাল করিয়াছেন। অতএব এই অধ্যায় সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। একত্রিংশ অধ্যায়ে গোপীগণ কৃষ্ণবিষয়ক গান করিতে করিতে তাহাকে ডাকিতেছেন। ইহাতে ভক্তিরস এবং আদিরস দুইই আছে। বদ্বাইবার কথা বেশি কিছু নাই। দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ পুনরাবির্ভূত হইলেন। এইখানে গোপীদিগের ইন্দ্রিয়প্রণোদিত ব্যবহারের প্রমাণার্থে একটি কবিতা উদ্ধৃত করিব।

“কাচিদঞ্জলিনাগহুং তন্বী তাম্বুলচর্চিতম্।

একা তদাঙ্ঘ্রিকমলং সস্তপ্তা স্তনয়োর্নাধাৎ ॥”

এই অধ্যায়ের শেষে কৃষ্ণ ও গোপীগণের মধ্যে কিছু আধ্যাত্মিক কথোপকথন আছে। আমরা এখানে তাহা উদ্ধৃত করা আবশ্যিক বিবেচনা করিতেছি না। তাহার পর ত্রয়স্বত্রিংশ অধ্যায়ে রাসক্রীড়া ও বিহারবর্ণন। রাসক্রীড়া বিষ্ণুপুরাণোক্ত রাসক্রীড়ার ন্যায় নৃত্যগীত মাত্র। তবে গোপীগণ এখানে শ্রীকৃষ্ণকে পতিভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিল, এজন্য কিঞ্চিৎমাত্র ইন্দ্রিয়সম্বন্ধও আছে। যথা,—

কস্যাম্বিচল্লীর্বিষ্ণুপুকুণ্ডলম্বিমুদিতম্।

গন্ডং গন্ডে সংদধত্যাঃ প্রাদান্তাম্বুলচর্চিতম্ ॥ ১৩ ॥

নৃত্যস্তী গায়তী কাচিৎ কুঞ্জম্পুরমেখলা।

পার্শ্বস্থ্যচ্যুতহস্তাঙ্জং শান্তাধাৎ স্তনয়োঃ শিবম্ ॥ ১৪ ॥

* * *

তদঙ্গসঙ্গপ্রমুদাকুলেন্দ্রিয়াঃ কেশান্ দৃকুদলং কুচপটিকাং বা।

নাঙ্গঃ প্রতিব্যোঢ়মলং ব্রজস্মিয়ো বিস্রস্তমালাভরণাঃ কুরুদ্বহ ॥ ১৫ ॥

এইরূপ কথা ভিন্ন বেশি আর কিছু নাই। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে পুরাণকার জিতেন্দ্রিয়স্বরূপ বর্ণিত করিয়াছেন, তাহা পদ্বর্ষে বলিয়াছি এবং তাহার প্রমাণও দিয়াছি।

দশম পরিচ্ছেদ—শ্রীরাধা

অথর্ষবেদের উপনিষদ্ সকলের মধ্যে একখানির নাম গোপালতাপনী। কৃষ্ণের গোপমূর্তির উপাসনা ইহার বিষয়। ইহার রচনা দেখিয়া বোধ হয় যে, অধিকাংশ উপনিষদ্ অপেক্ষা উহা অনেক আধুনিক। ইহাতে কৃষ্ণ যে গোপগোপীপরিবৃত্ত, তাহা বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে গোপগোপীর যে অর্থ করা হইয়াছে, তাহা প্রচলিত অর্থ হইতে ভিন্ন। গোপী অর্থে অবিদ্যা কলা। টীকাকার বলেন,

“গোপায়স্তীতি গোপ্যঃ পালনশক্তয়ঃ।” আর গোপীজনবল্লভ অর্থে “গোপীনাং পালনশক্তীনাং জনঃ সমূহঃ তদ্বাচ্যা অবিদ্যাঃ কলাশ্চ তাসাং বল্লভঃ স্বামী প্রেরক ঈশ্বরঃ।”

উপনিষদে এইরূপ গোপীর অর্থ আছে, কিন্তু রাসলীলার কোন কথাই নাই। রাধার নামমাত্র নাই। এক জন প্রধানা গোপীর কথা আছে, কিন্তু তিনি রাধা নহেন, তাহার নাম গান্ধর্বা। তাহার প্রধান্যও কামকোঁলিতে নহে—তত্ত্বজিজ্ঞাসায়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে আর জয়দেবের কাব্যে ভিন্ন কোন প্রাচীন গ্রন্থে রাধা নাই।

ভাগবতের এই রাসপঞ্চাধ্যায়ের মধ্যে ‘রাধা’ নাম কোথাও পাওয়া যায় না। বৈষ্ণবাচার্য্যদিগের অস্থিমঞ্জার ভিতর রাধা নাম প্রবিষ্ট। তাহারা টীকাটিপ্পনীর ভিতর পুনঃ পুনঃ রাধাপ্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছেন, কিন্তু মূলে কোথাও রাধার নাম নাই। গোপীদিগের অনুরাগাধিক্যজনিত ঈর্ষ্যার প্রমাণ স্বরূপ কবি লিখিয়াছেন যে, তাহারা পদচিহ্ন দেখিয়া অনুমান করিয়াছিল যে, কোন এক জন গোপীকে লইয়া কৃষ্ণ বিজনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাও গোপীদিগের ঈর্ষ্যাজনিত ভ্রমমাত্র। শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন এই কথাই আছে, কাহাকেও লইয়া অন্তর্হিত হইলেন, এমন কথা নাই এবং রাধার নামগন্ধও নাই।

বিক্রম রচনাবলী

রাসপঞ্চাধ্যায়ে কেন, সমস্ত ভাগবতে কোথাও রাধার নাম নাই। ভাগবতে কেন, বিষ্ণুপুরাণে, হরিবংশে বা মহাভারতে কোথাও রাধার নাম নাই। অথচ এখনকার কৃষ্ণ উপাসনার প্রধান অঙ্গ রাধা। রাধা ভিন্ন এখন কৃষ্ণনাম নাই। রাধা ভিন্ন এখন কৃষ্ণের মন্দির নাই বা মূর্তি নাই। বৈষ্ণবদিগের অনেক রচনায় কৃষ্ণের অপেক্ষাও রাধা প্রাধান্যলাভ করিয়াছেন। যদি মহাভারতে, হরিবংশে, বিষ্ণুপুরাণে বা ভাগবতে 'রাধা' নাই, তবে এ 'রাধা' আসিলেন কোথা হইতে?

রাধাকে প্রথমে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে দেখিতে পাই। উইলসন্ সাহেব বলেন যে, ইহা পুরাণ-গণের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ বলিয়াই বোধ হয়। ইহার রচনাপ্রণালী আজিকালিকার ভট্টাচার্যদিগের রচনার মত। ইহাতে ষষ্ঠী মনসারও কথা আছে। আমি পুর্বেই বলিয়াছি যে, আদিম ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ বিলোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার প্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছি। যাহা এখন আছে, তাহাতে এক নতুন দেবতত্ত্ব সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহাই পুর্বাধি প্রসিদ্ধ যে, কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার। ইনি বলেন, কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার হওয়া দূরে থাকুক, কৃষ্ণই বিষ্ণুকে সৃষ্টি করিয়াছেন। বিষ্ণু থাকেন বৈকুণ্ঠে, কৃষ্ণ থাকেন গোলোকে রাসমণ্ডলে,—বৈকুণ্ঠ তাহার অনেক নীচে। ইনি কেবল বিষ্ণুকে নহে, ব্রহ্মা, রুদ্র, লক্ষ্মী, দুর্গা প্রভৃতি সমস্ত দেবদেবী এবং জীবগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহার বাসস্থান গোলোকধামে, বলিয়াছি। তথায় গো, গোপ ও গোপীগণ বাস করে। তাহারা দেবদেবীর উপর। সেই গোলোকধামের অধিষ্ঠাত্রী কৃষ্ণবিলাসিনী দেবীই রাধা। রাধার আগে রাসমণ্ডল, রাসমণ্ডলে ইনি রাধাকে সৃষ্টি করেন। রাসের রা এবং ধা ধাতুর ধা, ইহাতে রাধা নাম নিষ্পন্ন করিয়াছেন।* সেই গোপগোপীর বাসস্থান রাধাধিষ্ঠিত গোলোকধাম পুর্বাধিদিগের বর্ণিত বৃন্দাবনের বর্জনিশ নকল। এখনকার কৃষ্ণযাত্রায় যেমন চন্দ্রাবলী নামে রাধার প্রতিযোগিনী গোপী আছে, গোলোকধামেও সেইরূপ বিরজা নাম্নী রাধার প্রতিযোগিনী গোপী ছিল। মানভঞ্জন যাত্রায় যেমন যাত্রাওয়ালারা কৃষ্ণকে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে লইয়া যায়, ইনিও তেমন কৃষ্ণকে গোলোকধামে বিরজার কুঞ্জে লইয়া গিয়াছেন। তাহাতে যাত্রার রাধিকার যেমন ঈর্ষ্যা ও কোপ উপস্থিত হয়, ব্রহ্মবৈবর্তের রাধিকারও সেইরূপ ঈর্ষ্যা ও কোপ উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাতে আর একটা মহা গোলযোগ ঘটিয়া যায়। রাধিকা কৃষ্ণকে বিরজার মন্দিরে ধরিবার জন্য রথে চড়িয়া বিরজার মন্দিরে গিয়া উপস্থিত। সেখানে বিরজার দ্বারবান্ ছিলেন শ্রীদামা বা শ্রীদাম। শ্রীদামা রাধিকাকে দ্বার ছাড়িয়া দিল না। এ দিকে রাধিকার ভয়ে বিরজা গলিয়া জল হইয়া নদীরূপ ধারণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে দুঃখিত হইয়া তাহাকে পুনর্জীবন এবং পুর্বাধি রূপ প্রদান করিলেন। বিরজা গোলোকনাথের সহিত অবিরত আনন্দানুভব করিতে লাগিল। ক্রমশঃ তাহার সাতটি পুত্র জন্মিল। কিন্তু পুত্রগণ আনন্দানুভবের বিঘ্ন, এ জন্য মাতা তাহাদিগকে অভিশপ্ত করিলেন, তাহারা সাত সমুদ্র হইয়া রহিলেন। এ দিকে রাধা, কৃষ্ণবিরজা-বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া, কৃষ্ণকে অনেক ভৎসনা করিলেন, এবং অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, তুমি গিয়া পৃথিবীতে বাস কর। এ দিকে কৃষ্ণকিষ্কর শ্রীদামা রাধার এই দুর্ব্যবহারে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকেও ভৎসনা করিলেন। শুনিয়া রাধা শ্রীদামাকে তিরস্কার করিয়া শাপ দিলেন, তুমি গিয়া অসুদূর হইয়া জন্মগ্রহণ কর। শ্রীদামাও রাধাকে শাপ দিলেন, তুমিও গিয়া পৃথিবীতে মানুষী হইয়া রায়ণপত্নী (যাত্রার আয়ান ঘোষ) এবং কলঙ্কিনী হইয়া খ্যাত হইবে।

শেষ দুই জনেই কৃষ্ণের নিকট আসিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন। শ্রীদামাকে কৃষ্ণ বর দিয়া বলিলেন যে, তুমি অসুদূর হইবে, যুদ্ধে তোমাকে কেহ পরাভব করিতে পারিবে না। শেষে শঙ্করশূলস্পর্শে মৃত হইবে। রাধাকেও আশ্বাসিত করিয়া বলিলেন, 'তুমি যাও; আমিও যাইতেছি।' শেষ পৃথিবীর ভারাবতরণ জন্য, তিনি পৃথিবীতে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন।

এ সকল কথা নতুন হইলেও, এবং সর্বশেষে প্রচারিত হইলেও এই ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ

* রাসে সম্ভূয় গোলোকে, সা দধাব হরেঃ পুরঃ।

তেন রাধা সমাখ্যাতা পুরাবিস্তির্জিতম্—ব্রহ্মখণ্ডে ৫ অধ্যায়ঃ।

কিন্তু আবার স্থানান্তরে,—

* * * রাকারো দানবাচকঃ।

ধা নিস্বর্ণাণ্ড তন্দাত্রী তেন রাধা প্রকীর্ত্বিতা ॥—শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ২৩ অধ্যায়ঃ।

বাল্মীকীর বৈষ্ণবধর্মের উপর অতিশয় আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। জয়দেবাদি বাল্মীকীর বৈষ্ণবকবিগণ, বাল্মীকীর জাতীয় সঙ্গীত, বাল্মীকীর যাত্রা মহোৎসবদির মূল ব্রহ্মবৈবর্তে। তবে ব্রহ্মবৈবর্তকারকথিত একটা বড় মূল কথা বাল্মীকীর বৈষ্ণবেরা গ্রহণ করেন নাই, অন্ততঃ সেটা বাল্মীকীর বৈষ্ণবধর্ম তাদৃশ পরিস্ফুট হয় নাই—রাধিকা রায়গপত্নী বলিয়া পরিচিতা, কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্তের মতে তিনি বিধিবিধানানুসারে কৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী। সেই বিবাহবৃত্তান্তটি সবিস্তারে বলিতেছি, বলিবার আগে গীতগোবিন্দের প্রথম কবিতাটা পাঠকের স্মরণ করিয়া দিই।

“মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ-
নক্ন্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইথং নন্দানিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োজয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃকেলয়ঃ ॥”

অর্থ। হে রাধে! আকাশ মেঘে স্নিগ্ধ হইয়াছে, তমাল দ্রুম সকলে বনভূমি অন্ধকার হইয়াছে, অতএব তুমিই ইহাকে গৃহে লইয়া যাও, নন্দ এইরূপ আদেশ করায়, পৃথিস্থ কুঞ্জদ্রুমভিমুখে চলিত রাধামাধবের যমুনাকূলে বিজনকৌল সকলের জয় হউক।

এ কথার অর্থ কি? টীকাকার কি অনুবাদকার কেহই বিশদ করিয়া বুঝাইতে পারেন না। একজন অনুবাদকার বলিয়াছেন, “গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকটি কিছু অস্পষ্ট; কবি নায়ক-নায়িকার কোন্ অবস্থা মনে করিয়া লিখিয়াছেন, ঠিক বলা যায় না। টীকাকারের মত, ইহা রাধিকাসখীর উক্তি। তাহাতে ভাব এক প্রকার মধুর হয় বটে, কিন্তু শব্দার্থের কিছু অসঙ্গতি ঘটে।” বস্তুতঃ ইহা রাধিকাসখীর উক্তি নহে; জয়দেব গোস্বামী ব্রহ্মবৈবর্ত-লিখিত এই বিবাহের সূচনা স্মরণ করিয়াই এ শ্লোকটি রচনা করিয়াছেন। এক্ষণে আমি ঠিক এই কথাই ব্রহ্মবৈবর্ত হইতে উদ্ধৃত করিতেছি; তবে বক্তব্য এই যে, রাধা শ্রীদামশাপানুসারে শ্রীকৃষ্ণের কয় বৎসর আগে পৃথিবীতে আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বলিয়া, রাধিকা কৃষ্ণের অপেক্ষা অনেক বড় ছিলেন। তিনি যখন যুবতী, শ্রীকৃষ্ণ তখন শিশু।

“একদা কৃষ্ণসহিতো নন্দো বৃন্দাবনং যযৌ।
তত্রোপবনভাণ্ডীরে চারয়ামাস গোকুলম্ ॥ ১ ॥
সরঃস্বাদুতোয়শ্চ পায়য়ামাস তং পপৌ।
উবাস বটমূলে চ বালং কৃত্বা স্ববক্ষসি ॥ ২ ॥
এতস্মিন্ভ্রুত্রে কৃষ্ণো মায়াবালকবিগ্রহঃ।
চকার মায়াকস্মান্মেঘাচ্ছন্নং নভো মূনে ॥ ৩ ॥
মেঘাবৃতং নভো দৃষ্ট্বা শ্যামলং কাননান্তরম্।
ঝঞ্জাবাতং মেঘশব্দং বজ্রশব্দশ্চ দারুণম্ ॥ ৪ ॥
বৃষ্টিধারামতিস্থূলাং কম্পমানাংশ্চ পাদপান্।
দৃষ্টেদ্বং পতিতস্কন্ধান্ নন্দো ভয়মবাপ হ ॥ ৫ ॥
কথং যাস্যামি গোবৎসং বিহায় স্বাশ্রমং প্রতি।
গৃহং যদি ন যাস্যামি ভবিতা বালকস্য কিম্ ॥ ৬ ॥
এবং নন্দে প্রবদতি রুরোদ শ্রীহরিস্তদা।
মায়্যভিয়া ভয়েভ্যশ্চ পিতুঃ কণ্ঠং দধার সঃ ॥ ৭ ॥
এতস্মিন্ভ্রুত্রে রাধা জগাম কৃষ্ণসম্মিধিম্।”

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণম্, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ১৫ অধ্যায়ঃ।

অর্থ। “একদা কৃষ্ণসহিত নন্দ বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। তথাকার ভাণ্ডীরবনে গোগণকে চরাইতেছিলেন। সরোবরে স্বাদু জল তাহাদিগকে পান করাইলেন, এবং পান করিলেন। এবং বালককে বক্ষে লইয়া বটমূলে বসিলেন। হে মূনে! তার পর মায়াতে শিশুশরীরধারণকারী কৃষ্ণ অকস্মাৎ মায়ার দ্বারা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন করিলেন, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন এবং কাননান্তর শ্যামল; ঝঞ্জাবাত, মেঘশব্দ, দারুণ বজ্রশব্দ, অতিস্থূল বৃষ্টিধারা, এবং বৃক্ষসকল কম্পমান হইয়া পতিত-স্কন্ধ হইতেছে, দেখিয়া নন্দ ভয় পাইলেন। ‘গোবৎস ছাড়িয়া কিরূপেই বা আপনার আশ্রমে যাই, যদি গৃহে না যাই, তবে এই বালকেরই বা কি হইবে,’ নন্দ এইরূপ বলিতেছেন, শ্রীহারি

বাংকম রচনাবল

তখন কাঁদতে লাগলেন; মায়াভয়ে ভীতযুক্ত হইয়া বাপের কণ্ঠ ধারণ করিলেন। এই সময়ে রাধা কৃষ্ণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।”

রাধার অপদূর্ষ লাভ্য দেখিয়া নন্দ বিস্মিত হইলেন, তিনি রাধাকে বলিলেন, “আমি গর্গমুখে জানিয়াছি, তুমি পদ্মারও অধিক হরির প্রিয়া; আর ইনি পরম নিগর্গণ অচ্যুত মহাবিষ্ণু; তথাপি আমি মানব, বিষ্ণুমায়ায় মোহিত আছি। হে ভদ্রে! তোমার প্রাণনাথকে গ্রহণ কর; যথায় সুখী হও, যাও। পশ্চাৎ মনোরথ পূর্ণ করিয়া আমার পুত্র আমাকে দিও।”

এই বলিয়া নন্দ রাধাকে কৃষ্ণসমর্পণ করিলেন। রাধাও কৃষ্ণকে কোলে করিয়া লইয়া গেলেন। দূরে গেলে রাধা রাসমণ্ডল স্মরণ করিলেন, তখন মনোহর বিহারভূমি সৃষ্ট হইল। কৃষ্ণ সেইখানে নীত হইলে কিশোরমূর্তি ধারণ করিলেন। তিনি রাধাকে বলিলেন, “যদি গোলোকের কথা স্মরণ হয়, তবে যাহা স্বীকার করিয়াছি, তাহা পূর্ণ করিব।” তাঁহারা এরূপ প্রেমালাপে নিযুক্ত ছিলেন, এমন সময়ে ব্রহ্মা সেইখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি রাধাকে অনেক স্তবস্তুতি করিলেন। পরিশেষে নিজে কন্যাকর্তা হইয়া, যথাবিহিত বেদবিধি অনুসারে রাধিকাকে কৃষ্ণে সম্প্রদান করিলেন। তাঁহাদিগকে বিবাহবন্ধনে বদ্ধ করিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন। রায়ানের সঙ্গে রাধিকার যথাশাস্ত্র বিবাহ হইয়াছিল কি না, যদি হইয়া থাকে, তবে পূর্বে কি পরে হইয়াছিল, তাহা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে পাইলাম না। রাধাকৃষ্ণের বিবাহের পর বিহারবর্ণন। বলা বাহুল্য যে, ব্রহ্মবৈবর্তের রাসলীলাও ঐরূপ।

যাহা হউক, পাঠক দেখিবেন যে, ব্রহ্মবৈবর্তকার সম্পূর্ণ নূতন বৈষ্ণবধর্ম সৃষ্ট করিয়াছেন। সে বৈষ্ণবধর্মের নামগন্ধমাত্র বিষ্ণু বা ভাগবত বা অন্য পুরাণে নাই। রাধাই এই নূতন বৈষ্ণবধর্মের কেন্দ্রস্বরূপ। জয়দেব কবি, গীতগোবিন্দ কাব্যে এই নূতন বৈষ্ণবধর্মাবলম্বন করিয়াই, গোবিন্দগীতি রচনা করিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টান্তানুসরণে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি বাঙ্গালার বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণসঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। এই ধর্ম অবলম্বন করিয়াই শ্রীচৈতন্যদেব কান্তরসার্শ্রিত অভিনব ভক্তিবাদ প্রচার করিয়াছেন। বলিতে গেলে, সকল কবি, সকল ঋষি, সকল পুরাণ, সকল শাস্ত্রের অপেক্ষা ব্রহ্মবৈবর্তকারই বাঙ্গালীর জীবনের উপর অধিকতর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। এখন দেখা যাউক, এই নূতন ধর্মের তাৎপর্য কি এবং কোথা হইতে ইহা উৎপন্ন হইল।

ভারতবর্ষে যে সকল দর্শনশাস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ছয়টি দর্শনের প্রাধান্য সচরাচর স্বীকৃত হয়। কিন্তু ছয়টির মধ্যে দুইটিরই প্রাধান্য বেশী—বেদান্তের ও সাংখ্যের। সচরাচর ব্যাসপ্রণীত ব্রহ্মসূত্রে বেদান্তদর্শনের সৃষ্টি বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। বস্তুতঃ বেদান্তদর্শনের আদি ব্রহ্মসূত্রে নহে, উপনিষদে। উপনিষদকেও বেদান্ত বলে। উপনিষদসূত্র ব্রহ্মতত্ত্ব, সংক্ষেপতঃ ঈশ্বর ভিন্ন কিছুর নাই। এই জগৎ ও জীবগণ ঈশ্বরেরই অংশ। তিনি এক ছিলেন, সিস্ক্রাপ্রযুক্ত বহু হইয়াছেন। তিনি পরমাত্মা। জীবাত্মা সেই পরমাত্মার অংশ; ঈশ্বরের মায়া হইতেই জীবাত্মতা প্রাপ্ত; এবং সেই মায়া হইতে মৃত হইলেই আবার ঈশ্বরে বিলীন হইবে। ইহা অদ্বৈতবাদে পরিপূর্ণ।

প্রাথমিক বৈষ্ণবধর্মের ভিত্তি এই বৈদান্তিক ঈশ্বরবাদের উপর নিম্নিত। বিষ্ণু এবং বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণ, বৈদান্তিক ঈশ্বর। বিষ্ণুপুরাণে এবং ভাগবতে এবং তাদৃশ অন্যান্য গ্রন্থে যে সকল বিষ্ণুস্তোত্র বা কৃষ্ণস্তোত্র আছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে বা অসম্পূর্ণরূপে অদ্বৈতবাদাত্মক। কিন্তু এ বিষয়ের প্রধান উদাহরণ শান্তিপর্বে ভীষ্মকৃত কৃষ্ণস্তোত্র।

কিন্তু অদ্বৈতবাদ এবং দ্বৈতবাদও অনেক রকম হইতে পারে। আধুনিক সময়ে শঙ্করাচার্য্য, রামানুজাচার্য্য, মধ্বাচার্য্য এবং বল্লভাচার্য্য, এই চারি জনে অদ্বৈতবাদের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়া অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ এবং বিশুদ্ধদ্বৈতবাদ—এই চারি প্রকার মত প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীনকালে এত ছিল না। প্রাচীনকালে ঈশ্বর, এবং ঈশ্বরস্থিত জগতের সম্বন্ধ বিষয়ে দুই রকম ব্যাখ্যা দেখা যায়। প্রথম এই যে, ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুর নাই। ঈশ্বরই জগৎ, তদ্বিন্ন জাগতিক কোন পদার্থ নাই। আর এক মত এই যে, জগৎ ঈশ্বর বা ঈশ্বর জগৎ নহেন, কিন্তু ঈশ্বরে জগৎ আছে—“সূত্রে মণিগণা ইব।” ঈশ্বরও জাগতিক সর্বপদার্থে আছেন, কিন্তু ঈশ্বর তদতিরিক্ত। প্রাচীন বৈষ্ণবধর্ম এই দ্বিতীয় মতেরই উপর নির্ভর করে।

দ্বিতীয় প্রধান দর্শনশাস্ত্র সাংখ্য। কপিলের সাংখ্য ঈশ্বরই স্বীকার করে না। কিন্তু

পরবর্তী সাংখ্যারা ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন। সাংখ্যের স্থূলকথা এই, জড়জগৎ বা জড়জগন্ময়ী শক্তি পরমাত্মা হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। পরমাত্মা বা পুরুষ সম্পূর্ণরূপে সঙ্গশূন্য; তিনি কিছুই করেন না, এবং জগতের সঙ্গে তাঁর কোন সম্বন্ধ নাই। জড়জগৎ এবং জড়জগন্ময়ী শক্তিকে ইহারা 'প্রকৃতি' নাম দিয়াছেন। এই প্রকৃতিই সর্বসৃষ্টিকারিণী, সর্বসংঘারিণী, সর্বসংঘালিনী, এবং সর্বসংহারিণী। এই প্রকৃতিপুরুষতত্ত্ব হইতে প্রকৃতিপ্রধান তান্দ্রিকধর্মের উৎপত্তি। এই তান্দ্রিকধর্ম, প্রকৃতিপুরুষের একত্ব অথবা অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সম্পাদিত হওয়াতে প্রকৃতিপ্রধান বলিয়া এই ধর্ম লোকরঞ্জন হইয়াছিল। যাহারা বৈষ্ণবদিগের অদ্বৈতবাদে অসন্তুষ্ট, তাহারা তান্দ্রিকধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সেই তান্দ্রিকধর্মের সারাংশ এই বৈষ্ণবধর্ম সংলগ্ন করিয়া বৈষ্ণবধর্মকে পুনরুজ্জ্বল করিবার জন্য ব্রহ্মবৈবর্তকার এই অভিনব বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করিয়াছেন অথবা বৈষ্ণবধর্মের পুনঃসংস্কার করিয়াছেন। তাঁহার সৃষ্টা রাধা সেই সাংখ্যদিগের মূলপ্রকৃতিস্থানীয়া। যদিও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে আছে যে, কৃষ্ণ মূলপ্রকৃতিকে সৃষ্টি করিয়া, তাহার পর রাধাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ডে দেখা যায় যে, কৃষ্ণ স্বয়ংই রাধাকে পুনঃ পুনঃ মূলপ্রকৃতি বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। যথা—

“মমাদ্বাংশস্বরূপা ত্বং মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী ॥”

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে, ১৫ অধ্যায়ঃ, ৬৭ শ্লোকঃ।

পরমাত্মার সঙ্গে প্রকৃতির বা কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার কি সম্বন্ধ, তাহা পুরাণকার এইরূপে বদ্বাহিতেছেন। ইহা কৃষ্ণোক্তি।

“যথা ত্বণ্ড তথাহণ্ড ভেদো হি নাবয়োধ্ৰুবম্ ॥ ৫৭ ॥

যথা ক্ষীরে চ ধাবল্যং যথাগ্নৌ দাহিকা সতি।

যথা পৃথিব্যাং গন্ধশ্চ তথাহং ত্বয়ি সন্ততম্ ॥ ৫৮ ॥

বিনা মৃদা ঘটং কত্বং বিনা স্বর্ণেন কুণ্ডলম্।

কুলালঃ স্বর্ণকারশ্চ ন হি শক্তঃ কদাচন ॥ ৫৯ ॥

তথা ত্বয়া বিনা সৃষ্টিং ন চ কত্বমহং ক্ষমঃ।

সৃষ্টিরাধারভূতা ত্বং বীজরূপোহহমচ্যুতঃ ॥ ৬০ ॥

* * * *

কৃষ্ণং বদন্তি মাং লোকাস্ত্বয়ৈব রহিতং যদা।

শ্রীকৃষ্ণং তদা তে হি ত্বয়ৈব সহিতং পরম্ ॥ ৬২ ॥

ত্বণ্ড শ্রীস্বণ্ড সম্পত্তিস্বমাধারস্বরূপিণী।

সর্বশক্তিস্বরূপাসি সর্বেষাণ্ড মমাপি চ ॥ ৬৩ ॥

ত্বং স্ত্রী পুমানহং রাধে নেতি বেদেষু নির্ণয়ঃ।

ত্বণ্ড সর্বস্বরূপাসি সর্বরূপোহহমক্ষরে ॥ ৬৪ ॥

যদা তেজঃস্বরূপোহহং তেজোরূপাসি ত্বং তদা।

ন শরীরী যদাহণ্ড তদা ত্বমশরীরিণী ॥ ৬৫ ॥

সর্ববীজস্বরূপোহহং যদা যোগেন সুন্দরি।

ত্বণ্ড শক্তিস্বরূপাসি সর্বস্ত্রীরূপধারিণী ॥ ৬৬ ॥”

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ১৫ অধ্যায়ঃ।

“তুমি যেখানে, আমিও সেখানে, আমরাদিগের মধ্যে নিশ্চিত কোন ভেদ নাই। দৃষ্টি যেমন ধবলতা, অগ্নিতে যেমন দাহিকা, পৃথিবীতে যেমন গন্ধ, তেমনই আমি তোমাতে সর্বদাই আছি। কুস্তকার বিনা মৃত্তিকায় ঘট করিতে পারে না, স্বর্ণকার স্বর্ণ বিনা কুণ্ডল গড়িতে পারে না, তেমনই আমিও তোমা ব্যতীত সৃষ্টি করিতে পারি না। তুমি সৃষ্টির আধারভূতা, আমি অচ্যুতবীজরূপী। আমি যখন তোমা ব্যতীত থাকি, তখন লোকে আমাকে 'কৃষ্ণ' বলে, তোমার সহিত থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ বলে। তুমি শ্রী, তুমি সম্পত্তি, তুমি আধারস্বরূপিণী, সকলের এবং আমার সর্বশক্তিস্বরূপা। হে রাধে! তুমি স্ত্রী, আমি পুরুষ, বেদও ইহা নির্ণয় করিতে পারে না। হে অক্ষরে! তুমি সর্বস্বরূপা, আমি সর্বরূপ। আমি যখন তেজঃস্বরূপ, তুমি

বিক্রম রচনাবলী

তখন তেজোরূপা। আমি যখন শরীরী নই, তখন তুমিও অশরীরিণী। হে সুন্দরি! আমি যখন যোগের দ্বারা সৰ্ববীজস্বরূপ হই, তখন তুমি শক্তিস্বরূপা সৰ্বস্ট্রীপধারিণী হও।”
পুনশ্চ,

যথাহং তথা ত্বং যথা ধাবল্যদুষ্কয়োঃ ।
ভেদঃ কদাপি ন ভবেন্নিশ্চিতং তথাবয়োঃ ॥ ৫৬ ॥

* * * *

ত্বংকলাংশাংশকলয়া বিশ্বেষু সৰ্বযোষিতঃ ।
যা যোষিৎ সা চ ভবতী যঃ পুমান্ সোহহমেব চ ॥ ৬৮ ॥
অহং কলয়া বহিস্ত্বং স্বাহা দাহিকা প্রিয়া ।
ত্বয়া সহ সমর্থোহহং নালং দক্ষুণ্ড ত্বাং বিনা ॥ ৬৯ ॥
অহং দীপ্তিবতাং সূর্য্যঃ কলয়া তং প্রভাত্মিকা ।
সঙ্গতশ্চ ত্বয়া ভাসে ত্বাং বিনাহং ন দীপ্তমান্ ॥ ৭০ ॥
অহং কলয়া চন্দ্রস্ত্বং শোভা চ রোহিণী ।
মনোহরস্ত্বয়া সাক্ষং ত্বাং বিনা চ ন সুন্দরি ॥ ৭১ ॥
অহমিন্দ্রশ্চ কলয়া স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ ত্বং সতি
ত্বয়া সাক্ষং দেবরাজো হতশ্রীশ্চ ত্বয়া বিনা ॥ ৭২ ॥
অহং ধর্মশ্চ কলয়া ত্বং মূর্ত্তিশ্চ ধর্মিণী ।
নাহং শক্তো ধর্মকৃত্যে ত্বং ধর্মক্রিয়াং বিনা ॥ ৭৩ ॥
অহং যজ্ঞশ্চ কলয়া ত্বং স্বাংশেন দক্ষিণা ।
ত্বয়া সাক্ষং ফলদোহ্যসমর্থস্ত্বয়া বিনা ॥ ৭৪ ॥
কলয়া পিতৃলোকোহহং স্বাংশেন ত্বং স্বধা সতি ।
ত্বয়ালং কব্যাদানে চ সদা নালং ত্বয়া বিনা ॥ ৭৫ ॥
ত্বং সম্পৎস্বরূপাহমীশ্বরশ্চ ত্বয়া সহ ।
লক্ষ্মীযুক্তস্ত্বয়া লক্ষ্ম্যা নিশ্রীকশ্চাপি ত্বাং বিনা ॥ ৭৬ ॥
অহং পুমাংস্ত্বং প্রকৃতির্ন স্রষ্টাহং ত্বয়া বিনা ।
যথা নালং কুলালশ্চ ঘটং কত্বং মৃদা বিনা ॥ ৭৭ ॥
অহং শেষশ্চ কলয়া স্বাংশেন ত্বং বসুন্ধরা ।
ত্বাং শস্যরজাধারাণ্ড বিভর্মি মূর্ত্তি সূন্দরি ॥ ৭৮ ॥
ত্বং শান্তিশ্চ কান্তিশ্চ মূর্ত্তির্মূর্ত্তিমতী সতি ।
তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষমা লজ্জা ক্ষুণ্ণা চ পরা দয়া ॥ ৭৯ ॥
নিদ্রা শূদ্রা চ তন্দ্রা চ মূচ্ছা চ সন্ততিঃ ক্রিয়া ।
মূর্ত্তিরূপা ভক্তিরূপা দেহিনাং দুঃখরূপিণী ॥ ৮০ ॥
মমাধারা সদা ত্বং তবাত্মাহং পরস্পরম্ ।
যথা ত্বং তথাহং সমো প্রকৃতিপদরূষো ।
ন হি সৃষ্টিভবেন্দেবি দ্বয়োরেকতরং বিনা ॥ ৮১ ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে, ৬৭ অধ্যায়ঃ।*

“যেমন দুষ্ক ও ধবলতা, তেমনই যেখানে আমি, সেইখানে তুমি। তোমাতে আমাতে কখনও ভেদ হইবে না, ইহা নিশ্চিত। এই বিশ্বের সমস্ত স্ত্রী তোমার কলাংশের অংশকলা; যাহাই স্ত্রী, তাহাই তুমি; যাহাই পুরুষ, তাহাই আমি। কলা দ্বারা আমি বহি, তুমি প্রিয়া দাহিকা স্বাহা; তুমি সঙ্গে থাকিলে, আমি দক্ষ করিতে সমর্থ হই, তুমি না থাকিলে হই না। আমি দীপ্তমান-দিগের মধ্যে সূর্য্য, তুমি কলাংশে প্রভা; তুমি সঙ্গে থাকিলে আমি দীপ্তমান হই, তুমি না থাকিলে হই না। কলা দ্বারা আমি চন্দ্র, তুমি শোভা ও রোহিণী; তুমি সঙ্গে থাকিলে আমি মনোহর; হে সুন্দরি! তুমি না থাকিলে নই। হে সতি! আমি কলা দ্বারা ইন্দ্র, তুমি

* বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত সংস্করণ হইতে ইহা উদ্ধৃত করা গেল। মূলে কিছু গোলযোগ আছে বোধ হয়।

বাক্য রচনাবলী

গৌরী লক্ষ্মীমহাভাগা কেশবো বরুণঃ স্বয়ম্ ।
 শ্রীদেবসেনা বিপ্রেন্দ্র! দেবসেনাপতিহরিঃ ॥ ২৬ ॥
 অবষ্টম্ভো গদাপাণিঃ শক্তিলক্ষ্মীদ্বিজোত্তম! ।
 কাষ্ঠা লক্ষ্মীনিমেষোহসৌ মদুহর্তোহসৌ কলা তু সা ।
 জ্যোৎস্না লক্ষ্মীঃ প্রদীপোহসৌ সর্বঃ সর্বেশ্বরো হরিঃ ॥ ২৭ ॥
 লতাভূতা জগন্মাতা শ্রীবিষ্ণুদ্রুমসংস্থিতঃ ॥ ২৮ ॥
 বিভাবরী শ্রীদিবসো দেবচক্রগদাধরঃ ।
 বরপ্রদো বরো বিষ্ণুবধুঃ পদ্মবনালয়া ॥ ২৯ ॥
 নদস্বরূপো ভগবান্ শ্রীনদীরূপসংস্থিতঃ ।
 ধ্বজশ্চ পুন্ডরীকাক্ষঃ পতাকা কমলালয়া ॥ ৩০ ॥
 তৃষ্ণা লক্ষ্মীজ্জগৎস্বামী লোভো নারায়ণঃ পরঃ ।
 রতিরাগো চ ধর্মজ্ঞ! লক্ষ্মীগোবিন্দ এব চ ॥ ৩১ ॥
 কিণ্ডারিতবহুনোক্তেন সংক্ষেপেণেদমুচ্যতে ।
 দেবতির্য্যম্ননুষ্যাদৌ পুংনাম্নি ভগবান্ হরিঃ ।
 স্ত্রীনাম্নি লক্ষ্মীমৈত্রেয়! নানয়োবিদ্যতে পরম্ ॥ ৩২ ॥”
 শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেংশে অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

“বিষ্ণুর শ্রী সেই জগন্মাতা অক্ষয় এবং নিত্য। হে দ্বিজোত্তম! বিষ্ণু সর্বগত, ইনিও সেইরূপ। ইনি বাক্য, বিষ্ণু অর্থ; ইনি নীতি, হরি নয়; ইনি বুদ্ধি, বিষ্ণু বোধ; ইনি ধর্ম, ইনি সংক্রিয়া; বিষ্ণু স্রষ্টা, ইনি সৃষ্টি; শ্রী ভূমি, হরি ভূধর; ভগবান্ সন্তোষ, হে মৈত্রেয়! লক্ষ্মী শাস্বতী তুষ্টি; শ্রী ইচ্ছা, ভগবান্ কাম; তিনি যজ্ঞ, ইনি দক্ষিণা; জনান্দর্ন পুরোডাশ, দেবী আদ্যাহুতি; হে মদুনে! লক্ষ্মী পত্নীশালা, মধুসূদন প্রাণবংশ; হরি যুগ, লক্ষ্মী চিতি; ভগবান্ কুশ, শ্রী ইধ্মা; ভগবান্ সাম, কমলালয়া উদ্গাতি; লক্ষ্মী স্বাহা, জগন্নাথ বাসুদেব অগ্নি; ভগবান্ শোরি শঙ্কর, হে দ্বিজোত্তম! লক্ষ্মী গৌরী; হে মৈত্রেয়! কেশব সূর্য্য, কমলালয়া তাঁহার প্রভা; বিষ্ণু পিতৃগণ, পদ্মা নিত্যতুষ্টিদা স্বধা; শ্রী স্বর্গ, সর্বাত্মক বিষ্ণু অতিবিস্তৃত আকাশস্বরূপ; শ্রীধর চন্দ্র, শ্রী তাঁহার অক্ষয় কান্তি; লক্ষ্মী জগচ্চেষ্টা ধৃতি, বিষ্ণু সর্বত্রগ বায়ু; হে দ্বিজ! গোবিন্দ জর্লাধি, হে মহামতে! শ্রী তাঁহার বেলা; লক্ষ্মী ইন্দ্রাণী-স্বরূপা, মধুসূদন দেবেন্দ্র; চক্রধর সাক্ষাৎ যম, কমলালয়া ধুমোর্ণা; শ্রী ঋদ্ধি, শ্রীধর স্বয়ং দেব ধনেশ্বর; কেশব স্বয়ং বরুণ, মহাভাগা লক্ষ্মী গৌরী; হে বিপ্রেন্দ্র! শ্রী দেবসেনা, হরি দেব-সেনাপতি; গদাধর পুরুষকার, হে দ্বিজোত্তম! লক্ষ্মী শক্তি; লক্ষ্মী কাষ্ঠা, ইনি নিমেষ; ইনি মদুহর্ত, তিনি কলা; লক্ষ্মী আলোক, সর্বেশ্বর হরি সর্বপ্রদীপ; জগন্মাতা শ্রী লতাভূতা, বিষ্ণু দ্রুমরূপে সংস্থিত; শ্রী বিভাবরী, দেবচক্রগদাধর দিবস; বিষ্ণু বরপ্রদ বর, পদ্মবনালয়া বধু; ভগবান্ নদস্বরূপী, শ্রী নদীরূপা; পুন্ডরীকাক্ষ ধ্বজ, কমলালয়া পতাকা; লক্ষ্মী তৃষ্ণা, জগৎস্বামী নারায়ণ পরম লোভ; হে ধর্মজ্ঞ! লক্ষ্মী রতি, গোবিন্দ রাগ; অধিক উক্তির প্রয়োজন নাই, সংক্ষেপে বলিতেছি, দেব তির্য্যক্ মনুষ্যাদিতে পুংনাম্বিশিষ্ট হরি, এবং স্ত্রীনাম্বিশিষ্টা লক্ষ্মী। হে মৈত্রেয়! এই দুই ভিন্ন আর কিছুই নাই।”

বেদান্তের যাহা মায়াবাদ, সাংখ্যে তাহা প্রকৃতিবাদ। প্রকৃতি হইতে শক্তিবাদ। এই কয়টি শ্লোকে শক্তিবাদ এবং অদ্বৈতবাদ মিলিত হইল। বোধ হয়, ইহাই স্মরণ রাখিয়া ব্রহ্মবৈবর্তকার লিখিয়াছেন যে, কৃষ্ণ রাধাকে বলিতেছেন যে, তুমি না থাকিলে, আমি কৃষ্ণ, এবং তুমি থাকিলে আমি শ্রীকৃষ্ণ। বিষ্ণুপুরাণকথিত এই শ্রী লইয়াই তিনি শ্রীকৃষ্ণ। পাঠক দেখিবেন, বিষ্ণুপুরাণে যাহা শ্রী সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, ব্রহ্মবৈবর্তে রাধা সম্বন্ধে ঠিক তাহাই কথিত হইয়াছে। রাধা সেই শ্রী। পরিচ্ছেদের উপর আমি শিরোনাম দিয়াছি, “শ্রীরাধা”। রাধা ঈশ্বরের শক্তি, উভয়ের বিধিসম্পাদিত পরিণয়, শক্তিমানের শক্তির স্ফূর্তি, এবং শক্তিরই বিকাশ উভয়ের বিহার।

যে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ এক্ষণে বিদ্যমান আছে, তৎকথিত ‘রাধাতত্ত্ব’ কি, তাহা বোধ করি এতক্ষণে পাঠককে বঝাইতে পারিলাম। কিন্তু আদিম ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে ‘রাধাতত্ত্ব’ ছিল কি? বোধ হয় ছিল; কিন্তু এ প্রকার নহে। বর্তমান ব্রহ্মবৈবর্তে রাধা শব্দের ব্যুৎপত্তি অনেক প্রকার

দেওয়া হইয়াছে। তাহার দুইটি পদ্বর্ষে ফুটনোটে উদ্ধৃত করিয়াছি, আর একটি উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

“রেফো হি কোটিজন্মাঘং কৰ্মভোগং শ্ৰুভাশ্ৰুভম্।
আকারো গৰ্ভবাসণ্ড মৃত্যুণ্ড রোগমুৎসৃজেৎ ॥ ১০৬ ॥
ধকার আয়ুযো হানিমাকারো ভববন্ধনম্।
শ্রবণস্মরণোক্তিভ্যঃ প্রণশ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ১০৭ ॥
রাকারো নিশ্চলাং ভক্তিং দাস্যং কৃষ্ণপদাম্বুজে।
সর্ব্বস্পিতং সদানন্দং সর্ব্বসিকৌঘমীশ্বরম্ ॥ ১০৮ ॥
ধকারঃ সহবাসণ্ড তত্তুল্যকালমেব চ।
দদাতি সার্ঘ্যং সারুপ্যং তত্ত্বজ্ঞানং হরেঃ সমম্ ॥ ১০৯ ॥”

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুঁরাণম্, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ১৩ অঃ।

ইহার একটিও রাধা শব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তি নয়। রাধ্ ধাতু আরাধনার্থে, পূজার্থে। যিনি কৃষ্ণের আরাধিকা, তিনিই রাধা বা রাধিকা। বর্ত্তমান ব্রহ্মবৈবর্ত্তে এ ব্যুৎপত্তি কোথাও নাই। যিনি এই রাধা শব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তি গোপন করিয়া কতকগুলো অবৈয়াকরণিক কল কৌশলের দ্বারা ভ্রান্তি জন্মাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং ভ্রান্তির প্রতিপোষণার্থে মিথ্যা করিয়া সামবেদের দোহাই দিয়াছেন,* তিনি কখনও ‘রাধা’ শব্দের সৃষ্টিকারক নহেন। যিনি রাধা শব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তির অনুযায়িক হইয়া রাধারূপক রচনা করেন নাই, তিনি কখনও রাধার সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন। সেই জন্য বিবেচনা করি যে, আদিম ব্রহ্মবৈবর্ত্তেই রাধার প্রথম সৃষ্টি। এবং সেখানে রাধা কৃষ্ণারাধিকা আদর্শরূপিণী গোপী ছিলেন, সন্দেহ নাই।

রাধা শব্দের আর একটি অর্থ আছে—বিশাখানক্ষত্রের† একটি নাম রাধা। কৃত্তিকা হইতে বিশাখা চতুর্দশ নক্ষত্র। পদ্বর্ষে কৃত্তিকা হইতে বৎসর গণনা হইত। কৃত্তিকা হইতে রাশি গণনা করিলে বিশাখা ঠিক মাঝে পড়ে। অতএব রাসমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তিনী হউন বা না হউন, রাধা রাশিমণ্ডলের বা রাশমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী বটেন। এই ‘রাশমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী’ রাধার সঙ্গে ‘রাসমণ্ডলের’ রাধার কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা আসল ব্রহ্মবৈবর্ত্তের অভাবে স্থির করা অসাধ্য।

একাদশ পরিচ্ছেদ—বৃন্দাবনলীলার পরিসমাপ্তি

ভাগবতে বৃন্দাবনলীলা সম্বন্ধীয় আর কয়েকটা কথা আছে।

১ম, নন্দ এক দিন স্নান করিতে যমুনায় নামিলে, বরুণের অনুচর আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া বরুণালয়ে যায়। কৃষ্ণ সেখানে গিয়া নন্দকে লইয়া আসেন। শাদা কথায় নন্দ এক দিন জলে ডুবিয়াছিলেন, কৃষ্ণ তাঁহাকে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন।

২য়, একটা সাপ আসিয়া এক দিন নন্দকে ধরিয়াছিল। কৃষ্ণ সে সাপের মুখ হইতে নন্দকে মুক্ত করিয়া সর্পকে নিহত করিয়াছিলেন। সর্পটি বিদ্যাধর। কৃষ্ণস্পর্শে মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া স্বস্থানে গমন করে। শাদা কথায় কৃষ্ণ একদিন নন্দকে সর্পমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

৩য়, শঙ্খচূড় নামে একটা অসুর আসিয়া ব্রজাঙ্গনাদিগকে ধরিয়া লইয়া যায়। কৃষ্ণ বলরাম তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া ব্রজাঙ্গনাদিগকে মুক্ত করেন এবং শঙ্খচূড়কে বধ করেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুঁরাণে শঙ্খচূড়ের কথা ভিন্নপ্রকার আছে, তাহার কিয়দংশ পদ্বর্ষে বলিয়াছি।

৪র্থ, এই তিনটা কথা বিষ্ণুপুঁরাণে, হরিবংশে, বা মহাভারতে নাই। কিন্তু কৃষ্ণকৃত অরিষ্টাসুর ও কেশী অসুরের বধবৃত্তান্ত হরিবংশে ও বিষ্ণুপুঁরাণে আছে এবং মহাভারতে শিশুপালকৃত কৃষ্ণনিন্দায় তাহার প্রসঙ্গও আছে। অরিষ্ট বৃষরূপী এবং কেশী অশ্বরূপী। শিশুপাল ইহাদিগকে বৃষ ও অশ্ব বলিয়াই নির্দেশ করিতেছেন।

অতএব প্রথমোক্ত তিনটি বৃত্তান্ত ভাগবতকারপ্রণীত উপন্যাস বলিয়া উড়াইয়া দিলে অরিষ্ট-

* রাধাশব্দস্য ব্যুৎপত্তিঃ সামবেদে নির্ূপিতা।—১৩ অঃ, ১৫৩।

† রাধা বিশাখা পদ্বর্ষে তু সিধ্যতিষো শ্রবিষ্ঠয়া।—অমরকোষ।

বাংকম রচনাবলী

বধ ও কেশিবধকে সেরূপে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। বিশেষ এই কেশিবধবৃত্তান্ত অথর্ষ-সংহিতায় আছে বলিয়াছি। সেখানে কেশীকে কৃষ্ণকেশী বলা হইয়াছে। কৃষ্ণকেশী অর্থে যার কাল চুল। ঋগ্বেদসংহিতাতেও একটি কেশিসূক্ত আছে (দশম মণ্ডল, ১৩৬ সূক্ত)। এই কেশী দেব কে, তাহা অনিশ্চিত। ইহার চতুর্থ ও পঞ্চম ঋক্ হইতে এমন বৃথা যায় যে, হয়ত মূনিই কেশী-দেবতা। মূনিগণ লম্বা লম্বা চুল রাখতেন। ঐ দুই ঋকে মূনিগণেরই প্রশংসা করা হইতেছে। Muir সাহেবও সেইরূপ বর্ণিয়াছেন। কিন্তু প্রথম ঋকে, অন্যপ্রকার বৃথান হইয়াছে। প্রথম ঋক্ রমেশ বাবু এইরূপ বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়াছেন:—

“কেশী নামক যে দেব, তিনি অগ্নিকে, তিনিই জলকে, তিনি ভুলোক ও দ্যুলোককে ধারণ করেন। সমস্ত সংসারকে কেশীই আলোকের দ্বারা দর্শনযোগ্য করেন। এই যে জ্যোতি, ইহার নাম কেশী।”

তাহা হইলে, জগদ্ব্যঞ্জক যে জ্যোতি, তাহাই কেশী। এবং জগদাবরক যে জ্যোতি, তাহাই কৃষ্ণকেশী। কৃষ্ণ তাহারই নিধনকর্তা, অর্থাৎ কৃষ্ণ জগদাবরক তমঃ প্রতিহত করিয়াছিলেন।

এইখানে বৃন্দাবনলীলার পরিসমাপ্ত। এক্ষণে আলোচ্য যে, আমরা ইহার ভিতর পাইলাম কি? ঐতিহাসিক কথা কিছুই পাইলাম না বলিলেই হয়। এই সকল পৌরাণিক কথা অতিপ্রকৃত উপন্যাসে পরিপূর্ণ। তাহার ভিতর ঐতিহাসিক তত্ত্ব অতি দুর্লভ। আমরা প্রধানতঃ ইহাই পাইয়াছি যে, কৃষ্ণ সম্বন্ধে যে সকল প্রবাদ আছে—চোরবাদ এবং পরদারবাদ—সে সকলই অমূলক ও অলীক। ইহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য আমরা এত সবিস্তারে বৃন্দাবনলীলার সমালোচনা করিয়াছি। ঐতিহাসিক তত্ত্ব যদি কিছু পাইয়া থাকি, তবে সেটুকু এই,— অত্যাচারকারী কংসের ভয়ে বসুদেব আপন পত্নী রোহিণী এবং পুত্রদ্বয় রাম ও কৃষ্ণকে নন্দালয়ে গোপনে রাখিয়াছিলেন। কৃষ্ণ শৈশব ও কৈশোর সেইখানে অতিবাহিত করেন। তিনি শৈশবে রূপলাবণ্যে এবং শিশুসুলভ গুণসকলে সর্বজনের প্রিয় হইয়াছিলেন। কৈশোরে তিনি অতিশয় বলশালী হইয়াছিলেন এবং বৃন্দাবনের অনিষ্টকারী পশু প্রভৃতি হনন করিয়া গোপালগণকে সর্বদা রক্ষা করিতেন। তিনি শৈশবাবধিই সর্বজন এবং সর্বজীবে কারুণ্যপরিপূর্ণ—সকলের উপকার করিতেন। গোপালগণ প্রতি এবং গোপবালিকাগণ প্রতি তিনি স্নেহশালী ছিলেন। সকলের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ করিতেন এবং সকলকে সম্বুষ্ঠ রাখিতে চেষ্টা করিতেন, এবং কৈশোরেই প্রকৃত ধর্মতত্ত্বও তাহার হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। এতটুকু ঐতিহাসিক তত্ত্বও যে পাইয়াছি, ইহাও সাহস করিয়া বলিতে পারি না। তবে ইহাও বলিতে পারি যে, ইহার বেশি আর কিছু নয়।

তৃতীয় খণ্ড

মথুরা-দ্বারকা

যস্তনোতি সতাং সেতুমৃতেনামৃতযোনিয়া।

ধর্মার্থব্যবহারাস্তৈস্তস্মৈ সত্যাত্মনে নমঃ ॥

শান্তিপর্ব্বণি, ৪৭ অধ্যায়ঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ—কংসবধ

এদিকে কংসের নিকট সংবাদ পহঁছিল যে, বৃন্দাবনে কৃষ্ণ বলরাম অতিশয় বলশালী হইয়াছেন। পুতনা হইতে অরিষ্ট পর্য্যন্ত কংসানুচর সকলকে নিহত করিয়াছেন। দেবর্ষি নারদ গিয়া কংসকে বলিলেন, কৃষ্ণ-রাম বসুদেবের পুত্র। দেবকীর অষ্টমগর্ভজা বলিয়া যে কন্যাকে কংস নিহত করিয়াছিলেন, সে নন্দ-যশোদার কন্যা। বসুদেব সন্তান পরিবর্তিত করিয়া কৃষ্ণকে নন্দালয়ে গোপনে রাখিয়াছেন। ইহা শুনিয়া কংস ভীত ও ক্রুদ্ধ হইয়া বসুদেবকে তিরস্কৃত করিলেন, এবং তাঁহার বধে উদ্যত হইলেন; এবং রাম-কৃষ্ণকে আনিবার জন্য অকুরনামা এক জন যাদবপ্রধানকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন। এ দিকে কংস আপনার বিখ্যাত বলবান্ মল্লদিগের দ্বারা রাম-কৃষ্ণের বধসাধনের অভিপ্রায়ে ধনুর্মুখ নামে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। রাম-কৃষ্ণ অকুর কর্তৃক তথায় আনীত হইয়া* রঙ্গভূমিতে প্রবেশপূর্ব্বক কংসের শিক্ষিত হস্তী কুবলয়াপীড়কে ও লক্ষপ্রতিষ্ঠ মল্ল চাণুর ও মৃষ্টিককে নিহত করিলেন। ইহা দেখিয়া কংস নন্দকে লোহময় নিগড়ে অবরুদ্ধ করিবার এবং বসুদেবকে বিনাশ করিবার জন্য আদেশ করিয়া কৃষ্ণ-বলরামকে তাড়াইয়া দিবার আজ্ঞা করিলেন। তখন যে মণ্ডে মল্লযুদ্ধ দেখিবার জন্য অন্যান্য যাদবের সহিত কংস উপবিষ্ট ছিলেন, কৃষ্ণ লক্ষ্যপ্রদান-পূর্ব্বক তদুপরি আরোহণ করিয়া কংসকে ধরিলেন এবং তাঁহাকে কেশের দ্বারা আকর্ষণ করিয়া রঙ্গভূমে নিপতিত ও তাঁহাকে নিহত করিলেন। পরে বসুদেব দেবকী প্রভৃতি গুরুজনকে যথাবিহিত বন্দনা করিয়া কংসের পিতা উগ্রসেনকে রাজ্যে অভিষেক করিলেন। নিজে রাজা হইলেন না।

হরিবংশ ও পুরাণ সকলে এইরূপ কংসবধবৃত্তান্ত কথিত হইয়াছে। কংসবধ ঐতিহাসিক ঘটনা বটে, কিন্তু তদ্বিষয়ক এই বিবরণ ঐতিহাসিকতাশূন্য। ইহাতে বিশ্বাস করিতে গেলে, অতিপ্রকৃত ব্যাপারে বিশ্বাস করিতে হয়। প্রথমতঃ দেবর্ষি নারদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে হয়। তার পর সেই দৈববাণীতে বিশ্বাস করিতে হয়, কেন না, কংসের ভয় সেই দৈববাণীস্মৃতি হইতে উৎপন্ন। তাহা ছাড়া, দুইটি গোপবালক আসিয়া বিনা যুদ্ধে সভামধ্যে মথুরাধিপতিকে বিনষ্ট করিবে, ইহা ত সহজে বিশ্বাস করা যায় না। অতএব দেখা যাউক যে, সর্ব্বপ্রাচীন গ্রন্থ মহাভারতে এই বিষয় কি আছে। মহাভারতের সভাপর্ব্ব জরাসন্ধবধ-পর্ব্বাধ্যায়ে কৃষ্ণ নিজে নিজের পূর্ব্ববৃত্তান্ত যুধিষ্ঠিরের নিকট বলিতেছেনঃ—

* পৃথিমধ্যে কুব্জা-ঘটিত ব্যাপারটা আছে। বিষ্ণুপুরাণে নিন্দনীয় কথা কিছু নাই। কুব্জা আপনাকে সুন্দরী হইতে দেখিয়া কৃষ্ণকে নিজ মন্দিরে যাইতে অনুরোধ করিলেন, কৃষ্ণ হাসিয়াই অস্থির। বিষ্ণুপুরাণে এই পর্য্যন্ত। কৃষ্ণের এ ব্যবহার মানবোচিত ও সম্ভজনোচিত। কিন্তু ভাগবতকার ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তকার তাহাতে সন্তুষ্ট নহেন, কুব্জার হঠাৎ ভক্তির হঠাৎ পুরস্কার দিয়াছেন, শেষ যাত্রায় কুব্জা পাটরাণী!

আমরা এইখান হইতে ভাগবতের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। তাহার কারণ, ভাগবতে ঐতিহাসিক কথা কিছুই পাওয়া যায় না; যাহা পাওয়া যায়, তাহা বিষ্ণুপুরাণেও আছে। তদতিরিক্ত যাহা পাওয়া যায়, তাহা অতিপ্রকৃত উপন্যাস মাত্র। তবে ভাগবতকথিত বাল্যলীলা অতি প্রসিদ্ধ বলিয়া, আমরা ভাগবতের সে অংশের পরিচয় দিতে বাধ্য হইয়াছি। এক্ষণে ভাগবতের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে পারি।

বিক্রম রচনাবলী

“কিয়ংকাল অতীত হইল, কংস* যাদবগণকে পরাভূত করিয়া সহদেবা ও অনুজা নামে বাহুদ্রথের দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল। ঐ দুরাগ্না স্বীয় বাহুবলে জ্ঞাতিবর্গকে পরাজয় করত সর্বাপেক্ষা প্রধান হইয়া উঠিল। ভোজবংশীয় বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণ মৃত্যুমুখী কংসের দৌরাগ্ন্যে সান্তিশয় ব্যথিত হইয়া জ্ঞাতিবর্গকে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমি তৎকালে অক্ষুরকে আহুক-কন্যা প্রদান করিয়া জ্ঞাতিবর্গের হিতসাধনার্থ বলভদ্র সমাভিব্যাহারে কংস ও সুনামাকে সংহার করিলাম।”

ইহাতে কৃষ্ণ বলরাম বৃন্দাবন হইতে আনীত হওয়ার কথা কিছুমাত্র নাই। বরং এমন বুদ্ধাইতেছে যে, কংসবধের পূর্বে হইতেই কৃষ্ণ বলরাম মথুরাতে বাস করিতেন। কৃষ্ণ বলিতেছেন যে, বৃদ্ধ যাদবেরা জ্ঞাতিবর্গকে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত তাহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। কৃষ্ণ তাহা না করিয়া জ্ঞাতিদিগের মঙ্গলার্থ কংসকেই বধ করিলেন। ইহাতে বলরাম ভিন্ন আর কেহ তাহার সহায় ছিল কি না, ইহা প্রকাশ নাই। কিন্তু ইহা স্পষ্ট বুদ্ধাইতে পারিতেছে যে, অন্যান্য যাদবগণ প্রকাশ্যে তাহাদের সাহায্য করুন বা না করুন, কংসকে কেহ রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন নাই। কংস তাহাদের সকলের উপর অত্যাচার করিত, এজন্য বরং বোধ হয়, তাহারাই রাম-কৃষ্ণের বলাধিক্য দেখিয়া তাহাদিগকে নেতৃত্বে সংস্থাপন করিয়া কংসের বধসাধন করিয়াছিলেন। এইটুকু ভিন্ন আর কিছু ঐতিহাসিক তত্ত্ব পাওয়া যায় না।

আর ঐতিহাসিক তত্ত্ব ইহা পাওয়া যায় যে, কৃষ্ণ কংসকে নিহত করিয়া কংসের পিতা উগ্রসেনকেই যাদবদিগের আধিপত্যে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। কেন না, মহাভারতেও উগ্রসেনকে যাদবদিগের আধিপতি স্বরূপ বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়। এ দেশের চিরপ্রচলিত রীতি ও নীতি এই যে, যে রাজাকে বধ করিতে পারে, সেই তাহার রাজ্যভোগী হয়। কংসের বিজেতা কৃষ্ণ অনায়াসেই মথুরার সিংহাসন অধিকৃত করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না, কেন না, ধর্ম্মতঃ সে রাজ্য উগ্রসেনের। উগ্রসেনকে পদচ্যুত করিয়াই কংস রাজা হইয়াছিল। ধর্ম্মই কৃষ্ণের নিকট প্রধান, তিনি শৈশবাবধিই ধর্ম্মাত্মা। অতএব যাহার রাজ্য, তাহাকেই তিনি রাজ্য প্রদান করিলেন। তিনি ধর্ম্মানুরুদ্ধ হইয়াই কংসকে নিহত করিয়াছিলেন। আমরা পরে দেখিব যে, তিনি প্রকাশ্যে বলিতেছেন যে, যাহাতে পরহিত, তাহাই ধর্ম্ম। এখানে ঘোরতর অত্যাচারী কংসের বধে সমস্ত যাদবগণের হিতসাধন হয়, এই জন্য তিনি কংসকে বধ করিয়াছিলেন—ধর্ম্মার্থ মাত্র। বধ করিয়া করুণহৃদয় আদর্শপুরুষ কংসের জন্য বিলাপ করিয়াছিলেন, এমন কথা গ্রন্থে লিখিত আছে। এই কংসবধে আমরা প্রথমে প্রকৃত ইতিহাসের সাক্ষাৎ পাই এবং এই কংসবধেই দেখি যে, কৃষ্ণ পরম বলশালী, পরম কার্যদক্ষ, পরম ন্যায়পর, পরম ধর্ম্মাত্মা, পরহিতে রত, এবং পরের জন্য কাতর। এইখান হইতে দেখিতে পাই যে, তিনি আদর্শ মানুষ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—শিক্ষা

পূরাণে কথিত হইয়াছে যে, কংসবধের পর কৃষ্ণ বলরাম কাশীতে সান্দীপনি ঋষির নিকট শিক্ষার্থে গমন করিলেন, এবং চতুঃষষ্টিদিবসমধ্যে শস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া গুরুদক্ষিণা প্রদানান্তে মথুরায় প্রত্যাগমন করিলেন।

কৃষ্ণের শিক্ষা সম্বন্ধে ইহা ছাড়া আর কিছু পূরাণেইতিহাসে পাওয়া যায় না। নন্দালয়ে তাহার কোনও প্রকার শিক্ষা হওয়ার কোন প্রসঙ্গ কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। অথচ নন্দ জ্ঞাতিতে বৈশ্য ছিলেন, বৈশ্যদিগের বেদে অধিকার ছিল। বৈশ্যালয়ে তাহাদিগের কোনও প্রকার বিদ্যাশিক্ষা না হওয়া বিচিত্র বটে। বোধ হয়, শিক্ষার সময় উপস্থিত হইবার পূর্বেই তিনি

* কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করিলাম, কিন্তু বলিতে বাধ্য, এই অনুবাদে আছে “দানবরাজ কংস।” মূলে তাহা নাই, যথা—

কস্যচিৎকথ কালস্য কংসো নির্মথ্য যাদবান্।

সুতরাং “দানবরাজ” শব্দ তুলিয়া দিয়াছি।

নন্দালয় হইতে মথুরায় পুনরানীত হইয়াছিলেন। পূর্বে-পরিচ্ছেদে মহাভারত হইতে যে কৃষ্ণবাক্য উদ্ধৃত করা গিয়াছে, তাহা হইতে এরূপ অনুমানই সঙ্গত যে, কংসবধের অনেক পূর্বে হইতেই তিনি মথুরায় বাস করিতেছিলেন, এবং মহাভারতের সভাপর্বে শিশুপালকৃত কৃষ্ণ-নিন্দায় দেখা যায় যে, শিশুপাল তাঁহাকে কংসের অনভোজী বলিতেছে—

“যস্য চানেন ধর্মজ্ঞ ভুক্তম্নং বলীয়সঃ।

স চানেন হতঃ কংস ইত্যেতন্ন মহাস্তুতং ॥”

মহাভারতম্, সভাপর্বে, ৪০ অধ্যায়ঃ।

অতএব বোধ হয়, শিক্ষার সময় উপস্থিত হইতে না হইতেই কৃষ্ণ মথুরায় আনীত হইয়াছিলেন। বৃন্দাবনের গোপীদিগের সঙ্গে প্রথিত কৈশোরলীলা যে উপন্যাস মাত্র, ইহা তাহার অন্যতর প্রমাণ।

মথুরাবাসকালেও তাহার কিরূপ শিক্ষা হইয়াছিল, তাহারও কোন বিশিষ্ট বিবরণ নাই। কেবল সান্দীপনি মূনির নিকট চতুঃষষ্টি দিবস অশিক্ষার কথাই আছে। যাঁহারা কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া জানেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিতে পারেন, সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের আবার শিক্ষার প্রয়োজন কি? তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, তবে চতুঃষষ্টি দিবস সান্দীপনিগৃহে শিক্ষারই বা প্রয়োজন কি? ফলতঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার হইলেও মানবধর্মাবলম্বী এবং মানুষী শক্তি দ্বারাই সকল কার্য সম্পন্ন করেন, এ কথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি এবং এক্ষণেও তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখাইব। মানুষী শক্তি দ্বারা কর্ম করিতে গেলে, শিক্ষার দ্বারা সেই মানুষী শক্তিকে অনুশীলিত এবং স্ফূর্তিত করিতে হয়। যদি মানুষী শক্তি স্বতঃস্ফূর্তিত হইয়া সর্বকার্যসাধনক্ষম হয়, তাহা হইলে সে ঐশী শক্তি—মানুষী শক্তি নহে। কৃষ্ণের যে মানুষী শিক্ষা হইয়াছিল, তাহা এই সান্দীপনিবৃত্তান্ত ভিন্ন আরও প্রমাণ আছে। তিনি সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। মহাভারতের সভাপর্বে অর্ঘ্যভিহরণ-পর্বাধ্যায়ে কৃষ্ণের পূজ্যতা বিষয়ে ভীষ্ম একটি হেতু এই নির্দেশ করিতেছেন যে, কৃষ্ণ নিখিল বেদবেদাঙ্গপারদর্শী। তাদৃশ বেদবেদাঙ্গজ্ঞানসম্পন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি দুর্লভ।

“বেদবেদাঙ্গবিজ্ঞানং বলং চাপ্যধিকং তথা।

নুগাং লোকে হি কোহন্যোহস্তি বিশিষ্টঃ কেশবাদতে ॥”

মহাভারতম্, সভাপর্বে, ৩৮ অধ্যায়ঃ।

মহাভারতে কৃষ্ণের বেদজ্ঞতা সম্বন্ধে এইরূপ আরও ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। এই বেদজ্ঞতা তাহার স্বতঃলব্ধও নহে। ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রমাণ পাইয়াছি যে, তিনি আঙ্গিরস-বংশীয় ঘোর ঋষির নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

সে সময়ে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দিগের উচ্চশিক্ষার উচ্চাংশকে তপস্যা বলিত। শ্রেষ্ঠ রাজর্ষিগণ কোন সময়ে না কোন সময়ে তপস্যা করিয়াছিলেন, এইরূপ কথা প্রায় পাওয়া যায়। আমরা এক্ষণে তপস্যা অর্থে যাহা বুঝি, বেদের অনেক স্থানেই দেখা যায় যে, তপস্যার প্রকৃত অর্থ তাহা নহে। আমরা বুঝি, তপস্যা অর্থে বনে বসিয়া চক্ষু বুজিয়া নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া পানাহার ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের ধ্যান করা। কিন্তু দেবতাদিগের মধ্যে কেহ কেহ এবং মহাদেবও তপস্যা করিয়াছিলেন, ইহাও কোন কোন গ্রন্থে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ শতপথব্রাহ্মণে আছে যে, স্বয়ং পরব্রহ্ম সিসৃক্ষু হইলে তপস্যার দ্বারাই সৃষ্টি করিলেন, যথা—

সোহকাময়ত। বহুঃ স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোহতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্বমসৃজত।*

অর্থ,—“তিনি ইচ্ছা করিলেন, আমি প্রজাসৃষ্টির জন্য বহু হইব। তিনি তপস্যা করিলেন। তপস্যা করিয়া এই সকল সৃষ্টি করিয়াছিলেন।”

এ সকল স্থানে তপস্যা অর্থে এই রকমই বুঝিতে হয় যে, চিন্তা সমাহিত করিয়া আপনার শক্তি সকলের অনুশীলন ও স্ফূরণ করা। মহাভারতে কথিত আছে যে, কৃষ্ণ দশ বৎসর হিমালয় পর্বতে তপস্যা করিয়াছিলেন। মহাভারতের ঐশিক পর্বে লিখিত আছে যে, অশ্বথামাপ্রযুক্ত ব্রহ্মশিরা অশ্রের দ্বারা উত্তরার গর্ভপাতের সম্ভাবনা হইলে, কৃষ্ণ সেই মর্তিশিশুকে

* ২ বঙ্গী, ৬ অনুবাক।

বাংকম রচনাবলী

পুনরুজ্জীবিত করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছিলেন, এবং তখন অশ্বখামাকে বলিয়াছিলেন যে, তুমি আমার তপোবল দেখিবে।

আদর্শ মনুষ্যের শিক্ষা আদর্শ শিক্ষাই হইবে। ফলও সেইরূপ দেখি। কিন্তু সেই প্রাচীন কালের আদর্শ শিক্ষা কিরূপ ছিল, তাহা কিছুর জানিতে পারা গেল না, ইহা বড় দুঃখের বিষয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—জরাসন্ধ

সকল সময়েই দেখা যায় যে, ভারতবর্ষে, অন্ততঃ ভারতবর্ষের উত্তরার্ধে এক এক জন সম্রাট ছিলেন, তাঁহার প্রাধান্য অন্য রাজগণ স্বীকার করিত। কেহ বা করদ, কেহ বা আজ্ঞানুবর্তী, এবং যুদ্ধকালে সকলেই সহায় হইত। ঐতিহাসিক সময়ে চন্দ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য, অশোক, মহাপ্রতাপশালী গুপ্তবংশীয়েরা, হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য, এবং আধুনিক সময় পাঠান ও মোগল—ইহারা এইরূপ সম্রাট ছিলেন। হিন্দুরাজ্যকালে অধিকাংশ সময়ই এই আধিপত্য মগধাধিপতিরই ছিল। আমরা যে সময়ের বর্ণনায় উপস্থিত, সে সময়েও মগধাধিপতি উত্তর-ভারতে সম্রাট। এই সম্রাট বিখ্যাত জরাসন্ধ। তাঁহার বল ও প্রতাপ মহাভারতে, হরিবংশে ও পুরাণ সকলে অতিশয় বিস্তারের সহিত বর্ণিত হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ একত্র হইয়াছিল। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধেও উভয় পক্ষের মোটে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা উপস্থিত ছিল, লেখা আছে। একা জরাসন্ধের বিংশতি অক্ষৌহিণী সেনা ছিল লিখিত হইয়াছে।

কংস এই জরাসন্ধের জামাতা। কংস তাঁহার দুই কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। কংসবধের পর তাঁহার বিধবা কন্যাদ্বয় জরাসন্ধের নিকটে গিয়া পতিহস্তার দমনার্থ রোদন করেন। জরাসন্ধ কৃষ্ণের বধার্থ মহাসৈন্য লইয়া আসিয়া মথুরা অবরোধ করেন। জরাসন্ধের অসংখ্য সৈন্যের তুলনায় যাদবদিগের সৈন্য অতি অল্প। তথাপি কৃষ্ণের সেনাপতিত্বগুণে যাদবেরা জরাসন্ধকে বিমুখ করিয়াছিলেন। কিন্তু জরাসন্ধের বলক্ষয় করা তাঁহাদের অসাধ্য। কেন না, জরাসন্ধের সৈন্য অগণ্য। অতএব জরাসন্ধ পুনঃপুনঃ আসিয়া মথুরা অবরোধ করিতে লাগিল। যদিও সে পুনঃপুনঃ বিমুখীকৃত হইল, তথাপি এই পুনঃপুনঃ আক্রমণে যাদবদিগের গুরুতর অশুভ উৎপাদনের সম্ভাবনা হইল। যাদবদিগের ক্ষুদ্র সৈন্য পুনঃপুনঃ যুদ্ধে ক্ষয় হইতে লাগিলে তাঁহারা সৈন্যাশূন্য হইবার উপক্রম হইলেন। কিন্তু সমুদ্রে জোয়ার-ভাটার ন্যায় জরাসন্ধের অগাধ সৈন্যের ক্ষয়বৃদ্ধি কিছুর জানিতে পারা গেল না। এইরূপ সপ্তদশ বার আক্রান্ত হওয়ার পর, যাদবেরা কৃষ্ণের পরামর্শানুসারে মথুরা ত্যাগ করিয়া দুরাক্রম্য প্রদেশে দুর্গনির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করিবার অভিপ্রায় করিলেন। অতএব সাগরদ্বীপ দ্বারকায় যাদবদিগের জন্য পুরী নির্ম্মাণ হইতে লাগিল এবং দুরারোহ রৈবতক পর্ব্বতে দ্বারকা রক্ষার্থে দুর্গাশ্রেণী সংস্থাপিত হইল। কিন্তু তাঁহারা দ্বারকা যাইবার পূর্ব্বেই জরাসন্ধ অষ্টাদশ বার মথুরা আক্রমণ করিতে আসিলেন।

এই সময়ে জরাসন্ধের উত্তেজনায় আর এক প্রবল শত্রু কৃষ্ণকে আক্রমণ করিবার জন্য উপস্থিত হইল। অনেক গ্রন্থেই দেখা যায় যে, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে স্থানে স্থানে যবনদিগের রাজত্ব ছিল। এক্ষণকার পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রাচীন গ্রীকদিগকেই ভারতবর্ষীয়েরা যবন বলিতেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত বিশুদ্ধ কি না, তদ্বিষয়ে অনেক সন্দেহ আছে। বোধ হয়, শক, হুণ, গ্রীক প্রভৃতি অহিন্দু সভ্য জাতিমাত্রকেই যবন বলিতেন। যাহাই হউক, ঐ সময়ে, কালযবন নামে একজন যবন রাজা ভারতবর্ষে অতি প্রবলপ্রতাপ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া সসৈন্যে মথুরা অবরোধ করিলেন। কিন্তু পরমসমরহস্যবিৎ কৃষ্ণ তাঁহার সহিত সসৈন্যে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। কেন না, ক্ষুদ্র যাদবসেনা তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বিমুখ করিলেও, সংখ্যায় বড় অল্প হইয়া যাইবে। হতাবশিষ্ট যাহা থাকিবে, তাহারা জরাসন্ধকে বিমুখ করিতে সক্ষম হইতে না পারে। আর ইহাও পশ্চাৎ দেখিব যে, সর্ব্বভূতে দয়াময় কৃষ্ণ প্রাণিহত্যা পক্ষে ধর্ম্ম্য প্রয়োজন ব্যতীত অন্যরূপ প্রকাশ করেন না। যুদ্ধ অনেক সময়েই ধর্ম্মানুমোদিত, সে সময়ে যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত হইলে, ধর্ম্মের হানি হয়, গীতায় কৃষ্ণ এই মতই প্রকাশ করিয়াছেন। এবং এখানেও কালযবন এবং জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধ ধর্ম্ম্য যুদ্ধ। আত্মরক্ষার্থ এবং স্বজনরক্ষার্থ, প্রজাগণের রক্ষার্থ যুদ্ধ না করা ঘোরতর অধর্ম্ম। কিন্তু যদি

যুদ্ধ করিতেই হইল, তবে যত অল্প মনুষ্যের প্রাণহানি করিয়া কার্য সম্পন্ন করা যায়, ধার্মিকের তাহাই কর্তব্য। আমরা মহাভারতের সভাপর্বে জরাসন্ধবধ-পর্বাধ্যায়ে দেখিব যে, যাহাতে অন্য কোন মনুষ্যের জীবন হানি না হইয়া জরাসন্ধবধ সম্পন্ন হয়, কৃষ্ণ তাহার সদুপায় উদ্ভূত করিয়াছিলেন। কালযবনের যুদ্ধেও তাহাই করিলেন। তিনি সসৈন্যে কালযবনের সম্মুখীন না হইয়া কালযবনের বধার্থ কৌশল অবলম্বন করিলেন। একাকী কালযবনের শিবিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কালযবন তাঁহাকে চিনিতে পারিল। কৃষ্ণকে ধরিবার জন্য হাত বাড়াইল, কৃষ্ণ ধরা না দিয়া পলায়ন করিলেন। কালযবন তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইল। কৃষ্ণ যেমন বেদে বা যুদ্ধবিদ্যায় সুপাণ্ডিত, শারীরিক ব্যায়ামেও তদ্রূপ সুপারগ। আদর্শ মনুষ্যের এইরূপ হওয়া উচিত, আমি “ধর্মতত্ত্বে” দেখাইয়াছি। অতএব কালযবন কৃষ্ণকে ধরিতে পারিলেন না। কৃষ্ণ কালযবন কর্তৃক অনুসৃত হইয়া এক গিরিগুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কথিত আছে, সেখানে মচুকুন্দ নামে এক ঋষি নিদ্রিত ছিলেন। কালযবন গুহাঙ্ককারমধ্যে কৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া, সেই ঋষিকেই কৃষ্ণভ্রমে পদাঘাত করিল। পদাঘাতে উন্মিষ্ট হইয়া ঋষি কালযবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র কালযবন ভস্মীভূত হইয়া গেল।

এই অতিপ্রকৃত ব্যাপারটাকে আমরা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। স্থূল কথা এই বৃদ্ধি যে, কৃষ্ণ কৌশলাবলম্বনপূর্বক কালযবনকে তাহার সৈন্য হইতে দূরে লইয়া গিয়া, গোপন স্থানে তাহার সঙ্গে দ্বৈরথ্য যুদ্ধ করিয়া তাহাকে নিহত করিয়াছিলেন। কালযবন নিহত হইলে, তাহার সৈন্য সকল ভঙ্গ দিয়া মথুরা পরিত্যাগ করিয়া গেল। তাহার পর জরাসন্ধের অষ্টাদশ আক্রমণ, —সে বারও জরাসন্ধ বিমুখ হইল।

উপরে যে রূপ বিবরণ লিখিত হইল, তাহা হরিবংশে ও বিষ্ণুর্বাদিপুুরাণে আছে। মহাভারতে জরাসন্ধের যে রূপ পরিচয় কৃষ্ণ স্বয়ং যুধিষ্ঠিরের কাছে দিয়াছেন, তাহাতে এই অষ্টাদশ বার যুদ্ধের কোন কথাই নাই। জরাসন্ধের সঙ্গে যে যাদবদিগের যুদ্ধ হইয়াছিল, এমন কথাও স্পষ্টতঃ নাই। যাহা আছে, তাহাতে কেবল এইটুকু বৃদ্ধি যায় যে, জরাসন্ধ মথুরা একবার আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু হংস নামক তাঁহার অনুগত কোন বীর বলদেব কর্তৃক নিহত হওয়ায় জরাসন্ধ দুঃখিত মনে স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছিলেন। সেই স্থান আমরা উদ্ধৃত করিতেছি :—

“কিয়ৎকাল অতীত হইল, কংস যাদবগণকে পরাভূত করিয়া সহদেবা ও অনুজা নামে বাহুদ্রথের দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল। ঐ দুরাগ্নী স্বীয় বাহুবলে জ্ঞাতিবর্গকে পরাজয় করত সর্বাপেক্ষা প্রধান হইয়া উঠিল। ভোজবংশীয় বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণ মূঢ়মতি কংসের দৌরাগ্ন্যে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া জ্ঞাতিবর্গকে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমি তৎকালে অকুরকে আহুককন্যা প্রদান করিয়া জ্ঞাতিবর্গের হিতসাধনার্থ বলভদ্র সমাভিব্যাহারে কংস ও সুনামাকে সংহার করিলাম। তাহাতে কংসভয় নিবারণ হইল বটে, কিন্তু কিছুদিন পরেই জরাসন্ধ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিল। তখন আমরা জ্ঞাতি বন্ধুগণের সহিত একত্র হইয়া পরামর্শ করিলাম যে, যদি আমরা শত্রুনাশক মহামুদ্র দ্বারা তিন শত বৎসর অবিশ্রামে জরাসন্ধের সৈন্য বধ করি, তথাপি নিঃশেষিত করিতে পারিব না। দেবতুল্য তেজস্বী মহাবলপরাক্রান্ত হংস ও ডিম্বক নামক দুই বীর তাহার অনুগত আছে; উহারা অপ্রাঘাতে কদাচ নিহত হইবে না। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ঐ দুই বীর এবং জরাসন্ধ এই তিন জন একত্র হইলে ত্রিভুবন বিজয় করিতে পারে। হে ধর্মরাজ! এই পরামর্শ কেবল আমাদের অভিমত হইল এমত নহে, অন্যান্য ভূপতিগণও উহাতে অনুমোদন করিবেন।

হংস নামে সুবিখ্যাত এক নরপতি ছিলেন। বলদেব তাঁহাকে সংগ্রামে সংহার করেন। ডিম্বক লোকমুখে হংস মরিয়াছে, এই কথা শ্রবণ করিয়া নামসাদৃশ্যপ্রযুক্ত তাহার সহচর হংস নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া স্থির করিল। পরে হংস বিনা আমার জীবন ধারণে প্রয়োজন নাই, এই বিবেচনা করত যমুনায়া নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। এ দিকে তৎ-সহচর হংসও পরম প্রণয়স্পদ ডিম্বককে আপন মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে প্রাণত্যাগ করিতে শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া যমুনাতে আত্মসমর্পণ করিল। জরাসন্ধ এই দুই বীর পুরুষের নিধনবার্তা শ্রবণে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও শূন্যমনা হইয়া স্বনগরে প্রস্থান করিলেন। জরাসন্ধ বিমনা হইয়া স্বপূরে গমন করিলে পর আমরা পরমাহ্বাদে মথুরায় বাস করিতে লাগিলাম।

বাংকম রচনাবলী

কিয়াদিনাস্তুর পতিবিয়োগ-দুঃখিনী জরাসন্ধনন্দিনী স্বীয় পিতার সমীপে আগমন পূর্বেক 'আমার পাতহস্তকে সংহার কর' বালিয়া বারংবার তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমরা পূর্বেই জরাসন্ধের বলাবল্যের বিষয় স্থির করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা স্মরণ করতঃ সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলাম। তখন আমরা আমাদের বিপুল ধনসম্পত্তি বিভাগ করতঃ সকলে কিছ, কিছ, লইয়া প্রস্থান কারব, এই স্থির করিয়া স্বস্থান পারত্যাগ পূর্বেক পশ্চিমাদিকে পলায়ন করলাম। ঐ পশ্চিম দেশে রৈবতোপশোভিত পরম রমণীয় কুশস্থলীনাম্নী পুরীতে বাস করিতেছি—তথায় এরূপ দুর্গসংস্কার করিয়াছি যে, সেখানে থাকিয়া বৃষ্ণবংশীয় মহারথাদিগের কথা দূরে থাকুক, স্ত্রীলোকেরাও অনায়াসে যুদ্ধ করিতে পারে। হে রাজন্! এক্ষণে আমরা অকুতোভয়ে ঐ নগরীমধ্যে বাস করিতেছি। মাধবগণ সমস্ত মগধদেশব্যাপী সেই সর্বশ্রেষ্ঠ রৈবতক পর্বত দোখিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন। হে কুরুকুলপ্রদীপ! আমরা সামর্থ্যযুক্ত হইয়াও জরাসন্ধের উপদ্রবভয়ে পর্বত আশ্রয় করিয়াছি। ঐ পর্বত দৈর্ঘ্য তিন যোজন, প্রস্থে এক যোজনের অধিক এবং একবিংশতি শৃঙ্গযুক্ত। উহাতে এক এক যোজনের পর শত শত দ্বার এবং অত্যুকৃষ্ট উন্নত তোরণ সকল আছে। যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাবলপরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়গণ উহাতে সর্বদা বাস করিতেছেন। হে রাজন্! আমাদের কুলে অষ্টাদশ সহস্র ভ্রাতা আছে। আহুকের একশত পুত্র, তাহারা সকলেই অমরতুল্য। চারুদেশ ও তাহার ভ্রাতা, চক্রদেব, সাত্যকি, আমি, বলভদ্র, যুদ্ধবিশারদ শাম্ব—আমরা এই সাত জন রথী; কৃতকর্মা, অনাধৃষ্টি, সমীক, সর্মিতঞ্জয়, কক্ষ, শঙ্কু ও কুন্তি, এই সাত জন মহারথ, এবং অন্ধকভোজের দুই বৃদ্ধ পুত্র ও রাজা এই মহাবলপরাক্রান্ত দৃঢ়কলেবর দশ জন মহাবীর,—ইহারা সকলেই জরাসন্ধাধিকৃত মধ্যম দেশ স্মরণ করিয়া যদুবংশীয়দিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন।”

এই জরাসন্ধবধ-পর্ব্বাধ্যায় প্রধানতঃ মৌলিক মহাভারতের অংশ বলিয়া আমার বিশ্বাস। দুএকটা কথা প্রক্ষিপ্ত থাকিতে পারে, কিন্তু অধিকাংশই মৌলিক। যদি তাহা সত্য হয়, তাহা হইলে, কৃষ্ণের সহিত জরাসন্ধের বিরোধ-বিষয়ে উপরি উক্ত বৃত্তান্তই প্রামাণিক বলিয়া আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে। কেন না, পূর্বে বৃদ্ধাইয়াছি যে, হরিবংশ এবং পুরাণ সকলের অপেক্ষা মহাভারতের মৌলিকাংশ অনেক প্রাচীন। যদি এ কথা যথার্থ হয়, তবে জরাসন্ধকৃত অষ্টাদশ বার মথুরা আক্রমণ এবং অষ্টাদশ বার তাহার পরাভব, এ সমস্তই মিথ্যা গল্প। প্রকৃত বৃত্তান্ত এই হইতে পারে যে, একবারমাত্র সে মথুরা আক্রমণে আসিয়াছিল এবং নিষ্ফল হইয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল। দ্বিতীয়বার আক্রমণের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু কৃষ্ণ দেখিলেন যে, চতুর্দিকে সমতল ভূমির মধ্যবর্তী মথুরা নগরীতে বাস করিয়া জরাসন্ধের অসংখ্যসৈন্যকৃত পুনঃপুনঃ অবরোধ নিষ্ফল করা অসম্ভব। অতএব যেখানে দুর্গনির্ম্মাণপূর্বেক দুর্গাশ্রয়ে ক্ষুদ্র সেনা রক্ষা করিয়া জরাসন্ধকে বিমুখ করিতে পারিবেন, সেইখানে রাজধানী তুলিয়া লইয়া গেলেন। দেখিয়া জরাসন্ধ আর সে দিকে ঘেঁষিলেন না। জয়-পরাজয়ের কথা ইহাতে কিছই নাই। ইহাতে কেবল ইহাই বৃদ্ধা যায় যে, যুদ্ধকৌশলে কৃষ্ণ পারদর্শী, তিনি পরম রাজনীতিজ্ঞ এবং অনর্থক মনুষ্যহত্যার নিতান্ত বিরোধী। আদর্শ মনুষ্যের সমস্ত গুণ তাহাতে ক্রমশঃ পরিষ্ফুট হইতেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—কৃষ্ণের বিবাহ

কৃষ্ণের প্রথম ভার্য্যা রুক্মিণী। ইনি বিদর্ভরাজ্যের অধিপতি ভীষ্মকের কন্যা। তিনি অতিশয় রূপবতী এবং গুণবতী শুনিয়া কৃষ্ণ ভীষ্মকের নিকট রুক্মিণীকে বিবাহার্থ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। রুক্মিণীও কৃষ্ণের অনুরক্তা হইয়াছিলেন। কিন্তু ভীষ্মক কৃষ্ণশত্রু জরাসন্ধের পরামর্শে রুক্মিণীকে কৃষ্ণে সমর্পণ করিতে অসম্মত হইলেন। তিনি কৃষ্ণদেবক শিশুপালের সঙ্গে রুক্মিণীর বিবাহ স্থির করিয়া দিনাবধারণপূর্বেক সমস্ত রাজগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। যাদবগণের নিমন্ত্রণ হইল না। কৃষ্ণ স্থির করিলেন, যাদবদিগকে সঙ্গে লইয়া ভীষ্মকের রাজধানীতে যাইবেন এবং রুক্মিণীকে তাহার বন্ধুবর্গের অসম্মতিতেও গ্রহণ করিয়া বিবাহ করিবেন।

কৃষ্ণ তাহাই করিলেন। বিবাহের দিনে রুক্মিণী দেবারাধনা করিয়া দেবমন্দির হইতে বাহির

হইলে পর, কৃষ্ণ তাঁহাকে লইয়া রথে তুলিলেন। ভীষ্মক ও তাঁহার পুত্রগণ এবং জরাসন্ধ প্রভৃতি ভীষ্মকের মিত্ররাজগণ কৃষ্ণের আগমনসংবাদ শুনিয়াই এইরূপ একটা কাণ্ড উপস্থিত হইবে বুঝিয়াছিলেন। অতএব তাঁহারা প্রস্তুত ছিলেন। সৈন্য লইয়া সকলে কৃষ্ণের পশ্চাৎ ধাবত হইলেন। কিন্তু কেহই কৃষ্ণকে ও যাদবগণকে পরাভূত করিতে পারিলেন না। কৃষ্ণ রুক্মিণীকে দ্বারকায় লইয়া গিয়া যথাশাস্ত্র বিবাহ করিলেন।

ইহাকে 'হরণ' বলে। হরণ অর্থে কন্যার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার বুঝায় না। কন্যার যদি পাত্র অভিমত হয়, এবং সে বিবাহে সে সম্মত থাকে, তবে তাহার প্রতি কি অত্যাচার? রুক্মিণী-হরণেও সে দোষ ঘটে নাই, কেন না, রুক্মিণী কৃষ্ণে অনুরক্তা, এবং পরে দেখাইব যে, কৃষ্ণান্দ-মোদিত অজ্জর্জনকৃত সুভদ্রাহরণেও সে দোষ ঘটে নাই। তবে এরূপ কন্যাহরণে কোন প্রকার দোষ আছে কি না, তাহার বিশেষ বিচার আবশ্যিক, এ কথা আমরা স্বীকার করি। আমরা সে বিচার সুভদ্রাহরণের সময় করিব। কেন না, কৃষ্ণ নিজেই সে বিচার সেই সময় করিয়াছেন। অতএব এক্ষণে সে বিষয়ে কোন কথা বলিব না।

তবে ইহার ভিতর আর একটা কথা আছে। সে কালে ক্ষত্রিয়রাজগণের বিবাহের দুইটি পদ্ধতি প্রচলিত ছিল;—এক স্বয়ংবর বিবাহ, আর এক হরণ। কখনও কখনও এক বিবাহে দুই রকম ঘটয়া যাইত, যথা—কাশিরাজকন্যা অম্বিকাদির বিবাহে। ঐ বিবাহে স্বয়ংবর হয়। কিন্তু আদর্শ ক্ষত্রিয় দেবরত ভীষ্ম, স্বয়ংবর না মানিয়া, তিনটি কন্যাই কাড়িয়া লইয়া গেলেন। আর কন্যার স্বয়ংবরই হউক, আর হরণই হউক, কন্যা একজন লাভ করিলে, উদ্ধতস্বভাব রণপ্রিয় ক্ষত্রিয়গণ একটা যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত করিতেন। ইতিহাসে দ্রৌপদীস্বয়ংবরে এবং কাব্যে ইন্দুমতীস্বয়ংবরে দেখিতে পাই যে, কন্যা হতা হয় নাই, তথাপি যুদ্ধ উপস্থিত। মহাভারতের মৌলিক অংশে রুক্মিণী যে হতা হইয়াছিলেন, এমন কথাটা পাওয়া যায় না। শিশুপালবধ-পর্বাধ্যায়ে কৃষ্ণ বলিতেছেন:—

রুক্মিণ্যামস্য মৃঢ়স্য প্রার্থনাসীন্মৃদুর্ষতঃ।

ন চ তাং প্রাপ্তবান্ মৃঢ়ঃ শূদ্রো বেদশ্রুতীমিব ॥

শিশুপালবধপর্বাধ্যায়ে, ৪৫ অঃ, ১৫ শ্লোকঃ।

শিশুপাল উত্তর করিলেন:—

মৎপূর্বাং রুক্মিণীং কৃষ্ণ সংসৎসু পরিকীর্তয়ন্।

বিশেষতঃ পার্থিবেষু ব্রীড়াং ন কুরূষে কথম্ ॥

মন্যমানো হি কঃ সৎসু পুরুষঃ পরিকীর্তয়েৎ।

অন্যপূর্বাং স্ত্রিয়ং জাতু ত্বদন্যো মধুসূদন ॥

শিশুপালবধপর্বাধ্যায়ে, ৪৫ অঃ, ১৮-১৯ শ্লোকঃ।

ইহাতে এমন কিছুই নাই যে, তাহা হইতে বুঝিতে পারিব যে, রুক্মিণী হতা হইয়াছিলেন, বা তজ্জন্য কোন যুদ্ধ হইয়াছিল। তার পর উদ্যোগপর্বে আর এক স্থানে আছে,—

যো রুক্মিণীমেকরথেন ভোজান্ উৎসাদ্য রাজ্ঞঃ সমরে প্রসহ্য।

উবাহ ভার্য্যাং যশসা জ্বলন্তীং যস্য্যং জজ্ঞে রৌক্মিণেয়ো মহাত্মা ॥

ইহাতে যুদ্ধের কথা আছে, কিন্তু হরণের কথা নাই।

আর এক স্থানে রুক্মিণীহরণবৃত্তান্ত আছে। উদ্যোগপর্বে সৈন্যানির্ঘাণ সময়ে রুক্মিণীর দ্রাতা রুক্মী পাণ্ডবদিগের শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তদুপলক্ষে কথিত হইতেছে:—

“বাহুবলগর্ভিত রুক্মী পূর্বে ধীমান্ বাসুদেবের রুক্মিণীহরণ সহ্য করিতে না পারিয়া, 'আমি কৃষ্ণকে বিনষ্ট না করিয়া কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইব না', এইরূপ প্রতিজ্ঞাপূর্বক প্রবুদ্ধ ভাগীরথীর ন্যায় বেগবতী বিচিত্র আয়ুধধারিণী চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন। পরে তাঁহার সন্নিহিত হইবামাত্র পরাজিত ও লজ্জিত হইয়া প্রতিগমন করিলেন। কিন্তু যে স্থানে বাসুদেবকর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন, তথায় ভোজকট নামক প্রভূত সৈন্য ও গজবাজিসম্পন্ন সুবিখ্যাত এক নগর সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই নগর হইতে ভোজরাজ রুক্মী এক অক্ষৌহিণী সেনা সমভিব্যাহারে সত্বরে পাণ্ডবগণের নিকট আগমন করিলেন এবং পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতসারে কৃষ্ণের প্রিয়ানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত কবচ, ধনু, তলবার,

বীষ্ণু রচনাবলী

খজা ও শরাসন ধারণ করিয়া আদিত্যসঙ্কাশ ধ্বজের সহিত পাণ্ডবসৈন্যমণ্ডলী মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।”

এই কথা উদ্যোগপর্বে ১৫৭শ অধ্যায়ে আছে। ঐ অধ্যায়ের নাম রুক্মিপ্রত্যাখ্যান। মহাভারতের যে পর্বসংগ্রহাধ্যায়ের কথা পূর্বে বলিয়াছি, তাহাতে লিখিত আছে যে, উদ্যোগপর্বে ১৮৬ অধ্যায়, এবং ৬৬৯৮ শ্লোক আছে।

“উদ্যোগপর্বনির্দিষ্টং সন্ধিবিশ্রমিতম্।
অধ্যায়ানাং শতং প্রোক্তং ষড়শীতিমর্ষিণা ॥
শ্লোকানাং ষট্‌সহস্রাণি তাবন্ত্যেব শতানি চ।
শ্লোকাশ্চ নবতিঃ প্রোক্তান্তথৈবাষ্টৌ মহাস্থনা ॥”

মহাভারতম্, আদিপর্ব।

এক্ষণে মহাভারতে ১৯৭ অধ্যায় পাওয়া যায়। অতএব ১১ অধ্যায় পর্বসংগ্রহাধ্যায় সংকলিত হওয়ার পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে উদ্যোগপর্বে ৭৬৫৭ শ্লোক পাওয়া যায়। অতএব প্রায় এক হাজার শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। প্রক্ষিপ্ত এই একাদশ অধ্যায় ও সহস্র শ্লোক কোন্‌গদ্যলি? প্রথমেই দেখিতে হয় যে, উদ্যোগপর্বান্তর্গত কোন্‌ বৃত্তান্তগুলি পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে ধৃত হয় নাই। এই রুক্মিসমাগম বা রুক্মিপ্রত্যাখ্যান পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে ধৃত হয় নাই। অতএব ঐ ১৫৭ অধ্যায় প্রক্ষিপ্ত একাদশ অধ্যায়ের মধ্যে একটি, ইহা বিচারসঙ্গত। এই রুক্মিপ্রত্যাখ্যানপর্বাধ্যায়ের সঙ্গে মহাভারতের কোন সম্বন্ধ নাই। রুক্মী সসৈন্যে আসিলেন এবং অজ্ঞান কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন, পশ্চাৎ দুর্ঘোষন কর্তৃকও পরিত্যক্ত হইলেন, পশ্চাৎ স্বস্থানে চলিয়া গেলেন, ইহা ভিন্ন মহাভারতের সঙ্গে তাঁহার আর কোন সম্বন্ধ নাই। এই দুইটি লক্ষণ একত্রিত করিয়া বিচার করিয়া দেখিলে, অবশ্য বুঝিতে হইবে যে, ১৫৭ অধ্যায় প্রক্ষিপ্ত, কাজেই রুক্মিণী-হরণ বৃত্তান্ত মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত। ইহার অন্যতর প্রমাণ এই যে, বিষ্ণুপুরাণে আছে যে, মহাভারতের যুদ্ধের পূর্বেই রুক্মী বলরাম কর্তৃক অক্ষয়ীড়াজনিত বিবাদে নিহত হইয়াছিলেন। রুক্মিণীকে শিশুপাল কামনা করিয়াছিলেন, ইহা সত্য এবং তিনি রুক্মিণীকে বিবাহ করিতে পান নাই—কৃষ্ণ তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, ইহাও সত্য। বিবাহের পর একটা যুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু ‘হরণ’ কথাটা মৌলিক মহাভারতে কোথাও নাই। হরিবংশে ও পুরাণে আছে।

শিশুপাল ভীষ্মকে তিরস্কারের সময় কাশিরাজের কন্যাহরণ জন্য তাঁহাকে গালি দিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণকে তিরস্কারের সময় রুক্মিণীহরণের কোন কথাও তুলেন নাই। অতএব বোধ হয় না যে, রুক্মিণী হত্যা হইয়াছিলেন। পূর্বেদ্বিত কথোপকথনে ইহাই সত্য বোধ হয় যে, শিশুপাল রুক্মিণীকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ভীষ্মক রুক্মিণীকে কৃষ্ণকেই সম্প্রদান করিয়াছিলেন। তার পর তাঁহার পুত্র রুক্মী শিশুপালের পক্ষ হইয়া বিবাদ উপস্থিত করিয়াছিলেন। রুক্মী অতিশয় কলহপ্রিয় ছিলেন। অনিরুদ্ধের বিবাহকালে দ্যুতোপলক্ষে বলরামের সঙ্গে কলহ উপস্থিত করিয়া নিজেই নিহত হইয়াছিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—নরকবধাদি

কথিত হইয়াছে, নরকাসুর নামে পৃথিবীর এক পুত্র ছিল। প্রাগ্‌জ্যোতিষে তাহার রাজধানী। সে অত্যন্ত দুর্ষনিত ছিল। ইন্দ্র স্বয়ং দ্বারকায় আসিয়া তাহার নামে কৃষ্ণের নিকট নালিশ করিলেন। অন্যান্য দুষ্কর্মের মধ্যে নরক ইন্দ্র বিষ্ণু প্রভৃতি আদিত্যদিগের মাতা অর্দিতর কুণ্ডল চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিল। কৃষ্ণ ইন্দ্রের নিকট নরকবধে প্রতিশ্রুত হইয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে গিয়া নরককে বধ করিলেন। নরকের ষোল হাজার কন্যা ছিল, তাহাদিগের সকলকে লইয়া আসিয়া বিবাহ করিলেন। নরকমাতা পৃথিবী নরকাপহৃত অর্দিতকুণ্ডল লইয়া আসিয়া কৃষ্ণকে উপহার দিলেন; এবং বলিয়া গেলেন যে, কৃষ্ণ যখন বরাহ অবতার হইয়াছিলেন, তখন পৃথিবীর উদ্ধারজন্য বরাহের যে স্পর্শ, সেই স্পর্শে পৃথিবী গর্ভবতী হইয়া নরককে প্রসব করিয়াছিলেন।

সমস্তই অতিপ্রকৃত এবং সমস্তই অতি মিথ্যা। বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করেন নাই, প্রজাপতি পৃথিবীর উদ্ধারের জন্য বরাহরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, ইহাই বেদে আছে। কৃষ্ণের সময়ে, নরক প্রাগ্জ্যোতিষের রাজা ছিলেন না—ভগদত্ত প্রাগ্জ্যোতিষের রাজা ছিলেন। তিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনহস্তে নিহত হন। ফলতঃ ইন্দ্রের দ্বারকা গমন, পৃথিবীর গর্ভাধান এবং একজনের ষোড়শ সহস্র কন্যা ইত্যাদি সকলই অতিপ্রকৃত উপন্যাস মাত্র। কৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র মহিষী থাকাও এই উপন্যাসের অংশমাত্র এবং মিথ্যা গল্প; ইহা পাঠককে আর বলিতে হইবে না।

এই নরকাসুরবধ হইতে বিষ্ণুপুরাণের মতে পারিজাত হরণের সূত্রপাত। কৃষ্ণ দিতির কুণ্ডল লইয়া অর্দিতিকে দিবার জন্য সত্যভামা সমাভিব্যাহারে ইন্দ্রালয়ে গমন করিলেন। সেখানে সত্যভামা পারিজাত কামনা করায় পারিজাত বৃক্ষ লইয়া ইন্দ্রের সঙ্গে কৃষ্ণের যুদ্ধ বাধিল। ইন্দ্র পরাস্ত হইলেন। হরিবংশে ইহা ভিন্নপ্রকারে লিখিত আছে। কিন্তু যখন আমরা বিষ্ণুপুরাণকে হরিবংশের পূর্বাঙ্গমী গ্রন্থ বিবেচনা করি, তখন এখানে বিষ্ণুপুরাণেরই অনুবর্তী হইলাম। উভয় গ্রন্থকাথিত বৃত্তান্তই অত্যন্তুত ও অতিপ্রকৃত। যখন আমরা ইন্দ্র, ইন্দ্রালয় এবং পারিজাতের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই অবিশ্বাসী, তখন এই সমস্ত পারিজাতহরণবৃত্তান্তই আমাদের পরিহার্য।

ইহার পর বাণাসুরবধবৃত্তান্ত। তাহাও ঐরূপ অতিপ্রকৃত অদ্ভুতব্যাপারপরিপূর্ণ, এজন্য তাহাও আমরা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য। তাহার পর পৌণ্ড্র বাসুদেববধ এবং বারাগসীদাহ। ইহার কতকটা ঐতিহাসিকতা আছে বোধ হয়। পৌণ্ড্রদিগের রাজ্য ঐতিহাসিক, এবং পৌণ্ড্র জাতির কথা ঐতিহাসিক এবং ঐতিহাসিক সময়েও বিবিধ দেশী বিদেশী গ্রন্থে পাওয়া যায়। রামায়ণে তাহাদিগকে দাক্ষিণাত্যে দেখা যায়, কিন্তু মহাভারতের সময়ে তাহারা আধুনিক বাঙ্গালার পশ্চিমভাগবাসী। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পৌণ্ড্ররা উপস্থিত ছিল, মহাভারতে তাহারা অনার্য জাতির মধ্যে গণিত হইয়াছে। দশকুমারচরিতেও তাহাদিগের কথা আছে এবং একজন চৈনিক পরিব্রাজক তাহাদিগকে বাঙ্গালা দেশে স্থাপিত দেখিয়া গিয়াছেন। তিনি তাহাদিগের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্ধনেও গিয়াছিলেন, কৃষ্ণের সময়ে যিনি পৌণ্ড্রদিগের রাজা ছিলেন, তাহারও নাম বাসুদেব। বাসুদেব শব্দের অনেক অর্থ হয়। যিনি বাসুদেবের পুত্র, তিনি বাসুদেব। এবং যিনি সর্বনিবাস অর্থাৎ সর্বভূতের বাসস্থান, তিনিও বাসুদেব।* অতএব যিনি ঈশ্বরের অবতার, তিনিই প্রকৃত বাসুদেব নামের অধিকারী। এই পৌণ্ড্রক বাসুদেব প্রচার করিলেন যে, দ্বারকানিবাসী বাসুদেব, জাল বাসুদেব; তিনি নিজেই প্রকৃত বাসুদেব—ঈশ্বরবতার। তিনি কৃষ্ণকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তুমি আমার নিকটে আসিয়া, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মাদি যে সকল চিহ্নে আমারই প্রকৃত অধিকার, তাহা আমাকেই দিবে। কৃষ্ণ 'তথাস্তু' বলিয়া পৌণ্ড্ররাজ্যে গমন করিলেন এবং চক্রাদি অস্ত্র পৌণ্ড্রকের প্রতি ক্ষিপ্ত করিয়া তাহাকে নিহত করিলেন। বারাগসীর অধিপতিগণ পৌণ্ড্রকের পক্ষ হইয়াছিল, এবং পৌণ্ড্রকের মৃত্যুর পরেও কৃষ্ণের সঙ্গে শত্রুতা করিয়া, যুদ্ধ করিতেছিল। এজন্য তিনি বারাগসী আক্রমণ করিয়া শত্রুগণকে নিহত করিলেন এবং বারাগসী দখল করিলেন।

এ স্থলে শত্রুকে নিহত করা অধর্ম নহে, কিন্তু নগরদাহ ধর্ম্মানুমোদিত নহে। পরম ধর্ম্মাত্মা কৃষ্ণের দ্বারা এরূপ কার্য কেন হইয়াছিল, তাহার বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ কিছু পাওয়া যায় না। বিষ্ণুপুরাণে লেখা আছে যে, কাশিরাজ কৃষ্ণহস্তে নিহত হইলে, তাহার পুত্র মহাদেবের তপস্যা করিয়া কৃষ্ণের বধের নিমিত্ত "কৃত্য উৎপন্ন হউক," এই বর প্রার্থনা করিলেন। কৃত্য অভিচারকে বলে। অর্থাৎ যজ্ঞ হইতে শরীরবিশিষ্টা অমোঘ কোন শক্তি উৎপন্ন হইয়া শত্রুর বধসাধন করে। মহাদেব প্রার্থিত বর দিলেন। কৃত্য উৎপন্ন হইয়া ভীষণ মূর্ত্তিধারণপূর্বক কৃষ্ণের বধার্থ ধাবমান হইল। কৃষ্ণ সন্দর্শন চক্রকে আঞ্জা করিলেন যে, তুমি এই কৃত্যকে সংহার কর। বৈষ্ণবচক্রের প্রভাবে মাহেশ্বরী কৃত্য বিধ্বস্তপ্রভাবা হইয়া পলায়ন করিল। চক্রও পশ্চাদ্ধাবিত হইল। কৃত্য বারাগসী নগর মধ্যে প্রবেশ করিল। চক্রানলে সমস্ত পুরী দখল হইয়া গেল। ইহা অতিশয় ঐতিহাসিক ও অবিশ্বাসযোগ্য ব্যাপার। হরিবংশে পৌণ্ড্রকবধের কথা আছে, কিন্তু বারাগসীদাহের কথা নাই। কিন্তু ইহার কিঞ্চিৎ প্রসঙ্গ মহাভারতে আছে। অতএব

“বসুঃ সর্বনিবাসশ্চ বিশ্বানি যস্য লোমসু।

স চ দেবঃ পরং ব্রহ্ম বাসুদেব ইতি স্মৃতঃ ॥”

বাংকম রচনাবলী

বারাণসীদাহ অর্নৈতিহাসিক বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না। তবে কি জন্য বারাণসীদাহ করিতে কৃষ্ণ বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহার বিশ্বাসযোগ্য কারণ কিছু জানা যায় না।

যে সকল যুদ্ধের কথা বলা গেল, তন্মিত্ত উদ্যোগপর্বে ৪৭ অধ্যায়ে অর্জুনবাক্যে কৃষ্ণকৃত গান্ধারজয়, পাণ্ডাজয়, কর্ণজয়, শাম্বজয় এবং একলব্যের সংহারের প্রসঙ্গ আছে। ইহার মধ্যে শাম্বজয়বৃত্তান্ত মহাভারতের বনপর্বে আছে। ইহা ভিন্ন আর কয়টির কোন বিস্তারিত বিবরণ আমি কোন গ্রন্থে পাইলাম না। বোধ হয়, হরিবংশ ও পুরাণ সকল সংগ্রহের পূর্বে এই সকল যুদ্ধ-বিষয়ক কিম্বদন্তী বিলুপ্ত হইয়াছিল। হরিবংশে ও ভাগবতে অনেক নতুন কথা আছে, কিন্তু মহাভারতে বা বিষ্ণুপুরাণে তাহার কোন প্রসঙ্গ নাই বলিয়া আমি সে সকল পরিত্যাগ করিলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—দ্বারকাবাস—সামন্তক

দ্বারকায় কৃষ্ণ রাজা ছিলেন না। যত দূর বৃদ্ধিতে পারা যায়, তাহাতে বোধ হয় যে, ইউরোপীয় ইতিহাসে যাহাকে Oligarchy বলে, যাদবেরা দ্বারকায় তাহাই ছিলেন। অর্থাৎ তাঁহারা সমাজের অধিনায়ক ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা পরস্পর সকলে সমানস্পর্ধী। বয়োজ্যেষ্ঠকে আপনাদিগের মধ্যে প্রধান বিবেচনা করিতেন, সেই জন্য উগ্রসেনের রাজা নাম। কিন্তু এরূপ প্রধান ব্যক্তির কার্যতঃ বড় কর্তৃত্ব থাকিত না। যে বৃদ্ধিবিক্রমে প্রধান, নেতৃত্ব তাহারই ঘটিত। কৃষ্ণ যাদবদিগের মধ্যে বলবীর্ষ্য বৃদ্ধিবিক্রমে সর্বশ্রেষ্ঠ, এই জন্যই তিনি যাদবদিগের নেতৃত্বরূপ ছিলেন। তাঁহার অগ্রজ বলরাম এবং কৃতবর্মা প্রভৃতি অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠ যাদবগণও তাঁহার বশীভূত ছিলেন। কৃষ্ণও সর্বদা তাঁহাদিগের মঙ্গলকামনা করিতেন। কৃষ্ণ হইতেই তাঁহাদিগের রক্ষা সাধিত হইত এবং কৃষ্ণ বহুরাজ্যবিজেতা হইয়াও জ্ঞাতিবর্গকে না দিয়া আপনি কোন ঐশ্বর্যভোগ করিতেন না। তিনি সকলের প্রতি তুল্যপ্রীতিসম্পন্ন ছিলেন। সকলেরই হিতসাধন করিতেন। জ্ঞাতিদিগের প্রতি আদর্শ মনুষ্যের যেরূপ ব্যবহার কর্তব্য, তাহা তিনি করিতেন। কিন্তু জ্ঞাতিভাব চিরকালই সমান। তাঁহার বলবিক্রমের ভয়ে জ্ঞাতিরা তাঁহার বশীভূত ছিল বটে, কিন্তু তাঁহার প্রতি দ্বেষশূন্য ছিল না। এ বিষয়ে কৃষ্ণ স্বয়ং যাহা নারদের কাছে বলিয়াছিলেন, ভীষ্ম তাহা নারদের মুখে শুনিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন। কথাগুলি সত্য হউক, মিথ্যা হউক, লোকশিক্ষার্থে আমরা তাহা মহাভারতের শান্তিপর্বে হইতে উদ্ধৃত করিতেছি,—

“জ্ঞাতিদিগকে ঐশ্বর্যের অর্দ্ধাংশ প্রদান ও তাহাদিগের কটুবাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের দাসের ন্যায় অবস্থান করিতেছি। বহিলাভার্থী ব্যক্তি যেমন অরণি কাষ্ঠকে মথিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ জ্ঞাতিবর্গের দুর্ভাক্য নিরন্তর আমার হৃদয় দক্ষ করিতেছে। বলদেব বল, গদ সুকুমারতা এবং আমার আত্মজ প্রদ্যুম্ন সৌন্দর্য্য-প্রভাবে জনসমাজে অদ্বিতীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। আর অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়েরাও মহাবলপরাক্রান্ত, উৎসাহসম্পন্ন ও অধ্যবসায়শালী; তাঁহারা যাহার সহায়তা না করেন, সে বিনষ্ট হয় এবং যাহার সহায়তা করেন, সে অনায়াসে অসামান্য ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া থাকে। ঐ সকল ব্যক্তি আমার পক্ষ থাকিতেও আমি অসহায় হইয়া কালযাপন করিতেছি। আহুক ও অক্রুর আমার পরম সূত্র, কিন্তু ঐ দুই জনের মধ্যে একজনকে স্নেহ করিলে অন্যের ক্রোধোদ্দীপন হয়; সুতরাং আমি কাহারই প্রতি স্নেহ প্রকাশ করি না। আর নিতান্ত সৌহার্দবশতঃ উহাদিগকে পরিত্যাগ করাও সুকঠিন। অতঃপর আমি এই স্থির করিলাম যে, আহুক ও অক্রুর যাহার পক্ষ, তাহার দুঃখের পরিসীমা নাই, আর তাঁহারা যাহার পক্ষ নহেন, তাহা অপেক্ষাও দুঃখী আর কেহই নাই। যাহা হউক, এক্ষণে আমি দ্যুতকারী সহোদরদ্বয়ের মাতার ন্যায় উভয়েরই জয় প্রার্থনা করিতেছি। হে নারদ! আমি ঐ দুই মিত্রকে আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত এইরূপ কষ্ট পাইতেছি।”

এই কথার উদাহরণস্বরূপ সামন্তক মণির বৃত্তান্ত পাঠককে উপহার দিতে ইচ্ছা করি। সামন্তক মণির বৃত্তান্ত অতিপ্রকৃত পরিপূর্ণ। অতিপ্রকৃত অংশ বাদ দিলে যেটুকু থাকিবে, তাহাও কত দূর সত্য, বলা যায় না। যাহা হউক, স্থূল বৃত্তান্ত পাঠককে শুনাইতেছি।

সম্রাজিত নামে এক জন যাদব দ্বারকায় বাস করিতেন। তিনি একটি অতি উজ্জ্বল সর্বজনলোভনীয় মণি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মণির নাম সামন্তক। কৃষ্ণ সেই মণি দেখিয়া বিবেচনা

করিয়াছিলেন যে, ইহা যাদবধিপতি উগ্রসেনেরই যোগ্য। কিন্তু জ্ঞাতিবিরোধ-ভয়ে সত্রাজিতের নিকট মণি প্রার্থনা করেন নাই। কিন্তু সত্রাজিত মনে ভয় করিলেন যে, কৃষ্ণ এই মণি চাহিবেন। চাহিলে তিনি রাখিতে পারিবেন না, এই ভয়ে মণি তিনি নিজে ধারণ না করিয়া আপনার ভ্রাতা প্রসেনকে দিয়াছিলেন। প্রসেন সেই মণি ধারণ করিয়া এক দিন মৃগয়ায় গিয়াছিলেন। বনমধ্যে একটা সিংহ তাঁহাকে হত করিয়া সেই মণি মুখে করিয়া লইয়া চলিয়া যায়। জাম্ববান্ সিংহকে হত করিয়া সেই মণি গ্রহণ করে। জাম্ববান্ একটা ভল্লুক। কথিত আছে যে, সে ত্রেতাযুগে রামের বানরসেনার মধ্যে থাকিয়া রামের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল।

এ দিকে প্রসেন নিহত এবং মণি অন্তর্হিত জানিতে পারিয়া দ্বারকাবাসী লোকে এইরূপ সন্দেহ করিল যে, কৃষ্ণের যখন এই মণি লইবার ইচ্ছা ছিল, তখন তিনিই প্রসেনকে মারিয়া মণি গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। এইরূপ লোকাপবাদ কৃষ্ণের অসহ্য হওয়ায় তিনি মণির সন্ধানে বাহির্গত হইলেন। যেখানে প্রসেনের মৃতদেহ দেখিলেন, সেইখানে সিংহের পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। তাহা সকলকে দেখাইয়া আপনার কলঙ্ক অপনীত করিলেন। পরে সিংহের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া ভল্লুকের পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। সেই পদচিহ্ন ধরিয়া গর্তের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় জাম্ববানের পুত্রপালিকা ধাত্রীর হস্তে সেই সামন্তক মণি দেখিতে পাইলেন। পরে জাম্ববানের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাভব করিলেন। তখন জাম্ববান্ তাঁহাকে সামন্তক মণি দিল, এবং আপনার কন্যা জাম্ববতীকে কৃষ্ণে সম্প্রদান করিল। কৃষ্ণ মণি লইয়া দ্বারকায় আসিয়া মণি সত্রাজিতকেই প্রত্যর্পণ করিলেন। তিনি পরম্ব কামনা করিতেন না। কিন্তু সত্রাজিত, কৃষ্ণের উপর অভূতপূর্বে কলঙ্ক আরোপিত করিয়াছিলেন, এই ভয়ে ভীত হইয়া, কৃষ্ণের তুষ্টিসাধনার্থ আপনার কন্যা সত্যভামাকে কৃষ্ণে সম্প্রদান করিলেন। সত্যভামা সর্বজনপ্রার্থনীয় রূপবতী কন্যা ছিলেন। এজন্য তিন জন প্রধান যাদব, অর্থাৎ শতধন্বা, মহাবীর কৃতবর্মা এবং কৃষ্ণের পরম ভক্ত ও সূহৃৎ অক্রুর ঐ কন্যাকে কামনা করিয়াছিলেন। এক্ষণে সত্যভামা কৃষ্ণে সম্প্রদত্তা হওয়ায় তাঁহারা আপনাদিগকে অত্যন্ত অপমানিত বিবেচনা করিলেন এবং সত্রাজিতের বধের জন্য ষড়্‌যন্ত্র করিলেন। অক্রুর ও কৃতবর্মা শতধন্বাকে পরামর্শ দিলেন যে, তুমি সত্রাজিতকে বধ করিয়া তাহার মণি চুরি কর। কৃষ্ণ তোমাদের যদি বিরুদ্ধাচরণ করেন, তাহা হইলে, আমরা তোমার সাহায্য করিব। শতধন্বা সম্মত হইয়া কদাচিৎ কৃষ্ণ বারণাবতে গমন করিলে, সত্রাজিতকে নিদ্রিত অবস্থায় বিনাশ করিয়া মণি চুরি করিলেন।

সত্যভামা পিতৃবধে শোকাতুরা হইয়া কৃষ্ণের নিকট নালিশ করিলেন। কৃষ্ণ তখন দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিয়া, বলরামকে সঙ্গে লইয়া, শতধন্বার বধে উদ্যোগী হইলেন। শুনিয়া শতধন্বা কৃতবর্মা ও অক্রুরের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা কৃষ্ণ বলরামের সহিত শত্রুতা করিতে অস্বীকৃত হইলেন। তখন শতধন্বা অগত্যা অক্রুরকে মণি দিয়া দ্রুতগামী ঘোড়াকে আরোহণ-পূর্বক পলায়ন করিলেন। কৃষ্ণ বলরাম রথে যাইতেছিলেন, রথ ঘোড়াকে ধরিতে পারিল না। শতধন্বার অশ্বিনীও পথক্রান্তা হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। শতধন্বা তখন পাদচারে পলায়ন করিতে লাগিল। ন্যায়যুদ্ধপরায়ণ কৃষ্ণ তখন রথে বলরামকে রাখিয়া স্বয়ং পাদচারে শতধন্বার পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। কৃষ্ণ দই ক্রোশ গিয়া শতধন্বার মস্তকচ্ছেদন করিলেন। কিন্তু মণি তাঁহার নিকট পাইলেন না। ফিরিয়া আসিয়া বলরামকে এই কথা বলিলে বলরাম তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিলেন না। ভাবিলেন, মণির ভাগে বলরামকে বঞ্চিত করিবার জন্য কৃষ্ণ মিথ্যা কথা বলিতেছেন। বলরাম বলিলেন, “ধিক্ তোমায়! তুমি এমন অর্থালোভী! এই পথ আছে, তুমি দ্বারকায় চলিয়া যাও: আমি আর দ্বারকায় যাইব না।” এই বলিয়া তিনি কৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া বিদেহ নগরে গিয়া তিন বৎসর বাস করিলেন। এদিকে অক্রুরও দ্বারকা ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। পরে যাদবগণ তাঁহাকে অভয় দিয়া পুনর্বার দ্বারকায় আনাইলেন। কৃষ্ণ তখন এক দিন সমস্ত যাদবগণকে সমবেত করিয়া, অক্রুরকে বলিলেন যে, সামন্তক মণি তোমার নিকট আছে, আমরা তাহা জানি। সে মণি তোমারই থাক্, কিন্তু সকলকে একবার দেখাও। অক্রুর ভাবিলেন, আমি যদি অস্বীকার করি, তাহা হইলে সন্ধান করিলে, আমার নিকট মণি বাহির হইবে। অতএব তিনি অস্বীকার না করিয়া মণি বাহির করিলেন। তাহা দেখিয়া বলরাম এবং সত্যভামা সেই মণি লইবার জন্য অতিশয় ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু সত্যপ্রতিজ্ঞ কৃষ্ণ সেই

বাঁকম রচনাবলী

মণি বলরাম বা সত্যভামা কাহাকেও দিলেন না, আপনিও লইলেন না, অকুরকেই প্রত্যর্পণ করিলেন।*

এই সামন্তকর্মণিবৃত্তান্তেও কৃষ্ণের ন্যায়পরতা, স্বার্থশূন্যতা, সত্যপ্রতিজ্ঞতা এবং কার্যদক্ষতা অতি পরিষ্ফুট। কিন্তু উপন্যাসটা সত্যমূলক বলিয়া বোধ হয় না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ—কৃষ্ণের বহুবিবাহ

এই সামন্তকর্মণির কথায় কৃষ্ণের বহুবিবাহের কথা আপনা হইতেই আসিয়া পড়িতেছে। তিনি রুক্মিণীকে পূর্বে বিবাহ করিয়াছিলেন, এক্ষণে এক সামন্তকর্মণির প্রভাবে আর দুইটি ভার্য্যা, জাম্ববতী এবং সত্যভামা, লাভ করিলেন। ইহাই বিষ্ণুপুরাণ বলেন। হরিবংশ এক পৈঠা উপর গিয়া থাকেন,—তিনি বলেন, দুইটি না, চারিটি। সত্রাজিতের তিনটি কন্যা ছিল,—সত্যভামা, প্রস্বাপিনী এবং ব্রতিনী। তিনটিই তিনি শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিলেন। কিন্তু দুই চারিটায় কিছু আসিয়া যায় না—মোট সংখ্যা নাকি ষোল হাজারের উপর। এইরূপ লোকপ্রবাদ। বিষ্ণুপুরাণে ৪ অংশে আছে, “ভগবতোহ্যত্র মর্ত্যলোকেহবতীর্ণস্য ষোড়শসহস্রাণ্যেকোত্তরশতাধিকানি স্ত্রীগামভবন্।”† কৃষ্ণের ষোল হাজার এক শত এক স্ত্রী। কিন্তু ঐ পুরাণের ৫ অংশের ২৮ অধ্যায়ে প্রধানাদিগের নাম করিয়া পুরাণকার বলিতেছেন, রুক্মিণী ভিন্ন “অন্যাশ্চ ভার্য্যাঃ কৃষ্ণস্য বভূবুঃ সপ্ত শোভনাঃ।” তার পর, “ষোড়শাসন্ সহস্রাণি স্ত্রীগামন্যানি চক্রিণঃ।” তাহা হইলে, দাঁড়াইল ষোল হাজার সাত জন। ইহার মধ্যে ষোল হাজার নরককন্যা। সেই আঘাড়ে গল্প বলিয়া আমি ইতিপূর্বেই বাদ দিয়াছি।

গল্পটা কত বড় আঘাড়ে, আর এক রকম করিয়া বুঝাই। বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ অংশের ঐ পঞ্চদশ অধ্যায়ে আছে যে, এই সকল স্ত্রীর গর্ভে কৃষ্ণের এক লক্ষ আশী হাজার পুত্র জন্মে। বিষ্ণুপুরাণেই কথিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণ এক শত পঁচিশ বৎসর ভূতলে ছিলেন। হিসাব করিলে, কৃষ্ণের বৎসরে ১৪৪০টি পুত্র, ও প্রতিদিন চারিটি পুত্র জন্মিত। এ স্থলে এইরূপ কল্পনা করিতে হয় যে, কেবল কৃষ্ণের ইচ্ছায় কৃষ্ণমহিষীরা পুত্রবতী হইতেন।

এই নরকাসুরের ষোল হাজার কন্যার আঘাড়ে গল্প ছাড়িয়া দিই। কিন্তু তিন্তিন আট জন “প্রধানা” মহিষীর কথা পাওয়া যাইতেছে। এক জন রুক্মিণী। বিষ্ণুপুরাণকার বলিয়াছেন, আর সাত জন। কিন্তু ৫ অংশের ২৮ অধ্যায়ে নাম দিতেছেন আট জনের, যথা—

“কালিন্দী মিত্রবিন্দা চ সত্যা নাগ্নিজিতী তথা।
দেবী জাম্ববতী চাপি রোহিণী কামরূপিণী ॥
মদুরাজসুতা চান্যা সুশীলা শীলমণ্ডনা।
সাত্রাজিতী সত্যভামা লক্ষ্মণা চারুহাসিনী ॥”

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| ১। কালিন্দী | ৫। রোহিণী (ইনি কামরূপিণী) |
| ২। মিত্রবিন্দা | ৬। মদুরাজসুতা সুশীলা |
| ৩। নাগ্নিজিতকন্যা সত্যা | ৭। সাত্রাজিতকন্যা সত্যভামা |
| ৪। জাম্ববতী | ৮। লক্ষ্মণা |

রুক্মিণী লইয়া নয় জন হইল। আবার ৩২ অধ্যায়ে আর এক প্রকার। কৃষ্ণের পুত্রগণের নামকীর্তন হইতেছেঃ—

প্রদ্যুম্নাদ্যা হরেঃ পুত্রা রুক্মিণ্যাঃ কথিতাস্তব।
ভানুং ভৈমরিকণ্ঠেব সত্যভামা ব্যজায়ত ॥ ১ ॥
দীপ্তমান্ তাম্রপক্ষাদ্যা রোহিণ্যাং তনয়া হরেঃ।
বভূবুর্জাম্বুবত্যাণ্ড শাম্বাদ্যা বাহুশালিনঃ ॥ ২ ॥

* এইরূপ বিষ্ণুপুরাণে আছে। হরিবংশ বলেন, কৃষ্ণ আপনিই মণি ধারণ করিলেন।

† বিষ্ণুপুরাণ, ৪ অং, ১৫ অ, ১৯।

তনয়া ভদ্রবিন্দাদ্যা নাগ্নিজিত্যাং মহাবলাঃ ।
সংগ্রামজিৎপ্রধানাস্তু শৈব্যায়াম্ভবন্ সুতাঃ ॥ ৩ ॥
বৃকাদ্যাস্তু সুতা মাদ্র্যাং গাগ্রবৎপ্রমুখান্ সুতান্ ।
অবাপ লক্ষ্মুণা পুত্রাঃ কালিন্দ্যাণ্ড শ্রুতাদয়ঃ ॥ ৪ ॥

এই তালিকায় পাওয়া গেল, রুক্মিণী ছাড়া,

- | | |
|-------------------|------------------|
| ১। সত্যভামা (৭) | ৫। শৈব্যা (২) |
| ২। রোহিণী (৫) | ৬। মাদ্রী (৬) |
| ৩। জাম্ববতী (৪) | ৭। লক্ষ্মুণা (৮) |
| ৪। নাগ্নিজিতী (৩) | ৮। কালিন্দী (১) |

কিন্তু ৪র্থ অংশের ১৫ অধ্যায়ে আছে, “তাসাণ্ড রুক্মিণী-সত্যভামাজাম্ববতী-জালহাসিনী-প্রমুখা অষ্টো পত্ন্যঃ প্রধানাঃ।” এখানে আবার সব নাম পাওয়া গেল না, নতুন নাম “জালহাসিনী” একটা পাওয়া গেল। এই গেল বিষ্ণুপুরাণে। হরিবংশে আরও গোলযোগ।

হরিবংশে আছে;—

মহিষীঃ সপ্ত কল্যাণীস্ততোহন্যা মধুসূদনঃ ।
উপযেমে মহাবাহুগুণোপেতাঃ কুলোদ্গতাঃ ॥
কালিন্দীং মিত্রবিন্দাণ্ড সত্যাং নাগ্নিজিতীং তথা ।
সুতাং জাম্ববতশ্চাপি রোহিণীং কামরূপিনীম্ ॥
মদ্ররাজসুতাণ্ডাপি সুশীলাং ভদ্রলোচনাম্ ।
সাগ্নাজিতীং সত্যভামাং লক্ষ্মুণাং জালহাসিনীম্ ।
শৈব্যস্য চ সুতাং তন্বীং রূপেণাপসরসাং সমাং ॥

১১৮ অধ্যায়ঃ, ৪০-৪৩ শ্লোকঃ ।

এখানে পাওয়া যাইতেছে যে, লক্ষ্মুণাই জালহাসিনী। তাহা ধারণাও পাই,—

- | | |
|-------------------|------------------------------|
| (১) কালিন্দী। | (৫) রোহিণী |
| (২) মিত্রবিন্দা। | (৬) মাদ্রী সুশীলা। |
| (৩) সত্যা। | (৭) সাগ্নাজিতকন্যা সত্যভামা। |
| (৪) জাম্ববৎ-সুতা। | (৮) জালহাসিনী লক্ষ্মুণা। |

(৯) শৈব্যা।

ক্রমেই শ্রীবৃদ্ধি—রুক্মিণী ছাড়া নয় জন হইল। এ গেল ১১৮ অধ্যায়ের তালিকা। হরিবংশে আবার ১৬২ অধ্যায়ে আর একটি তালিকা আছে, যথা—

অষ্টো মহিষ্যঃ পুত্রিণ্য ইতি প্রাধান্যতঃ স্মৃতাঃ ।
সম্বর্ষা বীরপ্রজাশৈচব তাম্বপত্যানি মে শৃণু ॥
রুক্মিণী সত্যভামা চ দেবী নাগ্নিজিতী তথা ।
সুদত্তা চ তথা শৈব্যা লক্ষ্মুণা জালহাসিনী ॥
মিত্রবিন্দা চ কালিন্দী জাম্ববততথ পৌরবী ।
সুভীমা চ তথা মাদ্রী * * *

ইহাতে পাওয়া গেল, রুক্মিণী ছাড়া,

- | | |
|--------------------------|------------------|
| (১) সত্যভামা। | (৬) মিত্রবিন্দা। |
| (২) নাগ্নিজিতী। | (৭) কালিন্দী। |
| (৩) সুদত্তা। | (৮) জাম্ববতী। |
| (৪) শৈব্যা। | (৯) পৌরবী। |
| (৫) লক্ষ্মুণা জালহাসিনী। | (১০) সুভীমা। |

(১১) মাদ্রী।

হরিবংশকার ঋষি ঠাকুর, আট জন বলিয়া রুক্মিণী সমেত বার জনের নাম দিলেন।

বাংকম রচনাবলী

তাহাতেও ক্ষান্ত নহেন। ইহাদের একে একে সন্তানগণের নামকীর্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন আবার বাহির হইল—

- | | |
|-------------------|---------------|
| (১২) সূদেবা। | (১৪) কোশিকী। |
| (১৩) উপাসঙ্গ। | (১৫) সূতসোমা। |
| (১৬) যৌধিষ্ঠিরী।* | |

এ ছাড়া পূর্বে সত্রাজিতের আর দুই কন্যা ব্রতিনী এবং প্রস্বাপিনীর কথা বলিয়াছেন। এ ছাড়া মহাভারতের নূতন দুইটি নাম পাওয়া যায়,—গান্ধারী ও হৈমবতী।† সকল নামগুলি একত্র করিলে, প্রধানা মহিষী কতগুলি হয় দেখা যাউক। মহাভারতে আছে,—

- | | |
|---------------|---------------|
| (১) রুক্মিণী। | (৪) শৈব্যা। |
| (২) সত্যভামা। | (৫) হৈমবতী। |
| (৩) গান্ধারী। | (৬) জাম্ববতী। |

মহাভারতে আর নাম নাই, কিন্তু “অন্যা” শব্দটা আছে। তার পর বিষ্ণুপুরাণের ২৮ অধ্যায়ে ১, ২, ৩, ছাড়া এই কয়টা নামও পাওয়া যায়।

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| (৭) কালিন্দী। | (১০) রোহিণী। |
| (৮) মিত্রবিন্দা। | (১১) মাদ্রী। |
| (৯) সত্যা নাগজিতী। | (১২) লক্ষ্মণা জালহাসিনী। |

বিষ্ণুপুরাণের ৩২ অধ্যায়ে তদতিরিক্ত পাওয়া যায়, শৈব্যা। তাঁহার নাম উপরে লেখা আছে। তার পর হরিবংশের প্রথম তালিকা ১১৮ অধ্যায়ে, ইহা ছাড়া নূতন নাম নাই, কিন্তু ১৬২ অধ্যায়ে নূতন পাওয়া যায়।

- | | |
|---------------|-------------|
| (১৩) সূদত্তা। | (১৪) পৌরবী। |
| (১৫) সূভামা। | |

এবং ঐ অধ্যায়ে সন্তানগণনায় পাই,

- | | |
|------------------|---------------|
| (১৬) সূদেবা। | (১৮) কোশিকী। |
| (১৭) উপাসঙ্গ। | (১৯) সূতসোমা। |
| (২০) যৌধিষ্ঠিরী। | |

এবং সত্যভামার বিবাহকালে কৃষ্ণে সম্প্রদত্তা,

- | | |
|---------------|-------------------|
| (২১) ব্রতিনী। | (২২) প্রস্বাপিনী। |
|---------------|-------------------|

আট জনের জায়গায় ২২ জন পাওয়া গেল। উপন্যাসকারদিগের খুব হাত চলিয়াছিল, এ কথা স্পষ্ট। ইহার মধ্যে ১৩ হইতে ২২ কেবল হরিবংশে আছে। এই জন্য ঐ ১০ জনকে ত্যাগ করা যাইতে পারে। তবু থাকে ১২ জন। গান্ধারী ও হৈমবতীর নাম মহাভারতের মৌসলপর্ব্বে ভিন্ন আর কোথাও পাওয়া যায় না। মৌসলপর্ব্বে যে মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত, তাহা পরে দেখাইব। এজন্য এই দুই নামও পরিত্যাগ করা যাইতে পারে। বাকি থাকে ১০ জন।

জাম্ববতীর নাম বিষ্ণুপুরাণের ২৮ অধ্যায়ে এইরূপ লেখা আছে,—

“দেবী জাম্ববতী চাপি রোহিণী কামরূপিনী।”

হরিবংশে এইরূপ,—

“সূতা জাম্ববতশ্চাপি রোহিণী কামরূপিনী।”

ইহার অর্থে যদি বুঝা যায়, জাম্ববৎসূতাই রোহিণী, তাহা হইলে অর্থ অসঙ্গত হয় না,

* ইহারাও প্রধানা অষ্টের ভিতর গণিত হইয়াছেন। ‘তাসামপত্যান্যটানাং ভগবন্ প্রববীত মে।’ ইহার উত্তরে এ সকল মহিষীর অপত্য কথিত হইতেছে।

† রুক্মিণী স্বথ গান্ধারী শৈব্যা হৈমবতীতাপি।

দেবী জাম্ববতী চৈব বিবিশুর্জাতবেদসম্ ॥

মৌসলপর্ব্ব, ৭ অধ্যায়।

বরং সেই অর্থই সঙ্গত বোধ হয়। অতএব জাম্ববতী ও রোহিণী একই। বাকি থাকিল ৮ জন।

সত্যভামা ও সত্যাও এক। তাহার প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি।

সত্রাজিতবধের কথার উত্তরে

“কৃষ্ণঃ সত্যভামামমর্ষতাম্নলোচনঃ প্রাহ, সত্যে, মমৈষাবহাসনা।”

অর্থাৎ কৃষ্ণ ক্রোধারক্ত লোচনে সত্যভামাকে বলিলেন, “সত্যে! ইহা আমারই অবহাসনা।” পদুশচ পঞ্চমাংশের ৩০ অধ্যায়ে, পারিজাতহরণে কৃষ্ণ সত্যভামাকে বলিতেছেন—

“সত্যে! যথা স্বমিত্যুক্তং ত্বয়া কৃষ্ণাসকৃৎপ্রিয়ম্।”

আবশ্যক হইলে, আরও ভূরি ভূরি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। ইহা যথেষ্ট।

অতএব এই দশ জনের মধ্যে, সত্যা সত্যভামারই নাম বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইল। এখন আট জন পাই। যথা—

- | | |
|-------------|-----------------------|
| ১। রুক্মিণী | ৫। কালিন্দী |
| ২। সত্যভামা | ৬। মিত্রবিন্দা |
| ৩। জাম্ববতী | ৭। মাদ্রী |
| ৪। শৈব্যা | ৮। জালহাসিনী লক্ষ্মণা |

ইহার মধ্যে পাঁচ জন—শৈব্যা, কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, লক্ষ্মণা ও মাদ্রী সুশীলা—ইহারা তালিকার মধ্যে আছেন মাত্র। ইহাদের কখনও কার্যক্ষেত্রে দেখিতে পাই না। ইহাদের কবে বিবাহ হইল, কেন বিবাহ হইল, কেহ কিছু বলে না। কৃষ্ণজীবনে ইহাদের কোন সংস্পর্শ নাই। ইহাদের পুত্রের তালিকা কৃষ্ণপুত্রের তালিকার মধ্যে বিষ্ণুপুত্রাণকার লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগকে কখনও কর্মক্ষেত্রে দেখি না। ইহারা কাহার কন্যা, কোন্ দেশসম্ভূতা, তাহার কোন কথা কোথাও নাই। কেবল, সুশীলা মদুরাজকন্যা, ইহাই আছে। কৃষ্ণের সমসাময়িক মদুরাজ, নকুল সহদেবের মাতুল, কুরুক্ষেত্রের বিখ্যাত রথী শল্য। তিনি ও কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে সপ্তদশ দিন, পরস্পরের শত্রুসেনা মধ্যে অবস্থিত। অনেক বার তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইয়াছে। কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় অনেক কথা শল্যকে বলিতে হইয়াছে, শল্য সম্বন্ধীয় কথা কৃষ্ণকে বলিতে হইয়াছে। কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় অনেক কথা শল্যকে শুনিতে হইয়াছে, শল্য সম্বন্ধীয় অনেক কথা কৃষ্ণকেও শুনিতে হইয়াছে। এক পলক জন্য কিছুতেই প্রকাশ নাই যে, কৃষ্ণ শল্যের জামাতা, বা ভগিনীপতি, বা তাদৃশ কোন সম্বন্ধবিশিষ্ট। সম্বন্ধের মধ্যে এইটুকু পাই যে, শল্য কর্ণকে বলিয়াছেন, ‘অজ্জর্ন ও বাসুদেবকে এখনই বিনাশ কর’। কৃষ্ণও যুধিষ্ঠিরকে শল্যবধে নিযুক্ত করিয়া তাহার যমস্বরূপ হইলেন। কৃষ্ণ যে মাদ্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়াই বোধ হয়। শৈব্যা, কালিন্দী, মিত্রবিন্দা এবং লক্ষ্মণার কুলশীল, দেশ এবং বিবাহবৃত্তান্ত কিছুই কেহ জানে না। তাঁহারাও কাব্যের অলঙ্কার, সে বিষয়ে আমার সংশয় হয় না।

কেন না, কেবল মাদ্রী নয়, জাম্ববতী রোহিণী ও সত্যভামাকেও ঐরূপ দেখি। জাম্ববতীর সঙ্গে কালিন্দী প্রভৃতির প্রভেদ এই যে, তাঁহার পুত্র শাম্বের নাম, আর পাঁচ জন যাদবের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু শাম্ব কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ, কেবল এক লক্ষ্মণাহরণে। লক্ষ্মণা দুর্ষ্যোধনের কন্যা। মহাভারত যেমন পাণ্ডবদিগের জীবনবৃত্ত, তেমনি কৌরবদিগেরও জীবনবৃত্ত। লক্ষ্মণাহরণে যদি কিছু সত্য থাকিত, তবে মহাভারতে লক্ষ্মণাহরণ থাকিত। তাহা নাই। লক্ষ্মণাহরণ ভিন্ন যদুবংশধরংসেও শাম্বের নায়কতা দেখা যায়। তিনিই পেটে মুসল জড়াইয়া মেয়ে সাজিয়াছিলেন। আমি এই গ্রন্থের সপ্তম খণ্ডে বলিয়াছি যে, এই মোসলপর্ব প্রসিদ্ধ। মুসল-ঘটিত বৃত্তান্তটা অতিপ্রকৃত। এজন্য পরিত্যাজ্য। জাম্ববতীর বিবাহের পরে সুভদ্রার বিবাহ,—অনেক পরে। সুভদ্রার পৌত্র পরিক্ষিৎ যখন ৩৬ বৎসরের, তখন যদুবংশধরংস। সুতরাং যদুবংশধরংসের সময় শাম্ব প্রাচীন। প্রাচীন ব্যক্তির গর্ভিণী সাজিয়া ঋষিদের ঠকাইতে যাওয়া অসম্ভব। জাম্ববতী নিজে ভল্লুককন্যা, ভল্লুকী। ভল্লুকী কৃষ্ণভার্য্যা বা কোন মানুষের ভার্য্যা হইতে পারে না। এই জন্য রোহিণীকে কামরূপিণী বলা হইয়াছে। কামরূপিণী কেন না, ভল্লুকী হইয়াও মানবরূপিণী হইতে পারিতেন। কামরূপিণী ভল্লুকীতে

বিক্রম রচনাবলী

আমি বিশ্বাসবান্ নহি, এবং কৃষ্ণ ভল্লুককন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহাও বিশ্বাস করিতে পারি না।

সত্যভামার পুত্র ছিল শূর্ন, কিন্তু তাঁহারা কখনও কোন কাৰ্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত নহেন। তাঁহার প্রতি সন্দেহের এই প্রথম কারণ। তবে সত্যভামা নিজে রুক্মিণীর ন্যায় মধ্যে মধ্যে কাৰ্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত বটে। তাঁহার বিবাহবৃত্তান্তও সবিস্তারে আলোচনা করা গিয়াছে।

মহাভারতের বনপর্বে মার্কাণ্ডেয়সমস্যা-পর্বাধ্যায়ের সত্যভামাকে পাওয়া যায়। ঐ পর্বাধ্যায় প্রক্ষিপ্ত; মহাভারতের বনপর্বে সমালোচনাকালে পাঠক তাহা দেখিতে পাইবেন। ঐখানে দ্রৌপদীসত্যভামাসংবাদ বলিয়া একটি ক্ষুদ্র পর্বাধ্যায় আছে, তাহাও প্রক্ষিপ্ত। মহাভারতীয় কথার সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। উহা স্বামী প্রতি স্ত্রীর কিরূপ আচরণ কর্তব্য, তৎসম্বন্ধীয় একটি প্রবন্ধমাত্র। প্রবন্ধটার লক্ষণ আধুনিক।

তার পর উদ্যোগপর্বেও সত্যভামাকে দেখিতে পাই—যানসন্ধি-পর্বাধ্যায়ের। সে স্থানও প্রক্ষিপ্ত, যানসন্ধি-পর্বাধ্যায়ের সমালোচনা কালে দেখাইব। কৃষ্ণ, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বরণ হইয়া উপপ্লব্য নগরে আসিয়াছিলেন—যুদ্ধযাত্রায় সত্যভামাকে সঙ্গে আনিবার সম্ভাবনা ছিল না, এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যে সত্যভামা সঙ্গে ছিলেন না, তাহা মহাভারত পড়িলেই জানা যায়। যুদ্ধপর্ব সকলে এবং তৎপরবর্তী পর্ব সকলে কোথাও আর সত্যভামার কথা নাই।

কেবল কৃষ্ণের মানবলীলাসম্বরণের পর, মৌসলপর্বে সত্যভামার নাম আছে। কিন্তু মৌসলপর্বও প্রক্ষিপ্ত, তাহাও পরে দেখাইব।

ফলতঃ মহাভারতের যে সকল অংশ নিঃসন্দেহে মৌলিক বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে, তাহার কোথাও সত্যভামার নাম নাই। প্রক্ষিপ্ত অংশ সকলেই আছে। সত্যভামা সম্বন্ধীয় সন্দেহের এই দ্বিতীয় কারণ।

তার পর বিষ্ণুপুরাণ। বিষ্ণুপুরাণে ইহার বিবাহবৃত্তান্ত সামন্তক মণির উপাখ্যানমধ্যে আছে। যে আঘাটে গল্পে কৃষ্ণের সঙ্গে ভল্লুকসুতার পরিণয়, ইহার সঙ্গে পরিণয় সেই আঘাটে গল্পে। তার পর কথিত হইয়াছে যে, এই বিবাহের জন্য দ্বৈষবিশিষ্ট হইয়া শতধন্বা সত্যভামার পিতা সত্রাজিতকে মারিয়াছিলেন। কৃষ্ণ তখন বারণাবতে, জতুগৃহদাহপ্রবাদ জন্য পাণ্ডবদিগের অন্বেষণে গিয়াছিলেন। সেইখানে সত্যভামা তাঁহার নিকট নালিশ করিয়া পাঠাইলেন। কথাটা মিথ্যা। কৃষ্ণ কখন বারণাবতে যান নাই—গেলে মহাভারতে থাকিত। তাহা নাই। এই সকল কথা সন্দেহের তৃতীয় কারণ।

তার পর, বিষ্ণুপুরাণে সত্যভামাকে কেবল পারিজাতহরণবৃত্তান্তে পাই। সেটা অনৈসর্গিক অলীক ব্যাপার; প্রকৃত ও বিশ্বাসযোগ্য ঘটনায় তাঁহাকে বিষ্ণুপুরাণে কোথাও পাই না। সন্দেহের এই চতুর্থ কারণ।

মহাভারতে আদিপর্বে সম্ভব-পর্বাধ্যায়ের সপ্তষষ্ঠি অধ্যায়ের নাম ‘অংশাবতরণ’। মহাভারতের নায়কনায়িকাগণ কে কোন দেব দেবী অসুর রাক্ষসের অংশে জন্মিয়াছিল, তাহাই ইহাতে লিখিত হইয়াছে। শেষভাগে লিখিত আছে যে, কৃষ্ণ নারায়ণের অংশ, বলরাম শেষ নাগের অংশ, প্রদ্যম্ন সনৎকুমারের অংশ, দ্রৌপদী শচীর অংশ, কুন্তী ও মাদ্রী সিন্ধি ও ধৃতির অংশ। কৃষ্ণমহিষীগণ সম্বন্ধে লেখা আছে যে, কৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র মহিষী অপ্সরোগণের অংশ এবং রুক্মিণী লক্ষ্মী দেবীর অংশ। আর কোনও কৃষ্ণমহিষীর নাম নাই। সন্দেহের এই পঞ্চম কারণ। সন্দেহের এ কারণ কেবল সত্যভামা সম্বন্ধে নহে। রুক্মিণী ভিন্ন কৃষ্ণের সকল প্রধান মহিষীদিগের প্রতি বর্তে। নরকের ষোড়শ সহস্র কন্যার অনৈসর্গিক কথাটা ছাড়িয়া দিলে, রুক্মিণী ভিন্ন কৃষ্ণের আর কোনও মহিষী ছিল না, ইহাই মহাভারতের এই অংশের দ্বারা প্রমাণিত হয়।

ভল্লুকদৌহিত্র শাম্ব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা বাদ দিলে, রুক্মিণী ভিন্ন আর কোনও কৃষ্ণমহিষীর পুত্র পৌত্র কাহাকেও কোন কর্মক্ষেত্রে দেখা যায় না। রুক্মিণীবংশই রাজা হইল—আর কাহারও বংশের কেহ কোথাও রহিল না।

এই সকল কারণে আমার খব সন্দেহ যে, কৃষ্ণের একাধিক মহিষী ছিল না। এমন তঠাতও পারে, ছিল। তখনকার এই রীতিই ছিল। পণ্ড পাণ্ডবের সকলেরই একাধিক মহিষী ছিল। আদর্শ ধার্মিক ভীষ্ম, কনিষ্ঠ ভ্রাতার জন্য কাশিরাজের তিনটি কন্যা হরণ করিয়া

আনিয়াছিলেন। একাধিক বিবাহ যে কৃষ্ণের অনাভিমত, এ কথাটাও কোথাও নাই; আমিও বিচারে কোথাও পাই নাই যে, পুরুষের একাধিক বিবাহ সকল অবস্থাতেই অধর্ম। ইহা নিশ্চিত বটে যে, সচরাচর অকারণে পুরুষের একাধিক বিবাহ অধর্ম। কিন্তু সকল অবস্থাতে নহে। যাহার পত্নী কুষ্ঠগ্রস্ত বা এরূপ রুগ্ন যে, সে কোন মতেই সংসারধর্মের সহায়তা করিতে পারে না, তাহার যে দারাস্তরপরিগ্রহ পাপ, এমন কথা আমি বুদ্ধিতে পারি না। যাহার স্ত্রী ধর্মভ্রষ্টা কুলকলঙ্কিনী, সে যে কেন আদালতে না গিয়া দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করিতে পারিবে না, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আসে না। আদালতে যে গোরববৃদ্ধি হয়, তাহার উদাহরণ আমরা সভ্যতর সমাজে দেখিতে পাইতেছি। যাহার উত্তরাধিকারীর প্রয়োজন, কিন্তু স্ত্রী বক্ষ্যা, সে যে কেন দারাস্তর গ্রহণ করিবে না, তা বুদ্ধিতে পারি না। ইউরোপ যিহুদার নিকট শিখিয়াছিল যে, কোন অবস্থাতেই দারাস্তর গ্রহণ করিতে নাই। যদি ইউরোপের এ কুশিক্ষা না হইত, তাহা হইলে, বোনাপার্টিকে জসেফাইনের বর্জ্জন রূপ অতি ঘোর নারকী পাতকে পতিত হইতে হইত না; অষ্টম হেনরীকে কথায় কথায় পত্নীহত্যা করিতে হইত না। ইউরোপে আজ কালি সভ্যতার উজ্জ্বললোকে এই কারণে অনেক পত্নীহত্যা, পতিহত্যা হইতেছে। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, যাহাই বিলাতী, তাহাই চমৎকার, পবিত্র, দোষশূন্য, উদ্ধর্দাধঃ চতুর্দশ পুরুষের উদ্ধারের কারণ। আমার বিশ্বাস, আমরা যেমন বিলাতের কাছে অনেক শিখিতে পারি, বিলাতও আমাদের কাছে অনেক শিখিতে পারে। তাহার মধ্যে এই বিবাহতত্ত্ব একটা কথা।

কৃষ্ণ একাধিক বিবাহ করিয়াছিলেন কি না, সে বিষয়ে কোন গণনীয় প্রমাণ নাই, ইহা দেখিয়াছি। যদি করিয়া থাকেন, তবে কেন করিয়াছিলেন, তাহারও কোন বিশ্বাসযোগ্য ইতিবৃত্ত নাই। যে যে তাঁহাকে স্যমস্তক মণি উপহার দিল, সে সঙ্গে সঙ্গে অর্মানি একটি কন্যা উপহার দিল, ইহা পিতামহীর উপকথা। আর নরকরাজার ষোল হাজার মেয়ে, ইহা প্রপিতামহীর উপকথা। আমরা শুনিয়া খুসী—বিশ্বাস করিতে পারি না।

চতুর্থ খণ্ড

ইন্দ্রপ্রস্থ

অকুণ্ঠং সৰ্ব্বেকাৰ্য্যেষু ধৰ্ম্মকাৰ্য্যার্থমদ্যতম্ ।

বৈকুণ্ঠস্য চ যদ্রূপং তস্মৈ কাৰ্য্যাত্মনে নমঃ ॥

শান্তিপৰ্ব্বণি, ৪৭ অধ্যায়ঃ ।

প্রথম পরিচ্ছেদ—দ্রৌপদীস্বয়ংবর

মহাভারতে কৃষ্ণকথা যাহা আছে, তাহার কোন অংশ মৌলিক এবং বিশ্বাসযোগ্য তাহার নিৰ্ব্বাচন জন্য প্রথম খণ্ডে যে সকল নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছি, এক্ষণে আমি পাঠককে সেই সকল স্মরণ করিতে অনুরোধ করি।

মহাভারতে কৃষ্ণকে প্রথম দ্রৌপদীস্বয়ংবরে দেখিতে পাই। আমার বিবেচনায় এই অংশের মৌলিকতায় সন্দেহ হইবার কারণ নাই। লাসেন্ সাহেব, দ্রৌপদীকে পাণ্ডালের পণ্ড জাতির একীকরণস্বরূপ পাণ্ডালী বলিয়া, দ্রৌপদীর মানবীত্ব উড়াইয়া দিয়াছেন, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। আমিও বিশ্বাস করি না যে, যজ্ঞের অগ্নি হইতে দ্রুপদ কন্যা পাইয়াছিলেন, অথবা সেই কন্যার পাঁচটি স্বামী ছিল। তবে দ্রুপদের ঔরসকন্যা থাকা অসম্ভব নহে, এবং তাহার স্বয়ংবর বিবাহ হইয়াছিল, এবং সেই স্বয়ংবরে অর্জুন লক্ষ্যবেধ করিয়াছিলেন, ইহা অশ্বাস করিবার কারণ নাই। তার পর, তাঁহার পাঁচ স্বামী হইয়াছিল, কি এক স্বামী হইয়াছিল, সে কথার মীমাংসায় আমাদের কোন প্রয়োজন নাই।*

কৃষ্ণকে মহাভারতে প্রথম দ্রৌপদীস্বয়ংবরে দেখি। সেখানে তাঁহার দেবত্ব কিছুই সূচিত হয় নাই। অন্যান্য ঋগ্বেদদিগের ন্যায় তিনি ও অন্যান্য যাদবেরা নিমন্ত্রিত হইয়া পাণ্ডালে আসিয়াছিলেন। তবে অন্যান্য ঋগ্বেদেরা দ্রৌপদীর আকাঙ্ক্ষায় লক্ষ্যবেধে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু যাদবেরা কেহই সে চেষ্টা করে নাই।

পাণ্ডবেরা এই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু নিমন্ত্রিত হইয়া নহে। দুর্যোধন তাঁহাদিগের প্রাণহানি করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারা আত্মরক্ষার্থে ছদ্মবেশে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। এক্ষণে দ্রৌপদীস্বয়ংবরের কথা শুনিয়া ছদ্মবেশে এখানে উপস্থিত।

এই সমবেত ব্রাহ্মণ-ঋগ্বেদ-মণ্ডল মধ্যে কেবল কৃষ্ণই ছদ্মবেশযুক্ত পাণ্ডবদিগকে চিনিয়াছিলেন। ইহা যে তিনি দৈবশক্তির প্রভাবে জানিতে পারিয়াছিলেন, এমন ইঙ্গিত মাত্র নাই। মনুষ্যবুদ্ধিতেই তাহা বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার উক্তিহেই ইহা প্রকাশ। তিনি বলদেবকে বলিতেছেন, “মহাশয়! যিনি এই বিস্তীর্ণ শরাসন আকর্ষণ করিতেছেন, ইনিই অর্জুন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আর যিনি বাহুবলে বৃক্ষ উৎপাটনপূর্ব্বক নিভয়ে রাজমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইতেছেন, ইঁহার নাম বৃকোদর।” ইত্যাদি। ইহার পরে সাক্ষাৎ হইলে যখন তাঁহাকে ষুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “কি প্রকারে তুমি আমাদের চিনিলে?” তাহাতে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, “ভস্মাচ্ছাদিত বহি কি লুকান থাকে?” পাণ্ডবদিগকে সেই ছদ্মবেশে চিনিতে পারা অতি কঠিন; আর কেহ যে চিনিতে পারে নাই, তাহা বিস্ময়কর নহে; কৃষ্ণ যে চিনিতে পারিয়াছিলেন—স্বাভাবিক মনুষ্যবুদ্ধিতেই চিনিয়াছিলেন—ইহাতে কেবল ইহাই বুঝায় যে, অন্যান্য মনুষ্যাপেক্ষা তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিলেন। মহাভারতকার এ কথাটা কোথাও

* পূর্বে বলিয়াছি যে, মহাভারতের পৰ্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, অনুরূপমণিকাধ্যায়ে ব্যাসদেব ১৫০ শ্লোকে মহাভারতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ রচিত করিয়াছেন। ঐ অনুরূপমণিকার সংক্ষিপ্ত বিবরণে দ্রৌপদীস্বয়ংবরের কথা আছে, কিন্তু পণ্ড পাণ্ডবের সঙ্গে যে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল, এমন কথা নাই। অর্জুনই তাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন, এই কথাই আছে।

“সমবায়ৈ ততো রাজ্ঞাং কন্যাং ভর্তৃস্বয়ংবরাম্ ।

প্রাপ্তবানর্জুনঃ কৃষ্ণাং কৃত্বা কৰ্ম্ম সদুৎকরম্ ॥” ১২৫ ॥

পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই; কিন্তু কৃষ্ণের কার্যে সর্বত্র দেখিতে পাই যে, তিনি মনুষ্যবুদ্ধিতে কার্য করেন বটে, কিন্তু তিনি সর্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণবুদ্ধি মনুষ্য। এই বুদ্ধিতে কোথাও ছিদ্র দেখা যায় না। অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় তিনি বুদ্ধিতেও আদর্শ মনুষ্য।

অনন্তর অজ্জর্ন লক্ষ্য বিধিলে সমাগত রাজাদিগের সঙ্গে তাঁহার বড় বিবাদ বাধিল। অজ্জর্ন ভিক্ষুকব্রাহ্মণবেশধারী। একজন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ বড় বড় রাজাদিগের মূখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া যাইবে, ইহা তাঁহাদিগের সহ্য হইল না। তাঁহারা অজ্জর্নের উপর আক্রমণ করিলেন। যত দূর যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে অজ্জর্নই জয়ী হইয়াছিলেন। এই বিবাদ কৃষ্ণের কথায় নিবারণ হইয়াছিল। মহাভারতে এইটুকু কৃষ্ণের প্রথম কাজ। তিনি কি প্রকারে বিবাদ মিটাইয়াছিলেন, সেই কথাটা বলাই আমাদের উদ্দেশ্য। বিবাদ মিটাইবার অনেক উপায় ছিল। তিনি নিজে বিখ্যাত বীরপুরুষ, এবং বলদেব, সাত্যকি প্রভৃতি অদ্বিতীয় বীরেরা তাঁহার সহায় ছিল। অজ্জর্ন তাঁহার আত্মীয়—পিতৃস্বসার পুত্র। তিনি যাদবদিগকে লইয়া সমরক্ষেত্রে অজ্জর্নের সাহায্যে নামিলে, তখনই বিবাদ মিটিয়া যাইতে পারিত। ভীম তাহাই করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ আদর্শ ধার্মিক, যাহা বিনা যুদ্ধে সম্পন্ন হইতে পারে, তাহার জন্য তিনি কখনও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন নাই। মহাভারতের কোন স্থানেই ইহা নাই যে, কৃষ্ণ ধর্মার্থ ভিন্ন অন্য কারণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আত্মরক্ষার্থ ও পরের রক্ষার্থ যুদ্ধ ধর্ম, আত্মরক্ষার্থ বা পরের রক্ষার্থ যুদ্ধ না করা পরম অধর্ম। আমরা বাঙ্গালি জাতি, আজি সাত শত বৎসর সেই অধর্মের ফলভোগ করিতেছি। কৃষ্ণ কখনও অন্য কারণে যুদ্ধ করেন নাই। আর ধর্মস্থাপনজন্য তাঁহার যুদ্ধে আপত্তি ছিল না। যেখানে যুদ্ধ ভিন্ন ধর্মের উন্নতি নাই, সেখানেও যুদ্ধ না করাই অধর্ম। কেবল কাশীরাম দাস বা কথকঠাকুরদের কথিত মহাভারতে যাঁহাদের অধিকার, তাঁহাদের বিশ্বাস, কৃষ্ণই সকল যুদ্ধের মূল; কিন্তু মূল মহাভারত বুদ্ধিপূর্বক পড়িলে এরূপ বিশ্বাস থাকে না। তখন বুদ্ধিতে পারা যায় যে, ধর্মার্থ ভিন্ন কৃষ্ণ কখনও কাহাকেও যুদ্ধে প্রবৃত্তি দেন নাই। নিজেও ধর্মার্থ ভিন্ন যুদ্ধ করেন নাই।

এখানেও কৃষ্ণ যুদ্ধের কথা মনেও আনিলেন না। তিনি বিবদমান ভূপালবৃন্দকে বলিলেন, “ভূপালবৃন্দ! ইঁহারাই রাজকুমারীকে ধর্মতঃ লাভ করিয়াছিলেন, তোমরা ক্ষান্ত হও, আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই।” ‘ধর্মতঃ’! ধর্মের কথাটা ত এতক্ষণ কাহারও মনে পড়ে নাই। সে কালের অনেক ক্ষত্রিয় রাজা ধর্মভীত ছিলেন, রুচিপূর্বক কখন অধর্ম প্রবৃত্ত হইতেন না। কিন্তু এ সময়ে রাগান্বিত হইয়া ধর্মের কথাটা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু যিনি প্রকৃত ধর্মান্বিতা, ধর্মবুদ্ধিই যাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য, তিনি এ বিষয়ের ধর্ম কোন পক্ষে, তাহা ভুলেন নাই। ধর্মবিস্মৃতিদিগের ধর্মস্মরণ করিয়া দেওয়া, ধর্মানিভজ্ঞদিগকে ধর্ম বৃদ্ধাইয়া দেওয়াই, তাঁহার কাজ।

ভূপালবৃন্দকে কৃষ্ণ বলিলেন, “ইঁহারাই রাজকুমারীকে ধর্মতঃ লাভ করিয়াছেন, অতএব আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই।” শূন্যিয়া রাজারা নিরস্ত হইলেন। যুদ্ধ ফুরাইল। পাণ্ডবেরা আশ্রমে গেলেন।

এক্ষণে ইহা বৃদ্ধা যায় যে, যদি একজন বাজে লোক দৃপ্ত রাজগণকে ধর্মের কথাটা স্মরণ করিয়া দিত, তাহা হইলে দৃপ্ত রাজগণ কখনও যুদ্ধ হইতে বিরত হইতেন না। যিনি ধর্মের কথাটা স্মরণ করিয়া দিলেন, তিনি মহাবলশালী এবং গৌরবান্বিত। তিনি জ্ঞান, ধর্ম ও বাহুবলে সকলের প্রধান হইয়াছিলেন। সকল বৃত্তিগুলিই সম্পূর্ণরূপে অনুশীলিত করিয়াছিলেন, তাহারই ফল এই প্রাধান্য। সকল বৃত্তিগুলি অনুশীলিত না হইলে, কেহই তাদৃশ ফলদায়িনী হয় না। এইরূপ কৃষ্ণচরিত্রের দ্বারা ধর্মতত্ত্ব পরিষ্কৃত হইতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—কৃষ্ণ-যুদ্ধিষ্ঠির-সংবাদ

অজ্জর্ন লক্ষ্য বিধিয়া, রাজগণের সহিত যুদ্ধ সমাপন করিয়া ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে আশ্রমে গমন করিলেন। রাজগণও স্ব স্ব স্থানে গমন করিতে লাগিলেন। এক্ষণে কৃষ্ণের কি করা কর্তব্য ছিল? দ্রৌপদীর স্বয়ংবর ফুরাইল, উৎসব যাহা ছিল, তাহা ফুরাইল, কৃষ্ণের পাণ্ডালে থাকিবার আর কোন প্রয়োজন ছিল না। এক্ষণে স্বস্থানে ফিরিয়া গেলেই হইত। অন্যান্য

বিক্রম রচনাবলী

রাজগণ তাহাই করিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ তাহা না করিয়া, বলদেবকে সঙ্গে লইয়া, যেখানে ভার্গবকস্ম-শালায় ভিক্ষুকবেশধারী পাণ্ডবগণ বাস করিতোছিলেন, সেইখানে গিয়া যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন।

সেখানে তাঁহার কিছু কাজ ছিল না—যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে তাঁহার পূর্বে কখন সাক্ষাৎ বা আলাপ ছিল না। কেন না, মহাভারতকার লিখিয়াছেন যে, “বাসুদেব যুধিষ্ঠিরের নিকট অভিগমন ও চরণবন্দন পূর্বক আপনার পরিচয় প্রদান করিলেন।” বলদেবও ঐরূপ করিলেন। যখন আপনার পরিচয় প্রদান করিতে হইল, তখন অবশ্য ইহা বঝিতে হইবে যে, পূর্বে পরস্পরের সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ বা আলাপ ছিল না। কৃষ্ণ-পাণ্ডবে এই প্রথম সাক্ষাৎ। কেবল পিতৃবসার পুত্র বলিয়া কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে খুঁজিয়া লইয়া তাঁহাদিগের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। কাজটা সাধারণ-লৌকিক-ব্যবহার-অনুমোদিত হয় নাই। লোকের প্রথা আছে বটে যে, পিসিত বা মাসিত ভাই যদি একটা রাজা বা বড়লোক হয়, তবে উপযাচক হইয়া তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া আইসে। কিন্তু পাণ্ডবেরা তখন সামান্য ভিক্ষুক মাত্র; তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কৃষ্ণের কোন অভীষ্টই সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। আলাপ করিয়া কৃষ্ণও যে কোন লৌকিক অভীষ্ট সিদ্ধ করিলেন, এমন দেখা যায় না। তিনি কেবল বিনয়পূর্বক যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সদালাপ করিয়া তাঁহার মঙ্গলকামনা করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। এবং তার পর পাণ্ডবদিগের বিবাহসমাপ্তি পর্যন্ত পাণ্ডালে আপন শিবিরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বিবাহ সমাপ্ত হইয়া গেলে, তিনি “কৃতদার পাণ্ডবদিগের যৌতুক স্বরূপ বিচিত্র বৈদূর্য্য মণি, সুবর্ণের আভরণ, নানা দেশীয় মহার্ঘ বসন, রমণীয় শয্যা, বিবিধ গৃহসামগ্রী, বহুসংখ্যক দাসদাসী, সুশিক্ষিত গজবৃন্দ, উৎকৃষ্ট ঘোটকাবলী, অসংখ্য রথ এবং কোটি কোটি রজত কাণ্ডন শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রেরণ করিলেন।” এ সকল পাণ্ডবদিগের তখন ছিল না; কেন না, তখন তাঁহারা ভিক্ষুক এবং দূরবস্থাপন্ন। অথচ এ সকলে তখন তাঁহাদের বিশেষ প্রয়োজন; কেন না, তাঁহারা রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া গৃহী হইয়াছেন। সুতরাং যুধিষ্ঠির “কৃষ্ণপ্রেরিত দ্রব্যসামগ্রী সকল আহ্বাদ পূর্বক গ্রহণ করিলেন।” কিন্তু কৃষ্ণ তাঁহাদিগের সঙ্গে আর সাক্ষাৎ না করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। তারপর তিনি পাণ্ডবদিগকে আর খোঁজেন নাই। পাণ্ডবেরা রাজ্যার্ক প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে নগরনির্মাণপূর্বক বাস করিতে লাগিলেন। যে প্রকারে পুনরায় পাণ্ডবদিগের সহিত তাঁহার মিলন হইল, তাহা পরে বলিব।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, যিনি এইরূপ নিঃস্বার্থ আচরণ করিতেন, যিনি দূরবস্থাগ্রস্তমাত্রেরই হিতানুসন্ধান করা নিজ জীবনের ব্রতস্বরূপ করিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য মুর্খেরা এবং তাঁহাদের শিষ্যগণ সেই কৃষ্ণকে কুকর্মানুরত, দুর্ভিক্ষিয়ুক্ত, দুঃ এবং পাপাচারী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ঐতিহাসিক তত্ত্বের বিশ্লেষণের শক্তি বা তাহাতে শ্রদ্ধা এবং যত্ন না থাকিলে, এইরূপ ঘটাই সম্ভব। স্থূল কথা এই, যিনি আদর্শ মনুষ্য, তাঁহার অন্যান্য সদ্বৃত্তির ন্যায় প্রীতিবৃত্তিও পূর্ণবিকশিত ও স্ফূর্তিপ্ৰাপ্ত হওয়াই সম্ভব। শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠিরের প্রতি যে ব্যবহার করিলেন, তাহা অনেকেরই পূর্ববদ্বিত সখ্যস্থলে করা সম্ভব। যুধিষ্ঠির কুটুম্ব; যদি কৃষ্ণের সঙ্গে পূর্ব হইতে তাঁহার আলাপ প্রণয় এবং আত্মীয়তা থাকিত, তাহা হইলে তিনি যে ব্যবহার করিলেন, তাহা কেবল ভদ্রজনোচিত বলিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারিতাম—বেশী বলিবার অধিকার থাকিত না। কিন্তু যিনি অপরিচিত এবং দরিদ্র ও হীনাবস্থাপন্ন কুটুম্বকে খুঁজিয়া লইয়া, আপনার কার্য্য ক্ষতি করিয়া, তাহার উপকার করেন, তাঁহার প্রীতি আদর্শ প্রীতি। কৃষ্ণের এই কার্য্যটি ক্ষুদ্র কার্য্য বটে, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যই মনুষ্যের চরিত্রের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। একটা মহৎ কার্য্য বদ্মায়েসেও চেষ্টাচারিত্র করিয়া করিতে পারে, এবং করিয়াও থাকে। কিন্তু যাঁহার ছোট কাজগুলিও ধর্ম্মাত্মতার পরিচায়ক, তিনি যথার্থ ধর্ম্মাত্মা। তাই, আমরা মহাভারতের আলোচনায়ও* কৃষ্ণকৃত ছোট বড় সকল কার্য্যের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, আমরা এ প্রণালীতে কখন কৃষ্ণকে বঝিবার চেষ্টা করি নাই। তাহা না করিয়া কৃষ্ণচরিত্রের যথো কেবল “অশ্বখামা হত ইতি গজঃ” এই কথাটি শিখিয়া রাখিয়াছি। অর্থাৎ যাহা সত্য এবং ঐতিহাসিক, তাহার কোন অনুসন্ধান না করিয়া, যাহা মিথ্যা এবং কল্পিত, তাহারই উপর নির্ভর

* হরিবংশ ও পুরাণ সকলে বিশ্বাসযোগ্য কথা পাওয়া যায় না বলিয়া পূর্বে ইহা পারি নাই।

করিয়া আছি। “অশ্বখামা হত ইতি গজঃ”* কথার ব্যাপারটা যে মিথ্যা, তাহা দ্রোণবধ-পর্বাধ্যায় সমালোচনাকালে আমরা প্রমাণীকৃত করিব।

এই বৈবাহিক পর্বে কৃষ্ণ সম্বন্ধে একটা বড় তামাসার কথা ব্যাসোক্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে। তাহা আমাদের সমালোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত না হইলেও, তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা আবশ্যিক বিবেচনা করিলাম। দ্রুপদরাজ, কন্যার পণ্ড স্বামী হইবে শুনিয়া তাহাতে আপত্তি করিতেছেন। ব্যাস তাহার আপত্তি খণ্ডন করিতেছেন। খণ্ডনোপলক্ষে তিনি দ্রুপদকে একটি উপাখ্যান শ্রবণ করান। উপন্যাসটি বড় অদ্ভুত ব্যাপার। উহার স্থূল তাৎপর্য এই যে, ইন্দ্র একদা গঙ্গাজলে একটি রোরুদ্যমানা সুন্দরী দর্শন করেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, “তুমি কেন কাঁদিতেছ?” তাহাতে সুন্দরী উত্তর করে যে, “আইস, দেখাইতেছি।” এই বলিয়া সে ইন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া দেখাইয়া দিল যে, এক যুবা এক যুবতীর সঙ্গে পাশক্রীড়া করিতেছে। তাহারা ইন্দ্রের যথোচিত সম্মান না করায় ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু যে যুবা পাশক্রীড়া করিতেছিলেন, তিনি স্বয়ং মহাদেব। ইন্দ্রকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া তিনিও ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ইন্দ্রকে এক গর্তের ভিতর প্রবেশ করিতে বলিলেন। ইন্দ্র গর্তের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সেখানে তাহার মত আর চারিটি ইন্দ্র আছেন! শেষ মহাদেব পাঁচ জন ইন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন যে, “তোমরা গিয়া পৃথিবীতে মনুষ্য হও।” সেই ইন্দ্ররাই আবার মহাদেবের কাছে প্রার্থনা করিলেন যে, “ইন্দ্রাদি পণ্ডদেব গিয়া আমাদের কোন মনুষ্যের গর্ভে উৎপন্ন করুন”!!! সেই পাঁচ জন ইন্দ্র ইন্দ্রাদির ঔরসে পণ্ড পাণ্ডব হইলেন। বিনাপরাধে মেয়েটাকে মহাদেব হুকুম দিলেন যে, “তুমি গিয়া ইহাদিগের পত্নী হও।” সে দ্রৌপদী হইল। সে যে কেন কাঁদিয়াছিল, তাহার আর কোন খবরই নাই। অধিকতর রহস্যের বিষয় এই যে, নারায়ণ এই কথা শুনিবামাত্রই আপনার মাথা হইতে দুইগাছি চুল উপড়াইয়া ফেলিয়া দিলেন। একগাছি কাঁচা, একগাছি পাকা। পাকা-গাছিটি বলরাম হইলেন, কাঁচা-গাছিটি কৃষ্ণ হইলেন!!!

বুদ্ধিমান পাঠককে বোধ হয় বুঝাইতে হইবে না যে, এই উপাখ্যানটি, আমরা যাহাকে মহাভারতের তৃতীয় স্তর বলিয়াছি, তদন্তর্গত। অর্থাৎ ইহা মূল মহাভারতের কোন অংশ নহে। প্রথমতঃ, উপাখ্যানটির রচনা এবং গঠন এখনকার বাঙ্গালার সর্বনিম্নশ্রেণীর উপন্যাস-লেখকদিগের প্রণীত উপন্যাসের রচনা ও গঠন অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। মহাভারতের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের প্রতিভাশালী কবিগণ এরূপ উপাখ্যানসৃষ্টির মহাপাপে পাপী হইতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ, মহাভারতের অন্যান্য অংশের সঙ্গে ইহার কোন প্রয়োজনীয় সম্বন্ধ নাই। এই উপাখ্যানটির সমুদায় অংশ উঠাইয়া দিলে, মহাভারতের কোন কথাই অস্পষ্ট, অথবা কোন প্রয়োজনই অসিদ্ধ থাকিবে না। দ্রুপদরাজের আপত্তিখণ্ডনজন্য ইহার কোন প্রয়োজন নাই; কেন না, ঐ আপত্তি ব্যাসোক্ত দ্বিতীয় একটি উপাখ্যানের দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে। দ্বিতীয় উপাখ্যান ঐ অধ্যায়েই আছে। তাহা সংক্ষিপ্ত এবং সরল এবং আদিম মহাভারতের অন্তর্গত হইলে হইতে পারে। প্রথমোক্ত উপাখ্যানটি ইহার বিরোধী। দুইটিতে দ্রৌপদীর পূর্বজন্মের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পরিচয় আছে। সুতরাং একটি যে প্রক্ষিপ্ত, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এবং যাহা উপরে বলিয়াছি, তাহাতে প্রথমোক্ত উপাখ্যানটিই প্রক্ষীপ্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়। তৃতীয়তঃ, এই প্রথমোক্ত উপাখ্যান মহাভারতের অন্যান্য অংশের বিরোধী। মহাভারতের সর্বত্রই কথিত আছে, ইন্দ্র এক। এখানে ইন্দ্র পাঁচ। মহাভারতের সর্বত্রই কথিত আছে যে, পাণ্ডবেরা ধর্ম, বায়ু, ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমারদিগের ঔরসপুত্র মাত্র। এখানে সকলেই এক একজন ইন্দ্র। এই বিরোধের সামঞ্জস্যের জন্য উপাখ্যানরচনাকারী গন্দর্ভ লিখিয়াছেন যে, ইন্দ্রেরা মহাদেবের নিকট প্রার্থনা করিলেন, “ইন্দ্রাদি আসিয়া আমাদের কোন মনুষ্যের গর্ভে উৎপন্ন করুন।” জগদ্বিজয়ী গ্রন্থ মহাভারত এরূপ গন্দর্ভের লেখনীপ্রসূত নহে, উহা নিশ্চিত।

এই অশ্রদ্ধেয় উপাখ্যানটির এ স্থলে উল্লেখ করার আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া আমরা মহাভারতের তিনটি স্তর ভাগ করিতেছি ও করিব, তাহা

* পরে দেখিব, “অশ্বখামা হত ইতি গজঃ” এই বুলিটাই মহাভারতে নাই। ইহা কথকঠাকুরের সংস্কৃত।

বাংকম রচনাবলী

উদাহরণের দ্বারা পাঠককে বুঝাই। তা ছাড়া একটা ঐতিহাসিক তত্ত্বও ইহা দ্বারা স্পষ্টীকৃত হয়। যে বিষ্ণু, বেদে সূর্যের মূর্ত্তিবিশেষ মাত্র, পুরাণোত্থাসের উচ্চস্তরে যিনি সর্বব্যাপক ঈশ্বর, তিনি কি প্রকারে পরবর্ত্তী হতভাগ্য লেখকদিগের হস্তে দাড়ি, গোঁপ, কাঁচা চুল, পাকা চুল প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইলেন, এই সকল প্রক্ষিপ্ত উপাখ্যানের দ্বারা তাহা বুঝা যায়। এই সকল প্রক্ষিপ্ত উপাখ্যানে হিন্দুধর্ম্মের অবনতির ইতিহাস পড়িতে পাই। তাই এই স্থানে ইহার উল্লেখ করিলাম। কোন কৃষ্ণদেবী শৈব দ্বারা এই উপাখ্যান রচিত হইয়া মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এমন বিবেচনাও করা যাইতে পারে। কেন না, এখানে মহাদেবই সর্বনিয়ন্তা এবং কৃষ্ণ নারায়ণের একটি কেশ মাত্র। মহাভারতের আলোচনায় কৃষ্ণবাদী এবং শৈবদিগের মধ্যে এইরূপ অনেক বিবাদের চিহ্ন দেখিতে পাই। এবং যে সকল অংশে সে চিহ্ন পাই, তাহার অধিকাংশই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ করিবার কারণ পাই। যদি এ কথা যথার্থ হয়, তবে ইহাই উপলব্ধি করিতে হইবে যে, এই বিবাদ আদিম মহাভারতের প্রচারের অনেক পরে উপস্থিত হইয়াছিল। অর্থাৎ যখন শিবোপাসনা ও কৃষ্ণোপাসনা উভয়ই প্রবল হয়, তখন বিবাদও ঘোরতর হইয়াছিল। মহাভারতপ্রচারের সময়ে বা তাহার পরবর্ত্তী প্রথম কালে এতদুভয়ের মধ্যে কোন উপাসনাই প্রবল ছিল না। সে সময়টা বেদের দেবতার প্রবলতার সময়। যত উভয়েই প্রবল হইল, তত বিবাদ বাধিল—তত মহাভারতের কলেবর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। উভয় পক্ষেরই অভিপ্রায়, মহাভারতের দোহাই দিয়া আপনার দেবতাকে বড় করেন। এই জন্য শৈবেরা শিবমাহাত্ম্যসূচক রচনা সকল মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত করিতে লাগিলেন।* তদুত্তরে বৈষ্ণবেরা বিষ্ণু বা কৃষ্ণমাহাত্ম্যসূচক সেইরূপ রচনা সকল গুঁজিয়া দিতে লাগিলেন। অনুশাসন-পর্বে এই কথার কতকগুলি উত্তম উদাহরণ পাওয়া যায়। ইচ্ছা করিলে, পাঠক পড়িয়া দেখিবেন। প্রায় সকলগুলিতেই একটু একটু গন্দর্ভের গাত্রসৌরভ আছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—সুভদ্রাহরণ

দ্রৌপদীস্বয়ংবরের পর, সুভদ্রাহরণে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাই। সুভদ্রার বিবাহে কৃষ্ণ যাহা করিয়াছিলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর নীতিজ্ঞেরা তাহা বড় পছন্দ করিবেন না। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর নীতিশাস্ত্রের উপর, একটা জগদীশ্বরের নীতিশাস্ত্র আছে—তাহা সকল শতাব্দীতে, সকল দেশে খাটিয়া থাকে। কৃষ্ণ যাহা করিয়াছিলেন, তাহা আমরা সেই চিরস্থায়ী অদ্রাস্ত জাগতিক নীতির দ্বারাই পরীক্ষা করিব। এ দেশে অনেকেই একবার গজের মাপে লাখেরাজ বা জোত জমা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; জমীদারেরা এখনকার ছোট সরকারি গজে মাপিয়া তাহাদিগের অনেক ভূমি কাড়িয়া লইয়াছে। তেমনি ঊনবিংশ শতাব্দীর যে ছোট মাপকাটি হইয়াছে, তাহার জ্বালায় আমরা ঐতিহাসিক পৈতৃক সম্পত্তি সকলই হারাইতেছি, ইহা অনেক বার বলিয়াছি। আমরা এক্ষণে সেই একবারি গজ চলাইব।

কৃষ্ণভক্তেরা বলিতে পারেন, এরূপ একটা বিচারে প্রবৃত্ত হইবার আগে, স্থির কর যে, এই সুভদ্রাহরণবৃত্তান্ত মূল মহাভারতের অন্তর্গত, কি প্রক্ষিপ্ত। যদি ইহা প্রক্ষিপ্ত এবং আধুনিক বলিয়া বোধ করিবার কোন কারণ থাকে, তবে সেই কথা বলিলেই সব গোল মিটিল—এত বাগাড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। অতএব আমরা বলিতে বাধ্য যে, সুভদ্রাহরণ যে মূল মহাভারতের অংশ, ইহা যে প্রথম স্তরের অন্তর্গত, তদ্বিষয়ে আমাদের কোন সংশয় নাই। ইহার প্রসঙ্গ অনুক্রমগিকাধ্যায়ে এবং পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে আছে। ইহার রচনা অতি উচ্চশ্রেণীর কবি রচনা। দ্বিতীয় স্তরের রচনাও সচরাচর অতি সুন্দর। তবে প্রথম স্তর ও দ্বিতীয় স্তরে রচনাগত একটা প্রভেদ এই যে, প্রথম স্তরের রচনা সরল ও স্বাভাবিক, দ্বিতীয় স্তরের রচনায় অলঙ্কার ও অতুষ্টির বড় বাহুল্য। সুভদ্রাহরণের রচনাও সরল ও স্বাভাবিক, অলঙ্কার ও অতুষ্টির তেমন বাহুল্য নাই। সুতরাং ইহা প্রথমস্তর-গত—দ্বিতীয় স্তরের নহে। আর আসল কথা এই যে, সুভদ্রাহরণ মহাভারত হইতে তুলিয়া লইলে, মহাভারত অসম্পূর্ণ হয়। সুভদ্রা হইতে অভিমন্যু, অভিমন্যু হইতে পরিষ্কিৎ, পরিষ্কিৎ হইতে জনমেজয়। ভদ্রাজর্জুনের বংশই বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতে

* সেইগুলি অবলম্বন করিয়া মূর প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কৃষ্ণকে শৈব বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

সাম্রাজ্য শাসিত করিয়াছিল—দ্রৌপদীর বংশ নহে। বরং দ্রৌপদীস্বয়ংবর বাদ দেওয়া যায়, তবু স্ভদ্রা নয়।

দ্রৌপদীর ন্যায় স্ভদ্রাকেও সাহেবরা উড়াইয়া দিয়াছেন। লাসেন্ বলেন,—যাদবসম্প্রীতিরূপ যে মঙ্গল, তাহাই স্ভদ্রা। বেবর সাহেবের আপত্তি ইহার অপেক্ষা গুরুতর। তিনি কেন কৃষ্ণভগিনী স্ভদ্রার মানবীত্ব অস্বীকৃত করেন, তজ্জন্য যজুর্বেদের মাধ্যন্দিনীশাখা ২৩ অধ্যায়ের ১৮ কণ্ডিকার ৪র্থ মন্ত্রটি উদ্ধৃত করিতে হইতেছে।

“হে অম্বে! হে অম্বিকে! হে অম্বালিকে! দেখ, এই অশ্ব এক্ষণে চিরকালের জন্য নির্দ্রিত হইয়াছে, আমি কাম্পিলবাসিনী স্ভদ্রা হইয়াও স্বয়ং ইহার সমীপে (পতিত্বে বরণ করণার্থ) সমাগত হইয়াছি, এ বিষয়ে আমাকে কেহই নিয়োগ করে নাই।”*

ইহাতে বেবর সাহেব সিদ্ধান্ত করিতেছেন,—

“Kampila is a town in the country of the Panchalas. Subhadra, therefore, would seem to be the wife of the King of that district.” &c.

সায়নাচার্য্য কাম্পিলবাসিনীর এইরূপ অর্থ করেন—“কাম্পিলশব্দেদন শ্লাঘ্যো বস্ত্রবিশেষ উচ্যতে।” কিন্তু বেবর সাহেবের বিশ্বাস যে, তিনি সায়নাচার্য্যের অপেক্ষা সংস্কৃত বুদ্ধি ভাল, অতএব তিনি এ ব্যাখ্যা গ্রাহ্য করেন না। তাহা না-ই করুন, কিন্তু কাম্পিলবাসিনী কোন স্ত্রীর নাম স্ভদ্রা ছিল বলিয়া কৃষ্ণভগিনীর নাম কেন স্ভদ্রা হইতে পারে না, তাহা বুদ্ধিতে পারিলাম না। যে রাজাই অশ্বমেধ যজ্ঞ করুন, তাহারই মহিষীকে এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে, তাহাকেই বলিতে হইবে, “আমি কাম্পিলবাসিনী স্ভদ্রা।” স্ভদ্রা শব্দে সামশ্রমী মহাশয় এই অর্থ করেন,—কল্যাণী অর্থাৎ সৌভাগ্যবতী। মহীধর বলেন,—কাম্পিলনগরীয় মহিলাগণ অতিশয় রূপলাবণ্যবতী। অতএব এই মন্ত্রের অর্থ এই যে, “আমি সৌভাগ্যবতী ও রূপলাবণ্যবতী হইয়াও এই অশ্বের নিকট সমাগত হইয়াছি।” অতএব বুদ্ধিতে পারি না যে, এই মন্ত্রের বলে কৃষ্ণভগিনী অজ্জর্নপত্নী স্ভদ্রার পরিবর্তে কেন একজন পাণ্ডালী স্ভদ্রাকে কল্পনা করিতে হইবে। যুদ্ধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এবং তাহার বহুপুর্বেবর্তী রাজগণও অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, ইহাই মহাভারতে এবং অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। অতএব ইহাই সম্ভব যে, অশ্বমেধ যজ্ঞের এই যজুর্মন্ত্র কৃষ্ণ-পাণ্ডবের অপেক্ষা প্রাচীন। এখন যেমন লোকে আধুনিক লেখকদিগের কাব্যগ্রন্থ হইতে পুত্রকন্যার নামকরণ করিতেছে, † তেমনি সে কালেও বেদ হইতে লোকের পুত্রকন্যার নাম রাখা অসম্ভব নহে। এই মন্ত্র হইতেই কাশিরাজ আপনার তিনটি কন্যার নাম অম্বা, অম্বিকা, অম্বালিকা রাখিয়া থাকিবেন, এবং এইরূপেই কৃষ্ণভগিনী স্ভদ্রারও নামকরণ হইয়া থাকিবে। এই মন্ত্রে এমন কিছু দেখি না যে, তজ্জন্য কৃষ্ণভগিনী স্ভদ্রা কেহ ছিলেন না, এমন কথা অনুমান করা যায়। অতএব আমরা স্ভদ্রাহরণের বিচারে প্রবৃত্ত হইব।

এক্ষণে, স্ভদ্রাহরণের নৈতিক বিচারে প্রবৃত্ত হইবার আগে পাঠকের নিকট একটা অনুরোধ আছে। তিনি কাশীদাসের গ্রন্থে অথবা কথকের নিকট, অথবা পিতামহীর মুখে, অথবা বাঙ্গালা নাটকাদিতে যে স্ভদ্রাহরণ পড়িয়াছেন বা শুনিয়াছেন, তাহা অনুগ্রহপূর্বক ভুলিয়া যাউন। অজ্জর্নকে দেখিয়া স্ভদ্রা অনঙ্গশরে ব্যথিত হইয়া উন্মত্ত হইলেন, সত্যভামা মধ্যবর্তিনী দূতী হইলেন, অজ্জর্ন স্ভদ্রাকে হরণ করিয়া লইয়া গেলে যাদবসেনার সঙ্গে তাঁর ঘোরতর যুদ্ধ হইল, স্ভদ্রা তাহার সার্থি হইয়া গগনমার্গে তাহার রথ চালাইতে লাগিলেন—সে সকল কথা ভুলিয়া যান। এ সকল অতি মনোহর কাহিনী বটে, কিন্তু মূল মহাভারতে ইহার কিছুই নাই। ইহা কাশীরাম দাসের গ্রন্থেই প্রথম দেখিতে পাই, কিন্তু এ সকল তাহার সৃষ্টি, কি তাহার পরবর্তী কথকদিগের সৃষ্টি, তাহা বলা যায় না। সংস্কৃত মহাভারতে যে প্রকার স্ভদ্রাহরণ কথিত হইয়াছে, তাহার স্থূলমর্ম্ম বলিতেছি।

দ্রৌপদীর বিবাহের পর পাণ্ডবেরা ইন্দ্রপ্রস্থে সুখে রাজ্য করিতেছিলেন। কোন কারণে অজ্জর্ন দ্বাদশ বৎসরের জন্য ইন্দ্রপ্রস্থ পরিত্যাগপূর্বক বিদেশে ভ্রমণ করেন। অন্যান্য

* শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রয়ী কৃত অনুবাদ।

† যথা—প্রমীলা, মৃগালিনী ইত্যাদি।

বিশ্বকম রচনাবলী

দেশপর্যটনান্তর শেষে তিনি দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। তথায় যাদবেরা তাঁহার বিশেষ সমাদর ও সৎকার করেন। অজ্জর্ন কিছু দিন সেখানে অবস্থিতি করেন। একদা যাদবেরা রৈবতক পর্ষতে একটা মহান্ উৎসব আরম্ভ করেন। সেখানে যদুবীরেরা ও যদুকুলাঙ্গনাগণ সকলেই উপস্থিত হইয়া আমোদ আহ্লাদ করেন। অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সুভদ্রাও উপস্থিত ছিলেন। তিনি কুমারী ও বালিকা। অজ্জর্ন তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। কৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়া অজ্জর্নকে বলিলেন, “সখে! বনচর হইয়াও অনঙ্গশরে চণ্ডল হইলে?” অজ্জর্ন অপরাধ স্বীকার করিয়া, সুভদ্রা যাহাতে তাঁহার মহিষী হন, তদ্বিষয়ে কৃষ্ণের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষ্ণ যে পরামর্শ দিলেন তাহা এইঃ—

“হে অজ্জর্ন! স্বয়ংবরই ক্ষত্রিয়দিগের বিধেয়, কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রবৃত্তির কথা কিছুই বলা যায় না, সুতরাং তদ্বিষয়ে আমার সংশয় জন্মিতেছে। আর ধর্মশাস্ত্রকারেরা কহেন, বিবাহোদ্দেশে বলপূর্বক হরণ করাও মহাবীর ক্ষত্রিয়দিগের প্রশংসনীয়। অতএব স্বয়ংবরকাল উপস্থিত হইলে তুমি আমার ভগিনীকে বলপূর্বক হরণ করিয়া লইয়া যাইবে; কারণ, স্বয়ংবরকালে সে কাহার প্রতি অনুরক্ত হইবে, কে বলিতে পারে?”

এই পরামর্শের অনুবর্তী হইয়া অজ্জর্ন প্রথমতঃ যুধিষ্ঠির ও কুন্তীর অনুমতি আনিতে দৃঢ় প্রেরণ করেন। তাঁহাদিগের অনুমতি পাইলে, একদা, সুভদ্রা যখন রৈবতক পর্ষতকে প্রদক্ষিণ করিয়া দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিতেছিলেন, তখন তাঁহাকে বলপূর্বক গ্রহণ করিয়া রথে তুলিয়া অজ্জর্ন প্রস্থান করিলেন।

এখন, আজিকালিকার দিনে যদি কেহ বিবাহোদ্দেশে কাহারও মেয়ে বলপূর্বক কাড়িয়া লইয়া প্রস্থান করে, তবে সে সমাজে নিন্দিত এবং রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবার যোগ্য সন্দেহ নাই। এবং এখনকার দিনে কেহ যদি অপর কাহাকে বলে, “মহাশয়! যখন আমার ভগিনীকে বিবাহ করিতে আপনার ইচ্ছা হইয়াছে, তখন আপনি উহাকে কাড়িয়া লইয়া পলায়ন করুন, ইহাই আমার পরামর্শ,” তবে সে ব্যক্তিও জনসমাজে নিন্দনীয় হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব প্রচলিত নীতিশাস্ত্রানুসারে (সে নীতিশাস্ত্রের কিছুমাত্র দোষ দিতেছি না,) কৃষ্ণাজ্জর্ন উভয়েই অতিশয় নিন্দনীয় কার্য করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। লোকের চক্ষে ধূলা দিয়া কৃষ্ণকে বাড়ান যদি আমার উদ্দেশ্য হইত, তবে সুভদ্রাহরণপর্ষাধ্যায় প্রক্ষিপ্ত বলিয়া, কিম্বা এমনই একটা কিছু জুয়াচুরি করিয়া, এ কথাটা বাদ দিয়া যাইতাম। কিন্তু সে সকল পথ আমার অবলম্বনীয় নহে। সত্য ভিন্ন মিথ্যা প্রশংসায়, কাহারও মহিমা বাড়িতে পারে না এবং ধর্মের অবনতি ভিন্ন উন্নতি হয় না।

কিন্তু কথাটা একটু তলাইয়া বুঝিতে হইবে। কেহ কাহারও মেয়ে কাড়িয়া লইয়া গিয়া বিবাহ করিলে, সেটা দোষ বলিয়া গণিতে হয় কেন? তিন কারণে। প্রথমতঃ, অপহৃত কন্যার উপর অত্যাচার হয়। দ্বিতীয়তঃ, কন্যার পিতা মাতা ও বন্ধুবর্গের উপর অত্যাচার। তৃতীয়তঃ, সমাজের উপর অত্যাচার। সমাজরক্ষার মূলসূত্র এই যে, কেহ কাহারও উপর অবৈধ বলপ্রয়োগ করিতে পারিবে না। কেহ কাহারও উপর অবৈধ বলপ্রয়োগ করিলেই সমাজের স্থিতির উপর আঘাত করা হইল। বিবাহার্থীকৃত কন্যাহরণকে নিন্দনীয় কার্য বিবেচনা করিবার এই তিনটি গুরুতর কারণ বটে, কিন্তু তদ্বিধি আর চতুর্থ কারণ কিছু নাই।

এখন দেখা যাউক, কৃষ্ণের এই কাজে এই তিন জনের মধ্যে কে কতদূর অত্যাচার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ, অপহৃত কন্যার উপর কতদূর অত্যাচার হইয়াছিল দেখা যাক। কৃষ্ণ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং বংশের শ্রেষ্ঠ। যাহাতে সুভদ্রার সর্বতোভাবে মঙ্গল হয়, তাহাই তাঁহার কর্তব্য—তাহাই তাঁহার ধর্ম—উনবিংশ শতাব্দীর ভাষায় তাহাই তাঁহার “Duty”। এখন স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রধান মঙ্গল—সর্বস্বাঙ্গীণ মঙ্গল বলিলেও হয়—সৎপাত্রস্থা হওয়া। অতএব সুভদ্রার প্রতি কৃষ্ণের প্রধান “ডিউটি”—তিনি যাহাতে সৎপাত্রস্থা হইলেন, তাহাই করা। এখন, অজ্জর্নের ন্যায় সৎপাত্র কৃষ্ণের পরিচিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ছিল না, ইহা বোধ হয় মহাভারতের পাঠকদিগের নিকট কষ্ট পাইয়া প্রমাণ করিতে হইবে না। অতএব তিনি যাহাতে অজ্জর্নের পত্নী হইবেন, ইহাই সুভদ্রার মঙ্গলার্থ কৃষ্ণের করা কর্তব্য। তাঁহার যে উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতেই তিনি দেখাইয়াছেন, বলপূর্বক হরণ ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে এই কর্তব্য সাধন হইতে পারিত কি না, তাহা সন্দেহহীন। যেখানে ভাবিফল চিরজীবনের মঙ্গল, সেখানে

যে পথে সন্দেহ, সে পথে যাইতে নাই। যে পথে মঙ্গলসিদ্ধি নিশ্চিত, সেই পথেই যাইতে হয়। অতএব কৃষ্ণ, সুভদ্রার চিরজীবনের পরম শুভ সুনিশ্চিত করিয়া দিয়া, তাহার প্রতি পরম-ধর্ম্মানুমত কার্য্যই করিয়াছিলেন—তাহার প্রতি কোন অত্যাচার করেন নাই।

এ কথার প্রতি দুইটি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। প্রথম আপত্তি এই যে, আমার যে কাজে ইচ্ছা নাই, সে কাজ আমার পক্ষে মঙ্গলকর হইলেও, আমার উপর বলপ্রয়োগ করিয়া সে কার্য্য প্রবৃত্ত করিবার কাহারও অধিকার নাই। পুরোহিত মহাশয় মনে করেন যে, আমি যদি আমার সর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণকে দান করি, তবে আমার পরম মঙ্গল হইবে। কিন্তু তাহার এমন কোন অধিকার নাই যে, আমাকে মারপিট করিয়া সর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণকে দান করান। শুভ উদ্দেশ্যের সাধন জন্য নিন্দনীয় উপায় অবলম্বন করাও নিন্দনীয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর ভাষায় ইহার অনুবাদ এই যে, “The end does not sanctify the means.”

এ কথার দুইটি উত্তর আছে। প্রথম উত্তর এই যে, সুভদ্রার যে অঞ্জনের প্রতি অনিচ্ছা বা বিরক্তি ছিল, এমত কিছুই প্রকাশ নাই। ইচ্ছা অনিচ্ছা কিছুই প্রকাশ নাই। প্রকাশ থাকিবার সম্ভাবনা বড় অল্প। হিন্দুর ঘরের কন্যা—কুমারী এবং বালিকা—পাত্রবিশেষের প্রতি ইচ্ছা বা অনিচ্ছা বড় প্রকাশ করে না। বাস্তবিক, তাহাদের মনেও বোধ হয়, পাত্রবিশেষের প্রতি ইচ্ছা অনিচ্ছা বড় জন্মেও না, তবে ধেড়ে মেয়ে ঘরে পুঁষিয়া রাখিলে জন্মিতে পারে। এখন, যদি কোন কাজে আমার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা কিছুই নাই থাকে, যদি সেই কাজ আমার পক্ষে পরম মঙ্গলকর হয়, আর কেবল বিশেষ প্রবৃত্তির অভাবে বা লজ্জাবশতঃ বা উপায়ান্ধবশতঃ আমি সে কার্য্য স্বয়ং করিতেছি না, এমন হয়, আর যদি আমার উপর একটু বলপ্রয়োগের ভাণ করিলে সেই পরম মঙ্গলকর কার্য্য সুসিদ্ধ হয়, তবে সে বলপ্রয়োগ কি অধর্ম্ম? মনে কর, একজন বড় ঘরের ছেলে দুরবস্থায় পড়িয়াছে, তোমার কাছে একটি চাকরি পাইলে খাইয়া বাঁচে, কিন্তু বড় ঘর বালিয়া তাহাতে তেমন ইচ্ছা নাই, কিন্তু তুমি তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া চাকরিতে বসাইয়া দিলে আপত্তি করিবে না, বরং সপরিবারে খাইয়া বাঁচিবে। সে স্থলে তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া দুটো ধমক দিয়া তাহাকে দফতরখানাতে বসাইয়া দেওয়া কি তোমার অধর্ম্মাচরণ বা পীড়ন করা হইবে? সুভদ্রার অবস্থাও ঠিক তাই। হিন্দুর ঘরের কুমারী মেয়ে, বুঝাইয়া বলিলে, কি “এসো গো” বলিয়া ডাকিলে, বরের সঙ্গে যাইবে না। কাজেই ধরিয়া লইয়া যাওয়ার ভাণ ভিন্ন তাহার মঙ্গলসাধনের উপায়ান্তর ছিল না।

“আমার যে কাজে ইচ্ছা নাই, সে কাজ আমার পক্ষে পরম মঙ্গলকর হইলেও, আমার প্রতি বলপ্রয়োগ করিয়া সে কাজে প্রবৃত্ত করিবার কাহারও অধিকার নাই।” এই আপত্তির দুইটি উত্তর আছে, আমরা বলিয়াছি। প্রথম উত্তর, উপরে বুঝাইলাম। প্রথম উত্তরে আমরা ঐ আপত্তির কথাটা যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া উত্তর দিয়াছি। দ্বিতীয় উত্তর এই যে, কথাটা সকল সময়ে যথার্থ নয়। যে কার্য্য আমার পরম মঙ্গল, সে কার্য্য আমার অনিচ্ছা থাকিলেও বলপ্রয়োগ করিয়া আমাকে তাহাতে প্রবৃত্ত করিতে যে কাহারও অধিকার নাই, এ কথা সকল সময়ে খাটে না। যে রোগীর রোগপ্রভাবে প্রাণ যায়, কিন্তু ঔষধে রোগীর স্বভাবসুলভ বিরাগবশতঃ সে ঔষধ খাইবে না, তাহাকে বলপূর্ব্বক ঔষধ খাওয়াইতে চিকিৎসকের এবং বন্ধুবর্গের অধিকার আছে। সাংঘাতিক বিস্ফোটক সে ইচ্ছাপূর্ব্বক কাটাইবে না,—জোর করিয়া কাটিবার ডাক্তারের অধিকার আছে। ছেলে লেখাপড়া শিখিবে না, জোর করিয়া লেখাপড়া শিখাইবার অধিকার শিক্ষক ও পিতা মাতা প্রভৃতির আছে। এই বিবাহের কথাতেই দেখ, অপ্ৰাপ্তবয়ঃ কুমার কি কুমারী যদি অনুরূপ বিবাহে উদ্যত হয়, বলপূর্ব্বক তাহাকে নিবৃত্ত করিতে কি পিতা মাতার অধিকার নাই? আজিও সভ্য ইউরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে কন্যার বিবাহে জোর করিয়া সংপাত্রে কন্যাদান করার প্রথা আছে। যদি পনের বৎসরের কোন হিন্দুর মেয়ে কোন সুপাত্রে আপত্তি উপস্থিত করে, তবে কোন পিতা মাতা জোর করিয়া তাহাকে সংপাত্ৰস্থ করিতে আপত্তি করিবেন? জোর করিয়া বালিকা কন্যা সংপাত্ৰস্থ করিলে তিনি কি নিন্দনীয় হইবেন? যদি না হন, তবে সুভদ্রাহরণে কৃষ্ণের অনুমতি নিন্দনীয় কেন?

এই গেল প্রথম আপত্তির দুই উত্তর। এখন দ্বিতীয় আপত্তির বিচারে প্রবৃত্ত হই।

দ্বিতীয় আপত্তি এই হইতে পারে যে, ভাল, স্বীকার করা গেল যে, কৃষ্ণ সুভদ্রার মঙ্গলকামনা করিয়াই, এই পরামর্শ দিয়াছিলেন—কিন্তু বলপূর্ব্বক হরণ ভিন্ন কি তাহাকে অঞ্জনেরমহিষী

বিক্রম রচনাবলী

করিবার অন্য উপায় ছিল না? স্বয়ংবরে যেন ভয় ছিল, যেন মৃগমতি বালিকা কেবল মুখ দেখিয়া ভুলিয়া গিয়া কোন অপাত্রে বরমাল্য দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু উপায়ান্তর কি ছিল না? কৃষ্ণ কি অর্জুন, বসুদেব প্রভৃতি কর্তৃপক্ষের কাছে কথা পাড়িয়া রীতিমত সম্বন্ধ স্থির করিয়া, তাঁহাদিগকে বিবাহে সম্মত করিয়া কন্যা সম্প্রদান করাইতে পারিতেন। যাদবেরা কৃষ্ণের বশীভূত; কেহই তাঁহার কথায় অমত করিত না। এবং অর্জুনও সুপাত্র, কেহই আপত্তি করিত না। তবে না হইল কেন?

এখনকার দিনকাল হইলে, এ কাজ সহজে হইত। কিন্তু ভদ্রার্জুনের বিবাহ চারি হাজার বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছিল, তখনকার বিবাহপ্রথা এখনকার বিবাহপ্রথার মত ছিল না। সেই বিবাহপ্রথা না বদলিলে কৃষ্ণের আদর্শ বৃদ্ধি ও আদর্শ প্রীতি আমরা সম্পূর্ণরূপে বদলিতে পারিব না।

মনুতে আছে, বিবাহ অষ্টবিধ, (১) ব্রাহ্ম, (২) দৈব, (৩) আর্ষ, (৪) প্রাজাপত্য, (৫) আসুর, (৬) গান্ধর্ব, (৭) রাক্ষস ও (৮) পৈশাচ। এই ক্রমান্বয়টা পাঠক মনে রাখিবেন।

এই অষ্টপ্রকার বিবাহে সকল বর্ণের অধিকার নাই। ক্ষত্রিয়ের কোন কোন বিবাহে অধিকার, দেখা যাউক। তৃতীয় অধ্যায়ের ২৩ শ্লোকে কথিত হইয়াছে,

যড়ানুপূর্ব্বা বিপ্রস্য ক্ষত্রস্য চতুরোহবরান্।

ইহার টীকায় কুল্লুকভট্ট লেখেন, “ক্ষত্রিয়স্য অবরানুপারিতনানাসুরাদীংশ্চতুরঃ।” তবেই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে, কেবল আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ, এই চারি প্রকার বিবাহ বৈধ। আর সকল অবৈধ।

কিন্তু ২৫ শ্লোকে আছে—

পৈশাচশ্চাসুরশ্চৈব ন কর্তব্যো কদাচন ॥

পৈশাচ ও আসুর বিবাহ সকলেরই অকর্তব্য। অতএব ক্ষত্রিয় পক্ষে কেবল গান্ধর্ব ও রাক্ষস, এই দ্বিবিধ বিবাহই বিহিত রহিল।

তন্মধ্যে, বরকন্যার উভয়ে পরস্পর অনুরাগ সহকারে যে বিবাহ হয়, তাহাই গান্ধর্ব বিবাহ। এখানে সুভদ্রার অনুরাগ অভাবে সে বিবাহ অসম্ভব, এবং সেই বিবাহ “কামসম্ভব,” সুতরাং পরম নীতিজ্ঞ কৃষ্ণার্জুনের তাহা কখনও অনুমোদিত হইতে পারে না। অতএব রাক্ষস বিবাহ ভিন্ন অন্য কোন প্রকার বিবাহ শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্য নহে ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রশস্ত নহে; অন্য প্রকার বিবাহেরও সম্ভাবনা এখানে ছিল না। বলপূর্ব্বক কন্যাকে হরণ করিয়া বিবাহ করাকে রাক্ষস বিবাহ বলে। বস্তুতঃ শাস্ত্রানুসারে এই রাক্ষস বিবাহই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে একমাত্র প্রশস্ত বিবাহ। মনু ৩ অ, ২৪ শ্লোকে আছে—

চতুরো ব্রাহ্মণস্যাদ্যান্ প্রশস্তান্ কবর্যো বিদুঃ।

রাক্ষসং ক্ষত্রিয়স্যৈকমাসুরং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ ॥

যে বিবাহ ধর্ম্য ও প্রশস্ত, আপনার ভগিনীর ও ভগিনীপতির গৌরবার্থ ও নিজকুলের গৌরবার্থ, কৃষ্ণ সেই বিবাহের পরামর্শ দিতে বাধ্য ছিলেন। অতএব কৃষ্ণ অর্জুনকে যে পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পরম শাস্ত্রজ্ঞতা, নীতিজ্ঞতা, অভ্রান্তবুদ্ধি এবং সর্বপক্ষের মানসম্ভ্রম রক্ষার অভিপ্রায় ও হিতেচ্ছাই দেখা যায়।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, এখানে মনুর দোহাই দিলে চলবে না। মহাভারতের যুদ্ধের সময়ে মনুসংহিতা ছিল, ইহার প্রমাণ কি? কথা ন্যায্য বটে, তত প্রাচীনকালে মনুসংহিতা সংকলিত হইয়াছিল কি না, সে বিষয়ে বাদ প্রতিবাদ হইতে পারে। তবে মনুসংহিতা পূর্ব্ব-প্রচলিত রীতি-নীতির সংকলন মাত্র, ইহা পণ্ডিতদিগের মত। যদি তাহা হয়, তবে যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালে ঐরূপ বিবাহপদ্ধতি প্রচলিত ছিল, ইহা বিবেচনা করা যাইতে পারে। নাই পারুক—মহাভারতেই এ বিষয়ে কি আছে, তাহাই দেখা যাউক। এই সুভদ্রাহরণ-পূর্ব্বাধ্যায়েরই সে বিষয়ে কি প্রমাণ পাওয়া যায়, দেখা যাউক। বড় বেশী খুঁজিতে হইবে না। আমরা পাঠকদিগের নিকট যে উত্তর দিতেছি, কৃষ্ণ নিজেই সেই উত্তর বলদেবকে দিয়াছিলেন। অর্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, শূনিয়া যাদবেরা ক্রুদ্ধ হইয়া রণসজ্জা করিতেছিলেন। বলদেব বলিলেন, অত গন্ডগোল করিবার আগে, কৃষ্ণ কি বলেন শূনা যাউক। তিনি চূপ করিয়া

আছেন। তখন বলদেব কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া, অজ্ঞান তাঁহাদের বংশের অপমান করিয়াছে বলিয়া রাগ প্রকাশ করিলেন, এবং কৃষ্ণের অভিপ্রায় কি, জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষ্ণ উত্তর করিলেন—

“অজ্ঞান আমাদিগের কুলের অবমাননা করেন নাই, বরং সমাধিক সম্মান রক্ষাই করিয়াছেন। তিনি তোমাদিগকে অর্থলুদ্ধ মনে করেন না বলিয়া অর্থদ্বারা সুভদ্রাকে গ্রহণ করিতে চেষ্টাও করেন নাই। স্বয়ংবরে কন্যা লাভ করা অতীব দুরূহ ব্যাপার, এই জন্যই তাহাতে সম্মত হন নাই, এবং পিতামাতার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক প্রদত্তা কন্যার পাণিগ্রহণ করা তেজস্বী ক্ষত্রিয়ের প্রশংসনীয় নহে। অতএব আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় উক্ত দোষ সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া বলপূর্ব্বক সুভদ্রাকে হরণ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধ আমাদের কুলোচিত হইয়াছে, এবং কুলশীল বিদ্যা ও বুদ্ধিসম্পন্ন পার্থ বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছেন বলিয়া সুভদ্রাও যশস্বিনী হইবেন, সন্দেহ নাই।”

এখানে কৃষ্ণ ক্ষত্রিয়ের চারি প্রকার বিবাহের কথা বলিয়াছেন;—

১। অর্থ (বা শুল্ক) দিয়া যে বিবাহ করা যায় (আসুর)।

২। স্বয়ংবর।

৩। পিতা মাতা কর্তৃক প্রদত্তা কন্যার সহিত বিবাহ (প্রাজাপত্য)।

৪। বলপূর্ব্বক হরণ (রাক্ষস)।

ইহার মধ্যে প্রথমটিতে কন্যাকুলের অকীর্ত্তি ও অযশ, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। দ্বিতীয়ের ফল অনিশ্চিত। তৃতীয়ে, বরের অগোরব। কাজেই চতুর্থই এখানে একমাত্র বিহিত বিবাহ। ইহা কৃষ্ণোক্তিহেই প্রকাশ আছে।*

ভরসা করি, এমন নিষ্পোধ কেহই নাই যে, সিদ্ধান্ত করেন যে, আমি রাক্ষস বিবাহের পক্ষ সমর্থন করিতেছি। রাক্ষস বিবাহ অতি নিন্দনীয়, সে কথা বলিয়া স্থান নষ্ট করা নিষ্প্রয়োজন। তবে সে কালে যে ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে ইহা প্রশংসিত ছিল, কৃষ্ণ তাহার দায়ী নহেন। আমাদিগের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে, “রিফর্ম্-ই” আদর্শ মনুষ্য, এবং কৃষ্ণ যদি আদর্শ মনুষ্য, তবে মালাবারি ধরণের রিফর্ম্-ই হওয়াই তাঁহার উচিত ছিল, এবং এই কুপ্রথার প্রশ্রয় না দিয়া দমন করা উচিত ছিল। কিন্তু আমরা মালাবারি চংটাকে আদর্শ মনুষ্যের গুণের মধ্যে গণি না, সুতরাং এ কথার কোন উত্তর দেওয়া আবশ্যিক বিবেচনা করি না।

আমরা বলিয়াছি যে, বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া যে বিবাহ, তাহা তিন কারণে নিন্দনীয়; (১) কন্যার প্রতি অত্যাচার, (২) তাহার পিতৃকুলের প্রতি অত্যাচার, (৩) সমাজের প্রতি অত্যাচার। কন্যার প্রতি যে কোন অত্যাচার হয় নাই, বরং তাহার পরম মঙ্গলই সাধিত হইয়াছিল, তাহা দেখাইয়াছি। এক্ষণে তাঁহার পিতৃকুলের প্রতি কোন অত্যাচার হইয়াছে কি না, দেখা যাউক। কিন্তু আর স্থান নাই, সংক্ষেপে কথা শেষ করিতে হইবে। যাহা বলিয়াছি, তাহাতে সকল কথাই শেষ হইয়া আসিয়াছে।

কন্যাহরণে তৎপিতৃকুলের উপর দুই কারণে অত্যাচার ঘটে। (১) তাঁহাদিগের কন্যা অপাত্রে বা অনভিপ্রেত পাত্রের হস্তগত হয়। কিন্তু এখানে তাহা ঘটে নাই। অজ্ঞান অপাত্রেও নহে, অনভিপ্রেত পাত্রও নহে। (২) তাঁহাদিগের নিজের অপমান। কিন্তু পূর্ব্ব যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার দ্বারা প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে, ইহাতে যাদবেরা অপমানিত হইয়াছেন বিবেচনা করিবার কোন কারণ ছিল না। এ কথা যাদবশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণই প্রতিপন্ন করিয়াছেন, এবং তাঁহার সে কথা ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা করিয়া অপর যাদবেরা অজ্ঞানকে ফিরাইয়া আনিয়া সমারোহপূর্ব্বক তাঁহার বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের প্রতি অত্যাচার হইয়াছিল, ইহা বলিবার আমাদের আর আবশ্যিকতা নাই।

* মহাভারতের অনুশাসন-পর্ব্ব যে বিবাহতত্ত্ব আছে, তাহার আমরা কোন উল্লেখ করিলাম না, কেন না, উহা প্রক্ষিপ্ত। সেখানে রাক্ষস বিবাহ ভীষ্ম কর্তৃক নিন্দিত ও নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু ভীষ্ম স্বয়ং কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনা স্থির করিয়া, কাশিরাজের তিনটি কন্যা হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। সুতরাং ভীষ্মের রাক্ষস বিবাহকে নিন্দিত ও নিষিদ্ধ বলা সম্ভব নহে। ভীষ্মের চরিত্র এই যে, যাহা নিষিদ্ধ ও নিন্দিত, তাহা তিনি প্রাণান্তেও করিতেন না। যে কবি তাঁহার চরিত্র সৃষ্ট করিয়াছেন, সে কবি কখনই তাঁহার মত দিয়া এ কথা বাহির করেন নাই।

বিক্রম রচনাবলী

(৩) সমাজের প্রতি অত্যাচার। যে বলকে সমাজ অবৈধ বল বিবেচনা করে, সমাজমধ্যে কাহারও প্রতি সেই বল প্রযুক্ত হইলেই সমাজের প্রতি অত্যাচার হইল। কিন্তু যখন তাত্‌কালিক আৰ্যসমাজ ক্ষত্রিয়কৃত এই বলপ্রয়োগকে প্রশস্ত ও বিহিত বলিত, তখন সমাজের আর বলিবার অধিকার নাই যে, আমার প্রতি অত্যাচার হইল। যাহা সমাজসম্মত, তদ্বারা সমাজের উপর কোন অত্যাচার হয় নাই।

আমরা এই তত্ত্ব এত সবিস্তারে লিখিলাম, তাহার কারণ আছে। সুভদ্রাহরণের জন্য কৃষ্ণদেবীরা কৃষ্ণকে কখনও গালি দেন নাই। তুজ্জন্য কৃষ্ণপক্ষসমর্থনের কোন আবশ্যিকতা ছিল না। আমার দেখাইবার উদ্দেশ্য এই যে, বিলাত হইতে যে ছোট মাপকাটিটি আমরা ধার করিয়া আনিয়াছি, সে মাপকাটিতে মাপিলে, আমরাদিগের পূর্বাধিকারগত অতুল সম্পত্তি অধিকাংশই বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে। আমরাদিগের সেই একধরির গজ বাহির করা চাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—খান্ডবদাহ

সুভদ্রাহরণের পর খান্ডবদাহে কৃষ্ণের দর্শন পাই। পান্ডবেরা খান্ডবপ্রস্থে বাস করিতেন। তাহাদিগের রাজধানীর নিকট খান্ডব নামে এক বৃহৎ অরণ্য ছিল। কৃষ্ণাজ্জর্ন তাহা দক্ষ করেন। তাহার বৃত্তান্তটি এই। গল্পটা বড় আশাঢ়ে রকম।

পূর্বাধিকারে শ্বেতকি নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি বড় যাজ্ঞিক ছিলেন। চিরকালই যজ্ঞ করেন। তাহার যজ্ঞ করিতে করিতে ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণেরা হায়রান হইয়া গেল। তাহারা আর পারে না—সাব জবাব দিয়া সরিয়া পড়িল। রাজা তাহাদিগকে পীড়াপীড়ি করিলেন—তাহারা বলিল, “এ রকম কাজ আমাদের দ্বারা হইতে পারে না—তুমি রুদ্রের কাছে যাও।” রাজা রুদ্রের কাছে গেলেন—রুদ্র বলিলেন, “আমরা যজ্ঞ করি না—এ কাজ ব্রাহ্মণের। দুর্ভাসা এক জন ব্রাহ্মণ আছেন, তিনি আমারই অংশ—আমি তাহাকে বলিয়া দিতেছি।” রুদ্রের অনুরোধে, দুর্ভাসা রাজার যজ্ঞ করিলেন। ঘোরতর যজ্ঞ—বার বৎসর ধরিয়৷ ক্রমাগত অগ্নিতে ঘটধারা। ঘি খাইয়া অগ্নির Dyspepsia উপস্থিত। তিনি ব্রাহ্মণের কাছে গিয়া বলিলেন, “ঠাকুর! বড় বিপদ, খাইয়া খাইয়া শরীরের বড় গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, এখন উপায় কি?” ব্রাহ্মণ যে রকম ডাক্তারি করিলেন, তাহা *Similia Similibus Curanter* হিসাবে। তিনি বলিলেন, “ভাল, খাইয়া যদি পীড়া হইয়া থাকে, তবে আরও খাও। খান্ডব বনটা খাইয়া ফেল—পীড়া আরাম হইবে।” শুনিয়া অগ্নি খান্ডব বন খাইতে গেলেন। চারি দিকে হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন। কিন্তু বনে অনেক জীবজন্তু বাস করিত—হাতীরা শূড়ে করিয়া জল আনিল, সাপেরা ফণা করিয়া জল আনিল, এই রকম বনবাসী পশুপক্ষিগণ মিলিয়া আগুন নিবাইয়া দিল। আগুন সাত বার জ্বলিলেন, সাত বার তাহারা নিবাইল। অগ্নি তখন ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া কৃষ্ণাজ্জর্নের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, “আমি বড় পেটুক, বড় বেশী খাই, তোমরা আমাকে খাওয়াইতে পার?” তাহারা স্বীকৃত হইলেন। তখন তিনি আত্মপরিচয় দিয়া ছোট রকমের প্রার্থনা জানাইলেন—“খান্ডব বনটি খাব। খাইতে গিয়াছিলাম, কিন্তু ইন্দ্র আসিয়া বৃষ্টি করিয়া আমাকে নিবাইয়া দিয়াছে—খাইতে দেয় নাই।” তখন কৃষ্ণাজ্জর্ন অস্ত্র ধরিয়৷ বন পোড়াইতে গেলেন। ইন্দ্র আসিয়া বৃষ্টি করিতে লাগিলেন, অজ্জর্নের বাণের চোটে বৃষ্টি বন্ধ হইয়া গেল। সেটা কি রকমে হয়, আমরা কালিকালের লোক তাহা বঝিতে পারি না। পারিলে, অতিবৃষ্টিতে ফসল রক্ষার একটা উপায় করা যাইতে পারিত। যাই হোক—ইন্দ্র চটিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। সব দেবতা অস্ত্র লইয়া তাহার সহায় হইলেন। কিন্তু অজ্জর্নকে আঁটিয়া উঠিবার যো নাই। ইন্দ্র পাহাড় ছুঁড়িয়া মারিলেন—অজ্জর্ন বাণের চোটে পাহাড় কাটিয়া ফেলিলেন। (বিদ্যাটা এখনকার দিনে জানা থাকিলে রেইল্‌ওয়ে টানেল্‌ করিবার বড় সুবিধা হইত।) শেষ ইন্দ্র বজ্রপ্রহারে উদ্যত—তখন দৈববাণী হইল যে, ইহারা নরনারায়ণ প্রাচীন ঋষি।*

* পাঠক দেখিয়াছেন, এক স্থানে কৃষ্ণ বিষ্ণুর কেশ; এখানে প্রাচীন ঋষি, আবার দেখিব, তিনি বিষ্ণুর অবতার। এ কথার সামঞ্জস্যচেষ্টায় বা খণ্ডনে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণচরিত্রই আমাদের সমালোচ্য।

দৈববাণীটা বড় সর্বাধা—কে বলিল, তার ঠিকানা নাই—কিন্তু বলিবার কথাটা প্রকাশ হইয়া পড়ে। দৈববাণী শুনিয়া দেবতারা প্রস্থান করিলেন। কৃষ্ণার্জুন স্বচ্ছন্দে বন পোড়াইতে লাগিলেন। আগুনের ভয়ে পশুপক্ষী পলাইতেছিল, সকলকে তাঁহারা মারিয়া ফেলিলেন। তাহাদের মৈদ মাংস খাইয়া অগ্নির মন্দাগ্নি ভাল হইল—বিষে বিষক্ষয় হইল—তিনি কৃষ্ণার্জুনকে বর দিলেন। পরাভূত দেবতারা আসিয়াও বর দিলেন। সকল পক্ষ খুসী হইয়া ঘরে গেলেন।

এরূপ আঘাতে গল্পের উপর বুনিয়াদ খাড়া করিয়া ঐতিহাসিক সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, কেবল হাস্যাস্পদ হইতে হয়—অন্য লাভ নাই। আর আমাদের যাহা সমালোচ্য—অর্থাৎ কৃষ্ণচরিত্র,—তাহার ভালমন্দ কোন কথাই ইহাতে নাই। যদি ইহার কোন ঐতিহাসিক তাৎপর্য থাকে, তবে সেটুকু এই যে, পাণ্ডবদিগের রাজধানীর নিকটে একটা বড় বন ছিল, সেখানে অনেক হিংস্র পশু বাস করিত, কৃষ্ণার্জুন তাহাতে আগুন লাগাইয়া, হিংস্র পশুদিগকে বিনষ্ট করিয়া জঙ্গল আবাদ করিবার যোগ্য করিয়াছিলেন। কৃষ্ণার্জুন যদি তাই করিয়াছিলেন, তাহাতে ঐতিহাসিক কীর্তি বা অকীর্তি কিছুই দেখি না। সুন্দরবনের আবাদকারীরা নিত্য তাহা করিয়া থাকে।

আমরা স্বীকার করি যে, এ ব্যাখ্যাটা নিতান্ত টালবয়স হইলারি ধরনের হইল। কিন্তু আমরা যে এরূপ একটা তাৎপর্য সূচিত করিতে বাধ্য হইলাম, তাহার কারণ আছে। খাণ্ডবদাহটা অধিকাংশ তৃতীয় স্তরান্তর্গত হইতে পারে, কিন্তু স্থূল ঘটনার কোন সূচনা যে আদিম মহাভারতে নাই, এ কথা আমরা বলিতে প্রস্তুত নহি। পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে এবং অনুক্রমণিকাধ্যায়ে ইহার প্রসঙ্গ আছে। এই খাণ্ডবদাহ হইতে সভাপর্ষের উৎপত্তি। এই বনমধ্যে ময় দানব বাস করিত। সেও পুড়িয়া মরিবার উপক্রম হইয়াছিল। সে অর্জুনের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাহিয়াছিল; অর্জুনও শরণাগতকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই উপকারের প্রত্যুপকার জন্য ময় দানব পাণ্ডবদিগের অত্যাৎকৃষ্ট সভা নিৰ্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিল। সেই সভা লইয়াই সভাপর্ষের কথা।

এখন সভাপর্ষ অষ্টাদশ পর্ষের এক পর্ষ। মহাভারতের যুদ্ধের বীজ এইখানে। ইহা একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। যদি তা না যায়, তবে ইহার মধ্যে কতটুকু ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত থাকিতে পারে, তাহা বিচার করিয়া দেখা উচিত। সভা এবং তদুপলক্ষে রাজসূয় যজ্ঞকে মৌলিক এবং ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করার প্রতি কোনই আপত্তি দেখা যায় না। যদি সভা ঐতিহাসিক হইল, তবে তাহার নিৰ্ম্মাতা এক জন অবশ্য থাকিবে। মনে কর, সেই কারিগর বা এঞ্জিনিয়ারের নাম ময়। হয়ত সে অনার্যবংশীয়—এজন্য তাহাকে ময় দানব বলিত। এমন হইতে পারে যে, সে বিপন্ন হইয়া অর্জুনের সাহায্যে জীবন লাভ করিয়াছিল, এবং কৃতজ্ঞতাবশতঃ এই এঞ্জিনিয়ারী কাজটুকু করিয়া দিয়াছিল। যদি ইহা প্রকৃত হয়, তবে সে যে কিরূপে বিপন্ন হইয়া অর্জুনকৃত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে কথা কেবল খাণ্ডবদাহেই পাওয়া যায়। অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, এ সকলই কেবল অন্ধকারে টিল মারা। তবে অনেক প্রাচীন ঐতিহাসিক তত্ত্বই এইরূপ অন্ধকারেও টিল।

হয়ত, ময় দানবের কথাটা সমুদায়ই কবির সৃষ্টি। তা যাই হোক, এই উপলক্ষে কবি যে ভাবে কৃষ্ণার্জুনের চরিত্র সংস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা বড় মনোহর। তাহা না লিখিয়া থাকা যায় না। ময় দানব প্রাণ পাইয়া অর্জুনকে বলিলেন, “আপনি আমাকে পরিগ্রহ করিয়াছেন, অতএব আজ্ঞা করুন, আপনার কি প্রত্যুপকার করিব?” অর্জুন কিছুই প্রত্যুপকার চাহিলেন না, কেবল প্রীতি ভিক্ষা করিলেন। কিন্তু ময় দানব ছাড়ে না: কিছু কাজ না করিয়া যাইবে না। তখন অর্জুন তাহাকে বলিলেন,—

“হে কৃতজ্ঞ! তুমি আসন্নমৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছ বলিয়া আমার প্রত্যুপকার করিতে ইচ্ছা করিতেছ, এই নিমিত্ত তোমার দ্বারা কোন কর্ম সম্পন্ন করিয়া লইতে ইচ্ছা হয় না।”

ধর্ম; খ্রীষ্টান ইউরোপে ইহা নাই। বাইবেলে যে ধর্ম অনুজ্ঞাত হইয়াছে, স্বর্গ বা ঈশ্বর-প্রীতি তাহার কাম্য। আমরা এ সকল পরিত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্য গ্রন্থ হইতে যে ধর্ম ও নীতি শিক্ষা করিতে যাই, আমাদের বিবেচনায় সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য। অর্জুন-বাক্যের অপরাধে এই নিষ্কাম ধর্ম আরও স্পষ্ট হইতেছে। ময় যদি কিছু কাজ করিতে

বিশ্বকম রচনাবলী

পারিলে মনে সুখী হয়, তবে সে সুখ হইতে অজ্ঞান তাহাকে বঞ্চিত করিতে অনিচ্ছুক। অতএব তিনি বলিতে লাগিলেন,—

“তোমার অভিলাষ যে ব্যর্থ হয়, ইহাও আমার অভিপ্রেত নহে। অতএব তুমি কৃষ্ণের কোন কর্ম কর, তাহা হইলেই আমার প্রত্যুপকার করা হইবে।”

অর্থাৎ, তোমার দ্বারা যদি কাজ লইতে হয়, তবে সেও পরের কাজ। আপনার কাজ লওয়া হইবে না।

তখন ময় কৃষ্ণকে অনুরোধ করিলেন—কিছু কাজ করিতে আদেশ কর। ময় “দানবকুলের বিশ্বকর্মা”—বা চীফ্ এঞ্জিনিয়র। কৃষ্ণও তাহাকে আপনার কাজ করিতে আদেশ করিলেন না। বলিলেন, “যুধিষ্ঠিরের একটি সভা নিষ্পন্ন কর। এমন সভা গড়িবে, মনুষ্যে যেন তাহার অনুকরণ করিতে না পারে।”

ইহা কৃষ্ণের নিজের কাজ নহে—অথচ নিজের কাজ বটে। আমরা পূর্বে বলিয়াছি, কৃষ্ণ স্বজীবনে দুইটি কার্য উদ্দিষ্ট করিয়াছিলেন—ধর্মপ্রচার এবং ধর্মরাজ্যসংস্থাপন। ধর্মপ্রচারের কথা এখনও বড় উঠে নাই। এই সভা নিষ্পন্ন ধর্মরাজ্যসংস্থাপনের প্রথম সূত্র। এইখানেই তাহার এই অভিসন্ধির প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। যুধিষ্ঠিরের সভা নিষ্পন্ন হইতে যে সকল ঘটনাবলী হইল, শেষে তাহা ধর্মরাজ্যসংস্থাপনে পরিণত হইল। ধর্মরাজ্যসংস্থাপন, জগতের কাজ; কিন্তু যখন তাহা কৃষ্ণের উদ্দেশ্য, তখন এ সভাসংস্থাপন তাহার নিজের কাজ।

গত অধ্যায়ে সমাজসংস্কারের কথাটা উঠিয়াছিল। আমরা বলিয়াছি যে, তিনি সমাজসংস্থাপক বা Social Reformer হইবার প্রয়াস পান নাই। দেশের নৈতিক এবং রাজনৈতিক পুনর্জীবন (Moral and Political Regeneration), ধর্মপ্রচার এবং ধর্মরাজ্য-সংস্থাপন, ইহাই তাহার উদ্দেশ্য। ইহা ঘটিলে সমাজসংস্কার আপনি ঘটিয়া উঠে—ইহা না ঘটিলে সমাজসংস্কার কোন মতেই ঘটিবে না। আদর্শ মনুষ্য তাহা জানিতেন,—জানিতেন, গাছের পাট না করিয়া কেবল একটা ডালে জল সোঁচিলে ফল ধরে না। আমরা তাহা জানি না—আমরা তাই সমাজসংস্কারকে একটা পৃথক্ জিনিস বলিয়া খাড়া করিয়া গুণ্ডগোল উপস্থিত করি। আমাদের খ্যাতিপ্রিয়তাই ইহার এক কারণ। সমাজসংস্কারক হইয়া দাঁড়াইলে হঠাৎ খ্যাতিলাভ করা যায়—বিশেষ সংস্কারপদ্ধতিটা যদি ইংরেজি ধরণের হয়। আর যার কাজ নাই, হুজুক তার বড় ভাল লাগে। সমাজসংস্কার আর কিছুই হউক না হউক, একটা হুজুক বটে। হুজুক বড় আমোদের জিনিস। এই সম্প্রদায়ের লোকদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করি, ধর্মের উন্নতি ব্যতীত সমাজসংস্কার কিসের জোরে হইবে। রাজনৈতিক উন্নতিরও মূল ধর্মের উন্নতি। অতএব সকলে মিলিয়া ধর্মের উন্নতিতে মন দাও। তাহা হইলে আর সমাজসংস্কারের পৃথক্ চেষ্টা করিতে হইবে না। তা না করিলে, কিছুতেই সমাজসংস্কার হইবে না। তাই আদর্শ মনুষ্য মালাবারি হইবার চেষ্টা করেন নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—কৃষ্ণের মানবিকতা

কৃষ্ণচরিত্রের এই সমালোচনায় আমি কৃষ্ণের কেবল মানুষী প্রকৃতিরই সমালোচনা করিতেছি। তিনি ঈশ্বর কি না, তাহা আমি কিছু বলিতেছি না। সে কথার সঙ্গে পাঠকের কোন সম্বন্ধ নাই। কেন না, আমার যদি সেই মত হয়, তবে আমি পাঠককে সে মত গ্রহণ করিতে বলিতেছি না। গ্রহণ করা না করা, পাঠকের নিজের বুদ্ধির ও চিত্তের উপর নির্ভর করে, অনুরোধ চলে না। স্বর্গ জেলখানা নহে—তাহার যে একটি বৈ ফটক নাই, এ কথা আমি মনে করি না। ধর্ম এক বস্তু বটে, কিন্তু তাহার নিকটে পেরাঁছবার অনেক পথ আছে—কৃষ্ণভক্ত এবং খ্রীষ্টীয়ান উভয়েই সেখানে পেরাঁছিতে পারে।* অতএব কেহ কৃষ্ণধর্ম গ্রহণ না করিলে, আমি তাহাকে পতিত মনে করিব না, এবং ভরসা করি যে, কৃষ্ণদেবী বা প্রাচীন বৈষ্ণবের দল আমাকে নিরয়গামী বলিয়া ভাবিবেন না।

* “ধর্মের অসংখ্য দ্বার। যে কোন প্রকারে হউক, ধর্মের অনুষ্ঠান করিলে উহা কদাপি নিষ্ফল হয় না।”—মহাভারত, শান্তিপর্ষ, ১৭৪ অ।

আমাদের এখন বলিবার কথা এই, আমরা তাঁহার মানুষী প্রকৃতির মাত্র সমালোচন করিতেছি। আমরা তাঁহাকে আদর্শ মানুষ্য বলিয়াছি। ইহাতে তাঁহার মানুষ্যাতীত কোন প্রকৃতি থাকিলেও তাহার বিকাশ মাত্র প্রতিষেধক হইল। বলিয়াছি, এমন হইতে পারে যে, ঈশ্বর লোকশিক্ষার্থ আদর্শমানুষ্য স্বরূপ লোকালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। যদি তাই হয়, তবে তিনি কেবল মানুষিক শক্তিতে, জগতে কেবল মানুষিক কার্য করিবেন। তিনি কখনও কোন লোকাতীত শক্তির দ্বারা কোন লৌকিক বা অলৌকিক কার্য নিৰ্ব্বাহ করিবেন না। কেন না, মানুষ্যের কোন অলৌকিক শক্তি নাই। যিনি তাহার আশ্রয় করিয়া স্বকার্য সাধন করিলেন, তিনি আর মানুষ্যের আদর্শ হইতে পারিলেন না। যে শক্তি মানুষ্যের নাই, তাহার অনুকরণ মানুষ্য করিবে কি প্রকারে?*

অতএব, শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার হইলেও তাঁহার কোন অলৌকিক শক্তির বিকাশ বা অমানুষী কার্যসিদ্ধি সম্ভবে না। মহাভারতের যে সকল অংশে কৃষ্ণের অলৌকিক শক্তির আরোপ আছে, তাহা অমূলক এবং প্রক্ষিপ্ত কি না, সে কথার বিচার আমরা যথাস্থানে করিব। এক্ষণে আমাদের বক্তব্য এই যে, কৃষ্ণ কোথাও আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া পরিচয় দেন না।† কোথাও এমন প্রকাশ করেন নাই যে, তাঁহার কোন প্রকার অমানুষিক শক্তি আছে। কেহ তাঁহাতে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিলে, তখন তিনি সে কথার অনুমোদন করেন নাই, বা এমন কোন আচরণ করেন নাই, যাহাতে তাহাদের সেই বিশ্বাস দৃঢ়ীকৃত হইতে পারে। বরং এক স্থানে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, “আমি যথাসাধ্য পুরুষকার প্রকাশ করিতে পারি, কিন্তু দৈবের অনুষ্ঠানে আমার কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই।”‡

তিনি যত্নপূৰ্ব্বক মানুষ্যোচিত আচার ব্যবহারের অনুষ্ঠান করেন। যাহার মনে থাকে যে, আমি একটা দেবতা বলিয়া পরিচিত হইব, সে একটু মানুষ্যোচিত আচারের উপর চড়ে, কৃষ্ণ সে ভাব কোথাও লক্ষিত হয় না। এই সকল কথার উদাহরণস্বরূপ তিনি খাণ্ডবদাহের পর যুধিষ্ঠিরাদির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, যখন দ্বারকা যাত্রা করেন, তখন তিনি যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি। উহা অত্যন্ত মানুষিক।

“বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভগবান্ বাসুদেব পরম প্রীত পাণ্ডবগণ কর্তৃক অভিপূজিত হইয়া কিয়দ্দিন খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করিলেন। পরিশেষে পিতৃদর্শনে সাতিশয় উৎসুক হইয়া স্বভবনে গমন করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইলেন। তিনি প্রথমতঃ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণ করিয়া পশ্চাৎ স্বীয় পিতৃস্বস্যা কুন্তী দেবীর চরণবন্দন করিলেন। তখন বাসুদেব, সাক্ষাৎকরণমানসে স্বীয় ভাগিনী সুভদ্রার সমীপে উপস্থিত হইয়া, অর্থযুক্ত যথার্থ হিতকর অলপাক্ষর ও

* “We forget that Christ incarnate was such as we are, and some of us are putting him where he can be no example to us at all. Let no fear of losing the dear great truth of the divinity of Jesus make you lose the dear great truth of the humanity of Jesus. He took upon himself our nature; as a man of the like passions, he fought that terrible fight in the wilderness; year by year, as an innocent man, was he persecuted by narrow-hearted Jews; and his was a humanity whose virtue was pressed by all the needs of the multitude and yet kept its richness of nature; a humanity which, though given up to death on the cross, expressed all that is within the capacity of our own humanity; and if we really follow him we shall be holy even as he is holy.”

Sermon by Dr. Brookly, delivered at Trinity Church, Boston, March, 29th, 1885.

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমি ঠিক এই কথা বলি।

† যে দুই এক স্থানে এরূপ কথা আছে, সে সকল অংশ যে প্রক্ষিপ্ত, তাহাও যথাস্থানে আমরা প্রমাণীকৃত করিব।

‡ অহং হি তৎ করিষ্যামি পরং পুরুষকারতঃ।

দৈবং তু ন ময়া শক্যং কৰ্ম্ম কর্ত্বং কথংগন ॥

উদ্যোগপর্ব, ৭৮ অধ্যায়।

বীক্ষম রচনাবলী

অখণ্ডনীয় বাক্যে তাঁহাকে নানাপ্রকার বন্ধাইলেন। ভদ্রভাষণী ভদ্রাও তাঁহাকে জননী প্রভৃতি স্বজনসমীপে বিজ্ঞাপনীয় বাক্য সমুদায় কাহিয়া দিয়া বারংবার পূজা ও অভিবাদন করিলেন। বৃষ্ণবংশাবতংস কৃষ্ণ তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া দ্রৌপদী ও ধৌম্যের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ধৌম্যকে যথার্থি বন্দন ও দ্রৌপদীকে সম্ভাষণ ও আমন্ত্রণ করিয়া অর্জুনসমভিব্যাহারে তথা হইতে যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। তথায় ভগবান্ বাসুদেব পাণ্ডবকর্তৃক বেষ্টিত হইয়া অমরগণ-পরিবৃত মহেন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

তৎপরে কৃষ্ণ যাত্রাকালোচিত কার্য্য করিবার মানসে স্নানান্তে অলঙ্কার পরিধান করিয়া মালা জপ, নমস্কার ও নানাবিধ গন্ধদ্রব্য দ্বারা দেব ও দ্বিজগণের পূজা সমাধা করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে তৎকালোচিত সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া স্বপ্নের গমনোদ্যোগে বহিঃকক্ষায় বিনির্গত হইলেন। স্বাস্থ্যবাচক ব্রাহ্মণগণ দধিপাত্র স্থলপুষ্প ও অক্ষত প্রভৃতি মাঙ্গল্য বস্তু হস্তে করিয়া তথায় উপস্থিত ছিলেন। বাসুদেব তাঁহাদিগকে ধনদানপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিলেন। পরে অত্যুৎকৃষ্ট তিথিনক্ষত্রযুক্ত মূহূর্ত্তে গদা চক্র অসি শার্ঙ্গ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রপরিবৃত গরুড়কেতন বায়ুবেগগামী কাণ্ডনময় রথে আরোহণ করিয়া স্বপ্নের গমন করিতেছেন, এমন সময়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির স্নেহপরতন্ত্র হইয়া সেই রথে আরোহণপূর্ব্বক দারুক সারথিকে তৎস্থান হইতে স্থানান্তরে উপবেশন করাইয়া স্বয়ং সারথি হইয়া বল্গা গ্রহণ করিলেন। মহাবাহু অর্জুনও তাহাতে আরোহণ করিয়া স্বর্ণদণ্ডবিরাজিত শ্বেত চামর গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে বীজন করতঃ প্রদক্ষিণ করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন নকুল এবং সহদেব, ঋত্বিক্ ও পুরোহিতগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। শত্রুবলান্তক বাসুদেব যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণ কর্তৃক অনুগম্যমান হইয়া শিষ্যগণানুগত গরুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি অর্জুনকে আমন্ত্রণ ও গাঢ় আলিঙ্গন, যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনকে পূজা এবং নকুল ও সহদেবকে সম্ভাষণ করিলেন। যুধিষ্ঠির ভীমসেন ও অর্জুন তাঁহাকে আলিঙ্গন এবং নকুল ও সহদেব তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। তৎপরে ক্রমে ক্রমে অর্দ্ধ যোজন গমন করিয়া শত্রুনির্সূদন কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণ করতঃ প্রতিনিবৃত্ত হউন বলিয়া তাঁহার পাদদ্বয় গ্রহণ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির চরণপতিত পতিতপাবন কমললোচন কৃষ্ণকে উত্থাপিত করিয়া তাঁহার মস্তকাস্পর্শপূর্ব্বক স্বভবনে গমন করিতে অনুমতি করিলেন। তখন ভগবান্ বাসুদেব পাণ্ডবগণের সহিত যথার্থি প্রতিজ্ঞা করতঃ অতি কষ্টে তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া অমরাবতীপ্রস্থিত মহেন্দ্রের ন্যায় দ্বারাবতী প্রতিগমন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ যতক্ষণ কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন, ততক্ষণ তাঁহারা নিমেষশূন্য নয়নে তাঁহাকে নিরীক্ষণ ও মনে মনে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণকে দেখিয়া তাঁহাদিগের মন পরিতৃপ্ত না হইতে হইতেই তিনি তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন। তখন পাণ্ডবগণ কৃষ্ণদর্শনে নিতান্ত নিরাশ হইয়া তদ্বিষয়িণী চিন্তা করিতে করিতে স্বপ্নের প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। দেবকীনন্দন কৃষ্ণও অনুগামী মহাবীর সাত্বত এবং দারুক সারথির সহিত বেগবান্ গরুড়ের ন্যায় সঙ্ঘরে দ্বারকাপ্নরে সমুপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে সূহৃৎজনপরিবৃত হইয়া স্বপ্নের প্রবেশ করিলেন, এবং ভ্রাতা পুত্র ও বন্ধুদিগকে বিদায় দিয়া দ্রৌপদীর সহিত আমোদ প্রমোদে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এ দিকে কৃষ্ণও পরম আহ্লাদির্ভাচিত্তে দ্বারকাপ্নরে প্রবেশ করিলেন। উগ্রসেন প্রভৃতি যদুশ্রেষ্ঠগণ তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। বাসুদেব পুত্রপ্রবেশ করিয়া অগ্রে বৃদ্ধ পিতা, আহুক ও যশস্বিনী মাতাকে, পরে বলভদ্রকে অভিবাদন করিলেন। অনন্তর তিনি প্রদ্যুম্ন শাম্ব নিশঠ চারুদেষ্ গদ অনিরুদ্ধ ও ভানুকে আলিঙ্গন করিয়া বৃদ্ধগণের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক রুক্মিণীর ভবনে উপস্থিত হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—জরাসন্ধবধের পরামর্শ

এ দিকে সভানির্ম্মাণ হইল। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ করিবার প্রস্তাব হইল। সকলেই সে বিষয়ে মত করিল, কিন্তু যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের মত ব্যতীত তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে অনিচ্ছুক— কেন না, কৃষ্ণই নীতিজ্ঞ। অতএব তিনি কৃষ্ণকে আনিতে পাঠাইলেন। কৃষ্ণও সংবাদপ্রাপ্তমাত্র খান্ডবপ্রস্থে উপস্থিত হইলেন।

রাজসূয়ের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বলিতেছেন :—

“আমি রাজসূয় যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিয়াছি। ঐ যজ্ঞ কেবল ইচ্ছা করিলেই সম্পন্ন হয় এমত নহে। যে রূপে উহা সম্পন্ন হয়, তাহা তোমার সর্বাধিদিত আছে। দেখ, যে ব্যক্তিতে সকলই সম্ভব, যে ব্যক্তি সর্বত্র পূজ্য, এবং যিনি সমুদায় পৃথিবীর ঈশ্বর, সেই ব্যক্তিই রাজসূয়ানুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র।”

কৃষ্ণকে যুধিষ্ঠিরের এই কথাই জিজ্ঞাস্য। তাঁহার জিজ্ঞাস্য এই যে—“আমি কি সেইরূপ ব্যক্তি? আমাতে কি সকলই সম্ভব? আমি কি সর্বত্র পূজ্য, এবং সমুদায় পৃথিবীর ঈশ্বর?” যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের ভুজবলে একজন বড় রাজা হইয়া উঠিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি এমন একটা লোক হইয়াছেন কি যে, রাজসূয়ের অনুষ্ঠান করেন? আমি কত বড় লোক, তাহার ঠিক মাপ কেহই আপনা আপনি পায় না। দান্তিক ও দুরাত্মগণ খুব বড় মাপকাটিতে আপনাকে মাপিয়া আপনার মহত্ত্ব সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে বাসিয়া থাকে, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের ন্যায় সাবধান ও বিনয়সম্পন্ন ব্যক্তির তাহা সম্ভব নহে। তিনি মনে মনে বুঝিতেন বটে যে, আমি খুব বড় রাজা হইয়াছি, কিন্তু আপনার কৃত আশ্রমানে তাঁহার বড় বিশ্বাস হইতেছে না। তিনি আপনার মন্ত্রিগণ ও ভীমার্জুনাদি অনুজগণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—“কেমন, আমি রাজসূয় যজ্ঞ করিতে পারি কি?” তাঁহারা বলিয়াছেন—“হাঁ, অবশ্য পার। তুমি তার যোগ্য পাত্র।” ধোম্য দ্বৈপায়নাদি ঋষিগণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “কেমন, আমি কি রাজসূয় পারি?” তাঁহারাও বলিয়াছিলেন, “পার। তুমি রাজসূয়ানুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র।” তথাপি সাবধান* যুধিষ্ঠিরের মন নিশ্চিন্ত হইল না। অর্জুন হউন, ব্যাস হউন,—যুধিষ্ঠিরের নিকট পরিচিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাঁহার কাছে এ কথার উত্তর না শুনিলে যুধিষ্ঠিরের সন্দেহ যায় না। তাই “মহাবাহু সর্বলোকোত্তম” কৃষ্ণের সহিত পরামর্শ করিতে স্থির করিলেন। ভাবিলেন, “কৃষ্ণ সর্বজ্ঞ ও সর্বকৃৎ, তিনি অবশ্যই আমাকে সৎপরামর্শ দিবেন।” তাই তিনি কৃষ্ণকে আনিতে লোক পাঠাইয়াছিলেন, এবং কৃষ্ণ আসিলে তাই, তাঁহাকে পূর্বেদিত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। কেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহাও কৃষ্ণকে খুলিয়া বলিতেছেন।

“আমার অন্যান্য সূহৃদগণ আমাকে ঐ যজ্ঞ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন, কিন্তু আমি তোমার পরামর্শ না লইয়া উহার অনুষ্ঠান করিতে নিশ্চয় করি নাই। হে কৃষ্ণ! কোন কোন ব্যক্তি বন্ধুতার নিমিত্ত দোষোদ্ঘোষণা করেন না। কেহ কেহ স্বার্থপর হইয়া প্রিয়বাক্য কহেন। কেহ বা যাহাতে আপনার হিত হয়, তাহাই প্রিয় বলিয়া বোধ করেন। হে মহাত্মন! এই পৃথিবী মধ্যে উক্ত প্রকার লোকই অধিক, সুতরাং তাহাদের পরামর্শ লইয়া কোন কার্য করা যায় না। তুমি উক্ত দোষরহিত ও কাম-ক্রোধ-বিবর্জিত; অতএব আমাকে যথার্থ পরামর্শ প্রদান কর।”

পাঠক দেখুন, কৃষ্ণের আশ্রয়গণ যাঁহারা প্রত্যহ তাঁহার কার্যকলাপ দেখিতেন, তাঁহারা কৃষ্ণকে কি ভাবিতেন।† আর এখন আমরা তাঁহাকে কি ভাবি। তাঁহারা জানিতেন, কৃষ্ণ কাম-ক্রোধ-বিবর্জিত, সর্বাপেক্ষা সত্যবাদী, সর্বদোষরহিত, সর্বলোকোত্তম, সর্বজ্ঞ ও সর্বকৃৎ,—আমরা জানি, তিনি লম্পট, ননীমাখনচোর, কুচক্রী, মিথ্যাবাদী, রিপুবশীভূত, এবং অন্যান্য দোষযুক্ত। যিনি ধর্মের চরমাদর্শ বলিয়া প্রাচীন গ্রন্থে পরিচিত, তাঁহাকে যে জাতি এ পদে অবনত করিয়াছে, সে জাতির মধ্যে যে ধর্মলোপ হইবে, বিচিত্র কি?

যুধিষ্ঠির যাহা ভাবিয়াছিলেন, ঠিক তাহাই ঘটিল; যে অপ্রিয় সত্যবাক্য আর কেহই

* পাণ্ডব পাঁচ জনের চরিত্র বুদ্ধিমান সমালোচকে সমালোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন যে, যুধিষ্ঠিরের প্রধান গুণ, তাঁহার সাবধানতা। ভীম দঃসাহসী, “গোঁয়ার”, অর্জুন আপনার বাহুবলের গোঁরব জানিয়া নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত, যুধিষ্ঠির সাবধান। এ জগতে সাবধানতাই অনেক স্থানে ধর্ম বলিয়া পরিচিত হয়। কথাটা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, বড় গুরুতর কথা বলিয়াই এখানে ইহার উত্থাপন করিলাম। এই সাবধানতার সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের দ্যতানুরাগ কতটুকু সঙ্গত, তাহা দেখাইবার এ স্থান নহে।

† যুধিষ্ঠিরের মূখ হইতে বাস্তবিক এই কথাগুলি বাহির হইয়াছিল, আর তাহাই কেহ লিখিয়া রাখিয়াছে, এমত নহে। মৌলিক মহাভারতে তাঁহার কিরূপ চরিত্র প্রচারিত হইয়াছিল, ইহাই আমাদের আলোচ্য।

বঙ্কিম রচনাবলী

যুধিষ্ঠিরকে বলে নাই, কৃষ্ণ তাহা বলিলেন। মিষ্ট কথাই আবরণ দিয়া যুধিষ্ঠিরকে তিনি বলিলেন, “তুমি রাজসূয়ের অধিকারী নও, কেন না, সম্রাট্ ভিন্ন রাজসূয়ের অধিকার হয় না, তুমি সম্রাট্ নও। মগধাধিপতি জরাসন্ধ এখন সম্রাট্। তাহাকে জয় না করিলে তুমি রাজসূয়ের অধিকারী হইতে পার না ও সম্পন্ন করিতে পারিবে না।”

যাঁহারা কৃষ্ণকে স্বার্থপর ও কুচক্রী ভাবেন, তাঁহারা এই কথা শুনিয়া বলিলেন, “এ কৃষ্ণের মতই কথাটা হইল বটে। জরাসন্ধ কৃষ্ণের পদ্বর্ষশত্রু, কৃষ্ণ নিজে তাঁহাকে আঁটয়া উঠিতে পারেন নাই; এখন সুযোগ পাইয়া বলবান্ পাণ্ডবদিগের দ্বারা তাহার বধ-সাধন করিয়া আপনার ইষ্টসিদ্ধির চেষ্টায় এই পরামর্শটা দিলেন।”

কিন্তু আরও একটু কথা বাকি আছে। জরাসন্ধ সম্রাট্, কিন্তু তৈমুরলঙ্গ বা প্রথম নেপোলিয়ানের ন্যায় অত্যাচারকারী সম্রাট্। পৃথিবী তাহার অত্যাচারে প্রপীড়িত। জরাসন্ধ রাজসূয়যজ্ঞার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়া, “বাহুবলে সমস্ত ভূপতিগণকে পরাজয় করিয়া সিংহ যেমন পদ্বর্ষকন্দর-মধ্যে করিগণকে বদ্ধ রাখে, সেইরূপ তাঁহাদিগকে গিরিদুর্গে বদ্ধ রাখিয়াছে।” রাজগণকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখার আর এক ভয়ানক তাৎপর্য ছিল। জরাসন্ধের অভিপ্রায়, সেই সম্মানীত রাজগণকে যজ্ঞকালে সে মহাদেবের নিকট বলি দিবে। পদ্বর্ষ যে যজ্ঞকালে কেহ কখনও নরবলি দিত, তাহা ইতিহাসজ্ঞ পাঠককে বলিতে হইবে না।* কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন,

“হে ভারতকুলপ্রদীপ! বলিপ্রদানার্থ সম্মানীত ভূপতিগণ প্রোক্ষিত ও প্রমূষ্ট হইয়া পশুদিগের ন্যায় পশুপতির গৃহে বাস করত অতি কষ্টে জীবন ধারণ করিতেছেন। দুরাত্মা জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে অচিরাৎ ছেদন করিবে, এই নিমিত্ত আমি তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে উপদেশ দিতেছি। ঐ দুরাত্মা ষড়শীতি জন ভূপতিকে আনয়ন করিয়াছে, কেবল চতুর্দশ জনের অপতুল আছে; চতুর্দশ জন আননীত হইলেই ঐ নৃপাধম উহাদের সকলকে এককালে সংহার করিবে। হে ধর্ম্মাত্মন! এক্ষণে যে ব্যক্তি দুরাত্মা জরাসন্ধের ঐ দুর কন্মের বিষয় উৎপাদন করিতে পারিবেন, তাঁহার যশোরশি ভূমণ্ডলে দেদীপ্যমান হইবে, এবং যিনি উহাকে জয় করিতে পারিবেন, তিনি নিশ্চয় সাম্রাজ্য লাভ করিবেন।”

অতএব জরাসন্ধবধের জন্য যুধিষ্ঠিরকে কৃষ্ণ যে পরামর্শ দিলেন, তাহার উদ্দেশ্য, কৃষ্ণের নিজের হিত নহে;—যুধিষ্ঠিরেরও যদিও তাহাতে ইষ্টসিদ্ধি আছে, তথাপি তাহাও প্রধানতঃ ঐ পরামর্শের উদ্দেশ্য নহে; উহার উদ্দেশ্য কারারুদ্ধ রাজমণ্ডলীর হিত—জরাসন্ধের অত্যাচার-প্রপীড়িত ভারতবর্ষের হিত—সাধারণ লোকের হিত। কৃষ্ণ নিজে তখন রৈবতকের দুর্গের আশ্রয়ে, জরাসন্ধের বাহুর অতীত এবং অজেয়; জরাসন্ধের বধে তাঁহার নিজের ইষ্টানিষ্ট কিছুরই ছিল না। আর থাকিলেও, যাহাতে লোকহিত সাধিত হয়, সেই পরামর্শ দিতে তিনি ধর্ম্মতঃ বাধ্য—সে পরামর্শে নিজের কোন স্বার্থসিদ্ধি থাকিলেও সেই পরামর্শ দিতে বাধ্য। এই কার্যে লোকের হিত সাধিত হইবে বটে, কিন্তু ইহাতে আমারও কিছুর স্বার্থসিদ্ধি আছে,—এমন পরামর্শ দিলে লোকে আমাকে স্বার্থপর মনে করিবে—অতএব আমি এমন পরামর্শ দিব না;—যিনি এইরূপ ভাবেন, তিনিই স্বার্থপর এবং অধার্ম্মিক, কেন না, তিনি আপনার মর্যাদাই ভাবিলেন, লোকের হিত ভাবিলেন না। যিনি সে কলঙ্ক সাদরে মস্তকে বহন করিয়া লোকের হিতসাধন করেন, তিনিই আদর্শ ধার্ম্মিক। শ্রীকৃষ্ণ সর্বত্রই আদর্শ ধার্ম্মিক।

যুধিষ্ঠির সাবধান ব্যক্তি, সহজে জরাসন্ধের সঙ্গে বিবাদে রাজি হইলেন না। কিন্তু ভীমের দৃষ্ট তেজস্বী ও অর্জুনের তেজোগর্ভ বাক্য, ও কৃষ্ণের পরামর্শে তাহাতে শেষে সম্মত হইলেন। ভীমার্জুন ও কৃষ্ণ এই তিন জন জরাসন্ধ-জয়ে যাত্রা করিলেন। যাহার অর্গণিত সেনার ভয়ে প্রবল পরাক্রান্ত বৃষ্ণবংশ রৈবতকে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিন জন মাত্র জয় করিতে যাত্রা করিলেন, এ কিরূপ পরামর্শ? এ পরামর্শ কৃষ্ণের, এবং এ পরামর্শ কৃষ্ণের আদর্শচরিত্রানুযায়ী। জরাসন্ধ দুরাত্মা, এজন্য সে দণ্ডনীয়, কিন্তু তাহার সৈনিকেরা কি অপরাধ করিয়াছে যে, তাহার সৈনিকদিগকে বধের জন্য সৈন্য লইয়া যাইতে হইবে? এরূপ

* কেহ কদাচিৎ দিত—সামাজিক প্রথা ছিল না। কৃষ্ণ এক স্থানে বলিতেছেন, “আমরা কখন নরবলি দোঁখি নাই।” ধার্ম্মিক ব্যক্তির এ ভয়ানক প্রথার দিক্ দিয়া যাইতেন না।

সসৈন্য যুদ্ধে কেবল নিরপরাধীদিগের হত্যা, আর হয়ত অপরাধীরও নিষ্কৃতি; কেন না, জরাসন্ধের সৈন্যবল বেশী, পাণ্ডবসৈন্য তাহার সমকক্ষ না হইতে পারে। কিন্তু তখনকার ক্ষত্রিয়গণের এই ধর্ম ছিল যে, দ্বৈরথ্য যুদ্ধে আহত হইলে কেহই বিমুখ হইতেন না।* অতএব কৃষ্ণের অভিসন্ধি এই যে, অনর্থক লোকক্ষয় না করিয়া, তাঁহারা তিন জন মাত্র জরাসন্ধের সম্মুখীন হইয়া তাহাকে দ্বৈরথ্য যুদ্ধে আহত করিবেন—তিন জনের মধ্যে এক জনের সঙ্গে যুদ্ধে সে অবশ্য স্বীকৃত হইবে। তখন যাহার শারীরিক বল, সাহস ও শিক্ষা বেশী, সেই জিতিবে। এ বিষয়ে চারি জনেই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যুদ্ধসম্বন্ধে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তাঁহারা স্নাতক ব্রাহ্মণবেশে গমন করিলেন। এ ছদ্মবেশ কেন, তাহা বুঝা যায় না। এমন নহে যে, গোপনে জরাসন্ধকে ধরিয়া বধ করিবার তাঁহাদের সঙ্কল্প ছিল। তাঁহারা শত্রুভাবে, দ্বারস্থ ভেরী সকল ভগ্ন করিয়া, প্রাকার চৈত্য চূর্ণ করিয়া জরাসন্ধসভায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। অতএব গোপন উদ্দেশ্য নহে। ছদ্মবেশ কৃষ্ণাজ্জর্নের অযোগ্য। ইহার পর আরও একটি কাণ্ড, তাহাও শোচনীয় ও কৃষ্ণাজ্জর্নের অযোগ্য বলিয়াই বোধ হয়। জরাসন্ধের সমীপবর্তী হইলে ভীমাঙ্গর্জন “নিয়মস্থ” হইলেন। নিয়মস্থ হইলে কথা কহিতে নাই। তাঁহারা কোন কথাই কহিলেন না। সুতরাং জরাসন্ধের সঙ্গে কথা কহিবার ভার কৃষ্ণের উপর পড়িল। কৃষ্ণ বলিলেন, “ইঁহারা নিয়মস্থ, এক্ষণে কথা কহিবেন না; পূর্বারত্ন অতীত হইলে আপনার সহিত আলাপ করিবেন।” জরাসন্ধ কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণান্তর তাঁহাদিগকে যজ্ঞশালায় রাখিয়া স্বীয় গৃহে গমন করিলেন, এবং অর্দ্ধরাত্র সময়ে পুনরায় তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন।

ইহাও একটা কল কৌশল। কল কৌশলটা বড় বিশুদ্ধ রকমের নয়—চাতুরী বটে। ধর্মাত্মার ইহা যোগ্য নহে। এ কল কৌশল ফিকির ফন্দীর উদ্দেশ্যটা কি? যে কৃষ্ণাজ্জর্নকে এত দিন আমরা ধর্মের আদর্শের মত দেখিয়া আসিতোছি, হঠাৎ তাঁহাদের এ অবনতি কেন? এ চাতুরীর কোন যদি উদ্দেশ্য থাকে, তাহা হইলেও বুঝিতে পারি যে, হাঁ, অভীষ্টসিদ্ধির জন্য, ইঁহারা এই খেলা খেলিতেছেন, কল কৌশল করিয়া শত্রুনিপাত করিবেন বলিয়াই এ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে ইহাও বলিতে বাধ্য হইব যে, ইঁহারা ধর্মাত্মা নহেন, এবং কৃষ্ণচরিত্র আমরা যে রূপ বিশুদ্ধ মনে করিয়াছিলাম, সে রূপ নহে।

যাঁহারা জরাসন্ধ-বধ-বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত পাঠ করেন নাই, তাঁহারা মনে করিতে পারেন, কেন, এরূপ চাতুরীর উদ্দেশ্য ত পড়িয়াই রহিয়াছে। নিশীথকালে, যখন জরাসন্ধকে নিঃসহায় অবস্থায় পাইবেন, তখন, তাহাকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া বধ করাই এ চাতুরীর উদ্দেশ্য। তাই ইঁহারা যাহাতে নিশীথকালে তাহার সাক্ষাৎলাভ হয়, এমন একটা কৌশল করিলেন। বাস্তবিক, এরূপ কোন উদ্দেশ্য তাঁহাদের ছিল না, এরূপ কোন কার্য তাঁহারা করেন নাই। নিশীথকালে তাঁহারা জরাসন্ধের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তখন জরাসন্ধকে আক্রমণ করেন নাই—আক্রমণ করিবার কোন চেষ্টাও করেন নাই। নিশীথকালে যুদ্ধ করেন নাই—দিনমানে যুদ্ধ হইয়াছিল। গোপনে যুদ্ধ করেন নাই—প্রকাশ্যে সমস্ত পৌরবর্গ ও মগধবাসীদিগের সমক্ষে যুদ্ধ হইয়াছিল। এমন এক দিন যুদ্ধ হয় নাই, চৌদ্দ দিন এমন যুদ্ধ হইয়াছিল। তিন জনে যুদ্ধ করেন নাই, এক জনে করিয়াছিলেন। হঠাৎ আক্রমণ করেন নাই—জরাসন্ধকে তজ্জন্য প্রস্তুত হইতে বিশেষ অবকাশ দিয়াছিলেন—এমন কি, পাছে যুদ্ধে আমি মারা পড়ি, এই ভাবিয়া যুদ্ধের পূর্বে জরাসন্ধ আপনার পুত্রকে রাজ্যে অভিষেক করিলেন, তত দূর পর্যন্ত অবকাশ দিয়াছিলেন। নিরস্ত্র হইয়া জরাসন্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। লুকাচুরি কিছুই করেন নাই, জরাসন্ধ জিজ্ঞাসা করিবামাত্র কৃষ্ণ আপনাদিগের যথার্থ পরিচয় দিয়াছিলেন। যুদ্ধকালে জরাসন্ধের পুরোহিত যুদ্ধজাত অঙ্গের বেদনা উপশমের উপযোগী ঔষধ সকল লইয়া নিকটে রহিলেন, কৃষ্ণের পক্ষে সেরূপ কোন সাহায্য ছিল না, তথাপি “অন্যায় যুদ্ধ” বলিয়া তাঁহারা কোন আপত্তি করেন নাই। যুদ্ধকালে জরাসন্ধ ভীমকর্তৃক অতিশয় পীড়মান হইলে, দয়াময় কৃষ্ণ ভীমকে তত পীড়ন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। যাঁহাদের এইরূপ চরিত্র, এই কার্যে তাঁহারা কেন চাতুরী করিলেন? এ উদ্দেশ্যশূন্য চাতুরী কি সম্ভব? অতি নির্বোধে, যে শঠতার কোন উদ্দেশ্য নাই, তাহা করিলে করিতে পারে; কিন্তু কৃষ্ণাজ্জর্ন, আর যাহাই হউন, নির্বোধ

* কালযবন ক্ষত্রিয় ছিল না।

বাংলা রচনাবলী

নহেন, ইহা শব্দপক্ষও স্বীকার করেন। তবে এ চাতুরীর কথা কোথা হইতে আসিল? যাহার সঙ্গে এই সমস্ত জরাসন্ধ-পর্বাধ্যায়ের অনৈক্য, সে কথা ইহার ভিতর কোথা হইতে আসিল। ইহা কি কেহ বসাইয়া দিয়াছে? এই কথাগুলি কি প্রক্ষিপ্ত? এই বৈ এ কথার আর কোন উত্তর নাই। কিন্তু সে কথাটা আর একটু ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখা উচিত।

আমরা দেখিয়াছি যে, মহাভারতে কোন স্থানে কোন একটি অধ্যায়, কোন স্থানে কোন একটি পর্বাধ্যায় প্রক্ষিপ্ত। যদি একটি অধ্যায়, কি একটি পর্বাধ্যায় প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে, তবে একটি অধ্যায় কি একটি পর্বাধ্যায়ের অংশবিশেষ বা কতক শ্লোক তাহাতে প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে না কি? বিচিন্তন কিছুই নহে। বরং প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সকলেই এইরূপ ভূরি ভূরি হইয়াছে, ইহাই প্রসিদ্ধ কথা। এই জন্যই বেদাদির এত ভিন্ন ভিন্ন শাখা, রামায়ণাদি গ্রন্থের এত ভিন্ন ভিন্ন পাঠ, এমন কি, শকুন্তলা মেঘদূত প্রভৃতি আধুনিক (অপেক্ষাকৃত আধুনিক) গ্রন্থেরও এত বিবিধ পাঠ। সকল গ্রন্থেরই মৌলিক অংশের ভিতর এইরূপ এক একটা বা দুই চারিটা প্রক্ষিপ্ত শ্লোক মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়—মহাভারতের মৌলিক অংশের ভিতর তাহা পাওয়া যাইবে, তাহার বিচিন্তন কি?

কিন্তু যে শ্লোকটা আমার মতের বিরোধী, সেইটাই যে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া আমি বাদ দিব, তাহা হইতে পারে না। কোনটি প্রক্ষিপ্ত—কোনটি প্রক্ষিপ্ত নহে, তাহার নিদর্শন দেখিয়া পরীক্ষা করা চাই। যেটাকে আমি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ত্যাগ করিব, আমাকে অবশ্য দেখাইয়া দিতে হইবে যে, প্রক্ষিপ্তের চিহ্ন উহাতে আছে, চিহ্ন দেখিয়া আমি উহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিতেছি।

অতি প্রাচীন কালে যাহা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা ধরিবার উপায়, আভ্যন্তরিক প্রমাণ ভিন্ন আর কিছুই নাই। আভ্যন্তরিক প্রমাণের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ প্রমাণ—অসঙ্গতি, অনৈক্য। যদি দেখি যে, কোন পুথিতে এমন কোন কথা আছে যে, সে কথা গ্রন্থের আর সকল অংশের বিরোধী, তখন স্থির করিতে হইবে যে, হয় উহা গ্রন্থকারের বা লিপিকারের ভ্রমপ্রমাদবশতঃ ঘটয়াছে, নয় উহা প্রক্ষিপ্ত। কোনটি ভ্রমপ্রমাদ, আর কোনটি প্রক্ষিপ্ত, তাহা সহজে নিরূপণ করা যায়। যদি রামায়ণের কোন কাণ্ডে দেখি যে, লেখা আছে যে, রাম উষ্মীলাকে বিবাহ করিলেন, তখনই সিদ্ধান্ত করিব যে এটা লিপিকারের ভ্রমপ্রমাদ মাত্র। কিন্তু যদি দেখি যে, এমন লেখা আছে যে, রাম উষ্মীলাকে বিবাহ করায় লক্ষ্মণের সঙ্গে বিবাদ উপস্থিত হইল, তারপর রাম, লক্ষ্মণকে উষ্মীলা ছাড়িয়া দিয়া মিটমাট করিলেন, তখন আর বলিতে পারিব না যে, এ লিপিকার বা গ্রন্থকারের ভ্রমপ্রমাদ—তখন বলিতে হইবে যে, এটুকু কোন ভ্রাতৃসৌহার্দ-রসে রসিকের রচনা, ঐ পুথিতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এখন, আমি দেখাইয়াছি যে, জরাসন্ধ-পর্বাধ্যায়ের যে কয়টা কথা আমাদের এখন বিচার্য, তাহা ঐ পর্বাধ্যায়ের আর সকল অংশের সম্পূর্ণ বিরোধী। আর ইহাও স্পষ্ট যে, ঐ কথাগুলি এমন কথা নহে যে, তাহা লিপিকারের বা গ্রন্থকারের ভ্রমপ্রমাদ বলিয়া নির্দিষ্ট করা যায়। সুতরাং ঐ কথাগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিবার আমাদের অধিকার আছে।

ইহাতেও পাঠক বলিতে পারেন যে, যে এই কথাগুলি প্রক্ষিপ্ত করিল, সেই বা এমন অসংলগ্ন কথা প্রক্ষিপ্ত করিল কেন? তাহারই বা উদ্দেশ্য কি? এ কথাটার মীমাংসা আছে। আমি পুনঃ পুনঃ বুঝাইয়াছি যে, মহাভারতের তিন স্তর দেখা যায়। তৃতীয় স্তর নানা ব্যক্তির গঠিত। কিন্তু আদিম স্তর এক হাতের এবং দ্বিতীয় স্তরও এক হাতের। এই দুই জনেই শ্রেষ্ঠ কবি, কিন্তু তাঁহাদের রচনাপ্রণালী স্পষ্টতঃ ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির, দেখিলেই চেনা যায়। যিনি দ্বিতীয় স্তরের প্রণেতা, তাঁহার রচনার কতকগুলি লক্ষণ আছে, যুদ্ধপর্বাধ্যায়ের তাঁহার বিশেষ হাত আছে—ঐ পর্বাধ্যায়ের অধিকাংশই তাঁহার প্রণীত, সেই সকল সমালোচনকালে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। এই কবির রচনার অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে, ইনি কৃষ্ণকে চতুরচূড়ামণি সাজাইতে বড় ভালবাসেন। বুদ্ধির কৌশল, সকল গুণের অপেক্ষা ইহার নিকট আদরণীয়। এরূপ লোক এ কালেও বড় দুর্লভ নয়। এখনও বোধ হয়, অনেক সুশিক্ষিত উচ্চ শ্রেণীর লোক আছেন যে, কৌশলবিদ বুদ্ধিমান চতুরই তাঁহাদের কাছে মনুষ্যত্বের আদর্শ। ইউরোপীয় সমাজে এই আদর্শ বড় প্রিয়—তাহা হইতে আধুনিক Diplomacy বিদ্যার সৃষ্টি। বিস্মার্ক একদিন জগতের প্রধান মনুষ্য ছিলেন। থেমিস্টক্লিসের সময় হইতে আজ পর্যন্ত যাহারা এই বিদ্যায় পটু, তাঁহারা ই ইউরোপে মান্য—“Francis d' Assisi বা Imitation of

Christ” গ্রন্থের প্রণেতাকে কে চিনে? মহাভারতের দ্বিতীয় কবিও মনে সেইরূপ চরমাদর্শ ছিল। আবার কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। তাই তিনি পুরুষোত্তমকে কৌশলীর শ্রেষ্ঠ সাজাইয়াছেন। তিনি মিথ্যা কথার দ্বারা দ্রোণহত্যা সম্বন্ধে বিখ্যাত উপন্যাসের প্রণেতা। জয়দ্রথবধে সুদর্শনচক্রে রবি আচ্ছাদন, কর্ণাজ্জ্বনের যুদ্ধে অজ্জ্বনের রথচক্র পৃথিবীতে পড়িয়া ফেলা, আর ঘোড়া বসাইয়া দেওয়া, ইত্যাদি কৃষ্ণকৃত অদ্ভুত কৌশলের তিনিই রচয়িতা। এক্ষণে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, জরাসন্ধবধপর্বাধ্যায়ের এই অনর্থক এবং অসংলগ্ন কৌশলবিষয়ক প্রক্ষিপ্ত শ্লোকগুলির প্রণেতা তাঁহাকেই বিবেচনা হয়, এবং তাঁহাকে এ সকলের প্রণেতা বিবেচনা করিলে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আর বড় অস্বকার থাকে না। কৃষ্ণকে কৌশলময় বলিয়া প্রতিপন্ন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। কেবল এইটুকুর উপর নির্ভর করিতে হইলে হয়ত আমি এত কথা বলিতাম না। কিন্তু জরাসন্ধবধ-পর্বাধ্যায়ের তাঁর হাত আরও দেখিব।

সপ্তম পরিচ্ছেদ—কৃষ্ণ-জরাসন্ধ-সংবাদ

নিশীথকালে যজ্ঞাগারে জরাসন্ধ স্নাতকবেশধারী তিন জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদিগের পূজা করিলেন। এখানে কিছুই প্রকাশ নাই যে, তাঁহারা জরাসন্ধের পূজা গ্রহণ করিলেন কি না। আর এক স্থানে আছে। মূলের উপর আর একজন কারিগরি করায় এই রকম গোলযোগ ঘটিয়াছে।

তৎপরে সৌজন্য-বিনিময়ের পর জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন, “হে বিপ্রগণ! আমি জানি, স্নাতকব্রতচারী ব্রাহ্মণগণ সভাগমন সময় ভিন্ন কখন মাল্য* বা চন্দন ধারণ করেন না। আপনারা কে? আপনাদের বস্ত্র রক্তবর্ণ; অঙ্গে পুষ্পমাল্য ও অনুলেপন সুশোভিত; ভূজে জ্যাচিহ্ন লক্ষিত হইতেছে, আকার দর্শনে ক্ষত্রত্বের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে; কিন্তু আপনারা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, অতএব সত্য বলুন, আপনারা কে? রাজসমক্ষে সত্যই প্রশংসনীয়। কি নিমিত্ত আপনারা দ্বার দিয়া প্রবেশ না করিয়া, নির্ভয়ে চৈতক পর্বতের শৃঙ্গ ভগ্ন করিয়া প্রবেশ করিলেন? ব্রাহ্মণেরা বাক্য দ্বারা বীর্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু আপনারা কার্য দ্বারা উহা প্রকাশ করিয়া নিতান্ত বিরুদ্ধানুষ্ঠান করিতেছেন। আরও, আপনারা আমার কাছে আসিয়াছেন, আমিও বিধিপূর্বক পূজা করিয়াছি, কিন্তু কি নিমিত্ত পূজা গ্রহণ করিলেন না? এক্ষণে কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন বলুন।”

তদন্তরে কৃষ্ণ স্নিগ্ধগম্ভীরস্বরে (মৌলিক মহাভারতে কোথাও দেখি না যে, কৃষ্ণ চণ্ডল বা রুদ্র হইয়া কোন কথা বলিলেন, তাঁহার সকল রিপুই বশীভূত) বলিলেন, “হে রাজন্! তুমি আমাদিগকে স্নাতক ব্রাহ্মণ বলিয়া বোধ করিতেছ, কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন জাতিই স্নাতক-ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাদের বিশেষ নিয়ম ও অবিশেষ নিয়ম উভয়ই আছে। ক্ষত্রিয় জাতি বিশেষ নিয়মী হইলে সম্পত্তিশালী হয়। পুষ্পধারী নিশ্চয়ই শ্রীমান্ হয় বলিয়া আমরা পুষ্পধারণ করিয়াছি। ক্ষত্রিয় বাহুবলেই বলবান্, বাণবীর্যশালী নহেন: এই নিমিত্ত তাঁহাদের অপ্রগল্ভ বাক্য প্রয়োগ করা নির্দারিত আছে।”

কথাগুলি শাস্ত্রোক্ত ও চতুরের কথা বটে, কিন্তু কৃষ্ণের যোগ্য কথা নহে, সত্যপ্রিয় ধর্মাত্মার কথা নহে। কিন্তু যে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছে, তাহাকে এইরূপ উত্তর কাজেই দিতে হয়। ছদ্মবেশটা যদি দ্বিতীয় স্তরের কবির সৃষ্টি হয়, তবে এ বাক্যগুলির জন্য তিনিই দায়ী। কৃষ্ণকে যে রকম চতুরচূড়ামণি সাজাইতে তিনি চেষ্টা করিয়াছেন, এই উত্তর তাহার অঙ্গ বটে। কিন্তু যাহাই হউক, দেখা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মণ বলিয়া চলনা করিবার কৃষ্ণের কোন উদ্দেশ্য ছিল না। ক্ষত্রিয় বলিয়া আপনাদিগকে তিনি স্পষ্টই স্বীকার করিতেছেন। কেবল তাহাই নহে, তাঁহারা শত্রুভাবে যুদ্ধার্থে আসিয়াছেন, তাহাও স্পষ্ট বলিতেছেন।

“বিধাতা ক্ষত্রিয়গণের বাহুতেই বল প্রদান করিয়াছেন। হে রাজন্! যদি তোমার আমাদের

* লিখিত আছে যে, মাল্য তাঁহারা একজন মালাকারের নিকট বলপূর্বক কাড়িয়া লইয়াছিলেন। যাহাদের এত ঐশ্বর্য যে, রাজসূয়ের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত, তাঁহাদের তিন ছড়া মালা কিনিবার যে কাড়ি জুটিবে না, ইহা অতি অসম্ভব। যাহারা কপটদ্যুতাপহৃত রাজাই ধর্ম্মানুরোধে পরিত্যাগ করিলেন, তাঁহারা যে ডাকাতি করিয়া তিন ছড়া মালা সংগ্রহ করিবেন, উহা অতি অসম্ভব। এ সকল দ্বিতীয় স্তরের কবির হাত। দৃপ্ত ক্ষত্রত্বের বর্ণনায় এ সকল কথা বেশ সাজে।

বাংকম রচনাবলী

বাহুবল দেখিতে বাসনা থাকে, তবে অদ্যই দেখিতে পাইবে, সন্দেহ নাই। হে বৃহদ্রথনন্দন! বীর ব্যক্তিগণ শত্রুগৃহে অপকাশ্যভাবে এবং সুহৃদৃগৃহে প্রকাশ্যভাবে প্রবেশ করিয়া থাকেন। হে রাজন্! আমরা স্বকার্যসাধনার্থ শত্রুগৃহে আগমন করিয়া তদন্ত পূজা গ্রহণ করি না; এই আমাদের নিত্যব্রত।”

কোন গোল নাই—সব কথাগুলি স্পষ্ট। এইখানে অধ্যায় শেষ হইল, আর সঙ্গে সঙ্গে ছন্দবেশের গোলযোগটা মিটিয়া গেল। দেখা গেল যে, ছন্দবেশের কোন মানে নাই। তারপর, পর-অধ্যায়ে কৃষ্ণ যে সকল কথা বলিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন প্রকার। তাঁহার যে উন্নত চরিত্র এ পর্য্যন্ত দেখিয়া আসিয়াছি, সে তাঁহারই যোগ্য। পূর্বে অধ্যায়ে এবং পর-অধ্যায়ে বর্ণিত কৃষ্ণচরিত্রে এত গুরুতর প্রভেদ যে, দুই হাতের বর্ণন বলিয়া বিবেচনা করিবার আমাদের অধিকার আছে।

জরাসন্ধের গৃহকে কৃষ্ণ তাঁহাদের শত্রুগৃহ বলিয়া নির্দেশ করাতে, জরাসন্ধ বলিলেন, “আমি কোন সময়ে তোমাদের সহিত শত্রুতা বা তোমাদের অপকার করিয়াছি, তাহা আমার স্মরণ হয় না। তবে কি নির্মিত্ত নিরপরাধে তোমরা আমাকে শত্রু জ্ঞান করিতেছ।”

উত্তরে, জরাসন্ধের সঙ্গে কৃষ্ণের যথার্থ যে শত্রুতা, তাহাই বলিলেন। তাঁহার নিজের সঙ্গে জরাসন্ধের যে বিবাদ, তাহার কিছুমাত্র উত্থাপনা করিলেন না। নিজের সঙ্গে বিবাদের জন্য কেহ তাঁহার শত্রু হইতে পারে না, কেন না, তিনি সর্বত্র সমদর্শী, শত্রুমিত্র সমান দেখেন। তিনি পাণ্ডবের সুহৃদৃ এবং কৌরবের শত্রু, এইরূপ লৌকিক বিশ্বাস। কিন্তু বাস্তবিক মৌলিক মহাভারতের সমালোচনে আমরা ক্রমশঃ দেখিব যে, তিনি ধর্ম্মের পক্ষ, এবং অধর্ম্মের বিপক্ষ; তন্মিত্ত তাঁহার পক্ষাপক্ষ কিছুই নাই। কিন্তু সে কথা এখন থাক। আমরা এখানে দেখিব যে, কৃষ্ণ উপযাচক হইয়া জরাসন্ধকে আত্মপরিচয় দিলেন, কিন্তু নিজের সঙ্গে বিবাদের জন্য তাঁহাকে শত্রু বলিয়া নির্দেশ করিলেন না। তবে যে মনুষ্যজাতির শত্রু, সে কৃষ্ণের শত্রু। কেন না, আদর্শ পুরুষ সর্বভূতে আপনাকে দেখেন, তন্মিত্ত তাঁহার অন্য প্রকার আত্মজ্ঞান নাই। তাই তিনি জরাসন্ধের প্রশ্নের উত্তরে, জরাসন্ধ তাঁহার যে অপকার করিয়াছিল, তাহার প্রসঙ্গ মাত্র না করিয়া সাধারণের যে অনিষ্ট করিয়াছে, কেবল তাহাই বলিলেন। বলিলেন যে, তুমি রাজগণকে মহাদেবের নিকট বলি দিবার জন্য বন্দী করিয়াছ। তাই, যুধিষ্ঠিরের নিয়োগক্রমে, আমরা তোমার প্রতি সমুদ্যত হইয়াছি। শত্রুতাটা বৃদ্ধাইয়া দিবার জন্য কৃষ্ণ জরাসন্ধকে বলিতেছেনঃ—

“হে বৃহদ্রথনন্দন! আমরাদিগকেও তৎকৃত পাপে পাপী হইতে হইবে, যেহেতু আমরা ধর্ম্মচারী এবং ধর্ম্মরক্ষণে সমর্থ।”

এই কথাটার প্রতি পাঠক বিশেষ মনোযোগী হইবেন, এই ভরসায় আমরা ইহা পূর্বে অক্ষরে লিখিলাম। এখন, পুরাতন বলিয়া বোধ হইলেও, কথাটা অতিশয় গুরুতর। যে ধর্ম্মরক্ষণে ও পাপের দমনে সক্ষম হইয়াও তাহা না করে, সে সেই পাপের সহকারী। অতএব ইহলোকে সকলেরই সাধ্যমত পাপের নিবারণের চেষ্টা না করা অধর্ম্ম। “আমি ত কোন পাপ করিতেছি না, পরে করিতেছে, আমার তাতে দোষ কি?” যিনি এইরূপ মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন, তিনিও পাপী। কিন্তু সচরাচর ধর্ম্মাভাৱাও তাই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন। এই জন্য জগতে যে সকল নরোত্তম জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা এই ধর্ম্মরক্ষা ও পাপনিবারণরত গ্রহণ করেন। শাক্যসিংহ, যিশুখ্রীষ্ট প্রভৃতি ইহার উদাহরণ। এই বাক্যই তাঁহাদের জীবনচরিতের মূলসূত্র। খ্রীকৃষ্ণেরও সেই ব্রত। এই মহাবাক্য স্মরণ না রাখিলে তাঁহার জীবনচরিত বৃদ্ধা যাইবে না। জরাসন্ধ কংস শিশুপালের বধ, মহাভারতের যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষে কৃষ্ণকৃত সহায়তা, কৃষ্ণের এই সকল কার্য এই মূলসূত্রের সাহায্যেই বৃদ্ধা যায়। ইহাকেই পুরাণকারেরা “পৃথিবীর ভারহরণ” বলিয়াছেন। খ্রীষ্টকৃত হউক, বুদ্ধকৃত হউক, কৃষ্ণকৃত হউক, এই পাপনিবারণ ব্রতের নাম ধর্ম্মপ্রচার। ধর্ম্মপ্রচার দুই প্রকারে হইতে পারে ও হইয়া থাকে; এক, বাক্যতঃ অর্থাৎ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উপদেশের দ্বারা; দ্বিতীয়, কার্যতঃ অর্থাৎ আপনার কার্যসকলকে ধর্ম্মের আদর্শে পরিণত করণের দ্বারা। খ্রীষ্ট, শাক্যসিংহ ও খ্রীকৃষ্ণ এই দ্বিবিধ অনুষ্ঠানই করিয়াছিলেন। তবে শাক্যসিংহ ও খ্রীষ্টকৃত ধর্ম্মপ্রচার, উপদেশপ্রধান; কৃষ্ণকৃত ধর্ম্মপ্রচার কার্যপ্রধান। ইহাতে কৃষ্ণেরই প্রাধান্য, কেন না, বাক্য সহজ, কার্য কঠিন এবং অধিকতর ফলোপধায়ক। যিনি কেবল মানুষ, তাঁহার দ্বারা ইহা সুসম্পন্ন হইতে পারে কি না, সে কথা এক্ষণে আমাদের বিচার্য্য নহে।

এইখানে একটা কথার মীমাংসা করা ভাল। কৃষ্ণকৃত কংস-শিশুপালাদির বধের উল্লেখ করিলাম, এবং জরাসন্ধকে বধ করিবার জন্যই কৃষ্ণ আসিয়াছেন বলিয়াছি; কিন্তু পাপীকে বধ করা কি আদর্শ মনুষ্যের কাজ? যিনি স্বর্ভূতে সমদর্শী, তিনি পাপাত্মাকেও আশ্রয় দেখিয়া, তাহারও হিতাকাঙ্ক্ষী হইবেন না কেন? সত্য বটে, পাপীকে জগতে রাখিলে জগতের মঙ্গল নাই, কিন্তু তাহার বধসাধনই কি জগৎ উদ্ধারের একমাত্র উপায়? পাপীকে পাপ হইতে বিরত করিয়া, ধর্ম প্রবৃত্তি দিয়া, জগতের এবং পাপীর উভয়ের মঙ্গল এককালে সিদ্ধ করা তাহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় নয় কি? আদর্শ পুরুষের তাহাই অবলম্বন করাই কি উচিত ছিল না? যিশু, শাক্যসিংহ ও চৈতন্য এইরূপে পাপীর উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

এ কথার উত্তর দুইটি। প্রথম উত্তর এই যে, কৃষ্ণচরিত্রে এ ধর্মেরও অভাব নাই। তবে ক্ষেত্রভেদে ফলভেদও ঘটিয়াছে। দুর্ষোধ্যন ও কর্ণ, যাহাতে নিহত না হইয়া ধর্মপথ অবলম্বন-পূর্বক জীবনে ও রাজ্যে বজায় থাকে, সে চেষ্টা তিনি বিধিমনে করিয়াছিলেন, এবং সেই কার্য সম্বন্ধেই বলিয়াছিলেন, পুরুষকারের দ্বারা যাহা সাধ্য, তাহা আমি করিতে পারি; কিন্তু দৈব আমার আয়ত্ত নহে। কৃষ্ণ মানুসী শক্তির দ্বারা কার্য করিতেন, তজ্জন্য যাহা স্বভাবতঃ অসাধ্য, তাহাতে যত্ন করিয়াও কখন কখন নিষ্ফল হইতেন। শিশুপালেরও শত অপরাধ ক্ষমা করিয়াছিলেন। সেই ক্ষমার কথাটা অলৌকিক উপন্যাসে আবৃত হইয়া আছে। যথাস্থানে আমরা তাহার তাৎপর্য বুঝিতে চেষ্টা করিব। কংসবধের কথা পূর্বে বলিয়াছি।

পাইলেটকে খ্রীষ্টীয়ান করা, খ্রীষ্টের পক্ষে যত দূর সম্ভব ছিল, কংসকে ধর্মপথে আনয়ন করা কৃষ্ণের পক্ষে তত দূর সম্ভব। জরাসন্ধ সম্বন্ধেও তাই বলা যাইতে পারে। তথাপি জরাসন্ধ সম্বন্ধে কৃষ্ণের সে বিষয়ের একটু কথোপকথন হইয়াছিল। জরাসন্ধ কৃষ্ণের নিকট ধর্মোপদেশ গ্রহণ করা দূরে থাকুক, সে কৃষ্ণকেই ধর্মবিষয়ক একটা লেকচার শুনাইয়া দিল, যথা—

“দেখ, ধর্ম বা অর্থের উপঘাত দ্বারাই মনঃপীড়া জন্মে। কিন্তু যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয়কূলে জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্মজ্ঞ হইয়াও নিরপরাধে লোকের ধর্মার্থে উপঘাত করে, তাহার ইহকালে অমঙ্গল ও পরকালে নরকে গমন হয়, সন্দেহ নাই।” ইত্যাদি।

এ সব স্থলে ধর্মোপদেশে কিছু হয় না। জরাসন্ধকে সৎপথে আনিবার জন্য উপায় ছিল কি না, তাহা আমাদের বুঝিতে আসে না। অতিমানুষকীর্তি একটা প্রচার করিলে, যা হয়, একটা কাণ্ড হইতে পারিত। তেমন অন্যান্য ধর্মপ্রচারকদিগের মধ্যে অনেক দেখি, কিন্তু কৃষ্ণচরিত্র অতিমানুষী শক্তির বিরোধী। শ্রীকৃষ্ণ ভূত ছাড়াইয়া, রোগ ভাল করিয়া, বা কোন প্রকার বুদ্ধরূকি ভেল্কির দ্বারা ধর্মপ্রচার বা আপনার দেবত্বস্থাপন করেন নাই।

তবে ইহা বুঝিতে পারি যে, জরাসন্ধের বধ কৃষ্ণের উদ্দেশ্য নহে; ধর্মের রক্ষা অর্থাৎ নির্দোষী অথচ প্রপীড়িত রাজগণের উদ্ধারই তাহার উদ্দেশ্য। তিনি জরাসন্ধকে অনেক বুঝাইয়া পরে বলিলেন, “আমি বসুদেবনন্দন কৃষ্ণ, আর এই দুই বীরপুরুষ পাণ্ডুতনয়। আমরা তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি, এক্ষণে হয় সমস্ত ভূপতিগণকে পরিত্যাগ কর, না হয় যুদ্ধ করিয়া যমালয়ে গমন কর।” অতএব জরাসন্ধ রাজগণকে ছাড়িয়া দিলে, কৃষ্ণ তাহাকে নিষ্কৃতি দিতেন। জরাসন্ধ তাহাতে সম্মত না হইয়া যুদ্ধ করিতে চাহিলেন, সুতরাং যুদ্ধই হইল। জরাসন্ধ যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কোনরূপ বিচারে যথার্থ স্বীকার করিবার পাত্র ছিলেন না।

দ্বিতীয় উত্তর এই যে, যিশু বা বুদ্ধের জীবনীতে যতটা পরিতোদ্ধারের চেষ্টা দেখি, কৃষ্ণের জীবনে ততটা দেখি না, ইহা স্বীকার্য। যিশু বা শাক্যের ব্যবসায়ই ধর্মপ্রচার। কৃষ্ণ ধর্মপ্রচার করিয়াছেন বটে, কিন্তু ধর্মপ্রচার তাহার ব্যবসায় নহে; সেটা আদর্শ পুরুষের আদর্শ-জীবননির্বাহের আনুষঙ্গিক ফল মাত্র। কথাটা এই রকম করিয়া বলাতে কেহই না মনে করেন যে, যিশুখ্রীষ্ট বা শাক্যসিংহের, বা ধর্মপ্রচার ব্যবসায়ের কিছুমাত্র লাঘব করিতে ইচ্ছা করি। যিশু এবং শাক্য উভয়কেই আমি মনুষ্যশ্রেষ্ঠ বলিয়া ভক্তি করি, এবং তাহাদের চরিত্র আলোচনা করিয়া তাহাতে জ্ঞানলাভ করিবার ভরসা করি। ধর্মপ্রচারকের ব্যবসায় (ব্যবসায় অর্থে এখানে যে কর্মের অনুষ্ঠানে আমরা স্বর্বাদা প্রবৃত্ত) আর সকল ব্যবসায় হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানি। কিন্তু যিনি আদর্শ মনুষ্য, তাহার সে ব্যবসায় হইতে পারে না। কারণ, তিনি আদর্শ মনুষ্য, মানুষ্যের যত প্রকার অনুষ্ঠেয় কর্ম আছে, সকলই তাহার অনুষ্ঠেয়। কোন কর্মই তাহার “ব্যবসায় নহে”, অর্থাৎ অন্য কর্মের অপেক্ষা প্রধানত্ব লাভ করিতে পারে না। যিশু বা শাক্যসিংহ আদর্শ

বিশ্বকম রচনাবলী

পদ্রুশ নহেন, কিন্তু মনুষ্যশ্রেষ্ঠ। মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ ব্যবসায় অবলম্বনই তাঁহাদের বিধেয়, এবং তাহা অবলম্বন করিয়া তাঁহারা লোকাহিতসাধন করিয়া গিয়াছেন।

কথাটা যে আমার সকল শিক্ষিত পাঠক বুঝিয়াছেন, এমন আমার বোধ হয় না। বুঝিবার একটা প্রতিবন্ধক আছে। আদর্শ পদ্রুশের কথা বলিতেছি। অনেক শিক্ষিত পাঠক “আদর্শ” শব্দটি “Ideal” শব্দের দ্বারা অনুবাদ করিবেন। অনুবাদও দৃশ্য হইবে না। এখন, একটা “Christian Ideal” আছে। খ্রীষ্টিয়ানের আদর্শ পদ্রুশ যিশু। আমরা বাল্যকাল হইতে খ্রীষ্টিয়ান জাতির সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া সেই আদর্শটি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। আদর্শ পদ্রুশের কথা হইলেই সেই আদর্শের কথা মনে পড়ে। যে আদর্শ সেই আদর্শের সঙ্গে মিলে না, তাহাকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। খ্রীষ্ট পতিতোদ্ধারী; কোন দুরাত্মাকে তিনি প্রাণে নষ্ট করেন নাই, করিবার ক্ষমতাও রাখিতেন না। শাক্যসিংহে বা চৈতন্যে আমরা সেই গুণ দেখিতে পাই, এজন্য ইহাদিগকে আমরা আদর্শ পদ্রুশ বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু কৃষ্ণ পতিতপাবন নাম ধরিয়াও, প্রধানতঃ পতিত-নিপাতী বলিয়াই ইতিহাসে পরিচিত। সুতরাং তাঁহাকে আদর্শ পদ্রুশ বলিয়াই আমরা হঠাৎ বুঝিতে পারি না। কিন্তু আমাদের একটা কথা বিচার করিয়া দেখা উচিত। এই Christian Ideal কি যথার্থ মনুষ্যত্বের আদর্শ? সকল জাতির জাতীয় আদর্শ কি সেইরূপই হইবে?

এই প্রশ্নে আর একটা প্রশ্ন উঠে—হিন্দুর আবার জাতীয় আদর্শ আছে না কি? Hindu Ideal আছে না কি? যদি থাকে, তবে কে? কথাটা শিক্ষিত হিন্দুমণ্ডলীমধ্যে জিজ্ঞাসা হইলে অনেকেরই মস্তককণ্ডুয়নে প্রবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা। কেহ হয়ত জটাবল্কলধারী শূদ্রশ্মশ্রুগুণ্ড-বিভূষিত ব্যাস বিশিষ্টাদি ঋষিদিগকে ধরিয়া টানাটানি করিবেন, কেহ হয়ত বলিয়া বাসিবেন, “ও ছাই ভস্ম নাই।” নাই বটে সত্য, থাকিলে আমাদের এমন দৃষ্টি হইবে কেন? কিন্তু একদিন ছিল। তখন হিন্দু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। সে আদর্শ হিন্দু কে? ইহার উত্তর আমি সেরূপ বুঝিয়াছি, তাহা পদ্রুশে বুঝিয়াছি। রামচন্দ্রাদি ক্ষত্রিয়গণ সেই আদর্শপ্রতিমার নিকটবর্তী, কিন্তু যথার্থ হিন্দু আদর্শ শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই যথার্থ মনুষ্যত্বের আদর্শ—খ্রীষ্ট প্রভৃতিতে সেরূপ আদর্শের সম্পূর্ণতা পাইবার সম্ভাবনা নাই।

কেন, তাহা বলিতেছি। মনুষ্যত্ব কি, ধর্মতত্ত্বে তাহা বুঝিবার চেষ্টা পাইয়াছি। মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ স্ফূর্তি ও সামঞ্জস্যে মনুষ্যত্ব। যাঁহাতে সে সকলের চরম স্ফূর্তি ও সামঞ্জস্য পাইয়াছে, তিনিই আদর্শ মনুষ্য। খ্রীষ্টে তাহা নাই—শ্রীকৃষ্ণে তাহা আছে। যিশুকে যদি রোমক সম্রাট যিহুদার শাসনকর্ত্ত্বে নিযুক্ত করিতেন, তবে কি তিনি সুশাসন করিতে পারিতেন? তাহা পারিতেন না—কেন না, রাজকার্যের জন্য যে সকল বৃত্তিগুলি প্রয়োজনীয়, তাহা তাঁহার অনর্শীলিত হয় নাই। অথচ এরূপ ধর্মাত্মা ব্যক্তি রাজ্যের শাসনকর্ত্তা হইলে সমাজের অনন্ত মঙ্গল। পঞ্চান্তরে শ্রীকৃষ্ণ যে সর্বশ্রেষ্ঠ নীতিজ্ঞ, তাহা প্রসিদ্ধ। শ্রেষ্ঠ নীতিজ্ঞ বলিয়া তিনি মহাভারতে ভূরি ভূরি বর্ণিত হইয়াছেন, এবং যুধিষ্ঠির বা উগ্রসেন শাসনকার্যে তাঁহার পরামর্শ ভিন্ন কোন গুরুতর কাজ করিতেন না। এইরূপে কৃষ্ণ নিজে রাজা না হইয়াও প্রজার অশেষ মঙ্গলসাধন করিয়াছিলেন—এই জরাসন্ধের বন্দিগণের মুক্তি তাহার এক উদাহরণ। পুনশ্চ, মনে কর, যদি যিহুদীরা রোমকের অত্যাচারপীড়িত হইয়া স্বাধীনতার জন্য উঠিত হইয়া, যিশুকে সেনাপতিত্বে বরণ করিত, যিশু কি করিতেন? যুদ্ধে তাঁহার শক্তিও ছিল না, প্রবৃত্তিও ছিল না। “কাইসরের পাওনা কাইসরকে দাও” বলিয়া তিনি প্রস্থান করিতেন। কৃষ্ণও যুদ্ধে প্রবৃত্তিশূন্য—কিন্তু ধর্মার্থ যুদ্ধও আছে। ধর্মার্থ যুদ্ধ উপস্থিত হইলে অগত্যা প্রবৃত্ত হইতেন। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তিনি অজেয় ছিলেন। যিশু অশিক্ষিত, কৃষ্ণ সর্বশাস্ত্রবিৎ। অন্যান্য গুণ সম্বন্ধেও ঐরূপ। উভয়েই শ্রেষ্ঠ ধার্মিক ও ধর্মজ্ঞ। অতএব কৃষ্ণই যথার্থ আদর্শ মনুষ্য—“Christian Ideal” অপেক্ষা “Hindu Ideal” শ্রেষ্ঠ।

ঈদৃশ সর্বগুণসম্পন্ন আদর্শ মনুষ্য কার্যবিশেষে জীবন সমর্পণ করিতে পারেন না। তাহা হইলে, ইতর কার্যগুলি অনর্শিত, অথবা অসামঞ্জস্যের সহিত অনর্শিত হয়। লোক চরিত্রভেদে, অবস্থাভেদে, শিক্ষাভেদে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম ও ভিন্ন ভিন্ন সাধনের অধিকারী; আদর্শ মনুষ্য, সকল শ্রেণীরই আদর্শ হওয়া উচিত। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণের, শাক্যসিংহ, যিশু বা চৈতন্যের ন্যায় সম্রাস গ্রহণপূর্বক ধর্ম প্রচার ব্যবসায়স্বরূপ অবলম্বন করা অসম্ভব। কৃষ্ণ সংসারী,

গৃহী, রাজনীতিজ্ঞ, যোদ্ধা, দণ্ডপ্রণেতা, তপস্বী, ধর্মপ্রচারক; সংসারী ও গৃহীদিগের, রাজা-দিগের, যোদ্ধাদিগের, রাজপুরুষদিগের, তপস্বীদিগের, ধর্মবেত্তাদিগের এবং একাধারে সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের আদর্শ। জরাসন্ধাদির বধ আদর্শরাজপুরুষ ও দণ্ডপ্রণেতার অবশ্য অনুল্লেখ্য। ইহাই Hindu Ideal. অসম্পূর্ণ যে বৌদ্ধ বা খ্রীষ্ট ধর্ম, তাহার আদর্শ পুরুষকে আদর্শ স্থানে বসাইয়া, সম্পূর্ণ যে হিন্দুধর্ম, তাহার আদর্শ পুরুষকে আমরা বুদ্ধিতে পারিব না।

কিন্তু বুদ্ধিব্যবহার বড় প্রয়োজন হইয়াছে, কেন না, ইহার ভিতর আর একটা বিস্ময়কর কথা আছে। কি খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ইউরোপে, কি হিন্দুধর্মাবলম্বী ভারতবর্ষে, আদর্শের ঠিক বিপরীত ফল ফলিয়াছে। খ্রীষ্টীয় আদর্শ পুরুষ, বিনীত, নিরীহ, নির্বিরোধী, সন্ন্যাসী; এখনকার খ্রীষ্টীয়ান ঠিক বিপরীত। ইউরোপ এখন ঐহিক সুখরত সশস্ত্র যোদ্ধাবর্গের বিস্তীর্ণ শিবির মাত্র। হিন্দুধর্মের আদর্শ পুরুষ সর্বকর্মকৃৎ—এখনকার হিন্দু সর্বকর্ম অকর্ম। এরূপ ফলবিপরীত ঘটিল কেন? উত্তর সহজ,—লোকের চিত্ত হইতে উভয় দেশেই সেই প্রাচীন আদর্শ লুপ্ত হইয়াছে। উভয় দেশেই এককালে সেই আদর্শ একদিন প্রবল ছিল—প্রাচীন খ্রীষ্টীয়ানদিগের ধর্মপরায়ণতা ও সহিষ্ণুতা, ও প্রাচীন হিন্দু রাজগণ ও রাজপুরুষ-গণের সর্বগুণবত্তা তাহার প্রমাণ। যে দিন সে আদর্শ হিন্দুদিগের চিত্ত হইতে বিদূরিত হইল—যে দিন আমরা কৃষ্ণচরিত্র অবনত করিয়া লইলাম, সেই দিন হইতে আমাদের সামাজিক অবনতি। জয়দেব গোসাঁইয়ের কৃষ্ণের অনুকরণে সকলে ব্যস্ত—মহাভারতের কৃষ্ণকে কেহ স্মরণ করে না। এখন আবার সেই আদর্শ পুরুষকে জাতীয় হৃদয়ে জাগরিত করিতে হইবে। ভরসা করি, এই কৃষ্ণচরিত্র ব্যাখ্যায় সে কার্যের কিছু আনুকূল্য হইতে পারিবে।

জরাসন্ধবধের ব্যাখ্যায় এ সকল কথা বলিবার তত প্রয়োজন ছিল না, প্রসঙ্গতঃ এ তত্ত্ব উত্থাপিত হইয়াছে মাত্র। কিন্তু এ কথাগুলি এক স্থানে না এক স্থানে আমাকে বলিতে হইত। আগে বলিয়া রাখায় লেখক পাঠক উভয়ের পথ সুগম হইবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ—ভীম-জরাসন্ধের যুদ্ধ

আমরা এ পর্য্যন্ত কৃষ্ণচরিত্র যত দূর সমালোচনা করিয়াছি, তাহাতে মহাভারতে কৃষ্ণকে কোথাও বিষ্ণু বলিয়া পরিচিত হইতে দেখি নাই। কেহ তাহাকে বিষ্ণু বলিয়া সম্বোধন বা বিষ্ণুজ্ঞানে তাহার সঙ্গে কথোপকথন করে নাই। তাহাকেও এ পর্য্যন্ত মনুষ্যশক্তির অতিরিক্ত শক্তিতে কোন কার্য করিতে দেখি নাই। তিনি বিষ্ণুর অবতার হউন বা না হউন, কৃষ্ণচরিত্রের স্থূল মর্ম মনুষ্যত্ব, দেবত্ব নহে, ইহা আমরা পুনঃ পুনঃ বুঝাইয়াছি।

কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, ইহার পরে মহাভারতের অনেক স্থানে তাহাকে বিষ্ণু বলিয়া সম্বোধিত এবং পরিচিত হইতে দেখি। অনেকে বিষ্ণু বলিয়া তাহার উপাসনা করিতেছে দেখি; এবং কদাচ কখনও তাহাকে লোকাতীতা বৈষ্ণবী শক্তিতে কার্য করিতেও দেখি; এ পর্য্যন্ত তাহা দেখি নাই, কিন্তু এখনই দেখিব। এই দুইটি ভাব পরস্পর বিরোধী কি না?

যদি কেহ বলেন যে, এই দুইটি ভাব পরস্পর বিরোধী নহে, কেন না, যখন দৈব শক্তির বা দেবত্বের কোন প্রকার বিকাশের কোন প্রয়োজন নাই, তখন কাব্যে বা ইতিহাসে কেবল মনুষ্যভাব প্রকটিত হয়, আর যখন তাহার প্রয়োজন আছে, তখন দৈবভাব প্রকটিত হয়, তাহা হইলে আমরা বলিব যে, এই উত্তর যথার্থ হইল না। কেন না, নিষ্প্রয়োজনেই দৈবভাবের প্রকাশ অনেক সময়ে দেখা যায়। এই জরাসন্ধবধ হইতেই দুই একটা উদাহরণ দিতেছি।

জরাসন্ধবধের পর কৃষ্ণ ও ভীমার্জুন জরাসন্ধের রথখানা লইয়া তাহাতে আরোহণপূর্বক নিষ্ক্রান্ত হইলেন। দেবনির্মিত রথ, তাহাতে কিছুর অভাব নাই। তবু খামখাই কৃষ্ণ গরুড়কে স্মরণ করিলেন, স্মরণমাত্র গরুড় আসিয়া রথের চুড়ায় বসিলেন। গরুড় আসিয়া আর কোন কাজ করিলেন না, তাহাতে আর কোন প্রয়োজনও ছিল না। কথাটারও আর কোন প্রয়োজন দেখা যায় না, কেবল মাঝ হইতে কৃষ্ণের বিষ্ণুত্ব সূচিত হয়। জরাসন্ধকে বধ করিবার সময় কোন দৈব শক্তির প্রয়োজন হইল না, কিন্তু রথে চড়িবার বেলা হইল!

আবার যুদ্ধের পূর্বে, অর্নি একটা কথা আছে। জরাসন্ধ যুদ্ধে স্থিরসংকল্প হইলে কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন,

বাঁকম রচনাবলী

“হে রাজন্! আমাদের তিন জনের মধ্যে কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা হয় বল? কে যুদ্ধ করিতে সজ্জীভূত হইবে?” জরাসন্ধ ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অথচ ইহার দুই ছত্র পদ্যেই লেখা আছে যে, কৃষ্ণ জরাসন্ধকে যাদবগণের অবধ্য স্মরণ করিয়া ব্রহ্মার আদেশানুসারে স্বয়ং তাহার সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন না।

ব্রহ্মার এই আদেশ কি, তাহা মহাভারতে কোথাও নাই। পরবর্ত্তী গ্রন্থে আছে। এখন পাঠকের বিশ্বাস হয় না কি যে, এইগুলি আদিম মহাভারতে মূলের উপর পরবর্ত্তী লেখকের কারিগরি? আর কৃষ্ণের বিষ্ণুত্ব ভিতরে ভিতরে খাড়া রাখা ইহার উদ্দেশ্য? আদিম স্তরের মূলে কৃষ্ণবিষ্ণুতে কোনরূপ সম্বন্ধ স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দেওয়া হয় নাই, কেন না, কৃষ্ণচরিত্র মনুষ্য-চরিত্র; দেবচরিত্র নহে। যখন ইহাতে কৃষ্ণোপাসক দ্বিতীয় স্তরের কবির হাত পড়িল, তখন এটা বড় ভুল বলিয়া বোধ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। পরবর্ত্তী কবিকল্পনাটা তাহার জানা ছিল, তিনি অভাব পূরণ করিয়া দিলেন।

এইরূপ, যেখানে বন্ধনবিমুক্ত ক্ষত্রিয় রাজগণ কৃষ্ণকে ধর্ম্মরক্ষার জন্য ধন্যবাদ করিতেছেন, সেখানেও, কোথাও কিছু নাই, খামকা তাহারা কৃষ্ণকে “বিষ্ণো” বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। এখন ইতিপূর্বে কোথাও দেখা যায় না যে, তিনি বিষ্ণু বা তদর্থক অন্য নামে সম্বোধিত হইয়াছেন। যদি এমন দেখিতাম যে, ইতিপূর্বে কৃষ্ণ এরূপ নামে মধ্য মধ্যে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন, তাহা হইলে বুদ্ধিতাম যে, ইহাতে অসঙ্গত বা অনৈসর্গিক কিছুই নাই, লোকের এমন বিশ্বাস আছে বলিয়াই ইহা হইল। যদি এমন দেখিতাম যে, এই সময়ে কৃষ্ণ কোন অলৌকিক কাজ করিয়াছেন, তাহা দেবতা ভিন্ন মনুষ্যের সাধ্য নহে, তাহা হইলেও হঠাৎ এ “বিষ্ণো!” সম্বোধনের উপযোগিতা বুদ্ধিতে পারিতাম। কিন্তু কৃষ্ণ তেমন কিছুই কাজ করেন নাই। তিনি জরাসন্ধকে বধ করেন নাই—সর্বলোকসমক্ষে ভীম তাহাকে বধ করিয়াছিলেন। সে কার্যের প্রবর্ত্তক কৃষ্ণ বটে, কিন্তু কারাবাসী রাজগণ তাহার কিছুই জানেন না। অতএব কৃষ্ণ অকস্মাৎ রাজগণ কর্তৃক এই বিষ্ণুত্ব আরোপ কখন ঐতিহাসিক বা মৌলিক হইতে পারে না। কিন্তু উহা ঐ গরুড় স্মরণ ও ব্রহ্মার আদেশ স্মরণের সঙ্গে অত্যন্ত সঙ্গত, জরাসন্ধবধের আর কোন অংশের সঙ্গে সঙ্গত নহে। তিনটি কথা এক হাতের কারিগরি—আর তিনটা কথাই মূল্যার্থিত। বোধ হয়, ইহা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে।

যাঁহারা বলিবেন, তাহা হয় নাই, তাহাদিগের এ কৃষ্ণচরিত্র সমালোচনার অনুবর্ত্তী হইবার আর কোন ফল দেখি না। কেন না, এ সকল বিষয়ে অন্য কোন প্রমাণ সংগ্রহের সম্ভাবনা নাই। আর এই সমালোচনায় যাঁহাদের এমন বিশ্বাস হইয়াছে যে, জরাসন্ধবধ মধ্যে কৃষ্ণের এই বিষ্ণুত্বসূচনা পরবর্ত্তী কবি-প্রণীত ও প্রক্ষিপ্ত, তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করি, তবে কৃষ্ণের ছদ্মবেশ ও কপটাচারবিষয়ক যে কয়েকটি কথা এই জরাসন্ধবধ-পর্বাধ্যায়ে আছে, তাহাও এরূপ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিব না কেন? দুই বিষয়ই ঠিক একই প্রমাণের উপর নির্ভর করে।

বস্তুতঃ এই দুই বিষয় একত্র করিয়া দেখিলে বেশ বৃদ্ধা যাইবে যে, এই জরাসন্ধবধ-পর্বাধ্যায়ে পরবর্ত্তী কবির বিলক্ষণ কারিগরি আছে, এবং এই সকল অসঙ্গতি তাহারই ফল। দুই কবির যে হাত আছে, তাহার আর এক প্রমাণ দিতোছি।

জরাসন্ধের পূর্বেবৃত্তান্ত কৃষ্ণ যুদ্ধার্থিত্বের কাছে বিবৃত করিলেন, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। সেই সঙ্গে, কৃষ্ণের সহিত জরাসন্ধের কংসবধজনিত যে বিরোধ, তাহারও পরিচয় দিলেন। তাহা হইতে কিছু উদ্ধৃতও করিয়াছি। তাহার পরেই মহাভারতকার কি বলিতেছেন, শুনুন।

“বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরপতি বৃহদ্রথ ভার্য্যাদ্বয় সমভিব্যাহারে তপোবনে বহুদিবস তপোহনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। তাঁহারা জরাসন্ধ ও চণ্ডকৌশিকোক্ত সমুদায় বর লাভ করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে ভগবান্ বাসুদেব কংস নরপতিকে সংহার করেন। কংসনিপাত নিবন্ধন কৃষ্ণের সহিত জরাসন্ধের ঘোরতর শত্রুতা জন্মিল।”

এ সকলই ত কৃষ্ণ বলিয়াছেন—আরও সবিস্তার বলিয়াছেন—আবার সে কথা কেন? প্রয়োজন আছে। মূল মহাভারতপ্রণেতা অশ্রুতরসে বড় রসিক নহেন—কৃষ্ণ অলৌকিক ঘটনা কিছুই বলিবেন না। সে অভাব এখন পূরিত হইতে চলিল। বৈশম্পায়ন বলিতেছেন,—

“মহাবল পরাক্রান্ত জরাসন্ধ গিরিশ্রেণী মধ্যে থাকিয়া কৃষ্ণের বধার্থে এক বৃহৎ গদা

একোনশত বার ঘূর্ণায়মান করিয়া নিষ্ক্ষেপ করিল। গদা মথুরাস্থিত অদ্ভুত কস্মঠ বাসুদেবের একোনশত যোজন অন্তরে পতিত হইল। পৌরগণ কৃষ্ণসমীপে গদাপতনের বিষয় নিবেদন করিল। তদবধি সেই মথুরার সমীপবর্তী স্থান গদাবসান নামে বিখ্যাত হইল।”

এখনও যদি কোন পাঠকের বিশ্বাস থাকে যে, বর্তমান জরাসন্ধবধ-পর্বাধ্যায়ের সমুদায় অংশই মূল মহাভারতের অন্তর্গত এবং একব্যক্তি প্রণীত, এবং কৃষ্ণাদি যথার্থই ছন্দবেশে গিরিরাজে আসিয়াছিলেন, তবে তাঁহাকে অনুরোধ করি, হিন্দুদিগের পুরাণেতিহাস মধ্যে ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়া অন্য শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হউন। এদিকে কিছুর হইবে না।

অতঃপর, জরাসন্ধবধের অবশিষ্ট কথাগুলি বলিয়া এ পর্বাধ্যায়ের উপসংহার করিব; সে সকল খুব সোজা কথা।

জরাসন্ধ যুদ্ধার্থ ভীমকে মনোনীত করিলে, জরাসন্ধ “যশস্বী ব্রাহ্মণ কর্তৃক কৃত-স্বস্তায়ন হইয়া ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে বস্ম ও কিরীট পরিত্যাগ পূর্ব্বক” যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। “তখন যাবতীয় পুরবাসী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বনিতা ও বৃদ্ধগণ তাঁহাদের সংগ্রাম দেখিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। যুদ্ধক্ষেত্র জনতা দ্বারা সমাকীর্ণ হইল।” “চতুর্দশ দিবস যুদ্ধ হইল।” (যদি সত্য হয়, বোধ হয় তবে মধ্যে মধ্যে অবকাশমত যুদ্ধ হইত) চতুর্দশ দিবসে “বাসুদেব জরাসন্ধকে ক্লান্ত দেখিয়া ভীমকস্মঠ ভীমসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে কোণ্ডেয়! ক্লান্ত শত্রুকে পীড়ন করা উচিত নহে; অধিকতর পীড়মান হইলে জীবন পরিত্যাগ করে। অতএব ইনি তোমার পীড়নীয় নহেন। হে ভরতর্ষভ, ইহার সহিত বাহুযুদ্ধ কর।” (অর্থাৎ যে শত্রুকে ধর্ম্মতঃ বধ করিতে হইবে, তাহাকেও পীড়ন কর্তব্য নহে।) ভীম জরাসন্ধকে পীড়ন করিয়াই বধ করিলেন। ভীমের ধর্ম্মজ্ঞান কৃষ্ণের তুল্য হইতে পারে না।

তখন কৃষ্ণাজ্জর্ন ও ভীম কারাবদ্ধ মহীপালগণকে বিমুক্ত করিলেন। তাহাই জরাসন্ধবধের একমাত্র উদ্দেশ্য। অতএব রাজগণকে মুক্ত করিয়া আর কিছুর করিলেন না, দেশে চলিয়া গেলেন। তাঁহারা Annexationist ছিলেন না—পিতার অপরাধে পুত্রের রাজ্য অপহরণ করিতেন না, তাঁহারা জরাসন্ধকে বিনষ্ট করিয়া জরাসন্ধপুত্র সহদেবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। সহদেব কিছুর নজর দিল, তাহা গ্রহণ করিলেন। কারামুক্ত রাজগণ কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

“এক্ষণে এই ভৃত্যদিগকে কি করিতে হইবে অনুমতি করুন।”

কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে কহিলেন, “রাজা যুদ্ধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, আপনারা সেই সাম্রাজ্য-চিকীর্ষু ধর্ম্মিকের সাহায্য করেন, ইহাই প্রার্থনা।”

যুদ্ধিষ্ঠিরকে কেন্দ্রস্থিত করিয়া ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করা, কৃষ্ণের এক্ষণে জীবনের উদ্দেশ্য। অতএব প্রতি পদে তিনি তাহার উদ্যোগ করিতেছেন।

এই জরাসন্ধবধে কৃষ্ণচরিত্রের বিশেষ মহিমা প্রকাশমান—কিন্তু পরবর্তী লেখকদিগের দৌরাভ্যে ইহা বড় জটিল হইয়া পড়িয়াছে। ইহার পর শিশুপালবধ। সেখানে আরও গন্ডগোল।

নবম পরিচ্ছেদ—অর্ঘ্যভিহরণ

যুদ্ধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ হইল। নানাদিক্দেশ হইতে আগত রাজগণ, ঋষিগণ, এবং অন্যান্য শ্রেণীর লোকে রাজধানী পুরিয়া গেল। এই বৃহৎ কার্যের সুনির্ব্বাহ জন্য পাণ্ডবেরা আত্মীয়বর্গকে বিশেষ বিশেষ কার্যে নিযুক্ত করিলেন। দৃশ্যশাসন ভোজ্য দ্রব্যের তত্ত্বাবধানে, সঞ্জয় পরিচর্যায়, কৃপাচার্য রত্নরক্ষায় ও দক্ষিণাদানে, দুর্যোধন উপায়নপ্রতিগ্রহে, ইত্যাদি রূপে সকলকেই নিযুক্ত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কোন্ কার্যে নিযুক্ত হইলেন? দৃশ্যশাসনাদির নিয়োগের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নিয়োগের কথাও লেখা আছে। তিনি ব্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত হইলেন।

কথাটা বুঝা গেল না। শ্রীকৃষ্ণ কেন এই ভৃত্যোপযোগী কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন? তাঁহার যোগ্য কি আর কোন ভাল কাজ ছিল না? না, ব্রাহ্মণের পা ধোয়াই বড় মহৎ কাজ?

বিক্রম রচনাবলী

তাঁহাকে আদর্শপুরুষ বলিয়া গ্রহণ করিয়া কি পাচক ব্রাহ্মণঠাকুরদিগের পদপ্রক্ষালন করিয়া বেড়াইতে হইবে? যদি তাই হয়, তবে তিনি আদর্শপুরুষ নহেন, ইহা আমরা মনস্তকণ্ঠে বলিব।

কথাটার অনেক রকম ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণগণের প্রচারিত এবং এখনকার প্রচলিত ব্যাখ্যা এই যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণগণের গৌরব বাড়াইবার জন্যই সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া এইটিতে আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এ ব্যাখ্যা অতি অশ্রদ্ধেয় বলিয়া আমাদের বোধ হয়। শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য ক্ষত্রিয়দিগের ন্যায় ব্রাহ্মণকে যথাযোগ্য সম্মান করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে কোথাও ব্রাহ্মণের গৌরব প্রচারের জন্য বিশেষ ব্যস্ত দেখি না। বরং অনেক স্থানে তাঁহাকে বিপরীত পথ অবলম্বন করিতে দেখি। যদি বনপর্বে দূর্ব্বাসার আতিথ্য বৃত্তান্তটা মৌলিক মহাভারতের অন্তর্গত বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলে বৃদ্ধিতে হইবে যে, তিনি রকম সক্রম করিয়া ব্রাহ্মণঠাকুরদিগকে পাণ্ডবদিগের আশ্রম হইতে অর্দ্ধচন্দ্র প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি ঘোরতর সাম্যবাদী। গীতোক্ত ধর্ম্ম যদি কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্ম হয়, তবে

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।

শর্দূনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ৫ ॥ ১৭

তাঁহার মতে ব্রাহ্মণে, গোরুতে, হাতিতে, কুকুরে ও চণ্ডালে সমান দেখিতে হইবে। তাহা হইলে ইহা অসম্ভব যে, তিনি ব্রাহ্মণের গৌরব বৃদ্ধির জন্য তাঁহাদের পদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত হইবেন।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, কৃষ্ণ যখন আদর্শ পুরুষ, তখন বিনয়ের আদর্শ দেখাইবার জন্যই এই ভৃত্যকার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। জিজ্ঞাস্য, তবে কেবল ব্রাহ্মণের পাদপ্রক্ষালনেই নিযুক্ত কেন? বয়োবৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণেরও পাদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত নহেন কেন? আর ইহাও বক্তব্য যে, এইরূপ বিনয়কে আমরা আদর্শ বিনয় বলিতে পারি না। এটা বিনয়ের বড়াই।

অন্যে বলিতে পারেন যে, কৃষ্ণচরিত্র সম্বোধনযোগী। সে সময়ে ব্রাহ্মণগণের প্রতি ভক্তি বড় প্রবল ছিল; কৃষ্ণ ধর্ন্ত, পশার করিবার জন্য এইরূপ অলৌকিক ব্রহ্মভক্তি দেখাইতেছিলেন।

আমি বলি, এই শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত। কেন না, আমরা এই শিশুপালবধ-পর্বাধ্যায়ের অন্য অধ্যায়ে (চৌয়াল্লিশে) দেখিতে পাই যে, কৃষ্ণ ব্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত না থাকিয়া তিনি ক্ষত্রিয়োচিত ও বীরোচিত কার্য্যান্তরে নিযুক্ত ছিলেন। তথায় লিখিত আছে, “মহাবাহু বাসুদেব শঙ্খ, চক্র ও গদা ধারণ পূর্বেক সমাপন পর্য্যন্ত ঐ যজ্ঞ রক্ষা করিয়াছিলেন।” হয়ত দুইটা কথাই প্রক্ষিপ্ত। আমরা এ পরিচ্ছেদে এ কথা বর্ণনা আন্দোলন আবশ্যিক বিবেচনা করি না। কথাটা তেমন গুরুতর কথা নয়। কৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে মহাভারতীয় উক্তি অনেক সময়েই পরস্পর অসঙ্গত, ইহা দেখাইবার জন্যই এতটা বলিলাম। নানা হাতের কাজ বলিয়া এত অসঙ্গতি।

এই রাজসূয় যজ্ঞের মহাসভায় কৃষ্ণ কর্তৃক শিশুপাল নামে প্রবল পরাক্রান্ত মহারাজা নিহত হইলেন। পাণ্ডবদিগের সংশ্লেষ মাত্রে থাকিয়া কৃষ্ণের এই এক মাত্র অস্ত্র ধারণ বলিলেও হয়। খাণ্ডবদাহের যুদ্ধটা আমরা বড় মৌলিক বলিয়া ধরি নাই, ইহা পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে।

শিশুপালবধ-পর্বাধ্যায়ে একটা গুরুতর ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত আছে। বলিতে গেলে, তেমন গুরুতর ঐতিহাসিক তত্ত্ব মহাভারতের আর কোথাও নাই। আমরা দেখিয়াছি যে, জরাসন্ধবধের পূর্বে, কৃষ্ণ কোথাও মৌলিক মহাভারতে, দেবতা বা ঈশ্বরাতার-স্বরূপ অভিহিত বা স্বীকৃত নহেন। জরাসন্ধবধে, সে কথাটা অর্মানি অস্ফুট রকম আছে। এই শিশুপালবধেই প্রথম কৃষ্ণের সমসাময়িক লোক কর্তৃক তিনি জগদীশ্বর বলিয়া স্বীকৃত। এখানে কুরুবংশের তাৎকালিক নেতা ভীষ্মই এই মতের প্রচারকর্তা।

এখন ঐতিহাসিক স্কুল প্রশ্নটা এই যে, যখন দেখিয়াছি যে, কৃষ্ণ তাঁহার জীবনের প্রথমাংশে ঈশ্বরাতার বলিয়া স্বীকৃত নহেন, তখন জানিতে হইবে, কোন্ সময়ে তিনি প্রথম ঈশ্বর বলিয়া স্বীকৃত হইলেন? তাঁহার জীবিতকালেই কি ঈশ্বরাতার বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন? দেখিতে পাই বটে যে, এই শিশুপালবধে, এবং তৎপরবর্ত্তী মহাভারতের অন্যান্য অংশে তিনি ঈশ্বর বলিয়া স্বীকৃত হইতেছেন। কিন্তু এমন হইতে পারে যে, শিশুপালবধ-পর্বাধ্যায় এবং সেই সেই অংশ প্রক্ষিপ্ত। এ প্রশ্নের উত্তরে কোন্ পক্ষ অবলম্বনীয়?

এ কথার আমরা এক্ষণে কোন উত্তর দিব না। ভরসা করি, ক্রমশঃ উত্তর আপনিই পরিষ্ফুট হইবে। তবে ইহা বক্তব্য যে, শিশুপালবধ-পর্বাধ্যায় যদি মৌলিক মহাভারতের অংশ হয়, তবে এমন বিবেচনা করা যাইতে পারে যে, এই সময়েই কৃষ্ণ ঈশ্বরত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতেছিলেন। এবং এ বিষয়ে তাঁহার স্বপক্ষ বিপক্ষ দুই পক্ষ ছিল। তাঁহার পক্ষীয়দিগের প্রধান ভীষ্ম, এবং পাণ্ডবেরা। তাঁহার বিপক্ষদিগের এক জন নেতা শিশুপাল। শিশুপালবধ বৃত্তান্তের স্থূল মর্ম এই যে, ভীষ্মাদি সেই সভামধ্যে কৃষ্ণের প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা পান। শিশুপাল তাহার বিরোধী হন। তাহাতে তুমুল বিবাদের যোগাড় হইয়া উঠে। তখন কৃষ্ণ শিশুপালকে নিহত করেন, তাহাতে সব গোল মিটিয়া যায়। যজ্ঞের বিঘ্ন বিনষ্ট হইলে, যজ্ঞ নিষ্বিঘ্নে নিষ্বাহ হয়।

এ সকল কথার ভিতর যথার্থ ঐতিহাসিকতা কিছুমাত্র আছে কি না, তাহার মীমাংসার পূর্বে বুদ্ধিতে হয় যে, এই শিশুপালবধ-পর্বাধ্যায় মৌলিক কি না? এ কথাটার উত্তর বড় সহজ নহে। শিশুপালবধের সঙ্গে মহাভারতের স্থূল ঘটনাগুলির কোন বিশেষ সম্বন্ধ আছে, এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু তা না থাকিলেই যে প্রক্ষিপ্ত বলিতে হইবে, এমন নহে। ইহা সত্য বটে যে, ইতিপূর্বে অনেক স্থানে শিশুপাল নামে প্রবল পরাক্রান্ত এক জন রাজার কথা দেখিতে পাই। পরভাগে দেখি, তিনি নাই। মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। পাণ্ডব-সভায় কৃষ্ণের হস্তে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল, ইহার বিরোধী কোন কথা পাই না। অনুক্রমণিকাধ্যায়ে এবং পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে শিশুপালবধের কথা আছে। আর রচনাবলী দেখিলেও শিশুপালবধ-পর্বাধ্যায়কে মৌলিক মহাভারতের অংশ বলিয়াই বোধ হয় বটে। মৌলিক মহাভারতের আর কয়টি অংশের ন্যায়, নাটক্যাংশে ইহার বিশেষ উৎকর্ষ আছে। অতএব ইহাকে অমৌলিক বলিয়া একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না।

তা না পারি, কিন্তু ইহাও স্পষ্ট বোধ হয় যে, যেমন জরাসন্ধবধ-পর্বাধ্যায়ে দুই হাতের কারিগরি দেখিয়াছি, ইহাতেও সেই রকম। বরং জরাসন্ধবধের অপেক্ষা সে বৈচিত্র্য শিশুপালবধে বেশী। অতএব আমি এই সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য যে, শিশুপালবধ স্থূলতঃ মৌলিক বটে, কিন্তু ইহাতে দ্বিতীয় স্তরের কবির বা অন্য পরবর্ত্তী লেখকের অনেক হাত আছে।

এক্ষণে শিশুপালবধ বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলিব।

আজিকার দিনেও আমরাই দেশে একটি প্রথা প্রচলিত আছে যে, কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাড়ীতে সভা হইলে সভাস্থ সর্বপ্রধান ব্যক্তিকে স্রক্চন্দন দেওয়া হইয়া থাকে। ইহাকে “মালাচন্দন” বলে। ইহা এখন পাত্রের গুণ দেখিয়া দেওয়া হয় না, বংশমর্যাদা দেখিয়া দেওয়া হয়। কুলীনের বাড়ীতে গোষ্ঠীপতিকেই মালাচন্দন দেওয়া হয়। কেন না, কুলীনের কাছে গোষ্ঠীপতি বংশই বড় মান্য। কৃষ্ণের সময়ে প্রথাটা একটু ভিন্ন প্রকার ছিল। সভাস্থ সর্বপ্রধান ব্যক্তিকে অর্ঘ্য প্রদান করিতে হইত। বংশমর্যাদা দেখিয়া দেওয়া হইত না, পাত্রের নিজের গুণ দেখিয়া দেওয়া হইত।

যুধিষ্ঠিরের সভায় অর্ঘ্য দিতে হইবে—কে ইহার উপযুক্ত পাত্র? ভারতবর্ষীয় সমস্ত রাজগণ সভাস্থ হইয়াছেন, ইহার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কে? এই কথা বিচার্য। ভীষ্ম বলিলেন, “কৃষ্ণই সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহাকে অর্ঘ্য প্রদান কর।”

প্রথম যখন এই কথা বলেন, তখন ভীষ্ম যে কৃষ্ণকে দেবতা বিবেচনাতেই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থির করিয়াছিলেন, এমন ভাব কিছই প্রকাশ নাই। কৃষ্ণ “তেজঃ বল ও পরাক্রম বিষয়ে শ্রেষ্ঠ” বলিয়াই তাঁহাকে অর্ঘ্যদান করিতে বলিলেন। ক্ষত্রগুণে কৃষ্ণ ক্ষত্রিয়গণের শ্রেষ্ঠ, এই জন্যই অর্ঘ্য দিতে বলিলেন। এখানে দেখা যাইতেছে, ভীষ্ম কৃষ্ণের মনুষ্যচরিত্রই দেখিতেছেন।

এই কথানুসারে কৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদত্ত হইল। তিনিও তাহা গ্রহণ করিলেন। ইহা শিশুপালের অসহ্য হইল। শিশুপাল ভীষ্ম, কৃষ্ণ ও পাণ্ডবদিগকে এককালীন তিরস্কার করিয়া যে বক্তৃতা করিলেন, বিলাতে পার্লামেন্ট মহাসভায় উহা উক্ত হইলে উচিত দরে বিকাইত। তাঁহার বক্তৃতার প্রথম ভাগে তিনি যাহা বলিলেন, তাঁহার বাণিতা বড় বিশুদ্ধ অথচ তীর। কৃষ্ণ রাজা নহেন, তবে এত রাজা থাকিতে তিনি অর্ঘ্য পান কেন? যদি স্থবির বলিয়া তাঁহার পূজা করিয়া থাক, তবে তাঁর বাপ বসুদেবকে পূজা করিলে না কেন? তিনি তোমাদের আত্মীয় এবং প্রিয়চকীর্ষ বলিয়া কি তাঁর পূজা করিয়াছ? স্বশুরে দুপদ থাকিতে তাঁকে কেন?

বিক্রম রচনাবলী

কৃষ্ণকে আচার্য্য* মনে করিয়াছ? দ্রোণাচার্য্য থাকিতে কৃষ্ণের অর্চনা কেন? ঋত্বিক্ বলিয়া কি তাঁহাকে অর্ঘ দাও? বেদব্যাস থাকিতে কৃষ্ণ কেন?† ইত্যাদি।

মহারাজ শিশুপাল কথা কহিতে কহিতে অন্যান্য বাণ্মীর ন্যায় গরম হইয়া উঠিলেন, তখন লজ্জিক ছাড়িয়া রেটারিকে উঠিলেন, বিচার ছাড়িয়া দিয়া গালি দিতে আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডবদিগকে ছাড়িয়া কৃষ্ণকে ধরিলেন। অলঙ্কারশাস্ত্র বিলক্ষণ বদ্বিতেন,—প্রথমে “প্রিয়চক্রী” “অপ্রাপ্তলক্ষণ” ইত্যাদি চুটুকিতে ধরিয়া, শেষ “ধর্ম্ভ্রষ্ট” “দুরাত্মা” প্রভৃতি বড় বড় গালিতে উঠিলেন। পরিশেষে Climax—কৃষ্ণ যতভোজী কুঙ্কর, দারপরিগ্রহকারী ক্রীব‡ ইত্যাদি। গালির একশেষ করিলেন।

শুনিয়া, ক্ষমাগুণের পরমাধার, পরমযোগী, আদর্শ পুরুষ কোন উত্তর করিলেন না। কৃষ্ণের এমন শক্তি ছিল যে, তদুদ্দেশ্যে তিনি শিশুপালকে বিনষ্ট করিতে সক্ষম—পরবর্তী ঘটনায় পাঠক তাহা জানিবেন। কৃষ্ণও কখন যে এরূপ পরুষবচনে তিরস্কৃত হইয়াছিলেন, এমন দেখা যায় না। তথাপি তিনি এ তিরস্কারে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। ইউরোপীয়দিগের মত ডাকিয়া বলিলেন না, “শিশুপাল! ক্ষমা বড় ধর্ম্ম, আমি তোমায় ক্ষমা করিলাম।” নীরবে শত্রুকে ক্ষমা করিলেন।

কর্ম্মকর্ত্তা যুধিষ্ঠির আহত রাজার ক্রোধ দেখিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতে গেলেন—যজ্ঞবাড়ীর কর্ম্মকর্ত্তার যেমন দস্তুর। মধুরবাক্যে কৃষ্ণের কুৎসাকারীকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বড় ভীষ্ম লোহনির্ম্মিত—তাঁহার সেটা বড় ভাল লাগিল না। বড় সম্পর্টই বলিল, “কৃষ্ণের অর্চনা যাহার অনভিমত, এমন ব্যক্তিকে অনুনয় বা সান্ত্বনা করা অনর্চিত।”

তখন কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম, সদর্থযুক্ত বাক্যপরম্পরায়, কেন তিনি কৃষ্ণের অর্চনার পরামর্শ দিয়াছেন, তাহার কৈফিয়ৎ দিতে লাগিলেন। আমরা সেই বাক্যগুলির সারভাগ উদ্ধৃত করিতেছি, কিন্তু তাহার ভিতর একটা রহস্য আছে, আগে দেখাইয়া দিই। কতকগুলি বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, আর সকল মনুষ্যের, বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়ের যে সকল গুণ থাকে, সে সকল গুণে কৃষ্ণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই জন্য তিনি অর্ঘের যোগ্য। আবার তারই মাঝে কতকগুলি কথা আছে, তাহাতে ভীষ্ম বলিতেছেন যে, কৃষ্ণ স্বয়ং জগদীশ্বর, এই জন্য কৃষ্ণ সকলের অর্চনীয়। আমরা দুই রকম পৃথক্ পৃথক্ দেখাইতেছি, পাঠক তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য বদ্বিতে চেষ্টা করুন। ভীষ্ম বলিলেন,

“এই মহতী নৃপসভায় একজন মহীপালও দৃষ্ট হয় না, যাহাকে কৃষ্ণ তেজোবলে পরাজয় করেন নাই।”

এ গেল মনুষ্যত্ববাদ—তার পরেই দেবত্ববাদ—

“অচ্যুত কেবল আমরাদিগের অর্চনীয় এমত নহে, সেই মহাভূজ ত্রিলোকীর পূজনীয়। তিনি যুদ্ধে অসংখ্য ক্ষত্রিয়বর্গের পরাজয় করিয়াছেন, এবং অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।”

পুনশ্চ, মনুষ্যত্ব—

“কৃষ্ণ জন্মিয়া অবধি যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, লোকে মৎসর্গ্নিধানে পুনঃ পুনঃ তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিয়াছে। তিনি অত্যন্ত বালক হইলেও আমরা তাঁহার পরীক্ষা করিয়া থাকি। কৃষ্ণের শৌর্য্য, বীর্য্য, কীর্ত্তি ও বিজয় প্রভৃতি সমস্ত পরিজ্ঞাত হইয়া”—

পরে, সঙ্গে সঙ্গে দেবত্ববাদ,

“সেই ভূতসুখাবহ জগদর্চিত অচ্যুতের পূজা বিধান করিয়াছি।”

পুনশ্চ, মনুষ্যত্ব, পরিষ্কার রকম—

“কৃষ্ণের পূজ্যতা বিষয়ে দুটি হেতু আছে; তিনি নিখিল বেদবেদাঙ্গ-পারদর্শী ও সমাধিক বলশালী। ফলতঃ মনুষ্যালোকে তাদৃশ বলবান্ এবং বেদবেদাঙ্গসম্পন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রত্যক্ষ

* কৃষ্ণ, অভিমন্যু, সাত্যকি প্রভৃতি মহারথীর, এবং কদাপি স্বয়ং অর্জুনেরও যুদ্ধবিদ্যার আচার্য্য।

† অতএব কৃষ্ণ বিখ্যাত বেদজ্ঞ, ইহা স্বীকৃত হইল।

‡ কৃষ্ণ অনপত্য নহেন—তবে ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তির জিতেন্দ্রিয়কে এইরূপ গালি দেয়।

হওয়া সুকঠিন। দান, দাক্ষ্য, শ্রুত, শৌর্য্য, লজ্জা, কীর্ত্তি, বুদ্ধি, বিনয়, অনুপম শ্রী, ধৈর্য্য ও সন্তোষ প্রভৃতি সমুদায় গুণাবলি কৃষ্ণে নিয়ত বিরাজিত রহিয়াছে। অতএব সেই সর্বগুণসম্পন্ন আচার্য্য, পিতা ও গুরুস্বরূপ পূজার্ত্ত কৃষ্ণের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন তোমাদের সর্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তিনি ঋত্বিক্, গুরু, সম্বন্ধী, স্নাতক, রাজা এবং প্রিয়পাত্র। এই নিমিত্ত অচ্যুত অর্চ্চিত হইয়াছেন।” *

পুনশ্চ দেবত্ববাদ,

“কৃষ্ণই এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা, তিনিই অব্যক্ত প্রকৃতি, সনাতন, কর্ত্তা, এবং সর্বভূতের অধীশ্বর, সুতরাং পরমপূজনীয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বুদ্ধি, মন, মহত্ত্ব, পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভূত, সমুদায়ই একমাত্র কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত আছে। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, দিক্‌বিদিক্ সমুদায়ই একমাত্র কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত আছে। ইত্যাদি।”

ভীষ্ম বলিয়াছেন, কৃষ্ণের পূজার দুইটি কারণ—(১) যিনি বলে সর্বশ্রেষ্ঠ, (২) তাঁহার তুল্য বেদবেদাঙ্গপারদর্শী কেহ নহে। অদ্বিতীয় পরাক্রমের প্রমাণ এই গ্রন্থে অনেক দেওয়া গিয়াছে। কৃষ্ণের অদ্বিতীয় বেদজ্ঞতার প্রমাণ গীতা। যাহা আমরা ভগবদ্গীতা বলিয়া পাঠ করি, তাহা কৃষ্ণ-প্রণীত নহে। উহা ব্যাস-প্রণীত বলিয়া খ্যাত—“বৈয়াসিকী সংহিতা” নামে পরিচিত। উহার প্রণেতা ব্যাসই হউন আর যেই হউন, তিনি ঠিক কৃষ্ণের মুখের কথাগুলি নোট করিয়া রাখিয়া ঐ গ্রন্থ সংকলন করেন নাই। উহাকে মৌলিক মহাভারতের অংশ বলিয়াও আমার বোধ হয় না। কিন্তু গীতা কৃষ্ণের ধর্ম্মমতের সংকলন, ইহা আমার বিশ্বাস। তাঁহার মতাবলম্বী কোন মনীষী কর্ত্তক উহা এই আকারে সংকলিত, এবং মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে, ইহাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। এখন বলিবার কথা এই যে, গীতোক্ত ধর্ম্ম যাঁহার প্রণীত, তিনি স্পষ্টতঃই অদ্বিতীয় বেদবিৎ পণ্ডিত ছিলেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি বেদকে সর্বোচ্চ স্থানে বসাইতেন না—কখন বা বেদের একটু একটু নিন্দা করিতেন। কিন্তু তথাপি অদ্বিতীয় বেদজ্ঞ ব্যতীত অন্যের দ্বারা গীতোক্ত ধর্ম্ম প্রণীত হয় নাই, ইহা যে গীতা ও বেদ উভয়ই অধ্যয়ন করে, সে অনায়াসেই বুঝিতে পারে।

যিনি এইরূপ, পরাক্রমে ও পাণ্ডিত্যে, বীর্ষ্যে ও শিক্ষায়, কর্ম্মে ও জ্ঞানে, নীতিতে ও ধর্ম্মে, দয়ায় ও ক্ষমায়, তুল্যরূপেই সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনিই আদর্শ পুরুষ।

দশম পরিচ্ছেদ—শিশুপালবধ

ভীষ্ম কথা সমাপ্ত করিয়া, শিশুপালকে নিতান্ত অবজ্ঞা করিয়া বলিলেন, “যদি কৃষ্ণের পূজা শিশুপালের নিতান্ত অসহ্য বোধ হইয়া থাকে, তবে তাঁহার ষেরূপ অভিরূচি হয়, করুন।” অর্থাৎ “ভাল না লাগে, উঠিয়া যাও।”

পরে মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

“কৃষ্ণ অর্চ্চিত হইলেন দেখিয়া সুনীথনামা এক মহাবল পরাক্রান্ত বীরপুরুষ ক্রোধে কম্পান্বিতকলেবর ও আরক্তনেত্র হইয়া সকল রাজগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক করিলেন, ‘আমি পূর্ব্ব সেনাপতি ছিলাম, সম্প্রতি যাদব ও পাণ্ডবকুলের সম্মেলোন্মূলন করিবার নিমিত্ত অদ্যই সমরসাগরে অবগাহন করিব।’ চেদিরাজ শিশুপাল, মহীপালগণের অবিচলিত উৎসাহ সন্দর্শনে প্রোৎসাহিত হইয়া যজ্ঞের ব্যাঘাত জন্মাইবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন, যাহাতে যুদ্ধিষ্ঠিরের অভিষেক এবং কৃষ্ণের পূজা না হয়, তাহা আমাদের সর্বতোভাবে কর্ত্তব্য। রাজারা নিষেদ প্রযুক্ত ক্রোধপরবশ হইয়া মন্ত্রণা করিতেছেন দেখিয়া কৃষ্ণ স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহারা যুদ্ধার্থ পরামর্শ করিতেছেন।”

রাজা যুদ্ধিষ্ঠির সাগরসদৃশ রাজমন্ডলকে রোষপ্রচলিত দেখিয়া প্রাজ্ঞতম পিতামহ ভীষ্মকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, “হে পিতামহ! এই মহান্ রাজসমুদ্র সংক্ষোভিত হইয়া উঠিয়াছে, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয়, অনুমতি করুন।”

* প্রথম অধ্যায়ে যাহা বলিয়াছি—অনুশীলনধর্ম্মের চরমাদর্শ শ্রীকৃষ্ণ, এই ভীষ্মোক্তিতে তাহা পরিষ্কৃত হইতেছে।

বাঁকম রচনাবলী

শিশুপালবধের ইহাই যথার্থ কারণ। শিশুপালকে বধ না করিলে তিনি রাজগণের সহিত মিলিত হইয়া যজ্ঞ নষ্ট করিতেন।

শিশুপাল আবার ভীষ্মকে ও কৃষ্ণকে কতকগুলো গালিগালাজ করিলেন।

ভীষ্মকে ও কৃষ্ণকে এবারেও শিশুপাল বড় বেশি গালি দিলেন। “দুরাত্মা”, “যাহাকে বালকেও ঘৃণা করে,” “গোপাল,” “দাস” ইত্যাদি। পরম যোগী শ্রীকৃষ্ণ পদনর্বার তাহাকে ক্ষমা করিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। কৃষ্ণ যেমন বলের আদর্শ, ক্ষমার তেমন আদর্শ। ভীষ্ম প্রথমে কিছু বলিলেন না, কিন্তু ভীম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শিশুপালকে আক্রমণ করিবার জন্য উঠিত হইলেন। ভীষ্ম তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া শিশুপালের পদনর্বারতা তাঁহাকে শুনাইতে লাগিলেন। এই বৃত্তান্ত অত্যন্ত অসম্ভব, অনৈসর্গিক ও অবিশ্বাসযোগ্য। সে কথা এই—

শিশুপালের জন্মকালে তাঁহার তিনটি চক্ষু ও চারিটি হাত হইয়াছিল, এবং তিনি গম্ভীর মত চীৎকার করিয়াছিলেন। এরূপ দুর্লক্ষণযুক্ত পুত্রকে তাঁহার মাতাপিতা পরিত্যাগ করাই শ্রেয় বিবেচনা করিল। এমন সময়ে, দৈববাণী হইল। সে কালে যাহারা আষাঢ়ে গল্প প্রস্তুত করিতেন, দৈববাণীর সাহায্য ভিন্ন তাহারা গল্প জমাইতে পারিতেন না। দৈববাণী বলিল, “বেশ ছেলে, ফেলিয়া দিও না, ভাল করিয়া প্রতিপালন কর; যমেও ইহার কিছু করিতে পারিবে না। তবে যিনি ইহাকে মারিবেন, তিনি জন্মিয়াছেন।” কাজেই বাপ মা জিজ্ঞাসা করিল, “বাছা দৈববাণী, কে মারিবে নামটা বলিয়া দাও না?” এখন দৈববাণী যদি এত কথাই বলিলেন, তবে কৃষ্ণের নামটা বলিয়া দিলেই গোল মিটিত। কিন্তু তা হইলে গল্পের Plot-interest হয় না। অতএব তিনি কেবল বলিলেন, “যার কোলে দিলে ছেলের বেশী হাত দুইটা খসিয়া যাইবে, আর বেশী চোখটা মিলাইয়া যাইবে, সেই ইহাকে মারিবে।”

কাজে কাজেই শিশুপালের বাপ দেশের লোক ধরিয়া কোলে ছেলে দিতে লাগিলেন। কাহারও কোলে গেলে ছেলের বেশী হাত বা চোখ ঘুঁচিল না। কৃষ্ণকে শিশুপালের সমবয়স্ক বলিয়াই বোধ হয়; কেন না, উভয়েই এক সময়ে রুক্মিণীকে বিবাহ করিবার উমেদার ছিলেন, এবং দৈববাণীর ‘জন্মগ্রহণ করিয়াছেন’ কথাতেও ঐরূপ বুঝায়। কিন্তু তথাপি কৃষ্ণ দ্বারকা হইতে চৌদ্দেশে গিয়া শিশুপালকে কোলে করিলেন। তখনই শিশুপালের দুইটা হাত খসিয়া গেল, আর একটা চোখ মিলাইয়া গেল।

শিশুপালের মা কৃষ্ণের পিসীমা। পিসীমা কৃষ্ণকে জ্বরদস্তী করিয়া ধরিলেন, “বাছা! আমার ছেলে মারিতে পারিবে না।” কৃষ্ণ স্বীকার করিলেন, শিশুপালের বধোচিত শত অপরাধ তিনি ক্ষমা করিবেন।

যাহা অনৈসর্গিক, তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। বোধ করি পাঠকেরাও করেন না। কোন ইতিহাসে অনৈসর্গিক ব্যাপার পাইলে তাহা লেখকের বা তাঁহার পদনর্বারগামীদিগের কল্পনাপ্রসূত বলিয়া সকলেই স্বীকার করিবেন। ক্ষমাগুণের মাহাত্ম্য বুঝে না, এবং কৃষ্ণচরিত্রের মাহাত্ম্য বুঝে না, এমন কোন কবি, কৃষ্ণের অদ্ভুত ক্ষমাশীলতা বুঝিতে না পারিয়া, লোককে শিশুপালের প্রতি ক্ষমার কারণ বুঝাইবার জন্য এই অদ্ভুত উপন্যাস প্রস্তুত করিয়াছেন। কাণা কাণাকে বুঝায়, হাতী কুলোর মত। অসুরবধের জন্য যে কৃষ্ণ অবতীর্ণ, তিনি যে অসুরের অপরাধ পাইয়া ক্ষমা করিবেন, ইহা অসঙ্গত বটে। কৃষ্ণকে অসুরবধার্থ অবতীর্ণ মনে করিলে, এই ক্ষমাগুণও বুঝা যায় না, তাঁহার কোন গুণই বুঝা যায় না। কিন্তু তাঁহাকে আদর্শ পুরুষ বলিয়া ভাবিলে, মনুষ্যত্বের আদর্শের বিকাশ জন্যই অবতীর্ণ, ইহা ভাবিলে, তাঁহার সকল কার্যই বিশদরূপে বুঝা যায়। কৃষ্ণচরিত্রস্বরূপ রত্নভাণ্ডার খুলিবার চাবি এই আদর্শপুরুষতত্ত্ব।

শিশুপালের গোটাকতক কটুক্তি কৃষ্ণ সহ্য করিয়াছিলেন বলিয়াই যে কৃষ্ণের ক্ষমাগুণের প্রশংসা করিতেছি, এমত নহে। শিশুপাল ইতিপূর্বে কৃষ্ণের উপর অনেক অত্যাচার করিয়াছিল। কৃষ্ণ প্রাগ্জ্যোতিষপুরে গমন করিলে সে সময় পাইয়া, দ্বারকা দক্ষ করিয়া পলাইয়াছিল। কদাচিৎ ভোজরাজ রৈবতক বিহারে গেলে সেই সময়ে আসিয়া শিশুপাল অনেক যাদবকে বিনষ্ট ও বন্ধ করিয়াছিল। বসুদেবের অশ্বমেধের ঘোড়া চুরি করিয়াছিল। এটা তাৎকালিক ক্ষত্রিয়দিগের নিকট বড় গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য। এ সকলও কৃষ্ণ ক্ষমা করিয়াছিলেন। আর কেবল শিশুপালেরই যে তিনি বৈরাচরণ ক্ষমা করিয়াছিলেন এমত নহে। জরাসন্ধও তাঁহাকে বিশেষরূপে পীড়িত করিয়াছিল। স্বতঃ হোক, পরতঃ হোক, কৃষ্ণ যে জরাসন্ধের নিপাত সাধনে

সক্ষম, তাহা দেখাইয়াছি। কিন্তু যত দিন না জরাসন্ধ রাজমণ্ডলীকে আবদ্ধ করিয়া পশুপতির নিকট বালি দিতে প্রস্তুত হইল, তত দিন তিনি তাহার প্রতি কোন প্রকার বৈরাচরণ করিলেন না। এবং পাছে যুদ্ধ হইয়া লোকক্ষয় হয় বলিয়া, নিজে সরিয়া গিয়া রৈবতকে গড় বাঁধিয়া রহিলেন। সেইরূপ যত দিন শিশুপাল কেবল তাহারই শত্রুতা করিয়াছিল, তত দিন কৃষ্ণ তাহার কোন প্রকার অনিষ্ট করেন নাই। তার পর যখন সে পাণ্ডবের যজ্ঞের বিঘ্ন ও ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের বিঘ্ন করিতে উদ্যুক্ত হইল, কৃষ্ণ তখন তাহাকে বধ করিলেন। আদর্শ পুরুষের ক্ষমা, ক্ষমাপরায়ণতার আদর্শ, এজন্য কেহ তাহার অনিষ্ট করিলে তিনি তাহার কোন প্রকার বৈরসাধন করিতেন না, কিন্তু আদর্শ পুরুষ দণ্ডপ্রণেতারও আদর্শ, এজন্য কেহ সমাজের অনিষ্ট সাধনে উদ্যত হইলে, তিনি তাহাকে দণ্ডিত করিতেন।

কৃষ্ণের ক্ষমাগুণের প্রসঙ্গ উঠিলে কর্ণ দুর্যোধন প্রতি তিনি যে ক্ষমা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। সে উদ্যোগপর্ষের কথা, এখন বলিবার নয়। কর্ণ দুর্যোধন যে অবস্থায় তাহাকে বন্ধন করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল, সে অবস্থায় আর কাহাকে কেহ বন্ধনের উদ্যোগ করিলে বোধ হয় যিশু ভিন্ন অন্য কোন মনুষ্যই শত্রুকে মার্জনা করিতেন না। কৃষ্ণ তাহাদের ক্ষমা করিলেন, পরে বন্ধুভাবে কর্ণের সঙ্গে কথোপকথন করিলেন, এবং মহাভারতের যুদ্ধে তাহাদের বিরুদ্ধে কখন অস্ত্র ধারণ করিলেন না।

ভীষ্ম ও শিশুপালে আরও কিছু বকাবাকি হইল। ভীষ্ম বলিলেন, “শিশুপাল কৃষ্ণের তেজেই তেজস্বী, তিনি এখনই শিশুপালের তেজোহরণ করিবেন।” শিশুপাল জবলিয়া উঠিয়া ভীষ্মকে অনেক গালাগালি দিয়া শেষে বলিল, “তোমার জীবন এই ভূপালগণের অনুগ্রহাধীন, ইহারা মনে করিলেই তোমার প্রাণসংহার করিতে পারেন।” ভীষ্ম তখনকার ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা—তিনি বলিলেন, “আমি ইহাদিগকে তৃণতুল্য বোধ করি না।” শুনিয়া সমবেত রাজমণ্ডলী গর্জিয়া উঠিয়া বলিল, “এই ভীষ্মকে পশুবৎ বধ কর অথবা প্রদীপ্ত হুতাশনে দগ্ধ কর।” ভীষ্ম উত্তর করিলেন, “যা হয় কর, আমি এই তোমাদের মস্তকে পদার্পণ করিলাম।”

বুড়াকে জোরেও আঁটিবার যো নাই, বিচারেও আঁটিবার যো নাই। ভীষ্ম তখন রাজগণকে মীমাংসার সহজ উপায়টা দেখাইয়া দিলেন। তিনি যাহা বলিলেন, তাহার স্কুল মর্ম এই;— “ভাল, কৃষ্ণের পূজা করিয়াছি বলিয়া তোমরা গোল করিতেছ; তাহার শ্রেষ্ঠত্ব মানিতেছ না। গোলে কাজ কি, তিনি ত সম্মুখেই আছেন—একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ না? যাঁহার মরণ-কণ্ডুতি থাকে, তিনি একবার কৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া দেখুন না?”

শুনিয়া কি শিশুপাল চূপ করিয়া থাকিতে পারে? শিশুপাল কৃষ্ণকে ডাকিয়া বলিল, “আইস, সংগ্রাম কর, তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি।”

এখন, কৃষ্ণ প্রথম কথা কহিলেন। কিন্তু শিশুপালের সঙ্গে নহে। ক্ষত্রিয় হইয়া কৃষ্ণ যুদ্ধে আহ্বত হইয়াছেন, আর যুদ্ধে বিমুখ হইবার পথ রহিল না; এবং যুদ্ধেরও ধর্মতঃ প্রয়োজন ছিল। তখন সভাস্থ সকলকে সম্বোধন করিয়া শিশুপালকৃত পূর্বাপরাধ সকল একটি একটি করিয়া বিবৃত করিলেন। তার পর বলিলেন, “এত দিন ক্ষমা করিয়াছি। আজ ক্ষমা করিব না।”

এই কৃষ্ণোক্তি মধ্যে এমন কথা আছে যে, তিনি পিতৃস্বসার অনুরোধেই তাহার এত অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন। ইতিপূর্বেই যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ করিয়া হয়ত পাঠক জিজ্ঞাসা করিবেন, এ কথাটাও প্রক্ষিপ্ত? আমাদের উত্তর এই যে, ইহা প্রক্ষিপ্ত হইলেও হইতে পারে, কিন্তু প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করিবার কোন প্রয়োজন দেখি না। ইহাতে অনৈসর্গিকতা কিছুই নাই; বরং ইহা বিশেষরূপে স্বাভাবিক ও সম্ভব। ছেলে দুরন্ত, কৃষ্ণদেবী; কৃষ্ণও বলবান্, মনে করিলে শিশুপালকে মাছির মত টিপিয়া মারিতে পারেন, এমন অবস্থায় পিসী যে ভ্রাতৃপুত্রকে অনুরোধ করিবেন, ইহা খুব সম্ভব। ক্ষমাপরায়ণ কৃষ্ণ শিশুপালকে নিজ গুণেই ক্ষমা করিলেও পিসীর অনুরোধ স্মরণ রাখিবেন, ইহাও খুব সম্ভব। আর পিতৃস্বসার পুত্রকে বধ করা আপাততঃ নিন্দনীয় কার্য্য। কৃষ্ণ পিসীর খাতির কিছুই করিলেন না, এ কথাটা উঠিতেও পারিত। সে কথার একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া চাই। এ জন্য কৃষ্ণের এই উক্তি খুব সঙ্গত।

তার পরেই আবার একটা অনৈসর্গিক কাণ্ড উপস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ, শিশুপালের বধ জন্য আপনার চক্রাস্ত্র স্মরণ করিলেন। স্মরণ করিবার মাত্র চক্র তাহার হাতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন কৃষ্ণ চক্রের দ্বারা শিশুপালের মাথা কাটিয়া ফেলিলেন।

বিক্রম রচনাবলী

বোধ করি, এ অনৈসর্গিক ব্যাপার কোন পাঠকেই ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। যিনি বলিবেন, কৃষ্ণ ঈশ্বরবতার, ঈশ্বরে সকলই সম্ভবে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, যদি চক্রের দ্বারা শিশুপালকে বধ করিতে হইবে, তবে সে জন্য কৃষ্ণের মনুষ্যশরীর ধারণের কি প্রয়োজন ছিল? চক্র ত চেতনাবিশিষ্ট জীবের ন্যায় আজ্ঞামত যাতায়াত করিতে পারে দেখা যাইতেছে, তবে বৈকুণ্ঠ হইতেই বিষ্ণু তাহাকে শিশুপালের শিরশ্ছেদ জন্য পাঠাইতে পারেন নাই কেন? এ সকল কাজের জন্য মনুষ্য-শরীর গ্রহণের প্রয়োজন কি? ঈশ্বর কি আপনার নৈসর্গিক নিয়মে বা কেবল ইচ্ছা মাত্র একটা মনুষ্যের মৃত্যু ঘটাইতে পারেন না যে, তজ্জন্য তাঁহাকে মনুষ্যদেহ ধারণ করিতে হইবে? এবং মনুষ্য-দেহ ধারণ করিলেও কি তিনি এমনই হীনবল হইবেন যে, স্বীয় মানুসী শক্তিতে একটা মানুষের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন না, ঐশী শক্তির দ্বারা দৈব অস্ত্রকে স্মরণ করিয়া আনিতে হইবে? ঈশ্বর যদি এরূপ অলপশক্তিমান হন, তবে মানুষের সঙ্গে তাঁহার তফাৎ বড় অলপ। আমরাও কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করি না—কিন্তু আমাদের মতে কৃষ্ণ মানুসী শক্তি ভিন্ন অন্য শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতেন না, এবং মানুসী শক্তির দ্বারাই সকল কার্যই সম্পন্ন করিতেন। এই অনৈসর্গিক চক্রাস্ত্রস্মরণবৃত্তান্ত যে অলৌকিক ও প্রক্ষিপ্ত, কৃষ্ণ যে মানুষযুদ্ধেই শিশুপালকে নিহত করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ মহাভারতেই আছে। উদ্যোগপর্বে ধৃতরাষ্ট্র শিশুপালবধের ইতিহাস কহিতেছেন, যথা—

“পূর্বে রাজসূয় যজ্ঞে, চৌদরাজ ও করুষক প্রভৃতি যে সমস্ত ভূপাল সর্বপ্রকার উদ্যোগ-বিশিষ্ট হইয়া বহুসংখ্যক বীরপুরুষ সমাভিব্যাহারে একত্র সমবেত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে চৌদরাজতনয় সূর্যের ন্যায় প্রতাপশালী, শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর, ও যুদ্ধে অজেয়। ভগবান্ কৃষ্ণ ক্ষণকাল মধ্যে তাঁহারা পরাজয় করিয়া ক্ষত্রিয়গণের উৎসাহ ভঙ্গ করিয়াছিলেন; এবং করুষরাজ-প্রমুখ নরেন্দ্রবর্গ যে শিশুপালের সম্মান বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সিংহস্বরূপ কৃষ্ণকে রথারূঢ় নিরীক্ষণ করিয়া চৌদপতিরে পরিত্যাগপূর্বক ক্ষুদ্র মৃগেন্দ্র ন্যায় পলায়ন করিলেন, তিনি তখন অবলীলাক্রমে শিশুপালের প্রাণসংহারপূর্বক পাণ্ডবগণের যশ ও মান বর্দ্ধন করিলেন।”—১২ অধ্যায়।

এখানে ত চক্রের কোন কথা দেখিতে পাই না। দেখিতে পাই, কৃষ্ণকে রথারূঢ় হইয়া রীতিমত মানুষিক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। এবং তিনি মানুষযুদ্ধেই শিশুপাল ও তাহার অনুচরবর্গকে পরাভূত করিয়াছিলেন। যেখানে এক গ্রন্থে একই ঘটনার দুই প্রকার বর্ণনা দেখিতে পাই—একটি নৈসর্গিক, অপরটি অনৈসর্গিক, সেখানে অনৈসর্গিক বর্ণনাকে অগ্রাহ্য করিয়া নৈসর্গিককে ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করাই বিধেয়। যিনি পুরাণেতিহাসের মধ্যে সত্যের অনুসন্ধান করিবেন, তিনি যেন এই সোজা কথাটা স্মরণ রাখেন। নহিলে সকল পরিশ্রমই বিফল হইবে।

শিশুপালবধের আমরা যে সমালোচনা করিলাম, তাহাতে উক্ত ঘটনার স্থূল ঐতিহাসিক তত্ত্ব আমরা এইরূপ দেখিতেছি। রাজসূয়ের মহাসভায় সকল ক্ষত্রিয়ের অপেক্ষা কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতা স্বীকৃত হয়। ইহাতে শিশুপাল প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষত্রিয় রুষ্ট হইয়া যজ্ঞ নষ্ট করিবার জন্য যুদ্ধ উপস্থিত করে। কৃষ্ণ তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করেন এবং শিশুপালকে নিহত করেন। পরে যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সমাপিত হয়।

আমরা দেখিয়াছি, কৃষ্ণ যুদ্ধে সচরাচর বিদ্বৈষাবিশিষ্ট। তবে অর্জুনাদি যুদ্ধক্ষম পাণ্ডবেরা থাকিতে, তিনি যজ্ঞঘাদিগের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন কেন? রাজসূয়ে যে কার্যের ভার কৃষ্ণের উপর ছিল, তাহা স্মরণ করিলেই পাঠক কথার উত্তর পাইবেন। যজ্ঞরক্ষা ভার কৃষ্ণের উপর ছিল, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। যে কাজের ভার যাহার উপর থাকে, তাহা তাহার অনুষ্ঠেয় কর্ম (Duty)। আপনার অনুষ্ঠেয় কর্মের সাধন জন্যই কৃষ্ণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া শিশুপালকে বধ করিয়াছিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ—পাণ্ডবের বনবাস

রাজসূয় যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, কৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরিয়া গেলেন। সভাপর্বে আর তাঁহাকে দেখিতে পাই না। তবে এক স্থানে তাঁহার নাম হইয়াছে।

দ্যুতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে হারিলেন। তার পর দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ, এবং সভামধ্যে বস্ত্রহরণ। মহাভারতের এই ভাগের মত, কাব্যংশে উৎকৃষ্ট রচনা জগতের সাহিত্যে বড় দুর্লভ। কিন্তু কাব্য আমাদের এখন সমালোচনীয় নহে—ঐতিহাসিক মূল্য কিছুর আছে কি না পরীক্ষা করিতে হইবে। যখন দ্রুশাসন সভামধ্যে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করিতে প্রবৃত্ত, নিরুপায় দ্রৌপদী তখন কৃষ্ণকে মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলেন। সে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছিঃ—

“গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্ কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয়!”

এবং সে সম্বন্ধে আমাদের যাহা বলিবার, তাহা পূর্বে বলিয়াছি।

তার পর বনপর্বে। বনপর্বে তিনবার মাত্র কৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। প্রথম, পাণ্ডবেরা বনে গিয়াছেন শূন্যিা বৃষ্ণভোজেরা সকলে তাঁহাদিগকে দেখিতে আসিয়াছিল—কৃষ্ণও সেই সঙ্গে আসিয়াছিলেন। ইহা সম্ভব। কিন্তু যে অংশে এই বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, তাহা মহাভারতের প্রথম স্তরগতও নহে, দ্বিতীয় স্তরগতও নহে। রচনার সাদৃশ্য কিছুমাত্র নাই। চরিত্রগত সঙ্গতি কিছুমাত্র নাই। কৃষ্ণকে আর কোথাও রাগিতে দেখা যায় না, কিন্তু এখানে, যুধিষ্ঠিরের কাছে আসিয়াই কৃষ্ণ চটিয়া লাল। কারণ কিছুরই নাই, কেহ শত্রু উপস্থিত নাই, কেহ কিছুর বলে নাই, কেবল দুর্ঘ্যোজন প্রভৃতিতে মারিয়া ফেলিতে হইবে, এই বলিয়াই এত রাগ যে, যুধিষ্ঠির বহুতর স্তব-স্তুতি মিনতি করিয়া তাঁহাকে থামাইলেন। যে কবি লিখিয়াছেন যে, কৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, মহাভারতের যুদ্ধে তিনি অস্ত্রধারণ করিবেন না, এ কথা সে কবির লেখা নয়, ইহা নিশ্চিত। তার পর এখনকার হোঁৎকাদিগের মত কৃষ্ণ বলিয়া বসিলেন, “আমি থাকিলে এতটা হয়!—আমি বাড়ী ছিলাম না।” তখন যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণ কোথায় গিয়াছিলেন, সেই পরিচয় লইতে লাগিলেন। তাহাতে শাল্ববধের কথাটা উঠিল। তাহার সঙ্গে কৃষ্ণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই পরিচয় দিলেন। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। সৌভ নামে তাহার রাজধানী। সেই রাজধানী আকাশময় উড়িয়া উড়িয়া বেড়ায়; শাল্ব তাহার উপর থাকিয়া যুদ্ধ করে। সেই অবস্থায় কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ হইল। যুদ্ধের সময়ে কৃষ্ণের বিস্তর কাঁদাকাটি। শাল্ব একটা মায়া বসুদেব গড়িয়া তাহাকে কৃষ্ণের সম্মুখে বধ করিল দেখিয়া কৃষ্ণ কাঁদিয়া মূর্ছিত। এ জগদীশ্বরের চিত্র নহে, কোন মানু্ষিক ব্যাপারের চিত্রও নহে। অনুক্রমণিকাধ্যায়ে এবং পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে এই সকল ব্যাপারে কোন প্রসঙ্গও নাই। ভরসা করি, কোন পাঠক এ সকল উপন্যাসের সমালোচনার প্রত্যাশা করেন না।

তার পরে দুর্বাসার শিষ্য ভোজন। সে ঘোরতর অনৈসর্গিক ব্যাপার। অনুক্রমণিকাধ্যায়ে সে কথা থাকিলেও তাহার কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই। সুতরাং তাহা আমাদের সমালোচনীয় নহে।

তার পর বনপর্বের শেষের দিকে মার্কণ্ডেয়সমস্যা-পর্বাধ্যায়ে কৃষ্ণকে দেখিতে পাই। পাণ্ডবেরা কাম্যক বনে আসিয়াছেন শূন্যিা, কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে আবার দেখিতে আসিয়াছিলেন—এবার একা নহে; ছোট ঠাকুরাণীটি সঙ্গে। মার্কণ্ডেয়সমস্যা-পর্বাধ্যায় একখানি বৃহৎ গ্রন্থ বলিলেও হয়। কিন্তু মহাভারতের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে, এমন কথা উহাতে কিছুরই নাই। সমস্তটাই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হয়। পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে মার্কণ্ডেয়-সমস্যা-পর্বাধ্যায়ের কথা আছে বটে, কিন্তু অনুক্রমণিকাধ্যায়ে নাই। মহাভারতের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের রচনার সঙ্গে ইহার কোন সাদৃশ্যই নাই। কিন্তু ইহা মৌলিক মহাভারতের অংশ কি না, তাহা আমাদের বিচার করিবারও কোন প্রয়োজন রাখে না। কেন না, কৃষ্ণ এখানে কিছুরই করেন নাই। আসিয়া যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী প্রভৃতিতে কিছুর মিশ্র কথা বলিলেন, উত্তরে কিছুর মিশ্র কথা শুনিলেন। তার পর কয় জনে মিলিয়া ঋষি ঠাকুরের আঘাতে গল্প সকল শুনিতে লাগিলেন।

মার্কণ্ডেয়ের কথা ফুরাইলে দ্রৌপদী সত্যভামাতে কিছুর কথা হইল। পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে দ্রৌপদী সত্যভামার সংবাদ গণিত হইয়াছে; কিন্তু অনুক্রমণিকাধ্যায়ে ইহার কোন প্রসঙ্গ নাই। ইহা যে প্রক্ষিপ্ত, তাহা পূর্বে বলিয়াছি।

তাহার পর বিরাটপর্ব। বিরাটপর্বে কৃষ্ণ দেখা দেন নাই—কেবল শেষে উত্তরার বিবাহে আসিয়া উপস্থিত। আসিয়া যে সকল কথাবার্তা বলিয়াছিলেন, তাহা উদ্যোগপর্বে আছে। উদ্যোগপর্বে কৃষ্ণের অনেক কথা আছে। ক্রমশঃ সমালোচনা করিব।

পঞ্চম খণ্ড

উপপ্লব্য

সর্বভূতাত্মভূতায় ভূতাদিনিধনায় চ।

অক্রোধদ্রোহমোহায় তস্মৈ শান্তাত্মনে নমঃ ॥

শান্তিপর্ব্ব, ৪৭ অধ্যায়ঃ।

প্রথম পরিচ্ছেদ—মহাভারতের যুদ্ধের সেনোদ্যোগ

এক্ষণে উদ্যোগপর্ব্বের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

সমাজে অপরাধী আছে। মনুষ্যগণ পরস্পরের প্রতি অপরাধ সর্বদাই করিতেছে। সেই অপরাধের দমন সমাজে একটি মূখ্য কার্য। রাজনীতি রাজদণ্ড ব্যবস্থাশাস্ত্র ধর্মশাস্ত্র আইন আদালত সকলেরই একটি মূখ্য উদ্দেশ্য তাই।

অপরাধীর পক্ষে কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, নীতিশাস্ত্রে তৎসম্বন্ধে দুইটি মত আছে। এক মত এই যে—দণ্ডের দ্বারা অর্থাৎ বলপ্রয়োগের দ্বারা দোষের দমন করিতে হইবে—আর একটি মত এই যে, অপরাধ ক্ষমা করিবে। বল এবং ক্ষমা দুইটি পরস্পর বিরোধী—কাজেই দুইটি মত যথার্থ হইতে পারে না। অথচ দুইটির মধ্যে একটি যে একেবারে পরিহার্য, এমন হইতে পারে না। সকল অপরাধ ক্ষমা করিলে সমাজের ধ্বংস হয়, সকল অপরাধ দণ্ডিত করিলে মনুষ্য পশুত্ব প্রাপ্ত হয়। অতএব বল ও ক্ষমার সামঞ্জস্য নীতিশাস্ত্রের মধ্যে একটি অতি কঠিন তত্ত্ব। আধুনিক সুসভ্য ইউরোপ ইহার সামঞ্জস্যে অদ্যাপি পের্ণীছিতে পারিলেন না। ইউরোপীয়দিগের খ্রীষ্টধর্ম বলে, সকল অপরাধ ক্ষমা কর; তাহাদিগের রাজনীতি বলে, সকল অপরাধ দণ্ডিত কর। ইউরোপে ধর্ম অপেক্ষা রাজনীতি প্রবল, এজন্য ক্ষমা ইউরোপে লুপ্তপ্রায়, এবং বলের প্রবল প্রতাপ।

বল ও ক্ষমার যথার্থ সামঞ্জস্য এই উদ্যোগপর্ব্বমধ্যে প্রধান তত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণই তাহার মীমাংসক, প্রধানতঃ শ্রীকৃষ্ণই উদ্যোগপর্ব্বের নায়ক। বল ও ক্ষমা উভয়ের প্রয়োগ সম্বন্ধে তিনি যে রূপ আদর্শ কার্যতঃ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্ব্ব দেখিয়াছি। যে তাহার নিজের অনিষ্ট করে, তিনি তাহাকে ক্ষমা করেন, এবং যে লোকের অনিষ্ট করে, তিনি বলপ্রয়োগপূর্ব্বক তাহার প্রতি দণ্ডবিধান করেন। কিন্তু এমন অনেক স্থলে ঘটে, যেখানে ঠিক এই বিধান অনুসারে কার্য চলে না, অথবা এই বিধানানুসারে বল কি ক্ষমা প্রযোজ্য, তাহার বিচার কঠিন হইয়া পড়ে। মনে কর, কেহ আমার সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছে। আপনার সম্পত্তি উদ্ধার সামাজিক ধর্ম। যদি সকলেই আপনার সম্পত্তি উদ্ধারে পরাঙ্মুখ হয়, তবে সমাজ অচিরে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। অতএব অপহৃত সম্পত্তির উদ্ধার করিতে হইবে। এখনকার দিনে সভ্য সমাজ সকলে, আইন আদালতের সাহায্যে, আমরা আপন আপন সম্পত্তির উদ্ধার করিতে পারি। কিন্তু যদি এমন ঘটে যে, আইন-আদালতের সাহায্য প্রাপ্য নহে, সেখানে বলপ্রয়োগ ধর্মসঙ্গত কি না? বল ও ক্ষমার সামঞ্জস্য সম্বন্ধে এই সকল কূট তর্ক উঠিয়া থাকে। কার্যতঃ প্রায় দেখিতে পাই যে, যে বলবান্, সে বলপ্রয়োগের দিকেই যায়। যে দুর্বল, সে ক্ষমার দিকেই যায়। কিন্তু যে বলবান্ অথচ ক্ষমাবান্, তাহার কি করা কর্তব্য? অর্থাৎ আদর্শ পুরুষের এরূপ স্থলে কি কর্তব্য? তাহার মীমাংসা উদ্যোগপর্ব্বের আরম্ভেই আমরা কৃষ্ণবাক্যে পাইতেছি।

ভরসা করি, পাঠকেরা সকলেই জানেন যে, পাণ্ডবেরা দ্যুতক্রীড়ায় শকুনির নিকট হারিয়া এই পণে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, আপনাদিগের রাজ্য দুর্য্যোধনকে সম্প্রদান করিয়া দ্বাদশ বর্ষ বনবাস করিবেন। তৎপরে এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিবেন; যদি অজ্ঞাতবাসের ঐ এক বৎসরের মধ্যে কেহ তাহাদিগের পরিচয় পায়, তবে তাহারা রাজ্য পুনর্বার প্রাপ্ত হইবেন না, পুনর্বার দ্বাদশ বর্ষ জন্য বনগমন করিবেন। কিন্তু যদি কেহ পরিচয় না পায়, তবে তাহারা দুর্য্যোধনের নিকট আপনাদিগের রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন। এক্ষণে তাহারা দ্বাদশ বর্ষ বনবাস সম্পূর্ণ করিয়া, বিরাটরাজের পুরীমধ্যে এক বৎসর অজ্ঞাতবাস সম্পন্ন করিয়াছেন; ঐ বৎসরের মধ্যে কেহ তাহাদিগের পরিচয়

পায় নাই। অতএব তাঁহারা দুর্যোধনের নিকট আপনাদিগের রাজ্য পাইবার ন্যায়তঃ ও ধর্মতঃ অধিকারী। কিন্তু দুর্যোধন রাজ্য ফিরাইয়া দিবে কি? না দিবারই সম্ভাবনা। যদি না দেয়, তবে কি করা কর্তব্য? যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বধ করিয়া রাজ্যের পুনরুদ্ধার করা কর্তব্য কি না?

অজ্ঞাতবাসের বৎসর অতীত হইলে পাণ্ডবেরা বিরাটরাজের নিকট পরিচিত হইলেন। বিরাটরাজ তাঁহাদিগের পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া আপনার কন্যা উত্তরাকে অর্জুনপুত্র অভিমন্যুকে সম্প্রদান করিলেন। সেই বিবাহ দিতে অভিমন্যুর মাতুল কৃষ্ণ ও বলদেব ও অন্যান্য যাদবেরা আসিয়াছিলেন। এবং পাণ্ডবদিগের শ্বশুর দ্রুপদ এবং অন্যান্য কুটুম্বগণও আসিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে বিরাটরাজের সভায় আসীন হইলে, পাণ্ডব-রাজ্যের পুনরুদ্ধার প্রসঙ্গটা উত্থাপিত হইল। নৃপতিগণ “শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।” তখন শ্রীকৃষ্ণ রাজাদিগকে সম্বোধন করিয়া অবস্থা সকল বুঝাইয়া বলিলেন। যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা বুঝাইয়া, তারপর বলিলেন, “এক্ষণে কৌরব ও পাণ্ডবগণের পক্ষে যাহা হিতকর, ধর্ম্য, যশস্কর ও উপযুক্ত, আপনারা তাহাই চিন্তা করুন।”

কৃষ্ণ এমন কথা বলিলেন না যে, যাহাতে রাজ্যের পুনরুদ্ধার হয়, তাহারই চেষ্টা করুন। কেন না, হিত, ধর্ম, যশ হইতে বিচ্ছিন্ন যে রাজ্য, তাহা তিনি কাহারও প্রার্থনীয় বিবেচনা করেন না। তাই পুনর্বার বুঝাইয়া বলিতেছেন, “ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অধর্মাগত সুরসাম্রাজ্যও কামনা করেন না, কিন্তু ধর্মার্থসংযুক্ত একটি গ্রামের আধিপত্যেও অধিকতর অভিলাষী হইয়া থাকেন।” আমরা পূর্বে বুঝাইয়াছি যে, আদর্শ মনুষ্য সন্ন্যাসী হইলে চলিবে না—বিষয়ী হইতে হইবে। বিষয়ীর এই প্রকৃত আদর্শ। অধর্মাগত সুরসাম্রাজ্যও কামনা করিব না, কিন্তু ধর্মতঃ আমি যাহার অধিকারী, তাহার এক তিলও বণ্ডককে ছাড়িয়া দিব না; ছাড়িলে কেবল আমি একা দঃখী হইব, এমন নহে, আমি দঃখী না হইতেও পারি, কিন্তু সমাজবিধবৎসের পথাবলম্বনরূপ পাপ আমাকে স্পর্শ করিবে।

তারপর কৃষ্ণ কৌরবদিগের লোভ ও শঠতা, যুধিষ্ঠিরের ধার্মিকতা এবং তাঁহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধ বিবেচনাপূর্বক ইতিকর্তব্যতা অবধারণ করিতে রাজগণকে অনুরোধ করিলেন। নিজের অভিপ্রায়ও কিছু ব্যক্ত করিলেন। বলিলেন, যাহাতে দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যাদর্শ প্রদান করেন—এইরূপ সন্ধির নিমিত্ত কোন ধার্মিক পুরুষ দত্ত হইয়া তাঁহার নিকট গমন করুন। কৃষ্ণের অভিপ্রায় যুদ্ধ নহে, সন্ধি। তিনি এতদূর যুদ্ধের বিরুদ্ধ যে, অর্দ্ধরাজ্য মাত্র প্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট থাকিয়া সন্ধিস্থাপন করিতে পরামর্শ দিলেন, এবং শেষ যখন যুদ্ধ অলঙ্ঘনীয় হইয়া উঠিল, তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি সে যুদ্ধে স্বয়ং অস্ত্রধারণ করিয়া নরশোণিতস্রোত বৃদ্ধি করিবেন না।

কৃষ্ণের বাক্যাবসানে বলদেব তাঁহার বাক্যের অনুমোদন করিলেন, যুধিষ্ঠিরকে দ্যুতক্রীড়ার জন্য কিছু নিন্দা করিলেন, এবং শেষে বলিলেন যে, সন্ধি দ্বারা সম্পাদিত অর্থই অর্থকর হইয়া থাকে, কিন্তু যে অর্থ সংগ্রাম দ্বারা উপার্জিত, তাহা অর্থই নহে। সুরাপায়ী বলদেবের এই কথাগুলি সোণার অক্ষরে লিখিয়া ইউরোপের ঘরে ঘরে রাখিলে মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল হইতে পারে।

বলদেবের কথা সমাপ্ত হইলে সাত্যকি গাত্রোথান করিয়া (পাঠক দেখিবেন, সে কালেও “Parliamentary procedure” ছিল) প্রতিবক্তৃত্ব করিলেন। সাত্যকি নিজে মহাবলবান্ বীরপুরুষ, তিনি কৃষ্ণের শিষ্য এবং মহাভারতের যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষীয় বীরদিগের মধ্যে অর্জুন ও অভিমন্যুর পরেই তাঁহার প্রশংসা দেখা যায়। কৃষ্ণ সন্ধির প্রস্তাব করায় সাত্যকি কিছু বলিতে সাহস করেন নাই, বলদেবের মুখে ঐ কথা শুনিয়া সাত্যকি ক্ষুব্ধ হইয়া বলদেবকে ক্রীব কাপুরুষ ইত্যাদি বাক্যে অপমানিত করিলেন। দ্যুতক্রীড়ার জন্য বলদেব যুধিষ্ঠিরকে যেটুকু দোষ দিয়াছিলেন, সাত্যকি তাহার প্রতিবাদ করিলেন, এবং আপনার অভিপ্রায় এই প্রকাশ করিলেন যে, যদি কৌরবেরা পাণ্ডবদিগকে তাহাদের পৈতৃক রাজ্য সমস্ত প্রত্যর্পণ না করেন, তবে কৌরবদিগকে সমূলে নিম্মূল করাই কর্তব্য।

তারপর বৃদ্ধ দ্রুপদের বক্তৃত্ব। দ্রুপদও সাত্যকির মতাবলম্বী। তিনি যুদ্ধার্থ উদ্যোগ করিতে, সৈন্য সংগ্রহ করিতে এবং মিত্ররাজগণের নিকট দত্ত প্রেরণ করিতে পাণ্ডবগণকে পরামর্শ দিলেন। তবে তিনি এমনও বলিলেন যে, দুর্যোধনের নিকটেও দত্ত প্রেরণ করা হউক।

বাংকম রচনাবলী

পারিশেষে কৃষ্ণ পুনর্বার বক্তৃতা করিলেন। দুঃপদ প্রাচীন এবং সম্বন্ধে গুরুতর, এই জন্য কৃষ্ণ স্পষ্টতঃ তাঁহার কথায় বিরোধ করিলেন না। কিন্তু এমন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন যে, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তিনি স্বয়ং সে যুদ্ধে নির্লিপ্ত থাকিতে ইচ্ছা করেন। তিনি বলিলেন, “কুরু ও পাণ্ডবদিগের সহিত আমাদের তুল্য সম্বন্ধ, তাঁহারা কখন মর্যাদালঙ্ঘনপূর্ব্বক আমাদের সহিত অশিষ্ট ব্যবহার করেন নাই। আমরা বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া এখানে আগমন করিয়াছি, এবং আপনিও সেই নিমিত্ত আসিয়াছেন। এক্ষণে বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে, আমরা পরমাত্মদে নিজ নিজ গৃহে প্রতিগমন করিব।” গুরুজনকে ইহার পর আর কি ভৎসনা করা যাইতে পারে? কৃষ্ণ আরও বলিলেন যে, “যদি দুর্য্যোধন সন্ধি না করে, তাহা হইলে অগ্রে অন্যান্য ব্যক্তিদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া পশ্চাৎ আমাদেরকে আহ্বান করিবেন,” অর্থাৎ “এ যুদ্ধে আসিতে আমাদের বড় ইচ্ছা নাই।” এই কথা বলিয়া কৃষ্ণ দ্বারকা চলিয়া গেলেন।

আমরা দেখিলাম যে, কৃষ্ণ যুদ্ধে নিতান্ত বিপক্ষ, এমন কি, তজ্জন্য অর্দ্ধরাজ্য পরিত্যাগেও পাণ্ডবদিগকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। আরও দেখিলাম যে, তিনি কৌরব পাণ্ডবদিগের মধ্যে পক্ষপাতশূন্য উভয়ের সহিত তাঁহার তুল্য সম্বন্ধ স্বীকার করেন। পরে যাহা ঘটিল, তাহাতে এই দুই কথারই আরও বলবৎ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

এদিকে উভয় পক্ষের যুদ্ধের উদ্যোগ হইতে লাগিল, সেনা সংগৃহীত হইতে লাগিল, এবং রাজগণের নিকট দূত গমন করিতে লাগিল। কৃষ্ণকে যুদ্ধে বরণ করিবার জন্য অর্জুন স্বয়ং দ্বারকায় গেলেন। দুর্য্যোধনও তাই করিলেন। দুই জনে এক দিনে এক সময়ে কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাহার পর যাহা ঘটিল, মহাভারত হইতে তাহা উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

“বাসুদেব তৎকালে শয়ান ও নিদ্রাভিত্ত হইলেন। প্রথমে রাজা দুর্য্যোধন তাঁহার শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার মস্তকসমীপন্যস্ত প্রশস্ত আসনে উপবেশন করিলেন। ইন্দ্রনন্দন পশ্চাৎ প্রবেশপূর্ব্বক বিনীত ও কৃতাজলি হইয়া যাদবপতির পদতলসমীপে সমাসীন হইলেন। অনন্তর বৃষ্ণনন্দন জাগরিত হইয়া অগ্রে ধনঞ্জয় পরে দুর্য্যোধনকে নয়নগোচর করিবামাত্র স্বাগত প্রশ্ন সহকারে সৎকারপূর্ব্বক আগমন হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন।

দুর্য্যোধন সহাস্য বদনে কহিলেন, ‘হে যাদব! এই উপস্থিত যুদ্ধে আপনাকে সাহায্য দান করিতে হইবে। যদিও আপনার সহিত আমাদের উভয়েরই সমান সম্বন্ধ ও তুল্য সৌহৃদ্য; তথাপি আমি অগ্রে আগমন করিয়াছি। সাধুগণ প্রথমাগত ব্যক্তির পক্ষই অবলম্বন করিয়া থাকেন; আপনি সাধুগণের শ্রেষ্ঠ ও মাননীয়; অতএব অদ্য সেই সদাচার প্রতিপালন করুন।’

কৃষ্ণ কহিলেন, ‘হে কুরুবীর! আপনি যে অগ্রে আগমন করিয়াছেন, এ বিষয়ে আমার কিছু মাত্র সংশয় নাই; কিন্তু আমি কুন্তীকুমারকে অগ্রে নয়নগোচর করিয়াছি, এই নিমিত্ত আমি আপনাদের উভয়কেই সাহায্য করিব। কিন্তু ইহা প্রসিদ্ধ আছে, অগ্রে বালকেরই বরণ করিবে, অতএব অগ্রে কুন্তীকুমারের বরণ করাই উচিত। এই বলিয়া ভগবান্ যদুনন্দন ধনঞ্জয়কে কহিলেন—হে কৌন্তেয়! অগ্রে তোমারই বরণ গ্রহণ করিব। আমার সমযোদ্ধা নারায়ণ নামে এক অর্ষদ গোপ, এক পক্ষের সৈনিক পদ গ্রহণ করুক। আর অন্য পক্ষে আমি সমরপরাশ্রমুখ ও নিরস্ত্র হইয়া অবস্থান করি, ইহার মধ্যে যে পক্ষ তোমার হৃদয়তর, তাহাই অবলম্বন কর।

ধনঞ্জয় অরাতিমর্দন জনামর্দন সমরপরাশ্রমুখ হইবেন, শ্রবণ করিয়াও তাঁহারে বরণ করিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন অর্ষদ নারায়ণী সেনা প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণকে সমরে পরাশ্রমুখ বিবেচনা করতঃ প্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন।”

উদ্যোগপর্ব্বের এই অংশ সমালোচনা করিয়া আমরা এই কয়টি কথা বৃষ্ণিতে পারি।

প্রথম—যদিও কৃষ্ণের অভিপ্রায় যে, কাহারও আপনার ধর্ম্মার্থসংযুক্ত অধিকার পরিত্যাগ করা কর্তব্য নহে, তথাপি বলের অপেক্ষা ক্ষমা তাঁহার বিবেচনায় এত দূর উৎকৃষ্ট যে, বলপ্রয়োগ করার অপেক্ষা অর্দ্ধেক অধিকার পরিত্যাগ করাও ভাল।

দ্বিতীয়—কৃষ্ণ সম্বন্ধে সমদর্শী। সাধারণ বিশ্বাস এই যে, তিনি পাণ্ডবদিগের পক্ষ, এবং কৌরবদিগের বিপক্ষ। উপরে দেখা গেল যে, তিনি উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে পক্ষপাতশূন্য।

তৃতীয়—তিনি স্বয়ং অদ্বিতীয় বীর হইয়াও যুদ্ধের প্রতি বিশেষ প্রকারে বিরাগযুক্ত। প্রথমে যাহাতে যুদ্ধ না হয়, এইরূপ পরামর্শ দিলেন, তারপর যখন যুদ্ধ নিতান্তই উপস্থিত হইল, এবং অগত্যা তাঁহাকে এক পক্ষে বরণ হইতে হইল, তখন তিনি অস্ত্রত্যাগে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ

হইয়া বরণ হইলেন। এরূপ মাহাত্ম্য আর কোন ক্ষত্রিয়েরই দেখা যায় না, জিতেন্দ্রিয় এবং সর্বত্যাগী ভীষ্মেরও নহে।

আমরা দেখিব যে, যাহাতে যুদ্ধ না হয়, তজ্জন্য কৃষ্ণ ইহার পরেও অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যিনি সকল ক্ষত্রিয়ের মধ্যে যুদ্ধের প্রধান শত্রু, এবং যিনি একাই সর্বত্র সমদর্শী, লোকে তাঁহাকেই এই যুদ্ধের প্রধান পরামর্শদাতা, অনুষ্ঠাতা এবং পাণ্ডবপক্ষের প্রধান কুচক্রী বলিয়া স্থির করিয়াছে। কাজেই এত সবিস্তারে কৃষ্ণচরিত্র সমালোচনার প্রয়োজন হইয়াছে।

তারপর, নিরস্ত্র কৃষ্ণকে লইয়া অর্জুন যুদ্ধের কোন কাৰ্য্যে নিযুক্ত করিবেন, ইহা চিন্তা করিয়া, কৃষ্ণকে তাঁহার সারথ্য করিতে অনুরোধ করিলেন। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সারথ্য অতি হেয় কাৰ্য্য। যখন মদুরাজ শল্য কর্ণের সারথ্য করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন, তখন তিনি বড় রাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু আদর্শপুরুষ অহঙ্কারশূন্য। অতএব কৃষ্ণ অর্জুনের সারথ্য তখনই স্বীকার করিলেন। তিনি সর্বদোষশূন্য এবং সর্বগুণান্বিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—সঞ্জয়যান

উভয় পক্ষে যুদ্ধের উদ্যোগ হইতে থাকুক। এদিকে দ্রুপদের পরামর্শানুসারে যুদ্ধিষ্ঠিরাদি দ্রুপদের পুরোহিতকে ধৃতরাষ্ট্রের সভায় সন্ধিস্থাপনের মানসে প্রেরণ করিলেন, কিন্তু পুরোহিত মহাশয় কৃতকাৰ্য্য হইতে পারিলেন না। কেন না, বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্রবেধ্য ভূমিও প্রত্যর্পণ করা দুর্য্যোধনাদির অভিপ্রায় নহে। এদিকে যুদ্ধে ভীমার্জুন ও কৃষ্ণকে* ধৃতরাষ্ট্রের বড় ভয়; অতএব যাহাতে পাণ্ডবেরা যুদ্ধ না করে, এমন পরামর্শ দিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্র আপনার অমাত্য সঞ্জয়কে পাণ্ডবদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন। “তোমাদের রাজ্যও আমরা অধর্ম করিয়া কাড়িয়া লইব, কিন্তু তোমরা তজ্জন্য যুদ্ধও করিও না, সে কাজটা ভাল নহে,” এরূপ অসঙ্গত কথা বিশেষ নিলঞ্জ ব্যক্তি নহিলে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না। কিন্তু দূতের লজ্জা নাই। অতএব সঞ্জয় পাণ্ডবসভায় আসিয়া দীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতার স্থূলমর্ম এই যে, “যুদ্ধ বড় গুরুতর অধর্ম, তোমরা সেই অধর্ম প্রবৃত্ত হইয়াছ, অতএব তোমরা বড় অধার্মিক!” যুদ্ধিষ্ঠির, তদন্তরে অনেক কথা বলিলেন, তন্মধ্যে আমাদের যেটুকু প্রয়োজনীয়, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

“হে সঞ্জয়! এই পৃথিবীতে দেবগণেরও প্রার্থনীয় যে সমস্ত ধন সম্পত্তি আছে, তৎসমুদায় এবং প্রাজাপত্য স্বর্গ এবং ব্রহ্মলোক এই সকলও অধর্মতঃ লাভ করিতে আমার বাসনা নাই। যাহা হউক, মহাত্মা কৃষ্ণ ধর্মপ্রদাতা, নীতিসম্পন্ন ও ব্রাহ্মণগণের উপাসক। উনি কোরব ও পাণ্ডব উভয় কুলেরই হিতৈষী এবং বহুসংখ্যক মহাবলপরাক্রান্ত ভূপতিগণকে শাসন করিয়া থাকেন। এক্ষণে উনিই বলুন যে, যদি আমি সন্ধিপথ পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে নিন্দনীয় হই, আর যদি যুদ্ধে নিবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমার স্বধর্ম পরিত্যাগ করা হয়, এ স্থলে কি কর্তব্য। মহাপ্রভাব শিনির নপ্তা এবং চৌদি, অক্ষক, বৃষ্ণ, ভোজ, কুকুর ও সঞ্জয়বংশীয়গণ বাসুদেবের বুদ্ধিপ্রভাবেই শত্রু দমনপূর্বক সুহৃদগণকে আনন্দিত করিতেছেন। ইন্দ্রকম্প উগ্রসেন প্রভৃতি বীর সকল

* বিপক্ষেরাও যে এক্ষণে কৃষ্ণের সর্বপ্রাধান্য স্বীকার করিতেন, তাহার অনেক প্রমাণ উদ্যোগপর্বে পাওয়া যায়। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগের অন্যান্য সহায়ের নামোল্লেখ করিয়া পরিশেষে বলিয়াছিলেন, “বৃষ্ণসিংহ কৃষ্ণ ষাঁহাদিগের সহায়, তাঁহাদিগের প্রতাপ সহ্য করা কাহার সাধ্য?” (২১ অধ্যায়) পুনশ্চ বলিতেছেন, “সেই কৃষ্ণ এক্ষণে পাণ্ডবদিগকে রক্ষা করিতেছেন। কোন শত্রু বিজয়াভিলাষী হইয়া দ্বৈরথযুদ্ধে তাঁহার সম্মুখীন হইবে? হে সঞ্জয়! কৃষ্ণ পাণ্ডবার্থে যেরূপ পরাক্রম প্রকাশ করেন, তাহা আমি শ্রবণ করিয়াছি। তাঁহার কাৰ্য্য অনুক্ষণ স্মরণ করত আমি শান্তিলাভে বঞ্চিত হইয়াছি; কৃষ্ণ ষাঁহাদিগের অগ্রণী, কোন ব্যক্তি তাঁহাদিগের প্রতাপ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে? কৃষ্ণ অর্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়াছেন শুনিয়া ভয়ে আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে।” আর এক স্থানে ধৃতরাষ্ট্র বলিতেছেন কিন্তু “কেশবও অধর্ম্য, লোকত্রয়ের অধিপতি, এবং মহাত্মা। যিনি সর্বলোকে একমাত্র বরণ্য, কোন মনুষ্য তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিবে?” এইরূপ অনেক কথা আছে।

বঙ্কিম রচনাবলী

এবং মহাবলপরাক্রান্ত মনস্বী সত্যপরায়ণ যাদবগণ কৃষ্ণ কর্তৃক সততই উপদেষ্ট হইয়া থাকেন। কৃষ্ণ গ্রাতা ও কর্তা বালয়াই কাশীশ্বর ব্রহ্ম উত্তম শ্রী প্রাপ্ত হইয়াছেন; গ্রীষ্মাবসানে জলদজাল যেমন প্রজাদিগকে বারিদান করে, তদ্রূপ বাসুদেব কাশীশ্বরকে সমুদায় অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করিয়া থাকেন। কৰ্ম্মনিশ্চয়জ্ঞ কেশব ঈদৃশ গুণসম্পন্ন, ইনি আমাদের নিতান্ত প্রিয় ও সাধুতম, আমি কদাচ ইহার কথার অন্যথাচরণ করিব না।”

বাসুদেব কহিলেন, “হে সঞ্জয়! আমি নিরন্তর পাণ্ডবগণের অবিনাশ, সমৃদ্ধি ও হিত এবং সপুত্র রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অভ্যুদয় বাসনা করিয়া থাকি। কোরব ও পাণ্ডবগণের পরস্পর সন্ধি সংস্থাপন হয়, ইহা আমার অভিপ্রেত, আমি উহাদিগকে ইহা ব্যতীত আর কোন পরামর্শ প্রদান করি না। অন্যান্য পাণ্ডবগণের সমক্ষে রাজা যুধিষ্ঠিরের মুখেও অনেক বার সন্ধি সংস্থাপনের কথা শুনিয়াছি; কিন্তু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও তাহার পুত্রগণ সাতিশয় অর্থলোভী, পাণ্ডবগণের সহিত তাহার সন্ধি সংস্থাপন হওয়া নিতান্ত দুষ্কর, সুতরাং বিবাদ যে ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? হে সঞ্জয়! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও আমি কদাচ ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হই নাই, ইহা জানিয়া শুনিয়াও তুমি কি নিমিত্ত স্বকৰ্ম্মসাধনোদ্যত উৎসাহসম্পন্ন স্বজন-পরিপালক রাজা যুধিষ্ঠিরকে অধার্ম্মিক বলিয়া নির্দেশ করিলে?”

এই পর্য্যন্ত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই কথাটা কৃষ্ণচরিত্রে বড় প্রয়োজনীয়। আমরা বলিয়াছি, তাহার জীবনের কাজ দুইটি—ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থাপন এবং ধর্ম্ম-প্রচার। মহাভারতে তাহার কৃত ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার প্রচারিত ধর্ম্মের কথা প্রধানতঃ ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত গীতা-পর্বাধ্যায়েই আছে। এমন বিচার উঠিতে পারে যে, গীতায় যে ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে, তাহা গীতাকার কৃষ্ণের মুখে বসাইয়াছেন বটে, কিন্তু সে ধর্ম্ম যে কৃষ্ণ-প্রচারিত কি গীতাকার-প্রণীত, তাহার স্থিরতা কি? সৌভাগ্যক্রমে আমরা গীতা-পর্বাধ্যায় ভিন্ন মহাভারতের অন্যান্য অংশেও কৃষ্ণদত্ত ধর্ম্মোপদেশ দেখিতে পাই। যদি আমরা দেখি যে, গীতায় যে অভিনব ধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে আর মহাভারতের অন্যান্য অংশে কৃষ্ণ যে ধর্ম্ম ব্যাখ্যাত করিতেছেন, ইহার মধ্যে একতা আছে, তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি যে, এই ধর্ম্ম কৃষ্ণপ্রণীত এবং কৃষ্ণপ্রচারিতই বটে। মহাভারতের ঐতিহাসিকতা যদি স্বীকার করি, আর যদি দেখি যে, মহাভারতকার যে ধর্ম্মব্যাখ্যা স্থানে স্থানে কৃষ্ণে আরোপ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বত্র এক প্রকৃতির ধর্ম্ম, যদি পুনশ্চ দেখি যে, সেই ধর্ম্ম প্রচলিত ধর্ম্ম হইতে ভিন্নপ্রকৃতির ধর্ম্ম; তবে বলিব, এই ধর্ম্ম কৃষ্ণেরই প্রচারিত। আবার যদি দেখি যে, গীতায় যে ধর্ম্ম সবিস্তারে এবং পূর্ণতার সহিত ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার সহিত ঐ কৃষ্ণপ্রচারিত ধর্ম্মের সঙ্গে ঐক্য আছে, উহা তাহারই আংশিক ব্যাখ্যা মাত্র, তবে বলিব যে, গীতোক্ত ধর্ম্ম যথার্থই কৃষ্ণপ্রণীত বটে।

এখন দেখা যাউক, কৃষ্ণ এখানে সঞ্জয়কে কি বলিতেছেন।

“শুচি ও কুটুম্বপরিপালক হইয়া বেদাধ্যয়ন করতঃ জীবনযাপন করিবে, এইরূপ শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিধি বিদ্যমান থাকিলেও ব্রাহ্মণগণের নানা প্রকার বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। কেহ কৰ্ম্মবশতঃ কেহ বা কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র বেদজ্ঞান দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়, এইরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন; কিন্তু যেমন ভোজন না করিলে তৃপ্তিলাভ হয় না, তদ্রূপ কৰ্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া কেবল বেদজ্ঞ হইলে ব্রাহ্মণগণের কদাচ মোক্ষলাভ হয় না। যে সমস্ত বিদ্যা দ্বারা কৰ্ম্ম সংসাধন হইয়া থাকে, তাহাই ফলবতী; যাহাতে কোন কৰ্ম্মানুষ্ঠানের বিধি নাই, সে বিদ্যা নিতান্ত নিষ্ফল। অতএব যেমন পিপাসার্ত্ত ব্যক্তির জল পান করিবামাত্র পিপাসা শান্তি হয়, তদ্রূপ ইহকালে যে সকল কৰ্ম্মের ফল প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তাহারই অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। হে সঞ্জয়! কৰ্ম্মবশতঃই এইরূপ বিধি বিহিত হইয়াছে; সুতরাং কৰ্ম্মই সর্ব্বপ্রধান। যে ব্যক্তি কৰ্ম্ম অপেক্ষা অন্য কোন বিষয়কে উৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া থাকে, তাহার সমস্ত কৰ্ম্মই নিষ্ফল হয়।

“দেখ, দেবগণ কৰ্ম্মবলে প্রভাবসম্পন্ন হইয়াছেন; সমীরণ কৰ্ম্মবলে সতত সঞ্চার করিতেছেন; দিবাকর কৰ্ম্মবলে আলস্যশূন্য হইয়া অহোরাত্র পরিভ্রমণ করিতেছেন; চন্দ্রমা কৰ্ম্মবলে নক্ষত্রমণ্ডলী-পরিবৃত্ত হইয়া মাসান্দক উদিত হইতেছেন, হুতাশন কৰ্ম্মবলে প্রজাগণের কৰ্ম্ম সংসাধন করিয়া নিরর্বাচ্ছন্ন উত্তাপ প্রদান করিতেছেন; পৃথিবী কৰ্ম্মবলে নিতান্ত দুর্ভর ভার অনায়াসেই বহন করিতেছেন; স্রোতস্বতী সকল কৰ্ম্মবলে প্রাণিগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া সলিলরাশি ধারণ করিতেছেন; অমিতবলশালী দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিবার

নির্মিত ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি সেই কর্মবলে দশ দিক্ ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া বারিবর্ষণ করিয়া থাকেন এবং অপ্রমত্তচিত্তে ভোগাভিলাষ বিসর্জন ও প্রিয়বস্তু সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠত্বলাভ এবং দম, ক্ষমা, সমতা, সত্য ও ধর্ম প্রতিপালন-পূর্বক দেবরাজ্য অধিকার করিয়াছেন। ভগবান্ বৃহস্পতি সমাহিত হইয়া ইন্দ্রিয়নিরোধপূর্বক ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; এই নির্মিত তিনি দেবগণের আচার্য্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। রুদ্র, আদিত্য, যম, কুবের, গন্ধর্বা, যক্ষ, অসুর, বিশ্বাসু ও নক্ষত্রগণ কর্মপ্রভাবে বিরাজিত রহিয়াছেন; মহর্ষিগণ ব্রহ্মবিদ্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিয়াছেন।”

কর্মবাদ কৃষ্ণের পূর্বেও প্রচলিত ছিল, কিন্তু সে প্রচলিত মতানুসারে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডই কর্ম। মনুষ্যজীবনের সমস্ত অনুষ্ঠেয় কর্ম, যাহাকে পাশ্চাত্যেরা Duty বলেন—সে অর্থে সে প্রচলিত ধর্ম “কর্ম” শব্দ ব্যবহৃত হইত না। গীতাতেই আমরা দেখি, কর্ম শব্দের পূর্বপ্রচলিত অর্থ পরিবর্তিত হইয়া, যাহা কর্তব্য, যাহা অনুষ্ঠেয়, যাহা Duty, সাধারণতঃ তাহাই কর্ম নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। আর এইখানে হইতেছে। ভাষাগত বিশেষ প্রভেদ আছে—কিন্তু মর্মার্থ এক। এখানে যিনি বক্তা, গীতাতেও তিনিই প্রকৃত বক্তা, এ কথা স্বীকার করা যাইতে পারে।

অনুষ্ঠেয় কর্মের যথাবিহিত নির্বাহের অর্থাৎ ডিউটির সম্পাদনের নামান্তর স্বধর্মপালন। গীতার প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণ স্বধর্মপালনে অর্জুনকে উপদিষ্ট করিতেছেন। এখানেও কৃষ্ণ সেই স্বধর্মপালনের উপদেশ দিতেছেন। যথা,

“হে সঞ্জয়! তুমি কি নির্মিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রভৃতি সকল লোকের ধর্ম সবিশেষ জ্ঞাত হইয়াও কোরবগণের হিতসাধন মানসে পাণ্ডবদিগের নিগ্রহ চেষ্টা করিতেছ? ধর্মরাজ যুদ্ধিষ্ঠির বেদজ্ঞ, অশ্বমেধ ও রাজসূয়যজ্ঞের অনুষ্ঠানকর্তা, যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী এবং হস্ত্যশ্বরথচালনে সূনিপুণ। এক্ষণে যদি পাণ্ডবেরা কোরবগণের প্রাণহিংসা না করিয়া ভীমসেনাকে সান্ত্বনা করতঃ রাজ্যলাভের অন্য কোন উপায় অবধারণ করিতে পারেন, তাহা হইলে ধর্মরক্ষা ও পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান হয়। অথবা ইহারা যদি ক্ষত্রিয়ধর্ম প্রতিপালনপূর্বক স্বকর্ম সংসাধন করিয়া দূরদৃষ্টবশতঃ মৃত্যুমুখে নিপতিত হন, তাহাও প্রশস্ত। বোধ হয়, তুমি সন্ধিসংস্থাপনই শ্রেয়ঃসাধন বিবেচনা করিতেছ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ক্ষত্রিয়দিগের যুদ্ধে ধর্মরক্ষা হয়, কি যুদ্ধ না করিলে ধর্মরক্ষা হয়? ইহার মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করিবে, আমি তাহারই অনুষ্ঠান করিব।”

তার পর শ্রীকৃষ্ণ চতুর্বর্ণের ধর্মকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের যেরূপ ধর্ম কথিত হইয়াছে—এখানেও ঠিক সেইরূপ। এইরূপ মহাভারতে অন্যত্রও ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায় যে, গীতান্তে ধর্ম এবং মহাভারতের অন্যত্র কথিত কৃষ্ণোক্ত ধর্ম এক। অতএব গীতান্তে ধর্ম যে কৃষ্ণোক্ত ধর্ম—সে ধর্ম যে কেবল কৃষ্ণের নামে পরিচিত, এমন নহে—যথার্থই কৃষ্ণপ্রণীত ধর্ম, ইহা এক প্রকার সিদ্ধ। কৃষ্ণ সঞ্জয়কে আরও অনেক কথা বলিলেন। তাহার দুই একটা কথা উদ্ধৃত করিব।

ইউরোপীয়দিগের বিবেচনায় পররাজ্যাপহরণ অপেক্ষা গৌরবের কর্ম কিছুই নাই। উহার নাম “Conquest,” “Glory,” “Extension of Empire” ইত্যাদি ইত্যাদি। যেমন ইংরেজিতে, ইউরোপীয় অন্যান্য ভাষাতেও ঠিক সেইরূপ পররাজ্যাপহরণের গুণানুবাদ। শূদ্র এক “Glorie” শব্দের মোহে মূগ্ধ হইয়া প্রুষ্ণিয়ার দ্বিতীয় ফ্রেড্রীক তিন বার ইউরোপে সমরানল জ্বালিয়া লক্ষ লক্ষ মনুষ্যের সর্বনাশের কারণ হইয়াছিলেন। ঈদৃশ রুধিরপিপাসু রাক্ষস ভিন্ন অন্য ব্যক্তির সহজেই ইহা বোধ হয় যে, এইরূপ “Glorie” ও তস্করতাতে প্রভেদ আর কিছুই নাই—কেবল পররাজ্যাপহারক বড় চোর, অন্য চোর ছোট চোর।* কিন্তু এ কথাটা বলা বড় দায়, কেন না, দিগ্বিজয়ের এমনই একটা মোহ আছে যে, আর্ষ্য ক্ষত্রিয়েরাও মূগ্ধ হইয়া অনেক সময়ে ধর্মধর্ম ভুলিয়া যাইতেন। ইউরোপে কেবল Diogenes মহাবীর

* তবে যেখানে কেবল পরোপকারার্থ পরের রাজ্য হস্তগত করা যায়, সেখানে নাকি ভিন্ন কথা হইতে পারে। সেরূপ কার্যের বিচারে আমি সক্ষম নহি—কেন না, রাজনীতিজ্ঞ নহি।

বাঁকম রচনাবলী

আলেকজান্ডরকে বলিয়াছিলেন, “তুমি এক জন বড় সদ্য মাত্র।” ভারতবর্ষেও শ্রীকৃষ্ণ পররাজ্যলোলুপ রাজাদিগকে তাই বলিতেছেন,—তাঁহার মতে ছোট চোর লুকাইয়া চুরি করে, বড় চোর প্রকাশ্যে চুরি করে। তিনি বলিতেছেন,

“তম্ভকর দৃশ্য বা অদৃশ্য হইয়া হঠাৎ যে সর্বস্ব অপহরণ করে, উভয়ই নিন্দনীয়। সুতরাং দুর্যোধনের কার্যও একপ্রকার তম্ভকরকার্য বলিয়া প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে।”

এই তম্ভকরদিগের হাত হইতে নিজস্ব রক্ষা করাকে কৃষ্ণ পরম ধর্ম বিবেচনা করেন। আধুনিক নীতিজ্ঞদিগেরও সেই মত। ছোট চোরের হাত হইতে নিজস্ব রক্ষার ইংরেজি নাম Justice; বড় চোরের হাত হইতে নিজস্ব রক্ষার নাম Patriotism। উভয়েরই দেশীয় নাম স্বধর্মপালন। কৃষ্ণ বলিতেছেন, “এই বিষয়ের জন্য প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাও শ্লাঘনীয়, তথাপি পৈতৃক রাজ্যের পুনরুদ্ধারের জন্য বিমুখ হওয়া কোন ক্রমেই উচিত নহে।”

কৃষ্ণ সঞ্জয়ের ধর্মের ভাঙামি শুনিয়া সঞ্জয়কে কিছু সঙ্গত তিরস্কারও করিলেন। বলিলেন, “তুমি এক্ষণে রাজা যুধিষ্ঠিরকে ধর্মোপদেশ প্রদান করিতে অভিলাষী হইয়াছ, কিন্তু তৎকালে (যখন দুর্যোধন সভামধ্যে দ্রৌপদীর উপর অশ্রাব্য অত্যাচার করে) সভামধ্যে দুর্যোধনকে ধর্মোপদেশ প্রদান কর নাই।” কৃষ্ণ সচরাচর প্রিয়বাদী, কিন্তু যথার্থ দোষকীর্তনকালে বড় স্পষ্টবক্তা। সত্যই সর্বকালে তাঁহার নিকট প্রিয়।

সঞ্জয়কে তিরস্কার করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ করিলেন যে, উভয় পক্ষের হিত সাধনার্থ স্বয়ং হস্তিনা নগরে গমন করিবেন। বলিলেন, “যাহাতে পাণ্ডবগণের অর্থহানি না হয়, এবং কৌরবেরাও সন্ধি সংস্থাপনে সম্মত হন, এক্ষণে তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিতে হইবে। তাহা হইলে, সুমহৎ পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান হয়, এবং কৌরবগণও মৃত্যুপাশ হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন।”

লোকের হিতার্থ, অসংখ্য মনুষ্যের প্রাণরক্ষার্থ, কৌরবেরও রক্ষার্থ, কৃষ্ণ এই দুষ্কর কর্মে স্বয়ং উপযাচক হইয়া প্রবৃত্ত হইলেন। মনুষ্যশক্তিতে দুষ্কর কর্ম, কেন না, এক্ষণে পাণ্ডবেরা তাঁহাকে বরণ করিয়াছে; এজন্য কৌরবেরা তাঁহার সঙ্গে শত্রুবৎ ব্যবহার করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু লোকহিতার্থ তিনি নিরস্ত হইয়া শত্রুপুত্রীমধ্যে প্রবেশ করাই শ্রেয় বিবেচনা করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—যানসন্ধি

এইখানে সঞ্জয়যান-পর্বাধ্যায় সমাপ্ত। সঞ্জয়যান-পর্বাধ্যায়ে শেষ ভাগে দেখা যায় যে, কৃষ্ণ হস্তিনা যাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন, এবং বাস্তবিক তাহার পরেই তিনি হস্তিনায় গমন করিলেন বটে। কিন্তু সঞ্জয়যান-পর্বাধ্যায় ও ভগবদ্‌যান-পর্বাধ্যায়ের মধ্যে আর তিনটি পর্বাধ্যায় আছে: “প্রজাগর,” “সনৎসুজাত”, এবং “যানসন্ধি।” প্রথম দুইটি প্রক্ষিপ্ত, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উহাতে মহাভারতের কথাও কিছুই নাই—অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম ও নীতিকথা আছে। কৃষ্ণের কোন কথাই নাই, সুতরাং ঐ দুই পর্বাধ্যায়ে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই।

যানসন্ধি-পর্বাধ্যায়ে সঞ্জয় হস্তিনায় ফিরিয়া আসিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে যাহা যাহা বলিলেন, এবং তচ্ছবণে ধৃতরাষ্ট্র, দুর্যোধন এবং অন্যান্য কৌরবগণে যে বাদানুবাদ হইল, তাহাই কথিত আছে। বক্তৃতা সকল অতি দীর্ঘ, পুনরুক্তির অত্যন্ত বাহুল্যবিশিষ্ট এবং অনেক সময়ে নিঃপ্রয়োজনীয়। কৃষ্ণের প্রসঙ্গ, ইহার দুই স্থানে আছে।

প্রথম, অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে। ধৃতরাষ্ট্র অতিবিস্তারে অজ্জর্নবাক্য সঞ্জয়-মুখে শুনিয়া, আবার হঠাৎ সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “বাসুদেব ও ধনঞ্জয় যাহা কহিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছি, অতএব তাহাই কীর্তন কর।”

তদন্তরে, সঞ্জয়, সভাতলে যে সকল কথাবার্তা হইয়াছিল, তাহার কিছুই না বলিয়া, এক আঘাতে গল্প আরম্ভ করিলেন। বলিলেন যে, তিনি পার্টিপ পার্টিপ,—অর্থাৎ চোরের মত, পাণ্ডবদিগের অন্তঃপুরমধ্যে অভিমন্যু প্রভৃতিরও অগম্য স্থানে গমন করিয়া কৃষ্ণাজ্জর্নের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। দেখেন, কৃষ্ণাজ্জর্ন মদ খাইয়া উন্মত্ত। অজ্জর্ন, দ্রৌপদী ও সত্যভামার পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া আছেন। কথাবার্তা নতন কিছুই হইল না। কৃষ্ণ কেবল কিছু

দম্ভের কথা বলিলেন,—বলিলেন, “আমি যখন সহায়, তখন অজ্জর্ন সকলকে মারিয়া ফেলিবে।”

তার পর অজ্জর্ন কি বলিলেন, সে কথা এখানে আর কিছু নাই, অথচ ধৃতরাষ্ট্র তাহা শুনিতে চাহিয়াছিলেন। অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের শেষে আছে, “অনন্তর মহাবীর কিরীটী তাঁহার (কৃষ্ণের) বাক্য সকল শুনিয়া লোমহর্ষণ বচন প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।” এই কথায় পাঠকের এমন মনে হইবে যে, বর্ষা ঊনষষ্টিতম অধ্যায়ে অজ্জর্ন যাহা বলিলেন, তাহাই কথিত হইতেছে। সে দিক্ দিয়া ঊনষষ্টিতম অধ্যায় যায় নাই। ঊনষষ্টিতম অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে কিছু অনুরোধ করিয়া সন্ধি স্থাপন করিতে বলিলেন। ষষ্টিতম অধ্যায়ে দুর্যোধন প্রত্যুত্তরে বাপকে কিন্তু কড়া কড়া শুনাইয়া দিল। একষষ্টিতম অধ্যায়ে কর্ণ আসিয়া মাঝে পড়িয়া বক্তৃতা করিলেন। ভীষ্ম তাঁহাকে উত্তম মধ্যম রকম শুনাইলেন। কর্ণে ভীষ্মে বাধিয়া গেল। দ্বিষষ্টিতমে দুর্যোধনে ভীষ্মে বাধিয়া গেল। ত্রিষষ্টিতমে ভীষ্মের বক্তৃতা। চতুঃষষ্টিতমে বাপ বেটায় আবার বাধিল। পরে, এত কালের পর আবার হঠাৎ ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন যে, অজ্জর্ন কি বলিলেন? তখন সঞ্জয় সেই অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের ছিন্ন সূত্র যোড়া দিয়া অজ্জর্নবাক্য বলিতে লাগিলেন। বোধ করি, কোন পাঠকেরই এখন সংশয় নাই যে, ৫৯।৬০। ৬১।৬২।৬৩।৬৪ অধ্যায়গুলি প্রক্ষিপ্ত। এই কয় অধ্যায়ে মহাভারতের ক্রিয়া এক পদও অগ্রসর হইতেছে না। এই অধ্যায়গুলি বড় স্পষ্টতঃ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ইহার উল্লেখ করিলাম।

যে সকল কারণে এই ছয় অধ্যায়কে প্রক্ষিপ্ত বলা যাইতে পারে, অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়কেও সেই কারণে প্রক্ষিপ্ত বলা যাইতে পারে—পরবর্তী এই অধ্যায়গুলি প্রক্ষিপ্তের উপর প্রক্ষিপ্ত। অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সম্বন্ধে আরও বলা যাইতে পারে যে, ইহা কেবল অপ্রাসঙ্গিক এবং অসংলগ্ন এমন নহে, পূর্বে কৃষ্ণবাক্যের সম্পূর্ণ বিরোধী। এই সকল বক্তৃত্ত্বের কিছু মাত্র প্রসঙ্গ অনুরূপিকাধ্যায়ে বা পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে নাই। বোধ হয়, কোন রসিক লেখক, অসুরনিপাতন শৌরি এবং সুরনিপাতিনী সুরা, উভয়েরই ভক্ত; একত্র উভয় উপাস্যকে দেখিবার জন্য অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়টি প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন।

যানসন্ধি-পর্বাধ্যায়ে এই গেল কৃষ্ণসম্বন্ধীয় প্রথম প্রসঙ্গ। দ্বিতীয় প্রসঙ্গ, সপ্তষষ্টিতম হইতে সপ্ততিতম পর্যন্ত চারি অধ্যায়ে। এখানে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের জিজ্ঞাসা মতে কৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করিতেছেন। সঞ্জয় এখানে পূর্বে যাঁহাকে মদ্যপানে উন্মত্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাকেই জগদীশ্বর বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। বোধ হয় ইহাও প্রক্ষিপ্ত। প্রক্ষিপ্ত হউক না হউক, ইহাতে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। যদি অন্য কারণে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে আমাদের বিশ্বাস থাকে, তবে সঞ্জয়বাক্যে আমাদের প্রয়োজন কি? আর যদি সে বিশ্বাস না থাকে, তবে সঞ্জয়বাক্যে এমন কিছু নাই যে, তাহার বলে আমাদের সে বিশ্বাস হইতে পারে। অতএব সঞ্জয়বাক্যের সমালোচনা আমাদের নিষ্প্রয়োজনীয়। কৃষ্ণের মানুষ-চরিত্রের কোন কথাই তাহাতে আমরা পাই না। তাহাই আমাদের সমালোচ্য।

এইখানে যানসন্ধি পর্বাধ্যায় সমাপ্ত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনা-যাত্রার প্রস্তাব

শ্রীকৃষ্ণ, পূর্বেকৃত অঙ্গীকারানুসারে সন্ধি স্থাপনার্থ কৌরবদিগের নিকট যাইতে প্রস্তুত হইলেন। গমনকালে পাণ্ডবেরা ও দ্রৌপদী, সকলেই তাঁহাকে কিছু কিছু বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদিগের কথার উত্তর দিলেন। এই সকল কথোপকথন অবশ্য ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। তবে কবি ও ইতিহাসবেত্তা যে সকল কথা কৃষ্ণের মুখে বলাইয়াছেন, তাহার দ্বারা বুঝা যায় যে, কৃষ্ণের পরিচয় তিনি অবগত ছিলেন। ঐ সকল বক্তৃতা হইতে আমরা কিছু কিছু উদ্ধৃত করিব।

যুধিষ্ঠিরের কথার উত্তরে কৃষ্ণ এক স্থানে বলিতেছেন, “হে মহারাজ, ব্রহ্মচার্য্যাদি ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বিধেয় নহে। সমুদায় আশ্রমীরা ক্ষত্রিয়ের ভৈক্ষ্যচরণ নিষেধ করিয়া থাকেন। বিধাতা সংগ্রামে জয়লাভ বা প্রাণপরিত্যাগ ক্ষত্রিয়ের নিত্যধর্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন; অতএব দীনতা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিতান্ত নিন্দনীয়। হে অরার্তিনিপাতন যুধিষ্ঠির! আপনি দীনতা

বিক্রম রচনাবলী

অবলম্বন করিলে, কখনই স্বীয় অংশ লাভ করিতে পারিবেন না। অতএব বিক্রম প্রকাশ করিয়া শত্রুগণকে বিনাশ করুন।”

গীতাতেও অর্জুনকে কৃষ্ণ এইরূপ কথা বলিয়াছেন দেখা যায়। ইহা হইতে যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায়, তাহা পদার্থে বদ্বান গিয়াছে। পদার্থ ভীমের কথার উত্তরে বলিতেছেন, “মনুষ্য পদার্থকার পরিত্যাগপদার্থকে কেবল দৈব বা দৈব পরিত্যাগপদার্থকে কেবল পদার্থকার অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া কর্ম প্রবৃত্ত হয়, সে কর্ম সিদ্ধ না হইলে ব্যর্থ বা কর্ম সিদ্ধ হইলে সন্তুষ্ট হয় না।”

গীতাতেও এইরূপ উক্তি আছে।* অর্জুনের কথার উত্তরে কৃষ্ণ বলিতেছেন, “উর্ধ্বর ক্ষেত্রে যথানিয়মে হলাচালন বীজবপনাদি করিলেও বর্ষা ব্যতীত কখনই ফলোৎপত্তি হয় না। পদার্থ যদি পদার্থকার সহকারে তাহাতে জল সেচন করে, তথাপি দৈবপ্রভাবে উহা শুষ্ক হইতে পারে। অতএব প্রাচীন মহাত্মাগণ দৈব ও পদার্থকার উভয় একত্র মিলিত না হইলে কার্যসিদ্ধি হয় না বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আমি যথাসাধ্য পদার্থকার প্রকাশ করিতে পারি; কিন্তু দৈব কর্মের অনুষ্ঠানে আমার কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই।”

এ কথার উল্লেখ আমরা পদার্থে করিয়াছি। কৃষ্ণ এখানে দৈব একেবারে অস্বীকার করিলেন। কেন না, তিনি মানুষী শক্তির দ্বারা কর্ম সাধনে প্রবৃত্ত। ঐশী শক্তির দ্বারা কর্মসাধন ঈশ্বরের অভিপ্রেত হইলে, অবতারের কোন প্রয়োজন থাকে না।

অন্যান্য বক্তার কথা সমাপ্ত হইলে, দ্রোপদী কৃষ্ণকে কিছু বলিলেন। তাঁহার বক্তৃতায় এমন একটা কথা আছে যে, স্ত্রীলোকের মুখে তাহা অতি বিস্ময়কর। তিনি বলিতেছেন—

“অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করিলে যে পাপ হয়, বধ্য ব্যক্তিকে বধ না করিলেও সেই পাপ হইয়া থাকে।”

এই উক্তি স্ত্রীলোকের মুখে বিস্ময়কর হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে, বহু বৎসর পদার্থে বঙ্গদর্শনে আমি দ্রোপদীচরিত্রের যে রূপ পরিচয় দিয়াছিলাম, তাহার সঙ্গে এই বাক্যের অত্যন্ত সুসঙ্গতি আছে। আর স্ত্রীলোকের মুখে ভাল শুনাক্ না শুনাক্, ইহা যে প্রকৃত ধর্ম, এবং কৃষ্ণেরও যে এই মত, ইহাও আমি জরাসন্ধবধের সমালোচনাকালে ও অন্য সময়ে বদ্বাইয়াছি।

দ্রোপদীর এই বক্তৃতার উপসংহারকালে এক অপদার্থ কবি-কৌশল আছে। তাহা উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

“অসিতাপাঙ্গী দ্রুপদনন্দিনী এই কথা শুনিয়া কুটিলাগ্র, পরম রমণীয়, সর্বগন্ধাধিবাসিত, সর্বলক্ষণসম্পন্ন, মহাভূজগদশ কেশকলাপ ধারণ করিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে দীননয়নে পুনরায় কৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন, হে জনান্দন! দুরাত্মা দুরাশাসন আমার এই কেশ আকর্ষণ করিয়াছিল। শত্রুগণ সন্ধিস্থাপনের মত প্রকাশ করিলে তুমি এই কেশকলাপ স্মরণ করিবে। ভীমার্জুন দীনের ন্যায় সন্ধি স্থাপনে কৃতসংকল্প হইয়াছেন; তাহাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি নাই, আমার বন্ধ পিতা মহারথ পদার্থগণ সমাভিব্যাহারে শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করিবেন, আমার মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র অভিমন্যুকে পদার্থকৃত করিয়া কোরবগণকে সংহার করিবে। দুরাত্মা দুরাশাসনের শ্যামল বাহু ছিল, ধরাতলে নিপতিত ও পাংশুলনিষ্ঠ না দেখিলে আমার শান্তিলাভের সম্ভাবনা কোথায়? আমি হৃদয়ক্ষেত্রে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় ক্রোধ স্থাপন পদার্থকে ত্রয়োদশ বৎসর প্রতীক্ষা করিয়াছি। এক্ষণে সেই ত্রয়োদশ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে, তথাপি তাহা উপশমিত হইবার কিছুমাত্র উপায় দেখিতেছি না; আজি আবার ধর্মপথাবলম্বী বৃকোদরের বাক্যশল্যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।

“নিবিড়নিতম্বিনী আয়তলোচনা কৃষ্ণা এই কথা কহিয়া বাস্পগঙ্গদম্বরে কম্পিতকলেবরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, দ্রুপদীভূত হৃতাশনের ন্যায় অত্যাধ নেত্রজলে তাঁহার স্তনযুগল অভিষিক্ত হইতে লাগিল। তখন মহাবাহু বাসুদেব তাঁহারে সান্ত্বনা করতঃ কহিতে লাগিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি অতি অল্প দিন মধ্যেই কোরব মহিলাগণকে রোদন করিতে দেখিবে। তুমি যেমন রোদন করিতেছ, কুরুকুলকামিনীরাও তাহাদের জ্ঞাতি বাসবগণ নিহত হইলে এইরূপ রোদন করিবে। আমি যুধিষ্ঠিরের নিয়োগানুসারে ভীমার্জুন নকুল সহদেব সমাভিব্যাহারে কোরবগণের বধ-

* সিদ্ধাসিন্দোঃ সমো ভূম্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ২ ॥ ৪৮

সাধনে প্রবৃত্ত হইবে। ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ কালপ্রেরিতের ন্যায় আমার বাক্যে অনাদর প্রকাশ করিলে অচিরাৎ নিহত ও শৃগাল কুক্কুরের ভক্ষ্য হইয়া ধরাতলে শয়ন করিবে। যদি হিমবান্ প্রচলিত, মেদিনী উৎক্লিপ্ত ও আকাশমন্ডল নক্ষত্রসমূহের সহিত নিপতিত হয়, তথাপি আমার বাক্য মিথ্যা হইবে না। হে কৃষ্ণ! বাৎস সংবরণ কর, আমি তোমারে যথার্থ কহিতেছি, তুমি অচিরকাল মধ্যেই স্বীয় পতিগণকে শত্রু সংহার করিয়া রাজ্যলাভ করিতে দেখিবে।”

এই উক্তি শোণিতপিপাসুর হিংসাপ্রবৃত্তিজনিত বা হৃদয়ের ক্রোধভিব্যক্তি নহে। যিনি সর্বত্রগামী সর্বকালব্যাপী বুদ্ধির প্রভাবে, ভবিষ্যতে যাহা হইবে, তাহা স্পষ্ট দেখিতে ছিলেন, তাহার ভবিষ্যদ্বক্তি মাত্র। কৃষ্ণ বিলক্ষণ জানিতেন যে, দুর্যোধন রাজ্যাংশ প্রত্যাৰ্ণ-পূর্বক সন্ধি স্থাপন করিতে কদাপি সম্মত হইবে না। ইহা জানিয়াও যে তিনি সন্ধিস্থাপনার্থ কোঁরব-সভায় গমনের জন্য উদ্যোগী, তাহার কারণ এই যে, যাহা অনুষ্টেয়, তাহা সিদ্ধ হউক বা না হউক, করিতে হইবে। সন্ধি ও অসন্ধি তুল্য জ্ঞান করিতে হইবে। ইহাই তাহার মূর্খবিনির্গত গীতোক্ত অমৃতময় ধর্ম। তিনি নিজেই অর্জুনকে শিখাইয়াছেন যে,

সিদ্ধাসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।

সেই নীতির বশবর্তী হইয়া, আদর্শযোগী, ভবিষ্যৎ জানিয়াও সন্ধিস্থাপনের চেষ্টায় কোঁরব-সভায় চলিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—যাত্রা

যাত্রাকালে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত ব্যবহারই মনুষ্যোপযোগী এবং কালোচিত। তিনি “রেবতী নক্ষত্রযুক্ত কার্ত্তিকমাসীয় দিনে মৈত্র মূহূর্ত্তে কোঁরব-সভায় গমন করিবার বাসনায় সুবিশ্বস্ত ব্রাহ্মণগণের মঙ্গল্য পূর্ণ্যনির্ঘোষ শ্রবণ ও প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্বক স্নান ও বসনভূষণ পরিধান করিয়া সূর্য ও বাহির উপাসনা করিলেন; এবং বৃষলাঙ্গুল দর্শন, ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন, অগ্নি প্রদক্ষিণ ও কল্যাণকর দ্রব্য সকল সন্দর্শনপূর্বক” যাত্রা করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যে ধর্ম প্রচারিত করিয়াছেন, তাহাতে তৎকালে প্রবল কাম্যকর্মপরায়ণ যে বৈদিক ধর্ম, তাহার নিন্দাবাদ আছে। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণগণকে কখনও অবমাননা করিতেন না। তিনি আদর্শ মনুষ্য, এই জন্য তৎকালে ব্রাহ্মণদিগের প্রতি যে ব্যবহার উচিত ছিল, তিনি তাহাই করিতেন। তখনকার ব্রাহ্মণেরা বিদ্বান্, জ্ঞানবান্, ধর্মান্বিতা, এবং অস্বার্থপর হইয়া সমাজের মঙ্গলসাধনে নিরত ছিলেন, এজন্য অন্য বর্ণের নিকট, পূজা তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য। কৃষ্ণও সেই জন্য তাহাদিগকে উপযুক্তরূপে পূজা করিতেন। উদাহরণস্বরূপ পৃথিমধ্যে ঋষিগণের সমাগমের বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি।

“মহাবাহু কেশব এইরূপে কিয়দ্দূর গমন করিয়া পথের উভয় পার্শ্বে ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্যমান কতিপয় মহর্ষিরে সন্দর্শন করিলেন। তিনি তাহাদিগকে দেখিবামাত্র অতিমাত্র ব্যাগ্রতাসহকারে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া অভিবাদনপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহর্ষিগণ! সমুদায় লোকের কুশল? ধর্ম উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইতেছে? ঋগির্ষাদি বর্ণগণ ব্রাহ্মণগণের শাসনে অবস্থান করিতেছে? আপনারা কোথায় সিদ্ধ হইয়াছেন? কোথায় যাইতে বাসনা করিতেছেন? আপনাদের প্রয়োজন কি? আমারে আপনাদের কোন কার্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে? এবং আপনারা কি নিমিত্ত ধরণীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন?”

“তখন মহাভাগ জামদগ্ন্য কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, হে মধুসূদন! আমাদের মধ্যে কেহ কেহ দেবর্ষি, কেহ কেহ বহুশ্রুত ব্রাহ্মণ, কেহ কেহ রাজর্ষি এবং কেহ কেহ তপস্বী। আমরা অনেক বার দেবাসুরের সমাগম দেখিয়াছি; এক্ষণে সমুদায় ঋগির্ষ, সভাসদ্ ভূপতি ও আপনারে অবলোকন করিবার বাসনায় গমন করিতেছি। আমরা কোঁরবসভামধ্যে আপনার মূর্খবিনির্গত ধর্মার্থযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। হে যাদবশ্রেষ্ঠ! ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর প্রভৃতি মহাত্মগণ এবং আপনি যে সত্য ও হিতকর বাক্য কহিবেন, আমরা সেই সকল বাক্য শ্রবণে নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি।

“এক্ষণে আপনি সত্বরে কুরুরাজ্যে গমন করুন; আমরা তথায় আপনারে সভামণ্ডপে দিব্য আসনে আসীন ও তেজঃপ্রদীপ্ত দেখিয়া পুনরায় আপনার সহিত কথোপকথন করিব।”

বাংকম রচনাবলী

এখানে ইহাও বক্তব্য যে, এই জামদগ্ন্য পরশুরাম কৃষ্ণের সমসাময়িক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। রামায়ণে আবার তিনি রামচন্দ্রের সমসাময়িক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। অথচ পুরাণে তিনি রাম কৃষ্ণ উভয়েরই পূর্বাগামী বিষ্ণুর অবতারান্তর বলিয়া খ্যাত। পুরাণের দশাবতারবাদ কত দূর সঙ্গত, তাহা আমরা গ্রন্থান্তরে বিচার করিব।

এই হস্তিনাযাত্রার বর্ণনায় জানা যায় যে, কৃষ্ণ নিজেও সাধারণ প্রজার নিকটেও পূজ্য ছিলেন। হস্তিনাযাত্রার বর্ণনা আরও কিছু উদ্ধৃত করিলাম।

“দেবকীনন্দন সর্বশস্যপরিপূর্ণ অতি রম্য সুখাস্পদ পরম পবিত্রশালিভবন এবং অতি মনোহর ও হৃদয়তোষণ বহুবিধ গ্রাম্যপশু সন্দর্শন করত বিবিধ পুর ও রাজ্য অতিক্রম করিলেন। কুরুকুলসংরক্ষিত নিত্যপ্রহৃষ্ট অনর্দিগ্ন ব্যসনরহিত পুরবাসীগণ কৃষ্ণকে দর্শন করিবার মানসে উপপ্লব্য নগর হইতে পথিমধ্যে আগমন করিয়া তাঁহার পথ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাত্মা বাসুদেব সমাগত হইলে তাহারা বিধানানুসারে তাঁহার পূজা করিতে লাগিল।

“এদিকে ভগবান্ মরীচিমালী স্বীয় কিরণজাল পরিত্যাগ করিয়া লোহিত কলেবর ধারণ করিলে অরাতিনিপাতন মধুসূদন বৃকস্থলে সমুপস্থিত হইয়া সঙ্ঘেরে রথ হইতে অবতরণপূর্বক যথাবিধি শৌচ সমাপনান্তে রথাস্থমোচনে আদেশ করিয়া সন্ধ্যার উপাসনা করিতে লাগিলেন। দারুক কৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে অশ্বগণকে রথ হইতে মুক্ত করতঃ শাস্ত্রানুসারে তাহাদের পরিচর্যা ও গাত্র হইতে সমুদয় যোক্তাদি মোচন করিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিল। মহাত্মা মধুসূদন সন্ধ্যা সমাপনান্তে স্বীয় সমাভিব্যাহারী জনগণকে কহিলেন, হে পরিচারকবর্গ! অদ্য যুদ্ধিষ্ঠিরের কার্য্যানুরোধে এই স্থানে রজনী অতিবাহিত করিতে হইবে। তখন পরিচারকগণ তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া ক্ষণকালমধ্যে পটমণ্ডপ নিষ্কারণ ও বিবিধ সুমিষ্ট অন্নপান প্রস্তুত করিল। অনন্তর সেই গ্রামস্থ স্বধর্মাবলম্বী আৰ্য কুলীন ব্রাহ্মণ সমুদায় অরাতিকুলকালান্তক মহাত্মা হৃষীকেশের সমীপে আগমনপূর্বক বিধানানুসারে তাঁহার পূজা ও আশীর্বাদ করিয়া স্ব স্ব ভবনে আনয়ন করিতে বাসনা করিলেন। ভগবান্ মধুসূদন তাঁহাদের অভিপ্রায়ে সম্মত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে অর্চনপূর্বক তাঁহাদের ভবনে গমন করিয়া তাঁহাদিগের সমাভিব্যাহারে পুনরায় স্বীয় পটমণ্ডপে আগমন করিলেন। পরে সেই সমুদায় ব্রাহ্মণগণের সমাভিব্যাহারে সুমিষ্ট দ্রব্যজাত ভোজন করিয়া পরম সুখে যামিনী যাপন করিলেন।

ইহা নিতান্তই মানুষ্যচরিত্র, কিন্তু আদর্শ মনুষ্যের চরিত্র।

দেখা যাইতেছে যে, দেবতা বলিয়া কেহ তাঁহাকে পূজা করিতেছে, এমন কথা নাই। তবে শ্রেষ্ঠ মনুষ্য যেরূপ পূজা পাইবার সম্ভাবনা, তাহাই তিনি পাইতেছেন, এবং আদর্শ মনুষ্যের লোকের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করা সম্ভব, তিনি তাহাই করিতেছেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—হস্তিনায় প্রথম দিবস

কৃষ্ণ আসিতেছেন শুনিয়া, বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার অভ্যর্থনা ও সম্মানের জন্য বড় বেশী রকম উদ্যোগ আরম্ভ করিলেন। নানারত্নসমাকীর্ণ সভা সকল নিষ্কারণ করাইলেন, এবং তাঁহাকে উপঢৌকন দিবার জন্য অনেক হস্তাস্থরথ, দাস, “অজাতাপত্য শতসংখ্যক দাসী,” মেঘ, অশ্বতরী, মণিমাণিক্য ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

বিদুর দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন, “ভাল, ভাল। তুমি যেমন ধার্মিক, তেমনই বুদ্ধিমান। কিন্তু রত্নাদি দিয়া কৃষ্ণকে ঠকাইতে পারিবে না। তিনি যে জন্য আসিতেছেন, তাহা সম্পাদন কর; তাহা হইলেই তিনি সন্তুষ্ট হইবেন—অর্থপ্রলোভিত হইয়া তোমার বশ হইবেন না।

ধৃতরাষ্ট্র ধূর্ত, এবং বিদুর সরল; দুর্ঘোষন দুই। তিনি বলিলেন, “কৃষ্ণ পূজনীয় বটে, কিন্তু তাঁহার পূজা করা হইবে না। যুদ্ধ ত ছাড়িব না; তবে তাঁর সমাদরে কাজ কি? লোকে মনে করিবে, আমরা ভয়েই বা তাঁহার খোশামোদ করিতেছি। আমি তদপেক্ষা সৎ পরামর্শ স্থির করিয়াছি। আমরা তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিব। পাণ্ডবের বল বৃদ্ধি কৃষ্ণ, কৃষ্ণ আটক থাকিলে পাণ্ডবেরা আমার বশীভূত থাকিবে।”

এই কথা শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্রও পুত্রকে তিরস্কার করিতে বাধ্য হইলেন। কেন না, কৃষ্ণ দূত

হইয়া আসিতেছেন। কৃষ্ণভক্ত ভীষ্ম দুর্যোধনকে কতকগুলো কটুক্তি করিয়া সভা হইতে উঠিয়া গেলেন।

নাগরিকেরা, এবং কোরবেরা বহু সম্মানের সহিত কৃষ্ণকে কুরুসভায় আনীত করিলেন। তাঁহার জন্য যে সকল সভা নির্মিত ও রত্নজাত রক্ষিত হইয়াছিল, তিনি তৎপ্রতি দৃষ্টিপাতও করিলেন না। তিনি ধৃতরাষ্ট্রভবনে গমন করিয়া কুরুসভায় উপবেশনপূর্বক, যে যেমন যোগ্য, তাহার সঙ্গে সেইরূপ সংসম্বাষণ করিলেন। পরে সেই রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া, দীনবন্ধু এক দীনভবনে চলিলেন।

বিদুর, ধৃতরাষ্ট্রের এক রকম ভাই। উভয়েরই ব্যাসদেবের ঔরসে জন্ম। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র রাজা বিচিত্রবীর্ষের ক্ষেত্রজ পুত্র; বিদুর তাহা নহে। তিনি, বিচিত্রবীর্ষের দাসী এক বৈশ্যার গর্ভে জন্মিয়াছিলেন। তাঁহাকে বিচিত্রবীর্ষের ক্ষেত্রজ ধরিলেও, তাঁহার জাতি নির্ণয় হয় না। কেন না, ব্রাহ্মণের ঔরসে, ক্ষত্রিয়ের ক্ষেত্রে, বৈশ্যার গর্ভে তাঁহার জন্ম।* তিনি সামান্য ব্যক্তি, কিন্তু পরম ধার্মিক। কৃষ্ণ রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া তাঁহার বাড়ীতে গিয়া, তাঁহার নিকট আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। সেই জন্য, আজিও এ দেশে “বিদুরের খুদ,” এই বাক্য প্রচলিত আছে। পাণ্ডবমাতা কুন্তী, কৃষ্ণের পিতৃস্বসা, সেইখানে বাস করিতেন। বনগমনকালে পাণ্ডবেরা তাঁহাকে সেইখানে রাখিয়াছিলেন। কৃষ্ণ কুন্তীকে প্রণাম করিতে গেলেন। কুন্তী পুত্রগণ ও পুত্রবধুর দৃঃখের বিবরণ শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণের নিকট অনেক কাঁদাকাটা করিলেন। উত্তরে কৃষ্ণ যাহা বলিলেন, তাহা অমূল্য। যে ব্যক্তি মনুষ্য-চরিত্রের সর্বপ্রদেশ সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়াছে, সে ভিন্ন আর কেহই সে কথার অমূল্যত্ব বুঝিবে না। মূর্খের ত কথাই নাই। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,

“পাণ্ডবগণ, নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্রোধ, হর্ষ, ক্ষুধা, পিপাসা, হিম, রৌদ্র পরাজয় করিয়া বীরোচিত সুখে নিরত রহিয়াছেন। তাঁহারা ইন্দ্রিয়সুখ পরিত্যাগ করিয়া বীরোচিত সুখে সন্তুষ্ট আছেন; সেই মহাবলপরাক্রান্ত মহোৎসাহসম্পন্ন বীরগণ কদাচ অল্পে সন্তুষ্ট হইবেন না। বীরব্যক্তির হই অতিশয় ক্লেশ, না হয় অত্যুক্ত সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন; আর ইন্দ্রিয়সুখাভিলাষী ব্যক্তিগণ মধ্যাবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকে; কিন্তু উহা দৃঃখের আকর; রাজ্যলাভ বা বনবাস সুখের নিদান।”

“রাজ্যলাভ বা বনবাস”† এ কথা ত আধুনিক হিন্দু বুঝে না। বুঝিলে, এত দৃঃখ

* মহাভারতীয় নায়কদিগের সকলেরই জাতি সম্বন্ধে এইরূপ গোলযোগ। পাণ্ডবদিগের সম্বন্ধে এইরূপ গোলযোগ। পাণ্ডবদিগের প্রপিতামহী সত্যবতী, দাসকন্যা। ভীষ্মের মার জাতি লুকাইবার বোধ হয় বিশেষ প্রয়োজন ছিল, এজন্য তিনি গঙ্গানন্দন। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু ব্রাহ্মণের ঔরসে, ক্ষত্রিয়ের গর্ভজাত। ব্যাস নিজে সেই ধীবরনন্দিনীর কানীনপুত্র। অতএব পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্রের জাতি সম্বন্ধে এত গোলযোগ যে, এখনকার দিনে, তাঁহারা সর্বজাতির অপাত্তেয় হইতেন। পাণ্ডুর পুত্রগণ, কুন্তীর গর্ভজাত বটে, কিন্তু বাপের বোটা নহেন; পাণ্ডু নিজে পুত্রোৎপাদনে অক্ষম। তাঁহারা ইন্দ্রাদির ঔরস পুত্র বলিয়া পরিচিত। এদিকে, দ্রোণাচার্যের পিতা ভরদ্বাজ ঋষি, কিন্তু মা একটা কলসী; কলসীর গর্ভধারণ যাঁহাদের বিশ্বাস না হইবে, তাঁহারা দ্রোণের মাতৃকুল সম্বন্ধে বিশেষ সন্দিহান হইবেন। পাণ্ডবদিগের পিতা সম্বন্ধে যত গোলযোগ, কর্ণ সম্বন্ধেও তত—বেশীর ভাগ তিনি কানীন। দ্রৌপদী ও ধৃষ্টদ্যুম্নের বাপ মা কে, কেহ বলিতে পারে না; তাঁহারা যজ্ঞোদ্ভূত।

এ সময়ে কিন্তু, বিবাহ সম্বন্ধে কোন গোলযোগ ছিল না। অনুলোম প্রতিলোম বিবাহের কথা বলিতেছি না। অনেক ঋষির ধর্মপত্নীও ক্ষত্রিয়কন্যা ছিলেন; যথা, অগস্ত্যপত্নী লোপামুদ্রা, ঋষ্যশৃঙ্গের স্ত্রী শান্তা, ঋচীকভার্য্যা, জমদগ্নির ভার্য্যা (কেহ কেহ বলেন, পরশুরামের ভার্য্যা) রেণুকা ইত্যাদি। এমনও কথা আছে যে, পরশুরাম পৃথিবী ক্ষত্রিয়শূন্য করিলে, ব্রাহ্মণদিগের ঔরসে পরবর্তী ক্ষত্রিয়েরা জন্মিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণকন্যা দেবযানী, ক্ষত্রিয় যযাতির ধর্মপত্নী। আহারাদি সম্বন্ধে কোন বাঁধাবাঁধ ছিল না, তাহাও ইতিহাসে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, পরস্পরের অন্নভোজন করিতেন।

† মিল্টনের ক্ষুদ্রচেতা সয়তান্ বলিয়াছিল যে, স্বর্গে দাসত্বের অপেক্ষা বরং নরকে রাজত্ব শ্রেয়ঃ। আমি জানি যে, আমার এমন পাঠক অনেক আছেন, যাঁহারা এই ক্ষুদ্রোক্তির সঙ্গে উপরিলিখিত মহতী বাণীর কোন প্রভেদ দেখিবেন না। তাঁহাদিগের মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণরূপে আশাশূন্য। লঘুচেতা, পরের প্রভুত্ব সহ্য করিতে পারে না। মহাত্মা, কর্তব্যানুরোধে তাহা পারেন, কিন্তু মহাত্মা

বিক্রম রচনাবলী

থাকিত না। যে দিন বৃষ্টিবে, সে দিন আর দৃষ্টি থাকিবে না। হিন্দু পুরাণেতিহাসে এমন কথা থাকিতে আমরা কি না, মেম সাহেবদের লেখা নবেল পড়িয়া দিন কাটাই, না হয় সভা করিয়া পাঁচ জনে জুটিয়া পাঁথর মত কিঁচির মিঁচির করি।

কৃষ্ণ কুন্তীকে আরও বলিলেন, “আপনি তাহাদিগকে শত্রুবিনাশ করিয়া সকল লোকের আধিপত্য ও অতুল সম্পত্তি ভোগ করিতে দেখিবেন।”

অতএব কৃষ্ণ নিশ্চিত জানিতেন যে, সন্ধি হইবে না—যুদ্ধ হইবে। তথাপি সন্ধি স্থাপন জন্য হস্তিনায় আসিয়াছেন; কেন না, যে কৰ্ম্ম অনুষ্ঠেয়, তাহা সন্ধি হইক বা না হইক, তাহার অনুষ্ঠান করিতে হয়, ফলাফলে অনাসক্ত হইয়া কৰ্ত্তব্য সাধন করিতে হয়। ইহাকেই তিনি গীতায় কৰ্ম্মযোগ বলিয়া বুঝাইয়াছেন। যুদ্ধের অপেক্ষা সন্ধি মনুষ্যের হিতকর; এই জন্য সন্ধিস্থাপন অনুষ্ঠেয়। কিন্তু যখন যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া সন্ধিস্থাপন করিতে পারিলেন না, তখন কৃষ্ণই আবার যুদ্ধে বীতশ্রদ্ধ অর্জুনের প্রধান উৎসাহদাতা ও সহায়। কেন না, যখন সন্ধি অসাধ্য, তখন যুদ্ধই অনুষ্ঠেয় ধৰ্ম্ম। অতএব যে কৰ্ম্মযোগ তিনি গীতায় উপদিষ্ট করিয়াছেন, তিনি নিজেই তাহাতে প্রধান যোগী। তাহার আদর্শ চরিত্র পুণ্ড্রপুণ্ড্র সমালোচনে আমরা প্রকৃত মনুষ্যত্ব কি, তাহা বুঝিতে পারিব বলিয়াই এত প্রয়াস পাইতেছি।

কৃষ্ণ, কুন্তীর নিকট হইতে বিদায় হইয়া পুনর্বার কোঁরব-সভায় গমন করিলেন। সেখানে গেলে, দুর্যোধন তাহাকে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না। দুর্যোধন ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষ্ণ প্রথমে তাহাকে লৌকিক নীতিটা স্মরণ করাইয়া দিলেন। বলিলেন, “দুঃখগণ কার্যসম্পাদনান্তে ভোজন ও পূজা গ্রহণ করিয়া থাকে; অতএব আমি কৃতকার্য হইলেই আপনার পূজা গ্রহণ করিব।” দুর্যোধন তবুও ছাড়ে না; আবার পীড়াপীড়ি করিল। তখন কৃষ্ণ বলিলেন,

“লোকে হয় প্রীতিপূর্ব্বক অথবা বিপন্ন হইয়া অন্যের অন্ন ভোজন করে। আপনি প্রীতি সহকারে আমাকে ভোজন করাইতে বাসনা করেন নাই; আমিও বিপদগ্রস্ত হই নাই, তবে কি নিমিত্ত আপনার অন্ন ভোজন করিব?”

ভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ একটা সামান্য কৰ্ম্ম; কিন্তু আমাদের দৈনিক জীবন, সচরাচর কতকগুলো সামান্য কৰ্ম্মের সমবায় মাত্র। সামান্য কৰ্ম্মের জন্য একটা নীতি আছে অথবা থাকা উচিত। বৃহৎ কৰ্ম্ম সকলের নীতির যে ভিত্তি, ক্ষুদ্র কৰ্ম্ম সকলের নীতিরও সেই ভিত্তি। সে ভিত্তি ধৰ্ম্ম। তবে উন্নতচরিত্র মনুষ্যের সঙ্গে ক্ষুদ্রচেতার এই প্রভেদ যে, ক্ষুদ্রচেতা ধৰ্ম্ম পরাজম্বু না হইলেও, সামান্য বিষয়ে নীতির অনুবর্ত্তী হইতে সক্ষম হইবেন না, কেন না, নীতির ভিত্তি তিনি অনুসন্ধান করেন না। আদর্শ মনুষ্য এই ক্ষুদ্র বিষয়েও নীতির ভিত্তি অনুসন্ধান করিলেন। দেখিলেন যে, এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ সরলতা ও সত্যের বিরুদ্ধ হয়। অতএব দুর্যোধনকে সরল ও সত্য উত্তর দিলেন, স্পষ্ট কথা পরুষ হইলেও তাহা বলিতে সঙ্কুচিত হইলেন না। যেখানে অকপট ব্যবহার ধৰ্ম্মানুমত হয়, সেখানেও তাহা পরুষ বলিয়া আমরা পরাজম্বু। এই ধৰ্ম্মবিরুদ্ধ লজ্জা অনেক সময়ে আমরাইগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধৰ্ম্মে বিপন্নও করে।

কৃষ্ণ তার পর কুরুসভা হইতে উঠিয়া, বিদুরের ভবনে গমন করিলেন।

বিদুরের সঙ্গে রাগিতে তাহার অনেক কথোপকথন হইল। বিদুর তাহাকে বুঝাইলেন যে, তাহার হস্তিনায় আসা অনুচিত হইয়াছে; কেন না, দুর্যোধন কোন মতেই সন্ধি স্থাপন করিবে না। কৃষ্ণের উত্তর হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

“যিনি অশ্বকুঞ্জরথসমবেত বিপর্য্যস্ত সমুদায় পৃথিবী মৃত্যুপাশ হইতে বিমুক্ত করিতে সমর্থ হন, তাহার উৎকৃষ্ট ধৰ্ম্মলাভ হয়।”

ইউরোপের প্রতি রাজপ্রাসাদে এই কথাগুলি স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখা উচিত। সিমলার রাজপ্রাসাদেও বাদ না পড়ে। কৃষ্ণ পুনশ্চ বলিতেছেন,

“যে ব্যক্তি ব্যসনগ্রস্ত বান্ধব মুক্ত করিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্নবান্ না হন, পণ্ডিতগণ

জানেন যে, মহাদৃষ্টি বা মহাসূত্র ব্যতীত, তাহার বহুবিস্তারাকাঙ্ক্ষণী চিত্তবৃত্তি সকল সফলপ্রাপ্ত হইতে পারে না।

তাঁহারা নৃশংস বলিয়া কীৰ্ত্তন করেন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মিত্রের কেশ পর্য্যন্ত ধারণ করিয়া তাহাকে অকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিবেন। * * * * যদি তিনি (দুর্য্যোধন) আমার হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়াও আমার প্রতি শঙ্কা করেন, তাহাতে আমার কিছ্ মাত্র ক্ষতি নাই; প্রত্যুত আত্মীয়কে সদুপদেশ প্রদান নিবন্ধন পরম সন্তোষ ও আনন্ধ্য লাভ হইবে। যে ব্যক্তি জ্ঞাতভেদ সময়ে সৎপরামর্শ প্রদান না করে, সে ব্যক্তি কখনও আত্মীয় নহে।”

ইউরোপীয়দিগের বিশ্বাস, কৃষ্ণ কেবল পরম্প্রীলুদ্ধ পাঁপিষ্ঠ গোপ; এ দেশের লোকের কাহারও বা সেইরূপ বিশ্বাস, কাহারও বিশ্বাস যে, তিনি মনুষ্যহত্যার জন্য অবতীর্ণ, কাহারও বিশ্বাস, তিনি “চক্রী”—অর্থাৎ স্বাভিলাষসিদ্ধি জন্য কুচক্র উপস্থিত করেন। তিনি যে এ সকল নহেন—তিনি যে তৎপরিবর্ত্তে লোকহিতৈষীর শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ, ধর্ম্মোপদেশটার শ্রেষ্ঠ, আদর্শ মনুষ্য—ইহাই বৃদ্ধাইবার জন্য এই সকল উদ্ধৃত করিতেছি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ—হস্তিনায় দ্বিতীয় দিবস

পরাদিন প্রাতে স্বয়ং দুর্য্যোধন ও শকুনি আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বিদুরভবন হইতে কোরবসভায় লইয়া গেলেন। অতি মহতী সভা হইল। নারদাদি দেবর্ষি, এবং জমদগ্নি প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষি তথায় উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ পরম বাগ্মতার সহিত দীর্ঘ বক্তৃতায় ধৃতরাষ্ট্রকে সন্ধিস্থাপনে প্রবৃত্তি দিতে লাগিলেন। ঋষিগণও সেইরূপ করিলেন। কিছ্ হইল না। ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, “আমার সাধ্য নহে, দুর্য্যোধনকে বল।” দুর্য্যোধনকে কৃষ্ণ, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি অনেক প্রকার বৃদ্ধাইলেন। সন্ধি স্থাপন দূরে থাক, দুর্য্যোধন কৃষ্ণকে কড়া কড়া শুনাইয়া দিলেন। কৃষ্ণও তাহার উপযুক্ত উত্তর দিলেন। দুর্য্যোধনের দৃষ্টিচরিত্র ও পাপাচরণ সকল বৃদ্ধাইয়া দিলেন। ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্য্যোধন উঠিয়া গেলেন।

তখন কৃষ্ণ, যাহা সমস্ত পৃথিবীর রাজনীতির মূলসূত্র, তদনুসারে কার্য্য করিতে ধৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দিলেন। রাজশাসনের মূলসূত্র এই যে, প্রজারক্ষার্থ দৃষ্কৃতকারীকে দণ্ডিত করিবে। অর্থাৎ অনেকের হিতার্থ একের দণ্ড বিধেয়। সমাজের রক্ষার্থ হত্যাকারীর বধ বিহিত। যাহাকে বন্ধ না করিলে তাহার পাপাচরণে বহুসহস্র প্রাণীর প্রাণসংহার হইবে, তাহাকে বন্ধ করাই জ্ঞানীর উপদেশ। ইউরোপীয় সমস্ত রাজা ও রাজমন্ত্রী পরামর্শ করিয়া এই জন্য খ্রীঃ ১৮১৫ অব্দে নাপোলেয়নকে যাবজ্জীবন আবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই জন্য মহানীতিজ্ঞ কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দিলেন যে, দুর্য্যোধনকে বাঁধিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি করুন। তিনি নিজে, সমস্ত যদুবংশের রক্ষার্থ, কংস মাতুল হইলেও তাহাকে বধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি সে উদাহরণও দিলেন। বলা বাহুল্য যে, এ পরামর্শ গৃহীত হইল না।

এদিকে দুর্য্যোধন রুষ্ট হইয়া কৃষ্ণকে আবদ্ধ করিবার জন্য কর্ণের সঙ্গে পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

সাত্যকি, কৃতবর্ষ্মা প্রভৃতি কৃষ্ণের জ্ঞাতিবর্গ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সাত্যকি কৃষ্ণের নিতান্ত অনুরাগত ও প্রিয়; অস্প্রবিদ্যায় অজ্জর্ননের শিষ্য, এবং প্রায় অজ্জর্ননতুল্য বীর। ইঙ্গিতজ্ঞ মহাবুদ্ধিমান সাত্যকি এই মন্ত্রণা জানিতে পারিলেন। তিনি অন্যতর যাদববীর কৃতবর্ষ্মাকে সসৈন্যে পুরদ্বারে প্রস্থিত থাকিতে বলিয়া কৃষ্ণকে এই মন্ত্রণা জানাইলেন। এবং সভামধ্যে প্রকাশ্যে ইহা ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতিকে জানাইলেন। শুনিয়া বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন,

“যেমন পতঙ্গগণ পাবকে পতিত হইয়া বিনষ্ট হয়, ইহাদের দশাও কি সেইরূপ হইবে না? সেইরূপ জনান্দর্ন ইচ্ছা করিলে যুদ্ধকালে সকলকেই শমনসদনে প্রেরণ করিবেন।” ইত্যাদি।

পরে কৃষ্ণ যাহা বলিলেন, তাহা যথার্থই আদর্শ পুরুষের উক্তি। তিনি বলশালী, সুতরাং ক্রোধশূন্য এবং ক্ষমাশীল। তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন,

“শুনিতোছি, দুর্য্যোধন প্রভৃতি সকলে ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে বলপূর্ব্বক নিগৃহীত করিবেন। কিন্তু আপনি অনুরাগিত করিয়া দেখুন, আমি ইহাদিগকে আক্রমণ করি, কি ইহারা আমাকে আক্রমণ করেন। আমার এরূপ সামর্থ্য আছে যে, আমি একাকী ইহাদিগকে সকলকে নিগৃহীত করিতে পারি। কিন্তু আমি কোন প্রকারেই নিন্দিত পাপজনক কর্ম্ম করিব না। আপনার পুত্রেরাই পাণ্ডবগণের অর্থে লোলুপ হইয়া স্বার্থভ্রষ্ট হইবেন। বস্তুতঃ ইহারা আমাকে

বাঁকম রচনাবলী

নিগৃহীত করিতে ইচ্ছা করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কৃতকার্য করিতেছেন। আমি অদ্যই ইহাদিগকে ও ইহাদিগের অনুচরগণকে নিগ্রহণ করিয়া পাণ্ডবগণকে প্রদান করিতে পারি। তাহাতে আমাকে পাপভাগী হইতেও হয় না। কিন্তু আপনার সন্নিধানে ঈদৃশ ক্রোধ ও পাপবুদ্ধিজানিত গর্হিত কার্যে প্রবৃত্ত হইব না। আমি অনুজ্ঞা করিতেছি যে, দুর্নীতিপরায়ণগণ দুর্ঘোষনের ইচ্ছানুসারে কার্য করুক।”*

এই কথার পর, ধৃতরাষ্ট্র দুর্ঘোষনকে ডাকাইয়া আনাইলেন, এবং তাঁহাকে অতিশয় কটুক্তি করিয়া ভৎসনা করিলেন। বলিলেন,

“তুমি অতি নৃশংস, পাপাত্মা ও নীচাশয়; এই নিমিত্তই অসাধ্য, অযশস্কর, সাধুবিগর্হিত, পাপাচরণে সমুৎসুক হইয়াছ। কুলপাংশুল মূঢ়ের ন্যায় দুর্ভাগ্যাদিগের সহিত মিলিত হইয়া নিতান্ত দুর্দৈর্ঘ্য জনানন্দনকে নিগ্রহ করিতে ইচ্ছা করিতেছ। যেমন বালক চন্দ্রমাকে গ্রহণ করিতে উৎসুক হয়, তুমিও সেইরূপ ইন্দ্রাদি দেবগণের দুর্ভাগ্য কেশবকে গ্রহণ করিবার বাসনা করিতেছ। দেব, মনুষ্য, গন্ধর্বা, অসুর ও উরগগণ ষাঁহার সংগ্রাম সহ্য করিতে সমর্থ হয় না; তুমি কি, সেই কেশবের পরিচয় পাও নাই? বৎস! হস্তদ্বারা কখন বায়ু গ্রহণ করা যায় না; পাণিতল দ্বারা কখন পাবক স্পর্শ করা যায় না; মস্তক দ্বারা কখন মৌদিনী ধারণ করা যায় না; এবং বলদ্বারাও কখন কেশবকে গ্রহণ করা যায় না।”

তার পর বিদুরও দুর্ঘোষনকে ঐরূপ ভৎসনা করিলেন। বিদুরের বাক্যবসানে, বাসুদেব উচ্চহাস্য করিলেন, পরে সাত্যকি ও কৃতবর্মার হস্ত ধারণপূর্বক কুরুসভা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

এই পর্য্যন্ত মহাভারতে আখ্যাত ভগবদ্যান-বৃত্তান্ত, সুসঙ্গত ও স্বাভাবিক; কোন গোলযোগ নাই। অতিপ্রকৃত কিছই নাই ও অবিশ্বাসের কারণও কিছই নাই। কিন্তু অঙ্গুলিকণ্ডুয়ন-নিপীড়িত প্রক্ষিপ্তকারীর জাতি গোষ্ঠী ইহা কদাচ সহ্য করিতে পারে না। এমন একটা মহদ্ব্যাপারের ভিতর একটা অনৈসর্গিক অদ্ভুত কাণ্ড না প্রবিষ্ট করাইলে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব রক্ষা

* কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রকাশিত অনুবাদ প্রসংসিত, এ জন্য সচরাচর আমি মূলের সহিত অনুবাদ না মিলাইয়াই অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়াছি। কিন্তু কৃষ্ণের এই উক্তিতে কিছই অসঙ্গতি ঐ অনুবাদে দেখা যায়, যথা, যে কার্যের জন্য পাপভাগী হইতে হয় না এক স্থানে বলিয়াছেন, সেই কার্যকে কয় ছত্র পরে পাপবুদ্ধিজানিত বলিতেছেন। এজন্য মূলের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলাম। মূলে তত অসঙ্গতি দেখা যায় না। মূল উদ্ধৃত করিতেছি—

রাজস্নেহে যদি কুপ্তা মাং নিগৃহীয়ুরোজসা।
এতে বা মামহং বৈনাননুজানীহি পার্থিব ॥
এতান্ হি সর্বান্ সংরক্ষামিষুভুমহমুৎসহে।
ন চাহং নিন্দিতং কস্ম কুর্ঘ্যাং পাপং কথংন ॥
পাণ্ডবার্থে হি লুভাস্তঃ স্বার্থান্ হাসান্তি তে সূতাঃ।
এতে চেদেবমিচ্ছন্তি কৃতকার্যে যুধিষ্ঠিরঃ ॥
অদৌব হাহমেনাংশ্চ যে চৈনাননু ভারত।
নিগৃহ্য রাজন্ পার্থেভ্যো দদ্যাং কিং দৃষ্কৃতং ভবেৎ ॥
ইদন্তু ন প্রবর্তেয়ং নিন্দিতং কস্ম ভারত।
সন্নিধৌ তে মহারাজ ক্রোধজং পাপবুদ্ধিজম্ ॥
এষ দুর্ঘোষনো রাজন্ যথেষ্টতি তথাস্তু তৎ।
অহন্তু সর্বাংশুনয়াননুজানামি তে নৃপ ॥

“কিং দৃষ্কৃতং ভবেৎ” ইতি বাক্যের অর্থ ঠিক “পাপভাগী হইতে হয় না”, এমত নহে। কথার ভাব ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, “দুর্ঘোষন আমাকে বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে; আমি যদি তাহাকে এখন বাঁধিয়া লইয়া যাই, তাহা হইলে কি এমন মন্দ কাজ হয়?” দুর্ঘোষনকে বন্ধ করা মন্দ কাজ হয় না, কেন না, অনেকের হিতের জন্য একজনকে পরিত্যাগ করা শ্রেয় বলিয়া কৃষ্ণ স্বয়ংই ধৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দিয়াছেন যে, ইহাকে বন্ধ কর। তবে কৃষ্ণ এক্ষণে স্বয়ং এ কাজ করিলে ক্রোধবশতঃই তিনি ইহা করিতেছেন, ইহা বুঝাইবে। কেন না, এক্ষণে তিনি নিজে তাহাকে বন্ধ করিবার অভিপ্রায় করেন নাই। ক্রোধ বাহাতে প্রবর্তিত করে, তাহা পাপবুদ্ধিজানিত, সুতরাং আদর্শ পুরুষের পক্ষে নিন্দিত ও পরিহার্য্য কর্ম।

হয় কৈ? বোধ করি, এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া তাঁহারা, কৃষ্ণের হাস্য ও নিস্ক্রান্তির মধ্যে একটা বিশ্বরূপপ্রকাশ প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন। এই মহাভারতের ভীষ্মপর্বে ভগবদ্গীতা-পর্বাধ্যায়ে (তাহা প্রক্ষিপ্ত হউক বা না হউক) আর একবার বিশ্বরূপপ্রদর্শন বর্ণিত আছে। সেই বিশ্বরূপ-বর্ণনায় আর এই বর্ণনায় কি বিস্ময়কর প্রভেদ! গীতার একাদশের বিশ্বরূপবর্ণনা প্রথম শ্রেণীর কবির রচনা; সাহিত্য-জগৎ খুঁজিয়া বেড়াইলে তেমন আর কিছু পাওয়া দুলভ। আর ভগবদ্‌যান-পর্বাধ্যায়ে এই বিশ্বরূপবর্ণনা যাঁহার রচিত, কাব্যরচনা তাঁহার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। ভগবদ্‌গীতার একাদশে পড়ি যে, ভগবান্ অর্জুনকে বলিতেছেন, “তোমা ব্যাতিরেকে আর কেহই ইহা পদ্বর্ষে নিরীক্ষণ করে নাই।” কিন্তু তৎপদ্বর্ষেই এখানে দুর্যোধনাদি কৌরবসভাস্থ সকল লোকেই বিশ্বরূপ নিরীক্ষণ করিল। ভগবান্ গীতার একাদশে, আরও বলিতেছেন, “তোমা ব্যাতিরেকে মনুষ্যালোকে আর কেহই বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, দান, ক্রিয়াকলাপ, লয় ও অতি কঠোর তপস্যা দ্বারা আমার ঈদৃশ রূপ অবলোকন করিতে সমর্থ হয় না।” কিন্তু কুবীর হাতে পড়িয়া, এখানে বিশ্বরূপ যার তার প্রত্যক্ষীভূত হইল। গীতায় আরও কথিত হইয়াছে, “অনন্য-সাধারণ ভক্তি প্রদর্শন করিলেই আমারে এইরূপে জ্ঞাত হইতে পারে, এবং আমারে দর্শন ও আমাতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়।” কিন্তু এখানে দুর্যোধনকারী পাপাত্মা ভক্তিশূন্য শত্রুগণও তাহা নিরীক্ষণ করিল।

নিঃপ্রয়োজনে কোন কৰ্ম্ম মূর্খেও করে না, যিনি বিশ্বরূপী, তাঁহার ত কথাই নাই। এখানে বিশ্বরূপ প্রকাশের কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় নাই। দুর্যোধনাদি বলপ্রয়োগের পরামর্শ করিতেছিল, বলপ্রয়োগের কোন উদ্যম করে নাই। পিতা ও পিতৃব্য কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়া দুর্যোধন নিরুত্তর হইয়াছিল। বলপ্রকাশের কোন উদ্যম করিলেও, সে বল নিশ্চিত ব্যর্থ হইত, ইহা কৃষ্ণের অগোচর ছিল না। তিনি স্বয়ং এতাদৃশ বলশালী যে, বল দ্বারা কেহ তাঁহার নিগ্রহ করিতে পারে না। ধৃতরাষ্ট্র ইহা বলিলেন, বিদুর বলিলেন, এবং কৃষ্ণ নিজেও বলিলেন। কৃষ্ণের নিজের বল আত্মরক্ষায় প্রচুর না হইলেও কোন শঙ্কা ছিল না, কেন না, সাত্যকি কৃতবর্ষ্মা প্রভৃতি মহাবলপরাক্রান্ত বৃষ্ণিবংশীয়েরা তাঁহার সাহায্য জন্য উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদিগের সৈন্যও রাজদ্বারে যোজিত ছিল। দুর্যোধনের সৈন্য উপস্থিত থাকার কথা কিছু দেখা যায় না। অতএব বলদ্বারা নিগ্রহের চেষ্টা ফলবতী হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সম্ভাবনার অভাবেও ভীত হন, কৃষ্ণ এরূপ কাপুরুষ নহেন। যিনি বিশ্বরূপ, তাঁহার এরূপ ভয়ের সম্ভাবনা নাই। অতএব বিশ্বরূপ প্রকাশের কোন কারণ ছিল না। এ অবস্থায় ক্রুদ্ধ বা দাস্তিক ব্যক্তি ভিন্ন শত্রুকে ভয় দেখাইবার চেষ্টা করে না। যিনি বিশ্বরূপ, তিনি ক্রোধশূন্য এবং দম্ভশূন্য।

অতএব, এখানে বিশ্বরূপের কথাটা কুবীর প্রণীত অলীক উপন্যাস বলিয়া ত্যাগ করাই বিধেয়। আমি পুনঃ পুনঃ দেখাইয়াছি, মানুসী শক্তি অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণ কৰ্ম্ম করেন, ঐশী শক্তি দ্বারা নহে। এখানে তাহার ব্যতিক্রম হইয়াছিল, এরূপ বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই।

কুরুসভা হইতে কৃষ্ণ কুন্তীসম্ভাষণে গেলেন। সেখান হইতে তিনি উপপ্লব্য নগরে, যেখানে পাণ্ডবেরা অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে কর্ণকে আপনার রথে তুলিয়া লইলেন।

যাহারা কৃষ্ণকে নিগ্রহ করিবার জন্য পরামর্শ করিতেছিল, কর্ণ তাহার মধ্যে। তবে কর্ণকে কৃষ্ণ স্বরথে আরোহণ করাইয়া চলিলেন কেন, তাহা পরপরিচ্ছেদে বলিব। সে কথায় কৃষ্ণচরিত্র পরিষ্ফুট হয়। সাম ও দণ্ডনীতিতে কৃষ্ণের নীতিজ্ঞতা দেখিয়াছি। এক্ষণে ভেদ নীতিতে তাঁহার পারদর্শিতা দেখিব। সেই সঙ্গে ইহাও দেখিব যে, কৃষ্ণ আদর্শ পুরুষ বটে, কেন না, তাঁহার দয়া, জীবের হিতকামনা, এবং বুদ্ধি, সকলই লোকাতীত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ—কৃষ্ণ-কর্ণসংবাদ

কৃষ্ণ সর্বভূতে দয়াময়। এই মহাযুদ্ধজনিত যে অসংখ্য প্রাণিহ্বয় হইবে, তাহাতে আর কোন ক্ষত্রিয় ব্যথিত নহে, কেবল কৃষ্ণই ব্যথিত। যখন প্রথম বিরাট নগরে যুদ্ধের প্রস্তাব হয়, তখন কৃষ্ণ যুদ্ধের বিরুদ্ধে মত দিয়াছিলেন। অর্জুন তাঁহাকে যুদ্ধে বরণ করিতে গেলে, কৃষ্ণ এ যুদ্ধে অস্ত্র ধরিবেন না ও যুদ্ধ করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিলেন। কিন্তু তাহাতেও যুদ্ধ বন্ধ

বিক্রম রচনাবলী

হইল না। অতএব উপায়ান্তর না দেখিয়া ভরসাশূন্য হইয়াও সন্ধি স্থাপনের জন্য ধৃতরাষ্ট্র-সভায় গেলেন। তাহাতেও কিছ্ হইল না, প্রাণহত্যা নিবারণ হয় না। তখন রাজনীতিজ্ঞ কৃষ্ণ জনসমূহের রক্ষার্থ উপায়ান্তর উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলেন।

কর্ণ মহাবীরপুরুষ। তিনি অজ্ঞানের সমকক্ষ রথী। তাঁহার বাহুবলেই দুর্যোধন আপনাকে বলবান্ মনে করেন। তাঁহার বলের উপর নির্ভর করিয়াই প্রধানতঃ তিনি পাণ্ডব-দিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত। কর্ণের সাহায্য না পাইলে তিনি কদাচ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না। কর্ণকে তাঁহার শত্রুপক্ষের সাহায্যে প্রবৃত্ত দেখিলেই অবশ্যই তিনি যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবেন। যাহাতে তাহা ঘটে, তাহা করিবার জন্য কর্ণকে আপনার রথে তুলিয়া লইলেন। বিরলে কর্ণের সঙ্গে কথোপকথন আবশ্যিক।

কৃষ্ণের এই অভিপ্রায় সিদ্ধির উপযোগী অন্যের অজ্ঞাত সহজ উপায়ও ছিল।

কর্ণ অধিরথনামা সূতের পুত্র বলিয়া পরিচিত। বস্তুতঃ তিনি অধিরথের পুত্র নহেন—পালিতপুত্র মাত্র। তাহা তিনি জানিতেন না। তাঁহার নিজ জন্মবৃত্তান্ত তিনি অবগত ছিলেন না। তিনি সূতপত্নী রাধার গর্ভজাত না হইয়া, কুন্তীর গর্ভজাত, সুর্য্যের ঔরসে তাঁহার জন্ম। তবে কুন্তীর কন্যাকালে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া কুন্তী, পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবার পরেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তিনি যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণের সহোদর ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। এ কথা কুন্তী ভিন্ন আর কেহই জানিত না। আর কৃষ্ণ জানিতেন; তাঁহার অলৌকিক বুদ্ধির নিকটে সকল কথাই সহজে প্রতিভাত হইত। কুন্তী তাঁহার পিতৃস্বসা; ভোজরাজগৃহে এ ঘটনা হয়, অতএব কৃষ্ণ মনুষ্যবুদ্ধিতেই ইহা জানিতে পারা অসম্ভব নহে।

কৃষ্ণ এই কথা এক্ষণে রথারূঢ় কর্ণকে শুনাইলেন। বলিলেন,

“শাস্ত্রজ্ঞেরা কহেন, যিনি যে কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তিনিই সেই কন্যার সহোদর ও কানীনপুত্রের পিতা। হে কর্ণ! তুমিও তোমার জননীর কন্যাকালাবস্থায় সমুৎপন্ন হইয়াছ, তন্নিমিত্ত তুমি ধর্ম্মতঃ পুত্র; অতএব চল, ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধেও* তুমি রাজ্যেশ্বর হইবে।” তিনি কর্ণকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তিনি জ্যেষ্ঠ, এ জন্য তিনিই রাজা হইবেন, অপর পণ্ড পাণ্ডব তাঁহার আজ্ঞানুবর্তী হইয়া তাঁহার পরিচর্য্যায় নিবৃত্ত থাকিবে।

কৃষ্ণের এই পরামর্শ সর্ব্বজনের ধর্ম্মবুদ্ধিকর ও হিতকর। প্রথমতঃ কর্ণের পক্ষে হিতকর, কেন না, তিনি রাজ্যেশ্বর হইবেন, এবং তাঁহার পক্ষে ধর্ম্মানুমত, কেন না, ভ্রাতৃগণের প্রতি শত্রুভাব পরিত্যাগ করিয়া মিত্রভাব অবলম্বন করিবেন। ইহা দুর্যোধনাদির পক্ষেও পরম হিতকর, কেন না, যুদ্ধ হইলে তাঁহারা কেবল রাজ্যভ্রষ্ট নহে, সর্ব্বংশে নিপাতপ্রাপ্ত হইবারই সম্ভাবনা। যুদ্ধ না হইলে তাঁহাদের প্রাণও বজায় থাকিবে, রাজ্যও বজায় থাকিবে, কেবল পাণ্ডবের ভাগ ফিরাইয়া দিতে হইবে। ইহাতে পাণ্ডবদিগেরও হিত ও ধর্ম্ম, কেন না, যুদ্ধরূপ নৃশংস ব্যাপারে প্রবৃত্ত না হইয়া, আত্মীয় স্বজন জ্ঞাতি বধ না করিয়াও, স্বরাজ্য কর্ণের সহিত ভোগ করিবেন। আর এ পরামর্শের পরম ধর্ম্ম্যতা ও হিতকারিতা এই যে, ইহা দ্বারা অসংখ্য মনুষ্যগণের প্রাণ রক্ষা হইতে পারিবে।

কর্ণও কৃষ্ণের কথার উপযোগিতা স্বীকার করিলেন। তিনিও বুঝিয়াছিলেন যে, এ যুদ্ধে দুর্যোধনাদির রক্ষা নাই। কিন্তু কৃষ্ণের কথায় সম্মত হইলে তাঁহাকে কোন কোন গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইতে হয়। অধিরথ ও রাধা তাঁহাকে প্রতিপালন করিয়াছে। তাহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া তিনি সূতবংশে বিবাহ করিয়াছেন, এবং সেই ভার্য্যা হইতে তাঁহার পুত্র পৌত্রাদি জন্মিয়াছে। তাহাদিগকে কোন মতেই কর্ণ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। আর তিনি

* “বিরুদ্ধে”ও এই পদটি কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদে আছে, কিন্তু ইহা এখানে অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। আমার কাছে মূল মহাভারত যাহা আছে, তাহাতে দেখিলাম, নিগ্রহাধর্ম্মশাস্ত্রাগাম্ আছে। বোধ হয় নিগ্রহাধর্ম্মশাস্ত্রাগাম্ হইবে। তাহা হইলে অর্থ সঙ্গত হয়।

এই অংশ ছাপা হওয়ার পর জানিতে পারিলাম যে, ইহার অন্যতর পাঠও আছে, যথা—“নিগ্রহাধর্ম্ম-শাস্ত্রাগাম্।” এ স্থলে নিগ্রহ অর্থে মর্ষ্যাদা। যথা—

“নিগ্রহো ভৎসনেহপি স্যাৎ মর্ষ্যাদায়াণ বন্ধনে।”—ইতি মেদিনী।

“নিগ্রহো ভৎসনে প্রোক্তো মর্ষ্যাদায়াণ বন্ধনে।”—ইতি বিশ্ব।

“নিয়মেন বিধিনা গ্রহণং নিগ্রহঃ।”—ইতি চিন্তামণিঃ।

ত্রয়োদশ বৎসর দুর্যোধনের আশ্রয়ে থাকিয়া রাজ্যভোগ করিয়াছেন; দুর্যোধন তাঁহারই ভরসা করেন; এখন দুর্যোধনকে পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবপক্ষে গেলে লোকে তাঁহাকে কৃতঘ্ন, পাণ্ডবদিগের ঐশ্বর্যালোলুপ বা তাহাদের ভয়ে ভীত কাপুরুষ বলিবে। এই জন্য কর্ণ কোন মতেই কৃষ্ণের কথায় সম্মত হইলেন না।

কৃষ্ণ বলিলেন, “যখন আমার কথা তোমার হৃদয়ঙ্গম হইল না, তখন নিশ্চয়ই এই বসুন্ধরার সংহারদশা সমুপস্থিত হইয়াছে।”

কর্ণ উপযুক্ত উত্তর দিয়া, কৃষ্ণকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বিষন্নভাবে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

কৃষ্ণচরিত্র বৃষ্ণিব্যবহার জন্য কর্ণচরিত্রের বিস্তারিত সমালোচনার প্রয়োজন নাই; এজন্য আমি তৎসম্বন্ধে কিছু বলিলাম না। কর্ণচরিত্র অতি মহৎ ও মনোহর।

নবম পরিচ্ছেদ—উপসংহার

কৃষ্ণ উপপ্লব্য নগরে ফিরিয়া আসিলে, যুধিষ্ঠিরাদি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি হস্তিনাপুরে কি করিয়াছিলে বল।

কৃষ্ণ, নিজে যাহা বলিয়াছিলেন, এবং অন্যে যাহা বলিয়াছিল, তাই বলিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই সকল বক্তৃতার পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে ঘেরূপ বর্ণনা দেখিয়াছি, এখানে তাহার সহিত মিল নাই। কিছুর সঙ্গে কিছু মিলে না। মিলিলে দীর্ঘ পুনরুক্তি ঘটিত। তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য কোন মহাপুরুষ কিছু নতুন রকম বসাইয়া দিয়াছেন বোধ হয়।

এইখানে ভগবদ্‌যান-পর্বাধ্যায় সমাপ্ত। তারপর সৈন্যনির্বাণ-পর্বাধ্যায়। ইহাতে বিশেষ কথা কিছু নাই। কতকগুলো মৌলিক কথা আছে; কতকগুলো কথা অমৌলিক বলিয়া বোধ হয়; কৃষ্ণসম্বন্ধীয় কথা বড় অল্প। কৃষ্ণের ও অর্জুনের পরামর্শানুসারে, পাণ্ডবেরা ধৃষ্টদ্যুম্নকে সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন, এবং বলরাম মদ খাইয়া আসিয়া, কৃষ্ণকে কিছু মিষ্ট ভৎসনা করিলেন, কেন না, তিনি কুরুপাণ্ডবকে সমান জ্ঞান করেন না। কুরুসভায় যাহা ঘটিয়াছিল, সে কথাও কিছু হইল। ইহা ভিন্ন আর কিছু নাই।

তাহার পর উলুকদুতাগমন-পর্বাধ্যায়। এটি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। ইহাতে আর কিছুই নাই, কেবল উভয় পক্ষের গালিগালাজ। দুর্যোধন, শকুনি প্রভৃতির পরামর্শে উলুককে পাণ্ডবদিগের নিকট পাঠাইলেন। উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, কেবল পাণ্ডবদিগকে ও কৃষ্ণকে খুব গালিগালাজ করা। উলুক আসিয়া ছয় জনকেই খুব গালিগালাজ করিল। পাণ্ডবেরা উত্তরে খুবই গালিগালাজ করিলেন। কৃষ্ণ বড় কিছু বলিলেন না, তাঁহার ন্যায় রোষামর্শশূন্য ব্যক্তি গালিগালাজ করে না, বরং একটা রাগারাগি বাড়াবাড়ি যাহাতে না হয়, এই অভিপ্রায়ে পাণ্ডবেরা উত্তর করিবার আগেই তিনি উলুককে বিদায় করিবার চেষ্টা করিলেন। বলিলেন, “তুমি শীঘ্র গমন করিয়া দুর্যোধনকে কহিবে—পাণ্ডবেরা তোমার বাক্য শ্রবণ ও তাহার যথার্থ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এক্ষণে তোমার ঘেরূপ অভিপ্রায় তাহাই হইবে।” অথচ গালিগালাজটা কৃষ্ণাৰ্জুনের ভাগেই বেশী রকম হইয়াছিল।

কিন্তু উলুকের দুর্বুদ্ধি, উলুক ছাড়ে না। আবার গালিগালাজ আরম্ভ করিল। না হইবে কেন? ইনি দুর্যোধনের সহোদর। তখন পাণ্ডবেরা একে একে উলুকের উত্তর দিলেন। উলুককে সুদ সমেত আসল ফিরাইয়া দিলেন। কৃষ্ণও একটা কথা বলিলেন, “আমি অর্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়াছি বলিয়া যুদ্ধ করিব না, ইহা মনে স্থির করিয়া ভীত হইতেছ না; কিন্তু যেমন হুতাশনে তৃণ সকল ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ আমিও চরম কালে ক্রোধভরে সমস্ত পার্থিব-গণকে সংহার করিব সন্দেহ নাই।”

উলুকদুতাগমন-পর্বাধ্যায়ে মহাভারতের কার্যের পক্ষে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ইহাতে রচনার নৈপুণ্য বা কবিত্ব নাই। এবং কোন কোন স্থানে মহাভারতের অন্যান্যংশের সহিত বিরুদ্ধভাবাপন্ন; অনুক্রমণিকাধ্যায়ে সঞ্জয় এবং কৃষ্ণের দৌত্যের কথা আছে, কিন্তু উলুকদুতের কথা নাই। এই সকল কারণে ইহাকে আদিমস্তুরাস্তগত বিবেচনা করি না।

ইহার পর রথার্থীরথসংখ্যান, এবং তৎপরে অম্বোপাখ্যান-পর্বাধ্যায়। এ সকলে কৃষ্ণবৃত্তান্ত কিছুই নাই। এইখানে উদ্যোগপর্ব সমাপ্ত।

ষষ্ঠ খণ্ড

কুরুক্ষেত্র

যো নিষণ্নো ভবেদ্রাত্রৌ দিবা ভবতি বিষ্ঠিতঃ।

ইষ্টানিষ্টস্য চ দ্রষ্টা তস্মৈ দ্রষ্টাশ্চনে নমঃ॥

শান্তিপর্বে, ৪৭ অধ্যায়ঃ।

প্রথম পরিচ্ছেদ—ভীষ্মের যুদ্ধ

এক্ষণে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবে। মহাভারতে চারিটি পর্বে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। দুর্যোধনের সেনাপতিগণের নামক্রমে ক্রমান্বয়ে এই চারিটি পর্বে নাম হইয়াছে ভীষ্মপর্ব, দ্রোণপর্ব, কর্ণপর্ব ও শল্যপর্ব।

এই যুদ্ধপর্বগুলি মহাভারতের নিকৃষ্ট অংশ মধ্যে গণ্য করা উচিত। পুনরুক্তি, অকারণ এবং অরুচিকর বর্ণনাবাহুল্য, অনৈসর্গিকতা, অতুক্তি এবং অসঙ্গত দোষ এইগুলিতে বড় বেশী। ইহার অল্প ভাগই আদিমস্তরভুক্ত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু কোন অংশ মৌলিক, আর কোন অংশ অমৌলিক স্থির করা বড় দুষ্কর। যেখানে সবই কাঁটাবন, সেখানে পুষ্পচয়ন বড় দুঃসাধ্য। তবে যেখানে কৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে কোন কথা পাওয়া যায়, সেই স্থান আমরা যথাসাধ্য বুদ্ধিবীর চেষ্ঠা করিব।

ভীষ্মপর্বে প্রথম জম্বুখণ্ড-বিনির্মাণ-পর্বাধ্যায়। তাহার সঙ্গে যুদ্ধের কোন সম্বন্ধ নাই—মহাভারতেরও বড় অল্প। কৃষ্ণচরিত্রের কোন কথাই নাই। তারপর ভগবদ্গীতা-পর্বাধ্যায়। ইহার প্রথম চব্বিশ অধ্যায়ের পর গীতারম্ভ। এই চব্বিশ অধ্যায় মধ্যে কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বিশেষ কোন কথা নাই। কৃষ্ণ যুদ্ধের পূর্বে দুর্গাস্তব করিতে অর্জুনকে পরামর্শ দিলে, অর্জুন যুদ্ধারম্ভকালে দুর্গাস্তব পাঠ করিলেন। কোন গুরুতর কার্য আরম্ভ করিবার সময়ে আপন আপন বিশ্বাসানুযায়ী দেবতার আরাধনা করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া কর্তব্য। তাহা হইলে ঈশ্বরের আরাধনা হইল। যাহা বলিয়া ডাকি না কেন, এক ভিন্ন ঈশ্বর নাই।

তারপর গীতা। ইহাই কৃষ্ণচরিত্রের প্রধান অংশ। এই গীতান্ত অনূপম পবিত্র ধর্ম প্রচারই কৃষ্ণের আদর্শ মনুষ্যত্বের বা দেবত্বের এক প্রধান পরিচয়।

কিন্তু এখানে আমি গীতা সম্বন্ধে কোন কথা বলিব না। তাহার কারণ এই যে, এই গীতান্ত ধর্ম একখানি পৃথক্ গ্রন্থে* কিছ্ কিছু বঝাইয়াছি, পরে আর একখানি† লিখিতে নিযুক্ত আছি। গীতা সম্বন্ধে আমার মত এই দুই গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। এখানে পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই।

ভগবদ্গীতা-পর্বাধ্যায়ের পর ভীষ্মবধ-পর্বাধ্যায়। এইখানেই যুদ্ধারম্ভ। যুদ্ধে কৃষ্ণ অর্জুনের সার্থি মাত্র। সার্থিদিগের অদৃষ্ট বড় মন্দ ছিল। মহাভারতে যে যুদ্ধের বর্ণনা আছে, তাহা কতকগুলি দ্বৈরথ্যযুদ্ধ মাত্র। রথিগণ যুদ্ধ করিবার সময়ে পরস্পরের অশ্ব ও সার্থিকে বিনাশ করিবার চেষ্ঠা করিতেন। তাহার কারণ, অশ্ব বা সার্থি নষ্ট হইলে, আর রথ চলিবে না। রথ না চলিলে রথী বিপন্ন হইতেন। সার্থিরা যোদ্ধা নহে—বিনা দোষে বিনা যুদ্ধে নিহত হইত। কৃষ্ণকেও সে সূতের ভাগী হইতে হইয়াছিল। তিনি হত হইতেন নাই বটে, কিন্তু যুদ্ধের অষ্টাদশ দিবস মূহুর্তে মূহুর্তে বহুসংখ্যক বাণের দ্বারা বিদ্ধ হইয়া ক্ষত বিক্ষত হইতেন। অন্যান্য সার্থিগণ আত্মরক্ষায় অক্ষম, তাহারা বৈশ্য, জাতিতে ক্ষত্রিয় নহে। কৃষ্ণ, আত্মরক্ষায় অতিশয় সক্ষম, তথাচ কর্তব্যানুরোধে বসিয়া মার খাইতেন।

মহাভারতের যুদ্ধে তিনি অস্ত্রধারণ করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, ইহা বলিয়াছি।

* ধর্মতত্ত্ব।

† শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বাঙ্গালা টীকা।

কিন্তু একদিন তিনি অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু প্রয়োগ করেন নাই। সে ঘটনাটা এইরূপঃ—

ভীষ্ম দুর্যোধনের সেনাপতিত্বে নিযুক্ত হইয়া যুদ্ধ করেন। তিনি যুদ্ধে এরূপ নিপুণ যে, পাণ্ডবসেনার মধ্যে অর্জুন ভিন্ন আর কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। কিন্তু অর্জুন তাঁহার সঙ্গে ভাল করিয়া স্বর্শক্তি অনুসারে যুদ্ধ করেন না। তাহার কারণ এই যে, ভীষ্ম সম্বন্ধে অর্জুনের পিতামহ, এবং বাল্যকালে পিতৃহীন পাণ্ডবগণকে ভীষ্মই পিতৃবৎ প্রতিপালন করিয়াছিলেন। ভীষ্ম এখন দুর্যোধনের অনুরোধে নিরপরাধী পাণ্ডবদিগের শত্রু হইয়া তাহাদের অনিষ্টার্থ তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছেন বলিয়া, যদিও ভীষ্ম ধর্ম্মতঃ অর্জুনের বধ্য, তথাপি অর্জুন পদ্বর্কথা স্মরণ করিয়া কোন মতেই ভীষ্মের বধ সাধনে সম্মত নহে। এজন্য ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে মৃদুযুদ্ধ করেন, পাছে ভীষ্ম নিপতিত হন, এজন্য সর্বদা সঙ্কুচিত। তাহাতে ভীষ্ম, অপ্রতিহত বীর্ষ্য বহুসংখ্যক পাণ্ডবসেনা বিনষ্ট করিতেন। ইহা দেখিয়া এক দিবস ভীষ্মকে বধ করিবার মানসে কৃষ্ণ স্বয়ং চক্রহস্তে অর্জুনের রথ হইতে অবরোহণপদ্বর্ক ভীষ্মের প্রতি পদরজে ধাবমান হইলেন।

দেখিয়া, কৃষ্ণভক্ত ভীষ্ম পরমাহ্বাদিত হইয়া বলিলেন,

এহোহি দেবেশ জগন্নিবাস! নমোহস্তু তে শার্ঙ্গগদাসিপাগে।

প্রসহ্য মাং পাতয় লোকনাথ! রথোত্তমাৎ ভূতশরণ্য সংখ্যে॥

“এসো এসো দেবেশ জগন্নিবাস! হে শার্ঙ্গগদাখণ্ডধারিন্! তোমাকে নমস্কার। হে লোকনাথ ভূতশরণ্য! যুদ্ধে আমাকে অবিলম্বে রথোত্তম হইতে পাতিত কর।”

অর্জুনও কৃষ্ণের পশ্চাদনুসরণ করিয়া, কৃষ্ণকে অনুন্নয় করিয়া, স্বয়ং সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া, ফিরাইয়া আনিলেন।

এই ঘটনা দুই বার বর্ণিত হইয়াছে, একবার তৃতীয় দিবসের যুদ্ধে, আর একবার নবম দিবসের যুদ্ধে। শ্লোকগুণি একই, সুতরাং এক দিবসেরই ঘটনা লিপিকারের ভ্রম প্রমাদ বা ইচ্ছাবশতঃ দুই বার লিখিত হইয়া থাকিবে। সংস্কৃত গ্রন্থে সচরাচর এরূপ ঘটিয়া থাকে।

রচনা দেখিয়া বিচার করিলে, এই বিবরণকে মহাভারতের প্রথমস্তরভুক্ত বিবেচনা করা যাইতে পারে। কবিদ্ব প্রথম শ্রেণীর, ভাব ও ভাষা উদার এবং জটিলতাশূন্য। প্রথম স্তরের যতটুকু মৌলিকতা স্বীকার করা যাইতে পারে, এই ঘটনারও ততটুকু মৌলিকতা স্বীকার করা যাইতে পারে।

এই ঘটনা লইয়া কৃষ্ণভক্তেরা, কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে একটা তর্ক তুলিয়া থাকেন। কাশীদাস ও কথকেরা এই প্রতিজ্ঞাভঙ্গ অবলম্বন করিয়া, কৃষ্ণের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, ভীষ্ম যুদ্ধারম্ভকালে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে—তুমি যেমন প্রতিজ্ঞা করিয়াছ যে, এ যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবে না, আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তোমাকে অস্ত্র ধারণ করাইব।

অতএব এক্ষণে ভক্তবৎসল কৃষ্ণ, আপনার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিত করিয়া, ভক্তের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন।

এ সুবৃদ্ধিরচনার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। ভীষ্মের এবম্বিধ প্রতিজ্ঞাও মূল মহাভারতে দেখা যায় না। কৃষ্ণেরও কোন প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিত হয় নাই। তাঁহার প্রতিজ্ঞার মর্ম্ম এই যে—যুদ্ধ করিব না। দুর্যোধন ও অর্জুন উভয়ে তাঁহাকে এককালে বরণাভিলাষী হইলে, তিনি উভয়ের সঙ্গে তুল্য ব্যবহার করিবার জন্য বলিলেন, “আমার তুল্য বলশালী আমার নারায়ণী সেনা এক জন গ্রহণ কর; আর এক জন আমাকে লও।” “অযুধ্যমানঃ সংগ্রামে ন্যস্তশস্ত্রোহ-হমেকতঃ” এই পর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞা। সে প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হইয়াছিল। কৃষ্ণ যুদ্ধ করেন নাই। ভীষ্ম সম্বন্ধীয় এই ঘটনাটির উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে; কেবল সাধ্যানুসারে যুদ্ধে পরাজিত অর্জুনকে যুদ্ধে উত্তেজিত করা। ইহা সার্থিরা করিতেন। উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল।

যুদ্ধের নবম দিবসের রাত্রিতেও কৃষ্ণ ঐরূপ অভিপ্রায়ে কথা কহিয়াছিলেন। ভীষ্মকে অপরাজিত দেখিয়া যুধিষ্ঠির নবম রাতে বন্ধুবান্ধবগণকে ডাকিয়া ভীষ্মবধের পরামর্শ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন, আমাকে অনুমতি দাও, আমি ভীষ্মকে বধ করিতেছি। অথবা অর্জুনের উপরই এ ভার থাক; অর্জুনও ইহাতে সক্ষম।

বিক্রম রচনাবলী

যুধিষ্ঠির এ কথায় সম্মত হইলেন না। কৃষ্ণ যে ভীষ্মবধ ইচ্ছা করিলেই করিতে পারিতেন, তাহা তিনি স্বীকার করিলেন। কিন্তু বলিলেন, “আত্মগৌরবের নিমিত্ত তোমাকে মিথ্যাবাদী করিতে চাই না। তুমি অযুধ্যমান থাকিয়াই সাহায্য কর।” যুধিষ্ঠির অজ্ঞান সম্বন্ধে কিছুই বলিলেন না। পরে কৃষ্ণের সম্মতি লইয়া, এবং অন্য পাণ্ডবগণ ও কৃষ্ণকে সঙ্গে করিয়া ভীষ্মের কাছে তাঁহার বধোপায় জানিতে গেলেন।

ভীষ্ম নিজের বধোপায় বলিয়া দিলেন। দৃশ্যতঃ সেইরূপ কার্য হইল। কার্যতঃ তাহার কিছুই হইল না। কৃষ্ণ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল—অজ্ঞানই ভীষ্মকে শরশয্যাশায়িত ও রথ হইতে নিপাতিত করিলেন। মূল মহাভারতের উপর দ্বিতীয় স্তরের কবি, কলম চালাইয়া একটা সঙ্গতিশূন্য, নিষ্প্রয়োজনীয়, কিন্তু আপাতমনোহর শিখিণ্ডিসম্বন্ধীয় গল্প খাড়া করিয়াছেন। কৃষ্ণচরিত্রের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই, এজন্য আমরা তাহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—জয়দ্রথবধ

ভীষ্মের পর দ্রোণাচার্য্য সেনাপতি। দ্রোণপর্বে প্রথমে কৃষ্ণকে বিশেষ কোন কর্ম করিতে দেখা যায় না। তিনি নিপুণ সারাথির ন্যায় কেবল সারথ্যই করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি য় কর্তা ও নেতা, এ কথাটা এখানে সত্য নহে। মধ্যে মধ্যে অজ্ঞান ও যুধিষ্ঠিরকে সদুপদেশ দেওয়া ভিন্ন তিনি আর কিছুই করেন নাই। দ্রোণাভিষেক-পর্বাধ্যায়ের একাদশ অধ্যায়ে সঞ্জয়কৃত কৃষ্ণের বলবীর্ষ্য ও মহিমা কীর্তন জন্য এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা পাওয়া যায়। তাহাতে কোন প্রয়োজন নাই। এই অধ্যায়টি প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই বোধ হয়, এবং কৃষ্ণের বলবীর্ষ্য ও মহিমা কীর্তনের মহাভারতে বা অন্যত্র কিছুই অভাবও নাই। আমরা তাঁহার মানবচরিত্র সমালোচনা করিতে ইচ্ছুক; মানবচরিত্র কার্য্য প্রকাশ; অতএব আমরা কেবল কৃষ্ণকৃত কার্য্যেরই অনুসন্ধান করিব।

দ্রোণপর্বে প্রথম ভগদত্তবধে কৃষ্ণের কোন কার্য্য দেখিতে পাই। ভগদত্ত মহাবীর, পাণ্ডবপক্ষীয় আর কেহ তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারিল না; শেষ অজ্ঞান আসিয়া তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভগদত্ত অজ্ঞানের সঙ্গে যুদ্ধে আপনাকে অশক্ত দেখিয়া, তাঁহার প্রতি বৈষম্য পরিত্যাগ করিলেন। অজ্ঞান বা অপর কেহই এই অস্ত্র নিবারণে সমর্থ নহেন; অতএব কৃষ্ণ অজ্ঞানকে আচ্ছাদিত করিয়া আপনি বক্ষে ঐ অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তাঁহার বক্ষে অস্ত্র বৈজয়ন্তী মালা হইয়া বিলম্বিত হইল।

এই অস্ত্র একটা অনৈসর্গিক অবোধগম্য ব্যাপার। যাহা অনৈসর্গিক, তাহাতে আমরা পাঠককে বিশ্বাস করিতে বলি না এবং অনৈসর্গিকের উপর কোন সত্যও সংস্থাপিত হয় না। অতএব এ গল্পটা আমাদের পরিত্যাজ্য।

দ্রোণপর্বে, অভিমন্যুবধের পরে কৃষ্ণকে প্রকৃতপক্ষে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ দেখিতে পাই। য় দিন সপ্ত রথী বেড়িয়া অন্যান্যপূর্বেক অভিমন্যুকে বধ করে, সে দিন কৃষ্ণাজ্ঞান সে রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহার কৃষ্ণের নারায়ণী সেনার সঙ্গে যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন—ঐ সেনা কৃষ্ণ দুর্যোধনকে দিয়াছিলেন। এক পক্ষে তিনি নিজে, অন্য পক্ষে তাঁহার সেনা—এইরূপে তিনি উভয় পক্ষের সঙ্গে সাম্য রক্ষা করিয়াছিলেন।

যুদ্ধান্তে ও দিবসান্তে শিবিরে ফিরিয়া আসিয়া কৃষ্ণাজ্ঞান অভিমন্যুবধ বৃত্তান্ত শুনিলেন। অজ্ঞান অতিশয় শোককাতর হইলেন।* যোগেশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং শোকমোহের অতীত। তাঁহার প্রথম কার্য্য অজ্ঞানকে সান্ত্বনা করা। তিনি যে সকল কথা বলিয়া অজ্ঞানকে প্রবোধ দিলেন, তাহা তাঁহারই উপযুক্ত। গীতায় তিনি যে ধর্ম প্রচারিত করিয়াছেন, সেই ধর্ম অনুমোদিত মহাবাক্যের দ্বারা অজ্ঞানের শোকাপনয়ন করিলেন। ঋষিরা যুধিষ্ঠিরকে প্রবোধ দিতেছিলেন,

* এমনও পাঠক থাকিতে পারেন যে, তাঁহাকে বলিয়া দিতে হয় যে, অভিমন্যু অজ্ঞানের পুত্র ও কৃষ্ণের ভাগিনেয়।

এই বলিয়া যে, সকলেই মরিয়াছে ও সকলেই মরিয়া থাকে। তিনি তাহা বলিলেন না। তিনি বৃদ্ধাইলেন,

“যুদ্ধোপজীবী ক্ষত্রিয়গণের এই পথ। যুদ্ধমৃত্যুই ক্ষত্রিয়গণের সনাতন ধর্ম।”

কৃষ্ণ অভিমন্যুজননী সুভদ্রাকেও ঐ কথা বলিয়া প্রবোধ দিলেন। বলিলেন,

“সৎকুলজাত ধৈর্যশালী ক্ষত্রিয়ের যেরূপে প্রাণপরিত্যাগ করা উচিত, তোমার পুত্র সেইরূপে প্রাণত্যাগ করিয়াছে; অতএব শোক করিবার আবশ্যিকতা নাই। মহারথ, ধীর, পিতৃতুল্য-পরাক্রমশালী অভিমন্যু ভাগ্যক্রমেই বীরগণের অভিলষিত গতি প্রাপ্ত হইয়াছে। মহাবীর অভিমন্যু ভূরি শত্রু সংহার করিয়া পুণ্যজনিত সর্বকামপ্রদ অক্ষয় লোকে গমন করিয়াছে। সাধুগণ, তপস্যা ব্রহ্মচর্য শাস্ত্র ও প্রজ্ঞা দ্বারা যেরূপ গতি অভিলাষ করেন, তোমার কুমারের সেইরূপ গতিলাভ হইয়াছে। হে সুভদ্রে! তুমি বীরজননী, বীরপত্নী, বীরনন্দিনী ও বীর-বান্ধবা; অতএব তনয়ের নিমিত্ত তোমার শোকাকুল হওয়া উচিত নহে।”

এ সকলে মাতার শোক নিবারণ হয় না জানি। কিন্তু এ হতভাগ্য দেশে এরূপ কথাগুলো শুনি ও শুনাই, ইহা ইচ্ছা করে।

এদিকে পুত্রশোকাকর্ষিত অর্জুন অতিশয় রোষপরবশ হইয়া এক নিদারুণ প্রতিজ্ঞায় আপনাকে আবদ্ধ করিলেন। তিনি যাহা শুনিলেন, তাহাতে বৃদ্ধিলেন যে, অভিমন্যুর মৃত্যুর প্রধান কারণ জয়দ্রথ। তিনি অতি কঠিন শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, পরদিন সূর্যাস্তের পূর্বে জয়দ্রথকে বধ করিবেন, না পারেন, আপনি, অগ্নিপ্রবেশপূর্বক প্রাণত্যাগ করিবেন।

এই প্রতিজ্ঞায় উভয় শিবিরে বড় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। পাণ্ডবসৈন্য অতিশয় কোলাহল করিতে লাগিল, এবং বাদিন্দ্রবাদকগণ ভারি বাজানা বাজাইতে লাগিল। কোরবেরা চমকিত হইয়া অনুসন্ধান দ্বারা প্রতিজ্ঞা জানিতে পারিয়া জয়দ্রথরক্ষার্থে মন্ত্রণা করিতে লাগিল।

কৃষ্ণ দেখিলেন, একটা বিষম ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে। অর্জুন বিবেচনা না করিয়া যে কঠিন প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছেন, তাহাতে উত্তীর্ণ হওয়া সুসাধ্য নহে। জয়দ্রথ নিজে মহারথী, সিন্ধুসৌবীর-দেশের অধিপতি, বহু সেনার নায়ক, এবং দুর্যোধনের ভগিনীপতি। কোরবপক্ষীয় অপরায়ে যোদ্ধগণ তাহাকে সাধ্যানুসারে রক্ষা করিবেন। এ দিকে পাণ্ডবপক্ষের প্রধান পুরুষেরা সকলেই অভিমন্যুশোকে বিহ্বল—মন্ত্রণায় বিমুখ। অতএব কৃষ্ণ নিজেই নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া কস্মৈ প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কোরবশিবিরে গুপ্তচর পাঠাইলেন। চর আসিয়া সেখানকার বৃত্তান্ত সব বলিল। কোরবেরা প্রতিজ্ঞার কথা সব জানিয়াছে। দ্রোণাচার্য্য ব্যূহরচনা করিবেন; তৎপশ্চাৎ কর্ণাদি সমস্ত কোরবপক্ষীয় বীরগণ একত্রিত হইয়া জয়দ্রথকে রক্ষা করিবেন। এই দুর্ভেদ্য ব্যূহভেদ করিয়া, সকল বীরগণকে একত্র পরাজিত করিয়া, মহাবীর জয়দ্রথকে নিহত করা অর্জুনেরও অসাধ্য হইতে পারে। অসাধ্য হয়, তবে অর্জুনের আত্মহত্যা নিশ্চিত।

অতএব কৃষ্ণ আপনার অনুষ্ঠেয় চিন্তা করিয়া, তাহার ব্যবস্থা করিলেন। আপনার সার্থি দারুককে ডাকিয়া, কৃষ্ণের নিজের রথ, উত্তম অশ্বে যোজিত করিয়া, অস্ত্রশস্ত্র পরিপূর্ণ করিয়া প্রভাতে প্রস্তুত রাখিতে আজ্ঞা করিলেন। তাহার অভিপ্রায় যে, যদি অর্জুন এক দিনে ব্যূহ পার হইয়া সকল বীরগণকে পরাজয় করিতে না পারেন, তবে তিনি নিজেই যুদ্ধ করিয়া কোরব-নেতৃগণকে বধ করিয়া জয়দ্রথবধের পথ পরিষ্কার করিয়া দিবেন।

কৃষ্ণকে যুদ্ধ করিতে হয় নাই, অর্জুন স্বীয় বাহুবলেই কৃতকার্য হইয়াছিলেন। কিন্তু যদি কৃষ্ণকে যুদ্ধ করিতে হইত, তাহা হইলে “অযুধ্যমানঃ সংগ্রামে নাস্তশস্ত্রাহহমেকতঃ” ইতি সত্য হইতে বিচ্যুতি ঘটিত না। কারণ, যে যুদ্ধ সম্বন্ধে এ প্রতিজ্ঞা ঘটিয়াছিল, সে যুদ্ধ এ নহে। কুরুপাণ্ডবের রাজ্য লইয়া যে যুদ্ধ, এ সে যুদ্ধ নহে। আজিকার এ অর্জুনপ্রতিজ্ঞাজনিত যুদ্ধ। এ যুদ্ধের উদ্দেশ্য ভিন্ন; এক দিকে জয়দ্রথের জীবন, অন্য দিকে অর্জুনের জীবন লইয়া যুদ্ধ। যুদ্ধে অর্জুনের পরাভব হইলে, তাহাকে অগ্নিপ্রবেশ করিয়া আত্মহত্যা করিতে হইবে। এ যুদ্ধ পূর্বে উপস্থিত হয় নাই—সুতরাং “অযুধ্যমানঃ সংগ্রামে” ইতি প্রতিজ্ঞা ইহার পক্ষে বর্তে না। অর্জুন কৃষ্ণের সখা, শিষ্য এবং ভগিনীপতি; তাহার আত্মহত্যানিবারণ কৃষ্ণের অনুষ্ঠেয় কর্ম।

ইহার পর কৃষ্ণ ও অপর সকলে নিদ্রা গেলেন। এইখানে একটা আঘাতে রকম স্বপ্নের গল্প আছে। স্বপ্নে আবার কৃষ্ণ অর্জুনের কাছে আসিলেন, উভয়ে সেই রাত্রে হিমালয় গেলেন।

বাঁকম রচনাবলী

মহাদেবের উপাসনা করিলেন, পাশ্চাত্য অস্ত্র পদার্থই (বনবাসকালে) অর্জুন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু আবার চাহিলেন ও পাইলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সকল সমালোচনার নিতান্ত অযোগ্য।

পরদিন সূর্যাস্তের প্রাক্কালে অর্জুন জয়দ্রথকে নিহত করিলেন। তজ্জন্য কৃষ্ণের কোন সাহায্য প্রয়োজন হয় নাই। তথাপি কাঁথিত হইয়াছে, কৃষ্ণ অপরাহ্নে যোগমায়া দ্বারা সূর্যকে আচ্ছন্ন করিলেন; জয়দ্রথ নিহত হইলে পরে সূর্যকে পুনঃপ্রকাশিত করিলেন। কেন? সূর্যাস্ত হইয়াছে ভ্রমে, জয়দ্রথ অর্জুনের সম্মুখে আসিবেন, এইরূপ ভ্রান্তির সৃষ্টির জন্য? এইরূপ ভ্রান্তিতে পড়িয়া জয়দ্রথ এবং তাঁহার রক্ষকগণ, উল্লসিত এবং অনবহিত হইবেন, ইহাই কি অভিপ্রেত? এইখানে কাব্যের এক স্তরের উপর আর এক স্তর নিহিত হইয়াছে স্পষ্ট দেখা যায়। এক দিকে দেখা যায় যে, এরূপ ভ্রান্তিজননের কোন প্রয়োজন ছিল না। যোগমায়াবিকাশের পদার্থেও অর্জুন জয়দ্রথকে দেখিতে পাইতেছিলেন, এবং তিনি জয়দ্রথকে প্রহার করিতেছিলেন, জয়দ্রথও তাঁহাকে প্রহার করিতেছিল। সূর্য্যাবরণের পরেও ঠিক তাহাই হইতে লাগিল। সূর্য্যাবরণের পদার্থেও অর্জুনকে যেরূপ করিতে হইতেছিল, এখনও ঠিক সেইরূপ হইতে লাগিল। সমস্ত কৌরববীরগণকে পরাভূত না করিয়া অর্জুন জয়দ্রথকে নিহত করিতে পারিলেন না। আর এক দিকে এই সকল উক্তি বিরোধী, সূর্য্যাবরণকারিণী যোগমায়ার বিকাশ। এ ভ্রান্তিসৃষ্টির প্রয়োজন, পরপরিচ্ছেদে বুঝাইতেছি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—দ্বিতীয় স্তরের কবি

আমরা এত দূর পর্য্যন্ত সোজা পথে, সুবিধামত চলিয়া আসিতেছিলাম; কিন্তু এখন হইতে ঘোরতর গোলযোগ। মহাভারত সমুদ্রবিশেষ, কিন্তু এতক্ষণ আমরা, তাহার স্থির বারিরাশিমধ্যে মধুর মৃদুগন্তীর শব্দ শুনিতে শুনিতে সুখে নৌযাত্রা করিতেছিলাম। এক্ষণে সহসা আমরা ঘোর বাতায় পড়িয়া, তরঙ্গাভিঘাতে পুনঃ পুনঃ উৎক্ষিপ্ত নিক্ষিপ্ত হইব। কেন না, এখন আমরা বিশেষ প্রকারে মহাভারতের দ্বিতীয় স্তরের কবির হাতে পড়িলাম। তাঁহার হস্তে কৃষ্ণচরিত্র সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছে। যাহা উদার ছিল, তাহা এক্ষণে ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িতেছে; যাহা সরল, তাহা এক্ষণে কৌশলময়। যাহা সত্যময় ছিল, তাহা এক্ষণে অসত্য ও প্রবণ্ডনার আকর; যাহা ন্যায় ও ধর্ম্মের অনুমোদিত ছিল, তাহা এক্ষণে অন্যায় ও অধর্ম্ম কলুষিত। দ্বিতীয় স্তরের কবির হাতে কৃষ্ণচরিত্র এইরূপ বিকার প্রাপ্ত হইয়াছে।

কিন্তু কেন ইহা হইল? দ্বিতীয় স্তরের কবি নিতান্ত ক্ষুদ্র কবি নহেন; তাঁহার সৃষ্টিকৌশল জাজ্বল্যমান। তিনি ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানশূন্য নহেন। তবে তিনি কৃষ্ণের এরূপ দশা ঘটাইয়াছেন কেন? তাহার অতি নিগূঢ় তাৎপর্য্য দেখা যায়।

প্রথমতঃ আমরা পুনঃ পুনঃ দেখিয়াছি ও দেখিব যে, কৃষ্ণ প্রথম স্তরের কবির হাতে ঈশ্বরাবতার বলিয়া পরিষ্ফুট নহেন। তিনি নিজে ত সে কথা মুখেও আনেন না; পুনঃ পুনঃ আপনার মানবী প্রকৃতিই প্রবাদিত ও পরিচিত করেন; এবং মানুষী শক্তি অবলম্বন করিয়া কার্য্য করেন। কবিও প্রায় সেই ভাবেই তাঁহাকে স্থাপিত করিয়াছেন। প্রথম স্তরে এমন সন্দেহও হয় যে, যখন ইহা প্রণীত হইয়াছিল, তখন হয়ত কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার বলিয়া সর্ব্বজন-স্বীকৃত নহেন। তাঁহার নিজের মনেও সে ভাব সকল সময়ে বিরাজমান নহে। স্থূল কথা, মহাভারতের প্রথম স্তর কতকগুলি প্রাচীন কিম্বদন্তীর সংগ্রহ মাত্র এবং কাব্যালঙ্কারে কবিকর্তৃক রঞ্জিত; এক আখ্যায়িকার সূত্রে যথায়থ সন্নিবেশপ্রাপ্ত। কিন্তু যখন দ্বিতীয় স্তর মহাভারতে প্রবিষ্ট হইল, তখন বোধ হয়, শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব সর্ব্বত্র স্বীকৃত। অতএব দ্বিতীয় স্তরের কবি তাঁহাকে ঈশ্বরাবতারস্বরূপই স্থিত ও নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার রচনায় কৃষ্ণও অনেক বার আপনার ঈশ্বরত্বের পরিচয় দিয়া থাকেন, এবং ঐশী শক্তি দ্বারা কার্য্য নিষ্পন্ন করেন। কিন্তু ঈশ্বর পুণ্যময়, কবি তাহাও জানেন। তবে, একটা তত্ত্ব পরিষ্ফুট করিবার জন্য তাঁহাকে বড় ব্যস্ত দেখি। ইউরোপীয়েরাও সেই তত্ত্ব লইয়া বড় ব্যস্ত। তাঁহারা বলেন, ভগবান্ দয়াময়, করুণাক্রমেই জীবসৃষ্টি করিয়াছেন; জীবের মঙ্গলই তাঁহার কামনা। তবে পৃথিবীতে দুঃখ কেন? তিনি পুণ্যময়, পুণ্যই তাঁহার অভিপ্রেত। তবে আবার পৃথিবীতে পাপ আসিল কোথা হইতে? খ্রীষ্টানের পক্ষে এ তত্ত্বের মীমাংসা বড় কষ্টকর, কিন্তু হিন্দুর পক্ষে তাহা সহজ।

হিন্দুর মতে ঈশ্বরই জগৎ। তিনি নিজে সুখদুঃখ, পাপপুণ্যের অতীত। আমরা যাহাকে সুখদুঃখ বলি, তাহা তাঁহার কাছে সুখদুঃখ নহে, আমরা যাহাকে পাপপুণ্য বলি, তাহা তাঁহার কাছে পাপপুণ্য নহে। তিনি লীলার জন্য এই জগৎসৃষ্টি করিয়াছেন। জগৎ তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে—তাঁহারই অংশ। তিনি আপনার সত্তাকে অবিদ্যায় আবৃত করাতেই উহা সুখদুঃখ পাপপুণ্যের আধার হইয়াছে। অতএব সুখদুঃখ পাপপুণ্য তাঁহারই মায়াজনিত। তাঁহা হইতেই সুখদুঃখ ও পাপপুণ্য। দুঃখ যে পাই, তাঁহার মায়্যা; পাপ যে করি, তাঁহার মায়্যা। বিষ্ণুপুরাণে কবি কৃষ্ণপীড়িত কালিয় সপের মুখে এই কথা দিয়াছেন,—

যথাহং ভবতা সৃষ্টো জাত্যা রূপেণ চেশ্বর।

স্বভাবেন চ সংযুক্তস্তথৈদং চেষ্টিতং মম॥

অর্থাৎ “তুমি আমাকে সর্পজাতীয় করিয়াছ, তাই আমি হিংসা করি।” প্রহ্লাদ বিষ্ণুর শ্রব করিবার সময় বলিতেছেন,

বিদ্যাবিদ্যে ভবান্ সত্যমসত্যং ত্বং বিষামৃতে।*

“তুমি বিদ্যা, তুমিই অবিদ্যা, তুমি সত্য, তুমিই অসত্য, তুমি বিষ, তুমিই অমৃত।” তিনি ভিন্ন জগতে কিছুই নাই। ধর্ম, অধর্ম, জ্ঞান, অজ্ঞান, সত্য, অসত্য, ন্যায়, অন্যায়, বুদ্ধি, দুর্ভুদ্ধি সব তাঁহা হইতে।

তিনি গীতায় স্বয়ং বলিতেছেন,

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্ত্রামসাশ্চ যে।

মত্ত এবোতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥ ৭।১২

“যাহা সাত্ত্বিক ভাব বা রাজস বা তামস, সকলই আমা হইতে জানিবে। আমি তাহার বশ নহি, সে সকল আমার অধীন।” শান্তিপর্বে ভীষ্ম যেখানে কৃষ্ণকে “সত্যাত্মনে নমঃ” “ধর্মাাত্মনে নমঃ,” বলিয়া শ্রব করিতেছেন, সেইখানেই “কামাত্মনে নমঃ,” “ঘোরাাত্মনে নমঃ,” “ক্রৌর্যাাত্মনে নমঃ,” “দৃপ্ত্যাাত্মনে নমঃ” ইত্যাদি শব্দে নমস্কার করিতেছেন; এবং উপসংহারে বলিতেছেন, “সর্বাাত্মনে নমঃ”। প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র হইতে এরূপ বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বহু শত পৃষ্ঠা পূরণ করা যাইতে পারে।

যদি তাই, তবে মানুষকে একটা গুরুতর কথা বঝাইতে পারি। দুঃখ জগদীশ্বরপ্রেরিত, তিনি ভিন্ন ইহার অন্য কারণ নাই। যে পার্শ্বিষ্ট এজন্য নিন্দিত এবং দণ্ডনীয়, তাহার সম্বন্ধে লোককে বঝাইতে পারি, ইহার পাপবুদ্ধি জগদীশ্বরপ্রবর্তিত, ইহার বিচারের তিনি কর্তা, তোমরা কে?

এই তত্ত্বের অবতারণায় দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি, ভিতরে ভিতরে প্রবৃত্ত। শ্রেষ্ঠ কবিগণ, কখনই আধুনিক লেখকদিগের মত ভূমিকা করিয়া, ভূমিকায় সকল কথা বলিয়া দিয়া, কাব্যের অবতারণা করেন না। যত্নপূর্ব্বক তাঁহাদিগের মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিতে হয়। সেক্ষপীয়রের এক একখানি নাটকের মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিবার জন্য কত সহস্র কৃতবিদ্য প্রতিভাশালী ব্যক্তি কত ভাবিলেন, কত লিখিলেন, আমরা তাহা বঝিবার জন্য কত মাথা ঘামাইলাম; কিন্তু আমাদের এই অপূর্ব্ব মহাভারত গ্রন্থের একটা অধ্যায়ের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য আমরা কখনও এক দণ্ডের জন্য কোন চেষ্টা করিলাম না। যেমন হরিসংকীর্ণকালে এক দিকে বৈষ্ণবেরা, খোলে ঘা পড়িতেই কাঁদিয়া পড়িয়া মাটিতে গড়াগড়ি দেন, আর এক দিকে নব্য শিক্ষিতেরা “Nuisance!” বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন, তেমনই প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থের নাম মাত্র এক দল মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দেন—মকল কাবল ভূসি শূনিয়া ভক্তিরসে দেশ আপ্নত করেন, আর এক দল সকলই মিথ্যা, উপধর্ম্ম, অশ্রাব্য, পরিহার্য্য, উপহাস্যস্পদ বিবেচনা করেন। বঝিবার চেষ্টা কাহারও নাই। শব্দার্থবোধ হইলেই তাঁহারা যথেষ্ট বঝিলেন মনে করেন। দুঃখের উপর দুঃখ এই, কেহ বঝাইলেও বঝিতে ইচ্ছা করেন না।

ঈশ্বরই সব—ঈশ্বর হইতেই সমস্ত। তাঁহা হইতে জ্ঞান, তাঁহা হইতে জ্ঞানের অভাব বা ভ্রান্তি, তাঁহা হইতে বুদ্ধি, তাঁহা হইতে দুর্ভুদ্ধি। তাঁহা হইতে সত্য, আবার তাঁহা হইতে

* বিষ্ণুপুরাণ। ১ অংশ, ১৯ অধ্যায়।

বিশ্বকম রচনাবলী

অসত্য। তাঁহা হইতে ন্যায়, এবং তাঁহা হইতেই অন্যায়। মনুষ্যজীবনের প্রধান উপাদান এই জ্ঞান ও বুদ্ধি, সত্য ও ন্যায়, এবং তদভাবে ভ্রান্তি, দূর্ভুক্তি, অসত্য বা অন্যায় সবই ঈশ্বরপ্রেরিত। কিন্তু জ্ঞান, বুদ্ধি, সত্য এবং ন্যায় তাঁহা হইতে, ইহা বুদ্ধিবাহার প্রয়োজন নাই; হিন্দুর কাছে তাহা স্বতঃসিদ্ধ। তবে ভ্রান্তি, দূর্ভুক্তি প্রভৃতিও যে তাঁহা হইতে, তাহা মনুষ্যের হৃদয়ঙ্গম করিবার প্রয়োজন আছে। অন্ততঃ মহাভারতের দ্বিতীয় স্তরের কবি, এমন বিবেচনা করেন। আধুনিক জ্যোতির্বিদেরা বলিয়া থাকেন, আমরা চন্দ্রের এক পিঠই চিরকাল দেখি, অপর পৃষ্ঠ কখন দেখিতে পাই না। এই কবি সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব জগৎরহস্যের অপর পৃষ্ঠ আমাদের কাছে দেখাইতে চাহেন। তিনি জয়দ্রথবধে দেখাইতেছেন, ভ্রান্তি ঈশ্বরপ্রেরিত, ঘটোৎকচবধে দেখাইবেন, দূর্ভুক্তিও তাঁহার প্রেরিত, দ্রোণবধে দেখাইবেন, অসত্যও ঈশ্বর হইতে, দুর্য্যোধনবধে দেখাইবেন, অন্যায়ও তাঁহা হইতে। আরও একটা কথা বাকি আছে। জ্ঞানবল, বুদ্ধিবল, সত্যবল, ন্যায়বল, বাহুবলের কাছে কেহ নয়। বিশেষতঃ রাজনীতিতে বাহুবলের প্রাধান্য। মহাভারত বিশিষ্ট প্রকারে রাজনৈতিক কাব্য অর্থাৎ ঐতিহাসিক কাব্য; ইতিহাসের উপর নিম্নিত কাব্য। অতএব এ কাব্যে বাহুবলের স্থান, জ্ঞান বুদ্ধ্যাদির উপরে। দ্বিতীয় স্তরের কবি দেখিতে পান যে, কেবল জ্ঞান ভ্রান্তি, বুদ্ধি দূর্ভুক্তি, সত্যাসত্য, এবং ন্যায়ন্যায় ঐশিক নিয়োগাধীন, ইহা বলিলেই রাজনৈতিক তত্ত্বটা সম্পূর্ণ হইল না, বাহুবল ও বাহুবলের অভাবও তাই। তিনি ইহা সম্পূর্ণ করিবার জন্য মৌসলপর্ব্ব প্রণীত করিয়াছেন। তথায় কৃষ্ণের অভাবে স্বয়ং অর্জুন লগ্নুধারী কৃষ্ণকর্ণের নিকট পরাভূত হইলেন।

আমি যাহাকে ঐশিক নিয়োগ বলিতেছি, অথবা দ্বিতীয় স্তরের কবি যাহা ঈশ্বরপ্রেরণা বলিয়া বুদ্ধেন, ইউরোপীয়েরা তাহার স্থানে “Law” সংস্থাপিত করিয়াছেন। এই মহাভারতীয় কবিগণের বুদ্ধিতে “Law” কোন স্থান পাইয়াছিল কি না, আমি বলিতে পারি না। তবে ইহা বলিতে পারি, যাহা “লর” উপরে, যাহা হইতে “Law”, তাহা তাঁহারা ভালরূপে বুদ্ধিবাহারি ছিলেন। তাঁহারা বুদ্ধিবাহারি ছিলেন, সকলই ঈশ্বরেচ্ছা। কৃষ্ণকে কক্ষ্মক্ষেত্রে অবতারিত করিয়া, এই কবি সেই ঈশ্বরেচ্ছা বুদ্ধিবাহারিতে চেষ্টা করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—ঘটোৎকচবধ

জয়দ্রথবধে আর একটা কৃষ্ণ সম্বন্ধে অনৈসর্গিক কথা আছে। অর্জুন জয়দ্রথের শিরশ্ছেদে উদ্যত হইলে, কৃষ্ণ বলিলেন, একটা উপদেশ দিই শুন। ইহার পিতা, পুত্রের জন্য তপস্যা করিয়া এই বর পাইয়াছে যে, যে জয়দ্রথের মাথা মাটিতে ফেলিবে, তাহারও মস্তক বিদীর্ণ হইয়া খণ্ড খণ্ড হইবে। অতএব তুমি উহার মাথা মাটিতে ফেলিও না। উহার মস্তক বাণে বাণে সঞ্চালিত করিয়া, যেখানে উহার পিতা সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতেছে, সেইখানে লইয়া গিয়া তাহার ক্রোড়ে নিক্ষেপ কর। অর্জুন তাহাই করিলেন। বৃদ্ধা সন্ধ্যা করিয়া উঠিবার সময় ছিল মস্তক তাঁহার কোল হইতে মাটিতে পড়িয়া গেল। অর্জুন বৃদ্ধার মাথা ফাটিয়া খণ্ড খণ্ড হইল।

অনৈসর্গিক বলিয়া কথাটা আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি। তৎপরে ঘটোৎকচবধঘটিত বীভৎস কাণ্ড বর্ণিত করিতে আমি বাধ্য।

হিড়িম্ব নামে এক রাক্ষস ছিল, হিড়িম্বা নামে রাক্ষসী তাহার ভগিনী। ভীম কদাচিৎ রাক্ষসটাকে মারিয়া, রাক্ষসীটাকে বিবাহ করিলেন। বরকন্যা যে পরম্পরের অনুপযোগী, এমন কথা বলা যায় না। তার পর সেই রাক্ষসীর গর্ভে ভীমের এক পুত্র জন্মিল। তাহার নাম ঘটোৎকচ। সেটাও রাক্ষস। সে বড় বলবান্। এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পিতৃপিতৃব্যের সাহায্যার্থ দল বল লইয়া আসিয়া যুদ্ধ করিতেছিল। আমি তাহার কিছু বুদ্ধিবিপর্ষ্য দেখিতে পাই— সে প্রতিষেক্গণকে ভোজন না করিয়া, তাহাদিগের সঙ্গে বাণাদির দ্বারা মানুষযুদ্ধ করিতেছিল। তাহার দূর্ভাগ্যবশতঃ দুর্য্যোধনের সেনার মধ্যে একটা রাক্ষসও ছিল। দুইটা রাক্ষসে খুব যুদ্ধ করে।

এখন, এই দিন, একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড উপস্থিত হইল। অন্য দিন কেবল দিনেই যুদ্ধ হয়, আজ রাতেও আলো জ্বালিয়া যুদ্ধ। রাগিতে নিশাচরের বল বাড়ে; অতএব ঘটোৎকচ দুর্নিবার্য হইল। কোঁরববীর কেহই তাহার সম্মুখীন হইতে পারিল না। কোঁরবদিগের রাক্ষসটাও মারা

গেল। কেবল কর্ণই একাকী ঘটোৎকচের সমকক্ষ হইয়া, রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। শেষ কর্ণও আর সামলাইতে পারেন না। তাঁহার নিকট ইন্দ্রদত্তা একপদ্রুশঘাতিনী এক শক্তি ছিল। এই শক্তি সম্বন্ধে অদ্ভুতের অপেক্ষাও অদ্ভুত এক গল্প আছে—পাঠককে তৎপঠনে পীড়িত করিতে আমি অনিচ্ছুক। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই শক্তি কেহ কোন মতেই ব্যর্থ করিতে পারে না, এক জনের প্রতি প্রযুক্ত হইলে সে মরিবে, কিন্তু শক্তি আর ফিরিবে না; তাই একপদ্রুশঘাতিনী। কর্ণ এই অমোঘ শক্তি অর্জুনবধার্থে তুলিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু আজ ঘটোৎকচের যুদ্ধে বিপন্ন হইয়া তাহারই প্রতি শক্তি প্রযুক্ত করিলেন। ঘটোৎকচ মরিল। মৃত্যুকালে বিক্ষ্যাচলের একপাদপরিমিত শরীর ধারণ করিল, এবং তাহার চাপে এক অক্ষৌহিণী সেনা মরিল!

এ সকল অপরাধে প্রাচীন হিন্দু কবিকে মার্জনা করা যায়, কেন না, বালক ও অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের পক্ষে এ রকম গল্প বড় মনোহর। কিন্তু তিনি তার পর যাহা রচনা করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় কেবল তাঁহার নিজেরই মনোহর। তিনি বলেন, ঘটোৎকচ মরিলে পাণ্ডবেরা শোককাতর হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ রথের উপর নাচিতে আরম্ভ করিলেন! তিনি আর গোপবালক নহেন, পোত্র হইয়াছে; এবং হঠাৎ বায়ুরোগাক্রান্ত হওয়ার কথাও গ্রন্থকার বলেন না। কিন্তু তবু রথের উপর নাচ! কেবল নাচ নহে, সিংহনাদ ও বাহুর আক্ষেপন! অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি? এত নাচকাচ কেন? কৃষ্ণ বলিলেন, “কর্ণের নিকট যে অমোঘ শক্তি ছিল, যা তোমার বধের জন্য তুলিয়া রাখিয়াছিল, তাহা ঘটোৎকচের জন্য পরিত্যক্ত হইয়াছে। এক্ষণে তোমার আর ভয় নাই; তুমি এক্ষণে কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারিবে।” জয়দ্রথবধ উপলক্ষে দেখিয়াছি, কর্ণের সঙ্গে অর্জুনের পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ হইয়াছে, এবং কর্ণ পরাভূত হইয়াছেন। তখন সেই ঐন্দ্রী শক্তির কোন কথাই কাহারও মনে হয় নাই; কবিরও নহে। কিন্তু তখন মনে করিলে জয়দ্রথবধ হয় না; কর্ণ জয়দ্রথের রক্ষক। সুতরাং তখন চুপে চাপে গেল। যাক—এই শক্তিঘটিত বৃত্তান্তটা অনৈসর্গিক, সুতরাং তাহা আমাদের আলোচনার অযোগ্য। যে কথাটা বলিবার জন্য, ঘটোৎকচবধের কথা তুলিলাম, তাহা এই। কৃষ্ণ, অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিয়া বলিতেছেন,

“যাহা হউক, হে ধনঞ্জয়! আমি তোমার হিতার্থে বিবিধ উপায় উদ্ভাবনপূর্বক ক্রমে ক্রমে মহাবলপরাক্রান্ত জরাসন্ধ, শিশুপাল, নিষাদ একলব্য, হিড়িম্ব, কিস্কী, বক, আলায়ুধ, উগ্রকর্মা, ঘটোৎকচ প্রভৃতি রাক্ষসের বধ সাধন করিয়াছি।”

কথাটা সত্য নহে। কৃষ্ণ শিশুপালকে বধ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে অর্জুনের হিতার্থে নহে, শিশুপাল তাঁহাকে সভামধ্যে অপমানিত ও যুদ্ধে আহূত করিয়াছিল, এই জন্য বা যজ্ঞের রক্ষার্থে। জরাসন্ধবধেরও কৃষ্ণ কর্তা না হউন, প্রবর্তক, কিন্তু সে অর্জুনের হিতার্থে নহে, কারারুদ্ধ রাজগণের মুক্তিজন্য। কিন্তু বক, হিড়িম্ব, কিস্কীর প্রভৃতি রাক্ষসদিগের বধের, এবং একলব্যের অঙ্গুষ্ঠচ্ছেদের সঙ্গে কৃষ্ণের কিছুমাত্র সম্বন্ধ ছিল না। তিনি তাহার কিছুই জানিতেন না, এবং ঘটনাকালে উপস্থিতও ছিলেন না। মহাভারতে এক স্থানে পাই বটে, কৃষ্ণ একলব্যকে বধ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ অঙ্গুষ্ঠচ্ছেদের কথা তাহার বিরোধী। ঘটনাগর্ভ, অর্থাৎ একলব্যের অঙ্গুষ্ঠচ্ছেদ এবং রাক্ষসগণের বধ, প্রকৃত ঘটনাও নহে।

তবে, এ মিথ্যা বাক্য কৃষ্ণমুখে সাজাইবার উদ্দেশ্য কি?

এ সম্বন্ধে কেবল আর একটা কথা বলিব। ভক্তে বলিতে পারিবেন, কৃষ্ণ ইচ্ছার দ্বারা সকলই করিতেছেন। তাঁহার ইচ্ছাতেই হিড়িম্বাদি বধ, এবং ঘটোৎকচের প্রতি কর্ণের শক্তি প্রযুক্ত হইয়াছিল। এ কথা সঙ্গত নহে। কৃষ্ণই বলিতেছেন যে, তিনি বিবিধ “উপায় উদ্ভাবন” করিয়া ইহা করিয়াছেন। আর যদি ইচ্ছাময় সর্বকর্তা ইচ্ছাদ্বারা এ সকল কার্য সাধন করিবেন, তবে মনুষ্যশরীর লইয়া অবতীর্ণ হইবার প্রয়োজন কি ছিল? আমরা পুনঃ পুনঃ দেখিয়াছি যে, কৃষ্ণ ইচ্ছাশক্তির দ্বারা কোন কর্ম করেন না; পদ্রুশকার অবলম্বন করেন। তিনি নিজেও তাহা বলিয়াছেন; সে কথা পূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। দেখা গিয়াছে যে, তিনি ইচ্ছা করিয়াও যত্ন করিয়া সঙ্কিসংস্থাপন করিতে পারেন নাই বা কর্ণকে যুধিষ্ঠিরের পক্ষে আনিতে পারেন নাই। আর যদি ইচ্ছার দ্বারা কর্ম সম্পন্ন করিবেন, তবে ছাই ভস্ম জড়পদার্থ একটা শক্তি-অস্ত্রের জন্য ইচ্ছাময়ের এত ভাবনা কেন?

বাংকম রচনাবলী

ইহার ভিতরে আসল কথাটা, যাহা পূর্বে পরিচ্ছেদে বলিয়াছি। বুদ্ধি ঈশ্বরপ্রেরিত, দূর্ষদ্বিও ঈশ্বরপ্রেরিত, কবি এই কথা বলিতে চাহেন। কণ অর্জুনের জন্য ঐন্দ্রী শক্তি তুলিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন যে ঘটোৎকচের উপর তাহা পরিত্যাগ করিলেন, ইহা কণের দূর্ষদ্বি। কৃষ্ণ বলিতেছেন, সে আমি করাইয়াছি; অর্থাৎ দূর্ষদ্বি ঈশ্বরপ্রেরিত। শিশুপাল দূর্ষদ্বিক্রমে সভাতলে কৃষ্ণের অসহ্য অপমান করিয়াছিলেন। জরাসন্ধ, সৈন্যসাহায্যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অজেয়; পাণ্ডবের কথা দূরে থাক, কৃষ্ণসনাথ যাদবেরাও তাহাকে জয় করিতে পারেন নাই। কিন্তু শারীরিক বলে ভীম তাহার অপেক্ষা বলবান্; একাকী ভীমের সঙ্গে মল্লের মত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া তাদৃশ রাজরাজেশ্বর সম্মাটের পক্ষে দূর্ষদ্বি। কৃষ্ণোক্তির মর্ম্ম এই যে, সে দূর্ষদ্বিও আমার প্রেরিত। দ্রোণাচার্য্য অনাৰ্য্য একলব্যের নিকট গুরুদক্ষিণাম্বরূপ তাহার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ চাহিয়াছিলেন। ঐ অঙ্গুষ্ঠ গেলে বহুকষ্টলব্ধ একলব্যের ধনুর্বিদ্যা নিষ্ফল হয়। কিন্তু একলব্য সে প্রার্থিত গুরুদক্ষিণা দিয়াছিলেন। ইহা একলব্যের দারুণ দূর্ষদ্বি। কৃষ্ণের কথার মর্ম্ম এই যে, সে দূর্ষদ্বি তাহার প্রেরিত—ঈশ্বরপ্রেরিত। রাম্ভসবধ সম্বন্ধেও ঐরূপ। এ সমস্তই দ্বিতীয় স্তর।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—দ্রোণবধ

প্রাচীন ভারতবর্ষে কেবল ক্ষত্রিয়েরাই যুদ্ধ করিতেন, এমন নহে। ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য যোদ্ধার কথা মহাভারতেই আছে। দূর্ষ্যোধনের সেনানায়কদিগের মধ্যে তিন জন প্রধান বীর ব্রাহ্মণ;—দ্রোণ, তাহার শ্যালক কৃপ, এবং তাহার পুত্র অশ্বথামা। অন্যান্য বিদ্যার ন্যায়, ব্রাহ্মণেরা যুদ্ধ-বিদ্যারও আচার্য্য ছিলেন। দ্রোণ ও কৃপ, এইরূপ যুদ্ধাচার্য্য। এই জন্য ইহাদিগকে দ্রোণাচার্য্য ও কৃপাচার্য্য বলিত।

এদিকে ব্রাহ্মণের সঙ্গে যুদ্ধে বিপদও বেশী। কেন না, রণেও ব্রাহ্মণকে বধ করিলে, ব্রহ্মহত্যার পাতক ঘটে। অন্ততঃ মহাভারতকার এই কারণ, ব্রাহ্মণ যোদ্ধাগণকে লইয়া বড় বিপন্ন, ইহা স্পষ্টই দেখা যায়। এই জন্য কৃপ ও অশ্বথামা যুদ্ধে মরিল না। কোঁরবপক্ষীয় সকলেই মরিল, কেবল তাহারা দুই জনে মরিলেন না; তাহারা অমর বলিয়া গ্রন্থকার নিষ্কৃতি পাইলেন। কিন্তু দ্রোণাচার্য্যকে না মারিলে চলে না; ভীষ্মের পর তিনি সর্ব্বপ্রধান যোদ্ধা; তিনি জীবিত থাকিতে পাণ্ডবেরা বিজয়লাভ করিতে পারেন না। কিন্তু এ কথাও গ্রন্থকার বলিতে অনিচ্ছুক যে, ধার্ম্মিক রাজগণের মধ্যে কেহ তাহাকে মারিয়া ব্রহ্মহত্যার ভাগী হইল। বিশেষতঃ, দ্রোণাচার্য্যকে দ্বৈরথযুদ্ধে পরাজিত করিতে পারে, পাণ্ডবপক্ষে এমন বীর অর্জুন ভিন্ন আর কেহই নাই; কিন্তু দ্রোণাচার্য্য অর্জুনের গুরু, এজন্য অর্জুনের পক্ষে বিশেষরূপে অবধ্য। তাই গ্রন্থকার একটা কৌশল অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

পাণ্ডবভার্য্য্য দ্রোপদীর পিতা দ্রুপদ রাজার সঙ্গে পূর্বেকালে বড় বিবাদ হইয়াছিল। দ্রুপদ, দ্রোণের বিক্রমের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই—অপদস্থ ও অপমানিত হইয়াছিলেন। এজন্য তিনি দ্রোণবধার্থ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। যজ্ঞকুণ্ড হইতে দ্রোণবধকারী পুত্র উদ্ভূত হয়—নাম ধৃষ্টদ্যুম্ন। ধৃষ্টদ্যুম্ন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবদিগের সেনাপতি। তিনিই দ্রোণবধ করিবেন, পাণ্ডবদিগের এই ভরসা। যিনি ব্রহ্মবধার্থ দৈবকর্ম্মজাত, ব্রহ্মবধ তাহার পক্ষে পাপ নয়।

কিন্তু মহাভারত এক হাতের নয়, নানা রচয়িতা নানা দিকে ঘটনাবলী যথেষ্ট লইয়া গিয়াছেন। পনের দিবস যুদ্ধ হইল, ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যের কিছুই করিতে পারিলেন না। তাহার নিকট পরাভূত হইলেন। অতএব দ্রোণ মরার ভরসা নাই—প্রত্যহ পাণ্ডবদিগের সৈন্যক্ষয় হইতে লাগিল। তখন দ্রোণবধার্থ একটা ঘোরতর পাপাচারের পরামর্শ পাণ্ডব পক্ষে স্থির হইল। এই মহাপাপমন্ত্রণার কলঙ্কটা কৃষ্ণের স্কন্ধে অর্পিত হইয়াছে। তিনিই ইহার প্রবৃত্তক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কৃষ্ণ বলিতেছেন,

“হে পাণ্ডবগণ! অন্যের কথা দূরে থাকুক, সাক্ষাৎ দেবরাজ ইন্দ্র দ্রোণাচার্য্যকে সংগ্রামে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন। কিন্তু উনি অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিলে মনুষ্যেরাও তাহার বিনাশ করিতে পারে, অতএব তোমরা ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক উহারে পরাজয় করিবার চেষ্টা কর।”

আর পাতা দশ বার পদুর্ষে যাঁহার মূখে কবি এই বাক্য সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন,
“আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, যে স্থানে ব্রহ্ম, সত্য, দম, শৌচ, ধর্ম, শ্রী, লজ্জা, ক্ষমা, ধৈর্য্য অবস্থান করে, আমি সেইখানেই অবস্থান করি।”*

যিনি ভগবদ্গীতা-পর্বাধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, ধর্মসংরক্ষণের জন্যই যুগে যুগে অবতীর্ণ হই; যাঁহার চরিত্র, এ পর্য্যন্ত আদর্শ ধার্মিকের চরিত্র বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছে, যাঁহার ধর্ম দার্ট্য শত্রুগণ কর্তৃক স্বীকৃত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে,† তিনি কি না ডাকিয়া বলিতেছেন, “তোমরা ধর্ম পরিত্যাগ কর!” তাই বলিতেছিলাম, মহাভারত নানা হাতের রচনা; যাঁহার ষেরূপ ইচ্ছা, তিনি সেইরূপ গড়িয়াছেন।

কৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন,

“আমার নিশ্চিত বোধ হইতেছে যে, অশ্বথামা নিহত হইয়াছেন, ইহা জানিতে পারিলে দ্রোণ আর যুদ্ধ করিবেন না। অতএব কোন ব্যক্তি উঁহার নিকট গমনপদুর্ষক বলুন যে, অশ্বথামা সংগ্রামে বিনষ্ট হইয়াছেন।”

অঞ্জুন মিথ্যা বলিতে অস্বীকৃত হইলেন, যুধিষ্ঠির কণ্ঠে তাহাতে সম্মত হইলেন। ভীম বিনা বাক্যব্যয়ে অশ্বথামা নামক একটা হস্তীকে মারিয়া আসিয়া দ্রোণাচার্য্যকে বলিলেন, “অশ্বথামা মরিয়াছেন।”‡ দ্রোণ জানিতেন, তাঁহার পুত্র “অমিতবলবিক্রমশালী, এবং শত্রুর অসহ্য”— অতএব ভীমের কথা বিশ্বাস করিলেন না। ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিহত করিবার চেষ্টায় মনোযোগী হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পুনশ্চ আবার যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অশ্বথামার মৃত্যুর কথা সত্য কি না? যুধিষ্ঠির কখনও অধর্ম করেন না, এবং অসত্য বলেন না, এজন্য তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, অশ্বথামা কুঞ্জর মরিয়াছে—কিন্তু কুঞ্জর শব্দটা অব্যক্ত রহিল।§

তাহাতেই বা কি হইল? দ্রোণ প্রথমে বিমনায়মান হইলেন বটে, কিন্তু তৎপরে অতি ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মৃত্যুস্বরূপ ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার আপনার সাধের অতীত যুদ্ধ করিয়া, নিরস্ত্র ও বিরথ হইয়া দ্রোণহস্তে মরণাপন্ন হইলেন। তখন ভীম গিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করিলেন, এবং দ্রোণাচার্য্যের রথ ধারণ করিয়া কতকগুলি কথা বলিলেন, তাহাই দ্রোণকে যুদ্ধে পরাজিত করিবার পক্ষে যথেষ্ট। ভীম বলিলেন,

“হে ব্রহ্মন্! যদি স্বধর্ম অসন্তুষ্ট শিক্ষিতাস্ত্র অধম ব্রাহ্মণগণ সমরে প্রবৃত্ত না হন, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়গণের কখনই ক্ষয় হয় না। পণ্ডিতেরা প্রাণিগণের হিংসা না করাই প্রধান ধর্ম বলিয়া নির্দেশ করেন। সেই ধর্ম প্রতিপালন করা ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্তব্য; আপনিই ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ; কিন্তু চণ্ডালের ন্যায় অজ্ঞানান্ধ হইয়া পুত্র ও কলত্রের উপকারার্থ অর্থলালসা নিবন্ধন বিবিধ ম্লেচ্ছজাতি ও অন্যান্য প্রাণিগণের প্রাণ বিনাশ করিতেছেন। আপনি এক পুত্রের উপকারার্থ স্বধর্ম পরিত্যাগপদুর্ষক স্বকারণ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া অসংখ্য জীবের জীবন নাশ করিয়া কি নিমিত্ত লজ্জিত হইতেছেন না?”

কথাগুলি সকলই সত্য। ইহার পর আর তিরস্কার কি আছে? ইহাতেও দুর্ষোধ্যের ন্যায় দুরাত্মার মত ফিরিতে পারে না বটে, কিন্তু দ্রোণাচার্য্য ধর্মাত্মা; ইহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট। ইহার পর অশ্বথামার মৃত্যুর কথাটা আর না তুলিলেও চলিত। কিন্তু তাহাও এখানে আবার পুনরুক্ত হইয়াছে।

এ কথা পর দ্রোণাচার্য্য অস্ত্র শস্ত্র ত্যাগ করিলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার মাথা কাটিয়া আনিলেন।

* ঘটোৎকচবধ-পর্বাধ্যায়, ১৮২ অধ্যায়।

† ধৃতরাষ্ট্রবাক্য দেখ।

‡ গোপালভাঁড় এইরূপ “কৃষ্ণ পাইয়াছিল।”

§ “অশ্বথামা হত ইতি গজঃ”—এ কথাটা মহাভারতের নহে। বোধ হয় কথকেরা তৈয়ার করিয়া থাকিবেন। মূল মহাভারতে ইহা নাই। মহাভারতে আছে,

তমতথ্যভয়ে মগ্নো জয়ে সন্তো যুধিষ্ঠিরঃ।

অব্যক্তমরবীদ্বাক্যং হতঃ কুঞ্জর ইত্যত ॥ ১১১ ॥

বাংকম রচনাবলী

এক্ষণে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। যে কাব্যটা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা যদি যথার্থ ঘটিয়া থাকে, তবে যিনি ইহাতে লিপ্ত ছিলেন, তিনি তিনি মহাপাপে লিপ্ত। গ্রন্থকারও তাহা বন্ধন। তিনি বলিয়াছেন যে, ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের রথ ইতিপূর্বে পৃথিবীর উপর চারি অঙ্গুলি উদ্ধেব চলিত, এখন ভূমি স্পর্শ করিয়া চলিল। এই অপরাধে তাহার নরক দর্শন হইয়াছিল, ইহাও বলিয়াছেন। আমাদের মতে, এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা এবং মিথ্যা প্রবণতার দ্বারা গুরুহত্যার উপযুক্ত দণ্ড, নরকদর্শন মাত্র নহে;—অনন্ত নরকই ইহার উপযুক্ত।

কৃষ্ণ এই মহাপাপের প্রবর্তক, এজন্য কৃষ্ণকে সেইরূপ অপরাধী ধরিতে হয়। কিন্তু ইহার উত্তর এই প্রচলিত আছে যে, যিনি ঈশ্বর, স্বয়ং পাপ পুণ্যের কর্তা ও বিধাতা, পাপপুণ্যই যাহার সৃষ্টি, তাহার আবার পাপপুণ্য কি? পাপপুণ্য তাহাকে স্পর্শিতে পারে না। এ কথা সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া কি, মনুষ্যদেহ-ধারণকালে পাপ তাহার আচরণীয়? তিনি নিজে বলিয়াছেন যে, তিনি ধর্মসংস্থাপনার্থ অবতীর্ণ—পাপাচরণ দ্বারা কি ধর্মসংস্থাপন তাহার উদ্দেশ্য? তিনি স্বয়ং ত এরূপ বলেন না। তিনি গীতায় বলিয়াছেন,

“জনকাদি কর্মদ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। জনগণকে স্বধর্ম প্রবৃত্ত করিবার জন্য (দৃষ্টান্তের দ্বারা) তুমি কর্ম কর। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে রূপ করিয়া থাকেন, ইতর লোকেও তাই করে; শ্রেষ্ঠ যাহা মানেন, লোক তাহারই অনুবর্তিত হয়। হে পার্থ! ত্রিলোকে আমার কর্তব্য কিছই নাই; আমার প্রাপ্তব্য বা অপ্রাপ্তব্য কিছই নাই; তথাপি আমি কর্ম করি। (কেন না) আমি যদি কদাচিৎ অতন্দ্রিত হইয়া কর্মানুবর্তন না করি, তবে মনুষ্যগণ সর্বতোভাবে আমার পথের অনুবর্তী হইবে।”—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৩য় অঃ, ২০-২৩।

অতএব শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন, মানবাবতারে, স্বকার্যের দৃষ্টান্তের দ্বারা ধর্মসংস্থাপন তাহার উদ্দেশ্যের মধ্যে। অতএব স্বধর্ম মহাপাপের দৃষ্টান্ত তাহার অভিপ্রেত হইতে পারে না।

তবে এ কাণ্ডটা কি? তাহার মীমাংসা স্থির না করিয়া আমি কৃষ্ণচরিত্র প্রণয়নে প্রবৃত্ত হই নাই। কেন না, বৃন্দাবনের গোপী ও “অশ্বথামা হত ইতি গজঃ” ইহাই কৃষ্ণের প্রধান অপবাদ।

কাণ্ডটা কি? তাহার উত্তর, কাণ্ডটা সমস্তই অমৌলিক। যদি পাঠক মনোযোগপূর্বক আমার এই গ্রন্থখানি পড়িয়া থাকেন, তবে বুঝিয়া থাকিবেন যে, সমস্ত মহাভারত, অর্থাৎ এক্ষণে যে গ্রন্থ মহাভারত নামে প্রচলিত, তাহা এক হাতের নহে। তাহার কিয়দংশ মৌলিক, আদিম মহাভারত বা “প্রথম স্তর।” অপরাংশ অমৌলিক ও পরবর্তী কবিগণকর্তৃক মূলগ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত। কোন অংশ মৌলিক, আর কোন অংশ অমৌলিক, ইহা নিরূপণ করা কঠিন। নিরূপণ জন্য আমি কয়েকটি সংকেত পাঠককে বলিয়া দিয়াছি। সেইগুলি এখন পাঠককে স্মরণ করিতে হইবে।

(১) তাহার মধ্যে একটি এই,—

“শ্রেষ্ঠ কবিদিগের বর্ণিত চরিত্রগুলির সর্বাংশ সুসঙ্গত হয়। যদি কোথাও ব্যতিক্রম দেখা যায়, তবে সে অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করা যাইতে পারে।”

উদাহরণ দিবার জন্য বলিয়াছিলাম যে, যদি কোথাও ভীষ্মের পরদারপরায়ণতা বা ভীষ্মের ভীর্ণতা দেখি, তবে জানিব, ঐ অংশ প্রক্ষিপ্ত। এখানে ঠিক তাই; এক মাত্রায় নহে, তিন মাত্রায় কেবল তাই। পরম ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের সঙ্গে এই নৃশংস বিশ্বাসঘাতকতা ও মিথ্যা প্রবণতার দ্বারা গুরুনিপাত যাদৃশ অসঙ্গত, তত অসঙ্গত আর কোন দুই বস্তুই হইতে পারে না। তার পর মহাতেজস্বী, বলগর্ভশালী, ভয়শূন্য ভীষ্মের চরিত্রের সঙ্গেও ইহা তদ্রূপ অসঙ্গত। ভীষ্ম বাহুবল ভিন্ন আর কিছই মানেন না—শত্রুর বিরুদ্ধে আর কিছই প্রয়োগ করেন না; রাজ্যার্থেও নহে, প্রাণরক্ষার্থেও নহে। স্থানান্তরেও কথিত আছে, অশ্বথামা নারায়ণাস্ত্র নামে অনিবার্য দৈবাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন—তাহাতে সমস্ত পৃথিবী নষ্ট হইতে পারে। দিব্যাস্ত্রবিৎ অর্জুনও তাহার নিবারণে অক্ষম; সমস্ত পাণ্ডবসৈন্য বিনষ্ট হইতে লাগিল। ইহা হইতে পরিচয় পাইবার একটি উপায় ছিল—এই দৈবাস্ত্র সমরবিমুখ ব্যক্তিকে স্পর্শ করে না। অতএব প্রাণরক্ষার্থ কৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে সমস্ত পাণ্ডবসৈন্য ও সেনাপতিগণ, রথ ও বাহন হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক বিমুখ হইয়া বসিলেন; কৃষ্ণের আজ্ঞায়

অজ্জুনকেও তাহা করিতে হইল। কেবল, ভীম কিছতেই তাহা করিলেন না,—বলিলেন, “আমি শরনিকর নিপাতে অশ্বখামার অস্ত্র নিবারণ করিতেছি। আমি এই সুবর্ণময়ী গুণ্ডা গদা সমুদ্যত করিয়া দ্রোণপুত্রের নারায়ণাস্ত্র বিমর্দিত করত অন্তকের ন্যায় রণস্থলে বিচরণ করিব। এই ভূমণ্ডলমধ্যে যেমন কোন জ্যোতিঃপদার্থই সূর্যের সদৃশ নহে, তদ্রূপ আমার তুল্য পরাক্রমশালী আর কোন মনুষ্যই নাই। আমার এই যে ঐরাবতশৃঙ্গসদৃশ সুদৃঢ় ভূজদণ্ড অবলোকন করিতেছ, ইহা হিমালয় পর্বতেরও নিপাতনে সমর্থ। আমি অযুতনাগতুল্য বলশালী; দেবলোকে পুরন্দর যেরূপ অপ্রতিদ্বন্দ্বী, নরলোকে আমিও তদ্রূপ। আজ আমি দ্রোণপুত্রের অস্ত্রনিবারণে প্রবৃত্ত হইতেছি, সকলে আমার বাহুবীৰ্য্য অবলোকন করুন। যদি কেহ এই নারায়ণাস্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী বিদ্যমান না থাকে, তাহা হইলে আমি স্বয়ং সমস্ত কৌরব ও পাণ্ডব-সমক্ষে এই অস্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হইব।” স্বীকার করি, বড়াই বড় বেশী, গল্পটাও নিতান্ত আশাঢ়ে। তা হোক—সত্য বলিয়া কাহাকেও ইহা গ্রহণ করিতে হইতেছে না। কবিপ্রণীত চরিত্রচিত্রের সুসঙ্গতি লইয়া কথা কহিতেছি। নারায়ণাস্ত্রমোক্ষ মৌলিক না হইতে পারে, কিন্তু এই ছাঁচে মৌলিক মহাভারতে সর্বত্রই ভীমের চরিত্র ঢালা। ইহার সঙ্গে ভীমের সেই শৃগালো-পন্ন দ্রোণপ্রবণনা কতটা সুসঙ্গত? এই ভীম কি স্ত্রীলোকেরও ঘৃণাস্পদ যে শত্রুবধোপায়, তাহা অবলম্বন করিতে পারে? দ্রোণাচার্য্যের অপেক্ষা নারায়ণাস্ত্র সহস্রগুণে ভয়ঙ্কর; যে নারায়ণাস্ত্রের সম্মুখে সিংহের ন্যায় দৃপ্ত, যাহাকে বলপ্রয়োগ ব্যতীতও* নারায়ণাস্ত্রের সম্মুখ হইতে কেহ বিমুখ করিতে পারিল না, তাহাকে অজ্জুনের প্রতিষেধা মাত্র দ্রোণের ভয়ে শৃগালাধমের ন্যায় কার্য্যপ্রবৃত্ত বলিয়া যে কবি বর্ণনা করিয়াছেন, সে কবির কবিত্ব কোথায়? মহাভারত প্রণয়ন কি তাহার সাধ্য?

তবে নিহত অশ্বখামাগজের এই গল্প, ভীমের চরিত্রের সঙ্গে অসঙ্গত; যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের সঙ্গেও অসঙ্গত, ইহা দেখিয়াছি। কিন্তু ভীমের চরিত্রের সঙ্গে ও যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের সঙ্গে ইহার যতটা অসঙ্গতি, তদপেক্ষা কৃষ্ণচরিত্রের সঙ্গেও ইহার অসঙ্গতি আরও বেশী। যদি আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহা পাঠক বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই এই অসঙ্গতির পরিমাণ বুঝিতে পারিবেন। আলোকে অন্ধকারে যত অসঙ্গতি; কৃষ্ণে শ্বেতে; তাপে শৈতে; মধুরে ককর্শে; রোগে স্বাস্থ্যে; ভাবে অভাবে যতটা অসঙ্গতি, ইহাও তত। যখন মৌলিক চরিত্রের সঙ্গে একটি নয়, তিনটি মৌলিক চরিত্রের সঙ্গে এ গল্পের এত অসঙ্গতি, তখন ইহা অমৌলিক ও প্রক্ষিপ্ত, এবং অন্যকবিপ্রণীত বলিয়া আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি।

(২) আমার কথা শেষ হয় নাই। কোন অংশ মৌলিক, কোন অংশ অমৌলিক, ইহার নিস্বাচন জন্য যে কয়েকটি লক্ষণ নির্দিষ্ট করিয়াছি, তাহার একটির দ্বারা পরীক্ষা করায় এই হতগজবৃত্তান্তটা অমৌলিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। আর একটির দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। আর একটি সূত্র এই যে, দুইটি বিবরণ পরস্পরবিরোধী হইলে, তাহার একটি প্রক্ষিপ্ত এখন মহাভারতে, ঐ অশ্বখামাগজের গল্পের সঙ্গে সঙ্গেই দ্রোণবধের আর একটি বৃত্তান্ত পাই একটিই যথেষ্ট কারণ, কিন্তু দুইটি একত্র জড়ান হইয়াছে। আমরা সেই স্বতন্ত্র বিবরণটি পৃথক্ করিয়া মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা বুঝাইবার জন্য, অগ্রে আমার বল উচিত যে, দ্রোণ অধর্ম্মযুদ্ধ করিতেছিলেন। মহাভারতে কথিত অন্যান্য দৈবাস্ত্রের মধ্যে ব্রহ্মাস্ত্র একটি। আজ এ দেশের লোকে, যে উপায়ে যে কার্য্যসাধনে অব্যর্থ, তাহাকে সেই কার্য্যের “ব্রহ্মাস্ত্র” বলে। এই ব্রহ্মাস্ত্র অস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের প্রতি প্রয়োগ নিষিদ্ধ ও অধর্ম্ম, ইহাই ঋষিদিগের মত। দ্রোণ ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা অস্ত্রানভিজ্ঞ সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতেছিলেন। এমন সময়ে,—

“বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, গোতম, বশিষ্ঠ, অত্রি, ভৃগু, অঙ্গিরা, সিকত, পৃশ্নি, গর্গ বালখিলা, মরীচিপ ও অন্যান্য ক্ষুদ্রতর সাগ্নিক ঋষিগণ আচার্য্যাকে নিঃস্কণ্ডিয় করিতে অবলোকন করিয়া তাহারে ব্রহ্মলোকে নীত করিবার বাসনায় সকলে শীঘ্র সমাগত হইয়া কহিতে লাগিলেন হে দ্রোণ! তুমি অধর্ম্মযুদ্ধ করিতেছ; অতএব এক্ষণে তোমার বিনাশসময় উপস্থিত হইয়াছে

* অজ্জুন ও কৃষ্ণ ভীমকে বলপূর্ব্বক রথ হইতে টানিয়া ফেলিয়া দিয়া অস্ত্র শস্ত্র কাড়িয় লইয়াছিলেন।

বঙ্কিম রচনাবলী

তুমি আয়ুধ পরিত্যাগ করিয়া একবার আমাদিগকে নিরীক্ষণ কর। আর তোমার এরূপ কার্যের অনুষ্ঠান করা কৰ্তব্য নহে। তুমি বেদবেদাঙ্গবেত্তা এবং সত্যধৰ্মপরায়ণ; অতএব এরূপ কার্য করা তোমার নিতান্ত অনর্চিত; তুমি অবিমুগ্ধ হইয়া আয়ুধ পরিত্যাগপূৰ্বক শাস্ত্র পথে অবস্থান কর। অদ্য তোমার মর্ত্যলোকনিবাসের কাল পরিপূর্ণ হইয়াছে। হে বিপ্র! অস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে ব্রহ্মাস্ত্র বিনাশ করিয়া নিতান্ত অসৎকার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ; অতএব আয়ুধ অবিলম্বে পরিত্যাগ কর; আর কুরকার্যের অনুষ্ঠান করা তোমার কৰ্তব্য নহে।”

ইহাতেই দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলেন। যুধিষ্ঠিরের নিকট অশ্বখামার মৃত্যু শুনিয়াও যুদ্ধে ক্ষান্ত হন নাই, পূৰ্ব্বে বলিয়াছি। তার পরেও তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনষ্ট করিবার উপক্রম করিলে, যদুবংশীয় সাত্যকি আসিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের রক্ষা সম্পাদন করিলেন। সাত্যকির সঙ্গে কেহই যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইল না। দ্রোণও নিবারণিত হইলেন। তখন যুধিষ্ঠির স্বপক্ষীয় বীরগণকে বলিলেন,—

“হে বীরগণ! তোমরা পরম যত্নসহকারে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হও। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যের বিনাশের নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। অদ্য সমরক্ষেত্রে দুঃপদনন্দনের কার্য্য সন্দর্শনে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, উনি ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রোণকে নিপাতিত করিবেন। অতএব তোমরা মিলিত হইয়া দ্রোণের সহিত যুদ্ধারম্ভ কর।”

এই কথার পর, পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাভারত হইতে পুনশ্চ উদ্ধৃত করিতেছি—

“মহারথ দ্রোণও মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া সমাগত বীরগণের প্রতি মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। সত্যসন্ধ মহাবীর দ্রোণাচার্য্য মহারথগণের প্রতি ধাবমান হইলে মেদিনীমণ্ডল কম্পিত ও প্রচণ্ড বায়ু সেনাগণকে ভীত করত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। মহতী উল্কা সূর্য্য হইতে নিঃসৃত হইয়া আলোক প্রকাশপূৰ্বক সকলকে শঙ্কিত করিল। দ্রোণাচার্য্যের অস্ত্র সকল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। রথের ভীষণ নিস্বন ও অশ্বগণের অশ্রুপাত হইতে লাগিল। তৎকালে মহারথ দ্রোণ নিতান্ত নিস্তেজ হইলেন। তাঁহার বাম নয়ন ও বাম বাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। তিনি সম্মুখে ধৃষ্টদ্যুম্নকে অবলোকন করিয়া নিতান্ত উন্মনা হইলেন, এবং ব্রহ্মবাদী ঋষিগণের বাক্য স্মরণ করিয়া ধৰ্ম্মযুদ্ধ অবলম্বনপূৰ্বক প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেন।”

পাঠক দেখিবেন যে, এখানে দ্রোণের প্রাণত্যাগের অভিলাষের কারণপরম্পরার মধ্যে অশ্বখামার মৃত্যুসম্বাদ পরিগণিত হয় নাই। বিচারকের পক্ষে এই এক প্রমাণ যথেষ্ট।

দ্রোণ তথাপি যুদ্ধ ছাড়িলেন না। মহাভারতকার দশ হাজার সৈন্যধ্বংসের কম কথা কন না, তিনি বলেন, তার পরেও দ্রোণাচার্য্য ত্রিশ হাজার সৈন্য বিনষ্ট করিলেন, এবং ধৃষ্টদ্যুম্নকে পুনর্বার পরাভূত করিলেন। এবার ভীম ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করিলেন, এবং দ্রোণাচার্য্যের রথ ধরিয় (ভীমের অভ্যাস, রথগুলা ধরিয় আছাড় মারিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলেন*) সেই পূৰ্ব্বোক্ত তীর তিরস্কার করিলেন। সেই তিরস্কারে দ্রোণ যথার্থ আয়ুধ ত্যাগ করিলেন,—

“এবং তৎপরে রথোপরি সমুদায় অস্ত্রশস্ত্র সন্নিবেশিত করিয়া যোগ অবলম্বনপূৰ্বক সমস্ত জীবকে অভয়প্রদান করিলেন। ঐ সময়ে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন রক্ত প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় রথে ভীষণ সশর শরাসন অবস্থানপূৰ্বক করবাল ধারণপূৰ্বক দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। এইরূপে দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের বশীভূত হইলে সমরাজ্ঞে মহান্ হাহাকার-শব্দ সমুখিত হইল। এদিকে জ্যোতিষ্ময় মহাতপা দ্রোণাচার্য্য অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূৰ্বক শমভাব অবলম্বন করিয়া যোগ-সহকারে অনাদিপুরুষ বিষ্ণুর ধ্যান করিতে লাগিলেন। এবং মুখ ঈষৎ উন্মিত, বক্ষঃস্থল বিষ্টান্তিত ও নেত্রদ্বয় নির্মীলিত করিয়া বিষয়াদি বাঞ্ছা পরিত্যাগ ও সাত্ত্বিকভাব অবলম্বনপূৰ্বক একাক্ষর বেদমন্ত্র ঔঁকার ও পরাৎপর দেবদেবেশ বাসুদেবকে স্মরণ করত সাধুজনেরও দুর্লভ স্বর্গলোকে গমন করিলেন।”

তার পর ধৃষ্টদ্যুম্ন আসিয়া মৃতদেহের মস্তক কাটিয়া লইয়া গেলেন।

অতএব, দ্রোণের মৃত্যুর মহাভারতে দুইটি পৃথক্ পৃথক্ বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। দুইটি সম্পূর্ণরূপে যে পরস্পরের বিরোধী, তাহা নহে; একত্রে গাঁথা যায়। একত্রে গাঁথাও আছে—

* রথগুলা যদি “এক্কার” মত হয়, তবে এখনকার লোকেও ইহা পারে।

ভাল জোড় লাগে নাই, মোটারকম রিপদুকর্ম, স্থানে স্থানে ফাঁক পাড়িয়াছে। ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এই দুইটি বিবরণের মধ্যে একটিই দ্রোণের মৃত্যুর পক্ষে যথেষ্ট, দুইটির প্রয়োজন নাই। একজন কবি এইরূপ দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ জোড়া দিবার চেষ্টা করিবার সম্ভাবনা ছিল না। দুইটি ভিন্ন ভিন্ন স্তরের দুই জন কবির প্রণীত বলিয়া কাজেই স্বীকার করিতে হয়। কোন্টি প্রক্ষিপ্ত? দ্রোণের প্রাণত্যাগেচ্ছার যে সকল কারণ মহাভারত হইতে উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, অশ্বথামার মৃত্যুসংবাদ তাহাতে ধরা হয় নাই। অতএব অশ্বথামার মৃত্যুঘটিত বৃত্তান্তটি প্রকৃত হওয়া অসম্ভব। কিন্তু যে সকল সূত্র পূর্বে সংস্থাপিত করিয়াছি, তাহা স্মরণ করিলেই ইহার মীমাংসা হইবে।

আমরা বলিয়াছি যে, যখন দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বা পরস্পরবিরোধী বিবরণের মধ্যে একটি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া স্থির হইবে, তখন কোন্টি প্রক্ষিপ্ত, তাহা মীমাংসার জন্য দেখিতে হইবে, কোন্টি অন্য লক্ষণের দ্বারা পরস্পরবিরোধী বলিয়া বোধ হয়। যেটি অন্য লক্ষণেও ধরা পাড়বে, সেইটিই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ত্যাগ করিবে।* আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, অশ্বথামাবধসংবাদ-বৃত্তান্ত, কৃষ্ণ, ভীম ও যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের সঙ্গে অত্যন্ত অসঙ্গত। আমরা পূর্বে এই একটি লক্ষণ স্থির করিয়াছি যে, এরূপ অসঙ্গতি থাকিলে তাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ধরিতে হইবে।† অতএব এই অশ্বথামাবধসংবাদ-বৃত্তান্ত প্রক্ষিপ্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

(৩) আরও একটা কথা আছে। দেখিয়াছি যে, অশ্বথামার মৃত্যুসংবাদে দ্রোণ যুদ্ধে কিছুমাত্র শৈথিল্য করেন নাই। তবে কৃষ্ণ একথা বলাইলেন কেন? দ্রোণের যুদ্ধে নিবৃত্তির সম্ভাবনা আছে বলিয়া? সম্ভাবনা কোথা? দ্রোণ জানেন, অশ্বথামা অমর। সে কথা অনৈসর্গিক বলিয়া না হয় ছাড়িয়া দিলাম। সামান্য মানুষের, তোমার আমার অথবা একটা কুলি মজুরের যে বুদ্ধি, ততটুকু বুদ্ধিও কৃষ্ণের ছিল, যদি এরূপ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও বুদ্ধিতে পারা যাইবে যে, কৃষ্ণ এরূপ পরামর্শ দিবার সম্ভাবনা ছিল না। দ্রোণই হউক আর যেই হউক, এরূপ সংবাদ শুনিয়া আত্মহত্যা উদ্যত হইবার আগে, একবার স্বপক্ষীয় কাহাকেও কি জিজ্ঞাসা করিবেন না যে, অশ্বথামা মরিয়াছে কি? অশ্বথামার অনুসন্ধান পাঠাইবেন না? তাহাই নিতান্ত সম্ভব। তাহা ঘটিলে জুয়াচুরি তখনই সমস্ত ফাঁসিয়া যাইবে।

অতএব উপন্যাসটি প্রথমতঃ প্রক্ষিপ্ত, দ্বিতীয়তঃ মিথ্যা। আমি এমত বলি না যে, ঋষিবাক্যে দ্রোণ অস্ত্র পরিত্যাগ করাই সত্য। ঋষিদের সেই রণক্ষেত্রে আগমন অনৈসর্গিক ব্যাপার, সূতরাং তাহাও অপ্রকৃত বলিয়া পরিত্যাগ করিতে আমি বাধ্য। ইহার মধ্যে প্রকৃত বা বিশ্বাসযোগ্য কথা এই হইতে পারে যে, দ্রোণ অধর্মচারণ করিতেছিলেন—ভীমের তীর তিরস্কারে তাহা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। যুদ্ধে বিমুখ হওয়া তাঁহার সাধ্য নহে—অপটুতা এবং দুর্যোধনকে বিপৎকালে পরিত্যাগ, এই উভয় দোষেই দূষিত হইতে হইবে। অতএব মৃত্যুই স্থির করিলেন। বোধ হয়, এতটুকু একটু কিংবদন্তী ছিল—তাহারই উপর মহাভারতের প্রথম স্তর নির্মিত হইয়াছিল। হয়ত, তাহাও যথার্থ ঘটনা নহে। বোধ হয়, যথার্থ ঘটনা এই পর্য্যন্ত যে, দ্রোণ যুদ্ধে দুঃপদপদ কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন; পরে যাহা বলিতেছি, তাহাতে তাই বুঝায়; তার পর প্রবলপ্রতাপ পাণ্ডালবংশকে রক্ষিত্যকলঙ্ক হইতে উদ্ধৃত করিবার জন্য নানাবিধ উপন্যাস প্রস্তুত হইয়াছে।

(৪) এখন দেখা যাউক, অনুক্রমণিকাধ্যায়ে, এবং পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে কি আছে। অনুক্রমণিকাধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্রবিলাপে এই মাত্র আছে যে—

“যদাশ্রোষং দ্রোণমাচার্য্যমেকং ধৃষ্টদ্যুম্নেনাভ্যতিক্রম্য ধর্ম্মম্।

রথোপস্থে প্রায়গতং বিশস্তং তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥”

অর্থ। হে সঞ্জয়! যখন শূর্নিলাম যে, এক আচার্য্য দ্রোণকে ধৃষ্টদ্যুম্ন ধর্ম্মাতিক্রমপূর্বক প্রায়োপবিষ্ট অবস্থায় রথোপস্থে বধ করিয়াছে, তখন আর জয়ে সন্দেহ করি নাই।

অতএব এখানেও দেখা যাইতেছে যে, দ্রোণবধে ধৃষ্টদ্যুম্ন ভিন্ন আর কেহ অধর্ম্মচারণ করে নাই। ধৃষ্টদ্যুম্নেরও পাপ এই যে, প্রায়োপবিষ্ট বৃদ্ধকে তিনি নিহত করিয়াছিলেন। দ্রোণের

* ৩৪ পৃষ্ঠা (৬) সূত্র দেখ।

† ৩৩ পৃষ্ঠা (৪) সূত্র দেখ।

বঙ্কিম রচনাবলী

প্রায়োপবেশনের কারণ এখানে কিছু কথিত হয় নাই। যুধিষ্ঠিরবাক্যে বা ঋষিগণের বাক্যে বা ভীমের তিরস্কারে, তাহা কিছু কথিত হয় নাই। পশ্চাৎ দেখিব, তিনি পরে শ্রান্ত হইয়াই নিহত হইলেন। আসন্নমৃত্যু ব্রাহ্মণের প্রায়োপবেশনের সেও উপযুক্ত কারণ।

(৫) পর্ষসংগ্রহাধ্যায়ে কোন কথাই নাই—“দ্রোণে যুধি নিপাতিতে,” এ ছাড়া আর কিছুই নাই। হত গজের কথাটা সত্য হইলে, তাহার প্রসঙ্গ অবশ্যই থাকিত। অভিমন্যুর অধর্মযুদ্ধে মৃত্যুর কথা আছে—দ্রোণেরও অবশ্য থাকিত। গল্পটা তখন তৈয়ার হয় নাই, এজন্য নাই।

(৬) তার পর, দ্রোণপর্ষের সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে দ্রোণযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। তাহাতেও এই জুরাচুরির কোন প্রসঙ্গ নাই। কেবল আছে যে, ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণকে নিপাতিত করিলেন। এই অধ্যায়গুলি যখন প্রণীত হয়, তখনও গল্পটা তৈয়ার হয় নাই।

(৭) আশ্বমেধিক পর্ষে আছে যে, কৃষ্ণও দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিলে, বসুদেব কৃষ্ণের নিকট যুদ্ধবৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করিলেন। কৃষ্ণ তাহাকে যুদ্ধবৃত্তান্ত সংক্ষেপে শুনাইলেন। দ্রোণযুদ্ধ সম্বন্ধে কৃষ্ণ ইহাই বলিলেন যে, দ্রোণাচার্য্য ও ধৃষ্টদ্যুম্ন পাঁচ দিন যুদ্ধ হয়। পরিশেষে দ্রোণ সমরশ্রমে একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নহস্তে নিহত হইলেন। বোধ হয়, এইটুকুই সত্য; এবং যুবার সহিত যুদ্ধে বৃদ্ধের শ্রান্তিই দ্রোণের যুদ্ধবিবর্তির যথার্থ কারণ। আর সকলই কবিকল্পনা বা উপন্যাস। নিতান্তই যে উপন্যাস, তাহার সাত রকম প্রমাণ দিলাম।

কিন্তু সেই উপন্যাস মধ্যে, কৃষ্ণকে মিথ্যা প্রবণতার প্রবৃত্তক বলিয়া স্থাপিত করিবার কারণ কি? কারণ পর্ষে বঝাইয়াছি। বঝাইয়াছি যে, যেমন জ্ঞান ঈশ্বরদত্ত, অজ্ঞান বা ভ্রান্তিও তাই। জয়দ্রথবধে কবি তাহা দেখাইয়াছেন। ভ্রান্তিও ঈশ্বরপ্রেরিত। ঘটোৎকচবধে কবি দেখাইয়াছেন যে, যেমন বুদ্ধি ঈশ্বরপ্রেরিত, দুর্ভুদ্ধিও ঈশ্বরপ্রেরিত। আরও বঝাইয়াছি যে, যেমন সত্যও ঈশ্বরের, অসত্যও তেমনই ঈশ্বরের। এই দ্রোণবধে কবি তাহাই দেখাইলেন।

ইহার পর, নারায়ণাস্ত্রমোক্ষ-পর্ষাধ্যায়। সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। বিস্তারিতের প্রয়োজন নাই, কেন না, নারায়ণাস্ত্র বৃত্তান্তটা অনৈসর্গিক, সুতরাং পরিত্যাজ্য। তবে এই পর্ষাধ্যায়ে একটা রহস্যের কথা আছে।

দ্রোণ নিহত হইলে, অর্জুন গুরুর জন্য শোকে অত্যন্ত কাতর। মিথ্যা কথা বলিয়া গুরুবধসাধনজন্য তিনি যুধিষ্ঠিরকে খুব তিরস্কার করিলেন, এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের নিন্দা করিলেন। যুধিষ্ঠির ভাল মানুষ, কিছু উত্তর করিলেন না, কিন্তু ভীম অর্জুনকে কড়া রকম কিছু শুনাইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন অর্জুনকে আরও কড়া রকম শুনাইলেন। তখন অর্জুনশিষ্য যদুবংশীয় সাত্যকি, অর্জুনের পক্ষ হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে ভারি রকম গালিগালাজ দিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন সুদ সমেত ফিরাইয়া দিলেন। তখন দুই জনে পরস্পরের বধে উদ্যত। কৃষ্ণের ইঙ্গিতে ভীম ও সহদেব থামাইয়া দিলেন। বিবাদটা এই যে, মিথ্যা কথা বলিয়া দ্রোণের মৃত্যু-সাধন করা কৰ্ত্তব্য ও অকৰ্ত্তব্য কি না, এই তত্ত্ব লইয়া দুই পক্ষে যত কথা আছে, সব বলিলেন, কিন্তু কেহই কৃষ্ণকে ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না। কেহই বলিলেন না যে, কৃষ্ণের কথায় এরূপ হইয়াছে। কৃষ্ণের নামও কেহ করিলেন না। পাঁচ হাতের কাজ না হইলে এমন ঘটে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—কৃষ্ণকথিত ধর্মতত্ত্ব

যিনি অশ্বথামাবধসংবাদ-বৃত্তান্ত রচনা করিয়াছেন, তিনি অর্জুনকে বড় উচ্চ স্থানে স্থাপিত করিয়াছেন। কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির ও ভীমের অপেক্ষা তাহার ধার্মিকতা অনেক বেশী, এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন। যাহার প্রস্তাবকর্তা কৃষ্ণ, এবং যাহা পরিশেষে ভীম ও যুধিষ্ঠির সম্পাদিত করিলেন, সে মিথ্যা কথা বলিয়া অর্জুন তাহাতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না; বরং তজ্জন্য যুধিষ্ঠিরকে যথেষ্ট ভৎসনা করিলেন। কিন্তু এক্ষণে যে বিবরণে আমাকে প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে, তাহাতে অর্জুন অতি মূঢ় ও পাষণ্ড বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছেন। এবং কৃষ্ণের নিকট ধর্মোপদেশ পাইয়াই সৎপথ অবলম্বন করিতেছেন। বৃত্তান্তটা এইঃ—

দ্রোণের পর কর্ণ দুর্যোধনের সেনাপতি। তাহার যুদ্ধে পাণ্ডবসেনা অস্থির। যুধিষ্ঠির নিজ দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। কর্ণ তাহাকে এরূপ সম্ভাড়িত করিলেন যে, যুধিষ্ঠির ভয়ে রণক্ষেত্র হইতে পলাইয়া গিয়া শিবিরে লুক্কায়িত হইয়া বিছানায় শুলিয়া

পাড়িলেন। এদিকে অর্জুন যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যুধিষ্ঠিরকে না দেখিয়া চিন্তিত হইয়া তাঁহার অব্যবহায়ে শিবিরে গেলেন। তখনও কর্ণ নিহত হইয়া নাই। যুধিষ্ঠির যখন শুনিলেন যে, অর্জুন এখনও কর্ণবধ করেন নাই, তখন রাগিয়া বড় গরম হইলেন। কাপুরুষের স্বভাবই এই যে, আপনি যাহা না পারে, পরে তাহা করিয়া না দিলে বড় চটিয়া উঠে। সুতরাং যুধিষ্ঠির অর্জুনকে খুব কঠিন গালগালাজ করিলেন। শেষে বলিলেন যে, তুমি নিজে যখন যুদ্ধে ভীত হইয়া পলায়ন করিয়াছ, তখন তুমি কৃষ্ণকে গান্ডীব শরাসন প্রদান কর।

শুনিয়া অর্জুন তরবারি লইয়া যুধিষ্ঠিরকে কাটিতে উঠিলেন। কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তরবারি দিয়া কাহাকে বধ করিবে? অর্জুন বলিলেন, “তুমি অন্যকে গান্ডীব* শরাসন সমর্পণ কর, এই কথা যিনি আমাকে কহিবেন, আমি তাহার মস্তক ছেদন করিব, এই আমার উপাংশুরত। এক্ষণে তোমার সমক্ষেই মহারাজ আমাকে এই কথা কহিয়াছেন, অতএব আমি এই ধর্মভীরু নরপতির নিহত করিয়া প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন ও সত্যের আনুগ্য লাভ করত নিশ্চিত হইব।”

কথাটা মৃদু ও পাষণ্ডের মত হইল—অর্জুনের মত নহে। একে ত, গান্ডীব অন্যকে দাও বলিলে কোন ব্যক্তিকে খুন করিতে হইবে, এ প্রতিজ্ঞাই মৃদুতার কাজ। তার পর পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠাগ্রজ উত্তেজনার জন্য এরূপ কথা বলিয়াছেন বলিয়া, তাহাকে বধ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া অতিশয় পাষণ্ডের কাজ। তবে ইহার ভিতর গুরুতর কথা আছে; তাহার বিস্তারিত মীমাংসা কৃষ্ণ কর্তৃক হইয়াছিল, এই জন্য এ কথার অবতারণায় আমি বাধ্য।

কথাটা এই। সত্য পরম ধর্ম। যদি অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বধ না করেন, তবে তাহাকে সত্যচ্যুত হইতে হয়। অর্জুনের প্রশ্ন এই যে, সত্যরক্ষার্থ যুধিষ্ঠিরকে বধ করা তাহার কর্তব্য কি না। অর্জুন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার মতে এক্ষণে কি করা কর্তব্য?”

কৃষ্ণ যে উত্তর দিলেন, তাহা বৃঝাইবার পূর্বে, আমরা পাঠককে অনুরোধ করি যে, আপনিই ইহার উত্তর দিবার চেষ্টা করুন। বোধ করি, সকল পাঠকই একমত হইয়া উত্তর দিবেন যে, এরূপ সত্যের জন্য যুধিষ্ঠিরকে বধ করা অর্জুনের কর্তব্য নহে। কৃষ্ণও সেই উত্তর দিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য নীতিপন্ডিত আধুনিক পাঠক যে কারণে এই উত্তর দিবেন, কৃষ্ণ সেই কারণে এ সকল উত্তর দিলেন না। তিনি প্রাচ্যনীতির বশবর্তী হইয়াই এই উত্তর দিলেন। তাহার কারণ বৃঝাইতে হইবে না—বৃঝাইতে হইবে না যে, শ্রীকৃষ্ণ ভারতবর্ষে অবতীর্ণ, ইংলণ্ডে নহে। তিনি ভারতবর্ষের নীতিতে সুপন্ডিত, ইউরোপীয় নীতি তখন হয়ও নাই; এবং কৃষ্ণ তন্মার্গাবলম্বী হইলে অর্জুনও তাহার কিছুই বৃঝিতেন না।

কৃষ্ণ অর্জুনকে বৃঝাইবার জন্য যে সকল তত্ত্বের অবতারণা করিলেন, এক্ষণে তাহার স্কুলমর্ম বলিতেছি—অন্ততঃ যে অংশ বিবাদের স্কুল হইতে পারে, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

তাঁহার প্রথম কথা “অহিংসা পরম ধর্ম”। ইহাতে প্রথম আপত্তি হইতে পারে যে, সকল স্থানে অহিংসা ধর্ম নহে। দ্বিতীয় আপত্তি এই হইতে পারে যে, কৃষ্ণ স্বয়ং গীতাপর্ব্বাধ্যায়ে অর্জুনকে যে উপদেশ দিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন, এ উক্তি তাহার বিপরীত।

যিনি অহিংসাতত্ত্বের যথার্থ মর্ম না বৃঝেন, তিনিই এরূপ আপত্তি করিবেন। অহিংসা পরম ধর্ম, এ কথায় এমন বৃঝায় না যে, কোন অবস্থায় কোন প্রকারে প্রাণহিংসা করিলে অধর্ম হয়। প্রাণহিংসা ব্যতীত আমরা ক্ষণমাত্র জীবন ধারণ করিতে পারি না, ইহা ঐশিক নিয়ম। যে জল পান করি, তাহার সঙ্গে সহস্র সহস্র অণুবীক্ষণদৃশ্য জীব উদরস্থ করি; প্রতি নিশ্বাসে বহুসংখ্যক তাদৃক জীব নাসাপথে প্রেরিত করি, প্রতি পদার্থে সহস্র সহস্রকে দলিত করি। একটি শাকের পাতা বা একটি বেগুনের সঙ্গে অনেকগুলিকে রাঁধিয়া খাই। যদি বল, এ সকল অজ্ঞানকৃত হিংসা, তাহাতে পাপ নাই; আমি তাহার উত্তরে বলি যে, জ্ঞানকৃত প্রাণহিংসা ব্যতীতও আমাদের প্রাণরক্ষা নাই। যে বিষধর সর্প বা বৃশ্চিক, আমার গৃহে বা আমার শয্যাতে আশ্রয় করিয়াছে, আমি তাহাকে বিনাশ না করিলে সে আমাকে বিনাশ করিবে। যে ব্যাঘ্র আমাকে গ্রহণ করিবার জন্য লক্ষনোদ্যত, আমি তাহাকে বিনাশ না করিলে সে আমাকে বিনাশ করিবে। যে শত্রু আমার বধসাধনে কৃতনিশ্চয় ও উদ্যতায়ুধ, আমি তাহাকে বিনাশ না করিলে সে আমাকে

* পাঠককে বোধ করি বলিতে হইবে না, গান্ডীব অর্জুনের ধনুকের নাম। উহা দেবদত্ত, অর্ধশতাব্দী এবং শরাসন মধ্যে ভয়ঙ্কর।

বিক্রম রচনাবলী

বিনাশ করিবে। যে দস্যু ধৃতাস্ত্র হইয়া নিশীথে আমার গৃহ প্রবেশপূর্বক সর্বস্ব গ্রহণ করিতেছে, যদি বিনাশ ভিন্ন তাহাতে নিবারণের উপায় না থাকে, তবে তাহাকে বিনাশ করাই আমার পক্ষে ধর্ম্মানুগত। যে বিচারকের সম্মুখে হত্যাকারিকৃত হত্যা প্রমাণিত হইয়াছে, যদি তাহার বধদণ্ড রাজনিয়োগসম্মত হয়, তবে তিনি তাহার বধাজ্ঞা প্রচার করিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য। এবং যে রাজপুরুষের উপর বধাহের বধের ভার আছে, সেও তাহাকে বধ করিতে বাধ্য। সেকেন্দর বা গজনবী মহম্মদ, আতিলা বা জঙ্গিজ, তৈমুর বা নাদের, দ্বিতীয় ফ্রেড্রিক্ বা নাপোলেয়ন্ পরস্ব ও পররাষ্ট্রাপহরণ জন্য যে অগণিত শিক্ষিত তস্কর লইয়া পররাজ্যপ্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা লক্ষ লক্ষ হইলেও প্রত্যেকেই ধর্ম্মতঃ বাধ্য। এখানে হিংসাই ধর্ম্ম।

পক্ষান্তরে, যে পাখিটি আকাশে উড়িয়া যাইতেছে, ভোজন জন্যই হউক বা খেলার জন্যই হউক, তাহার নিপাত অধর্ম্ম। যে মাছিটি মিষ্টবিন্দুর অন্তর্বেশে উড়িয়া বেড়াইতেছে, ক্রীড়াশীল বালক যে তাহাকে ধরিয়া টিপিয়া মারিল, তাহা অধর্ম্ম। যে মৃগ বা যে কুক্কট তোমার আমার ন্যায় জীবনযাত্রা নিব্বাহের জন্য জগতে আসিয়াছে, উদরন্তরী যে তাহাকে বধ করিয়া খায়, সে অধর্ম্ম। আমরা বায়ুপ্রবাহের তলচারী জীব; মৎস্য, জলপ্রবাহের উপরিচর জীব; আমরা যে তাহাদের ধরিয়া খাই, সে অধর্ম্ম।

তবে অহিংসা পরম ধর্ম্ম, এ বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, ধর্ম্ম্য প্রয়োজন ব্যতীত যে হিংসা, তাহা হইতে বিরতিই পরম ধর্ম্ম। নচেৎ হিংসাকারীর নিবারণ জন্য হিংসা অধর্ম্ম নহে; বরং পরম ধর্ম্ম। এই কথা স্পষ্টীকৃত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলাকের ইতিহাস শুনাইলেন। তাহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, বলাক নামে ব্যাধ, প্রাণিগণের বিশেষবিনাশহেতু এক স্বাপদকে বিনাশ করিয়াছিল, করিবামাত্র তাহার উপর “আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল, অঙ্গুরোদিগের অতি মনোরম গীত-বাদ্য আরম্ভ হইল, এবং সেই ব্যাধকে স্বর্গে সমানীত করিবার নিমিত্ত বিমান সমুপস্থিত হইল।” ব্যাধের পুণ্য এই যে, সে হিংসাকারীর হিংসা করিয়াছিল।

অহিংসা পরম ধর্ম্ম, এই অর্থে বৃদ্ধিতে হইবে। তবে, ধর্ম্ম্য প্রয়োজন ভিন্ন হিংসা করিবে না, এ কথায় একটা ভারি গোলযোগ হয়, এবং জগতে চিরকাল হইয়া আসিতেছে। ধর্ম্ম্য প্রয়োজন কি? ধর্ম্ম কি? Inquisition কর্তৃক মনুষ্যবধে ধর্ম্ম্য প্রয়োজন আছে বলিয়া কোটি কোটি মনুষ্য যমপুরে প্রেরিত হইয়াছিল। ধর্ম্মার্থই St. Bartholomew হত্যাকাণ্ড। ধর্ম্মাচরণ বিবেচনাতেই ক্রুসেদওয়ালাদিগের দ্বারা পৃথিবী নরশোণিতপ্রবাহে পঙ্কিল হইয়াছিল। ধর্ম্ম-বিস্তারের জন্য মুসলমানেরা লক্ষ লক্ষ মনুষ্যহত্যা করিয়াছিল। বোধ হয়, ধর্ম্মপ্রয়োজন সম্বন্ধে ভ্রান্তিতে পাড়িয়া মনুষ্য যত মনুষ্য নষ্ট করিয়াছে, তত মনুষ্য আর কোন কারণেই নষ্ট হয় নাই।

অর্জুনেরও এখন সেই ভ্রান্তি উপস্থিত। তিনি মনে করিয়াছেন যে, সত্যরক্ষাধর্ম্মার্থ যুদ্ধিষ্ঠরকে বধ করা কর্তব্য। অতএব কেবল অহিংসা পরম ধর্ম্ম, এ কথা বলিলেও তাহার ভ্রান্তির দূরীকরণ হয় না। এই জন্য কৃষ্ণের দ্বিতীয় কথা।

সে দ্বিতীয় কথা এই যে, বরং মিথ্যা বাক্যও প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কিন্তু কখনই প্রাণিহিংসা করা কর্তব্য নহে।* ইহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, অহিংসা ও সত্য, এই দুইয়ের মধ্যে অহিংসা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ইহার অর্থ এইঃ—নানাবিধ পুণ্য কর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া গণনা করা যায়; যথা—দান, তপ, দেবভক্তি, সত্য, শৌচ, অহিংসা ইত্যাদি। ইহার মধ্যে সকলগুলি সমান নহে; ইতরবিশেষ হওয়াই সম্ভব। শৌচের মাহাত্ম্য বা দানের মাহাত্ম্য কি সত্যের সঙ্গে বা অহিংসার সঙ্গে এক?

* যে বচনের উপর নির্ভর করিয়া কৃষ্ণকথিত এই ধর্ম্মতত্ত্ব সংস্থাপিত হইতেছে, তাহার মূল সংস্কৃত উদ্ধৃত করা কর্তব্য।

প্রাণিনামবধস্তাত সর্বজ্যাশ্মতো মম।

অনুতাং বা বদেদ্বাচং ন তু হিংসাং কথংন ॥

পাঠক দেখিবেন, অহিংসা পরমধর্ম্ম, এটা কৃষ্ণবাক্যের ঠিক অনুবাদ নহে। ঠিক অনুবাদ—“আমার মতে প্রাণিগণের অহিংসা সর্ব হইতে শ্রেষ্ঠ।” অর্থগত বিশেষ প্রভেদ নাই বলিয়া “অহিংসা পরমধর্ম্ম” ইতিপরিচিত বাক্যই ব্যবহার করিয়াছি।

যদি তাহা না হয়, যদি তারতম্য থাকে, তবে সর্বশ্রেষ্ঠ কে? কৃষ্ণ বলেন, অহিংসা। সত্যের স্থান তাহার নীচে।

আমরা পাশ্চাত্যের শিষ্য। অনেক পাঠক এই কথায় শিহরিয়া উঠিবেন। পাশ্চাত্যেরা নারিক বলিয়া থাকেন, কোনও অবস্থাতেই মিথ্যা বলা যাইতে পারে না। তা না হয় হইল; সে কথা এখন উঠিতেছে না। এমন কেহই বলিবেন না যে, পাশ্চাত্যদিগের মতে একজন মিথ্যাবাদী একজন হত্যাকারীর অপেক্ষা গুরুতর পাপী, অথবা মিথ্যাবাদী ও হত্যাকারী তুল্য পাপী। তাঁহারা যে তাহা বলেন না, সমস্ত ইউরোপীয় দর্শনবিদগণ তাহার প্রমাণ। যদি তাই হইল, তবে এখন কৃষ্ণের সঙ্গে পাশ্চাত্যের শিষ্যগণের মতভেদের এখানে কোন লক্ষণ দেখা যায় না। এখানে কেবল পাপের তারতম্যের কথা হইতেছে। কোন অধর্মই কোন সময়ে করিতে নাই। নরহত্যাও করিতে নাই, মিথ্যা কথাও বলিতে নাই। কৃষ্ণের কথার ফল এই যে, যদি এমন অবস্থা কাহারও ঘটে যে, হয় তাহাকে মিথ্যা কথা বলিতে হইবে, নয় নরহত্যা করিতে হইবে, তবে সে বরং মিথ্যা কথা বলিবে, তথাপি নরহত্যা করিবে না। যদি এরূপ ধর্মাত্মা নীতিজ্ঞ কেহ থাকেন যে, বলেন যে, বরং নরহত্যা করিবে, তথাপি মিথ্যা কথা বলিবে না, তবে আমাদের উত্তর এই যে, তাঁহার ধর্ম তাঁহাতেই থাক, এ নারকী ধর্ম যেন ভারতবর্ষে বিরলপ্রচার হয়।

কৃষ্ণের এই মত। যদি অজ্ঞান ইহার অনুবর্তী হইবেন, তবে ভ্রাতৃবধ-পাপ হইতে তাঁহাকে বিরত করিবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। কিন্তু অজ্ঞান বলিতে পারেন, “এ ত গেল তোমার মত। কিন্তু লৌকিক ও প্রচলিত ধর্ম কি? তোমার মতই যথার্থ হইতে পারে, কিন্তু ইহা যদি প্রচলিত ধর্ম অনুমোদিত না হয়, তবে আমি জনসমাজে সত্যচ্যুত পাপাত্মা বলিয়া কলঙ্কিত হইব।” এজন্য কৃষ্ণ আপনার মত প্রকাশ করিয়া প্রচলিত ধর্ম যাহা, তাহা বুঝাইতেছেন। তিনি বলিলেন, “হে ধনঞ্জয়! কুরুপিতামহ ভীষ্ম, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, বিদুর ও যশস্বিনী কুন্তী যে ধর্মরহস্য কাহিয়াছেন, আমি যথার্থরূপে তাহাই কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এই বলিয়া বলিলেন,

“সাধু ব্যক্তিই সত্য কথা কাহিয়া থাকেন, সত্য অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই।* সত্যতত্ত্ব অতি দুর্জয়। সত্যবাক্য প্রয়োগ করাই অবশ্য কর্তব্য।

এই গেল স্থূলনীতি। তারপর বিজ্ঞত তত্ত্ব বলিতেছেন,

“কিন্তু যে স্থানে মিথ্যা সত্যস্বরূপ, ও সত্য মিথ্যাস্বরূপ হয়, সে স্থলে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করা দোষাবহ নহে।”

কিন্তু কখন কি এমন হয়? এ কথাটা আবার উঠিবে, সেই সময়ে আমরা ইহার যথাসাধ্য বিচার করিব। তার পর কৃষ্ণ বলিতেছেন,

“বিবাহ, রতিক্রীড়া, প্রাণবিয়োগ ও সর্বস্বাপহরণকালে এবং ব্রাহ্মণের নিমিত্ত মিথ্যা প্রয়োগ করিলেও পাতক হয় না।”

এখানে ঘোর বিবাদের স্থল, কিন্তু বিবাদ এখন থাক। কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদে উল্লিখিতরূপ আছে। উহা একটি শ্লোকের মাত্র অনুবাদ, কিন্তু মূলে ঐ বিষয়ে দুইটি শ্লোক আছে। দুইটিই উদ্ধৃত করিতেছি;

১। প্রাণাত্যয়ে বিবাহে চ বক্তব্যমন্তং ভবেৎ।

সর্বস্বস্যাপহারে চ বক্তব্যমন্তং ভবেৎ ॥

২। বিবাহকালে রতিসম্প্রয়োগে প্রাণাত্যয়ে সর্বধনাপহারে।

বিপ্রস্য চার্থে হনন্তং বদেত পণ্ডান্তান্যাহুরপাতকানি ॥

এই দুইটি শ্লোকের একই অর্থ; কেবল প্রথম শ্লোকটিতে ব্রাহ্মণের কথা নাই, এই প্রভেদ। এখন পাঠকের মনে এই প্রশ্ন আপনাই উদয় হইবে, একই অর্থবাচক দুইটি শ্লোকের প্রয়োজন কি?

ইহার উত্তর এই যে, এই দুইটিই অন্যত্র হইতে উদ্ধৃত—Quotation—কৃষ্ণের নিজোক্তি নহে। সংস্কৃতগ্রন্থে এমন স্থানে স্থানে দেখা যায় যে, অন্যত্র হইতে বচন ধৃত হয়, কিন্তু স্পষ্ট

* “ন সত্যাহিত্যতে পরম্।” ইতিপূর্বে কৃষ্ণ বলিয়াছেন, “প্রাণনামবধস্তাত সর্বজ্ঞান্যাত্মতো মম।” এই দুইটি কথা পরস্পরবিরোধী। তাহার কারণ, একটি কৃষ্ণের মত, আর একটি ভীষ্মাদিকথিত প্রচলিত ধর্মনীতি।

বাংকম রচনাবলী

করিয়া বলা হয় না যে, এই বচন গ্রন্থান্তরে। এই মহাভারতীয় গীতা-পর্বাধ্যায়েই তাহার উদাহরণ গ্রন্থান্তরে দিয়াছি।

আমি আন্দাজের উপর নির্ভর করিয়া বলিতেছি না, এ বচন দুইটি অন্যত্র হইতে ধৃত। দ্বিতীয় শ্লোকটি, যথা—“বিবাহকালে রতিসম্প্রয়োগে” ইত্যাদি—ইহা বিশিষ্টের বচন। পাঠক বিশিষ্টের ১৬ অধ্যায়ে, ৩৫ শ্লোকে তাহা দেখিবেন; ইহা মহাভারতের আদিপর্বে, ৩৪১২ শ্লোকে, যেখানে কৃষ্ণের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই, সেখানেও কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হইয়া উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা—

ন নস্ময়ন্তুং বচনং হিনস্তি ন স্ত্রীষু রাজস্ব বিবাহকালে।

প্রাণাত্যয়ে সর্বাধনাপহারে পণ্ডান্তান্যাহুরপাতকানি ॥

চারিটি ভিন্ন পাঁচটির কথা এখানে নাই, তথাপি বিশিষ্টের সেই “পণ্ডান্তান্যাহুর-পাতকানি” আছে। প্রচলিত বচন সকল মুখে মুখে এইরূপ বিকৃত হইয়া যায়।

প্রথম শ্লোকটির পূর্বাঙ্গমী শ্লোকের সহিত লিখিতেছি;

(ক) ভবেৎ সত্যমবজ্ঞব্যং বজ্ঞব্যমন্তং ভবেৎ।

(খ) যত্রান্ত্যং ভবেৎ সত্যং সত্যপ্ণাপ্যন্তং ভবেৎ ॥

(গ) প্রাণাত্যয়ে বিবাহে চ বজ্ঞব্যমন্তং ভবেৎ।

(ঘ) সর্বাধনাপহারে চ বজ্ঞব্যমন্তং ভবেৎ।

এক্ষণে মহাভারতের সভাপর্বে হইতে একটি (১৩৮৪৪) শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি—কৃষ্ণের সহিত সেখানে কোন সম্বন্ধ নাই।

(চ) প্রাণান্তিকে বিবাহে চ বজ্ঞব্যমন্তং ভবেৎ।

(ছ) অন্তেন ভবেৎ সত্যং সত্যেনৈবান্তং ভবেৎ ॥

পাঠক দেখিবেন, (গ) ও (চ) আর (খ) (ছ) একই। শব্দগুলিও প্রায় একই। অতএব ইহাও প্রচলিত পুরাতন বচন।

ইহা কৃষ্ণের মত নহে; নিজের অনুমোদিত নীতি বলিয়াও তাহা বলিতেছেন না; ভীষ্মাদির কাছে যাহা শুনিয়াছেন, তাহাই বলিতেছেন; নিজের অনুমোদিত হউক বা না হউক, কেন তিনি ইহা অজ্ঞানকে শুনাইতে বাধ্য, তাহা বলিয়াছি। সুতরাং কৃষ্ণচরিত্রে এ নীতির যথার্থ্যাযথার্থ বিচারে কোন প্রয়োজন হইতেছে না।

কিন্তু আসল কথা বাকি আছে। আসল কথা, কৃষ্ণের নিজের মতও এই যে, অবস্থা বিশেষে সত্য মিথ্যা হয় এবং মিথ্যা সত্য হয়; এবং সে সকল স্থানে মিথ্যাই প্রযোক্তব্য। একথা তিনি পরে বলিতেছেন।

প্রথমে বিচার্য, কখনও কি মিথ্যা সত্য হয়, এবং সত্য মিথ্যা হয়? ইহার স্কুল উত্তর এই যে, যাহা ধর্ম্মানুমোদিত, তাহাই সত্য, আর যাহা অধর্ম্মের অনুমোদিত, তাহাই মিথ্যা। ধর্ম্মানুমোদিত মিথ্যা নাই; এবং অধর্ম্মানুমোদিত সত্য নাই। তবে সত্যাসত্য মীমাংসা ধর্ম্মাধর্ম্ম মীমাংসার উপর নির্ভর করিতেছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে ধর্ম্মতত্ত্ব নির্ণয় করিতেছেন। কথাগুলাতে গীতার উদারনীতির গম্ভীর শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। বলিতেছেন,

“ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম তত্ত্ব নির্ণয়ের বিশেষ লক্ষণ নির্দিষ্ট আছে। কোন কোন স্থলে অনুমান দ্বারাও নিতান্ত দুর্ব্বোধ ধর্ম্মের নির্ণয় করিতে হয়।”

ইহার অপেক্ষা উদার ইউরোপেও কিছু নাই। তার পর,

“অনেকে শ্রুতিতে ধর্ম্মের প্রমাণ বলিয়া নির্দেশ করেন। তাহাতে আমি দোষারোপ করি না; কিন্তু শ্রুতিতে সমস্ত ধর্ম্মতত্ত্ব নির্দিষ্ট নাই; এই জন্য অনেক স্থলে অনুমান দ্বারা ধর্ম্ম নির্দিষ্ট করিতে হয়।”

এই কথাটা লইয়া আজও সভ্যজগতে বড় গোলমাল। যাঁহারা বলেন যে, যাহা দৈবোক্তি, বেদই হউক, বাইবেলই হউক, কোরাণই হউক,—তাহাতে যাহা আছে, তাহাই ধর্ম্ম—তাহার বাহিরে ধর্ম্ম কিছুই নাই—তাঁহারা আজও বড় বলবান। তাঁহাদের মতে ধর্ম্ম দৈবোক্তি নির্দিষ্ট, অনুমানের বিষয় নহে। এ কথা মনুষ্যজাতির উন্নতির পথে বড় দুরন্তীর্ণ কণ্টক। আমাদের দেশের কথা দূরে থাকুক, ইউরোপেও আজও এই মত উন্নতির পথ রোধ করিতেছে। আমাদের দেশের অবনতির ইহা একটি প্রধান কারণ। আজও ভারতবর্ষের ধর্ম্মজ্ঞান বেদ ও

মনুষ্যাজ্ঞবল্ক্যাদি স্মৃতির দ্বারা নিরুদ্ধ;—অনুমানের পথ নিষিদ্ধ। অতি দূরদর্শী মনুষ্যাদর্শ শ্রীকৃষ্ণ লোকোন্মতির এই বিষম ব্যাঘাত সেই অতি-প্রাচীন কালেও দেখিয়াছিলেন। এখন হিন্দুসমাজের ধর্মজ্ঞান দেখিয়া বিষমমনে সেই শ্রীকৃষ্ণেরই শরণ লইতে ইচ্ছা করে।

কিন্তু অনুমানের একটা মূল চাহি। যেমন অগ্নি ভিন্ন ধূমোৎপত্তি হয় না, এই মূলের উপর অনুমান করি যে, সম্মুখস্থ ধূমবান্ পর্বত বহিমান্ ও বটে, তেমনি একটা লক্ষণ চাহি যে, তাহা দেখিলেই বৃষ্টিতে পারিব যে, এই কস্মটা ধর্ম বটে। শ্রীকৃষ্ণ তাহার লক্ষণ নির্দিষ্ট করিতেছেন।

“ধর্ম প্রাণগণকে ধারণ করে বলিয়া ধর্ম নামে নির্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব যদ্বারা প্রাণগণের রক্ষা হয়, তাহাই ধর্ম।”

এই হইল কৃষ্ণকৃত ধর্মের লক্ষণনির্দেশ। কথাটায়, এখনকার Herbert Spencer, Bentham, Mill ইতি সম্প্রদায়ের শিষ্যগণ কোন প্রকার অমত করিবেন না জানি। কিন্তু অনেকে বলিবেন, এ যে ঘোরতর হিতবাদ—বড় Utilitarian রকমের ধর্ম। বড় Utilitarian রকম বটে, কিন্তু আমি গ্রন্থান্তরে বুঝাইতেছি যে, ধর্মতত্ত্ব হিতবাদ হইতে বিযুক্ত করা যায় না; জগদীশ্বরের সার্বভৌতিকত্ব এবং সর্বময়তা হইতেই ইহাকে অনুমিত করিতে হয়। সঙ্কীর্ণ শ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে হিতবাদের বিরোধ হইতে পারে, কিন্তু যে হিন্দুধর্ম বলে যে, ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন, হিতবাদ সে ধর্মের প্রকৃত অংশ। এই কৃষ্ণবাক্যই যথার্থ ধর্মলক্ষণ।

পূর্বে বুঝাইয়াছি, যাহা ধর্মানুমোদিত, তাহাই সত্য; যাহা ধর্মানুমোদিত নহে, তাহাই মিথ্যা। অতএব যাহা সর্বলোকহিতকর, তাহাই সত্য, যাহা লোকের অহিতকর, তাহাই মিথ্যা। এই অর্থে, যাহা লৌকিক সত্য, তাহা ধর্মতঃ মিথ্যা হইতে পারে; এবং যাহা লৌকিক মিথ্যা, তাহা ধর্মতঃ সত্য হইতে পারে। এইরূপ স্থলে মিথ্যাও সত্যস্বরূপ এবং সত্যও মিথ্যাস্বরূপ হয়।

উদাহরণ স্বরূপ কৃষ্ণ বলিতেছেন, যদি কেহ কাহারে বিনাশ করিবার মানসে কাহারও নিকট তাহার অনুসন্ধান করে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির মৌনাবলম্বন করাই উচিত। যদি একান্তই কথা কহিতে হয়, তবে সে স্থলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাই কর্তব্য। ঐরূপ স্থলে মিথ্যা সত্যস্বরূপ হয়।

এই প্রস্তাব উত্থাপিত করিবার পূর্বেই, কৃষ্ণ, কোঁশিকের উপাখ্যান অর্জুনকে শুনাইয়া ভূমিকা করিয়াছিলেন। সে উপাখ্যান এই,

“কোঁশিক নামে এক বহুশ্রুত তপস্বিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ গ্রামের অনতিদূরে নদীগণের সঙ্গমস্থানে বাস করিতেন। ঐ ব্রাহ্মণ সর্বদা সত্যবাক্য প্রয়োগরূপ ব্রত অবলম্বনপূর্বক তৎকালে সত্যবাদী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। একদা কতকগুলি লোক দস্যুভয়ে ভীত হইয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিলে, দস্যুরাও ক্রোধভরে যত্নসহকারে সেই বনে তাহাদিগকে অন্বেষণ করত সেই সত্যবাদী কোঁশিকের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিল, হে ভগবন্! কতকগুলি ব্যক্তি এই দিকে আগমন করিয়াছিল, তাহারা কোন পথে গমন করিয়াছে, যদি আপনি তাহা অবগত থাকেন, তাহা হইলে সত্য করিয়া বলুন। কোঁশিক দস্যুগণকর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া সত্যপালনার্থে তাহাদিগকে কহিলেন, কতকগুলি লোক এই বৃক্ষ, লতা ও বৃক্ষপরিবেষ্টিত অটবীমধ্যে গমন করিয়াছে। তখন সেই কুরকর্মা দস্যুগণ তাহাদের অনুসন্ধান পাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ ও বিনাশ করিল। সূক্ষ্মধর্মনিভিজ্ঞ সত্যবাদী কোঁশিকও সেই সত্যবাক্যজনিত পাপে লিপ্ত হইয়া ঘোর নরকে নিপতিত হইলেন।”

এ স্থলে ইহা অভিপ্রেত যে, কোঁশিক অবগত হইয়াছিলেন যে, ইহারা দস্যু; পলায়িত ব্যক্তিগণের অনিষ্ট ইহাদের উদ্দেশ্য—নহিলে তাঁহার কোন পাপই নাই। যদি তাহা অবগত ছিলেন, তবে তিনি কৃষ্ণের মতে সত্যকথনের দ্বারা পাপাচরণ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে ঘোরতর মতভেদ। আমাদের প্রতীচ্য শিক্ষকদিগের নিকট শিখিয়াছি যে, সত্য নিত্য, কখন মিথ্যা হয় না, এবং কোন সময়ে মিথ্যা প্রযোক্তব্য নহে। সুতরাং কৃষ্ণের মত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট নির্দিষ্ট হইতে পারে। যাহারা ইহার নিন্দা করিবেন (আমি ইহার সমর্থনও করিতেছি না), তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, কোঁশিকের এ অবস্থায় কি করা উচিত ছিল? সহজ উত্তর, মৌনাবলম্বন করা উচিত ছিল। সে কথা ত কৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন—সে বিষয়ে মতভেদ নাই। যদি দস্যুরা মৌনী থাকিতে না দেয়? পীড়নাদির দ্বারা উত্তর গ্রহণ করে? কেহ কেহ

বিশ্বকম রচনাবলী

বলিতে পারেন যে, পীড়ন ও মৃত্যু স্বীকার করিয়াও কোঁশিকের মৌনরক্ষা করা উচিত ছিল। তাহাতেও আমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। তবে জিজ্ঞাস্য এই, ঈদৃশ ধর্ম পৃথিবীতে সাধারণতঃ চলিবার সম্ভাবনা আছে কি না? ইহাতে সাংখ্যপ্রবচনকারের একটি সূত্র আমাদের মনে পড়িল। মহর্ষি কপিল বলিয়াছেন, “নাশক্যোপদেশবিধিরূপাদিষ্টেইপ্যানুপদেশঃ।”* এরূপ ধর্মপ্রচার চেষ্টা নিষ্ফল বলিয়া বোধ হয়। যদি সফল হয়, মানবজাতির পরম সৌভাগ্য।

কথাটা এখানে ঠিক তাহা নয়। কথাটা এই যে, যদি একান্তই কথা কহিতে হয়, অবশ্যং কুর্জিতব্যে বা শঙ্করন্ বাপ্যকুর্জতঃ।

তাহা হইলে কি করিবে? সত্য বলিয়া জ্ঞানতঃ নরহত্যার সহায়তা করিবে? যিনি এইরূপ ধর্মতত্ত্ব বুকেন, তাহার ধর্মবাদ যথার্থই হউক, অযথার্থই হউক, নিতান্ত নৃশংস বটে।

প্রতিবাদকারী বলিতে পারেন যে, কৃষ্ণোক্ত এই নীতির একটি ফল এমন হয় যে, হত্যাকারীর জীবনরক্ষার্থ মিথ্যা শপথ করাও ধর্ম। যিনি এরূপ আপত্তি করিবেন, তিনি এই সত্যতত্ত্ব কিছুই বুকেন নাই। হত্যাকারীর দণ্ড মনুষ্যজীবন রক্ষার্থ নিতান্ত প্রয়োজনীয়, নহিলে যে যাহাকে পাইবে, মারিয়া ফেলিবে। অতএব হত্যাকারীর দণ্ডই ধর্ম; এবং তাহার রক্ষার্থ যে মিথ্যা বলে, সে অধর্ম করে।

কৃষ্ণোক্ত এই সত্যতত্ত্ব নির্দেশ এবং মনুষ্যসাধারণের অবলম্বনীয় কি না, তাহা আমি এক্ষণে বলিতে প্রস্তুত নহি। তবে কৃষ্ণচরিত্র বুদ্ধাইবার জন্য উহা পরিষ্ফুট করিতে আমি বাধ্য। কিন্তু ইহাও বলিতে আমি বাধ্য যে, পাশ্চাত্যেরা যে কারণে বলেন যে, সত্য সকল সময়েই সত্য, কোন অবস্থাতেই পরিহার্য্য নহে, তাহার মূলে একটা গুরুতর কথা আছে। কথাটা এই যে, ইহাই যদি ধর্ম—সত্য যেখানে মনুষ্যের হিতকারী, সেইখানেই ধর্ম, আর যেখানে মনুষ্যের হিতকারী নয়, সেখানে অধর্ম, ইহাই যদি ধর্ম হয়, তাহা হইলে মনুষ্যজীবন এবং মনুষ্য-সমাজ অতিশয় বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে,—যে লোকহিত তোমার উদ্দেশ্য, তাহা ডুবিয়া যায়। অবস্থাবিশেষ উপস্থিত হইলে, সত্য অবলম্বনীয় বা মিথ্যা অবলম্বনীয়, এ কথার মীমাংসা কে করিবে? যে সে মীমাংসা করিবে। যে সে মীমাংসা করিতে বাসিলে, মীমাংসা কখন ধর্মানুমোদিত হইতে পারে না। শিক্ষা, জ্ঞান, বুদ্ধি অনেকেরই অতি সামান্য; কাহারও সম্পূর্ণ নহে। বিচারশক্তি অধিকাংশেরই আদৌ অল্প, তার উপর ইন্দ্রিয়ের বেগ, স্নেহ মমতার বেগ, ভয়, লোভ, মোহ, ইত্যাদির প্রকোপ। সত্য নিত্যপালনীয়, এরূপ ধর্মব্যবস্থা না থাকিলে, মনুষ্যজাতি সত্যশূন্য হইবারই সম্ভাবনা।

প্রাচীন হিন্দু ঋষিরা যে তাহা বুঝিতেন না, এমত নহে। বুঝিয়াই তাঁহারা বিশেষ করিয়া বিধান করিয়া দিয়াছেন, কোন্ কোন্ সময়ে মিথ্যা বলা যাইতে পারে। প্রাণাত্যয়ে ইত্যাদি সেই বিধি আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি। মনু, গৌতম প্রভৃতি ঋষিদিগেরও মতও সেই প্রকার। তাঁহারা যে কয়টি বিশেষ বিধি বলিয়াছেন, তাহা ধর্মানুমত কি না, তাহার বিচারে আমার প্রয়োজন নহে। কৃষ্ণকথিত সত্যতত্ত্ব পরিষ্ফুট করাই আমার উদ্দেশ্য। কৃষ্ণও আধুনিক ইউরোপীয়-দিগের ন্যায় বুঝিয়াছিলেন যে, বিশেষ বিধি ব্যতীত, এই সাধারণ বিধি কার্য্যে পরিণত করা, সাধারণ লোকের পক্ষে অতি দুরূহ। কিন্তু তাঁহারা বিবেচনায় প্রাণাত্যয়ে প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ অবস্থা নির্দেশ করিলেই লোককে ধর্মানুমত সত্যচরণ বুদ্ধান যায় না। তিনি তৎপরিবর্তে কি জন্য, এবং কিরূপ অবস্থায় সাধারণ বিধি উল্লঙ্ঘন করা উচিত, তাহাই বলিতেছেন। আমরা তাহা স্পষ্টীকৃত করিতেছি।

দান, তপ, শৌচ, আর্জব, সত্য প্রভৃতি অনেকগুলি কার্য্যকে ধর্ম বলা যায়। ইহার সকল-গুলিই সাধারণতঃ ধর্ম, আবার সকলগুলিই অবস্থাবিশেষে অধর্ম। অনুপযুক্ত প্রয়োগ বা ব্যবহারই অধর্ম। দান সম্বন্ধে উদাহরণ প্রয়োগ পূর্ব্বক বলিতেছেন, “সমর্থ হইলেও চৌরাদিকে ধন দান করা কদাপি কর্তব্য নহে। পাপাত্মাদিগকে ধন দান করিলে অধর্মাচরণ নিবন্ধন দাতারও নিতান্ত নিপীড়িত হইতে হয়।” সত্য সম্বন্ধেও সেইরূপ। শ্রীকৃষ্ণ তাহার যে দুইটি উদাহরণ দিয়াছেন, তাহার একটি উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, আর একটি এই:

* প্রথম অধ্যায়, ৯ সূত্র।

“যে স্থলে মিথ্যা শপথ দ্বারাও চোরসংসর্গ হইতে মুক্তি লাভ হয়, সে স্থলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাই শ্রেয়ঃ। সে মিথ্যা নিশ্চয়ই সত্যস্বরূপ হয়।”

ইহা ভিন্ন প্রচলিত ধর্মশাস্ত্র হইতে প্রাণাত্যয়ে বিবাহে ইত্যাদি কথা পুনরুক্ত হইয়াছে।

কৃষ্ণকথিত সত্যতত্ত্ব এইরূপ। ইহার স্থূল তাৎপর্য এইরূপ বুঝা গেল যে,

১। যাহা ধর্মনির্মোদিত, তাহাই সত্য, যাহা ধর্মবিরুদ্ধ, তাহা অসত্য।

২। যাহাতে লোকের হিত, তাহাই ধর্ম।

৩। অতএব যাহাতে লোকের হিত, তাহাই সত্য। যাহা তদ্বিরুদ্ধ, তাহা অসত্য।

৪। এইরূপ সত্য সর্বদা সর্বস্থানে প্রযোক্তব্য।

কৃষ্ণভক্ত বালিতে পারেন যে, ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সত্যতত্ত্ব কোথাও কথিত হইয়াছে, এমন যদি দেখাইতে পার, তবে আমরা কৃষ্ণের মত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি। যদি তাহা না পার, তবে ইহাই আদর্শ মনুষ্যোচিত বাক্য বালিয়া স্বীকার কর।

উপসংহারে আমার ইহাও বক্তব্য যে, “যদ্বারা লোকরক্ষা বা লোকহিত সাধিত হয়, তাহাই ধর্ম, আমরা যদি ভক্তি সহকারে এই কৃষ্ণোক্তি হিন্দুধর্মের মূলস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলে হিন্দুধর্মের ও হিন্দুজাতির উন্নতির আর বিলম্ব থাকে না। তাহা হইলে, যে উপধর্মের ভঙ্গরাশিমধ্যে, পবিত্র এবং জগতে অতুল্য হিন্দুধর্ম প্রোথিত হইয়া আছে, তাহা অনলপকালে কোথায় উড়িয়া যায়। তাহা হইলে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কুক্রিয়া, অনর্থক সামর্থ্যব্যয় ও নিষ্ফল কালাতিপাত, দেশ হইতে দূরীভূত হইয়া সংকর্ষ ও সদনুষ্ঠানে হিন্দু-সমাজ প্রভাবিত হইয়া উঠে। তাহা হইলে ভণ্ডামি, জাতি মারামারি, পরস্পরের বিদ্বেষ ও অনিষ্টচেষ্টা আর থাকে না। আমরা মহতী কৃষ্ণকথিতা নীতি পরিত্যাগ করিয়া, শূলপাণি ও রঘুনন্দনের পদানত—লোকহিত পরিত্যাগ করিয়া তিথিতত্ত্ব মলমাসতত্ত্ব প্রভৃতি আটাইশ তত্ত্বের কচকচিতে মগ্নমুগ্ধ। আমাদের জাতীয় উন্নতি হইবে ত কোন্ জাতি অধঃপাতে যাইবে? যদি এখনও আমাদের ভাগ্যেদয় হয়, তবে আমরা সমস্ত হিন্দু একত্রিত হইয়া, নমো ভগবতে বাসুদেবায় বালিয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম প্রণাম করিয়া, তদুপদিষ্ট এই লোকহিতাত্মক ধর্ম গ্রহণ করিব।* তাহা হইলে নিশ্চিতই আমরা জাতীয় উন্নতি সাধিত করিতে পারিব।

সপ্তম পরিচ্ছেদ—কর্ণবধ

অর্জুন কৃষ্ণের কথা বুঝিলেন, কিন্তু অর্জুন ক্ষত্রিয়, প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার জন্য ব্যাকুল। অতএব যাহাতে দুই দিক্ রক্ষা হয়, কৃষ্ণকে তাহার উপায় অবধারণ করিতে বলিলেন।

কৃষ্ণ বলিলেন, অপমান মাননীয় ব্যক্তির মৃত্যুস্বরূপ। তুমি যুধিষ্ঠিরকে অপমানসূচক একটা কথা বল, তাহা হইলেই, তাঁহাকে বধ করার তুল্য হইবে। অর্জুন তখন যুধিষ্ঠিরকে অপমানসূচক বাক্যে ভৎসিত করিলেন। কিন্তু কৃষ্ণকে আবার এক বিপদে ফেলিলেন। বলিলেন, আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অপমানিত করিয়া গুরুতর পাপ করিয়াছি, অতএব আত্মহত্যা করিব। এই বালিয়া আবার অসি নিষ্কোষিত করিলেন। কৃষ্ণ তাঁহারও মৃত্যুর সোজা ব্যবস্থা করিলেন। বলিলেন, আত্মশ্লাঘা সজ্জনের মৃত্যুস্বরূপ। কথাটা কিছুমাত্র অন্যায় নহে। অর্জুন তখন অনেক আত্মশ্লাঘা করিলেন। তখন সব গোল মিটিয়া গেল।

কৃষ্ণ, অর্জুনের সার্থি, কিন্তু যেমন অর্জুনের অশ্বের যস্তা, তেমন এখন স্বয়ং অর্জুনেরও নিয়ন্তা। কখনও অর্জুনের আজ্ঞায় কৃষ্ণ রথ চালান, কখনও কৃষ্ণের আজ্ঞায় অর্জুন চলেন। এখন কৃষ্ণ, অর্জুনকে কর্ণবধে নিযুক্ত করিলেন।

এই কর্ণবধ মহাভারতের একটি প্রধান ঘটনা। বহুকাল হইতে ইহার সূত্রপাত হইয়া আসিতেছে। কর্ণই অর্জুনের প্রতিষেধক। ভীমার্জুন নকুল সহদেব চারি জনে যুধিষ্ঠিরের জন্য দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন, কর্ণ একাই দুর্যোধনের জন্য দিগ্বিজয় করিয়াছিল। অর্জুন দ্রোণের শিষ্য, কর্ণ দ্রোণগুরু পরশুরামের শিষ্য। অর্জুনের যেমন গান্ধীব ধনু ছিল, কর্ণের

* বেণ্থামের কথা ইংলন্ড শূনিল—কৃষ্ণের কথা ভারতবর্ষ শূনিবে না?

বিক্রম রচনাবলী

তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিজয় ধনু ছিল। অর্জুনের কৃষ্ণ সার্থি, মহাবীর শল্য কর্ণের সার্থি, উভয়ে অনেক দিব্যাস্ত্রে শিক্ষিত। উভয়েই পরস্পরের বধের জন্য বহুদিন হইতে প্রতিজ্ঞাত। অর্জুন ভীষ্মদ্রোণবধে কিছুমাত্র যত্নশীল ছিলেন না, কর্ণবধে তাঁহার দৃঢ় যত্ন। কুন্তী যখন কর্ণকে কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত অবগত করিয়া, তাঁহার নিকট আর পাঁচটি পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা চাহিলেন, তখন কর্ণ যুধিষ্ঠির ভীম নকুল সহদেবের প্রাণ ভিক্ষা মাতাকে দিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই অর্জুনের প্রাণ ভিক্ষা দিলেন না। তাঁহাকে বধ করিবেন, না হয় তাঁহার হস্তে নিহত হইবেন, ইহা নিশ্চিত জানাইলেন।

সেই মহাযুদ্ধে অদ্য অর্জুনকে কৃষ্ণ লইয়া যাইলেন। ইহারই জন্য কৃষ্ণ অর্জুনকে যুধিষ্ঠিরের শিবিরে লইয়া আসিয়াছিলেন। ভীম অর্জুনকে যুধিষ্ঠিরের সন্মানে যাইতে বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু রণ শেষ না করিয়া অর্জুনের আসিতে ইচ্ছা ছিল না। কৃষ্ণ জিদ করিয়া তাঁহাকে লইয়া আসিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত যে, কর্ণ ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া পরিশ্রান্ত হউন, অর্জুন ততক্ষণ বিশ্রাম লাভ করিয়া পুনঃসুজস্বী হউন। এক্ষণে যুদ্ধে লইয়া যাইবার সময়ে আরও অর্জুনের তেজোবৃদ্ধি জন্য অর্জুনের বীরত্বের প্রশংসা করিলেন, এবং তাঁহার পুর্বেকৃত অতিদুর্দর্ষ কার্য সকল স্মরণ করাইয়া দিলেন। দ্রোপদীর অপমান, অভিমন্যুর অন্যায়যুদ্ধে হত্যা প্রভৃতি কর্ণকৃত পাণ্ডবপীড়ন বৃত্তান্ত সকল স্মরণ করাইয়া দিলেন। এই বক্তৃতার মধ্য হইতে কোন অংশ উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। কেবল ইহাই বক্তব্য, কৃষ্ণ বলিতেছেন, “পুর্বে বিষ্ণু যেমন দানবগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন,” “পুর্বে দানবগণ বিষ্ণু কর্তৃক নিহত হইলে” ইত্যাদি বাক্যে বুদ্ধিতে পারি যে, কৃষ্ণ এখনও আপনাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পরিচয় দেন না। দেবত্বে কোন অধিকার প্রকাশ করেন না, ইহা প্রথম স্তরের একটি লক্ষণ। দ্বিতীয় স্তরে, অন্য ভাব।

পরে কর্ণ অর্জুনের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তাহার বর্ণনায় আমার প্রয়োজন নাই। কথিত হইয়াছে যে, কর্ণের সর্পবাণ হইতে কৃষ্ণ অর্জুনকে রক্ষা করিয়াছিলেন। অর্জুন উহার নিবারণ করিতে পারেন নাই, অতএব কৃষ্ণ পদাঘাতে অর্জুনের রথ ভূমিতে কিঞ্চিৎ বসাইয়া দিলেন, অশ্বগণ জানু পাতিয়া পড়িয়া গেল। অর্জুনের মস্তক বাঁচিয়া গেল; কেবল কীরিট কাটা পড়িল। অর্জুন নিজে মস্তক অবনত করিলেও সেই ফল হইত। কথাটা সমালোচনার যোগ্য নহে। তবে কৃষ্ণের সারথ্যের প্রশংসা মহাভারতে পুনঃ পুনঃ দেখা যায়।

যুদ্ধের শেষ ভাগে কর্ণের রথচক্র মাটিতে বাঁসিয়া গেল। কর্ণ তাহা তুলিবার জন্য মাটিতে নামিলেন। যতক্ষণ রথচক্রের উদ্ধার না করেন, ততক্ষণ জন্য অর্জুনের কাছে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। অর্জুনও ক্ষমা করিয়াছিলেন দেখা যাইতেছে, কেন না, কর্ণ তাহার পর আবার রথে উঠিয়া পুর্বেকৃত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কর্ণের দুর্ভাগ্য যে, ক্ষমা প্রার্থনাকালে তিনি অর্জুনকে এমন কথা বলিয়াছিলেন যে, ধর্মতঃ তিনি ঐ সময়ের জন্য কর্ণকে ক্ষমা করিতে বাধ্য; কৃষ্ণ অধর্মের শাস্তা। তিনি কর্ণকে তখন বলিলেন,

“হে সূতপুত্র! তুমি ভাগ্যান্ধ্রমে এক্ষণে ধর্ম স্মরণ করিতেছ। নীচাশয়েরা দুঃখে নিমগ্ন হইয়া প্রায়ই দৈবকে নিন্দা করিয়া থাকে: আপনাদিগের দুঃস্বপ্নের প্রতি কিছুতেই দৃষ্টিপাত করে না। দেখ, দুর্ষেয়াধন, দুঃশাসন ও শকুনি তোমার মতানুসারে একবস্ত্রা দ্রোপদীরে যে সভায় আনয়ন করিয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন দৃষ্ট শকুনি দুর্ভিক্ষ-পরতন্ত্র হইয়া তোমার অনুমোদনে অক্ষয়ীড়ায় নিতান্ত অনভিজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করিয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন রাজা দুর্ষেয়াধন তোমার মতানুযায়ী হইয়া ভীমসেনকে বিষাক্ত ভোজন করাইয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি বারণাবত নগরে জতুগৃহমধ্যে প্রসুপ্ত পাণ্ডবগণকে দক্ষ করিবার নিমিত্ত অগ্নিপ্রদান করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি সভামধ্যে দুঃশাসনের বশীভূতা রজস্বলা দ্রোপদীরে, হে কৃষ্ণ! পাণ্ডবগণ বিনষ্ট হইয়া শাস্বত নরকে গমন করিয়াছে, এক্ষণে তুমি অন্য পতিরে বরণ কর, এই কথা বলিয়া উপহাস করিয়াছিলে এবং অনার্য ব্যক্তিরে তাঁহারে নিরপরাধে ক্লেশ প্রদান করিলে উপেক্ষা করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি রাজ্যলোভে শকুনিকে আশ্রয়পুর্বেক পাণ্ডবগণকে দ্যুতক্রীড়া করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি মহারথগণ-সমবেত হইয়া বালক

অভিমন্যুকে পরিবেষ্টন পূর্বেক বিনাশ করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? হে কর্ণ! তুমি যখন তত্তৎকালে অধর্মনিষ্ঠান করিয়াছ, তখন আর এ সময় ধর্ম ধর্ম করিয়া তালদেশ শূন্য করিলে কি হইবে? তুমি যে এখন ধর্মপরায়ণ হইলেও জীবন সত্ত্বে মূর্ত্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে, ইহা কদাচ মনে করিও না। পূর্বে নিষদদেশাধিপতি নল যেমন পুষ্কর দ্বারা দ্যুতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া পুনরায় রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধর্মপরায়ণ পাণ্ডবগণও ভুজবলে সৌমদিগের সহিত শত্রুগণকে বিনাশ করত রাজ্যলাভ করিবেন। ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণ অবশ্যই ধর্মসংরক্ষিত পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত হইবে।”

কৃষ্ণের কথা শুনিয়া কর্ণ লজ্জায় মস্তক অবনত করিলেন। তার পর পূর্বেক যুদ্ধ করিয়া, অজ্ঞানবাণে নিহত হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ—দুর্যোধনবধ

কর্ণ মরিলে, দুর্যোধন শল্যকে সেনাপতি করিলেন। পূর্বেদিনের যুদ্ধে যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয় হইয়া কাপুররূপতা-কলঙ্ক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এ কলঙ্ক অপনীত করা নিতান্ত আবশ্যিক। সর্বদর্শী কৃষ্ণ আজিকার প্রধান যুদ্ধে তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন। তিনিও সাহস করিয়া শল্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বধ করিলেন।

সেই দিন সমস্ত কোরবসৈন্য পাণ্ডবগণ কর্তৃক নিহত হইল। দুই জন ব্রাহ্মণ, কৃপ ও অশ্বথামা, যদুবংশীয় কৃতবর্মা এবং স্বয়ং দুর্যোধন, এই চারি জন মাত্র জীবিত রহিলেন। দুর্যোধন পলাইয়া গিয়া দ্বৈপায়ন হুদে ডুবিয়া রহিল। পাণ্ডবগণ খুঁজিয়া সেখানে তাহাকে ধরিল। কিন্তু বিনা যুদ্ধে তাহাকে মারিল না।

যুধিষ্ঠিরের চিরকাল স্থূলবুদ্ধি, সেই স্থূলবুদ্ধির জন্যই পাণ্ডবদিগের এত কষ্ট। তিনি এই সময়ে সেই অপূর্ণ বুদ্ধির বিকাশ করিলেন। তিনি দুর্যোধনকে বলিলেন, “তুমি অভীষ্ট আয়ুধ গ্রহণপূর্বে আমাদের মধ্যে যে কোন বীরের সহিত সমাগত হইয়া যুদ্ধ কর। আমরা সকলে রণস্থলে অবস্থানপূর্বেক যুদ্ধব্যাপার নিরীক্ষণ করিব। আমি কহিতেছি যে, তুমি আমাদের মধ্যে একজনকে বিনাশ করিতে পারিলেই সমুদায় রাজ্য তোমার হইবে।” দুর্যোধন বলিলেন, আমি গদাযুদ্ধ করিব। কৃষ্ণ জানিতেন, গদাযুদ্ধে ভীম ব্যতীত কোন পাণ্ডবই দুর্যোধনের সমকক্ষ নহে। দুর্যোধন অন্য কোন পাণ্ডবকে যুদ্ধে আহত করিলে, পাণ্ডবদিগের আবার ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে। কেহ কিছু বলিলেন না, সকলেই বলদৃপ্ত; যুধিষ্ঠিরকে ভৎসনার ভার কৃষ্ণই গ্রহণ করিলেন। সেই কার্য তিনি বিশিষ্ট প্রকারে নিষ্পাহ করিলেন।

দুর্যোধনও অতিশয় বলদৃপ্ত, সেই দর্পে যুধিষ্ঠিরের বুদ্ধির দোষ সংশোধন হইল। দুর্যোধন বলিলেন, যাহার ইচ্ছা হয়, আমার সঙ্গে গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। সকলকেই বধ করিব। তখন ভীমই গদা লইয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন।

এখানে আবার মহাভারতের সুর বদল। আঠার দিন যুদ্ধ হইয়াছে, ভীম দুর্যোধনেই সর্বদাই যুদ্ধ হইয়াছে, গদাযুদ্ধও অনেক বার হইয়াছে, এবং বরাবরই দুর্যোধনই গদাযুদ্ধে ভীমের নিকট পরাভব প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু আজ সুর উঠিল যে, ভীম গদাযুদ্ধে দুর্যোধনের তুল্য নহে। আজ ভীম পরাভূতপ্রায়। আসল কথাটা ভীমের সেই দারুণ প্রতিজ্ঞা। সভাপর্বে যখন দ্যুতক্রীড়ার পর, দুর্যোধন দ্রৌপদীকে জিতিয়া লইল, তখন দুর্যোধন একবস্ত্রা রজস্বলা দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণ করিয়া সভামধ্যে আনিয়া বিবস্ত্রা করিতেছিলেন, তখন ভীম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আমি দুর্যোধনকে বধ করিয়া তাহার বুক চিরিয়া রক্ত খাইব। ভীম মহাশ্মশানতুল্য বিকট রণস্থলে দুর্যোধনকে নিহত করিয়া রাক্ষসের মত তাহার তপ্ত শোণিত পান করিয়া, সকলকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, আমি অমৃত পান করিলাম। দুর্যোধন সেই সভামধ্যে “হাসিতে হাসিতে দ্রৌপদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করতঃ বসন উত্তোলনপূর্বেক সর্বলক্ষণ-সম্পন্ন বজ্রতুল্য দৃঢ় কদলীদণ্ড ও করিশূণ্ডের ন্যায় স্বীয় মধ্য উরু, তাঁহাকে দেখাইলেন।” তখন ভীম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমি মহাযুদ্ধে গদাঘাতে ঐ উরু যদি ভগ্ন না করি, তবে আমি যেন নরকে যাই।

বঙ্গীয় রচনাবলী

আজি সেই উরু গদাঘাতে ভাঙ্গিতে হইবে। কিন্তু একটা তাহার বিশেষ প্রতিবন্ধক—গদাঘাতের নিয়ম এই যে, নাভির অধঃ গদাঘাত করিতে নাই—তাহা হইলে অন্যায় যুদ্ধ করা হয়। ন্যায়যুদ্ধে ভীম দুর্যোধনকে মারিতে পারিলেও, প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইবে না।

যে জ্যেষ্ঠতাপুত্রের হৃদয়রুধির পান করিয়া নৃত্য করিয়াছে, সে রাক্ষসের কাছে মাথায় গদাঘাত ও উরুতে গদাঘাতে তফাৎ কি? যে বৃকোদর দ্রোণভয়ে মিথ্যা প্রবণতার সময়ে প্রধান উদ্যোগী বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছেন, তিনি উরুতে গদাঘাতের জন্য অন্যের উপদেশসাপেক্ষ হইতে পারেন না। কিন্তু সেরূপ কিছু হইল না। ভীম উরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গেলেন। বলিয়াছি, দ্বিতীয় স্তরের কবি (এখানে তাহারই হাত দেখা যায়) চরিত্রের সুসঙ্গতি রক্ষণে সম্পূর্ণ অমনোযোগী। তিনি এখানে ভীমের চরিত্রের কিছুমাত্র সুসঙ্গতি রাখিলেন না; অজ্ঞানেরও নহে। ভীম ভুলিয়া গেলেন যে, উরুভঙ্গ করিতে হইবে; আর যে পরমধার্মিক অজ্ঞান, দ্রোণবধের সময়, তাহার অশ্রুগুরু, ধর্ম্মের আচার্য্য, সখা, এবং পরমশত্রুর পাত্র কৃষ্ণের কথাতো মিথ্যা বলিতে স্বীকৃত করেন নাই, তিনি এক্ষণে স্বেচ্ছাক্রমে অন্যায়যুদ্ধে ভীমকে প্রবর্তিত করিলেন। কিন্তু কথাটা কৃষ্ণ হইতে উৎপন্ন না হইলে, কবির উদ্দেশ্য সফল হয় না। অতএব কথাটা এই প্রকারে উঠিল—

অজ্ঞান ভীম-দুর্যোধনের যুদ্ধ দেখিয়া কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ইহাদিগের মধ্যে গদাঘাত কে শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণ বলিলেন, ভীমের বল বেশী, কিন্তু দুর্যোধনের গদাঘাত যত্ন ও নৈপুণ্য অধিক। বিশেষ যাহারা প্রথমতঃ প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া পুনরায় সমরে শত্রুগণের সম্মুখীন হয়, তাহাদিগকে জীবিতানিরপেক্ষ ও একাগ্রচিত্ত বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। জীবিতাশানিরপেক্ষ হইয়া সাহস সহকারে যুদ্ধ করিলে, সংগ্রামে সে বীরকে কেহই পরাভব করিতে পারে না। অতএব যদি ভীম দুর্যোধনকে অন্যায়যুদ্ধে সংহার না করেন, তবে দুর্যোধন জয়ী হইয়া যুধিষ্ঠিরের কথামত পুনর্বার রাজ্যলাভ করিবে।

কৃষ্ণের এইরূপ কথা শুনিয়া অজ্ঞান “স্বীয় বাম জানু আঘাত করতঃ ভীমকে সঙ্কেত করিলেন।” তার পর ভীম দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করিয়া তাহাকে নিপাতিত করিলেন।

যেমন ন্যায় ঈশ্বরপ্রেরিত, অন্যায়ও তেমন ঈশ্বরপ্রেরিত। ইহাই এখানে দ্বিতীয় স্তরের কবির উদ্দেশ্য।

যুদ্ধকালে দর্শকমধ্যে, বলরাম উপস্থিত ছিলেন। ভীম ও দুর্যোধন উভয়েই গদাঘাত তাহার শিষ্য। কিন্তু দুর্যোধনই প্রিয়তর। রেবতীবল্লভ সর্বদাই দুর্যোধনের পক্ষপাতী। এক্ষণে দুর্যোধন, ভীম কর্তৃক অন্যায়যুদ্ধে নিপাতিত দেখিয়া, অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, লাঙ্গল উঠাইয়া তিনি ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। বলা বাহুল্য যে, বলরামের স্কন্ধে সর্বদাই লাঙ্গল, এই জন্য তাহার নাম হলধর। কেন তাহার এ বিড়ম্বনা, যদি কেহ এ কথা জিজ্ঞাসা করেন, তবে তাহার কিছু উত্তর দিতে পারিব না। যাই হউক, কৃষ্ণ বলরামকে অনুন্নয় বিনয় করিয়া কোনরূপে শান্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। বলরাম কৃষ্ণের কথায় সম্মুগ্ধ হইলেন না। রাগ করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

তার পর একটা বীভৎস ব্যাপার উপস্থিত হইল। ভীম, নিপাতিত দুর্যোধনের মাথায় পদাঘাত করিতেছিলেন। যুধিষ্ঠির নিবারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভীম তাহা শুনেন নাই। কৃষ্ণ তাহাকে এই কদর্য আচরণে নিযুক্ত দেখিয়া তাহাকে নিবারণ না করার জন্য যুধিষ্ঠিরকে তিরস্কার করিলেন। এদিকে, পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ দুর্যোধনের নিপাত জন্য ভীমের বিস্তর প্রশংসা ও দুর্যোধনের প্রতি কটুক্তি করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ তাহাতে বিরক্ত হইয়া বলিলেন,

“মৃতকল্প শত্রুর প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে।”

কৃষ্ণের এই সকল কথা কৃষ্ণের ন্যায় আদর্শ পুরুষের উচিত। কিন্তু ইহার পর যাহা গ্রন্থমধ্যে পাই, তাহা অতিশয় আশ্চর্য্য ব্যাপার।

প্রথম আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, কৃষ্ণ অন্যাকে বলিলেন, “মৃতকল্প শত্রুর প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে।” কিন্তু ইহা বলিয়াই নিজে দুর্যোধনকে কটুক্তি করিতে লাগিলেন।

দুর্যোধনের উত্তর দ্বিতীয় আশ্চর্য্য ব্যাপার। দুর্যোধন তখনও মরেন নাই, ভগ্নোন্নয় হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে কৃষ্ণের কটুক্তি শুনিয়া কৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন,

“হে কংসদাসতনয়! ধনঞ্জয় তোমার বাক্যানুসারে বৃকোদরকে আমার উরু ভগ্ন করিতে

সঙ্কেত করাতে ভীমসেন অধর্মযুদ্ধে আমাে নিপাতিত করিয়াছে, ইহাতে তুমি লজ্জিত হইতেছ না। তোমার অন্যায় উপায় দ্বারাই প্রতিদিন ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত সহস্র নরপতি নিহত হইয়াছেন।* তুমি শিখণ্ডীরে অগ্রসর করিয়া পিতামহকে নিপাতিত করিয়াছ।† অশ্বথামা নামে গজ নিহত হইলে তুমি কোশলেই আচার্য্যকে অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করাইয়াছিলে এবং সেই অবসরে দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন তোমার সমক্ষে আচার্য্যকে নিহত করিতে উদ্যত হইলে তাহার নিষেধ কর নাই।‡ কর্ণ অর্জুনের বিনাশার্থ বহুদিন অতি যত্নসহকারে যে শক্তি রাখিয়াছিলেন, তুমি কোশলক্রমে সেই শক্তি ঘটোৎকচের উপর নিক্ষেপ করাইয়া, ব্যর্থ করাইয়াছ।§ সাত্যকি তোমারই প্রবর্তনাপরতন্ত্র হইয়া ছিন্নহস্ত প্রায়োপবিষ্ট ভূরিশ্রবাকে নিহত করিয়াছিলেন।|| মহাবীর কর্ণ অর্জুনবধে সমুদ্যত হইলে, তুমি কোশলক্রমে তাহার সর্পবাণ ব্যর্থ করিয়াছ।** এবং পরিশেষে সূতপুত্রের রথচক্র ভূগর্ভে প্রবিষ্ট ও তিনি চক্রোদ্ধারের নিমিত্ত ব্যস্তসমস্ত হইলে তুমি কোশলক্রমে অর্জুন দ্বারা তাহার বিনাশ সাধনে কৃতকার্য হইয়াছ।†† অতএব তোমার তুল্য পাপাত্মা, নিন্দীয় ও নিলজ্জ আর কে আছে? দেখ, তোমরা যদি ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও আমার সহিত ন্যায়যুদ্ধ করিতে, তাহা হইলে কদাপি জয়লাভে সমর্থ হইতে না। তোমার অন্যায় উপায় প্রভাবেই আমরা স্বধর্ম্মানুগত পার্থিবগণের সহিত নিহত হইলাম।”

এই বাক্যপরম্পরা সম্বন্ধে আমি যে কয়েকটি ফুটনোট দিলাম, পাঠকের তৎপ্রতি মনোযোগ করিতে হইবে। বাক্যগুলি সম্পূর্ণ মিথ্যা। এরূপ সম্পূর্ণ মিথ্যা তিরস্কার মহাভারতে আর কোথাও নাই। তাহাই বলিতেছিলাম যে, দুর্য্যোধনের উত্তর আশ্চর্য্য।

তৃতীয় আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, কৃষ্ণ ইহার উত্তর করিলেন। পূর্বে দেখিয়াছি, তিনি গম্ভীরপ্রকৃতি ও ক্ষমাশীল, কাহার কৃত তিরস্কারের উত্তর করেন না। সভামধ্যে শিশুপালকৃত অসহ্য নিন্দাবাদ বিনাবাক্যব্যয়ে সহ্য করিয়াছিলেন। বিশেষ, দুর্য্যোধন এখন মূর্খ, তাহার কথার উত্তরের কোন প্রয়োজন নাই; তাহাকে কোন প্রকারে কটুক্তি করা কৃষ্ণ নিজেই নিন্দনীয় বিবেচনা করেন। তথাপি কৃষ্ণ দুর্য্যোধনকৃত তিরস্কারের উত্তরও করিলেন, এবং কটুক্তিও করিলেন। উত্তরে দুর্য্যোধনকৃত পাপাচার সকল বিবৃত করিয়া উপসংহারে বলিলেন, “বিস্তর অকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ। এক্ষণে তাহার ফলভোগ কর।”

উত্তরে দুর্য্যোধন বলিলেন, “আমি অধ্যয়ন, বিধিপূর্ব্বক মান, সসাগরা বসুন্ধরার শাসন, বিপক্ষগণের মস্তকোপরি অবস্থান, অন্য ভূপালের দুর্লভ দেবভোগ্য সুখসম্ভোগ, ও অত্যাৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছি, পরিশেষে ধর্ম্মপরায়ণ ক্ষত্রিয়গণের প্রার্থনীয় সমরমৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব আমার তুল্য সৌভাগ্যশালী আর কে হইবে? এক্ষণে আমি দ্রাতৃবর্গ ও বন্ধুবান্ধবগণের সহিত স্বর্গে চলিলাম, তোমরা শোকাকুলিতচিত্তে মৃতকল্প হইয়া এই পৃথিবীতে অবস্থান কর।”

এই উত্তর আশ্চর্য্য নহে। যে সর্বস্ব পণ করিয়া হারিয়াছে, সে যদি দুর্য্যোধনের মত দাম্ভিক হয়, তবে সে যে জয়ী শত্রুকে বলিবে, আমিই জিতিয়াছি, তোমরা হারিয়াছ, ইহা আশ্চর্য্য নহে। দুর্য্যোধন এইরূপ কথা হুদে থাকিয়াও বলিয়াছিল। যুদ্ধে মরিলে যে স্বর্গলাভ হয়, সকল ক্ষত্রিয়ই বলিত। উত্তর আশ্চর্য্য নহে, কিন্তু উত্তরের ফল সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য। এই কথা বলিবা মাত্র “আকাশ হইতে সূর্গাঙ্ক পদ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। গন্ধর্ব্বগণ সুমধুর বাদিত্রবাদন ও অম্বরী সকল রাজা দুর্য্যোধনের যশোগান করিতে আরম্ভ করিলেন। সিদ্ধগণ তাহারে

* এরূপ বিবেচনা করিবার কারণ মহাভারতে কোথাও নাই। কোন স্তরেই না।

† কৃষ্ণ ইহার বিন্দুবিসর্গেও ছিলেন না। মহাভারতে কোথাও এমন কথা নাই।

‡ শত্রুকে বধ করিতে কেন নিষেধ করিবেন?

§ কৃষ্ণ তজ্জন্য কোন যত্ন বা কোশল করেন নাই। মহাভারতে ইহাই আছে যে, কোঁরবগণের অনুরোধানুসারেই কর্ণ ঘটোৎকচের প্রতি শক্তি প্রয়োগ করিলেন।

|| কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এমন কথা মহাভারতে কোথাও নাই। সাত্যকি ভূরিশ্রবাকে নিহত করিয়াছিলেন বটে। কৃষ্ণ বরং ছিন্নবাহু ভূরিশ্রবাকে নিহত করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

** সে কোঁশল, নিজপদবলে রথচক্র ভূপ্রোথিত করা। এ উপায় অতি ন্যায্য এবং সার্থক ধর্ম্ম, রথীর রক্ষা।

†† কি কোঁশল? মহাভারতে এ সম্বন্ধে কৃষ্ণকৃত কোন কোঁশলের কথা নাই। যুদ্ধে অর্জুন কর্ণকে নিহত করিয়াছিলেন, ইহাই আছে।

বিক্রম রচনাবলী

সাধুবাদ প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। সুগন্ধসম্পন্ন সুখস্পর্শ সমীরণ মন্দ মন্দ সঞ্চারিত হইতে লাগিল। দিগ্‌মণ্ডল ও নভোমণ্ডল সুনীল হইল। তখন বাসুদেবপ্রমুখ পাণ্ডবগণ সেই দুর্যোধনের সম্মানসূচক অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় লজ্জিত হইলেন। এবং তাঁহারা ভীষ্ম দ্রোণ কৰ্ণ ভূরিশ্রবাকে অধর্মযুদ্ধে বিনাশ করিয়াছেন, এই কথা শ্রবণ করিয়া শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন।”

যিনি মহাভারতের সর্ব পাপাত্মার অধম পাপাত্মা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, তাঁহার এরূপ অদ্ভুত সম্মান ও সাধুবাদ, আর যাঁহারা সকল ধর্মাত্মার শ্রেষ্ঠ ধর্মাত্মা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, তাঁহাদের এই অধর্মচরণ জন্য লজ্জা, মহাভারতে আশ্চর্য। সিদ্ধগণ, অঙ্গরোগণ, দেবগণ মিলিয়া প্রকটিত করিতেছেন, দুরাত্মা দুর্যোধন ধর্মাত্মা, আর কৃষ্ণপাণ্ডব মহাপাপিষ্ঠ। ইহা মহাভারতে আশ্চর্য, কেন না, ইহা সমস্ত মহাভারতের বিরোধী। সিদ্ধগণাদি দূরে থাক, কোন মনুষ্য দ্বারা এরূপ সাধুবাদ মহাভারতে আশ্চর্য বলিয়া বিবেচ্য, কেন না, মহাভারতের উদ্দেশ্যই দুর্যোধনের অধর্ম ও কৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের ধর্ম কীর্তন। রসের উপর রসের কথা, তাঁহারা দুর্যোধন-মুখে শুনিলেন যে, তাঁহারা ভীষ্ম, দ্রোণ, কৰ্ণ ও ভূরিশ্রবাকে অধর্মযুদ্ধে বধ করিয়াছেন; অমনি শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এত কাল তাহার কিছু জানিতেন না, এখন পরম শত্রুর মুখে জানিয়া, ভদ্রলোকের মত, শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে, ভীষ্ম বা কৰ্ণকে তাঁহারা কোন প্রকার অধর্ম করিয়া মারেন নাই, কিন্তু পরম শত্রু দুর্যোধন বলিতেছে, তোমরা অধর্ম করিয়া মারিয়াছ, কাজেই তাহাতে অবশ্য বিশ্বাস করিলেন; অমনি শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে, ভূরিশ্রবাকে তাঁহারা কেহই বধ করেন নাই—সত্যিক করিয়াছিলেন, সত্যিককে বরং কৃষ্ণ, অর্জুন ও ভীষ্ম নিষেধ করিয়াছিলেন, তথাপি যখন পরমশত্রু দুর্যোধন বলিতেছে, তোমরাই মারিয়াছ, আর তোমরাই অধর্মচরণ করিয়াছ, তখন গোবেচারা পাণ্ডবেরা অবশ্য বিশ্বাস করিতে বাধ্য যে, তাঁহারা মারিয়াছেন, এবং তাঁহারা অধর্ম করিয়াছেন; কাজেই তাঁহারা ভদ্রলোকের মত কণ্ঠদিতে আরম্ভ করিলেন। এ ছাই ভস্ম মাথামুণ্ডের সমালোচনা বিড়ম্বনা মাত্র। তবে এ হতভাগ্য দেশের লোকের বিশ্বাস যে, যাহা কিছু পৃথিবীর ভিতর পাওয়া যায়, তাহাই ঋষিবাক্য, অদ্রাস্ত, শিরোধার্য। কাজেই এ বিড়ম্বনা স্বেচ্ছাপূর্বক আমাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে।

আশ্চর্য কথাগুলো এখনও শেষ হয় নাই। কৃষ্ণ ত স্বকৃত অধর্মচরণ জন্য লজ্জিত হইলেন, আবার সেই সময়ে অত্যন্ত নিলজ্জভাবে পাণ্ডবদিগের কাছে সেই পাপাচরণ জন্য আত্মপ্লাম্বাধা করিতে লাগিলেন।*

বলা বাহুল্য যে, দুর্যোধনকৃত তিরস্কারাদি বৃত্তান্ত সমস্তই অমৌলিক। দ্রোণবধাদি যে অমৌলিক, তাহা আমি পূর্বে প্রমাণীকৃত করিয়াছি। যাহা অমৌলিক, তাহার প্রসঙ্গ যে অংশে আছে, তাহাও অবশ্য অমৌলিক। কেবল এতটুকু বলা আবশ্যিক যে, এখানে দ্বিতীয় স্তরের কবিরও লেখনীচিহ্ন দেখা যায় না। এ তৃতীয় স্তরের বলিয়া বোধ করা যায়। দ্বিতীয় স্তরের কবি কৃষ্ণভক্ত, এই লেখক কৃষ্ণদ্বৈষক। শৈবদি অবৈষ্ণব বা বৈষ্ণবদ্বৈষগণও স্থানে স্থানে মহাভারতের কলেবর বাড়াইয়াছেন, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। তাঁহারা কেহ এখানে গ্রন্থকার,

* যথা, “ভীষ্মপ্রমুখ মহারথগণ ও রাজা দুর্যোধন অসাধারণ সমরবিশারদ ছিলেন, তোমরা কদাচ তাঁহাদিগকে ধর্মযুদ্ধে পরাজয় করিতে সমর্থ হইতে না। আমি কেবল তোমাদের হিতানুষ্ঠানপরতন্ত্র হইয়া অনেক উপায় উদ্ভাবন ও মায়াবল প্রকাশপূর্বক তাঁহাদিগকে নিপাতিত করিয়াছি। আমি যদি ঐরূপ কুটিল ব্যবহার না করিতাম, তাহা হইলে তোমাদিগের জয়লাভ, রাজ্যলাভ ও অর্থলাভ কখনই হইত না। দেখ, ভীষ্ম প্রভৃতি সেই চারি মহাত্মা ভূমণ্ডলে অতিরথ বলিয়া প্রথিত আছেন। লোকপালগণ সমবেত হইয়াও তাঁহাদিগকে ধর্মযুদ্ধে নিহত করিতে সমর্থ হইতেন না। আর দেখ, সমরে অপরিশ্রান্ত গদাধারী এই দুর্যোধনকে দণ্ডধারী কৃতান্তও ধর্মযুদ্ধে বিনষ্ট করিতে পারেন না; অতএব ভীষ্ম যে উহারে অসং উপায় অবলম্বনপূর্বক নিপাতিত করিয়াছেন, সে কথা আর অন্বেদন করিবার আবশ্যিক নাই। এইরূপ প্রসিদ্ধ আছে যে, শত্রুসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে তাহাদিগকে কুট যুদ্ধে বিনাশ করিবে। মহাত্মা সুব্রহ্মণ্য কুট যুদ্ধের অনুষ্ঠান করিয়াই অসুরগণকে নিহত করিয়াছিলেন; তাঁহাদের অনুকরণ করা সকলেরই কর্তব্য।” এমন নিলজ্জ অধর্ম আর কোথাও শূনা যায় না।

ইহাই সম্ভব। আবার এ কাজ কৃষ্ণভক্তের, ইহাও অসম্ভব নহে। নিন্দাচ্ছলে স্তুতি করা ভারতবর্ষীয় কবিদের একটা বিদ্যার মধ্যে।* এ তাও হইতে পারে।

সে যাই হউক, ইহার পরেই আবার দেখিতে পাই যে, দুর্যোধন অশ্বথামার নিকট বলিতেছেন, “আমি অমিততেজা বাসুদেবের মাহাত্ম্য বিলক্ষণ অবগত আছি। তিনি আমারে ক্ষত্রিয়ধর্ম হইতে পরিভ্রষ্ট করেন নাই। অতএব আমার জন্য শোক করিবার প্রয়োজন কি?”

এমন বারোইয়ারি কাণ্ডের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া বিড়ম্বনা নয়?

নবম পরিচ্ছেদ—যুদ্ধশেষ

অন্যায় যুদ্ধে দুর্যোধন হত হইয়াছে বলিয়া যুধিষ্ঠিরের ভয় হইল যে, তপঃপ্রভাবশালিনী গান্ধারী শুনিয়া পাণ্ডবদিগকে ভস্ম করিয়া ফেলিবেন। এ জন্য তিনি কৃষ্ণকে অনুরোধ করিলেন যে, তিনি হস্তিনায় গমন করিয়া ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে শান্ত করিয়া আসুন।

কথাটা প্রথম স্তরের নয়, কেন না, এখানে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বলিতেছেন, “তুমি অব্যয়, এবং লোকের সৃষ্টি ও সংহারকর্তা।” ইহার কিছু পূর্বেই অর্জুনের রথ হইতে কৃষ্ণ অবতরণ করায় সে রথ জ্বলিয়া গিয়াছিল। অর্জুনের জিজ্ঞাসা মতে কৃষ্ণ বলিলেন, “ব্রহ্মাস্ত্রপ্রভাবে পূর্বেই এই রথে অগ্নি সংলগ্ন হইয়াছিল। কেবল আমি উহাতে অধিষ্ঠান করিয়াছিলাম বলিয়া এ কাল পর্যন্ত দক্ষ হয় নাই।” অর্থাৎ আমি দেবতা বা বিষ্ণু। ইহা দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তর।

কৃষ্ণ হস্তিনায় গিয়া ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে কিছু বঝাইলেন। উদ্ধৃত করা বা সমালোচনার যোগ্য কোন কথা নাই।

তার পর, দুর্যোধন অশ্বথামাকে সেনাপতিত্বে বরণ করিলেন। কিন্তু তখন সেনার মধ্যে সেই অশ্বথামা, কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা। এইখানে শল্যপর্ব শেষ।

তাহার পর, সৌপ্তিক পর্ব। সৌপ্তিক পর্ব, অতি ভীষণ ব্যাপারে পরিপূর্ণ। প্রথমাংশে অশ্বথামা চোরের মত নিশীথ কালে পাণ্ডবশিবিরে প্রবিষ্ট হইয়া নিদ্রাভিত্তিক ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রোপদীর পুত্র, এবং সমস্ত পাণ্ডালগণকে, সেনা ও সেনাপতিগণকে বধ করিলেন। পুত্র পাণ্ডব ও কৃষ্ণ ভিন্ন পাণ্ডবপক্ষে আর কেহ রহিল না।

বস্তুতঃ এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কুরুপাণ্ডালের যুদ্ধ। পাণ্ডালেরা নির্বংশ হইলে যুদ্ধ শেষ হইল।

তাহার পরে, সৌপ্তিক পর্বে একটা ঐষীক পর্বাধ্যায় আছে। অশ্বথামা এই চোরোচিত কার্য করিয়া পাণ্ডবদিগের ভয়ে বনে গিয়া লুক্কায়িত হইলেন। পাণ্ডবেরা পরদিন তাহার অন্বেষণে ধাবিত হইলেন। অশ্বথামা ধরা পড়িয়া আত্মরক্ষার্থ অতি ভয়ঙ্কর ব্রহ্মশিরা অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। অর্জুনও তাম্বিবারণার্থ ব্রহ্মশিরা অস্ত্রের প্রতিপ্রয়োগ করিলেন। দুই অস্ত্রের তেজে ব্রহ্মাণ্ডধ্বংসের সম্ভাবনা দেখিয়া ঋষিরা মিটমাট করিয়া দিলেন। অশ্বথামার শিরস্থিত সহজর্মাণি কাটিয়া দ্রোপদীকে উপহার দিলেন। এ দিকে ব্রহ্মশিরা অস্ত্র পাণ্ডববধে উত্তরার গর্ভ নষ্ট করিল।

এই সকল অনৈসর্গিক ব্যাপার আমরা ছাড়িয়া দিতে পারি। আমাদের সমালোচনার যোগ্য কৃষ্ণচরিত্র-ঘটিত কোন কথাই সৌপ্তিক পর্বে নাই।

তার পর স্ত্রীপর্ব। স্ত্রীপর্ব আরও ভীষণ। নিহত বীরবর্গের স্ত্রীগণের ইহাতে

* একটা উদাহরণ না দিলে, অনেক পাঠক বৃষ্টিতে পারিবেন না; স্মর ভস্মীভূত হওয়ার পর বিলাপকালে রতির মুখে ভারতচন্দ্র বলিতেছেন,

“একের কপালে রহে, আরের কপাল দহে
আগুনের কপালে আগুন।”

ইহা আগুনকে গালি বটে, কিন্তু একটু ভাষান্তর করিলেই স্তুতি, যথা—

“হে অগ্নে! তুমি শম্ভুললার্টাবহারী লোকধ্বংসকারী, তোমার শিখণ্ডী স্ত্রীলবিশিষ্ট হউক।” পাঠক, ভারতচন্দ্রপ্রণীত অন্নদামঙ্গলে দক্ষকৃত শিবনিন্দা দেখিবেন। গ্রন্থের কলেবরবৃদ্ধিভয়ে তাহা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

বাংকম রচনাবলী

আর্তনাদ। এমন ভীষণ আর্তনাদ আর কখন শুন্য যায় নাই। কিন্তু কৃষ্ণসম্বন্ধীয় দুইটি কথা মাত্র আছে।

১। ধৃতরাষ্ট্র আলিঙ্গনকালে ভীমকে চূর্ণ করিবেন, কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ তাহার জন্য লোহভীম সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। অন্ধ রাজা তাহাই চূর্ণ করিলেন। অনৈসর্গিক বৃত্তান্ত আমাদের পরিহার্য। এজন্য এ সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার নাই।

২। গান্ধারী কৃষ্ণের নিকট অনেক বিলাপ করিয়া, শেষ কৃষ্ণকেই অভিষেক করিলেন। বলিলেনঃ—

“জনান্দর্শন! যখন কোরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পরের ক্রোধানলে পরস্পর দগ্ধ হয় তৎকালে তুমি কি নিমিত্ত তদ্বিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে? তোমার বহুসংখ্যক ভৃত্য ও সৈন্য বিদ্যমান আছে; তুমি শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, বাক্যবিশারদ ও অসাধারণ বলবীৰ্য্যশালী, তথাপি তুমি ইচ্ছাপূর্ব্বক কোরবগণের বিনাশে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছ। অতএব তোমারে অবশ্যই ইহার ফলভোগ করিতে হইবে। আমি পরিশুদ্ধা দ্বারা যে কিছু তপঃসঞ্চয় করিয়াছি, সেই নিতান্ত দুর্লভতপঃপ্রভাবে তোমারে অভিষেক প্রদান করিতেছি যে, তুমি যেমন কোরব ও পাণ্ডবগণের জ্ঞাতিবিনাশে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছ, তেমনি তোমার আপনার জ্ঞাতিবর্গও তোমাকর্তৃক বিনষ্ট হইবে। অতঃপর ষট্‌ত্রিংশৎ* বর্ষ সমুপস্থিত হইলে তুমি অমাত্য, জ্ঞাতি ও পুত্রহীন ও বনচারী হইয়া অতি কুৎসিত উপায় দ্বারা নিহত হইবে। তোমার কুলরমণীগণও ভরতবংশীয় মহিলাগণের ন্যায় পুত্রহীন ও বন্ধুবান্ধববিহীন হইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিবে।”

কৃষ্ণ, হাসিয়া উত্তর করিলেন, “দেবি! আমা ব্যতিরেকে যদুবংশীয়দিগের বিনাশ করে, এমন আর কেহ নাই। আমি যে যদুবংশ ধ্বংস করিব, তাহা অনেক দিন অবধারণ করিয়া রাখিয়াছি। আমার যাহা অবশ্যকর্তব্য, এক্ষণে আপনি তাহাই কহিলেন। যাদবেরা মনুষ্য বা দেবদানবগণেরও বধ্য নহে। সুতরাং তাহারা পরস্পর বিনষ্ট হইবেন।”

এইরূপে দ্বিতীয় স্তরের কবি মৌসল পর্ব্বের পূর্ব্বসূচনা করিয়া রাখিলেন। মৌসল পর্ব্ব যে দ্বিতীয় স্তরের, তাহারও পূর্ব্বসূচনা আমরাও করিয়া রাখিয়াছি।

দশম পরিচ্ছেদ—বিধি সংস্থাপন

এক্ষণে আমরা অতি দূস্তর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বিবরণ হইতে উত্তীর্ণ হইলাম। কৃষ্ণচরিত্র পুনর্ব্বার সুবিমল প্রভাভাসিত হইতে চলিল। কিন্তু শান্তি ও অনুশাসন পর্ব্ব কৃষ্ণ ঈশ্বর বলিয়া স্পষ্টতঃ স্বীকৃত।

যুদ্ধাদির অবশেষে, অগাধবুদ্ধি যুধিষ্ঠির, আবার এক অগাধবুদ্ধির খেলা খেলিলেন। তিনি অর্জুনকে বলিলেন, এত জ্ঞাতি প্রভৃতি বধ করিয়া আমার মনে কোন সুখ নাই—আমি বনে যাইব, ভিক্ষা করিয়া খাইব। অর্জুন বড় রাগ করিলেন—যুধিষ্ঠিরকে অনেক বুঝাইলেন। তখন অর্জুন যুধিষ্ঠিরে বড় ভারি বাদানুবাদ উপস্থিত হইল। শেষ, ভীম, নকুল, সহদেব, দ্রোপদী ও স্বয়ং কৃষ্ণ অনেক বুঝাইলেন। দুর্ব্বলচিত্ত যুধিষ্ঠির কিছুতেই বুঝেন না। ব্যাস, নারদ প্রভৃতি বুঝাইলেন। কিছুতেই না। শেষ কৃষ্ণের কথায় মহাসমারোহের সহিত হস্তিনা প্রবেশ করিলেন।

কৃষ্ণ তাহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করাইলেন। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের স্তব করিলেন। সে স্তব জগদীশ্বরের। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের স্তব করিয়া নমস্কার করিলেন। কৃষ্ণ বয়ঃকনিষ্ঠ; যুধিষ্ঠির আর কখন তাহাকে স্তব বা নমস্কার করেন নাই।

এদিকে কোরবশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম, শরশয্যায় শয়ান, তাঁর যন্ত্রণায় কাতর, উত্তরায়ণের প্রতীক্ষায় শরীর রক্ষা করিতেছেন। তিনি ঋষিগণ-পরিবৃত্ত হইয়া, সর্ব্বময়, সর্ব্বাধার, পরমপুরুষ কৃষ্ণকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। তাহার স্তুতিবাক্যে চণ্ডলচিত্ত হইয়া কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরাদি সঙ্গে লইয়া ভীষ্মকে দর্শন দিতে চলিলেন। পথে যাইতে যাইতে যুধিষ্ঠির উপযাচক হইয়া পরশুরামের উপাখ্যান কৃষ্ণের নিকট শ্রবণ করিলেন।

* ষট্‌ত্রিংশৎ বলেন কেন?

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ অনুমতি করিয়াছিলেন যে, ভীষ্মের নিকট জ্ঞানলাভ কর। ভীষ্ম সর্বধর্মবেত্তা; তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্ঞান তাঁহার সঙ্গে যাইবে; তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে সেই জ্ঞান জগতে প্রচারিত হয়, ইহা তাঁহার ইচ্ছা। এই জন্য তিনি যুধিষ্ঠিরকে তাঁহার নিকট জ্ঞানলাভাদিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। ভীষ্মকেও যুধিষ্ঠিরাদিকে ধর্মোপদেশ দিয়া অনুগ্রহীত করিতে আদেশ করিলেন।

ভীষ্ম স্বীকৃত হইলেন না। বলিলেন, ধর্ম কর্ম সবই তোমা হইতে; তুমিই সব জান; তুমিই যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ প্রদান কর। আমি আপনি শরখচিত হইয়া মূর্খ ও অত্যন্ত ক্লিষ্ট, আমার বুদ্ধিব্রংশ হইতেছে; আমি পারিয়া উঠিব না। তখন কৃষ্ণ বলিলেন, আমার বরে তোমার শরাঘাতনিবন্ধন সমস্ত ক্লেশ বিদূরিত হইবে, তোমার অন্তঃকরণ জ্ঞানালোকে সমুজ্জ্বল হইবে, বুদ্ধি অব্যতিক্রান্ত থাকিবে; তোমার মন কেবল সত্ত্বগুণাশ্রয় করিবে। তুমি দিব্যচক্ষুঃ-প্রভাবে ভূত ভবিষ্যৎ সমস্ত দেখিবে।

কৃষ্ণের কৃপায় সেইরূপই হইল। কিন্তু তথাপি ভীষ্ম আপত্তি করিলেন। কৃষ্ণকে বলিলেন, “তুমি স্বয়ং কেন যুধিষ্ঠিরকে হিতোপদেশ প্রদান করিলে না?”

উত্তরে কৃষ্ণ বলিলেন, সমস্ত হিতাহিত কর্ম আমা হইতে সম্ভূত। চন্দ্রের শীতাংশু ঘোষণাও ষেরূপ, আমার যশোলাভ সেইরূপ। আমার এখন ইচ্ছা, আপনাকে সমাধিক যশস্বী করি। আমার সমুদয় বুদ্ধি সেই জন্য আপনাকে অর্পণ করিয়াছি। ইত্যাদি।

তখন ভীষ্ম প্রফুল্লচিত্তে যুধিষ্ঠিরকে ধর্মতত্ত্ব শুনাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজধর্ম, আপদধর্ম এবং মোক্ষধর্ম অতি সবিস্তারে শুনাইলেন। মোক্ষধর্মের পর শান্তিপর্ব সমাপ্ত।

এই শান্তিপর্বের তিন স্তরই দেখা যায়। প্রথম স্তরই ইহার কঙ্কাল ও তার পর যিনি যেমন ধর্ম বুঝিয়াছেন, তিনিই তাহা শান্তিপর্বভুক্ত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে আমাদের সমালোচনার যোগ্য একটা গুরুতর কথা আছে। কেবল ধার্মিককে রাজা করিলেই ধর্মরাজ্য সংস্থাপিত হইল না। আজ ধার্মিক যুধিষ্ঠির রাজা ধর্মাত্মা; কাল তাঁহার উত্তরাধিকারী পাপাত্মা হইতে পারেন। এই জন্য ধর্মরাজ্য সংস্থাপন করিয়া, তাহার রক্ষার জন্য ধর্মানুমত ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করাও চাই। রণজয়, রাজ্য স্থাপনের প্রথম কার্য মাত্র; তাহার শাসন জন্য বিধিব্যবস্থাই (Legislation) প্রধান কার্য। কৃষ্ণ সেই কার্যে ভীষ্মকে নিযুক্ত করিলেন। ভীষ্মকে নিযুক্ত করিলেন, তাহার বিশেষ কারণ ছিল; আদর্শ নীতিজ্ঞই তাহা লক্ষিত করিতে পারেন। কৃষ্ণ সেই সকল কারণ নিজেই ভীষ্মকে বুঝাইতেছেন।

“আপনি বয়োবৃদ্ধ এবং শাস্ত্রজ্ঞান এবং শুদ্ধাচারসম্পন্ন। রাজধর্ম ও অপরাপর ধর্ম কিছুই আপনার অবিদিত নাই। জন্মাবধি আপনার কোনও দোষই লক্ষিত হয় নাই, নরপতিগণ আপনারে সর্বধর্মবেত্তা বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন। অতএব পিতার ন্যায় আপনি এই ভূপালগণকে নীতি উপদেশ প্রদান করুন। আপনি প্রতিনিয়ত ঋষি ও দেবগণের উপাসনা করিয়াছেন। এক্ষণে এই ভূপতিগণ আপনার নিকট ধর্মবৃত্তান্ত শ্রবণোৎসুক হইয়াছেন। অতএব আপনাকে অবশ্যই বিশেষরূপে সমস্ত ধর্মকীর্তন করিতে হইবে। পণ্ডিতদিগের মতে ধর্মোপদেশ প্রদান করা বিদ্বান্ ব্যক্তিরই কর্তব্য।”

তার পর অনুশাসন পর্ব। এখানেও হিতোপদেশ; যুধিষ্ঠির শ্রোতা, ভীষ্ম বক্তা। কতকগুলো বাজে কথা লইয়া, এই অনুশাসন পর্ব গ্রথিত হইয়াছে। সমুদয়ই বোধ হয় তৃতীয় স্তরের। তন্মধ্যে আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয় কিছু নাই।

পরিশেষে ভীষ্ম স্বর্গারোহণ করিলেন। ইহাই কেবল প্রথম স্তরের।

একাদশ পরিচ্ছেদ—কামগীতা

ভীষ্মের স্বর্গারোহণের পর, যুধিষ্ঠির আবার কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিলেন। বাহানা লইলেন বনে যাইব। অনেকে অনেক প্রকার বুঝাইলেন। কিন্তু কৃষ্ণ এবার রোগের প্রকৃত ঔষধ প্রয়োগ করিলেন। সেরূপ রোগ নির্ণয় করা আর কাহারও সাধ্য নহে। যুধিষ্ঠিরের প্রকৃত রোগ অহঙ্কার। ইংরেজি বিদ্যালয়ে শিখায় pride শব্দ অহঙ্কার শব্দের প্রতিশব্দ। বস্তুতঃ তাহা

বিক্রম রচনাবলী

নহে। অহঙ্কার ও মাৎস্য্য পৃথক্ পৃথক্ বস্তু। “আমি এই সকল করিতেছি,” “ইহা আমার,” “এই আমার সুখ,” “ইহা আমার দুঃখ,” এইরূপ জ্ঞানই অহঙ্কার। এই যুধিষ্ঠিরের দুঃখের কারণ। আমি এই পাপ করিয়াছি—আমার এই শোক উপস্থিত; আমি লইয়াই সব, অতএব আমি বনে যাইব, ইত্যাদি আত্মাভিমানই যুধিষ্ঠিরের এই কাঁদাকাঁটের মূলে আছে। সেই মূলে কুঠারাঘাতপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে উদ্ধৃত করা, এই ধর্ম্মবেত্ত্বশ্রেষ্ঠের উদ্দেশ্য। এজন্য তিনি পরদুঃখবাক্যে যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, “আপনার এখনও শত্রু অবশিষ্ট আছে। আপনার শরীরের অভ্যন্তরে যে অহঙ্কাররূপ দুঃখীয় শত্রু রহিয়াছে, তাহা কি আপনি নিরীক্ষণ করিতেছেন না?” এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অহঙ্কারকে বিনষ্ট করার সম্বন্ধে একটি রূপক যুধিষ্ঠিরকে শুনাইলেন। তার পর তিনি যুধিষ্ঠিরকে যে অত্যুক্তি জ্ঞানোপদেশ দিলেন, তাহা সর্বিস্তারে উদ্ধৃত করিতেছি। যে নিষ্কাম ধর্ম্ম আমরা গীতায় পড়ি, তাহা এখানেও আছে। এইরূপ অতি মহৎ ধর্ম্মোপদেশেই কৃষ্ণচরিত্র বিশেষ স্ফূর্ত্তি পায়।

“হে ধর্ম্মরাজ! ব্যাধি দুই প্রকার, শারীরিক ও মানসিক। ঐ দুই প্রকার ব্যাধি পরস্পরের সাহায্যে পরস্পর সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। শরীরে যে ব্যাধি উপস্থিত হয়, তাহারে শারীরিক এবং মনোমধ্যে যে পীড়া উপস্থিত হয়, তাহারে মানসিক ব্যাধি কহে। কফ পিত্ত ও বায়ু এই তিনটি শরীরের গুণ, যখন এই তিন গুণ সমভাবে অবস্থান করে, তখন শরীরকে সুস্থ এবং যখন ঐ গুণত্রয়ের মধ্যে বৈষম্য উপস্থিত হয়, তখনই শরীরকে অসুস্থ বলা যায়। পিত্তের আধিক্য হইলে কফের হ্রাস ও কফের আধিক্য হইলে পিত্তের হ্রাস হইয়া থাকে। শরীরের ন্যায় আত্মারও তিনটি গুণ আছে। ঐ তিনটি গুণের নাম সত্ত্ব, রজ ও তম। ঐ গুণত্রয় সমভাবে অবস্থান করিলে আত্মার স্বাস্থ্যলাভ হয়। ঐ গুণত্রয়ের মধ্যে একের আধিক্য হইলে অন্যের হ্রাস হয়। হর্ষ উপস্থিত হইলে শোক এবং শোক উপস্থিত হইলে হর্ষ তিরোহিত হইয়া যায়। দুঃখের সময় কি কেহ সুখানুভব করে এবং সুখের সময় কি কাহার দুঃখানুভব হয়? যাহা হউক, এক্ষণে সুখদুঃখ উভয়ই স্মরণ করা আপনার কর্তব্য নহে। সুখদুঃখাতীত পরব্রহ্মকে স্মরণ করাই আপনার বিধেয়। *** পূর্ব্ব ভীষ্ম দ্রোণাদির সহিত আপনার যে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে একমাত্র অহঙ্কারের সহিত তাহা অপেক্ষা অধিক ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইয়াছে। ঐ যুদ্ধে অভিমুখীন হওয়া আপনার অবশ্য কর্তব্য। যোগ ও তদুপযোগী কার্য্য সমুদায় অবলম্বন করিলেই এই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিবেন। এই যুদ্ধে শরনিকর, ভৃত্য ও বন্ধুবর্গের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই; একমাত্র মনকে সহায় করিয়া ঐ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ঐ যুদ্ধে জয়লাভ করিতে না পারিলে দুঃখের পরিসীমা থাকিবে না। অতএব আপনি আমার এই উপদেশানুসারে অচিরাৎ অহঙ্কারকে পরাজয়পূর্ব্বক শোক পরিত্যাগ করিয়া সুস্থচিত্তে পৈতৃক রাজ্য প্রতিপালন করুন।

হে ধর্ম্মরাজ! কেবল রাজ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধিলাভ করা কদাপি সম্ভবপর নহে। ইন্দ্রিয় সমুদায়কে পরাজয় করিতে পারিলেও সিদ্ধিলাভ হয় কি না সন্দেহ। যাহারা রাজ্যাদি বিষয় সমুদায় পরিত্যাগ করিয়াও মনে মনে বিষয়ভোগের বাসনা করে, তাহাদিগের ধর্ম্ম ও সুখ তোমার শত্রুগণ লাভ করুক। মমতা সংসার-প্রাপ্তির ও নির্ম্মমতা ব্রহ্মলাভের কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। ঐ বিরুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী মমতা ও নির্ম্মমতা লোকসমুদায়ের চিত্তে অলক্ষিতভাবে অবস্থানপূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ ও পরাজয় করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্বের অবিদ্যমানতানিবন্ধন জগতের অস্তিত্ব অবিদ্যমান বলিয়া বিশ্বাস করেন, প্রাণি-গণের দেহনাশ করিলেও তাঁহারে হিংসাপাপে লিপ্ত হইতে হয় না; যে ব্যক্তি স্থাবরজঙ্গমসংবলিত সমুদায় জগতের আধিপত্য লাভ করিয়াও মমতা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহাকে কখনই সংসারপাপে বদ্ধ হইতে হয় না। আর যে ব্যক্তি অরণ্যে ফলমূলাদি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়াও বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিতে না পারে, তাহারে নিশ্চয়ই সংসারজালে জড়িত হইতে হয়। অতএব ইন্দ্রিয় ও বিষয় সমুদায় মায়ায় বলিয়া নিশ্চয় করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি এই সমুদায়ের প্রতি কিছুমাত্র মমতা না করেন, তিনি নিশ্চয়ই সংসার হইতে মুক্তি-লাভে সমর্থ হন। কামপরতন্ত্র মূঢ় ব্যক্তির কদাচ প্রশংসার আশ্রয় হইতে পারে না। কামনা মন হইতে সমুৎপন্ন হয়; উহা সমুদায় প্রবৃত্তির মূল কারণ। যে সমুদায় মহাত্মা বহু জন্মের অভ্যাসবশতঃ কামনারে অধর্ম্মরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া ফললাভের বাসনা সহকারে দান, বেদাধ্যয়ন.

তপস্যা, ব্রত, যজ্ঞ, বিবিধ নিয়ম, ধ্যানমার্গ ও যোগমার্গ আশ্রয় না করেন, তাঁহারা এই এককালে কামনারে পরাজয় করিতে সমর্থ হন। কামনিগ্রহই যথার্থ ধর্ম ও মোক্ষের বীজস্বরূপ, সন্দেহ নাই।

অতঃপর পুরাবিৎ পণ্ডিতগণ যে কামগীতা কীর্তন করিয়া থাকেন, আমি এক্ষণে তোমার নিকট তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। কামনা স্বয়ং কহিয়াছে যে, নির্মমতা ও যোগাভ্যাস ভিন্ন কেহই আমারে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি জপাদি কার্য দ্বারা আমারে জয় করিতে চেষ্টা করে, আমি তাহার মনে অভিমানরূপে আবির্ভূত হইয়া তাহার কার্য বিফল করিয়া থাকি। যে ব্যক্তি বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা আমারে পরাজিত করিতে চেষ্টা করে, আমি তাহার মনে জঙ্গমমধ্যগত জীবাত্মার ন্যায় ব্যক্তুরূপে উদ্ভিত হই। যে ব্যক্তি দেববেদান্ত সমালোচন দ্বারা আমারে শাসন করিতে যত্নবান হয়, আমি তাহার মনে স্থাবরাস্তর্গত জীবাত্মার ন্যায় অব্যক্ত-রূপে অবস্থান করি। যে ব্যক্তি ধৈর্য দ্বারা আমারে জয় করিতে চেষ্টা করে, আমি কখনই তাহার মন হইতে অপনীয় হই না। যে ব্যক্তি তপস্যা দ্বারা আমারে পরাজয় করিতে যত্ন করে, আমি তাহার তপস্যাতেই প্রাদুর্ভূত হই এবং যে ব্যক্তি মোক্ষার্থী হইয়া আমারে জয় করিতে বাসনা করে, আমি তাহারে লক্ষ্য করিয়া নৃত্য ও উপহাস করিয়া থাকি। পণ্ডিতেরা আমারে সর্বভূতের অবধ্য ও সনাতন বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন।

হে ধর্মরাজ! এই আমি আপনার কামগীতা সবিস্তারে কীর্তন করিলাম। অতএব কামনারে পরাজয় করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। আপনি বিধিপূর্বক অশ্বমেধ ও অন্যান্য সুসমৃদ্ধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া কামনারে ধর্মবিষয়ে নীত করুন। বারংবার বন্ধুবিয়োগে অভিভূত হওয়া আপনার নিতান্ত অনুচিত। আপনি অনুতাপ দ্বারা কখনই তাঁহাদিগকে পুনর্দর্শন লাভে সমর্থ হইবেন না। অতএব এক্ষণে মহাসমারোহে সুসমৃদ্ধ যজ্ঞ সমুদায়ের অনুষ্ঠান করুন, তাহা হইলেই ইহলোকে অতুল কীর্তি ও পরলোকে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।”

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ—কৃষ্ণপ্রয়াণ

ধর্মরাজ্য সংস্থাপিত হইল; ধর্ম প্রচারিত হইয়াছে। পাণ্ডবদিগের সঙ্গে কৃষ্ণের জন্য এ গ্রন্থের সম্বন্ধ; মহাভারতে যে জন্য কৃষ্ণের দেখা পাই, তাহা সব ফুরাইল। এইখানে কৃষ্ণ মহাভারত হইতে অন্তর্হিত হওয়া উচিত। কিন্তু রচনাকণ্ডূতিপীড়িতেরা তত সহজে কৃষ্ণকে ছাড়িবার পাত্র নহেন। ইহার পরে অর্জুনের মুখে তাঁহারা একটা অপ্ৰাসঙ্গিক, অদ্ভুত কথা তুলিলেন। তিনি বলিলেন, তুমি যুদ্ধকালে আমাকে যে ধর্মোপদেশ দিয়াছিলে, সব ভুলিয়া গিয়াছি। আবার বল। কৃষ্ণ বলিলেন, কথা বড় মন্দ। আমার আর সে সব কথা মনে হইবে না। আমি তখন যোগযুক্ত হইয়াই সে সব উপদেশ দিয়াছিলাম। আর তুমিও বড় নিষেধ ও শ্রদ্ধাশূন্য; তোমায় আর কিছুর বলিতে চাই না। তথাপি এক পুরাতন ইতিহাস শুনাইতেছি।

কৃষ্ণ ঐ ইতিহাসোক্ত ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া, অর্জুনকে আবার কিছুর তত্ত্বজ্ঞান শুনাইলেন। পূর্বে যাহা শুনাইয়াছিলেন, তাহা গীতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখন যাহা শুনাইলেন, গ্রন্থকার তাহার নাম রাখিয়াছেন “অনুগীতা”। ইহার এক ভাগের নাম “ব্রাহ্মণগীতা”।

ভগবদ্গীতা, প্রজাগর, সনৎসুজাতীয়, মার্কণ্ডেয়সমস্যা, এই অনুগীতা প্রভৃতি অনেকগুলি ধর্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থ মহাভারতের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়া, এক্ষণে মহাভারতের অংশ বলিয়া প্রচলিত। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গীতা, কিন্তু অন্যগুলিতেও অনেক সারগর্ভ কথা পাওয়া যায়। অনুগীতাও উত্তম গ্রন্থ। “ভট্ট মোক্ষমূলর,” ইহাকে তাঁহার “Sacred Books of the East” নামক গ্রন্থাবলীমধ্যে স্থান দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কাশীনাথ গ্রাম্বক তেলাঙ, এক্ষণে যিনি বোম্বাই হাইকোর্টের জজ, তিনি ইহা ইংরাজিতে অনুবাদিত করিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থ যেমনই হউক, ইহাতে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। গ্রন্থ যেমনই হউক, ইহা কৃষ্ণোক্তি নহে। গ্রন্থকার বা অপর কেহ, যেরূপ অবতারণা করিয়া, ইহাকে কৃষ্ণের মুখে উক্ত করিয়াছেন, তাহাতে বৃথা যায় যে, ইহা কৃষ্ণোক্ত নহে; জোড়া দাগ বড় স্পষ্ট, কণ্ঠেও জোড় লাগে নাই। গীতোক্ত ধর্মের সঙ্গে অনুগীতোক্ত ধর্মের এরূপ কোন সাদৃশ্য নাই যে, ইহাকে গীতাভেত্তার

বীক্ষম রচনাবলী

উক্তি বিবেচনা করা যায় না। শ্রীযুক্ত কাশীনাথ গ্রাম্বক, নিজকৃত অনুবাদের যে দীর্ঘ উপ-
ক্রমিকা লিখিয়াছেন, তাহাতে সন্তোষজনক প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত
হইয়াছেন যে, অনুগীতা, গীতার অনেক শতাব্দী পরে রচিত হইয়াছিল। সে প্রমাণের
বিস্তারিত আলোচনার আমাদের প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণচরিত্রের কোন অংশই অনুগীতার উপর
নির্ভর করে না। তবে, অনুগীতা ও ব্রাহ্মণগীতা (বা ব্রহ্মগীতা) যে প্রকৃত পক্ষে প্রক্ষিপ্ত, তাহার
প্রমাণার্থ ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পর্ষসংগ্রহাধ্যায়ে ইহার কিছুমাত্র প্রসঙ্গ নাই।

অজ্জুনকে উপদিষ্ট করিয়া, কৃষ্ণ অজ্জুন ও যুধিষ্ঠিরাদির নিকট বিদায় গ্রহণপূর্বক দ্বারকা
যাত্রা করিলেন। এই বিদায় মানবপ্রকৃতিসুলভ স্নেহাভিব্যক্তিতে পরিপূর্ণ। কৃষ্ণের মানবিকতার
পূর্বে পূর্বে আমরা অনেক উদাহরণ দিয়াছি। অতএব ইহার সবিস্তার বর্ণন নিষ্প্রয়োজন।

পাঠমধ্যে উত্কে মূর্খের সঙ্গে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ বর্ণিত হইয়াছে। কৃষ্ণ যুদ্ধ নিবারণ করেন
নাই, বলিয়া উত্কে তাঁহাকে শাপ দিতে প্রস্তুত। কৃষ্ণ বলিলেন, শাপ দিও না, দিলে তোমার
তপঃক্ষয় হইবে, আমি সন্ধিস্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, আর আমি জগদীশ্বর। তখন
উত্কে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া শুব করিলেন। কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখিতে চাইলেন; কৃষ্ণও
বিশ্বরূপ দেখাইলেন। তার পর জোর করিয়া উত্কেকে অভিলষিত বরদান করিলেন। তাহার
পর চণ্ডাল আসিল, কুকুর আসিল, চণ্ডাল উত্কেকে কুকুরের প্রস্রাব খাইতে বলিল, ইত্যাদি,
ইত্যাদি নানারূপ বীভৎস ব্যাপার আছে। এই উত্কেসমাগম বৃত্তান্ত মহাভারতের পর্ষ-
সংগ্রহাধ্যায়ে নাই; সুতরাং ইহা মহাভারতের অংশ নহে। কাজেই এ সম্বন্ধে আমাদের কোন
কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। স্পষ্টতঃ এখানে তৃতীয় স্তর দেখা যায়।

দ্বারকায় গিয়া কৃষ্ণ বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মিলিত হইলে বসুদেব তাঁহার নিকট যুদ্ধবৃত্তান্ত
শুনিতে ইচ্ছা করিলেন। কৃষ্ণ যুদ্ধবৃত্তান্ত পিতাকে যাহা শুনাইলেন, তাহা সংক্ষিপ্ত, অত্যাঙ্কি-
শূন্য, এবং কোন প্রকার অনৈসর্গিক ঘটনার প্রসঙ্গদোষরহিত। অথচ সমস্ত স্থূল ঘটনা প্রকাশিত
করিলেন। কেবল অভিমন্যুবধ গোপন করিলেন। কিন্তু সুভদ্রা তাঁহার সঙ্গে দ্বারকায়
গিয়াছিলেন, সুভদ্রা অভিমন্যুবধের প্রসঙ্গ স্বয়ং উত্থাপন করিলেন। তখন কৃষ্ণ সে বৃত্তান্তও
সবিস্তারে বলিলেন।

এদিকে যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণের বিদায়কালে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, অশ্বমেধ যজ্ঞ-
কালে পুনর্বার আসিতে হইবে। এক্ষণে সেই যজ্ঞের সময় উপস্থিত। অতএব তিনি যাদবগণ-
পরিবৃত্ত হইয়া পুনর্বার হস্তিনায় গমন করিলেন।

কৃষ্ণ তথায় আসিলে, অভিমন্যুপত্নী উত্তরা একটি মৃত পুত্র প্রসব করিলেন। কৃষ্ণ তাহাকে
পুনর্জীবিত করিলেন। কিন্তু ইহা হইতে এমন সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, কৃষ্ণ ঐশী শক্তির
প্রয়োগদ্বারা এই কার্য সম্পাদন করিলেন। এখনকার অনেক ডাক্তারই মৃত সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে
তাহাকে পুনর্জীবিত করিতে পারেন ও করিয়া থাকেন এবং কিরূপে করিতে পারেন, তাহা
আমরা অনেকেই জানি। ইহা দ্বারা কেবল ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, যাহা তখনকার লোক
আর কেহ জানিত না, কৃষ্ণ তাহা জানিতেন। তিনি আদর্শ মনুষ্য, এজন্য সর্বপ্রকার বিদ্যা ও
জ্ঞান তাঁহার অধিকৃত হইয়াছিল।

তার পর নির্বিঘ্নে যজ্ঞ সম্পন্ন হইল। কৃষ্ণও দ্বারকায় পুনরাগমন করিলেন। তার পর
আর পাণ্ডবগণের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই।

সপ্তম খণ্ড

প্রভাস

যোহসৌ যুগসহস্রান্তে প্রদীপ্তাচ্চির্বিভাবসুঃ।

সংভক্ষয়তি ভূতানি তস্মৈ ঘোরাঅনে নমঃ ॥

শান্তিপর্ব্ব, ৪৭ অধ্যায়ঃ।

প্রথম পরিচ্ছেদ—যদুবংশধ্বংস

তার পর, আশ্রমবাসিক পর্ব্ব। ইহার সঙ্গে কৃষ্ণের কোন সম্বন্ধ নাই। তার পর অতি ভয়াবহ মৌসল পর্ব্ব। ইহাতে সমস্ত যদুবংশের নিঃশেষ ধ্বংস ও কৃষ্ণ বলরামের দেহত্যাগ কথিত হইয়াছে। যদুবংশীয়েরা পরস্পরকে নিহত করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ নিজে এই মহাভয়ানক ব্যাপার নিবারণের কোন উপায় করেন নাই—বরং অনেক যাদব তাঁহার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল এইরূপে কথিত হইয়াছে।

সে বৃত্তান্ত এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে। গান্ধারীকথিত ষট্‌ত্রিংশৎ বৎসর অতীত হইয়াছে যাদবেরা অত্যন্ত দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছেন। একদা বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও নারদ, এই লোকবিপ্রুত ঋষিগণ দ্বারকায় উপস্থিত। দুর্বিনীত যাদবেরা কৃষ্ণপুত্র শাম্বকে মেয়ে সাজাইয়া ঋষিদিগের কাছে লইয়া গিয়া বলিলেন, ইনি গর্ভবতী, ইহার কি পুত্র হইবে? পুরাণেতিহাসে ঋষিগণ অতি ভয়ানক ক্রোধপরবশ স্বরূপে বর্ণিত হইয়া থাকেন। কথায় কথায় তাঁহাদের অভি সম্প্রাপ্তের ঘটনা দেখিলে, তাহাদিগকে জিতেন্দ্রিয় ঈশ্বরপরায়ণ ঋষি না বলিয়া, অতি নৃশংস নরপিশাচ বলিয়া গণ্য করিতে হয়। এখনকার দিনে যে কেহ ভদ্রলোক এমন একটা তামাস হাসিয়া উড়াইয়া দিত; অন্ততঃ একটু তিরস্কারবাক্যই যথেষ্ট হয়। কিন্তু এই জিতেন্দ্রিয় মহর্ষিগণ একেবারে সমস্ত যদুবংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন। বলিলেন লৌহময় মূসল প্রসব করিবে, আর সেই মূসল হইতে কৃষ্ণ বলরাম ভিন্ন সমস্ত যদুবংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। কৃষ্ণ এ কথা অবগত হইলেন। তিনি বলিলেন, মূনিগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা অবশ্য হইবে। শাপ নিবারণের কোন উপায় করিলেন না।

অগত্যা শাম্ব, পুরুষই হউক আর যাই হউক, এক লোহার মূসল প্রসব করিল। যাদব গণের রাজা (কৃষ্ণ রাজা নহেন, উগ্রসেন রাজা বা প্রধান) ঐ মূসল চূর্ণ করিতে আজ্ঞা দিলেন মূসল চূর্ণ হইল—চূর্ণ সকল সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইল। এদিকে যাদবগণ সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। তখন কৃষ্ণ তাহাদিগের “বিনাশ বাসনায়” যাদবগণকে প্রভাসতীরে যাত্রা করিতে বলিলেন।

প্রভাসে আসিয়া, যাদবগণ সুরাপান করিয়া নানাবিধ উৎসব করিতে লাগিল। শেতে পরস্পর কলহ আরম্ভ করিল। কুরুক্ষেত্রের মহারথী সাত্যকি প্রথম বিবাদ আরম্ভ করিলেন তিনি কৃতবর্ম্মার সঙ্গে বিবাদ করিলে প্রদ্যুম্ন সাত্যকির পক্ষাবলম্বন করিলেন। সাত্যকি কৃতবর্ম্মার শিরশ্ছেদ করিলেন। তখন কৃতবর্ম্মার জ্ঞাতি গোষ্ঠী (যাদবেরা, বৃষ্ণ, ভোজ অন্ধক, কুকুর ইতি ভিন্ন ভিন্ন বংশীয়) সাত্যকি ও প্রদ্যুম্নকে নিহত করিল। তখন কৃষ্ণ এ মূর্খিট এরকা (শরগাছ) কুদ্ধ হইয়া গ্রহণ করিলেন। এবং তদ্বারা অনেক যাদব নিপাতিত করিলেন। গ্রন্থান্তরে আছে যে, এই শরগাছ মূসলচূর্ণ, যাহা রাজাজ্ঞানুসারে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। মহাভারতে সে কথাটা পাইলাম না, কিন্তু লিখিত আছে যে, কৃষ্ণ এরকামূর্খিট গ্রহণ করিতে তাহা মূসলরূপে পরিণত হইল, এবং ইহাও আছে যে, ঐ স্থানের সমুদায় এরকাই ব্রাহ্মণ-শাপে মূসলীভূত হইয়াছিল। যাদবগণ তখন ঐ সকল এরকা গ্রহণপূর্ব্বক পরস্পর নিহত করিতে লাগিল। এইরূপে সমস্ত যাদবগণ পরস্পরকে নিহত করিলেন। তখন দারুক (কৃষ্ণের সার্থি) ও বহু (যাদব) কৃষ্ণকে বলিলেন, “জনান্দর্ন! আপনি এক্ষণে অসংখ্য লোকের প্রাণসংহার করিলেন, অতঃপর চলুন, আমরা মহাত্মা বলভদ্রের নিক যাই।”

বাঁকম রচনাবলী

কৃষ্ণ দারুককে হস্তিনায় অর্জুনের নিকট পাঠাইলেন। অর্জুন আসিয়া যাদবদিগের কুলকামিনীগণকে হস্তিনায় লইয়া যাইবে, এইরূপ আজ্ঞা করিলেন। বলরামকে কৃষ্ণ যোগাসনে আসীন দেখিলেন। তাঁহার মুখ হইতে একটি সহস্রমস্তক সর্প নির্গত হইয়া সাগর, নদী, বরুণ, এবং বাসুকি প্রভৃতি অন্য সর্পগণ কর্তৃক স্তুত হইয়া সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করিল। বলরামের দেহ জীবনশূন্য হইল। তখন কৃষ্ণ স্বয়ং মর্ত্যলোক ত্যাগ বাসনায় মহাযোগ অবলম্বনপূর্বক ভূতলে শয়ন করিলেন। জরা নামে ব্যাধ মৃগদ্রমে তাঁহার পাদপদ্ম শরদ্বারা বিদ্ধ করিল। পরে আপনার দ্রম জানিতে পারিয়া শঙ্কিতমনে কৃষ্ণের চরণে নিপতিত হইল। কৃষ্ণ তাহাকে আশ্বাসিত করিয়া আকাশমন্ডল উদ্ভাসিত করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন।

এদিকে অর্জুন দ্বারকায় আসিয়া রামকৃষ্ণাদির ঔদ্ধবদৈহিক কৰ্ম সম্পাদন করিয়া যাদব-কুলকামিনীগণকে লইয়া হস্তিনায় চলিলেন। পৃথিবীতে দস্যুগণ লাঠি হাতে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। যিনি পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন, এবং ভীষ্ম কর্ণের নিহন্তা, তিনি লগুড়ধারী চাষাদিগকে পরাভূত করিতে পারিলেন না। গান্ধীব তুলিতে পারিলেন না। রুক্মিণী, সত্যভামা, হেমবতী, জাম্ববতী প্রভৃতি কৃষ্ণের প্রধানা মহিষীগণ ভিন্ন আর সকলকেই দস্যুগণ হরণ করিয়া লইয়া গেল।

এই সকল কথা কি মৌলিক? মুসল এরকার অনৈসর্গিক উপন্যাস আমরা পূর্বাণীয়মান্দু-সারে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য। কিন্তু তাহা ত্যাগ করিলে যে, প্রাকৃতিক স্কুল কথা কিছু বাকী থাকে, তাহা তত শীঘ্র ত্যাগ করা যায় না। যাদবেরা পানাসক্ত ও দুর্নীতিপরায়ণ হইয়াছিল; ইহা পূর্বে কথিত হইয়াছে। তাহারা সকলে একবংশীয় নহে; ভিন্ন ভিন্ন বংশীয়, এবং অনেক সময়ে পরস্পর বিরুদ্ধাচারী। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বাষ্পেয় সাত্যকি ও কৃষ্ণ পাণ্ডবপক্ষে, কিন্তু অন্ধক ও ভোজবংশীয় কৃতবর্মা, দুর্যোধনের পক্ষে। তার পর, যাদবদিগের কেহ রাজা ছিল না, উগ্রসেনকে কখন রাজা বলা হইয়া থাকে, কিন্তু যাদবদিগের মধ্যে কেহই রাজা নহেন, ইহাই প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণের গুণাধিক্য হেতু, তিনি যাদবগণের নেতা ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অগ্রজ বলরামের সঙ্গে তাঁহার মতভেদ দেখা যায়, এবং শান্তিপূর্বে দেখিতে পাই, ভীষ্ম একটি কৃষ্ণনারদসংবাদ বলিতেছেন, তাহাতে কৃষ্ণ নারদের কাছে দুঃখ করিতেছেন যে, তিনি জ্ঞাতিগণের মনোরঞ্জনার্থ বহুতর যত্ন করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। এ সকল কথা পূর্বে বলিয়াছি। অতএব, যখন যাদবেরা, পরস্পর বিদ্বেষবিশিষ্ট, স্ব স্ব প্রধান, অত্যন্ত বলদৃপ্ত, দুর্নীতিপরায়ণ, এবং সুরাপাননিরত,* তখন তাঁহারা যে পরস্পর বিবাদ করিয়া যদুকুলক্ষয় করিবেন এবং তন্নিবন্ধন কৃষ্ণ বলরামেরও যে ইচ্ছাধীন বা অনিচ্ছাধীন দেহান্ত হইবে, ইহা অনৈসর্গিক বা অসম্ভব নহে। বোধ হয়, এরূপ একটা কিম্বদন্তী প্রচলিত ছিল, এবং তাহার উপর পুরাণকারগণ যদুবংশধ্বংস স্থাপিত করিয়াছেন। অতএব এ অংশের মৌলিকতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। তবে কেবল দুই একটা কথা বলা আবশ্যিক। লিখিত হইয়াছে যে, যদুবংশ-ধ্বংস নিবারণ জন্য কৃষ্ণ কিছুই করেন নাই, বরং তাহার আনুকূল্যই করিয়াছিলেন। ইহাও যদি সত্য হয়, তাহাতে কৃষ্ণচরিত্রের অসঙ্গতি বা অগৌরব কিছুই দেখি না। আদর্শ মনুষ্য, আদর্শ মনুষ্যের উপযুক্ত কাজই করিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মীয় বা অনাত্মীয় কেহ নাই— আদর্শ পুরুষের ধর্মই আত্মীয়। যদুবংশীয়েরা যখন অধার্মিক হইয়া উঠিয়াছিল, তখন তাহাদের দণ্ড ও প্রয়োজনীয় স্থলে বিনাশসাধনই তাঁহার কর্তব্য। যিনি জরাসন্ধ প্রভৃতিকে অধর্মাত্মা বলিয়াই বিনষ্ট করিলেন, তিনি যাদবগণকে অধর্মাত্মা দেখিয়া তাহাদের যদি বিনষ্ট না করেন, তবে তিনি ধর্মের বন্ধু নহেন, আত্মীয়গণের বন্ধু, আপনার বন্ধু, ধর্মের পক্ষপাতী নহেন, আপনার পক্ষপাতী, বংশের পক্ষপাতী। আদর্শ ধর্মাত্মা, তাহা হইতে পারেন না— কৃষ্ণও তাহা হইলেন নাই।

কৃষ্ণের দেহত্যাগের কারণটা কতক অনিশ্চিত রহিল। চারি প্রকার কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে।

* যাদবেরা এমন মদ্যাসক্ত ছিলেন যে, কৃষ্ণ বলরাম ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, দ্বারকায় যে সুরা প্রস্তুত করিবে, তাহাকে শূলে দিব। আমি পাশ্চাত্য রাজপুরুষগণকে এই নীতির অন্তর্ভুক্তি হইতে বলিতে ইচ্ছা করি।

প্রথম, টাল্‌বয়স-হুইলার সম্প্রদায় বলিতে পারেন, কৃষ্ণ, জুলিয়স্ কাইসরের মত, দ্বৈষাংশিষ্ট বন্ধুগণ কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। এরূপ কথা কোন গ্রন্থেই নাই।

দ্বিতীয়, তিনি যোগাবলম্বন করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের শিষ্যগণ যোগাবলম্বনে দেহত্যাগের কথাটার বিশ্বাস করিবেন না। আমি নিজে অবিশ্বাসের কারণ দেখি না। যাঁহারা যোগাভ্যাসকালে নিশ্বাস অবরুদ্ধ করা অভ্যাস করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্বাস অবরুদ্ধ করিয়া আপনার মৃত্যু সম্পাদন করিতে পারেন না, এমন কথা আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি না। এরূপ ঘটনা বিশ্বস্তসূত্রে শূনাও গিয়া থাকে। অন্যে বলিতে পারেন, ইহা আত্মহত্যা, সূতরাং পাপ; সূতরাং আদর্শ মনুষ্যের অনাচরণীয়, আমি ঠিক তাহা বলিতে পারি না। প্রাচীন বয়সে, জীবনের কার্য সমস্ত সম্পন্ন হইলে পরে, ঈশ্বরে লীন হইবার জন্য মনোমধ্যে তন্ময় হইয়া, শ্বাসরোধকে আত্মহত্যা বলিব, না “ঈশ্বরপ্রাপ্তি” বলিব? সেটা বিচারস্থল। আত্মহত্যা মহাপাপ স্বীকার করি, জীবনশেষে যোগবলে প্রাণত্যাগও কি তাই?

তৃতীয়, জরাব্যাদের শরাঘাত।

চতুর্থ, এই সময়ে কৃষ্ণের বয়স শত বর্ষের অধিক হইয়াছিল, বলিয়া বিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছিল। এ জরাব্যাদ, জরাব্যাদি নয় ত?

যাঁহারা কৃষ্ণকে মনুষ্যমাত্র বিবেচনা করিয়া তাঁহার ঈশ্বরত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারা এই চারিটি মতের যে কোনটি গ্রহণ করিতে পারেন। আমি কৃষ্ণকে ঈশ্বরাতার বলিয়া স্বীকার করি। অতএব আমি বলি, কৃষ্ণের ইচ্ছাই কৃষ্ণের দেহত্যাগের কারণ। আমার মত ইহা বটে যে, জগতে মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রচার তাঁহার ইচ্ছা এবং সেই ইচ্ছা পূরণজন্য তিনি মানুসী শক্তির দ্বারা সকল কর্ম নিষ্পন্ন করেন, কিন্তু তাহা বলিলেও ঈশ্বরাতারের জন্মমৃত্যু তাঁহার ইচ্ছাধীন মাত্র বলিতে হইবে। অতএব আমি বলি, কৃষ্ণের ইচ্ছাই কৃষ্ণের দেহত্যাগের একমাত্র কারণ।

মৌসলপর্ষ মহাভারতের প্রথম স্তরের অন্তর্গত কি না, তাহার আমি বিচার করি নাই। বিশেষ প্রয়োজন নাই, বলিয়া সমালোচনা করি নাই। বিশেষ প্রয়োজন নাই কেন, তাহাও বলিয়াছি। স্থূল ঘটনাটা কতক সত্য বলিয়াই বোধ হয়। তবে তাহা হইলেও, ইহা মহাভারতের প্রথম স্তরের অন্তর্গত নহে বলিয়াই বোধ হয়। যাহা পুরাণ ও হরিবংশে আছে, কৃষ্ণজীবনঘটিত এমন আর কোন ঘটনাই মহাভারতে নাই। এইটাই কেবল পুরাণাদিতেও আছে, হরিবংশেও আছে, মহাভারতেও আছে। পাণ্ডবদিগের সম্বন্ধে যাহা কিছু কৃষ্ণ করিয়াছিলেন, তাহা ভিন্ন আর কোন কৃষ্ণবৃত্তান্ত মহাভারতে নাই ও থাকিবার সম্ভাবনা নাই। এইটাই কেবল সে নিয়ম-বহির্ভূত। কৃষ্ণ এখানে ঈশ্বরাতার, এটি দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের চিহ্ন পূর্বে বলিয়াছি। এরূপ বিবেচনা করিবার অন্যান্য হেতুও নির্দেশ করা যাইতে পারে, কিন্তু প্রয়োজনাভাব। তবে, ইহা বলা কর্তব্য যে, অনুক্রমগিকাধ্যয়ে মৌসলপর্ষের কোন প্রসঙ্গই নাই। পরীক্ষিতের জন্মবৃত্তান্তের পরবর্তী কোন কথাই অনুক্রমগিকাধ্যয়ে নাই। আমার বিবেচনায় পরীক্ষিতের জন্মই আদিম মহাভারতের শেষ। তার পরবর্তী যে সকল কথা, তাহা দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—উপসংহার

সমালোচকের কার্য প্রয়োজনানুসারে দ্বিবিধ:—এক প্রাচীন কুসংস্কারের নিরাস; অপর সত্যের সংগঠন। কৃষ্ণচরিত্রে প্রথমোক্ত কার্যই প্রধান; এজন্য আমরাদিগের সময় ও চেষ্টা সেই দিকেই বেশী গিয়াছে। কৃষ্ণের চরিত্রে সত্যের নূতন সংগঠন করা অতি দূরূহ ব্যাপার, কেন না, মিথ্যা ও অতিপ্রকৃত উপন্যাসের ভস্মে অগ্নি এখানে এরূপ আচ্ছাদিত যে, তাহার সন্ধান পাওয়া ভার। যে উপাদানে গড়িয়া প্রকৃত কৃষ্ণচরিত্র পুনঃ সংস্থাপিত করিব, তাহা মিথ্যার সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে। আমার যত দূর সাধ্য, তত দূর আমি গড়িলাম।

উপসংহারে দেখা কর্তব্য যে, যতটুকু সত্য পুরাণেতিহাসে পাওয়া যায়, ততটুকুতে কৃষ্ণচরিত্র কিরূপ প্রতিপন্ন হইল।

দেখিয়াছি, বাল্যে কৃষ্ণ শারীরিক বলে আদর্শ বলবান্। তাঁহার অশিক্ষিত বলপ্রভাবে বৃন্দাবন হিংস্রজন্তু প্রভৃতি হইতে সুরক্ষিত হইত। তাঁহার অশিক্ষিত বলেও কংসের মল্লপ্রভৃতি নিহত হইয়াছিল। গোচারণকালে গোপালগণের সঙ্গে সর্বদা ক্রীড়া ও ব্যায়ামাদিতে তিনি

বিক্রম রচনাবলী

শারীরিক বলের স্ফূর্তি জন্মাইয়াছিলেন। দেখিয়াছি, দ্রুতগমনে কালযবনও তাঁহাকে পারেন নাই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাঁহার রথসঞ্চালনবিদ্যার বিশেষ প্রশংসা দেখা যায়।

এই বল শিক্ষিত হইলে, তিনি সে সময়ের ক্ষত্রিয়সমাজে সর্বপ্রধান অস্ত্রবিৎ বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। কেহ কখন তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই। তিনি কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি সে সময়ের সর্বপ্রধান যোদ্ধৃগণের সঙ্গে, এবং অন্যান্য বহুতর রাজগণের সঙ্গে,—কাশী, কলিঙ্গ, পৌণ্ড্রক, গান্ধার প্রভৃতি রাজাদিগের সঙ্গে যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সকলকেই পরাভূত করিয়াছিলেন, কেহ কখন তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই। তাঁহার যুদ্ধশিষ্যেরা, যথা—সাত্যকি ও অভিমন্যু যুদ্ধে প্রায় অপরাজেয় হইয়াছিলেন। স্বয়ং অর্জুনও তাঁহার নিকট কোন কোন বিষয়ে যুদ্ধ সম্বন্ধে শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন।

কেবল শারীরিক বলের ও শিক্ষার উপর যে রণপটুতা নির্ভর করে, পুরাণেতিহাসে তাহারই প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেরূপ রণপটুতা একজন সামান্য সৈনিকেরও থাকিতে পারে। সৈন্যপতাই যোদ্ধার প্রকৃত গুণ। সৈন্যপত্যে সে সময়ের যোদ্ধৃগণ পটু ছিলেন না। মহাভারতে বা পুরাণে কাহারও সে গুণের বড় পরিচয় পাই না, ভীষ্মের বা অর্জুনেরও নহে। কৃষ্ণের সৈন্যপত্যের বিশেষ কিছু পরিচয় পাওয়া যায়, জরাসন্ধযুদ্ধে। তাঁহার সৈন্যপত্য গুণে ক্ষুদ্রা যাদবসেনা জরাসন্ধের সংখ্যাভীত সেনা মথুরা হইতে বিমুখ করিয়াছিল। সেই অগণনীয় সেনার ক্ষয়, যাদবসেনার দ্বারা অসাধ্য জানিয়া মথুরা পরিত্যাগ, নতুন নগরীর নিৰ্ম্মাণার্থ সাগরদ্বীপ দ্বারকার নিৰ্ব্বাচন, এবং তাহার সম্মুখস্থ রৈবতক পর্বতমালায় দুর্ভেদ্য দুর্গশ্রেণী-নিৰ্ম্মাণ যে রণনীতিজ্ঞতার পরিচয়, সেরূপ পরিচয় পুরাণেতিহাসে কোন ক্ষত্রিয়েরই পাওয়া যায় না। পুরাণকার ঋষিদিগের ইহা অবোধগম্য—অতএব ইহাও এক অন্যতর প্রমাণ যে, কৃষ্ণেতিহাস তাঁহাদের কল্পনামাত্রপ্রসূত নহে।

শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকলও চরমস্ফূর্তিপ্ৰাপ্ত, তাহারও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তিনি অদ্বিতীয় দেবজ্ঞ, ইহাই ভীষ্ম তাঁহার অর্ঘপ্রাপ্তির অন্যতর কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন। শিশুপাল সে কথার অন্য উত্তর দেন নাই, কেবল ইহাই বলিয়াছিলেন যে, তবে বেদব্যাস থাকিতে কৃষ্ণের পূজা কেন?

কৃষ্ণের জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকল যে চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল, কৃষ্ণপ্রচারিত ধর্মই ইহার তীরোজ্জ্বল প্রমাণ। এই ধর্ম যে কেবল গীতাতেই পাওয়া যায়, এমত নহে, মহাভারতের অন্য স্থানেও পাওয়া যায়, ইহা দেখিয়াছি। কৃষ্ণকথিত ধর্মের অপেক্ষা উন্নত, সর্বলোকহিতকর, সর্বজনের আচরণীয় ধর্ম আর কখন পৃথিবীতে প্রচারিত হয় নাই, ইহা গ্রন্থান্তরে বলিয়াছি। এই ধর্ম যে জ্ঞানের পরিচয় দেয়, তাহা প্রায় মনুষ্যাতীত। কৃষ্ণ মানুষী শক্তির দ্বারা সকল কার্য সিদ্ধ করেন, ইহা আমি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি ও প্রমাণীকৃতও করিতেছি। কেবল এই গীতায়, শ্রীকৃষ্ণ প্রায় অনন্ত জ্ঞানের আশ্রয় লইয়াছেন।

সর্বজনীন ধর্ম হইতে অবতরণ করিয়া রাজধর্ম বা রাজনীতি সম্বন্ধেও দেখিতে পাই যে, কৃষ্ণের জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকল চরমস্ফূর্তিপ্ৰাপ্ত। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সম্ভ্রান্ত রাজনীতিজ্ঞ বলিয়াই যুধিষ্ঠির ব্যাসদেবের পরামর্শ পাইয়াও কৃষ্ণের পরামর্শ ব্যতীত রাজসূয় যজ্ঞে হস্তার্পণ করিলেন না। অবাধ্য যাদবেরা এবং বাধ্য পাণ্ডবেরা তাঁহাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া কিছু করিতেন না। জরাসন্ধকে নিহত করিয়া, কারারুদ্ধ রাজগণকে মুক্ত করা, উন্নত রাজনীতির অতি উৎকৃষ্ট উদাহরণ—সাম্রাজ্য স্থাপনের অল্পায়াসসাধ্য অথচ পরম ধর্ম উপায়। ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের পর, ধর্মরাজ্য শাসনের জন্য রাজধর্মনিয়োগে ভীষ্মের দ্বারা রাজব্যবস্থা সংস্থাপন করান, রাজনীতিজ্ঞতার দ্বিতীয় অতিপ্রশংসনীয় উদাহরণ। আরও অনেক উদাহরণ পাঠক পাইয়াছেন।

কৃষ্ণের বুদ্ধি, চরম স্ফূর্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া, তাহা সর্বব্যাপিনী, সর্বদর্শিনী, সকল প্রকার উপায়ের উদ্ভাবিনী, ইহা আমরা পুনঃ পুনঃ দেখিয়াছি। মনুষ্যশরীর ধারণ করিয়া যত দূর সর্বজ্ঞ হওয়া যায়, কৃষ্ণ তত দূর সর্বজ্ঞ। অপূর্ব অধ্যাত্তত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্ব, যাহার উপরে আজিও মনুষ্যবুদ্ধি আর যায় নাই, তাহা হইতে চিকিৎসাবিদ্যা ও সঙ্গীতবিদ্যা, এমন কি, অশ্বপরিচর্যা পর্যন্ত তাঁহার আয়ত্ত ছিল। উত্তরার মৃত পুত্রের পুনর্জীবন একের উদাহরণ; বিখ্যাত বংশীবিদ্যা দ্বিতীয়ের, এবং জয়দ্রথবধের দিবসে অশ্বের শল্যোদ্ধার তৃতীয়ের উদাহরণ।

কৃষ্ণের কার্যকারিণী বৃত্তি সকলও চরমস্ফূর্তিপ্ৰাপ্ত। তাঁহার সাহস, ক্ষিপ্ৰকারিতা, এবং সৰ্ব্বকৰ্ম্মে তৎপরতার অনেক পরিচয় দিয়াছি। তাঁহার ধৰ্ম্ম এবং সত্য যে অবিচলিত, এই গ্রন্থে তাহার প্রমাণ পরিপূর্ণ। সৰ্ব্বজনে দয়া ও প্রীতিই এই ইতিহাসে পরিষ্ফুট হইয়াছে। বলদপ্তগণের অপেক্ষা বলবান্ হইয়াও লোকহিতার্থ তিনি শান্তির জন্য দৃঢ়ত্ব এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি সৰ্ব্বলোকহিতৈষী, কেবল মনুষ্যের নহে—গোবৎসাদি তিৰ্যাক্ যোনির প্রতিও তাঁহার দয়া। গিরিযজ্ঞে তাহা পরিষ্ফুট। ভাগবতকারকথিত বাল্যকালে বানরদিগের জন্য নবনীত চুরির এবং ফলবিধেত্রীর কথা কতদূর কিম্বদন্তীমূলক, বলা যায় না—কিন্তু যিনি গোবৎসের উত্তম ভোজন জন্য ইন্দ্রযজ্ঞ বন্ধ করাইলেন, ইহাও তাঁহার চরিত্রানুমোদিত। তিনি আত্মীয় স্বজন জ্ঞাত গোষ্ঠীর কিরূপ হিতৈষী, তাহা দেখিয়াছি, কিন্তু ইহাও দেখিয়াছি, আত্মীয় পাপাচারী হইলে তিনি তাহার শত্রু। তাঁহার অপারিসীম ক্ষমাগুণ দেখিয়াছি, আবার ইহাও দেখিয়াছি যে, সময় উপস্থিত দেখিলে তিনি অয়োনিম্মিত হৃদয়ে অকুণ্ঠিতভাবে দণ্ডবিধান করেন। তিনি স্বজনপ্রিয়, কিন্তু লোকহিতার্থে স্বজনের বিনাশেও তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। কংস মাতুল; পাণ্ডবেরা যাহা, শিশুপালও তাহা;—পিতৃস্বসার পুত্র; উভয়কেই দণ্ডিত করিলেন; তারপর, পরিশেষে স্বয়ং যাদবেরা সুরাপায়ী ও দুর্নীতিপরায়ণ হইলেও, তাহাদিগকেও রক্ষা করিলেন না।

এই সকল শ্রেষ্ঠ বৃত্তি কৃষ্ণে চরম স্ফূর্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলনে তিনি অপরাঙ্মুখ ছিলেন না, কেন না, তিনি আদর্শ মনুষ্য। যে জন্য বৃন্দাবনে রজলীলা, পরিণত বয়সে সেই উদ্দেশ্যে সমুদ্রবিহার, যমুনাবিহার, রৈবতক-বিহার। তাহার বিস্তারিত বর্ণনা আবশ্যিক বিবেচনা করি নাই।

কেবল একটা কথা এখন বাকি আছে। ধৰ্ম্মতত্ত্বে বলিয়াছি, ভক্তিই মনুষ্যের প্রধান বৃত্তি। কৃষ্ণ আদর্শ মনুষ্য, মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রচারের জন্য অবতীর্ণ—তাঁহার ভক্তির স্ফূর্তি দেখিলাম কই? কিন্তু যদি তিনি ঈশ্বরবতার হয়েন, তবে তাঁহার এই ভক্তির পাত্র কে? তিনি নিজে! নিজের প্রতি যে ভক্তি, সে কেবল আপনাকে পরমাত্মা হইতে অভিন্ন হইলেই উপস্থিত হয়। ইহা জ্ঞানমার্গের চরম। ইহাকে আত্মরতি বলে। ছান্দোগ্য উপনিষদে উহা এইরূপ কথিত হইয়াছে—“য এবং পশ্যন্তেবং মন্বান এবং বিজানন্তাত্মরতিরাত্মক্ৰীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড়্ ভবতীতি।”

“যে ইহা দেখিয়া, ইহা ভাবিয়া, ইহা জানিয়া, আত্মায় রত হয়, আত্মাতেই ক্রীড়াশীল হয়, আত্মাই যাহার মিথুন (সহচর), আত্মাই যাহার আনন্দ, সে স্বরাট্।”

ইহাই গীতায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কৃষ্ণ আত্মারাম; আত্মা জগন্ময়; তিনি সেই জগতে প্রীতিবিশিষ্ট। পরমাত্মার আত্মরতি আর কোন প্রকার বুদ্ধিতে পারি না। অন্ততঃ আমি বুদ্ধিতে পারি না।

উপসংহারে বক্তব্য, কৃষ্ণ সৰ্ব্বত্র সৰ্ব্বসময়ে সৰ্ব্বগুণের অভিব্যক্তিতে উজ্জ্বল। তিনি অপরা-
জয়, অপরাজিত, বিশুদ্ধ, প্ৰণয়ময়, প্রীতিময়, দয়াময়, অনুষ্টেয় কৰ্ম্মে অপরাঙ্মুখ—ধৰ্ম্মাত্মা,
বেদজ্ঞ, নীতিজ্ঞ, ধৰ্ম্মজ্ঞ, লোকহিতৈষী, ন্যায়নিষ্ঠ, ক্ষমাশীল, নিরপেক্ষ, শাস্তা, নিম্মর্ম, নিরহংকার,
যোগযুক্ত, তপস্বী। তিনি মানুসী শক্তির দ্বারা কৰ্ম্ম নিৰ্ব্বাহ করেন, কিন্তু তাঁহার চরিত্র
অমানুষ। এই প্রকার মানুসী শক্তির দ্বারা অতিমানুষ চরিত্রের বিকাশ হইতে তাঁহার মনুষ্যত্ব
বা ঈশ্বরত্ব অনর্মিত করা বিধেয় কি না, তাহা পাঠক আপন বুদ্ধিবিবেচনা অনুসারে স্থির
করিবেন। যিনি মীমাংসা করিবেন যে, কৃষ্ণ মনুষ্যমাত্র ছিলেন, তিনি অন্ততঃ Rhys Davids
শাক্যসিংহ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, কৃষ্ণকে তাহাই বলিবেন:—“The Wisest and Greatest
of the Hindus.” আর যিনি বুঝিবেন যে, এই কৃষ্ণচরিত্রে ঈশ্বরের প্রভাব দেখিতে পাওয়া
যায়, তিনি যুক্তকরে, বিনীতভাবে এই গ্রন্থ সমাপনকালে আমার সঙ্গে বলুন—

নাকারণাৎ কারণাদ্বা কারণাকারণাম্ চ।

শরীরগ্রহণং বাপি ধৰ্ম্মগ্রাণায় তে পরম্ ॥

যে সকল অংশে তাঁহাকে শিবোপাসক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাহা প্রক্ষিপ্তের
লক্ষণবিশিষ্ট।

ধর্মতত্ত্ব

অনুশীলন

প্রথম অধ্যায়—দুঃখ কি ?

গুরু। বাচস্পতি মহাশয়ের সম্বাদ কি? তাঁর পীড়া কি সারিয়াছে?

শিষ্য। তিনি ত কাশী গেলেন।

গুরু। কবে আসিবেন?

শিষ্য। আর আসিবেন না। একবারে দেশত্যাগী হইলেন।

গুরু। কেন?

শিষ্য। কি সুখে আর থাকিবেন?

গুরু। দুঃখ কি?

শিষ্য। সবই দুঃখ—দুঃখের বাকি কি? আপনাকে বলিতে শুনিয়াছি ধর্মই সুখ। কিন্তু বাচস্পতি মহাশয় পরম ধার্মিক ব্যক্তি, ইহা সর্ববাদিসম্মত। অথচ তাঁহার মত দুঃখীও আর কেহ নাই, ইহাও সর্ববাদিসম্মত।

গুরু। হয় তাঁর কোন দুঃখ নাই, নয় তিনি ধার্মিক নন।

শিষ্য। তাঁর কোন দুঃখ নাই? সে কি কথা? তিনি চিরদরিদ্র, অন্ন চলে না। তার পর এই কঠিন রোগে ক্লিষ্ট, আবার গৃহদাহ হইয়া গেল। আবার দুঃখ কাহাকে বলে?

গুরু। তিনি ধার্মিক নহেন।

শিষ্য। সে কি? আপনি কি বলেন যে, এই দারিদ্র্য, গৃহদাহ, রোগ, এ সকলই অধর্মের ফল?

গুরু। তা বলি।

শিষ্য। পূর্বজন্মের?

গুরু। পূর্বজন্মের কথায় কাজ কি? ইহজন্মের অধর্মের ফল।

শিষ্য। আপনি কি ইহাও মানেন যে, এ জন্মে আমি অধর্ম করিয়াছি বলিয়া আমার রোগ হয়?

গুরু। আমিও মানি, তুমিও মান। তুমি কি মান না যে, হিম লাগাইলে সন্দ্বি হয়, কি গুরুভোজন করিলে অজীর্ণ হয়?

শিষ্য। হিম লাগান কি অধর্ম?

গুরু। অন্য ধর্মের মত একটা শারীরিক ধর্ম আছে। হিম লাগান তাহার বিরোধী। এই জন্য হিম লাগান অধর্ম।

শিষ্য। এখানে অধর্ম মানে hygiene?

গুরু। যাহা শারীরিক নিয়মবিরুদ্ধ, তাহা শারীরিক অধর্ম।

শিষ্য। ধর্মধর্ম কি স্বাভাবিক নিয়মানুবর্তিতা আর নিয়মাতিক্রম?

গুরু। ধর্মধর্ম অত সহজে বুঝবার কথা নহে। তাহা হইলে ধর্মতত্ত্ব বৈজ্ঞানিকের হাতে রাখিলেই চলিত। তবে হিম লাগান সম্বন্ধে অতটুকু বলিলেই চলিতে পারে।

শিষ্য। তাই না হয় হইল। বাচস্পতির দারিদ্র্য দুঃখ কোন পাপের ফল?

গুরু। দারিদ্র্য দুঃখটা আগে ভাল করিয়া বুঝা যাউক। দুঃখটা কি?

শিষ্য। খাইতে পায় না।

গুরু। বাচস্পতির সে দুঃখ হয় নাই, ইহা নিশ্চিত। কেন না, বাচস্পতি খাইতে না পাইলে এত দিন মরিয়া যাইত।

শিষ্য। মনে করুন, সপরিবারে বুকড়ি চালের ভাত আর কাঁচকলা ভাতে খায়।

গুরু। তাহা যদি শরীর পোষণ ও রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট না হয়, তবে দুঃখ বটে। কিন্তু

যদি শরীর রক্ষা ও পুষ্টির পক্ষে উহা যথেষ্ট হয়, তবে তাহার অধিক না হইলে দুঃখ বোধ করা, ধার্মিকের লক্ষণ নহে, পেটদুকের লক্ষণ। পেটদুক অধার্মিক।

শিষ্য। ছেঁড়া কাপড় পরে।

গুরু। বস্ত্র লজ্জা নিবারণ হইলেই ধার্মিকের পক্ষে যথেষ্ট। শীতকালে শীত নিবারণও চাই। তাহা মোটা কম্বলেও হয়। তাহা বাচস্পতির জুটে না কি?

শিষ্য। জুটিতে পারে। কিন্তু তাহারা আপনারা জল তুলে, বাসন মাজে, ঘর ঝাঁট দেয়।

গুরু। শারীরিক পরিশ্রম ঈশ্বরের নিয়ম। যে তাহাতে অনিচ্ছুক, সে অধার্মিক। আমি এমন বলিতেছি না যে, ধনে কোন প্রয়োজন নাই। অথবা যে ধনোপার্জনে যত্নবান্, সে অধার্মিক। বরং যে সমাজে থাকিয়া ধনোপার্জনে যথাবিহিত যত্ন না করে, তাহাকে অধার্মিক বলি। আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, সচরাচর যাহারা আপনাদিগকে দারিদ্র্যপীড়িত মনে করে, তাহাদিগের নিজের কুশিক্ষা এবং কুবাসনা—অর্থাৎ অধর্ম সংস্কার, তাহাদিগের কষ্টের কারণ। অনুচিত ভোগলালসা অনেকের দুঃখের কারণ।

শিষ্য। পৃথিবীতে কি এমন কেহ নাই, যাহাদের পক্ষে দারিদ্র্য যথার্থ দুঃখ?

গুরু। অনেক কোটি কোটি। যাহারা শরীর রক্ষার উপযোগী অন্নবস্ত্র পায় না—আশ্রয় পায় না—তাহারা যথার্থ দরিদ্র। তাহাদের দারিদ্র্য দুঃখ বটে!

শিষ্য। এ দারিদ্র্যও কি তাহাদের ইহজন্মকৃত অধর্মের ভোগ?

গুরু। অবশ্য।

শিষ্য। কোন্ অধর্মের ভোগ দারিদ্র্য?

গুরু। ধনোপার্জনের উপযোগী অথবা গ্রাসাচ্ছাদন আশ্রয়াদির প্রয়োজনীয় যাহা, তাহার সংগ্রহের উপযোগী আমাদের কতকগুলি শারীরিক ও মানসিক শক্তি আছে। যাহারা তাহার সম্যক্ অনুশীলন করে নাই বা সম্যক্ পরিচালনা করে না, তাহারাই দরিদ্র।

শিষ্য। তবে, বুদ্ধিতেছি, আপনার মতে আমাদের সমস্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তি অনুশীলন ও পরিচালনাই ধর্ম, ও তাহার অভাবই অধর্ম।

গুরু। ধর্মতত্ত্ব সর্বাপেক্ষা গুরুতর তত্ত্ব। তাহা এত অল্প কথায় সম্পূর্ণ হয় না। কিন্তু মনে কর যদি তাই বলা যায়?

শিষ্য। এ যে বিলাতী Doctrine of Culture!

গুরু। Culture বিলাতী জিনিষ নহে। ইহা হিন্দুধর্মের সারাংশ।

শিষ্য। সে কি কথা? Culture শব্দের একটা প্রতিশব্দও আমাদের দেশীয় কোন ভাষায় নাই।

গুরু। আমরা কথা খুঁজিয়া মরি, আসল জিনিষটা খুঁজি না। তাই আমাদের এমন দশা। দ্বিজবর্গের চতুরাশ্রম কি মনে কর?

শিষ্য। System of Culture?

গুরু। এমন, যে তোমার Matthew Arnold প্রভৃতি বিলাতী অনুশীলনবাদীদের বুদ্ধিব্যবহার সাধ্য আছে কি না সন্দেহ। সধবার পতিদেবতার উপাসনায়, বিধবার ব্রহ্মচর্যে, সমস্ত ব্রতনিয়মে, তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে, যোগে, এই অনুশীলনতত্ত্ব অন্তর্নিহিত। যদি এই তত্ত্ব কখন তোমাকে বুদ্ধাইতে পারি, তবে তুমি দেখিবে যে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় যে পরম পবিত্র অমৃতময় ধর্ম কথিত হইয়াছে, তাহা এই অনুশীলনতত্ত্বের উপর গঠিত।

শিষ্য। আপনার কথা শুনিয়া আপনার নিকট অনুশীলনতত্ত্ব কিছু শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি। কিন্তু আমি যত দূর বুদ্ধি, পাশ্চাত্য অনুশীলনতত্ত্ব ত নাস্তিকের মত। এমন কি, নিরীশ্বর কোমৎ-ধর্ম অনুশীলনের অনুষ্ঠান পদ্ধতি মাত্র বলিয়াই বোধ হয়।

গুরু। এ কথা অতি যথার্থ। বিলাতী অনুশীলনতত্ত্ব নিরীশ্বর, এই জন্য উহা অসম্পূর্ণ ও অপরিণত অথবা উহা অসম্পূর্ণ বা অপরিণত বলিয়াই নিরীশ্বর,—ঠিক সেটা বুদ্ধি না। কিন্তু হিন্দুরা পরম ভক্ত, তাহাদিগের অনুশীলনতত্ত্ব জগদীশ্বর-পাদপদ্মেই সমর্পিত।

শিষ্য। কেন না, উদ্দেশ্য মূক্তি। বিলাতী অনুশীলনতত্ত্বের উদ্দেশ্য সুখ। এই কথা কি ঠিক?

গুরু। সুখ ও মূক্তি, পৃথক্ বলিয়া বিবেচনা করা উচিত কি না? মূক্তি কি সুখ নয়?

বাঁকম রচনাবলী

শিষ্য। প্রথমতঃ, মর্ন্তি সখ নয়—সখদঃখ মাত্রেই অভাব। দ্বিতীয়তঃ, মর্ন্তি যদিও সখবিশেষ বলেন, তথাপি সখমাত্র মর্ন্তি নয়। আমি দুইটা মিঠাই খাইলে সখী হই, আমার কি তাহাতে মর্ন্তি লাভ হয়?

গুরুর। তুমি বড় গোলযোগের কথা আনিয়া ফেলিলে। সখ এবং মর্ন্তি, এই দুইটা কথা আগে বঝিতে হইবে, নহিলে অনুশীলনতত্ত্ব বঝা যাইবে না। আজ আর সময় নাই—আইস, একটু ফুলগাছে জল দিই, সন্ধ্যা হইল। কাল সে প্রসঙ্গ আরম্ভ করা যাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়—সখ কি?

শিষ্য। কাল আপনার কথায় এই পাইলাম যে, আমাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তি সকলের সম্যক্ অনুশীলনের অভাবই আমাদের দুঃখের কারণ। বটে?

গুরুর। তার পর?

শিষ্য। বলিয়াছি যে, বাচস্পতির নিস্বাসনের একটি কারণ এই যে, তাহার ঘর পুড়িয়া গিয়াছে। আগুন কাহার দোষে কি প্রকারে লাগিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না—কিন্তু বাচস্পতির নিজ দোষে নহে, ইহা এক প্রকার নিশ্চিত। তাহার কোন্ অনুশীলনের অভাবে গৃহ দগ্ধ হইল?

গুরুর। অনুশীলনতত্ত্বটা না বঝিয়াই আগে হইতে কি প্রকারে সে কথা বঝিবে? সখদঃখ মানসিক অবস্থা মাত্র—সখদঃখের কোন বাহ্যিক অস্তিত্ব নাই। মানসিক অবস্থা মাত্রেই যে সম্পূর্ণরূপে অনুশীলনের অধীন, তাহা তুমি স্বীকার করিবে। এবং ইহাও বঝিতে পারিবে যে, মানসিক শক্তি সকলের যথাবিহিত অনুশীলন হইলে গৃহদাহ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হইবে না।

শিষ্য। অর্থাৎ বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে হইবে না। কি ভয়ানক!

গুরুর। সচরাচর যাহাকে বৈরাগ্য বলে, তাহা ভয়ানক ব্যাপার হইলে হইতে পারে। কিন্তু তাহার কথা হইতেছে কি?

শিষ্য। হইতেছে বৈ কি? হিন্দুধর্মের টান সেই দিকে। সাংখ্যকার বলেন, তিন প্রকার দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি পরমপুরুষার্থ। তার পর আর এক স্থানে বলেন যে, সখ এত অল্প যে, তাহাও দুঃখ পক্ষে নিক্ষেপ করিবে। অর্থাৎ সখ দুঃখ সব ত্যাগ করিয়া, জড়পিণ্ডে পরিণত হও। আপনার গীতোক্ত ধর্মও তাই বলেন। শীতোষ্ণ সখদঃখাদি দ্বন্দ্ব সকল তুল্য জ্ঞান করিবে। যদি সখে সখী না হইবে—তবে জীবনে কাজ কি? যদি ধর্মের উদ্দেশ্য সখ পরিত্যাগ, তবে আমি সেই ধর্ম চাই না। এবং অনুশীলনতত্ত্বের উদ্দেশ্য যদি ঈদৃশ ধর্মই হয়, তবে আমি অনুশীলনতত্ত্ব শুনিতে চাই না।

গুরুর। অত রাগের কথা কিছ্ নাই—আমার এই অনুশীলনতত্ত্বে তোমার দুইটা মিঠাই খাওয়ার পক্ষে কোন আপত্তি হইবে না—বরং বিধিই থাকিবে। সাংখ্যদর্শনকে তোমাকে ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে বলিতেছি না। শীতোষ্ণসখদঃখাদি দ্বন্দ্ব সম্বন্ধীয় যে উপদেশ, তাহারও এমন অর্থ নহে যে, মনুষ্যের সখভোগ করা কর্তব্য নহে। উহার অর্থ কি, তাহার কথায় এখন কাজ নাই। তুমি কাল বলিয়াছিলে যে, বিলাতী অনুশীলনের উদ্দেশ্য সখ, ভারতবর্ষীয় অনুশীলনের উদ্দেশ্য মর্ন্তি। আমি তদন্তরে বলি, মর্ন্তি সখের অবস্থাবিশেষ। সখের পূর্ণমাত্রা এবং চরমোৎকর্ষ। যদি এ কথা ঠিক হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় অনুশীলনের উদ্দেশ্যও সখ।

শিষ্য। অর্থাৎ ইহকালে দুঃখ ও পরকালে সখ।

গুরুর। না, ইহকালে সখ ও পরকালে সখ।

শিষ্য। কিন্তু আমার আপত্তির উত্তর হয় নাই—আমি ত বলিয়াছিলাম যে, জীব মর্ন্ত হইলে সে সখদঃখের অতীত হয়। সখশূন্য যে অবস্থা, তাহাকে সখ বলিব কেন?

গুরুর। এই আপত্তি খণ্ডন জন্য, সখ কি ও মর্ন্তি কি, তাহা বঝা প্রয়োজন। এখন, মর্ন্তির কথা থাক। আগে সখ কি, তাহা বঝিয়া দেখা যাক।

শিষ্য। বলুন।

গুরু। তুমি কাল বলিয়াছিলে যে, দুইটা মিঠাই খাইতে পাইলে তুমি সুখী হও। কেন সুখী হও, তাহা বঝিতে পার?

শিষ্য। আমার ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়।

গুরু। এক মুঠা শুকনা চাউল খাইলেও তাহা হয়—মিঠাই খাইলে ও শুকনা চাল খাইলে কি তুমি তুল্য সুখী হও?

শিষ্য। না। মিঠাই খাইলে অধিক সুখ সন্দেহ নাই।

গুরু। তাহার কারণ কি?

শিষ্য। মিঠাইয়ের উপাদানের সঙ্গে মনুষ্য-রসনার এরূপ কোন নিত্য সম্বন্ধ আছে যে, সেই সম্বন্ধ জন্মাই মিষ্ট লাগে।

গুরু। মিষ্ট লাগে সে জন্ম বটে, কিন্তু তাহা ত জিজ্ঞাসা করি নাই। মিঠাই খাওয়ায় তোমার সুখ কি জন্ম? মিষ্টতায় সকলের সুখ নাই। তুমি একজন আসল বিলাতি সাহেবকে একটা বড়বাজারের সন্দেশ কি মিহিদানা সহজে খাওয়াইতে পারিবে না। পক্ষান্তরে তুমি এক টুকরা রোস্ট বীফ খাইয়া সুখী হইবে না। 'রবিন্সন্ ক্রুশো' গ্রন্থের ফ্রাইডে নামক বর্ষের মনে পড়ে? সেই আমমাংসভোজী বর্ষের মখে সলবণ সুসিদ্ধ মাংস ভাল লাগিত না। এই সকল বৈচিত্র্য দেখিয়া বঝিতে পারিবে যে, তোমার মিঠাই খাওয়ার যে সুখ, তাহা রসনার সঙ্গে ঘৃতশর্করাদির নিত্য সম্বন্ধবশতঃ নহে। তবে কি?

শিষ্য। অভ্যাস।

গুরু। তাহা না বলিয়া অনুশীলন বল।

শিষ্য। অভ্যাস আর অনুশীলন কি এক?

গুরু। এক নহে বলিয়াই বলিতেছি যে, অভ্যাস না বলিয়া অনুশীলনই বল।

শিষ্য। উভয়ে প্রভেদ কি?

গুরু। এখন তাহা বুঝাইবার সময় নহে। অনুশীলনতত্ত্ব ভাল করিয়া না বঝিলে তাহা বঝিতে পারিবে না। তবে কিছু শুনিয়া রাখ। যে প্রত্যহ কুইনাইন খায়, তাহার কুইনাইনের স্বাদ কেমন লাগে? কখন সুখদ হয় কি?

শিষ্য। বোধ করি কখন সুখদ হয় না, কিন্তু ক্রমে তিক্ত সহ্য হইয়া যায়।

গুরু। সেইটুকু অভ্যাসের ফল। অনুশীলন, শক্তির অনুকূল; অভ্যাস, শক্তির প্রতিকূল। অনুশীলনের ফল শক্তির বিকাশ, অভ্যাসের ফল শক্তির বিকার। অনুশীলনের পরিণাম সুখ, অভ্যাসের পরিণাম সহিষ্ণুতা। এক্ষণে মিঠাই খাওয়ার কথাটা মনে কর। এখানে তোমার চেষ্টা স্বাভাবিকী রসাম্বাদিনী শক্তির অনুকূল, এ জন্ম তোমার সে শক্তি অনুশীলিত হইয়াছে—মিঠাই খাইয়া তুমি সুখী হও। ঐরূপ অনুশীলনবলে তুমি রোস্ট বীফ খাইয়াও সুখী হইতে পার। অন্যান্য ভক্ষ্য পেয় সম্বন্ধেও সেইরূপ।

এ গেল একটা ইন্দ্রিয়ের সুখের কথা। আমাদের আর আর ইন্দ্রিয় আছে, সেই সকল ইন্দ্রিয়ের অনুশীলনেও ঐরূপ সুখোৎপত্তি।

কতকগুলি শারীরিক শক্তিবিশেষের নাম দেওয়া গিয়াছে ইন্দ্রিয়। আরও অনেকগুলি শারীরিক শক্তি আছে। যথা, গীতবাদ্যের তাল বোধ হয় যে শক্তির অনুশীলনে, তাহাও শারীরিক শক্তি। সাহেবরা তাহার নাম দিয়াছেন muscular sense। এইরূপ আর আর শারীরিক শক্তি আছে। এ সকলের অনুশীলনেও ঐরূপ সুখ।

তা ছাড়া, আমাদের কতকগুলি মানসিক শক্তি আছে। সেগুলির অনুশীলনের যে ফল, তাহাও সুখ। ইহাই সুখ, ইহা ভিন্ন অন্য কোন সুখ নাই। ইহার অভাব দুঃখ। বঝিলে?

শিষ্য। না। প্রথমতঃ শক্তি কথাটাতেই গোল পড়িতেছে। মনে করুন, দয়া আমাদের মনের একটি অবস্থা। তাহার অনুশীলনে সুখ আছে। কিন্তু আমি কি বলিব যে, দয়া শক্তির অনুশীলন করিতে হইবে?

গুরু। শক্তি কথাটা গোলের বটে। তৎপরিবর্তে অন্য শব্দের আদেশ করার প্রতি আমার কোন আপত্তি নাই। আগে জিনিষটা বুঝ, তার পর যাহা বলিবে, তাহাতেই বুঝা যাইবে। শরীর এক ও মন এক বটে, তথাপি ইহাদিগের বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া আছে; এবং কাজেই সেই সকল বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার সম্পাদনকারিণী বিশেষ বিশেষ শক্তি কল্পনা করা অবৈজ্ঞানিক

বিক্রম রচনাবলী

হয় না। কেন না, আদৌ এই সকল শক্তির মূল এক হইলেও, কার্যতঃ ইহাদিগের পার্থক্য দেখিতে পাই। যে অন্ধ, সে দেখিতে পায় না, কিন্তু শব্দ শুনিতে পায়; যে বধির, সে শব্দ শুনিতে পায় না, কিন্তু চক্ষু দেখিতে পায়। কেহ কিছু স্মরণ রাখিতে পারে না, কিন্তু সে হয়ত সুকল্পনাবিশিষ্ট কবি; আবার কেহ কল্পনায় অক্ষম, কিন্তু বড় মেধাবী। কেহ ঈশ্বরে ভক্তিশূন্য, কিন্তু লোককে দয়া করে; আবার নিন্দ্য লোককেও ঈশ্বরে কিঞ্চিৎ ভক্তিবিশিষ্ট দেখা গিয়াছে।* সুতরাং দেহ ও মনের ভিন্ন ভিন্ন শক্তি স্বীকার করা যাইতে পারে। তবে কতকগুলি শক্তি—যথা স্নেহ, দয়া ইত্যাদিকে শক্তি বলা ভাল শুনায় না। কিন্তু অন্য ব্যবহার্য শব্দ কি আছে?

শিষ্য। ইংরাজি শব্দটা faculty, অনেক বাঙ্গালি লেখক বৃত্তি শব্দের দ্বারা তাহার অনুবাদ করিয়াছেন।

গুরু। পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রে বৃত্তি শব্দ সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

শিষ্য। কিন্তু এক্ষণে সে অর্থ বাঙ্গালা ভাষায় অপ্রচলিত। বৃত্তি শব্দ চলিয়াছে।

গুরু। তবে বৃত্তিই চালাও। বুদ্ধিতেই হইল। যখন তোমরা morals অর্থে “নীতি” শব্দ চালাইয়াছ, Science অর্থে “বিজ্ঞান” চালাইয়াছ, তখন faculty অর্থে বৃত্তি শব্দ চালাইলে দোষ ধরিব না।

শিষ্য। তার পর আমার দ্বিতীয় আপত্তি। আপনি বলিলেন, বৃত্তির অনুশীলন সুখ—কিন্তু জল বিনা তৃষ্ণার অনুশীলনে দুঃখ।

গুরু। রও। বৃত্তির অনুশীলনের ফল ক্রমশঃ স্ফূর্তি, চরমে পরিণতাবস্থা, তার পর উদ্দীপ্ত বস্তুর সন্মিলনে পরিতৃপ্ত। এই স্ফূর্তি এবং পরিতৃপ্ত উভয়ই সুখের পক্ষে আবশ্যিক।

শিষ্য। ইহা যদি সুখ হয়, তবে বোধ হয়, এরূপ সুখ মনুষ্যের উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত নহে।

গুরু। কেন?

শিষ্য। ইন্দ্রিয়পর ব্যক্তির ইন্দ্রিয়বৃত্তির অনুশীলনে ও পরিতৃপ্তিতে সুখ। তাই কি তাহার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত?

গুরু। না। তাহা নহে। তাহা হইলে ইন্দ্রিয় প্রবলতাহেতু মানসিক বৃত্তি সকলের অস্ফূর্তি এবং ক্রমশঃ বিলোপ হইবার সম্ভাবনা। এ বিষয়ে স্থূল নিয়ম হইতেছে সামঞ্জস্য। ইন্দ্রিয় সকলেরও এককালীন বিলোপ ধর্ম্মানুমত নহে। তাহাদের সামঞ্জস্যই ধর্ম্মানুমত। বিলোপে ও সংযমে অনেক প্রভেদ। সে কথা পশ্চাৎ বুঝাইব। এখন স্থূল কথাটা বুঝিয়া রাখ যে, বৃত্তি সকলের অনুশীলনের স্থূল নিয়ম পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য। এই সামঞ্জস্য কি, তাহা সবিস্তারে একদিন বুঝাইব। এখন কথাটা এই বুঝাইতেছি যে, সুখের উপাদান কি?

প্রথম। শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকলের অনুশীলন। তজ্জনিত স্ফূর্তি ও পরিণতি। দ্বিতীয়। সেই সকলের পরস্পর সামঞ্জস্য।

তৃতীয়। তাদৃশ অবস্থায় সেই সকলের পরিতৃপ্তি।

ইহা ভিন্ন আর কোন জাতীয় সুখ নাই। আমি সময়ান্তরে তোমাকে বুঝাইতে পারি, যোগীর যোগজনিত যে সুখ, তাহাও ইহার অন্তর্গত। ইহার অভাবই দুঃখ। সময়ান্তরে আমি তোমাকে বুঝাইতে পারি যে, বাচস্পতির গৃহদাহজনিত যে দুঃখ, অথবা তদপেক্ষাও হতভাগ্য ব্যক্তির পুরুশোকজনিত যে দুঃখ, তাহাও এই দুঃখ। আমার অবশিষ্ট কথাগুলি শুনিলে তুমি আপনি তাহা বুঝিতে পারিবে, আমাকে বুঝাইতে হইবে না।

শিষ্য। মনে করুন, তাহা যেন বুঝিলাম, তথাপি প্রধান কথাটা এখনও বুঝিলাম না। কথাটা এই হইতেছিল যে, আমি বলিয়াছিলাম যে, বাচস্পতি ধার্মিক ব্যক্তি, তথাপি দুঃখী। আপনি বলিলেন যে, যখন সে দুঃখী, তখন সে কখনও ধার্মিক নহে। আপনার কথা প্রমাণ করিবার জন্য, আপনি সুখ কি, তাহা বুঝাইলেন: এবং সুখ বুঝাতে বুঝিলাম যে, দুঃখ কি। ভাল, তাহাতে যেন বুঝিলাম যে, বাচস্পতি যথার্থ দুঃখী নহেন, অথবা তাহাকে যদি দুঃখী বলা যায়, তবে তিনি নিজের দোষে, অর্থাৎ নিজ শারীরিক বা মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের

* উদাহরণ—বিলাতের সপ্তদশ শতাব্দীর Puritan সম্প্রদায়। অপিচ, Inquisition অধ্যক্ষেরা।

ঘটিত করাতে এই দুঃখ পাইতেছেন। কিন্তু তাহাতে এমন কিছুই বৃথা গেল না যে, তিনি অধার্মিক। এ অনুশীলনতত্ত্বের সঙ্গে ধর্মধর্মের সম্বন্ধ কি, তাহা ত কিছুই বৃথা গেল না। যদি কিছু বৃথা থােক, তবে সে এই যে, অনুশীলনই ধর্ম।

গুরু। এক্ষণে তাই মনে করিতে পার। তাহা ছাড়া আরও একটা গুরুতর কথা আছে, তাহা না বৃথাইলে অনুশীলনের সঙ্গে ধর্মের কি সম্বন্ধ, তাহা সম্পূর্ণরূপে বৃথাতে পারিবে না। কিন্তু সেটা আমাকে সর্বশেষে বলিতে হইবে; কেন না, অনুশীলন কি, তাহা ভাল করিয়া না বৃথিলে সে তত্ত্ব তুমি গ্রহণ করিতে পারিবে না।

শিষ্য। অনুশীলন আবার ধর্ম! এ সকল নতুন কথা।

গুরু। নতুন নহে। পুরাতনের সংস্কার মাত্র।

তৃতীয় অধ্যায়—ধর্ম কি?

শিষ্য। অনুশীলনকে ধর্ম বলা যাইতে পারে, ইহা বৃথাতে পারিতেছি না। অনুশীলনের ফল সুখ, ধর্মের ফলও কি সুখ?

গুরু। না ত কি ধর্মের ফল দুঃখ? যদি তা হইত, তাহা হইলে আমি জগতের সমস্ত লোককে ধর্ম পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দিতাম।

শিষ্য। ধর্মের ফল পরকালে সুখ হইতে পারে, কিন্তু ইহকালেও কি তাই?

গুরু। তবে বৃথাইলাম কি! ধর্মের ফল ইহকালে সুখ ও যদি পরকাল থাকে, তবে পরকালেও সুখ। ধর্ম সুখের একমাত্র উপায়। ইহকালে কি পরকালে অন্য উপায় নাই।

শিষ্য। তথাপি গোল মিটিতেছে না। আমরা বলি খ্রীষ্টধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, বৈষ্ণবধর্ম—তৎপরিবর্তে কি খ্রীষ্ট অনুশীলন, বৌদ্ধ অনুশীলন, বৈষ্ণব অনুশীলন বলিতে পারি?

গুরু। ধর্ম কথাটার অর্থটা উল্টাইয়া দিয়া তুমি গোলযোগ উপস্থিত করিলে। ধর্ম শব্দটা নানা প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য অর্থে আমরাদিগের প্রয়োজন নাই;* তুমি যে অর্থে এখন ধর্ম শব্দ ব্যবহার করিলে, উহা ইংরেজি Religion শব্দের আধুনিক তর্জমা মাত্র। দেশী জিনিষ নহে।

শিষ্য। ভাল, religion কি, তাহাই না হয় বুঝান।

গুরু। কি জন্য? Religion পাশ্চাত্য শব্দ, পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ইহা নানা প্রকারে বৃথাইয়াছেন; কাহারও সঙ্গে কাহারও মত মিলে না।†

শিষ্য। কিন্তু রিলিজনের ভিতর এমন কি নিত্য বস্তু কিছুই নাই, যাহা সকল রিলিজনে পাওয়া যায়?

গুরু। আছে। কিন্তু সেই নিত্য পদার্থকে রিলিজন বলিবার প্রয়োজন নাই; তাহাকে ধর্ম বলিলে আর কোন গোলযোগ হইবে না।

শিষ্য। তাহা কি?

গুরু। সমস্ত মনুষ্য জাতি—কি খ্রীষ্টিয়ান, কি বৌদ্ধ, কি হিন্দু, কি মুসলমান, সকলেরই পক্ষে যাহা ধর্ম।

শিষ্য। কি প্রকারে তাহার সন্ধান পাওয়া যায়?

গুরু। মনুষ্যের ধর্ম কি, তাহার সন্ধান করিলেই পাওয়া যায়।

শিষ্য। তাই ত জিজ্ঞাস্য।

গুরু। উত্তরও সহজ। চৌম্বকের ধর্ম কি?

শিষ্য। লৌহাকর্ষণ।

গুরু। অগ্নির ধর্ম কি?

শিষ্য। দাহকতা।

গুরু। জলের ধর্ম কি?

শিষ্য। দ্রাবকতা।

* ক চিহ্নিত ক্রোড়পত্র দেখ। † খ চিহ্নিত ক্রোড়পত্র দেখ।

বিক্রম রচনাবলী

গুরু। বৃক্ষের ধর্ম কি?
শিষ্য। ফল পুষ্পের উৎপাদকতা।
গুরু। মানুষের ধর্ম কি?
শিষ্য। এক কথায় কি বলিব?
গুরু। মনুষ্যত্ব বল না কেন?
শিষ্য। তাহা হইলে মনুষ্যত্ব কি বৃক্ষিতে হইবে।
গুরু। কাল তাহা বৃক্ষাইব।

চতুর্থ অধ্যায়—মনুষ্যত্ব কি?

গুরু। মনুষ্যত্ব বৃক্ষিতে ধর্ম সহজে বৃক্ষিতে পারিবে। তাই আগে মনুষ্যত্ব বৃক্ষাইতেছি। মনুষ্যত্ব বৃক্ষিব্যবহার আগে বৃক্ষত্ব বৃক্ষ। এই একাট ঘাস দেখিতেছ, আর এই বটগাছ দেখিতেছ—দুইটিই কি এক জাতীয়?

শিষ্য। হাঁ, এক হিসাবে এক জাতীয়। উভয়েই উদ্ভিদ।

গুরু। দুইটিকেই কি বৃক্ষ বলিবে?

শিষ্য। না, বটকেই বৃক্ষ বলিব—ওটি তৃণ মাত্র।

গুরু। এ প্রভেদ কেন?

শিষ্য। কাণ্ড, শাখা, পল্লব, ফুল, ফল, এই লইয়া বৃক্ষ। বটের এ সব আছে, ঘাসের এ সব নাই।

গুরু। ঘাসেরও সব আছে—তবে ক্ষুদ্র, অপরিণত। ঘাসকে বৃক্ষ বলিবে না?

শিষ্য। ঘাস আবার বৃক্ষ?

গুরু। যদি ঘাসকে বৃক্ষ না বল, তবে যে মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলি পরিণত হয় নাই, তাহাকেও মনুষ্য বলিতে পারা যায় না। ঘাসের যেমন উদ্ভিত আছে, একজন হট্টেট্ট বা চিপেবারও সেরূপ মনুষ্যত্ব আছে। কিন্তু যে উদ্ভিতকে বৃক্ষত্ব বলি, সে যেমন ঘাসের নাই, তেমনি যে মনুষ্যত্ব মনুষ্যধর্ম, হট্টেট্ট বা চিপেবার সেই মনুষ্যত্ব নাই। বৃক্ষত্বের উদাহরণ ছাড়িও না, তাহা হইলেই বৃক্ষিবে। ঐ বাঁশঝাড় দেখিতেছ—উহাকে বৃক্ষ বলিবে?

শিষ্য। বোধ হয় বলিব না। উহার কাণ্ড, শাখা ও পল্লব আছে; কিন্তু কৈ, উহার ফুল ফল হয় না; উহার সর্বাঙ্গীণ পরিণতি নাই; উহাকে বৃক্ষ বলিব না।

গুরু। তুমি অনভিজ্ঞ। পঞ্চাশ ষাট বৎসর পরে এক একবার উহার ফুল হয়। ফুল হইয়া ফল হয়, তাহা চালের মত। চালের মত, তাহাতে ভাতও হয়।

শিষ্য। তবে বাঁশকে বৃক্ষ বলিব।

গুরু। অথচ বাঁশ তৃণ মাত্র। একাট ঘাস উপড়াইয়া লইয়া গিয়া বাঁশের সহিত তুলনা করিয়া দেখ—মিলিবে। উদ্ভিত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরাও বাঁশকে তৃণশ্রেণীর মধ্যে গণ্য করিয়া গিয়াছেন। অতএব দেখ, স্ফূর্ত্তিগুণে তৃণে তৃণে কত তফাৎ। অথচ বাঁশের সর্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তি নাই। যে অবস্থায় মনুষ্যের সর্বাঙ্গীণ পরিণতি সম্পূর্ণ হয়, সেই অবস্থাকেই মনুষ্যত্ব বলিতেছি।

শিষ্য। এরূপ পরিণতি কি ধর্মের আয়ত্ত?

গুরু। উদ্ভিদের এইরূপ উৎকর্ষে পরিণতি, কতকগুলি চেষ্টার ফল; লৌকিক কথায় তাহাকে কর্ষণ বা পাট বলে। এই কর্ষণ কোথাও মনুষ্য কর্তৃক হইতেছে, কোথাও প্রকৃতির দ্বারা হইতেছে। একটা সামান্য উদাহরণে বৃক্ষাইব। তোমাকে যদি কোন দেবতা আসিয়া বলেন যে, বৃক্ষ আর ঘাস, এই দুইই একত্র পৃথিবীতে রাখিব না। হয় সব বৃক্ষ নষ্ট করিব, নয় সব তৃণ নষ্ট করিব। তাহা হইলে তুমি কি চাহিবে? বৃক্ষ রাখিতে চাহিবে, না ঘাস রাখিতে চাহিবে?

শিষ্য। বৃক্ষ রাখিব, তাহাতে সন্দেহ কি? ঘাস না থাকিলে ছাগল গোরুর কিছু কষ্ট হইবে, কিন্তু বৃক্ষ না থাকিলে আম, কাঁঠাল প্রভৃতি উপাদেয় ফলে বঞ্চিত হইব।

গুরু। মূর্খ! তৃণ জাতি পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইলে অন্নভাবে মারা যাইবে যে?

জান না যে, ধানও তৃণজাতীয়? যে ভাঁটুই দেখতেছে, উহা ভাল করিয়া দেখিয়া আইস। ধানের পাট হইবার পূর্বে ধানও ঐরূপ ছিল। কেবল কর্ষণ জন্য জীবনদায়িনী লক্ষ্মীর তুল্য হইয়াছে। গমও ঐরূপ। যে ফুলকাঁপ দিয়া অম্লের রাশি সংহার কর, তাহাও আদিম অবস্থায় সমদ্রতীরবাসী তিত্ত্ববাদ কদর্যা উদ্ভিদ ছিল—কর্ষণে এই অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। উদ্ভিদের পক্ষে কর্ষণ যাহা, মনুষ্যের পক্ষে স্বীয় বৃত্তিগুলির অনুশীলন তাই; এজন্য ইংরোজিতে উভয়ের নাম, CULTURE! এই জন্য কথিত হইয়াছে যে, “The Substance of Religion is Culture.” “মানববৃত্তির উৎকর্ষণেই ধর্ম।”

শিষ্য। তাহা হউক। স্থূল কথাও কিছই বৃদ্ধিতে পারি নাই—মনুষ্যের সর্বাঙ্গীণ পরিণতি কাহাকে বলে?

গুরু। অঙ্কুরের পরিণাম, মহামহীরুহ। মাটি খোঁজ, হয়ত একটি অতি ক্ষুদ্র, প্রায় অদৃশ্য, অঙ্কুর দেখিতে পাইবে। পরিণামে সেই অঙ্কুর সেই প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের মত বৃক্ষ হইবে। কিন্তু তজ্জন্য ইহার কর্ষণ—কৃষকেরা যাহাকে গাছের পাট বলে, তাহা চাই। সরস মাটি চাই—জল না পাইলে হইবে না। রৌদ্র চাই, আওতায় থাকিলে হইবে না। যে সামগ্রী বৃক্ষশরীরের পোষণজন্য প্রয়োজনীয়, তাহা মৃত্তিকায় থাকা চাই—বৃক্ষের জাতিবিশেষে মাটিতে সার দেওয়া চাই। ঘেরা চাই। ইত্যাদি। তাহা হইলে অঙ্কুর সুবৃক্ষ হইবে। মনুষ্যেরও এইরূপ। যে শিশু দেখতেছে, ইহা মনুষ্যের অঙ্কুর। বিহিত কর্ষণে অর্থাৎ অনুশীলনে উহা প্রকৃত মনুষ্য হইবে। পরিণামে সর্বগুণযুক্ত, সর্ব-সুখ-সম্পন্ন মনুষ্য হইতে পারিবে। ইহাই মনুষ্যের পরিণতি।

শিষ্য। কিছই বৃদ্ধিলাভ না। সর্বসুখী সর্বগুণযুক্ত কি সকল মনুষ্য হইতে পারে?

গুরু। কখন হইতে পারিবে কি না, সে কথা এখন তুলিয়া কাজ নাই। সে অনেক বিচার। তবে ইহা স্বীকার করিব যে, এ পর্যন্ত কেহ কখন হয় নাই। আর সহসা কেহ হইবারও সম্ভাবনা নাই। তবে আমি যে ধর্মের ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত, তাহার বিহিত অবলম্বনে ইহাই হইবে যে, লোকে সর্বগুণ অর্জনের জন্য যত্নে বহুগুণসম্পন্ন হইতে পারিবে; সর্বসুখ লাভের চেষ্টায় বহু সুখ লাভ করিতে পারিবে।

শিষ্য। আমাকে ক্ষমা করুন—মনুষ্যের সর্বাঙ্গীণ পরিণতি কাহাকে বলে, তাহা এখনও ভাল করিয়া বৃদ্ধিতে পারিলাম না।

গুরু। চেষ্টা কর। মনুষ্যের দুইটি অঙ্গ, এক শরীর, আর এক মন। শরীরের আবার কতকগুলি প্রত্যঙ্গ আছে; যথা,—হস্ত পদাদি কস্মৈন্দ্রিয়, চক্ষু কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়; মস্তিষ্ক, হৃৎ, বায়ুকোষ, অন্ত্র প্রভৃতি জীবনসঞ্চালক প্রত্যঙ্গ; অস্থি, মজ্জা, মেদ, মাংস, শোণিত প্রভৃতি শারীরিক উপাদান, এবং ক্ষুৎপিপাসাদি শারীরিক বৃত্তি। এ সকলের বিহিত পরিণতি চাই। আর মনেরও কতকগুলি প্রত্যঙ্গ—

শিষ্য। মনের কথা পশ্চাৎ শুনিব; এখন শারীরিক পরিণতি ভাল করিয়া বুঝান। শারীরিক প্রত্যঙ্গ সকলের কি প্রকারে পরিণতি সাধিত হইবে? শিশুর এই ক্ষুদ্র দুর্বল বাহু, বয়োগুণে আপনাই বর্দ্ধিত ও বলশালী হইবে। তাহা ছাড়া আবার কি চাই?

গুরু। তুমি যে স্বাভাবিক পরিণতির কথা বলিতেছ, তাহার দুইটি কারণ। আমিও সেই দুইটির উপর নির্ভর করিতেছি। সেই দুইটি কারণ—পোষণ ও পরিচালনা। তুমি কোন শিশুর একটি বাহু, কাঁধের কাছে দৃঢ় বন্ধনীর দ্বারা বাঁধিয়া রাখ, বাহুতে আর রক্ত না যাইতে পারে। তাহা হইলে ঐ বাহু আর বাড়িবে না, হয়ত অবশ, নয় দুর্বল ও অকর্মণ্য হইয়া যাইবে। কেন না, যে শোণিতে বাহুর পুষ্টি হইত, তাহা আর পাইবে না। আবার, বাঁধিয়া কাজ নাই, কিন্তু এমন কোন বন্দোবস্ত কর যে, শিশু কখনও আর হাত নাড়িতে না পারে। তাহা হইলে ঐ হাত অবশ ও অকর্মণ্য হইয়া যাইবে। অন্ততঃ হস্ত সঞ্চালনে যে ক্ষিপিকারিতা জৈব কার্যে প্রয়োজনীয়, তাহা কখনও হইবে না। উদ্ধরবাহুদিগের বাহু দেখিয়াছ ত?

শিষ্য। বৃদ্ধিলাভ, অনুশীলন গুণে শিশুর কোমল ক্ষুদ্র বাহু পরিণতবয়স্ক মানুষ্যের বাহুর বিস্তার, বল ও ক্ষিপিকারিতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এ ত সকলেরই সহজেই হয়। আর কি চাই?

গুরু। তোমার বাহুর সঙ্গে এই বাগানের মালীর বাহু তুলনা করিয়া দেখ। তুমি তোমার

বাক্য রচনাবলী

বাহুস্থিত অঙ্গুলিগুলিকে অনুশীলনে এরূপ পরিণত করিয়াছে যে, এখনই পাঁচ মিনিটে তুমি দুই পৃষ্ঠা কাগজে লিখিয়া ফেলিবে, কিন্তু ঐ মালী দশ দিন চেষ্টা করিয়া তোমার মত একটি “ক” লিখিতে পারিবে না। তুমি যে না ভাবিয়া, না যত্ন করিয়া অবহেলায় যেখানে যে আকারের যে অক্ষরের প্রয়োজন, তাহা লিখিয়া যাইতেছ, ইহা উহার পক্ষে অতিশয় বিস্ময়কর, ভাবিয়া সে কিছুর বুদ্ধিতে পারে না। সচরাচর অনেকেই লিখিতে জানে, এই জন্য সভ্য সমাজে লিপিবিদ্যা বিস্ময়কর অনুশীলন বলিয়া লোকের বোধ হয় না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই লিপিবিদ্যা ভোজবাজির অপেক্ষা আশ্চর্য অনুশীলনফল। দেখ, একটি শব্দ লিখিতে গেলে, মনে কর এই অনুশীলন শব্দ লিখিতে গেলে,—প্রথমে এই শব্দটির বিশ্লেষণ করিয়া উহার উপাদানভূত বর্ণগুলি স্থির করিতে হইবে—বিশ্লেষণে পাইতে হইবে, অ, ন, উ, শ, ঙ্গ, ল, ন। ইহা প্রথমে কেবল কর্ণে, তাহার পর প্রত্যেকের চাক্ষুষ দৃষ্টব্য অবয়ব ভাবিয়া মনে আনিতে হইবে। এক একটি অবয়ব মনে পাড়িবে, আবার এক একটি কাগজে আঁকিতে হইবে। অথচ তুমি এত শীঘ্র লিখিবে যে, তাহাতে বুঝাইবে যে, তুমি কোন প্রকার মানসিক চিন্তা করিতেছ না। অনুশীলন গুণে অনেকেই এই অসাধারণ কৌশলে কুশলী। অনুশীলনজনিত আরও প্রভেদ এই মালীর তুলনাতেই দেখ। তুমি যেখানে পাঁচ মিনিটে দুই পৃষ্ঠা কাগজে লিখিবে, মালী তেমনি পাঁচ মিনিটে এক কাঠা জমিতে কোদালি দিবে। তুমি দুই ঘণ্টায়, হয়ত দুই প্রহরেও তাহা পারিয়া উঠিবে না। এ বিষয়ে তোমার বাহু উপযুক্তরূপে চালিত অর্থাৎ অনুশীলিত হয় নাই, সমুচিত পরিণতি প্রাপ্ত হয় নাই। অতএব তোমার ও মালীর উভয়েরই হস্ত ক্রিয়দংশে অপরিণত; সর্বাঙ্গীণ পরিণতি প্রাপ্ত হয় নাই। আবার এক জন শিক্ষিত গায়কের সঙ্গে তোমার নিজের তুলনা করিয়া দেখ। হয়ত, শৈশবে তোমার কণ্ঠ ও গায়কের কণ্ঠে বিশেষ তারতম্য ছিল না; অনেক গায়ক সচরাচর স্বভাবতঃ সুকণ্ঠ নহে। কিন্তু অনুশীলন গুণে গায়ক সুকণ্ঠ হইয়াছে, তাহার কণ্ঠের সর্বাঙ্গীণ পরিণতি হইয়াছে। আবার দেখ,—বল দেখি, তুমি কয় ক্রোশ পথ হাঁটিতে পার?

শিষ্য। আমি বড় হাঁটিতে পারি না; বড় জোর এক ক্রোশ।

গুরু। তোমার পদদ্বয়ের সর্বাঙ্গীণ পরিণতি হয় নাই। দেখ তোমার হাত, পা, গলা, তিনেরই সহজ পুষ্টি ও পরিণতি হইয়াছে—কিন্তু একেরও সর্বাঙ্গীণ পরিণতি হয় নাই। এইরূপ আর সকল শারীরিক প্রত্যঙ্গের বিষয়ে দেখিবে। শারীরিক প্রত্যঙ্গ মাত্রেরই সর্বাঙ্গীণ পরিণতি না হইলে শারীরিক সর্বাঙ্গীণ পরিণতি হইয়াছে বলা যায় না; কেন না, ভগ্নাংশগুলির পূর্ণতাই ষোল আনার পূর্ণতা। এক আনায় আধ পয়সা কম হইলে, পুরা টাকাতেই কমতি হয়। যেমন শরীর সম্বন্ধে বুঝাইলাম, এমনই মন সম্বন্ধে জানিবে। মনেরও অনেকগুলি প্রত্যঙ্গ আছে, সেগুলিকে বৃত্তি বলা গিয়াছে। কতকগুলির কাজ জ্ঞানার্জন ও বিচার। কতকগুলির কাজ কার্যে প্রবৃত্তি দেওয়া—যথা ভক্তি, প্রীতি, দয়াদি। আর কতকগুলির কাজ আনন্দের উপভোগ, সৌন্দর্য হৃদয়ে গ্রহণ, রসগ্রহণ, চিত্তবিনোদন। এই ত্রিবিধ মানসিক বৃত্তিগুলির সকলের পুষ্টি ও সম্পূর্ণ বিকাশই মানসিক সর্বাঙ্গীণ পরিণতি।

শিষ্য। অর্থাৎ জ্ঞানে পাণ্ডিত্য, বিচারে দক্ষতা, কার্যে তৎপরতা, চিত্তে ধর্মাত্মতা এবং সুরসে রসিকতা, এই সকল হইলে, তবে মানসিক সর্বাঙ্গীণ পরিণতি হইবে। আবার তাহার উপর শারীরিক সর্বাঙ্গীণ পরিণতি আছে অর্থাৎ শরীর বলিষ্ঠ, সুস্থ, এবং সর্ববিধ শারীরিক ক্রিয়ায় সুদক্ষ হওয়া চাই। কৃষ্ণার্জুন আর শ্রীরাম লক্ষ্মণ ভিন্ন আর কেহ কখন এরূপ হইয়াছিল কি না, তাহা শুনি নাই।

গুরু। যাহারা মনুষ্যজাতির মধ্যে উৎকৃষ্ট, তাহারা চেষ্টা করিলে যে সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিবে না, এমত কথা স্বীকার করা যায় না। আমার এমনও ভরসা আছে, যুগান্তরে যখন মনুষ্যজাতি প্রকৃত উন্নতি প্রাপ্ত হইবে, তখন অনেক মনুষ্যই এই আদর্শানুযায়ী হইবে। সংস্কৃত গ্রন্থে প্রাচীন ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয় রাজগণের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায়, সেই রাজগণ সম্পূর্ণরূপে এই মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সে বর্ণনাগুলি যে অনেকটা লেখকদিগের কপোলকল্পিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এরূপ রাজগণবর্ণনা যে স্থলে সাধারণ, সে স্থলে ইহাই অনুমেয় যে, এইরূপ একটা আদর্শ সে কালের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দিগের সম্মুখে ছিল। আমিও সেইরূপ আদর্শ তোমার সম্মুখে স্থাপন করিতেছি। যে যাহা হইতে

চায়, তাহার সম্মুখে তাহার সর্বাঙ্গসম্পন্ন আদর্শ চাই। সে ঠিক আদর্শানুরূপ না হউক, তাহার নিকটবর্তী হইবে। ষোল আনা কি, তাহা না জানিলে আট আনা পাইবার কেহ কামনা করে না। যে শিশু টাকায় ষোল আনা, ইহা বুঝে না, সে টাকার মূল্যস্বরূপ চারিটি পয়সা লইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারে।

শিষ্য। এরূপ আদর্শ কোথায় পাইব? এরূপ মানুষ ত দেখি না।

গুরু। মানুষ না দেখ, ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বরই সর্বগুণের সর্বাঙ্গীণ স্ফূর্তির ও চরম পরিণতির একমাত্র উদাহরণ। এই জন্য বেদান্তের নিগূণ ঈশ্বরে, ধর্ম সম্যক্ ধর্মত্ব প্রাপ্ত হয় না; কেন না, যিনি নিগূণ, তিনি আমাদের আদর্শ হইতে পারেন না। অদ্বৈতবাদীদের “একমেবাদ্বিতীয়ম্” চৈতন্য অথবা যাহাকে হবার্ট স্পেন্সর “Inscrutable Power in Nature” বলিয়া ঈশ্বরস্থানে সংস্থাপিত করিয়াছেন—অর্থাৎ যিনি কেবল দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক ঈশ্বর, তাঁহার উপাসনায় ধর্ম সম্পূর্ণ হয় না। আমাদের পুরাণেতিহাসে কথিত বা খ্রীষ্টিয়ানের ধর্মপন্থকে কথিত সগুণ ঈশ্বরের উপাসনাই ধর্মের মূল, কেন না, তিনিই আমাদের আদর্শ হইতে পারেন। যাহাকে “Impersonal God” বলি, তাঁহার উপাসনা নিষ্ফল; যাহাকে “Personal God” বলি, তাঁহার উপাসনাই সফল।

শিষ্য। মানিলাম সগুণ ঈশ্বরকে আদর্শ স্বরূপ মানিতে হইবে। কিন্তু উপাসনার প্রয়োজন কি?

গুরু। ঈশ্বরকে আমরা দেখিতে পাই না। তাঁহাকে দেখিয়া দেখিয়া চলিব, সে সম্ভাবনা নাই। কেবল তাঁহাকে মনে ভাবিতে পারি। সেই ভাবাই উপাসনা। তবে বেগার টালা রকম ভাবিলে কোন ফল নাই। সন্ধ্যা কেবল আওড়াইলে কোন ফল নাই। তাঁহার সর্বগুণসম্পন্ন বিশুদ্ধ স্বভাবের উপর চিত্ত স্থির করিতে হইবে, ভক্তিভাবে তাঁহাকে হৃদয়ে ধ্যান করিতে হইবে। প্রীতির সহিত হৃদয়কে তাঁহার সম্মুখীন করিতে হইবে। তাঁহার স্বভাবের আদর্শে আমাদের স্বভাব গঠিত হইতে থাকুক, মনে এ রত দৃঢ় করিতে হইবে;—তাহা হইলেই সেই পবিত্র চরিত্রের বিমল জ্যোতি আমাদের চরিত্রে পড়িবে। তাঁহার নির্মালতার মত নির্মালতা, তাঁহার শক্তির অনুকারী সর্বত্র-মঞ্জলময় শক্তি কামনা করিতে হইবে। তাঁহাকে সর্বদা নিকটে দেখিতে হইবে, তাঁহার স্বভাবের সঙ্গে একস্বভাব হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। অর্থাৎ তাঁহার সামীপ্য, সালোক্য, সারূপ্য, সাযুজ্য কামনা করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা ক্রমে ঈশ্বরের নিকট হইব। আর্ষ্য ঋষিরা বিশ্বাস করিতেন যে, তাহা হইলে আমরা ক্রমে সারূপ্য ও সাযুজ্য প্রাপ্ত হইব,—ঈশ্বরের সঙ্গে এক হইব, ঈশ্বরেই লীন হইব। ইহাকেই মোক্ষ বলে। মোক্ষ আর কিছই নয়, ঐশ্বরিক আদর্শ-নীতি ঈশ্বরানুকৃত স্বভাবপ্রাপ্তি। তাহা পাইলেই সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া গেল, এবং সকল সুখের অধিকারী হওয়া গেল।

শিষ্য। আমি এত দিন বৃষ্ণিতাম, ঈশ্বর একটা সমুদ্র, আমি এক ফোঁটা জল, তাহাতে গিয়া মিশিব।

গুরু। উপাসনা-তত্ত্বের সার মর্ম হিন্দুরা যেমন বৃষ্ণিয়াছিলেন, এমন আর কোন জাতিই বুঝে নাই। এখন সে পরম রমণীয় ও সুসার উপাসনাপদ্ধতি এক দিকে আত্মপীড়নে, আর এক দিকে রক্তদারিতে পরিণত হইয়াছে।

শিষ্য। এখন আমাকে আর একটা কথা বুঝান। মানুষে প্রকৃত মানুষত্বের, অর্থাৎ সর্বাঙ্গ-সম্পন্ন স্বভাবের আদর্শ নাই, এজন্য ঈশ্বরকে ধ্যান করিতে হইবে। কিন্তু ঈশ্বর অনন্তপ্রকৃতি। আমরা ক্ষুদ্রপ্রকৃতি। তাঁহার গুণগুলি সংখ্যায় অনন্ত, বিস্তারেও অনন্ত। যে ক্ষুদ্র, অনন্ত তাহার আদর্শ হইবে কি প্রকারে? সমুদ্রের আদর্শে কি পুকুর কাটা যায়, না আকাশের অনুকরণে চাঁদোয়া খাটান যায়?

গুরু। এই জন্য ধর্মতিহাসের প্রয়োজন। ধর্মতিহাসের প্রকৃত আদর্শ নিউ টেষ্টেমেণ্টের, এবং আমাদের পুরাণেতিহাসের প্রক্ষিপ্তাংশ বাদে সারভাগ। ধর্মতিহাসে (Religious History) প্রকৃত ধার্মিকদের চরিত্র ব্যাখ্যাত থাকে। অনন্তপ্রকৃতি ঈশ্বর উপাসকের প্রথমাবস্থায় তাহার আদর্শ হইতে পারেন না, ইহা সত্য, কিন্তু ঈশ্বরের অনুকারী মানুষেরা, অর্থাৎ যাহাদিগের গুণাধিক্য দেখিয়া ঈশ্বরাংশ বিবেচনা করা যায়, অথবা যাহাদিগকে মানবদেহধারী ঈশ্বর মনে করা যায়, তাঁহারা ই সেখানে বাঞ্ছনীয় আদর্শ হইতে পারেন। এই জন্য

বিশ্বকম রচনাবলী

যীশুখৃষ্ট খ্রীষ্টিয়ানের আদর্শ, শাক্যসিংহ বৌদ্ধের আদর্শ। কিন্তু এরূপ ধর্মপরিবর্তক আদর্শ যেমন হিন্দুশাস্ত্রে আছে, এমন আর পৃথিবীর কোন ধর্মপুস্তকে নাই—কোন জাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ নাই। জনকাদি রাজর্ষি, নারদাদি দেবর্ষি, বশিষ্ঠাদি ব্রহ্মর্ষি, সকলেই অনুশীলনের চরমাদর্শ। তাহার উপর শ্রীরামচন্দ্র, যদুধিষ্ঠির, অজ্ঞান, লক্ষ্মণ, দেবরত ভীষ্ম প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ, আরও সম্পূর্ণতা-প্রাপ্ত আদর্শ। খৃষ্ট ও শাক্যসিংহ কেবল উদাসীন, কৌপীনধারী নির্ম্মম ধর্মবেত্তা। কিন্তু ইংহারা তা নয়। ইংহারা সর্বগুণাবিশিষ্ট—ইংহাদিগেতেই সর্ববৃত্তি সর্বাঙ্গ-সম্পন্ন স্ফূর্তি পাইয়াছে। ইংহারা সিংহাসনে বসিয়াও উদাসীন; কাম্বুকহস্তেও ধর্মবেত্তা; রাজা হইয়াও পণ্ডিত; শক্তিমান্ হইয়াও সর্বজনে প্রেমময়। কিন্তু এই সকল আদর্শের উপর হিন্দুর আর এক আদর্শ আছে, যাঁহার কাছে আর সকল আদর্শ খাটো হইয়া যায়—যদুধিষ্ঠির যাঁহার কাছে ধর্ম শিক্ষা করেন, স্বয়ং অজ্ঞান যাঁহার শিষ্য, রাম ও লক্ষ্মণ যাঁহার অংশ মাত্র, যাঁহার তুল্য মহামহিমাময় চরিত্র কখন মনুষ্যভাষায় কীর্তিত হয় নাই। আইস, আজ তোমাকে কৃষ্ণোপাসনায় দীক্ষিত করি।

শিষ্য। সে কি? কৃষ্ণ!

গুরু। তোমরা কেবল জয়দেবের কৃষ্ণ বা যাত্রার কৃষ্ণ চেন—তাই শিহরিতেছ। তাহারও সম্পূর্ণ অর্থ বুঝ না। তাহার পশ্চাতে, ঈশ্বরের সর্বগুণসম্পন্ন যে কৃষ্ণচরিত্র কীর্তিত আছে, তাহার কিছুই জান না। তাঁহার শারীরিক বৃত্তিসকল সর্বাঙ্গীণ স্ফূর্তি প্রাপ্ত হইয়া অননু-ভবনীয় সৌন্দর্য্য এবং অপারিমেয় বলে পরিণত; তাঁহার মানসিক বৃত্তিসকল সেইরূপ স্ফূর্তি প্রাপ্ত হইয়া সর্বলোকাতীত বিদ্যা, শিক্ষা, বীর্য্য এবং জ্ঞানে পরিণত, এবং প্রীতিবৃত্তির তদনুরূপ পরিণতিতে তিনি সর্বলোকের সর্বহিতে রত। তাই তিনি বলিয়াছেন—

পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।

ধর্মসংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

যিনি বাহুবলে দুষ্টির দমন করিয়াছেন, বুদ্ধিবলে ভারতবর্ষ একীভূত করিয়াছেন, জ্ঞানবলে অপদূর্ব্ব নিষ্কাম ধর্মের প্রচার করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। যিনি কেবল প্রেমময় বলিয়া, নিষ্কাম হইয়া এই সকল মনুষ্যের দুষ্কর কাজ করিয়াছেন, যিনি বাহুবলে সর্বজয়ী এবং পরের সাম্রাজ্য স্থাপনের কর্তা হইয়াও আপনি সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই, যিনি শিশুপালের শত অপরাধ ক্ষমা করিয়া ক্ষমাগুণ প্রচার করিয়া, তার পর কেবল দণ্ডপ্রণেতৃত্ব প্রযুক্তই তাহার দণ্ড করিয়াছিলেন, যিনি সেই বেদপ্রবল দেশে, বেদপ্রবল সময়ে, বলিয়াছিলেন, “বেদে ধর্ম নহে—ধর্ম লোকহিতে”—তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। যিনি একাধারে শাক্যসিংহ, যীশুখৃষ্ট, মহম্মদ ও রামচন্দ্র: যিনি সর্ববলাধার, সর্বগুণাধার, সর্বধর্মবেত্তা, সর্বত্র প্রেমময়, তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি।

নমো নমস্তেহস্তু সহস্রকৃষ্ণঃ ।

পদশ্চ ভূয়োহপি নমো নমস্তে ॥

পঞ্চম অধ্যায়—অনুশীলন

শিষ্য। অদ্য অবশিষ্ট কথা শ্রবণের বাসনা করি।

গুরু। সকল কথাই অবশিষ্টের মধ্যে। এখন আমরা পাইয়াছি কেবল দুইটা কথা। (১) মানুষের সুখ, মনুষ্যত্ব; (২) এই মনুষ্যত্ব, সকল বৃত্তিগুলির উপযুক্ত স্ফূর্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্যের সাপেক্ষ। এক্ষণে, এই বৃত্তিগুলি কি প্রকার, তাহার কিছু পর্য্যালোচনার প্রয়োজন।

বৃত্তিগুলিকে সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) শারীরিক ও (২) মানসিক। মানসিক বৃত্তিগুলির মধ্যে কতকগুলি জ্ঞান উপার্জন করে, কতকগুলি কাজ করে, বা কার্য্যে প্রবৃত্তি দেয়, আর কতকগুলি জ্ঞান উপার্জন করে না, কোন বিশেষ কার্য্যের প্রবর্তকও নয়, কেবল আনন্দ অনুভূত করে। যেগুলির উদ্দেশ্য জ্ঞান, সেগুলিকে জ্ঞানার্জনী বলিব। যেগুলির প্রবর্তনায় আমরা কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, বা হইতে পারি, সেগুলিকে কার্য্যকারিণী

বৃত্তি বলিব। আর যেগুলি কেবল আনন্দ অনুভূত করায়, সেগুলিকে আহুদিনী বা চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি বলা যাউক। জ্ঞান, কর্ম, আনন্দ, এ ত্রিবিধ বৃত্তির ত্রিবিধ ফল। সচ্চিদানন্দ এই ত্রিবিধ বৃত্তির প্রাপ্য।

শিষ্য। এই বিভাগ কি বিশুদ্ধ? সকল বৃত্তির পরিতৃপ্তিতেই ত আনন্দ?

গুরু। তা বটে। কিন্তু এমন কতকগুলি বৃত্তি আছে, যাহাদিগের পরিতৃপ্তির ফল কেবল আনন্দ—আনন্দ ভিন্ন অন্য ফল নাই। জ্ঞানার্জনী বৃত্তির মূখ্য ফল জ্ঞানলাভ, গৌণ ফল আনন্দ। কার্যকারিণী বৃত্তির মূখ্য ফল কার্যে প্রবৃত্তি, গৌণ ফল আনন্দ। কিন্তু এগুলির মূখ্য ফলেই আনন্দ—অন্য ফল নাই। পাশ্চাত্যেরা ইহাকে *Æsthetic Faculties* বলেন।

শিষ্য। পাশ্চাত্যেরা *Æsthetic* ত *Intellectual* বা *Emotional* মধ্যে ধরেন, কিন্তু আপনি চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি পৃথক্ করিলেন।

গুরু। আমি ঠিক পাশ্চাত্যদিগের অনুসরণ করিতেছি না। ভরসা করি, অনুসরণ করিতে বাধ্য নহি। সত্যের অনুসরণ করিলেই আমার উদ্দেশ্য সফল হইবে। এখন মনুষ্যের সমুদায় শক্তিগুলিকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা গেল। (১) শারীরিকী, (২) জ্ঞানার্জনী, (৩) কার্যকারিণী, (৪) চিত্তরঞ্জিনী। এই চতুর্বিধ বৃত্তিগুলির উপযুক্ত স্ফূর্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্যই মনুষ্যত্ব।

শিষ্য। ক্রোধাদি কার্যকারিণী বৃত্তি, এবং কামাদি শারীরিক বৃত্তি। এগুলিরও সম্যক্ স্ফূর্তি ও পরিণতি কি মনুষ্যত্বের উপাদান?

গুরু। এই চারি প্রকার বৃত্তির অনুশীলন সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিয়া সে আপত্তির মীমাংসা করিতেছি।

শিষ্য। কিন্তু অন্য প্রকার আপত্তিও আছে। আপনি যাহা বলিলেন, তাহাতে ত নূতন কিছু পাইলাম না। সকলেই বলে, ব্যায়ামাদির দ্বারা শারীরিকী বৃত্তিগুলির পুষ্টি হয়। অনেকেই তাহা করে। আর যাহারা সক্ষম, তাহারা পোষ্যগণকে সুশিক্ষা দিয়া জ্ঞানার্জনী বৃত্তির স্ফূর্তির জন্য যথেষ্ট যত্ন করিয়া থাকে—তাই সভ্য জগতে এত বিদ্যালয়। তৃতীয়তঃ—কার্যকারিণী বৃত্তির রীতিমত অনুশীলন যদিও তাদৃশ ঘটয়া উঠে না বটে, তবু তাহার উচিত্য সকলেই স্বীকার করে। চতুর্থ চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির স্ফূরণও কতক বাঞ্ছনীয় বলিয়া যে জ্ঞান আছে, তাহার প্রমাণ সাহিত্য ও সুক্ষ্ম শিল্পের অনুশীলন। নূতন আমাকে কি শিখাইলেন?

গুরু। এ সংসারে নূতন কথা বড় অল্পই আছে। বিশেষ, আমি যে কোন নূতন সম্বাদ লইয়া স্বর্গ হইতে সদ্য নামিয়া আসি নাই, ইহা তুমি এক প্রকার মনে স্থির করিয়া রাখিতে পার। আমার সব কথাই পুরাতন। নূতনে আমার নিজের বড় অবিশ্বাস। বিশেষ, আমি ধর্মব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত। ধর্ম পুরাতন, নূতন নহে। আমি নূতন ধর্ম কোথায় পাইব?

শিষ্য। তবে শিক্ষাকে যে আপনি ধর্মের অংশ বলিয়া খাড়া করিতেছেন, ইহাই দেখিতেছি নূতন।

গুরু। তাহাও নূতন নহে। শিক্ষা যে ধর্মের অংশ, ইহা চিরকাল হিন্দুধর্ম আছে। এই জন্য সকল হিন্দুধর্মশাস্ত্রেই শিক্ষাপ্রণালী বিশেষ প্রকারে বিহিত হইয়াছে। হিন্দুর ব্রহ্মচার্য্যাশ্রমের বিধি, কেবল পাঠাবস্থার শিক্ষার বিধি। কত বৎসর ধরিয়া অধ্যয়ন করিতে হইবে, কি প্রণালীতে অধ্যয়ন করিতে হইবে, কি অধ্যয়ন করিতে হইবে, তাহার বিস্তারিত বিধান হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে আছে। ব্রহ্মচার্যের পর গার্হস্থ্যাশ্রমও শিক্ষানবিশী মাত্র। ব্রহ্মচার্যে জ্ঞানার্জনী বৃত্তিসকলের অনুশীলন; গার্হস্থ্যে কার্যকারিণী বৃত্তির অনুশীলন। এই দ্বিবিধ শিক্ষার বিধি সংস্থাপনের জন্য হিন্দুশাস্ত্রকারেরা ব্যস্ত। আমিও সেই আর্ষ ঋষিদিগের পদারবিন্দ ধ্যান-পূর্ব্বক, তাহাদিগের প্রদর্শিত পথেই যাইতেছি। তিন চারি হাজার বৎসর পূর্ব্ব ভারতবর্ষের জন্য যে বিধি সংস্থাপিত হইয়াছিল, আজকার দিনে ঠিক সেই বিধিগুলি অক্ষরে অক্ষরে মিলাইয়া চালাইতে পারা যায় না। সেই ঋষিরা যদি আজ ভারতবর্ষে বর্তমান থাকিতেন, তবে তাহারা বলিতেন, “না, তাহা চলবে না। আমাদের বিধিগুলির সর্ব্বাঙ্গ বজায় রাখিয়া এখন যদি চল, তবে আমাদের প্রচারিত ধর্মের মর্মের বিপরীতাচরণ হইবে।” হিন্দুধর্মের সেই মর্মভাগ অমর; চিরকাল চলিবে, মনুষ্যের হিত সাধন করিবে; কেন না, মানবপ্রকৃতিতে

বিক্রম রচনাবলী

তাহার ভিত্তি। তবে বিশেষ বিধি সকল, সকল ধর্মই সময়োচিত হয়। তাহা কালভেদে পরিহার্য বা পরিবর্তনীয়। হিন্দুধর্মের নব সংস্কারের এই স্থূল কথা।

শিষ্য। কিন্তু আমার সন্দেহ হয়, আপনি ইহার ভিতর অনেক বিলাতী কথা আনিয়া ফেলিতেছেন। শিক্ষা যে ধর্মের অংশ, ইহা কোম্বতের মত।

গুরু। হইতে পারে। এখন, হিন্দুধর্মের কোন অংশের সঙ্গে যদি কোম্বত মতের কোথাও কোন সাদৃশ্য ঘটিয়া থাকে, তবে যখনস্পর্শদোষ ঘটিয়াছে বলিয়া হিন্দুধর্মের সেটুকু ফেলিয়া দিতে হইবে কি? খ্রীষ্টধর্ম ঈশ্বরোপাসনা আছে বলিয়া, হিন্দুদিগকে ঈশ্বরোপাসনা পরিত্যাগ করিতে হইবে কি? সে দিন নাইণ্টীন্থ সেণ্টুরিতে হবর্ট স্পেন্সর কোম্বত মত প্রতিবাদে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে মত প্রচার করিয়াছেন, তাহা মর্মতঃ বেদান্তের অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ। স্পিনোজার মতের সঙ্গেও বেদান্ত মতের সাদৃশ্য আছে। বেদান্তের সঙ্গে হবর্ট স্পেন্সরের বা স্পিনোজার মতের সাদৃশ্য ঘটিল বলিয়া বেদান্তটা হিন্দুয়ানির বাহির করিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে কি? আমি স্পেন্সর বা স্পিনোজীয় বলিয়া বেদান্ত ত্যাগ করিব না—বরং স্পিনোজা বা স্পেন্সরকে ইউরোপীয় হিন্দু বলিয়া হিন্দু মধ্যে গণ্য করিব। হিন্দুধর্মের যাহা স্থূল ভাগ, ইউরোপ হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া তাহার একটু আধটু ছুইতে পারিতেছেন, হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতার ইহা সামান্য প্রমাণ নহে।

শিষ্য। যাই হউক। গণিত বা ব্যায়াম শিক্ষা যদি ধর্মের শাসনাধীন হইল, তবে ধর্ম ছাড়া কি?

গুরু। কিছুই ধর্ম ছাড়া নহে। ধর্ম যদি যথার্থ সুখের উপায় হয়, তবে মনুষ্যজীবনের সর্বাংশই ধর্ম কর্তৃক শাসিত হওয়া উচিত। ইহাই হিন্দুধর্মের প্রকৃত মর্ম। অন্য ধর্ম তাহা হয় না, এজন্য অন্য ধর্ম অসম্পূর্ণ; কেবল হিন্দুধর্ম সম্পূর্ণ ধর্ম। অন্য জাতির বিশ্বাস যে, কেবল ঈশ্বর ও পরকাল লইয়াই ধর্ম। হিন্দুর কাছে, ইহকাল পরকাল, ঈশ্বর, মনুষ্য, সমস্ত জীব, সমস্ত জগৎ—সকল লইয়া ধর্ম। এমন সর্বব্যাপী সর্বসুখময়, পবিত্র ধর্ম কি আর আছে?

ষষ্ঠ অধ্যায়—সামঞ্জস্য

শিষ্য। বৃত্তির অনুশীলন কি, তাহা বুঝিলাম। এখন সে সকলের সামঞ্জস্য কি, তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। শারীরিক প্রভৃতি বৃত্তিগুলি কি সকলই তুল্যরূপে অনুশীলিত করিতে হইবে? কাম, ক্রোধ, বা লোভের ষেরূপ অনুশীলন, ভক্তি, প্রীতি, দয়ারও কি সেইরূপ অনুশীলন করিব? পূর্বগামী ধর্মবেত্তাগণ বলিয়া থাকেন যে, কাম ক্রোধাদির দমন করিবে, এবং ভক্তিপ্রীতিদয়াদির অপরিমিত অনুশীলন করিবে। তাহা যদি সত্য হয়, তবে সামঞ্জস্য কোথায় রহিল?

গুরু। ধর্মবেত্তাগণ যাহা বলিয়া আসিয়াছেন, তাহা সুসঙ্গত, এবং তাহার বিশেষ কারণ আছে। ভক্তিপ্রীতি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বৃত্তিগুলির সম্প্রসারণশক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক, এবং এই বৃত্তিগুলির অধিক সম্প্রসারণেই অন্য বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য ঘটে। সমুচিত স্ফূর্তি ও সামঞ্জস্য যাহাকে বলিয়াছি, তাহার এমন তাৎপর্য নহে যে, সকল বৃত্তিগুলিই তুল্যরূপে স্ফূর্তিত ও বর্দ্ধিত হইবে। সকল শ্রেণীর বৃক্ষের সমুচিত বৃদ্ধি ও সামঞ্জস্যে সুরম্য উদ্যান হয়। কিন্তু এখানে সমুচিত বৃদ্ধির এমন অর্থ নহে যে, তাল ও নারিকেল বৃক্ষ যত বড় হইবে, মল্লিকা বা গোলাপের তত বড় আকার হওয়া চাই। যে বৃক্ষের যেমন সম্প্রসারণশক্তি, সে ততটা বাড়িবে। এক বৃক্ষের অধিক বৃদ্ধির জন্য যদি অন্য বৃক্ষ সমুচিত বৃদ্ধি না পায়, যদি তেঁতুলের আওতায় গোলাপের কেয়ারি শুকাইয়া যায়, তবে সামঞ্জস্যের হানি হইল। মনুষ্যচারিত্রেও সেইরূপ। কতকগুলি বৃত্তি—যথা ভক্তি, প্রীতি, দয়া,—ইহাদিগের সম্প্রসারণশক্তি অন্যান্য বৃত্তির অপেক্ষা অধিক; এবং এইগুলির অধিক সম্প্রসারণই সমুচিত স্ফূর্তি, ও সকল বৃত্তির সামঞ্জস্যের মূল। পক্ষান্তরে আরও কতকগুলি বৃত্তি আছে; প্রধানতঃ কতকগুলি শারীরিক বৃত্তি,—সেগুলিও অধিক সম্প্রসারণশক্তিশালিনী। কিন্তু সেগুলির অধিক সম্প্রসারণে অন্যান্য বৃত্তির সমুচিত স্ফূর্তির বিঘ্ন হয়। সুতরাং সেগুলি যত দূর স্ফূর্তি পাইতে পারে, তত দূর স্ফূর্তি পাইতে

দেওয়া অকর্তব্য। সেগর্দলি তেঁতুলগাছ, তাহার আওতায় গোলাপের কেয়ারি মরিয়া যাইতে পারে। আমি এমন বলিতেছি না যে, সেগর্দলি বাগান হইতে উচ্ছেদ করিয়া ফেলিয়া দিবে। তাহা অকর্তব্য; কেন না, অম্ল প্রয়োজন আছে—নিকৃষ্ট বৃত্তিতেও প্রয়োজন আছে। সে সকল কথা সবিস্তারে পরে বলিতেছি। তেঁতুলগাছ বাগান হইতে উচ্ছেদ করিবে না বটে, কিন্তু তাহার স্থান এক কোণে। বড় বাড়িতে না পায়—বাড়িলেই ছাঁটিয়া দিবে। দুই-একখানা তেঁতুল ফলিলেই হইল—তার বেশী আর না বাড়িতে পারে। নিকৃষ্ট বৃত্তির সংসারিক প্রয়োজনসিদ্ধির উপযোগী স্ফূর্তি হইলেই হইল—তাহার বেশী আর বৃদ্ধি যেন না পায়। ইহাকেই সমুচিত বৃদ্ধি ও সামঞ্জস্য বলিয়াছি।

শিষ্য। তবেই বুদ্ধিলাভ যে এমন কতকগর্দলি বৃত্তি আছে—যথা কামাদি, তাহার দমনই সমুচিত স্ফূর্তি।

গুরু। দমন অর্থে যদি ধ্বংস বুঝ, তবে এ কথা ঠিক নহে। কামের ধ্বংসে মনুষ্য জাতির ধ্বংস ঘটিবে। সুতরাং এই অতি কদর্য বৃত্তিরও ধ্বংস ধর্ম নহে—অধর্ম। আমাদের পরম রমণীয় হিন্দুধর্মেরও এই বিধি। হিন্দুশাস্ত্রকারেরা ইহার ধ্বংস বিহিত করেন নাই, বরং ধর্মার্থ তাহার নিয়োগই বিহিত করিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে পুত্রোৎপাদন এবং বংশরক্ষা ধর্মের অংশ। তবে ধর্মের প্রয়োজনতিরিক্ত এই বৃত্তির যে স্ফূর্তি, তাহা হিন্দুশাস্ত্রানুসারেও নিষিদ্ধ—এবং তদনুগামী এই ধর্মব্যাত্যা যাহা তোমাকে শুনাইতেছি, তাহাতেও নিষিদ্ধ হইতেছে। কেন না, বংশরক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যতটুকু প্রয়োজনীয়, তাহার অতিরিক্ত যে স্ফূর্তি, তাহা সামঞ্জস্যের বিঘ্নকর, এবং উচ্চতর বৃত্তিসকলের স্ফূর্তিরোধক। যদি অনুচিত স্ফূর্তিরোধকে দমন বল, তবে এ সকল বৃত্তির দমনই সমুচিত অনুশীলন। এই অর্থে ইন্দ্রিয় দমনই পরম ধর্ম।

শিষ্য। এই বৃত্তিটার লোকরক্ষার্থ একটা প্রয়োজন আছে বটে, এই জন্য আপনি এ সকল কথা বলিতে পারিলেন, কিন্তু অপরাপর অপকৃষ্ট বৃত্তি সম্বন্ধে এ সকল কথা খাটে না।

গুরু। সকল অপকৃষ্ট বৃত্তি সম্বন্ধে এই কথা খাটিবে। কোন্টির সম্বন্ধে খাটে না?

শিষ্য। মনে করুন ক্রোধ। ক্রোধের উচ্ছেদে আমি ত কোন অনিষ্ট দেখি না।

গুরু। ক্রোধ আত্মরক্ষা ও সমাজ রক্ষার মূল। দণ্ডনীতি—বিধিবদ্ধ সামাজিক ক্রোধ। ক্রোধের উচ্ছেদে দণ্ডনীতির উচ্ছেদ হইবে। দণ্ডনীতির উচ্ছেদ সমাজের উচ্ছেদ।

শিষ্য। দণ্ডনীতি ক্রোধমূলক বলিয়া আমি স্বীকার করিতে পারিলাম না, বরং দয়ামূলক বলা ইহার অপেক্ষা ভাল হইতে পারে। কেন না, সর্বলোকের মঙ্গল কামনা করিয়াই, দণ্ডশাস্ত্র-প্রণেতারা দণ্ডবিধি উদ্ভূত করিয়াছেন। এবং সর্বলোকের মঙ্গল কামনা করিয়া রাজা দণ্ড প্রণয়ন করিয়া থাকেন।

গুরু। আত্মরক্ষার কথাটা বুঝিয়া দেখ। অনিষ্টকারীকে নিবারণ করিবার ইচ্ছাই ক্রোধ। সেই ক্রোধের বশীভূত হইয়াই আমরা অনিষ্টকারীর বিরোধী হই। এই বিরোধই আত্মরক্ষার চেষ্টা। হইতে পারে যে, আমরা কেবল বুদ্ধিবলেই স্থির করিতে পারি যে, অনিষ্টকারীর নিবারণ করা উচিত। কিন্তু কেবল বুদ্ধি দ্বারা কার্য্যে প্রেরিত হইলে, ক্রোধের যে ক্ষিপিকারিতা এবং আগ্রহ, তাহা আমরা কদাচ পাইব না। তার পর যখন মনুষ্য পরকে আত্মবৎ দেখিতে চেষ্টা করে, তখন এই আত্মরক্ষা ও পররক্ষা তুল্যরূপেই ক্রোধের ফল হইয়া দাঁড়ায়। পররক্ষায় চেষ্টিত যে ক্রোধ, তাহা বিধিবদ্ধ হইলে দণ্ডনীতি হইল।

শিষ্য। লোভে ত আমি কিছু ধর্ম দেখি না।

গুরু। যে বৃত্তির অনুচিত স্ফূর্তিকে লোভ বলা যায়, তাহার উচিত এবং সামঞ্জস্যভূত স্ফূর্তি—ধর্মসঙ্গত অর্জনে স্পৃহা। আপনার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যাহা যাহা প্রয়োজনীয়, এবং আমার উপর যাহাদের রক্ষার ভার আছে, তাহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যাহা যাহা প্রয়োজনীয়, তাহার সংগ্রহ অবশ্য কর্তব্য। এইরূপ পরিমিত অর্জনে—কেবল ধনার্জনের কথা বলিতেছি না, ভোগ্য বস্তু মাত্রেরই অর্জনের কথা বলিতেছি—কোন দোষ নাই। সেই পরিমিত মাত্রা ছাপাইয়া উঠিলেই এই স্ফূর্তি লোভে পরিণত হইল। অনুচিত স্ফূর্তি প্রাপ্ত হইল বলিয়া উহা তখন মহাপাপ হইয়া দাঁড়াইল। দুইটি কথা বুঝ। যেগর্দলিকে আমরা নিকৃষ্ট বৃত্তি বলি, তাহাদের সকলগর্দলিই উচিত মাত্রায় ধর্ম, অনুচিত মাত্রায় অধর্ম। আর এই

বাঁকম রচনাবলী

বৃত্তিগুণি এমনই তেজস্বিনী যে, যত্ন না করিলে এগুণি সচরাচর উচিত মাত্রা অতিক্রম করিয়া উঠে, এ জন্য দমনই এগুণি সম্বন্ধে প্রকৃত অনুরূপ। এই দুটি কথা বদ্বিলেই তুমি অনুরূপতত্ত্বের এ অংশ বদ্বিলে। দমনই প্রকৃত অনুরূপ, কিন্তু উচ্ছেদ নহে। মহাদেব, মন্থথের অনুরূচিত স্ফূর্তি দেখিয়া তাহাকে ধ্বংস করিয়াছিলেন, কিন্তু লোকহিতার্থ আবার তাহাকে পুনর্জীবিত করিতে হইল।* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কৃষ্ণের যে উপদেশ, তাহাতেও ইন্দ্রিয়ের উচ্ছেদ উপদিষ্ট হয় নাই, দমনই উপদিষ্ট হইয়াছে। সংযত হইলে সে সকল আর শাস্তির বিঘ্নকর হইতে পারে না, যথা

রাগদ্বৈষ্যবিমুত্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।

আত্মবশৈষ্যর্ষিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ২। ৬৪।

শিষ্য। যাই হউক, এ তত্ত্ব লইয়া আর অধিক কালহরণের প্রয়োজন নাই। ভক্তি, প্রীতি, দয়া প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বৃত্তিসকলের অনুরূপ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করুন।

গুরু। এ বিষয়ে এত কথা বলিবার আমারও ইচ্ছা ছিল না। দুই কারণে বলিতে বাধ্য হইলাম। প্রথম তোমার আপত্তি খণ্ডন করিতে হইল। আর আজকাল যোগধর্মের একটা হুজুক উঠিয়াছে, তাহাতে কিছু বিরক্ত হইয়াছি। এই ধর্মের ফলাফল সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। ইহার যে সুমহৎ ফল আছে, তাহাতে সন্দেহ কি? তবে যাঁহারা এই হুজুক লইয়া বেড়ান, তাঁহাদের মত এই দেখিতে পাই যে, কতকগুলি বৃত্তির সর্বাঙ্গীণ উচ্ছেদ, কতকগুলির প্রতি অমনোযোগ, এবং কতকগুলির সমাধিক সম্প্রসারণ—ইহাই যোগের উদ্দেশ্য। এখন যদি সকল বৃত্তির উচিত স্ফূর্তি ও সামঞ্জস্য ধর্ম হয়, তবে তাঁহাদিগের এই ধর্ম অধর্ম। বৃত্তি নিকৃষ্ট হউক বা উৎকৃষ্ট হউক, উচ্ছেদমাত্র অধর্ম। লম্পট বা পেটুক অধাম্মিক; কেন না, তাহারা আর সকল বৃত্তির প্রতি অমনোযোগী হইয়া দুই একটির সমাধিক অনুরূপে নিযুক্ত। যোগীরাও অধাম্মিক; কেন না, তাঁহারাও আর সকল বৃত্তির প্রতি অমনোযোগী হইয়া, দুই একটির সমাধিক অনুরূপ করেন। নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বৃত্তিভেদে না হয় লম্পট বা উদরস্তরীকে নীচ শ্রেণীর অধাম্মিক বলিলাম এবং যোগীদিগকে উচ্চশ্রেণীর অধাম্মিক বলিলাম, কিন্তু উভয়কেই অধাম্মিক বলিব। আর আমি কোন বৃত্তিকে নিকৃষ্ট বা অনিষ্টকর বলিতে সম্মত নাই। আমাদের দোষে অনিষ্ট ঘটে বলিয়া সেগুলিকে নিকৃষ্ট কেন বলিব? জগদীশ্বর আমাদের নিকৃষ্ট কিছুই দেন নাই। তাঁহার কাছে নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ভেদ নাই। তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা স্ব স্ব কার্যোপযোগী করিয়াছেন। কার্যোপযোগী হইলেই উৎকৃষ্ট হইল। সত্য বটে জগতে অমঙ্গল আছে। কিন্তু সে অমঙ্গল, মঙ্গলের সঙ্গে এমন সম্বন্ধবিশিষ্ট যে, তাহাকে মঙ্গলের অংশ বিবেচনা করাই কর্তব্য। আমাদের সকল বৃত্তিগুণিই মঙ্গলময়। যখন তাহাতে অমঙ্গল হয়, সে আমাদেরই দোষে। জগত্তত্ত্ব যতই আলোচনা করা যাইবে, ততই বদ্বিবে যে, আমাদের মঙ্গলের সঙ্গেই জগৎ সম্বন্ধ। নিখিল বিশ্বের সর্বাংশই মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুণিরই অনুরূপ। প্রকৃতি আমাদের সকল বৃত্তিগুণিরই সহায়। তাই যুগপদম্পরায় মনুষ্যজাতির মোটের উপর উন্নতিই হইয়াছে, মোটের উপর অবনতি নাই। ধর্মই এই উন্নতির কারণ। যে বৈজ্ঞানিক নাস্তিক ধর্মকে উপহাস করিয়া বিজ্ঞানই এই উন্নতির কারণ বলেন, তিনি জানেন না যে, তাঁহার বিজ্ঞানও এই ধর্মের এক অংশ, তিনিও একজন ধর্মের আচার্য্য। তিনি যখন “Law”র মহিমা কীর্তন করেন, আর আমি যখন হরিনাম করি, দুই জন একই কথা বলি। দুই জনে একই বিশ্বেশ্বরের মহিমা কীর্তন করি। মনুষ্যমধ্যে ধর্ম লইয়া এত বিবাদ বিসম্বাদ কেন, আমি বদ্বিতে পারি না।

* মন্থথ ধ্বংস হইল, অথচ রতি হইতে জীবলোক রক্ষা পাইতে পারে না, এজন্য মন্থথের পুনর্জীবন। পক্ষান্তরে আবার রতি কর্তৃক পুনর্জন্মলব্ধ কাম প্রতিপালিত হইলেন। এ কথাটাও যেন মনে থাকে। অনুরূচিত অনুরূপেই অনুরূচিত স্ফূর্তি। পৌরাণিক উপাখ্যানগুলির এইরূপ গঢ় তাৎপর্য্য অনুভূত করিতে পারিলে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম আর উপধর্মসকুল বা “silly” বলিয়া বোধ হইবে না। সময়ান্তরে দুই একটা উদাহরণ দিব।

সপ্তম অধ্যায়—সামঞ্জস্য ও স্বেচ্ছা

গুরু। এক্ষণে নিকৃষ্ট কার্যকারিণী বৃত্তির কথা ছাড়িয়া দিয়া, যাহাকে উৎকৃষ্ট বৃত্তি বল, সে সকলের কথা বলি শুন।

শিষ্য। আপনি বলিয়াছেন, কতকগুলি কার্যকারিণী বৃত্তি, যথা ভক্ত্যাদি, অধিক সম্প্রসারণে সক্ষম, এবং তাহাদিগের অধিক সম্প্রসারণেই সকল বৃত্তির সামঞ্জস্য। আর কতকগুলি বৃত্তি আছে, যথা কামাদি, সেগুলিও অধিক সম্প্রসারণে সক্ষম, সেগুলির অধিক সম্প্রসারণে সামঞ্জস্যের ধ্বংস। কতকগুলির সম্প্রসারণের আধিক্যে সামঞ্জস্য, কতকগুলির সম্প্রসারণের আধিক্যে অসামঞ্জস্য, এমন ঘটে কেন, তাহা বুঝান নাই। আপনি বলিয়াছেন যে, কামাদির অধিক স্বেচ্ছা, অন্যান্য বৃত্তি, যথা ভক্তি প্রীতি দয়া, এ সকলের উত্তম স্বেচ্ছা হয় না, এই জন্য অসামঞ্জস্য ঘটে। কিন্তু ভক্তি প্রীতি দয়াদির অধিক স্বেচ্ছাও কাম ক্রোধাদির উত্তম স্বেচ্ছা হয় না; ইহাতে অসামঞ্জস্য ঘটে না কেন?

গুরু। যেগুলি শারীরিক বৃত্তি বা পাশব বৃত্তি, যাহা পশুদিগেরও আছে এবং আমাদিগেরও আছে, সেগুলি জীবনরক্ষা বা বংশরক্ষার জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ইহাতে সহজেই বুঝা যায়, সেগুলি স্বতঃস্ফূর্ত—অনুশীলনসাপেক্ষ নহে। আমাদিগকে অনুশীলন করিয়া ক্ষুধা আনিতে হয় না, অনুশীলন করিয়া ঘুমাইবার শক্তি অর্জন করিতে হয় না। দেখিও, স্বতঃস্ফূর্তে ও সহজে গোল করিও না। যাহা আমাদের সঙ্গে জন্মিয়াছে, তাহা সহজ। সকল বৃত্তিই সহজ। কিন্তু সকল বৃত্তি স্বতঃস্ফূর্ত নহে। যাহা স্বতঃস্ফূর্ত, তাহা অন্য বৃত্তির অনুশীলনে বিলুপ্ত হইতে পারে না।

শিষ্য। কিছুই বুঝিলাম না। যাহা স্বতঃস্ফূর্ত নহে, তাহাই বা অন্য বৃত্তির অনুশীলনে বিলুপ্ত হইবে কেন?

গুরু। অনুশীলন জন্য তিনটি সামগ্রী প্রয়োজনীয়। (১) সময়, (২) শক্তি (Energy), (৩) যাহা লইয়া বৃত্তির অনুশীলন করিব—অনুশীলনের উপাদান। এখন আমাদিগের সময় ও শক্তি উভয় সঙ্কীর্ণ। মনুষ্যজীবন কয়েক বৎসর মাত্র পরিমিত। জীবিকানির্ব্বাহের কার্যের পর বৃত্তির অনুশীলন জন্য যে সময় অবশিষ্ট থাকে, তাহার কিছুমাত্র অপব্যয় হইলে সকল বৃত্তির সমুচিত অনুশীলনের উপযোগী সময় পাওয়া যাইবে না। অপব্যয় না হয়, তাহার জন্য এই নিয়ম করিতে হয় যে, যে বৃত্তি অনুশীলনসাপেক্ষ নহে, অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্ত, তাহার অনুশীলন জন্য সময় দিব না; যাহা অনুশীলনসাপেক্ষ, তাহার অনুশীলনে সকল সময়টুকু দিব। যদি তাহা না করিয়া, স্বতঃস্ফূর্ত বৃত্তির অনাবশ্যক অনুশীলনে সময় হরণ করি, তবে সময়ভাবে অন্য বৃত্তিগুলির উপযুক্ত অনুশীলন হইবে না। কাজেই সে সকলের খর্ব্বতা বা বিলোপ ঘটিবে। দ্বিতীয়তঃ শক্তি সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে। আমাদের কাজ করিবার মোট যে শক্তিটুকু আছে, তাহাও পরিমিত। জীবিকানির্ব্বাহের পর যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা স্বতঃস্ফূর্ত বৃত্তির অনুশীলন জন্য বড় বেশী থাকে না। বিশেষ পাশব বৃত্তির সমাধিক অনুশীলন, শক্তিক্ষয়কারী। তৃতীয়তঃ, স্বতঃস্ফূর্ত পাশব বৃত্তির অনুশীলনের উপাদান ও মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের উপাদান পরস্পর বড় বিরোধী। যেখানে ওগুলি থাকে, সেখানে এগুলি থাকিতে পায় না। বিলাসিনীমণ্ডলমধ্যবর্তী হৃদয়ে ঈশ্বরের বিকাশ অসম্ভব এবং ক্রুদ্ধ অস্প্রধারীর নিকট ভিক্ষার্থীর সমাগম অসম্ভব। আর শেষ কথা এই যে, পাশব বৃত্তি-গুলি শরীর ও জাতি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়া, পুরুষপরম্পরাগত স্বেচ্ছাজন্যই হউক, বা জীবরক্ষাভিলাষী ঈশ্বরের ইচ্ছায়ই হউক, এমন বলবতী যে, অনুশীলনে তাহারা সমস্ত হৃদয় পরিব্যাপ্ত করে, আর কোন বৃত্তিরই স্থান হয় না। এইটি বিশেষ কথা।

পক্ষান্তরে, যে বৃত্তিগুলি স্বতঃস্ফূর্ত নহে, তাহার অনুশীলনে আমাদের সমস্ত অবসর ও জীবিকানির্ব্বাহাবশিষ্ট শক্তির নিয়োগ করিলে, স্বতঃস্ফূর্ত বৃত্তির আবশ্যিক স্বেচ্ছার কোন বিঘ্ন হয় না। কেন না, সেগুলি স্বতঃস্ফূর্ত। কিন্তু উপাদানবিরোধহেতু, তাহাদের দমন হইতে পারে বটে। কিন্তু ইহা দেখা গিয়াছে যে, এ সকলের দমনই যথার্থ অনুশীলন।

শিষ্য। কিন্তু যোগীরা অন্য বৃত্তির সম্প্রসারণ দ্বারা—কিম্বা উপায়ান্তরের দ্বারা, পাশব বৃত্তিগুলির ধ্বংস করিয়া থাকেন, এ কথা কি সত্য নয়?

বিক্রম রচনাবলী

গুরু। চেষ্টা করিলে যে কামাদির উচ্ছেদ করা যায় না, এমত নহে। কিন্তু সে ব্যবস্থা অনুশীলন ধর্মের নহে, সন্ন্যাসধর্মের। সন্ন্যাসকে আমি ধর্ম বলি না—অন্তত সম্পূর্ণ ধর্ম বলি না। অনুশীলন প্রবৃত্তিমার্গ—সন্ন্যাস নিবৃত্তিমার্গ। সন্ন্যাস অসম্পূর্ণ ধর্ম। ভগবান্ স্বয়ং কর্মেরই শ্রেষ্ঠতা কীর্তন করিয়াছেন; অনুশীলন কর্মাত্মক।

শিষ্য। যাক্। তবে আপনার সামঞ্জস্য তত্ত্বের স্থূল নিয়ম একটা এই বুদ্ধিলাভ যে, যাহা স্বতঃস্ফূর্ত, তাহা বাড়িতে দিব না, যে বৃত্তি স্বতঃস্ফূর্ত নহে, তাহা বাড়িতে দিতে পারি। কিন্তু ইহাতে একটা গোলযোগ ঘটে। প্রতিভা (Genius) কি স্বতঃস্ফূর্ত নহে? প্রতিভা একটি কোন বিশেষ বৃত্তি নহে, তাহা আমি জানি। কিন্তু কোন বিশেষ মানসিক বৃত্তি স্বতঃস্ফূর্তমতী বলিয়া তাহাকে কি বাড়িতে দিব না? তাহার অপেক্ষা আত্মহত্যা ভাল।

গুরু। ইহা যথার্থ।

শিষ্য। ইহা যদি যথার্থ হয়, তবে এই বৃত্তিকে বাড়িতে দিতে পারি, আর এই বৃত্তিকে বাড়িতে দিতে পারি না, ইহা কোন লক্ষণ দেখিয়া নির্বাচন করিব? কোন কষ্টপাথরে ঘসিয়া ঠিক করিব যে, এইটি সোনা, এইটি পিতল।

গুরু। আমি বলিয়াছি যে, সুখের উপায় ধর্ম, আর মনুষ্যেই সুখ। অতএব সুখই সেই কষ্টপাথর।

শিষ্য। বড় ভয়ানক কথা। আমি যদি বলি, ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তিই সুখ?

গুরু। তাহা বলিতে পার না। কেন না, সুখ কি, তাহা বুঝাইয়াছি। আমাদের সমুদায় বৃত্তিগুলির স্ফূর্তি, সামঞ্জস্য এবং উপযুক্ত পরিতৃপ্তিই সুখ।

শিষ্য। সে কথাটা এখনও আমার ভাল করিয়া বুঝা হয় নাই। সকল বৃত্তির স্ফূর্তি ও পরিতৃপ্তির সমবায় সুখ? না প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির স্ফূর্তি ও পরিতৃপ্তিই সুখ?

গুরু। সমবায়ই সুখ। ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির স্ফূর্তি ও পরিতৃপ্তি সুখের অংশ মাত্র।

শিষ্য। তবে কষ্টপাথর কোনটা? সমবায় না অংশ?

গুরু। সমবায়ই কষ্টপাথর।

শিষ্য। এ ত বুঝিতে পারিতেছি না। মনে করুন, আমি ছবি আঁকিতে পারি। কতকগুলি বৃত্তিবিশেষের পরিমার্জনে এ শক্তি জন্মে। কথাটা এই যে, সেই বৃত্তিগুলির সমাধিক সম্প্রসারণ আমার কর্তব্য কি না, আপনাকে এ প্রশ্ন করিলে আপনি বলিবেন, “সকল বৃত্তির উপযুক্ত স্ফূর্তি ও চরিতার্থতার সমবায় যে সুখ, তাহার কোন বিঘ্ন হইবে কি না, এ কথা বুঝিয়া তবে চিত্রবিদ্যার অনুশীলন কর।” অর্থাৎ আমার তুলি ধরিবার আগে আমাকে গণনা করিয়া দেখিতে হইবে যে, ইহাতে আমার মাংসপেশীর বল, শিরা ধমনীর স্বাস্থ্য, চক্ষের দৃষ্টি, শ্রবণের শ্রুতি—আমার ঈশ্বরে ভক্তি, মনুষ্যে প্রীতি, দীনে দয়া, সত্যে অনুরাগ—আমার অপত্যে স্নেহ, শত্রুতে ক্রোধ,—আমার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি, দার্শনিক ধৃতি,—আমার কাব্যের কল্পনা, সাহিত্যের সমালোচনা—কোন দিকে কিছুর কোন বিঘ্ন হয় কি না। ইহাও কি সাধ্য?

গুরু। কঠিন বটে নিশ্চিত জানিও। ধর্মচরণ ছেলেখেলা নহে। ধর্মচরণ অতি দূরূহ ব্যাপার। প্রকৃত ধার্মিক যে পৃথিবীতে এত বিরল, তাহার কারণই তাই। ধর্ম সুখের উপায় বটে, কিন্তু সুখ বড় আয়াসলভ্য। সাধনা অতি দূরূহ। দূরূহ, কিন্তু অসাধ্য নহে।

শিষ্য। কিন্তু ধর্ম ত সর্বসাধারণের উপযোগী হওয়া উচিত।

গুরু। ধর্ম, যদি তোমার আমার গাড়িবার সামগ্রী হইত, ত না হয়, তুমি যাহাকে সাধারণের উপযোগী বলিতেছ, সেইরূপ করিয়া গাড়িতাম। ফরমায়েস মত জিনিস গাড়িয়া দিতাম। কিন্তু ধর্ম তোমার আমার গাড়িবার নহে। ধর্ম ঐশিক নিয়মাধীন। যিনি ধর্মের প্রণেতা, তিনি ইহাকে যে রূপ করিয়াছেন, সেইরূপ আমাকে বুঝাইতে হইবে। তবে ধর্মকে সাধারণের অনুপযোগীও বলা উচিত নহে। চেষ্টা করিলে, অর্থাৎ অনুশীলনের দ্বারা সকলেই ধার্মিক হইতে পারে। আমার বিশ্বাস যে, এক সময়ে সকল মনুষ্যই ধার্মিক হইবে। যত দিন তাহা না হয়, তত দিন তাহারা আদর্শের অনুসরণ করুক। আদর্শ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ কর। তাহা হইলেই তোমার এ আপত্তি খণ্ডিত হইবে।

শিষ্য। আমি যদি বলি যে, আপনার ওরূপ একটা পারিভাষিক এবং দৃষ্টপ্রাপ্য সুখ মানি না, আমার ইন্দ্রিয়াদির পরিতৃপ্তিই সুখ?

গুরু। তাহা হইলে আমি বলিব, স্নেহের উপায় ধর্ম নহে, স্নেহের উপায় অধর্ম।

শিষ্য। ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি কি স্নেহ নহে? ইহাও বৃত্তির স্বয়ংক্রিয় ও চরিতার্থতা বটে। আমি ইন্দ্রিয়গণকে খর্ব করিয়া, কেন দয়া দাক্ষিণ্যাদির সমাধিক অনুশীলন করিব, আপনি তাহার উপযুক্ত কোন কারণ দেখান নাই। আপনি ইহা বুঝাইয়াছেন বটে যে, ইন্দ্রিয়াদির অধিক অনুশীলনে দয়া দাক্ষিণ্যাদির ধ্বংসের সম্ভাবনা—কিন্তু তদন্তরে আমি যদি বলি যে, ধ্বংস হউক, আমি ইন্দ্রিয়স্নেহে বঞ্চিত হই কেন?

গুরু। তাহা হইলে আমি বলিব, তুমি কিষ্কিন্দা হইতে পথ ভুলিয়া আসিয়াছ। যাহা হউক, তোমার কথার আমি উত্তর দিব। ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি স্নেহ? ভাল, তাই হউক। আমি তোমাকে অবাধে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিতে অনুমতি দিতেছি। আমি খত লিখিয়া দিতেছি যে, এই ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিতে কখন কেহ কোন বাধা দিবে না, কেহ নিন্দা করিবে না—যদি কেহ করে, আমি গুণাগারি দিব। কিন্তু তোমাকেও একখানি খত লিখিয়া দিতে হইবে। তুমি লিখিয়া দিবে যে, “আর ইহাতে স্নেহ নাই” বলিয়া তুমি ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি ছাড়িয়া দিবে না। শ্রান্তি, ক্লান্তি, রোগ, মনস্তাপ, আয়ুষ্ক্লয়, পশুত্বে অধঃপতন প্রভৃতি কোনরূপ ওজর আপত্তি করিয়া ইহা কখন ছাড়িতে পারিবে না। কেমন, রাজি আছ?

শিষ্য। দোহাই মহাশয়ের! আমি নই। কিন্তু এমন লোক কি সর্বদা দেখা যায় না, যাহারা যাবজ্জীবন ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিই সার করে? অনেক লোকই ত এইরূপ?

গুরু। আমরা মনে করি বটে, এমন লোক অনেক। কিন্তু ভিতরের খবর রাখি না। ভিতরের খবর এই—যাহাদিগকে যাবজ্জীবন ইন্দ্রিয়পরায়ণ দেখি, তাহাদিগের ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি চেষ্টা বড় প্রবল বটে, কিন্তু তেমন পরিতৃপ্তি ঘটে নাই। যেরূপ তৃপ্তি ঘটিলে ইন্দ্রিয়পরায়ণতার দুঃখটা বুঝা যায়, সে তৃপ্তি ঘটে নাই। তৃপ্তি ঘটে নাই বলিয়াই চেষ্টা এত প্রবল। অনুশীলনের দোষে, হৃদয়ে আগুন জ্বলিয়াছে,—দাহ নিবারণের জন্য তারা জল খুঁজিয়া বেড়ায়; জানে না যে, অগ্নিদেহের ঔষধ জল নয়।

শিষ্য। কিন্তু এমনও দেখি যে, অনেক লোক অবাধে অনুষ্কণ ইন্দ্রিয়বিশেষ চরিতার্থ করিতেছে, বিরাগও নাই। মদ্যপ ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণস্থল। অনেক মাতাল আছে, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত মদ খায়, কেবল নিদ্রিত অবস্থায় ক্ষান্ত। কই, তাহারা ত মদ ছাড়ে না—ছাড়িতে চায় না।

গুরু। একে একে বাপু। আগে “ছাড়ে না” কথাটাই বুঝ। ছাড়ে না, তাহার কারণ আছে। ছাড়িতে পারে না। ছাড়িতে পারে না, কেন না, এটি ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির লালসা মাত্র নহে—এ একটি পীড়া। ডাক্তারেরা ইহাকে Dipsomania বলেন। ইহার ঔষধ আছে—চিকিৎসা আছে। রোগী মনে করিলেই রোগ ছাড়িতে পারে না। সেটা চিকিৎসকের হাত। চিকিৎসা নিষ্ফল হইলে রোগের যে অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, তাহা ঘটে;—মৃত্যু আসিয়া রোগ হইতে মুক্ত করে। ছাড়ে না, তাহার কারণ এই। “ছাড়িতে চায় না”—এ কথা সত্য নয়। যে মুখে যাহা বলুক, তুমি যে শ্রেণীর মাতালের কথা বলিলে, তাহাদিগের মধ্যে এমন কেহই নাই যে, মদ্যের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য মনে মনে অত্যন্ত কাতর নহে। যে মাতাল সপ্তাহে এক দিন মদ খায়, সেই আজিও বলে “মদ ছাড়িব কেন?” তাহার মদ্যপানের আকাঙ্ক্ষা আজিও পরিতৃপ্ত হয় নাই—তৃষ্ণা বলবতী আছে। কিন্তু যাহার মাত্রা পূর্ণ হইয়াছে, সে জানে যে, পৃথিবীতে যত দুঃখ আছে, মদ্যপানের অপেক্ষা বড় দুঃখ বুঝি আর নাই। এ সকল কথা মদ্যপ সম্বন্ধেই যে খাটে, এমত নহে। সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়পরায়ণের পক্ষে খাটে। কাম্বুকের অনর্চিত অনুশীলনের ফলও একটি রোগ। তাহারও চিকিৎসা আছে এবং পরিণামে অকালমৃত্যু আছে। এইরূপ একটি রোগীর কথা আমি আমার কোন চিকিৎসক বন্ধুর কাছে এইরূপ শুনিলাম যে, তাহাকে হাসপাতালে লইয়া গিয়া তাহার হাত পা বাঁধিয়া রাখিতে হইয়াছিল, এবং সে ইচ্ছামত অঙ্গ সঞ্চালন করিতে না পারে, এ জন্য লাইকর্লিটি দিয়া তাহার অঙ্গের স্থানে স্থানে ঘা করিয়া দিতে হইয়াছিল। ঔদরিকের কথা সকলেই জানে। আমার নিকট এক জন ঔদরিক বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তিনি ঔদরিকতার অনর্চিত অনুশীলনের ও পরিতৃপ্তির জন্য গ্রহণী রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তিনি বেশ জানিতেন যে, দুঃপচনীয় দ্রব্য আহার করিলেই তাহার পীড়া বৃদ্ধি হইবে। সে জন্য লোভ সম্বরণের যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন, কিন্তু কোন মতেই কৃতকার্য

বাঁকম রচনাবলী

হইতে পারেন নাই। বলা বাহুল্য যে, তিনি অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলেন। বাপু হে! এই সকল কি সুখ? ইহার আবার প্রমাণ প্রয়োগ চাই?

শিষ্য। এখন বোধ হয়, আপনি যাহাকে সুখ বলিতেছেন, তাহা বদ্বিয়ারিছ। ক্ষণিক যে সুখ, তাহা সুখ নহে।

গুরু। কেন নহে? আমি জীবনের মধ্যে যদি একবার একটি গোলাপ ফুল দেখি, কি একটি গান শুনি, আর পরক্ষণেই সব ভুলিয়া যাই, তবে সে সুখ বড় ক্ষণিক সুখ, কিন্তু সে সুখ কি সুখ নহে? তাহা সত্যই সুখ।

শিষ্য। যে সুখ ক্ষণিক অথচ যাহার পরিণাম স্থায়ী দুঃখ, তাহা সুখ নহে, দুঃখের প্রথমাবস্থা মাত্র। এখন বদ্বিয়ারিছ কি?

গুরু। এখন পথে আসিয়াছ। কিন্তু এ ব্যাখ্যা ত ব্যতিরেকী। কেবল ব্যতিরেকী ব্যাখ্যায় সবটুকু পাওয়া যাইবে না। সুখ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—(১) স্থায়ী, (২) ক্ষণিক। ইহার মধ্যে—

শিষ্য। স্থায়ী কাহাকে বলেন? মনে করুন, কোন ইন্দ্রিয়সক্ত ব্যক্তি পাঁচ বৎসর ধরিয়া ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগ করিতেছে। কথাটা নিতান্ত অসম্ভব নহে। তাহার সুখ কি ক্ষণিক?

গুরু। প্রথমতঃ, সমস্ত জীবনের তুলনায় পাঁচ বৎসর মূহূর্ত্ত মাত্র। তুমি পরকাল মান, না মান, আমি মানি। অনন্ত কালের তুলনায় পাঁচ বৎসর কতক্ষণ? কিন্তু আমি পরকালের ভয় দেখাইয়া কাহাকেও ধার্মিক করিতে চাই না। কেন না, অনেক লোক পরকাল মানে না—মুখে মানে ত হৃদয়ের ভিতর মানে না; মনে করে, ছেলেদের জুজুর ভয়ের মত মানুষকে শাস্ত করিবার একটা প্রাচীন কথা মাত্র। তাই আজিকালি অনেক লোক পরকালের ভয়ে ভয় পায় না। পরকালের দুঃখের ভয়ের উপর যে ধর্মের ভিত্তি, তাহা এই জন্য সাধারণ লোকের হৃদয়ে সর্ব্বত্র বলবান্ হয় না। “আজিকার দিনে” বলিতেছি; কেন না, এক সময়ে এদেশে সে ধর্ম বড় বলবান্ হই ছিল বটে। এক সময়ে, ইউরোপেও বড় বলবান্ ছিল বটে, কিন্তু এখন বিজ্ঞানময়ী উনবিংশ শতাব্দী। সেই রক্তমাংস-পূতিগন্ধ-শালিনী, কামান-গোলা-বারুদ-ব্রীচ্-লোডার-টপীডো প্রভৃতিতে শোভিতা রক্ষসী,—এক হাতে শিল্পীর কল চালাইতেছে, আর এক হাতে ঝাঁটা ধরিয়া, যাহা প্রাচীন, যাহা পবিত্র, যাহা সহস্র সহস্র বৎসরের যত্নের ধন, তাহা ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দিতেছে। সেই পোড়ারমুখী, এদেশে আসিয়াও কালা মুখ দেখাইতেছে। তাহার কুহকে পড়িয়া, তোমার মত সহস্র সহস্র শিক্ষিত, অশিক্ষিত, এবং অর্দ্ধশিক্ষিত বাঙ্গালী পরকাল আর মানে না। তাই আমি এই ধর্মব্যাখ্যায় যত পারি, পরকালকে বাদ দিতেছি। তাহার কারণ এই যে, যাহা তোমাদের হৃদয়ক্ষেত্রে নাই, তাহার উপর ভিত্তি সংস্থাপন করিয়া আমি ধর্মের মন্দির গড়িতে পারিব না। আর আমার বিবেচনায়, পরকাল বাদ দিলেই ধর্ম ভিত্তিশূন্য হইল না। কেন না, ইহলোকের সুখও কেবল ধর্মমূলক, ইহকালের দুঃখও কেবল অধর্মমূলক। এখন ইহকালের দুঃখকে সকলেই ভয় করে, ইহকালের সুখ সকলেই কামনা করে। এজন্য ইহকালের সুখ দুঃখের উপরও ধর্ম সংস্থাপিত হইতে পারে। এই দুই কারণে, অর্থাৎ ইহকাল সর্ব্ববাদিসম্মত, এবং পরকাল সর্ব্ববাদিসম্মত নহে বলিয়া, আমি কেবল ইহকালের উপরই ধর্মের ভিত্তি সংস্থাপন করিতেছি। কিন্তু “স্থায়ী সুখ কি?” যখন এ প্রশ্ন উঠিল, তখন ইহার প্রথম উত্তরে অবশ্য বলিতে হয় যে, অনন্তকালস্থায়ী যে সুখ, ইহকাল পরকাল উভয় কালব্যাপী যে সুখ, সেই সুখ স্থায়ী সুখ। কিন্তু ইহার দ্বিতীয় উত্তর আছে।

শিষ্য। দ্বিতীয় উত্তর পরে শুনিব, এক্ষণে আর একটা কথার মীমাংসা করুন। মনে করুন, বিচারার্থ পরকাল স্বীকার করিলাম। কিন্তু ইহকালে যাহা সুখ, পরকালেও কি তাই সুখ? ইহকালে যাহা দুঃখ, পরকালেও কি তাই দুঃখ? আপনি বলিতেছেন, ইহকালপরকালব্যাপী যে সুখ, তাহাই সুখ—একজাতীয় সুখ কি উভয়কালব্যাপী হইতে পারে?

গুরু। অন্য প্রকার বিবেচনা করিবার কোন কারণ আমি অবগত নহি। কিন্তু এ কথার উত্তর জন্য দুই প্রকার বিচার আবশ্যিক। যে জন্মান্তর মানে, তাহার পক্ষে এক প্রকার, আর যে জন্মান্তর মানে না, তাহার পক্ষে আর এক প্রকার। তুমি কি জন্মান্তর মান?

শিষ্য। না।

গুরু। তবে, আইস। যখন পরকাল স্বীকার করিলে অথচ জন্মান্তর মানিলে না, তখন

দুইটি কথা স্বীকার করিলে;—প্রথম এই শরীর থাকিবে না, সুতরাং শারীরিকী বৃত্তিচয়-জনিত যে সকল সুখ দুঃখ, তাহা পরকালে থাকিবে না। দ্বিতীয় শরীর ব্যতিরিক্ত যাহা, তাহা থাকিবে, অর্থাৎ ত্রিবিধ মানসিক বৃত্তিগুলি থাকিবে, সুতরাং মানসিক বৃত্তিজনিত যে সকল সুখ দুঃখ, তাহা পরকালেও থাকিবে। পরকালে এইরূপ সুখের আধিক্যকে স্বর্গ বলা যাইতে পারে, এইরূপ দুঃখের আধিক্যকে নরক বলা যাইতে পারে।

শিষ্য। কিন্তু যদি পরকাল থাকে, তবে ইহা ধর্মব্যাখ্যার অতি প্রধান উপাদান হওয়াই উচিত। তজ্জন্য অন্যান্য ধর্মব্যাখ্যায় ইহাই প্রধানত্ব লাভ করিয়াছে। আপনি পরকাল মানিয়াও যে উহা ধর্মব্যাখ্যায় বর্জিত করিয়াছেন, ইহাতে আপনার ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্ত হইয়াছে বিবেচনা করি।

গুরু। অসম্পূর্ণ হইতে পারে। সে কথাতেও কিছু সন্দেহ আছে। অসম্পূর্ণ হউক বা না হউক, কিন্তু ভ্রান্ত নহে। কেন না, সুখের উপায় যদি ধর্ম হইল, আর ইহকালের যে সুখ, পরকালেও যদি সেই সুখই সুখ হইল, তবে ইহকালেরও যে ধর্ম, পরকালেরও সেই ধর্ম। পরকাল নাই মান, কেবল ইহকালকে সার করিয়াও সম্পূর্ণরূপে ধার্মিক হওয়া যায়। ধর্ম নিত্য। ধর্ম ইহকালেও সুখপ্রদ, পরকালেও সুখপ্রদ। তুমি পরকাল মান আর না মান—ধর্মচরণ করিও, তাহা হইলে ইহকালেও সুখী হইবে, পরকালেও সুখী হইবে।

শিষ্য। আপনি নিজে পরকাল মানেন—কিছু প্রমাণ আছে বলিয়া মানেন, না, কেবল মানিতে ভাল লাগে, তাই মানেন?

গুরু। যাহার প্রমাণাভাব, তাহা আমি মানি না। পরকালের প্রমাণ আছে বলিয়াই পরকাল মানি।

শিষ্য। যদি পরকালের প্রমাণ আছে, যদি আপনি নিজে পরকালে বিশ্বাসী, তবে আমাকে তাহা মানিতে উপদেশ দিতেছেন না কেন? আমাকে সে সকল প্রমাণ বুঝাইতেছেন না কেন?

গুরু। আমাকে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, সে প্রমাণগুলি বিবাদের স্থল। প্রমাণগুলির এমন কোন দোষ নাই যে, সে সকল বিবাদের সম্মীমাংসা হয় না, বা হয় নাই। তবে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের কুসংস্কারবশতঃ বিবাদ মিটে না। বিবাদের ক্ষেত্রে অবতরণ করিতে আমার ইচ্ছা নাই এবং প্রয়োজনও নাই। প্রয়োজন নাই, এই জন্য বলিতেছি যে, আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি যে, পবিত্র হও, শুদ্ধচিত্ত হও, ধর্মাত্মা হও। ইহাই যথেষ্ট। আমরা এই ধর্মব্যাখ্যার ভিতর যত প্রবেশ করিব, ততই দেখিব যে, এক্ষণে যাহাকে সমুদায় চিত্তবৃত্তির সর্বাঙ্গীণ স্ফূর্তি ও পরিণতি বলিতেছি, তাহার শেষ ফল পবিত্রতা—চিত্তশুদ্ধি*। তুমি পরকাল যদি নাও মান, তথাপি শুদ্ধচিত্ত ও পবিত্রাত্মা হইলে নিশ্চয়ই তুমি পরকালে সুখী হইবে। যদি চিত্ত শুদ্ধ হইল, তবে ইহলোকই স্বর্গ হইল, তখন পরলোকে স্বর্গের প্রতি আর সন্দেহ কি? যদি তাই হইল, তবে, পরকাল মানা না-মানাতে বড় আসিয়া গেল না। যাহারা পরকাল মানেন না, ইহাতে ধর্ম তাহাদের পক্ষে সহজ হইল; যে ধর্ম তাহারা পরকালমূলক বলিয়া এত দিন অগ্রাহ্য করিত, তাহারা এখন সেই ধর্মকে ইহকালমূলক বলিয়া অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারিবে। আর যাহারা পরকালে বিশ্বাস করে, তাহাদের বিশ্বাসের সঙ্গে এ ব্যাখ্যার কোন বিবাদ নাই। তাহাদের বিশ্বাস দিন দিন দৃঢ়তর হউক, বরং ইহাই আমি কামনা করি।

শিষ্য। আপনি বলিয়াছিলেন যে, ইহকাল-পরকালব্যাপী যে সুখ, তাহাই সুখ। এক-জাতীয় সুখ উভয় কালব্যাপী হইতে পারে। যে জন্মান্তর মানেন না, তাহার পক্ষে এই তত্ত্ব যে কারণে গ্রাহ্য, তাহা বুঝাইলেন। যে জন্মান্তর মানেন, তাহার পক্ষে কি?

গুরু। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, অনুশীলনের সম্পূর্ণতায় মোক্ষ। অনুশীলনের পূর্ণ-মাত্রায় আর পুনর্জন্ম হইবে না। ভক্তিতত্ত্ব যখন বুঝাইব, তখন এ কথা আরও স্পষ্ট বুঝিবে।

শিষ্য। কিন্তু অনুশীলনের পূর্ণমাত্রা ত সচরাচর কাহার কপালে ঘটা সম্ভব নহে। যাহাদের অনুশীলনের সম্পূর্ণতা ঘটে নাই, তাহাদের পুনর্জন্ম ঘটিবে। এই জন্মের অনুশীলনের ফলে তাহারা কি পরজন্মে কোন সুখ প্রাপ্ত হইবে?

* সকল কথা ক্রমে পরিষ্কৃত হইবে।

বিশ্বকম রচনাবলী

গুরু। জন্মান্তরবাদের স্থূল মর্ম্মই এই যে, এ জন্মের কর্ম্মফল পরজন্মে পাওয়া যায়। সমস্ত কর্ম্মের সম্বায় অনুশীলন। অতএব এ জন্মের অনুশীলনের যে শুভ ফল, তাহা অনুশীলনবাদীর মতে পরজন্মে অবশ্য পাওয়া যাইবে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এ কথা অর্জুনকে বলিয়াছেন।

“তত্র তং বৃদ্ধিসংযোগং লভতে পৌৰ্ব্ব্যদৌহিকম্” ইত্যাদি।

গীতা। ৪৩। ৬।

শিষ্য। এক্ষণে আমরা মূল কথা হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। কথাটা হইতেছিল, স্থায়ী সুখ কি? তাহার প্রথম উত্তরে আপনি বলিয়াছেন যে, ইহকালে ও পরকালে চিরস্থায়ী যে সুখ, তাহাই স্থায়ী সুখ। ইহার দ্বিতীয় উত্তর আছে বলিয়াছেন। দ্বিতীয় উত্তর কি?

গুরু। দ্বিতীয় উত্তর যাহারা পরকাল মানে না, তাহাদের জন্য। ইহজীবনই যদি সব হইল, মৃত্যুই যদি জীবনের অন্ত হইল, তাহা হইলে, যে সুখ সেই অন্তকাল পর্য্যন্ত থাকিবে, তাহাই স্থায়ী সুখ। যদি পরকাল না থাকে, তবে ইহজীবনে যাহা চিরকাল থাকে, তাহাই স্থায়ী সুখ। তুমি বলিতেছিলে, পাঁচ সাত দশ বৎসর ধরিয়া কেহ কেহ ইন্দ্রিয়সুখে নিমগ্ন থাকে। কিন্তু পাঁচ সাত দশ বৎসর কিছ্ চিরজীবন নহে। যে পাঁচ সাত দশ বৎসর ধরিয়া ইন্দ্রিয় পরিতর্পণে নিযুক্ত আছে, তাহারও মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সে সুখ থাকিবে না। তিনটির একটি না একটি কারণে অবশ্য অবশ্য, তাহার সে সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবে। (১) অতিভোগজনিত গ্লানি বা বিরাগ—অতিতৃপ্তি; কিম্বা (২) ইন্দ্রিয়সক্তিজনিত অবশ্যম্ভাবী রোগ বা অসামর্থ্য; অথবা (৩) বয়োবৃদ্ধি। অতএব এ সকল সুখের ক্ষণিকত্ব আছেই আছে।

শিষ্য। আর যে সকল বৃত্তিগুলিকে উৎকৃষ্ট বৃত্তি বলা যায়, সেগুলির অনুশীলনে যে সুখ, তাহা কি ইহজীবনে চিরস্থায়ী?

গুরু। তদ্বিশয়ে অণু মাত্র সন্দেহ নাই। একটা সামান্য উদাহরণের দ্বারা বুঝাইব। মনে কর, দয়া বৃত্তির কথা হইতেছে। পরোপকারে ইহার অনুশীলন ও চরিতার্থতা। এ বৃত্তির দোষ এই যে, যে ইহার অনুশীলন আরম্ভ করে নাই, সে ইহার অনুশীলনের সুখ বিশেষরূপে অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু ইহা যে অনুশীলিত করিয়াছে, সে জানে, দয়ার অনুশীলন ও চরিতার্থতায়, অর্থাৎ পরোপকারে এমন তীর সুখ আছে যে, নিকৃষ্ট শ্রেণীর ঐন্দ্রিয়িকেরা সর্বলোকসুন্দরীগণের সমাগমেও সেরূপ তীর সুখ অনুভূত করিতে পারে না। এ বৃত্তি যত অনুশীলিত করিবে, ততই ইহার সুখজনকতা বাড়িবে। নিকৃষ্ট বৃত্তির ন্যায় ইহাতে গ্লানি জন্মে না, অতিতৃপ্তিজনিত বিরাগ জন্মে না, বৃত্তির অসামর্থ্য বা দৌর্ব্বল্য জন্মে না, বল ও সামর্থ্য বরং বাড়িতে থাকে। ইহার নিয়ত অনুশীলন পক্ষে কোন ব্যাঘাত নাই। ঔদরিক দিবসে দুই বার, তিন বার, না হয় চারি বার আহার করিতে পারে। অন্যান্য ঐন্দ্রিয়িকের ভোগেরও সেইরূপ সীমা আছে। কিন্তু পরোপকার দণ্ডে দণ্ডে, পলকে পলকে করা যায়। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইহার অনুশীলন চলে। অনেক লোক মরণকালেও একটি কথা বা একটি ইঙ্গিতের দ্বারা লোকের উপকার করিয়া গিয়াছেন। আডিসন মৃত্যুকালেও কুপথাবলম্বী যুবাকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, “দেখ, ধার্ম্মিক (Christian) কেমন সুখে মরে!”

তার পর, পরকালের কথা বলি। যদি জন্মান্তর না মানিয়া পরকাল স্বীকার করা যায়, তবে ইহা বলিতে হইবে যে, পরকালেও আমাদের মানসিক বৃত্তিগুলি থাকিবে, সুতরাং এ দয়া বৃত্তিটিও থাকিবে। আমি ইহাকে যে রূপ অবস্থায় লইয়া যাইব, পারলৌকিক প্রথমাবস্থায় ইহার সেই অবস্থায় থাকা সম্ভব; কেন না, হঠাৎ অবস্থান্তরের উপযুক্ত কোন কারণ দেখা যায় না। আমি যদি ইহা উত্তমরূপে অনুশীলিত ও সুখপ্রদ অবস্থায় লইয়া যাই, তবে উহা পরলোকেও আমার পক্ষে সুখপ্রদ হইবে। সেখানে আমি ইহা অনুশীলিত ও চরিতার্থ করিয়া ইহলোকের অপেক্ষা অধিকতর সুখী হইব।

শিষ্য। এ সকল সুখ-স্বপ্ন মাত্র—অতি অশ্রদ্ধেয় কথা। দয়ার অনুশীলন ও চরিতার্থতা কর্ম্মাধীন। পরোপকার কর্ম্মমাত্র। আমার কর্ম্মইন্দ্রিয়গুলি, আমি শরীরের সঙ্গে এখানে রাখিয়া গেলাম, সেখানে কিসের দ্বারা কর্ম্ম করিব?

গুরু। কথাটা কিছ্ নিব্বোধের মত বলিলে। আমরা ইহাই জানি যে, যে চৈতন্য

শরীরবদ্ধ, সেই চৈতন্যের কর্ম কর্মেন্দ্রিয়সাধ্য। কিন্তু যে চৈতন্য শরীরে বদ্ধ নহে, তাহারও কর্ম যে কর্মেন্দ্রিয়সাপেক্ষ, এমত বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে।

শিষ্য। ইহাই যুক্তিসঙ্গত। অন্যথা-সিদ্ধি-শূন্যস্য নিয়তপদস্বর্বাভিত্তা কারণত্বং। কর্ম অন্যথা-সিদ্ধি-শূন্য। কোথাও আমরা দেখি নাই যে, কর্মেন্দ্রিয়শূন্য যে, সে কর্ম করিয়াছে।

গুরু। ঈশ্বরে দেখিতেছ। যদি বল ঈশ্বর মানি না, তোমার সঙ্গে আমার বিচার ফুরাইল। আমি পরকাল হইতে ধর্মকে বিষদ্বক্ত করিয়া বিচার করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু ঈশ্বর হইতে ধর্মকে বিষদ্বক্ত করিয়া বিচার করিতে প্রস্তুত নাই। আর যদি বল, ঈশ্বর সাকার, তিনি শিল্পকারের মত হাতে করিয়া জগৎ গড়িয়াছেন, তাহা হইলেও তোমার সঙ্গে বিচার ফুরাইল। কিন্তু ভরসা করি, তুমি ঈশ্বর মান এবং ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়াও স্বীকার কর। যদি তাহা কর, তবে কর্মেন্দ্রিয়শূন্য নিরাকারের কর্মকর্তৃত্ব স্বীকার করিলে। কেন না, ঈশ্বর সর্বকর্তা, সর্বস্রষ্টা।

পরলোকে জীবনের অবস্থা স্বতন্ত্র। অতএব প্রয়োজনও স্বতন্ত্র। ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন না হওয়াই সম্ভব।

শিষ্য। হইলে হইতে পারে। কিন্তু এ সকল আন্দাজি কথা। আন্দাজি কথার প্রয়োজন নাই।

গুরু। আন্দাজি কথা, ইহা আমি স্বীকার করি। বিশ্বাস করা, না করার পক্ষে তোমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, ইহাও আমি স্বীকার করি। আমি যে দেখিয়া আসি নাই, ইহা বোধ করি বলা বাহুল্য। কিন্তু এ সকল আন্দাজি কথার একটু মূল্য আছে। যদি পরকাল থাকে, আর যদি Law of Continuity অর্থাৎ মানসিক অবস্থার ক্রমান্বয় ভাব সত্য হয়, তবে পরকাল সম্বন্ধে যে অন্য কোনরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পার, আমি এমন পথ দেখিতেছি না। এই ক্রমান্বয় ভাবটির প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিবে। হিন্দু, খৃষ্টীয়, বা ইসলামী যে স্বর্গনরক, তাহা এই নিয়মের বিরুদ্ধ।

শিষ্য। যদি পরকাল মানিতে পারি, তবে এটুকুও না হয় মানিয়া লইব। যদি হাতীটা গিলিতে পারি, তবে হাতীর কানের ভিতর যে মশাটা ঢুকিয়াছে, তাহা গলায় বাধিবে না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এ পরকালের শাসনকর্তৃত্ব কই?

গুরু। যাহারা স্বর্গের দণ্ডধর গড়িয়াছে, তাহারা পরকালের শাসনকর্তা গড়িয়াছে। আমি কিছুই গড়িতে বাসি নাই। আমি মনুষ্যজীবনের সমালোচনা করিয়া, ধর্মের যে স্থূল মর্ম বর্ণিয়াছি, তাহাই তোমাকে বুঝাইতেছি। কিন্তু একটা কথা বলিয়া রাখায় ক্ষতি নাই। যে পাঠশালায় পড়িয়াছে, সে যে দিন পাঠশালা ছাড়িল, সেই দিনই একটা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতে পরিণত হইল না। কিন্তু সে কালক্রমে একটা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতে পরিণত হইতে পারে, এমত সম্ভাবনা রহিল। আর যে একেবারে পাঠশালায় পড়ে নাই, জন স্টুয়ার্ট মিলের মত পৈতৃক পাঠশালাতেও পড়ে নাই, তাহার পণ্ডিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। ইহলোককে আমি তেমনি একটা পাঠশালা মনে করি। যে এখান হইতে সদ্বৃত্তিগুণি মাঞ্জিত ও অনুশীলিত করিয়া লইয়া যাইবে, তাহার সেই বৃত্তিগুণি ইহলোকের কল্পনাতীত সফলিত প্রাপ্ত হইয়া সেখানে তাহার অনন্ত সুখের কারণ হইবে, এমন সম্ভব। আর যে সদ্বৃত্তিগুণির অনুশীলন অভাবে অপক্লাবস্থায় পরলোকে লইয়া যাইবে, তাহার পরলোকে কোন সুখেরই সম্ভাবনা নাই। আর যে কেবল অসদ্বৃত্তিগুণি সফলিত করিয়া পরলোকে যাইবে, তাহার অনন্ত দুঃখ। জন্মান্তর যদি না মানা যায়, তবে এইরূপ স্বর্গ নরক মানা যায়। কৃষি-কীট-সঙ্কুল অবর্ণনীয় হৃদরূপ নরক বা অসুরোকণ্ঠ-নিলাদ-মধুরিত, উর্ধ্বশী মেনকা রস্তাদির নৃত্যসমাকুলিত, নন্দন-কানন-কুসুম-সুবাস-সমল্লাসিত স্বর্গ মানি না। হিন্দুধর্ম মানি, হিন্দুধর্মের “বখামি” গুলি মানি না। আমার শিষ্যদিগেরও মানিতে নিষেধ করি।

শিষ্য। আমার মত শিষ্যের মানিবার কোন সম্ভাবনা দেখি না। সম্প্রতি পরকালের কথা ছাড়িয়া দিয়া, ইহকাল লইয়া সুখের যে ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, তাহার সূত্র পুনর্গ্রহণ করুন।

গুরু। বোধ হয় এতক্ষণে বুঝাইয়া থাকিব যে, পরকাল বাদ দিয়া কথা কহিলেও, কোন কোন সুখকে স্থায়ী, কোন কোন সুখের স্থায়িত্বভাবে তাহাকে ক্ষণিক বলা যাইতে পারে।

শিষ্য। বোধ হয় কথাটা এখনও বুঝি নাই। আমি একটা টপ্পা শুনিয়া আসিলাম,

বাংকম রচনাবলী

কি একখানা নাটকের অভিনয় দেখিয়া আসিলাম। তাহাতে কিছ্ৰু আনন্দ লাভও করিলাম। সে সুখ স্থায়ী না ক্ষণিক?

গুরুদ। যে আনন্দের কথা তুমি মনে ভাবিতেছ, বৃদ্ধিতে পারিতেছি, তাহা ক্ষণিক বটে, কিন্তু চিত্তরঞ্জনী বৃত্তির সমুচিত অনুশীলনের যে ফল, তাহা স্থায়ী সুখ। সেই স্থায়ী সুখের অংশ বা উপাদান বলিয়া, ঐ আনন্দটুকুকে স্থায়ী সুখের মধ্যে ধরিয়া লইতে হইবে। সুখ যে বৃত্তির অনুশীলনের ফল, এ কথাটা যেন মনে থাকে। এখন বলিয়াছি যে, কতকগুলি বৃত্তির অনুশীলনজনিত যে সুখ, তাহা অস্থায়ী। শেষোক্ত সুখও আবার দ্বিবিধ; (১) যাহার পরিণামে দুঃখ, (২) যাহা ক্ষণিক হইলেও পরিণামে দুঃখশূন্য। ইন্দ্রিয়াদি নিকৃষ্ট বৃত্তি সম্বন্ধে পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে উহা অবশ্য বৃদ্ধিয়াছে যে, এই বৃত্তিগুলির পরিমিত অনুশীলনে দুঃখশূন্য সুখ, এবং এই সকলের অসমুচিত অনুশীলনে যে সুখ, তাহারই পরিণাম দুঃখ। অতএব সুখ ত্রিবিধ।

(১) স্থায়ী।

(২) ক্ষণিক, কিন্তু পরিণামে দুঃখশূন্য।

(৩) ক্ষণিক, কিন্তু পরিণামে দুঃখের কারণ।

শেষোক্ত সুখকে সুখ বলা অবিধেয়,—উহা দুঃখের প্রথমাবস্থা মাত্র। সুখ তবে, (১) হয়, যাহা স্থায়ী, (২) নয়, যাহা অস্থায়ী অথচ পরিণামে দুঃখশূন্য। আমি যখন বলিয়াছি যে, সুখের উপায় ধর্ম, তখন এই অর্থেই সুখ শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। এই ব্যবহারই এই শব্দের যথার্থ ব্যবহার, কেন না, যাহা বস্তুত দুঃখের প্রথমাবস্থা, তাহাকে ভ্রান্ত বা পশুবৃত্তিদিগের মতাবলম্বী হইয়া সুখের মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে না। যে জলে পড়িয়া ডুবিয়া মরে, জলের স্নিগ্ধতাবশত তাহার প্রথম নিমজ্জনকালে কিছ্ৰু সুখোপলব্ধি হইতে পারে। কিন্তু সে অবস্থা তাহার সুখের অবস্থা নহে, নিমজ্জনদুঃখের প্রথমাবস্থা মাত্র। তেমনি দুঃখপরিণাম সুখও দুঃখের প্রথমাবস্থা—নিশ্চয়ই তাহা সুখ নহে।

এখন তোমার প্রশ্নের উত্তর শোন। তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, “এই বৃত্তিকে বাড়িতে দিতে পারি, আর এই বৃত্তিকে বাড়িতে দিতে পারি না, ইহা কোন লক্ষণ দেখিয়া নির্বাচন করিব? কোন কণ্ঠিপাথরে ঘষিয়া ঠিক করিব যে, এইটি পিতল?” এই প্রশ্নের উত্তর এখন পাওয়া গেল। যে বৃত্তিগুলির অনুশীলনে স্থায়ী সুখ, তাহাকে অধিক বাড়িতে দেওয়াই কর্তব্য—যথা ভক্তি, প্রীতি, দয়াদি। আর যেগুলির অনুশীলনে ক্ষণিক সুখ, তাহা বাড়িতে দেওয়া অকর্তব্য, কেন না, এ সকল বৃত্তির অধিক অনুশীলনের পরিণাম সুখ নহে। যতক্ষণ ইহাদের অনুশীলন পরিমিত, ততক্ষণ ইহা অবিধেয় নহে—কেন না, তাহাতে পরিণামে দুঃখ নাই। তার পর আর নহে। অনুশীলনের উদ্দেশ্য সুখ; যেদূপ অনুশীলনে সুখ জন্মে, দুঃখ নাই, তাহাই বিহিত। অতএব সুখই সেই কণ্ঠিপাথর।

অষ্টম অধ্যায়—শারীরিকী বৃত্তি

শিষ্য। যে পর্য্যন্ত কথা হইয়াছে, তাহাতে বৃদ্ধিয়াছি, অনুশীলন কি। আর বৃদ্ধিয়াছি সুখ কি। বৃদ্ধিয়াছি অনুশীলনের উদ্দেশ্য সেই সুখ; এবং সামঞ্জস্য তাহার সীমা। কিন্তু বৃত্তিগুলির অনুশীলন সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ কিছ্ৰু এখনও পাই নাই। কোন বৃত্তির কি প্রকার অনুশীলন করিতে হইবে, তাহার কিছ্ৰু উপদেশের প্রয়োজন নাই কি?

গুরুদ। ইহা শিক্ষাতত্ত্ব। শিক্ষাতত্ত্ব ধর্মতত্ত্বের অন্তর্গত। আমাদের এই কথাবার্তার প্রধান উদ্দেশ্য তাহা নহে। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, ধর্ম কি তাহা বৃদ্ধি। তজ্জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই আমি বলিব।

বৃত্তি চতুর্বিধ বলিয়াছি: (১) শারীরিকী, (২) জ্ঞানার্জনী, (৩) কার্যকারিণী, (৪) চিত্তরঞ্জনী। আগে শারীরিকী বৃত্তির কথা বলিব—কেন না, উহাই সর্বাগ্রে স্ফূর্তিত হইতে থাকে। এ সকলের স্ফূর্তি ও পরিতৃপ্তিতে যে সুখ আছে, ইহা কাহাকেও বৃদ্ধাইতে হইবে না। কিন্তু ধর্মের সঙ্গে এ সকলের কোন সম্বন্ধ আছে, এ কথা কেহ বিশ্বাস করে না।

শিষ্য। তাহার কারণ বৃত্তির অনুশীলনকে ধর্ম কেহ বলে না।

গুরু। কোন কোন ইউরোপীয় অনুশীলনবাদী বৃত্তির অনুশীলনকে ধর্ম বা ধর্মস্থানীয় কোন একটা জিনিস বিবেচনা করেন, কিন্তু তাঁহারা এমন কথা বলেন না যে, শারীরিক বৃত্তির অনুশীলন তাহার পক্ষে প্রয়োজনীয়।*

শিষ্য। আপনি কেন বলেন?

গুরু। যদি সকল বৃত্তির অনুশীলন মনুষ্যের ধর্ম হয়, তবে শারীরিক বৃত্তির অনুশীলনও অবশ্য ধর্ম। কিন্তু সে কথা না হয় ছাড়িয়া দাও। লোকে সচরাচর যাহাকে ধর্ম বলে, তাহার মধ্যে যে কোন প্রচলিত মত গ্রহণ কর, তথাপি দেখবে যে, শারীরিক বৃত্তির অনুশীলন প্রয়োজনীয়। যদি যাগযজ্ঞ ব্রতানুষ্ঠান ক্রিয়াকলাপকে ধর্ম বল; যদি দয়া, দান্ধিক্য, পরোপকারকে ধর্ম বল; যদি কেবল দেবতার উপাসনা বা ঈশ্বরোপাসনাকে ধর্ম বল; না হয় খৃষ্টধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, ইসলামধর্মকে ধর্ম বল, সকল ধর্মের জন্যই শারীরিক বৃত্তির অনুশীলন প্রয়োজনীয়। ইহা কোন ধর্মেরই মূখ্য উদ্দেশ্য নহে বটে, কিন্তু সকল ধর্মের বিঘ্ননাশের জন্য ইহার বিশেষ প্রয়োজন। এই কথাটা কখনও কোন ধর্মবেত্তা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই, কিন্তু এখন এ দেশে সে কথা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

শিষ্য। ধর্মের বিঘ্ন বা কিরূপ, এবং শারীরিক বৃত্তির অনুশীলনে কিরূপে তাহার বিনাশ, ইহা বুঝাইয়া দিন।

গুরু। প্রথম ধর, রোগ। রোগ ধর্মের বিঘ্ন। যে গোঁড়া হিন্দু রোগে পড়িয়া আছে, সে যাগযজ্ঞ, ব্রতনিয়ম, তীর্থদর্শন, কিছুই করিতে পারে না। যে গোঁড়া হিন্দু নয়, কিন্তু পরোপকার প্রভৃতি সদনুষ্ঠানকে ধর্ম বলিয়া মানে, রোগ তাহারও ধর্মের বিঘ্ন। রোগে যে নিজে অপটু, সে কাহার কি কার্য করবে? যাহার বিবেচনায় ধর্মের জন্য এ সকল কিছুই প্রয়োজন নাই, কেবল ঈশ্বরের চিন্তাই ধর্ম, রোগ তাহারও ধর্মের বিঘ্ন। কেন না, রোগের যন্ত্রণাতে ঈশ্বরে মন নিবিষ্ট হয় না; অন্ততঃ একাগ্রতা থাকে না; কেন না, চিন্তকে শারীরিক যন্ত্রণায় অভিভূত করিয়া রাখে, মধ্যে মধ্যে বিচলিত করে। রোগ কর্মীর কর্মের বিঘ্ন, যোগীর যোগের বিঘ্ন, ভক্তের ভক্তির সাধনের বিঘ্ন। রোগ ধর্মের পরম বিঘ্ন।

এখন তোমাকে বুঝাইতে হইবে না যে, শারীরিক বৃত্তি সকলের সমুচিত অনুশীলনের অভাবই প্রধানতঃ রোগের কারণ।

শিষ্য। যে হিম লাগান কথাটা গোড়ায় উঠিয়াছিল, তাহাও কি অনুশীলনের অভাব?

গুরু। ত্বর্গিন্দ্রিয়ের স্বাস্থ্যকর অনুশীলনের ব্যাঘাত। শারীরতত্ত্ববিদ্যাতে তোমার কিছুমাত্র অধিকার থাকিলেই তাহা বুঝিতে পারিবে।

শিষ্য। তবে দেখিতেছি যে, জ্ঞানার্জনী বৃত্তির সমুচিত অনুশীলন না হইলে, শারীরিক বৃত্তির অনুশীলন হয় না।

গুরু। না, তা হয় না। সমস্ত বৃত্তিগুলির যথাযথ অনুশীলন পরস্পরের অনুশীলনের সাপেক্ষ। কেবল শারীরিক বৃত্তির অনুশীলন জ্ঞানার্জনী বৃত্তির সাপেক্ষ, এমত নহে। কার্যকারিণী বৃত্তিগুলিও তৎসাপেক্ষ। কোন কার্য কি উপায়ে করা উচিত, কোন বৃত্তির কিসে অনুশীলন হইবে, কিসে অনুশীলনের অবরোধ হইবে, ইহা জ্ঞানের দ্বারা জানিতে হইবে। জ্ঞান ভিন্ন তুমি ঈশ্বরকেও জানিতে পারিবে না। কিন্তু সে কথা এখন থাক।

শিষ্য। এখন থাকিলে চলবে না। যদি বৃত্তিগুলির অনুশীলন পরস্পর সাপেক্ষ, তবে কোনগুলির অনুশীলন আগে আরম্ভ করিব?

গুরু। সকলগুলিরই যথাসাধ্য অনুশীলন এককালেই আরম্ভ করিতে হইবে; অর্থাৎ শৈশবে।

শিষ্য। আশ্চর্য্য কথা! শৈশবে আমি জানি না যে, কি প্রকারে কোন বৃত্তির অনুশীলন করিতে হইবে। তবে কি প্রকারে সকল বৃত্তির অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হইব?

গুরু। এই জন্য শিক্ষকের সহায়তা আবশ্যিক। শিক্ষক এবং শিক্ষা ভিন্ন কখনই মনুষ্য মনুষ্য হয় না। সকলেরই শিক্ষকের আশ্রয় লওয়া কর্তব্য। কেবল শৈশবে কেন, চিরকালই আমাদের পরের কাছে শিক্ষার প্রয়োজন। এই জন্য হিন্দুধর্ম গুরুর এত মান। আর গুরু

* Herbert Spencer বলেন। গ চিহ্নিত ক্রোড়পত্র দেখ।

বিশ্বকম রচনাবলী

নাই, গুরুদ্বয় সম্মান নাই, কাজেই সমাজের উন্নতি হইতেছে না। ভক্তিবৃত্তির অনুশীলনের কথা যখন বলিব, তখন এ কথা মনে থাকে যেন। এখন যাহা বলিতেছিলাম, তাহা বলি।

(২) বৃত্তি সকলের এইরূপ পরস্পর সাপেক্ষতা হইতে শারীরিক বৃত্তি অনুশীলনের দ্বিতীয় প্রয়োজন, অথবা ধর্মের দ্বিতীয় বিঘ্নের কথা পাওয়া যায়। যদি অন্যান্য বৃত্তিগুলি শারীরিক বৃত্তির সাপেক্ষ হইল, তবে জ্ঞানার্জ্জ্বনী প্রভৃতি বৃত্তির সম্যক অনুশীলনের জন্য শারীরিক বৃত্তি সকলের সম্যক অনুশীলন চাই। বাস্তবিক, ইহা প্রসিদ্ধ যে, শারীরিক শক্তি সকল বলিষ্ঠ ও পুষ্ট না থাকিলে মানসিক শক্তি সকল বলিষ্ঠ ও পুষ্ট হয় না, অথবা অসম্পূর্ণ স্ফূর্তি প্রাপ্ত হয়। শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য মানসিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজন, মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজন, ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতেরা শরীর ও মনের এই সম্বন্ধ উত্তমরূপে প্রমাণীকৃত করিয়াছেন। আমাদের দেশে এক্ষণে যে কালোজি শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত, তাহার প্রধান নিন্দাবাদ এই যে, ইহাতে শিক্ষার্থীদের শারীরিক স্ফূর্তির প্রতি কিছু মাত্র দৃষ্টি থাকে না, এজন্য কেবল শারীরিক নহে, অকালে মানসিক অধঃপতনও উপস্থিত হয়। ধর্ম মানসিক শক্তির উপর নির্ভর করে; কাজে কাজেই ধর্মেরও অধোগতি ঘটে।

(৩) কিন্তু এ সম্বন্ধে তৃতীয় তত্ত্ব, বা তৃতীয় বিঘ্ন আরও গুরুতর। যাহার শারীরিক বৃত্তি সকলের সমুচিত অনুশীলন হয় নাই, সে আত্মরক্ষায় অক্ষম। যে আত্মরক্ষায় অক্ষম, তাহার নিঃস্বিঘ্নে ধর্মাচরণ কোথায়? সকলেরই শত্রু আছে। দস্যু আছে। ইহারা সর্বদা ধর্মাচরণের বিঘ্ন করে। তন্মিলন অনেক সময়ে যে বলে শত্রুদমন করিতে না পারে, সে বলাভাব হেতুই আত্মরক্ষার্থে অধর্ম অবলম্বন করে। আত্মরক্ষা এমন অলঙ্ঘনীয় যে, পরম ধার্মিকও এমন অবস্থায় অধর্ম অবলম্বন পরিত্যাগ করিতে পারে না। মহাভারতকার, “অশ্বখামা হত ইতি গজঃ” ইতি উপন্যাসে ইহার উত্তম উদাহরণ কল্পনা করিয়াছেন। বলে দ্রোণাচার্যকে পরাভব করিতে অক্ষম হইয়া যুদ্ধার্থীর ন্যায় পরম ধার্মিকও মিথ্যা প্রবণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

শিষ্য। প্রাচীন কালের পক্ষে এ সকল কথা খাটিলে খাটিতে পারে, কিন্তু এখনকার সভ্য সমাজে রাজাই সকলের রক্ষা করেন। এখন কি আত্মরক্ষায় সকলের সক্ষম হওয়া তাদৃশ প্রয়োজনীয়?

গুরুদ্বয়। রাজা সকলকে রক্ষা করিবেন, এইটা আইন বটে। কিন্তু কার্যতঃ তাহা ঘটে না। রাজা সকলকে রক্ষা করিয়া উঠিতে পারেন না। পারিলে এত খুন, জখম, চুরি ডাকাতি, দাঙ্গা মারামারি প্রত্যহ ঘটিত না। পুলিশের বিজ্ঞাপন সকল পাড়িলে জানিতে পারিবে যে, যাহারা আত্মরক্ষায় অক্ষম, সচরাচর তাহাদের উপরেই এই সকল অত্যাচার ঘটে। বলবানের কাছে কেহ আগু হয় না। কিন্তু আত্মরক্ষার কথা তুলিয়া কেবল আপনার শরীর বা সম্পত্তি রক্ষার কথা আমি বলিতেছিলাম না, ইহাও তোমার বুদ্ধি কণ্ঠব্য। যখন তোমাকে প্রীতিবৃত্তির অনুশীলনের কথা বলিব, তখন বুঝিবে যে, আত্মরক্ষা যেমন আমাদের অনুষ্ঠেয় ধর্ম, আপনার স্বপিতৃ পরিবার স্বজন কুটুম্ব প্রতিবাসী প্রভৃতির রক্ষাও তাদৃশ আমাদের অনুষ্ঠেয় ধর্ম। যে ইহা করে না, সে পরম অধার্মিক। অতএব যাহার তদুপযোগী বল বা শারীরিক শিক্ষা হয় নাই, সেও অধার্মিক।

(৪) আত্মরক্ষা, বা স্বজনরক্ষার এই কথা হইতে ধর্মের চতুর্থ বিঘ্নের কথা উঠিতেছে। এই তত্ত্ব অত্যন্ত গুরুতর; ধর্মের অতি প্রধান অংশ। অনেক মহাত্মা এই ধর্মের জন্য, প্রাণ পর্যন্ত, প্রাণ কি, সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমি স্বদেশরক্ষার কথা বলিতেছি।

যদি আত্মরক্ষা এবং স্বজনরক্ষা ধর্ম হয়, তবে স্বদেশরক্ষাও ধর্ম। সমাজস্থ এক এক ব্যক্তি যেমন অপর ব্যক্তির সর্বস্ব অপহরণ মানসে আক্রমণ করে, এক এক সমাজ বা দেশও অপর সমাজকে সেইরূপ আক্রমণ করে। মনুষ্য যতক্ষণ না রাজার শাসনে বা ধর্মের শাসনে নিরুদ্ধ হয়, ততক্ষণ কাড়িয়া খাইতে পারিলে ছাড়ে না। যে সমাজে রাজশাসন নাই, সে সমাজের ব্যক্তিগণ যে যার পারে, সে তার কাড়িয়া খায়। তেমনি, বিবিধ সমাজের উপর কেহ এক জন রাজা না থাকতে, যে সমাজ বলবান্, সে দুর্বল সমাজের কাড়িয়া খায়। অসভ্য সমাজের কথা বলিতেছি না, সভ্য ইউরোপের এই প্রচলিত রীতি। আজ ফ্রান্স জার্মানির কাড়িয়া খাইতেছে, কাল জার্মানি ফ্রান্সের কাড়িয়া খাইতেছে; আজ তুর্ক গ্রীসের কাড়িয়া খায়, কাল রুস তুর্কের কাড়িয়া খায়। আজ Rhenish Frontier, কাল পোলন্ড, পরশু, বুল্গেরিয়া, আজ মিশর,

কাল টুকুইন। এই সকল লইয়া ইউরোপীয় সভ্য জাতিগণ কুকুরের মত হুড়াহুড়ি কামড়াকামড়ি করিয়া থাকেন। যেমন হাটের কুকুরেরা যে যার পায়, সে তার কাড়িয়া খায়, কি সভ্য কি অসভ্য জাতি তেমনি পরের পাইলেই কাড়িয়া খায়। দুর্বল সমাজকে বলবান্ সমাজ আক্রমণ করিবার চেষ্টায় সর্বদাই আছে। অতএব আপনার দেশরক্ষা ভিন্ন আত্মরক্ষা নাই। আত্মরক্ষা ও স্বজনরক্ষা যদি ধর্ম হয়, তবে দেশরক্ষাও ধর্ম। বরং আরও গুরুতর ধর্ম; কেন না, এস্থলে আপন ও পর, উভয়ের রক্ষার কথা।

সামাজিক কতকগুলি অবস্থা ধর্মের উপযোগী আর কতকগুলি অনুপযোগী। কতকগুলি অবস্থা সমস্ত বৃত্তির অনুশীলনের ও পরিতৃপ্তির অনুকূল। আবার কোন কোন সামাজিক অবস্থা কতকগুলি বৃত্তির অনুশীলন ও পরিতৃপ্তির প্রতিকূল। অধিকাংশ সময়ে এই প্রতিকূলতা রাজা বা রাজপুরুষ হইতেই ঘটে। ইউরোপের যে অবস্থায়, প্রটেস্ট্যান্টদিগকে রাজা পুড়াইয়া মারিতেন, সেই অবস্থা ইহার একটি উদাহরণ; ঔরঙ্গজেবের হিন্দুধর্মের বিদ্বেষ আর একটি উৎপীড়ন। সমাজের যে অবস্থা ধর্মের অনুকূল, তাহাকে স্বাধীনতা বলা যায়। স্বাধীনতা দেশী কথা নহে, বিলাতী আমদানি। লিবার্টি শব্দের অনুবাদ। ইহার এমন তাৎপর্য নহে যে, রাজা স্বদেশীয় হইতে হইবে। স্বদেশীয় রাজা অনেক সময়ে স্বাধীনতার শত্রু, বিদেশীয় রাজা অনেক সময়ে স্বাধীনতার मित्र। ইহার অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ইহা ধর্মোন্মত্তির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। অতএব আত্মরক্ষা, স্বজনরক্ষা, এবং স্বদেশরক্ষার জন্য যে শারীরিক বৃত্তির অনুশীলন, তাহা সকলেরই কর্তব্য।

শিষ্য। অর্থাৎ সকলেরই যোদ্ধা হওয়া চাই।

গুরু। তাহার অর্থ এমন নহে যে, সকলকে যুদ্ধব্যবসায় অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু সকলেরই প্রয়োজনানুসারে যুদ্ধে সক্ষম হওয়া কর্তব্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে সকল বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষকেই যুদ্ধব্যবসায়ী হইতে হয়, নহিলে সেনাসংখ্যা এত অল্প হয় যে, বৃহৎ রাজ্য সে সকল ক্ষুদ্র রাজ্য অনায়াসে গ্রাস করে। প্রাচীন গ্রীকনগরী সকলে সকলকেই এই জন্য যুদ্ধ করিতে হইত। বৃহৎ রাজ্যে বা সমাজে, যুদ্ধ শ্রেণীবিশেষের কাজ বলিয়া নির্দিষ্ট থাকে। প্রাচীন ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয়, এবং মাধ্যকালিক ভারতবর্ষের রাজপুতেরা ইহার উদাহরণ। কিন্তু তাহার ফল এই হয় যে, সেই শ্রেণীবিশেষ আক্রমণকারী কর্তৃক বিজিত হইলে, দেশের আর রক্ষা থাকে না। ভারতবর্ষের রাজপুতেরা পরাভূত হইবামাত্র, ভারতবর্ষ মুসলমানের অধিকারভুক্ত হইল। কিন্তু রাজপুত ভিন্ন ভারতবর্ষের অন্য জাতি সকল যদি যুদ্ধে সক্ষম হইত, তাহা হইলে ভারতবর্ষে সে দৃশ্য হইত না। ১৭৯৩ সালে ফ্রান্সের সমস্ত বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ অস্ত্রধারণ করিয়া সমবেত ইউরোপকে পরাভূত করিয়াছিল। যদি তাহা না করিত, তবে ফ্রান্সের বড় দৃশ্য হইত।

শিষ্য। কি প্রকার শারীরিক অনুশীলনের দ্বারা এই ধর্ম সম্পূর্ণ হইতে পারে?

গুরু। কেবল বলে নহে। চুয়াড়ের সঙ্গে যুদ্ধে কেবল শারীরিক বলই যথেষ্ট, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে শারীরিক বল অপেক্ষা শারীরিক শিক্ষাই বিশেষ প্রয়োজনীয়। এখনকার দিনে প্রথমতঃ শারীরিক বলের ও অস্থি মাংসপেশী প্রভৃতির পরিপূষ্টির জন্য ব্যায়াম চাই। এদেশে ডন, কুস্তী, মৃগদুর প্রভৃতি নানা প্রকার ব্যায়াম প্রচলিত ছিল। ইংরেজি সভ্যতা শিখিতে গিয়া আমরা কেন এ সকল ত্যাগ করিলাম, তাহা বুঝিতে পারি না। আমাদের বর্তমান বুদ্ধি-বিপর্যয়ের ইহা একটি উদাহরণ।

দ্বিতীয়তঃ এবং প্রধানতঃ অস্ত্রশিক্ষা। সকলেরই সর্ববিধ অস্ত্রপ্রয়োগে সক্ষম হওয়া উচিত।

শিষ্য। কিন্তু এখনকার আইন অনুসারে আমাদের অস্ত্রধারণ নিষিদ্ধ।

গুরু। সেটা একটা আইনের ভুল। আমরা মহারাণীর রাজভক্ত প্রজা, আমরা অস্ত্রধারণ করিয়া তাহার রাজ্য রক্ষা করিব, ইহাই বাঞ্ছনীয়। আইনের ভুল পশ্চাৎ সংশোধিত হইতে পারে।

তার পর তৃতীয়তঃ অস্ত্রশিক্ষা ভিন্ন আর কতকগুলি শারীরিক শিক্ষা শারীরিক ধর্ম সম্পূর্ণ জন্য প্রয়োজনীয়। যথা অশ্বারোহণ। ইউরোপে যে অশ্বারোহণ করিতে পারে না এবং যাহার অস্ত্রশিক্ষা নাই, সে সমাজের উপহাস্যস্পদ। বিলাতী স্ত্রীলোকদিগেরও এ সকল শক্তি হইয়া থাকে। আমাদের কি দৃশ্য!

বিক্রম রচনাবলী

অশ্বারোহণ যেমন শারীরিক ধর্মশিক্ষা, পদব্রজে দূরগমন এবং সন্তরণও তাদৃশ। যোদ্ধার পক্ষে ইহা নহিলেই নয়, কিন্তু কেবল যোদ্ধার পক্ষে ইহা প্রয়োজনীয়, এমন বিবেচনা করিও না। যে সাঁতার না জানে, সে জল হইতে আপনার রক্ষায় ও পরের রক্ষায় অপটু। যুদ্ধে কেবল জল হইতে আত্মরক্ষা ও পরের রক্ষার জন্য ইহা প্রয়োজনীয় এমন নহে, আক্রমণ, নিষ্ক্রমণ, ও পলায়ন জন্য অনেক সময়ে ইহার প্রয়োজন হয়। পদব্রজে দূরগমন আরও প্রয়োজনীয়, ইহা বলা বাহুল্য। মনুষ্য মাত্রের পক্ষেই ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

শিষ্য। অতএব যে শারীরিক বৃত্তির অনুশীলন করিবে, কেবল তাহার শরীর পুষ্টি ও বলশালী হইলেই হইবে না। সে ব্যায়ামে সুপটু—

গুরু। এই ব্যায়াম মধ্যে মল্লযুদ্ধটা ধরিয়া লইবে। ইহা বিশেষ বলকারক। আত্মরক্ষার ও পরোপকারের বিশেষ অনুকূল।*

শিষ্য। অতএব, চাই শরীরপুষ্টি, ব্যায়াম, মল্লযুদ্ধ, অস্ত্রশিক্ষা, অশ্বারোহণ, সন্তরণ, পদব্রজে দূরগমন—

গুরু। আরও চাই সহিষ্ণুতা। শীত, গ্রীষ্ম, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রান্তি, সকলই সহ্য করিতে পারা চাই। ইহা ভিন্ন যুদ্ধার্থীর আরও চাই। প্রয়োজন হইলে মাটি কাটিতে পারিবে—ঘর বাঁধিতে পারিবে—মোট বহিতে পারিবে। অনেক সময়ে যুদ্ধার্থীকে দশ বার দিনের খাদ্য আপনার পিঠে বহিয়া লইয়া যাইতে হইয়াছে। স্থূল কথা, যে কর্মকারক আপনার কর্ম জানে, সে যেমন অস্ত্রখানি তীক্ষ্ণধার ও শাণিত করিয়া, সকল দ্রব্য ছেদনের উপযোগী করে, দেহকে সেইরূপ একখানি শাণিত অস্ত্র করিতে হইবে—যেন তদ্বারা সর্বকর্ম সিদ্ধ হয়।

শিষ্য। কি উপায়ে ইহা হইতে পারে?

গুরু। ইহার উপায় (১) ব্যায়াম, (২) শিক্ষা, (৩) আহার, (৪) ইন্দ্রিয়সংযম। চারিটিই অনুশীলন।

শিষ্য। ইহার মধ্যে ব্যায়াম ও শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন শুনিয়াছি। কিন্তু আহার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। বাচস্পতি মহাশয়ের সেই কাঁচকলা ভাতে ভাতের কথাটা স্মরণ করুন। ততটুকু মাত্র আহার করাই কি ধর্মানুমত? তাহার বেশী আহার কি অধর্ম? আপনি ত এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন।

গুরু। আমি বলিয়াছি শরীর রক্ষা ও পুষ্টির জন্য যদি তাহাই যথেষ্ট হয়, তবে তাহার অধিক কামনা করা অধর্ম। শরীর রক্ষা ও পুষ্টির জন্য কিরূপ আহার প্রয়োজনীয়, তাহা বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বলিবেন, ধর্মোপদেশটার সে কাজ নহে। বোধ করি তাঁহারা বলিবেন যে, কাঁচকলা ভাতে ভাত শরীর রক্ষা ও পুষ্টির জন্য যথেষ্ট নহে। কেহ বা বলিতে পারেন, বাচস্পতির ন্যায়, যে ব্যক্তি কেবল বসিয়া বসিয়া দিন কাটায়, তাহার পক্ষে উহাই যথেষ্ট। সে তর্কে আমাদের প্রয়োজন নাই—বৈজ্ঞানিকের কর্ম বৈজ্ঞানিক করুক। আহার সম্বন্ধে যাহা প্রকৃত ধর্মোপদেশ—যাহা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মুখনির্গত—গীতা হইতে তাহাই তোমাকে শুনাইয়া আমি নিরস্ত হইব।

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিন্দনাঃ।

রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকাঃ ॥ ৮।১৭

যে আহার আয়ুর্বৃদ্ধিকারক, উৎসাহবৃদ্ধিকারক, বলবৃদ্ধিকারক, স্বাস্থ্যবৃদ্ধিকারক, সুখ বা চিত্তপ্রসাদ বৃদ্ধিকারক, এবং রুচিবৃদ্ধিকারক, যাহা রসযুক্ত, স্নিগ্ধ, যাহার সারাংশ দেহে থাকিয়া যায় (অর্থাৎ Nutritious) এবং যাহা দেখিলে খাইতে ইচ্ছা করে, তাহাই সাত্ত্বিকের প্রিয়।

শিষ্য। ইহাতে মদ্য, মাংস, মৎস্য বিহিত, না নিষিদ্ধ হইল?

গুরু। তাহা বৈজ্ঞানিকের বিচার্য। শরীরতত্ত্ববিদ বা চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করিও যে, ইহা আয়ু সত্ত্ব বলারোগ্য সুখপ্রীতিবিন্দন, ইত্যাদি গুণযুক্ত কি না।

শিষ্য। হিন্দুশাস্ত্রকারেরা ত এ সকল নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

গুরু। আমার বিবেচনায় বৈজ্ঞানিকের বা চিকিৎসকের আসনে অবতরণ করা

* লেখক-প্রণীত 'দেবী চৌধুরাণী' নামক গ্রন্থে প্রফুল্লকুমারীকে অনুশীলনের উদাহরণ স্বরূপ প্রতিকৃত করা হইয়াছে। এজন্য সে স্ত্রীলোক হইলেও তাহাকে মল্লযুদ্ধ শিক্ষা করান হইয়াছে।

ধর্মোপদেশকের বা ব্যবস্থাপকের উচিত নহে। তবে হিন্দুশাস্ত্রকারেরা মদ্য, মাংস, মৎস্য নিষেধ করিয়া যে মন্দ করিয়াছেন, এমন বলিতেও পারি না। বরং অনুশীলনতত্ত্ব তাহাদের বিধি সকলের মূল ছিল, তাহা বৃদ্ধা যায়। মদ্য যে অনিষ্টকারী, অনুশীলনের হানিকর, এবং যাহাকেই তুমি ধর্ম বল, তাহারই বিঘ্নকর, এ কথা বোধ করি তোমাকে কষ্ট পাইয়া বৃদ্ধাইতে হইবে না। মদ্য নিষেধ করিয়া হিন্দুশাস্ত্রকারেরা ভালই করিয়াছেন।

শিষ্য। কোন অবস্থাতেই কি মদ্য ব্যবহার্য্য নহে?

গুরু। যে পীড়িত ব্যক্তির পীড়া মদ্য ভিন্ন উপশান্ত হয় না, তাহার পক্ষে ব্যবহার্য্য হইতে পারে। শীতপ্রধান দেশে, বা অন্য দেশে শৈত্যাদিক্য নিবারণ জন্য ব্যবহার্য্য হইলে হইতে পারে। অত্যন্ত শারীরিক ও মানসিক অবসাদকালে ব্যবহার্য্য হইলে হইতে পারে। কিন্তু এ বিধিও চিকিৎসকের নিকট লইতে হইবে—ধর্মোপদেশটার নিকট নহে। কিন্তু একটি এমন অবস্থা আছে যে, সে সময়ে বৈজ্ঞানিক বা চিকিৎসকের কথার অপেক্ষা বা কাহারও বিধির অপেক্ষা না করিয়া পরিমিত মদ্য সেবন করিতে পার।

শিষ্য। এমন কি অবস্থা আছে?

গুরু। যুদ্ধ। যুদ্ধকালে মদ্য সেবন করা ধর্মোপদেশে বটে। তাহার কারণ এই যে, যে সকল বৃত্তির বিশেষ সফলত্বতে যুদ্ধে জয় ঘটে, পরিমিত মদ্য সেবনে সে সকলের বিশেষ সফলত্ব জন্মে। এ কথা হিন্দুধর্মের অননুমোদিত নহে। মহাভারতে আছে যে, জয়দ্রথ বধের দিন, অর্জুন একাকী ব্যুহ ভেদ করিয়া শত্রুসেনামধ্যে প্রবেশ করিলে, যুদ্ধার্থীর সমস্ত দিন তাহার কোন সম্বাদ না পাইয়া ব্যাকুল হইয়াছিলেন। সাত্যকি ভিন্ন আর কেহই এমন বীর ছিল না, সে ব্যুহ ভেদ করিয়া তাহার অনুসন্ধানে যায়। এ দুষ্কর কার্য্যে যাইতে যুদ্ধার্থীর সাত্যকিকে অনুমতি করিলেন। তদন্তরে সাত্যকি উত্তম মদ্য চাহিলেন। যুদ্ধার্থীর তাহাকে প্রচুর পরিমাণে উত্তম মদ্য দিলেন। মার্কাণ্ডেয় পুরাণে পড়া যায় যে, স্বয়ং কালিকা অসুর বধকালে সুরাপান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে চিন্‌হটের যুদ্ধে ইংরেজসেনা হিন্দু মুসলমান কর্তৃক পরাভূত হয়। স্বয়ং Sir Henry Lawrence সে যুদ্ধে ইংরেজসেনার নায়ক ছিলেন, তথাপি ইংরেজের পরাজয় ঘটিয়াছিল। ইংরেজ ইতিহাস-লেখক সর জন কে ইহার একটি কারণ এই নির্দেশ করেন যে, ইংরেজসেনা সে দিন মদ্য পায় নাই। অসম্ভব নহে।

যাই হোক, মদ্য সেবন সম্বন্ধে আমার মত এই যে, (১) যুদ্ধকালে পরিমিত মদ্য সেবন করিতে পার, (২) পীড়াদিতে সূচিকিৎসকের ব্যবস্থানুসারে সেবন করিতে পার, (৩) অন্য কোন সময় সেবন করা অবিধেয়।

শিষ্য। মৎস্য মাংস সম্বন্ধে আপনার কি মত?

গুরু। মৎস্য মাংস শরীরের অনিষ্টকারী, এমন বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। বরং উপকারী হইতে পারে। কিন্তু সে বিচার বৈজ্ঞানিকের হাতে। ধর্মবেত্তার বক্তব্য এই যে, মৎস্য মাংস, প্রীতিবৃত্তির অনুশীলনের ক্রিয়পরিমাণে বিরোধী। সর্বভূতে প্রীতি হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব। অনুশীলনতত্ত্বেও তাই। অনুশীলন হিন্দুধর্মের অন্তর্নিহিত—ভিন্ন নহে। এই জন্যই বোধ হয় হিন্দুশাস্ত্রকারেরা মৎস্য মাংস ভক্ষণ নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার ভিতর আর একটা কথা আছে। মৎস্য মাংস বর্জিত করিলে শারীরিক বৃত্তি সকলের সমুচিত সফলত্ব রোধ হয় কি না? এ কথা বিজ্ঞানবিদের বিচার্য্য। কিন্তু যদি বিজ্ঞানশাস্ত্র বলে যে, সমুচিত সফলত্ব রোধ হয় বটে, তাহা হইলে প্রীতিবৃত্তির অনুচিত সম্প্রসারণ ঘটিল, সামঞ্জস্য বিনষ্ট হইল। এমত অবস্থায় মৎস্য মাংস ব্যবহার্য্য। কথাটা বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে। ধর্মোপদেশটার বৈজ্ঞানিকের আসন গ্রহণ করা উচিত নহে, পূর্বে বলিয়াছি।

শারীরিক বৃত্তির অনুশীলনের প্রয়োজনীয় মধ্যে, (১) ব্যায়াম, (২) শিক্ষা, এবং (৩) আহারের কথা বলিলাম। এক্ষণে (৪) ইন্দ্রিয় সংযম সম্বন্ধেও একটা কথা বলা আবশ্যিক। শারীরিক বৃত্তির সদনুশীলনজন্য ইন্দ্রিয় সংযম যে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, বোধ করি বৃদ্ধাইতে হইবে না। ইন্দ্রিয় সংযম ব্যতীত শরীরের পুষ্টি নাই, বল নাই, ব্যায়ামের সম্ভাবনা থাকে না। শিক্ষা নিষ্ফল হয়, আহার বৃথা হয়, তাহার পরিপাকও হয় না। আর ইন্দ্রিয়ের সংযমই যে ইন্দ্রিয়ের উপযুক্ত অনুশীলন, ইহাও তোমাকে বৃদ্ধাইয়াছি। এক্ষণে তোমাকে স্মরণ করিতে

বিক্রম রচনাবলী

বলি যে, ইন্দ্রিয় সংযম মানসিক বৃত্তির অন্তর্শীলনের অধীন; মানসিক শক্তি ভিন্ন ইহা ঘটে না। অতএব যেমন ইতিপূর্বে দেখিয়াছি যে, মানসিক বৃত্তির উচিত অন্তর্শীলন শারীরিক বৃত্তির অন্তর্শীলনের উপর নির্ভর করে, তেমনি এখন দেখিতেছি যে, শারীরিক বৃত্তির উচিত অন্তর্শীলন আবার মানসিক বৃত্তির উপর নির্ভর করে। শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুণ এইরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট; একের অন্তর্শীলনের অভাবে অন্যের অন্তর্শীলনের অভাব ঘটে। অতএব যে সকল ধর্মোপদেশটা কেবল মানসিক বৃত্তির অন্তর্শীলনের উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত, তাহাদের কথিত ধর্ম অসম্পূর্ণ। যে শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল জ্ঞানোপার্জন, সে শিক্ষা অসম্পূর্ণ, সুতরাং ধর্মবিরুদ্ধ। কালেজে ছেলে পড়াইলেই ছেলে মানুষ হয় না। এবং কতকগুলো বহির্পাঠে পণ্ডিত হয় না। পণ্ডিত্য সম্বন্ধে এই প্রথাটা বড় অনিষ্টকারী হইয়া উঠিয়াছে।

নবম অধ্যায়—জ্ঞানোপার্জনী বৃত্তি

শিষ্য। শারীরিক বৃত্তির অন্তর্শীলন সম্বন্ধে কিছু উপদেশ পাইয়াছি, এক্ষণে জ্ঞানোপার্জনী বৃত্তির অন্তর্শীলন সম্বন্ধে কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি। আমি যত দূর বুঝিয়াছি, তাহা এই যে, অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় এ সকল বৃত্তির অন্তর্শীলনে সুখ, ইহাই ধর্ম। অতএব জ্ঞানোপার্জনী বৃত্তি সকলের অন্তর্শীলন এবং জ্ঞানোপার্জন করিতে হইবে।

গুরু। ইহা প্রথম প্রয়োজন। দ্বিতীয় প্রয়োজন, জ্ঞানোপার্জন ভিন্ন অন্য বৃত্তির সম্যক অন্তর্শীলন করা যায় না। শারীরিক বৃত্তির উদাহরণদ্বারা ইহা বুঝাইয়াছি। ইহা ভিন্ন তৃতীয় প্রয়োজন আছে। তাহা বোধ হয়, সর্বাপেক্ষা গুরুতর। জ্ঞান ভিন্ন ঈশ্বরকে জানা যায় না। ঈশ্বরের বিধিপূর্বক উপাসনা করা যায় না।

শিষ্য। তবে কি মূর্খের ঈশ্বরোপাসনা নাই? ঈশ্বর কি কেবল পণ্ডিতের জন্য?

গুরু। মূর্খের ঈশ্বরোপাসনা নাই। মূর্খের ধর্ম নাই বলিলে অত্যাচার হয় না। পৃথিবীতে যত জ্ঞানকৃত পাপ দেখা যায়, সকলই প্রায় মূর্খের কৃত। তবে একটা ভ্রম সংশোধন করিয়া দিই। যে লেখাপড়া জানে না, তাহাকেই মূর্খ বলিও না। আর যে লেখাপড়া করিয়াছে, তাহাকেই জ্ঞানী বলিও না। জ্ঞান পুস্তকপাঠ ভিন্ন অন্য প্রকারে উপার্জিত হইতে পারে; জ্ঞানোপার্জনী বৃত্তির অন্তর্শীলন বিদ্যালয় ভিন্ন অন্যত্র হইতে পারে। আমাদের দেশের প্রাচীন স্ত্রীলোকেরা ইহার উত্তম উদাহরণস্থল। তাহারা প্রায় কেহই লেখাপড়া জানিতেন না, কিন্তু তাহাদের মত ধার্মিকও পৃথিবীতে বিরল। কিন্তু তাহারা বহির্পাঠ না পড়ুন, মূর্খ ছিলেন না। আমাদের দেশে জ্ঞানোপার্জনের কতকগুলি উপায় ছিল, যাহা এক্ষণে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। কথকতা ইহার মধ্যে একটি। প্রাচীনারা কথকের মুখে পুরাণোতিহাস শ্রবণ করিতেন। পুরাণোতিহাসের মধ্যে অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার নিহিত আছে। তচ্ছব্ধে তাহাদিগের জ্ঞানোপার্জনী বৃত্তি সকল পরিমার্জিত ও পরিতৃপ্ত হইত। তন্মিলন আমাদের দেশে হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্যে পুরুষপরম্পরায় একটি অপূর্ব জ্ঞানের স্রোত চলিয়া আসিতেছিল। তাহারা তাহার অধিকারিণী ছিলেন। এই সকল উপায়ে তাহারা শিক্ষিত বাবুদিগের অপেক্ষা অনেক বিষয় ভাল বুঝিতেন। উদাহরণস্বরূপ অতিথিসংস্কারের কথাটা ধর। অতিথিসংস্কারের মাহাত্ম্য জ্ঞানলভ্য; জাগতিক সত্যের সঙ্গে ইহা সম্বন্ধবিশিষ্ট। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় অতিথির নামে জ্বলিয়া উঠেন; ভিখারী দেখিলে লাঠি দেখান। কিন্তু যে জ্ঞান ইহাদের নাই, প্রাচীনাদের ছিল; তাহারা অতিথিসংস্কারের মাহাত্ম্য বুঝিতেন। এমনই আর শত শত উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। সে সকল বিষয়ে নিরঙ্কর প্রাচীনারাই জ্ঞানী, এবং আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় অজ্ঞানী, ইহাই বলিতে হইবে।

শিষ্য। ইহা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দোষ নহে, বোধ হয় ইংরেজী শিক্ষাপ্রণালীর দোষ।

গুরু। সন্দেহ নাই। আমি যে অন্তর্শীলনতত্ত্ব তোমাকে বুঝাইলাম অর্থাৎ সকল বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্যপূর্বক অন্তর্শীলন করিতে হইবে, এই কথাটি না বুঝাই এ দোষের কারণ।

কাহারও কোন কোন বৃত্তির অন্তর্শীলন কর্তব্য, এরূপ লোক-প্রতীতি আছে, এবং তদনুসারে কার্য হইতেছে। এইরূপ লোক-প্রতীতির ফল আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী। সেই

শিক্ষাপ্রণালীতে তিনটি গুরুতর দোষ আছে। এই মনুষ্যত্বতত্ত্বের প্রতি মনোযোগী হইলেই, সেই সকল দোষের আবিষ্কার ও প্রতিকার করা যায়।

শিষ্য। সে সকল দোষ কি?

গুরু। প্রথম, জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলির প্রতিই অধিক মনোযোগ; কার্যকারিণী বা চিত্ত-রঞ্জিনী প্রক্তি প্রায় অমনোযোগ।

এই প্রথার অনুবর্তী হইয়া আধুনিক শিক্ষকেরা শিক্ষালয়ে শিক্ষা দেন বলিয়া, এ দেশে ও ইউরোপে এত অনিষ্ট হইতেছে। এ দেশে বাঙ্গালিরা অমানুষ হইতেছে; তর্ককুশল, বাগ্মী বা সুলেখক—ইহাই বাঙ্গালির চরমোৎকর্ষের স্থান হইয়াছে। ইহারই প্রভাবে ইউরোপের কোন প্রদেশের লোক কেবল শিল্পকুশল, অর্থগৃহু, স্বার্থপর হইতেছে; কোন দেশে রণপ্রিয়, পরস্বাপহারী পিশাচ জন্মিতেছে। ইহারই প্রভাবে ইউরোপে এত যুদ্ধ, দুর্ভলের উপর এত পীড়ন। শারীরিক বৃত্তি, কার্যকারিণী বৃত্তি, মনোরঞ্জিনী বৃত্তি, যতগুলি আছে, সকলগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যযোগ্য যে বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন, তাহাই মঙ্গলকর; সেগুলির অবহেলা, আর বুদ্ধিবৃত্তির অসঙ্গত স্ফূর্তি মঙ্গলদায়ক নহে। আমরাদিগের সাধারণ লোকের ধর্মসংক্রান্ত বিশ্বাস এরূপ নহে। হিন্দুর পূজনীয় দেবতাদিগের প্রাধান্য, রূপবান্ চন্দ্র বা বলবান্ কাণ্ডিকেয়ে নিহিত হয় নাই; বুদ্ধিমান্ বৃহস্পতি বা জ্ঞানী ব্রহ্মায় অর্পিত হয় নাই; রসজ্ঞ গন্ধর্বারাজ বা বাণেশ্বরে নিহিত নহে। কেবল সেই সর্বাত্মসম্পন্ন—অর্থাৎ সর্বাত্মাণ পরিণতিবিশিষ্ট ষড়ৈশ্বর্যশালী বিষ্ণুতে নিহিত হইয়াছে। অনুশীলন নীতির স্থূল গ্রন্থি এই যে, সর্বপ্রকার বৃত্তি পরস্পর পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্যবিশিষ্ট হইয়া অনুশীলিত হইবে, কেহ কাহাকে ক্ষুণ্ণ করিয়া অসঙ্গত বৃদ্ধি পাইবে না।

শিষ্য। এই গেল একটি দোষ? আর?

গুরু। আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীর দ্বিতীয় ভ্রম এই যে, সকলকে এক এক, কি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে পরিপক্ব হইতে হইবে—সকলের সকল বিষয় শিখিবার প্রয়োজন নাই। যে পারে, সে ভাল করিয়া বিজ্ঞান শিখুক, তাহার সাহিত্যের প্রয়োজন নাই। যে পারে, সে সাহিত্য উত্তম করিয়া শিখুক, তাহার বিজ্ঞানে প্রয়োজন নাই। তাহা হইলে মানসিক বৃত্তির সকলগুলির স্ফূর্তি ও পরিণতি হইল কৈ? সবাই আধখানা করিয়া মানুষ হইল, আস্ত মানুষ পাইব কোথা? যে বিজ্ঞানকুশলী, কিন্তু কাব্যরসাদির আশ্বাদনে বঞ্চিত, সে কেবল আধখানা মানুষ। অথবা যে সৌন্দর্য্যদত্তপ্রাণ, সর্বসৌন্দর্য্যের রসগ্রাহী, কিন্তু জগতের অপূর্ণ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে অজ্ঞ—সেও আধখানা মানুষ। উভয়েই মনুষ্যত্ববিহীন, সুতরাং ধর্ম পতিত। যে ক্ষত্রিয় যুদ্ধবিশারদ—কিন্তু রাজধর্ম অনভিজ্ঞ—অথবা যে ক্ষত্রিয় রাজধর্ম অভিজ্ঞ, কিন্তু রণবিদ্যায় অনভিজ্ঞ, তাহারা যেমন হিন্দুশাস্ত্রানুসারে ধর্মচ্যুত, ইহারাও তেমনি ধর্মচ্যুত—এই প্রকৃত হিন্দুধর্মের মর্ম।

শিষ্য। আপনার ধর্মব্যাখ্যা অনুসারে সকলকেই সকল শিখিতে হইবে।

গুরু। না, ঠিক তা নয়। সকলকেই সকল মনোবৃত্তিগুলি সংকর্ষিত করিতে হইবে।

শিষ্য। তাই হউক—কিন্তু সকলের কি তাহা সাধ্য? সকলের সকল বৃত্তিগুলি তুল্যরূপে তেজস্বিনী নহে। কাহারও বিজ্ঞানানুশীলনী বৃত্তিগুলি অধিক তেজস্বিনী, সাহিত্যানুশীলনী বৃত্তিগুলি সেরূপ নহে। বিজ্ঞানের অনুশীলন করিলে সে একজন বড় বৈজ্ঞানিক হইতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের অনুশীলনে তাহার কোন ফল হইবে না, এ স্থলে সাহিত্যে বিজ্ঞানে তাহার কি তুল্যরূপ মনোযোগ করা উচিত?

গুরু। প্রতিভার বিচারকালে যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ কর। সেই কথা ইহার উত্তর। তার পর তৃতীয় দোষ শুন।

জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলি সম্বন্ধে বিশেষ একটি সাধারণ ভ্রম এই যে, সংকর্ষণ অর্থাৎ শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জন, বৃত্তির স্ফূরণ নহে। যদি কোন বৈদ্য, রোগীকে উদর ভরিয়া পথ্য দিতে ব্যতিব্যস্ত হইয়েন, অথচ তাহার ক্ষুধাবৃদ্ধি বা পরিপাকশক্তির প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না করেন, তবে সেই চিকিৎসক যেরূপ ভ্রান্ত, এই প্রণালীর শিক্ষকেরাও সেইরূপ ভ্রান্ত। যেমন সেই চিকিৎসকের চিকিৎসার ফল অজীর্ণ, রোগবৃদ্ধি,—তেমনি এই জ্ঞানার্জন ব্যতিক্রম শিক্ষকদিগের শিক্ষার ফল মানসিক অজীর্ণ—বৃত্তি সকলের অবনতি। মূখস্থ কর, মনে রাখ, জিজ্ঞাসা

বাংকম রচনাবলী

করিলে যেন চটপট করিয়া বলিতে পার। তার পর, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইল, কি শূন্য কাষ্ঠ কোপাইতে কোপাইতে ভোঁতা হইয়া গেল, স্বশক্তি অবলম্বনী হইল, কি প্রাচীন পুস্তকপ্রণেতা এবং সমাজের শাসনকর্তারূপ বুদ্ধাপিতামহীবর্গের আঁচল ধরিয়া চলিল, জ্ঞানাজ্জর্ননী বৃত্তিগুণি বড়ো খোকার মত কেবল গলাইয়া দিলে গিলিতে পারে, কি আপনি আহাৰ্জ্জনে সক্ষম হইল, সে বিষয় কেহ ভ্রমেও চিন্তা করেন না। এই সকল শিক্ষিত গন্দর্ভ জ্ঞানের ছালা পিঠে করিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া বেড়ায়—বিস্মৃতি নামে করুণাময়ী দেবী আসিয়া ভার নামাইয়া লইলে, তাহারা পালে মিশিয়া স্বচ্ছন্দে ঘাস খাইতে থাকে।

শিষ্য। আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি আপনার এত কোপদৃষ্টি কেন?

গুরু। আমি কেবল আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথা বলিতেছিলাম না; এখনকার ইংরেজের শিক্ষাও এইরূপ। আমরা যে মহাপ্রভুদিগের অনুকরণ করিয়া, মনুষ্যজন্ম সার্থক করিব মনে করি, তাহাদিগেরও বুদ্ধি সঙ্কীর্ণ, জ্ঞান পীড়াদায়ক।

শিষ্য। ইংরেজের বুদ্ধি সঙ্কীর্ণ? আপনি ক্ষুদ্র বাঙ্গালি হইয়া এত বড় কথা বলিতে সাহস করেন? আবার জ্ঞান পীড়াদায়ক?

গুরু। একে একে বাপু। ইংরেজের বুদ্ধি সঙ্কীর্ণ, ক্ষুদ্র বাঙ্গালি হইয়াও বলি। আমি গোম্পদ বলিয়া যে ডোবাকে সমুদ্র বলিব, এমত হইতে পারে না। যে জাতি এক শত কুড়ি বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষের আধিপত্য করিয়া ভারতবাসীদিগের সম্বন্ধে একটা কথাও বুঝিল না, তাহাদের অন্য লক্ষ গুণ থাকে স্বীকার করিব, কিন্তু তাহাদিগকে প্রশস্তবুদ্ধি বলিতে পারিব না। কথাটার বেশী বাড়াবাড়ির প্রয়োজন নাই—তিস্ত হইয়া উঠবে। তবে ইংরেজের অপেক্ষাও সঙ্কীর্ণ পথে বাঙ্গালির বুদ্ধি চলিতেছে, ইহা আমি না হয় স্বীকার করিলাম। ইংরেজের শিক্ষা অপেক্ষাও আমাদের শিক্ষা যে নিকৃষ্ট, তাহা মন্তকণ্ঠে স্বীকার করি। কিন্তু আমাদের সেই কুশিক্ষার মূল ইউরোপের দৃষ্টান্ত। আমাদের প্রাচীন শিক্ষা হয়ত আরও নিকৃষ্ট ছিল। কিন্তু তাহা বলিয়া বর্তমান শিক্ষাকে ভাল বলিতে পারি না। একটা আপত্তি মিটিল ত?

শিষ্য। জ্ঞান পীড়াদায়ক, এখনও বুঝিতে পারিতেছি না।

গুরু। জ্ঞান স্বাস্থ্যকর, এবং জ্ঞান পীড়াদায়ক। আহাৰ স্বাস্থ্যকর, এবং অজীর্ণ হইলে পীড়াদায়ক। অজীর্ণ জ্ঞান পীড়াদায়ক। অর্থাৎ কতকগুলো কথা জানিয়াছি, কিন্তু যাহা যাহা জানিয়াছি, সে সকলের কি সম্বন্ধ, সকলগুলির সম্বন্ধে ফল কি, তাহা কিছুই জানি না। গৃহে অনেক আলোক জ্বলিতেছে, কেবল সিঁড়িটুকু অন্ধকার। এই জ্ঞানপীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির এই জ্ঞান লইয়া কি করিতে হয়, তাহা জানে না। একজন ইংরেজ স্বদেশ হইতে নতুন আসিয়া একখানি বাগান কিনিয়াছিলেন। মালী বাগানের নারিকেল পাড়িয়া আনিয়া উপহার দিল। সাহেব ছোবড়া খাইয়া তাহা অস্বাদু বলিয়া পরিত্যাগ করিলেন। মালী উপদেশ দিল, “সাহেব! ছোবড়া খাইতে নাই—আঁটি খাইতে হয়।” তার পর আঁব আসিল। সাহেব মালীর উপদেশ-বাক্য স্মরণ করিয়া ছোবড়া ফেলিয়া দিয়া আঁটি খাইলেন। দেখিলেন, এবারও বড় রস পাওয়া গেল না। মালী বলিয়া দিল, “সাহেব কেবল খোসাখানা ফেলিয়া দিয়া, শাঁসটা ছুরি দিয়া কাটিয়া খাইতে হয়।” সাহেবের সে কথা স্মরণ রহিল। শেষ ওল আসিল। সাহেব, তাহার খোসা ছাড়াইয়া কাটিয়া খাইলেন। শেষে যন্ত্রণায় কাতর হইয়া মালীকে প্রহারপূর্বক আধা কর্দিতে বাগান বেঁচিয়া ফেলিলেন। অনেকের মানসক্ষেত্র এই বাগানের মত ফলে ফুলে পরিপূর্ণ, তবে অধিকারীর ভোগে হয় না। তিনি ছোবড়ার জায়গায় আঁটি, আঁটির জায়গায় ছোবড়া খাইয়া বসিয়া থাকেন। এরূপ জ্ঞান বিড়ম্বনা মাত্র।

শিষ্য। তবে কি জ্ঞানাজ্জর্ননী বৃত্তি সকলের অনুশীলন জন্য জ্ঞান নিষ্প্রয়োজন?

গুরু। পাগল! অস্ত্রখানা শানাইতে গেলে কি শূন্যের উপর শান দেওয়া যায়? জেয় বস্তু ভিন্ন কিসের উপর অনুশীলন করিবে? জ্ঞানাজ্জর্ননী বৃত্তি সকলের অনুশীলন জন্য জ্ঞানাজ্জর্ন নিশ্চিত প্রয়োজন। তবে ইহাই বুঝাইতে চাই যে, জ্ঞানাজ্জর্ন যেরূপ উদ্দেশ্য, বৃত্তির বিকাশও সেইরূপ মূখ্য উদ্দেশ্য। আর ইহাও মনে করিতে হইবে, জ্ঞানাজ্জর্নেই জ্ঞানাজ্জর্ননী বৃত্তিগুণির পরিভূষি। অতএব চরম উদ্দেশ্য জ্ঞানাজ্জর্নই বটে। কিন্তু যে অনুশীলনপ্রথা চলিত, তাহাতে পেট বড় না হইতে আহাৰ ঠুসিয়া দেওয়া হইতে থাকে। পাকশক্তির বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি নাই, ক্ষুধা বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি নাই—আধার বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি নাই—ঠুসে গেলা!

যেমন কতকগুলি অবোধ মাতা এইরূপ করিয়া শিশুর শারীরিক অবনতি সংসাধিত করিয়া থাকে, তেমন এখনকার পিতা ও শিক্ষকেরা পুত্র ও ছাত্রগণের অবনতি সংসাধিত করেন।

জ্ঞানাজ্জর্ন ধর্মের একটি প্রধান অংশ। কিন্তু সম্প্রতি তৎসম্বন্ধে এই তিনটি সামাজিক পাপ সর্বদা বর্তমান। ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য সমাজে গৃহীত হইলে, এই কুশিকারূপ পাপ সমাজ হইতে দূরীকৃত হইবে।

দশম অধ্যায়—মনুষ্যে ভক্তি

শিষ্য। সুখ, সকল বৃত্তিগুলির সম্যক্ স্ফূর্তি, পরিণতি, সামঞ্জস্য এবং চরিতার্থতা। বৃত্তিগুলির সম্যক্ স্ফূর্তি, পরিণতি এবং সামঞ্জস্যে মনুষ্যত্ব। বৃত্তিগুলি, শারীরিকী, জ্ঞানাজ্জর্নী, কার্যকারিণী এবং চিত্তরঞ্জিনী। ইহার মধ্যে শারীরিকী ও জ্ঞানাজ্জর্নী বৃত্তির অনুশীলন প্রথা সম্বন্ধে কিছু উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। নিকৃষ্টা কার্যকারিণী বৃত্তিগুলির অনুশীলন কি, সামঞ্জস্য বৃদ্ধিবার সময়ে, ভয়, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদির উদাহরণে বৃদ্ধিযাছি। নিকৃষ্টা কার্যকারিণী বৃত্তি সম্বন্ধে, বোধ করি, আপনার আর কোন বিশেষ উপদেশ নাই, তাহাও বৃদ্ধিযাছি। কিন্তু অনুশীলনতত্ত্বের এ সকল ত সামান্য অংশ। অবশিষ্ট যাহা শ্রোতব্য, তাহা শূন্যে ইচ্ছা করি।

গুরু। এক্ষণে যাহাকে কার্যকারিণী বৃত্তিগুলির মধ্যে সচরাচর উৎকৃষ্ট বলে, তাদৃশ বৃত্তির কথা বলিব। বৃত্তির মধ্যে যে অর্থে উৎকর্ষ নিকর্ষ নির্দেশ করা যায়, সেই অর্থে এই তিনটি বৃত্তি সর্বশ্রেষ্ঠ—ভক্তি, প্রীতি, দয়া।

শিষ্য। ভক্তি, প্রীতি, দয়া, এ তিনটি কি একই বৃত্তি নহে? প্রীতি ঈশ্বরে ন্যস্ত হইলেই সে ভক্তি হইল, এবং আর্ন্তে ন্যস্ত হইলেই তাহা দয়া হইল।

গুরু। যদি এরূপ বলিতে চাও, তাহাতে আমার এখন কোন আপত্তি নাই; কিন্তু অনুশীলন জন্য তিনটিকে পৃথক্ বিবেচনা করাই ভাল। বিশেষ, ঈশ্বরে ন্যস্ত যে প্রীতি, সেই ভক্তি, এমন নহে। মনুষ্য—যথা রাজা, গুরু, পিতা, মাতা, স্বামী প্রভৃতিও ভক্তির পাত্র। আর ঈশ্বরে ভক্তি না হইয়াও কেবল প্রীতি জন্মিতে পারে। তাই, বাঙ্গালার বৈষ্ণবেরা, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, এবং মধুর, ঈশ্বরের প্রতি এই পঞ্চবিধ অনুরাগ স্বীকার করেন। সে পাঁচটি দেখিবে, এই ভক্তি, প্রীতি, দয়া মাত্র। তবে কোন ভাবটি মিশ্র, কোনটি অমিশ্র, যথা—

শান্ত (সাধারণ ভক্তের যে ভাব) = ভক্তি।

দাস্য (হনুমানাদির যে ভাব) = ভক্তি + দয়া।

সখ্য (শ্রীদামাদির যে ভাব) = প্রীতি।

বাৎসল্য (নন্দ যশোদা) = প্রীতি + দয়া।

মধুর (রাধা) = ভক্তি + প্রীতি + দয়া।

শিষ্য। কৃষ্ণের প্রতি রাধার যে ভাব বাঙ্গালার বৈষ্ণবেরা কল্পনা করেন, তাহার মধ্যে দয়া কোথায়?

গুরু। স্নেহ আছে স্বীকার কর?

শিষ্য। করি, কিন্তু স্নেহ ত প্রীতি।

গুরু। কেবল প্রীতি নহে। প্রীতি ও দয়ার মিশ্রণে স্নেহ। সুতরাং মধুর ভাবের ভিতর দয়াও আছে। ভক্তি, প্রীতি, দয়া, মনুষ্যবৃত্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ। এই ভক্তি ঈশ্বরে ন্যস্ত হইলেই, অন্য ধর্মাবলম্বীরা সন্তুষ্ট হইলেন, ধর্মের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। কিন্তু বাঙ্গালার বৈষ্ণবেরা তাহাতেও সন্তুষ্ট নহেন, তাঁহারা চাহেন যে, তিনটি শ্রেষ্ঠ বৃত্তিই ঈশ্বরমুখী হইবে। ইহা এক দিনের কাজ নহে। ক্রমে একটি একটি, দুইটি দুইটি করিয়া শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যের পর্যায়ক্রমে সর্বশেষে সকলগুলিই ঈশ্বরে অর্পণ করিতে শিখিতে হইবে, তখন “রাধা” (যে আরাধনা করে) হইতে পারা যায়।

কিন্তু ঈশ্বরভক্তির কথা এখন থাক। আগে মনুষ্যে ভক্তির কথা বলা যাউক। যিনিই আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং যাঁহার শ্রেষ্ঠতা হইতে আমরা উপকৃত হই, তিনিই ভক্তির পাত্র। ভক্তির সামাজিক প্রয়োজন এই যে, (১) ভক্তি ভিন্ন নিকৃষ্ট কখন উৎকৃষ্টের অনুগামী হয় না।

বিশ্বকম রচনাবলী

(২) নিকৃষ্ট উৎকৃষ্টের অনুগামী না হইলে সমাজের ঐক্য থাকে না, বন্ধন থাকে না, উন্নতি ঘটে না।

দেখা যাউক, মনুষ্যমধ্যে কে ভক্তির পাত্র। (১) পিতামাতা ভক্তির পাত্র। তাঁহারা যে আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহা বদ্বাইতে হইবে না। গুরু জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ, আমাদের জ্ঞানদাতা, এজন্য তিনিও ভক্তির পাত্র। গুরু ভিন্ন মনুষ্যের মনুষ্যত্বই অসম্ভব, ইহা শারীরিক বৃত্তি আলোচনাকালে বদ্বাইয়াছি। এজন্য গুরু বিশেষ প্রকারে ভক্তির পাত্র। হিন্দুধর্ম সর্বতত্ত্বদর্শী, এজন্য হিন্দুধর্মের গুরুভক্তির উপর বিশেষ দৃষ্টি। পুরোহিত, অর্থাৎ যিনি ঈশ্বরের নিকট আমাদের মঙ্গল কামনা করেন, সর্বথা আমাদের হিতানুষ্ঠান করেন এবং আমাদের অপেক্ষা ধর্মাত্মা ও পবিত্রস্বভাব, তিনিও ভক্তির পাত্র। যিনি কেবল চাল কলার জন্য পুরোহিত, তিনি ভক্তির পাত্র নহেন। স্বামী সকল বিষয়েই স্ত্রীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনি ভক্তির পাত্র। হিন্দুধর্ম ইহাও বলে যে, স্ত্রীরও স্বামীর ভক্তির পাত্র হওয়া উচিত, কেন না, হিন্দুধর্ম বলে যে, স্ত্রীকে লক্ষ্মীরূপা মনে করিবে। কিন্তু এখানে হিন্দুধর্মের অপেক্ষা কোমৎ ধর্মের উক্তি কিছু স্পষ্ট এবং শ্রদ্ধার যোগ্য। যেখানে স্ত্রী স্নেহে, ধর্ম বা পবিত্রতায় শ্রেষ্ঠ, সেখানে তাঁহারও স্বামীর ভক্তির পাত্র হওয়া উচিত বটে। গৃহধর্ম ইহারা ভক্তির পাত্র; যাঁহারা ইহাদের স্থানীয়, তাঁহারাও সেইরূপ ভক্তির পাত্র। গৃহমধ্যে যাহারা নিম্নস্থ তাহারা যদি ভক্তির পাত্রগণকে ভক্তি না করে, যদি পিতা মাতাকে পুত্র কন্যা বা বধু ভক্তি না করে, যদি স্বামীকে স্ত্রী ভক্তি না করে, যদি স্ত্রীকে স্বামী ঘৃণা করে, যদি শিক্ষাদাতাকে ছাত্র ঘৃণা করে, তবে সে গৃহে কিছুমাত্র উন্নতি নাই—সে গৃহ নরকবিশেষ। এ কথা কষ্ট পাইয়া বদ্বাইতে হইবে না, প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। এই সকল ভক্তির পাত্রের প্রতি সমুচিত ভক্তির উদ্রেক অনুশীলনের একটি মূখ্য উদ্দেশ্য। হিন্দুধর্মেরও সেই উদ্দেশ্য। বরং অন্যান্য ধর্মের অপেক্ষা এ বিষয়ে হিন্দুধর্মেরই প্রাধান্য আছে। হিন্দুধর্ম যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম, ইহা তদ্বিষয়ে অন্যতর প্রমাণ।

(২) এখন বদ্বিয়া দেখ, গৃহস্থ পরিবারের যে গঠন, সমাজের সেই গঠন। গৃহের কর্তার ন্যায়, পিতা মাতার ন্যায়, রাজা সেই সমাজের শিরোভাগ। তাঁহার গুণে, তাঁহার দণ্ডে, তাঁহার পালনে সমাজ রক্ষিত হইয়া থাকে। পিতা যেমন সন্তানের ভক্তির পাত্র, রাজাও সেইরূপ প্রজার ভক্তির পাত্র। প্রজার ভক্তিতেই রাজা শক্তিমান—নহিলে রাজার নিজ বাহুতে বল কত? রাজা বলশূন্য হইলে সমাজ থাকিবে না। অতএব রাজাকে সমাজের পিতার স্বরূপ ভক্তি করিবে। লর্ড রীপন সম্বন্ধে যে সকল উৎসাহ ও উৎসর্বাদি দেখা গিয়াছে, এইরূপ এবং অন্যান্য সদুপায় দ্বারা রাজভক্তি অনুশীলিত করিবে। যুদ্ধকালে রাজার সহায় হইবে। হিন্দুধর্ম পুনঃ পুনঃ রাজভক্তির প্রশংসা আছে। বিলাতী ধর্ম হউক বা না হউক, বিলাতী সামাজিক নীতিতে রাজভক্তির বড় উচ্চ স্থান ছিল। বিলাতে এখন আর রাজভক্তির সে স্থান নাই। যেখানে আছে—যথা জর্মানি বা ইতালি, সেখানে রাজ্য উন্নতিশীল।

শিষ্য। সেই ইউরোপীয় রাজভক্তিটা আমার বড় বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়। লোকে রামচন্দ্র বা যুধিষ্ঠিরের ন্যায় রাজাকে যে ভক্তি করিবে, ইহা বদ্বিতে পারি, আকবর বা অশোকের উপর ভক্তিও না হয় বদ্বিলাম, কিন্তু দ্বিতীয় চার্লস বা পঞ্চদশ লুইর মত রাজার উপরে যে রাজভক্তি হয়, ইহার পর মনুষ্যের অধঃপতনের আর গুরুতর চিহ্ন কি হইতে পারে?

গুরু। যে মনুষ্য রাজা, সেই মনুষ্যকে ভক্তি করা এক বস্তু, রাজাকে ভক্তি করা স্বতন্ত্র বস্তু। যে দেশে একজন রাজা নাই—যে রাজ্য সাধারণতন্ত্র, সেইখানকার কথা মনে করিলেই বদ্বিতে পারিবে যে, রাজভক্তি কোন মনুষ্যবিশেষের প্রতি ভক্তি নহে। আমেরিকার কংগ্রেসের বা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কোন সভ্যবিশেষ ভক্তির পাত্র না হইতে পারেন, কিন্তু কংগ্রেস ও পার্লামেন্ট ভক্তির পাত্র তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেইরূপ চার্লস ষ্টুয়ার্ট বা লুই কাপে ভক্তির পাত্র না হইতে পারেন, কিন্তু তত্তৎ সময়ের ইংলন্ড বা ফ্রান্সের রাজা তত্তৎ প্রদেশীয়দিগের ভক্তির পাত্র।

শিষ্য। তবে কি একটা দ্বিতীয় ফিলিপ বা একটা ঔরঙ্গজেবের ন্যায় নরাধমের বিপক্ষে বিদ্রোহ পাপের মধ্যে গণ্য হইবে?

গুরু। কদাপি না। রাজা যতক্ষণ প্রজাপালক, ততক্ষণ তিনি রাজা। যখন তিনি

প্রজাপীড়ক হইলেন, তখন তিনি আর রাজা নহেন, আর ভক্তির পাত্র নহেন। এরূপ রাজাকে ভক্তি করা দূরে থাক, যাহাতে সে রাজা স্বেচ্ছাচারিতা সমাজের অমঙ্গল। কিন্তু সে সকল কথা ভক্তিতত্ত্বে উঠিতেছে না, প্রীতিতত্ত্বের অন্তর্গত। আর একটা কথা বলিয়া রাজভক্তি সমাপ্ত করি। রাজা যেমন ভক্তির পাত্র, তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ রাজপুরুষগণও যথাযোগ্য সম্মানের পাত্র। কিন্তু তাঁহারা যতক্ষণ আপন আপন রাজকার্যে নিযুক্ত থাকেন, এবং ধর্মতঃ সেই কার্য নিব্বাহ করেন, ততক্ষণই তাঁহারা সম্মানের পাত্র। তার পর তাঁহারা সাধারণ মনুষ্য।

রাজপুরুষে যথাযোগ্য ভক্তি ভাল, কিন্তু বেশী মাত্রায় কিছুই ভাল নহে—কেন না, বেশী মাত্রা অসামঞ্জস্যের কারণ। রাজা সমাজের প্রতিনিধি এবং রাজপুরুষেরা সমাজের ভূতা—এ কথা কাহারও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। আমাদের দেশীয় লোক এ কথা বিস্মৃত হইয়া, রাজপুরুষের অপরিমিত তোষামোদ করিয়া থাকেন।

(৩) রাজার অপেক্ষাও, যাঁহারা সমাজের শিক্ষক, তাঁহারা ভক্তির পাত্র। গৃহস্থ গুরুর কথা, গৃহস্থিত ভক্তির পাত্রদিগের সঙ্গে বলিয়াছি, কিন্তু এই গুরুর গণ, কেবল গার্হস্থ্য গুরুর নহেন, সামাজিক গুরুর। যাঁহারা বিদ্যা বুদ্ধি বলে, পরিশ্রমের সহিত সমাজের শিক্ষায় নিযুক্ত, তাঁহারাই সমাজের প্রকৃত নেতা, তাঁহারাই যথার্থ রাজা। অতএব ধর্মবেত্তা, বিজ্ঞানবেত্তা, নীতিবেত্তা, দার্শনিক, পুরাণবেত্তা, সাহিত্যকার, কবি প্রভৃতির প্রতি যথোচিত ভক্তির অনুরোধ কর্তব্য। পৃথিবীর যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে, তাহা ইহাদিগের দ্বারা হইয়াছে। ইহারা পৃথিবীকে যে পথে চালান, সেই পথে পৃথিবী চলে। ইহারা রাজাদিগেরও গুরুর। রাজগণ ইহাদিগের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া তবে সমাজশাসনে সক্ষম হইলেন। এই হিসাবে, ভারতবর্ষ ভারতীয় ঋষিদিগের সৃষ্টি—এই জন্য ব্যাস, বাস্মীক, বিশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, কপিল, গোতম—সমস্ত ভারতবর্ষের পূজ্যপাদ পিতৃগণস্বরূপ। ইউরোপেও গালিলীও, নিউটন, কান্ট, কোম্‌ৎ, দাস্তে, শেক্সপিয়ার প্রভৃতি সেই স্থানে।

শিষ্য। আপনার কথার তাৎপর্য কি এইরূপ বোধিতে হইবে যে, যাঁহা দ্বারা আমি যে পরিমাণে উপকৃত, তাঁহার প্রতি সেই পরিমাণে ভক্তিযুক্ত হইব?

গুরুর। তাহা নহে। ভক্তি কৃতজ্ঞতা নহে। অনেক সময়ে নিকৃষ্টের নিকটও কৃতজ্ঞ হইতে হয়। ভক্তি পরের জন্য নহে, আপনার উন্নতির জন্য। যাহার ভক্তি নাই, তাহার চরিত্রের উন্নতি নাই। এই লোকশিক্ষকদিগের প্রতি যে ভক্তির কথা বলিলাম, তাহাই উদাহরণ স্বরূপ লইয়া বুদ্ধি দেখ। তুমি কোন লেখকের প্রণীত গ্রন্থ পড়িতেছ। যদি সে লেখকের প্রতি তোমার ভক্তি না থাকে, তবে সে গ্রন্থের দ্বারা তোমার কোন উপকার হইবে না। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশে তোমার চরিত্র কোনরূপ শাসিত হইবে না। তাহার মর্মার্থ তুমি গ্রহণ করিতে পারিবে না। গ্রন্থকারের সঙ্গে সহৃদয়তা না থাকিলে, তাঁহার উক্তির তাৎপর্য বুঝা যায় না। অতএব জগতের শিক্ষকদিগের উপর ভক্তি না থাকিলে শিক্ষা নাই। সেই শিক্ষাই সকল উন্নতির মূল; অতএব সে ভক্তি ভিন্ন উন্নতিও নাই। ইহাদের প্রতি সমুচিত ভক্তি অনুরোধের পরম ধর্ম।

শিষ্য। কৈ, এ ধর্ম ত আপনার প্রশংসিত হিন্দুধর্মের শিখায় না?

গুরুর। এটা অতি মূর্খের মত কথা। বরং হিন্দুধর্মের ইহা যে পরিমাণে শিখায়, এমন আর কোন ধর্মই শিখায় নাই। হিন্দুধর্মের ব্রাহ্মণগণ সকলের পূজ্য। তাঁহারা যে বর্ণশ্রেষ্ঠ এবং আপামর সাধারণের বিশেষ ভক্তির পাত্র, তাহার কারণ এই যে, ব্রাহ্মণেরাই ভারতবর্ষের সামাজিক শিক্ষক ছিলেন। তাঁহারা ধর্মবেত্তা, তাঁহারাই নীতিবেত্তা, তাঁহারাই বিজ্ঞানবেত্তা, তাঁহারাই পুরাণবেত্তা, তাঁহারাই দার্শনিক, তাঁহারাই সাহিত্যপ্রণেতা, তাঁহারাই কবি। তাই অনন্তজ্ঞানী হিন্দুধর্মের উপদেশকগণ তাঁহাদিগকে লোকের অশেষ ভক্তির পাত্র বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন। সমাজ ব্রাহ্মণকে এত ভক্তি করিত বলিয়াই, ভারতবর্ষ অল্পকালে এত উন্নত হইয়াছিল। সমাজ শিক্ষাদাতাদিগের সম্পূর্ণ বশবস্তুর হইয়াছিল বলিয়াই সহজে উন্নতি লাভ করিয়াছিল।

শিষ্য। আধুনিক মত এই যে, ভণ্ড ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগের চাল কলার পাকা বন্দোবস্ত করিবার জন্য এই দুর্জয় ব্রহ্মভক্তি ভারতবর্ষে প্রচার করিয়াছে।

বিক্রম রচনাবলী

গুরু। তুমি যে ফলের নাম করিলে, যাঁহারা তাহা অধিক পরিমাণে ভোজন করিয়া থাকেন, এ কথাটা তাঁহাদিগের বুদ্ধি হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। দেখ, বিধি বিধান ব্যবস্থা সকলই ব্রাহ্মণের হাতেই ছিল। নিজ হস্তে সে শক্তি থাকিতেও তাঁহারা আপনাদের উপজীবিকা সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিয়াছেন? তাঁহারা রাজ্যের অধিকারী হইবেন না, বাণিজ্যের অধিকারী হইবেন না, কৃষিকার্যের পর্যন্ত অধিকারী নহেন। এক ভিন্ন কোন প্রকার উপজীবিকার অধিকারী নহেন। যে একটি উপজীবিকা ব্রাহ্মণেরা বাঁছিয়া বাঁছিয়া আপনাদিগের জন্য রাখিলেন, সেটি কি? যাহার পর দুঃখের উপজীবিকা আর নাই, যাহার পর দারিদ্র্য আর কিছুতেই নাই—ভিক্ষা। এমন নিঃস্বার্থ উন্নতিচিন্তা মনুষ্যশ্রেণী ভূমণ্ডলে আর কোথাও জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা বাহাদুরির জন্য বা পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য, বাঁছিয়া বাঁছিয়া ভিক্ষাবৃত্তিটি উপজীবিকা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা বুদ্ধিয়াছিলেন যে, ঐশ্বর্য্যসম্পদে মন গেলে জ্ঞানোপার্জনের বিঘ্ন ঘটে, সমাজের শিক্ষাদানে বিঘ্ন ঘটে। একমন, একধ্যান হইয়া লোকশিক্ষা দিবেন বলিয়াই সর্বত্যাগী হইয়াছিলেন। যথার্থ নিষ্কাম ধর্ম যাহাদের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে, তাহারা ই পরাহিতব্রত সঙ্কল্প করিয়া এরূপ সর্বত্যাগী হইতে পারে। তাঁহারা যে আপনাদিগের প্রতি লোকের অচলা ভক্তি আদিষ্ট করিয়াছিলেন, তাহাও স্বার্থের জন্য নহে। তাঁহারা বুদ্ধিয়াছিলেন যে, সমাজশিক্ষকদিগের উপর ভক্তি ভিন্ন উন্নতি নাই, সে জন্য ব্রাহ্মণভক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। এই সকল করিয়া তাঁহারা যে সমাজ ও যে সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা আজিও জগতে অতুল্য, ইউরোপ আজিও তাহা আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারে। ইউরোপে আজিও যুদ্ধটা সামাজিক প্রয়োজন মধ্যে। কেবল ব্রাহ্মণেরই এই ভয়ঙ্কর দুঃখ—সকল দুঃখের উপর শ্রেষ্ঠ দুঃখ—সকল সামাজিক উৎপাতের উপর বড় উৎপাত—সমাজ হইতে উঠাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন। সমাজ ব্রাহ্মণ্য নীতি অবলম্বন করিলে দুঃখের আর প্রয়োজন থাকে না। তাঁহাদের কীর্তি অক্ষয়। পৃথিবীতে যত জাতি উৎপন্ন হইয়াছে, প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণদিগের মত প্রতিভাশালী, ক্ষমতাশালী, জ্ঞানী ও ধার্মিক কোন জাতিই নহে। প্রাচীন এথেন্স বা রোম, মধ্যকালের ইতালি, আধুনিক জার্মানি বা ইংল্যান্ডবাসী—কেহই তেমন প্রতিভাশালী বা ক্ষমতাশালী ছিলেন না; রোমক ধর্মযাজক, বৌদ্ধ ভিক্ষু, বা অপর কোন সম্প্রদায়ের লোক তেমন জ্ঞানী বা ধার্মিক ছিল না।

শিষ্য। তা যাক। এখন দেখি ত ব্রাহ্মণেরা লুচিও ভাজেন, রুটীও বেচেন, কালী খাড়া করিয়া কসাইয়ের ব্যবসাও চালান। তাঁহাদিগকে ভক্তি করিতে হইবে?

গুরু। কদাপি না। যে গুণের জন্য ভক্তি করিব, সে গুণ যাহার নাই, তাহাকে ভক্তি করিব কেন? সেখানে ভক্তি অধর্ম। এইটুকু না বুঝাই, ভারতবর্ষের অবনতির একটি গুরুতর কারণ। যে গুণে ব্রাহ্মণ ভক্তির পাত্র ছিলেন, সে গুণ যখন গেল, তখন আর ব্রাহ্মণকে কেন ভক্তি করিতে লাগিলাম? কেন আর ব্রাহ্মণের বশীভূত রহিলাম? তাহাতেই কুশিক্ষা হইতে লাগিল, কুপথে যাইতে লাগিলাম। এখন ফিরিতে হইবে।

শিষ্য। অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে আর ভক্তি করা হইবে না।

গুরু। ঠিক তাহা নহে। যে ব্রাহ্মণের গুণ আছে, অর্থাৎ যিনি ধার্মিক, বিদ্বান্, নিষ্কাম, লোকের শিক্ষক, তাঁহাকে ভক্তি করিব; যিনি তাহা নহেন, তাঁহাকে ভক্তি করিব না। তৎপরিবর্তে যে শূদ্র ব্রাহ্মণের গুণযুক্ত, অর্থাৎ যিনি ধার্মিক, বিদ্বান্, নিষ্কাম, লোকের শিক্ষক, তাঁহাকেও ব্রাহ্মণের মত ভক্তি করিব।

শিষ্য। অর্থাৎ বৈদ্য কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মণ শিষ্য; ইহা আপনি সঙ্গত মনে করেন?

গুরু। কেন করিব না? ঐ মহাত্মা সূত্রব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ গুণসকলে ভূষিত ছিলেন। তিনি সকল ব্রাহ্মণের ভক্তির যোগ্য পাত্র।

শিষ্য। আপনার এরূপ হিন্দুয়ানিতে কোন হিন্দু মত দিবে না।

গুরু। না দিক, কিন্তু ইহাই ধর্মের যথার্থ মর্ম। মহাভারতের বনপর্বে মার্কণ্ডেয়সমস্যা পর্বাধ্যায়ে ২১৫ অধ্যায়ে ঋষিবাক্য এইরূপ আছে:—“পাতিতাজনক কুক্রিয়াসক্ত, দান্তিক ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হইলেও শূদ্রসদৃশ হয়, আর যে শূদ্র সত্য, দম ও ধর্ম সতত অনুরক্ত, তাহাকে আমি ব্রাহ্মণ বিবেচনা করি। কারণ, ব্যবহারেই ব্রাহ্মণ হয়।” পুনশ্চ বনপর্বে অজগর পর্বাধ্যায়ে ১৮০ অধ্যায়ে রাজর্ষি নহুষ বলিতেছেন, “বেদমূলক সত্য দান ক্ষমা অনশংস্যা অহিংসা ও করুণা

শুদ্ধেও লক্ষিত হইতেছে। যদ্যপি শুদ্ধেও সত্যাদি ব্রাহ্মণধর্ম লক্ষিত হইল, তবে শুদ্ধও ব্রাহ্মণ হইতে পারে।” তদন্তরে যুধিষ্ঠির বলিতেছেন,—“অনেক শুদ্ধে ব্রাহ্মণলক্ষণ ও অনেক দ্বিজাতিতেও শুদ্ধলক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে; অতএব শুদ্ধবংশ্য হইলেই যে শুদ্ধ হয়, এবং ব্রাহ্মণবংশ্য হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, এরূপ নহে। কিন্তু যে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক ব্যবহার লক্ষিত হয়, তাহারাই ব্রাহ্মণ, এবং যে সকল ব্যক্তিতে লক্ষিত না হয়, তাহারাই শুদ্ধ।” এরূপ কথা আরও অনেক আছে। পুনশ্চ বৃদ্ধগোতম-সংহিতায় ২১ অধ্যায়ে,

ক্ষান্তং দান্তং জিতক্রোধং জিতাত্মাং জিতেন্দ্রিয়ম্ ।
তমেব ব্রাহ্মণং মন্যে শেবাঃ শূদ্রা ইতি স্মৃতাঃ ॥
অগ্নিহোত্ররতপরান্ স্বাধ্যায়নিরতান্ শূচীন্ ।
উপবাসরতান্ দান্তাংস্তান্ দেবা ব্রাহ্মণান্ বিদুঃ ॥
ন জাতিঃ পূজ্যতে রাজন্ গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ ।
চন্ডালমপি বিত্ত্বস্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥

ক্ষমাবান্, দমশীল, জিতক্রোধ এবং জিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়কেই ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে; আর সকলে শূদ্র। যাহারা অগ্নিহোত্ররতপর, স্বাধ্যায়নিরত, শূচি, উপবাসরত, দান্ত, দেবতারা তাহাদিগকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। হে রাজন্! জাতি পূজ্য নহে, গুণই কল্যাণকারক। চন্ডালও বিত্ত্বস্থ হইলে দেবরা তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।

শিষ্য। যাক। এক্ষণে দৃষ্টিতেছি, মনুষ্যমধ্যে তিন শ্রেণীর লোকের প্রতি ভক্তি অনুশীলনীয়, (১) গৃহস্থিত গুরুজন, (২) রাজা, এবং (৩) সমাজ-শিক্ষক। আর কেহ?

গুরু (৪) যে ব্যক্তি ধার্মিক বা যে জ্ঞানী, সে এই তিন শ্রেণীর মধ্যে না আসিলেও ভক্তির পাত্র। ধার্মিক, নীচজাতীয় হইলেও ভক্তির পাত্র।

(৫) আর কতকগুলি লোক আছেন, তাহারা কেবল ব্যক্তিবিশেষের ভক্তির পাত্র, বা সমাজবিশেষে ভক্তির পাত্র। এ ভক্তিকে আঞ্জাকারিতা বা সম্মান বলিলেও চলে। যে কোন ব্যক্তিবিশেষে অপর ব্যক্তির আঞ্জাকারিতা স্বীকার করে, সেই অপর ব্যক্তি তাহার ভক্তির, আঞ্জাকারিতা, তাহার সম্মানের পাত্র হওয়া উচিত। ইংরেজীতে ইহার একটি বেশ নাম আছে—subordination। এই নামে আগে Official Subordination মনে পড়ে। এ দেশে সে সামগ্রীর অভাব নাই—কিন্তু যাহা আছে, তাহা বড় ভাল জিনিস নহে। ভক্তি নাই, ভয় আছে। তাহা মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি, ভয় একটা সর্বনিকৃষ্ট বৃত্তির মধ্যে। ভয়ের মত মানসিক অবনতির বৃদ্ধির কারণ অল্পই আছে। উপরওয়ালার আঞ্জা পালন করিবে, তাহাকে সম্মান করিবে, পার ভক্তি করিবে, কিন্তু কদাচ ভয় করিবে না। কিন্তু Official Subordination ভিন্ন অন্য এক জাতীয় আঞ্জাকারিতা প্রয়োজনীয়। সেটা আমাদের দেশের পক্ষে বড় গুরুতর কথা। ধর্ম কর্ম অনেকই সমাজের মঙ্গলার্থ। সে সকল কাজ সচরাচর পাঁচ জনে মিলিয়া করিতে হয়—একজনে হয় না। যাহা পাঁচ জনে মিলিয়া করিতে হয়, তাহাতে ঐক্য চাই। ঐক্য জন্য ইহাই প্রয়োজনীয় যে, এক জন নায়ক হইবে, আর অপরকে তাহার এবং পর্যায়ক্রমে অন্যান্যের বশবর্তী হইয়া কাজ করিতে হইবে। এখানেও Subordination প্রয়োজনীয়। কাজেই ইহা একটি গুরুতর ধর্ম। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের সমাজে এ সামগ্রী নাই। যে কাজ দশ জনে মিলিয়া মিশিয়া করিতে হইবে, তাহাতে সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইতে চাহে, কেহ কাহারও আঞ্জা স্বীকার না করায় সব ব্যথা হয়। এমন অনেক সময় হয় যে, নিকৃষ্ট ব্যক্তি নেতা, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অধীন হয়। এ স্থানে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির কর্তব্য যে, নিকৃষ্টকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া তাহার আঞ্জা বহন করেন—নহিলে কার্যোদ্ধার হইবে না। কিন্তু আমাদের দেশের লোক কোন মতেই তাহা স্বীকার করেন না। তাই আমাদের সামাজিক উন্নতি এত অল্প।

(৬) আর ইহাও ভক্তিতত্ত্বের অন্তর্গত কথা যে, যাহার যে বিষয়ে নৈপুণ্য আছে, সে বিষয়ে তাহাকে সম্মান করিতে হইবে। বয়োজ্যেষ্ঠকেও কেবল বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া সম্মান করিবে।

(৭) সমাজকে ভক্তি করিবে। ইহা স্মরণ রাখিবে যে, মনুষ্যের যত গুণ আছে, সবই সমাজে আছে। সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা, দণ্ডপ্রণেতা, ভরণপোষণ এবং রক্ষাকর্তা। সমাজই রাজা, সমাজই শিক্ষক। ভক্তিভাবে সমাজের উপকারে যত্নবান্ হইবে। এই তত্ত্বের সম্প্রসারণ

বিক্রম রচনাবলী

করিয়া ওগুস্ত কোম্ৎ “মানবদেবীর” পূজার বিধান করিয়াছেন। সুতরাং এ বিষয়ে আর বেশী বলিবার প্রয়োজন নাই।

এখন ভক্তির অভাবে, আমাদের দেশে কি অমঙ্গল ও বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে দেখ। হিন্দুর মধ্যে ভক্তির কিছই অভাব ছিল না। ভক্তি, হিন্দুধর্মের ও হিন্দুশাস্ত্রের একটি প্রধান উপাদান। কিন্তু এখন শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভক্তি একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য সাম্যবাদের প্রকৃত মর্ম বঝিতে না পারিয়া, তাঁহারা এই বিকৃত তাৎপর্য বঝিয়া লইয়াছেন যে, মনুষ্যে মনুষ্যে বঝি সর্বত্র সর্বথাই সমান—কেহ কাহাকে ভক্তি করিবার প্রয়োজন করে না। ভক্তি, যাহা মনুষ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি, তাহা হীনতার চিহ্ন বলিয়া তাঁহাদের বোধ হইয়াছে। পিতা এখন “My dear father”—অথবা বড়ো বেটা। মাতা, বাপের পরিবার। বড় ভাই, জ্ঞাতি মাত্র। শিক্ষক, মাষ্টার বেটা। পুরোহিত চালকলা-লোলুপ ভণ্ড। যে স্বামী দেবতা ছিলেন,—তিনি এখন কেবল প্রিয় বন্ধু মাত্র—কেহ বা ভৃত্যও মনে করেন। স্ত্রীকে আর আমরা লক্ষ্মীস্বরূপা মনে করিতে পারি না—কেন না, লক্ষ্মীই আর মানি না। এই গেল গৃহের ভিতর। গৃহের বাহিরে অনেকে রাজাকে শত্রু মনে করিয়া থাকেন। রাজপুরুষ, অত্যাচারকারী রাক্ষস। সমাজশিক্ষকেরা, কেবল আমাদের সমালোচনাশক্তির পরিচয় দিবার স্থল—গালি ও বিদ্বেষের স্থান। ধার্মিক বা জ্ঞানী বলিয়া কাহাকেও মানি না। যদি মানি, তবে ধার্মিককে “গোবেচারা” বলিয়া দয়া করি—জ্ঞানীকে শিক্ষা দিবার জন্য ব্যস্ত হই। কেহ কাহারও অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করিব না, সেই জন্য কেহ কাহারও অনুবর্তী হইয়া চলিব না; কাজেই ঐক্যের সহিত কোন সামাজিক মঙ্গল সাধিত করিতে পারি না। নৈপুণ্যের আদর করিব না; বৃদ্ধের বহুদর্শিতা লইয়া ব্যঙ্গ করি। সমাজের ভয়ে জড়সড় থাকি, কিন্তু সমাজকে ভক্তি করি না। তাই গৃহ নরক হইয়া উঠিতেছে, রাজনৈতিক ভেদ ঘটিতেছে, শিক্ষা অনিষ্টকারী হইতেছে, সমাজ অনুন্নত ও বিশৃঙ্খল রহিয়াছে; আপনাদিগের চিত্ত অপরিশুদ্ধ ও আত্মাদরে ভরিয়া রহিয়াছে।

শিষ্য। উন্নতির জন্য ভক্তির যে এত প্রয়োজন, তাহা আমি কখনও মনে করি নাই।

গুরু। তাই আমি ভক্তিকে সর্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি বলিতেছিলাম। এ শুদ্ধ মনুষ্যভক্তির কথাই বলিয়াছি। আগামী দিবস ঈশ্বরভক্তির কথা শুনিও। ভক্তির শ্রেষ্ঠতা আরও বিশেষরূপে বঝিতে পারিবে।

একাদশ অধ্যায়—ঈশ্বরে ভক্তি

শিষ্য। আজ, ঈশ্বরে ভক্তি সম্বন্ধে কিছু উপদেশের প্রার্থনা করি।

গুরু। যাহা কিছু তুমি আমার নিকট শুনিয়াছ, আর যাহা কিছু শুনবে, তাহাই ঈশ্বর-ভক্তিসম্বন্ধীয় উপদেশ; কেবল বলিবার এবং বঝিবার গোল আছে। “ভক্তি” কথাটা হিন্দুধর্মের বড় গুরুতর অর্থবাচক, এবং হিন্দুধর্মের ইহা বড় প্রসিদ্ধ। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মবেত্তারা ইহা নানা প্রকারে বঝাইয়াছেন। এবং খৃষ্টাদি আর্ষ্যতর ধর্মবেত্তারাও ভক্তিবাদী। সকলের উক্তির সংশ্লেষ এবং অতুল্যত ভক্তাদিগের চরিত্রের বিশ্লেষ দ্বারা, আমি ভক্তির যে স্বরূপ স্থির করিয়াছি, তাহা এক কথায় বলিতেছি, মনোযোগপূর্বক শ্রবণ কর এবং যত্নপূর্বক স্মরণ রাখিও। নহিলে আমার সকল পরিশ্রম বিফল হইবে।

শিষ্য। আঞ্জা করুন।

গুরু। যখন মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরমুখী বা ঈশ্বরানুবর্তিনী হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি।

শিষ্য। বঝিলাম না।

গুরু। অর্থাৎ যখন জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরানুসন্ধান করে, কার্যকারিণী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরে অর্পিত হয়, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরের সৌন্দর্য্যই উপভোগ করে, এবং শারীরিকী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরের কার্যসাধনে বা ঈশ্বরের আঞ্জাপালনে নিযুক্ত হয়, সেই অবস্থাকেই ভক্তি বলি। যাহার জ্ঞান ঈশ্বরে, কর্ম ঈশ্বরে, আনন্দ ঈশ্বরে, এবং শরীরার্পণ ঈশ্বরে, তাহারই ঈশ্বরে ভক্তি হইয়াছে। অথবা—ঈশ্বরসম্বন্ধিনী ভক্তির উপযুক্ত স্ফূর্তি ও পরিণতি হইয়াছে।

শিষ্য। এ কথার প্রতি আমার প্রথম আপত্তি এই যে, আপনি এ পর্যন্ত ভক্তি অন্যান্য বৃত্তির মধ্যে একটি বৃত্তি বলিয়া বঝাইয়া আসিয়াছেন, কিন্তু এখন সকল বৃত্তির সমষ্টিকে ভক্তি বলিতেছেন।

গুরু। তাহা নহে। ভক্তি একই বৃত্তি। আমার কথার তাৎপর্য এই যে, যখন সকল বৃত্তিগুলাই এই এক ভক্তিবৃত্তির অনঙ্গামী হইবে, তখনই ভক্তির উপযুক্ত স্ফূর্তি হইল। এই কথার দ্বারা, বৃত্তিমধ্যে ভক্তির যে শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলিয়াছিলাম, তাহাই সমর্থিত হইল। ভক্তি ঈশ্বরার্চিতা হইলে, আর সকল বৃত্তিগুলাই উহার অধীন হইবে, উহার প্রদর্শিত পথে যাইবে, ইহাই আমার কথার স্থূল তাৎপর্য। এমন তাৎপর্য নহে যে, সকল বৃত্তির সমষ্টি ভক্তি।

শিষ্য। কিন্তু তাহা হইলে সামঞ্জস্য কোথা গেল? আপনি বলিয়াছেন যে, সকল বৃত্তিগুলাই সমর্চিত স্ফূর্তিই মনুষ্যত্ব। সেই সমর্চিত স্ফূর্তির এই অর্থ করিয়াছেন যে, কোন বৃত্তির সমধিক স্ফূর্তির দ্বারা অন্য বৃত্তির সমর্চিত স্ফূর্তির অবরোধ না হয়। কিন্তু সকল বৃত্তিই যদি এই এক ভক্তিবৃত্তির অধীন হইল, ভক্তিই যদি অন্য বৃত্তিগুলাকে শাসিত করিতে লাগিল, তবে পরস্পরের সামঞ্জস্য কোথায় রহিল?

গুরু। ভক্তির অনুবর্তিতা কোন বৃত্তিরই চরম স্ফূর্তির বিঘ্ন করে না। মনুষ্যের বৃত্তি মাত্রেরই যে কিছু উদ্দেশ্য হইতে পারে, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঈশ্বরই মহৎ। যে বৃত্তির যত সম্প্রসারণ হউক না কেন, ঈশ্বরানুবর্তী হইলে, সে সম্প্রসারণ বাড়িবে বৈ কমিবে না। ঈশ্বর যে বৃত্তির উদ্দেশ্য,—অনন্ত মঙ্গল, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত ধর্ম, অনন্ত সৌন্দর্য, অনন্ত শক্তি, অনন্তই যে বৃত্তির উদ্দেশ্য,—তাহার আবার অবরোধ কোথায়? ভক্তিশাসিতাবস্থাই সকল বৃত্তির যথার্থ সামঞ্জস্য।

শিষ্য। তবে আপনি যে মনুষ্যত্ব-তত্ত্ব এবং অনুশীলনধর্ম আমাকে শিখাইতেছেন, তাহার স্থূল তাৎপর্য কি এই যে, ঈশ্বরে ভক্তিই পূর্ণ মনুষ্যত্ব, এবং অনুশীলনের একমাত্র উদ্দেশ্য সেই ঈশ্বরে ভক্তি?

গুরু। অনুশীলনধর্মের মর্ম এই কথা আছে বটে যে, সকল বৃত্তির ঈশ্বরে সমর্পণ ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই। ইহাই প্রকৃত কৃষ্ণার্পণ, ইহাই প্রকৃত নিষ্কাম ধর্ম। ইহাই স্থায়ী সুখ। ইহারই নামান্তর চিত্তশুদ্ধি। ইহারই লক্ষণ “ভক্তি, প্রীতি, শান্তি।” ইহাই ধর্ম—ইহা ভিন্ন ধর্মাস্তর নাই। আমি ইহাই শিখাইতেছি। কিন্তু তুমি এমন মনে করিও না যে, এই কথা বঝিলেই তুমি অনুশীলনধর্ম বঝিলে।

শিষ্য। আমি যে এখনও কিছু বঝি নাই, তাহা আমি স্বয়ং স্বীকার করিতেছি। অনুশীলনধর্ম এই তত্ত্বের প্রকৃত স্থান কি, তাহা এখনও বঝিতে পারি নাই। আপনি বৃত্তি যে ভাবে বঝাইয়াছেন, তাহাতে শারীরিক বল, অর্থাৎ মাংসপেশীর বল একটা Faculty না হউক, একটা বৃত্তি বটে। অনুশীলনধর্মের বিধানানুসারে, ইহার সমর্চিত অনুশীলন চাই। মনে করুন, রোগ দারিদ্র্য আলস্য বা তাদৃশ অন্য কোন কারণে কোন ব্যক্তির এই বৃত্তির সমর্চিত স্ফূর্তি হয় নাই। তাহার কি ঈশ্বরভক্তি ঘটিতে পারে না?

গুরু। আমি বলিয়াছি যে, যে অবস্থায় মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলাই ঈশ্বরানুবর্তী হয়, তাহাই ভক্তি। ঐ ব্যক্তির শারীরিক বল বেশী থাক, অল্প থাক, যতটুকু আছে, তাহা যদি ঈশ্বরানুবর্তী হয়, অর্থাৎ ঈশ্বরানুমত কার্যে প্রযুক্ত হয়—আর অন্য বৃত্তিগুলাও সেইরূপ হয়, তবে তাহার ঈশ্বরে ভক্তি হইয়াছে। তবে অনুশীলনের অভাবে, ঐ ভক্তির কার্যকারিতার সেই পরিমাণে হ্রাস ঘটিবে। এক জন দস্য একজন ভাল মানুষকে পীড়িত করিতেছে। মনে কর, দুই ব্যক্তি তাহা দেখিল। মনে কর, দুই জনেই ঈশ্বরে ভক্তিযুক্ত, কিন্তু এক জন বলবান্, অপর দুর্বল। যে বলবান্, সে ভাল মানুষকে দস্যহস্ত হইতে মুক্ত করিল, কিন্তু যে দুর্বল, সে চেষ্টা করিয়াও পারিল না। এই পরিমাণে, বৃত্তিবেশেষের অনুশীলনের অভাবে, দুর্বল ব্যক্তির মনুষ্যত্বের অসম্পূর্ণতা বলা যাইতে পারে, কিন্তু ভক্তির হ্রাস বলা যায় না। বৃত্তি সকলের সমর্চিত স্ফূর্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই; এবং সেই বৃত্তিগুলাই ভক্তির অনঙ্গামী না হইলেও মনুষ্যত্ব নাই! উভয়ের সমাবেশেই সম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব। ইহাতে বৃত্তিগুলাই স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইতেছে, অথচ ভক্তির প্রাধান্য বজায় থাকিতেছে। তাই বলিতেছিলাম যে, বৃত্তিগুলাই ঈশ্বর-সমর্পণ, এই কথা বঝিলেই মনুষ্যত্ব বঝিলে না। তাহার সঙ্গে এটুকুও বঝা চাই।

বিশ্বকম রচনাবলী

শিষ্য। এখন আরও আপত্তি আছে। যে উপদেশ অনুসারে কার্য হইতে পারে না, তাহা উপদেশই নহে। সকল বৃত্তিগর্ভাই কি ঈশ্বরগামী করা যায়? ক্রোধ একটা বৃত্তি, ক্রোধ কি ঈশ্বরগামী করা যায়?

গুরু। জগতে অতুল সেই মহাক্রোধগীতি তোমার কি স্মরণ হয়?

ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরোতি,
যাবৎ গিরঃ খে মরুতাং চরন্তি।
তাবৎ স বহির্ভবনেন্নজন্মা
ভস্মাবশেষং মদনঞ্চকার ॥

এই ক্রোধ মহাপবিত্র ক্রোধ—কেন না, যোগভঙ্গকারী কুপ্রবৃত্তি ইহার দ্বারা বিনষ্ট হইল। ইহা স্বয়ং ঈশ্বরের ক্রোধ। অন্য এক নীচ বৃত্তি যে ব্যাসদেব ঈশ্বরানুবর্তী হইয়াছিল, তাহার এক অতি চমৎকার উদাহরণ মহাভারতে আছে। কিন্তু তুমি ঊর্নবিংশ শতাব্দীর মানুষ। আমি তোমাকে তাহা বুঝাইতে পারিব না।

শিষ্য। আরও আপত্তি আছে—

গুরু। থাকাই সম্ভব। “যখন মনুষ্যের সকল বৃত্তিগর্ভাই ঈশ্বরমুখী বা ঈশ্বরানুবর্তী হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি।” এ কথাটা এত গুরুতর, ইহার ভিতর এমন সকল গুরুতর তত্ত্ব নিহিত আছে যে, ইহা তুমি যে একবার শুনিয়াই বুঝিতে পারিবে, এমন সম্ভাবনা কিছু মাত্র নাই। অনেক সন্দেহ উপস্থিত হইবে, অনেক গোলমাল ঠেকিবে, অনেক ছিদ্র দেখিবে, হয়ত পরিশেষে ইহাকে অর্থশূন্য প্রলাপ বোধ হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও সহসা নিরাশ হইও না। দিন দিন, মাস মাস, বৎসর বৎসর এই তত্ত্বের চিন্তা করিও। কার্যক্ষেত্রে ইহাকে ব্যবহৃত করিবার চেষ্টা করিও। ইক্ষনপুষ্ট অগ্নির ন্যায় ইহা ক্রমশ তোমার চক্ষে পরিষ্কৃত হইতে থাকিবে। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে তোমার জীবন সার্থক হইল বিবেচনা করিবে। মনুষ্যের শিক্ষণীয় এমন গুরুতর তত্ত্ব আর নাই। এক জন মনুষ্যের সমস্ত জীবন সংশিক্ষায় নিযুক্ত করিয়া, সে যদি শেষে এই তত্ত্ব আসিয়া উপস্থিত হয়, তবেই তাহার জীবন সার্থক জানিবে।

শিষ্য। যাহা এরূপ দুঃপ্রাপ্য, তাহা আপনিই বা কোথায় পাইলেন?

গুরু। অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদ্ভূত হইত, “এ জীবন লইয়া কি করিব?” “লইয়া কি করিতে হয়?” সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। অনেক প্রকার লোক-প্রচলিত উত্তর পাইয়াছি, তাহার সত্যাসত্য নিরূপণ জন্য অনেক ভোগ ভুগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি। যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক লিখিয়াছি, অনেক লোকের সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছি, এবং কার্যক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, দেশী বিদেশী শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি। জীবনের সার্থকতা সম্পাদন জন্য প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিয়াছি। এই পরিশ্রম, এই কষ্ট ভোগের ফলে এইটুকু শিখিয়াছি যে, সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্তিতাই ভক্তি, এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই। “জীবন লইয়া কি করিব।” এ প্রশ্নের এই উত্তর পাইয়াছি। ইহাই যথার্থ উত্তর, আর সকল উত্তর অযথার্থ। লোকের সমস্ত জীবনের পরিশ্রমের এই শেষ ফল; এই এক মাত্র সুফল। তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, আমি এ তত্ত্ব কোথায় পাইলাম। সমস্ত জীবন ধরিয়া, আমার প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া এত দিনে পাইয়াছি। তুমি এক দিনে ইহার কি বুঝিবে?

শিষ্য। আপনার কথাতে আমি ইহাই বুঝিতেছি যে, ভক্তির লক্ষণ সম্বন্ধে আমাকে যে উপদেশ দিলেন, ইহা আপনার নিজের মত। আৰ্য ঋষিরা এ তত্ত্ব অনবগত ছিলেন।

গুরু। মূর্খ! আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির এমন কি শক্তি থাকিবার সম্ভাবনা যে, যাহা আৰ্য ঋষিগণ জানিতেন না—আমি তাহা আবিষ্কৃত করিতে পারি। আমি যাহা বলিতেছিলাম, তাহার তাৎপর্য এই যে, সমস্ত জীবন চেষ্টা করিয়া তাঁহাদিগের শিক্ষার মৰ্ম গ্রহণ করিয়াছি। তবে, আমি যে ভাষায় তোমাকে ভক্তি বুঝাইলাম, সে ভাষায়, সে কথায় তাঁহারা ভক্তিতত্ত্ব বুঝান নাই। তোমরা ঊর্নবিংশ শতাব্দীর লোক—ঊর্নবিংশ শতাব্দীর ভাষাতেই তোমাদিগকে বুঝাইতে হয়। ভাষার প্রভেদ হইতেছে বটে, কিন্তু সত্য নিত্য। ভক্তি শাস্ত্রের সময়ে যাহা ছিল, তাহাই আছে। ভক্তির যথার্থ স্বরূপ যাহা, তাহা আৰ্য ঋষিদিগের উপদেশমধ্যে প্রাপ্তব্য। তবে যেমন সমুদ্রনিহিত রত্নের যথার্থ স্বরূপ, ডুব দিয়া না দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় না, তেমনি

অগাধ সমুদ্র হিন্দুশাস্ত্রের ভিতরে ডুব না দিলে, তদন্তর্নিহিত রত্নসকল চিনিতে পারা যায় না।

শিষ্য। আমার ইচ্ছা আপনার নিকট তাঁহাদের কৃত ভক্তিব্যাখ্যা শুন।

গুরু। শূন্য নিতান্ত আবশ্যিক; কেন না, ভক্তি হিন্দুরই জিনিস। খৃষ্টধর্মের ভক্তিবাদ আছে বটে, কিন্তু হিন্দুরই নিকট ভক্তির যথার্থ পরিণামপ্রাপ্তি হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদিগের কৃত ভক্তিব্যাখ্যা সর্বিস্তারে বলিবার বা শূনিবার আমার বা তোমার অবকাশ হইবে না। আর আমাদের মূখ্য উদ্দেশ্য অনুশীলনধর্ম বৃদ্ধা, তাহার জন্য সেরূপ সর্বিস্তার ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই; স্থূল কথা তোমাকে বলিয়া যাইব।

শিষ্য। আগে বলুন, ভক্তিবাদ কি চিরকালই হিন্দুধর্মের অংশ?

গুরু। না, তাহা নহে। বৈদিক ধর্মের ভক্তি নাই। বেদের ধর্মের পরিচয়, বোধ হয়, তুমি কিছু জান। সাধারণ উপাসকের সহিত সচরাচর উপাস্য দেবের যে সম্বন্ধ দেখা যায়, বৈদিক ধর্মের উপাস্য উপাসকের সেই সম্বন্ধ ছিল। 'হে ঠাকুর! আমার প্রদত্ত এই সোমরস পান কর! হবি ভোজন কর, আর আমাকে ধন দাও, সম্পদ দাও, পুত্র দাও, গোরু দাও, শস্য দাও, আমার শত্রুকে পরাস্ত কর।' বড় জোর বলিলেন, 'আমার পাপ ধ্বংস কর।' দেবগণকে এইরূপ অভিপ্রায়ে প্রসন্ন করিবার জন্য বৈদিকেরা যজ্ঞাদি করিতেন। এইরূপ কাম্য বস্তুর উদ্দেশ্যে যজ্ঞাদি করাকে কাম্য কর্ম বলে। কাম্যাদি কর্মাত্মক যে উপাসনা, তাহার সাধারণ নাম কর্ম। এই কাজ করিলে তাহার এই ফল, অতএব কাজ করিতে হইবে—এইরূপে ধর্মার্জনের যে পদ্ধতি, তাহারই নাম কর্ম। বৈদিক কালের শেষভাগে এইরূপ কর্মাত্মক ধর্মের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। যাগ যজ্ঞের দৌরাণ্যে ধর্মের প্রকৃত মর্ম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এমন অবস্থায় উচ্চ শ্রেণীর প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ দেখিতে পাইলেন যে, এই কর্মাত্মক ধর্ম বৃথাধর্ম। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বুঝিয়াছিলেন যে, বৈদিক দেবদেবীর কল্পনায় এই জগতের অস্তিত্ব বৃদ্ধা যায় না; ভিতরে ইহার একটা অনন্ত অজ্ঞেয় কারণ আছে। তাঁহারা সেই কারণের অনুসন্ধান তৎপর হইলেন।

এই সকল কারণে ধর্মের উপর অনেকে বীতশ্রদ্ধ হইলেন। তাঁহারা ত্রিবিধ বিপ্লব উপস্থিত করিলেন—সেই বিপ্লবের ফলে আশিয়া প্রদেশ অদ্যাপি শাসিত। এক দল চার্বাক,—তাঁহারা বলিলেন, কর্মকাণ্ড সকলই মিথ্যা—খাও দাও, নেচে বেড়াও। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের সৃষ্টিকর্তা ও নেতা শাক্যসিংহ—তিনি বলিলেন, কর্মফল মানি বটে, কিন্তু কর্ম হইতেই দুঃখ। কর্ম হইলে পুনর্জন্ম, অতএব ধর্মের ধ্বংস কর, তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া চিত্তসংযমপূর্বক অষ্টাঙ্গ ধর্মপথে গিয়া নির্ব্বাণ লাভ কর। তৃতীয় বিপ্লব দার্শনিকদিগের দ্বারা উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহারা প্রায় ব্রহ্মবাদী। তাঁহারা দেখিলেন যে, জগতের যে অনন্ত কারণভূত চৈতন্যের অনুসন্ধান তাঁহারা প্রবৃত্ত, তাহা অতিশয় দুঃস্বপ্ন। সেই ব্রহ্ম জানিতে পারিলে—সেই জগতের অন্তরাখ্যা বা পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ, এবং জগতের সঙ্গেই বা তাঁহার বা আমাদের কি সম্বন্ধ, তাহা জানিতে পারিলে, বৃদ্ধা যাইতে পারে যে, এ জীবন লইয়া কি করিতে হইবে। সেটা জানা কঠিন—তাহা জানাই ধর্ম। অতএব জ্ঞানই ধর্ম—জ্ঞানেই নিঃশ্রেয়স। বেদের যে অংশকে উপনিষদ্ বলা যায়, তাহা এই প্রথম জ্ঞানবাদীদিগের কীর্তি। ব্রহ্মনিরূপণ এবং আত্মজ্ঞানই উপনিষদ্ সকলের উদ্দেশ্য। তার পর ছয় দর্শনে এই জ্ঞানবাদ আরও বিবর্তিত ও প্রচারিত হইয়াছে। কপিলের সাংখ্যে ব্রহ্ম পরিত্যক্ত হইলেও সে দর্শনশাস্ত্র জ্ঞানবাদাত্মক। দর্শনের মধ্যে কেবল পূর্ব্বমীমাংসা কর্মবাদী—আর সকলেই জ্ঞানবাদী।

শিষ্য। জ্ঞানবাদ বড় অসম্পূর্ণ বলিয়া আমার বোধ হয়। জ্ঞানে ঈশ্বরকে জানিতে পারি বটে, কিন্তু জ্ঞানে কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়? জানিলেই কি পাওয়া যায়? ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মার একত্ব, মনে করুন বৃদ্ধিতে পারিলাম—বৃদ্ধিতে পারিলেই কি ঈশ্বরে মিলিত হইলাম? দুইকে এক করিয়া মিলাইয়া দিবে কে?

গুরু। এই ছিদ্রেই ভক্তিবাদের সৃষ্টি। ভক্তিবাদী বলিলেন, জ্ঞানে ঈশ্বর জানিতে পারি বটে, কিন্তু জানিতে পারিলেই কি তাঁহাকে পাইলাম? অনেক জিনিস আমরা জানিয়াছি—জানিয়াছি বলিয়া কি তাহা পাইয়াছি? আমরা যাহাকে দ্বেষ করি, তাহাকেও ত জানি, কিন্তু তাহার সঙ্গে কি আমরা মিলিত হইয়াছি? আমরা যদি ঈশ্বরের প্রতি দ্বেষ করি, তবে কি

বস্কম রচনাবলী

তাঁহাকে পাইব? বরং যাহার প্রতি আমাদের অনুরাগ আছে, তাহাকে পাইবার সম্ভাবনা। যে শরীরী, তাহাকে কেবল অনুরাগে না পাইলে না পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু যিনি অশরীরী, তিনি কেবল অন্তঃকরণের দ্বারাই প্রাপ্য। অতএব তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ থাকিলেই আমরা তাঁহাকে পাইব। সেই প্রকারের অনুরাগের নাম ভক্তি। শাণ্ডিল্যসূত্রের দ্বিতীয় সূত্র এই—
“সা (ভক্তিঃ) পরানুরক্তিরীশ্বরে।”

শিষ্য। ভক্তিবাদের উৎপত্তির এই ইতিবৃত্ত শুনিয়া আমি বিশেষ আপ্যায়িত হইলাম। ইহা না শুনিলে ভক্তিবাদ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতাম না। শুনিয়া আর একটা কথা মনে উদয় হইতেছে। সাহেবেরা এবং দয়ানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি এদেশীয় পণ্ডিতেরা বৈদিক ধর্মকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া থাকেন, এবং পৌরাণিক বা আধুনিক হিন্দুধর্মকে নিকৃষ্ট বলিয়া থাকেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি, এ কথা অতিশয় অযথার্থ। ভক্তিশূন্য যে ধর্ম, তাহা অসম্পূর্ণ বা নিকৃষ্ট ধর্ম—অতএব বেদে যখন ভক্তি নাই, তখন বৈদিক ধর্মই নিকৃষ্ট, পৌরাণিক বা আধুনিক বৈষ্ণবদি ধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। যাহারা এ সকল ধর্মের লোপ করিয়া বৈদিক ধর্মের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত বিবেচনা করি।—

গুরু। কথা যথার্থ। তবে ইহাও বলিতে হয় যে, বেদে যে ভক্তিবাদ কোথাও নাই, ইহাও ঠিক নহে। শাণ্ডিল্যসূত্রের টীকাকার স্বপ্নেশ্বর ছান্দোগ্য উপনিষদ্ হইতে একটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে ভক্তি শব্দ ব্যবহৃত না থাকিলেও ভক্তিবাদের সার মর্ম তাহাতে আছে। বচনটি এই—“আত্মবেদং সর্বমিতি। স বা এষ এব পশ্যন্তেবং মন্বান এবং বিজানন্তাত্মরতি-
রাত্মনীড় আত্মমিত্বন আত্মানন্দঃ স স্বরাড্ ভবতীতি।”

ইহার অর্থ এই যে, আত্মা এই সকলই (অর্থাৎ পদার্থে যাহা বলা হইয়াছে)। যে ইহা দেখিয়া, ইহা ভাবিয়া, ইহা জানিয়া, আত্মায় রত হয়, আত্মাতে ক্রীড়াশীল হয়, আত্মাই যাহার মিত্বন (সহচর), আত্মাই যাহার আনন্দ, সে স্বরাজ (আপনার রাজা বা আপনার দ্বারা রঞ্জিত) হয়। ইহা যথার্থ ভক্তিবাদ।

দ্বাদশ অধ্যায়—ভক্তি

ঈশ্বরে ভক্তি—শাণ্ডিল্য

গুরু। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাই ভক্তিতত্ত্বের প্রধান গ্রন্থ। কিন্তু গীতোক্ত ভক্তিতত্ত্ব তোমাকে বুঝাইবার আগে ঐতিহাসিক প্রথাক্রমে বেদে যতটুকু ভক্তিতত্ত্ব আছে, তাহা তোমাকে শুনান ভাল। বেদে এ কথা প্রায় নাই, ছান্দোগ্য উপনিষদে কিছু আছে, ইহা বলিয়াছি। যাহা আছে, তাহার সহিত শাণ্ডিল্য মহর্ষির নাম সংযুক্ত।

শিষ্য। যিনি ভক্তিসূত্রের প্রণেতা?

গুরু। প্রথমে তোমাকে আমার বলা কর্তব্য যে, দুই জন শাণ্ডিল্য ছিলেন, বোধ হয়। এক জন উপনিষদসূত্র এই ঋষি। আর এক জন শাণ্ডিল্য-সূত্রের প্রণেতা। প্রথমোক্ত শাণ্ডিল্য প্রাচীন ঋষি, দ্বিতীয় শাণ্ডিল্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক পণ্ডিত। ভক্তিসূত্রের ৩১ সূত্রে প্রাচীন শাণ্ডিল্যের নাম উদ্ধৃত হইয়াছে।

শিষ্য। অথবা এমন হইতে পারে যে, আধুনিক সূত্রকার প্রাচীন ঋষির নামে আপনার গ্রন্থখানি চালাইয়াছেন। এক্ষণে প্রাচীন ঋষি শাণ্ডিল্যের মতই ব্যাখ্যা করুন।

গুরু। দর্ভাগ্যক্রমে সেই প্রাচীন ঋষি-প্রণীত কোন গ্রন্থ বর্তমান নাই। বেদান্তসূত্রের শঙ্করাচার্য্য যে ভাষ্য করিয়াছেন, তন্মধ্যে সূত্রবিশেষের ভাষ্যের ভাবার্থ হইতে কোলরুক সাহেব এইরূপ অনুমান করেন, পঞ্চরাত্রের প্রণেতা এই প্রাচীন ঋষি শাণ্ডিল্য। তাহা হইতেও পারে, না হইতেও পারে; পঞ্চরাত্রে ভাগবত ধর্ম কথিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এইরূপ সামান্য মূলের উপর নির্ভর করিয়া স্থির করা যায় না যে, শাণ্ডিল্যই পঞ্চরাত্রের প্রণেতা। ফলে প্রাচীন ঋষি শাণ্ডিল্য যে ভক্তিমর্মের এক জন প্রবর্তক, তাহা বিবেচনা করিবার অনেক কারণ আছে। কথিত ভাষ্যে জ্ঞানবাদী শঙ্কর, ভক্তিবাদী শাণ্ডিল্যের নিন্দা করিয়া বলিতেছেন।—

“বেদপ্রতিষেধশ্চ ভবতি। চতুষ্টয় বেদেষু পরং শ্রেয়োহলক্কা শাণ্ডিল্য ইদং শাস্ত্রমধিগতবান্। ইত্যাদি বেদনিন্দাদর্শনাৎ। তস্মাদসঙ্গতা এষা কল্পনা ইতি সিদ্ধাঃ।”

অর্থাৎ, “ইহাতে বেদের বিপ্রতিষেধ হইতেছে। চতুর্বেদে পরং শ্রেয়ঃ লাভ না করিয়া শাণ্ডিল্য এই শাস্ত্র অধিগমন করিয়াছিলেন। এই সকল বেদানন্দা দর্শন করায় সিদ্ধ হইতেছে যে, এ সকল কল্পনা অসঙ্গত।”

শিষ্য। কিন্তু এই প্রাচীন ঋষি শাণ্ডিল্য ভক্তিবাদে কত দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা জানিবার কিছ্ৰ উপায় আছে কি?

গুরু। কিছ্ৰ আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয় প্রপাঠকের চতুর্দশ অধ্যায় হইতে একটু পড়িতেছি, শ্রবণ কর!—

“সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ সর্বমিদমভ্যাতোহবাক্যানাদর এষ ম আত্মান্তর্হৃদয় এতদ্রক্ষৈতমিতঃ প্রেত্যাভিসম্ভাবিতাস্মীতি যস্য স্যাদদ্ধা ন বিচিকিৎসাহস্তীতিহস্মাৎ শাণ্ডিল্যঃ শাণ্ডিল্যঃ।”

অর্থাৎ, “সর্বকর্মা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্বরস এই জগতে পরিব্যাপ্ত বাক্যবিহীন, এবং আপ্তকাম হেতু আদরের অপেক্ষা করেন না এই আমার আত্মা হৃদয়ের মধ্যে, ইনিই ব্রহ্ম। এই লোক হইতে অবসৃত হইয়া, ইহাকেই সুস্পষ্ট অনুভব করিয়া থাকি। যাঁহার ইহাতে শ্রদ্ধা থাকে, তাঁহার ইহাতে সংশয় থাকে না। ইহা শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন।”

এ কথা বড় অধিক দূর গেল না। এ সকল উপনিষদের জ্ঞানবাদীরাও বলিয়া থাকেন। “শ্রদ্ধা” কথা ভক্তিবাদক নহে বটে, তবে শ্রদ্ধা থাকিলে সংশয় থাকে না, এ সকল ভক্তির কথা বটে। কিন্তু আসল কথাটা বেদান্তসারে পাওয়া যায়। বেদান্তসারকর্তা সদানন্দাচার্য উপাসনা শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—“উপাসনানি সগুণব্রহ্মবিষয়কমানসব্যাপাররূপাণি শাণ্ডিল্য-বিদ্যাধীন।”

এখন একটু অনুধাবন করিয়া বঝ। হিন্দুধর্ম ঈশ্বরের দ্বিবিধ কল্পনা আছে—অথবা ঈশ্বরকে হিন্দুরা দুই রকমে বঝিয়া থাকে। ঈশ্বর নিগুণ এবং ঈশ্বর সগুণ। তোমাদের ইংরেজিতে যাহাকে “Absolute” বা “Unconditioned” বলে, তাহাই নিগুণ। যিনি নিগুণ, তাঁহার কোন উপাসনা হইতে পারে না; যিনি নিগুণ, তাঁহার কোন গুণানুবাদ করা যাইতে পারে না; যিনি নিগুণ, যাঁহার কোন “Conditions of Existence” নাই বা বলা যাইতে পারে না—তাঁহাকে কি বলিয়া ডাকিব? কি বলিয়া তাঁহার চিন্তা করিব? অতএব কেবল সগুণ ঈশ্বরেরই উপাসনা হইতে পারে। নিগুণবাদে উপাসনা নাই। সগুণ বা ভক্তিবাদী অর্থাৎ শাণ্ডিল্যাদিই উপাসনা করিতে পারেন। অতএব বেদান্তসারের এই কথা হইতে দুইটি বিষয় সিদ্ধ বলিয়া মনে করিতে পারি। প্রথম, সগুণবাদের প্রথম প্রবর্তক শাণ্ডিল্য, ও উপাসনারও প্রথম প্রবর্তক শাণ্ডিল্য। আর ভক্তি সগুণবাদেরই অনুসারিণী।

শিষ্য। তবে কি উপনিষদ্ সমুদয় নিগুণবাদী?

গুরু। ঈশ্বরবাদীর মধ্যে কেহ প্রকৃত নিগুণবাদী আছে কি না, সন্দেহ। যে প্রকৃত নিগুণবাদী, তাহাকে নাস্তিক বলিলেও হয়। তবে, জ্ঞানবাদীরা মায়া নামে ঈশ্বরের একটি শক্তি কল্পনা করেন। সেই মায়াই এই জগৎসৃষ্টির কারণ। সেই মায়ার জন্যই আমরা ঈশ্বরকে জানিতে পারি না। মায়া হইতে বিমুক্ত হইতে পারিলেই ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে এবং ব্রহ্মে লীন হইতে পারা যায়। অতএব ঈশ্বর তাঁহাদের কাছে কেবল জ্ঞেয়। এই জ্ঞান ঠিক “জানা” নহে। সাধন ভিন্ন সেই জ্ঞান জন্মিতে পারে না। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান এবং শ্রদ্ধা, এই ছয় সাধনা। ঈশ্বরবিষয়ক শ্রবণ, মনন ও নির্দিধ্যাসন ব্যতিরেকে অন্য বিষয় হইতে অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহই শম। তাহা হইতে বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ দম। তদতিরিক্ত বিষয় হইতে নিবর্তিত বাহ্যেন্দ্রিয়ের দমন, অথবা বিধিপূর্বক বিহিত কর্মের পরিত্যাগই উপরতি। শীতোষ্ণাদি সহন, তিতিক্ষা। মনের একাগ্রতা, সমাধান। গুরুবাক্যাদিতে বিশ্বাস, শ্রদ্ধা। সর্বত্র এইরূপ সাধন কথিত হইয়াছে, এমত নহে। কিন্তু ধ্যান ধারণা তপসাদি প্রায়ই জ্ঞানবাদীর পক্ষে বিহিত। অতএব জ্ঞানবাদীরও উপাসনা আছে। উহা অনুশীলন বটে। আমি তোমাকে বঝাইয়াছি যে, উপাসনাও অনুশীলন। অতএব জ্ঞানবাদীর ঈদৃশ অনুশীলনকে তুমি উপাসনা বলিতে পার। কিন্তু সে উপাসনা যে অসম্পূর্ণ, তাহাও পূর্ব্ব যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ করিলে বঝিতে পারিবে। যথার্থ উপাসনা ভক্তি-প্রসূত। ভক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যায় গীতোক্ত ভক্তিতত্ত্ব তোমাকে বঝাইতে হইবে। সেই সময়ে এ কথা আর একটু স্পষ্ট হইবে।

বীজকম রচনাবলী

শিষ্য। এক্ষণে আপনার নিকট যাহা শুনিলাম, তাহাতে কি এমন বৃদ্ধিতে হইবে যে, সেই প্রাচীন ঋষি শান্ডিল্যই ভক্তিমার্গের প্রথম প্রবর্তক?

গুরু। ছান্দোগ্য উপনিষদে যেমন শান্ডিল্যের নাম আছে, তেমন দেবকীনন্দন কৃষ্ণেরও নাম আছে। অতএব কৃষ্ণ আগে, কি শান্ডিল্য আগে, তাহা আমি জানি না; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ কি শান্ডিল্য ভক্তিমার্গের প্রথম প্রবর্তক, তাহা বলিতে পারি না।

ত্রয়োদশ অধ্যায়—ভক্তি

ভগবৎগীতা—স্থূল উদ্দেশ্য

শিষ্য। এক্ষণে গীতোক্ত ভক্তিতত্ত্বের কথা শুনিলার বাসনা করি।

গুরু। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের নাম ভক্তিযোগ। কিন্তু প্রকৃত ভক্তির ব্যাখ্যা দ্বাদশ অধ্যায়ে অতি অল্পই আছে। দ্বিতীয় হইতে দ্বাদশ পর্যন্ত সকল অধ্যায়গুলির পর্য্যালোচনা না করিলে, গীতোক্ত প্রকৃত ভক্তিতত্ত্ব বুঝা যায় না। যদি গীতার ভক্তিতত্ত্ব বুঝিতে চাও, তাহা হইলে এই এগার অধ্যায়ের কথা কিছু বুঝিতে হইবে। এই এগার অধ্যায়ে জ্ঞান, কর্ম এবং ভক্তি, তিনেরই কথা আছে—তিনেরই প্রশংসা আছে। যাহা আর কোথাও নাই, তাহাও ইহাতে আছে। জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সামঞ্জস্য আছে। এই সামঞ্জস্য আছে বলিয়াই ইহাকে সর্বোৎকৃষ্ট ধর্মগ্রন্থ বলা যাইতে পারে। কিন্তু সেই সামঞ্জস্যের প্রকৃত তাৎপর্য এই যে, এই তিনের চরমাবস্থা যাহা, তাহা ভক্তি। এই জন্য গীতা প্রকৃত পক্ষে ভক্তিশাস্ত্র।

শিষ্য। কথাগুলি একটু অসঙ্গত লাগিতেছে। আত্মীয় অন্তরঙ্গ বধ করিয়া রাজ্যলাভ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া অর্জুন যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতেন, কৃষ্ণ তাঁহাকে প্রবৃত্তি দিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন—ইহাই গীতার বিষয়। অতএব ইহাকে ঘাতকশাস্ত্র বলাই বিধেয়; ইহাকে ভক্তিশাস্ত্র বলিব কি জন্য?

গুরু। অনেকের অভ্যাস আছে যে, তাঁহারা গ্রন্থের একখানা পাতা পড়িয়া মনে করেন, আমরা এ গ্রন্থের মর্ম গ্রহণ করিয়াছি। যাঁহারা এই শ্রেণীর পণ্ডিত, তাঁহারা ভগবৎগীতাকে ঘাতক-শাস্ত্র বলিয়া বুঝিয়া থাকেন। স্থূল কথা এই যে, অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু সে কথা এখন থাক্। যুদ্ধ মাত্র যে পাপ নহে, এ কথা তোমাকে পূর্বে বুঝাইয়াছি।

শিষ্য। বুঝাইয়াছেন যে, আত্মরক্ষার্থ এবং স্বদেশরক্ষার্থ যুদ্ধ ধর্মমধ্যে গণ্য।

গুরু। এখানে অর্জুন আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত। কেন না, আপনার সম্পত্তি উদ্ধার—আত্মরক্ষার অন্তর্গত।

শিষ্য। যে নরপিশাচ অনর্থক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, সেই এই কথা বলিয়া যুদ্ধপ্রবৃত্ত হয়। নরপিশাচপ্রধান প্রথম নেপোলেয়ন্ ফ্রান্স রক্ষার ওজর করিয়া ইউরোপ নরশোণিতে প্লাবিত করিয়াছিল।

গুরু। তাহার ইতিহাস যখন নিরপেক্ষ লেখকের দ্বারা লিখিত হইবে, তখন জানিতে পারিবে, নেপোলেয়নের কথা মিথ্যা নহে। নেপোলেয়ন্ নরপিশাচ ছিলেন না। যাক্—সে কথা বিচার্য্য নহে। আমাদের বিচার্য্য এই যে, অনেক সময় যুদ্ধও পুণ্য কর্ম।

শিষ্য। কিন্তু সে কখন?

গুরু। এ কথার দুই উত্তর আছে। এক, ইউরোপীয় হিতবাদীর উত্তর। সে উত্তর এই যে, যুদ্ধে যেখানে লক্ষ লোকের অনিষ্ট করিয়া কোটি কোটি লোকের হিত সাধন করা যায়, সেখানে যুদ্ধ পুণ্য কর্ম। কিন্তু কোটি লোকের জন্য এক লক্ষ লোককেই বা সংহার করিবার আমাদের কি অধিকার? এ কথার উত্তর হিতবাদী দিতে পারেন না। দ্বিতীয় উত্তর ভারতবর্ষীয়। এই উত্তর আধ্যাত্মিক এবং পারমার্থিক। হিন্দুর সকল নীতির মূল আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক। সেই মূল, যুদ্ধের কর্তব্যতার ন্যায় এমন একটা কঠিন তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া যেমন বিশদরূপে বুঝান যায়, সামান্য তত্ত্বের উপলক্ষে সেরূপ বুঝান যায় না। তাই গীতাকার অর্জুনের যুদ্ধে অপ্রবৃত্তি কল্পিত করিয়া, তদুপলক্ষে পরম পবিত্র ধর্মের আমূল ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

শিষ্য। কথাটা কিরূপে উঠতেছে?

গুরু। ভগবান্ কৰ্তব্যাকৰ্তব্য সম্বন্ধে অজ্ঞানকে প্রথমে দ্বিবিধ অনুষ্ঠান বুঝাইতেছেন। প্রথমে আধ্যাত্মিকতা, অর্থাৎ আত্মার অনশ্বরতা প্রভৃতি, যাহা জ্ঞানের বিষয়। ইহা জ্ঞানযোগ বা সাংখ্যযোগ নামে অভিহিত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি বলিতেছেন,—

লোকেহস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কৰ্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩।৩

ইহার মধ্যে জ্ঞানযোগ প্রথমতঃ সংক্ষেপে বুঝাইয়া কৰ্মযোগ সবিস্তারে বুঝাইয়াছেন। এই জ্ঞান ও কৰ্ম যোগ প্রভৃতি বুঝিলে তুমি জানিতে পারিবে যে, গীতা ভক্তিশাস্ত্র—তাই এত সবিস্তারে ভক্তির ব্যাখ্যায়, গীতার পরিচয় দিতেছি।

চতুর্দশ অধ্যায়—ভক্তি

ভগবঙ্গীতা—কৰ্ম

গুরু। এক্ষণে তোমাকে গীতোক্ত কৰ্মযোগ বুঝাইতেছি, কিন্তু তাহা শুনিলেই তাহা শুনিলেই ভক্তির আমি যে ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহা মনে কর। মনুষ্যের যে অবস্থায় সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরভীতমুখী হয়, মানসিক সেই অবস্থা অথবা যে বৃত্তির প্রাবল্যে এই অবস্থা ঘটে, তাহাই ভক্তি। এক্ষণে শ্রবণ কর।

শ্রীকৃষ্ণ কৰ্মযোগের প্রশংসা করিয়া অজ্ঞানকে কৰ্ম প্রবৃত্তি দিতেছেন।

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকৰ্মকৃৎ।
কার্যতে হ্যবশঃ কৰ্ম সৰ্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৩।৫

কেহই কখন নিষ্কৰ্ম হইয়া অবস্থান করিতে পারে না। কৰ্ম না করিলে প্রকৃতিজাত গুণসকলের দ্বারা কৰ্ম প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অতএব কৰ্ম করিতেই হইবে। কিন্তু সে কি কৰ্ম?

কৰ্ম বলিলে বেদোক্ত কৰ্মই বুঝাইত, অর্থাৎ আপনার মঙ্গলকামনায় দেবতার প্রসাদার্থ যাগযজ্ঞ ইত্যাদি বুঝাইত, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। অর্থাৎ কাম্য কৰ্ম বুঝাইত। এইখানে প্রাচীন বেদোক্ত ধর্মের সঙ্গে কৃষ্ণোক্ত ধর্মের প্রথম বিবাদ, এইখান হইতে গীতোক্ত ধর্মের উৎকর্ষের পরিচয়ের আরম্ভ। সেই বেদোক্ত কাম্য কৰ্মের অনুষ্ঠানের নিন্দা করিয়া কৃষ্ণ বলিতেছেন,

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকৰ্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বৰ্য্যগতিং প্রতি ॥
ভোগৈশ্বৰ্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ২।৪২-৪৪

“যাহারা বক্ষ্যমাণরূপ শ্রুতিসুখকর বাক্য প্রয়োগ করে, তাহারা বিবেকশূন্য। যাহারা বেদবাক্যে রত হইয়া, ফলসাধন কৰ্ম ভিন্ন আর কিছই নাই, ইহা বলিয়া থাকে, যাহারা কাম-পরবশ হইয়া স্বর্গই পরমপুরুষার্থ মনে করিয়া জন্মই কৰ্মের ফল ইহা বলিয়া থাকে, যাহারা (কেবল) ভোগৈশ্বৰ্য্যপ্রাপ্তির সাধনীভূত ক্রিয়াবিশেষবহুল বাক্য মাত্র প্রয়োগ করে, তাহারা অতি মূর্খ। এইরূপ বাক্যে অপহৃতচিত্ত ভোগৈশ্বৰ্য্যপ্রসক্ত ব্যক্তিদিগের ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি কখন সমাধিতে নিহিত হইতে পারে না।”

অর্থাৎ বৈদিক কৰ্ম বা কাম্য কৰ্মের অনুষ্ঠান ধর্ম নহে। অথচ কৰ্ম করিতেই হইবে। তবে কি কৰ্ম করিতে হইবে? যাহা কাম্য নহে, তাহাই নিষ্কাম। যাহা নিষ্কাম ধর্ম বলিয়া পরিচিত, তাহা কৰ্মমার্গ মাত্র, কৰ্মের অনুষ্ঠান।

শিষ্য। নিষ্কাম কৰ্ম কাহাকে বলে?

বিক্রম রচনাবলী

গুরু। নিষ্কাম কর্মের এই লক্ষণ ভগবান্ নির্দেশ করিতেছেন,
কর্মণ্যেবার্থিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।

মা কর্মফলহেতুভূমা তে সঙ্গোহস্তকর্মণি ॥ ২।৪৭

অর্থাৎ, তোমার কর্মই অধিকার, কদাচ কর্মফলে যেন না হয়। কর্মের ফলার্থী হইও না; কর্মত্যাগেও প্রবৃত্তি না হউক।

অর্থাৎ, কর্ম করিতে আপনাকে বাধ্য মনে করিবে, কিন্তু তাহার কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা করিবে না।

শিষ্য। ফলের আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে কর্ম করিব কেন? যদি পেট ভরিবার আকাঙ্ক্ষা না রাখি, তবে ভাত খাইব কেন?

গুরু। এইরূপ ভ্রম ঘটিবার সম্ভাবনা বলিয়া ভগবান্ পর-শ্লোকে ভাল করিয়া বুঝাইতেছেন—

“যোগস্থঃ কুরু কর্মণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়!”

অর্থাৎ, হে ধনঞ্জয়! সঙ্গ ত্যাগ করিয়া যোগস্থ হইয়া কর্ম কর।

শিষ্য। কিছই বুঝিলাম না। প্রথম—সঙ্গ কি?

গুরু। আসক্তি। যে কর্ম করিতেছ, তাহার প্রতি কোন প্রকার অনুরাগ না থাকে। ভাত খাওয়ার কথা বলিতোছিলে। ভাত খাইতে হইবে সন্দেহ নাই; কেন না, “প্রকৃতিজ গুণে” তোমাকে খাওয়াইবে, কিন্তু আহারে যেন অনুরাগ না হয়। ভোজনে অনুরাগযুক্ত হইয়া ভোজন করিও না।

শিষ্য। আর “যোগস্থ” কি?

গুরু। পর-চরণে তাহা কথিত হইতেছে।

যোগস্থঃ কুরু কর্মণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূষা সমস্বং যোগ উচ্যতে ॥

কর্ম করিবে, কিন্তু কর্ম সিদ্ধ হউক, অসিদ্ধ হউক, সমান জ্ঞান করিবে। তোমার যত দূর কর্তব্য, তাহা তুমি করিবে। তাতে তোমার কর্ম সিদ্ধ হয় আর নাই হয়, তুল্য জ্ঞান করিবে। এই যে সিদ্ধ্যসিদ্ধিকে সমান জ্ঞান করা, ইহাকেই ভগবান্ যোগ বলিতেছেন। এইরূপ যোগস্থ হইয়া, কর্ম আসক্তিশূন্য হইয়া কর্মের যে অনুষ্ঠান করা, তাহাই নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠান।

শিষ্য। এখনও বুঝিলাম না। আমি সিংধকাটি লইয়া আপনার বাড়ী চুরি করিতে যাইতোছি। কিন্তু আপনি সজাগ আছেন, এজন্য চুরি করিতে পারিলাম না। তার জন্য দুঃখিত হইলাম না। ভাবিলাম, “আচ্ছা, হলো হলো, না হলো না হলো।” আমি কি নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান করিলাম?

গুরু। কথাটা ঠিক সোণার পাথরবাটির মত হইল। তুমি মদুখে, হলো হলো, না হলো না হলো বল, আর নাই বল, তুমি যদি চুরি করিবার অভিপ্রায় কর, তাহা হইলে তুমি কখনই মনে এরূপ ভাবিতে পারিবে না। কেন না, চুরির ফলাকাঙ্ক্ষী না হইয়া, অর্থাৎ অপহৃত ধনের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া, তুমি কখন চুরি করিতে যাও নাই। যাহাকে “কর্ম” বলা যাইতেছে, চুরি তাহার মধ্যে নহে। “কর্ম” কি তাহা পরে বুঝাইতেছি। কিন্তু চুরি “কর্ম” মধ্যে গণ্য হইলেও তুমি তাহা অনাসক্ত হইয়া কর নাই। এজন্য ঈদৃশ কর্মানুষ্ঠানকে সৎ ও নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠান বলা যাইতে পারে না।

শিষ্য। ইহাতে যে আপত্তি, তাহা পদ্বেষ্ট করিয়াছি। মনে করুন, আমি বিড়ালের মত ভাত খাইতে বসি, বা উইলিয়ম দি সাইলেন্টের মত দেশোদ্ধার করিতে বসি, দুইয়েতেই আমাকে ফলার্থী হইতে হইবে। অর্থাৎ উদরপূর্তির আকাঙ্ক্ষা করিয়া ভাতের পাতে বসিতে হইবে, এবং দেশের দুঃখনিবারণ আকাঙ্ক্ষা করিয়া দেশের উদ্ধারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

গুরু। ঠিক সেই কথারই উত্তর দিতে যাইতেছিলাম। তুমি যদি উদরপূর্তির আকাঙ্ক্ষা করিয়া ভাত খাইতে বসো, তবে তোমার কর্ম নিষ্কাম হইল না। তুমি যদি দেশের দুঃখ নিজের দুঃখতুল্য বা তদধিক ভাবিয়া তাহার উদ্ধারের চেষ্টা করিলে, তাহা হইলেও কর্ম নিষ্কাম হইল না।

শিষ্য। যদি সে আকাঙ্ক্ষা না থাকে, তবে কেনই এই কর্ম প্রবৃত্ত হইবে?

গুরু। কেবল ইহা তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম বলিয়া। আহার এবং দেশোদ্ধার, উভয়ই তোমার অনুষ্ঠেয়। চৌর্য্য তোমার অনুষ্ঠেয় নহে।

শিষ্য। তবে কোন্ কর্ম অনুষ্ঠেয়, আর কোন্ কর্ম অনুষ্ঠেয় নহে, তাহা কি প্রকারে জানিব? তাহা না বলিলে ত নিষ্কাম ধর্মের গোড়াই বোঝা গেল না?

গুরু। এ অপদূর্ব্ব ধর্ম-প্রণেতা কোন কথাই ছাড়িয়া যান নাই। কোন্ কর্ম অনুষ্ঠেয়, তাহা বলিতেছেন,—

যজ্ঞার্থাৎ কর্মগোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ।

তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মনুস্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৩।৯

এখানে যজ্ঞ শব্দে ঈশ্বর। আমার কথায় তোমার ইহা বিশ্বাস না হয়, স্বয়ং শঙ্করাচার্যের কথার উপর নির্ভর কর। তিনি এই শ্লোকের ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

“যজ্ঞো বৈ বিযুর্জিতি শ্রুতেষজ্ঞ ঈশ্বরস্তদর্থং।”

তাহা হইলে শ্লোকের অর্থ হইল এই যে, ঈশ্বরার্থ বা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট যে কর্ম, তদ্বিন অন্য কর্ম বন্ধন মাত্র (অনুষ্ঠেয় নহে); অতএব কেবল ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্মই করিবে। ইহার ফল দাঁড়ায় কি? দাঁড়ায় যে, সমস্ত বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরমুখী করিবে, নহিলে সকল কর্ম ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম হইবে না। এই নিষ্কাম ধর্মই নামান্তরে ভক্তি। এইরূপে কর্ম ও ভক্তির সামঞ্জস্য। কর্মের সহিত ভক্তির ঐক্য স্থানান্তরে আরও স্পষ্টীকৃত হইতেছে। যথা—

ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যাস্যাধ্যাত্মচেতসা।

নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যদ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥

অর্থাৎ বিবেকবুদ্ধিতে কর্মসকল আঘাতে অপর্ণ করিয়া, নিষ্কাম হইয়া এবং মমতা ও বিকার-শূন্য হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

শিষ্য। ঈশ্বরে কর্ম অপর্ণ কি প্রকারে হইতে পারে?

গুরু। “অধ্যাত্মচেতসা” এই বাক্যের সঙ্গে “সংন্যাস্য” শব্দ বন্ধিতে হইবে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য “অধ্যাত্মচেতসা” শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, “অহং কর্তেশ্বরায় ভূত্যবৎ করোমীত্যনয়া বুদ্ধ্যা।” “কর্তা যিনি ঈশ্বর, তাঁহারই জন্য, তাঁহার ভূত্যস্বরূপ এই কাজ করিতেছি।” এইরূপ বিবেচনায় কাজ করিলে, কৃষ্ণে কর্মোপর্ণ হইল।

এখন এই কর্মযোগ বন্ধিলে? প্রথমতঃ কর্ম অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু কেবল অনুষ্ঠেয় কর্মই কর্ম। যে কর্ম ঈশ্বরোদ্দিষ্ট, অর্থাৎ ঈশ্বরভিষেত, তাহাই অনুষ্ঠেয়। তাহাতে আসক্তিশূন্য এবং ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সিদ্ধি অসিদ্ধি তুল্য জ্ঞান করিবে। কর্ম ঈশ্বরে অপর্ণ করিবে অর্থাৎ কর্ম তাঁহার, আমি তাঁহার ভূত্য স্বরূপ কর্ম করিতেছি, এইরূপ বুদ্ধিতে কর্ম করিবে; তাহা হইলেই কর্মযোগ সিদ্ধ হইল।

ইহা করিতে গেলে কার্য্যকারিণী ও শারীরিকী বৃত্তি সকলকেই ঈশ্বরমুখী করিতে হইবে। অতএব কর্মযোগই ভক্তিযোগ। ভক্তির সঙ্গে ইহার ঐক্য ও সামঞ্জস্য দেখিলে। এই অপদূর্ব্ব তত্ত্ব, অপদূর্ব্ব ধর্ম কেবল গীতাতেই আছে। এইরূপ আশ্চর্য্য ধর্মব্যাখ্যা আর কখন কোন দেশে হয় নাই। কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা তুমি এখন প্রাপ্ত হও নাই। কর্মযোগেই ধর্ম সম্পূর্ণ হইল না, কর্ম ধর্মের প্রথম সোপান মাত্র। কাল তোমাকে জ্ঞানযোগের কথা কিছু বলিব।

পঞ্চদশ অধ্যায়—ভক্তি

ভগবৎগীতা—জ্ঞান

গুরু। এক্ষণে জ্ঞান সম্বন্ধে ভগবদ্ভক্তির সার মর্ম শ্রবণ কর। কর্মের কথা বলিয়া, চতুর্থাধ্যায়ে আপনার অবতার-কথন সময়ে বলিতেছেন,—

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামনুপাশ্রিতাঃ।

বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মস্তাবমাগতাঃ ॥ ৪।১০

ইহার ভাবার্থ এই যে, অনেকে বিগতরাগভয়ক্রোধ, মন্ময় (ঈশ্বরময়) এবং আমার উপাশ্রিত হইয়া জ্ঞান তপের দ্বারা পবিত্র হইয়া আমার ভাব অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব বা মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে।

বিক্রম রচনাবলী

শিষ্য। এই জ্ঞান কি প্রকার?

গুরু। যে জ্ঞানের দ্বারা জীব সমুদায় ভূতকে আত্মাতে এবং ঈশ্বরে দেখিতে পায়। যথা—

যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষস্যাত্মন্যাথো ময়ি। ৪।৩৫

শিষ্য। সে জ্ঞান কিরূপে লাভ করিব?

গুরু। ভগবান্ তাহার উপায় এই বলিয়াছেন,

তর্হিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।

উপদেক্ষ্যন্ত তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৪।৩৪

অর্থাৎ প্রণিপাত, জিজ্ঞাসা এবং সেবার দ্বারা জ্ঞানী তত্ত্বদর্শীদিগের নিকট তাহা অবগত হইবে।

শিষ্য। আপনাকে আমি সেবার দ্বারা পারিতুষ্ট করিয়া প্রণিপাত এবং পরিপ্রশ্নের সহিত জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমাকে সেই জ্ঞান দান করুন।

গুরু। তাহা আমি পারি না; কেন না, আমি জ্ঞানীও নহি, তত্ত্বদর্শীও নহি। তবে একটা মোটা সংক্ষেপ বলিয়া দিতে পারি।

জ্ঞানের দ্বারা সমুদায় ভূতকে আপনাতে এবং ঈশ্বরে দেখিতে পাওয়া যায়, ইতিবাক্যে কাহার কাহার পরস্পর সম্বন্ধ জেয় বলিয়া কথিত হইয়াছে?

শিষ্য। ভূত, আমি, এবং ঈশ্বর।

গুরু। ভূতকে জানিবে কোন্ শাস্ত্রে?

শিষ্য। বহির্বিজ্ঞানে।

গুরু। অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীতে কোম্ভের প্রথম চারি—Mathematics, Astronomy, Physics, Chemistry, গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থতত্ত্ব এবং রসায়ন। এই জ্ঞানের জন্য আজিকার দিনে পাশ্চাত্যদিগকে গুরু করিবে। তার পর আপনাকে জানিবে কোন্ শাস্ত্রে?

শিষ্য। বহির্বিজ্ঞানে এবং অন্তর্বিজ্ঞানে।

গুরু। অর্থাৎ কোম্ভের শেষ দুই—Biology, Sociology, এ জ্ঞানও পাশ্চাত্যের নিকট যাচঞা করিবে।

শিষ্য। তার পর ঈশ্বর জানিব কিসে?

গুরু। হিন্দুশাস্ত্রে। উপনিষদে, দর্শনে, পুরাণে, ইতিহাসে, প্রধানতঃ গীতায়।

শিষ্য। তবে, জগতে যাহা কিছু জেয়, সকলই জানিতে হইবে। পৃথিবীতে যত প্রকার জ্ঞানের প্রচার হইয়াছে, সব জানিতে হইবে। তবে জ্ঞান এখানে সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে?

গুরু। যাহা তোমাকে শিখাইয়াছি, তাহা মনে করিলেই ঠিক বুঝিবে। জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকলের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি হওয়া চাই। সর্বপ্রকার জ্ঞানের চর্চা ভিন্ন তাহা হইতে পারে না। জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকলের উপযুক্ত স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি হইলে, সেই সঙ্গে অনুশীলন ধর্মের বাবস্থানসারে যদি ভক্তি বৃত্তিরও সম্যক্ স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি হইয়া থাকে, তবে জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলি যখন ভক্তির অধীন হইয়া ঈশ্বরমুখী হইবে, তখনই এই গীতোক্ত জ্ঞানে পৌঁছাবে। অনুশীলনধর্মই যেমন কর্মযোগ, অনুশীলনধর্মই তেমনি জ্ঞানযোগ।

শিষ্য। আমি গণ্ডমুখের মত আপনার ব্যাখ্যাত অনুশীলনধর্ম সকলই উল্টা বুঝিয়াছিলাম; এখন কিছু কিছু বুঝিতেছি।

গুরু। এক্ষণে সে কথা যাউক। এই জ্ঞানযোগ বুঝিবার চেষ্টা কর।

শিষ্য। আগে বলুন, কেবল জ্ঞানেই কি প্রকারে ধর্মের পূর্ণতা হইতে পারে? তাহা হইলে পণ্ডিতই ধার্মিক।

গুরু। এ কথা পদর্শে বলিয়াছি। পণ্ডিত জ্ঞান নহে। যে ঈশ্বর বুঝিয়াছে, যে ঈশ্বরে জগতে যে সম্বন্ধ, তাহা বুঝিয়াছে, সে কেবল পণ্ডিত নহে, সে জ্ঞানী। পণ্ডিত না হইলেও সে জ্ঞানী। শ্রীকৃষ্ণ এমত বলিতেছেন না যে, কেবল জ্ঞানেই তাঁহাকে কেহ পাইয়াছে। তিনি বলিতেছেন,

বীতরাগভয়ক্রোধামময়া মামুপাশ্রিতাঃ।

বহবো জ্ঞানতপসা পুত্ৰা মস্তাবমাগতাঃ ॥ ৪।১০

অর্থাৎ যাহারা চিত্তসংযত এবং ঈশ্বরপরায়ণ, তাহারা ই জ্ঞানের দ্বারা পুত্র হইয়া তাঁহাকে পায়।

আসল কথা, কৃষ্ণোক্ত ধর্মের এমন মর্ম নহে যে, কেবল জ্ঞানের দ্বারাই সাধন সম্পূর্ণ হয়। জ্ঞান ও কর্ম উভয়ের সংযোগ চাই।* কেবল কর্ম হইবে না, কেবল জ্ঞানেও নহে। কর্মই আবার জ্ঞানের সাধন। কর্মের দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়। ভগবান্ বলিতেছেন,—

আরদ্রক্লেম্মানৈর্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে। ৬।৩।

যিনি জ্ঞানযোগে আরোহণেচ্ছ, কর্মই তাহার তদারোহণের কারণ বলিয়া কথিত হয়। অতএব কর্মনিষ্ঠানের দ্বারা জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। এখানে ভগবদ্বাক্যের অর্থ এই যে, কর্মযোগ ভিন্ন চিত্তশুদ্ধি জন্মে না। চিত্তশুদ্ধি ভিন্ন জ্ঞানযোগে পৌঁছান যায় না।

শিষ্য। তবে কি কর্মের দ্বারা জ্ঞান জন্মিলে কর্ম ত্যাগ করিতে হইবে?

গুরু। উভয়েরই সংযোগ ও সামঞ্জস্য চাই।

যোগসংন্যস্তকর্মণং জ্ঞানসংহীনসংশয়ম্।

আত্মবস্তং ন কর্মণি নিবধান্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪।৪১

হে ধনঞ্জয়! কর্মযোগের দ্বারা যে ব্যক্তি সংন্যস্তকর্ম এবং জ্ঞানের দ্বারা যার সংশয় ছিন্ন হইয়াছে, সেই আত্মবান্কে কর্মসকল বন্ধ করিতে পারে না।

তবেই চাই (১) কর্মের সংন্যাস বা ঈশ্বরার্পণ এবং (২) জ্ঞানের দ্বারা সংশয়চ্ছেদন। এইরূপে কর্মবাদের ও জ্ঞানবাদের বিবাদ মিটিল। ধর্ম সম্পূর্ণ হইল। এইরূপে ধর্মপ্রণেতৃশ্রেষ্ঠ, ভূতলে মহামহিমাময় এই নতন ধর্ম প্রচারিত করিলেন। কর্ম ঈশ্বরে অর্পণ কর; কর্মের দ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়া পরমার্থতত্ত্বে সংশয় ছেদন কর। এই জ্ঞানও ভক্তিতে যুক্ত: কেন না,—

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তান্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।

গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধৃতকল্মষাঃ ॥ ৫।১৭

ঈশ্বরেই যাহাদের বুদ্ধি, ঈশ্বরেই যাহাদের আত্মা, তাহাতে যাহাদের নিষ্ঠা, ও যাহারা তৎপরায়ণ, তাহাদের পাপসকল জ্ঞানে নির্ধৃত হইয়া যায়, তাহারা মোক্ষ প্রাপ্ত হয়।

শিষ্য। এখন বুঝিতেছি যে, এই জ্ঞান ও কর্মের সম্বন্ধে ভক্তি। কর্মের জন্য প্রয়োজন—কার্যকারিণী ও শারীরিকী বৃত্তিগুলি সকলেই উপযুক্ত স্ফূর্তি ও পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরমুখী হইবে। জ্ঞানের জন্য চাই—জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলি ঐরূপ স্ফূর্তি ও পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরমুখী হইবে। আর চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি?

গুরু। সেইরূপ হইবে। চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি সকল বুদ্ধিব্যবহার সময়ে বলিব।

শিষ্য। তবে মনুষ্যে সমুদয় বৃত্তি উপযুক্ত স্ফূর্তি ও পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরমুখী হইলে, এই গীতোক্ত জ্ঞানকর্মনি্যাস যোগে পরিণত হয়। এতদুভয়ই ভক্তিবাদ। মনুষ্যত্ব ও অনুশীলনধর্ম যাহা আমাকে শুনাইয়াছেন, তাহা এই গীতোক্ত ধর্মের নতন ব্যাখ্যা মাত্র।

গুরু। ক্রমে এ কথা আরও স্পষ্ট বুঝিবে।

ষোড়শ অধ্যায়—ভক্তি

ভগবৎগীতা—সন্ন্যাস

গুরু। তার পর, আর একটা কথা শোন। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে যৌবনে জ্ঞানার্জন করিতে হয়, মধ্য বয়সে গৃহস্থ হইয়া কর্ম করিতে হয়। গীতোক্ত ধর্ম ঠিক তাহা বলা হয় নাই; বরং কর্মের দ্বারা জ্ঞান উপার্জন করিবে, এমন কথা বলা হইয়াছে। ইহাই সত্য কথা; কেন না, অধ্যয়নও কর্মের মধ্যে, এবং কেবল অধ্যয়নে জ্ঞান জন্মিতে পারে না। সে যাই হোক, মনুষ্যের এমন এক দিন উপস্থিত হয় যে, কর্ম করিবার সময়ও নহে, জ্ঞানোপার্জনের সময়ও নহে। তখন জ্ঞান উপার্জিত হইয়াছে, কর্মেরও শক্তি বা প্রয়োজন আর নাই। হিন্দুশাস্ত্রে এই

* বলা বাহুল্য যে, এই কথা জ্ঞানবাদী শঙ্করাচার্যের মতের বিরুদ্ধ। তাহার মতে জ্ঞান কর্ম সমুচ্চয় নাই। শঙ্করাচার্যের মতের যাহা বিরোধী, শিক্ষিত সম্প্রদায় ভিন্ন আর কেহ আমার কথায় এখনকার দিনে গ্রহণ করিবেন না, তাহা আমি জানি। পক্ষান্তরে ইহাও কণ্ঠব্য যে, শ্রীধর স্বামী প্রভৃতি ভক্তিবাদিগণ শঙ্করাচার্যের অনুবর্তী নন। এবং অনেক অনুগামী পণ্ডিত শঙ্করের মতের বিরোধী বলিয়াই তাহাকে স্বপক্ষসমর্থন জন্য ভাষ্যের মধ্যে বড় বড় প্রবন্ধ লিখিতে হইয়াছে।

বিক্রম রচনাবলী

অবস্থায় তৃতীয় ও চতুর্থীশ্রম অবলম্বন করিবার বিধি আছে। তাহাকে সচরাচর সন্ন্যাস বলে। সন্ন্যাসের স্থূল মর্ম কৰ্মত্যাগ। ইহাও মুক্তির উপায় বলিয়া ভগবৎকর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। বরং তিনি এমনও বলিয়াছেন যে, যদিও জ্ঞানযোগে আরোহণ করিবার যে ইচ্ছা করে, কৰ্মই তাহার সহায়, কিন্তু যে জ্ঞানযোগে আরোহণ করিয়াছে, কৰ্মত্যাগ তাহার সহায়।

আরদুরক্ষোম্মর্নৈর্যোগং কৰ্ম কারণমুচ্যতে।

যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৬। ৩

শিষ্য। কিন্তু কৰ্মত্যাগ ও সংসারত্যাগ একই কথা। তবে কি সংসারত্যাগ একটা ধর্ম? জ্ঞানীর পক্ষে ঠিক কি তাই বিহিত?

গুরু। পূর্বাঙ্গামী হিন্দুধর্মশাস্ত্রের তাহাই মত বটে। জ্ঞানীর পক্ষে কৰ্মত্যাগ যে তাহার সাধনের সাহায্য করে, তাহাও সত্য। এ বিষয়ে ভগবদ্বাক্যই প্রমাণ। তথাপি কৃষ্ণোক্ত এই পুণ্যময় ধর্মের এমন শিক্ষা নহে যে, কেহ কৰ্মত্যাগ বা কেহ সংসারত্যাগ করিবে। ভগবান্ বলেন যে, কৰ্মযোগ ও কৰ্মত্যাগ উভয়ই মুক্তির কারণ, কিন্তু তন্মধ্যে কৰ্মযোগই শ্রেষ্ঠ।

সন্ন্যাসঃ কৰ্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।

তয়োস্তু কৰ্মসংন্যাসাৎ কৰ্মযোগো বিশিষ্যতে ॥ ৫। ২

শিষ্য। তাহা কখনই হইতে পারে না। জ্বরত্যাগটা যদি ভাল হয়, তবে জ্বর কখন ভাল নহে। কৰ্মত্যাগ যদি ভাল হয়, তবে কৰ্ম ভাল হইতে পারে না। জ্বরত্যাগের চেয়ে কি জ্বর ভাল?

গুরু। কিন্তু এমন যদি হয় যে, কৰ্ম রাখিয়াও কৰ্মত্যাগের ফল পাওয়া যায়?

শিষ্য। তাহা হইলে কৰ্মই শ্রেষ্ঠ। কেন না, তাহা হইলে কৰ্ম ও কৰ্মত্যাগ, উভয়েরই ফল পাওয়া গেল।

গুরু। ঠিক তাই। পূর্বাঙ্গামী হিন্দুধর্মের উপদেশ—কৰ্মত্যাগপূর্বক সন্ন্যাসগ্রহণ। গীতার উপদেশ—কৰ্ম এমন চিন্তে কর যে, তাহাতেই সন্ন্যাসের ফল প্রাপ্ত হইবে। নিষ্কাম কৰ্মই সন্ন্যাস—সন্ন্যাসে আবার বেশী কি আছে? বেশীর মধ্যে কেবল আছে, নিঃপ্রয়োজনীয় দুঃখ।

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দৌষ্ট ন কাঙ্ক্ষতি।

নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥

সাংখ্যযোগো পৃথ্ব্বালাঃ প্রবদান্তি ন পিণ্ডিতাঃ।

একমপ্যান্স্থিতঃ সম্যগ্ভয়োর্বিবিন্দতে ফলম্ ॥

যৎ সাংখ্যেঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্যোগৈরপি গম্যতে।

একং সাংখ্যং যোগং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥

সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।

যোগযুক্তো মূনির্বন্ধ ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৫। ৩-৬

“যাঁহার দ্বेष নাই ও আকাঙ্ক্ষা নাই, তাঁহাকেই নিত্যসন্ন্যাসী বলিয়া জানিও। হে মহাবাহো! তাদৃশ নির্দ্বন্দ্ব পুরুষেরাই সুখে বন্ধনমুক্ত হইতে পারে। (সাংখ্য) সন্ন্যাস ও (কৰ্ম) যোগ যে পৃথক্, ইহা বালকেই বলে, পিণ্ডিতে নহে। একের আশ্রয়ে, একরে উভয়েরই ফল লাভ করা যায়। সাংখ্যে (সন্ন্যাস)* যাহা পাওয়া যায়, (কৰ্ম) যোগেও তাই পাওয়া যায়। যিনি উভয়কে একই দেখেন, তিনিই যথার্থদর্শী। হে মহাবাহো! কৰ্মযোগ বিনা সন্ন্যাস দুঃখের কারণ। যোগযুক্ত মূনি অচিরে বন্ধন পায়েন। স্থূল কথা এই যে, যিনি অনুষ্টেয় কৰ্ম সকলই করিয়া থাকেন, অথচ চিন্তে সকল কৰ্মসম্বন্ধেই সন্ন্যাসী, তিনিই ধার্মিক।

শিষ্য। এই পরম বৈষ্ণবধর্ম ত্যাগ করিয়া এখন বৈরাগীরা ডোর কোঁপীন পরিয়া সং সাজিয়া বেড়ায় কেন, বঝিতে পারি না। ইংরেজেরা যাহাকে Asceticism বলেন, বৈরাগ্য শব্দে তাহা বুঝায় না, এখন দেখিতেছি। এই পরম পবিত্র ধর্ম সেই পাপের মলোচ্ছেদ হইতেছে। অথচ এমন পবিত্র, সর্বব্যাপী, উন্নতিশীল বৈরাগ্য আর কোথাও নাই। ইহাতে সর্বত্র সেই

* “সাংখ্য” কথাটির অর্থ লইয়া আপাততঃ গোলযোগ বোধ হইতে পারে। যাঁহাদিগের এমত সন্দেহ হইবে, তাঁহারা শাঙ্কর ভাষা দেখিবেন।

পবিত্র বৈরাগ্য, সঙ্কম্ব বৈরাগ্য; অথচ Asceticism কোথাও নাই। আপনি যথার্থই বলিয়াছেন, এমন আশ্চর্য্য ধর্ম, এমন সত্যময় উন্নতিকর ধর্ম, জগতে আর কখন প্রচারিত হয় নাই। গীতা থাকিতে, লোকে বেদ, স্মৃতি, বাইবেল বা কোরাণে ধর্ম খুঁজিতে যায়, ইহা আশ্চর্য্য বোধ হয়। এই ধর্মের প্রথম প্রচারকের কাছে কেহই ধর্মবেত্তা বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। এ অতিমানুষ ধর্মপ্রণেতা কে?

গুরু। শ্রীকৃষ্ণ যে অর্জুনের রথে চড়িয়া, কুরুক্ষেত্রে, যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে এই সকল কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহা আমি বিশ্বাস করি না। না বিশ্বাস করিবার অনেক কারণ আছে। গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত, এ কথা বলা যাইতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণ যে গীতোক্ত ধর্মের সৃষ্টিকর্তা, তাহা আমি বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। ফলে তুমি দেখিতে পাইতেছ যে, এক নিষ্কামবাদের দ্বারা সমুদায় মনুষ্যজীবন শাসিত, এবং নীতি ও ধর্মের সকল উচ্চ তত্ত্ব একতা প্রাপ্ত হইয়া পবিত্র হইতেছে। কাম্য কর্মের ত্যাগই সন্ন্যাস, নিষ্কাম কর্মই সন্ন্যাস, নিষ্কাম কর্মত্যাগ সন্ন্যাস নহে।

কাম্যানাং কর্ম্যাণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।

সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ১৮।২

যে দিন ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প, এবং ভারতবর্ষের এই নিষ্কাম ধর্ম একত্রিত হইবে, সেই দিন মনুষ্য দেবতা হইবে। তখন ঐ বিজ্ঞান ও শিল্পের নিষ্কাম প্রয়োগ ভিন্ন সকাম প্রয়োগ হইবে না।

শিষ্য। মানুষের অদৃষ্টে কি এমন দিন ঘটবে?

গুরু। তোমরা ভারতবাসী, তোমরা করিলেই হইবে। দুই-ই তোমাদের হাতে। এখন ইচ্ছা করিলে তোমরাই পৃথিবীর কর্তা ও নেতা হইতে পার। সে আশা যদি তোমাদের না থাকে, তবে বৃথাই আমি বকিয়া মরিতেছি। সে যাহা হউক, এক্ষণে এই গীতোক্ত সন্ন্যাসবাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, কর্মহীন সন্ন্যাস নিকৃষ্ট সন্ন্যাস। কর্ম, বুদ্ধাইয়াছি—ভক্ত্যাশ্রয়ক। অতএব এই গীতোক্ত সন্ন্যাসবাদের তাৎপর্য্য এই যে, ভক্ত্যাশ্রয় কর্মযুক্ত সন্ন্যাসই যথার্থ সন্ন্যাস।

সপ্তদশ অধ্যায়—ভক্তি

ধ্যান বিজ্ঞানাদি

গুরু। ভগবদ্গীতা পাঁচ অধ্যায়ের কথা তোমাকে বুঝাইয়াছি। প্রথম অধ্যায়ে সৈন্যদর্শন, দ্বিতীয়ে জ্ঞানযোগের স্কুলাভাষ, উহার নাম সাংখ্যযোগ, তৃতীয়ে কর্মযোগ, চতুর্থে জ্ঞান-কর্ম-ন্যাসযোগ, পঞ্চমে সন্ন্যাসযোগ, এ সকল তোমাকে বুঝাইয়াছি। ষষ্ঠে ধ্যানযোগ। ধ্যান জ্ঞানবাদীর অনুষ্ঠান, সুতরাং উহার পৃথক্ আলোচনার প্রয়োজন নাই। যে ধ্যানমার্গাবলম্বী, সে যোগী। যোগী কে, তাহার লক্ষণ এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। যে অবস্থায় চিত্ত যোগানুষ্ঠান দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া উপরত হয়; যে অবস্থায় বিশুদ্ধান্তঃকরণের দ্বারা আত্মাকে অবলোকন করিয়া আত্মাতেই পরিতৃপ্ত হয়; যে অবস্থায় বুদ্ধিমাগ্নলভ্য, অতীন্দ্রিয়, আত্যন্তিক সুখ উপলব্ধ হয়; যে অবস্থায় অবস্থান করিলে আত্মতত্ত্ব হইতে পরিচ্যুত হইতে হয় না; যে অবস্থা লাভ করিলে, অন্য লাভকে অধিক বলিয়া বোধ হয় না, এবং যে অবস্থা উপস্থিত হইলে গুরুতর দুঃখও বিচলিত করিতে পারে না, সেই অবস্থার নামই যোগ—নহিলে খাওয়া ছাড়িয়া বার বৎসর একঠাই বসিয়া চোক্ বুদ্ধিয়া ভাবিলে যোগ হয় না। কিন্তু যোগীর মধ্যেও প্রধান ভক্ত—

যোগিনামপি সর্বেষাং মদগতেনাস্তুরাত্মনা।

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৬।৪৭

“যে আমাতে আসক্তমনা হইয়া শ্রদ্ধাপূর্বক আমাকে ভজনা করে, আমার মতে যোগযুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে সে-ই শ্রেষ্ঠ।” ইহা ভগবদুক্তি। অতএব এই গীতোক্ত ধর্ম, জ্ঞান কর্ম ধ্যান সন্ন্যাস—ভক্তি ব্যতীত কিছুই সম্পূর্ণ নহে। ভক্তিই সর্বসাধনের সার।

সপ্তমে বিজ্ঞানযোগ। ইহাতেই ঈশ্বর, আপন স্বরূপ করিতেছেন। ঈশ্বর আপনাকে নিগূণ

বিক্রম রচনাবলী

ও সগুণ, অর্থাৎ স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণের দ্বারা বর্ণিত করিয়াছেন। কিন্তু ইহাও বিশদরূপে বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন তাঁহাকে জানিবার উপায় নাই। অতএব ভক্তিই ব্রহ্মজ্ঞানের সহায়।

অষ্টমে তারকব্রহ্মযোগ। ইহাও সম্পূর্ণরূপে ভক্তিব্যোগ। ইহার স্থূল তাৎপর্য্য ঈশ্বর-প্রাপ্তির উপায় কথিত হইয়াছে। একান্ত ভক্তির দ্বারাই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

নবমাধ্যয়ে বিখ্যাত রাজগুহ্যযোগ। ইহাতে অতিশয় মনোহারিণী কথা সকল আছে। ইতিপূর্বে জগদীশ্বর একটি অতিশয় মনোহর উপমার দ্বারা আপনার সহিত জগতের সম্বন্ধ প্রকটিত করিয়াছিলেন,—“যেমন সূত্রে মণি সকল গ্রথিত থাকে, তদ্রূপ আমাতেই এই বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে।” নবমে আর একটি সুন্দর উপমা প্রযুক্ত হইয়াছে, যথা—

“আমার আত্মা ভূতসকল ধারণ ও পালন করিতেছে, কিন্তু কোন ভূতেই অবস্থান করিতেছে না। যেমন সমীরণ সর্বত্রগামী ও মহৎ হইলেও, প্রতিনিয়ত আকাশে অবস্থান করে, তদ্রূপ সকল ভূতই আমাতে অবস্থান করিতেছে।” হর্বাট স্পেন্সরের নদীর উপর জলবুদ্বদের উপমা অপেক্ষা এই উপমা কত গুণে শ্রেষ্ঠ!

শিষ্য। চক্ষু হইতে আমার ঠুলি খসিয়া পড়িল। আমার একটা বিশ্বাস ছিল যে—নির্গুণ ব্রহ্মবাদটা Pantheism মাত্র। এক্ষণে দেখিতেছি, তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন।

গুরু। ইংরেজী সংস্কারবিশিষ্ট হইয়া এ সকলের আলোচনার দোষ ঐ। আমাদের মধ্যে এমন অনেক বাবু আছেন, কাচের টম্বলেরে না খাইলে তাঁহাদের জল মিষ্ট লাগে না। তোমাদের আর একটা ভ্রম আছে বোধ হয় যে, মনুষ্য মাত্রেই—মূর্খ ও জ্ঞানী, ধনী ও দরিদ্র, পুরুষ ও স্ত্রী, বৃদ্ধ ও বালক,—সকল জাতি, সকলেই যে তুল্যরূপে পরিগ্রাহকের অধিকারী, এ সাম্যবাদ শাক্যসিংহের ধর্ম্ম ও খৃষ্টধর্ম্মই আছে, বর্ণভেদজ্ঞ হিন্দুধর্ম্ম নাই। এই অধ্যায়ের দুইটা শ্লোক শ্রবণ কর।

সমোহং সর্বভূতেশু ন মে দ্বেষোহস্তি ন প্রিয়ঃ ।

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥ ৯। ২৯

* * *

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য য়েহপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ ।

স্ত্রিয়ো বৈশ্যান্থথা শূদ্রাস্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ৯। ৩২

“আমি সকল ভূতের পক্ষে সমান; কেহ আমার দ্বেষ বা কেহ প্রিয় নাই; যে আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা করে, আমি তাহাতে, সে আমাতে। * * পাপযোনিও আশ্রয় করিলে পরাগতি পায়—বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রীলোক, সকলেই পায়।”

শিষ্য। এটা বোধ হয় বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে গৃহীত হইয়াছে।

গুরু। কৃর্তাবিদ্যাদিগের মধ্যে এই একটা পাগলামি প্রচলিত হইয়াছে। ইংরেজ পণ্ডিতগণের কাছে তোমরা শুনিয়াছ যে, ৫৪৩ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বাব্দে (বা ৪৭৭) শাক্যসিংহ মরিয়াছেন; কাজেই তাঁহাদের দেখাদেখি সিদ্ধান্ত করিতে শিখিয়াছ যে, যাহা কিছু ভারতবর্ষে হইয়াছে, সকলেই বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে গৃহীত হইয়াছে। তোমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, হিন্দুধর্ম্ম এমনই নিকৃষ্ট সামগ্রী যে, ভাল জিনিষ কিছুই তাহার নিজ ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। এই অনুকরণপ্রিয় সম্প্রদায় বলিয়া যায় যে, বৌদ্ধধর্ম্ম নিজেই এই হিন্দুধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যদি সমগ্র বৌদ্ধধর্ম্ম ইহা হইতে উৎপন্ন হইতে পারিল ত আর কোন ভাল জিনিষ কি তাহা হইতে উদ্ভূত হইতে পারে না?

শিষ্য। যোগশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে করিতে আপনার এ রাগটুকু সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। এক্ষণে রাজগুহ্যযোগের বৃত্তান্ত শুনিতে চাই।

গুরু। রাজগুহ্যযোগ সর্বপ্রধান সাধন বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহার স্থূল তাৎপর্য্য এই, যদিও ঈশ্বর সকলের প্রাপ্য বটে, তথাপি যে যে-ভাবে চিন্তা করে, সে সেই ভাবেই তাঁহাকে পায়। যাঁহারা দেবদেবীর সকাম উপাসনা করেন, তাঁহারা ঈশ্বরানুগ্রহে সিদ্ধকাম হইয়া স্বর্গ ভোগ করেন বটে, কিন্তু তাঁহারা ঈশ্বর প্রাপ্ত করেন না। কিন্তু যাঁহারা নিষ্কাম হইয়া দেবদেবীর উপাসনা করেন, তাঁহাদের উপাসনা নিষ্কাম বলিয়া তাঁহারা ঈশ্বরেরই উপাসনা করেন; কেন না, ঈশ্বর ভিন্ন অন্য দেবতা নাই। তবে যাঁহারা সকাম হইয়া দেবদেবীর উপাসনা করেন, তাঁহারা যে

ভাবান্তরে ঈশ্বরোপাসনায় ঈশ্বর পান না, তাহার কারণ, সকাম উপাসনা ঈশ্বরোপাসনার প্রকৃত পদ্ধতি নহে। পরন্তু ঈশ্বরের নিষ্কাম উপাসনাই মূখ্য উপাসনা, তাঁহ্ন ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয় না। অতএব সর্বকামনা পরিত্যাগপূর্বক সর্বকর্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া ঈশ্বরে ভক্তি করাই ধর্ম ও মোক্ষের উপায়। এই রাজগুহ্যযোগ ভক্তিপূর্ণ।

সপ্তমে ঈশ্বরের স্বরূপ কথিত হইয়াছে, দশমে তাহার বিভূতি সকল কথিত হইতেছে। এই বিভূতিযোগ অতি বিচিত্র, কিন্তু এক্ষণে উহাতে আমাদের প্রয়োজন নাই। দশমে বিভূতি সকল বিবৃত করিয়া, তাহার প্রত্যক্ষস্বরূপ একাদশে ভগবান্ অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করান। তাহাতেই দ্বাদশে ভক্তিপ্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল। কালি তোমাকে সেই ভক্তিযোগ শুনাইব।

অষ্টাদশ অধ্যায়—ভক্তি

ভগবঙ্গীতা—ভক্তিযোগ

শিষ্য। ভক্তিযোগ বলিবার আগে, একটা কথা বুঝাইয়া দিন। ঈশ্বর এক, কিন্তু সাধন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কেন? সোজা পথ একটা ভিন্ন পাঁচটা থাকে না।

গুরু। সোজা পথ একটা ভিন্ন পাঁচটা থাকে না বটে, কিন্তু সকলে, সকল সময়ে, সোজা পথে যাইতে পারে না। পাহাড়ের চূড়ায় উঠিবার যে সোজা পথ, দুই এক জন বলবানে তাহাতে আরোহণ করিতে পারে। সাধারণের জন্য ঘুরাণ ফিরাণ পথই বিহিত। এই সংসারে নানাবিধ লোক; তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা, এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি। কেহ সংসারী, কাহারও সংসার হয় নাই, হইয়াছিল ত সে ত্যাগ করিয়াছে। যে সংসারী, তাহার পক্ষে কর্ম; যে অসংসারী, তাহার পক্ষে সন্ন্যাস। যে জ্ঞানী, অথচ সংসারী, তাহার পক্ষে জ্ঞান ও বিজ্ঞানযোগই প্রশস্ত; যে জ্ঞানী অথচ সংসারী নয় অর্থাৎ যে যোগী, তাহার পক্ষে ধ্যানযোগই প্রশস্ত। আর আপামর সাধারণ সকলেরই পক্ষে সর্বসাধনশ্রেষ্ঠ রাজগুহ্যযোগই প্রশস্ত। অতএব সর্বপ্রকার মনুষ্যের উন্নতির জন্য জগদীশ্বর এই আশ্চর্য্য ধর্ম প্রচার করিয়াছেন। তিনি করুণাময়—যাহাতে সকলেরই পক্ষে ধর্ম সোজা হয়, ইহাই তাহার উদ্দেশ্য।

শিষ্য। কিন্তু আপনি যাহা বুঝাইয়াছেন, তাহা যদি সত্য হয়, তবে ভক্তিই সকল সাধনের অন্তর্গত। তবে এক ভক্তিকে বিহিত বলিলেই, সকলের পক্ষে পথ সোজা হইত।

গুরু। কিন্তু ভক্তির অনুশীলন চাই। তাই বিবিধ সাধন, বিবিধ অনুশীলনপদ্ধতি। আমার কথিত অনুশীলনতত্ত্ব যদি বুঝিয়া থাক, তবে এ কথা শীঘ্র বুঝিবে। ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির মনুষ্যের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন অনুশীলনপদ্ধতি বিধেয়। যোগ, সেই অনুশীলনপদ্ধতির নামান্তর মাত্র।

শিষ্য। কিন্তু যে প্রকারে এই সকল যোগ কথিত হইয়াছে, তাহাতে পাঠকের মনে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে। নিগুণ ব্রহ্মের উপাসনা অর্থাৎ জ্ঞান, সাধনবিশেষ বলিয়া কথিত হইয়াছে, সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা অর্থাৎ ভক্তিও সাধন বলিয়া কথিত হইয়াছে। অনেকের পক্ষে দুই-ই সাধ্য। যাহার পক্ষে দুই-ই সাধ্য, সে কোন্ পথ অবলম্বন করিবে? দুই-ই ভক্তি বটে জানি, তথাপি জ্ঞান-বুদ্ধি-ময়ী ভক্তি, আর কর্ম-ময়ী ভক্তি মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?

গুরু। দ্বাদশ অধ্যায়ের আরম্ভে এই প্রশ্নই অর্জুন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এবং এই প্রশ্নের উত্তরই দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তিযোগ। এই প্রশ্নটি বুঝাইবার জন্যই গীতার পূর্বগামী একাদশ অধ্যায় তোমাকে সংক্ষেপে বুঝাইলাম। প্রশ্ন না বুঝিলে উত্তর বুঝা যায় না।

শিষ্য। কৃষ্ণ কি উত্তর দিয়াছেন?

গুরু। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, নিগুণ ব্রহ্মের উপাসক ও ঈশ্বরভক্ত, উভয়েই ঈশ্বর প্রাপ্ত করেন। কিন্তু তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, ব্রহ্মোপাসকেরা অধিকতর দুঃখ ভোগ করে; ভক্তেরা সহজে উদ্ধৃত হয়।

ক্লেশোহধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।

অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবস্তিরবাপাতে ॥

যে তু সর্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।

অনন্যোন্নিব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥

তেষামহং সমুদ্বর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। ১২। ৫-৭

বাঁকম রচনাবলী

শিষ্য। এক্ষণে বলুন, তবে এই ভক্ত কে?

গুরু। ভগবান্ স্বয়ং তাহা বলিতেছেন।

অদ্বৈতা সৰ্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
 নিস্কামো নিরহংকারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥
 সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
 গয্যাপিতমনোবুদ্ধির্ঘো মদুত্তমঃ স মে প্রিয়ঃ ॥
 যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
 হর্ষামর্ষভয়োদ্বৈগৈশ্চর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ।
 অনপেক্ষঃ শূচিদক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
 সৰ্বারম্ভপারিত্যাগী যো মদুত্তমঃ স মে প্রিয়ঃ ॥
 যো ন হ্রস্বতি ন দ্বৈষতি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
 শূভাশুভপারিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥
 সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
 শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ ॥
 তুল্যানিন্দাস্তুতিস্মরণী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
 অনিকেতঃ স্থিরমতিভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥
 যে তু ধর্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্যুপাসতে।
 শ্রদ্ধাধান্য গৎপরমা ভক্তাস্তেহতীৰ মে প্রিয়াঃ ॥ ১২।১৩-২০

“যে মমতাশূন্য (অর্থাৎ যার ‘আমার! আমার!’ জ্ঞান নাই), অহংকারশূন্য, যাহার সুখ দুঃখে সমান জ্ঞান, যে ক্ষমাশীল, যে সন্তুষ্ট, যোগী, সংযতাত্মা এবং দৃঢ়সংকল্প, যাহার মন ও বুদ্ধি আমাতে আর্পিত, এমন যে আমার ভক্ত, সে-ই আমার প্রিয়। যাহা হইতে লোক উদ্বিগ্ন প্রাপ্ত হয় না এবং যিনি লোক হইতে নিজে উদ্বিগ্ন প্রাপ্ত হন না, যে হর্ষ অমর্ষ ভয় এবং উদ্বিগ্ন হইতে মুক্ত, সে-ই আমার প্রিয়। যে বিষয়াদিতে অনপেক্ষ, শূচি, দক্ষ, উদাসীন, গতব্যথ, অথচ সৰ্বারম্ভ পারিত্যাগ করিতে সক্ষম, এমন যে আমার ভক্ত, সে-ই আমার প্রিয়। যাহার কিছুতে হর্ষ নাই, অথচ দ্বৈষও নাই, যিনি শোকও করেন না, বা আকাঙ্ক্ষা করেন না, যিনি শূভাশুভ সকল পারিত্যাগ করিতে সমর্থ, এমন যে ভক্ত, সে-ই আমার প্রিয়। যাহার নিকট শত্রু ও মিত্র, মান ও অপমান, শীতোষ্ণ, সুখ ও দুঃখ সমান, যিনি আসঙ্গ-বিবর্জিত, যিনি নিন্দা ও স্তুতি তুল্য বোধ করেন, যিনি সংযতবাক্য, যিনি যে কিছু দ্বারা সন্তুষ্ট, এবং যিনি সর্বদা আশ্রয়ে থাকেন না, এবং স্থিরমতি, সেই ভক্ত আমার প্রিয়। এই ধর্মামৃত যেমন বলিয়াছি, যে সেইরূপ অনুষ্ঠান করে, সেই শ্রদ্ধাবান্ আমার পরম ভক্ত, আমার অতিশয় প্রিয়।”

এখন বুঝিলে ভক্তি কি? ঘরে কপাট দিয়া পূজার ভান করিয়া বসিলে ভক্ত হয় না। মালা ঠক্ঠক্ করিয়া, হরি! হরি! করিলে ভক্ত হয় না; হা ঈশ্বর! যো ঈশ্বর! করিয়া গোলযোগ করিয়া বেড়াইলে ভক্ত হয় না; যে আত্মজয়ী, যাহার চিত্ত সংযত, যে সমদর্শী, যে পরহিতে রত, সে-ই ভক্ত। ঈশ্বরকে সর্বদা অন্তরে বিদ্যমান জানিয়া, যে আপনার চরিত্র পবিত্র না করিয়াছে, যাহার চরিত্র ঈশ্বরানুরূপী নহে, সে ভক্ত নহে। যাহার সমস্ত চরিত্র ভক্তির দ্বারা শাসিত না হইয়াছে, সে ভক্ত নহে। যাহার সকল চিত্তবৃত্তি ঈশ্বরমুখী না হইয়াছে, সে ভক্ত নহে। গীতোক্ত ভক্তির স্থূল কথা এই। এরূপ উদার, এবং প্রশস্ত ভক্তিবাদ জগতে আর কোথাও নাই। এই জন্য ভগবদ্গীতা জগতে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

উনিবিংশতীতম অধ্যায়—ভক্তি

ঈশ্বরে ভক্তি—বিষ্ণুপুরাণ

গুরু। ভগবদ্গীতার অবশিষ্টাংশের কোন কথা তুলিবার এক্ষণে আমাদের প্রয়োজন নাই। এক্ষণে আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা স্পষ্ট করিবার জন্য বিষ্ণুপুরাণোক্ত প্রহ্লাদচরিত্রের আমরা সমালোচনা করিব। বিষ্ণুপুরাণে দুইটি ভক্তের কথা আছে, সকলেই জানেন—ধ্রুব ও প্রহ্লাদ।

এই দুই জনের ভক্তি দুই প্রকার। যাহা বলিয়াছি, তাহাতে বদ্বিয়াছ উপাসনা দ্বিবিধ, সকাম এবং নিষ্কাম। সকাম যে উপাসনা, সেই কাম্য কর্ম্ম; নিষ্কাম যে উপাসনা, সেই ভক্তি। ধ্রুবের উপাসনা সকাম,—তিনি উচ্চ পদ লাভের জন্যই বিষ্ণুর উপাসনা করিয়াছিলেন। অতএব তাহার কৃত উপাসনা প্রকৃত ভক্তি নহে; ঈশ্বরে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস এবং মনোবুদ্ধি সমর্পণ হইয়া থাকিলেও তাহা ভক্তের উপাসনা নহে। প্রহ্লাদের উপাসনা নিষ্কাম। তিনি কিছুই পাইবার জন্য ঈশ্বরে ভক্তিমান্ হইয়া নাই; বরং ঈশ্বরে ভক্তিমান্ হওয়াতে বহুবিধ বিপদে পড়িয়াছিলেন; কিন্তু ঈশ্বরে ভক্তি সেই সকল বিপদের কারণ, ইহা জানিতে পারিয়াও তিনি ভক্তি ত্যাগ করেন নাই। এই নিষ্কাম প্রেমই যথার্থ ভক্তি এবং প্রহ্লাদই পরমভক্ত। বোধ হয় গ্রন্থকার সকাম ও নিষ্কাম উপাসনার উদাহরণস্বরূপ, এবং পরম্পরের তুলনার জন্য ধ্রুব ও প্রহ্লাদ, এই দুইটি উপাখ্যান রচনা করিয়াছেন। ভগবঙ্গীতার রাজযোগ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা যদি তোমার স্মরণ থাকে, তাহা হইলে বদ্বিবে যে, সকাম উপাসনাও একেবারে নিষ্ফল নহে। যে যাহা কামনা করিয়া উপাসনা করে, সে তাহা পায়, কিন্তু ঈশ্বর পায় না। ধ্রুব উচ্চ পদ কামনা করিয়া উপাসনা করিয়াছিলেন, তাহা তিনি পাইয়াছিলেন; তথাপি তাহার সে উপাসনা নিম্নশ্রেণীর উপাসনা, ভক্তি নহে। প্রহ্লাদের উপাসনা ভক্তি, এই জন্য তিনি লাভ করিলেন—মুক্তি।

শিষ্য। অনেকেই বলিবে, লাভটা ধ্রুবেরই বেশী হইল। মুক্তি পারলৌকিক লাভ, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে অনেকের সংশয় আছে। এরূপ ভক্তিদর্শন লোকায়ত্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।

গুরু। মুক্তির প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তুমি ভুলিয়া গিয়াছ। ইহলোকেই মুক্তি হইতে পারে ও হইয়া থাকে। যাহার চিত্ত শুদ্ধ এবং দুঃখের অতীত, সে-ই ইহলোকেই মুক্ত। সম্রাট্ দুঃখের অতীত নহেন, কিন্তু মুক্ত জীব ইহলোকেই দুঃখের অতীত; কেন না, সে আত্মজয়ী হইয়া বিশ্বজয়ী হইয়াছে। সম্রাটের কি সুখ বলিতে পারি না। বড় বেশী সুখ আছে বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু যে মুক্ত, অর্থাৎ সংযতাত্মা, বিশুদ্ধচিত্ত, তাহার মনের সুখের সীমা নাই। যে মুক্ত, সে-ই ইহজীবনেই সুখী। এই জন্য তোমাকে বলিয়াছিলাম যে, সুখের উপায় ধর্ম্ম। মুক্ত ব্যক্তির সকল বৃত্তিগুলি সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া সামঞ্জস্যযুক্ত হইয়াছে বলিয়া সে মুক্ত। যাহার বৃত্তিসকল স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত নহে, সে অজ্ঞান, অসামর্থ্য, বা চিত্তমালিন্যবশত মুক্ত হইতে পারে না।

শিষ্য। আমার বিশ্বাস যে, এই জীবন্মুক্তির কামনা করিয়া ভারতবর্ষীরে এরূপ অধঃপাতে গিয়াছেন। যাঁহারা এই প্রকার জীবন্মুক্ত, সাংসারিক ব্যাপারে তাদৃশ তাঁহাদের মনোযোগ থাকে না; এজন্য ভারতবর্ষের এই অবনতি হইয়াছে।

গুরু। মুক্তির যথার্থ তাৎপর্য্য না বুঝাই এই অধঃপতনের কারণ। যাঁহারা মুক্ত বা মুক্তিপথের পথিক, তাঁহারা সংসারে নির্লিপ্ত হইয়া, কিন্তু তাঁহারা নিষ্কাম হইয়া যাবতীয় অনুরোধের অনুরোধ করেন। তাঁহাদের কর্ম্ম নিষ্কাম বলিয়া, তাঁহাদের কর্ম্ম স্বদেশের এবং জগতের মঙ্গলকর হয়; সকাম কর্ম্মীদের কর্ম্ম কাহারও মঙ্গল হয় না। আর তাঁহাদের বৃত্তিসকল অনুশীলিত এবং স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত, এই জন্য তাঁহারা দক্ষ এবং কর্ম্মঠ; পূর্বে যে ভগবদ্ভাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে দেখিবে যে, ভগবদ্ভক্তদের দক্ষতা* একটি লক্ষণ। তাঁহারা দক্ষ অথচ নিষ্কাম কর্ম্মী, এ জন্য তাঁহাদের দ্বারা যতটা স্বজাতির এবং জগতের মঙ্গল সিদ্ধ হয়, এত আর কাহারও দ্বারা হইতে পারে না। এ দেশের সকলে এইরূপ মুক্তিমাগার্গবলম্বী হইলেই ভারতবর্ষীরেই জগতে শ্রেষ্ঠ জাতির পদ প্রাপ্ত হইবে। মুক্তিতত্ত্বের এই যথার্থ ব্যাখ্যার লোপ হওয়ায় অনুশীলনবাদের দ্বারা আমি তাহা তোমার হৃদয়ঙ্গম করিতেছি।

শিষ্য। এক্ষণে প্রহ্লাদচরিত্র শুনিতে বাসনা করি।

গুরু। প্রহ্লাদচরিত্র সবিস্তারে বলিবার আমার ইচ্ছাও নাই, প্রয়োজনও নাই। তবে একটা কথা এই প্রহ্লাদচরিত্রে বুঝাইতে চাই। আমি বলিয়াছি যে, কেবল, হা ঈশ্বর! হো ঈশ্বর! করিয়া বেড়াইলে ভক্তি হইল না। যে আত্মজয়ী, সর্ব্বভূতকে আপনার মত দেখিয়া সর্ব্বজনের হিতে রত, শত্রু মিত্রে সমদর্শী, নিষ্কাম কর্ম্মী,—সে-ই ভক্ত। এই কথা ভগবঙ্গীতায় উক্ত হইয়াছে দেখাইয়াছি। এই প্রহ্লাদ তাহার উদাহরণ। ভগবঙ্গীতায় যাহা উপদেশ, বিষ্ণুপুরাণে

সেই “হর্ষামর্ষভয়োদ্বৈগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ” স্মরণ কর। এখন, ভয় হইতে মুক্ত যে ভক্ত, সে কি প্রকার তাহা বুঝিলে? “মর্ষ্যাপিতমনোবুদ্ধিঃ” কি বুঝিলে? ভক্তের সেই সকল লক্ষণ বুঝাইবার জন্য এই প্রহ্লাদচরিত্র কহিতোঁছি।

হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে তাড়াইয়া দিলেন, প্রহ্লাদ আবার গুরুগৃহে গেলেন। অনেক কালের পর আবার আনাইয়া অধীত বিদ্যার আবার পরীক্ষা লইতে বাসিলেন। প্রথম উত্তরেই প্রহ্লাদ আবার সেই কথা বলিল,

কারণং সকলস্যাস্য স নো বিষ্ণুঃ প্রসীদতু।

হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে মারিয়া ফেলিতে হুকুম দিলেন। শত শত দৈত্য তাঁহাকে কাঁটিতে আসিল, কিন্তু প্রহ্লাদ “দৃঢ়নিশ্চয়,” “ঈশ্বর্যাপিতমনোবুদ্ধিঃ”—যাহারা মারিতে আসিল, প্রহ্লাদ তাহাদিগকে বলিল, “বিষ্ণু তোমাদের অস্ত্রও আছেন, আমাতেও আছেন, এই সত্যানুসারে আমি তোমাদের অস্ত্রের দ্বারা আক্রান্ত হইব না।” ইহাই “দৃঢ়নিশ্চয়”।

শিষ্য। জানি যে, বিষ্ণুপুরাণের উপন্যাসে আছে যে, প্রহ্লাদ অস্ত্রের আঘাতে অক্ষত রহিলেন। কিন্তু উপন্যাসেই এমন কথা থাকিতে পারে,—যথার্থ এমন ঘটনা হয় না। যে যেমন ইচ্ছা ঈশ্বরভক্ত হউক, নৈসর্গিক নিয়ম তাহার কাছে নিষ্ফল হয় না—অস্ত্র পরমভক্তেরও মাংস কাটে।

গুরু। অর্থাৎ তুমি Miracle মান না। কথাটা পুরাতন। আমি তোমাদের মত ঈশ্বরের শক্তিকে সীমাবদ্ধ করিতে সম্মত নহি। বিষ্ণুপুরাণে যেভাবে প্রহ্লাদের রক্ষা কথিত হইয়াছে, ঠিক সেইরূপ ঘটিতে দেখা যায় না বটে, আর উপন্যাস বলিয়াই সেই বর্ণনা সম্ভবপর হইয়াছে, ইহাও স্বীকার করি। কিন্তু একটি নৈসর্গিক নিয়মের দ্বারা ঈশ্বরানুকম্পায় নিয়মাস্তরের অদৃষ্টপূর্বে প্রতিষেধ যে ঘটিতে পারে না, এমত কথা তুমি বলিতে পার না। অস্ত্র পরম ভক্তেরও মাংস কাটে, কিন্তু ভক্ত ঈশ্বরানুকম্পায় আপনার বল বা বুদ্ধি এরূপে প্রযুক্ত করিতে পারে যে, অস্ত্র নিষ্ফল হয়। বিশেষ, যে ভক্ত, সে “দক্ষ”; ইহা পূর্বে কথিত হইয়াছে, তাহার সকল বৃত্তিগুলি সম্পূর্ণ অনুশীলিত, সুতরাং সে অতিশয় কার্যক্ষম; ইহার উপর ঈশ্বরানুগ্রহ পাইলে সে যে নৈসর্গিক নিয়মের সাহায্যেই অতিশয় বিপন্ন হইয়াও আত্মরক্ষা করিতে পারিবে, ইহা অসম্ভব কি?† যাহাই হউক, এ সকল কথায় আমাদিগের কোন প্রয়োজন এক্ষণে দেখা যাইতেছে না,—কেন না, আমি ভক্তি বুঝাইতেছি, ভক্ত কি প্রকারে ঈশ্বরানুগ্রহ প্রাপ্ত হন, বা হন কি না, তাহা বুঝাইতেছি না। এরূপ কোন ফলই ভক্তের কামনা করা উচিত নহে,—তাহা হইলে তাঁহার ভক্তি নিষ্কাম হইবে না।

শিষ্য। কিন্তু প্রহ্লাদ ত এখানে রক্ষা কামনা করিলেন—

গুরু। না, তিনি রক্ষা কামনা করেন নাই। তিনি কেবল ইহাই মনে স্থির বুঝিলেন যে, যখন আমার আরাধ্য বিষ্ণু আমাতেও আছেন, এই অস্ত্রও আছেন, তখন এ অস্ত্র কখন আমার অনিষ্ট হইবে না। সেই দৃঢ়নিশ্চয়তাই আরও স্পষ্ট হইতেছে। কেবল ইহাই বুঝান আমার উদ্দেশ্য। প্রহ্লাদচরিত্র যে উপন্যাস, তদ্বিষয়ে সংশয় কি? সে উপন্যাসে নৈসর্গিক বা অনৈসর্গিক কথা আছে, তাহাতে কি আসিয়া যায়? উপন্যাসে এরূপ অনৈসর্গিক কথা থাকিলে ক্ষতি কি? অর্থাৎ যেখানে উপন্যাসকারের উদ্দেশ্য মানস ব্যাপারের বিবরণ, জড়ের গুণ ব্যাখ্যা নহে, তখন জড়ের অপ্রকৃত ব্যাখ্যা থাকিলে মানস ব্যাপারের ব্যাখ্যা অস্পষ্ট হয় না। বরং অনেক সময় অধিকতর স্পষ্ট হয়। এই জন্য জগতের শ্রেষ্ঠ কবির মধ্যে অনেকেই অতিপ্রকৃতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

তার পর অস্ত্র প্রহ্লাদ মারিল না দেখিয়া, হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে বলিলেন, “ওরে দুর্ষবুদ্ধি, এখনও শত্রুস্তুতি হইতে নিবৃত্ত হ! বড় মূর্খ হইস্ না, আমি এখনও তোকে অভয় দিতেছি।”

* মর্ষ্যাপিতমনোবুদ্ধির্ষো মন্ডুক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।

† ঠিক এই কথাটি প্রতিপন্ন করিবার জন্য সিপাহী হস্ত হইতে দেবী চৌধুরাণীর উদ্ধার বর্তমান লেখক কর্তৃক প্রণীত হইয়াছে। সময়ে মেঘোদয়, ঈশ্বরের অনুগ্রহ; অবশিষ্ট ভক্তের নিজের দক্ষতা। দেবী চৌধুরাণীর সঙ্গে পাঠক এই ভক্তিব্যাখ্যা মিলাইয়া দেখিতে পারেন।

বিক্রম রচনাবলী

অভয়ের কথা শুনিয়ে প্রহ্লাদ বলিল, “যিনি সকল ভয়ের অপহারী, যাঁহার স্মরণে জন্ম জরা যম প্রভৃতি সকল ভয়ই দূর হয়, সেই অনন্ত ঈশ্বর হৃদয়ে থাকিতে আমার ভয় কিসের?”

সেই “ভয়োদ্বৈগৈর্মুক্তো” কথা মনে কর। তার পর হিরণ্যকশিপু, সর্পগণকে আদেশ করিলেন যে, উহাকে দংশন কর। কথাটা উপন্যাস, সুতরাং এরূপ বর্ণনায় ভরসা করি, তুমি বিরক্ত হইবে না। সাপের কামড়েও প্রহ্লাদ মরিল না,—সে কথাও তোমার বিশ্বাস করিয়া কাজ নাই। কিন্তু যে কথার জন্য পুরাণকার এই সর্পদংশন-বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন, তৎপ্রতি মনোযোগ কর।

স হ্রাসকৃত্তমতিঃ কৃষ্ণে দশ্যমানো মহোরগৈঃ।

ন বিবেদাত্তনো গাত্রং তৎস্মৃত্যাহ্লাদসংস্থিতঃ ॥

প্রহ্লাদের মন কৃষ্ণে তখন এমন আসক্ত যে, মহাসর্পসকল দংশন করিতেছে, তথাপি কৃষ্ণস্মৃতির আহ্লাদে তিনি ব্যথা কিছুই জানিতে পারিলেন না। এই আহ্লাদের জন্য সুখ দুঃখ সমান জ্ঞান হয়। সেই ভগবদ্বাক্য আবার স্মরণ কর “সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী।” “ক্ষমী” কি, পরে বুঝিবে, এখন “সমদুঃখসুখ” বুঝিলে?

শিষ্য। বুঝিলাম এই যে, ভক্তের মনে বড় একটা ভারি সুখ রাত্রি দিন রহিয়াছে বলিয়া, অন্য সুখ দুঃখ, সুখ দুঃখ বলিয়াই বোধ হয় না।

গুরু। ঠিক তাই। সর্প কর্তৃক প্রহ্লাদ বিনষ্ট হইল না, দেখিয়া হিরণ্যকশিপু মত্ত হস্তি-গণকে আদেশ করিলেন যে, উহাকে দাঁতে ফাড়াইয়া মারিয়া ফেল। হস্তীদিগের দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল, প্রহ্লাদের কিছু হইল না; বিশ্বাস করিও না—উপন্যাস মাত্র। কিন্তু তাহাতে প্রহ্লাদ পিতাকে কি বলিলেন শুন,—

দস্তা গজানাং কুলিশাগ্নিষ্ঠুরাঃ

শীর্ণা যদেতে ন বলং মমৈতৎ।

মহাবিপৎপাপবিনাশনোহয়ং

জনান্দর্দনানুস্মরণানুভাবঃ ॥

“কুলিশাগ্নিকঠিন এই সকল গজদন্ত যে ভাঙ্গিয়া গেল, ইহা আমার বল নহে। যিনি মহাবিপৎ ও পাপের বিনাশন, তাঁহারই স্মরণে হইয়াছে।”

আবার সেই ভগবদ্বাক্য স্মরণ কর “নির্মমো নিরহঙ্কারঃ” ইত্যাদি।* ইহাই নিরহঙ্কার। ভক্ত জানে যে, সকলই ঈশ্বর করিতেছেন, এই জন্য ভক্ত নিরহঙ্কার।

হস্তী হইতে প্রহ্লাদের কিছু হইল না দেখিয়া হিরণ্যকশিপু আগুনে পোড়াইতে আদেশ করিলেন। প্রহ্লাদ আগুনেও পুড়িল না। প্রহ্লাদ “শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ,” তাই প্রহ্লাদের সে আগুন পদ্মপত্রের ন্যায় শীতল বোধ হইল।† তখন দৈত্যপুরোহিত ভার্গবেরা দৈত্যপতিকে বলিলেন যে, “ইহাকে আপনি ক্ষমা করিয়া আমাদের জিহ্মা করিয়া দিন। তাহাতেও যদি এ বিষ্ণুভক্তি পরিত্যাগ না করে, তবে আমরা অভিচারের দ্বারা ইহাকে বধ করিব। আমাদের কৃত অভিচার কখন বিফল হয় না।”

দৈত্যেশ্বর এই কথায় সন্তুষ্ট হইলে, ভার্গবেরা প্রহ্লাদকে লইয়া গিয়া, অন্যান্য দৈত্যগণের সঙ্গে পড়াইতে লাগিলেন। প্রহ্লাদ সেখানে নিজে একটি ক্লাস খুলিয়া বসিলেন। এবং দৈত্যপত্ৰগণকে একত্রিত করিয়া তাহাদিগকে বিষ্ণুভক্তিতে উপদেশ দিতে লাগিলেন। প্রহ্লাদের বিষ্ণুভক্তি আর কিছুই নহে—পরহিতরত মাত্র—

বিস্তারঃ সর্বভূতস্য বিষ্ণোর্বিষ্মদং জগৎ।

দ্রষ্টব্যামাত্মবৎ তস্মাদভেদেন বিচক্ষণৈঃ ॥

* * *

সর্বত্র দৈত্যাঃ সমতামুপেত

সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য ॥

অর্থাৎ বিশ্ব, জগৎ, সর্বভূত, বিষ্ণুর বিস্তার মাত্র; বিচক্ষণ ব্যক্তি এই জন্য সকলকে আপনার

* নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী।

† শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ ॥

সঙ্গে অভেদ দেখিবেন। ** হে দৈত্যগণ! তোমরা সর্বত্র সমান দেখিও, এই সমস্ত (আপনার সঙ্গে সর্বভূতের) ঈশ্বরের আরাধনা।

প্রহ্লাদের উক্তি বিষ্ণুপুরাণ হইতে তোমাকে পড়িতে অনুরোধ করি। এখন কেবল আর দুইটি শ্লোক শুন।

অথ ভদ্রাণি ভূতানি হীনশক্তিরহং পরম্।
মুদং তথাপি কুর্বাণীত হানির্দেষফলং যতঃ ॥
বন্ধবৈরাণি ভূতানি দ্বেষং কুর্বাণীস্তি চেত্ততঃ।
শোচ্যান্যহোহঁতিমোহেন ব্যাপ্তানীতি মনীষিণা ॥

“অন্যের মঙ্গল হইতেছে, আপনি হীনশক্তি, ইহা দেখিয়াও আহ্লাদ করিও, দ্বেষ করিও না; কেন না, দ্বেষে অনিষ্টই হইয়া থাকে। যাহাদের সঙ্গে শত্রুতা বন্ধ হইয়াছে, তাহাদেরও যে দ্বেষ করে, সে অতি মোহেতে ব্যাপ্ত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞানীরা দুঃখ করেন।”

এখন সেই ভগবদুক্ত লক্ষণ মনে কর।

“যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ” এবং ‘ন দ্বেষিষ্ট’* শব্দ মনে কর। ভগবদ্বাক্যে পুরাণকর্তার কৃত এই টীকা।

প্রহ্লাদ আবার বিষ্ণুভক্তির উপদ্রব করিতেছে জানিয়া হিরণ্যকশিপু তাহাকে বিষ পান করাইতে আজ্ঞা দিলেন। বিষেও প্রহ্লাদ মরিল না। তখন দৈত্যেশ্বর পুরোহিতগণকে ডাকাইয়া অভিচার-ক্রিয়ার দ্বারা প্রহ্লাদের সংহার করিতে আদেশ করিলেন। তাহারা প্রহ্লাদকে একটু বুঝাইলেন; বলিলেন—তোমার পিতা জগতের ঈশ্বর, তোমার অন্তে কি হইবে? প্রহ্লাদ “স্থিরমতি”†; প্রহ্লাদ তাহাদিগকে হাসিয়া উড়াইয়া দিল। তখন দৈত্যপুরোহিতেরা ভয়ানক অভিচার-ক্রিয়ার সৃষ্টি করিলেন। অগ্নিময়ী মূর্ত্তিমতী অভিচার-ক্রিয়া প্রহ্লাদের হৃদয়ে শূলাঘাত করিল। প্রহ্লাদের হৃদয়ে শূল ভাঙ্গিয়া গেল। তখন সেই মূর্ত্তিমান্ অভিচার, নিরপরাধ প্রহ্লাদের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছিল বলিয়া অভিচারকারী পুরোহিতদিগকেই ধ্বংস করিতে গেল। তখন প্রহ্লাদ “হে কৃষ্ণ! হে অনন্ত! ইহাদের রক্ষা কর” বলিয়া সেই দহমান পুরোহিতদিগের রক্ষার জন্য ধাবমান হইলেন। ডাকিলেন, “হে সর্বব্যাপিন্, হে জগৎস্বরূপ, হে জগতের সৃষ্টিকর্তা, হে জনান্দন! এই ব্রাহ্মণগণকে এই দুঃসহ মন্ত্রাগ্নি হইতে রক্ষা কর! যেমন সকল ভূতে সর্বব্যাপী, জগদ্গুরু, বিষ্ণু তুমি আছ, তেমনই এই ব্রাহ্মণেরা জীবিত হউক! বিষ্ণু সর্বগত বলিয়া যেমন অগ্নিকে আমি শত্রুপক্ষ বলিয়া ভাবি নাই, এ ব্রাহ্মণেরাও তেমন—ইহারাও জীবিত হোক। যাহারা আমাকে মারিতে আসিয়াছিল, যাহারা বিষ দিয়াছিল, যাহারা আমাকে আগুনে পোড়াইয়াছিল, হাতীর দ্বারা আমাকে আহত করিয়াছিল, সাপের দ্বারা দংশিত করিয়াছিল, আমি তাহাদের মিত্রভাবে আমার সমান দেখিয়াছিলাম, শত্রু মনে করি নাই, আজ সেই সত্যের হেতু এই পুরোহিতেরা জীবিত হউক।” তখন ঈশ্বরকৃপায় পুরোহিতেরা জীবিত হইয়া, প্রহ্লাদকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গৃহে গমন করিল।

এমন আর কখন শূনিব কি? তুমি ইহার অপেক্ষা উন্নত ভক্তিবাদ, ইহার অপেক্ষা উন্নত ধর্ম অন্য কোন দেশের কোন শাস্ত্রে দেখাইতে পার?‡

শিষ্য। আমি স্বীকার করি, দেশীয় গ্রন্থসকল ত্যাগ করিয়া কেবল ইংরাজি পড়ায় আমাদের বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে।

গুরু। এখন ভগবদ্গীতায় যে ভক্ত ক্ষমাশীল এবং শত্রু মিত্রে তুল্যজ্ঞানী বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহা কি প্রকার, তাহা বুঝিলে?§

* যো ন হস্যতি ন দ্বেষিষ্ট ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।

† অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ।

‡ মনস্বী শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার স্বপ্রণীত “Oriental Christ” নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থে লিখিয়াছেন, “A suppliant for mercy on behalf of those very men who put him to death, he said—‘Father! forgive them, for they know not what they do.’ Can ideal forgiveness go any further?” *Ideal* যার বৈ কি, এই প্রহ্লাদচরিত্র দেখুন না।

§ সমঃ শত্রৌ চ মিত্র চ তথা মানাপমানয়োঃ।

বাঁকম রচনাবলী

পরে, হিরণ্যকশিপু পুত্রের প্রভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার এই প্রভাব কোথা হইতে হইল?” প্রহ্লাদ বলিলেন, “অচ্যুত হরি যাহাদের হৃদয়ে অবস্থান করেন, তাহাদের এইরূপ প্রভাব হইয়া থাকে। যে অন্যের অনিষ্ট চিন্তা করে না—কারণাভাববশতঃ তাহারও অনিষ্ট হয় না। যে কস্মের দ্বারা, মনে বা বাক্যে পরপীড়ন করে, তাহার সেই বীজে প্রভূত অশুভ ফলিয়া থাকে।

কেশব আমাতেও আছেন, সর্বভূতেও আছেন, ইহা জানিয়া আমি কাহারও মন্দ ইচ্ছা করি না, কাহারও মন্দ করি না, কাহাকেও মন্দ বলি না। আমি সকলের শুভ চিন্তা করি, আমার শারীরিক বা মানসিক, দৈব বা ভৌতিক অশুভ কেন ঘটবে? হরি সর্বময় জানিয়া সর্বভূতে এইরূপ অব্যাভিচারিণী ভক্তি করা পণ্ডিতের কর্তব্য।”

ইহার অপেক্ষা উন্নত ধর্ম আর কি হইতে পারে? বিদ্যালয়ে এ সকল না পড়াইয়া, পড়ায় কি না—মেকলে প্রণীত ক্লাইভ ও হেষ্টিংস সম্বন্ধীয় পাপপূর্ণ উপন্যাস। আর সেই উচ্চ শিক্ষার জন্য আমাদের শিক্ষিতমণ্ডলী উন্মত্ত।

পরে, প্রহ্লাদের বাক্যে পুনশ্চ ক্রুদ্ধ হইয়া দৈত্যপতি তাহাকে প্রাসাদ হইতে নিষ্কিপ্ত করিয়া, শম্বরাসুরের মায়ার দ্বারা ও বায়ুর দ্বারা প্রহ্লাদের বিনাশের চেষ্টা করিলেন। প্রহ্লাদ সে সকলে বিনষ্ট না হইলে, নীতিশিক্ষার জন্য তাহাকে পুনশ্চ গুরুগৃহে পাঠাইলেন। সেখানে নীতিশিক্ষা সমাপ্ত হইলে আচার্য্য প্রহ্লাদকে সঙ্গে করিয়া দৈত্যেশ্বরের নিকট লইয়া আসিলেন। দৈত্যেশ্বর পুনশ্চ তাহার পরীক্ষার্থ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন,—

“হে প্রহ্লাদ! মিত্রের ও শত্রুর প্রতি ভূপতি কিরূপ ব্যবহার করিবেন? তিন সময়ে কিরূপ আচরণ করিবেন? মন্ত্রী বা অমাত্যের সঙ্গে বাহ্যে এবং অভ্যন্তরে,—চর, চোর, শঙ্কিতে এবং অশঙ্কিতে,—সন্ধি বিগ্রহে, দুর্গ ও আর্টাবিক সাধনে বা কণ্টকশোষণে—কিরূপ করিবেন, তাহা বল।

প্রহ্লাদ পিতৃপদে প্রণাম করিয়া বলিলেন, “গুরু সে সব কথা শিখাইয়াছেন বটে, আমিও শিখিয়াছি। কিন্তু সে সকল নীতি আমার মনোমত নহে। শত্রু মিত্রের সাধন-জন্য সাম দান ভেদ দণ্ড, এই সকল উপায় কথিত হইয়াছে, কিন্তু পিতঃ! রাগ করিবেন না, আমি ত সে রূপ শত্রু মিত্র দেখি না। যেখানে সাধ্য নাই,* সেখানে সাধনের কি প্রয়োজন! যখন জগন্ময় জগন্নাথ পরমাত্মা গোবিন্দ সর্বভূতাত্মা, তখন আর শত্রু মিত্র কে? তোমাতে ভগবান্ আছেন, আমাতে আছেন, আর সকলেও আছেন, তখন এই ব্যক্তি মিত্র, আর এই শত্রু, এমন করিয়া পৃথক্ ভাবিব কি প্রকারে? অতএব দুষ্ট-চেষ্টা-বিধি-বহুল এই নীতিশাস্ত্রে কি প্রয়োজন?”

হিরণ্যকশিপু ক্রুদ্ধ হইয়া প্রহ্লাদের বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিলেন। এবং প্রহ্লাদকে নাগপাশে বদ্ধ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে অসুরগণকে আদেশ করিলেন। অসুরেরা প্রহ্লাদকে নাগপাশে বদ্ধ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া পর্বত চাপা দিল। প্রহ্লাদ তখন জগদীশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন। স্তব করিতে লাগিলেন, কেন না, অস্তিম কালে ঈশ্বরচিন্তা বিধেয়; কিন্তু ঈশ্বরের কাছে আত্মরক্ষা প্রার্থনা করিলেন না; কেন না, প্রহ্লাদ নিষ্কাম। প্রহ্লাদ ঈশ্বরে তন্ময় হইয়া, তাহার ধ্যান করিতে করিতে তাঁহাতে লীন হইলেন। প্রহ্লাদ যোগী† তখন তাঁহার নাগপাশ খসিয়া গেল, সমুদ্রের জল সরিয়া গেল; পর্বতসকল দূরে নিক্ষেপ করিয়া প্রহ্লাদ গাত্রোথান করিলেন। তখন প্রহ্লাদ আবার বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন,—আত্মরক্ষার জন্য নহে, নিষ্কাম হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু তখন তাঁহাকে দর্শন দিলেন। এবং ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন। প্রহ্লাদ “সন্তুষ্টঃ সততং,” সন্তরাং তাঁহার জগতে প্রার্থনীয় কিছুই নাই। অতএব তিনি কেবল চাহিলেন যে, “যে সহস্র যোনিতে আমি পরিভ্রমণ করিব, সে সকল জন্মেই যেন তোমার প্রতি আমার অচলা ভক্তি থাকে।” ভক্ত ভক্তিই প্রার্থনা করে, ভক্তির জন্য ভক্তি প্রার্থনা করে, মূর্ত্তির জন্য বা অন্য ইষ্টসাধনের জন্য নহে।

ভগবান্ কহিলেন, “তাহা আছে ও থাকিবে। অন্য বর দিব, প্রার্থনা কর।”

* অর্থাৎ যখন পৃথিবীতে কাহাকেও শত্রু মনে করা উচিত নহে।

† সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।

প্রহ্লাদ দ্বিতীয় বর প্রার্থনা করিলেন, “আমি তোমার স্তুতি করিয়াছিলাম বলিয়া, পিতা আমার যে দ্বেষ করিয়াছিলেন, তাঁর সেই পাপ ক্ষালিত হউক।”

ভগবান্ তাহাও স্বীকার করিয়া, তৃতীয় বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু নিষ্কাম প্রহ্লাদের জগতে আর তৃতীয় প্রার্থনা ছিল না; কেন না, তিনি “সর্ব্বারম্ভপারিত্যাগী,— হর্ষ, দ্বেষ, শোক, আকাঙ্ক্ষাশূন্য, শুভাশুভপারিত্যাগী।” * তিনি আবার চাহিলেন, “তোমার প্রতি আমার ভক্তি যেন অব্যাভিচারিণী থাকে।”

বর দিয়া বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলেন। তার পর হিরণ্যকশিপু আর প্রহ্লাদের উপর অত্যাচার করেন নাই।

শিষ্য। তুল্যমানে এক দিকে বেদ, নিখিল ধর্ম্মশাস্ত্র, বাইবেল, কোরাণ, আর এক দিকে প্রহ্লাদচারিত্র রাখিলে প্রহ্লাদচারিত্রই গুরু হয়।

গুরু। এবং প্রহ্লাদকথিত এই বৈষ্ণব ধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ইহা ধর্ম্মের সার, সুতরাং সকল বিশুদ্ধ ধর্ম্মই আছে। যে পরিমাণে যে ধর্ম্ম বিশুদ্ধ, ইহা সেই পরিমাণে সেই ধর্ম্ম আছে। খৃষ্টধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম এই বৈষ্ণব ধর্ম্মের অন্তর্গত। গড়্ বলি, আল্লা বলি, ব্রহ্ম বলি, সেই এক জগন্নাথ বিষ্ণুকেই ডাকি। সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মাস্বরূপ জ্ঞান ও আনন্দময় চৈতন্যকে যে জানিয়াছে, সর্ব্বভূতে যাহার আত্মজ্ঞান আছে, যে অভেদী, অথবা সেইরূপ জ্ঞান ও চিন্তের অবস্থা প্রাপ্তিতে যাহার যত্ন আছে, সেই বৈষ্ণব ও সেই হিন্দু। তদ্বিন্দু যে কেবল লোকের দ্বেষ করে, লোকের অনিষ্ট করে, পরের সঙ্গে বিবাদ করে, লোকের কেবল জাতি মারিতেই ব্যস্ত, তাহার গলায় গোচ্ছা করা পৈতা, কপালে কপালজোড়া ফোঁটা, মাথায় টীক, এবং গায়ে নামাবলি ও মুখে হরিনাম থাকিলেও, তাহাকে হিন্দু বলিব না। সে ম্লেচ্ছের অধিক ম্লেচ্ছ, তাহার সংস্পর্শে থাকিলেও হিন্দুর হিন্দুয়ানি যায়।

বিংশতিতম অধ্যায়—ভক্তি

ভক্তির সাধন

শিষ্য। এক্ষণে আপনাকে জিজ্ঞাস্য যে, আপনার নিকট যে ভক্তির ব্যাখ্যা শুনিলাম, তাহা সাধন, না সাধ্য?

গুরু। ভক্তি, সাধন ও সাধ্য। ভক্তি মুক্তিপ্রদা, এজন্য ভক্তি সাধন। আর ভক্তি মুক্তিপ্রদা হইলেও মুক্তি বা কিছুই কামনা করে না, এজন্য ভক্তিই সাধ্য।

শিষ্য। তবে, এই ভক্তির সাধন কি, শুনিতে ইচ্ছা করি। ইহার অনুশীলন প্রথা কি? উপাসনাই ভক্তির সাধন বলিয়া চিরপ্রথিত, কিন্তু আপনার ব্যাখ্যা যদি যথার্থ হয়, তবে ইহাতে উপাসনার কোন স্থান দেখিতেছি না।

গুরু। উপাসনার যথেষ্ট স্থান আছে, কিন্তু উপাসনা কথাটা অনেক প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহাতে গোলযোগ হইতে পারে বটে। সকল বৃত্তিগুণকে ঈশ্বরমুখী করিবার যে চেষ্টা, তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপাসনা আর কি হইতে পারে? তুমি অন্তর্দিন সমস্ত কার্য্যে ঈশ্বরকে আন্তরিক চিন্তা না করিলে কখনই তাহা পারিবে না।

শিষ্য। তথাপি হিন্দুশাস্ত্রে এই ভক্তির অনুশীলনের কি প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। আপনি যে ভক্তিতত্ত্ব বুঝাইলেন, তাহা হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ভক্তি হইলেও হিন্দুদিগের মধ্যে বিরল। হিন্দুর মধ্যে ভক্তি আছে; কিন্তু সে আর এক রকমের। প্রতিমা গড়িয়া, তাহার সম্মুখে যোড়হাত করিয়া, পটুবস্ত্র গলদেশে দিয়া গঙ্গতভাবে অশ্রুমোচন, “হরি! হরি!” বা “মা! মা!” ইত্যাদি শব্দে উচ্চতর গোলযোগ, অথবা রোদন, এবং প্রতিমার চরণামৃত পাইলে তাহা মাথায়, মুখে, চোখে, নাকে, কাণে,—

গুরু। তুমি যাহা বলিতেছ, বুঝিয়াছি। উহাও চিন্তের উন্নত অবস্থা, উহাকে উপহাস

* সর্ব্বারম্ভপারিত্যাগী যো মন্তস্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষতি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।

শুভাশুভপারিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥

বাঞ্চকম রচনাবলী

করিও না। তোমার হক্কলী, টিঙল অপেক্ষা ওরূপ এক জন ভাবুক আমার শ্রদ্ধার পাত্র। তুমি গোণ ভক্তির কথা তুলিতেছ।

শিষ্য। আপনার পদস্বকার কথায় ইহাই বদ্বিয়ারিছ যে, ইহাকে আপনি ভক্তি বলিয়া স্বীকার করেন না।

গুরু। ইহা মূখ্য ভক্তি নহে, কিন্তু গোণ বা নিকৃষ্ট ভক্তি বটে। যে সকল হিন্দুশাস্ত্র অপেক্ষাকৃত আধুনিক, ইহাতে সে সকল পরিপূর্ণ।

শিষ্য। গীতাদি প্রাচীন শাস্ত্রে মূখ্য ভক্তিতত্ত্বেরই প্রচার থাকাতেও আধুনিক শাস্ত্রে গোণ ভক্তি কি প্রকারে আসিল?

গুরু। ভক্তি জ্ঞানাত্মিকা, এবং কর্ম্মাত্মিকা, ভরসা করি, ইহা বদ্বিয়ারিছ। ভক্তি উভয়াত্মিকা বলিয়া, তাহার অনুশীলনে মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরে সমর্পিত করিতে হয়। সকল বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করিতে হয়। যখন ভক্তি কর্ম্মাত্মিকা এবং কর্ম্ম সকলই ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে হয়, তখন কাজেই কস্মিন্দ্রিয় সকলই ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য আমি তোমাকে বদ্বিয়ারিছ যে, যাহা জগতে অনুষ্ঠেয় অর্থাৎ ঈশ্বরানুমোদিত কর্ম্ম, তাহাতে শারীরিক বৃত্তির নিয়োগ হইলেই ঐ বৃত্তি ঈশ্বরমুখী হইল। কিন্তু অনেক শাস্ত্রকারেরা অন্যরূপ বদ্বিয়ারিছেন। কি ভাবে তাঁহারা কস্মিন্দ্রিয় সকল ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে চান, তাহার উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি শ্লোক ভাগবতপুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। হরিনামের কথা হইতেছে,—

বিলে বতোরুদ্রমবিদ্রুমান্ যে ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
জিহ্বাসতী দান্দুর্দীরকেব সূত ন চোপগায়তুরুগায়গাথাঃ ॥
ভারঃ পরং পট্টিকরীটজুষ্টমপ্যুত্তমাঙ্গং ন নমেন্মুকুন্দং।
শাবৌ করৌ নো কুরুতঃ সপর্ষ্যাং হরেল্লসৎকাণ্ডনকঙ্কণৌ বা ॥
বহ্নায়িতে তে নয়নে নরাণাং লিঙ্গানি বিষ্ণোনিরীক্ষতো যে।
পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজৌ ক্ষেত্রাণি নানুরজতো হরেষৌ ॥
জীবন্তুবো ভাগবতাঽপ্তিরেণুন্ ন জাতু মর্ত্যোভিলভেত যন্তু।
শ্রীবিষ্ণুপদ্যা মনুজন্তুলস্যাঃ শ্বসন্তুবো যন্তু ন বেদ গন্ধং ॥
তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যঙ্গহ্যমানৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ ॥

ভাগবত, ২ স্ক, ৩ অ, ২০—২৪।

“যে মনুষ্য কর্ণপুটে হরীগুণানুবাদ শ্রবণ না করে, হায়! তাহার কর্ণ দুইটি বৃথা গর্ত মাত্র। হে সূত! যে হরীগাথা গান না করে, তাহার অসতী জিহ্বা ভেকজিহ্বাতুল্যা। যাহার মস্তক মুকুন্দকে নমস্কার না করে, তাহা পট্ট-কিরীট-শোভিত হইলেও বোঝা মাত্র। যাহার হস্তদ্বয় হরির সপর্ষ্যা না করে, তাহা কনককঙ্কণে শোভিত হইলেও মড়ার হাত মাত্র। মনুষ্য-দিগের চক্ষুর্দ্বয় যদি বিষ্ণুমূর্ত্তি* নিরীক্ষণ না করে, তবে তাহা ময়ূরপুচ্ছ মাত্র। আর যে চরণদ্বয় হরিতীর্থে পর্যটন না করে, তাহার বৃক্ষজন্ম লাভ হইয়াছে মাত্র। আর যে ভগবৎপদরেণু ধারণ না করে, সে জীবদ্দশাতেই শব। বিষ্ণুপাদার্পিত তুলসীর গন্ধ যে মনুষ্য না জানিয়াছে, সে নিশ্বাস থাকিতেও শব। হায়! হরিনামকীর্তনে যাহার হৃদয় বিকারপ্রাপ্ত না হয়, এবং বিকারেও যাহার চক্ষে জল ও গাত্রে রোমাণ্ড না হয়, তাহার হৃদয় লৌহময়।”

এই শ্রেণীর ভক্তেরা এইরূপে ঈশ্বরে বাহ্যেন্দ্রিয় সমর্পণ করিতে চাহেন। কিন্তু ইহা সাকারোপাসনাসাপেক্ষ। নিরাকারে চক্ষুপাণিপাদের এরূপ নিয়োগ অঘটনীয়।

শিষ্য। কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর এখনও পাই নাই। ভক্তির প্রকৃত সাধন কি?

গুরু। তাহা ভগবান্ গীতার সেই দ্বাদশ অধ্যায়ে বলিতেছেন,—

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যোনেব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥

* এখানে “লিঙ্গানি বিষ্ণোঃ” অর্থে বিষ্ণুর মূর্ত্তিসকল। অতি সঙ্গত অর্থ। তবে শিবলিঙ্গের কেবল সেই অর্থ না করিয়া, কদর্ঘ্য উপন্যাস ও উপাসনাপদ্ধতিতে যাই কেন?

তেষামহং সমুদ্বর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবৌশিতচেতসাং ॥
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় ।
নিবাসিষ্যসি ময্যেব অত উদ্ধরং ন সংশয়ঃ ॥ ১২।৬—৮

“হে অর্জুন! যাহারা সর্বকর্ম আমাতে ন্যস্ত করিয়া মৎপরায়ণ হয়, এবং অন্য ভজনার্থিত যে ভক্তিযোগ, তদ্বারা আমার ধ্যান ও উপাসনা করে, মৃত্যুযুক্ত সংসার হইতে সেই আমাতে নিবিষ্টচেতাদিগের আমি অচিরে উদ্ধারকর্ত্তা হই। আমাতে তুমি মন স্থির কর, আমাতে বুদ্ধি নিবিষ্ট কর, তাহা হইলে তুমি দেহান্তে আমাতেই অধিষ্ঠান করিবে।”

শিষ্য। বড় কঠিন কথা। এইরূপ ঈশ্বরে চিত্ত নিবিষ্ট করিতে কয়জন পারে?

গুরু। সকলেই পারে। চেষ্টা করিলেই পারে।

শিষ্য। কি প্রকারে চেষ্টা করিতে হইবে?

গুরু। ভগবান্ তাহাও অর্জুনকে বলিয়া দিতেছেন,

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্ ।

অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ১২।৯

“হে অর্জুন! যদি আমাতে চিত্ত স্থির করিয়া রাখিতে না পার, তবে অভ্যাসযোগের দ্বারা আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর।” অর্থাৎ যদি ঈশ্বরে চিত্ত স্থির রাখিতে না পার, তবে পুনঃ পুনঃ চেষ্টার দ্বারা সেই কার্য অভ্যস্ত করিবে।

শিষ্য। অভ্যাস মাত্রই কঠিন, এবং এ গুরুতর অভ্যাস আরও কঠিন। সকলে পারে না। যাহারা না পারে, তাহারা কি করিবে?

গুরু। যাহারা কর্ম করিতে পারে, তাহারা যে কর্ম ঈশ্বরোদ্দিষ্ট বা ঈশ্বরানুমোদিত, সেই সকল কর্ম সর্বদা করিলে ক্রমে ঈশ্বরে মন স্থির হইবে। তাহাই ভগবান্ বলিতেছেন—

অভ্যাসেহ্যস্যসমর্থোহসি মৎকর্মপরমো ভব ।

মদর্থমপি কর্মাণি কুর্স্বন্ সিদ্ধিমবাপস্যসি ॥ ১২।১০

“যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তবে মৎকর্মপরায়ণ হও। আমার জন্য কর্মসকল করিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।”

শিষ্য। কিন্তু অনেকে কর্মেও অপটু—বা অকর্মা। তাহাদের উপায় কি?

গুরু। এই প্রশ্নের আশঙ্কায় ভগবান্ বলিতেছেন,—

অথৈতদ্যশক্তোহসি কস্তুং মদ্যোগমাশ্রিতঃ ।

সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥ ১২।১১

“যদি মদাশ্রিত কর্মেও অশক্ত হও, তবে যতাত্মা হইয়া সর্বকর্মফল ত্যাগ কর।”

শিষ্য। সে কি? যে কর্মে অক্ষম, যাহার কোন কর্ম নাই, সে কর্মফল ত্যাগ করিবে কি প্রকারে?

গুরু। কোন জীবই একেবারে কর্মশূন্য হইতে পারে না। যে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কর্ম না করে, ভূতত্যাগিত হইয়া সেও কর্ম করিবে। এ বিষয়ে ভগবদুক্তি পূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। যে কর্মই তদ্বারা সম্পন্ন হয়, যদি কর্মকর্ত্তা তাহার ফলাকাঙ্ক্ষা না করে, তবে অন্য কামনা-ভাবে, ঈশ্বরই একমাত্র কাম্য পদার্থ হইয়া দাঁড়াইবেন। তখন আপনা হইতেই চিত্ত ঈশ্বরে স্থির হইবে।

শিষ্য। এই চতুর্বিধ সাধনই অতি কঠিন। আর ইহার কিছুতেই উপাসনার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না।

গুরু। এই চতুর্বিধ সাধনই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। ঈদৃশ সাধকদিগের পক্ষে অন্যবিধ উপাসনার প্রয়োজন নাই।

শিষ্য। কিন্তু অজ্ঞ, নীচবৃত্ত, কলুষিত, বালক প্রভৃতির এ সকল সাধন আয়ত্ত নহে। তাহারা কি ভক্তির অধিকারী নহে?

গুরু। এই সব স্থলে উপাসনাত্মিকা গোণ ভক্তির প্রয়োজন। গীতায় ভগবদুক্তি আছে যে,—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং ।

বিক্রম রচনাবলী

“যে যে-রূপে আমাকে আশ্রয় করে, আমি তাহাকে সেইরূপ ভজনা করি।”
এবং স্থানান্তরে বলিয়াছেন,—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোল্লং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্লামি প্রযতাত্মনঃ ॥

“যে ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল, জল দেয়, তাহা প্রযতাত্মার ভক্তির উপহার বলিয়া আমি গ্রহণ করি।”

শিষ্য। তবে কি গীতায় সাকার মূর্ত্তির উপাসনা বিহিত হইয়াছে?

গুরু। ফল পুষ্পাদি প্রদান করিতে হইলে, তাহা যে প্রতিমায় অর্পণ করিতে হইবে, এমন কথা নাই। ঈশ্বর সর্ব্বত্র আছেন; যেখানে দিবে, সেইখানে তিনি পাইবেন।

শিষ্য। প্রতিমাদির পূজা বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মে নিষিদ্ধ, না বিহিত?

গুরু। অধিকারিভেদে নিষিদ্ধ, এবং বিহিত। তদ্বিষয়ে ভাগবতপুরাণ হইতে কপিলাস্তিক উদ্ধৃত করিতেছি। ভাগবতপুরাণে কপিল, ঈশ্বরের অবতার বলিয়া গণ্য। তিনি তাহার মাতা দেবহৃতীকে নিগূণ ভক্তিযোগের সাধন বলিতেছেন। এই সাধনের মধ্যে এক দিকে সর্ব্বভূতে ঈশ্বরচিন্তা, দয়া, মৈত্র, যম নিয়মাদি ধরিয়াছেন, আর এক দিকে প্রতিমা দর্শন, স্পর্শন, পূজাদি ধরিয়াছেন। কিন্তু বিশেষ এই বলিতেছেন,—

অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা ।
তমবজ্জায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেহর্চাবিড়ম্বনং ॥
যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং ।
হিত্বার্চাং ভজতে মৌঢ্যাদুশ্মন্যেব জুহোতি সঃ ॥

৩ স্ক। ২৯ অ। ১৭। ১৮

“আমি, সর্ব্বভূতে ভূতাত্মস্বরূপ অবস্থিত আছি। সেই আমাকে অবজ্ঞা করিয়া (অর্থাৎ সর্ব্বভূতকে অবজ্ঞা করিয়া) মনুষ্য প্রতিমাপূজা বিড়ম্বনা করিয়া থাকে। সর্ব্বভূতে আত্ম-স্বরূপ ঈশ্বর আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যে প্রতিমা ভজনা করে, সে ভস্মে ঘি ঢালে।”

পুনশ্চ,

অর্চাদাবর্চয়েত্তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকুৎ ।

যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতং ॥ ২৯ অ। ২০

যে ব্যক্তি স্বকর্মে রত, সে যত দিন না আপনার হৃদয়ে সর্ব্বভূতে অবস্থিত ঈশ্বরকে জানিতে পারে, তাবৎ প্রতিমাদি পূজা করিবে।

বিধিও রহিল, নিষেধও রহিল। যাহার সর্ব্বজনে প্রীতি নাই, ঈশ্বর জ্ঞান নাই, তাহার প্রতিমাদির অর্চনা বিড়ম্বনা। আর যাহার সর্ব্বজনে প্রীতি জন্মিয়াছে, ঈশ্বর জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহারও প্রতিমাদি পূজা নিষ্প্রয়োজনীয়। তবে যত দিন সে জ্ঞান না জন্মে, তত দিন বিষয়ী লোকের পক্ষে প্রতিমাদি পূজা অবিহিত নহে; কেন না, তদ্বারা ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি জন্মিতে পারে। প্রতিমাপূজা গোণ ভক্তির মধ্যে।

শিষ্য। গোণ ভক্তি কাহাকে বলিতেছেন, আমি ঠিক বুঝিতেছি না।

গুরু। মূখ্য ভক্তির অনেক বিঘ্ন আছে। যাহা দ্বারা সেই সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয়, শাণ্ডিল্যসূত্রপ্রণেতা তাহারই নাম দিয়াছেন গোণ ভক্তি। ঈশ্বরের নামকীর্ত্তন, ফল পুষ্পাদির দ্বারা তাহার অর্চনা, বন্দনা, প্রতিমাদির পূজা—এ সকল গোণ ভক্তির লক্ষণ। সূত্রের টীকাকার স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, এই সকল অনুষ্ঠান ভক্তিজনক মাত্র; ইহার ফলাস্তর নাই।*

শিষ্য। তবে আপনার মত এই বুঝিলাম যে, পূজা, হোম, যজ্ঞ, নামসংকীর্ত্তন, সন্ধ্যা-বন্দনাদি বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী নহে। তবে উহাতে কোন প্রকার ঐহিক বা পারমার্থিক ফল নাই,—ঐ সকল কেবল ভক্তির সাধন মাত্র।

গুরু। তাহাও নিকৃষ্ট সাধন। উৎকৃষ্ট সাধন, যাহা তোমাকে কৃষ্ণোক্তি উদ্ধৃত করিয়া শুনাইয়াছি। যে তাহাতে অক্ষম, সেই পূজাদি করিবে। তবে স্তুতি বন্দনা প্রভৃতি সম্বন্ধে একটা বিশেষ কথা আছে। যখন কেবল ঈশ্বরচিন্তাই উহার উদ্দেশ্য, তখন উহা মূখ্য ভক্তির

* ভক্ত্যা কীর্ত্তনে ভক্ত্যা দানে পরাভক্তিং সাধয়েদিতি ** ন ফলাস্তরার্থং গৌরবাদিতি।

লক্ষণ। যথা বিপন্মুক্ত প্রহ্লাদকৃত বিষ্ণু-স্তুতি মূখ্য ভক্তি। আর “আমার পাপ ক্ষালিত হউক,” “আমার সুখে দিন যাউক”, ইত্যাদি সকাম সন্ধ্যাবন্দনা, স্তুতি বা Prayer, গোণভক্তিমধ্যে গণ্য। আমি তোমাকে পরামর্শ দিই যে, কৃষ্ণোক্তির অনুবর্তী হইয়া ঈশ্বরের কর্মতৎপর হও।

শিষ্য। সেও ত পূজা, হোম, যাগ যজ্ঞ—

গুরু। সে আর একটি ভ্রম। এ সকল ঈশ্বরের জন্য কর্ম নহে; এ সকল সাধকের নিজ মঙ্গলোদ্দেশ্য কর্ম—সাধকের নিজের কার্য; ভক্তির বৃদ্ধি জন্যও যদি এ সকল কর, তথাপি তোমার নিজের জন্যই হইল। ঈশ্বর জগন্ময়; জগতের কাজই তাঁহার কাজ। অতএব যাহাতে জগতের হিত হয়, সেই সকল কর্মই কৃষ্ণোক্ত “মৎকর্ম”; তাহার সাধনে তৎপর হও, এবং সমস্ত বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলনের দ্বারায় সে সকল সম্পাদনের যোগ্য হও। তাহা হইলে যাঁহার উদ্দেশ্য সেই সকল কর্ম, তাঁহাতে মন স্থির হইবে। তাহা হইলে ক্রমশঃ জীবন্মুক্ত হইবে। জীবন্মুক্তিই সুখ। বলিয়াছি, “সুখের উপায় ধর্ম।” এই জীবন্মুক্তিসুখের উপায়ই ধর্ম। রাজসম্পদাদি কোন সম্পদেই তত সুখ নাই।

যে ইহা না পারিবে, সে গোণ উপাসনা অর্থাৎ পূজা, নামকীর্তন, সন্ধ্যাবন্দনাদির দ্বারা ভক্তির নিকৃষ্ট অনুশীলনে প্রবৃত্ত হউক। কিন্তু তাহা করিতে হইলে, অন্তরের সহিত সে সকলের অনুষ্ঠান করিবে। তদ্ব্যতীত ভক্তির কিছুমাত্র অনুশীলন হয় না। কেবল বাহ্য্যাম্বরে বিশেষ অনিষ্ট জন্মে। উহা তখন ভক্তির সাধন না হইয়া কেবল শঠতার সাধন হইয়া পড়ে। তাহার অপেক্ষা সর্বপ্রকার সাধনের অভাবই ভাল। কিন্তু, যে কোন প্রকার সাধনে প্রবৃত্ত নহে, সে শঠ ও ভণ্ড হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও, তাহার সঙ্গে পশুগণের প্রভেদ অল্প।

শিষ্য। তবে, এখনকার অধিকাংশ বাঙ্গালি হয় ভণ্ড ও শঠ, নয় পশুবৎ।

গুরু। হিন্দুর অবনতির এই একটা কারণ। কিন্তু তুমি দেখিবে, শীঘ্রই বিশুদ্ধ ভক্তির প্রচারে হিন্দু নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া, ক্রময়েলের সমকালিক ইংরেজের মত বা মহম্মদের সমকালিক আরবের মত অতিশয় প্রতাপান্বিত হইয়া উঠিবে।

শিষ্য। কায়মনোবাক্যে জগদীশ্বরের নিকট সেই প্রার্থনা করি।

একবিংশতিতম অধ্যায়—প্রীতি

শিষ্য। এক্ষণে অন্যান্য হিন্দুগ্রন্থের ভক্তিব্যাখ্যা শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। তাহা এই অনুশীলনধর্মের ব্যাখ্যায় প্রয়োজনীয় নহে। ভাগবতপুরাণেও ভক্তিতত্ত্বের অনেক কথা আছে। কিন্তু ভগবদ্গীতাতেই সে সকলের মূল। এইরূপ অন্যান্য গ্রন্থেও যাহা আছে, সেও গীতামূলক। অতএব সে সকলের পর্য্যালোচনায় কালক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই। কেবল চৈতন্যের ভক্তিবাদ ভিন্ন প্রকৃতির। কিন্তু অনুশীলনধর্মের সহিত সে ভক্তিবাদের সম্বন্ধ তাদৃশ ঘনিষ্ঠ নহে, বরং একটুখানি বিরোধ আছে। অতএব আমি সে ভক্তিবাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না।

শিষ্য। তবে এক্ষণে প্রীতিবৃত্তির অনুশীলন সম্বন্ধে উপদেশ দান করুন।

গুরু। ভক্তিবৃত্তির কথা বলিবার সময়ে প্রীতিরও আসল কথা বলিয়াছি। মনুষ্যে প্রীতি ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি নাই। প্রহ্লাদচারিত্রে প্রহ্লাদোক্তিতে ইহা বিশেষ বর্ণিয়াছি। অন্য ধর্মের এ মত হোক না হোক, হিন্দুধর্মের এই মত। প্রীতির অনুশীলনের দুইটি প্রণালী আছে। একটি প্রাকৃতিক বা ইউরোপীয়, আর একটি আধ্যাত্মিক বা ভারতবর্ষীয়। আধ্যাত্মিক প্রণালীর কথা এখন থাক। আগে প্রাকৃতিক প্রণালী আমি যে রকম বর্ণি, তাহা বর্ণাইতেছি। প্রীতি দ্বিবিধ, সহজ এবং সংসর্গজ। কতকগুলি মনুষ্যের প্রতি প্রীতি আমাদের স্বভাবসিদ্ধ, যেমন সন্তানের প্রতি মাতা পিতার, বা মাতা পিতার প্রতি সন্তানের। ইহাই সহজ প্রীতি। আর কতকগুলির প্রতি প্রীতি সংসর্গজ, যেমন স্ত্রীর প্রতি স্বামীর, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর, প্রভুর প্রতি ভূত্যের, বা ভূত্যের প্রতি প্রভুর। এই সহজ এবং সংসর্গজ প্রীতিই পারিবারিক বন্ধন এবং ইহা হইতেই পারিবারিক জীবনের সৃষ্টি। এই পরিবারই প্রীতির প্রথম শিক্ষাস্থল। কেন না, যে ভাবের বশীভূত হইয়া অন্যের জন্য আমরা আত্মত্যাগে প্রবৃত্ত হই, তাহাই প্রীতি। পুত্রাদির জন্য আমরা আত্মত্যাগ করিতে স্বতই প্রবৃত্ত, এই জন্য পরিবার

বাংকম রচনাবলী

হইতে প্রথম প্রীতিবৃত্তির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হই। অতএব পারিবারিক জীবন ধার্মিকের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তাই হিন্দুশাস্ত্রকারেরা শিক্ষানবিশীর পরেই গার্হস্থ্য আশ্রম অবশ্য পালনীয় বলিয়া অনুজ্ঞাত করিয়াছিলেন।

পারিবারিক অনুশীলনে প্রীতিবৃত্তি কিয়ৎপরিমাণে স্ফূর্তিত হইলে পরিবারের বাহিরেও বিস্তার কামনা করে। বলিয়াছি যে, প্রীতিবৃত্তি অন্যান্য শ্রেষ্ঠ বৃত্তির ন্যায় অধিকতর স্ফূরণক্ষম; সুতরাং অনুশীলিত হইতে থাকিলেই ইহা গৃহের ক্ষুদ্র সীমা ছাপাইয়া বাহির হইতে চাহিবে। অতএব ইহা ক্রমশঃ কুটুম্ব, বন্ধুবর্গ, অনুগত ও আশ্রিতে, গোষ্ঠীতে, গোত্রে সমাবিষ্ট হয়। ইহাতেও অনুশীলন থাকিলে ইহার স্ফূর্তিশক্তি সীমা প্রাপ্ত হয় না। ক্রমে আপনার গ্রামস্থ, নগরস্থ, দেশস্থ, মনুষ্যমাত্রের উপর নিবিষ্ট হয়। যখন নিখিল জন্মভূমির উপর এই প্রীতি বিস্তারিত হয়, তখন ইহা সচরাচর দেশবাৎসল্য নাম প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় এই বৃত্তি অতিশয় বলবতী হইতে পারে, এবং হইয়াও থাকে। হইলে, ইহা জাতিবিশেষের বিশেষ মঙ্গলের কারণ হয়। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে প্রীতিবৃত্তির এই অবস্থা সচরাচর প্রবল দেখা যায়। ইউরোপীয়দিগের জাতীয় উন্নতি যে এতটা বেশী হইয়াছে, ইহা তাহার এক কারণ।

শিষ্য। ইউরোপে দেশবাৎসল্যের এত প্রাবল্য এবং আমাদের দেশে নাই, তাহার কারণ কি আপনি কিছু বুঝাইতে পারেন?

গুরু। উত্তমরূপে পারি। ইউরোপের ধর্ম, বিশেষতঃ পূর্বাংশে ইউরোপের ধর্ম, হিন্দুধর্মের মত উন্নত ধর্ম নহে; ইহাই সেই কারণ। একটু সবিস্তারে সেই কথাটা বুঝাইতেছি, তাহা শুন।

দেশবাৎসল্য প্রীতিবৃত্তির স্ফূর্তির চরম সীমা নহে। তাহার উপর আর এক সোপান আছে। সমস্ত জগতে যে প্রীতি, তাহাই প্রীতিবৃত্তির চরম সীমা। তাহাই যথার্থ ধর্ম। যত দিন প্রীতির জগৎপরিমিত স্ফূর্তি না হইল, তত দিন প্রীতিও অসম্পূর্ণ—ধর্মও অসম্পূর্ণ।

এখন দেখা যায় যে, ইউরোপীয়দিগের প্রীতি আপনাদের স্বদেশেই পর্য্যবসিত হয়, সমস্ত মনুষ্যালোকে ব্যাপ্ত হইতে সচরাচর পারে না। আপনার জাতিকে ভালবাসেন, অন্য জাতীয়কে দেখিতে পারেন না, ইহাই তাহাদের স্বভাব। অন্যান্য জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা সধর্মীকে ভালবাসে, বিধর্মীকে দেখিতে পারে না। মুসলমান ইহার উদাহরণ। কিন্তু ধর্ম এক হইলে, জাতি লইয়া তাহারা বড় আর দ্বेष করে না। মুসলমানের চক্ষে সব মুসলমান প্রায় তুল্য; কিন্তু ইংরেজখ্রীষ্টিয়ান ও রুশখ্রীষ্টিয়ানের মধ্যে বড় গোলযোগ।

শিষ্য। এ স্থলে মুসলমানেরও প্রীতি জাগতিক নহে, ইউরোপের প্রীতিও জাগতিক নহে।

গুরু। মুসলমানের প্রীতি-বিস্তারে নিরোধক তাহার ধর্ম। জগৎসুদ্ধ মুসলমান হইলে জগৎসুদ্ধ সে ভালবাসিতে পারে, কিন্তু জগৎসুদ্ধ খ্রীষ্টিয়ান হইলে জন্মাণ জন্মাণ ভিন্ন, ফরাসি ফরাসি ভিন্ন আর কাহাকেও ভালবাসিতে পারে না। এখন জিজ্ঞাস্য কথা এই,—ইউরোপীয় প্রীতি দেশব্যাপক হইয়াও আর উঠিতে পারে না কেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে বুঝিতে হইবে, প্রীতিস্ফূর্তির কাৰ্য্যতঃ বিরোধী কে? কাৰ্য্যতঃ বিরোধী আত্মপ্রীতি। পশুপক্ষীর ন্যায় মনুষ্যোতে আত্মপ্রীতিও অতিশয় প্রবলা। পরপ্রীতির অপেক্ষা আত্মপ্রীতি প্রবলা। এই জন্য উন্নত ধর্মের দ্বারা চিত্ত শাসিত না হইলে, প্রীতির বিস্তার আত্মপ্রীতির দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়। অর্থাৎ পরে প্রীতি যত দূর আত্মপ্রীতির সঙ্গে সঙ্গত হয়, তত দূরই তাহার বিস্তার হয়, বেশী হয় না। এখন পারিবারিক প্রীতি আত্মপ্রীতির সঙ্গে সুসঙ্গত; এই পুত্র আমার, এই ভাৰ্য্যা আমার, ইহারা আমার সুখের উপাদান, এই জন্য আমি ইহাদের ভালবাসি। তার পর কুটুম্ব, বন্ধু, স্বজন, জ্ঞাতি, গোষ্ঠীগোত্রও আমার, আশ্রিত অনুগত, ইহারাও আমার, ইহারাও আমার সুখের উপাদান, এই জন্য আমি ইহাদের ভালবাসি। তেমনি আমার গ্রাম, আমার নগর, আমার দেশ আমি ভালবাসি। কিন্তু জগৎ আমার নহে, জগৎ আমি ভালবাসিব না। পৃথিবীতে এমন লক্ষ লক্ষ লোক আছে, যাহার দেশ আমার দেশ হইতে ভিন্ন, কিন্তু এমন কেহই নাই, যাহার পৃথিবী আমার পৃথিবী হইতে ভিন্ন। সুতরাং পৃথিবী আমার নহে, আমি পৃথিবী ভালবাসিব কেন?

শিষ্য। কেন? ইহার কি কোন উত্তর নাই?

গুরু। ইউরোপে অনেক রকমের উত্তর আছে, ভারতবর্ষে এক উত্তর আছে। ইউরোপে হিতবাদীদের "Greatest good of the greatest number," কোম্বের Humanity পূজা, সর্বোপরি খ্রীষ্টের জাগতিক প্রীতিবাদ, মনুষ্য মনুষ্যে সকলেই এক ঈশ্বরের সন্তান, সুতরাং সকলেই ভাই ভাই, এই সকল উত্তর আছে।

শিষ্য। এই সকল উত্তর থাকিতে, বিশেষ খ্রীষ্টধর্মের এই উন্নত নীতি থাকিতে, ইউরোপে প্রীতি দেশ ছাড়ায় না কেন?

গুরু। তাহার কারণ অনুসন্ধান জন্য প্রাচীন গ্রীস ও রোমে যাইতে হইবে। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে কোন উন্নত ধর্ম ছিল না, যে পৌত্তলিকতা সুন্দরের এবং শক্তিমানের পূজা মাত্র, তাহার উপর আর কোন উচ্চ ধর্ম ছিল না। জগতের লোক কেন ভালবাসিব, ইহার কোন উত্তর ছিল না। এই জন্য তাহাদের প্রীতি কখন দেশকে ছাড়ায় নাই। কিন্তু এই দুই জাতি অতি উন্নতস্বভাব আর্ষ্যবংশীয় জাতি ছিল; তাহাদের স্বাভাবিক মহত্ত্বগুণে তাহাদের প্রীতি দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া বড় বেগবতী ও মনোহারিণী হইয়াছিল। দেশবাসল্যে এই দুই জাতি পৃথিবীতে বিখ্যাত।

এখন আধুনিক ইউরোপ খ্রীষ্টীয়ান হোক আর যাই হোক, ইহার শিক্ষা প্রধানত প্রাচীন গ্রীস ও রোম হইতে। গ্রীস ও রোম ইহার চরিত্রের আদর্শ। সেই আদর্শ আধুনিক ইউরোপে যতটা আধিপত্য করিয়াছে, যীশু তত দূর নহে। আর এক জাতি আধুনিক ইউরোপীয়দিগের শিক্ষা ও চরিত্রের উপর কিছু ফল দিয়াছে। যিহুদী জাতির কথা বলিতেছি। যিহুদী জাতিও বিশিষ্টরূপে দেশবৎসল, লোকবৎসল নহে। এই তিন দিকের গ্রিস্মোতে পড়িয়া ইউরোপ দেশবৎসল হইয়া পড়িয়াছে, লোকবৎসল হইতে পারে নাই। অথচ খ্রীষ্টের ধর্ম ইউরোপের ধর্ম। তাহাও বর্তমান। কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম এই তিনের সমবায়ের অপেক্ষা ক্ষীণবল বলিয়া কেবল মুখেই রহিয়া গিয়াছে। ইউরোপীয়েরা মুখে লোকবৎসল, অন্তরে ও কার্যে দেশবৎসল মাত্র। কথাটা বুঝিলে?

শিষ্য। প্রীতির প্রাকৃতিক বা ইউরোপীয় অনুশীলন কি, তাহা বুঝিলাম। বুঝিলাম, ইহাতে প্রীতির পূর্ণ স্ফূর্তি হয় না। দেশবাসল্যে থামিয়া যায়, কেন না, তার আত্মপ্রীতি আসিয়া আপত্তি উত্থাপিত করে যে, জগৎ ভালবাসিব কেন, জগতের সঙ্গে আমার বিশেষ কি সম্পর্ক? এক্ষণে প্রীতির পরমার্থিক বা ভারতবর্ষীয় অনুশীলনের মর্ম কি বলুন।

গুরু। তাহা বুঝিবার আগে ভারতবর্ষীয়ের চক্ষে ঈশ্বর কি, তাহা মনে করিয়া দেখ। খ্রীষ্টীয়ানের ঈশ্বর জগৎ হইতে স্বতন্ত্র। তিনি জগতের ঈশ্বর বটে, কিন্তু যেমন জন্মার্ণ বা রুশিয়ার রাজা সমস্ত জন্মার্ণ বা সমস্ত রুষ হইতে একটা পৃথক্ ব্যক্তি, খ্রীষ্টীয়ানের ঈশ্বর তাই। তিনিও পার্থিব রাজার মত পৃথক্ করিয়া রাজ্য পালন রাজ্য শাসন করেন, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন, এবং লোকে কি করিল, পুঁলিসের মত তাহার খবর রাখেন। তাঁহাকে ভালবাসিতে হইলে, পার্থিব রাজাকে ভালবাসিবার জন্য যেমন প্রীতিবৃত্তির বিশেষ বিস্তার করিতে হয়, তেমনই করিতে হয়।

হিন্দুর ঈশ্বর সেরূপ নহেন। তিনি সর্বভূতময়। তিনিই সর্বভূতের অন্তরাত্মা। তিনি জড় জগৎ নহেন, জগৎ হইতে পৃথক্, কিন্তু জগৎ তাঁহাতেই আছে। যেমন সূত্রে মণিহার, যেমন আকাশে বায়ু, তেমন তাঁহাতে জগৎ। কোন মনুষ্য তাঁহা ছাড়া নহে, সকলেই তিনি বিদ্যমান। আমাতে তিনি বিদ্যমান। আমাকে ভালবাসিলে তাঁহাকে ভালবাসিলাম। তাঁহাকে না ভাল বাসিলে আমাকেও ভাল বাসিলাম না। তাঁহাকে ভাল বাসিলে সকল মনুষ্যকেই ভাল বাসিলাম। সকল মনুষ্যকে না ভালবাসিলে, তাঁহাকে ভালবাসা হইল না, আপনাকে ভালবাসা হইল না, অর্থাৎ সমস্ত জগৎ প্রীতির অন্তর্গত না হইলে প্রীতির অস্তিত্বই রহিল না। যতক্ষণ না বুঝিতে পারিব যে, সকল জগৎই আমি, যতক্ষণ না বুঝিব যে, সর্বলোকে আর আমাতে অভেদ, ততক্ষণ আমার জ্ঞান হয় নাই, ধর্ম হয় নাই, ভক্তি হয় নাই, প্রীতি হয় নাই। অতএব জাগতিক প্রীতি হিন্দুধর্মের মূলেই আছে; অচ্ছেদ্য, অভিন্ন, জাগতিক প্রীতি ভিন্ন হিন্দু নাই। ভগবানের সেই মহাবাক্য পুনরুক্ত করিতেছিঃ—

সর্বভূতস্বাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।

ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥

বীকম রচনাবলী

যো মাং পশ্যাতি সর্বত্র সর্বত্র ময়ি পশ্যাতি ।

তস্যাহং ন প্রণশ্যামি সচ মে ন প্রণশ্যাতি ॥*

“যে যোগযুক্তা হইয়া সর্বভূতে আপনাকে দেখে এবং আপনাতে সর্বভূতকে দেখে ও সর্বত্র সমান দেখে, যে আমাকে সর্বত্র দেখে, আমাতে সকলকে দেখে, আমি তাহার অদৃশ্য হই না, সেও আমার অদৃশ্য হয় না।”

স্থূল কথা, মনুষ্যে প্রীতি হিন্দু শাস্ত্রের মতে ঈশ্বরে ভক্তির অন্তর্গত; মনুষ্যে প্রীতি ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি নাই; ভক্তি ও প্রীতি হিন্দুধর্মের অভিন্ন, অভেদ্য, ভক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যাকালে ইহা দেখিয়াছি; ভগবৎগীতা এবং বিষ্ণুপুরাণোক্ত প্রহ্লাদচরিত্র হইতে যে সকল বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে ইহা দেখিয়াছি। প্রহ্লাদকে যখন হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞাসা করিলেন যে, শত্রুর সঙ্গে রাজার কিরূপ ব্যবহার করা কর্তব্য, প্রহ্লাদ উত্তর করিলেন, “শত্রু কে? সকলই বিষ্ণু-(ঈশ্বর)ময়, শত্রু মিত্র কি প্রকারে প্রভেদ করা যায়!” প্রীতিতত্ত্বের এইখানে একশেষ হইল। এবং এই এক কথাতেই সকল ধর্মের উপর হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইল বিবেচনা করি। প্রহ্লাদের সেই সকল উক্তি এবং গীতা হইতে যে সকল বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা পুনর্বার স্মরণ কর। স্মরণ না হয়, গ্রন্থ হইতে পুনর্বার অধ্যয়ন কর। তদ্ব্যতীত হিন্দুধর্মোক্ত প্রীতিতত্ত্ব বুঝিতে পারিবে না। এই প্রীতি জগতের বন্ধন, এই প্রীতি ভিন্ন জগৎ বন্ধনশূন্য বিশৃঙ্খল জড়পিণ্ড সকলের সমষ্টি মাত্র। প্রীতি না থাকিলে পরস্পর বিদ্বেষপরায়ণ মনুষ্য জগতে বাস করিতে অক্ষম হইত, অনেক কাল হয়ত পৃথিবী মনুষ্যশূন্য, নয় মনুষ্য লোকের অসহ্য নরক হইয়া উঠিত। ভক্তির পর প্রীতির অপেক্ষা উচ্চ বৃত্তি আর নাই। যেমন ঈশ্বরে এই জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে, প্রীতিতেও তেমনিই জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে। ঈশ্বরই প্রীতি, ঈশ্বরই ভক্তি,—বৃত্তি স্বরূপ জগদাধার হইয়া তিনি লোকের হৃদয়ে অবস্থান করেন। অজ্ঞান আমাদের ঈশ্বরকে জানিতে দেয় না এবং অজ্ঞানই আমাদের ভক্তি প্রীতি ভুলাইয়া রাখে। অতএব ভক্তি প্রীতির সম্যক্ অনুশীলন জন্য, জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকলের সম্যক্ অনুশীলন আবশ্যিক। ফলে সকল বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন ও সামঞ্জস্য ব্যতীত সম্পূর্ণ ধর্ম লাভ হয় না, ইহার প্রমাণ পুনঃ পুনঃ পাইয়াছি।

শিষ্য। এক্ষণে প্রীতিবৃত্তির ভারতবর্ষীয় বা পারমার্থিক অনুশীলনপদ্ধতি বুঝিলাম। জ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ বুঝিয়া জগতের সঙ্গে তাহার এবং আমার অভিন্নতা ক্রমে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। ক্রমে সর্বলোককে আপনার মত দেখিতে শিখিলে প্রীতিবৃত্তির পূর্ণ স্ফূর্তি হইবে। ইহার ফলও বুঝিলাম। আত্মপ্রীতি ইহার বিরোধী হইবার সম্ভাবনা নাই—কেন না, সমস্ত জগৎ আত্মময় হইয়া যায়। অতএব ইহার ফল কেবল দেশবাৎসল্য মাত্র হইতে পারে না,—সর্বলোকবাৎসল্যই ইহার ফল। প্রাকৃতিক অনুশীলনের ফল ইউরোপে কেবল দেশবাৎসল্য মাত্র জন্মিয়াছে—কিন্তু ভারতবর্ষে লোকবাৎসল্য জন্মিয়াছে কি?

গুরু। আজিকালকার কথা ছাড়িয়া দাও। আজিকালি পাশ্চাত্য শিক্ষার জোর বড় বেশী বলিয়া আমরা দেশবৎসল হইতেছি, লোকবৎসল আর নহি। এখন ভিন্ন জাতির উপর আমাদেরও বিদ্বেষ জন্মিতেছে। কিন্তু এতকাল তাহা ছিল না; দেশবাৎসল্য জিনিষটা দেশে ছিল না। কথাটাও ছিল না। ভিন্ন জাতির প্রতি ভিন্ন ভাব ছিল না। হিন্দু রাজা ছিল, তার পর মুসলমান হইল, হিন্দু প্রজা তাহাতে কথা কহিল না, হিন্দুর কাছে হিন্দু মুসলমান সমান। মুসলমানের পর ইংরেজ রাজা হইল, হিন্দু প্রজা তাহাতে কথা কহিল না। বরং হিন্দুরাই ইংরেজকে ডাকিয়া রাজ্যে বসাইল। হিন্দু সিপাহী, ইংরেজের হইয়া লড়িয়া, হিন্দুর রাজ্য জয় করিয়া ইংরেজকে দিল। কেন না, হিন্দুর ইংরেজের উপর ভিন্নজাতীয় বলিয়া কোন

* এই ধর্ম বৈদিক। বাজসনেয় সংহিতোপনিষদে আছে—

যস্তু সর্বত্রিণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যাতি ।

সর্বভূতেষু চাত্মানন্ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥

যস্মিন্ সর্বত্রিণি ভূতান্যাত্মেবাভূদ্বিজানতঃ ।

তন্নঃ কঃ মোহঃ কঃ শোক একমনুপশ্যতঃ ॥

দেষ্ট নাই। আজিও ইংরেজের অধীন ভারতবর্ষ অত্যন্ত প্রভুভক্ত। ইংরেজ ইহার কারণ না বুঝিয়া মনে করে, হিন্দু দুর্বল বলিয়া ক্রিম প্রভুভক্ত।

শিষ্য। তা, সাধারণ হিন্দু প্রজা বা ইংরেজের সিপাহীরা যে বুঝিয়াছিল, ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন, সকলই আমি, এ কথা ত বিশ্বাস হয় না।

গুরু। তাহা বুঝে নাই। কিন্তু জাতীয় ধর্ম জাতীয় চরিত্র গঠিত। যে জাতীয় ধর্ম বুঝে না, সেও জাতীয় ধর্মের অধীন হয়, জাতীয় ধর্ম তাহার চরিত্র শাসিত হয়। ধর্মের গুঢ় মর্ম অল্প লোকেই বুঝিয়া থাকে। যে কয় জন বুঝে, তাহাদেরই অনুকরণে ও শাসনে জাতীয় চরিত্র শাসিত ও গঠিত হয়। এই অনুশীলনধর্ম যাহা তোমাকে বুঝাইতেছি, তাহা যে সাধারণ হিন্দুর সহজে বোধগম্য হইবে, তাহার বেশী ভরসা আমি এখন রাখি না। কিন্তু এমন ভরসা রাখি যে, মনস্বিগণ কর্তৃক ইহা গৃহীত হইলে, ইহার দ্বারা জাতীয় চরিত্র গঠিত হইতে পারিবে। জাতীয় ধর্মের মূখ্য ফল অল্প লোকেই প্রাপ্ত হয়, কিন্তু গৌণ ফল সকলেই পাইতে পারে।

শিষ্য। তার পর আর একটা কথা আছে। আপনি যে প্রীতির পারমাণ্বিক অনুশীলন-পদ্ধতি বুঝাইলেন, তাহার ফল, লোক-বাৎসল্যে দেশ-বাৎসল্যে ভাসিয়া যায়। কিন্তু দেশ-বাৎসল্যের অভাবে ভারতবর্ষ সাত শত বৎসর পরাধীন হইয়া অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছে। এই পারমাণ্বিক প্রীতির সঙ্গে জাতীয় উন্নতির কিরূপে সামঞ্জস্য হইতে পারে?

গুরু। সেই নিষ্কাম কর্মযোগের দ্বারাই হইবে। যাহা অনুষ্ঠেয় কর্ম, তাহা নিষ্কাম হইয়া করিবে। যে কর্ম ঈশ্বরানুমোদিত, তাহাই অনুষ্ঠেয়। আত্মরক্ষা, দেশরক্ষা, পরপীড়িতের রক্ষা, অনুন্নতের উন্নতি সাধন—সকলই ঈশ্বরানুমোদিত কর্ম, সুতরাং অনুষ্ঠেয়। অতএব নিষ্কাম হইয়া আত্মরক্ষা, দেশরক্ষা, পীড়িত দেশীয়বর্গের রক্ষা, দেশীয় লোকের উন্নতি সাধন করিবে।

শিষ্য। নিষ্কাম আত্মরক্ষা কি রকম? আত্মরক্ষাই ত সকাম।

গুরু। সে কথার উত্তর কাল দিব।

দ্বাবিংশতম অধ্যায়—আত্মপ্রীতি

শিষ্য। আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, নিষ্কাম আত্মরক্ষা কি রকম? আপনি বলিয়াছিলেন, “কাল উত্তর দিব।” সেই উত্তর এক্ষণে শুনিব ইচ্ছা করি।

গুরু। আমার এই ভক্তিবাদ সমর্থনার্থ কোন জড়বাদীর সহায়তা গ্রহণ করিব, তুমি এমন প্রত্যাশা কর না। তথাপি হবর্ট স্পেন্সরের একটি কথা তোমাকে পড়াইয়া শুনাইব।

“A creature must live before it can act. From this it is a corollary that the acts by which each maintain his own life must, *speaking generally*, precede in imperativeness all other acts of which he is capable. For if it be asserted that these other acts must precede in imperativeness the acts which maintain life; and if this, accepted as a general law of conduct, is conformed to by all; then by postponing the acts which maintain life to the other acts which life makes possible, all must lose their lives. . . . The acts required for continued self-preservation, including the enjoyment of benefits achieved by such acts, are the first requisites to universal welfare. Unless each *duly* cares for himself, his care for all others is ended by death; and if each thus dies, there remain no others to be cared for.”*

অতএব জগদীশ্বরের সৃষ্টিরক্ষার্থ আত্মরক্ষা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। জগদীশ্বরের সৃষ্টিরক্ষার্থ প্রয়োজনীয় বলিয়া, ইহা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম। ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম, এজন্য আত্মরক্ষাকেও নিষ্কাম কর্মে পরিণত করা যাইতে পারে ও করাই কর্তব্য।

এক্ষণে পরহিত ও পররক্ষার সঙ্গে এই আত্মরক্ষার তুলনা করিয়া দেখ। পরহিত ধর্মাপেক্ষা

* *Data of Ethics*, Chap. XI. [p. 187.]। Italic যে যে শব্দে দেওয়া হইল, তাহা আমার দেওয়া।

বাংকম রচনাবলী

আত্মরক্ষা ধর্মের গৌরব অধিক। যদি জগতে লোকে পরস্পরের হিত না করে, পরস্পরের রক্ষা না করে, তাহাতে জগৎ মনুষ্যশূন্য হইবে না। অসভ্য সমাজ সকল ইহার উদাহরণ। কিন্তু সকলে আত্মরক্ষায় বিরত হইলে, সভ্য কি অসভ্য, কোন সমাজ কোন প্রকার মনুষ্য বা জীব জগতে থাকিবে না। অতএব পরহিতের আগে আপনার প্রাণরক্ষা।

শিষ্য। এ সকল আতি অশ্রদ্ধেয় কথা বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। মনে করুন, পরকে না দিয়া আপনি খাইব?

গুরু। তুমি যাহা কিছু আহাৰ্য্য সংগ্রহ কর, তাহা যদি সমস্তই প্রত্যহ অন্যকে বিলাইয়া দাও, তবে পাঁচ-সাত দিনে তোমার দানধর্মের শেষ হইবে। কেন না, তুমি নিজে না খাইয়া মরিয়া যাইবে। পরকে দিবে, কিন্তু পরকে দিয়া আপনি খাইবে। যদি পরকে দিতে না কুলায়, তবে কাজেই পরকে না দিয়া আপনিই খাইবে। এই “না কুলায়” কথাটাই যত অধর্মের গোড়া। যাঁর নিজের আহাৰের জন্য প্রত্যহ তিনটা পাঁঠা, দেড় কুড়ি মাছের প্রাণ সংহার হয়, তাঁর কাজেই পরকে দিতে কুলায় না। যে সর্বভূতে সমান দেখে, আপনাতে ও পরে সমান দেখে, সে পরকে যেমন দিতে পারে, আপনি তেমনই খায়। ইহাই ধর্ম—আপনি উপবাস করিয়া পরকে দেওয়া ধর্ম নহে। কেন না, আপনাতে ও পরে সমান করিতে হইবে।

শিষ্য। ভাল, আমার প্রযুক্ত উদাহরণটা না হয়, অনুপযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু কখন কি পরোপকারার্থ আপনার প্রাণ বিসর্জন করা কর্তব্য নহে?

গুরু। অনেক সময়ে তাহা অবশ্য কর্তব্য। না করাই অধর্ম।

শিষ্য। তাহার দুই একটা উদাহরণ শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। যে মাতা পিতার নিকট তুমি প্রাণ পাইয়াছ, যাঁহাদিগের যত্নে তুমি কৰ্মক্ষম ও ধর্মক্ষম হইয়াছ, তাঁহাদিগের রক্ষার্থ প্রয়োজনমতে আপনার প্রাণ বিসর্জনই ধর্ম, না করা অধর্ম।

সেইরূপ প্রাণদানাদি উপকার যদি তুমি অন্যের কাছে পাইয়া থাক, তবে তাহার জন্যও ঐরূপ আত্মপ্রাণ বিসর্জনীয়।

যাহাদের তুমি রক্ষক, তাহাদের জন্য আত্মপ্রাণ ঐরূপে বিসর্জনীয়। এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, তুমি রক্ষক কাহার। তুমি রক্ষক, (১) স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারবর্গের, (২) স্বদেশের, (৩) প্রভুর, অর্থাৎ যে তোমাকে রক্ষার্থ বেতন দিয়া নিযুক্ত করিয়াছে, তাহার; (৪) শরণাগতের। অতএব স্ত্রীপুত্রাদি, স্বদেশ, প্রভু, এবং শরণাগত, এই সকলের রক্ষার্থ আপনার প্রাণ পরিত্যাগ করা ধর্ম।

যাহারা আপনাদের রক্ষায় অক্ষম, মনুষ্য মাত্রেই তাহাদের রক্ষক। স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ, পীড়িত, অন্ধ খঞ্জাদি অঙ্গহীন, ইহারা আত্মরক্ষায় অক্ষম। ইহাদের রক্ষার্থ প্রাণ পরিত্যাগ ধর্ম।

এইরূপ আরও অনেক স্থান আছে। সকলগুলি গণনা করিয়া উঠা যায় না। প্রয়োজনও নাই। যাহার জ্ঞানার্জনী ও কার্যকারিণী বৃত্তি অনুশীলিত ও সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হইয়াছে, সে সকল অবস্থাতেই বৃষ্টিতে পারিবে যে, এই স্থলে প্রাণ পরিত্যাগ ধর্ম, এই স্থলে অধর্ম।

শিষ্য। আপনার কথার তাৎপর্য্য এই বুঝিলাম যে, আত্মপ্রীতি প্রীতিবৃত্তির বিরোধী হইলেও, ঘৃণার যোগ্য নহে। উপযুক্ত নিয়মে উহার সীমাবদ্ধ করিয়া উহারও সম্যক্ অনুশীলন কর্তব্য। বটে?

গুরু। বস্তুতঃ যদি আত্ম-পর সমান হইল, তবে আত্মপ্রীতি ও জাগতিক প্রীতি, ভিন্ন বিবেচনা করাও উচিত নহে। উপযুক্তরূপে উভয়ে অনুশীলিত ও সামঞ্জস্যবিশিষ্ট হইলে আত্ম-প্রীতি জাগতিক প্রীতির অন্তর্গত হইয়া দাঁড়ায়। কেন না, আমি ত জগতের বাহিরে নই। ধর্মের, বিশেষত হিন্দুধর্মের মূল একমাত্র ঈশ্বর। ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন; এজন্য সর্বভূতের হিতসাধন আমাদের ধর্ম, কেন না, বলিয়াছি যে—সকল বৃত্তিকে ঈশ্বরমুখী করাই মনুষ্যজন্মের চরম উদ্দেশ্য। যদি সর্বভূতের হিতসাধন ধর্ম হয়, তবে পরেরও হিতসাধন যেমন আমার ধর্ম, তেমনি আমার নিজেরও হিতসাধন আমার ধর্ম। কারণ, আমিও সর্বভূতের অন্তর্গত; ঈশ্বর যেমন অপর ভূতে আছেন, তেমনি আমাতেও আছেন। অতএব পরেরও রক্ষাদি আমার ধর্ম এবং আপনারও রক্ষাদি আমার ধর্ম। আত্মপ্রীতি ও জাগতিক প্রীতি এক।

শিষ্য। কিন্তু কথাটার গোলযোগ এই যে, যখন আত্মহিত এবং পরহিত পরস্পর বিরোধী,

তখন আপনার হিত করিব, না পরের হিত করিব? পদ্বর্গামী ধর্মবেত্তাগণের মত এই যে, আত্মহিতে ও পরহিতে পরস্পর বিরোধ হইলে, পরহিত সাধনই ধর্ম।

গুরু। ঠিক এমন কথাটা কোন ধর্ম আছে, তাহা আমি বুঝি না। খ্রীষ্টধর্মের উক্তি যে, “পরের তোমার প্রতি যেইরূপ ব্যবহার তুমি বাসনা কর, তুমি পরের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিবে।” এ উক্তিতে পরহিতকে প্রাধান্য দেওয়া হইতেছে না, পরহিত ও আত্মহিতকে তুল্য করা হইতেছে। কিন্তু সে কথা থাক, কেন না, আমাকেও এই অনুশীলনতত্ত্বে পরহিতকেই স্থলবিশেষে প্রাধান্য দিতে হইবে। কিন্তু তুমি যে কথা তুলিলে, তাহারও সূক্ষ্মমাংসা আছে। সেই মীমাংসার প্রথম এবং প্রধান নিয়ম এই যে, পরের অনিষ্টমাত্রই অধর্ম। পরের অনিষ্ট করিয়া আপনার হিতসাধন করিবার কাহারও অধিকার নাই। ইহা হিন্দুধর্মেরও বলে, খ্রীষ্ট বৌদ্ধাদি অপর ধর্মেরও এই মত, এবং আধুনিক দার্শনিক বা নীতিবেত্তাদিগেরও মত। অনুশীলনতত্ত্ব যদি বুঝিয়া থাক, তবে অবশ্য বুঝিয়াছ, পরের অনিষ্ট, ভক্তি প্রীতি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বৃত্তিসকলের সমুচিত অনুশীলনের বিরোধী ও বিঘ্নকর এবং যে সাম্যজ্ঞান ভক্তি ও প্রীতির লক্ষণ, তাহার উচ্ছেদক। পরের অনিষ্ট, ভক্তি প্রীতি দয়াদির অনুশীলনের বিরোধী, এজন্য যেখানে পরের অনিষ্ট ঘটে, সেখানে তদ্বারা আপনার হিতসাধন করিবে না, ইহা অনুশীলনধর্মের এবং হিন্দুধর্মের আজ্ঞা। আত্মপ্রীতি-তত্ত্বের ইহাই প্রথম নিয়ম।

শিষ্য। নিয়মটা কি প্রকারে খাটে—দেখা যাউক। এক ব্যক্তি চোর, সে সপরিবারে খাইতে পায় না, উপবাস করিয়া আছে। এরূপ যে চোরের সর্বদা ঘটে, তাহা বলা বাহুল্য। সে, রাতে আমার ঘরে সিংধ দিয়াছে—অভিপ্রায়, কিছু চুরি করিয়া আপনার ও পরিবারবর্গের আহার সংগ্রহ করে। তাহাকে আমি ধৃত করিয়া বিহিত দণ্ডবিধান করিব, না উপহারস্বরূপ কিছু অর্থ দিয়া বিদায় করিব?

গুরু। তাহাকে ধৃত করিয়া বিহিত দণ্ডবিধান করিবে।

শিষ্য। তাহা হইলে আমার সম্পত্তিরক্ষা-রূপ ইষ্টসাধন হইল বটে, কিন্তু চোরের এবং তাহার নিরপরাধী স্ত্রীপুত্রগণের ঘোরতর অনিষ্ট হইল। আপনার সূত্রটি খাটে?

গুরু। চোরের নিরপরাধী স্ত্রীপুত্রাদি যদি অনাহারে মরে, তুমি তাহাদের আহারার্থ কিছু দান করিতে পার। চোরও যদি না খাইয়া মরে, তবে তাহাকেও খাইতে দিতে পার। কিন্তু চুরির দণ্ড দিতে হইবে। কেন না, না দিলে, কেবল তোমার অনিষ্ট নহে, সমস্ত লোকের অনিষ্ট। চোরের প্রশ্নে চৌর্যবৃদ্ধি, চৌর্যবৃদ্ধিতে সমাজের অনিষ্ট।

শিষ্য। এ ত বিলাতী হিতবাদীর কথা—আপনার মতে “Greatest good of the greatest number” এখানে অবলম্বনীয়।

গুরু। হিতবাদ মতটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার বস্তু নহে। হিতবাদীদিগের ভ্রম এই যে, তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, সমস্ত ধর্মতত্ত্বটা এই হিতবাদ মতের ভিতরই আছে। তাহা না হইয়া, ইহা ধর্মতত্ত্বের সামান্য অংশ মাত্র। আমি যেখানে উহাকে স্থান দিলাম, তাহা আমার ব্যাখ্যাত অনুশীলনতত্ত্বের একটি কোণের কোণ মাত্র। তত্ত্বটা সত্যমূলক, কিন্তু ধর্মতত্ত্বের সমস্ত ক্ষেত্র আবৃত করে না। ধর্ম ভক্তিতে, সর্বভূতে সমদৃষ্টিতে। সেই মহাশিখর হইতে যে সহস্র সহস্র নির্ঝরিণী নামিয়াছে—হিতবাদ ইহা তাহার একটি ক্ষুদ্রতম স্রোতঃ। ক্ষুদ্রতম হউক—ইহার জল পবিত্র। হিতবাদ ধর্ম—অধর্ম নহে।

স্থূল কথা, অনুশীলনধর্ম “Greatest good of the greatest number,” গণিততত্ত্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে। যদি ভূতমাত্রের হিতসাধন ধর্ম হয়, তবে এক জনের হিতসাধন ধর্ম, আবার একজনের হিতসাধন অপেক্ষা দশ জনের তুল্য হিতসাধন অবশ্য দশগুণ ধর্ম। যদি এক দিকে এক জনের হিতসাধন ও আর এক দিকে দশ জনের তুল্য হিতসাধন পরস্পর বিরুদ্ধ কর্ম হয়, তবে এক জনের হিত পরিত্যাগ করিয়া দশ জনের তুল্য হিতসাধনই ধর্ম; এবং দশ জনের হিত পরিত্যাগ করিয়া এক জনের তুল্য হিতসাধন করা অধর্ম।* এখানে “Good of the greatest number.”

* ভরসা করি, কেহই ইহার এমন অর্থ বুঝিবেন না যে, দশ জনের হিতের জন্য এক জনের অনিষ্ট করিবে। তাহা করা ধর্মবিরুদ্ধ, ইহা বলা বাহুল্য।

বাঁকম রচনাবলী

পক্ষান্তরে, এক জনের অল্প হিত, আর এক দিকে আর এক জনের বেশী হিত পরস্পর বিরোধী, সেখানে অল্প হিত পরিত্যাগ করিয়া বেশী হিত সাধন করাই ধর্ম, তদ্বিরোধীতাই অধর্ম। এখানে কথাটা "Greatest good."

শিষ্য। সে ত স্পষ্ট কথা।

গুরু। যত স্পষ্ট এখন বোধ হইতেছে, কার্যকালে তত স্পষ্ট হয় না। এক দিকে শ্যামু ঠাকুর, কুলীন ব্রাহ্মণ, কন্যাভারগ্ৰস্ত, অর্থাভাবে মেয়েটি স্বঘরে দিতে পারিতেছেন না; আর এক দিকে রামা ডোম, কতকগুলি অপোগন্ডভারগ্ৰস্ত, সপরিবারে খাইতে পায় না, প্রাণ যায়। এখানে "Greatest good" রামার দিকে, কিন্তু উভয়েই তোমার নিকট যাচুঞা করিতে আসিলে, তুমি বোধ করি শ্যামু ঠাকুরকে পাঁচটি টাকা দিয়াও কুণ্ঠিত হইবে, মনে করিবে কম হইল, আর রামাকে চারিটা পয়সা দিতে পারিলেই আপনারে দাতা ব্যক্তি মধ্যে গণ্য করিবে। অন্ততঃ অনেক বাঙ্গালিই এইরূপ। বাঙ্গালি কেন, সকল জাতীয় লোক সম্বন্ধে এইরূপ সহস্র উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

শিষ্য। সে কথা যাক্। সর্বভূতে যদি সমান, তবে অল্পের অপেক্ষা বেশী লোকের হিতসাধন ধর্ম, এবং এক জনের অল্প হিতের অপেক্ষায় এক জনের বেশী হিতসাধন ধর্ম। কিন্তু যেখানে এক জনের বেশী হিত একদিকে, আর দশ জনের অল্প হিত (তুল্য হিত নহে) আর একদিকে, সেখানে ধর্ম কি?

গুরু। সেখানে অঙ্ক করিবে। মনে কর, এক দিকে এক জনের যে পরিমাণ হিত সাধিত হইতে পারে, অন্য দিকে শত জনের প্রত্যেকের চতুর্থাংশের এক অংশ সাধিত হইতে পারে। এ স্থলে এই শত জনের হিতের অঙ্ক $\frac{200}{100} = 200$ । এখানে এক জনের বেশী হিত পরিত্যাগ করিয়া শত জনের অল্প হিতসাধন করাই ধর্ম। পক্ষান্তরে, যদি এই শত জনের প্রত্যেকের হিতের মাত্রা চতুর্থাংশ না হইয়া সহস্রাংশ হইত, তাহা হইলে ইহাদিগের সুখের মাত্রার সমষ্টি এক জনের $\frac{1}{100}$ মাত্র। সুতরাং এ স্থলে সে শত ব্যক্তির হিত পরিত্যাগ করিয়া এক ব্যক্তির হিতসাধন করাই ধর্ম।

শিষ্য। হিতের কি এরূপ ওজন হয়? মাপকাঠিতে মাপ হয়, এত গজ এত ইঞ্চি?

গুরু। ইহার সদ্বস্তুর কেবল অনুশীলনবাদীই দিতে পারেন। যাঁহার সকল বৃত্তি, বিশেষ জ্ঞানাজ্জর্ননী বৃত্তি সম্যক্ অনুশীলিত ও সফলপ্রাপ্ত হইয়াছে, হিতাহিত মাত্রা ঠিক বুদ্ধিতে তিনি সক্ষম। যাঁহার সেরূপ অনুশীলন হয় নাই, তাঁহার পক্ষে ইহা অনেক সময় দুঃসাধ্য, কিন্তু তাঁহার পক্ষে সর্বপ্রকার ধর্মই দুঃসাধ্য, ইহা বোধ করি বুঝাইয়াছি। তথাপি ইহা দেখিবে যে, সচরাচর মনুষ্য অনেক স্থানেই এরূপ কার্য করিতে পারে। ইউরোপীয় হিতবাদীরা ইহা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়াছেন, সুতরাং আমার আর সে সকল কথা তুলিবার প্রয়োজন নাই। হিতবাদের এতটুকু বুঝাইবার আমার উদ্দেশ্য এই যে, তুমি বুঝ যে, অনুশীলনতত্ত্বে হিতবাদের স্থান কোথায়।

শিষ্য। স্থান কোথায়?

গুরু। প্রীতিবৃত্তির সামঞ্জস্যে। সর্বভূত সমান, কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের হিত পরস্পর বিরোধী হইয়া থাকে, সে স্থলে ওজন করিয়া বা অঙ্ক করিয়া দেখিবে। অর্থাৎ "Greatest good of the greatest number" আমি যে অর্থে বুঝাইলাম, তাহাই অবলম্বন করিবে। যখন পরহিতে পরহিতে এইরূপ বিরোধ, তখন কি প্রকারে এই বিচার কর্তব্য, তাহাই বুঝাইয়াছি। কিন্তু পরহিতে পরহিতে বিরোধের অপেক্ষা, আত্মহিতে পরহিতে বিবাদ আরও সাধারণ এবং গুরুতর ব্যাপার। সেখানেও সামঞ্জস্যের সেই নিয়ম। অর্থাৎ—

(১) যখন এক দিকে তোমার হিত, অপর দিকে একাধিক সংখ্যক লোকের তুল্য হিত, সেখানে আত্মহিত ত্যাজ্য, এবং পরহিতই অনুষ্ঠেয়।

(২) যেখানে এক দিকে আত্মহিত, অন্য দিকে অপর এক জনের অধিক হিত, সেখানেও পরের হিত অনুষ্ঠেয়।

(৩) যেখানে তোমার বেশী হিত এক দিকে, অন্যের অল্প হিত এক দিকে, সেখানে কোন দিকের মোট মাত্রা বেশী, তাহা দেখিবে। তোমার দিক বেশী হয়, আপনার হিত সাধিত করিবে; পরের দিক বেশী হয়, পরের হিত খুঁজিবে।

শিষ্য। (৪) আর যেখানে দুইখানে দুই দিক্ সমান?

গুরু। সেখানে পরের হিত অনুষ্ঠেয়।

শিষ্য। কেন? সর্বভূত যখন সমান, তখন আপনি পর ত সমান।

গুরু। অনুশীলনতত্ত্বে ইহার উত্তর পাওয়া যায়। প্রীতিবৃত্তি পরানুরাগিণী। কেবল আত্মানুরাগিণী প্রীতি প্রীতি নহে। আপনার হিতসাধনে প্রীতির অনুশীলন, স্ফুরণ বা চরিতার্থ হয় না। পরহিতসাধনে তাহা হইবে। এই জন্য এ স্থলে পরপক্ষ অবলম্বনীয়। কেন না, তাহাতে পরহিতও সাধিত হয় এবং প্রীতিবৃত্তির অনুশীলন ও চরিতার্থতা জন্য তোমার যে নিজের হিত, তাহাও সাধিত হয়। অতএব মোটের উপর পরপক্ষে বেশী হিত সাধিত হয়।

অতএব, আত্মপ্রীতির সামঞ্জস্য সম্বন্ধে আমি যে প্রথম নিয়ম বলিয়াছি, অর্থাৎ যেখানে পরের অনিষ্ট হয়, সেখানে আত্মহিত পরিত্যাজ্য, তাহার সম্প্রসারণ ও সীমাবন্ধন স্বরূপ হিতবাদীদিগের এই নিয়ম দ্বিতীয় নিয়মের স্বরূপ গ্রহণ করিতে পার।

আর একটি তৃতীয় নিয়ম আছে। অনেক সময় আমার আত্মহিত যত দূর আমার আয়ত্ত, পরের হিত তাদৃশ নহে। উদাহরণস্বরূপ দেখ, আমরা যত সহজে আপনার মানসিক উন্নতি সাধিত করিতে পারি, পরের তত সহজে পারি না। এ স্থলে অগ্রে আপনার মানসিক উন্নতির সাধনই কর্তব্য; কেন না, সিদ্ধির সম্ভাবনা বেশী। পুনশ্চ, অনেক স্থলে আপনার হিত আগে সাধিত না করিলে পরের হিত সাধিত করিতে পারা যায় না। এ স্থলেও পরপক্ষ অপেক্ষা আত্মপক্ষই অবলম্বনীয়। আমার মানসিক উন্নতি না হইলে, আমি তোমার মানসিক উন্নতি সাধিত করিতে পারিব না; অতএব এখানে আগে আপনার হিত অবলম্বনীয়। যদি তোমাকে আমাকে এককালে শত্রুতে আক্রমণ করে, তবে আগে আপনার রক্ষা না করিলে, আমি তোমাকে রক্ষা করিতে পারিব না। চিকিৎসক নিজে রুগ্নশয্যাশায়ী হইলে, আগে আপনার আরোগ্যসাধন না করিলে, পরকে আরোগ্য দিতে পারেন না। এ সকল স্থানেও আত্মহিতই আগে সাধনীয়।

এক্ষণে, তোমাকে যাহা বুঝাইয়াছিলাম, তাহা আবার স্মরণ কর।

প্রথম, আত্মপর অভেদজ্ঞানই যথার্থ প্রীতির অনুশীলন।

দ্বিতীয়, তদ্বারা আত্মপ্রীতির সমুচিত ও সীমাবদ্ধ অনুশীলন নিষিদ্ধ হইতেছে না, কেন না, আমিও সর্বভূতের অন্তর্গত।

তৃতীয়, বৃত্তির অনুশীলনের চরম উদ্দেশ্য—সকল বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করা। অতএব যাহা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম, তাহাই অনুষ্ঠেয়। ঈদৃশ অনুষ্ঠেয় কর্মের অনুবর্তনে কখন অবস্থা-বিশেষে আত্মহিত, কখন অবস্থাবিশেষে পরহিতকে প্রাধান্য দিতে হয়।

তাহাতে হিন্দুধর্মোক্ত সাম্যজ্ঞানের বিঘ্ন হয় না। তুমি যেখানে আত্মরক্ষার অধিকারী, পরেও সেইখানে সেইরূপ আত্মরক্ষার অধিকারী। যেখানে তুমি পরের জন্য আত্মবিসর্জনে বাধ্য, পরেও সেইখানে তোমার জন্য আত্মবিসর্জনে বাধ্য। এই জ্ঞানই সাম্যজ্ঞান। অতএব আমি যে সকল বর্জিত কথা বলিলাম, তদ্বারা গীতোক্ত সাম্যজ্ঞানের কোন হানি হইতেছে না।

শিষ্য। কিন্তু আমি ইতিপূর্বে যে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তাহার কোন সমুচিত উত্তর হয় নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, হিন্দুর পারমার্থিক প্রীতির সঙ্গে জাতীয় উন্নতির কিরূপে সামঞ্জস্য হইতে পারে।

গুরু। উত্তরের প্রথম সূত্র সংস্থাপিত হইল। এক্ষণে ক্রমশঃ উত্তর দিতেছি।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়—স্বজনপ্রীতি

গুরু। এক্ষণে হার্ট স্পেন্সরের যে উক্তি তোমাকে শুনাইয়াছি, তাহা স্মরণ কর।

“Unless each duly cares for himself, his care for all others is ended by death; and if each thus dies, there remain no others to be cared for.”

জগদীশ্বরের সৃষ্টিরক্ষা জগদীশ্বরের অভিপ্রেত, ইহা যদি মানিয়া লওয়া যায়, তবে আত্মরক্ষা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম; কেন না, তদ্ব্যতীত সৃষ্টিরক্ষা হয় না। কিন্তু এ কথা কেবল আত্মরক্ষা

বাঁকম রচনাবলী

সম্বন্ধেই যে খাটে, এমন নহে। যাহারা আত্মরক্ষায় অক্ষম, এবং যাহাদের রক্ষার ভার তোমার উপর, তাহাদের রক্ষাও আত্মরক্ষার ন্যায় জগৎরক্ষার পক্ষে তাদৃশ প্রয়োজনীয়।

শিষ্য। আপনি সন্তানাদির কথা বলিতেছেন?

গুরু। প্রথমে অপত্যপ্রীতির কথাই বলিতেছি। বালকেরা আপনাদিগের পালনে ও রক্ষণে সক্ষম নহে। অন্যে যদি তাহাদিগকে রক্ষা ও পালন না করে, তবে তাহারা বাঁচে না। যদি সমস্ত শিশু অপালিত ও অরক্ষিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে, তবে জগৎও জীবশূন্য হইবে। অতএব আত্মরক্ষাও যেমন গুরুতর ধর্ম, সন্তানাদির পালনও তাদৃশ গুরুতর ধর্ম; আত্মরক্ষার ন্যায়, ইহাও ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম, সুতরাং ইহাকেও নিষ্কাম কর্মে পরিণত করা যাইতে পারে। বরং আত্মরক্ষার অপেক্ষাও সন্তানাদির পালন ও রক্ষণ গুরুতর ধর্ম; কেন না, যদি সমস্ত জগৎ আত্মরক্ষায় বিরত হইয়াও সন্তানাদি রক্ষায় নিযুক্ত ও সফল হইয়া সন্তানাদি রাখিয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে সৃষ্টি রক্ষিত হয়, কিন্তু সমস্ত জীব সন্তানাদির রক্ষায় বিরত হইয়া কেবল আত্মরক্ষায় নিযুক্ত হইলে, সন্তানাদির অভাবে জীবসৃষ্টি বিলুপ্ত হইবে। অতএব আত্মরক্ষার অপেক্ষা সন্তানাদির রক্ষা গুরুতর ধর্ম।

ইহা হইতে একটি গুরুতর তত্ত্ব উপলব্ধ হয়। অপত্যাদির রক্ষার্থ আপনার প্রাণ বিসর্জন করা ধর্মসঙ্গত। পূর্বে যে কথা আন্দাজি বলিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা প্রমাণীকৃত হইল।

ইহা পশু পক্ষীতেও করিয়া থাকে। ধর্মজ্ঞানবশতঃ তাহারা এরূপ করে, এমন বলা যায় না। অপত্যপ্রীতি স্বাভাবিক বৃত্তি, এই জন্য ইহা করিয়া থাকে। অপত্যশ্নেহ যদি স্বতন্ত্র স্বাভাবিক বৃত্তি হয়, তবে তাহা সাধারণ প্রীতিবৃত্তির বিরোধী হইবার সম্ভাবনা। অনেক সময়ে হইয়াও থাকে। অনেক সময়েই দেখিতে পাই যে, অনেকে অপত্যশ্নেহের বশীভূত হইয়া পরের অনিষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হয়। যেমন জাগতিক প্রীতির সঙ্গে আত্মপ্রীতির বিরোধ সম্ভাবনার কথা পূর্বে বলিয়াছিলাম, জাগতিক প্রীতির সঙ্গে অপত্যপ্রীতিরও সেইরূপ বিরোধের শঙ্কা করিতে হয়।

কেবল তাহাই নহে। এখানে যে আত্মপ্রীতি আসিয়া যোগ দেয় না, এমন কথা বলা যায় না। ছেলে আমার, সুতরাং পরের কাড়িয়া লইয়া ইহাকে দিতে হইবে। ছেলের উপকারে আমার উপকার, অতএব যে উপায়ে হউক, ছেলের উপকার সিদ্ধ করিতে হইবে। এরূপ বুদ্ধির বশীভূত হইয়া অনেকে কার্য করিয়া থাকেন।

অতএব এই অপত্যপ্রীতির সামঞ্জস্যজন্য বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন।

শিষ্য। এই সামঞ্জস্যের উপায় কি?

গুরু। উপায়—হিন্দুধর্মের ও প্রীতিতত্ত্বের সেই মূল সূত্র—সর্বভূতে সমদর্শন। অপত্যপ্রীতি সেই জাগতিক প্রীতিতে নিমজ্জিত করিয়া, অপত্যপালন ও রক্ষণ ঈশ্বরোদ্দিষ্ট; সুতরাং অনুষ্ঠেয় কর্ম জানিয়া, “জগদীশ্বরের কর্ম নিস্বাহ করিতেছি, আমার ইহাতে ইষ্টানিষ্ট কিছু নাই,” ইহা মনে বুদ্ধিয়া, সেই অনুষ্ঠেয় কর্ম করিবে। তাহা হইলে এই অপত্যপালন ও রক্ষণধর্ম নিষ্কাম ধর্মে পরিণত হইবে। তাহা হইলে তোমার অনুষ্ঠেয় কর্মেরও অতিশয় সুনিস্বাহ হইবে; অথচ তুমি নিজে এক দিকে শোকমোহাদি, আর এক দিকে পাপ ও দুর্ভাসনা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে।

শিষ্য। আপনি কি অপত্যশ্নেহ-বৃত্তির উচ্ছেদ করিয়া তাহার স্থানে জাগতিক প্রীতির সমাবেশ করিতে বলেন?

গুরু। আমি কোন বৃত্তিরই উচ্ছেদ করিতে বলি না, ইহা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি। তবে, পাশব বৃত্তি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ কর। পাশব বৃত্তিসকল স্বতঃস্ফূর্ত। যাহা স্বতঃস্ফূর্ত, তাহার দমনই অনুশীলন। অপত্যশ্নেহ পরম রমণীয় ও পবিত্র বৃত্তি। পাশব বৃত্তি-গুলির সঙ্গে ইহার এই ঐক্য আছে যে, ইহা যেমন মনুষ্যের আছে, তেমনি পশুদিগেরও আছে। তাদৃশ সকল বৃত্তিই স্বতঃস্ফূর্ত, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। অপত্যশ্নেহও সেই জন্য স্বতঃস্ফূর্ত। বরং সমস্ত মানসিক বৃত্তির অপেক্ষা ইহার বল দুর্দমনীয় বলা যাইতে পারে। এখন অপত্যপ্রীতি যতই রমণীয় ও পবিত্র হউক না কেন, উহার অনর্চিত স্ফূর্তি অসামঞ্জস্যের কারণ, যাহা স্বতঃস্ফূর্ত, তাহার সংযম না করিলে অনর্চিত স্ফূর্তি ঘটিয়া উঠে। এই জন্য উহার সংযম আবশ্যিক। উহার সংযম না করিলে, জাগতিক প্রীতি ও ঈশ্বরে ভক্তি, উহার স্রোতে ভাসিয়া

যায়। আমি বলিয়াছি, ঈশ্বরে ভক্তি ও মনুষ্যে প্রীতি, ইহাই ধর্মের সার, অনুশীলনের মূখ্য উদ্দেশ্য, সুখের মূলীভূত এবং মনুষ্যত্বের চরম। অতএব অপত্যপ্রীতির অনর্দচিত স্ফূর্তিতে এইরূপ ধর্মনাশ, সুখনাশ, এবং মনুষ্যত্বনাশ ঘটিতে পারে। লোকে ইহার অন্যায় বশীভূত হইয়া ঈশ্বর ভুলিয়া যায়; ধর্মধর্ম ভুলিয়া, অপত্য ভিন্ন আর সকল মনুষ্যকে ভুলিয়া যায়। আপনার অপত্য ভিন্ন আর কাহারও জন্য কিছু করিতে চাহে না। ইহাই অন্যায় স্ফূর্তি। পক্ষান্তরে, অবস্থা বিশেষে ইহার দমন না করিয়া ইহার উদ্দীপনই বিধেয় হয়। অন্যান্য পাশব বৃত্তি হইতে ইহার এক পার্থক্য এই যে, ইহা কামাদি নীচ বৃত্তির ন্যায় সর্বদা এবং সর্বত্র স্বতঃস্ফূর্ত নহে। এমন নরপিশাচ ও পিশাচীও দেখা যায় যে, তাহাদের এই পরম রমণীয়, পবিত্র এবং সুখকর স্বাভাবিক বৃত্তি অন্তর্হিত। অনেক সময়ে সামাজিক পাপবাহুল্যে এই সকল বৃত্তির বিলোপ ঘটে। ধনলোভে পিশাচ পিশাচীরা পুত্র কন্যা বিক্রয় করে; লোকলজ্জা-ভয়ে কুলকলঙ্কিনীরা তাহাদের বিনাশ করে; কুলকলঙ্কভয়ে কুলাভিমানীরা কন্যাসন্তান বিনাশ করে; অনেক কামুকী কামাতুর হইয়া সন্তান পরিত্যাগ করিয়া যায়। অতএব এই বৃত্তির অভাব বা লোপও অতি ভয়ঙ্কর অধর্মের কারণ। যেখানে ইহা উপযুক্তরূপে স্বতঃস্ফূর্ত না হয়, সেখানে অনুশীলন দ্বারা ইহাকে স্ফূর্তিত করা আবশ্যিক। উপযুক্তমত স্ফূর্তিত ও চরিতার্থ হইলে ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন আর কোন বৃত্তিই ঈদৃশ সুখদ হয় না। সুখকারিতায় অপত্যপ্রীতি ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন সকল বৃত্তির অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ।

অপত্যপ্রীতি সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, দম্পতিপ্রীতি সম্বন্ধেও তাহা বলা যায়। অর্থাৎ (১) স্ত্রীর প্রতিপালন ও রক্ষণের ভার তোমার উপর। স্ত্রী নিজে আত্মরক্ষণে ও প্রতিপালনে অক্ষম। অতএব তাহা তোমার অনুষ্টেয় কর্ম। স্ত্রীর পালন ও রক্ষা ব্যতীত প্রজার বিলোপ সম্ভাবনা। এজন্য তৎপালন ও রক্ষণ জন্য স্বামীর প্রাণপাত করাও ধর্মসঙ্গত।

(২) স্বামীর পালন ও রক্ষণ স্ত্রীর সাধ্য নহে, কিন্তু তাহার সেবা ও সুখসাধন তাহার সাধ্য। তাহাই তাহার ধর্ম। অন্য ধর্ম অসম্পূর্ণ, হিন্দুধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সম্পূর্ণ; হিন্দুধর্ম স্ত্রীকে সহধর্মিণী বলিয়াছে। যদি দম্পতিপ্রীতিকে পাশব বৃত্তিতে পরিণত না করা হয়, তবে ইহাই স্ত্রীর যোগ্য নাম; তিনি স্বামীর ধর্মের সহায়। অতএব স্বামীর সেবা, সুখসাধন ও ধর্মের সহায়তা, ইহাই স্ত্রীর ধর্ম।

(৩) জগৎ রক্ষার্থ এবং ধর্মাচরণের জন্য দম্পতিপ্রীতি। তাহা স্মরণ রাখিয়া এই প্রীতির অনুশীলন করিলে ইহাও নিষ্কাম ধর্ম পরিণত হইতে পারে ও হওয়াই উচিত। নহিলে ইহা নিষ্কাম ধর্ম নহে।

শিষ্য। আমি এই দম্পতিপ্রীতিকেই পাশব বৃত্তি বলি, অপত্যপ্রীতিকে পাশব বৃত্তি বলিতে তত সম্মত নহি। কেন না, পশুদিগেরও দাম্পত্য অনুরাগ আছে। সে অনুরাগও অতিশয় তীব্র।

গুরু। পশুদিগের দম্পতিপ্রীতি নাই।

শিষ্য।—

মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে
পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্তমানঃ ।
শৃঙ্গেন চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং
মৃগীমকন্ডুয়ত কৃষ্ণসারঃ ॥
দদৌ রসাৎ পঙ্কজরেণুর্গন্ধি
গজায় গন্ডুষজলং করেণুঃ ।
অকৌপভুক্তেন বিসেন জায়াং
সম্ভাবয়ামাস রথাস্কনামা ॥

গুরু। ওহো! কিন্তু আসল কথাটা ছাড়িয়া গেলে যে!

তং দেশমারোপিতপুষ্পচাপে

রতিদ্বিতীয়ে মদনে প্রপন্নে—ইত্যাদি।

রতি সহিত মন্থথ সেখানে উপস্থিত, তাই এই পাশব অনুরাগের বিকাশ। কবি নিজেই বলিয়া দিয়াছেন যে, এই অনুরাগ স্মরজ। ইহা পশুদিগেরও আছে, মনুষ্যেরও আছে। ইহাকে

বাংকম রচনাবলী

কামবৃত্তি বলিয়া পুরুষে নির্দিষ্ট করিয়াছি। ইহাকে দম্পতিপ্রীতি বলি না। ইহা পাশব বৃত্তি বটে, স্বতঃস্ফূর্ত, এবং ইহার দমনই অনুশীলন। কাম, সহজ; দম্পতিপ্রীতি সংসর্গজ; কামজনিত অনুরাগ ক্ষণিক, দম্পতিপ্রীতি স্থায়ী। তবে ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, অনেক সময়ে এই কামবৃত্তি আসিয়া দম্পতিপ্রীতিস্থান অধিকার করে। অনেক সময়ে তাহার স্থান অধিকার না করুক, দম্পতিপ্রীতির সঙ্গে সংযুক্ত হয়। সে অবস্থায় যে পরিমাণে ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি, বাসনার প্রবলতা, সেই পরিমাণে দম্পতিপ্রীতিও পাশবতা প্রাপ্ত হয়। এই সকল অবস্থায় দম্পতিপ্রীতি অতিশয় বলবতী বৃত্তি হইয়া উঠে। এ সকল অবস্থায় তাহার সামঞ্জস্য আবশ্যিক। যে সকল নিয়ম পুরুষে বলা হইয়াছে, তাহাই সামঞ্জস্যের উত্তম উপায়।

শিষ্য। আমি যত দূর বৃদ্ধিতে পারি, এই কামবৃত্তিই সৃষ্টিরক্ষার উপায়। দম্পতিপ্রীতি ব্যতীত ইহার দ্বারাই জগৎ রক্ষিত হইতে পারে। ইহাই তবে নিষ্কাম ধর্ম পরিণত করা যাইতে পারে। দম্পতিপ্রীতি যে নিষ্কাম ধর্ম পরিণত করা যাইতে পারে, এমন বিচারপ্রণালী দেখিতেছি না।

গুরু। স্মরজ বৃত্তিও যে নিষ্কাম ধর্মের কারণ হইতে পারে, ইহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু তোমার আসল কথাতেই ভুল। দম্পতিপ্রীতি ব্যতীত কেবল পাশব বৃত্তিতে জগৎ রক্ষা হইতে পারে না।

শিষ্য। পশুসৃষ্টি ত কেবল তদ্বারাই রক্ষিত হইয়া থাকে।

গুরু। পশুসৃষ্টি রক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু মনুষ্যসৃষ্টি রক্ষা পাইতে পারে না। কারণ, পশুদিগের স্ত্রীদিগের আত্মরক্ষার ও আত্মপালনের শক্তি আছে। মনুষ্যস্ত্রীর তাহা নাই। অতএব মনুষ্যজাতিমধ্যে পুরুষ দ্বারা স্ত্রীজাতির পালন ও রক্ষণ না হইলে স্ত্রীজাতির বিলোপের সম্ভাবনা।

শিষ্য। মনুষ্যজাতির অসভ্যাবস্থায় কিরূপ?

গুরু। যেরূপ অসভ্যাবস্থায় মনুষ্য পশুতুল্য, অর্থাৎ বিবাহপ্রথা নাই, সেই অবস্থায় স্ত্রীলোক সকল আত্মরক্ষায় ও আত্মপালনে সক্ষম কি না, তাহা বিচারের প্রয়োজন নাই। কেন না, তাদৃশ অসভ্যাবস্থার সঙ্গে ধর্মের কোন সম্বন্ধ নাই। মনুষ্য যত দিন সমাজভুক্ত না হয়, তত দিন তাহাদের শারীরিক ধর্ম ভিন্ন অন্য ধর্ম নাই বলিলেও হয়। ধর্মাচরণ জন্য সমাজ আবশ্যিক। সমাজ ভিন্ন জ্ঞানোন্নতি নাই; জ্ঞানোন্নতি ভিন্ন ধর্মাধর্ম জ্ঞান সম্ভবে না। ধর্মাধর্ম ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি সম্ভবে না; এবং যেখানে অন্য মনুষ্যের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, সেখানে মনুষ্যে প্রীতি প্রভৃতি ধর্মও সম্ভবে না। অর্থাৎ অসভ্যাবস্থায় শারীরিক ধর্ম ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম সম্ভব নহে।

ধর্মজন্য সমাজ আবশ্যিক। সমাজগঠনের পক্ষে একটি প্রথম প্রয়োজন বিবাহপ্রথা। বিবাহপ্রথার স্থূল মর্ম এই যে, স্ত্রীপুরুষ এক হইয়া সাংসারিক ব্যাপার ভাগে নিষ্বাহ করিবে। যাহার যাহা যোগ্য, সে সেই ভাগের ভারপ্রাপ্ত। পুরুষের ভাগ—পালন ও রক্ষণ। স্ত্রী অন্য-ভারপ্রাপ্ত, পালন ও রক্ষণে সক্ষম হইলেও বিরত। বহুপুরুষপরম্পরায় এইরূপ বিরতি ও অনভ্যাসবশতঃ সামাজিক নারী আত্মপালনে ও রক্ষণে অক্ষম। এ অবস্থায় পুরুষ স্ত্রীপালন ও রক্ষণ না করিলে অবশ্য স্ত্রীজাতির বিলোপ ঘটিবে। অথচ যদি পুরুষ তাহাদিগের সে শক্তি পুনরভ্যাসে পুরুষপরম্পরা উপস্থিত হইতে পারে, এমন কথা বল, তবে বিবাহপ্রথার বিলোপ এবং সমাজ ও ধর্ম বিনষ্ট না হইলে তাহার সম্ভাবনা নাই, ইহাও বলিতে হইবে।

শিষ্য। তবে পাশ্চাত্যেরা যে স্ত্রীপুরুষের সাম্য স্থাপন করিতে চাহেন, সেটা সামাজিক বিড়ম্বনা মাত্র?

গুরু। সাম্য কি সম্ভবে? পুরুষে কি প্রসব করিতে পারে, না শিশুকে স্তন্য পান করাইতে পারে? পক্ষান্তরে স্ত্রীলোকের পল্টন লইয়া লড়াই চলে কি?

শিষ্য। তবে শারীরিক বৃত্তির অনুশীলনের কথা যে পুরুষে বলিয়াছিলেন, তাহা স্ত্রীলোকের পক্ষে খাটে না?

গুরু। কেন খাটে না? যাহার যে শক্তি আছে, সে তাহার অনুশীলন করিবে। স্ত্রীলোকের যুদ্ধ করিবার শক্তি থাকে, তাহা অনুশীলিত করুক; পুরুষের স্তন্য পান করাইবার শক্তি থাকে, অনুশীলিত করুক।

শিষ্য। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, পাশ্চাত্য স্ত্রীলোকেরা ঘোড়ায় চড়া, বন্দুক ছোড়া প্রভৃতি পৌরুষ কস্মে বালক্ষণ পটুতা লাভ করিয়া থাকে।

গুরু। অভ্যাস ও অনুশীলনে যে প্রভেদের কথা পূর্বে বলিয়াছি, তাহা স্মরণ কর। অনুশীলন, শান্তির অনুকূল; অভ্যাস, শান্তির প্রতিকূল। অনুশীলনে শান্তির বিকাশ; অভ্যাসে বিকার। এ সকল অভ্যাসের ফল, অনুশীলনের নহে। অভ্যাস, প্রয়োজনমতে কর্তব্য, অনুশীলন সর্বত্র কর্তব্য।

যাক। এ তত্ত্ব যেটুকু বলা আবশ্যিক, তাহা বলা গেল। এখন অপত্যপ্রীতি ও দম্পতি-প্রীতি সম্বন্ধে কয়টা বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা পুনরুক্ত করিয়া সমাপ্ত কর।

প্রথম, বলিয়াছি যে, অপত্যপ্রীতি স্বতঃস্ফূর্ত। দম্পতিপ্রীতি স্বতঃস্ফূর্ত নহে, কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত ইন্দ্রিয়তৃপ্তলালসা ইহার সঙ্গে সংযুক্ত হইলে, ইহাও স্বতঃস্ফূর্তের ন্যায় বলবতী হয়। এই উভয় বৃত্তিই এই সকল কারণে অতি দুর্দমনীয় বেগবিশিষ্ট। অপত্যপ্রীতির ন্যায় দুর্দমনীয় বেগবিশিষ্ট বৃত্তি মনুষ্যের আর আছে কি না সন্দেহ। নাই বলিলে অতুক্তি হইবে না।

দ্বিতীয়, এই দুইটি বৃত্তিই অতিশয় রমণীয়। ইহাদের তুল্য বল আর কোন বৃত্তির থাকিলে থাকিতে পারে, কিন্তু এমন পরম রমণীয় বৃত্তি মনুষ্যের আর নাই। রমণীয়তায় এই দুইটি বৃত্তি সমস্ত মনুষ্যবৃত্তিকে এত দূর পরাভব করিয়াছে যে, এই দুইটি বৃত্তি, বিশেষতঃ দম্পতি-প্রীতি, সকল জাতির কাব্য-সাহিত্য অধিকৃত করিয়া রাখিয়াছে। সমস্ত জগতে ইহাই কাব্যের একমাত্র উপাদান বলিলেও বলা যায়।

তৃতীয়তঃ, সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে সুখকরও এই দুই বৃত্তির তুল্যও আর নাই। ভক্তি ও জাগতিক প্রীতির সুখ উচ্চতর ও তীব্রতর, কিন্তু তাহা অনুশীলন ভিন্ন পাওয়া যায় না; সে অনুশীলনও কঠিন ও জ্ঞানসাপেক্ষ। কিন্তু অপত্যপ্রীতির সুখ অনুশীলনসাপেক্ষ নহে, এবং দম্পতিপ্রীতির সুখ কিয়ৎপরিমাণে অনুশীলনসাপেক্ষ হইলেও সে অনুশীলন অতি সহজ ও সুখকর।

এই সকল কারণে এই দুই বৃত্তি অনেক সময়ে মনুষ্যের ঘোরতর ধর্মবিঘ্নে পরিণত হয়। ইহারা পরম রমণীয় এবং অতিশয় সুখদ, এজন্য ইহাদের অপরিমিত অনুশীলনে মনুষ্যের অতিশয় প্রবৃত্তি। এবং ইহার বেগ দুর্দমনীয়, এই জন্য ইহার অনুশীলনের ফল, ইহাদের সর্বগ্রাসিনী বৃদ্ধি! তখন ভক্তি, প্রীতি এবং সমস্ত ধর্ম ইহাদের বেগে ভাসিয়া যায়। এই জন্য সচরাচর দেখা যায় যে, মনুষ্য স্ত্রীপুত্রাদির স্নেহের বশীভূত হইয়া অন্য সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে। বাঙ্গালির এ কলঙ্ক বিশেষ বলবান্।

এই কারণে যাহারা সন্ন্যাসধর্মাবলম্বী, তাহাদিগের বিকট অপত্যপ্রীতি ও দম্পতিপ্রীতি অতিশয় ঘৃণিত। তাহারা স্ত্রীমাত্রকেই পিশাচী মনে করেন। আমি তোমাকে বুঝাইয়াছি, অপত্যপ্রীতি ও দম্পতিপ্রীতি সমুচিত মাত্রায় পরম ধর্ম। তাহা পরিত্যাগ ঘোরতর অধর্ম। অতএব সন্ন্যাসধর্মাবলম্বীদিগের এই আচরণ যে মহৎ পাপাচরণ, তাহা তোমাকে বলিতে হইবে না। আর জাগতিক-প্রীতি-তত্ত্ব বুঝাইবার সময় তোমাকে বুঝাইয়াছি যে, এই পারিবারিক প্রীতি জাগতিক প্রীতিতে আরোহণ করিবার প্রথম সোপান। যাহারা এই সোপানে পদার্পণ না করে, তাহারা জাগতিক প্রীতিতে আরোহণ করিতে পারে না।

শিষ্য। যীশু?

গুরু। যীশু বা শাক্যসিংহের ন্যায় যাহারা পারে, তাহাদের ঈশ্বরংশ বলিয়া মনুষ্যে স্বীকার করিয়া থাকে। ইহাই প্রমাণ যে, এই বিধি যীশু বা শাক্যসিংহের ন্যায় মনুষ্য ভিন্ন আর কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না। আর যীশু বা শাক্যসিংহ যদি গৃহী হইয়া জগতের ধর্মপ্রবর্তক হইতে পারিতেন, তাহা হইলে তাহাদিগের ধার্মিকতা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইত সন্দেহ নাই।* আদর্শ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ গৃহী। যীশু বা শাক্যসিংহ সন্ন্যাসী—আদর্শ পুরুষ নহেন।

অপত্যপ্রীতি ও দম্পতিপ্রীতি ভিন্ন স্বজনপ্রীতির ভিতর আরও কিছু আছে। (১) যাহারা অপত্যস্থানীয়, তাহারাও অপত্যপ্রীতির ভাগী। (২) যাহারা শৌণ্ডিত-সম্বন্ধে আমাদের সহিত

* 'কৃষ্ণচরিত্র' নামক গ্রন্থে এই কথাটা বর্তমান গ্রন্থকার কর্তৃক সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে।

বিশ্বকম রচনাবলী

সম্বন্ধ, যথা—দ্রাভা ভাগিনী প্রভৃতি, তাহারাও আমাদের প্রীতির পাত্র। সংসর্গজনিতই হউক, আত্মপ্রীতির সম্প্রসারণেই হউক, তাহাদের প্রতি প্রীতি সচরাচর জন্মিয়া থাকে। (৩) এইরূপ প্রীতির সম্প্রসারণ হইতে থাকিলে, কুটুম্বাদি ও প্রতিবাসিগণ প্রীতির পাত্র হয়, ইহা প্রীতির নৈসর্গিক বিস্তার কখনকালে বলিয়াছি। (৪) এমন অনেক ব্যক্তির সংসর্গে আমরা পড়িয়া থাকি যে, তাহারা আমাদের স্বজনমধ্যে গণনীয় না হইলেও তাহাদের গুণে মন্থ হইয়া আমরা তাহাদের প্রতি বিশেষ প্রীতিযুক্ত হইয়া থাকি। এই বন্ধুপ্রীতি অনেক সময়ে অত্যন্ত বলবতী হইয়া থাকে।

ঈদৃশ প্রীতিও অনুশীলনীয় ও উৎকৃষ্ট ধর্ম। সামঞ্জস্যের সাধারণ নিয়মের বশবর্তী হইয়া ইহার অনুশীলন করিবে।

চতুর্বিংশতিতম অধ্যায়—স্বদেশপ্রীতি

গুরু। অনুশীলনের উদ্দেশ্য, সমস্ত বৃত্তিগুলিকে স্ফূর্তিত ও পরিণত করিয়া ঈশ্বরমুখী করা। ইহার সাধন, কর্মীর পক্ষে, ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম। ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন, এজন্য সমস্ত জগৎ আত্মবৎ প্রীতির আধার হওয়া উচিত। জাগতিক প্রীতির ইহাই মূল। এই মৌলিকতা দেখিতে পাইতেছ, ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্মের। সমস্ত জগৎ কেন আপনার মত ভাল বাসিব? ইহা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম বলিয়া। তবে, যদি এমন কাজ দেখি যে, তাহাও ঈশ্বরোদ্দিষ্ট, কিন্তু এই জাগতিক প্রীতির বিরোধী, তবে আমাদের কি করা কর্তব্য? যদি দুই দিক্ বজায় না রাখা যায়, তবে কোন দিক্ অবলম্বন করা কর্তব্য?

শিষ্য। সে স্থলে বিচার করা কর্তব্য। বিচারে যে দিক্ গুরু হইবে, সেই দিক্ অবলম্বন করা কর্তব্য।

গুরু। তবে, যাহা বলি, তাহা শুনিয়া বিচার কর। দম্পতিপ্রীতি-তত্ত্ব বদ্বাইবার সময়ে বদ্বাইয়াছি যে, সমাজের বাহিরে মনুষ্যের কেবল পশুজীবন আছে মাত্র, সমাজের ভিতরে ভিন্ন মনুষ্যের ধর্মজীবন নাই। সমাজের ভিতরে ভিন্ন কোন প্রকার মঙ্গল নাই বলিলেও অত্যাতি হয় না। সমাজধ্বংসে সমস্ত মনুষ্যের ধর্মধ্বংস। এবং সমস্ত মনুষ্যের সকলপ্রকার মঙ্গলধ্বংস। তোমার ন্যায় সুশিক্ষিতকে কষ্ট পাইয়া এ কথাটা বোধ করি বদ্বাইতে হইবে না।

শিষ্য। নিঃপ্রয়োজন। বাচস্পতি মহাশয় দেশে থাকিলে এ সকল বিষয়ে আপত্তি উত্থাপিত করার ভার তাঁরে দিতাম।

গুরু। যদি তাহাই হইল, যদি সমাজধ্বংসে ধর্মধ্বংস এবং মনুষ্যের সমস্ত মঙ্গলের ধ্বংস, তবে সব রাখিয়া আগে সমাজ রক্ষা করিতে হয়। এই জন্য হবর্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন, “The life of the social organism must, as an end, rank above the lives of its units.” অর্থাৎ আত্মরক্ষার অপেক্ষাও দেশরক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এবং এই জন্যই সহস্র সহস্র ব্যক্তি আত্মপ্রাণ বিসর্জন করিয়াও দেশরক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন।

যে কারণে আত্মরক্ষার অপেক্ষা দেশরক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম, সেই কারণেই ইহা স্বজনরক্ষার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ধর্ম। কেন না, তোমার পরিবারবর্গ সমাজের সামান্য অংশ মাত্র, সমুদায়ের জন্য অংশ মাত্রকে পরিত্যাগ বিধেয়।

আত্মরক্ষার ন্যায় ও স্বজনরক্ষার ন্যায় স্বদেশরক্ষা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম; কেন না, ইহা সমস্ত জগতের হিতের উপায়। পরস্পরের আক্রমণে সমস্ত বিনষ্ট বা অধঃপতিত হইয়া কোন পরস্বলোলুপ পাপিষ্ঠ জাতির অধিকারভুক্ত হইলে, পৃথিবী হইতে ধর্ম ও উন্নতি বিলুপ্ত হইবে। এই জন্য সর্বভূতের হিতের জন্য সকলেরই স্বদেশরক্ষণ কর্তব্য।

যদি স্বদেশরক্ষাও আত্মরক্ষা ও স্বজনরক্ষার ন্যায় ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম হয়, তবে ইহাও নিষ্কাম কর্ম পরিণত হইতে পারে। ইহা যে আত্মরক্ষা ও স্বজনরক্ষার অপেক্ষা সহজে নিষ্কাম কর্ম পরিণত হইতে পারে ও হইয়া থাকে, তাহা বোধ করি কষ্ট পাইয়া বদ্বাইতে হইবে না।

শিষ্য। প্রশ্নটা উত্থাপিত করিয়া আপনি বলিয়াছিলেন, “বিচার কর।” এক্ষণে বিচারে কি নিষ্পন্ন হইল?

গুরু। বিচারে এই নিষ্পন্ন হইতেছে যে, সর্বভূতে সমদৃষ্টি যাদৃশ আমার অনুষ্ঠেয় কর্ম, আত্মরক্ষা, স্বজনরক্ষা এবং দেশরক্ষা আমার তাদৃশ অনুষ্ঠেয় কর্ম। উভয়েরই অনুষ্ঠান করিতে হইবে। যখন উভয়ে পরস্পরবিরোধী হইবে, তখন কোন্ দিক্ গুরু, তাহাই দেখিবে। আত্মরক্ষা, স্বজনরক্ষা, দেশরক্ষা—জগৎরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়, অতএব সেই দিক্ অবলম্বনীয়।

কিন্তু বস্তুতঃ জাগতিক প্রীতির সঙ্গে, আত্মপ্রীতি বা স্বজনপ্রীতি বা দেশপ্রীতির কোন বিরোধ নাই। যে আক্রমণকারী, তাহা হইতে আত্মরক্ষা করিব, কিন্তু তাহার প্রতি প্রীতিশূন্য কেন হইবে? ক্ষুধার্ত চোরের উদাহরণের দ্বারা ইহা তোমাকে পূর্বে বুঝাইয়াছি। আর ইহাও বুঝাইয়াছি যে, জাগতিক প্রীতি এবং সর্বত্র সমদর্শনের এমন তাৎপর্য্য নহে যে, পড়িয়া মার খাইতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যখন সকলেই আমার তুল্য, তখন আমি কখন কাহারও অনিষ্ট করিব না। কোন মনুষ্যেরও করিব না এবং কোন সমাজেরও করিব না। আপনার সমাজের যেমন সাধ্যানুসারে ইষ্ট সাধন করিব, সাধ্যানুসারে পর-সমাজেরও তেমনি ইষ্ট সাধন করিব। সাধ্যানুসারে—কেন না, কোন সমাজের অনিষ্ট করিয়া অন্য কোন সমাজের ইষ্ট সাধন করিব না। পর-সমাজের অনিষ্ট সাধন করিয়া, আমার সমাজের ইষ্ট সাধন করিব না, এবং আমার সমাজের অনিষ্ট সাধন করিয়া কাহারও আপনার সমাজের ইষ্ট সাধন করিতে দিব না। ইহাই যথার্থ সম দর্শন এবং ইহাই জাগতিক প্রীতি ও দেশপ্রীতির সামঞ্জস্য। কয় দিন পূর্বে তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহার উত্তর পাইলে। বোধ করি, তোমার মনে ইউরোপীয় Patriotism ধর্মের কথা জাগিতেছিল, তাই তুমি এ প্রশ্ন করিয়াছিলে। আমি তোমাকে যে দেশপ্রীতি বুঝাইলাম, তাহা ইউরোপীয় Patriotism নহে। ইউরোপীয় Patriotism একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ। ইউরোপীয় Patriotism ধর্মের তাৎপর্য্য এই যে, পর-সমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু অন্য সমস্ত জাতির সর্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে। এই দুরন্ত Patriotism প্রভাবে আমেরিকার আদিম জাতিসকল পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইল। জগদীশ্বর ভারতবর্ষে যেন ভারতবর্ষীয়ের কপালে এরূপ দেশবাসল্য ধর্ম না লিখেন। এখন বল, প্রীতিতত্ত্বের স্থূল তত্ত্ব কি বুঝিলে?

শিষ্য। বুঝিয়াছি যে, মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলি অনুশীলিত হইয়া যখন ঈশ্বরানুবর্তিনী হইবে, মনের সেই অবস্থাই ভক্তি।

এই ভক্তির ফল, জাগতিক প্রীতি। কেন না, ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন।

এই জাগতিক প্রীতির সঙ্গে আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি এবং স্বদেশপ্রীতির প্রকৃত পক্ষে কোন বিরোধ নাই। আপাতত যে বিরোধ আমরা অনুভব করি, সেটা এই সকল বৃত্তিকে নিষ্কামতায় পরিণত করিতে আমরা যত্ন করি না, এই জন্য। অর্থাৎ সমুচিত অনুশীলনের অভাবে।

আরও বুঝিয়াছি, আত্মরক্ষা হইতে স্বজনরক্ষা গুরুতর ধর্ম, স্বজনরক্ষা হইতে দেশরক্ষা গুরুতর ধর্ম। যখন ঈশ্বরে ভক্তি এবং সর্বলোকে প্রীতি এক, তখন বলা যাইতে পারে যে, ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন, দেশপ্রীতি সর্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম।

গুরু। ইহাতে ভারতবর্ষীয়দিগের সামাজিক ও ধর্ম সম্বন্ধীয় অবনতির কারণ পাইলে। ভারতবর্ষীয়দিগের ঈশ্বরে ভক্তি ও সর্বলোকে সমদৃষ্টি ছিল। কিন্তু তাঁহারা দেশপ্রীতি সেই সার্বলৌকিক প্রীতিতে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা প্রীতিবৃত্তির সামঞ্জস্যযুক্ত অনুশীলন নহে। দেশপ্রীতি ও সার্বলৌকিক প্রীতি, উভয়ের অনুশীলন ও পরস্পর সামঞ্জস্য চাই। তাহা ঘটিলে, ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির আসন গ্রহণ করিতে পারিবে।

শিষ্য। ভারতবর্ষ আপনার ব্যাখ্যাত অনুশীলনতত্ত্ব বুঝিতে পারিলে ও কার্যে পরিণত করিলে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতির আসন গ্রহণ করিবে, তদ্বিষয়ে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়—পশুপ্রীতি

গুরু। প্রীতিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় আর একটি কথা বাকি আছে। অন্য সকল ধর্মের অপেক্ষা হিন্দুধর্ম যে শ্রেষ্ঠ, তাহার সহস্র উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। এই প্রীতিতত্ত্ব যাহা তোমাকে

বাংকম রচনাবলী

বুঝাইলাম, ইহার ভিতরেই তাহার কত উদাহরণ পাওয়া যাইতে পারে। হিন্দুদিগের জাগতিক প্রীতি যাহা তোমাকে বুঝাইয়াছে, তাহাতেই ইহার চমৎকার উদাহরণ পাইয়াছ। অন্য ধর্মোও সর্বলোকে প্রীতিযুক্ত হইতে বলে বটে, কিন্তু তাহার উপযুক্ত মূল কিছুই নির্দেশ করিতে পারে না। হিন্দুধর্মের এই জাগতিক প্রীতি জগত্তে দৃঢ় বন্ধমূল। ঈশ্বরের সর্বব্যাপকতায় ইহার ভিত্তি। হিন্দুদিগের দম্পতিপ্রীতি সমালোচনায় আর একটি এই শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ পাওয়া যায়; হিন্দুদিগের দম্পতিপ্রীতি অন্য জাতির আদর্শস্থল; হিন্দুধর্মের বিবাহপ্রথা ইহার কারণ।* আমি এক্ষণে প্রীতিতত্ত্বটি আর একটি প্রমাণ দিব।

ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন। এই জন্য সর্বভূতে সমদৃষ্টি করিতে হইবে। কিন্তু সর্বভূত বলিলে কেবল মনুষ্য বুঝায় না। সমস্ত জীব সর্বভূতান্তর্গত। অতএব পশুগণও মনুষ্যের প্রীতির পাত্র। মনুষ্যও ষেরূপ প্রীতির পাত্র, পশুগণও সেইরূপ প্রীতির পাত্র। এইরূপ অভেদজ্ঞান আর কোন ধর্ম নাই, কেবল হিন্দুধর্ম ও হিন্দুধর্ম হইতে উৎপন্ন বৌদ্ধধর্ম আছে।

শিষ্য। কথাটা বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্ম হইতে পাইয়াছে, না হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্ম হইতে পাইয়াছে?

গুরু। অর্থাৎ তোমার জিজ্ঞাস্য যে, ছেলে বাপের বিষয় পাইয়াছে, না বাপ ছেলের বিষয় পাইয়াছে?

শিষ্য। বাপ কখন ছেলের বিষয় পায়?

গুরু। যে প্রকৃতির গতিবিরুদ্ধ পক্ষ সমর্থন করে, প্রমাণের ভার তাহার উপর। বৌদ্ধ পক্ষে প্রমাণ কি?

শিষ্য। কিছুই না বোধ হয়। হিন্দু পক্ষে প্রমাণ কি?

গুরু। ছেলে বাপের বিষয় পায়, এই কথাই যথেষ্ট। তা ছাড়া বাজসনেয় উপনিষৎ শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ দিয়াছি যে, সর্বভূতের যে সাম্য, ইহা প্রাচীন বেদোক্ত ধর্ম।

শিষ্য। কিন্তু বেদে ত অশ্বমেধাদির বিধি আছে।

গুরু। বেদ যদি কোন এক ব্যক্তিবিশেষ-প্রণীত একখানি গ্রন্থ হইত, তাহা হইলে না হয় বেদের প্রতি অসঙ্গতি দোষ দেওয়া যাইত। Thomas Aquinas সঙ্গে হব'ট স্পেন্সরের সঙ্গতি খোঁজা যত দূর সম্ভব, বেদের ভিন্ন ভিন্ন অংশের সঙ্গতির সন্ধানও তত দূর সম্ভব। হিংসা হইতে অহিংসায় ধর্মের উন্নতি। যাক্। হিন্দুধর্মবিহিত “পশুদিগের প্রতি অহিংসা” পরম রমণীয় ধর্ম। যত্নে ইহার অনুশীলন করিবে। অহিন্দুরা যত্নে ইহার অনুশীলন করিয়া থাকে। খাইবার জন্য বা চাষের জন্য বা চাঁড়বার জন্য যাহারা গো মেষ অশ্বাদির পালন করে, আমি কেবল তাহাদের কথা বলিতেছি না। কুকুরের মাংস খাওয়া যায় না, তথাপি কত যত্নে খুঁটানেরা কুকুর পালন করে! তাহাতে তাহাদের কত সুখ! আমাদের দেশে কত স্ত্রীলোক বিড়াল পুষ্টিয়া অপত্যহীনতার দুঃখ নিবারণ করে। একটি পক্ষী পুষ্টিয়া কে না সুখী হয়? আমি একদা একখানি ইংরাজি গ্রন্থে পড়িয়াছিলাম,—যে বাড়ীতে দেখিবে—পিঞ্জরে পক্ষী আছে, জানিবে—সেই বাড়ীতে একজন বিজ্ঞ মানুষ আছে। গ্রন্থখানির নাম মনে নাই, কিন্তু বিজ্ঞ মানুষের কথা বটে।

পশুদিগের মধ্যে গো হিন্দুদিগের বিশেষ প্রীতির পাত্র। গোরুর তুল্য হিন্দুর পরমোপকারী আর কেহই নাই। গোদুগ্ধ হিন্দুর দ্বিতীয় জীবন স্বরূপ। হিন্দু, মাংস ভোজন করে না। যে অন্য আমরা ভোজন করি, তাহাতে পুষ্টিকর (nitrogenous) দ্রব্য বড় অল্প, গোরুর দুগ্ধ না খাইলে সে অভাব মোচন হইত না। কেবল গোরুর দুগ্ধ খাইয়াই আমরা মানুষ এমন নহে; যে ধান্যের উপর আমাদের নির্ভর, তাহার চাষও গোরুর উপর নির্ভর—গোরুই আমাদের অন্নদাতা। গোরু কেবল ধান্য উৎপাদন করিয়াই ক্ষান্ত নহে; তাহা মাঠ হইতে গোলায়, গোলা হইতে বাজারে, বাজার হইতে ঘরে বহিয়া দিয়া যায়। ভারতবর্ষের সমস্ত বহনকার্য গোরুই করে। গোরু মরিয়াও দ্বিতীয় দধীচির ন্যায়, অস্থির দ্বারা, শৃঙ্গের দ্বারা ও চামড়ার দ্বারা উপকার করে। মূর্খে বলে, গোরু হিন্দুর দেবতা; দেবতা নহে, কিন্তু দেবতার ন্যায় উপকার করে।

* বাবু চন্দ্রনাথ বসু প্রণীত হিন্দুবিবাহ বিষয়ক পুস্তিকা দেখ।

বৃষ্টিদেবতা ইন্দ্র আমাদের যত উপকার করে, গোরু তাহার অধিক উপকার করে। ইন্দ্র যদি পূজাহঁ হইলেন, গোরুও তবে পূজাহঁ। যদি কোন কারণে বাঙ্গালা দেশে হঠাৎ গোবংশ লোপ পায়, তবে বাঙ্গালি জাতিও লোপ পাইবে সন্দেহ নাই। যদি হিন্দু, মুসলমানের দেখাদেখি গোরু খাইতে শিখিত, তবে হয় এত দিন হিন্দু নাম লোপ পাইত, নয় হিন্দুরা অতিশয় দুর্দশাপন্ন হইয়া থাকিত। হিন্দুর অহিংসা ধর্মই এখানে হিন্দুকে রক্ষা করিয়াছে। অনুশীলনের ফল হাতে হাতে দেখ। পশুপ্রীতি অনুশীলিত হইয়াছিল বলিয়াই হিন্দুর এ উপকার হইয়াছে।

শিষ্য। বাঙ্গালার অর্ধেক কৃষক মুসলমান।

গুরু। তাহারা হিন্দুজাতিসম্ভূত বলিয়াই হউক, আর হিন্দুর মধ্যে থাকার জন্যই হউক, আচারে ত তাহারা হিন্দু। তাহারা গোরু খায় না। হিন্দুবংশসম্ভূত হইয়া যে গোরু খায়, সে কুলাঙ্গার ও নরাধম।

শিষ্য। অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন, হিন্দুরা জন্মান্তরবাদী; তাহারা মনে করে, কি জানি, আমাদের কোন্ পূর্বপুরুষ দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া কোন্ পশু হইয়া আছেন, এই আশঙ্কায় হিন্দুরা পশুদিগের প্রতি দয়াবান্।

গুরু। তুমি পাশ্চাত্য পণ্ডিতে ও পাশ্চাত্য গদর্ভে গোল করিয়া ফেলিতেছ। এক্ষণে হিন্দুধর্মের মর্ম কিছু কিছু বুঝিলে, এক্ষণে ডাক শুনিলে গদর্ভ চিনিতে পারিবে।

ষড়্বিংশতম অধ্যায়—দয়া

গুরু। ভক্তি ও প্রীতির পর দয়া। আন্তের প্রতি যে বিশেষ প্রীতিভাব, তাহাই দয়া। প্রীতি যেমন ভক্তির অন্তর্গত, দয়া তেমনই প্রীতির অন্তর্গত। যে আপনাকে সর্বভূতে এবং সর্বভূতকে আপনাতে দেখে, সে সর্বভূতে দয়াময়। অতএব ভক্তির অনুশীলনেই যেমন প্রীতির অনুশীলন, তেমনই প্রীতির অনুশীলনেই দয়ার অনুশীলন। ভক্তি, প্রীতি, দয়া, হিন্দুধর্ম এক সূত্রে গ্রথিত—পৃথক্ করা যায় না। হিন্দুধর্মের মত সর্বাস্তসম্পন্ন ধর্ম আর দেখা যায় না।

শিষ্য। তথাপি দয়ার পৃথক্ অনুশীলন হিন্দুধর্ম অনুজ্ঞাত হইয়াছে।

গুরু। ভূরি ভূরি, পুনঃ পুনঃ। দয়ার অনুশীলন যত পুনঃ পুনঃ অনুজ্ঞাত হইয়াছে, এমন কিছুই নহে। যাহার দয়া নাই, সে হিন্দুই নহে। কিন্তু হিন্দুধর্মের এই সকল উপদেশে দয়া কথাটা তত ব্যবহৃত হয় নাই, যত দান শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। দয়ার অনুশীলন দানে, কিন্তু দান কথাটা লইয়া একটা গোলযোগ ঘটিয়াছে। দান বলিলে সচরাচর আমরা অন্নদান, বস্ত্রদান, ধনদান ইত্যাদিই বুঝি। কিন্তু দানের এরূপ অর্থ অতি সঙ্কীর্ণ। দানের প্রকৃত অর্থ ত্যাগ। ত্যাগ ও দান পরস্পর প্রতিশব্দ। দয়ার অনুশীলনার্থ ত্যাগ শব্দও অনেক স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই ত্যাগ অর্থে কেবল ধনত্যাগ বুঝা উচিত নহে। সর্বপ্রকার ত্যাগ—আত্মত্যাগ পর্যন্ত বুঝিতে হইবে। অতএব যখন দানধর্ম আদিষ্ট হইয়াছে, তখন আত্মত্যাগ পর্যন্ত ইহাতে আদিষ্ট হইল বুঝিতে হইবে। এইরূপ দানই যথার্থ দয়ার অনুশীলনমার্গ। নহিলে তোমার অনেক টাকা আছে, তাহার অত্যাংশ তুমি কোন দরিদ্রকে দিলে, ইহাতে তাহাকে দয়া করা হইল না। কেন না, যেমন জলাশয় হইতে এক গন্ডুষ জল তুলিয়া লইলে জলাশয়ের কোন প্রকার সঙ্কোচ হয় না, তেমনই এইরূপ দানে তোমারও কোন প্রকার কষ্ট হইল না, কোন প্রকার আত্মোৎসর্গ হইল না। এরূপ দান যে না করে, সে ঘোরতর নরাধম বটে, কিন্তু যে করে, সে একটা বাহাদুর নয়। ইহাতে দয়া বৃত্তির প্রকৃত অনুশীলন নাই। আপনাকে কষ্ট দিয়া পরের উপকার করিবে, তাহাই দান।

শিষ্য। যদি আপনিই কষ্ট পাইলাম, তবে বৃত্তির অনুশীলনে সুখ হইল কৈ? অথচ আপনি বলিয়াছেন—সুখের উপায় ধর্ম।

গুরু। যে, বৃত্তিকে অনুশীলিত করে, তাহার সেই কষ্টই পরম পবিত্র সুখে পরিণত হয়। শ্রেষ্ঠ বৃত্তিগুলি—ভক্তি, প্রীতি, দয়া; ইহাদের একটি লক্ষণ এই, ইহাদের অনুশীলনজনিত দুঃখ সুখে পরিণত হয়। এই বৃত্তিগুলি সকল দুঃখকেই সুখে পরিণত করে। সুখের উপায়

বিক্রম রচনাবলী

ধর্মই বটে, আর সেই যে কষ্ট, সেও ষত দিন আত্ম-পর ভেদজ্ঞান থাকে, তত দিনই লোক তাহাকে কষ্ট নাম দেয়। ফলতঃ ধর্মানুমোদিত যে আত্মপ্রীতি, তাহার সহিত সামঞ্জস্যযুক্ত পরের জন্য যে আত্মত্যাগ, তাহা ঈশ্বরানুমোদিত; এ জন্য নিষ্কাম হইয়া তাহার অনুষ্ঠান করিবে। সামঞ্জস্যবিধি পূর্বে বলিয়াছি।

এক্ষণে দানধর্ম যে ভাবে সাধারণ হিন্দুশাস্ত্রকারদিগের দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার আছে। হিন্দুধর্মের সাধারণ শাস্ত্রকারেরা (সকলে নহে) বলেন, দান করিলে পুণ্য হয়, এজন্য দান করিবে। এখানে “পুণ্য”—স্বর্গাদি কাম্য বস্তু লাভের উপায়। দান করিলে অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয়, এই জন্য দান করিবে, ইহাই সাধারণ হিন্দুশাস্ত্রকারের ব্যবস্থা। এরূপ দানকে ধর্ম বলিতে পারি না। স্বর্গলাভার্থে ধন দান করার অর্থ—মূল্য দিয়া স্বর্গে একটু জমি খরিদ করা, স্বর্গের জন্য টাকা দান দিয়া রাখা মাত্র। ইহা ধর্ম নহে, বিনিময় বা বাণিজ্য। এরূপ দানকে ধর্ম বলা ধর্মের অবমাননা।

দান করিতে হইবে, কিন্তু নিষ্কাম হইয়া দান করিবে। দয়াবৃত্তির অনুশীলন জন্য দান করিবে; দয়াবৃত্তিতে প্রীতিবৃত্তিরই অনুশীলন, এবং প্রীতি ভিত্তিরই অনুশীলন; অতএব ভক্তি, প্রীতি, দয়ার অনুশীলন জন্য দান করিবে, বৃত্তির অনুশীলন ও স্ফূর্তিতে ধর্ম, অতএব ধর্মার্থেই দান করিবে, পুণ্যার্থ বা স্বর্গার্থ নহে। ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন; অতএব সর্বভূতে দান করিবে; যাহা ঈশ্বরের, তাহা ঈশ্বরকে দেয়, ঈশ্বরে সর্বস্ব দানই মনুষ্যের চরম। সর্বভূতে এবং তোমাতে অভেদ, অতএব তোমার সর্বস্ব তোমার, এষণ্ড সর্বলোকের অধিকার; যাহা সর্বলোকের, তাহা সর্বলোককে দিবে। ইহাই যথার্থ হিন্দুধর্মের অনুমোদিত, গীতোক্ত ধর্মের অনুমোদিত দান। ইহাই যথার্থ দানধর্ম। নহিলে তোমার অনেক আছে, তুমি ভিক্ষুককে কিছু দিলে, তাহা দান নহে। বিস্ময়ের বিষয়, এমন অনেক লোকও আছে যে, তাহাও দেয় না।

শিষ্য। সকলকেই কি দান করিতে হইবে? দানের কি পাত্রাপত্র নাই? আকাশের সূর্য্য সর্বত্র করবর্ষণ করেন বটে, কিন্তু অনেক প্রদেশ তাহাতে দক্ষ হইয়া যায়। আকাশের মেঘ সর্বত্র জলবর্ষণ করেন বটে, কিন্তু তাহাতে অনেক স্থান হাজিয়া ভাসিয়া যায়। বিচারশূন্য দানে কি সেইরূপ আশঙ্কা নাই?

গুরু। দান, দয়াবৃত্তির অনুশীলন জন্য। যে দয়ার পাত্র, তাহাকেই দান করিবে। যে আত্ম, সে-ই দয়ার পাত্র, অপরে নহে। অতএব যে আত্ম, তাহাকেই দান করিবে—অপরকে নহে। সর্বভূতে দয়া করিবে বলিলে এমন বুঝায় না যে, যাহার কোন প্রকার দুঃখ নাই, তাহার দুঃখমোচনার্থে আত্মোৎসর্গ করিবে। তবে কোন প্রকার দুঃখ নাই, এমন লোকও সংসারে পাওয়া যায় না। যাহার দারিদ্র্যদুঃখ নাই, তাহাকে ধনদান বিধেয় নহে, যাহার রোগ-দুঃখ নাই, তাহার চিকিৎসা বিধেয় নহে। ইহা বলা কর্তব্য, অনুচিত দানে অনেক সময়ে পৃথিবীর পাপ বৃদ্ধি হয়। অনেক লোক অনুচিত দান করে বলিয়া, পৃথিবীতে যাহারা সৎকার্য্যে দিন যাপন করিতে পারে, তাহারাও ভিক্ষুক বা প্রবণ্ডক হয়। অনুচিত দানে সংসারে আলস্য, বণ্ডনা এবং পাপক্রিয়া বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, অনেকে তাই ভাবিয়া কাহাকেও দান করেন না। তাহাদের বিবেচনায় সকল ভিক্ষুকই আলস্যবশতই ভিক্ষুক অথবা প্রবণ্ডক। এই দুই দিক বাঁচাইয়া দান করিবে। যাহারা জ্ঞানার্জনী ও কার্য্যকারিণী বৃত্তি বিহিত অনুশীলিত করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে ইহা কঠিন নহে। কেন না, তাহারা বিচারক্ষম অথচ দয়াপর। অতএব মনুষ্যের সকল বৃত্তির সম্যক অনুশীলন ব্যতীত কোন বৃত্তিই সম্পূর্ণ হয় না।

গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ে দান সম্বন্ধে যে ভগবদুক্তি আছে, তাহারও তাৎপর্য্য এইরূপ।

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেহনুপকারিণে।

দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতং ॥

যত্ত্ব প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিদ্য বা পুনঃ।

দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতং ॥

অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।

অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্ত্বামসমুদাহৃতং ॥

অর্থাৎ “দেওয়া উচিত, এই বিবেচনায় যে দান, যাহার প্রত্যাশার করিবার সম্ভাবনা নাই, তাহাকে দান, দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া যে দান, তাহাই সাত্ত্বিক দান। প্রত্যাশার-প্রত্যাশায় যে দান, ফলের উদ্দেশ্যে যে দান, এবং অপসন্ন হইয়া যে দান করা যায়, তাহা রাজস দান। দেশ কাল পাত্র বিচারশূন্য যে দান, অনাদরে এবং অবজ্ঞায়ুক্ত যে দান, তাহা তামস দান।”

শিষ্য। দানের দেশ কাল পাত্র কিরূপে বিচার করিতে হইবে, গীতায় তাহার কিছুর উপদেশ আছে কি?

গুরু। গীতায় নাই, কিন্তু ভাষ্যকারেরা সে কথা বলিয়াছেন। ভাষ্যকারদিগের রহস্য দেখ। দেশ কাল পাত্র বিচার করিবে, এ কথাটার বাস্তবিক একটা বিশেষ ব্যাখ্যা প্রয়োজন করে না। সকল কস্মই দেশ কাল পাত্র বিচার করিয়া করিতে হয়। দানও সেইরূপ। দেশ কাল পাত্র বিচার না করিয়া দান করিলে, দান আর সাত্ত্বিক হইল না, তামসিক হইল। কথাটার অর্থ সোজা বুদ্ধিব্যবহার জন্য হিন্দুধর্মের কোন বিশেষ বিধির প্রয়োজন করে না। বাঙ্গালা দেশ দুর্ভিক্ষে উৎসন্ন যাইতেছে; মনে কর, সেই সময়ে মাগেষ্ঠের কাপড়ের কল বন্ধ—শিল্পীদিগের কষ্ট হইয়াছে। এ অবস্থায় আমার কিছুর দিবার থাকিলে দুই জায়গায় কিছুর দিতে পারিলে ভাল হয়, না পারিলে কেবল বাংলায় যা পারি দিব। তাহা না দিয়া, যদি আমি সকলই মাগেষ্ঠের দিই, তবে দেশ-বিচার হইল না। কেন না, মাগেষ্ঠের দিবার অনেক লোক আছে, বাঙ্গালায় দিবার লোক বড় কম। কালবিচারও ঐরূপ। আজ যে ব্যক্তির প্রাণ তুমি আপনার প্রাণপাত করিয়া রক্ষা করিলে, কাল হয়ত তাহাকে তুমি রাজদণ্ডে দণ্ডিত করিতে বাধ্য হইবে, তখন সে প্রাণদান চাহিলে তুমি দিতে পারিবে না। পাত্রবিচার অতি সহজ—প্রায় সকলেই করিতে পারে। দুঃখীকে সকলেই দেয়, জুরাচোরকে কেহই দিতে চাহে না। অতএব “দেশে কালে চ পাত্রে চ” এ কথা একটা সূক্ষ্ম ব্যাখ্যার বিশেষ প্রয়োজন নাই—যে উদার জাগতিক মহানীতি সকলের হৃদয়গত, ইহা তাহারই অন্তর্গত। এখন ভাষ্যকারেরা কি বলেন, তাহা দেখ। “দেশে”—কি না “পুণ্যে কুরুক্ষেত্রাদৌ।” শঙ্করাচার্য ও শ্রীধর স্বামী উভয়েই ইহা বলেন। তার পর “কালে” কি? শঙ্কর বলেন, “সংক্রান্ত্যাদৌ”—শ্রীধর বলেন, “গ্রহণাদৌ”। পাত্রে কি? শঙ্কর বলেন, “ষড়ঙ্গবিদ্বৈদপারগ ইত্যাদৌ আচারনিষ্ঠায়”—শ্রীধর বলেন, “পাত্র-ভূতায় তপোব্রতাদিসম্পন্নায় ব্রাহ্মণায়।” সর্বনাশ! আমি যদি স্বদেশে বাসিয়া মাসের ১লা হইতে ২৯শে তারিখের মধ্যে কোন দিনে, অতি দীনদুঃখী পীড়িত কাতর এক জন মূর্খ কি ডোমকে কিছুর দান করি, তবে সে দান ভগবদভিপ্রেত দান হইল না! এইরূপে কখন কখন ভাষ্যকারদিগের বিচারে অতি উন্নত, উদার এবং সার্বলৌকিক যে হিন্দুধর্ম, তাহা অতি সঙ্কীর্ণ এবং অনুদার উপধর্ম পরিণত হইয়াছে। এখানে শঙ্করাচার্য ও শ্রীধর স্বামী যাহা বলিলেন, তাহা ভগবদ্বাক্যে নাই। কিন্তু তাহা স্মৃতিশাস্ত্রে আছে। ভগবদ্বাক্যে স্মৃতির অনুমোদিত করিবার জন্য সেই উদার ধর্মকে অনুদার এবং সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। এই সকল মহাপ্রতিভাসম্পন্ন, সর্বশাস্ত্রবিৎ মহামহোপাধ্যায়গণের তুলনায় আমাদের মত ক্ষুদ্র লোকেরা পর্ব্বতের নিকট বালুকাকণাতুল্য, কিন্তু ইহাও কথিত আছে যে,—

কেবলং শাস্ত্রমার্গিত্য ন কর্তব্যো বিনির্গয়ঃ।

যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্মহানিঃ প্রজায়তে ॥*

বিনা বিচারে, ঋষিদিগের বাক্যসকল মস্তকের উপর এত কাল বহন করিয়া আমরা এই বিশৃঙ্খলা, অধর্ম এবং দুর্দশায় আসিয়া পড়িয়াছি। এখন আর বিনা বিচারে বহন করা কর্তব্য নহে। আপনার বুদ্ধি অনুসারে সকলেরই বিচার করা উচিত। নহিলে আমরা চন্দনবাহী গন্দভের অবস্থাই ক্রমে প্রাপ্ত হইব। কেবল ভারেই পীড়িত হইতে থাকিব—চন্দনের মহিমা কিছুরই বৃদ্ধি না।

শিষ্য। তবে এখন ভাষ্যকারদিগের হাত হইতে হিন্দুধর্মের উদ্ধার করা আমাদের গুরুতর কর্তব্য কার্য।

* মনু, ১২ অধ্যায়, ১১৩শ শ্লোকের টীকায় কুল্লুকভট্ট-ধৃত বৃহস্পতি-বচন।

বাংকম রচনাবলী

গুরু। প্রাচীন ঋষি এবং পণ্ডিতগণ অতিশয় প্রতিভাসম্পন্ন এবং মহাজ্ঞানী। তাঁহাদের প্রতি বিশেষ ভক্তি করিবে, কদাপি অমর্যাদা বা অনাদর করিবে না। তবে যেখানে বুঝবে যে, তাঁহাদিগের উক্তি ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ, সেখানে তাঁহাদের পরিত্যাগ করিয়া, ঈশ্বরানুভবপ্রায়েরই অনুসরণ করিবে।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়—চিত্তরঞ্জনী বৃত্তি

শিষ্য। এক্ষণে অন্যান্য কার্যকারিণী বৃত্তির অনুশীলনের পদ্ধতি শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। সে সকল বিস্তারিত কথা শিক্ষাতত্ত্বের অন্তর্গত। আমার কাছে তাহা বিশেষ শূন্যের প্রয়োজন নাই। শারীরিকী বৃত্তি বা জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সম্বন্ধেও আমি কেবল সাধারণ অনুশীলনপদ্ধতি বলিয়া দিয়াছি, বৃত্তিবিশেষ সম্বন্ধে অনুশীলনপদ্ধতি কিছু শিখাই নাই। কি প্রকারে শরীরকে বলাধান করিতে হইবে, কি প্রকারে অস্ত্রশিক্ষা বা অশ্বসঞ্চালন করিতে হইবে, কি প্রকারে মেধাকে তীক্ষ্ণ করিতে হইবে বা কি প্রকারে বুদ্ধিকে গণিতশাস্ত্রের উপযোগী করিতে হইবে, তাহা বলি নাই। কারণ, সে সকল শিক্ষাতত্ত্বের অন্তর্গত। অনুশীলনতত্ত্বের স্থূল মর্ম্ম বুদ্ধিব্যবহার জন্য কেবল সাধারণ বিধি জানিলেই যথেষ্ট হয়। আমি শারীরিকী ও জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সম্বন্ধে তাহাই বলিয়াছি। কার্যকারিণী বৃত্তি সম্বন্ধেও সেইরূপ কথা বলাই আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু কার্যকারিণী বৃত্তি অনুশীলন সম্বন্ধে যে সাধারণ বিধি, তাহা ভক্তিতত্ত্বের অন্তর্গত। প্রীতি ভক্তির অন্তর্গত, এবং দয়া প্রীতির অন্তর্গত। সমস্ত ধর্ম্মই এই তিনটি বৃত্তির উপর বিশেষ প্রকারে নির্ভর করে। এই জন্য আমি ভক্তি, প্রীতি, দয়া বিশেষ প্রকারে বুঝাইয়াছি। নচেৎ সকল বৃত্তি গণনা করা বা তাহার অনুশীলনপদ্ধতি নির্বাচন করা আমার উদ্দেশ্য নহে, সাধ্যও নহে। শারীরিকী, জ্ঞানার্জনী বা কার্যকারিণী বৃত্তি সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য, তাহা বলিয়াছি। এক্ষণে চিত্তরঞ্জনী বৃত্তি সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব।

জগতের সকল ধর্ম্মের একটি অসম্পূর্ণতা এই যে, চিত্তরঞ্জনী বৃত্তিগুলির অনুশীলন বিশেষরূপে উপদিষ্ট হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ এমত সিদ্ধান্ত করিতে পারে না যে, প্রাচীন ধর্ম্মবেত্তারা ইহার আবশ্যিকতা অনবগত ছিলেন বা এ সকলের অনুশীলনের কোন উপায় বিহিত করেন নাই। হিন্দুর পূজার পুষ্প, চন্দন, মাল্য, ধূপ, দীপ, ধূনা, গুগ্গুল, নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতি সকলেরই উদ্দেশ্য ভক্তির অনুশীলনের সঙ্গে চিত্তরঞ্জনী বৃত্তির অনুশীলনের সন্মিলন অথবা এই সকলের দ্বারা ভক্তির উদ্দীপন। প্রাচীন গ্রীকদিগের ধর্ম্ম, এবং মধ্যকালের ইউরোপে রোমীয় খ্রীষ্টধর্ম্ম উপাসনার সঙ্গে চিত্তরঞ্জনী বৃত্তিসকলের স্ফূর্তির ও পরিভূপ্তির বিলক্ষণ চেষ্টা ছিল। আর্পলীস্ বা রাফেলের চিত্র, মাইকেল এঞ্জেলো বা ফিদিয়সের ভাস্কর্য্য, জর্মানির বিখ্যাত সঙ্গীতপ্রণেতৃগণের সঙ্গীত উপাসনার সহায় হইয়াছিল। চিত্রকরের, ভাস্করের, স্থপতির, সঙ্গীতকারকের সকল বিদ্যা ধর্ম্মের পদে উৎসর্গ করা হইত। ভারতবর্ষেরও স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত উপাসনার সহায়।

শিষ্য। তবে এমন হইতে পারে, প্রতিমা গঠন, উপাসনার সঙ্গে এই প্রকার চিত্তরঞ্জনী বৃত্তির ভূপ্তির আকাঙ্ক্ষার ফল।

গুরু। এ কথা সঙ্গত বটে,* কিন্তু প্রতিমাগঠনের যে অন্য কোন মূলও নাই, এমন কথা

* এ বিষয়ে পূর্বে যাহা ইংরাজিতে বর্তমান লেখক কর্তৃক লিখিত হইয়াছিল, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"The true explanation consists in the ever true relations of the subjective Ideal to its objective Reality. Man is by instinct a poet and an artist. The passionate yearnings of the heart for the Ideal, in beauty, in power, and in purity, must find an expression in the world of the Real. Hence proceed all poetry and all art. Exactly in the same way the ideal of the Divine in man receives a form from him, and the form an image. The existence of Idols is as justifiable as that of the tragedy of Hamlet or of that of Prometheus. The religious worship of idols is as justifiable as the intellectual worship of

বলিতে পার না। প্রতিমাপূজার উৎপত্তি কি, তাহা বিচারের স্থল এ নহে। চিত্রবিদ্যা, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য, সঙ্গীত, এ সকল চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির স্ফূর্তি ও তৃপ্তিবিধায়ক, কিন্তু কাব্যই চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলনের শ্রেষ্ঠ উপায়। এই কাব্য, গ্রীক ও রোমকে ধর্মের সহায়, কিন্তু হিন্দু-ধর্মই কাব্যের বিশেষ সাহায্য গ্রহীত হইয়াছে। রামায়ণ ও মহাভারতের তুল্য কাব্যগ্রন্থ আর নাই, অথচ ইহাই হিন্দুদিগের এক্ষণে প্রধান ধর্মগ্রন্থ। বিষ্ণু ও ভাগবতাদি পুরাণে এমন কাব্য আছে যে, অন্য দেশে তাহা অতুলনীয়। অতএব হিন্দুধর্ম যে চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলনের অল্প মনোযোগ ছিল, এমন নহে। তবে যাহা পূর্বে বিধিবদ্ধ না হইয়া কেবল লোকাচারেই ছিল, তাহা এক্ষণে ধর্মের অংশ বলিয়া বিধিবদ্ধ করিতে হইবে। এবং জ্ঞানার্জনী ও কার্যকারিণী বৃত্তিগুলির যেমন অনুশীলন অবশ্য কর্তব্য, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির সেইরূপ অনুশীলন ধর্মশাস্ত্রের দ্বারা অনুজ্ঞাত করিতে হইবে।

শিষ্য। অর্থাৎ যেমন ধর্মশাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে যে, গুরুজনে ভক্তি করিবে, কাহারও হিংসা করিবে না, দান করিবে, শাস্ত্রাধ্যয়ন ও জ্ঞানোপার্জন করিবে, সেইরূপ আপনার এই ব্যাখ্যানুসারে ইহাও বিহিত হইবে যে, চিত্রবিদ্যা, ভাস্কর্য্য, নৃত্য, গীত, বাদ্য এবং কাব্যের অনুশীলন করিবে?

গুরু। হাঁ। নহিলে মনুষ্যের ধর্মহানি হইবে।

শিষ্য। বুদ্ধিলাভ না।

গুরু। বুদ্ধি। জগতে আছে কি?

শিষ্য। যাহা আছে, তাই আছে।

গুরু। তাহাকে কি বলে?

শিষ্য। সৎ।

গুরু। বা সত্য। এখন এই জগৎ ত জড়পিণ্ডের সমষ্টি। জাগতিক বস্তু নানাবিধ, ভিন্ন-প্রকৃতি, বিবিধ গুণবিশিষ্ট। ইহার ভিতর কিছুর ঐক্য দেখিতে পাও না? বিশৃঙ্খলার মধ্যে কি শৃঙ্খলা দেখিতে পাও না?

শিষ্য। পাই।

গুরু। কিসে দেখ?

শিষ্য। এক অনন্ত অনির্বাচনীয় শক্তি—যাহাকে স্পেন্সরের Inscrutable Power in Nature বলিয়াছেন; তাহা হইতে সকল জন্মিতেছে, চলিতেছে, নিয়ত উৎপন্ন হইতেছে এবং তাহাতেই সব বিলীন হইতেছে।

গুরু। তাহাকে বিশ্বব্যাপী চৈতন্য বলা যাউক। সেই চৈতন্যরূপী যে শক্তি, তাহাকে চিৎশক্তি বলা যাউক। এখন বল দেখি, সতে এই চিদের অবস্থানের ফল কি?

শিষ্য। ফল ত এই মাত্র আপনিই বলিয়াছেন। ফল এই জাগতিক শৃঙ্খলা। অনির্বাচনীয় ঐক্য।

গুরু। বিশেষ করিয়া ভাবিয়া বল, জীবের পক্ষে এই অনির্বাচনীয় শৃঙ্খলার ফল কি?

শিষ্য। জীবনের উপযোগিতা বা জীবের সুখ।

গুরু। তাহার নাম দাও আনন্দ। এই সচ্চিদানন্দকে জানিলেই জগৎ জানিলাম। কিন্তু জানিব কি প্রকারে? এক একটা করিয়া ভাবিয়া দেখ। প্রথম, সৎ অর্থাৎ যাহা আছে, সেই অস্তিত্বমাত্র জানিব কি প্রকারে?

শিষ্য। এই “সৎ” অর্থে সতের গুণও বটে?

গুরু। হাঁ; কেন না, সেই সকল গুণও আছে। তাহাই সত্য।

Hamlet or Prometheus. The homage we owe to the ideal of the human realised in art is admiration, The homage we owe to the ideal of the Divine realised in idolatry is worship.”—Statesman, Oct. 28, 1882.

এই তত্ত্ব সুলেখক বাবু চন্দ্রনাথ বসু নবজীবনের “ষোড়শোপচারে পূজা” ইত্যাদি শীর্ষক প্রবন্ধে এরূপ বিশদ ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, আমার উপরিধৃত দুই ছত্র ইংরেজির অনুবাদ এখানে দিবার প্রয়োজন আছে বোধ হয় না।

বাঁকম রচনাবলী

শিষ্য। তবে সৎ বা সত্যকে প্রমাণের দ্বারা জানিতে হইবে।

গুরু। প্রমাণ কি?

শিষ্য। প্রত্যক্ষ ও অনুমান। অন্য প্রমাণ আমি অনুমানের মধ্যে ধরি।

গুরু। ঠিক। কিন্তু অনুমানেরও বৃন্দিয়াদ প্রত্যক্ষ। অতএব সত্যজ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক।* প্রত্যক্ষ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা হইয়া থাকে। অতএব যথার্থ প্রত্যক্ষ জন্য ইন্দ্রিয়সকলের অর্থাৎ কতিপয় শারীরিক বৃত্তির স্বচ্ছন্দতাই যথেষ্ট। তার পর অনুমানজন্য জ্ঞানাজ্জর্ননী বৃত্তি সকলের সমুচিত স্ফূর্তি ও পরিণতি আবশ্যিক। জ্ঞানাজ্জর্ননী বৃত্তিগুলির মধ্যে কতকগুলিকে হিন্দুদিগের দর্শনশাস্ত্রে মনঃ নাম দেওয়া হইয়াছে, আর কতকগুলির নাম বুদ্ধি বলা হইয়াছে। এই মন ও বুদ্ধির প্রভেদ কোন কোন ইউরোপীয় দার্শনিককৃত জ্ঞাপিকা এবং বিচারিকা বৃত্তি মধ্যে যে প্রভেদ, তাহার সঙ্গে কতক মিলে। অনুমান জন্য এই মনোনামযুক্ত বৃত্তিগুলির স্ফূর্তিই বিশেষ প্রয়োজনীয়। এখন এই সদ্ব্যাপী চিৎকে জানিবে কি প্রকারে?

শিষ্য। সেও অনুমানের দ্বারা।

গুরু। ঠিক তাহা নহে। যাহাকে বুদ্ধি বা বিচারিকা বৃত্তি বলা হইয়াছে, তাহার অনুশীলনের দ্বারা। অর্থাৎ সৎকে জানিতে হইবে জ্ঞানের দ্বারা এবং চিৎকে জানিবে ধ্যানের দ্বারা। তার পর আনন্দকে জানিবে কিসের দ্বারা?

শিষ্য। ইহা অনুমানের বিষয় নহে, অনুভবের বিষয়। আমরা আনন্দ অনুমান করি না—অনুভব করি, ভোগ করি। অতএব আনন্দ জ্ঞানাজ্জর্ননী বৃত্তির অপ্ৰাপ্য। অতএব ইহার জন্য অন্যজাতীয় বৃত্তি চাই।

গুরু। সেইগুলি চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি। তাহার সম্যক অনুশীলনে এই সচ্চিদানন্দময় জগৎ এবং জগন্ময় সচ্চিদানন্দের সম্পূর্ণ স্বরূপানুভূতি হইতে পারে। তদ্ব্যতীত ধর্ম অসম্পূর্ণ। তাই বলিতেছিলাম যে, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলন অভাবে ধর্মের হানি হয়। আমাদের সর্বাঙ্গসম্পন্ন হিন্দুধর্মের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবে যে, ইহার যত পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা কেবল ইহাকে সর্বাঙ্গসম্পন্ন করিবার চেষ্টার ফল। ইহার প্রথমাবস্থা ঋগ্বেদ-সংহিতার ধর্ম আলোচনায় জানা যায়। যাহা শক্তিমান বা উপকারী বা সুন্দর, তাহারই উপাসনা এই আদিম বৈদিক ধর্ম। তাহাতে আনন্দভাগ যথেষ্ট ছিল, কিন্তু সতের ও চিতের উপাসনার, অর্থাৎ জ্ঞান ও ধ্যানের অভাব ছিল। এই জন্য কালে তাহা উপনিষদসকলের দ্বারা সংশোধিত হইল। উপনিষদের ধর্ম—চিন্ময় পরব্রহ্মের উপাসনা। তাহাতে জ্ঞানের ও ধ্যানের অভাব নাই। কিন্তু আনন্দাংশের অভাব আছে। ব্রহ্মানন্দপ্রাপ্তিই উপনিষদসকলের উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিসকলের অনুশীলন ও স্ফূর্তির পক্ষে সেই জ্ঞান ও ধ্যানময় ধর্মের কোন ব্যবস্থা নাই। বৌদ্ধ ধর্ম উপাসনা নাই। বৌদ্ধেরা সৎ মানিতেন না। এবং তাঁহাদের ধর্ম আনন্দ ছিল না। এই তিন ধর্মের একটিও সচ্চিদানন্দপ্রয়াসী হিন্দুজাতির মধ্যে অধিক দিন স্থায়ী হইল না। এই তিন ধর্মের সারভাগ গ্রহণ করিয়া পৌরাণিক হিন্দুধর্ম সংগঠিত হইল। তাহাতে সতের উপাসনা, চিতের উপাসনা এবং আনন্দের উপাসনা প্রচুর পরিমাণে আছে। বিশেষ আনন্দভাগ বিশেষরূপে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাই জাতীয় ধর্ম হইবার উপযুক্ত, এবং এই কারণেই সর্বাঙ্গসম্পন্ন হিন্দুধর্ম অন্য কোন অসম্পূর্ণ বিজাতীয় ধর্ম কর্তৃক স্থানচ্যুত বা বিজিত হইতে পারে নাই। এক্ষণে যাঁহারা ধর্মসংস্কারে প্রবৃত্ত, তাঁহাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, ঈশ্বর যেমন সংস্বরূপ, যেমন চিৎস্বরূপ, তেমন আনন্দস্বরূপ; অতএব চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি সকলের অনুশীলনের বিধি এবং উপায় না থাকিলে সংস্কৃত ধর্ম কখন স্থায়ী হইবে না।

শিষ্য। কিন্তু পৌরাণিক হিন্দুধর্ম আনন্দের কিছু বাড়াবাড়ি আছে, সামঞ্জস্য নাই, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

গুরু। অবশ্য হিন্দুধর্ম অনেক জঞ্জাল জমিয়াছে—ঝাঁটাইয়া পরিষ্কার করিতে হইবে। হিন্দুধর্মের মর্ম যে বৃদ্ধিতে পারিবে, সে অনায়াসেই আবশ্যিকীয় ও অনাবশ্যিকীয় অংশ বৃদ্ধিতে পারিবে ও পরিত্যাগ করিবে। তাহা না করিলে হিন্দুজাতির উন্নতি নাই। এক্ষণে

* সকল জ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক নহে, ইহা ভগবৎগীতার টীকায় বুদ্ধান গিয়াছে—পুনরুক্তি অনাবশ্যিক।

ইহাই আমাদের বিবেচ্য যে, ঈশ্বর অনন্ত সৌন্দর্যময়। তিনি যদি সগুণ হইলেন, তবে তাঁহার সকল গুণই আছে; কেন না, তিনি সর্বময়, এবং তাঁহার সকল গুণই অনন্ত। অনন্তের গুণ সান্ত বা পরিমাণবিশিষ্ট হইতে পারে না। অতএব ঈশ্বর অনন্তসৌন্দর্য্যবিশিষ্ট। তিনি মহৎ, শূচি, প্রেমময়, বিচিত্র অথচ এক, সর্বাঙ্গসম্পন্ন এবং নিষ্বিকার। এই সকল গুণই অপরিমেয়। অতএব এই সকল গুণের সমবায় যে সৌন্দর্য্য, তাহাও তাঁহাতে অনন্ত। যে সকল বৃত্তির দ্বারা সৌন্দর্য্য অনুভূত করা যায়, তাহাদিগের সম্পূর্ণ অনুশীলন ভিন্ন তাঁহাকে পাইব কি প্রকারে? অতএব বুদ্ধাদি জ্ঞানাজ্জর্নী বৃত্তির, ভক্ত্যাদি কার্যকারিণী বৃত্তির অনুশীলন, ধর্মের জন্য যেরূপ প্রয়োজনীয়, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলির অনুশীলনও সেইরূপ প্রয়োজনীয়। তাঁহার সৌন্দর্য্যের সমুচিত অনুভব ভিন্ন আমাদের হৃদয়ে কখনও তাঁহার প্রতি সম্যক্ প্রেম বা ভক্তি জন্মবে না। আধুনিক বৈষ্ণবধর্ম এই জন্য কৃষ্ণোপাসনার সঙ্গে কৃষ্ণের ব্রজলীলাকীর্তনের সংযোগ হইয়াছে।

শিষ্য। তাহার ফল কি সুফল হইয়াছে?

গুরু। যে এই ব্রজলীলার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিয়াছে, এবং যাহার চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে, তাহার পক্ষে ইহার ফল সুফল। যে অজ্ঞান, এই ব্রজলীলার প্রকৃত অর্থ বুঝে না, যাহার নিজের চিত্ত কলুষিত, তাহার পক্ষে ইহার ফল কুফল। চিত্তশুদ্ধি, অর্থাৎ জ্ঞানাজ্জর্নী, কার্যকারিণী প্রভৃতি বৃত্তিগুলির সমুচিত অনুশীলন ব্যতীত কেহই বৈষ্ণব হইতে পারে না। এই বৈষ্ণব ধর্ম অজ্ঞান বা পাপাত্মার জন্য নহে। যাহারা রাধাকৃষ্ণকে ইন্দ্রিয়সুখরত মনে করে, তাহারা বৈষ্ণব নহে—পৈশাচ।

সচরাচর লোকের বিশ্বাস যে, রাসলীলা অতি অশ্লীল ও জঘন্য ব্যাপার। কালে লোকে রাসলীলাকে একটা জঘন্য ব্যাপারে পরিণত করিয়াছে। কিন্তু আদৌ ইহা ঈশ্বরোপাসনা মাত্র, অনন্ত সুন্দরের সৌন্দর্য্যের বিকাশ এবং উপাসনা মাত্র; চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির চরম অনুশীলন, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করা মাত্র। প্রাচীন ভারতে স্ত্রীগণের জ্ঞানমার্গ নিষিদ্ধ; কেন না, বেদাদির অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। স্ত্রীলোকের পক্ষে কর্মমার্গ কষ্টসাধ্য, কিন্তু ভক্তিতে তাহাদের বিশেষ অধিকার। ভক্তি, বলিয়াছি—“পরানুরক্তিরীশ্বরে।” অনুরাগ নানা কারণে জন্মিতে পারে; কিন্তু সৌন্দর্য্যের মোহঘটিত যে অনুরাগ, তাহা মনুষ্যে সর্বাপেক্ষা বলবান্। অতএব অনন্ত সুন্দরের সৌন্দর্য্যের বিকাশ ও তাহার আরাধনাই অপরের হউক বা না হউক, স্ত্রীজাতির জীবনসার্থকতার মুখ্য উপায়। এই তত্ত্বাত্মক রূপকই রাসলীলা। জড় প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য্য তাহাতে বর্তমান; শরৎকালের পূর্ণচন্দ্র, শরৎপ্রবাহপরিপূর্ণা শ্যামসলিলা যমুনা, প্রস্ফুটিত কুসুমসুবাসিত কুঞ্জবিহঙ্গমকুঞ্জিত বৃন্দাবনবনস্থলী, জড়প্রকৃতি মধ্যে অনন্ত সুন্দরের সশরীরে বিকাশ। তাহার সহায় বিশ্ববিমোহিনী বংশী। এইরূপ সর্বপ্রকার চিত্তরঞ্জনের দ্বারা স্ত্রীজাতির ভক্তি উদ্ভিন্ত হইলে তাহারা কৃষ্ণানুরাগিণী হইয়া কৃষ্ণে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইল; আপনাকেই কৃষ্ণ বলিয়া জানিতে লাগিল,—

কৃষ্ণে নিরুদ্ধহৃদয়া ইদম্ভূঃ পরম্পরম্ ।
কৃষ্ণোহহমেতল্ললিতং ব্রজাম্যালোক্যতাং গতিং ॥
অন্যা ব্রবীতি কৃষ্ণস্য মম গীর্তিনিশাম্যতাং ।
দৃষ্ট কাণ্ডিন্য! তিষ্ঠাত্র কৃষ্ণোহহমিতি চাপরা ।
বাহুমাস্ফাটা কৃষ্ণস্য লীলাসর্বস্বমাদদে ॥
অন্যা ব্রবীতি ভো গোপা নিঃশঙ্কৈঃ স্থীয়তামিহ ।
অলং বৃষ্টিভয়েনাত্র ধৃতো গোবর্দ্ধনো ময়া ॥ ইত্যাদি

জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে অভেদজ্ঞান, জ্ঞানের তাহাই চিরোদ্দেশ্য। মহাজ্ঞানীও সমস্ত জীবন ইহার সন্ধানে ব্যয়িত করিয়াও ইহা পাইয়া উঠেন না। কিন্তু এই জ্ঞানহীনা গোপকন্যাগণ কেবল জগদীশ্বরের সৌন্দর্য্যের অনুরাগিণী হইয়া (অর্থাৎ আমি যাহাকে চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলন বলিতেছি, তাহার সর্বোচ্চ সোপানে উঠিয়া) সেই অভেদজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরে বিলীন হইল। রাসলীলা রূপকের ইহাই স্থূল তাৎপর্য্য এবং আধুনিক বৈষ্ণবধর্মও সেই পথগামী। অতএব মনুষ্যত্বে, মনুষ্যজীবনে, এবং হিন্দুধর্মে, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির কত দূর আধিপত্য বিবেচনা কর।

বাংকম রচনাবলী

শিষ্য। এক্ষণে এই চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিসকলের অনুশীলন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান করুন।

গুরু। জাগতিক সৌন্দর্য্যে চিত্তকে সংযুক্ত করাই ইহার অনুশীলনের প্রধান উপায়। জগৎ সৌন্দর্য্যময়। বহিঃপ্রকৃতিও সৌন্দর্য্যময়, অন্তঃপ্রকৃতিও সৌন্দর্য্যময়। বহিঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য সহজে চিত্তকে আকৃষ্ট করে। সেই আকর্ষণের বশবর্তী হইয়া সৌন্দর্য্যগ্রাহণী বৃত্তিগুলির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। বৃত্তিগুলি স্ফূর্তিত হইতে থাকিলে, ক্রমে অন্তঃপ্রকৃতিও সৌন্দর্য্যানুভাবে সক্ষম হইলে, জগদীশ্বরের অনন্ত সৌন্দর্য্যের আভাস পাইতে থাকিবে। সৌন্দর্য্যগ্রাহণী বৃত্তিগুলির এই এক স্বভাব যে, তন্দ্বারা প্রীতি, দয়া, ভক্তি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কার্য্যকারণী বৃত্তিসকল স্ফূর্তিত ও পরিপুষ্ট হইতে থাকে। তবে একটা বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুচিত অনুশীলন ও স্ফূর্তিতে আর কতকগুলি কার্য্যকারণী বৃত্তি দুর্ব্বলা হইয়া পড়ে। এই জন্য সচরাচর লোকের বিশ্বাস যে, কবিরা কাব্য ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ে অকর্ম্মণ্য হয়। এ কথার যথার্থ্য এই পর্য্যন্ত যে যাহারা চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুচিত অনুশীলন করে, অন্য বৃত্তিগুলির সহিত তাহাদের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার চেষ্টা পায় না, অথবা “আমি প্রতিভাশালী, আমাকে কাব্যরচনা ভিন্ন আর কিছু করিতে নাই,” এই ভাবিয়া যাহারা ফুলিয়া বসিয়া থাকেন, তাহারাই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন। পক্ষান্তরে যে সকল শ্রেষ্ঠ কবি, অন্যান্য বৃত্তির সমুচিত পরিচালনা করিয়া সামঞ্জস্য রক্ষা করেন, তাহারা অকর্ম্মণ্য না হইয়া বরং বিষয়কর্ম্মে বিশেষ পটুতা প্রকাশ করেন। ইউরোপে শেক্সপীয়র, মিলটন, দান্তে, গেটে প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবিরা বিষয়কর্ম্মে অতি সুদক্ষ ছিলেন। কালিদাস না কি কাশ্মীরের রাজা হইয়াছিলেন। এখনকার লর্ড টেনিসন না কি ঘোরতর বিষয়ী লোক। চার্লচ ডিকেন্স প্রভৃতির কথাও জান।

শিষ্য। কেবল নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের উপর চিত্ত স্থাপনেই কি চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিসকলের সমুচিত স্ফূর্তি হইবে?

গুরু। এ বিষয়ে মনুষ্যই মনুষ্যের উত্তম সহায়। চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিসকলের অনুশীলনের বিশেষ সাহায্যকারী বিদ্যাসকল, মনুষ্যের দ্বারা উদ্ভূত হইয়াছে। স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত, নৃত্য, এ সকল সেই অনুশীলনের সহায়। বহিঃসৌন্দর্য্যের অনুভবশক্তি এ সকলের দ্বারা বিশেষরূপে স্ফূর্তিত হয়। কিন্তু কাব্যই এ বিষয়ে মনুষ্যের প্রধান সহায়। তন্দ্বারাই চিত্ত বিশুদ্ধ এবং অন্তঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য প্রেমিক হয়। এই জন্য কবি, ধর্ম্মের একজন প্রধান সহায়। বিজ্ঞান বা ধর্ম্মোপদেশ, মনুষ্যত্বের জন্য যেরূপ প্রয়োজনীয়, কাব্যও সেইরূপ। যিনি তিনের মধ্যে একটিকে প্রাধান্য দিতে চাহেন, তিনি মনুষ্যত্ব বা ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম বুঝেন নাই।

শিষ্য। কিন্তু কুকাব্যও আছে।

গুরু। সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত। যাহারা কুকাব্য প্রণয়ন করিয়া পরের চিত্ত কলুষিত করিতে চেষ্টা করে, তাহারা তস্করাদির ন্যায় মনুষ্যজাতির শত্রু। এবং তাহাদিগকে তস্করাদির ন্যায় শারীরিক দণ্ডের দ্বারা দণ্ডিত করা বিধেয়।

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়—উপসংহার

গুরু। অনুশীলনতত্ত্ব সমাপ্ত করিলাম। যাহা বলিবার, তাহা সব বলিয়াছি, এমন নহে। সকল কথা বলিতে হইলে কথা শেষ হয় না। সকল আপত্তির মীমাংসা করিয়াছি এমন নহে; কেন না, তাহা করিতে গেলেও কথার শেষ হয় না। অনেক কথা অস্পষ্ট বা অসম্পূর্ণ আছে, এবং অনেক ভুলও যে থাকিতে পারে, তাহা আমার স্বীকার করিতে আপত্তি নাই। আমি এমনও প্রত্যাশা করিতে পারি না যে, আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা সকলই বুঝিয়াছে। তবে ইহা পুনঃ পুনঃ পর্যালোচনা করিলে ভবিষ্যতে বুঝিতে পারিবে, এমন ভরসা করি। তবে স্থূল মর্ম্ম যে বুঝিয়াছে, বোধ করি এমন প্রত্যাশা করিতে পারি।

শিষ্য। তাহা আপনাকে বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

১। মনুষ্যের কতকগুলি শক্তি আছে। আপনি তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছিলেন। সেইগুলির অনুশীলন, প্রস্ফূরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব।

২। তাহাই মনুষ্যের ধর্ম।

৩। সেই অনুশীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য।

৪। তাহাই সুখ।

৫। এই সমস্ত বৃত্তির উপযুক্ত অনুশীলন হইলে ইহারা সকলই ঈশ্বরমুখী হয়। ঈশ্বরমুখতাই উপযুক্ত অনুশীলন। সেই অবস্থাই ভক্তি।

৬। ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন; এই জন্য সর্বভূতে প্রীতি, ভক্তির অন্তর্গত, এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় অংশ। সর্বভূতে প্রীতি ব্যতীত ঈশ্বরে ভক্তি নাই, মনুষ্যত্ব নাই, ধর্ম নাই।

৭। আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি, পশুপ্রীতি, দয়া, এই প্রীতির অন্তর্গত। ইহার মধ্যে মনুষ্যের অবস্থা বিবেচনা করিয়া, স্বদেশপ্রীতিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা উচিত।

এই সকল স্থূল কথা।

গুরু। কই, শারীরিকী বৃত্তি, জ্ঞানার্জনী বৃত্তি, কার্যকারিণী, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি, এ সকলের তুমি ত নামও করিলে না?

শিষ্য। নিষ্প্রয়োজন। অনুশীলনতত্ত্বের স্থূল মর্ম এ সকল বিভাগ নাই। এক্ষণে বঝিয়াছি, আমাকে অনুশীলনতত্ত্ব বঝাইবার জন্য এ সকল নামের সৃষ্টি করিয়াছেন।

গুরু। তবে, তুমি অনুশীলনতত্ত্ব বঝিয়াছ। এক্ষণে আশীর্বাদ করি, ঈশ্বরে ভক্তি তোমার দৃঢ় হউক। সকল ধর্মের উপরে স্বদেশপ্রীতি, ইহা বিস্মৃত হইও না।*

ক্রোড়পত্র—ক

(মিল্লিখিত “ধর্মজিজ্ঞাসা” নামক প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল।)

ধর্ম শব্দের আধুনিক ব্যবহার-জাত কয়েকটা ভিন্ন ভিন্ন অর্থ তাহার ইংরেজি প্রতিশব্দের দ্বারা আগে নির্দেশ করিতেছি, তুমি বঝিয়া দেখ। প্রথম, ইংরেজি যাহাকে Religion বলে, আমরা তাহাকে ধর্ম বলি, যেমন হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, খ্রীষ্টীয় ধর্ম। দ্বিতীয়, ইংরেজি যাহাকে Morality বলে, আমরা তাহাকেও ধর্ম বলি, যথা—অমুক কার্য “ধর্ম-বিরুদ্ধ,” “মানব-ধর্মশাস্ত্র,” “ধর্মসূত্র” ইত্যাদি। আধুনিক বাঙ্গালায় ইহার আর একটি নাম প্রচলিত আছে—নীতি। বাঙ্গালি একালে আর কিছু পারুক আর না পারুক, “নীতিবিরুদ্ধ” কথাটা চট্ করিয়া বলিয়া ফেলিতে পারে। তৃতীয়, ধর্ম শব্দে Virtue বঝায়। Virtue ধর্মাত্মা মনুষ্যের অভ্যস্ত গুণকে বঝায়; নীতির বশবর্তী অভ্যাসের উহা ফল। এই অর্থে আমরা বলিয়া থাকি—অমুক ব্যক্তি ধার্মিক, অমুক ব্যক্তি অধার্মিক। এখানে অধর্মকে ইংরেজিতে Vice বলে। চতুর্থ, রিলিজন বা নীতির অনুমোদিত যে কার্য, তাহাকেও ধর্ম বলে, তাহার বিপরীতকে অধর্ম বলে। যথা—দান পরম ধর্ম, অহিংসা পরম ধর্ম, গুরুনিন্দা পরম অধর্ম। ইহাকে সচরাচর পাপপুণ্যও বলে। ইংরেজিতে এই অধর্মের নাম “sin”—পুণ্যের এক কথায় একটা নাম নাই—“good deed” বা তদ্রূপ বাগ্‌বাহুল্য দ্বারা সাহেবেরা অভাব মোচন করেন। পঞ্চম, ধর্ম শব্দে গুণ বঝায়, যথা—চুম্বকের ধর্ম লৌহাকর্ষণ। এস্থলে যাহা অর্থান্তরে অধর্ম, তাহাকেও ধর্ম বলা যায়। যথা, “পরিনিন্দা—ক্ষুদ্রচেতাদিগের ধর্ম।” এই অর্থে মনু স্বয়ং “পাষাণ্ডধর্মের” কথা লিখিয়াছেন, যথা—

“হিংস্রাহিংস্রে মৃদুকুরে ধর্মধর্মাবৃত্তান্তে।

যদ্যস্য সোহদধাৎ সর্গে তত্তস্য স্বয়মাবিশৎ ॥”

পুনশ্চ—

“পাষাণ্ডগণধর্মাংশ্চ শাস্ত্রেহস্মিন্নুক্তবান্ মনুঃ।”

আর ষষ্ঠতঃ, ধর্ম শব্দ তখন আচার বা ব্যবহারার্থে প্রযুক্ত হয়। মনু এই অর্থেই বলেন,—

“দেশধর্মান্ জাতিধর্মান্ কুলধর্মাংশ্চ শাস্ততান্।”

* অনুশীলনতত্ত্বের সঙ্গে জাতিভেদ ও শ্রমজীবনের কি সম্বন্ধ, তাহা এই গ্রন্থমধ্যে বঝাইলাম না। কারণ, তাহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার টীকায় “স্বধর্ম” বঝাইবার সময়ে বঝাইয়াছি। গ্রন্থের সম্পূর্ণতা রক্ষার জন্য (ঘ) চিহ্নিত ক্রোড়পত্রে তদংশ গীতার টীকা হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

বিক্রম রচনাবলী

এই ছয়টি অর্থ লইয়া এ-দেশীয় লোক বড় গোলযোগ করিয়া থাকে। এই মাত্র এক অর্থে ধর্ম শব্দ ব্যবহার করিয়া, পরস্পরেই ভিন্নার্থে ব্যবহার করে; কাজেই অপসিদ্ধান্তে পতিত হয়। এইরূপ অনিয়ম প্রয়োগের জন্য ধর্ম সম্বন্ধে কোন তত্ত্বের সন্ধানই হয় না। এ গোলযোগ আজ নূতন নহে। যে সকল গ্রন্থকে আমরা হিন্দুশাস্ত্র বলিয়া নির্দেশ করি, তাহাতেও এই গোলযোগ বড় ভয়ানক। মনুসংহিতার প্রথমাধ্যায়ের শেষ ছয়টি শ্লোক ইহার উত্তম উদাহরণ। ধর্ম কখন রিলিজনের প্রতি, কখন নীতির প্রতি, কখনও অভ্যস্ত ধর্মান্বিতার প্রতি, এবং কখন পুণ্যকর্মের প্রতি প্রযুক্ত হওয়াতে—নীতির প্রকৃতি রিলিজনে, রিলিজনের প্রকৃতি নীতিতে, অভ্যস্ত গুণের লক্ষণ কর্ম, কর্মের লক্ষণ অভ্যাসে ন্যস্ত হওয়াতে একটা ঘোরতর গন্ডগোল হইয়াছে। তাহার ফল এই হইয়াছে যে, ধর্ম (রিলিজন)—উপধর্মসঙ্কুল, নীতি—দ্রাস্ত, অভ্যাস—কঠিন, এবং পুণ্য—দুঃখজনক হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দুধর্মের ও হিন্দুনীতির আধুনিক অবনতি ও তৎপ্রতি আধুনিক অনাস্থার গুরুতর এক কারণ এই গন্ডগোল।

ক্রোড়পত্র—খ

(“ধর্মজিজ্ঞাসা” নামক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত)

গুরু। রিলিজন কি?

শিষ্য। সেটা জানা কথা।

গুরু। বড় নয়—বল দেখি কি জানা আছে?

শিষ্য। যদি বলি পারলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাস।

গুরু। প্রাচীন যীহুদীরা পরলোক মানিত না। যীহুদীদের প্রাচীন ধর্ম কি ধর্ম নয়?

শিষ্য। যদি বলি দেবদেবীতে বিশ্বাস।

গুরু। ইস্লাম, খ্রীষ্টীয়, যীহুদ, প্রভৃতি ধর্ম দেবী নাই। সে সকল ধর্ম দেবও এক—ঈশ্বর। এগুলি কি ধর্ম নয়?

শিষ্য। ঈশ্বরে বিশ্বাসই ধর্ম?

গুরু। এমন অনেক পরম রমণীয় ধর্ম আছে, যাহাতে ঈশ্বর নাই। ঋগ্বেদসংহিতার প্রাচীনতম মন্ত্রগুলি সমালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, তৎপ্রণয়নের সমকালিক আর্ষ্যদিগের ধর্ম অনেক দেবদেবী ছিল বটে, কিন্তু ঈশ্বর নাই। বিশ্বকর্মা, প্রজাপতি, ব্রহ্ম ইত্যাদি ঈশ্বরবাচক শব্দ, ঋগ্বেদের প্রাচীনতম মন্ত্রগুলিতে নাই—যেগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক, সেইগুলিতে আছে। প্রাচীন সাংখ্যেরাও অনীশ্বরবাদী ছিলেন। অথচ তাঁহারা ধর্মহীন নহেন; কেন না, তাঁহারা কর্মফল মানিতেন, এবং মূর্ত্তি বা নিঃশ্রেয়স্ কামনা করিতেন। বৌদ্ধধর্মও নিরীশ্বর। অতএব ঈশ্বরবাদ ধর্মের লক্ষণ কি প্রকারে বলি? দেখ, কিছুই পরিষ্কার হয় নাই।

শিষ্য। তবে বিদেশী তর্কিকদিগের ভাষা অবলম্বন করিতে হইল—লোকাতীত চৈতন্যে বিশ্বাসই ধর্ম।

গুরু। অর্থাৎ Supernaturalism, কিন্তু ইহাতে তুমি কোথায় আসিয়া পড়িলে দেখ। প্রেততত্ত্ববিদ সম্প্রদায় ছাড়া, আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মতে লোকাতীত চৈতন্যের কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং ধর্মও নাই—ধর্মের প্রয়োজনও নাই। রিলিজনকে ধর্ম বলিতেছি মনে থাকে যেন।

শিষ্য। অথচ সে অর্থে ঘোর বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যেও ধর্ম আছে। যথা Religion of Humanity.

গুরু। সুতরাং লোকাতীত চৈতন্যে বিশ্বাস ধর্ম নয়।

শিষ্য। তবে আপনিই বলেন, ধর্ম কাহাকে বলিব।

গুরু। প্রশ্নটা অতি প্রাচীন। “অথাতো ধর্ম-জিজ্ঞাসা” মীমাংসা দর্শনের প্রথম সূত্র। এই প্রশ্নের উত্তর দানই মীমাংসা দর্শনের উদ্দেশ্য। সর্বত্র গ্রাহ্য উত্তর আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। আমি যে ইহার সদুত্তর দিতে সক্ষম হইব, এমন সম্ভাবনা নাই। তবে পূর্বপণ্ডিতদিগের মত তোমাকে শুনাইতে পারি। প্রথম মীমাংসাকারের উত্তর শুন। তিনি বলেন, “নোদনালক্ষণো ধর্মঃ।” নোদনা, ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক বাক্য। শূদ্র এইটুকু থাকিলে বলা যাইত,

কথাটা বৃষ্টি নিতান্ত মন্দ নয়; কিন্তু যখন উহার উপর কথা উঠিল, “নোদনা প্রবর্তকো বেদবিধি-
রূপঃ,” তখন আমার বড় সন্দেহ হইতেছে, তুমি উহাকে ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিবে কি না।

শিষ্য। কখনই না। তাহা হইলে যতগুণি পৃথক্ ধর্মগ্রন্থ, ততগুণি পৃথক্-প্রকৃতি-
সম্পন্ন ধর্ম মানিতে হয়। খ্রীষ্টানে বলিতে পারে, বাইবেল-বিধিই ধর্ম; মুসলমানও কোরান
সম্বন্ধে ঐরূপ বলিবে। ধর্মপদ্ধতি ভিন্ন হউক, ধর্ম বলিয়া একটা সাধারণ সামগ্রী নাই কি?
Religions আছে বলিয়া Religion বলিয়া একটা সাধারণ সামগ্রী নাই কি?

গুরু। এই এক সম্প্রদায়ের মত। লোগান্ধি ভাস্কর প্রভৃতি এইরূপ কহিয়াছেন যে,
“বেদপ্রতিপাদ্যপ্রয়োজনবদর্থো ধর্মঃ।” এই সকল কথার পরিণামফল এই দাঁড়াইয়াছে যে,
যাগাদিই ধর্ম এবং সদাচারই ধর্ম শব্দে বাচ্য হইয়া গিয়াছে—যথা মহাভারতে,

শ্রদ্ধা কর্ম তপশ্চৈব সত্যমক্রোধ এবচ।

স্বেষ্ট দারেষ্ট সন্তোষঃ শৌচং বিদ্যানসুয়িতা ॥

আত্মজ্ঞানং তিতিক্ষা চ ধর্মঃ সাধারণো নৃপ ॥

কেহ বা বলেন, “দ্রব্যক্রিয়াগুণাদীনাং ধর্মত্বং” এবং কেহ বলেন, ধর্ম অদৃষ্টবিশেষ। ফলত
আর্যদিগের সাধারণ অভিপ্রায় এই যে, বেদ বা লোকাচারসম্মত কার্যই ধর্ম, যথা বিশ্বামিত্র—
যমার্য্যাঃ ক্রিয়মাণং হি শংসন্ত্যাগমবেদিনঃ।

স ধর্মো যং বিগর্হন্তি তমধর্মং প্রচক্ষতে ॥

কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রে যে ভিন্ন মত নাই, এমত নহে। “দ্বৈ বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্
ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ,” ইত্যাদি শ্রুতিতে সূচিত হইয়াছে যে, বৈদিক জ্ঞান ও
তদনুবর্তী যাগাদি নিকৃষ্ট ধর্ম, ব্রহ্মজ্ঞানই পরম ধর্ম। ভগবদ্গীতার স্কন্দ তাৎপর্যই কর্মাত্মক
বৈদিকাদি অনুষ্ঠানের নিকৃষ্টতা এবং গীতোক্ত ধর্মের উৎকর্ষ প্রতিপাদন। বিশেষত হিন্দু
ধর্মের ভিতর একটি পরম রমণীয় ধর্ম পাওয়া যায়, যাহা এই মীমাংসা এবং তন্নীত হিন্দু-
ধর্মবাদের সাধারণত বিরোধী। যেখানে এই ধর্ম দেখি—অর্থাৎ কি গীতায়, কি মহাভারতের
অন্যত্র, কি ভাগবতে—সর্বত্রই দেখি, শ্রীকৃষ্ণই ইহার বক্তা। এই জন্য আমি হিন্দুশাস্ত্রে নিহিত
এই উৎকৃষ্টতর ধর্মকে শ্রীকৃষ্ণ-প্রচারিত মনে করি, এবং কৃষ্ণোক্ত ধর্ম বলিতে ইচ্ছা করি।
মহাভারতের কর্ণপর্বে হইতে একটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া উহার উদাহরণ দিতেছি।

“অনেকে শ্রুতিরে ধর্মের প্রমাণ বলিয়া নির্দেশ করেন। আমি তাহাতে দোষারোপ করি
না। কিন্তু শ্রুতিতে সমুদায় ধর্মতত্ত্ব নির্দিষ্ট নাই। এই নির্মিত্ত অনুমান দ্বারা অনেক স্থলে
ধর্ম নির্দিষ্ট করিতে হয়। প্রাণিগণের উৎপত্তির নির্মিত্তই ধর্ম নির্দেশ করা হইয়াছে।
অহিংসায়ুক্ত কার্য করিলেই ধর্ম অনুষ্ঠান করা হয়। হিংস্রকদিগের হিংসা নিবারণার্থেই ধর্মের
সৃষ্টি হইয়াছে। উহা প্রাণিগণকে ধারণ করে বলিয়াই ধর্ম নাম নির্দিষ্ট হইতেছে। অতএব
যদ্বারা প্রাণিগণের রক্ষা হয়, তাহাই ধর্ম” ইহা কৃষ্ণোক্তি। ইহার পরে বনপর্বে হইতে
ধর্মব্যাধোক্ত ধর্মব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিতেছি। “যাহা সাধারণের একান্ত হিতজনক, তাহাই সত্য।
সত্যই শ্রেয় লাভের অদ্বিতীয় উপায়। সত্যপ্রভাবেই যথার্থ জ্ঞান ও হিতসাধন হয়।” এ স্থলে
ধর্ম অর্থেই সত্য শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে।

শিষ্য। এ দেশীয়েরা ধর্মের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা নীতির ব্যাখ্যা বা পুণ্যের ব্যাখ্যা।
রিলিজনের ব্যাখ্যা কই?

গুরু। রিলিজন শব্দে যে বিষয় বুঝায়, সে বিষয়ের স্বাতন্ত্র্য আমাদের দেশের লোক কখন
উপলব্ধি করেন নাই। যে বিষয়ের প্রজ্ঞা আমার মনে নাই, আমার পরিচিত কোন শব্দে কি
প্রকারে তাহার নামকরণ হইতে পারে?

শিষ্য। কথাটা ভাল বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। তবে আমার কাছে একটি ইংরেজি প্রবন্ধ আছে, তাহা হইতে একটু পড়িয়া শুনাই।

“For religion, the ancient Hindu had no name, because his conception
of it was so broad as to dispense with the necessity of a name. With
other peoples, religion is only a part of life; there are things religious, and
there are things lay and secular. To the Hindu, his whole life was religion.
To other peoples, their relations to God and to the spiritual world are

বিশ্বকম রচনাবলী

things sharply distinguished from their relations to man and to the temporal world. To the Hindu, his relations to God and his relations to man, his spiritual life and his temporal life are incapable of being so distinguished. They form one compact and harmonious whole, to separate which into its component parts is to break the entire fabric. All life to him was religion, and religion never received a name from him, because it never had for him an existence apart from all that had received a name. A department of thought which the people in whom it had its existence had thus failed to differentiate, has necessarily mixed itself inextricably with every other department of thought, and this is what makes it so difficult at the present day, to erect it into a separate entity.”*

শিষ্য। তবে রিলিজন কি, তদ্বিষয়ে পাশ্চাত্য আচার্য্যদিগের মতই শূন্য ষাউক।

গুরু। তাহাতেও বড় গোলযোগ। প্রথমতঃ রিলিজন শব্দের যৌগিক অর্থ দেখা ষাউক। প্রচলিত মত এই যে, *re-ligare* হইতে শব্দ নিস্পন্ন হইয়াছে, অতএব ইহার প্রকৃত অর্থ বন্ধন, —ইহা সমাজের বন্ধনী। কিন্তু বড় বড় পণ্ডিতগণের এ মত নহে। রোমক পণ্ডিত কিরিরো (বা সিসিরো) বলেন যে, ইহা *re-ligare* হইতে নিস্পন্ন হইয়াছে। তাহার অর্থ পুনরাহরণ, সংগ্রহ, চিন্তা, এইরূপ। মক্ষমূলর প্রভৃতি এই মতানুযায়ী। যেটাই প্রকৃত হউক, দেখা যাইতেছে যে, এ শব্দের আদি অর্থ এক্ষণে আর ব্যবহৃত নহে। যেমন লোকের ধর্মবুদ্ধি স্ফূর্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, এ শব্দের অর্থও তেমনি স্ফূর্তিত ও পরিবর্তিত হইয়াছে।

শিষ্য। প্রাচীন অর্থে আমাদিগের প্রয়োজন নাই, এক্ষণে ধর্ম অর্থাৎ রিলিজন কাহাকে বলিব, তাই বলুন।

গুরু। কেবল একটি কথা বলিয়া রাখি। ধর্ম শব্দের যৌগিক অর্থ অনেকটা *religio* শব্দের অনুরূপ। ধর্ম = ধৃ + মন্ (ধিয়তে লোকো অনেন, ধরতি লোকং বা) এই জন্য আমি ধর্মকে *religio* শব্দের প্রকৃত প্রতিশব্দ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি।

শিষ্য। তা হোক—এক্ষণে রিলিজনের আধুনিক ব্যাখ্যা বলুন।

গুরু। আধুনিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে জার্মানেরাই সর্বাগ্রগণ্য। দুর্ভাগ্যবশত আমি নিজে জার্মান জানি না। অতএব প্রথমত মক্ষমূলরের পুস্তক হইতে জার্মানদিগের মত পড়িয়া শুনাইব। আদৌ কাণ্টের মত পর্যালোচনা কর।

“According to Kant, religion is morality. When we look upon all our moral duties as divine Commands, that, he thinks constitutes religion. And we must not forget that Kant does not consider that duties are moral duties because they rest on a divine command (that would be according to Kant merely revealed Religion); on the contrary, he tells us that because we are directly conscious of them as duties, therefore we look upon them as divine commands.”

তার পর ফিল্ডে। ফিল্ডের মতে “Religion is knowledge. It gives to a man a clear insight into himself, answers the highest questions, and thus imparts to us a complete harmony with ourselves, and a thorough sanctification to our mind.” সাংখ্যাদিরও প্রায় এই মত। কেবল শব্দপ্রয়োগ ভিন্ন প্রকার। তার পর স্লয়ের মেকর। তাঁহার মতে,—“Religion consists in our consciousness of

* লেখক-প্রণীত কোন ইংরেজি প্রবন্ধ হইতে এইটুকু উদ্ধৃত হইল, উহা এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। ইহার মর্মার্থ বাঙ্গালায় এখানে সন্নিবেশিত করিলে করা যাইতে পারিত, কিন্তু বাঙ্গালায় এ রকমের কথা আমার অনেক পাঠকে বৃদ্ধিবে না। যাঁহাদের জন্য লিখিতেছি, তাঁহারা না বৃদ্ধিবে, লেখা বৃথা। অতএব এই রুচিবিরুদ্ধ কাষাটুকু পাঠক মার্জনা করিবেন। যাঁহারা ইংরেজি জানেন না, তাঁহারা এটুকু ছাড়িয়া গেলে ক্ষতি হইবে না।

absolute dependence on something, which though it determines us, we cannot determine in our turn.” তাহাকে উপহাস করিয়া হীগেল বলেন,—“Religion is or ought to be perfect freedom; for it is neither more or less than the divine spirit becoming conscious of himself through the finite spirit—” এ মত কতকটা বেদান্তের অনুগামী।

শিষ্য। যাহারই অনুগামী হউক, এই চারিটির একটি ব্যাখ্যাও ত শ্রদ্ধেয় বলিয়া বোধ হইল না। আচার্য্য মক্ষমুলরের নিজের মত কি?

গুরু। বলেন, “Religion is a subjective faculty for the apprehension of the Infinite.”

শিষ্য। Faculty! সর্বনাশ! বরং রিলিজন বদ্বিলে বদ্বা যাইবে,—Faculty বদ্বিব কি প্রকারে? তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ কি?

গুরু। এখন জার্মানদের ছাড়িয়া দিয়া দুই এক জন ইংরেজের ব্যাখ্যা আমি নিজে সংগ্রহ করিয়া শুনাইতেছি। টইলর সাহেব বলেন যে, যেখানে “Spiritual Beings” সম্বন্ধে বিশ্বাস আছে, সেইখানেই রিলিজন। এখানে “Spiritual Beings” অর্থে কেবল ভূত প্রেত নহে—লোকাতীত চৈতন্যই অভিপ্রেত; দেবদেবী ও ঈশ্বরও তদন্তর্গত। অতএব তোমার বাক্যের সহিত ইহার বাক্যের ঐক্য হইল।

শিষ্য। সে জ্ঞান ত প্রমাণাধীন।

গুরু। সকল প্রমাজ্ঞানই প্রমাণাধীন, ভ্রমজ্ঞান প্রমাণাধীন নহে। সাহেব মোস্কের বিবেচনায় রিলিজনটা ভ্রমজ্ঞান মাত্র। এক্ষণে জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের ব্যাখ্যা শোন।

শিষ্য। তিনি ত নীতিমাত্রবাদী, ধর্মবিরোধী।

গুরু। তাহার শেষাবস্থার রচনা পাঠে সেরূপ বোধ হয় না। অনেক স্থানে দ্বিধাযুক্ত বটে।—যাই হোক, তাহার ব্যাখ্যা উচ্চশ্রেণীর ধর্মসকল সম্বন্ধে বেশ খাটে।

তিনি বলেন, “The essence of Religion is the strong and earnest direction of the emotions and desires towards an ideal object recognised as of the highest excellence, and is rightfully paramount over all selfish objects of desire.”

শিষ্য। কথাটা বেশ।

গুরু। মন্দ নহে বটে। সম্প্রতি আচার্য্য সীলীর কথা শোন। আধুনিক ধর্মতত্ত্ব-ব্যাখ্যাকারদিগের মধ্যে তিনি এক জন শ্রেষ্ঠ। তাহার প্রণীত “Ecce Homo” এবং “Natural Religion” অনেককেই মোহিত করিয়াছে। এ বিষয়ে তাহার একটি উক্তি বাঙ্গালি পাঠকদিগের নিকট সম্প্রতি পরিচিত হইয়াছে।* বাক্যটি এই—“The substance of Religion is Culture.” কিন্তু তিনি এক দল লোকের মতের সমালোচনকালে এই উক্তির দ্বারা তাহাদিগের মত পরিস্ফুট করিয়াছেন—এটি ঠিক তাহার নিজের মত নহে। তাহার নিজের মত বড় সর্বব্যাপী। সে মতানুসারে রিলিজন “habitual and permanent admiration.” ব্যাখ্যাটি সর্বিস্তারে শুনাইতে হইল।

“The words Religion and Worship are commonly and conveniently appropriated to the feelings with which we regard God. But those feelings—love, awe, admiration, which together make up worship—are felt in various combinations for human beings, and even for inanimate objects. It is not exclusively but only *par excellence* that religion is directed towards God. When feelings of admiration are very strong and at the same time serious and permanent, they express themselves in recurring acts, and hence arises ritual, liturgy and whatever the multitude identifies with religion. But without ritual, religion may exist in its

বিক্রম রচনাবলী

elementary state and this elementary state of Religion is what may be described as *habitual and permanent admiration*."

শিষ্য। এ ব্যাখ্যাটি অতি সুন্দর। আর আমি দেখতেছি, মিল যে কথা বলিয়াছেন, তাহার সঙ্গে ইহার ঐক্য হইতেছে। এই "habitual and permanent admiration" যে মানসিক ভাব, তাহারই ফল, "strong and earnest direction of the emotions and desires towards an ideal object recognised as of the highest excellence."

গুরু। এ ভাব, ধর্মের একটি অঙ্গমাত্র।

যাহা হউক, তোমাকে আর পণ্ডিতের পণ্ডিতে বিরক্ত না করিয়া, অগস্ত কোম্বলের ধর্ম-ব্যাখ্যা শুনাইয়া, নিরস্ত হইব। এটিতে বিশেষ মনোযোগ প্রয়োজন; কেন না, কোম্বল নিজে একটি অভিনব ধর্মের সৃষ্টিকর্তা, এবং তাহার এই ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়াই তিনি সেই ধর্ম সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি বলেন, "Religion, in itself expresses the state, of perfect *unity* which is the distinctive mark of man's existence both as an individual and in society, when all the constituent parts of his nature, moral and physical, are made habitually to converge towards one common purpose." অর্থাৎ "Religion consists in regulating one's individual nature, and forms the rallying-point for all the separate individuals."

যতগুলি ব্যাখ্যা তোমাকে শুনাইলাম, সকলের মধ্যে এইটি উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। আর যদি এই ব্যাখ্যা প্রকৃত হয়, তবে হিন্দুধর্ম সকল ধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

শিষ্য। আগে ধর্ম কি বুঝি, তার পর পারি যদি, তবে না হয় হিন্দুধর্ম বুঝিব। এই সকল পণ্ডিতগণকৃত ধর্মব্যাখ্যা শুনিয়া আমার সাত কাণার হাতী দেখা মনে পড়িল।

গুরু। কথা সত্য। এমন মনুষ্য কে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যে ধর্মের পূর্ণ প্রকৃতি ধ্যানে পাইয়াছে? যেমন সমগ্র বিশ্বসংসার কোন মনুষ্য চক্ষে দেখিতে পায় না, তেমনই সমগ্র ধর্ম কোন মনুষ্য ধ্যানে পায় না। অন্যের কথা দূরে থাক, শাক্যসিংহ, যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ, কি চৈতন্য,—তাঁহারাও ধর্মের সমগ্র প্রকৃতি অবগত হইতে পারিয়াছিলেন, এমত স্বীকার করিতে পারি না। অন্যের অপেক্ষা বেশি দেখুন, তথাপি সবটা দেখিতে পান নাই। যদি কেহ মনুষ্য-দেহ ধারণ করিয়া ধর্মের সম্পূর্ণ অবয়ব হৃদয়ে ধ্যান, এবং মনুষ্যালোকে প্রচারিত করিতে পারিয়া থাকেন, তবে সে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকার। ভগবদ্গীতার উক্তি, ঈশ্বরবতার শ্রীকৃষ্ণের উক্তি কি কোন মনুষ্যপ্রণীত, তাহা জানি না। কিন্তু যদি কোথাও ধর্মের সম্পূর্ণ প্রকৃতি ব্যক্ত ও পরিষ্ফুট হইয়া থাকে, তবে সে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়।

ক্রোড়পত্র—গ

(অষ্টম অধ্যায় দেখ)

If, as the sequence of a malady contracted in pursuit of illegitimate gratification, an attack of iritis injures vision, the mischief is to be counted among those entailed by immoral conduct; but if, regardless of protesting sensations, the eyes are used in study too soon after ophthalmia, and there follows blindness for years or for life, entailing not only personal unhappiness but a burden on others, moralists are silent. The broken leg which a drunkard's accident causes, counts among those miseries brought on self and family by intemperance, which form the ground for reprobating it; but if anxiety to fulfil duties prompts the continued use of a sprained knee in spite of the pain, and brings on a chronic lameness involving lack of exercise, consequent ill-health, inefficiency, anxiety, and unhappiness, it is supposed that ethics has no verdict to give in the matter. A student who is plucked because he has spent in amusement the time and money that

should have gone in study, is blamed for thus making parents unhappy and preparing for himself a miserable future ; but another who, thinking exclusively of claims on him, reads night after night with hot or aching head, and, breaking down, cannot take his degree, but returns home shattered in health and unable to support himself, is named with pity only, as not subject to any moral judgment ; or rather, the moral judgment passed is wholly favourable.

Thus recognizing the evils caused by some kinds of conduct only, men at large, and moralists as exponents of their beliefs, ignore the suffering and death daily caused around them by disregard of that guidance which has established itself in the course of evolution. Led by the tacit assumption, common to Pagan stoics and Christian ascetics, that we are so diabolically organized that pleasures are injurious and pains beneficial, people on all sides yield examples of lives blasted by persisting in actions against which their sensations rebel. Here is one who, drenched to the skin and sitting in a cold wind, pooh-poohs his shiverings and gets rheumatic fever with subsequent heart-disease, which makes worthless the short life remaining to him. Here is another who, disregarding painful feelings, works too soon after a debilitating illness, and establishes disordered health that lasts for the rest of his days, and makes him useless to himself and others. Now the account is of a youth who, persisting in gymnastic feats spite of scarcely bearable straining, bursts a blood-vessel, and, long laid on the shelf, is permanently damaged ; while now it is of a man in middle life who, pushing muscular effort to painful excess suddenly brings on hernia. In this family is a case of aphasia, spreading paralysis, and death, caused by eating too little and doing too much ; in that, softening of the brain has been brought on by ceaseless mental efforts against which the feelings hourly protested ; and in others, less serious brain-affections have been contracted by overstudy continued regardless of discomfort and the craving for fresh air and exercise.* Even without accumulating special examples, the truth is forced on us by the visible traits of classes. The careworn man of business too long at his office, the cadaverous barrister pouring half the night over his briefs, the feeble factory hands and unhealthy seamstresses passing long hours in bad air, the anæmic, flat-chested school girls, bending over many lessons and forbidden boisterous play, no less than Sheffield grinders who die of suffocating dust, and peasants crippled with rheumatism due to exposure, show us the widespread miseries caused by persevering in actions repugnant to the sensations and neglecting actions which the sensations prompt. Nay the evidence is still more extensive and conspicuous. What are the puny malformed children, seen in poverty-stricken districts, but children whose appetites for food and desires for warmth have not been adequately satisfied ? What are populations stunted in growth and prematurely aged,

* I can count up more than a dozen such cases among those personally well known to me.

বস্কিম রচনাবলী

such as parts of France show us, but populations injured by work in excess and food in defect: the one implying positive pain, the other negative pain? What is the implication of that greater mortality which occurs among people who are weakened by privations, unless it is that bodily miseries conduce to fatal illness? Or once more, what must we infer from the frightful amount of disease and death suffered by armies in the field, fed on scanty and bad provisions, lying on damp ground, exposed to extremes of heat and cold, inadequately sheltered from rain, and subject to exhausting efforts; unless it be the terrible mischiefs caused by continuously subjecting the body to treatment which the feelings protest against?

It matters not to the argument whether the actions entailing such effects are voluntary or involuntary. It matters not from the biological point of view, whether the motives prompting them are high or low. The vital functions accept no apologies on the ground that neglect of them was unavoidable, or that the reason for neglect was noble. The direct and indirect sufferings caused by nonconformity to the laws of life, are the same whatever induces the nonconformity; and cannot be omitted in any rational estimate of conduct. If the purpose of ethical inquiry is to establish rules of right living; and if the rules of right living are those of which the total results, individual and general, direct and indirect, are most conducive to human happiness; then it is absurd to ignore the immediate results and recognize only the remote results. —Herbert Spencer: *Data of Ethics*, pp. 93-95.

ক্রোড়পত্র—ঘ

(অনুশীলনতত্ত্বের সঙ্গে জাতিভেদ ও শ্রমজীবনের সম্বন্ধ)

“বৃত্তির সঞ্চালন দ্বারা আমরা কি করি? হয় কিছু কৰ্ম করি, না হয় কিছু জানি। কৰ্ম ও জ্ঞান ভিন্ন মনুষ্যের জীবনে ফল আর কিছু নাই।*

অতএব জ্ঞান ও কৰ্ম মানুষ্যের স্বধৰ্ম। সকল বৃত্তিগুণিল সকলেই যদি বিহিতরূপে অনুশীলিত করিত, তবে জ্ঞান ও কৰ্ম উভয়ই সকল মনুষ্যেরই স্বধৰ্ম হইত। কিন্তু মনুষ্য-সমাজের অপরিণতাবস্থায় তাহা সাধারণতঃ ঘটিয়া উঠে না।† কেহ কেবল জ্ঞানকেই প্রধানতঃ স্বধৰ্মস্থানীয় করেন, কেহ কৰ্মকে ঐরূপ প্রধানতঃ স্বধৰ্ম বলিয়া গ্রহণ করেন।

জ্ঞানের চরমোদ্দেশ্য ব্রহ্ম; সমস্ত জগৎ ব্রহ্মে আছে। এজন্য জ্ঞানার্জন যাহাদিগের স্বধৰ্ম, তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলা যায়। ব্রাহ্মণ শব্দ ব্রহ্মণ্ শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে।

কৰ্মকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা বুদ্ধিতে গেলে কৰ্মের বিষয়টা ভাল করিয়া বুদ্ধিতে হইবে। জগতে অন্তর্বিষয় আছে ও বহির্বিষয় আছে। অন্তর্বিষয় কৰ্মের বিষয়ীভূত হইতে পারে না; বহির্বিষয়ই কৰ্মের বিষয়। সেই বহির্বিষয়ের মধ্যে কতকগুলিই হৌক, অথবা সবই হৌক, মনুষ্যের ভোগ্য। মনুষ্যের কৰ্ম মনুষ্যের ভোগ্য বিষয়কেই আশ্রয় করে। সেই আশ্রয় ত্রিবিধ, যথা,—(১) উপাদান, (২) সংযোজন বা সংগ্রহ,

* কোম্ৎ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ তিন ভাগে চিন্তাপরিণতিকে বিভক্ত করে, “Thought, Feeling, Action,” ইহা ন্যায্য। কিন্তু Feeling অবশেষে Thought কিম্বা Action প্রাপ্ত হয়। এই জ্ঞান পরিণামের ফল জ্ঞান ও কৰ্ম, এই দ্বিবিধ বলাও ন্যায্য।

† আমি ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপকেও সমাজের অপরিণতাবস্থা বলিতেছি।

(৩) রক্ষা। যাহারা উৎপাদন করে, তাহারা কৃষিধর্মী; (২) যাহারা সংযোজন বা সংগ্রহ করে, তাহারা শিল্প বা বাণিজ্যধর্মী; (৩) এবং যাহারা রক্ষা করে, তাহারা যুদ্ধধর্মী। ইহাদিগের নামান্তর ব্রহ্মসূত্রে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এ কথা পাঠক স্বীকার করিতে পারেন কি?

স্বীকার করিবার প্রতি একটা আপত্তি আছে। হিন্দুদিগের ধর্মশাস্ত্রানুসারে এবং এই গীতার ব্যবস্থানুসারে কৃষি শব্দের ধর্ম নহে; বাণিজ্য এবং কৃষি, উভয়েই বৈশ্যের ধর্ম। অন্য তিন বর্ণের পরিচর্য্যাই শূদ্রের ধর্ম। এখনকার দিনে দেখিতে পাই, কৃষি প্রধানতঃ শূদ্রেরই ধর্ম। কিন্তু অন্য তিন বর্ণের পরিচর্য্যও এখনকার দিনে প্রধানতঃ শূদ্রেরই ধর্ম। যখন জ্ঞানধর্মী, যুদ্ধধর্মী, বাণিজ্যধর্মী বা কৃষিধর্মীর কর্মের এত বাহুল্য হয় যে, তদ্বর্ষ্মিগণ আপনাদিগের দৈহিকাদি প্রয়োজনীয় সকল কর্ম সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারে না, তখন কতকগুলি লোক তাহাদিগের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হয়। অতএব (১) জ্ঞানার্জন বা লোকশিক্ষা, (২) যুদ্ধ বা সমাজরক্ষা, (৩) শিল্প বা বাণিজ্য, (৪) উৎপাদন বা কৃষি, (৫) পরিচর্য্য, এই পঞ্চবিধ কর্ম।”

ভগবদ্গীতার টীকায় যাহা লিখিয়াছি, তাহা হইতে এই কয়টি কথা উদ্ধৃত করিলাম। এক্ষণে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, সর্ব্ববিধ কর্মানুষ্ঠান জন্য অনুশীলন প্রয়োজনীয়। তবে কথা এই যে, যাহার যে স্বধর্ম, অনুশীলন তদনুবর্তী না হইলে সে স্বধর্মের সুপালন হইবে না। অনুশীলন স্বধর্মানুবর্তী হওয়ার অর্থ এই যে, স্বধর্মের প্রয়োজন অনুসারে বৃত্তিবিশেষের বিশেষ অনুশীলন চাই।

সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বৃত্তিবিশেষের বিশেষ অনুশীলন কি প্রকারে হইতে পারে, তাহা শিক্ষাতত্ত্বের অন্তর্গত। সুতরাং এ গ্রন্থে সে বিশেষ অনুশীলনের কথা লেখা গেল না। আমি এই গ্রন্থে সাধারণ অনুশীলনের কথাই বলিয়াছি; কেন না, তাহাই ধর্মতত্ত্বের অন্তর্গত; বিশেষ অনুশীলনের কথা বলি নাই; কেন না, তাহা শিক্ষাতত্ত্ব। উভয়ে কোন বিরোধ নাই ও হইতে পারে না, ইহাই আমার এখানে বলিবার প্রয়োজন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ভূমিকা

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি প্রণীত গীতার ভাষ্য ও টীকা থাকিতে গীতার অন্য ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। তবে ঐ সকল ভাষ্য ও টীকা সংস্কৃত ভাষায় প্রণীত। এখনকার দিনে এমন অনেক পাঠক আছেন যে, সংস্কৃত বুঝেন না, অথচ গীতা পাঠে বিশেষ ইচ্ছুক। কিন্তু গীতা এমনই দূরদূর গ্রন্থ যে, টীকার সাহায্য ব্যতীত অনেকেরই বোধগম্য হয় না। এই জন্য গীতার একখানি বাঙ্গালা টীকা প্রয়োজনীয়।

বাঙ্গালা টীকা দুই প্রকার হইতে পারে। এক, শঙ্করাদি-প্রণীত প্রাচীন ভাষ্যের ও টীকার বাঙ্গালা অনুবাদ দেওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয়, নূতন বাঙ্গালা টীকা প্রণয়ন করা যাইতে পারে। কেহ কেহ প্রথমোক্ত প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। বাবু হিতলাল মিশ্র নিজকৃত অনুবাদে, কখন শঙ্করভাষ্যের সারাংশ, কখন শ্রীধরস্বামিকৃত টীকার সারাংশ সংকলন করিয়াছেন। পরম বৈষ্ণব ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ দত্ত নিজকৃত অনুবাদে, অনেক সময়ে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রণীত টীকার মর্মার্থ দিয়াছেন। ইহাদিগের নিকট বাঙ্গালী পাঠক তজ্জন্য বিশেষ ঋণী। প্রিয়বর শ্রীযুক্ত বাবু ভূধরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গীতার আর একখানি সংস্করণ প্রকাশে উদ্যত হইয়াছেন; বিজ্ঞাপনে দেখিলাম, তাহাতে শঙ্করভাষ্যের অনুবাদ থাকিবে। ইহা বাঙ্গালী পাঠকের বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয়।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন দ্বিতীয় প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি নিজকৃত অনুবাদের সহিত “গীতাসন্দীপনী” নামে একখানি বাঙ্গালা টীকা প্রকাশ করিতেছেন। ইহা সুখের বিষয় যে, “গীতাসন্দীপনী”তে গীতার মর্ম পূর্বপণ্ডিতেরা যে রূপ বুঝিয়াছিলেন, সেইরূপ বুঝান হইতেছে। বাঙ্গালী পাঠকেরা শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বাবুর নিকট তজ্জন্য কৃতজ্ঞ হইবেন সন্দেহ নাই।

এই সকল অনুবাদ বা টীকা থাকাতেও মাদৃশ ব্যক্তির অভিনব অনুবাদ ও টীকা প্রকাশে প্রবৃত্ত হওয়া বৃথা পরিশ্রম বলিয়া গণিত হইতে পারে। কিন্তু ইহার ষথার্থ প্রয়োজন না থাকিলে, আমি এই গুরুতর কার্যে হস্তক্ষেপ করিতাম না। সে প্রয়োজন কি, তাহা বুঝাইতেছি।

এখনকার পাঠকদিগের মধ্যে প্রায় অধিকাংশই “শিক্ষিত”-সম্প্রদায়ভুক্ত। যাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, তাঁহাদিগেরই সচরাচর “শিক্ষিত” বলা হইয়া থাকে; আমি প্রচলিত প্রথার বশবর্তী হইয়াই তদর্থে “শিক্ষিত” শব্দ ব্যবহার করিতেছি। কাহারও শিক্ষা বেশী, কাহারও শিক্ষা কম, কিন্তু কম হউক, বেশী হউক, এখনকার পাঠক অধিকাংশই “শিক্ষিত” সম্প্রদায়ভুক্ত, ইহা আমার জানা আছে। এখন গোলযোগের কথা এই যে, এই শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রাচীন পণ্ডিতদিগের উক্তি সহজে বুঝিতে পারেন না। বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া দিলেও তাহা বুঝিতে পারেন না। যেমন টোলের পণ্ডিতেরা, পাশ্চাত্যদিগের উক্তির অনুবাদ দেখিয়াও সহজে বুঝিতে পারেন না, যাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, তাঁহারা প্রাচীন প্রাচ্য পণ্ডিতদিগের বাক্য কেবল অনুবাদ করিয়া দিলে সহজে বুঝিতে পারেন না। ইহা তাঁহাদিগের দোষ নহে, তাঁহাদিগের শিক্ষার নৈসর্গিক ফল। পাশ্চাত্য চিন্তা-প্রণালী প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের চিন্তা-প্রণালী হইতে এত বিভিন্ন যে, ভাষার অনুবাদ হইলেই ভাবের অনুবাদ হৃদয়ঙ্গম হয় না। এখন আমাদের “শিক্ষিত” সম্প্রদায়, শৈশব হইতে পাশ্চাত্য চিন্তা-প্রণালীর অনুবর্তী, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়া চিন্তা-প্রণালী তাঁহাদিগের নিকট অপরিচিত: কেবল ভাষান্তরিত হইলে প্রাচীন ভাবসকল তাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম হয় না। তাঁহাদিগকে বুঝাইতে গেলে পাশ্চাত্য প্রথা অবলম্বন করিতে হয়, পাশ্চাত্য ভাবের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। পাশ্চাত্য প্রথা অবলম্বন করিয়া পাশ্চাত্য ভাবের সাহায্যে গীতার মর্ম তাঁহাদিগকে বুঝান, আমার এই টীকার উদ্দেশ্য।

ইহার আরও বিশেষ প্রয়োজন এই যে, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে যে সকল সংশয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, পূর্বপণ্ডিতদিগের কৃত ভাষ্যাদিতে তাহার মীমাংসা নাই। থাকিবারও সম্ভাবনা নাই; কেন না, তাঁহারা যে সকল পাঠকের সাহায্য জন্য ভাষ্যাদি প্রণয়ন

করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মনে সে সকল সংশয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনাই ছিল না। এই টীকায় যত দূর সাধ্য, সেই সকল সংশয়ের মীমাংসা করা গিয়াছে।

অতএব যে সকল পণ্ডিতগণ গীতার ব্যাখ্যা বাঙ্গালায় প্রচার করিয়াছেন বা করিতেছেন, আমি তাঁহাদিগের প্রতিযোগী নহি; যথাসাধ্য তাঁহাদিগের সাহায্য করি, ইহাই আমার ক্ষুদ্রাভিলাষ। আমিও যত দূর পারিয়াছি, পূর্বে পণ্ডিতদিগের অনুগামী হইয়াছি। আনন্দগিরি-টীকা-সম্বলিত শঙ্করভাষ্য, শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা রামানুজভাষ্য, মধুসূদন সরস্বতীকৃত টীকা, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী-কৃত টীকা ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই টীকা প্রণয়ন করিয়াছি। তবে ইহাও আমাকে বলিতে হইতেছে যে, যে ব্যক্তি পাশ্চাত্য সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং দর্শন অবগত হইয়াছে, সকল সময়েই যে, সে প্রাচীনদিগের অনুগামী হইতে পারিবে, এমন সম্ভাবনা নাই। আমিও সর্বত্র তাঁহাদের অনুগামী হইতে পারি নাই। যাঁহারা বিবেচনা করেন, এদেশীয় পূর্বে পণ্ডিতেরা যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলই ঠিক এবং পাশ্চাত্যগণ জাগতিক তত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা সকলই ভুল, তাঁহাদিগের সঙ্গে আমার কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই।

টীকাই আমার উদ্দেশ্য, কিন্তু মূল ভিন্ন টীকা চলে না, এই জন্য মূলও দেওয়া গেল। অনেক পাঠক অনুবাদ ভিন্ন মূল বুঝিতে সক্ষম নহেন, এজন্য একটা অনুবাদও দেওয়া গেল। বাঙ্গালা ভাষায় গীতার অনেক উৎকৃষ্ট অনুবাদ আছে। পাঠক যেটা ভাল বিবেচনা করেন, সেইটা অবলম্বন করিতে পারেন। সচরাচর যাহাতে অনুবাদ অবিকল হয়, সেই চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু দুই এক স্থানে অর্থব্যক্তির অনুরোধে এ নিয়মের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।

কলিকাতা।

১২৯৩ সাল।

শ্রীবাঙ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রথমোঃধ্যায়ঃ

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুদ্ধৎসবঃ।

মামকাঃ পাণ্ডবশৈব কিমকুর্ষত সঞ্জয় ॥ ১ ॥

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, হে সঞ্জয়! পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধার্থী সমবেত আমার পক্ষ ও পাণ্ডবেরা কি করিল? ১।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, মহাভারতের ভীষ্মপর্বে অষ্টম অধ্যায়। ভীষ্মপর্বে ৩ অধ্যায় হইতে ৪৩ অধ্যায় পর্যন্ত—এই অংশের নাম ভগবদ্গীতাপর্বাধ্যায়; কিন্তু ভগবদ্গীতার আরম্ভ পঞ্চ-বিংশতিতম অধ্যায়ে। তৎপূর্বে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা সকল পাঠক জানিতে না পারেন, এজন্য তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি; কেন না, তাহা না বলিলে, ধৃতরাষ্ট্র কেন এই প্রশ্ন করিলেন, এবং সঞ্জয়ই বা কে, তাহা অনেক পাঠক বুঝিবেন না।

যুদ্ধার্থীর রাজ্যসমৃদ্ধি দেখিয়া, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্যোধন তাহা অপহরণ করিবার অভিপ্রায়ে যুদ্ধার্থীরকে কপটদ্যুতে আহ্বান করেন। যুদ্ধার্থীর কপটদ্যুতে পরাজিত হইয়া এই পণে আবদ্ধ হইলেন যে, দ্বাদশ বৎসর তিনি ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ বনবাস করিবেন, তার পর এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিবেন। এই ত্রয়োদশ বৎসর দুর্যোধন তাঁহাদিগের রাজ্য ভোগ করিবেন। তার পর পাণ্ডবেরা এই পণ রক্ষা করিতে পারিলে, আপনাদিগের রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন। পাণ্ডবেরা দ্বাদশ বৎসর বনবাসে এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে যাপন করিলেন, কিন্তু দুর্যোধন তার পর রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। কাজেই পাণ্ডবেরা যুদ্ধ করিয়া স্বরাজ্যের উদ্ধার করিতে প্রস্তুত হইলেন। উভয় পক্ষ সেনা সংগ্রহ করিলেন। উভয়পক্ষীয় সেনা যুদ্ধার্থ কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইল। যখন উভয় সেনা পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছে, কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হয় নাই, তখন এই গীতার আরম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত নহেন—তিনি হস্তিনা নগরে আপনার রাজভবনে আছেন। তাহার কারণ, তিনি জন্মান্তর, যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া যুদ্ধদর্শন-সুখেও বঞ্চিত। কিন্তু যুদ্ধে কি হয়, তাহা জানিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র। যুদ্ধের পূর্বে ভগবান্ ব্যাসদেব তাঁহার সম্বোধনে

বিক্ষম রচনাবলী

আসিয়াছিলেন, তিনি অনুরূপ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন, বলিলেন যে, “আমি জ্ঞাতিবধ সন্দর্শন করিতে অভিলাষ করি না, আপনার তেজঃপ্রভাবে আদ্যোপান্ত এই যুদ্ধ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিব।” তখন ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী সঞ্জয়কে বর দান করিলেন। বর-প্রভাবে সঞ্জয় হস্তিনাপুরে থাকিয়াও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধবৃত্তান্ত সকল দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইলেন, দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে শুনাইতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্র মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করিতেছেন, সঞ্জয় উত্তর দিতেছেন। মহাভারতের যুদ্ধপর্বগর্ভে এই প্রণালীতে লিখিত। সকলই সঞ্জয়োক্তি। এক্ষণে উভয়পক্ষীয় সেনা যুদ্ধার্থ পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছে শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিতেছেন, উভয় পক্ষ কি করিলেন। গীতার এইরূপ আরম্ভ।

এই দিব্য চক্ষুর কথাটা অনৈসর্গিক, পাঠককে বিশ্বাস করিতে বলি না। গীতোক্ত ধর্মের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ নাই।

যে ধর্মব্যাখ্যা গীতার উদ্দেশ্য, প্রথমাধ্যায়ে তাহার কিছুই নাই। কি প্রসঙ্গোপলক্ষ্যে এই তত্ত্ব উত্থাপিত হইয়াছিল, প্রথমাধ্যায়ে এবং দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম একাদশ শ্লোকে কেবল তাহারই পরিচয় আছে। গীতার মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য এতদংশের কোন প্রয়োজন নাই। পাঠক ইচ্ছা করিলে এতদংশ পরিত্যাগ করিতে পারেন। আমার যে উদ্দেশ্য, তাহাতে এতদংশের কোন টীকা লিখিবারও প্রয়োজন নাই; ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও এতদংশ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তবে শ্রেণীবিশেষের পাঠক কোন কোন বিষয়ে কিছু জানিতে ইচ্ছা করিতে পারেন। এজন্য দুই একটা কথা লেখা গেল।

কুরুক্ষেত্র একটি চক্র বা জনপদ। ঐ চক্র এখনকার স্থানেশ্বর বা থানেশ্বর নগরের দক্ষিণবর্তী। আম্বালা নগর হইতে উহা ১৫ ক্রোশ দক্ষিণ। পানিপাট হইতে উহা ২০ ক্রোশ উত্তর। কুরুক্ষেত্র ও পানিপাট ভারতবর্ষের যুদ্ধক্ষেত্র, ভারতের ভাগ্য অনেক বার ঐ ক্ষেত্রে নিষ্পত্তি পাইয়াছে। “ক্ষেত্র” নাম শুনিয়া ভরসা করি, কেহ একখানি মাঠ বুঝিবেন না। কুরুক্ষেত্র প্রাচীন কালেই পণ্ড যোজন দীর্ঘে এবং পণ্ড যোজন প্রস্থে। এই জন্য উহাকে সমস্ত-পণ্ডক বলা যাইত। চক্রের সীমা এখন আরও বাড়িয়া গিয়াছে।

কুরু নামে এক জন চন্দ্রবংশীয় রাজা ছিলেন। তাঁহা হইতেই এই চক্রের নাম কুরুক্ষেত্র হইয়াছে। তিনি দুর্যোধনাদির ও পাণ্ডবদিগের পূর্বপুরুষ; এজন্য দুর্যোধনাদিকে কোঁরব বলা হয়, এবং কখন কখন পাণ্ডবদিগকেও বলা হয়। তিনি এই স্থানে তপস্যা করিয়া বর লাভ করিয়াছিলেন, এই জন্য ইহার নাম কুরুক্ষেত্র। মহাভারতে কথিত হইয়াছে যে, তাঁহার তপস্যার কারণই উহা পুণ্যতীর্থ। ফলে চিরকালই কুরুক্ষেত্র পুণ্যক্ষেত্র বা ধর্মক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে, “দেবাঃ হ বৈ সত্রং নিষেদুর্গিরিন্দ্রঃ সোমো মথো বিষ্ণুর্বিশ্বেদেবা অন্যত্রোবাশ্চিভ্যাম্। তেষাং কুরুক্ষেত্রং দেবযজনমাস। তস্মাদাহুঃ কুরুক্ষেত্রং দেবযজনম্।” অর্থাৎ দেবতারা এইখানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এজন্য ইহাকে “দেবতাদিগের যজ্ঞস্থান” বলে।

মহাভারতের বনপর্বের তীর্থযাত্রা পর্বাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, কুরুক্ষেত্র ত্রিলোকীর মধ্যে প্রধান তীর্থ। বনপর্বের কুরুক্ষেত্রের সীমা এইরূপ লেখা আছে—“উত্তরে সরস্বতী, দক্ষিণে দৃষ্ণতী; কুরুক্ষেত্র এই উভয় নদীর মধ্যবর্তী।” (৮৩ অধ্যায়) মনুসংহিতায় বিখ্যাত ব্রহ্মাবর্তেরও ঠিক সেই সীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে—

সরস্বতীদৃষ্ণতোদেবনদ্যোর্ষদন্তরং।

তং দেবনির্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্তং প্রচক্ষতে ॥ ২। ১৭।

অতএব কুরুক্ষেত্র এবং ব্রহ্মাবর্ত একই। কালিদাসের নিম্নলিখিত কবিতাতে তাহাই বুঝা যাইতেছে।

ব্রহ্মাবর্তং জনপদমথচ্ছায়য়া গাহমানঃ •

ক্ষেত্রং ক্ষত্রপ্রঘনাপিশুনং কোঁরবং তন্তুজেথাঃ।

রাজন্যানাং শিতশরশতৈর্ষত্র গান্ডীবধন্বা

ধারাপাতৈস্ত্ৰিমিব কমলান্যভ্যবর্ষন মূখানি ॥

—মেঘদূত ৪৯।

কিন্তু মনুতে আবার অন্য প্রকার আছে। যথা—

কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ ।
এষ ব্রহ্মাৰ্ষিদেশো বৈ ব্রহ্মাবতীর্দনস্তরঃ ॥

অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে চৈনিক পরিব্রাজক হিউন্থসাঙ্ও ইহাকে স্বীয় গ্রন্থে “ধৰ্ম্মক্ষেত্র” বলিয়াছেন।*

কুরুক্ষেত্র আজও পুণ্যতীর্থ বলিয়া ভারতবর্ষে পরিচিত; অনেক যোগী সন্ন্যাসী তথা পরিভ্রমণ করেন। কুরুক্ষেত্রে অনেক ভিন্ন ভিন্ন তীর্থ আছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি মহাভারতের যুদ্ধের স্মারক স্বরূপ। যে স্থানে অভিমন্যু সম্পর্কিতকর্তৃক অন্যান্য-যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন, সে স্থানকে এক্ষণে ‘অভিমন্যুক্ষেত্র’ বা ‘অমিন’ বলিয়া থাকে। সেখানে আজও পুত্রহীনারা পুত্রকামনায় অর্দিতর মন্দিরে অর্দিতর উপাসনা করে। যেখানে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিহত যোদ্ধাদিগের সৎকার সমাপন হইয়াছিল, ক্ষেত্রের যে ভাগ সেই বীরগণের অস্থিতে সমাকীর্ণ হইয়াছিল, এখনও তাহাকে ‘অস্থিপুত্র’ বলে। যেখানে সাত্যকিতে ও ভূরিশ্রবতে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়, এবং অর্জুন সাত্যকির ব্রহ্মার্থ অন্যান্য করিয়া ভূরিশ্রবার বাহুচ্ছেদ করেন, সে স্থানকে এক্ষণে “ভোর” বলে। জনপ্রবাদ আছে যে, ভূরিশ্রবার সালঙ্কার ছিন্ন হস্ত পক্ষীতে লইয়া যায়। সেই ছিন্ন হস্তের অলঙ্কারে একখণ্ড বহুমূল্য হীরক ছিল। তাহাই কহীনুর, এক্ষণে ভারতেশ্বরীর অঙ্গে শোভা পাইতেছে। কথাটা যে সত্য, তাহার অবশ্য কোন প্রমাণ নাই।

কুরুক্ষেত্রের নাম বাঙ্গালীমাত্রেরই মুখে আছে। একটা কিছুর গোল দেখিলে বাঙ্গালীর মেয়েরাও বলে, “কুরুক্ষেত্র হইতেছে।” অথচ কুরুক্ষেত্রের সর্বিশেষ তত্ত্ব কেহই জানে না। বিশেষ টম্‌সন, হুইলার প্রভৃতি ইংরেজ লেখকেরা সর্বিশেষ না জানিয়া অনেক গোলযোগ বাধাইয়াছেন। তাই কুরুক্ষেত্রের কথা এখানে এত সর্বিস্তারে লেখা গেল।†

সঞ্জয় উবাচ।

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যুঢ়ং দুর্যোধনস্তদা ।
আচার্য্যম্‌পসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥

সঞ্জয় বলিলেন—

ব্যুহিত পাণ্ডবসৈন্য দেখিয়া রাজা দুর্যোধন আচার্য্যের নিকটে গিয়া বলিলেন। ২।

দুর্যোধনাদির অস্ত্রবিদ্যার আচার্য্য ভরদ্বাজপুত্র দ্রোণ। ইনি পাণ্ডবদিগেরও গুরু। ইনি ব্রাহ্মণ। কিন্তু যুদ্ধবিদ্যায় অদ্বিতীয়। শস্ত্রবিদ্যা ক্ষত্রিয়দিগেরই ছিল, এমন নহে। দ্রোণাচার্য্য, পরশুরাম, কৃপাচার্য্য, অশ্বথামা, ইঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ, অথচ সচরাচর ক্ষত্রিয়দিগের অপেক্ষা যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। যখন পশ্চাৎ স্বধৰ্ম্মপালনের কথা উঠিবে, তখন এই কথা স্মরণ করিতে হইবে।

যুদ্ধার্থ সৈন্য-সম্মিলনকে ব্যুহ বলে।

সমগ্রস্য তু সৈন্যস্য বিন্যাসঃ স্থানভেদতঃ ।

স ব্যুহ ইতি বিখ্যাতো যুদ্ধেষু পৃথিবীভূজাম্ ॥

আধুনিক ইউরোপীয় সমরে সেনাপতির ব্যুহরচনাই প্রধান কার্য্য।

* M. Stanislaus Julien অনুবাদে লিখিয়াছেন, “Le champ du bonheur,” অর্থাৎ ধৰ্ম্মক্ষেত্র।

† সাহেবদিগের ভ্রমের উদাহরণস্বরূপ গীতার অনুবাদক টম্‌সনের টীকা হইতে দুই ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি। কুরুক্ষেত্র সম্বন্ধে লিখিতেছেন,—

“A part of Dharmmakshetra, the flat plain around Dehli, which city is often identified with Hastinapur, the Capital of Kurukshetra.”

এইটুকুর ভিতর ৫টি ভুল। (১) ধৰ্ম্মক্ষেত্র নামে কোন স্বতন্ত্র ক্ষেত্র নাই। (২) কুরুক্ষেত্র ধৰ্ম্মক্ষেত্রের অংশ মাত্র নহে। (৩) “The flat plain around Dehli” কুরুক্ষেত্র নহে। (৪) দিল্লী হস্তিনাপুর নহে। (৫) হস্তিনাপুর কুরুক্ষেত্রের রাজধানী নহে। এতটুকুর ভিতর এতগুলি ভুল একত্র করা যায়, আমরা জানিতাম না।

বিক্রম রচনাবলী

পশ্যতাং পান্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমদম্ ।

ব্যুত্ৰাং দ্রুপদপুত্রেন তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩ ॥

হে আচার্য্য! আপনার শিষ্য ধীমান্ দ্রুপদপুত্রের দ্বারা ব্যুহিতা পান্ডবদিগের মহতী সেনা দর্শন করুন। ৩।

দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, পান্ডবদিগের একজন সেনাপতি। তিনিই ব্যুহ রচনা করিয়াছিলেন। কথিত আছে, ইহার পিতা দ্রোণবধ কামনার যজ্ঞ করিলে ইহার জন্ম হয়। ইনিও দ্রোণের শিষ্য বলিয়া বর্ণিত হইতেছেন। এ কথাটা স্বধর্মপালন বুদ্ধিব্যবহার সময়ে স্মরণ করিতে হইবে। নিজ বধার্থ উৎপন্ন শত্রুকে দ্রোণ শিক্ষা দিয়াছিলেন। আচার্য্যের ধর্ম বিদ্যা দান।

অত্র শূরা মহেষ্वासো ভীমাজ্জর্জনসমা যুধি ।

যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪ ॥

ধৃষ্টকেতুশ্চৈকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্যবান্ ।

পুরুর্জিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যাশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫ ॥

যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমোজাশ্চ বীর্যবান্ ।

সৌভদ্রো দ্রোপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ ॥ ৬ ॥

ইহার মধ্যে শূর, বাণক্ষেপে মহান্, যুদ্ধে ভীমাজ্জর্জনতুল্য, যুযুধান, (১) বিরাট, (২) মহারথ দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, (৩) চৈকিতান, বীর্যবান্ কাশীরাজ, পুরুর্জিৎ, কুন্তিভোজ, (৪) নরশ্রেষ্ঠ শৈব্যা, বিক্রমশালী যুধামন্যু, বীর্যবান্ উত্তমোজা, সৌভদ্রাপুত্র, (৫) দ্রোপদীর পুত্রগণ, ইহারা সকলেই মহারথ। ৪। ৫। ৬।

(১) যুযুধান—যদুবংশীয় মহাবীর সাত্যকি।

(২) দ্রুপদ, বিরাট, সাত্যকি, ধৃষ্টকেতু প্রভৃতি সকলে অক্ষৌহিণীপতি।

(৩) ধৃষ্টকেতু মহাভারতে চৌদ্দেশের অধিপতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। অন্যবিধ বর্ণনাও আছে। (মহা, উদ্যোগ, ১৭১ অধ্যায়)।

(৪) কুন্তিভোজ বংশের নাম। বৃদ্ধ কুন্তিভোজ বসুদেবের পিতা শূরের পিতৃস্বসুপুত্র। পান্ডবমাতা কুন্তী তাহার ভবনে প্রতিপালিতা হইলেন। পুরুর্জিৎ এ সম্বন্ধে পান্ডব-মাতুল।

(৫) বিখ্যাত অভিমন্যু।

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম ।

নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭ ॥

হে দ্বিজোত্তম! আমরাদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রধান, আমার সৈন্যের নায়ক, তাঁহাদিগকে অবগত হউন। আপনার অবগতির জন্য সে সকল আপনাকে বলিতেছি। ৭।

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিজয়ঃ ।

অশ্বথামা বিকর্ণশ্চ সৌমদন্তির্জয়দ্রথঃ ॥ ৮ ॥*

আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, যুদ্ধজয়ী কৃপ, (৬) অশ্বথামা, (৭) বিকর্ণ, সৌমদন্তপুত্র (৮) ও জয়দ্রথ (৯)। ৮।

(৬) ইনিও ব্রাহ্মণ এবং অস্ত্রবিদ্যায় কোঁরবিদগের আচার্য্য।

(৭) দ্রোণপুত্র।

(৮) ইনিই বিখ্যাত ভূরিশ্রবা।

(৯) দুর্যোধনের ভগিনীপতি।

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ ।

নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ ॥

আরও অনেক অনেক বীর আমার জন্য ত্যক্তজীবন হইয়াছেন (অর্থাৎ জীবনত্যাগে প্রস্তুত হইয়াছেন)। তাঁহারা সকলে নানাশস্ত্রধারী এবং যুদ্ধবিশারদ। ৯।

গীতার প্রথমাধ্যায়ে ধর্মতত্ত্ব কিছন্ন নাই। কিন্তু প্রথম অধ্যায় কাব্যংশে বড় উৎকৃষ্ট। উপরে উভয় পক্ষের বহু গুণবান্ সেনানায়কদিগের নাম যে পাঠককে স্মরণ করাইয়া দেওয়া

* সৌমদন্তিষ্ঠৈব চ ইতি পাঠান্তর আছে।

হইল, ইহা কবির একটা কৌশল। পশ্চাতে অর্জুনের যে করুণাময়ী মনোমোহিনী উক্তি লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য এখন হইতে উদ্যোগ হইতেছে।

অপর্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।

পর্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ ॥ ১০ ॥

ভীষ্মাভিরক্ষিত আমাদের সেই সৈন্য অসমর্থ। আর ইহাদিগের ভীষ্মাভিরক্ষিত সৈন্য সমর্থ। ১০।

পর্যাপ্ত এবং অপর্যাপ্ত শব্দের অর্থ শ্রীধর স্বামী'র টীকানুসারে করা গেল। অন্যে অর্থ করিয়াছেন—পরিমিত এবং অপরিমিত।

অয়নেষু চ সর্বেষু যথাভাগমবাস্তিতাঃ।

ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তুঃ সর্ব্ব এব হি ॥ ১১ ॥

আপনারা সকলে স্ব-স্ব বিভাগানুসারে সকল ব্যুহদ্বারে অবাস্তি করিয়া ভীষ্মকে রক্ষা করুন। ১১।

ভীষ্ম দুর্যোধনের সেনাপতি।

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।

সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধেদ্রা প্রতাপবান্ ॥ ১২ ॥

(তখন) প্রতাপবান্ কুরুবৃদ্ধ পিতামহ (ভীষ্ম) দুর্যোধনের হর্ষ জন্মাইয়া উচ্চ সিংহনাদ করতঃ শঙ্খধ্বনি করিলেন। ১২।

পূর্ব্বকালে রথিগণ যুদ্ধের পূর্ব্ব শঙ্খধ্বনি করিতেন। ভীষ্ম দুর্যোধনের পিতামহের ভাই।

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্যাশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।

সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোহভবৎ ॥ ১৩ ॥

তখন শঙ্খ, ভেরী, পণব, আনক, গোমুখ সকল (বাদ্যযন্ত্র) সহসা আহত হইলে সে শব্দ তুমুল হইয়া উঠিল। ১৩।

ততঃ শ্বেতৈহৈষ্যুক্তৈ মহতি স্যান্দনে স্থিতৌ।

মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্নুতুঃ ॥ ১৪ ॥

তখন শ্বেতাশ্বযুক্ত মহারথে স্থিত কৃষ্ণাৰ্জুন দিব্য শঙ্খ বাজাইলেন। ১৪।

পাণ্ডজন্যাং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।

পৌণ্ড্রং দধেদ্রা মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ ॥ ১৫ ॥

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।

নকুলঃ সহদেবশ্চ সূঘোষমণিপুত্ৰপকৌ ॥ ১৬ ॥

কৃষ্ণ পাণ্ডজন্য নামে শঙ্খ, অর্জুন দেবদত্ত এবং ভীমকর্মা ভীম পৌণ্ড্র নামে মহাশঙ্খ বাজাইলেন। কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয়, নকুল সূঘোষ, এবং সহদেব মণিপুত্রপক (নামে) শঙ্খ বাজাইলেন। ১৫। ১৬।

কাশ্যাশ্চ পরমেস্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।

ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭ ॥

দ্রুপদো দ্রোপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।

সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্নুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮ ॥

পরম ধনুর্ধর কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, অপরাজিত সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রোপদীর পুত্রগণ, মহাবাহু সূভদ্রাপুত্র,—হে পৃথিবীপতে! ইহারা সকলেই পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খ বাজাইলেন। ১৭। ১৮।

স ঘোষো ধাত্ত্বরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।

নভশ্চ পৃথিবীণৈব তুমুলোহভান্দনাদয়ন্ ॥ ১৯ ॥*

সেই শব্দ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগের হৃদয় বিদীর্ণ করিল ও আকাশ এবং পৃথিবীকে তুমুল ধ্বনিত করিল। ১৯।

তুমুলো ব্যান্দনাদয়ন্ ইতি পাঠান্তর আছে।

ষষ্ঠিকম রচনাবলী

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কর্পিধ্বজঃ ।
 প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুর্দ্যম পাণ্ডবঃ ।
 হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ॥ ২০ ॥

পরে হে মহীপতে!* ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে ব্যবস্থিত দেখিয়া অস্ত্রনিষ্ক্ষেপে প্রবৃত্ত কর্পিধ্বজ অর্জুন ধনু উত্তোলন করিয়া হৃষীকেশকে এই কথা বলিলেন। ২০।

“ব্যবস্থিত” শব্দের ব্যাখ্যায় শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন, “যুদ্ধোদ্যোগে অবস্থিত।”

অর্জুন উবাচ ।

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেহচ্যুত ॥ ২১ ॥
 যাবদেতান্নিরীক্ষেহহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্ ।
 কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥ ২২ ॥
 যোৎসামানানবেক্ষেহহং য এতেহহ সমাগতাঃ ।
 ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দ্ববুদ্ধৈর্দ্বৈ প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩ ॥

অর্জুন বলিলেন—

যাহারা যুদ্ধ-কামনায় অবস্থিত, আমি যাবৎ তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করি, এই রণসমুদ্যমে কাহাদিগের সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে (যাবৎ তাহা দেখি), যাহারা দ্বন্দ্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রের প্রিয়চিকীর্ষায় এইখানে যুদ্ধে সমাগত হইয়াছে, সেই সকল যুদ্ধার্থীদিগকে (যাবৎ) আমি দেখি, (তাবৎ) তুমি উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন কর। ২১। ২২। ২৩।

সঞ্জয় উবাচ ।

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত ।
 সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥ ২৪ ॥
 ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাণ্ড মহীক্ষিতাম্ ।
 উবাচ পার্থ পশ্যেতান্ সমবেতান্ কুরুর্নিতি ॥ ২৫ ॥

সঞ্জয় বলিলেন—

হে ভারত!* অর্জুন কর্তৃক হৃষীকেশ এইরূপ অভিহিত হইয়া উভয় সেনার মধ্যে ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখ সকল রাজগণের সম্মুখে সেই উৎকৃষ্ট রথ স্থাপন করিয়া কহিলেন, হে পার্থ! সমবেত কুরুগণকে এই নিরীক্ষণ কর। ২৪। ২৫।

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্ ।
 আচার্য্যাত্মাতুলান্ ভ্রাতৃন পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তুথা ॥
 শ্বশুরান্ সূহৃদশৈচব সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২৬ ॥

তখন অর্জুন সেইখানে স্থিত উভয় সেনায় পিতৃব্যগণ, পিতামহগণ, আচার্য্যগণ, মাতুলগণ, ভ্রাতৃগণ, পুত্রগণ, পৌত্রগণ, শ্বশুরগণ, সখিগণ † এবং সূহৃদগণকে দেখিলেন। ২৬।

তান্ সমীক্ষ্য স কোত্তৈয়ঃ সর্বান্ বন্ধনবস্থিতান্ ।
 কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২৭ ॥

সেই কুস্তীপুত্র সেই সকল বন্ধগণকে অবস্থিত দেখিয়া, পরম কৃপাবিষ্ট হইয়া বিষাদপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন। ২৭।

অর্জুন উবাচ ।

দৃষ্টেদমান্ স্বজনান কৃষ্ণ যুযুৎসুন্ সমবস্থিতান্ । §
 সীদন্তি মম গাত্রাণি মূখণ্ড পরিশদৃশ্যতি ॥ ২৮ ॥

* বোধ করি পাঠকের স্মরণ আছে যে, সঞ্জয়োক্তি চলিতেছে। • সঞ্জয় কুরুক্ষেত্রের বৃত্তান্ত ধৃতরাষ্ট্রকে শুনাইতেছেন।

† ধৃতরাষ্ট্র এবং অর্জুন উভয়কেই “ভারত” বলিয়া এই গ্রন্থে সম্বোধন করা হইয়াছে, তাহার কারণ, ইহারা দ্বন্দ্বপুত্র ভারতের বংশ।

‡ সখা ও সূহৃদে অবশ্য প্রভেদ আছে। যাহার নিকট উপকার পাওয়া গিয়াছে, সেই সখা।

§ দৃষ্টেদমং স্বজনং কৃষ্ণ যুযুৎসুং সমবস্থিতম্ ইতি পাঠান্তর আছে।

অর্জুন বলিলেন—

হে কৃষ্ণ! এই যুদ্ধেচ্ছ, সম্মুখে অবস্থিত স্বজনগণকে দেখিয়া আমার শরীর অবসন্ন হইতেছে এবং মন্থ শব্দ হইতেছে। ২৮।

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।

গান্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ স্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥ ২৯ ॥

আমার দেহ কাঁপতেছে, রোমহর্ষ জন্মিতেছে, হস্ত হইতে গান্ডীব খসিয়া পড়িতেছে এবং চর্ম জ্বালা করিতেছে। ২৯।

ন চ শক্ৰোম্যবস্থা তুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।

নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০ ॥

হে কেশব! আমি আর থাকিতে পারিতেছি না, আমার মন যেন ভ্রান্ত হইতেছে, আমি দুর্লক্ষণ সকল দর্শন করিতেছি। ৩০।

ন চ শ্রেয়োহনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।

ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ নচ রাজ্যং সুখানি চ ॥ ৩১ ॥

যুদ্ধে আত্মীয়বর্গকে বিনাশ করার আমি কোন মঙ্গল দেখি না—হে কৃষ্ণ! আমি জয় চাই না, রাজ্যসুখ চাই না। ৩১।

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।

যেষামর্থৈ কাঙ্ক্ষতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥ ৩২ ॥

ত ইমেহবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।

আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩ ॥

মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।

এতান্ন হস্তুমিচ্ছামি ঘ্নাতোহপি মধুসূদন ॥ ৩৪ ॥

যাহাদিগের জন্য রাজ্য, ভোগ, সুখ কামনা করা যায়, সেই আচার্য্য, পিতা, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালা এবং কুটুম্বগণ যখন ধন প্রাণ ত্যাগ করিয়া এই যুদ্ধে অবস্থিত, তখন হে গোবিন্দ! আমাদের রাজ্যেই কাজ কি, ভোগেই কাজ কি, জীবনেই কাজ কি? হে মধুসূদন! আমি হত হই হইব, তথাপিও তাহাদিগকে মারিতে ইচ্ছা করি না। ৩২। ৩৩। ৩৪।

“আমি হত হই হইব (ঘ্নাতোহপি)” কথা তাৎপর্য্য এই যে, “আমি না মারিলে তাহারা আমাকে মারিয়া ফেলিতে পারে বটে। যদি তাই হয়, সেও ভাল, তথাপি আমি তাহাদিগকে মারিব না। বস্তৃতঃ ভীষ্ম, দ্রোণের সহিত অর্জুন এই ভাবেই যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অর্জুনের “মদ্র যুদ্ধের” কথা আমরা অনেক বার শুনিতো পাই।

অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিল্পু মহীকৃতে।

নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাঞ্জনাঙ্গর্দন ॥ ৩৫ ॥

পৃথিবীর কথা দূরে থাক, ত্রৈলোক্যের রাজ্যের জন্যই বা ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণকে বধ করিলে কি সুখ হইবে, জনাঙ্গর্দন?। ৩৫।

পাপমেবাপ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।

তস্মান্নাহা বয়ং হস্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্।*

স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৬ ॥

এই আততায়ীদিগকে বিনাশ করিলে আমাদের পাপ আশ্রয় করিবে, অতএব আমরা সবান্ধব ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগকে বিনাশ করিতে পারিব না। হে মাধব! স্বজন হত্যা করিয়া আমরা কি প্রকারে সুখী হইব?। ৩৬।

ছয় জনকে আততায়ী বলে—

অগ্নিদো গরলশৈব শস্ত্রপাণিধনাপহঃ।

ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়্ভেতে আততায়িনঃ ॥

যে ঘরে আগুন দেয়, যে বিষ দেয়, শস্ত্রপাণি, ধনাপহারী, ভূমি যে অপহরণ করে ও বিনতা অপহরণ করে, এই ছয় জন আততায়ী। অর্থশাস্ত্রানুসারে আততায়ী বধ্য। টীকাকারেরা

* স্ববান্ধবান্ ইতি পাঠান্তর আছে।

বিশ্বকম রচনাবলী

অজ্ঞানের বাক্যের এইরূপ অর্থ করেন যে, যদিও অর্থশাস্ত্রানুসারে আততায়ী বধ্য, তথাপি ধর্মশাস্ত্রানুসারে গুরু প্রভৃতি অবধ্য। ধর্মশাস্ত্রের কাছে অর্থশাস্ত্র দুর্বল, সুতরাং দ্রোণ ভীষ্মাদি আততায়ী হইলেও তাহাদিগের বধে পাপাশ্রয় হইবে। একালে আমরা "Law" এবং "Morality" মধ্যে যে প্রভেদ করি, এ বিচার ঠিক সেইরূপ। "Law"র উপর "Morals"। ইংরেজের পিনাল কোডেও লিখে যে, অবস্থাবিশেষে আততায়ীর বধজন্য দণ্ড নাই। কিন্তু সেই সকল অবস্থায় আততায়ীর বধ সর্বত্র আধুনিক নীতিশাস্ত্রসঙ্গত নহে।

আনন্দগিরি এই শ্লোকের আর একটা অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন, এমনও বুঝাইতে পারে যে, গুরু প্রভৃতি বধ করিলে আমরাই আততায়ী হইব; সুতরাং আমাদের পাপাশ্রয় করিবে। "গুরুভ্রাতৃসহুংপ্রভৃতীনেতান্ হৃদ্বা বয়মাততায়িনঃ স্যামঃ।"

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যাস্তি লোভোপহতচেতসঃ।

কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥ ৩৭ ॥

কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্তিতুং।

কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যাস্তির্জনান্দর্ন ॥ ৩৮ ॥

যদ্যপি ইহারা লোভে হতজ্ঞান হইয়া কুলক্ষয়দোষ এবং মিত্রদ্রোহে যে পাতক, তাহা দেখিতেছে না, কিন্তু হে জনান্দর্ন! আমরা কুলক্ষয় করার দোষ দেখিতেছি, আমরা সে পাপ হইতে নিবর্তিবদ্ধিবিশিষ্ট কেন না হইব?। ৩৭। ৩৮।

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যাস্তি কুলধর্মাঃ সনাতনাঃ।

ধর্মো নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্মোহভিভবত্যুত ॥ ৩৯ ॥

কুলক্ষয়ে সনাতন কুলধর্ম নষ্ট হয়। ধর্ম নষ্ট হইলে অবশিষ্ট কুল অধর্ম অভিভূত হয়। ৩৯।

সনাতন কুলধর্ম—অর্থাৎ পূর্বপুরুষপরম্পরা-প্রাপ্ত কুলধর্ম।

অধর্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যাস্তি কুলস্থিরঃ।

স্ত্রীষু দৃষ্টাসু বাষ্কোয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪০ ॥

হে কৃষ্ণ! অধর্মাভিভবে কুলস্ত্রীগণ দৃষ্টা হয়, স্ত্রীগণ দৃষ্টা হইলে, হে বাষ্কোয়!* বর্ণসঙ্কর জন্মায়। ৪০।

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘানাং কুলস্য চ।

পতাস্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডাদকক্রিয়াঃ ॥ ৪১ ॥

এই সঙ্কর কুলনাশকারীদিগের ও তাহাদের কুলের নরকের নিমিত্ত হয়। পিণ্ডাদকক্রিয়ার লোপ হেতু তাহাদিগের পিতৃগণ পতিত হয়। ৪১।

দৌষেরেতৈঃ কুলঘানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।

উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্মাঃ কুলধর্মাশ্চ শাস্বতাঃ ॥ ৪২ ॥

এইরূপ কুলঘাদিগের বর্ণসঙ্করকারক এই দোষে জাতিধর্ম এবং সনাতন কুলধর্ম উৎসন্ন যায়। ৪২।

উৎসন্নকুলধর্মানাং মনুষ্যাণাং জনান্দর্ন।

নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥ ৪৩ ॥

হে জনান্দর্ন! আমরা শুনিয়াছি যে, যে মনুষ্যদিগের কুলধর্ম উৎসন্ন যায়, তাহাদিগের নিয়ত নরকে বাস হয়। ৪৩।

৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, এই পাঁচটি শ্লোক আধুনিক কৃতবিদ্য পাঠকদিগের কানে ভাল লাগিবে না। ইহা বর্ণসঙ্কর-বিরোধী প্রাচীন কুসংস্কারপূর্ণ বলিয়া বোধ হইবে, তার উপর "লুপ্তপিণ্ডাদকক্রিয়াঃ" প্রভৃতি অলঙ্কারও আছে। বর্ণসঙ্করের উপর গীতাকারের বিশেষ বিদ্বেষ দেখা যায়। ইনি স্বয়ং ভগবানের মুখেও বর্ণসঙ্করের নিন্দা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। আমরা যখন তদ্বিষয়িণী ভগবদুক্তির সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব, তখন তদুক্তির তাৎপর্য বৃদ্ধিবার চেষ্টা করিব। এক্ষণে অজ্ঞানোক্তির স্থূল মর্ম বৃদ্ধিলেই যথেষ্ট হইল। কুলের পুরুষগণ মরিলে কুলস্ত্রীগণ যে ব্যাভিচারিণী হয়, ইহা সচরাচর দেখা যায়। কুলস্ত্রীগণ

* কৃষ্ণ বৃষ্ণিবংশসম্ভূত, এজন্য বাষ্কোয়।

ব্যভিচারিণী হইলে তাহাদিগের গর্ভে নীচ লোকের ঔরসে সন্তান জন্মিতে থাকে। বংশ নীচসন্ততিতে পরিপূর্ণ হয়, কাজেই কুলধর্ম লোপ পায়। বর্ণসঙ্করে যাঁহারা দোষ না দেখেন, এবং পিণ্ডাদির স্বর্গকারকতায় যাঁহারা বিশ্বাসবান্ নহেন—স্বর্গ নরকাদিও যাঁহারা মানেন না, তাঁহারাও বোধ করি, এতটুকু স্বীকার করিবেন।* বাকীটুকু কালোচিত ভাষা এবং অলঙ্কার।† কথটা অতি মোটা কথা বটে। কথটা অর্জুনের মূখে বসাইবার একটু কারণ আছে—অর্জুনের এই “কুলধর্মের” বড়াইয়ের উত্তরে ভগবান্ “স্বধর্মের” কথাটা তুলিবেন। এটুকু গ্রন্থকারের কৌশল। “ন কাঙ্ক্ষ বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ” এই অমৃতময় বাক্যের পর বলিবার যোগ্য কথা এ নহে।

অহো বত মহৎ পাপং কৰ্ত্ত্বং ব্যবসিতা বয়ং।

যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমদ্যতাঃ ॥ ৪৪ ॥

হায়! আমরা রাজ্যসুখলোভে স্বজনকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছি—মহৎ পাপ করিতে অধ্যবসায় করিয়াছি। ৪৪।

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।

ধাত্ত্বরাষ্ট্রা রণে হন্যস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥

যদি আমি প্রতীকারপরাঙ্মুখ এবং অশস্ত্র হইলে শস্ত্রধারী ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ যুদ্ধে আমাকে বিনাশ করে, তাহাও আমার পক্ষে অপেক্ষাকৃত মঙ্গলকর হইবে। ৪৫।

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা অর্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপা বিশৎ।

বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৬ ॥

সঞ্জয় বলিলেন—

অর্জুন এইরূপ বলিয়া শোকাকুল মানসে ধনুর্বাণ পরিত্যাগ করিয়া সংগ্রামস্থলে রথোপস্থ উপবেশন করিলেন। ৪৬।

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসু পনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে

শ্রীকৃষ্ণা অর্জুনসম্বাদে অর্জুনবিষাদোঃ

নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ।

* The women, for instance, whose husbands, friends or relations have been all slain in battle, no longer restrained by law, seek husbands among other and lower castes, or tribes, causing a mixture of blood, which many nations at all ages have regarded as a most serious evil; but particularly those who—like the Aryans, the Jews and the Scotch—were at first surrounded by foreigners very different to themselves, and thus preserved the distinction and genealogies of their races more effectively than any other.

(Thomson's *Translation of the Bhagavadgita*, p. 7.)

By the destruction of the males the rites of both tribe and family would cease, because women were not allowed to perform them; and confusion of castes would arise, for the women would marry men of another caste. Such marriages were considered impure (Manu, x. 1-40). Such marriages produced elsewhere a confusion of classes. Livy tells us that the Roman patricians at the instance of Canuleius complained of the intermarriages of the plebian class with their own, affirming that “omnia divina humanaque turbare, ut qui natus sit, ignoret, cujus sanguinis, quorum sacrorum sit.”

(Davies' *Translation of the Bhagavadgita*, p. 26)

† In bringing forward these and other melancholy superstitions of Brahmanism in the mouth of Arjuna, we are not to suppose that our poet—though as much Brahman as philosopher in many unimportant points of belief—himself received and approved of them. (Thomson, p. 7.)

‡ কোন কোন পুস্তকে “সৈন্যদর্শনং” ইতি পাঠ আছে।

বাঁকম রচনাবলী

বলিয়াছি, গীতার প্রথম অধ্যায়ে ধর্মতত্ত্ব কিছু নাই, কিন্তু এই অধ্যায় একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য। কাব্যের উপাদান সকল এখানে বড় সুন্দর সাজান হইয়াছে। কুরুক্ষেত্রে উভয় সেনা সুসজ্জিত হইয়া পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছে। পাণ্ডবদিগের মহতী সেনা ব্যূহবদ্ধা হইয়াছে দেখিয়া রাজা দুর্যোধন, পরম রণপণ্ডিত আপনার আচার্য্যকে দেখাইলেন। একটু ভীত হইয়া আচার্য্যকে বলিলেন, “আপনারা আমার সেনাপতি ভীষ্মকে রক্ষা করিবেন।” কিন্তু সেই বৃদ্ধ ভীষ্ম যুবর অপেক্ষাও উদ্যমশীল—তিনি সেই সময়ে সিংহনাদ করিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন—(শঙ্খ তখনকার bugle)। তাঁহার শঙ্খধ্বনি শুনিয়া উৎসাহে বা প্রত্যুত্তরে উভয় সৈন্যস্থ যোদ্ধগণ সকলেই শঙ্খধ্বনি করিলেন। তখন উভয় দলে নানাবিধ রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল—শঙ্খে, ভেরীতে, অন্যান্য বাদ্যের কোলাহলে গগন বিদীর্ণ হইল—আকাশ পৃথিবী তুমুল হইয়া উঠিল। সেই মহোৎসাহের সময়ে স্থিরাচিত্ত অর্জুন—যাঁহার উপরে কোরব-জয়ের ভার—আপনার সারথি কৃষ্ণকে বলিলেন—“একবার উভয় সেনার মধ্যে রথ রাখ দেখ—দেখ, কাহার সঙ্গে আমায় যুদ্ধ করিতে হইবে।” কৃষ্ণ, শ্বেতাশ্বত্থ মহারথ উভয় সেনার মধ্যে স্থাপিত করিলেন,—সর্বস্ত্র সর্বকর্তা বলিলেন, “এই দেখ।” অর্জুন দেখিলেন, দুই দিকেই ত আপনার জন,—পিতৃব্য, পিতামহ, পুত্র, পৌত্র, মাতুল, শ্বশুর, শ্যালক, সুহৃৎ, সখা—তাঁহার গা কাঁপিয়া উঠিল, শরীরে রোমাঞ্চ হইল, মূখ শুকাইল, দেহ অবসন্ন হইল, মাথা ঘুরিল, হাত হইতে সেই মহাধনু গাণ্ডীব খসিয়া পড়িল। বলিলেন, “কৃষ্ণ! রাজ্য যাদের জন্য, তাদের মারিয়া রাজ্যে কি ফল?—আমি যুদ্ধ করিব না।” এই সংগ্রামক্ষেত্র, দুই দিকে দুই মহতী সেনা, এই তুমুল কোলাহল, রণবাদ্য এবং ঘোরতর উৎসাহ—সেই সময়ে এই মহাবীরের প্রথমে ঈর্ষ্যা, তার পর তাঁহার হৃদয়ে সেই করুণ এবং মহান্ প্রশান্ত ভাব—এরূপ মহাচিত্র সাহিত্যজগতে দুর্লভ। “ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ নচ রাজ্যং সুখানি চ”—ঈদৃশী অমৃতময়ী বাণী আর কে কোথায় শুনিয়াছে?

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ

সঞ্জয় উবাচ।

তন্তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপদুর্গাকুলেক্ষণম্ ।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১ ॥

সঞ্জয় বলিলেন—

তখন সেই কৃপাবিষ্ট অশ্রুপদুর্গাকুললোচন বিষাদযুক্ত (অর্জুন)কে মধুসূদন এই কথা বলিলেন। ১।

শ্রীভগবান্ উবাচ।

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্ ।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন ॥ ২ ॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন—

হে অর্জুন! এই সঙ্কটে অনার্য্যসেবিত স্বর্গহানিকর এবং অকীর্তিকর তোমার এই মোহ কোথা হইতে উপস্থিত হইল? ২।

মা ক্লৈবাং গচ্ছ কোন্তেয়* নৈতৎ ত্বয়্যুপপদ্যতে ।

ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্তেদ্বান্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩ ॥

হে কোন্তেয়! ক্লীবতা প্রাপ্ত হইও না, ইহা তোমার উপযুক্ত নহে। হে পরন্তপ! ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য পরিত্যাগ করিয়া উত্থান কর। ৩।

অর্জুন উবাচ।

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন ।

ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজাহাবীরসূদন ॥ ৪ ॥

অর্জুন বলিলেন—

হে শত্রুনিসূদন মধুসূদন! পূজাহা যে ভীষ্ম এবং দ্রোণ, যুদ্ধে তাঁহাদের সহিত বাণের দ্বারা কি প্রকারে আমি প্রতিযুদ্ধ করিব?। ৪।

* “ক্লৈবাং মা স্ম গমঃ পার্থ” ইতি আনন্দগিরি-ধৃত পাঠ।

গুরুনহস্তা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে ।
হস্তার্থকামাংস্তু গুরুনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিক্তান্ ॥ ৫ ॥

মহানুভব গুরুদিগকে বধ না করিয়া ইহলোকে ভিক্ষা অবলম্বন করিতে হয়, সেও শ্রেয়। আর গুরুদিগকে বধ করিয়া যে অর্থ কাম ভোগ করা যায়, তাহা রুধিরলিপ্ত। ৫।

ন চৈতদ্বিন্মঃ কতরনো গরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ঃ ।
যানেব হস্তা ন জিজীবিষাম-
স্তেহবস্তুতাঃ প্রমুখে ধাত্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬ ॥

আমরা জয়ী হই বা আমরাদিগকে জয় করুক, ইহার মধ্যে কোনটি শ্রেয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না—যাহাদিগকে বধ করিয়া আমরা বাঁচিতে ইচ্ছা করি না, সেই ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ সম্মুখে অবস্থিত। ৬।

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমুঢ়চেতাঃ ।
যচ্ছেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রুহি তন্মে
শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥ ৭ ॥

কার্পণ্য-দোষে আমি অভিভূত হইয়াছি এবং ধর্ম সম্বন্ধে আমার চিন্তা বিমুঢ় হইয়াছে, তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। যাহা ভাল হয়, আমাকে নিশ্চিত করিয়া বল। আমি তোমার শিষ্য এবং তোমার শরণাপন্ন হইতেছি—আমাকে শিক্ষা দাও। ৭।

কার্পণ্য অর্থে দীনতা। তারানাথ 'বাচস্পত্যে' এই অর্থ নির্দেশ করিয়া উদাহরণস্বরূপ গীতার এই বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভরসা করি, কোন পাঠকই এখানে দীনতা অর্থে দারিদ্র্য বুঝিবেন না। 'দীন' অর্থে মহাব্যসনপ্রাপ্ত। উদাহরণস্বরূপ—তারানাথ রামায়ণ হইতে আর একটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথাঃ—“মহত্বা ব্যসনং প্রাপ্তো দীনঃ কৃপণ উচ্যতে।” আনন্দ-গিরি বলেন—“যোহুপাং স্বলপামপি স্বক্ষতিং ন ক্ষমতে স কৃপণঃ।” যে সামান্য ক্ষতি স্বীকার করিতে পারে না, সেই কৃপণ।* শ্রীধর স্বামী বুঝাইয়াছেন যে, “এই সকল বন্ধুবর্গকে নষ্ট করিয়া কি প্রাণ ধারণ করিব?” অজ্ঞানের ইতি বুদ্ধিই কার্পণ্য। তিনি “কার্পণ্যদোষ” ইতি সমাসকে দ্বন্দ্ব সমাস বুঝিয়াছেন—কার্পণ্য এবং দোষ। দোষ শব্দে এখানে পূর্ব্বকথিত কুলক্ষয়কৃত পাপ বুঝিতে হইবে। অন্যান্য টীকাকারেরা সেরূপ অর্থ করেন নাই।

নহি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্-
যচ্ছেকমুচ্ছেষণমিন্দ্রিয়ানাম্ ।
অবাপ্য ভূমাবসপত্তমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥ ৮ ॥

পৃথিবীতে অসপত্ত সমৃদ্ধ রাজ্য এবং সুরলোকের আধিপত্য পাইলেও যে শোক আমার ইন্দ্রিয়গণকে বিশেষণ করিবে, তাহা কিসে যাইবে, আমি দেখিতেছি না। ৮।

সঞ্জয় উবাচ ।

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরস্তপঃ ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তুষ্ণীং বভূব হ ॥ ৯ ॥

সঞ্জয় বলিতেছেন—

শত্রুজয়ী অজ্ঞান † হৃষীকেশকে এইরূপ বলিয়া, যুদ্ধ করিব না, ইহা গোবিন্দকে বলিয়া তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিলেন। ৯।*

* কাশীনাথ গ্রাম্বক তেলাং “কার্পণ্য” শব্দের প্রতিবাক্য দিয়াছেন “helplessness.”

† মূলে “গুড়াকেশ” শব্দ আছে। গুড়াকেশ অজ্ঞানের একটি নাম। টীকাকারেরা ইহার অর্থ করেন ‘নিদ্রাজয়ী’। অন্যবিধ অর্থও দেখা গিয়াছে।

বাংলা রচনাবলী

তম্ভাচ হৃষীকেশঃ প্রহসান্নিব ভারত।

সেনরোরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০ ॥

হে ভারত! হৃষীকেশ হাস্য করিয়া উভয় সেনার মধ্যে বিষাদপর অর্জুনকে এই কথা বলিলেন। ১০।

শ্রীভগবান্ উবাচ।

অশোচ্যানবশোচস্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।

গতাসুনগতাসুংশ্চ নানুশোচান্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

তুমি বিজ্ঞের ন্যায় কথা কহিতেছ বটে; কিন্তু যাহাদের জন্য শোক করা উচিত নহে, তাহাদের জন্য শোক করিতেছ। কি জীবিত, কি মৃত, কাহারও জন্য পণ্ডিতেরা শোক করেন না। ১১।

এইখানে প্রকৃত গ্রন্থারম্ভ। এখন কি কথাটা উঠিতেছে, তাহা বুঝিয়া দেখা যাউক।

দুর্যোধনাদি অন্যায়পদ্বর্ষক পাণ্ডবদিগের রাজ্যাপহরণ করিয়াছে। যুদ্ধ বিনা তাহার পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। এখানে যুদ্ধ কি কর্তব্য?

মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে এই কথাটার অনেক বিচার হইয়াছে। বিচারে স্থির হইয়াছিল যে, যুদ্ধই কর্তব্য। তাই এই উভয় সেনা সংগৃহীত হইয়া পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছে।

এ অবস্থায় যুদ্ধ কর্তব্য কি না, আধুনিক নীতির অনুগামী হইয়া বিচার করিলেও আমরা পাণ্ডবদিগের সিদ্ধান্তের যথার্থ স্বীকার করিব। এই জগতে যত প্রকার কৰ্ম্ম আছে, তন্মধ্যে সচরাচর যুদ্ধই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। কিন্তু ধর্ম্মযুদ্ধও আছে। আমেরিকায় ওয়াশিংটন, ইউরোপে উইলিয়ম দি সাইলেন্ট, এবং ভারতবর্ষে প্রতাপসিংহ প্রভৃতি যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা পরম ধর্ম্ম—দানাদি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। পাণ্ডবদিগেরও এই যুদ্ধপ্রবৃত্তি সেই শ্রেণীর ধর্ম্ম। এ বিচার আমি কৃষ্ণচারিত্রে সবিস্তারে করিয়াছি—এক্ষণে সে সকল পুনরুক্ত করিবার প্রয়োজন নাই* এ বিচারের স্থূল মর্ম্ম এই যে, যেটি যাহার ধর্ম্মানুমত অধিকার, তাহার সাধ্যানুসারে রক্ষা করা তাহার ধর্ম্ম। রক্ষার অর্থ এই যে, কেহ অন্যায়পদ্বর্ষক তাহার অপহরণ বা অবরোধ করিতে না পারে; করিলে তাহার পুনরুদ্ধার এবং অপহর্তার দণ্ডবিধান করা কর্তব্য। যদি লোকে স্বেচ্ছামত পরকে অধিকারচ্যুত করিয়া স্বচ্ছন্দে পরস্বাপহরণপদ্বর্ষক উপভোগ করিতে পারে, তবে সমাজ এক দিন টিকে না। সকল মনুষ্যই তাহা হইলে অনন্ত দুঃখ ভোগ করিবে। অতএব আপনার সম্পত্তির পুনরুদ্ধার কর্তব্য। যদি বল ভিন্ন অন্য সদুপায় থাকে, তবে তাহাই অগ্রে অবলম্বনীয়। যদি বল ভিন্ন সদুপায় না থাকে, তবে বলই প্রযোজ্য। এখানে বলই ধর্ম্ম।

মহাভারতে দেখি যে, অর্জুন ইতিপদ্বর্ষে সকল সময়েই যুদ্ধপক্ষ ছিলেন। যখন যুদ্ধে স্বজনবধের সময় উপস্থিত হইল, বধ্য স্বজনবর্গের মূখ দেখিয়া তিনি যে কাতরচিত্ত ও যুদ্ধবৃদ্ধি হইতে বিচলিত হইবেন, ইহাও সজ্জনস্বভাবসুলভ ভ্রান্তি।

মহাভারতে ইহাও দেখিতে পাই যে, যাহাতে যুদ্ধ না হয়, তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। পরে যখন যুদ্ধ অলংঘ্য হইয়া উঠিল, তখন তিনি যুদ্ধে কোন পক্ষে রতী হইতে অস্বীকৃত হইয়া, কেবল অর্জুনের সারথ্য মাত্র স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত হইলেও তিনি পরম ধর্ম্মজ্ঞ, সুতরাং এ স্থলে ধর্ম্মের পথ কোন্টা, তাহা অর্জুনকে বুঝাইতে বাধ্য। অতএব অর্জুনকে বুঝাইতেছেন যে, যুদ্ধ করাই এখানে ধর্ম্ম, যুদ্ধ না করাই অধর্ম্ম।

বাস্তবিক যে, যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধারম্ভসময়ে কৃষ্ণাৰ্জুনে এই কথোপকথন হইয়াছিল, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু গীতাকার এইরূপ কল্পনা করিয়া কৃষ্ণপ্রচারিত ধর্ম্মের সার মর্ম্ম সংকলিত করিয়া মহাভারতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, ইহা বিশ্বাস করা যাইতে পারে।

যুদ্ধে প্রবৃত্তিসূচক যে সকল উপদেশ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দিতেছেন, তাহা এই দ্বিতীয় অধ্যায়েই আছে। অন্যান্য অধ্যায়েও “যুদ্ধ কর” এইরূপ উপদেশ দিয়া ভগবান্ মধ্যে মধ্যে

* এবং নবজীবন, প্রথম খণ্ড দেখ।

আপনার বাক্যের উপসংহার করেন বটে, কিন্তু সে সকল বাক্যের সঙ্গে যুদ্ধের কর্তব্যতার বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। ইহাই বোধ হয় যে, যে কৌশলে গ্রন্থকার এই ধর্মব্যাখ্যার প্রসঙ্গ মহাভারতের সঙ্গে সম্বন্ধ করিয়াছেন, তাহার অপ্রকৃততা পাঠক অনুভূত করিতে না পারেন, এই জন্য যুদ্ধের কথাটা মধ্যে মধ্যে পাঠককে স্মরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। নতুবা যুদ্ধপক্ষ সমর্থন এই গ্রন্থের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে। যুদ্ধপক্ষ সমর্থনকে উপলক্ষ্য করিয়া সমস্ত মনুষ্যধর্মের প্রকৃত পরিচয় প্রচারিত করাই ইহার উদ্দেশ্য।

এই কথাটা বিশেষ করিয়া আলোচনা করিলে, বোধ হয়, পাঠক মনে মনে বুঝিবেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে উভয় সেনার সম্মুখে রথ স্থাপিত করিয়া, কৃষ্ণার্জুনে যথার্থ এইরূপ কথোপকথন যে হইয়াছিল, তাহাতে বিশেষ সন্দেহ! দুই পক্ষের সেনা ব্যাহিত হইয়া পরস্পরকে প্রহার করিতে উদ্যত, সেই সময়ে যে এক পক্ষের সেনাপতি উভয় সৈন্যের মধ্যে রথ স্থাপন করিয়া অষ্টাদশ অধ্যায় যোগধর্ম শ্রবণ করিবেন, এ কথাটা বড় সম্ভবপর বলিয়াও বোধ হয় না। এ কথার যৌক্তিকতা স্বীকার করা যাউক না যাউক, পাঠকের আর কয়েকটি কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য।

(১) গীতায় ভগবৎপ্রচারিত ধর্ম সংকলিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু গীতাগ্রন্থখানি ভগবৎপ্রণীত নহে, অন্য ব্যক্তি ইহার প্রণেতা।

(২) যে ব্যক্তি এই গ্রন্থের প্রণেতা, তিনি যে কৃষ্ণার্জুনের কথোপকথনকালে সেখানে উপস্থিত থাকিয়া সকলই স্বকর্ণে শুনিয়াছিলেন, এবং শুনিয়া সেইখানে বসিয়া সব লিখিয়াছিলেন বা স্মৃতিধরের মত স্মরণ রাখিয়াছিলেন, এমন কথাও বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। সুতরাং যে সকল কথা গীতাকার ভগবানের মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন, সে সকলই যে প্রকৃত পক্ষে ভগবানের মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল, এমন বিশ্বাস করা যায় না। অনেক কথা যে গ্রন্থকারের নিজের মত, তিনি ভগবানের মুখ হইতে বাহির করিতেছেন, ইহা সম্ভব।

যাঁহারা বলিবেন যে, এই গ্রন্থ মহাভারতান্তর্গত, মহাভারত মহর্ষি ব্যাস-প্রণীত, তিনি যোগবলে সর্বজ্ঞ এবং অদ্রাস্ত, অতএব এরূপ সংশয় এখানে অকর্তব্য, তাঁহাদিগের সঙ্গে আমাদের কোন বিচার হইতে পারে না। সে শ্রেণীর পাঠকের জন্য এই ব্যাখ্যা প্রণীত হয় নাই, ইহা আমার বলা রহিল।

(৩) সংস্কৃত সকল গ্রন্থে মধ্যে মধ্যে প্রক্ষিপ্ত শ্লোক পাওয়া যায়। শঙ্করাচার্যের ভাষ্য প্রণীত হইবার পর কোন শ্লোক গীতায় প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে নাই, তাঁহার ভাষ্যের সঙ্গে এখন প্রচলিত মূলের ঐক্য আছে। কিন্তু শঙ্করাচার্যের অন্যান্য সহস্র বা ততোধিক বৎসর পূর্বেও গীতা প্রচলিত ছিল। এই কাল মধ্যে যে কোন শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হয় নাই, তাহা কি প্রকারে বলিব? আমরা মধ্যে মধ্যে এমন শ্লোক পাইব, যাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই বোধ হয়।

এই সকল কথা স্মরণ না রাখিলে আমরা গীতার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে পারিব না। এ জন্য আগেই এই কয়টি কথা বলিয়া রাখিলাম। এক্ষণে দেখা যাউক, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের এই যুদ্ধের ধর্ম্যতা বুঝাইতেছেন, সে সকল কথার সার মর্ম কি?

আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর নীতিশাস্ত্রের বশবর্তী হইয়া উপরে যে প্রণালীতে সংক্ষেপে এই যুদ্ধের ধর্ম্যতা বুঝাইলাম, শ্রীকৃষ্ণ যে সে প্রথা অবলম্বন করেন নাই, ইহা বলা বাহুল্য। তাঁহার কথার স্কুল মর্ম এই যে, সকলেরই স্বধর্ম পালন করা কর্তব্য।

আগে আমাদের বুঝিয়া দেখা চাই যে, স্বধর্ম সামগ্রীটা কি?

শঙ্করাদি পূর্বপণ্ডিতগণের পক্ষে এ তত্ত্ব ব্রহ্মান বড় সহজ হইয়াছিল। অর্জুনে ক্ষত্রিয়, সুতরাং অর্জুনের স্বধর্ম ক্ষত্র ধর্ম বা যুদ্ধ। তিনি যে যুদ্ধ না করিয়া বরং বলিতেছিলেন যে, “ভিক্ষাবলম্বন করিব, সেও ভাল,” সেটা তাঁহার পরধর্মাবলম্বনের ইচ্ছা—কেন না, ভিক্ষা ব্রাহ্মণের ধর্ম।*

কিন্তু আমরা এই ব্যাখ্যায় সকল বুঝিলাম কি? বর্ণাশ্রমধর্মাবলম্বী হিন্দুগণের স্বধর্ম বর্ণবিভাগানুসারে নির্ণীত হইতে পারে, ইহা যেন বুঝিলাম। কিন্তু অহিন্দুর পক্ষে স্বধর্ম কি? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের যে সমষ্টি, তাহা পৃথিবীর লোকসংখ্যার অতি ক্ষুদ্রাংশ—

* শোকমোহাভ্যাং হাভিভূতবিবেকবিজ্ঞানঃ স্বতএব ক্ষত্রধর্ম যুদ্ধে প্রবৃত্তোহপি তস্মাদ্‌যুদ্ধাদ্‌-পররাম পরধর্মণ্ড ভিক্ষাজীবনাদিকং কর্তুং প্রবর্তে।—শঙ্করভাষ্য।

বিশ্বকম রচনাবলী

অধিকাংশ মনুষ্য চতুর্দিকের বাহির; তাহাদের স্বধর্ম নাই? জগদীশ্বর কি তাহাদের কোন ধর্ম বিহিত করেন নাই? কোটি কোটি মনুষ্য সৃষ্টি করিয়া কেবল ভারতবাসীর জন্য ধর্ম বিহিত করিয়া, আর সকলকেই ধর্মচ্যুত করিয়াছেন? ভগবদুক্ত ধর্ম কি হিন্দুর জন্যই? স্লেচ্ছেরা কি তাঁহার সন্তান নহে? ভাগবত ধর্ম এমন অনুদার নহে।

যিনি স্বয়ং জগদীশ্বরের এইরূপ ধর্মচ্যুতিতে বিশ্বাসবান্, তিনি খ্রীষ্টানের* তুল্য। আর যিনি তাহাতে বিশ্বাসবান্ নহেন, তিনি “স্বধর্মের” অন্য তাৎপর্যের অনুসন্ধান করিবেন সন্দেহ নাই।

যাহার যে ধর্ম, তাহার তাই স্বধর্ম। এখন মনুষ্যের ধর্ম কি? যাহা লইয়া মনুষ্যত্ব, তাহাই মনুষ্যের ধর্ম। কি লইয়া মনুষ্যত্ব? মানুষ্যের শরীর আছে, এবং মন† আছে। এই শরীরই বা কি? এবং মনই বা কি? শরীর কতকগুলি জড় পদার্থের সমবায়, তাহাতে কতকগুলি শক্তি আছে। এই শক্তিগুলি শরীর হইতে তিরোহিত হইলে মনুষ্যত্ব থাকে না; কেন না, মানুষ্যের মৃতদেহে মনুষ্যত্ব আছে, এমন কথা বলা যায় না। তবেই জড় পদার্থকে ছাড়িয়া দিতে হইবে—সেই দৈহিকী শক্তিগুলিই মনুষ্যশরীরের প্রকৃত উপাদান। আমি স্থানান্তরে এইগুলির নাম দিয়াছি—“শারীরিকী বৃত্তি”। মনুষ্যের মনও এইরূপ শক্তি বা বৃত্তির সমষ্টি। সেইগুলির নাম দেওয়া যাউক—মানসিক বৃত্তি। এখন দেখা যাইতেছে যে, এই শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি লইয়াই মানুষ বা মানুষ্যের মনুষ্যত্ব।

যদি তাই হইল, তবে সেই সকল বৃত্তিগুলির বিহিত অনুশীলনই মানুষ্যের ধর্ম।

বৃত্তির সঞ্চালন দ্বারা আমরা কি করি? হয় কিছু কর্ম করি, না হয় কিছু জানি। কর্ম ও জ্ঞান ভিন্ন মনুষ্যের জীবনে ফল আর কিছু নাই।‡

অতএব জ্ঞান ও কর্ম মানুষ্যের স্বধর্ম। সকল বৃত্তিগুলি সকলেই যদি বিহিতরূপে অনুষ্ঠিত করিত, তবে জ্ঞান ও কর্ম উভয়েই সকল মনুষ্যেরই স্বধর্ম হইত। কিন্তু মনুষ্য-সমাজের অপরিণতাবস্থায় তাহা সাধারণতঃ ঘটিয়া উঠে না।§ কেহ কেবল জ্ঞানকেই প্রধানতঃ স্বধর্মস্থানীয় করেন, কেহ কর্মকে ঐরূপ প্রধানতঃ স্বধর্মস্বরূপ গ্রহণ করেন।

জ্ঞানের চরমোদ্দেশ্য ব্রহ্ম; সমস্ত জগৎ ব্রহ্মে আছে। এ জন্য জ্ঞানার্জন যাহাদিগের স্বধর্ম, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলা যায়। ব্রাহ্মণ শব্দ ব্রহ্মান্ শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে।

কর্মকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা বুদ্ধিতে গেলে কর্মের বিষয়টা ভাল করিয়া বুদ্ধিতে হইবে। জগতে অন্তর্বিষয় আছে ও বহির্বিষয় আছে। অন্তর্বিষয় কর্মের বিষয়ীভূত হইতে পারে না, বহির্বিষয়ই কর্মের বিষয়। সেই বহির্বিষয়ের মধ্যে কতকগুলিই হউক অথবা সবই হউক, মনুষ্যের ভোগ্য। মনুষ্যের কর্ম মনুষ্যের ভোগ্য বিষয়কেই আশ্রয় করে। সেই আশ্রয় ত্রিবিধ, যথা (১) উৎপাদন, (২) সংযোজন বা সংগ্রহ, (৩) রক্ষা। (১) যাহারা উৎপাদন করে, তাহারা কৃষধর্মী; (২) যাহারা সংযোজন বা সংগ্রহ করে, তাহারা শিল্প বা বাণিজ্যধর্মী; এবং (৩) যাহারা রক্ষা করে, তাহারা যুদ্ধধর্মী। ইহাদিগের নামান্তর ব্যুৎক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এ কথা পাঠক স্বীকার করিতে পারেন কি?

স্বীকার করিবার প্রতি একটা আপত্তি আছে। হিন্দুদিগের ধর্মশাস্ত্রানুসারে এবং এই গীতার ব্যবস্থানুসারে কৃষি শূদ্রের ধর্ম নহে; বাণিজ্য এবং কৃষি, উভয়ই বৈশ্যের ধর্ম। অন্য

* খ্রীষ্টানদিগের বিশ্বাস যে, যে যীশুখ্রীষ্ট না ভজে, জগদীশ্বর তাহাকে অনন্তকাল জন্য নরকে নিক্ষেপ করেন।

† “মন” চলিত কথা, এই জন্য “মন” শব্দ ব্যবহার করিলাম। এই চলিত কথাটি ইংরেজী “mind” শব্দের অনুবাদ মাত্র। হিন্দুদর্শনশাস্ত্রের ভাষা ব্যবহার করিতে গেলে, ইহার পরিবর্তে বুদ্ধি ও মন উভয় শব্দ এবং তৎসঙ্গে অহঙ্কার এই তিনটি শব্দই ব্যবহার করিতে হইবে। তাহার পরিবর্তে “matter and mind” এই বিভাগের অনুবর্তী হওয়াই ভাল।

‡ কোমৎ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ তিন ভাগে চিত্তপরিণতিকে বিভক্ত করেন, Thought, Feeling, Action,” ইহা ন্যায্য। কিন্তু Feeling অবশেষে Thought কিম্বা Action প্রাপ্ত হয়। এই জন্য পরিণামের ফল জ্ঞান ও কর্ম এই দ্বিবিধ বলাও ন্যায্য।

§ আমি উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপকেও সমাজের অপরিণতাবস্থা বলিতেছি।

তিন বর্ণের পরিচর্য্যাই শূদ্রের ধর্ম। এখনকার দিনে দেখিতে পাই, কৃষি প্রধানতঃ শূদ্রেরই ধর্ম। কিন্তু অন্য তিন বর্ণের পরিচর্য্যায় এখনকার দিনে প্রধানতঃ শূদ্রেরই ধর্ম। যখন জ্ঞানধর্মী, যুদ্ধধর্মী, বাণিজ্যধর্মী বা কৃষিধর্মীর কর্মের এত বাহুল্য হয় যে, তদ্ব্যঙ্গগণ আপনাদিগের দৈহিকাদি প্রয়োজনীয় সকল কর্ম সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারে না, তখন কতকগুলি লোক তাহাদিগের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হয়। অতএব (১) জ্ঞানার্জন বা লোকশিক্ষা, (২) যুদ্ধ বা সমাজরক্ষা, (৩) শিল্প বা বাণিজ্য, (৪) উৎপাদন বা কৃষি, (৫) পরিচর্য্যায় এই পঞ্চবিধ কর্ম।

ইহার অনুরূপ পাঁচটি জাতি, রূপান্তরে, সকল সমাজেই আছে। তবে অন্য সমাজের সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রভেদ এই যে, এখানে ধর্ম পুরুষপরম্পরাগত। কেবল হিন্দুসমাজেই যে এরূপ, তাহা নহে, হিন্দুসমাজসংলগ্ন মুসলমানদিগের মধ্যেও এরূপ ঘটিয়াছে। দরজিরা পুরুষানুক্রমে সিলাই করে, জোলারা পুরুষানুক্রমে বস্ত্র বুনেন, কলুরা পুরুষানুক্রমে তৈল বিক্রয় করে। ব্যবসা এইরূপ পুরুষপরম্পরানিবদ্ধ হইলে একটা দোষ ঘটে এই যে, যখন কোন জাতির সংখ্যা বৃদ্ধি হইল, তখন নির্দিষ্ট ব্যবসায়ে কুলান হয় না, কর্মান্তর অবলম্বন না করিলে জীবিকা-নির্ব্বাহ হয় না। প্রাচীন কালের অপেক্ষা এ কালে শূদ্রজাতির সংখ্যা বিশেষ প্রকারে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে।* এজন্য শূদ্র এখন কেবল পরিচর্য্যায় ছাড়িয়া কৃষিধর্মী। পক্ষান্তরে পূর্ব্বকালে আর্য্যসমাজস্থ অধিকাংশ লোক এইরূপ সামাজিক কারণে শিল্প, বাণিজ্য বা কৃষিধর্মী ছিল। এবং তাহাদিগেরই নাম বৈশ্য।

সে যাই হউক, মনুষ্য মাত্রে, জ্ঞান বা কর্মানুসারে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বণিক, শিল্পী, কৃষক, বা পরিচারকধর্মী। সামাজিক অবস্থার গতি দেখিয়া যদি বল যে, মনুষ্য মাত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র, তাহাতেও কোন আপত্তি হইতে পারে না। স্থূল কথা এই যে, এই ষড়্‌বিধ বা পঞ্চবিধ বা চতুর্বিধ কর্ম ভিন্ন মনুষ্যের কর্মান্তর নাই। যদি থাকে, তাহা কুকর্ম।† এই ষড়্‌বিধ কর্মের মধ্যে যিনি যাহা গ্রহণ করেন, উপজীবিকার জন্যই হউক, আর যে কারণেই হউক, যাহার ভার আপনার উপর গ্রহণ করেন, তাহাই তাহার অনুষ্টেয় কর্ম, তাহার Duty. তাহাই তাহার স্বধর্ম। ইহাই আমার বুদ্ধিতে গীতোক্ত স্বধর্মের উদার ব্যাখ্যা। যাহারা ইহার কেবল প্রাচীন হিন্দুসমাজের উপযোগী অর্থ নির্দেশ করেন, তাহারা ভগবদুক্তিকে অতি সঙ্কীর্ণার্থক বিবেচনা করেন। ভগবান্ কখনই সঙ্কীর্ণবুদ্ধি নহেন।

যাহা ভগবদুক্তি,—গীতাই হউক, Bibleই হউক, স্বয়ং অবতীর্ণ ভগবানের স্বমুখনির্গতই হউক বা তাহার অনুগৃহীত মনুষ্যের মুখনির্গতই হউক, যখন উহা প্রচারিত হয়, উহা তখনকার ভাষায় ব্যক্ত হইয়া থাকে, এবং তখনকার সমাজের এবং লোকের শিক্ষা ও সংস্কারের অবস্থার অনুমত যে অর্থ, তাহাই তৎকালে গৃহীত হয়। কিন্তু সমাজের অবস্থা এবং লোকের শিক্ষা ও সংস্কারসকল কালক্রমে পরিবর্তিত হয়। তখন ভগবদুক্তির ব্যাখ্যারও সম্প্রসারণ আবশ্যিক হয়। কেন না, ধর্ম নিত্য; এবং সমাজের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধও নিত্য। ঈশ্বরোক্ত ধর্ম যে কেবল একটি বিশেষ সমাজ বা বিশেষ সামাজিক অবস্থার পক্ষেই ধর্ম, সমাজের অবস্থান্তরে তাহা আর খাটিবে না, এজন্য সমাজকে পূর্ব্বাবস্থাতে রাখিতে হইবে, ইহা কখন ঈশ্বরানুপ্রায়সঙ্গত হইতে পারে না। কালক্রমে সামাজিক পরিবর্তনানুসারে ঈশ্বরোক্তির সামাজিক জ্ঞানোপযোগিনী ব্যাখ্যা প্রয়োজনীয়। কৃষ্ণোক্ত স্বধর্মের অর্থের ভিতর বর্ণাশ্রমধর্মও আছে; আমি যাহা বঝাইলাম, তাহাও আছে; কেন না, উহা বর্ণাশ্রমধর্মের সম্প্রসারণ মাত্র। তবে প্রাচীন কালে বর্ণাশ্রম বুদ্ধিলেই ঈশ্বরোক্তির কালোচিত ব্যাখ্যা করা হয়; আমি যে রূপে বঝাইলাম, এখন সেইরূপ বুদ্ধিলেই কালোচিত ব্যাখ্যা করা হয়।

* কেবল কালসহকারে প্রজাবৃদ্ধির কথা বলিতেছি না। “বাস্তুর উৎপত্তি” বিষয়ে বঙ্গদর্শনে যে কয়টি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহাতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছি যে, অনার্য্য জাতিবিশেষসকল হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু শূদ্রজাতি-বিশেষে পরিণত হইয়াছে। যথা, পুণ্ড্র নামক প্রাচীন অনার্য্য জাতিবিশেষ এখন কোন স্থানে পুড়া, কোন স্থানে পোদে পরিণত হইয়াছে। এইরূপে কালক্রমে শূদ্রের সংখ্যা বাড়িয়াছে। বর্ণসংস্কার শূদ্রবৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

† যথা চৌর্য্যাদি।

বাংকম রচনাবলী

স্বধর্ম কি, তাহা যদি, যাহা হউক এক রকম, আমরা বুঝিয়া থাকি, তবে এক্ষণে স্বধর্ম পালন কেন করিব, তাহা বুঝিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ দুই প্রকার বিচার অবলম্বনপূর্বক এ তত্ত্ব অজ্ঞানকে বুঝাইতেছেন। একটি জ্ঞানমার্গ, আর একটি কর্মমার্গ। এই অধ্যায়ে দ্বাদশ শ্লোক হইতে আটত্রিশ শ্লোক পর্যন্ত জ্ঞানমার্গ কীর্তন, তৎপরে কর্মমার্গ।

জ্ঞানমার্গের স্থূল তত্ত্ব আত্মা অবিনশ্বর, পর-শ্লোকে সেই কথা উঠিতেছে।

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।

ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বৈ বয়মতঃপরম্ ॥ ১২ ॥

আমি কদাচিৎ ছিলাম না, এমন নহে। তুমি বা এই রাজগণ ছিলেন না, এমন নহে। ইহার পরে আমরা সকলে যে থাকিব না, এমন নহে। ১২।

যুদ্ধে স্বজন-নিধন-সম্ভাবনা দেখিয়া অজ্ঞান অনুতাপ করিলেন। তাহাতে কৃষ্ণ ইহার পূর্বশ্লোকে বলিয়াছেন, “যাহার জন্য শোক করিতে নাই, তাহার জন্য তুমি শোক করিতেছ।” যে মরিবে, তাহার জন্য শোক করা উচিত নহে কেন, তাহা এই শ্লোকে বুঝাইতেছেন। ভাবার্থ এই যে, “দেখ, কেহ মরে না। দেখ, আমি, তুমি, আর এই রাজগণ অর্থাৎ সকলেই চিরস্থায়ী; পূর্ব্বেও সকলেই ছিলাম, এ জীবন ধ্বংসের পর সবাই থাকিবে। যদি থাকিবে, মরিবে না, তবে তাহাদের জন্য শোক করিবে কেন?”

ইহাই হিন্দুধর্মের স্থূল কথা—হিন্দুধর্মাস্তর্গত প্রধান তত্ত্ব। কেবল হিন্দুধর্মের নহে, খ্রীষ্টধর্মের, বৌদ্ধধর্মের, ইসলামধর্মের, সকল ধর্মের মধ্যে ইহাই প্রধান তত্ত্ব। সে তত্ত্ব এই যে, দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মা আছে, এবং সেই আত্মা অবিনাশী। শরীরের ধ্বংস হইলেও আত্মা পরকালে বিদ্যমান থাকে। পরকালে আত্মার কি অবস্থা হয়, তদ্বিষয়ে নানা মতভেদ আছে ও হইতে পারে, কিন্তু দেহাতিরিক্ত অথচ দেহস্থিত আত্মা আছে, এবং তিনি বিনাশ-শূন্য, অমর, ইহা হিন্দু, খ্রীষ্টীয়ান, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, মুসলমান প্রভৃতি সকলের সম্মত। এই সকল ধর্মের ইহাই মূলভিত্তি।

এই তত্ত্বের প্রধান প্রতিবাদী বৈজ্ঞানিকেরা। তাঁহারা বলেন, শরীরাতিরিক্ত আর কিছু নাই। শরীরাতিরিক্ত আর একটা যে আত্মা আছে, তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই।

আজকাল বৈজ্ঞানিকেরাই বড় বলবান্। পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম এক দিকে, তাঁহারা আর এক দিকে। তাঁহাদের প্রচণ্ড প্রতাপে পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম হঠিয়া যাইতেছে। অথচ বিজ্ঞানের* অপেক্ষা ধর্ম বড়। পক্ষান্তরে ধর্ম বড় বলিয়া আমরা বিজ্ঞানকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। ধর্মও সত্য, বিজ্ঞানও সত্য। অতএব এ স্থলে আমাদের বিচার করিয়া দেখা যাউক, কতটুকু সত্য কোন্ দিকে আছে। বিশেষতঃ শিক্ষিত বাঙ্গালী, বিজ্ঞান জানুন বা না জানুন, বিজ্ঞানের প্রতি অচল ভক্তিবিশিষ্ট। বিজ্ঞানে রেলওয়ে টেলিগ্রাফ হয়, জাহাজ চলে, কল চলে, কাপড় হয়, নানা রকমে টাকা আসে, অতএব বিজ্ঞানই তাঁহাদের কাছে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ। যখন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য এই টীকা লেখা যাইতেছে, তখন আত্মবাদের বিজ্ঞান যে প্রতিবাদ করেন, তাহা বিচার করিয়া দেখা উচিত।

এ বিচারে আগে বুঝা কর্তব্য যে, আত্মা কাহাকে বলা যাইতেছে, এবং হিন্দুরা আত্মাকে কিরূপ বুঝে।

হিন্দু দার্শনিকেরা আত্মাকে বলেন, “অহম্প্রত্যয়বিষয়াম্পদপ্রত্যয়লক্ষিতার্থঃ”—অর্থাৎ “আমি” বলিলে যাহা বুঝিব, সেই আত্মা। এ সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছি, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা এই বাক্যের সম্প্রসারণ মাত্র।

“আমি দুঃখ ভোগ করি—কিন্তু আমি কে? বাহ্য-প্রকৃতি ভিন্ন আর কিছু তোমাদের হৃদয়ের গোচর নহে। তুমি বলিতেছ, আমি বড় দুঃখ পাইতেছি—আমি বড় সুখী। কিন্তু একটি মনুষ্যদেহ ভিন্ন “তুমি” বলিব, এমন কোন সামগ্রী দেখিতে পাই না। তোমার দেহ এবং দৈহিক প্রক্রিয়া, ইহাই কেবল আমার জ্ঞানগোচর। তবে কি তোমার দেহেরই এই সুখ দুঃখ ভোগ বলিব?”

* পাঠকের স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রচলিত প্রধানসারে Scienceকেই বিজ্ঞান বলিতেছি ও বলিব।

তোমার মৃত্যু হইলে তোমার সেই দেহ পড়িয়া থাকিবে, কিন্তু তৎকালে তাহার সুখ দুঃখ ভোগের কোন লক্ষণ দেখা যাইবে না। আবার মনে কর, কেহ তোমাকে অপমান করিয়াছে, তাহাতে দেহের কোন বিকার নাই, তথাপি তুমি দুঃখী। তবে তোমার দেহ দুঃখভোগ করে না। যে দুঃখভোগ করে, সে স্বতন্ত্র। সেই তুমি। তোমার দেহ তুমি নহে।

এইরূপ সকল জীবের। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই জগতের কিয়দংশ ইন্দ্রিয়গোচর, কিয়দংশ অননুমেষ মাত্র, ইন্দ্রিয়-গোচর নহে, এবং সুখ দুঃখাদির ভোগকর্তা। যে সুখ দুঃখাদির ভোগকর্তা, সেই আত্মা।**

আত্মতত্ত্ব বিষয়ক এই স্থূল কথাটা খ্রীষ্টিয়াদি সকল ধর্মেই আছে। কিন্তু তাহার উপর আর একটা অতি সুক্ষ্ম, অতি চমৎকার কথা কেবল হিন্দুধর্মেই আছে। সেই তত্ত্ব অতি উন্নত, উদার, বিশুদ্ধ, বিশ্বাসমাত্র মনুষ্যজন্ম সার্থক হয়। হিন্দু ভিন্ন আর কোন জাতিই সেই অতি মহত্ত্ব অননুভূত করিতে পারে নাই। যে সকল কারণে হিন্দুধর্ম অন্য সকল ধর্মের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা তাহার মধ্যে একটি অতি গুরুতর কারণ। সেই তত্ত্ব এখন বুঝাইতেছি।

আত্মা সকলেরই আছে। তুমি যখন আমা হইতে ভিন্ন, তখন তোমার আত্মা আমা হইতে কাজেই ভিন্ন। কিন্তু ভিন্ন হইয়াও প্রকৃতরূপে ভিন্ন নহে। মনে কর, বহুসংখ্যক শূন্য পাত্র আছে; তাহার সকলগুলির ভিতর আকাশ আছে। এক পাত্রান্তরস্থ আকাশ পাত্রান্তরস্থ আকাশ হইতে ভিন্ন। কিন্তু পৃথক্ হইলেও সকল পাত্রস্থ আকাশ জাগতিক আকাশের অংশ। পাত্রগুলি ভগ্ন করিলেই আর কিছুমাত্র পার্থক্য থাকে না। সকল পাত্রস্থ আকাশ সেই জাগতিক আকাশ হইতে অভিন্ন হয়। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন জীবগত আত্মা পরস্পর পৃথক্ হইলেও জাগতিক আত্মার অংশ, কেহ বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইলে সেই জাগতিক আত্মায় বিলীন হয়। এই জগদাত্মাকে হিন্দু-দার্শনিকেরা পরমাত্মা বলেন। জীবদেহস্থায়ী আত্মা যত দিন সেই পরমাত্মায় বিলীন না হয়, তত দিন তাহাকে জীবাত্মা বলেন।

এখন এই জীবাত্মা কি নশ্বর? দেহের ধ্বংস হইলেই কি তাহার ধ্বংস হইল? ইহার সহজ উত্তর এই যে, যাহা অবিনশ্বরের অংশ, তাহা কখন নশ্বর হইতে পারে না। যদি জাগতিক আকাশ অবিনশ্বর হয়, তবে ভাঙস্থ আকাশও অবিনশ্বর। যদি পরমাত্মা অবিনশ্বর হয়, তবে তদংশ জীবাত্মাও অবিনশ্বর।

এই হইল হিন্দুধর্মের কথা। অন্য কোন ধর্ম এই অতুল্য তত্ত্বের নিকটেও আসিতে পারেন নাই। আমরা পরে দেখাইব যে, ইহার অপেক্ষা উন্নত তত্ত্ব মনুষ্যজাত তত্ত্বের ভিতর আর নাই বলিলেও হয়। প্রাচীন ঋষিরা বলিতে পারেন, “আমরা যদি আর কিছু না করিতাম, কেবল এই কথাটা পৃথিবীতে প্রচার করিয়া যাইতাম, তাহা হইলেও আমরা সকল মনুষ্যের উপরে আসন পাইবার যোগ্য হইতাম।”† বাস্তবিক এই সকল তত্ত্বের আলোচনা করিলে তাঁহাদিগকে মনুষ্যমধ্যে গণনা করা যাইতে পারে না; দেবতা বলিতেই ইচ্ছা করে।

এখন দেখা যাউক, বৈজ্ঞানিকেরা এ সম্বন্ধে কি বলেন। তাঁহারা বলেন, আদৌ আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ নাই। প্রমাণাভাবে কোন কথাই স্বীকার কর্তব্য নহে। যখন আত্মার অস্তিত্বই স্বীকার করা যাইতে পারে না, তখন তাহার অবিনাশিতা, জীবাত্মা, পরমাত্মা, এ সকল উপন্যাস-মধ্যে গণনা করিতে হয়। এই শ্রেণীর এক জন জগদ্বিখ্যাত লেখক, আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার পক্ষে যে আপত্তি, তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন।

“Thought and consciousness, though mentally distinguishable from the body, may not be a substance separable from it, but a result of it, standing in relation to it, like that of a tune to the musical instrument on which it is played; and that the arguments used to prove that the soul does not die with the body, would equally prove that the tune does not die with the instrument but survives its destruction and continues to exist apart.

* প্রবন্ধ পুস্তক।

† যে তত্ত্বটা বুঝাইলাম, তাহা যে বিলাতী pantheism নয়, এ কথা বোধ হয় বলিবার প্রয়োজন নাই।

বিক্রম রচনাবলী

In fact, those moderns who dispute the evidence of the immortality of the soul, do not in general believe the soul to be a substance *per se*, but regard it as a bundle of attributes, the attributes of feeling, thinking, reasoning, believing, willing and these attributes they regard as a consequence of the bodily organization which therefore, they urge, it is as unreasonable to suppose surviving when that organization is dispersed, as to suppose the colour or odour of a rose surviving when the rose itself has perished. Those, therefore, who would deduce the immortality of the soul from its own nature have first to prove that the attributes in question are not attributes of the body, but of a separate substance.”*

এইখানে পাঠক একটু সঙ্কল্প বুদ্ধি রাখা দেখুন। এই বিচারের তাৎপর্য এই যে, আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণাভাব, সুতরাং আত্মার অস্তিত্ব অসিদ্ধ। তদ্বিন্ধ ইহার দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ হইতেছে না। আত্মা নাই, এমন কথা মিল, কি কেহই বলিতে পারেন না। উক্ত বিচারে যে আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে না, তাহা মিল নিজেই বুঝাইতেছেন।

“In the first place, it does not prove, experimentally, that any mode of organization has the power of producing feeling or thought. To make that proof good, it would be necessary, that we should be able to produce an organism, and try whether it would feel, which we cannot do.”

পুনশ্চ—

“There are thinkers who regard it as a truth of reason that miracles are impossible; and in like manner there are others who, because the phenomena of life and consciousness are associated in their minds by undeviating experience with the action of material organs, think it an absurdity *per se* to imagine it possible those phenomena can exist under any other conditions. But they should remember that the uniform co-existence of one fact with another does not make the one fact a part of the other or the same with it. The relation of thought to a material brain is no metaphysical necessity; but simply a constant co-existence within the limits of observation. And when analysed to the bottom on the principles of the associative Psychology, just as much as the mental functions, is, like matter itself, merely a set of human sensations either actual or inferrible as possible. . . Experience furnishes us with no example of any series of states of consciousness without this group of contingent sensations attached to it; but it is as easy to imagine such a series of states without, as with, this accompaniment, and we know of no reason in the nature of things against the possibility of its being thus disjoined. We may suppose that the same thoughts, emotions, volition and even sensations which we have here, may persist or recommence somewhere else under other conditions, just as we may suppose that other thoughts and sensations may exist under other conditions in other parts of the universe. And in entertaining this supposition we need not be embarrassed by any metaphysical difficulty about a thinking substance. Substance is but a general name for the perdurability of attributes; where-

* *Three Essays on Religion*, p. 197. শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য এই টীকা লেখা যাইতেছে, সুতরাং ইংরেজির তরজমা দেওয়া যাইবে না।

ever there is a series of thoughts connected together by memories, that constitutes a thinking substance.”

জড়বাদীর আপত্তি এই বিচারে ভাসিয়া গেল, তাহার চিহ্নমাত্র রহিল না। তথাপি ইহাতেই আত্মবাদী জয়ী হইতেছেন না। পৃথক্ আত্মা নাই, অথবা তাহা নশ্বর, এ কথা বলিবার কাহারও অধিকার নাই, ইহাতে প্রমাণীকৃত হইল। কিন্তু আত্মা যে একাট স্বতন্ত্র পদার্থ, এবং তাহা অবিনাশী, ইহা প্রমাণীকৃত হইল না। তুমি বলিতেছ, স্বতন্ত্র আত্মা আছে, এবং তাহা অবিনাশী, এ কথার প্রমাণ কি?

অনেক সহস্র বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর সকল সভ্য জাতির মধ্যে এই প্রমাণ সংগৃহীত হইয়া আসিয়াছে। বৈজ্ঞানিকেরা তাহা অপ্রচুর বলিয়া উড়াইয়া দেন। বৈজ্ঞানিকেরা সত্যবাদী এবং প্রমাণ সম্বন্ধে তাঁহারা সর্বাধিক। অতএব তাঁহারা এ কথা কেন বলেন, সেটাও বুঝিয়া রাখা চাই।

বুঝিতে গেলে, আগে বুঝিতে হইবে, প্রমাণ কি? যাহা দ্বারা কোন বিষয়ের জ্ঞান জন্মে, তাহাই তাহার প্রমাণ। আমি এই পদার্থটি দেখিতে পাইতেছি বলিয়াই, জানিতে পারিতেছি যে, পদার্থটি আছে। প্রত্যক্ষ দৃষ্টিই এখানে পদার্থের অস্তিত্বের প্রমাণ। আমি গৃহমধ্যে শয়ন করিয়া মেঘগজ্জর্জন শুনিলাম, ইহাতে জানিলাম যে, আকাশে মেঘ আছে। এখানে মেঘ আমার প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। কিন্তু মেঘের ধ্বনি আমার প্রত্যক্ষের* বিষয়। প্রত্যক্ষভাবেও মেঘ-বিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার কারণ পদার্থকৃত প্রত্যক্ষ হইতে অনুমান। যখনই যখনই এইরূপ গজ্জর্জনধ্বনি শুনিয়া আকাশ প্রতি দৃষ্টিপাত করা গিয়াছে, তখনই তখনই আকাশে মেঘ দেখা গিয়াছে।

অতএব আমরা দ্বিবিধ প্রমাণের দেখা পাইতেছি—(১) প্রত্যক্ষ, (২) অনুমান। ভারতবর্ষীয়েরা অন্যবিধ প্রমাণও স্বীকার করেন, তাহার কথা পরে বলিতেছি। বৈজ্ঞানিক বা জড়বাদীগণ অন্য কোন প্রকার প্রমাণ স্বীকার করেন না। তাঁহারা অনুমান সম্বন্ধে ইহাও বলেন যে, যে অনুমান প্রত্যক্ষমূলক নহে, সে অনুমান অসিদ্ধ; অথবা এরূপ অনুমান হইতেই পারে না। এই তত্ত্বের মীমাংসা জন্য ইউরোপীয়েরা এক অতি বিচিত্র এবং মনোহর দর্শনশাস্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার সবিশেষ পরিচয় দিবার স্থান নাই।

এখন ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, আত্মা কখন কাহারও প্রত্যক্ষের বিষয় হয় নাই। শরীর প্রত্যক্ষ, কিন্তু শরীরস্থ আত্মার প্রত্যক্ষতা নাই। শরীর-বিমুক্ত আত্মারও কেহ কখন প্রত্যক্ষ করে নাই। যাহা প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, তৎসম্বন্ধে প্রত্যক্ষমূলক কোন অনুমানও হইতে পারে না। কেবল ইহাই নহে। আত্মা ভিন্ন এমন অন্য কোন পদার্থ সম্বন্ধে মনুষ্যের কোন প্রকার প্রত্যক্ষজাত কোন প্রকার জ্ঞান নাই যে, তাহা হইতে আত্মার অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। এরূপ যে সকল প্রমাণ এদেশে বা ইউরোপে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা বিচারে টিকে না। অতএব আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই।†

তাই বিজ্ঞান, আত্মাকে খুঁজিয়া পায় না। বিজ্ঞান সত্যবাদী। বিজ্ঞানের যত দূর সাধ্য,

* যাহা ইন্দ্রিয়গোচর, তাহাই প্রত্যক্ষের বিষয়। পদার্থের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইল, মেঘের ধ্বনির শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হইল।

† তবে সর্ব দেশে সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে, মৃত ব্যক্তির দেহবিমুক্ত আত্মা কখন কখন মনুষ্যের ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ হয়। দেহ-বিমুক্ত আত্মা এইরূপে মনুষ্যের ইন্দ্রিয়গোচর হইলে অবস্থাবিশেষে ভূত প্রেত নাম প্রাপ্ত হয়। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, এ সকল চিত্তের ভ্রমমাত্র, রজ্জুতে সর্পজ্ঞানবৎ ভ্রমজ্ঞান মাত্র, আর ঈদৃশ ভ্রমজ্ঞানই আত্মার স্বাতন্ত্র্য বিশ্বাসের কারণ। কিন্তু এন্ধ্রমে ইউরোপ ও আমেরিকায় Spiritualism তত্ত্বের প্রাদুর্ভাব, এই প্রেততত্ত্বই বিজ্ঞানের একাট শাখা হইয়া দাঁড়াইয়াছে; এবং Crookes, Wallace প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকেরা এতদ্বিষয়ক প্রমাণ সকল এমন উত্তমরূপে পরীক্ষিত ও শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন যে, প্রতিপক্ষেরা কিছু গোলযোগে পড়িয়াছেন। ইহার নানা প্রকার বাদ প্রতিবাদ চলিতেছে। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, প্রেতপ্রত্যক্ষের যথার্থ এখনও বৈজ্ঞানিকেরা সাধারণতঃ স্বীকার করেন না। সুতরাং ইহা আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণের মধ্যে আমি গণনা করিতে পারিলাম না। আর ঈদৃশ প্রমাণের উপর ধর্মের ভিত্তি স্থাপন করা বাঞ্ছনীয় বিবেচনা করি না। ধর্ম বিজ্ঞান নহে; তাহার ভিত্তি আরও দৃঢ়সংস্থাপিত।

বিশ্বকম রচনাবলী

বিজ্ঞান তত দূর সন্ধান করিল, কিন্তু যথার্থ সত্যানুসন্ধিৎসু হইয়া ও সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও বিজ্ঞান আত্মাকে পাইল না। পাইল না কেন, না বিজ্ঞানের তত দূর গতিশক্তি নাই। যাহার যত দৌড়, তাহার বেশী সে যাইতে পারে না। ডুবুরী কোমরে দাঁড়ি বাঁধিয়া সাগরে নামে, যতটুকু দাঁড়ি, তত দূর যাইতে পারে, তার বেশী যাইতে পারে না, সাগরে সমস্ত রত্ন কুড়াইবার তার সাধ্য নাই। প্রমাণের দাঁড়ি বিজ্ঞানের কোমরে বাঁধা, বিজ্ঞান প্রমাণের অপ্ৰাপ্য আত্মতত্ত্ব পাইবে কোথা? যেখানে বিজ্ঞান পৌঁছে না, সেখানে বিজ্ঞানের অধিকার নাই, যে উচ্চ ধামের নিম্ন সোপানে বসিয়া বিজ্ঞান জন্ম সার্থক করে, সেখানে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অনুসন্ধান করাই ভ্রম। "Our victorious Science fails to sound one fathom's depth on any side, since it does not explain the parentage of *mind*.* For mind was in truth before all science, and remains for ever, the seer, judge, interpreter, even father of all its systems, facts, and laws. Our faculties are none the less truly above our heads because we no longer wonder like children at processes we do not understand. Spite of category and formula of Kant and Hegel, we are abashed before our own untraceable thought. The star of heaven, the grass of the field, the very dust that shall be man, foil our curiosity as much as ever, and none the less for yielding to the lens, the prism and the polariscope of science ever now triumphs for our pride and delight." † যখন বিজ্ঞান একটি ধূলিকণার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারে না, ‡ তখন আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করিবে কি প্রকারে? যে হৃদয়ে ঈশ্বরকে না পায়, সে বিজ্ঞানে পায় না। যে হৃদয়ে ঈশ্বরকে পাইয়াছে, তাহার কাছে আত্মবাদ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের কোন প্রয়োজন নাই।

এখন বৈজ্ঞানিক উত্তর করিবেন যে, বিচার বড় অন্যায় হইতেছে। যখন বলিতেছ, জ্ঞান মাত্রের উপায় প্রমাণ, তখন অবশ্য স্বীকার করিতেছ যে, প্রমাণাতিরিক্ত জ্ঞেয় কিছুই নাই। আত্মতত্ত্ব যখন প্রমাণের অতীত, আত্মার অস্তিত্বের যখন প্রমাণ নাই, তখন আত্মাসম্বন্ধে মনুষ্যের কোন জ্ঞান নাই ও হইতে পারে না। অতএব আত্মা আছে কি না জানি না, ইহা ভিন্ন আর কিছু আমাদের বলিবার উপায় নাই।

এ কথার দুইটি উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। একটি প্রাচীন হিন্দু দার্শনিকদিগের উত্তর, একটি আধুনিক জন্মগাদিগের উত্তর। দর্শনশাস্ত্রে এই দুইটি জাতিই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ। এই দুই জাতিই দেখিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষমূলক যে অনুমান, তাহার গতিশক্তি অতি সংকীর্ণ, তাহা কখনই মনুষ্য-জ্ঞানের সীমা নহে। এই জন্য হিন্দু দার্শনিকেরা অন্যবিধ প্রমাণ স্বীকার করেন। নৈয়ায়িকেরা বলেন, আর দ্বিবিধ প্রমাণ আছে, উপমান এবং শব্দ। সাংখ্যেরা উপমান স্বীকার করেন না, কিন্তু শব্দকে তৃতীয় প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন।

উপমান (Analogy) যে একটি পৃথক্ প্রমাণ, ইহা আমরা পাঠকদিগকে স্বীকার করিতে বলিতে পারি না। অনেক স্থলে উহার দ্বারা প্রমাণজ্ঞান জন্মে না, ভ্রমজ্ঞান জন্মে। যেখানে উপমান প্রমাণের কার্য্য করে, সেখানে উহা পৃথগ্‌বিধ প্রমাণ নহে, অনুমানবিশেষ মাত্র। এক্ষণে "শব্দ" কি, তাহা বুঝাইতেছি।

আপ্তোপদেশই শব্দ, অর্থাৎ ভ্রমপ্রমাদাদিশূন্য যে বাক্য, তাহাই তৃতীয় প্রমাণ। যদি বেদাদিকে ভ্রমপ্রমাদাদিশূন্য বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারি, তবে তাহা প্রমাণ। যদি বেদাদিকে আমরা ভ্রমপ্রমাদাদিশূন্য বাক্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি, তবে আত্মার অস্তিত্ব ও অবিনাশিতা বেদে উক্ত হইয়াছে বলিয়া, উহা অনায়াসে স্বীকার করা যাইতে পারে। পরন্তু বেদাদি যদি মনুষ্যোক্তি হয়, তবে উহা ভ্রমপ্রমাদাদিশূন্য বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না; কেন না, মনুষ্যমাত্রই ভ্রমপ্রমাদাদির অধীন। স্থূল কথা, এক ঈশ্বরই ভ্রমপ্রমাদাদিশূন্য পুরুষ।

* আত্মা।

† *Oriental Religions, India*, p. 447.

‡ কতকগুলি ইউরোপীয় দার্শনিকদের মতে বহির্জগতের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই।

যদি কোন উক্তিকে ঈশ্বরোক্তি বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারি, তবে তাহাই প্রকৃত শব্দ-রূপ প্রমাণ। খ্রীষ্টিয়ানেরাও ইহাকে উৎকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন—ইংরাজি নাম Revelation. বস্তুত যদি কোন উক্তিকে ঈশ্বরোক্তি বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে তাহা প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট প্রমাণ। কেন না, প্রত্যক্ষ ও অনুমানও ভ্রান্ত হইতে পারে, ঈশ্বর কখনই ভ্রান্ত হইতে পারেন না। যদি এই গীতাকে কাহারও ঈশ্বরোক্তি বলিয়া বিশ্বাস হয়, তবে আত্মার অস্তিত্ব ও অবিনাশিতা সম্বন্ধে তাঁহার অন্য প্রমাণ খুঁজবার প্রয়োজন নাই; এই গীতাই অখণ্ডনীয় প্রমাণ। তবে নিরীশ্বর বৈজ্ঞানিক, গীতাদিকে ঈশ্বরোক্তি বলিয়া স্বীকার করিবেন না। আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে তিনি কি বাধ্য নহেন?

তাঁহাদিগের জন্য জন্মাণ-দার্শনিকদিগের উত্তর আছে। কাণ্টের বিচিত্র দর্শনশাস্ত্র পাঠককে বুঝাইবার স্থান এখানে নাই। কিন্তু কাণ্ট এবং তাঁহার পরবর্তী কতকগুলি লক্ষপ্রতিষ্ঠ দার্শনিকদিগের মত এই যে, প্রত্যক্ষ এবং প্রত্যক্ষমূলক অনুমান ভিন্ন জ্ঞানের অন্য কারণ আছে। তাঁহারা বলেন, কতকগুলি তত্ত্ব মনুষ্যাচিন্তে স্বতঃসিদ্ধ। তাঁহারা কেবল “বলেন” ইহাই নয়, কাণ্ট এই তত্ত্বের যে প্রকার প্রমাণ করিয়াছেন, তাহা মনুষ্যবুদ্ধির আশ্চর্য্য পরিচয়স্থল। কাণ্ট ইহাও বলেন যে, যাহাকে আমরা বুদ্ধি বলি, অর্থাৎ যে শক্তির দ্বারা আমরা প্রত্যক্ষাদি হইতে প্রাপ্ত জ্ঞান লইয়া বিচার করি, তাহার অপেক্ষা উচ্চতর আমাদের আর এক শক্তি আছে। যাহা বিচারে অপ্রাপ্য, সেই শক্তির প্রভাবে আমরা তাহা জানিতে পারি। ঈশ্বর, আত্মা, এবং জগতের একত্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞান আমরা সেই মহতী শক্তি হইতে পাই। এই “Transcendental Philosophy,” সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। অতএব এমন লোক অনেক আছেন যে, আত্মার অস্তিত্ব ও অবিনাশিতায় বিশ্বাস তাঁহাদের পক্ষে দুর্লভ। তবে যাহা আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য, তাহা আমি এখানে বলিতে বাধ্য। আমার নিজের বিশ্বাস এই যে, চিত্তবৃত্তি সকল সমর্দচিত মার্জিত হইলে, আত্মসম্বন্ধীয় এই জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ হয়।*

ভক্তের এ সকল কচকিচিতে কোন প্রয়োজন নাই। ঈশ্বরভক্ত কেবল ক্ষুদ্র দর্শনশাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া, আত্মার স্বাতন্ত্র্য বা অবিনাশিতা স্বীকার করেন না। ভক্তের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট যে, ঈশ্বর আছেন, এবং তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন যে, তিনিই পরমাত্মা এবং স্বয়ংই সর্ব্বভূতে অবস্থান করিতেছেন। তবে যে এই দীর্ঘ বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম, তাহার কারণ এই যে, অনেকে অসম্পূর্ণ বিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আত্মতত্ত্বকে উপহাসিত করেন। তাঁহাদের জানা উচিত যে, আত্মতত্ত্ব পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অতীত হউক, বিজ্ঞানবিরুদ্ধ নহে।

দেহিনোহস্মিন্ যথা দেহে কোমারং যৌবনং জরা।

তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিপূর্ণীরস্তর ন মূহ্যতি ॥ ১০ ॥

দেহীর যেমন এই দেহে কোমার ও যৌবন ও বার্দ্ধক্য, তেমনি দেহান্তর-প্রাপ্তি। পণ্ডিত তাহাতে মুগ্ধ হন না। ১০।

গীতোক্ত প্রথম প্রধান তত্ত্ব, আত্মার অবিনাশিতা। এই শ্লোকে দ্বিতীয় প্রধান তত্ত্ব কথিত হইতেছে—জন্মান্তরবাদ। যেমন এই দেহেতেই আমরাদিকে ক্রমশঃ কোমার, যৌবন, জরা ইত্যাদি অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতে হয়, তেমনি দেহান্তে দেহান্তরপ্রাপ্তি অবস্থান্তরপ্রাপ্তি মাত্র। অর্থাৎ মৃত্যু কেবল অবস্থান্তর মাত্র, যেমন কোমার গেলে যৌবন উপস্থিত হয়, যৌবন গেলে জরা উপস্থিত হয়, তেমনি এ দেহ যায়, আর এক দেহ আসে;—যেমন কোমার গিয়া যৌবন আসিলে কেহ শোক করে না, যৌবন গিয়া জরা আসিলে কেহ শোক করে না, তেমনি এ দেহ গেলে দেহান্তরপ্রাপ্তির বেলাই বা কেন শোক করিব?

এই কথায় মানিয়া লওয়া হইল যে, মরিলেই আবার জন্ম আছে। আত্মার অবিনাশিতা যেমন হিন্দুধর্ম্মের প্রথম তত্ত্ব, জন্মান্তরবাদ তেমনি দ্বিতীয় তত্ত্ব। কিন্তু আত্মার অবিনাশিতা যেমন খ্রীষ্টিয়াদি অন্যান্য প্রধান ধর্ম্ম স্বীকৃত, জন্মান্তরবাদ সেরূপ নহে। পক্ষান্তরে জন্মান্তরবাদ যে কেবল হিন্দুধর্ম্মেই আছে, এমনও নহে। বৌদ্ধধর্ম্মেরও ইহা প্রধান তত্ত্ব, এবং

* অনেকে বলিবেন, তবে কি Huxley, Tyndall প্রভৃতির মত লোকের চিত্তবৃত্তি সকল সমর্দচিত মার্জিত হয় নাই? উত্তর—না, সকলগুলি হয় নাই।

বিক্রম রচনাবলী

অন্যান্য ধর্মোৎ ছিল বা আছে। তবে ইউরোপে এ মত অগ্রাহ্য এবং ইহার কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই। এজন্য শিক্ষিত বাঙ্গালী এ মত গ্রাহ্য করেন না।

বাস্তবিক আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যেমন কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই, তেমন জন্মান্তর সম্বন্ধেও তদ্রূপ কোন প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে যেমন আত্মার অস্তিত্ব অপ্রমাণ করা যায় না, জন্মান্তরও অপ্রমাণ করা যায় না। তা না থাক, যাহার প্রমাণাভাব, তাহা মানিতে কেহ বাধ্য নহে। এই তত্ত্বে বিশ্বাস যে, চিত্তবৃত্তি সকলের সমুচিত অনুশীলনে স্বতঃসিদ্ধ হয়, এমন কথাও আমি বলিতে পারি না। তবে যিনি স্বর্গ নরকাদি মানেন, জন্মান্তরবাদীর অপেক্ষা তাঁহার বেশী জোর কিছুই নাই। যেমন জন্মান্তরবাদের আপোপদেশ ভিন্ন অন্য প্রমাণ নাই, স্বর্গ নরকাদিরও তেমন অন্য প্রমাণ নাই। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এ দেশে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি ইউরোপীয়দিগের দেখাদেখি প্রমাণাভাবেও স্বর্গনরকে বিশ্বাসবান্—অর্থাৎ সুখ-দুঃখ-যুক্ত পারলৌকিক অবস্থাবিশেষে বিশ্বাসবান্, কিন্তু জন্মান্তরে কোন মতেই বিশ্বাসবান্ নহেন।

কথাটা একটু সবিস্তারে সমালোচনা করিবার আমাদের একটু প্রয়োজন আছে। যিনি আত্মার অস্তিত্ব মানেন না, তাঁহার সঙ্গে ত আমাদের কথাই নাই; কেন না, তিনি কাজেই জন্মান্তর মানিবেন না। কিন্তু যিনি আত্মার অস্তিত্ব ও অবিনাশিতা মানেন, তাঁহার সম্মুখে একটা বড় গুরুতর প্রশ্ন আপনা হইতেই উপস্থাপিত হয়।

জীবাত্মা যদি অবিদ্যমান হইল, তবে দেহান্তে তাহার গতি কি হয়?

এ বিষয়ে জগতে অনেকগুলি মত প্রচলিত আছে।

- ১। ভূতযোনি প্রাপ্ত হয়। ইহা সচরাচর অসভ্য জাতিদিগের বিশ্বাস।
- ২। স্বর্গাদি লোকান্তর প্রাপ্ত হয়। খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমানদিগের এই মত।
- ৩। জন্মান্তর প্রাপ্ত হয়। বৌদ্ধদিগের এই মত।
- ৪। পররন্ধ্রে লীন হয় বা নির্বাণ প্রাপ্ত হয়।

হিন্দুধর্ম শেযোক্ত এই তিনটি মতই প্রচলিত আছে। এই তিনটি মতের সামঞ্জস্য কি প্রকার হইয়াছে, তাহা বুঝাইতেছি। হিন্দুরা বলেন যে, দেহান্তে জীবাত্মা মৃত্ত হয় না; আপনার কৃত কর্ম্মানুসারে পুনর্বার দেহান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহার আবার জন্মান্তর হয়। যখন জীবাত্মা এমন অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, ঈশ্বরে লীন হইবার যোগ্য হইয়াছে, তখন আর জন্ম হয় না, ঈশ্বরপ্রাপ্ত হয় বা নির্বাণপ্রাপ্ত হয়। ইহাকেই সচরাচর মুক্তি বা মোক্ষ বলে। কিসে জীবাত্মা এই অবস্থাপন্ন হইতে পারে, ইহাই সাংখ্যাদি দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। হিন্দুরা ইহাও বলেন যে, যখন জীবাত্মা মৃত্ত হইবার অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই, অথচ এমন কোন সূক্ষ্ম করিয়াছে যে, স্বর্গাদি উপভোগের যোগ্য, তখন জীবাত্মা কৃত পুণ্যের পরিমাণানুযায়ী কাল, স্বর্গাদি উপভোগ করে, পরে জন্মান্তর প্রাপ্ত হয়।

আপাততঃ শূন্যে এ সকল কথা পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রাপ্ত অনেকের নিকট অশ্রদ্ধের বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু একটু বিচার করিলে আর এক রকম বোধ হইবে।

এই জন্মান্তরবাদ হিন্দুধর্ম অতিশয় প্রবল। উপনিষদুক্ত হিন্দুধর্ম, গীতোক্ত হিন্দুধর্ম, পৌরাণিক হিন্দুধর্ম বা দার্শনিক হিন্দুধর্ম, সকল প্রকার হিন্দুধর্ম ইহার উপর স্থাপিত। যেমন সূত্রে মণি গ্রথিত থাকে, হিন্দুধর্মের সকল তত্ত্বগুলিই তেমনি এই সূত্রে গ্রথিত আছে। অতএব এই তত্ত্বটি আমাদের কাছে বড় যত্নপূর্বক বুঝিতে হইবে। কথাটাও বড় গুরুতর,—অতি দুরূহ। আমরা বাল্যকাল হইতে কথাটা শুনিয়া আসিতেছি, ইহা আমাদের বাল্য-সংস্কারের মধ্যে, সুতরাং আমরা সচরাচর ইহার গৌরব অনুভব করি না। কিন্তু বিদেশীয় এবং অন্যধর্মাবলম্বী চিন্তাশীল পণ্ডিতেরা কুসংস্কারবর্জিত হইয়া ইহার আলোচনাকালে বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন! গীতার অনুবাদকার টমসন সাহেব এতৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন, “Undoubtedly it is the most novel and startling idea ever started in any age or country.” টেলর সাহেব ইহাকে “One of the most remarkable developments of ethical speculation” বলিয়া প্রশংসিত করিয়াছেন।*

কথাটা যদি এমনই গুরুতর, তবে ইহা আর একটু ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

* *Primitive Culture*, Vol. I, p. 12.

বলা হইয়াছে, জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ, ইহা হিন্দুশাস্ত্রের উক্তি। পরমাত্মা বা পরব্রহ্মের অংশ তাহা হইতে পার্থক্য লাভ করিল কি প্রকারে? তাহার দেহবদ্ধাবস্থা বা কেন? হিন্দুশাস্ত্র ইহার যে উত্তর আছে, তাহা বঝাইতেছি। ঈশ্বরের অশেষ প্রকার শক্তি আছে। একটি শক্তির নাম মায়া। এই মায়া কি, তাহা স্থানান্তরে বঝাইব। এই মায়ার দ্বারা তিনি আপনার সত্তাকে জগতে পরিণত করিয়াছেন। তিনি চৈতন্যময়; তাহা ভিন্ন আর চৈতন্য নাই; অতএব জগতে যে চৈতন্য দেখি, ইহা তাহারই অংশ; তাহার সিস্কাক্রমে এই অংশ মায়ার বশীভূত হইয়া পৃথক্ ও দেহবদ্ধ হইয়াছে। যদি সেই পৃথক্ভূত চৈতন্য বা জীবাত্মা কোন প্রকারে মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে, তবে আর তাহার পার্থক্য থাকিবে কেন? পার্থক্য ঘূচিয়া যাইবে, জীবাত্মা আবার পরমাত্মায় বিলীন হইবে।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, জীবাত্মা এই মায়াকে অতিক্রম করিবে কি প্রকারে? যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা বা নিয়োগক্রমেই বদ্ধ হইয়া থাকে, তবে আবার বিমুক্ত হইবার সাধ্য কি? ইহার উত্তর এই যে, ঈশ্বরের নিয়োগ এরূপ নহে যে, জীবাত্মা চিরকালই মায়াবদ্ধ থাকিবে। তিনি যে সকল নিয়ম করিয়াছেন, মায়ার অতিক্রমের উপায়ও তাহার ভিতরে রাখিয়াছেন। সে উপায় কি, তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ বলেন, জ্ঞানেই সেই মায়াকে অতিক্রম করা যায়; কেহ বলেন—কর্মে, কেহ বলেন—ভক্তিতে। এই সকল মতের মধ্যে কোন্টি সত্য বা কোন্টি অসত্য, তাহার বিচার পশ্চাৎ করা যাইবে। এখন সকলগুলিই সত্য, ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া যাউক। এখন এইগুলিই যদি ঈশ্বরে বিলীন হইবার উপায় হয়, তবে যে ব্যক্তি ইহাজীবনে জ্ঞান, কর্ম বা ভক্তির সমুচিত অনুষ্ঠান করে নাই, সে ঈশ্বরে লয় বা মুক্তি লাভ করিবে না। তবে সে ব্যক্তির আত্মা, মৃত্যুর পর কোথায় যাইবে? আত্মা অবিনশ্বর; সুতরাং দেহভ্রষ্ট আত্মাকে কোথাও না কোথাও যাইতে হইবে।

ইহার এক উত্তর এই হইতে পারে যে, দেহভ্রষ্ট আত্মা কর্মানুসারে স্বর্গে বা নরকে যাইবে। স্বর্গ বা নরক প্রভৃতি লোকান্তরের অস্তিত্বের প্রমাণাভাব। কিন্তু প্রমাণের কথা এখন থাক। স্বীকার করা যাউক, কর্মফলানুসারে আত্মা স্বর্গে বা নরকে যায়। এখন জিজ্ঞাস্য যে, জীবাত্মা স্বর্গে বা নরকে কিয়ৎকালের জন্য যায়, না অনন্তকালের জন্য যায়?

যদি বল কিয়ৎকালের জন্য যায়, তবে সেখান হইতে ফিরিয়া আবার কোথায় যাইবে? জন্মান্তর স্বীকার না করিয়া, এ প্রশ্নের উত্তর নাই। হয় বল যে, জীব কর্মফলের উপযোগী কাল স্বর্গ বা নরক ভোগ করিয়া, পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিবে, নয় বল যে, অনন্তকাল সে স্বর্গ বা নরক ভোগ করিবে।

ত্রিষ্ঠিয়ানেরা তাই বলেন। তাহারা বলেন যে, ঈশ্বর বিচার করিয়া পাপীকে অনন্ত নরকে এবং পুণ্যবান্কে অনন্ত স্বর্গে প্রেরণ করেন।

এ কথায় বড় গোলমালে পড়িতে হয়। মনুষ্যালোকে এমন কেহই নাই যে, কোন সৎ কর্ম কখন করে নাই বা কোন অসৎ কর্ম কখন করে নাই। সকলেই কিছু পাপ, কিছু পুণ্য করে। এখন জিজ্ঞাস্য যে, যে কিছু পাপ করিয়াছে, কিছু পুণ্য করিয়াছে, সে অনন্ত স্বর্গে যাইবে, না অনন্ত নরকে যাইবে? যদি সে অনন্ত স্বর্গে যায়, তবে জিজ্ঞাসা করি, তাহার পাপের দণ্ড হইল না কেন? যদি বল, অনন্ত নরকে যাইবে, তবে জিজ্ঞাসা করি, তাহার পুণ্যের পুরস্কার হইল না কেন?

যদি বল, যাহার পাপের ভাগ বেশী, সে অনন্ত নরকে, যাহার পুণ্যের ভাগ বেশী, সে অনন্ত স্বর্গে যাইবে। তাহা হইলেও ঈশ্বরে অবিচার আরোপ করা হইল। কেন না, তাহা হইলে এক পক্ষে পুণ্যের কিছুই পুরস্কার হইল না, আর এক পক্ষে পাপের কিছুই দণ্ড হইল না।

কেবল ঈশ্বরের প্রতি অবিচার আরোপ করা হয়, এমত নহে। ঘোরতর নিষ্ঠুরতা আরোপ করাও হয়। যাহাকে দয়াময় বলি, তিনি যে এই অল্পকাল পরিমিত মনুষ্যজীবনে কৃত পাপের জন্য অনন্তকালস্থায়ী দণ্ড বিধান করিবেন, ইহার অপেক্ষা অবিচার ও নিষ্ঠুরতা আর কি আছে? ঈদৃশ নিষ্ঠুরতা ইহলোকের পামরগণের মধ্যেও পাওয়া যায় না।

যদি বল, যাহার পাপের ভাগ বেশী, পুণ্যের ভাগ কম, সে পুণ্যানুরূপ কাল স্বর্গভোগ করিয়া অনন্তকাল জন্য নরকে যাইবে, এবং তদ্বিপরীতে বিপরীত ফল হইবে; তাহাতেও ঐ সকল আপত্তির নিরাস হইল না। কেন না, পরিমিত কাল, কোন্টি কোন্টি যুগ হইলেও, অনন্ত

বাঁকম রচনাবলী

কালের তুলনায় কিছুই নহে। অবিচার ও নিষ্ঠুরতার লাঘব হইল, এমন হইতে পারে, অভাব হইল না। অতএব তুমি যদি স্বর্গ নরক স্বীকার কর, তবে তোমাকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, অনন্ত কালের জন্য স্বর্গ নরক ভোগ বিহিত হইতে পারে না। তুমি উদ্ধব ইহাই বলিতে পার যে, পাপ পুণ্যের পরিমাণানুযায়ী পরিমিত কাল জীব স্বর্গ বা নরক বা পৌর্বা-পর্যের সহিত উভয় লোক ভোগ করিবে। তাহা হইলে সেই সাবেক প্রশ্নটির উত্তর বাকি থাকে। সেই পরিমিত কালের অবসানে জীবাত্মা কোথায় যাইবে? পররন্ধে লীন হইতে পারে না; কেন না, জ্ঞান কর্মাদিই যদি মুক্তির উপায়, তবে স্বর্গ নরকে সে উপায়ের সাধনাভাবে মুক্তি অপ্রাপ্য। কেন না, স্বর্গ নরক ভোগ মাত্র—কর্মক্ষেত্র নহে, এবং দেহশূন্য আত্মার জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ের অভাবে, স্বর্গ নরকে জ্ঞান কর্মের অভাব। অতএব এখনও জিজ্ঞাস্য, সেই পরিমিত কালের অবসানে জীবাত্মা কোথায় যায়?

হিন্দুশাস্ত্র এ প্রশ্নের উত্তরে বলে,—জীবাত্মা তখন জীবলোকে প্রত্যাগমন করিয়া দেহান্তর ধারণ করে। হিন্দুধর্মের, বিশেষতঃ এই গীতোকৃত ধর্মের এই অভিপ্রায় যে, জীবাত্মা সচরাচর দেহদ্বংসের পর দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া পুনর্বার জন্মগ্রহণ করে। সেই দেহান্তর-প্রাপ্তিতে কর্মফলানুসারে এবং পাপপুণ্যের তারতম্যানুসারে সদস্য যোনি প্রাপ্ত হয়। সচরাচর কর্মফল ভোগ জন্মান্তরেই হইয়া থাকে, কিন্তু কতকগুলি কর্ম এমন আছে যে, তাহার ফলে স্বর্গপ্রাপ্ত হইতে পারে, আর কতকগুলি কর্ম এমন আছে যে, তাহার ফলে নরক ভোগ করিতে হয়। যে সেরূপ কর্ম করিয়াছে, তাহাকে স্বর্গে বা নরকে যাইতে হইবে। কর্মের ফলের পরিমাণানুযায়ী কালই স্বর্গ বা নরক ভোগ করিবে, তাহার পর আবার জীবলোকে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিবে।

কিন্তু যে ব্যক্তি জন্মান্তর মানে না, তাহার সকল আপত্তির এখনও নিরাস হয় নাই। সে বলিবে, “যাহা বলিলে, এটা সাফ আন্দাজি কথা। অনন্ত স্বর্গ নরক ভোগ অসঙ্গত কথা স্বীকার করি। স্বর্গ ও নরক আমি আদৌ মানিতেছি না। কেন না, তাহার প্রমাণাভাব। কিন্তু স্বর্গ নরক না মানিলেই জন্মান্তর মানিব কেন? মানিলাম যে, আত্মা অবিনাশী। তুমি বলিতেছ যে, অবিনাশী আত্মা, যদি দেহান্তরে না যায়, তবে কোথায় যাইবে? আমি উত্তরে বলিব, কোথায় যায়, তাহা জানি না। পরকালের কথা কিছুই জানি না। যাহা জানি না, তাহার প্রমাণাভাব, তাহা মানিব না। জন্মান্তরের প্রমাণ দাও, তবে মানিব। গতান্তরের প্রমাণাভাব, জন্মান্তরের প্রমাণ নয়। তুমি যে রামও নও, শ্যামও নও, তাহাতে প্রমাণ হইতেছে না যে, তুমি যাদব কি মাধব। জন্মান্তর যে হইয়া থাকে, তাহার প্রমাণ কি?”

কথা বড় শক্ত। জন্মান্তরবাদীরা এ বিষয়ে যে সকল প্রমাণ দিয়া থাকেন বা ইচ্ছা করিলে দিতে পারেন, তাহা আমি যথাসাধ্য নিম্নে সংগ্রহ করিলাম।

১। এ দেশে সচরাচর লোকের অদৃষ্ট-তারতম্য দেখাইয়া এই মত সমর্থন করা হয়। কেহ বিনা দোষে দুঃখী; কেহ সহস্র দোষ করিয়াও সুখী, এ দেশীয়গণ জন্মান্তরের সুকৃত দুষ্কৃত ভিন্ন এরূপ বৈষম্যের কিছু কারণ দেখেন না। লোকান্তরে অর্থাৎ স্বর্গ নরকে সুকৃতের পুরস্কার ও দুষ্কৃতের দণ্ড হইবে, এ কথা বলিলে ইহলোকের অদৃষ্ট-বৈষম্য সম্পূর্ণরূপে বুঝা যায় না। কেহ আজন্ম দুঃখী, অন্তহীনের ঘরে জন্মিয়াছে; কেহ আজন্ম সুখী, রাজার একমাত্র পুত্র;—জন্মকালেই এ অদৃষ্ট-তারতম্য কেন? যদি ইহা জীবের কর্মফল হয়, তবে ইহজন্মের কর্মফল নহে; কেন না, সদ্যঃপ্রসূত শিশুর ত কিছুই ইহজন্মকৃত কর্ম নাই। কাজেই তাঁহারা এখানে পূর্বজন্মকৃত কর্মফল বিবেচনা করিয়া থাকেন।

আপত্তিকারক এ বিচারে সম্মুখ হইবেন না। মনে কর, তিনি বলিবেন, “সকলই কি কর্মফল? যদি তাই হয়, তবে মৃত্যুকেও কর্মফল বলিতে হইবে। কিন্তু কখনও কোন জীব মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। অতএব ইহাই সিদ্ধ যে, এমন কোন কর্ম বা অকর্ম নাই, যদ্বারা মৃত্যু হইতে রক্ষা হইতে পারে। অতএব মৃত্যু কর্মফল হইতে পারে না। মৃত্যু যদি কর্মফল না হইল, তবে জন্মই বা কর্মফল বলিব কেন? যাহা কর্মফল, আর যাহা কর্মফল নহে, সকলই ঈশ্বরের নিয়মে ঘটে। ইহাও তাই। দম্পতি-সংসর্গে অবস্থাবিশেষে পুত্র জন্মে; রাজার ঘরেও জন্মে, মূর্খের ঘরেও জন্মে। ইহাও তাই ঘটিয়াছে। এমন স্থলে জাত ব্যক্তির কর্মফল খুঁজিব কেন?”

এখানেও বিচার শেষ হয় না। পূর্বে জন্মবাদী প্রত্যুত্তরে বলিতে পারে, “ঈশ্বরের নিয়মের ফলে সকলই ঘটে, ইহা আমিও স্বীকার করি। তবে বলিতেছি যে, এ বিষয়ে ঈশ্বরের নিয়ম এই যে, পূর্বে জন্মকৃত ফলানুসারে এই সকল বৈষম্য ঘটে। তুমি যে নিয়ম বলিতেছ, আমি তাহা অস্বীকার করিতেছি—জন্মের কারণ উপস্থিত হইলেই জন্ম ঘটিবে—তা রাজ্যীর গর্ভেই কি, আর দরিদ্রের গর্ভেই কি? কিন্তু এ নিয়মে কি জন্মতত্ত্ব সকলই বুঝাইতে পার? কেহ রূপ, কান্তি, বুদ্ধি, সদগুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে—কেহ কুরূপ, নিষেধ ও গুণহীন হইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে। তুমি যদি বল যে, এইরূপ প্রভেদ অনেক স্থলে জন্মের পরবর্তী শিক্ষার ফল, তাহাতে আমার উত্তর এই যে, শিক্ষার প্রভেদে কতক তারতম্য ঘটে বটে, কিন্তু সমস্ত তারতম্যটুকু শিক্ষাধীন বলিয়া বুঝা যায় না। কেন না, অনেক স্থলেই দেখা যায় যে, এক প্রকার শিক্ষায় পাত্রভেদে ফলের বিশেষ তারতম্য ঘটে। এমন কি, শিক্ষা আরম্ভ হইবার পূর্বে দেহ ও বুদ্ধির তারতম্য দেখা যায়। ছয় মাসের শিশুদিগের মধ্যেও এ প্রভেদ লক্ষিত হয়। জানি, তুমি বলিবে যে, যেটুকু শিক্ষার অধীন বলিয়া বুঝা যায় না, সে তারতম্যটুকু বৈজিক, অর্থাৎ পিতা মাতা বা পূর্বে পুরুষগণের প্রকৃতির ফল। আমি ইহাও মানি যে, মাতা পিতা বা তৎপূর্বে গামী পূর্বে পুরুষগণের প্রকৃতি, এমন কি সংস্কার পর্যন্ত আমাদিগকে পাইতে হয়, এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু মনুষ্যমধ্যে যে তারতম্যের কথা বলিতেছি, তাহা তোমার বৈজিক তত্ত্বে নিঃশেষে বুঝা যায় না। দেখ, এক মাতার গর্ভে এক পিতার ঔরসে অনেকগুলি ভ্রাতা জন্মে; তাহাদের মাতা পিতা বা পূর্বে পুরুষ সম্বন্ধে কোনই প্রভেদ নাই; অথচ ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিশেষ তারতম্য দেখা যায়। ইহার উত্তরে তুমি বলিতে পার বটে যে, গর্ভাধানকালে মাতা পিতার দৈহিক অবস্থা এবং যত দিন শিশু গর্ভে থাকে, তত দিন মাতার দৈহিক ও মানসিক অবস্থা ও তৎকালীন ঘটনাসকল এই তারতম্যের কারণ। না হয় ইহাও মানিলাম—কিন্তু যমজেও এরূপ তারতম্য দেখা যায়—সে তারতম্যের কিছুর কারণ নির্দেশ করিতে পার কি?”

ইহারও বৈজ্ঞানিক উত্তর দিতে পারেন। তিনি বলিতে পারেন যে, এই সকল তারতম্য এত দূর মনুষ্য-পরিজ্ঞাত নৈসর্গিক নিয়মাধীন বলিয়া বুঝা গেল, তবে বাকিটুকু মনুষ্যের জ্ঞেয় নিয়মের অধীন বলিয়া বিবেচনা করা উচিত—পূর্বে জন্ম কল্পনা করা অনাবশ্যিক। এখনও বিজ্ঞান এত দূর যায় নাই যে, এই তারতম্যের কারণ সর্বত্র নির্দেশ করা যায়; কিন্তু একদিন যাইবে ভরসা করা যায়।

এ দিকে জন্মান্তরবাদীও বলিতে পারেন যে, এ তোমার আন্দাজি কথা। যাহা বিজ্ঞান এখন বুঝাইতে পারিতেছে না, তাহা যে বিজ্ঞান বুঝাইতে পারে, এবং ভবিষ্যতে বুঝাইতে পারিবে, এটা আন্দাজি কথা। ইহা আমি মানি না।

এরূপ বিচারের অন্ত নাই, কোন পক্ষের জয় পরাজয় নাই। এখানে বৈজ্ঞানিক জন্মান্তরবাদীকে নিরস্ত করিতে পারেন না, বা জন্মান্তরবাদী বৈজ্ঞানিককে নিরস্ত করিতে পারেন না। উভয়ের দশা তুল্য হইয়া পড়ে। যাহা অজ্ঞাত, উভয়কেই তাহার আশ্রয় লইতে হয়। তবে জন্মান্তরবাদীকেই বিশেষ প্রকারে অজ্ঞাত ও অপ্রামাণিকের আশ্রয় লইতে হয়। এ বিচারে জন্মান্তর প্রমাণীকৃত হইতেছে, এমন আমরা স্বীকার করিতে পারি না।

২। যাহাতে মনুষ্যসাধারণের বিশ্বাস, তাহা সত্য বলিয়া বিবেচনা করিতে হয়, এমন কথা অনেকে বলেন। খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমানেরা যাই বলুন, অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মনুষ্যেরা সাধারণতঃ জন্মান্তরে বিশ্বাস করে। পৃথিবী অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, নানা দেশে নানা জাতিই জন্মান্তরে বিশ্বাসবান্।*

* “It has been accepted, in some form, by disciples of every religion in the world. It is common to Greek philosophers, Egyptian priests, Jewish Rabbins and several early Christian sects. It appears in the speculations of the Neo-Platonists, of later European mystics, even of socialists like Fourier, who elaborates a fanciful system of successive lines mutually connected by numerical relation. It reaches from the Eleusinian mysteries down to the

বিশ্বকম রচনাবলী

বলা বাহুল্য যে, এ প্রমাণও অনেক লোকের প্রতীতিকর হইবে না। যাহা জনসাধারণের বিশ্বাস, তাহাও সকল সময়ে সত্য হয় না। ইহা প্রসিদ্ধ। যথা, পৃথিবী সূর্য্যাদির সম্বর্তনকেন্দ্র।

৩। যত দিন না আত্মা বহুজন্মান্বিত জ্ঞান কর্ম্মাদির দ্বারা বিধৃতপাপ হয়, তত দিন ব্রহ্মপ্রাপ্তির যোগ্য হয় না। এক জন্মে সকলে তদুপযোগী চিত্তশুদ্ধি লাভ করে না। এ কথাটা আমাদের দেশী, কিন্তু গ্রীক দার্শনিকেরাও এই যুক্তির দ্বারা জন্মান্তরবাদের সত্যতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যাঁহারা তাহা সবিস্তারে পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা Phaedon নামক বিখ্যাত গ্রন্থে সোক্রেটিসের উক্তি অধ্যয়ন করিবেন। বৈজ্ঞানিক বলিবেন, এ কথাও প্রমাণাভাব।

৪। অনেকের বিশ্বাস যে, যোগসিদ্ধ পুরুষেরা আপনাদিগের পূর্ব্বেজন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ করিতে পারেন। কিন্তু কোন সিদ্ধপুরুষের যে এরূপ পূর্ব্বেজন্মস্মৃতি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার বিশ্বাসজনক কিছু প্রমাণ নাই। পুরাণেতিহাসের সকল কথা যে বিশ্বাসযোগ্য নহে, ইহা বলা বাহুল্য।* আর যদি কোন সিদ্ধপুরুষ যথার্থই বলিয়া থাকেন যে, তাঁহার পূর্ব্বেজন্মস্মৃতি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা হইলেও প্রমাণ সম্পূর্ণ হইল না। কেন না, দুইটি সন্দেহের কারণ বিদ্যমান থাকে, (১) তিনি সত্য কথা বলিতেছেন কি না, (২) যদিও ইচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা না বলুন, তাঁহার সেই বিস্মৃতি কোন পীড়াজনিত মস্তিস্কের বিক্রিয়া মাত্র কি না?

৫। যোগীদিগের পূর্ব্বেজন্মস্মৃতিতে বিশ্বাসবান্ না হইলেও, আর এক প্রকার পূর্ব্বেজন্মস্মৃতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। অনেকেরই এমন ঘটে যে, কোন নতুন স্থানে আসিলে মনে হয় যে, পূর্ব্বে যেন কখনও এ স্থানে আসিয়াছি—কোন একটা নতুন ঘটনা হইলে মনে হয়, যেন এ ঘটনা পূর্ব্বে কখন ঘটিয়াছিল। অথচ ইহাও নিশ্চিত স্মরণ হয় যে, এ জন্মে কখন সে স্থানে আসি নাই বা সে ঘটনা ঘটে নাই। অনেকে এমন স্থলে বিবেচনা করেন যে, পূর্ব্বেজন্মে সেই স্থানে গিয়াছিলাম, অথবা সেই ঘটনা ঘটিয়াছিল—নহিলে এরূপ স্মৃতি কোথা হইতে উদয় হয়?

এরূপ স্মৃতির উদয় যে হইয়া থাকে, তাহা সত্য। অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি সত্য। অনেক পাঠকই বলিতে পারিবেন যে, তাঁহাদের মনে কখন না কখন এমন স্মৃতির উদয় হইয়াছিল। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানশাস্ত্রও ইহার সত্যতা স্বীকার করে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে,

religions of many rude tribes of North America and the Pacific isles. Not a few noble dreams of the cultivated imagination are subtly associated with it, as in Plato, Giordano Bruno, Herder, Sir Thomas Browne, and specially notable is Lessing's conception of gradual improvement of the human type through metamorphosis in a series of future lives." *Oriental Religions: India*, p. 517.

যিনি এ সকল কথার বিস্তারিত প্রথম সংগ্রহ দেখিতে চান, তিনি টেলর-প্রণীত *Primitive Culture* নামক গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায় অধ্যয়ন করিবেন।

* কিন্তু ইহা আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে, ভিন্ন দেশীয় লেখকেও এরূপ পূর্ব্বেজন্মস্মৃতির কথা বলেন।

"Pythagoras is made to illustrate in his own person his doctrine of metempsychosis, by recognizing where it hung in Here's temple the shield he had carried in a former birth, when he was that Euphorbos whom Menelaus slew at the siege of Troy. Afterwards he was Hermotimos, the Klazomenian prophet, whose funeral rites were so prematurely celebrated while his soul was out, and after that, as Lucian tells the story, his prophetic soul passed into the body of a cock. Mikyllos asks this cock to tell him about Troy—were things there really as Homer said? But the cock replies;—"How should Homer have known, O Mikyllos? When the Trojan war was going on, he was a camel in Baktria."—Tylor's *Primitive Culture*, vol. II, p. 13.

বলা বাহুল্য, ইহা সব খোস গল্প মাত্র।

এ সকল "Fallacies of Memory," অথবা মস্তিস্কের Double action. কিরূপে এরূপ স্মৃতির উদয় হয়, তাহা কার্পেণ্টর সাহেবের *Mental Physiology* নামক গ্রন্থ হইতে দুইটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া বঝাইব।

"Several years ago the Rev. S. Hansard, now Rector of Bethnal Green, was doing clerical duty for a time at Hurstmonceaux in Sussex and while there, he one day went over with a party of friends of Pevensey Castle, which he did not remember to have previously visited. As he approached the gateway he became conscious of a very vivid impression of having seen it before and he "seemed to himself to see" not only the gateway itself but donkeys beneath the arch and people on the top of it. His conviction that he *must* have visited the castle on some former occasion—although he had neither the slightest remembrance of such a visit, nor any knowledge of having ever been in the neighbourhood previously to his residence at Hurstmonceaux—made him enquire from his mother if she could throw any light on the matter. She at once informed him that being in that part of the country when he was about *eighteen months* old, she has gone over with a large party and had taken him in the pannier of a donkey, that the elders of the party having brought lunch with them, had eaten it on the roof of the gateway, where they would have been seen from below, whilst he had been left with the attendants and donkeys.—This case is remarkable for the vividness of the sensorial impression (it may be worth mentioning that Mr. Hansard has a decidedly artistic temperament) and for the reproduction of details which were not likely to have been brought up in conversation, even if he had happened to hear the visit itself mentioned as an event of his childhood, and of such mention he has no remembrance whatever."

যদি এই ব্যক্তির মা না বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে এ স্মৃতি কোথা হইতে আসিল, তাহার কিছুই নিশ্চয়তা হইত না। পূর্বজন্মবাদীগণ ইহা পূর্বজন্মস্মৃতি বলিয়া ধরিতেন সন্দেহ নাই। এইরূপ অনেক স্মৃতি আছে, যাহার আমরা কোন কারণ দেখি না, অনুসন্ধান করিলে ইহজন্মেই তাহার কারণ পাওয়া যায়। এইরূপ সফল অনুসন্ধানের আর একটি উদাহরণ কার্পেণ্টর সাহেবের ঐ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

"In a Roman Catholic town in Germany a young woman who could neither read nor write, was seized with a fever and was said by the priests to be possessed of a devil, because she was heard talking Latin, Greek and Hebrew. Whole sheets of her ravings were written out and found to consist of sentences intelligible in themselves, but having slight connection with each other. Of her Hebrew sayings only a few could be traced to the Bible and most seemed to be in Rabbinical dialect. All trick was out of the question; the woman was a simple creature; there was no doubt as to the fever. It was long before any explanation, save that of demoniacal possession, could be obtained. At last the mystery was unveiled by a physician who determined to trace back the girl's history and who after much trouble discovered that at the age of nine she had been charitably taken by an old Protestant pastor, a great Hebrew scholar, in whose house she lived till his death. On further inquiry it appeared to have been the old man's custom for years to walk up and down a passage in his house

বিক্রম রচনাবলী

into which the kitchen opened, and to read to himself with a loud voice out of his books. The books were ransacked and among them were found several of the Greek and Latin Fathers together with a collection of Rabbinical writings. In these works so many of the passages taken down at the young woman's bedside were identified that there could be no reasonable doubt as to their source."

এ দেশে হইলে ইহার আর কোন অনুসন্ধান হইত না, গ্রীক, ল্যাটিন ও হিব্রু, এই স্ত্রীলোকের "পূর্বেজন্মার্জিত বিদ্যার" মধ্যে গণিত ও স্থিরীকৃত হইত।

পক্ষান্তরে ইহাও বলিতে পারা যায় না, এরূপ সকল স্মৃতিই, অনুসন্ধান করিলে, এই বর্তমান জীবনমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। বেশী অনুসন্ধান না হইলে এ কথা স্থির করিয়া বলা যায় না। তেমন বেশী অনুসন্ধান আজও হয় নাই। যত দিন না হয় তত দিন এ প্রমাণ কত দূর গ্রাহ্য, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না।

অনুসন্ধানের ফল যাহা হউক, আর একটা তর্ক উঠিতে পারে। স্মৃতি মস্তিষ্কের ক্রিয়া, না আত্মার ক্রিয়া? যদি বল, আত্মার ক্রিয়া, তবে পূর্বেজন্মের সর্বিশেষ স্মৃতি আমাদের মনে উদয় হয় না কেন? কেবল এক আধটুকু অস্পষ্ট স্মৃতি কখন কদাচিৎ মনে আসার কথা বল কেন? আত্মা ত সেই আছে, তবে তাহার স্মৃতি কোথায় গেল? আর যদি বল, স্মৃতি মস্তিষ্কের ক্রিয়া, তবে এই এক আধটুকু অস্পষ্ট স্মৃতিই বা উদিত হইতে পারে কি প্রকারে? কেন না, যে মস্তিষ্কে পূর্বেজন্মের স্মৃতি ছিল, সে মস্তিষ্ক ত দেহের সঙ্গে ধ্বংস পাইয়াছে— আর নাই।

এ আপত্তির সম্মীমাংসা করা যায়। কিন্তু প্রয়োজন নাই। কেন না, এই সকল স্মৃতি যে পূর্বেজন্মস্মৃতি, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে না।

শেষ কথা এই যে, যাঁহারা জীবাত্মার নিত্যতা স্বীকার করেন, তাঁহাদের জন্মান্তর স্বীকার ভিন্ন গতি নাই। আত্মা যদি নিত্য হয়, তবে অবশ্য পূর্বে ছিল। কোথায় ছিল? পরমাত্মায় লীন ছিল, এ কথা বলা যায় না। কেন না, পরমাত্মায় যাহা লীন, তাহা জীবাত্মা নহে, তাহার পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। আর যদি বল, লোকান্তরে ছিল, তাহা হইলে ইহলোকে তাহার জন্ম, জন্মান্তর বলিতেই হইবে। লোকান্তরে ছিল, যদি এমন না বল, তবে অবশ্য বলিতে হইবে যে, ইহলোকেই দেহান্তরে ছিল।

এমন কেহ থাকিতে পারেন যে, আত্মার অবিনাশিতা স্বীকার করিবেন, কিন্তু নিত্যতা স্বীকার করিবেন না। অর্থাৎ বলিবেন যে, দেহের সহিত আত্মার জন্ম হয়, জন্ম হইলে আর ধ্বংস নাই; কিন্তু জন্মের পূর্বে যে আত্মা ছিল, এমন না হইতে পারে। যাঁহারা এমন বলেন, তাঁহারা প্রত্যেক জীবজন্মে একটি নূতন সৃষ্টির কল্পনা করেন। এরূপ কল্পনা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ। কেন না, বিজ্ঞানশাস্ত্রের মূল সূত্র এই যে, জাগতিক নিয়ম সকল নিত্য, তাহার কখন বিপর্যয় ঘটে না। এখন জাগতিক নিয়মের মধ্যে বিশেষ প্রকারে প্রমাণীকৃত একটি নিয়ম এই যে, জগতে কিছু নূতন সৃষ্টি নাই। জগতে কিছু নূতন সৃষ্টি হয় না,—নিত্য নিয়মাবলীর প্রভাবে বস্তুর রূপান্তর হয় মাত্র।* এই যে জীব-শরীর, ইহা জন্মিলে বা গর্ভে সঞ্চারিত হইলে কোন নূতন সৃষ্টি হইল, এমন কথা বলা যায় না; পূর্বে হইতে বিদ্যমান জড় পদার্থসমূহের নূতন সমবায় হইল মাত্র। অন্য বস্তুর রূপান্তর হইল মাত্র। আত্মা, যাহা শরীরের সহিত জন্মগ্রহণ করিল, তাহা কিছুরই রূপান্তর বলা যায় না। কেন না, আত্মা জড় পদার্থ নহে, সুতরাং জড়ের বিকার নহে। পূর্বেজাত আত্মা সকলও অবিনাশী, সুতরাং তাহারও রূপান্তর নহে। কাজেই নূতন সৃষ্টি বলিতে হইবে। কিন্তু নূতন সৃষ্টি জাগতিক নিয়মবিরুদ্ধ। অতএব আত্মাকে অবিনাশী বলিলে নিত্য ও অনাদি কাজেই বলিতে হয়। নিত্য ও অনাদি বলিলে জন্মান্তর কাজেই স্বীকার করিতে হয়।

আর যাঁহারা আত্মার স্বাতন্ত্র্য বা অবিনাশিতা স্বীকার করেন না, তাঁহারা অবশ্য জন্মান্তরও স্বীকার করিবেন না। তাঁহাদিগের প্রতি আমার বক্তব্য এই যে, জন্মান্তরবাদ অপ্ৰামাণ্য হইলেও

* নাবস্থনো বস্তু-সিদ্ধিঃ *Exnibilo nihil fit.*

ইহা তাঁহাদিগের কাছে অশ্রদ্ধেয় হইতে পারে না। তাঁহাদিগেরই সম্প্রদায়ভুক্ত ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা কি বলেন, শুননা যাউক।*

বৌদ্ধতত্ত্ববেত্তা Rhys Davids লেখেন,

“The doctrine of Transmigration in either the Brahmanical or the Buddhist form, is not capable of disproof; while it affords an explanation, quite complete to those who can believe in it, of the apparent anomalies and wrongs in the distribution of happiness or woe.† The explanation can always be exact, for it is scarcely more than a repetition of the facts to be explained; it may always fit the facts, for it is derived from them; and it cannot be disproved,‡ for it lies in a sphere beyond the reach of human enquiry.”

টেলর সাহেব লিখিতেছেন—

“The Buddhist Theory of “Karma,” or “Action,” which controls the destiny of all sentient beings, not by judicial rewards and punishment, but by the inexorable result of cause into effect, where the present is ever determined by the past in an unbroken line of causation is indeed one of the world’s most remarkable developments of ethical speculation.”—*Primitive Culture*, Vol. II, p. 12.

কথাটার ভিতর একটু নিগূঢ়ার্থ আছে। খ্রীষ্টানেরা জন্মান্তর বিশ্বাস করেন না; তাঁহারা বলেন, স্বর্গে বসিয়া ঈশ্বর পাপ পুণ্যের বিচার করিয়া দোষীর দণ্ড ও পুণ্যাত্মার পুরস্কার বিহিত করেন। টেলর সাহেবের এ কথাটার তাৎপর্য এই যে, ঈশ্বর যে হাকিমের মত বেণে বসিয়া ডিক্রী ডিসমিস করেন, তাহার অপেক্ষা এই কার্যকারণ সম্বন্ধে নিবন্ধ জীবাদৃষ্ট অধিকতর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বটে। কথাটা একটু ভাল করিয়া বুঝা উচিত। জগতের শাসনপ্রণালী এই যে, কতকগুলি জাগতিক নিয়ম আছে। তাহা নিত্য, কখন বিপর্যাস্ত হয় না। সেইগুলির প্রভাবে সমস্ত জাগতিক ক্রিয়া নিৰ্বাহ হয়; জগদীশ্বরকে কখনও হস্তক্ষেপ করিয়া নিজে কোন কাজ করিতে হয় না। ইহাও সত্য, সকল কাজ তিনি নিজেই করেন, কিন্তু সে নিয়মের আড়ালে থাকিয়া। কিন্তু যদি বলি যে, তিনি বিচারকার্যে রতী হইয়া জীবের মৃত্যুর পর তাহার অদৃষ্ট সম্বন্ধে ডিক্রী ডিসমিস করিয়া কাহাকে স্বর্গে বা কাহাকে নরকে পাঠাইতেছেন, তবে যাহা জগতের বিরুদ্ধ, তাহা কল্পনা করা হইল। এখানে নিয়মের দ্বারা কোন কার্য সিদ্ধ হইতেছে না, স্বয়ং জগদীশ্বরকে কার্য করিতে হইতেছে। প্রত্যেক জীবের দণ্ড পুরস্কার বিধান, এক একটি ঈশ্বরের অনিয়মসিদ্ধ কার্য—অর্থাৎ miracle. কিন্তু জন্মান্তরবাদে এ আপত্তি ঘটে না। ঈশ্বরের নিয়ম এই যে, এইরূপ পাপাচারী এইরূপ যোনি প্রাপ্ত হইবে। কর্ম কারণ, যোনিবিশেষ তাহার কার্য। এইরূপ কার্য-কারণ-সম্বন্ধ-নিবন্ধ কর্মফলের দ্বারাই জন্মান্তর সম্পাদিত হয়—“miracle” প্রয়োজন হয় না।

শ্লেগেল বড় গোঁড়া খ্রীষ্টীয়ান, কিন্তু তিনি ইউরোপের এক জন সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক ও পণ্ডিত। তিনি এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহার ইংরেজি অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি।

“In this doctrine, there was a noble element of truth—the feeling that man, since he has gone astray, and wandered so far from his God,

* অনেকগুলি আধুনিক ইউরোপীয় লেখক জন্মান্তরবাদ সমর্থন করিয়াছেন। Herder ও Lessing তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তন্মিহ্ন Fourier, Soame Jenyns, Figuier, Dupont de Nemours, Pezzani প্রভৃতি অনেক ইতর লেখকের নাম করা যাইতে পারে।

† *Buddhism*, p. 100.

‡ যদি বল, প্রেততত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা প্রমাণ করিতেছেন যে, দেহভ্রষ্ট মনুষ্যাত্মা কখন কখন মনুষ্যের ইন্দ্রিয়গোচর হইয়া থাকে, তাহাতেও জন্মান্তরবাদের নিরাস হয় না। জন্মান্তরবাদীরা এমন বলেন না যে, সকল সময়েই মৃত্যু হইবামাত্র আত্মা দেহান্তরে প্রবেশ করে। যদি এমন হয় যে, কখন কখন দেহান্তরপ্রাপণ পক্ষে কালবিলম্ব ঘটে, তাহা হইতে জন্মান্তর অপ্ৰমাণিত হইল না।

বিশ্বকম রচনাবলী

must needs exert many efforts, and undergo a long and painful pilgrimage before he can regain the source of all perfection ;—the firm conviction and positive certainty that nothing defective, impure, or defiled with earthly stains can enter the pure region of perfect spirits, or be eternally united to God ; and that thus before it can attain to this blissful end, the immortal soul must pass through long trials and many purifications. It may now well be conceived, (and indeed the experience of this life would prove it) that suffering, which deeply pierces the soul, anguish that convulses all the members of existence, may contribute, or may even be necessary, to the deliverance of the soul from all alloy, and pollution, or to borrow a comparison from natural objects, the generous metal is melted down in fire and purged from its dross. It is certainly true that the greater the degeneracy and the degradation of man, the nearer is his approximation to the brute ; and when the transmigration of the immortal soul through the bodies of various animals is merely considered as the punishment of its former transgressions, we can very well understand the opinion which supposes that man who by his crimes and the abuse of his reason, had descended to the level of the brute should at last be transformed into the brute itself.”*

পরিশেষে আমেরিকা-নিবাসী সামুয়েল জনসন সাহেবের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। ইহার মত বিজ্ঞ লেখক দুর্লভ।

“The Transmigration faith was so widely spread in the elder world, because it had its roots in natural and profound aspirations. It combined the two-fold intuition of immortality and moral sequence with that mystic sense of the unity of being which is a germ of the highest religious truth.”†

এক্ষণে যাহা বলা হইল, তাহার স্থূল মর্ম বলিতেছি।

১। জন্মান্তরবাদ অপ্রমাণ করা যায় না।

২। ইহার পক্ষে কোন রকম কিছু প্রমাণও আছে।

৩। যাহারা আত্মার অবিনাশিতা স্বীকার করেন, তাহাদিগের নিকট ইহার প্রামাণ্যতা অখণ্ডনীয়।

৪। যাহারা আত্মার অবিনাশিতা স্বীকার করেন না, এই তত্ত্ব তাহাদিগের নিকটও অশ্রদ্ধেয় হইতে পারে না; কেন না, জাগতিক নিত্য নিয়মাবলীর সঙ্গে সঙ্গতিযুক্ত পরলোকবাদ আর কিছুই প্রচলিত নাই।

যিনি ভক্ত, তাহার পক্ষে এ সকল বিচারের কোন প্রয়োজন নাই। যদি এই শ্লোকটিতে ঈশ্বরোক্তির মর্ম থাকে, তবে তাহাই তাহার বিশ্বাসের যথেষ্ট কারণ। তাহার বিচার্য বিষয় এই যে, জন্মান্তরবাদ যাহা গীতায় আছে, তাহা যথার্থ ঈশ্বরোক্তি, না গ্রন্থকারের বিশ্বাস মাত্র—তিনি আপনার বিশ্বাস ঈশ্বরবাক্যমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন?

যদি কাহারও এমন সংশয় উপস্থিত হয় যে, ইহা ভগবদুক্তি কি না এবং উপরে যে সকল প্রমাণের উপরে সমালোচনা করা গেল, তাহাতে যদি জন্মান্তরে বিশ্বাসবান্ না হইলেন, তবে তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, জন্মান্তরে বিশ্বাস না করিলেও, এই গীতোক্ত মর্ম গ্রহণ করা যায় কি না?

ইহার উত্তর বড় সোজা। এই গীতোক্ত মর্ম সমস্ত মনুষ্যের জন্য। জন্মান্তরে যে বিশ্বাস

* *Philosophy of History*—translated by Robertson—Bohn's Edition, pp. 157-8.

† *Oriental Religions : India*, p, 539.

করে, তাহার পক্ষে ইহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম; যে না করে, তাহার পক্ষেও ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম। যে শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করে, তাহার পক্ষে ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম; যে ভক্তি না করে, তাহার পক্ষেও ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম। যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, তাহার পক্ষে ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম; যে ঈশ্বরে বিশ্বাস নাও করে, তাহার পক্ষেও ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম; কেন না, চিত্তশুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সংযম অনীশ্বরবাদীর পক্ষেও শ্রেষ্ঠ ধর্ম; সেই চিত্তশুদ্ধি এই গীতার উদ্দেশ্য। এরূপ বিশ্বলৌকিক ও সর্বব্যাপক ধর্ম আর কখন পৃথিবীতে প্রচারিত হয় নাই। যাঁহার যতটুকুতে অধিকার, তিনি ততটুকু গ্রহণ করিবেন। যেখানে যাহার বিশ্বাস নাই, সেখানে সে অনাধিকারী। যাঁহার যাহাতে অধিকার, তিনি তাহা ইহাতে পাইবেন।

মাত্রাস্পর্শাস্তু কোশ্চেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।

আগমাপায়িনোহনিত্যান্তার্থস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ১৪ ॥

হে কোশ্চেয়! ইন্দ্রিয়গণ এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে তৎসংযোগ,* ইহাই শীতোষ্ণাদি সুখদুঃখ-জনক। সে সকলের উৎপত্তি ও অপায় আছে, অতএব তাহা অনিত্য, অতএব হে ভারত! সে সকল সহ্য কর। ১৪।

একাদশ শ্লোকে বলা হইল যে, যাহার জন্য শোক করা উচিত নহে, তাহার জন্য তুমি শোক করিতেছ। দ্বাদশ শ্লোকে এরূপ অনুযোগ করিবার কারণ নির্দেশ করা হইল। সে কারণ এই যে, কেহই ত মরিবে না; কেন না, আত্মা অবিনাশী। তুমি কাটিয়া পড়িলেও সে থাকিবে, কেন না, তাহার আত্মা থাকিবে। একাদশ শ্লোক পাঠে জানা যায় যে, যখন গীতা প্রণীত হয়, তখন জন্মান্তর জনসমাজে গৃহীত। একাদশ শ্লোকে অর্জুনের আপত্তি আশঙ্কা করিয়া, ভগবান্ তাহারই খণ্ডন করিতেছেন। অর্জুন বলিতে পারেন, আত্মা না হয় রহিল, কিন্তু যখন দেহ গেল, তখন আমার আত্মীয় ব্যক্তি, যাহার জন্য শোক করিতেছি, সে আর রহিল কে? দেহান্তর প্রাপ্ত হইলে সে ত ভিন্ন ব্যক্তি হইল। এই আপত্তির আশঙ্কা করিয়া ভগবান্ ত্রয়োদশ শ্লোকে বলিতেছেন যে, এরূপ ভেদ কল্পনা করা অনুচিত; কেন না, যেমন কোমার, যৌবন, জরা এক ব্যক্তিরই অবস্থান্তর মাত্র, তেমনি দেহান্তরপ্রাপ্তিও অবস্থান্তর মাত্র। ইহাতেও অর্জুন আপত্তি করিতে পারেন যে, না হয় স্বীকার করা গেল যে, দেহান্তরেও দেহীর একতা থাকে—কিন্তু মৃত্যুর একটা দুঃখ-কষ্ট ত আছেই? এই স্বজনগণ সেই কষ্ট পাইবে—তাহা স্মরণ করিয়া শোক করিব না কেন? তাহাদের বিরহে কাতর হইব না কেন?

তাহার উত্তরে ভগবান্ এই চতুর্দশ শ্লোকে বলিতেছেন যে, যে সকলকে তুমি এই দুঃখ বলিতেছ, তাহা ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ-জনিত। যতক্ষণ সেই সংযোগ থাকে, ততক্ষণ সেই দুঃখ থাকে, সংযোগের অভাবে আর সে দুঃখ থাকে না। যেমন যতক্ষণ স্নেহের সঙ্গে রৌদ্রাদি উত্তাপের বা হিমের শৈত্যের সংযোগ হয়, ততক্ষণ উষ্ণ বা শীতস্বরূপ যে দুঃখ, তাহা অনুভূত করি, রৌদ্রাদির অভাব হইলে আর তাহা থাকে না। যাহা থাকিবে না, অনিত্য, তাহা সহ্য করাই উচিত। যে দুঃখ সহ্য করিলেই ফুরাইবে, তাহার জন্য কষ্ট বিবেচনা করিব কেন?

এই সহিষ্ণুতা বা ধৈর্য্যগুণ থাকিলেই জীবন মধুর হয়। অভ্যাস করিলে অভ্যাসগুণে আর কোন দুঃখকেই দুঃখবোধ হয় না। তার পর এই গীতোক্ত সর্বানন্দময়ী ভক্তিতে মনুষ্যের জীবন অপরিসীম সুখে আপ্লুত হয়। দুঃখমাত্র থাকে না। জীবনকে সুখময় করিবার জন্য, গোড়াতে এই দুঃখসহিষ্ণুতা আছে—তাহা ব্যতীত কিছ্ হইবে না। ইন্দ্রিয়গণের সহিত বহির্বিষয়ের সংযোগজনিত যে দুঃখ—ভোগবিলাসাদি, তাহাও দুঃখের মধ্যে গণ্য করিতে হইবে; কেন না, তাহার প্রতি অনুরাগ জন্মিলে, তাহার অভাবও দুঃখ বলিয়া বোধ হয়। এই জন্য “শীতোষ্ণ সুখদুঃখ” একত্র গণনা করা হইয়াছে।†

* মাত্রাস্চ স্পর্শাশ্চ ইতি শঙ্করঃ।

† এখানে মূলে যে মাত্রা শব্দ আছে ও মাত্রাস্পর্শ পদ আছে, তাহার দুই প্রকার অর্থ করা যায়। উহার দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে বুদ্ধাইতে পারে, এবং ইন্দ্রিয়গণের বিষয়কেও বুদ্ধাইতে পারে। শঙ্করাচার্য্য বলেন,—“মাত্রা আভিষ্কারী যন্তে শব্দাদয় ইতি শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়গণ, মাত্রাণাং স্পর্শাঃ শব্দাদিভিঃ সংযোগাঃ।” শ্রীধর স্বামীও ঐরূপ বলেন, যথা—“মী যন্তে জায়ন্তে বিষয়া আভির্ভিতি মাত্রা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়স্তাসাং স্পর্শা বিষয়েঃ সহ সম্বন্ধাঃ (মাত্রাস্পর্শাঃ)।” মধুসূদন সরস্বতীও ঠিক তাই বলেন। পঞ্চান্তরে, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেন, “মাত্রা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিষয়াঃ।” তাতেও বড় আসিয়া যাইত না, কিন্তু একজন ইংরেজ অনুবাদক Davis স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, এই মাত্রা শব্দ ল্যাটিন ভাষায় Materia ও ইংরাজিতে

বিশ্বকম রচনাবলী

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পদরুশং পদরুশষভ।

সমদুঃখসুখং ধীরং সোহমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫ ॥

হে পদরুশষভ! সুখদুঃখে সম্ভাব যে ধীর পদরুশ, এ সকলে ব্যথিত হন না, তিনিই মোক্ষলাভে সমর্থ হন। ১৫।

সুখ দুঃখ সহ্য করিতে পারিলে মোক্ষলাভের উপযোগী হয় কেন? দুঃখ হইতে মুক্তিই, মুক্তি বা মোক্ষ। সংসার দুঃখময়। যাঁহারা বলেন, সংসারে দুঃখের অপেক্ষা সুখ বেশী, তাঁহাদেরও স্বীকার করিতে হইবে, সংসারে দুঃখ আছে। এজন্য জন্মান্তরও দুঃখ; কেন না, পুনর্বার সংসারে আসিয়া আবার দুঃখভোগ করিতে হইবে। অতএব পুনর্জন্ম হইতে মুক্তিলাভও মুক্তি বা মোক্ষ। স্থূলতঃ দুঃখভোগ হইতে মুক্তিলাভই মোক্ষ। এই জন্য সাংখ্যকার প্রথম সূত্রেই বলিয়াছেন, “ত্রিবিধদুঃখস্যাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপদরুশার্থঃ।” এখন, দুঃখ সহ্য করিতে শিখিলেই দুঃখ হইতে মুক্তি হইল। কেন না, যে দুঃখ সহ্য করিতে শিখিয়াছে, সে দুঃখকে আর দুঃখ মনে করে না। তাহার আর দুঃখ নাই বলিয়া তাহার মোক্ষলাভ হইয়াছে। অতএব মোক্ষের জন্য মরিবার প্রয়োজন নাই। দুঃখ সহ্য করিতে পারিলে, অর্থাৎ দুঃখে দুঃখিত না হইলে, ইহজীবনেই মোক্ষলাভ হইল।

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।

উভয়োরপি দৃষ্টোহন্তস্বনয়োস্তুত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬ ॥

অসৎ বস্তুর অস্তিত্ব নাই, সদ্বস্তুর অভাব হয় না। তত্ত্বদর্শিগণ এইরূপ উভয়ের অন্ত দর্শন করিয়াছেন। ১৬।

অস্ ধাতু হইতে সৎ শব্দ হইয়াছে। যাহা থাকিবে, তাহাই সৎ; যাহা নাই বা থাকিবে না, তাহাই অসৎ। আত্মাই সৎ; শীতোষ্ণাদি সুখ দুঃখ অসৎ। নিত্য আত্মায় এই অনিত্য শীতোষ্ণাদি সুখ-দুঃখাদি স্থায়ী হইতে পারে না। কেন না, সৎ যে আত্মা, অসৎ শীতোষ্ণাদি তাহার ধর্মবিরোধী। শ্রীধর স্বামী এইরূপ বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন, “অসতোহনাত্মধর্মত্বাৎ অবিদ্যমানস্য শীতোষ্ণাদেৱাত্মনি ন ভাবঃ।” আমরা তাঁহারই অনুসরণ করিয়াছি।

শঙ্করাচার্য্য এই শ্লোক অবলম্বন করিয়া সদসদ্বুদ্ধি যে প্রকার বুঝাইয়াছেন, তাহাও পাঠকদিগের বিশেষ অভিনিবেশপূর্ব্বক আলোচনা করা কর্তব্য। তাহা হইতে আমরাদিগের পূর্ব্বপদরুশেরা এই সকল বিষয় কোন্ দিক্ হইতে দেখিতেন, এবং আমরা এখন কোন্ দিক্ হইতে দেখি, তাহার প্রভেদ বুঝিতে পারিবেন। এই শ্লোকের শঙ্করপ্রণীত ভাষ্য অতিশয় দূরহ। নিম্নে তাহার একটি অনুবাদ দেওয়া গেল।

“কারণ হইতে উৎপন্ন, অতএব অসৎস্বরূপ শীত উষ্ণ প্রভৃতি কার্যের অস্তিত্ব নাই। শীত উষ্ণাদি যে কারণ হইতে উৎপন্ন, তাহা প্রমাণ দ্বারা নিরূপিত হয়; সুতরাং উহারা সৎ পদার্থ হইতে পারে না। কারণ, উহারা বিকার মাত্র, এবং বিকারেরও সর্ব্বদা ব্যভিচার দৃষ্ট হয় (অর্থাৎ কখন বিকার থাকে, কখন থাকে না)। যেমন চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাইলেও ঘটাদি পদার্থ মৃত্তিকা ভিন্ন অন্য কিছু* বলিয়া উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ কারণ ভিন্ন অন্য কিছু বলিয়া উপলব্ধি না হওয়ায় সর্ব্বপ্রকার বিকার পদার্থই অসৎ। উৎপত্তির পূর্ব্ব এবং ধ্বংসের পরে, মৃত্তিকাদি কারণ হইতে উৎপন্ন ঘটাদি কার্যের উপলব্ধি হয় না। সেই সকল কারণও আবার তাহাদের কারণ হইতে ভিন্ন বলিয়া উপলব্ধি হয় না, সুতরাং তাহারাও অসৎ। এস্থলে আপত্তি হইতে পারে, কারণসমূহ এইরূপে অসৎ হইলে সকল পদার্থই অসৎ হইয়া পড়ে, (সৎ আর কিছুই থাকে না)। এরূপ আপত্তির খণ্ডন এই যে, সকল স্থলেই দুই প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয়; সৎ বলিয়া জ্ঞান ও অসৎ বলিয়া জ্ঞান। যে বস্তুর জ্ঞানের ব্যভিচার

matter, সুতরাং তিনি “মাত্রাস্পর্শাঃ” পদের অনুবাদে “Matter-contacts” লিখিয়াছেন। পরিমাণ-জ্ঞানের জন্য ইন্দ্রিয়বিষয়েরও যে আবশ্যিকতা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সাংখ্যদর্শনের “তন্মাত্র” শব্দের তাৎপর্য্য বিচার করা কর্তব্য। বলা বাহুল্য যে, আমি বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও ডেভিস সাহেবকে পরিত্যাগ করিয়া শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীধর স্বামীর অনুসরণ করিয়াছি।

* অর্থাৎ ঘটের জ্ঞান জন্মিতে গেলে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্তিকার জ্ঞান জন্মায়। মৃত্তিকার জ্ঞান না জন্মাইলে ঘটের জ্ঞান জন্মায় না, সুতরাং ঘট অসৎ, উহার কারণ মৃত্তিকা সৎ।

নাই অর্থাৎ যে বস্তু একবার “আছে” বলিয়া বোধ হইলে আর “নাই” বলিয়া বোধ হয় না, তাহার নাম সৎ। আর যে বস্তু একবার আছে বলিয়া বোধ হইলে পরে আবার নাই বলিয়া বোধ হয়, তাহার নাম অসৎ। এইরূপে বুদ্ধিতন্ত্র সৎ ও অসৎ দুই ভাগে বিভক্ত, এবং সকলেই স্বর্ষগ এই দুই প্রকার জ্ঞান হইতেছে বলিয়া উপলব্ধি করেন। বিশেষণ ও বিশেষ্য পদ এক বিভক্তিতে বর্তমান থাকিলে তাহাদের অভেদ হয়, যেমন “নীলং উৎপলং” ইহার অর্থ উৎপল নীল হইতে অভিন্ন, অর্থাৎ ঐ উৎপলের জ্ঞান হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে অভিন্নভাবে নীলত্বেরও জ্ঞান হইবে। এইরূপ যখন “ঘটঃ সন্,” “পট সন্,” “হস্তী সন্” ইত্যাদি জ্ঞান হয়, তখন ঘটজ্ঞানের সহিত “সৎ” এই জ্ঞান অভিন্নভাবে উৎপন্ন হয়। সুতরাং সৎ ও অসৎ ভেদবুদ্ধির যে কল্পনা করা হইতছিল, তাহা নিরর্থক হয়। কিন্তু লোকে এরূপ অভিন্নভাবে উপলব্ধি করে না। এই বুদ্ধিদ্বয়ের (সৎ ও অসৎ) মধ্যে ঘটাদি বুদ্ধির ব্যাভিচার হয়, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে; সৎ বুদ্ধির ব্যাভিচার হয় না। অতএব ব্যাভিচার হয় বলিয়া যে পদার্থ ঘটাদি বুদ্ধির বিষয়, তাহা অসৎ, এবং অব্যভিচার হয় না বলিয়া উহা বুদ্ধির বিষয় হইতে পারে না।

যদি বল, ঘট বিনষ্ট হইলে যখন ঘটবুদ্ধির ব্যাভিচার হয়, তখন সেই সঙ্গে সঙ্গে সৎবুদ্ধিরও ব্যাভিচার হউক (অর্থাৎ আপত্তিকারীর মতে ঘটবুদ্ধি ও সৎবুদ্ধি অভিন্ন, সুতরাং ঘটবুদ্ধির ব্যাভিচার হইলে সৎবুদ্ধিরও ব্যাভিচার হউক)। এই আপত্তি খাটিতে পারে না; কারণ, তৎকালে সেই সৎবুদ্ধি ঘটাদিতে বর্তমান থাকে, (সুতরাং উহার ব্যাভিচার হয় না।) সে সৎবুদ্ধি বিশেষণভাবে অবস্থিত, সুতরাং (বিশেষ্যনাশে) বিনষ্ট হয় না।

যদি বল, সৎবুদ্ধির স্থলে যেসকল যুক্তি অনুসারে একটি ঘট বিনষ্ট হইলেও অন্য ঘটে ত ঘটবুদ্ধি থাকে, “সুতরাং ঘটবুদ্ধি সৎ হউক,” এ আপত্তি ইহাতে খাটিতে পারে না; যেহেতু সে ঘটবুদ্ধি পটাদিতে থাকে না।

যদি বল, সৎবুদ্ধিও ঘট নষ্ট হইলে দৃষ্ট হয় না। এ কথা গুরুতর নহে। সৎবুদ্ধি বিশেষণভাবে অবস্থিত, বিশেষ্যের অভাব হইলে বিশেষণ থাকিতে পারে না। থাকিলে তাহার বিষয় কি হইবে? বিষয়ের অভাব হইলে সৎবুদ্ধি থাকে না। যদি বল, ঘটাদি বিশেষ্যের অভাব হইলেও বিশেষণ বিশেষ্য ভাবে এক বিভক্তিতে উল্লেখ করা যায় বলিয়া ঘট সৎ হইবে, তাহার উত্তর এই যে, মরীচিকা প্রভৃতি স্থলেও সৎবুদ্ধি এবং উদক, উভয়ের অভাব হইলেও এক বিভক্তিতে ‘সৎ ইদং উদকং’ এরূপ ব্যবহার হয়, (ইহার দ্বারা এক বিভক্তিতে উল্লেখ হওয়া সৎ অথবা অসৎ, এ উভয়ের কোন পক্ষেই প্রমাণ নহে।)

অতএব দেহাদি দ্বন্দ্ব কারণ হইতে উৎপন্ন ও অসৎ, উহার অস্তিত্ব নাই; এবং সৎ যে আত্মা, তাহারও কোথাও অভাব নাই, যেহেতু তাহার কোথাও ব্যাভিচার হয় না। ইহাই সৎ এবং অসৎরূপ আত্মা এবং অনাত্মার স্বরূপনির্ণয়। যে সৎ, সে সৎই; যে অসৎ, সে অসৎই।*

শঙ্করাচার্য যেমন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, এই দার্শনিক বিচারও তাহার উপযুক্ত। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে ইহা বড় মিশিবে না। সুখ দুঃখকে সৎই বল, আর অসৎই বল, সুখ দুঃখ আছে। থাকিবে না সত্য, কিন্তু নাই, এ কথা বলিবার বিষয় নাই। কিন্তু থাকিবে না, এইটাই বড় কাজের কথা। তবে সহ্য করিতে পারিলেই দুঃখ নষ্ট হইবে।

“—The darkest day,
Wait till to-morrow,
Will have passed away.”

এখন ১৪।১৫।১৬, এই তিন শ্লোকে যাহা উক্ত হইল, তাহা ভাল করিয়া না বুঝিলে, কয়েকটি আপত্তি উপস্থাপিত হইতে পারে। প্রথম আপত্তি, দুঃখ সহ্য করিতে হইবে—নিবারণ করিতে হইবে না? অঞ্জনের দুঃখ, জ্ঞান-বন্ধ-বধ: যুদ্ধ না করিলেই সে দুঃখ নিবারণ হইল; দুঃখনিবারণের সহজ উপায় আছে। এ স্থলে তাহাকে দুঃখনিবারণ করিতে উপদেশ না দিয়া, ভগবান্ দুঃখ সহ্য করিতে উপদেশ দিতেছেন, ইহা কিরূপ উপদেশ? রোগীর রোগের উপশমের জন্য ঔষধ ব্যবহার করিতে পরামর্শ না দিয়া, তাহাকে রোগের দুঃখ সহ্য করিতে উপদেশ দেওয়ার সঙ্গে কি এ উপদেশ তুল্য নহে?

বিশ্বকম রচনাবলী

না। তাহা নহে। দঃখ নিবারণের কোন নিষেধ নাই। তবে যেখানে দঃখ নিবারণ করিতে গেলে অধর্ম হয়, সেখানে দঃখ নিবারণ না করিয়া সহ্য করিবে। যে যুদ্ধে অর্জুন প্রবৃত্ত, তাহা ধর্মযুদ্ধ। ধর্মযুদ্ধের অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের আর ধর্ম নাই। ধর্ম পরিত্যাগে অধর্ম। অতএব এ স্থলে দঃখ সহ্য না করিয়া নিবারণ করিলে অধর্ম আছে। এজন্য এখানে সহ্য করিতে হইবে, নিবারণ করা হইবে না।

দ্বিতীয় আপত্তি এই, দঃখই সহ্য করিবে—সুখ সহ্য করা কিরূপ? সুখ দঃখ সমান জ্ঞান করিব? তবে ভগবানের কি এই আজ্ঞা যে, পৃথিবীর কোন সুখে সুখ হইবে না? তবে আর aceticism কাহাকে বলে? সুখশূন্য ধর্ম লইয়া কি হইবে?

ইহার উত্তর পূর্বেই লিখিয়াছি। ইন্দ্রিয়ের অধীন যে সুখ, তাহা দঃখের কারণ—তাহা দঃখমধ্যে গণ্য। ইন্দ্রিয়াদির অনধীন যে সুখ, যথা—জ্ঞান, ভক্তি, প্রীতি, দয়াদির্জনিত যে সুখ, তাহা গীতোক্ত ধর্মাসারে পরিত্যাজ্য নহে, বরং গীতোক্ত ধর্মের সেই সুখই উদ্দেশ্য। আর ইন্দ্রিয়ের অধীন যে সুখ, তাহাও প্রকৃতপক্ষে পরিত্যাজ্য নহে। তৎপরিত্যাগও গীতোক্ত ধর্মের উদ্দেশ্য নহে। তাহাতে অনাসক্তিই গীতোক্ত ধর্মের উদ্দেশ্য, পরিত্যাগ উদ্দেশ্য নহে।

রাগদ্বेषবিমুক্তেষু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।

আত্মবশৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ২। ৬৪ ॥

উক্ত চতুঃষষ্টিতম শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে আমরা এ বিষয়ে আরও কিছু বলিব।

আমরা দেখিতেছি যে, দ্বাদশ শ্লোকে হিন্দুধর্মের প্রথম তত্ত্ব সূচিত হইয়াছে আত্মার অবিনাশিতা। ত্রয়োদশ শ্লোকে দ্বিতীয় তত্ত্ব—জন্মান্তরবাদ। চতুর্দশ, পঞ্চদশ, এবং ষোড়শ শ্লোকে তৃতীয় তত্ত্ব সূচিত হইতেছে—সুখদঃখের অনাত্মধর্মিতা ও অনিত্যত্ব। সাংখ্যদর্শনের ব্যাখ্যার উপলক্ষে আত্মার সঙ্গে সুখদঃখের সম্বন্ধ পূর্বে যে রূপ বঝাইয়াছিলাম, তাহা বঝাইতেছি।

“শরীরাদি ব্যতিরিক্ত পুরুষ। কিন্তু দঃখ ত শারীরাদিক; শারীরাদিতে যে দঃখের কারণ নাই,—এমন দঃখ নাই। যাহাকে মানসিক দঃখ বলি—বাহ্য পদার্থই তাহার মূল। আমার বাক্যে তুমি অপমানিত হইলে, আমার বাক্য প্রাকৃতিক পদার্থ, তাহা শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা তুমি গ্রহণ করিলে, তাহাতে তোমার দঃখ। অতএব প্রকৃতি ভিন্ন দঃখ নাই, কিন্তু প্রকৃতিঘটিত দঃখ পুরুষে বর্তে কেন? “অসঙ্গোহয়ম্পুরুষঃ।” পুরুষ একা, কাহারও সংসর্গবিশিষ্ট নহে। (১ম অধ্যায়ে ১৫শ সূত্র।) অবস্থাাদি সকল শরীরের, আত্মার নহে। (ঐ, ১৪ সূত্র।) “ন বাহ্যান্তরায়োরুপরজ্যোপরঞ্জকভাবোহপি দেশব্যবধানাৎ স্নৃগ্মাস্থপাটলিপুত্রস্থয়োরিব।” বাহ্য এবং আন্তরিকের মধ্যে উপরজ্য এবং উপরঞ্জক ভাব নাই; কেন না, তাহা পরস্পর সংলগ্ন নহে, দেশব্যবধানবিশিষ্ট, যেমন এক জন পাটলিপুত্র নগরে থাকে, আর একজন স্নৃগ্ম নগরে থাকে, ইহাদিগের পরস্পরের ব্যবধান তদ্রূপ।

তবে পুরুষের দঃখ কেন? প্রকৃতির সংযোগই দঃখের কারণ। বাহ্যে আন্তরিকে দেশব্যবধান আছে বটে, কিন্তু কোন প্রকার সংযোগ নাই, এমত নহে। যেমন স্ফাটিক পাত্রের নিকট জ্বাকুসুম রাখিলে পাত্র পুষ্ণের বর্ণবিশিষ্ট হয় বলিয়া, পুষ্ণ এবং পাত্র এক প্রকার সংযোগ আছে বলা যায়, এ সেইরূপ সংযোগ। পুষ্ণ এবং পাত্র মধ্যে দেশব্যবধান থাকিলেও পাত্রের বর্ণ বিকৃত হইতে পারে: ইহাও সেইরূপ। এ সংযোগ নিত্য নহে, দেখা যাইতেছে; সুতরাং তাহার উচ্ছেদ হইতে পারে। সেই সংযোগ উচ্ছেদ হইলেই দঃখের কারণ অপনীত হইল। অতএব এই সংযোগের উচ্ছিন্নিই দঃখনিবারণের উপায়, সুতরাং তাহাই পুরুষার্থ। “যদ্বা তদ্বা তদুচ্ছিন্নিঃ পুরুষার্থস্তদুচ্ছিন্নিঃ পুরুষার্থঃ” (৬, ৭০।)*

অবিনাশি তু তর্হিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্।

বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কত্তুমর্হতি ॥ ১৭ ॥

যাহার দ্বারা এই সকলই ব্যাপ্ত, তাহাকে অবিনাশী জানিবে। এই অব্যয়ের কেহই বিনাশ করিতে পারে না। ১৭।

“যাহার দ্বারা” অর্থাৎ পরমাত্মার দ্বারা। এই “সকলই” অর্থাৎ জগৎ। এই সমস্ত জগৎ পরমাত্মার দ্বারা ব্যাপ্ত—শঙ্কর বলেন, যেমন ঘটাদি আকাশের দ্বারা ব্যাপ্ত, সেইরূপ ব্যাপ্ত।

* প্রবন্ধ-পুস্তক হইতে উদ্ধৃত।

যাহা সর্বব্যাপী, তাহার বিনাশ হইতে পারে না; কেন না, যত কাল কিছু থাকিবে, তত কাল সেই সর্বব্যাপী সত্তাও থাকিবে। যত কাল কিছু থাকিবে, তত কাল সেই সর্বব্যাপী সত্তা সর্বব্যাপীই থাকিবে। অতএব তাহা অব্যয়। আকাশ সর্বব্যাপী, আকাশের বিনাশ বা ক্ষয় আমরা মনেও কল্পনা করিতে পারি না। আকাশ অবিনাশী এবং অব্যয়। যিনি সর্বব্যাপী, সুতরাং আকাশও যাঁহার দ্বারা ব্যাপ্ত, তিনিও অবিনাশী ও অব্যয়। কাজেই কেহই ইঁহার বিনাশসাধন করিতে পারে না।

এক্ষণে এই কথার দ্বারা আর কয়েকটি কথা সূচিত হইতেছে। সেই সকল কথা হিন্দু-ধর্মের স্থূল কথা, এ জন্য এখানে তাহার উত্থাপন করা উচিত।

প্রথমতঃ এই শ্লোকের দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, ঈশ্বর নিরাকার, সাকার হইতে পারেন না। যাহা সাকার, তাহা সর্বব্যাপী হইতে পারে না। সাকার ইন্দ্রিয়াদির গ্রাহ্য। আমরা জানি যে, ইন্দ্রিয়াদির গ্রাহ্য সাকার সর্বব্যাপী কোন পদার্থ নাই। অতএব ঈশ্বর যদি সর্বব্যাপী হয়েন, তবে তিনি সাকার নহেন।

ঈশ্বর সাকার নহেন, ইহাই গীতার মত। কেবল গীতার নহে, হিন্দুশাস্ত্রের এবং হিন্দু-ধর্মের ইহাই সাধারণ মত। উপনিষৎ এবং দর্শনশাস্ত্রের এই মত। সে সকলে ঈশ্বর সর্বব্যাপী চৈতন্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন। সত্য বটে, পুরাণেতিহাসে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি সাকার চৈতন্য কল্পিত হইয়া অনেক স্থলে ঈশ্বরস্বরূপ উপাসিত হইয়াছেন। যে কারণে এইরূপ ঈশ্বরের রূপকল্পনার প্রয়োজন বা উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার অনুসন্ধানের এ স্থলে প্রয়োজন নাই। কেবল ইহাই বক্তব্য যে, পুরাণেতিহাসে শিবাদি সাকার বলিয়া কথিত হইলেও পুরাণ ও ইতিহাসকারেরা ঈশ্বরের সাকারতা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন না, ঈশ্বর যে নিরাকার, তাহা কখনই ভুলেন না। পুরাণেতিহাসেও ঈশ্বর নিরাকার।

একটা উদাহরণ দিলেই আমার কথার তাৎপর্য বৃদ্ধা যাইবে। বিষ্ণুপুরাণের প্রহ্লাদচরিত্র ইহার উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করা যাউক। তথায় বিষ্ণুই ঈশ্বর। প্রহ্লাদ তাঁহাকে “নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ” বলিয়া শ্রব করিতেছেন। অন্য স্থলে স্পষ্টতঃ সাকারতা স্বীকার করিতেছেন। যথা—

ব্রহ্মহে সৃজতে বিশ্বং স্থিতৌ পালয়তে পুনঃ।

রুদ্ররূপায় কল্পান্তে নমস্তুভ্যং ত্রিমূর্তয়ে ॥

এবং পরিশেষে পীতাম্বর হরি সশরীরে প্রহ্লাদকে দর্শন দিলেন। কিন্তু তথাপি এই প্রহ্লাদচরিত্রে বিষ্ণু নিরাকার; তাঁহার নাম “অনন্ত,” তিনি “সর্বব্যাপী”। যিনি অনন্ত এবং সর্বব্যাপী, তিনি নিরাকার ভিন্ন সাকার হইতে পারেন না; এবং তিনি যে নির্গুণ ও নিরাকার, তাহা পুনঃ পুনঃ কথিত হইয়াছে। যথা—

নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ পরাশ্রনে।

নামরূপং ন যস্যৈকো যোহস্তিত্বেনোপলভ্যতে ॥ ইত্যাদি। ১।১৯।৭৯

পুনশ্চ বিষ্ণু “অনাদিমধ্যান্তঃ,” সুতরাং নিরাকার।

এরূপ সকল পুরাণে ইতিহাসে। অতএব ঈশ্বর নিরাকার, ইহাই যে হিন্দুধর্মের মর্ম, ইহা এক প্রকার নিশ্চিত।

তবে কি হিন্দুধর্ম সাকারের উপাসনা নাই? গ্রামে গ্রামে ত প্রত্যহ প্রতিমা-পূজা দেখিতে পাই, ভারতবর্ষ প্রতিমাচর্চনায় পরিপূর্ণ। তবে হিন্দুধর্ম সাকারবাদ নাই কি প্রকারে বলিব?

ইহার উত্তর এই যে, অন্য দেশে যাহা হউক, হিন্দুর প্রতিমাচর্চনা সাকারের উপাসনা নয়; এবং যে হিন্দু প্রতিমাচর্চনা করে, সে নিতান্ত অজ্ঞ ও অশিক্ষিত না হইলে মনে করে না যে, এই প্রতিমা ঈশ্বর, অথবা ঈশ্বরের এইরূপ আকার বা ইহা ঈশ্বরের প্রকৃত প্রতিমা। যে একখানা মাটির কালী গড়িয়া পূজা করে, সে যদি স্বকৃত উপাসনার কিছু মাত্র বুঝে, তবে সে জানে, এই চিত্রিত মৃৎপিণ্ড ঈশ্বর নহে বা ঈশ্বরের প্রতিমা নহে, এবং সে জানে, তাহা ঈশ্বরের প্রতিকৃতি হইতে পারে না।

তবে সে মাটির তালের পূজা করে কেন? সে যাঁহার পূজা করিবে, তাঁহাকে খুঁজিয়া পায় না। তিনি অদৃশ্য, অচিন্তনীয়, ধ্যানের অপ্রাপ্য, অতএব উপাসনার অতীত। কাজেই সে তাঁহাকে ডাকিয়া বলে, “হে বিশ্বব্যাপিনি সর্বময়ি আদ্যাশক্তি! তুমি সর্বত্রই আছ, কিন্তু আমি তোমাকে দেখিতে পাই না; তুমি সর্বত্রই আবির্ভূত হইতে পার, অতএব আমি দেখিতে পাই,

বিশ্বকম রচনাবলী

এমন কিছুতে আবির্ভূত হও। আমি তোমার যে রূপ কল্পনা করিয়া গড়িয়াছি, তাহাতে আবির্ভূত হও, আমি তোমার উপাসনা করি। নহিলে কোথায় পুষ্পচন্দন দিব, তদ্বিষয়ে মনঃস্থির করিতে পারি না।

এই প্রতিমাপূজার উপরে আমাদের শিক্ষাগুরু ইংরেজদিগের বড় রাগ এবং তাহাদিগের শিষ্য নব্য ভারতবর্ষীয়েরও বড় রাগ। ইংরেজের রাগ, তাহার কারণ—বাইবেলে ইহার নিষেধ আছে। শিক্ষিত ভারতবর্ষীয়ের রাগ; কেন না, ইংরেজের ইহার উপর রাগ। যাহা ইংরেজে নিন্দা করে, তাহা “আমাদের” অবশ্য নিন্দনীয়। প্রতিমাপূজা ইংরেজের নিকট নিন্দনীয়, অতএব প্রতিমাপূজা অবশ্য “আমাদের” নিন্দনীয়, তাহার আর বিচার আচারের প্রয়োজন নাই। ইংরেজ বলে যে, এই প্রতিমাপূজার জন্য ভারতবর্ষ উৎসন্ন গিয়াছে, এবং ইহার ধ্বংস না হইলে একেবারে উৎসন্ন যাইবে; সুতরাং আমরাও তাহাই বিশ্বাস করিতে বাধ্য; তাহার আর বিচার আচারের প্রয়োজন নাই। সত্য বটে, রোম গ্রীস প্রভৃতি প্রাচীন রাজ্য প্রতিমাপূজা করিয়াও উন্নত হইয়াছিল, কিন্তু ইংরেজ বলে যে, ভারতবর্ষ প্রতিমাপূজায় উৎসন্ন যাইবে, অতএব ভারতবর্ষ নিশ্চয় প্রতিমাপূজায় উৎসন্ন যাইবে; তদ্বিষয়ে বিচারের প্রয়োজন নাই। এইরূপ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে ভাবিয়া থাকেন। অন্যমত বিবেচনা করা কুশিক্ষা, কুবুদ্ধি, এবং নীচাশয়তার কারণ মনে করেন।

আমরা এরূপ উক্তি অনমোদন করিতে পারি না। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সকলের অন্তর্য়ামী। সকলের অন্তরের ভিতর তিনি প্রবেশ করিতে পারেন, সকল প্রকারের উপাসনা গ্রহণ করিতে পারেন; কি নিরাকারের উপাসক, কি সাকারোপাসক, কেহই তাহার প্রকৃত স্বরূপ অনুভূত করিতে পারেন না। তিনি অচিন্তনীয়। অতএব তাহার চক্ষে সাকার উপাসকের উপাসনা ও নিরাকার উপাসকের উপাসনা তুল্য; কেহই তাহাকে জানে না। যদি ইহা সত্য হয়, যদি ভক্তিই উপাসনার সার হয়, এবং ভক্তিশূন্য উপাসনা যদি তাহার অগ্রাহ্যই হয়, তবে ভক্তিশূন্য উপাসনার উপাসনা তাহার নিকট গ্রাহ্য; ভক্তিশূন্য হইলে নিরাকারোপাসকের উপাসনা তাহার নিকট পৌঁছিতে না। অতএব আমাদের বিশ্বাস যে, ভারতবর্ষীয়ের যদি ঈশ্বরে ভক্তি থাকে, তবে সাকার উপাসনার ভাবে আচ্ছন্ন হইলেও কেহ উৎসন্ন যাইবে না, আর ভক্তিশূন্য হইলে নিরাকারোপাসনায়ও উৎসন্ন হইবে, তদ্বিষয়ের কোন সংশয় নাই। সাকার ও নিরাকার উপাসনার মধ্যে আমাদের মতে কোনটাই নিষ্ফল নহে; এবং এতদুভয়ের মধ্যে উৎকর্ষাপকর্ষ নাই। সুতরাং উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার নিষ্প্রয়োজনীয়।

সাকারোপাসকেরা বলিয়া থাকেন, নিরাকারের উপাসনা হয় না। অনন্তকে আমরা মনে ধরিতে পারি না, সুতরাং তাহার ধ্যান বা চিন্তা আমাদের দ্বারা সম্ভব নহে, এ কথাও বিচার নিষ্প্রয়োজন বোধ হয়। কেন না, এমন যদি কেহ থাকেন যে, তিনি আপনার সান্ত চিন্তাশক্তির দ্বারা অনন্তের ধ্যান বা চিন্তায় সক্ষম, এবং তাহাতে ভক্তিশূন্য হইতে পারেন, তবে তিনি নিরাকারেরই উপাসনা করুন। যিনি তাহা না পারেন, তাহাকে কাজেই সাকারের উপাসনা করিতে হইবে। অতএব সাকারোপাসক ও নিরাকারোপাসকের মধ্যে বিচার, বিবাদ ও পরস্পরের বিদ্বেষের কোন কারণ দেখা যায় না।

পাঠক স্মরণ রাখিবেন যে, আমি “সাকারের উপাসনা,” এবং “সাকারোপাসক” ভিন্ন “সাকারবাদ” বা “সাকারবাদী” শব্দ ব্যবহার করিতেছি না। কেন না, “সাকারবাদ” অবশ্য পরিহার্য। ঈশ্বর সাকার নহেন, ইহা পূর্বেই বলা গিয়াছে।

কথাটা উঠিতে পারে যে, ঈশ্বর যদি সাকার নহেন, তবে হিন্দুধর্ম্মের অবতারবাদের কি হইবে? এই গীতার বক্তা কৃষ্ণকে উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করা যাউক। ঈশ্বর নিরাকার, কিন্তু কৃষ্ণ সাকার। ইহাকে তবে কি প্রকারে ঈশ্বরবতার বলা যাইবে? এই প্রশ্নের যথাসাধ্য উত্তর আমি কৃষ্ণচরিত্র নামক মৎপ্রণীত গ্রন্থে দিয়াছি, সুতরাং এখানে সে সকল কথা পুনর্বার বলিবার প্রয়োজন নাই। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, সুতরাং ইচ্ছানুসারে তিনি যে আকার ধারণ করিতে পারেন না, এ কথা বলিলে তাহার শক্তির সীমা নির্দেশ করা হয়।

“যেন সর্ব্বমিদং ততম্” ইত্যাদি বাক্যে অনেকের এইরূপ ভ্রম জন্মিতে পারে যে, বিলাতী Pantheism এবং হিন্দুধর্ম্মের ঈশ্বরবাদ বৃষ্টি একই। স্থানান্তরে এই ভ্রমের নিরাস করা যাইবে।

অন্তবস্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ ।

অনাশিনোহপ্রমেয়স্য তস্মাদ্‌যুদ্ধস্ব ভারত ॥ ১৮ ॥

নিত্য, অবিনাশী এবং অপ্রমেয় আত্মার এই দেহ নশ্বর বলিয়া কথিত হইয়াছে। অতএব হে ভারত! যুদ্ধ কর। ১৮ ।

নিত্য, অর্থাৎ সর্বদা একরূপে স্থিত (শ্রীধর)।

অপ্রমেয় অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা অপরিচ্ছেদ্য। প্রত্যক্ষাদির অতীত।

শ্রীধর এই শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন—“নিত্য অর্থাৎ সর্বদা একরূপ, অতএব অবিনাশী, ও অপ্রমেয় অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন যে আত্মা, তাঁহার এই দেহ সুখদুঃখাদিধর্মিক, ইহা তত্ত্বদর্শীদিগের দ্বারা উক্ত; যখন আত্মার বিনাশ নাই, সুখদুঃখাদি সম্বন্ধ নাই, তখন মোহজনিত শোক পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ কর, অর্থাৎ স্বধর্ম ত্যাগ করিও না।”

এই শ্লোকের ব্যাখ্যার পর শঙ্করাচার্য্য যাহা বলিয়াছেন, তাহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ আবশ্যিক। তিনি বলেন—“ইহাতে যুদ্ধের কর্তব্যতা বিধান করা হইতেছে না। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াও ইনি শোকমোহপ্রতিবন্ধ হইয়া তৃষ্ণীভাবে আছেন, ভগবান্‌ তাঁহার কর্তব্যপ্রতিবন্ধের অপনয়ন করিতেছেন মাত্র। অতএব ‘যুদ্ধ কর’ ইহা অনুবাদ মাত্র, বিধি নয়।”

অনেকের বিশ্বাস যে, এই গীতাগ্রন্থের স্থূল উদ্দেশ্য—যুদ্ধের ন্যায় নৃশংস ব্যাপারে মনুষ্যের প্রবৃত্তি দেওয়া। তাঁহারা যে গীতা বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই, তাহা বলা বাহুল্য। গীতা বাজারের উপন্যাস-গ্রন্থ নহে যে, একবার পড়িবা মাত্র উহার সমস্ত তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে। বিশেষরূপে উহার আলোচনা না করিলে বুঝা যায় না। গীতার এতদংশের উদ্দেশ্য—স্বধর্মপালনের অপরিহার্য্যতা প্রতিপন্ন করা। স্বধর্ম বলিলে শিক্ষিত সম্প্রদায় বুঝিতে কষ্ট পাইতে পারেন, ইহার ইংরাজি প্রতিশব্দ Duty শুনিলে বোধ হয়, সে কষ্ট থাকিবে না। গীতার এতদংশের উদ্দেশ্য—সেই Duty ধর্মের অবশ্যসম্পাদ্যতা প্রতিপন্ন করা। সকল মনুষ্যের স্বধর্ম একপ্রকার নহে—কাহারও স্বধর্ম দণ্ড-প্রণয়ন; কাহারও স্বধর্ম ক্ষমা। সিপাহীর স্বধর্ম শত্রুকে আঘাত করা, ডাক্তারের স্বধর্ম সেই আঘাতের চিকিৎসা। মনুষ্যের যত প্রকার কর্ম আছে, তত প্রকার স্বধর্ম আছে। কিন্তু সকল প্রকার স্বধর্ম মধ্যে যুদ্ধই সর্বাপেক্ষা নৃশংস ব্যাপার। যুদ্ধ পরিহার করিতে পারিলে যুদ্ধ কাহারও কর্তব্য নহে। কিন্তু এমন অবস্থা ঘটে যে, এই নৃশংস কার্য্য অপরিহার্য্য ও অবশ্যসম্পাদ্য হইয়া উঠে। তৈমুরলঙ্গ বা নাদের দেশ দক্ষ ও লুণ্ঠিত করিতে আসিতেছে, এমন অবস্থায় যে যুদ্ধ করিতে জানে, যুদ্ধ তাহারই অপরিহার্য্য ও অবশ্যসম্পাদ্য স্বধর্ম। অতএব গীতাকার স্বধর্মপালন সম্বন্ধে ইংরাজি দর্শনশাস্ত্রে যাহাকে Crucial instance বলে, তাহাই অবলম্বন করিয়া স্বধর্মের অবশ্যসম্পাদ্যতা এবং তদুপলক্ষে সমস্ত ধর্মেরও নিগূঢ় রহস্য ব্যাখ্যাত করিতেছেন। উদাহরণস্বরূপ যে স্বধর্ম সর্বাপেক্ষা নৃশংস ও ভয়াবহ ও যাহাতে সাধুজন মাত্রই স্বতঃ অপ্রবৃত্ত, তাহাই গ্রহণ করা হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে—যুদ্ধের মধ্যে যে যুদ্ধ সর্বাপেক্ষা নৃশংস ও ভয়াবহ, যাহাতে স্বভাবতঃ নৃশংস ব্যক্তিও সহজে প্রবৃত্ত হইতে চাহে না, তাহাই উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। Crucial instance বটে। গীতার উদ্দেশ্য ইহাই প্রতিপাদন করা যে, স্বধর্ম এরূপ নৃশংস, ভয়াবহ এবং সাধুজন-প্রবৃত্তির আপাত-বিরোধী হইলেও তাহা অবশ্য পালনীয়।

কিন্তু শ্লোকটার ভাবার্থ বোধ করি, এখনও পরিষ্কার হয় নাই। ‘আত্মা অবিনাশী—কেহ তাহার বিনাশ করিতে পারে না—অতএব যুদ্ধ কর,’ এই কথার অর্থ কি? আত্মা অবিনাশী বলিয়া কাহাকে হত্যা করায় কি দোষ নাই? ভগবদ্‌বাক্যের সে তাৎপর্য্য নহে। ইহার তাৎপর্য্য উপরিধৃত শঙ্করভাষ্যে যাহা কথিত হইয়াছে, তাই। অর্জুন যুদ্ধে প্রবৃত্ত, তবে মোহে অভিভূত হইয়া, মানুষ মারিতে হইবে, এই দুঃখে তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছেন। ভগবান্‌ বুঝাইতেছেন যে, দুঃখ করিবার কারণ কিছুই নাই—কেন না, কেহই মরিবে না। শরীর নষ্ট হইবে বটে, কিন্তু শরীর ত অনিত্য, অর্জুন যুদ্ধ না করিলেও এক দিন অবশ্য নষ্ট হইবে। কিন্তু শরীর নষ্ট হইলে মানুষ মরে না—যাহার শরীর, সে অমর—কেহই তাহাকে মারিতে পারে না। অতএব যুদ্ধের প্রতি অর্জুন যে আপত্তি উপস্থিত করিতেছেন, সেটা ভ্রমজনিত মাত্র। অতএব তিনি যুদ্ধ করিতে পারেন।

বঙ্গিকম রচনাবলী

য এনং বোত্তি হস্তারং যশৈচনং মন্যতে হতম্ ।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হস্তি ন হন্যতে ॥ ১৯ ॥

যে ইহাকে হস্তা বলিয়া জানে, এবং যে ইহাকে হত বলিয়া জানে, ইহারা উভয়েই অনাভিজ্ঞ । ইনি হত্যা করেন না—হতও হয়েন না । ১৯ ।

প্রাচীন টীকাকারেরা এই শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন; যথা—ভীষ্মাদির মৃত্যু নিমিত্ত অর্জুনের শোক, উক্ত বাক্যে নিবারণিত হইল । এক্ষণে “আমি ইহাদের বধের কর্তা” এই নিমিত্ত যে দুঃখ, প্রথম অধ্যায়ে ৩৪।৩৫ ইত্যাদি শ্লোকে অর্জুনের দ্বারা উক্ত হইয়াছে, তাহার উত্তরে ভগবান্ বুদ্ধাইতেছেন যে, আত্মা যেমন কাহারও কর্তৃক হত হয়েন না, তেমনি তিনি কাহাকেও হত্যা করেন না । কেন না, আত্মা অবিক্রিয় ।

শঙ্কর ও শ্রীধর প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়েরা যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, আমি এক্ষণে সেইরূপ বলিতেছি । ইহার পরবর্তী শ্লোকেরও সেইরূপ অর্থ করিব । অন্য অর্থ হয় কি না, তাহাও বলা যাইবে । টীকাকারেরা বলেন, আত্মা যে অবিক্রিয়, তাহার প্রমাণ পরবর্তী শ্লোকে দেওয়া হইতেছে ।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্মায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ ।
অজো নিত্যঃ শাস্বতোহয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যামানে শরীরে ॥ ২০ ॥

ইনি জন্মেন না বা মরেন না, কখন হয়েন নাই, বর্তমান নাই বা হইবেন না । ইনি অজ, নিত্য, শাস্বত, পুরাণ; শরীর হত হইলে ইনি হত হয়েন না । ২০ ।

টীকাকারেরা বলেন, আত্মা যে অবিক্রিয়, ইহার ষড়্ভাববিকারশূন্যত্বের দ্বারা দৃঢ়ীকৃত করা হইতেছে । ইনি জন্মশূন্য—এই কথার দ্বারা জন্ম প্রতিষিদ্ধ হইল; মরেন না—ইহাতে বিনাশ প্রতিষিদ্ধ হইল । ইনি কখন উৎপন্ন হয়েন নাই, এজন্য বর্তমান নাই । যাহা জন্মে, তাহাকেই বর্তমান বলা যায়; কিন্তু ইনি পূর্বে হইতে স্বতঃ সদ্‌রূপে আছেন, অতএব উৎপন্ন হইয়া যে বিদ্যমানতা, তাহা ইহার নাই । এবং সেই জন্য ইনি আবার জন্মিবেন না । সেই জন্য ইনি অজ অর্থাৎ জন্মশূন্য, ইনি নিত্য অর্থাৎ সর্বদা একরূপ, শাস্বত অর্থাৎ অপক্ষয়শূন্য, পুরাণ অর্থাৎ বিপরিণামশূন্য ।

এক্ষণে পাঠক, এই দুইটি শ্লোকের প্রতি মনোভিনিবেশ করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, আত্মার এই অবিক্রিয়ত্ববাদ সম্বন্ধে কোন কথা স্পষ্টতঃ মূলে নাই । অস্পষ্টতঃ “নায়ং হস্তি” এই কথাটা আছে, কিন্তু ইহার অন্য অর্থ না হইতে পারে, এমনও নহে । যদি কেহ মরে না, তবে আত্মাও কাহাকে মারে না ।

আত্মা যে অবিক্রিয়, ইহা প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রের একটি মত । তত্ত্বটা কি, তাহা পাঠককে বুদ্ধান যাইতে পারে, কিন্তু সে প্রসঙ্গ উত্থাপিত করা আবশ্যিক বোধ হইতেছে না । আবশ্যিক বোধ হইতেছে না, তাহার কারণ, আমরা গীতার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত, কিন্তু এই দুইটি শ্লোক গীতার নহে । শ্লোক দুইটি কঠোপনিষদের । গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের যেটি ১৯শ শ্লোক, তাহা কঠোপনিষদেরও দ্বিতীয় বল্লীর ১৯শ শ্লোক; আর গীতার ঐ অধ্যায়ের যেটি ২০শ শ্লোক, তাহাও কঠোপনিষদের ঐ বল্লীর ১৮শ শ্লোক । গীতার শ্লোক ও কঠোপনিষদের শ্লোক পাশাপাশি লেখা যাইতেছে ।

গীতা ।

য এনং বোত্তি হস্তারং যশৈচনং মন্যতে হতম্ ।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হস্তি ন হন্যতে ॥ ২।১৯
ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্মায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ ।
অজো নিত্যঃ শাস্বতোহয়ম্পুরাণো ন হন্যতে হন্যামানে শরীরে ॥ ২।২০

কঠোপনিষদ্ ।

হস্তা চেন্মন্যতে হস্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্ ।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হস্তি ন হন্যতে ॥ ২।১৯

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।

অজো নিত্যঃ শাস্বতোহম্পদুরাগো ন হন্যাতে হন্যামানে শরীরে ॥ ২।১৮

শ্লোক দুইটি কঠোপনিষদ্ হইতে গীতায় আনীত হইয়াছে, গীতা হইতে কঠোপনিষদে নীত হয় নাই। এ কথা লইয়া বোধ করি বেশী বিচারের প্রয়োজন নাই। আমরা দেখিব, উপনিষদ্ হইতে অনেক শ্লোক গীতায় আনীত হইয়াছে। অন্ততঃ প্রাচীন ভাষ্যকারদিগের এই মত। শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—“শোকমোহাদিসংসারকারণনিবৃত্ত্যর্থং গীতাশাস্ত্রং ন প্রবর্ত্তক-মিত্যেতৎ পার্থস্য সাক্ষীভূতে ঋচাবানিনায়” এবং আনন্দগিরি লিখিয়াছেন—“হস্তা চেন্মন্যাতে হস্তুং ইত্যাদ্যাম্চমর্থতো দর্শয়িত্বা ব্যাচষ্টে য এনর্মিতি।”

এক্ষণে এই শ্লোক সম্বন্ধে দুইটি কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি।

প্রথম, আত্মা যদি কর্ত্তা নহে, তবে কর্ম্মযোগ জলে ভাসাইয়া দিতে হয়। শঙ্করাচার্য্যের যে তাহাই উদ্দেশ্য, ইহা বলা বাহুল্য। কর্ম্মযোগের কথা যখন পড়িবে, পাঠক তখন এ বিষয়ের বিচার করিতে পারিবেন।

দ্বিতীয়, আত্মার অবিক্রিয়ত্ব একটা দার্শনিক মত। প্রাচীন কালে সকল দেশে, দর্শন ধর্ম্মের স্থান অধিকার করে এবং ধর্ম্ম দর্শনের অনুগামী হয়। ইহা উভয়েরই অনিষ্টকারী। ধর্ম্ম ও দর্শন পরস্পর হইতে বিযুক্ত হইলেই উভয়ের উন্নতি হয়, নচেৎ হয় না। এই তত্ত্বটি সপ্রমাণ করিয়া কোম্ৎ ও তর্কশিষ্যগণ দর্শন ও ধর্ম্ম উভয়েরই উপকার করিয়াছেন। আমরাদিগেরও সেই মার্গাবলম্বী হওয়া উচিত।

দার্শনিক মত যাহাই হউক, হিন্দুধর্ম্মের সাধারণ মত—আত্মাই কর্ত্তা। ইহা প্রমাণ করিবার জন্য শত পৃষ্ঠা ধরিয়া বচন উদ্ধৃত করিতে পারা যায়। আমরা কেবল দুইটি কথা তুলিব। একটি উপনিষদ্ হইতে, আর একটি পুরাণ হইতে।

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ।

নান্যৎ কিঞ্চন মিসৎ।

স ঈক্ষত লোকান্ নৃ সৃজা ইতি ॥ ১

স ইমাল্লোকানসৃজত অস্তো মরীচীর্ম্মরমিত্যাতি।

ঋগ্বেদীয়ৈতরেয়োপনিষৎ।

আত্মাই সব সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং আত্মাই কর্ত্তা।

দ্বিতীয় উদাহরণ পুরাণ হইতে গ্রহণ করিতেছি। উহা কঠোপনিষদের শ্লোকের সঙ্গে তুলনা করিয়া পাঠক দেখিবেন, হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান করা কি যন্ত্রণা—

কঃ কেন হন্যাতে জন্তুর্জন্তুঃ কঃ কেন রক্ষ্যতে।

হস্তি রক্ষতি চৈবাত্মা হ্যসৎ সাধু সমাচরন্ ॥

বিষ্ণুপুরাণ। ১।১৮।২৯

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমবায়ম্।

কথং স পদ্রুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হস্তি কন্ ॥ ২১ ॥

যে ইহাকে অবিনাশী, নিত্য, অজ এবং অবায় বলিয়া জানে, হে পার্থ, সে পদ্রুষ কাহাকে মারে? কাহাকেই বা হনন করায়?। ২১।

ভাবার্থ—যে জানে যে, দেহ নাশ হইলেই শরীরীর বিনাশ হইল না, সে যদি কাহারও দেহধ্বংসের কারণ হয়, তবে তাহার উচিত নহে যে, সে “আমি ইহার বিনাশের কারণ হইলাম” বলিয়া দৃঃখিত হয়। কেন না, আত্মা অবিনাশী। শরীরের বিনাশে তাহার বিনাশ হইল না।

তবে যদি বল যে, “ভাল, আত্মার বিনাশ না হউক, কিন্তু শরীরের ত বিনাশ আছেই। শরীরনাশেরই বা আমি কেন কারণ ছই?” তাহার উত্তর পরশ্লোকে কথিত হইতেছে—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়

নবানি গৃহ্ণ্যতি নরোহপরাণি।

তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণা-

ন্যান্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২ ॥

বিক্রম রচনাবলী

যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র* গ্রহণ করে, তেমনি আত্মা পুরাতন শরীর পরিত্যাগ করিয়া নূতন শরীরে সংগত হয়। ২২।

অর্থাৎ যেমন তোমার জীর্ণ বস্ত্র কেহ ছিঁড়িয়া দিক বা না দিক, তোমাকে জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র গ্রহণ করিতেই হইবে, তেমনি তুমি যুদ্ধ কর বা না কর, যোদ্ধৃগণ অবশ্য দেহত্যাগ করিবে, তোমার যুদ্ধবিবর্তিতে তাহাদের দেহনাশ নিবারণ হইবে না। তবে কেন যুদ্ধ করিবে না?

স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, যে ব্যক্তি বধকার্য্য করিতে হইবে বলিয়া শোকমোহপ্রযুক্ত ধর্ম্মযুদ্ধ হইতে বিমুখ হয়, তাহার প্রতি এই সকল বাক্য প্রযোজ্য। নচেৎ আত্মা অবিদ্যমান এবং দেহমাত্র নশ্বর, ইহার এমন অর্থ নহে যে, কেহ কাহাকে খুন করিলে তাহাতে দোষ নাই। খুন করিলে দোষ আছে কি না আছে—সে বিচারের সঙ্গে এ বিচারের কোন সম্বন্ধই নাই—থাকিতেও পারে না। এখানে বিবেচ্য, ধর্ম্মযুদ্ধে শোকমোহের কোন কারণ আছে কি না? উত্তর—কারণ নাই, কেন না, আত্মা অবিদ্যমান, আর দেহ নশ্বর। দেহী কেবল নূতন কাপড় পরিবে মাত্র—তাহাতে কাঁদাকাটার কথাটা কি?

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।

ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষণতি মারুতঃ ॥ ২৩ ॥

এই (আত্মা) অস্ত্রে কাটে না, আগুনে পুড়ে না, জলে ভিজে না, এবং বাতাসে শুকায় না। ২৩।

আত্মা নিরবয়ব, এই জন্য অস্ত্রাদির অতীত।

অচ্ছেদ্যোহয়মদাহ্যোহয়মক্লেদ্যোহশোষ্য এব চ।

নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থানুরচলোহয়ং সনাতনঃ।

অব্যক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়মবিকার্য্যোহয়মুচ্যতে ॥ ২৪ ॥

ইনি ছেদনীয় নহেন, দহনীয় নহেন, ক্লেদনীয় নহেন, এবং শোষণীয় নহেন। (ইনি) নিত্য, সর্ব্বগত, স্থানু, অচল, সনাতন, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অবিকার্য্য বলিয়া কথিত হন। ২৪।

স্থানু—অর্থাৎ স্থিরস্বভাব। অচল—পূর্্বরূপ অপরিভ্রাণী। সনাতন—চিরন্তন, অনাদি। অব্যক্ত—চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অবিষয়। অচিন্ত্য—মনের অবিষয়। অবিকার্য্য অচল—কর্মেন্দ্রিয়ের অবিষয়।

শঙ্কর এই শ্লোকের অর্থ এইরূপ করেন। আত্মা অচ্ছেদ্য ইত্যাদি, এজন্য আত্মা নিত্য; নিত্য—এজন্য সর্ব্বগত; সর্ব্বগত—এজন্য স্থিরস্বভাব; স্থিরস্বভাব—এজন্য অচল; অচল—এজন্য সনাতন, ইত্যাদি।

তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫ ॥

অতএব ইহাকে এইরূপ জানিয়া, শোক করিও না। ২৫।

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।

তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং† শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬ ॥

আর যদি ইহা তুমি মনে কর, আত্মা সর্ব্বদাই জন্মে, সর্ব্বদা মরে, তথাপি হে মহাবাহো! ইহার জন্য শোক করিও না। ২৬।

কেন তথাপি শোক করিবে না? শঙ্কর বলেন, মৃত্যু অবশ্যস্বাভাবী বলিয়া। পরশ্লোকেও সেই কথা আছে। কিন্তু পরশ্লোকে “ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ” এই বাক্য আত্মার অবিদ্যমানতাও সূচিত হইতেছে। তাহা হইলে আর আত্মার বিনাশ স্বীকার করা হইল কৈ? এবং নূতন কথাই বা কি হইল? এই জন্য শ্রীধর আর এক প্রকার বদ্বাইয়াছিলেন। তিনি বলেন যে,

* “It was if my soul were thinking separately from the body; she looked upon the *body as a foreign substance, as we look upon a garment.*” Wilhelm Meister, Carlyle’s Translation. Book VI.

যে কয়টা কথা ইটালিক অক্ষরে লিখিলাম, পাঠক তৎপ্রতি অনুধাবন করিবেন, গীতার কথাটা বেশ বদ্বা যাইবে।

† “নৈবং” পাঠান্তর।

আত্মাও যদি মরিল, তাহা হইলে তোমাকেও আর পাপপুণ্যের ফলভাগী হইতে হইবে না, তবে আর দুঃখের বিষয় কি?

কেন তথাপি শোক করিবে না, তাহা পরশ্লোকে বলা হইতেছে।

জাতস্য হি ধুবো মৃত্যুধুবং জন্ম মৃতস্য চ।

তস্মাদপরিহার্যেহর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭ ॥

যে জন্মে, সে অবশ্য মরে; যে মরে, সে অবশ্য জন্মে; অতএব যাহা অপরিহার্য, তাহাতে শোক করিও না। ২৭।

আত্মার অবিনাশিতা গীতাকারের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে। “নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্” বলিয়া মানিয়া লইয়াও, উত্তরে আবার বলিতেছেন, “ধুবং জন্ম মৃতস্য চ।” যদি মরিলে আবার অবশ্য জন্মবে, তবে আত্মা অবশ্য অবিনাশী, “নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্” বলা আর খাটে না। তবে শ্রীধরের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে এ আপত্তি উপস্থিত হয় না।

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।

অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮ ॥

জীবসকল আদিতে অব্যক্ত, (কেবল) মধ্যে ব্যক্ত, (আবার) নিধনে অব্যক্ত; সেখানে শোকবিলাপ কি?। ২৮।

অব্যক্ত শব্দের অর্থ পূর্বে বলা হইয়াছে। শঙ্কর অর্থ করেন, “অব্যক্তমদর্শনমনুপলঙ্কি-
র্ষেষ্ণাং ভূতানাং” অর্থাৎ যে (যে অবস্থায়) ভূতসকলের দর্শন বা উপলঙ্কি নাই। শ্রীধর অর্থ করেন,
“অব্যক্তং প্রধানং তদেবাদি উৎপত্তেঃ পূর্বে রূপম্।” অর্থাৎ ভূত সকল উৎপত্তির পূর্বে
কারণরূপে অব্যক্ত থাকে। অপর সকলে কেহ শ্রীধরের, কেহ শঙ্করের অনুবর্তী হইয়াছেন।
শঙ্করের অর্থ গ্রহণ করিলেই অর্থ সহজে বুঝা যায়।

শ্লোকের অর্থ এই যে, যেখানে জীব সকল আদিতে অর্থাৎ জন্মের পূর্বে চক্ষুরাদির
অতীত ছিল; কেবল মধ্যে দিনকত জন্মগ্রহণ করিয়া ব্যক্তরূপ হইয়াছিল, শেষে মৃত্যুর পর
আবার চক্ষুরাদির অতীত হইবে, তখন আর তজ্জন্য শোক করিব কেন? “প্রতিবুদ্ধস্য
স্বপ্নদৃষ্টবস্তুষ্চিব শোকো ন যুজ্যতে” (শ্রীধর স্বামী)—ঘুম ভাঙ্গিলে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় জীবের
জন্য শোক অনুচিত।

এখানেও আত্মার অবিনাশিত্ববাদ জাজ্বল্যমান।

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-

মাশ্চর্য্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ।

আশ্চর্য্যবচৈনমন্যঃ শৃণোতি

শ্রুতাপোনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯ ॥

এই (আত্মা)কে কেহ আশ্চর্য্যবৎ দেখেন; কেহ ইহাকে আশ্চর্য্যবৎ বলেন; কেহ ইহাকে
আশ্চর্য্যবৎ শুনিয়া থাকেন। শুনিয়াও কেহ ইহাকে জানিতে পারিলেন না। ২৯।

এই শ্লোকের অভিপ্রায় এই। আত্মা অবিনাশী হইলেও পণ্ডিতেরাও মৃত ব্যক্তির জন্য
শোক করিয়া থাকেন বটে। কিন্তু তাহার কারণ এই যে, তাঁহারাও প্রকৃত আত্মতত্ত্ব অবগত নহেন।
আত্মা তাঁহাদের নিকট বিস্ময়ের বিষয় মাত্র—তাঁহারা আশ্চর্য্য বিবেচনা করেন। আত্মার
দুর্জয়তাবশতঃ সকলের এই ভ্রান্তি।

এ কথাতে এই আপত্তি হইতে পারে যে, “আত্মা অবিনাশী” এবং “ইন্দ্রিয়াদির অবিষয়”
এই সকল কথাতে এমন কিছু নাই যে, পণ্ডিতেও বুঝিতে পারে না। কিন্তু ভগবদুক্তির
উদ্দেশ্য কেবল দুর্বেধ্যতা প্রতিপাদন করা নহে। আমরা আত্মার অবিনাশিতা বুঝিতে
পারিলেও কথাটা আমাদের হৃদয়ে বড় প্রবেশ করে না। তদ্বিষয়ক যে বিশ্বাস, তাহা আমাদের
সমস্ত জীবন শাসিত করে না। এই বিশ্বাসকে আমরা একটা সর্বদা-জাজ্বল্যমান, জীবন্ত,
সর্বথা-হৃদয়ে-প্রস্ফুটিত-ব্যাপারে পরিণত করি না। ইহাই ভগবদুক্তির উদ্দেশ্য।

দেহী নিত্যমবধ্যোহয়ং দেহে সর্বস্য ভারত।

তস্মাৎ সর্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০ ॥

হে ভারত! সকলের দেহে, আত্মা নিত্য ও অবধ্য। অতএব জীব সকলের জন্য তোমার
শোক করা উচিত নহে। ৩০।

বিক্রম রচনাবলী

আত্মার অবিনাশিতা সম্বন্ধে যাহা কথিত হইল, এই শ্লোক তাহার উপসংহার।

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।

ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছেদয়োহন্যৎ ক্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥ ৩১ ॥

স্বধর্ম্ম প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ভীত হইও না। ধর্ম্ম্য যুদ্ধের অপেক্ষা ক্রিয়ের পক্ষে শ্রেয় আর নাই। ৩১।

এক্ষণে ১১ ও ২২ শ্লোকের টীকায় যাহা বলা গিয়াছে, তাহা স্মরণ করিতে হইবে। স্বধর্ম্ম কি, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। ক্রিয় অর্থাৎ যুদ্ধব্যবসায়ীর স্বধর্ম্ম—যুদ্ধ। কিন্তু যোদ্ধার স্বধর্ম্ম যুদ্ধ বলিয়া যে, যুদ্ধ উপস্থিত হইলেই যে যোদ্ধাকে তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, এমন নহে। অনেক সময়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া যোদ্ধার পক্ষে অধর্ম্ম। অনেক রাজা পরস্বাপহরণ জন্যই যুদ্ধ করেন। তাদৃশ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া ধর্ম্মানুসৃত নহে। কিন্তু যে যুদ্ধব্যবসায়ী, মনুষ্য-সমাজের দোষে তাহাকে তাহাতেও প্রবৃত্ত হইতে হয়। যোদ্ধাগণ রাজা বা সেনাপতির আজ্ঞানুবর্তী। তাঁহাদের আজ্ঞামত যুদ্ধ করিতে, অধীন যোদ্ধামাত্রেরই বাধ্য। কিন্তু সে অবস্থায় যুদ্ধ করিলেও তাঁহারা পরস্বাপহরণ ইত্যাদি পাপের অংশী হইবেন। এই অধর্ম্মযুদ্ধই অনেক। যোদ্ধা তাহা হইতে কোনরূপে নিষ্কর্ত পান না। ভীষ্মের ন্যায় পরমধর্ম্মিক ব্যক্তিরও অন্তদাসত্ববশতঃ দুর্য্যোধনের পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক অধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার কথা এই মহাভারতেই আছে। ইউরোপীয় সৈন্যমাধ্যে খৃঃজিলাে ভীষ্মের অবস্থাপন্ন লোক সহস্র সহস্র পাওয়া যাইবে। অতএব যোদ্ধার এই মহৎ দুর্য্যোগ্য যে, স্বধর্ম্ম পালন করিতে গিয়া, অনেক সময়েই অধর্ম্ম লিপ্ত হইতে হয়। ধর্ম্মিক যোদ্ধা ইহাকে মহৎদুঃখ বিবেচনা করেন। কিন্তু ধর্ম্মযুদ্ধও আছে। আত্মরক্ষা, স্বজনরক্ষা, সমাজরক্ষা, দেশরক্ষা, সমস্ত প্রজার রক্ষা, ধর্ম্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এইরূপ যুদ্ধে যোদ্ধার অধর্ম্ম সঞ্চার না হইয়া পরম ধর্ম্ম সঞ্চার হয়। এখানে কেবল স্বধর্ম্মপালন নহে, তাহার সঙ্গে অনন্ত পুণ্য সঞ্চার। এরূপ ধর্ম্মযুদ্ধ যে যোদ্ধার অদৃষ্টে ঘটে, সে পরম ভাগ্যবান্। অজ্ঞানের সেই সময় উপস্থিত, এরূপ যুদ্ধে অপ্রবৃত্তি পরম অধর্ম্ম—অনর্থক স্বধর্ম্মপরিত্যাগ। অজ্ঞান সেই অনর্থক স্বধর্ম্মপরিত্যাগরূপ ঘোরতর অধর্ম্ম প্রবৃত্তি। ইহার কারণ আর কিছু নহে। কেবল স্বজনাদি নিধনের ভয়। সেই ভয়ে ভীত শোকাকুল বা মূগ্ধ হইবার কোন কারণ নাই, তাহা ভগবান্ বুদ্ধাইলেন: বুদ্ধাইলেন যে, কেহ মরিবে না—কেন না, দেহী অমর। যাইবে কেবল শূন্য দেহ, কিন্তু সেটা ত জীর্ণ বস্ত্র মাত্র। অতএব স্বজনবধাশঙ্কায় ভীত হইয়া স্বধর্ম্ম উপেক্ষা অকর্তব্য। এই ধর্ম্মযুদ্ধের মত এমন মঙ্গলময় ব্যাপার ক্রিয়ের আর ঘটে না। ইহাই শ্লোকার্থ।

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।

সুখিনঃ ক্রিয়য়া পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥ ৩২ ॥

মুক্ত স্বর্গদ্বারস্বরূপ ঈদৃশ যুদ্ধ, আপনা হইতে যাহা উপস্থিত হইয়াছে, সুখী ক্রিয়েরাই ইহা লাভ করিয়া থাকে। ৩২।

অথ চেতুমিমং ধর্ম্মাং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।

ততঃ স্বধর্ম্মাং কীর্ত্তিঃ হি হি পাপমবাপস্যসি ॥ ৩৩ ॥

আর যদি তুমি এই ধর্ম্ম্য যুদ্ধ না কর, তবে স্বধর্ম্ম এবং কীর্ত্তি পরিত্যাগে পাপযুক্ত হইবে। ৩৩।

৩১ শ্লোকের টীকায় যাহা লেখা গিয়াছে, তাহাতেই এই দুই শ্লোকের তাৎপর্য্য স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

অকীর্ত্তিঃপাি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেহব্যয়াম্।

সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্মরণাদর্তিরিচ্যতে ॥ ৩৪ ॥

লোকে তোমার চিরস্থায়ী অকীর্ত্তি ঘোষণা করিবে। সমর্থ ব্যক্তির অকীর্ত্তির অপেক্ষা মৃত্যু ভাল। ৩৪।

ভয়াদ্রুগাদুপরতং মংস্যন্তে হ্মং মহারথাঃ।

যেষাং হ্মং বহুমানো ভূত্বা যস্যসি লাঘবম্ ॥ ৩৫ ॥

মহারথগণ মনে করিবেন, তুমি ভয়ে রণ হইতে বিরত হইলে। যাঁহারা তোমাকে বহুমান করেন, তাঁহাদিগের নিকট তুমি লাঘব প্রাপ্ত হইবে। ৩৫।

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহুন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ ।

নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥ ৩৬ ॥

তোমার শত্রুগণ তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিবে ও অনেক অবাচ্য কথা বলিবে। তার পর অধিক দুঃখ আর কি আছে? । ৩৬ ।

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিহ্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্ ।

তস্মাদুক্তিঞ্চ কোন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

হত হইলে স্বর্গ পাইবে। জয়ী হইলে পৃথিবী ভোগ করিবে। অতএব হে কোন্তেয়! যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া উত্থান কর। ৩৭ ।

৩৪। ৩৫। ৩৬। ৩৭, এই চারিটি শ্লোক কি প্রকারে এখানে আসিল, তাহা বুঝা যায় না। এই চারিটি শ্লোক গীতার অযোগ্য। গীতায় ধর্মপ্রসঙ্গ আছে, এবং দার্শনিক তত্ত্বও আছে। এই চারিটি শ্লোকের বিষয় না ধর্ম, না দার্শনিক তত্ত্ব! ইহাতে বিষয়ী লোকে যে অসার অশ্রদ্ধের কথা সচরাচর উপদেশ স্বরূপ ব্যবহার করে, তাহা ভিন্ন আর কিছই নাই। ইহা ঘোরতর স্বার্থবাদে পূর্ণ, তাহা ভিন্ন আর কিছই নহে।

৩৩শ শ্লোক পর্যন্ত ভগবান্ অর্জুনকে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় পরম পবিত্র উপদেশ দিলেন। ৩৪ শ্লোক হইতে আবার জ্ঞান ও কর্ম সম্বন্ধীয় পরম পবিত্র উপদেশ আরম্ভ হইবে। এই চারিটি শ্লোকের সঙ্গে, দুইয়ের একেরও কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই। তৎপরিবর্তে লোক-নিন্দা-ভয় প্রদর্শিত হইতেছে। বলা বাহুল্য যে, লোক-নিন্দা-ভয় কোন প্রকার ধর্ম নহে। সত্য বটে, আধুনিক সমাজ সকলে ধর্ম এতই দুর্বল যে, অনেক সময়ে লোক-নিন্দা-ভয়ই ধর্মের স্থান অধিকার করে। অনেক চোর চোর্যে ইচ্ছুক হইয়াও কেবল লোক-নিন্দা-ভয়ে চুরি করে না, অনেক পারদারিক লোক-নিন্দা-ভয়েই শাসিত থাকে। তাহা হইলেও ইহা ধর্ম হইল না; পিতলকে গিলিট করিলে দুই চারি দিন সোনা বলিয়া চালান যায় বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া পিতল সোনা হয় না। পক্ষান্তরে এই লোক-নিন্দা বহুতর পাপের কারণ। আজিকার দিনে হিন্দুসমাজের ভ্রূণহত্যা ও স্ত্রীহত্যা অনেকই এই লোক-নিন্দা-ভয় হইতেই উৎপন্ন। এক সময়ে ফরাসীর দেশে উচ্চ শ্রেণীর লোকের মধ্যে পারদারিকতার অভাবই নিন্দার কারণ ছিল। সিয়াপোষ কাফরদিগের মধ্যে, যে একজনও মুসলমানের মাথা কাটে নাই, অর্থাৎ যে নরঘাতী নহে, সে সমাজে নিন্দিত—তাহার বিবাহ হয় না। সকল সমাজেরই সহস্র সহস্র পাপ লোক-নিন্দা-ভয় হইতেই উৎপন্ন; কেন না, সাধারণ লোক নিষেধ, যাহা ভাল, তাহারও নিন্দা করিয়া থাকে। লোকে যাহা ভাল বলে, মনুষ্য এখন তাহারই অন্বেষণ করে বলিয়াই মনুষ্যের ধর্মাচরণে অবসর বা তৎপ্রতি মনোযোগ নাই। লোক-নিন্দা-ভয়ে অনেকে যে ধর্মাচরণ করিতে পারে না, এবং ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে অসার লোকে লোক-নিন্দা-ভয় প্রদর্শন করে, ইহা সচরাচর দেখা গিয়া থাকে। যে লোক-নিন্দা-ভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত, সে সাক্ষাৎ নরপিশাচ। ভগবান্ স্বয়ং যে অর্জুনকে সেই মহাপাপে উপদিষ্ট করিবেন, ইহা সম্ভব নহে। কোন জ্ঞানবান্ ব্যক্তিই ইহা ঈশ্বরোক্তি বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। ইহা গীতাকারের নিজের কথা বলিয়াও গ্রহণ করিতে পারা যায় না; কেন না, গীতাকার যেই হউন, তিনি পরম জ্ঞানী এবং ভগবদ্বাক্ত সন্দীক্ষিত; এরূপ পাপোক্তি তাহা হইতেও সম্ভবে না। যদি কেহ বলেন যে, এই শ্লোক চারিটি প্রক্ষিপ্ত, তবে তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহা শঙ্করের পর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। অভিনবগুপ্তাচার্য এই কয় শ্লোককে “লৌকিক ন্যায়” বলিয়াছেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যদি “লৌকিক ন্যায়” পরিত্যাগ না করিবেন, তবে আর দাঁড়াই কোথায়! যাহাই হউক, লোকনিন্দার কথার পর ও পৃথিবীভোগের কথার পরেই “এষা তেহ্‌ভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে” ইত্যাদি কথা অসংলগ্ন বোধ হয় বটে। অতএব যাহারা এই চারিটি শ্লোক প্রক্ষিপ্ত বলিবেন, তাহাদের সঙ্গে আমরা বিবাদ করিতে ইচ্ছুক নহি।

বলিতে কেবল বাকি আছে যে, যদিও ৩৭শ শ্লোকে লোক-নিন্দা-ভয় দেখান নাই, তথাপি ইহা স্বার্থবাদ-পরিপূর্ণ। স্বর্গ বা রাজ্যের প্রলোভন দেখাইয়া ধর্ম প্রবৃত্ত করা, আর ছেলেকে মিঠাই দিব বলিয়া সৎকর্ম প্রবৃত্ত করা তুল্য কথা। উভয়ই নিকৃষ্ট স্বার্থপরতার উত্তেজনা মাত্র।

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ ।

ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৮ ॥

বিক্রম রচনাবলী

অতএব সুখদুঃখ, লাভালাভ, জয়পরাজয় তুল্য জ্ঞান করিয়া যুদ্ধার্থ উদযুক্ত হও। নচেৎ পাপযুক্ত হইবে। ৩৮।

যুদ্ধই যদি স্বধর্ম, অতএব অপরিহার্য, তবে তাহাতে সুখ দুঃখ, লাভালাভ, জয় পরাজয় সমান জ্ঞান করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে; কেন না, ফল যাহাই হউক, যাহা অনুষ্ঠেয়, তাহা অবশ্য কর্তব্য—করিলে সুখ হইবে কি দুঃখ হইবে, লাভ হইবে কি অলাভ হইবে, ইহা বিবেচনা করা কর্তব্য নহে। ইহাই পশ্চাৎ কর্মযোগ বলিয়া কথিত হইয়াছে। যথা—

সিদ্ধাসিদ্ধোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮ ॥

পাঠক দেখিবেন, ৩৭শ শ্লোকের পর আবার সুর ফিরিয়াছে। এখন যথার্থ ভগবদ্গীতার মহিমাময় শব্দ পাওয়া যাইতেছে। এই যথার্থ কৃষ্ণের বংশীরব। ৩৪-৩৭শ শ্লোক ও ৩৮শ শ্লোকে কত প্রভেদ!

এষা তেহ্ভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।

বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ৩৯ ॥

তোমাকে সাংখ্যে এই জ্ঞান কথিত হইল। (কর্ম) যোগে ইহা (যাহা বলিব) শ্রবণ কর। তুম্বারা যুক্ত হইলে, হে পার্থ! কর্মবন্ধ হইতে মুক্ত হইবে। ৩৯।

প্রথম—সাংখ্য কি? “সম্যক্ খ্যায়তে প্রকাশ্যতে বস্তুতত্ত্বমনয়োতি সংখ্যা। সম্যগ্জ্ঞানং তস্যং প্রকাশমানমাত্তত্ত্বং সাংখ্যম্।” (শ্রীধর)। যাহার দ্বারা বস্তুতত্ত্ব সম্যক্ প্রকাশিত হয়, তাহা সংখ্যা। তাহার সম্যগ্জ্ঞান প্রকাশমান আত্মতত্ত্ব সাংখ্য। সচরাচর সাংখ্য নামটি এক্ষণে দর্শনবিশেষ সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তজ্জন্য ইংরেজ পণ্ডিতেরা গুরুতর ভ্রমে পড়িয়া থাকেন। বস্তুতঃ এই গীতাগ্রন্থে সাংখ্য শব্দ “তত্ত্বজ্ঞান” অর্থেই ব্যবহৃত দেখা যায়, এবং ইহাই ইহার প্রাচীন অর্থ বলিয়া বোধ হয়।

দ্বিতীয়—যোগ কি? যেমন সাংখ্য এক্ষণে কপিল-দর্শনের নাম, যোগও এক্ষণে পাতঞ্জল-দর্শনের নাম। পতঞ্জলি যে অর্থে যোগ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন,* এক্ষণে সচরাচর যোগ করিলে তাহাই আমরা বুঝিয়া থাকি। কিন্তু গীতায় যোগ শব্দ সে অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। তাহা হইলে “কর্মযোগ” “ভক্তিযোগ” ইত্যাদি শব্দের কোন অর্থ হয় না। বস্তুতঃ গীতায় “যোগ” শব্দটি সর্বত্র এক অর্থেই যে ব্যবহৃত হইয়াছে, এমন কথাও বলা যায় না। সচরাচর ইহা গীতায় যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায় যে, ঈশ্বরারাধনা বা মোক্ষের বিবিধ উপায় বা সাধনাবিশেষই যোগ। জ্ঞান, ঈদৃশ একটি উপায় বা সাধন, কর্ম তাদৃশ উপায়ান্তর, ভক্তি তৃতীয়, ইত্যাদি—এজন্য জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার হইয়া থাকে। সচরাচর এই অর্থ, কিন্তু এ শ্লোকে সে অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে না। এ স্থলে “যোগ” অর্থে কর্মযোগ। এই অর্থে “যোগ” “যোগী” “যুক্ত” ইত্যাদি শব্দ গীতায় ব্যবহৃত হইতে দেখিব। স্থানান্তরে “যোগ” শব্দে জ্ঞানযোগাদিও বুঝাইতে দেখা যাইবে।

অতএব এই শ্লোকের দুইটি শব্দ বুঝিলাম—সাংখ্য, জ্ঞান; এবং যোগ, কর্ম। এক্ষণে মনুষ্যপ্রকৃতির কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যিক।

মনুষ্যজীবনে যাহা কিছু আছে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা তাহা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন:—Thought, Action and Feeling. আমরা না হয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতাবলম্বী নাই হইলাম, তথাপি আমরা নিজেই মনুষ্যজীবন আলোচনা করিয়া দেখিলে জানিব যে, তাহাতে এই তিন ভিন্ন আর কিছুই নাই। এই তিনকেই ঈশ্বরমুখ করা যাইতে পারে: তিনই ঈশ্বরার্চিত হইলে ঈশ্বরসমীপে লইয়া যাইতে পারে। Thought ঈশ্বরমুখ হইলে জ্ঞানযোগ; Action ঈশ্বরমুখ হইলে কর্মযোগ; Feeling ঈশ্বরমুখ হইলে ভক্তিযোগ। ভক্তিযোগের কথা এখন থাক। ৩৪ শ্লোক পর্যন্ত জ্ঞানের কথা ভগবান্ অর্জুনকে বুঝাইলেন; এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের নামই “সাংখ্যযোগ”।† জ্ঞানে অর্জুনকে উপদিষ্ট করিয়া ভগবান্ এক্ষণে ৩৯ শ্লোক‡ হইতে কর্ম উপদিষ্ট করিতেছেন। কি বলিতেছেন, এক্ষণে তাহাই শুন।

* যোগশিচন্তবৃত্তিনিরোধঃ।

† চতুর্থাধ্যায়ের নাম “জ্ঞানযোগ”। প্রভেদ কি, পশ্চাৎ জানা যাইবে।

‡ মধ্যের চারিটি শ্লোক তবে কি প্রসিদ্ধি বলিয়া বোধ হয় না?

ভাষ্যকারেরা বলেন, এই কৰ্ম্ম, জ্ঞানের সাধন (শ্রীধর) বা প্রাপ্তির উপায় (শঙ্কর)। অর্থাৎ প্রথমে তত্ত্বজ্ঞান কি, তাহা অজ্ঞানকে বুঝাইয়া, “যদি অজ্ঞানের তত্ত্বজ্ঞান অপরোক্ষ না হইয়া থাকে, তবে চিত্তশুদ্ধি দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান জন্মবার নিমিত্ত এই কৰ্ম্মযোগ” কহিতেছেন (হিতলাল মিশ্র)। বলা বাহুল্য, এরূপ কথা মূলে এখানে নাই। তবে স্থানান্তরে এরূপ কথা আছে বটে, যথা—

আরুর্দুক্ষোমূর্নেৰ্যোগং কৰ্ম্ম কারণমুচ্যতে। ৩। ৬

কিন্তু আবার স্থানবিশেষে অন্য প্রকার কথাও পাওয়া যাইবে, যথা—

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্যোগৈরিপি গম্যতে।

ইত্যাদি। ৫। ৬। ৫

এ সকল কথার মৰ্ম্ম পশ্চাৎ বুঝা যাইবে।

এই শ্লোকে কৰ্ম্মযোগের ফলও কথিত হইতেছে। এই ফল “কৰ্ম্মবন্ধ” হইতে মোচন। কৰ্ম্মবন্ধ কি? কৰ্ম্ম করিলেই তাহার ফলভোগ করিতে হয়। জন্মান্তরবাদীরা বলেন, এ জন্মে যাহা করা যায়, জন্মান্তরে তাহার ফলভোগ করিতে হয়। যদি আর পুনর্জন্ম না হয়, তবেই আর কৰ্ম্মফল ভোগ করিতে হইল না। তাহা হইলেই কৰ্ম্মবন্ধ হইতে মুক্তি হইল। অতএব মোক্ষপ্রাপ্তই কৰ্ম্মবন্ধ হইতে মুক্ত।

কিন্তু যে জন্মান্তর না মানে, সেও কৰ্ম্মবন্ধ হইতে মুক্তি এ জীবনের চরমোদ্দেশ্য বলিয়া মানিতে পারে। পরকালে বা জন্মান্তরে কি হইবে, তাহা জানি না, কিন্তু আমরা সকলেই জানি যে, ইহজন্মেই আমরা সকল কৰ্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকি। আমরা সকলেই জানি যে, হিম লাগাইলে ইহজন্মেই সর্দি হয়। আমরা সকলেই জানি যে, রোগের চিকিৎসা করিলে রোগ আরাম হয়। সকলেই জানি যে, আমরা যদি কাহারও শত্রুতা করি, তবে সেও ইহজীবনেই আমাদের শত্রুতা করে, এবং আমরা যদি কাহারও উপকার করি, তবে তাহার ইহজীবনেই আমাদের প্রত্যুপকার করার সম্ভাবনা। সকলেই জানে, ধনসঞ্চয় করিলেই ইহজন্মেই “বড়মানুষী” করা যায়; এবং পরিশ্রম করিয়া অধ্যয়ন করিলেই ইহজন্মেই বিদ্যালাভ করা যায়। সকল প্রকার কৰ্ম্মের ফল ইহজন্মেই এইরূপ পাওয়া গিয়া থাকে।

তবে কতকগুলি কৰ্ম্ম আছে, তাহার বিশেষ প্রকার ফলের প্রত্যাশা করিতে আমরা শিক্ষিত হইয়াছি। এই কৰ্ম্মগুলিকে সচরাচর পাপ পুণ্য বলিয়া থাকে। তাহার যে সকল ফল প্রাপ্ত হইবার প্রত্যাশা করিতে আমরা শিখিয়াছি, তাহা ইহজন্মে পাই না বটে। আমরা শিখিয়াছি যে, দান করিলে স্বর্গলাভ হয়, কিন্তু ইহজীবনে কাহারও স্বর্গলাভ হয় না। কেহ বা মনে করেন, একগুণ দিলে দশগুণ পাওয়া যায়, কিন্তু ইহজীবনে একগুণ দিলে অর্ধগুণও পাওয়া যায় না। শূনা আছে, চুরি করিলে একটা ঘোরতর পাপ হয়। কিন্তু ইহজীবনে চুরি করিয়া সকলে রাজদণ্ডে পড়ে না—সকলে সে পাপের কোন প্রকার দণ্ড দেখিতে পায় না। সকলে দেখিতে পায় না বলিয়া ইহজীবনে চুরির কোন প্রকার দণ্ড নাই—কৰ্ম্মফলভোগ নাই, এমন নহে; এবং দানের যে কোন পুরস্কার নাই, তাহাও নহে। চিত্তপ্রসাদ আছে—পুনঃ পুনঃ দানে আপনার চিত্তের উন্নতি এবং মাহাত্ম্য বৃদ্ধি আছে। পাপ পুণ্যে ইহজীবনে কিরূপ সমুচিত কৰ্ম্মফল পাওয়া যায়, তাহা আমি গ্রন্থান্তরে বুঝাইয়াছি,* পুনর্দুক্তির প্রয়োজন নাই। যাঁহাদের ইচ্ছা হইবে, সেই গ্রন্থে দৃষ্টি করিবেন।

সেই গ্রন্থে ইহাও বুঝাইয়াছি যে, সম্পূর্ণ ধৰ্ম্মাচরণের দ্বারা ইহজীবনেই মুক্তিলাভ করা যায়। সেই মুক্তি কি প্রকার এবং কিরূপেই লাভ হয়, তাহাও সেই গ্রন্থে বুঝাইয়াছি। সে সকল কথা আর এখানে পুনর্দুক্ত করিব না। ফলে জীবন্মুক্তি হিন্দুধৰ্ম্মের বহির্ভূত তত্ত্ব নহে। এই গীতাতেই উক্ত হইয়াছে যে, জীবন্মুক্তি লাভ করা যায়। আমরা ক্রমশঃ তাহা বুঝিব। যেরূপ অনুষ্ঠানের দ্বারা তাহা লাভ করা যাইতে পারে, তাহাই কৰ্ম্মযোগ। ইহাও দেখিব। সুতরাং যাঁহারা জন্মান্তর মানেন না, তাঁহারাও কৰ্ম্মযোগের দ্বারা মুক্তিলাভ করিতে পারেন। গীতান্তে ধৰ্ম্ম বিশ্বলৌকিক, ইহা পূর্বে বলা গিয়াছে।

উপসংহারে বলা কর্তব্য যে, আর এক কৰ্ম্মফলের কথা আছে। হিন্দুরা যাগযজ্ঞ

বীক্ষম রচনাবলী

ব্রতানুষ্ঠান করিয়া থাকেন—কর্মফল পাইবার জন্য। এই সকলের ইহলোকে যে কোন প্রকার ফল পাওয়া যায় না, এমন কথা আমরা বলি না। একাদশীরত করিলে শারীরিক স্বাস্থ্য লাভ করা যায় এবং অন্যান্য যোগযজ্ঞের ও ব্রতাদির কোন কোন প্রকার শারীরিক বা মানসিক ফল পাওয়া যাইতে পারে। তবে হিন্দুরা সচরাচর যে সকল ফল কামনা করিয়া এই সকল অনুষ্ঠান করেন, তাহা এ জন্মে পাওয়া যায় না বটে। ভরসা করি, এ টীকার এমন কোন পাঠক উপস্থিত হইবেন না, যিনি এ প্রশ্নের কোন উত্তর প্রত্যাশা করিবেন।

নেহাভিক্রমশোহস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।

স্বপ্নমপ্যস্য ধর্মস্য দ্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০ ॥

এই (কর্মযোগে) প্রারম্ভের নাশ নাই; প্রত্যবায় নাই; এ ধর্মের অল্পতেই মহত্ত্ব হইতে পরিগ্রহণ পাওয়া যায়। ৪০।

জ্ঞান সম্বন্ধে এরূপ কথা বলা যায় না। কেন না, অল্প জ্ঞানের কোন ফলোপধায়িতা নাই; বরং প্রত্যবায় আছে, উদাহরণ—সামান্য জ্ঞানীর ঈশ্বরানুসন্ধান নাস্তিকতা উপস্থিত হইয়া থাকে, এমন সচরাচর দেখা গিয়াছে।

ব্যবসায়িত্বিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরনন্দন।

বহুশাখা হ্যনস্তাশ্চ বুদ্ধয়োহব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১ ॥

হে কুরনন্দন! ইহাতে (কর্মযোগে) ব্যবসায়িত্বিকা (নিশ্চয়িত্বিকা) বুদ্ধি একই হইয়া থাকে। কিন্তু অব্যবসায়িগণের বুদ্ধি বহুশাখাযুক্ত ও অনন্ত হইয়া থাকে। ৪১।

শ্রীধর বলেন, “পরমেশ্বরে ভক্তির দ্বারা আমি নিশ্চিত হ্রাণ পাইব,” এই নিশ্চয়িত্বিকা বুদ্ধি ব্যবসায়িত্বিকা বুদ্ধি। ইহা একই হয়, অর্থাৎ একনিষ্ঠই হয়, নানা বিষয়ে ধাবিত হয় না। কিন্তু যাহারা অব্যবসায়ী, অর্থাৎ যাহাদের সেরূপ নিশ্চয়িত্বিকা বুদ্ধি নাই, অর্থাৎ যাহারা ঈশ্বরারাধনাবহির্মুখ, এবং সকাম, তাহাদের কামনা সকল অনন্ত, এবং কর্মফল-গুণফলদ্বাদির প্রকারভেদ আছে, এজন্য তাহাদের বুদ্ধিও বহুশাখা ও অনন্ত হয়, অর্থাৎ কত দিকে যায়, তাহার অন্ত নাই। যাহারা কামনাপরবশ, এবং কামনাপরবশ হইয়াই কাম্য কর্ম করিয়া থাকে, তাহাদের ঈশ্বরারাধনার বুদ্ধি একনিষ্ঠ নহে, নানাবিধ বিষয়েই প্রধাবিত হয়।

কথাটার মূল তাৎপর্য এই। ভগবান্ কর্মযোগের অবতারণা করিতেছেন, কিন্তু অজ্ঞান সহসা মনে করিতে পারেন যে, কাম্য কর্মের অনুষ্ঠানই কর্মযোগ; কেন না, তৎকালে বৈদিক কাম্য কর্মই কর্ম বলিয়া পরিচিত। কর্ম বলিলে সেই সকল কর্মই বুঝায়। অতএব প্রথমেই ভগবান্ বলিয়া রাখিতেছেন যে, কাম্য কর্ম কর্মযোগ নহে, তাহার বিরোধী। কর্ম কি, তাহা পশ্চাৎ বলিবেন, কিন্তু তাহা বলিবার আগে এ বিষয়ে যে সাধারণ ভ্রম প্রচলিত, পরে তাহারই নিরাস করিতেছেন।

যামিমাং পূর্নপতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।

বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ ॥ ৪২ ॥

কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্।

ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যর্গতিং প্রতি ॥ ৪৩ ॥

ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।

ব্যবসায়িত্বিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪ ॥

হে পার্থ! অবিবেকিগণ এই শ্রবণরমণীয়, জন্মকর্মফলপ্রদ, ভোগৈশ্বর্য্যের সাধনভূত ক্রিয়াবিশেষবহুল বাক্য বলে, যাহারা বেদবাদরত, “(তীক্ষ্ণ) আর কিছুই নাই” যাহারা ইহা বলে, তাহারা কামাত্মা, স্বর্গপরা, ভোগৈশ্বর্য্য আসক্ত এবং সেই কথায় যাহাদের চিত্ত অপহৃত, তাহাদের বুদ্ধি সমাধিতে সংশয়বিহীন হয় না। ৪২। ৪৩। ৪৪।

এই তিনটি শ্লোক ও ইহার পরবর্ত্তী দুই শ্লোকের ও ৫৩ শ্লোকের বিশেষ প্রাধান্য আছে; কেন না, এই ছয়টি শ্লোকে একটি বিশেষ ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত আছে। এবং গীতার এবং কৃষ্ণের মাহাত্ম্য বুদ্ধিবার জন্য ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয়। অতএব ইহার প্রতি পাঠকের বিশেষ মনোযোগের অনুরোধ করি।*

* এই শ্লোকত্রয়ের বিশেষ প্রাধান্য আছে বলিয়া পাঠকের সন্দেহভঞ্জনার্থ মৎকৃত অনুবাদ ভিন্ন আর

প্রথমতঃ শ্লোকদ্বয়ে যে কয়টা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা বুঝা যাউক।

কাম্য কৰ্মের কথা হইতেছিল। এখনও সেই কথাই হইতেছে। কাম্যকৰ্মবিষয়িণী কথাকে আপাতশ্রুতিসুখকর বলা হইতেছে; কেন না, বলা হইয়া থাকে যে, এই করিলে স্বর্গলাভ হইবে, এই করিলে রাজ্যলাভ হইবে, ইত্যাদি।

সেই সকল কথা “জন্মকৰ্মফলপ্রদ”। শঙ্কর ইহার এইরূপ অর্থ করেন, “জন্মৈব কৰ্মণঃ ফলং জন্মকৰ্মফলং, তৎ প্রদদাতীতি জন্মকৰ্মফলপ্রদা।” জন্মই কৰ্মের ফল, যাহা তাহা প্রদান করে, তাহা “জন্মকৰ্মফলপ্রদ”। শ্রীধর ভিন্ন প্রকার অর্থ করেন, “জন্ম চ তত্র কৰ্মাণি চ তৎফলানি চ প্রদদাতীতি।” জন্ম, তথা কৰ্ম, এবং তাহার ফল, ইহা যে প্রদান করে। অনুবাদকেরা কেহ শঙ্করের, কেহ শ্রীধরের অনুবর্তী হইয়াছেন। দুই অর্থই গ্রহণ করা যাইতে পারে।

তার পর ঐ কাম্যকৰ্মবিষয়িণী কথাকে “ভোগৈশ্বৰ্যের সাধনভূত ক্রিয়াবিশেষবহুল” বলা হইয়াছে। তাহা বুঝিবার কোন কষ্ট নাই। ভোগৈশ্বৰ্য্য প্রাপ্তির জন্য ক্রিয়াবিশেষের বাহুল্য ঐ সকল বিধিতে আছে, এই মাত্র অর্থ।

কথা এইরূপ। যাহারা এই সকল কথা বলে, তাহারা “বেদবাদরত”। বেদেই এই সকল কাম্যকৰ্মবিষয়িণী কথা আছে—অন্ততঃ তৎকালে বেদেই ছিল; এবং এখনও ঐ সকল কৰ্ম বেদমূলক বলিয়াই প্রসিদ্ধ ও অনুষ্ঠেয়। যাহারা কাম্যকৰ্মানুরাগী, তাহারা বেদেরই দোহাই দেয়—বেদ ছাড়া “আর কিছু নাই” ইহাই বলে। অর্থাৎ বেদোক্ত কাম্যকৰ্মাত্মক যে ধৰ্ম্ম, তাহা ভিন্ন আর কিছু ধৰ্ম্ম নাই, ইহাই তাহাদের মত। তাহারা “কামাত্মা” বা কামনাপরবশ—“স্বর্গপর,” অর্থাৎ স্বর্গই তাহাদের পরমপদার্থ, ঈশ্বরে তাহাদের মতি নাই, মোক্ষলাভে তাহাদের আকাঙ্ক্ষা নাই। তাহারা ভোগ এবং ঐশ্বৰ্য্য আসক্ত—সেই জন্যই স্বর্গ কামনা করে; কেন না, স্বর্গ একটা ভোগৈশ্বৰ্য্যের স্থান বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস আছে। কাম্যকৰ্মবিষয়ক পুস্তিপত বাক্য তাহাদের মনকে মূগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ঈদৃশ ব্যক্তির অবিবেকী বা মূঢ়। সমাধিতে—ঈশ্বরে চিন্তের যে অভিমুখতা বা একাগ্রতা—তাহাতে এবংবিধ বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা হয় না।

শ্লোকদ্বয়ের অর্থ এক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিতেছি। বেদে নানা কাম্য কৰ্মের বিধি আছে; বেদে বলে যে, সেই সকল বহুপ্রকার কাম্য কৰ্মের ফলে স্বর্গাদি বহুবিধ ভোগৈশ্বৰ্য্য প্রাপ্তি হয়, সুতরাং আপাততঃ শ্রুতিতে সে সকল কথা বড় মনোহারিণী। যাহারা কামনাপরায়ণ, আপনার ভোগৈশ্বৰ্য্য খুঁজে, সেই জন্য স্বর্গাদি কামনা করে, তাহাদের মন সেই সকল কথায় মূগ্ধ হয়। তাহারা কেবল বেদের দোহাই দিয়া বেড়ায়, বলে—ইহা ছাড়া আর ধৰ্ম্ম নাই। তাহারা মূঢ়। তাহাদের বুদ্ধি কখন ঈশ্বরে একাগ্র হইতে পারে না। কেন না, তাহাদের বুদ্ধি “বহুশাখা” ও “অনস্তা,” ইহা পূর্বশ্লোকে কথিত হইয়াছে।

কথাটা বড় ভয়ানক ও বিস্ময়কর। ভারতবর্ষ এই ঊনবিংশ শতাব্দীতেও বেদশাসিত। আজও বেদের যে প্রতাপ, ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের তাহার সহস্রাংশের এক অংশ নাই। সেই প্রাচীন কালে বেদের আবার ইহার সহস্রগুণ প্রতাপ ছিল। সাংখ্যপ্রবচনকার ঈশ্বর মানেন না—ঈশ্বর নাই, এ কথা তিনি মূগ্ধকণ্ঠে বলিতে সাহস করিয়াছেন, তিনিও বেদ অমান্য করিতে সাহস করেন না—পুনঃ পুনঃ বেদের দোহাই দিতে বাধ্য হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ মূগ্ধকণ্ঠে বলিতেছেন, এই বেদবাদীরা মূঢ়, বিলাসী; ইহারা ঈশ্বরারাধনার অযোগ্য!

ইহার ভিতরে একটা ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত আছে। তাহা বুঝাইবার আগে আর দুইটা

একটি অনুবাদ দেওয়া ভাল। এজন্য কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের অনুবাদকৃত অনুবাদও এ স্থলে দেওয়া গেল। উহা অবিকল অনুবাদ এমন বলা যায় না, কিন্তু বিশদ বটে।

“যাহারা আপাতমনোহর শ্রবণরমণীয় বাক্যে অনুরক্ত; বহুবিধ ফলপ্রকাশক বেদবাক্যই যাহাদের প্রীতিকর; যাহারা স্বর্গাদি ফলসাধন কৰ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই স্বীকার করে না; যাহারা কামনাপরায়ণ; স্বর্গই যাহাদের পরমপদার্থ; জন্ম কৰ্ম ও ফলপ্রদ ভোগ ও ঐশ্বৰ্য্যের সাধনভূত নানাবিধ ক্রিয়া-প্রকাশক বাক্যে যাহাদের চিত্ত অপহৃত হইয়াছে; এবং যাহারা ভোগ ও ঐশ্বৰ্য্য একান্ত সংসক্ত; সেই বিবেকহীন মূঢ়দিগের বুদ্ধি সমাধি বিষয়ে সংশয়শূন্য হয় না।”

বিশ্বকম রচনাবলী

কথা বলা আবশ্যিক। প্রথমতঃ কৃষ্ণের ঈদৃশ উক্তি বেদের নিন্দা নহে, বৈদিক কৰ্মবাদীদের নিন্দা। যাহারা বলে, বেদোক্ত কৰ্মই (যথা, অশ্বমেধাদি) ধৰ্ম, কেবল তাহাই আচরণীয়, তাহাদেরই নিন্দা। কিন্তু বেদে যে কেবল অশ্বমেধাদি যজ্ঞেরই বিধি আছে, আর কিছু নাই, এমন নহে। উপনিষদে যে অতুল্যত ব্রহ্মবাদ আছে, গীতা সম্পূর্ণরূপে তাহার অনুবাদিনী, তদুক্ত জ্ঞানবাদ অনেক সময়েই গীতায় উদ্ধৃত, সংকলিত ও সম্প্রসারিত হইয়া নিষ্কাম কৰ্মবাদ ও ভক্তিবাদের সহিত সমঞ্জসীভূত হইয়াছে। অতএব কৃষ্ণের এতদুক্তিকে সমস্ত বেদের নিন্দা বিবেচনা করা অনুচিত। তবে দ্বিতীয় কথা এই বক্তব্য যে, যাহারা বলেন যে, বেদে যাহা আছে, তাহাই ধৰ্ম, তাহা ছাড়া আর কিছু ধৰ্ম নহে, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের মধ্যে নহেন। তিনি বলেন, (১) বেদে ধৰ্ম আছে, ইহা মানি। (২) কিন্তু বেদে এমন অনেক কথা আছে, যাহা প্রকৃত ধৰ্ম নহে—যথা, এই সকল জন্মকৰ্মফলপ্রদা ক্রিয়াবিশেষবহুলা পুষ্টিপতা কথা। (৩) তিনি আরও বলেন যে, যেমন এক দিকে বেদে এমন অনেক কথা আছে, যাহা ধৰ্ম নহে, আবার অপর দিকে অনেক তত্ত্ব যাহা প্রকৃত ধৰ্মতত্ত্ব, অথচ বেদে নাই। ইহার উদাহরণ আমরা গীতাতেই পাইব। কিন্তু গীতা ভিন্ন মহাভারতের অন্য স্থানেও পাওয়া যায়। উদাহরণ-স্বরূপ কৰ্ণপৰ্ব হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি।

শ্রুতেধৰ্ম ইতি হ্যেবে বদন্তি বহবো জনাঃ।

তত্তে ন প্রত্যসুয়ামি ন চ সৰ্ব্বং বিধীয়তে ॥ ৫৬ ॥

প্রভবার্থায় ভূতানাং ধৰ্মপ্রবচনং কৃতম্ ॥ ৫৭ ॥*

যদি কেহ ইহাকে বেদিন্দা বলিতে চাহেন, তবে শ্রীকৃষ্ণ বেদিন্দক এবং গীতার এবং মহাভারতের অন্যত্র বেদিন্দা আছে। বস্তুতঃ ইহা এই পর্য্যন্ত বেদিন্দা যে, এতদ্বারা বেদের অসম্পূর্ণতা সূচিত হয়।

তত দূর ইহাকে না হয়, বেদিন্দাই বলা যাউক। এই বেদিন্দার ভিতর একটা ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত আছে বলিয়াছি, তাহা মৎপ্রণীত “ধৰ্মতত্ত্ব” গ্রন্থে বঝাইয়াছি। কিন্তু ঐ গ্রন্থ সম্প্রতি মাত্র প্রচারিত হইয়াছে। এ জন্য পাঠকদিগের সুলভ না হইতে পারে। অতএব প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

“সাধারণ উপাসকের সহিত সচরাচর উপাস্য দেবের যে সম্বন্ধ দেখা যায়, বৈদিক ধৰ্মে উপাস্য-উপাসকের সেই সম্বন্ধ ছিল। ‘হে ঠাকুর! আমার প্রদত্ত এই সোমরস পান কর। হবি ভোজন কর, আর আমাকে ধন দাও, সম্পদ দাও, পুত্র দাও, গোরু দাও, শস্য দাও, আমার শত্রুকে পরাস্ত কর।’ বড় জোর বলিলেন, ‘আমার পাপ ধ্বংস কর।’ দেবগণকে এইরূপ অভিপ্রায়ে প্রসন্ন করিবার জন্য বৈদিকেরা যজ্ঞাদি করিতেন। এইরূপ কাম্য বস্তুর উদ্দেশ্যে যজ্ঞাদি করাকে কাম্য কৰ্ম বলে।

কাম্যাদি কৰ্মাত্মক যে উপাসনা, তাহার সাধারণ নাম কৰ্ম। এই কাজ করিলে তাহার এই ফল; অতএব কাজ করিতে হইবে—এইরূপ ধৰ্মার্জনের যে পদ্ধতি, তাহারই নাম কৰ্ম। বৈদিক কালের শেষ ভাগে এইরূপ কৰ্মাত্মক ধৰ্মের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। যাগযজ্ঞের দৌরাণ্যে ধৰ্মের প্রকৃত মৰ্ম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এমন অবস্থায় উচ্চ শ্রেণীর প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ দেখিতে পাইলেন যে, এই কৰ্মাত্মক ধৰ্ম বৃথা ধৰ্ম। তাহাদের মধ্যে অনেকেই বঝিয়াছিলেন যে, বৈদিক দেবদেবীর কল্পনায় এই জগতের অস্তিত্ব বঝা যায় না; ভিতরে ইহার একটা অনন্ত অজ্ঞেয় কারণ আছে। তাহারা সেই কারণের অনুসন্ধান তৎপর হইলেন।

এই সকল কারণে ধৰ্মের উপর অনেকে বীতশ্রদ্ধ হইলেন। তাহারা ত্রিবিধ বিপ্লব উপস্থিত করিলেন। সেই বিপ্লবের ফলে আশিয়া প্রদেশ অদ্যাপি শাসিত। এক দল চার্বাক—তাহারা বলেন, কৰ্মকাণ্ড সকলই মিথ্যা—খাও দাও, নেচে বেড়াও। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের সৃষ্টিকর্তা ও

* “অনেকে শ্রুতিকে ধৰ্মপ্রমাণ বলিয়া নির্দেশ করেন। আমি তাহাতে দোষারোপ করি না। কিন্তু শ্রুতিতে সমুদায় ধৰ্মতত্ত্ব নির্দিষ্ট নাই। এই নির্মিত্ত অনুমান দ্বারা অনেক স্থলে ধৰ্ম নির্দিষ্ট করিতে হয়।” কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ—কৰ্ণপৰ্ব, ৭০ অধ্যায়। সিংহ মহোদয় যে কাপি দেখিয়া অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাতে এই শ্লোক দুইটি ৭০ অধ্যায়ে আছে। কিন্তু অন্যত্র ৩৯ অধ্যায়ে ইহা পাওয়া যায়।

নেতা শাক্যসিংহ—তিনি বলিলেন, কর্মফল মানি বটে, কিন্তু কর্ম হইতেই দুঃখ। কর্ম হইতে পুনর্জন্ম। অতএব কর্মের ধ্বংস কর, তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া চিত্তসংযমপূর্বক অষ্টাঙ্গ ধর্মপথে গিয়া নিস্বর্ণ লাভ কর। তৃতীয় বিপ্লব দার্শনিকদিগের দ্বারা উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহারা প্রায় ব্রহ্মবাদী। তাঁহারা দেখিলেন যে, জগতের যে অনন্ত কারণভূত চৈতন্যের অনুসন্ধান তাঁহারা প্রবৃত্ত, তাহা অতিশয় দুঃখের। সেই ব্রহ্ম জানিতে পারিলে—সেই জগতের অন্তরাগ্না বা পরমাগ্নার সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ এবং জগতের সঙ্গেই বা তাঁহার বা আমাদের কি সম্বন্ধ, তাহা জানিতে পারিলে বুঝা যাইতে পারে যে, এ জীবন লইয়া কি করিতে হইবে। সেটা কঠিন—তাহা জানাই ধর্ম—অতএব জ্ঞানই ধর্ম—জ্ঞানই নিঃশ্রেয়স। বেদের যে অংশকে উপনিষদ্ বলা যায়, তাহা এই প্রথম জ্ঞানবাদীদিগের কীর্তি। ব্রহ্মনিরূপণ ও আত্মজ্ঞানই উপনিষদ্ সকলের উদ্দেশ্য। তার পর ছয় দর্শনে এই জ্ঞানবাদ আরও বিবর্তিত ও প্রচারিত হইয়াছে। কপিলের সাংখ্যে ব্রহ্ম পরিত্যক্ত হইলেও সে দর্শনশাস্ত্র জ্ঞানবাদাত্মক।”

শ্রীকৃষ্ণ এই জ্ঞানবাদীদিগের মধ্যে। কিন্তু অন্য জ্ঞানবাদী যাহা দেখিতে পার না, অনন্তজ্ঞানী তাহা দেখিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন যে, জ্ঞান সকলের আয়ত্ত নহে; অন্ততঃ অনেকের পক্ষে অতি দুঃসাধ্য। তিনি আরও দেখিয়াছিলেন, ধর্মের অন্য পথও আছে; অধিকারিভেদে তাহা জ্ঞানাপেক্ষা দুঃসাধ্য। পরিশেষে ইহাও দেখিয়াছিলেন, অথবা দেখাইয়াছেন—জ্ঞানমার্গ এবং অন্য মার্গ, পরিণামে সকলই এক। এই কয়টি কথা লইয়া গীতা।

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ট্রৈগুণ্যো ভবাজ্জুন।

নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥ ৪৫ ॥

হে অজ্জুন! বেদ সকল ত্রৈগুণ্যবিষয়; তুমি নিস্ট্রৈগুণ্য হও। নির্দ্বন্দ্ব, নিত্যসত্ত্বস্থ, যোগ-ক্ষেম-রহিত এবং আত্মবান্ হও। ৪৫।

এই শ্লোকে ব্যবহৃত শব্দগুলির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা প্রয়োজনীয় বলিয়া অনুবাদে তাহার কিছুই পরিষ্কার করা গেল না। প্রথম, “ত্রৈগুণ্যবিষয়” কি? সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই ত্রিগুণ; ইহার সমষ্টি ত্রৈগুণ্য। এই তিন গুণের সমষ্টি কোথায় দেখি? সংসারে। সেই সংসার যাহার বিষয়, অর্থাৎ প্রকাশ্যিতব্য (Subject), তাহাই “ত্রৈগুণ্যবিষয়।”

শঙ্করাচার্য এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন—“ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ ত্রৈগুণ্যং সংসারো বিষয়ঃ প্রকাশ্যিতব্যো যেষাং তে বেদাঃ ত্রৈগুণ্যবিষয়া।” ইহাও একটু বেদনিন্দার মত শুনায়। অতএব শঙ্করের টীকাকার আনন্দগিরি প্রমাদ গণিয়া সকল দিক্ বজায় রাখিবার জন্য লিখিলেন, “বেদশব্দেনাত্ত্ব কস্মকান্ডমেব গৃহ্যতে। তদভ্যাসবতাং তদনুষ্ঠানদ্বারা সংসারপ্রোব্যান্ন বিবেকবসরোহস্তীত্যর্থঃ।” অর্থাৎ “এখানে বেদ শব্দের অর্থে কস্মকান্ড বুদ্ধিতে হইবে। যাহারা তাহা অভ্যাস করে, তাহাদের তদনুষ্ঠান দ্বারা সংসারপ্রোব্যা হেতু বিবেকের অবসর থাকে না।” বেদের কতটুকু কস্মকান্ড, আর কতটুকু জ্ঞানকান্ড, সে বিষয়ে কোন ভ্রম না ঘটিলে, আনন্দগিরির এ কথায় আমাদের কোন আপত্তি নাই।

শ্রীধর স্বামী বলেন, “ত্রিগুণাত্মকাঃ সকামা যে অধিকারিণস্তদ্বিষয়াঃ কস্মফলসম্বন্ধপ্রতিপাদকা বেদাঃ।” এই ব্যাখ্যা অবলম্বনে প্রাচীন বাঙ্গালা অনুবাদক হিতলাল মিশ্র বুঝাইয়াছেন যে, “ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সকাম অধিকারীদিগের নিমিত্তই (!) বেদ সকল কর্মফল সম্বন্ধে প্রতিপাদক হইবে।” এবং শ্রীধরের বাক্যেরই অনুসরণ করিয়া কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতকার এই শ্লোকটির অনুবাদ করিয়াছেন যে, “বেদসকল সকাম ব্যক্তিদিগের কর্মফলপ্রতিপাদক।” অন্যান্যেও সেই পথ অবলম্বন করিয়াছেন।

উভয় ব্যাখ্যা মস্মতঃ এক। সেই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়া এই শ্লোকের প্রথমার্ধ বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। তাহা হইলেই ইহার অর্থ এই হইতেছে যে, “হে অজ্জুন! বেদ সকল সংসার-প্রতিপাদক বা কর্মফলপ্রতিপাদক। তুমি বেদকে অতিক্রম করিয়া সাংসারিক বিষয়ে বা কর্মফল বিষয়ে নিষ্কাম হও।” কথাটা কি হইতেছিল, স্মরণ করিয়া দেখা যাউক। প্রথমে ভগবান্ অজ্জুনকে সাংখ্যযোগ বুঝাইয়া, তৎপরে কর্মযোগ বুঝাইবেন অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু কর্মযোগ কি, তাহা এখনও বলেন নাই। কেন না, কর্ম সম্বন্ধে যে একটা গুরুতর সাধারণ ভ্রম প্রচলিত ছিল (এবং এখনও আছে), প্রথমে তাহার নিরাস করা কর্তব্য। নহিলে প্রকৃত কর্ম কি, অজ্জুন তাহা বুঝিবেন না। সে সাধারণ ভ্রম এই যে, বেদে যে সকল যজ্ঞাদির

বাঁকম রচনাবলী

অনুষ্ঠান-প্রথা কথিত ও বিহিত হইয়াছে, তাহাই কৰ্ম্ম। ভগবান্ ব্ৰাহ্মাইতে চাহেন যে, ইহা প্রকৃত কৰ্ম্ম নহে। বরং যাহারা ইহাতে চিন্তানিবেশ করে, ঈশ্বরারাধনায় তাহাদিগের একাগ্রতা হয় না। এ জন্য প্রকৃত কৰ্ম্মযোগীর পক্ষে উহা কৰ্ম্ম নহে। এই ৪৫শ শ্লোকে সেই কথাই পুনরুক্ত হইতেছে। ভগবান্ বলিতেছেন যে, বেদ সকল, যাহারা সংসারী অর্থাৎ সংসারের সুখ খোঁজে, তাহাদিগেরই অনুসরণীয়। তুমি সেরূপ সাংসারিক সুখ খুঁজিও না। ত্রৈগুণ্যের অতীত হও।

কি প্রকারে ত্রৈগুণ্যের অতীত হইতে পারা যায়, শ্লোকের দ্বিতীয় অঙ্কে তাহা কথিত হইতেছে। ভগবান্ বলিতেছেন—তুমি নির্বন্দ্ব হও, নিত্যসত্ত্ব হও, যোগ-ক্ষেম-রহিত হও এবং আত্মবান্ হও। এখন এই কয়টা কথা ব্ৰাহ্মলেই শ্লোক ব্ৰাহ্ম হয়।

১। নির্বন্দ্ব—শীতোষ্ণ সুখদুঃখাদিকে বন্দ্ব বলে, তাহা পূর্বে বলা গিয়াছে। যে সে-সকল তুল্য জ্ঞান করে, সেই নির্বন্দ্ব।

২। নিত্যসত্ত্ব—নিত্য সত্ত্বগুণাশ্রিত।

৩। যোগ-ক্ষেম-রহিত—যাহা অপ্রাপ্ত, তাহার উপার্জনকে যোগ বলে, আর যাহা প্রাপ্ত, তাহার রক্ষণকে ক্ষেম বলে। অর্থাৎ উপার্জন রক্ষা সম্বন্ধে যে চিন্তা, তদ্রহিত হও।

৪। আত্মবান্—অথবা অপ্রমত্ত।*

যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্নতোদকে।

তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥ ৪৬ ॥

এখানে এই শ্লোকের অনুবাদ দিলাম না। টীকার ভিতরে অনুবাদ পাওয়া যাইবে। কেন না, এই শ্লোকের প্রচলিত যে অর্থ, তাহাতে দুই একটা আপত্তি ঘটে; সে সকলের মীমাংসা না করিয়া অনুবাদ দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে।

আমি এই শ্লোকের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা ব্ৰাহ্মাইব।

প্রথম। যে ব্যাখ্যাটি পূর্বে হইতে প্রচলিত, এবং শঙ্কর ও শ্রীধরাদির অনুমোদিত, তাহাই অগ্রে ব্ৰাহ্মাইব।

দ্বিতীয়। আর একটি নূতন ব্যাখ্যা পাঠকের সমীপে তাঁহার বিচার জন্য উপস্থিত করিব। সঙ্গত বোধ না হয়, পাঠক তাহা পরিত্যাগ করিবেন।

তৃতীয়। আধুনিক ইংরেজি অনুবাদকেরা যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও ব্ৰাহ্মাইব।

সংক্ষেপতঃ সেই তিন প্রকার ব্যাখ্যা এইঃ—

১ম। সর্বতঃ সংপ্নতোদকে উদপানে যাবানর্থঃ বিজানতো ব্রাহ্মণস্য সর্বেষু বেদেষু তাবানর্থঃ। ইংরেজি অনুবাদকেরা এই অর্থ করিয়াছেন। ইহার কোন মানে হয় না।

২য়। সর্বতঃ সংপ্নতোদকে সতি উদপানে যাবানর্থ ইত্যাদি পূর্বেবৎ। এই ব্যাখ্যা নূতন।

* আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যেরূপ মূলসঙ্গত বোধ হইয়াছে, আমি সেইরূপ অর্থ করিলাম। কিন্তু যাহারা বেদের গৌরব বজায় রাখিয়া এই শ্লোকের অর্থ করিতে চান, তাঁহারা কিরূপ বুঝেন, তাহার উদাহরণস্বরূপ বাবু কেদারনাথ দত্ত কৃত এই শ্লোকের ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠকের যে অর্থ সঙ্গত বোধ হয়, সেই অর্থ গ্রহণ করিবেন।

“শাস্ত্রসমূহের দুই প্রকার বিষয়—অর্থাৎ উদ্দিষ্ট বিষয় ও নিদ্দিষ্ট বিষয়। যে বিষয়টি যে শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য, তাহাই তাহার উদ্দিষ্ট বিষয়। যে বিষয়কে নিদ্দেশ্য করিয়া উদ্দিষ্ট বিষয়কে লক্ষ্য করে, সেই বিষয়ের নাম নিদ্দিষ্ট বিষয়। অরুদ্ধতী যে স্থলে উদ্দিষ্ট বিষয়, সে স্থলে তাহার নিকটে প্রথমে লক্ষিত যে স্থূল তারা, তাহাই নিদ্দিষ্ট বিষয় হয়। বেদসমূহ নিগূণ তত্ত্বকে উদ্দিষ্ট বলিয়া লক্ষ্য করে, কিন্তু নিগূণ তত্ত্ব সহসা লক্ষিত হয় না বলিয়া প্রথমে কোন সগূণ তত্ত্বকে নিদ্দেশ্য করিয়া থাকে। সেই জন্যই সত্ত্ব, রজঃ ও তম রূপ ত্রিগুণময়ী মায়াকেই প্রথম দৃষ্টিক্রমে বেদ সকলের বিষয় বলিয়া বোধ হয়। হে অর্জুন, তুমি সেই নিদ্দিষ্ট বিষয়ে আবদ্ধ না থাকিয়া নিগূণতত্ত্বরূপ উদ্দিষ্ট তত্ত্ব লাভ করত নিস্ট্রৈগুণ্য স্বীকার কর। বেদ শাস্ত্র কোন স্থলে রজস্তমোগুণাত্মক কৰ্ম্ম, কোন স্থলে সত্ত্বগুণাত্মক জ্ঞান এবং বিশেষ বিশেষ স্থলে নিগূণ ভক্তি উপদিষ্ট হইয়াছে। গুণময় মানাপমানাদি বন্দ্বভাব হইতে রহিত হইয়া নিত্য সত্ত্ব অর্থাৎ আমার ভক্তগণের সঙ্গ করত কৰ্ম্মজ্ঞানমার্গের অনুসন্ধান যোগ ও ক্ষেমানুসন্ধান পরিত্যাগপূর্বক বুদ্ধিযোগ সহকারে নিস্ট্রৈগুণ্য লাভ কর।”

৩য়। উদপানে যাবানর্থঃ সর্বতঃ সংপ্নতোদকে তাবানর্থঃ। এবং সর্বেষু বেদেষু যাবানর্থঃ বিজানতো ব্রাহ্মণস্য তাবানর্থঃ। এই অর্থ প্রাচীন এবং প্রচলিত।

অগ্রে প্রচলিত ব্যাখ্যাই ব্দুঝাইব। কিন্তু বাঙ্গালা অনুবাদ দেওয়া যায় নাই; তদভাবে যাঁহারা সংস্কৃত না জানেন, তাঁহাদের অসুবিধা হইতে পারে, এ জন্য প্রচলিত ব্যাখ্যার উদাহরণস্বরূপ প্রথমে প্রাচীন অনুবাদক হিতলাল মিশ্র-কৃত অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

“যাহা হইতে জল পান করা যায়, তাহা উদপান শব্দে বাচ্য, অর্থাৎ পুষ্করিণী এবং কুপাদি। তাহাতে স্থিত অল্প জলে একেবারে সমস্ত প্রয়োজন সাধনের অসম্ভব হেতু সেই সেই সমস্ত কুপাদি পরিভ্রমণ করিলে, পৃথক্ পৃথক্ যে প্রকার স্নান পানাদি প্রয়োজন সম্পন্ন হয়, সে সমুদায় প্রয়োজন, সংপ্নতোদকশব্দবাচ্য এক মহাহুদে একত্র যেমন নিস্বাহ হইতে পারে, তদ্রূপ সমস্ত বেদে কথিত যে কর্মফলরূপ অর্থ, তাহা সমুদায়ই ভগবদ্ভক্তিযুক্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির তদ্বারাই সম্পন্ন হয়।”

শঙ্কর ও শ্রীধর উভয়েই এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, কাজেই আর সকলে সেই পথের পথিক হইয়াছেন। শ্রীধর-কৃত ব্যাখ্যা আমরা উদ্ধৃত করিতেছি।

“উদকং পীয়তে যস্মিন্‌স্তদুদপানং বাপীকুপতড়াগাদি। তস্মিন্‌ স্বল্পেপাদকে একত্র কৃৎ-স্বার্থস্যাসম্ভবান্তর তত্র পরিভ্রমণেন বিভাগশো যাবান্‌ স্নানপানাদিরর্থঃ প্রয়োজনং ভবতি তাবান্‌ সর্বেহি প্যর্থঃ সর্বতঃ সংপ্নতোদকে মহাহুদে একত্রৈব যথা ভবতি এবং যাবান্‌ সর্বেষু বেদেষু তত্তৎকর্মফলরূপোহর্থস্তাবান্‌ সর্বেহি পি বিজানতো ব্যবসায়াত্মিকাবুদ্ধিযুক্তস্য ব্রাহ্মণস্য ব্রহ্মনিষ্ঠস্য ভবত্যেব।”

ইহার স্কুল তাৎপর্য এই যে, যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় অনেকগুলি পরিভ্রমণ করিলে যাবৎ পরিমিত প্রয়োজন সম্পন্ন হয়, এক মহাহুদেই তাবৎ প্রয়োজন সম্পন্ন হয়। সেইরূপ সমস্ত বেদে যাবৎ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, ব্যবসায়াত্মিক-বুদ্ধি-যুক্ত ব্রহ্মনিষ্ঠায় তাবৎ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়।*

আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধি, এই ব্যাখ্যা বুদ্ধিতে গিয়া যে গোলযোগে পড়িয়াছি, প্রাচীন মহা-মহোপাধ্যায়দিগের পাদপদ্ম বন্দনাপূর্বক আমি তাহা নিবেদন করিতেছি। যে আপনার সন্দেহ ব্যক্ত করিতে সাহস না করে, তাহার কোন জ্ঞানই জন্মে নাই। এবং জন্মবারও সম্ভাবনাও নাই।

‘যাবৎ’ ‘তাবৎ’ শব্দ পরিমাণবাচক। কিন্তু কেবল যাবৎ বলিলে কোন পরিমাণ ব্দুঝা যায় না। একটা যাবৎ থাকিলেই তার একটা তাবৎ আছেই। একটা তাবৎ থাকিলেই তার একটা যাবৎ আছেই। এমন অনেক সময়ে ঘটে যে, কেবল “যাবৎ” শব্দটা স্পষ্ট, তাহার পরবর্ত্তী “তাবৎ”কে ব্দুঝিয়া লইতে হয়; যথা—“আমি যাবৎ না আসি, তুমি এখানে থাকিও।” ইহার প্রকৃত অর্থ, “আমি যাবৎ না আসি, (তাবৎ) তুমি এখানে থাকিও।” অতএব স্পষ্টই হউক, আর উহাই হউক, যাবৎ থাকিলেই তাবৎ থাকিবে। তদ্রূপ তাবৎ থাকিলেই যাবৎ থাকিবে।

এই যাবৎ তাবৎ শব্দের পরস্পরের সম্বন্ধ এই, যে বস্তুর সঙ্গে যাবৎ থাকে, আর যাহার সঙ্গে তাবৎ থাকে, উভয়ের পরিমাণ এক বা সমান বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। অতএব যাবৎ তাবৎ থাকিলে দুইটি তুল্য বা তুলনার বস্তু আছে, ইহাই ব্দুঝিতে হইবে। “আমি যাবৎ না আসি, (তাবৎ) তুমি এখানে থাকিও” এই বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য এই যে, “আমার পুনরাগমন পর্যন্ত যে কাল, আর তোমার এখানে অবস্থিতকাল, উভয়ে সমান হইবে।” এখানে এই দুইটি সময় তুল্য বা তুলনীয়।

* শঙ্করাচার্য-ব্যবহৃত ভাষা কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকার। শ্লোকের দ্বিতীয়ার্কেয় ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, “সর্বেষু বেদেষু বেদোক্তেষু কর্মসু য়োহর্থো যৎ কর্মফলং সোহর্থো ব্রাহ্মণস্য সন্ন্যাসিনঃ পরমার্থতত্ত্বং বিজানতো যোহর্থঃ যৎ বিজ্ঞানফলং সর্বতঃ সংপ্নতোদকস্থানীয়ং তস্মিন্‌স্তাদানেব সংপদ্যতে ইত্যাদি।” ইহার ভিতর অন্য যে কল-কৌশল থাকে, তাহা পশ্চাৎ ব্দুঝাইব। সম্প্রতি “সর্বেষু বেদেষু” ইহার যেরূপ অর্থ ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য করিয়াছেন, তৎপ্রতি পাঠককে মনোযোগ করিতে বলি। “সর্বেষু বেদেষু” অর্থ “বেদোক্তেষু কর্মসু।” যে কারণে আনন্দগিরি বলিয়াছেন, “বেদশব্দেনাত্র কর্মকাণ্ডমেব গৃহ্যতে,” সেই কারণে ইনিও বলিয়াছেন, “সর্বেষু বেদেষু” অর্থে “বেদোক্তেষু কর্মসু।”

বাংকম রচনাবলী

এইরূপ যেখানে একটি যাবান্ আর একটি তাবান্ আছে, সেখানেও বদ্বিধিতে হইবে যে, দুইটি বিষয় পরস্পর তুলিত হইতেছে। যদি তার পর আবার যাবান্ তাবান্ দেখি, তবে অবশ্য বদ্বিধিতে হইবে যে, আবার আরও দুইটি বিষয় পরস্পর তুলিত হইতেছে। ইহার অন্যথা কদাচ হইতে পারে না।

এখন এই শ্লোকের মূলে মোটে একটি যাবান্ আর একটি তাবান্ আছে; অতএব বদ্বিধিতে হইবে, দুইটি বিষয় মাত্র পরস্পর তুলিত হইতেছে, অর্থাৎ (১) উদপানে বা সঙ্কীর্ণ জলাশয়ে অবস্থাবিশেষে যাবৎ পরিমিত প্রয়োজন, (২) সমস্ত বেদে অবস্থাবিশেষে তাবৎ প্রয়োজন। কিন্তু প্রাচীন টীকাকারদিগের কৃত যে ব্যাখ্যা, যাহার উদাহরণ উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে দেখি যে, দুইটা যাবান্ এবং দুইটা তাবান্।* অতএব বদ্বিধিতে হইবে যে, প্রথমে দুইটা বস্তু পরস্পর তুলিত হইলে পর, আবার দুইটা বস্তু পরস্পর তুলিত হইয়াছে। প্রথম, সঙ্কীর্ণ জলাশয়ের সঙ্গে সমস্ত বেদ তুলিত না হইয়া মহাহৃদের সঙ্গে তুলিত হইতেছে। তার পরে আবার সমস্ত বেদ, সঙ্কীর্ণ জলাশয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ ছাড়িয়া ব্রহ্মানিষ্ঠার সঙ্গে তুলনা প্রাপ্ত হইল। ইহাতে কোন অর্থবিপর্যয় ঘটিতেছে কি না?

সচরাচর এ প্রশ্নের এই উত্তর যে, কোন অর্থবিপর্যয় ঘটিতেছে না। কেন না, যাবান্ তাবান্ যেখানে নাও থাকে, সেখানে ব্যাখ্যার প্রয়োজনানুসারে ব্যাখ্যাকারকে বসাইয়া লইতে হয়; তাহার উদাহরণ পূর্বে দেওয়া গিয়াছে। এ কথার এখানে দুইটি আপত্তি উপস্থিত হইতেছে।

প্রথম আপত্তি এই। মানিলাম যে, ব্যাখ্যার প্রয়োজনানুসারে ব্যাখ্যাকার যাবান্ তাবান্ বসাইয়া লইতে পারেন। কিন্তু যাবান্ কাটিয়া তাবান্ করিতে, তাবান্ কাটিয়া যাবান্ করিতে পারেন কি? আমি যদি বলি, আমি যাবৎ না আসি, তুমি এখানে থাকিও, তাহা হইলে ব্যাখ্যাকার তাবৎ শব্দ বসাইয়া লইয়া 'তাবৎ তুমি এখানে থাকিও' বলিতে পারেন। কিন্তু তিনি যদি যাবৎ কাটিয়া তাবৎ করেন, তাবৎ কাটিয়া যাবৎ করেন, যদি বলেন যে, এই বাক্যের অর্থ 'আমি তাবৎ না আসি, যাবৎ তুমি এখানে থাকিও' তাহা হইলে তাহার ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য ও মূলের বিপরীত বলিতে হইবে।

আরও একটা উদাহরণের দ্বারা কথাটা আরও স্পষ্ট করা যাউক।

“যাবৎ তোমার জীবন, তাবৎ আমার সুখ।” (ক)

এই বাক্যটি উদাহরণ-স্বরূপ গ্রহণ কর, এবং তাহাতে (ক) চিহ্ন দাও। তার পর উহার যাবৎ কাটিয়া তাবৎ কর, তাবৎ কাটিয়া যাবৎ কর। তাহা হইলে বাক্য এইরূপ দাঁড়াইতেছে।

“তাবৎ তোমার জীবন, যাবৎ আমার সুখ।” (খ)

এখন দেখ, বাক্যার্থের কিরূপ বিপর্যয় ঘটিল। (ক)-চিহ্নিত বাক্যের প্রকৃত অর্থ যে, “তুমি যত দিন বাঁচবে, তত দিনই আমি সুখী, তার পর আর সুখী হইব না।” (খ)-চিহ্নিত বাক্যের প্রকৃত অর্থ “যত দিন আমি সুখী থাকিব, তত দিন তুমি বাঁচবে, তার পর আর তুমি বাঁচবে না।” অর্থের সম্পূর্ণ বিপর্যয় ঘটিল।

অতএব টীকাকার কখনও যাবান্ কাটিয়া তাবান্, তাবান্ কাটিয়া যাবান্ করিবার অধিকারী নহেন। কিন্তু এখানে টীকাকার ঠিক তাহাই করিয়াছেন। বদ্বিধিবার জন্য শ্লোকের চারিটি চরণে ক্রমান্বয়ে ক, খ, গ, ঘ, চিহ্ন দেওয়া যাক। তাহা হইলে শ্লোকস্থ “যাবানের” গায়ে (ক) এবং “তাবানের” গায়ে (গ) চিহ্ন পড়িতেছে।

(ক) যাবানর্থ উদপানে

(গ) তাবান্ সর্বেষু বেদেষু

(খ) সর্বতঃ সংপ্নুতোদকে

(ঘ) ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ

তদ্ব্যখ্যায় টীকাকার করিয়াছেন—

(ক) যাবানর্থ উদপানে

(গ) যাবান্ সর্বেষু বেদেষু

(খ) তাবান্ সর্বতঃ সংপ্নুতোদকে

(ঘ) তাবান্ ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ

* পূর্বে অক্ষরে এই চারিটা শব্দ ছাপিয়াছি, পাঠক মিলাইয়া দেখিবেন।

এক্ষণে পাঠক (গ)তে (গ)তে মিলাইয়া দেখিবেন, তাবান্ কাটিয়া যাবান্ হইয়াছে কি না।* দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, ব্যাখ্যার প্রয়োজনমতে ব্যাখ্যাকার যাবান্ তাবান্ বসাইয়া বুঝাইয়া দিতে পারেন। কিন্তু নিষ্প্রয়োজনে বসাইতে পারেন কি? যেখানে নতুন যাবান্ তাবান্ না বসাইয়া লইয়া সোজা অর্থ করিলেই অর্থ হয়, সেখানেও কি যাবান্ তাবান্ বসাইয়া লইতে হইবে? এখানে কি নতুন যাবান্ তাবান্ না বসাইলে অর্থ হয় না? হয় বৈ কি। বড় সোজা অর্থই আছে।

যাবানর্থ উদপানে সৰ্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।

তাবান্ সৰ্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥

ইহার সোজা অর্থ আমি এইরূপ বুঝি;—

সৰ্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে সতি উদপানে যাবানর্থঃ বিজানতো ব্রাহ্মণস্য সৰ্ব্বেষু বেদেষু তাবানর্থঃ।

অর্থাৎ সকল স্থান জলে প্লাবিত হইলে উদপানে অর্থাৎ ক্ষুদ্র জলাশয়ে যাবৎ প্রয়োজন, ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠের সমস্ত বেদে তাবৎ প্রয়োজন।

মহামহোপাধ্যায় প্রাচীন ঋষিতুল্য ভাষ্যকার টীকাকারেরা যে এই সহজ অর্থের প্রতি দৃষ্টি করেন নাই, আমার এরূপ বোধ হয় না। আমার বোধ হয় যে, তাঁহারা এই অর্থের প্রতি বিলক্ষণ দৃষ্টি করিয়াছেন এবং অতিশয় দূরদর্শী দেশকালপাত্রজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াই এই সহজ অর্থ পরিত্যাগ করিয়াছেন। দুইটা ব্যাখ্যার প্রকৃত তাৎপর্য পর্যালোচনা করিলেই পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। শেষে কথিত এই সহজ ব্যাখ্যার তাৎপর্য কি? সৰ্ব্বত্র জলপ্লাবিত হইলে ক্ষুদ্র জলাশয়ে লোকের আর কি প্রয়োজন থাকে? কোন প্রয়োজনই থাকে না। কেন না, সৰ্ব্বত্র জলপ্লাবিত—সকল ঠাইই জল পাওয়া যায়। ঘরে বসিয়া জল পাইলে কেহ আর বাপী কুপাদিতে যায় না। তেমনি যে ঈশ্বরকে জানিয়াছে, তাহার পক্ষে সমস্ত বেদে আর কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই। এখন বেদে কিছু প্রয়োজন নাই, এমন কথা, আমরা ঊর্নাবংশ শতাব্দীর ইংরেজ শিষ্য, আমরা না হয় সাহস করিয়া বলিতে পারি, কিন্তু শঙ্করাচার্য্য, কি শ্রীধর স্বামী এমন কথা কি বলিতে পারিতেন? বেদ স্বয়ম্ভুব, অপোরুষের, নিত্য, সৰ্ব্বফলপ্রদ। প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা বেদকেই একটা ঈশ্বরস্বরূপ খাড়া করিয়া তুলিয়াছেন। কপিল ঈশ্বর পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু বেদ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। বৃহস্পতি বা শাক্যসিংহ প্রভৃতি যাঁহারা বেদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা হিন্দু-সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন। অতএব শঙ্করাচার্য্য, কি শ্রীধর স্বামী হইতে এমন উক্তি কখন সম্ভবে না যে, ব্রহ্মজ্ঞানীই হউক বা যেই হউক, কাহারও পক্ষে বেদ নিষ্প্রয়োজনীয়। কাজেই তাঁহাদিগকে এমন একটা অর্থ করিতে হইয়াছে যে, তাহাতে বুঝায় যে, ব্রহ্মজ্ঞানেও যা, বেদেও তা, একই ফল। তাহা হইলে বেদের মর্যাদা বাহাল রহিল। শেষে যে ব্যাখ্যা লিখিত হইল, তাহার অর্থ যে, ব্রহ্মজ্ঞানের তুলনায় বেদজ্ঞান অতি তুচ্ছ। এক্ষণে সেই “সৰ্ব্বেষু বেদেষু” অর্থে “বেদোক্তেষু কৰ্ম্মসু” “বেদশব্দেনাগ্র কৰ্ম্মকাণ্ডমেব গৃহ্যতে।” ইত্যাদি বাক্য পাঠক স্মরণ করুন। প্রাচীন টীকাকারদিগের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবেন।

এক্ষণে পাঠকের বিচার্য্য এই যে, দুইটা ব্যাখ্যা, তাহার মধ্যে একটার জন্য মূল কোন প্রকার পরিবর্তন করিতে হয় না; যেমন আছে, তেমনি ব্যাখ্যা করিলেই সেই অর্থ পাওয়া যায়। কিন্তু সে ব্যাখ্যার পক্ষে কেহই সহায় নাই। আর একটা ব্যাখ্যার জন্য কিছু নতুন কথা বসাইয়া কিছু কাটকট করিয়া লইতে হয়। কিন্তু সমস্ত টীকাকার, ভাষ্যকার ও অনুবাদক এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলী সেই ব্যাখ্যার পক্ষে। কোন ব্যাখ্যা গ্রহণ করা উচিত? আমার কোন দিকেই অনুরোধ নাই। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যেমন বুঝিয়াছি, সেইরূপ বুঝাইলাম। দুই দিকই বুঝাইলাম, পাঠকের যে ব্যাখ্যা সঙ্গত বোধ হয়, তাহাই অবলম্বন করিবেন। অভিনব ব্যাখ্যার সমর্থন জন্য আরও কিছু বলা যাইতে পারে, কিন্তু ততটা প্রয়াস পাইবার বিষয় কিছু দেখা যায় না। বৈদিক ধর্মের সঙ্গে গীতোক্ত ধর্মের কি সম্বন্ধ, পাঠক তাহা বুঝিলেই হইল। সে সম্বন্ধ কি, পূর্বে তাহা বলিয়াছি।

* সত্য বটে, শঙ্করাচার্য্য তাবান্ শব্দের স্থানে যাবান্ শব্দ ব্যবহার করার বিষয়ে সতর্ক হইয়াছেন, কিন্তু তৎপরিবর্তে “যদ্” শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কাজেই এক কথা।

বাংকম রচনাবলী

তৃতীয়; ইংরাজি অনুবাদকেরা এই শ্লোকের আর এক প্রকার অর্থ করিয়াছেন। সৰ্ব্বতঃ সংপ্নতোদকে সতি উদপানে যাবানর্থঃ, এরূপ না বুঝিয়া, তাঁহারা বুঝেন, সৰ্ব্বতঃ সংপ্নতোদকে উদপানে যাবানর্থঃ ইত্যাদি। অর্থাৎ “সংপ্নতোদকে” পদ “উদপানের” বিশেষণ মাত্র। অন্য ইংরাজি অনুবাদকগণের প্রতি পাঠকগণের শ্রদ্ধা হউক বা না হউক কাশীনাথ দ্ব্যম্বক তেলাঙ্গের প্রতি শ্রদ্ধা হইতে পারে। তিনি এই শ্লোকের এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন—

“To the instructed Brahmana there is in all the Vedas as much utility as in a reservoir of water into which waters flow from all sides.”

দুঃখের বিষয় কেবল এই যে, ইহার অর্থ হয় না। কিছু তাৎপর্য্য নাই। অনুবাদকও তাহা অগত্যা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি এই শ্লোকের একটি টীকা লিখিয়া, তাহাতে বলিয়াছেন—

“The meaning here is not easily apprehended. I suggest the following explanation :—Having said that the Vedas are concerned with actions for special benefits, Krishna compares them to a reservoir which provides water for various special purposes—drinking, bathing &c. The Vedas similarly prescribe particular rites and ceremonies for going to heaven, or destroying an enemy, &c. But, says Krishna, man’s duty is merely to perform the actions prescribed for him among these, and not entertain desires for the special benefits named.”

তেলাঙ্গের পর আর কোন ইংরেজি অনুবাদকের অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করা প্রয়োজনীয় হইতে পারে না। ইহাই বলা যথেষ্ট যে, Davis ও Thomson প্রভৃতি সাহেবেরা তেলাঙ্গের ন্যায় অর্থ করিয়াছেন। তবে তাঁহারা সেই অনুবাদের সঙ্গে যে একটু একটু টীকা সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে আরও রস আছে। Thomson-কৃত টীকাটুকু পাঠককে উপহার দিলেই যথেষ্ট হইবে। তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—

“As a tank full of fresh water may be used for drinking, bathing, washing one’s clothes and numerous other purposes, so the text of the Vedas may be turned to any object of self-interest by a Brahman who is well acquainted with them and knows how to wield them. We may exemplify this general fact by the uses made of texts from our scriptures in the mouths of the Puritans on the one hand, and of the Cavaliers on the other. Our author must not, however, be understood to reject the use of the Vedas by what he here says. He merely advises a careful use of them. Kapila himself admits them as a last source of proof of the truth when others fail.”

আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তি গীতার মর্ম্মার্থ বুঝিতে বা বুঝাইতে যে অক্ষম, তাহা আমি মনুস্তকণ্ঠে স্বীকার করি। তবে “স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য” ইত্যাদি বাক্য স্মরণ করিয়াই স্বকাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কিন্তু আমি বুঝাইতে পারি বা না পারি, প্রাচীন ভাষ্যকারদিগের যে সকল মহৎব্যক্তি উদ্ধৃত করিতেছি, অন্ততঃ তাহা হইতে পাঠক ইহার মর্ম্মার্থ বুঝিতে পারিবেন, এমত ভরসা আছে। কিন্তু তাহাতেও বুঝুন বা না বুঝুন, পাঠকের কাছে যুক্তকরে এই নিবেদন করি যে, ইংরেজের কাছে যেন গীতার্থ বুঝিবার জন্য না যান। সুশিক্ষিত বাঙ্গালীকে ইংরেজের কৃত গীতানুবাদ পড়িতে দেখিয়াছি বলিয়াই এ কথা বলিতেছি; এবং সেই প্রবৃত্তির বিনাশের জন্যই এতটা ইংরেজি এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

প্রবাদ আছে যে, পুরাণাদি প্রণয়নের পর ব্যাসদেব এক দিন সমুদ্রতীরে উপবেশন করিয়া কি চিন্তা করিতেছিলেন। সমুদ্রে বহু বহু উর্ম্মি-মালার স্তমত তাঁহারও মানসসমুদ্রে গুরুতর চিন্তা উঠিয়া মনকে অশান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সেই সময়ে দেবর্ষি নারদ তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। নারদের নিকট ব্যাসদেব মনের অবস্থা বিবৃত করেন; বলেন,—প্রভু, জগতের হিতার্থ আমি সাধারণের দুঃখোন্মুক্তি বৈদ্যকে সহজ করিয়া প্রচার করিয়াছি, গল্পচ্ছলে বৈদ্যকে উপদেশ লইয়া পুরাণাদি প্রণয়ন করিয়াছি, ইহাতে আমার জীবনের অধিকাংশ সময়

অতিবাহিত হইয়াছে। তথাপি এখন আমার মনে হইতেছে, বৃদ্ধি আমার কর্তব্য কিছই করা হয় নাই, অথচ আর আমি কি করিব, নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। এই জন্য মন অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে—অশান্ত মনে সমুদ্রতীরে আসিয়াছি—দেব! কোথায় আমার কর্তব্যের দ্রুটি হইয়াছে, আরও আমার কি কর্তব্য বাকি আছে, নির্দেশ করিয়া আমার এই অশান্ত মনে শান্তি প্রদান করুন। “ধর্মের প্রধান অবলম্বন ভক্তি জগতে প্রচার কর”—এই উপদেশ দিয়া দেবর্ষি অন্তর্হিত হইলেন। কথিত আছে যে, ব্যাসদেব তখন ভাগবত ও ভগবদ্গীতা প্রণয়ন করেন, আরও দুই একখানি পুরাণে ভক্তের আদর্শ অঙ্কন করেন। এই কারণে কেহ কেহ মহাভারত গীতার পুর্বে রচিত হইয়াছিল, অনুমান করেন।

গীতা ও ভাগবত ভক্তিপ্রধান গ্রন্থ। ব্যাসদেব বৃদ্ধিয়াছিলেন, ভক্তি জীবনের চরম উদ্দেশ্য, পরিগ্রহের একমাত্র উপায়।

কি কথাটা হইতেছিল, এক্ষণে এক বার স্মরণ করা কর্তব্য। ভগবান্ অর্জুনকে জ্ঞানযোগ বুদ্ধাইয়া, “এষা তেহর্ভিতা সাংখ্যে” ইত্যাদি বাক্যে বলিলেন যে, এখন তোমাকে কর্মযোগ শুনাইব। তখন কর্মযোগের কিছ প্রশংসা করিয়া, প্রথমতঃ একটা সাধারণ প্রচলিত ভ্রান্তির নিরাসে প্রবৃত্ত হইলেন। সে ভ্রান্তি এই যে, বেদোক্ত কাম্য কর্ম সকলেই লোকের চিত্ত নিবিষ্ট, তাদৃশ লোক ঈশ্বরে একাগ্রচিত্ত হইতে পারে না। তাই ভগবান্ অর্জুনকে বলিলেন যে, বেদ সকল “ত্রৈগুণ্যবিষয়,” তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য হও বা বেদবিষয়কে অতিক্রম কর। কেন না, যেমন সম্বন্ধ জলপ্লাবিত হইলে বাপী কদুপ তড়াগাদিতে কাহারও প্রয়োজন হয় না, তেমনি যে ব্রহ্মনিষ্ঠ, বেদে আর তাহার প্রয়োজন হয় না। কর্মযোগের সহিত বৈদিক কর্মের সম্বন্ধরহিত্য এইরূপে প্রতিপাদন করিয়া ভগবান্ এক্ষণে কর্মযোগ কহিতেছেন:—

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন ।

মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোহম্বকর্মণি ॥ ৪৭ ॥

কর্ম তোমার অধিকার, কিন্তু ফলে কদাচ (অধিকার) না হউক। তুমি কর্মফলহেতু হইও না; অকর্ম তোমার আসক্তি না হউক। ৪৭।

এই শ্লোক বৃদ্ধিতে গেলে, “কর্ম” কি, “কর্মফলহেতু” কি, “অকর্ম” কি, বৃদ্ধা চাই।

“কর্ম কি” কি, বৃদ্ধিলে, আর দুইটা বৃদ্ধা গেল। কর্মফল যাহার প্রবৃত্তি হেতু, সেই “কর্মফলহেতু”। কর্মশূন্যতাই অকর্ম। কর্ম কি, তাহা পরে বলিতেছি।

অতএব শ্লোকের অর্থ এই যে, কর্ম করিও, কিন্তু কর্মফল কামনা করিও না। কর্মফলপ্রাপ্তিই যেন তোমার কর্ম প্রবৃত্তির হেতু না হয়। কিন্তু কর্মের ফলের প্রত্যাশা না থাকিলে কেহ কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, এই জন্য শ্লোকশেষে তাহাও নিষিদ্ধ হইতেছে। বলা হইতেছে, ফল চাহি না বলিয়া কর্ম বিরত হইও না। অর্থাৎ কর্ম অবশ্য করিবে, কিন্তু ফল কামনা করিয়া কর্ম করিবে না।

বোধ হয় এক্ষণে শ্লোকের অর্থ বৃদ্ধা গিয়াছে। ইহাই সর্বাধিক্যাত নিষ্কাম কর্মতত্ত্ব। এরূপ উন্নত, পবিত্র এবং মনুষ্যের মঙ্গলকর মহামহিমময় ধর্মোক্তি জগতে আর কখন প্রচারিত হয় নাই। কেবল ভগবৎপ্রসাদাৎই হিন্দু এরূপ পবিত্র ধর্মতত্ত্ব লাভ করিতে পারিয়াছে।

কিন্তু লাভ করিয়াও হিন্দুর পক্ষে ইহার বিশেষ ফলোপধায়িতা ঘটে নাই। তাহার কারণ, এমন কথাতেও আমাদের বৃদ্ধিবিত্ত্বংশবশতঃ অনেক গোলযোগ ঘটিয়াছে। আমরা আজিও ভাল করিয়া ইহা বৃদ্ধিতে পারি নাই।

আমি এমন বলিতেছি না যে, আমি ইহা সম্পূর্ণরূপে বৃদ্ধিয়াছি বা পাঠককে সম্পূর্ণরূপে বৃদ্ধাইতে পারিব। ভগবান্ যাহাকে তাদৃশ অনুগ্রহ করিবেন, তিনিই ইহা বৃদ্ধিতে পারিবেন। তবে যতটুকু পারি, বৃদ্ধাইতে চেষ্টা করায় বোধ হয় ক্ষতি নাই।

ইহার প্রথম গোলযোগ কর্ম শব্দের অর্থ সম্বন্ধে। যাহা করা যায় বা করিতে হয়, তাহাই কর্ম, কর্ম শব্দের এই প্রচলিত অর্থ। কিন্তু কতকগুলি হিন্দু শাস্ত্রকার বা হিন্দু শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকার ইহাতে একটা গোলযোগ উপস্থিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাদের কৃপায় এ সকল স্থলে বৃদ্ধিতে হয়, কর্ম অর্থে বেদোক্ত যজ্ঞাদি। কর্ম মাত্রই কর্ম নহে—বেদোক্ত অথবা শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞই কর্ম।

বাংকম রচনাবলী

যদি তাই হয়, তাহা হইলে এই শ্লোকের অর্থ এই বুদ্ধিতে হয় যে, বেদোক্তাদি যজ্ঞাদি করিবে, কিন্তু সেই সকল যজ্ঞের ফল স্বর্গাদি, সেই স্বর্গাদির কামনা করিবে না।

এইরূপ অর্থ চিরপ্রচলিত বলিয়া সুশিক্ষিত ইংরেজিবিদগণও এইরূপ অর্থ বুদ্ধিয়াছেন। সুপরিভাষিত কাশীনাথ গ্রাম্বক তেলাঙ ইহার পূর্বে-শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন, “The Vedas... prescribe particular rites and ceremonies for going to heaven or destroying an enemy &c. But, says Krishna, man's duty is merely to perform the actions prescribed for him among these, and not entertain desires for the special benefits named.”

যদি কর্ম শব্দের এই অর্থ হয়, তবে পাঠককে একটু গোলযোগে পড়িতে হইবে। পাঠক বলিলেন যে, যে কর্মের ফল স্বর্গাদি, অন্য কোন প্রয়োজন নাই, যদি সে ফলই কামনা না করিলাম, তবে সে কর্মই করিব কেন? নিষ্কাম কাম্য কর্ম কিরূপ? কাম্য কর্ম নিষ্কাম হইয়াই বা করি কেন?

অতএব দেখা যাইতেছে যে, কর্ম অর্থে বেদোক্তাদি কাম্য কর্ম বুদ্ধিতে আমরা কোন বোধগম্য তত্ত্বে উপস্থিত হইতে পারি না। আর বেদোক্ত কাম্য কর্ম গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মের উদ্দিষ্ট নহে, তাহা গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচনায় অতি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ঐ তৃতীয় অধ্যায়ের নামই “কর্মযোগ”। ইহাতে কর্ম সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে—

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।

কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৫ ॥

“কেহ কখন ক্ষণমাত্র কর্ম না করিয়া থাকিতে পারে না; কেন না; প্রকৃতিজ বা স্বাভাবিক গুণে সকলকেই কর্ম করিতে বাধ্য করে।”

এখন দেখা যাইতেছে, বেদোক্ত যজ্ঞাদি সম্বন্ধে এ কথা কখনই বলা যায় না। কেবল সচরাচর যাহাকে কর্ম বলি—যাহাকে ভাষায় কাজ এবং ইংরেজিতে action বলে, তাহা সম্বন্ধেই কেবল এ কথা বলা যাইতে পারে। কেহ কখন কাজ না করিয়া থাকিতে পারে না, অন্য কোন কাজ না করুক, স্বভাব বা প্রকৃতির (Nature) বশীভূত হইয়া কতকগুলি কাজ অবশ্য করিতে হইবে। যথা,—অশন, বসন, শয়ন, শ্বাস, প্রশ্বাস ইত্যাদি। অতএব স্পষ্টই কর্ম শব্দে বাচ্য, যাহাকে সচরাচর কর্ম বলা যায়, তাহাই; যজ্ঞাদি নহে।

পুনশ্চ ঐ অধ্যায়ের ৮ম শ্লোকে কথিত হইতেছে—

নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ।

শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যোদকর্মণঃ ॥

“তুমি নিয়ত কর্ম কর; কর্ম অকর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ; অকর্ম তোমার শরীরযাত্রাও নিব্বাহ হইতে পারিবে না।”

এখানেও নিশ্চিত কর্ম সর্ববিধ কর্ম বা “কাজ”;—যজ্ঞাদি নহে। যজ্ঞাদি ব্যতীত সকলেরই শরীরযাত্রা নিব্বাহ হইতে পারে ও হইয়া থাকে, কেবল কাজ বা action, যাহাকে সচরাচর কর্ম বলা যায়, তাহা ভিন্ন শরীরযাত্রা নিব্বাহ হয় না।

এবংবিধ প্রমাণ গীতা হইতে আরও উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।* প্রমাণ নির্দোষ হইলে, এক প্রমাণই যথেষ্ট। অতএব আর নিঃপ্রয়োজনীয়।

অতএব ইহা সিদ্ধ যে, কর্মযোগ ব্যাখ্যায় কর্ম অর্থে সচরাচর যাহাকে কর্ম বলা যায়, অর্থাৎ কাজ বা action, তাহাই ভগবানের অভিপ্রেত;—বৈদিক যজ্ঞাদি নহে।

* পঞ্চান্তরে অষ্টমাধ্যয়ে, “ভূতভাবোন্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ” ইতি বাক্যও আছে। তাহার প্রচলিত অর্থ যজ্ঞ পক্ষে বটে। কিন্তু সেই প্রচলিত অর্থও যে ভ্রমাত্মক, বোধ করি পাঠক তাহা পশ্চাৎ বুদ্ধিতে পারিবেন। আমি বুদ্ধাইব, এমন কথা বলি না—পাঠক সহজেই বুদ্ধিবেন। এবং ইহাও স্বীকার করিতে আমি বাধ্য যে, কখন কখন গীতাতেও কর্ম শব্দে বৈদিক কাম্য কর্ম বুদ্ধায়, যথা— এই যে অধ্যায়ের ৪৯ শ্লোকে, “দুরেণ হ্যবরং কর্ম”। কিন্তু এখানেও স্পষ্টই বুদ্ধা যায়, এ “কর্মের” সঙ্গে কর্মযোগের বিরুদ্ধ ভাব। গীতার অনেকগুলি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে স্থানে স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি।

তাহা হইলে এই ৪৭ শ্লোকের অর্থ এই হইতেছে যে, কৰ্তব্য কৰ্ম সকল করিতে হইবে। কিন্তু তাহার ফল কামনা করিবে না, নিষ্কাম হইয়া করিবে। এক্ষণে এই মহাবাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

ইহার ভিতর দুইটি আজ্ঞা আছে—প্রথম, কৰ্ম করিতে হইবে। দ্বিতীয়, সকল কৰ্ম নিষ্কাম হইয়া করিতে হইবে। এক একটি করিয়া বুঝা যাউক। প্রথম, কৰ্ম করিতে হইবে।

কৰ্ম করিতে হইবে কেন? তৃতীয়াধ্যায়ের যে দুই শ্লোক উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতেই উহা বুঝান হইয়াছে। কৰ্ম আমাদের জীবনের নিয়ম—Law of Life—কৰ্ম না করিয়া কেহ ক্ষণকাল তিষ্ঠিতে পারে না। সকলেই প্রকৃতিজ গুণে কৰ্ম করিতে বাধ্য হয়। কৰ্ম না করিলে শরীরযাত্রাও নিৰ্বাহ হয় না। কাজেই সকলকে কৰ্ম করিতে হইবে।

কিন্তু সকল কৰ্মই কি করিতে হইবে? কতকগুলি কৰ্মকে আমরা সংকৰ্ম বলি, কতকগুলিকে অসংকৰ্ম বলি। অসংকৰ্মও করিতে হইবে?

অসংকৰ্ম আমাদের জীবন নিৰ্বাহের নিয়ম নহে—ইহা আমাদের Law of Life নহে। অসং কৰ্ম না করিয়া কেহ ক্ষণকাল থাকিতে পারে না, এমন নহে;—অসংকৰ্ম না করিলে কাহারও শরীরযাত্রা নিৰ্বাহের বিঘ্ন হয় না। চুরি বা পরদার না করিয়া কেহ যে বাঁচিতে পারে না, এমন নহে। সুতরাং অসং কৰ্ম করিতে হইবে না। তৃতীয় অধ্যায় হইতে উদ্ধৃত ঐ দুই শ্লোক হইতে বুঝা যাইতেছে, পশ্চাৎ আরও বুঝা যাইবে।

পক্ষান্তরে ইহাও জিজ্ঞাসিত হইতে পারে যে, যাহাকে সংকৰ্ম বলি, তাহাই কি আমাদের জীবনযাত্রার নিয়ম? আমরা কতকগুলিকে সংকৰ্ম বলি, যথা—পরোপকারাদি; আর কতকগুলিকে অসংকৰ্ম বলি, যথা—পরদারগমনাদি; আর কতকগুলিকে সদসং কিছুই বলি না, যথা, শয়ন ভোজনাদি। ভাল বুঝা গিয়াছে যে, দ্বিতীয় শ্রেণীর কৰ্মগুলি করিবার প্রয়োজন নাই; এবং তৃতীয় শ্রেণীর কৰ্মগুলি না করিলে নয়, সুতরাং করিতে হইবে। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর কৰ্মগুলি করিব কেন? সংকৰ্ম মনুষ্যজীবনের নিয়ম কিসে?

এ কথার উত্তর আমার প্রণীত ধৰ্মতত্ত্ব নামক গ্রন্থে সবিস্তারে দিয়াছি, সুতরাং পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। আমি সেই গ্রন্থে বুঝাইয়াছি যে, যাহাকে আমরা সংকৰ্ম বলি, তাহাই মনুষ্যত্বের প্রধান উপাদান। অতএব ইহা মনুষ্যজীবন নিৰ্বাহের নিয়ম।

বস্তুতঃ কৰ্মের এই ত্রিবিধ প্রভেদ করা যায় না। যাহাকে সংকৰ্ম বলি, আর যাহাকে সদসং কিছুই বলি না, অথচ করিতে বাধ্য হই, এতদুভয়ই মনুষ্যত্ব পক্ষে প্রয়োজনীয়। এই জন্য এই দুইকে আমি ধৰ্মতত্ত্বে অনুষ্টেয় কৰ্ম বলিয়াছি। এই টীকাতেও বলিতে থাকিব।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, কোন্ কৰ্ম অনুষ্টেয় এবং কোন্ কৰ্ম অনুষ্টেয় নহে, তাহার মীমাংসা কে করিবে? মীমাংসার স্থূল নিয়ম এই, গীতাতেই কথিত হইয়াছে, পশ্চাৎ দেখিব; এবং সেই নিয়ম অবলম্বন করিয়া আমি উক্ত ধৰ্মতত্ত্ব গ্রন্থে এ তত্ত্ব কিছু দূর মীমাংসা করিয়াছি।

এই শ্লোকোক্ত প্রথম বিধি, “কৰ্ম করিবে,” তৎসম্বন্ধে এক্ষণে এই পর্য্যন্ত বলিয়া দ্বিতীয় বিধি সামান্যতঃ বুঝাইব। দ্বিতীয় বিধি এই যে, যে কৰ্ম করিবে, তাহা নিষ্কাম হইয়া করিবে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাউক।

পরোপকার অনুষ্টেয় কৰ্ম। অনেকে পরোপকার এইরূপ অভিপ্রায়ে করিয়া থাকে যে, আমি যাহার উপকার করিলাম, সে আমার প্রত্যুপকার করিবে। ইহা সকাম কৰ্ম। ইহা এই বিধির বহির্ভূত।

অনেকে এই অভিপ্রায়ে দানাদির দ্বারা পরোপকার করে যে, ইহাতে আমার পুণ্যসঞ্চয় হইয়া তৎফলে স্বর্গাদি লাভ হইবে। ইহাও সকাম কৰ্ম, এবং এই বিধির বহির্ভূত।

অনেকে এইরূপ অভিপ্রায়ে পরোপকার করিয়া থাকেন যে, ঈশ্বর ইহাতে আমার উপর প্রসন্ন হইবেন, এবং প্রসন্ন হইয়া আমার মঙ্গল করিবেন। তাহা হইতে পারে; ঈশ্বর প্রসন্ন হইবেন সন্দেহ নাই এবং পরোপকারীর মঙ্গলও করিতে পারেন; কিন্তু ইহা নিষ্কাম কৰ্ম নহে। ইহা সকাম, এবং এই বিধির বহির্ভূত।

নিষ্কামকৰ্মী তাহাও চাহে না, কিছুই চাহে না, কেবল আপনার অনুষ্টেয় কৰ্ম করিতে চাহে। পরোপকার আমার অনুষ্টেয় কৰ্ম—এই জন্য আমি করিব, কোন ফলই চাই না। ইহা নিষ্কাম চিন্তাভাব।

বিশ্বকম রচনাবলী

ধর্মতত্ত্বে আমি আর আর উদাহরণের দ্বারা বুঝাইয়াছি যে, সকল প্রকার অনুষ্ঠেয় কর্মই নিষ্কাম হইতে পারে। অতএব পুনরুক্তি অনাবশ্যিক।

নিষ্কাম কর্ম সম্বন্ধে এইটি প্রথম কথা। এ তত্ত্ব ক্রমশঃ আরও পরিষ্ফুট ও বিশদ হইবে।

যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮ ॥

হে ধনঞ্জয়! যোগস্থ হইয়া “সঙ্গ” ত্যাগ করিয়া কর্ম কর। সিদ্ধি ও অসিদ্ধিকে তুল্য জ্ঞান করিয়া (কর্ম কর)। (এইরূপ) সমত্বকে যোগ বলে। ৪৮।

পূর্বে শ্লোকে ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য যে কর্ম, তাহাই বিহিত হইয়াছে। এক্ষণে সেইরূপ কর্ম করার পক্ষে তিনটি বিধি নির্দিষ্ট হইতেছে—

প্রথম, যোগস্থ হইয়া কর্ম করিবে।

দ্বিতীয়, সঙ্গ ত্যাগ করিয়া কর্ম করিবে।

তৃতীয়, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে তুল্যজ্ঞান করিবে।

ক্রমশঃ এই তিনটি বিধি বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক।

প্রথম, যোগস্থ হইয়া কর্ম করিবে। যোগ কি? যোগ শব্দ গীতায় স্থানে স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। পাঠককে বুঝাইতে হইবে না যে, যাহাকে পতঞ্জলি ঠাকুর “চিত্তবৃত্তিনিরোধ” বলিয়াছেন, সেইরূপ কথা হইতেছে না।

এখানে “যোগ” শব্দের অর্থে শ্রীধর স্বামী মতে “পরমেশ্বরৈকপরতা।” শঙ্করাচার্য্যও তাহাই বুঝিয়াছেন। তিনি বলেন, “যোগস্থঃ সন্ কুরু কর্মাণি কেবলমীশ্বরার্থম্।” কিন্তু শ্লোকের শেষাংশের ব্যাখ্যাকালে তিনি বলিয়াছেন, “কোহসৌ যোগো যন্ত্রস্থঃ কুর্ষ্বত্যুক্তমিদমেব তৎ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমত্বং যোগ উচ্যতে।”

স্থূল কথা, যোগ কি, তাহা যখন এই শ্লোকেই ভগবান্ বুঝাইয়াছেন, তখন আর ভিন্ন অর্থ খুঁজিবার প্রয়োজন কি? সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে যে সমত্বজ্ঞান, তাহাই যোগ। তৃতীয় বিধি বুঝিলেই তাহা বুঝিব। তৃতীয় বিধি, প্রথম বিধির সম্প্রসারণ মাত্র। সম্প্রসারণকে পুনরুক্তি বলা যায় না।

তৃতীয় বিধির আগে দ্বিতীয় বিধি বুঝা যাক। “সঙ্গ” ত্যাগ করিয়া কর্ম করিবে। সঙ্গ কি? শ্রীধর বলেন, “কর্তৃত্বাভিনিবেশঃ।” আমি কর্তা, এই অভিনিবেশ পরিত্যাগ করিয়া, কেবল ঈশ্বরশ্রয়ে অর্থাৎ ঈশ্বরই কর্তা, ইহা জানিয়া কর্ম করিবে।

শঙ্কর বলেন, “যোগস্থঃ সন্ কুরু কর্মাণি, কেবলমীশ্বরার্থং তত্রাপীশ্বরো মে তুষ্যতি সঙ্গং ত্যক্ত্বা,” কেবল ঈশ্বরার্থ কর্ম করিবে, কিন্তু ঈশ্বর তজ্জন্য আমার শূভ করুন, এরূপ কামনা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম করিবে। ফলে, ফলকামনা ত্যাগই সঙ্গত্যাগ, এইরূপ অর্থে “সঙ্গ” শব্দ পুনঃ পুনঃ গীতায় ব্যবহৃত হইয়াছে, দেখা যায়।

এক্ষণে তৃতীয় বিধি বুঝা যাউক। কর্মসিদ্ধি, এবং কর্মের অসিদ্ধিকে তুল্য জ্ঞান করিতে হইবে, এই সমত্বজ্ঞানই যোগ। এই কথা জ্ঞানবাদী শঙ্করাচার্য্য যেরূপ বুঝাইয়াছেন, আমাদের মত অজ্ঞানদীর্ঘের সেইরূপ বুঝায় বিশেষ লাভ নাই। তাঁহার মত এই যে, জ্ঞানপ্রাপ্তই কর্মের সিদ্ধি। তাই তিনি বলেন যে, “সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞানপ্রাপ্তলক্ষণা সিদ্ধিঃ।” এবং “তদ্বিপর্ষ্যয়জ্ঞান অসিদ্ধিঃ।” শ্রীধর ঠাকুরও এখানে শঙ্করাচার্য্যের অনুবর্তী। তিনি বলেন, “কর্মফলস্য জ্ঞানস্য সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ” ইত্যাদি।

এখন জ্ঞান, কর্মের ফল কি না, সে বিচারের প্রয়োজন নাই। স্থানান্তরে সে বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। আপাততঃ যে কথাটা উপস্থিত, তাহার সোজা অর্থ বুঝিতে পারিলে আমাদের পরম লাভ হইবে। টীকাকার মধুসূদন সরস্বতী সেই সোজা অর্থ বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন, “সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বতি ফলসিদ্ধৌ হর্ষং ফলাসিদ্ধৌ চ বিষাদং ত্যক্ত্বা” ইত্যাদি। ফলসিদ্ধিতে হর্ষত্যাগ এবং ফলের অসিদ্ধিতে বিষাদত্যাগ, ইহাই সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমত্বজ্ঞান। সাধারণ পাঠকের ইহাই সঙ্গত অর্থ বলিয়া বোধ হইবে। যে নিষ্কাম, ফলকামনা করে না, তাহার ফলসিদ্ধিতে হর্ষ হইতে পারে না এবং অসিদ্ধিতে বিষাদ জন্মিতে পারে না। যত দিন সে ফলসিদ্ধিতে আনন্দ লাভ করে, তত দিন বুঝিতে হইবে যে, সে ফলকামনা করে—কেন না, ফলকামনা না করিলে ফলসিদ্ধিতে হর্ষলাভ করিবে কেন। কর্মকারী নিষ্কাম হইলে, তাহার

ফলসিদ্ধিতে হর্ষ নাই বা অসিদ্ধিতে দঃখ নাই। তাহার পক্ষে অসিদ্ধি ও সিদ্ধি সমান। এই সমত্বজ্ঞানই যোগ। তাদৃশ যোগস্থ হইয়া কৰ্ম কর, ইহাই প্রথম বিধি।

দুরেণ হ্যবরং কৰ্ম বুদ্ধিযোগাদনঞ্জয়।

বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯ ॥

হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধিযোগ হইতে কৰ্ম অনেক নিকৃষ্ট। বুদ্ধিতে আশ্রয় প্রার্থনা কর। যাহারা সকাম, তাহারা নিকৃষ্ট। ৪৯।

বুদ্ধিযোগ কাহাকে বলে, তাহা পদার্থে কথিত হয় নাই। শ্রীধর বলেন, ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধি-যুক্ত কৰ্মযোগই বুদ্ধিযোগ। শঙ্কর বলেন, সমত্ববুদ্ধি। সমত্বং যোগ উচ্যতে। তাহা হইতে কৰ্ম অনেক নিকৃষ্ট যখন বলা হইতেছে, তখন বুদ্ধিতে হইবে, এখানে কৰ্ম শব্দে কাম্য কৰ্ম। ভাষ্যকারেরা এইরূপ বলেন। অতএব শ্লোকের প্রথমার্ধের অর্থ এই যে, যে কৰ্মযোগের কথা বলিলাম, তাহা হইতে কাম্য কৰ্ম অনেক নিকৃষ্ট।

শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধে বলা হইতেছে যে, বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ কর বা বুদ্ধির অনুষ্ঠান কর। ইহাতে এখানে “বুদ্ধি” শব্দে ঐ বুদ্ধিযোগই বুদ্ধিতে হয়। ভাষ্যকারেরা বলেন, সাংখ্যবুদ্ধি বা জ্ঞান। যদি তাই হয়, তবে প্রথমার্ধেও বুদ্ধি শব্দে জ্ঞান বুঝাই উচিত। তাহা হইলে তৃতীয় অধ্যায়ের আরম্ভে “জ্যায়সী চেৎ কৰ্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জানান্দর্ন” ইত্যাদি বাক্যে আর কোন গোলযোগ হইবে না। কিন্তু পরবর্তী ৫০ শ্লোকে কিছু গোলযোগ বাধিবে।

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে স্কৃতদুষ্কৃতে।

তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কৰ্মসু কৌশলম্ ॥ ৫০ ॥

যিনি বুদ্ধিযুক্ত, ইহজন্মে তিনি স্কৃত দুষ্কৃত উভয়ই পরিত্যাগ করেন। তজ্জন্য তুমি যোগের অনুষ্ঠান কর। কৰ্মে কৌশলই যোগ। ৫০।

“বুদ্ধিযুক্ত”—অর্থাৎ বুদ্ধিযোগে যুক্ত। যে সকল কৰ্মের ফল স্বর্গাদি, তাহাই স্কৃত; আর যে সকল কৰ্মের ফল নরকাদি, তাহাই দুষ্কৃত। যিনি বুদ্ধিযুক্ত, তিনি যাহাতে স্বর্গাদি বা নরকাদি প্রাপ্ত হয়, তাদৃশ উভয়বিধ কৰ্মই পরিত্যাগ করেন। ইহার তাৎপর্য এমন নহে যে, তিনি কোন প্রকার সৎকৰ্ম করেন না, অথবা ভাল মন্দ কোন কৰ্মই করেন না। ইহার অর্থ এই যে, তিনি স্বর্গাদি কামনা বা নরকাদির ভয়ে কোন কৰ্ম করেন না। যাহা করেন, তাহা অনুষ্ঠেয় বলিয়া করেন।

অতএব তুমি যোগের অনুষ্ঠান কর। কৰ্মে কৌশলই যোগ। প্রাচীন ভাষ্যকারেরা এ কথার অর্থ করিয়াছেন যে, কৰ্ম বন্ধনজনক; কেন না, কৰ্ম করিলেই পুনশ্চ জন্মগ্রহণ করিয়া তাহার ফলভোগ করিতে হয়। কিন্তু তাদৃশ বন্ধনকেও যদি ঈশ্বরারাধনার সাহায্যে মূর্ত্তির উপায়ে পরিণত করিতে পারা যায়, তবে তাহাকেই কৰ্মের কৌশল বা চাতুর্য বলা যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমরা এরূপ বুদ্ধিতে প্রস্তুত নহি। আমরা বুদ্ধি, যিনি কৰ্মে কুশলী, অর্থাৎ আপনার অনুষ্ঠেয় কৰ্মসকল যথাবিহিত নিব্বাহ করেন, তিনিই যোগী। কৰ্মে তাদৃশ কৌশল বা বিহিত অনুষ্ঠানই যোগ। “যোগঃ কৰ্মসু কৌশলম্।” এ কথার এই অর্থই সহজ এবং সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। যেখানে সহজ অর্থ আছে, সেখানে ভাষ্যকার মহামহোপাধ্যায়দিগকে দূর হইতে প্রণাম করিয়া, আমরা সেই সহজ অর্থেরই অনুবর্তী হইব।

কৰ্মজং বুদ্ধিযুক্তো হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।

জন্মবন্ধাবিনিস্কৃতোঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ৫১ ॥

বুদ্ধিযুক্ত জ্ঞানিগণ কৰ্মজনিত ফল ত্যাগ করিয়া, জন্মবন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া অনাময় পদ প্রাপ্ত হইবেন। ৫১।

“বুদ্ধিযুক্ত”—বুদ্ধিযোগাবলম্বী।

অনাময় পদ—সর্বোপদ্রবশূন্য স্ফুপদ। (শ্রীধর)

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধিবর্জিততরিস্যতি।

তদা গন্তাসি নিব্বৈদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥ ৫২ ॥

যবে তোমার বুদ্ধি মোহকানন অতিক্রম করিবে, তবে তুমি শ্রোতব্য এবং শ্রুত বিষয় সকলে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবে। ৫২।

বাংকম রচনাবলী

এই ফলকামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক অনাময় পদ কিসে পাওয়া যায়? যখন মোহ বা দেহাভিমান হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তখন সমস্ত শ্রুত বা শ্রোতব্য বিষয়ে বৈরাগ্য বা কামনা-শূন্যতা জন্মে। স্বর্গাদি সুখ বা রাজ্যাদি সম্পদ, কোন বিষয়েরই কথা শুনিয়া মন্থ হইতে হয় না।

শ্রুতিবিপ্রতিপন্নো তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।

সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩ ॥

তোমার “শ্রুতিবিপ্রতিপন্নো” বুদ্ধি যখন সমাধিতে নিশ্চলা, (সুতরাং) অচলা হইয়া থাকিবে, তখন যোগ প্রাপ্ত হইবে। ৫৩।

“শ্রুতিবিপ্রতিপন্নো”। বিপ্রতিপন্ন অর্থে বিক্ষিপ্ত।* কিন্তু শ্রুতি কি? শ্রুতি, যাহা শূন্য গিয়াছে—আর শ্রুতি, বেদকে বলে। বেদ বুদ্ধিবিক্ষেপের কারণ হইতে পারে, ইহা প্রাচীন ভাষ্যকারেরা স্বীকার করিতে পারেন না; সুতরাং এখানে শ্রুতি শব্দে “যাহা শূন্য গিয়াছে,” তাঁহারা এইরূপ অর্থ করেন। রামানুজের মত সোজা—শ্রুতি, শ্রবণ মাত্র। মধুসূদন আর একটু বেশী বলেন, “নানাবিধ ফলশ্রবণই” শ্রুতি। শঙ্করাচার্য্য তাই বলেন, তবে তাঁহার মাজ্জিত লেখনীর শব্দের ছটাটা বেশীর ভাগ। তিনি বলেন, “শ্রুতিবিপ্রতিপন্নো অনেকসাধ্যসাধনসম্বন্ধ-প্রকাশনশ্রুতিভিঃ শ্রবণৈর্ষ্বপ্রতিপন্নো।” শ্রীধর স্বামী সকলের অপেক্ষা একটু সাহস করিয়াছেন—তিনি বলেন, “নানালৌকিকবৈদিকার্থশ্রবণৈর্ষ্বপ্রতিপন্নো।”

ইংরেজ গীতার কিছই বুঝে না—বুঝিবার সম্ভাবনাও নাই। কিন্তু অনেক সময়ে পণ্ডিত, মূর্খের কথাও শুনায় ক্ষতি বোধ করে না। Davis সাহেব এই সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

সাহেব প্রথমে একটু আপনার বড়াই করিতেছেন—

“I, too, have consulted Hindu Commentators largely (কদাচিৎ) and have found them deficient in critical insight and more intent on finding or forming Vedantist doctrines in every part than in giving the true sense of the author. (শাঙ্কর ভাষ্য সম্বন্ধে অনেক দেশী লোকেও এ কথা বলিয়া থাকেন)। I have examined their explanations with the freedom of inquiry that is common to western habits of thought, and thus while I have sometimes followed their guidance, I have been obliged to reject their comments as misrepresenting the doctrine of the author. I append some instances of this kind, that my readers may be able to form their own judgement.”

এই বলিয়া সাহেব, দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই শ্লোককেই উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি শ্রুতি শব্দে ‘বেদ’ এই অর্থ করেন। এবং উপরিলিখিত উক্তি পোষকতায় বলেন যে—

“Here the reference is to *Sruti* which means (1) hearing, (2) revelation. Hindu commentators say that the meaning is, what you have heard, about the means of obtaining desirable things; assuming as a certain proposition that the Vedas could not be attacked. The doctrine of the Bhagavadgita is, however, that the devotee (*yogin*), when fixed in meditation lays aside the Vedas and Vedic ritual.”

ডেবিস এক জন ক্ষুদ্র প্রাণী—তাঁহার উক্তি উদ্ধৃত করিয়া কাগজ নষ্ট করিবার প্রয়োজন ছিল না। তবে এই মতটা ইউরোপের এক জন পণ্ডিতশ্রেষ্ঠের—খোদ লাসেনের। তিনিও “শ্রুতিবিপ্রতিপন্নো” পদের ঐরূপ অনুবাদ করিয়াছেন। আর আর ক্ষুদ্র অনুবাদকেরা তাঁহার পথে গিয়াছেন। তন্মিত্ত ডেবিসের আত্মশ্লাঘার ভিতর একটি অমূল্য কথা আছে—সেই অমূল্য তত্ত্ব ভারতবর্ষে ইদানীং ছিল না ও এখনও নাই। “FREEDOM OF ENQUIRY”—এই অমূল্য বাক্যের অনুরোধেই আমরা তাঁহার ন্যায় লেখকের আত্মশ্লাঘা উদ্ধৃত করিতে কুণ্ঠিত হইলাম না।

* *Anglice*—distracted.

বেদ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের যে রূপ মত আমরা বুঝিয়াছি বা বুঝাইয়াছি, তাহার সঙ্গে দেশী মতের অপেক্ষা বিলাতী মতটা বেশী সঙ্গত। তবে পাঠক ইচ্ছা করিলে শ্রীধর স্বামীকে এখানে বিলাতী দলে টানিয়া লইতে পারেন।

এই শ্লোকে “শ্রুতিবিপ্রতিপত্তা” ভিন্ন আর একটি মাত্র পদ বুঝাইবার প্রয়োজন। যাহাতে চিত্ত সমাহিত হয়, তাহাই “সমাধি”।

এক্ষণে অনুবাদ পাঠ করিলে, পাঠক বোধ হয় শ্লোকার্থ বুঝিতে পারিবেন।

অর্জুন উবাচ।

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।

স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥ ৫৪ ॥

অর্জুন বলিলেন,—

হে কেশব! যিনি সমাধিস্থ হইয়া স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়াছেন, তাহার কি লক্ষণ? স্থিতধী ব্যক্তি কি বলেন, কিরূপে অবস্থান করেন, কিরূপ চলেন?। ৫৪।

ইতিপূর্বে সাংখ্যযোগ করিয়া, ভগবান্ এক্ষণে অর্জুনকে কর্মযোগ বুঝাইলেন। কর্ম-যোগের শেষ কথা এই বলিয়াছেন যে, কর্মফল সম্বন্ধে যাহা (বেদেই হউক, অন্যত্রই হউক) শুনিয়াছ, তাহাতে তোমার বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। যত দিন সেরূপ থাকিবে, তত দিন তুমি কর্মযোগ প্রাপ্ত হইবে না। কিন্তু যখন তোমার বুদ্ধি সমাধিতে (পরমেশ্বরে) স্থির হইবে, তখন তুমি যোগ প্রাপ্ত হইবে। যাহার এইরূপ বুদ্ধি স্থির হইয়াছে, তাহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বা স্থিতধী বলা যায়। অর্জুন এক্ষণে সেই সমাধিস্থিত স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রজহতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।

আত্মন্যোবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫ ॥

যখন সকল প্রকার মনোগত কামনা বর্জিত হয়, আপনাতে বা (আত্মাতে) আপনি তুষ্ট থাকে, তখন স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়। ৫৫।

কামনার পূরণেই মানুষের সুখ দেখিতে পাই। যে কামনা ত্যাগ করিল, তাহার আর কি সুখ রহিল? শঙ্করাচার্য্য বলেন, পরমার্থদর্শনলাভে অন্য আনন্দ নিষ্প্রয়োজন। বেদে তাদৃশ ব্যক্তিকে “আত্মারাম” বলা হইয়াছে।

আমরা আর একটা সোজা উত্তরে সন্তুষ্ট। আমরা স্বীকার করি, পরমেশ্বরই আনন্দ। তিনিই পরমানন্দ। কিন্তু বহির্জগৎও ঈশ্বর হইতে বিযুক্ত নহে। কামনাশূন্য হইলে বহির্বিষয়ে আনন্দ উপভোগ করা যাইবে না কেন? যে কামনাশূন্য, সে কি জগতের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হয় না? না, জ্ঞানার্জনে আনন্দ লাভ করে না? না সৎকর্ম-সম্পাদনে প্রফুল্ল হয় না? কর্মের অনুষ্ঠানই আনন্দময়—তাহার উপর সিদ্ধি ও অসিদ্ধি তুল্যজ্ঞান থাকিলে, সে আনন্দের আর কখন লাঘব হয় না; এবং এইরূপ আনন্দ আত্মাতেই; কাহারও সাপেক্ষ নহে।

যিনি এই কথাটা তলাইয়া না বুঝিবেন, তিনি গীতার এই সকল উক্তি, এই শ্লোক, এবং ইহার পরবর্তী কয়টি শ্লোক Ascetic Philosophy বলিয়া গণ্য করিবেন। বস্তুতঃ ইহা Asceticism নহে। সংসারে যে কিছু সুখ আছে, তাহার নিষিদ্ধা উপভোগের এই তত্ত্বই উপযোগী। সংসারে উপভোগ্য যে কিছু সুখ আছে, তাহার উপভোগের বিষয় কামনা ও ইন্দ্রিয়াদির প্রাবল্য। তাহা বশবর্তী হইলে সাংসারিক সুখসকলের উপভোগের আর কোন বিষয় থাকে না, সংসার পবিত্র ও সুখময় কর্মক্ষেত্রে পরিণত হয়। এই তত্ত্ব পরিষ্ফুট করিবার জন্য মৎপ্রণীত অনুশীলনতত্ত্বে (ধর্মতত্ত্ব, প্রথম ভাগ) আমি বিশেষ যত্ন পাইয়াছি, সুতরাং পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। পরবর্তী শ্লোক সকলে ইহা বিশেষ প্রকারে পরিষ্ফুট হইবে।

দুঃখেষ্বনুদ্বিগমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।

বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীন্মূনিরুচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

দুঃখে যিনি অনুদ্বিগমনা, সুখে যিনি স্পৃহাশূন্য, যাহার অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ আর নাই, তাহাকে স্থিতধী মূনি বলা যায়। ৫৬।

বিশ্বকম রচনাবলী

এ সকল Asceticism নহে, এই তত্ত্ব দঃখনাশক, (সুতরাং) সুখবৃদ্ধির উপায়। দঃখে যে কাতর হয়, সেই দঃখী। দঃখে যাহার মন উদ্ভিন্ন হয় না, সে দঃখজয়ী হইয়াছে, তাহার আর দঃখ নাই। সুখে যাহার স্পৃহা, সে বড় দঃখী; কেন না, সুখের স্পৃহা অনেক সময়েই ফলবতী হয় না, ফলবতী হইলেও আশানুরূপ ফল ফলে না; এই উভয় অবস্থাতেই সেই সুখস্পৃহা দঃখে পরিণত হয়। অতএব সুখস্পৃহা কেবল দঃখবৃদ্ধির কারণ। ভয়, ক্রোধ দঃখের কারণ, ইহা বলা বাহুল্য। অনুরাগ অর্থে এখানে সকল প্রকার অনুরাগ বুঝা উচিত নহে। যথা ঈশ্বরানুরাগ—ইহা কখন নিষিদ্ধ হইতে পারে না। অনুরাগ অর্থে এখানে কেবল কাম্য বস্তুতে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ভোগ্যাদি বস্তুতে অনুরাগই বৃদ্ধিতে হইবে। তাদৃশ বিষয় সকলে অনুরাগ যে দঃখের কারণ, তাহা আবার বলিতে হইবে না।

বলিতে কেবল বাকি আছে যে, সুখস্পৃহা ত্যাগ করিলেই সুখ ত্যাগ করা হইল না। এবং সুখস্পৃহাত্যাগ ভিন্ন, সুখভোগত্যাগ এখানে বিহিত হইতেছে না। যে সুখে স্পৃহাশূন্য, সে সর্বপ্রকার সুখভোগ করিতে পারে, এবং করিয়াও থাকে। স্বয়ং জগদীশ্বর সর্বপ্রকার স্পৃহাশূন্য, অথচ অনন্ত সুখে সুখী। তবে মনুষ্য সম্বন্ধে এই আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে যে, মনুষ্য সুখে স্পৃহাশূন্য হইলে, সুখলাভের চেষ্টা করিবে না, সুখলাভের চেষ্টা না করিলে, মনুষ্য সুখলাভ করে না। যিনি কর্মযোগ বৃদ্ধি করিয়াছেন, তিনি কখন এই আপত্তি করিবেন না। কর্মযোগের মর্ম এই যে, নিষ্কাম হইয়া কর্ম করিবে। কর্মের ফলই সুখ—যে অনুষ্টেয় কর্ম সুনির্বাহ করে, সে তজ্জনিত সুখলাভও করে। যে কামনা বা স্পৃহা অধীন হইয়া কর্ম করে, সে সুখ লাভ করে না—কামনা ও স্পৃহা অনুষ্টেয় কর্মের, সুতরাং পাপের ও দঃখের কারণ হইয়া থাকে। অতএব নিষ্কাম ও সুখে স্পৃহাশূন্য হইয়া কর্ম করিবে—সুখ আপনি আসিবে। ৭০ শ্লোকে ভগবান্ স্বয়ং তাহাই বলিয়াছেন, পরে দেখিব।

যঃ সর্বগ্রন্থভিন্নেহস্তত্ত্বং প্রাপ্য শুভাশুভম্।

নাভিনন্দতি ন দ্বৈষ্ট তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭ ॥

যিনি সর্বগ্রন্থেহস্তত্ত্বং, তত্ত্ববিষয়ে শুভপ্রাপ্তিতে আনন্দিত বা অশুভপ্রাপ্তিতে বিদ্বেষয়ুক্ত হন না, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। ৫৭।

“সর্বগ্রন্থেহস্তত্ত্বং।”—শ্রীধর বলেন, সর্বগ্রন্থ কি না “পুত্রমিত্রাদিষ্বপি।” শঙ্কর বলেন, “দেহজীবিতাদিষ্বপি।” শঙ্করের ব্যাখ্যাই প্রকৃত বলিয়া বোধ হয়। দেহ জীবনাদির শুভাশুভে যাহার কোন আনন্দ বা বিদ্বেষ নাই, তাহারই বুদ্ধি যে ঈশ্বরে স্থির হইবার সম্ভাবনা, তাহা বুঝাইতে হইবে না।

যদা সংহরতে চায়ং কৃষ্ণ্মাহঙ্গানীং সর্বশঃ।

ইন্দ্রিয়গীন্দ্রিয়ার্থেভ্যন্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮ ॥

কৃষ্ণ যেমন সকল বস্তু হইতে আপনার অঙ্গসকল সংহরণ করিয়া লয়, তেমনি যিনি ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়সকল সংহরণ করেন, তাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত। ৫৮।

এই কথার উপর কোন টীকা চাহি না। ইন্দ্রিয়সংযম ভিন্ন কোন প্রকার ধর্ম্মাচরণ নাই, ইহা সকল ধর্ম্মগ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠা, সকল ধর্ম্মান্দিরের প্রথম সোপান।* সর্বশাস্ত্রেই আগে ইন্দ্রিয়সংযমের কথা। কেবল এই কৃষ্ণের উপমার প্রতি একটু মনোযোগ আবশ্যিক। কৃষ্ণ তাহার হস্তপদাদি সংহৃত করিয়া রাখে—ধ্বংস করে না, এবং আবশ্যিকমত তদ্বারা জৈবনিক কার্য্য নির্ব্বাহ করে। ইন্দ্রিয়াদি সম্বন্ধেও তাই। ইহার সংযমই ধর্ম্ম, ধ্বংস ধর্ম্ম নহে। ধর্ম্মতত্ত্বে এ কথা বুঝাইয়াছি।

* All ethical gymnastic consists therefore singly in subjugating the instincts and appetites of our physical system in order that we remain their masters in any and all circumstances hazardous to morality; a gymnastic exercise rendering the will hardy and robust and which by the consciousness of regained freedom makes the heart glad. Kant: *Metaphysics of Ethics*—translated by Semple.

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।

রসবর্জ্জং রসোহপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥ ৫৯ ॥

নিরাহার দেহীর (ইন্দ্রিয়াদির) বিষয় বিনিবর্ত্ত হয়, কিন্তু তৎপ্রতি অনুরাগ যায় না। (কেবল) ব্রহ্মসাক্ষাৎকারেই তাহা নিবর্ত্ত হইয়া থাকে। ৫৯।

“নিরাহার”—যে ইন্দ্রিয়াদির বিষয়োপভোগে বিরত।

মনের একটি অতি ভয়ঙ্কর অবস্থা আছে, দূর্ভাগ্যবশতঃ জগতে তাহা সর্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। উপভোগ যায়, কিন্তু বাসনা যায় না। প্রাচীন ভাষ্যকারেরা আতুরাদির উদাহরণ দিয়াছেন। যে জড় বা আতুর, তাহার উপভোগ্যের সাধ্য নাই, সুতরাং উপভোগ নাই। কিন্তু ভোগের বাসনার অভাব নাই। দূর্ভাগ্যক্রমে ইহার অপেক্ষা শোচনীয় উদাহরণ আমরা প্রত্যহ দেখিতে পাই। লোকনিন্দাভয়ে বা পবিত্র চরিত্রের ভান করিয়া বা সন্ন্যাসাদি ধর্ম গ্রহণ করিয়া, অনেকে উপভোগ ত্যাগ করেন, কিন্তু বাসনা ত্যাগ করিতে পারেন না। তার পর এক দিন বালির বাঁধ ভাঙ্গিয়া পাপের স্রোতে সব ভাসিয়া যায়। ঈদৃশ ব্যক্তির সঙ্গে উপভোগরত ব্যক্তির প্রভেদ বড় অল্প। এইরূপ মানসিক অবস্থা বড় দুর্জয়। কিন্তু ঈশ্বরে অনুরাগ জন্মিলে ইহা দূরীকৃত হয়। “পরং দৃষ্ট্বা” এই কথাই এমন তাৎপর্য্য নহে যে, ঈশ্বরকে চক্ষু দেখিবে।

ধর্মের এই বিষয় এমন গুরুতর যে, ভগবান্ পরবর্ত্তী কয় শ্লোকে ইহা আরও পরিষ্ফুট করিতেছেন।

যততো হ্যপি কোন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।

ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০ ॥

তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।

বশে হি যস্যোন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১ ॥

হে কোন্তেয়! বিবেকী পুরুষ প্রযত্ন করিলেও প্রমথনকারী ইন্দ্রিয়গণ বলপূর্ব্বক চিত্ত হরণ করে। ৬০।

সেই সকল ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া, যোগযুক্ত হইয়া, মৎপর হইয়া যিনি অবস্থান করেন, যাহার ইন্দ্রিয়সকল বশীভূত হইয়াছে, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। ৬১।

এই গেল ইন্দ্রিয়গণের স্বাভাবিক বলের কথা। যিনি বিবেকী, তিনিও যত্ন করিয়াও ইহাদিগকে সহজে দমন করিতে পারেন না, বলপূর্ব্বক ইহারা চিত্তকে হরণ করে। আর যাহারা যত্ন করে না, যাহারা বাহিরে উপভোগ করে না, কিন্তু মনে কেবল সেই ইন্দ্রিয়বিষয়েরই ধ্যান করে, তাহাদের সর্বনাশ ঘটে। সেই কথা পরবর্ত্তী দুই শ্লোকে বলা হইতেছে।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষু পজায়তে।

সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে ॥ ৬২ ॥

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।

স্মৃতিভ্রংশাদ্ভুন্ধিনাশো ব্ৰুন্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩ ॥

(ইন্দ্রিয়ের) বিষয় ধ্যান করিতে করিতে তাহাতে আসক্তি জন্মে। আসক্তি হইতে কামনা জন্মে, কামনা হইতে ক্রোধ জন্মে। ৬২।

ক্রোধ হইতে সম্মোহ হয়, সম্মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ হইতে ব্ৰুন্ধিনাশ, ব্ৰুন্ধিনাশ হইতে বিনাশ ঘটে। ৬৩।

যাহাকে মনে পুনঃ পুনঃ স্থান দিবে, তাহারই প্রতি আসক্তি জন্মিবে। আসক্তি জন্মিলে তাহা পাইতে ইচ্ছা করে, অর্থাৎ কামনা জন্মে। না পাইলেই, প্রতিরোধক বিষয়ের প্রতি ক্রোধের উৎপত্তি হয়। ক্রোধে কৰ্ত্তব্যাকৰ্ত্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞানশূন্যতা বা মূঢ়তা জন্মে। এরূপ মোহ হইতে কার্য্য-কারণ-পরস্পর-সম্বন্ধ বিস্মৃত হইতে হয়। কার্য্যকারণসম্বন্ধ ভুলিলেই ব্ৰুন্ধিনাশ হইল। ব্ৰুন্ধিনাশে বিনাশ।*

* সীতারামের চরিত্রে বর্ত্তমান লেখক এই কথাগুলি উদাহরণের দ্বারা পরিষ্ফুট করিতে যত্ন করিয়াছেন।

বিশ্বকম রচনাবলী

ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিতে হইবে, এবং ইন্দ্রিয়াদির বিষয়কে মনেও স্থান দেওয়া হইবে না। তবে কি ইন্দ্রিয়াদির উপভোগ একেবারে নিষিদ্ধ? যদি তাহা হয়, তবে এই গীতোক্ত ধর্ম asceticism* না ত কি? তাহা হইলে জনসমাজকে সন্ন্যাসীর মঠে পরিণত করিতে হয়।

তাহা নহে, ইন্দ্রিয়ের উপভোগ নিষিদ্ধ নহে, তাহার বিশেষ বিধি পরশ্লোকে দেওয়া হইতেছে।

রাগদ্বেষ্টবিমুক্তৈশ্চ বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্ ।

আত্মবৈশ্যাবিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪ ॥

যিনি বিধেয়াত্মা, তিনি অনুরাগ ও বিদ্বেষ হইতে বিমুক্ত এবং আপনার বশ্য ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা বিষয়ের উপভোগ করিয়া প্রসাদ লাভ করেন। ৬৪।

বিধেয়াত্মা—যাঁহার আত্মা বা অন্তঃকরণ বশবত্তী।

ঈদৃশ ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সকল নিজের আঞ্জাধীন—বলের দ্বারা তাঁহার চিত্ত হরণ করিতে পারে না। তাঁহার ইন্দ্রিয়সকল ভোগ্য বিষয়ের প্রতি অনুরাগ ও বিদ্বেষ হইতে বিমুক্ত—ইন্দ্রিয়সকল তাঁহার বশ, তিনি ইন্দ্রিয়ের বশ নহেন। ঈদৃশ ব্যক্তি ইন্দ্রিয়াদি বিষয়ের উপভোগ করিয়া প্রসাদ বা শান্তি লাভ করেন। অর্থাৎ তাঁহার কৃত উপভোগ দুঃখের কারণ নহে, সুখের কারণ। তাই বলিতেছিলাম যে, গীতোক্ত এই ধর্ম Ascetic Philosophy নহে—প্রকৃত পুণ্যময় ও সুখময় ধর্ম। বিষয়ের উপভোগ হইতে নিষিদ্ধ হইতেছে না, তবে ইহার পরিমাণ ও উপযুক্ত বিধি কথিত হইয়াছে।

একটা কথা বুঝাইতে বাকি আছে। বিধেয়াত্মা পুরুষের ইন্দ্রিয়সকলকে “রাগদ্বেষ্ট বিমুক্ত”—অনুরাগ ও বিদ্বেষশূন্য বলা হইয়াছে। বিধেয়াত্মা পুরুষের ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়ে অনুরাগ-শূন্য কেন হইবে, তাহা বুঝান নিম্নপ্রয়োজন। কিন্তু বিদ্বেষশূন্য বলিবার কারণ কি? ভোগবিষয়ে অনুরাগই ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক ধর্ম, বিদ্বেষ অস্বাভাবিক, কখন দেখান যায় না। যাহার সম্ভাবনা নাই, তাহার নিষেধের কারণ কি? আর যদি উপভোগ্য বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের বিদ্বেষ ঘটে, সে ত ভালই—তাহা হইলে আর ইন্দ্রিয়সুখে প্রবৃত্তি থাকিবে না। তবে এ নিষেধ কেন?

উপভোগ্যে যে বিদ্বেষ ঘটে না, এমন নহে। রোগীর আহারে অরুচি এবং অলসের ব্যায়ামসুখে অরুচি, উদাহরণ-স্বরূপ নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে। এ সকল শারীরিক স্বাস্থ্যেরও লক্ষণ নহে, মানসিক স্বাস্থ্যেরও লক্ষণ নহে। অনেককে দেখিতে পাই, কিছুতেই পাড়ওয়লা ধূতি পরিবেন না, চাঁট জুতা নহিলে পায়ের দিবেন না। ইহাদিগের চিত্ত আজিও বিকারশূন্য হয় নাই, যে ফিন্ ফিনে কালাপেড়ে ধূতি নহিলে পরিবে না, তাহাদিগের চিত্ত যেমন এখনও বিকৃত, ইহাদিগের তেমনি। যখন সকলই সমান জ্ঞান হইবে, তখন ইহারা আর এরূপ আপত্তি করিবে না।

এই সকল ক্ষুদ্র উদাহরণে কথাটা যত ক্ষুদ্র বোধ হইতেছে, বস্তুতঃ কথাটা ততটা ছোট কথা নহে। একটা বড় উদাহরণ দ্বারা ইহার গৌরব প্রতিপন্ন করিতেছি। রোমান কাথলিক ধর্মোপদেষ্টাদিগের ইন্দ্রিয়বিশেষের তৃপ্তির প্রতি বিদ্বেষ—কার্যতঃ না হউক, বিধিতঃ বটে। এই জন্য তাঁহাদের মধ্যে চিরকোমার বিহিত ছিল। ইহার ফলে কিরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল, তাহা ইতিহাসপাঠক মাত্রই জানেন। কিন্তু আর্ঘ্য ঋষিরা যথার্থ স্থিতপ্রজ্ঞ—কোন ইন্দ্রিয়ের প্রতি তাঁহাদের অনুরাগও নাই, বিদ্বেষও নাই। অতএব তাঁহারা ব্রহ্মচার্য সমাপন করিয়া, যথাকালে দারপরিগ্রহ করিতেন। কিন্তু তাঁহারা যেমন বিদ্বেষশূন্য, ইন্দ্রিয়ের প্রতি তেমনি অনুরাগশূন্য, অতএব কেবল ধর্মতঃ সম্ভানোৎপাদন জন্যই বিবাহ করিতেন, এবং সেই জন্যই স্বভাব-নির্দিষ্ট সাময়িক নিয়মের আতিরিক্ত কখন ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতেন না।

Asceticism দূরে থাকুক, যাহাকে Puritanism বলে, এই গীতোক্ত ধর্ম তাহারও বিরোধী। কেন না, Puritanism এই “বিদ্বেষ”-বুদ্ধিজাত। গীতোক্ত ধর্ম কোনরূপ ভণ্ডামি চলিবার পথ নাই।

* আমরা যাহাকে বৈরাগ্য বা সংন্যাস বলি, Asceticism তাহা হইতে একটু স্বতন্ত্র জিনিস। এই জন্য ইংরেজি কথাটাই আমি উপরে ব্যবহার করিয়াছি।

† “Makes the heart glad,”—পূর্বেদিত কাস্তুর উক্তি দেখ।

প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে ।

প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পৰ্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫ ॥

প্রসাদে তাঁহার সকল দুঃখের বিনাশ জন্মে। যিনি প্রসন্নচিত্ত, আশু তাঁহার বুদ্ধি স্থিত হয়। ৬৫ ।

পূর্বে শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, আত্মবশ্য ও রাগদ্বेषবিমুক্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ের উপভোগে প্রসাদ লাভ হয়। প্রসাদ অর্থে প্রসন্ন চিত্ত বা শান্তি। এক্ষণে কথিত হইতেছে, সেই প্রসাদে সর্বদুঃখ নষ্ট হয়, এবং সেই প্রসন্নচেতার স্থিতপ্রজ্ঞতা জন্মে।

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা ।

ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥ ৬৬ ॥

অযুক্তের বুদ্ধি নাই। অযুক্তের ভাবনা নাই। যাহার ভাবনা নাই, তাহার শান্তি নাই; যাহার শান্তি নাই, তাহার সুখ নাই। ৬৬ ।

অযুক্ত অসমাহিতান্তঃকরণ (যোগশূন্য)। ভাবনা ধ্যান, চিন্তা। যাহার অন্তঃকরণ অসমাহিত, ইন্দ্রিয়সকল বশীকৃত হয় নাই, তাহার শাস্ত্রাদির আলোচনাতেও বুদ্ধি জন্মে না। যাহার বুদ্ধি নাই, সে চিন্তা করিতে পারে না। (ভাষ্যকারেরা বলেন, আত্মজ্ঞানার্ভিনিবেশ নাই) যাহার চিন্তার শক্তি নাই, তাহার শান্তি নাই; শান্তি না থাকিলে সুখ নাই।

ইন্দ্রিয়পর ব্যক্তির যে বুদ্ধি নাই, ইহা বুদ্ধি শব্দের সাধারণ অর্থে সত্য নহে। অনেক ইন্দ্রিয়পর ব্যক্তি বুদ্ধিমান্ বলিয়া জগতে পরিচিত হইয়াছেন। তবে সে বুদ্ধিতে তাঁহাদিগকে কখন সুখী করে না। যে বুদ্ধিতে সুখী করে না, সে বুদ্ধি বুদ্ধিই নহে।

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোহনুবিধীয়তে ।

তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাস্তিসি ॥ ৬৭ ॥

যাহার মন বিষয়ে প্রবর্তমান ইন্দ্রিয়গণের অনুবর্তন করে, যেমন বায়ু নৌকাকে জলে মগ্ন করে, সেইরূপ (ইন্দ্রিয়) তাহার প্রজ্ঞা হরণ করে। ৬৭ ।

টীকার প্রয়োজন নাই।

তস্মাদ্যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ ।

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮ ॥

অতএব হে মহাবাহো! যাহার ইন্দ্রিয়সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে সর্বপ্রকারে বিমুক্ত হইয়াছে, সেই স্থিতপ্রজ্ঞ। ৬৮ ।

টীকার প্রয়োজন নাই।

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্য জাগর্তি সংযমী ।

যস্য জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মূনেঃ ॥ ৬৯ ॥

যাহা সর্বভূতের রাত্রি, সংযমী তখন জাগ্রত। সর্বভূত যখন জাগে, দৃষ্টিযুক্ত মূনির তাহাই রাত্রি। ৬৯ ।

মহাভারতকারের অনুবাদই এই শ্লোকের প্রচুর টীকা। “অজ্ঞানার্ভিমিরাবৃতমতি ব্যক্তিদিগের নিশাস্বরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠাতে জিতেন্দ্রিয় যোগিগণ জাগ্রত থাকেন। এবং প্রাণিগণ যে বিষয়নিষ্ঠা-স্বরূপ দিবায় প্রবোধিত থাকে, আত্মতত্ত্বদর্শী যোগীদিগের সেই রাত্রি।”

আপূর্ষ্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং

সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ ।

তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব

স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০ ॥

যেমন পূর্ষ্যমাণ স্থিরপ্রতিষ্ঠ সমুদ্রে নদীসকল প্রবেশ করে, সেইরূপ ভোগসকল যাহাতে প্রবেশ করে, তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হইবেন; যিনি ভোগসকলের কামনা করেন, তিনি পান না। ৭০ ।

সমুদ্র, জলের অন্বেষণে বেড়ায় না; নদীসকল আপনা হইতে জল লইয়া সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া তাহাকে পরিপূর্ণ রাখে। তেমনি যিনি ইন্দ্রিয়সকল বশ করিয়াছেন, ভোগ সকল আপনা হইতেই তাঁহাকে আশ্রয় করে; সেই কারণে তিনিই শান্তি লাভ করেন। যিনি ইন্দ্রিয়-তাড়িত, সুতরাং কামনাপরবশ, তিনি সে শান্তি কদাচ লাভ করিতে পারেন না। এখন ৫৬

বিশ্বকম রচনাবলী

শ্লোকের টীকায় যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ কর। কামনা পরিত্যাগই কর্মফলজনিত সুখ-লাভের কারণ। কর্মফলজনিত সুখ আসিয়া তাঁহাকে আপনি আশ্রয় করে। তাদৃশ সুখই শান্তিদায়ক। কামনার্জনিত সুখে শান্তি নাই; সুতরাং সে সুখ সুখই নয়।

বিহায় কামান্ যঃ সৰ্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিম্পহঃ।

নিম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তির্মধিগচ্ছতি ॥৭১॥

যিনি সর্বকামনা ত্যাগ করিয়া নিম্পহ হইয়া বিচরণ করেন, যিনি মমতাশূন্য এবং নিরহঙ্কার, তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হইবেন। ৭১।

মমতাশূন্য—আত্মাভিমানশূন্য।

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।

স্থিত্বাহস্যামন্তকালেহপি ব্রহ্মনির্বাণম্চ্ছতি ॥ ৭২ ॥

হে পার্থ! ইহাই ব্রহ্মনিষ্ঠা। ইহা প্রাপ্ত হইলে আর মুগ্ধ হইতে হয় না। কেবল অন্তকালেও ইহাতে স্থিত হইলেও ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৭২।

তবে ব্রহ্মনিষ্ঠা, অতি অল্প কথার ভিতর আসিল। ইন্দ্রিয়সংযম এবং কামনাপরিত্যাগই ব্রহ্মনিষ্ঠা। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ঈশ্বরে সমাহিতচিত্তের ইহা লক্ষণ মাত্র—ভগবদারাধনা ভিন্ন কামনাত্যাগ ঘটে না। অতএব সংযতেন্দ্রিয় ও নিষ্কাম হইয়া যে ঈশ্বরে চিত্তার্পণ, তাহাই প্রকৃত ব্রহ্মনিষ্ঠা। ইন্দ্রিয়সংযম এবং ঈশ্বরে চিত্তার্পণপূর্বক নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান, ইহাই যথেষ্ট ব্রহ্মনিষ্ঠা।

ইহা হইলেই ধর্ম সম্পূর্ণ হইল। ইহাই হিন্দুধর্মের সারভাগ। গীতায় আর যাহা কিছু আছে, তাহা এই কথার সম্প্রসারণ মাত্র—অধিকারভেদে পদ্ধতিনির্বাচন মাত্র। হিন্দুধর্ম বা অপর কোন ধর্ম ইহা ছাড়া যাহা কিছু আছে, তাহা ধর্মের প্রয়োজনীয় অংশ নহে। তাহা হয় উপন্যাস, নয় উপধর্ম, নয় সামাজিক নীতি, নয় বাজে কথা—ত্যাগ করিলেই ভাল। ইহা সকলের আয়ত্ত, ইহার জন্য বেদাধ্যয়নের আবশ্যিক নাই, সন্ধ্যাগায়ত্রীর আবশ্যিক নাই। স্ত্রীলোক বা পতিত ব্যক্তি, শূদ্র বা ম্লেচ্ছ, মুসলমান বা খ্রীষ্টীয়ান, সকলেরই ইহা আয়ত্ত। ইহাই জগতে একমাত্র ধর্ম—ইহাই একমাত্র Catholic religion.

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু পনিষৎসু ব্রহ্ম-

বিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-

সংবাদে সাংখ্যযোগো নাম

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ।

তৃতীয় অধ্যায়

অর্জুন উবাচ

জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মতা বুদ্ধিজ্ঞানদর্শন।

তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥১॥

হে জনাশ্রয়! যদি তোমার মতে কর্ম হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, তবে হে কেশব! আমাকে হিংসাত্মক কর্ম কেন নিষ্কৃত করিতেছ?। ১।

বুদ্ধি অর্থে এখানে আবার জ্ঞান বুদ্ধিতে হইতেছে। ভগবান্ অর্জুনকে যুদ্ধ করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু দ্বিতীয়াধ্যায়ের শেষ কয়েক শ্লোকে, অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণে অর্জুন এইরূপ বুদ্ধিয়াছেন যে, জ্ঞান কর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ। তাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, যদি জ্ঞানই কর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ, তবে আমাকে কর্ম, বিশেষ যুদ্ধের ন্যায় নিষ্কৃত কর্ম কেন নিষ্কৃত করিতেছ?

অর্জুনের এইরূপ সংশয় কিরূপে উপস্থিত হইল, শ্রীধর তাহা এইরূপে বুঝাইয়াছেন, “অশোচ্যান্বশোচস্বম্” (দ্বিতীয়াধ্যায়ের ১১শ শ্লোক দেখ) ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা প্রথমে মোক্ষ-সাধনজন্য দেহাত্মবিবেকবুদ্ধির কথা বলিয়া, তাহার পর “এষা তেহভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধিঃ”

ইত্যাদি বাক্যে (দ্বিতীয়াধ্যায়ের ৩৯শ শ্লোক দেখ) কৰ্ম্মও কথিত হইয়াছে। কিন্তু এতদুভয় মধ্যে গুণপ্রধান ভাব স্পষ্টতঃ দেখান হয় নাই। তথা বুদ্ধিবৃত্ত স্থিতপ্রজ্ঞের নিষ্ক্রিয়ত্ব, নিয়তেন্দ্রিয়ত্ব, নিরহঙ্কারত্ব ইত্যাদি লক্ষণের গুণবাদে “এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ” (৭২ শ্লোক দেখ) সপ্রশংসা উপসংহারে, বুদ্ধি ও কৰ্ম্ম, এতন্মধ্যে বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্বই ভগবানের অভিপ্রায় বুদ্ধিয়াই অর্জুন এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

বস্তুতঃ দ্বিতীয়াধ্যায়ে স্পষ্টতঃ কোথাও বলেন নাই যে, কৰ্ম্ম হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ। তবে ৪৯ শ্লোকে কিছুর গোলযোগ ঘটিয়াছে বটে।

“দুরেণ হ্যবরং কৰ্ম্ম বুদ্ধিবোগাদ্ধনঞ্জয়।”

এখানে ভাষ্যকারেরা যে বুদ্ধি অর্থে ব্যবসায়িত্বিকা কৰ্ম্মযোগ বুঝাইয়াছেন, তাহাও উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে বুঝাইয়াছি। সেখানে এই অর্থ পরিত্যাগ করিয়া, বুদ্ধি অর্থে জ্ঞান বুঝিলে আর কোনও গোল থাকে না। নচেৎ এইখানে গোলযোগ উপস্থিত হয়, এ কথাও পূর্বে বলিয়াছি। আনন্দগিরিও এই তৃতীয়ের প্রথম শ্লোকের ভাষ্যের টীকায় “দুরেণ হ্যবরং কৰ্ম্ম” ইত্যাদি শ্লোকটি বিশেষরূপে নির্দিষ্ট করিয়াছেন।

যাহাই হউক, জ্ঞান কৰ্ম্মের গুণপ্রাধান্য সম্বন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে ভগবদুক্তি যাহা আছে, তাহা কিছুর “ব্যামিশ্র” (anglice ambiguous) বটে। বোধ হয়, ইচ্ছাপূর্ব্বকই ভগবান্ কথা প্রথমে পরিষ্কৃত করেন নাই—এই প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষা করিয়াছিলেন। কেন না, এই প্রশ্নের উত্তর উপলক্ষে পরবর্ত্তী কয়েক অধ্যায়ে জ্ঞান-কৰ্ম্মের তারতম্য ও পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ে যে মীমাংসা হইয়াছে, ইহা মনুষ্যের অনন্ত মঙ্গলকর, এবং ইহাকে অতিমানুষ-বুদ্ধি-প্রসূত বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। আর কোথাও কখনও ভূমণ্ডলে এরূপ স্বৰ্গমঙ্গলময় ধৰ্ম্ম কথিত হয় নাই।

অর্জুন সেই “ব্যামিশ্র” বাক্যের কথাই বিশেষ করিয়া বলিতেছেন,

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে ।

তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োহহমাপ্নুয়াম্ ॥ ২ ॥

ব্যামিশ্র (সন্দেহজনক) বাক্যের দ্বারা আমার মন মূগ্ধ করিতেছ। অতএব যাহার দ্বারা আমি শ্রেয় প্রাপ্ত হইব, সেই একই (এক প্রকার নিষ্ঠাই) আমাকে নিশ্চিত করিয়া বলিয়া দাও। ২।

শ্রীভগবান্‌বাচ ।

লোকেহস্মিন্‌ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ ।

জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কৰ্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩ ॥

হে অনঘ! ইহলোকে দ্বিবিধা নিষ্ঠা আছে, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। অর্থাৎ সাংখ্যাদিগের জ্ঞানযোগ এবং (কৰ্ম্ম)যোগীদিগের কৰ্ম্মযোগ বলিয়াছি। ৩।

এই সকল কথা একবার বুঝান হইয়াছে। পূর্নবুদ্ধির প্রয়োজন নাই।

ন কৰ্ম্মণামনারম্ভান্নৈক্কৰ্ম্মাং পূর্নবোধহনুতে ।

ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমাধিগচ্ছতি ॥ ৪ ॥

এই কৰ্ম্মের অননুষ্ঠানেই পূর্নবোধ নৈক্কৰ্ম্ম্য প্রাপ্ত হয় না। আর কৰ্ম্মত্যাগেই সিদ্ধি পাওয়া যায় না। ৪।

অর্জুনের প্রশ্ন ছিল, যদি কৰ্ম্ম হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, তবে কৰ্ম্ম নিয়োগ করিতেছ কেন? ভগবানের উত্তর, জ্ঞান যদি শ্রেষ্ঠই হয়, তাহা হইলে কি তোমাকে কৰ্ম্ম ত্যাগ করিতে বলিতে হইবে? জ্ঞাননিষ্ঠ হইলেই কি তুমি কৰ্ম্ম ত্যাগ করিতে পারিবে? তুমি কোন কৰ্ম্মের অননুষ্ঠান না করিলেই কি নৈক্কৰ্ম্ম্য প্রাপ্ত হইবে? না নৈক্কৰ্ম্ম্য প্রাপ্ত হইলেই সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে?

কৰ্ম্মের অননুষ্ঠানে কেন নৈক্কৰ্ম্ম্য প্রাপ্ত হইবে না, তাহা ভগবান্‌ বলিতেছেন,

ন হি কশ্চিৎ ক্ৰণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকৰ্ম্মকুৎ ।

কার্য্যতে হ্যবশঃ কৰ্ম্ম সৰ্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৫ ॥

কেহই কখনও ক্রণমাত্র কৰ্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। প্রকৃতিজ গুণে সকলেই কৰ্ম্ম করিতে বাধ্য হয়। ৫।

হে অর্জুন! তুমি বলিতেছ, জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব সত্ত্বেও আমি তোমাকে কৰ্ম্ম করিতে বলিতেছি, কিন্তু কৰ্ম্ম না করিয়া থাকিতে পার কৈ? প্রকৃতি ছাড়াই কৈ? নিশ্বাস, প্রশ্বাস,

বিক্রম রচনাবলী

অশন, শয়ন, স্নান, পান, এ সকল কৰ্ম নয় কি? জ্ঞানমার্গাবলম্বী হইলে এ সকল ত্যাগ করা যায় কি?

জিজ্ঞাসু এখানে বলিতে পারেন যে, যে সকল কৰ্ম প্রকৃতির বশ হইয়া করিতে হইবে, তাহা ত্যাগ করা যায় না বটে; কিন্তু যে সকল কার্য আপনার ইচ্ছাধীন, তাহা কি জ্ঞানী বা সন্ন্যাসী পরিত্যাগ করিতে পারেন না?

ইহার সহজ উত্তর এই, অনুষ্টেয় কৰ্ম কেহই পরিত্যাগ করিতে পারে না। ঈশ্বরচিন্তা স্বেচ্ছাধীন কৰ্ম, ইহা কি জ্ঞানমার্গাবলম্বী পরিত্যাগ করিতে পারে? তবে জ্ঞানের উদ্দেশ্য কি?

অনেকে বলিবেন, সাধারণতঃ যাহাকে কৰ্ম বলে, তাহার কথা হইতেছে না। হিন্দুশাস্ত্রে শ্রোত কৰ্ম ও স্মার্ত কৰ্মকেই কৰ্ম বলে। কিন্তু ইহা সত্য নহে, শ্রোত কৰ্ম ও স্মার্ত কৰ্ম না করিয়া কেহ ক্ষণকাল তিষ্ঠিতে পারে না এবং এই সকল স্বাভাবিক নহে যে, প্রকৃতির তাড়নায় বাধ্য হইয়া তাহা করিতে হয়। অতএব সাধারণতঃ যাহাকে কৰ্ম বলে—যাহা কিছু করা যায়—তাহারই কথা হইতেছে বটে। ইহা আমি পূর্বেও বলিয়াছি, এক্ষণেও বলিতেছি। গীতার ব্যাখ্যায় কৰ্ম বলিলে, কৰ্ম মাত্রই বুদ্ধিতে হইবে; কেবল শ্রোত স্মার্ত কৰ্ম যে ভগবানের অভিপ্রেত নহে, তাহা এই শ্লোকেই দেখা যাইতেছে।

কস্মৈন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আশ্তে মনসা স্মরণ্ ।

ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬ ॥

যে বিমূঢ়াত্মা, মনেতে ইন্দ্রিয়-বিষয় সকল স্মরণ রাখিয়া, কেবল কস্মৈন্দ্রিয় সংযত করিয়া অবস্থিত করে, সে মিথ্যাচারী। ৬।

ভগবান্ বলিয়াছেন যে, কস্মৈর অননুষ্ঠানেই নৈস্কৰ্ম্য পাওয়া যায় না এবং কৰ্মত্যাগেই সিদ্ধি পাওয়া যায় না। কস্মৈর অননুষ্ঠানে যে নৈস্কৰ্ম্য ঘটে না, ভগবান্ তাহার এই প্রমাণ দিলেন যে, তুমি কস্মৈর অনুষ্ঠান না করিলেও স্বভাবগুণেই তোমাকে কৰ্ম করিতে বাধ্য হইতে হইবে। আর কৰ্মত্যাগেই যে সিদ্ধি ঘটে না, তাহার এই প্রমাণ দিতেছেন যে, কস্মৈন্দ্রিয়সকল সংযত করিয়া, “কৰ্ম করিব না” বলিয়া বসিয়া থাকিলেও, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সকল মনে আসিয়া উদিত হইতে পারে। তাহা হইলে সে মিথ্যাচার মাত্র। তাহাতে কোন সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই।

যদি কৰ্মত্যাগও করা যায় না, এবং কৰ্মত্যাগ করিলেও সিদ্ধি নাই, তবে কৰ্তব্য কি, তাহাই এক্ষণে কথিত হইতেছে।

যস্মিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেহজ্জর্ন ।

কস্মৈন্দ্রিয়েঃ কৰ্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭ ॥

হে অজ্জর্ন! যে ইন্দ্রিয়সকল মনের দ্বারা নিয়ত করিয়া, অসক্ত হইয়া কস্মৈন্দ্রিয়ের দ্বারা কৰ্মযোগের অনুষ্ঠান করে, সেই শ্রেষ্ঠ। ৭।

নিয়তং কুরু কৰ্ম ভুং কৰ্ম জ্যায়ো হ্যকৰ্মণঃ ।

শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যোদকৰ্মণঃ ॥ ৮ ॥

তুমি নিয়ত কৰ্ম করিবে। কৰ্মশূন্যতা হইতে কৰ্ম শ্রেষ্ঠ। কৰ্মশূন্যতায় তোমার শরীর-যাত্রাও নিৰ্বাহ হইতে পারে না। ৮।

“তৎ কিং কৰ্মিণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব!” অজ্জর্নের এই প্রশ্নের, ভগবান্ এই উত্তর দিলেন। উত্তর এই যে, কৰ্মত্যাগ কেহই করিতে পারে না, এবং কৰ্ম ত্যাগ করিলেই সিদ্ধি ঘটে না। কৰ্ম না করিলে তোমার জীবনযাত্রা নিৰ্বাহের সম্ভাবনা নাই। অতএব কৰ্ম করিবে। তবে যদি কৰ্ম করিতেই হইল, তবে যে প্রকারে করিলে কৰ্ম মঙ্গলকর হয়, তাহাই করিবে। কৰ্ম যাহাতে শ্রেয়ঃসাধক হয়, তাহার দুইটি নিয়ম কথিত হইল। প্রথম, ইন্দ্রিয়সকল* মনের দ্বারা সংযত করিয়া; দ্বিতীয়, অনাসক্ত হইয়া কৰ্ম করিবে। তদতিরিক্ত আর একটি নিয়ম আছে; তাহাই সৰ্ব্বাৎকৃষ্ট ও সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং কৰ্মযোগের কেন্দ্রীভূত। তাহা পরবর্তী শ্লোকে কথিত হইতেছে।

* ভাষ্যকারেরা বলেন,—কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল।

যজ্ঞার্থাৎ কৰ্ম্মগোহন্যত্র লোকোহয়ং কৰ্ম্মবন্ধনঃ ।

তদর্থং কৰ্ম্ম কৌন্তেয় মদুত্তমঃ সমাচর ॥৯ ॥

যজ্ঞার্থে যে কৰ্ম্ম, তাঁহ্ন অন্যত্র কৰ্ম্ম ইহলোকে বন্ধনের কারণ। হে কৌন্তেয়! তুমি সেই জ্ঞান্য (যজ্ঞার্থে) অনাসক্ত হইয়া কৰ্ম্মানুষ্ঠান কর। ৯।

যজ্ঞ শব্দের অর্থের উপর এই শ্লোকের ব্যাখ্যা নির্ভর করে। সচরাচর বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপকে পূর্বে যজ্ঞ বলিত,—যথা অশ্বমেধাদি। এক্ষণে সর্বপ্রকার শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপকেই যজ্ঞ বলে।

প্রাচীন ভাষ্যকার শঙ্কর ও শ্রীধর এ অর্থে গ্রহণ করেন না। শঙ্কর বলেন,—“যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি শ্রুতেষজ্ঞ ঈশ্বরঃ”। শ্রীধর সেই অর্থ গ্রহণ করেন। মধুসূদন সরস্বতীও এইরূপ অর্থ করেন। রামানুজ তাহা বলেন না। তিনি দ্রব্যার্জনার্দিক কৰ্ম্মকে যজ্ঞ বলেন।

শঙ্করাদি-কথিত যজ্ঞ শব্দের অর্থ গ্রহণ করিলে, এই শ্লোকের অর্থ এইরূপ হয় যে, ঈশ্বরোদ্দিষ্ট ভিন্ন যে সকল কৰ্ম্ম, তাহা কেবল কৰ্ম্মফল ভোগের জন্য বন্ধন মাত্র। অতএব অনাসক্ত হইয়া কেবল ঈশ্বরোদ্দেশেই কৰ্ম্ম করিবে।

তাহা হইলে বিচার্য শ্লোকের অর্থ এই হয় যে, ঈশ্বরারাধনার্থে যে কৰ্ম্ম, তাহা ভিন্ন অন্য সকল কৰ্ম্ম, কৰ্ম্মফলভোগের বন্ধন মাত্র। অতএব কেবল ঈশ্বরারাধনার্থেই কৰ্ম্ম করিবে।

এ স্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, তাও কি হয়? ভগবান্‌ই স্বয়ং বলিতেছেন, নিতান্ত পক্ষে প্রকৃতিত্যাগিত হইয়া এবং জীবনযাত্রা নিৰ্ব্বাহার্থেও কৰ্ম্ম করিতে হইবে। ঈশ্বরারাধনা কি সে সকল কৰ্ম্মের উদ্দেশ্য হইতে পারে? আমি জীবনযাত্রা নিৰ্ব্বাহার্থে স্নান পান, আহার ব্যায়ামাদি করি, তাহাতে ঈশ্বরারাধনার কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে?

এ কথা বুদ্ধিবার আগে স্থির করিতে হয়, ঈশ্বরারাধনা কি? মনুষ্যের আরাধনা করিতে গেলে, আমরা আরাধ্য ব্যক্তির স্তবস্তুতি করি। কিন্তু ঈশ্বরকে সেরূপ তোষামোদপ্রিয় ক্ষুদ্রচেতা মনে করা যায় না। তাঁহার স্তবস্তুতি করিলে যদি আমাদের নিজের সুখ, কি চিত্তোন্নতি হয়, তবে এরূপ স্তবস্তুতি করার পক্ষে কোন আপত্তিই নাই, এবং এরূপ স্থলে ইহা অবশ্য কৰ্তব্য। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকে প্রকৃত ঈশ্বরারাধনা বলা যায় না। সেইরূপ যাহাকে সাধারণতঃ “যাগযজ্ঞ” বলে, পুষ্প চন্দন, নৈবদ্য, হোম, বলি, উৎসব, এ সকলও ঈশ্বরারাধনা নহে।

ঈশ্বরের তুষ্টিসাধন ঈশ্বরারাধনা বটে, কিন্তু তোষামোদে তাঁহার তুষ্টিসাধন হইতে পারে না। তাঁহার অভিপ্রেত কার্যের সম্পাদন, তাঁহার নিয়ম প্রতিপালনই তাঁহার তুষ্টিসাধন—তাহাই প্রকৃত ঈশ্বরারাধনা। এই তাঁহার অভিপ্রেত কার্যের সম্পাদন ও তাঁহার নিয়ম প্রতিপালন কাহাকে বলি? বিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদ এক কথায় এই প্রশ্নের অতি সুন্দর উত্তর দিয়াছেন—

“সর্বত্র দৈত্যাঃ সমতামুপেত

সমস্তমারাধনমচ্যুতস্য ॥”

সর্বভূতে সমদৃষ্টিই প্রকৃত ঈশ্বরারাধনা; আমরা ক্রমশঃ ভূয়ো ভূয়ঃ দেখিব, গীতোক্ত ঈশ্বরারাধনাও তাই—সর্বভূতে সমদৃষ্টি, সর্বভূতে আত্মবৎ জ্ঞান, এবং সর্বভূতের হিতসাধন। অতএব কৰ্ম্মযোগীর কৰ্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য, সর্বভূতের হিতসাধন।

যে কৰ্ম্মকর্তা, সে নিজেও সর্বভূতের অন্তর্গত। অতএব আত্মরক্ষাও ঈশ্বরভিষেত। জগদীশ্বর আত্মরক্ষার ভার, সকলকেই নিজের উপর দিয়াছেন। এ সকল কথা আমি সর্বিস্তারে ধৰ্ম্মতত্ত্বে বুঝাইয়াছি, পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই।

এই নবম শ্লোকে বলা হইতেছে যে, “যজ্ঞ” (যে অর্থেই হউক) ভিন্ন অন্যত্র কৰ্ম্ম বন্ধন মাত্র। “বন্ধন” কি, এইটা বুঝাইতে বাকি আছে। অন্যবিধ কৰ্ম্ম নিষ্ফল হয় বা পাপজনক, এমন কথা বলা হইতেছে না—বলা হইতেছে, তাহা বন্ধনস্বরূপ। এই বন্ধন বুদ্ধিতে জন্মান্তরবাদ স্মরণ করিতে হইবে। কৰ্ম্ম করিলেই জন্মান্তরে তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে। কৰ্ম্মফল—সুফলই হউক, আর কুফলই হউক, তাহা ভোগ করিবার জন্য জীবকে জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হইবে। যত দিন জন্মের পর জন্ম হইবে, তত দিন জীবের মুক্তি নাই। মুক্তি প্রতিবন্ধক বলিয়াই কৰ্ম্ম বন্ধন মাত্র।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে,—যদি জন্মান্তর না থাকে? তাহা হইলেও গীতোক্ত নিষ্কাম কৰ্ম্মই কি ধৰ্ম্মানুমোদিত? না নিষ্কাম কৰ্ম্মও যা, সকাম কৰ্ম্মও তা?

বাঁকম রচনাবলী

আমি ধর্মতত্ত্বে এ কথার উত্তর দিয়াছি। নিষ্কাম কর্ম ভিন্ন মনুষ্যত্ব নাই। মনুষ্যত্ব ব্যতীত ইহজন্মে বা ইহলোকে স্থায়ী সুখ নাই। অতএব গীতোক্ত এই ধর্ম বিশ্বজনীন।

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ ।

অনেন প্রসাবিষ্যদ্বমেঘ বোহিস্ত্বষ্টকামধুক্ ॥ ১০ ॥

পূর্বকালে প্রজাপতি প্রজাগণের সহিত যজ্ঞের সৃষ্টি করিয়া কহিলেন, “ইহার দ্বারা তোমরা বর্দ্ধিত হইবে, ইহা তোমাদিগের অভীষ্টপ্রদ হইবে”। ১০।

এখানে ‘যজ্ঞ’ শব্দ আর ‘ঈশ্বর’ নহে বা ঈশ্বরারাধনা নহে। কেবল যজ্ঞই অর্থাৎ শ্রোত স্মার্ত্ত কর্মই যজ্ঞ; এবং পরবর্ত্তী ১২শ, ১৩শ, ১৪শ এবং ১৫শ শ্লোকেতে যজ্ঞ শব্দ কেবল ঐ যজ্ঞই বুঝায়। এক শ্লোকে একার্থে একটি শব্দ কোন অর্থবিশেষে ব্যবহৃত করিয়া, তাহার পরছত্রই ভিন্নার্থে কেহ ব্যবহার করে না। এ জন্য অনেক আধুনিক পণ্ডিত নবম শ্লোকে যজ্ঞার্থে যজ্ঞই বুঝেন। কাশীনাথ গ্র্যাম্বক তেলাঙ্ স্বকৃত অনুবাদে যজ্ঞার্থে sacrifice লিখিয়াছেন। তাহার পর দশম শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—“Probably the sacrifices spoken of in that passage (নবম শ্লোকে) must be taken to be the same as those referred to in this passage.” ডেবিস্ সাহেবও তৎপথাবলম্বী। শঙ্করের ভাষ্য দেখিয়াও গ্রাহ্য করেন নাই, নোট্টে এইরূপ ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। এদিকে কামধুকের স্থানে Kamduk লিখিয়া বসিয়াছেন! একবার নহে, বার বার!!!

এতক্ষণ ভগবান্ সকাম কর্মের নিন্দা ও নিষ্কাম কর্মের প্রশংসা করিতেছিলেন। কিন্তু যজ্ঞ সকাম। অতএব যজ্ঞার্থে ঈশ্বর না বুঝিলে ইহাই বুঝিতে হয়, ভগবান্ সকাম কর্ম করিতে উপদেশ দিতেছেন। তাই নবমে যজ্ঞার্থে ঈশ্বর, ইহা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বেদ হইতে বাহির করিয়াছেন। চতুর্বেদ তাহার কণ্ঠস্থ।

এক্ষণে এই শ্লোকটা সম্বন্ধে একটা কথা বুঝাইবার প্রয়োজন আছে। বলা হইতেছে, প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এমন কেহই বুঝিবেন না যে, যজ্ঞ একটা জীব বা জিনিষ; প্রজাপতি যখন মনুষ্য সৃষ্টি করিলেন, তখন তাহাকেও সৃষ্টি করিলেন। ইহার অর্থ এই যে, বেদে যজ্ঞবিধি আছে, এবং যখন প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করিলেন, তখন সেই বেদও ছিল। গোঁড়া হিন্দু এইটুকুতেই সন্তুষ্ট হইবেন, কিন্তু আমার অধিকাংশ পাঠক সে শ্রেণীর লোক নহেন। আমার পাঠকেরা বলিবেন, প্রথমতঃ প্রজাসৃষ্টিই মানি না—মনুষ্য ত বানরের বিবর্ত্তন। তার পর বেদ নিত্য বা অপৌরুষেয় বা প্রজাসৃষ্টির সমসাময়িক, ইহাও মানি না। পরিশেষে প্রজাপতি যে প্রজা সৃষ্টি করিয়া যজ্ঞ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করিয়া শুনাইলেন, ইহাও মানি না।

মানিবার আবশ্যিকতা নাই। আমিও মানি না। শ্রীকৃষ্ণও মানিতে বলিতেছেন না। ক্রমশঃ বুঝা যাইবে। এই সকল কথার আলোচনা, আর পরবর্ত্তী কয়েকটি শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য্য আমি ষোড়শ শ্লোকের পর বলিব।

শুনশ্চ লৌকিক বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া বলিতেছেন,

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ ।

পরম্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাস্যথ ॥ ১১ ॥

তোমরা যজ্ঞের দ্বারা দেবতাদিগকে সংবর্দ্ধিত কর; দেবগণ তোমাদিগকে সংবর্দ্ধিত করুন। পরম্পর এইরূপ সংবর্দ্ধিত করিয়া পরম শ্রেয়ঃ লাভ করিবে। ১১।

টীকায় শ্রীধর স্বামী বলেন, “তোমরা হবির্ভাগের দ্বারা দেবগণকে সংবর্দ্ধিত করিবে, দেবগণও বৃষ্টাদির দ্বারা অন্নোৎপত্তি করিয়া তোমাদিগকে সংবর্দ্ধিত করিবেন।” আমরা ত অন্ন না খাইলে বাঁচি না, ইহা জানা আছে। দেবতারাও না কি যজ্ঞের ঘি খাইয়া থাকেন, খাইলে তাঁহাদের পুষ্টিসাধন হয়। বেদে এরূপ কথা আছে। থাকুক।

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ ।

তৈর্দত্ত্বানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্তে স্তেন এব সঃ ॥ ১২ ॥

যজ্ঞের দ্বারা সংবর্দ্ধিত দেবগণ, যে অভীষ্ট ভোগ তোমাদিগকে দিবেন, তাঁহাদিগকে তন্দত্ত্ব (অন্ন) না দিয়া, যে খায়, সে চোর। ১২।

শ্রীধর স্বামী বলেন, (বলিবার বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায় না) “পশুযজ্ঞাদিভিরদত্ত্বা,” পশু-যজ্ঞাদির দ্বারা না দিয়া খায়, সে চোর। পশু যজ্ঞ যথা।

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্ ।

হোমো দৈবো বলিভৌতো নৃযজ্ঞোহতিথিভোজনম্ ॥

অর্থাৎ ব্রহ্মযজ্ঞ বা অধ্যাপন, পিতৃযজ্ঞ বা তর্পণ, দৈব যজ্ঞ বা হোম, ভূতযজ্ঞ বা বলি, এবং নরযজ্ঞ বা অতিথি-ভোজন। ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, শ্রীধর “পশুযজ্ঞৈরদত্ত্বা” বলেন না, “পশুযজ্ঞাদিভিরদত্ত্বা” বলেন।

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মূঢ়্যন্তে সর্বাঙ্কিল্বৈষেঃ ।

ভুঞ্জতে তে হুঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩ ॥

যে সজ্জনগণ যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করেন, তাঁহারা সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইবেন। যাহারা কেবল আপনার জন্য পাক করে, সেই পাপিষ্ঠেরা পাপ ভোজন করে। ১৩।

অন্যাদ্বান্তি ভূতানি পজ্জর্ন্যাদন্নসম্ভবঃ ।

যজ্ঞাদ্বান্তি পজ্জর্ন্যো যজ্ঞঃ কৰ্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪ ॥

অন্ন হইতে ভূতসকল উৎপন্ন; পজ্জর্ন্য হইতে অন্ন জন্মে; যজ্ঞ হইতে পজ্জর্ন্য জন্মে। কৰ্ম্ম হইতে যজ্ঞের উৎপত্তি। ১৪।

পজ্জর্ন্য একটি বৈদিক দেবতা। তিনি বৃষ্টি করেন। এখানে পজ্জর্ন্য অর্থে বৃষ্টি বৃষ্টিই হইবে।

অন্ন হইতে জীবের উৎপত্তি। কথাটা ঠিক বৈজ্ঞানিক না হউক, অসত্য নয় এবং বোধগম্য বটে। টীকাকারেরা বৃষ্টিইয়াছেন, অন্ন রূপান্তরে শব্দ শোণিত হয়, তাহা হইতে জীব জন্মে। ইহাই যথেষ্ট।

তার পর বৃষ্টি হইতে অন্ন। তাহাও স্বীকার করা যাইতে পারে; কেন না, বৃষ্টি না হইলে ফসল হয় না। কিন্তু যজ্ঞ হইতে বৃষ্টি, এ কথাটা বৈজ্ঞানিক স্বীকার করিবেন না। টীকাকারেরা বলেন, যজ্ঞের ধূমে মেঘ জন্মে। অন্য ধূমেও মেঘ জন্মিতে পারে। অধিকাংশ মেঘ ধূম ব্যতীত জন্মে। যে দেশে যজ্ঞ হয় না, সে দেশেও মেঘ ও বৃষ্টি হয়। সে যাহা হউক, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এ স্থলে আলোচিত হইতেছে না। তবে কি ভগবদ্ভক্তি অসত্য ও অবৈজ্ঞানিক? ক্রমশঃ তাহাই বৃষ্টিই হইবে।

কৰ্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাঙ্করসমুদ্ভবম্ ।

তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫ ॥

কৰ্ম্ম ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত জানিও; ব্রহ্ম অঙ্কর হইতে সমুদ্ভূত; অতএব সর্বগত ব্রহ্ম নিত্য যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত। ১৫।

টীকাকারেরা বলেন, ব্রহ্ম শব্দে এখানে বেদ বৃষ্টিবে। এবং অঙ্কর পরমাত্মা। তবে কেহ কেহ এই গোলযোগ করেন যে, প্রথম চরণে ব্রহ্ম শব্দে বেদ বৃষ্টিয়া, দ্বিতীয় চরণে ব্রহ্ম শব্দে পরব্রহ্ম বৃষ্টিবে। নাহিলে অর্থ হয় না। কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতকার এবং অন্যান্য অনুবাদকেরা এই মতের অনুবর্তী হইয়াছেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং দ্বিতীয় চরণেও ব্রহ্ম শব্দে বেদ বৃষ্টিয়াছেন, অতএব এই শ্লোকের দুই প্রকার অর্থ করা যায়।

প্রথম, শ্রীধরাদির মতে—

“কৰ্ম্ম বেদ হইতে, এবং বেদ পরব্রহ্ম হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে; অতএব সর্বগত ব্রহ্ম নিয়তই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন।”

দ্বিতীয়, শঙ্করাচার্য্যের মতে—

“কৰ্ম্ম বেদ হইতে, এবং বেদ পরব্রহ্ম হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে; অতএব বেদ সর্বার্থ-প্রকাশক হেতু নিয়তই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন।”

পাঠকের যে ব্যাখ্যা ইচ্ছা, তাহাই গ্রহণ করিতে পারেন; স্থূল তাৎপর্য্যের বিঘ্ন কোনও ব্যাখ্যাতেই হইবে না।

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ ।

অঘায়ুরিন্দ্রয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ১৬ ॥

বিশ্বকম রচনাবলী

এইরূপ প্রবর্তিত চক্রের যে অনুবর্তী না হয়, সে পাপজীবন ও ইন্দিয়ারাম, হে পার্থ, সে অনর্থক জীবন ধারণ করে। ১৬।

(ইন্দিয়সুখে যাহার আরাম, সেই ইন্দিয়ারাম।)

ব্রহ্ম হইতে বেদ, বেদ হইতে কৰ্ম্ম, কৰ্ম্ম হইতে যজ্ঞ, যজ্ঞ হইতে মেঘ, মেঘ হইতে অন্ন, অন্ন হইতে জীব। টীকাকারেরা ইহাকে জগচ্চক্র বলিয়াছেন। কৰ্ম্ম করিলে এই জগচ্চক্রের অনুবর্তন করা হইল। কেন না, কৰ্ম্ম হইতে যজ্ঞ হইবে, যজ্ঞ হইতে মেঘ হইবে, মেঘ হইতে অন্ন হইবে, অন্ন হইতে জীবনযাত্রা নিৰ্ব্বাহ হইবে। এই হইল চক্রের এক ভাগ। এ ভাগ সত্য নহে; কেন না, আমরা জানি, কৰ্ম্ম করিলেই যজ্ঞ* হয় না, যজ্ঞ করিলেই মেঘ হয় না, মেঘ হইলেই শস্য হয় না (সকল মেঘে বৃষ্টি নাই এবং অতিবৃষ্টিও আছে) ইত্যাদি। পক্ষান্তরে যজ্ঞ ভিন্ন কৰ্ম্ম আছে, বিনা যজ্ঞেও মেঘ হয়, বিনা মেঘেও শস্য হয় (যথা রবিখন্দ), শস্য বিনাও জীবন-যাত্রা নিৰ্ব্বাহ হয় (উদাহরণ, সকল অসভ্য ও অর্দ্ধসভ্য জাতি মৃগয়া বা পশুপালন করিয়া খায়) ইত্যাদি।

চক্রের দ্বিতীয় ভাগ এই যে, ব্রহ্ম হইতে বেদ, বেদ হইতে কৰ্ম্ম। ইহাও বিরোধের স্থল। ব্রহ্ম হইতে বেদ না বলিয়া, অনেকে বলেন, বেদ অপৌরুষেয়। অনেকে বলিতে পারেন, বেদ অপৌরুষেয়ও নহে, ব্রহ্মসম্মতও নহে, ঋষিপ্রণীত মাত্র, তাহার প্রমাণ বেদেই আছে। তার পর বেদ হইতে কৰ্ম্ম, এ কথা কেবল শ্রোত কৰ্ম্ম ভিন্ন আর কোন প্রকার কৰ্ম্ম সম্বন্ধে সত্য নহে। পাঠক দেখিবেন, দশম শ্লোক হইতে আর এই ষোড়শ পর্য্যন্ত আমরা অনৈসর্গিক কথার ঘোরতর আবর্তে পড়িয়াছি। সমস্তই অবৈজ্ঞানিক (unscientific) কথা। এখানে মহর্ষিতুল্য প্রাচীন ভাষ্যকারেরা কেহই সহায় নহেন; তাঁহারা বিশ্বাসের জাহাজে পাল ভরিয়া অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছেন। আমরা ম্লেচ্ছের শিষ্য; আমাদের উদ্ধারের সে উপায় নাই। তবে ইহা আমরা অনায়াসে বুঝিতে পারিব যে, গীতা বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ নহে। বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রচার জন্য Huxley বা Tyndale ইহার প্রণয়ন করেন নাই। তিন সহস্র বৎসর পূর্বে যে গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে, ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান তাহাতে পাওয়ার প্রত্যাশা করা যায় না।

তবে পাঠক বলিতে পারেন যে, যাহা তুমি ভগবদুক্তি বলিতেছ, তাহা ভ্রমশূন্য ও অসত্যশূন্য হওয়াই উচিত। অবৈজ্ঞানিক হইলে অসত্য হইল। ঈশ্বরের অসত্য কথা কি প্রকারে সম্ভবে?

কিন্তু এই সাতটি শ্লোক যে ভগবদুক্তি, তাহা আমি বলিতে পারি না। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, গীতায় যাহা কিছু আছে, তাহাই যে ভগবদুক্তি, এমন কথা বিশ্বাস করা উচিত নহে। আমি বলিয়াছি যে, কৃষ্ণকথিত ধর্ম্ম অন্য কর্তৃক সংকলিত হইয়াছে। যিনি সংকলন করিয়াছেন, তাঁহার নিজের মতামত অবশ্য ছিল। তিনি যে নিজ-সংকলিত গ্রন্থে কোথাও নিজের মত চালান নাই, ইহা সম্ভব নহে। শ্রীধর স্বামীর ন্যায় টীকাকারও সংকলনকর্ত্তা সম্বন্ধে “প্রায়শঃ শ্রীকৃষ্ণমুখাধ্বিনিস্তানেব শ্লোকানলিখৎ,” ইহা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন যে, “কাংশিচৎ তৎসঙ্গতয়ে স্বয়ং বারচয়ৎ।” এখানে দেখিতে পাইতেছি, কৃষ্ণোক্ত নিষ্কাম ধর্ম্মের সঙ্গে এই সাতটি শ্লোকের বিশেষ বিরোধ। এজন্য ইহা ভগবদুক্তি নহে—সংকলনকর্ত্তার মত—ইহাই আমার বিশ্বাস।

তবে ইহাও আমার বক্তব্য যে, ইহা যদি প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণোক্তই হয়, তবে যে এ সকল কথা ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানসঙ্গত হওয়া উচিত ছিল, এমন বিশ্বাস আমার নাই। আমি ‘কৃষ্ণচরিত্রে’ দেখাইয়াছি যে, কৃষ্ণ মানুষী শক্তির দ্বারা পার্থিব কৰ্ম্মসকল নিৰ্ব্বাহ করেন, ঐশী শক্তি দ্বারা নহে। মনুষ্যত্বের আদর্শের বিকাশ ভিন্ন, ঈশ্বরের মনুষ্যত্বে গ্রহণ করা বুঝা যায় না। কৃষ্ণ যদি মানবশরীরধারী ঈশ্বর হয়েন, তবে তাঁহার মানুষী শক্তি ভিন্ন ঐশী শক্তির দ্বারা কার্য করা অসম্ভব; কেন না, কোন মানুষেরই ঐশী শক্তি নাই—মানুষের আদর্শেও থাকিতে পারে না। কেবল মানুষী শক্তির ফল যে ধর্ম্মতত্ত্ব, তাহাতে তিন সহস্র বৎসর পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিক সত্য প্রত্যাশা করা যায় না। ঈশ্বরের তাহা অভিপ্রেত নহে।

* যদি বল, শ্রোত স্মার্ত্ত কৰ্ম্মই কৰ্ম্ম, কাজেই যজ্ঞ ভিন্ন কৰ্ম্ম নাই, তাহা হইলে “ন হি কশিচৎ ক্ৰণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকৰ্ম্মকৃৎ” (৫ম শ্লোক), এবং “শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যদকৰ্ম্মণঃ” (৮ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যের অর্থ নাই।

আর এই বৈজ্ঞানিকতা সম্বন্ধে আর একটা কথা আছে। মনে কর, এখন ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া নতুন ধর্মতত্ত্ব প্রচার করিলেন। এখনকার লোকের বোধগম্য বিজ্ঞান অতিক্রম করিয়া, নিজের স্বর্ষজ্ঞতাপ্রভাবে আর তিন চারি হাজার বৎসর পরে বিজ্ঞান যে অবস্থায় দাঁড়াইবে, তাহার সহিত সূসঙ্গতি রাখিলেন। বিজ্ঞানের যেরূপ দ্রুতগতি, তাহাতে তিন চারি হাজার বৎসর পরে বিজ্ঞানে যে কি না করিবে, তাহা বলা যায় না। তখন হয়ত মনুষ্য, জীবন্ত মনুষ্য হাতে গড়িয়া সৃষ্টি করিবে, ইথরের তরঙ্গে চড়িয়া সপ্তর্ষিমণ্ডল* বা রোহিণী নক্ষত্র† বেড়াইয়া আসিবে, হিমালয়ের উপর দাঁড়াইয়া মঙ্গলাদি গ্রহ-উপগ্রহবাসী কিম্বুতর্কিকমাকার জীবগণের সঙ্গে কথোপকথন বা যুদ্ধ করিবে, এ বেলা ও বেলা সূর্যালোকে অগ্নিভোজনের নিমন্ত্রণ রাখিতে যাইবে। মনে কর, ভগবান্ স্বর্ষজ্ঞতাপ্রযুক্ত এই ভাবী বিজ্ঞানের সঙ্গে সূসঙ্গতি রাখিয়া তদুপযোগী ভাষায় নতুন ধর্মতত্ত্ব প্রচার করিলেন। করিলে, শুনিলে কে? বুঝিলে কে? অনুবর্তী হইবে কে? কেহ না। এই জন্য ঈশ্বরোক্তি সময়োপযোগী ভাষায় প্রচারিত হওয়া উচিত। তার পর ক্রমশঃ মানুষ্যের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সেই প্রাচীন কালোপযোগী ভাষার দেশ কাল পাত্রের উপযোগী ব্যাখ্যা হইতে পারে। সেই জন্যই শঙ্করাদি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকৃত গীতাভাষ্য থাকিতেও, আমার ন্যায় মূর্খ অভিনব ভাষ্যরচনায় সাহসী।

এই সাতটি শ্লোক যে বৈজ্ঞানিক অসত্যে কলঙ্কিত, এই প্রথম আপত্তির আমি এই তিনটি উত্তর দিলাম। দ্বিতীয় আপত্তি এই উপস্থিত হইতে পারে যে, এই সাতটি শ্লোক গীতোক্ত নিষ্কাম ধর্মের বিরোধী। এ আপত্তি অতি যথার্থ। তবে এই কয়টি শ্লোক কেন এখানে আসিল, এ প্রশ্নের উত্তর শঙ্কর ও শ্রীধর যেরূপ দিয়াছেন, তাহা নবম শ্লোকের টীকায় বলিয়াছি। মধুসূদন সরস্বতী যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা অপেক্ষাকৃত সঙ্গত বোধ হইতে পারে। পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন তাহার মর্মার্থ অতি বিশদরূপে বুঝিয়াছেন, অতএব তাহার কৃত গীতার্থ-সন্দীপনী নাম্নী টীকা হইতে ঐ অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

“সহযজ্ঞ” অর্থাৎ কর্মসাধনারী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যকে সম্বোধন করিয়া প্রজাপতি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে কাম্য কর্মেরই উদ্দেশ্যনা হইল। কিন্তু “মা কর্মফলহেতুভূঃ” এই বচনে কাম্য কর্মের নিষেধও করা হইয়াছে, এবং গীতাতেও কাম্য কর্মের প্রসঙ্গ নাই, এজন্য ব্রহ্মার উক্তি এ স্থলে নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে; কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে এ আশঙ্কা বিদূরিত হইবে। “প্রজাগণ, তোমরা কামনা করিয়া ফলপ্রাপ্তির জন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিও” ব্রহ্মা এ কথা বলেন নাই। কর্তব্যানুরোধে কর্মের অনুষ্ঠান করিবে, ইহাই ব্রহ্মার উদ্দেশ্য। কিন্তু এই কর্মসাধন মধ্যে যে দিব্য শক্তি নিহিত আছে, তাহারই ঘোষণার্থ ব্রহ্মা বলিলেন, “তোমরা নিয়মিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিও। তাহারই অলৌকিক প্রভাবে তোমরা যখন যাহা বাসনা করিবে, তাহা সিদ্ধ হইতে থাকিবে। লোকে আশ্রয়ই জন্য যেমন আশ্রয়স্থল রোপণ করে, কিন্তু ছায়া ও মৃৎকুলের সঙ্গন্ধ তাহারা বিনা চেষ্টাতেই পাইয়া থাকে, সেইরূপ কর্তব্যের অনুরোধেই কর্ম সাধন করিবে, কিন্তু অনুষ্ঠানের ফল কামনা না করিলেও, উহা স্বতঃপ্রাপ্ত হইবে। ফলে ইচ্ছা না থাকিলেও কর্মের স্বভাবগুণেই ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে।”

আমার বোধ হয়, আমার পাঠকের নিকট শঙ্কর ও শ্রীধরের উত্তরের ন্যায়, এ উত্তরও সন্তোষজনক হইবে না। কিন্তু বিচারে বা প্রতিবাদে আমার কোন প্রয়োজন নাই। এই সাতটি শ্লোকের ভিতর একটি রহস্য আছে, তাহা দেখাইয়া দিয়া ক্ষান্ত হইব।

গীতাকার বলিতেছেন যে—

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ †

এই কথা গীতাকার নিজে হইতে বলেন নাই। এইরূপ বিশ্বাস প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল। মনুসংহিতায় আছে,

কর্মাত্মনাশ দেবানাং সোহসৃজৎ প্রাণিনাং প্রভুঃ।

সাধ্যানাশ গণং সৃক্ষ্মং যজ্ঞেষু সনাতনম্ ॥

১-২২। ইত্যাদি।

* Great Bears.

† Plerades.

‡ ইহার অনুবাদ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে।

বাংকম রচনাবলী

যজ্ঞের দ্বারা দেবগণ পরিতুষ্ট ও প্রসন্ন হইলেন, এবং যজ্ঞকারীকে অভিমত ফল দান করেন, ইহা বৈদিক ধর্মের স্ফুলাংশ। ইহাই লৌকিক ধর্ম।

এখন পূর্বাচলিত প্রাচীন লৌকিক ধর্মের প্রতি ধর্মসংস্কারের কিরূপ আচরণ করা কর্তব্য? এমন লৌকিক ধর্ম নাই, এবং হইতেও পারে না যে, তাহাতে উপধর্মের কোনও সম্বন্ধ নাই। যিনি ধর্মসংস্করণে প্রবৃত্ত, তিনি সেই লৌকিক বিশ্বাসভুক্ত উপধর্মের প্রতি কিরূপ আচরণ করিবেন?

কেহ কেহ বলেন, তাহার একেবারে উচ্ছেদ কর্তব্য। মহম্মদ তাহাই করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার ও তাহার পরবর্তী মহাপুরুষগণের তরবারির জোর তত বেশী না থাকিলে, তিনি কৃতকার্য হইতে পারিতেন না। যীশুখ্রীষ্ট নিজে যীহুদা ধর্মের উপরেই আপনার প্রচারিত ধর্মতত্ত্ব সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। তার পর খ্রীষ্টীয় ধর্ম যে রোমক সাম্রাজ্য হইতে প্রাচীন উপধর্মকে একেবারে দূরীকৃত করিয়াছিল, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, রোমক সাম্রাজ্যের প্রাচীন ধর্ম তখন একেবারে জীবনশূন্য হইয়াছিল। যাহা জীবনশূন্য, তাহার মৃত দেহটা ফেলিয়া দেওয়া বড় কঠিন কাজ নহে। পক্ষান্তরে শাক্যসিংহের ধর্ম, প্রাচীন ধর্মের সঙ্গে কখনও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই।

গীতাকারও বৈদিক ধর্মের প্রতি খড়াহস্ত নহেন। তিনি জানিতেন যে, তাহার কথিত নিষ্কাম কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ কখনও লৌকিক ধর্মের সমস্ত স্থান অধিকার করিতে পারিবে না। তবে লৌকিক ধর্ম বজায় থাকিলে, ইহার দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে সেই লৌকিক ধর্মের বিশুদ্ধ-সাধন হইতে পারিবে। এ জন্য তিনি সম্বন্ধবিচ্ছেদ করিতে ইচ্ছুক নহেন। যাঁহারা বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে তাঁহাকে আমরা গণনা করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার কৃত যে বিদ্রোহ, তাহার সীমা এই পর্য্যন্ত যে, বেদে ধর্ম আছে, তাহা অসম্পূর্ণ; নিষ্কাম কর্মযোগাদির দ্বারা তাহা সম্পূর্ণ করিতে হইবে। এই জন্য তিনি বৈদিক সকাম ধর্মকে নিকৃষ্ট বলিয়াছেন। কিন্তু নিকৃষ্ট বলিয়া যে তাহার কোনও প্রকার গুণ নাই, এমন কথা বলেন না। তাহার গুণ সম্বন্ধে এখানে গীতাকার যাহা বলেন, বুঝাইতেছি।

যাহারা কর্ম করে (সকলেই কর্ম করে), তাহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইতেছে। প্রথম, যাহারা নিষ্কামকর্মী, এবং যাহারা নিষ্কাম কর্মযোগের দ্বারা জ্ঞানমার্গে আরোহণ করিয়াছে, তাহাদের সপ্তদশ শ্লোকে “আত্মরতি” বা “আত্মারাম” বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়, যাহারা কেবল আপন ইন্দ্রিয়সুখের জন্য কর্ম করে, ষোড়শ শ্লোকে তাহাদিগকে “ইন্দ্রয়ারাম” বলা হইয়াছে। তৃতীয় তৃতীয় শ্রেণীর লোক আছে, তাহারা প্রচলিত ধর্মানুসারে যজ্ঞাদি করিয়া যজ্ঞাবিশিষ্ট ভোজন করে। দশম হইতে পঞ্চদশ শ্লোকে তাহাদেরই কথা বলা হইল। তাহাদের অন্ততঃ এই প্রশংসা করা যাইতে পারে যে, তাহারা “ইন্দ্রয়ারাম” নহে—প্রচলিত ধর্মানুসারে চলিয়া থাকে। যদিও তাহাদের ধর্ম উপধর্ম মাত্র, তথাপি তাহারা ঈশ্বরোপাসক; কেন না, ঈশ্বর যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত। এই কথার তাৎপর্য্য আমরা পরে বুঝিব। দেখিব যে, কৃষ্ণ বলিতেছেন যে, আমি ভিন্ন দেবতা নাই। যাহারা অন্য দেবতার উপাসনা করে, তাহারা আমারই উপাসনা করে। সে উপাসনাকে তিনি অবৈধ উপাসনা বলিয়াছেন। কিন্তু তথাপি তাহাও তাঁহার উপাসনা, এবং তিনিই তাহার ফলদাতা, ইহাও বলিয়াছেন।

এখন জিজ্ঞাস্য, কাহাদের মতটা উদার? যাঁহারা বলেন যে, অবৈধ উপাসনা অনন্ত নরকের পথ, না যাঁহারা বলেন যে, বৈধ হউক আর অবৈধ হউক, উপাসনা মাত্র ঈশ্বরের গ্রাহ্য? কি বৈধ আর অবৈধ, তাহা জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। কাহাদের মত উদার? যাঁহারা বলেন, জ্ঞানের অভাব জন্য উপাসক ঈশ্বর কর্তৃক পরিত্যক্ত হইবে, না যাঁহারা বলেন যে, ঈশ্বর জ্ঞানের মাপ করেন না, উপাসকের হৃদয়ের ভাব দেখেন? কে নরকে যাইবে,—যে বলে যে, নিরাকারের উপাসনা না করিলেই অনন্ত নরক, না যে যেমন বুঝে, তেমনই উপাসনা করে?

গঙ্গা বা Caspian Sea বা আমাদের লালদীঘি, সবই জল। কিন্তু জল গঙ্গা নহে। Caspian Seaও নহে বা লালদীঘি নহে। “জল মনুষ্যজীবনের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়,” বলিলে কখনও বুঝাইবে না যে, গঙ্গা মনুষ্য জীবনের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বা Caspian Sea তজ্জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় বা লালদীঘি তজ্জন্য প্রয়োজনীয়। অতএব বিষ্ণু সর্বব্যাপক বলিয়া যজ্ঞ বিষ্ণু, অতএব “যজ্ঞার্থে” বলিলে “বিষ্ণুার্থে” বুঝিতে হইবে, এ কথা খাটে না।

আর কোনও অর্থ শঙ্করাচার্যের অভিপ্রেত হইতে পারে কি না, এখন দেখা যাউক। আর কোন অভিপ্রায়ই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—তবে শতপথব্রাহ্মণ হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে যা হউক, একটা কিছুর পাওয়া যায়। সে কথার তাৎপর্য এই যে, ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবগণ কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ করেন। সেই দেবগণের মধ্যে বিষ্ণু এক জন। সেই যজ্ঞে ইনি অন্য দেবতাদিগের উপর প্রাধান্য লাভ করেন এবং তজ্জন্য যজ্ঞ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। অতএব এই বিষ্ণুই ঈশ্বর নহেন। আর পাঁচটা দেবতার মধ্যে এক জন মাত্র—আদৌ আর পাঁচটা দেবতার সঙ্গে সমান। শঙ্করাচার্যকৃত ব্যাখ্যা এই যে, “যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি শ্রুতেষাজ্ঞ ঈশ্বরঃ।” এখন যাহা বলিবেন যে, যদি “যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ” ইহা স্বীকার করিলে, যজ্ঞ ঈশ্বর, ইহা যে বেদে কথিত হইয়াছে, এমন কথা কোনও মতেই স্বীকার করা যায় না।

শঙ্করাচার্যের ন্যায় পণ্ডিত দুই সহস্র বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে কেহ জন্মিয়াছেন কি না সন্দেহ। এক্ষণে ভারতবর্ষে কেহই নাই যে, তাহার পাদুকা বহন করিবার যোগ্য। তবে দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া আমাদের স্মরণ করিতে হইবে যে, গীতা যে আদ্যন্ত সমস্ত শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম-বিনির্গত, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন বা করিতে বাধ্য। কাজেই এখানে অপরের উক্তি কিছুর আছে বা জোড়াতাড়া আছে, এমন কথা তিনি মুখেও আনিতে পারেন না। পক্ষান্তরে যদি যজ্ঞের প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে বৈদিক ত্রিয়াকলাপের অর্থাৎ সকাম কন্মের উৎসাহ দেওয়া হয়। তাহাতে অর্থবিরোধ উপস্থিত হয়। কেন না, এ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ সকাম কন্ম অপ্রশংসিত ও নিষ্কাম কন্ম অনুজ্ঞাত করিয়া আসিতেছেন। এই জন্য এখানে যজ্ঞার্থে ঈশ্বর বলিবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তাহা বলিয়াও পরবর্তী কয়টি শ্লোকের কোন উপায় হয় নাই। সে সকলে যজ্ঞার্থ কাম্য কন্মই বঝাইতে হইয়াছে। গীতায় এইরূপ কাম্য কন্মের বিধি থাকার কারণ ষোড়শ শ্লোকের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন যে, প্রথমে আত্মজ্ঞান-নিষ্ঠাযোগ্যতা প্রাপ্তির জন্য অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তি কন্মযোগানুষ্ঠান করিবে। ইহার জন্য “ন কন্মগা-মনারম্ভাৎ” ইত্যাদি যুক্তি পূর্বে কথিত হইয়াছে; কিন্তু অনাত্মজ্ঞের কন্ম না করার অনেক দোষ আছে, ইহাই কথিত হইতেছে।

শ্রীধর স্বামী শঙ্করাচার্যের অনুবর্তী। তিনি নবম শ্লোকের ব্যাখ্যায় যজ্ঞার্থে ঈশ্বরই বঝিয়াছেন। তিনি বলেন যে, সামান্যতঃ অকন্ম (কন্মশূন্যতা) হইতে কাম্য কন্ম শ্রেষ্ঠ, এই জন্য পরবর্তী শ্লোক কয়টি কথিত হইয়াছে।

সেই পরবর্তী শ্লোক কি, তাহা পাঠক নিম্নে জানিতে পারিবেন। তাহার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে যদি আমরা কেহ শঙ্করাচার্যকৃত নবম শ্লোকের যজ্ঞ শব্দের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক না হই, তবে তাহার আর একটা সদর্থের সন্ধান করা আমাদের কর্তব্য।

যজ্ঞ শব্দের মৌলিক অর্থই এখানে গ্রহণ করিলে ক্ষতি কি? যজ্ ধাতু দেবপূজার্থে। অতএব যজ্ঞের মৌলিক অর্থ দেবোপাসনা। যেখানে বহু দেবতার উপাসনা স্বীকৃত, সেখানে সকল দেবতার পূজা যজ্ঞ। কিন্তু যেখানে এক ঈশ্বরই সর্বদেবময়, যথা—

“যেহ প্যান্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।

তেহপি মামেব কোন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥” ২৩ ॥

গীতা, ৯ অ।

সেখানে যজ্ঞার্থে ঈশ্বরারাধনা। ভগবান্ তাহাই স্বয়ং বলিতেছেন—

“অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।” ২৪ ॥

গীতা, ৯ অ।

যজ্ ধাতু এবং যজ্ঞ শব্দ এইরূপ ঈশ্বরারাধনার্থে পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে। উপরিধৃত শ্লোকে তিনটি উদাহরণ আছে। আরও অনেক দেওয়া যাইতে পারে—

“ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোহপি মাম্।”

গীতা, ২৫, ১০ অ।

“যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোহস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ।”

গীতা, ২৫, ১০ অ।

বাঞ্চকম রচনাবলী

অন্য গ্রন্থেও যজ্ঞ শব্দের ঈশ্বরারাধনার্থে ব্যবহার অনেক দেখা যায়। যথা, মহাভারতে—
“বাক্ষজ্ঞেনাচ্চিত্তো দেবঃ প্রীয়তাং মে জনান্দন।”

শান্তিপর্বে, ৪৭ অধ্যায়।

এখন এই নবম শ্লোকে যজ্ঞ শব্দে ঈশ্বরারাধনা বন্ধিলে কি প্রত্যবায় আছে? তাহা করিলে, এই শ্লোকের সদর্থও হয়, সদুসঙ্গত অর্থও হয়।

কিন্তু যজ্ঞ শব্দের এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিবার পক্ষে কিছু আপত্তি আছে। একটি আপত্তি এইঃ—এই শ্লোকের পরবর্ত্তী কয় শ্লোকে যজ্ঞ শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে; সেখানে যজ্ঞ শব্দে ঈশ্বর, এমন অর্থ বন্ধায় না। “সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ,” “যজ্ঞভাবিতাঃ দেবাঃ,” “যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ,” “যজ্ঞ কৰ্ম্মসমুদ্ভবঃ,” “যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্” ইত্যাদি প্রয়োগে যজ্ঞ শব্দে বিষ্ণু বা ঈশ্বর বন্ধাইতে পারে না। এখন ৯ম শ্লোকে যজ্ঞ শব্দ এক অর্থে ব্যবহার করিয়া, তাহার পরেই দশম, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ শ্লোকে ভিন্নার্থে সেই শব্দ ব্যবহার করা নিতান্ত অসম্ভব। সামান্য লেখকও এরূপ করে না, গীতাপ্রণেতা যে এরূপ করিবেন, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। হয় গীতাকর্ত্তা রচনায় নিতান্ত অপটু, নয় শঙ্করাদিকৃত যজ্ঞ শব্দের এই অর্থ ভ্রান্ত। এ দুইয়ের একটাও স্বীকার করা যায় না। যদি তা না যায়, তবে স্বীকার করিতে হইবে যে, হয় নবম হইতে পঞ্চদশ পর্য্যন্ত একাধেই যজ্ঞ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, নয় নবম শ্লোকের পর একটা জোড়াতাড়া আছে।

প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে, যজ্ঞ বিষ্ণুর নাম নয়। অভিধানে কোথাও নাই যে, যজ্ঞ বিষ্ণুর নাম। কোথাও এমন প্রয়োগও নাই। ‘হে যজ্ঞ!’ বলিলে কেহই বন্ধাবে না যে, ‘হে বিষ্ণো!’ বলিয়া ডাকিতেছি। “বিষ্ণুর দশ অবতার” এ কথার পরিবর্ত্তে কখনও বলা যায় না যে, “যজ্ঞের দশ অবতার”। “যজ্ঞ, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বনমালী” বলিলে, লোকে হাসিবে। তবে শঙ্করাচার্য্য কেন বলেন যে, যজ্ঞার্থে বিষ্ণু? কেন বলেন, তাহা তিনি বলিয়াছেন। “যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি শ্রুতেঃ”—যজ্ঞ বিষ্ণু, ইহা বেদে আছে।

শতপথব্রাহ্মণে* কথিত আছে যে, অগ্নি, ইন্দ্র, সোম, মঘ, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ কুরুক্লেদ্রে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাঁহারা যজ্ঞকালে এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আমাদের মধ্যে যিনি শ্রম, তপ, শ্রদ্ধা, যজ্ঞ, আহুতির দ্বারা যজ্ঞের ফল প্রথমে অবগত হইতে পারিবেন, তিনি আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবেন। বিষ্ণু তাহা প্রথমে পাইলেন। তিনি দেবতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেন। এক্ষণে শতপথব্রাহ্মণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

“তদ্বিষ্ণুঃ প্রথমঃ প্রাপ। স দেবানাং শ্রেষ্ঠোহভবৎ। তস্মাদাহুর্বিষ্ণুর্দেবানাং শ্রেষ্ঠ ইতি। সঃ যঃ স বিষ্ণুর্যজ্ঞঃ সঃ যঃ স যজ্ঞোহসৌ স আদিত্যঃ।”

অর্থ—ইহা বিষ্ণু প্রথমে পাইলেন। তিনি দেবতাদিগের শ্রেষ্ঠ হইলেন। তাই বলে, বিষ্ণু দেবতাদিগের শ্রেষ্ঠ যে, সেই বিষ্ণু, যজ্ঞ সেই। যে সেই যজ্ঞ, সেই আদিত্য।

পুনশ্চ তৈত্তিরীয়সংহিতায় “শিপিবিষ্ণায়” শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা আছে।—“যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ পশবঃ শিপিঃ। যজ্ঞ এব পশুর্ষু প্রতিষ্ঠিতি।”† ভট্ট ভাস্কর মিশ্রও লিখিয়াছেন, “যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ পশবঃ শিপির্পরিতি শ্রুতেঃ।”

অতএব শঙ্করাচার্য্যের কথা ঠিক—শ্রুতিতে যজ্ঞকে বিষ্ণু বলা হইয়াছে। কিন্তু কি অর্থে? একটা অর্থ হইতে পারে যে, বিষ্ণু যজ্ঞ, কেন না, সর্বব্যাপী। ভট্ট ভাস্কর মিশ্রও তাই বলিয়াছেন। তিনি বলেন, “বিষ্ণুঃ পশবঃ শিপির্পরিতি শ্রুতেঃ সর্বপ্রাণাদ্যন্তুর্ষামিৎসেন প্রবিষ্ট ইত্যর্থঃ।”

এই গীতার ভিতর সন্ধান করিলেই পাওয়া যাইবে,—

“অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমোষধম্।

মন্ত্রোহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্ ॥”

গীতা, ৯ অ, ১৬।

আমি ক্রতু, আমি যজ্ঞ, আমি স্বধা, আমি ঔষধ, আমি মন্ত্র, আমি হুত, আমি অগ্নি, আমি হবন।

* ১৪।১।১

† ইহা আমি Muir সংগ্রহ হইতে তুলিলাম। কিন্তু একটু সন্দেহের বিষয় আছে।

যদি তাই হয়, তবে বিষ্ণু যজ্ঞ, কিন্তু যজ্ঞ বিষ্ণু নহে। বিষ্ণু সর্বময়, এজন্য তিনি মন্ত্র, তিনি ঘৃত, তিনি অগ্নি; কিন্তু মন্ত্রও বিষ্ণু নহে, ঘৃতও বিষ্ণু নহে, অগ্নিও বিষ্ণু নহে। অতএব বিষ্ণু যজ্ঞ, কিন্তু যজ্ঞ বিষ্ণু নহে, ইহা যদি সত্য হয়, তবে শঙ্করাচার্যের ব্যাখ্যা খাটে না।

যস্মাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।

আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে ॥ ১৭ ॥

যে মনুষ্যের আত্মাতেই রতি, যিনি আত্মতৃপ্ত, আত্মাতেই যিনি সন্তুষ্ট। তাঁহার কার্য নাই। ১৭।

দ্বিবিধ মনুষ্য, এক ইন্দ্রয়ারাম (১৫ শ্লোক দেখ), দ্বিতীয় আত্মারাম। যে আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ সেই আত্মারাম; সাংখ্যযোগ তাহারই জন্ম। এই শ্লোকে তাহারই কথা হইতেছে।

ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে, কেহই কৰ্ম না করিয়া ক্ষণমাত্র থাকিতে পারে না। কৰ্ম ব্যতীত কাহারও জীবনযাত্রাও নিৰ্বাহ হয় না। আবার এখন বলা যাইতেছে যে, ব্যক্তি বিশেষের কৰ্ম নাই। অতএব কৰ্ম বা কার্য শব্দের বিশেষ বুঝিতে হইবে। বৈদিকাদি সকাম কৰ্মই এখানে অভিপ্রেত। ভাবার্থ এই যে, যে আত্মতৃপ্ত, তাহার পক্ষে উপরিকথিত যজ্ঞাদির প্রয়োজন নাই।

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।

ন চাস্য সৰ্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যাপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮ ॥

তাঁহার কৰ্মের কোন প্রয়োজন নাই; এবং কৰ্ম অকরণেও কোন প্রত্যবায় নাই। সৰ্বভূত-মধ্যে কাহারও আশ্রয় ইঁহার প্রয়োজন নাই। ১৮।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কৰ্ম সমাচর।

অসক্তো হ্যাচরন্ কৰ্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ ॥ ১৯ ॥

অতএব সতত অসক্ত হইয়া কর্তব্য কার্য সম্পাদন করিবে। পূরুষ অসক্ত হইয়া কৰ্ম করিলে মুক্তি লাভ করে। ১৯।

‘অসক্ত’ অর্থে আসক্তিশূন্য অর্থাৎ ফলকামনাশূন্য। পাঠক দেখিবেন যে, ৮ম বা ৯ম শ্লোকের পর ১৮শ শ্লোক পর্যন্ত বাদ দিয়া পড়িলে, এই ‘তস্মাৎ’ (অতএব) শব্দ অতিশয় সুসঙ্গত হয়। মধ্যে যে কয়টি শ্লোক আছে, এবং যাহার ব্যাখ্যায় এত গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার পর এই ‘তস্মাৎ’ শব্দ বড় সঙ্গত বোধ হয় না। ৮ম শ্লোকে বলা হইল যে, কৰ্ম না করিলে তোমার শরীরযাত্রাও নিৰ্বাহিত হইতে পারে না। ৯ম শ্লোকে বলা হইল যে, ঈশ্বর আরাধনা ভিন্ন অন্যত্র কৰ্ম, বন্ধনের কারণ মাত্র। অতএব তুমি অনাসক্ত হইয়া কৰ্ম কর, অনাসক্ত হইয়া ঈশ্বর আরাধনার্থে কৰ্ম, তাহার দ্বারা মনুষ্য মুক্তি লাভ করে। ৮ম, তার পর ৯ম, তার পর ১৯শ শ্লোক পড়িলে এইরূপ সদর্থ হয়। মধ্যবর্তী নয়টি শ্লোক কিছু অসংলগ্ন বোধ হয়। মধ্যবর্তী কয়টি শ্লোকের যে ব্যাখ্যা হয় না, এমতও নহে। তাহা উপরে দেখাইয়াছি। অতএব এ নয়টি শ্লোক যে প্রক্ষিপ্ত, ইহা সাহস করিয়া বলিতে পারি না।

কৰ্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাশ্ৰিতা জনকাদয়ঃ।

লোকসংগ্রহমেবার্পি সংপশ্যান্ কর্তৃমহঁসি ॥ ২০ ॥

জনকাদি কৰ্মের দ্বারাই জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। তুমিও লোকসংগ্রহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কৰ্ম কর। ২০।

এই ‘লোকসংগ্রহ’ শব্দের অর্থে ভাষ্যকারেরা বুঝেন, দৃষ্টান্তের দ্বারা লোকের ধৰ্ম প্রবর্তন। শ্রীধর স্বামী বলেন যে, লোককে স্বধৰ্ম প্রবর্তন, অর্থাৎ আমি কৰ্ম করিলে সকলে কৰ্ম করিবে, না করিলে অজ্ঞেরা জ্ঞানীর দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইয়া নিজ ধৰ্ম পরিত্যাগপূর্বক পতিত হইবে, এই লোকরক্ষণই লোকসংগ্রহ। শঙ্করও এইরূপ বুঝাইয়াছেন। শঙ্করাচার্য বলেন, লোকের উন্মার্গপ্রবৃত্তি নিবারণ লোকসংগ্রহ। পরশ্লোকে গীতাকার এই কথা পরিষ্কার

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।

স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥ ২১ ॥

যে যে কৰ্ম শ্রেষ্ঠ লোকে আচরণ করেন, ইতর লোকেও তাহাই করে। তাঁহারা বাহা প্রমাণ্য বলিয়া বিবেচনা করেন, লোকে তাহারই অনুবর্তী হয়। ২১।

বিশ্বকর্ম রচনাবলী

পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, আত্মজ্ঞানীদিগের কর্ম নাই। এক্ষণে কথিত হইতেছে যে, কর্ম না থাকিলেও তাঁহাদের কর্ম করা কর্তব্য। কেন না, তাঁহারা কর্ম না করিলে সাধারণ লোক যাহারা আত্মজ্ঞানী নহে, তাহারাও তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইয়া কর্ম হইতে বিরত হইবে। কর্ম হইতে বিরত হইলে স্ব স্ব ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইবে। অতএব সকলেরই কর্ম করা কর্তব্য।

ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির জ্ঞানমার্গাবলম্বী ছিলেন। জ্ঞানমার্গাবলম্বীর কর্ম নাই, ইহা স্থির করিয়া তাঁহারা কর্মে বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। এবং সেই দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষই কর্মে অনুরাগশূন্য, সুতরাং অকর্মা লোকের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া এই অধঃপতন দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। ভগবান্ উপরিলিখিত যে মহাবাক্যের দ্বারা কর্মবাদ ও জ্ঞানবাদের সামঞ্জস্য বা একীকরণ করিলেন, ভারতবর্ষীয়েরা তাহা স্মরণ রাখিলে, তদনুবর্তী হইয়া কর্ম করিলে, জ্ঞান ও কর্ম উভয়ই তাঁহাদের তুল্যরূপে উদ্দেশ্য হইলে, তাঁহারা কখনই আজিকার দিনের সভ্যতর জাতি হইতে নিকৃষ্টদশাগ্রস্ত হইতেন না—পরাধীন, পরমুখপ্রেক্ষী, পরজাতিদত্তশিক্ষা-বিপদগ্রস্ত হইতেন না।

শ্রীকৃষ্ণ যে কেবল এই গীতাতেই কর্মের মহিমা কীর্তিত করিয়াছেন, এমত নহে; মহাভারতে উদ্যোগপর্বে সঞ্জয়যানপর্বাধ্যায়েও তিনি ঐরূপ করিয়াছেন। তাহা গ্রন্থান্তরে উদ্ধৃত করিয়াছি, এখানেও উদ্ধৃত করিলাম :—

“শুচি ও কুটুম্বপরিপালক হইয়া বেদাধ্যয়ন করত জীবন যাপন করিবে, এইরূপ শাস্ত্র-নির্দিষ্ট বিধি বিদ্যমান থাকিলেও ব্রাহ্মণগণের নানাপ্রকার বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। কেহ কর্মবশতঃ, কেহ বা কর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র বেদজ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাভ হয়, এইরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু যেমন ভোজন না করিলে তৃপ্তি লাভ হয় না, তদ্রূপ কর্মানুষ্ঠান না করিয়া কেবল বেদজ্ঞ হইলে ব্রাহ্মণগণের কদাচ মোক্ষ লাভ হয় না। যে সমস্ত বিদ্যা দ্বারা কর্ম সংসাধন হইয়া থাকে, তাহাই ফলবতী; যাহাতে কোনও কর্মানুষ্ঠানের বিধি নাই, সে বিদ্যা নিতান্ত নিষ্ফল। অতএব যেমন পিপাসার্ত্ত ব্যক্তির জল পান করিবা মাত্র পিপাসা শান্ত হয়, তদ্রূপ ইহকালে যে সকল কর্মের ফল প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তাহারই অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। হে সঞ্জয়! কর্মবশতঃই এইরূপ বিধি বিহিত হইয়াছে, সুতরাং কর্মই সর্বপ্রধান। যে ব্যক্তি কর্ম অপেক্ষা অন্য কোনও বিষয়কে উৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া থাকে, তাহার সমস্ত কর্মই নিষ্ফল হয়।

“দেখ, দেবগণ কর্মবলে প্রভাবসম্পন্ন হইয়াছেন। সমীরণ কর্মবলে সতত সঞ্চার করিতেছেন; দিবাকর কর্মবলে আলস্যশূন্য হইয়া অহোরাত্র পরিভ্রমণ করিতেছেন; চন্দ্রম। কর্মবলে নক্ষত্রমণ্ডলীপরিবৃত হইয়া মাসাদর্ক উদ্দিত হইতেছেন; হুতাশন কর্মবলে প্রজাগণের কর্ম সংসাধন করিয়া নিরবাচ্ছিন্ন উত্তাপ প্রদান করিতেছেন; পৃথিবী কর্মবলে নিতান্ত দুর্ভার ভার অনায়াসেই বহন করিতেছেন; স্নোতস্বতী সকল কর্মবলে প্রাণিগণের তৃপ্তি সাধন করিয়া সলিলরাশি ধারণ করিতেছে। অমিতবলশালী দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি সেই কর্মবলে দশ দিক্ ও নভোমণ্ডল হইতে বারি বর্ষণ করিয়া থাকেন এবং অপ্রমত্তচিত্তে ভোগাভিলাষ বিসর্জন ও প্রিয় বস্তুসমূহের পরিত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ এবং দম, ক্ষমা, সমতা, সত্য ও ধর্ম প্রতিপালনপূর্বক দেবরাজ্য অধিকার করিয়াছেন। ভগবান্ বৃহস্পতি সমাহিত হইয়া ইন্দ্রিয় নিরোধনপূর্বক ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি দেবগণের আচার্য্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। রুদ্র, আদিত্য, যম, কুবের, গন্ধর্বা, যক্ষ, অপ্সর, বিশ্বাসু ও নক্ষত্রগণ কর্মপ্রভাবে বিরাজিত রহিয়াছেন, মহর্ষিগণ ব্রহ্মবিদ্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন।”

আত্মজ্ঞানী ব্যক্তিদিগেরও কর্ম করা কর্তব্য, ইহা বলিয়া ভগবান্ কর্মপরায়ণতার মাহাত্ম্য আরও পরিষ্ফুট করিবার জন্য নিজের কথা বলিতেছেন :—

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং গ্রিষু লোকেষু কিঞ্চন !

নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্মণি ॥ ২২ ॥

যদি হাহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতিন্দ্রিতঃ ।

মম বর্ত্তানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ২৩ ॥

হে পার্থ! এই তিন লোকে আমার কিছু মাত্র কর্তব্য নাই। অপ্রাপ্ত অথবা প্রাপ্তব্য কিছুই নাই, তথাপি আমি কৰ্ম্ম করিয়া থাকি। ২২।

কৰ্ম্মে অনলস না হইয়া যদি আমি কখনও কৰ্ম্ম না করি, তবে হে পার্থ! মনুষ্য সকলে সৰ্ব্বপ্রকারে আমারই পথের অনুবর্তী হইবে। ২৩।

এখানে বক্তা স্বয়ং ভগবান্ জগদীশ্বর। ঈশ্বরের কোনও প্রয়োজন নাই, কোনও বিকার নাই, সুখ দুঃখ কিছুই নাই, অতএব তাঁহার কোনও কৰ্ম্ম নাই। তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং জগৎ চলবার নিয়মও করিয়াছেন, সেই নিয়মের বলে জগৎ চলিতেছে; তাহাতে তাঁহার হস্তক্ষেপের কোনও প্রয়োজন নাই। এ জন্য তাঁহার কৰ্ম্ম নাই। তবে তিনি যদি মনুষ্যের আদর্শ প্রচার জন্য ইচ্ছাক্রমে মনুষ্যশরীর ধারণ করেন, তাহা হইলে তিনি মনুষ্যধৰ্ম্মী বলিয়া তাঁহার কৰ্ম্মও আছে। যদিও তিনি নিজের ঐশী শক্তির দ্বারা সকল প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে পারেন, তথাপি মনুষ্যধৰ্ম্মিত্বহেতু কৰ্ম্মের দ্বারাই তাঁহাকে প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে হয়। তিনি আদর্শ মনুষ্য, কাজে কাজেই তিনি আদর্শ কৰ্ম্মী। অতএব তিনি কদাচ আলস্যপরবশ হইয়া কৰ্ম্ম না করিলে, লোকেও আদর্শ মনুষ্যের দৃষ্টান্তের অনুবর্তনে অলস ও কৰ্ম্মে অমনোযোগী হইবে। যে অলস ও কৰ্ম্মে অমনোযোগী, সে উৎসন্ন যায়। তাই ভগবান্ পুনশ্চ বলিতেছেন,—

উৎসীদেয়ুর্নিমে লোকা ন কুর্য্যাং কৰ্ম্ম চেদহম্।

সঙ্করস্য চ কর্তা স্যাম্পহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪ ॥

যদি আমি কৰ্ম্ম না করি, তাহা হইলে এই লোকসকল আমি উৎসন্ন দিব। সঙ্করের কর্তা হইব এবং এই প্রজা সকলের মালিন্যহেতু হইব। ২৪।

ভাষ্যকারেরা এই সঙ্কর শব্দে বর্ণসঙ্করই বুঝিয়াছেন। হিন্দুরা জাতিগত বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য অতিশয় যত্নশীল; এ জন্য বর্ণসঙ্কর একটা কদর্য সামাজিক দোষ বলিয়া প্রাচীন হিন্দুদিগের বিশ্বাস। মনু বলেন, নিকৃষ্ট বর্ণসঙ্কর জাতি রাজ্যনাশের কারণ, এবং এই গীতাতেই আছে—

“সঙ্করো নরকায়েব কুলঘ্যানাং কুলস্য চ।”

কিন্তু আমরা হঠাৎ বুঝিতে পারি না যে, সংসারে এত গুরুতর অমঙ্গল থাকিতে ঈশ্বরের আলস্যে বর্ণসঙ্করোৎপত্তির ভয়টাই এত প্রবল কেন? এমন ত কিছু বুঝিতে পারি না যে, ঈশ্বর বা শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ ধরিয়া ব্রাহ্মণীর নিকট, ক্ষত্রিয়কে ধরিয়া ক্ষত্রিয়ার নিকট, বৈশ্যকে ধরিয়া বৈশ্যার নিকট এবং শূদ্রকে ধরিয়া শূদ্রার নিকট প্রেরণ করিয়া বর্ণসঙ্কর্য নিবারণ করেন। দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, লোকক্ষয়, সৰ্বদেশব্যাপী রোগ, হত্যা, চৌর্য এবং দান, তপস্যা প্রভৃতি ধৰ্ম্মের তিরোভাব ঈশ্বরের আলস্যে, এ সকলের কোনও শঙ্কার কথা না বলিয়া, বর্ণসঙ্কর্যের ভয়ে শ্রীকৃষ্ণ এত হস্ত কেন? সঙ্কর জাতির বাহুল্য যে আধুনিক সমাজের উপকারী, ইহাও সপ্রমাণ করা যাইতে পারে। অতএব সঙ্কর অর্থে বর্ণসঙ্কর বুঝিলে, এই শ্লোকের অর্থ আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিগম্য হয় না।

কিন্তু সঙ্কর শব্দে বর্ণসঙ্করই বুঝিতে হইবে, সংস্কৃত ভাষায় এমন কিছু নিশ্চয়তা নাই। সঙ্কর অর্থে মিলন, মিশ্রণ। ভিন্নজাতীয় বা বিরুদ্ধভাবাপন্ন পদার্থের একত্রীকরণ ঘটিলে সঙ্কর্য উপস্থিত হয়। তাহার ফল বিশৃঙ্খলা, ইংরেজিতে যাহাকে disorder বলে। শ্রীকৃষ্ণাতির তাৎপর্য এই আমি বুঝি যে, তিনি কৰ্ম্মবিরত হইলে, সামাজিক বিশৃঙ্খলতা ঘটবে। আদর্শ পুরুষের দৃষ্টান্তে সকলেই আলস্যপরবশ এবং কৰ্ম্মে অমনোযোগী হইলে সামাজিক বিশৃঙ্খলতা যথার্থই সম্ভব।

সক্তাঃ কৰ্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত।

কুর্য্যান্দিদ্বাংস্তথাসক্তাশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥ ২৫ ॥

হে ভারত! যেমন অবিদ্বানেরা কৰ্ম্মে আসক্তিবিশিষ্ট হইয়া কৰ্ম্ম করিয়া থাকে, তেমনই লোকসংগ্রহচিকীর্ষু বিদ্বানেরা অনাসক্ত হইয়া কৰ্ম্ম করিবেন। ২৫।

অবিদ্বানেরা ফলকামনা করিয়া কৰ্ম্ম করে, বিদ্বানেরা লোকরক্ষার্থে অর্থাৎ ধৰ্ম্মার্থে ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া কৰ্ম্ম করিবেন।

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কৰ্ম্মসঙ্গিনাম্।

যোজয়েৎ সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ২৬ ॥

বিশ্বকম রচনাবলী

বিদ্বানেরা কস্মে আসক্ত অজ্ঞানদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেন না। আপনারা অবহিত হইয়া ও সৰ্ব্ব কস্ম করিয়া, তাহাদিগকে কস্মে নিযুক্ত করিবেন। ২৬।

যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহারা কস্ম না করিলে অজ্ঞানেরা বিবেচনা করিতে পারে যে, আমাদিগেরও এই সকল কস্ম কর্তব্য নহে; অতএব জ্ঞানীদিগের দৃষ্টান্তদোষে অজ্ঞানদিগের এইরূপ বুদ্ধিভেদ জন্মিতে পারে।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কস্মাণি সৰ্ব্বশঃ।

অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তৃহর্মিত মন্যতে ॥ ২৭ ॥

প্রকৃতির গুণসকলের দ্বারা সৰ্ব্বপ্রকার কস্ম ক্রিয়মাণ। কিন্তু যাহার বুদ্ধি অহঙ্কারে বিমূঢ়, সে আপনাকে কর্তা মনে করে। ২৭।

তত্ত্ববিত্ত্ব মহাবাহো গুণকস্মবিভাগয়োঃ।

গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ ২৮ ॥

হে মহাবাহো! গুণকস্মবিভাগের তত্ত্ব যাঁহারা জানেন, তাঁহারা বুঝেন যে, ইন্দ্রিয়সকলই বিষয়ে বর্তমান; এ জন্য তাঁহারা কস্মে আসক্ত হন না। ২৮।

যাঁহারা শরীর হইতে ভিন্ন আত্মা মানেন না, তাঁহারা উপরিব্যখ্যাত দুই শ্লোকের দুই অর্থ বুঝিবেন না। ঐ দুই শ্লোক এবং তৎপূর্বে বিদ্বান্ এবং অবিদ্বান্, জ্ঞানী অজ্ঞান ইত্যাদি শব্দ যে ব্যবহৃত হইয়াছে, সে সকল এই আত্মজ্ঞান লইয়া। যাঁহার আত্মজ্ঞান আছে, অর্থাৎ যিনি জানেন যে, শরীর হইতে পৃথক্ অবিনাশী আত্মা আছেন, তাঁহাকেই বিদ্বান্ বা জ্ঞানী বলা হইতেছে। বলা হইতেছে যে, অবিদ্বান্ বা অজ্ঞানেরা কস্মে আসক্ত বা ফলকামনাবিশিষ্ট, এবং বিদ্বান্ জ্ঞানীর কস্মে অনাসক্ত বা ফলকামনাশূন্য। কিন্তু এই প্রভেদ ঘটে কেন? আত্মজ্ঞান থাকিলেই ফলকামনা পরিত্যাগ করে, এবং আত্মজ্ঞান না থাকিলেই ফলকামনাবিশিষ্ট হয়, এই প্রভেদ ঘটে কেন, তাহাই এই দুই শ্লোকে বুঝান হইতেছে। ইন্দ্রিয়ের যাহা ভোগ্য, তাহাকেই বিষয় বলে। কেন না, তাহাই ইন্দ্রিয়ের বিষয়। ইন্দ্রিয়ে ও বিষয়ে যে সংযোগ সংঘটন, তাহাই কস্ম। যাহার আত্মজ্ঞান নাই, যে আত্মার অস্তিত্ব অবগত নহে, সে জানে যে, ইন্দ্রিয়ে ও বিষয়ে যে সংঘটন, তাহা আমা হইতেই ঘটিল; অতএব আমিই কস্মের কর্তা। “আমিই কস্মের কর্তা” এই বিবেচনাই অহঙ্কার। সে বুঝে যে, আমি কস্ম করিয়াছি, এ জন্য আমিই কস্মের ফল ভোগ করিব; তাই সে ফল কামনা করে। আর যাঁহার আত্মজ্ঞান আছে, আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস আছে, ইন্দ্রিয়সকল আত্মার কোন অংশ নহে, ইহা যাঁহার বোধ আছে, তিনি জানেন যে, ইন্দ্রিয় বা প্রকৃতিই কস্ম করিল। কেন না, তদ্বারাই বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ সংঘটিত হইল। আত্মা কস্ম করেন নাই, সুতরাং আত্মা তাহার ফলভাগী নহেন। আত্মাই আমি; অতএব আমি তাহার ফলভোগ করিব না, এই বোধে, তাঁহারা ফল কামনা করেন না। অতএব আত্মতত্ত্বজ্ঞানই নিষ্কাম কস্মের মূল। এবং এই তত্ত্বের দ্বারা জ্ঞানযোগের এবং কস্মযোগের সমুচ্চয় হইতেছে। জ্ঞান ব্যতীত কস্ম নিষ্কাম হয় না, এবং নিষ্কাম কস্ম ব্যতীত জ্ঞানের পরিপাক হয় না। নিষ্কাম কস্মও অভ্যস্ত না হইলে ঘটে না। আমরা পরে দেখিব যে, কথিত হইতেছে—কস্ম হইতেই জ্ঞানে আরোহণ করিতে হয়। সে কথা বলিবার কারণ এইখানে নির্দিষ্ট হইল।

প্রকৃতেঃ গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকস্মসু।

তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ বিচালয়েৎ ॥ ২৯ ॥

যাহারা প্রকৃতির গুণে বিমূঢ়, তাহারা ইন্দ্রিয়ের কস্মে অনুরাগযুক্ত হয়। এই সকল মন্দবুদ্ধি অল্পজ্ঞান ব্যক্তিদিগকে জ্ঞানিগণ বিচালিত করিবেন না। ২৯।

অর্থাৎ তাহাদিগকে কস্মফলকামনা পরিত্যাগ করিতে বলিলে, তাহা তাহারা পারিবে না। তবে উপদেশ বা দৃষ্টান্তের ফলে এমত ঘটিতে পারে যে, তাহারা সকাম কস্ম পর্যন্ত পরিত্যাগ করিবে। সকাম কস্ম অভ্যস্ত না হইলে, নিষ্কাম কস্ম সম্ভবে না; এই জন্য তাহাদিগের বুদ্ধি বিচালিত করা বা বুদ্ধিভেদ জন্মান নিষিদ্ধ হইতেছে।

ময়ি সৰ্ব্বাণি কস্মাণি সংন্যস্যাত্মাচ্চেতসা।

নিরাশীনির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০ ॥

আমাতে সমস্ত কস্ম সমর্পণ করিয়া অধ্যাত্ম-জ্ঞানের দ্বারা নিষ্পহ, মমতাশূন্য ও শোকশূন্য হইয়া যুদ্ধ কর। ৩০।

গোড়ার কথাটা এই হইয়াছিল যে, অর্জুন আত্মীয় স্বজনকে হত্যা করিয়া তাদৃশ পাপ-কর্মের দ্বারা রাজ্য লাভ করিতে অনিচ্ছুক; অতএব যুদ্ধ করিবেন না স্থির করিলেন। তদন্তরে ভগবান্ প্রথমে আত্মজ্ঞানে তাঁহাকে উপদিষ্ট করিলেন। তার পর কর্মের মাহাত্ম্য ও অবশ্য-কর্তব্যতা বুঝাইলেন। বুঝাইলেন যে, সকলকে কর্ম করিতেই হয়। অন্য কর্ম না করিলেও জীবনযাত্রা নিব্বাহের জন্য কর্ম করিতে হয়। তবে যাহার আত্মজ্ঞান নাই, সে মূর্খ ফলকামনা করিয়া কর্ম করে, আর যে আত্মজ্ঞানী, সে নিষ্কাম হইয়া কর্ম করে; কিন্তু নিষ্কাম হইয়াই হউক, আর সকাম হইয়াই হউক, অনুষ্ঠেয় কর্ম করিতেই হইবে। যদি করিতেই হইল, তবে নিষ্কাম হইয়া করাই ভাল; কেন না, নিষ্কাম কর্মই পরম ধর্ম। অতএব তুমি নিষ্কাম হইয়া, ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া, রাজ্যলাভ হইবে বা না হইবে, সে চিন্তা না করিয়া, কর্মের ফলাফল ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া, যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের অনুষ্ঠেয় কর্ম বলিয়া নিব্বিকারচিত্তে যুদ্ধ কর।

যে মে মতমিদং নিত্যমনুর্নতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।

শ্রদ্ধাবন্তোহনসুয়ন্তো মূঢ়্যন্তে তেহপি কর্ম্মভিঃ ॥ ৩১ ॥

যে সকল মনুষ্য শ্রদ্ধাবান্ ও অসুয়াশূন্য হইয়া আমার এই মতের নিত্য অনুষ্ঠান করে, তাহারা কর্ম হইতে অর্থাৎ কর্মফলভোগ হইতে মুক্ত হয়। ৩১।

যে হেতদভ্যসুয়ন্তো নানুর্নতিষ্ঠন্তি মে মতম্।

সর্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২ ॥

যাহারা অসুয়াপরবশ হইয়া আমার এই মতের অনুষ্ঠান করে না, তাহাদিগকে সর্বজ্ঞান-বিমূঢ়, বিনষ্ট এবং বিবেকশূন্য বলিয়া জানিও। ৩২।

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতেজ্ঞানবানপি।

প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥

জ্ঞানবান্ও, যাহা আপন প্রকৃতির অনুকূল, সেইরূপই চেষ্টা করে। জীবগণ প্রকৃতিরই অনুগামী হয়। নিগ্রহে কোন ফল হয় না। ৩৩।

ইন্দ্রিয়স্যেইন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বेषৌ ব্যবস্থিতৌ।

তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪ ॥

ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের রাগদ্বেষ অবশ্যম্ভাবী। তাহার বশগামী হইও না; কেন না, তাহা শ্রেয়োমার্গের বিঘ্নকারক। ৩৪।

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মা বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মা ভয়াবহঃ ॥ ৩৫ ॥

পরধর্ম্মের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান অপেক্ষা স্বধর্ম্মের অসম্পূর্ণ অনুষ্ঠানও ভাল। বরং স্বধর্ম্মে নিধনও ভাল, পরধর্ম্ম ভয়াবহ। ৩৫।

তৈত্রিশ, চৌত্রিশ, পঞ্চত্রিশ—এই তিন শ্লোকে যাহা কথিত হইল, তাহার মর্ম্মার্থ বুঝাইতেছি। সকলেই আপন আপন প্রকৃতির বশ, ইহা পূর্বে কথিত হইয়াছে। জ্ঞানবান্ও আপন স্বভাবের অনুকূল যে কার্য, তাহাই করিয়া থাকেন। নিবেদ বা পীড়নের দ্বারাও আপন স্বভাবের প্রতিকূল কার্যে কাহাকে নিযুক্ত বা সুদক্ষ করা যায় না। কিন্তু লোকে যদি ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হয়, তবে সে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পরধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া থাকে। স্বধর্ম্ম কি, তাহা পূর্বে বুঝাইয়াছি। বর্ণাশ্রমধর্ম্মই যে স্বধর্ম্ম, এমন অর্থ করা যায় না। কেননা, যে সকল সমাজের মধ্যে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম নাই, সে সকল সমাজের প্রতি এই উপদেশ অপ্রযোজ্য হয়। কিন্তু ভগবদুক্ত ধর্ম্ম সার্বজনীন, মনুষ্য মাত্রেরই রক্ষা ও পরিগ্রাণের উপায়। অতএব স্বধর্ম্ম এইরূপই বুঝিতে হইবে যে, ইহজীবনে যে, যে কর্ম্মকে আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, তাহাই তাহার স্বধর্ম্ম। যে সমাজে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রচলিত, এবং যে সমাজে সে ধর্ম্ম প্রচলিত নহে, এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, বর্ণাশ্রমধর্ম্মীরা পুরুষ-পরম্পরায় একজাতীয় কার্য্যকেই আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। অন্য সমাজে, লোক আপন আপন ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, সুযোগ এবং শক্তি অনুসারে কর্ম্ম প্রবৃত্ত হয়। শক্তি ও প্রবৃত্তির অনুযায়ী বলিয়া অথবা আজীবন অভ্যস্ত বলিয়া স্বধর্ম্মই লোকের অনুকূল। কিন্তু অনেক সময়ে দেখা যায় যে, ইন্দ্রিয়াদির বশীভূত হইয়া, ধনাদির লোভে বিমূঢ় হইয়া, স্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক লোকে পরধর্ম্ম অবলম্বন করে। তাহাদের প্রায় ঘোরতর

বাংকম রচনাবলী

অমঙ্গল ঘটয়া থাকে। প্রাচীন ভাষ্যকারেরা এই অমঙ্গল পারলৌকিক অবস্থা সম্বন্ধেই বুবেন। কিন্তু ইহলোকেও যে স্বধর্মত্যাগ এবং পরধর্ম অবলম্বন অমঙ্গলের কারণ, তাহা আমরা পুনঃ পুনঃ দেখিতে পাই। যে সকল পুরুষ স্বধর্মে থাকিয়া, তাহার সদনুষ্ঠান জন্য প্রাণপণ যত্ন করেন, এবং তাহার সাধন জন্য মৃত্যু পর্য্যন্ত স্বীকার করেন, তাঁহারা ইহলোকে বীর বলিয়া বিখ্যাত হইয়া থাকেন; এবং স্বধর্মের অনুষ্ঠানে কৃতকার্য হইতে পারিলে, তাঁহারা ইহলোকে যথার্থ সুখী হইবেন। কিন্তু পরধর্ম অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ যাহা নিজের অনুষ্ঠেয় নয়, এমন কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া, তাহা সুসম্পন্ন করিতে পারিলেও, কেহ যে সুখী বা যশস্বী হইতে পারিয়াছেন, এমন দেখা যায় না। অতএব পরধর্মের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান অপেক্ষা স্বধর্মের অসম্পূর্ণ অনুষ্ঠানও ভাল। বরং স্বধর্ম মরণও ভাল, তথাপি পরধর্ম অবলম্বনীয় নহে।

অর্জুন উবাচ।

অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপশ্রুতি পুরুষঃ।

অচ্ছিন্নপি বর্ষেয় বলাদিব নিযোজিতঃ ॥ ৩৬ ॥

পরে অর্জুন বলিতেছেন—

হে বর্ষেয়! পুরুষ কাহার দ্বারা প্রযুক্ত হইয়া পাপাচরণ করে? কাহার নিয়োগে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলের দ্বারা পাপে নিযুক্ত হয়?। ৩৬।

পূর্বে কথা হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের রাগদ্বेष অবশ্যস্বাভাবী। পুরুষের ইচ্ছা না থাকিলেও সে স্বধর্মচ্যুত হইয়া উঠে, ইহাই এরূপ কথায় বুঝায়। অর্জুন এক্ষণে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, কেন এরূপ ঘটয়া থাকে? কে এরূপ করায়?

শ্রীভগবানুবাচ।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।

মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ব্যানমিহ বৈরিণম্ ॥ ৩৭ ॥

ইহা কাম। ইহা ক্রোধ। ইহা রজোগুণোৎপন্ন মহাশন এবং অত্যাগ্র। ইহলোকে ইহাকে শত্রু বিবেচনা করিবে। ৩৭।

আগে শব্দার্থ সকল বুঝা যাউক। রজোগুণ কি তাহা স্থানান্তরে কথিত হইবে। মহাশন অর্থে যে অধিক আহার করে। কাম দুঃস্পর্শীয়, এ জন্য মহাশন।

পাঠক দেখিবেন যে, কাম ক্রোধ উভয়েরই নামোল্লেখ হইয়াছে। কিন্তু একবচন ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে বুঝায় যে, কাম ও ক্রোধ একই; দুইটি পৃথক্ রিপূর কথা হইতেছে না। ভাষ্যকারেরা বুঝাইয়াছেন যে, কাম প্রতিহত হইলে অর্থাৎ বাধা পাইলে ক্রোধে পরিণত হয়; অতএব কাম ক্রোধ একই।

তবে কথাটা এই হইল যে, স্বধর্ম অনুষ্ঠানই শ্রেয়, কিন্তু ইহা সকলে পারে না। কেন না, স্বভাবই বলবান্; স্বভাবের বশীভূত বলিয়াই লোকে অনিচ্ছুক হইয়াই পরধর্মাশ্রয় করে; পাপাচরণ করে। ইহার কারণ, কামের বলশালিতা। কাম অর্থে রিপূরিশেষ না বুঝিয়া, সাধারণতঃ ইন্দ্রিয় মাত্রেরই বিষয়াকাম্পনা বুঝিলে, এই সকল শ্লোকের প্রকৃত উদার তাৎপর্য বুঝিতে পারা যাইবে।

ভগবদ্বাক্যের যথার্থ্য এবং সার্বজনীনতার প্রমাণস্বরূপ পরবর্তী দেশী বিদেশী ইতিহাস হইতে তিনটি উদাহরণ প্রয়োগ করিব।

প্রথম, রাজার স্বধর্ম—রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন। তিনি ধর্মপ্রচারক বা ধর্মনিয়ন্তা নহেন। এখানে Religion অর্থে ধর্ম শব্দ ব্যবহার করিতেছি। কিন্তু মধ্যকালে ইউরোপে রাজগণ ধর্মনিয়ন্তৃত্ব গ্রহণ করায় মনুষ্যজাতির কি ভয়ানক অমঙ্গল ঘটয়াছিল, তাহা ইতিহাসে সুপরিচিত। উদাহরণস্বরূপ St. Bartholomew, Sicilian Vespers এবং স্পেনের Inquisition, এই তিনটা নামের উত্থাপনই যথেষ্ট। কথিত আছে, পঞ্চম চার্লসের সময়ে এক Netherland দেশে দশ লক্ষ মনুষ্য কেবল রাজার ধর্ম হইতে ভিন্নধর্মাবলম্বী বলিয়া প্রাণে নিহত হইয়াছিল। আজকাল ইংরেজরাজ্যে ভারতবর্ষে রাজার এরূপ পরধর্মাবলম্বন প্রবৃত্তি থাকিলে ভারতবর্ষে কয় জন হিন্দু থাকিত?

দ্বিতীয় উদাহরণ, বাঙ্গালা দেশে ইংরেজরাজত্বের প্রথম সময়ে। রাজার ধর্ম ক্ষত্রিয়ধর্ম:

বাণিজ্য বৈশ্যের ধর্ম। রাজা এই সময়ে বৈশ্যধর্মাবলম্বন করিয়াছিলেন—East India Company বাণিজ্যব্যবসায়ী হইয়াছিলেন। ইহার ফল ঘটিয়াছিল বাঙ্গালার শিল্পনাশ, বাণিজ্যনাশ, অর্থনাশ। বাঙ্গালার কার্পাসবস্ত্র, পটুবস্ত্র, রেশম, পিন্ডুল, কাঁসা, সব ধ্বংসপূরে গেল;—আভ্যন্তরিক বাণিজ্য কতক একেবারে অন্তর্হিত হইল, কতক অন্যের হাতে গেল; বাঙ্গালা এমন দারিদ্র্য-সমুদ্রে ডুবিবল যে, আর উঠিল না। কোম্পানিকেও শেষ বাণিজ্য ছাড়িতে হইল। মানুষ সব ছাড়ে, আফিস ছাড়ে না। সে বাণিজ্যের এখনও আফিসটুকু আছে।

তৃতীয় উদাহরণ, আমেরিকার স্বাধীনতার আধুনিক স্বধর্মত্যাগে ও পৌরুষ কস্মের প্রবৃত্তি। ইহাতে ঘটিতেছে, স্বাধীনতার বৈষয়িক ভিন্ন প্রকার অবনতি, গৃহে উচ্ছৃঙ্খলতা এবং জাতীয় সুখহানি। যে স্বাধীনলোক স্বগর্ভসম্ভূত শিশুকে স্তন্যদানে অসমর্থ, তাহাকে স্মরণ করিয়া, সহমরণাভিলাষিণী হিন্দু মহিলা অবশ্যই বলিবেন,

স্বধর্ম নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।

ধূমেনারিয়তে বহির্থাদর্শো মলেন চ।

যথোল্বেগাবৃত্তো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃত্তম্ ॥ ৩৮ ॥

যেমন ধূমে বহি আবৃত, মলে দর্পণ এবং গর্ভ জরায়ুর দ্বারা আবৃত থাকে, তেমনই কামের দ্বারা (জ্ঞান) আবৃত থাকে। ৩৮।

“জ্ঞান” শব্দটি মূলে নাই,—তৎপরিবর্তে “ইদম্” আছে। কিন্তু পরশ্লোকে “জ্ঞান” শব্দই আবৃতের বিশেষ্য; এ জন্য এ শ্লোকের অনুবাদেও সেইরূপ করা গেল।

৩৩শ শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, জ্ঞানবান্ ও আপন প্রকৃতির অনুরূপ চেষ্টা করে।

“সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতেজ্ঞানবানপি”

জ্ঞানবান্ জ্ঞান থাকিতে কেন এরূপ করে? তাহাই বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন যে, জ্ঞান এই কামের দ্বারা আবৃত থাকে; জ্ঞান এ অবস্থায় অকস্মাৎ হয়।

উপমা তিনটি অতি চমৎকার; কিন্তু উপমার কোশল বুঝাইবার পূর্বে বলা আবশ্যিক। “মল” শব্দে শঙ্করাচার্য্য “মল” অর্থাৎ মলাই বুঝিয়াছেন। কিন্তু শ্রীধর স্বামী বলেন, “মলেন” কি না “আগন্তুকেন”। এ অবস্থায় দর্পণস্থ প্রতিবিম্ব যে “মল” শব্দের অভিপ্রেত, ইহাই বুঝিতে হইতেছে।

উপমা তিনটির প্রতি দৃষ্টি করা যাউক। যাহা উপমিত, এবং যাহা উপমেয়, উভয়ই স্বাভাবিক। বহির স্বাভাবিক আবরণ ধূম; দর্পণ থাকিলেই ছায়া বা প্রতিবিম্ব থাকিবে, নহিলে দর্পণত্ব নাই; এবং গর্ভেরও স্বাভাবিক আবরণ জরায়ু। তেমনই জ্ঞানের আবরণ কামও স্বাভাবিক। ইহা পূর্বেই কথিত আছে। উপমেয় ও উপমিত উভয়ই প্রকাশাত্মক; বহি প্রকাশাত্মক, দর্পণ প্রকাশাত্মক, গর্ভ প্রকাশাত্মক;—তেমনই জ্ঞানও প্রকাশাত্মক। প্রকাশের জন্য প্রয়োজন, ক্রিয়াবিশেষ। ফল্গুকারাদির দ্বারা ধূমাবরণ, অপসারণের দ্বারা বিম্বাবরণ এবং প্রসবের দ্বারা উল্বেগাবরণ বিনষ্ট হইয়া অগ্নি, দর্পণ, ও গর্ভের প্রকাশ হয়, তেমনই ইন্দ্রিয় দমনের দ্বারা কামাবরণ বিনষ্ট হইয়া জ্ঞানের প্রকাশ পায়। ইহা ৪১ শ্লোকে দেখিব।

আবৃত্তং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।

কামরূপেণ কোন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥ ৩৯ ॥

হে কোন্তেয়! জ্ঞানীদিগের নিত্যশত্রু, কামরূপে দুষ্পূর, এবং অগ্নিতুল্য হইয়া জ্ঞানকে আবৃত রাখে। ৩৯।

কামই জ্ঞানীদিগের নিত্যশত্রু। ভোগকালে সুখদায়ক, পরিণামে সুখদায়ক এবং ভোগকালেও যাহা নিষ্প্রয়োজনীয়, তাহার অনুসন্ধান প্রবৃত্ত করিয়া দুঃখদায়ক, এই জন্য নিত্যশত্রু*। ইহা দুষ্পূর—কেন না, কিছুতেই ইহার পূরণ নাই; এবং ইহা সন্তাপহেতু, এই জন্য অগ্নিতুল্য।

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানম্চ্যতে।

এতৈর্বিমোহয়তোষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥ ৪০ ॥

ইন্দ্রিয় সকল ও মন ও বুদ্ধি ইহার অধিষ্ঠান বলিয়া কথিত হইয়াছে। জ্ঞানকে আবৃত রাখিয়া, এই সকলের দ্বারা ইহা (কাম) আত্মাকে মুগ্ধ করে। ৪০।

বিক্রম রচনাবলী

এই কাম কাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে? ইন্দ্রিয় সকলকে এবং মন ও বুদ্ধিকে। আত্মা হইতে পৃথক্। আত্মাকে আশ্রয় করিতে পারে না। আত্মাকে বিমুক্ত করিয়া রাখে।

তস্মাত্তুমিন্দ্রিয়ান্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।

পাপ্‌মানং প্রজাহি হোনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥ ৪১ ॥

অতএব হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি আগে ইন্দ্রিয়গণকে নিয়ত করিয়া, জ্ঞানবিজ্ঞানবিনাশী পাপস্বরূপ কামকে বিনষ্ট (বা ত্যাগ) কর। ৪১।

যদি ইন্দ্রিয়গণই কামের অধিষ্ঠানভূমি, তবে আগে ইন্দ্রিয়গণকে নিয়ত করিতে হইবে। তাহা হইলে কামকে বিনষ্ট করা হইবে।

জ্ঞান বা বিজ্ঞানে প্রভেদ কি? শ্রীধর বলেন, জ্ঞান আত্মবিষয়ক, বিজ্ঞান শাস্ত্রীয় অথবা “জ্ঞান শাস্ত্রাচার্যের উপদেশজাত, বিজ্ঞান নির্দিধ্যাসজাত।” শঙ্করাচার্য বলেন, “জ্ঞান শাস্ত্র হইতে আচার্যালঙ্ক আত্মাদির অবরোধ। আর তাহার বিশেষ প্রকার অনুভবই বিজ্ঞান।” পাঠক এই ব্যাখ্যা অপেক্ষা শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যা প্রাজল বলিয়া গ্রহণ করিবেন। আমি বুঝি যে, এইটুকু বুঝিতে পারিলেই আমাদের মত লোকের পক্ষে যথেষ্ট হইবে যে, কাম সর্বপ্রকার জ্ঞান ও আত্মার উন্নতির বিনাশক।

ইন্দ্রিয়ানি পরাণ্যাহুর্নিদ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।

মনসস্থু পরা বুদ্ধিবুদ্ধৈর্ষ্যঃ পরতস্থু সং ॥ ৪২ ॥

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধদ্বা সংস্তুভ্যাত্মানমাশ্রন্য।

জাহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥ ৪৩ ॥

ইন্দ্রিয় সকল শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত; ইন্দ্রিয় সকল হইতে মন শ্রেষ্ঠ; মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ; বুদ্ধি হইতে তিনি শ্রেষ্ঠ। ৪২।

এইরূপ বুদ্ধির দ্বারা পরমাত্মাকে বুঝিয়া আপনাকে স্তম্ভিত করিয়া, হে মহাবাহো! তুমি কামরূপ দুরাসদ* শত্রুকে জয় কর। ৪৩।

পাঠক প্রথম ৪২ শ্লোকের প্রতি মনোযোগ করুন। ইহা অনুবাদে দুর্বোধ্য।

বলা হইতেছে যে, ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত। মন ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ, ইত্যাদি। তবে ইন্দ্রিয়গণ কাহা হইতে শ্রেষ্ঠ? ভাষ্যকারেরা বলেন, দেহাদি হইতে। তাহাই শ্লোকের অভিপ্রায় বটে, কিন্তু আধুনিক পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ইন্দ্রিয় কি দেহাদি হইতে স্বতন্ত্র?

অতএব প্রথমে বুঝিতে হয়, ইন্দ্রিয় কি। দর্শনশাস্ত্রে কহে, চক্ষুঃশ্রবণাদি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, হস্তপদাদি পাঁচটি কস্মে'ন্দ্রিয়, এবং মন অন্তরিন্দ্রিয়। কিন্তু এ শ্লোকে মনকে ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্ বলা হইতেছে। সুতরাং জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কস্মে'ন্দ্রিয়ই এখানে অভিপ্রেত।

দেহাদি হইতে ইহা শ্রেষ্ঠ হইল কিসে? ভাষ্যকারেরা বলেন, ইন্দ্রিয় সকল সূক্ষ্ম ও প্রকাশক, দেহাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য। কিন্তু এ কথা কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয় সম্বন্ধেই সত্য। আর জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল দেহাদি হইতে স্বতন্ত্র নহে। তবে স্পষ্টতঃ ভাষ্যকারেরা দেহাদি শব্দের দ্বারা স্থূল পদার্থ বা স্থূল ভূত অভিপ্রেত করিয়াছেন। স্থূল কথা এই যে, ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ।

বক্তার অভিপ্রায় কি, তাহা মূলে যে “আহুঃ” পদ আছে, তাহার প্রতি মনোযোগ করিলে সন্ধান পাওয়া যাইবে। বক্তা নিজের মত বলিয়া ইহা বলিতেছেন না, এইরূপ কথিত হইয়াছে বলিয়া বলিতেছেন। কে এরূপ বলিয়াছে? সাংখ্যদর্শন স্মরণ করিলেই এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে। তাহা বুঝাইতেছি।

সাংখ্যদর্শনে সমস্ত পদার্থ পঞ্চবিংশতি গণে বিভক্ত হইয়াছে। পর্যায়ক্রমে পঞ্চবিংশতি গণ এইরূপ।

১। প্রকৃতি।

২। মহৎ।

৩। অহংকার।

৪ হইতে ১৯। পঞ্চ তন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়।

২০-২৪। পঞ্চ স্থূল ভূত।

২৫। পুরুষ।

* দুরাসদ শব্দে দুর্বিজ্ঞেয়, শ্রীধর স্বামী বুঝিয়াছেন।

এই পর্যায়ের তাৎপর্য এই যে, প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহংকার, অহংকার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়; পঞ্চ তন্মাত্র হইতে স্থূল ভূত। পুরুষ পরমাত্মা।

এই পর্যায়ানুসারে স্থূল ভূত (ক্ষিত্যাদি, সুতরাং পাণ্ডুর্তিতিক দেহাদি) হইতে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ। এখানে মন ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্; কিন্তু সাংখ্যমতানুসারে মন ইন্দ্রিয় হইলে অন্যান্য ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ; কেন না, অন্যগদ্বি বহির্ইন্দ্রিয়; দ্বিতীয় গণ, অহংকারকে বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যে বুদ্ধি বলিয়াছেন। অতএব বুদ্ধি মন হইতে শ্রেষ্ঠ।

কিন্তু এমন বলিতে পারা যায় না, এই সাংখ্যদর্শন গীতাপ্রণয়নকালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তবে গীতাপ্রণয়নকালে ইহা হইতে ভিন্ন প্রকার সাংখ্যমত প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ গীতাতেই আছে। তাহারই সম্প্রসারণে কর্ণিল-প্রচারিত সাংখ্য। গীতার সপ্তমাধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে এইরূপ গণ কথিত হইয়াছে,—

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।

অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্মা প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪ ॥

আটটি মাত্র গণ কথিত হইল; পাঁচটি স্থূল ভূত, মন, বুদ্ধি এবং অহংকার। শঙ্করাচার্য্য বলেন, পঞ্চ ভূতের গণনাতেই পঞ্চ তন্মাত্র এবং ইন্দ্রিয় সকলের গণনা হইল বুদ্ধিতে হইবে।* আর পাঠক ইহাও দেখিবেন যে, ভগবান্ বলিতেছেন যে, এই আট প্রকার আমার প্রকৃতি। অতএব কর্ণিল সাংখ্যের সঙ্গে এ মতের প্রভেদও অতি গুরুতর।

যাহা হউক, শ্লোকোক্ত পারম্পর্য্য কতক বুঝা গেল। কিন্তু বুদ্ধির আর একটি অর্থ আছে। নিশ্চয়্যাত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তিকে বুদ্ধি বলা যায়।† এই অর্থে বুদ্ধি শব্দ যে গীতাতেই ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখিয়াছি। শ্লোকের অবশিষ্টাংশ বুদ্ধিব্যবহার জন্য এই অর্থ স্মরণ করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়দমনের উপায় কথিত হইতেছে। অন্য সমস্ত অন্তঃকরণবৃত্তি হইতে শ্রেষ্ঠ যে এই নিশ্চয়্যাত্মিকা বৃত্তি, পরমাত্মা তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ।

এখন ৪৩ শ্লোক সহজে বুঝিব। এই নিশ্চয়্যাত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা সেই পরমাত্মাকে বুঝিয়া, আপনাকে নিশ্চল করিয়া কামকে পরাজিত করিতে হইবে। ইহার অপেক্ষা ইন্দ্রিয়জয়ের উৎকৃষ্ট উপায় আর কোথাও কখন কথিত হইয়াছে, এমন জানি না।‡

ইতি মহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু পনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে কৰ্ম্মযোগো নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ।

* অপি চ দ্বয়োদশ অধ্যায়ে ৫।৬ শ্লোকে বলিতেছেন,

মহাভূতান্যহংকারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।

ইন্দ্রিয়াণি দশৈকণ্ড পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৫ ॥

ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।

এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিহারমুদাহৃতম্ ॥ ৬ ॥

ইহাতে কর্ণিল সাংখ্যের ১৩টি গণ আছে, মন ও আত্মা, আরও সাতটি আছে। ইহা গণ বা পদার্থ বলিয়া কথিত হইতেছে না; সমস্ত জগৎকে এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত করিবার উদ্দেশ্য নাই। অতএব কর্ণিল সাংখ্য নহে; বরং কর্ণিল সাংখ্যের মূল এইখানে আছে, এমন কথা বলা যাইতে পারে।

† বেদান্তসার—২৮।

‡ সভ্যসমাজে মনুষ্যের একটি ইন্দ্রিয় এত প্রবল দেখা যায় যে, “ইন্দ্রিয়দোষ” বলিলে সেই ইন্দ্রিয়ের দোষই বুঝায়। ইহার প্রাবল্য নিবারণের উপায় অনেকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, অনেকে জিজ্ঞাসা হইয়াও লজ্জার অনুরোধে প্রশ্ন করিতে পারেন না। অনেকে এমনও আছেন যে, ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন বা তাহাকে নিশ্চয়্যাত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা ধারণ করিতে অক্ষম। অতএব ইন্দ্রিয়দমনের ক্ষুদ্রতর যে সকল উপায় আছে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

(১) শারীরিক ব্যায়াম। ইহাতে শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ স্বাস্থ্য সাধিত হয়। শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ স্বাস্থ্য থাকিলে ইন্দ্রিয়ের দূষণীয় বেগ জন্মিতে পারে না।

(২) আহারের নিয়ম। উত্তেজক পানাহার পরিত্যাগ করিবে। মদ্যাদি বিশেষ নিষেধ। মৎস্য, মাংস একেবারে নিষেধ করা যায় না; বিশেষতঃ মৎস্যের অনেক সদৃশ আছে; কিন্তু মৎস্য ইন্দ্রিয়ের

বাংলা রচনাবলী

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীভগবানুবাচ।

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।

বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুর্ইক্ষ্বাকবেহব্রবীৎ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—

এই অব্যয় যোগ আমি সূর্য্যকে বলিয়াছিলাম। সূর্য্য মনুকে বলিয়াছিলেন, মনু ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন। ১।

এই যোগের ফল অব্যয়, এ জন্য ইহাকে অব্যয় বলা হইয়াছে। ইক্ষ্বাকু মনুর পুত্র, এবং সূর্য্যবংশীয় রাজগণের আদি পুরুষ।

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।

স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরস্তপ ॥ ২ ॥

এইরূপ পরম্পরাপ্রাপ্ত হইয়া এই যোগ রাজর্ষিগণ অবগত হইয়াছিলেন। হে পরস্তপ! এক্ষণে মহৎ কালপ্রভাবে সে যোগ নষ্ট হইয়াছে। ২।

(টীকা অনাবশ্যক।)

স এবায়ং ময়া তেহ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।

ভক্তোহসি মে সখা চোতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥ ৩ ॥

তুমি আমার ভক্ত ও সখা, সেই পুরাতন যোগ অদ্য আমি তোমাকে বলিলাম। এ প্রসঙ্গ উত্তম। ৩।

(টীকা অনাবশ্যক।)

অজ্জর্ন উবাচ।

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।

কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪ ॥

বিশেষ উত্তেজক। অতএব মৎস্য মাংসের অল্প ভোজনই ভাল। মৎস্য মাংসের এই দোষ জন্যই ব্রহ্মচারীর পক্ষে হিন্দুশাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে। মৎস্য হিন্দুমাংসেরই পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

(৩) আলস্য পরিত্যাগ। আলস্য ইন্দ্রিয়দোষের একটি অতিশয় গুরুতর কারণ। আলস্যে কুচিন্তার অবসর পাওয়া যায়,—অন্য চিন্তার অভাব থাকিলে ইন্দ্রিয়সুখচিন্তাই বলবতী হয়। অন্য কর্ম না থাকিলে, ইন্দ্রিয়পরিত্যক্তি চেষ্টাই প্রবল হয়। যাঁহার বিষয়কর্ম আছে, তিনি বিষয়কর্ম বিশেষ মনোনিবেশ করিবেন এবং অবসরকালেও বিষয়কর্মের উন্নতিচেষ্টা করিবেন। তাহাতে দ্বিবিধ শুভ ফল ফলিবে; ইন্দ্রিয়ও শাসিত থাকিবে এবং বিষয়কর্মেরও উন্নতি ঘটিবে। তবে এরূপ বিষয়কর্ম-চিন্তার দোষ এই ঘটে যে, লোক অত্যন্ত বিষয়ী হইয়া উঠে। সেটা মানসিক অবনতির কারণ হয়। অতএব যাঁহারা পারেন, তাঁহারা অবসরকালে সুসাহিত্য পাঠ বা বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিবেন। যাঁহারা শিক্ষার অভাবে তাহাতে অক্ষম বা অননুরাগী, তাঁহারা আপনার কার্য শেষ করিয়া পরের কার্য করিবেন। পরিবারবর্গের সহিত কথোপকথন, বালকবালিকাদিগের বিদ্যাশিক্ষার তত্ত্বাবধান, আপনার আয়ব্যয়ের তত্ত্বাবধান এবং প্রতিবাসিগণের সুখস্বচ্ছন্দ্যের তত্ত্বাবধানে সকলেই সমস্ত অবসরকাল অতিবাহিত করিতে পারেন। ইহাতে যাঁহাদের মন না যায়, তাঁহারা কোনও গুরুতর পরকার্যে নিযুক্ত হইতে পারেন। অনেকে একটা স্কুল বা একটা ডাক্তারখানা স্থাপন ও রক্ষণে ব্রতী হইয়া অনেক পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

(৪) অতি প্রধান উপায় কুসংসর্গ পরিত্যাগ। যাঁহারা ইন্দ্রিয়পরবশ, অশ্লীলভাষী, অশ্লীল আমোদ-প্রমোদে অনুরক্ত, তাঁহাদের ছায়াও পরিত্যাগ করিবে। ইহাদের দৃষ্টান্ত, প্ররোচনা ও কথোপকথনে দেবর্ষিগণও কলুষিত হইতে পারেন। সভ্য সমাজে বাসের একটি প্রধান অঙ্গ এই কুসংসর্গ।

(৫) সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায়—কেবল ঈশ্বরচিন্তার নীচে—পবিত্র দাম্পত্য-প্রণয়। এ বিষয়ে অধিক লিখিবার প্রয়োজন নাই।

এই সকল কথা যদিও গীতাব্যাখ্যার পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক, তথাপি ইহা লোকের পক্ষে অশেষ মঙ্গলকর বলিয়া এ স্থানে লিখিত হইল।

আপনার জন্ম পরে, সূর্যের জন্ম পূর্বে; আপনি যে ইহা পূর্বে বলিয়াছিলেন, তাহা কি প্রকারে বুঝিতে পারিব?।৪।

(টীকা অনাবশ্যক।)

শ্রীভগবানুবাচ।

বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চাজ্জুন।

তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেথ পরস্তপ ॥ ৫ ॥

আমার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে, তোমারও হইয়াছে। আমি সেগুলি সকলই অবগত আছি। হে পরস্তপ! তুমি জান না। ৫।

সহসা অবতারবাদের কথা উত্থাপিত হইল। কৰ্ম ও জ্ঞানের সম্বন্ধ বুঝিবার জন্য উহার প্রয়োজন আছে। আপাততঃ এই শ্লোকগুলির ভাবে বোধ হয়, যেন অজ্জুন অবতারতত্ত্ব অবগত ছিলেন না। এ সম্বন্ধে কয়েকটা কথা স্মরণ রাখা কৰ্তব্য।

প্রথমতঃ, মহাভারতের অনেক স্থলে শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু ঈশ্বরের কথা বলা হইয়াছে, ইহা সত্য বটে। কিন্তু কৃষ্ণচরিত্র নামক মৎপ্রণীত গ্রন্থে বৃষ্ণাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, মহাভারতের সকল অংশ এক সময়ের নহে; এবং যে সকল অংশে কৃষ্ণের অবতারত্ব আরোপিত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। দ্বিতীয়তঃ, মহাভারতে দশ অবতারের কথা মাত্র নাই, এবং ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম অষ্টম অবতার শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে একত্র বিদ্যমান। তৃতীয়তঃ, দশ অবতারের কথা অপেক্ষাকৃত আধুনিক পুরাণগুলিতে আছে; কিন্তু পুরাণে আবার ভিন্ন প্রকারও আছে। ভাগবতে আছে, অবতার বাইশটি; আবার এ কথাও আছে যে, অবতার অসংখ্য। শ্রীকৃষ্ণও এখানে আটটি, কি দশটি, কি বাইশটির কথা বলিতেছেন না। “বহু” অবতারের কথা বলিতেছেন। ভাগবতের “অসংখ্য” এবং এই “বহু” শব্দ একার্থবাচক সন্দেহ নাই।

অজোহপি সন্নব্যাত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্।

প্রকৃতিং স্বামিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মায়মায়া ॥ ৬ ॥

আমি অজ; আমি অব্যাত্মা; সর্বভূতের ঈশ্বর; তাহা হইয়াও আপন প্রকৃতি বশীকৃত করিয়া আপন মায়ায় জন্মগ্রহণ করি। ৬।

অজ—জন্মরহিত।

অব্যাত্মা—যাঁহার জ্ঞানশক্তির ক্ষয় নাই (শঙ্কর)।

ঈশ্বর—কৰ্মপারতন্ত্র্য-রহিত (শ্রীধর)।

প্রকৃতি—ত্রিগুণাত্মিকা মায়া, সর্বজগৎ যাহার বশীভূত।

এতদ্ব্যতীত মূলে যে “অধিষ্ঠায়” শব্দ আছে, শঙ্করাচার্য্য তাহার অর্থ “বশীকৃত্য” লিখিয়াছেন, কিন্তু শ্রীধর স্বামী “স্বীকৃত্য” লিখিয়াছেন। শঙ্করকৃত ব্যাখ্যা অধিকতর সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করা গিয়াছে।

স্থূল কথা এই যে, ভগবানের কথায় এই আপত্তি হইতে পারে, যিনি জন্মরহিত, তাঁহার জন্ম হইল কি প্রকারে? জ্ঞানে মোক্ষ;—যাঁহার জ্ঞান অক্ষয়, তাঁহার জন্ম হইবে কেন? জন্ম কৰ্মাধীন,—যিনি ঈশ্বর, এ জন্য কৰ্মের অনধীন, তাঁহার জন্ম কেন?

উত্তরে ভগবান্ যাহা বলিয়াছেন, শঙ্করাচার্য্য তাহার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। আমার যে স্বপ্রকৃতি, অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তম ইতি ত্রিগুণাত্মিকা বৈষ্ণবী মায়া, সমস্ত জগৎ যাহার বশে আছে, যদ্বারা মোহিত হইয়া আমাকে বাসুদেব বলিয়া জানিতে পারে না, সেই প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া আমি জন্মগ্রহণ করি। আপনার মায়ায়—কি না, সাধারণ লোক যেমন পরমার্থনিবন্ধন জন্মগ্রহণ করে, এ সেরূপ নহে।

শ্রীধর স্বামী একটু ভিন্ন প্রকার অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ভগবান বলিতেছেন যে, আমি আপনার শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতি স্বীকার করিয়া, বিশুদ্ধ উজ্জ্বল সত্ত্বমূর্ত্তির দ্বারা স্বেচ্ছাক্রমে অবতীর্ণ হই।

কথাগুলি বড় জটিল। পাঠকের বুঝিবার সাহায্যার্থ দুই একটি কথা বলা উচিত।

“মায়া” ঈশ্বরের একটি শক্তি। এই মায়া, হিন্দুদিগের ঈশ্বরতত্ত্বে, বিশেষতঃ উপনিষদে ও দর্শনশাস্ত্রে অতি প্রধান স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। সাধারণতঃ বেদান্তে মায়া কিরূপে পরিচিত হইয়াছে, তাহা অনুসন্ধান করিবার আমাদের প্রয়োজন নাই। এই গীতাতেই মায়া কিরূপ

বিক্রম রচনাবলী

বুঝান হইয়াছে, তাহাই বুঝাইতেছি। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে, তৃতীয় অধ্যায়ের ৪২ শ্লোকের টীকায় আমরা গীতার সপ্তম অধ্যায় হইতে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছিলাম,—

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বৃদ্ধিরেব চ।

অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪ ॥

ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, আমার ভিন্ন ভিন্ন অষ্ট প্রকার প্রকৃতি। ৪। ইহা বলিয়াই বলিতেছেন—

অপরেয়ামিতস্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥ ৫ ॥

ইহা আমার অপরা বা নিকৃষ্টা প্রকৃতি; আমার পরা বা উৎকৃষ্টা প্রকৃতিও জান। ইনি জীবভূতা, এবং ইনি জগৎ ধারণ করিয়া আছেন। ৫।

তবে ঈশ্বরের যে শক্তি জীবস্বরূপা, এবং যাহা জগৎকে ধারণ করিয়া আছে, তাহাই তাঁহার পরা প্রকৃতি বা মায়ী। আপনার জীবস্বরূপা এই শক্তিতে ভগবান্ জীবসৃষ্টি করিয়াছেন, সেই শক্তিকে বশীভূত করিয়া আপনার স্বত্বকে জীবরূপী করিতে পারেন।

ঈশ্বর শরীর ধারণপূর্বক অবতীর্ণ হইতে পারেন না, ইহার বিচার নিঃপ্রয়োজন; কেন না, তিনি ইচ্ছাময় ও সর্বশক্তিমান্,—পারেন না, এমন কথা বলিলে তাঁহার শক্তির সীমা নির্দেশ করা হয়। ঈশ্বর শরীরী হইয়া অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব কি না, সে স্বতন্ত্র কথা। তাহার বিচার আমি গ্রন্থান্তরে* যথাসাধ্য করিয়াছি—পুনরুদ্ধার প্রয়োজন নাই। আর শরীর ধারণপূর্বক ঈশ্বর অবতীর্ণ হওয়ার কোন প্রয়োজন আছে কি না, ভগবান্ নিজেই পরশ্লোকদ্বয়ে তাহা বলিতেছেন।

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥

পরিচ্রাণায় সাধুনাম্ বিনাশায় চ দৃক্ষুতাম্।

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮ ॥

যে যে সময়ে ধর্মের ক্ষীণতা এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, আমি সেই সেই সময়ে আপনাকে সৃজন করি। ৭।

সাধুগণের পরিচ্রাণহেতু, দৃক্ষুতকারীদের বিনাশার্থ এবং ধর্মসংস্থাপনার্থ আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি। ৮।

জন্ম কৰ্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।

তত্ত্বদ্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জ্জুন ॥ ৯ ॥

হে অর্জুন! আমার জন্ম কৰ্ম দিব্য। ইহা যে তত্ত্বতঃ জ্ঞাত হয়, সে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয় না,—আমাকে প্রাপ্ত হয়। ৯।

দিব্য অর্থে “অপ্রাকৃত”, “ঐশ্বর” বা “অলৌকিক”।

ভগবানের মানবিক জন্ম কৰ্ম তত্ত্বতঃ জানিলে মোক্ষলাভ হইবে কেন? আমি কৃষ্ণচরিত্র-বিষয়ক গ্রন্থে এইরূপ বুঝাইয়াছি যে, মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রকাশের জন্য ভগবানের মানবদেহ ধারণ। অন্য উদ্দেশ্য সম্ভবে না। আদর্শ মনুষ্য, আদর্শ কৰ্মী। অতএব কৰ্মযোগীর পক্ষে আদর্শ কৰ্মীর কৰ্ম তত্ত্বতঃ বুঝা আবশ্যিক। তদ্ব্যতীত কৰ্মযোগ, অন্ধকারে লোষ্ট্রক্ষেপ। যদি ইহা না স্বীকার করা যায়, তবে কৰ্মযোগ কখনকালে এই অবতারতত্ত্ব উত্থাপনের কোনও প্রয়োজন দেখা যায় না। যিনি ভগবানের আদর্শকৰ্মি বুদ্ধিতে চেষ্টা করিবেন, তিনি কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থ বিস্তারশঃ পাঠ করিলে বুদ্ধিতে পারিবেন। আর একটা অর্থ না হয়, এমন নহে। যাহাকে দার্শনিকেরা জ্ঞানমার্গ কহেন, তাহার অর্থ এইরূপ প্রসিদ্ধ, ব্রহ্মজ্ঞানই মুক্তির পথ। ব্রহ্মকে জানিতে হইবে, কিন্তু ব্রহ্ম কি? ব্রহ্ম নিরাকার, নিরঞ্জন, অপরিচ্ছিন্ন, নিত্য, শুদ্ধমুদ্র, সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ। এই ব্রহ্মকে জানিলেই মুক্তিলাভ হয়। কিন্তু অবতীর্ণ এবং শরীরবিশিষ্ট যে ঈশ্বর, তাঁহাকে নিরাকার ইত্যাদি বলা যাইতে পারে না। তবে কি অবতীর্ণ

* কৃষ্ণচরিত্র, প্রথম খণ্ডে।

† এই সকলের কথাও আমি কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম খণ্ডে বিচার করিয়াছি। পুনরুদ্ধার অনাবশ্যিক।

এবং শরীরবিশিষ্ট ঈশ্বরের জ্ঞানে কোনও ফলোদয় নাই, তাঁহার উপাসনায় মুক্তির সম্ভাবনা নাই? এই শ্লোকে সে সংশয় নিরাকৃত হইতেছে। অবতীর্ণ এবং শরীরী ঈশ্বরের দিব্য জন্ম কৰ্ম্ম তত্ত্বতঃ জানিলেও মুক্তিলাভ হইতে পারে। কিন্তু তত্ত্বতঃ জানিতে হইবে। যাহাকে তাহাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া জানিলে সে লাভ নাই।

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।

বহবো জ্ঞানতপসা পুত্ৰা মন্তাবমাগতাঃ ॥ ১০ ॥

বীতরাগভয়ক্রোধ, মন্ময়, আমাতে উপাশ্রিত, জ্ঞানতপস্যার দ্বারা পুত্র অনেকে মন্তাবগত হইয়াছে। ১০।

প্রথমে কথার অর্থ। রাগ—অনুরাগ। মন্ময়—ব্রহ্মবিৎ, ঈশ্বরভেদজ্ঞানরহিত। আমাতে উপাশ্রিত। শঙ্কর বলেন, কেবল জ্ঞাননিষ্ঠ; শ্রীধর বলেন, মৎপ্রসাদলব্ধ মন্তাবগত, ঈশ্বরভাবগত, মোক্ষপ্রাপ্ত।

ভাষ্যকারেরা বলেন যে, এ কথা এখানে বলিবার কারণ এই যে, আমাতে ভক্তিবাদ এই নূতন প্রচারিত হইতেছে না। পূর্বেও অনেকে ঈদৃশ জ্ঞানতপের দ্বারা মোক্ষলাভ করিয়াছেন। তাহাই বটে, কিন্তু বেশীর ভাগ এইটুকু বুঝা কর্তব্য যে, যাঁহারা আদর্শ কৰ্ম্মীর কৰ্ম্মের মন্ময় বুদ্ধিয়া কৰ্ম্ম করিয়াছেন, তাঁহাদেরই কথা হইতেছে। পরবর্তী পঞ্চদশ শ্লোক পাঠ করিলেই ইহা বুঝা যাইবে। ইহা বুঝিতে না পারিলে কৰ্ম্মযোগের সঙ্গে এই সকল কথার কোনও সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যাইবে না।

নিষ্কাম কৰ্ম্মের পক্ষে রাগভয়ক্রোধ থাকিবে না, ঈশ্বরে অভেদ জ্ঞান থাকিবে, এবং জ্ঞান ও তপের (Spiritual culture) দ্বারা চরিত্র বিশুদ্ধীকৃত হইবে। ইহা না হইলে কৰ্ম্ম নিষ্কাম হইবে না।

সকলেই নিষ্কামকৰ্ম্মী হইতে পারে না। যাহারা সকাম কৰ্ম্ম করে, তাহাদের কৰ্ম্মের কি কোন ফল নাই? ঈশ্বর সকল কৰ্ম্মের ফলবিধাতা। ইহা পরবর্তী দুই শ্লোকে কথিত হইতেছে।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।

মম বর্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ১১ ॥

যে আমাকে যে ভাবে উপাসনা করে, আমি তাহাকে সেই ভাবেই তুষ্ট করি। মনুষ্য সর্বপ্রকারে আমার পথের অনুবর্তী হয়। ১১।

অগ্রে প্রথম চরণ বুঝা যাউক। অর্জুন বলিতে পারেন, “প্রভো! আসল কথাটা কি, তা ত এখনও বুঝাও নাই। নিষ্কাম কৰ্ম্মই তোমাকে পাইব, আর সকাম কৰ্ম্ম কিছুর পাইব না কি? সেগুলো কি পশুশ্রম?” ভগবান্ এই সংশয়চ্ছেদ করিতেছেন। সকলেই একই প্রকার চিন্তাভাবের অধীন হইয়া আমার উপাসনা করে না। যে যে-ভাবে আমার উপাসনা করে, তাহাকে সেইরূপ ফল দান করি। যে যাহা কামনা করিয়া আমার উপাসনা করে, তাহার সেই কামনা পূর্ণ করি। যে কোনও কামনা করে না,—অর্থাৎ যে নিষ্কাম, সে আমায় পায়। কামনা-ভাবে তাহার কামনা পূর্ণ হয় না, কিন্তু সে আমায় পায়।

তার পর দ্বিতীয় চরণ। “মনুষ্য সর্বপ্রকারে আমার পথের অনুবর্তী হয়,” এ কথার অর্থ সহসা এই বোধ হয় যে, “আমি যে পথে চলি, মানুষ সর্বপ্রকারে সেই পথে চলে।” এখানে সে অর্থ নহে—গীতাকারের “Idiom” ঠিক আমাদের “Idiom” সঙ্গে মিলিবে, এমন প্রত্যাশা করা যায় না। এ চরণের অর্থ এই যে, “উপাসনার বিষয়ে মনুষ্য যে পথই অবলম্বন করুক না, আমি যে পথে আছি, সেই পথেই মানুষকে আসিতে হইবে।” “মানুষ যে-দেবতারই পূজা করুক না কেন, সে আমারই পূজা করা হইবে; কেন না, এক ভিন্ন দেবতা নাই। আমিই সর্বদেব—অন্য দেবের পূজার ফল আমিই কামনানুরূপ দিই। এমন কি, যদি মানুষ দেবোপাসনা না করিয়া কেবল ইন্দ্রিয়াদির সেবা করে, তবে সেও আমার সেবা। কেন না, জগতে আমি ছাড়া কিছুর নাই—ইন্দ্রিয়াদিও আমি, আমিই ইন্দ্রিয়াদিস্বরূপে ইন্দ্রিয়াদির ফল দিই। ইহা নিকৃষ্ট ও দুঃখময় ফল বটে, কিন্তু যেমন উপাসনা ও কামনা, তদনুরূপ ফল দান করি।”

পৃথিবীতে বহুবিধ উপাসনাপদ্ধতি প্রচলিত আছে। কেহ নিরাকারের, কেহ সাকারের উপাসনা করেন। কেহ একমাত্র জগদীশ্বরের, কেহ বহু দেবতার উপাসনা করেন; কোনও জাতি ভূতযোনির, কোনও জাতি বা পিতৃলোকের, কেহ সজীবের, কেহ নির্জীবের, কেহ মনুষ্যের,

বিক্রম রচনাবলী

কেহ গবাদি পশুর, কেহ বা বৃক্ষের বা প্রস্তরখণ্ডের উপাসনা করে। এই সকলই উপাসনা; কিন্তু ইহার মধ্যে উৎকর্ষাপকর্ষ আছে, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু সে উৎকর্ষাপকর্ষ কেবল উপাসকের জ্ঞানের পরিমাণ মাত্র। যে নিতান্ত অজ্ঞ, সে পৃথিপার্শ্বে পুষ্পচন্দনসিন্দুরাক্ত শিলাখণ্ড দেখিয়া, তাহাতে আবার পুষ্পচন্দন সিন্দুর লেপিয়া যায়; যে কিঞ্চিৎ জানিয়াছে, সে না হয়, নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক। কিন্তু ঈশ্বরের প্রকৃতির পরিমাণজ্ঞান সম্বন্ধে দুই জনেই প্রায় তুল্য অন্ধ। যে হিমালয় পর্বতকে বল্মীক-পরিমিত মনে করে, আর যে তাহাকে বপ্র-পরিমিত মনে করে, এ উভয়ে সমান অন্ধ। ব্রহ্মবাদীও ঈশ্বরস্বরূপ অবগত নহেন—শিলাখণ্ডের উপাসকও নহে। তবে একজনের উপাসনা ঈশ্বরের নিকট গ্রাহ্য, আর একজনের অগ্রাহ্য ইহা কি প্রকারে বলা যাইবে? হয় কাহারও উপাসনা ঈশ্বরের গ্রাহ্য নহে, নয় সকল উপাসনাই গ্রাহ্য। স্থূল কথা, উপাসনা আমাদের চিত্তবৃত্তির, আমাদের জীবনের পবিত্রতা সাধন জন্য—ঈশ্বরের তৃষ্টিসাধন জন্য নহে। যিনি অনন্ত আনন্দময়, যিনি তৃষ্টি অতৃষ্টির অতীত, উপাসনা দ্বারা আমরা তাঁহার তৃষ্টিবিধান করিতে পারি না। তবে ইহা যদি সত্য হয় যে, তিনি বিচারক—কেন না, কস্মের ফলবিধাতা—তবে যাহা তাঁহার বিশুদ্ধ স্বভাবের অনুমোদিত, সেই উপাসনাই তাঁহার গ্রাহ্য হইতে পারে। যে উপাসনা কপট, কেবল লোকের কাছে ধার্মিক বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভের উপায়স্বরূপ, তাহা তাঁহার গ্রাহ্য নহে—কেন না, তিনি অন্তর্ধামী। আর যে উপাসনা আন্তরিক, তাহা দ্রাস্ত হইলেও তাঁহার কাছে গ্রাহ্য। যিনি নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক বা তপস্চারী, তাঁহার উপাসনা যদি কেবল লোকের কাছে পসার করিবার জন্য হয়, তাহার অপেক্ষা যে অভাগী পুত্রের মঙ্গল কামনায় ষষ্ঠীতলায় মাথা কুটে, তাহার উপাসনাই অধিক পরিমাণে ভগবানের গ্রাহ্য বলিয়া বোধ হয়।

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য বুঝিলে, পৃথিবীতে আর ধর্মগত পার্থক্য থাকে না;—হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টীয়ান, জৈন, নিরাকারবাদী, সাকারবাদী, বহুদেবোপাসক, জড়োপাসক, সকলেই সেই এক ঈশ্বরের উপাসক—যে পথে তিনি আছেন, সেই পথে সকলেই যায়। এই শ্লোকোক্ত ধর্মই জগতে একমাত্র অসাম্প্রদায়িক ধর্ম। এক মাত্র সর্বজনাবলম্বনীয় ধর্ম। ইহাও প্রকৃত হিন্দুধর্ম। হিন্দুধর্মের তুল্য উদার ধর্ম আর নাই—আর এই শ্লোকের তুল্য উদার মহাবাক্যও আর নাই।

কাঙ্ক্ষন্তঃ কস্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ ।

ক্ষিপ্ৰং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কস্মজা ॥ ১২ ॥

ইহলোকে যাহারা কস্মসিদ্ধি কামনা করে, তাহারা দেবগণের আরাধনা করে। এবং শীঘ্র মনুষ্যালোকেই তাহাদের কস্মসিদ্ধি হয়। ১২।

অর্থাৎ সচরাচর মনুষ্য কস্মফল কামনা করিয়া দেবগণের আরাধনা করে এবং ইহলোকেই সেই অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হয়।

সে ফল সামান্য। নিস্কাম কস্মের ফল অতি মহৎ। তবে মহৎ ফলের আশা না করিয়া, লোকে সামান্য ফলের চেষ্টা করে কেন? ইহা মনুষ্যের স্বভাব যে, যে-সুখ শীঘ্র পাওয়া যাইবে, তাহা ক্ষুদ্র হইলেও, মনুষ্য তাহারই চেষ্টা করে।

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকস্মবিভাগশঃ ।

তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্যাকর্তারমবায়ম্ ॥ ১৩ ॥

গুণ ও কস্মের বিভাগ অনুসারে আমি চারি বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি বটে, কিন্তু আমি তাহার (সৃষ্টি)কর্তা হইলেও আমাকে অকর্তা ও বিকার-রহিত জানিও। ১৩।

হিন্দুশাস্ত্রের সাধারণ উক্তি এই যে, ব্রাহ্মণবর্ণ সৃষ্টিকর্তার মুখ হইতে, ক্ষত্রিয় বাহু হইতে, বৈশ্য উরু হইতে এবং শূদ্র চরণ হইতে সৃষ্ট হয়। কিন্তু গুণকস্মবিভাগশঃ চাতুর্বর্ণ্য সৃষ্ট হইয়াছে, এই কথা হিন্দুশাস্ত্রের কথিত সাধারণ উক্তির সঙ্গে আপাততঃ সঙ্গত বোধ হয় না। নানা কারণে এ কথাটার বিস্তারিত বিচার আবশ্যিক।

প্রথমতঃ দেখা যায়, হিন্দুশাস্ত্রের কথিত সাধারণ উক্তির আদি বিখ্যাত পুরুষসূক্তে।

ঋগ্বেদসংহিতার দশম মন্ডলের নবমিতম সূক্তকে পুরুষসূক্ত কহে। উহার প্রথম ঋক্ “সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ” ইত্যাদি ব্রাহ্মণগণ আজও বিষ্ণুপূজাকালে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ—যাঁহারা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন যে, বৈদিক কালে জাতিভেদ

ছিল না,—তাঁহারা বলেন যে, এই সূক্ত আধুনিক। আমাদের সে বিচারে প্রয়োজন নাই। বৈদিক সূক্ত সবই অতি প্রাচীন, ইহা কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। আমার বলিবার কথা, ঐ সূক্তে যাহা আছে, তাহাতে ঠিক এমন বুঝায় না যে, মুখ হইতে ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইয়াছে, বাহু হইতে ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে, ইত্যাদি। সেই ঋক্-গুণি উদ্ধৃত করিতেছি—

“ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদ্বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ ।

উরু তদস্য যদৈশ্যঃ পদ্য্যং শূদ্রোহজায়ত ॥”

শূদ্রের সম্বন্ধে “অজায়ত” বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ সেই পুরুষের মুখ হইলেন এবং ক্ষত্রিয় বাহু (কৃত) হইলেন।* বৈশ্য সম্বন্ধেও বলা হইয়াছে যে, ইঁহার উরুই বৈশ্য।

বেদের মধ্যে কেবল তৈত্তিরীয় সংহিতায় পাওয়া যায় যে, প্রজাপতি মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, মধ্যভাগ হইতে (মধ্যতঃ) বৈশ্য, এবং চরণ হইতে শূদ্র সৃষ্টি করিলেন।

কিন্তু বেদের অন্যান্য ভাগে, চাতুর্বর্ণ্যের সৃষ্টি অন্য প্রকার কথিত হইয়াছে। শতপথ-ব্রাহ্মণে কথিত হইয়াছে, যথা—

“ভূরিতি বৈ প্রজাপতিরক্ষ অজনয়ত। ভুব ইতি ক্ষত্রং স্বরিতি বিশম্।” শূদ্রের কথা নাই।†

পুনশ্চ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে—

“ঋগ্ভো জাতং বৈশ্যং বর্ণমাহুঃ যজুর্ষেদং ক্ষত্রিয়স্যাহুর্ষোনিম্। সামবেদো ব্রাহ্মণানাং প্রসূতিঃ।”‡ অর্থাৎ সামবেদ হইতে ব্রাহ্মণের, যজুর্ষেদ হইতে ক্ষত্রিয়ের এবং ঋগ্বেদ হইতে বৈশ্যের জন্ম। এখানেও শূদ্রের কথা নাই।

* ডাক্তার হোগ্ এই ঋক্ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—“Now, according to this passage, which is the most ancient and authoritative, we have on the origin of Brahmanism, and *caste in general*, the Brahmana has not come from the mouth of this primary being, the Purusha, but the mouth of the latter became the Brahmanical caste, that is to say, was transformed into it. The passage has no doubt an allegorical sense. (বেদের অনেক সূক্তে তাই) Mouth is the seat of speech. The allegory points out that the Brahmans are teachers and instructors of mankind. The arms are the seat of strength. If the two arms of the Purusha are said to have been made of Kshatriya (warrior), that means, then, that the Kshatriyas have to carry arms to defend the empire. That the thighs of the Purusha were transformed into Vaisya, that, as the lower parts of the body are the principal repository of food taken, the Vaisya caste is destined to provide food for the others.” এটুকু বড় কষ্ট কল্পনা,—উরুতে ডাল ভাত যায় না—কিন্তু এ সকল স্থানে উদর শব্দের প্রয়োগও হিন্দুশাস্ত্রে দেখা যায়। যথা—মহাভারতের শান্তিপর্বে ৪৭ অধ্যায়ে—

“ব্রহ্ম বক্তং ভূজৌ ক্ষত্রং কৃৎস্নমূরুদরং বিশঃ” তার পর) “The creation of the Sudra from the feet of the Purusha indicates that he is destined to be a servant to the others, just as the foot supports the other parts of the body as a firm support.” Dr. Haug on the origin of Brahmanism, p. 4.

Dr. Muirও বলেন, “It is indeed said that the Sudra sprang from Purusha’s feet; but as regards the three superior castes and the members with which they are respectively connected, it is not quite clear which (*i.e.*) the castes or the members are to be taken as subjects, and which as the predicates, and consequently, whether we are to suppose verse 12, (উদ্ধৃত ঋক্) to declare that the three castes were the three members or conversely that the three members were, or became the three castes.” *Sanskrit Texts*, Vol. II, p. 15, 2nd edition.

† ২।১।৪।১১ ইত্যাদি।

‡ ৩।১২।১।২

বিক্রম রচনাবলী

উদাহরণস্বরূপ এই মতগুলি উদ্ধৃত করা গেল। এমন আরও অনেক আছে। সকল উদ্ধৃত করিতে গেলে পাঠকের বিরক্তিকর হইবে। স্থূল কথা, হিন্দুশাস্ত্রে চাতুর্স্বর্ণ্য উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা প্রকার মত আছে। শ্রীকৃষ্ণও যাহা বলিতেছেন, তাহাও সাধারণ মত হইতে ভিন্ন বলিয়া আপাততঃ বোধ হইতে পারে। তিনি বলেন না যে, আমি আমার অঙ্গবিশেষ হইতে বর্ণবিশেষ সৃষ্টি করিয়াছি। তিনি বলেন, গুণকর্মের বিভাগানুসারে করিয়াছি। প্রথমে দেখা যাউক, গুণ কাহাকে বলে।

সত্ত্বরজস্তম এই তিন গুণ। ভাষ্যকারেরা বলেন, সত্ত্বপ্রধান ব্রাহ্মণ, তাহাদিগের কর্ম শমদমাদি; সত্ত্বরজঃপ্রধান ক্ষত্রিয়, তাহাদিগের কর্ম শৌর্য্য যুদ্ধাদি; রজস্তমঃপ্রধান বৈশ্য, তাহাদিগের কর্ম কৃষিবাণিজ্যাদি; তমঃপ্রধান শূদ্র, তাহাদিগের কর্ম অন্য তিন বর্ণের সেবা। এইরূপ গুণকর্মের বিভাগ অনুসারে সৃষ্টি করিয়াছি, ইহাই ভগবদাভিপ্রায়।

এক্ষণে যে জন্মিবে, সে গর্ভে জন্মিবার পূর্বেই সত্ত্বগুণাধিক্য, রজোগুণাধিক্য বা তমোগুণাধিক্য ইত্যাদি প্রকৃতি সৃষ্টি হয়?

যিনি বলিবেন যে, আগে জীবের জন্ম, তার পর তাহার সত্ত্বপ্রধানাদি স্বভাব, তাঁহাকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, মনুষ্যের বংশানুসারে নহে, গুণানুসারে তাহার ব্রাহ্মণত্বাদি। ব্রাহ্মণের পুত্র হইলেই তাহাকে ব্রাহ্মণ হইতে হইবে, এমন নহে; সত্ত্বগুণপ্রধান স্বভাব হইলে শূদ্রের পুত্র হইলেও ব্রাহ্মণ হইবে এবং ব্রাহ্মণের পুত্রের তমোগুণপ্রধান স্বভাব হইলে সে শূদ্র হইবে, ভগবদ্বাক্য হইতে ইহাই সহজ উপলব্ধি।

আমি যে একটা নতুন মত নিজে গাড়িয়া প্রচার করিতেছি, তাহা নহে। প্রাচীন কালে, শঙ্কর শ্রীধরের অনেক পূর্বে প্রাচীন ঋষিগণও এই মত প্রচার করিয়াছিলেন। ধর্মতত্ত্বে তাহার কিছুর প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি, যথা—

ক্ষান্তং দান্তং জিতক্রোধং জিতাত্মানং জিতেন্দ্রিয়ম্।

তমেব ব্রাহ্মণং মন্যে শেযাঃ শূদ্রা ইতি স্মৃতাঃ॥

পুনশ্চ—

অগ্নিহোত্ররতপরান্ স্বাধ্যায়নিরতান্ শূচীন্।

উপবাসরতান্ দান্তাংস্তান্ দেবা ব্রাহ্মণান্ বিদুঃ॥

ন জাতিঃ পূজ্যতে রাজন্ গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ।

চন্ডালমপি বৃন্তস্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥

গোতমসংহিতা।

ক্ষমাবান্, দমশীল, জিতক্রোধ, এবং জিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়কেই ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে, আর সকলে শূদ্র। যাহারা অগ্নিহোত্ররতপর, স্বাধ্যায়নিরত, শূচি, উপবাসরত, দান্ত, দেবতারা তাহাদিগকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। হে রাজন্! জাতি পূজ্য নহে, গুণই কল্যাণকারক। চন্ডালও বৃন্তস্থ হইলে দেবতারা তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।

পুনশ্চ, মহাভারতের বনপর্বে মার্কণ্ডেয়সমস্যাপর্বাধ্যায়ে ২১৫ অধ্যায়ে ঋষিবাক্য আছে, “পাতিত্যজনক কুক্রিয়াসক্ত, দান্তিক ব্রাহ্মণ প্রাজ্ঞ হইলেও শূদ্রসদৃশ হয়, আর যে শূদ্র সত্য, দম ও ধর্ম সতত অনুরক্ত, তাহাকে আমি ব্রাহ্মণ বিবেচনা করি। কারণ, ব্যবহারেই ব্রাহ্মণ হয়।” পুনশ্চ বনপর্বে অজগরপর্বাধ্যায়ে ১৮০ অধ্যায়ে রাজর্ষি নহুষ বলিতেছেন, “বেদমূলক সত্য, দান, ক্ষমা, আনুশংস্যা, অহিংসা ও করুণা শূদ্রেও লক্ষিত হইতেছে। যদিপি সত্যাদি ব্রাহ্মণ-ধর্ম শূদ্রেও লক্ষিত হইল, তবে শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারে।” তদন্তরে যুধিষ্ঠির বলিতেছেন, “অনেক শূদ্রে ব্রাহ্মণলক্ষণ ও অনেক দ্বিজাতিতেও শূদ্রলক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে, অতএব শূদ্রবংশ্য হইলেই যে শূদ্র হয়, এবং ব্রাহ্মণবংশ্য হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, এরূপ নহে। কিন্তু যে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক ব্যবহার লক্ষিত হয়, তাহারাই ব্রাহ্মণ, এবং যে সকল ব্যক্তিতে লক্ষিত না হয়, তাহারাই শূদ্র।”

কিন্তু হইতোছিল নিষ্কাম ও সকাম কর্মের কথা, কর্মের ফলকামনার কথা,—চাতুর্স্বর্ণ্যের কথা আসিল কেন? কথাটা বলা হইয়াছে যে, কেহ ইহকালে আশুলভ্য ফলের কামনায় দেবদির যজ্ঞনা করে, কেহ বা নিষ্কাম কর্ম করিয়া থাকে। লোকের মধ্যে এরূপ বিসদৃশ আচরণ দেখা যায় কেন? তাহাদিগের প্রকৃতিভেদবশতঃ। এই প্রকৃতিভেদই চাতুর্স্বর্ণ্য বা বর্ণভেদ। কিন্তু

এই বর্ণভেদ কেন? ঈশ্বরেচ্ছা। ঈশ্বর ইহা করিয়াছেন। তবে ঈশ্বর কি কৰ্ম করেন? করেন বৈ কি। কিন্তু এরূপ কৰ্ম করিয়াও তিনি অকর্তা। কেন না, তিনি অব্যয়। তিনি যদি অব্যয়, তবে তিনি কৰ্মফলের অধীন হইতে পারেন না—তাঁহার সুখ দুঃখ, হাস বৃদ্ধি নাই। যদি তিনি ফলের অধীন নহেন, তবে তাঁহার কৃত কৰ্ম নিষ্কাম। তিনি নিষ্কামকৰ্মী। মনুষ্যও সেই জন্য নিষ্কাম না হইলে ঈশ্বরে মিলিত হইতে পারে না। জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হওয়াই মুক্তি। কিন্তু শূন্যসত্ত্ব নিষ্কামস্বভাব পরমাত্মায় সকাম জীবাত্মা লীন হইতে পারে না। নিষ্কামকৰ্মীই মুক্তির অধিকারী।

ঈশ্বর কৰ্ম করেন, এ কথা আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের শিষ্যেরা মানিবেন না। তাঁহারা বলিবেন, ঈশ্বর কৰ্ম করেন না; যাহা হয়, তাহা তাঁহার সংস্থাপন নিয়মে (Law) নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু সেই নিয়ম সংস্থাপনও কৰ্ম। যাঁহারা বলিবেন, সেই সকল নিয়ম জড়ের গুণ, যদি তাঁহারা জড়কে ঈশ্বরসৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করেন, তবে তাঁহারা ঈশ্বরের কৰ্মকারিত্ব স্বীকার করিলেন। যাঁহারা তাহাও স্বীকার করেন না, তাঁহারা অনীশ্বরবাদী, তাঁহাদের সঙ্গে ঈশ্বরের কৰ্মকারিত্ব সম্বন্ধে কোন বিচারই নাই।

ন মাং কৰ্মাণি লিম্পন্তি ন মে কৰ্মফলে স্পৃহা ।

ইতি মাং যোহভিজানাতি কৰ্মাভিন স বধ্যতে ॥ ১৪ ॥

কৰ্মসকল আমাকে লিপ্ত করে না। আমারও কৰ্মে ফলস্পৃহা নাই। এইরূপ আমার যে জানে, সে কৰ্মের দ্বারা আবদ্ধ হয় না। ১৪ ।

ঈশ্বরের নিষ্কামকৰ্মিত্ব না জানিলে, নিষ্কাম কৰ্ম বুঝা যায় না। তাহা জানিলে কৰ্ম নিষ্কাম হইবে। তাহা হইলে সকাম কৰ্মরূপ বন্ধন হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। পূর্বে-শ্লোকের যে টীকা দেওয়া গিয়াছে, তাহাতে এ কথা পরিষ্কৃত করা গিয়াছে।

এবং জ্ঞাত্ব কৃতং কৰ্ম পূৰ্বৈরপি মূমুক্ষুভিঃ ।

কুরু কৰ্মৈব তস্মাত্ত্বং পূৰ্বৈঃ পূৰ্বতমং কৃতম্ ॥ ১৫ ॥

এইরূপ জানিয়া পূর্বেকালের মোক্ষাভিলাষিগণ কৰ্ম করিয়াছিলেন, তুমি পূর্বেগামীদিগের পূর্বেকাল-কৃত কৰ্ম সকল কর। ১৫ ।

অর্থাৎ প্রাচীন কালে যাঁহারা মোক্ষকাম, তাঁহারা আপনাকে অকর্তা জানিয়া—কৰ্মের ফলভাগী নহি, ইহা জানিয়া কৰ্ম করিতেন। তুমিও সেইরূপ কৰ্ম কর।

কিং কৰ্ম কিমকৰ্মিত কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ ।

তন্তে কৰ্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেহশুভাৎ ॥ ১৬ ॥

কৰ্ম কি, অকৰ্ম কি, পণ্ডিতেরাও তাহা বুঝিতে পারেন না। অতএব কৰ্ম কি, তাহা তোমাকে বলিতেছি। তাহা জানিলে, অশুভ হইতে মুক্ত হইবে। ১৬ ।

অকৰ্ম অর্থে এখানে মন্দ কৰ্ম নহে—অকৰ্ম অর্থে কৰ্মশূন্যতা।

কৰ্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যং বিকৰ্মণঃ ।

অকৰ্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কৰ্মণো গতিঃ ॥ ১৭ ॥

কৰ্ম কি, তাহা বুঝিতে হইবে, বিকৰ্ম কি, তাহা বুঝিতে হইবে, এবং অকৰ্ম কি, তাহা বুঝিতে হইবে। কৰ্মের গতি দুজ্ঞেয়। ১৭ ।

কৰ্ম—অর্থে বিহিত কৰ্ম, যাহা যথার্থ কৰ্ম।

বিকৰ্ম—অবিহিত কৰ্ম।

অকৰ্ম—কৰ্মত্যাগ, কৰ্মশূন্যতা।

কৰ্মণ্যকৰ্ম যঃ পশ্যেদকৰ্মিণ চ কৰ্ম যঃ ।

স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেব স যুক্ত কৃৎসনকৰ্মকৃৎ ॥ ১৮ ॥

যে কৰ্মতেও কৰ্মশূন্যতা দেখে, এবং অকৰ্মেও কৰ্ম দেখে, সেই মনুষ্যের মধ্যে বুদ্ধিমান্। সেই যোগযুক্ত, এবং সেই সর্বকৰ্মকারী। ১৮ ।

ভগবদারাধনা কৰ্ম; কিন্তু তাহাতে কৰ্মের যে বন্ধকতা, তাহা ঘটে না, এই জন্য তাহাকে কৰ্মস্বরূপ বিবেচনা করিবে না। আর যে কৰ্ম বিহিত, তাহা না করিলে তাহার ফলভাগী হইতে হয়, ফলভাগিত্ব মুক্তির রোধক; এ জন্য না করাকেই, অর্থাৎ অকৰ্মকেই কৰ্ম বিবেচনা

বাঁকম রচনাবলী

করিবে। শ্রীধরের টীকার মর্মার্থ এই। ইহাতে এ শ্লোক হইতে ইহাই পাওয়া যায় যে, ভগবাদারাধনাই কর্তব্য। অন্যান্য অনুষ্ঠান মূর্ত্তির বিঘ্ন।

শঙ্করাচার্য্য অন্যরূপ বুঝাইয়াছেন। তিনি এই শ্লোক উপলক্ষে একটি দীর্ঘ এবং জটিল প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, তাহার স্থূল কথা এই—আত্মা ত্রিয়ানির্লিপ্ত; কর্ম্ম ইন্দ্রিয়াদির দ্বারাই কৃত হইয়া থাকে; কিন্তু ভ্রমক্রমেই আত্মাতে কর্ম্মরোপ হইয়া থাকে। যিনি ইহা জানেন, তিনি কর্ম্ম অকর্ম্ম দেখেন। আর ইন্দ্রিয়াদি বিহিতানুষ্ঠানে বিরত হইলেও সেই অকর্ম্মকেও তিনি ইন্দ্রিয়াদির কর্ম্ম দেখেন।

কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে, পরবর্ত্তী শ্লোকের উপর দৃষ্টি রাখিলে একটা সোজা অর্থ পাওয়া যায়। কামসংকল্প-বিবর্জিত, ফলকামনাশূন্য যে কর্ম্ম, সে অকর্ম্ম—কর্ম্মশূন্যতা। আর যিনি অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম বিরত, তাহার কর্তব্য-বিরতির ফলভাগিত্ব আছেই আছে—অতএব এখানে কর্ম্মশূন্যতাও কর্ম্ম। কেন না, ফলোৎপত্তির কারণ। যিনি ইহা বুঝিতে পারেন, তিনিই জ্ঞানী।

যস্য সর্ব্বৈ সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জিতাঃ ।

জ্ঞানাগ্নিদন্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ১৯ ॥

যাঁহার সকল চেষ্টা কাম ও সংকল্পবর্জিত, এবং যাঁহার কর্ম্ম জ্ঞানাগ্নিতে দন্ধ, তাঁহাকেই জ্ঞানিগণ পণ্ডিত বলেন। ১৯।

“কামসংকল্প” এই পদের অর্থের উপর শ্লোকের গৌরব কিয়ৎপরিমাণে নির্ভর করে। শঙ্করাচার্য্যকৃত অর্থ এই;—“কামসংকল্পবর্জিতাঃ,” “কামৈস্তৎকারণৈশ্চ সংকল্পৈপবর্জিতাঃ”। শ্রীধরকৃত ব্যাখ্যা এই, “কাম্যতে ইতি কামঃ। ফলং তৎসংকল্পেন বর্জিতাঃ।” মধুসূদন সরস্বতী বলেন, কামঃ ফলতৃষ্ণা। সংকল্পোহহং করোমীতি কর্তৃত্বাভিমানস্তাভ্যাং বর্জিতাঃ। এইরূপ নানা মূর্নির নানা মত। মধুসূদন সরস্বতীকৃত সংকল্প শব্দের অর্থ আভিধানিক নহে, কিন্তু এখানে খুব সঙ্গত। শঙ্করাচার্য্যকৃত, কাম এবং তাহার কারণ সংকল্প উভয়-বিবর্জিত হইলে কর্ম্ম প্রবৃত্তির অভাব জন্মিবে। যে কর্ম্ম করিবার অভিলাষ রাখে, এবং ফল কামনা করে না, সে কর্ম্ম করিবে কেন? এ জন্য শঙ্করাচার্য্য নিজেই বলিয়াছেন, “মুধৈব চেষ্টামাত্রম্ অনুষ্ঠীয়ন্তে প্রবৃত্তেন চেল্লোকসংগ্রহার্থং নিবৃত্তেন জীবনযাত্রার্থং।” অর্থাৎ ঈদৃশ ব্যক্তির সমারম্ভসকল অনর্থক চেষ্টা মাত্র। প্রবৃত্তিমার্গে কেবল লোকশিক্ষার্থ, এবং নিবৃত্তিমার্গে কেবল জীবনযাত্রানিব্বাহার্থ। পাঠকদিগের নিকট আমার বিনীত নিবেদন যে, তাহা হইলেও কাম ও সংকল্পবর্জিত হইল না।

মধুসূদন সরস্বতীও “লোকশিক্ষার্থং” ও “জীবনযাত্রার্থং” কথা দুইটি রাখিয়াছেন, কিন্তু “কামসংকল্পবর্জিত” পদের তিনি যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা পাঠক নিঃসঙ্কেচে গ্রহণ করিতে পারেন। ফলতৃষ্ণা এবং অহঙ্কারহিত যে কর্ম্মানুষ্ঠান, তাহাই বিহিত, এবং তাহাই কর্ম্ম-শূন্যতা।

সচরাচর লোকে ফলকামনাতেই কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়—এবং আমি এই কর্ম্ম করিতেছি বা করিয়াছি, এই অহঙ্কার তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। ভগবদাভিপ্রায় এই যে, দুইয়ের অভাবই কর্ম্মের লক্ষণ, কর্ম্ম তদুভয়ের অভাবই কর্ম্মশূন্যতা।

এইরূপ বুঝিলেই কি আপত্তির মীমাংসা হইল? হইল বৈ কি। ফলকামনাতেই লোকে সচরাচর কর্ম্ম প্রবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু ফলকামনা ব্যতীত যে কর্ম্ম প্রবৃত্ত হওয়া যায় না, এমন নহে। যদি তাই হইত, তাহা হইলে নিষ্কাম শব্দের অর্থ নাই—এমন বস্তুর অস্তিত্ব নাই। যদি তাই হইত, তাহা হইলে গীতার এক ছত্রেরও কোন মানে নাই। কথাটা পূর্বে বুঝান হয় নাই। এখন বুঝান যাউক।

কতকগুলি কার্য্য আছে, যাহা মনুষ্যের অনুষ্ঠেয়। যে সে কর্ম্মের ফলকামনা করে না, তাহারও পক্ষে অনুষ্ঠেয়। এমন মনুষ্য আছে সন্দেহ নাই, যে জীবন রক্ষা কামনা করে না—মরিতে পারিলেই তাহার সব যন্ত্রণা ফুরায়। কিন্তু আত্মজীবন রক্ষা তাহার অনুষ্ঠেয়। যে শূলরোগী আত্মহত্যা করে, সে পাপ করে সন্দেহ নাই। শত্রুর জীবনরক্ষা সচরাচর কেহ কামনা করে না, কিন্তু শত্রু মজ্জনোন্মুখ বা অন্য প্রকারে মৃত্যুকবলগ্রস্তপ্রায় দেখিলে তাহার রক্ষা আমাদের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম। শত্রুকে উদ্ধারকালে মনে হইতে পারে, “আমার চেষ্টা নিষ্ফল হইলেই ভাল।” এখানে ফলকামনা নাই, কিন্তু কর্ম্ম আছে।

তবে ইহাও বলা কৰ্তব্য যে, নিষ্কাম কৰ্ম্ম, ফলসিদ্ধির চেষ্ঠা নাই, এমন কথা বলাও যায় না, এবং গীতার সে অভিপ্রায়ও নয়। মূৰ্ত্তিই যাহার উদ্দেশ্য, সে মূৰ্ত্তি কামনা করে এবং মূৰ্ত্তি প্রাপ্তির উপযোগী চেষ্ঠা করে। কাম শব্দ গীতায় বা অন্যত্র এমন অর্থে ব্যবহার হয় না যে, তাহারও ফলসিদ্ধির চেষ্ঠা বৃদ্ধায় না। মনে কর, স্বদেশের বা স্বজাতির হিতসাধন একটি অনুষ্ঠেয় কৰ্ম্ম। যে স্বদেশহিতের চেষ্ঠা করে, সে যে স্বদেশের হিতকামনা করিয়া, সে চেষ্ঠা করে না, এমন কখনই হইতে পারে না। অতএব কাম শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তাহা বৃদ্ধা কৰ্তব্য।

ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চারিটি অপবৰ্গ—পুরুষার্থ। পুরুষার্থে ইহা ভিন্ন আর কোন প্রয়োজন নাই। যাহা ধৰ্ম্ম, অর্থ, অর্থাৎ ঐহিক ধন সৌভাগ্যাদি এবং মোক্ষ, এই তিনের অতিরিক্ত, তাহাই কাম। এই জন্য কাম্য কৰ্ম্মের দ্বারা স্বর্গাদি লাভ সাধনাকে কাম শব্দে অভিহিত করা যায়। কিন্তু সেই কাম্যকৰ্ম্মজনিত যে সুখভোগ, সে আপনার সুখ। অতএব কামের উদ্দিষ্ট যে সুখ—তাহা নিজের সুখ—পরের মঙ্গল নহে। যে কৰ্ম্মের উদ্দেশ্য পরিত্যাগ, তাহাই নিষ্কাম। যে কৰ্ম্মের উদ্দেশ্য নিজহিত, তাহা নিষ্কাম নহে।

কাম শব্দ মহাভারতের অন্যত্র বিশেষ করিয়া বৃদ্ধান আছে।

ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ পণ্ডানাং মনসো হৃদয়স্য চ ।

বিষয়ে বর্তমানানাং যা প্রীতিরূপজায়তে ।

স কাম ইতি মে বৃদ্ধিঃ কৰ্ম্মণাং ফলমুত্তমম্ ॥

পাঁচটি ইন্দ্রিয়, মন, এবং হৃদয়, স্ব স্ব বিষয়ে বর্তমান থাকিয়া যে প্রীতি উপভোগ, আমার বিবেচনায় তাহাই কাম। তাহাই কৰ্ম্মের উত্তম ফল।

অতএব কাম অর্থে আত্মসুখ।

এখন সেই স্বদেশহিতৈষীর উদাহরণ মনে কর। যদি স্বদেশহিতৈষী কেবল মাত্র স্বদেশের হিতকামনা করিয়া কৰ্ম্ম করেন, তবে তাহারই কৰ্ম্ম নিষ্কাম। আর যদি আপনার যশ মান সম্ভ্রম উন্নতি প্রভৃতির বাসনায় স্বদেশের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হইয়েন, তবে তিনি সকামকৰ্ম্মী।

দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম

হিন্দুধর্ম

সম্প্রতি সুশিক্ষিত বাঙ্গালিদিগের মধ্যে হিন্দুধর্মের আলোচনা দেখা যাইতেছে। অনেকেই মনে করেন যে, আমরা হিন্দুধর্মের প্রতি ভক্তিমান হইতেছি। যদি এ কথা সত্য হয়, তবে আহুদের বিষয় বটে। জাতীয় ধর্মের পুনর্জীবন ব্যতীত ভারতবর্ষের মঙ্গল নাই, ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু যাঁহারা হিন্দুধর্মের প্রতি এইরূপ অনুরাগযুক্ত, তাঁহাদিগকে আমাদের গোটাকত কথা জিজ্ঞাস্য আছে। প্রথম জিজ্ঞাস্য, হিন্দুধর্ম কি? হিন্দুয়ানিতে অনেক রকম দেখিতে পাই। হিন্দু হাঁচি পড়িলে পা বাড়ায় না, টিকিটিকি ডাকিলে “সত্য সত্য” বলে, হাই উঠিলে তুড়ি দেয়, এ সকল কি হিন্দুধর্ম? অমুক শিয়রে শুইতে নাই, অমুক আস্যে খাইতে নাই, শূন্য কলসী দেখিলে যাত্রা করিতে নাই, অমুক বারে ক্ষৌরী হইতে নাই, অমুক বারে অমুক কাজ করিতে নাই, এ সকল কি হিন্দুধর্ম? অনেকে স্বীকার করিবেন যে, এ সকল হিন্দুধর্ম নহে। মর্খের আচার মাত্র। যদি ইহা হিন্দুধর্ম হয়, তবে আমরা মূক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, আমরা হিন্দুধর্মের পুনর্জীবন চাই না।*

এক্ষণে শুনিতে পাইতেছি যে, হিন্দুধর্মের নিয়মগুলি পালন করিলে শরীর ভাল থাকে। যথা একাদশীর রত স্বাস্থ্যরক্ষার একটি উত্তম উপায়। তবে শরীররক্ষার রতই কি হিন্দুধর্ম? আমরা একটি জমিদার দেখিয়াছি। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং অত্যন্ত হিন্দু। তিনি অতি প্রত্যুষে গাত্রোথান করিয়া কি শীত কি বর্ষা প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করেন এবং তখনই পূজাহিকে বসিয়া বেলা আড়াই প্রহর পর্যন্ত অনন্যমনে তাহাতে নিযুক্ত থাকেন। পূজাহিকের কিছুমাত্র বিঘ্ন হইলে, মাথায় বজ্রাঘাত হইল, মনে করেন। তার পর অপরাহ্নে নিরামিষ শাকান্ন ভোজন করিয়া একাহারে থাকেন,—ভোজনান্তে জমিদারী কার্যে বসেন। তখন কোন্ প্রকার সর্বনাশ করিবেন, কোন্ অনাথা বিধবার সর্বস্ব কাড়িয়া লইবেন, কাহার ঋণ ফাঁকি দিবেন, মিথ্যা জাল করিয়া কাহাকে বিনাপরাধে জেলে দিতে হইবে, কোন্ মোকদ্দমার কি মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুত করিতে হইবে, ইহাতেই তাঁহার চিন্তা নিবিষ্ট থাকে, এবং যত্ন পর্যাপ্ত হয়। আমরা জানি যে, এ ব্যক্তির পূজা আহিকে, ক্রিয়া কর্ম, দেবতা ব্রাহ্মণে আন্তরিক ভক্তি, সেখানে কপটতা কিছু নাই। জাল করিতে করিতেও হরিনাম করিয়া থাকেন। মনে করেন, এ সময় হরি-স্মরণ করিলে এ জাল করা আমার অবশ্য সার্থক হইবে। এ ব্যক্তি কি হিন্দু?

আর একটি হিন্দুর কথা বলি। তাঁহার অভক্ষ্য প্রায় কিছুই নাই। যাহা অস্বাস্থ্যকর, তাহা ভিন্ন সকলই খান। এবং ব্রাহ্মণ হইয়া এক আধটু সুরাপান পর্যন্ত করিয়া থাকেন। যে কোন জাতির অন্ন গ্রহণ করেন। যবন ও স্লেচ্ছের সঙ্গে একত্র ভোজনে কোন আপত্তি করেন না। সন্ধ্যা আহিক ক্রিয়া কর্ম কিছুই করেন না। কিন্তু কখন মিথ্যা কথা কহেন না। যদি মিথ্যা কথা কহেন, তবে মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তি স্মরণপূর্বক যেখানে লোকহিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয়—অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেইখানেই মিথ্যা কথা কহিয়া থাকেন। নিষ্কাম হইয়া দান ও পরহিত সাধন করিয়া থাকেন। যথাসাধ্য ইন্দ্রিয় সংযম করেন এবং অন্তরে ঈশ্বরকে ভক্তি করেন। কাহাকে বণ্ডনা করেন না, কখন পরস্ব কামনা করেন না। ইন্দ্রাদি দেবতা আকাশাদি ঈশ্বরের মূর্ত্তি স্বরূপ এবং শক্তি ও সৌন্দর্যের বিকাশ স্বরূপ বিবেচনা করিয়া, সে সকলের মানসিক উপাসনা করেন। এবং পুরাণকাথিত শ্রীকৃষ্ণে সর্বগুণসম্পন্ন ঈশ্বরের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া আপনাকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত করেন। হিন্দুধর্মানেসারে গুরুজনে ভক্তি, পুত্র কলত্রাদির স্নেহ প্রতিপালন, পশুর প্রতি দয়া করিয়া থাকেন। তিনি অক্রোধ ও ক্ষমাশীল। এ ব্যক্তি কি হিন্দু? এ দুই ব্যক্তির মধ্যে কে হিন্দু? ইহাদের মধ্যে কেহই কি

* পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়, যে হিন্দুধর্ম প্রচার করিতে নিযুক্ত, তাহা আমাদের মতে কখনই টিকিবে না, এবং তাঁহার যত্ন সফল হইবে না। এইরূপ বিশ্বাস আছে বলিয়া, আমরা তাঁহার কোন কথার প্রতিবাদ করিলাম না।

দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম—হিন্দুধর্ম

হিন্দু নয়? যদি না হয়—তবে কেন নয়? ইহাদের মধ্যে কাহাতেও যদি হিন্দুরানি পাইলাম না, তবে হিন্দুধর্ম কি? এক ব্যক্তি ধর্মভ্রষ্ট, দ্বিতীয় ব্যক্তি আচারভ্রষ্ট। আচার ধর্ম, না ধর্মই ধর্ম? যদি আচার ধর্ম না হয়, ধর্মই ধর্ম হয়, তবে এই আচারভ্রষ্ট ধার্মিক ব্যক্তিকেই হিন্দু বলিতে হয়। তাহাতে আপত্তি কি?

ইহার উত্তরে অনেকে বলিবেন যে, এ ব্যক্তি হিন্দুশাস্ত্রবিহিত আচারবান্ নহে, এজন্য এ হিন্দু নহে। কোথায় এ হিন্দুধর্মের স্বরূপ পাইব?

এ সকল লোকের বিশ্বাস যে, হিন্দুশাস্ত্রেই হিন্দুধর্ম আছে। এই হিন্দুশাস্ত্র কি? শাস্ত্র তো অনেক। যে সকল গ্রন্থকে শাস্ত্র বলা যায়, তাহার যেখানে যাহা আছে, সকলই কি হিন্দুধর্ম? যদি কোন গ্রন্থ হিন্দুশাস্ত্র বলিয়া এ দেশে মান্য হয়, তবে সে ‘মনুসংহিতা’। মনুতে আছে যে, যুদ্ধকালে শত্রুসেনা যে তড়াগপুষ্করিণ্যাদির জলে স্নান পানাদি করে, তাহা নষ্ট করিবে।* যে হিন্দুধর্মের তৃত্বিতকে এক গণ্ডুষ জলদানের অপেক্ষা আর পুণ্য নাই বলে, সেই হিন্দুধর্মেরই এই গ্রন্থে বলিতেছে যে, সহস্র সহস্র লোককে জলপিপাসাপীড়িত করিয়া প্রাণে মারিবে। এটা কি হিন্দুধর্ম? যদি হয়, তবে এরূপ নৃশংস ধর্মের পুনর্জীবনে কি ফল? বস্তুতঃ এ হিন্দুধর্ম নহে, যুদ্ধনীতি মাত্র,—কি উপায়ে যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারা যায়, তদ্বিষয়ক উপদেশ। যদি ইহা হিন্দুধর্ম হয়, তবে এ হিন্দুধর্ম মন্বাদি অপেক্ষা মোল্‌ত্কে ও নেপোলিয়ন্‌ অধিক অভিজ্ঞ।

স্থূল কথা এই, মনুতে যাহা কিছু আছে, তাহাই যে ধর্ম নহে, ইহা এক উদাহরণেই সিদ্ধ হইতেছে। এ সকলকে যদি ধর্ম বলা যায়, তবে সে ধর্ম শব্দের অপব্যবহার। যখন বলি, চোরের ধর্ম লুকাচুরি, তখন যেমন ধর্ম শব্দ অর্থান্তরে প্রযুক্ত হয়, এ সকল বিধিকে “রাজধর্ম” ইত্যাদি বলা, সেইরূপ। তবে মনুতে যাহা যাহা পাই, তাহাই যদি ধর্ম নহে, তবে জিজ্ঞাস্য, মনুর কোন উক্তিগুলিতে হিন্দুধর্ম আছে এবং কোনগুলিতে নাই, এ কথার কে মীমাংসা করিবে? যদি মন্বাদি ঋষিরা অশ্রান্ত হন, তবে তাহাদের সকল উক্তিগুলিই ধর্ম—যদি তাহাই ধর্ম হয়, তবে ইহা মনুভুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে, হিন্দুধর্মীন্দুসারে সমাজ চলা অসাধ্য। মনু হইতেই একটা উদাহরণ দিয়া আমরা দেখাইতেছি। মনে কর, কাহারও পিতৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত। হিন্দুশাস্ত্রমতে শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হইবে। কাহাকে নিমন্ত্রণ করিবে? মনুতে নিষেধ আছে যে, যে রাজার বেতনভুক্, তাহাকে খাওয়াইবে না; যে বাণিজ্য করে, তাহাকে খাওয়াইবে না; যে টাকার সুদ খায়, তাহাকে খাওয়াইবে না; যে বেদাধ্যয়নশূন্য, তাহাকে খাওয়াইবে না; যে পরলোক মানে না, তাহাকে খাওয়াইবে না; যাহার অনেক যজমান, তাহাকে খাওয়াইবে না; যে চিকিৎসক, তাহাকে খাওয়াইবে না; যে শ্রোতস্মার্ত্ত অগ্নি পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাকে খাওয়াইবে না; যে শূদ্রের নিকট অধ্যয়ন করে, কি শূদ্রকে অধ্যয়ন করায়, যে ছল করিয়া ধর্মকর্ম করে, যে দ্বর্জ, যে পিতামাতার সহিত বিবাদ করে, যে পতিত লোকের সহিত অধ্যয়ন করে, ইত্যাদি বহুবিধ লোককে খাওয়াইবে না। এমন কথাও আছে যে, মিত্র ব্যক্তিকেও ভোজন করাইবে না। ইহা মনুভুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে, মনুর এই বিধি অনুসারে চলিলে শ্রাদ্ধকর্মের আজিকার দিনে একটিও ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় না। সুতরাং শ্রাদ্ধাদি পিতৃকার্য্য পরিত্যাগ করিতে হয়। অথচ যে বাপের শ্রাদ্ধ করিল না, তাহাকেই বা হিন্দু বলি কি প্রকারে? এইরূপ ভূরি ভূরি উদাহরণের দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, সর্ব্বাংশে শাস্ত্রসম্মত যে হিন্দুধর্ম, তাহা কোনরূপে এক্ষণে পুনঃসংস্থাপিত হইতে পারে না; কখন হইয়াছিল কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ। আর হইলেও সেরূপ হিন্দুধর্ম এক্ষণে সমাজের উপকার হইবে না, ইহা এক প্রকার নিশ্চিত বলা যাইতে পারে।

যদি সমস্ত শাস্ত্রের সঙ্গে সর্ব্বাংশে সংমিলিত যে হিন্দুধর্ম, তাহা পুনঃসংস্থাপনের সম্ভাবনা না থাকে, তবে এক্ষণে আমাদের কি করা কর্তব্য? দুইটি মাত্র পথ আছে। এক, হিন্দুধর্ম একেবারে পরিত্যাগ করা, আর এক হিন্দুধর্মের সারভাগ অর্থাৎ যেটুকু লইয়া সমাজ চলিতে পারে, এবং চলিলে সমাজ উন্নত হইতে পারে, তাহাই অবলম্বন করা। হিন্দুধর্ম একেবারে পরিত্যাগ করা আমরা ঘোরতর অনিষ্টকর মনে করি। যাহারা হিন্দুধর্ম একেবারে পরিত্যাগ

* ভিন্দ্যাচৈব তড়াগানি প্রাকারোপরিখাস্থথা ইত্যাদি। ৭ম অধ্যায়, ১৯৬।

বিশ্বকম রচনাবলী

করিতে পরামর্শ দেন, তাঁহাদের আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, হিন্দুধর্মের পরিবর্তে আর কোন নতন ধর্ম সমাজে প্রচলিত হওয়া উচিত, না সমাজকে একেবারে ধর্মহীন রাখা উচিত? যে সমাজ ধর্মশূন্য, তাহার উন্নতি দূরে থাকুক, বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।* আর তাঁহারা যদি বলেন যে, হিন্দুধর্মের পরিবর্তে ধর্মান্তরকে সমাজ আশ্রয় করুক, তাহা হইলে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, কোন ধর্মকে আশ্রয় করিতে হইবে? পৃথিবীতে আর যে কয়টি শ্রেষ্ঠ ধর্ম আছে, বৌদ্ধধর্ম, ইসলামধর্ম এবং খৃষ্টধর্ম, এই তিন ধর্মই ভারতবর্ষে হিন্দুধর্মকে স্থানচ্যুত করিয়া তাহার আসন গ্রহণ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে; কেহই হিন্দুধর্মকে স্থানচ্যুত করিতে পারে নাই। ইসলাম কতকগুলো বন্যজাতি এবং হিন্দুনাথধারী কতকগুলো অনাথ্য জাতিকে অধিকৃত করিয়াছে বটে, কিন্তু ভারতীয় প্রকৃত আৰ্যসমাজের কোন অংশ বিচলিত করিতে পারে নাই। ভারতীয় আৰ্য হিন্দু ছিল, হিন্দুই আছে। বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মকে ভারতবর্ষ ছাড়িয়া দিয়া দেশান্তরে পলায়ন করিয়াছে। খৃষ্টধর্ম রাজার ধর্ম হইয়াও কদাচিৎ একখানি চণ্ডালের বা পোদের গ্রাম অধিকার, অথবা দুই এক জন কুক্কট-মাংস-লোলুপ ভদ্রসন্তানকে দখল ভিন্ন আর কিছুই করিতে পারে নাই। যখন বৌদ্ধধর্ম, ইসলামধর্ম ও খৃষ্টধর্ম, হিন্দুধর্মের স্থান অধিকার করিতে পারে নাই, তখন আর কোন ধর্মকে তাহার স্থানে এখন স্থাপিত করিব? ব্রাহ্মধর্মের আমরা পৃথক্ উল্লেখ করিলাম না, কেন না, ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মের শাখা মাত্র। ইহার এমন কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই, যাহাতে মনে করা যাইতে পারে যে, ইহা ভবিষ্যতে সামাজিক ধর্ম পরিণত হইবে।

যখন ধর্মশূন্য সমাজের বিনাশ নিশ্চিত, যদি হিন্দুধর্মের স্থান অধিকার করিবার শক্তি আর কোন ধর্মেরই নাই, তখন হিন্দুধর্ম রক্ষা ভিন্ন হিন্দুসমাজের আর কি গতি আছে? তবে হিন্দুধর্ম লইয়া একটা গণ্ডগোলে পড়িতে হইতেছে। আমরা দেখিয়াছি যে, শাস্ত্রোক্ত যে ধর্ম, তাহার সর্বাঙ্গ রক্ষা করিয়া কখন সমাজ চলিতে পারে না—এখনও চলিতেছে না—এবং বোধ হয়, কখন চলে নাই। তা ছাড়া একটা প্রচলিত হিন্দুধর্ম আছে; তৎকর্তৃক শাস্ত্রের কতক বিধি রক্ষিত এবং কতক পরিত্যক্ত এবং অনেক অশাস্ত্রীয় আচার-ব্যবহার-বিধি তাহাতে গৃহীত হইয়াছে। হিন্দুধর্মের কি সপক্ষ কি বিপক্ষ সকলেই স্বীকার করেন যে, এই বিমিশ্র এবং কলুষিত হিন্দুধর্মের দ্বারা হিন্দুসমাজের উন্নতি হইতেছে না। তাই আমরা বলিতেছিলাম যে, যেটুকু হিন্দুধর্মের প্রকৃত মর্ম, যেটুকু সারভাগ, যেটুকু প্রকৃত ধর্ম, সেইটুকু অনুসন্ধান করিয়া আমাদের স্থির করা উচিত। তাহাই জাতীয় ধর্ম বলিয়া অবলম্বন করা উচিত। যাহা প্রকৃত হিন্দুধর্ম নহে, যাহা কেবল অপবিত্র কলুষিত দেশাচার বা লোকাচার, ছদ্মবেশে ধর্ম বলিয়া হিন্দুধর্মের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে, যাহা কেবল অলীক উপন্যাস, যাহা কেবল কাব্য, অথবা প্রহৃত্ত, যাহা কেবল ভণ্ড এবং স্বার্থপরদিগের স্বার্থসাধনার্থ সৃষ্ট হইয়াছে, এবং অজ্ঞ ও নির্বোধগণ কর্তৃক হিন্দুধর্ম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, যাহা কেবল বিজ্ঞান, অথবা ভ্রান্ত এবং মিথ্যা বিজ্ঞান, যাহা কেবল ইতিহাস, অথবা কেবল কল্পিত ইতিহাস, কেবল ধর্মগ্রন্থ মধ্যে বিন্যস্ত বা প্রক্ষিপ্ত হওয়া ধর্ম বলিয়া গণিত হইয়াছে, সে সকল এখন পরিত্যাগ করিতে হইবে। যাহাতে মনুষ্যের যথার্থ উন্নতি, শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সর্বাঙ্গ উন্নতি হয়, তাহাই ধর্ম। এইরূপ উন্নতিকর তত্ত্ব লইয়া সকল ধর্মেরই সারভাগ গঠিত, এইরূপ উন্নতিকর তত্ত্ব-সকল, সকল ধর্মোপেক্ষা হিন্দুধর্মেই প্রবল। হিন্দুধর্মেই তাহার প্রকৃত সম্পূর্ণতা আছে। হিন্দুধর্মের যেরূপ আছে, এরূপ আর কোন ধর্মই নাই। সেইটুকু সারভাগ। সেইটুকুই হিন্দুধর্ম। সেইটুকু ছাড়া আর যাহা থাকে—শাস্ত্র থাকুক, অশাস্ত্র থাকুক বা লোকাচারে থাকুক—তাহা অধর্ম। যাহা ধর্ম তাহা সত্য, যাহা অসত্য তাহা অধর্ম। যদি অসত্য মনুতে থাকে, মহাভারতে থাকে বা বেদে থাকে, তবু অসত্য, অধর্ম বলিয়া পরিহার্য।

এ কথায় দুইটি গোল ঘটে। প্রথম, বেদাদিতে অসত্য বা অধর্ম আছে, বা থাকিতে পারে,

* অনেকে বলেন যে, ধর্ম (Religion) পরিত্যাগ করিয়া কেবল নীতিমাত্র অবলম্বন করিয়া সমাজ চলিতে পারে ও উন্নত হইতে পারে। এ কথার প্রতিবাদের এ স্থান নহে। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, এমন কোন সমাজ দেখা যায় নাই যে, ধর্ম ছাড়িয়া, কেবল নীতিমাত্র অবলম্বন করিয়া উন্নত হইয়াছে। দ্বিতীয়, এই নীতিবাদীরা যাহাকে নীতি বলেন, তাহা বাস্তবিক ধর্ম বা ধর্মমূলক।

এ কথা অনেকেই স্বীকার করিবেন না। এমন কথা শুনিলে অনেকে কানে আঙ্গুল দিবেন। এ সম্প্রদায়ের জন্য আমরা লিখতেছি না। তাঁহাদের যা হোক্ একটা ধর্ম অবলম্বন আছে। যাঁহারা হিন্দুধর্ম আস্থাশূন্য হইয়াছেন, অথচ অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করেন নাই, তাঁহাদের জন্যই লিখতেছি। তাঁহারা এ কথা অস্বীকার করিবেন না।

আর একটি গোলযোগ এই যে, হিন্দুশাস্ত্রের কোন কথা সত্য, কোন কথা মিথ্যা, ইহার মীমাংসা কে করিবে? কোনটুকু ধর্ম, কোনটুকু ধর্ম নয়? কোনটুকু সার, কোনটুকু অসার? উত্তর, আপনাদেরই তাহার মীমাংসা করিতে হইবে। সত্যের লক্ষণ আছে। যেখানে সেই লক্ষণ দেখিব, সেইখানেই ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিব। যাহাতে সে লক্ষণ না দেখিব, তাহা পরিত্যাগ করিব। অতএব প্রকৃত হিন্দুধর্ম নিরূপণ পক্ষে, আগে দেখিতে হইবে, হিন্দুশাস্ত্র কি কি আছে?

কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র অগাধ সমুদ্র। তাহার যথোচিত অধ্যয়নের অবসর অল্প লোকেরই আছে। কিন্তু সকলে পরস্পরের সাহায্য করিলে, সকলেরই কিছু কিছু উপকার হইতে পারে। আমরা সে বিষয়ে যথাসাধ্য যত্ন করিব।—‘প্রচার,’ ১ম বর্ষ, পৃ. ১৫-২৩।

বেদ

বেদ, হিন্দুশাস্ত্রের শিরোভাগে। ইহাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং আর সকল শাস্ত্রের আকর বলিয়া প্রসিদ্ধ। অন্য শাস্ত্রে যাহা বেদাতিরিক্ত আছে, তাহা বেদমূলক বলিয়া চলিয়া যায়। যাহা বেদে নাই বা বেদবিরুদ্ধ, তাহাও বেদের দোহাই দিয়া পাচার হয়। অতএব, আগে বেদের কিছু পরিচয় দিব।

সকলেই জানেন, বেদ চারিটি—ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ষ। অনেক প্রাচীন গ্রন্থে দেখা যায় যে, বেদ তিনটি—ঋক্, যজুঃ, সাম। অথর্ষ সে সকল স্থানে গণিত হয় নাই। অথর্ষ বেদ অন্য তিন বেদের পর সংকলিত হইয়াছিল কি না, সে বিচারে আমাদের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

কিম্বদন্তী আছে যে, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস, বেদকে এই চারি ভাগে বিভক্ত করেন। ইহাতে বৃদ্ধা যায় যে, আগে চারি বেদ ছিল না, এক বেদই ছিল। বাস্তবিক দেখা যায় যে, ঋগ্বেদের অনেক শ্লোকার্ধ যজুর্বেদে ও সামবেদে পাওয়া যায়। অতএব এক সামগ্রী চারি ভাগ হইয়াছে, ইহা বিবেচনা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

যখন বলি, ঋক্ একটি বেদ, যজুঃ একটি বেদ, তখন এমন বুদ্ধিতে হইবে না যে, ঋগ্বেদ একখানি বই বা যজুর্বেদ একখানি বই। ফলতঃ এক একখানি বেদ লইয়া এক একটি ক্ষুদ্র লাইব্রেরী সাজান যায়। এক একখানি বেদের ভিতর অনেকগুলি গ্রন্থ আছে।

একখানি বেদের তিনটি করিয়া অংশ আছে, মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ। মন্ত্রগুলির সংগ্রহকে সংহিতা বলে, যথা—ঋগ্বেদসংহিতা, যজুর্বেদসংহিতা। সংহিতা, সকল বেদের এক একখানি, কিন্তু ব্রাহ্মণ ও উপনিষৎ অনেক। যজ্ঞের নিমিত্ত বিনিয়োগাদি সহিত মন্ত্রসকলের ব্যাখ্যা সহিত গদ্যগ্রন্থের নাম ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মপ্রতিপাদক অংশের নাম উপনিষৎ। আবার আরণ্যক নামে কতকগুলি গ্রন্থ বেদের অংশ। এই উপনিষদই ১০৮ খানি।

বেদ কে প্রণয়ন করিল? এ বিষয়ে হিন্দুদিগের মধ্যে অনেক মতভেদ আছে। এক মত এই যে, ইহা কেহই প্রণয়ন করে নাই। বেদ অপৌরুষেয় এবং চিরকালই আছে। কতকগুলি কথা আপনা হইতে চিরকাল আছে। মনুষ্য হইবার আগে, সৃষ্টি হইবার আগে হইতে, মনুষ্য-ভাষায় সংকলিত কতকগুলি গদ্য পদ্য আপনা হইতে চিরকাল আছে; অধিকাংশ পাঠকই এ মত গ্রহণ করিবেন না, বোধ হয়।

আর এক মত এই যে, বেদ ঈশ্বর-প্রণীত। ঈশ্বর বসিয়া বসিয়া অগ্নিস্তব ও ইন্দ্রস্তব ও নদীস্তব ও অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রভৃতির বিবিধ রচনা করিয়াছেন, ইহাও বোধ হয় পাঠকের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাস না করিতে পারেন। বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে আরও অনেক মত আছে, সে সকল সবিস্তারে সংকলিত করিবার প্রয়োজন নাই। বেদ যে মনুষ্য-প্রণীত, তাহা বেদের আর কিছু পরিচয় পাইলেই, বোধ হয় পাঠকেরা আপনারাই সিদ্ধান্ত করিতে পারিবেন। তাঁহারা আপন আপন বুদ্ধিমত মীমাংসা করেন, ইহাই আমাদের অনুরোধ।

বাংকম রচনাবলী

বেদ যেরূপেই প্রণীত হউক, এক জন উহা সংকলিত ও বিভক্ত করিয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহ। সেই বিভাগ মন্ত্রভেদে হইয়াছে এবং মন্ত্রভেদানুসারে তিন বেদই দেখা যায়। ঋগ্বেদের মন্ত্র ছন্দোনিবন্ধ স্তোত্র; যথা, ইন্দ্রস্তোত্র, অগ্নিস্তোত্র, বরুণস্তোত্র। যজুর্বেদের মন্ত্র প্রাশ্নপাঠ গদ্যে বিবৃত, এবং যজ্ঞানুষ্ঠানই তাহার উদ্দেশ্য। সামবেদের মন্ত্র গান। ঋগ্বেদের মন্ত্রও গীত হয় এবং গীত হইলে তাহাকেও সাম বলে। অথর্ষবেদের মন্ত্রের উদ্দেশ্য মারণ, উচাটন, বশীকরণ ইত্যাদি।

হিন্দু মতানুসারে অন্য বেদের অপেক্ষা সামবেদের উৎকর্ষ আছে। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, “বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামিত্যাди”* কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের কাছে ঋগ্বেদেরই প্রাধান্য। বাস্তবিক ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। এই জন্য আমরা প্রথমে ঋগ্বেদের পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হই। ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের পরিচয় পশ্চাৎ দিব, অগ্রে সংহিতার পরিচয় দেওয়া কর্তব্য হইতেছে।

ঋগ্বেদে দশটি মণ্ডল ও আটটি অষ্টক। এক একটি মন্ত্রকে এক একটি ঋচ্ বলে। এক ঋষির প্রণীত এক দেবতার স্তুতি সম্বন্ধে মন্ত্রগুলিকে একটি সূক্ত বলে। বহুসংখ্যক ঋষি কর্তৃক প্রণীত সূক্তসকল এক জন ঋষি কর্তৃক সংগৃহীত হইলে একটি মণ্ডল হইল। এইরূপ দশটি মণ্ডল ঋগ্বেদসংহিতায় আছে। কিন্তু এরূপ পরিচয় দিয়া আমরা পাঠকের বিশেষ কিছু উপকার করিতে পারিব না। এগুলি কেবল ভূমিকা স্বরূপ বলিলাম। আমরা পাঠককে ঋগ্বেদ-সংহিতার ভিতরে লইয়া যাইতে চাই। এবং সেই জন্য দুই একটা সূক্ত বা ঋক্ উদ্ধৃত করিব। সর্বাপেক্ষে ঋগ্বেদসংহিতার প্রথম মণ্ডলের প্রথম অনুবাকের প্রথম সূক্তের প্রথম ঋক্ উদ্ধৃত করিতেছি। কিন্তু ইহার একটি “হেডিং” আছে। আগে “হেডিং”টি উদ্ধৃত করি।

“ঋষির্বিশ্বামিত্রপুত্রো মধুচ্ছন্দা। অগ্নিদেবতা।

গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। ব্রহ্মযজ্ঞান্তে বিনিয়োগঃ অগ্নিস্টোমে চ।”

আগে এই “হেডিং”টুকু ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। এইরূপ “হেডিং” সকল সূক্তেরই আছে। ব্রাহ্মণ পাঠকেরা দেখিবেন, তাঁহারা প্রত্যহ যে সন্ধ্যা করেন, তাহাতে যে সকল বেদমন্ত্র আছে, সে সকলেরও এরূপ একটু একটু ভূমিকা আছে। দেখা যাক, এই “হেডিং”টুকুর তাৎপর্য কি? ইহাতে চারিটি কথা আছে, প্রথম, এই সূক্তের ঋষি, বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা। দ্বিতীয়, এই সূক্তের দেবতা অগ্নি। তৃতীয়, এই সূক্তের ছন্দ গায়ত্রী। চতুর্থ, এই সূক্তের বিনিয়োগ ব্রহ্মযজ্ঞান্তে এবং অগ্নিস্টোমযজ্ঞে। এইরূপ সকল সূক্তের একটি ঋষি, একটি দেবতা, ছন্দ এবং বিনিয়োগ নির্দিষ্ট আছে। ইহার তাৎপর্য কি?

প্রথম, ঋষিশব্দটুকু বুঝা যাক্। ঋষি বলিলে এক্ষণে আমরা সচরাচর সাদা দাড়ীওয়ালা গেরুয়াকাপড়-পরা সঙ্ঘাতিক-পরায়ণ ব্রাহ্মণ—বড় জোর সেকালের ব্যাস বাস্মীকির মত তপোবল-বিশিষ্ট একটা অলৌকিক কাণ্ড মনে করি। কিন্তু দেখা যাইতেছে, সেরূপ কোন অর্থে ঋষি শব্দ এ সকল স্থলে প্রযুক্ত হয় নাই।

বেদের অর্থ বুঝাইবার জন্য একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র আছে, তাহার নাম “নিরুক্ত”। নিরুক্ত একটি “বেদাঙ্গ”। যাস্ক, স্থৌলিষ্টিবী, শাকপাণি প্রভৃতি প্রাচীন মহর্ষিগণ নিরুক্তকর্তা। বেদের কোন শব্দের যথার্থ অর্থ জানিতে হইলে, নিরুক্তের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এখন, নিরুক্তকার ঋষি শব্দের অর্থ কি বলেন? নিরুক্তকার বলেন এই যে, “যস্য বাক্যং স ঋষিঃ” অর্থাৎ যাহার কথা সেই ঋষি।† অতএব যখন কোন সূক্তের পুর্বে দেখি যে, এই সূক্তের অমুক ঋষি, তখন বুঝিতে হইবে যে, সূক্তটির বক্তা ঐ ঋষি। এই বক্তা অর্থে প্রণেতা বুঝিতে হইবে কি? যাহারা বলেন, বেদ নিত্য অর্থাৎ কাহারও প্রণীত নহে, তাঁহাদের উত্তর এই যে, বেদ-মন্ত্রসকল ঋষিদিগের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছিল, তাঁহারা মন্ত্ররচনা করেন নাই, জ্ঞানবলে দৃষ্ট করিয়াছিলেন। যে ঋষি যে সূক্ত দেখিয়াছিলেন, তিনিই সেই সূক্তের ঋষি। শব্দ শ্রুত হইয়া থাকে ইহা জানি, কিন্তু যোগ-বলেই হউক আর যে বলেই হউক, শব্দ যে দৃষ্ট হইতে পারে, ইহা

* বেদের মধ্যে আমি সামবেদ ইত্যাদি।

† বৃহদ্দেবতা গ্রন্থের মতে সম্পূর্ণ ঋষিবাক্যস্তু সূক্তমিত্যাভিধীয়তে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ ঋষি-বাক্যকে সূক্ত বলে।

অনেকে কিছুতেই স্বীকার করিবেন না। যদি কেহ বিশ্বাস করিতে চান যে, যখন লিপিবিদ্যার সৃষ্টি হয় নাই, তখন মন্ত্রসকল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ঋষিদিগের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছিল, তবে তিনি স্বচ্ছন্দে বিশ্বাস করুন, আমরা আপত্তি করিব না। আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাই যে, বেদেই অনেক স্থলে আছে যে, মন্ত্রসকল ঋষিপ্রণীত, ঋষিদৃষ্ট নহে। আমরা ইহার অনেক উদাহরণ দিতে পারি, কিন্তু অপর সাধারণের পাঠ্য প্রচারে এরূপ উদাহরণের স্থান হইতে পারে না। এক্ষণে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এমন অনেক সূক্ত আছে যে, তাহাতে ঋষিরাই বলিয়াছেন যে, আমরা মন্ত্র করিয়াছি, গাড়াইয়াছি, সৃষ্ট করিয়াছি বা জন্মাইয়াছি। সে যাহাই হউক, ইহা স্থির যে, ঋষি অর্থে আদৌ তপোবলবিশিষ্ট মহাপুরুষ নহে, সূক্তের বক্তা মাত্র।

এই প্রথম সূক্তের ঋষি মধুচ্ছন্দা। তার পর দেবতা অগ্নি। সূক্তের দেবতা কি? যেমন ঋষি শব্দের আলোচনায় তাহার লৌকিক অর্থ উড়াইয়া গেল তেমনি দেবতা শব্দের আলোচনায় এরূপ দেবতার লৌকিক অর্থ উড়াইয়া যায়। নিরুক্তকার বলেন যে, “যস্য বাক্যং স ঋষিঃ যা তেনোচ্যতে সা দেবতা” অর্থাৎ সূক্তে যাহার কথা থাকে, সেই সে সূক্তের দেবতা। অর্থাৎ সূক্তের যা “Subject” তাই দেবতা।

ইহাতে অনেকে এমন কথা বলিতে পারেন, এক্ষণে যাহাদিগকে দেবতা বলি, অর্থাৎ ইন্দ্রাদি, সূক্ত সকলে তাঁহারা ই স্থূত হইয়াছেন, অতএব এখন যে অর্থে তাঁহারা দেবতা, সেই অর্থেই তাঁহারা বেদমন্ত্রে দেবতা। এরূপ আপত্তি যে হইতে পারে না, তাহার প্রমাণ দানস্তুতিসকল। কতকগুলি সূক্ত আছে, সেগুলিকে দানস্তুতি বলে। তাহাতে কোন দেবতারই প্রশংসা নাই, কেবল দানেরই প্রশংসা আছে। অতএব ঐ সকল সূক্তের দানই দেবতা। ইহা অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যদি দেবতা শব্দের অর্থ সূক্তের বিষয় (subject), তবে দেবতার আধুনিক অর্থ আসিল কোথা হইতে? এ তত্ত্ব বুঝিবার জন্য দেবতা শব্দটি একটু তলাইয়া বুঝিতে হইবে। নিরুক্তকার যাম্বক বলিয়াছেন, “যো দেবঃ সা দেবতা” যাহাকে দেব বলে, তাহাকেই দেবতা বলা যায়। এই দেব শব্দের উৎপত্তি দেখ। দিব ধাতু হইতে দেব। দিব দীপনে বা দ্যোতনে। যাহা উজ্জ্বল, তাহাই দেব। আকাশ, সূর্য্য, অগ্নি, চন্দ্র প্রভৃতি উজ্জ্বল, এই জন্য এ সকল আদৌ দেব। এ সকল মহিমাময় বস্তু, এই জন্য আদৌ ইহাদের প্রশংসায় স্তোত্র, অর্থাৎ সূক্ত রচিত হইয়াছিল। কালে যাহার প্রশংসায় সূক্ত রচিত হইতে লাগিল তাহাই দেব হইল। পঞ্জর্ন্য যিনি বৃষ্টি করেন, তিনি উজ্জ্বল নহেন, তিনিও দেব হইলেন। ইন্দ্র ধাতু বর্ষণে। সংস্কৃতে একটি র প্রত্যয় আছে। রুদ্র ধাতুর পর র করিয়া রুদ্র হয়, অসু ধাতুর পর র করিয়া অসুদ্র হয়। ইন্দ্র ধাতুর পর র করিয়া ইন্দ্র হয়। অতএব যিনি বৃষ্টি করেন, তিনিই ইন্দ্র। যিনি বৃষ্টি করেন তাঁহাকে উজ্জ্বল বলিয়া মনে কল্পনা করিতে পারি না, কিন্তু তিনি ক্ষমতাবান্—বৃষ্টি না হইলে শস্য হয় না, শস্য না হইলে লোকের প্রাণ বাঁচে না। কাজেই তিনিও বৈদিক সূক্তে স্থূত হইলেন। বৈদিক সূক্তে স্থূত হইলেন বলিয়াই তিনি দেবতা হইলেন। এ সকল কথার সবিস্তার প্রমাণ ক্রমে পাওয়া যাইবে।

“ঋষিমধুচ্ছন্দা। অগ্নিদেবতা। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ।” ছন্দ বুঝিতে কাহারও দেরী হইবে না। কেন না ছন্দ ইংরাজি বাঙ্গালাতেও আছে। ঋক্গুর্লি পদ্য, কাজেই ছন্দে বিন্যস্ত। “যদক্ষর-পরিমাণং তচ্ছন্দঃ।” অক্ষর পরিমাণকে ছন্দ বলে। চোন্দ অক্ষরে পয়ার হয়—পয়ার একটি ছন্দ। আমাদের যেমন পয়ার, ত্রিপদী, চতুষ্পদী, নানা রকম ছন্দ আছে, বেদেও তেমনি গায়ত্রী অনুষ্টুভ্, ত্রিষ্টুভ্, বৃহতী, পংক্তি প্রভৃতি নানাবিধ ছন্দ আছে। যে সূক্ত যে ছন্দে রচিত,—আমরা যাহাকে “হেঁড়িং” বলিয়াছি, তাহাতে দেবতার ও ঋষির পর ছন্দের নাম কথিত থাকে। যাহারা মাইকেল দত্ত ও হেমচন্দ্রের পদ্বর্ককার কবিদিগের কাব্য পাড়াইয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, এ প্রথা বাঙ্গালা রচনাতেও ছিল। আগে বিষয় অর্থাৎ দেবতা লিখিত হইত, যথা “গণেশ-বন্দনা।” তাহার পর ছন্দ লিখিত হইত, যথা “ত্রিপদী ছন্দ” বা “পয়ার।” শেষে ঋষি লিখিত হইত, যথা “কাশীরাম দাস কহে” কি “কহে রায় গুণাকর।” ইংরাজিতেও দেবতা ও ঋষি লিখিতে হয়: ছন্দ লিখিত হয় না। যথা, De Profundis দেবতা, Alfred Tennyson ঋষি।

ঋষি দেবতা ও ছন্দের পর বিনিয়োগ। যে কাজের জন্য সূক্তটির প্রয়োজন, অথবা যে কাজে উহা ব্যবহার হইবে, তাহাই বিনিয়োগ। যথা, অগ্নিষ্টোমে বিনিয়োগঃ অর্থাৎ অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে

বিশ্বকম রচনাবলী

ইহার নিয়োগ বা ব্যবহার। অতএব ইংরাজিতে বুঝাইতে হইলে বুঝাইব যে, ঋষি (author) দেবতা (subject) ছন্দ (metre) বিনিয়োগ (use)।

এক্ষণে আমরা ঋক্টি উদ্ধৃত করিতে পারি।

“অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবম্ভিজম্।
হোতারং রত্নধাতমম্ ॥”

‘ঈলে,’ কি না স্তব করি। “অগ্নিমীলে” কি না অগ্নিকে স্তব করি। এ ঋকের এইটিই আসল কথা। “অগ্নিং” কৰ্ম্ম “ঈলে” ক্রিয়া। আর যতগুলি কথা আছে, সব অগ্নির বিশেষণ। সেগুলি পরে বুঝাইব। আগে অগ্নি শব্দটি বুঝাই। বেদের টীকাকার সায়নাচার্য্য বলেন, অগ্নি অগ্ ধাতু হইতে হইয়াছে, “অগ কম্পনে।” বাচস্পত্য অভিধানে লেখে, “অগ বক্রগতো” কিন্তু ইহার আরও অনেক ব্যাখ্যা আছে। সে সকল উদ্ধৃত করিয়া পাঠককে পীড়িত করিব না। কিন্তু তাহার মধ্যে একটি ব্যাখ্যা অনেক কাজ করিয়াছে। নিরুক্তে সেটি পাওয়া যায়। “অগ্ন” শব্দ পদ্বর্ক “নী” ধাতুর পর ইন্ প্রত্যয় কর, তাহা হইলে অগ্নী হইবে। নিরুক্তকার বলেন, ইহাতে “অগ্নি” শব্দ নিষ্পন্ন হইবে। যাহা অগ্নে নীয়মান। এখন যজ্ঞ করিতে গেলে হোম চাই। হোমে অগ্নিতে আহুতি দিতে হয়। নহিলে দেবতারা পান না। এই জন্য যাহা প্রথমে যজ্ঞে নীয়মান তাহাই অগ্নি। এই ব্যাখ্যাটি পরিশুদ্ধ বলিয়া কোন মতে গৃহীত হইতে পারে না। কেন না অগ্নি এই নাম অন্যান্য আৰ্য্যজাতির মধ্যে দেখা যায়। যথা, Latin *ignis* Slav *Ogni*। তবে নিরুক্তকারের জন্যই হউক আর যে জন্যই হউক, ব্যাখ্যাটা চলিয়াছিল, চলিয়া দেবগঠনে লাগিয়াছিল, তাই ইহার কথা বলিলাম।—কাজেই যদি অগ্নিপদ্বর্ক নী ধাতু হইতে অগ্নি হইল, তবে অগ্নি দেবতাদিগের অগ্নী হইলেন, যদি অগ্নী হইলেন, তবেই তিনি দেবতাদের প্রধান, আগে যান এ কথাও উঠিল। বহুব্ধ মন্ত্রভাগে আছে—“অগ্নিম্ভুং দেবতানাম্।” অগ্নি দেবতাদিগের প্রথম ও মূখ্যস্বরূপ। আর “অগ্নির্বে দেবানামবমঃ” দেবতাদিগের মধ্যে অগ্নিই মূখ্য। এইরূপ কথা হইতে হইতেই কথা উঠিল, “অগ্নির্বে দেবানাং সেনানী” অর্থাৎ অগ্নি দেবতাদিগের সেনানী। সেনানী কি না সেনাপতি।

তার পর এক রহস্য আছে।—আমাদিগের বর্তমান হিন্দুশাস্ত্র অর্থাৎ পৌরাণিক হিন্দুয়ানিতে দেবতাদিগের সেনাপতি কে? পুরাণেতিহাসে কাহাকে দেবসেনানী বলে? কুমার, কার্ত্তিকেয়, স্কন্দ, ইনিই এখন দেবসেনানী। শেষ প্রচলিত মত এই যে, কার্ত্তিকেয়, মহাদেব অর্থাৎ রুদ্রের পুত্র। যখন এই মত প্রচলিত হইয়াছে, তখন অগ্নি রুদ্রে মিশিয়া গিয়াছে। অগ্নির সঙ্গে রুদ্রের কি সম্বন্ধ তাহা আমরা ক্রমে পরে দেখাইব, কিন্তু অতি প্রাচীন ইতিহাসে, যখন অগ্নি রুদ্র হন নাই, তখন কার্ত্তিকেয় অগ্নির পুত্র। যাঁহারা এ তত্ত্বের বিশেষ প্রমাণ খুঁজেন, তাঁহারা মহাভারতের বনপর্বে মার্কাণ্ডেয় সমস্যা পর্বাধ্যায়ের ১১২ অধ্যায়ে এবং তৎপরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে দেখিতে পাইবেন। “আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ।” অগ্নি দেব-সেনানী, শেষ দাঁড়াইল, অগ্নির ছেলে দেব-সেনানী। কুমার রুদ্রজ, অতএব শেষ মহাদেবের পুত্র।

অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবম্ভিজং।
হোতারং রত্নধাতমম্ ॥

“অগ্নিমীলে”। অগ্নিকে স্তব করি। অগ্নি কি রূপ তাহা বলা হইতেছে। “পুরোহিতং”। অগ্নি পুরোহিত। অগ্নি হোমকার্য্য সম্পন্ন করেন, এই জন্য অগ্নিকে পুরোহিত বলা হইতেছে। ঋগ্বেদ-সংহিতায় অগ্নিকে পুত্রঃ পুত্রঃ পুরোহিত বলা হইয়াছে। বেদব্যাখ্যায় পাঠক মহাশয়েরা যদি একটুখানি ব্যঙ্গ মার্জনা করিতে পারিতেন, তাহা হইলে আমরা বলিতাম যে, আধুনিক পুরোহিতদিগের সঙ্গে অগ্নির বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে; যজ্ঞীয় দ্রব্য উভয়েই উত্তমরূপে সংহার করেন।

“যজ্ঞস্য দেবং”। অগ্নি যজ্ঞের দেব। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে আমরা বলিয়াছি—দিব্ ধাতু দীপনে বা দ্যোতনে। “যজ্ঞস্য দেবং” যিনি যজ্ঞে দীপ্যমান।

ঋত্বিজং। ঋত্বিক্ বলে যাজককে। তখনকার এক একটি বৈদিক যজ্ঞে ষোল জন করিয়া

ঋত্বিক্ প্রয়োজন হইত। চারি জন হোতা, চারি জন অধ্বর্যু, চারি জন উদ্গাতা, আর চারি জন ব্রহ্মা। যাহারা ঋত্বিক্ পাঠ করিত, তাহারা হোতা। যজুর্বেদী ঋত্বিকেরা অধ্বর্যু। আর যাহারা সামগান করেন, তাহারা উদ্গাতা। যাহারা কার্য্য-পরিদর্শক, তাহারা ব্রহ্মা।

হোতারং। হোতৃগণ ঋত্বিক্ পাঠ করিয়া দেবতাদিগকে আহ্বান করেন, অগ্নি হবিরাদি বহন করিয়া দেবতাদিগকে আহ্বান করেন, এই জন্য অগ্নি হোতা। “ঋত্বিজং হোতারং” সায়নাচার্য্য ইহার এই অর্থ করেন যে, অগ্নি ঋত্বিকের মধ্যে হোতা।

রত্নধাতমম্। ধাতমম্ ধারয়িতারম্। যিনি রত্ন দান করেন, তিনি রত্নধাতম। অগ্নি যজ্ঞ-ফলরূপ রত্ন প্রদান করেন, এই নিমিত্ত অগ্নি রত্নধাতম।

এই একটি ঋক্ সবিস্তারে বৃক্বাইলাম। এই সূক্তে এমন নয়টি ঋক্ আছে। অবশিষ্ট আটটি এইরূপ সবিস্তারে বৃক্বাইবার প্রয়োজন নাই। আমরা কেবল তাহার একটা বাঙ্গালা অনুবাদ দিচ্ছি।

“অগ্নি পূর্বেঋষিদিগের দ্বারা স্তুত হইয়াছেন এবং নূতনের দ্বারাও। তিনি দেবতাদিগকে এখানে বহন করুন। ২।

যাহা দিন দিন বাড়িতে থাকে, এবং যাহাতে যশ ও শ্রেষ্ঠ ধীরবত্তা আছে, সেই ধন অগ্নির দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩।

হে অগ্নে! যাহা বিঘ্নরহিত এবং তুমি যাহার সর্ব্বতোভাবে রক্ষাকর্তা, সেই যজ্ঞই দেবগণের নিকট গমন করে। ৪।

যিনি আহ্বান-কর্তা, যজ্ঞকুশল, বিচিত্র যশঃশালিগণের শ্রেষ্ঠ এবং সত্যস্বরূপ, সেই অগ্নিদেব দেবগণের সহিত আগমন করুন। ৫।

হে অগ্নে! তুমি হবিদাতার যে মঙ্গল কর, হে অগ্নির! তাহা সত্যই তোমা ভিন্ন আর কেহই করিতে পারে না। ৬।

হে অগ্নে! আমরা প্রতিদিন রাতে ও দিবসে ভক্তিভাবে তোমাকে নমস্কার করিতে করিতে সমীপস্থ হই। ৭।

তুমি যজ্ঞসকলের জ্বলন্ত রাজা, সত্যের জ্বলন্ত রক্ষাকর্তা, এবং স্বর্গহে বর্ধমান, (তোমাকে নমস্কার করিতে করিতে আমরা তোমার সমীপস্থ হই)। ৮।

হে অগ্নে! পিতা যেমন পুত্রের, তুমি তেমনি আমাদের অনায়াসলভ্য হও; মঙ্গলার্থে তুমি আমাদের সন্নিহিত থাক। ৯।*

অনেক হিন্দুরই বিশ্বাস আছে যে, বেদের ভিতর মনুষ্যের বুদ্ধির অগম্য অতি দূরদূর কথা আছে; বৃক্বিব্যবহার চেষ্টা করা অকর্তব্য, কণ্ঠস্থ করাই ভাল—তাও দ্বিজাতির পক্ষে। এজন্য আমরা ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম সূক্তের অনুবাদ পাঠককে উপহার দিলাম। লোকে বলে, একটা ভাত টিপিপলেই হাঁড়ির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রয়োজনমতে আরও কোন কোন সূক্ত উদ্ধৃত করিব। সম্প্রতি প্রয়োজন নাই।

ইহার পর দ্বিতীয় সূক্তের এক দেবতা নহেন। প্রথম তিন ঋকের দেবতা, বায়ু, ৪—৬ ঋকের দেবতা ইন্দ্র ও বায়ু; শেষ তিনটি ঋকের দেবতা, মিত্র ও বরুণ, সংস্কৃতে “মিত্রাবরুণো।” মিত্র কে তাহা পরে বলিব। বেদের অনুশীলনে, এমন অনেক দেবতা পাওয়া যাইবে যে,

* মূল এই সূক্তে দিলাম। প্রথম ঋক্ পূর্বে দেওয়া গিয়াছে।

অগ্নিঃ পূর্বেভিঃ ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরুত। স দেবান্ এহ বক্ষতি। ২।

অগ্নিনা রয়িমশ্নবৎ পোষমেব দিবে দিবে। যশসং ধীরবত্তমং। ৩।

অগ্নে যং যজ্ঞমধরং বিশ্বতঃ পরিভূরসি। স ইন্দ্রেবেষু গচ্ছতি। ৪।

অগ্নিহোতা কবিষ্ঠুঃ সত্যশিচরশ্রবস্তমঃ। দেবো দেবেভিরাগমৎ। ৫।

যদঙ্গ দাশুযে ত্বমগ্নে ভদ্রং করিষ্যসি। ভবেত্তৎ সত্যমগ্নিরঃ। ৬।

উপহ্বাগ্নে দিবে দিবে দোষী বস্ত্রধিযা বয়ম্। নমো ভংরত এমসি। ৭।

রাজস্তুমধরুগাং গোপাম্ তস্য দীর্দিবিং। বর্ধমানং স্বে দমে। ৮।

স নঃ পিতেব সুনবেহগ্নে সুপায়নো ভব। সচস্বা নঃ স্বেস্তয়ে। ৯।

বাঙ্গালা অনুবাদ যাহা দেওয়া হইল, তাহার মধ্যে ১ ও ২ ঋক্ লেখকের; অন্য ঋক্গুলির অনুবাদ কোন বন্ধু হইতে উপহার প্রাপ্ত।

বিক্রম রচনাবলী

আধুনিক হিন্দুয়ানিতে যাহার নাম মাত্র নাই। আবার, আধুনিক হিন্দুর কাছে যে সকল দেবতার বড় আদর, তাহার মধ্যে অনেকের নামমাত্রও বেদে পাওয়া যাইবে না।

তৃতীয় সূক্তের দেবতাও অনেকগুলি। ১—৩ ঋকের দেবতা, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বেদে তাঁহাদের নাম “অশ্বিনো”। ৪—৬ ঋকের দেবতা ইন্দ্র; ৭—৯ ঋকের দেবতা “বিশ্বেদেবাঃ।” আধুনিক হিন্দু ইহাদিগের নামও অনবগত। ১০—১২ ঋকের দেবতা সরস্বতী।

চতুর্থ সূক্তের দেবতা ইন্দ্র। ঋগ্বেদে ইন্দ্রের স্তবই অধিক। ৪ হইতে ১১ পর্য্যন্ত সূক্তের দেবতা ইন্দ্র। তন্মধ্যে ষষ্ঠ সূক্তে মরুতেরাও আছেন। মরুতেরা বায়ু হইতে ভিন্ন। সে প্রভেদ পরে বুঝাইব।

দ্বাদশের আবার অগ্নিদেবতা। ইন্দ্রের পর ঋগ্বেদে অগ্নির স্তবই অধিক।

ত্রয়োদশ সূক্ত “আপ্রী” সূক্ত। আপ্রীসূক্তের বিনিয়োগ পশুযজ্ঞে। ঋগ্বেদে মোট দশটি আপ্রীসূক্ত আছে। এই আপ্রীসূক্তের দেবতাও অগ্নি, কিন্তু সূক্তের ১২টি ঋকে অগ্নির দ্বাদশ মন্ত্রের স্তব করা হইয়াছে।

চতুর্দশ সূক্তের অনেক দেবতা, যথা বিশ্বেদেবাঃ, ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, মিত্র, বৃহস্পতি, পৃষা, ভগ, আদিত্য ও মরুদগণ।

পঞ্চদশে ইন্দ্রাদি অনেক দেবতা। সায়নাচার্য্য বলেন, ঋতুরাই ইহার দেবতা। ষোড়শে একা ইন্দ্র দেবতা। সপ্তদশে ইন্দ্র, বরুণ। অষ্টাদশের এক দেবতা ব্রহ্মস্পতি। তিনি কে? সে বড় গোলযোগের কথা। আরও ইন্দ্র ও সোম আছেন, তন্মিত্র দক্ষিণা ও সদসস্পতি বা নারায়ণস বলিয়া এক দেবতা আছেন। ঊনবিংশ সূক্তের দেবতা অগ্নি, মরুৎ।

এক অধ্যায়ের দেবতার তালিকা দিয়াই আমরা ক্ষান্ত হইলাম। বৈদিক দেবতা কাহারো, তাহা পাঠককে দেখাইবার জন্য তাঁহাকে এতটা দুঃখ দিলাম। এই এক অধ্যায়ে যে সব দেবতার নাম আছে, অবশ্য এমত নহে। কিন্তু পাঠক দেখিলেন যে, এই এক অধ্যায়ের মধ্যে, যে সকল দেবতা এখনকার পূজার ভাগ খাইতে অগ্রসর তাঁহারা কেহ নাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, কার্তিক, গণেশ, ইহারা কেহই নাই। আমরা ঋগ্বেদের অন্যত্র বিষ্ণুকে খুব মতে পাইব; আর শিবকে না পাই, রুদ্রকে পাইব। ব্রহ্মাকে না পাই, প্রজাপতিকে পাইব। লক্ষ্মীকে না পাই, শ্রীকে পাইব। কিন্তু আর ঠাকুর ঠাকুরাণীগণের বৈদিকত্বের ও মৌলিকত্বের ভারী গোলযোগ। বাঙ্গালার চাউল কলার উপর তাঁহাদের আর যে দাবি দাওয়া থাকে থাকুক, বেদ-কর্তা ঋষিদিগের কাছে তাঁহারা সন্দ পান নাই, ইহা নিশ্চিত। এখন দেবত্ব বাজেয়াপ্ত করা যাইবে কি?

বাজেয়াপ্ত করিলে, অনেক বেচারী দেবতা মারা যায়। হিন্দুর মুখে ত শূনি, হিন্দুর দেবতা তেত্রিশ কোটি। কিন্তু দেখি, বেদে আছে, দেবতা মোটে তেত্রিশটি। ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের, ৩৪ সূক্তের, ১১ ঋকে অশ্বীদিগকে বলিতেছেন, “তিন একাদশ (১১ × ৩ = ৩৩) দেবতা লইয়া আসিয়া মধুপান কর।” ১।৪৫।২ ঋকে অগ্নিকে বলা হইতেছে, “তেত্রিশটিকে লইয়া আইস” ঐরূপ ১।১৩৯।১১ ও ৩।৬।৯ ও ৮।২৮।১ ও ৮।৩০।২ ও ৮।৩৫।৩ ও ৯।৯২।৪ ঋকে ঐরূপ আছে। কেবল ঋগ্বেদে নয়, শতপথব্রাহ্মণে, মহাভারতে, রামায়ণে ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও তেত্রিশটিমাত্র দেবতার কথা আছে।

এখন তেত্রিশ হইতে তেত্রিশ কোটি হইল কোথা হইতে? ইহার উত্তর, বিদ্যাসুন্দরের ভাটের কথায় দেওয়াই উচিত—

“এক মে হাজার লাখ মেয় কথা বনায়কে।”

ঋগ্বেদের ৩।৯।৯ ঋকে আছে, “ত্রীণি শতা ত্রীসহস্রাণি অগ্নিং ত্রিংশচ্চ দেবা নব চ অসপর্য্যন্।” তিন শত, তিন সহস্র, ত্রিশ, নয় দেবতা। তেত্রিশ কোটি হইতে আর কতক্ষণ লাগে।*

তার পর জিজ্ঞাস্য এই তেত্রিশটি দেবতা কে কে? ঋগ্বেদে সে কথা নাই, থাকিবার কথাও

* তবু ঋষি ঠাকুর তিন ছাড়েন নাই।

যে তিনের একাদশ গুণে তেত্রিশ, সেই তিনকে শত গুণ, সহস্র গুণ, দশ গুণ ও তিন গুণ করিয়াছেন। লোকে কোটি গুণ করিয়াছে। এই “তিন” পাঠক ছাড়িবেন না। তাহা হইলে হিন্দু ধর্মের চরমে পৌঁছিতে পারিবেন। সে কথা পরে হইবে।

দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম—বেদের দেবতা

নয়। তবে শতপথব্রাহ্মণে ও মহাভারতে উর্হাদিগের শ্রেণীবিন্যাস ও নাম পাওয়া যায়। শ্রেণী-বিন্যাস এইরূপ। দ্বাদশটি আদিত্য, একাদশটি রুদ্র এবং আটটি বসু। “আদিত্য” “রুদ্র” এবং “বসু” বিশেষ একটি দেবতার নাম নয়, দেবতার শ্রেণী বা জাতিবাচক মাত্র।

এই হইল একত্রিশ। তার পর এ ছাড়া “দ্যাভা পৃথিবী” এই দুইটি লইয়া তেত্রিশটি। শতপথব্রাহ্মণে প্রজাপতিকৈ ধরিয়া ৩৪টি গণা হইয়াছে। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে উর্হাদিগের নাম নির্দেশ আছে। যথা

আদিত্য। অংশ, ভগ, মিত্র, জলেশ্বর, বরুণ, ধাতা, অর্য্যমা, জয়ন্ত, ভাস্কর, ত্বষ্টা, পৃষা, ইন্দ্র, বিষ্ণু।

রুদ্র। অজ, একপদ, অহিরধা, পিনাকী, ঋত, পিতৃরূপ, গ্র্যম্বক, বৃষাকপি, শম্বু, হবন, ঈশ্বর।

বসু। ধর, ধ্রুব, সোম, সবিতা, অনিল, অনল, প্রত্যুষ, প্রভাস।

—‘প্রচার’, ১ম বর্ষ, পৃ. ৩৭-৪৬, ১০২-৮।

বেদের দেবতা

(বেদশীর্ষক প্রবন্ধের পরভাগ)

আমরা বেদ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি, তাহার উদ্দেশ্য যে কেবল পাঠককে দেখাইব, বেদে কি রকম সামগ্রী আছে, তাহা নহে। আমাদের আর একটি উদ্দেশ্য এই যে, বেদে কোন দেবতাদের উপাসনা আছে? ঋগ্বেদসংহিতা বেদের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন অংশ বলিয়া আধুনিক পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, তাই, আমরা এখন ঋগ্বেদসংহিতার আলোচনায় প্রবৃত্ত, কিন্তু সময়ে বেদের অন্যান্যংশের দেবোপাসনার স্থূল মর্ম্ম যাহা পাওয়া যায়, তাহা বুঝাইব। এখন, আমরা দেখিয়াছি, ঋগ্বেদে আছে যে, দেবতা তেত্রিশটি, কবি, ভক্ত বা ঠাকুরাণীর্দির্দিগের গল্পে গল্পে তেত্রিশ কোটি হইয়াছে।

তার পর দেখিয়াছি যে, সেই তেত্রিশটি দেবতা, শতপথব্রাহ্মণে (ইহাও বেদ) তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন, যথা (১) আদিত্য, (২) রুদ্র, (৩) বসু। তার পর মহাভারতে এই তিন শ্রেণীর দেবতার যেরূপ নাম দেওয়া আছে, তাহাও দিয়াছি।

ঋগ্বেদের সঙ্গে ইহার কিছু মিলে না। ইহার মধ্যে কোন কোন দেবতার নামও ঋগ্বেদে পাওয়া যায় না। ঋগ্বেদে এমন অনেক দেবতার নাম পাওয়া যায়, যাহা এই তালিকার ভিতর নাই। ঋগ্বেদে কতকগুলি আদিত্যের নাম আছে বটে, এবং রুদ্র ও বসু শব্দদ্বয় বহুবচনে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, এবং অষ্ট বসু, এমন কথা নাই। ঋগ্বেদে নিম্নলিখিত দেবতাদিগের নাম পাওয়া যায়।

(১) মিত্র, বরুণ, অর্য্যমা, ভগ, দক্ষ, অংশ, মার্ত্তণ্ড, সূর্য্য, সবিতা ও ইন্দ্র। ইহাদিগকে ঋগ্বেদের কোন স্থানে না কোন স্থানে আদিত্য বলা হইয়াছে।

ইহার মধ্যে অর্য্যমা, ভগ, দক্ষ, অংশ, মার্ত্তণ্ড ইহাদিগের কোন প্রাধান্য নাই।

(২) আর কয়টির, অর্থাৎ মিত্র, সূর্য্য, বরুণ, সবিতা ও ইন্দ্রের খুব প্রাধান্য। তন্মিত্র নিম্নলিখিত দেবতারারও ঋগ্বেদসংহিতায় বড় প্রবল।

অগ্নি, বায়ু, মরুদ্গণ, বিষ্ণু, পঞ্জর্ন্য, পৃষা, ত্বষ্টা, অশ্বীদ্বয়, সোম।

(৩) বৃহস্পতি, ব্রহ্মণস্পতি ও যমেরও কিছু গৌরব আছে।

(৪) দ্বিত, আপ্য, অহিরধা ও অজ একপদের নাম স্থানে স্থানে পাওয়া যায়।

(৫) এই কয়টি নামে সৃষ্টিকর্ত্তা বা ঈশ্বর বুঝায়—বিশ্বকর্মা, হিরণ্যগর্ভ, স্কম্ব, প্রজাপতি, পুরুষ, ব্রহ্ম।

(৬) তন্মিত্র কয়েকটি দেবী আছেন। দুইটি দেবী বড় প্রধানা—অর্দিতি ও উষা।

(৭) সরস্বতী, ইলা, ভারতী, মহী, হোত্রা, বরুদ্রী, ধীষণা, অরণ্যানী, অগ্নায়ী, বরুণানী, অশ্বিনী, রোদসী, রাকা, সিনিবালী গুঙ্গু, শ্রদ্ধা ও শ্রী, এই কয় দেবীও আছেন। তন্মিত্র পরিচিতা সকল নদীগণও স্তুত হইয়াছেন।

বাংকম রচনাবলী

এক্ষণে, আগে আদিত্যদিগের কথা কিছু বলিব। আদিত্য শব্দে এখন সচরাচর সূর্য্য ব্ৰূয়। দ্বাদশ আদিত্য বলিলে অনেকেই বারটি সূর্য্য ব্ৰূেন। অনেক পণ্ডিত আবার এই ব্যাখ্যা করেন যে, দ্বাদশ আদিত্য অর্থে বারটি মাস ব্ৰূিতে হইবে। পক্ষান্তরে আদিত্য সকল দেবতাদিগের সাধারণ নাম, এরূপ প্রয়োগও আছে। যাঁহারা অমরকোষের ছত্র দুই চারি পড়িয়াছেন, তাঁহারাও জানেন যে, “দেব” ইহার প্রতিশব্দ মধ্যে “আদিত্যেয়” শব্দটি ধরা হইয়াছে। আদিত্যেয়, আদিত্য, একই। এরূপ গণ্ডগোল কেন? দেখা যাউক আদিত্য শব্দের প্রকৃত অর্থ কি?

দিত ধাতু বন্ধনে বা খণ্ডনে বা ছেদনে। দিত, যাহার বন্ধন নাই, সীমা আছে, খণ্ডিত বা ছিন্ন। অদিত, যাহার বন্ধন নাই, অখণ্ড, অছিন্ন, সীমা নাই, যে অনন্ত; *The Infinite*.

এই জড় জগৎ সূর্য্য, চন্দ্র, আকাশ, মেঘ, সবই সেই অখণ্ড বা অনন্ত হইতে উৎপন্ন। পূর্বে ব্ৰূয়াইয়াছি, যাহা উজ্জ্বল, তাহাই দেব, সূর্য্যাদি রশ্মিময় পদার্থ দেব। তাহারা অনন্ত হইতে উৎপন্ন; অদিত অনন্ত, তাই অদিত দেবমাতা; দেবতারা আদিত্য। কিন্তু সকল দেবতার মাতা যে অদিত, ঠিক এ কথা বেদে পাওয়া যায় না। এ কথা পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক। পুরাণেতিহাসেই, বেদে অঙ্কুরিত যে হিন্দুধর্ম, তাহাই সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এখনকার সাহেবদিগের এবং সাহেব শিষ্যদিগের মত এই যে, পুরাণ ইতিহাস কেবল মূর্খতা, এবং ঔপধার্মিকতা, ভণ্ডামি এবং নষ্টামি। বাস্তবিক বৈদিক ধর্ম অপেক্ষা পৌরাণিক ধর্ম অঙ্কুরের অপেক্ষা বৃক্ষের ন্যায় শ্রেষ্ঠ। তবে বৃক্ষটিতে এখন অনেক বানরের বাসা হইয়াছে বটে। ভরসা আছে, সময়ান্তরে সে কথা ব্ৰূয়াইব। এক্ষণে কথাটা যাহা বলিতেছি, তাহা এইঃ—পৌরাণিকেরা ব্ৰূয়াইয়াছিল যে, এই অনন্ত,—অনন্ত কাল ও অনন্ত স্থিতি, অনন্ত জড়পরম্পরা, অনন্ত জীবপরম্পরা—এই অদিত; (*The Infinite in time, space and existence*) ইহাই সর্ব্বপ্রসূতি। সর্ব্বপ্রসূতি বলিয়া যাহা তেজঃপুঞ্জ, যাহা সুন্দর, যাহা দীপ্তমান, যাহা মহৎ, যাহা বলবান্—আকাশ চন্দ্র সূর্য্য বরুণ মরুৎ পর্জন্না, সকলেরই প্রসূতি। তাই অদিত দেবমাতা। কিন্তু ঋগ্বেদে অদিতের এতটা বিস্তার নাই। ঋগ্বেদে অদিত অনন্ত বটে, কিন্তু সে অনন্ত আকাশ। আকাশ অনন্ত, আকাশ অদিত। তাই বেদে অদিত কেবল সূর্য্যাদি আদিত্যদিগের মাতা। অদিত যে আকাশ, তাহা বেদের অনেক স্থানেই লেখা আছে;—যথা ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৬৩ সূক্তের ৩ ঋকে “যেভ্যো মাতা মধুমৎ পিন্বতে পয়ঃ পীষদ্বং দ্যৌর্দিতিরদ্বিবর্হাঃ”— ইত্যাদি।

এখানে অদিতের বিশেষণ “দ্যৌঃ” শব্দ। দ্যৌঃ শব্দে আকাশ।*

অদিত একটি প্রধানা বৈদিকী দেবী ইহা বলিয়াছি; কিন্তু দেখিতেছি, ইনি আকাশ মাত্র। ইহাকে আকাশ-দেবতা বলা যাইতে পারে। বেদের যে সকল দেবতার নাম করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে আরও আকাশ-দেবতা পাইব। বাস্তবিক ঋগ্বেদের দেবতারা, হয়,

- (১) আকাশ, যথা, অদিত, দ্যোস্, বরুণ (ইনি আদৌ জলেশ্বর নহেন), ইন্দ্র, পর্জন্না।
- (২) নয়, সূর্য্য দেবতা, যথা, সূর্য্য, মিত্র, সবিতা, পূষা, বিষ্ণু।
- (৩) নয়, অগ্নি দেবতা, যথা, অগ্নি, বৃহস্পতি, ব্রহ্মণস্পতি, রুদ্র।
- (৪) নয়, অন্যবিধ আলোক দেবতা, যথা, সোম, উষা, অশ্বীনিয়।
- (৫) নয়, বায়ু দেবতা, যথা, বায়ু, মরুদ্গণ।
- (৬) নয়, সৃষ্টিকর্তা, যথা প্রজাপতি, হিরণ্যগর্ভ, পুরুষ, বিশ্বকর্মা।
- (৭) তুষ্টি, যম, প্রভৃতি দুই চারিটি মাত্র এই শ্রেণীর বাহিরে।

—‘প্রচার’, ১ম বর্ষ, পৃ. ১২৪-২৮।

* শতপথব্রাহ্মণে আছে “ইয়ং বৈ পৃথিবী অদিতিঃ” এখানে যদিও পৃথিবীকে অদিতি বলা হইয়াছে, সে অনস্তার্থে। অথর্ব বেদে পৃথিবী হইতে অদিতির প্রভেদ করা হইয়াছে। যথা, “ভূমির্মাতা অদিতিনেী জনিতং ভ্রাতাস্তরীক্ষম্।” এখানে তিন লোক গণা হইল। এখানেও অদিতি স্পষ্টই আকাশ।

ইন্দ্র

এখন আমরা কতক কতক জানিয়াছি, ঋগ্বেদে কোন্ কোন্ দেবতার উপাসনা আছে। আকাশ দেবতা, সূর্য্য দেবতা, এ সকল কথা এখন ছাড়িয়া দিই। যদি প্রয়োজন বিবেচনা করি, তবে সে কথার সর্বিশেষ আলোচনা পশ্চাৎ করা যাইবে। এখন, ইন্দ্রাদির কথা বলি।

এই ইন্দ্রাদি কে? ইন্দ্র বলিয়া যে একজন দেবতা আছেন, কি বিষ্ণু বলিয়া দেবতা এক জন আছেন, ইহা আমরা কেমন করিয়া জানিলাম? কোন মনুষ্য কি তাঁহাদের দেখিয়া আসিয়াছে? তাঁহাদের অস্তিত্বের প্রমাণ কি? ইহার উত্তরে অনেক পাকা হিন্দু বলিবেন যে, “হাঁ অনেকেই তাঁহাদিগকে দেখিয়া আসিয়াছে। সেকালে ঋষিরা সর্ব্বদাই স্বর্গে যাইতেন এবং ইন্দ্রাদি দেবতার সঙ্গে আলাপ করিয়া আসিতেন। এবং তাঁহারাও সর্ব্বদা পৃথিবীতে আসিয়া মনুষ্যদিগের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিতেন। এ সকল কথা পুরাণ ইতিহাসে আছে।” বোধ হয়, আমরাই এ সকল কথার উত্তর দিতে হইবে না। কেন না আমাদের অধিকাংশ পাঠকই এ সকল কথায় শ্রদ্ধাযুক্ত নহেন। তবে এ সম্বন্ধে একটা কথা না বলিয়া থাকা যায় না। পুরাণেতিহাসে যে ইন্দ্রাদি দেবতার বর্ণনা আছে, যাঁহাদিগের সহিত রাজর্ষিরা এবং মহর্ষিরা সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন এবং যাঁহারা পৃথিবীতে আসিয়া সশরীরে লীলা করিতেন, তাঁহাদিগের চরিত্র বড় চমৎকার। কেহ গুরুত্বপূর্ণগামী, কেহ চোর, কেহ বাঙ্গালি বাবুদিগের ন্যায় ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়া নন্দনকাননে উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা লইয়া ক্রীড়া করেন, কেহ অভিমানী, কেহ স্বার্থপর, কেহ লোভী,—সকলেই মহাপাপিষ্ঠ, সকলেই দুর্ব্বল, কখন অসুর কর্তৃক তাড়িত, কখন রাক্ষস কর্তৃক দাসত্বশুল্কে বদ্ধ, কখন মানব কর্তৃক পরাজিত, কখন দুর্ব্বাসা প্রভৃতি মানবদিগের অভিশাপে বিপদগ্রস্ত, সর্ব্বদা রম্ভা বিষ্ণু মহেশ্বরের শরণাপন্ন। এই কি দেব-চরিত্র? ইহার সঙ্গে এবং নিকৃষ্ট মনুষ্য-চরিত্রের সঙ্গে প্রভেদ কি? এই সকল দেবতার উপাসনায় মহাপাপ এবং চিত্তের অবনতি ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। যদি এ সকল দেবতার উপাসনা হিন্দুধর্ম হয়, তবে হিন্দুধর্মের পুনর্জীবন নিশ্চিত বাঞ্ছনীয় নহে। বাস্তবিক হিন্দুধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য এরূপ নহে। ইহার ভিতর একটা গুঢ় তাৎপর্য্য আছে; তাহা পরম রমণীয় এবং মনুষ্যের উন্নতিকর। সেই কথাটি ক্রমে পরিষ্ফুট করিব বলিয়া আমরা এই সকল প্রবন্ধগুলি লিখিতেছি। সেই কথা বৃদ্ধিবার জন্য আগে বোঝা চাই, এই সকল দেবতা কোথা হইতে পাইলাম।

অনেকে বলিবেন, বেদেই পাইয়াছি। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, বেদেই বা তাঁহারা কোথা হইতে আসিলেন? বেদ-প্রণেতারা তাঁহাদিগকে কোথা হইতে জানিলেন? পাকা হিন্দুদিগের মধ্যে অনেকে বলিবেন, কেন বেদ ত অপোঁরুষেয়! বেদও চিরকাল আছেন, দেবতারাও চিরকাল আছেন, সুতরাং তাঁহারাও বেদে আছেন। অপর কেহ বলিবেন, বেদ ঈশ্বর-প্রণীত, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, কাজেই বেদে ইন্দ্রাদি দেবগণের কথা থাকা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। এরূপ পাকা হিন্দুর সঙ্গে বিচার করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা বলিয়াছি যে, বেদ যে ঋষি-প্রণীত অর্থাৎ মনুষ্য-রচিত, এ কথা বেদেই পুনঃপুনঃ উক্ত হইয়াছে। এ কথায় যাঁহারা বৃদ্ধিবেন না তাঁহাদিগকে বৃদ্ধিবার আর উপায় নাই।

বেদ যদি ঋষি-প্রণীত হইল, তবে বিচার্য্য এই যে, ঋষিরা ইন্দ্রাদিকে কোথা হইতে পাইলেন। তাঁহারা ত বলেন না যে, আমরা ইন্দ্রাদিকে দেখিয়াছি। সে কথা পুরাণ ইতিহাসে থাকুক, ঋগ্বেদে নাই। অথচ তাঁহারা ইন্দ্রাদির রূপ ও গুণ সর্বিস্তারে বর্ণন করিয়াছেন। খবর পেঁাছিল কোথা হইতে? ইন্দ্রাদি কি, এ কথাটা বৃদ্ধিলেই সে কথাটাও বোঝা যাইবে। এবং আরও অনেক কথা বোঝা যাইবে।

এই ইন্দ্রকেই উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করা যাউক। ইহার ইন্দ্র নাম হইল কোথা হইতে? কে নাম রাখিল? মনুষ্যে না তাঁর বাপ মায়ে? “তাঁর বাপ মায়ে,” এমন কথা বলিতেছি তাহার কারণ এই যে, তাঁহার বাপ মা আছেন, এ কথা ঋগ্বেদে আছে। তবে তাঁর বাপ মা কে, সে বিষয়ে ঋগ্বেদে বড় গোলযোগ। ঋগ্বেদে অনেক রকম বাপ মার কথা আছে। ঋগ্বেদে এক স্থানে মাত্র তিনি আদিত্য বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন। কিন্তু শেষ পৌরাণিক তত্ত্ব এই দাঁড়াইয়াছে

বাংকম রচনাবলী

যে, তিনি অর্দিত ও কশ্যপের পুত্র। পুরাণেতিহাসে তাঁহার এই পরিচয়। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে; অর্দিত ও কশ্যপ—ইন্দ্রের অন্তপ্রাশনের সময় কি তাঁহার ঐ নাম রাখিয়াছিলেন?

আগে বুঝিয়া দেখা যাউক যে, ইন্দ্র অর্দিত এবং কশ্যপের সন্তান কেন হইলেন? অর্দিত কে, তাহা আমরা পুর্বেই বুঝিয়াছি—তিনি অনন্ত প্রকৃতি। আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহার উপর দুই একজন বিলাতী পণ্ডিতের কথা হইলে বোধ হয় আমাদের দেশের অনেক বাবুর মনঃপুত হইবে। এই জন্য নোটে প্রথমতঃ আচার্য্য রোথের মত, দ্বিতীয়তঃ মাক্সমুল্লরের মত উদ্ধৃত করিলাম।*

এই ত গেল দেবতাদিগের মা। এখন দেবতাদিগের বাপ কশ্যপের কিছু পরিচয় দিই। এখানে সাহেবদিগের সাহায্য পাইব না বটে, কিন্তু বেদের সাহায্য পাইব। কশ্যপ অর্থে কচ্ছপ। এ অর্থ বেদেও লেখে, আজিও অভিধানেও লেখে। এখন, কচ্ছপের আর একটা সংস্কৃত নাম কৃষ্ণ। আবার কৃষ্ণ শব্দ কৃ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইতে পারে—কি প্রকারে নিষ্পন্ন হইতে পারে সে কচ্ছপিতে আমাদের কাজ নাই—বৈদিক ঋষিরা তাহার দায়ী।—অতএব যে করিয়াছে, সেই কৃষ্ণ। কৃষ্ণ হইতে হইতে কালক্রমে সেই কর্তা আবার কশ্যপ হইল, কেন না—কৃষ্ণ কশ্যপ একার্থবাচক শব্দ। যিনি সকল করিয়াছেন, যিনি বেদে প্রজাপতি বা পুরুষ বলিয়া অভিহিত, তিনি কৃষ্ণ, তিনিই এই কশ্যপ। এখন বেদ হইতে ইহার প্রমাণ দিওঁছি।

“স যৎ কৃষ্ণো নাম। এতদৈ রূপং ধ্বা প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত। যদসৃজত অকরোত্তৎ। যদকরোত্তস্মাৎ কৃষ্ণঃ। কশ্যপো বৈ কৃষ্ণ। তস্মাদাহুঃ সর্বাঃ প্রজাঃ কাশ্যপা ইতি।”
শতপথব্রাহ্মণ ৭।৪।১।৫

ইহার অর্থ—

“কৃষ্ণ নামের কথা বলা যাইতেছে।—প্রজাপতি এই রূপ ধারণ করিয়া প্রজা সৃজন করিলেন। যাহা সৃজন করিলেন, তাহা তিনি করিলেন (অকরোত্তৎ), করিলেন বলিয়া তিনি কৃষ্ণ। কশ্যপও (অর্থাৎ কচ্ছপ) কৃষ্ণ। এই জন্য লোকে বলে, সকল জীব কশ্যপের বংশ।”

অতএব প্রজাপতি বা স্রষ্টাই কশ্যপ। গোড়ায় তাই। তার উপর উপন্যাসকারেরা উপন্যাস বাড়াইয়াছে।

অতএব ইন্দ্রের বাপ মার ঠিকানা হইল। সকল বস্তুর বাপ মা যে, ইন্দ্রেরও বাপ মা সেই প্রকৃতি পুরুষ। সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষ নহে; ইন্দ্র যখন হইয়াছেন, সাংখ্য তখন হয় নাই। প্রকৃতি অনন্তসত্তা †—পুরুষ আদি কারণ। যখন বাপ মার এরূপ পরিচয় পাইলাম, তখন এরূপ

* আচার্য্য রোথ বলেন—

“Aditi Eternity or the Eternal, is the element which sustains and is sustained by the Adityas. This conception, owing to the character of what it embraces, had not in the Vedas been carried out into a definite personification, though the beginnings of such are not wanting. * * * This eternal and inviolable principle in which the Adityas live and which constitutes their essence is the Celestial Light.”

মূর সাহেব কৃতানুবাদ।

২। মাক্সমুল্লর বলেন—

“Aditi, an ancient God or Goddess, is in reality the earliest name invented to express the Infinite; not the Infinite as the result of a long process of abstract reasoning but the visible Infinite, visible by the naked eye, the endless expanse beyond the earth beyond the clouds beyond the sky.”

Translations from the Rig-Veda. I, 230.

সায়নাচার্য্যের মত ভিন্ন প্রকার, কিন্তু তিনিও জানেন যে অর্দিত চৈতন্যবৃন্দা দেবী-বিশেষ নহেন। তিনি বলেন “অর্দিতং অখণ্ডনীয়ং ভূমিৎ দিতং খণ্ডিতং প্রজাদিকাং।” কেহ কেহ অর্দিতিকে পৃথিবী মনে করিতেন, তাহা পুর্বে বলা হইয়াছে।

† পাঠকের স্মরণ থাকে যেন প্রথমে অর্দিত অনন্তসত্তা বা প্রকৃতি নহেন—প্রথমে অর্দিত অনন্ত আকাশ মাত্র। “অনন্ত” ইতিজ্ঞান, প্রথমে আকাশ হইতে জন্মিয়া পরিণামে সমস্ত সত্তায় পৌঁছে।

দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম—ইন্দ্র

বুঝা যায় যে, ইন্দ্রও বৃষ্টি একটা শরীরী চৈতন্য না হইবেন—প্রকৃতিতে ঐশী শক্তির বিকাশ মাত্র হইবেন। আমরা প্রথমে প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, ইন্দ্রের নামেই সে কথা স্পষ্ট বুঝা যায়। নামটা, অর্দিত ও কশ্যপ তাঁহার অন্তপ্রাশনের সময়ে রাখেন নাই, আমরাই রাখিয়াছি। আমরা যাঁহাকে ইন্দ্র বলি, তাঁহার গুণ দেখিয়াই ইন্দ্র নাম রাখিয়াছি। ইন্দ্র ধাতু বর্ষণে। তদন্তর “র” প্রত্যয় করিয়া “ইন্দ্র” শব্দ হয়। অতএব, যিনি বৃষ্টি করেন, তিনিই ইন্দ্র। আকাশ বৃষ্টি করে, অতএব ইন্দ্র আকাশ।

আমরা অন্য প্রবন্ধে বলিয়াছি, অর্দিতও আকাশ-দেবতা। আকাশকে দুই বার পৃথক্ পৃথক্ ভিন্ন ভিন্ন দেবতা কল্পনা করা কিছুই অসম্ভব নহে।* বরং আরও আকাশ-দেবতা আছে—থাকাও সম্ভব। যখন আকাশকে অনন্ত বলিয়া ভাবি, তখন আকাশ অর্দিত; যখন আকাশকে বৃষ্টিকারক বলিয়া ভাবি, তখন আকাশ ইন্দ্র; যখন আকাশকে আলোকময় ভাবি, তখন দ্যৌঃ। এমনই আকাশের আর আর মূর্ত্তি আছে। সূর্য্য অগ্নি বায়ু প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন শক্তির আলোচনায় ভিন্ন ভিন্ন বৈদিক দেবের উৎপত্তি হইয়াছে, ক্রমে দেখাইব।

আমরা যদি এই কথা মনে রাখি যে, বৃষ্টিকারী আকাশই ইন্দ্র, তাহা হইলে ইন্দ্র সম্বন্ধে যত গুণ, যত উপন্যাস, বেদ, পুরাণ ও ইতিহাসে কথিত হইয়াছে, তাহা বৃষ্টিতে পারি। এখন বৃষ্টিতে পারি, ইন্দ্রই কেন বজ্রধর, আর কেহ কেন নহে। যিনি বৃষ্টি করেন, তিনিই বজ্রপাত করেন।

ঋগ্বেদের সূক্তগুলির সর্বশেষ পর্য্যালোচনা করিলে বৃষ্টিতে পারিব যে, কতকগুলি সূক্ত অপেক্ষাকৃত প্রাচীন, কতকগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ইহাতে কিছুই অসম্ভব নাই, কেন না সংহিতা সংকলিত গ্রন্থ মাত্র। নানা সময়ে, নানা ঋষি কতৃক প্রণীত, না হয় দৃষ্ট মন্ত্রগুলির সংগ্রহ মাত্র। অতএব তাহার মধ্যে কোন্টি পূর্ব্ববর্ত্তী, কোন্টি পরবর্ত্তী অবশ্য হইবে। যে সূক্তগুলি আধুনিক, তাহাতে ইন্দ্র শরীরী, চৈতন্যযুক্ত দেবতা হইয়া পড়িয়াছেন বটে, তখন ইন্দ্রের উৎপত্তি ঋষিরা ভুলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন সূক্তগুলিতে দেখা যায় যে, ইন্দ্র যে আকাশ, এ কথা ঋষিদের মনে আছে। কতকগুলি উদাহরণ দিতেছি।

“অবন্ধান্দিন্দ্রম্মরুতশিচদ্র মাতা যদ্বীরং দধনন্ধনিষ্ঠা” ১০।৭৩।১

অর্থাৎ যখন তাঁহার ধনাঢ্য মাতা তাঁহাকে প্রসব করিলেন, তখন মরুতেরা তাঁহাকে বাড়াইলেন। এস্থলে ঋড়ের সঙ্গে বৃষ্টির সম্বন্ধ সূচিত হইতেছে।

“ইন্দ্রস্য শীর্ষং ক্রতযো নিরেকে” ১০।১১২।৩

এখানে সূর্য্যালোকে আকাশ আলোকিত হইবার কথা সূচিত হইতেছে এবং ইন্দ্রকে “হরিশিপ্র” “হরিকেশ” “হরিশমশ্রু” “হরিবর্ষা” “হিরণ্য” “হিরণ্যবাহু” ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা আকাশে সূর্য্যালোকজনিত কাণ্ডবর্ণ সূচিত হইতেছে। বর্ষণকালীন মেঘ সকল বায়ুর উপর আরোহণ করিয়া চলে, এজন্য কথিত হইয়াছে যে, ইন্দ্র বাতাসের ঘোড়ার উপর চলে “যুজানো অশ্বা বাতস্য ধুনী দেবো দেবস্য বজ্রিবঃ” ১০।২২।৪।৬। ইন্দ্রের বজ্রের সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে “সমুদ্রে অন্তঃ শয়তে উদ্দনা বজ্রো অভীবৃতঃ” ৮।৭৯।৯। বজ্র অন্তঃসমুদ্রে জলকতৃক আবৃত হইয়া শব্দইয়া থাকে। এখানে অন্তঃসমুদ্র অর্থে অন্তরীক্ষ, আর জল অর্থে অন্তরীক্ষের বায়বীয় পদার্থ। অথর্ব বেদে ইন্দ্রের জাল আছে “অন্তরীক্ষম্ জালমাসীজ্জালদণ্ডা দিশোমহীঃ।” অথর্ব বেদ ৮।৫। অর্থাৎ অন্তরীক্ষটা ইন্দ্রের জাল আর পৃথিবীর দিক্ সকল জালের দণ্ড বা বাঁশ—এ জাল আকাশেরই।

এরূপ উদাহরণ খুঁজিলে অনেক পাওয়া যায়। পাঠকের রুচি হয়, আমরা আরও যোগাইতে পারিব। এক্ষণে ইন্দ্র সম্বন্ধে যে সকল উপন্যাস আছে, তাহার দুই একটা বুঝাইবার চেষ্টা করা যাউক। এ সকল উপন্যাস অধিকাংশ অসূরবধ সম্বন্ধে। আধুনিক বৈয়াকরণেরা অসূর শব্দের এই ব্যাখ্যা করেন যে, “অস্যাতি ক্ষিপতি দেবান্ উর বিরোধে ইতি অসূরঃ।”

* মাও আকাশ, ছেলেও আকাশ ইহাও বিস্ময়কর নহে। প্রথম যখন আকাশ “অর্দিত” এবং আকাশ “ইন্দ্র” বলিয়া কল্পিত হয়, তখন ইহাদিগের মাতা পুত্র সম্বন্ধ কল্পিত হয় নাই। ঋগ্বেদে তিনি অর্দিতের পুত্রদিগের মধ্যে গণিত হন নাই; কেবল এক স্থানে মাত্র ইন্দ্র ঋগ্বেদে অর্দিত্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। সে সূক্তটিও বোধ হয় আধুনিক।

বিশ্বকম রচনাবলী

যদিও এই ব্যাখ্যা প্রকৃত নহে এবং আদৌ অসুর ও দেব উভয় শব্দ একার্থবাচক ছিল, তথাপি শেষাবস্থায় দেবদেবীদিগকেই যে অসুর বলা হইত, ইহা যথার্থ। যখন বেদে পড়ি যে, বৃহ নমুচি শম্বর প্রভৃতি অসুরগণ ইন্দের দ্বেষক ছিল এবং ইন্দ্র ইহাদিগকে বজ্রদ্বারা বধ করিলেন তখন অনেক স্থানেই বৃষ্টিতে পারি যে, এই সকল অসুর বৃষ্টির বিঘ্ন মাত্র, বৃষ্টি-নিরোধক প্রাকৃতিক ক্রিয়া মাত্র। আকাশ বজ্রপাত করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ করেন, অর্মানি সে অসুরেরা মরিয়া যায়। অর্মানি ইন্দের বজ্রে বৃহ মরে। “বজ্রেণ হত্বা নিরাপঃ সসর্জ” “বজ্রেণ যানি অতৃণৎ নদীনাং” “ইন্দ্রো অর্ণো অপাং পৈরয়দহীহাচ্চ সমুদ্রং” এমন কথা অনেক পাওয়া যায়। প্রথম মন্ডলের ৩২ সূক্তের ২ ঋকে আছে যে, “বাস্থা ইব ধেনবঃ স্যন্দমানাঃ অঞ্জঃ সমুদ্রমবজ্রমুদ্রাপঃ” বৃহাসুর হত হইলে পর রুদ্ধগতি নদী সকল বেগের সহিত সমুদ্রে প্রবাহিত হইয়াছিল, যদ্রুপ গো সকল হাম্বারব করিয়া সমুদ্র বৎসের নিকট গমন করে।

এই সকল কথাই মর্ম্ম এই যে, বৃহাদি অসুর বধ হইলেই জল ছোটে। অতএব অসুর-বধ আর কিছই নহে—বৃষ্টির বিঘ্ন সকল বিনাশ করিয়া বর্ষণ করা। সচরাচর দেখা যায় যে, গ্রীষ্মের পর প্রথম বৃষ্টিতে অধিক বজ্রাঘাত হয়, এই জন্য বজ্রের দ্বারা ইন্দ্র অসুর বধ করেন। কিন্তু কেবল বজ্রের দ্বারা নহে, “হিমেন অবিধ্যদব্দং” ৮।৩২।২৬, (হিমেন, হিমের দ্বারা অর্থাৎ আমরা যাহাকে শিল বলি তদ্বারা)। শুম্বকালের পর প্রথম বৃষ্টির সময়ে অনেক সময়ে শিল (hail) পড়ে। পুনশ্চ “অপাম্ ফেনেন নমুচেঃ শির ইন্দ্র উদবর্তয়ৎ” ৮।১৪।১৩ জলের ফেনার দ্বারা ইন্দ্র নমুচির মস্তক উদ্বর্তন করিলেন। ঝড় বৃষ্টির চোটে অসুরটা মারা গেল।

অতএব নমুচি বৃহ শম্বর অর্থাৎ প্রভৃতি অসুরেরা বৃষ্টি-নিরোধক প্রাকৃতিক ক্রিয়া ভিন্ন অন্য কিছই যে নহে, ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। কিন্তু ইহারা পুরাণেতিহাসের অনেক মাল মসলা যোগাইয়াছে।

ইন্দ্র বৃষ্টিকারী আকাশ, শুধু এই কথাটুকু লইয়া পুরাণেতিহাসের উপন্যাস সকল কি প্রকারে রচিত হইয়াছে, তাহার আর একটা উদাহরণ দিতেছি। অহল্যার গল্প সকলেই জানেন। কথিত আছে, ইন্দ্র গৌতমপত্নী অহল্যাকে হরণ করেন এবং ঋষির শাপে তাঁহার অঙ্গ সহস্রধা বিকৃত হয়। তাহার পর আবার ঋষিবাক্যে সেই বিকার সহস্র চক্ষু পরিণত হয়। উপন্যাসটা শুনিতে অতি কদর্য এবং এইরূপ উপন্যাসের জন্যই হিন্দুশাস্ত্র লক্ষ গালি খাইয়াছে। আর এই সকল উপন্যাসই হিন্দুধর্ম্মের প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এত অভ্যন্তর কারণ হইয়াছে। ইউরোপীয় পণ্ডিত সাহেবরাও—অন্যে নয়, মুর, মাক্সমুলার, লাসেন, প্রভৃতি, পড়িয়া শুনিয়া স্থির করিয়াছেন যে, লাম্পট্যপ্রিয় হিন্দুশাস্ত্রকারেরা লাম্পট্যপ্রিয়তাবশতঃই, ইন্দ্রাদি দেবতাকে লাম্পট বলিয়া চিত্রিত করিয়াছে।

কিন্তু কথাটা বড় সোজা। ইন্দ্র সহস্রাঙ্ক কিন্তু ইন্দ্র আকাশ। আকাশের সহস্র চক্ষু কে না দেখিতে পায়? সাহেবেরা কি দেখিতে পান না যে, আকাশে তারা উঠে? সহস্র তারাযুক্ত আকাশ, সহস্রাঙ্ক ইন্দ্র। কথাটা আমি নতুন গড়িতেছি না—অনেক সহস্র বৎসরের কথা। প্রাচীন গ্রীসেও এ কথা প্রচলিত ছিল। তবে আমরা বলি, ইন্দ্র সহস্রাঙ্ক; তাহারা বলে, আর্গাস শতাঙ্ক।*

পাঠক বলিতে পারেন, তাহা হউক, কিন্তু অহল্যার কথাটা আসিল কোথা হইতে? সকলেই জানেন হল বলে লাম্পলকে। অহল্যা অর্থাৎ যে ভূমি হলের দ্বারা কর্ষিত হয় না—কঠিন,

* Even where the tellers of legends may have altered or forgotten its earlier mythic meaning, there are often sufficient grounds for an attempt to restore it. **** For instance the Greeks had still present to their thought the meaning of Argos Panoptes, Io's hundred eyed all seeing guard, who slain by Hermes and changed into a peacock, for Macrobus writes as recognizing in him the star-eyed heaven itself, even as the Aryan Indra—the Sky—is the “thousand eyed.”

দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম—কোন পথে যাইতেছি?

অনুস্বর। ইন্দ্র বর্ষণ করিয়া সেই কঠিন ভূমিকে কোমল করেন,—জীর্ণ করেন, এই জন্য ইন্দ্র অহল্যা-জার। জুধাতু হইতে জার শব্দ নিস্পন্ন হয়। বৃষ্টির দ্বারা ইন্দ্র তাহাতে প্রবেশ করেন, এই জন্য তিনি অহল্যাতে অভিগমন করেন। কুমারিলভট্ট এ উপন্যাসের আর একটি ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা নোটে* উদ্ধৃত করিলাম। উপরি-কথিত ব্যাখ্যাগুলির জন্য লেখক নিজে দায়ী।

এখন বোধ হয় পাঠক কতক কতক বুঝিয়া থাকিবেন যে, হিন্দুধর্মের ইন্দ্রাদি দেবতা কোথা হইতে আসিয়াছেন এবং পুরাণেতিহাসের উপাখ্যান সকলই বা কোথা হইতে আসিয়াছে। বেদের অন্যান্য দেবতা সম্বন্ধেও আমরা কিছু কিছু বলিব।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই ইন্দ্রকে পূজা না করিব কেন? ইনি অচেতন, বর্ষণকারী আকাশ মাত্র, কিন্তু ইহাতে কি জগদীশ্বরের শক্তি, মহিমা, দয়ার আশ্চর্য্য পরিচয় পাই না? যদি আমি আকাশ সচেতন, স্বয়ং সুখ দুঃখের বিধানকর্তা বলিয়া, তাঁহার উপাসনা করি, যদি তাই ভাবিয়া, তাঁহার কাছে প্রার্থনা করি যে, হে ইন্দ্র! ধন দাও, গোরু দাও, ভাষ্য দাও, শত্রুসংহার কর, তবে আমার উপাসনা, দৃষ্ট, অলীক, উপধর্ম মাত্র। কিন্তু যদি আমার মনে থাকে যে, এই আকাশ নিজে অচেতন বটে, কিন্তু জগদীশ্বরের বর্ষণ-শক্তির বিকাশস্থল; যে অনন্ত কারুণ্যের গুণে পৃথিবী বৃষ্টি পাইয়া শীতলা, জলশালিনী, শস্যশালিনী, জীবশালিনী হয়, সেই কারুণ্যের দৃষ্টিপথবর্তিনী প্রতিমা, তবে তাহাকে ভক্তি করিলে, পূজা করিলে, ঈশ্বরের পূজা করা হইল। ঈশ্বরকে আমরা দেখিতে পাই না; তবে তাঁহাকে আমরা জানিতে পারি কিসে? তাঁহার কার্য্য দেখিয়া, তাঁহার শক্তি ও দয়ার পরিচয় পাইয়া। যেখানে সে শক্তি দেখিব, সে পরিচয় পাইব, সেইখানে তাঁহার উপাসনা করিব, নহিলে তাঁহার প্রতি আন্তরিক ভক্তির সম্পূর্ণ সফলিত হইবে না। আর যদি চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলির সফলিত সুখের হয়, তবে জগতে যাহা মহৎ, যাহা সুন্দর, যাহা শক্তিমান, তাহার উপাসনা করিতে হয়। যদি এ সকলের প্রতি ভক্তিমান না হইব, তবে চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলি লইয়া কি করিব? এ উপাসনা ভিন্ন হৃদয় মরুভূমি হইয়া যাইবে। এগুলি বাদ দিয়া যে ঈশ্বরোপাসনা, যে পরহীন বৃক্ষের ন্যায় অঙ্গহীন উপাসনা। হিন্দুধর্ম এ উপাসনা আছে। ইহা হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতার লক্ষণ। তবে দুর্ভাগ্যবশতঃ ক্রমে হিন্দুধর্মের বিকৃতি হইয়াছে, ইন্দ্র যে বর্ষণকারী আকাশ, তাহা ভুলিয়া গিয়া তাঁহাকে স্বয়ং সুখদুঃখের বিধাতা, অথচ ইন্দ্রিয়পরবশ, কুকর্মশালী, স্বর্গস্থ একটা জীবে পরিণত করিয়াছি। হিন্দুধর্মের সেইটুকু এখন বাদ দিতে হইবে—হিন্দুধর্ম যে একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই, ইহা মনে রাখিতে হইবে। তবে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, ঈশ্বর বিশ্বরূপ; যেখানে তাঁহার রূপ দেখিব, সেইখানে তাঁহার পূজা করিব। সেই অর্থে ইন্দ্রাদির উপাসনা পুণ্যময়—নহিলে অধর্ম। ‘প্রচার’, ১ম বর্ষ, পৃঃ ১৪৫-৫৬।

কোন পথে যাইতেছি?

যাঁহারা ধর্ম-ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত, তাঁহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক শ্রেণীর ব্যাখ্যাকারেরা বলেন, যাহাকে ধর্ম বলিতেছি, তাহা ঈশ্বরোক্ত বা ঈশ্বর-প্রেরিত উপদেশ। তাঁহাদের কাজ বড় সোজা। অমুক গ্রন্থে ঈশ্বরদত্ত উপদেশগুলি পাওয়া যায়, আর তাহার তাৎপর্য্য এই, এই কথা বলিলেই তাঁহাদের কাজ ফুরাইল। খ্রীষ্টীয়ান, ব্রাহ্মণ, মুসলমান, যীহুদী, সচরাচর এই প্রথাই অবলম্বন করিয়াছেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যাখ্যাকারেরা বলেন যে, কোন ধর্ম বা ধর্মপুস্তক যে ঈশ্বরোক্ত, ইহা বিশ্বাস করিবার উপযুক্ত কারণ নাই। বৌদ্ধ, কোম্বুত, ব্রাহ্ম, এবং নব্য হিন্দু ব্যাখ্যাকারেরা এই মতের উদাহরণস্বরূপ। ইঁহারা কোন গ্রন্থকেই ঈশ্বরোক্তি বলিয়া স্বীকার করেন না।

* “সমস্ততেজাঃ পরমেশ্বরত্বনিমিত্তেন্দ্রশব্দবাচ্যাঃ সবিতেবাহনি লীয়মানতয়া রাত্রেহল্যাশব্দবাচ্যায়াঃ ক্ষয়াক্ষয়করণহেতুত্বাঙ্গীর্জাত্যাদানেন বোধিতেন বেত্যহল্যাজার ইত্যুচ্যতে ন পরম্ভাব্যভিচারাত্।”

ইহার অর্থ। তেজোময় সবিতা ঐশ্বর্য্যহেতুক ইন্দ্রপদবাচ্য। অহন্ অর্থাৎ দিনকে লয় করে বলিয়া রাত্রে নাম অহল্যা। সেই রাত্রিকে ক্ষয় বা জীর্ণ করেন বলিয়া ইন্দ্র অর্থাৎ সবিতা অহল্যাজার। ব্যভিচার জন্য নহে। বঙ্গদর্শন, ১২৮১—৪৬৮ পৃঃ।

বঙ্কিম রচনাবলী

যদি ঈশ্বর-প্রণীত ধর্ম না স্বীকার করিলেন, তবে তাঁহাদিগকে ধর্মের একটা নৈসর্গিক ভিত্তি আছে, ইহা প্রমাণ করিতে হইবে। নইলে ধর্মের কোন মূল থাকে না—কিসের উপর ধর্ম সংস্থাপিত হইবে? ধর্মের এই নৈসর্গিক ভিত্তি কল্পিত অস্তিত্বশূন্য বস্তু নহে; যাঁহারা ঈশ্বর-প্রণীত ধর্ম স্বীকার করিয়া থাকেন, তাঁহারাও ধর্মের নৈসর্গিক ভিত্তি স্বীকার করিতে পারেন।

উপস্থিত লেখক হিন্দুধর্মের অন্যান্য নূতন ব্যাখ্যাকারদিগের ন্যায় দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। আমি কোন ধর্মকে ঈশ্বর-প্রণীত বা ঈশ্বর-প্রেরিত মনে করি না।* ধর্মের নৈসর্গিক ভিত্তি আছে, ইহাই স্বীকার করি। অথচ স্বীকার করি যে, সকল ধর্মের অপেক্ষা হিন্দুধর্ম শ্রেষ্ঠ।

এই দুইটি কথা একত্রিত করিলে, পাঠক প্রথমে আপত্তি করিবেন যে, এই দুইটি উক্তি পরস্পর অসঙ্গত। হিন্দুধর্ম যাঁহারা গ্রহণ করে, তাঁহারা হিন্দুধর্ম ঈশ্বরোক্ত বলিয়াই গ্রহণ করে। কেন না হিন্দুধর্ম বেদমূলক। বেদ হয় ঈশ্বরোক্ত, নয় ঈশ্বরের ন্যায় নিত্য। যে ইহা মানিল না, সে আবার হিন্দুধর্মের সত্যতা এবং শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করে কি প্রকারে?

ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, ধর্মের যে নৈসর্গিক ভিত্তি আছে, হিন্দুধর্ম তাহার উপর স্থাপিত, তাই ঈশ্বর-প্রণীত ধর্ম না মানিয়াও হিন্দুধর্মের যথার্থ্য ও শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করা যাইতে পারে। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে এই কথা ক্রমে পরিষ্ফুট হইতেছে।

যাঁহারা এই কথা বলেন, তাঁহাদের উপর এই কথা প্রমাণের ভার আছে। তাঁহাদিগকে দেখাইতে হইবে যে, হিন্দুধর্ম, ধর্মের নৈসর্গিক মূলের উপর স্থাপিত। যদি তাহা না দেখাইতে পারেন, তবে এক শ্রেণীর লোক বলিবেন, “হিন্দুধর্ম তবে ধর্মই নহে, মিথ্যা ধর্ম।” আর এক শ্রেণীর লোক বলিবেন, “ধর্মের নৈসর্গিক ভিত্তির কথা ছাড়িয়া দাও—বেদ নিত্য বা বিধিবাক্য বলিয়া স্বীকার কর।”

অতএব হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যায় আমাদের দেখাইতে হইবে যে, হিন্দুধর্ম, ধর্মের নৈসর্গিক ভিত্তির উপরে স্থাপিত। ইহা দেখাইতে গেলে প্রথমে বুঝাইতে হইবে, ধর্মের সেই নৈসর্গিক মূল কি? তাহার পর দেখাইতে হইবে যে, হিন্দুধর্ম সেই মূলের উপরেই স্থাপিত।

প্রথমটি, অর্থাৎ ধর্মের নৈসর্গিক তত্ত্ব, আমি ‘নবজীবনে’ বুঝাইতেছি। দ্বিতীয়টি ‘প্রচারে’ বুঝাইতে প্রয়াস পাইতেছি।

আমি ‘নবজীবনে’ দেখাইয়াছি যে, ধর্মের তিন ভাগ, (১) তত্ত্বজ্ঞান, (২) উপাসনা, (৩) নীতি। হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইতে গেলে, ঐ তিন ভাগই একে একে বুঝিয়া লইতে হয়।

হিন্দুধর্মের প্রথম ভাগ, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান, ইহাকেও আবার তিনটি পৃথক্ অবস্থায় অধীত করিতে হয়। (১) বৈদিক, (২) দার্শনিক, (৩) পৌরাণিক।

এই বৈদিক তত্ত্ব আবার ত্রিবিধ। (১) দেবতাতত্ত্ব, (২) ঈশ্বরতত্ত্ব, (৩) আত্মতত্ত্ব। দেবতাতত্ত্ব প্রধানতঃ সংহিতায়; আত্মতত্ত্ব উপনিষদে; ঈশ্বরতত্ত্ব উভয়ে।

অতএব হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যায় গোড়ায় ঋগ্বেদসংহিতার দেবতাতত্ত্ব। পাঠক এখন বুঝিয়াছেন যে, কেন আমরা ঋগ্বেদসংহিতার দেবতাদিগকে লইয়া ‘প্রচারে’ ধর্ম-ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছি।

পূর্বে কয় সংখ্যার কয়টি বৈদিক প্রবন্ধে আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহার মধ্যে ভরসা করি, পাঠকদিগের স্মরণ আছে। যথা, (১) বেদে বলে দেবতা মোটে তেত্রিশটি। অনেক আধুনিক দেবতা এই তেত্রিশটির মধ্যে নাই। অনেকে আবার এমন আছেন যে, তাঁহাদের উপাসনা এখন আর প্রচলিত নাই।

(২) সে তেত্রিশটি দেবতা হয় আকাশ, নয় সূর্য্য, নয় অগ্নি, নয় অন্য কোন নৈসর্গিক পদার্থ। তাঁহারা লোকাভীত চৈতন্য, অথবা এখানে যাঁহাকে দেবতা বলি—সেরূপ দেবতা নহেন।

(৩) এই নৈসর্গিক পদার্থের যে সকল গুণ, তাহার বর্ণনাগুলি ক্রমে বৈদিক এবং পৌরাণিক উপন্যাসে পরিণত হইয়াছে।

* যাহা কিছু জগতে আছে, তাহাই ঈশ্বর-প্রণীত বা ঈশ্বর-প্রেরিত। সে কথা এখন হইতেছে না।

(৪) এ সকল অচেতন পদার্থ জগদীশ্বরের মহিমার পরিচায়ক এবং নিজেও মহান্ বা সুন্দর, অতএব সে সকল বস্তুর ধ্যানে ঈশ্বরে ভক্তি, এবং চিত্তবৃত্তির স্ফূর্তি হয়। এই অর্থে বৈদিক উপাসনা বিধেয়।

এই চারিটির মধ্যে দ্বিতীয়, তৃতীয়, ও চতুর্থ তত্ত্বের প্রমাণ এবং উদাহরণস্বরূপ আমি অর্দিত ও ইন্দ্রের কিছু বিস্তারিত পরিচয় দিয়াছি। কিন্তু আর আর বৈদিক দেবতাগুলির প্রত্যেককে এইরূপ সশরীরে পরিচিত না করিলে, এই দেবতাতত্ত্ব প্রমাণীকৃত বা প্রাজল হইয়াছে, এমত বিবেচনা করা যায় না। অতএব ইন্দ্রের পরে, বরুণাদির পরিচয়ে প্রবৃত্ত হইব। কিন্তু সকলেরই তত সবিস্তারে পরিচয় আবশ্যিক হইবে না। আবশ্যিক হইলে দিব। দেবতাতত্ত্ব সমাপ্ত হইলে ঈশ্বরতত্ত্বের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে।

পাঠককে এত দূরে আনিয়া আমরা কোন্ পথে যাইতেছি, তাহা বলিয়া দেওয়া আবশ্যিক বোধ হইল। কোন্ পথে কোথায় যাইতেছি, তাহা না বলিয়া দিলে পাঠক সঙ্গে যাইতে অস্বীকার করিতে পারেন। 'প্রচার', ১ম বর্ষ, পৃ. ২০০-২০৪।

বরুণাদি*

আমরা বলিয়াছি, ইন্দ্র ও অর্দিত আকাশ-দেবতা। বরুণ আর একটি আকাশ-দেবতা। বৃ ধাতু আবরণে। যাহা চরাচর বিশ্ব আবরণ করিয়া আছে, তাহাই বরুণ। আকাশকে যখন অনন্ত ভাবি, তখন তিনি অর্দিত, যখন আকাশকে বৃষ্টিকারী ভাবি, তখন আকাশ ইন্দ্র, যখন আকাশকে সর্বাবরণকারী ভাবি, তখন আকাশ বরুণ।

পুরাণে বরুণ আর আকাশ-দেবতা নহেন, তিনি জলেশ্বর। ঋগ্বেদেও তিনি স্থানে স্থানে জলাধিপতি বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। তাহার কারণ বেদে পৃথিবীর বায়বীয় আবরণ অনেক স্থলে জল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।† কিন্তু প্রাচীন কালে তিনি যে আকাশ-দেবতা ছিলেন, গ্রীকদিগের মধ্যে Ouranos দেবতা তাহার এক প্রমাণ। ভাষাতত্ত্ববিৎ পাঠকেরা অবগত আছেন যে, গ্রীক ও হিন্দুরা যে এক বংশসম্ভূত, তাহার অনুল্লঙ্ঘ্য প্রমাণ আছে। গ্রীক ধর্মের Ouranos আকাশ-দেবতা।

ঋগ্বেদে বরুণের বড় প্রাধান্য। তিনি সচরাচর সম্রাট্ ও রাজা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। ইউরোপীয় পণ্ডিত কেহ কেহ বলেন যে, প্রথমে বরুণ বৈদিক উপাসকদিগের প্রধান দেবতা ছিলেন, ক্রমে ইন্দ্র তাঁহাকে স্থানচ্যুত করিয়াছেন। ফলতঃ ঋগ্বেদে বরুণের যে রূপ মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে, এরূপ ইন্দ্র ভিন্ন আর কোন দেবতারই হয় নাই। পৌরাণিক বরুণ ক্ষুদ্র দেবতা।

আর এক আকাশ-দেবতা “দ্যোঃ। ভাষাতত্ত্ববিদেরা বলেন, ইনি গ্রীকদিগের “Zeus” এবং “Zeus Pater” হইয়া রোমকদিগের Jupiter হইয়াছেন। Zeus ও Jupiter উক্ত জাতিদিগের প্রধান দেবতা। “দ্যোঃ” এককালে আর্যদিগের প্রধান দেবতা ছিলেন। ইঁহাকে বেদে প্রায় পৃথিবীর সঙ্গে একত্রে পাওয়া যায়। যুক্তনাম “দ্যাভা পৃথিবী”। দ্যোঃ পিতা—পৃথিবী মাতা। ইঁহাদিগের সম্বন্ধে কয়েকটা কথা ভবিষ্যতে বলিবার আছে। ইঁহারা যে আকাশ ও পৃথিবী, ইঁহাদের নামেই প্রকাশ আছে, অন্য প্রমাণ দিতে হইবে না।

আর একটি আকাশ-দেবতা পর্জন্য। ইনিও ইন্দ্রের ন্যায় বৃষ্টি করেন, বজ্রপাত করেন, ভূমিকে শস্যশালিনী করেন। ইন্দ্রের সঙ্গে ইঁহার প্রভেদ কেন হইল, তাহা আমি বৃদ্ধিতে পারি নাই, বৃদ্ধিতেও পারিলাম না। তবে ইঁহা বৃদ্ধিতে পারি যে, পর্জন্য ইন্দ্রের অপেক্ষা প্রাচীন দেবতা। লিথুয়েনিয়া বলিয়া রুশ দেশের একটি ক্ষুদ্র বিভাগ আছে। সে প্রদেশের লোক আর্যবংশোদ্ভব। শুনিয়াছি তাহাদের ভাষার সঙ্গে প্রাচীন বেদের ভাষার বিশেষ সাদৃশ্য। এমন কি বেদজ্ঞ ব্যক্তি তাহাদের ভাষা অনেক বৃদ্ধিতে পারেন। এই পর্জন্যদেব, সেই প্রদেশে

* এই প্রবন্ধ পড়িবার আগে, ইঁহার পূর্বস্থিত প্রবন্ধটি পড়িলে ভাল হয়।

† যথা “যে দেবাসো দিবি একাদশ স্থ পৃথিব্যামধি একাদশ স্থ। অপ্সুক্ষিতো মাহিনা একাদশ স্থ তে দেবাসো ইত্যাদি। ১, ১৩৯, ১১।

বিশ্বকম রচনাবলী

আজিও বিরাজ করিতেছেন। সেখানে নাম Perkusnas. সেখানেও তিনি বজ্রবৃষ্টির দেবতা। যদি এ কথা সত্য হয়, তবে যে আদিম আৰ্য্যজাতি, ইউরোপীয় ও ভারতবর্ষীয় আধুনিক আৰ্য্যজাতিদিগের পূর্বপুরুষ, পূর্বন্য তাঁহাদিগের দেবতা। ইন্দ্রের নাম ভারতবর্ষে ভিন্ন আর কোথাও নাই। ইনি কেবল ভারতবর্ষীয় দেবতা। আৰ্যেরা ভারতবর্ষে আসিলে তবে ইহার সৃষ্টি হইয়াছিল। ইন্দ্র পূর্বন্যের অনেক পরবর্তী।

এক্ষণে সূর্য্যদেবতাদিগের কথা বলি। সূর্য্যদেবতাগুলি সংখ্যায় অনেক। যথা, সূর্য্য, সবিতা, পূষা, মিত্র, অর্য্যমা, ভগ, বিষ্ণু। সূর্য্যের সবিশেষ পরিচয় দিতে হইবে না। সূর্য্যকে প্রত্যহ দেখিতে পাই—তিনি কে তা জানি। অন্য সৌর দেবতাদিগের পরিচয় দিতেছি। যজুর্বেদের মাধ্যন্দিনী-শাখা চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ে ব্রহ্মযজ্ঞপাঠে কতকগুলি দেবতার স্তুতি আছে। তন্মধ্যে রাত্রি, উষা ও প্রাতঃস্তুতির পর পারম্পর্য্যের সহিত কতকগুলি সৌর দেবতার স্তুতি আছে। প্রথমে ভগস্তুতি। তার পর পূষার স্তুতি। তার পর অর্য্যমার স্তুতি। তার পর বিষ্ণুর স্তুতি। পণ্ডিতবর সত্যব্রত সামশ্রমী যজুর্বেদের মাধ্যন্দিনী শাখা ব্রহ্মযজ্ঞপ্রকরণের অনুবাদের টীকায় ঐ মূর্ত্তি চারিটির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। “উষোদয়ের পরেই প্রাতঃকাল—ইহাকেই অরুণোদয়কাল কহে। প্রাতঃকালের পরেই ভগোদয়কাল—অর্থাৎ অরুণোদয়ের পরেই যখন সূর্য্যের প্রকাশ অপেক্ষাকৃত তীব্র হইয়া উঠে, ভগ সেই কালের সূর্য্য।”

“যে পর্য্যন্ত সূর্য্যের তেজ অত্যুগ্র না হয়, তাবৎ তাদৃশ স্বল্পতেজা সূর্য্যকে পূষা কহে, অর্থাৎ পূষা ভগোদয়ের পরকালবর্ত্তী সূর্য্য।”

তার পর অর্য্যমা, অর্য্যমা অর্ক একই। সামশ্রমী মহাশয় লিখিতেছেন।

“পূষোদয়ের পরেই অর্কোদয়কাল—ইহার পরেই মধ্যাহ্ন। এই কালের সূর্য্যকেই অর্ক বা অর্য্যমা কহে। এই অর্য্যমার অস্তেই পূষাহ্ন শেষ হয়।”

“মধ্যাহ্ন কালের সূর্য্যকে বিষ্ণু কহে।”

ঋগ্বেদে পূষাকে অনেক স্থলেই “পশুপা” “পৃষ্টিস্তর” ইত্যাদি শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। যে ভাবে এই কথাগুলি পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে, তাহাতে এমন বোধ হয় যে, যে মূর্ত্তিতে সূর্য্য কৃষিকর্মের রক্ষাকর্ত্তা, পশুদিগের পাতা, পূষা সূর্য্যের সেই মূর্ত্তি। কিন্তু এই পশু কে, সে বিষয়ে অনেক সন্দেহ আছে। অনেক স্থানে পূষা পৃথকদিগের দেবতা বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে।

যাহাই হউক, পূষা সম্বন্ধে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, কেন না তিনি এক্ষণে আর হিন্দুধর্মের প্রচলিত দেবতা নহেন।

এক্ষণে মিত্রের কথা বলি। মিত্র সূর্য্য, কিন্তু মিত্র বরুণের ভাই। বেদে যেখানে মিত্রের স্তুতি, সেইখানে বরুণের স্তুতি,—মিত্রাবরুণো বেদের দুইটি প্রধান দেবতা। আদিত্য শব্দ এই দুই দেবতা সম্বন্ধে যেমন পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে, এমন আর কোন দেবতা সম্বন্ধেই নহে। আমরা বলিয়াছি যে, বরুণ আকাশ, তবে মিত্র সূর্য্য হইল কোথা হইতে? তৈত্তিরীয় সংহিতায় আছে, “ন বৈ ইদং দিবা ন নক্তমাসীদব্যাকৃতং তে দেবা মিত্রাবরুণো অরুবন্ ইদং নো বিবাসয়তামিতি মিত্রো অহরজনয়দ্বরুণো রাত্রিং।” অর্থাৎ দিন ছিল না, রাত্রি ছিল না—জগৎ অব্যাকৃত ছিল, তখন দেবতারা মিত্র বরুণকে বলিলেন—তোমরা ইহাকে বিভাগ কর। মিত্র দিবা করিলেন, বরুণ রাত্রি করিলেন। ১।৭।১০।১। সায়নাচার্য্য বলিয়াছেন, “অস্তং গচ্ছন্ সূর্য্য এব বরুণ ইতি উচ্যতে—স হি স্বগমনেন রাত্রিং জনয়তি।” “অস্তগামী সূর্য্যকে বরুণ বলে, তিনি আপনার গমনের দ্বারা রাত্রির সৃষ্টি করেন।” শতপথব্রাহ্মণে আছে, “অয়ং হি লোকো মিত্রঃ। অসৌ বরুণঃ।” অর্থাৎ ইহলোক মিত্র, পরলোক বরুণ। বোধ হয়, ইহাতে পাঠক বুঝিয়াছেন যে, বরুণ সর্বাধিকারী অন্ধকার—তিনি সর্বত্রই আছেন, যেখানে কেহ গিয়া আলো করে, সেইখানে আলো হয়, নহিলে অন্ধকার, নহিলে বরুণ। আলো করেন মিত্র। সৌভাগ্যক্রমে এই বরুণ আর এই মিত্র অন্য আৰ্য্যজাতি মধ্যেও পূজিত। বরুণ যে গ্রীকদিগের Uranos তাহা বলিয়াছি। আবার তিনি প্রাচীন পারস্যজাতিদিগের দেবতা, এমনও কেহ কেহ বলেন। প্রাচীন পারস্যদিগের প্রধান দেবতা অহুরমজদ। ভাষাবিদেরা জানেন যে, পারস্যেরা সংস্কৃত স স্থানে হ উচ্চারণ করে।—যথা সিন্ধু স্থানে হিন্দু, সপ্ত স্থানে হপ্ত। তেমনি অসুর স্থানে অহুর। এখন

সুরাসুর শব্দ যাঁহারা ব্যবহার করেন তাঁহাদিগের কথা তাৎপর্য এই, অসুরেরা দেবতাদিগের বিদ্বেশী,* কিন্তু আদৌ অসুরই দেবতা। অসু নিশ্বাসে। অসু ধাতুর পর র প্রত্যয় করিয়া “অসুর” হয়। অর্থাৎ আকাশে সূর্যের পর্বতে নদীতে যাঁহাদিগকে প্রাচীন আর্যেরা শক্তিশালী লোকাতীত চৈতন্য মনে করিতেন, তাঁহারা অসুর। বেদে ইন্দ্রাদি দেবগণ পুনঃ পুনঃ অসুর বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। ঋগ্বেদে বরুণকে পুনঃ পুনঃ “অসুর” বলা হইয়াছে। এই অহুরমজ্জ নামের অহুর শব্দের তাৎপর্য দেব। অনেক ইউরোপীয় লেখক প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, এই অহুরমজ্জ বরুণ। ইনি বরুণ হউন বা না হউন, ইঁহার আনুষঙ্গিক দেবতা মিত্র যে বরুণের আনুষঙ্গিক মিত্র, তদ্বিষয়ে সন্দেহ অল্পই। মিত্র সম্বন্ধে আর একটি রহস্যের কথা আছে। প্রাচীন পারসিকদিগের মধ্যে এই মিত্রদেবের একটা উৎসব ছিল। সে উৎসব শীতকালে হইত। রোমকেরা যখন আশিয়ার পশ্চিম ভাগ অধিকৃত করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা স্বরাজ্য মধ্যে ঐ উৎসবটি প্রচলিত করেন। তার পর রোমক রাজ্য খ্রীষ্টীয়ান হইয়া গেল। কিন্তু উৎসবটি উঠিয়া গেল না। উৎসবটি শেষে খ্রীষ্টের জন্মোৎসব খ্রীষ্টমাসে (Christmas) পরিণত ও সেই নামে পরিচিত হইল। এই যে ইংরেজ মহলে আজ এত গাঁদাফুল ও কেকের শ্রাদ্ধ পড়িয়া গিয়াছে, সাহেবেরা জানুন বা না জানুন, মানুন বা না মানুন, এ উৎসব আদৌ আমাদের মিত্রদেবের উৎসব। নোটে প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি।†

আবার সেই মিত্রদেবের উৎসবই বা কি? সেটা সূর্যের উত্তরায়ণের উৎসব। আমাদেরও যে উৎসব আছে—“মকর সংক্রান্তি”—যে দিন সূর্যের মকর রাশিতে সঞ্চার হয়। বাস্তবিক এখনকার “মকর সংক্রান্তি”, আর যে দিন সূর্যের মকরে যথার্থ সঞ্চার হয়, সে এক দিনই নয়—মকরে প্রকৃত সঞ্চার, “মকর সংক্রান্তি” হইতে তিন সপ্তাহের কিছু বেশী পিছাইয়া পড়িয়াছে। এই ব্যতিক্রমের কারণ “Precession of the Equinoxes.” জ্যোতিষ শাস্ত্র যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা সহজে গণনা করিতে পারিবেন, কত দিনে এই ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। সে যাহাই হউক, সাহেবদিগের এই আমাদের “মকর সংক্রান্তি” পৌষপার্বণ ও “খ্রীষ্টমাস” একই। কথাটা “আষাঢ়ে” রকম, কিন্তু প্রমাণে কিছু ছিদ্র নাই।—‘প্রচার,’ ১ম বর্ষ, পৃ. ২০৪-১০।

* অস্যাতি ক্ষিপতি দেবান্ উর বিরোধে।

† The Roman winter solstice festival as celebrated on December 25 (VIII. Kal. Jan.) in connexion with the worship of the Sun-God Mithra, appears to have been instituted in this special form by Aurelian about A. D. 273, and to this festival the day owes its apposite name of Birth-day of the Unconquered Sun, “Dies Natalis Solis Invicti.” With full symbolic appropriateness, though not with historical justification, the day was adopted in the Western Church, whence in time it passed to the Eastern Church, as the solemn anniversary of the birth of Christ, the Christian Dies Natalis, Christmas day. Attempts have been made to ratify this date as a matter of history, but no valid or even consistent Christian tradition vouches for it. The real origin of the festival is clear from the writings of the Fathers after its institution. In religious symbolism of the material and spiritual Sun, Augustine and Gregory Nyassa discourse on the glowing light and dwindling darkness that follow the Nativity, while Leo the Great, among whose people the earlier Solar meaning of the festival remained in strong remembrance, rebukes in a sermon the pestiferous persuasion, as he calls it, that this solemn day is to be honoured not for the birth of Christ, but for the rising, as they say, of the new Sun.

Tylor's *Primitive Culture*, Vol. II, p. 297-8.

টেলর সাহেব নোটে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। যাঁহাদিগের সে প্রমাণগুলি বিস্তারিত দেখিবার ইচ্ছা থাকে, তাঁহারা তাঁহার ঐ নোটের লিখিত গ্রন্থগুলি পড়িয়া দেখিবেন। নোটে ছয়খানি গ্রন্থের নাম আছে।

সবিতা ও গায়ত্রী

আকাশ-দেবতাদিগের কথা বলিয়াছি। তার পর সূর্য্য-দেবতাদিগের কথা বলিতেছিলাম। সূর্য্য-দেবতা, সূর্য্য, ভগ, অর্য্যমা, পূষা, মিত্র, সবিতা, বিষ্ণু। ইহার মধ্যে সূর্য্যের কোন কথা বলিবার প্রয়োজন হয় নাই—চেনা জিনিষ। ভগ, অর্য্যমা, পূষা, ও মিত্র সম্বন্ধে কিছু কিছু বলা গিয়াছে। বিষ্ণুর কথা এখন বলিব না—পৌরাণিক তত্ত্বের আলোচনায় তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতে হইবে। অতএব এক্ষণে কেবল সবিতাই আমাদের আলোচ্য।

কিন্তু সবিতাকে লইয়া বড় গোলযোগ। সূর্য্যের নাম সবিতা, ইহা বালকেও জানে। কিন্তু প্রসিদ্ধ গায়ত্রী নামক মন্ত্রে যেখানে সবিতা আছেন (“তৎসবিতুঃ”) সেখানে তিনি স্বয়ং পরব্রহ্ম পরমেশ্বর বলিয়া পরিচিত। অনেকেই সবিতা অর্থে জগৎস্রষ্টাকেই বুঝেন। এ কথা আমাদের বিচার্য্য। পূষা বা মিত্রের মত তাঁহাকে অপচলিতের মধ্যে ফেলিয়া তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করিতে পারি না—কেন না তিনি আর্য্য ব্রাহ্মণের উপর বড় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। যে গায়ত্রীকে ব্রাহ্মণেরা আপনাদের ব্রাহ্মণ্যের ও উপাসনার সার ভাগ মনে করেন, তিনি সেই গায়ত্রীর দেবতা। গায়ত্রী কেবল তাঁরই স্তব। সুতরাং এ কথাটা আগে মীমাংসার প্রয়োজন—তিনি কেবল একটা বৃহৎ জড়পিণ্ড, না সর্ব্বস্রষ্টা, অনন্তচৈতন্য পরমেশ্বর? আমরা নিরপেক্ষ হইয়া এ বিষয়ের মীমাংসার চেষ্টা করিব। আমরা সবিতাকে সূর্য্য-দেবতা মধ্যে গণিয়াছি বটে, কিন্তু সে মতের বিরুদ্ধ কতকগুলি কথা আছে, তাহাও দেখাইতে হইবে।

“সু” ধাতু হইতে সবিতৃ শব্দ নিস্পন্ন হইয়াছে। তবেই সবিতা অর্থে প্রসবিতা। কাহার প্রসবিতা? নিরুক্তকার যাস্ক বলেন, “সর্ব্বস্য প্রসবিতা।” সায়নাচার্য্য গায়ত্রীর ব্যাখ্যা কালে “তৎসবিতুঃ” ইতি বাক্যের অর্থ করেন, “জগৎপ্রসবিতুঃ।” যদি তাই হয়, তাহা হইলে সবিতা পরব্রহ্ম পরমেশ্বর। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতিও “তৎসবিতুঃ” শব্দের ব্যাখ্যা পরব্রহ্ম পক্ষে করিয়া থাকেন। বেদের এক স্থানে তাঁহাকে “প্রজাপতি” বলা হইয়াছে। আর এক স্থানে বলা হইয়াছে যে, ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, অর্য্যমা, রুদ্র, কেহই তাঁহার বিরোধী হইতে পারে না।* জলবায়ু তাঁহার আঞ্জাকারী।† অন্য দেবতার তাঁহার অনুযায়ী‡ বরুণ, মিত্র, অর্য্যমা, অদিতি, ও বসুগণ তাঁহার স্তুতি করেন।§ তিনি প্রার্থনার বস্তুর ঈশ্বর; আমাদের কাম্য বস্তু সকল দান করেন। তিনি ভুবনের প্রজাপতি; আকাশের ধর্তা (দিবো ধর্তা ভুবনস্য প্রজাপতিঃ । ৫। ৫৩। ২।) তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আছে যে, “প্রজাপতিঃ সবিতা ভূত্বা প্রজা অসৃজত।” সবিতা প্রজাপতি হইয়া প্রজা সৃষ্টি করিলেন। কথাগুলোয় যেন কেবল পরমেশ্বরকেই বুঝায়।

পক্ষান্তরে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, প্রসবিতৃ শব্দ ঋগ্বেদে সূর্য্য প্রতিও এক স্থানে প্রযুক্ত হইয়াছে (৭। ৬৩। ২।)। ঋগ্বেদের সূক্তের একটি লক্ষণ এই যে, যখন যে দেবতা স্তুত হন, তখন তিনিই সকলের বড় হইয়া দাঁড়ান। সুতরাং সবিতার এত মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত দেখিয়াও কিছুই স্থির করা যায় না। সবিতা যে সূর্য্য, এমত বিবেচনা করিবার অনেকগুলি কারণ আছে।

১। ঋগ্বেদে অনেক স্থানে স্পষ্টই সূর্য্যার্থে সবিতৃ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। যথা, ৪ ম, ১৪ সু, ২ ঋকে।

২। সূর্য্যের ন্যায় তাঁহার রূপ। সূর্য্যের মত তাঁহার কিরণ আছে। (প্রসুবনস্তুভিজগৎ ৪ ম, ৫৩ সু, ৩ ঋক্) সূর্য্যের ন্যায় তাঁহার রথ আছে, অশ্ব আছে এবং সূর্য্যের ন্যায় তিনি আকাশ পরিভ্রমণ করেন।

৩। যাস্ক বলেন, যখন আকাশ হইতে অন্ধকার গিয়াছে, রশ্মি বিকীর্ণ হইয়াছে, সেই

* নাকিরস্য তানি ব্রতাঃ দেবস্য সবিতুর্মিনস্তি। ন যস্য ইন্দ্রো বরুণো ন মিত্রো ব্রতং অর্য্যমান্ মিনস্তি রুদ্রাঃ। অস্যাঃ সর্ব্বশাস্তারং সবিতুঃ কচ্চন প্রিয়ং। ন মিনস্তি স্বরাজ্যং ২। ৩৮। ৭। ৯।—৫। ৮২। ২।

† আপশ্চিদস্য ব্রতে আনিম্গ্ৰা অর্য্যশ্চৎ বাতো রমতে পরিজ্জন্মন্। ২। ৩৮। ২।

‡ যস্য প্রয়ানম্বেয়ে ইন্ধ্যবুর্দেবাঃ। ৫। ৮১। ৩।

§ অপি স্তুতঃ সবিতা দেবো অস্তুয়ং আর্চিষ্বেবসবো গৃগ্গন্তি। অভি যং দেবী অদিতির্গর্গতি সবং দেবস্য সবিতুর্জুর্ষাণা। অভিসম্বাজো বরুণো গৃগ্গন্তি অভিমিত্রাসো অর্য্যমা সযোষাঃ। ৭। ৩৮। ৩, ৪।

দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম—সবিতা ও গায়ত্রী

সবিতার কাল।* সায়নাচার্য্য বলেন যে, উদয়ের পূর্বে যে মূর্ত্তি সেই সবিতা, উদয় হইতে অন্ত পর্য্যন্ত যে মূর্ত্তি, সেই সূর্য্য।† অতএব এই মত পূর্বে পণ্ডিতগণ কর্তৃক গৃহীত।

৪। সবিতা যে পরব্রহ্ম নহেন, তাহার আর এক প্রমাণ এই যে, পরব্রহ্মবাদীরা ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়াই স্বীকার করেন, অথবা বিশ্বরূপ বলিয়া থাকেন, কিন্তু সবিতা অন্যান্য বৈদিক দেবতার ন্যায় সাকার। তিনি হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যহস্ত, হিরণ্যজিহব, হিরণ্যপাণি, পৃথুপাণি, সুপাণি, সুজিহব, মন্দ্রজিহব, হরিকেশ ইত্যাদি শব্দে বর্ণিত হইয়াছেন। তাহার বাহুর কথা অনেক বার কথিত হইয়াছে। (বাহু, কর মাত্র)

বোধ হয় এখন স্বীকার করিতে হইবে যে, সবিতা, পরব্রহ্ম নহেন, জড়পিণ্ড সূর্য্য। তবে গায়ত্রীর সেই “তৎসবিতুঃ” শব্দের অর্থ কি হইল? এত কাল কি ব্রাহ্মণেরা গায়ত্রীতে সূর্য্যকেই ডাকিয়া আসিতেছে, পরব্রহ্মকে নয়? যে গায়ত্রী না জপিয়া ব্রাহ্মণকে জলগ্রহণ করিতে নাই, যে গায়ত্রী জপ করিয়া ব্রাহ্মণ মনে করেন, আমি পবিত্র হইলাম, আমার সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল—সে কি কেবল জড়পিণ্ড সূর্য্যের কথা, জগদীশ্বরের নহে?

ব্রাহ্মণে এমন ভাবে না। এমন ভাবিতে ব্রাহ্মণের প্রাণে বড় আঘাত লাগে। ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মপক্ষে গায়ত্রীর কিরূপ অর্থ করেন, তাহার উদাহরণস্বরূপ মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের কৃত ব্যাখ্যা নোটে উদ্ধৃত করিলাম‡ কিন্তু এখনকার ব্রাহ্মণেরা যাই বলুন, এইরূপ ব্যাখ্যাই কি প্রকৃত ব্যাখ্যা? গায়ত্রী সামগ্রীটা কি, তাহা বুঝিলেই গোল মিটিতে পারে।

গায়ত্রী আর কিছুই নহে। ঋগ্বেদের একটি ঋক্। তৃতীয় মণ্ডলে দ্বিষষ্টিতম সূক্তের ১৮টি ঋক্ আছে; তন্মধ্যে দশম ঋক্ গায়ত্রী। ঐ সূক্তটি সমুদায় উদ্ধৃত করিতে হইতেছে, নহিলে পাঠক “গায়ত্রীর” মর্ম্ম বুঝিবেন না।

এই সূক্তের ঋষি বিশ্বামিত্র। ইন্দ্রাবরণো (ইন্দ্র ও বরুণ একত্রে) বৃহস্পতি, পৃষা, সবিতা, সোম, মিত্রাবরণো (মিত্র ও বরুণ একত্রে) এই সূক্তের দেবতা। অর্থাৎ বিশ্বামিত্র এই সূক্তে বস্তা (প্রণেতা) এবং ইন্দ্রাদি দেবতা ইহাতে স্তুত হইয়াছেন। ঐ স্তুত দেবতাদিগের মধ্যে সবিতা এক জন। যে ঋক্‌টিকে গায়ত্রী বলা যায়, তাহা তাহারই স্তব।

সূক্তটি এই—

“ইমা উ বাং ভূময়ো মন্যমানা যুবাবতে ন তুজ্যা অভুবন্ ।
কৃত্যাদিন্দ্রাবরণা যশো বাং যেন স্মা সিনং ভরথঃ সখিভ্যঃ ॥ ১ ॥
অয়ম্ বাং পুরুরতমো রয়ীয়ঞ্জশ্বত্তমমবসে জোহবীতি ।
সজোষাবিন্দ্রাবরণা মরুন্দিদিবা পৃথিব্যা শ্ণুতং হবং মে ॥ ২ ॥
অস্মৈ তাদিন্দ্রাবরণা বসু ষ্যাদস্মৈ রয়িম্মরুতঃ সর্ষবীরঃ ।
অস্মান্ বরুত্রীঃ শরণৈরবস্বস্মান্ হোত্রা ভারতী দক্ষিণাভিঃ ॥ ৩ ॥

* তস্য কালো যদা দ্যৌরপহততমস্কাকীর্ণশ্মিভবতি ।

† উদয়াৎ পূর্বেভাবী সবিতা। উদয়াস্তমধ্যবর্তী সূর্য্য ইতি ।

‡ “গায়ত্র্যা অর্থমাহ যোগী যাজ্ঞবল্ক্যঃ। দেবস্য সবিতুর্ভর্গো ভর্গমন্তর্গতং বিভুং। ব্রহ্মবাদিন এবাহুর্ষ্বরেণ্যাস্য ধীমহি। চিন্তয়ামো বয়ং ভর্গং ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বুদ্ধিবৃত্তীঃ পুনঃ পুনঃ। বুদ্ধেশ্চোদয়িতা যস্তু চিদাত্মা পুরুরুষো বিরাজ্। বরেণ্যং বরণীয়ং জন্মসংসার-ভীরুভিঃ। আদিত্যাস্তর্গতং যচ্চ ভর্গাথাং তন্মমুক্ষুভিঃ। জন্মমৃত্যুবিনাশায় দুঃখস্য ত্রিতয়স্য চ। ধ্যানেন পুরুরুষো যচ্চ দ্রষ্টব্যঃ সূর্য্যমণ্ডলে। মন্ত্রার্থমপি চৈবায়ং জ্ঞাপয়তোবমেবহি। তেন গায়ত্র্যা অয়মর্থঃ। দেবস্য সবিতুর্ভর্গস্বরূপান্তর্য্যামি ব্রহ্ম বরেণ্যং বরণীয়ং জন্মমৃত্যুভীরুভিঃ তদ্বিনাশায় উপাসনীয়ং। ধীমহি প্রাগুক্তেন সোহহমস্মীত্যেন চিন্তয়ামঃ, যো ভর্গঃ সর্ব্বান্তর্য্যামীশ্বরো নোহস্মাকং সর্ষ্বেষাং সংসারিণাং ধিয়ো বুদ্ধীঃ প্রচোদয়াৎ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু প্রেরয়তি। তথাচ ভগবদ্‌গীতয়াৎ। “ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্যেশেহজ্জর্ন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারুঢ়ানি মায়য়া।” ঈশ্বরোহন্তর্য্যামী হৃদ্যেশে অন্তঃকরণে ভ্রাময়ন্ তত্তৎকর্ম্মসু প্রেরয়ন্ যন্ত্রারুঢ়ানি দারুযন্ত্রতুল্যশরীরারুঢ়ানি ভূতানি প্রণিনো জীবানিতি যাবৎ মায়য়া অঘটনঘটনপটীয়স্যা নিজশক্ত্যা। তথাচাশ্বতরাণাং মন্ত্রঃ। “একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গুঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরায়া। কর্ম্মাধাক্ষঃ সর্ব্বভূতানিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নিগুণশ্চ।”

বিশ্বকম রচনাবলী

বৃহস্পতে জুষ্স্ব নো হব্যানি বিশ্বদেব্য।
 রাস্ব রঙ্গানি দাশুশে ॥ ৪ ॥
 শ্চিমকৈ বৃহস্পতিমধরেষু নমস্যত।
 অনাম্যোজ আ চকে ॥ ৫ ॥
 বৃষভং চর্ষণীনাং বিশ্বরূপমদাভ্যং।
 বৃহস্পতিং বরেণ্যং ॥ ৬ ॥
 ইয়ং তে পৃষাণ্নাঘৃণে সৃষ্টীতিদ্দেব নব্যসী।
 অস্মাভিস্তুভ্যং শস্যতে ॥ ৭ ॥
 তাং জুষ্স্ব গিরং মম বাজয়ন্তীমবা ধিয়ং।
 বধুয়ুর্নিব যোষণ্যং ॥ ৮ ॥
 যো বিশ্বাভি বিপশ্যতি ভুবনা সং চ পশ্যতি।
 স নঃ পৃষাবিতা ভুবৎ ॥ ৯ ॥
 তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
 ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ১০ ॥
 দেবস্য সবিতুর্বয়ং বাজয়ন্তঃ পুরক্ষ্যা।
 ভগস্য রাতিমীমহে ॥ ১১ ॥
 দেবং নরঃ সবিতারং বিপ্রা যজ্ঞেঃ সূবৃজ্জিভিঃ।
 নমস্যন্তি ধিরেষিতাঃ ॥ ১২ ॥
 সোমো জিগাতি গাতুবিৎ দেবানামেতি নিষ্কৃতং।
 ঋতস্য যোনিমাসদং ॥ ১৩ ॥
 সোমো অস্মভ্যং দ্বিপদে চতুষ্পদে চ পশবে।
 অনমীবা ইষস্করৎ ॥ ১৪ ॥
 অস্মাকমায়ুর্ষর্ধয়ন্নভিমাতেঃ সহমানঃ।
 সোমঃ সধস্তুমাসদৎ ॥ ১৫ ॥
 আ নো মিত্রাবরণা ঘৃতেগর্ব্যতিমুক্ষতং।
 মধবা রজাংসি সূক্রতু ॥ ১৬ ॥
 উরুশংসা নমোবৃধা মহা দক্ষস্য রাজথঃ।
 দ্রাঘিষ্ঠাভিঃ শ্চিচরতা ॥ ১৭ ॥
 গংগানা জমদগ্নিনা যোनावৃতস্য সীদতং।
 পাতং সোমমৃতাবৃধা ॥ ১৮ ॥

শেষ ৪ ঋকের ঋষি কোন কোন মতে জমদগ্নি। অস্যার্থ।

হে ইন্দ্র ও বরুণদেব! আপনাদিগের সম্বন্ধীয় মান্যমান এবং ভ্রমণশীল এই প্রজাগণ যুবা
 এবং বলবান্ রিপুকর্তৃক যেন বিনষ্ট না হয়। আপনাদিগের তাদৃশ যশ আর কোথায় আছে,
 যে যশঃদ্বারা সখিভূত আমাদিগকে অন্নপ্রদান করেন। ১। হে ইন্দ্র ও বরুণ! ধনেচ্ছ, মহান্
 যজমান রক্ষার নিমিত্ত আপনাদিগকে আহ্বান করেন। মরুৎগণ, দ্যুলোক ও পৃথিবীর সহিত
 সংগত হইয়া আপনারা আমাদের স্তুতি শ্রবণ করুন। ২। হে দেবদ্বয়! আমরা যেন সেই
 অভিলষিত বসু এবং সেই সর্বকর্মকরণে সামর্থ্যবিধায়ক অর্থ প্রাপ্ত হই। সকলের বরণীয়
 দেবপত্নীগণ রক্ষার সহিত এবং হবনীয় সরস্বতী গোরূপ দক্ষিণার সহিত আমাদিগকে রক্ষা
 করুন। ৩। হে সর্বদেবাহিত বৃহস্পতে! আমাদিগের হব্যাদি গ্রহণ করুন এবং আমাদিগকে
 ধনদান করুন। ৪। হে ঋত্বিক্গণ! বৃহস্পতিদেবকে তোমরা স্তোত্রদ্বারা নমস্কার কর। আমরা
 তাঁহার অনভিভবনীয় তেজের স্তুতি করিতেছি। ৫। মনুষ্যাদিগের অভিমত ফলদাতা
 অনভিভবনীয় এবং ব্যাপ্তরূপ বরেণ্য বৃহস্পতিকে নমস্কার কর। ৬। হে দীপ্তমন্ পৃষন্!
 এই নূতন স্তুতি আপনার উদ্দেশে কীর্তন করিতেছি। ৭। হে পৃষন্, স্তুতিকারক আমার এই
 স্তুতি গ্রহণ করুন এবং স্তুতিদ্বারা প্রীত হইয়া অন্ন ইচ্ছাকারিণী ও হর্ষকারিণী এই স্তুতি গ্রহণ
 করুন, যেমন স্ত্রীকামী পুরুষ স্ত্রীকে গ্রহণ করে। ৮। যে পৃষাদেব বিশ্বজগৎ দর্শন করেন,

দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম—বৈদিক দেবতা

তিনি আমাদেরকে রক্ষা করুন। ৯। সবিতৃদেবের বরণীয় তেজ আমরা ধ্যান করি, যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেন। ১০। অন্ন ইচ্ছা করিয়া আমরা স্তুতির সহিত সবিতৃদেবের এবং ভগদেবের দান প্রার্থনা করি। ১১। নেতৃ বিপ্রগণ যজ্ঞে শোভন স্তুতিদ্বারা সবিতৃদেবকে বন্দনা করে। ১২। পথপ্রদর্শক সোমদেব দেবগণের সংস্কৃত আবাসে এবং যজ্ঞস্থানে গমন করেন। ১৩। সোমদেব আমাদেরকে এবং সর্বপ্রাণীকে অনাময়প্রদ অন্ন প্রদান করুন। ১৪। সোমদেব আমাদের আয়ুর্স্বর্ধ্বান এবং পাপনাশ করিয়া হবির্ধানপ্রদেশে আগমন করুন। ১৫। হে শোভনকর্মশীল মিত্র ও বরুণদেব! আপনারা আমাদের গাভীসকলকে দুগ্ধপূর্ণ করুন এবং জল মধুররসবিশিষ্ট করুন। ১৬। বহুস্তুত এবং স্তুতিবদ্ধ শুদ্ধরত আপনারা দীর্ঘস্তুতিদ্বারা বলের ঈশ্বর হয়েন। ১৭। জমদগ্নি ঋষি কর্তৃক স্তুত হইয়া যজ্ঞবর্দ্ধক আপনারা যজ্ঞস্থলে আগমন করুন এবং সোম পান করুন। ১৮।

এখন দেখা যাইতেছে, যখন, ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, সোমাদির সঙ্গে একত্রেই সবিতা স্তুত হইয়াছেন, তখন সবিতা পরব্রহ্ম না হইয়া সূর্য্য হইবারই সম্ভাবনা। একাদশ ঋক্টিও সবিতৃস্তব। ঐ ঋকে সবিতার সঙ্গে ভগদেবও যুক্ত হইয়াছেন। অতএব উভয়েই সূর্য্যের মূর্ত্তি বিশেষ, ইহাই সম্ভব। পাঠক দেখিবেন যে, ঋক্টিকে গায়ত্রী বলা যায় (দশম ঋক্) তাহার পূর্বে “ভু” “ভুব” “স্বর্” এ তিনটি শব্দ নাই। গায়ত্রীর পূর্বে এই তিনটি শব্দ সচরাচর উচ্চারিত হওয়ার নিয়ম থাকায়, অনেকে মনে করেন, “তৎসবিতা” অর্থে, এই ত্রৈলোক্যের প্রসবিতা।

এই ঋক্টি গায়ত্রী নাম হইল কেন? গায়ত্রী একটি ছন্দের নাম। এই ৬২তম সূক্তের প্রথম তিনটি ঋক্টি ত্রিষ্টুপ ছন্দে। আর ১৫টি গায়ত্রীছন্দে। এই ঋক্টির প্রাধান্য আছে বলিয়াই ইহাই গায়ত্রী নামে প্রচলিত। এই প্রাধান্য, ইহার অর্থগৌরব হেতু। সত্য বটে যে, সূর্য্যপক্ষে ব্যাখ্যা করিলে তত অর্থগৌরব থাকে না। কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে, যখন ভারতবর্ষে প্রধান ঋষিরা ব্রহ্মবাদী হইলেন, আর তাঁহারা ব্রহ্মবাদ বেদমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তখন গায়ত্রীর অর্থ ব্রহ্মপক্ষেই করিলেন। এবং সেই অর্থই ব্রাহ্মণমণ্ডলীতে প্রচলিত হইল।

ইহাতে ক্ষতি কি? ব্রাহ্মণেরই বা লাঘব কি? গায়ত্রীরই বা লাঘব কি? যে ঋষি গায়ত্রী প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তিনি যে অর্থই অভিপ্রেত করিয়া থাকুক না, যখন ব্রহ্মপক্ষে তাঁহার বাক্যের সদর্থ হয়, আর যখন সেই অর্থই গায়ত্রী সনাতন ধর্মোপযোগী এবং মনুষ্যের চিত্ত-শুদ্ধিকর, তখন সেই অর্থই প্রচলিত থাকাই উচিত। তাহাতে ব্রাহ্মণেরও গৌরব, হিন্দুধর্মেরও গৌরব। এই অর্থে ব্রাহ্মণ শব্দ, ব্রাহ্ম ত্রিষ্টুপ সকলেই গায়ত্রী জপ করিতে পারে। তবে আদৌ বৈদিক ধর্ম কি ছিল, তাহার যথার্থ মর্ম কি, তাহা হইতে কি প্রকারে বর্তমান হিন্দুধর্ম উৎপন্ন হইয়াছে, এই তত্ত্বগুলি পরিষ্কার করিয়া বুঝান আমাদের চেষ্টা, তাই গোড়ার কথাটা লইয়া আমাদের এত বিচার করিতে হইল। বৈদিক ধর্ম হিন্দুধর্মের মূল, কিন্তু মূল বৃক্ষ নহে; বৃক্ষ পৃথক্ বস্তু। বৃক্ষ যে শাখা প্রশাখা, পত্র পুষ্প ফলে ভূষিত, মূলে তাহা নাই। কিন্তু মূলের গুণাগুণ না বুঝিলে, আমরা বৃক্ষটিও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব না।—‘প্রচার’, ১ম বর্ষ, পৃ. ২২৮-৩৭।

বৈদিক দেবতা

এক্ষণে আমরা অবশিষ্ট বৈদিক দেবতাদিগের কথা সংক্ষেপে বলিব। আমরা আকাশ ও সূর্য্যদেবতাদিগের কথা বলিয়াছি, এক্ষণে বায়ু-দেবতাদিগের কথা বলিব। বেশী বলিবার প্রয়োজন নাই। বায়ু দেবতা,—প্রথম বায়ু বা বাত, দ্বিতীয় মরুদ্গণ। বায়ুর বিশেষ পরিচয় কিছুই দিবার নাই। সূর্য্যের ন্যায় বায়ু আমাদের কাছে নিত্য পরিচিত। ইনি পৌরাণিক দেবতার মধ্যে স্থান পাইয়াছেন। পুরাণেইহাসে ইন্দ্রাদির ন্যায় ইনি একজন দিকপাল মধ্যে গণ্য। এবং বায়ু বা পবন নাম ধারণ করিয়াছেন। সুতরাং ইঁহাকে প্রচলিত দেবতাদের মধ্যে ধরিতে হয়।

মরুদ্গণ সেরূপ নহেন। ইঁহারা এক্ষণে অপ্রচলিত। বায়ু সাধারণ বাতাস, মরুদ্গণ ঝড়। নামটা কোথাও একবচন নাই; সর্বত্রই বহুবচন। কথিত আছে যে মরুদ্গণ ত্রিগুণিত ষষ্টি-

বাংকম রচনাবলী

সংখ্যক, একশত আশী। এ দেশে ঝড়ের যে দৌরাণ্ড্য, তাহাতে এক লক্ষ আশী হাজার বলিলেও অত্যাঙ্ক হইত না। ইংহাদিগকে কখন কখন রুদ্র বলা হইয়া থাকে। রুদ্ ধাতু চীৎকারার্থে। রুদ্ ধাতু হইতে রোদন শব্দ হইয়াছে। রুদ্ ধাতুর পর সেই "র" প্রত্যয় কারিয়া রুদ্র শব্দ হইয়াছে। ঝড় বড় শব্দ করে, এই জন্য মরুদ্গগকে রুদ্র বলা হইয়াছে সন্দেহ নাই। কোথাও বা মরুদ্গগকে রুদ্রের সন্ততি বলা হইয়াছে।

তার পর অগ্নিদেবতা। অগ্নিও আমাদের নিকট এত সুপরিচিত যে তাঁহারও কোন পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। কিছু পরিচয় দেওয়াও হইয়াছে।

ঋগ্বেদে আর একটি দেবতা আছেন, তাঁহাকে কখন বৃহস্পতি কখন ব্রহ্মগস্পতি বলা হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন ইনি অগ্নি, কেহ কেহ বলেন ইনি ব্রহ্মগ্যদেব। সে যাহাই হউক, ব্রহ্মগস্পতির সঙ্গে আমাদের আর বড় সম্বন্ধ নাই। বৃহস্পতি এক্ষণে দেবগুরু অথবা আকাশের একটি তারা। অতএব তাঁহার সম্বন্ধে বড় বিশেষ বলিবার প্রয়োজন নাই।

সোমকে এক্ষণে চন্দ্র বলি, কিন্তু ঋগ্বেদে তিনি চন্দ্র নহেন। ঋগ্বেদে তিনি সোমরসের দেবতা।

অশ্বীদ্বয় পুরাণেতিহাসে অশ্বিনীকুমার বলিয়া বিখ্যাত। কথিত আছে যে তাঁহারা সূর্যের ঔরসে অশ্বিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই জন্য তাঁহাদিগের পৌরাণিক নাম অশ্বিনীকুমার। এমন বিবেচনা করিবার অনেক কারণ আছে যে তাঁহারা শেষরাত্রির দেবতা; উষার পূর্বাঙ্গামী দেবতা।

আর একটি দেবতা ত্বষ্টা। পুরাণেতিহাসে বিশ্বকর্মা যাহা, ঋগ্বেদে ত্বষ্টা তাহাই। অর্থাৎ দেবতাদিগের কারিগর।

যমও ঋগ্বেদে আছেন কিন্তু যমও আমাদের নিকট বিশেষ পরিচিত। যমদেবতার একটি গুঢ় তাৎপর্য আছে, তাহা সময়ান্তরে বুঝাইবার প্রয়োজন হইবে।

ত্রিত আপ্য অজ একপাদ প্রভৃতি দুই একটি ক্ষুদ্র দেবতা আছেন, কখন কখন বেদে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু তাঁহাদের সম্বন্ধে এমন কিছুই কথা নাই যে, তাঁহাদের কোন পরিচয় দিবার প্রয়োজন করে।

বৈদিক দেবীদিগের মধ্যে অর্দিত পৃথিবী এবং উষা এই তিনেরই কিঞ্চিৎ প্রাধান্য আছে। অর্দিত ও পৃথিবীর কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছি। উষার পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই, কেন না যাহার ঘুম একটু সকালে ভাঙ্গিয়াছে সেই তাহাকে চিনে। সরস্বতীও একটি বৈদিক দেবী। তিনি কখন নদী কখন বাগ্‌দেবী। গঙ্গা-সিন্ধু প্রভৃতি নদী ঋগ্বেদে স্তুত হইয়াছেন। ফলতঃ ক্ষুদ্র বৈদিকদেবীদিগের সবিস্তার বর্ণনে কালহরণ করিয়া পাঠকদিগকে আর কষ্ট দিবার প্রয়োজন নাই। আমরা এইখানে বৈদিক দেবতাদিগের ব্যক্তিগত পরিচয় সমাপ্ত করিলাম। কিন্তু আমরা বৈদিক দেবতাতত্ত্ব সমাপ্ত করিলাম না। আমরা এখন বৈদিক দেবতাতত্ত্বের স্থূল মর্ম বুঝিবার চেষ্টা করিব। তার পর বৈদিক ঈশ্বরতত্ত্ব প্রবৃত্ত হইবার চেষ্টা করিব।—'প্রচার', ১ম বর্ষ, পৃ. ২৬৬-৬৮।

দেবতত্ত্ব

আমরা দেখিয়াছি যে, বেদের ইন্দ্রাদি দেবতার কেহ বা আকাশ, কেহ বা সূর্য, কেহ বা অগ্নি, কেহ বা নদী; এইরূপ অচেতন জড়পদার্থ মাত্র। বেদে এইরূপ অচেতন জড়পদার্থের উপাসনা কেন? এরূপ উপাসনা কোথা হইতে আসিল? ইহার উৎপত্তির কি কোন কারণ আছে? অদ্য এই বিষয়ের অনুসন্ধান প্রবৃত্ত হইব।

বিশ্বয়ের বিষয় এই যে, কেবল বৈদিক হিন্দুরাই এই ইন্দ্রাদির উপাসনা করিতেন না। পৃথিবীর অনেক সভ্য এবং অসভ্য জাতি ইংহাদিগের উপাসনা করিত এবং কখনও করিয়া থাকে। সেই সকল জাতিমধ্যে এই দেবতাদিগের নাম ভিন্ন প্রকার বটে, কিন্তু উপাস্য দেবতা একই। আমরা কেবল প্রাচীন আর্য্যজাতিসম্ভূত যোন, রোমক প্রভৃতি জাতিদিগের কথা বলিতেছি না। হিন্দুরা যে জাতি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহারাও সেই জাতি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; সুতরাং একই বংশে একই দেবতার উপাসনা যে প্রচলিত থাকিবে ইহা বিস্ময়কর নহে।

বিস্ময়কর এই যে, যে সকল জাতির সঙ্গে আর্ধ্যবংশীয়দিগের বংশগত, স্থানগত, বা অন্য কোন-প্রকার ঐতিহাসিক সম্বন্ধ নাই, তাহাদিগের মধ্যেও এই ইন্দ্রাদির উপাসনা প্রচলিত। আমেরিকা, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া বা পলিনেসিয়ার অভ্যন্তরবাসীদিগের মধ্যেও এই সকল দেবতাদিগের উপাসনা প্রচলিত। আমরা কতকগুলি উদাহরণ দিব। অধিক উদাহরণ সঙ্কলনের জন্য প্রচারের স্থান নাই। উদাহরণ দিবার পূর্বে আমাদের দুইটি কথা বলিবার আছে।

প্রথম, হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যায় আমরা পাশ্চাত্য লেখকদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতে অতিশয় অনিচ্ছুক। ইংরেজভক্ত পাঠকদিগের তৃষ্ণার জন্য দুই একবার আপন মতের পোষকতায় পাশ্চাত্য লেখকের মত উদ্ধৃত করিয়াছি বটে, কিন্তু সে অনিচ্ছাপূর্বক। এবং আপনার মতের সঙ্গে তাহাদিগের মত না মিলিলে সেরূপ সাহায্য গ্রহণ করি নাই। কিন্তু এখানে ইউরোপের সাহায্য ব্যতীত আমাদের চলিবার উপায় নাই, কেন না কোন হিন্দুই আমেরিকা, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও পলিনেসিয়ার আদিমবাসীদিগকে দেখিয়া আইসে নাই।

দ্বিতীয়, আমরা প্রধানতঃ অসভ্য জাতিদিগের মধ্য হইতেই অধিকাংশ উদাহরণ গ্রহণ করিব। ইহাতে কেহ মনে না করেন যে, আমরা হিন্দুদিগকে অথবা প্রাচীন বৈদিক হিন্দুদিগকে, অসভ্য জাতি মধ্যে গণ্য করি। ইহা আমরা বলিতে স্বীকৃত আছি যে, বৈদিক হিন্দুরা যে সকল কথা বর্ণিয়াছিলেন, ইউরোপে সভ্য জাতিরাও তাহার অনেক কথা এখনও বর্ণেন নাই। তবে সাদৃশ্য এই যে বৈদিক ধর্ম হিন্দুধর্মের প্রথম অবস্থা, আর আমরা যে সকল অসভ্য জাতিদের কথা বলিব, তাহাদেরও ধর্মের প্রথম অবস্থা।

এক্ষণে আমরা উদাহরণ সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হই। প্রথমতঃ ইন্দুদেবতাই আমাদের উদাহরণ হউন। প্রমাণ করিয়াছি যে, ইন্দু বৃষ্টি-দেবতা। শ্বেত-নীল-নদীতীরবাসী দিঙ্ক নামে জাতি ইন্দুকে দেবদেব নামে উপাসনা করে। তিনি ইন্দুর ন্যায় বৃষ্টি-দেবতা এবং ইন্দুর ন্যায় স্বর্গবাসী প্রধান দেবতা। ‘ডমর’ নামে অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে ‘ওমাকুরু’ নামে দেবতা বৃষ্টি-দেবতাও বটে, সর্বপ্রধান দেবতাও বটে। ইনিই ডমরদিগের ইন্দু। আমেরিকার আদিম জাতিদিগের মধ্যে দুইটি সভ্যজাতি ছিল,—মেক্সিকোর আদিমবাসী ‘অজতেক’ এবং ‘পিরুর’ আদিমবাসী ‘ইঙ্কার’দিগের প্রজা। অজতেকেরা ত্রালোকের উপাসনা করিত। তিনি ইন্দুর ন্যায় আকাশ-দেবতা এবং ইন্দুর ন্যায় বৃষ্টি-দেবতা এবং ইন্দুর ন্যায় বজ্রী। পিরুবাসীদিগের মধ্যে ইন্দু, দেব নহেন, দেবী। নিকারাগুয়াবাসীদিগের মধ্যে বৃষ্টি-দেবতার পূজা আছে। ভারতবর্ষীয় অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে উড়িষ্যার খন্দেরা পিঙ্কুপেন্দু নামে বৃষ্টি-দেবতার পূজা করে। কোলেদের বড় পর্বতকে তাহারা মরংবুরু বলে। তিনিই ইহাদের বৃষ্টি-দেবতা। পূর্বে আমরা স্থানান্তরে বলিয়াছি যে, রোমকদিগের জর্ডাপটার আমাদের দ্রৌষ্টিপতৃ। কিন্তু দ্যোঃ ত কেবল আকাশ, রোমকেরা কেবল আকাশের উপাসনায় সন্তুষ্ট নহেন। বৃষ্টিকারী আকাশের উপাসনা চাই। এজন্য তাহারা জর্ডাপটার প্লুবিয়স, অর্থাৎ বৃষ্টিকারী আকাশের উপাসনা করিতেন। ইনি রোমকদিগের ইন্দু।

অগ্নিকে দ্বিতীয় উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করা যাউক। পৃথিবীতে, বিশেষতঃ আশিয়া প্রদেশে, অগ্নির উপাসনা বড় প্রবলতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। আমেরিকার ডিলাবরেরা অগ্নিদেবতাকে আমেরিকার আদিমবাসীদিগের আদি পুরুষ (মনু) বলিয়া বৎসরে বৎসরে উপাসনা করে। অর্ভিঙের লিখিত পুস্তকে জানা যায় যে, চিনুক নামে আমেরিকার প্রান্তবাসী আদিমজাতিরা অগ্নির পূজা করিত। সভ্য মেক্সিকোবাসীদিগের মধ্যে অগ্নি একজন প্রধান দেবতা ছিলেন; কিন্তু তাহার নামটি এত দূরুচ্চার্য যে আমরা তাহা বাঙ্গলায় লিখিতে পারিলাম না।* পলিনেসিয়াতে মহুইকা নামে এবং আফ্রিকার ডাহোমে প্রদেশে জো নামে অগ্নি পূজিত। আশিয়া প্রদেশে কণ্ডলেরা সব পূজা করে এবং অগ্নিও পূজা করে। জাপান প্রদেশস্থ য়েসো প্রদেশে অগ্নিই প্রধান দেবতা। তুঙ্গুজ মোগল এবং তুর্ক জাতীয়েরা অগ্নির উপাসনা করিয়া থাকে। টইলর সাহের মোগলদিগের † একটি বিবাহমন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা পড়িয়া ঋগ্বেদের অগ্নি সঙ্ক মনে পড়ে।

* Xiuhteuctli ; also Huehuetotl.

† আমরা যাহাদিগকে মোগল বলি তাহারা ষথার্থ মোগল নহে। আরব্য বা পারস্য হইতে আসিয়া

বিশ্বকম রচনাবলী

ইতিহাসে বিখ্যাত আর্সিরিয়া, কালদিয়া, ফিনিসিয়া প্রভৃতি দেশের লোকেরা প্রধানতঃ অগ্নির উপাসক ছিল। প্রাচীন পারস্যবাসীরা বিখ্যাত অগ্নির উপাসক এবং তাহাদিগের বংশ, বোম্বাইয়ের পারসীরা অদ্যাপিও বিখ্যাত অগ্নির উপাসক। ইউরোপেও গ্রীকদের মধ্যে Vulcan, Hephaistos, Hestia অগ্নিদেবতা। তৎপরবর্তী ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রাচীন প্রুসিয়েরা এবং রুশিয়েরা এবং লিথুয়ানীয়েরা অগ্নির পূজা করিত। এখনও ইউরোপে একটু একটু অগ্নিপূজা আছে। উদাহরণস্বরূপ টইলর সাহেবের গ্রন্থ হইতে একটু উদ্ধৃত করিলাম।*

সূর্যোপাসনা জগতে অতিশয় বিস্তৃত। সভ্য এবং অসভ্য সকলেই তাহার উপাসনা করে। আমেরিকায় অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে হডসন বের উপকূলবাসী আদিমজাতিরা প্রাতঃসূর্যের উপাসনা করে। বঙ্কুবর দ্বীপবাসীরা মধ্যাহ্ন সূর্যের উপাসনা করে। দিলাবরদিগের দ্বাদশ দেবতার মধ্যে সূর্য্য দ্বিতীয় দেবতা। বার্জিনিয়ার আদিমবাসীরা উদয় এবং অস্তকালে সূর্যের উপাসনা করিত। পোত্তুবিভূমিরা ছাদের উপর উঠিয়া সূর্যের ভোগ দিত। আলগোঙ্কুইনদিগের চিত্রলিপি মধ্যে সূর্যের চিত্র প্রধান দেবতার চিত্রের স্বরূপ লিখিত হইয়াছে। সিউস জাতিরা সূর্য্যকে জগতের সৃজনকর্তা ও পালনকর্তা স্বরূপ বিবেচনা করে। গ্রীক জাতিরা সূর্য্যকে ঈশ্বরের প্রতিমাস্বরূপ বিবেচনা করে। আরোকানিয়েরা সূর্য্যকে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়া উপাসনা করে। পুয়েল্চেরা সূর্যের নিকট সকল মঙ্গল কামনা করে। টুকুমানবাসীরা সূর্যের মন্দির গঠন করিয়া, তন্মধ্যে তাহার উপাসনা করে। লুইসিয়ানাবাসী নাচেজ জাতিদিগের মধ্যে সূর্যের পুরোহিতেরাই রাজা হইত এবং সূর্যের মন্দির নিৰ্ম্মাণপূর্ব্বক রীতিমত প্রত্যহ তাহার উপাসনা করিত। ফ্লোরিদার আদিমবাসী অপলশেরা প্রকৃত সৌর ছিল। তাহারা প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে সূর্য্য উপাসনা করিত এবং বৎসরে চারিবার সূর্যের উৎসব করিত। এ দেশে দুর্গাপূজায় যেমন ঘটা, মোক্কিকো নিবাসী অজতেকদিগের মধ্যে সূর্য্যপূজার সেইরূপ ঘটা ছিল। তাহাদিগের নিৰ্ম্মিত সূর্যের বৃহৎ স্তূপ অদ্যাপি বর্তমান আছে এবং প্রেস্কটের মনোহর রচনায় এই সূর্যের ভীষণ উপাসনা চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছে। ফলতঃ সূর্য্যকেই অজতেকেরা ঈশ্বর বলিয়া মানিত। দক্ষিণ আমেরিকার বোগোটা নিবাসী মুইস্কা জাতিরা সূর্যের নিকট নরবলি দিত। পিরুর সূর্যোপাসনা অতি বিখ্যাত এবং পিরুবাসীদিগের জীবনের সমস্ত কৰ্ম্ম এই সূর্যোপাসনার দ্বারা শাসিত হইত। পিরুর রাজারা আমাদিগের রামচন্দ্রাদির ন্যায় সূর্য্যবংশীয় বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাহারা সূর্যের প্রতির্নিধি বলিয়া রাজ্য করিতেন। পিরুদেশে স্বর্ণখচিত অসংখ্য সূর্য্যমন্দিরে সূর্যের স্বর্ণনিৰ্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি সকল সর্বলোকের দ্বারা উপাসিত হইত।

ভারতবর্ষীয় অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে বোড়ো ও ধীমাল জাতিরা সূর্য্য উপাসনা করে। বাঙ্গালার প্রান্তবাসী কোল, মন্ড, ওরাঁও এবং সাঁওতাল জাতিরা সিংবোঙ্গা নামে সূর্য্যদেবের উপাসনা করে। উড়িষ্যার খন্দদিগের মধ্যে সূর্য্যদেবের নাম বড়াপেন্নু। তিনি স্রষ্টা এবং বিধাতা। তন্মিন্ন তাতার, মঙ্গল, তুঙ্গুজ, সাইবিরিয়াবাসীরা এবং লাপ জাতিরা সূর্যের উপাসনা করিয়া থাকে।

আর্য্যজাতিদিগের মধ্যে প্রাচীন পারসিকদিগের সূর্যোপাসনার কথা বলিয়াছি। গ্রীকদিগের মধ্যে সূর্য্যদেবতা হিলিয়স্ বা আপোলন নামে উপাসিত হইতেন। সক্রিটস্ প্রভৃতিও

যাহারা ভারতবর্ষে বাস করিয়াছে আমরা তাহাদিগকেই মোগল বলি। তাহারা মোগল নহে। মধ্য-আশিয়ায় মোগল নামে একটি ভিন্ন জাতি আছে।

* The Esthonian bride consecrates her new hearth and home by an offering of money cast into the fire, or laid on the oven for Tule-Ema, fire mother. The Carinthian peasant will "fodder" the fire to make it kindly and throw lard or dripping to it, that it may not burn his house. To the Bohemian it is a godless thing to spit into the fire, God's fire as he calls it. It is not right to throw away the crumbs after a meal, for they belong to the fire. Of every kind of dish some should be given to the fire and if some runs over, it is wrong to scold, for it belongs to the fire. It is because these rights are now so neglected that harmful fires so often break out." *Primitive Culture*, p. 285.

দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম—দেবতত্ত্ব

তাঁহার উপাসনা করিতেন। আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অনেকেই বলেন যে, গ্রীক প্রভৃতি আৰ্য্যজাতিদিগের দেবোপাখ্যান সকল অধিকাংশই সৌরোপন্যাস—সূর্যরূপক। তাঁহারা এ বিষয়ে কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, পাঠকেরা তাহা অবগত থাকিতে পারেন।

প্রাচীন মিশরবাসীদিগের মধ্যে সূর্যোপাসনার বড় প্রাধান্য ছিল। বৈদিক হিন্দুদিগের ন্যায় তাঁহারাও সূর্যের নানা মূর্তির উপাসনা করিতেন। এক মূর্তি রা আর এক মূর্তি ওসাইরিস, তৃতীয় মূর্তি হার্পক্রেতি* প্রাচীন সিরীয়, ও আসিরীয় ও টিরীয়দিগের মধ্যে সূর্য বালস্মেস্, বেল বা বাল নামে উপাসিত হইতেন। সিরিয়া হইতে সূর্যোপাসনা রোমকে আনীত হইয়াছিল। এই সূর্যদেবের নাম এলোগবল্। তাঁহার পুরোহিত হেলিওগবলস্ রোমকের একজন সম্রাট হইয়াছিলেন। পরে রোমক খৃষ্টান হইলেও খৃষ্টোপাসনার সঙ্গে সঙ্গে স্থানে স্থানে সূর্যোপাসনা চলিয়াছিল এবং এখনও চলিতেছে। যেখানে সূর্যোপাসনা লুপ্ত হইয়াছে, সেখানেও খৃষ্টমাস্ প্রভৃতি উৎসবে তাঁহার উপাসনার চিহ্ন অদ্যাপি বর্তমান আছে। পক্ষান্তরে, বিড়ুইন আরবেরা মুসলমান হইয়াও অদ্যাপি সূর্যের উপাসনা করিয়া থাকে।

চতুর্থ উদাহরণস্বরূপ আমরা বায়ুদেবতাকে গ্রহণ করি। ইন্দ্রাগ্নিসূর্যের ন্যায় বায়ুরও উপাসনা বহুদেশে প্রচলিত। আলগঙ্কুইন জাতিদিগের বায়ুদেবত্বটুটুয়ের উপাখ্যান লংফেলো কৃত Hiawatha নামক কাব্যে বর্ণিত আছে। দিলাবরদিগের দ্বাদশ দেবতার মধ্যে উত্তর, পশ্চিম, পূর্ব, দক্ষিণ, এই চারিটি দেবতা চারি প্রকার বায়ু মাত্র। ইরকোয়া জাতিদিগের মধ্যে বায়ুর অধিপতি দেবতার নাম গাওঃ। বেদে যেমন বায়ু এবং মরুদ্গণ পৃথক্ পৃথক্ দেবতা, অসভ্য জাতিদিগের মধ্যেও তেমনি কোথাও বায়ু কোথাও মরুদ্গণ পূজিত। পলিনেসীয়দিগের মধ্যে মরুদ্গণের পূজা আছে। তাহাদিগের মধ্যে প্রধান বেরোমতোঁতরু এবং তৈরিবু। বন্ধুজন ঝড়ের সময় সমুদ্রে থাকিলে উহারা এই মরুদ্গণের পূজা করে। উহাদিগের বিশ্বাস, ঐ পূজায় প্রার্থনামত ঝড় বন্ধ হয় এবং প্রার্থনামত ঝড় উপস্থিত হয়। অষ্ট্রেলিসিয়ার উপদ্বীপ মধ্যে মোঁই প্রধান দেবতা। তিনি কোন কোন স্থানে বায়ুদেবতা বলিয়া পূজিত হন। টাইটিতে তিনি পূর্ব বায়ু। নর্ভজল্যাণ্ডে তিনি বায়ুগণের শাসনকর্তা। ফিন্ জাতিদিগের প্রধান দেবতা উক্কো ঝড়ের অধিপতি। গ্রীকদিগের মধ্যে বোরিয়স্, জেফিরস্ এবং ইয়লস্ বায়ু দেবতা। হার্পিগণ মরুদ্দেবতা। স্ক্যান্ডিনেভীয়দিগের বিখ্যাত ওডিন মরুদ্দেবতা। এই মরুদ্দেবের পূজার চিহ্ন আজও ইউরোপে বর্তমান আছে। কারিন্থিয়ার কৃষকেরা মাংসপূর্ণ কাষ্ঠপাত্র গাছে ঝুলাইয়া দিয়া বায়ুদেবতাকে ভোগ দেয়। জার্মানির অন্তর্গত স্বাবিয়া, টাইরোল এবং উপর-পালার্টিনেট প্রদেশে ঝড় হইলে ঝড়কে ঐরূপ মাংস উপহার দিয়া শান্ত করিবার চেষ্টা করে।

বেদে বরুণ প্রধানতঃ আকাশদেবতা, কিন্তু তিনি স্থানে স্থানে জলেশ্বর বলিয়াও অভিহিত হইয়াছেন। পুরাণে তিনি কেবল জলেশ্বর। গ্রীকদিগের মধ্যেও বরুণ এইরূপ দুই ভাগ হইয়াছেন। বুরেনস্ (Uranos) আকাশ বরুণ এবং পোসাইডন (Poseidon) বা নেপচুন (Neptune) জলবরুণ। অসভ্য জাতিদের মধ্যেও এই দ্বিবিধ বরুণের উপাসনা আছে। আকাশ বরুণের কথা আমরা পরে বলিব, এক্ষণে জলেশ্বর বরুণেরই কথা বলি। পলিনেসিয়া প্রদেশে তুয়ারাতাই এবং রুয়াহাতু এই দুই জলেশ্বর বরুণ উপাসিত হইয়া থাকেন। আফ্রিকায় বোসমান জাতিদিগের মধ্যে জলেশ্বরের পূজা খুব ধুমধামের সহিত হইয়া থাকে। আফ্রিকার অন্যান্য প্রদেশেও জলেশ্বরের পূজা আছে। দক্ষিণ আমেরিকায় পিরুবাসীরা মামাকোচা নামে সমুদ্র-দেবের পূজা করে। পূর্ব আসিয়ার কামচকট্কা প্রদেশে মিৎক্ নামে জলেশ্বর উপাসিত হইয়া থাকেন। জাপানে দ্বিবিধ জলেশ্বর আছেন। স্থলমধ্যগত জলেশ্বরের নাম মিধসুনোকামি এবং জলমধ্যগত জলেশ্বরের নাম জেবিসু।

আগামী সংখ্যায় আমরা আর দুইটি বৈদিক দেবতাকে উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করিব। পরে যে তত্ত্ব বদ্বাইবার জন্য এই সকল উদাহরণ সংগ্রহ করিতেছি, তাহার অবতারণা করিব।—‘প্রচার’, ১ম বর্ষ, পৃ. ৩০১-১০।

*Harpokrates.

দ্যাবাপৃথিবী

আকাশের একটি নাম দ্য বা দ্যোঃ। নামটি এখনও অর্থাৎ আধুনিক সংস্কৃতে ব্যবহৃত হয়। এই দ্য বা দ্যো বেদে দেবতা বলিয়া স্তুত হইয়াছেন, ইহা বলিয়াছি। ইনি একজন আকাশ-দেবতা। ইন্দ্র বৃষ্টিকারী আকাশ, বরুণ আবরণকারী আকাশ, অর্দিত অনন্ত আকাশ। কিন্তু দ্যো বা দ্য আকাশের কোন মূর্তি—এ কথাটা বলা হয় নাই।

বেদে যেমন আকাশের স্তোত্র আছে, তেমনি পৃথিবীরও আছে। আকাশ দেব বলিয়া, পৃথিবী দেবী বলিয়া স্তুত হইয়াছেন। একটা কাজের কথা এই যে, এই দ্য বা দ্যো, আর এই পৃথিবী, একত্রে এক সৃষ্টিই স্তুত হইয়াছেন। তাঁহাদের যুগ্মনাম দ্যাবাপৃথিবী।

আরও কাজের কথা এই যে, কেবল তাঁহারা একত্রে স্তুত হইয়াছেন, এমত নহে, তাঁহারা দম্পতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। আকাশ পুরুষ, পৃথিবী স্ত্রী।

কেবল তাই নহে। এই দম্পতি সমস্ত জীবের পিতা ও মাতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। দ্যো পিতা, পৃথিবী মাতা। আজ আমরা পৃথিবীকে মা বলিয়া থাকি—বাজালা সাহিত্যেও “মাতর্স্বসুমতি!” এমন সম্বোধন পাওয়া যায়। কিন্তু আকাশকে পিতা বলিয়া ডাকিতে আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। বৈদিক ঋষিরা যেমন পৃথিবীকে মাতা বলিতেন, তেমনি আকাশকে পিতা বলিতেন। “তন্মাতা পৃথিবী তৎপিতা দ্যোঃ।” (১,৮৩,৪) এই “পিতা দ্যোঃ” বা “দ্যোঃপিতা” অর্থাৎ “দ্যোঃপিতৃ” শব্দ গ্রীকদিগের “Zeus Pater” এবং রোমকদিগের “Jupiter” ইহা পদ্বর্ষ বলা হইয়াছে।

হিন্দু দর্শনশাস্ত্রে বলে, আকাশ পঞ্চভূতের একটি। কিন্তু ইহাই আদিম। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে জল, জল হইতে স্ফিতি। ঋগ্বেদসংহিতায় দর্শনশাস্ত্র নাই—অতএব ঋগ্বেদসংহিতায় এ সকল কথা নাই। কিন্তু তাহাতে আছে যে, আকাশ হইতে সর্বভূতের উৎপত্তি হইয়াছে। যথা “দ্যাবাপৃথিবী জনিত্রী।” বা “দ্যোঃপিতা পৃথিবী মাতরধু-গণে ভ্রাতর্স্বসবো” ইত্যাদি।

তবেই, যেমন ইন্দ্র আকাশের বর্ষকমূর্তি, বরুণ আবরণকমূর্তি, অর্দিত অনন্তমূর্তি, দ্য বা দ্যো তেমনি জনকমূর্তি। মনুও বলিয়াছেন, “মাতা পৃথিব্যাঃ মূর্তিঃ।”

এখন আধুনিক বিজ্ঞানে এমন কথা বলে না যে, আকাশ এই বিশ্বব্যাপী জীবপুঞ্জের জনক। এরূপ কথার কোন “প্রমাণ” নাই। কিন্তু বিজ্ঞান লইয়া প্রাচীন ধর্ম সকল গঠিত হয় নাই। যখন বিজ্ঞান হয় নাই, তখন বিজ্ঞান কিছুরই গঠনে লাগিতে পারে না। তবে এই জনকপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার আকাশের কি কোন দাবি দাওয়া ছিল না তাহা আমাদের বলিবার প্রয়োজন করে না, কেবল ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, পৃথিবী জন্মিয়া এই দাবি স্বীকার করিয়াছিল। সকল আদিম ধর্ম আকাশ জনক। অনেক ধর্ম আকাশের নামে ঈশ্বরের নাম।

বেদে দ্যোঃ স্বামী, পৃথিবী স্ত্রী। প্রাচীন গ্রীকদিগের মধ্যেও আকাশ স্বামী, পৃথিবী স্ত্রী। আমরা বলিয়াছি যে এই “দ্যোঃ” শব্দই “Zeus,” কিন্তু Zeus গ্রীকপুরাণে পৃথিবীর স্বামী নহে। গ্রীকপুরাণে Ouranos দেবের পত্নী Gaia দেবী। Gaia সংস্কৃতে “গো”। গো শব্দে পৃথিবী সকলেই জানে। কিন্তু ইহার পতি Zeus নহেন, Ouranos পতি। Ouranos দ্যোঃ নহেন—Ouranos বরুণ। বরুণও আকাশ। অতএব গ্রীকপুরাণেও আকাশ পৃথিবীর স্বামী। এবং ইহারাই সেই পুরাণমতে সর্বজীবের জনক-জননী। আমাদের পাঠকেরা, দুই এক জন ছাড়া, বোধ হয় ল্যাটিন ও গ্রীক বন্ধন না—এবং আমরাও দুর্ভাগ্যক্রমে সেই অপরাধে অপরাধী। স্মরণ্য এ কথার পোষকতায় বচন উদ্ধৃতি করিতে পারিলাম না।*

উত্তর আমেরিকার হুরগ, ইরিকোওয়া প্রভৃতি জাতির মধ্যে, আফ্রিকার জুলুজাতি, বসনিজাতি প্রভৃতি জাতির মধ্যে এই আকাশ-দেবতা পূজিত। উত্তর আশিয়ার সামোয়েদ জাতির মধ্যে,

* এই তত্ত্বে পাঠক বন্ধিতে পারিবেন, যখন আকাশ ও পৃথিবীর পরিণয় কল্পিত হইয়াছিল, তখন দ্যোঃ শব্দ জিয়স্ শব্দে পরিণত হয় নাই। তখন আর্ষ্যবংশীয়েরা পৃথক্ পৃথক্ দেশে যাত্রা করে নাই। অনেক কালের প্রাচীন কথা।

দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম—চেতন্যবাদ

কিন্ জাতিদিগের মধ্যে এবং চীনজাতিদিগের মধ্যে আকাশ জনক বলিয়া প্রতিষ্ঠিত। অনেক স্থানে আকাশবাচক শব্দই ঈশ্বরবাচক শব্দ।

ঐরূপ আৰ্য্যজাতীয়দিগের মধ্যে, নানা অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে এবং চৈনিক জাতিদিগের মধ্যে আকাশ পিতা, পৃথিবী মাতা, পৃথিবী আকাশের পত্নী; পৃথিবী ও আকাশের সংযোগে বা বিবাহে জীবসৃষ্টি।

চৈনিক দার্শনিকেরা ইহার উপর একটু বাড়াইলেন। আকাশ পিতা, পৃথিবী মাতা; ইহা হইতে তাহারা করিলেন যে, সৃষ্টিতে দুইটি শক্তি আছে—একটি পুরুষ, একটি স্ত্রী, একটি স্বর্গীয়, একটি পার্থিব। একটির নাম ইন্, আর একটির নাম ইয়ঙ্।

ইহাতে পাঠকের, ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি পুরুষ মনে পড়িবে। ভারতবর্ষীয়েরা যে চৈনিক-দিগের নিকট হইতে এ কথা পাইয়াছিলেন, অথবা চৈনিকেরা যে ভারতবর্ষীয়দিগের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন, এমন কথা বলিবার কোন কারণ পাওয়া যায় না। বোধ হয়, দুই জাতির মধ্যে এক কারণেই এই প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব উদ্ভূত হইয়াছিল। উভয় দেশেই আকাশ পিতা, পৃথিবী মাতা, এবং উভয়ের সংযোগে বিশ্বজনন, এই বিশ্বাস ছিল, তাহা হইতেই প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব উদ্ভূত হইয়া থাকিবে। সাংখ্যের পুরুষ আকাশ নহে, এবং প্রকৃতি পৃথিবী নহে, তাহা আমরা জানি। বোধ হয় এই দ্যাবাপৃথিবীতত্ত্ব, উপনিষদের আত্মতত্ত্ব ও মায়াবাদে মিলিত হইয়া প্রকৃতি পুরুষে পরিণত হইয়া থাকিবে। সেই প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব হইতে তান্ত্রিক উপাসনার উৎপত্তি কি না, এবং ভৈরব ও ভৈরবীর মূলে এই দ্যাবাপৃথিবী কি না, সে স্বতন্ত্র কথা। এক্ষণে আমরা তাহার বিচারে প্রবৃত্ত নাহি।

আমরা এত দিনে যে দুইটি স্থূল কথা বঝাইলাম, তাহা পাঠককে এইখানে স্মরণ করাইয়া দিই।

প্রথম। ইন্দ্রাদি বৈদিক দেবতা বিশ্বের নানা বিকাশ মাত্র—যথা আকাশ, সূর্য্য, অগ্নি বা বায়ু।

দ্বিতীয়। ঐরূপ ইন্দ্রাদির উপাসনা কেবল ভারতবর্ষে নহে, অনেক স্থানে আছে। এক্ষণে আমরা বিচার করিব,

প্রথম। কেন ঐরূপ ঘটিয়াছে।

দ্বিতীয়। এখানে উপাসনা বস্তুটা কি।

‘প্রচার’ ১ম বর্ষ, পৃ. ৩৬৩-৬৭।

চেতন্যবাদ

পৃথিবীতে ধর্ম কোথা হইতে আসিল?

অনেকেই মনে করেন, এ কথার উত্তর অতি সহজ। খ্রীষ্টীয়ান বলিবেন, মূসা ও যীশু ধর্ম আনিয়াছেন। মূসলমান বলিবেন, মহম্মদ আনিয়াছেন, বৌদ্ধ বলিবেন, তথাগত আনিয়াছেন, ইত্যাদি। কিন্তু তাহা ছাড়া আরও ধর্ম আছে। প্রাচীন গ্রীক প্রভৃতি জাতির ধর্মের মূসা মহম্মদ কেহ নাই। পৃথিবীতে কত জাতীয় মনুষ্য আছে, তাহার সংখ্যা নাই বলিলেও হয়। সকলেরই এক একটা ধর্ম আছে, এমন কোন জাতি আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহাদের কোন প্রকার ধর্মজ্ঞান নাই। এই অসংখ্য জাতিদিগের ধর্ম প্রায় মহম্মদ মূসা খ্রীষ্ট বৌদ্ধের তুল্য কেহ ধর্মস্রষ্টা নাই। তাহাদের ধর্ম কোথা হইতে আসিল?

আর যাহারা বলেন যে, খ্রীষ্ট বা বুদ্ধ, মূসা বা মহম্মদ ধর্ম সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের কথায় একটা ভুল আছে। ইহারা কেহই ধর্মের সৃষ্টি করেন নাই, কোন প্রচলিত ধর্মের উন্নতি করিয়াছেন মাত্র। খ্রীষ্টের পূর্বে যিহুদায় যিহুদী ধর্ম ছিল, খ্রীষ্টধর্ম তাহারই উপর গঠিত হইয়াছে; মহম্মদের পূর্বে আরবে ধর্ম ছিল, ইসলাম তাহার উপর ও যিহুদী ধর্মের উপর গঠিত হইয়াছে; শাক্যসিংহের আগে বৈদিক ধর্ম ছিল, বৌদ্ধ ধর্ম হিন্দুধর্মের সংস্করণ মাত্র। মূসার ধর্ম প্রচারের পূর্বেও এক যিহুদী ধর্ম ছিল; মূসা তাহার উন্নতি করিয়াছিলেন। সেই সকল আদিম ধর্ম কোথা হইতে আসিল? তাহার প্রণেতা কাহাকেও দেখা যায় না।

বিশ্বকম রচনাবলী

অর্থাৎ কদাচিৎ ধর্মের সংস্কারক দেখা যায়, কোথাও ধর্মের স্রষ্টা দেখা যায় না। সৃষ্ট ধর্ম নাই; সকল ধর্মই পরম্পরাগত, কদাচিৎ বা সংস্কৃত।

বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে এমনই একটা প্রশ্ন আছে—পৃথিবীতে জীব কোথা হইতে আসিল? যদি বলা যায়, ঈশ্বরেচ্ছায় বা ঈশ্বরের সৃষ্টক্রমে পৃথিবীতে জীবসম্ভার হইয়াছে, তাহা হইলে বিজ্ঞান বিনষ্ট হইল। কেন না সকলই ঈশ্বরেচ্ছায় ঘটিয়াছে; সকল বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের এই উত্তর দিয়া অনুসন্ধান সমাপন করা যাইতে পারে। অতএব কি জীবোৎপত্তি কি ধর্মোৎপত্তি সম্বন্ধে এ উত্তর দিলে চলিবে না।

কেন না ধর্মোৎপত্তিও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। ইহারও অনুসন্ধান বৈজ্ঞানিক প্রথায় করিতে হইবে। বৈজ্ঞানিক প্রথা এই যে, বিশেষের লক্ষণ দেখিয়া সাধারণ লক্ষণ নির্দেশ করিতে হয়।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অনেকেই এই প্রণালী অনুসারে ধর্মের উৎপত্তির অনুসন্ধান করিয়াছেন। কিন্তু নানা মতের নানা মত। কাহারও মত এমন প্রশস্ত বলিয়া বোধ হয় না যে, পাঠককে তাহা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতে পারি। আমি নিজে যাহা কিছু বুঝি পাঠকদিগকে অতি সংক্ষেপে তাহার মর্মার্থ বুঝাইতেছি।

ধর্মের উৎপত্তি বুঝিতে গেলে সভ্য জাতির ধর্মের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে কিছু পাইব না। কেন না, সভ্য জাতির ধর্ম পুরাতন হইয়াছে, সে সকলের প্রথম অবস্থা আর নাই, প্রথমাবস্থা নাহিলে আর কোথাও উৎপত্তি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। গাছ কোথা হইতে হইল, অঙ্কুর দেখিলে বুঝা যায়; প্রকাণ্ড বৃক্ষ দেখিয়া বুঝা যায় না। অতএব অসভ্য জাতিদিগের ধর্মের সমালোচনা করিয়া ধর্মের উৎপত্তি বুঝাই ভাল।

এখন, মনুষ্য যতই অসভ্য হোক না কেন, একটা কথা তাহারা সহজে বুঝিতে পারে। বুঝিতে পারে যে, শরীর হইতে চৈতন্য একটা পৃথক্ সামগ্রী।

এই একজন মানুষ চলিতেছে, খাইতেছে, কথা কহিতেছে, কাজ করিতেছে। সে মরিয়া গেল, আর সে কিছুই পাইল না। তাহার শরীর যেমন ছিল, তেমনই আছে, হস্তপদাদি কিছুই অভাব নাই, কিন্তু সে আর কিছুই করিতে পারে না। একটা কিছু তার আর নাই, তাই আর পারে না। তাই অসভ্য মনুষ্য বুঝিতে পারে যে, শরীর ছাড়া জীব আর একটা কি আছে, সেইটার বলে জীবিত্ব, শরীরের বলে জীবিত্ব নহে।

সভ্য হইলে মনুষ্য ইহার নাম দেয়, “জীবন” বা “প্রাণ” বা আর কিছু। অসভ্য মনুষ্য নাম দিতে পারুক না পারুক, জিনিসটা বুঝিয়া লয়। বুঝিলে দেখিতে পারে যে, এটা কেবল জীবেরই আছে, এমত নহে, গাছ পালারও আছে। গাছ পালাতেও এমন একটা কি আছে যে, সেটা যত দিন থাকে, তত দিন গাছে ফুল ধরে, পাতা গজায়, ফল ধরে, সেটার অভাব হইলেই আর ফুল হয় না, পাতা হয় না, ফল হয় না, গাছ শুকাইয়া যায়, মরিয়া যায়। অতএব গাছ পালারও জীবন আছে। কিন্তু গাছ পালার সঙ্গে জীবের একটা প্রভেদ এই যে, গাছ পালা নড়িয়া বেড়ায় না, খায় না, গলায় শব্দ করে না, মারপিট লড়াই বা ইচ্ছাজনিত কোন ক্রিয়া করে না।

অতএব অসভ্য মনুষ্য জ্ঞানের সোপানে আর এক পদ উঠিল। দেখিল, জীবন ছাড়া জীব আর একটা কিছু আছে, যাহা গাছ পালায় নাই। সভ্য হইলে তাহার নাম দেয়, “চৈতন্য”। অসভ্য নাম দিতে পারুক না পারুক, জিনিসটা বুঝিয়া লয়।

আদিম মনুষ্য দেখে যে, মানুষ মরিলে, তাহার শরীর থাকে—অস্তিত্বঃ কিয়ৎক্ষণ থাকে, কিন্তু চৈতন্য থাকে না। মানুষ নিদ্রা যায়, তখন শরীর থাকে, কিন্তু চৈতন্য থাকে না। মূর্ছাদি রোগে শরীর থাকে, কিন্তু চৈতন্য থাকে না। তখন সে সিদ্ধান্ত করে যে, চৈতন্য শরীর ছাড়া একটা স্বতন্ত্র বস্তু।

এখন অসভ্য হইলেও, মনুষ্যের মনে এমন কথাটা উদয় হওয়া সম্ভাবনা যে, এই শরীর হইতে চৈতন্য যদি পৃথক্ বস্তু হইল, তবে শরীর না থাকিলে এই চৈতন্য থাকিতে পারে কি না? থাকে কি না?

মনে করিতে পারে, মনে করে, থাকে বৈ কি? স্বপ্নে দেখি; স্বপ্নে শরীর এক স্থানে রহিল, কিন্তু চৈতন্য গিয়া আর এক স্থানে দেখিতেছে, বেড়াইতেছে, সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছে, নানা কাজ করিতেছে। ভূত আছে, এ কথা স্বীকার করিবার আমাদের প্রয়োজন নাই, কিন্তু সভ্য কি অসভ্য মনুষ্য কখন কখন ভূত দেখিয়া থাকে, এ কথা স্বীকার করিবার বোধ হয় কাহারও আপত্তি

নাই। মস্তিস্কের রোগে, কিম্বা ভ্রমবশতঃ মনুষ্যে ভূত দেখে, ইহা বলা যাউক। যে কারণে হউক মনুষ্য ভূত দেখে। মরা মানুষের ভূত দেখিলে অসভ্য মানুষের মনে এমন হইতে পারে যে, শরীর গেলেও চৈতন্য থাকে। এই বিশ্বাসই পরলোকে বিশ্বাস, এবং এইখানেই ধর্মের প্রথম সূত্রপাত।

ইহা বলিয়াছি যে অসভ্য মানুষ বা আদিম মানুষ, যাহাকে ক্রিয়াবান্, আপনার ইচ্ছানুসারে ক্রিয়াবান্, দেখে, তাহারই চৈতন্য আছে বিশ্বাস করে। জীব, আপন ইচ্ছানুসারে ক্রিয়াবান্, এজন্য জীবের চৈতন্য আছে, নিষ্কর্মে ইচ্ছানুসারে ক্রিয়াবান্ নহে, এজন্য নিষ্কর্মে চৈতন্য নহে। কিন্তু আদিম মনুষ্য সকল সময়ে বুদ্ধিতে পারে না, কোনটা চৈতন্যযুক্ত, কোনটা চৈতন্যযুক্ত নহে। পাহাড়, পর্বত, জড়পদার্থ সচরাচর ইচ্ছানুসারে ক্রিয়াবান্ নহে, সচরাচর ইহাদের অচেতন বলিয়া বুদ্ধিতে পারে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে এক একটা পাহাড় অগ্নি উদ্গীরণ করিয়া অতি ভয়াবহ ব্যাপার সম্পাদন করে। সেটাকে ইচ্ছানুসারে ক্রিয়াবান্ বলিয়াই বোধ হয়; আদিম মনুষ্যের সেটাকে সচেতন্য বলিয়া বোধ হয়। কলনাদিনী নদী, রাত্রি দিন ছুটিতেছে, শব্দ করিতেছে, বাড়িতেছে, কমিতেছে, কখন ফাঁপিয়া উঠিয়া দুই কূল ভাসাইয়া দিয়া সর্বনাশ করিতেছে, কখন পরিমিত জলসেক করিয়া শস্য উৎপাদন করিতেছে, ইহাকেও ইচ্ছানুসারে ক্রিয়াবতী বলিয়া বোধ হয়। সূর্যের কথা বড় আশ্চর্য। জগতে যাহাই হোক না কেন, ইনি ঠিক সেই নিয়মিত সময়ে পৃথিবীকে হাজির। আবার ঠিক আপনার নির্দিষ্ট পথে সমস্ত দিন ফিরিয়া, ঠিক নিয়মিত সময়ে পশ্চিমে লুক্কায়িত। ইহাকেও স্বেচ্ছাক্রিয় বলিয়া বোধ হয়, ইহাও সচেতন্য বোধ হয়। চন্দ্র, ও তারা সম্বন্ধেও এইরূপ হইতে পারে। কোথা হইতে আকাশে মেঘ আসে? মেঘ আসিয়া কেন বৃষ্টি করে? বৃষ্টি করিয়া কোথায় চলিয়া যায়? মেঘ আসিলেই বা সকল সময়ে বৃষ্টি হয় না কেন? যে সময়ে বৃষ্টির প্রয়োজন, যে সময়ে বৃষ্টি হইলে শস্য হইবে, সচরাচর ঠিক সেই সময়ে বৃষ্টি হয় কেন? সচরাচর তাহা হয়, কিন্তু এক এক সময়ে তাই বা হয় না কেন? কখন কখন অনাবৃষ্টিতে দেশ জ্বলিয়া যায় কেন? এ সব আকাশের ইচ্ছা, মেঘের ইচ্ছা, বা বৃষ্টিরই ইচ্ছা, এজন্য আকাশ সচেতন, মেঘ সচেতন, বা বৃষ্টি সচেতন বলিয়া বোধ হয়। ঝড়, বা বায়ু সম্বন্ধেও ঐরূপ। বজ্র বা বিদ্যুৎ সম্বন্ধেও ঐরূপ ঘটে। অগ্নি সম্বন্ধেও যে ঐরূপ ঘটিবে, তাহা অগ্নির ক্রিয়া সকলের সমালোচনা করিলে সহজে বুঝা যাইতে পারে। অগাধ, দুস্তর, তরঙ্গ-সঙ্কুল, জলচরে সংস্কৃত রত্নাকর সমুদ্র সম্বন্ধেও সেই কথা হইতে পারে। ইত্যাদি।

এইরূপে জড়ে চৈতন্য আরোপ, ধর্মের দ্বিতীয় সোপান। ইহাকে ধর্ম না বলিয়া, উপধর্ম বলিতে কেহ ইচ্ছা করেন, আপত্তি নাই। ইহা স্মরণ রাখিলে যথেষ্ট হইবে যে, উপধর্মই সত্য ধর্মের প্রাথমিক অবস্থা। বিজ্ঞানের প্রথমাবস্থা যেমন ভ্রমজ্ঞান, ইতিহাসের প্রথমাবস্থা যেমন লৌকিক উপন্যাস বা উপকথা, ধর্মের প্রথমাবস্থা তেমনি উপধর্ম। মতান্তর আছে, তাহা আমরা জানি, কিন্তু মনুষ্যের আদিম অবস্থায় বিজ্ঞান নিকৃষ্ট, ইতিহাস নিকৃষ্ট, দর্শন, কাব্য সাহিত্য-শিল্প, সর্বপ্রকার বিদ্যা বুদ্ধি, সবই নিকৃষ্ট, কেবল তত্ত্বজ্ঞান উৎকৃষ্ট হইবে ইহা সম্ভব নহে।

তার পর ধর্মের তৃতীয় সোপান। যে সকল জড়পদার্থে মনুষ্য চৈতন্যারোপ করিতে আরম্ভ করে, তাহার মধ্যে অনেকগুলি অতিশয় ক্ষমতাশালী, তেজস্বী, বা সুন্দর। সেই আগ্নেয়গিরি একেবারে দেশ উৎসন্ন দিতে পারে, তাহার ক্রিয়া দেখিয়া মনুষ্যবুদ্ধি স্তম্ভিত, লুপ্তপ্রায় হইয়া যায়। সেই কূলপরিপ্লাবিনী, ভূমির উৎপাদিকা শক্তির সঞ্চারিণী নদী, মঙ্গলে অতিশয় প্রশংসনীয়, অমঙ্গলে অতি ভয়ঙ্করী বলিয়া বোধ হয়। ঝড়, বৃষ্টি, বায়ু, বজ্র, বিদ্যুৎ, অগ্নি, ইহাদের অপেক্ষা আর বলবান্ কে? ইহাদের অপেক্ষা ভীমকর্মা কে? যদি ইহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ থাকে, তবে সূর্য্য; ইহার প্রচণ্ড তেজ, আশ্চর্য্য গতি, ফলোৎপাদন জীবোৎপাদন শক্তি, আলোক, সকলই বিস্ময়কর। ইহাকে জগতের রক্ষক বলিয়া বোধ হয়, ইনি যতক্ষণ অনর্দিত থাকেন, ততক্ষণ জগতের ক্রিয়াকলাপ প্রায় বন্ধ হইয়া থাকে।

এই সকল শক্তিশালী মহামহিমাময় জড় পদার্থ, যদি সচেতন, স্বেচ্ছাচারী বলিয়া বোধ হইল, তবে মানুষের মন ভয়ে বা প্রীতিতে অভিভূত হয়। ইহাদের কেবল শক্তি এত বেশী তাই নহে, মনুষ্যের মঙ্গলামঙ্গল ইহাদিগের অধীন। সচরাচর দেখা যায় যে, যে চৈতন্যযুক্ত, সে তুষ্ট হইলে ভাল করে, রুষ্ট হইলে অনিষ্ট করে। এই সকল মহাশক্তিযুক্ত মঙ্গলামঙ্গল-সম্পাদক

বিশ্বকম রচনাবলী

পদার্থ যদি চৈতন্যবিশিষ্ট হয়, তবে তাহারাও সেই নিয়মের বশীভূত, ইহা আদিম মনুষ্য মনে করে। মনে করে, তাহাদের তুষ্ট রাখিতে পারিলে সর্বত্র মঙ্গল, তাহারা রুষ্ট হইলে সর্বনাশ হইবে। ইহাতে উপাসনার উৎপত্তি। ইহাই ধর্মের তৃতীয় সোপান। এই জন্য সর্বদেশে সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, ঝড়, বৃষ্টি, অগ্নি, জলধি, আকাশাদির উপাসনা। এই জন্য বেদের ইন্দ্রাদি আকাশ দেবতা, সূর্য্য দেবতা, বায়ু দেবতা, অগ্নি দেবতা প্রভৃতির উপাসনা।

কিন্তু ইহার মধ্যে একটা কথা আছে। উপাসনা দ্বিবিধ। যাহার শক্তিতে ভীত হই, বা যাহার শক্তি হইতে সুফল পাইবার আশা করি, তাহার উপাসনা করি। কিন্তু তা ছাড়া আরও এমন সামগ্রী আছে, যাহার উপাসনা করি, সেবা করি, আদর করি। যাহার ভয়দায়িকা শক্তি নাই, অথচ হিতকর তাহারও আদর করি। অচেতন ওষধি বা ওষধের আমরা এরূপ আদর করি। ছায়াকারক বট বা স্বাস্থ্যদায়ক শেফালিকা বা তুলসীর তলায় জল সিঞ্জন করি। উপকারী অশ্বের ভৃত্যবৎ সেবা করি। গৃহরক্ষক কুকুরকে যত্ন করি। দক্ষদায়িনী গাভী, এবং কর্ষণকারী বলদকে আরও আদর করি। ধার্মিক মনুষ্যকে ভক্তি করি। এ এক জাতীয় উপাসনা। এই উপাসনার বশবর্তী হইয়া হিন্দু ছুতার কুড়ালি পূজা করে, কামার হাতুড়ি পূজা করে, বৈশ্য্য বাদ্যযন্ত্র পূজা করে, লেখক লেখনী পূজা করে, ব্রাহ্মণ পুঁথি পূজা করে।*

আরও আছে। যাহা সুন্দর, তাহা আমরা বড় ভালবাসি। সুন্দর হইতে আমরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, কোন উপকার পাই না, তবু আমরা সুন্দরের আদর করি। যে ছেলে চন্দ্র হইতে কি উপকার বা অপকার পাওয়া যায়, তাহার কিছুই জানে না, সেও চাঁদ ভালবাসে। যে ছবির পুতুল, আমাদের ভাল মন্দ কিছুই করিতে পারে না, তাহাকেও আদর করি। সুন্দর ফুলটি, সুন্দর পাখিটি, সুন্দর মেয়েটিকে বড় আদর করি। চন্দ্র কেবল সৌন্দর্য্য গুণেই দেবতা, সাতাইশ নক্ষত্র তাহার মহিষী।

প্রকৃত পক্ষে ইহা উপাসনা নহে, কেবল আদর। কিন্তু অনেক সময়ে ইহা উপাসনা বলিয়া গণিত হয়। বৈদিক ধর্ম সম্বন্ধে তাই অনেক সময়ে হইয়াছে। কথাটা ঊনবিংশ শতাব্দীর ভাষায় অনুবাদ করা যাউক তাহা হইলেই অনেকেই বদ্বিধিতে পারিবেন।

যাহা শক্তিশালী, তাহা নৈসর্গিক পদার্থের কোন বিশেষ সম্বন্ধ বিশিষ্ট বলিয়াই শক্তিশালী। কার্বনের প্রতি অম্লজানের নৈসর্গিক অনুরাগই অগ্নির শক্তির কারণ। তাপ, জল, ও বায়ু এই তিন পদার্থে পরস্পরে বিশেষ কোন সম্বন্ধ বিশিষ্ট হওয়াতেই মেঘের শক্তি।

এই যে জাগতিক পদার্থের পরস্পরের সম্বন্ধের কথা বলিলাম, এই সম্বন্ধের বৈজ্ঞানিক নাম সত্য। সত্যই শক্তি। কেবল জড়শক্তি, আধ্যাত্মিক শক্তি সম্বন্ধেও এই কথা সত্য। যীশু বা শাক্যসিংহের উক্তি সকল বা কর্ম সকল সমাজের সহিত নৈসর্গিক শক্তিবিশিষ্ট, অর্দ্ধেক জগৎ আজিও তাহাদের বশীভূত।

যাহা হিতকর, শক্তিশালী হউক বা না হউক, কেবল হিতকর, ঊনবিংশ শতাব্দী তাহার নাম দিয়াছে, শিব। সুন্দর বা সৌম্যের নতুন নাম কিছু হয় নাই, সুন্দর সুন্দরই আছে, সৌম্য সৌম্যই আছে।

এই সত্য (The True), শিব (The Good) এবং সুন্দর (The Beautiful) এই ত্রিবিধ ভাব মানুষ্যের উপাস্য। এই উপাসনা দ্বিবিধ হইতে পারে। উপাসনার সময়ে অচেতন উপাস্যকে সচেতন মনে করিয়া উপাসনা করা যাইতে পারে, আদিম মনুষ্য তাহাই করিয়া থাকে। এই উপাসনা-পদ্ধতি দ্রাস্ত, কাজেই অহিতকর। দ্বিতীয়বিধ উপাসনায়, অচেতনকে অচেতন বলিয়াই জ্ঞান থাকে। গেটে (Goethe) বা বর্ডস্বর্থ (Wordsworth) এই জাতীয় জড়োপাসক। ইহা অহিতকর নহে, বরং হিতকর, কেন না ইহার দ্বারা কতকগুলি চিন্তাবৃত্তির স্ফূর্তি ও পরিণতি সাধিত হয়। ইহা অনুশীলন বিশেষ। এখনকার দেশী পণ্ডিতেরা (বিশেষ বালকেরা) তাহা বদ্বিধিতে পারিয়া উঠে না, কিন্তু কতকগুলি বৈদিক ঋষি তাহা বদ্বিধিতে। বেদে দ্বিবিধ উপাসনাই আছে।

* এই কথা শুনিয়া সর আলফ্রেড লায়েল লিখিলেন, কি ভয়ানক উপধর্ম! এমন নিকৃষ্ট জাতির কি গতি হইবে। কাজেই বদ্বিধির জোরে লেফটেনেন্ট গবর্নর হইলেন।

দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম—উপাসনা

‘প্রচারে’র প্রথম সংখ্যা হইতে বৈদিক দেবতাতত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা কি কি কথা বলিলাম তাহা একবার স্মরণ করিয়া দেখা যাউক।

১। ইন্দ্রাদি বৈদিক দেবতা, আকাশ, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, প্রভৃতি জড়ের বিকাশ ভিন্ন জাতীয় চৈতন্য নহেন।

২। এই সকল দেবতাদিগের উপাসনা যেমন বেদে আছে, এবং ভারতবর্ষীয়েরা যেমন ইহাদিগের দেবতা বলিয়া মানিয়া থাকে, সেইরূপ পৃথিবীর অন্যান্য জাতিগণ করিত বা করে।

৩। ইহার কারণ এই যে, প্রথমাবস্থায় মনুষ্য জড়ে চৈতন্য আরোপণ করিয়া, তাহার শক্তি, হিতকারিতা, বা সৌন্দর্য্য অনুসারে, তাহার উপাসনা করে।

৪। সেই উপাসনা ইষ্টকারী এবং অনিষ্টকারী উভয়বিধ হইতে পারে। এখন দেখিতে হইবে, বেদে কিরূপ উপাসনা আছে। তাহা হইলেই আমরা বৈদিক দেবতাতত্ত্ব সমাপ্ত করি।
—‘প্রচার’, ১ম বর্ষ, পৃ. ৩৭৪-৮৩।

উপাসনা

পূর্বে উপাসনা সম্বন্ধে যাহা বলা গিয়াছে, তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, উপাসনা দ্বিবিধ। এক, যাহাদের ফলপ্রদ বিবেচনা করা যায়, তাহাদের কাছে ফলকামনাপূর্ব্বক তাহাদের উপাসনা, আর, এক যাহাকে ভালবাসি, বা যাহার নিকট কৃতজ্ঞ হই তাহার প্রশংসা বা আদর। প্রথমোক্ত উপাসনা সকাম, দ্বিতীয় নিষ্কাম। এইরূপ সামান্য নিষ্কাম উপাসনা কেবল ঈশ্বর সম্বন্ধে হইতে পারে এমত নহে, সামান্য জড়পদার্থ সম্বন্ধে হইতে পারে। ভিন্নজাতীয় মহাত্মাদিগের বিশ্বাস যে, হিন্দু গোরুর উপাসনা করে। বস্তুতঃ এমন হিন্দু কেহই নাই যে, বিশ্বাস করে যে, আমি আমার গাইটির স্তবস্তুতি বা পূজা করিলে সে আমাকে কোন ফল দিবে। গোরু ঘাস খায়, আর দুধ দেয়, তাহা ছাড়া আর কিছু পারে না, তাহা সকলেই জানে। তবে সাধারণ হিন্দুর এই বিশ্বাস যে গোরুকে যত্ন করিলে, আদর করিলে, দেবতা প্রসন্ন হইবেন। এ কথাটা তত অসঙ্গত নহে। যাহা উপকারী, তাহা আদরের। যাহা আদরের, তাহার আদর অনুষ্ঠেয় কার্য্য ঈশ্বরানুমোদিত। এইরূপ গোরুর আদরের একটা উদাহরণ বেদ হইতেই উদ্ধৃত করিতোছি।

শুক্ল যজুর্বেদ সংহিতায় দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞে বৎসাপাকরণ কার্য্যের মন্ত্রে আছে,

“হে বৎসগণ, তোমরা ক্রীড়াপরবশ, সূতরাং বায়ুবেগে দিগ্দিগন্তরে ধাবমান হও। বায়ু-দেবতাই তোমাদিগের রক্ষক। ৩ ॥

হে গাভীগণ, আমরা শ্রেষ্ঠতম কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি। তৎসাধনার্থ সবিতা-দেবতা তোমাদিগকে প্রভূত তৃণ বন প্রাপ্ত করান। ৪ ॥

হে (স্বল্প বা বহুতর) রোগশূন্য অচিরপ্রসূতা অবধ্য গাভীগণ! তোমরা অক্ষুণ্ণ চিত্তে নিঃশঙ্ক ভাবে গোষ্ঠে প্রচুর তৃণ শস্য ভোজন করতঃ ইন্দ্র দেবতার ভোগের উপযোগী দুগ্ধের পরিবর্দ্ধন কর। তোমাদিগকে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর বা চৌর প্রভৃতি পার্শ্বগণ কেহই আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইবে না। তোমরা এই যজমানের গৃহে চিরদিন বহুপরিবার হইতে থাক। ৫ ॥”*

ঐ যজ্ঞের দুগ্ধকে সম্বোধন করিয়া ঋষিক বলেন।

“হে দুগ্ধ, যজ্ঞীয় সূপবিহীন শতধার এই পবিহ্নে তুমি শোধিত হও। সবিতা-দেবতা তোমাকে পবিহ্ন করুন।”

উখা অর্থাৎ হাঁড়িকে সম্বোধন করিয়া বলিতে হয়। “হে উখে! তুমি মৃন্ময়, সূতরাং পৃথিবীরূপিণী ত বটই। অধিকন্তু তোমার সাহায্যে যজমানগণের দু্যলোক প্রাপ্তি হয়। অতএব দু্যরূপাও তোমাকে বলিতে পারি। ২ ॥

“হে উখে, তোমার উদরে অবকাশ আছে। সূতরাং বায়ুর স্থান অন্তরীক্ষলোকও তোমার অধীন। অতএব তোমাকে অন্তরীক্ষলোকও বলিতে পারি। এতাবতা তুমি ত্রিলোকস্বরূপ।

* এই প্রবন্ধে যজুর্মন্ত্রের যে যে অনুবাদ উদ্ধৃত হইল, তাহা শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমীকৃত বাজসনেয়ী সংহিতার অনুবাদ হইতে।

বাঁকম রচনাবলী

সমস্ত দৃষ্টি ধারণেই সক্ষম হইতেছে। স্বীয় উৎকৃষ্ট তেজে দৃঢ় থাকিবে। বক্র হইবে না। সাবধান! তোমার দাঢ্যের ন্যূনতা বা বক্রতা হইলেই যজ্ঞবিঘ্ন উপস্থিত হইবে। সুতরাং যজ্ঞমান আমাদিগের প্রতি বক্র হইতে পারেন, অতএব তিনি যাহাতে বক্র না হন।” ৩॥

এখানে সকলেই দেখিতে পাইতেছেন যাহার উপাসনা হইতেছে, উপাসক তাহাকে অচেতন জড়পদার্থ বলিয়াই জানেন। হাঁড়ি কি দৃধকে কেহই ইন্টারিন্টফলপ্রদানে সক্ষম চৈতন্যবিশিষ্ট বস্তু বলিয়া মনে করিতে পারে না। অথচ তাহার উপাসনা হইতেছে। এ উপাসনা কেবল আদর মাত্র। গোবৎস সম্বন্ধেও ঐরূপ। অন্য যজ্ঞের মন্ত্র হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি।

চাতুর্মাস্য যাগে দর্শী অর্থাৎ হাতাকে বলা হইতেছে।

“হে দর্শী, তুমি অশ্নে পরিপূর্ণ হইবার অপূর্ণ শোভা ধারণ করিয়াছ। এই আকারেই ইন্দ্র দেবতার সমীপে গমন কর। ভরসা করি পুনরাগমনকালেও ফলে পরিপূর্ণ হইয়া এইরূপ শোভিত হইবে।”

অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে প্রথমেই যজ্ঞমানের মস্তক কেশ ও শ্মশ্রু প্রভৃতি ক্ষুরের দ্বারা মৃগ্ডন করিতে হয়। আগে কুশা কাটিয়া ক্ষুর পরীক্ষা করিতে হয়। সেই সময় কুশাকে বলিতে হয়, “হে কুশা সকল! অতীক্ষ্মধার ক্ষুরের দ্বারা ক্ষোঁরে যে কষ্ট হইতে পারে তাহা হইতে দ্রাণ কর। অর্থাৎ তোমাদের দ্বারাই তাহা পরীক্ষিত হউক।”

পরে ক্ষোঁরকালে ক্ষুরকে বলিতে হয়, “হে ক্ষুর, তুমি যেন ইহার রক্তপাত করিও না।”

পরে স্নান করিয়া ক্ষোঁম বস্ত্র পরিধান করিতে হয়। বস্ত্র পরিধানকালে বস্ত্রকে বলিতে হয়, “হে ক্ষোঁম! তুমি কি দীক্ষণীয় কি উপসদ উভয় প্রকার যজ্ঞেরই অঙ্গীভূত হইতেছ। আমি এই স্নানে সুন্দর কান্তি লাভ করতঃ সুখস্পর্শ কল্যাণকর তোমাকে পরিধান করিতেছি।”

তার পর গাত্রে নবনীত মন্দর্ন করিতে হয়। মন্দর্নকালে নবনীতকে বলিতে হয়। “হে গব্য নবনীত! তুমি তেজ সম্পাদনে সমর্থ হইতেছ। আমাকে তেজঃপ্রদান কর।”

এ সকল স্থানে কি কুশা কিংবা ক্ষুর বা বস্ত্র বা নবনীতকে কেহ ফলপ্রদানে সক্ষম চৈতন্যবিশিষ্ট দেবতা মনে করিতেছে না। বাতুল ভিন্ন অপরের দ্বারা এরূপ বিবেচনা হওয়া সম্ভব নহে। এ সকল কেবল যজ্ঞের বস্তুতে যজ্ঞজনক বিধি প্রয়োগ মাত্র। ইন্দ্রাদি দেবের যে স্তুতি সকল ঋগ্বেদে আছে আদৌ তাহা প্রশংসনীয় বা আদরণীয়ের প্রশংসা বা আদর মাত্র ছিল। উদাহরণ-স্বরূপ আমরা একটি ইন্দ্রস্তুত উদ্ধৃত করিতেছি।

“ইন্দ্রস্য ন্দ্র বীর্ঘ্যাণি প্র বোচং যানি চকার প্রথমানি বজ্রী।
অহ্নাহিম্বপস্তুতন্দ্র প্র বক্ষণা অভিনং পর্ষতানাং ॥
অহ্নাহিং পর্ষতে শিশ্রিয়াণং ত্বষ্টাস্মৈ বজ্রং স্বর্ঘ্যং ততক্ষ।
বাশ্রা ইব ধেনবঃ স্যন্দমানা অংজঃ সমুদ্রমবজ্ঞমুরাপঃ ॥
বৃষায়মানোহবৃগীত সোমং ত্রিকদ্রুকেষ্বপিবৎ স্ততস্য।
আ সায়কং মঘবাদন্ত বজ্রমহ্নেনং প্রথমজামহীনাং।
যদিন্দ্রাহন্ প্রথমজামহীনামান্মায়িনামমিনাঃ প্রোত মায়াঃ।
আং সূর্ঘ্যং জনয়ন্ দ্যামুঘাসং তাতিত্না শত্রুং ন কিলার্বিবিৎসে ॥
অহন্ বৃহৎ বৃহতরং ব্যংসমিন্দ্রো বজ্রেণ মহতা বধেন।
স্কন্ধাংসীব কুলিশেনাবিবৃগ্নাহিঃ শয়ত উপপৃক্ পৃথিব্যাঃ ॥
অষোক্ষেব দুর্মদ আ হি জুহেব মহাবীরং তুবিবাধম্জীষম্।
নাতারীদস্য সমৃতিং বধানাং সংরুজানাঃ পিপিস ইন্দ্রশত্রুঃ ॥
অপাদহস্তো অপ্তন্যাদিন্দ্রমাস্য বজ্রমধি সানো জঘান।
বৃষ্ণো বধিঃ প্রতিমানং বভূষন্ পুরুরা বৃগো অশয়ৎ ব্যস্তঃ ॥
নদং ন ভিন্নমমুয়া শয়ানং মনো রুহাণা অতিযন্ত্যাপঃ।
যাশিচৎ বৃগো মহিনা পর্য্যতিষ্ঠৎ তাসামহিঃ পঃসুতঃশীর্ভুব ॥
নীচাবয়া অভবৎ বৃহপুত্রেন্দ্রো অস্যা অব বধর্জভার।
উত্তরা সুরধরঃ পুত্র আসীৎ দানুঃশয়ে সহবৎসা ন ধেনুঃ ॥
অতিষ্ঠস্তীনামনিবেশনানাং কাষ্ঠানাং মধ্যে নিহিতং শরীরং।
বৃহস্য নিগ্যৎ বিচরন্ত্যাপো দীর্ঘং তম আশয়াদিন্দ্রশত্রুঃ ॥

দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম—উপাসনা

দাসপত্নীরাহিগোপা অতিষ্ঠান্নিরুদ্ধা আপঃ পণিনেব গাবঃ ।
 অপাং বিলমপিহিতং যদাসীৎ বৃহৎ জঘন্বা অপ তদ্বার ॥
 অশ্বেয়া বারো অভবস্তদিন্দ্র স্কে যত্ত্বা প্রত্যহন্দেব একঃ ।
 অজয়ো গা অজয়ঃ শূর সোমমবাস্জঃ সত্ত্ববে সপ্ত সিন্ধুন্ ॥
 নাষ্ট্ম বিদ্যুন্ন তন্যতুঃ সিষেধ ন যাং মিহমকিরৎরাদুনিং চ ।
 ইন্দ্রশচ যৎযদুধাতে অহিশ্চেচাতাপরীভ্যো মঘবা বিজিগ্যে ॥
 অহেৰ্ষাতারং কমপশ্য ইন্দ্র হৃদি যত্তে জঘন্মুঘো ভীরগচ্ছৎ ।
 নব চ যন্নবতিং চ শ্রবন্তীঃ শ্যোনো ন ভীতো অতরো রজাংসি ॥
 ইন্দ্রো যাতোহবসিতস্য রাজা শমস্য চ শৃঙ্গিনো বজ্রবাহুঃ ।
 সেদু রাজা ক্ষয়তি চৰ্ষণীনামরান্ন নেমিঃ পৰি তা বভূব ॥”

অনুবাদ

১। “বজ্রধর ইন্দ্রদেব প্রথমে যে সমস্ত পরাক্রমসূচক কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা আমি বর্ণনা করিতেছি। তিনি অহিনামে অভিহিত বৃহাস্পুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন। জলসমূহ ভূমিতে পাতিত করিয়াছিলেন এবং পার্শ্বত প্রদেশের রুদ্ধ বহনশীল নদী সকলের কূল ভগ্ন করিয়া জল প্রবাহিত করিয়াছিলেন।

২। ইন্দ্রদেব পর্ষতে লুক্কায়িত বৃহাস্পুরকে বধ করিয়াছিলেন। ত্বষ্টদেব ইন্দ্রদেবের নিমিত্ত গঞ্জর্জনশীল বজ্র নিৰ্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। বৃহাস্পুর হত হইলে পর রুদ্ধগতি নদী সকল বেগের সহিত সমুদ্রে প্রবাহিত হইয়াছিল, যদুপ গো সকল হম্বারব করিয়া সম্বর বৎসের নিকট গমন করে।

৩। বলবান্ ইন্দ্রদেব সোমরস পান করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন এবং উপর্যুপরি যজ্ঞদ্রয়ে সোমরস পান করিয়াছিলেন। তৎপরে বলবান্ ইন্দ্রদেব মারকবজ্র গ্রহণপূর্ব্বক অহিদেগের শ্রেষ্ঠ বৃহাস্পুরকে বধ করিয়াছিলেন।

৪। হে ইন্দ্রদেব! আপনি যখন অহিদেগের শ্রেষ্ঠ বৃহাস্পুরকে বধ করিয়া মায়াবী অসুরদিগের মায়া নষ্ট করিয়াছিলেন এবং তৎপরে যখন সূর্য্য উষাকাল এবং আকাশ সৃষ্টি করিয়াছিলেন তখন আর কোন শত্রু দেখিতে পান নাই।

৫। ইন্দ্রদেব তাঁহার বৃহৎ ও বধকারী বজ্রের সহিত লোকের উপদ্রবকারী বৃহাস্পুরকে লোকে যেমন কুঠার দ্বারা বৃক্ষস্কন্ধ ছেদন করে, তদুপ বাহুচ্ছেদনপূর্ব্বক বধ করিয়াছিলেন, এবং বৃহাস্পুরকে তদবস্থ ভূমির উপর পাতিত করিয়াছিলেন।

৬। আমার সমান যোদ্ধা আর কেহ নাই এইরূপ দর্পযুক্ত বৃহাস্পুর মহাবীর ও বহুশত্রু-নিবারক ইন্দ্রদেবকে যুদ্ধার্থে স্পর্ধা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইন্দ্রদেবের অস্ত্রপ্রহার হইতে কোন প্রকারে আপনাকে রক্ষা করিতে না পারিয়া অবশেষে হত হইয়া নদী সকলের উপর পাতিত হইয়া তাহাদের কূলাদি ভগ্ন করিয়াছিল।

৭। হস্ত ও পদশূন্য হইয়াও বৃহাস্পুর ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল এবং ইন্দ্র ইহার পাষণসদৃশ স্কন্ধের উপর বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিল। পৌরুষবর্জিত ব্যক্তি যদুপ পৌরুষবিশিষ্ট ব্যক্তির সমকক্ষ হইতে ইচ্ছা করে, তদুপ বৃহাস্পুর ইন্দ্রের সমকক্ষ হইতে ইচ্ছা করিয়া ইন্দ্র কর্তৃক শরীরের নানা স্থানে আহত হইয়া ভূমিতে পাতিত হইয়াছিল।

৮। নদীর জল সকল ভগ্ন কূলের উপর যেমন বেগের সহিত প্রবাহিত হয় তদুপ নদীর উপর পাতিত বৃহাস্পুরের দেহের উপর প্রবাহিত হইয়াছিল। বৃহাস্পুর জীবনদশায় যে জল সকল বলের দ্বারায় রুদ্ধ রাখিয়াছিলেন সেই জল সকলের নিম্নে মৃত্যুর পর তাঁহার দেহ পাতিত রহিল।

৯। বৃহাস্পুরের মাতা পুত্রদেহ রক্ষা করিবার নিমিত্ত স্বয়ং বৃহকে ব্যবহিত করিয়াছিল। কিন্তু ইন্দ্রদেব বৃহের মাতার উপর বজ্র প্রহার করেন, তাহাতে বৃহমাতা হত হইয়া গাভী বৎসের সহিত যেমন শয়ন করে, তদুপ মৃত পুত্রের উপর পাতিত হইয়া তাহা আচ্ছাদিত করতঃ শয়ন করিয়াছিল।

১০। অবিশ্রান্ত প্রবহনশীল নদী সকলের জলমধ্যে বৃহাস্পুরের দেহ পাতিত হইল। জল

বিক্রম রচনাবলী

সমুদ্র বন্ধনমুক্ত হইয়া অস্তহিত বৃহদেহের উপর প্রবাহিত হইতে লাগিল। ইন্দ্রদেবের সহিত শত্রুতা করিয়া বৃহাস্পতির চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইল।

১১। দাস এবং অহিনামে প্রসিদ্ধ বৃহাস্পতির যে সকল নদীর প্রবাহ নিরোধ করিয়াছিল যদ্রুপ পিণি নামক অসুর গো সকল গৃহাতে নিরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, ইন্দ্রদেব বৃহাস্পতিকে বধ করিয়া সেই সকল নিরোধ দূর করিয়া প্রবাহমার্গ মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

১২। হে ইন্দ্রদেব! যখন অসহায় বৃহাস্পতির আপনার বজ্রে প্রতিপ্রহার করিয়াছিল তখন আপনি অনায়াসে বৃহাস্পতিকে নিরাকৃত করিয়াছিলেন, যদ্রুপ অশ্বপুচ্ছগত বালসমুদ্র মক্ষিকাদি অনায়াসে নিরাকৃত করে। তদনন্তর আপনি পিণি নামক অসুর কতৃক অপহৃত অনিরুদ্ধ ও নিরুদ্ধ গোসমুদ্র জয় করিয়া স্ববশে আনয়ন করিয়াছিলেন। জয়লাভ করিয়া সোমরস পান করিয়াছিলেন এবং সপ্ত নদীর প্রবাহ নিরোধ অপনয়নপূর্ব্বক তাহাদিগকে প্রবাহিত করিয়াছিলেন।

১৩। বৃহাস্পতির ইন্দ্রকে নিরস্ত করিবার নিমিত্ত যে বিদ্যুৎ প্রহার, যে গজ্জন, যে বর্ষণ, যে অশনি নিক্ষেপ, এবং যে অপরাপর কৌশল প্রয়োগ করিয়াছিল, তৎসমুদায়ই ইন্দ্রের অনিষ্ট করিতে ব্যর্থ হইয়াছিল এবং অবশেষে ইন্দ্র বৃহাস্পতিকে অভিভূত করিয়াছিলেন।

১৪। হে ইন্দ্রদেব! আপনি যখন বৃহাস্পতিকে বধ করিয়া ভীত হইয়াছিলেন এবং ভীত হইয়া শ্যেন পক্ষীর ন্যায় একোনশত সংখ্যক প্রবহনশীল নদী পার হইয়াছিলেন, তখন বৃহাস্পতির বধের নির্যাতনেচ্ছা কোন্ জনকে দেখিয়াছিলেন?

১৫। বজ্রধর ইন্দ্রদেব স্থাবর এবং জঙ্গম জগতের রাজা, শান্ত এবং দুর্দান্ত জীবগণের অধীশ্বর। এবম্ভূত ইন্দ্রদেব মনুষ্যদিগের প্রভু। রথচক্রের নেমি যদ্রুপ চক্রগত অরাধ্য কাষ্ঠ সকল বেটন করিয়া থাকে, তদ্রুপ তিনি মনুষ্যদিগকে সর্ব্বতোভাবে বেটনপূর্ব্বক রক্ষা করেন।”*

এই সূক্তের তাৎপর্য্য বড় স্পষ্ট। পূর্ব্ব বৃহস্পতি গিয়াছে, ইন্দ্র বর্ষণকারী আকাশ। বৃহস্পতি নিরোধকারী নৈসর্গিক ব্যাপার। বর্ষণশক্তির দ্বারা সেই সকল নৈসর্গিক ব্যাপার অপহিত হইলে বৃহস্পতি হইল। এই সূক্ত বর্ষণকারী আকাশের সেই ক্রিয়ার প্রশংসা মাত্র। ইন্দ্র এখানে কোন চৈতন্যবিশিষ্ট পুরুষ নহেন, এবং এ সূক্তে তাহার কোন সকাম উপাসনাও নাই।

স্বীকার করি, এক্ষণে বৈদিক সংহিতায় যে উপাসনা আছে, তাহার প্রায় অধিকাংশই সকাম, এবং উপাস্যেরা তাহাতে চৈতন্যবিশিষ্ট দেবতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কিন্তু জড়শক্তির প্রশংসা-পদ্ধতি ক্রমে প্রচলিত হইয়া আসিলে, শব্দের আড়ম্বরে তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য লোকের চিত্ত হইতে অপসৃত হইল। “জগতের রাজা,” এবং “জীবগণের অধীশ্বর” ইত্যাকার বাক্যের যথার্থ তাৎপর্য্য যে, বৃষ্টি হইতেই জগৎ ও জীবের রক্ষা, লোকে ইহা ক্রমে ভুলিয়া যাইতে লাগিল, এবং ইন্দ্রকে যথার্থ জগতের চৈতন্যবিশিষ্ট রাজা এবং জীবগণের চৈতন্যবিশিষ্ট অধীশ্বর মনে করিতে লাগিল। তখন জগতের জড়শক্তির নিষ্কাম প্রশংসার স্থানে সকাম উপাসনা আসিয়া উপস্থিত হইল। যাহা চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলির অনুরূপ মাত্র ছিল, তাহা দেবতাবহুল উপধর্ম্ম পরিণত হইল।

বৈদিক ধর্ম্মের উৎপত্তি কি তাহা উপরি উক্ত অপেক্ষাকৃত প্রাচীন সূক্তগুলি হইতেই আমরা বুঝিতে পারি। ঋগ্বেদ-সংহিতার সকল সূক্তগুলি এক সময়ে প্রণীত হয় নাই; এবং ঋগ্বেদের সর্ব্বত্র বহু দেবতার উপাসনাত্মক উপধর্ম্মই যে আছে, এমত নহে। অনেকগুলি এমত সূক্ত আছে যে, তাহা হইতে আমরা একেশ্বরবাদই শিক্ষা করি। সগয়াস্তরে আমরা তাহার আলোচনা করিব। সেইগুলি যে বৈদিক ধর্ম্মের অপেক্ষাকৃত শেষাবস্থায়, আর উপরি উক্ত সূক্তের সদৃশ সূক্তগুলি যে আদিম অবস্থায়, আর সচেতন ইন্দ্রাদির উপাসনাত্মক সূক্তগুলি প্রধানতঃ যে মধ্যাবস্থায় প্রণীত হইয়াছিল, ইহা যে মনোযোগপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করিবে সেই বুঝিতে পারিবে। বেদব্যাস, বেদ বিভাগ করিয়াছিলেন। সঙ্কলন কৃতী চতুর্বেদের বিভাগ হয় নাই। যাহা সঙ্কলিত, তাহা নানা ব্যক্তির দ্বারা, নানা সময়ে প্রণীত হইয়াছিল। অতএব, আদিম, মধ্যকালিক, এবং শেষাবস্থার সূক্ত বলিয়া সূক্তগুলিকে বিভাগ করা যাইতে পারে। ধর্ম্মের

* এই অনুবাদ রমানাথ সরস্বতী কৃত।

দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম—হিন্দু কি জড়োপাসক?

প্রথমাবস্থা জড় প্রশংসা, মধ্যকালে চৈতন্যবাদ, এবং পরিণতি একেশ্বরবাদে। অতএব সৃষ্টির তাৎপর্য বৃদ্ধি তাহার সময় নির্দেশ করা যায়।

এক্ষণে 'প্রচার'র দ্বিতীয় সংখ্যা হইতে এ পর্যন্ত বৈদিক দেবতাতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিলাম পাঠক তাহা স্মরণ করুন। তাহার স্থূল তাৎপর্য এই:—

১। ইন্দ্রাদি বৈদিক দেবতা, আকাশ, সূর্য, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি জড়ের বিকাশ ভিন্ন কোন লোকোত্তর চৈতন্য নহে।

২। এই সকল দেবতাদিগের উপাসনা যেমন বেদে আছে, সেইরূপ ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্যান্য দেশে ছিল বা আছে।

৩। তাহার কারণ এই যে প্রথমাবস্থায় মনুষ্য জড়ে চৈতন্য আরোপণ করিয়া তাহার শক্তি, হিতকারিতা, বা সৌন্দর্য অনুসারে তাহার উপাসনা করে।

৪। এই উপাসনা গোড়ায় কেবল শক্তিমান, সুন্দর বা উপকারী জড়পদার্থের প্রশংসা বা আদর মাত্র। কালে লোকে সে কথা ভুলিয়া গেলে, ইহা ইতর দেবতার উপাসনায় পরিণত হয়।

হিন্দুধর্মে ইতর দেবোপাসনা এই অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। ঈদৃশ উপাসনা অনিষ্টকর এবং উপধর্ম। কিন্তু ইহার মূল অনিষ্টকর নহে। জড়শক্তিও ঈশ্বরের শক্তি। সে সকলের আলোচনার দ্বারা ঈশ্বরের মহিমা এবং কৃপা অনুভূত করা এবং তদ্বারা চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি সকলের অনুশীলন করা বিধেয় বটে।

বৈদিক ধর্মের এই স্থূল তাৎপর্য। আধুনিক হিন্দুধর্মেও সেই সকল বৈদিক দেবতার উপাসিত। অতএব এখনকার হিন্দুধর্মের সংস্কারে সেই কথা আমাদের মনে রাখা উচিত। জড়ের শক্তির চিত্তর দ্বারা জ্ঞানার্জনী এবং চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তি সকলের অনুশীলন করিব, এবং ঈশ্বরের মহিমা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করিব, কিন্তু জড়ের উপাসনা করিব না। ইহাই হিন্দুধর্মের একটি স্থূল কথা।

এক্ষণে বৈদিক তত্ত্বান্তর্গত দেবতাতত্ত্ব সমাপ্ত করিয়া, আমরা বৈদিক তত্ত্বান্তর্গত ঈশ্বরতত্ত্বের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারি। হিন্দুধর্মের এই ব্যাখ্যার প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত করিলাম।—
'প্রচার', ১ম বর্ষ, পৃ. ৩৯৭-৪০৭।

হিন্দু কি জড়োপাসক?

যতক্ষণ আমার অঙ্গুলিটি আমা হইতে বিচ্ছিন্ন নহে ততক্ষণ ঐ অঙ্গুলিটি চেতনাময়, কিন্তু অঙ্গুলিটি কাটিয়া ফেলিলে, উহা আমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে উহাতে আর চেতনা থাকে না, তখন উহা অচেতন জড় পদার্থ।

এই সমগ্র বিশ্ব চৈতন্যময় এক পুরুষের দেহ। ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শক্তির আধার সকল, অর্থাৎ অগ্নি বায়ু ইত্যাদি পদার্থ সকল সেই দেবতার অঙ্গবিশেষ। অগ্নিকে যদি সেই এক চৈতন্যময় পুরুষের অঙ্গ বলিয়া জানি, অগ্নিকে যদি সেই চৈতন্যময় পুরুষ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখি, তবে অগ্নির চেতনা আছে বলিয়া বৃদ্ধি। আর যিনি অগ্নির সহিত সেই চৈতন্যময়ের কোন সম্বন্ধ দেখিতে পান না তাহার কাছেই অগ্নি জড় পদার্থ।

আজকালকার পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অগ্নিকে (Igneous principle) জড় বলিয়া জানেন কিন্তু প্রাচীন হিন্দুগণ অগ্নির সহিত চৈতন্যের সম্বন্ধ বৃদ্ধি উহাকে চেতন বলিয়া বৃদ্ধিতেন। আজকালকার পাশ্চাত্যগণ অগ্নিগত শক্তিকেই (Heat) জগতের আদি শক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। হিন্দু ঋষিগণও এই অগ্নিকে জগতের আদি শক্তি বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, তবে প্রভেদ এই পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের অগ্নি জড়শক্তি, প্রাচীন হিন্দু ঋষিদের অগ্নি চৈতন্যময়।

প্রণব মন্ত্র হইতে এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় কার্য চলিতেছে। এই প্রণব মন্ত্রের দেবতা অগ্নি। হিন্দুরা বৃদ্ধিছিলেন যে, এই অগ্নিগত শক্তি হইতেই এই জগৎচক্র ঘূর্ণিত হইতেছে। কিন্তু এই অগ্নিগত শক্তি যে চৈতন্য সম্বন্ধ রহিত ইহা তাহারা কখনও ভাবিতেন না। হিন্দুদের কাছে প্রণব মন্ত্রের লক্ষ্য অগ্নিগত শক্তি ব্রহ্মচৈতন্যে চেতনাময়।

ঔকারস্য ব্রহ্মঋষিঃ গায়ত্রীচ্ছন্দোহগ্নিদেবতা সর্বকর্মারম্ভে বিনিয়োগঃ।

বাঁকম রচনাবলী

প্রণব মন্দের লক্ষ্য অগ্নিগত শক্তি সম্বন্ধে যিনি চিন্তা করিতে চান, অথবা উক্ত শক্তির সাহায্যে যিনি কোন কৰ্ম করিতে চান তাঁহাকে সৰ্ব্বপ্রথমে উক্ত মন্দের ঋষি কে—তাহা জানিতে হইবে। মন্দের ঋষি কে—ইহা না জানিয়া অর্থাৎ মন্দের লক্ষ্য শক্তি কিরূপ চেতনাযুক্ত ইহা না জানিয়া যিনি মন্ত্র সাহায্য গ্রহণ করেন তাঁহাকে পাপভাক্ হইতে হয় ইহা শ্রুতির কথা।

যোহহরহরবিদিতঋষিচ্ছন্দো দৈবতবিনয়োগেন ব্রাহ্মণেন বা মন্ত্রেণ বা যজ্ঞাতি যাজয়তি বা অধীতে অধ্যাপয়তি বা হোমে কৰ্ম্মণি অন্তর্জলাদৌ বা স পাপীয়ান্ ভবতি।

এখন দেখ বেদোক্ত ধৰ্ম্মাচারী ঋষিগণকে জড়োপাসক বলা কি কোন ক্রমে সম্ভব হয়? যে পাশ্চাত্যগণ হিন্দুদের জড়োপাসক বলেন প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা জড়োপাসক। পাশ্চাত্যগণ আজকাল নানা প্রকার প্রাকৃতিক শক্তির সাহায্য অবলম্বন করিয়া নানাবিধ কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; কিন্তু ঐ সকল শক্তি যে চেতনাময়ের চেতনাযুক্ত, ইহা একবারও ভাবেন না। জগতে ঐ সকল শক্তি দ্বারা চেতনাময়ের কি প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হইবে পাশ্চাত্যগণ তাহা একবার অনুসন্ধান করেন না। পাশ্চাত্যগণ ঋষি বিনয়োগাদি না জানিয়া প্রাকৃতিক শক্তির সহিত খেলা করিতেছেন। শ্রুতি মতে উঁহারা পাপভাগী হইতেছেন।

আমার বোধ হয় যোদিন হইতে ডাইনামাইট সৃষ্টি হইয়াছে সেই দিন হইতে পাশ্চাত্যগণের উক্ত পাপের ফল ফলিবার সূত্রপাত হইয়াছে।

হিন্দুরা জড়োপাসক নহে। চেতনাবিহীন পদার্থ হিন্দুদের কাছে অস্পৃশ্য পদার্থ। আজকাল যাহাকে জড় পদার্থ বলা হয়, যেমন অগ্নি বায়ু নদী পর্বত ইত্যাদি, ইহারা হিন্দুদের কাছে চেতনাময়ের চেতনাযুক্ত পদার্থ। চেতনাবিহীন পদার্থ আর মৃত শরীর এই দুইটি কথায় হিন্দু একই অর্থ বুঝিয়া থাকেন। মৃত শরীরের সংস্পর্শে হিন্দু থাকিতে চান না।—‘প্রচার’, ১ম বর্ষ, পৃ. ৪২৭-৩০।

হিন্দুধৰ্ম্ম সম্বন্ধে একটি স্থূল কথা

আমরা বেদের দেবতাতত্ত্ব সমাপন করিয়াছি। এক্ষণে ঈশ্বরতত্ত্ব সমালোচনে প্রবৃত্ত হইব। পরে আনন্দময়ী ব্রহ্ম কথায় আমরা প্রবেশ করিব।

একজন ঈশ্বর যে এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং ইহার স্থিতিবিধান ও ধ্বংস করিতেছেন, এই কথাটা আমরা নিত্য শুনি বলিয়া, ইহা যে কত গুরুতর কথা, মনুষ্যবুদ্ধির কত দূর দূরপ্রাপ্য, তাহা আমরা অনুধাবন করিয়া উঠিতে পারি না। মনুষ্যজ্ঞানের অগম্য যত তত্ত্ব আছে, সৰ্ব্বাপেক্ষা ইহাই মনুষ্যের বুদ্ধির অগম্য।

এই গুরুতর কথা, যাহা আজিও কৃতিবিদ্য সভ্য মনুষ্যরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছে না, তাহা কি আদিম অসভ্য জাতিদিগের জানা ছিল? ইহা অসম্ভব। বিজ্ঞান* প্রভৃতি ক্ষুদ্রতর জ্ঞানের উন্নতি অতি ক্ষুদ্র বীজ হইতে ক্রমশঃ হইয়া আসিতেছে; তখন সৰ্ব্বাপেক্ষা দূরপ্রাপ্য ও দুর্বেধ্য যে জ্ঞান তাহাই আদিম মনুষ্য সৰ্ব্বাগ্রে লাভ করিবে, ইহা সম্ভব নহে। অনেকে বলিবেন, ও বলিয়া থাকেন, ঈশ্বরকৃপায় তাহা অসম্ভব নহে; যাহা, মনুষ্য উদ্ধারের জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় তাহা কৃপা করিয়া তিনি অপকবুদ্ধি আদিম মনুষ্যের হৃদয়ে প্রকটিত করিতে পারেন; এবং এখনও দেখিতে পাই যে সভ্য সমাজস্থিত অনেক অকৃতিবিদ্য মূর্খেরও ঈশ্বরজ্ঞান আছে। এ উত্তর যথার্থ নহে। কেন না এখন পৃথিবীতে যে সকল অসভ্য জাতি বর্তমান আছে, তাহাদের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া দেখা হইয়াছে যে তাহাদের মধ্যে প্রায়ই ঈশ্বরজ্ঞান নাই। একটা মনুষ্যের আদি পুরুষ কিম্বা একটা বড় ভূত বলিয়া কোন অলৌকিক চেতন্যে কোন কোন অসভ্য জাতির বিশ্বাস থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা ঈশ্বরজ্ঞান নহে। তেমনি সভ্য সমাজস্থ নিৰ্ব্বোধ মূর্খ ব্যক্তি ঈশ্বর নাম শুনিয়া তাহার মৌখিক ব্যবহার করিতে পারে, কিন্তু যাহার চিত্তবৃত্তি অনুশীলিত

* হিন্দুশাস্ত্রে যাহারা অভিজ্ঞ তাহারা জানেন যে “বিজ্ঞান” অর্থে Science নহে। কিন্তু এক্ষণে ঐ অর্থে তাহা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে বলিয়া আমিও ঐ অর্থে ব্যবহার করিতে বাধ্য। “নীতি” শব্দেরও ঐরূপ দশা ঘটিয়াছে। নীতি অর্থে Politics কিন্তু এখন আমরা “Morals” অর্থে ব্যবহার করি।

দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম—হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে একটি স্থূল কথা

হয় নাই, তাহার পক্ষে ঈশ্বরজ্ঞান অসম্ভব। বাহি না পড়িলে যে চিত্তবৃত্তি সকল অনুশীলিত হয় না এমত নহে। কিন্তু যে প্রকারেই হউক, বুদ্ধি, ভক্তি, প্রভৃতির সম্যক্ অনুশীলন ভিন্ন ঈশ্বরজ্ঞান অসম্ভব। তাহা না থাকিলে, ঈশ্বর নামে কেবল দেবদেবীর উপাসনাই সম্ভব।

অতএব বুদ্ধির মার্জিতাবস্থা ভিন্ন মনুষ্যহৃদয়ে ঈশ্বরজ্ঞানোদয়ের সম্ভাবনা নাই। কোন জাতি যে পরিমাণে সভ্য হইয়া মার্জিতবুদ্ধি হয়, সেই পরিমাণে ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করে। এ কথার প্রতিবাদে যদি কেহ প্রাচীন যিহুদীদিগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলেন যে, তাহারা প্রাচীন গ্রীক প্রভৃতি জাতির অপেক্ষায় সভ্যতায় হীন হইয়াও ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করিয়াছিল, তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, যিহুদীদিগের সে ঈশ্বরজ্ঞান বস্তুতঃ ঈশ্বরজ্ঞান নহে। জিহোবাকে আমরা আমাদের পাশ্চাত্য শিক্ষকদিগের কৃপায় ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছি, কিন্তু জিহোবা যিহুদীদিগের একমাত্র উপাস্য দেবতা হইলেও ঈশ্বর নহেন। তিনি রাগদ্বेषপরতন্ত্র পক্ষপাতী মনুষ্যপ্রকৃত দেবতামাত্র। পক্ষান্তরে সুশিক্ষিত গ্রীকেরা ইহার অপেক্ষা উন্নত ঈশ্বরজ্ঞানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। খৃষ্টধর্মাবলম্বীদিগের যে ঈশ্বরজ্ঞান, যিশু যিহুদী হইলেও, সে জ্ঞান কেবল যিহুদীদিগেরই নিকট প্রাপ্ত নহে। খৃষ্টধর্মের যথার্থ প্রণেতা সেন্ট পল। তিনি গ্রীকদিগের শাস্ত্রে অত্যন্ত সুশিক্ষিত ছিলেন।

সর্বাপেক্ষা বৈদিক হিন্দুরাই অল্পকালে সভ্যতার পদবীতে আরুঢ় হইয়া ঈশ্বরজ্ঞানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমরা এ পর্য্যন্ত বৈদিক ধর্মের কেবল দেবতাতত্ত্বই সমালোচনা করিয়াছি। কেন না সেইটা গোড়া, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরিপক্ব যে বৈদিক ধর্ম, তাহা অতি উন্নত ধর্ম, এবং এক ঈশ্বরের উপাসনাই তাহার স্থূল মর্ম। তবে বলিবার কথা এই যে, প্রথম হিন্দুরা, একেবারে গোড়া হইতেই ঈশ্বরজ্ঞান প্রাপ্ত হয় নাই। জাতিকর্তৃক ঈশ্বরজ্ঞান প্রাপ্তির সচরাচর ইতিহাস এই যে, আগে নৈসর্গিক পদার্থ বা শক্তিতে ক্রিয়মান চৈতন্য আরোপ করে, অচেতনে চৈতন্য আরোপ করে। তাহাতে কি প্রকারে দেবোৎপত্তি হয় তাহা পূর্বে দেখাইয়াছি। এই প্রণালী অনুসারে, বৈদিকেরা কি প্রকারে ইন্দ্রাদি দেব পাইয়াছিলেন, তাহা দেখাইয়াছি। এই অবস্থায় জ্ঞানের উন্নতি হইলে উপাসকেরা দেখিতে পান যে, আকাশের উপাসনা করি, বায়ুরই উপাসনা করি, মেঘেরই উপাসনা করি, আর অগ্নিরই উপাসনা করি, এই সকল পদার্থই নিয়মের অধীন। এই নিয়মেও সর্বত্র একত্ব, এক স্বভাব দেখা যায়। ঘোল মউনির তাড়নে ঘোল, আর বাত্যাতিড়িত সমুদ্র এক নিয়মে বিলোড়িত হয়; যে নিয়মে আমার হাতের গন্ডুষের জল পড়িয়া যায়, সেই নিয়মেই আকাশের বৃষ্টি পৃথিবীতে পড়ে। এক নিয়তি সকলকে শাসন করিতেছে; সকলই সেই নিয়মের অধীন হইয়া আপন আপন কর্ম সম্পাদন করিতেছে, কেহই নিয়মকে ব্যতিক্রম করিতে পারেন না। তবে ইহাদেরও নিয়মকর্তা, শাস্তা, এবং কারণ-স্বরূপ আর একজন আছেন। এই বিশ্বসংসারে যাহা কিছু আছে সকলই সেই এক নিয়মে চালিত; অতএব এই বিশ্বজগতের সর্বংশই সেই নিয়মকর্তার প্রণীত এবং শাসিত। ইন্দ্রাদি হইতে রেণুকণা পর্য্যন্ত সকলই এক নিয়মের অধীন, সকলই এক জনের সৃষ্টি ও রক্ষিত, এবং এক জনই তাহার লয়কর্তা। ইহাই সরল ঈশ্বরজ্ঞান। জড়ের উপাসনা হইতেই ইহা অনেক সময়ে উৎপন্ন হয়, কেন না জড়ের একতা ও নিয়মাদীনতা ক্রমশঃ উপাসকের হৃদয়ঙ্গম হয়।

তবে ঈশ্বরজ্ঞান উপস্থিত হইলেই যে দেবদেবীর উপাসনা লুপ্ত হইবে এমত নহে। যাহাদিগকে চৈতন্যবিশিষ্ট বলিয়া পূর্বে বিশ্বাস হইয়াছে, জ্ঞানের আরও অধিক উন্নতি না হইলে, বিজ্ঞানশাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা ব্যতীত, তাহাদিগকে জড় ও অচেতন বলিয়া বিবেচনা হয় না। ঈশ্বরজ্ঞান এই বিশ্বাসের প্রতিষেধক হয় না। ঈশ্বর জগৎস্রষ্টা হউন, কিন্তু ইন্দ্রাদিও আছে, এই বিশ্বাস থাকে—তবে ঈশ্বরজ্ঞান হইলে উপাসক ইহা বিবেচনা করে যে, এই ইন্দ্রাদিও সেই ঈশ্বরের সৃষ্টি, এবং তাহার নিয়োগানুসারেই স্ব স্ব ধর্ম পালন করে। ঈশ্বর যেমন মনুষ্য ও জীবগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনি ইন্দ্রাদিকেও সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং মনুষ্যও জীবগণকে যেমন পালন ও কল্লেপ কল্লেপ ধ্বংস করেন, ইন্দ্রাদিকেও সেইরূপ করিয়া থাকেন। তবে ইন্দ্রাদিও মনুষ্যের উপাস্য, এ কথাতেও বিশ্বাস থাকে, কেন না ইন্দ্রাদিকে লোকোত্তর শক্তিসম্পন্ন ও ঈশ্বর কর্তৃক লোকরক্ষায় নিযুক্ত বলিয়া বিশ্বাস থাকে। এই কারণে ঈশ্বরজ্ঞান জন্মিলেও, জাতি মধ্যে দেবদেবীর উপাসনা উঠিয়া যায় না। হিন্দুধর্ম তাহাই ঘটিয়াছে। ইহাই প্রচলিত সাধারণ হিন্দুধর্ম—অর্থাৎ লৌকিক হিন্দুধর্ম, বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম নহে। লৌকিক হিন্দুধর্ম এই যে

বৈদিক রচনাবলী

একজন ঈশ্বর সর্বস্রষ্টা, সর্বকর্তা, কিন্তু দেবগণও আছেন, এবং তাঁহারা ঈশ্বর কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া লোক রক্ষা করিতেছেন। বেদে এবং হিন্দুশাস্ত্রের অন্যান্য অংশে স্থানে স্থানে এই ভাবের বাহুল্য আছে।

তার পর, জ্ঞানের আর একটু উন্নতি হইলে, দেবদেবী সম্বন্ধে ভাবান্তরের উদয় হয়। জ্ঞানবান্ উপাসক দেখিতে পান যে, ইন্দ্র বৃষ্টি করেন না, ঈশ্বরের শক্তিতে বা ঈশ্বরের নিয়মে বৃষ্টি হয়; ঈশ্বরই বৃষ্টি করেন। বায়ু নামে কোন স্বতন্ত্র দেবতা বাতাস করেন না; বাতাস ঐশিক কার্য। সূর্য্য চৈতন্যবিশিষ্ট আলোককর্তা নহেন; সূর্য্য জড় বস্তু, সৌরালোকও ঐশিক ক্রিয়া। যখন বৃষ্টিকর্তা, বায়ুকর্তা, আলোকদাতা প্রভৃতি সকলেই সেই ঈশ্বর বলিয়া জানা গেল, তখন, ইন্দ্র, বায়ু, সূর্য্য এ সকল উপাসনাকালে ঈশ্বরেরই নামান্তর বলিয়া গৃহীত হইল। তিনি এক, কিন্তু তাঁহার বিকাশ ও ক্রিয়া অসংখ্য, কার্যভেদে, শক্তিভেদে, বিকাশভেদে তাঁহার নামও অসংখ্য। তখন উপাসক যখন ইন্দ্র বলিয়া ডাকে তখন তাঁহাকেই ডাকে, যখন বরুণ বলিয়া ডাকে, তখন তাঁহাকেই ডাকে; যখন সূর্য্যকে বা অগ্নিকে ডাকে, তখন তাঁহাকেই ডাকে।

ইহার এক ফল হয় এই যে, উপাসক ঈশ্বরের শ্রবকালে ঈশ্বরকে পূর্বাধিক ইন্দ্রাদি নামে অভিহিত করে। ঈশ্বরই ইন্দ্রাদি, কাষেই ইন্দ্রাদিও ঈশ্বরের নামান্তর। তখন ইন্দ্রাদি নামে তাঁহার পূজাকালীন, ইন্দ্রাদির প্রতি সর্বাঙ্গীণ জগদীশ্বরত্ব আরোপিত হয়। কেন না, জগদীশ্বর ভিন্ন আর কেহই ইন্দ্রাদি নাই।

বেদের সূক্তে এই ভাবের বিশেষ বাহুল্য দেখিতে পাই। এ সূক্তে ইন্দ্রে জগদীশ্বরত্ব, ও সূক্তে বরুণে জগদীশ্বরত্ব, অন্য সূক্তে অগ্নিতে জগদীশ্বরত্ব, সূক্তান্তরে সূর্য্যে জগদীশ্বরত্ব, এইরূপ পুনঃ পুনঃ আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত মক্ষমুলের ইহার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, একটা কিন্তুত্বকিমাকার ব্যাপার ভাবিয়া কি বলিয়া এরূপ ধর্ম্মের নামকরণ করিবেন, তদ্বিষয়ী দৃষ্টিভঙ্গায় ম্লিয়মাণ! এরূপ কাণ্ডটা ত কোন পাশ্চাত্য ধর্ম্ম নাই, ইহা না Theism না Polytheism, না Atheism—কোন ismই নয়! ভাবিয়া চিন্তিয়া পণ্ডিতপ্রবর গ্রীক ভাষার অভিধান খুলিয়া খুব দেড়গজী রকম একটা নাম প্রস্তুত করিলেন—Kakenotheism বা Henotheism. এই সকল বিদ্যা যে এ দেশে অধীত, অধ্যাপিত, আদৃত, এবং অনুবাদিত হয়, ইহা সামান্য দৃষ্টির বিষয় নহে। আচার্য্য মক্ষমুলের বেদ বিশেষ প্রকারে অধীত করিয়াছেন, কিন্তু পুরাণেতিহাসে তাঁহার কিছুই দর্শন নাই বলিলেও হয়। যদি থাকিত, তাহা হইলে জানিতেন যে এই দূর্ভাগ্য ব্যাপার—অর্থাৎ সকল দেবতাতেই জগদীশ্বরত্ব আরোপ, কেবল বেদে নহে, পুরাণেতিহাসেও আছে। উহার তাৎপর্য্য আর কিছুই নহে—কেবল সমস্ত নৈসর্গিক ব্যাপারে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য দর্শন। তাঁহার Henotheism বা Kakenotheism আর কিছুই নহে, কেবল Polytheism নামক সামগ্রীর উত্তরাধিকারী Pure Theism.

এই গেল বৈদিক ধর্ম্মের তিন অবস্থা—

(১) প্রথম, দেবোপাসনা—অর্থাৎ জড়ে চৈতন্য আরোপ, এবং তাহার উপাসনা।

(২) ঈশ্বরোপাসনা, এবং তৎসঙ্গে দেবোপাসনা।

(৩) ঈশ্বরোপাসনা, এবং দেবগণের ঈশ্বরে বিলয়।

বৈদিক ধর্ম্মের চরমাবস্থা উপনিষদে। সেখানে দেবগণ একেবারে দূরীকৃত বলিলেই হয়। কেবল আনন্দময় ব্রহ্মই উপাস্যস্বরূপ বিরাজমান। এই ধর্ম্ম অতি বিশুদ্ধ, কিন্তু অসম্পূর্ণ। ইহাই চতুর্থাবস্থা।

শেষে গীতাদি ভক্তিশাস্ত্রের আবির্ভাবে এই সচ্চিদানন্দের উপাসনার সঙ্গে ভক্তি মিলিতা হইল। তখন হিন্দুধর্ম্ম সম্পূর্ণ হইল। ইহাই সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ ধর্ম্ম, এবং ধর্ম্মের মধ্যে জগতে শ্রেষ্ঠ। নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞান, এবং সগুণ ঈশ্বরের ভক্তিযুক্ত উপাসনা ইহাই বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্ম। ইহাই সকল মনুষ্যের অবলম্বনীয়। দৃষ্টির বিষয় এই যে, হিন্দুরা এ সকল কথা ভুলিয়া গিয়া কেবল ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশকে বা দেশাচারকে হিন্দুধর্ম্মের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহাতেই হিন্দুধর্ম্মের অবনতি এবং হিন্দুজাতির অবনতি ঘটিয়াছে।

এক্ষণে যাহা বলিলাম তাহা আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া প্রমাণের দ্বারা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব। সফল হইব কিনা, তাহা যিনি এই ধর্ম্মের উপাস্য, তাঁহারই হাত। কিন্তু পাঠকের যেন এই কয়টা স্থূল কথা মনে থাকে। নহিলে পরিশ্রম ব্যথা হইবে। হিন্দুধর্ম্ম

দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম—বেদের ঈশ্বরবাদ

সম্বন্ধে প্রচারে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ পায়, তাহা ধারাবাহিক ক্রমে না পড়িয়া, মাঝে মাঝে পড়িলে সে সকলের মর্ম গ্রহণের সম্ভাবনা নাই। হস্তীই হউক, আর শৃগালই হউক, অন্ধের ন্যায় কেবল তাহার কর চরণ বা কর্ণ স্পর্শ করিয়া তাহার স্বরূপ অনুভব করা যায় না। “এটা রাজদ্বারে আছে, সদূতরাং বান্ধব” এ রকম কথা আমরা শুনিয়াছি।—‘প্রচার’, ২য় বর্ষ, পৃ. ৭৪-৮০।

বেদের ঈশ্বরবাদ

প্রবাদ আছে হিন্দুদিগের তেত্রিশ কোটি দেবতা, কিন্তু বেদে বলে মোটে তেত্রিশটি দেবতা। এ সম্বন্ধে আমরা প্রথম প্রবন্ধে যে সকল ঋক্ উদ্ধৃত করিয়াছি, পাঠক তাহা স্মরণ করুন। আমরা দেখিয়াছি, বেদে বলে এই তেত্রিশটি দেবতা তিন শ্রেণীভুক্ত; এগারটি আকাশে, এগারটি অস্তরিক্ষে, এগারটি পৃথিবীতে।

ইহাতে যাস্ক কি বলেন শুন্যে। তিনি অতি প্রাচীন নিরুক্তকার—আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিত নহেন। তিনি বলেন,

“তিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তাঃ। অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানো বায়ুর্বা ইন্দ্রো বা অস্তরিক্ষস্থানঃ সূর্যো দ্যস্থানঃ। তাসাং মহাভাগ্যাদ্ একৈকস্যাপি বহুনি নামধেয়ানি ভবন্তি। অপি বা কস্ম-পৃথক্ভ্যাং যথা হোতা অধবর্যুর্ভ্রাতা উদ্গাতা ইত্যস্যেকস্য সতঃ।” ৭।৫।

অর্থাৎ “নৈরুক্তদিগের মতে বেদের দেবতা তিন জন। পৃথিবীতে অগ্নি, অস্তরিক্ষে ইন্দ্র বা বায়ু এবং আকাশে সূর্য। তাহাদের মহাভাগত্ব কারণ এক এক জনের অনেকগুলি নাম। অথবা তাহাদিগের কস্মের পার্থক্য জন্য, যথা হোতা, অধবর্যু, র্ভ্রাতা, উদ্গাতা, এক জনেরই নাম হয়।

তেত্রিশ কোটির স্থানে গোড়ায় তেত্রিশ পাইয়াছিলাম, এখন নিরুক্তের মতে, তেত্রিশের স্থানে মোটে তিন জন দেখিতেছি—অগ্নি, বায়ু বা ইন্দ্র, এবং সূর্য। বহুসংখ্যক পৃথক্ পৃথক্ চৈতন্য দ্বারা যে জগৎ শাসিত হয় না—জাগতিকী শক্তি এক, বহুবিধা নহে, পৃথিবীতে সর্বত্র এক নিয়মের শাসন, অস্তরিক্ষে সর্বত্র এক নিয়মের শাসন, এবং আকাশে সর্বত্র এক নিয়মের শাসন এখন তাহারা দেখিতেছেন। পৃথিবীতে আর এগারটি পৃথক্ দেবতা নাই—এক দেবতা, তাহার কস্মভেদে অনেক নাম, কিন্তু বস্তুতঃ তিনি এক, অনেক দেবতা নহেন। তেমনি অস্তরিক্ষেও এক দেবতা, আকাশেও এক দেবতা।

এখনও প্রকাশ পাইতেছে না যে, ঋষিরা জাগতিক শক্তির সম্পূর্ণ ঐক্য অনুভূত করিয়াছেন। এখন পৃথিবীর এক দেবতা, অস্তরিক্ষের অন্য দেবতা, আকাশের তৃতীয় দেবতা। জীব, উদ্ভিদাদির উৎপত্তি ও রক্ষা হইতে বায়ু বৃষ্টি প্রভৃতি অস্তরিক্ষের ক্রিয়া এত ভিন্নপ্রকৃতি, আবার সে সকল হইতে আলোকাদি আকাশব্যাপার সকল এত ভিন্ন যে, এই তিনের ঐক্য এবং একনিয়মাধীনত্ব অনুভূত করা আরও কালসাপেক্ষ। কিন্তু অসীম প্রতিভাসম্পন্ন বৈদিক ঋষিদিগের নিকট তাহাও অধিক দিন অস্পষ্ট থাকে নাই। ঋগ্বেদসংহিতাতেই পাওয়া যায়, “মুর্দ্ধা ভুবো ভবতি নক্তমগ্নিস্ততঃ সূর্যো জায়তে প্রাতরুদ্যান্।” (১০-৮৮) “অগ্নি রাতে পৃথিবীর মস্তক; প্রাতে তিনি সূর্য হইয়া উদয় হন।” পুনশ্চ “যদেনমদধূর্যাজ্জয়াসে দিবি দেবাঃ সূর্যামাদিতেয়ম্।” ইহাতে “এনং অগ্নিং সূর্যং আদিতেয়ং” ইত্যাদি বাক্যে অগ্নিই সূর্য বদ্বাইতেছে।

এই সূক্তের ব্যাখ্যায় যাস্ক বলেন, “দ্রেধা ভাবায় পৃথিব্যামস্তরিক্ষে দিবি ইতি শাকপর্দগঃ” অর্থাৎ শাকপর্দগ (পূর্বাঙ্গামী নিরুক্তকার) বলিয়াছেন যে “পৃথিবীতে, অস্তরিক্ষে, এবং আকাশে তিন স্থানে অগ্নি আছেন।” ভৌম, অস্তরিক্ষ, ও দিবা, এই ত্রিবিধ দেবই তবে অগ্নি।

অগ্নি সম্বন্ধে এইরূপ আরও অনেক কথা পাওয়া যায়। ক্রমে জগতের একশক্ত্যাধীনত্ব ঋষিদিগের মনে আরও স্পষ্ট হইয়া আসিতেছে। “ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্। একং সন্ধিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি অগ্নিং যমং মার্তরিশ্বানং।” ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি বল, বা দিবা সুপর্ণ গরুত্মান্ বল, এক জনকেই বিপ্রগণে অনেক বলেন, যথা, “অগ্নি যম মার্তরিশ্বান্।” পুনশ্চ, অথর্ব বেদে, “স বরুণঃ সায়মগ্নিভবতি স মিত্রো ভবতি প্রাতরুদ্যান্। স সবিতা ভূত্বা অস্তরিক্ষেণ যতি, স ইন্দ্রো ভূত্বা তপতি মধ্যতো দিবং” সেই অগ্নিই সায়ংকালে বরুণ হইলেন। তিনিই প্রাতঃকালে উদয় হইয়া মিত্র হইলেন। তিনিই সবিতা হইয়া অস্তরিক্ষে গমন করেন, এবং ইন্দ্র হইয়া মধ্যাকাশে তাপ বিকাশ করেন।

বিশ্বকম রচনাবলী

এইরূপে ঋষিরা বৃষ্টিতে লাগিলেন যে, অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবীর দেবগণ, দেবগণ, এবং আকাশের দেবগণ, সব এক। অর্থাৎ যে শক্তির দ্বারা পৃথিবী শাসিত হয়, যে শক্তির দ্বারা অন্তরীক্ষের প্রক্রিয়া সকল শাসিত হয়, আর যে শক্তির দ্বারা আকাশের প্রক্রিয়া সকল শাসিত হয়, সবই এক। জগৎ একই নিয়মের অধীন। একই নিয়মের অধীন। “মহম্বেদেবানাম-সুরভূমেকম্” (ঋগ্বেদ সংহিতা ৩।৫৫) এইরূপে বেদে একেশ্বরবাদ উপস্থিত হইল। অতএব বিশুদ্ধ বৈদিক ধর্ম তেত্রিশ দেবতারও উপাসনা নহে, তিন দেবতারও উপাসনা নহে, এক ঈশ্বরের উপাসনাই বিশুদ্ধ বৈদিক ধর্ম। বেদে যে ইন্দ্রাদির উপাসনা আছে, তাহার যথার্থ তাৎপর্য্য কি তাহা আমরা পূর্বে বঝাইয়াছি। স্থূলতঃ উহা জড়ের উপাসনা। সেইটি বেদের প্রাচীন এবং অসংস্কৃতাবস্থা। সুক্ষ্মতঃ উহা ঈশ্বরের বিবিধ শক্তি এবং বিকাশের উপাসনা—ঈশ্বরেরই উপাসনা। ইহাই বৈদিক ধর্মের পরিণাম, এবং সংস্কৃতাবস্থা। সাধারণ হিন্দু যদি জানিত যে বেদে কি আছে, তাহা হইলে কখন আর্জিকার হিন্দুধর্ম এমন কুসংস্কারাপন্ন এবং অবনত হইত না; মনসা মাকালের পূজায় পেরিঁছিত না। জ্ঞান, চাঁবি-তালার ভিতর বদ্ধ থাকাই উন্নতিপ্রাপ্ত সমাজের অবনতির কারণ। ভারতবর্ষে সচরাচর জ্ঞান চাঁবি-তালার ভিতর বদ্ধ থাকে; যাঁহার হাতে চাঁবি তিনি কদাচ কখন সিদ্ধক খুলিয়া, এক আধ টুকরা কোন প্রিয় শিষ্যকে বর্কশিষ্য করেন। তাই, ভারতবর্ষ অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার হইলেও সাধারণ ভারতসন্তান অজ্ঞান। ইউরোপের পূর্জি পাটা অপেক্ষাকৃত অল্প কিন্তু ইউরোপীয়েরা জ্ঞান বিতরণে সম্পূর্ণ মনোহস্ত। এই জন্য ইউরোপের ক্রমশঃ উন্নতি, আর এই জন্য ভারতবর্ষের ক্রমশঃ অবনতি। বেদ এত দিন চাঁবি-তালার ভিতর ছিল, তাই বেদমূলক ধর্মের ক্রমশঃ অবনতি। সৌভাগ্যক্রমে, বেদ এখন সাধারণ বাঙ্গালির বোধগম্য হইতে চলিল। বাঙ্গালা ভাষায় তাহার অনুবাদ সকল প্রচার হইতেছে। বাবু মহেশচন্দ্র পাল উপনিষদ্ ভাগের সানুবাদ প্রকাশ আরম্ভ করিয়াছেন। বেদজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী যজুর্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতা প্রভৃতির অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। এক্ষণে বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত ঋগ্বেদ সংহিতার অনুবাদ প্রকাশ আরম্ভ করিয়াছেন। এই তিন জনেই আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।*

* এস্থলে বাবু রমেশচন্দ্র দত্তের বিশেষ প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

ঋগ্বেদ সংহিতার অনুবাদ অতি গুরুতর ব্যাপার। রমেশ বাবু যেরূপ ক্ষিপিকারিতা, বিশুদ্ধি, এবং সর্ব্বাঙ্গীণতার সহিত এই কার্য্য সুনির্ব্বাহ করিতেছেন, ইউরোপে হইলে এত দিন বড় জয় জয়কার পড়িয়া যাইত। আমাদের সমাজে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া, ভরসা করি, তিনি ভগ্নোৎসাহ হইবেন না। আমরা যত দূর বৃষ্টিতে পারি, এবং প্রথম অষ্টকের অনুবাদ দেখিয়া যত দূর বৃষ্টিতে পারিয়াছি, তাহাতে তাঁহার ভূয়ো ভূয়ো প্রশংসা করিতে আমরা বাধ্য। পাঠকেরা বোধ করি জানেন, ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অনেক স্থানে সায়নাচার্য্যের ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, রমেশ বাবু সর্ব্বত্রই সায়নের অনুগামী হইয়াছেন।

বেদ সম্বন্ধে কতকগুলি বিলাতী মত আছে। অনেক স্থানে সেই মতগুলি অশ্রদ্ধেয়, অনেক স্থলে তাহা অতি শ্রদ্ধেয়। শ্রদ্ধেয় হউক অশ্রদ্ধেয় হউক, হিন্দুর সেগুলি জানা আবশ্যিক। জানিলে বৈদিক তত্ত্ব সমুদায়ের তাঁহারা সন্মীমাংসা করিতে পারেন। আমার যাহা মত, তাহার প্রতিবাদীরা কেন তাহার প্রতিবাদ করে, তাহা না জানিলে আমার মতের সত্যাসত্য কখনই আমি ভাল করিয়া বৃষ্টিতে পারিব না। অতএব সেই সকল মত সংকলন করিয়া টীকাতে উহা সন্নিবেশিত করাতে রমেশ বাবুর অনুবাদ বিশেষ উপকারক হইয়াছে। দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে, রমেশ বাবু ৩০০ পৃষ্ঠা পুস্তকের ১১৭০ মূল্য নিরূপিত করিয়াছেন, বোধ করি ইহা কেবল ছাপার খরচেই বিক্রীত হইতেছে।

যিনি যাহাই বলুন, রমেশচন্দ্রের এই কীর্ত্তিটি চিরস্মরণীয় হইবে। ইউরোপে যখন বাইবেল প্রথম ইংরেজি প্রভৃতি প্রচলিত ভাষায় অনুবাদিত হয়, তখন রোমকীয় পুরোহিত এবং অধ্যাপক সম্প্রদায়, অনুবাদের প্রতি খজাহস্ত হইয়াছিলেন। রমেশ বাবুর প্রতিও সেইরূপ অত্যাচার হওয়াই সম্ভবে। কিন্তু যেমন বাইবেলের সেই অনুবাদে, ইউরোপ উপধর্ম হইতে মুক্ত হইল, ইউরোপীয় উন্নতির পথ অনর্গল হইল, রমেশ বাবুর এই অনুবাদে এ দেশে তদ্রূপ সুফল ফলিবে। বাঙ্গালী ইহার ঋণ কখন পরিশোধ করিতে পারিবে না।

প্রথম অষ্টকের অনুবাদ এক খণ্ড আমাদিগের নিকট সমালোচনার জন্য প্রেরিত হইয়াছে। ‘প্রচারে’ কোন গ্রন্থের সমালোচনা হয় না, এবং বর্ত্তমান লেখকও গ্রন্থসমালোচনার কার্য্যে হস্তক্ষেপকরণে পরাঙ্মুখ।

দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম—বেদের ঈশ্বরবাদ

এইরূপে বৈদিক ঋষিরা ক্রমে ক্রমে এক বেদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জানিলেন যে এক জনই সব করিয়াছেন ও সব করেন। যাস্ক বলেন—“মাহাত্ম্যান্দ্বেবতায়ঃ এক আত্মা বহুধা স্তুয়তে। একস্যাত্মনোহন্যে দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি।”

মাহাত্ম্যপ্রযুক্ত এক আত্মা বহু দেবতা স্বরূপ স্তুত হন। দেবতা সকলেই একই আত্মার প্রত্যঙ্গমাত্র। অতএব ঈশ্বর এক ইহা স্থির।

(১) তিনি একাই এই বিশ্ব নির্মিত করিয়াছেন, এই জন্য বেদে তাঁহার এক নাম বিশ্বকর্মা। ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলের ৮১ ও ৮২ সূক্তে জগৎকর্তার এই নাম—পুরাণেতিহাসে বিশ্বকর্মা দেবতাদের প্রধান শিল্পকর মাত্র। সূক্তে আছে যে তিনি আকাশ ও পৃথিবী নির্মিত করিয়াছেন (১০।৮১।২) বিশ্বময় (বিশ্বতঃ) তাঁহার চক্ষু, মূখ, বাহু, পদ (ঐ, ৩) ইত্যাদি।

(২) তিনি হিরণ্যগর্ভ। এই হিরণ্যগর্ভের নানা শাস্ত্র নানা প্রকার ব্যাখ্যা আছে। হেমতুল্য নারায়ণসৃষ্ট অণ্ড হইতে উৎপন্ন বলিয়া ব্রহ্মাকে মনুসংহিতায় হিরণ্যগর্ভ বলা হইয়াছে এবং পুরাণেতিহাসেও হিরণ্যগর্ভ শব্দের ঐরূপ ব্যাখ্যা আছে। ঐ দশম মণ্ডলের ১২১ সূক্তে হিরণ্যগর্ভ সর্বাগ্রে জাত, সর্বভূতের একমাত্র পতি, স্বর্গ মর্ত্যের সৃষ্টিকর্তা, আত্মদ, বলদ, বিশ্বের উপাসিত, জগতের একমাত্র রাজা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

(৩) তিনি প্রজাপতি। তাঁহা হইতে সকল প্রজা সৃষ্ট হইয়াছে। স্থানে স্থানে সূর্য বা সর্বিতাকে প্রজাপতি বলা হইয়াছে। কিন্তু পরিশেষে যাঁহাকে ঋষিরা জগতের একমাত্র চৈতন্যবিশিষ্ট সর্বস্রষ্টা বলিয়া বুলিলেন তখন তাহাকেই এই নামে অভিহিত করিতে লাগিলেন। ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক দিনে ব্রহ্মাই এই নাম প্রাপ্ত হইলেন। ঋগ্বেদ সংহিতায় ব্রহ্মা শব্দ নাই।

(৪) ব্রহ্ম শব্দও আমি ঋগ্বেদসংহিতায় কোথাও দেখিতে পাই নাই। অথচ বেদের যে পরভাগ, উপনিষদ, এই ব্রহ্ম নিরূপণ তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। ব্রাহ্মণ ভাগে ও বাজসনেয় সংহিতায় ও অথর্ববেদে ব্রহ্মকে দেখা যায়। সে সকল কথা পরে হইবে।

(৫) ঋগ্বেদসংহিতার ৯০ সূক্তকে পুরুষসুক্ত বলে। ইহাতে সর্বব্যাপী পুরুষের বর্ণনা আছে। এই পুরুষ শতপথব্রাহ্মণে নারায়ণ নামে কথিত হইয়াছেন। অদ্যাপি বিষ্ণুপূজায় পুরুষসূক্তের প্রথম ঋক্ ব্যবহৃত হয়—

সহস্রশীর্ষঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ
স ভূমিং বিশ্বতো বৃহ্মা অত্যতিষ্ঠৎ দশাঙ্গুলং

কথিত হইয়াছে যে, এই পুরুষকে দেবতারা হবির সঙ্গে যজ্ঞে আহুতি দিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞফলে সমস্ত জীবের উৎপত্তি। এই পুরুষ “সর্বং যজুতং যচ্চ ভাব্যং”—সমস্ত বিশ্ব ইহার এক পাদ মাত্র। বিশ্বকর্মা হিরণ্যগর্ভ ও প্রজাপতির সঙ্গে, এই পুরুষ একীভূত হইলে বৈদান্তিক পরব্রহ্মে প্রায় উপস্থিত হওয়া যায়।

অতএব অতি প্রাচীন কালেই বৈদিকেরা জড়োপাসনা হইতে ক্রমশঃ বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিছু দিন সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রাদি বহু দেবের উপাসনা রহিল। ক্রমে ক্রমে দেখিব যে, সেই ইন্দ্রাদিও পরমাত্মায় লীন হইলেন। দেখিব যে হিন্দুধর্মের প্রকৃত মর্ম একমাত্র জগদীশ্বরের উপাসনা। আর সকলই তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র।

যেহপ্যান্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ।

তেহপি মামেব কোন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকং ॥ গীতা ৯।২৩

আমরা ঋগ্বেদ হইতেই আরম্ভ করি, আর রামপ্রসাদের শ্যামা বিষয়* হইতেই আরম্ভ করি,

এজন্য ‘প্রচারে’ উহার সমালোচনার সম্ভাবনা নাই। তবে, যে উদ্দেশ্যে ‘প্রচারে’ এই বৈদিক প্রবন্ধগুলি লিখিত হইতেছে, এই অনুবাদ সেই উদ্দেশ্যের সহায় ও সাধক। এই জন্য এই অনুবাদ সম্বন্ধে এই কয়টি কথা বলা প্রয়োজন বিবেচনা করিলাম। *বেদে কি আছে, তাহা যাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে বেদের অনুবাদ পাঠ করিতে হইবে—আমরা বেশী উদাহরণ উদ্ধৃত করি—‘প্রচারে’ এত স্থান নাই।

* রামপ্রসাদ কালী নামে পরব্রহ্মের উপাসনা করিতেন।

প্রসাদ বলে, ভক্তি মূর্ত্তি, উভয়কে মাথে ধরেছি।

এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে, ধর্ম কর্ম সব ছেড়েছি।

বঙ্গীয় রচনাবলী

সেই কৃষ্ণোক্ত ধর্মই উপস্থিত হইতে হইবে। বৃষ্ণিব—এক ঈশ্বর আছেন, অন্য কোন দেবতা নাই। ইন্দ্রাদি নামেই ডাকি, সেই এক জনকেই ডাকি। ইহাই কৃষ্ণোক্ত ধর্ম।—‘প্রচার’, ২য় বর্ষ, পৃ. ১৪৭-৫২।

• হিন্দুধর্ম ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই

প্রথমে জড়োপাসনা। তখন জড়কেই চৈতন্যবিশিষ্ট বিবেচনা হয়, জড় হইতে জাগতিক ব্যাপার নিস্পন্ন হইতেছে বোধ হয়। তাহার পর দেখিতে পাওয়া যায়, জাগতিক ব্যাপার সকল নিয়মাধীন। এক জন সর্বনিয়ন্তা তখন পাওয়া যায়। ইহাই ঈশ্বরজ্ঞান। কিন্তু যে সকল জড়কে চৈতন্যবিশিষ্ট বলিয়া কল্পনা করিয়া লোকে উপাসনা করিত, ঈশ্বরজ্ঞান হইলেই তাহাদের উপাসনা লোপ পায় না। তাহারা সেই সর্বশ্রুতা ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট চৈতন্য এবং বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত বলিয়া উপাসিত হইতে থাকে।

তবে দেবগণ ঈশ্বরসৃষ্ট, এ কথা ঋগ্বেদের সূক্তের ভিতর পাইবার তেমন সম্ভাবনা নাই। কেন না সূক্ত সকল ঐ সকল দেবগণেরই স্তোত্র; স্তোত্রে স্তুতকে কেহ ক্ষুদ্র বলিয়া উল্লেখ করিতে চাহে না। কিন্তু ঐ ভাব উপনিষদ্ সকলে অত্যন্ত পরিষ্কৃত। ঋগ্বেদীয় ঐতরেয়োপনিষদের আরম্ভেই আছে,

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মিমৎ

অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে কেবল একমাত্র আত্মাই ছিলেন—আর কিছুমাত্র ছিল না। পরে তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়া, দেবগণকে সৃষ্টি করিলেন;

স ঈক্ষতে মে নৃ লোকা লোকাপালান্ সৃজা ইতি। ইত্যাদি।

আমরা বলিয়াছি যে পরিশেষে যখন জ্ঞানের আধিক্যে লোকের আর জড় চৈতন্যে বিশ্বাস থাকে না, তখন উপাসক ঐ সকল জড়কে ঈশ্বরের শক্তি বা বিকাশ মাত্র বিবেচনা করে। তখন ঈশ্বর হইতে ইন্দ্রাদির ভেদ থাকে না, ইন্দ্রাদি নাম, ঈশ্বরের নামে পরিণত হয়। ইহাই আচার্য্য মাক্সমুলরের Henotheism. ঋগ্বেদ হইতে তিনি ইহার বিস্তার উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, সূত্রাং যিনি এই কথার বৈদিক প্রমাণ চাহেন, তাঁহাকে উক্ত লেখকের গ্রন্থাবলীর উপর বরাত দিলাম। এখানে সে সকল প্রমাণের পুনঃ সংগ্রহের প্রয়োজন নাই। যে কথাটা আচার্য্য মহাশয় বুদ্ধেন নাই, তাহা এই। তিনি বলেন, এটি বৈদিক ধর্মের বিশেষ লক্ষণ যে, যখন যে দেবতার স্তুতি করা হয়, তখন সেই দেবতাকে সকলের উপর বাড়ান হয়। স্থূল কথা যে, উহা বৈদিক ধর্মের বিশেষ লক্ষণ নহে—পুরাণেতিহাসে সর্বত্র আছে;—উহা পরিণত হিন্দুধর্মের একেশ্বরবাদের সঙ্গে প্রাচীন বহু দেবোপাসনার সংমিলন। যখন দেবতা একমাত্র বলিয়া স্বীকৃত হইলেন, তখন ইন্দ্র, বায়ু, বরুণাদি নামগুলি তাহারই নাম হইল। এবং তিনিই ইন্দ্রাদি নামে স্তুত হইতে লাগিলেন।

এই ইন্দ্রাদি যে শেষে সকলই ঈশ্বর স্বরূপ উপাসিত হইতেন, তাহার প্রমাণ বেদ হইতে দিলাম না। আচার্য্য মাক্সমুলরের গ্রন্থে সকল উদ্ধৃত Henotheism সম্বন্ধীয় উদাহরণগুলিই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ।—আমি দেখাইব যে ইহা কেবল বেদে নহে, পুরাণেতিহাসেও আছে। তজ্জন্য মহাভারত হইতে কয়েকটি স্তোত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

ইন্দ্র স্তোত্র আদিপর্বের পঞ্চবিংশ অধ্যায় হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। “হে সুরপতে! সম্প্রতি তোমা ব্যতিরেকে আমরাগের প্রাণ রক্ষার আর কোন উপায়ান্তর নাই—যেহেতু তুমিই প্রচুর বারি বর্ষণ করিতে সমর্থ। তুমি বায়ু; তুমি মেঘ; তুমি অগ্নি; তুমি গগনমণ্ডলে সৌদামিনী রূপে প্রকাশমান হও এবং তোমা হইতেই ঘনাবলী পরিচালিত হইয়া থাকে; তোমাকেই লোকে মহামেঘ বলিয়া নির্দেশ করে; তুমি ঘোর ও প্রকাণ্ড বজ্রজ্যোতিঃস্বরূপ; তুমি আদিত্য; তুমি বিভাবসু; তুমি অত্যাশ্চর্য্য মহাভূত; তুমি নিখিল দেবগণের অধিপতি; তুমি সহস্রাক্ষ; তুমি দেব; তুমি পরমগতি; তুমি অক্ষয় অমৃত; তুমি পরম পূজিত সৌম্যমূর্তি; তুমি মনুহুর্ভ; তুমি তিথি; তুমি বল; তুমি ক্ষণ; তুমি শরুপক্ষ, তুমি কৃষ্ণপক্ষ; তুমিই কলা, কাষ্ঠা, চূটী, মাস, ঋতু, সম্বৎসর ও অহোরাত্র; তুমি সমস্ত পর্বত ও বনসমাকীর্ণ বসুন্ধরা; তুমি

দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম—হিন্দুধর্মের ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই

তিমিরবিরাহিত ও সূর্যাসংস্কৃত আকাশ; তুমি তিমিতিমিঙ্গিল সহিত উত্তরঙ্গতরঙ্গকুলসংকুল মহার্ণব।” এই স্তোত্রে জগদ্ব্যাপী পরমেশ্বরের বর্ণনা করা হইল।

তার পর আদিপর্বে দ্বই শত উর্নবিংশ অধ্যায় হইতে অগ্নি স্তোত্র উদ্ধৃত করি।

“হে হুতাশন! মহর্ষিগণ কহেন, তুমিই এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছ, তুমি না থাকিলে এই সমস্ত জগৎ ক্ষণকালমধ্যে ধ্বংস হইয়া যায়; বিপ্রগণ স্বীপদ্র সমাভিব্যাহারে তোমাকে নমস্কার করিয়া স্বধর্মবিজিত ইষ্টগতিপ্রাপ্ত হন। হে অগ্নে! সজ্জনগণ তোমাকে আকাশবিলগ্ন সবিদ্যাৎ জলধর বলিয়া থাকেন; তোমা হইতে অস্ত্র সমুদায় নিগত হইয়া সমস্ত ভূতগণকে দক্ষ করে; হে জাতবেদঃ! এই সমস্ত চরাচর বিশ্ব তুমিই নিস্মরণ করিয়াছ; তুমিই সর্বাগ্রে জলের সৃষ্টি করিয়া তৎপরে তাহা হইতে সমস্ত জগৎ উৎপাদন করিয়াছ; তোমাতেই হব্য ও কব্য যথার্থিধি প্রতিষ্ঠিত থাকে; হে দেব! তুমি দহন; তুমি ধাতা; তুমি বৃহস্পতি; তুমি অশ্বিনীকুমার; তুমি মিত্র; তুমি সোম এবং তুমিই পবন।”

বনপর্বে তৃতীয় অধ্যায়ে সূর্য্য স্তোত্র এইরূপ—“ওঁ সূর্য্য; অর্য্যমা, ভগ, ত্বষ্টা, পৃষা, অর্ক, সবিতা, রবি, গভাস্ত্রমান্, অজ, কাল, মৃত্যু, ধাতব, প্রভাকর, পৃথিবী, জল, তেজঃ, আকাশ, বায়ু, সোম, বৃহস্পতি, শক্র, বৃধ, অঙ্গারক, ইন্দ্র, বিবস্বান্, দীপ্তাংশু, শর্চি, সৌরি, শনৈশচর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, স্কন্দ, বরুণ, যম, বৈদ্যতাগ্নি, জঠরাগ্নি, ঐক্ননাগ্নি, তেজঃপতি, ধর্মধর্জ বৈদকর্তা, বেদাঙ্গ, বেদবাহন, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, কলা, কাষ্ঠা, মূহূর্ত্ত, ক্ষপা, যাম, ক্ষণ, সম্বৎসরকর, অশ্বখ, কালচক্র, বিভাবসু, ব্যস্তাব্যস্ত, পুরুষ, শাস্ত্রতযোগী কালাধ্যক্ষ, প্রজাধ্যক্ষ, বিশ্বকর্মা, তমোনদ, বরুণ, সাগর অংশ, জীমূত, জীবন, অরিহা, ভূতাপ্রয়, ভূতপতি, স্রষ্টা, সম্বর্ত্তক, বহি, সর্বাদি, অলোলপ, অনন্ত, কপিল, ভানু, কামদ, জয়, বিশাল, বরদ, মন, সুপর্ণ, ভূতাদি, শীঘ্রগ, ধন্বন্তরি, ধুমকেতু, আদিদেব, দিতিসুত, দ্বাদশাক্ষর, অরবিন্দাক্ষ, পিতা, মাতা, পিতামহ, স্বর্গদ্বার, প্রজাদ্বার, মোক্ষদ্বার, ত্বিষ্টপ, দেহকর্তা, প্রশান্তাত্মা, বিশ্বাত্মা, বিশ্বতোমুখ, চরাচরাত্মা, সূক্ষ্মাত্মা ও মৈত্রেয়, স্বয়ম্ভু ও অমিততেজা।”

তার পর আদিপর্বে তৃতীয় অধ্যায়ের অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তোত্র উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

“হে অশ্বিনীকুমার! তোমরা সৃষ্টির প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলে; তোমরাই সর্বভূতপ্রধান হিরণ্য-গর্ভরূপে উৎপন্ন হইয়াছ, পরে তোমরাই সংসারে প্রপঞ্চস্বরূপে প্রকাশমান হইয়াছ। দেশকাল ও অবস্থাদ্বারা তোমাদিগের ইয়ত্তা করা যায় না; তোমরাই মায়া ও মায়ারূঢ় চৈতন্যরূপে দ্যোতমান আছ; তোমরা শরীরবৃক্ষে পক্ষিরূপে অবস্থান করিতেছ; তোমরা সৃষ্টির প্রক্রিয়ার পরমাণু সর্গিষ্ট ও প্রকৃতির সহযোগিতার আবশ্যিকতা রাখ না; তোমরা বাক্য ও মনের অগোচর; তোমরাই স্বীয়প্রকৃতি বিক্ষেপশক্তি দ্বারা নিখিলবিশ্বকে সুপ্রকাশ করিয়াছ।”

দ্বই শত একত্রিশ অধ্যায়ে, কার্ত্তিকেয়ের স্তোত্র এইরূপঃ—

“তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা, তুমি পরম পবিত্র; মন্ত্র সকল তোমারই শ্রব করিয়া থাকে; তুমিই বিখ্যাত হুতাশন, তুমিই সংবৎসর, তুমিই ছয় ঋতু, মাস, অর্দ্ধ মাস, অয়ন ও দিক্। হে রাজীব-লোচন! তুমি সহস্রমুখ ও সহস্রবাহু; তুমি লোক সকলের পাতা, তুমি পরমপবিত্র হবি, তুমিই সুরাসুরগণের শূন্যকর্তা; তুমিই প্রচণ্ড প্রভু ও শত্রুগণের জেতা; তুমি সহস্রভূ; তুমি সহস্রভুজ ও সহস্রশীর্ষ; তুমি অনন্তরূপ, তুমি সহস্রপাৎ, তুমিই গুরুশক্তিধারী।”

তার পর আদিপর্বে চরোবিংশ অধ্যায়ের গরুড় স্তোত্রে

“হে মহাভাগ পতগেশ্বর! তুমি ঋষি, তুমি দেব, তুমি প্রভু, তুমি সূর্য্য, তুমি প্রজাপতি, তুমি ব্রহ্মা, তুমি ইন্দ্র, তুমি হয়গ্রীব, তুমি শর, তুমি জগৎপতি, তুমি সুখ, তুমি দুঃখ, তুমি বিপ্র, তুমি অগ্নি, তুমি পবন, তুমি ধাতা, তুমি বিধাতা, তুমি বিষ্ণু, তুমি অমৃত, তুমি মহৎযশঃ, তুমি প্রভা, তুমি আমাদিগের পবিত্র স্থান, তুমি বল, তুমি সাধু, তুমি মহাত্মা, তুমি সমর্দ্ধিমান্, তুমি অস্তক, তুমি স্থিরাস্থির সমস্ত পদার্থ, তুমি অতি দুঃসহ, তুমি উত্তম, তুমি চরাচর স্বরূপ, হে প্রভূতকীর্ত্তি গরুড়! ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তোমা হইতেই ঘটিতেছে, তুমি স্বকীয় প্রভাপুঞ্জ সূর্য্যের তেজোরশি সমাঙ্কিত করিতেছ, হে হুতাশনপ্রভ! তুমি কোপাবিষ্ট দিবা-করের ন্যায় প্রজা সকলকে দক্ষ করিতেছ, তুমি সর্বসংহারে উদ্যত যুগান্ত বায়ুর ন্যায় নিতান্ত ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়াছ। আমরা মহাবলপরাক্রান্ত বিদ্যাৎসমানকার্ত্তি, গগনবিহারী, অমিত-পরাক্রমশালী, খগকুলচুড়ামণি, গরুড়ের শরণ লইলাম।”

বঙ্কিম রচনাবলী

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, এবং শিব সম্বন্ধে এইরূপ স্তোত্রের এতই বাহুল্য পুরাণাদিতে আছে যে, তাহার উদাহরণ দিবার প্রয়োজন হইতেছে না, এক্ষণে আমরা সেই ভগবদ্বাক্য স্মরণ করি—

যেহ প্যান্যদেবতাভক্তাঃ যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।

তেহঁপ মামেব কোন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ষকং ॥ গীতা। ৯।২৩।

অর্থাৎ ঈশ্বর ভিন্ন অন্য দেবতা নাই। যে অন্য দেবতাকে ভজনা করে সে অবিধিপূর্ষক ঈশ্বরকেই ভজনা করে।—‘প্রচার’, ২য় বর্ষ, পৃ. ২৭৪-৭৮।

সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকা

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা

জীবনী

দীনবন্ধুর জীবনচরিত লিখবার এখনও সময় হয় নাই। কোন ব্যক্তির জীবনের ঘটনাপরম্পরার বিবৃতিমাত্র জীবনচরিতের উদ্দেশ্য নহে। কিয়ৎ-পরিমাণে তাহাও উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু যিনি সম্প্রতি মাত্র অন্তর্হিত হইয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধীয় প্রকৃত ঘটনা সকল বিবৃত করিতে হইলে, এমন অনেক কথা বলিতে হয় যে, তাহাতে জীবিত লোক লিপ্ত। কখন কোন জীবিত ব্যক্তির নিন্দা করিবার প্রয়োজন ঘটে; কখন জীবিত ব্যক্তিদেগের অন্য প্রকার পীড়াদায়ক কথা বলিবার প্রয়োজন হয়; কখন কখন গুহ্য কথা ব্যক্ত করিতে হয়, তাহা কাহারও না কাহারও পীড়াদায়ক হয়। আর, একজনের জীবনবৃত্তান্ত অবগত হইয়া অন্য ব্যক্তি শিক্ষা প্রাপ্ত হউক,— ইহা যদি জীবনচরিত-প্রণয়নের যথার্থ উদ্দেশ্য হয়, তবে বর্ণনীয় ব্যক্তির দোষ গুণ উভয়েরই সর্বস্তর বর্ণনা করিতে হয়। দোষশূন্য মনুষ্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে নাই;—দীনবন্ধুরও যে কোন দোষ ছিল না, ইহা কোন সাহসে বলিব? যে কারণেই হউক, এক্ষণে তাঁহার জীবনচরিত লিখিতব্য নহে।

আর লিখিবার তাদৃশ প্রয়োজনও নাই। এই বঙ্গদেশে দীনবন্ধুকে না চিনিত কে? কাহার সঙ্গে তাঁহার আলাপ ও সৌহার্দ ছিল না? দীনবন্ধু যে প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাহা কে না জানে? সুতরাং জানাইবার তত আবশ্যিকতা নাই।

এই সকল কারণে, আমি এক্ষণে দীনবন্ধুর প্রকৃত জীবনচরিত লিখিব না। যাহা লিখিব, তাহা পক্ষপাত-শূন্য হইয়া লিখিতে যত্ন করিব। দীনবন্ধুর স্নেহ-ঋণে আমি ঋণী, কিন্তু তাই বলিয়া আমি মিথ্যা প্রশংসার দ্বারা সে ঋণ পরিশোধ করিবার যত্ন করিব না।

পূর্বে বাঙ্গালা রেলওয়ের কাঁচরাপাড়া স্টেশনের কয় ক্রোশ পূর্বেবর্তরে চৌবোড়িয়া নামে গ্রাম আছে। যমুনা নামে ক্ষুদ্র নদী এই গ্রামকে প্রায় চারি দিকে বেষ্টিত করিয়াছে; এই জন্য ইহার নাম চৌবোড়িয়া। সেই গ্রাম দীনবন্ধুর জন্মভূমি। এ গ্রাম নদীয়া জেলার অন্তর্গত। বাঙ্গালা সাহিত্য, দর্শন ও ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে নদীয়া জেলার বিশেষ গৌরব আছে; দীনবন্ধুর নাম নদীয়ার আর একটি গৌরবের স্থল।

সন ১২৩৮ সালে দীনবন্ধু জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কালাচাঁদ মিত্রের পুত্র। তাঁহার বাল্যকাল-সম্বন্ধীয় কথা অধিক বলিবার নাই। দীনবন্ধু অল্পবয়সে কলিকাতায় আসিয়া, হেয়ার স্কুলে ইংরেজি শিক্ষা আরম্ভ করেন। সেই বিদ্যালয়ে থাকিতে থাকিতেই তিনি বাঙ্গালা রচনা আরম্ভ করেন।

সেই সময় তিনি প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নিকট পরিচিত হইলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের তখন বড় দুরবস্থা। তখন প্রভাকর সর্বেত্রকৃষ্ণ সংবাদ-পত্র। ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের উপর একাধিপত্য করিতেন। বালকগণ তাঁহার কবিতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য ব্যগ্র হইত। ঈশ্বর গুপ্ত তরুণবয়স্ক লেখকদিগকে উৎসাহ দিতে বিশেষ সমুৎসুক ছিলেন। হিন্দু পৌত্রিয়ট যথার্থই বলিয়াছিলেন, আধুনিক লেখকদিগের মধ্যে অনেকে ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের প্রদত্ত শিক্ষার ফল কত দূর স্থায়ী বা বাঞ্ছনীয় হইয়াছে তাহা বলা যায় না। দীনবন্ধু প্রভৃতি উৎকৃষ্ট লেখকের ন্যায় এই ক্ষুদ্র লেখকও ঈশ্বর গুপ্তের নিকট ঋণী। সুতরাং ঈশ্বর গুপ্তের কোন প্রশংসার কথা লিখিয়া আপনাকে অকৃতজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছুক নহি। কিন্তু ইহাও অস্বীকার করিতে পারি না যে, এক্ষণকার পরিমাণ ধরিতে গেলে, ঈশ্বর গুপ্তের রুচি তাদৃশ বিশুদ্ধ বা উন্নত ছিল না, বলিতে হইবে। তাঁহার শিষ্যেরা অনেকেই তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষা বিস্মৃত হইয়া অন্য পথে গমন করিয়াছেন।

বিক্রম রচনাবলী

বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির রচনামধ্যে ঈশ্বর গুপ্তের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। কেবল দীনবন্ধুতেই কিয়ৎ-পরিমাণে তাঁহার শিক্ষার চিহ্ন পাওয়া যায়।

“এলোচুলে বেণে বউ আলতা দিয়ে পায়,
নলক নাকে, কলসী কাঁকে, জল আন্তে যায়।”

ইত্যাকার কবিতায় ঈশ্বর গুপ্তকে স্মরণ হয়। বাঙ্গালা সাহিত্যে চারি জন রহস্যপটু লেখকের নাম করা যাইতে পারে,—টেকচাঁদ, হুতোম, ঈশ্বর গুপ্ত এবং দীনবন্ধু। সহজেই বুঝা যায়, যে, ইহার মধ্যে দ্বিতীয় প্রথমের শিষ্য এবং চতুর্থ তৃতীয়ের শিষ্য। টেকচাঁদের সহিত হুতোমের যত দূর সাদৃশ্য, ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে দীনবন্ধুর তত দূর সাদৃশ্য না থাকুক, অনেক দূর ছিল। প্রভেদ এই যে, ঈশ্বর গুপ্তের লেখায় ব্যঙ্গ (wit) প্রধান; দীনবন্ধুর লেখায় হাস্য প্রধান। কিন্তু ব্যঙ্গ এবং হাস্য উভয়বিধ রচনায় দুই জনেই পটু ছিলেন,—তুল্য পটু ছিলেন না। হাস্যরসে ঈশ্বর গুপ্ত দীনবন্ধুর সমকক্ষ নহেন।

আমি যতদূর জানি, দীনবন্ধুর প্রথম রচনা “মানব-চরিত্র”-নামক একটি কবিতা। ঈশ্বর গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত “সাধুরঞ্জন”-নামক সাপ্তাহিক পত্রে উহা প্রকাশিত হয়। অতি অল্প বয়সের লেখা, এজন্য ঐ কবিতায় অনুপ্রাসের অত্যন্ত আড়ম্বর। ইহাও, বোধ হয়, ঈশ্বর গুপ্তের প্রদত্ত শিক্ষার ফল। অন্যে ঐ কবিতা পাঠ করিয়া কিরূপ বোধ করিয়াছিলেন বলিতে পারি না, কিন্তু উহা আমাকে অত্যন্ত মোহিত করিয়াছিল। আমি ঐ কবিতা আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম এবং যত দিন সেই সংখ্যার সাধুরঞ্জনখানি জীর্ণগলিত না হইয়াছিল, তত দিন উহাকে ত্যাগ করি নাই। সে প্রায় সাতাইশ বৎসর হইল; এই কাল মধ্যে ঐ কবিতা আর কখন দেখি নাই; কিন্তু ঐ কবিতা আমাকে এমনই মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিল যে, অদ্যাপি তাহার কোন কোন অংশ স্মরণ করিয়া বলিতে পারি। পাঠকগণের ঐ কবিতা দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা নাই, কেন না উহা কখন পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। অনেকেই দীনবন্ধুর প্রথম রচনার দুই এক পংক্তি শূন্যিলেও প্রীত হইতে পারেন; এজন্য স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া ঐ কবিতা হইতে দুই পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম। উহার আরম্ভ এইরূপ—

মানব-চরিত্র-ক্ষেত্রে নেত্র নিক্ষেপিয়া।
দঃখানলে দহে দেহ, বিদরয়ে হিয়া ॥

একটি কবিতা এই

যে দোষে সরস হয় সে জনে সরস।
যে দোষে বিরস হয় সে জনে বিরস ॥

আর একটি

যে নয়নে রেণু অণু অসি অনুমান।
বায়সে হানিবে তায় তীক্ষ্ণ চণ্ড-বাণ ॥

ইত্যাদি

সেই অবাধ, দীনবন্ধু মধ্যে মধ্যে প্রভাকরে কবিতা লিখিতেন। তাঁহার প্রণীত কবিতা সকল পাঠক-সমাজে আদৃত হইত। তিনি সেই তরুণ বয়সে যে কবিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাঁহার অসাধারণ “সুরধুনী” কাব্য এবং “দ্বাদশ কবিতা” সেই পরিচয়ানুরূপ হয় নাই। তিনি দুই বৎসর, জামাই-ষষ্ঠীর সময়ে, “জামাই-ষষ্ঠী” নামে দুইটি কবিতা লেখেন। এই দুইটি কবিতা বিশেষ প্রশংসিত এবং আগ্রহাতিশয্যের সহিত পঠিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় বৎসরের “জামাই-ষষ্ঠী” যে সংখ্যক প্রভাকরে প্রকাশিত হয়, তাহা পুনর্মুদ্রিত করিতে হইয়াছিল। সেই সকল কবিতা সেরূপ প্রশংসিত হইয়াছিল, “সুরধুনী” কাব্য এবং “দ্বাদশ কবিতা” সেরূপ প্রশংসিত হয় নাই। তাহার কারণ সহজেই বুঝা যায়। হাস্যরসে দীনবন্ধুর অদ্বিতীয় ক্ষমতা ছিল। “জামাই-ষষ্ঠী”তে হাস্যরস প্রধান। সুরধুনী কাব্যে ও দ্বাদশ কবিতায় হাস্যরসের আগ্রহ মাত্র নাই। প্রভাকরে দীনবন্ধু যে সকল কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহা পুনর্মুদ্রিত হইলে বিশেষরূপে আদৃত হইবার সম্ভাবনা।

আমরা দেখিয়াছি, কোন কোন সংবাদপত্রে “কালেজীয় কবিতাষুদ্বৈ”র উল্লেখ হইয়াছে। তাহাতে গৌরবের কথা কিছদু নাই, সে সম্বন্ধে আমি কিছদু বলিব না। তরুণ বয়সে গালি দিতে

দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী...সমালোচনা

কিছু ভাল লাগে; বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রায় পরস্পরকে গালি দিয়া থাকে। দীনবন্ধু চিরকাল, রহস্যপ্রিয়, এজন্য এটি ঘটয়াছিল।

দীনবন্ধু প্রভাকরে “বিজয়-কামিনী” নামে একটি ক্ষুদ্র উপাখ্যান কাব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। নায়কের নাম বিজয়, নায়িকার নাম কামিনী। তাহার, বোধ হয়, দশ বার বৎসর পরে “নবীন তপস্বিনী” লিখিত হয়। “নবীন তপস্বিনী”র নায়কের নামও বিজয়, নায়িকাও কামিনী। চরিত্রগত, উপাখ্যান কাব্য ও নাটকের নায়ক নায়িকার মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই। এই ক্ষুদ্র উপাখ্যান-কাব্যখানি সুন্দর হইয়াছিল।

দীনবন্ধু হেয়ারের স্কুল হইতে হিন্দু কলেজে যান, এবং তথায় ছাত্রবৃত্তি গ্রহণ করিয়া কয় বৎসর অধ্যয়ন করেন। তিনি কলেজের একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া গণ্য ছিলেন।

দীনবন্ধুর পাঠাবস্থার কথা আমি বিশেষ জানি না, তৎকালে তাহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না।

বোধ হয় ১৮৫৫ সালে, দীনবন্ধু কলেজ পরিত্যাগ করিয়া, ১৫০ বেতনে পাটনার পোস্টমাষ্টারের পদ গ্রহণ করেন। ঐ কর্মে তিনি ছয় মাস নিযুক্ত থাকিয়া সুখ্যাতি লাভ করেন। দেড় বৎসর পরেই তাহার পদবৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনি উড়িষ্যা বিভাগের ইন্স্পেক্টিং পোস্টমাষ্টার হইয়া যান। পদবৃদ্ধি হইল বটে, কিন্তু তখন বেতনবৃদ্ধি হইল না; পরে হইয়াছিল।

এক্ষণে মনে হয়, দীনবন্ধু চিরদিন দেড় শত টাকার পোস্টমাষ্টার থাকিতেন, সেও ভাল ছিল, তাহার ইন্স্পেক্টিং পোস্টমাষ্টার হওয়া মঙ্গলের বিষয় হয় নাই। পূর্বে এই পদের কার্যের নিয়ম ছিল যে, ইহাদিগকে অবিরত নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া পোস্ট আপিসের কার্য সকলের তত্ত্বাবধারণ করিতে হইবে। এক্ষণে ইহারা ছয় মাস হেডকোয়ার্টারে স্থায়ী হইতে পারেন। পূর্বে সে নিয়ম ছিল না। সংবৎসরই ভ্রমণ করিতে হইত। কোন স্থানে এক দিন, কোন স্থানে দুই দিন, কোন স্থানে তিন দিন—এইরূপ কাল মাত্র অবস্থিতি। বৎসর বৎসর ক্রমাগত এইরূপ পরিভ্রমে লোহার শরীরও ভগ্ন হইয়া যায়। নিয়ত আবর্তনে লোহার চক্র ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। দীনবন্ধুর শরীরে আর সে পরিভ্রম সহিল না; বঙ্গদেশের দূরদৃষ্টবশতই তিনি ইন্স্পেক্টিং পোস্টমাষ্টার হইয়াছিলেন।

ইহাতে আমাদের মূলধন নষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু কিছু লাভ হয় নাই এমত নহে। উপহাসনিপুণ লেখকের একটি বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন। নানা প্রকার মনুষ্যের চরিত্রের পর্য্যালোচনাতেই সেই শিক্ষা পাওয়া যায়। দীনবন্ধু নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া নানাবিধ চরিত্রের মনুষ্যের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। তজ্জনিত শিক্ষার গুণে তিনি নানাবিধ রহস্যজনক চরিত্র-সৃজনে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাহার প্রণীত নাটক সকলে যে রূপ চরিত্রবৈচিত্র্য আছে, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে বিরল।

উড়িষ্যা বিভাগ হইতে দীনবন্ধু নদীয়া বিভাগে প্রেরিত হইলেন, এবং তথা হইতে ঢাকা বিভাগে গমন করেন। এই সময়ে নীলবিষয়ক গোলযোগ উপস্থিত হয়। দীনবন্ধু নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া নীলকরদিগের দৌরাভ্য বিশেষরূপে অবগত হইয়াছিলেন। তিনি এই সময়ে “নীল-দর্পণ” প্রণয়ন করিয়া বঙ্গীয় প্রজাগণকে অপারিশোধনীয় ঋণে বদ্ধ করিলেন।

দীনবন্ধু বিলক্ষণ জানিতেন, যে, তিনি যে নীল-দর্পণের প্রণেতা, এ কথা ব্যক্ত হইলে, তাহার অনিষ্ট ঘটবার সম্ভাবনা। যে সকল ইংরেজের অধীন হইয়া তিনি কর্ম করিতেন, তাহারা নীলকরের সহৃদয়। বিশেষ, পোস্ট আপিসের কার্যে নীলকর প্রভৃতি অনেক ইংরেজের সংস্পর্শে সর্বদা আসিতে হয়। তাহারা শত্রুতা করিলে বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারুক না পারুক, সর্বদা উদ্বিগ্ন করিতে পারে; এ সকল জানিয়াও দীনবন্ধু নীল-দর্পণ-প্রচারে পরাজম্বু হইলেন নাই। নীল-দর্পণে গ্রন্থকারের নাম ছিল না বটে, কিন্তু গ্রন্থকারের নাম গোপন করিবার জন্য দীনবন্ধু অন্য কোন প্রকার যত্ন করেন নাই। নীল-দর্পণ-প্রচারের পরেই বঙ্গদেশের সকল লোকেই কোন প্রকারে না কোন প্রকারে জানিয়াছিল যে, দীনবন্ধু ইহার প্রণেতা।

দীনবন্ধু পরের দৃষ্থে নিতান্ত কাতর হইতেন, নীল-দর্পণ এই গুণের ফল। তিনি বঙ্গদেশের প্রজাগণের দৃষ্থে সহৃদয়তার সহিত সম্পূর্ণরূপে অনুভূত করিয়াছিলেন বলিয়াই নীল-দর্পণ প্রণীত ও প্রচারিত হইয়াছিল। যে সকল মনুষ্য পরের দৃষ্থে কাতর হন, দীনবন্ধু তাহার মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। তাহার হৃদয়ের অসাধারণ গুণ এই ছিল, যে, যাহার দৃষ্থে, সে যে রূপ

বিক্রম রচনাবলী

কাতর হইত, দীনবন্ধু তদ্রূপ বা ততোধিক কাতর হইতেন। ইহার একটি অপূর্ব উদাহরণ আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। একদা তিনি যশোহরে আমার বাসায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। রাতে তাঁহার কোন বন্ধুর কোন উৎকট পীড়ার উপক্রম হইল। যিনি পীড়ার আশঙ্কা করিতেছিলেন, তিনি দীনবন্ধুকে জাগরিত করিলেন, এবং পীড়ার আশঙ্কা জানাইলেন। শুনিয়া দীনবন্ধু মূচ্ছিত হইলেন। যিনি স্বয়ং পীড়িত বলিয়া সাহায্যার্থ দীনবন্ধুকে জাগাইয়াছিলেন, তিনিই আবার দীনবন্ধুর শূন্যায় নিযুক্ত হইলেন। ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। সেই দিন জানিয়াছিলাম, যে, অন্য যাহার যে গুণ থাকুক, পরের দুঃখে দীনবন্ধুর ন্যায় কেহ কাতর হয় না। সেই গুণের ফল নীল-দর্পণ।

নীল-দর্পণ ইংরেজিতে অনুবাদিত হইয়া ইংলণ্ডে যায়। লং সাহেব তৎপ্রচারের জন্য সুপ্রীম কোর্টের বিচারে দণ্ডনীয় হইয়া কারাবদ্ধ হইলেন। সীটনকার সাহেব তৎপ্রচার-জন্য অপদস্থ হইয়াছিলেন। এ সকল বৃত্তান্ত সকলেই অবগত আছেন।

এই গ্রন্থের নিমিত্ত লং সাহেব কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়াই হউক, অথবা ইহার কোন বিশেষ গুণ থাকার নিমিত্তই হউক, নীল-দর্পণ ইউরোপের অনেক ভাষায় অনুবাদিত ও পঠিত হইয়াছিল। এই সৌভাগ্য বাঙ্গালায় আর কোন গ্রন্থেরই ঘটে নাই। গ্রন্থের সৌভাগ্য যতই হউক, কিন্তু যে যে ব্যক্তি ইহাতে লিপ্ত ছিলেন, প্রায় তাঁহারা সকলেই কিছু কিছু বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ইহার প্রচার করিয়া লং সাহেব কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন; সীটনকার অপদস্থ হইয়াছিলেন। ইহার ইংরেজি অনুবাদ করিয়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত গোপনে তিরস্কৃত ও অবমানিত হইয়াছিলেন এবং শুনিয়াছি শেষে তাঁহার জীবননির্ব্বাহের উপায় সুপ্রীম কোর্টের চাকুরি পর্যন্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গ্রন্থকর্তা নিজে কারাবদ্ধ কি কৰ্ম্মচ্যুত হইলেন নাই বটে, কিন্তু তিনি ততোধিক বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। এক দিন রাতে নীল-দর্পণ লিখিতে লিখিতে দীনবন্ধু মেঘনা পার হইতেছিলেন। কূল হইতে প্রায় দুই ফ্রোশ দূরে গেলে নৌকা হঠাৎ জলমগ্ন হইতে লাগিল। দাঁড়ী মাঝি সকলেই সম্ভরণ আরম্ভ করিল; দীনবন্ধু তাহাতে অক্ষম। দীনবন্ধু নীল-দর্পণ হস্তে করিয়া জলমজ্জনোন্মুখ নৌকায় নিস্তন্ধে বসিয়া রহিলেন। এমন সময়ে হঠাৎ একজন সম্ভরণকারীর পদ মৃত্তিকা স্পর্শ করিবায় সে সকলকে ডাকিয়া বলিল, “ভয় নাই, এখানে জল অল্প, নিকটে অবশ্য চর আছে।” বাস্তব নিকটে চর ছিল, তথায় নৌকা আনীত হইয়া চরলগ্ন হইলে দীনবন্ধু উঠিয়া নৌকার ছাদের উপর বসিয়া রহিলেন। তখনও সেই আর্দ্র নীল-দর্পণ তাঁহার হস্তে রহিয়াছে। এই সময় মেঘনায় ভাঁটা বহিতেছিল, সম্বরেই জোয়ার আসিয়া এই চর ডুবিয়া যাইবে এবং সেই সঙ্গে এই জলপূর্ণ ভগ্ন তাঁর আসিয়া যাইবে, তখন জীবনরক্ষার উপায় কি হইবে, এই ভাবনা দাঁড়ী, মাঝি সকলেই ভাবিতেছিল, দীনবন্ধুও ভাবিতেছিলেন। তখন রাত্রি গভীর, আবার ঘোর অন্ধকার, চারি দিকে বেগবতীর বিষম স্রোতধ্বনি, ক্ৰচিং মধ্যে মধ্যে নিশাচর পক্ষীদিগের চীৎকার। জীবনরক্ষার কোন উপায় না দেখিয়া দীনবন্ধু একেবারে নিরাশ্বাস হইতেছিলেন, এমন সময়ে দূরে দাঁড়ের শব্দ শূন্য গেল। সকলেই উচ্চৈঃস্বরে পুনঃ পুনঃ ডাকিবায় দূরবর্তী নৌকারোহীরা উত্তর দিল, এবং সম্বরে আসিয়া দীনবন্ধু ও তৎসমভিব্যাহারীদিগের উদ্ধার করিল।

ঢাকা বিভাগ হইতে, দীনবন্ধু পুনর্বার নদীয়া প্রত্যাগমন করেন। ফলতঃ নদীয়া বিভাগেই তিনি অধিক কাল নিযুক্ত ছিলেন; বিশেষ কার্য-নির্ব্বাহ জন্য তিনি ঢাকা বা অন্যত্র প্রেরিত হইতেন।

ঢাকা বিভাগ হইতে প্রত্যাগমন-পরে দীনবন্ধু “নবীন তপস্বিনী” প্রণয়ন করেন। উহা কৃষ্ণনগরে মুদ্রিত হয়। ঐ মুদ্রায়ন্ত্রটি দীনবন্ধু প্রভৃতি কয়েক জন কৃতবিদ্যের উদ্যোগে স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু স্থায়ী হয় নাই।

দীনবন্ধু নদীয়া বিভাগ হইতে পুনর্বার ঢাকা বিভাগে প্রেরিত হইলেন। আবার ফিরিয়া আসিয়া উড়িষ্যা বিভাগে প্রেরিত হইলেন। পুনর্বার নদীয়া বিভাগে আইসেন। কৃষ্ণনগরেই তিনি অধিক কাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সেখানে একটি বাড়ী কিনিয়াছিলেন। সন ১৮৬৯ সালের শেষে বা সন ১৮৭০ সালের প্রথমে তিনি কৃষ্ণনগর পরিত্যাগ করিয়া, কলিকাতায় সুপারনিউমারি ইন্স্পেক্টিং পোস্টমাষ্টার নিযুক্ত হইয়া আইসেন। পোস্টমাষ্টার জেনারেলের সাহায্যেই এ পদের কার্য। দীনবন্ধুর সাহায্যে পোস্ট অফিসের কার্য কয় বৎসর অতি সুচারু-

দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী...সমালোচনা

রূপে সম্পাদিত হইতে লাগিল। ১৮৭১ সালে দীনবন্ধু লুশাই যুদ্ধের ডাকের বন্দোবস্ত করিবার জন্য কাছাড় গমন করেন। তথায় সেই গুরুতর কার্য সম্পন্ন করিয়া অল্পকালমধ্যে প্রত্যাগমন করেন।

কালিকাতায় অবস্থিতি কালে, তিনি “রায় বাহাদুর” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই উপাধি যিনি প্রাপ্ত হইলেন, তিনি আপনাকে কত দূর কৃতার্থ মনে করেন বলিতে পারি না। দীনবন্ধুর অদৃষ্টে ঐ পুরস্কার ভিন্ন আর কিছু ঘটে নাই। কেন না, দীনবন্ধু বাঙ্গালি-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম শ্রেণীর বেতন পাইতেন বটে, কিন্তু কালসাহায্যে প্রথম শ্রেণীর বেতন চতুর্পদ জম্মুদিগেরও প্রাপ্য হইয়া থাকে। পৃথিবীর সর্বত্রই প্রথম-শ্রেণীভুক্ত গন্দর্ভ দেখা যায়।

দীনবন্ধু এবং সূর্যনারায়ণ এই দুই জন পোস্টাল বিভাগের কর্মচারীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুদক্ষ বলিয়া গণ্য ছিলেন। সূর্যনারায়ণ বাবু আসামের কার্যের গুরু ভার লইয়া তথায় অবস্থিতি করিতেন; অন্য যেখানে কোন কঠিন কার্য পড়িত, দীনবন্ধু সেইখানেই প্রেরিত হইতেন। এইরূপ কার্যে ঢাকা, উড়িষ্যা, উত্তর পশ্চিম, দারজিলিঙ্গ, কাছাড় প্রভৃতি স্থানে সর্বদা যাইতেন। এইরূপে, তিনি বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার প্রায় সর্ব স্থানেই গমন করিয়াছিলেন, বেহারেরও অনেক স্থান দেখিয়াছিলেন। পোস্টাল বিভাগের যে পরিশ্রমের ভাগ তাহা তাহার ছিল, পুরস্কারের ভাগ অন্যের কপালে ঘটিত।

দীনবন্ধুর ষেরূপ কার্যদক্ষতা এবং বহুদর্শিতা ছিল, তাহাতে তিনি যদি বাঙ্গালী না হইতেন, তাহা হইলে মৃত্যুর অনেক দিন পূর্বেই তিনি পোস্টমাষ্টার জেনেরল হইতেন, এবং কালে ডাইরেক্টর জেনেরল হইতে পারিতেন। কিন্তু যেমন শতবার ধোঁত করিলে অঙ্গারের মালিন্য যায় না, তেমনি কাহারও কাহারও কাছে সহস্র গুণ থাকিলেও কৃষ্ণবর্ণের দোষ যায় না। Charity যেমন সহস্র দোষ ঢাকিয়া রাখে, কৃষ্ণচর্ম তেমনি সহস্র গুণ ঢাকিয়া রাখে।

পুরস্কার দূরে থাকুক, শেষাবস্থায় দীনবন্ধু অনেক লাঞ্ছনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পোস্টমাষ্টার জেনেরল এবং ডাইরেক্টর জেনেরলে বিবাদ উপস্থিত হইল। দীনবন্ধুর অপরাধ, তিনি পোস্টমাষ্টার জেনেরলের সাহায্য করিতেন। এজন্য তিনি কার্যান্তরে নিযুক্ত হইলেন। প্রথম কিছু দিন রেলওয়ের কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাহার পরে হাবড়া ডিবিজনে নিযুক্ত হইলেন। সেই শেষ পরিবর্তন।

শ্রমাধিক্যে অনেক দিন হইতে দীনবন্ধু উৎকটরোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, বহুদূর রোগ প্রায় সাংঘাতিক হয়। সে কথা সত্য কি না বলা যায় না, কিন্তু ইদানীং মনে করিয়াছিলাম যে, দীনবন্ধু বৃষ্টি রোগের হাত হইতে মুক্তি পাইবেন। রোগাক্রান্ত হইয়া অর্ধদীনবন্ধু অতি সাবধান, এবং অবিহিতাচারবর্জিত হইয়াছিলেন। অতি অল্প পরিমাণে অহিফেন সেবন আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহাতে রোগের কিঞ্চিৎ উপশম হইয়াছে বলিতেন। পরে সন ১২৮০ সালের আশ্বিন মাসে অকস্মাৎ বিস্ফোটককর্তৃক আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হইলেন। তাহার মৃত্যুর বৃত্তান্ত সকলে অবগত আছেন। বিস্তারিত লেখার আবশ্যিক নাই। লিখিতেও পারি না। যদি মনুষ্যের প্রার্থনা সফল হইবার সম্ভাবনা থাকিত, তবে প্রার্থনা করিতাম যে, এরূপ সুহৃদের মৃত্যুর কথা কাহাকেও যেন লিখিতে না হয়।

নবীন তপস্বিনীর পর “বিয়েপাগলা বড়ো” প্রচার হয়। দীনবন্ধুর অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকৃত-ঘটনা-মূলক এবং অনেক জীবিত ব্যক্তির চরিত্র তাহার প্রণীত চরিত্রে অনুরূপ হইয়াছে। “নীল-দর্পণে”র অনেকগুলি ঘটনা প্রকৃত; “নবীন তপস্বিনী”র বড় রাণী ছোট রাণীর বৃত্তান্ত প্রকৃত। “সধবার একাদশী”র প্রায় সকল নায়ক-নায়িকাগুলি জীবিত ব্যক্তির প্রতিকৃতি; তদ্বিগত ঘটনাগুলির মধ্যে কিয়দংশ প্রকৃত ঘটনা। “জামাই-বারিকে”র দুই স্ত্রীর বৃত্তান্ত প্রকৃত। “বিয়েপাগলা বড়ো”ও জীবিত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছিল।

প্রকৃত ঘটনা, জীবিত ব্যক্তির চরিত্র, প্রাচীন উপন্যাস, ইংরেজি গ্রন্থ এবং “প্রচলিত খোসগল্প” হইতে সারাদান করিয়া দীনবন্ধু তাহার অপূর্ব চিত্তরঞ্জক নাটক সকলের সৃষ্টি করিতেন। নবীন তপস্বিনীতে ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রাজা রমণীমোহনের বৃত্তান্ত কতক প্রকৃত। হোঁদলকুংকুতের ব্যাপার প্রাচীন-উপন্যাসমূলক; “জলধর” “জগদম্বা” “Mary Wives of Windsor” হইতে নীত।

বঙ্গীয় রচনাবলী

বঙ্গালি-পাঠক-মধ্যে নিতান্ত অশিক্ষিত অনেক আছেন। তাঁহারা ভাবিবেন, যদি দীনবন্ধুর গ্রন্থের মূল প্রাচীন উপন্যাসে, ইংরেজি গ্রন্থে বা প্রচলিত গল্পে আছে, তবে আর তাঁহার গ্রন্থের প্রশংসা কি? তাঁহারা ভাবিবেন, আমি দীনবন্ধুর অপপ্রশংসা করিতেছি। এ সম্প্রদায়ের পাঠকদিগকে কোন কথা বুঝাইয়া বলিতে আমি অনিচ্ছুক, কেন না জলে আলিপনা সম্ভবে না। সেক্ষপীয়রের প্রায় এমন নাটক নাই যাহা কোন প্রাচীনতরগ্রন্থ-মূলক নহে। স্কটের অনেকগুলি উপন্যাস প্রাচীন কথা বা প্রাচীন-গ্রন্থমূলক। মহাভারত রামায়ণের অনূকরণ। ইনিদ্, ইলিয়াদের অনূকরণ। ইহার মধ্যে কোন গ্রন্থ অপপ্রশংসনীয়?

“সধবার একাদশী” “বিয়েপাগলা বুড়ো”র পরে প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু উহা তৎপূর্বে লিখিত হইয়াছিল। সধবার একাদশীর যেমন অসাধারণ গুণ আছে, তেমন অনেক অসাধারণ দোষও আছে। এই প্রহসন বিশুদ্ধ রচনার অনূমোদিত নহে, এই জন্য আমি দীনবন্ধুকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলাম যে, ইহার বিশেষ পরিবর্তন ব্যতীত প্রচার না হয়। কিছু দিন মাত্র এ অনুরোধ রক্ষা হইয়াছিল। অনেকে বলিবেন, এ অনুরোধ রক্ষা হয় নাই ভালই হইয়াছে, আমরা “নিমচাঁদ”কে দেখিতে পাইয়াছি। অনেকে ইহার বিপরীত বলিবেন।

“লীলাবতী” বিশেষ যত্নের সহিত রচিত, এবং দীনবন্ধুর অন্যান্য নাটক্যপেক্ষা ইহাতে দোষ অল্প। এই সময়ে দীনবন্ধুর কবিজীবনের মধ্যাহ্নকাল বলা যাইতে পারে। ইহার পর হইতে কিঞ্চিৎ তেজঃক্ষতি দেখা যায়। এরূপ উদাহরণ অনেক পাওয়া যায়। স্কট প্রথমে পদ্যগ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন। প্রথম তিনখানি কাব্য অত্যন্তকৃষ্ণ হয়, “Lady of the Lake” নামক কাব্যের পর আর তেমন হইল না। দেখিয়া, স্কট পদ্য লেখা ত্যাগ করিলেন, গদ্যকাব্য লিখিতে আরম্ভ করিলেন। গদ্যকাব্য-লেখক বলিয়া স্কটের যে যশ, তাহার মূল প্রথম পনের বা ষোলখানি নবেল। “Kenilworth” নামক গ্রন্থের পর স্কটের আর কোন উপন্যাস প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাইবার যোগ্য হয় নাই। মধ্যাহ্নের প্রথর রৌদ্রের সঙ্গে সন্ধ্যাকালীন ক্ষীণালোকের যে সম্বন্ধ, “Ivanhoe” এবং “Kenilworth” প্রভৃতির সঙ্গে স্কটের শেষ দুইখানি গদ্যকাব্যের সেই সম্বন্ধ।

“লীলাবতী”র পর দীনবন্ধুর লেখনী কিছুকাল বিশ্রাম লাভ করিয়াছিল। সেই বিশ্রামের পর “সুন্দরধননী কাব্য” “জামাই-বারিক” এবং “দ্বাদশ কবিতা” অতি শীঘ্র শীঘ্র প্রকাশিত হয়। “সুন্দরধননী” কাব্য অনেক দিন পূর্বে লিখিত হইয়াছিল। ইহার কিয়দংশ “বিয়েপাগলা বুড়ো”রও পূর্বে লিখিত হইয়াছিল। ইহাও প্রচার না হয়, আমি এমত অনুরোধ করিয়াছিলাম,—আমার বিবেচনায় ইহা দীনবন্ধুর লেখনীর যোগ্য হয় নাই। বোধ হয়, অন্যান্য বন্ধুগণও এইরূপ অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই জন্য ইহা অনেক দিন অপকাশ ছিল।

দীনবন্ধুর মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে “কমলেকামিনী” প্রকাশিত হইয়াছিল। যখন ইহা সাধারণে প্রচারিত হয়, তখন তিনি রুগ্নশয্যায়।

আমি দীনবন্ধুর গ্রন্থ সকলের কোন সমালোচনা করিলাম না। গ্রন্থ-সমালোচনা এ প্রবন্ধে উদ্দিষ্ট নহে; সমালোচনার সময়ও নহে। দীনবন্ধু যে সুলেখক ছিলেন, ইহা সকলেই জানেন, আমাকে বলিতে হইবে না। তিনি যে অতি সুদক্ষ রাজকর্মচারী ছিলেন, তাহাও কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু দীনবন্ধুর একটি পরিচয়ের বাকি আছে। তাঁহার সরল, অকপট, স্নেহময় হৃদয়ের পরিচয় কি প্রকারে দিব? বঙ্গদেশে আজকাল গুণবান্ ব্যক্তির অভাব নাই, সুদক্ষ কর্মচারীর অভাব নাই, সুলেখকেরও নিতান্ত অভাব নাই, কিন্তু দীনবন্ধুর অন্তঃকরণের মত অন্তঃকরণের অভাব বঙ্গদেশে কেন—মনুষ্যালোকে—চিরকাল থাকিবে। এ সংসারে ক্ষুদ্র কীট হইতে সম্মান পর্য্যন্ত সকলেরই এক স্বভাব—অহঙ্কার, অভিমান, ক্রোধ, স্বার্থপরতা, কপটতায় পরিপূর্ণ। এমন সংসারে দীনবন্ধুর ন্যায় রত্নই অমূল্য রত্ন।

সে পরিচয় দিবারই বা প্রয়োজন কি? এই বঙ্গদেশে দীনবন্ধুকে কে বিশেষ না জানে? দারাজিলিঙ্গ হইতে বরিশাল পর্য্যন্ত, কাছাড় হইতে গঙ্গাম পর্য্যন্ত, ইহার মধ্যে কয়জন ভদ্রলোক দীনবন্ধুর বন্ধুত্বমধ্যে গণ্য নহেন? কয়জন তাঁহার স্বভাবের পরিচয় না জানেন? কাহার নিকট পরিচয় দিতে হইবে?

দীনবন্ধু যেখানে না গিয়াছেন বাঙ্গালায় এমত স্থান অল্পই আছে। যেখানে গিয়াছেন সেইখানেই বন্ধু সংগ্রহ করিয়াছেন। যে তাঁহার আগমন-বার্তা শুনিত, সেই তাঁহার সহিত

দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী...সমালোচনা

আলাপের জন্য উৎসুক হইত। যে আলাপ করিত, সেই তাহার বন্ধু হইত। তাহার ন্যায় সুরাসিক লোক বঙ্গভূমে এখন আর কেহ আছে কি না বলিতে পারি না। তিনি যে সভায় বসিতেন, সেই সভায় জীবনস্বরূপ হইতেন। তাহার সরস, সুমিষ্ট কথোপকথনে সকলেই মদ্রু হইত। শ্রোতৃবর্গ, মস্মের দুঃখ সকল ভুলিয়া গিয়া, তাহার সৃষ্ট হাস্যরস-সাগরে ভাসিত। তাহার প্রণীত গ্রন্থ সকল বাঙ্গালা ভাষায় সর্বোৎকৃষ্ট হাস্যরসের গ্রন্থ বটে, কিন্তু তাহার প্রকৃত হাস্যরসপটুতার শতাংশের পরিচয় তাহার গ্রন্থে পাওয়া যায় না। হাস্যরসাবতারণায় তাহার যে পটুতা, তাহার প্রকৃত পরিচয় তাহার কথোপকথনেই পাওয়া যাইত। অনেক সময়ে, তাহাকে সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ হাস্যরস বলিয়া বোধ হইত। দেখা গিয়াছে যে, অনেকে “আর হাসিতে পারি না” বলিয়া তাহার নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছে। হাস্যরসে তিনি প্রকৃত ঐন্দ্রজালিক ছিলেন।

অনেক লোক আছে যে, নির্বোধ অথচ অত্যন্ত আত্মাভিমানী। এরূপ লোকের পক্ষে দীনবন্ধু সাক্ষাৎ যম ছিলেন। কদাচ তাহাদিগের আত্মাভিমানের প্রতিবাদ করিতেন না, বরং সেই আগুনে সাধ্যমত বাতাস দিতেন। নির্বোধ সেই বাতাসে উন্মত্ত হইয়া উঠিত। তখন তাহার রঙ্গভঙ্গ দেখিতেন। এরূপ লোক দীনবন্ধুর হাতে পড়িলে কোনরূপে নিষ্কৃতি পাইত না।

ইদানীং কয়েক বৎসর হইল, তাহার হাস্যরসপটুতা ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল। প্রায় বৎসরাধিক হইল, এক দিন তাহার কোন বিশেষ বন্ধু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “দীনবন্ধু, তোমার সে হাস্যরস কোথা গেল? তোমার রস শূন্য হইতেছে, তুমি আর অধিক কাল বাঁচবে না।” দীনবন্ধু কেবলমাত্র উত্তর করিলেন, “কে বলিল?” কিন্তু পরক্ষণেই অন্যমনস্ক হইলেন। এক দিবস আমরা একত্রে রাত্রিযাপন করি। তাহার রস-উদ্দীপন-শক্তি শূন্য হইয়াছে কি না আপনি জানিবার নিমিত্ত একবার সেই রাতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; সে চেষ্টা নিতান্ত নিষ্ফল হয় নাই। রাত্রি প্রায় আড়াই প্রহর পর্যন্ত অনেকগুলি বন্ধুকে একেবারে মদ্রু করিয়াছিলেন। তখন জানিতাম না যে সেই তাহার শেষ উদ্দীপন। তাহার পর আর কয়েক বার দিবারাত্রি একত্রে বাস করিয়াছি, কিন্তু এই রাতের ন্যায় আর তাহাকে আনন্দ-উৎফুল্ল দেখি নাই। তাহার অসাধারণ ক্ষমতা ক্রমে দুর্বল হইতেছিল। তথাপি তাহার ব্যঙ্গশক্তি একেবারে নিস্তেজ হয় নাই। মৃত্যুশয্যায় পড়িয়াও তাহা ত্যাগ করেন নাই। অনেকেই জানেন যে, তাহার মৃত্যুর কারণ বিস্ফোটক, প্রথমে একটি পৃষ্ঠদেশে হয়, তাহার কিঞ্চিৎ উপশম হইলেই আর একটি পশ্চাৎভাগে হইল। তাহার পর শেষ আর একটি বামপদে হইল। এই সময় তাহার পদ্বর্ষোক্ত বন্ধুটি কার্যস্থান হইতে তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। দীনবন্ধু অতি দূরবর্তী মেঘের ক্ষীণ বিদ্যুতের ন্যায় ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, “ফোঁড়া এখন আমার পায়ে ধরিয়াছে।”

মনুষ্যমাত্রেরই অহঙ্কার আছে;—দীনবন্ধুর ছিল না; মনুষ্যমাত্রেরই রাগ আছে;—দীনবন্ধুর ছিল না। দীনবন্ধুর কোন কথা আমার কাছে গোপন ছিল না, আমি কখন তাহার রাগ দেখি নাই। অনেক সময়ে তাহার ক্রোধাভাব দেখিয়া তাহাকে অনুযোগ করিয়াছি, তিনি রাগ করিতে পারিলেন না বলিয়া অপ্রতিভ হইয়াছেন। অথবা দুঃখ হইবার জন্য যত্ন করিয়া, শেষে নিষ্ফল হইয়া বলিয়াছেন, “কই, রাগ যে হয় না।”

তাঁহার যে কিছু ক্রোধের চিহ্ন পাওয়া যায়, তাহা জামাই-বারিকের “ভোঁতারাম ভাটে”র উপরে। যেমন অনেকে দীনবন্ধুর গ্রন্থের প্রশংসা করিতেন, তেমনি কতকগুলি লোক তাঁহার গ্রন্থের নিন্দক ছিল। যেখানে যশ, সেইখানেই নিন্দা, সংসারের ইহা নিয়ম। পৃথিবীতে যিনি যশস্বী হইয়াছেন, তিনিই সম্প্রদায়বিশেষকর্তৃক নিন্দিত হইয়াছেন। ইহার অনেক কারণ আছে। প্রথম, দোষশূন্য মনুষ্য জন্মে না; যিনি বহুগুণবিশিষ্ট, তাহার দোষগুলি, গুণসামিধ্য হেতু, কিছু অধিকতর স্পষ্ট হয়, সুতরাং লোকে তৎকর্তৃনে প্রবৃত্ত হয়। দ্বিতীয়, গুণের সঙ্গে দোষের চিরবিরোধ, দোষযুক্ত ব্যক্তিগণ গুণশালী ব্যক্তির সুতরাং শত্রু হইয়া পড়ে। তৃতীয়, কর্মক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হইলে কার্যের গতিকে অনেক শত্রু হয়; শত্রুগণ অন্য প্রকারে শত্রুতা সাধনে অসমর্থ হইলে নিন্দার দ্বারা শত্রুতা সাধে। চতুর্থ, অনেক মনুষ্যের স্বভাবই এই, প্রশংসা অপেক্ষা নিন্দা করিতে ও শূন্যতে ভালবাসে; সামান্য ব্যক্তির নিন্দার অপেক্ষা যশস্বী ব্যক্তির নিন্দা বস্তা ও শ্রোতার সুখদায়ক। পঞ্চম, ঈর্ষা মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম; অনেকে পরের যশে

বিশ্বকম রচনাবলী

অত্যন্ত কাতর হইয়া যশস্বীর নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই শ্রেণীর নিন্দকই অনেক, বিশেষ বঙ্গদেশে।

দীনবন্ধু স্বয়ং নির্বিরোধ, নিরহঙ্কার, এবং হ্রোধশূন্য হইলেও এই সকল কারণে তাঁহার অনেকগুলি নিন্দক হইয়া উঠিয়াছিল। প্রথমাবস্থায় কেহ তাঁহার নিন্দক ছিল না, কেন না, প্রথমাবস্থাতে তিনি তাদৃশ যশস্বী হইলেন নাই। যখন “নবীন তপস্বিনী” প্রচারের পর তাঁহার যশের মাত্রা পূর্ণ হইতে লাগিল, তখন নিন্দকশ্রেণী মাথা তুলিতে লাগিল। দীনবন্ধুর গ্রন্থে যথার্থই অনেক দোষ আছে,—কেহ কেহ কেবল সেই জন্যই নিন্দা করিতেন। তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই; তবে তাঁহারা যে দোষের ভাগের সঙ্গে গুণের ভাগ বিবেচনা করেন না, এই জন্যই তাঁহাদিগকে নিন্দক বলি।

অনেকে দীনবন্ধুর নিকট চাকরির উমেদারী করিয়া নিষ্ফল হইয়া সেই রাগে দীনবন্ধুর সমালোচক-শ্রেণী-মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। এ শ্রেণীস্থ নিন্দকদিগের নিন্দায় দীনবন্ধু হাসিতেন,—নিম্ন শ্রেণীর সংবাদপত্রে তাঁহার সমর্চিত ঘৃণা ছিল, ইহা বলা বাহুল্য। কিন্তু “কলিকাতা রিবিউ”র ন্যায় পত্রে কোন নিন্দা দেখিলে তিনি ক্ষুব্ধ এবং বিরক্ত হইতেন। কলিকাতা রিবিউতে সুরধনু কবীর যে সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা অন্যায় বোধ হয় না। দীনবন্ধু যে ইহাতে রাগ করিয়াছিলেন, ইহাই অন্যায়। “ভোঁতারাম ভাট” দীনবন্ধুর চরিত্রে ক্ষুদ্র কলঙ্ক!

ইহা স্পষ্ট করিয়া বলা যাইতে পারে যে, দীনবন্ধু কখন একটিও অসৎ কার্য করেন নাই। তাঁহার স্বভাব তাদৃশ তেজস্বী ছিল না বটে, বন্ধুর অনুরোধ বা সংসর্গদোষে নিন্দনীয় কার্যের কিঞ্চিৎ সংস্পর্শ তিনি সকল সময়ে এড়াইতে পারিতেন না; কিন্তু যাহা অসৎ, যাহাতে পরের অনিষ্ট আছে, যাহা পাপের কার্য, এমত কার্য দীনবন্ধু কখনও করেন নাই। তিনি অনেক লোকের উপকার করিয়াছেন, তাঁহার অনুগ্রহে বিস্তর লোকের অন্নের সংস্থান হইয়াছে।

একটি দুর্লভ সুখ দীনবন্ধুর কপালে ঘটিয়াছিল। তিনি সাধবী স্নেহশালিনী পতিপরায়ণা পত্নীর স্বামী ছিলেন। দীনবন্ধুর অল্পবয়সে বিবাহ হয় নাই। হুগলীর কিছুর উত্তর বংশবাটী গ্রামে তাঁহার বিবাহ হয়। দীনবন্ধু চিরদিন গৃহসুখে সুখী ছিলেন। দম্পতী-কলহ কখন না কখন সকল ঘরেই হইয়া থাকে, কিন্তু কস্মিন্ কালে মূহূর্ত্ত নিমিত্ত ইহাদের কথাস্তর হয় নাই। একবার কলহ করিবার নিমিত্ত দীনবন্ধু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, কিন্তু প্রতিজ্ঞা বৃথা হইয়াছিল। বিবাদ করিতে পারেন নাই। কলহ করিতে গিয়া তিনিই প্রথমে হাসিয়া ফেলেন, কি তাঁহার সহধর্ম্মিণী রাগ দেখিয়া উপহাস দ্বারা বেদখল করেন, তাহা এক্ষণে আমার স্মরণ নাই।

দীনবন্ধু আটটি সন্তান রাখিয়া গিয়াছেন।

দীনবন্ধু বন্ধুবর্গের প্রতি বিশেষ স্নেহবান্ ছিলেন। আমি ইহা বলিতে পারি যে, তাঁহার ন্যায় বন্ধুর প্রতি সংসারের একটি প্রধান সুখ। যাঁহারা তাহা হারাইয়াছেন, তাঁহাদের দুঃখ বর্ণনীয় নহে।

কবিত্ব

যে বৎসর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু হয়, সেই বৎসর মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত “তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য” রহস্যসন্দর্ভে [‘বিবিধার্থ-সংগ্রহে’?] প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। ইহাই মধুসূদনের প্রথম বাঙ্গালা কাব্য। তার পর-বৎসর দীনবন্ধুর প্রথম গ্রন্থ “নীল-দর্পণ” প্রকাশিত হয়।

সেই ১৮৫৯।৬০ সাল বাঙ্গালা সাহিত্যে চিরস্মরণীয়—উহা নতুন পুরাতনের সন্ধিস্থল। পুরাণ দলের শেষ কবি ঈশ্বরচন্দ্র অন্তিমিত, নতনের প্রথম কবি মধুসূদনের নবোদয়। ঈশ্বরচন্দ্র খাঁটি বাঙ্গালী, মধুসূদন ডাহা ইংরেজ। দীনবন্ধু ইহাদের সন্ধিস্থল। বলিতে পারা যায়, যে, ১৮৫৯।৬০ সালের মত দীনবন্ধুও বাঙ্গালা কাব্যের নতুন পুরাতনের সন্ধিস্থল।

দীনবন্ধু ঈশ্বর গুপ্তের একজন কাব্য-শিষ্য। ঈশ্বরচন্দ্রের কাব্যশিষ্যদিগের মধ্যে দীনবন্ধু গুরুর যতটা কবি-স্বভাবের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, এত আর কেহ নহে। দীনবন্ধুর হাস্যরসের যে অধিকার, তাহা গুরুর অনুকারী। বাঙ্গালীর প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে দীনবন্ধুর

দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী...সমালোচনা

কবিতার যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহাও গুরুদর অনুকারী। যে রুচির জন্য দীনবন্ধুকে অনেকে দর্শিয়া থাকেন, সে রুচিও গুরুদর।

কিন্তু কবিত্ব সম্বন্ধে গুরুদর অপেক্ষা শিষ্যকে উচ্চ আসন দিতে হইবে। ইহা গুরুদরও অগোরবের কথা নহে। দীনবন্ধুর হাস্যরসে অধিকার যে ঈশ্বর গুরুদর অনুকারী বলিয়াছি, সে কথার তাৎপর্য এই যে, দীনবন্ধু ঈশ্বর গুরুদর সঙ্গে এক জাতীয় ব্যঙ্গ-প্রণেতা ছিলেন। আগেকার দেশীয় ব্যঙ্গ-প্রণালী এক জাতীয় ছিল—এখন আর এক জাতীয় ব্যঙ্গ আমাদিগের ভালবাসা জন্মিতেছে। আগেকার লোক কিছুর মোটা কাজ ভালবাসিত; এখন সরুর উপর লোকের অনুরাগ। আগেকার রসিক, লাঠিয়ালের ন্যায় মোটা লাঠি লইয়া সজোরে শত্রুর মাথায় মারিতেন, মাথার খুলি ফাটিয়া যাইত। এখনকার রসিকেরা ডাক্তারের মত, সরুর লান্‌সেটখানি বাহির করিয়া, কখন কুচ করিয়া ব্যথার স্থানে বসাইয়া দেন, কিছুর জানিতে পারা যায় না, কিন্তু হৃদয়ের শোণিত ক্ষতমুখে বাহির হইয়া যায়। এখন ইংরেজ-শাসিত সমাজে ডাক্তারের শ্রীবৃদ্ধি—লাঠিয়ালের বড় দূরবস্থা। সাহিত্য সমাজে লাঠিয়াল আর নাই, এমন নহে—দুর্ভাগ্যক্রমে সংখ্যায় কিছুর বাড়িয়াছে, কিন্তু তাহাদের লাঠি ঘুণে ধরা, বাহুতে বল নাই, তাহারা লাঠির ভরে কাতর, শিক্ষা নাই, কোথায় মারিতে কোথায় মারে। লোক হাসায় বটে, কিন্তু হাস্যের পাত্র তাহারা স্বয়ং। ঈশ্বর গুরুদর বা দীনবন্ধু এ জাতীয় লাঠিয়াল ছিলেন না। তাহাদের হাতে পাকা বাঁশের মোটা লাঠি, বাহুতেও অমিত বল, শিক্ষাও বিচিহ্ন। দীনবন্ধুর লাঠির আঘাতে অনেক জলধর ও রাজীব মুখোপাধ্যায় জলধর বা রাজীব-জীবন পরিত্যাগ করিয়াছে।

কবির প্রধান গুণ, সৃষ্টি-কৌশল। ঈশ্বর গুরুদর এ ক্ষমতা ছিল না। দীনবন্ধুর এ শক্তি অতি প্রচুর পরিমাণে ছিল। তাহার প্রণীত জলধর, জগদম্বা, মল্লিকা, নিমচাঁদ দত্ত, প্রভৃতি এই সকল কথার উজ্জ্বল উদাহরণ। তবে, যাহা সুক্ষ্ম, কোমল, মধুর, অকৃত্রিম, করুণ, প্রশান্ত—সে সকলে দীনবন্ধুর তেমন অধিকার ছিল না। তাহার লীলাবতী, মালতী, কামিনী, সৈরিকানী, সরলা, প্রভৃতি রসজ্ঞের নিকট তাদৃশ আদরণীয়া নহে। তাহার বিনায়ক, রমণীমোহন, অরবিন্দ, ললিতমোহন মন মুগ্ধ করিতে পারে না। কিন্তু যাহা স্থূল, অসঙ্গত, অসংলগ্ন, বিপর্যস্ত, তাহা তাহার ইঙ্গিত মাত্রেরও অধীন। ওঝার ডাকে ভূতের দলের মত স্মরণমাত্র সারি দিয়া আসিয়া দাঁড়ায়।

কি উপাদান লইয়া দীনবন্ধু এই সকল চিত্র রচনা করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। বিস্ময়ের বিষয়, বাঙ্গালা সমাজ সম্বন্ধে দীনবন্ধুর বহুদর্শিতা। সকল শ্রেণীর বাঙ্গালির দৈনিক জীবনের সকল খবর রাখে, এমন বাঙ্গালী লেখক আর নাই। এ বিষয়ে বাঙ্গালী লেখকদিগের এখন সাধারণতঃ বড় শোচনীয় অবস্থা। তাহাদিগের অনেকেরই লিখবার যোগ্য শিক্ষা আছে, লিখবার শক্তি আছে, কেবল যাহা জানিলে তাহাদের লেখা সার্থক হয় তাহা জানা নাই। তাহারা অনেকেই দেশবৎসল, দেশের মঙ্গলার্থ লেখেন, কিন্তু দেশের অবস্থা কিছুরই জানেন না। কলিকাতার ভিতর স্বশ্রেণীর লোকে কি করে, ইহাই অনেকের স্বদেশ সম্বন্ধীয় জ্ঞানের সীমা। কেহ বা অতিরিক্ত দুই চারিখানি পল্লীগাম, বা দুই একটা ক্ষুদ্র নগর দেখিয়াছেন, কিন্তু সে বর্ষ কেবল পথ ঘাট, বাগান বাগিচা, হাট বাজার। লোকের সঙ্গে মিলেন নাই। দেশ সম্বন্ধীয় তাহাদের যে জ্ঞান তাহা সচরাচর সম্বাদপত্র হইতে প্রাপ্ত। সম্বাদপত্র লেখকেরা আবার সচরাচর (সকলে নহেন) ঐ শ্রেণীর লেখক—ইংরেজেরা ত বটেই। কাজেই তাহাদের কাছেও দেশ সম্বন্ধীয় যে জ্ঞান পাওয়া যায়, তাহা দার্শনিকদিগের ভাষায় রঞ্জুতে সর্পজ্ঞানবৎ ভ্রম জ্ঞান বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। এমন বলিতেছি না যে, কোন বাঙ্গালী লেখক গ্রাম্য প্রদেশ ভ্রমণ করেন নাই। অনেকে করিয়াছেন, কিন্তু লোকের সঙ্গে মিশিয়াছেন কি? না মিশিলে, যাহা জানিয়াছেন তাহার মূল্য কি?

বাঙ্গালী লেখকদিগের মধ্যে দীনবন্ধুই এ বিষয়ে সর্বোচ্চ স্থান পাইতে পারেন। দীনবন্ধুকে রাজকার্য্যানুরোধে, মণিপুর হইতে গঙ্গাম পর্যন্ত, দার্জিলিং হইতে সমুদ্র পর্যন্ত, পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। কেবল পথ ভ্রমণ বা নগর দর্শন নহে, ডাকঘর দেখিবার জন্য গ্রামে গ্রামে যাইতে হইত। লোকের সঙ্গে মিশিবার তাহার অসাধারণ শক্তি ছিল। তিনি আহ্লাদ-পূর্বক সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিতেন। ক্ষেত্রমণির মত গ্রাম্য প্রদেশের ইতর লোকের

বিশ্বকম রচনাবলী

কন্যা, আদুরীর মত গ্রাম্য বর্ষীয়সী, তোরাবে মত গ্রাম্য প্রজা, রাজীবের মত গ্রাম্য বৃদ্ধ, নশীরাম ও রতার মত গ্রাম্য বালক, পক্ষান্তরে নিমচাঁদের মত সহুরে শিক্ষিত মাতাল, অটলের মত নগরবিহারী গ্রাম্য বাবু, কাণ্ডনের মত মনুষ্যশোণিতপায়িনী নগরবাসিনী রাক্ষসী, নদেরচাঁদ হেমচাঁদের মত “উনপাঁজুরে বরাখুরে” হাপ পাড়াগেয়ে হাপ সহুরে বসাতে ছেলে, ঘটীরামের মত ডিপটুটি, নীলকুঠির দেওয়ান, আমীন তাগাদগীর, উড়ে বেহারা, দুলে বেহারা, পেঁচোর মা কাওরাণীর মত লোকের পর্য্যন্ত তিনি নাড়ী নক্ষত্র জানিতেন। তাহারা কি করে, কি বলে, তাহা ঠিক জানিতেন। কলমের মুখে তাহা ঠিক বাহির করিতে পারিতেন,—আর কোন বাঙ্গালী লেখক তেমন পারে নাই। তাঁহার আদুরীর মত অনেক আদুরী আমি দেখিয়াছি—তাহারা ঠিক আদুরী। নদেরচাঁদ হেমচাঁদ আমি দেখিয়াছি, তাহারা ঠিক নদেরচাঁদ বা হেমচাঁদ। মল্লিকা দেখা গিয়াছে,—ঠিক অমনি ফুটন্ত মল্লিকা। দীনবন্ধু অনেক সময়েই শিক্ষিত ভাস্কর বা চিত্রকরের ন্যায় জীবিত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চরিত্রগুলি গঠিতেন। সামাজিক বৃক্ষে সামাজিক বানর সমারূঢ় দেখিলেই, অমনি তুলি ধরিয়া তাহার লেজশুদ্ধ আঁকিয়া লইতেন। এটুকু গেল তাঁহার Realism, তাহার উপর Idealize করিবারও বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল। সম্মুখে জীবন্ত আদর্শ রাখিয়া, আপনার স্মৃতির ভান্ডার খুলিয়া, তাহার ঘাড়ের উপর অন্যের গুণ দোষ চাপাইয়া দিতেন। যেখানে যেটি সাজে, তাহা বসাইতে জানিতেন। গাছের বানরকে এইরূপ সাজাইতে সাজাইতে সে একটা হনুমান বা জাম্বুবানে পরিণত হইত। নিমচাঁদ, ঘটীরাম, ভোলাচাঁদ প্রভৃতি বন্য জন্তুর এইরূপ উৎপত্তি। এই সকল সৃষ্টির বাহুল্য ও বৈচিত্র্য বিবেচনা করিলে, তাঁহার অভিজ্ঞতা বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয়।

কিন্তু কেবল অভিজ্ঞতায় কিছুর হয় না, সহানুভূতি ভিন্ন সৃষ্টি নাই। দীনবন্ধুর সামাজিক অভিজ্ঞতাই বিস্ময়কর নহে—তাঁহার সহানুভূতিও অতিশয় তীব্র। বিস্ময় এবং বিশেষ প্রশংসার কথা এই যে, সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গেই তাঁহার তীব্র সহানুভূতি। গরিব দঃখীর দঃখের মর্ম বঝিতে এমন আর কাহাকে দেখি না। তাই দীনবন্ধু অমন একটা তোরাপ কি রাইচরণ, একটা আদুরী কি রেবতী লিখিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই তীব্র সহানুভূতি কেবল গরিব দঃখীর সঙ্গে নহে; ইহা সর্বব্যাপী। তিনি নিজে পবিত্রচারিত্র ছিলেন, কিন্তু দঃখচারিত্রের দঃখ বঝিতে পারিতেন। দীনবন্ধুর পবিত্রতার ভান ছিল না। এই বিশ্বব্যাপী সহানুভূতির গুণেই হউক বা দোষেই হউক, তিনি সর্বস্থানে যাইতেন, শুদ্ধাত্মা পাপাত্মা সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিতেন। কিন্তু অগ্নিমধ্যস্থ অদাহ্য শিলার ন্যায় পাপাগ্নি কুণ্ডেও আপনার বিশুদ্ধি রক্ষা করিতেন। নিজে এই প্রকার পবিত্রচেতা হইয়াও সহানুভূতি শক্তির গুণে তিনি পাপিষ্ঠের দঃখ পাপিষ্ঠের ন্যায় বঝিতে পারিতেন। তিনি নিমচাঁদ দত্তের ন্যায় বিশুদ্ধ-জীবন-সুখ বিফলীকৃতশিক্ষা, নৈরাশ্যপীড়িত মদ্যপের দঃখ বঝিতে পারিতেন, বিবাহ বিষয়ে ভগ্ন-মনোরথ রাজীব মুখোপাধ্যায়ের দঃখ বঝিতে পারিতেন, গোপীনাথের ন্যায় নীলকরের আঞ্জাবান্তিতার যন্ত্রণা বঝিতে পারিতেন। দীনবন্ধুকে আমি বিশেষ জানিতাম; তাঁহার হৃদয়ের সকল ভাগই আমার জানা ছিল। আমার এই বিশ্বাস, এরূপ পরদঃখকাতর মনুষ্য আর আমি দেখিয়াছি কি না সন্দেহ। তাঁহার গ্রন্থেও সেই পরিচয় আছে।

কিন্তু এ সহানুভূতি কেবল দঃখের সঙ্গে নহে; সুখ দঃখ রাগ দ্বेष সকলেরই সঙ্গে তুল্য সহানুভূতি। আদুরীর বাউটি পৈছার সুখের সঙ্গে সহানুভূতি, তোরাপের রাগের সঙ্গে সহানুভূতি, ভোলাচাঁদ যে শূভ কারণ বশতঃ স্বশুরবাড়ী যাইতে পারে না, সে সুখের সঙ্গেও সহানুভূতি। সকল কবিই এ সহানুভূতি চাই। তা নহিলে কেহই উচ্চ শ্রেণীর কবি হইতে পারেন না। কিন্তু অন্য কবিদিগের সঙ্গে ও দীনবন্ধুর সঙ্গে একটু প্রভেদ আছে। সহানুভূতি প্রধানতঃ কল্পনাশক্তির ফল। আমি আপনাকে ঠিক অন্যের স্থানে কল্পনার দ্বারা বসাইতে পারিলেই তাহার সঙ্গে আমার সহানুভূতি জন্মে। যদি তাহাই হয় তবে এমন হইতে পারে যে অতি নিশ্চর নিষ্ঠুর ব্যক্তিও কল্পনাশক্তির বল থাকিলে কাব্য প্রণয়ন কালে দঃখীর সঙ্গে আপনার সহানুভূতি জন্মাইয়া লইয়া কাব্যের উদ্দেশ্য সাধন করেন। কিন্তু আবার এমন শ্রেণীর লোকও আছেন, যে, দয়া প্রভৃতি কোমল বৃত্তি সকল তাঁহাদের স্বভাবে এত প্রবল যে, সহানুভূতি তাঁহাদের স্বতঃসিদ্ধ, কল্পনার সাহায্যের অপেক্ষা করে না। মনস্তত্ত্ববিদেরা বলিবেন, এখানেও কল্পনাশক্তি লুকাইয়া কাজ করে, তবে সে কার্য এমন অভ্যস্ত, বা শীঘ্র সম্পাদিত যে, আমরা

দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী...সমালোচনা

বুঝিতে পারি না যে এখানেও কল্পনা বিরাজমান। তাই না হয় হইল, তথাপিও একটা প্রভেদ হইল। প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকের সহানুভূতি তাঁহাদের ইচ্ছা বা চেষ্টার অধীন, দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের সহানুভূতি তাঁহাদের ইচ্ছাধীন নহে, তাঁহারা সহানুভূতির অধীন। এক শ্রেণীর লোক যখন মনে করেন, তখনই সহানুভূতি আসিয়া উপস্থিত হয়, নহিলে সে আসিতে পারে না; সহানুভূতি তাঁহাদের দাসী। অপর শ্রেণীর লোকেরা নিজেই সহানুভূতির দাস, তাঁহারা তাকে চান বা না চান, সে আসিয়া ঘাড়ে চাপিয়াই আছে, হৃদয় ব্যাপিয়া আসন পাতিয়া বিরাজ করিতেছে। প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকের কল্পনাশক্তি বড় প্রবল; দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের প্রীতি দয়াদি বৃত্তি সকল প্রবল।

দীনবন্ধু এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক ছিলেন। তাঁহার সহানুভূতি তাঁহার অধীন বা আয়ত্ত নহে; তিনিই নিজে সহানুভূতির অধীন। তাঁহার সর্বব্যাপী সহানুভূতি তাঁহাকে যখন যে পথে লইয়া যাইত, তখন তাহাই করিতে বাধ্য হইতেন। তাঁহার গ্রন্থে যে রুচির দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, বোধ হয়, এখন তাহা আমরা বুঝিতে পারিব। তিনি নিজে সুশিক্ষিত, এবং নিম্মলচরিত্র, তথাপি তাঁহার গ্রন্থে যে রুচির দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার প্রবলা, দুর্দমনীয়া সহানুভূতিই তাহার কারণ। যাহার সঙ্গে তাঁহার সহানুভূতি, যাহার চরিত্র আঁকিতে বাসিয়াছেন, তাহার সমুদায় অংশই তাঁহার কলমের আগায় আসিয়া পড়িত! কিছুর বাদসাদ দিবার তাঁহার শক্তি ছিল না, কেন না তিনি সহানুভূতির অধীন, সহানুভূতি তাঁহার অধীন নহে। আমরা বলিয়াছি যে, তিনি জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চরিত্র প্রণয়নে নিযুক্ত হইতেন। সেই জীবন্ত আদর্শের সঙ্গে সহানুভূতি হইত বলিয়াই তিনি তাহাকে আদর্শ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার উপর আদর্শের এমনই বল যে, সেই আদর্শের কোন অংশ ত্যাগ করিতে পারিতেন না। তোরাপের সৃষ্টিকালে তোরাপ যে ভাষায় রাগ প্রকাশ করে, তাহা বাদ দিতে পারিতেন না। আদুরীর সৃষ্টিকালে আদুরী যে ভাষায় রহস্য করে, তাহা বাদ দিতে পারিতেন না। নিমচাঁদ গড়িবার সময়ে, নিমচাঁদ যে ভাষায় মাতলামি করে, তাহা ছাড়িতে পারিতেন না। অন্য কবি হইলে সহানুভূতির সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করিত,—বলিত,—“তুমি আমাকে তোরাপের বা আদুরীর বা নিমচাঁদের স্বভাব চরিত্র বুঝাইয়া দাও—কিন্তু ভাষা আমার পছন্দমত হইবে,—ভাষা তোমার কাছে লইব না।” কিন্তু দীনবন্ধুর সাধ্য ছিল না, সহানুভূতির সঙ্গে কোন প্রকার বন্দোবস্ত করেন। সহানুভূতি তাঁহাকে বলিত, “আমার হুকুম—সবটুকু লইতে হইবে—মায় ভাষা। দেখিতেছ না যে, তোরাপের ভাষা ছাড়িলে, তোরাপের রাগ আর তোরাপের রাগের মত থাকে না, আদুরীর ভাষা ছাড়িলে আদুরীর তামাসা আর আদুরীর তামাসার মত থাকে না, নিমচাঁদের ভাষা ছাড়িলে নিমচাঁদের মাতলামি আর নিমচাঁদের মাতলামির মত থাকে না? সবটুকু দিতে হবে।” দীনবন্ধুর সাধ্য ছিল না যে বলেন—যে “না তা হইবে না।” তাই আমরা একটা আস্ত তোরাপ, আস্ত নিমচাঁদ, আস্ত আদুরী দেখিতে পাই। রুচির মুখ রক্ষা করিতে গেলে, ছেঁড়া তোরাপ, কাটা আদুরী, ভাঙ্গা নিমচাঁদ আমরা পাইতাম।

আমি এমন বলিতেছি না যে, দীনবন্ধু যাহা করিয়াছেন, বেশ করিয়াছেন। গ্রন্থে রুচির দোষ না ঘটে, ইহা সর্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়, তাহাতে সংশয় কি? আমি যে কয়টা কথা বলিলাম তাহার উদ্দেশ্য প্রশংসা বা নিন্দা নহে। মানুষটা বুঝানই আমার উদ্দেশ্য। দীনবন্ধুর রুচির দোষ তাঁহার ইচ্ছায় ঘটে নাই, তাঁহার তীর সহানুভূতির গুণেই ঘটিয়াছে। গুণেও দোষ জন্মে, ইহা সকলেই জানে। কথাটায় আমরা মানুষটা বুঝিতে পারিতেছি। গ্রন্থ ভাল হউক আর মন্দ হউক, মানুষটা বড় ভালবাসিবার মানুষ। তাঁহার জীবনেও তাই দেখিয়াছি। দীনবন্ধুকে যত লোক ভালবাসিত, আর কোন বাঙ্গালীকে যে তত লোকে ভালবাসিয়াছে, এমন আমি কখন দেখি নাই বা শুনি নাই। সেই সর্বব্যাপিনী তীর সহানুভূতিই তাহার কারণ।

দীনবন্ধুর এই দুইটি গুণ—(১) তাঁহার সামাজিক অভিজ্ঞতা, (২) তাঁহার প্রবল এবং স্বাভাবিক সর্বব্যাপী সহানুভূতি, তাঁহার কাব্যের গুণ দোষের কারণ—এই তত্ত্বটি বুঝান এই সমালোচনার প্রধান উদ্দেশ্য। আমি ইহাও বুঝাইতে চাই যে, যেখানে এই দুইটির মধ্যে একটির অভাব হইয়াছে, সেইখানেই তাঁহার কবিত্ব নিষ্ফল হইয়াছে। যাহারা তাঁহার প্রধান নায়ক নায়িকা (hero এবং heroine), তাহাদিগের চরিত্র যে তেমন মনোহর হয় নাই, ইহাই তাহার কারণ। আদুরী বা তোরাপ জীবন্ত চিত্র, কামিনী বা লীলাবতী, বিজয় বা ললিতমোহন সেরূপ নয়।

বাংকম রচনাবলী

আদুরী বা তোরাপের বেলা তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ ভাষা পর্যন্ত আনিয়া কবির কলমের আগায় বসাইয়া দিয়াছিল; কামিনী বা বিজয়ের বেলা, লীলাবতী বা ললিতের বেলা, চরিত্র ও ভাষা উভয় বিকৃত কেন? যদি তাঁহার সহানুভূতি স্বাভাবিক এবং সর্বব্যাপী, তবে এখানে সহানুভূতি নিষ্ফল কেন? কথাটা বুঝা সহজ। এখানে অভিজ্ঞতার অভাব। প্রথমে নায়িকাদের কথা ধর। লীলাবতী বা কামিনীর শ্রেণীর নায়িকা সম্বন্ধে তাঁহার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। ছিল না, কেন না, কোন লীলাবতী বা কামিনী বাঙ্গালা সমাজে ছিল না বা নাই। হিন্দুর ঘরে ধেড়ে মেয়ে, কোর্টশিপের পাত্রী হইয়া, যিনি কোর্ট করিতেছেন, তাঁহাকে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া বসিয়া আছে, এমন মেয়ে বাঙ্গালী সমাজে ছিল না—কেবল আজকাল নাকি দুই একটা হইতেছে শুনিতোছি। ইংরেজের ঘরে তেমন মেয়ে আছে; ইংরেজ কন্যা-জীবনই তাই। আর্মাদিগের দেশের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থেও তেমন আছে। দীনবন্ধু ইংরেজি ও সংস্কৃত নাটক নবেল ইত্যাদি পড়িয়া এই ভ্রমে পড়িয়াছিলেন যে, বাঙ্গালা কাব্যে বাঙ্গালার সমাজস্থিত নায়ক নায়িকাকেও সেই ছাঁচে ঢালা চাই। কাজেই যাহা নাই, যাহার আদর্শ সমাজে নাই, তিনি তাই গড়িতে বসিয়াছিলেন। এখন, আমি ইহাও বুঝাইয়াছি যে, তাঁহার চরিত্র প্রণয়ন প্রথা এই ছিল যে, জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চিত্রকরের ন্যায় চিত্র আঁকিতেন। এখানে জীবন্ত আদর্শ নাই, কাজেই ইংরেজি ও সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যগত মৃৎপদতুলগুণি দেখিয়া, সে চরিত্র গঠন করিতে হইত। জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে নাই, কাজেই সে সর্বব্যাপিনী সহানুভূতিও সেখানে নাই। কেন না, সর্বব্যাপিনী সহানুভূতিও জীবন্ত ভিন্ন জীবনহীনকে ব্যাপ্ত করিতে পারে না—জীবনহীনের সঙ্গে সহানুভূতির কোন সম্বন্ধ নাই। এখানে পাঠক দেখিলেন যে, দীনবন্ধুর সামাজিক অভিজ্ঞতাও নাই—স্বাভাবিক সহানুভূতিও নাই। এই দুইটি লইয়াই দীনবন্ধুর কবিত্ব। কাজেই এখানে কবিত্ব নিষ্ফল।

যেখানে দীনবন্ধুর প্রধান নায়িকা কোর্টশিপের পাত্রী নহে—যথা সৈরিক্রী—সেখানেও দীনবন্ধু জীবন্ত আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া পুস্তকগত আদর্শ অবলম্বন করিয়াছেন। কাজেই সেখানেও নায়িকার চরিত্র স্বাভাবিক হইতে পায় নাই।

দীনবন্ধুর নায়কদিগের সম্বন্ধে ঐরূপ কথা বলা যাইতে পারে। দীনবন্ধুর নায়কগুণি সর্বগুণসম্পন্ন বাঙ্গালী যুব—কাজ কর্ম্ম নাই, কাজ কর্ম্মের মধ্যে কাহারও Philanthropy, কাহারও কোর্টশিপ। ঐরূপ চরিত্রের জীবন্ত আদর্শ বাঙ্গালা সমাজেই নাই, কাজেই এখানেও অভিজ্ঞতা নাই, সহানুভূতি নাই। কাজেই এখানেও দীনবন্ধুর কবিত্ব নিষ্ফল।

যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া দীনবন্ধু জলধর বা জগদম্বা বা নিমচাঁদের চরিত্র প্রণীত করিয়াছিলেন, যদি এখানে সেই প্রথা অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলেও এখানে তাঁহার কবিত্ব সফল হইত। যদি একত্রে, একাধারে বাঞ্ছনীয় আদর্শ পাইলেন না, তবে বহুসংখ্যক জীবন্ত আদর্শের অংশবিশেষ বাছিয়া লইয়া যদি বিন্যস্ত করিতেন, তাহা হইলেও এখানেও কবিত্ব সফল হইত। তাঁহার সে শক্তি যে বিলক্ষণ ছিল, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। বোধ হয়, তাঁহার চিত্তের উপর ইংরেজি সাহিত্যের আধিপত্য বেশী হইয়াছিল বলিয়াই এ স্থলে সে পথে যাইতে ইচ্ছা করেন নাই। পক্ষান্তরে ভিন্ন প্রকৃতির কবি অর্থাৎ যাঁহাদের সহানুভূতি কল্পনার অধীনা, স্বাভাবিকী নহে, তাঁহারা এমন স্থলে কল্পনার বলে সেই জীবনহীন আদর্শকে জীবন্ত করিয়া, সহানুভূতিকে জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়া বসাইয়া, একটা নবীনমাধব বা লীলাবতীর চরিত্রকে জীবন্ত করিতে পারিতেন। সেক্ষপীয়র অবলীলাক্রমে জীবন্ত Caliban বা জীবন্ত Ariel সৃষ্টি করিয়াছেন, কালিদাস অবলীলাক্রমে উমা বা শকুন্তলার সৃষ্টি করিয়াছেন। এখানে সহানুভূতি কল্পনার আজ্ঞাকারিণী।

দীনবন্ধুর এই অলৌকিক সমাজজ্ঞতা এবং তাঁর সহানুভূতির ফলেই তাঁহার প্রথম নাটক প্রণয়ন। যে সকল প্রদেশে নীল প্রস্তুত হইত, সেই সকল প্রদেশে তিনি অনেক ভ্রমণ করিয়াছিলেন। নীলকরের তাৎকালিক প্রজাপীড়ন সর্বিস্তারে স্বক্ষণে অবগত হইয়াছিলেন। এই প্রজাপীড়ন তিনি যেমন জানিয়াছিলেন, এমন আর কেহই জানিতেন না। তাঁহার স্বাভাবিক সহানুভূতির বলে সেই পীড়িত প্রজাদিগের দুঃখ তাঁহার হৃদয়ে আপনার ভোগ্য দুঃখের ন্যায় প্রতীয়মান হইল, কাজেই হৃদয়ের উৎস কবিকে লেখনীমুখে নিঃসৃত করিতে হইল। নীলদর্পণ বাঙ্গালার Uncle Tom's Cabin. “টম্ কাকার কুটীর” আমেরিকার কার্ফ্রিদিগের দাসত্ব

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহ—ভূমিকা

ঘুচাইয়াছে; নীলদর্পণ, নীল দাসদিগের দাসত্ব মোচনের অনেকটা কাজ করিয়াছে। নীলদর্পণে, গ্রন্থকারের অভিজ্ঞতা এবং সহানুভূতি পূর্ণ মাত্রায় যোগ দিয়াছিল বলিয়া, নীল-দর্পণ তাঁহার প্রণীত সকল নাটকের অপেক্ষা শক্তিশালী। অন্য নাটকের অন্য গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু নীল-দর্পণের মত শক্তি আর কিছুতেই নাই। তাঁর আর কোন নাটকই পাঠককে বা দর্শককে তাদৃশ বশীভূত করিতে পারে না। বাঙ্গালা ভাষায় এমন অনেকগুলি নাটক নবেল বা অন্যবিধ কাব্য প্রণীত হইয়াছে, যাহার উদ্দেশ্য সামাজিক অনিষ্টের সংশোধন। প্রায়ই সেগুলি কাব্য্যাংশে নিকৃষ্ট, তাহার কারণ কাব্যের মূখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্যসৃষ্টি! তাহা ছাড়িয়া, সমাজ সংস্করণকে মূখ্য উদ্দেশ্য করিলে কাজেই কবিত্ব নিষ্ফল হয়। কিন্তু নীলদর্পণের মূখ্য উদ্দেশ্য এবম্বিধ হইলেও কাব্য্যাংশে তাহা উৎকৃষ্ট। তাহার কারণ এই যে, গ্রন্থকারের মোহময়ী সহানুভূতি সকলই মাধুর্য্যময় করিয়া তুলিয়াছে।

উপসংহারে আমার কেবল ইহাই বক্তব্য যে, আমি দীনবন্ধুর কবিত্বের দোষ-গুণের যে উৎপত্তিস্থল নির্দিষ্ট করিলাম, ইহা তাঁহার গ্রন্থ হইতেই যে পাইয়াছি, এমন নহে। বহি পড়িয়া একটা আন্দাজ Theory খাড়া করিয়াছি, এমন নহে। গ্রন্থকারের হৃদয় আমি বিশেষ জানিতাম, তাই এ কথা বলিয়াছি ও বলিতে পারিয়াছি। যাহা গ্রন্থকারের হৃদয়ে পাইয়াছি, গ্রন্থেও তাহা পাইয়াছি বলিয়া এ কথা বলিলাম। গ্রন্থকারকে না জানিলে, তাঁহার গ্রন্থ এরূপে বঝিতে পারিতাম কি না বলিতে পারি না। অন্যে, যে গ্রন্থকারের হৃদয়ের এমন নিকটে স্থান পায় নাই, সে বলিতে পারিত কি না, জানি না। কথাটা দীনবন্ধুর গ্রন্থের পাঠকমণ্ডলীকে বঝাইয়া বলিব, ইহা আমার বড় সাধ ছিল। দীনবন্ধুর স্নেহ ও প্রীতি ঋণের যতটুকু পারি পরিশোধ করিব, এই বাসনা ছিল। তাই, এই সমালোচনা লিখিবার জন্য আমি তাঁহার পুত্রদিগের নিকট উপযাচক হইয়াছিলাম। দীনবন্ধুর গ্রন্থের প্রশংসা বা নিন্দা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। কেবল, সেই অসাধারণ মনুষ্য কিসে অসাধারণ ছিলেন, তাহাই বঝান আমার উদ্দেশ্য।

শ্রীবাঁকমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব

উপক্রমণিকা

বাঙ্গালা সাহিত্যে আর যাহারই অভাব থাকুক, কবিতার অভাব নাই। উৎকৃষ্ট অভাব নাই—বিদ্যাপতি হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত অনেক সুকবি বাঙ্গালায় জন্ম গ্রহণ অনেক উত্তম কবিতা লিখিয়াছেন, বলিতে গেলে বরং বলিতে হয় যে, বাঙ্গালা সাহিত্য, কাব্যরাশি ভারে কিছু পীড়িত। তবে আবার ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ করিয়া সে বোঝা আরও ভারি করি কেন? সেই কথাটা আগে বঝাই।

প্রবাদ আছে যে, গরিব বাঙ্গালীর ছেলে সাহেব হইয়া, মোচার ঘণ্টে অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন। সামগ্রীটা কি এ? বহুকণ্ঠে পিসীমা তাঁহাকে সামগ্রী বঝাইয়া দিলে, তিনি স্থির করিলেন যে, এ “কেলা কা ফুল”। রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া যায় যে, এখন আমরা সকলেই মোচা ভুলিয়া কেলা কা ফুল বলিতে শিখিয়াছি। তাই আজ ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ করিতে বসিয়াছি। আর যেই কেলা কা ফুল বলুক, ঈশ্বর গুপ্ত মোচা বলেন।

একদিন বর্ষাকালে গঙ্গাতীরস্থ কোন ভবনে বসিয়াছিলাম। প্রদোষকাল—প্রস্ফুটিত চন্দ্রালোকে বিশাল বিস্তীর্ণ ভাগীরথী লক্ষবীচিবিক্ষেপশালিনী—মৃদু পবনহিল্লোলে তরঙ্গভঙ্গ-চঞ্চল চন্দ্রকরমালা লক্ষ তারকার মত ফুটিতেছিল ও নিব্বিতেছিল। যে বারেডায় বসিয়াছিলাম তাহার নীচে দিয়া বর্ষার তীরগামী বারিরাশি মৃদু রব করিয়া ছুটিতেছিল। আকাশে নক্ষত্র, নদীবক্ষে নৌকায় আলো, তরঙ্গে চন্দ্ররশ্মি! কাব্যের রাজ্য উপস্থিত হইল। মনে করিলাম, কবিতা পড়িয়া মনের তৃপ্ত সাধন করি। ইংরেজি কবিতায় তাহা হইল না—ইংরেজির সঙ্গে এ ভাগীরথীর ত কিছুই মিলে না। কালিদাস ভবভূতিও অনেক দূরে।

বিশ্বকম রচনাবলী

মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র কাহাতেও তৃপ্ত হইল না। চুপ করিয়া রহিলাম। এমন সময়ে গঙ্গাবক্ষ হইতে মধুর সঙ্গীতধ্বনি শূনা গেল। জেলে জাল বাহিতে বাহিতে গায়িতেছে—

“সাধো আছে মা মনে।
দুর্গা বলে প্রাণ ত্যজিব,
জাহ্নবী-জীবনে।”

তখন প্রাণ জুড়াইল—মনের সুদ মিলিল—বাজালা ভাষায়—বাজালীর মনের আশা শূন্যে পাইলাম—এ জাহ্নবী-জীবন দুর্গা বলিয়া প্রাণ ত্যজিবাহই বটে, তাহা বদ্বিলাম। তখন সেই শোভাময়ী জাহ্নবী, সেই সৌন্দর্য্যময় জগৎ, সকলই আপনার বলিয়া বোধ হইল—এতক্ষণ পরের বলিয়া বোধ হইতেছিল।

সেইরূপ, আজকার দিনের অভিনব এবং উন্নতির পথে সমারূঢ় সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট বাজালা সাহিত্য দেখিয়া অনেক সময়ে বোধ হয়—হোক সুন্দর, কিন্তু এ বদ্বি পরের—আমাদের নহে। খাঁটি বাজালী কথায়, খাঁটি বাজালীর মনের ভাব ত খুঁজিয়া পাই না। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এখানে সব খাঁটি বাজালা। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষিত বাজালীর কবি—ঈশ্বর গুপ্ত বাজালীর কবি। এখন আর খাঁটি বাজালী কবি জন্মে না—জন্মবার যো নাই—জন্মিয়া কাজ নাই। বাজালার অবস্থা আবার ফিরিয়া অবনতির পথে না গেলে খাঁটি বাজালী কবি আর জন্মিতে পারে না। আমরা “বৃত্তসংহার” পরিত্যাগ করিয়া “পৌষপার্শ্বণ” চাই না। কিন্তু তবু বাজালীর মনে পৌষপার্শ্বণে যে একটা সুখ আছে—বৃত্তসংহারে তাহা নাই। পিঠা পুর্লিতে যে একটা সুখ আছে, শচীর বিশ্বাধর-প্রতিবিস্মিত সুখায় তাহা নাই। সে জিনিষটা একেবারে আমাদের ছাড়িলে চলবে না; দেশশুদ্ধ জোনসু, গমিসের তৃতীয় সংস্করণে পরিণত হইলে চলবে না। বাজালী নাম রাখিতে হইবে। জননী জন্মভূমিকে ভালবাসিতে হইবে। যাহা মার প্রসাদ, তাহা যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিতে হইবে। এই দেশী জিনিষগুলি মার প্রসাদ। এই খাঁটি বাজালাটি, এই খাঁটি দেশী কথাগুলি মার প্রসাদ। মার প্রসাদে পেট না ভরে, বিলাতী বাজার হইতে কিনিয়া খাইতে পারি—কিন্তু মার প্রসাদ ছাড়িব না। এই কবিতাগুলি মার প্রসাদ। তাই সংগ্রহ করিলাম।

এই সংগ্রহের জন্য বাবু গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ই পাঠকের ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহার উদ্যোগ ও পরিশ্রম ও যত্নই ইহা সম্পন্ন হইয়াছে। ইহাতে যে পরিশ্রম আবশ্যিক তাহা আমাকে করিতে হইলে, আমি কখন পারিয়া উঠিতাম না।

এক্ষণে পাঠককে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের যে জীবনী উপহার দিতেছি, তাহার জন্যও ধন্যবাদ গোপাল বাবুরই প্রাপ্য। তাঁহার জীবনী সংগ্রহ করিয়া গোপাল বাবু আমাকে কতকগুলি নোট দিয়াছিলেন। আমি সেই নোটগুলি অবলম্বন করিয়া এই জীবনী সংকলন করিয়াছি। গোপালবাবু নিজে সুলেখক, এবং বাজালা সাহিত্যসংসারে সুপরিচিত। তাঁহার নোটগুলি এরূপ পরিপাটী যে, আমি তাহাতে কাটাকুটি বড় কিছু করি নাই, কেবল আমার নিজের বক্তব্যের সঙ্গে গাঁথিয়া দিয়াছি। প্রথম পরিচ্ছেদটি বিশেষতঃ এই প্রণালীতে লিখিত। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, গোপাল বাবুর নোটগুলি প্রায় বজায় রাখিয়াছি—আর কিছুই গাঁথিতে হয় নাই। তৃতীয় পরিচ্ছেদের জন্য আমি একাই সম্পূর্ণরূপে দায়ী।

এই কথাগুলি বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, গোপাল বাবুই এই সংগ্রহ ও জীবনী জন্য আমার ও সাধারণের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ—বাল্য ও শিক্ষা

প্রয়াগে যুক্তবেণী—বাজালার ধান্যক্ষেত্র মধ্যে যুক্তবেণী—কলিকাতার ১৫ ফ্রোশ উত্তরে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী ত্রিপথগামিনী হইয়াছেন। যেখানে এই পবিত্র তীর্থস্থান, তাহার পশ্চিম পারশ্ব গ্রামের নাম “দ্বিবেণী”—পূর্বে পারশ্বিত গ্রামের নাম “কাঞ্চনপল্লী” বা কাঁচরাপাড়া।

কাঁচরাপাড়ার দক্ষিণে কুমারহট্ট, কুমারহট্টের দক্ষিণে গৌরীভা বা গরিফা। এই তিন গ্রামে অনেক বৈদ্যের বাস। এই বৈদ্যদিগের মধ্যে অনেকেই বাজালার মূখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহ—ভূমিকা

গরিফার গৌরব রামকমল সেন, কেশবচন্দ্র সেন, কৃষ্ণবিহারী সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।
কুমারহট্টের গৌরব কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ। কাঁচরাপাড়ার একটি অলঙ্কার ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।*

কাঁচরাপাড়া গ্রামে রামচন্দ্র দাস একটি বৈদ্যবংশের আদি পুরুষ। তাঁহার একমাত্র পুত্রের নাম রামগোবিন্দ। রামগোবিন্দের দুই পুত্র, (১) বিজয়রাম, (২) নিধিরাম। বিজয়রাম পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল। সেই জন্য তিনি বাচস্পতি উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার একটি টোল ছিল, তথায় অনেক ছাত্র সংস্কৃত, সাহিত্য, ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি তাঁহার নিকট শিক্ষা করিত। তিনি সংস্কৃত ভাষায় কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, কিন্তু তাহা প্রকাশিত হয় নাই।

কনিষ্ঠ নিধিরাম, আয়ুর্ষেদ চিকিৎসা শাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কবিভূষণ উপাধি পাইয়াছিলেন। নিধিরামের তিনটি পুত্র জন্মে, (১) বৈদ্যনাথ, (২) ভোলানাথ এবং (৩) গোপীনাথ।

গোপীনাথের প্রথম পক্ষের দ্বিতীয় পুত্র হরিনারায়ণ দাসের ঔরসে শ্রীমতী দেবীর গর্ভে (১) গিরিশচন্দ্র, (২) ঈশ্বরচন্দ্র, (৩) রামচন্দ্র, (৪) শিবচন্দ্র এবং একটি কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র, পিতার দ্বিতীয় পুত্র। তিনি ১৭৩৩ শকের (বঙ্গাব্দ ১২১৮ সালে) ২৫এ ফাল্গুনে শুক্রবারে কাঁচরাপাড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।

গুপ্তেরা তাদৃশ ধনী ছিল না; মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। পৈতৃক ধান্যক্ষেত্র, পুষ্করিণী, উদ্যান, এবং রাইয়তি জমির আয়ে এই একান্তভুক্ত পরিবারের কোন অভাব ঘটিত না। সমাজ মধ্যে এই গৃহস্থেরা মান্য গণ্য ছিল।

ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা, চিকিৎসা-ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া, স্বগ্রামের নিকট শেয়ালডাঙ্গার কুটিতে মাসিক ৮ আট টাকা বেতনে কাজ করিতেন।

কলিকাতা জোড়াসাঁকোয় ঈশ্বরচন্দ্রের মাতামহাশ্রম। ঈশ্বরচন্দ্র শৈশব হইতেই স্বীয় জননীর সহিত কাঁচরাপাড়া, এবং মাতামহাশ্রমে বাস করিতেন। মাতামহ রামমোহন গুপ্ত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কানপুরে বিষয়-কর্ম করিতেন। মাতামহের অবস্থা বড় ভাল ছিল না।

ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যকালের যে দুই একটা কথা জানা যায়, তাহাতে বোধ হয়, ঈশ্বর বড় দুরন্ত ছেলে ছিলেন। সাহসটা খুব ছিল। পাঁচ বৎসর বয়সে কালীপূজার দিন, অমাবস্যার রাতে, একা নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছিলেন। অন্ধকারে, একজন কেহ পথে তাঁহার ঘাড়ে পড়িয়া গিয়াছিল। সে ঘোর অন্ধকারে তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—

“কেরে?—কে যায়?”

“আমি—ঈশ্বর।”

“একেলা এই অন্ধকারে অমাবস্যার রাতে কোথায় যাইতেছিস?”

“ঠাকুর মশায়ের বাড়ী লুচি আনিতে।”

দেশকাল গুণে এ সাহসের পরিণাম—হোগলকুণ্ডিয়ায় বসিয়া কবিতা লেখা!

ঈশ্বরচন্দ্রের বয়ঃক্রম যৎকালে ১০ বর্ষ, সেই সময়ে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়।

স্বর্গবিয়োগের কিছুদিন পরেই তাঁহার পিতা হরিনারায়ণ দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন।

তিনি বিবাহ করিয়া শ্বশুরালয় হইতে বাটী না আসিয়া কার্যস্থলে গমন করেন। নব বধু একাকিনী কাঁচরাপাড়ার বাটীতে আসিলে, হরিনারায়ণের বিমাতা (মাতা জীবিতা ছিলেন না) তাঁহাকে বরণ করিয়া লইতেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেই সময়ে যাহা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার চরিত্রের উপযোগী বটে। ঈশ্বরচন্দ্রের এই মহৎ গুণ ছিল যে, তিনি খাঁটি জিনিষ বড় ভালবাসিতেন, মেকির বড় শত্রু। এই সংগ্রহস্থিত কবিতাগুলি পড়িলেই পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, কবি মেকির বড় শত্রু—সকল রকম মেকির উপর তিনি গালি বর্ষণ করিতেছেন—গবর্ণর জেনেরল হইতে কলিকাতার মুটে পর্য্যন্ত কাহারও মাফ নাই। এই বিমাতার আগমনে কবির সঙ্গে মেকির প্রথম সম্মুখসাক্ষাৎ। খাঁটি মা কোথায় চলিয়া গিয়াছে—তাহার স্থানে একটা মেকি মা আসিয়া দাঁড়াইল। মেকির শত্রু ঈশ্বরচন্দ্রের রাগ আর সহ্য হইল না, এক

* এই প্রদেশের বৈদ্যগণ রাজকার্যেও বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। নাম করিলে অনেকের নাম করা যাইতে পারে।

বিশ্বকম রচনাবলী

গাছা রুল লইয়া স্বীয় বিমাতাকে লক্ষ্য করিয়া বিষম বেগে তিনি নিক্ষেপ করিলেন। কবি-প্রযুক্ত রুল সৌভাগ্যক্রমে, বিমাতার অপেক্ষা আরও অসার সামগ্রী খুঁজিল—বিমাতা ত্যাগ করিয়া একটা কলা গাছে বিপীড়িত গেল।

অস্ত্র ব্যর্থ দেখিয়া কিরাতপরাজিত ধনঞ্জয়ের মত ঈশ্বরচন্দ্র এক ঘরে ঢুকিয়া সমস্ত দিন দ্বার রুদ্ধ করিয়া রহিলেন। কিন্তু বরদানার্থ পিনাকহস্তে পশুপতি না আসিয়া, প্রহারার্থ জুতাহস্তে জ্যেষ্ঠা মহাশয় আসিয়া উপস্থিত। জ্যেষ্ঠা মহাশয় দ্বার ভাঙ্গিয়া ঈশ্বরচন্দ্রকে পাদুকা প্রহার করিয়া চলিয়া গেলেন।

কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের পাশুপত অস্ত্র সংগ্রহ হইল সন্দেহ নাই। তিনি বুঝিলেন, এ সংসার মৌকি চলিবার ঠাই—মৌকির পক্ষ হইয়া না চলিলে এখানে জুতা খাইতে হয়। ইহার পর, যখন তাঁহার লেখনী হইতে অজস্র তীর জ্বালাবিশিষ্ট বক্রোক্তি সকল নির্গত হইল, তখন পৃথিবীর অনেক রকম মৌকি তাঁহার নিকট জুতা খাইল। কবিকে মারিলে, কবি মার তুলিয়া রাখেন। ইংরেজ সমাজ বায়রণকে প্রপীড়িত করিয়াছিল—বায়রণ, ডন জুয়ানে তাহার শোধ লইলেন।

পরে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ আসিয়া সান্ধনা করিয়া বলেন, “তোদের মা নাই, মা হইল, তোদেরই ভাল। তোদের দেখিবে শুনবে।”

আবার মৌকি! জ্যেষ্ঠা মহাশয় যা হোক—খাঁটি রকম জুতা মারিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু পিতামহের নিকট এ স্নেহের মৌকি ঈশ্বরচন্দ্রের সহ্য হইল না। ঈশ্বরচন্দ্র পিতামহের মূখের উপর বলিলেন,—

“হাঁ! তুমি আর একটা বিয়ে করে যেমন বাবাকে দেখুছ, বাবা আমাদের তেমনই দেখবেন।”

দুরন্ত ছেলে, কাজেই ঈশ্বরচন্দ্র লেখা পড়ায় বড় মন দিলেন না। বুদ্ধির অভাব ছিল না। কথিত আছে ঈশ্বরচন্দ্রের যখন তিন বৎসর বয়স, তখন তিনি একবার কলিকাতায় মাতুলালয়ে আসিয়া পীড়িত হইলেন। সেই পীড়ায় তাঁহাকে শয্যাগত হইয়া থাকিতে হয়। কলিকাতা তৎকালে নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর ছিল এবং মশা মাছির বড়ই উপদ্রব ছিল। প্রবাদ আছে, ঈশ্বরচন্দ্র শয্যাগত থাকিয়া সেই মশা মাছির উপদ্রবে একদা স্বতঃই আবৃত্তি করিতে থাকেন—

“রেতে মশা দিনে মাছি,

এই তাড়য়ে কল্কেতায় আছি।”

I lisped in numbers, for the numbers came!

তাই নাকি? অনেকে কথাটা না বিশ্বাস করিতে পারেন—আমরা বিশ্বাস করিব কি না জানি না। তবে যখন জন ষ্টুয়ার্ট মিলের তিন বৎসর বয়সে গ্রীক শেখার কথাটা সাহিত্য-জগতে চলিয়া গিয়াছে, তখন এ কথাটা চলুক।

ঈশ্বরচন্দ্রের পূর্বপুরুষদিগের মধ্যে অনেকেই তৎকালে সাধারণ্যে সমাদৃত পাঁচালি, কবি প্রভৃতিতে যোগদান এবং সংগীত রচনা করিতে পারিতেন। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ও পিতৃব্যদিগের সংগীত রচনা শক্তি ছিল। বীজ গুণে নাকি অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে।

কিন্তু পাঠশালায় গিয়া লেখা পড়া শিখিতে ঈশ্বরচন্দ্র মনোযোগী ছিলেন না। কখনও পাঠশালায় যাইতেন, কখনও বা টো টো করিয়া খেলিয়া বেড়াইতেন। এ সময়ে মূখে মূখে কবিতা রচনায় তৎপর ছিলেন। পাঠশালার উচ্চশ্রেণীর ছাত্রেরা পারস্য ভাষার যে সকল পুস্তক অর্থ করিয়া পাঠ করিত, শুনিয়া, ঈশ্বর তাহার এক এক স্থল অবলম্বন পূর্বক বাঙ্গালা ভাষায় কবিতা রচনা করিতেন।

ঈশ্বরচন্দ্রকে লেখা পড়া শিক্ষায় অমনোযোগী দেখিয়া, গুরুজনেরা সকলেই বলিতেন, ঈশ্বর মূর্থ এবং অপরের গলগ্রহ হইবে। চিরজীবন অন্নবস্ত্রের জন্য কষ্ট পাইবে।

সেই অনাবিষ্ট বালক সমাজে লক্ষপ্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। আমাদের দেশে সচরাচর প্রচলিত প্রধানসারে লেখা পড়া না শিখিলেই ছেলে গেল স্থির করা যায়। কিন্তু ক্লাইব বালককালে কেবল পরের ফলকরা চুরি করিয়া বেড়াইতেন, বড় ফোড়িক বাপের অবাধ্য বয়্যাটে ছেলে ছিলেন, এবং আর আর অনেকে এইরূপ ছিলেন। কিম্বদন্তী আছে, স্বয়ং কালিদাস নাকি বাল্যকালে ঘোর মূর্থ ছিলেন।

মাতৃহীন হইবার পরই ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া মাতুলালয়ে অবস্থান করিতে থাকেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহ—ভূমিকা

কলিকাতায় আসিয়া সামান্য প্রকার শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। স্বভাবসিদ্ধ কবিতা রচনায় বিশেষ মনোযোগ থাকায়, শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি দিতেন না।

ঈশ্বরচন্দ্র যে ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন, আজ কাল অনেক ছেলেকে সেই ভ্রমে পতিত হইতে দেখি। লিখবার একটু শক্তি থাকিলেই, অমনি পড়া শূন্য ছাড়িয়া দিয়া কেবল রচনায় মন। রাতারাতি যশস্বী হইবার বাসনা। এই সকল ছেলেদের দুই দিক নষ্ট হয়—রচনাশক্তি যেটুকু থাকে, শিক্ষার অভাবে তাহা সামান্য ফলপ্রদ হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বাল্যে পড়া শূন্যে অমনোযোগী হইলেন, শেষে তিনি কিছু শিখিয়াছিলেন। তাঁহার গদ্য রচনায় তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ আছে। কিন্তু তিনি বাল্যকালে যে সম্পূর্ণ শিক্ষালাভ করেন নাই, ইহা বড় দুঃখেরই বিষয়। তিনি সুশিক্ষিত হইলে, তাঁহার যে প্রতিভা ছিল, তাহার বিহিত প্রয়োগ হইলে, তাঁহার কবিত্ব, কাব্য, এবং সমাজের উপর আধিপত্য অনেক বেশী হইত। আমার বিশ্বাস যে, তিনি যদি তাঁহার সমসাময়িক লেখক কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বা পরবর্তী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ন্যায় সুশিক্ষিত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার সময়েই বাঙ্গালা সাহিত্য অনেক দূর অগ্রসর হইত। বাঙ্গালার উন্নতি আরও ত্রিশ বৎসর অগ্রসর হইত। তাঁহার রচনায় দুইটি অভাব দেখিয়া বড় দুঃখ হয়—মার্জিত রুচির অভাব, এবং উচ্চ লক্ষ্যের অভাব। অনেকটাই ইয়ারকি। আধুনিক সামাজিক বানরদিগের ইয়ারকির মত ইয়ারকি নয়—প্রতিভাশালী মহাত্মার ইয়ারকি। তবু ইয়ারকি বটে। জগদীশ্বরের সঙ্গেও একটু ইয়ারকি—

কহিতে না পার কথা—কি রাখিব নাম?

তুমি হে আমার বাবা হাবা আত্মারাম।

ঈশ্বর গুপ্তের যে ইয়ারকি, তাহা আমরা ছাড়িতে রাজি নই। বাঙ্গালা সাহিত্যে উহা আছে বলিয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যে একটা দুর্লভ সামগ্রী আছে। অনেক সময়েই এই ইয়ারকি বিশুদ্ধ, এবং ভোগবিলাসের আকাঙ্ক্ষা বা পরের প্রতি বিদ্বেষশূন্য। রত্নটি পাইয়া হারাইতে আমরা রাজি নই, কিন্তু দুঃখ এই যে—এতটা প্রতিভা ইয়ারকিতেই ফুরাইল।

একজন দেউলেপড়া শূঁড়ী, মতি শীলের গল্প শুনিয়া, দুঃখ করিয়া বলিয়াছিল, “কত লোকে খালি বোতল বেঁচিয়া বড় মানুষ হইল—আমি ভরা বোতল বেঁচিয়া কিছু করিতে পারিলাম না?” সুশিক্ষার অভাবে ঈশ্বর গুপ্তের ঠিক তাই ঘটিয়াছিল। তাই এখনকার ছেলেদের সতর্ক করিতেছি—ভাল শিক্ষা লাভ না করিয়া কালির আঁচড় পাড়িও না। মহাত্মা-দিগের জীবনচরিতের সমালোচনায় অনেক গুরুতর নীতি আমরা শিখিয়া থাকি। ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনের সমালোচনায় আমরা এই মহতী নীতি শিখি—সুশিক্ষা ভিন্ন প্রতিভা কখন পূর্ণ ফলপ্রদা হয় না।

ঈশ্বরচন্দ্রের স্মৃতিশক্তি বাল্যকাল হইতে অত্যন্ত প্রখর ছিল। একবার যাহা শুনিতেন, তাহা আর ভুলিতেন না। কঠিন সংস্কৃত ভাষার দুর্ভেদ্য শ্লোকসমূহের ব্যাখ্যা একবার শুনিয়াই তাহা অবিকল কবিতায় রচনা করিতে পারিতেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার একজন বাল্যসখা, ১২৬৬ সালের ১লা বৈশাখের ‘সংবাদ প্রভাকরে’ নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন,—

“ঈশ্বর বাবু দুঃখপোষ্যাবস্থার পরই বিশাল বুদ্ধিশালিতা ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করেন। যৎকালীন পাঠশালার প্রথম শিক্ষায় অতি শৈশবকালে প্রবর্ত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহা অপেক্ষা অধিকবয়স্ক বালকেরা পারস্য শাস্ত্র পাঠ করিত। তাহাতেই যে দুই একটি পারস্য শব্দ শ্রুত হইত, তাহার অর্থ শ্রুতি মাত্রেই বিশেষ বিদিত হইয়া, বঙ্গ শব্দের সহিত সংযোজনা করিয়া, উভয় ভাষায় মিলিত অথচ অর্থবিশিষ্ট কবিতা অনায়াসেই প্রস্তুত করিতেন। ১১।১২ বৎসর বয়ঃক্রম হইতেই অল্পে অল্পে পরিশ্রমে ঈদৃশ মনোরম বাঙ্গালা গান প্রস্তুত করিতে পারগ হইয়াছিলেন যে, সখের দলের কথা দূরে থাকুক, উক্ত কাণ্ডনপল্লীতে বারোইয়ারী প্রভৃতি পূজোপলক্ষে যে সকল গুস্তাদী দল আগমন করিত, তাহাদের সমাভিব্যাহারী গুস্তাদলোক উত্তর গান স্বরায় প্রস্তুত করিতে অক্ষম হওয়াতে ঈশ্বর বাবু অনায়াসে অতি শীঘ্রই অতি সুশ্রাব্য চমৎকার গান পরিপাটী প্রণালীতে প্রস্তুত করিয়া দিতেন।”

লেখক পরে লিখিয়া গিয়াছেন, “ঈশ্বর বাবু অপ্ৰাপ্তবয়স্কাবস্থাতেই ইংরাজি বিদ্যাভ্যাস এবং জীবিকান্বেষণ জন্য কলিকাতায় আগমন করেন। আমার সহিত সন্দর্শন হইয়া প্রথমতঃ

বিক্রম রচনাবলী

যখন তাঁহার সহিত প্রণয় সঞ্চার হয়, তখন আমারও পঠদশা, তিনি যদিও আমার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক বয়স্ক ছিলেন, তথাপি উভয়েই অপ্ৰাপ্তবয়স্ক, কেবল বিদ্যাভ্যাসেই আসক্ত ছিলাম। আমি সে সময় সর্বদা তাঁহার সংসর্গে থাকিতাম, তাহাতে প্রায় প্রতিদিনই এক একটি অলৌকিক কাণ্ড প্রত্যক্ষ হইত। অর্থাৎ প্রত্যহই নানা বিষয়ে অবলীলাক্রমে অপূর্ষ কবিতা রচনা করিয়া সহচর স্নেহসমূহের সম্পূর্ণ সন্তোষ বিধান করিতেন। কোন ব্যক্তি কোন কঠিন সমস্যা পূরণ করিতে দিলে, তৎক্ষণাৎ তাহা যাদৃশ সাধু শব্দে সম্পূরণ করিতেন, তদুপ পূর্বে কদাপি প্রত্যক্ষ হয় নাই।”

উক্ত বাল্যসখা শেষ লিখিয়া গিয়াছেন, “ঈশ্বর বাবু যৎকালীন ১৭।১৮ বর্ষবয়স্ক, তৎকালীন দিবা রাত্রি একত্র সহবাস থাকাতে আমার নিকট মূদ্ধবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। অনুমান হয়, এক মাস কি দেড় মাস মধ্যেই মিশ্র পর্য্যন্ত এককালীন মুখস্থ ও অর্থের সহিত কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। শ্রুতিধরদিগের প্রশংসা অনেক শ্রুতিগোচর আছে, ঈশ্বর বাবুর অদ্ভুত শ্রুতিধরতা সর্বদাই আমার প্রত্যক্ষ হইয়াছে। বাঙ্গালা কবিতা তাঁহার স্বপ্রণীতই হউক বা অন্যকৃতই হউক, একবার রচনা এবং সমক্ষে পাঠ মাত্রই হৃদয়ঙ্গম হইয়া, একেবারে চিত্রপটে চিত্রিতের ন্যায় চিত্রস্থ হইয়া চিরদিন সমান স্মরণ থাকিত।”

কলিকাতার প্রসিদ্ধ ঠাকুর-বংশের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের মাতামহ-বংশের পরিচয় ছিল। সেই সূত্রে ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়াই ঠাকুর বাটীতে পরিচিত হইলেন। পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র নন্দকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের বিশেষ সখ্য জন্মে। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার নিকট নিয়ত অবস্থানপূর্ষক কবিতা রচনা করিয়া সখ্য বৃদ্ধি করিতেন। যোগেন্দ্রমোহন, ঈশ্বরচন্দ্রের সমবয়স্ক ছিলেন। লেখা পড়া শিক্ষা এবং ভাষানুশীলনে তাঁহার অনুরাগ ও যত্ন ছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের সহবাসে তাঁহার রচনাশক্তিও জন্মিয়াছিল। যোগেন্দ্রমোহনই ঈশ্বরচন্দ্রের ভাবী সৌভাগ্যের এবং যশকীর্তির সোপানস্বরূপ।

ঠাকুর বাটীতে মহেশচন্দ্র নামে ঈশ্বরচন্দ্রের এক আত্মীয়ের গতিবিধি ছিল। মহেশচন্দ্রও কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। মহেশের কিঞ্চিৎ বাতিকের ছিট থাকায় লোকে তাঁহাকে “মহেশা পাগলা” বলিত। এই মহেশের সহিত ঠাকুর বাটীতে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রায়ই মূখে মূখে কবিতা-যুদ্ধ হইত।

ঈশ্বরচন্দ্রের যৎকালে ১৫ বর্ষ বয়স, তৎকালে গুপ্তীপাড়ার গৌরহরি মল্লিকের কন্যা দুর্গামণি দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

দুর্গামণির কপালে সুখ হইল না। ঈশ্বরচন্দ্র দেখিলেন, আবার মেকি! দুর্গামণি দেখিতে কুৎসিতা! হাবা! বোবার মত! এ ত স্ত্রী নহে, প্রতিভাশালী কবির অর্দ্ধাঙ্গ নহে—কবির সহধর্মিণী নহে। ঈশ্বরচন্দ্র বিবাহের পর হইতে আর তাহার সঙ্গে কথা কহিলেন না।

ইহার ভিতর একটু Romanceও আছে। শুননা যায়, ঈশ্বরচন্দ্র, কাঁচরাপাড়ার একজন ধনবানের একটি পরমা সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিতে অভিলাষী হইলেন। কিন্তু তাঁহার পিতা সে বিষয়ে মনোযোগী না হইয়া, গুপ্তীপাড়ার উক্ত গৌরহরি মল্লিকের উক্ত কন্যার সহিত বিবাহ দেন। গৌরহরি, বৈদ্যদিগের মধ্যে একজন প্রধান কুলীন ছিলেন, সেই কুল-গৌরবের কারণ এবং অর্থ দান করিতে হইল না বলিয়া, সেই পাত্রীর সহিতই ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা পুত্রের বিবাহ দেন। ঈশ্বরচন্দ্র পিতার আজ্ঞায় নিতান্ত অনিচ্ছায় বিবাহ করেন, কিন্তু বিবাহের পরই তিনি বলিয়াছিলেন যে, আমি আর সংসারধর্ম করিব না। কিছু কাল পরে ঈশ্বরচন্দ্রের আত্মীয় মিত্রগণ তাঁহাকে আর একটি বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি বলেন যে, দুই সতীনের ঝগড়ার মধ্যে পড়িয়া মারা যাওয়া অপেক্ষা বিবাহ না করাই ভাল।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনী হইতে আমরা এই আর একটি মহতী নীতি শিক্ষা করি। ভরসা করি আধুনিক বর কন্যাদিগের ধনলোলুপ পিতৃমাতৃগণ এ কথাটা হৃদয়ঙ্গম করিবেন।

ঈশ্বর গুপ্ত, স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ না করুন, চিরকাল তাঁহাকে গৃহে রাখিয়া ভরণ-পোষণ করিয়া, মৃত্যুকালে তাঁহার ভরণ-পোষণ জন্য কিছু কাগজ রাখিয়া গিয়াছিলেন। দুর্গামণিও সচ্চরিত্রা ছিলেন। কয়েক বৎসর হইল, দুর্গামণি দেহ ত্যাগ করিয়াছেন।

এখন আমরা দুর্গামণির জন্য বেশী দুঃখ করিব, না ঈশ্বরচন্দ্রের জন্য বেশী দুঃখ করিব? দুর্গামণির দুঃখ ছিল কি না তাহা জানি না। যে আগুনে ভিতর হইতে শরীর পুড়ে, সে

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহ—ভূমিকা

আগুন তাঁহার হৃদয়ে ছিল কি না জানি না। ঈশ্বরচন্দ্রের ছিল—কবিতায় দেখিতে পাই। অনেক দাহ করিয়াছে দেখিতে পাই। যে শিক্ষাটুকু স্ত্রীলোকের নিকট পাইতে হয়, তাহা তাঁহার হয় নাই। যে উন্নতি স্ত্রীলোকের সংসর্গে হয়, স্ত্রীলোকের প্রতি স্নেহ ভক্তি থাকিলে হয়, তাঁহার তাহা হয় নাই। স্ত্রীলোক তাঁহার কাছে কেবল ব্যঙ্গের পাত্র। ঈশ্বর গুপ্ত তাহাদের দিগে আঙ্গুল দেখাইয়া হাসেন, মূখ ভেঙ্গান, গালি পাড়েন, তাহারা যে পৃথিবীর পাপের আকর তাহা নানা প্রকার অশ্লীলতার সহিত বলিয়া দেন—তাহাদের সুখময়ী, রসময়ী, পুণ্যময়ী করিতে পারেন না। এক একবার স্ত্রীলোককে উচ্চ আসনে বসাইয়া কবি যাত্রার সাধ মিটাইতে যান—কিন্তু সাধ মিটে না। তাঁহার উচ্চাসনস্থিতা নায়িকা বানরীতে পরিণত হয়। তাঁহার প্রণীত “মানভঞ্জন” নামক বিখ্যাত কাব্যের নায়িকা ঐরূপ। উক্ত কবিতা আমরা এই সংগ্রহে উদ্ধৃত করি নাই। স্ত্রীলোক সম্বন্ধীয় কথা বড় অল্পই উদ্ধৃত করিয়াছি। অনেক সময়ে ঈশ্বর গুপ্ত স্ত্রীলোক সম্বন্ধে প্রাচীন ঋষিদিগের ন্যায় মূক্তকণ্ঠ—অতি কদর্য ভাষায় ব্যবহার না করিলে, গালি পূরা হইল মনে করেন না। কাজেই উদ্ধৃত করিতে পারি নাই।

এখন দুর্গামণির জন্য দুঃখ করিব, না ঈশ্বর গুপ্তের জন্য? ভরসা করি, পাঠক বলিবেন, ঈশ্বর গুপ্তের জন্য।

১২৩৭ সালের কার্তিক মাসে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা হরিনারায়ণের মৃত্যু হয়।

মাতার মৃত্যুর পরই ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া, মাতুলালয়ে থাকিয়া, ঠাকুর বাটীতেই প্রতিপালিত হইতেন। পিতার মৃত্যুর পর অর্থোপার্জন আবশ্যিক হইয়া উঠে। জ্যেষ্ঠ গিরিশচন্দ্র এবং সর্বকনিষ্ঠ শিবচন্দ্র পুর্বেই মরিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের লালন পালন ভার ঈশ্বরচন্দ্রের উপরই অর্পিত হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—কর্ম্ম

প্রবাদ আছে, লক্ষ্মী সরস্বতীতে চিরকাল বিবাদ। সরস্বতীর বরপুত্রেরা প্রায় লক্ষ্মীছাড়া; লক্ষ্মীর বরপুত্রেরা সরস্বতীর বিষনয়নে পরিত। কথাটা কতক সত্য হইলেও হইতে পারে, কিন্তু সে বিষয়ে লক্ষ্মীর বড় অপরাধ নাই। বিক্রমাদিত্য হইতে কৃষ্ণচন্দ্র পর্য্যন্ত দেখিতে পাই লক্ষ্মীর বরপুত্রেরা সরস্বতীর পুত্রগণের বিশেষ সহায়। লক্ষ্মী, চিরকাল সরস্বতীকে হাত ধরিয়া তুলিয়া খাড়া করিয়া রাখিতেন; নহিলে বোধ হয়, সরস্বতী অনেক দিন, বিষ্ণুপার্শ্বে অনন্ত-শয্যায় শয়ন করিয়া, ঘোর নিদ্রায় নিমগ্ন হইতেন—তাঁহার পালিত গন্দর্ভগুলি সহস্র চীৎকার করিলেও উঠিতেন না। এখন হয়ত সে ভাবটা তেমন নাই। এখন সরস্বতী কতকটা আপনার বলে বলবতী; অনেক সময়েই আপনার বলেই পদ্মবনে দাঁড়াইয়া বীণায় ঝঙ্কার দিতেছেন দেখিতে পাই। হয়ত দেখিতে পাই, দুই জনে একাসনে বসিয়াই সুখ স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিতেছেন—সতীনের মত কোন্দল ঝকড়া নাক কাটাকাটি কিছুর নাই; অনেক সময়ে দেখি সরস্বতী আসিয়াছেন দেখিয়াই লক্ষ্মী আসিয়া উপস্থিত হন। কিন্তু যখন ঈশ্বর গুপ্ত সরস্বতীর আরাধনায় প্রথম প্রবৃত্ত, তখন সে দিন উপস্থিত হয় নাই। লক্ষ্মীর একজন বরপুত্র তাঁহার সহায় হইলেন। লক্ষ্মী সরস্বতীকে হাত ধরিয়া তুলিলেন।

যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্রের কবিত্বশক্তি এবং রচনাশক্তি দর্শনে এই সময়ে অর্থাৎ ১২৩৭ সালে বাঙ্গালা ভাষায় একখানি সংবাদপত্র প্রচার করিতে অভিলাষী হইলেন। ইহার পুর্বে ৬খানি মাত্র বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশ হইয়াছিল।

(১) “বাঙ্গালা গেজেট”—১২২২ সালে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশ হয়। ইহাই প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র। (২) “সমাচার দর্পণ”—১২২৪ সালে শ্রীরামপুরের মিশনারিদিগের দ্বারা প্রকাশ হয়। (৩) ১২২৭ সালে রাজা রামমোহন রায়ের উদ্যোগে—“সংবাদ-কৌমুদী” প্রকাশ হয়। (৪) ১২২৮ সালে “সমাচার চন্দ্রিকা”, (৫) “সংবাদ তিমিরনাশক” এবং (৬) বাবু নীলরত্ন হালদার কর্তৃক “বঙ্গদূত” প্রকাশ হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র, যোগেন্দ্রমোহনের সাহায্যে, উৎসাহে এবং উদ্যোগে সাহসী হইয়া সন ১২৩৭ সালের ১৬ই মাঘে “সংবাদ প্রভাকর” প্রচারারম্ভ করেন। তৎকালে প্রভাকর সপ্তাহে একবার মাত্র প্রকাশ হইত।

বিক্রম রচনাবলী

ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে প্রভাকরের জন্ম-বিবরণ সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন, “বাবু যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সম্পূর্ণ সাহায্যক্রমে প্রথমে এই প্রভাকর পত্র প্রকটিত হয়। তখন আমাদের যন্ত্রালয় ছিল না। চোরবাগানে এক মদ্রাযন্ত্র ভাড়া করিয়া ছাপা হইত। ৩৮ সালের শ্রাবণ মাসে পূর্বে ঠাকুর বাবুদিগের বাটীতে স্বাধীনরূপে যন্ত্রালয় স্থাপিত করা যায়। তাহাতে ৩৯ সাল পর্যন্ত সেই স্বাধীন যন্ত্রে অতি সম্ভ্রমের সহিত মদ্রিত হইয়াছিল।”

কিঞ্চিদধিক ১৯ বর্ষবয়স্ক নবকবি-সম্পাদিত নব প্রভাকর অল্প দিনের মধ্যে সম্ভ্রান্ত কৃতিবিদ্যা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। কলিকাতার যে সকল সম্ভ্রান্ত ধনবান এবং কৃতিবিদ্য লেখক, সাপ্তাহিক প্রভাকরের সহায়তা করেন, ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে তাহাদিগের নামের নিম্নলিখিত তালিকা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন,—

“শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, বাবু নন্দলাল ঠাকুর, বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুর, বাবু নন্দকুমার ঠাকুর, বাবু রামকমল সেন, শ্রীযুক্ত বাবু হরকুমার ঠাকুর, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, হালিরাম চৌকিয়াল ফুঙ্কন, শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, বাবু নীলরত্ন হালদার, বাবু ব্রজমোহন সিংহ, কৃষ্ণচন্দ্র বসু, বাবু রসিকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বাবু ধর্মদাস পালিত, বাবু শ্যামাচরণ সেন, শ্রীযুক্ত নীলমণি মতিলাল ও অন্যান্য। শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ যিনি এক্ষণে সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কারশাস্ত্রের অধ্যাপক, তিনি লিপিবিশয়ে বিস্তর সাহায্য করিতেন। তাহার রচিত সংস্কৃত শ্লোকদ্বয়* অদ্যাবধি প্রভাকরের শিরোভূষণ রহিয়াছে। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় অনেক উত্তম উত্তম গদ্য পদ্য লিখিয়া প্রভাকরের শোভা ও প্রশংসা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।”

এই প্রভাকর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অধিতীয় কীর্তি। মধ্যে একবার প্রভাকর মেঘে ঢাকা পড়িয়াছিলেন বটে, কিন্তু আবার পুনর্নুদিত হইয়া অদ্যাপি কর বিতরণ করিতেছেন। বাঙ্গালা সাহিত্য এই প্রভাকরের নিকট বিশেষ ঋণী। মহাজন মরিয়া গেলে খাতক আর বড় তার নাম করে না। ঈশ্বর গুপ্ত গিয়াছেন, আমরা আর সে ঋণের কথা বড় একটা মুখে আনি না। কিন্তু এক দিন প্রভাকর বাঙ্গালা সাহিত্যের হর্তা কর্তা বিধাতা ছিলেন। প্রভাকর বাঙ্গালা রচনার রীতিও অনেক পরিবর্তন করিয়া যান। ভারতচন্দ্রী ধরণটা তাহার অনেক ছিল বটে—অনেক স্থলে তিনি ভারতচন্দ্রের অনুগামী মাত্র, কিন্তু আর একটা ধরণ ছিল, যা কখন বাঙ্গালা ভাষায় ছিল না, যাহা পাইয়া আজ বাঙ্গালার ভাষা তেজস্বিনী হইয়াছে। নিত্য নৈমিত্তিকের ব্যাপার, রাজকীয় ঘটনা, সামাজিক ঘটনা, এ সকল যে রসময়ী রচনার বিষয় হইতে পারে, ইহা প্রভাকরই প্রথম দেখায়। আজ শিখের যুদ্ধ, কাল পৌষপার্শ্বণ, আজ মিশনারি, কাল উমেদারি, এ সকল যে সাহিত্যের অধীন, সাহিত্যের সামগ্রী, তাহা প্রভাকরই দেখাইয়াছিলেন। আর ঈশ্বর গুপ্তের নিজের কীর্তি ছাড়া প্রভাকরের শিক্ষানবিশদিগের একটা কীর্তি আছে। দেশের অনেকগুলি লক্ষপ্রতিষ্ঠ লেখক প্রভাকরের শিক্ষানবিশ ছিলেন। বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় একজন। বাবু দীনবন্ধু মিত্র আর একজন। শুনিয়াছি, বাবু মনোমোহন বসু আর একজন। ইহার জন্যও বাঙ্গালার সাহিত্য, প্রভাকরের নিকট ঋণী। আমি নিজে প্রভাকরের নিকটে বিশেষ ঋণী। আমার প্রথম রচনাগুলি প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। সে সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আমাকে বিশেষ উৎসাহ দান করেন।

১২৩৯ সালে যোগেন্দ্রমোহন প্রাণত্যাগ করায়, সংবাদ প্রভাকরের তিরোধান হয়। ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে লিখিয়া গিয়াছেন, “এই সময়ে (১২৩৯ সালে) জগদীশ্বর আমাদের কর্ম এবং উৎসাহের শিরে বিষম বজ্র নিক্ষেপ করিলেন, অর্থাৎ মহোপকারী সাহায্যকারী বহুগুণধারী আশ্রয়দাতা বাবু যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় সাংঘাতিক রোগ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া কৃতান্তের দশে পতিত হইলেন। সুতরাং ঐ মহাত্মার

* সত্য মনস্তামরসপ্রভাকরঃ সর্দৈব সর্বেষু সমপ্রভাকরঃ।

উর্দোত ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসম্বাদনবপ্রভাকরঃ।

নস্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেপ্বিন্দীবরেষু ক্ৰিচ্চন্দ্রামংগ্রামতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ।

অদ্যোদ্যাদিমল প্রভাকরকরপ্রোম্ভিন্নপম্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরাঃ স্বাস্তিধিরেফা রসং॥

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহ—ভূমিকা

লোকান্তরগমনে আমরা অপৰ্য্যাপ্ত শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া এককালীন সাহস এবং অনুরাগশূন্য হইলাম। তাহাতে প্রভাকর করের অনাদররূপ মেঘাচ্ছন্ন হওন জন্য এই প্রভাকর কর প্রচ্ছন্ন করিয়া কিছু দিন গুপ্তভাবে গুপ্ত হইলেন।”

প্রভাকর সম্পাদন দ্বারা ঈশ্বরচন্দ্র সাধারণে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার কবিত্ব এবং রচনা-শক্তি দর্শনে আন্দুলের জমীদার বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক, ১২৩৯ সালের ১০ শ্রাবণে “সংবাদ রত্নাবলী” প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেই পত্রের সম্পাদক হইলেন।

১২৫৯ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র বাঙ্গালা সংবাদপত্রসমূহের যে ইতিবৃত্ত প্রকাশ করেন, তন্মধ্যে এই রত্নাবলী সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন, “বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের আনুকূল্যে মেছুয়াবাজারের অন্তঃপাতী বাঁশতলার গলিতে “সংবাদ রত্নাবলী” আবির্ভূত হইল। মহেশচন্দ্র পাল এই পত্রের নামধারী সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার কিছু মাত্র রচনাশক্তি ছিল না। প্রথমে ইহার লিপিকাৰ্য্য আমরাই নিষ্পন্ন করিতাম। রত্নাবলী সাধারণ সমীপে সাতিশয় সমাদৃত হইয়াছিল। আমরা তৎকর্মে বিরত হইলে, রঙ্গপুর ভূম্যধিকারী সভার পূর্বাভাস সম্পাদক রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্য সেই পদে নিযুক্ত হইলেন।”

ঈশ্বরচন্দ্রের অনুজ রামচন্দ্র, ১২৬৬ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে লিখিয়া গিয়াছেন, “ফলতঃ গুণাকর প্রভাকর কর বহুকাল রত্নাবলীর সম্পাদকীয় কার্যে নিযুক্ত ছিলেন না, তাহা পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ প্রদেশে শ্রীক্ষেত্রাদি তীর্থ দর্শনে গমন করিয়া, কটকে পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত শ্যামামোহন রায় পিতৃব্য মহাশয়ের সদনে কিছু দিন অবস্থান করিয়া, একজন অতি সুপণ্ডিত দণ্ডীর নিকট তন্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন। এবং তাহার কিয়দংশ বঙ্গভাষায় সুমিষ্ট কবিতায় অনুবাদও করিয়াছিলেন।”

১২৪৩ সালের বৈশাখ মাসে ঈশ্বরচন্দ্র কটক হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। তিনি কলিকাতায় আসিয়াই প্রভাকরের পুনঃ প্রচার জন্য চেষ্টিত হইলেন। তাঁহার সে বাসনাও সফল হয়। ১২৫৩ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র, প্রভাকরের পূর্বাভাস প্রকাশ সূত্রে লিখিয়া গিয়াছেন, “১২৪৩ সালের ২৭এ শ্রাবণ বৃধবার দিবসে এই প্রভাকরকে পুনর্বার বার্ষিক রূপে প্রকাশ করি, তখন এই গুরুতর কর্ম সম্পাদন করিতে পারি, আমরাদিগের এমত সম্ভাবনা ছিল না। জগদীশ্বরকে চিন্তা করিয়া এতৎ অসংসাহসিক কর্ম প্রবৃত্ত হইলে, পাতুরেঘাটানিবাসী সাধারণ-মঙ্গলাভিলাষী বাবু কানাইলাল ঠাকুর, এবং তদনুজ বাবু গোপাললাল ঠাকুর মহাশয় যথার্থ হিতকারী বন্ধুর স্বভাবে ব্যয়োপযুক্ত বহুল বিত্ত প্রদান করিলেন, এবং অদ্যাবধি আমরাদিগের আবশ্যিক ক্রমে প্রার্থনা করিলে তাঁহারা সাধ্যমত উপকার করিতে ঘৃণা করেন না। এ কারণ আমরা উল্লিখিত ভ্রাতাঘরের পরোপকারিতা গুণের ঋণের নির্মিত্ত জীবনের স্থায়িত্ব কাল পর্য্যন্ত দেহকে বন্ধক রাখিলাম।”

অল্পকালের মধ্যেই প্রভাকরের প্রভা আবার সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে। নগর এবং গ্রাম্যপ্রদেশের সম্ভ্রান্ত জমীদার এবং কৃতিবিদ্যাগণ এই সময়ে ঈশ্বরচন্দ্রকে যথেষ্ট সহায়তা করিতে থাকেন। কয়েক বর্ষের মধ্যেই প্রভাকর এত দূর উন্নতি লাভ করে যে, ঈশ্বরচন্দ্র ১২৪৬ সালের ১লা আষাঢ় হইতে প্রভাকরকে প্রাত্যহিক পত্রে পরিণত করেন। ভারতবর্ষের দেশীয় সংবাদপত্রের মধ্যে এই প্রভাকরই প্রথম প্রাত্যহিক।

প্রভাকর প্রাত্যহিক হইলে, যে সকল ব্যক্তি লিপি সাহায্য এবং উৎসাহ দান করেন, ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৪ সালের ২রা বৈশাখের প্রভাকরে তাঁহাদিগের সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন,—

“প্রভাকরের লেখকের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে, প্রভাকরের পুরাতন লেখকদিগের মধ্যে যে যে মহোদয় জীবিত আছেন, তাঁহাদের নাম নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম;—

শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, রাধানাথ শিরোমণি, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, বাবু নীলরত্ন হালদার, গঙ্গাধর তর্কবাগীশ, ব্রজমোহন সিংহ, গোপালকৃষ্ণ মিত্র, বিশ্বম্ভর পাইন, গোবিন্দচন্দ্র সেন, ধর্মদাস পালিত, বাবু কানাইলাল ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীশঙ্করচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ, রায় রামলোচন ঘোষ বাহাদুর, হরিমোহন সেন, জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক।”

“সীতানাথ ঘোষ, গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যাদবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, হরনাথ মিত্র, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, গোপালচন্দ্র দত্ত, শ্যামাচরণ বসু, উমানাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনাথ শীল, এবং শঙ্কুনাথ

বিক্রম রচনাবলী

পণ্ডিত ইংহারা কেহ তিন চারি বৎসর পর্যন্ত প্রভাকরের লেখক বন্ধুর শ্রেণী মধ্যে ভুক্ত হইয়াছেন।”

“শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য মহাশয়, আমাদিগের সম্প্রদায়ের এক জন প্রধান সংযুক্ত বন্ধু, শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদকের ন্যায় তাবৎ কৰ্ম সম্পন্ন করেন, অতএব ইংহাদিগের বিষয় প্রকাশ করা অতিরেক মাত্র। বিশেষতঃ শেষোক্ত ব্যক্তির শ্রমের হস্তে যখন আমরা সমুদয় কৰ্ম সমর্পণ করি, তখন তাঁহার ক্ষমতা সকলেই বিবেচনা করিবেন।”

“রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অস্মাদিগের সংযোজিত লেখক বন্ধু, ইংহার সদগুণ ও ক্ষমতার কথা কি ব্যাখ্যা করিব! এই সময়ে আমাদিগের পরম স্নেহান্বিত মৃত বন্ধু বাবু প্রসন্নচন্দ্র ঘোষের শোক পুনঃ পুনঃ শেল স্বরূপ হইয়া হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে। যেহেতু ইনি রচনা বিষয়ে তাঁহার ন্যায় ক্ষমতা দর্শাইতেছেন, বরং কবিত্ব ব্যাপারে ইংহার অধিক শক্তি দৃষ্ট হইতেছে। কবিতা নর্তকীর ন্যায় অভিপ্রায়ের বাদ্য তালে ইংহার মানসরূপ নাট্যশালায় নিয়ত নৃত্য করিতেছে। ইনি কি গদ্য কি পদ্য উভয় রচনা দ্বারা পাঠকবর্গের মনে আনন্দ বিতরণ করিয়া থাকেন।”

“ঠাকুরবংশীয় মহাশয়দিগের নামোল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র, যেহেতু প্রভাকরের উন্নতি সৌভাগ্য প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি যে কিছুর তাহা কেবল ঐ ঠাকুরবংশের অনুরূহ দ্বারাই হইয়াছে। মৃত বাবু যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রথমতঃ ইহাকে স্থাপিত করেন। পরে বাবু কানাইলাল ঠাকুর ও গোপাললাল ঠাকুর, চন্দ্রকুমার ঠাকুর, নন্দলাল ঠাকুর, বাবু হরকুমার ঠাকুর, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মৃত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, বাবু রমানাথ ঠাকুর, বাবু মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়, বাবু মথুরানাথ ঠাকুর, বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি মহাশয়েরা আমাদিগের আশার অতীত কৃপা বিতরণ করিয়াছেন, এবং ইংহাদিগের যত্নে অদ্যাপি অনেক মহাশয় আমাদিগের প্রতি যথোচিত স্নেহ করিয়া থাকেন।”

“এই প্রভাকরের প্রতি বাবু গিরিশচন্দ্র দেব মহাশয়ের অত্যন্ত অনুরূহ জন্য আমরা অত্যন্ত বাধ্য আছি। বিবিধ বিদ্যাতৎপর মহানুভব বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভাকরের প্রতি অতিশয় স্নেহ করতঃ ইংহার সৌভাগ্যবর্ধন বিষয়ে বিপুল চেষ্টা করিয়া থাকেন। বাবু রমাপ্রসাদ রায়, বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ, বাবু মাধবচন্দ্র সেন, বাবু রাজেন্দ্র দত্ত, বাবু হরচন্দ্র লাহিড়ী, বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরী, রায় হরিনারায়ণ ঘোষ প্রভৃতি মহাশয়েরা আমাদিগের পক্ষে সমাদর করিয়া, উন্নতিকল্পে বিলক্ষণ যত্নশীল আছেন।”

প্রভাকরের বর্ষ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লেখক এবং সাহায্যকারী সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকে। বঙ্গদেশের প্রায় সমস্ত সম্ভ্রান্ত জমীদার এবং কলিকাতার প্রায় সমস্ত ধনবান এবং কৃতিবিদ্য ব্যক্তি প্রভাকরের গ্রাহক ছিলেন। মূল্যদানে অসমর্থ অনেক ব্যক্তিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিনামূল্যে প্রভাকর দান করিতেন। তাহার সংখ্যাও ৩।৪ শত হইবে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি স্থানের প্রবাসী বাঙ্গালীগণও গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়া নিয়ত স্থানীয় প্রয়োজনীয় সংবাদ পাঠাইতেন। সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে সেই সকল সংবাদদাতা সংবাদ প্রেরণে প্রভাকরের বিশেষ উপকার করেন। প্রভাকর এই সময়ে বাঙ্গালার সংবাদপত্রসমূহের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া লয়।

১২৫৩ সালে ঈশ্বরচন্দ্র “পাষাণ্ডপীড়ন” নামে একখানি পত্রের সৃষ্টি করেন। ১২৫৯ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে সংবাদপত্রের ইতিবৃত্ত মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন, “১২৫৩ সালের আষাঢ় মাসের সপ্তম দিবসে প্রভাকর যন্ত্রে পাষাণ্ডপীড়নের জন্ম হইল। ইহাতে পূর্বে কেবল সর্ষজন-মনোরঞ্জন প্রকৃষ্ট প্রবন্ধপুঞ্জ প্রকটিত হইত, পরে ৫৪ সালে কোন বিশেষ হেতুতে পাষাণ্ডপীড়ন, পাষাণ্ডপীড়ন করিয়া, আপনিই পাষাণ্ড হস্তে পীড়িত হইলেন। অর্থাৎ সীতানাথ ঘোষ নামক জনৈক কৃতঘ্ন ব্যক্তি যাহার নামে এই পত্র প্রচারিত হয়, সেই অধার্মিক ঘোষ বিপক্ষের সহিত যোগদান করতঃ ঐ সালের ভাদ্র মাসে পাষাণ্ডপীড়নের হেড চুরি করিয়া পলায়ন করিল, সুতরাং আমাদিগের বন্ধুগণ তৎপ্রকাশে বর্ণিত হইলেন। ঐ ঘোষ উক্ত পত্র ভাস্করের করে দিয়া পাতরে আছড়াইয়া নষ্ট করিল।”

সংবাদ ভাস্কর-সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের অনেক দিন হইতেই মিত্রতা ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ সালের ২রা বৈশাখের প্রভাকরে লিখিয়া গিয়াছেন, “সুবিখ্যাত পণ্ডিত ভাস্কর-সম্পাদক তর্কবাগীশ মহাশয় পূর্বে বন্ধুরূপে এই প্রভাকরের অনেক সাহায্য করিতেন, এক্ষণে সময়াভাবে আর সেরূপ পারেন না।”

১২৫৪ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র পুনরায় লেখেন, “ভাস্কর-সম্পাদক

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহ—ভূমিকা

ভট্টাচার্য্য মহাশয় এইক্ষণে যে গুরুতর কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, তাহাতে কি প্রকারে লিপি দ্বারা অস্মৎ পত্রের আনন্দকল্যা করিতে পারেন? তিনি ভাস্কর পত্রকে অতি প্রশংসিত রূপে নিষ্পন্ন করিয়া বন্ধুগণের সাহিত আলাপাদি করেন, ইহাতেই তাঁহাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ প্রদান করি। বিশেষতঃ সুখের বিষয় এই যে, সম্পাদকের যে যথার্থ ধর্ম্ম, তাহা তাঁহাতেই আছে।”

এই ১২৫৪ সালেই তর্কবাগীশের সাহিত ঈশ্বরচন্দ্রের বিবাদ আরম্ভ এবং ক্রমে প্রবল হয়। ঈশ্বরচন্দ্র “পাষণ্ডপীড়ন” এবং তর্কবাগীশ “রসরাজ” পত্র অবলম্বনে কবিতাযুদ্ধ আরম্ভ করেন। শেষে নিতান্ত অশ্লীলতা, গ্লানি, এবং কুৎসাপূর্ণ কবিতায় পরস্পরে পরস্পরকে আক্রমণ করিতে থাকেন। দেশের সর্বসাধারণে সেই লড়াই দেখিবার জন্য মত্ত হইয়া উঠে। সেই লড়াইয়ে ঈশ্বরচন্দ্রেরই জয় হয়।

কিন্তু দেশের রুচিকে বলিহারি! সেই কবিতা-যুদ্ধ যে কি ভয়ানক ব্যাপার, তাহা এখনকার পাঠকের বুঝিয়া উঠিবার সম্ভাবনা নাই। দৈবাধীন আমি এক সংখ্যা মাত্র রসরাজ একদিন দেখিয়াছিলাম। চারি পাঁচ ছত্রের বেশী আর পড়া গেল না। মনুষ্যভাষা যে এত কদর্য্য হইতে পারে, ইহা অনেকেই জানে না। দেশের লোকে এই কবিতা-যুদ্ধে মূগ্ধ হইয়াছিলেন। বলিহারি রুচি! আমার স্মরণ হইতেছে, দুই পত্রের অশ্লীলতায় জ্বালাতন হইয়া, লং সাহেব অশ্লীলতা নিবারণ জন্য আইন প্রচারে যত্নবান ও কৃতকার্য্য হইলেন। সেই দিন হইতে অশ্লীলতা পাপ আর বড় বাঙ্গালা সাহিত্যে দেখা যায় না।

অনেকের ধারণা যে, এই বিবাদ সূত্রে উভয়ের মধ্যে বিষম শত্রুতা ছিল। সেটি ভ্রম। তর্কবাগীশ গুরুতর পীড়ায় শয্যাগত হইলে, ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহাকে দেখিতে গিয়া বিশেষ আত্মীয়তা প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র যে সময়ে মৃত্যুশয্যায় পতিত হন, তর্কবাগীশও সে সময়ে রুগ্নশয্যায় পতিত ছিলেন, সুতরাং সে সময়ে তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখিতে আসিতে পারেন নাই। ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পর তর্কবাগীশ সেই রুগ্নশয্যায় শয়ন করিয়া ভাস্করে যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা দেওয়া গেল,—

“প্রশ্ন। প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কোথায়?

উত্তর। স্বর্গে।

প্র। কবে গেলেন?

উ। গত শনিবারে গঙ্গাযাত্রা করিয়াছিলেন, রাতি দুই প্রহর এক ঘণ্টাকালে গমন করিয়াছেন।

প্র। তাঁহার গঙ্গাযাত্রা ও মৃত্যুশোকের বিষয়, শনিবাসরীয় ভাস্করে প্রকাশ হয় নাই কেন?

উ। কে লিখিবে? গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য শয্যাগত।

প্র। কত দিন?

উ। এক মাস কুড়ি দিন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এই দুইটি নাম দক্ষিণ হস্তে লইয়া বক্ষঃস্থলে রাখিয়া দিয়াছেন, যদি মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পান, তবে আপনার পীড়ার বিষয় ও প্রভাকর-সম্পাদকের মৃত্যুশোক স্বহস্তে লিখিবেন, আর যদি প্রভাকর-সম্পাদকের অনঙ্গমন করিতে হয়, তবে উভয় সম্পাদকের জীবন বিবরণ ও মৃত্যুশোক প্রকাশ জগতে অপকাশ রহিল।”

তর্কবাগীশ মহাশয়, ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর ঠিক এক পক্ষ পরেই অর্থাৎ ১২৬৫ সালের ২৪এ মাঘ প্রাণত্যাগ করেন।

পাষণ্ডপীড়ন উঠিয়া যাইলে, ১২৫৪ সালের ভাদ্র মাসে ঈশ্বরচন্দ্র “সাধুরঞ্জন” নামে আর একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। এখানিতে তাঁহার ছাত্রমণ্ডলীর কবিতা ও প্রবন্ধ সকল প্রকাশ হইত। “সাধুরঞ্জন” ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পর কয়েক বর্ষ পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছিল।

অল্প বয়স হইতেই ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতা এবং মফস্বলের অনেকগুলি সভায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তত্ত্ববোধিনী সভা, টাকীর নীতিতরঙ্গিনী সভা, দর্জিঁপাড়ার নীতিসভা প্রভৃতির সভ্যপদে নিযুক্ত থাকিয়া মধ্যে মধ্যে বক্তৃতা, প্রবন্ধ এবং কবিতা পাঠ করিতেন। তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে তিনি আজিকার দিনে বাঁচিয়া নাই; তাহা হইলে সভার জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইতেন। রামরঙ্গিনী, শ্যামতরঙ্গিনী, নববাহিনী, ভবদাহিনী প্রভৃতি সভার জ্বালায়, তিনি কলিকাতা ছাড়িতেন সন্দেহ নাই। কলিকাতা ছাড়িলেও নিষ্কৃতি পাইতেন, এমন নহে। গ্রামে গেলে দেখিতেন, গ্রামে গ্রামরক্ষিণী সভা, হাটে হাটভঞ্জনী, মাঠে মাঠসংগারিণী, ঘাটে ঘাটসাধনী, জলে

বিশ্বকম রচনাবলী

জলতরঙ্গিণী, স্থলে স্থলশায়িনী, খানায় নিখাতিনী, ডোবায় নিমজ্জিনী, বিলে বিলবাসিনী, এবং মাচার নীচে অলাবুসমপহারিণী সভা সকল সভ্য সংগ্রহের জন্য আকুল হইয়া বেড়াইতেছে।

সে কাল আর এ কালের সন্ধিস্থানে ঈশ্বর গুপ্তের প্রাদুর্ভাব। এ কালের মত তিনি নানা সভার সভ্য, নানা স্কুল কর্মিটির মেম্বর ইত্যাদি ছিলেন—আবার ও দিগে কবির দলে, হাফ আখড়াইয়ের দলে গান বাঁধিতেন। নগর এবং উপনগরের সখের কবি এবং হাফ আখড়াই দল-সমূহের সংগীতসংগ্রামের সময় তিনি কোন না কোন পক্ষে নিযুক্ত হইয়া সংগীত রচনা করিয়া দিতেন। অনেক স্থলেই তাঁহার রচিত গীত ঠিক উত্তর হওয়ায় তাঁহারই জয় হইত। সখের দল-সমূহ সর্বাগ্রে তাঁহাকেই হস্তগত করিতে চেষ্টা করিত, তাঁহাকে পাইলে আর অন্য কবির আশ্রয় লইত না।

সন ১২৫৭ সাল হইতে ঈশ্বরচন্দ্র একটি নতুন অনুষ্ঠান করেন। নববর্ষে অর্থাৎ প্রতি বর্ষের ১লা বৈশাখে তিনি স্বীয় যন্ত্রালয়ে একটি মহতী সভা সমাহৃত করিতে আরম্ভ করেন। সেই সভায় নগর, উপনগর, এবং মফস্বলের প্রায় সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোক এবং সে সময়ের সমস্ত বিদ্বান ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ আমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইতেন। কলিকাতার ঠাকুরবংশ, মল্লিক-বংশ, দত্তবংশ, শোভাবাজারের দেববংশ প্রভৃতি সমস্ত সম্ভ্রান্ত বংশের লোকেরা সেই সভায় উপস্থিত হইতেন। বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির ন্যায় মান্যগণ্য ব্যক্তিগণ সভাপতির আসন গ্রহণ করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেই সভায় মনোরম প্রবন্ধ এবং কবিতা পাঠ করিয়া, সভাস্থ সকলকে তুষ্ট করিতেন। পরে ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রগণের মধ্যে যাঁহাদিগের রচনা উৎকৃষ্ট হইত, তাঁহারা তাহা পাঠ করিতেন। যে সকল ছাত্রের রচনা উৎকৃষ্ট হইত, তাঁহারা নগদ অর্থ পুরস্কার স্বরূপ পাইতেন। নগর ও মফস্বলের অনেক সম্ভ্রান্তলোক ছাত্রদিগকে সেই পুরস্কার দান করিতেন। সভাভঙ্গের পর ঈশ্বরচন্দ্র সেই আমন্ত্রিত প্রায় চারি পাঁচ শত লোককে মহাভোজ দিতেন।

প্রাত্যহিক প্রভাকরের কলেবর ক্ষুদ্র, এবং তাহাতে সম্পাদকীয় উক্তি এবং সংবাদাদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রদান করিতে হইত, এজন্য ঈশ্বরচন্দ্র তাহাতে মনের সাধে কবিতা লিখিতে পারিতেন না। সেই জন্যই তিনি ১২৬০ সালের ১লা তারিখ হইতে এক একখানি স্থূলকায় প্রভাকর প্রতি মাসের ১লা তারিখে প্রকাশ করিতেন। মাসিক প্রভাকরে নানাবিধ খণ্ড কবিতা ব্যতীত গদ্য-পদ্যপূর্ণ গ্রন্থও প্রকাশ করিতে থাকেন।

প্রভাকরের দ্বিতীয় বার অভ্যুদয়ের কয়েক বর্ষ পর হইতেই ঈশ্বরচন্দ্র দৈনিক প্রভাকর সম্পাদনে ক্ষান্ত হইলেন। কেবল মধ্যে মধ্যে কবিতা লিখিতেন এবং বিশেষ রাজনৈতিক বা সামাজিক কোন ঘটনা হইলে, তৎসম্বন্ধে সম্পাদকীয় উক্তি লিখিতেন। সহকারী সম্পাদক বাবু শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ই সমস্ত কার্য সম্পাদন করিতেন। মাসিক পত্র সৃষ্টির পর হইতে ঈশ্বরচন্দ্র বিশেষ পরিশ্রম করিয়া, তাহা সম্পাদন করিতেন। শেষ অবস্থায় ঈশ্বরচন্দ্রের দেশ পর্যাটনে বিশেষ অনুরাগ জন্মে। সেই জন্যই তিনি সহকারীর হস্তে সম্পাদনভার দান করিয়া, পর্যাটনে বহির্গত হইতেন। কলিকাতায় থাকিলে, অধিকাংশ সময়ে উপনগরের কোন উদ্যানে বাস করিতেন।

শারদীয়া পূজার পর জলপথে প্রায়ই ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। তিনি পূর্ব্ববাসালা ভ্রমণে বহির্গত হইয়া, রাজা রাজবল্লভের কীর্ত্তিনাশ দর্শনে কবিতা প্রণয়নপূর্ব্বক প্রভাকরে প্রকাশ করেন। আদিশুরের যজ্ঞস্থলের ইতিবৃত্তও প্রকাশ করিয়াছিলেন। গোড় দর্শন করিয়া তাহার ধ্বংসাবশেষ সম্বন্ধে কবিতা রচনা করেন। গয়া, বারানসী, প্রয়াগ প্রভৃতি প্রদেশ ভ্রমণে বর্ষাধিক কাল অতিবাহিত করেন। তিনি যেখানে যাইতেন, সেইখানেই সমাদর এবং সম্মানের সহিত গৃহীত হইতেন। যাঁহারা তাঁহাকে চিনিতেন না, তাঁহারাও তাঁহার মিষ্টভাষিতায় মুগ্ধ হইয়া আদর করিতেন। এই ভ্রমণসূত্রে স্বদেশের সকল প্রান্তের সম্ভ্রান্ত লোকের সহিতই তাঁহার আলাপ পরিচয় এবং মিত্রতা হইয়াছিল। তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া, মফস্বলের ধনবান জমীদারগণ মহানন্দ প্রকাশ করিতেন এবং অবাচিত হইয়া পাথেয়স্বরূপ পর্য্যাপ্ত অর্থ এবং নানাবিধ মূল্যবান দ্রব্য উপহার দিতেন। যাঁহার সহিত একবার আলাপ হইত, তিনিই ঈশ্বরচন্দ্রের মিত্রতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতেন। মিষ্টভাষিতা এবং সরলতার দ্বারা তিনি সকলেরই হৃদয় হরণ করিতেন। ভ্রমণ-কালে কোন অপরিচিত স্থানে নৌকা লাগিলে, তীরে উঠিয়া পথে যে সকল বালককে খেলিতে দেখিতেন, তাহাদিগের সহিত আলাপ করিয়া, তাহাদিগের বাটীতে যাইতেন। তাহাদিগের

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহ—ভূমিকা

বাটীতে লাউ, কুমড়া প্রভৃতি কোন ফল মূল দেখিতে পাইলে চাহিয়া আনিতেন। ইহাতে কোন হীনতা বোধ করিতেন না। বালকদিগের অভিভাবকগণ শেষ ঈশ্বরচন্দ্রের পরিচয় প্রাপ্ত হইলে, যথাসাধ্য সমাদর করিতে ঘূর্টি করিতেন না। ভ্রমণকালে বালকদিগকে দেখিতে পাইলে, তাহাদিগকে ডাকিয়া গান শুনিতেন এবং সকলকে পয়সা দিয়া তুষ্ট করিতেন।

প্রাচীন কবিদিগের অপ্রকাশিত লুপ্তপ্রায় কবিতাবলী, গীত, পদাবলী এবং তৎসহ তাহাদিগের জীবনী প্রকাশ করিতে অভিলাষী হইয়া, ঈশ্বরচন্দ্র ক্রমাগত দশবর্ষকাল নানা স্থান পর্য্যটন, এবং যথেষ্ট শ্রম করিয়া, শেষ সে বিষয়ে সফলতা লাভ করেন। বাঙ্গালীজাতির মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রই এ বিষয়ের প্রথম উদ্যোগী। সর্ব্বাদৌ ১২৬০ সালের ১লা পৌষের মাসিক প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র বহুকণ্ঠে সংগৃহীত রামপ্রসাদ সেনের জীবনী ও তৎপ্রণীত “কালীকীর্্তন” ও “কৃষ্ণকীর্্তন” প্রভৃতি বিষয়ক অনেকগুলি লুপ্তপ্রায় গীত এবং পদাবলী প্রকাশ করেন। তৎপরে পর্য্যায়ক্রমে প্রতি মাসের প্রভাকরে রামনিধি সেন (নিধুবাবু), হরুঠাকুর, রাম বসু, নিতাইদাস বৈরাগী, লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস, রাসু ও নৃসিংহ এবং আরও কয়েক জন প্রাচীন খ্যাতনামা কবির জীবনচরিত, গীত এবং পদাবলী প্রকাশ করেন। সেগুলি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল, কিন্তু প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

মৃত কবি ভারতচন্দ্র রায়ের জীবনী এবং তৎপ্রণীত অনেক লুপ্তপ্রায় কবিতা এবং পদাবলী বহুপরিশ্রমে সংগ্রহ করিয়া, সন ১২৬২ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠের প্রভাকরে প্রকাশ করেন। সেই সনের আষাঢ় মাসে তাহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। ইহাই ঈশ্বরচন্দ্রের প্রথম পুস্তক প্রকাশ।

১২৬৪ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে “প্রবোধ প্রভাকর” নামে গ্রন্থ প্রকাশারম্ভ হইয়া, সেই সনের ১লা ভাদ্রে তাহা শেষ হয়। পদ্মলোচন ন্যায়রত্ন সেই পুস্তক প্রণয়ন কালে তাহার বিশেষ সহায়তা করেন। উক্ত সনের ১লা চৈত্রে “প্রবোধ প্রভাকর” স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ হয়।

তৎপরে প্রতি মাসের মাসিক প্রভাকরে ক্রমান্বয়ে “হিতপ্রভাকর” এবং “বোধেন্দুবিকাশ” প্রকাশ ও সমাপ্ত করেন। ঈশ্বরচন্দ্র নিজে তাহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাহার অনুজ বাবু রামচন্দ্র গুপ্ত পরে পুস্তকাকারে “হিতপ্রভাকর” ও “বোধেন্দুবিকাশের” প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। তিনখানি পুস্তকেরই দ্বিতীয় খণ্ড অপ্রকাশিত আছে।

কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস এবং নীতিবিষয়ক অনেকগুলি কবিতা “নীতিহার” নামে প্রভাকরে প্রকাশ করেন।

১২৬৫ সালের মাঘ মাসের মাসিক প্রভাকর সম্পাদনের পর ঈশ্বরচন্দ্র শ্রীমদ্ভাগবতের বাঙ্গালা কবিতায় অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন। মঙ্গলাচরণ এবং পরবর্ত্তী কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ করিয়াই তিনি মৃত্যুশয্যায় শয়ন করেন।

অবিপ্রাস্ত মস্তিষ্ক চালনাসূত্রে মধ্যে মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইত। সেই জন্যই মধ্যে মধ্যে জলপথে এবং স্থলপথে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। ১২৬০ সাল হইতে ঈশ্বরচন্দ্রের শ্রম বৃদ্ধি হয়। মাসিক পত্র সম্পাদন এবং উপর্য্যুপরি কয়খানি গ্রন্থ এই সময় হইতে লিখেন। কিন্তু এই সময়টিই তাহার জীবনের মধ্যাহ্নকালস্বরূপ সমুজ্জ্বল।

১২৬৫ সালের মাঘের মাসিক প্রভাকর সম্পাদন করিয়াই ঈশ্বরচন্দ্র জ্বররোগে আক্রান্ত হইলেন। শেষ তাহা বিকারে পরিণত হয়। উক্ত সনের ৮ই মাঘের প্রভাকরের সম্পাদকীয় উক্তিতে নিম্নলিখিত কথা প্রকাশ হয়;—

“অদ্য কয়েক দিবস হইতে আমারদিগের সর্বাধ্যক্ষ কবিকুলকেশরী শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় জ্বরবিকার রোগাক্রান্ত হইয়া শয্যাগত আছেন। শারীরিক গ্লানি যথেষ্ট হইয়াছিল, সদুপযুক্ত গুণযুক্ত এতদেশীয় বিখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মহোদয়েরা চিকিৎসা করিতেছেন। তদ্বারা শারীরিক গ্লানি অনেক নিবৃত্তি পাইয়াছে। ফলে এক্ষণে রোগ নিঃশেষ হয় নাই।”

ঈশ্বরচন্দ্রের রোগের সংবাদ প্রকাশ হইবামাত্র দেশের সকলেই উদ্ভিন্ন হইয়া উঠেন। কলিকাতার সম্ভ্রান্ত লোকেরা এবং মিত্রমণ্ডলী দর্শিতান্তঃকরণে ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখিতে যান। অনেকে বহুকণ্ঠে পর্য্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্রের নিকট অবস্থান, তত্ত্বাবধান এবং চিকিৎসা বিষয়ে পরামর্শ দান করিতে থাকেন।

বঙ্গীয় রচনাবলী

ঈশ্বরচন্দ্রের পীড়ায় সাধারণকে নিতান্ত উদ্ভিন্ন এবং বিশেষ বিবরণ জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে দেখিয়া, পরদিনের অর্থাৎ ১০ই মাঘের প্রভাকরে তাহার অবস্থার ও চিকিৎসার বিবরণ প্রকাশিত হয়।

তৎপরদিন অর্থাৎ ১০ই মাঘের প্রভাকরে তাহার পর বৃত্তান্ত লিখিত হয়। পীড়ায় সকল মনুষ্যেরই দুঃখ সমান—সকল চিকিৎসকেরই বিদ্যা সমান এবং সকল ব্যাধিরই পরিণাম শেষ এক। অতএব সে সকল কিছুই উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন দেখি না।

১০ই মাঘ শনিবারে ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনাশা ক্ষীণ হইয়া আসিলে, হিন্দুপ্রথামত তাহাকে গঙ্গাযাত্রা করান হয়। ১২ই মাঘ সোমবারের প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্রের অনুজ রামচন্দ্র লেখেন,—

“সংবাদ প্রভাকরের জন্মদাতা ও সম্পাদক আমার সহোদর পরমপূজ্যবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহোদয় গত ১০ই মাঘ শনিবার রজনী অনুমান দুই প্রহর এক ঘটিকা কালে ‘ভাগীরথীতীরে নীরে সজ্ঞানে অনবরত স্বীয়ভিষ্টদেব ভগবানের নাম উচ্চারণ পূর্বক এতন্মায়াময় কলেবর পরিত্যাগ পূর্বক পরলোকে পরমেশ্বর সাক্ষাৎকারে গমন করিয়াছেন।”

এক্ষণে ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত্র সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিয়া এই পরিচ্ছেদ শেষ করিব। ঈশ্বরচন্দ্রের ভাগ্য তাহার স্বহস্তগঠিত।

তিনি কলিকাতায় আগমন করিয়া, অনুজ রামচন্দ্রের সহিত পরাম্বে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। একদা সেই সময়ে রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, “ভাই, আমাদের মাসিক ৪০ টাকা আয় হইলে, উত্তমরূপে চলিবে।” শেষ প্রভাকরের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের দৈন্যদশা বিদূরিত হইয়া, সম্ভ্রান্ত ধনবানের ন্যায় আয় হইতে থাকে। প্রভাকর হইতেই অনেক টাকা আসিত। তদ্ব্যতীত সাধারণের নিকট হইতে সকল সময়েই বৃত্তি প্রভৃতি প্রাপ্ত হইতেন। একদা অনুজ রামচন্দ্রকে অর্থোপার্জনে উদাসীন দেখিয়া বলিয়াছিলেন, “আমি এক দিন ভিক্ষা করিতে বাহির হইলে, এই কলিকাতা হইতেই লক্ষ টাকা ভিক্ষা করিয়া আনিতে পারি, তোর দশা কি হইবে?” বাস্তবিক ঈশ্বরচন্দ্রের সেইরূপ প্রতিপত্তি হইয়াছিল।

অর্থের প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রের কিছুমাত্র মমতা ছিল না। পাত্রাপাত্র ভেদ জ্ঞান না করিয়া সাহায্য-প্রার্থী মাত্রকেই দান করিতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ প্রতিনিয়তই তাহার নিকট যাতায়াত করিতেন, ঈশ্বরচন্দ্রও তাহাদিগকে নিয়মিত বার্ষিক বৃত্তি দান ব্যতীত সময়ে সময়ে অর্থসাহায্য করিতেন। পরিচিত বা সামান্য পরিচিত ব্যক্তি, ঋণ প্রার্থনা করিলে, তদুত্তরেই তাহা প্রদান করিতেন। কেহ সে ঋণ পরিশোধ না করিলে, তাহা আদায় জন্য ঈশ্বরচন্দ্র চেষ্টা করিতেন না। এই সূত্রে তাহার অনেক অর্থ পরহস্তগত হয়। সমাধিক আয় হইতে থাকিলেও তাহার রীতিমত কোন হিসাবপত্র ছিল না। ব্যয় করিয়া যে সময়ে যত টাকা বাঁচিত, তাহা কলিকাতার কোন না কোন ধনী লোকের নিকট রাখিয়া দিতেন। তাহার রসিদপত্র লইতেন না। তাহার মৃত্যুর পর অনেক বড়লোক (!!)

সেই টাকাগুলি আত্মসাৎ করেন। রসিদ অভাবে তদীয় ভ্রাতা তৎসমস্ত আদায় করিতে পারেন নাই।

ঈশ্বরচন্দ্রের বাটীর দ্বার অব্যাহত ছিল। দুই বেলাই ক্রমাগত উনুন জ্বলিত, যে আসিত, সেই আহার পাইত। তিনি প্রায় মধ্যে মধ্যে ভোজের অনুষ্ঠান করিয়া, আত্মীয় মিত্র এবং ধনী লোকদিগকে আহার করাইতেন।

ঈশ্বরচন্দ্র প্রতি বৎসর বাঙ্গালার অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের নিকট হইতে মূল্যবান শাল উপহার পাইতেন। তৎসমস্ত গাটীর বাঁধা থাকিত। একদা একজন পরিচিত লোক বলিলেন, “শালগুলো ব্যবহার করেন না, পোকায় কাটিবে, নষ্ট হইয়া যাইবে কেন; বিক্রয় করিলে, অনেক টাকা পাওয়া যাইবে। আমাকে দিউন, বিক্রয় করিয়া টাকা আনিয়া দিব।” ঈশ্বরচন্দ্র তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া কয়েক শত টাকা মূল্যের এক গাটীর শাল তাহাকে দিলেন। কিন্তু সে ব্যক্তি আর টাকাও দেয় নাই, শালও ফিরিয়ে দেয় নাই, ঈশ্বরচন্দ্রও তাহার আর কোন তত্ত্বও লয়েন নাই।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাল্যকালে যদিও উদ্ধত, অবাধ্য এবং স্বেচ্ছানুরক্ত ছিলেন, বয়োবৃদ্ধিসহকারে সে সকল দোষ যায়। তিনি সদাই হাস্যবদন; মিস্ট কথা, রসের কথা, হাসির কথা নিয়তই মুখে লাগিয়া থাকিত। রহস্য এবং ব্যঙ্গ তাহার প্রিয় সহচর ছিল। কপটতা, ছলনা, চাতুরী জানিতেন না। তিনি সদালাপী ছিলেন। কথায় হউক, বক্তৃতায় হউক, বিবাদে হউক, কবিতায়

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহ—ভূমিকা

হউক, গীতে হউক, লোককে হাসাইতে বিলক্ষণ পটু ছিলেন। সামান্য বালক হইতে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলের সহিত সমান ব্যবহার করিতেন। শত্রুরাও তাঁহার ব্যবহারে মুগ্ধ হইত।

চরিত্রটি সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিল না। পানদোষ ছিল। প্রকাশ আছে যে, যে সময়ে তিনি সুরাপান করিতেন, সে সময়ে লেখনী অনর্গল কবিতা প্রসব করিত। যে কোন শ্রেণীর যে কোন পরিচিত বা অপরিচিত ব্যক্তি যে কোন সময়ে তাঁহাকে যে কোন প্রকার কবিতা, গীত বা ছড়া প্রস্তুত করিয়া দিতে অনুরোধ করিত, তিনি আনন্দের সহিত তাঁহাদিগের আশা পূর্ণ করিতেন। কাহাকেও নিরাশ করিতেন না।

ঈশ্বরচন্দ্র পুনঃ পুনঃ আপন কবিতায় স্বীকার করিয়াছেন, তিনি সুরাপান করিতেন।—

এক (১) দুই (২) তিন (৩) চারি (৪) ছেড়ে দেহ ছয় (৬)।

পাঁচেরে (৫) করিলে হাতে রিপু রিপু নয় ॥

তণ্ড ছাড়া পণ্ড সেই অতি পরিপাটি।

বাবু সেজে পাটির উপরে রাখি পাটি ॥

পাত্র হোয়ে পাত্র পেয়ে ঢোলে মারি কাটি।

ঝোলমাথা মাছ নিয়া চাটি দিয়া চাটি ॥

তিনি সুরাপান করিতেন, এজন্য লোকে নিন্দা করিত। তাই ঈশ্বর গুপ্ত মধ্যে মধ্যে কবিতায় তাহাদিগের উপর ঝাল ঝাড়িতেন। ঋতু কবিতার মধ্যে পাঠক এই সংগ্রহে দেখিতে পাইবেন।

যখন ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে আমার পরিচয়, তখন আমি বালক, স্কুলের ছাত্র, কিন্তু তথাপি ঈশ্বর গুপ্ত আমার স্মৃতিপথে বড় সমৃদ্ধজ্বল। তিনি সুপুরুষ, সুন্দর কাস্তিবিশিষ্ট ছিলেন। কথার স্বর বড় মধুর ছিল। আমরা বালক বলিয়া আমাদের সঙ্গে নিজে একটু গম্ভীরভাবে কথাবার্তা করিতেন—তাঁহার কতকগুলো নন্দীভৃঙ্গী থাকিত—রসাভাষের ভার তাহাদের উপর পড়িত। ফলে তিনি রস ব্যতীত এক দণ্ড থাকিতে পারিতেন না। স্বপ্রণীত কবিতাগুলি পড়িয়া শুনাইতে ভাল বাসিতেন। আমরা বালক হইলেও আমাদের কাছেও শুনাইতে ঘৃণা করিতেন না। কিন্তু হেমচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় তাঁহার আবৃত্তিশক্তি পরিমার্জিত ছিল না। যাহার কিছু রচনাশক্তি আছে, এমন সকল যুবককে তিনি বিশেষ উৎসাহ দিতেন, তাহা পুঙ্খবলি রাখি। কবিতা রচনার জন্য দীনবন্ধুকে, দ্বারকানাথ অধিকারীকে এবং আমাকে একবার প্রাইজ দেওয়াইয়াছিলেন। দ্বারকানাথ অধিকারী কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র—তিনিই প্রথম প্রাইজ পান। তাঁহার রচনাপ্রণালীটা কতকটা ঈশ্বর গুপ্তের মত ছিল—সরল স্বচ্ছ—দেশী কথায়, দেশী ভাব তিনি ব্যক্ত করিতেন। অল্প বয়সেই তাঁহার মৃত্যু হয়। জীবিত থাকিলে বোধ হয় তিনি একজন উৎকৃষ্ট কবি হইতেন। দ্বারকানাথ, দীনবন্ধু, ঈশ্বরচন্দ্র, সকলেই গিয়াছে—তাঁহাদের কথাগুলি লিখবার জন্য আমি আছি।

সুরাপান করুন, আর পাঁটার স্তোত্র লিখুন, ঈশ্বরচন্দ্র বিলাসী ছিলেন না। সামান্য বেশে সামান্য ভাবে অবস্থান করিতেন। যথেষ্ট অর্থ থাকিলেও ধনী ব্যক্তির উপযোগী সাজসজ্জা কিছুই করিতেন না। বৈঠকখানায় একখানি সামান্য গালিছা বা মাদুর পাতা থাকিত, কোন প্রকার আসবাব থাকিত না। সম্ভ্রান্ত লোকেরা আসিয়া তাহাতে বসিয়াই ঈশ্বরের সহিত আলাপ করিয়া তৃপ্ত হইয়া যাইতেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—কবিত্ব

ঈশ্বর গুপ্ত কবি। কিন্তু কি রকম কবি?

ভারতবর্ষে পুঙ্খবলি জ্ঞানীগণকেই কবি বলিত। শাস্ত্রবেত্তারা সকলেই “কবি”। ধর্মশাস্ত্রকারও কবি, জ্যোতিষশাস্ত্রকারও কবি।

তার পর কবি শব্দের অর্থের অনেক রকম পরিবর্ত ঘটিয়াছে। “কাব্যোষু মাঘঃ কবিঃ কালিদাসঃ” এখানে অর্থটা ইংরেজি Poet শব্দের মত। তার পর এই শতাব্দীর প্রথমাংশে

(১) কাম, (২) ক্রোধ, (৩) লোভ, (৪) মোহ, (৬) মাৎসর্য, (৫) মদ। “রিপু রিপু নয়” অর্থাৎ “মদ” শব্দ এখানে রিপু অর্থে বদ্বিবে না।

বাংকম রচনাবলী

“কবির লড়াই” হইত। দুই দল গায়ক জুটিয়া ছন্দোবন্ধে পরস্পরের কথার উত্তর প্রত্যুত্তর দিতেন। সেই রচনার নাম “কবি।”

আবার আজকাল কবি অর্থে Poet, তাহাকে পারা যায়, কিন্তু “কবিত্ব” সম্বন্ধে আজকাল বড় গোল। ইংরেজিতে যাহাকে Poetry বলে, এখন তাহাই কবিত্ব। এখন এই অর্থ প্রচলিত, সুতরাং এই অর্থে ঈশ্বর গুপ্ত কবি কি না আমরা বিচার করিতে বাধ্য।

পাঠক বোধ হয় আমার কাছে এমন প্রত্যাশা করেন না যে, এই কবিত্ব কি সামগ্রী, তাহা আমি বুঝাইতে বাসিব। অনেক ইংরেজ বাঙ্গালী লেখক সে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহাদের উপর আমার বরাত দেওয়া রহিল। আমার এই মাত্র বক্তব্য যে, সে অর্থে ঈশ্বর গুপ্তকে উচ্চাসনে বসাইতে সমালোচক সম্মত হইবেন না। মনুষ্য-হৃদয়ের কোমল, গম্ভীর, উন্নত, অক্ষুণ্ণ ভাবগুলি ধরিয়া তাহাকে গঠন দিয়া, অব্যক্তকে তিনি ব্যক্ত করিতে জানিতেন না। সৌন্দর্য্যসৃষ্টিতে তিনি তাদৃশ পটু ছিলেন না। তাহার সৃষ্টিই বড় নাই। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, ইংহারা সকলেই এ কবিত্বে তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রাচীনেরাও তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভারত-চন্দ্রের ন্যায় হীরামালিনী গড়িবার তাহার ক্ষমতা ছিল না; কাশীরামের মত সুভদ্রাহরণ কি শ্রীবৎসচিন্তা, কীর্ত্তিবাসের মত তরণীসেন বধ, মনুসুন্দরামের মত ফুল্লরা গড়িতে পারিতেন না। বৈষ্ণব কবিদের মত বীণায় ঝঙ্কার দিতে জানিতেন না। তাহার কাব্যে সুন্দর, করুণ, প্রেম, এ সব সামগ্রী বড় বেশী নাই। কিন্তু তাহার যাহা আছে, তাহা আর কাহারও নাই। আপন অধিকারের ভিতর তিনি রাজা।

সংসারের সকল সামগ্রী কিছু ভাল নহে। যাহা ভাল, তাও কিছু এত ভাল নহে যে, তার অপেক্ষা ভাল আমরা কামনা করি না। সকল বিষয়েই প্রকৃত অবস্থার অপেক্ষা উৎকর্ষ আমরা কামনা করি। সে উৎকর্ষের আদর্শ সকল, আমাদের হৃদয়ে অক্ষুণ্ণ রকম থাকে। সেই আদর্শ ও সেই কামনা, কবির সামগ্রী। যিনি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাহাকে গঠন দিয়া শরীরী করিয়া, আমাদের হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন, সচরাচর তাহাকেই আমরা কবি বলি। মধুসূদনাদি তাহা পারিয়াছেন, ঈশ্বরচন্দ্র তাহা পারেন নাই বা করেন নাই, এই জন্য এই অর্থে আমরা মধুসূদনাদিকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া, ঈশ্বরচন্দ্রকে নিম্নশ্রেণীতে ফেলিয়াছি। কিন্তু এইখানেই কি কবিত্বের বিচার শেষ হইল? কাব্যের সামগ্রী কি আর কিছু রহিল না?

রহিল বৈকি। যাহা আদর্শ, যাহা কমনীয়, যাহা আকাঙ্ক্ষিত, তাহা কবির সামগ্রী। কিন্তু যাহা প্রকৃত, যাহা প্রত্যক্ষ, যাহা প্রাপ্ত, তাহাই বা নয় কেন? তাহাতে কি কিছু রস নাই? কিছু সৌন্দর্য্য নাই? আছে বৈকি। ঈশ্বর গুপ্ত, সেই রসে রসিক, সেই সৌন্দর্য্যের কবি। যাহা আছে, ঈশ্বর গুপ্ত তাহার কবি। তিনি এই বাঙ্গালা সমাজের কবি। তিনি কলিকাতা সহরের কবি। তিনি বাঙ্গালার গ্রাম্যদেশের কবি। এই সমাজ, এই সহর, এই দেশ বড় কাব্যময়। অন্যে তাহাতে বড় রস পান না। তোমরা পৌষপার্শ্বণে পিটাপুর্লি খাইয়া অজীর্ণে দুঃখ পাও, তিনি তাহার কাব্যরসটুকু সংগ্রহ করেন। অন্যে নববর্ষে মাংস চিবাইয়া, মদ গিলিয়া, গাঁদাফুল সাজাইয়া কষ্ট পায়, ঈশ্বর গুপ্ত মক্ষিকাবৎ তাহার সারাদান করিয়া নিজে উপভোগ করেন, অন্যকেও উপহার দেন। দুর্ভিক্ষের দিন, তোমরা মাতা বা শিশুর চক্ষে অশ্রুবিন্দুশ্রেণী সাজাইয়া মনুস্তাহারের সঙ্গে তাহার উপমা দাও—তিনি চালের দরটি কষিয়া দেখিয়া তার ভিতর একটু রস পান।

মনের চেলে মন ভেঙ্গেচে

ভাঙ্গা মন আর গড়ে না কো।

তোমরা সুন্দরীগণকে পুষ্পোদ্যানে বা বাতায়নে বসাইয়া প্রতিমা সাজাইয়া পূজা কর, তিনি তাহাদের রান্নাঘরে, উন্নন গোড়ায় বসাইয়া, শাশুড়ী ননদের গঞ্জনা ফেলিয়া, সত্যের সংসারের এক রকম খাঁটি কাব্য রস বাহির করেন;—

বধুর মধুর খনি, মধুশতদল।

সলিলে ভাসিয়া যায়, চক্ষু ছল ছল।

ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য চালের কাঁটায়, রান্নাঘরের ধুঁয়ায়, নাটুরে মাঝির ধর্জির ঠেলায়, নীলের দাদনে, হোটেলের খানায়, পাঁটার অস্থিস্থিত মজ্জায়। তিনি আনারসে মধুর রস ছাড়া কাব্য রস পান, তপসেমাছে মৎস্যভাব ছাড়া তপস্বীভাব দেখেন, পাঁটার বোকাগন্ধ ছাড়া একটু দখীচির

গায়ের গন্ধ পান। তিনি বলেন, “তোমাদের এদেশ, এ সমাজ বড় রঙ্গভরা। তোমরা মাথা কুটাকুটি করিয়া দুর্গোৎসব কর, আমি কেবল তোমাদের রঙ্গ দেখি—তোমরা এ ওকে ফাঁকি দিতেছ, এ ওর কাছে মেকি চালাইতেছ, এখানে কাষ্ঠ হাসি হাস, ওখানে মিছা কান্না কাঁদ, আমি তা বসিয়া বসিয়া দেখিয়া হাসি। তোমরা বল, বাঙ্গালীর মেয়ে বড় সুন্দরী, বড় গুণবতী, বড় মনোমোহিনী—প্রেমের আধার, প্রাণের সুসার, ধর্মের ভান্ডার;—তা হইলে হইতে পারে, কিন্তু আমি দেখি উহারা বড় রঙ্গের জিনিস। মানুষে যেমন রূপী বাঁদর পোষে, আমি বলি পুরুষে তেমন মেয়েমানুষ পোষে—উভয়কে মুখ ভেঙ্গানতেই সুখ।” স্ত্রীলোকের রূপ আছে—তাহা তোমার আমার মত ঈশ্বর গুপ্তও জানিতেন, কিন্তু তিনি বলেন, উহা দেখিয়া মুগ্ধ হইবার কথা নহে—উহা দেখিয়া হাসিবার কথা। তিনি স্ত্রীলোকের রূপের কথা পড়িলে হাসিয়া লুটাইয়া পড়েন। মাঘ মাসের প্রাতঃস্নানের সময় যেখানে অন্য কবি রূপ দেখিবার জন্য, যুবতিগণের পিছে পিছে যাইতেন, ঈশ্বরচন্দ্র সেখানে তাহাদের নাকাল দেখিবার জন্য যান। তোমরা হয়ত, সেই নীহারশীতল স্বচ্ছসলিলধৌত কষিতকান্তি লইয়া আদর্শ গাড়িবে, তিনি বলিলেন, “দেখ—দেখি! কেমন তামাসা! যে জাতি স্নানের সময় পরিধেয় বসন লইয়া বিব্রত, তোমরা তাহাদের পাইয়া এত বাড়াবাড়ি কর!” তোমরা মহিলাগণের গৃহকর্ম আস্থা ও যত্ন দেখিয়া, বলিবে, “ধন্য স্বামীপুত্রসেবারত! ধন্য স্ত্রীলোকের স্নেহ ও ধৈর্য্য!” ঈশ্বরচন্দ্র তখন তাহাদের হাঁড়িশালে গিয়া দেখিবেন, রন্ধনের চাল চর্বাণেই গেল, পিটুলির জন্য কোন্দল বাধিয়া গেল, স্বামী ভোজন করাইবার সময়ে শাশুড়ী ননদের মুণ্ড ভোজন হইল, এবং কুটুম্বভোজনের সময় লজ্জার মুণ্ড ভোজন হইল। স্থূল কথা, ঈশ্বর গুপ্ত Realist এবং ঈশ্বর গুপ্ত Satirist। ইহা তাঁহার সাম্রাজ্য, এবং ইহাতে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে অধিতীয়।

ব্যঙ্গ অনেক সময়ে বিদ্বেষপ্রসূত। ইউরোপে অনেক ব্যঙ্গকুশল লেখক জন্মিয়াছেন। তাঁহাদের রচনা অনেক সময়ে হিংসা, অসূয়া, অকৌশল, নিরানন্দ, এবং পরশ্রীকাতরতাপরিপূর্ণ। পড়িয়া বোধ হয় ইউরোপীয় যুদ্ধ ও ইউরোপীয় রসিকতা এক মার পেটে জন্মিয়াছে—দুয়ের কাজ মানুষকে দুঃখ দেওয়া। ইউরোপীয় অনেক কুসামগ্রী এই দেশে প্রবেশ করিতেছে—এই নরঘাতিনী রসিকতাও এদেশে প্রবেশ করিয়াছে। হুতোম পেঁচার নক্সা বিদ্বেষপরিপূর্ণ। ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গে কিছুমাত্র বিদ্বেষ নাই। শত্রুতা করিয়া তিনি কাহাকেও গালি দেন না। কাহারও অনিষ্ট কামনা করিয়া কাহাকেও গালি দেন না। মেকির উপর রাগ আছে বটে, তা ছাড়া সবটাই রঙ্গ, সবটা আনন্দ। কেবল ঘোর ইয়ারকি। গৌরীশঙ্করকে গালি দিবার সময়েও রাগ করিয়া গালি দেন না। সেটা কেবল জিগীষা—ব্রাহ্মণকে কুভাষায় পরাজয় করিতে হইবে এই জিদ। কবির লড়াই, ঐ রকম শত্রুতাশূন্য গালাগালি। ঈশ্বর গুপ্ত “কবির লড়াইয়ে” শিক্ষিত—সে ধরণটা তাঁহার ছিল।

অন্যতঃ তাও না—কেবল আনন্দ। যে যেখানে সমুখে পড়ে, তাহাকেই ঈশ্বরচন্দ্র তাহার গালে এক চড়, নহে একটা কাণমলা দিয়া ছাড়িয়া দেন—কারণ আর কিছুই নয়, দুই জনে একটু হাসিবার জন্য। কেহই চড় চাপড় হইতে নিস্তার পাইতেন না। গবর্ণর জেনেরল, লেপ্টেন্যান্ট গবর্ণর, কোন্সিলের মেম্বার হইতে, মুটে, মাঝি, উড়িয়া বেহারা কেহ ছাড়া নাই। এক একটি চড় চাপড় এক একটি বজ্র—যে মারে, তাহার রাগ নাই, কিন্তু যে খায়, তার হাড়ে হাড়ে লাগে। তাতে আবার পাত্রাপাত্র বিচার নাই। যে সাহসে তিনি বলিয়াছেন,—

বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী, মুখে গন্ধ ছুটে।

আমাদের সে সাহস নাই। তবে বাঙ্গালীর মেয়ের উপর নীচের লিখিত দুই চরণে আমাদের ঢেরা সই রহিল—

সিন্দূরের বিন্দুসহ কপালেতে উল্কি।

নসী জশী ক্ষেমী বামী, রামী শ্যামী গুল্কী ॥

মহারাণীকে স্তুতি করিতে করিতে দেশী Agitatorদের কাণ ধরিয়া টানাটানি—

তুমি মা কম্পতরু, আমরা সব পোষা গোরু,

শিখি নি সিং বাঁকানো,

কেবল খাব খোল বিচারি ঘাস।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহ—ভূমিকা

অশ্লীল। আর যাহার উদ্দেশ্য সেরূপ নহে, কেবল পাপকে তিরস্কৃত বা উপহাসিত করা যাহার উদ্দেশ্য, তাহার ভাষা রুচি এবং সভ্যতার বিরুদ্ধ হইলেও অশ্লীল নহে। ঋষিরাও এরূপ ভাষা ব্যবহার করিতেন। সেকালের বাঙ্গালীদিগের ইহা এক প্রকার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। আমি এমন অনেক দেখিয়াছি, অশীতিপর বৃদ্ধ, ধর্মাত্মা, আজন্ম সংযতেন্দ্রিয়, সভ্য, সুশীল, সজ্জন, এমন সকল লোকও, কুকাজ দেখিয়াই রাগিলেই “বদ্‌জোবান” আরম্ভ করিতেন। তখনকার রাগ প্রকাশের ভাষাই অশ্লীল ছিল। ফলে সে সময়ে ধর্মাত্মা এবং অধর্মাত্মা উভয়কেই অশ্লীলতায় সুপটু দেখিতাম—প্রভেদ এই দেখিতাম, যিনি রাগের বশীভূত হইয়া অশ্লীল, তিনি ধর্মাত্মা। যিনি হিন্দ্রিয়াস্তরের বশে অশ্লীল তিনি পাপাত্মা। সৌভাগ্যক্রমে সেরূপ সামাজিক অবস্থা ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছে।

ঈশ্বর গুপ্ত ধর্মাত্মা, কিন্তু সেকালে বাঙ্গালী। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা অশ্লীল। সংসারের উপর, সমাজের উপর, ঈশ্বর গুপ্তের রাগের কারণ অনেক ছিল। সংসার, বাল্যকালে বালকের অমূল্য রত্ন যে মাতা, তাহা তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইল। খাঁটি সোনা কাড়িয়া লইয়া, তাহার পরিবর্তে এক পিতলের সামগ্রী দিয়া গেল—মার বদলে বিমাতা। তার পর যৌবনের যে অমূল্যরত্ন—শুধু যৌবনের কেন, যৌবনের, প্রোঢ় বয়সের, বান্ধাকোর তুল্যরূপেই অমূল্যরত্ন যে ভার্যা, তাহার বেলাও সংসার বড় দাগা দিল। যাহা গ্রহণীয় নহে, ঈশ্বরচন্দ্র তাহা লইলেন না, কিন্তু দাগাবাজির জন্য সংসারের উপর ঈশ্বরের রাগটা রহিয়া গেল। তার পর অল্প বয়সে পিতৃহীন, সহায়হীন হইয়া, ঈশ্বরচন্দ্র অল্পকষ্টে পড়িলেন। কত বানরে, বানরের অট্টালিকায় শিকলে বাঁধা থাকিয়া ক্ষীর সর পায়সান্ন ভোজন করে, আর তিনি দেবতুল্য প্রতিভা লইয়া ভূমণ্ডলে আসিয়া, শাকাম্বের অভাবে ক্ষুধার্ত। কত কুকুর বা মকট বরষে জুড়ী জুড়িয়া, তাহার গায়ে কাদা ছড়াইয়া যায়, আর তিনি হৃদয়ে বাগ্‌দেবী ধারণ করিয়াও খালি পায়ে বর্ষার কাদা ভাঙ্গিয়া উঠিতে পারেন না। দুর্বল মনুষ্য হইলে এ অত্যাচারে হারি মানিয়া, রণে ভঙ্গ দিয়া, পলায়ন করিয়া দুঃখের অন্ধকার গহবরে লুকাইয়া থাকে। কিন্তু প্রতিভাশালীরা প্রায়ই বলবান।

ঈশ্বর গুপ্ত সংসারকে সমাজকে, স্বীয় বাহুবলে পরাস্ত করিয়া, তাহার নিকট হইতে ধন, যশ, সম্মান আদায় করিয়া লইলেন। কিন্তু অত্যাচারজনিত যে ক্রোধ তাহা মিটিল না। জ্যেষ্ঠা মহাশয়ের জুতা তিনি সমাজের জন্য তুলিয়া রাখিয়াছিলেন। এখন সমাজকে পদতলে পাইয়া বিলক্ষণ উত্তম মধ্যম দিতে লাগিলেন। সেকালে বাঙ্গালীর ক্রোধ কদর্যের উপর কদর্য ভাষাতেই অভিব্যক্ত হইত। বোধ হয় ইহাদের মনে হইত, বিশুদ্ধ পবিত্র কথা, দেবদ্বিজাদি প্রভৃতি যে বিশুদ্ধ ও পবিত্র তাহারই প্রতি ব্যবহার্য্য—যে দুর্ভাষা, তাহার জন্য এই কদর্য ভাষা। এইরূপে ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় অশ্লীলতা আসিয়া পড়িয়াছে।

আমরা ইহাও স্বীকার করি যে, তাহা ছাড়া অন্যবিধ অশ্লীলতাও তাহার কবিতায় আছে। কেবল রঙ্গদারির জন্য, শুধু ইয়ারকির জন্য এক আধটু অশ্লীলতাও আছে। কিন্তু দেশ কাল বিবেচনা করিলে, তাহার জন্য ঈশ্বরচন্দ্রের অপরাধ ক্ষমা করা যায়। সে কালে অশ্লীলতা ভিন্ন কথার আমোদ ছিল না। যে ব্যঙ্গ অশ্লীল নহে, তাহা সরস বলিয়া গণ্য হইত না। যে কথা অশ্লীল নহে, তাহা সতেজ বলিয়া গণ্য হইত না। যে গালি অশ্লীল নহে, তাহা কেহ গালি বলিয়া গণ্য করিত না। তখনকার সকল কাব্যই অশ্লীল। চোর, কবি, চোরপণ্ডাশৎ দুই পক্ষে অর্থ খাটাইয়া লিখিবেন—বিদ্যাপক্ষে এবং কালীপক্ষে—দুই পক্ষে সমান অশ্লীল। তখন পূজা পার্বণ অশ্লীল—উৎসবগর্ভিত অশ্লীল—দুর্গোৎসবের নবমীর রাত্রি বিখ্যাত ব্যাপার। যাত্রার সঙ অশ্লীল হইলেই লোকরঞ্জক হইত। পাঁচালি হাফআকড়াই অশ্লীলতার জন্যই রচিত। ঈশ্বর গুপ্ত সেই বাতাসে জীবন প্রাপ্ত ও বর্দ্ধিত। অতএব ঈশ্বর গুপ্তকে আমরা অনায়াসে একটুখানি মার্জনা করিতে পারি।

আর একটা কথা আছে। অশ্লীলতা সকল সভ্যসমাজেই ঘৃণিত। তবে, যেমন লোকের রুচি ভিন্ন ভিন্ন, তেমনি দেশভেদেও রুচি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। এমন অনেক কথা আছে, যাহা ইংরেজেরা অশ্লীল বিবেচনা করেন, আমরা করি না। আবার এমন অনেক কথা আছে, যাহা আমরা অশ্লীল বিবেচনা করি, ইংরেজেরা করেন না। ইংরেজের কাছে, প্যানটালুন বা উরুদেশের নাম অশ্লীল—ইংরেজের মেয়ের কাছে সে নাম মূখে আনিতে নাই। আমরা ধূতি পায়জামা বা

বিশ্বকম রচনাবলী

উরু শব্দগুলিকে অশ্লীল মনে করি না। মা, ভাগিনী বা কন্যা কাহারও সম্মুখে ঐ সকল কথা ব্যবহার করিতে আমাদের লজ্জা নাই। পক্ষান্তরে স্ত্রীপুরুষে মূখচুম্বনটা আমাদের সমাজে অতি অশ্লীল ব্যাপার! কিন্তু ইংরেজের চক্ষে উহা অতি পবিত্র কার্য—মাতৃপিতৃ সমক্ষেই উহা নিষ্বাহ পাইয়া থাকে। এখন আমাদের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে, আমরা দেশী জিনিষ সকলই হেয় বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছি, বিলাতী জিনিষ সবই ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। দেশী সুরুচি ছাড়িয়া আমরা বিদেশী সুরুচি গ্রহণ করিতেছি। শিক্ষিত বাঙ্গালী এমনও আছেন যে, তাঁহাদের পরস্ত্রীর মূখচুম্বনে আপত্তি নাই, কিন্তু পরস্ত্রীর অনাবৃত চরণ! আলতাপরা মলপরা পা! দর্শনে বিশেষ আপত্তি। ইহাতে আমরা যে কেবলই জিতিয়াছি এমত নহে। একটা উদাহরণের দ্বারা বুঝাই। মেঘদূতের একটি কবিতায় কালিদাস কোন পর্ব্বতশৃঙ্গকে ধরণীর স্তন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা বিলাতী রুচিবিরুদ্ধ। স্তন বিলাতী রুচি অনুসারে অশ্লীল কথা। কাজেই এই উপমাটি নব্যের কাছে অশ্লীল। নব্যাবদ্ হয়ত ইহা শুনিয়া কানে আঙ্গুল দিয়া পরস্ত্রী মূখচুম্বন ও করস্পর্শের মহিমা কীর্ত্তনে মনোযোগ দিবেন। কিন্তু আমি ভিন্ন রকম বুঝি। আমি এ উপমার অর্থ এই বুঝি যে, পৃথিবী আমাদের জননী। তাই তাঁকে ভক্তিভাবে স্নেহ করিয়া “মাতা বসুমতী” বলি; আমরা তাঁহার সন্তান; সন্তানের চক্ষে, মাতৃস্তনের অপেক্ষা সুন্দর, পবিত্র, জগতে আর কিছুই নাই—থাকিতে পারে না। অতএব এমন পবিত্র উপমা আর হইতে পারে না। ইহাতে যে অশ্লীলতা দেখে, আমার বিবেচনায় তাহার চিত্তে পার্শ্চিস্তা ভিন্ন কোন বিশুদ্ধ ভাবের স্থান হয় না। কবি এখানে অশ্লীল নহে,—এখানে পাঠকের হৃদয় নরক। এখানে ইংরেজি রুচি বিশুদ্ধ নহে—দেশী রুচিই বিশুদ্ধ।

আমাদের দেশের অনেক প্রাচীন কবি, এইরূপ বিলাতী রুচির আইনে ধরা পড়িয়া বিনাপরাধে অশ্লীলতা অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন। স্বয়ং বাঙ্গালীকি কালিদাসেরও অব্যাহতি নাই। যে ইউরোপে মসুর জোয়ার নবেলের আদর, সে ইউরোপের রুচি বিশুদ্ধ, আর যাঁহারা রামায়ণ, কুমারসম্ভব লিখিয়াছেন, সীতা শকুন্তলার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদের রুচি অশ্লীল! এই শিক্ষা আমরা ইউরোপীয়ের কাছে পাই। কি শিক্ষা! তাই আমি অনেক বার বলিয়াছি, ইউরোপের কাছে বিজ্ঞান ইতিহাস শিল্প শেখ। আর সব দেশীয়ের কাছে শেখ।

অন্যের ন্যায় ঈশ্বর গুপ্তও হাল আইনে অনেক স্থানে ধরা পড়েন। সে সকল স্থানে আমরা তাঁহাকে বেকসুর খালাস দিতে রাজি। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে, আর অনেক স্থানেই তত সহজে তাঁহাকে নিষ্কৃতি দেওয়া যায় না। অনেক স্থানে তাঁহার রুচি বাস্তবিক কদর্য, যথার্থ অশ্লীল, এবং বিরক্তিকর। তাহার মার্জনা নাই।

ঈশ্বর গুপ্তের যে অশ্লীলতার কথা আমরা লিখিলাম, পাঠক তাহা এ সংগ্রহে কোথাও পাইবেন না। আমরা তাহা সব কাটিয়া দিয়া, কবিতাগুলিকে নেড়া মূড়া করিয়া বাহির করিয়াছি। অনেকগুলিকে কেবল অশ্লীলতাদোষ জন্যই একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছি। তবে তাঁহার কবিতার এই দোষের এত বিস্তারিত সমালোচনা করিলাম, তাহার কারণ এই যে, এই দোষ তাঁহার প্রসিদ্ধ। ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্ব কি প্রকার তাহা বুঝিতে গেলে, তাহার দোষ গুণ দুই বুঝাইতে হয়। শুধু তাই নয়। তাঁহার কবিত্বের অপেক্ষা আর একটা বড় জিনিষ পাঠককে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। ঈশ্বর গুপ্ত নিজে কি ছিলেন, তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ। কবিতা দর্পণ মাত্র—তাহার ভিতর কবির অবিকল ছায়া আছে। দর্পণ বুঝিয়া কি হইবে? ভিতরে যাহার ছায়া, ছায়া দেখিয়া তাহাকে বুঝিব। কবিতা, কবির কীর্ত্ত—তাহা ত আমাদের হাতেই আছে—পড়িলেই বুঝিব। কিন্তু যিনি এই কীর্ত্ত রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি কি গুণে, কি প্রকারে, এই কীর্ত্ত রাখিয়া গেলেন, তাহাই বুঝিতে হইবে। তাহাই জীবনী ও সমালোচনাদত্ত প্রধান শিক্ষা ও জীবনী ও সমালোচনার মূখ্য উদ্দেশ্য।

ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনীতে আমরা অবগত হইয়াছি যে, একজন অশিক্ষিত যুবা কলিকাতায় আসিয়া, সাহিত্য ও সমাজে আধিপত্য সংস্থাপন করিল। কি শক্তিতে? তাহাও দেখিতে পাই—নিজ প্রতিভা গুণে। কিন্তু ইহাও দেখিতে পাই যে, প্রতিভানুযায়ী ফল ফলে নাই। প্রভাকর মেঘাচ্ছন্ন। সে মেঘ কোথা হইতে আসিল? বিশুদ্ধ রুচির অভাবে। এখন ইহা এক প্রকার স্বাভাবিক নিয়ম যে, প্রতিভা ও সুরুচি পরস্পর সখী—প্রতিভার অনুগামিনী সুরুচি। ঈশ্বর

গুপ্তের বেলা তাহা ঘটে নাই কেন? এখানে দেশ, কাল, পাত্র বৃষ্টিয়া দেখিতে হইবে। তাই আমি দেশের রুচি বৃষ্টিলাম, কালের রুচি বৃষ্টিলাম, এবং পাত্রের রুচি বৃষ্টিলাম। বৃষ্টিলাম যে পাত্রের রুচির অভাবের কারণ, (১) পুস্তকদত্ত সুরাশিক্ষার অল্পতা, (২) মাতার পবিত্র সংসর্গের অভাব, (৩) সহধর্মিণী, অর্থাৎ যাঁহার সঙ্গে একত্রে ধর্ম শিক্ষা করি, তাঁহার পবিত্র সংসর্গের অভাব, (৪) সমাজের অত্যাচার, এবং তজ্জনিত সমাজের উপর কবির জাতক্রোধ। যে মেঘে প্রভাকরের তেজোহাস করিয়াছিল এই সকল উপাদানে তাহার জন্ম। স্থূল তাৎপর্য এই যে, ঈশ্বরচন্দ্র যখন অশ্লীল তখন কুরুচির বশীভূত হইয়াই অশ্লীল, ভারতচন্দ্রাদির ন্যায় কোথাও কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া অশ্লীল নহেন। তাই দর্পণতলস্থ প্রতিবিস্বের সাহায্যে প্রতিবিস্বধারী সত্ত্বাকে বৃষ্টিবার জন্য আমরা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অশ্লীলতা দোষ এত সবিস্তারে সমালোচনা করিলাম। ব্যাপারটা রুচিকর নহে। মনে করিলে, নমঃ নমঃ বলিয়া দুই কথায় সারিয়া যাইতে পারিতাম। অভিপ্রায় বৃষ্টিয়া বিস্তারিত সমালোচনা পাঠক মার্জনা করিবেন।

মানুষটাকে আর একটু ভাল করিয়া বৃষ্টিয়া যাউক—কবিতা না হয় এখন থাক। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আমরা বলিয়াছি ঈশ্বর গুপ্ত বিলাসী ছিলেন না। অথচ দেখিতে পাই, মুখের আটক পাটক কিছুই নাই। অশ্লীলতার ঘোর আমোদ, ইয়ারকি ভরা—পাঁটার স্তোত্র লেখেন, তপসে মাছের মজা বৃষ্টি, লেবু দিয়া আনারসের পরমভক্ত, সুরাপান* সম্বন্ধে মন্থকণ্ঠ—আবার বিলাসী করে বলে? কথাটা বৃষ্টিয়া দেখা যাউক।

এই সংগ্রহের প্রথম খণ্ডে পাঠক ঈশ্বর গুপ্ত প্রণীত কতকগুলি নৈতিক ও পরমার্থিক বিষয়ক কবিতা পাইবেন। অনেকের পক্ষে ঐগুলি নীরস বলিয়া বোধ হইবে, কিন্তু যদি পাঠক ঈশ্বর গুপ্তকে বৃষ্টিতে চাহেন, তবে সেগুলি মনোযোগপূর্বক পাঠ করিবেন। দেখিবেন সেগুলি ফরমায়েশি কবিতা নহে। কবির আন্তরিক কথা তাহাতে আছে। অনেকগুলির মধ্যে ঐ কয়টি বাছিয়া দিয়াছি—আর বেশী দিলে রসিক বাঙ্গালী পাঠকের বিরক্তিকর হইয়া উঠবে। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পরমার্থ বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র গদ্যে পদ্যে যত লিখিয়াছেন, এত আর কোন বিষয়েই বোধ হয় লিখেন নাই। এ গ্রন্থ পদ্যসংগ্রহ বলিয়া, আমরা তাঁহার গদ্য কিছুই উদ্ধৃত করি নাই, কিন্তু সে গদ্য পড়িয়া বোধ হয় যে, পদ্য অপেক্ষাও বৃষ্টি গদ্যে তাঁহার মনের ভাব আরও সুস্পষ্ট। এই সকল গদ্য পদ্যে প্রণিধান করিয়া দেখিলে, আমরা বৃষ্টিতে পারিব, যে ঈশ্বর গুপ্তের ধর্ম, একটা কৃত্রিম ভান ছিল না। ঈশ্বরে তাঁর আন্তরিক ভক্তি ছিল। তিনি মদ্যপ হউন, বিলাসী হউন, কোন হবিষ্যাসী নামাবলীধারীতে সেরূপ আন্তরিক ঈশ্বরে ভক্তি দেখিতে পাই না। সাধারণ ঈশ্বরবাদী বা ঈশ্বরভক্তের মত তিনি ঈশ্বরবাদী ও ঈশ্বরভক্ত ছিলেন না। তিনি ঈশ্বরকে নিকটে দেখিতেন, যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেন, যেন মুখামুখী হইয়া কথা কহিতেন। আপনাকে যথার্থ ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বরকে আপনার সাক্ষাৎ মর্ত্তমান পিতা বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন। মুখামুখী হইয়া বাপের সঙ্গে বচসা করিতেন। কখন বাপের আদর খাইবার জন্য কোলে বসিতে যাইতেন, আপনি বাপকে কত আদর করিতেন—উত্তর না পাইলে কাঁদাকাটা বাধাইতেন। বলিতে কি, তাঁহার ঈশ্বরে গাঢ় পুত্রবৎ অকৃত্রিম প্রেম দেখিয়া চক্ষের জল রাখা যায় না। অনেক সময়েই দেখিতে পাই যে, মর্ত্তমান ঈশ্বর সম্মুখে পাইতেছেন না, কথার উত্তর পাইতেছেন না বলিয়া, তাঁহার অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছে, বাপকে বকিয়া ফাটাইয়া দিতেছেন। বাপ নিরাকার নির্গুণ চৈতন্য মাত্র, সাক্ষাৎ মর্ত্তমান বাপ নহেন, এ কথা মনে করিতেও অনেক সময়ে কষ্ট হইত।†

কাতর কিঙ্কর আমি, তোমার সন্তান।
আমার জনক তুমি, সবার প্রধান ॥
বার বার ডাকিতেছি, কোথা ভগবান্।
একবার তাহে তুমি, নাহি দাও কান ॥

* সুরাপানের মার্জনা নাই। মার্জন্যের আমিও কোন কারণ দেখাইতে ইচ্ছক নহি। কেবল সে সম্বন্ধে পাঠককে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কবির এই উক্তিটি স্মরণ করিতে বলি—

একোহি দোষো গুণসম্বিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেপ্সিবাকঃ।

† কবিতাসংগ্রহের ৫৯ পৃষ্ঠার কবিতাটি পাঠ কর।

বঙ্কিম রচনাবলী

সর্বদিকে সর্বলোকে, কত কথা কয়।
শ্রবণে সে সব রব, প্রবেশ না হয় ॥
হায় হায় কব কায়, ঘটিল কি জ্বালা।
জগতের পিতা হোয়ে, তুমি হলে কালা ॥
মনে সাধ কথা কই, নিকটে আনিয়া।
অধীর হ'লেম ভেবে, বধির জানিয়া ॥

এ ভক্তের স্তুতি নহে—এ বাপের উপর বেটার অভিমান। ধন্য ঈশ্বরচন্দ্র! তুমি পিতৃপদ লাভ করিয়াছ সন্দেহ নাই। আমরা কেহই তোমার সমালোচক হইবার যোগ্য নহি।

ঈশ্বরচন্দ্রের ঈশ্বরভক্তির যথার্থ স্বরূপ যিনি অনদ্ভূত করিতে চান, ভরসা করি তিনি এই সংগ্রহের উপর নির্ভর করিবেন না। এ সংগ্রহ সাধারণের আয়ত্ত ও পাঠ্য করিবার জন্য ইহা নানা দিকে সঙ্কীর্ণ করিতে আমি বাধ্য হইয়াছি। ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কতকগুলি গদ্য পদ্য প্রবন্ধ মাসিক প্রভাকরে প্রকাশিত হয়, যিনি পাঠ করিবেন, তিনিই ঈশ্বরচন্দ্রের অকৃত্রিম ঈশ্বরভক্তি বৃদ্ধিতে পারিবেন। সেগুলি যাহাতে পুনর্মুদ্রিত হয়, সে যত্ন পাইব।

বৈষ্ণবগণ বলেন, হনুমদাদি দাস্যভাবে, শ্রীদামাদি সখ্যভাবে, নন্দযশোদা পুত্রভাবে, এবং গোপীগণ কান্তভাবে সাধনা করিয়া ঈশ্বর পাইয়াছিলেন। কিন্তু পৌরাণিক ব্যাপার সকল আমাদের হইতে এত দূর সংস্থিত যে, তদালোচনায় আমাদের যাহা লভনীয়, তাহা আমরা বড় সহজে পাই না। যদি হনুমান্, উদ্ধব, যশোদা বা শ্রীরাধাকে আমাদের কাছে পাইতাম, তবে সে সাধনা বৃদ্ধিবার চেষ্টা কতক সফল হইত। বাঙ্গালার দুই জন সাধক, আমাদের বড় নিকট। দুই জনই বৈদ্য, দুই জনই কবি। এক রামপ্রসাদ সেন, আর এক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ইহারা কেহই বৈষ্ণব ছিলেন না, কেহই ঈশ্বরকে প্রভু, সখা, পুত্র, বা কান্তভাবে দেখেন নাই। রামপ্রসাদ ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ মাতৃভাবে দেখিয়া ভক্তি সাধিত করিয়াছিলেন—ঈশ্বরচন্দ্র পিতৃভাবে। রামপ্রসাদের মাতৃপ্রেমে আর ঈশ্বরচন্দ্রের পিতৃপ্রেমে ভেদ বড় অল্প।

তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত ত্রিসংসার।
আমি হে ঈশ্বর গুপ্ত কুমার তোমার ॥
পিতৃ নামে নাম পেয়ে, উপাধি পেয়েছি।
জন্মভূমি জননীর কোলেতে বসেছি ॥
তুমি গুপ্ত আমি গুপ্ত, গুপ্ত কিছু নয়।
তবে কেন গুপ্ত ভাবে ভাব গুপ্ত রয়?

পুনশ্চ—আরও নিকটে—

তোমার বদনে যদি, না সরে বচন।
কেমনে হইবে তবে, কথোপকথন ॥
আমি যদি কিছু বলি, বন্ধে অভিপ্রায়।
ইসেরায় ঘাড় নেড়ে, সায় দিও তায় ॥

যার এই ঈশ্বরভক্তি—যে ঈশ্বরকে এইরূপ সর্বদা নিকটে, অতি নিকটে দেখে—ঈশ্বর-সংসর্গতৃষ্ণায় যাহার হৃদয় এইরূপে দন্ধ—সে কি বিলাসী হইতে পারে? হয় হউক। আমরা এরূপ বিলাসী ছাড়িয়া সন্ন্যাসী দেখিতে চাই না।

তবে ঈশ্বর সন্ন্যাসী, হবিষ্যাসী বা অভোক্তা ছিলেন না। পাঁটা, তপসে মাছ, বা আনারসের গুণ গায়িতে ও রসাস্বাদনে, উভয়েই সক্ষম ছিলেন। যদি ইহা বিলাসিতা হয়, তিনি বিলাসী ছিলেন। তাহার বিলাসিতা তিনি নিজে স্পষ্ট করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন;—

লক্ষ্মীছাড়া যদি হও, খেয়ে আর দিয়ে।
কিছুমাত্র সুখ নাই, হেন লক্ষ্মী নিয়ে ॥
যতক্ষণ থাকে ধন, তোমার আগারে।
নিজে খাও, খেতে দাও, সাধ্য অনুসারে ॥
ইথে যদি কমলার, মন নাই সরে
প্যাঁচা লয়ে যান মাতা, কৃপণের ঘরে ॥

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহ—ভূমিকা

শাকান্নমাত্র যে ভোজন না করে, তাহাকেই বিলাসী মধ্যে গণনা করিতে হইবে, ইহাও আমি স্বীকার করি না। গীতার ভগবদ্ভক্তি এই—

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্য সুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ
শ্লিষ্কারস্যাস্থিরাহুদ্যাঃ আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ।

স্থূল কথা এই, যাহা আগে বলিয়াছি—ঈশ্বর গুপ্ত মেকির বড় শত্রু। মেকি মানুষের শত্রু, এবং মেকি ধর্মের শত্রু। লোভী পরদেষী অথচ হবিষ্যাসী ভণ্ডের ধর্ম তিনি গ্রহণ করেন নাই। ভণ্ডের ধর্মকে ধর্ম বলিয়া তিনি জানিতেন না। তিনি জানিতেন ধর্ম ঈশ্বরানুরাগে, আহার ত্যাগে নহে। যে ধর্ম ঈশ্বরানুরাগ ছাড়িয়া পানাহারত্যাগকে ধর্মের স্থানে খাড়া করিতে চাহিত—তিনি তাহার শত্রু। সেই ধর্মের প্রতি বিদেষবশতঃ পাঁটার স্তোত্র, আনারসের গুণগানে, এবং তপসের মহিমা বর্ণনায় কবির এত সুখ হইত। মানুষটা বুকিলাম, নিজে ধার্মিক, ধর্ম খাঁটি, মেকির উপর খজাহস্ত। ধার্মিকের কবিতায় অশ্লীলতা কেন দেখি, বোধ হয় তাহা বুকিয়াছি। বিলাসিতা কেন দেখি, বোধ হয় তাহা এখন বুকিলাম।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার কথা বলিতে বলিতে তাঁহার ব্যঙ্গের কথা, ব্যঙ্গের কথা হইতে তাঁহার অশ্লীলতার কথা, অশ্লীলতার কথা হইতে তাঁহার বিলাসিতার কথা আসিয়া পড়িয়াছিল। এখন ফিরিয়া যাইতে হইতেছে।

অশ্লীলতা যেমন তাঁহার কবিতার এক প্রধান দোষ, শব্দাডম্বরপ্রিয়তা তেমনি আর এক প্রধান দোষ। শব্দচ্ছটায়, অনুপ্রাস যমকের ঘটায়, তাঁহার ভাবার্থ অনেক সময়ে একেবারে ঘুচিয়া মূছিয়া যায়। অনুপ্রাস যমকের অনুরোধে অর্থের ভিতর কি ছাই ভস্ম থাকিয়া যায়, কবি তাহার প্রতি কিছুমাত্র অনুধাবন করিতেছেন না—দেখিয়া অনেক সময়ে রাগ হয়, দুঃখ হয়, হাসি পায়, দয়া হয়, পড়িতে আর প্রবৃত্তি হয় না। যে কারণে তাঁহার অশ্লীলতা, সেই কারণে এই যমকানুপ্রাসে অনুরাগ দেশ কাল পাত্র। সংস্কৃত সাহিত্যের অবনতির সময় হইতে যমকানুপ্রাসের বড় বাড়াবাড়ি। ঈশ্বর গুপ্তের পক্ষেই—কবিওয়ালার কবিতায়, পাঁচালিওয়ালার পাঁচালিতে, ইহার বেশী বাড়াবাড়ি। দাশরথি রায় অনুপ্রাস যমকে বড় পটু—তাই তাঁর পাঁচালি লোকের এত প্রিয় ছিল। দাশরথি রায়ের কবিত্ব না ছিল, এমন নহে, কিন্তু অনুপ্রাস যমকের দৌরাণ্ড্যে তাহা প্রায় একেবারে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে; পাঁচালিওয়ালার ছাড়িয়া তিনি কবির শ্রেণীতে উঠিতে পান নাই। এই অলঙ্কার প্রয়োগে পটুতায় ঈশ্বর গুপ্তের স্থান তার পরেই—এত অনুপ্রাস যমক আর কোন বাঙ্গালীতে ব্যবহার করে না। এখানেও মার্জিত রুচির অভাব জন্য বড় দুঃখ হয়।

অনুপ্রাস যমক যে স্বর্গই দুষ্য এমন কথা আমি বলি না। ইংরেজিতে ইহা বড় কদর্য শুনায় বটে, কিন্তু সংস্কৃতে ইহার উপযুক্ত ব্যবহার অনেক সময়েই বড় মধুর। কিছুই বাহুল্য ভাল নহে—অনুপ্রাস যমকের বাহুল্য বড় কষ্টকর। রাখিয়া ঢাকিয়া, পরিমিত ভাবে ব্যবহার করিতে পারিলে বড় মিঠে। বাঙ্গালাতেও তাই। মধুসূদন দত্ত মধ্যে মধ্যে পদ্যে অনুপ্রাসের ব্যবহার করেন,—বড় বুকিয়া সুকিয়া, রাখিয়া ঢাকিয়া, ব্যবহার করেন—মধুর হয়। শ্রীমান্ অক্ষয়চন্দ্র সরকার গদ্যে কখন কখন, দুই এক বৃন্দ অনুপ্রাস ছাড়িয়া দেন—রস উছলিয়া উঠে। ঈশ্বর গুপ্তেরও এক একটি অনুপ্রাস বড় মিঠে—

বিবিজান চলে জান লবেজান করে।

ইহার তুলনা নাই। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময় অসময় নাই, বিষয় অবিষয় নাই, সীমা সরহন্দ নাই—একবার অনুপ্রাস যমকের ফোয়ারা খুলিলে আর বন্ধ হয় না। আর কোন দিগে দৃষ্টি থাকে না, কেবল শব্দের দিকে। এরূপ শব্দ ব্যবহারে তিনি অস্থিতীয়। তিনি শব্দের প্রতিযোগীশূন্য অধিপতি। এই দোষ গুণের উদাহরণস্বরূপ দুইটি গীত বোধেন্দুবিকাশ হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

রাগিণী বেহাগ—তাল একতাল।

কে রে, বামা, বারিদবরণী,
তরুণী, ভালে, ধরেছে তরণি,
কাহারো ঘরণী, আসিয়ে ধরণী, করিছে দনুজ জয়।

বিক্রম রচনাবলী

হের হে ভূপ, কি অপরূপ, অনূপ রূপ, নাহি স্বরূপ,
 মদননিধনকরণকারণ, চরণ শরণ লয় ॥
 বামা, হাসিছে ভাষিছে, লাজ না বাসিছে,
 হৃদহৃৎকাররবে, বিপক্ষ নাশিছে, গ্রাসিছে বারণ, হয়। ১
 বামা, টালিছে টালিছে, লাবণ্য গালিছে,
 সঘনে বলিছে, গগনে চলিছে,
 কোপেতে জর্দালিছে, দনুজ দালিছে, ছালিছে, ভুবনময় ॥ ২
 কে রে, ললিতরসনা, বিকটদশনা,
 করিয়ে ঘোষণা, প্রকাশে বাসনা,
 হয়ে শবাসনা, বামা বিবসনা, আসবে মগনা রয়। ৩

রাগিণী বেহাগ—তাল একতাল।

কে রে, বামা, ষোড়শী রূপসী,
 সুরেশী, এ, যে, নহে মানুষী,
 ভালে শিশুশশী, করে শোভে অসি, রূপমসী, চারু ভাস।
 দেখ, বাজিছে ঝম্প, দিতেছে ঝম্প,
 মারিছে লম্ফ, হতেছে কম্প,
 গেল রে পৃথবী, করে কি কীর্তি, চরণে কৃতিবাস ॥ ১
 কে রে, করাল-কামিনী, মরালগামিনী,
 কাহার স্বামিনী, ভুবনভামিনী,
 রূপেতে প্রভাত, করেছে যামিনী, দামিনীজড়িত-হাস। ২
 কে রে, যোগিণী সঙ্গে, রুধির-রঙ্গে,
 রণতরঙ্গে, নাচে ত্রিভঙ্গে,
 কুটীলাপাঙ্গে, তিমির-অঙ্গে, করিছে তিমির নাশ। ৩
 আহা, যে দোখি পর্ষ, যে ছিল গর্ষ,
 হইল খর্ষ, গেল রে সর্ষ,
 চরণসরোজে, পাড়িয়ে শর্ষ, করিছে সর্ষনাশ। ৪
 দোখি, নিকট মরণ, কর রে স্মরণ,
 মরণহরণ, অভয় চরণ

নিবিড় নবীন নীরদবরণ, মানসে কর প্রকাশ। ৫

ঈশ্বর গুপ্ত অপূর্ষ শব্দকোশলী বলিয়া, তাঁহার যেমন এই গুরুতর দোষ জন্মিয়াছে, তিনি অপূর্ষ শব্দকোশলী বলিয়া তেমনি তাঁহার এক মহৎ গুণ জন্মিয়াছে—যখন অনুপ্রাস যমকে মন না থাকে, তখন তাঁহার বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গালা সাহিত্যে অতুল। যে ভাষায় তিনি পদ্য লিখিয়াছেন, এমন খাঁটি বাঙ্গালায়, এমন বাঙ্গালীর প্রাণের ভাষায়, আর কেহ পদ্য কি গদ্য কিছুই লেখে নাই। তাহাতে সংস্কৃতজনিত কোন বিকার নাই—ইংরেজিবিংশীর বিকার নাই। পাণ্ডিত্যের অভিমান নাই—বিশুদ্ধির বড়াই নাই। ভাষা হেলে না, টলে না, বাঁকে না—সরল, সোজা পথে চলিয়া গিয়া পাঠকের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করে। এমন বাঙ্গালীর বাঙ্গালা ঈশ্বর গুপ্ত ভিন্ন আর কেহই লেখে নাই—আর লিখিবার সম্ভাবনা নাই। কেবল ভাষা নহে—ভাবও তাই। ঈশ্বর গুপ্ত দেশী কথা—দেশী ভাব প্রকাশ করেন। তাঁর কবিতায় কেলা কা ফুল নাই।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা প্রচারের জন্য আমরা যে উদ্যোগী—তাহার বিশেষ কারণ তাঁহার ভাষার এই গুণ। খাঁটি বাঙ্গালা আমাদের বড় মিঠে লাগে—ভরসা করি পাঠকেরও লাগিবে। এমন বলিতে চাই না যে, ভিন্ন ভাষার সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে বাঙ্গালা ভাষার কোন উন্নতি হইতেছে না বা হইবে না। হইতেছে ও হইবে। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা যাহাতে জাতি হারাইয়া ভিন্ন ভাষার অনুকরণ মাত্রে পরিণত হইয়া পরাধীনতা প্রাপ্ত না হয় তাহাও দেখিতে হয়। বাঙ্গালা ভাষা বড় দোটারানার মধ্যে পড়িয়াছে। ত্রিপথগামিনী এই স্রোতস্বতীর ত্রিবেণীর মধ্যে আবর্তে পড়িয়া আমরা ক্ষুদ্র লেখকেরা অনেক ঘুরপাক খাইতেছি। একদিনে সংস্কৃতের স্রোতে মরা গাঙ্গে

বঙ্গীয় রচনাবলী

ছিলেন। আদিব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন, এবং তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য ছিলেন। ব্রাহ্মদিগের সঙ্গে সমবেত হইয়া বক্তৃতা, উপাসনাদি করিতেন। এ জন্য শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট তিনি পরিচিত ছিলেন এবং আদৃত হইতেন।

তৃতীয়। ঈশ্বর গুপ্তের রাজনীতি বড় উদার ছিল। তাহাতেও যে তিনি সময়ের অগ্রবর্তী ছিলেন, সে কথা বুঝাইতে গেলে অনেক কথা বলিতে হয়, সুতরাং নিরস্ত হইলাম।

এক্ষণে এই সংগ্রহ সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিয়া আমি ক্ষান্ত হইব। ঈশ্বর গুপ্ত যত পদ্য লিখিয়াছেন, এত আর কোন বাঙ্গালী লেখে নাই। গোপাল বাবুর অনুমান, তিনি প্রায় পঞ্চাশ হাজার ছত্র পদ্য লিখিয়াছেন। এখন যাহা পাঠককে উপহার দেওয়া যাইতেছে, তাহা উহার ক্ষুদ্রাংশ। যদি তাহার প্রতি বাঙ্গালী পাঠক সমাজের অনুরাগ দেখা যায়, তবে ক্রমশঃ আরও প্রকাশ করা যাইবে। এ সংগ্রহ প্রথম খণ্ড মাত্র। বাঁছিয়া বাঁছিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিতাগর্দলি যে ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছি এমন নহে। যদি সকল ভাল কবিতাগর্দলিই প্রথম খণ্ডে দিব, তবে অন্যান্য খণ্ডে কি থাকিবে?

নির্বাচনকালে আমার এই লক্ষ্য ছিল যে, ঈশ্বর গুপ্তের রচনার প্রকৃতি কি, যাহাতে পাঠক বুঝিতে পারেন, তাহাই করিব। এজন্য, কেবল আমার পছন্দ মত কবিতাগর্দলি না তুলিয়া সকল রকমের কবিতা কিছু কিছু তুলিয়াছি। অর্থাৎ কবির যত রকম রচনা প্রথা ছিল, সকল রকমের কিছু কিছু উদাহরণ দিয়াছি। কেবল যাহা অপাঠ্য তাহারই উদাহরণ দিই নাই। আর “হিতপ্রভাকর,” “বোধেন্দুবিকাশ,” “প্রবোধপ্রভাকর” প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে কিছু সংগ্রহ করি নাই। কেন না সেই গ্রন্থগর্দলি অবিকল পুনর্মুদ্রিত হইবার সম্ভাবনা আছে। তন্মিন্ন তাহার গদ্য রচনা হইতে কিছুই উদ্ধৃত করি নাই। ভরসা করি, তাহার স্বতন্ত্র এক খণ্ড প্রকাশিত হইতে পারিবে।

পারিশেষে বক্তব্য যে, অনবকাশ—বিদেশে বাস প্রভৃতি কারণে আমি মূদ্রাক্ষকনকার্যের কোন তত্ত্বাবধান করিতে পারি নাই। তাহাতে যদি দোষ হইয়া থাকে, তবে পাঠক মার্জনা করিবেন।

BENGALI SELECTIONS

Appointed by the Syndicate of the Calcutta University for the
Entrance Examination, 1895.

PREFACE

One of the objects kept in view in this compilation has been to place before the student as great a variety of style as is possible in a small volume like the present. I have admitted on this ground, a few short extracts from the older poets, whose quaint and now antiquated style is as superior to that of their modern successors in vigore and raciness, as it is inferior to it in elegance and refinement.

I have also taken care that the matter should be equally varied, and should enable the young student to form some idea of ancient as well as modern Hindu thought and culture. The passage specially translated from the *Mahabharata*, Pandit Iswar Chandra Vidyasagar's beautiful renderings from Kalidasa, Babu Bhudeb Mukherjee's masterly studies of modern Bengali life, and Babu Rajkrishna Mukerjee's lucid expositions of the most advanced European thought in his singularly charming style, will present the student with reading as varied as useful, and with instruction which, although almost indispensably necessary to him, he cannot expect to obtain from his English text-books. There are many who do not accept the views put forward in some of these extracts, but it is impossible to find anything in Bengali literature, or in any literature, to which

all parties will subscribe. The best way of training the minds of young men is not to restrict them to any particular groove of thought. Among the results of education, scarcely anything is more valuable than the capacity to consider questions that arise from different and even opposite points of view. I have not therefore thought it proper to confine the extracts to what will meet with universal acceptance, to the exclusion of what will best benefit the student.

A word about Grammar. Bengali Grammar is still in some respects in an unsettled state. Purists insist on a rigid adherence to the rules of Sanskrit Grammar in all cases to which they can be made applicable, while others contend that whatever is sanctioned by the usage of the best writers is admissible. In the present volume I have allowed each writer to retain his own Grammar, confining my own duty as Editor to the correction of obvious errors and misprints.

I have admitted extracts from my own writing with some reluctance. They had a place in all previous selections; their exclusion now for the first time would have required some explanation, and I had none to offer.

The student will probably find the present volume of selections more difficult than any of its predecessors. But students who do not take the trouble of acquiring a classical language must be prepared to give to their own vernacular, more time and attention than they have hitherto done. They have hitherto enjoyed an unfair advantage over those who take up a classical language, and they must not complain now that the balance is sought to be redressed.

BANKIM CHANDRA CHATTERJEE.

বঙ্গলা সাহিত্যে 'প্যারীচাঁদ মিত্র

['লুপ্তরসোদ্ধার'-এর ভূমিকা]

সাত আট বৎসর হইল, মৃত মহাত্মা প্যারীচাঁদ মিত্রের কনিষ্ঠ পুত্র বাবু নগেন্দ্রলাল মিত্রকে আমি বলিয়াছিলাম যে, তাঁহার পিতার সকল গ্রন্থগুলি একত্র করিয়া পুনর্মুদ্রিত করা তাঁহাদিগের কর্তব্য। উক্ত মহাত্মার পুত্রেরা এক্ষণে সেই পরামর্শের অনুবর্তী হইয়া কার্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের ইচ্ছাক্রমে বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য, তাহা এই স্থানে সন্নিবেশিত হইল।

বঙ্গলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান অতি উচ্চ। তিনি বঙ্গলা সাহিত্যের এবং বঙ্গলা গদ্যের একজন প্রধান সংস্কারক। কথাটা বুঝাইবার জন্য বঙ্গলা গদ্যের ইতিবৃত্ত পাঠককে কিছু স্মরণ করাইয়া দেওয়া আমার কর্তব্য।

এক জনের কথা অপরকে বুঝান ভাষা মাত্রেরই যে উদ্দেশ্য, ইহা বলা অনাবশ্যক। কিন্তু কোন কোন লেখকের রচনা দেখিয়া বোধ হয় যে, তাঁহাদের বিবেচনায় যত অল্প লোকে তাঁহাদিগের ভাষা বুঝিতে পারে, ততই ভাল। সংস্কৃতে কাদম্বরী-প্রণেতা এবং ইংরাজিতে এমসনের রচনা প্রচলিত ভাষা হইতে এত দূর পৃথক্ যে, বহু কষ্ট স্বীকার না করিলে, কেহ তাঁহাদিগের গ্রন্থ হইতে কোন রস পায় না। অন্যে তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিয়া কোন উপকার পাইবে, এরূপ যে লেখকের উদ্দেশ্য, তিনি সচরাচর বোধগম্য ভাষাতেই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া থাকেন। যে দেশের সাহিত্যে সাধারণ বোধগম্য ভাষাই সচরাচর ব্যবহৃত হয়, সেই দেশের সাহিত্যই দেশের মঙ্গলকর হয়। মহাপ্রতিভাশালী কবিগণ তাঁহাদিগের হৃদয়স্থ উন্নত ভাব সকল তদুপযোগী উন্নত ভাষা

বাংকম রচনাবলী

ব্যতীত ব্যক্ত করিতে পারেন না, এই জন্য অনেক সময়ে, মহাকাব্যগণ দূরদূর ভাষার আশ্রয় লইতে বাধ্য হন এবং সেই সকল উন্নত ভাবের অলঙ্কার স্বরূপ পদ্যে সে সকলকে বিভূষিত করেন।* কিন্তু গদ্যের এরূপ কোন প্রয়োজন নাই। গদ্য যত সুখবোধ্য হইবে, সাহিত্য ততই উন্নতিকারক হইবে। যে সাহিত্যের পাঁচ সাত জন মাত্র অধিকারী, সে সাহিত্যের জগতে কোন প্রয়োজন নাই।

প্রাচীন কালে, অর্থাৎ এদেশে মদ্রাঘন্ত্র স্থাপিত হইবার পূর্বে, বাঙ্গালার সচরাচর পুস্তক-রচনা সংস্কৃতের ন্যায় পদ্যেই হইত। গদ্য-রচনা যে ছিল না এমন কথা বলা যায় না, কেন না হস্ত-লিখিত গদ্য গ্রন্থের কথা শুনা যায়। সে সকল গ্রন্থও এখন প্রচলিত নাই, সুতরাং তাহার ভাষা কিরূপ ছিল, তাহা এক্ষণে বলা যায় না। মদ্রাঘন্ত্র সংস্থাপিত হইলে, গদ্য বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রথম প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইল। প্রবাদ আছে যে, রাজা রামমোহন রায় সে সময়ের প্রথম গদ্য-লেখক। তাহার পর যে গদ্যের সৃষ্টি হইল, তাহা লৌকিক বাঙ্গালা ভাষা হইতে সম্পূর্ণ-রূপে ভিন্ন। এমন কি, বাঙ্গালা ভাষা দুইটি স্বতন্ত্র বা ভিন্ন ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। একটির নাম সাধুভাষা অর্থাৎ সাধুজনের ব্যবহার্য ভাষা, আর একটির নাম অপর ভাষা অর্থাৎ সাধু ভিন্ন অপর ব্যক্তিদিগের ব্যবহার্য ভাষা। এস্থলে সাধু অর্থে পণ্ডিত বুদ্ধিতে হইবে। আমি নিজে বাল্যকালে ভট্টাচার্য্য অধ্যাপকদিগকে যে ভাষায় কথোপকথন করিতে শুনিয়াছি, তাহা সংস্কৃত ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য কেহই ভাল বুদ্ধিতে পারিতেন না। তাহারা কদাচ 'খয়ের' বলিতেন না,—'খদির' বলিতেন; কদাচ 'চিনি' বলিতেন না—'শক'রা' বলিতেন। 'ঘ' বলিলে তাহাদের রসনা অশুদ্ধ হইত, 'আজ্য'ই বলিতেন, কদাচিৎ কেহ ঘৃতে নামিতেন। 'চুল' বলা হইবে না,—'কেশ' বলিতে হইবে। 'কলা' বলা হইবে না,—'রস্তা' বলিতে হইবে। ফলাহারে বসিয়া 'দই' চাহিবার সময় 'দধি' বলিয়া চীৎকার করিতে হইবে। আমি দেখিয়াছি, একজন অধ্যাপক এক দিন 'শিশুমার' ভিন্ন 'শুশুক' শব্দ মুখে আনিবেন না, শ্রোতারও কেহ শিশুমার অর্থ জানে না, সুতরাং অধ্যাপক মহাশয় কি বলিতেছেন, তাহার অর্থবোধ লইয়া অতিশয় গণ্ডগোল পড়িয়া গিয়াছিল। পণ্ডিতদিগের কথোপকথনের ভাষাই যেখানে এইরূপ ছিল, তবে তাহাদের লিখিত বাঙ্গালা ভাষা আরও কি ভয়ঙ্কর ছিল, তাহা বলা বাহুল্য। এরূপ ভাষায় কোন গ্রন্থ প্রণীত হইলে, তাহা তখনই বিলুপ্ত হইত, কেন না কেহ তাহা পড়িত না। কাজেই বাঙ্গালা সাহিত্যের কোন শ্রীবৃদ্ধি হইত না।

এই সংস্কৃতানুসারিণী ভাষা প্রথম মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার প্রাপ্ত হইল। ইহাদিগের ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী হইলেও তত পূর্বেই নহে। বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাহার পূর্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে পারে নাই, এবং তাহার পরেও কেহ পারে নাই। কিন্তু তাহা হইলেও সর্বজন-বোধগম্য ভাষা হইতে ইহা অনেক দূরে রহিল। সকল প্রকার কথা এ ভাষায় ব্যবহার হইত না বলিয়া, ইহাতে সকল প্রকার ভাব প্রকাশ করা যাইত না এবং সকল প্রকার রচনা ইহাতে চলিত না। গদ্যে ভাষার ওজস্বিতা এবং বৈচিত্র্যের অভাব হইলে, ভাষা উন্নতি-শালিনী হয় না। কিন্তু প্রাচীন প্রথায় আবদ্ধ এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার মনোহারিতায় বিমুগ্ধ হইয়া কেহই আর কোন প্রকার ভাষায় রচনা করিতে ইচ্ছুক বা সাহসী হইত না। কাজেই বাঙ্গালা সাহিত্য পূর্বমত সঙ্কীর্ণ পথেই চলিল।

ইহা অপেক্ষা বাঙ্গালা ভাষায় আরও একটি গুরুতর বিপদ ঘটিয়াছিল। সাহিত্যের ভাষাও যেমন সঙ্কীর্ণ পথে চলিতোছিল, সাহিত্যের বিষয়ও ততোধিক সঙ্কীর্ণ পথে চলিতোছিল। যেমন ভাষাও সংস্কৃতের ছায়ামাত্র ছিল, সাহিত্যের বিষয়ও তেমনই সংস্কৃতের এবং কদাচিৎ ইংরাজির ছায়ামাত্র ছিল। সংস্কৃত বা ইংরাজি গ্রন্থের সারসংকলন বা অনুবাদ ভিন্ন বাঙ্গালা সাহিত্য আর কিছুই প্রসব করিত না। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিভাশালী লেখক ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহারও শকুন্তলা ও সীতার বনবাস সংস্কৃত হইতে, দ্রাস্তিবীলাস ইংরাজি হইতে

* কবি যদি ভাষার উপর প্রকৃতরূপে প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারেন, তাহা হইলে মহাকাব্যও অতি প্রাজ্ঞ ভাষায় রচিত হয়। সংস্কৃতে রামায়ণ ও কালিদাসের মহাকাব্য সকল কাব্যের শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এরূপ সুখবোধ্য কাব্যও সংস্কৃতে আর নাই।

এবং বেতাল-পঞ্চবিংশতি হিন্দি হইতে সংগৃহীত। অক্ষয়কুমার দত্তের ইংরাজি একমাত্র অবলম্বন ছিল। আর সকলে তাঁহাদের অনুকারী এবং অনুবর্তী। বাঙ্গালি-লেখকেরা গতানু-গতিকের বাহিরে হস্তপ্রসারণ করিতেন না। জগতের অনন্ত ভাণ্ডার আপনাদের অধিকারে আনিবার চেষ্টা না করিয়া, সকলেই ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে চুরির সন্ধান বেড়াইতেন। সাহিত্যের পক্ষে ইহার অপেক্ষা গুরুতর বিপদ আর কিছুই নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয় বাবু যাহা করিয়াছিলেন, তাহা সময়ের প্রয়োজনানুসৃত, অতএব তাঁহারা প্রশংসা ব্যতীত অপ্ৰশংসার পাত্র নহেন; কিন্তু সমস্ত বাঙ্গালি-লেখকের দল সেই একমাত্র পথের পথিক হওয়াই বিপদ।

এই দুইটি গুরুতর বিপদ হইতে প্যারীচাঁদ মিত্রই বাঙ্গালা সাহিত্যকে উদ্ধৃত করেন। যে ভাষা সকল বাঙ্গালির বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালি কর্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই তাহা গ্রন্থপ্রণয়নে ব্যবহার করিলেন। এবং তিনিই প্রথম ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে পূর্বাগামী লেখকদিগের উচ্ছৃঙ্খলশেষের অনুসন্ধান না করিয়া, স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করিলেন। এক “আলালের ঘরের দুলাল” নামক গ্রন্থে এই উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। “আলালের ঘরের দুলাল” বাঙ্গালা ভাষায় চিরস্থায়ী ও চিরস্মরণীয় হইবে। উহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তৎপরে কেহ প্রণীত করিয়া থাকিতে পারেন অথবা ভবিষ্যতে কেহ করিতে পারেন, কিন্তু “আলালের ঘরের দুলালে”র দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে আর কোন বাঙ্গালা গ্রন্থের দ্বারা সেরূপ হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে কি না সন্দেহ।

আমি এমন বলিতেছি না যে “আলালের ঘরের দুলালে”র ভাষা আদর্শ ভাষা। উহাতে গাভীঘোঁর এবং বিশুদ্ধির অভাব আছে এবং উহাতে অতি উন্নত ভাব সকল, সকল সময়ে, পরিস্ফুট করা যায় কি না সন্দেহ। কিন্তু উহাতেই প্রথম এ বাঙ্গালা দেশে প্রচারিত হইল যে, যে বাঙ্গালা সর্বজনমধ্যে কথিত এবং প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায়, সে রচনা সুন্দরও হয়, এবং যে সর্বজন-হৃদয়-গ্রাহিতা সংস্কৃতানুযায়িনী ভাষার পক্ষে দুর্লভ, এ ভাষার তাহা সহজ গুণ। এই কথা জানিতে পারা বাঙ্গালি জাতির পক্ষে অল্প লাভ নহে, এবং এই কথা জানিতে পারার পর হইতে উন্নতির পথে বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি অতিশয় দ্রুতবেগে চলিতেছে। বাঙ্গালা ভাষার এক সীমায় তারাশঙ্করের কাদম্বরীর অনুবাদ, আর এক সীমায় প্যারীচাঁদ মিত্রের “আলালের ঘরের দুলাল”। ইহার কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নয়। কিন্তু “আলালের ঘরের দুলালে”র পর হইতে বাঙ্গালি লেখক জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয়-ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা দ্বারা, আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়। প্যারীচাঁদ মিত্র, আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যের সৃষ্টিকর্তা নহেন, কিন্তু বাঙ্গালা গদ্য যে উন্নতির পথে যাইতেছে, প্যারীচাঁদ মিত্র তাহার প্রধান ও প্রথম কারণ। ইহাই তাঁহার অক্ষয় কীর্তি।

আর তাঁহার দ্বিতীয় অক্ষয় কীর্তি এই যে, তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে,—তাহার জন্য ইংরাজি বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে তেমনই সাহিত্যে, ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা বাঙ্গালা দেশকে উন্নত করিতে হয়, তবে বাঙ্গালা দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি “আলালের ঘরের দুলাল”। প্যারীচাঁদ মিত্রের এই দ্বিতীয় অক্ষয়-কীর্তি।

অতএব বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান অতি উচ্চ। এই কথাই আমার বক্তব্য। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ সকলের বিস্তারিত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবার আমার অবসর নাই।

শ্রীবিষ্ণুমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

‘সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী

প্রতিভাশালী ব্যক্তিদেগের মধ্যে অনেকেই জীবিতকালে আপন আপন কৃতকার্যের পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অনেকের ভাগ্যে তাহা ঘটে না। যাঁহাদের কার্য দেশ কালের উপযোগী নহে, বরং তাহার অগ্রগামী, তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটে না। যাঁহারা লোকরঞ্জন অপেক্ষা লোকহিতকে

বিক্রম রচনাবলী

শ্রেষ্ঠ মনে করেন, তাঁহাদের ভাগ্যেও ঘটে না। যাঁহাদের প্রতিভার এক অংশ উজ্জ্বল, অপরাংশ ম্লান, কখন ভস্মাচ্ছন্ন কখন প্রদীপ্ত, তাঁহাদের ভাগ্যেও ঘটে না; কেন না অন্ধকার কাটিয়া দীপ্তির প্রকাশ পাইতে দিন লাগে।

ইহার মধ্যে কোন কারণে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়* তাঁহার জীবিতকালে, বাঙ্গালা সাহিত্য-সভায় তাঁহার উপযুক্ত আসন প্রাপ্ত হইলেন নাই, তাহা এ জীবনী পাঠে পাঠক বুঝিতে পারেন। কিন্তু তিনি যে এ পর্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যে আপনার উপযুক্ত আসন প্রাপ্ত হইলেন নাই, তাহা যিনিই তাঁহার গ্রন্থগুলি যত্নপূর্ব্বক পাঠ করিবেন, তিনিই স্বীকার করিবেন। কালে সে আসন প্রাপ্ত হইবেন। আমি বা চন্দ্রনাথ বাবু এক এক কলম লিখিয়া, তাঁহাকে এক্ষণে সে স্থান দিতে পারিব, এমন ভরসায় আমি উপস্থিত কস্মের ব্রতী হই নাই। তবে আমাদের এক অতি বলবান্ সহায় আছে। কাল, আমাদের সহায়। কালক্রমে ইহা অবশ্য ঘটিবে। আমরাও কালের অনুচর; তাই কালসাপেক্ষ কার্যের সূত্রপাতে এক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমার সহোদর। আমি দ্রাতৃশ্লেহবশতঃ তাঁহার জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হই নাই। আমি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, দীনবন্ধু মিত্র, এবং প্যারীচাঁদ মিত্রের জন্য যাহা করিয়াছি, আমার অগ্রজের জন্য তাহাই করিতেছি। তবে দ্রাতৃশ্লেহসুলভ পক্ষপাতের পরিবাদ ভয়ে তাঁহার গ্রন্থ সমালোচনার ভার আমি গ্রহণ করিলাম না। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার ও আমার পরমসুহৃদ্ বিখ্যাত সমালোচক বাবু চন্দ্রনাথ বসু এই ভার গ্রহণ করিয়া আমাকে ও পাঠকবর্গকে বাধিত করিয়াছেন।

জীবনী লিখিবারও আমি উপযুক্ত পাত্র নহি। যাঁহার জীবনী লেখা যায়, তাঁহার দোষ গুণ উভয়ই কীর্তন না করিলে, জীবনী লোকশিক্ষার উপযোগী হয় না—জীবনী লেখার উদ্দেশ্য সফল হয় না। সকল মানুষেরই দোষ গুণ দুই থাকে; আমার অগ্রজেরও ছিল। কিন্তু তাঁহার দোষ কীর্তনে আমার প্রবৃত্তি হইতে পারে না; আমি তাঁহার গুণকীর্তন করিলে লোকে বিশ্বাস করিবে না, দ্রাতৃশ্লেহজনিত পক্ষপাতের ভিতর ফেলিবে। কিন্তু তাঁহার জীবনের ঘটনা সকল আমি ভিন্ন আর কেহ সর্বিশেষ জানে না—সুতরাং আমিই লিখিতে বাধ্য।

লিখিতে গেলে, তাঁহার দোষ গুণের কথা কিছুই বলিব না, এমন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা যায় না, কেন না কিছু কিছু দোষ গুণের কথা না বলিলে, ঘটনাগুলি বুঝান যায় না। যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা অস্তুতঃ কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহার দোষে, বা তাঁহার গুণে ঘটিয়াছিল। কি দোষে কি গুণে ঘটিয়াছিল, তাহা বলিতে হইবে। তবে যাহাতে গুণ দোষের কথা খুব কম বলিতে হয়, সে চেষ্টা করিব।

অবসথী গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় এক শ্রেণীর ফুলিয়া কুলীনদিগের পূর্ব্বপুরুষ। তাঁহার বাস ছিল হুগলী জেলার অন্তঃপাতী দেশমুখো। তাঁহার বংশীয় রামজীবন চট্টোপাধ্যায় গঙ্গার পূর্ব্বতীরস্থ কাঁটালপাড়া গ্রাম নিবাসী রঘুদেব ঘোষালের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র রামহরি চট্টোপাধ্যায় মাতামহের বিষয় প্রাপ্ত হইয়া কাঁটালপাড়ায় বাস করিতে লাগিলেন। সেই অর্ধি রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের বংশীয় সকলেই কাঁটালপাড়ায় বাস করিতেছেন। এই ক্ষুদ্র লেখকই কেবল স্থানান্তরবাসী।

সেই কাঁটালপাড়া, সঞ্জীবচন্দ্রের জন্মভূমি।† তিনি কথিত রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র; পরমারাধ্য ষাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র। ১৭৫৬ শকে বৈশাখ মাসে ইহার জন্ম। যাহারা জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত তাহাদের কৌতূহল নিবারণার্থ ইহা লেখা আবশ্যিক,

* ইহার প্রকৃত নাম সঞ্জীবনচন্দ্র, কিন্তু সংক্ষেপানুরোধে সঞ্জীবচন্দ্র নামই ব্যবহৃত হইত। প্রকৃত নামের আশ্রয় লইয়াই এই সংগ্রহের নাম দিয়াছি, সঞ্জীবনী সূধা।

† জীবনী লিখিবার অনুরোধে, জ্যেষ্ঠ দ্রাতাকেও কেবল সঞ্জীবচন্দ্র বলিয়া লিখিতে বাধ্য হইতেছি। প্রথাটা অত্যন্ত ইংরাজি রকমের, কিন্তু যখন আমার পরম সুহৃদ্ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বাবু রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় এই প্রথা প্রবর্তিত করিয়াছেন, তখন মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা। বিশেষ তিনি আমারই “দাদা মহাশয়”, কিন্তু পাঠকের কাছে সঞ্জীবচন্দ্র মাত্র। অতএব দাদা মহাশয়, দাদা মহাশয়, পুনঃ পুনঃ পাঠকের রুচিকর না হইতে পারে।

যে, তাঁহার জন্মকালে, তিনটি গ্রহ, অর্থাৎ রবি, চন্দ্র, রাহু, তুঙ্গী, এবং শুক্র স্বক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে লগ্নাধিপতি ও দশমাধিপতি অন্তর্মিত। দেখিবেন, ফল মিলিয়াছে কিনা।

সে সময়ে গ্রাম্য প্রদেশে পাঠশালার গুরু মহাশয় শিক্ষামন্দিরের দ্বাররক্ষক ছিলেন; তাঁহার সাহায্যে সকলকেই মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিতে হইত। অতএব সঞ্জীবচন্দ্র যথাকালে এই বেত্রপাণি দৌবারিকের হস্তে সমর্পিত হইলেন। গুরু মহাশয় যদিও সঞ্জীবচন্দ্রের বিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যেই নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তথাপি হাট বাজার করা ইত্যাদি কার্যে, তাঁহার মনোভিনিবেশ বেশী ছিল, কেন না তাহাতে উপরি লাভের সম্ভাবনা। সুতরাং ছাত্রও বিদ্যাজর্জনে তাদৃশ মনোযোগী ছিলেন না। লাভের ভাগটা গুরুরই গুরুরতর রহিল।

এই সময়ে আমাদের পিতা, মেদিনীপুরে ডেপুটী কালেক্টরী করিতেন। আমরা সকলে, কাঁটালপাড়া হইতে তাঁহার সন্নিধানে নীত হইলাম। সঞ্জীবচন্দ্র মেদিনীপুরের স্কুলে প্রবিষ্ট হইলেন। কিছুকালের পর আবার আমাদেরকে কাঁটালপাড়ায় আসিতে হইল। এবার সঞ্জীবচন্দ্র হুগলী কলেজে প্রেরিত হইলেন। তিনি কিছু দিন সেখানে অধ্যয়ন করিলে আবার একজন “গুরু মহাশয়” নিযুক্ত হইলেন। আমার ভাগ্যোদয়ক্রমেই এই মহাশয়ের শূভাগমন; কেন না আমাকে ক, খ, শিখিতে হইবে, কিন্তু বিপদ অনেক সময়েই সংক্রামক। সঞ্জীবচন্দ্রও রামপ্রাণ সরকারের হস্তে সমর্পিত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে আমরা আট দশ মাসে এই মহাত্মার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মেদিনীপুর গেলাম। সেখানে, সঞ্জীবচন্দ্র আবার মেদিনীপুরের ইংরেজি স্কুলে প্রবিষ্ট হইলেন।

সেখানে তিন চারি বৎসর কাটিল। সঞ্জীবচন্দ্র অনায়াসে সর্বোচ্চ শ্রেণীর সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্রদিগের মধ্যে স্থান লাভ করিলেন। এইখানে তিনি তখনকার প্রচলিত Junior Scholarship পরীক্ষা দিলে, তাঁহার বিদ্যোপার্জনের পথ সুগম হইত। কিন্তু বিধাতা সেরূপ করিলেন না। পরীক্ষার অল্পকাল পূর্বেই আমাদেরকে মেদিনীপুর পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হইল। আবার কাঁটালপাড়ায় আসিলাম। সঞ্জীবচন্দ্রকে আবার হুগলী কলেজে প্রবিষ্ট হইতে হইল। Junior Scholarship পরীক্ষার বিলম্ব পড়িয়া গেল।

এই সকল ঘটনাগুলিকে গুরুরতর শিক্ষাবিভ্রাট বলিতে হইবে। আজ এ স্কুলে, কাল ও স্কুলে, আজ গুরু মহাশয়, কালি মাষ্টার, আবার গুরু মহাশয়, আবার মাষ্টার, এরূপ শিক্ষাবিভ্রাট ঘটিলে কেহই সুচারুরূপে বিদ্যোপার্জন করিতে পারে না। যাঁহারা গবর্ণমেন্টের উচ্চতর চাকরি করেন, তাঁহাদের সম্মানগণকে প্রায় সচরাচর এইরূপ শিক্ষাবিভ্রাটে পড়িতে হয়। গৃহকর্তার বিশেষ মনোযোগ, অর্থব্যয়, এবং আত্মসুখের লাঘব স্বীকার ব্যতীত ইহার সদুপায় হইতে পারে না।

কিন্তু ইহাও সকলের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, দুই দিকেই বিষম সঙ্কট। বালক বালিকা-দিগের শিক্ষা অতিশয় সতর্কতার কাজ। এক দিগে পুনঃ পুনঃ বিদ্যালয় পরিবর্তনে বিদ্যা শিক্ষার অতিশয় বিশৃঙ্খলতার সম্ভাবনা; আর দিগে আপনার শাসনে বালক না থাকিলে বালকের বিদ্যাশিক্ষায় আলস্য বা কুসংসর্গ ঘটনা, খুব সম্ভব। সঞ্জীবচন্দ্র প্রথমে, প্রথমোক্ত বিপদে পড়িয়াছিলেন, এক্ষণে অদৃষ্টদোষে দ্বিতীয় বিপদেও তাঁহাকে পড়িতে হইল। এই সময়ে পিতৃদেব বিদেশে, আমাদের সর্বজ্যেষ্ঠ সহোদরও চাকরি উপলক্ষে বিদেশে। মধ্যম সঞ্জীবচন্দ্র বালক হইলেও কর্তা—

Lord of himself, that heritage of woe!

কাজেই কতকগুলো বিদ্যানুশীলনবিমুখ ক্রীড়াকৌতুকপরায়ণ বালক—ঠিক বালক নহে, বয়ঃপ্রাপ্ত যুবা, আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিল।

সঞ্জীবচন্দ্র চিরকাল সমান উদার, প্রীতিপরবশ। প্রাচীন বয়সেও আশ্রিত অনুগত ব্যক্তি কুম্বভাবাপন্ন হইলেও তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারিতেন না। কৈশোরে যে তাহা পারেন নাই, তাহা বলা বাহুল্য। কাজেই বিদ্যাচর্চার হানি হইতে লাগিল। নিম্নলিখিত ঘটনাটিতে তাহা কিছুকালের জন্য একেবারে বন্ধ হইল।

হুগলী কলেজে পুনঃপ্রবিষ্ট হওয়ার পর প্রথম পরীক্ষার সময় উপস্থিত। এক দিন হেড মাষ্টার গ্রেব্‌স সাহেব আসিয়া কোন দিন কোন ক্লাসের পরীক্ষা হইবে, তাহা বলিয়া দিয়া গেলেন। সঞ্জীবচন্দ্র কলেজ হইতে বাড়ী আসিয়া স্থির করিলেন, এ দুই দিন বাড়ী থাকিয়া

বঙ্গীয় রচনাবলী

ভাল করিয়া পড়া শুন্য করা যাউক, কলেজে যাইব না, পরীক্ষার দিন যাইব। তাহাই করিলেন, কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁহাদিগের ক্লাসের পরীক্ষার দিন বদল হইল—অবধারিত দিবসের পূর্বাধীন পরীক্ষা হইবে স্থির হইল। আমি সে সন্ধান জানিতে পারিয়া, অগ্রজকে তাহা জানাইলাম। বন্ধুলাম যে, তিনি পরীক্ষা দিতে কলেজে যাইবেন। কিন্তু পরীক্ষার দিন, কলেজে যাইবার সময় দেখিলাম, তিনি উপরিলিখিত বানর সম্প্রদায়ের মধ্যে এক জনের সঙ্গে সতরণ খেলিতে-ছিলেন। বিদ্যার মধ্যে এইটি তাহারা অনুশীলন করিত, এবং সঞ্জীবচন্দ্রকে এ বিদ্যা দান করিয়াছিল। আমি তখন পরীক্ষার কথাটা সঞ্জীবচন্দ্রকে স্মরণ করাইয়া দিলাম। কিন্তু বানর সম্প্রদায় সেখানে দলে ভারি ছিল; তাহারা বাদানুবাদ করিয়া প্রতিপন্ন করিল যে, আমি অতিশয় দুষ্ট বালক, কেন না লেখা পড়া ভান করিয়া থাকি, এবং কখন কখন গোইন্দাগিরি করিয়া বানর সম্প্রদায়ের কীর্তি কলাপ মাতৃদেবীর শ্রীচরণে নিবেদন করি। কাজেই ইহাই সম্ভব যে, আমি গল্পটা রচনা করিয়া বলিয়াছি। সরলচিত্ত সঞ্জীবচন্দ্র তাহাই বিশ্বাস করিলেন। পরীক্ষা দিতে গেলেন না। তৎকালে প্রচলিত নিয়মানুসারে কাজেই উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন না। ইহাতে এমন ভগ্নোৎসাহ হইলেন যে, তৎক্ষণাৎ কলেজ পরিত্যাগ করিলেন, কাহারও কথা শুনিলেন না।

তখন পিতাঠাকুর বর্দ্ধমানে ডেপুটি কালেক্টর। তখন রেল হয় নাই; বর্দ্ধমান দূরদেশ। এই সংবাদ যথা কালে তাঁহার কাছে পৌঁছিল। তাঁহার বিজ্ঞতা অসাধারণ ছিল, তিনি এই সংবাদ পাইয়াই পুত্রকে আপনার নিকট লইয়া গেলেন। তাঁহার স্বভাব চরিত্র বিলক্ষণ পর্যবেক্ষণ করিয়া বন্ধুলেন যে, ইহাকে তাড়না করিয়া আবার কলেজে পাঠাইলে এখন কিছু হইবে না, যখন স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া বিদ্যোপার্জন করিবে, তখন সুফল ফলিবে।

তাহাই ঘটিল। সহসা সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভা জ্বলিয়া উঠিল। যে আগুন এত দিন ভস্মাচ্ছন্ন ছিল হঠাৎ তাহা জ্বালাবিশিষ্ট হইয়া চারি দিক আলো করিল। এই সময়ে আমাদিগের সর্বাগ্রজ শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় বারাকপুরে চাকরি করিতেন। তখন সেখানে গবর্ণমেন্টের একটি উত্তম ডিস্ট্রিক্ট স্কুল ছিল। প্রধান শিক্ষকের বিশেষ খ্যাতি ছিল। সঞ্জীবচন্দ্র Junior Scholarship পরীক্ষা দিবার জন্য প্রথম শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইলেন। পরীক্ষার জন্য তিনি এরূপ প্রস্তুত হইলেন যে, সকলেই আশা করিল যে তিনি পরীক্ষায় বিশেষ যশোলাভ করিবেন। কিন্তু বিধিলিপি এই যে, পরীক্ষায় তিনি চিরজীবন বিফলযত্ন হইবেন। এবার পরীক্ষার দিন তাঁহার গুরুতর পীড়া হইল; শয্যা হইতে উঠিতে পারিলেন না। পরীক্ষা দেওয়া হইল না।

তার পর আর সঞ্জীবচন্দ্র কোন বিদ্যালয়ে গেলেন না। বিনা সাহায্যে, নিজ প্রতিভা বলে, অল্পদিনে ইংরেজি সাহিত্যে, বিজ্ঞানে এবং ইতিহাসে অসাধারণ শিক্ষা লাভ করিলেন। কলেজে যে ফল ফলিত, ঘরে বসিয়া তাহা সমস্ত লাভ করিলেন।

তখন পিতৃদেব বিবেচনা করিলেন যে, এখন ইহাকে কন্মের প্রবৃত্ত করিয়া দেওয়া আবশ্যিক। তিনি সঞ্জীবচন্দ্রকে বর্দ্ধমান কমিশনরের আপসে একটি সামান্য কেরানিগিরি করিয়া দিলেন। কেরানিগিরিটি সামান্য, কিন্তু উন্নতির আশা অসামান্য। তাঁহার সঙ্গে যে যে সে আপসে কেরানিগিরি করিত, সকলেই পরে ডেপুটি মাজিস্ট্রেট হইয়াছিল। ইনিও হইতেন, উপায়ান্তরে হইয়াও ছিলেন। কিন্তু এ পথে আমি একটা প্রতিবন্ধক উপস্থিত করিলাম। তিনি যে একটি ক্ষুদ্র কেরানিগিরি করিতেন ইহা আমার অসহ্য হইত। তখন নতুন প্রেসিডেন্সি কলেজ খুলিয়াছিল; তাহার "Law Class" তখন নতুন। আমি তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম। তখন যে কেহ তাহাতে প্রবিষ্ট হইতে পারিত। আমি অগ্রজকে পরামর্শ দিয়া, কেরানিগিরিটি পরিত্যাগ করাইয়া ল ক্লাসে প্রবিষ্ট করাইলাম। আমি শেষ পর্যন্ত রহিলাম না; দুই বৎসর পড়িয়া চাকরি করিতে গেলাম। তিনি শেষ পর্যন্ত রহিলেন, কিন্তু পড়া শুন্য আর মনোযোগ করিলেন না। পরীক্ষায় সুফল বিধাতা তাঁহার অদৃষ্টে লিখেন নাই; পরীক্ষায় নিষ্ফল হইলেন। তখন প্রতিভা ভস্মাচ্ছন্ন।

তখন উদারচেতা মহাত্মা, এ সকল ফলাফল কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করিয়া, কাঁটালপাড়ায় মনোহর পুষ্কোদ্যান রচনায় মনোযোগ দিলেন। পিতা ঠাকুর মনে করিলেন, পুত্র পুষ্কোদ্যানে অর্থব্যয় করা অপেক্ষা, অর্থ উপার্জন করা ভাল। তিনি যাহা মনে করিতেন, তাহা করিতেন। তখন উইলসন সাহেব নতুন ইন্কমটেক্স বসাইয়াছেন। তাহার অবধারণ জন্য জেলায় জেলায়

সঞ্জীবনীসুধা—ভূমিকা

আসেসর নিযুক্ত হইতেন। পিতা ঠাকুর সঞ্জীবচন্দ্রকে আড়াই শত টাকা বেতনের একটি আসেসরিতে নিযুক্ত করাইলেন। সঞ্জীবচন্দ্র হুগলী জেলায় নিযুক্ত হইলেন।

কয়েক বৎসর আসেসরি করা হইল। তার পর পদটা এবলিশ হইল। পুনশ্চ কাঁটালপাড়ায় পদ্প্রাপ্ত, সৌন্দর্য্যপ্রিয়, সুখপ্রিয় সঞ্জীবচন্দ্র আবার পদ্প্রোদ্যান রচনায় মনোযোগ দিলেন। কিন্তু এবার একটা বড় গোলযোগ উপস্থিত হইল। জ্যেষ্ঠাগ্রজ, শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অভিপ্রায় করিলেন যে, পিতৃদেবের দ্বারা নতুন শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত করাইবেন। তিনি সেই মনোহর পদ্প্রোদ্যান ভাঙ্গিয়া দিয়া, তাহার উপর শিবমন্দির প্রস্তুত করিলেন। দুঃখে সঞ্জীবচন্দ্রের ভস্মাচ্ছাদিতা প্রতিভা আবার জ্বলিয়া উঠিল—সেই অগ্নিশিখায় জন্মিল—“Bengal Ryot.”

এই পুস্তকখানি ইংরেজিতে লিখিত। এখনকার পাঠক জানেন না যে, এ জিনিষটা কি? কিন্তু একদিন এই পুস্তক হাইকোর্টের জজদিগেরও হাতে হাতে ফিরিয়াছে। এই পুস্তকখানি প্রণয়নে সঞ্জীবচন্দ্র বিস্ময়কর পরিশ্রম করিয়াছিলেন। প্রত্যহ কাঁটালপাড়া হইতে দশটার সময়ে ট্রেনে কলিকাতায় আসিয়া রাশি রাশি প্রাচীন পুস্তক ঘাঁটিয়া অভিলষিত তত্ত্ব সকল বাহির করিয়া সংগ্রহ করিয়া লইয়া সন্ধ্যাকালে বাড়ী যাইতেন। রাতে তাহা সাজাইয়া লিপিবদ্ধ করিয়া প্রাতে আবার কলিকাতায় আসিতেন। পুস্তকখানির বিষয়, (১) বঙ্গীয় প্রজাদিগের পূর্বতন অবস্থা, (২) ইংরেজের আমলে প্রজাদিগের সম্বন্ধে যে সকল আইন হইয়াছে, তাহার ইতিবৃত্ত ও ফলাফল বিচার, (৩) ১৮৫৯ সালের দশ আইনের বিচার, (৪) প্রজাদিগের উন্নতির জন্য যাহা কর্তব্য।

পুস্তকখানি প্রচারিত হইবা মাত্র, বড় বড় সাহেব মহলে বড় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। রেবিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারী চাপ্‌মান্ সাহেব স্বয়ং কলিকাতা রিবিউতে ইহার সমালোচনা করিলেন। অনেক ইংরেজ বলিলেন যে, ইংরেজেও এমন গ্রন্থ লিখিতে পারে নাই। হাইকোর্টের জজেরা ইহা অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ঠাকুরাণী দাসীর মোকদ্দমায় ১৫ জন জজ ফুল বেণে বসিয়া প্রজাপক্ষে যে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, এই গ্রন্থ অনেক পরিমাণে তাহার প্রবৃত্তিদায়ক। গ্রন্থখানি দেশের অনেক মঙ্গল সিদ্ধ করিয়া এক্ষণে লোপ পাইয়াছে, তাহার কারণ ১৮৫৯ সালের দশ আইন রহিত হইয়াছে; Hills vs. Iswar Ghose মোকদ্দমার ব্যবস্থা রহিত হইয়াছে। এই দুই ইহার লক্ষ্য ছিল।

গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া লেফটেন্যান্ট গবর্নর সাহেব, সঞ্জীবচন্দ্রকে একটি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট পদ উপহার দিলেন। পর পাইয়া সঞ্জীবচন্দ্র আমাকে বলিলেন, “ইহাতে পরীক্ষা দিতে হয়; আমি কখন পরীক্ষা দিতে পারি না; সুতরাং এ চাকরি আমার থাকিবে না।”

পারিশেষে তাহাই ঘটিল, কিন্তু এক্ষণে সঞ্জীবচন্দ্র কৃষ্ণনগরে নিযুক্ত হইলেন। তখনকার সমাজের ও কাব্যজগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র দীনবন্ধু মিত্র তখন তথায় বাস করিতেন। ইহাদের পরস্পরে আন্তরিক, অকপট বন্ধুতা ছিল; উভয়ে উভয়ের প্রণয়ে অতিশয় সুখী হইয়াছিলেন। কৃষ্ণনগরের অনেক সুশিক্ষিত মহাত্মাব্যক্তিগণ তাহাদিগের নিকট সমাগত হইতেন; দীনবন্ধু ও সঞ্জীবচন্দ্র উভয়েই কথোপকথনে অতিশয় সুরসিক ছিলেন। সরস কথোপকথনের তরঙ্গে প্রত্যহ আনন্দস্রোত উচ্ছলিত হইত। কৃষ্ণনগর বাসকালই সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা সুখের সময় ছিল। শরীর নীরোগ, বলিষ্ঠ; অভিলষিত পদ, প্রয়োজনীয় অর্থাগম, পিতামাতার অপরিমিত স্নেহ; ভ্রাতৃগণের সৌহৃদ্য, পারিবারিক সুখ, এবং বহু সৎসুহৃৎসংসর্গসঞ্জাত অক্ষুণ্ণ আনন্দপ্রবাহ। মনুষ্যে যাহা চায়, সকলই তিনি এই সময়ে পাইয়াছিলেন।

দুই বৎসর এইরূপে কৃষ্ণনগরে কাটিল। তাহার পর গবর্নমেন্টে তাহাকে কোন গুরুতর কার্যের ভার দিয়া পালার্মো পাঠাইলেন। পালার্মো, তখন ব্যাঘ্র ভল্লুকের আবাসভূমি, বন্য প্রদেশ মাত্র। সুহৃৎপ্রিয় সঞ্জীবচন্দ্র সে বিজন বনে একা তিষ্ঠিতে পারিলেন না। শীঘ্রই বিদায় লইয়া আসিলেন। বিদায় ফুরাইলে আবার যাইতে হইল, কিন্তু যে দিন পালার্মো পৌঁছিলা, সেই দিনই পালার্মোর উপর রাগ করিয়া বিনা বিদায়ে চলিয়া আসিলেন। আজিকার দিনে, এবং সে কালেও এরূপ কাজ করিলে চাকরি থাকে না। কিন্তু তাহার চাকরি রহিয়া গেল, আবার বিদায় পাইলেন। আর পালার্মো গেলেন না। কিন্তু পালার্মোয়ে যে অল্প কাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তাহার চিহ্ন বাঙ্গালা সাহিত্যে রহিয়া গেল। “পালার্মো” শীর্ষক যে কয়টি মধুর

বিক্রম রচনাবলী

প্রবন্ধ এই সংগ্রহে সংকলিত হইয়াছে, তাহা সেই পালামো যাত্রার ফল। প্রথমে ইহা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। প্রকাশ কালে, তিনি নিজের রচনা বলিয়া ইহা প্রকাশ করেন নাই। “প্রমথ নাথ বসু” ইতি কাল্পনিক নামের আদ্যক্ষর সহিত ঐ প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল। আমার সম্মুখে বসিয়াই তিনি এগুলি লিখিয়াছিলেন, অতএব এগুলি যে তাঁহার রচনা তদ্বিষয়ে পাঠকের সন্দেহ করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

এবার বিদায়ের অবসানে তিনি যশোহরে প্রেরিত হইলেন। সে স্থান অস্বাস্থ্যকর, তথায় সপরিবারে পীড়িত হইয়া আবার বিদায় লইয়া আসিলেন। তার পর অল্প দিন আলিপুর্নে থাকিয়া পাবনায় প্রেরিত হইলেন।

ডিপার্টমেন্টগিরিতে দুইটা পরীক্ষা দিতে হয়। পরীক্ষা বিষয়ে তাঁহার যে অদৃষ্ট তাহা বলিয়াছি। কিন্তু এবার প্রথম পরীক্ষায় তিনি কোনরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। কস্ম গেল। তাঁহার নিজমুখে শুনিয়াছি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার মার্ক তাঁহার হইয়াছিল। কিন্তু বেঙ্গল অফিসের কোন কর্মচারী ঠিক ভুল করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার অনিষ্ট করিয়াছিল। বড় সাহেবদিগকে একথা জানাইতে আমি পরামর্শ দিয়াছিলাম; জানানও হইয়াছিল কিন্তু কোন ফলোদয় হয় নাই।

কথাটা অমূলক কি সমূলক তাহা বলিতে পারি না। সমূলক হইলেও, গবর্নমেন্টের এমন একটা গলৎ সচরাচর স্বীকার করা প্রত্যাশা করা যায় না। কোন কেরানি যদি কৌশল করে, তবে সাহেবদিগের তাহা ধরিবার উপায় অল্প। কিন্তু গবর্নমেন্ট এ কথার আন্দোলনে যে রূপ ব্যবহার করিলেন, তাহা দুই দিক রাখা রকমের। সঞ্জীবচন্দ্র ডিপার্টমেন্টগিরি আর পাইলেন না। কিন্তু গবর্নমেন্ট তাঁহাকে তুল্য বেতনের আর একটি চাকরি দিলেন। বারাসতে তখন একজন স্পেশিয়াল সবরেজিষ্ট্রার থাকিত। গবর্নমেন্ট সেই পদে সঞ্জীবচন্দ্রকে নিযুক্ত করিলেন।

যখন তিনি বারাসতে তখন প্রথম সেন্সস্ হইল। এ কার্যের কর্তৃত্ব Inspector General of Registration এর উপরে অর্পিত। সেন্সসের অঙ্ক সকল ঠিক ঠাক্ দিবার জন্য হাজার কেরানি নিযুক্ত হইল। তাহাদের কার্যের তত্ত্বাবধান জন্য সঞ্জীবচন্দ্র নির্বাচিত ও নিযুক্ত হইলেন।

এ কার্য শেষ হইলে পরে, সঞ্জীবচন্দ্র হুগলীর Special Sub-Registrar হইলেন। ইহাতে তিনি সুখী হইলেন, কেন না তিনি বাড়ী হইতে আপিস করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে হুগলীর সবরেজিষ্ট্রারী পদের বেতন কমান গবর্নমেন্টের অভিপ্রায় হওয়ায়, সঞ্জীবচন্দ্রের বেতনের লাঘব না হয়, এই অভিপ্রায়ে তিনি বর্ধমান প্রেরিত হইলেন।

বর্ধমানে সঞ্জীবচন্দ্র খুব সুখে ছিলেন। এইখানে থাকিবার সময়েই বাঙ্গালা সাহিত্যের সঙ্গে তাঁহার প্রকাশ্য সম্বন্ধ জন্মে। বাল্যকাল হইতেই সঞ্জীবচন্দ্রের বাঙ্গালা রচনায় অনুরাগ ছিল। কিন্তু তাঁহার বাল্য রচনা কখন প্রকাশিত হয় নাই, এক্ষণেও বিদ্যমান নাই। কিশোর বয়সে শ্রীযুক্ত কালিদাস মৈত্র সম্পাদিত শশধর নামক পত্রে তিনি দুই একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা প্রশংসিতও হইয়াছিল। তাহার পর অনেক বৎসর বাঙ্গালা ভাষার সঙ্গে বড় সম্বন্ধ রাখেন নাই। ১২৭৯ সালের ১লা বৈশাখ আমি বঙ্গদর্শন সৃষ্টি করিলাম। ঐ বৎসর ভবানীপুরে উহা মন্দিরিত ও প্রকাশিত হইতে লাগিল। কিন্তু ইত্যবসরে সঞ্জীবচন্দ্র কাঁটালপাড়ার বাড়ীতে একটি ছাপাখানা স্থাপিত করিলেন। নাম দিলেন বঙ্গদর্শন প্রেস। তাঁহার অনুরোধে আমি বঙ্গদর্শন ভবানীপুর হইতে উঠাইয়া আনিলাম। বঙ্গদর্শন প্রেসে বঙ্গদর্শন ছাপা হইতে লাগিল। সঞ্জীবচন্দ্রও বঙ্গদর্শনের দুই একটা প্রবন্ধ লিখিলেন। তখন আমি পরামর্শ স্থির করিলাম যে, আর একখানা ক্ষুদ্রতর মাসিক পত্র বঙ্গদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হওয়া ভাল। যাহারা বঙ্গদর্শনের মূল্য দিতে পারে না, অথবা বঙ্গদর্শন যাহাদের পক্ষে কঠিন, তাহাদের উপযোগী একখানি মাসিক পত্র প্রচার বাঞ্ছনীয় বিবেচনায়, তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম যে, তাদৃশ কোন পত্রের স্বত্ব ও সম্পাদকতা তিনি গ্রহণ করেন। সেই পরামর্শানুসারে তিনি ভ্রমর নামে মাসিক পত্র প্রকাশিত করিতে লাগিলেন। পত্রখানি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল; এবং তাহাতে বিলক্ষণ লাভও হইত। এখন আবার তাঁহার তেজস্বিনী প্রতিভা পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। প্রায় তিনি একাই ভ্রমরের সমস্ত প্রবন্ধ লিখিতেন; আর কাহারও সাহায্য সচরাচর গ্রহণ করিতেন না। এই সংগ্রহে যে দুটি উপন্যাস দেওয়া গেল, তাহা ভ্রমরে প্রকাশিত হইয়াছিল।

সঞ্জীবনীসুধা—ভূমিকা

এক কাজ তিনি নিয়মমত অধিক দিন করিতে ভাল বাসিতেন না। ভ্রমর লোকান্তরে উড়িয়া গেল। আমিও ১২৮২ সালের পর বঙ্গদর্শন বন্ধ করিলাম। বঙ্গদর্শন এক বৎসর বন্ধ থাকিলে পর, তিনি আমার নিকট ইহার স্বত্বাধিকার চাহিয়া লইলেন। ১২৮৪ সাল হইতে ১২৮৯ সাল পর্যন্ত তিনিই বঙ্গদর্শনের সম্পাদকতা করেন। পূর্বে আমার সম্পাদকতার সময়ে, বঙ্গদর্শনে ষেরূপ প্রবন্ধ বাহির হইত, এখনও তাহাই হইতে লাগিল। সাহিত্য সম্বন্ধে বঙ্গদর্শনের গৌরব অক্ষুণ্ণ রহিল। যাঁহারা পূর্বে বঙ্গদর্শনে লিখিতেন, এখনও তাঁহারা লিখিতে লাগিলেন। অনেক নূতন লেখক—যাঁহারা এক্ষণে খুব প্রসিদ্ধ, তাঁহারাও লিখিতে লাগিলেন। “কৃষ্ণকান্তের উইল,” “রাজসিংহ,” “আনন্দমঠ,” “দেবী” তাঁহার সম্পাদকতা কালেই বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। তিনি নিজেও তাঁহার তেজস্বিনী প্রতিভার সাহায্য গ্রহণ করিয়া, “জাল প্রতাপচাঁদ,” “পালার্মো,” “বৈজিকতত্ত্ব” প্রভৃতি প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। কিন্তু বঙ্গদর্শনের আর তেমন প্রতিপত্তি হইল না। তাহার কারণ, ইহা কখনও সময়ে প্রকাশিত হইত না। সম্পাদকের অমনোযোগে, এবং কার্য্যাধ্যক্ষতার কার্যের বিশৃঙ্খলতায়, বঙ্গদর্শন কখনও আর নির্দিষ্ট সময়ে বাহির হইত না। এক মাস, দুই মাস, চারি মাস, ছয় মাস, এক বৎসর বাকি পড়িতে লাগিল।

বর্ধমানেরও স্পেসিয়াল সবারেজিস্ট্রীর বেতন কমিয়া গেল। এবার সঞ্জীবচন্দ্রকে যশোহর যাইতে হইল। তাঁহার যাওয়ার পরে, বার্টন নামা এক জন নরাধম ইংরেজ কালেক্টর হইয়া সেখানে আসিল। যে কালেক্টর, সেই মাজিস্ট্রেট, সেই রেজিস্ট্রার। ভারতে আসিয়া বার্টনের একমাত্র বৃত ছিল—শিক্ষিত বাঙ্গালী কর্মচারীকে কিসে অপদস্থ ও অপমানিত করিবেন বা পদচ্যুত করাইবেন, তাহাই তাঁহার কার্য। অনেকের উপর তিনি অসহ্য অত্যাচার করিয়াছিলেন। সঞ্জীবচন্দ্রের উপরও আরম্ভ করিলেন। সঞ্জীবচন্দ্র বিরক্ত হইয়া বিদায় লইয়া বাড়ী আসিলেন।

বাড়ী আসিলে পর, আমাদিগের পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করিলেন। এত দিন তাঁহার ভয়ে, সঞ্জীবচন্দ্র আপনার মনের বাসনা চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। পিতৃদেবের স্বর্গারোহণের পর আমরা দুই জনের দুইটি সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিলাম। আমি কাঁটালপাড়া ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় উঠিয়া আসিলাম—সঞ্জীবচন্দ্র চাকরি ত্যাগ করিলেন। সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয় ও কার্য্যালয় কলিকাতায় উঠাইয়া আনিলেন।

কিন্তু আর বঙ্গদর্শন চলা ভার হইল। বঙ্গদর্শনের কোন কোন কর্মচারী এমন ছিল, যে, তাহাদিগের বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যিক ছিল। পিতাঠাকুর মহাশয় যত দিন বর্তমান ছিলেন, তত দিন তিনি সে দৃষ্টি রাখিতেন। তাঁহার অবর্তমানে কাহার শস্য কাহার গৃহে যাইতে লাগিল, তাহার ঠিক নাই। যিনি মালিক, তিনি উদারতা ও চক্ষুলাজ্ঞা বশতঃ কিছুই দেখেন না। টাকা কাড়ি “মুশুরিবাটা” হইতে লাগিল। প্রথমে ছাপাখানা গেল—শেষে বঙ্গদর্শনের অপঘাত মৃত্যু হইল।

তার পর সঞ্জীবচন্দ্র, কাঁটালপাড়ার বাড়ীতে বসিয়া রহিলেন। কয়েক বৎসর কেবল বসিয়া রহিলেন। কোন মতে কোন কার্যে কেহ প্রবৃত্ত করিতে পারিল না। সে জ্বালাময়ী প্রতিভা আর জ্বলিল না। ক্রমশঃ শরীর রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। পরিশেষে ১৮৯১ শকে বৈশাখ মাসে, জ্বরবিধিকারে তিনি দেহত্যাগ করিলেন।

তাঁহার প্রণীত গ্রন্থাবলীর মধ্যে (১) মাধবীলতা, (২) কণ্ঠমালা, (৩) জাল প্রতাপচাঁদ, (৪) রামেশ্বরের অদৃষ্ট, (৫) যাত্রা সমালোচন, (৬) Bengal Ryot, এই কয়খানি পৃথক্ ছাপা হইয়াছে, অবশিষ্ট গ্রন্থগুলি প্রকাশ করিতে আমি প্রবৃত্ত হইলাম। “রামেশ্বরের অদৃষ্ট” এক্ষণে আর পাওয়া যায় না, এজন্য তাহাও এই সংগ্রহভূক্ত হইল।

শ্রীবাঙ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা

নতন গ্রন্থের সমালোচনা

আমরা প্রথমত প্রাপ্ত পুস্তকাদির সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় এ পর্যন্ত প্রবৃত্ত হই নাই। ইহার কারণ এই যে, আমাদের বিবেচনায় এরূপ সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় কাহারও কোন উপকার নাই। এইরূপ সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় গ্রন্থের প্রকৃত গুণদোষের বিচার হইতে পারে না। তদ্বারা, গ্রন্থকারের প্রশংসা বা নিন্দা ভিন্ন অন্য কোন কার্যই সিদ্ধ হয় না। কিন্তু গ্রন্থকারের প্রশংসা বা নিন্দা সমালোচনার উদ্দেশ্য নহে। কেবল সেই উদ্দেশ্যে গ্রন্থ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছুক নহি। গ্রন্থ পাঠ করিয়া পাঠক যে সুখলাভ বা যে জ্ঞানলাভ করিবেন, তাহা অধিকতর স্পষ্টীকৃত বা তাহার বৃদ্ধি করা; গ্রন্থকার যেখানে ভ্রান্ত হইয়াছেন, সেখানে ভ্রম সংশোধন করা; যে গ্রন্থে সাধারণের অনিষ্ট হইতে পারে, সেই গ্রন্থের অনিষ্টকারিতা সাধারণের নিকট প্রতীয়মান করা; এইগুলি সমালোচনার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য দুই ছত্রে সিদ্ধ হইতে পারে না। সেই কারণেই এ পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় আমরা বিরত ছিলাম। ইচ্ছা আছে, অবকাশানুসারে গ্রন্থবিশেষের বিস্তারিত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। সাধ্যানুসারে সেই ইচ্ছামত কার্য হইতেছে।

এই সকল কারণে আমরা যে সকল গ্রন্থ উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার অধিকাংশের প্রায়ই কোন প্রকার উল্লেখ করি নাই। কিন্তু আমরা তজ্জন্য অকৃতজ্ঞ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছি। গ্রন্থকারগণ যে উদ্দেশ্যে আমাদেরকে গ্রন্থগুলি উপহার দিয়াছেন, যদি তাহা সিদ্ধ না করিলাম, তবে ঐ সকল গ্রন্থের মূল্য প্রেরণ আমাদের কৰ্তব্য। তদপেক্ষা একটু লেখা সহজ, সুতরাং আমরা তাহাতেই প্রবৃত্ত হইলাম।—'বঙ্গদর্শন', কার্তিক ১২৭৯, পৃ. ৩৩৬-৩৭।

THREE YEARS IN EUROPE.*

আমরা স্বীকার করিয়াছিলাম যে, এই গ্রন্থখানি সবিস্তারে সমালোচিত করিব। অবকাশভাবে এ পর্যন্ত অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে পারি নাই। পাঠকেরা ত্রুটি মার্জনা করিবেন।

এ দেশীয় কোন সুশিক্ষিত ব্যক্তি, সন ১৮৬৮ সালে ইংলণ্ডে গমন করেন। তথায় তিন বৎসর অবস্থিতি করেন। ইংলণ্ড হইতে সহোদরকে পত্র লিখিতেন। তিন বৎসরে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কয়দংশ সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। পুস্তক লেখকের নাম প্রকাশিত হয় নাই।

এইরূপ একখানি গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ইংরাজ শিক্ষার প্রসাদে আমরা ইংরাজি গ্রন্থাদি হইতে ইংলণ্ডের বিষয় অনেক অবগত হইয়াছি, এবং এখানেও অনেক ইংরাজ দেখিতে পাই। তথাপি, অন্ধ যেমন স্পর্শের দ্বারা হস্তির আকার অনুভূত করিয়াছিল, ইংলণ্ড সম্বন্ধে আমাদের অনেক বিষয়ে সেইরূপ জ্ঞান। ইংরাজি গ্রন্থ বা পত্রাদি ইংরাজের প্রণীত। ইংরাজের চক্ষে যেমন দেখায়, তাহাতে ইংলণ্ড সেইরূপ চিত্রিত। আমাদের চক্ষে ইংলণ্ড কিরূপ দেখাইবে, তাহার কিছুই সে সকলে পাওয়া যায় না। মসূর তাইন একজন কৃতিবিদ্যা ফরাশী। তিনি ফরাশীর চক্ষে ইংলণ্ড দেখিয়া, তদেদর্শবিবরণ একখানি গ্রন্থে প্রচারিত করিয়াছেন। তৎপাঠে আমরা জানিতে পারি যে, ইংরাজের চিত্রিত ইংলণ্ড হইতে মসূর তাইনের চিত্রিত ইংলণ্ড অনেক বিষয়ে স্বতন্ত্র। ইংরাজ ও ফরাশীতে বিশেষ সাদৃশ্য; আমাদের চক্ষে দেখিতে গেলে উভয়ে এক দেশবাসী, এক জাতি, এক ধর্ম্মানুষ্ঠান; উভয়ের এক প্রকার শিক্ষা, এক প্রকার আচার ব্যবহার, এক প্রকার স্বভাব। যদি ফরাশীর লিখিত চিত্রে ইংলণ্ড এইরূপ নতন বস্তু বলিয়া বোধ হয়, তবে বাঙ্গালীর বর্ণনায় আরও কত তারতম্য ঘটিবে,

* *Three years in Europe, being Extracts from Letters sent from Europe.* Calcutta, I. C. Bose & Co. 1872.

Three Years in Europe

তাহা সহজেই অনুমেয়। অতএব বাঙ্গালীর হস্তলিখিত একখানি ইংলণ্ডের চিত্র দেখিবার আমাদের বড় বাসনা ছিল। এই লেখক বাঙ্গালী জাতির সেই বাসনা পূরাইয়াছেন, এজন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ করি।

ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, লেখক ইউরোপ একটু অনুকূল চক্ষে দেখিয়াছেন। আমাদের দেশের লোকের চক্ষে যে ইউরোপ অতি আশ্চর্য্য দেশ বোধ হইবে, তাহাতে সংশয় নাই। যে দেশের জন কয়েক লোক মাত্র সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া পাঁচ সহস্র মাইল দূরে আসিয়া প্রত্যহ নতুন নতুন বিস্ময়কর কার্য্য করিতেছেন, তাঁহাদের স্বদেশ যে আমাদের নিকটে বিশেষ প্রশংসনীয় হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? অতএব যাঁহার স্বভাব দ্বৈষাভিষিষ্ট নহে, তিনিই ইংলণ্ডকে অনুকূল চক্ষে দেখিবেন, সন্দেহ নাই। তথাপি বিদেশে গেলে বিদেশের সকল বিষয় ভাল লাগে না। ইউরোপে কি কি আমাদের ভাল লাগে না, সেইটুকু শূনিবার জন্য আমাদের বিশেষ কৌতূহল আছে। এ গ্রন্থে সে আকাঙ্ক্ষা নিবারণ হয় না।

সেইটুকু আমরা কেন শূনিতে চাই? তাহা আমরা বুঝাইতে পারিব কি না, বলিতে পারি না। আমরা বাঙ্গালী, ইংরাজ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ জাতির তুলনায় আমরা অতি সামান্য জাতি বলিয়া গণ্য। ইংরাজের তুলনায় আমাদের কিছুই প্রশংসনীয় নহে। আমাদের কিছুই ভাল নহে। একথা সত্য কি না, তাহা আমরা ঠিক জানি না; কিন্তু প্রত্যহ শূনিতে শূনিতে আমাদের উহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস হইয়া উঠিতেছে। সে বিশ্বাসটি ভাল নহে। ইহাতে আমাদের স্বদেশভক্তি, স্বজাতির প্রতি শ্রদ্ধার হ্রাস হইতেছে। যাহাতে কিছু ভাল নাই—তাহা কে ভালবাসিবে? আমরা যদি অন্য জাতির অপেক্ষা বাঙ্গালী জাতির, অন্য দেশের অপেক্ষা বাঙ্গালা দেশের কোন বিশেষ গুণ না দেখি, তবে আমাদের দেশবাসিন্যের অভাব হইবে। এই জন্য আমাদের সর্বদা ইচ্ছা করে যে, সত্যতম জাতি অপেক্ষা আমরা কোন অংশে ভাল কি না, তাহা শূনি। কিন্তু কোথাও তাহা শূনিতে পাই না। যাহা শূনি, তাহা সত্যপ্রিয় সূবিবেচকের কথা নহে। যাহা শূনি, তাহা শুদ্ধ স্বদেশপিঞ্জর মধ্যে পালিত মিথ্যাদস্ত্যপ্রিয় ব্যক্তিদের কথা—তাহাতে বিশ্বাস হয় না—বাসনা পরিতৃপ্ত হয় না। যদি এই লেখকের ন্যায় সূর্শিক্ষিত, সূবিবেচক, বহুদেশদর্শী ব্যক্তির নিকট সে কর্ণানন্দদায়িনী কথা শূনিতে পাইতাম—তবে সুখ হইত। তাহা যে শূনিলাম না, সে লেখকের দোষ নহে—আমাদের কপালের দোষ। লেখক স্বদেশবিদ্বেষী বা ইংরাজপ্রিয় নহেন। তিনি স্বদেশবৎসল, স্বদেশবৎসল্যে তাঁহার অন্তঃকরণ বিচলিত হইলে, তিনি প্রবাস হইতে স্বদেশ বিষয়ে যে সকল কবিতাগুলিন লিখিয়া ভ্রাতাকে পাঠাইয়াছেন, তাহা আমাদের কর্ণে অমৃত বর্ষণ করে। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, গুণহীনা মাতার প্রতি সৎপুত্রের যে রূপ স্নেহ, স্বদেশের প্রতি তাঁহার সেই স্নেহ। গুণবতী মাতার প্রতি পুত্রের যে স্নেহ, সে স্নেহ কোথায়? এই বঙ্গদেশের প্রতি সে স্নেহ কাহার আছে? সে স্নেহ কিসে হইবে? এ গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমাদের সেই কথা মনে পড়িল। জন্মভূমি সম্বন্ধে আমরা যে “স্বর্গাদপি গরিয়সী” বলিবার অধিকারী নই, আমাদের সেই কথা মনে পড়িল। সেই কথা মনে পড়ায়, আমরা এ আক্ষেপ করিলাম। যে মনুষ্য জননীকে “স্বর্গাদপি গরিয়সী” মনে করিতে না পারে, সে মনুষ্যমধ্যে হতভাগ্য। যে জাতি জন্মভূমিকে “স্বর্গাদপি গরিয়সী” মনে করিতে না পারে সে জাতি জাতিমধ্যে হতভাগ্য। আমরা সেই হতভাগ্য জাতি বলিয়া এ রোদন করিলাম। লেখক যদি আমাদের মনের ভাব বুঝিয়া থাকেন, তবে তিনিও আমাদের সঙ্গে রোদন করিবেন। যদি কেহ সত্যপ্রিয়, দেশবৎসল বাঙ্গালী থাকেন, তিনি আমাদের সঙ্গে রোদন করিবেন।

আমরা গ্রন্থ সমালোচনা ত্যাগ করিয়া একটু অপ্ৰাসঙ্গিক কথা তুলিয়াছি, কিন্তু কথা নিতান্ত অপ্ৰাসঙ্গিকও নহে। আমরা যে ভাব ব্যক্ত করিলাম, এই গ্রন্থের আলোচনায় সেই ভাবই বাঙ্গালীর মনে উদয় হইতে পারে। যদি সাধারণ বাঙ্গালীর মনে ইহা হইতে সেই ভাব উদ্ভূত হয়, তবে এ গ্রন্থ সার্থক। তাহা হইলে ইহার মূল্য নাই।

এই গ্রন্থের প্রকৃত সমালোচনা সম্ভবে না। কেন না, ইহা সাধারণ সমীপে প্রকাশিত করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমে প্রণীত হয় নাই। সুতরাং রচনাচাতুর্য্য, বা বিষয়ঘটিত পারিপাট্য ইহার উদ্দেশ্য নহে। ভ্রাতার সঙ্গে সরল কথোপকথনের স্বরূপ ইহা লিখিত হইয়াছিল। অতএব সমালোচক যে সকল দোষ গুণের সন্ধান করেন, ইহাতে তাহার সন্ধান কর্তব্য নহে। কিন্তু সন্ধান করিলেও দোষ ভাগ পাওয়া কঠিন হইবে, গুণ অনেক পাওয়া যাইবে। ভাষা সরল, এবং

বিশ্বকম রচনাবলী

আড়ম্বরশূন্য। ভাবও সরল, এবং আড়ম্বরশূন্য। লেখকের হৃদয়ও যে সরল এবং আড়ম্বর-
শূন্য, এই গ্রন্থ তাহার পরিচয়। লেখক সর্বত্রই গুণগ্রাহী, উৎসাহশীল, এবং সুপ্রসন্ন।
তাঁহার রচনাও সুন্দর, বুদ্ধি মার্জিত, এবং বিচারক্ষমতা অনিন্দনীয়। বিশেষ, তাঁহার একটি
গুণ দেখিয়া আমরা বড় প্রীত হইয়াছি। চিত্রে বা খোদিত প্রস্তরে যে রস, বাঙ্গালীরা প্রায়ই তাহা
অনুভূত করিতে পারেন না। বালকে বা চাষায় “সং” দেখিয়া যে রূপ সুখ বোধ করে, সুশিক্ষিত
বাঙ্গালীরাও চিত্রাদি দেখিয়া সেইরূপ সুখ বোধ করেন। এই গ্রন্থের লেখক সে শ্রেণীর বাঙ্গালী
নহেন। তিনি চিত্রাদির যে সকল সমালোচনা পত্রমধ্যে ন্যস্ত করিয়াছেন, তাহাতে বিশেষ
রসানুভাবকতা এবং সহৃদয়তা প্রকাশ পায়। ইউরোপে পর্যটন করিলে, ভুবনে অতুল্য চিত্রাদি
দর্শনে, এবং তত্ত্বদ্বিষয়ের বিচক্ষণ বিচারকদিগের সহবাসে যে বুদ্ধি মার্জিততা, এবং রসগ্রাহিণী
শক্তি ক্ষুদ্রিত হইবে, ইহা সঙ্গত। কিন্তু এ লেখকের রসগ্রাহিণী শক্তি স্বভাবজাতাও বটে।
তিনি ইউরোপে প্রবেশ করিবার পূর্বেই মাল্টা নগরে “Charity”র গঠিত মূর্তি দেখিয়া
লিখিয়াছেন;—

“It is impossible for me to describe in adequate terms the meekness
and tender pathos that dwells in the placid and unclouded face of the
mother as she gazes with a loving and affectionate look on the sweet
heaven of her infant’s face. I stood there I know not how long, but this
I know I could have stood there for hours together, and not have wished
to go away.” P. 11-12.

পুস্তকের মধ্যে মধ্যে যে সকল বর্ণনা আছে, তাহাতে আমরা প্রীত হইয়াছি। সে সকল
গ্রন্থকারের লিপিশক্তির পরিচয়। উদাহরণস্বরূপ আমরা নিম্নলিখিত বর্ণনাটি উদ্ধৃত করিলাম—

“From Iona we went to the small uninhabited island of Staffa contain-
ing several wonderful caves, of which Fingal’s cave is the most magnificent.
This cave with its splendid arch 70 feet high, supporting an intablature
of 30 feet additional,—its dark basaltic pillars, its arching roof above, and
the sea ever and anon rushing and roaring below, is a most wonderful sight
indeed. The sea being calm we went in a boat to the inner end of the
cave. The walls consist of countless gigantic columns sometimes square,
often pentagonal or hexagonal, and of a dark purple color which adds
to the solemnity of the aspect of the place. The roof itself consists of
overhanging pillars; and every time that the wave comes in with a roaring
sound, the roof, the caverns, and the thousand pillars return the sound
increased tenfold, and the whole effect is grand.” P. 48.

স্থানাভাব প্রযুক্ত আমরা অন্যান্যাংশ উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না, কিন্তু ইহা বলিতে পারি
যে, তাঁহার চক্ষু সৌন্দর্য্যানুসন্ধানী—যেখানে যাহা দেখিয়াছেন, তাহার সুন্দর ভাগ গ্রহণ
করিয়াছেন। যখন তিনি কালিদনীয় খালের মধ্যে, তখনকার অবস্থায় অনেকেই বিরক্ত হইয়া
উঠিতেন; তিনি লিখিয়াছেন;—

“On both sides of us were continuous chains of mountains, and it being
very bad weather, dark clouds hanging over our heads served as a gloomy
canopy extending from the ridges on our right to those on our left. As
far as the eye could reach, before or behind, there was nothing but this
gloomy vista,—the dark clouds above, dark waters below, and high moun-
tains on both sides of us. The scene was grand indeed, and I can assure
you. I would not have changed that gloomy scene of highland grandeur
for the neatest and prettiest spot in the earth, nor ever for the sunniest sky,
the dark rolling clouds which added to the gloom and sublimity of the
scene.” P. 50.

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন

লেখক মধ্যে মধ্যে কবিতা রচনা করিয়া ভ্রাতাকে পাঠাইয়া দিতেন। বাঙ্গালী হইয়া যিনি ইংরাজিতে কবিতা রচনা করেন, আমরা কখন তাহার প্রশংসা করিব না, ইহা আমাদের স্থির প্রতিজ্ঞা। সুতরাং তাহার কবিতার প্রশংসা করিতে পারিলাম না।

পারিশেষে লেখকের নিকট আমরাদিগের বিশেষ অনুরোধ এই যে, এই পুস্তকখানি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করুন। যাঁহারা ইংরাজি জানেন না, তাঁহাদিগের পক্ষে ইহা ষাটশ মনোরঞ্জক এবং উপকারী, ইংরাজি অভিজ্ঞদিগের নিকট তাদৃশ নহে। যাঁহারা ইংরাজি জানেন, তাঁহারা ইউরোপের বিষয় কিছু কিছু জানেন। যাঁহারা ইংরেজি জানেন না, তাঁহারা ইউরোপের বিষয় কিছুই জানেন না। বিলাত কি—মরুভূমি কি জলাশয়, ভূত প্রেত কি রাক্ষসের বাস, তাহার কিছুই জানেন না। অন্ততঃ গ্রন্থকারকে অনুরোধ করি যে, বঙ্গসুন্দরীদিগের পাঠার্থে ইহা বাঙ্গালায় প্রচার করুন। তজ্জন্য যে কিছু পরিবর্তন আবশ্যিক, তাহা কষ্টকর হইবে না; কষ্টকর হইলেও তাহার সার্থকতা আছে। বাঙ্গালীদিগের মেয়ের এমন শক্তি হইয়াছে যে, এরূপ গ্রন্থ পড়িয়া মর্মগ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু বাঙ্গালায় এমন গ্রন্থ প্রায় নাই যে, তাঁহাদের শয়নগৃহের পশ্চাতে কি আছে, তাহা জ্ঞাত করায়। সুতরাং অনেকেরই বোধ আছে, বিলাতে বাঙ্গালীতে মোট বয়, বাঙ্গালীতে ভূমি চষে; কেন না সাহেব কি মোট বাঁহবে, না লাঙ্গল ধরিবে?—‘বঙ্গদর্শন’, ফাল্গুন ১২৭৯, পৃ. ৫০৩-০৭।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন

হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা। শ্রীরাজনারায়ণ বসু প্রণীত। কলিকাতা জাতীয় যন্ত্র।

এই গ্রন্থ, এবং ইহার পরে যে গ্রন্থের উল্লেখ করা যাইতেছে, এই দুই গ্রন্থের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া, আমরা একটি আনন্দ অনুভব করিতেছি। আমরা সচরাচর বাঙ্গালা গ্রন্থের অপ্ৰশংসা করিয়া থাকি। তাহাতে লেখকদিগেরও অসুখ, আমরাদিগেরও অসুখ। লেখক মাত্রেরই দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে “আমার প্রণীত গ্রন্থ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, অনিন্দনীয়, এবং রামায়ণ হইতে আজি পর্যন্ত যত গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে, সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।” সমালোচক যদি ইহার অন্যথা লেখেন, তবেই গ্রন্থকারের বিষম রাগ উপস্থিত হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে পৃথিবী মধ্যে যত দেশে যত গ্রন্থকার জন্মগ্রহণ করিয়া লোকপীড়া জন্মাইয়াছেন, তন্মধ্যে সাধারণ বাঙ্গালী গ্রন্থকার সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট। সুতরাং তাঁহাদিগের আমরা প্রশংসা করি না। অপ্ৰশংসা দেখিয়া, লেখক সম্প্রদায় আমরাদিগের প্রতি রাগ করেন। সভ্য জাতীয়দিগের মধ্যে কাহারও এরূপ রাগ হইলে, তিনি সে রাগ গায়ে মারেন; দুই একজন ব্যাকুল গ্রন্থকার কদাচিৎ সমালোচনার প্রতিবাদ করেন। কিন্তু বাঙ্গালীর স্বভাব সেরূপ নহে। বাঙ্গালী অন্য যে কার্যে পরাজন্ম হউন না কেন, কলহে কদাপি পরাজন্ম নহেন। সমালোচনায় অপ্ৰশংসা দেখিলেই তাহার প্রতিবাদ করিতে হইবে—প্রতিবাদ করিতে গেলে এ সম্প্রদায়ের লেখকদিগের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, ভদ্রলোকের ভাষা এবং ভদ্রলোকের ব্যবহার বর্জনীয়। যে দেশে অল্পকাল হইল, কবির লড়াই ভদ্রলোকের প্রধান আমোদ ছিল—যে দেশে অদ্যাপিও পাঁচালি প্রচলিত, যে দেশের লোক অশ্লীল গালিগালাজ ভিন্ন অন্য গালি জানে না, সে দেশের কুদ্ধ লেখকেরা যে রাগের সময়ে আপনাপন শিক্ষা এবং সংসর্গের স্পষ্ট পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না, তাহা সহজেই অনুমেয়। কখন কখন দেখিয়াছি যে মহাসম্ভ্রান্ত দেশমান্য ব্যক্তিও আপনার সম্মানের টুকুটি হইয়াছে বিবেচনা করিয়া, রাগান্বিত হইয়া ইতরের আশ্রয় অবলম্বন করিয়াছেন এবং মাতৃভাষাকে কলুষিত করিয়াছেন। কখন কখন দেখিয়াছি, রাগান্বিত লেখকেরা সমালোচনার মর্ম গ্রহণ করিতেও অক্ষম। যদি আমরা কোন পুস্তকান্তর্গত চর্চিত চর্চণকে ব্যঙ্গ করিয়া “নতন” বলিয়াছি, গ্রন্থকার মনে করিয়াছেন যে, সত্য সত্যই তাঁহার কথাগুলিকে নতন বলিয়াছি। যদি কোন গ্রন্থে দুই আর দুই চারি হয়, এমত কথা পাঠ করিয়া তাহা দুজ্জের বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছি, অমনি গ্রন্থকার মনে করিয়াছেন যে, আমার আবিষ্কৃত তত্ত্ব সত্য সত্যই দুজ্জের বলিয়া নিন্দা করিয়াছে। সুতরাং তিনি অধীর হইয়া প্রমাণ করিতে বাসিয়াছেন যে, তাঁহার কথাগুলি অতি প্রাচীন এবং সকলেরই জ্ঞানগোচর। কখন কখন দেখিয়াছি, কোন সামান্য অপরিচিত লেখক মনে মনে স্থির করিয়াছেন, আমরা ঈর্ষাবশতই তাঁহার গ্রন্থের নিন্দা করিয়াছি। এ সকল রহস্য

বিশ্বকম রচনাবলী

বিশেষ আমোদ প্রাপ্ত হইয়া থাকি বটে, কিন্তু কতকগুলিন ভাল মানুষকে যে মনঃপীড়া দিয়া থাকি, এবং তাঁহাদিগের বিরাগভাজন হই, ইহা আমাদের বড় দুঃখ। অতএব বঙ্গীয় পুস্তক সমালোচনা আমাদের বড় অপপ্রীতিকর কার্য হইয়া উঠিয়াছে। কেবল কর্তব্যানুরোধেই আমরা তাহাতে প্রবৃত্ত। কর্তব্যানুরোধেই আমরা অনিচ্ছুক হইয়াও অপ্রশংসনীয় গ্রন্থের অপ্রশংসা করিয়া থাকি। আমাদের নিতান্ত কামনা যে, প্রশংসনীয় গ্রন্থ আমাদের হাতে পড়ে আমরা প্রশংসা করিয়া লেখক সমাজকে জানাই যে, আমরা বিশ্বনিন্দুক নহি। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে, এবং বাঙ্গালা ভাষার দুর্ভাগ্যক্রমে সেরূপ গ্রন্থ অতি বিরল। অদ্য দুইখানি প্রশংসনীয় গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তাই আজ আমাদের এত আহ্লাদ। তাহার মধ্যে রাজনারায়ণ বাবুর গ্রন্থখানি প্রথমেই সমালোচনীয়।

হিন্দু ধর্ম যে সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ, এই কথা প্রতিপন্ন করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। গত ভাদ্র মাসে জাতীয় সভায় রাজনারায়ণ বাবু উপস্থিত মতে একটি বক্তৃতা করেন। তৎপরে তাহা স্মরণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহাতেই এ প্রস্তাবের উৎপত্তি।

বঙ্গদর্শনের প্রথম প্রচারকালে কার্য্যাদ্যক্ষ সাধারণ সমক্ষে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, এই পত্রে ধর্ম সম্প্রদায়ের মতামতের সমালোচনা হইবে না। আমরা সেই প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ। সেই প্রতিজ্ঞালঙ্ঘন না করিলে আমরা এ প্রবন্ধের উপযুক্ত সমালোচনা করিতে পারি না, কেন না তাহা করিতে গেলে হিন্দু ধর্মের দোষ গুণ বিচার করিতে হয়। অতএব আমরা ইহার প্রকৃত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারিলাম না, ইহা আমাদের দুঃখ রহিল।

কিন্তু সে তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়াও যদি একজন হিন্দুবংশজাত লেখক বলেন যে, আমাদের দেশের ধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম, ইহা একজন সুপণ্ডিত লোকের নিকট শুনিয়া সুখ হইল, তবে বোধ করি, অন্য ধর্মাবলম্বী লোকেও তাঁহাকে মার্জনা করিবেন।

আমরা বলিতেছি, এ কথা শুনিয়া আমাদের সুখ হইল, কিন্তু এ কথা আমরা যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিতেছি না, বা অযথার্থ বলিয়া অগ্রাহ্য করিতেছি না। হিন্দু ধর্ম অন্য ধর্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি না, তদ্বিষয়ে কোন অভিমত ব্যক্ত না করিয়া, নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা, বোধ হয়, বলা যাইতে পারে।

লেখক যাহাকে স্বয়ং হিন্দু ধর্ম বলেন, তাহারই শ্রেষ্ঠত্ব সংস্থাপনই যে তাঁহার উদ্দেশ্য, ইহা অবশ্য অনুমেয়। তিনি বলেন যে, ব্রহ্মোপাসনাই হিন্দু ধর্ম। অতএব ব্রহ্মোপাসনা যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম, কেবল তাহাই সমর্থন করা তাঁহার উদ্দেশ্য। এ দেশের সাধারণ ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। হিন্দু ধর্ম সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—কিন্তু আমাদের দেশের চলিত ধর্ম শ্রেষ্ঠ, এমত কথা তিনি বলেন না। যে ধর্মকে তিনি শ্রেষ্ঠ বলেন, তৎসম্বন্ধে লোকের বড় মতভেদ নাই। পরব্রহ্মের উপাসনা—সকল ধর্মের অন্তর্গত—সকলেরই সারভাগ।

রাজনারায়ণ বাবু নিজ প্রশংসিত ধর্মের মূলস্বরূপ বেদাদি হিন্দু শাস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি যে ধর্মের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মূল হিন্দু শাস্ত্র আছে, ইহা যথার্থ। কিন্তু উহা হিন্দু ধর্মের একাংশ মাত্র—অতি অল্পাংশ। কোন পদার্থের অংশ মাত্রকে সেই পদার্থ কল্পনা করায় সত্যের বিষয় হয়। অংশ মাত্র গ্রহণ করিয়া সকল পদার্থেরই প্রশংসা করা যায়। রাজনারায়ণ বাবু যেমন হিন্দু ধর্মের অংশবিশেষ গ্রহণ করিয়া ঐ ধর্মের প্রশংসা করিয়াছেন, তেমনি ঐ ধর্মের অপরাংশ গ্রহণ করিয়া তাঁহার সকল কথাই খণ্ডন করা যাইতে পারে। যেমন অঙ্গুরীয় মধ্যস্থ হীরককে অঙ্গুরীয় বলা যায় না, তেমনি কেবল ব্রহ্মোপাসনাকে হিন্দু ধর্ম বলা যায় না। যেমন কলিকাতাকে ভারতবর্ষ বলা যায় না, তেমনি কেবল ব্রহ্মোপাসনাকে হিন্দু ধর্ম বলা যায় না। উপধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন পরিশুদ্ধ ব্রহ্মোপাসনা কোন কালে একা ভারতবর্ষ বা ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে বা আধুনিক ব্রাহ্ম ভিন্ন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল কি না, সন্দেহ। যদি এ কথা যথার্থ হয়, তবে ব্রাহ্ম ধর্মেরই শ্রেষ্ঠতা সংস্থাপন লেখকের উদ্দেশ্য বলিতে হইবে। বোধ হয়, রাজনারায়ণ বাবু এ কথা অস্বীকার করিবেন না।

ইহাতে আমরা লেখকের অপ্রশংসা করিতেছি না। স্বমত সংস্থাপনে সকলেরই অধিকার আছে। বিশেষ ব্রাহ্ম পরিবর্তে হিন্দু কথাটি ব্যবহারে বিশেষ উপকার আছে। হিন্দু ধর্মের সহিত ব্রাহ্ম ধর্মের একতা স্বীকার করায় আমাদের বিবেচনায় উভয় সম্প্রদায়ের মঙ্গল। আমি যদি অন্যের সহিত পৃথক হইয়া একা কোন সদনুষ্ঠানে রত হই, তবে আমার একারই উপকার;

যদি সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া সেই সদনুষ্ঠানে রত হই, তবে সকলেই তাহার ফলভোগী হইবে। অল্প লোক লইয়া একটি নূতন সম্প্রদায় স্থাপনের অপেক্ষা বহু লোকের সঙ্গে পুরাতন ধর্মের পরিশোধন ভাল। কেন না তাহাতে বহু লোকের ইচ্ছা সাধন হয়। আমরা হিন্দু, কোন সম্প্রদায়ভুক্ত নহি; কোন সম্প্রদায়ের আনুকূল্যে এ কথা বলিলাম না; হিন্দু জাতির আনুকূল্যেই এ কথা বলিলাম।

অন্যান্য বিষয়ে আমরা কোন কথা বলিতে ইচ্ছুক নহি বলিয়া গ্রন্থকারের রচনার প্রশংসা করিয়া আমরা ক্ষান্ত হইব। এই প্রবন্ধের রচনাপ্রণালী অতি পরিপাটি। লেখক অতি পরিশুদ্ধ, অথচ সকলের বোধগম্য এবং শ্রুতিসুখদ ভাষায় আপন বক্তব্য প্রকাশিত করিয়াছেন। মিথ্যা বাগাড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া প্রয়োজনীয় কথায় সুচারুরূপে কার্য সমাধা করিয়াছেন। তাহার সংগ্রহও প্রশংসনীয়। সর্বাপেক্ষা তাহার প্রবন্ধের শেষ ভাগে সন্নিবেশিত জয়োচ্চারণ আমাদের প্রীতিপ্রদ হইয়াছে। আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া পাঠকদিগকে উপহার দিলাম। ইহাতে নূতন কথা কিছু নাই, কিন্তু এরূপ পুরাতন কথা যদি হৃদয় হইতে নিঃসৃত হয়, তবে তাহাতেই আমাদের সুখ। রাজনারায়ণ বাবুর হৃদয় হইতে এ কথা নিঃসৃত হইয়াছে বলিয়াই, তাহাতে আমাদের সুখ।

“আমার এইরূপ আশা হইতেছে, পূর্বে যেমন হিন্দু জাতি বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতা জন্য বিখ্যাত হইয়াছিল, তেমনি পুনরায় সে বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতা ধর্ম জন্য সমস্ত পৃথিবীতে বিখ্যাত হইবে। মিষ্টন তাহার স্বজাতীয় উন্নতির সম্বন্ধে এক স্থানে বলিয়াছেন,—

Methinks I see in my mind a noble and puissant nation rousing herself like a strong man after sleep and shaking her invincible looks; methinks I see her as an eagle mewing her mighty youth and kindling her undazzled eyes at the full mid-day heaven.

আমিও সেইরূপ হিন্দু জাতি সম্বন্ধে বলিতে পারি, আমি দেখিতেছি, আবার আমার সম্মুখে মহাবল পরাক্রান্ত হিন্দু জাতি নিদ্রা হইতে উঠিত হইয়া বীরকুণ্ডল পুনরায় স্পন্দন করিতেছে এবং দেবিক্রমে উন্নতির পথে ধাবিত হইতে প্রবৃত্ত হইতেছে। আমি দেখিতেছি যে এই জাতি পুনরায় নবযৌবনান্বিত হইয়া পুনরায় জ্ঞান ধর্ম ও সভ্যতাতে উজ্জ্বল হইয়া পৃথিবীকে সুশোভিত করিতেছে; হিন্দু জাতির কীর্তি হিন্দু জাতির গরিমা পৃথিবীর পুনরায় বিস্তারিত হইতেছে। এই আশাপূর্ণ হৃদয়ে ভারতের জয়োচ্চারণ করিয়া আমি অদ্য বক্তৃতা সমাপন করিতেছি।

মিলে সব ভারতসন্তান

এক তান মনঃ প্রাণ;

গাও ভারতের যশোগান।

ভারতভূমির তুল্য আছে কোন স্থান?

কোন অঙ্গি হিমাঙ্গি সমান?

ফলবতী বসুমতী, স্নোতস্বতী পূণ্যবতী,

শতখনি রতনের নিধান।

হোক্ ভারতের জয়,

জয় ভারতের জয়,

গাও ভারতের জয়,

কি ভয় কি ভয়,

গাও ভারতের জয়॥

রূপবতী সাধবী সতী ভারতললনা।

কোথা দিবে তাদের তুলনা?

শর্মিষ্ঠা সাবিত্রী সীতা, দময়ন্তী পতিরতা,

অতুলনা ভারতললনা।

হোক্ ভারতের জয়,

ইত্যাদি।

বিশিষ্ট গৌতম অগ্নি মহামুনিগণ
 বিশ্বামিত্র ভৃগুতপোধন।
 বাল্মীকি বেদব্যাস, ভবভূতি কালিদাস,
 কবিকুল ভারতভূষণ।
 হোক্ ভারতের জয়,
 ইত্যাদি।
 কেন ডর, ভীরু, কর সাহস আশ্রয়,
 যতোধর্ম স্ততো জয়।
 ছিন্ন ভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল,
 মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়?
 হোক্ ভারতের জয়,
 জয় ভারতের জয়,
 গাও ভারতের জয়,
 কি ভয় কি ভয়,
 গাও ভারতের জয়॥”

রাজনারায়ণ বাবুর লেখনীর উপর পুষ্প চন্দন বৃষ্টি হউক! এই মহাগীত ভারতের সর্বত্র গীত হউক। হিমালয়কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক! গঙ্গা যমুনা সিন্ধু নর্মদা গোদাবরী তটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্ম্মরিত হউক! পূর্ব পশ্চিম সাগরের গম্ভীর গর্জনে মন্দ্রীভূত হউক! এই বিংশতি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক!

কিঞ্চৎ জলযোগ। প্রহসন, কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্র।

একেই কি বলে সভ্যতার জন্মাবধি প্রহসনের কিছুর ছড়াছড়ি হইয়াছে। সেই সকল পাঠে আমরা স্থির করিয়াছি যে হাস্যরসবিহীন অশ্লীল প্রলাপকেই বঙ্গদেশে প্রহসন বলে। দুইখানি প্রহসন এই পরিভাষা হইতে বিশেষরূপে বর্জিত, একেই কি বলে সভ্যতা এবং সধবার একাদশী। সধবার একাদশী অশ্লীলতাদোষে দূষিত হইলেও, অন্যান্য গুণে ভারতবর্ষীয় ভাষায় এরূপ প্রহসন দুর্লভ। “কিঞ্চৎ জলযোগ” ঐ দুই প্রহসনের তুল্য নহে বটে কিন্তু ইহাকেও বর্জিত করিতে পারি। ইহাও একখানি উৎকৃষ্ট প্রহসন। এ প্রহসনের একটি গুণ এই যে, তৎপ্রণেতা প্রহসন লিখিতে নাটক লিখিয়া ফেলেন নাই। অনেকেরই প্রণীত প্রহসন, প্রহসন নহে, অপকৃষ্ট নাটক মাত্র; এ প্রহসন প্রহসন মাত্র, কিন্তু অপকৃষ্ট নহে। ইহাতে হাস্যের প্রাচুর্য না থাকুক, নিতান্ত অভাব নাই, এবং ব্যঙ্গ যথেষ্ট। সেই ব্যঙ্গ যদি কোন শ্রেণীবিশেষের প্রতি লক্ষ্য হইয়া থাকে তথাপি নিন্দনীয় নহে, কেন না ব্যঙ্গের অনুপযুক্ত বিষয় লইয়া কোথাও ব্যঙ্গ দেখিলাম না। যাহা ব্যঙ্গের যোগ্য, তৎপ্রতি ব্যঙ্গ প্রযুক্ত; তাহাতে অনিষ্ট নাই, ইষ্ট আছে। কে ব্যঙ্গের যোগ্য, তাহার মীমাংসার স্থান এ নহে; সংক্ষেপে কিঞ্চৎ বলিব।

কার্যের যে সকল গুণ আছে, তাহার মধ্যে একটি ফলোপধায়কতা। কার্য হয় সফল, নয় নিষ্ফল। কার্য সফল হইলে, তাহার ফলে যদি অন্যের ইষ্ট হয়, তবে তাহাকে পুণ্য বলি। যদি তাহার ফলে পরের অনিষ্ট হয়, তবে তাহাকে কর্তার অভিপ্রায়ভেদে পাপ বা দ্রাস্তি বলি। যদি অসদাভিপ্রায়ে সেই অনিষ্টজনক কার্য কৃত হইয়া থাকে, তবে তাহা পাপ বা দ্রাস্তিয়া। যদি অসদাভিপ্রায় ব্যতীত ঘটিয়া থাকে, তবে তাহা দ্রাস্তি মাত্র।

দেখা যাইতেছে যে পুণ্য, পাপ, বা দ্রাস্তি, কেহই ব্যঙ্গের যোগ্য নহে। পুণ্য প্রতিষ্ঠার যোগ্য, তৎপ্রতি ব্যঙ্গ অপ্রযুক্ত। পাপ, ভৎসনা, দণ্ড, বা শোচনার যোগ্য, তৎপ্রতিও ব্যঙ্গ অপ্রযুক্ত। যাহাতে দুঃখ করা উচিত, তাহা ব্যঙ্গের যোগ্য নহে। তদ্রূপ, দ্রাস্তিও ব্যঙ্গের যোগ্য নহে—উপদেশ তৎপ্রতি প্রযুক্ত।

নিষ্ফল ক্রিয়ার প্রতি অবস্থাবিশেষে ব্যঙ্গ প্রযুক্ত। ক্রিয়া যে নিষ্ফল হয়, তাহার সচরাচর কারণ এই যে উদ্দেশ্যের সহিত অনুষ্ঠানের সঙ্গতি থাকে না। যেখানে অনুষ্ঠানে উদ্দেশ্যে অসঙ্গত, সেইখানে ব্যঙ্গ প্রযুক্ত। বাঙ্গালার কথার অপতুল হেতু ইহাকেও প্রমাদ বলিতে হয়, কিন্তু প্রথমোক্ত দ্রাস্তির সহিত ইহার বিশেষ প্রভেদ আছে। ইংরাজি ভাষায় এই দুইটির জন্য

পৃথক পৃথক নাম আছে। একটিকে Error বলে আর একটিকে Mistake বলে। Error ব্যঙ্গের যোগ্য নহে, Mistake ব্যঙ্গের যোগ্য।

ক্রিয়া সম্বন্ধে যে রূপ, ক্রিয়ার অপরিণত মনের ভাব সম্বন্ধেও সেইরূপ। পদ্যের উপযোগী চিত্তভাবকে ধর্ম বলা যায়; পাপের উপযোগী ভাবকে অধর্ম বলি, এবং ভ্রান্তির উপযোগী ভাবকে অজ্ঞানতা বলি। এই তিনই ব্যঙ্গের অযোগ্য। কিন্তু যে চিত্তবৃত্তি হইতে প্রমাদ জন্মে, তাহা ব্যঙ্গের যোগ্য। আমরা দুইটি ইংরাজি কথা ব্যবহার করিয়াছি, আর একটি ব্যবহার করিলে অধিক দোষ হইবে না। Mistake যে রূপ ব্যঙ্গের যোগ্য, Follyও তদ্রূপ। এই নাটকে বিধুমুখীর বা পূর্ণচন্দ্র বা পেরুরামের চিত্রে যে ব্যঙ্গ দেখা যায়, তাহা ঐরূপ অসঙ্গত কার্য বা ভাবের উপর লক্ষিত। সুতরাং নিন্দনীয় নহে। পরন্তু এই প্রহসনের আদ্যোপান্ত পাঠ বা অভিনয় দর্শন প্রীতিকর। ইহা সামান্য প্রশংসা নহে, কেন না অন্যান্য বাঙ্গালা প্রহসনে প্রায় তাহা অসহ্য কষ্টকর।

পরিভাষার বিষয় এই যে, এ প্রহসনের কোন কোন স্থলে এমত ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে যে ভদ্রলোকে পরস্পরের সাক্ষাতে উচ্চারণ করেন না। ইহাকে অশ্লীলতা বলা যাউক বা না যাউক, একটু দোষ বটে। কিন্তু ইহা মনুষ্যকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যাহা যে, ইহাতে কদর্য্যভাবজনক কথা কিছুই নাই। এমত কোন কথা নাই যে তাহাতে পাঠকের বা দর্শকের মন কলুষিত হইতে পারে।—‘বঙ্গদর্শন’, চৈত্র ১২৭৯, পৃ. ৫৭১-৭৬।

দুর্গা

শ্রীকৃষ্ণ এবং দুর্গা এই বঙ্গদেশের প্রধান আরাধ্য দেবতা। ইংহাদিগের পূজা না করে এমত হিন্দু প্রায় বঙ্গদেশে নাই। কেবল পূজা নহে, কৃষ্ণভক্তি ও দুর্গাভক্তি এ দেশের লোকের সর্বকর্মব্যাপী হইয়াছে। প্রভাতে উঠিয়া শিশুরাও “দুর্গা দুর্গা” বলিয়া গাত্রোথান করে। যে কিছু লেখা পড়া আরম্ভ করিতে হইলে, আগে দুর্গা নাম লিখিতে হয়। “দুর্গে” “দুর্গে দুর্গাতিনাশিনি” ইত্যাদি শব্দ অনেকের প্রতিনিঃশ্বাসেই নির্গত হয়। আমাদের প্রধান পর্বাহ দুর্গোৎসব। সেই উৎসব অনেকের জীবনমধ্যে প্রধান কর্ম বা প্রধান আনন্দ। সম্বৎসর তাহারই উদ্যোগে যায়। পথে পথে কালীর মঠ। অমাবস্যায় অমাবস্যায় কালীপূজা। কোন গ্রামে পীড়া আরম্ভ হইলে রক্ষাকালীপূজা। কাহারও কিছু অশুভ সম্ভাবনা হইলেই চণ্ডীপাঠ—অর্থাৎ কালীর মহিমা কীর্তন। ইংহার প্রীত্যর্থ পূর্ববঙ্গে অনেক প্রাচীন বিজ্ঞ ব্যক্তিও মদ্যপান ও অন্যান্য কুৎসিত কর্মে রত। ফলে এই দেবী বঙ্গদেশ শাসন করিতেছেন। ডাকাইতেরা ইংহার পূজা না দিয়া ডাকাইতি করে না।

এই দেবী কোথা হইতে আসিলেন? ইনি কে? আমরাইগের হিন্দু ধর্মকে সনাতন ধর্ম বলিবার কারণ এই যে, এই ধর্ম বেদমূলক। যাহা বেদে নাই, তাহা হিন্দু ধর্মের অন্তর্গত কি না সন্দেহ। যদি হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে কোন গুরুতর কথা বেদে না থাকে, তবে হয় বেদ অসম্পূর্ণ, না হয় সেই কথা হিন্দুধর্মাস্তর্গত নহে। বেদ অসম্পূর্ণ ইহা আমরা বলিতে পারি না, কেন না তাহা হইলে হিন্দু ধর্মের মূলোচ্ছেদ করিতে হয়। তবে দ্বিতীয় পক্ষই এমন স্থলে অবলম্বনীয় কি না, তাহা হিন্দুদিগের বিচার্য্য।

দুর্গার কথা বেদে আছে কি? সকল হিন্দুরই কর্তব্য যে এ কথার অনুসন্ধান করেন। আমরা অদ্য তাহাদের এ বিষয়ে কিছু সাহায্য করিব।

অনেকেই জানেন যে বেদ একখানি গ্রন্থ নয়। অথবা চারি বেদ চারিখানি গ্রন্থ মাত্র নহে। কতকগুলি মন্ত্র, কতকগুলি “ব্রাহ্মণ” নামক গ্রন্থ, এবং কতকগুলি উপনিষদ্ লইয়া এক একটি বেদ সম্পূর্ণ। তন্মধ্যে মন্ত্রই বেদের শ্রেষ্ঠাংশ বলা যাইতে পারে।

ইহা একপ্রকার নিশ্চিত যে কোন বৈদিক সংহিতায় এই দেবীর বিশেষ কোন উল্লেখ নাই। ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, বায়ু, সোম, অগ্নি, বিষ্ণু, রুদ্র, অশ্বিনীকুমার প্রভৃতির দেবতার ভূরি ভূরি উল্লেখ ও স্তুতিবাদ আছে; পুষণ, অর্ষ্যমন প্রভৃতি এক্ষণে অপরিচিত অনেক দেবতার উল্লেখ আছে, কিন্তু দুর্গা বা কালী বা তাহার অন্য কোন নামের বিশেষ উল্লেখ নাই।

ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মন্ডলের অষ্টমার্শকে “রাগি পরিশিষ্টে” একটি দুর্গা-স্তব আছে

বাংকম রচনাবলী

মাত্র। কিন্তু তাহাতে যদিও দুর্গা নাম ব্যবহৃত হইয়াছে, তথাপি তাঁহাকে আমাদের পূজিতা দুর্গা বলা যাইতে পারে না। উহা রাত্রি-স্তোত্র মাত্র। সন্দিহান পাঠকের সন্দেহ ভঞ্জনার্থ, আমরা উহা উদ্ধৃত করিলাম।

আরাত্রি পার্থিবং রজঃ পিতুরপ্রায়ি ধামাভিঃ।
দিবঃ সদাংসি বৃহতী বিতিষ্ঠসে ত্বেষাং বর্ততে তমঃ ॥ ১ ॥
যে তে রাত্রি নৃচাক্ষসো যুক্তাসো নবতিনব।
অশীতিঃ সন্তুষ্ঠা উতো তে সপ্ত সপ্ততীঃ ॥ ২ ॥

রাত্রিং প্রপদ্যে জননীং সর্বভূতনবেশনীং।
ভদ্রাং ভগবতীং কৃষ্ণাং বিশ্বস্য জগতো নিশাং ॥ ৩ ॥
সম্বেশনীং সংযমনীং গ্রহনক্ষত্রমালিনীম্।
প্রপমোহং শিবাং রাত্রিং
ভদ্রে পারং অশীমিহি ভদ্রে পারং অশীমিহি ঔ নমঃ ॥ ৪ ॥

স্তোষ্যামি প্রযতো দেবীং শরণ্যাং বহুর্চাপ্রিয়াং।
সহস্রসংমিতাং দুর্গাং জাতবেদসে সুনবাম সোমম্ ॥ ৫ ॥
শাস্ত্যর্থং ত্বিছজাতীনামৃষিভিঃ সোমপাশ্রিতাঃ। (সমুপাশ্রিতাঃ?)
ঋগ্বেদে ত্বং সমুৎপন্নরাতীয়তো নিদহাতি বেদঃ ॥ ৬ ॥
যে ত্বাং দেবি প্রপদ্যন্তে ব্রাহ্মণাঃ হব্যবাহিনাং।
অবিদ্যা বহুবিদ্যা বা স নঃ পর্ষদতিদুর্গানি বিশ্বাঃ ॥ ৭ ॥

অগ্নিবর্ণাং শৃভাং সৌম্যাং কীর্তয়িষ্যান্তি যে দ্বিজাঃ।
তান্ তারয়তি দুর্গানি নাবেব সিন্ধুং দুর্জিতাত্যগ্নিঃ ॥ ৮ ॥
দুর্গেষু বিষমে ঘোরে সংগ্রামে রিপুসঙ্কটে।
অগ্নিচোরনিপাতেষু দুর্ষ্টগ্রহনিবারণে ॥ ৯ ॥

দুর্গেষু বিষমেষু ত্বাং সংগ্রামেষু বনেষু চ।
মোহয়িত্বা প্রপদ্যন্তে তেষাং মে অভয়ং কুরু তেষাং মে অভয়ং কুরু ঔ নমঃ ॥ ১০ ॥
কেশিনীং সর্বভূতানাং পঞ্চমীতি চ নাম চ।
সা মাং সমা নিশা দেবী সর্বতঃ পরিরক্ষতু সর্বতঃ পরিরক্ষতু ঔ নমঃ ॥ ১১ ॥
তামগ্নিবর্ণান্তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কস্মফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সূতরসি তরসে নমঃ ॥ ১২ ॥
দুর্গা দুর্গেষু স্থানেষু সন্নোদেবীরভীষ্টয়ে।
য ইমং দুর্গাস্তবং পুণ্যং রাত্রৌ রাত্রৌ সদা পঠেৎ।
রাত্রিঃ কুশিকঃ সৌভরো রাত্রিস্তবো গায়ত্রী রাত্রিসুস্তং জপেন্নিত্যং তৎকালমুপপদ্যতে ॥ ১৩ ॥

এই সংস্কৃত এক এক স্থানে অত্যন্ত দুর্দূহ, এজন্য আমরা ইহার অনুবাদে সাহসী হইলাম না। ডাক্তার জন মিয়োর কৃত ইংরেজি অনুবাদের অনুবাদ নিম্নে লিখিলাম। তাঁহার অনুবাদও সন্তোষজনক নহে।

“হে রাত্রি! পার্থিব রজঃ তোমার পিতার কিরণে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। হে বৃহতি! তুমি দিব্যালয়ে থাক, অতএব তমঃ বর্তে। হে নরদর্শকেরা তোমাতে যুক্ত তাহারা নবনবতি বা অষ্টাশীতি বা সপ্তসপ্ততি হউক (অর্থ কি?) সর্বভূতনবেশনী, জননী, ভদ্রা, ভগবতী, কৃষ্ণা, এবং বিশ্বজগতের নিশাম্বরূপ রাত্রিকে প্রাপ্ত হই। সকলের প্রবেশকারিণী শাসনকত্রী (?) গ্রহনক্ষত্রমালিনী, মঙ্গলযুক্ত রাত্রিকে আমি প্রাপ্ত হইয়াছি; হে ভদ্রে! আমরা যেন পারে যাই, আমরা যেন পারে যাই, ঔ নমঃ। দেবী, শরণ্যা, বহুর্চাপ্রিয়া, সহস্রতুল্যা দুর্গাকে আমি যত্নে তুষ্ট করি। আমরা জাতবেদকে (অগ্নি) সোমদান করি। দ্বিজাতিগণের শাস্ত্যর্থ তুমি ঋষিদিগের আশ্রয় (?) ঋগ্বেদে তুমি সমুৎপন্না অগ্নি অরতিদিগের দহন করেন (?) দেবি! যে

ব্রাহ্মণেরা, অবিদ্যা হউন, বা বহুবিদ্যা হউন, তোমার কাছে আসেন, তিনি (?) আমাদের সকল বিপদে দ্রাণ করিবেন। যে ব্রাহ্মণেরা অগ্নিবর্ণা শুভা, সৌম্যাকে কীর্তিত করিবে, সমুদ্রে নৌকার ন্যায় অগ্নি তাহাদিগকে বিপদ হইতে পার করিবেন। বিপদে ঘোর বিষম সংগ্রামে, সঙ্কটে বিষম বিপদে সংগ্রামে, বনে অগ্নিনিপাতে, চোরনিপাতে, দুষ্টগ্রহ নিবারণে, তোমার কাছে আসে, এ সকল হইতে আমাকে অভয় কর! এ সকল হইতে আমাকে অভয় কর! ঔ নমঃ। ষিনি সর্বভূতের কেশিনী, পঞ্চমী নাম যাঁর, সেই দেবী প্রতিরাগ্রে সকল হইতে পরিরক্ষণ করুন! সকল হইতে পরিরক্ষণ করুন! ঔ নমঃ। অগ্নিবর্ণা তপের দ্বারা জ্বালাবিশিষ্টা, বৈরোচনী, কৰ্মফলে জুষ্টি, দুর্গাদেবীর শরণাগত হই, হে সুবেগবতি! তোমার বেগকে নমস্কার। দুর্গাদেবী বিপদস্থলে আমাদের মঙ্গলার্থ হউন। এই পাবন দুর্গাস্তব যে রাগ্রে রাগ্রে সदा পাঠ করিবে—রাত্রি, কুশিক, সৌভর, রাত্রিস্তব, গায়ত্রী, যে রাত্রিসুস্ত নিত্য জপ করে সে তৎকাল প্রাপ্ত হয়।”

ইহার সকল স্থলে অনুবাদ হইয়া উঠে নাই, এবং যাহা অনুবাদ হইয়াছে তাহার সকল স্থলের কেহ অর্থ করিতে পারে না। কিন্তু এত দূর বৃথা যাইতেছে যে, যদি এই দেবী আমাদের পূজিতা দুর্গা হইতেন, তবে দুর্গা রাত্রির অন্যতর নাম মাত্র।

ইহা ভিন্ন যজুর্বেদের (বাজসনেয়) সংহিতায় এক স্থানে অম্বিকার উল্লেখ আছে। কিন্তু সেখানে অম্বিকা শিবের ভগিনী—যথা।

“এষ তে রুদ্র ভাগঃ স্বপ্না অম্বিকয়া স্বং জুশ্ব স্বাহা ॥”

আর কোন সংহিতায় কোথাও দুর্গার কোন নামের কোন উল্লেখ নাই।

তৎপরে ব্রাহ্মণ। কোন ব্রাহ্মণে কোন নামে ইহার কোন উল্লেখ নাই। তারপর উপনিষদ্। উপনিষদে দুর্গার নাম কোথাও নাই; এক স্থানে উমা হৈমবতী, আর এক স্থানে কালী করালী নামের উল্লেখ আছে। ঐ দুইটি স্থানই আমরা ক্রমশঃ উদ্ধৃত করিতেছি।

প্রথম, কেনোপনিষদে আছে—

“অথ ইন্দ্রম্ অরুবন্ মঘবনোতদ্বিজানীহ কিমেতদ্যক্ষমিতি। তথোতি তদভ্যদ্রবস্তস্মান্তি-রোদধে।

স তস্মিন্বেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীম্।

তং হোবাচ কিমেতদ্যক্ষমিতি।

সা ব্রহ্মোতি হোবাচ ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধর্মিতি। ততো হৈব দিবাশ্চকার ব্রহ্মোতি।”

“তাহারা তখন ইন্দ্রকে বলিলেন, “মঘবন্ এ যক্ষ কি জানুন।” ইন্দ্র “তাই” বলিয়া তাহার কাছে গেলেন, সে অন্তর্দান হইল।

সেই আকাশে বহুশোভমানা উমা হৈমবতী নামক স্ত্রীলোকের নিকট আসিলেন। তাহাকে বলিলেন, “কি এ যক্ষ?” তিনি কহিলেন, “এ ব্রহ্মা, ব্রহ্মার এই বিজয়ে আপনারা মহৎ হউন।” তাহাতে জানিলেন যে, ইতি ব্রহ্মা।”

ইহার অর্থ কি, আমরা বুঝিতে পারিব না, কিন্তু সায়নাচার্য্য বুঝিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। সায়নাচার্য্য এই উমা হৈমবতীকে ব্রহ্মজ্ঞান বলেন। তৈত্তিরীয় আরণ্যকাস্তর্গত এক স্থানে সোম শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, “হিমবৎপুত্র্যা গৌর্য্যা ব্রহ্মবিদ্যাভিমানিরূপত্বাৎ গৌরীবাচকো উমাশব্দো ব্রহ্মবিদ্যাং উপলক্ষয়তি। অতএব তলবকারোপনিষদি (ইহারই নামান্তর কেনোপনিষদ্) ব্রহ্মবিদ্যামুক্তিপ্ৰস্তাবে ব্রহ্মবিদ্যামুক্তিঃ পঠ্যতে। বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীং তাং হোবাচ ইতি। তদ্বিষয়তয়া তয়া উময়া সহিতবর্তমানত্বাৎ সোমঃ।”

তবে কেনোপনিষদের উমা হৈমবতী ব্রহ্মবিদ্যামাত্র। মহাভারতীয় ভীষ্মপর্বে অর্জুনকৃত একটি দুর্গাস্তব আছে, তাহাতে দুর্গাকে “ব্রহ্মবিদ্যা” বলা হইয়াছে। যথা—

স্বং ব্রহ্মবিদ্যা বিদ্যানাং মহানিদ্রা চ দৌহিনাং।

দ্বিতীয়, মন্ডুকোপনিষদে এক স্থানে কালী ও করালী নামের উল্লেখ আছে। কিন্তু সে কোন দেবীর নাম বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই—অগ্নির সপ্তজিহবার নামের মধ্যে কালী ও করালী দুইটি নাম, ইহাই কথিত আছে, যথা—

কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা যা চ সূধুম্ববর্ণা।

স্ফূলিঙ্গিনী বিশ্বরূপী চ দেবী লোলায়মানা ইতি সপ্ত জিহবা ॥

বঙ্গীয় রচনাবলী

কালী, করালী, মনোজবা, স্দুলোহিতা, স্দুধ্মবর্ণা, স্দুলিঙ্গিনী, এবং বিশ্বরূপী এই সাতটি অগ্নির জিহবা।

ইহা ভিন্ন বেদে আর কোথাও দূর্গা, কালী, উমা, অম্বিকা প্রভৃতি কোন নামে এই দেবীর কোন উল্লেখ নাই।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দূর্গাগায়ত্রী আছে। তাহা এই—

“কাত্যায়নায় বিস্মহে কন্যাকুমারী ধীমহি। তন্নো দূর্গাঃ প্রচোদয়াৎ।

পাঠক দেখিবেন, স্দুলিঙ্গাস্ত দূর্গা শব্দের পরিবর্তে পুংলিঙ্গাস্ত দূর্গা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার জন্য সায়নাচার্য লিখিয়াছেন, “লিঙ্গাদিব্যত্যয়ঃ সর্ষত্র ছান্দসো দ্রষ্টব্যঃ।” তিনি কাত্যায়ন শব্দের এই ব্যাখ্যা করেন, “কৃতিং বস্ত্রে ইতি কত্যো রুদ্রঃ। স এবায়নং যস্য সা কাত্যায়নী। অথবা কতস্য ঋষিবেশেষস্য অপত্যং কাত্যঃ।” কন্যাকুমারীর এইরূপ ব্যাখ্যা করেন, “কুৎসিতং অনিষ্টং মারয়তি ইতি কুমারী, কন্যা দীপ্যমানা চাসৌ কুমারী চ কন্যাকুমারী।”

এতদ্বিধা ঋগ্বেদান্তর্গত রাত্রিপরিশিষ্ট হইতে যে দূর্গাস্তব উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার ১২ সংখ্যক শ্লোক ঐ তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দ্বিতীয় অনুবাকে অগ্নিস্তবে আছে। তাহাতে দূর্গার উল্লেখ আছে, দেখা গিয়াছে।

কৈবল্যোপনিষদে “উমা সহায়ম্” বলিয়া মহাদেবের উল্লেখ আছে। কৈবল্যোপনিষদে অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ঐস্থলে আশ্বলায়ন বক্তা।

ওয়েবর বলেন তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অষ্টাদশ অনুবাকে “উমাপত্যে” শব্দ আছে—কিন্তু ঐ বচন আমরা দেখি নাই।

উপনিষদে বা আরণ্যকে আর কোথাও দূর্গার উল্লেখ পাওয়া যায় না।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, আমরাদিগের পূর্জিতা দূর্গা কি রাত্রি, না মহাদেবের ভগিনী, না ব্রহ্মবিদ্যা, না অগ্নিজিহবা?—‘বঙ্গদর্শন’, জ্যৈষ্ঠ ১২৮০, পৃ. ৪৯-৫৩।

জন স্টুয়ার্ট মিল

মিলের মৃত্যু হইয়াছে! আমরা কখন তাঁহাকে চক্ষে দেখি নাই; তিনিও কখন বঙ্গদর্শনের পরিচয় গ্রহণ করেন নাই। তথাপি আমরাদিগের মনে হইতেছে যেন আমরাদিগের কোন পরম আত্মীয়ের সহিত চিরবিচ্ছেদ হইয়াছে!

২৭ বৈশাখ তারিখের টেলিগ্রাম ২৮ তারিখে প্রকাশ হয় যে মিল শঙ্কটাপন্নরূপে পীড়িত। পরদিন প্রাতে মিলের কুশল জানিবার জন্য সাতিশয় আগ্রহীচক্রে সম্বাদপত্র খুলিলাম, দেখিলাম যে চিকিৎসকেরা মিলের জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছেন। সেই দিবস অপরাহ্নে সম্বাদ আইসে যে মিল নাই!

ছয় হাজার মাইল দূরে থাকিয়া আমরা এই শোক পাইয়াছি, না জানি ইংলণ্ডবাসীরা কতই দুঃখ করিতেছেন! কিন্তু কেনই দুঃখ করি তাহা বলা যায় না! যে মহোদয় আপন বুদ্ধিবলে প্রায় সমস্ত মানব জাতিকে ঋণী করিয়াছেন, যিনি যাবজ্জীবন এই ঋণ প্রদানে নিযুক্ত ছিলেন এবং যিনি এতাদৃশ কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন যে, যে কেহ হউক যত্নসহকারে আবেদন করিলেই তাঁহার বদান্যতার ফলভোগী হইতে পারিবে, এরূপ মহাপুরুষ এত কাল পরে বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন বলিয়া কেনই এত কাতর হই? তথাচ মৃত্যুশোক দূর হইবার নহে, “মিল নাই” এই কথা মনে করিলে চিত্ত স্বভাবতঃই ব্যথিত হয়।

মিল অতি সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন নৈয়ায়িক ছিলেন। তাঁহার কৃত ইংরাজি ন্যায়শাস্ত্র এবং অর্থব্যবহারশাস্ত্র তাঁহার প্রধান কীর্তি। ইহাতে তিনি যে কোন নূতন কথা উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহা নহে কিন্তু এতৎসংক্রান্ত সমুদায় কথা এমন সূক্ষ্মকথন করিয়া লিখিয়াছেন এবং প্রত্যেক বিষয় এত পরিষ্কার করিয়া বঝাইয়াছেন যে, তাঁহার গ্রন্থ পাঠ না করিলে কাহারই উদ্ভূতশাস্ত্র অধ্যয়ন সম্পূর্ণ হইবেক না।

* এই প্রবন্ধে যাহা কিছু বেদ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা ডাক্তার জন মিয়োরের সংগ্রহ (Sanskrit Texts) হইতে নীত। সেই সংগ্রহই এই প্রবন্ধের অবলম্বন।

তিনি রাজ্যশাসনপ্রণালী বিষয়ে যে সমস্ত কথা বলিয়া গিয়াছেন, বোধ হয় যে, কিছুকাল পরে ইংলণ্ডে তাহা ফলধারণ করিবে। তাহার পরামর্শ ইংলণ্ডীয়দিগের প্রকৃতির উপযোগী বটে তথাপি অপর সাধারণে এখনও তাহার সম্পূর্ণ মর্মাগ্রহণ করিয়া উঠিতে পারে নাই।

বিদ্যানুশীলন বিষয়ে তিনি যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন এখন সর্বত্র সকলেই সেই পথানুসারী হইতেছে। মিল বলিয়াছেন যে, যেমন চৌর্য্য প্রভৃতি অপরাধ নিবারণের উপায় রাজা কর্তৃক নির্দিষ্ট হওয়া আবশ্যিক, তদ্রূপ তাবৎ লোককে লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়াও রাজার কর্তব্য। তাহার ঐকান্তিক বাসনা ছিল যে উত্তম অধম, ধনী দরিদ্র, ভদ্র অভদ্র সকলেই বিদ্যাভ্যাস করিবে; সর্বত্র বিজ্ঞানশাস্ত্রের চর্চা বর্দ্ধিত হইবে এবং ধর্মোপদেশ বিষয়ে রাজার হস্তক্ষেপ করা কর্তব্য নহে। কাষে না হউক মনে মনে প্রধান প্রধান রাজকর্মচারিগণ প্রায় সকলেই এই সকল কথার যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়াছেন।

মনোবিজ্ঞানশাস্ত্রে মিল অনেকের যথেষ্টচারিতা দমন করিয়াছেন। এখন Absolutist বলিয়া কাহারও পরিচয় দিলে তাহার একপ্রকার নিন্দা করা হয়। এতাদৃশ সংস্কার বিস্তার করণ পক্ষে মিলের আয়াস যথেষ্ট ফললাভ করিয়াছে।

মিল শেষাবস্থায় সামাজিক ব্যবস্থা বিষয়ে দুটি নূতন কার্য্য হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ তাহার মতে স্ত্রীজাতি সর্বতোভাবে পুরুষের তুল্য, অতএব যাহাতে উভয় জাতির শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট সম্বন্ধ দূরীকৃত হয় মিল তাহার জন্য অতিশয় চেষ্টিত ছিলেন। পরিণামে ইহার কি হয় বলা যায় না কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকার অবস্থার প্রতি মনোনিবেশ করিয়া দেখিলে বোধ হয় না যে, যে উদ্যম আরম্ভ হইয়াছে তাহা সহসা ভঙ্গ হইবেক। এই বিষয়ক চিন্তাকালে আমরাদিগের মনে হয় যেন মিল আপন স্ত্রীবিয়োগের পর তাহার গাঢ় পঙ্কীভক্তি, কার্য্য পর্য্যবসিত করণার্থ ব্রত স্বরূপ এই চেষ্টাতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এস্থলে এ কথা বলিলে তাহার মনের ভাব কতক প্রকাশ হইবেক যে, ফরাসিদেশে আডিনে নামক নগরের এক গির্জার সমাধিক্ষেত্রে মিলের স্ত্রী সমাধিস্থ হইলেন এবং ঐ সমাধি সর্বদা দেখিতে পাইবেন বলিয়া মিল তাহার নিকটবর্তী একটি বাটী ক্রয় করেন। সেই বাটীতে এরিসিপেলাস রোগে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

দ্বিতীয়; মিলের কল্পনা এই যে পৃথিবীর ভূমিসম্পত্তির উপস্বত্ব ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছে; ইহার কিয়দংশ কেবল মাত্র সভ্যতার উন্নতিজনিত; তাহাতে কাহারও আয়াস বা অর্থব্যয় হয় না, কিন্তু কেবল কতিপয় ভূম্যধিকারীই তাহার ফলভোগী হইলেন। যদিও উপস্বত্বের এই বর্দ্ধিত অংশ রাজহস্তে সমর্পিত হয়, তবে ক্রমশঃ রাজকরের লাঘব হইয়া রাজ্যস্থ তাবৎ লোকেই ইহার কিছু কিছু অংশ পাইতে পারেন। অতএব ইহার সদুপায় করা কর্তব্য। মিল এই কার্য্য অতি অল্পদিন হইল হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহার মৃত্যুর পরে যে হঠাৎ আর কেহ ইহাতে প্রবর্ত হইবেন, বোধ করি তাহার সম্ভাবনা অল্প।

মিল প্রথমাবস্থায় অনেক বিষয়ে কোম্বলের সহিত একমত ছিলেন কিন্তু পরিণামে নানা মতভেদ উপস্থিত হয়। আমরা মনে করি যে পরস্পরের বিবাদের স্থূল কথা এই যে,—

ব্যক্তিবিশেষ ও জনসমাজ এতদুভয় মধ্যে, মিলের মতে ব্যক্তির প্রাধান্য রক্ষা করিয়া সমাজের উন্নতিসাধন করিতে হইবেক নতুবা পৃথিবী ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া যাইবেক।

আর কোম্বল বলেন যে, সহস্র চেষ্টা করিলেও মনুষ্যের স্বার্থানুরাগ পরহিতৈষিতা অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইবেক না; ব্যক্তিবিশেষের প্রাধান্য রক্ষার্থ যত্ন প্রয়োগ হইলে, সেই যত্নের দ্বারা সমাজের যে উন্নতি হইতে পারিত তাহার ব্যাঘাত হইবেক। অতএব স্বার্থানুরাগ কেবল দমন করিবার চেষ্টা করাই কর্তব্য।

মিল ও কোম্বলের ন্যায় মহোপাধ্যায়গণ যে সকল বিষয়ের ঐক্যমত সংস্থাপন করিতে পারেন নাই, তাহার কোন পক্ষের মত সমর্থন করা সামান্য লোকের পক্ষে অবশ্যই অসাধ্য। সুতরাং মতদ্বয় মধ্যে কোন্টি শ্রেষ্ঠ এবং কোন্টি নিকৃষ্ট তদ্বিষয়ে আমরা কোন কথা বলিতে পারি না। কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলিতে ইচ্ছা করি যে, মিল, কোম্বল দর্শন বিচার করিবার জন্য Auguste Comte and Positivism নামক যে পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাহাতে জনসমাজের কর্তব্যের ক্ষতি হইয়াছে। কিন্তু তাহা মিলের অভিপ্রেত নহে বলিয়া তজ্জন্য মিলকে বিশেষ

বঙ্গীয় রচনাবলী

দোষ দেওয়া যায় না। অনেকে কোম্‌তের গ্রন্থ পাঠ করা দূরদূর বালিয়া মিলের গ্রন্থ হইতে তাহার মতের সার সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ইহার পরিণাম কেবল এই মাত্র হয় যে, যেমন কিছুদিন পূর্বে খৃষ্টান মহাশয়েরা সকল কথা না বুঝিয়া কেবল হিন্দুধর্মের প্রতি ব্যঙ্গ করিতেই পটু হইতেন, মিলকৃত কোম্‌ভাষ্যের পাঠক মহাশয়েরাও তদ্রূপ কেবল ব্যঙ্গ করিবার ক্ষমতা লাভ করেন।

মিলের ধর্ম বিষয়ে আমরা কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করি না, কারণ তিনি নিজে তাহা পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত করেন নাই। ইহাতে তিনি নিন্দাভাজন হইয়াছেন কি না তদ্বিষয়ে দ্বিমত থাকিতে পারে। কিন্তু যদি তিনি স্বয়ং আপন প্রকৃত বিশ্বাস গোপন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, তবে অন্যের পক্ষে তাহার আন্দোলন করা বন্ধুর কার্য হইতে পারে না।

আমরা এতক্ষণ যে সকল বিষয়ের আলোচনা করিতেছিলাম, তাহাতে আমরা সমগ্র মানব-জাতির সহিত ভ্রাতৃসম্পর্কে আবদ্ধ। কিন্তু ভারতবাসী বালিয়া মিলের সহিত আমাদের আরো কিছু সম্পর্ক আছে। যৎকালে ভারতবর্ষ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃত্বাধীন ছিল তখন মিল প্রথমতঃ ইস্ট ইন্ডিয়া হাউসের একজন কেরানি এবং পরিশেষে চিঠিপত্র-পরীক্ষকের কার্য করিতেন। কোর্ট অফ ডাইরেকটর হইতে ভারতবর্ষে যে সকল আজ্ঞালিপি আসিত তাহা মিলের পরীক্ষা ভিন্ন প্রেরিত হইত না। কিম্বদন্তী আছে যে, ভারতবর্ষের বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ক সন ১৮৫৪ সালের প্রসিদ্ধ লিপিরচনাকার্যে মিলের বিশিষ্ট সাহায্য ছিল। ফলতঃ উহাতে যেরূপ নিয়ম নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহার সহিত মিলের Liberty নামক পুস্তকোক্ত মতের সম্পূর্ণ ঐক্য লক্ষিত হইবেক।

ভারতবর্ষের রাজকার্য মহারাণীর কর্মচারিগণের হস্তে অর্পিত হইবার সময় মিলকে ইন্ডিয়া কৌন্সিলের মেম্বর হইতে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু ঐ নূতন বন্দোবস্ত মিলের মতে অর্থোক্তিক বালিয়া তিনি উক্ত পদ গ্রহণ করেন নাই। তৎকালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষ হইতে, মহারাণীকে এই কার্য হইতে ক্ষান্ত করিবার জন্য এক আবেদন করা হয়। কথিত আছে যে, মিল তাহার রচনা করিয়াছিলেন। উক্ত আবেদনে লিখিত ছিল যে, ভারতবর্ষের ন্যায় রাজ্য পার্লামেন্টের অধীন না হইয়া কোম্পানির অধীন থাকিলে ভারতবাসীদের মঙ্গল হইবেক, নতুবা তাহারা ইংলণ্ডের দলাদলির আক্রোশে পড়িয়া নিতান্ত উৎপীড়িত হইবেক। তৎকালে এই কথার প্রতি কেহই তাদৃশ মনোযোগ করেন নাই; কিন্তু এখন ইহাকে তুচ্ছ করিতে পারে এমন লোক কে আছে?

জীবনবৃত্তান্ত লিখিবার প্রথা অনুসারে মিলের বিষয়ে, নিম্নলিখিত তারিখগুলি সংগ্রহ করিয়া দেওয়া গেল।

মিলের জন্ম,	...	১৮০৬
তৎকৃত System of Logic নামক ন্যায়শাস্ত্র প্রকাশ,	...	১৮৪৩
Essay on Unsettled Questions of Political Economy প্রকাশ,	...	১৮৪৪
মিল ইস্ট ইন্ডিয়া হাউসের Examiner of Indian Correspondence		
পদে নিযুক্ত,	...	১৮৫৬
মিল উক্ত কর্ম ত্যাগ করেন,	...	১৮৫৮
মিলকৃত Essays on Liberty প্রকাশ	...	১৮৫৯
Dissertations and Discussions Political &c, প্রকাশ	...	১৮৫৯
Thoughts on Parliamentary Reforms প্রকাশ	...	১৮৫৯
Principles of Political Economy (অর্থব্যবহারশাস্ত্র) প্রকাশ	...	১৮৬১
Considerations on Representative Government প্রকাশ	...	১৮৬১
Utilitarianism প্রকাশ	...	১৮৬২
Auguste Comte & Positivism প্রকাশ	...	১৮৬৫
Examination of Sir W. Hamilton's Philosophy প্রকাশ	...	১৮৬৫
মিল পার্লামেন্টের মেম্বর হইলেন	...	১৮৬৫
তৎকৃত Inaugural Address delivered to the University of St. Andrew প্রকাশ	...	১৮৬৭

মৃত মাইকেল মধুসূদন দত্ত

England and Ireland প্রকাশ	...	১৮৬৮
Subjection of Women প্রকাশ	...	১৮৬৮
মিলের মৃত্যু	...	১৮৭৩

—‘বঙ্গদর্শন’, শ্রাবণ ১২৮০, পৃ. ১৪৫-৪৮।

মৃত মাইকেল মধুসূদন দত্ত

আজি বঙ্গভূমির উন্নতি সম্বন্ধে আর আমরা সংশয় করি না—এই ভূমণ্ডলে বাঙ্গালি জাতির গৌরব হইবে। কেন না বঙ্গদেশ রোদন করিতে শিখিয়াছে—অকপটে বাঙ্গালী, বাঙ্গালী কবির জন্য রোদন করিতেছে।

যে দেশে এক জন সুকবি জন্মে, সে দেশের সৌভাগ্য। যে দেশে সুকবি যশঃ প্রাপ্ত হয়, সে দেশের আরও সৌভাগ্য। যশঃ, মৃতের পুরস্কার—জীবিতের যথাযোগ্য যশঃ কোথায়? প্রায় দেখা যায়, যিনি যশের পাত্র, তিনি জীবিতকালে যশস্বী নহেন; যিনি যশের অপাত্র, তিনি জীবিতকালে যশস্বী। সক্রোতিস্ এবং যীশুখ্রীষ্টের দেশীয়েরা, তাঁহাদিগকে অপমান করিয়া প্রাণদণ্ড করিয়াছিল। কোপারনিকস্, গেলিলীয়, দান্তে, প্রভৃতির দুঃখ কে না জানে? আবার হেলি, সিওয়ার্ড মহাকবি বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। এ দেশে, আজিও দাশরথি রায়ের একটু যশঃ আছে। যে দেশের শ্রেষ্ঠ কবি যশস্বী হইয়া জীবন সমাপন করেন, সে দেশ প্রকৃত উন্নতির পথে দাঁড়াইয়াছে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে যশস্বী হইয়া মরিয়াছেন, ইহাতে বুঝা যায় যে, বাঙ্গালা দেশ উন্নতির পথে দাঁড়াইয়াছে।

বাঙ্গালা প্রাচীন দেশ। যাঁহারা ভূতত্ত্ববেত্তাদিগের মুখে শুনে যে, বাঙ্গালা নদীমুখনীত কন্দর্মে সম্প্রতি রচিত, তাঁহারা যেন না মনে করেন যে, কালি পরশ্ব হিমাচলপদতলে সাগরোন্মির্ প্রহত হইত। সেরূপ অনুমানশক্তি কেবল হুইলর সাহেবের ন্যায় পণ্ডিতেরই শোভা পায়। কিন্তু এই প্রাচীন দেশে, দুই সহস্র বৎসর মধ্যে কবি একা জয়দেব গোস্বামী। শ্রীহর্ষের কথা বিবাদের স্থল—নিশ্চয়স্থল হইলেও শ্রীহর্ষ বাঙ্গালী নহেন। জয়দেব গোস্বামীর পর শ্রীমধুসূদন।

যদি কোন আধুনিক ঐশ্বর্য্য-গর্বিত ইউরোপীয় আমাদিগের জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের আবার ভরসা কি?—বাঙ্গালির মধ্যে মনুষ্য জন্মিয়াছে কে? আমরা বলিব, ধর্ম্মোপদেশকের মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেব, দার্শনিকের মধ্যে রঘুনাথ, কবির মধ্যে শ্রীজয়দেব ও শ্রীমধুসূদন।

স্মরণীয় বাঙ্গালির অভাব নাই। কুল্লুক ভট্ট, রঘুনন্দন, জগন্নাথ, গদাধর, জগদীশ, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, মধুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, রামমোহন রায়, প্রভৃতি অনেক নাম করিতে পারি। অবনতাবস্থায়ও বঙ্গমাতা রত্নপ্রসবিনী। এই সকল নামের সঙ্গে মধুসূদন নামও বঙ্গদেশে ধন্য হইল! কেবলই কি বঙ্গদেশে?

আমাদের ভরসা আছে। আমরা স্বয়ং নিগূর্ণ হইলেও, রত্নপ্রসবিনীর সন্তান। সকলে সেই কথা মনে করিয়া, জগতীতলে আপনার যোগ্য আসন গ্রহণ করিতে যত্ন কর। আমরা কিসে অপটু? রণে? রণ কি উন্নতির উপায়? আর কি উন্নতির উপায় নাই? রক্তস্রোতে জাতীয় তরণী না ভাসাইলে কি সুখের পারে যাওয়া যায় না? চিরকালই কি বাহুবলই একমাত্র বল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে? মনুষ্যের জ্ঞানোন্নতি কি বৃথা হইতেছে? দেশভেদে, কালভেদে কি উপায়ান্তর হইবে না?

ভিন্ন ভিন্ন দেশে জাতীয় উন্নতির ভিন্ন ভিন্ন সোপান। বিদ্যালোচনার কারণেই প্রাচীন ভারত উন্নত হইয়াছিল, সেই পথে আবার চল, আবার উন্নত হইবে। কাল প্রসন্ন—ইউরোপ সহায়—সুপবন বহিতেছে দেখিয়া, জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও—তাহাতে নাম লেখ “শ্রীমধুসূদন।”

বঙ্গদেশ, বঙ্গ কবির জন্য রোদন করিতেছে। বঙ্গ কবিগণ মিলিয়া, বঙ্গীয় কবিকুলভূষণের জন্য রোদন করিতেছেন। কবি নহিলে কবির জন্য রোদনে কাহার অধিকার?—‘বঙ্গদর্শন’, ভাদ্র ১২৮০, পৃ. ২০৯-১০।

জাতিবৈর

ভারতবর্ষীয় যে কোন ইংরেজি সম্বাদপত্র (ইংরেজি সম্বাদপত্র অর্থে ইংরেজের দ্বারা সম্পাদিত সম্বাদপত্র) আমরা হস্তে গ্রহণ করি না কেন, সম্মান করিলে অবশ্যই দেখিব যে, তাহার কোন স্থানে না কোন স্থানে দেশীয় লোকদিগের উপর কিছুর গালি—কিছুর অন্যায়ে নিন্দা আছে। আবার যে কোন বাঙ্গালা সম্বাদপত্র পড়ি না কেন, সম্মান করিলে তাহার কোন অংশে না কোন অংশে—ইংরেজের উপর ক্রোধ প্রকাশ—ইংরেজের নিন্দা—অবশ্য দেখিতে পাইব। দেশী পত্র মাতেই ইংরেজের অন্যায়ে নিন্দা থাকে, ইংরেজি পত্র মাতেই দেশী লোকের অন্যায়ে নিন্দা থাকে। বহুকাল হইতে এরূপ হইতেছে—নতুন কথা নহে।

সম্বাদপত্রে যে রূপ দেখা যায়, সামাজিক কথোপকথনেও সেইরূপ। ইহা জাতিবৈরের ফল। এতদুভয় জাতির মধ্যে যে বিদ্বেষ ভাব, তাহাকেই জাতিবৈর বলিতেছি। প্রায় অধিকাংশ সদাশয় ইংরেজ ও দেশীয় লোক এই জাতিবৈরের জন্য দুঃখিত। তাঁহারা এই জাতিবৈরকে মহা অশুভকারী মনে করিয়া ইহার শান্তির জন্য যত্ন করেন। যে সকল সম্বাদপত্রে এই জাতিবৈরের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতেই আবার ইহার নিবারণার্থ নানাবিধ কুটার্থ, অলঙ্কারবিশিষ্ট, প্রবন্ধ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ইহার নিরাকরণার্থ অনেক দ্বিজাতীয়, সমাজ, সভা, সোসাইটি, এসোসিয়েশন স্থাপিত হইয়া, শ্বেত কৃষ্ণ উভয় বর্ণে রঞ্জিত হইয়া সতরণের ছকের দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার সমতা জন্য কত ইউনিয়ন ক্লাব সংস্থাপিত হইয়া সুপকার এবং মদ্যবিক্রেতাকুলের আনন্দ বৃদ্ধি করিয়াছে। কিন্তু কিছুর্তেই এ রোগের উপশম হইল না, এ বিষয় নামিল না। দুঃখের বিষয় যে, কেহ কখন বিবেচনা করিয়া দেখিল না যে, এই জাতিবৈর শমিত করিয়া, আমরা উপকৃত হইব কি না? আর উপকৃত হই বা না হই, বাস্তবিক ইহার শমতা সাধ্য কি না?

ইংরেজেরা যে এ দেশের লোকের অপেক্ষা সাধারণতঃ শ্রেষ্ঠ, তাহা আত্মগোঁরবান্ধ ব্যক্তি ব্যতীত কেহই অস্বীকার করিবেন না। ইংরেজেরা আমাদের অপেক্ষা বলে, সভ্যতায়, জ্ঞানে, এবং গোঁরবে শ্রেষ্ঠ। কোন এক জন ইংরেজের অপেক্ষা, কোন এক জন বাঙ্গালীকে শ্রেষ্ঠ দেখা যাইতে পারে, কিন্তু সাধারণ বাঙ্গালীর অপেক্ষা, সাধারণ ইংরেজ যে শ্রেষ্ঠ তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। যেখানে এরূপ তারতম্য, সেখানে যদি শ্রেষ্ঠ পক্ষ নিস্পৃহ, হিতাকাঙ্ক্ষী এবং শমিতবল হইয়া থাকিতে পারেন, নিকৃষ্ট পক্ষ তাঁহাদিগের নিকট বিনীত, আঞ্জাকারী এবং ভক্তিমান হইয়া থাকিতে পারেন, তবেই উভয়ে প্রীতির সম্ভাবনা। যে নিকৃষ্ট হইয়া, বিনীত, বশ্য এবং ভক্তিমান না হইবে, শ্রেষ্ঠ তাহার উপর কাজে কাজেই বিরক্ত হইবেন। আর যে শ্রেষ্ঠ হইয়া বল প্রকাশ এবং অনিষ্টকারী হইবে, নিকৃষ্ট সুতরাং তাহার উপর রাগ করিবেন। অতএব ইংরেজেরা যদি আমাদের প্রতি নিস্পৃহ, হিতাকাঙ্ক্ষী এবং শমিতবল হইয়া আচরণ করিতে পারেন, আর আমরা যদি তাঁহাদিগের নিকট নম্র, আঞ্জাকারী, এবং ভক্তিমান হইতে পারি, তবে জাতিবৈর দূর হইতে পারে। কিন্তু ইংরেজেরা জেতা, আমরা বিজিত। মনুষ্যের স্বভাবই এমত নহে যে বিজিত হইয়া জেতার প্রতি ভক্তিমান হয় অথবা তাহাদিগকে হিতাভিলাষী, নিস্পৃহ মনে করে; এবং জেতাও কখন বল প্রকাশে কুণ্ঠিত হইতে পারেন না। আঞ্জাকারী আমরা বটে, কিন্তু বিনীত নহি এবং হইতেও পারিব না। কেন না আমরা প্রাচীন জাতি; অদ্যাপি মহাভারত রামায়ণ পড়ি, মনু যাজ্ঞবল্ক্যের ব্যবস্থা অনুসারে চলি, স্নান করিয়া জগতে অতুল্য ভাষায় ঈশ্বর আরাধনা করি। যত দিন এ সকল বিস্মৃত হইতে না পারি তত দিন বিনীত হইতে পারিব না, মূখে বিনয় করিব, অন্তরে নহে। অতএব এই জাতিবৈর, আমাদের প্রকৃত অবস্থার ফল—যত দিন দেশী বিদেশীতে বিজিত-জেত-সম্বন্ধ থাকিবে, যত দিন আমরা নিকৃষ্ট হইয়াও পূর্বাগোঁরব মনে রাখিব, তত দিন জাতিবৈরের শমতার সম্ভাবনা নাই।

এবং আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে, যত দিন ইংরেজের সমতুল্য না হই, তত দিন যেন আমাদের মধ্যে এই জাতিবৈরিতার প্রভাব এমনই প্রবল থাকে। যত দিন জাতিবৈর আছে, তত দিন প্রতিযোগিতা আছে। বৈরভাবের কারণই আমরা ইংরেজদিগের কতক কতক সমতুল্য হইতে যত্ন করিতেছি। ইংরেজদের নিকট অপমানগ্রস্ত, উপহাসিত হইলে, যত দূর আমরা তাহাদিগের সমকক্ষ হইবার জন্য যত্ন করিব, তাহাদিগের কাছে বাপু বাছা ইত্যাদি আদর পাইলে

তত দূর করিব না—কেন না সে গায়ের জ্বালা থাকিবে না। বিপক্ষের সঙ্গেই প্রতিযোগিতা ঘটে—স্বপক্ষের সঙ্গে নহে। উন্নত শব্দ, উন্নতির উদ্দীপক—উন্নত বন্ধু আলস্যের আশ্রয়। আমরাইগের সৌভাগ্যক্রমেই ইংরেজের সঙ্গে আমাদের জাতিবৈর ঘটিয়াছে।

যদি শূভানুধ্যায়ীদের যত্ন সফল হইয়া, সম্প্রতি জাতিবৈরিতার উপশম ঘটে, তাহা হইলে আমরা যে মানসিক সম্বন্ধের কথা উপরে বলিয়াছি, তাহা অবশ্য ঘটিবে; জাতিবৈর উচ্ছিন্ন হইলেই নিকৃষ্ট জাতি উৎকৃষ্টের নিকট বিনীত, আজ্ঞাকারী এবং ভক্তিমান হইবে,—কেন না সে অবস্থা না ঘটিলে জাতিবৈর যাইবে না। এইরূপ মানসিক অবস্থা, উন্নতির পথরোধক। যে বিনীত, সে আত্মক্ষমতায় বিশ্বাসশূন্য,—যে পরের আজ্ঞানুকারী, সে আত্মানুবর্তিতাশূন্য,—এবং যে প্রভুর প্রতি ভক্তিমান, সে প্রভুর প্রতি সকল ভার অপর্ণ করিয়া আত্মকার্যে বিমুখ হয়। যখন বাঙ্গালী ইংরেজের তুল্য না হইয়াও ইংরেজের প্রতি জাতিবৈরশূন্য হইবে, তখন বাঙ্গালী আত্মোন্নতির সম্ভাবনায় বিশ্বাস করিবে না, তাহার চেষ্টাও করিবে না, আত্মচিত্তবৃত্তিকে স্ফূর্তি দিবে না, আত্মরক্ষায় যত্ন করিবে না। তখন ভাবী উন্নতির মূল এককালীন উৎপাটিত হইবে। সে দূরবস্থা কখন না ঘটুক! জাতিবৈর এখনও বহুকাল বঙ্গদেশে বিরাজ করুক।

অতএব জাতিবৈর স্বভাবসঙ্গত, এবং ইহার দূরীকরণ স্পৃহণীয় নহে। কিন্তু জাতিবৈর স্পৃহণীয় বলিয়া, পরস্পরের প্রতি দ্বেষভাব স্পৃহণীয় নহে। দ্বেষ, মনের অতি কুৎসিত অবস্থা; যাহার মনে স্থান পায় তাহার চরিত্র কলুষিত করে। বাঙ্গালী ইংরেজের প্রতি বিরক্ত থাকুন, কিন্তু ইংরেজের অনিষ্ট কামনা না করেন; ইংরেজ বাঙ্গালীর প্রতি বিরক্ত থাকুন, কিন্তু বাঙ্গালীর অনিষ্ট কামনা না করেন। জাতিবৈরের ফলে প্রতিযোগিতা ভিন্ন বিদ্বेष ও অনিষ্ট কামনা না ঘটে। অনেক স্থানে তাহা ঘটিতেছে।—‘সাধারণী’, ১১ কার্তিক ১২৮০।

মানস বিকাশ*

বাঙ্গালা সাহিত্যের আর যে দুঃখই থাকুক, উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যের অভাব নাই। বরং অন্যান্য ভাষার অপেক্ষা বাঙ্গালায় এই জাতীয় কবিতার আধিক্য। অন্যান্য কবির কথা না ধরিলেও, একা বৈষ্ণব কবিগণই ইহার সমুদ্রবিশেষ। বাঙ্গালার সর্বোৎকৃষ্ট কবি—জয়দেব—গীতিকাব্যের প্রণেতা। পরবর্তী বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, এবং চণ্ডীদাসই প্রসিদ্ধ, কিন্তু আরও কতকগুলি এই সম্প্রদায়ের গীতিকাব্য-প্রণেতা আছেন; তাহাদের মধ্যে অনূন চারি পাঁচ জন উৎকৃষ্ট কবি বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীকে এই শ্রেণীর কাব্য বলিতে হয়। রামপ্রসাদ সেন, আর একজন প্রসিদ্ধ গীতি-কবি। তৎপরে কতকগুলি “কবিওয়ালার” প্রাদুর্ভাব হয়, তন্মধ্যে কাহারও কাহারও গীত অতি সুন্দর। রাম বসু, হরু ঠাকুর, নিতাই দাসের এক একটি গীতি এমত সুন্দর আছে যে, ভারতচন্দ্রের রচনার মধ্যে ততুল্য কিছুই নাই। কিন্তু কবিওয়ালাদিগের অধিকাংশ রচনা, অশ্রদ্ধেয় ও অশ্রাব্য সন্দেহ নাই। আধুনিক কবিদিগের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত এক জন অত্যুৎকৃষ্ট। হেম বাবুর গীতিকাব্যের মধ্যে এমত অংশ অনেক আছে যে, তাহা বাঙ্গালা ভাষায় তুলনারহিত। অবকাশরঞ্জিনীর কবি, আর একজন উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য-প্রণেতা। বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রণীত কাব্য-নিচয়ের মধ্যে এক একখানি অতি সুন্দর গীতিকাব্য পাওয়া যায়। সম্প্রতি “মানস বিকাশ” নামে যে কাব্যগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তৎসম্বন্ধেও সেই কথা বলা যাইতে পারে।

সকলই নিয়মের ফল। সাহিত্যও নিয়মের ফল। বিশেষ বিশেষ কারণ হইতে, বিশেষ বিশেষ নিয়মানুসারে, বিশেষ বিশেষ ফলোৎপত্তি হয়। জল উপরিস্থ বায়ু এবং নিম্নস্থ পৃথিবীর অবস্থানুসারে, কতকগুলি অলংঘ্য নিয়মের অধীন হইয়া, কোথাও বাষ্প, কোথাও বৃষ্টিবিন্দু, কোথাও শিশির, কোথাও হিমকণা বা বরফ, কোথাও কুজ্ঝটিকারূপে পরিণত হয়। তেমনি সাহিত্যও দেশভেদে, দেশের অবস্থান্তে, অসংখ্য নিয়মের বশবর্তী হইয়া রূপান্তরিত হয়। সেই সকল নিয়ম অত্যন্ত জটিল, দুঃস্বপ্ন, সন্দেহ নাই; এ পর্যন্ত কেহ তাহার সবিশেষ তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারেন নাই। কোমৎ বিজ্ঞান সম্বন্ধে ষেরূপ তত্ত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছেন, সাহিত্য সম্বন্ধে

* মানস বিকাশ। কলিকাতা প্রাচীন ভারত যন্ত্র।

বিক্রম রচনাবলী

কেহ তদ্রূপ করিতে পারেন নাই। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র। যে সকল নিয়মানুসারে দেশভেদে, রাজবিপ্লবের প্রকারভেদ, সমাজবিপ্লবের প্রকারভেদ, ধর্মবিপ্লবের প্রকারভেদ ঘটে, সাহিত্যের প্রকারভেদ সেই সকল কারণেই ঘটে। কোন কোন ইউরোপীয় গ্রন্থকার সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের আভ্যন্তরিক সম্বন্ধ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। বকুল ভিন্ন কেহ বিশেষরূপে পরিশ্রম করেন নাই, এবং হিতবাদ মতপ্রিয় বকুল-এর সঙ্গে কাব্যসাহিত্যের সম্বন্ধ কিছুর অল্প। মনুষ্যচরিত্র হইতে ধর্ম এবং নীতি মুছিয়া দিয়া, তিনি সমাজতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত। বিদেশ সম্বন্ধে যাহা হউক, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এ তত্ত্ব কেহ কখন উত্থাপন করিয়াছেন এমত আমাদের স্মরণ হয় না। সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে মক্ষমূল্যের গ্রন্থ বহুমূল্য বটে, কিন্তু প্রকৃত সাহিত্যের সঙ্গে সে গ্রন্থের সামান্য সম্বন্ধ। ভারতবর্ষীয় সাহিত্যের প্রকৃত গতি কি? তাহা জানি না, কিন্তু তাহার গোটাকত স্থূল স্থূল চিহ্ন পাওয়া যায়। প্রথম ভারতীয় আর্ষ্যগণ অনার্য আদিমবাসীদিগের সহিত বিবাদে ব্যস্ত; তখন ভারতবর্ষীয়েরা অনার্যকুলপ্রমথনকারী, ভীতিশূন্য, দিগন্তবিচারী, বিজয়ী বীর জাতি। সেই জাতীয় চরিত্রের ফল রামায়ণ। তার পর ভারতবর্ষের, অনার্য শত্রু সকল ক্রমে বিজিত, এবং দূরপ্রস্থিত; ভারতবর্ষ আর্ষ্যগণের করস্থ, আয়ত্ত, ভোগ্য, এবং মহা সমৃদ্ধিশালী। তখন আর্ষ্যগণ বাহ্য শত্রুর ভয় হইতে নিশ্চিন্ত, আভ্যন্তরিক সমৃদ্ধি সম্পাদনে সচেষ্ট, হস্তগতা অনন্তরত্ন-প্রসবিনী ভারতভূমি অংশীকরণে ব্যস্ত। যাহা সকলে জয় করিয়াছে, তাহা কে ভোগ করিবে? এই প্রশ্নের ফল আভ্যন্তরিক বিবাদ। তখন আর্ষ্য পৌরুষ চরমে দাঁড়াইয়াছে—অন্য শত্রুর অভাবে সেই পৌরুষ পরস্পরের দমনার্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সময়ের কাব্য মহাভারত। বল যাহার, ভারত তাহার হইল। বহুকালের রক্তবৃষ্টি শমিত হইল। স্থির হইয়া, উন্নতপ্রকৃতি আর্ষ্যকুল শান্তিসুখে মন দিলেন। দেশের ধন বৃদ্ধি, শ্রী বৃদ্ধি ও সভ্যতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। রোমক হইতে যবদ্বীপ ও চৈনিক পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের বাণিজ্য ছুটিতে লাগিল; প্রতি নদীকূলে অনন্তসৌধমালাশোভিত মহানগরী সকল মস্তক উত্তোলন করিতে লাগিল। ভারতবর্ষীয়েরা সুখী হইলেন। সুখী এবং কৃতী। এই সুখ ও কৃতিত্বের ফল, কালিদাসাদির নাটক ও মহাকাব্য সকল। কিন্তু লক্ষ্মী বা সরস্বতী কোথাও চিরস্থায়িনী নহেন; উভয়েই চঞ্চলা। ভারতবর্ষ ধর্মশৃঙ্খলে এরূপ নিবদ্ধ হইয়াছিল যে, সাহিত্যরসগ্রাহণী শক্তিও তাহার বশীভূতা হইল। প্রকৃতপ্রকৃত বোধ বিলুপ্ত হইল। সাহিত্যও ধর্মানুকারণী হইল। কেবল তাহাই নহে, বিচার-শক্তি ধর্মমোহে বিকৃত হইয়াছিল—প্রকৃত ত্যাগ করিয়া অপ্রকৃত কামনা করিতে লাগিল। ধর্মই তৃষ্ণা, ধর্মই আলোচনা, ধর্মই সাহিত্যের বিষয়। এই ধর্মমোহের ফল পুরাণ।

ভারতবর্ষীয়েরা শেষে আসিয়া এমন প্রদেশ অধিকার করিয়া বসতি স্থাপনা করিয়াছিলেন যে, তথাকার জলবায়ুর গুণে তাঁহাদিগের স্বাভাবিক তেজোলুপ্ত হইতে লাগিল। তথাকার তাপ অসহ্য, বায়ু জলবাস্পপূর্ণ, ভূমি নিম্না এবং উর্বরা, এবং তাহার উৎপাদ্য অসার, তেজোহানিকারক ধান্য। সেখানে আসিয়া আর্ষ্যতেজঃ অন্তর্হিত হইতে লাগিল, আর্ষ্যপ্রকৃতি কোমলতাময়ী আলস্যের বশবর্তিনী, এবং গৃহসুখাভিলাষিনী হইতে লাগিল। সকলেই বৃষ্টিতে পারিতেছেন যে, আমরা বাঙ্গালার পরিচয় দিতেছি। এই উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, নিশ্চেষ্ট, গৃহসুখপরায়ণ চরিত্রের অনুকরণে এক বিচিত্র গীতিকাব্য সৃষ্ট হইল। সেই গীতিকাব্যও উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, ভোগাসক্ত, গৃহসুখপরায়ণ। সে কাব্যপ্রণালী অতিশয় কোমলতাপূর্ণ, অতি সুমধুর, দম্পতিপ্রণয়ের শেষ পরিচয়। অন্য সকল প্রকারের সাহিত্যকে পশ্চাতে ফেলিয়া, এই জাতি-চরিত্রানুকারণী গীতিকাব্য সাত আট শত বৎসর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের জাতীয় সাহিত্যের পদে দাঁড়াইয়াছে। এই জন্য গীতিকাব্যের এত বাহুল্য।

বঙ্গীয় গীতিকাব্য-লেখকদিগকে দুই দলে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক দল, প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে মনুষ্যকে স্থাপিত করিয়া, তৎপ্রতি দৃষ্টি করেন; আর এক দল, বাহ্য প্রকৃতিকে দূরে রাখিয়া কেবল মনুষ্যহৃদয়কেই দৃষ্টি করেন। এক দল মানবহৃদয়ের সন্মানে প্রবৃত্ত হইয়া বাহ্য প্রকৃতিকে দীপ করিয়া, তদালোকে অন্বেষ্য বস্তুকে দীপ্ত এবং প্রস্ফুট করেন; আর এক দল, আপনাদিগের প্রতিভাতেই সকল উজ্জ্বল করেন, অথবা মনুষ্যচরিত্র-খনিতে যে রত্ন মিলে, তাহার দীপ্তির জন্য অন্য দীপের আবশ্যক নাই, বিবেচনা করেন। প্রথম শ্রেণীর প্রধান জয়দেব, দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রধান বিদ্যাপতি। জয়দেবাদির কবিতায়, সতত মাধবী যামিনী, মলয়সমীর, ললিতলতা

কুবলয়দল শ্রেণী, স্ফুটিত কুসুম, শরচ্চন্দ্র, মধুকরবন্দ, কোকিলকুজিতকুঞ্জ, নবজলধর, এবং তৎসঙ্গে কামিনীর মৃগমণ্ডল, ভ্রুবল্লী, বাহুলতা, বিম্বোষ্ঠ, সরসীরহলোচন, অলসনিমেষ, এই সকলের চিত্র, বাতোন্মূখিত তর্কিতরঙ্গবৎ সতত চাকাচক্য সম্পাদন করিতেছে। বাস্তবিক এই শ্রেণীর কবিদের কবিতায় বাহ্য প্রকৃতির প্রাধান্য। বিদ্যাপতি যে শ্রেণীর কবি, তাঁহাদিগের কাব্যে বাহ্য প্রকৃতির সম্বন্ধ নাই এমত নহে—বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে মানবহৃদয়ের নিত্য সম্বন্ধ সূতরাং কাব্যেরও নিত্য সম্বন্ধ; কিন্তু তাঁহাদিগের কাব্যে বাহ্য প্রকৃতির অপেক্ষাকৃত অস্পষ্টতা লক্ষিত হয়, তৎপরিবর্তে মনুষ্যহৃদয়ের গঢ় তলচারী ভাব সকল প্রধান স্থান গ্রহণ করে। জয়দেবাদিতে বহিঃ-প্রকৃতির প্রাধান্য, বিদ্যাপতি প্রভৃতিতে অন্তঃপ্রকৃতির রাজ্য। জয়দেব, বিদ্যাপতি উভয়েই রাধাকৃষ্ণের প্রণয়কথা গীত করেন। কিন্তু জয়দেব যে প্রণয় গীত করিয়াছেন, তাহা বহিঃপ্রকৃতির অনুগামী। বিদ্যাপতির কবিতা বহিঃপ্রকৃতির অতীত। তাহার কারণ কেবল এই বাহ্য প্রকৃতির শক্তি। স্থূল প্রকৃতির সঙ্গে স্থূল শরীরেরই নিকট সম্বন্ধ, তাহার আধিক্যে কবিতা একটু ইন্দ্রিয়ানু-সারিণী হইয়া পড়ে। বিদ্যাপতি মনুষ্যহৃদয়কে বহিঃপ্রকৃতি ছাড়া করিয়া, কেবল তৎপ্রতি দৃষ্টি করেন, সূতরাং তাঁহার কবিতা, ইন্দ্রিয়ের সংস্রবশূন্য, বিলাসশূন্য, পবিত্র হইয়া উঠে। জয়দেবের গীত, রাধাকৃষ্ণের বিলাস পূর্ণ; বিদ্যাপতির গীত রাধাকৃষ্ণের প্রণয় পূর্ণ। জয়দেব ভোগ; বিদ্যাপতি আকাঙ্ক্ষা ও স্মৃতি। জয়দেব সুখ, বিদ্যাপতি দুঃখ। জয়দেব বসন্ত, বিদ্যাপতি বর্ষা। জয়দেবের কবিতা, উৎফুল্ল কমলজালশোভিত, বিহঙ্গমাকুল, স্বচ্ছ বারিবিশিষ্ট সুন্দর সরোবর; বিদ্যাপতির কবিতা দূরগামিনী বেগবতী তরঙ্গসঙ্কুল নদী। জয়দেবের কবিতা স্বর্ণহার, বিদ্যাপতির কবিতা রুদ্রাঙ্কমালা। জয়দেবের গান, মুরজবীণাসঙ্গিনী স্ত্রীকণ্ঠগীতি; বিদ্যাপতির গান, সায়াহ্ন সমীরণের নিঃশ্বাস।

আমরা জয়দেব ও বিদ্যাপতির সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাঁহাদিগকে এক এক ভিন্ন শ্রেণীর গীতকবির আদর্শ স্বরূপ বিবেচনা করিয়া তাহা বলিয়াছি। যাহা জয়দেব সম্বন্ধে বলিয়াছি, তাহা ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে বর্তে, যাহা বিদ্যাপতি সম্বন্ধে বলিয়াছি তাহা গোবিন্দদাস চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের সম্বন্ধে তদ্রূপই বর্তে।

আধুনিক বাঙ্গালি গীতিকাব্য-লেখকগণকে একটি তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। তাঁহারা আধুনিক ইংরেজি গীতকবিদিগের অনুগামী। আধুনিক ইংরেজি কবি ও আধুনিক বাঙ্গালি কবিগণ সভ্যতা বৃদ্ধির কারণে স্বতন্ত্র একটি পথে চলিয়াছেন। পূর্বে কবিগণ কেবল আপনাকে চিনিতেন, আপনার নিকটবর্তী যাহা তাহা চিনিতেন। যাহা আভ্যন্তরিক, বা নিকটস্থ, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ সন্ধান জানিতেন, তাহার অনুকরণীয় চিত্র সকল রাখিয়া গিয়াছেন। এক্ষণকার কবিগণ জ্ঞানী—বৈজ্ঞানিক, ইতিহাসবেত্তা, আধ্যাত্মিকতত্ত্ববিৎ। নানা দেশ, নানা কাল, নানা বস্তু তাঁহাদিগের চিত্তমধ্যে স্থান পাইয়াছে। তাঁহাদিগের বুদ্ধি বহুবিষয়িণী বলিয়া তাঁহাদিগের কবিতাও বহুবিষয়িণী হইয়াছে। তাঁহাদিগের বুদ্ধি দূরসম্বন্ধগ্রাহিণী বলিয়া তাঁহাদিগের কবিতাও দূরসম্বন্ধ-প্রকাশিকা হইয়াছে। কিন্তু এই বিস্তৃতিগুণ হেতু প্রগাঢ়তা গুণের লাঘব হইয়াছে। বিদ্যাপতি প্রভৃতির কবিতার বিষয় সঙ্কীর্ণ, কিন্তু কবিত্ব প্রগাঢ়; মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের কবিতার বিষয় বিস্তৃত, বা বিচিত্র, কিন্তু কবিত্ব তাদৃশ প্রগাঢ় নহে। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, কবিত্বশক্তির হ্রাস হয় বলিয়া যে প্রবাদ আছে, ইহার তাহার একটি কারণ। যে জল সঙ্কীর্ণ রূপে গভীর, তাহা তড়াগে ছড়াইলে আর গভীর থাকে না।

কাব্যে অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে যথার্থ সম্বন্ধ এই যে, উভয়ে উভয়ের প্রতিবিম্ব নিপতিত হয়। অর্থাৎ বহিঃপ্রকৃতির গুণে হৃদয়ের ভাবান্তর ঘটে, এবং মনের অবস্থাবিশেষে বাহ্য দৃশ্য সুখকর বা দুঃখকর বোধ হয়—উভয়ে উভয়ের ছায়া পড়ে। যখন বহিঃপ্রকৃতি বর্ণনীয়, তাহা অন্তঃপ্রকৃতির সেই ছায়া সহিত চিত্রিত করাই কাব্যের উদ্দেশ্য। যখন অন্তঃপ্রকৃতি বর্ণনীয় তখন বহিঃপ্রকৃতির ছায়া সমেত বর্ণনা তাহার উদ্দেশ্য। যিনি ইহা পারেন, তিনিই সুকবি। ইহার ব্যতিক্রমে এক দিকে ইন্দ্রিয়পরতা, অপর দিকে আধ্যাত্মিকতা দোষ জন্মে। এ স্থলে শারীরিক ভোগাশক্তিকেই ইন্দ্রিয়পরতা বলিতেছি না—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে আনুরক্তিকে ইন্দ্রিয়পরতা বলিতেছি। ইন্দ্রিয়পরতা দোষের উদাহরণ, কালিদাস ও জয়দেব। আধ্যাত্মিকতা দোষের উদাহরণ, পোপ ও জনসন।

ভারতচন্দ্রাদি বাঙ্গালি কবি, যাহারা কালিদাস ও জয়দেবকে আদর্শ করেন, তাঁহাদের কাব্য

বিক্রম রচনাবলী

ইন্দ্রিয়পর। কোন মূর্খ না মনে করেন যে, ইহাতে কালিদাসাদির কবিত্বের নিন্দা হইতেছে— কেবল কাব্যের শ্রেণী নিষ্পাচন হইতেছে মাত্র। আধুনিক, ইংরেজি কাব্যের অনুকারী বাঙ্গালি কবিগণ, কিয়দংশে আধ্যাত্মিকতা দোষে দুষ্ট। মধুসূদন, ষেরূপ ইংরেজি কবিদিগের শিষ্য, সেইরূপ কতক দূর জয়দেবদিগের শিষ্য, এই জন্য তাঁহাতে আধ্যাত্মিক দোষ তাদৃশ স্পষ্ট নহে।—‘বঙ্গদর্শন’, পৃষ্ঠা ১২৮০, পৃ. ৪০২-৪০৭।

সর্ উইলিয়ম গ্রে ও সর্ জর্জ কাম্বেল

পূর্ববঙ্গবাসী কোন বর, কলিকাতানিবাসী একটি কন্যা বিবাহ করিয়া গৃহে লইয়া যান। কন্যাটি পরমাসুন্দরী, বুদ্ধিমতী, বিদ্যাবতী, কিস্মীতা এবং সুশীলা। তাঁহার পিতা মহা ধনী, নানা রত্নে ভূষিতা করিয়া কন্যাকে স্বশুরগৃহে পাঠাইলেন। মনে ভাবিলেন, আমার মেয়ের কোন দোষ কেহ বাহির করিতে পারিবে না। সঙ্গের লোক ফিরিয়া আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন হে, বাঙ্গালেরা মেয়ের কোন দোষ বাহির করিতে পারিয়াছে?” সঙ্গের লোক বলিল “আজ্ঞা হাঁ—দোষ লইয়া বড় গন্ডগোল গিয়াছে।” বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—“সে কি? কি দোষ?” ভৃত্য বলিল “বাঙ্গালেরা বড় নিন্দা করিয়াছে, মেয়ের কপালে উল্কি নাই।” আমরা এই বঙ্গদর্শনে, কখন সর্ জর্জ কাম্বেল সাহেব সম্বন্ধে কোন কথা বলি নাই। যাঁহার নিন্দা তিন বৎসরকাল বাঙ্গালাপত্রের জীবনস্বরূপ ছিল, তাঁহার কোন উল্লেখ না থাকাতে, আমাদের ভয় করে যে পাছে কেহ বলে যে, বঙ্গদর্শনের উল্কি নাই। আমরা অদ্য বঙ্গদর্শনকে উল্কি পরাইতে প্রবৃত্ত হইলাম।

তবে এই উল্কি বড় সামান্য নহে। যে পত্র বা পত্রিকা (কোন্‌গুর্লি পত্র আর কোন্‌গুর্লি পত্রিকা তাহা আমরা ঠিক জানি না—কি করিলে পত্র পত্রিকা হইয়া যায়, তাহাও অবগত নহি) একবার কপালে এই উল্কি পরিয়াছেন, তিনি বঙ্গদেশ মোহিয়াছেন, মুগ্ধ হইয়া বঙ্গীয় পাঠকগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছে—এবং সাম্বৎসরিক অগ্রিম মূল্যে বরণ করিয়া তাঁহাকে ঘরে তুলিয়াছে। যে এই উল্কি পরে, তাহার অনেক সুখ।

এক্ষণে সর্ জর্জ কাম্বেল এতদেশে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন—ইহাতে সকলেই দুঃখিত। এ পৃথিবীতে পরিনিন্দা প্রধান সুখ—বিশেষ যদি নিন্দিত ব্যক্তি উচ্চশ্রেণীস্থ এবং গুণবান্ হয় তবে আরও সুখ। সর্ জর্জ কাম্বেল গুণবান্ হউন বা না হউন উচ্চশ্রেণীস্থ বটে। তাঁহার নিন্দায় যে সুখ, তাহাতে এক্ষণে বঙ্গদেশের লোক বঞ্চিত হইল। ইহার অপেক্ষায়, আর গুরুতর দুর্ঘটনা কি হইতে পারে। এই যে গুরুতর দুর্ভিক্ষবহিতে দেশ দগ্ধ হইতেছিল—তাহাতেও আমরা কোন মতে প্রাণ ধারণ করিতেছিলাম—খবরের কাগজ চলিতেছিল, বাঙ্গালি বাবু গল্পের মজলিশে অশ্লীল গল্প ছাড়াইয়া, সর্ জর্জের নিন্দা করিয়া বোতল শেষ করিতেছিলেন। কিন্তু এক্ষণে? হায়! এক্ষণে কি হইবে!

এইরূপ সর্বজননিন্দাহঁ হওয়া সচরাচর দেখা যায় না। অনেকে বলিবেন, সর্ জর্জ কাম্বেলের অসাধারণ দোষ ছিল, এই জন্যই তিনি এইরূপ অসাধারণ নিন্দনীয় হইয়াছিলেন। আমরাদিগের বিশ্বাস আছে যে এইরূপ সর্বজননিন্দনীয় হয়, যাঁহার নিন্দায় সকলের তুষ্টি জন্মে, সে হয় অসাধারণ দোষে দোষী বা অসাধারণ গুণে গুণবান্—নয়ত দুই। জিজ্ঞাস্য, সর্ জর্জ কাম্বেল, অসাধারণ দোষে দোষী, না অসাধারণ গুণে গুণবান্, বলিয়া তাঁহার এই নিন্দাতিশয্য হইয়াছিল?

তাঁহার পূর্বগামী শাসনকর্তা সর্ উইলিয়ম গ্রে। সর্ উইলিয়ম গ্রে ন্যায় কোন লেঃ গবর্নর প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া নাই। সর্ জর্জ কাম্বেল ও সর্ উইলিয়ম গ্রে এই ভাগ্যতারতম্য কোন দোষে বা কোন গুণে? কোন গুণে সর্ উইলিয়ম সকলের প্রিয়, কোন দোষে সর্ জর্জ সকলের অপিয়?

যাঁহারা এই কথার মীমাংসা করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগকে একটা কথা বঝাইতে হয়। এই ব্রিটিশ ভারতীয় শাসনপ্রণালী দূর হইতে দেখিতে বড় জাঁক, শূন্যতে ভয়ানক, বৃষ্টিতে বড় গোল—ইহার প্রকৃতি কি প্রকার? এক লেঃ গবর্নর কর্তৃক যে এই বহুৎ রাজ্য শাসিত হয় সে কোন রীতি অবলম্বন করিয়া?

সর্ উইলিয়ম গ্রে ও সর্ জর্জ কাম্বেল

সে রীতি দুই প্রকার। একটি রীতি, একটি সামান্য উদাহরণের দ্বারা বুঝাইব। মনে কর, বাঁধের কথা উপস্থিত। কমিশ্যনরের রিপোর্টে হউক, বোর্ডের রিপোর্টে হউক, ইঞ্জিনিয়ারদিগের রিপোর্টে হউক, সংবাদপত্রে হউক, লেঃ গবর্নর জানিলেন যে, নদীতীরস্থ প্রাচীন বাঁধ সকল রক্ষিত হইতেছে না—তাহার উপায় করা কর্তব্য। তখন লেঃ গবর্নরের হুকুম হইল যে, রিপোর্ট তলব কর। এই হুকুমে যদি কোন বিশেষ গুণশালিত্ব বা যোগ্যতা থাকে, তবে সে গুণশালিত্ব বা যোগ্যতা লেঃ গবর্নরের। সেক্রেটারি সাহেব হুকুম পাইয়া, বোর্ডে চিঠি লিখিলেন—তাহার চিঠিতে কথাটা একটু বিস্তৃতি পাইল—তিনি বলিলেন ইহার বিশেষ অবস্থা জানিবে—অধীনস্থ কর্মচারীদিগের অভিপ্রায় কি তাহা লিখিবে, ইহার কিরূপ উপায় হইতে পারে তাহা লিখিবে। বোর্ড, ঐ পত্রখানির একাদশ খণ্ড অতি পরিষ্কার অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া, একাদশ কমিশ্যনরের নিকট পাঠাইলেন। একাদশ কমিশ্যনর, অনুলিপি প্রাপ্ত হইয়া তাহার কোণে পেন্সিলে প্রাপ্তির তারিখ লিখিয়া বাস্ক্রে ফেলিলেন, তাহার গুরুতর কর্তব্য কার্য সমাপ্ত হইল। বাস্ক্রে প্রাচীন প্রধানসারে যথাসময়ে চাপরাশির স্কন্ধে আরোহণ করিয়া, কেরাণীর নিকট পেশীছিল। কেরাণী তাহার আর এক এক খণ্ড পরিষ্কার অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া সাত দিনের মিয়াদ লিখিয়া দিয়া, কালেক্টরদিগের নিকট পাঠাইলেন। যে পথে মহাজন যায় সেই পথ,—দোন্দু প্রচণ্ড প্রতাপান্বিত শ্রীল শ্রীযুক্ত কালেক্টর বাহাদুর, চুরটু খাইতে খাইতে চিঠির কোণে লিখিলেন “সব্‌ডিবিজন ও ডেপুটিগণ বরাবর।” চিঠি এইরূপে বড় ডাকঘর হইতে মেজো ডাকঘরে, মেজো ডাকঘর হইতে ছোট ডাকঘরে, এবং তথা হইতে শেষে আটচালা নিবাসী বোতামশূন্য চাপকানধারী কালকোল নাদুস নাদুস ডিপুটি বাহাদুরের ছিন্ন পাদুকামণ্ডিত শ্রীপাদপদ্মযুগলে মধুলুক ভ্রমরের ন্যায় আসিয়া পড়িল। ডিপুটি বাহাদুরেরা প্রায় উপরস্থ মহাত্মাদিগের অনুকরণ করিয়া, ইংরেজি চিঠির বাস্ক্রালা পরওয়ানা করিয়া সব-ইনস্পেক্টরগণের নিকট ফেলফোর রিপোর্ট তলব করিলেন—সব-ইনস্পেক্টর পরওয়ানা কনষ্টেবলের হাওয়ানা করিল—কনষ্টেবল যে গ্রামে বাঁধ সেইখানে, কাল কোর্তা কাল দাড়ি এবং মোটা রুল লইয়া, দর্শন দিয়া এক অল্লাভাবে শীর্ণ ক্লিষ্ট চৌকিদারকে ধরিল। ধরিয়াই জিজ্ঞাসা করিল যে, “তোদের গাঁয়ের বাঁধ থাকে না কেন রে?” চৌকিদার ভীত হইয়া বলিল, “আজ্ঞা, জমীদারে মেরামত করে না, আমি গরিব মানুষ কি করিব?” কনষ্টেবল তখন জমীদারী কাছারিতে পদরেণু অর্পণ করিয়া গোমস্তাকে কিছু তম্বী করিলেন। গোমস্তা জমীদারী খাতায় পাঁচ টাকা খরচ লিখিয়া কনষ্টেবল বাবুকে দেড় টাকা পারিতোষিক দিয়া বিদায় করিলেন। কনষ্টেবল আসিয়া সব-ইনস্পেক্টর সমক্ষে রিপোর্ট করিলেন “বাঁধ সব বেমেরামত—জমীদার মেরামত করে না—জমীদার মেরামত করিলেই মেরামত হইতে পারে।” ডিপুটি বাহাদুর লিখিলেন, “বাঁধ সব বেমেরামত,—জমীদারেরা মেরামত করে না—তাহারা মেরামত করিলেই হয়।” কালেক্টর বাহাদুর সেই সকল কথা লিখিলেন, অধিকন্তু “এক্ষণে জমীদারদিগকে বাঁধ মেরামত করিতে বাধ্য করা উচিত।” কমিশ্যনর, সেই সকল কথা লিখিয়া বোর্ডে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এক্ষণে, কি প্রকারে জমীদার বাঁধ মেরামত করিতে বাধ্য হইতে পারে?” বোর্ড তত্ত্বদুস্তি পুনরুক্ত করিয়া, একটা যাহা হয় উপায় নির্দিষ্ট করিলেন। সেক্রেটারি সাহেব সেই সকল কথা সাজাইয়া লিখিয়া এক রিজলিউশনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া পাঠাইলেন, লেঃ গবর্নর সাহেব সম্মত হইয়া তাহাতে দস্তখত করিয়া দিলেন। আজ্ঞা দেশে প্রচারিত হইল; লেঃ গবর্নর বাহাদুরের যশ দেশে বিদেশে ঘোষিল। যাহারা মিত্রপক্ষ তাহারা গবর্নর বাহাদুরের প্রশংসা করিতে লাগিল—শত্রুপক্ষ নানা জাতীয় ইংরেজি বাস্ক্রালায় তাহাকে গালি পাড়িতে লাগিল। নষ্টের গোড়া চৌকিদার নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে কোদালি পাড়িতে লাগিল।

বাস্তবিক যে এইরূপ কোন প্রকৃত ঘটনা ঘটিয়াছে, এমত নহে। একটি কল্পিত ঘটনা অবলম্বন করিয়াই এ সকল কথা লিখিলাম। এইরূপ যে সচরাচরই ঘটিয়া থাকে, এমত নহে। কিন্তু অনেক সময়ে ঘটে। সৌভাগ্যক্রমে যাহারা সুযোগ্য শাসনকর্তা, তাহারা এ প্রথা অবলম্বন করেন না, অযোগ্যেরা করিয়া থাকেন, এইরূপ কার্যপ্রণালীকে “কলে শাসন” বলা যাইতে পারে। ধর্মের কলের ন্যায় শাসনের কলও বাতাসে নড়িয়া থাকে; কোন দিক্ হইতে কোন কর্মচারীর রিপোর্টের বাতাস, বা অন্য প্রকার ফাঁপ উঠিয়া, কলে লাগিলে, কল চলিতে আরম্ভ করে; তদন্তের হুকুম হইতে কলের দম আরম্ভ হইয়া বোর্ড কমিশ্যনর প্রভৃতি অধোধঃ পর্য্যায়ক্রমে

বাংকম রচনাবলী

ধূরিয়া আবার লেঃ গবর্নর পর্য্যন্ত আসিয়া সহি মোহরের মঞ্জুরি মদ্বিত করিয়া দিয়া বন্ধ হয়। যেমন কলের ধূতি, কলের সূতা প্রভৃতি সামগ্রী আছে, তেমনি কলে তৈয়ারি রাজাজ্ঞাও আছে।

যে লেঃ গবর্নর এইরূপ কলে শাসন করেন, তিনি সন্মানুষ হইলে হইতে পারেন; তন্নিম্ন তাঁহার বুদ্ধিমত্তা, যোগ্যতা বা অন্য কোন গুণের প্রশংসার কারণ দেখা যায় না। তিনি কখন আপন বুদ্ধির চালনা করেন না, কোন বিষয়ের সন্ধিবেচনা করিবার জন্য তাঁহাকে নিজে কষ্ট পাইতে হয় না। তিনি পরিশ্রম স্বীকার করিয়া কখন কোন নূতন বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন না; পরিশ্রম স্বীকার করিয়া কোন বিষয়ের যথার্থ স্বয়ং মীমাংসা করেন না। তিনি শাসনযন্ত্রের একাট অংশ মাত্র—যখন রাজ্যের কল বাতাসে নড়িল, তখন তিনিও নড়িলেন, কলে চালিত হইয়া মঞ্জুরি লিপি সমেত সহিমোহর করিয়া দিয়া কলে থামিলেন। সেইরূপ ঘণ্টা পূর্ণ হইলে, ঘাড়ির মূরদ, বাহির হইয়া, ঠংঠং করিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া, আবার কলে মিশিয়া যায়।

সর্ উইলিয়ম গ্রে ও সর্ জর্জ কাম্বেলে প্রধান প্রভেদ এই যে, সর্ উইলিয়ম গ্রে কলে শাসন করিতেন, সর্ জর্জ কাম্বেল তাহা করিতেন না।

কলে শাসনের অনেক গুণ আছে। তাহার ফল ভাল হউক, মন্দ হউক, লোকের অসন্তোষের সম্ভাবনা অতি অল্প। যাহা পূর্বাধিক চলিয়া আসিতেছে, তাহা নিতান্ত অনিষ্টকর হইলেও, লোকে তাহাতে সন্তুষ্ট; পূর্বাধিক চলিত রীতি অত্যন্ত অনিষ্টকারী হইলেও লোকে তাহার সংশোধনে অসন্তুষ্ট। পুরাতনের মন্দও ভাল, নূতনের ভালও মন্দ। কলের শাসন, শাসনই নহে; যিনি কলে শাসন করেন, তিনি কিছু করেন না বলিলেই হয়। অতএব কলের শাসনে পুরাতনের কিঞ্চিৎমাত্র সংস্করণ ভিন্ন নূতন কখন ঘটে না; যাহা আছে, তাহাই প্রায় বজায় থাকে; যাহা নাই, অথচ আবশ্যিক, প্রায় তাহা ঘটিয়া উঠে না। এজন্য লোকেরও অসন্তোষ জন্মে না। বিশেষ এদেশীয় লোক পুরাতনের অত্যন্ত অনুরাগী, নূতনে অত্যন্ত বিরক্ত।

সর্ উইলিয়ম গ্রে, কলে শাসন করিতেন, সূতরাং লোকের বড় প্রিয় ছিলেন। সর্ জর্জ কাম্বেল, কলে শাসন করিতেন না, এজন্য লোকের বড় অপ্ৰিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। রাজ্যশাসন উভয়েরই উদ্দেশ্য; কিন্তু সর্ উইলিয়ম গ্রে উদ্দেশ্য ছিল কেবল শাসনের কল চালান; সর্ জর্জ কাম্বেলের উদ্দেশ্য শাসনের উদ্দেশ্য সফল করা। এমত বলিতেছি না যে সর্ জর্জ কাম্বেল সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনে সূফল ফলিয়াছে, সর্ উইলিয়ম গ্রে শাসনে কুফল ফলিয়াছে, এ কথা বলাও আমাদের অভিপ্রায় নহে। কেবল বলিতে চাই যে, সর্ জর্জ কাম্বেল আপন বুদ্ধিতে চলিতেন; এ বৃহৎ রাজ্যশাসন জন্য চিন্তা করিতেন; উদ্দেশ্যগুলি স্থির করিয়া, তাহার সাধনে প্রাণপণে যত্ন করিতেন; যে কার্য কর্তব্য এবং সাধ্য বলিয়া বুদ্ধিতেন, কিছুতেই তাহা হইতে বিরত হইতেন না। সর্ উইলিয়ম গ্রে এ সকল কিছুই করিতেন না। যাহা হয় আপনি হউক, কেহ কল টিপিয়া দেয় ত কল চলুক—আমি কিছুর মধ্যে থাকিব না। নিজের বুদ্ধি, গ্রে সাহেব প্রায় খরচ করিতেন না; জমার অঙ্কে কিছু ছিল কি না বলা যায় না। নিজের যত্ন প্রায় তাঁহার কোন বিষয়ে ছিল না। তাঁহার দ্বারা যে কিছু সংকার্য সিদ্ধ হইয়াছে— তাহা কলে; তাঁহার দ্বারা যে কিছু অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহা কলে। তিনি উচ্চ শিক্ষার পোষক ছিলেন বলিয়া বাঙ্গালি মহলে বড় প্রশংসিত; কিন্তু বাঙ্গালি বাবুদিগের মত, আসল কথাটা কি তাহা বুঝেন নাই; কেবল আর্টিকিন্সন সাহেব কল টিপিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া কলের পুতুলী সর্ উইলিয়ম গ্রে উচ্চ শিক্ষার পোষকতা করিয়াছিলেন, ঘাড়ির মূরদ ঘাড়ি পিটিয়া দিয়া কলে লুকুকাইয়াছিলেন।

এমন নহে যে, সর্ জর্জ কাম্বেলের সময় কলে শাসন একেবারে ছিল না। শাসনের কল চিরকাল বজায় আছে; যিনি ইচ্ছা তিনি শাসনকর্তা হউন, সে কল মধ্যে মধ্যে বাতাসে নড়বে; সকল শাসনকর্তাকেই শাসনের কল চালাইয়া কতকগুলি কার্য সম্পন্ন করিতে হইবে। তবে সর্ জর্জ কাম্বেল কলে সিদ্ধ তত্ত্বগুলি অবশ্যগ্রাহ্য মনে করিতেন না; ইচ্ছানুসারে তাহা ত্যাগ করিতেন; ইচ্ছানুসারে তত্ত্বস্থানে নূতন সিদ্ধান্ত আদিষ্ট করিতেন। সর্ জর্জ কাম্বেল কলে নিজে চালাইতেন, স্বয়ং কলের অংশ ছিলেন না।

সর্ উইলিয়ম গ্রে সকলের মন রাখিয়া কাজ করিতেন; গালিগালাজকে বড় ভয় করিতেন। সম্বাদপত্রের ভয়ে তটস্থ ছিলেন; ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আসোসিয়েশনকে মূরদ্বি বলিয়া মানিতেন। সূখ্যাতির আশায় এবং গালির ভয়ে, তিনি সম্বাদপত্রের আজ্ঞাকারী ছিলেন; ব্রি, ই,

সর্ উইলিয়ম গ্রে ও সর্ জর্জ কাম্বেল

আসোসিয়েশনের প্রধান মেম্বরদিগের কেনা বেচার মধ্যে ছিলেন। সর্ জর্জ কাম্বেল, কাহারও নিকট সুখ্যাতি খুঁজিতেন না; কাহারও অনুরোধ রাখিতেন না। সম্বাদপত্র সকলকে ঘৃণা করিতেন, ব্রিটিশ ইং আসোসিয়েশনকে ব্যঙ্গ করিতেন। অতএব একজন যে লোকের প্রিয়, আর একজন অপ্ৰিয় হইবেন ইহা সহজেই অনুমেয়।

সর্ উইলিয়ম গ্রে কিয়দংশে প্রিয়বাদী ছিলেন, সর্ জর্জ কাম্বেল বড় অপ্ৰিয়বাদী ছিলেন। সকলকে কটু বলায় সর্ জর্জ কাম্বেলের বিশেষ আমোদ ছিল। তাঁহার গুরুতর অহঙ্কারই এই অপ্ৰিয়বাদিত্বের একটি প্রধান কারণ। তিনি জানিতেন যে, পৃথিবীতে বুদ্ধিমান্ পণ্ডিত এবং বিজ্ঞ, একা সর্ জর্জ কাম্বেল; আর সকল মনুষ্যই মূর্খ, নির্বোধ, অসার, ভণ্ড এবং স্বার্থপর। তিরস্কারই তাহাদের প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার। এইরূপ তমোভিত্ত হইয়া সর্ জর্জ কাম্বেল কাহারও পরামর্শ গ্রাহ্য করিতেন না। নিজেও দেশের অবস্থা কিছুই জানিতেন না। অথচ সকল বিষয়েই আত্মবুদ্ধিমত মীমাংসা করিয়া হস্তক্ষেপ করিতেন। তাহাতে অনেক অনিষ্ট ঘটাইয়াছেন।

সর্ জর্জ কাম্বেল এদেশীয়গণকে বিশেষ ঘৃণা করিতেন। তিনি বিবেচনা করিতেন, ইহারা অকর্মণ্য—কোন গুরুতর ভারের অযোগ্য। এই ঘৃণা, তাঁহার শাসনকার্যের আর একটি ঘোরতর বিঘ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যাহার প্রতি ঘৃণা আছে তাহার সুখ দুঃখের ভাগী হওয়া যায় না, প্রজার সুখ দুঃখের ভাগী না হইলে, কখন প্রজার সুখ বৃদ্ধি, দুঃখ নিবারণ করা যায় না।

সর্ উইলিয়ম গ্রে, ও সর্ জর্জ কাম্বেল উভয়েই স্বেচ্ছাচারী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। যিনি যাহা ধরিতেন, তিনি তাহা আর ছাড়িতে চাহিতেন না। দুই জনের “রোখ” বড় ভয়ানক ছিল—দণ্ড প্রণয়নের সাধ দুই জনেরই বড় গুরুতর ছিল। দুই জনেরই একটি নিতান্ত নিন্দনীয় দোষ ছিল যে, বিনাপরাধেও দণ্ডবিধান করিতেন। বিশেষ সর্ জর্জ কাম্বেলের ন্যায়নিষ্ঠতা কিছুই ছিল না।

স্থূল কথা এই যে, সর্ জর্জ কাম্বেল অত্যন্ত গর্বিত, আত্মাভিমानी, কৃষ্ণচর্মে ঘৃণাবিশিষ্ট, পরোপদেশে বিরক্ত, স্বেচ্ছাচারী, অপ্ৰিয়বাদী, অপ্ৰিয়কারী, অন্যায়পর শাসনকর্তা ছিলেন। সর্ উইলিয়ম গ্রে এত দোষ ছিল না; তিনি কেবল স্থূলবুদ্ধি ছিলেন; কোনরূপে লোকের মন রাখিয়া, কলে শাসন করিয়া, নিন্দার হাত হইতে মুক্তিলাভ তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

গুণ পক্ষে, সর্ জর্জ কাম্বেল সাহেবের নিতান্ত অভাব ছিল না। তিনি বুদ্ধিমান্, সুপণ্ডিত, পরিশ্রমী, এবং অধ্যবসায়সম্পন্ন। দুর্ভিক্ষের ব্যাপারে দেখা গিয়াছে, তিনি ক্ষিপ্ৰকারী এবং দূরদর্শী। তিনি সাম্যবাদী। প্রজার কোন মঙ্গল সিদ্ধ করিয়া থাকুন, বা না থাকুন, তিনি প্রজার হিতৈষী। সর্ উইলিয়ম গ্রে গুণের মধ্যে কেবল ইহাই আমাদের স্মরণ হইতেছে যে, তিনি অপেক্ষাকৃত নিরপেক্ষ ছিলেন। সর্ জর্জ কাম্বেলের মত বহু গুণে গুণবান্ ও বহু দোষে দোষী শাসনকর্তা কেহই এদেশে আসেন নাই; সর্ উইলিয়ম গ্রে মত দোষশূন্য ও গুণশূন্য কেহ আসেন নাই। গুণবান্ ও দোষযুক্তের শত্রু অনেক, নিন্দেদা ও নিগূর্ণের শত্রু থাকে না। সর্ জর্জ কাম্বেলের নিন্দা এবং সর্ উইলিয়ম গ্রে সুখ্যাতির কারণই এই।

কিন্তু কিছু বিবেচনা করিয়া দেখিলে, সে নিন্দা ও সুখ্যাতির সকল কারণ বজায় থাকে না। দুই একটা উদাহরণের দ্বারা এ কথা প্রতিপন্ন করিতেছি।

রোডশেষের আইন প্রচার করার জন্য সর্ জর্জ কাম্বেল বিশেষ নিন্দিত, কিন্তু এ বিষয়ে সর্ জর্জ কাম্বেলের দোষ কি? তিনি কেবল উপরিস্থ কর্মচারীর আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছিলেন। রোডশেষের দায়ী ডিউক্ অব আর্গাইল; অধস্তন কর্মচারীর সাধ্য নাই উপরিস্থ কর্মচারীর আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন। সর্ জর্জ কাম্বেল রোডশেষ বিধিবদ্ধ করিয়া অলঙ্ঘনীয় আজ্ঞাপালন করিয়াছেন মাত্র।

নূতন কার্যবিধি আইনের দুইটি নিয়মের জন্য সর্ জর্জ কাম্বেল নিন্দিত হইয়া থাকেন। প্রথম, জুরির বিচারের অলঙ্ঘনীয়তার উচ্ছেদ; দ্বিতীয়, সরাসরি বিচারের প্রথা।

সরাসরি বিচার প্রথার আমরা অনুমোদন করি না। অনুমোদন করি না, তাহার কারণ এই যে, এ দেশীয় বিচারকগণ অনেকেই এই ক্ষমতার অযোগ্য। কিন্তু বিচারক অযোগ্য বলিয়া আইন

বিক্রম রচনাবলী

অসম্পূর্ণ থাকিবে কেন? একটি কথা বিশেষ বিবেচনা করা আবশ্যিক। যেরূপ লিখিত বিচারপ্রণালী প্রচলিত, তাহাতে একটি ফৌজদারী মোকদ্দমা করিতে অনেক বিলম্ব হয়। বিচারকেরা যে কয়েকটির বিচার করিতে পারেন, সেই কয়টির বিচার করিয়া অর্বাশেষ্টের দিন ফিরাইয়া দেন। এইরূপ অনেক মোকদ্দমার দিন, পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া যায়। অর্থী প্রত্যর্থী অনেকবার কষ্ট পাইয়া, রফা করিয়া চলিয়া যায়। না হয়, সাক্ষী পলায়; নয়, ধনী পক্ষ সময় পাইলে অর্থ ব্যয় করিয়া সাক্ষীগণকে বশীভূত করে। এইরূপে বিচারকের অনবকাশে অনেক মোকদ্দমার বিচার একেবারে হয় না। ইহার দুইটি মাত্র উপায় সম্ভবে; প্রথম, বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি; দ্বিতীয় বিচারকের অবকাশ বৃদ্ধি। প্রথম উপায়, অর্থব্যয়সাপেক্ষ; বিচারসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে গেলে, আবার নতুন টেক্স বসাইতে হয়। টেক্সের নামে লোকের যেরূপ ভয়, টেক্স বসিলে লোকের যেরূপ কষ্ট, টেক্সের জন্য গবর্ণমেন্টের উপর প্রচার যেরূপ অসন্তোষ তাহাতে আর টেক্স বসান সম্ভব নহে। সুতরাং বিচারকের সংখ্যা বাড়াইবার কোন উপায় নাই। অতএব বিচারকের অবসর বৃদ্ধি ভিন্ন এ অবিচার নিবারণের উপায়ান্তর নাই। বিচারকের অবসর বৃদ্ধির একমাত্র উপায় আছে। যাহাতে মোকদ্দমায় অল্প সময় লাগে, তাহা করিলেই অবসর বৃদ্ধি হইতে পারে। এই জন্য সরাসরি বিচারের সৃষ্টি। ইহার অন্য কোন উপায় নাই—কেবল কতকগুলি মোকদ্দমায় লেখাপড়ার অল্পতা করা এক মাত্র উপায়। যদি বল, আপিল উঠিয়া গেল কেন? উত্তর, প্রমাণ লিপিবদ্ধ না থাকিলে কি দেখিয়া আপিল আদালত বিচার নিষ্পত্তি করিবেন।

জুরির বিষয়েও একটি বিশেষ কথা আছে। যদি হাঁড়ি গড়া, ঘটি গড়ায় নৈপুণ্য শিক্ষার অধীন, তবে বিচারকার্যেই শিক্ষার প্রয়োজন নাই, এ কথা নিষেধ বা কুসংস্কারাবিষ্ট লোকেই বলিবে। বিচারকার্য শিক্ষিত জজের দ্বারা হওয়াই কর্তব্য—যে অনেক দিন ধরিয়া কোন একটি কাজ অভ্যাস করিয়াছে, তাহাকেই শিক্ষিত বলিতেছি। যদি কাঁসারীকে ঘটি গড়িতে না দিয়া, তাঁতিকে কাপড় বুনিতে না দিয়া, পাঁচজন মাটি কাটা মজুরকে দিয়া ঘটি গড়ান, বা বস্ত্র বুনান ভাল না হয়, তবে যে বিচারকার্য শিল্পকর্মসাপেক্ষা শতগুণে কঠিন, তাহাতেই কি কেবল শিক্ষিতাপেক্ষা অশিক্ষিতের কার্য ভাল? অনেকে বলেন, এক জন বিচারকের উপর নির্ভর করিলে ভুলের সম্ভাবনা, অতএব এক জন জজের অপেক্ষা পাঁচ জন জুরির বিচার ভাল। ইহা বলিলে বলিতে হয় যে, একজন নিউটন অপেক্ষা পাঁচ জন পাঠশালার গুরু গণনায় ভাল, এক জন হক্সলী অপেক্ষা পাঁচটি নেটিব ডাক্তার শারীরতত্ত্বে ভাল, এক জন কার্লিডাস অপেক্ষা বাঙ্গালা সম্বাদপত্রের পাঁচ জন পত্রপ্রেমক কবিভ্বে ভাল। আমরাইগের সংস্কার আছে যে, যাহা বিলাতী তাহাই ভাল, বিলাতে জুরির প্রথা প্রচলিত আছে, সুতরাং আমাদের দেশেও ঠিক সেই জুরির বিচার চালাইতে হইবে! এরূপ কুসংস্কারাবিষ্ট লোকে জানেন না যে, ইংলণ্ডে যখন বিচারকেরা পক্ষপাতী ছিলেন, ধনীর বশীভূত হইয়া দীনের অন্যায় দণ্ড করিতেন, তখন দীনের রক্ষার্থ দীনের দ্বারা দীনের বিচার, ধনীর দ্বারা ধনীর বিচার, সমানের দ্বারা সমানের বিচার, এই প্রথা সৃষ্ট হইয়াছিল। এইক্ষণে ইংলণ্ডে সে অবস্থা নাই, কিন্তু ইংলণ্ডের ন্যায় দেশাচারপ্রিয় দেশে দেশাচার শীঘ্র লোপ পায় না বলিয়াই উহা অদ্যাপি চলিতেছে। এবং কতকগুলি অনুকরণভঙ্গ দেশেও গৃহীত হইয়াছে। এক্ষণে ইংলণ্ডীয় কৃতবিদ্য চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ জুরির বিচারের প্রথার বিরোধী হইয়া দাঁড়াইতেছেন। ভারতবর্ষ, বিশেষ প্রকারে জুরির বিচার প্রথার অযোগ্য। জুরির সৃষ্টি হইয়া অর্বাধি ভারতবর্ষে অবিচার হইতেছে—দোষী দোষ করিয়া, সেসন হইতে প্রায় খালাস পাইয়া আসিতেছে—হুগলীতে নবীনের বিচার, ইহার একটি জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ। এই ঘোর অবিচার নিবারণের জন্যই সর্ জর্জ কাম্বেল জুরির আইনের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করাইয়াছেন। সে জন্য তাঁহার নিন্দা না করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতে হয়। তিনি যে জুরির প্রথার একেবারে উচ্ছেদ করেন নাই, ইহাতেই আমরা দুঃখিত।

কার্যবিধি আইন সম্বন্ধে আর একটি কথা আমরাইগের বলিতে বাকি আছে। ব্রিটিশ-ভারতবর্ষীয় রাজ্যে সর্বাপেক্ষা তিমিরময় কলঙ্ক—দেশী বিদেশীতে বিচারাগারে বৈষম্য। দেশীর জন্য এক আইন আদালত—সাহেবের জন্য ভিন্ন আইন আদালত। এই লজ্জাকর কলঙ্ক মেকলে হইতে লরেন্স পর্যন্ত অনেকে অপনীত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন—কেহ শস্ত্র হয়েন নাই। সর্ জর্জ কাম্বেল হইতেই সেই কার্য কিয়দংশে সিদ্ধ হইতেছে। এ বিষয়ে তিনি দেশীয় লোকের পরম বন্ধুর কার্য করিয়াছিলেন। অন্য কেহ করিলে, এত দিন তাঁহার

বঙ্গে দেবপূজা—প্রতিবাদ

সুখ্যাতিতে দেশ পুরিয়া যাইত। সর্ জর্জ কাম্বেল এ কার্য করিয়াছেন বলিয়া সে কথার কোন উচ্চবাচ্য নাই।

উচ্চশিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ তাঁহার আর একটি নিন্দার কারণ। যিনি কোন প্রকার শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করেন, তিনি মনুষ্যজাতির শত্রুর মধ্যে গণ্য। তবে ইহা স্মরণ করিতে হইবে যে, সকল মনুষ্যেরই শিক্ষায় সমান অধিকার। শিক্ষায় ধনীর পুত্রের যে অধিকার, কৃষকপুত্রের সেই অধিকার। রাজকোষ হইতে ধনীদিগের শিক্ষার জন্য অধিক অর্থব্যয় হউক, নিধনদিগের শিক্ষায় অল্প ব্যয় হউক, ইহা ন্যায়বিগর্হিত কথা। বরং নিধনদিগের শিক্ষার্থ অধিক ব্যয়, এবং ধনীদিগের শিক্ষার্থ অল্প ব্যয়ই ন্যায়সঙ্গত; কেন না ধনীগণ আপন ব্যয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু নিধনগণ, সংখ্যায় অধিক, এবং রাজকোষ ভিন্ন অনন্যগতি। কিন্তু ভারতবর্ষীয় ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট পূর্বাধিকার শিক্ষার্থ যে প্রণালীতে ব্যয় করিয়া আসিয়াছেন, তাহা ন্যায়ানুসৃত নহে। ধনীর শিক্ষার্থই সে ব্যয় হইয়া আসিতেছে; দরিদ্রের শিক্ষার্থ প্রায় নহে। যখন ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেন্ট হইতে এ প্রথা পরিবর্তন করিয়া, ধনীর শিক্ষার ব্যয়ের লাঘব করিয়া, দরিদ্র শিক্ষার ব্যয় বাড়াইবার প্রস্তাব হইয়াছিল, তখন সর্ উইলিয়ম গ্রে “উচ্চশিক্ষা! উচ্চশিক্ষা!” করিয়া সে প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া, দেশের লোকের প্রিয় হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু দেশের মঙ্গল করেন নাই। যদি উচ্চশিক্ষার ব্যয় হইতে কিছু টাকা লইয়া তাহা দরিদ্রশিক্ষায় ব্যয় করিবার জন্য সর্ জর্জ কাম্বেল উচ্চশিক্ষার ব্যয় কমাইয়া থাকেন, তবে আমরা তাঁহার নিন্দা করিতে পারি না।

আরও কয়েকটি বিষয়ে সমালোচনার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু স্থানাভাবে এ প্রস্তাবের আর সম্প্রসারণ করিতে পারিলাম না। উপসংহারে বক্তব্য যে, যদি কেহ আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করে যে, সর্ জর্জ কাম্বেলের কৃত এমন কি কার্য আছে যে তজ্জন্য সর্ জর্জের কিছু প্রশংসা করিতে পারি? আমরা তাহা হইলে বলিব যে, দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে তিনি উপকার করিয়াছেন, ব্রিটিশজাত প্রজাকে এতদেশীয় আদালতের বিচারাধীন করিয়াছেন, প্রিন্সিপ্যাল আয় ব্যয়, তাঁহার হস্তে যেরূপ সুনিয়মবিশিষ্ট ছিল। পক্ষান্তরে যদি কাহাকে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, সর্ উইলিয়ম গ্রে কৃত এমন কোন কার্য আছে যে, তজ্জন্য আমরা তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া প্রশংসা করিতে পারি, তাহা হইলে তিনি কি উত্তর দিবেন? উচ্চশিক্ষার পক্ষ সমর্থন?

অনেকে এই প্রস্তাব পাঠ করিয়া লেখকের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইবেন। এদেশীয় লোকের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস আছে যে, সর্ জর্জ কাম্বেল, মনুষ্যাকারে পিশাচ ছিলেন। আমরা পিশাচ বলিয়া তাঁহাকে বর্ণিত করি নাই। তিনি বহু দোষযুক্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার দোষের বর্ণনার অভাব নাই। যাহার অনেক দোষ, তাহার কোন গুণ আছে কি না, এ বিষয়ের সমালোচনার ফল আছে—যে এক চক্ষে দেখে সে অন্ধের অন্ধ। এ প্রস্তাবের জন্য, যদি কেহ রাগ করেন, আমাদের আর্পিত নাই। কোন শ্রেণীর পাঠকের সন্তোষের কামনায় কোন প্রকার কথা এ পত্রে লিখিত হয় না; কোন শ্রেণীর পাঠকের অসন্তোষের আশঙ্কায় কোন কথা ব্যক্ত করিয়া বলিতে, এ পত্রের লেখকেরা সঙ্কুচিত নহেন। বর্তমান লেখক সর্ জর্জ কাম্বেল কর্তৃক কোন অংশে উপকৃত বা সর্ উইলিয়ম গ্রে কর্তৃক কোন অংশে অপকৃত নহেন; যাহা লিখিত হইল, সত্যানুরোধেই লিখিত হইল। এদেশে অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাইতেছে; ভ্রান্ত ভ্রান্তকে উপদেশ দিতেছে। যদি এই প্রবন্ধের সাহায্যে কেহ এ কথাটি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তাহা হইলেই এ প্রস্তাবের সার্থকতা হইল। শ্রীভজরাম।—‘বঙ্গদর্শন’, জ্যৈষ্ঠ ১২৮১, পৃ. ৭৩-৮২।

বঙ্গে দেবপূজা

প্রতিবাদ

কার্ত্তিক মাসের ভ্রমরে শ্রীঃ স্বাক্ষরিত “বঙ্গে দেবপূজা” নামক প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার কথা আছে।

শ্রীঃ মহাশয়ের কথার রীতিমত প্রতিবাদ করিতে গেলে যে সময় লাগে তাহা আমার নাই; এবং যে স্থান লাগে তাহা ভ্রমরের নাই! কিন্তু, কথা সহজ—সংক্ষেপে বলিলেই চলিবে।

বিশ্বকম রচনাবলী

তাঁহার স্থূল কথা এই যে, পৌত্তলিকমত, সত্য হউক, মিথ্যা হউক, ইহা বঙ্গদেশে প্রচলিত থাকাতে, দেশের বিশেষ উপকার আছে। কি কি উপকার?

তিনি, প্রথম উপকার, এই দেখান যে, দেবসেবার অনুরোধে সেবক ভাল খায় পরে। এবং এই কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য বৈষ্ণবের বাড়ী ব্রাহ্ম অতিথির উদাহরণ দিয়াছেন। শ্রীঃ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, যাহারা ঠাকুরপূজা করে না, তাহারা কি কখন ভাল খায় পরে না? শ্রীঃ মহাশয় কি কখন সাহেবদিগের আহার দেখেন নাই, তাহারা কয়টা শালগ্রামের ভোগ দেয়। হিন্দু পুণ্ডল পূজা করে, ইংরেজ করে না; ইংরেজ ভাল খায়, না হিন্দু ভাল খায়? ইংরেজ। তবে আহারাদির পারিপাট্য যে ঠাকুরপূজার ফল নহে, তাহা শ্রীঃ মহাশয়কে স্বীকার করিতে হইবে।

তিনি হয়ত বলিবেন, ইহা সত্য, তবে বাঙ্গালি এমন জানি যে, যাহা কিছু ভাল খায়, তাহা ঠাকুরের অনুরোধে, ঠাকুর না থাকিলে খাইত না। এ কথা মিথ্যা। অনেক ঘোর নাস্তিক, উৎকৃষ্ট আহার করে, এবং অনেক দৃঢ়ভক্ত কানাইয়া লালকে এমন কদম্ব ভোগ দেয় যে, তাহার গন্ধে ভূত প্রেত পলায়। স্থূল কথা এই যে, যাহার শক্তি ও সংস্কার আছে, সেই ভাল খায়। যে এখন ঠাকুরকে উপলক্ষ করিয়া ভাল খায়, বা খাওয়ায়, সে পৌত্তলিক না হইলে উদরের অনুরোধে ভাল খাইত, খাওয়াইত। শ্রীঃ মহাশয় দ্বিতীয় উপকারটি বঙ্গমহিলা সম্বন্ধে দেখাইয়াছেন। লিখেন, “প্রকৃত ঈশ্বরের নিকট থাকায় যে ফল, তাহা তাহাদের ফলিতেছে।” শ্রীঃ মহাশয় সে ফল কি আপনি জানেন? সে ফল পুরুষোত্তম, কাশী, প্রভৃতি তীর্থস্থানে প্রকটিত আছে। ঈশ্বরসামিধ্য হিন্দু মহিলার নিকট নিঃশঙ্কচিত্তে পাপ করিবার স্থান বলিয়া পরিচিত।

তিনি বলেন, সাকারে প্রার্থনা আন্তরিক হয়, নিরাকারে তত হয় না। কে বলিয়াছে? কেন হয় না? যাহাকে চাক্ষুষ মাটি বা পাতর দেখিতেছি, তাহার কাছে যদি আন্তরিক কাঁদিতে পারি, তবে যাঁহাকে চক্ষু দেখিতেছি না, কিন্তু মনে জানিতেছি তিনি ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন, কেন তাঁহার কাছে আন্তরিক কাঁদিতে না পারিব? কেন সেইরূপ সান্ত্বনা লাভ না করিব? শ্রীঃ, যুবতীর মুখে যে কয়টি কথা বসাইয়াছেন, তাহা মেয়েলি কথা বলিয়া উত্তর দিতে ইচ্ছা করে না। যুবতী স্ত্রীবুদ্ধিতে অলীক কথা বলিয়াছে, ভক্ত নিরাকারবাদীর অন্তঃকরণ বুদ্ধিতে পারে না বলিয়া বলিয়াছে। দেবতার কাছে আছি বলিয়া, তাহার যে সুখ, যে সাহস, সর্বব্যাপী ঈশ্বরের কাছে আছি বলিয়া নিরাকার ভক্তেরও সেই সুখ, সেই সাহস। বিশ্বাসের দার্ঢ্য থাকিলে সাকার নিরাকারে কোন প্রভেদ নাই।

তৃতীয় উপকার, তারকেশ্বর, বৈদ্যনাথ রোগ ভাল করেন, শ্রীঃ বলেন, রোগ বিশ্বাসে ভাল হয়, বিশ্বাস দেবতার উপর। যদি বিশ্বাসে রোগ ভাল হয়, তবে বিশ্বাসযোগ্য ডাক্তারের সংখ্যা বাড়িলেই দেবতার পদচ্যুত হইতে পারেন।

চতুর্থ উপকার, উৎসব, যথা দুর্গোৎসবাদি। জিজ্ঞাসা করি এই হতভাগ্য অন্ধকৃষ্ণ, বৃথা হট্টগোলে ব্যতিব্যস্ত বঙ্গসমাজে এতটা উৎসবের কি প্রয়োজন আছে? এখন কতকগুলি কঠিন-হৃদয়, ভোগপরাঙ্মুখ, উৎসববিবর্ত সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় না হইলে, ভারতবর্ষের কি উদ্ধার হইবে?

পঞ্চম, শ্রীঃ বলেন এই উপধর্ম বঙ্গের সমাজবন্ধন; এ বন্ধন রাখিয়া, সমাজ রক্ষা কর। বঙ্গসমাজবন্ধন ছিন্ন করিয়া, সমাজ ভঙ্গ করা, বিচলিত, বিপ্লুত করারই প্রয়োজন হইয়াছে; এই খইয়ে বন্ধনে বাঙ্গালির প্রাণ গেল। এ পচা গোরুর দড়ি আর আমাদের গলায় রাখিও না। যদি দেবতাপূজাই এই নরক তুল্য সমাজের মূল গ্রন্থি হয়, তবে আমি বলি যে, শীঘ্র শাণিত ছুরিকার দ্বারা ইহা ছিন্ন কর। নূতন সমাজ পত্তন হউক।

রূপক একটি ভ্রমের কারণ। “বন্ধন” শব্দটি ব্যবহার করিলে লোকে মনে করিবে “বড় আঁটাআঁটি—দড়ি ছাড়িস না, বাঁধন ঠিক রাখিস।” বস্তুতঃ সমাজবন্ধন মানে কি? শ্রীঃ কি মনে করেন যে, দেবতার পূজা উঠিয়া গেলেই, সমাজ খসিয়া পড়িবে, সমাজের লোক সকল, সমাজ ছাড়িয়া, গোশালাবিমুক্ত গোরুর ন্যায় বনের দিকে ছুটিবে? তাহা নহে। আসল কথা এই দেবতাভক্তি, বঙ্গসমাজের একটি ধর্মভিত্তি। এ ভিত্তি ভাঙ্গিয়া গেলে ধর্মের অন্য ভিত্তি হইবে; সমাজ নষ্ট হইবে না। যত দিন না নূতন ভিত্তি পত্তন হয়, তত দিন কেহ এই ভিত্তি বিনষ্ট করিতে পারিবে না। শিক্ষা এবং লোকবাদ (public opinion) এবং উৎকৃষ্ট নীতিশাস্ত্রজনিত নূতন ভিত্তি চারিদিকে স্থাপিত হইতেছে। শ্রীঃ বলেন, “ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রভৃতি যে কয়েকটি গুণের

বঙ্গে দেবপূজা—প্রতিবাদ

নির্মিত বাঙ্গালা বিখ্যাত, তাহা এই দেবতাদিগের প্রসাদাৎ।” ইত্যাদি। পুস্তকপূজা ভিন্ন যে ভক্ত্যাদি গার্হস্থ্য ধর্মের অন্য মূল নাই, এ কথা এরূপ অমূলক এবং অশ্রদ্ধেয় যে ইহার প্রতিবাদ আবশ্যিক করে না।

আমি সংক্ষেপতঃ দেখাইলাম যে, শ্রীঃ বঙ্গীয় দেবতাগণকে যে কয়েক বিষয়ে উপকারক মনে করেন, তাহা কেবল তাঁহার ভ্রান্তি। সকল ভ্রান্তি দেখাইতে গেলে, তিন নম্বর ভ্রমর আমাকেই ইজারা করিতে হইবে। কিন্তু বিচারার্থ আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি যে, কোন কোন বিষয়ে সাকার-পূজা উপকার করে। তাই বলিয়া কি সাকার পূজা অবলম্বনীয়? এ জগতে এমন অপকৃষ্ট সামগ্রী কি আছে যে, তদ্বারা কোন না কোন উপকার নাই। মদ্য উৎকৃষ্ট ঔষধ; অনেক বিষে উৎকৃষ্ট ঔষধ প্রস্তুত হয়; তাই বলিয়া কি মদ্য এবং বিষ নিত্য সেবা করা কর্তব্য? কয়েদী জেলে গিয়া, পরের খরচে খাইতে পায়, তাই বলিয়া কি কারাবাস কামনীয়? অপদ্রকের ব্যয় অল্প, সেই জন্য কি অপদ্রকতা কামনীয়? অনেক স্ত্রীলোক অসতী হইয়াই পুত্রবতী হইয়াছে; তাহাতে কি অসতীত্ব ইষ্টবস্তু হইল? সাকার পূজায় কিছুর কিছুর উপকার আছে বলিয়াই কি সাকার পূজা প্রচলনীয় বলিয়া সিদ্ধ হইল?

সকলেরই কিছুর শুভ ফল আছে, সকলেতেই কিছুর অশুভ ফল আছে। শুভাশুভের তারতম্য বিচার করিয়া, কোনটি কামনীয়, কোনটি পরিহার্য মনুষ্যে বিচার করে। একটি গেল, তাহার স্থানে আর একটি হইল; যেটি ছিল, তাহার যে সকল শুভ ফল, তাহা আর রহিল না, কিন্তু যেটি হইল, তাহার জন্য নতুন কতকগুলি শুভ ঘটবে। এইগুলি যদি পূর্বে শুভের অপেক্ষা গুরুতর হয়, তবে ইহাই বাঞ্ছনীয়। সাকার পূজার শুভ ফল অনেক থাকিতে পারে, কিন্তু নিরাকার পূজার শুভফল যে তদপেক্ষা গুরুতর নহে, তাহার আলোচনায় শ্রীঃ একেবারে প্রবৃত্ত হইবেন নাই।

যখন এদেশে রেলের গাড়ি ছিল না, তখন ভ্রমণ পদব্রজে, নৌকায়, বা পাল্‌কীতে করিতে হইত। নৌকা বা পাল্‌কীতে যাতায়াতের দুই একটি সুফল ছিল—তাহা বাষ্পীয় যানে নাই। নৌকাযাত্রা স্বাস্থ্যকর। যেদেশ দিয়া রেইল গাড়িতে যাও তাহার কিছুই দেখা হয় না, গড়গড় করিয়া তাহা পার হইয়া যাও। পাল্‌কীতে বা পদব্রজে গেলে, সকল দেশ দেখিয়া যাওয়া যায়; তাহাতে বহুদর্শিতা এবং কৌতূহল নিবারণ লাভ হয়। তাই বলিয়া যে বলিবে রেলগাড়ি উঠাইয়া দাও, দেশের সর্বনাশ হইতেছে, তাহাকে শ্রীঃ কিরূপ বোদ্ধা বলিয়া গণ্য করিবেন? নিরাকারভক্তও তাঁহাকে সেইরূপ বোদ্ধা বলিয়া মনে করিতে পারে।

তিনি সাকার পূজার গুণ কতকগুলি দেখাইয়াছেন; দোষ একটিও দেখান নাই। তাহার দুই একটি অশুভ ফলের উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় হইতেছে। উল্লেখমাত্র করিব।

প্রথম, সাকার ধর্ম, বিজ্ঞানবিরোধী। যেখানে সাকার ধর্ম প্রচলিত, সেখানে জ্ঞানের উন্নতি হয় না। সেখানে সকল প্রশ্নেরই এক উত্তর—“দেবতায় করেন।” অন্য উত্তরের সন্ধান হয় না। অতএব সাকার পূজা জ্ঞানোন্নতির কষ্টক।

যদি কেহ বলেন যে, অনেক য়নানী এবং অনেক আর্ষ্য পণ্ডিত জ্ঞানের উন্নতি করিয়াছিলেন, তাঁহারা কি সাকারবাদী ছিলেন না? উত্তর, না—কেহই না। য়নানী তত্ত্বজ্ঞ দার্শনিক এবং বিজ্ঞানবেত্তাগণ, এবং আর্ষ্য মহর্ষিরা, যাঁহারা কিছু জ্ঞানের উন্নতি করিয়াছিলেন, সকলেই নিরাকারবাদী ছিলেন। সাকারবাদী কর্তৃক জ্ঞানের উন্নতি প্রায় দেখা যায় না।

দ্বিতীয়। সাকার পূজা, স্বানুবর্তিতার বিরোধী। চারিদিকে মনুষ্যচিত্তকে বাঁধিয়া, মনুষ্য-চরিত্রের স্ফূর্তি, উন্নতি এবং বিস্তৃতি লোপ করে।

তৃতীয়। জ্ঞান এবং স্বানুবর্তিতার গতি রোধ করিয়া, এবং অন্যান্য প্রকারে সাকার পূজা সমাজের গতিরোধ করে।

পক্ষান্তরে, ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, সাকার পূজার একটি গুরুতর সুফল আছে, শ্রীঃ তাহা ধরেন নাই। সাকার পূজা কল্প্য এবং সূক্ষ্ম শিল্পের অত্যন্ত পুষ্টিকারক। সাকারবাদীদিগের প্রধান কবিদিগের তুল্য কবি, নিরাকারবাদীদিগের মধ্যে একজন মাত্র আছেন—একা সেক্ষিপয়র। বঙ্গদেশেও, সাকার পূজার ফল, বৈষ্ণবকবিদিগের অপূর্ষ গীতিকাব্য।

শ্রীঃ সাকার নিরাকারের মধ্যে কোনটি প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনা তাহার মীমাংসা করেন নাই; আমিও তাহা করিব না। বৃষ্টি বিচার করিতে গেলে, দুয়ের একটিও টিকিবে না। ভক্তিতে

বাংকম রচনাবল

কৃষ্ণ পাওয়া যায়, কিন্তু তাকে কৃষ্ণ বা ঈশ্বর কাহাকেও পাওয়া যায় না। কিন্তু যদি দুইটির মধ্যে একটি প্রকৃত হয়, তবে যেটি প্রকৃত সেইটি প্রচলিত হওয়াই কৰ্তব্য, অপ্রকৃতির সহস্র শূভ ফল থাকিলেও তাহা প্রচলিত হওয়াই অকৰ্তব্য। যদি সাকার পূজাই প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনা হয়, তবে তৎপ্রদত্ত উপকার সকল এক এক করিয়া গণিবার আবশ্যিকতা নাই; তাহাতে কোন উপকার না থাকিলেও, সহস্র অনুপকার থাকিলেও তাহাই অবলম্বনীয়। আর যদি তাহা না হইয়া নিরাকার প্রকৃত ঈশ্বর স্বরূপ হয়, তবে সাকার পূজায়, সহস্র উপকার থাকিলেও, নিরাকার পূজায় কোন ইষ্ট না থাকিলেও, সাকার পূজা লুপ্ত হওয়াই উচিত। ইহার কারণ সত্য ভিন্ন অসত্যে কখন মঙ্গল নাই। সত্যই ধর্ম, সত্যই শূভ, সত্যই বাঞ্ছনীয়, সত্যমেব জয়তি। বঃ—‘ভ্রমর’, অগ্রহায়ণ ১২৮১, পৃ. ১৮১-৮৭।

কল্পতরু*

গদ্যোপন্যাসকে সচরাচর আমরা কাব্যই বলিয়া থাকি। কাব্যের বিষয় মনুষ্যচরিত্র। মনুষ্যচরিত্র ঘোরতর বৈচিত্র্যবিশিষ্ট। মনুষ্য স্বভাবতঃ স্বার্থপর, এবং মনুষ্য স্বভাবতঃ পরদুঃখে দুঃখী এবং পরোপকারী। মনুষ্য পশুবৃত্ত, এবং মনুষ্য দেবতুল্য। সকল মনুষ্যের চরিত্রই এইরূপ বৈচিত্র্যবিশিষ্ট; এমন কেহ নাই যে, সে একান্ত স্বার্থপর, এবং এমন কেহ নাই যে সে একান্ত স্বার্থবিস্মৃত পরহিতানুরক্ত; কেহই নিতান্ত পশু নহে, কেহই নিতান্ত দেবতা নহে। এই পশুত্ব ও দেবত্ব, একত্রে, একাধারে, সকল মনুষ্যেই কিয়ৎপরিমাণে আছে; তবে সর্বত্র উভয়ের মাত্রা সমান নহে। কাহারও সদৃগুণের ভাগই অধিক, অসদৃগুণের ভাগ অল্প, সে ব্যক্তিকে আমরা ভাল লোক বলি; কাহারও সদৃগুণের ভাগ অল্প, অসদৃগুণের ভাগ অধিক, তাহাকে মন্দ বলি। কিন্তু এইরূপ দ্বিপ্রকৃতিত্ব সকল মনুষ্যেরই আছে; মনুষ্যচরিত্রই দ্বিপ্রাকৃতিক; দুইটি বিষদৃশ ভাগে মনুষ্যহৃদয় বিভক্ত।

কাব্যের বিষয় মনুষ্যচরিত্র; যে কাব্য সম্পূর্ণ, তাহাতে এই দুই ভাগই প্রতিবিস্মিত হইবে। কি গদ্য, কি পদ্য প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থ মাগ্রেই এইরূপ সম্পূর্ণতাযুক্ত। কিন্তু কোন কোন কবি, এক একভাগ মাত্র গ্রহণ করেন। তাঁহারা যে মনুষ্যের দ্বিপ্রকৃতিত্ব অবগত নহেন, এমত নহে; তবে তাঁহারা বিবেচনা করেন, যে, যেমন একত্রে সমাবিষ্ট মনুষ্যচরিত্রের ভাল মন্দ অধীত এবং পর্যবেক্ষিত করা আবশ্যিক, তেমনি উহা পৃথক্ পৃথক্ করিয়া অধীত এবং পর্যবেক্ষিত করাও আবশ্যিক। যেমন একটি যুক্তবর্ণের উচ্চারণ শিখিবার পূর্বে যে বর্ণদ্বয়ের যোগে তাহা নিঃস্পন্দ হইয়াছে, তত্তৎ উচ্চারণ অগ্রে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া শিখা কৰ্তব্য, তেমনি মনুষ্যচরিত্রের অংশ-দ্বয়কে বিষদৃশ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ অধ্যয়ন করা বিধেয়। এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া কতকগুলি কবি মনুষ্যচরিত্রের অংশমাত্র গ্রহণ করেন। যাঁহারা মহদংশ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের গ্রন্থের এক বিশিষ্ট উদাহরণ বিষ্ণুর হৃদয়গোর গদ্যকাব্যাবলী। যাঁহারা অসদৃশ গ্রহণ করেন, তাঁহারা প্রায় রহস্যলেখক। ইঁহাদিগের চুড়ামণি সর্ বণ্টস্। ইঁহাদিগের গ্রন্থ সকল অতি উৎকৃষ্ট হইলেও, অসম্পূর্ণ কাব্য।

এই সম্প্রদায়ের কেবল দুই জন লেখক বাঙ্গালা ভাষায় সুপরিচিত; প্রথম টেকচাঁদ ঠাকুর; দ্বিতীয় হুতোম পেঁচা লেখক। অদ্য সেই সম্প্রদায়ের তৃতীয় লেখকের পরিচয় দিতেছি।

বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, একখানি মাত্র গ্রন্থ প্রচার করিয়া, বাঙ্গালায় প্রধান লেখকদিগের মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। রহস্যপটুতায়, মনুষ্যচরিত্রের বহুদর্শিতায়, লিপিতাত্ত্ব্যে, ইনি টেকচাঁদ ঠাকুর এবং হুতোমের সমকক্ষ, এবং হুতোম ক্ষমতালী হইলেও পরদ্বেষী, পরনিন্দক, সুনীতির শত্রু, এবং বিশুদ্ধ রুচির সঙ্গে মহাসমরে প্রবৃত্ত। ইন্দ্রনাথ বাবু পরদুঃখে কাতর, সুনীতির প্রতিপোষক, এবং তাঁহার গ্রন্থ সুরুচির বিরোধী নহে। তাঁহার যে লিপিকৌশল, যে রচনাচাতুর্য্য, তাহা আলালের ঘরের দুলালে নাই—সে বাক্শক্তি নাই। তাঁহার গ্রন্থে রঙ্গদর্শনপ্রিয়তার ঈষৎ মধুর হাসি ছত্রে ছত্রে প্রভাসিত আছে, অপাঙ্গে যে চতুরের বক্র দৃষ্টিটুকু পদে পদে লক্ষিত হয়, তাহা না হুতোমে, না টেকচাঁদে, দুইয়ের

* কল্পতরু। শ্রীইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা। ক্যানিঙ লাইব্রেরি। ১২৮১।

একেও নাই। তাঁহার গ্রন্থ রত্নময়, সর্বস্থানেই মনুজ্ঞা প্রবালাদি জ্বলিতেছে। দীনবন্ধু বাবুর মত তিনি উচ্চ হাসি হাসেন না, হৃতোমের মত “বেলেল্লাগিরিতে” প্রবৃত্ত হইলেন না, কিন্তু তিলাঙ্ক রসের বিশ্রাম নাই। সে রসও উগ্র নহে, মধুর, সর্বদা সহনীয়। “কল্পতরু” বঙ্গভাষায় একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

যাহাকে সম্পূর্ণ কাব্য বলিয়াছি, এ গ্রন্থ তাহার মধ্যে গণ্য নহে। যিনি মনুষ্যের শক্তি, মনুষ্যের মহত্ত্ব,—সুখের উচ্ছ্বাস, দুঃখের অন্ধকার দেখিতে চাহেন, তিনি এ গ্রন্থে পাইবেন না। যিনি মনুষ্যের ক্ষুদ্রতা, নীচাশয়, স্বার্থপরতা, এবং বুদ্ধির বৈপরীত্য দেখিতে চাহেন, তিনি ইহাতে যথেষ্ট পাইবেন। যিনি তমোভিত্ত অথচ ভীরু, নিষেধ, ভণ্ড, ইন্দ্রিয়পরবশ আধুনিক যুবা দেখিতে চাহেন, তিনি নরেন্দ্রনাথকে দেখিবেন। যিনি শঠ, বণ্ডক, লুন্ড, অপরিণামদর্শী, বাচাল, “চালাকদাস” দেখিতে চাহেন, তিনি রামদাসকে দেখিবেন। যে সকল বন্য জন্তুগণ অনতিপূর্বকালে সাহেবের কাছে নথি পড়িয়া অর্থ ও মেদ সঞ্চয় করিত, কালীনাথ ধরে, তাহারা জাজ্বল্যমান; এবং ধরপত্নী গৃহিণীর চুড়া। গবেশচন্দ্র নায়কের চুড়া। তাঁহার মত সুদক্ষ, অস্বার্থপর মনুষ্যরত্নের পরিচয়—পাঠক স্বয়ং লইবেন।

এই সকল চিত্র প্রকৃতিমূলক—কিন্তু তাহাদিগের কার্য আত্যন্তিকতাবিশিষ্ট। যে যাহাতে উপহাসের বিষয়, রহস্যলেখক তাহার সেই প্রবৃত্তিঘটিত কার্যকে আত্যন্তিক বৃদ্ধি দিয়া চিত্রিত করেন। এ আত্যন্তিকতা দোষ নহে—এটি লেখকের কৌশল। এই গ্রন্থে বিবৃত সকল কার্যই আত্যন্তিকতাবিশিষ্ট। গ্রন্থে এমন কিছুই নাই যে, আত্যন্তিকতাবিশিষ্ট নহে।

মনুষ্যহৃদয়ের যে সকল সৎপ্রবৃত্তি, গ্রন্থকার তাহা গ্রন্থমধ্যে একবারে প্রবেশ করিতে দেন নাই। মধুসূদন ভ্রাতৃবৎসল, এবং নিতান্ত নিরীহ—তদ্বিন্ম গ্রন্থোক্ত নায়ক নায়িকার কাহারও কোন সদগুণ নাই। মনুষ্যহৃদয়ের সদগুণের পরিচয়ও লেখকের অভিপ্রেত নহে। যাহা তাঁহার অভিপ্রেত তাহাতে তিনি সিদ্ধকাম হইয়াছেন বলিতে হইবে।

গল্পটি অতি সামান্য; সহজে বলিতে ছত্র দুই লাগে। আলালের ঘরের দুলাল ইহা অপেক্ষা বৈচিত্র্যবিশিষ্ট। আর আলালের ঘরের দুলাল উচ্চনীতির আধার—ইহা সেরূপ নহে। আলালের ঘরের দুলালের উদ্দেশ্য নীতি; কল্পতরুর উদ্দেশ্য ব্যঙ্গ। আলালের ঘরের দুলালের লেখক মনুষ্যের দুঃপ্রবৃত্তি দেখিয়া কাতর, ইনি মনুষ্যচরিত্র দেখিয়া ঘৃণাযুক্ত। কল্পতরুর অপেক্ষা আলালের ঘরের দুলালের সম্পূর্ণতা এবং উচ্চাশয়তা আছে।

যে গ্রন্থের আমরা এত প্রশংসা করিলাম, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া, লেখকের লিপিপ্ৰণালীর পরিচয় দিব। যে অংশ উদ্ধৃত করিলাম, গ্রন্থকার তাহাতে একটু বীভৎস রসের অন্যায় অবতারণা করিয়াছেন, এটি রুচির দোষ বটে। ভরসা করি অন্যান্য গুণে প্রীত হইয়া পাঠক তাহাকে মার্জনা করিবেন।

“মধুসূদন খর্ব্বাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ, কৃশ, এবং তাহার চুল কাফ্রির মত, এই অপরাধে নরেন্দ্রনাথ তাহাকে বিশেষ ভালবাসিতে পারিতেন না। এরূপ সহোদরকে বারংবার ‘পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত অগ্রজ মহাশয়’ বলিয়া পত্র লিখিতে ঘৃণা হইত, এই হেতু প্রতিবার বন্ধের পর বাটী হইতে কলিকাতা যাইবার সময়, যত দিন থাকিতে হইবে অনুমান করিয়া, খরচের টাকা একবারে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। পাছে নরেন্দ্রের কোন কষ্ট হইবে, এই ভাবিয়া মধুসূদনও যেমন করিয়া হউক সমস্ত টাকা সংগ্রহ করিয়া দিতেন।

দুমাস আড়াই মাস অন্তরে নরেন্দ্রনাথ বাটীতে নিজদেহের কুশল লিখিতেন। একবার, বহুকাল পত্র না পাইয়া মধুসূদন চিন্তাকুল হন, এবং পিসীর পরামর্শে নরেন্দ্রকে কলিকাতায় দেখিতে যান। নরেন্দ্রনাথ ইহাকে দুই দিবসের অধিক বাসায় থাকিতে দেন নাই, এবং বন্ধুবর্গের নিকট জ্যেষ্ঠকে বাটীর সরকার বলিয়া পরিচিত করেন, ইহা আমরা উত্তমরূপে জানি। নরেন্দ্রনাথ সেই অবধি জ্যেষ্ঠের প্রতি অনিবার্য ঘৃণাকে হৃদয়ে লালনপালন করিতে লাগিলেন।

পূর্ব পূর্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে, নরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় কি কি করিয়া অবশেষে কি রূপে সেই ভয়ঙ্কর রজনীতে তদীয় শ্রীচরণ-দ্বয়কে কণ্ট দিয়াছেন। ঐ সমস্ত ঘটনার বহুকাল, এমন কি ৪।৫ মাস পূর্ব হইতে নরেন্দ্রনাথ বাটীর কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ক্রমে অগ্রহায়ণ মাস শেষ হইল, পরীক্ষার কাল উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তথাপি নরেন্দ্র বাড়ী আসিলেন

বিশ্বকম রচনাবলী

না। ক্রমে পৌষ মাঘ মাসও গেল। তখন মধুসূদনের মনে বড়ই ভাবনা হইল। পিসী গৃহকার্য সমাপন করিয়া প্রতিদিন বিকালে কান্না ধরিলেন।

‘একে পিসী, তায় বয়সে বড়’ স্নাতরাং শঙ্করী ঠাকুরাণীকে আমরা কখন নাম ধরিয়া ডাকিব না। পিসী অথবা পিসীমা বলিতে থাকিব। হে হৃদয়গ্রাহিপাঠক মহাশয়! যদি আপনার পিসী—আপনাদের ‘পরমারাধ্য পরমপূজনীয়’ পিতামহের চিরবিধবা কন্যা থাকেন, তবেই আমাদের ভক্তির স্বরূপ বৃষ্টিতে সমর্থ হইবেন।

দিন যায়, রাত্রি আইসে; কিন্তু মধুসূদনের ‘ভাই নরেন্দ্র’ বাটী আইসে না। রাত্রি যায় দিন আইসে, কিন্তু পিসীমার ‘নরেন’ ঘরে আইসে না। দিন রাত্রির কেহ নাই, কাজেই তাহারা না চাইতে আইসে, না চাইতে যায়। আমাদের ‘নরেনের’ পিসী আছেন, স্নাতরাং তিনি কাঁদিয়াও নরেন্দ্রনাথকে পান না। পাইবেন কেমনে? ছেলের যখন ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে, তখন বাপ মায় পান না, তায়, পিসী কোন্ ছার?

মধুসূদন পিসীমার অনুরোধে তাঁহাদের গ্রামের গদিয়ান বাবুকে নরেন্দ্রনাথের সংবাদ জানিবার জন্য একখানি সজলনয়ন পত্র কলিকাতায় লিখিলেন। উত্তর আসিল যে অগ্রহায়ণ মাস অর্ধ গদিয়ান বাবু নরেন্দ্রনাথের কোন সমাচার পান নাই।

তখন বাড়ীতে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। পিসীমার নাকঝাড়তে উঠান সর্বদা সপ্ সপ্ করিতে লাগিল; ঘরের মিষ্টান্ন পর্যন্ত পিসীমার চক্ষের জলে লোণা হইতে লাগিল। শোক-সন্তপ্তা পিসী সর্বদাই নাক ঝাড়িতে আরম্ভ করিলে, প্রতিবেশিনীরাও তাঁহার বাড়ী যাওয়া পরিত্যাগ করিল।

পিসী মধুসূদনকে কলিকাতায় নরেন্দ্রের সন্ধান করিতে যাইবার জন্য বলিলেন। মধু একবার মাত্র কলিকাতায় গিয়াছিলেন; তখন গবেশ রায় সঙ্গে ছিল। এখন গবেশ বিদেশ গিয়াছেন; স্নাতরাং কলিকাতার গলির ভয়ে, বিনা গবেশ রায়ে, মধুসূদনের যাওয়া ঘটিল না।

একদিন রাত্রি-প্রভাতে পিসীমা ভারি মূখভার করিয়া শয্যা হইতে উঠিলেন, এবং গুণ্ গুণ্ স্বরে গৃহকার্য আরম্ভ করিলেন। কাজ সারা হইল, স্নানে যাইবার জন্য তেলের বাটি গামছা লইয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন; কিন্তু যাইতে পারিলেন না। পরচালায়, বাম হস্ত ভূমিতে পাতিয়া, দুই পা ছড়াইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন।

গ্রামের উত্তর পাড়ার একটি স্ত্রীলোক পরম্পরায় শুনিতে পাইল যে, মধুর পিসী কাঁদিতেছেন। ইহার একটু কবিকল্পনা ছিল; পাড়াগাঁয়ে অনেক স্ত্রীলোকেরই থাকে। ‘ঘটকদের নরেন্দ্র কাল্ রেতে বাড়ী এসেছিল, সকাল বেলা তারে সাপে খেয়েছে, তাই তার পিসী কেঁদে গাঁ মাথায় করেছে’ যাহাকে দেখে এই কথা বলিতে বলিতে সে ঘটকবাড়ী অভিমুখে চলিল। যখন পহুঁছিল, তখন বাড়ী লোকারণ্য; বোধ হয় যেন ব্রহ্মাণ্ড আর স্ত্রীলোক নাই। সকলেই বলিতেছে ‘অমন ছেলে হয় না, হবে না।’ ইহার মধ্যে কেহ আর এক জনের নিকট ‘সুদের পয়সা কটা’ চাহিতেছে। পিসীর দিকে যেই মূখ ফিরায়, অমনি তাহার চক্ষু ছলছল, কে যেন লক্ষা বাটীয়া দেয়; যেই বিমূখ হয়, অমনি ভাবান্তর যেন ‘পিসীর’ দুঃখের কথা তাহারা শনেও নাই। কিন্তু পিসীমা এক-চিন্তে এক-ভাবে, বসিয়া কেবল চীৎকার করিতেছেন। রোদনের বিরাম নাই, বৈজাত্য নাই। অল্পবয়স্কা একটি স্ত্রীলোক—সেও কাঁদিতে গিয়াছিল—ফিরিয়া যাইবার সময় বলিয়া গেল ‘বেটী বসে কাঁদছে, যেন আলকাত্রা মাখান বড় চরকা ঘুরছে।’

একটু একটু কাঁদিয়া যখন সকলেই একে একে চলিয়া যাইতে লাগিল, তখন পিসীমা রোদনের বেগ কিঞ্চিৎ সম্বরণ করিলেন, দুটি একটি কথা কহিতে লাগিলেন।

‘আহা বাছা আমার এত গুণের ছেলে! এমন ছেলে কি কারও হয়! ভাই মরেছে, সয়েছে। বলি, নরেন্দ্র বড় হবে, আমার সকল দুঃখ যাবে,—’ পিসীমা নাক ঝাড়িলেন, একটি স্ত্রীলোকের গায় লাগিল, সে নাক তুলিয়া চলিয়া গেল। পিসীর কি দুঃখ, নরেন্দ্র হইতে কেমন করিয়াই বা সে দুঃখ মোচন হইবে, তাহা আমরা জানি না। পিসী-লোকের জ্ঞান পিসীদেরই আছে, নরলোকের সম্ভবে না।

পিসী পুনশ্চ চীৎকার ধরিলেন; আবার কান্নার বেগ থামাইলেন, আবার কথা আরম্ভ হইল। ‘নরেন আমার পিসীমা বৈ পিসী বলে না, এমন ছেলে কোথায় পাব? আর কি এমন হবে?’

নরেন তুই একবার দেখা দে, আবার যাস্। প্রাণ না বেরুলে যে মরণ হয় না। এখন আমি কোথায় যাই?’

নানা ছাঁদে বিনাইয়া পিসী কাঁদতেছেন, কথা কহিতেছেন, আবার কাঁদতেছেন। কিন্তু ইহার মূল কারণ কেহই কিছ্ জানিতে পারে না। অবশেষে এক জন বৃদ্ধা বলিল, ‘যা হয়েছে, তা ফেরবার নয়, এখন তোমার মধু বেঁচে থাকুক, আশীর্বাদ কর। কপালে যা ছিল, হ’ল; কাঁদলে কি হবে। শুনলে কবে? এ দারুণ কথা ব’ল্লে কে, কেমন ক’রেই বা ব’ল্লে?’

পিসীমা চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন, ‘ষাট! ষাট! বৃড়ীর দাস আমার! তা কেন হবে? ছেলের খপর পাই নাই; তার রেতে স্বপন দেখেছি, তাই বড় ভাবনা হয়েছে।’

নরেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় নাই, একথা তখন জানিতে পারিয়া দুই জন অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল। পিসী তখন স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন।

‘নিজের ভাল দেখিলে মন্দ হয়’ তাহাতেই পিসীর এত শোক দুঃখ উপস্থিত হইয়াছিল। রাত্রি-শেষে পিসী স্বপ্ন দেখেন যে, মূল্যকের ছোট লাটসাহেব মরেছে, তাতে লাটহস্তী ক্ষেপে বেড়ায়। পথে নরেন্দ্রনাথকে দেখিতে পাইয়া, তাহাকে শৃঙের দ্বারা মস্তকে তুলিয়া লইয়া গিয়া লাটসিংহাসনে বসাইয়া দেয়, তাহার পর নরেন্দ্রনাথ মেম বিবাহ করিয়াছে। তাহাতে পিসীমা বলিলেন, ‘জাত যা’ক তবুও বউ নিয়ে ঘরে এস’—নরেন্দ্রনাথ এল না। তখন পিসী নরেন্দ্রনাথের হাতে ধরিয়া আনিতে চাহিলেন। নরেন্দ্র হাত ছাড়াইয়া লইল। অর্মানি পিসীর নিদ্রাভঙ্গ।

ইহাতেই পিসীর শঙ্কা, শঙ্কা হইতে দুঃখ, দুঃখ হইতে শোক, শোক হইতে গুণ্ গুণ্ স্বরে গৃহকার্য্য সারা, গুণ্ গুণ্ স্বর হইতে পরিশেষে পা ছড়াইয়া চীৎকার ধ্বনিতে কান্না ও পাড়ার লোক জোটা।

অনেক প্রবোধে পিসীমার কান্নার ‘ইতি’ হইল। আমরাও পাঠকবর্গকে বিরাম দিবার জন্য পরিচ্ছেদের উপসংহার করিলাম।—‘বঙ্গদর্শন’, পৌষ ১২৮১. পৃ. ৪১৫-২০।

বৃহৎসংহার*

এই মহাকাব্যের বিষয়, ইন্দ্রকৃত বৃহৎসংহার বধ। হেমবাবু পৌরাণিক বৃত্তান্তের অবিকল অনুসরণ করেন নাই—অনেক স্থানেই নিজ কল্পনাকে স্ফূর্তিত করিয়াছেন। পাতালে, বৃহৎসংহার, নির্বাসিত দেবগণ মন্ত্রণায় নিযুক্ত। এই স্থানে গ্রন্থারম্ভ। প্রথম সর্গ পড়িয়া অনেকেরই পাণ্ডিমোনিয়মে মন্ত্রণানিযুক্ত দেবদূতগণের কথা মনে পড়িবে। হেম বাবু স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, “বাল্যাবধি আমি ইংরাজিভাষা অভ্যাস করিয়া আসিতেছি, এবং সংস্কৃতভাষা অবগত নাই, সুতরাং এই পুস্তকের অনেক স্থানে যে ইংরাজি গ্রন্থকারদিগের ভাবসঙ্কলন এবং সংস্কৃতভাষার অনভিজ্ঞতা-দোষ লক্ষিত হইবে তাহা বিচিত্র নহে।” হেমবাবু, মিল্টনের অনুসরণ করিয়া থাকুন বা না থাকুন, তিনি এ অংশেও যে স্বকীয় কবিত্বশক্তির বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন, তাহা পাঠমাগ্রেই সহৃদয় ব্যক্তি বৃদ্ধিতে পারিবেন। “নিবিড়ধুম্রল ঘোর” সেই পাতালপূরীর মধ্যে, সেই দীপ্তশূন্য অমরগণের দীপ্তশূন্য সভা—অল্পশক্তির সহিত বর্ণিত হয় নাই। একটি শ্লোক বিশেষ ভয়ঙ্কর—

চারিদিকে সমুখিত অক্ষুট আরাব
ক্রমে দেব-বৃন্দমুখে ফুটে ঘন ঘন,
ঝটিকার পূর্বে যেন ঘন ঘনচ্ছবাস
বহে যুড়ি চারি দিক আলোড়ি সাগর।

স্বর্গভ্রষ্ট দেবগণ সেই তমসাচ্ছন্ন, ভীমশব্দপূর্ণ সভাতলে বসিয়া, পুনর্বার স্বর্গ আক্রমণের পরামর্শ করিতে লাগিলেন। দেবমুখে সন্নিবেশিত বাক্যগুলিতে একটি অর্থ আছে; বোধ

* বৃহৎসংহার কাব্য। প্রথম খণ্ড। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত। শ্রীক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা।

বঙ্কিম রচনাবলী

করি, সকলেই বিনা টিপ্পনীতে তাহা বঝিতে পারিবেন। অধিক উদ্ধৃত করিবার আমাদিগের স্থান নাই; উদাহরণস্বরূপ তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি।

“ধিক্ দেব! ঘৃণাশূন্য, অক্ষুণ্ণ-হৃদয়,
এত দিন আছ এই অন্ধতমপুরে;
দেবত্ব, বিভব, বীর্য্য, সর্ব্ব তেয়াগিয়া
দাসত্বের কলঙ্কেতে ললাট উজ্জ্বলি।

“ধিক্ সে অমরনামে, দৈত্যভয়ে যদি
অমরা পশিতে ভয় কর দেবগণ,
অমরতা পরিণাম পরিশেষে যদি
দৈত্য-পদরজঃ পৃষ্ঠে করহ ভ্রমণ।

“বল হে অমরগণ—বল প্রকাশিয়া
দৈত্যভয়ে এইরূপে থাকিবে কি হেথা?
চির অন্ধকার এই পাতাল প্রদেশে,
দৈত্য-পদ-রজঃ-চিহ্ন বক্ষে সংস্থাপিয়া?”

এই সর্গে অনেক স্থানে আশ্চর্য্য কবিত্ব প্রকাশ আছে, তাহা দেখাইবার আমাদিগের অবকাশ নাই। অন্যান্য সর্গ সম্বন্ধে অধিকতর বক্তব্য আছে।

এই দেবসমাজে ইন্দ্র ছিলেন না। তিনি কুমেরু শিখরে নির্যাতির আরাধনা করিতেছিলেন। অমরগণ বিনা ইন্দ্রেই পুনর্যুদ্ধ অভিপ্রেত করিলেন।

দ্বিতীয় সর্গ ইন্দ্রালয়ে। প্রথম সর্গে রৌদ্র ও বীর রসের তরঙ্গ তুলিয়া কুশলময় কবি সহসা সে ক্ষুণ্ণ সাগর শান্ত করিলেন। সহসা এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্যময়ী সৃষ্টি সম্প্রসারিত করিলেন। নন্দনবনে বৃহস্পতি ঐন্দ্রিলা, নবপ্রাপ্ত স্বর্গসুখে সুখময়ী—

রতি ফুলমালা হাতে দেয় তুলি,
পরিছে হরিষে সুষমাতে ভুলি,
বদন মণ্ডলে ভাসিছে ব্রীড়া।

এই চিত্রমধ্যে বসন্ত-পবনের মাধুর্য্যের ন্যায় একটি মাধুর্য্য আছে—কিসের সে মাধুর্য্য, পবন-মাধুর্য্যের ন্যায় তাহা অনির্ব্বচনীয়—স্বপ্নবৎ—

করিছে শয়ন কভু পারিজাতে
মৃদুল মৃদুল সুশীতল বাতে
মৃদিয়া নয়ন কুসুমে হেলি।

এই সুখশয্যায় শয়ন করিয়া, ঐন্দ্রিলা স্বামীর কাছে সোহাগ বাড়াইতে লাগিলেন। তিনি স্বর্গের অধীশ্বরী হইয়াছেন, তথাপি তাহার সাধ পূরে না—শচীকে আনিয়া দাসী করিয়া দিতে হইবে। বৃহস্পতির তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। এই কথোপকথন আমাদিগের তত ভাল লাগে নাই। ইন্দ্রজয়ী মহাসুরের সঙ্গে মহাসুরের মহিষী নন্দনে বসিয়া এই কথোপকথন করিতেছেন, গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে ইহা মনে থাকে না, মর্ত্ত্যভূমে সামান্য বঙ্গগৃহিণীর স্বামিসন্তোষণ বলিয়া কখন কখন ভ্রম হয়।

তৃতীয় সর্গে, বৃহস্পতির সভাতলে প্রবেশ করিলেন

নিবিড় দেহের বর্ণ মেঘের আভাস,
পর্ব্বতের চূড়া যেন, সহসা প্রকাশ—

“পর্ব্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ” ইহা প্রথম শ্রেণীর কবির উক্তি—মিল্টনের যোগ্য। বৃহস্পতির কাব্য মধ্যে এরূপ উক্তি অনেক আছে।—‘বঙ্গদর্শন’, মাঘ ১২৮১, পৃ. ৪৭২-৭৩।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

(সম্পাদকীয় উক্তি)

বহুসংখ্যক গ্রন্থ আমাদের নিকট অসমালোচিত রহিয়াছে। গ্রন্থকারগণও ব্যস্ত হইয়াছেন। কেন সে সকল গ্রন্থ এ পর্যন্ত সমালোচিত হয় নাই, তাহা যে বুঝে না, তাহাকে বুঝান দায়। বুঝাইতেও আমরা বাধ্য কি না তর্কিত সন্দেহ। কিছু বুঝাইলেও ক্ষতি নাই। প্রথম, স্থানাভাব। বঙ্গদর্শনের আকার ক্ষুদ্র; অন্যান্য বিষয়ের সন্নিবেশের পরে প্রায় স্থান থাকে না। দ্বিতীয় অবকাশ। আজ কালি বাঙ্গালা ছাপাখানা ছারপোকায় সঙ্গে তুলনীয় হইয়াছে; উভয়ের অপত্য বৃদ্ধির সীমা নাই, এবং উভয়েরই সন্তানসন্ততি কদর্য এবং ঘৃণাজনক। যেখানে ছারপোকায় দৌরাখ্য সেখানে কেহ ছারপোকা মারিয়া নিঃশেষ করিতে পারে না; আর যেখানে বাঙ্গালা গ্রন্থ সমালোচনার জন্য প্রেরিত হয়, সেখানে তাহা পড়িয়া কেহ শেষ করিতে পারে না। আমরা যত গ্রন্থ সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়া থাকি, তাহা সকল পাঠান্তর সমালোচনা করা যায়, এত অবকাশ নিষ্কর্মা লোকের থাকিতে পারে, কিন্তু বঙ্গদর্শনলেখকদিগের কাহারও নাই। থাকিবার সম্ভাবনাও নাই। থাকিলেও, বাঙ্গালা গ্রন্থমাত্র পাঠ করা যে যন্ত্রণা, তাহা সহ্য করিতে কেহই পারে না। “বহুসংহার” বা “কল্পতরু” বা তদ্বৎ অন্যান্য বাঙ্গালা গ্রন্থ পাঠ করা সুখের বটে, কিন্তু অধিকাংশ বাঙ্গালা গ্রন্থ পাঠ করা এরূপ গুরুতর যন্ত্রণা যে, তাহার অপেক্ষা অধিকতর দণ্ড কিছুই আমাদের আর স্মরণ হয় না।

অনেকে বলিতে পারেন, যদি তোমাদিগের এ অবকাশ বা ধৈর্য্য নাই, তবে এ কাজে রতী হইয়াছিলে কেন? ইহাতে আমাদের এই উত্তর যে, আমরা বিশেষ না জানিয়া এ দৃষ্কর্মা করিয়াছি। আর করিব না। বঙ্গদর্শনে যাহাতে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা আর না প্রকাশ হয় এমত চেষ্টা করিব।

আমাদের স্থূল বক্তব্য এই যে, আমাদের নিকট যে সকল গ্রন্থ এক্ষণে অসমালোচিত আছে বা যাহা ভবিষ্যতে প্রাপ্ত হইবে, তৎসম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা আর বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইবে না। কোন কোন গ্রন্থের সম্বন্ধে আমরা পূর্বে প্রথানুসারে সবিস্তারে সমালোচনা করিব।— ‘বঙ্গদর্শন’, মাঘ ১২৮১, পৃষ্ঠা. ৪৮০।

জ্ঞান সম্বন্ধে দার্শনিক মত*

ন্যায়দর্শনের সঙ্গে বাঙ্গালি মাত্রেরই একটি বিশেষ সম্বন্ধ আছে। যদি কেহ আমাদেরকে বলে যে, তোমরা এত বড়াই কর, কিন্তু কোন্ বিষয়ে তোমাদের পূর্বপুরুষেরা পৃথিবীবাসী অন্যান্য জাতির অপেক্ষা গৌরব লাভ করিয়াছিলেন, তাহা হইলে, আমরা আর কিছু বলিতে পারি বা না পারি, ন্যায়শাস্ত্রের উল্লেখ করিতে পারি। ইহাই বাঙ্গালিদিগের জাতীয় গৌরব। ভারতবর্ষীয় প্রত্নতত্ত্বের যতই গাঢ়তর অনুসন্ধান হইতেছে—ততই দেখা যাইতেছে যে সাহিত্যে, দর্শনে, গণিতশাস্ত্রে,—স্থাপত্যে, সঙ্গীতে, ব্যবস্থাশাস্ত্রে,—ঐশ্বর্য্যে, বাহুবলে—একদিন ভারতভূমি, ভূমণ্ডলে রাজস্বরূপা ছিলেন। কিন্তু সে গৌরবে বঙ্গদেশের অংশ মগধ কান্যকুব্জাদির ন্যায় নহে। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য মধ্যমপ্রকার—জয়দেব গোস্বামী ইহার চূড়া। মানবাদি ধর্মশাস্ত্র বঙ্গীয় নহে। যে স্থাপত্য জন্য ফর্গুসন সাহেব ভারতবর্ষীয়গণকে ভূমণ্ডলে অতুল্য বলিয়াছেন, বঙ্গদেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশে তাহা প্রচুরতর। যে সঙ্গীতের জন্য সেদিন আলদি স সাহেব, ভারতবর্ষকে পৃথিবীস্বরী বলিয়াছেন, তাহার চালনা বঙ্গদেশে চিরকালই সামান্য প্রকার। আর্থ্যভট্ট, ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি কেহই বাঙ্গালি নহে। কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রে বাঙ্গালিরা অদ্বিতীয়। উদয়নাচার্য্য বোধ হয়, বাঙ্গালি। রঘুনাথ শিরোমণি, মথুরানাথ তর্কবাগীশ, ভবানন্দ সিদ্ধান্ত-

* ন্যায় পদার্থ তত্ত্ব। বাঙ্গালা দর্শন। শ্রীহরিকিশোর তর্কবাগীশ প্রণীত। কলিকাতা। গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

বঙ্গীয় রচনাবলী

বাগীশ, কৃষ্ণদাস সার্বভৌম, গদাধর তর্কালঙ্কার, জগদীশ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বাঙ্গালি। গৌতম, কণাদ, কোন্ দেশবাসী তাহা নিশ্চিত করিবার কোন উপায় নাই—কিন্তু পরবর্ত্তী প্রধান নৈয়ায়িকদিগের মধ্যে অনেকেই বাঙ্গালি। নবদ্বীপে, ন্যায়শাস্ত্র যেরূপ মার্জিত এবং পরিপুষ্ট হইয়াছিল, এরূপ ভারতবর্ষের আর কোথাও হয় নাই। নবদ্বীপে, বাঙ্গালির প্রধান কীর্ত্তি ও অকীর্ত্তির জন্মভূমি। নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্রের অভ্যুদয়, নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের অভ্যুদয়—নবদ্বীপে বৈষ্ণব সাহিত্যের আকর—কৃষ্ণচন্দ্রীয় সাহিত্যও নবদ্বীপের নামে খ্যাত—আর, নবদ্বীপেই সপ্তদশ পাঠান কৃত বঙ্গবিজয়!—‘বঙ্গদর্শন’, ফাল্গুন ১২৮১, পৃ. ৪৮৭-৮৮।

কৃষ্ণচরিত্র*

বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় খণ্ডে মানস বিকাশের সমালোচনায় কথিত হইয়াছে যে, যেমন অন্যান্য, ভৌতিক, আধ্যাত্মিক বা সামাজিক ব্যাপার নৈসর্গিক নিয়মের ফল, কাব্যও তদ্রূপ। দেশভেদে ও কালভেদে কাব্যের প্রকৃতিগত প্রভেদ জন্মে। ভারতীয় সমাজের যে অবস্থার উক্তি রামায়ণ, মহাভারত সে অবস্থার নহে; মহাভারত যে অবস্থার উক্তি, কালিদাসাদির কাব্য সে অবস্থার নহে। তথায় দেখান গিয়াছে যে বঙ্গীয় গীতিকাব্য, বঙ্গীয় সমাজের কোমল প্রকৃতি, নিশ্চেষ্টতা, এবং গৃহসুখনিরতির ফল। অদ্য সেই কথা স্পষ্টীকরণে প্রবৃত্ত হইব।

বিদ্যাপতি, এবং তদনুবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিদিগের গীতের বিষয়, একমাত্র কৃষ্ণ ও রাধিকা। বিষয়ান্তর নাই। তজ্জন্য এই সকল কবিতা অনেক আধুনিক বাঙ্গালির অর্দ্রচিকর। তাহার কারণ এই যে, নায়িকা, কুমারী বা নায়কের শাস্ত্রানুসারে পরিণীতা পত্নী নহে, অন্যের পত্নী; অতএব সামান্য নায়কের সঙ্গে কুলটার প্রণয় হইলে যেমন অপবিত্র, অর্দ্রচিকর, এবং পাপে পাকিল হয়, কৃষ্ণলীলাও তাঁহাদের বিবেচনায় তদ্রূপ—অতি কদর্য্য পাপের আধার। বিশেষ এ সকল কবিতা অনেক সময় অশ্লীল, এবং ইন্দ্রিয়ের পুষ্টিকর—অতএব ইহা সর্ব্বথা পরিহার্য্য। যাঁহারা এইরূপ বিবেচনা করেন, তাঁহারা নিতান্ত অসারগ্রাহী। যদি কৃষ্ণলীলার এই ব্যাখ্যা হইত, তবে ভারতবর্ষে কৃষ্ণভক্তি এবং কৃষ্ণগীতি কখন এত কাল স্থায়ী হইত না। কেন না অপবিত্র কাব্য কখন স্থায়ী হয় না। এ বিষয়ের যথার্থ্য্য নিরূপণ জন্য আমরা এই নিগূঢ় তত্ত্বের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

কৃষ্ণ যেমন আধুনিক বৈষ্ণব কবিদিগের নায়ক, সেইরূপ জয়দেবে, ও সেইরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে। কিন্তু কৃষ্ণচরিত্রের আদি, শ্রীমদ্ভাগবতেও নহে। ইহার আদি মহাভারতে। জিজ্ঞাস্য এই যে মহাভারতে যে কৃষ্ণচরিত্র দেখিতে পাই, শ্রীমদ্ভাগবতেও কি সেই কৃষ্ণের চরিত্র? জয়দেবেও কি তাই? এবং বিদ্যাপতিতেও কি তাই? চারি জন গ্রন্থকারই কৃষ্ণকে ঐশিক অবতার বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু চারি জনেই কি এক প্রকার সে ঐশিক চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন? যদি না করিয়া থাকেন, তবে প্রভেদ কি? যাহা প্রভেদ বলিয়া দেখা যায়, তাহার কি কিছ্র কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে? সে প্রভেদের সঙ্গে, সামাজিক অবস্থার কি কিছ্র সম্বন্ধ আছে?

প্রথমে বক্তব্য, প্রভেদ থাকিলেই তাহা যে সামাজিক অবস্থাভেদের ফল, আর কিছ্র নহে, ইহা বিবেচনা করা অকর্ত্তব্য। কাব্যে কাব্যে প্রভেদ নানাপ্রকারে ঘটে। যিনি কবিতা লিখেন, তিনি, জাতীয় চরিত্রের অধীন; সামাজিক বলের অধীন; এবং আত্মস্বভাবের অধীন। তিনটিই তাঁহার কাব্যে ব্যক্ত হইবে। ভারতবর্ষীয় কবি মাত্রেরই কতকগুলি বিশেষ দোষ গুণ আছে যাহা ইউরোপীয় বা পারসিক ইত্যাদি জাতীয় কবির কাব্যে অপ্রাপ্য। সেগুলি তাঁহাদিগের জাতীয় দোষ গুণ। প্রাচীন কবি মাত্রেরই কতকগুলি দোষ গুণ আছে, যাহা আধুনিক কবিতে অপ্রাপ্য। সেইগুলি তাঁহাদিগের সাময়িক লক্ষণ। আর কবি মাত্রের শক্তির তারতম্য এবং বৈচিত্র্য আছে। সেগুলি তাঁহাদিগের নিজগুণ।

অতএব, কাব্যবৈচিত্র্যের তিনটি কারণ—জাতীয়তা, সাময়িকতা, এবং স্বাতন্ত্র্য। যদি চারি জন কবি কর্ত্তক গীত কৃষ্ণচরিত্রে প্রভেদ পাওয়া যায়, তবে সে প্রভেদের কারণ তিন প্রকারই থাকিবার সম্ভাবনা। বঙ্গবাসী জয়দেবের সঙ্গে, মহাভারতকার বা শ্রীমদ্ভাগবতকারের জাতীয়তা-

* প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ। শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার কর্ত্তক সম্পাদিত। চুঁচুড়া—সাধারণী বন্দ।

জনিত পার্থক্য থাকিবারই সম্ভাবনা; তুলসীদাসে এবং কৃষ্ণবাসে আছে। আমরা জাতীয়তা এবং স্বাতন্ত্র্য পরিত্যাগ করিয়া, সাময়িকতার সঙ্গে এই চারিটি কৃষ্ণচরিত্রের কোন সম্বন্ধ আছে কি না ইহারই অনুসন্ধান করিব।

মহাভারত কোন সময়ে প্রণীত হইয়াছিল, তাহা এ পর্যন্ত নির্দূপিত হয় নাই। নির্দূপিত হওয়াও অতি কঠিন। মূল গ্রন্থ একজন প্রণীত বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু এক্ষণে যাহা মহাভারত বলিয়া প্রচলিত তাহার সকল অংশ কখন একজনের লিখিত নহে। যেমন একজন একটি অট্টালিকা নিৰ্ম্মাণ করিয়া গেলে, তাহার পরপরুষেরা তাহাতে কেহ একটি নতুন কুঠারি, কেহ বা একটি নতুন বারান্দা, কেহ বা একটি নতুন প্রাচীর নিৰ্ম্মাণ করিয়া, তাহার বৃদ্ধি করিয়া থাকেন, মহাভারতেও তাহাই ঘটিয়াছে। মূলগ্রন্থের ভিতর পরবর্তী লেখকেরা কোথাও কতকগুলি কবিতা, কোথাও একটি উপন্যাস, কোথাও একটি পৰ্ব্বাধ্যায় সন্নিবেশিত করিয়া বহু স্রিতের জলে পুষ্ট সমুদ্রবৎ বিপুল কলেবর করিয়া তুলিয়াছেন। কোন ভাগ আদি গ্রন্থের অংশ, কোন ভাগ আধুনিক সংযোগ, তাহা সর্বত্র নির্দূপণ করা অসাধ্য। অতএব আদি গ্রন্থের বয়ঃক্রম নির্দূপণ অসাধ্য। তবে উহা যে শ্রীমদ্ভাগবতের পূৰ্ব্বগামী ইহা বোধ হয় সুশিক্ষিত কেহই অস্বীকার করিবেন না। যদি অন্য প্রমাণ নাও থাকে, তবে কেবল রচনাপ্রণালী দেখিলে বৃদ্ধিতে পারা যায়। ভাগবতের সংস্কৃত অপেক্ষাকৃত আধুনিক; ভাগবতে কাব্যের গতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক পথে।

অতএব প্রথম মহাভারত। মহাভারত খ্রীষ্টাব্দের অনেক পূৰ্ব্বে প্রণীত হইয়াছিল, ইহাও অনুভবে বুঝা যায়। মহাভারত পড়িয়া বোধ হয়, ভারতবর্ষীয়দিগের দ্বিতীয়াবস্থা, অথবা তৃতীয়াবস্থা ইহাতে পরিচিত হইয়াছে। তখন দ্বাপর, সত্য যুগ আর নাই। যখন সরস্বতী ও দৃশ্বতী তীরে, নবাগত আৰ্য্য বংশ, সরল গ্রাম্য ধর্ম রক্ষা করিয়া, দস্যুভয়ে আকাশ, ভাস্কর, মরুতাদি ভৌতিক শক্তিকে আত্মরক্ষার্থ আহ্বান করিয়া, অপেক্ষ সোমরস পানকে জীবনের সার সুখজ্ঞান করিয়া আৰ্য্য জীবন নিৰ্ব্বাহ করিতেন, সে সত্য যুগ আর নাই। দ্বিতীয়াবস্থাও নাই। যখন, আৰ্য্যগণ সংখ্যায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া, বহু যুদ্ধে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়া দস্যুজয়ে প্রবৃত্ত, সে ত্রেতা আর নাই। যখন আৰ্য্যগণ, বাহুবলে বহু দেশ অধিকৃত করিয়া, শিল্পাদির উন্নতি করিয়া, প্রথম সভ্যতার সোপানে উঠিয়া, কাশী, অযোধ্যা, মিথিলাদি নগর সংস্থাপিত করিতেছেন, সে ত্রেতা আর নাই। যখন, আৰ্য্যহৃদয়ক্ষেত্রে নতুন জ্ঞানের অঙ্কুর দেখা দিতেছে, সে ত্রেতা আর নাই। এক্ষণে দস্যু জাতি বিজিত, পদানত, দেশপ্রান্তবাসী শূদ্র, ভারতবর্ষ আৰ্য্যগণের করস্থ, আয়ত্ত, ভোগ্য, এবং মহাসমৃদ্ধিশালী। তখন আৰ্য্যগণ বাহ্য শত্রুর ভয় হইতে নিশ্চিন্ত, আভ্যন্তরিক সমৃদ্ধি সম্পাদনে সচেষ্ট, হস্তগতা অনন্তরত্নপ্রসবিনী ভারতভূমি অংশীকরণে ব্যস্ত। যাহা সকলে জয় করিয়াছে তাহা কে ভোগ করিবে? এই প্রশ্নের ফল আভ্যন্তরিক বিবাদ। তখন আৰ্য্য পৌরুষ চরমে দাঁড়াইয়াছে। যে হলাহল বৃক্ষের ফলে, দুই সহস্র বৎসর পরে জয়চন্দ্র এবং পৃথ্বীরাজ পরস্পর বিবাদ করিয়া উভয়ে সাহাবৃদ্ধিদের করতলস্থ হইলেন, এই দ্বাপরে তাহার বীজ বপন হইয়াছে। এই দ্বাপরের কাব্য মহাভারত। (১)

এরূপ সমাজে দুই প্রকার মনুষ্য সংসারচক্রের অগ্রগামী হইয়া দাঁড়ান; এক সমরবিজয়ী বীর, দ্বিতীয় রাজনীতিবিদ মন্ত্রী। এক মল্লকৈ, দ্বিতীয় বিস্মাক; এক গারিবলদি, দ্বিতীয় কাবুর; মহাভারতেও এই দুই চিত্র প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, এক অঞ্জর্ন, দ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণ।

এই মহাভারতীয় কৃষ্ণচরিত্রকাব্য সংসারে তুলনারহিত। যে ব্রজলীলা জয়দেব ও বিদ্যাপতির কাব্যের একমাত্র অবলম্বন, যাহা শ্রীমদ্ভাগবতেও অত্যন্ত পরিষ্কৃত, ইহাতে তাহার সূচনাও নাই। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ অদ্বিতীয় রাজনীতিবিদ—সাম্রাজ্যের গঠন বিশ্লেষণে বিধাতুল্য কৃতকার্য—সেই জন্য ইশ্বরবতার বলিয়া কল্পিত। শ্রীকৃষ্ণ ঐশিক শক্তিদর বলিয়া কল্পিত, কিন্তু মহাভারতে ইনি অস্বধারী নহেন, সামান্য জড় শক্তি বাহুবল ইহার বল নহে; উচ্চতর মানসিক বলই ইহার বল। যে অর্বাধ ইনি মহাভারতে দেখা দিলেন, সেই অর্বাধ এই মহেতিহাসের মূল গ্রন্থ রঞ্জু ইহার হাতে—প্রকাশ্যে কেবল পরামর্শদাতা—কৌশলে সর্বকর্তা। ইহার কেহ মর্ম বৃদ্ধিতে পারে না, কেহ অন্ত পায় না, সে অনন্ত চক্রে কেহ প্রবেশ করিতে পারে না। ইহার যেমন দক্ষতা,

(১) পাঠক বৃদ্ধিতে পারিবেন যে কতিপয় শতাব্দীকে এখানে “যুগ” বলা যাইতেছে।

বঙ্কিম রচনাবলী

তেমনই ধৈর্য্য। উভয়েই দেবতুল্য। পৃথিবীর বীরমণ্ডলী একত্রিত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত; যে ধনু ধরিতে জানে সেই কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ, পাণ্ডবদিগের পরমাত্মীয় হইয়াও, কুরুক্ষেত্রে অস্ত্র ধরেন নাই। তিনি মানসিক শক্তি মর্দুমান, বাহুবলের আশ্রয় লইবেন না। তাঁহার অভীষ্ট, পৃথিবীর রাজকুল ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া, একা পাণ্ডব পৃথিবীশ্বর থাকেন; স্বপক্ষ বিপক্ষ উভয়ের নিধন না হইলে তাহা ঘটে না; যিনি ঈশ্বরবতার বলিয়া কল্পিত, তিনি স্বয়ং রণে প্রবৃত্ত হইলে, যে পক্ষাবলম্বন করিবেন, সেই পক্ষের সম্পূর্ণ রক্ষা সম্ভাবনা। কিন্তু তাহা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। কেবল পাণ্ডবদিগকে একেশ্বর করাও তাঁহার অভীষ্ট নহে। ভারতবর্ষের একা তাহার উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষ তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত; খণ্ডে খণ্ডে এক একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজগণ পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া পরস্পরকে ক্ষীণ করিত, ভারতবর্ষ অবিরত সমরানলে দগ্ধ হইতে থাকিত। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে, এই সসাগরা ভারত একচ্ছত্রাধীন না হইলে ভারতের শান্তি নাই; শান্তি ভিন্ন লোকের রক্ষা নাই; উন্নতি নাই। অতএব এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরস্পরবিদ্বেষী রাজগণকে প্রথমে ধ্বংস করা কর্তব্য, তাহা হইলেই ভারতবর্ষ একায়ত্ত, শান্ত, এবং উন্নত হইবে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাহারা পরস্পরের অস্ত্র পরস্পরে নিহত হয়, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য হইল। ইহারই পৌরাণিক নাম পৃথিবীর ভারমোচন। শ্রীকৃষ্ণ, স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া, এক পক্ষের রক্ষা চেষ্টা করিয়া, কেন সে উদ্দেশ্যের বিঘ্ন করিবেন? তিনি বিনা অস্ত্রধারণে, অজ্জ্বলের রথে বসিয়া, ভারতরাজকুলের ধ্বংস সিদ্ধ করিলেন।

এইরূপ, মহাভারতীয় কৃষ্ণচরিত্র যতই আলোচনা করা যাইবে, ততই তাহাতে এই দুরকর্মা দূরদর্শী রাজনীতিবিদগণের লক্ষণ সকল দেখা যাইবে। তাহাতে বিলাসপ্রিয়তার লেশ মাত্র নাই—গোপবালকের চিহ্ন মাত্র নাই।

এদিকে দর্শন শাস্ত্রের প্রাদুর্ভাব হইতেছিল। বৈদিক ও পৌরাণিক দেবগণের আরাধনা করিয়া আর মার্জিতবুদ্ধি আর্চ্যগণ সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহারা দেখিলেন যে, যে সকল ভিন্ন ভিন্ন নৈসর্গিক শক্তিকে তাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ দেব কল্পনা করিয়া পূজা করিতেন, সকলেই এক মূল শক্তির ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ মাত্র। জগৎকর্তা এক এবং অদ্বিতীয়। তখন ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণ লইয়া মহাগোলযোগ উপস্থিত হইল। কেহ বলিলেন ঈশ্বর আছেন, কেহ বলিলেন নাই। কেহ বলিলেন ঈশ্বর এই জড় জগৎ হইতে পৃথক্, কেহ বলিলেন এই জড় জগৎই ঈশ্বর। তখন, নানা জনের নানা মতে, লোকের মন অস্থির হইয়া উঠিল; কোন্ মতে বিশ্বাস করিবে? কাহার পূজা করিবে? কোন্ পদার্থে ভক্তি করিবে? দেবভক্তির জীবন নিশ্চয়তা—অনিশ্চয়তা জন্মিলে ভক্তি নষ্ট হয়। পুনঃ পুনঃ আন্দোলনে ভক্তিমূল ছিল হইয়া গেল। অধিকাংশ ভারতবর্ষ নিরীশ্বর বৌদ্ধমত অবলম্বন করিল। সনাতন ধর্ম মহাসঙ্কটে পতিত হইল। শতাব্দীর পর শতাব্দী এইরূপে কাটিয়া গেলে শ্রীমদ্ভাগবতকার সেই ধর্মের পুনরুদ্ধারে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাতে দ্বিতীয় কৃষ্ণচরিত্র প্রণীত হইল।

আচার্য্য টিণ্ডল এক স্থানে ঈশ্বর নিরূপণের কাঠিন্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি একাধারে উৎকৃষ্ট কবি, এবং উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক হইবে, সেই ঈশ্বর নিরূপণে সক্ষম হইবে। প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকতা এবং প্রথম শ্রেণীর কবিত্ব, একাধারে এ পর্য্যন্ত সন্নিবেশিত হয় নাই। এক ব্যক্তি নিউটন ও সেক্সপীয়রের প্রকৃতি লইয়া এ পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করেন নাই। কিন্তু বৈজ্ঞানিক কবি কেহ না হইয়া থাকুন, দার্শনিক কবি অনেক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—ঋগ্বেদের ঋষিগণ হইতে রাজকৃষ্ণবাবু পর্য্যন্ত ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। দার্শনিক কবিগণ আপনাদিগকে ঈশ্বর নিরূপণে সমর্থ বিবেচনা করেন। শ্রীমদ্ভাগবতকার দার্শনিক এবং শ্রীমদ্ভাগবতকার কবি। তিনি দর্শনে ও কাব্যে মিলাইয়া, ধর্মের পুনরুদ্ধারে প্রবৃত্ত হইলেন। এবং এই ভূমণ্ডলে এরূপ দূরত্ব ব্যাপারে যদি কেহ কৃতকার্য হইয়া থাকেন, তবে শাক্যসিংহ ও শ্রীমদ্ভাগবতকার হইয়াছেন।

দার্শনিকদিগের মতের মধ্যে একটি মত, পণ্ডিতের নিকট অতিশয় মনোহর। সাংখ্যকার, মানস রসায়নে জগৎকে বিশ্লিষ্ট করিয়া, আত্মা এবং জড় জগৎকে ভাগ করিয়া ফেলিলেন। জগৎ দ্বৈপ্রকৃতিক—তাহাতে পদার্থ এবং প্রকৃতি বিদ্যমান। কথাটি অতি নিগূঢ়,—বিশেষ গভীরার্থ-পূর্ণ। ইহা প্রাচীন দর্শন শাস্ত্রের শেষ সীমা। গ্রীক্ পণ্ডিতেরা বহুকণ্ঠে এই তত্ত্বের আভাসমাত্র পাইয়াছিলেন। অদ্যাপি ইউরোপীয় দার্শনিকেরা এই তত্ত্বের চতুঃপার্শ্ব অন্ধ মধুমাকিকার ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। কথাটির স্থূল মর্ম যাহা তাহা সাংখ্যদর্শন বিষয়ক

প্রবন্ধে বরাইয়াছি। এই প্রকৃতি ও পুরুষ সাংখ্য মতানুসারে পরস্পরে আসক্ত, স্ফাটিকপাত্রে জ্বাপদ্রুপের প্রতিবিন্দুর ন্যায়, প্রকৃতিতে পুরুষ সংযুক্ত, ইহাদিগের মধ্যে সম্বন্ধ বিচ্ছেদেই জীবের মুক্তি।

এই সকল দুরূহ তত্ত্ব দার্শনিকের মনোহর, কিন্তু সাধারণের বোধগম্য নহে। শ্রীমদ্ভাগবতকার ইহাকেই জনসাধারণের বোধগম্য, এবং জনসাধারণের মনোহর করিয়া সাজাইয়া, মৃত ধর্ম জীবন সঞ্চারের অভিপ্রায় করিলেন। মহাভারতে যে বীর ঈশ্বরবতার বলিয়া লোকমণ্ডলে গৃহীত হইয়াছিল, তিনি তাহাকেই পুরুষ স্বরূপে স্বীয় কাব্যমধ্যে অবতীর্ণ করিলেন, এবং স্বকপোল হইতে গোপকন্যা রাধিকাকে সৃষ্ট করিয়া, প্রকৃতিস্থানীয় করিলেন। প্রকৃতি পুরুষের যে পরস্পরাসক্তি, বাল্যলীলায় তাহা দেখাইলেন; এবং তদুভয়ে যে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ, জীবের মুক্তির জন্য কামনীয়, তাহাও দেখাইলেন। সাংখ্যের মতে ইহাদিগের মিলনই জীবের দুঃখের মূল—তাই কবি এই মিলনকে অস্বাভাবিক এবং অপবিত্র করিয়া সাজাইলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের গুঢ় তাৎপর্য, আত্মার ইতিহাস—প্রথমে প্রকৃতির সহিত সংযোগ, পরে বিয়োগ, পরে মুক্তি।

জয়দেবপ্রণীত তৃতীয় কৃষ্ণচরিত্রে এই রূপক একেবারে অদৃশ্য। তখন আৰ্য্যজাতির জাতীয় জীবন দুর্বল হইয়া আসিয়াছে। রাজকীয় জীবন নিবিয়াছে—ধর্মের বান্ধক্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। উগ্রতেজস্বী, রাজনীতিবিশারদ আৰ্য্য বীরেরা বিলাসপ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইয়াছেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি মার্জিতচিত্ত দার্শনিকের স্থানে অপরিণামদর্শী স্মার্ত্ত এবং গৃহসুখ-বিমুগ্ধ কবি অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভারত দুর্বল, নিশ্চেষ্ট, নিদ্রায় উন্মুগ্ধ, ভোগপরায়ণ। অস্ত্রের ঝঞ্জনায় স্থানে রাজপুত্রী সকলে নৃপুত্র নিকণ বাজিতেছে—বাহ্য এবং আভ্যন্তরিক জগতের নিগূঢ়তত্ত্বের আলোচনার পরিবর্তে কামিনীগণের ভাবভঙ্গীর নিগূঢ় তত্ত্বের আলোচনার ধুম পড়িয়া গিয়াছে। জয়দেব গোস্বামী এই সময়ের সামাজিক অবতার; গীতগোবিন্দ এই সমাজের উক্তি। অতএব গীতগোবিন্দের শ্রীকৃষ্ণ, কেবল বিলাসরসে রসিক কিশোর নায়ক। সেই কিশোর নায়কের মূর্ত্তি, অপদূর্ষ মোহন মূর্ত্তি; শব্দভাণ্ডারে যত সুকুমার কুসুম আছে, সকলগুণি বাছিয়া বাছিয়া চতুর গোস্বামী এই কিশোর কিশোরী রচিয়াছেন; আদিরসের ভাণ্ডারে যতগুণি স্নিকোজ্জ্বল রত্ন আছে, সকলগুণিতে ইহা সাজাইয়াছেন; কিন্তু যে মহা গৌরবের জ্যোতি মহাভারতে ও ভাগবতে কৃষ্ণচরিত্রের উপর নিঃসৃত হইয়াছিল, এখানে তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়পরতার অন্ধকার ছায়া আসিয়া, প্রথর সুখতৃষাতপ্ত আৰ্য্য পাঠককে শীতল করিতেছে।

তার পর, বঙ্গদেশ যখনহস্তে পতিত হইল। পৃথক যেমন বনে রত্ন কুড়াইয়া পায়, যখন সেইরূপ বঙ্গরাজ্য অনায়াসে কুড়াইয়া লইল। প্রথমে নাম মাত্র বঙ্গ দিল্লীর অধীন ছিল, পরে যখনশাসিত বঙ্গরাজ্য সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হইল। আবার বঙ্গদেশের কপালে ছিল যে জাতীয় জীবন কিঞ্চিৎ পুনরুদ্দীপ্ত হইবে। সেই পুনরুদ্দীপ্ত জীবন বলে, বঙ্গভূমে রঘুনাথ ও চৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইলেন। বিদ্যাপতি তাহাদিগের পূর্বাগামী,—পুনরুদ্দীপ্ত জাতীয় জীবনের প্রথম শিখা। তিনি জয়দেবপ্রণীত চিত্রখানি তুলিয়া লইলেন—তাহাতে নতন রঙ ঢালিলেন। জয়দেব অপেক্ষা বিদ্যাপতির দৃষ্টি তেজস্বিনী—তিনি শ্রীকৃষ্ণকে কিশোরবয়স্ক বিলাসরত নায়কই দেখিলেন বটে, কিন্তু জয়দেব কেবল বাহ্য প্রকৃতি দেখিয়াছিলেন—বিদ্যাপতি অন্তঃপ্রকৃতি পর্যন্ত দেখিলেন। যাহা জয়দেবের চক্ষে কেবল ভোগ তৃষা বলিয়া প্রকটিত হইয়াছিল—বিদ্যাপতি তাহাতে অন্তঃপ্রকৃতির সম্বন্ধ দেখিলেন। জয়দেবের সময় সুখভোগের কাল, সমাজের দুঃখ ছিল না। বিদ্যাপতির সময় দুঃখের সময়। ধর্ম লুপ্ত, বিধর্মিগণ প্রভু, জাতীয় জীবন শিথিল, সবেমাত্র পুনরুদ্দীপ্ত হইতেছে—কবির চক্ষু ফুটিল। কবি, সেই দুঃখে, দুঃখ দেখাইয়া, দুঃখের গান গাইলেন। আমরা বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় খণ্ডে মানসবিকাশের সমালোচনা উপলক্ষে বিদ্যাপতি ও জয়দেবে প্রভেদ সবিস্তারে দেখাইয়াছি; সেই সকল কথা পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। এস্থলে, কেবল ইহাই বক্তব্য যে, সাময়িক প্রভেদ, এই প্রভেদের একটি কারণ। বিদ্যাপতির সময়ে, বঙ্গদেশে চৈতন্যদেবকৃত ধর্মের নবাব্যুদয়ের, এবং রঘুনাথকৃত দর্শনের নবাব্যুদয়ের পূর্বসূচনা হইতেছিল; বিদ্যাপতির কাব্যে সেই নবাব্যুদয়ের সূচনা লক্ষিত হয়। তখন বাহ্য ছাড়িয়া, আভ্যন্তরিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে। সেই আভ্যন্তরিক দৃষ্টির ফল ধর্ম ও দর্শন শাস্ত্রের উন্নতি।

বিশ্বকম রচনাবলী

আমরা যে গ্রন্থকে উপলক্ষ করিয়া, এই কয়টি কথা বলিলাম, তৎসম্বন্ধে এক্ষণে কিছু বলা কর্তব্য। শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ মিত্র “প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ” প্রকাশ করিতেছেন। যে দুই খণ্ড আমরা দেখিয়াছি, তাহাতে কেবল বিদ্যাপতিরই কয়েকটি গীত প্রকাশিত হইয়াছে। বিদ্যাপতি প্রভৃতি উৎকৃষ্ট প্রাচীন কবিদিগের রচনা এক্ষণে অতি দুষ্প্রাপ্য। যাহাতে উহা পাওয়া যায়, তাহাতে এত ভেদ মিশান যে, খাঁটি মাল বাছিয়া লইতে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না। অক্ষয় বাবু ও সারদা বাবু উৎকৃষ্ট গীত সকল বাছিয়া শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিতেছেন। বিদ্যাপতির রচনা পাঠ পক্ষে সাধারণ পাঠকের একটি প্রতিবন্ধক এই যে, তাঁহার ভাষা আধুনিক প্রচলিত বাঙ্গালা নহে—সাধারণ পাঠকের তাহা বুঝিতে বড় কষ্ট হয়। প্রকাশকেরা টীকায় দুরূহ শব্দ সকলের সদর্থ লিখিয়া সে প্রতিবন্ধকের অপনয়ন করিতেছেন। যে কার্যে ইঁহারা প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা গুরূতর, সুকঠিন, এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ইঁহারা সে কার্যের উপযুক্ত ব্যক্তি। উভয়েই কৃতবিদ্যা এবং অক্ষয় বাবু সাহিত্যসমাজে সুপরিচিত। তিনি কাব্যের সুপরীক্ষক, তাঁহার রুচি সুসমাজিত, এবং তিনি বিদ্যাপতির কাব্যের মস্মজ্ঞ। দুরূহ শব্দ সকলের ইঁহারা যে প্রকার সদর্থ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা বিশেষ সাধুবাদ করিতে পারি। ভরসা করি, পাঠকসমাজ ইঁহাদিগের উপযুক্ত সহায়তা করিবেন।—‘বঙ্গদর্শন’, চৈত্র ১২৮১, পৃ. ৫৪৭-৫৪।

ঋতুবর্ণন*

কাব্যের দুইটি উদ্দেশ্য; বর্ণন ও শোধান।

এই জগৎ শোভাময়। যাহা দেখিতে সুন্দর, শুনিতে সুন্দর, যাহা সুগন্ধ, যাহা সুকোমল, তৎসমুদয়ে বিশ্ব পরিপূর্ণ। কাব্যের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য, কিন্তু সৌন্দর্য্য খুঁজিতে হয় না—এ জগৎ যেমন দেখি, তেমনি যদি লিখিতে পারি, যদি ইঁহার যথার্থ প্রতিকৃতির সৃষ্টি করিতে পারি, তাহা হইলেই সুন্দরকে কাব্যে অবতীর্ণ করিতে পারিলাম। অতএব কেবল বর্ণনা মাত্রই কাব্য।

সংসার সৌন্দর্য্যময় কিন্তু যাহা সুন্দর নহে, তাহারও অভাব নাই। পৃথিবীতে কদাকার কুবর্ণ, পুত্ৰিগন্ধ, ককর্শস্পর্শ, ইত্যাদি বহুতর কুৎসিত সামগ্রী আছে, এবং অনেক বস্তু এমনও আছে যে, তাহাতে সৌন্দর্য্যের ভাব বা অভাব কিছুই লক্ষিত হয় না। ইঁহাও কি কাব্যের সামগ্রী? অথচ ঐ সকলের বর্ণনাও ত কাব্যমধ্যে পাওয়া যায়—এবং অনেক সময় যাহা অসুন্দর, তাহারই সৃজন কবির মুখ্য উদ্দেশ্যস্বরূপ প্রতীয়মান হয়। কারণ কি?

সকলেই বুদ্ধিশালী। কাব্যের অধিকারও বুদ্ধির নিয়মানুসারে বুদ্ধি পাইয়াছে। আদৌ সুন্দরের বর্ণনা বর্ণনাকাব্যের উদ্দেশ্য। কিন্তু জগতে সুন্দর অসুন্দর মিশ্রিত; অনেক সুন্দরের বর্ণনার নিতান্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ, অসুন্দরের বর্ণনা; অনেক সময়ে আনুষঙ্গিক অসুন্দরের বর্ণনায় সুন্দরের সৌন্দর্য্য স্পষ্টীকৃত হইয়া থাকে। এজন্য অসুন্দরের বর্ণনা বর্ণনাকাব্যে স্থান পাইয়াছে; কালে বর্ণনা মাত্রই বর্ণনাকাব্যের উদ্দেশ্য হইয়া উঠিয়াছে।

অতএব সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত বর্ণনাকাব্যের উদ্দেশ্য, স্বরূপ বর্ণনা। জগৎ যেমন আছে, ঠিক তাহার প্রকৃত চিত্রের সৃজন করিতে এ শ্রেণীর কবিরা যত্ন করেন।

আর এক শ্রেণীর কবিদিগের উদ্দেশ্য অবিকল স্বরূপ বর্ণনা নহে। অপ্রকৃত বর্ণনাও তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহারা প্রকৃতি সংশোধন করিয়া লয়েন—যাহা সুন্দর, তাহাই বাছিয়া লইয়া, যাহা অসুন্দর তাহা বহিস্কৃত করিয়া কাব্যের প্রণয়ন করেন। কেবল তাহাই নহে। সুন্দরেও যে সৌন্দর্য্য নাই, যে রস, যে রূপ, যে স্পর্শ, যে গন্ধ, কেহ কখন ইন্দ্রিয়গোচর করে নাই, “যে আলোক জলে স্থলে কোথাও নাই” সেই আত্মচিত্তপ্রসূত উজ্জ্বল হৈমকিরণে সকলকে পরিপ্লুত করিয়া, সুন্দরকে আরও সুন্দর করেন—সৌন্দর্য্যের অতি প্রকৃত চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি করেন। অতি প্রকৃত কিন্তু অপ্রকৃত নহে। তাঁহাদের সৃষ্টিতে অযথার্থ, অভাবনীয়, সত্যের বিপরীত, প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীত কিছুই নাই, কিন্তু প্রকৃতিতে ঠিক তাহার আদর্শ কোথাও

* ঋতুবর্ণন। শ্রীগঙ্গাচরণ সরকার প্রণীত। চুঁচুড়া সাধারণী যন্ত্র।

দেখিবে না। ইহাকেই আমরা প্রবন্ধরূপে শোধন বলিয়াছি। যে কাব্যে এই শোধনের অভাব, যাহার উদ্দেশ্য কেবল “যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং” তাহাকেই আমরা বর্ণনা বলিয়াছি।

আমরা দুই জন আধুনিক বাঙ্গালি কবির কাব্যকে উদাহরণস্বরূপ প্রয়োগ করিয়া এই কথাটি সুস্পষ্ট করিতে চাই। যে কাব্যের উদ্দেশ্য শোধন, হেম বাবু প্রণীত “বৃহৎসংহার” তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তাহার কাব্যে প্রকৃতি পরিশুদ্ধ হইয়া, মনোহর নবীন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া লোকের মনোমোহন করিতেছেন। মানব স্বভাব সংশুদ্ধ হইয়া দৈব এবং আসুন্দরিক প্রকৃতিতে পরিণত হইয়াছে; ককর্শ পৃথিবী পরিশুদ্ধ হইয়া স্বর্গে ও নৈমিষারণ্যে পরিণত হইয়াছে। যে জ্যোতিঃ দেবগণের শিরোমণ্ডলে, তাহা জগতে নাই—কবির হৃদয়ে আছে। যে জ্বালা শচীর কটাক্ষে, তাহা জগতে নাই—কবির হৃদয়ে আছে। সংসারকে শোধন করিয়া কবি আপনার কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কাব্যের উৎকৃষ্ট উদাহরণ বাবু গঙ্গাচরণ সরকার প্রণীত ঋতুবর্ণন। ইহাতে প্রকৃতির সংশোধন উদ্দিষ্ট নহে—প্রকৃত বর্ণনা, স্বরূপ চিত্র, বাহ্য জগতের আলোকচিত্র, ইহার উদ্দেশ্য।—‘বঙ্গদর্শন’, বৈশাখ ১২৮২, পৃ. ২১-২২।

পলাশির যুদ্ধ*

পলাশির যুদ্ধ ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত। এবং পলাশির যুদ্ধ অনৈতিহাসিক বৃত্তান্ত। কেন না ইহার প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হয় নাই। সুতরাং কাব্যকারের ইহাতে বিশেষ অধিকার। এই জন্যই বোধ হয়, মেকলে ক্লাইবের জীবনচরিত নামক উপন্যাস লিখিয়াছিলেন।† যাহা হউক মেকলের সঙ্গে আমাদের এক্ষণে কার্য্য নাই; নবীন বাবুর গ্রন্থের কথা বলি।...

মেঘনাদবধ, বা বৃহৎসংহারের সহিত এই কাব্যের তুলনা করিতে চেষ্টা পাইলে, কবির প্রতি অবিচার করা হয়। ঐ কাব্যদ্বয়ের ঘটনা সকল কাঙ্ক্ষনিক, অতি প্রাচীন কালে ঘটিয়াছিল বলিয়া কল্পিত এবং সুরাসুর রাক্ষস, বা অমানুষিক শক্তিধর মনুষ্যগণ কর্তৃক সম্পাদিত; সুতরাং কবি সে ক্ষেত্রে যথেষ্টরূপে বিচরণ করিয়া, আপনার অভিলাষ মত সৃষ্টি করিতে পারেন। পলাশির যুদ্ধে ঘটনা সকল ঐতিহাসিক, আধুনিক; এবং আমাদের মত সামান্য মনুষ্যকর্তৃক সম্পাদিত। সুতরাং কবি এস্থলে, শৃঙ্খলাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় পৃথিবীতে বন্ধ, আকাশে উঠিয়া গান করিতে পারেন না। অতএব কাব্যের বিষয়-নির্বাচন সম্বন্ধে নবীন বাবুকে সৌভাগ্যশালী বলিতে পারি না।

* পলাশির যুদ্ধ। (কাব্য) শ্রীমতী নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত। কলিকাতা। নতুন ভারত যন্ত্র। ১২৮১।

† আমরা এরূপ ব্যঙ্গ করিতে বড় ভয় পাই। সময়ে সময়ে এরূপ ব্যঙ্গ করিয়া, আমরা বড় অপ্রতিভ হই। এদেশীয় পাঠকেরা সচরাচর, পিতৃ মাতৃ উচ্চারণ করিয়া অথবা মূর্খ, পাপিষ্ঠ, নরাধম বলিয়া কাহাকে গালি দিলে, বৃদ্ধিতে পারেন যে একটা রহস্য হইল বটে, তন্মিলন অন্য কোন প্রকারে যে ব্যঙ্গ হইতে পারে, ইহা আমরা সকলে বড় বৃদ্ধিতে পারি না। যে সকল ইংরেজ সমালোচক, যাহা কিছু আর্থ সাহিত্যে, আর্থ দর্শনে, আর্থ ভাস্কর্যে, বা আর্থ বিজ্ঞানে উৎকৃষ্ট দেখেন, তাহাই ইউরোপ হইতে নীত মনে করেন, তাহাদিগকে ব্যঙ্গ করিবার জন্য, এবং যে সকল দেশী সমালোচক যেখানে সাদৃশ্য দেখেন, সেইখানে চুরি মনে করেন, তাহাদিগকে ব্যঙ্গ করিবার জন্য, আমরা সেবার লিখিয়াছিলাম যে, শকুন্তলা মিরন্দার যেখানে সাদৃশ্য আছে, সেখানে অবশ্য সেক্ষপীয়র হইতে কালিদাস চুরি করিয়াছেন। ইহা পাঠ করিয়া অনেকেই ব্যতিব্যস্ত! কি সর্বনাশ! কালিদাস সেক্ষপীয়রের পরবর্তী! আর একখানি গ্রন্থ সমালোচনাকালে, লেখক যে সকল পচা পুরাতন চর্চিত চর্চিত পুনর্চিত তত্ত্ব লিখিয়াছিলেন, তাহার দুই একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া, অতিশয় অভিনব বলিয়া পাঠককে উপঢৌকন দিয়াছিলাম। পড়িয়া লেখক বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইয়া, রোদন করিয়া বলিলেন, “আমার লিখিত বিষয় সকলের নবীনত্ব আছে বলিয়া বঙ্গদর্শন আমাকে গালি দিয়াছে!” কি দুঃখ!

এই স্থানে ক্লাইবের জীবনচরিতকে উপন্যাস গ্রন্থ বলিলাম দেখিয়া, এই সকল পাঠকগণ উপরি-কথিত প্রধানসারে তাহার অর্থ বৃদ্ধিতে পারেন। তাহাদিগকে বৃদ্ধিবার জন্য বলিয়া রাখা ভাল যে, কতকগুলি বাঙ্গালা সম্বাদপত্র যেরূপ উপন্যাস, এও সেইরূপ উপন্যাস।

বিক্রম রচনাবলী

তবে, এই কাব্যমধ্যে ঘটনাবৈচিত্র্য, সৃষ্টিবৈচিত্র্য, সংঘটন করা, কবির সাধ্য বটে। তৎসম্বন্ধে নবীন বাবু তাদৃশ শক্তিপ্রকাশ করেন না। বৃহৎসংহারের একটি বিশেষ গুণ এই যে, সেই একখানি কাব্যে উৎকৃষ্ট উপাখ্যান আছে, নাটক আছে, এবং গীতিকাব্য আছে। পলাশির যুদ্ধে, উপাখ্যান এবং নাটকের ভাগ অতি অল্প—গীতি অতি প্রবল। নবীন বাবু বর্ণনা এবং গীতিতে এক প্রকার মন্ত্রাসিদ্ধ। সেই জন্য পলাশির যুদ্ধ এত মনোহর হইয়াছে।

এই সকল বিষয়ে তাঁহার লিপিপ্রণালীর সঙ্গে বাইরণের লিপিপ্রণালীর বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। চরিত্রের আশ্লেষণে দুই জনের এক জনও শক্তি প্রকাশ করেন না।—বিশ্লেষণে দুই জনেরই কিছু শক্তি আছে। নাটকের যাহা প্রাণ—হৃদয়ে হৃদয়ে “ঘাত প্রতিঘাত”—দুই জনের এক জনের কাব্যে তাহার কিছুমাত্র নাই। কিন্তু অন্য দিকে দুই জনেই শক্তিশালী। ইংরেজিতে বাইরণের কবিতা তীরতেজস্বিনী, জ্বালাময়ী, অগ্নিতুল্যা, বাঙ্গালাতেও নবীন বাবুর কবিতা সেইরূপ তীরতেজস্বিনী, জ্বালাময়ী, অগ্নিতুল্যা। তাঁহাদিগের হৃদয়নিরুদ্ধ ভাব সকল, আগ্নেয়গিরিনিরুদ্ধ, অগ্নিশিখাবৎ—যখন ছুটে, তখন তাহার বেগ অসহ্য। বাইরণ স্বয়ং এক স্থানে কোন নায়কের প্রণয়বেগ বর্ণনাচ্ছলে নায়ককে যাহা বলাইয়াছেন, তাঁহার নিজের কবিতার বেগ এবং নবীন বাবুর কবিতার বেগ সম্বন্ধে তাহাই বলা যাইতে পারে।

* * * * *

But mine was like the lava flood
That boils in Etna's breast of flame.
I cannot prate in puling strain
Of lady-love and beauty's chain :
If changing cheek and scorching vein,
Lips taught to writhe but not complain,
If bursting heart, and madd'ning brain,
And daring deed and vengeful steel
And all that I have felt and feel,
Betoken love, that love was mine,
And shown by many a bitter sign.*

নবীন বাবুরও যখন স্বদেশবাৎসল্য স্রোতঃ উচ্ছলিত হয়, তখন তিনিও রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে জানেন না। সেও গৈরিক নিস্রবের ন্যায়। যদি উচ্চৈঃস্বরে রোদন, যদি আন্তরিক মর্মভেদী কাতরোক্তি, যদি ভয়শূন্য তেজোময় সত্যপ্রিয়তা, যদি দুর্ভাসাপ্রার্থিত ক্রোধ, দেশবাৎসল্যের লক্ষণ হয়—তবে সেই দেশবাৎসল্য নবীন বাবুর, এবং তাহার অনেক লক্ষণ এই কাব্যমধ্যে বিকীর্ণ হইয়াছে।

বাইরণের ন্যায় নবীন বাবু বর্ণনায় অত্যন্ত ক্ষমতাসালী। বাইরণের ন্যায়, তাঁহারও শক্তি আছে যে, দুই চারিটি কথায়, তিনি উৎকৃষ্ট বর্ণনার অবতরণ করিতে পারেন। ক্লাইবের নৌকারোহণ ইহার দৃষ্টান্তস্থল। কিন্তু অনেক সময়েই, নবীন বাবু সে প্রথা পরিত্যাগ করিয়া, বর্ণনায় অনর্থক কালহরণ করেন।

যাহাই হউক, কবিদিগের মধ্যে নবীন বাবুকে আমরা অধিকতর উচ্চ আসন দিতে পারি না পারি, তাঁহাকে বাঙ্গালার বাইরণ বলিয়া পরিচিত করিতে পারি। এ প্রশংসা বড় অল্প প্রশংসা নহে। পলাশির যুদ্ধ যে বাঙ্গালার সাহিত্যভাণ্ডারে একটি বহুমূল্য রত্ন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

উপসংহারকালে, পাঠকদিগকে আমরা একটি কথা বলিব। পলাশির যুদ্ধের আমরা রাখিয়া ঢাকিয়া পরিচয় দিয়াছি। যদি তাঁহারা ইহার যথার্থ পরিচয় লইতে ইচ্ছা করেন, আদ্যোপান্ত স্বয়ং পাঠ করিবেন। যে বাঙ্গালি হইয়া, বাঙ্গালির আন্তরিক রোদন না পড়িল, তাহার বাঙ্গালি জন্ম বৃথা।—‘বঙ্গদর্শন’, কার্তিক ১২৮২, পৃ. ৩১৯-২৭।

* The Giaour.

বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ

চারি বৎসর গত হইল বঙ্গদর্শন প্রকাশ আরম্ভ হয়। যখন ইহাতে আমি প্রবৃত্ত হই, তখন আমার কতকগুলি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। পত্রসূচনায় কতকগুলি ব্যক্ত করিয়াছিলাম; কতকগুলি অব্যক্ত ছিল। যাহা ব্যক্ত হইয়াছিল, এবং যাহা অব্যক্ত ছিল, এক্ষণে তাহার অধিকাংশই সিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে আর বঙ্গদর্শন রাখিবার প্রয়োজন নাই।

যখন বঙ্গদর্শন প্রকাশারম্ভ হয়, তখন সাধারণের পাঠযোগ্য অথচ উত্তম সাময়িক পত্রের অভাব ছিল। এক্ষণে তাদৃশ সাময়িক পত্রের অভাব নাই। যে অভাব পূর্ণ করিবার ভার বঙ্গদর্শন গ্রহণ করিয়াছিল, এক্ষণে বাকুব, আর্ষ্যদর্শন প্রভৃতির দ্বারা তাহা পূরিত হইবে। অতএব বঙ্গদর্শন রাখিবার আর প্রয়োজন নাই। আমার অপেক্ষা দক্ষতর ব্যক্তিগণ এই ভার গ্রহণ করিয়াছেন দেখিয়া, আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত এবং বঙ্গদর্শনের জন্য আমি যে শ্রম স্বীকার করিয়াছিলাম, তাহা সার্থক বিবেচনা করি। তাহাদিগকে ধন্যবাদপূর্ব্বক, আমি বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

এ সম্বাদে কেহ সন্তুষ্ট, কেহ ক্ষুব্ধ হইতে পারেন। কেহ ক্ষুব্ধ হইতে পারেন এ কথা বলায় আত্মশ্লাঘার বিষয় কিছই নাই। কেন না এমত ব্যক্তি বা এমন বস্তু জগতে নাই, যাহার প্রতি কেহ না কেহ অনুরক্ত নহেন। যদি কেহ বঙ্গদর্শনের এমত বন্ধ থাকেন যে বঙ্গদর্শনের লোপ তাহার কষ্টদায়ক হইবে, তাহার প্রতি আমার এই নিবেদন যে, যখন আমি এই বঙ্গদর্শনের ভার গ্রহণ করি, তখন এমত সঙ্কল্প করি নাই যে, যত দিন বাঁচিব এই বঙ্গদর্শনে আবদ্ধ থাকিব। র্তাবিশেষ গ্রহণ করিয়া কেহই চিরদিন তাহাতে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। মনুষ্যজীবন ক্ষণস্থায়ী; এই অল্পকাল মধ্যে সকলকেই অনেকগুলি অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে হয়; এজন্য কোন একটিতে কেহ চিরকাল আবদ্ধ থাকিতে পারে না। ইহসংসারে এমন অনেক গুরুতর ব্যাপার আছে বটে যে, তাহাতে এই জীবন মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত নিবদ্ধ রাখাই উচিত। কিন্তু এই ক্ষুদ্র বঙ্গদর্শন তাদৃশ গুরুতর ব্যাপার নহে, এবং আমিও তাদৃশ গুরুতর ব্যাপারে নিযুক্ত হইবার যোগ্য পাত্র নহি।

যাঁহারা বঙ্গদর্শনের লোপ দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইবেন, তাহাদের প্রতিই আমার এই নিবেদন। আর যাঁহারা ইহাতে আহ্লাদিত হইবেন, তাহাদিগকে একটি মন্দ সম্বাদ শুনাইতে আমি বাধ্য হইলাম। বঙ্গদর্শন আপাততঃ রহিত করিলাম বটে, কিন্তু কখনও যে এই পত্র পুনর্জীবিত হইবে না এমত অঙ্গীকার করিতেছি না। প্রয়োজন দেখিলে স্বতঃ বা অন্যতঃ ইহা পুনর্জীবিত করিব ইচ্ছা রহিল।

বঙ্গদর্শন সম্পাদনকালে আমি অনেকের কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইয়াছি। সেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার, এই সময়ে আমার প্রধান কার্য।

প্রথমতঃ সাধারণ পাঠকশ্রেণীর নিকট আমি বিশেষ বাধ্য। তাঁহারা যে পরিমাণে বঙ্গদর্শনের প্রতি আদর ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আমার আশার অতীত। আমি এক দিনের তরেও ব্যক্তিবিশেষের আদর ও উৎসাহের কামনা করি নাই, কিন্তু সাধারণ পাঠকের এই উৎসাহ ও যত্ন না দেখিলে আমি এত দিন বঙ্গদর্শন রাখিতাম কি না সন্দেহ। এ বৎসর বঙ্গদর্শনের প্রতি আমি তাদৃশ যত্ন করি নাই, এবং সন ১২৮২ সালের বঙ্গদর্শন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের তুল্য হয় নাই, তথাপি পাঠকশ্রেণীর আদরের লাঘব বা অনাস্থা দেখি নাই। ইহার জন্য আমি বঙ্গীয় পাঠকগণের কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ।

তৎপরে, যে সকল কৃতবিদ্য সুলেখকদিগের সহায়তাতেই বঙ্গদর্শন এত আদরণীয় হইয়াছিল, তাহাদিগের কাছে আমার অপারিশোধনীয় ঋণ স্বীকার করিতে হইতেছে। বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বাবু রামদাস সেন, পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি, বাবু প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়* প্রভৃতির লিপিশক্তি,

* বাহুল্যভয়ে সকলের নাম লিখিত হইল না। বিশেষ আমার ভ্রাতৃদ্বয়, বাবু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাবু পর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অথবা ভ্রাতৃবৎ বন্ধু বাবু জগদীশনাথ রায়ের নিকট প্রকাশ্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা বাগাড়ম্বর মাত্র। বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু শ্রীকৃষ্ণ দাসও আমার কৃতজ্ঞতাভাজন।

বিক্রম রচনাবলী

বিদ্যাবত্তা, উৎসাহ, এবং শ্রমশীলতাই বঙ্গদর্শনের উন্নতির মূল কারণ। ঈদৃশ ব্যক্তিগণের সহায়তা লাভ করিয়াছিলাম, ইহা আমার অল্প শ্লাঘার বিষয় নহে।

আর একজন আমার সহায় ছিলেন—সাহিত্যে আমার সহায়, সংসারে আমার সুখ দুঃখের ভাগী—তাঁহার নাম উল্লেখ করিব মনে করিয়াও উল্লেখ করিতে পারিতোঁছি না। এই বঙ্গদর্শনের বয়ঃক্রম অধিক হইতে না হইতেই দীনবন্ধু আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার জন্য তখন বঙ্গসমাজ রোদন করিতোঁছিল, কিন্তু এই বঙ্গদর্শনে আমি তাঁহার নামোল্লেখও করি নাই। কেন, তাহা কেহ বুঝে না। আমার যে দুঃখ কে তাহার ভাগী হইবে? কাহার কাছে দীনবন্ধুর জন্য কাঁদিলে প্রাণ জুড়াইবে? অন্যের কাছে দীনবন্ধু স্দলেখক—আমার কাছে প্রাণতুল্য বন্ধু—আমার সঙ্গে সে শোকে পাঠকের সহৃদয়তা হইতে পারে না বলিয়া, তখনও কিছ্ বলি নাই এখনও আর কিছ্ বলিলাম না।

তৃতীয়, যে সকল সহযোগিবর্গ বঙ্গদর্শনকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে আমার শত শত ধন্যবাদ। ইহাতেও আমার একটি স্পর্কার কথা আছে। উচ্চশ্রেণীর দেশী সম্বাদপত্র মাত্রই বঙ্গদর্শনের অনুকূল ছিলেন, অধিকতর স্পর্কার কথা এই যে, নিম্নশ্রেণীর সম্বাদপত্র মাত্রই ইহার প্রতিকূলতা করিয়াছিলেন। ইংরেজেরা বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের বড় খবর রাখেন না; কিন্তু এক্ষণে গতাসু ইন্ডিয়ান অবজর্বর বঙ্গদর্শনের বিশেষ সহায়তা করিতেন। আমি ইন্ডিয়ান অবজর্বর ও ইন্ডিয়ান মিররের নিকট যেরূপ উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, এরূপ আর কোন ইংরেজ পত্রের নিকট প্রাপ্ত হই নাই। অবজর্বর এক্ষণে গত হইয়াছেন, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ মিরর অদ্যাপি উন্নত ভাবে দেশের মঙ্গল সাধন করিতেছেন। এবং ঈশ্বরেচ্ছায় বহুকাল তদ্রূপ মঙ্গল সাধন করিবেন; তাঁহাকে আমার শত সহস্র ধন্যবাদ। বঙ্গদর্শনের সহিত অনেক গুরুতর বিষয়ে তাঁহার মতভেদ থাকাতেও তিনি যে এইরূপ সহৃদয়তা প্রকাশপূর্বক বল প্রদান করিতেন, ইহা তাঁহার উদারতার সামান্য পরিচয় নহে।

সহৃদয়তা, এবং বল, আমি কেবল অবজর্বর ও মিররের কাছে প্রাপ্ত হইয়াছি এমত নহে। দেশী সম্বাদপত্রের অগ্রগণ্য হিন্দু পেট্রিয়ট এবং স্থিরবুদ্ধি ও দেশবৎসল সহচরের দ্বারা আমি তদ্রূপ উপকৃত, এবং তাঁহাদের কাছে আমি সেইরূপ কৃতজ্ঞ। নিরপেক্ষ সন্ধিষ্মান্ এবং যথার্থবাদী ভারতসংস্কারক, বিজ্ঞ এডুকেশন গেজেট, ও তেজস্বিনী, তীক্ষ্ণদৃষ্টিশালিনী সাধারণী এবং সত্যপ্রিয় সাপ্তাহিক সমাচার প্রভৃতি পত্রকে বহুবিধ আনুকূল্যের জন্য আমি শত শত ধন্যবাদ করি।

চারি বৎসর হইল বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনায় বঙ্গদর্শনকে কালস্রোতে জলবৃদ্ধি বলিয়াছিলাম। আজ সেই জলবৃদ্ধি জলে মিশাইল—‘বঙ্গদর্শন’, চৈত্র ১২৮২, পৃ. ৫৭৪-৭৬।

বঙ্গদর্শন

যখন বঙ্গদর্শনের চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত করিয়া আমি পাঠকদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করি, তখন স্বীকার করিয়াছিলাম যে, প্রয়োজন দেখিলে স্বতঃ হউক অন্যতঃ হউক বঙ্গদর্শন পুনর্জীবিত করিব।

বঙ্গদর্শনের লোপ জন্য আমি অনেকের কাছে তিরস্কৃত হইয়াছি। সেই তিরস্কারের প্রাচুর্য্য আমার এমত প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, বঙ্গদর্শনে দেশের প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন আছে বলিয়া, ইহা পুনর্জীবিত হইল।

যাহা এক জনের উপর নির্ভর করে, তাহার স্থায়িত্ব অনিশ্চিত। বঙ্গদর্শন যত দিন আমার ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, স্বাস্থ্য বা জীবনের উপর নির্ভর করিবে তত দিন বঙ্গদর্শনের স্থায়িত্ব অসম্ভব। এজন্য আমি বঙ্গদর্শনের সম্পাদকীয় কার্য পরিত্যাগ করিলাম। বঙ্গদর্শনের স্থায়িত্ববিধান করাই আমার উদ্দেশ্য।

যাঁহার হস্তে বঙ্গদর্শন সমর্পণ করিলাম তাঁহার দ্বারা ইহা পূর্বাপেক্ষা শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিবে, ইহা আমার সম্পূর্ণ ভরসা আছে। তাঁহার সঙ্কল্প সকল আমি অবগত আছি। তিনি নিজের উপর নির্ভর যত করুন বা না করুন দেশীয় স্দলেখক মাত্রেরই উপর অধিকতর নির্ভর করিবেন।

তাঁহার ইচ্ছা বঙ্গদর্শনকে, সুশিক্ষিত মণ্ডলীর সাধারণ উক্তিপত্ররূপে পরিণত করেন। তাহা হইলেই বঙ্গদর্শন স্থায়ী এবং মঙ্গলপ্রদ হইবে।

ইউরোপীয় সাময়িক পত্রে এবং এতদেশীয় সাময়িক পত্রে বিশেষ প্রভেদ এই যে, এখানে যিনি সম্পাদক তিনিই প্রধান লেখক। ইউরোপীয় সম্পাদক, সম্পাদক মাত্র—কদাচিৎ লেখক। পত্র এবং প্রবন্ধের উদ্বাহে তিনি ঘটক মাত্র—স্বয়ং বরকর্তা হইয়া সচরাচর উপস্থিত হয়েন নাই। এবার বঙ্গদর্শন সেই প্রণালী অবলম্বন করিল।

যাহা সকলের মনোনীত, তাহার সহিত সম্বন্ধ গৌরবের বিষয়। আমি সে গৌরবের আকাঙ্ক্ষা করি। বঙ্গদর্শনের সম্পাদকীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিলাম বটে, কিন্তু ইহার সহিত আমার সম্বন্ধবিচ্ছেদ হইল না। যত দিন বঙ্গদর্শন থাকিবে, আমি ইহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিব এবং যদি পাঠকেরা বিরক্ত না হয়েন, তবে ইহার স্তম্ভে তাঁহাদিগের সম্মুখে মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হইয়া বঙ্গদর্শনের গৌরবে গৌরব লাভ করিবার স্পর্শা করিব।

এক্ষণে বঙ্গদর্শনকে অভিনব সম্পাদকের হস্তে সমর্পণ করিয়া, আশীর্বাদ করিতেছি যে, ইহার সুশীতল ছায়ায় এই তপ্ত ভারতবর্ষ পরিব্যাপ্ত হউক। আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি, ক্ষুদ্রশক্তি, সেই মহতী ছায়াতলে অলক্ষিত থাকিয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যের দৈনন্দিন শ্রীবৃদ্ধি দর্শন করি, ইহাই আমার বাসনা।*—'বঙ্গদর্শন', বৈশাখ ১২৮৪, পৃ. ১-৩।

সূচনা

আমাদিগের এই মাসিক পত্রখানি অতি ক্ষুদ্র। এত ক্ষুদ্র পত্রের একটা বিস্তারিত মূখবন্ধ লেখা কতকটা অসঙ্গত বোধ হয়। বড় বড় এবং ভাল ভাল এত মাসিক পত্র থাকিতে আবার একখানি এমন ক্ষুদ্র পত্র কেন? সেই কথা বলিবার জন্যই এই সূচনাটুকু আমরা লিখিলাম।

এ কথা কতকটা আমরা বিজ্ঞাপনেই বলিয়াছি। পৃথিবীতে হিমালয়ও আছে, বঙ্গমীকও আছে। সমুদ্রে জাহাজও আছে, ডিঙ্গীও আছে। তবে ডিঙ্গীর এই গুণ, জাহাজ সব স্থানে চলে না, ডিঙ্গী সব স্থানে চলে। যেখানে জাহাজ চলে না, আমরা সেইখানে ডিঙ্গী চালাইব। চড়ায় ঠেকিয়া বঙ্গদর্শন-জাহাজ বান্‌চাল হইয়া গেল—প্রচার ডিঙ্গী, এ হাঁটু জলেও নির্বিঘ্নে ভাসিয়া যাইবে ভরসা আছে।

দেখ, ইউরোপীয় এক একখানি সাময়িক পত্র, আমাদের দেশের এক একখানি পুরাণ বা উপপুরাণের তুল্য আকার;—দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, গভীরতা এবং গাম্ভীর্য্য কল্পান্তজীবী মার্কেডয় বা অষ্টাদশ পুরাণ-প্রণেতা বেদব্যাসেরই আয়ত্ত বলিয়া বোধ হয়। আমরা যদি মনে করিতে পারিতাম যে, রাবণ কুম্ভকর্ণ মেগেজিন পড়িতেন, তাহা হইলে তাঁহারা কণ্টেম্পারারি বা নাইন্টীন্থ সেণ্ডুরি পড়িতেন সন্দেহ নাই। ইউরোপে বা লঙ্কায় সে সব সম্ভবে, ক্ষুদ্র-প্রাণ বাঙ্গালীর দেশে, সে সকল সম্ভবে না। ক্ষুদ্র-প্রাণ বাঙ্গালী বড় অধ্যয়নপর হইলেও ছয় ফর্ম্মা সুপার-রয়ল মাসে মাসে পাইলে পরিতোষ লাভ করে। তাহাতেও ইহা দেখি যে, মাসে মাসে অঙ্গলোকই ছয় ফর্ম্মা সুপার-রয়ল আয়ত্ত করিতে পারেন। যাহাদিগকে শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম করিয়া দিনপাত করিতে হয়, অর্থচিন্তায় এবং সংসারের জ্বালায় শশব্যস্ত, মহাজনের তাড়নায় বিব্রত,—এক মাসে ছয় ফর্ম্মা পড়া তাঁহারা বিড়ম্বনা মনে করেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই টাকা দিয়া বা না দিয়া ছয় ফর্ম্মার মাসিক পত্র লইয়া দুই এক বার চক্ষু বুলাইয়া তত্ত্বপোষের উপর ফেলিয়া রাখেন। তার পর সেই জ্ঞানবুদ্ধিবিদ্যারসপরিপূর্ণ মাসিক পত্রখণ্ড ক্রমে ক্রমে গড়াইতে গড়াইতে তত্ত্বপোষের নীচে পড়িয়া যায়। স্রুয়মান দীপতৈল তাহাকে নিষিক্ত

* গত বৎসর বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ কালে আমি অনবধানতা বশতঃ একটি গুরুতর অপরাধে পতিত হইয়াছিলাম। যাহাদিগের বলে এবং সাহায্যে আমি চারি বৎসর বঙ্গদর্শন সম্পাদনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলাম, কবিবর বাবু নবীনচন্দ্র সেন তাঁহাদিগের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য। সে উপকার ভুলিবার নহে—আমিও ভুলি নাই। তবে বিখ্যাত মদ্রাকরের প্রেতগণ আমাকে চারি বৎসর জ্বালাইয়া তৃপ্তলাভ করে নাই; শেষ দিন, আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার কালে নবীন বাবুর নামটি উঠাইয়া দিয়াছিল। বঙ্গদর্শনের পুনর্জীবন কালে আমি নবীন বাবুর কাছে বিনীত ভাবে এই দোষের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

বাংলা রচনাবলী

করিতে থাকে। বুদ্ধুক্ষু পিপীলিকা জাতি তদুপরি বিহার করিতে থাকে। এবং পরিশেষে বালকেরা তাহা আধকৃত করিয়া কাটয়া, ছাঁটয়া, লাজ বাঁধিয়া দিয়া, ঘুড়ী করিয়া উড়াইয়া দেয়;—হেম বাবু, রবীন্দ্রবাবু, নবীন বাবুর কাবিতা, দ্বিজেন্দ্র বাবু, যোগেন্দ্র বাবুর দর্শনশাস্ত্র; বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস, চন্দ্র বাবুর সমালোচন, কালীপ্রসন্ন বাবুর চিন্তা সূত্রবদ্ধ হইয়া পবন-পথে উত্থানপূর্বক বালকমণ্ডলীর নয়নানন্দ বর্জন করিতে থাকে। আর যে খণ্ড সৌভাগ্যশালী হইয়া অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিল, তাহার ত কথাই নাই। উন্নত ধরান, মশলা বাঁধা, মোছা, মাজা, ঘষা প্রভৃতি নানাবিধ সাংসারিক কার্যে নিযুক্ত হইয়া, সে পত্র নিজ সাময়িক জীবন চরিতার্থ করে। এমন হইতে পারে যে, ইহা সাময়িক পত্রের পক্ষে সঙ্গতি বটে, এবং ছয় ফর্মার স্থানে তিন ফর্মার আদেশ করিয়া ‘প্রচার’ যে গতান্তর প্রাপ্ত হইবেন, এমন বোধ হয় না; গতান্তরও বেগের দোকান ভিন্ন আর কিছুর দেখা যায় না। তবে তিন ফর্মায় এই ভরসা করা যাইতে পারে যে, ছেলের ঘুড়ী হইবার আগে, বাপের পড়া হইতে পারে; এবং পাকশালের কার্যনির্বাহে প্রেরিত হইবার পূর্বে গৃহিণীদিগের সহিত প্রচারের কিছুর সদালাপ হইতে পারে।

তার পর টাকার কথা। বৎসরে তিন টাকা অতি অল্প টাকা—অথচ সাময়িক পত্রের অধিকারী ও কার্য্যাধ্যক্ষগণের নিকট শূন্যে পাই যে, তাহাও আদায় হয় না। সাহিত্যানুরাগী বাঙ্গালীরা যে স্বভাবতঃ শঠ বণ্ডক এবং প্রতারক, ইচ্ছাপূর্বক সাময়িক পত্রের মূল্য ফাঁকি দেন, ইহা আমাদের বিশ্বাস হয় না, সুতরাং আমরা ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, তিন টাকাও সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের ক্ষমতাতীত। সকলের তিন টাকা জোটে না, এই জন্য দেন না, দিতে পারেন না বলিয়াই দেন না। যাঁহারা তিন টাকা দিতে পারেন না, তাঁহারা দেড় টাকা দিতে পারিবেন এমত বিবেচনা করিয়া, আমরা এই নূতন সাময়িক পত্র প্রকাশ করিলাম।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যদি লোক পড়েই না, টাকাই দেয় না, তবে এত ভ্রমরাশির উপর আবার এ নূতন ছাইমুঠা ঢালিবার প্রয়োজন কি? সাময়িক সাহিত্য যদি আমরা ছাই ভস্মের মধ্যে গণনা করিতাম, তাহা হইলে অবশ্য আমরা এ কার্যে হাত দিতাম না। আমাদের বিবেচনায় সভ্যতা-বৃদ্ধির এবং জ্ঞানবিস্তারের সাময়িক সাহিত্য একটি প্রধান উপায়। যে সকল জ্ঞানগর্ভ এবং মনুষ্যের উন্নতিসাধক তত্ত্ব, দুষ্প্রাপ্য, দুর্লভ এবং বহু পরিশ্রমে অধ্যয়নীয় গ্রন্থ সকলে, সাগর-গর্ভ-নিহিত রত্নের ন্যায় লুক্কায়িত থাকে, তাহা সাময়িক সাহিত্যের সাহায্যে সাধারণ সমীপে অনায়াসলভ্য হইয়া সুপরিচিত হয়। এমন কি, সাময়িক পত্র যদি যথাবিধি সম্পাদিত হয়, তাহা হইলে সাময়িক পত্রের সাধারণ পাঠকের অন্য কোন গ্রন্থ পড়িবার বিশেষ প্রয়োজন থাকে না। আর সাময়িক পত্রের সমকালিক লেখক ও ভাবুকদিগের মনে যে সকল নূতন তত্ত্ব আবির্ভূত হয়, তাহা সমাজে প্রচারিত করিবার সাময়িক পত্রই সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। তাহা না থাকিলে লেখক ও ভাবুকদিগকে প্রত্যেকে এক একখানি নূতন গ্রন্থ প্রচার করিতে হয়। বহুসংখ্যক গ্রন্থ সাধারণ পাঠক কর্তৃক সংগৃহীত এবং অধীত হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব সাময়িক পত্রই প্রাচীন জ্ঞান এবং নূতন ভাব উভয় প্রচারপক্ষেই সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। এই জন্যই আমরা সর্ব-সাধারণ-সুলভ সাময়িক পত্রের প্রচারে রতী হইয়াছি। আমাদের অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় যে, এই সময়ে, “নবজীবন” নামে অত্যুৎকৃষ্ট উচ্চদরের সাময়িক পত্রের প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে। আমরা সেই মহন্দৃষ্টান্তের অনুগামী হইয়া এই রত্ন পালন করিতে যত্ন করিব। ‘সত্য, ধর্ম’ এবং ‘আনন্দের’ প্রচারের জন্যই আমরা এই সুলভ পত্র প্রচার করিলাম এবং সেই জন্যই ইহার নাম দিলাম “প্রচার।”

যখন সর্বসাধারণের জন্য আমরা পত্র প্রচার করিতেছি, তখন অবশ্য ইহা আমাদের উদ্দেশ্য যে, প্রচারের প্রবন্ধগুলি সর্বসাধারণের বোধগম্য হয়। আমাদের পূর্ববর্তী সম্পাদকেরা এ বিষয়ে কত দূর মনোযোগী হইয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না—আমাদের এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ থাকিলে ইহা বলিতে পারি। কাজটা কঠিন, কৃতকার্য হইতে পারিব, এমন ভরসা অতি অল্প। তবে সাধারণপাঠ্য বলিয়া আমরা বালকপাঠ্য প্রবন্ধ ইহাতে সন্নিবেশিত করিব না। ভরসা করি, প্রচারে যাহা প্রকাশিত হইবে, তাহা অপরিণ্ডিত ও পরিণ্ডিত উভয়েরই আলোচনীয় হইবে। অনেকের বিশ্বাস আছে যে, যাহা অকৃতবিদ্যা ব্যক্তি পড়িবে বা বুঝিবে বা শুনবে, তাহা পরিণ্ডিতের পড়িবার বা বুঝিবার বা শুনবার যোগ্য নয়। আমাদের এ বিষয়ে অনেক সংশয় আছে। আমরা দেখিয়াছি, মহাভারতের ব্যাখ্যা পরিণ্ডিতে ও মূর্খে তুল্য মনোভিনিবেশপূর্বক

শুনিয়েছেন। ভিতরে সর্বত্রই মনুষ্য-প্রকৃতি এক। আমরা কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করিলে, অজ্ঞানীকে যতটা ঘৃণা করি, বোধ হয়, ততটাই কোন উপযুক্ত কারণ নাই। অজ্ঞ এবং জ্ঞানী উভয়ে কান পাতিয়া শুনিতে পারেন, আজকার দিনে এ বাঙ্গালা দেশে এমন অনেক বলিবার কথা আছে।

এ শিক্ষা শিখাইবে কে? এ পত্রের শিরোভাগে ত সম্পাদকের নাম নাই। থাকিবারও কোন প্রয়োজন দেখি না। সম্পাদক কে, পাঠকের জানিবারও কোন প্রয়োজন নাই; কেন না পাঠকেরা প্রবন্ধ পড়িবেন, সম্পাদককে পড়িবেন না। সম্পাদকের এমন কোন দাবি দাওয়া নাই যে, তিনি আত্মপরিচয় দিয়া পাঠকদিগের সম্মুখীন হইতে পারেন। তাঁহার কাজ, যাঁহারা বিদ্বান্, ভাবুক, রসজ্ঞ, লোকহিতৈষী এবং সুলেখক, তাঁহাদের লিখিত প্রবন্ধ সকল সংগ্রহ করিয়া পাঠকদিগকে উপহার প্রদান করেন। এ কাজ তিনি পারিবেন, এমন ভরসা করেন। আমরা মনুষ্যের নিকট সাহায্যের ভরসা পাইয়াছি। এক্ষণে যিনি মনুষ্যের জ্ঞানাতীত, যাঁহার নিকট মনুষ্য শ্রেষ্ঠ ও কীটানুমান, তাঁহার সাহায্যের প্রার্থনা করি। সকল সিদ্ধিই তাঁহার প্রসাদমাত্র এবং সকল অসিদ্ধি তাঁহার কৃত নিয়মলঙ্ঘনেরই ফল।—‘প্রচার’, শ্রাবণ ১২৯১, পৃ. ১-৬।

আদি ব্রাহ্ম সমাজ

ও

“নব হিন্দু সম্প্রদায়”

বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্প্রতি একটি বক্তৃতা করেন। তাহা অগ্রহায়ণের “ভারতী”তে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রস্তাবটির শিরোনাম, “একটি পুরাতন কথা।” বক্তৃতাটি শুনি নাই, মর্দুিত প্রবন্ধটি দেখিয়াছি। নিম্নস্বাক্ষরকারী লেখক তাহার লক্ষ্য।

ইহা আমার পক্ষে কিছুই নতুন নহে। রবীন্দ্র বাবু যখন ক, খ, শিখেন নাই, তাহার পূর্বে হইতে এরূপ সুখ দুঃখ আমার কপালে অনেক ঘটিয়াছে। আমার বিরুদ্ধে কেহ কখন কোন কথা লিখিলে বা বক্তৃতায় বলিলে এ পর্যন্ত কোন উত্তর করি নাই। কখন উত্তর করিবার প্রয়োজন হয় নাই। এবার উত্তর করিবার একটু প্রয়োজন পড়িয়াছে। না করিলে যাহারা আমার কথায় বিশ্বাস করে, (এমন কেহ থাকিলে থাকিতে পারে) তাহাদের অনিষ্ট ঘটিবে।

কিন্তু সে প্রয়োজনীয় উত্তর দুই ছত্রে দেওয়া যাইতে পারে। রবীন্দ্র বাবুর কথার উত্তরে ইহার বেশী প্রয়োজন নাই। রবীন্দ্র বাবু প্রতিভাশালী, সুশিক্ষিত, সুলেখক, মহৎ স্বভাব, এবং আমার বিশেষ প্রীতি, যত্ন এবং প্রশংসার পাত্র। বিশেষতঃ তিনি তরুণবয়স্ক। যদি তিনি দুই একটা কথা বেশী বলিয়া থাকেন, তাহা নীরবে শুনাই আমার কর্তব্য।

তবে যে এ কয় পাতা লিখিলাম, তাহার কারণ, এই রবির পিছনে একটা বড় ছায়া দেখিতেছি। রবীন্দ্র বাবু আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক। সম্পাদক না হইলেও আদি ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ যে বিশেষ ঘনিষ্ঠ, তাহা বলা বাহুল্য। বক্তৃতাটি পড়িয়া আমার আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্বন্ধে কতকগুলি কথা মনে পড়িল। আদি ব্রাহ্ম সমাজের লেখকদিগের নিকট আমার কিছু নিবেদন আছে। সেই জন্যই লিখিতেছি। কিন্তু নিবেদন জানাইবার পূর্বে পাঠককে একটা রহস্য বুঝাইতে হইবে।

গত শ্রাবণ মাসে, “নবজীবন” প্রথম প্রকাশিত হয়, তাহাতে সম্পাদক একটি সুচনা লিখিয়াছিলেন। সুচনায়, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রশংসা ছিল, বঙ্গদর্শনেরও প্রশংসা ছিল। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তত্ত্ববোধিনীর অপেক্ষা বঙ্গদর্শনের প্রশংসাটা একটু বেশী ঘোরাল হইয়া উঠিয়াছিল।

তার পর সঞ্জীবনীতে একখানি প্রেরিত পত্র প্রকাশিত হইল। পত্রখানির উদ্দেশ্য নবজীবন-সম্পাদককে এবং নবজীবনের সুচনাঞ্জে গালি দেওয়া। এই পত্রে লেখকের স্বাক্ষর ছিল না, কিন্তু অনেকেই জানে যে, আদি ব্রাহ্ম সমাজের এক জন প্রধান লেখক, ঐ পত্রের প্রণেতা। তিনি আমার বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র এবং শুনিয়েছেন, তিনি নিজে ঐ পত্রখানির জন্য পরে অনুতাপ করিয়াছিলেন, অতএব নাম প্রকাশ করিলাম না। যদি কেহ এই সকল কথা অস্বীকার করেন, তবে নাম প্রকাশ করিতে বাধ্য হইব।

বঙ্গীয় রচনাবলী

নবজীবন-সম্পাদক অক্ষয় বাবু, এ পত্রের কোন উত্তর দিলেন না। কিন্তু নবজীবনের আর এক জন লেখক এখানে চুপ করিয়া থাকা উচিত বোধ করিলেন না। আমার প্রিয় বন্ধু বাবু চন্দ্রনাথ বসু, ঐ পত্রের উত্তর দিয়াছিলেন; এবং গালাগালির রকমটা দেখিয়া “ইতর” শব্দটা লইয়া একটু নাড়াচাড়া করিয়াছিলেন।

তদন্তরে সঞ্জীবনীতে আর একখানি বেনামি পত্র প্রকাশিত হইল। নাম নাই বটে, কিন্তু নামের আদ্য অক্ষর ছিল,—“র”। লোকে কাজেই বলিল পত্রখানি রবীন্দ্র বাবুর লেখা। রবীন্দ্র বাবু ইতর শব্দটা চন্দ্র বাবুকে পাল্টাইয়া বলিলেন।

নবজীবনের পনের দিন পরে, প্রচারের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইল। প্রচার, আমার সাহায্যে ও আমার উৎসাহে প্রকাশিত হয়। নবজীবনে আমি হিন্দু ধর্ম—যে হিন্দু ধর্ম আমি গ্রহণ করি—তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া নিয়মক্রমে লিখিতেছিলাম। প্রচারেও ঐ বিষয়ে নিয়মক্রমে লিখিতে লাগিলাম। সেই ধর্ম আদি ব্রাহ্ম সমাজের অভিমত নহে। যে কারণেই হউক, প্রচার প্রকাশিত হইবার পর আমি আদি ব্রাহ্ম সমাজ-ভুক্ত লেখকদিগের দ্বারা চারি বার আক্রান্ত হইয়াছি। রবীন্দ্র বাবুর এই আক্রমণ চতুর্থ আক্রমণ। গড় পড়তায় মাসে একটি। এই সকল আক্রমণের তীব্রতা একটু পরদা পরদা উঠিতেছে। তাহার একটু পরিচয় আবশ্যিক।

প্রথম। তত্ত্ববোধিনীতে “নব্য হিন্দু সম্প্রদায়” এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধে আমার লিখিত “ধর্ম-জিজ্ঞাসা” সমালোচিত হয়। সমালোচনা আক্রমণ নহে। এই লেখক বিজ্ঞ, গম্ভীর, এবং ভাবুক। আমার যাহা বলিবার আছে, তাহা সব শুনিয়া, যদি প্রথম সংখ্যার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া, তিনি সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন, তবে তাহার কোন দোষই দিতে পারিতাম না। তিনি যদি অকারণে আমার উপর নিরীশ্বরবাদ প্রভৃতি দোষ আরোপিত না করিতেন, তবে আজ তাহার প্রবন্ধ এই গণনার ভিতর ধরিতে পারিতাম না। তিনি যে দয়ার সহিত সমালোচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি আমার ধন্যবাদের পাত্র। বোধ হয় বলায় দোষ নাই যে, এই লেখক স্বয়ং তত্ত্ববোধিনী-সম্পাদক বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দ্বিতীয়। তত্ত্ববোধিনীর ঐ সংখ্যায় “নূতন ধর্মমত” ইতিশীর্ষক দ্বিতীয় এক প্রবন্ধে অন্য লেখকের দ্বারা প্রচার ও নবজীবনের প্রথম সংখ্যায় ধর্ম সম্বন্ধে আমার যে সকল মত প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা—সমালোচিত নহে—তিরস্কৃত হয়। লেখকের নাম প্রবন্ধে ছিল না। লেখক কে তাহা জানি না, কিন্তু লোকে বলে, উহা বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসুর লেখা। তিনি আদি ব্রাহ্ম সমাজের সভাপতি। উহাতে “নাস্তিক” “জঘন্য কোমত মতাবলম্বী” ইত্যাদি ভাষায় অভিহিত হইয়াছিলাম। এই লেখক যিনিই হউন, বড় উদার-প্রকৃতি। তিনি উদারতা প্রযুক্ত, ইংরেজেরা যাহাকে বর্জিলের ভিতর হইতে বিড়াল বাহির করা বলে, তাহাই করিয়া বসিয়াছেন। একটু উদ্ধৃত করিতেছি।

“ধর্ম জিজ্ঞাসা”—প্রবন্ধলেখক তাহার প্রস্তাবের শেষে বলিয়াছেন “যে ধর্মের তত্ত্বজ্ঞানে অধিক সত্য, উপাসনা যে ধর্মের সর্বাপেক্ষা চিত্তশুদ্ধিকর এবং মনোবৃত্তি সকলের স্ফূর্তিদায়ক, যে ধর্মের নীতি সর্বাপেক্ষা ব্যক্তিগত এবং জাতিগত উন্নতির উপযোগী, সেই ধর্মই অবলম্বন করিবে। সেই ধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ। হিন্দুধর্মের সার ব্রাহ্মধর্মই এই সকল লক্ষণাক্রান্ত। আমাদিগের ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ক যে সকল শ্লোক আছে, সকলই সত্য। ব্রহ্মোপাসনা যেমন চিত্তশুদ্ধিকর ও মনোবৃত্তি সকলের স্ফূর্তিদায়ক, এমন অন্য কোন ধর্মের উপাসনা নহে। ঐ ধর্মের নীতি যেমন ব্যক্তিগত এবং জাতিগত উন্নতির উপযোগী, এমন অন্য কোন ধর্মের নীতি নহে। ব্রাহ্মধর্মই বঙ্গদেশের শিক্ষিত লোক মাত্রেরই গ্রহণযোগ্য। তাহাতে জাতীয় ভাব ও সত্য উভয়ই রক্ষিত হইয়াছে। উহা দেশের উন্নতির সঙ্গে সুসঙ্গত। উহা সমস্ত বঙ্গ দেশের লোক গ্রহণ করিলে বঙ্গ দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।” (তত্ত্ববোধিনী—ভাদ্র, ৯১ পৃষ্ঠা)। ইহার পরে আবার নূতন হিন্দুধর্ম সংস্কারের উদ্যম, নবজীবন ও প্রচারের ধৃষ্টতার পরিচয় বটে।

তৃতীয়। তৃতীয় আক্রমণ, তত্ত্ববোধিনীতে নহে, এবং ধর্ম সম্বন্ধে কোন বিচারেও নহে। প্রচারের প্রথম সংখ্যায় “বঙ্গালার কলঙ্ক” বলিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিত হয়। নব্যভারতে বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ নামে একজন লেখক উহার প্রতিবাদ করেন। তত্ত্ববোধিনীতে দেখিয়াছি যে, ইনি আদি ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক। শুনিয়াছি ইনি ষোড়াসাঁকোর ঠাকুর মহাশয়দিগের

এক জন ভৃত্য—নাএব কি কি আমি ঠিক জানি না। যদি আমার ভুল হইয়া থাকে, ভরসা করি, ইনি আমাকে মার্জনা করিবেন। ইনি সকল মাসিক পত্রে লিখিয়া থাকেন, এবং ইহার কোন কোন প্রবন্ধ পড়িয়াছি। আমার কথার দুই এক স্থানে কখন কখন প্রতিবাদ করিয়াছেন দেখিয়াছি। সে সকল স্থলে কখন অসৌজন্য বা অসভ্যতা দেখি নাই। কিন্তু এবারকার এই প্রবন্ধে ভাষাটা সহসা বড় নাএবি রকম হইয়া উঠিয়াছে। পাঠককে একটু উপহার দিতেছি।

“হে বঙ্গীয় লেখক! যদি ইতিহাস লিখিতে চাও, তবে রাশি রাশি গ্রন্থ অধ্যয়ন কর। আবিষ্কৃত শাসনপত্রগুলির মূল শ্লোক বিশেষরূপে আলোচনা কর—কাহারও অনুবাদের প্রতি অন্ধভাবে নির্ভর করিও না। উইলসন, বেবার, মেকস্‌মুলার, কনিংহাম প্রভৃতি পণ্ডিতগণের পদলেহন করিলে কিছুই হইবে না। কিম্বা মিওর, ভাউদাজি, মেইন, মিত্র, হাণ্টার প্রভৃতির কুসুম-কাননে প্রবেশ করিয়া তস্করবৃত্তি অবলম্বন করিও না। স্বাধীন ভাবে গবেষণা কর। না পার গুরুগরি করিও না।”* নব্যভারত—ভাদ্র, ২২৫ পৃষ্ঠা।

এখন, এই লেখকের কথা উত্থাপন করার আমার এমন উদ্দেশ্য নাই যে, কেহ বৃথেন, প্রভু-দিগের আদেশানুসারে ভৃত্যের ভাষার এই বিকৃতি ঘটয়াছে। তিনি আদি ব্রাহ্ম সমাজের সহকারী সম্পাদক বলিয়াই, তাহার উল্লেখ করিলাম।

চতুর্থ আক্রমণ, আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদকের দ্বারা হইয়াছে। গালিগালাজের বড় ছড়াছড়ি, বড় বাড়াবাড়ি আছে। আমরা প্রায়ই দেখিয়াছি, গালিগালাজে প্রভুর অপেক্ষা ভৃত্য মজবুত। এখানে বলিতে হইবে, প্রভুই মজবুত। তবে প্রভু, ভৃত্যের মত মেছোহাটা হইতে গালি আমদানি করেন নাই; প্রার্থনা-মন্দির হইতে আনিয়াছেন। উদাহরণ—“অসাধারণ প্রতিভা ইচ্ছা করিলে স্বদেশের উন্নতির মূল শিথিল করিতে পারেন, কিন্তু সত্যের মূল শিথিল করিতে পারেন না।” আরও বাড়াবাড়ি আছে। মেছোহাটার ভাষা এত দূর পৌঁছে না। পাঠক মনে করিবেন, রবীন্দ্র বাবু তরুণবয়স্ক বলিয়াই এত বাড়াবাড়ি হইয়াছে। তাহা নহে। সুর কেমন পরদা পরদা উঠিতেছে, তাহা দেখাইয়া আসিয়াছি। সমাজের সহকারী সম্পাদকের কর্তৃক মধ্যমের পর, সম্পাদক স্বয়ং পঞ্চমে না উঠিলে [সুর] লাগাইতে পারিবার সম্ভাবনা ছিল না।

রবীন্দ্র বাবু বলেন যে, আমার এই মত যে, সত্য ত্যাগ করিয়া প্রয়োজন মতে মিথ্যা কথা বলিবে। বরং আরও বেশী বলেন; পাঠক বিশ্বাস না করেন, তাহার লিপি উদ্ধৃত করিতেছি, পড়ুন।

“আমাদের দেশের প্রধান লেখক প্রকাশ্য ভাবে, অসঙ্কেচে, নির্ভয়ে, অসত্যকে সত্যের সহিত একাসনে বসাইয়াছেন, সত্যের পূর্ণ সত্যতা অস্বীকার করিয়াছেন, এবং দেশের সমস্ত পাঠক নীরবে নিস্তব্ধভাবে শ্রবণ করিয়া গিয়াছেন। সাকার নিরাকারের উপাসনা ভেদ লইয়াই সকলে কোলাহল করিতেছেন, কিন্তু অলক্ষ্যে ধর্ম্মের ভিত্তিমূলে যে আঘাত পড়িতেছে, সেই আঘাত হইতে ধর্ম্মকে ও সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য কেহ দণ্ডায়মান হইতেছেন না। এ কথা কেহ ভাবিতেছেন না যে, যে সমাজে প্রকাশ্য ভাবে কেহ ধর্ম্মের মূলে কুঠারঘাত করিতে সাহস করে, সেখানে ধর্ম্মের মূল না জানি কতখানি শিথিল হইয়া গিয়াছে। আমাদের শিরার মধ্যে মিথ্যাচরণ ও কাপুরুষতা যদি রক্তের সহিত সঞ্চারিত না হইত, তাহা হইলে, কি আমাদের দেশের মুখ্য লেখক পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া স্পর্ধা সহকারে সত্যের বিরুদ্ধে একটি কথা কহিতে সাহস করেন? ইত্যাদি ইত্যাদি। (ভারতী—অগ্রহায়ণ, ৩৪৭ পৃঃ)।

সর্ব্বনাশের কথা বটে, আদি ব্রাহ্ম সমাজ না থাকিলে আমার হাত হইতে দেশ রক্ষা পাইত কি না সন্দেহ। হয়ত পাঠক জানিতে ইচ্ছা করিতেছেন, কবে এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটিল! কবে আমি পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া, স্পর্ধা সহকারে, লোক ডাকিয়া বলিয়াছি, “তোমরা ছাই ভস্ম সত্য ভাসাইয়া দাও—মিথ্যার আরাধনা কর।” কথাটার উত্তর দিতে পারিলাম না। ভরসা ছিল,

* কৈলাস বাবুর প্রবন্ধেই প্রকাশ আছে যে, তিনি জানিয়াছেন যে প্রবন্ধ আমার লিখিত এবং আমিই তাহার লক্ষ্য। ২২৫ পৃষ্ঠা প্রথম স্তম্ভের নোট এবং অন্যান্য স্থান পড়িয়া দেখায় ইহা যে আমার লেখা তাহা অনেকেই জানে, এবং কোন কোন সম্বাদপত্রেও সে কথা প্রকাশিত হইয়াছিল।

† বক্তৃতার সময়ে শ্রোতারাই এই শব্দটা কিরূপ শুনিয়াছিলেন?

বাংকম রচনাবলী

রবীন্দ্র বাবু এ বিষয়ে সহায়তা করবেন, কিন্তু বড় করেন নাই। তাঁহার কুড়ি স্তম্ভ বক্তৃতার মধ্যে মোটে ছয় ছয় প্রমাণ প্রয়োগ খুঁজিয়া পাইলাম। তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

লেখক মহাশয় একটি হিন্দুর আদর্শ কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন, “তিনি যদি মিথ্যা কহেন, তবে মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তি স্মরণ পূর্ব্বক যেখানে লোক-হিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয় অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেইখানেই মিথ্যা কথা কহিয়া থাকেন।”

প্রমাণ প্রয়োগ এই পর্যন্ত; তার পর আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক বলিতেছেন, “কোনখানেই মিথ্যা সত্য হয় না; শ্রদ্ধাস্পদ বাংকম বাবু বলিলেও হয় না, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিলেও হয় না।”

আমি বলিলেও মিথ্যা সত্য না হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ বলিলেও না হইতে পারে, কিন্তু বোধ করি আদি ব্রাহ্ম সমাজের কেহ কেহ বলিলে হয়। উদাহরণস্বরূপ “একটি আদর্শ হিন্দু-কল্পনা” সম্পাদক মহাশয়ের মূখ-নিঃসৃত এই চারিটি শব্দ পাঠককে উপহার দিতেছি।

প্রথম “কল্পনা” শব্দটি সত্য নহে। আমি আদর্শ হিন্দু “কল্পনা” করিয়াছি, এ কথা আমার লেখার ভিতর কোথাও নাই। আমার লেখার ভিতর এমন কিছুই নাই যে, তাহা হইতে এমন অনুমান করা যায়। প্রচারের প্রথম সংখ্যার হিন্দু ধর্ম শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে কথাটা রবীন্দ্র বাবু তুলিয়াছেন। পাঠক ঐ প্রবন্ধ পড়িয়া দেখিবেন যে, “কল্পনা” নহে। আমার নিকট পরিচিত দুই জন হিন্দুর দোষ গুণ বর্ণনা করিয়াছি। এক জন সন্ধ্যা আহিকে রত, কিন্তু পরের অনিষ্টকারী। আদি ব্রাহ্ম সমাজের কেহ যদি চাহেন, আমি তাঁহার বাড়ী তাঁহাদিগকে দেখাইয়া আনিতে পারি। স্পষ্টই বলিয়াছি যে, আমি ঐ ব্যক্তিকে দেখিয়াছি। ঐ ব্যক্তির পরিচয় দিয়া বলিয়াছি, “আর একটি হিন্দুর কথা বলি।” ইহাতে কল্পনা বুঝায় না, পরিচিত ব্যক্তির পরিচয় বুঝায়।

তার পর “আদর্শ” কথাটি সত্য নহে। “আদর্শ” শব্দটা আমার উক্তিভেদে নাই। ভাবেও বুঝায় না। যে ব্যক্তি কখন কখন সুরা পান করে, সে ব্যক্তি আদর্শ হিন্দু বলিয়া গৃহীত হইল কি প্রকারে?

এই দুইটি কথা “অসত্য” বলিতে হয়। অথচ সত্যের মহিমা কীর্তনে লাগিয়াছে। অতএব কৃষ্ণের আজ্ঞায় মিথ্যা সত্য হউক না হউক, আদি ব্রাহ্ম সমাজের লেখকের বাক্যবলে হইতে পারে।

প্রয়োজন হইলে এরূপ উদাহরণ আরও দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্র বাবুর সঙ্গে এরূপ বিচারে আমার প্রবৃত্তি নাই। আমার যদি মনে থাকিত যে, আমি রবীন্দ্র বাবুর প্রতিবাদ করিতেছি, তাহা হইলে এতটুকুও বলিতাম না। এই রবির পিছনে যে ছায়া আছে, আমি তাহারই প্রতিবাদ করিতেছি, বলিয়া এত কথা বলিলাম।

এখন এ সকল বাজে কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক। স্থূল কথা মীমাংসায় প্রবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন। “যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়”—এ কথার কোন অর্থ আছে কি? যদি বলা যায়, “একটা চতুষ্কোণ গোলক”—তবে অনেকেই বলিবেন, এমন কথার অর্থ নাই। যদি রবীন্দ্র বাবু আমার উক্তি তাই মনে করিতেন, তবে গোল মিটিত। তাঁহার বক্তৃতাও হইত না—আমাকেও এ পাপ প্রবন্ধ লিখিতে হইত না। তাহা নহে। ইহা অর্থযুক্ত বাক্য বটে, এবং তিনিও ইহাকে অর্থযুক্ত বাক্য মনে করিয়া, ইহার উপর বক্তৃতাটি খাড়া করিয়াছেন।

যদি তাই, তবে জিজ্ঞাসা করিতে হয়, তিনি এমন কোন চেষ্টা করিয়াছেন কি, যাহাতে লেখক যে অর্থে এই কথা ব্যবহার করিয়াছিল, সেই অর্থটি তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হয়? যদি তাহা না করিয়া থাকেন, তবে গালিই তাঁহার উদ্দেশ্য—সত্য তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। তিনি বলিবেন, “এমন কোন চেষ্টার প্রয়োজনই হয় নাই। লেখকের যে ভাব, লেখক নিজেই স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন—বলিয়াছেন, যেখানে লোকহিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।” ঠিক কথা, কিন্তু এই কথা বলিয়াই আমি শেষ করি নাই। মহাভারতীয় একটি কৃষ্ণোক্তির উপর বরাত দিয়াছি। এই কৃষ্ণোক্তিটি কি, রবীন্দ্র বাবু তাহা পড়িয়া দেখিয়াছেন কি? যদি না দেখিয়া থাকেন, তবে কি প্রকারে জানিলেন যে, আমার কথার ভাবার্থ তিনি বুঝিয়াছেন?

প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্র বাবু বলিতে পারেন, “অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত সমুদ্রবিশেষ, আমি কোথায় সে কৃষ্ণোক্তি খুঁজিয়া পাইব? তুমি ত কোন নিদর্শন লিখিয়া দাও নাই।” কাজটা রবীন্দ্র বাবুর পক্ষে বড় কঠিন ছিল না। ১৫ই শ্রাবণ আমার ঐ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তার পর, অনেক বার রবীন্দ্র বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে। প্রতিবার অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্তা হইয়াছে।

কথাবার্তা প্রায় সাহিত্য বিষয়েই হইয়াছে। এত দিন কথাটা জিজ্ঞাসা করিলে আমি দেখাইয়া দিতে পারিতাম, কোথায় সে কৃষ্ণোক্তি। রবীন্দ্র বাবুর অনুসন্ধানের ইচ্ছা থাকিলে, অবশ্য জিজ্ঞাসা করিতেন।

ঐ কৃষ্ণোক্তির মর্ম পাঠককে এখন সংক্ষেপে বুঝাই। কর্ণের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া যুদ্ধিষ্ঠির শিবিরে পলায়ন করিয়া শূন্য হইয়া আছেন। তাঁহার জন্য চিন্তিত হইয়া কৃষ্ণোক্তির সেখানে উপস্থিত হইলেন। যুদ্ধিষ্ঠির কর্ণের পরাক্রমে কাতর ছিলেন, ভাবিতোছিলেন, অজ্ঞান এতক্ষণ কর্ণকে বধ করিয়া আসিতেছে। অজ্ঞান আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কর্ণ বধ হইয়াছে কি না। অজ্ঞান বলিলেন, না, হয় নাই। তখন যুদ্ধিষ্ঠির রাগান্বিত হইয়া, অজ্ঞানের অনেক নিন্দা করিলেন, এবং অজ্ঞানের গান্ধীবের অনেক নিন্দা করিলেন। অজ্ঞানের একটি প্রতিজ্ঞা ছিল—যে গান্ধীবের নিন্দা করিবে, তাহাকে তিনি বধ করিবেন। কাজেই এক্ষণে “সত্য” রক্ষার জন্য তিনি যুদ্ধিষ্ঠিরকে বধ করিতে বাধ্য—নাহিলে “সত্য”-চ্যুত হইতেন। তিনি জ্যেষ্ঠ সহোদরের বধে উদ্যত হইলেন—মনে করিলেন, তার পর প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ, আত্মহত্যা করিবেন। এই সকল জানিয়া, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, এরূপ সত্য রক্ষণীয় নহে। এ সত্য-লঙ্ঘনই ধর্ম। এখানে সত্যচ্যুতিই ধর্ম। এখানে মিথ্যাই সত্য হয়।

এটা যে উপন্যাস মাত্র, তাহা আদি ব্রাহ্ম সমাজের শিক্ষিত লেখকদিগকে বুঝাইতে হইবে না। রবীন্দ্র বাবুর বক্তৃতার ভাবে বুঝায় যে, যেখানে কৃষ্ণ নাম আছে, সেখানে আর আমি মনে করি না যে, এখানে উপন্যাস আছে—সকলই প্রতিবাদের অতীত সত্য বলিয়া ধ্রুব জ্ঞান করি। আমি যে এমন মনে করিতে পারি যে, এ কথাগুলি সত্য সত্য কৃষ্ণ স্বয়ং যুদ্ধিষ্ঠিরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলেন নাই, ইহা কৃষ্ণ-প্রচারিত ধর্মের কবিকৃত উপন্যাসযুক্ত ব্যাখ্যা মাত্র, ইহা বোধ হয়, তাঁহারা বুঝিবেন না। তাহাতে এখন ক্ষতি নাই। আমার এখন এই জিজ্ঞাস্য যে, তিনি আমার কথার অর্থ বুঝিতে কি গোলযোগ করিয়াছেন, তাহা এখন বুঝিয়াছেন কি? না হয়, একটু বুঝাই।

রবীন্দ্র বাবু “সত্য” এবং “মিথ্যা” এই দুইটি শব্দ ইংরেজি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। সেই অর্থেই আমার ব্যবহৃত “সত্য” “মিথ্যা” বুঝিয়াছেন। তাঁহার কাছে সত্য, *Truth*, মিথ্যা, *Falsehood*। আমি সত্য মিথ্যা শব্দ ব্যবহার কালে ইংরেজির অনুবাদ করি নাই। এই অনুবাদপরায়ণতাই আমার বিবেচনায়, আমাদের মৌলিকতা, স্বাধীন চিন্তা ও উন্নতির এক বিঘ্ন হইয়া উঠিয়াছে। “সত্য” “মিথ্যা” প্রাচীনকাল হইতে যে অর্থে ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, আমি সেই অর্থে ব্যবহার করিয়াছি। সে দেশী অর্থে, সত্য *Truth*, আর তাহা ছাড়া আরও কিছু। প্রতিজ্ঞা-রক্ষা, আপনার কথা রক্ষা, ইহাও সত্য। এইরূপ একটি প্রাচীন ইংরেজি কথা আছে—“*Troth*”। ইহাই *Truth* শব্দের প্রাচীন রূপ। এখন, *Truth* শব্দ *Troth* হইতে ভিন্নার্থ হইয়া পড়িয়াছে। ঐ শব্দটিও এখনও আর বড় ব্যবহৃত হয় না। *Honour, Faith*, এই সকল শব্দ তাহার স্থান গ্রহণ করিয়াছে। এ সামগ্রী চোর ও অন্যান্য দুষ্কৃত্যকারীদের মধ্যেও আছে। তাহারা ইহার সাহায্যে পৃথিবীর পাপ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। যাহা *Truth*—রবীন্দ্র বাবুর *Truth* তাহার দ্বারা পাপের সাহায্য হইতে পারে না।

এক্ষণে রবীন্দ্র বাবুর সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহাদের মতে আপনার পাপপ্রতিজ্ঞা (সত্য) রক্ষার্থ নিরপরাধী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বধ করাই কি অজ্ঞানের উচিত ছিল? যদি কেহ প্রাতে উঠিয়া সত্য করে যে, আজ দিবাসানের মধ্যে পৃথিবীতে যত প্রকার পাপ আছে—হত্যা, দস্যুতা, পরদার, পরপীড়ন,—সকলই সম্পন্ন করিব—তাঁহাদের মতে কি ইহার সেই সত্য পালনই উচিত? যদি তাঁহাদের সে মত হয়; তবে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তাঁহাদের সত্যবাদ তাঁহাদেরই থাক্, এদেশে যেন প্রচারিত না হয়। আর তাঁহাদের মত যদি সেরূপ না হয়, তবে অবশ্য তাঁহারা স্বীকার করিবেন যে, এখানে সত্যচ্যুতিই ধর্ম। এখানে মিথ্যাই সত্য।

এ অর্থে “সত্য” “মিথ্যা” শব্দ ব্যবহার করা আমার উচিত হইয়াছে কি না, ভরসা করি, এ বিচার উঠিবে না। সংস্কৃত শব্দের চিরপ্রচলিত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া, ইংরেজি কথার অর্থ তাহাতে লাইতে হইবে, ইহা আমি স্বীকার করি না। হিন্দুর বর্ণনার স্থানে যে খ্রীষ্টীয়ানের বর্ণনা করিতে হইবে, তাহাও স্বীকার করি না।

রবীন্দ্র বাবু, “সত্য” শব্দের ব্যাখ্যায় যেমন গোলযোগ করিয়াছেন, লোকহিত লইয়াও তেমনি—বরং আরও বেশী গোলযোগ করিয়াছেন। কিন্তু আর কচকাঁচ বাড়াইতে আমার ইচ্ছা নাই।

বাঁকম রচনাবলী

এখন আর আমার সময়ও নাই। প্রচারে আর স্থানও নাই। বোধ হয়, পাঠকের আর ধৈর্য্যও থাকিবে না। সুতরাং ক্ষান্ত হইলাম।

এখন রবীন্দ্র বাবু বলিতে পারেন যে, “যদি বুদ্ধিতে পারিতেছ যে, তোমার ব্যবহৃত শব্দের অর্থ বুদ্ধিতে না পারিয়া, আমি ভ্রমে পতিত হইয়াছি—তবে আমার ভ্রম সংশোধন করিয়াই তোমার ক্ষান্ত হওয়া উচিত ছিল—আদি ব্রাহ্ম সমাজকে জড়াইতেছ কেন?” এই কথার উত্তরে, যে কথা সাধারণ পাঠ্য প্রবন্ধে বলা রুচিবর্গহীন, যাহা Personal, তাহা বলিতে বাধ্য হইলাম। আমার সৌভাগ্যক্রমে, আমি রবীন্দ্রবাবুর নিকট বিলক্ষণ পরিচিত। শ্লাঘাস্বরূপ মনে করি,—এবং ভরসা করি, ভবিষ্যতেও মনে করিতে পারিব যে, আমি তাঁহার সুহৃৎজন মধ্যে গণ্য হই। চারি মাস হইল প্রচারের সেই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই চারি মাস মধ্যে রবীন্দ্র বাবু অনগ্রহপূর্ব্বক অনেকবার আমাকে দর্শন দিয়াছেন। সাহিত্য বিষয়ে, অনেক আলাপ করিয়াছেন। এ প্রসঙ্গ কখনও উত্থাপিত করেন নাই। অথচ বোধ হয়, যদি ঐ প্রবন্ধ পড়িয়া রবীন্দ্র বাবুর এমন বিশ্বাসই হইয়াছিল যে, দেশের অবনতি, এবং ধর্ম্মের উচ্ছেদ, এই দুইটি আমি জীবনের উদ্দেশ্য করিয়াছি, তবে যিনি ধর্ম্মপ্রচারে নিযুক্ত, আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক, এবং স্বয়ং সত্যানুরাগ প্রচারে যত্নশীল, তিনি এমন ঘোর পাপিষ্ঠের উদ্ধারের জন্য যে সে প্রসঙ্গ ঘৃণাক্ষরেও উত্থাপিত করিবেন না, তার পর চারি মাস বাদে সহসা পরোক্ষে বাগ্মিতার উৎস খুলিয়া দিবেন, ইহা আমার অসম্ভব বোধ হয়। তাই মনে করি, এ উৎস তিনি নিজে খুলেন নাই, আর কেহ খুলিয়া দিয়াছে। এক্ষণে আদি ব্রাহ্ম সমাজের লেখকদিগের কাজ, গোড়ায় যাহা বলিয়াছি, পাঠক তাহা স্মরণ করুন। আদি ব্রাহ্ম সমাজকে জড়ানতে, আমার কোন দোষ আছে কি না, বিচার করুন।

তাই, আদি ব্রাহ্ম সমাজের লেখকদিগের কাছে আমার একটা নিবেদন আছে। আদি ব্রাহ্ম সমাজকে আমি বিশেষ ভক্তি করি। আদি ব্রাহ্ম সমাজের দ্বারা এ দেশে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ উন্নতি সিদ্ধ হইয়াছে ও হইতেছে জানি। বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাবু রাজনারায়ণ বসু, বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে সমাজের নেতা, সে সমাজের কাছে অনেক শিক্ষা লাভ করিব, এমন আশা রাখি। কিন্তু বিবাদ বিসম্বাদে সে শিক্ষা লাভ করিতে পারিব না। বিশেষ আমার বিশ্বাস, আদি ব্রাহ্ম সমাজের লেখকদিগের দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের অতিশয় উন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে। সেই বাঙ্গালা সাহিত্যের কার্য্য আমরা জীবন সমর্পণ করিয়াছি। আমি ক্ষুদ্র, আমার দ্বারা এমন কিছু কাজ হয় নাই, বা হইতে পারে না, যাহা আদি ব্রাহ্ম সমাজের লেখকেরা গণনার মধ্যে আনেন। কিন্তু কাহারও আন্তরিক যত্ন নিষ্ফল হয় না। ফল যতই অল্প হউক, বিবাদ বিসম্বাদে কর্ম্মবে বই বাড়িবে না। পরম্পরের আনুকূল্যে ক্ষুদ্রের দ্বারাও বড় কাজ হইতে পারে। তাই বলিতেছি, বিবাদ বিসম্বাদে, স্বনামে বা বিনামে, স্বতঃ বা পরতঃ, প্রকাশ্যে বা পরোক্ষে, বিবাদ বিসম্বাদে তাঁহারা মন না দেন। আমি এই পর্য্যন্ত ক্ষান্ত হইলাম, আর কখন এরূপ প্রতিবাদ করিব এমন ইচ্ছা নাই। তাঁহাদের যাহা কর্তব্য বোধ হয়, অবশ্য করিবেন।

উপসংহারে, রবীন্দ্র বাবুকেও একটা কথা বলিবার আছে। সত্যের প্রতি কাহারও অভক্তি নাই, কিন্তু সত্যের ভানের উপর আমার বড় ঘৃণা আছে। যাহারা নেড়া বৈরাগীর হরিনামের মত মুখে সত্য সত্য বলে, কিন্তু হৃদয় অসত্যে পরিপূর্ণ, তাহাদের সত্যানুরাগকেই সত্যের ভান বলিতেছি। এ জিনিষ, এ দেশে বড় ছিল না,—এখন বিলাত হইতে ইংরেজির সঙ্গে বড় বেশী পরিমাণে আমদানি হইয়াছে। সামগ্রীটা বড় কদর্য্য। মৌখিক “Lie direct” সম্বন্ধে তাঁহাদের যত আপত্তি—কার্য্যতঃ সমুদ্রপ্রমাণ মহাপাপেও আপত্তি নাই। সে কালের হিন্দুর এই দোষ ছিল বটে যে, “Lie direct” সম্বন্ধে তত আপত্তি ছিল না, কিন্তু ততটা কপটতা ছিল না।* দুইটিই মহাপাপ। এখন ইংরেজি শিক্ষার গুণে হিন্দু পাপটা হইতে অনেক অংশে উদ্ধার পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু ইংরেজি পাপটা বড় বাড়িয়া উঠিতেছে। মৌখিক অসত্যের অপেক্ষা আন্তরিক অসত্য যে গুরুতর পাপ, রবীন্দ্র বাবু বোধ হয় তাহা স্বীকার করিবেন। সত্যের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে গিয়া কেবল মৌখিক সত্যের প্রচার, আন্তরিক সত্যের প্রতি অপেক্ষাকৃত অমনোযোগ, রবীন্দ্র বাবুর যত্নে এমনটা না ঘটে, এইটুকু সাবধান করিয়া দিতেছি। ঘটিয়াছে,

* দেবী চৌধুরাণীতে প্রসঙ্গক্রমে ইহা উত্থাপিত করিয়াছি—১৩০ পৃষ্ঠা দেখ।

লর্ড রিপনের উৎসবের জমা-খরচ

এমন কথা বলিতেছি না, কিন্তু পথ বড় পিচ্ছিল, এজন্য এটুকু বলিলাম, মার্জনা করিবেন। তাঁহার কাছে অনেক ভরসা করি, এই জন্য বলিলাম। তিনি এত অল্প বয়সেও বাঙ্গালার উজ্জ্বল রত্ন—আশীর্বাদ করি, দীর্ঘজীবী হইয়া আপনার প্রতিভার উপযুক্ত পরিমাণে দেশের উন্নতি সাধন করুন। শ্রীবাণীকমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।—‘প্রচার’, অগ্রহায়ণ ১২৯১, পৃ. ১৬৯-১৮৪।

লর্ড রিপনের উৎসবের জমা-খরচ

এ উৎসবে আমরা পাইলাম কি? হারাইলাম কি? যে সপ্তয়ী লোক, সে সকল সময়ে আপনার জমা-খরচটা খতাইয়া দেখে। আমাদের জাতীয় জমা-খরচটার মধ্যে মধ্যে কৈফিয়ৎ কাটিয়া দেখা ভাল। আগে দেখা যাউক, আমাদের লাভের অঙ্ক কি?

প্রথমতঃ, আমরা এ উৎসবে লাভ করিয়াছি রাজভক্তি। অনেকে বলিবেন, আমাদের রাজভক্তি ছিল বলিয়াই, উৎসব করিয়াছি। সকলেই বুঝেন যে, ঠিক তাহা নহে; অন্য কারণে এ উৎসব উপস্থিত হইয়াছে। উৎসবেই আমাদের রাজভক্তি বাড়িয়াছে। রাজভক্তি বড় বাঞ্ছনীয়। রাজভক্তি জাতীয় উন্নতির একটি গুরুতর কারণ। রাজভক্তির জন্য ইহা প্রয়োজনীয় নহে যে, রাজা স্বয়ং একটা ভক্তির যোগ্য মনুষ্য হইবেন। ইংলন্ডের এলিজাবেথ বা প্রুশিয়ার দ্বিতীয় ফ্রেড্রিক, এতদুভয়ের কেহই ভক্তির যোগ্য ছিলেন না। এরূপ নৃশংস-চরিত্র নরনারী পৃথিবীতে দুর্লভ। কিন্তু এলিজাবেথের প্রতি জাতীয় রাজভক্তি ইংলন্ডের উন্নতির একটি কারণ। ফ্রেড্রিকের প্রতি জাতীয় রাজভক্তি প্রুশিয়ার উন্নতির একটি কারণ।

আমাদের দ্বিতীয় লাভ, জাতীয় ঐক্য। এই বোধহয়, ঐতিহাসিক কালে প্রথম সমস্ত ভারতবর্ষ এক হইয়া একটা কাজ করিল। আমরা এই প্রথম বুঝিলাম যে, আমাদের মধ্যে ঐক্য ঘটিতে পারে। আমরা এই প্রথম বুঝিলাম, ভারতবর্ষীয়েরা একজাতি।

তৃতীয় লাভ, রাজকীয় শক্তি। রাজকীয় শক্তি কতকটা ঐক্যের ফল বটে, কিন্তু ঐক্য থাকিলেই যে শক্তি থাকে, এমত নহে। সকল সমাজেই, সমাজই রাজা। রাজা সমাজ শাসন করেন বটে, কিন্তু সে সমাজের প্রতিনিধিস্বরূপ। সমাজ রাজার উপর আবার রাজা। কেবল সমাজ রাজার দণ্ড পুরস্কারের কর্তা। যে সমাজ রাজাকে দণ্ডিত বা পুরস্কৃত করিয়া থাকে, সেই সমাজেরই রাজনৈতিক শক্তি আছে। প্রকৃত রাজদণ্ড সেই সমাজেরই হাতে। আজ, লর্ড রিপনকে সুশাসনের জন্য পুরস্কৃত করিয়া ভারতবর্ষীয় সমাজ সেই রাজদণ্ড স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছে। ইহাই স্বাধীনতা।

আমাদের চতুর্থ লাভ,—এটুকু কেবল বাঙ্গালার লাভ;—সমাজের কর্তৃত্ব ভূমিধিকারীদের হাত হইতে এই প্রথম মধ্যবিত্ত লোকের হাতে গেল। অর্থাৎ কর্তৃত্ব, ধনের হাত হইতে বুদ্ধি-বিদ্যার হাতে গেল। এখন হইতে বাঙ্গালায় ধনবানেরা আর কেহই নহেন, শিক্ষিত সম্প্রদায়ই কর্তা। ইহা সমাজের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলকর, উন্নতির লক্ষণ, এবং উন্নতির সোপান। এখনকার নূতন সমাজ নেতৃগণের নিকট আমাদের নিবেদন, তাঁহারা সমাজ ধীরে ধীরে সুপথে চালাইলে, বিপ্লব না ঘটে।

এই গেল লাভের অঙ্ক জমা। এক্ষণে খরচটা দেখা যাউক।

আমাদের প্রথম ক্ষতি এই যে, এ উৎসবে দ্বৈষক ইংরেজ-সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৈরিতা বড় বাড়িয়া উঠিল। মুখে যিনি যাহা বলুন, তাঁহারা এ উৎসব কখন মার্জনা করিবেন না। তাঁহাদের সঙ্গে আর গোল মিটিবে না। ইহাতে সময়ে সময়ে আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

আমাদের দ্বিতীয় ক্ষতি এই যে, কিছু “স্টীম” ছাড়া হইয়াছে, যে সঞ্চিত বলে সমাজ-যন্ত্র দ্রুতবেগে চলবে, তাহার কিছু ব্যয় হইয়াছে। সেটা নিতান্ত মন্দও হয় নাই। বড় বেশী স্টীম জমিলে বিপ্লব উপস্থিত হয়।

আমাদের তৃতীয় ক্ষতি এই যে, গলাবাজির দৌরাখ্যাটা বড় বাড়িয়া গেল। কথার ছড়াছড়ি বড় বেশী হইয়া গিয়াছে। সেটা শুল্ক। একে ত বাঙ্গালী সহজেই কেবল বাক্য-বাহাদুর, তার উপর বক্তৃতা নামে বিলাতি মালের আমদানি হইয়াছে। সোণা বলিয়া সোয়াসা বিক্রয় হইতেছে। আমাদের ভয়, পাছে আপনাদের বাক্জালে আপনারাই জড়াইয়া পড়ি, কথার কুয়াশায় আর পথ দেখিতে না পাই; তুবড়ী বাজির মত মুখে সোঁ সোঁ করিয়া ফাটিয়া যাই।

বাংকম রচনাবলী

সে যাহাই হোক, খরচের অপেক্ষা জমা যে বেশী, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। খরচগুলি ছোট ছোট, লাভগুলি বড় বড়। উৎসবে আমরা মনুাফা করিয়াছি, এখন রেখে ঢেকে চালাইতে পারিলেই হয়। তবে লাভ কি, লোকসান কি তাহা না বুকিয়া, “বেড়ে হয়েছে! বেড়ে হয়েছে!” বলিয়া বেড়ান জাতীয় শিক্ষার পক্ষে ভাল নহে। ‘প্রচার’ পৌষ, ১২৯১, পৃ. ২১৮-২২০।

আগামী বৎসরে প্রচার যে রূপ হইবে

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, যাহা সঙ্কল্প করা যায়, তাহা সকল সময়ে সম্পন্ন হয় না। যখন প্রচার প্রথম প্রকাশ হয়, তখন আমাদের এমন অভিপ্রায় ছিল না যে, প্রচার কেবল ধর্ম-বিষয়ক পত্র হইবে। কিন্তু প্রচারের লেখকদিগের রুচির গतिकে, বিশেষতঃ প্রধান লেখকের অভিপ্রায় অনুসারে, ইহাতে এক্ষণে ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ ভিন্ন আর কিছু থাকে না।

ইহাতে প্রচারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। জ্ঞানের মধ্যে ধর্মজ্ঞানই সর্বশ্রেষ্ঠ বটে, কিন্তু অন্যান্য জ্ঞান ভিন্ন ধর্মজ্ঞানের সম্যক্ স্ফূর্তি হয় না। বিশেষ মনুষ্যজীবন বিচিত্র ও বহুবিষয়ক; এজন্য জ্ঞানেরও বৈচিত্র্য ও বহুবিষয়কতা চাই। যাহা বিচিত্র ও বহুবিষয়ক নহে, তাহা সাধারণের নিকট আদরণীয় হইতে পারে না। সাধারণের নিকট আদরণীয় না হইলে ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধেও সফলতা ঘটে না। অতএব আগামী বৎসরে যাহাতে প্রচার বিচিত্র ও বহুবিষয়ক হয়, আমরা তাহা করিবার উদ্যোগী হইয়াছি। প্রচারের প্রধান লেখকেরাও এ বিষয়ে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন।

কিন্তু প্রচারের বর্তমান ক্ষুদ্রাকার থাকিলে, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। আমরা ধর্মালোচনা পরিত্যাগ করিতে পারি না, অথবা তাহার অল্পতা করিতে পারি না। কাজেই প্রচারের কলেবর বৃদ্ধি করিতে হইবে। কলেবর বৃদ্ধি করিয়া, আমরা নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে প্রচার সম্পাদিত করিতে পারিব।

১। ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ এক্ষণে যে রূপ প্রকাশিত হইতেছে সেইরূপ হইতে থাকিবে। এখন যাঁহারা তাহা লিখিতেছেন, তাঁহারা তাহা লিখিবেন।

২। স্থানাভাবপ্রযুক্ত আমরা উপন্যাস বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। এক্ষণে স্থানাভাব থাকিবে না। অতএব উপন্যাস পুনঃ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইবে। “সীতারাম” বন্ধ হওয়ায়, অনেক পাঠক দুঃখ বা অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব আগামী শ্রাবণ মাস হইতে “সীতারাম” পুনঃ প্রকাশিত হইতে থাকিবে।

৩। এতিম্ন সামাজিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, দার্শনিক, এবং অন্যান্য প্রবন্ধ ও রহস্য প্রকাশিত হইবে।

এই সঙ্কল্প পাঠকদিগের অনুমোদিত না হইলে, সিদ্ধ হইবে না। কেন না পত্রের কলেবর বৃদ্ধি করিলে কাজেই মূল্য বৃদ্ধি হইবে। এই জন্য দুই মাস অগ্রে পাঠকদিগকে সম্বাদ দিলাম। পত্রের কলেবর এবং মূল্য কি পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে, তাহা পাঠকেরা বিজ্ঞাপনে দৃষ্টি করিবেন।—‘প্রচার’, জ্যৈষ্ঠ ১২৯১, পৃ. ৩৬১-৬২।

মাসিক সংবাদ

গঙ্গাতীরে পাটনা নামে কোন নগর আছে। তথায় ককুড় নামা প্রথিতযশা অতি জ্ঞানবান্ এক বিচারপতি জনসমাজের প্রতি কৃপা করিয়া মাসিক আড়াই হাজার টাকামাত্র বেতন লইয়া বিচার বিতরণ করিতেন। তাহাতে পুণ্যক্ষেত্র পার্শ্বপত্র পবিগ্নিত হইতছিল। একদা, বৃধিয়া নাম্নী অপ্ৰাপ্ত-যৌবনা ক্কাচিৎ কুমারী তাঁহার বিচারাগারে বিচার প্রার্থিত হইল। বলিল—“ধর্মাবতার! গুরুরূচরণ দোসাদ নামে চোর, আমার ঘটি বাটি চুরি করিয়াছে।” বিচারনিধান এই অশ্রুতপূর্ষ অভাবনীয় অঘটনীয় সম্বাদশ্রবণে বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া মনে মনে নানাবিধ তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন—“কালের কি বিচিত্র গতি! হায়! কুমারীর ঘটি বাটি চুরি! এমন কি হয়!” মলিন্লুচ যুক্তপাণি হইয়া বিচারাসনতলে নিবেদন করিল—“হে ধর্মস্বরূপ! এমন কি হয়! বরং আকাশে স্তরে স্তরে সহস্রদল পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতে পারে

—বরং প্রভাতে পশ্চিমে দ্বাদশ আদিত্য উদিত হইতে পারে, বরং হিমালয়-শিখর-দেশে যুখে যুখে মকর কুম্ভীর সন্তরণ করিতে পারে, তথাপি, হে ধর্ম্মস্বরূপ! কুমারীর কখন ঘটি বাটি চুরি যাইতে পারে না। ধর্ম্মাবতার! এই দূশচারিণী বর্ধিয়া ঘোরতর অসতী—ইহার কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে।” তখন বিচারাসন হইতে সেই জ্ঞানসমুদ্রের কল্লোল সমুখিত হইল—“রে মলিন্দুচ! সাধু সাধু! এ অতি সঙ্গত কথা। আমি অনন্ত জ্ঞানী বিচারক; আমি অচিরেই পরীক্ষার দ্বারা এ কঠিন সমস্যার মীমাংসা করিব।” তখন ধন্বন্তরীর প্রতি মহা বিচারক আজ্ঞা প্রচার করিলেন, “বিবস্ত্র করিয়া এই দূশচারিণীকে পরীক্ষিত কর।” দূশচারিণী পরীক্ষিত হইয়া চরিতার্থ হইল। কিন্তু কালের কি অনন্ত মহিমা! সেই প্রদেশে “বেহার হেরল্ড্” নামে অতি দুর্দান্ত রাক্ষস ধর্ম্মহিংসা করিয়া দিন যাপন করে। সেই মহাধনুর্ধর, পাটলিপুত্র নগরে এইরূপ সাক্ষাৎ ধর্ম্মের অবতারণা শ্রবণ করিয়া মহা ক্রোধভরে বিচারপতির প্রতি এমন এক শর প্রয়োগ করিলেন যে, তাহা ত্যাগে এক, মদ্রাঙ্কনে সহস্র, পতনকালে লক্ষ, এবং সংহারকালে কোটি কোটি হইয়া পড়িল। প্রথিতযশা বিচারনিধি শরজালে বিদ্ধ হইয়া, বিচারাসন হইতে ভূপতিত হইলেন। ইতি ককুড়-বধ।

He comes, nor law, nor justice his course delay
Hide! blushing Glory, hide Budhia's day.
The vanquished hero leaves his broken bands,
And shows his misery in distant lands.
His fate was destined on Patna's sand,
A petty niggeress, and a Baboo's hand!

* * * * *

কৃষ্ণনগরের মুনসেফ শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ সেন মহাশয় তাঁহার একটি রায়ে লিখিয়াছেন, হিন্দু বিধবাদিগের মধ্যে শতকরা ৯৯ জন অসতী। আমাদের একটি গল্প মনে পড়িল। গুরুদেব শিম্ব্যালয়ে গিয়াছেন, আদর অভ্যর্থনার পর যথাসময়ে শিষ্য রন্ধনের যোগাড় করিয়া দিল। ঝোল রাঁধিতে বড় বড় দশটি কই মাছ আনিয়া দিল; অতিপ্রায়, গুরুদেবের সেবা হইবে, অবশিষ্ট শিষ্য সহ স্বামীপুত্র প্রসাদ পাইবেন। রন্ধন শেষ হইল, গুরুদেব ভোজনে বসিলেন। ঝোলে নুন ঝাল সমান হইয়াছিল, একটি একটি করিয়া অমৃত বোধে গুরুদেব নয়টি মাছ খাইয়া ফেলিলেন। তখন তিনি অম্ল রসাম্বাদে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে কিন্তু গুরুদেবের কার্য্য শিষ্যের ভক্তির সীমা অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছিল, সে জিদ করিয়া বলিল—“এখন অম্বল থাকুক, আগে ও মাছটি খান।” গুরুদেব কিন্তু কিছুতেই স্বীকার পাইলেন না। শিষ্য তখন যৎপরোনাস্তি বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল—“উটি যদি না খান, ত আপনার বেটার মাথা খান।” আমরাও চণ্ডী বাবুকে অনুরোধ করি, যদি নিরানন্দইটির মাথাই খাইলেন, তবে আর একটি রাখিয়া ফল কি? আর একবার রায় লিখিয়া উটিকেও টানিয়া লউন।—‘প্রচার’ শ্রাবণ ১২৯৫, পৃ. ১৫৪-৫৫।

পত্রাবলী

[কালীপ্রসন্ন ঘোষকে লিখিত]

সুহৃদ্বরেণু—

আপনার পত্রগুলির যে উত্তর দিতে পারি না, তাহার অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি কারণ এই যে, তাহার উত্তর অদেয়। আপনি যাহা লেখেন তাহা এত মধুর যে, উত্তর যাহাই দিই না কেন তাহা কৰ্কশ হইবে। আপনার পত্রের উত্তর দেওয়া, আর অমৃত পান করিয়া ধন্বন্তরিকে মূল্য দেওয়া সমান বলিয়া বোধ হয়। আপনার পত্রের উত্তর না দেওয়াই ভাল—কোকিলকে Thanks দিয়া কি হইবে? আপনার নববর্ষ প্রভৃতি দিবসের সম্ভাষণ সম্বন্ধে এই কথা বিশেষ খাটে। আপনি নিজে পীড়িত; চক্ষের যন্ত্রণায় লিখিতে অসমর্থ, তথাপি আমাদের মঙ্গল আন্তরিক কামনা করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। আপনার তুল্য মনুষ্য অতি দুর্লভ। আপনাকে কায়মনোবাক্যে আশীর্বাদ করিতেছি, আপনি অচিরাৎ সুস্থ হইয়া স্বদেশের উন্নতি সাধন করিতে থাকুন।

স্যার আশালি ইডেনের স্বদেশ গমন উপলক্ষে কলিকাতায় হৃদয়স্থূল পড়িয়া গিয়াছে। কেহ বলে, গোবর জল ছড়া দাও। কেহ বলে, “অরে নিদারুণ প্রাণ! কোন পথে...যান, আগে যা রে পথ দেখাইয়া” ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের লাভের মধ্যে দুই একটা সমারোহ দেখিতে যাইব।

আমার দৌহিত্রটি এ পর্যন্ত আরোগ্য লাভ করিতে পারে নাই, তবে পূর্বাপেক্ষা ভাল আছে। আর ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, যম, কুবের প্রভৃতি দিকপালগণ পূর্বাভ্যুত দিকপালন করিতেছেন—চন্দ্রের মধ্যে মধ্যে পূর্ণোদয় হয়, মধ্যে মধ্যে অমাবস্যা। এখন কালী প্রসন্ন হইলেই আনন্দমঠ বজায় হয়। ইতি তাং ৪ বৈশাখ [১২৮৯ সাল] [১৬ এপ্রিল, ১৮৮২]

শ্রীবাঙ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

‘ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন’]

[কালীপ্রসন্ন ঘোষকে লিখিত]

সুহৃদ্বরেণু—

আপনার অনুগ্রহ পত্র পাইয়া আনন্দ লাভ করিলাম।

আমি যখন প্রথম এখানে আসি, তখন দুই এক মাসের জন্য আসিতেছি এরূপ কর্তৃপক্ষের নিকট শুনিয়াছিলাম। এজন্য একাই আসিয়াছি। বিশেষ পরিবার আনিবার স্থান এ নহে। এক্ষণে জানিলাম ইহার ভিতর অনেক চক্র আছে। * * * সেই মন্থরার দল আমাদের স্বদেশী স্বজাতি, আমার তুল্য পদস্থ; আমার ও আপনার বন্ধুবর্গের মধ্যে গণ্য। আমিই বা আনন্দমঠ লিখিয়া কি করিব, আপনিই বা তাহার মূলমন্ত্র বুঝাইয়া কি করিবেন? এ ঈর্ষ্যাপরবশ, আত্মোদরপরায়ণ জাতির উন্নতি নাই। বল, “বন্দেউদরং”।

বৈশাখের “বান্ধব” পাইয়াছি। এবং “মূলমন্ত্র” “জাতীয় সঙ্গীত” এবং অন্যান্য প্রবন্ধ পড়িয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছি।

আপনিও “শাপেনাস্তং গমিতমহিমা,” শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। তবে আপনি মহৎ কর্তব্যানুরোধেই এ দশা প্রাপ্ত, কাজেই তাহা সহ্য হয়, কিন্তু আমি যে কি জন্য বৈতরণীসৈকতে পড়িয়া ঘোড়ার ঘাস কাটি তাহা বুঝিতে পারি না। যে ব্যক্তি লিখিয়াছিল “যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী” সে ব্যক্তি নিশ্চিত জানিত উড়িষ্যার বৈতরণীপারেই যমদ্বার বটে।

দশমহাবিদ্যার কিয়দংশ হস্তলিপি হইতে হেম বাবুর মুখেই শুনিয়াছিলাম। সেটুকু আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল। বোধ হয় সেটুকু আপনিও গ্রন্থকারের মুখে শুনিয়া থাকিবেন। অবশিষ্টাংশ এখনও ভাল করিয়া পড়ি নাই। সেটুকু পড়িলাম তাহাতে বুঝিলাম যে গ্রন্থকারের মুখে না শুনিলে গ্রন্থের সকল রসটুকু পাওয়া যায় না। বিশেষ তাহার ছন্দ নূতন—আমার আবৃত্তির সম্পূর্ণ আয়ত্ত নহে। এ জন্য স্থির করিয়াছি, যদি কখন রজনী প্রভাত হয়, তবে তাহারই মুখে অবশিষ্টাংশ শুনিয়া হৃদয়ঙ্গম করিব।

আনন্দমঠে বিস্তর ছাপার ভুল দেখিলাম। অনুগ্রহ করিয়া মার্জনা করিবেন। ইতি ২৩শে পৌষ [১২৮৯] [৬ জানুয়ারি ১৮৮৩]

অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী
শ্রীবিষ্ণুমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

‘ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন’]

[সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত]

শ্রীচরণেষু—

অঘোর বরাটকে একটু পত্র লিখিবেন, যে, মাঘ মাসের বঙ্গদর্শন বাহির করার পক্ষে আপত্তি নাই, ভবিষ্যৎ সংখ্যার প্রতি আপত্তি আছে। অর্থাৎ মাঘ সংখ্যা ভিন্ন আর বাহির করিতে দিবেন না। ইহা লিখিবেন।

পত্র পাঠ মাত্র ইহা লিখিবেন। চন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া অনেক কাকুতি মিনতি করিতেছে। কিন্তু এটুকু লইলে বিবাদ সম্পূর্ণ মিটিবে না। ইতি তাং ২৩ ফেব্রুয়ারি [১৮৮৪]*

“শ্রীশচন্দ্র মজুমদার” সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—পৃষ্ঠা ৩৫]

শ্রীবিষ্ণুমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

[শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত]

প্রিয়তমেষু

আমি হাঁপানির পীড়ায় অত্যন্ত অসুস্থ থাকায় তোমার পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব হইয়াছে। গেজেটে তোমার appointment দেখিয়া অত্যন্ত আহলাদিত হইলাম। ভরসা করি শীঘ্রই চাকরী চিরস্থায়ী হইবে।

“পদরত্নাবলী” পাইয়াছি। কিন্তু সুখ্যাতি কাহার করিব? কবিদিগের না সংগ্রহকারদিগের? যদি কবিদিগের প্রশংসা করিতে বল, বিস্তর প্রশংসা করিতে পারি। আর যদি সংগ্রহকারদিগের প্রশংসা করিতে বল, তবে কি কি বলিব আমায় লিখিবে, আমি সেইরূপ লিখিব। তুমি এবং রবীন্দ্রনাথ যখন সংগ্রহকার, তখন সংগ্রহ যে উৎকৃষ্ট হইয়াছে তাহা কেহই সন্দেহ করিবে না এবং আমার সার্টিফিকেট নিঃপ্রয়োজন। তথাপি তোমরা যাহা লিখিতে বলিবে, লিখিব।

কৃষ্ণ সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করিয়াছ, পত্রে তাহার উত্তর সংক্ষেপে দিলেই চলিবে। আমি যাহা লিখিয়াছি (নবজীবনে ও প্রচারে) ও যাহা লিখিব, তাহাতে এই দুইটি তত্ত্ব প্রমাণিত হইবে।

১। শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছাক্রমে কদাপি যুদ্ধে প্রবৃত্ত নহেন।

২। ধর্মযুদ্ধ আছে। ধর্মার্থেই মনুষ্যকে অনেক সময়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হয় (যথা William the Silent)। ধর্মযুদ্ধে অপ্রবৃত্তি অধর্ম। সে সকল স্থানে ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে কখনও প্রবৃত্ত নহেন।

৩। অন্যে যাহাতে ধর্মযুদ্ধ ভিন্ন কোন যুদ্ধে কখন প্রবৃত্ত না হয়, এ চেষ্টা তিনি সাধ্যানুসারে করিয়াছিলেন।

মনুষ্যে ইহার বেশী পারে না। কৃষ্ণচরিত্র মনুষ্যচরিত্র। ঈশ্বর লোকহিতার্থে মনুষ্যচরিত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণনগরে কবে যাইবে? ইতি তাং ২৫শে আশ্বিন [১২৯২] [১০ অক্টোবর ১৮৮৫]

শ্রীবিষ্ণুমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

‘প্রদীপ’]

* অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যা ‘বঙ্গদর্শনে’ প্রকাশিত চন্দ্রনাথ বসুর “পশুপতি সম্বাদ” বিষ্ণুমচন্দ্রকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। এই প্রসঙ্গে বিষ্ণুমচন্দ্র তাহার মেজদাদা সঞ্জীবচন্দ্রকে উক্ত পত্রখানি লেখেন।

বঙ্কিম রচনাবলী

[গিরিজাপ্রসন্ন রায়কে লিখিত]

সাদর সম্ভাষণ—

আপনার পত্র পাইয়া প্রীত হইয়াছি। আপনি যে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি হইতে পারে না। কেবল এই কথা যে, আমার প্রণীত নরনারীচরিত্রগুলি আপনাদিগের এতদূর পরিশ্রমের যোগ্য কিনা সন্দেহ।

তবে, আপনি সুলেখক এবং উৎকৃষ্ট বোদ্ধা, তাহার পরিচয় পূর্বে পাইয়াছি। আপনার যত্নে আমার রচনা আশার অতীত সফলতা লাভ করিতে পারিবে, এমন ভরসা করি।

আমার পুস্তক হইতে যেখানে যতদূর উদ্ধৃত করা আবশ্যিক বোধ করিবেন, তাহা করিবেন। তাহাতে আমার কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

পুস্তকের নাম যাহা নির্বাচিত করিয়াছেন, তাহাতেও আমার কোন আপত্তি হইতে পারে না।

আমি চন্দ্র বাবুর মতের অপেক্ষা না করিয়াই আপনার পত্রের উত্তর দিলাম, কেননা আপনার বিচার-শক্তির পরিচয় পূর্বেই পাইয়াছি।

‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ সম্বন্ধে একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল। প্রথম সংস্করণে কয়েকটা গুরুতর দোষ ছিল, দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা কতক কতক সংশোধন করা হইয়াছে। পুস্তকের অর্দ্ধেক মাত্র সংশোধিত হইয়া মৃদু হইলে, আমাকে কিছু দিনের জন্য কলিকাতা হইতে অতিদূরে যাইতে হইয়াছিল। অতএব অবশিষ্ট অংশ সংশোধিত না হইয়াই ছাপা হইয়াছিল। তাহাতে প্রথমাংশে ও শেষাংশে কোথাও কিছু অসঙ্গতি থাকিতে পারে।

চন্দ্র বাবু ও অক্ষয় বাবু আপনার সহায়তা করিবেন, আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। ***
ইতি ১১ই জ্যৈষ্ঠ [১২৯৩] [২৪ মে ১৮৮৬]

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র শর্ম্মণঃ

‘বঙ্কিমচন্দ্র’]

[জ্যোতিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত]

[১৮৮৭ সনে সঞ্জীবচন্দ্রের একমাত্র পুত্র জ্যোতিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেহেরপুরে পুলিস-ইন্স্পেক্টরের পদে নিয়োগের পর চাকরিতে পাকা হইয়া, পুলিসের চাকরি কিভাবে নির্বাহ করিবেন, তাহার উপদেশ চাহিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে এক পত্র দিয়াছিলেন। ইহার উত্তরে নিম্নলিখিত উপদেশ সম্বলিত পত্র বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে লেখেন।]

প্রিয়তমেষু,

তুমি বোধ করি পূজার সময় বাড়ী গিয়াছিলে, এতদিনে ফিরিয়া আসিয়া থাকিবে।

আমার নিকট উপদেশ চাহিয়াছিলে, আমি এই পত্রের মধ্যে সাতটি উপদেশ লিখিয়া পাঠাইলাম। ঐ সাতটি *Golden rule* বিবেচনা করিবে। বিশেষ প্রথম পাঁচটি। উহার অনুবর্তী হইলে সর্বত্র মঙ্গল ঘটিবে। এখানকার সমস্ত মঙ্গল। ভরসা করি এই মাস হইতে তুমি সংসারের ভার লইতে পারিবে। ইতি ১৩ আশ্বিন।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বিশেষ উপদেশ

- I. প্রথম প্রয়োজনীয় কথা। সত্য ভিন্ন কখন মিথ্যা পথে যাইবে না। কলমের মুখে কখন মিথ্যা নির্গত না হয়। তাহা হইলে চাকরি থাকে না। নিতান্ত পক্ষে কর্তৃপক্ষের অবিশ্বাস জন্মে। অবিশ্বাস জন্মিলে আর উন্নতি হয় না।
- II. দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় কথা। পরিশ্রম। বিনা পরিশ্রমে কখন উন্নতি হয় না। কখন কোন কাজ পড়িয়া না থাকে।
- III. উপরওয়ালাদের আজ্ঞাকারী, তাঁহাদিগের নিকট বিনীতভাব। চাকরি রাখার পক্ষে এবং উন্নতির পক্ষে ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তর্ক করিও না।
- IV. আপনার কাজের *Rules & Laws* বিশেষরূপে অবগত হইবে।

V. কাহারও উপর অত্যাচার করিবে না। পুর্নিসের লোকে আসামীর উপর বড় অত্যাচার করে। অনেকের বিশ্বাস যে তা নহিলে কাজ চলে না। তাহা ভ্রান্তি। না চলে সেও ভাল। ইহা নিজে কখন করিবে না, বা অধীনস্থ কাহাকে করিতে দিবে না। ইহার কারাদণ্ড আছে।

VI. সকলের সঙ্গে সদ্যবহার করিবে। অধীনস্থ ব্যক্তিদিগকে ব্যবহার দ্বারায় বশীভূত করিবে। কেহ শত্রু না হয়! কর্তব্য কর্মের অনুরোধে অনেকের অনিষ্ট করিতে হয়। তাহার উপায় নাই। দোষীর অবশ্য দণ্ড চাই।

VII. নিস্কারণে ভীত হইবে না।

‘প্রবাসী’, শ্রাবণ ১৩৫৮]

[ভূদেব মধুখোপাধ্যায়কে লিখিত]

[২৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫] ৮।৬।৮৮

শ্রদ্ধাস্পদেষু

তিনকাড়ি বাবুর নিকট এক সেট পুস্তক দিয়াছি। তন্মধ্যে আর একটি নতুন পুস্তক ধর্মতত্ত্ব আছে। ঐ গ্রন্থ পাঠকালে আপনার যাহা কিছু মনে উদয় হয় অথবা গ্রন্থকারকে বলিবার প্রয়োজন হয়, তাহা যদি অনুগ্রহ করিয়া মার্জ্জানে নোট করিয়া রাখেন, তবে ভবিষ্যতে উপকৃত হইতে পারিব।

‘ভূদেব-চরিত’]

[ভূদেব মধুখোপাধ্যায়কে লিখিত]

৫ নং প্রতাপ চাটুয্যার গলি
কলিকাতা—১৩ জুন [১৮৮৮]
[৩২ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫]

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আপনার অনুগ্রহপত্র পাইয়াছি। আমার পুস্তকগুলি আপনি নিজে স্টেশনে আসিয়া লইয়া গিয়াছেন, এবং অনুগ্রহ না হইয়াও পড়িয়া থাকেন, ইহার অপেক্ষা পুস্তকের আদর আর কি বেশী হইতে পারে? ইহাই আমার আশার অতীত ফল।

পুস্তকগুলি মেরুপ বাজারে বিক্রয় হয়, সেইরূপ বাঁধানই আপনাকে পাঠান হইয়াছে, ভাল করিয়া বাঁধান হয় নাই। সকলগুলি, এক রকম বাঁধান, এবং বাঁধান ইহার অপেক্ষা ভাল হয়, এইরূপ করিয়া বাঁধাইয়া পাঠাইবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বাঁধান পুস্তক আবার বাঁধাইতে গেলে, ছোট মার্জ্জান আরও ছাঁটা পড়িয়া যাইবে, এবং আবাঁধা পুস্তক এক সেট পুরা হয় না, এজন্য যেমন ছিল তেমনই পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছি। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা গ্রন্থেরও একটু বাহ্য সৌষ্ঠব চাই, এজন্য পুস্তকগুলি সোণার জলে এবং কাপড়ে বাঁধাইয়া বিক্রয় করিয়া থাকি।

গীতা পুনশ্চ প্রচারে প্রকাশিত হইতেছে। যদি আপনার দেখিবার ইচ্ছা হয়, তবে পাঠাইতে পারি। উহাতে আপনার দেখিবার যোগ্য কিছু নাই, ইহা বলা বাহুল্য। তবে, আমরা কি ভাবি, কি করি, ইহা বোধ হয় দেখিতে আপনার ইচ্ছা হইতে পারে। ইতি

শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

[কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেবকে লিখিত]

অশেষ গুণসম্পন্ন শ্রীযুক্ত কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব
আশীর্বাদ ভাজনেষু

আপনি আমাকে যে কয়েক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ধর্মশাস্ত্রব্যবসায়ীরাই তাহার উপযুক্ত উত্তর দিতে সক্ষম। আমি ধর্মশাস্ত্রব্যবসায়ী নহি, এবং ধর্মশাস্ত্রবেত্তার আসন গ্রহণ করিতেও

বাংলায় রচনাবলী

প্রস্তুত নহি। তবে সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে যে আন্দোলন উপস্থিত, তৎসম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিবার আমার আপত্তি নাই।

প্রথমতঃ—শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কোন প্রকার সমাজ সংস্কার যে সম্পন্ন হইতে পারে, অথবা সম্পন্ন করা উচিত, আমি এমন বিশ্বাস করি না। যখন মৃত মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুবিবাহ নিবারণ জন্য শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিয়া আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, তখনও আমি এই আপত্তি করিয়াছিলাম, এবং এখনও পর্যন্ত সে মত পরিবর্তন করার কোন কারণ আমি দেখি নাই। আমার এরূপ বিবেচনা করিবার দুইটী কারণ আছে। প্রথম এই যে, বাঙ্গালী সমাজ শাস্ত্রের বশীভূত নহে,—দেশাচার বা লোকাচারের বশীভূত। সত্য বটে যে, অনেক সময়ে লোকাচার শাস্ত্রানুযায়ী, কিন্তু অনেক সময়ে দেখা যায় যে, লোকাচার শাস্ত্রবিরুদ্ধ। যেখানে লোকাচার এবং শাস্ত্র বিরোধ, সেখানে লোকাচারই প্রবল।

উপরিউক্ত বিশ্বাসের দ্বিতীয় কারণ এই যে, সমাজ সর্বত্র শাস্ত্রের বিধানানুসারে চলিলে, সামাজিক মঙ্গল ঘটিবে কি না সন্দেহ। আপনারা সমুদ্রযাত্রার সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধান সকল অনুসন্ধান দ্বারা বাহির করিয়া, সমাজকে তদনুসারে চলিতে পরামর্শ দিতে ইচ্ছা করিতেছেন; কিন্তু সকল বিষয়েই কি সমাজকে শাস্ত্রের বিধানানুসারে চলিতে বলিতে সাহস করিবেন? ধর্মশাস্ত্রের একটি বিধি এই, ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠ বর্ণের পরিচর্য্যাই শূদ্রের ধর্ম। বাঙ্গালার শূদ্রেরা কি সেই ধর্মাবলম্বী? শাস্ত্রের ব্যবস্থা এখানে চলে না। আপনারা কেহ চালাইতে সাহসী হইবেন কি? চেষ্টা করিলেও এ ব্যবস্থা চালান যায় কি? হাইকোর্টের শূদ্র জজ জিজয়িত ছাড়া, বা সৌভাগ্যশালী শূদ্র জমিদার জমিদারের আসন ছাড়া, ধর্মশাস্ত্রের গৌরবার্থ লুচিভাজা ব্রাহ্মণের পদ সেবায় নিযুক্ত হইবেন কি? কোন মতেই না। বাঙ্গালী সমাজ, প্রয়োজন মতে ধর্মশাস্ত্রের কিয়দংশ মানে; প্রয়োজন মতে অবশিষ্টাংশ অনেককাল বিসর্জন দিয়াছে। এবং সেইরূপ প্রয়োজন বৃদ্ধিলে, অবশিষ্টাংশ বিসর্জন দিবে। এমন স্থলে ধর্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা খুঁজিয়া কি ফল? আমার নিজের বিশ্বাস যে, ধর্ম সম্বন্ধে এবং নীতি সম্বন্ধে সামাজিক উন্নতি (Religious and moral regeneration) না ঘটিলে, কেবল শাস্ত্রের বা গ্রন্থ বিশেষের দোহাই দিয়া, সামাজিক প্রথা বিশেষ পরিবর্তন করা যায় না। আমার প্রণীত কৃষ্ণ-চরিত্র বিষয়ক গ্রন্থে, ইহা আমি সবিস্তারে বঝাইয়াছি। আমি উপরে বলিয়াছি যে, সমাজ দেশাচারের অধীন, —শাস্ত্রের অধীন নহে। এই দেশাচার পরিবর্তন জন্য ধর্ম সম্বন্ধীয় এবং নীতি সম্বন্ধীয় সাধারণ উন্নতি ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এই সাধারণ উন্নতি কিয়ৎ পরিমাণে ঘটিয়াছে বলিয়াই এই আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। এই উন্নতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইলে, সমুদ্রযাত্রার সমাজের কাহারও কোন আপত্তি থাকিবে না, কাহারও আপত্তি থাকিলেও সে আপত্তির কোন বল থাকিবে না। কিন্তু যতদিন না সেই উন্নতির উপযুক্ত মাত্রা পরিপূর্ণ হয়, ততদিন কেহই সমুদ্রযাত্রা সাধারণে প্রচলিত করিতে পারিবেন না।

তবে ইহাও বক্তব্য যে, সমুদ্রযাত্রার পক্ষে বাঙ্গালী সমাজ বর্তমান সময়ে কতদূর বিরোধী, তাহা এখন আমাদের কাহারও ঠিক জানা নাই। দেখিতে পাই যে, যাঁহার অর্থ ও অবস্থা সমুদ্রযাত্রার অনুকূলে, তিনিই ইচ্ছা করিলে ইউরোপ যাইতেছেন। সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রনিষিদ্ধ বলিয়া কেহ কেহ যে যান নাই, ইহা আমার দৃষ্টিগোচরে কখনও আসে নাই। তবে, ইহা স্বীকার করিতে আমি বাধ্য যে, যাঁহারা ইউরোপ হইতে ফিরিয়া আসেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এক প্রকার সমাজ হইতে বহিস্কৃত হইয়া আছেন, কিন্তু তাঁহাদের দোষে কি আমাদের দোষে, তাহা ঠিক বলা যায় না। তাঁহারা এ দেশে আসিয়াই সাহেব সাজিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক বাঙ্গালী সমাজের বাহিরে অবস্থিত করেন। বিদেশীয় পরিচ্ছদ, বিদেশীয় ভোজন প্রথা এবং বিদেশীয় ব্যবহার দ্বারা আপনাদিগকে পৃথক রাখেন। যাঁহারা ইউরোপ হইতে আসিয়া সে রূপ আচরণ না করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অনায়াসে হিন্দুসমাজে পুনর্মিলিত হইয়াছেন। ইউরোপ হইতে প্রত্যাগত মহাশয়েরা সকলেই দেশে ফিরিয়া আসিয়া হিন্দুসমাজসম্মত ব্যবহার করিলে, সাধারণতঃ তাঁহারা যে পরিত্যক্ত হইবেন একথা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না।

পরিশেষে আমার এই বক্তব্য, সমুদ্রযাত্রা হিন্দুদিগের ধর্মশাস্ত্রানুমোদিত কি না, তাহা বিচার করিবার আগে দেখিতে হয় যে, ইহা ধর্মানুমোদিত কি না? যাহা ধর্মানুমোদিত,

কিন্তু ধর্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ, তাহা কি ধর্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া পরিহার্য? অনেকে বলিবেন যে, যাহা ধর্মশাস্ত্রসম্মত, তাহাই ধর্ম, যাহা হিন্দুদিগের ধর্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ, তাহাই অধর্ম। এ কথা আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। হিন্দুদিগের প্রাচীন গ্রন্থে এরূপ কথা পাই না। মহাভারতে কৃষ্ণোক্তি এইরূপ আছে।

ধারণাদ্বন্দ্বমিত্যাহুর্দ্বন্দ্বো ধারণতে প্রজাঃ।
যৎ স্যাৎকারণ প্রযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ।

কর্ণপর্ষ একোনসপ্ততিতমোহধ্যায়, ৫৯ শ্লোক।

ধর্ম লোক সকলকে ধারণ (রক্ষা) করেন, এই জন্য ধর্ম বলে। যাহা হইতে লোকের রক্ষা হয়, ইহাই ধর্ম নিশ্চিত জানিবে।

যদি মহাভারতকার মিথ্যা না লিখিয়া থাকেন, যদি হিন্দুদের আরাধ্য ঈশ্বরবতার বলিয়া সমাজে পূজিত কৃষ্ণ মিথ্যাবাদী না হন, তবে যাহা লোকহিতকর তাহাই ধর্ম। এই সমুদ্রযাত্রা পদ্ধতি লোকহিতকর কি না? যদি লোকহিতকর হয়, তবে ইহা স্মৃতিশাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও কেন পরিত্যাগ করিব?

আমি এইরূপ বৃষ্ণ ধর্মশাস্ত্রে যাহাই আছে, তাহাই হিন্দুধর্ম নহে। হিন্দুধর্ম অতিশয় উদার। স্মার্ত ঋষিদিগের হাতে—বিশেষতঃ আধুনিক স্মার্ত রঘুনন্দনাদির হাতে—ইহা অতিশয় সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। স্মার্ত ঋষিগণ হিন্দুধর্মের স্রষ্টা নহেন,—হিন্দুধর্ম সনাতন—তাহাদিগের পূর্ব হইতেই আছে। অতএব সনাতন ধর্ম এবং এই ধর্মশাস্ত্রে বিরোধ অসম্ভব নহে। যেখানে এরূপ বিরোধ দেখিব, সেখানে সনাতন ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করাই উচিত। ধর্ম এবং হিন্দুধর্ম কোন বিরোধ আমি স্বীকার করিতে পারি না। ধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের যদি কোন বিরোধ থাকে, তবে হিন্দুধর্মের গৌরব কি? উহাকে সনাতন ধর্ম বলিব কেন? এরূপ বিরোধ নাই। সমুদ্রযাত্রা লোকহিতকর বলিয়া ধর্মানুমোদিত। সুতরাং ধর্মশাস্ত্রে যাহাই থাকুক, সমুদ্রযাত্রা হিন্দুধর্মানুমোদিত।

কলিকাতা,
২৭ জুলাই, ১৮৯২
[‘হিতবাদী’]

আপনার একান্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী,
শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত]

নমস্কার পূর্বক নিবেদন

আপনার যাহা বক্তব্য তাহা কাল বৈকালে মুখে মুখেই বলিতে পারিতেন, তথাপি পত্রখানি যে নিজে হাতে করিয়া আনিয়াছিলেন, ইহা আমার বিশেষ সৌভাগ্য, কারণ মুখের কথা তখনই অন্তর্হিত হইত, কিন্তু পত্রখানি যত্ন করিয়া রাখিলে শত বৎসর থাকিতে পারে। আমি উহা যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিব এবং আমার মৃত্যুর পর, এরূপ যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিবার জন্য আমার দৌহিত্রদিগকে বলিয়া যাইব। কারণ উহাতে আপনি আমাকে বলিয়াছেন যে “আপনার সম্মানে বঙ্গবাসী মাত্রেরই সম্মান করা হইয়াছে ও সম্মানও সম্মানিত হইয়াছে”। অন্যে এ কথা বলিলে, তাহার মূল্য যাহাই হউক, আপনি সত্যবাদী ও সমাজের শিরোভূষণ স্বরূপ, অতএব আপনার এই উক্তি আমার বংশে চিরস্মরণীয় ও চিররক্ষণীয়।

যখন বিষবৃক্ষ অনুবাদিত হইয়া প্রথম পরিচিত হয় তখন একখানি ইংরেজ সংবাদপত্র (Scotsman) বলিয়াছেন যে, ঐ গ্রন্থ সংস্কৃত Epic কাব্যের Episodeগুলির সহিত তুলনীয়, এবং একজন বলিয়াছেন যে Sophocles প্রণীত Antigone চরিত্রের পর আর ইহার তুল্য স্ত্রী চরিত্র কোন সাহিত্যে সৃষ্ট হয় নাই। এ সকল কথা আমি বড় গৌরবের কথা মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু আপনার উক্তি আমার পক্ষে তদপেক্ষা অধিকতর গৌরবের হইয়াছে। ইতি ১৯ পৌষ ১৩০০ [২ জানুয়ারি ১৮৯৪]

শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পাঠ্য পুস্তক

সহজ রচনাশিক্ষা

উপক্রমণিকা

আমরা যাহা মনে করি, তাহা লোকের কাছে প্রকাশ করিতে হইলে, হয় মূখে মূখে বলি, নয় লিখিয়া প্রকাশ করি। মূখে মূখে বলিলে, লোকে তাহাকে কথোপকথন, বা অবস্থাবিশেষে বক্তৃতা বলে। লিখিয়া প্রকাশ করিতে হইলে, চিঠি, সংবাদপত্র, পুস্তক ইত্যাদিতে প্রকাশ করা যায়।

কিন্তু মূখেই বলি, আর লিখিয়াই বলি, বলিবার সময়ে কথাগুলি একটু সাজাইয়া লইতে হয়। সাজাইয়া না বলিলে, হয়ত তুমি যাহাকে বলিতেছ, সে তোমার সকল কথা বুদ্ধিতে পারিবে না, নয়ত সে কথাগুলি গ্রাহ্য করিবে না। এই সাজানকে রচনা বলে।

রচনা অতি সহজ। মূখে মূখে কহিবার সময়েও আমরা সাজাইয়া কথা কই, তাহা না করিলে কেহ আমাদের কথা বুদ্ধিতে পারিত না। অতএব যে মূখে মূখে কথোপকথন করিতে পারে, লিখিতে জানিলে সেও অবশ্য লিখিত রচনা করিতে পারে। তবে সকল কাজই অভ্যাসাধীন। মৌখিক রচনায় সকলেরই অভ্যাস আছে। লিখিত রচনায় যাহাদের অভ্যাস নাই, তাহাদিগকে অভ্যাস করিতে হইবে। সেই অভ্যাস করাইবার জন্য এই পুস্তকের প্রথম অধ্যায় লিখিলাম।

আর মৌখিক রচনার সঙ্গে লিখিত রচনার একটু প্রভেদ এই আছে যে, লিখিত রচনার কতকগুলি নিয়ম আছে; সে নিয়মগুলি মৌখিক রচনায় বড় মানা যায় না—না মানিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই, কিন্তু লিখিত রচনায় না মানিলেই নয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেই নিয়মগুলি বুঝাইব। তৃতীয় অধ্যায়ে পত্ররচনা শিখাইব।

প্রথম অধ্যায়

রচনা অভ্যাস

প্রথম পাঠ

রাম খাইতেছে। পাখী উড়িতেছে। হরি পীড়িত হইয়াছে। মানুষ মরিয়া যায়। এইগুলিকে এক একটি বাক্য, উক্তি, বা পদ বলা যায়।

“রাম খাইতেছে”—এই বাক্যে কাহার কথা বলা যাইতেছে? রামের কথা। অতএব রাম এই বাক্যের “বিষয়”।

“পাখী উড়িতেছে”—কাহার কথা বলিতেছি? পাখীর কথা। “হরি পীড়িত হইয়াছে”—কাহার কথা বলিতেছি? হরির কথা। “মানুষ মরিয়া যায়”—কাহার কথা বলিতেছি? মানুষের কথা। পাখী, হরি, মানুষ ইহারা ঐ ঐ বাক্যের বিষয়।

“রাম খাইতেছে” এখানে রামের কথা বলিতেছি বটে, কিন্তু রামের কি কথা বলিতেছি? সে “খাইতেছে”—তাহার খাবার কথা বলিতেছি। “খাইতেছে” হইল বক্তব্য।

“পাখী উড়িতেছে।” “উড়িতেছে” বক্তব্য। “যদু পীড়িত হইয়াছে।” পীড়া এখানে বক্তব্য। “মানুষ মরিয়া যায়।” মরা এখানে বক্তব্য।

অতএব সকল বাক্যে, দুইটি বস্তু থাকে; একটি “বিষয়” আর একটি “বক্তব্য”।

এই দুইটিই না থাকিলে বাক্য বলা সম্পূর্ণ হয় না। শুধু “গোরু” বলিলে, তুমি বুঝিতে পারিবে না যে, আমার বলিবার কথা কি। কিন্তু “গোরু চরিতেছে” বলিলেই তুমি বুঝিতে পারিলে। বাক্য সম্পূর্ণ হইল। শুধু “ভাসিতেছে” বলিলে তুমি বুঝিতে পার না যে, আমার বলিবার ইচ্ছা কি। তুমি জিজ্ঞাসা করিবে, কি ভাসিতেছে? কিন্তু যদি বলি যে, “কুস্তীর ভাসিতেছে” বা “নৌকা ভাসিতেছে” বাক্য সম্পূর্ণ হইল—তুমি বুঝিতে পারিলে।

অভ্যাসার্থ

১। নীচের লিখিত বিষয়গুলি লইয়া, তাহাতে বক্তব্য যোগ কর।

ঘোড়া, আকাশ, নক্ষত্র, সমুদ্র, বালক, মাতা, শিক্ষক, পুস্তক, ঈশ্বর, বৃক্ষ, ঠক, ঘট, প্রাণ।

২। নীচের লিখিত বক্তব্য লইয়া তাহাতে বিষয় যোগ কর।

হাসিল। ভাঙ্গিয়া গেল। উচিত নয়। বাড়িয়াছে। অধীন ছিল। ডুবিয়াছিল। প্রকাশ হইল।

দ্বিতীয় পাঠ

কখন কখন বিষয়ের কোন গুণ কি দোষ আগে লিখিয়া তার পর বক্তব্য লিখিতে হয়। যেমন “সুন্দর পাখী উড়িতেছে।” “দুঃখী হরি পীড়িত হইয়াছে।” এখানে, পাখীটির একটি গুণ যে, সে সুন্দর; ইহা বলা হইল। হরির একটি দোষ যে, সে দুঃখী; ইহা বলা হইল। এগুলিকে বিশেষণ বলে। “সুন্দর” “দুঃখী” এই দুটি বিশেষণ। যাহার বিশেষণ, তাহাকে বিশেষ্য বলে। “পাখী” “হরি” ইহারা বিশেষ্য।

বিশেষণ উপযুক্ত হইতে পারে, অনুপযুক্তও হইতে পারে। উপযুক্ত বিশেষণ, যেমন—

ফলবান্ বৃক্ষ।

নির্মল আকাশ।

বলবান্ মনুষ্য।

বেগবতী নদী।

অনুপযুক্ত বিশেষণ, যেমন,—

নির্মল বৃক্ষ। ফলবান্ মনুষ্য। বেগবান্ আকাশ।

এইগুলি অনুপযুক্ত। বৃক্ষের সমলতা বা নির্মলতা নাই, এই জন্য নির্মল বৃক্ষ বলা যায় না। মানুষে কোন ফল ফলে না, এই জন্য ফলবান্ মনুষ্য বলা যায় না। আকাশের বেগ নাই, এজন্য বেগবান্ আকাশ বলা যায় না। যে বিশেষণ উপযুক্ত তাহাই লিখিবে, যাহা অনুপযুক্ত তাহা লিখিও না।

অভ্যাসার্থ

৩। নীচের লিখিত বিশেষ্যের সঙ্গে উপযুক্ত বিশেষণ যোগ কর।

সমুদ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, হস্তী, বন, সংসার, স্ত্রী, কন্যা, পুত্র, বালিকা, দেশ, রাত্রি, আসন, পুতুল, হংস।

৪। নীচের লিখিত বিশেষণের পর উপযুক্ত বিশেষ্য যোগ কর।

নশ্বর, পবিত্র, দীন, অযোগ্য, কষ্টসাধ্য, গুণবতী, সুলভ, সদাচার, শান্ত, পরিষ্কার, অজ্ঞাত।

তৃতীয় পাঠ

“ফলবান্ বৃক্ষ”, “বলবান্ পুরুষ”, “নির্মল আকাশ”, “বেগবতী নদী” বলিলে বাক্য সম্পূর্ণ হইল না। “ফলবান্ বৃক্ষ” সম্বন্ধে কি বলিতেছ? “বলবান্ পুরুষ” সম্বন্ধে কি বলিতে চাও? এখানে “ফলবান্ বৃক্ষ”, “বলবান্ পুরুষ” বিষয়; কিন্তু বক্তব্য কই? বক্তব্য লিখিলে তবে বাক্য সম্পূর্ণ হইবে। যেমন—

ফলবান্ বৃক্ষ কাটিও না।

নির্মল আকাশ দেখিতে সুন্দর।

বলবান্ পুরুষ সাহসী হয়।

বেগবতী নদী বহিতেছে।

বিশ্বকম রচনাবলী

অভ্যাসার্থ

৫। নীচের লিখিত বিষয়ে বক্তব্য যোগ কর।

দয়াময় ভগবান্।	স্নেহময়ী মাতা।
অবোধ শিশু।	অন্নহীন ভিক্ষুক।
নিষ্ফল কার্য।	স্বচ্ছ সরোবর।
সহজ কাজ।	মজবুত বাঁশ।
অন্ধকার রাত্রি।	পাকা আটচালা।

“ফলবান্ বৃক্ষ,” “বলবান্ পুরুষ” বলিলে বাক্য সম্পূর্ণ হয় না বটে, কিন্তু যদি বলি “বৃক্ষ ফলবান্,” “মনুষ্য বলবান্,” তাহা হইলে বাক্য সম্পূর্ণ হয়। তাহার কারণ সহজে বুঝিতে পারিবে। “ফলবান্ বৃক্ষ” বলিলে, “ফলবান্ বৃক্ষ”ই বিষয় হইল, বক্তব্য নাই। কিন্তু “বৃক্ষ ফলবান্” বলিলে বৃক্ষ বিষয় হইল—ফলবত্তা তাহার বক্তব্য। “বৃক্ষ ফলবান্” এ কথায় এই বুঝায় যে, বৃক্ষে ফল হয়। “মানুষ বলবান্” বলিলে বুঝাইবে, “মানুষের বল আছে।”

দেখ, দুই রকমে এক বক্তব্য প্রকাশ করা যায়। যথা—

{ বৃক্ষ ফলবান্।	{ মনুষ্য বলবান্।
{ বৃক্ষে ফল হয়।	{ মানুষের বল আছে।
{ আকাশ নিস্মল।	{ নদী বেগবতী।
{ আকাশের নিস্মলতা আছে।	{ নদীর বেগ আছে।
{ আকাশ নিস্মল হইয়াছে।	

“আছে” “হয়” “হইয়াছে” এইগুলিকে ক্রিয়া বলে। যাহাতে একটা কাজ বুঝায়, কিম্বা অবস্থান্তরপ্রাপ্তি বুঝায়, তাহাকেই ক্রিয়া বলে। ধরিল, থাকিল, যাইল, শয়ন করিল, ভক্ষণ করিল, নিবেদন করিল—এ সব ক্রিয়া।

অতএব বক্তব্য দুই প্রকারে প্রকাশ করা যায়, এক প্রকার বিশেষণ দ্বারা, যেমন “বৃক্ষ ফলবান্”; আর এক প্রকার ক্রিয়া দ্বারা, যেমন—“বৃক্ষে ফল হয়।”

অভ্যাসার্থ

৬। নীচের লিখিত বাক্যগুলির বক্তব্য বিশেষণের দ্বারা বল।

বাস্তুরূপের বৃদ্ধি আছে।	সন্দেশের স্বাদ ভাল লাগে।
ইংরেজের বিদ্যা আছে।	বসন্তের বাতাস আস্তে বয়।
মৎস্যে খারাপ গন্ধ পাওয়া যায়।	জলে ভিজিলে পীড়া হয়।

৭। নীচের লিখিত বাক্যগুলিতে বক্তব্য ক্রিয়ার দ্বারা প্রকাশ কর।

পৃথিবী ঘূর্ণ্যমান।	তাহার স্বর গম্ভীর।
সূর্য্যকিরণ অসহ্য।	মাতাল চিরদুঃখী।

ব্যাপ্ত মাংসাশী

চতুর্থ পাঠ

বিশেষণের আবার বিশেষণ হয়, যেমন—

অতিশয় ভারী। প্রচণ্ড তেজস্বী। প্রগাঢ় অন্ধকার।

ইহাতে বিশেষ্য যোগ করা যায়; যথা—

অতিশয় ভারী লোহা। প্রচণ্ড তেজস্বী অগ্নি। প্রগাঢ় অন্ধকার রাত্রি।

অথবা,

লোহা অতিশয় ভারী। সূর্য্য প্রচণ্ড তেজস্বী। বর্ষার রাত্রি প্রগাঢ় অন্ধকার।

আবার ক্রিয়ারও বিশেষণ আছে, যেমন—

মৃদু হাসিতেছে।	দারুণ জ্বলিতেছে।
শীঘ্র যাইতেছে।	ভালরূপে মেরামত করিতেছে।

পঞ্চম পাঠ

এখন বিষয়, বক্তব্য, বিশেষণ, ক্রিয়ার বিশেষণ, এই সকল লইয়া বাক্যরচনা করিতে শিখ।
একটা বিষয় লও। “রাক্ষস”। বক্তব্য—তাহার বিনাশ। বাক্য এইরূপে লিখিতে হইবে।
“রাক্ষস বিনষ্ট হইল।”

এখন বিশেষণ যোগ কর। প্রথম বিষয়ের বিশেষণ লেখ।
“পাপিষ্ঠ রাক্ষসেরা বিনষ্ট হইল।”

তার পর ক্রিয়ার বিশেষণ লেখ।
“পাপিষ্ঠ রাক্ষসেরা নিঃশেষে বিনষ্ট হইল।”

তার পর ইচ্ছা করিলে, “পাপিষ্ঠে” বিশেষণের বিশেষণ দিতে পার।
“চিরপাপিষ্ঠ রাক্ষসেরা নিঃশেষে বিনষ্ট হইল।”

পরীক্ষার্থ

নিম্নলিখিত বিষয় ও বক্তব্য লইয়া বিশেষণ, বিশেষণের বিশেষণ ও ক্রিয়ার বিশেষণ যোগপূর্বক বাক্য রচনা কর।

বিষয়	বক্তব্য
পুত্র	পিতামাতার উপকার করা।
রাজা	প্রজাপালন করা।
স্ত্রী	স্বামীর সেবা করা।
বিদ্যা	অভ্যাসের অধীন।

ষষ্ঠ পাঠ

কখন কখন বাক্য সম্পূর্ণ হইলেও, আরও কিছুর আকাঙ্ক্ষা থাকে। “চিরপাপিষ্ঠ রাক্ষসেরা নিঃশেষে বিনষ্ট হইল” এই বাক্যটি সম্পূর্ণ বটে, কিন্তু ইহাতে কিছু আকাঙ্ক্ষা রহিল। কর্ম আছে কিন্তু কর্তা নাই। রাক্ষসেরা বিনষ্ট হইল, আমরা জানিতোঁছি; কিন্তু কে তাহাদের বিনষ্টকারী, তাহা জানিতে পারিতোঁছি না। অতএব আকাঙ্ক্ষা পূরণ কর। যথাঃ—

“বানরের দ্বারা চিরপাপিষ্ঠ রাক্ষসেরা নিঃশেষে বিনষ্ট হইল।” আবার বানরের বিশেষণ দিতে পার, যথাঃ—

“দুন্দাস্ত বানরের দ্বারা চিরপাপিষ্ঠ রাক্ষসেরা বিনষ্ট হইল।”

আবার দুন্দাস্তেরও বিশেষণ দেওয়া যায়।

কখন কখন আকাঙ্ক্ষা পূরণ না করিলে বাক্যই সম্পূর্ণ হয় না, যেমন—

“যদি আমি সেখানে যাই।”

“তুমি এমন কথা বলিয়াছিলে।”

এ সকল বাক্য সম্পূর্ণ নহে। সম্পূর্ণ করিতে গেলে, বলিতে হইবে,

“যদি আমি সেখানে যাই, তবে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও।”

“তুমি এমন কথা বলিয়াছিলে যে, তুমি আমাকে কিছু টাকা দিবে।”

পরীক্ষার্থ

নিম্নলিখিত বাক্যগুলিতে আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিয়া বাক্য সম্পূর্ণ কর।

হাতীর গায়ে যে বল আছে,

রামধন এমন দাস্তিক,

রাজা দশরথ বিজ্ঞ ছিলেন বটে,

সাঁতার জানিয়াও যে সমুদ্রে ঝাঁপ দেয়,

যদি তোমার এতই অভিমান যে, রাজার দান গ্রহণ করিবে না,

তামাকু যদি এমন অস্বাস্থ্যকর,

বিশ্বকম রচনাবলী

সপ্তম পাঠ

এখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্য রচনা করিতে শিখিয়াছ। এখন একটি বিষয় লইয়া তৎসম্বন্ধে দুই তিনটি বাক্য রচনা করিতে অভ্যাস কর।

একটি বিষয় লও, যথা—অশ্ব। অশ্ব সম্বন্ধে দুই তিনটি বাক্য লেখ। যথাঃ—

“অশ্ব চতুষ্পদ। অশ্ব বড় দ্রুতগামী। মনুষ্য অশ্বের উপর আরোহণ করে।”

এখানে তিনটি বাক্যের বিষয় একই অশ্ব, কিন্তু বক্তব্য তিনটি। যথা—১। চতুষ্পদত্ব। ২। দ্রুতগমন। ৩। মনুষ্যগণের তদুপরি আরোহণ। এই জন্য তিনটি পৃথক্ বাক্য হইল। এইরূপ এক বিষয়ে অনেকগুলি বাক্যকে একত্র করিলে প্রবন্ধ বা বক্তৃতা হইল।

আর একটি বিষয় লও “পৃথিবী”।

“পৃথিবী গোলাকার। পৃথিবীতে জল ও স্থল আছে। পৃথিবী সূর্যকে সংবেষ্টন করে।”

পরীক্ষার্থ

হস্তী, কুক্কুর, চন্দ্র, সূর্য, বৃক্ষ, বিদ্যা, মাতাপিতা, রাগ, সাহস, শিক্ষক, দয়া।

অষ্টম পাঠ

অনেক বালককে প্রবন্ধ লিখিতে বলিলে তাহারা খুঁজিয়া পায় না যে, কি লিখিতে হইবে। যদি বলা যায় যে, অশ্ব সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখ; তাহারা খুঁজিয়া পায় না যে, অশ্ব সম্বন্ধে কি প্রবন্ধ লিখিবে। এই সকল বালকের সাহায্য জন্য কতকগুলি যুক্তি বলিয়া দিতেছি।

১। প্রথমে বিষয়টি কি তাহা বর্ণন করিবে।

২। তার পর তাহার জাতিভেদ বা প্রকারভেদ বা সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলে তাহা বঝাইবে।

৩। তাহার দোষগুণের বা কার্যের বিচার করিবে।

৪। কিসে সেই বিষয়ে মনুষ্যের উপকার বা উন্নতি হইতে পারে, তাহার বিচার করিবে।

অশ্বের উদাহরণে ইহা বঝাইতেছি।

১। বর্ণনা

অশ্ব চতুষ্পদ জন্তু বিশেষ।

২। জাতিভেদ

অশ্ব অনেক জাতীয় আছে—যথা আরবী, কাবুলী, তুরকী, ওয়েলর, টাট, ইত্যাদি।

৩। গুণ দোষ বিচার

অশ্ব, পশুজাতি মধ্যে বিশেষ বলবান ও দ্রুতগামী। অশ্বের আরও গুণ এই যে, অশ্ব সহজে মনুষ্যের বশ হয়। এজন্য মানুস অশ্ব হইতে অনেক উপকার পায়।

৪। উপকার

মনুষ্য অশ্বকে বশ করিয়া তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্বক যথেষ্ট ভ্রমণ করে। যে পথ অনেক বিলম্বে যাইতে হইত, অথবা শ্রমাধিক্যবশতঃ যাওয়াই যাইত না, অশ্বের সাহায্যে তাহা অল্প সময়ে যাওয়া যায়। মনুষ্য গাড়ি প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে অশ্বযোজন করিয়া, সুখে আসীন হইয়া বিচরণ করে। যুদ্ধকালে অশ্ব, যোদ্ধার বিশেষ সহায়। ইহা ভিন্ন অনেক দেশে অশ্বের দ্বারা ভারবহন ও হলাকর্ষণ কার্যও নিৰ্ব্বাহ হয়।

এই যে উদাহরণ দেওয়া গেল, ইহা সংক্ষিপ্ত। ইচ্ছা করিলে ইহার সম্প্রসারণ করিতে পার। যথা, বর্ণনায়—“অশ্ব চতুষ্পদ জন্তু বিশেষ” লেখা গিয়াছে। কিন্তু চতুষ্পদ জন্তু, কেহ মাংসাহারী, কেহ উদ্ভিজ্জাহারী, কেহ উভয়াহারী। অতএব অশ্ব ইহার কোন শ্রেণীভুক্ত, তাহা লেখা উচিত। যথা—

“অশ্ব উদ্ভিজ্জ মাত্র খায়, মাংস খায় না।” ,কিন্তু আরও অনেক চতুষ্পদ আছে যে, তাহারা

কেবল উদ্ভিজ্জ খায়। যথা, গোমহিষাদি। অতএব আরও বিশেষ করিয়া লিখিতে পার যে, “যে সকল চতুষ্পদ উদ্ভিজ্জাহারী, তাহাদের মধ্যে কতকগুলির শৃঙ্গ আছে, কতকগুলির শৃঙ্গ নাই। অশ্ব দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে।”

এইরূপ আরও সম্প্রসারণ করা যায়।

এইরূপে (২) জাতিভেদ, (৩) দোষ-গুণ, (৪) উপকার—এ সকলেরও সম্প্রসারণ করা যায়।

পরীক্ষার্থ

নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে এইরূপ সম্প্রসারিত প্রবন্ধ লেখ।

হস্তী, কুক্কুর, চন্দ্র, সূর্য্য, বৃক্ষ, বিদ্যা, মাতাপিতা, রাগ, সাহস, শিক্ষক, দয়া।

ইহাও স্মরণ রাখিবে যে, সকল বিষয়েই প্রবন্ধকে ঐরূপ চারি ভাগে বিভক্ত করা যায় না। কখন কোনটি ছাড়িয়া দিতে হয়। যথা, চন্দ্র সূর্য্যের জাতিভেদ নাই—উহা ছাড়িয়া দিবে; তবে চন্দ্র সূর্য্য সম্বন্ধে লোকের মতভেদ আছে, পার ত, তাহা লিখিবে। আর এই চারিটি ভাগ ছাড়া আর যাহা কিছু বক্তব্য লিখিতে চাও তাহাতে আপত্তি নাই। বিশেষ কোন বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে গেলে পূর্বেগামী লেখকদিগের মত সংকলন করা প্রথা আছে; আবশ্যিক মতে তাহা করিতে পার। ভাল বুদ্ধিতে তাহার প্রতিবাদ করিতে পার।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পাঠ—বিশুদ্ধি

রচনার চারিটি গুণ বিশেষ করিয়া শিখিতে হইবে। এই চারিটির নাম (১) বিশুদ্ধি, (২) অর্থব্যক্তি, (৩) প্রাজ্ঞতা, (৪) অলঙ্কার।

প্রথমে বিশুদ্ধি। রচনার ভাষা শুদ্ধ না হইলে সব নষ্ট হইল। বিশুদ্ধির প্রতি সর্ব্বাগ্রে মনোযোগ করিতে হইবে। বিশুদ্ধি সর্ব্বপ্রধান গুণ।

যাহা বিশুদ্ধ নহে, তাহা অশুদ্ধ। কি হইলে রচনা অশুদ্ধ হয়, তাহা বুদ্ধিতেই, বিশুদ্ধি কি তাহা বুঝিবে।

পূর্বেই বলিয়াছি যে মৌখিক রচনা যেরূপ, লিখিত রচনাও সেইরূপ; তবে কিছু প্রভেদ আছে। লিখিত রচনা কতকগুলি নিয়মের অধীন, মৌখিক রচনা সে সব নিয়মের অধীন নয়। অথবা অধীন হইলেও মৌখিক রচনায় সে সকল নিয়ম লঙ্ঘনে দোষ ধরা যায় না। লিখিত রচনায় যে সকল নিয়ম লঙ্ঘিত হইলে দোষ ধরিতে হয়, সেই সকল নিয়ম লঙ্ঘিত হইলেই রচনা অশুদ্ধ হইল। সেই সকল দোষের কথা এখন লিখিতেছি।

১। বর্ণাশুদ্ধি। মূখে সকলেই বলে, “পষ্ট” “মেগ” “শপত” “শট” “বাঁদ” “দুর্বল” “নেতা” কিন্তু লিখিতে হইবে “স্পষ্ট, মেঘ, শপথ, শঠ, বাঁধ, দুর্বল, নৃত্য।”

২। সংক্ষিপ্ত। মূখে বলি, “কোরে” “কচ্চি” “কর্ব্ব” “কল্পুম” “কচ্ছিলুম” কিন্তু লিখিতে হইবে, “করিয়া” “করিতেছি” “করিব” “করিলাম” “করিতেছিলাম” ইত্যাদি।

৩। প্রাদেশিকতা। বাঙ্গালার কোন প্রদেশের লোকে বলে, “কল্পুম”, কোন প্রদেশে, “কল্পেম”, কোথাও, “কল্পাম”, কোথাও “কল্পু”। কোন প্রদেশবিশেষেরই ভাষা ব্যবহার করা হইবে না;—যাহা লিখিত ভাষায় চিরপ্রচলিত, তাহাই ব্যবহৃত হইবে।

অন্যান্য স্থানের অপেক্ষা রাজধানীর ভাষাই সমাধিক পরিচিত। অতএব রাজধানীর ভদ্র-সমাজে যে ভাষা চলিত তাহা লিখিত রচনায় ব্যবহৃত হইতে পারে। কোন দেশে বলে “ছড়ি” কোন দেশে বলে “নিড়ি”। “ছড়ি” কলিকাতার ভদ্রসমাজে চলিত। উহা ব্যবহৃত হইতে পারে। “লগি” “লগা” “চৈড়”—ইহার মধ্যে লগিই কলিকাতায় চলিত, উহাই ব্যবহৃত হইতে পারে। অপর দুইটি ব্যবহৃত হইতে পারে না।

৪। গ্রাম্যতা। কেবল ইতর লোক বা গ্রাম্য লোকের মধ্যে যে সকল শব্দ প্রচলিত, তাহা ব্যবহৃত হইতে পারে না। “কৌশল্যার পো রাম,” “দশরথের বেটা লক্ষ্মণ,” এ সকল বাক্য গ্রাম্যতা-দোষে দূষিত।

বাংলা রচনাবলী

নাটক ও উপন্যাস গ্রন্থে, যে স্থানে কথোপকথন লিখিত হইতেছে, সেখানে এই চারিটি দোষ অর্থাৎ বর্ণাশুদ্ধি, সংক্ষিপ্ত, প্রাদেশিকতা ও গ্রাম্যতা থাকিলে দোষ ধরা যায় না। কেন না মৌখিক রচনা এ সকল নিয়মের অধীন নহে বলিয়াছি। কথোপকথন মৌখিক রচনা মাত্র। কবিতা রচনাতেও অনেক স্থানে এ সকল নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়।

৫। ব্যাকরণ-দোষ। রচনায় ব্যাকরণের সকল নিয়মগুণ বজায় রাখিতে হইবে। ব্যাকরণের সকল নিয়মগুণ এখানে লেখা যাইতে পারে না—তাহা হইলে এইখানে একখানি ব্যাকরণের গ্রন্থ লিখিতে হয়। কিন্তু উদাহরণস্বরূপ দুই একটা সাধারণ নিয়ম বুঝাইয়া দেওয়া যাইতেছে।

সন্ধি। সংস্কৃতের নিয়ম, সন্ধির যোগ্য দুইটি বর্ণ একত্রে থাকিলে সকল স্থানেই সন্ধি হইবে। কিন্তু বাঙ্গালার নিয়ম তাহা নহে, বাঙ্গালার সমাস ব্যতীত সন্ধি হয় না। যে দুইটি শব্দে সমাস হয় না, সে দুইটি শব্দে সন্ধিও হইবে না।

সহজ উদাহরণ;—“সঃ অস্তিঃ,” সংস্কৃতে, “সোহস্তি” হইবে; কিন্তু বাঙ্গালায় “তিনি আছেন” “তিন্যাছেন” হইবে না। “অঙ্গুলি” উখিত এই দুইটি শব্দ সংস্কৃতে যে অবস্থায় থাকুক না কেন, মধ্যে আর কিছু না থাকিলে, “অঙ্গুল্যুখিত” হইয়া যাইবে, কিন্তু বাঙ্গালায় যদি বলি, “তিনি অঙ্গুলি উখিত করিলেন,” সে স্থলে “তিনি অঙ্গুল্যুখিত করিলেন,” এরূপ কখনই লিখিতে পারিব না। কেন না এখানে সমাস নাই।

বাঙ্গালায় সন্ধির দ্বিতীয় নিয়ম এই যে, সংস্কৃতে ও অসংস্কৃতে কখন সন্ধি হইবে না। “আমার অঙ্গুলি” বলিতে হইবে, “আমারঙ্গুলি” হয় না। সন্ধি করিতে হইলে, “মমাঙ্গুলি” বলিবে, সেও ভাল বাঙ্গালা হয় না—কেন না সমাস নাই। “মড়াহারী পক্ষী” বলা যায় না; “শবাহারী” বলিতে হইবে। “গাধাকৃত পশু” বলা যায় না; “গন্দর্ভাকৃত” বলিতে হইবে। সকলেই “মনান্তর” বলে, কিন্তু ইহা অশুদ্ধ। কেন না “মন” বাঙ্গালা শব্দ; সংস্কৃত মনস্, প্রথমায় মনঃ, এজন্য, “মনোদুঃখ”, “মনোরথ” শুদ্ধ।

তৃতীয় নিয়ম। যদি দুইটি শব্দই অসংস্কৃত হয়, তবে কখনই সন্ধি হইবে না। যথা, “পাকা আতা” সন্ধি হয় না।

সমাস। সমাসেরও নিয়ম ঐরূপ; সংস্কৃতে এবং অসংস্কৃতে সমাস হয় না। যেমন, “মহকুমাধ্যক্ষ”; “উকীলাগ্রগণ্য”; “মোক্তারাতি” এ সকল অশুদ্ধ। অথচ এরূপ অশুদ্ধি এখন সচরাচর দেখা যায়।

উভয় শব্দ সংস্কৃত হইলেও সমাস করা না করা লেখকের ইচ্ছাধীন। “অধরের অমৃত” বলিতে পার, অথবা “অধরামৃত” বলিতে পার। “অধরামৃত” বলিলে সমাস হইল, “অধরের অমৃত” বলিলে সমাস হইল না। সন্ধি করা না করাও লেখকের ইচ্ছাধীন। কেহ লেখেন “অধরামৃত”, কেহ লেখেন “অধর অমৃত”।

বাঙ্গালায় সন্ধি সমাসের বাহুল্য ভাল নহে। সহজ রচনায় উহা যত কম হয়, তত ভাল।

প্রত্যয়। প্রত্যয় সম্বন্ধে সংস্কৃতের যে নিয়ম, বাঙ্গালা রচনায় সংস্কৃত প্রত্যয় ব্যবহারকালে সেই সকল বজায় রাখিতে হইবে। “সৌজন্যতা” “ঐক্যতা” এ সকল অশুদ্ধ। “সৌজন্য” “ঐক্য” এইরূপ হইবে।

সংস্কৃত শব্দের পরে অসংস্কৃত প্রত্যয় ব্যবহার হইতে পারে না। “মুখামি” বলা যায় না, কেন না “মুখ” সংস্কৃত শব্দ, “মি” সংস্কৃত প্রত্যয় নহে; “মুখতা” বলিতে হইবে। “অহম্মুখ” সংস্কৃত শব্দ; এজন্য “আহম্মুখি” অশুদ্ধ, “অহম্মুখতা” বলিতে হইবে।

স্ত্রীত্ব। সংস্কৃতে এই নিয়ম আছে যে, বিশেষ্য যে লিঙ্গান্ত হইবে, বিশেষণও সেই লিঙ্গান্ত হইবে। যথা, সুন্দরী বালিকা, সুন্দর বালক; বেগবান্ নদ, বেগবতী নদী।

বাঙ্গালায় এই নিয়মের অনুবর্তী হওয়া লেখকের ইচ্ছাধীন। অনেকেই সুন্দরী বালিকা লেখেন; কিন্তু সুন্দর বালিকাও বলা যায়। বিশেষতঃ বিশেষণ বিশেষ্যের পরে থাকিলে ইহাতে কোন দোষই হয় না। যথা, এই বালিকাটি বড় সুন্দর। “রামের স্ত্রী বড় মুখর।” অনেক সময়ে বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গান্ত হইলে বড় কদর্য শুনায়। যথা, “রামের মা উত্তমা পাঁচকা” এখানে “উত্তম পাঁচকা” বলিতে হইবে।

বাঙ্গালা রচনায় স্ত্রীত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি নিয়ম প্রবল;—

১। স্ত্রীলিঙ্গান্ত বিশেষ্যের বিশেষণকে পুংলিঙ্গান্ত রাখিতে পার। যেমন সুন্দর বালিকা,

উর্ধ্বর ভূমি। কিন্তু পুংলিঙ্গান্ত বা ক্লীবলিঙ্গান্ত বিশেষ্যের বিশেষণকে কখন স্ত্রীলিঙ্গান্ত করিতে পার না। “পঞ্চমী দিবস” “মহতী কার্য্য” “সুবিস্থতা জনপদ” এ সকল অশুদ্ধ।

২। স্ত্রীলিঙ্গান্ত বিশেষ্যের বিশেষণকে ইচ্ছামত স্ত্রীলিঙ্গান্ত না করিলে, না করিতে পার; কিন্তু যদি কতকগুলি বিশেষণ থাকে আর তাহার একটিকে স্ত্রীলিঙ্গান্ত কর, তবে আর সকলগুলিকেও স্ত্রীলিঙ্গান্ত করিতে হইবে। “সুন্দর বালিকা” বলিতে পার, কিন্তু “সুসজ্জিতা সুন্দর বালিকা” বলিতে পার না, “সুসজ্জিতা সুন্দরী বালিকা” বলিতে হইবে। “প্রথর নদী” বলিতে পার, কিন্তু “কুলপ্লাবিনী প্রথর নদী” বলিতে পার না; এখানে “প্রথরা” বলিতে হইবে।

৩। বিশেষণ হইলে সংস্কৃত শব্দই স্ত্রীলিঙ্গান্ত হয়, অসংস্কৃত বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গান্ত হয় না। যথা “একটা বড় বাঘিনী” ভিন্ন “একটা বড়ী বাঘিনী” বলা যায় না; “ঢেঙ্গা মেয়ে” ব্যতীত “ঢেঙ্গী মেয়ে” বলা যায় না। “ফুটা কোড়ি,” “ফুটী কোড়ি” নহে। হিন্দীর নিয়ম বিপরীত। হিন্দীতে “ফুটী কোড়ি” বলিতে হইবে।

৪। অসংস্কৃত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গান্ত বিশেষণ ভাল শুনায় না। “গর্ভবতী মেয়ে” না বলিয়া “গর্ভবতী কন্যা” বলাই ভাল। “সুশীলা বউ” না বলিয়া “সুশীল বউ” বা “সুশীলা বধু” বলা উচিত। “মুখরা চাকরাণী” না বলিয়া “মুখরা দাসী” বলিব।

কারক। সকল বাক্যে কর্তা ও কর্ম্ম যেন নির্দিষ্ট থাকে। বাঙ্গালায় এ বিষয়ে ভুল সর্ব্বদা হয়। “আমাকে মারিয়াছে।” কে মারিয়াছে তাহার ঠিক নাই। “বুঝি দেশে রহিতে দিল না।” কে রহিতে দিল না তাহার ঠিক নাই।

দ্বিতীয় পাঠ

অর্থব্যক্তি

তোমার যাহা বলিবার প্রয়োজন, রচনায় তাহা যদি প্রকাশ করিতে না পারিলে, তবে রচনা বৃথা হইল। অর্থব্যক্তির বিশেষ কোন নিয়ম নাই, তবে দুই একটা সঙ্কেত আছে।

যে কথাটিতে তোমার কাজ হইবে, সেই কথাটি ব্যবহার করিবে। তাহা শুনিতে ভাল নয়, কি বিদেশী কথা, এরূপ আপত্তি গ্রাহ্য করিও না। এক সময়ে লেখকদিগের প্রতিজ্ঞা ছিল যে, সংস্কৃতমূলক শব্দ ভিন্ন অন্য কোন শব্দ ব্যবহার করিবে না। কিন্তু এখনকার উৎকৃষ্ট লেখকেরা প্রায়ই এ নিয়ম ত্যাগ করিয়াছেন। যে কথাটিতে মনের ভাব ঠিক ব্যক্ত হয়, তাঁহারা সেই কথাই ব্যবহার করেন।

একটি উদাহরণ দিতেছি। তুমি কোন আদালতের ইশ্‌তিহারের কথা লিখিতেছ। আদালত হইতে যে সকল আঞ্জা, সকলের জানিবার জন্য প্রচারিত হয়, তাহাকে ইশ্‌তিহার বলে। ইহার আর একটি নাম “বিজ্ঞাপন”। “বিজ্ঞাপন” সংস্কৃত শব্দ, ইশ্‌তিহার বৈদেশিক শব্দ, এজন্য অনেকে “বিজ্ঞাপন” শব্দ ব্যবহার করিতে চাহিবেন। কিন্তু বিজ্ঞাপনের একটু দোষ আছে, তাহার অনেক অর্থ হইয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থকর্তা গ্রন্থ লিখিয়া গ্রন্থের পরিচয় জন্য প্রথম যে ভূমিকা লেখেন তাহার নাম “বিজ্ঞাপন”। দোকানদার আপনার জিনিস বিক্রয়ের জন্য খবরের কাগজে বা অন্যত্র যে খবর লেখে, তাহার নাম “বিজ্ঞাপন”। সভা কি রাজকর্ম্মচারীর রিপোর্টের নাম “বিজ্ঞাপন”। “বিজ্ঞাপন” শব্দের এইরূপ গোলযোগ আছে। এস্থলে, আমি ইশ্‌তিহার শব্দই ব্যবহার করিব। কেন না, ইহার অর্থ সকলেই বুঝে, লৌকিক ব্যবহার আছে। অর্থেরও কোন গোল নাই।

দ্বিতীয় সঙ্কেত এই যে, যদি এমন কোন শব্দই না পাইলাম যে তাহাতে আমার মনের ভাব ঠিক ব্যক্ত হয়, তবে যোঁটি উহারই মধ্যে ভাল, সেইটি ব্যবহার করিব। ব্যবহার করিয়া তাহার পরিভাষা করিয়া অর্থ বুঝাইয়া দিব। দেখ, “জাতি” শব্দ নানার্থ। প্রথম, জাতি (Caste) অর্থে হিন্দুসমাজের জাতি; যেমন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কৈবর্ত ইত্যাদি। দ্বিতীয়, জাতি অর্থে দেশবিশেষের মনুষ্য (Nation); যেমন ইংরেজজাতি, ফরাসীজাতি, চীনজাতি। তৃতীয়, জাতি অর্থে মনুষ্যবংশ (Race); যেমন আর্য্যজাতি, সেমীয়জাতি, তুরাণীজাতি ইত্যাদি। চতুর্থ, জাতি অর্থে কোন দেশের মনুষ্যদিগের শ্রেণীবিশেষ মাত্র (Tribe); যেমন, য়িহুদায়

বিশ্বকম রচনাবলী

দশজাতি ছিল। পশু, 'নানাজাতি পক্ষী', 'কুকুরের জাতি' (Species) বলিলে যে অর্থ বুঝায়, তাই। ইহার মধ্যে কোনও অর্থ প্রকাশ করিতে গেলে, জাতি ভিন্ন বাঙ্গালায় অন্য শব্দ নাই। এস্থলে জাতি শব্দই ব্যবহার করিতে হইবে। কিন্তু ব্যবহার করিয়া তাহার পরিভাষা করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, কোন অর্থে 'জাতি' শব্দ ব্যবহার করা যাইতেছে। বুঝাইয়া দিয়া, উপরে যেমন দেওয়া গেল, সেইরূপ উদাহরণ দিলে আরও ভাল হয়।

তৃতীয় পাঠ

প্রাজলতা

প্রাজলতা রচনার বড় গুণ। তুমি যাহা লিখিবে, লোকে পড়িবামাত্র যেন তাহা বুঝিতে পারে। যাহা লিখিলে, লোকে যদি তাহা না বুঝিতে পারিল, তবে লেখা বৃথা। কিন্তু অনেক লেখক এ কথা মনে রাখেন না। কতকগুলি নিয়ম, আর কতকগুলি কৌশল মনে রাখিলে রচনা খুব প্রাজল করা যায়। দুই রকমই বলিয়া দিতেছি।

১। একটি বস্তুর অনেকগুলি নাম থাকিতে পারে, যেমন আগুনের নাম অগ্নি, হুতাশন অথবা হুতভুক্, অনল, বৈশ্বানর, বায়ুসখা ইত্যাদি। এখন, আগুনের কথা লিখিতে গেলে ইহার মধ্যে কোন নামটি ব্যবহার করিব? যেটি সবাই জানে, অর্থাৎ আগুন বা অগ্নি। যদি বলি, "হুতভুক্ সাহায্যে বাষ্পীয় যন্ত্র সংগঠিত হয়," তবে অধিকাংশ বাঙ্গালী আমার কথা বুঝিবে না। যদি বলি যে, "অগ্নির সাহায্যে বাষ্পীয় যন্ত্র চলে" সকলেই বুঝিবে।

২। অনর্থক কতকগুলো সংস্কৃত শব্দ লইয়া সন্ধি সমাসের আড়ম্বর করিও না—অনেকে বুঝিতে পারে না। যদি বলি, "মীনক্ষোভাকুল কুবলয়" তোমরা কেহ কি সহজে বুঝিবে? আর যদি বলি, "মাছের তাড়নে যে পদ্ম কাঁপিতেছে," তবে কে না বুঝিবে?

৩। অনর্থক কথা বাড়াইও না। অল্প কথায় কাজ হইলে, বেশী কথার প্রয়োজন কি? "এবম্বিধ বিবিধ প্রকার ভয়াবহ ব্যাপারের বশীভূত হইয়া, যখন সূর্য্যদেব পূর্ব্বগগনে অধিষ্ঠান করিয়া পৃথিবীতে স্বীয় কিরণমালা প্রেরণ করিলেন, তখন আমি সেই স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র গমন করিলাম।" এরূপ না বলিয়া যদি বলি, "এইরূপ অনেক বিষয়ে ভয় পাইয়া, যখন সূর্য্য উঠিল তখন আমি সেস্থান হইতে চলিয়া গেলাম," তবে অর্থের কোন ক্ষতি হয় না, অথচ সকলে সহজে বুঝিতে পারে।

৪। জটিল বাক্য রচনা করিও না। অনেকগুলি বাক্য একত্র জড়িত করা হইলে বাক্য জটিল হয়। যেখানে বাক্য জটিল হইয়া আসিবে, সেখানে জটিল বাক্যটি ভাঙ্গিয়া ছোট ছোট সরল বাক্যে সাজাইবে। উদাহরণ দেখে—

"দিন দিন পল্লীগাম সকলের যেরূপ শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াইতেছে, তাহাতে অল্পকাল মধ্যে পল্লীগাম যে জলহীন হইবে, এবং তদ্ব্যতিক্রম যে কৃষিকার্যের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিবে, এরূপ অনুমান করিয়াও অনেক দেশহিতৈষী ব্যক্তি তাহার প্রতিবিধানে যত্ন করেন না, দেখিয়া আমরা বড় দুঃখিত হইয়াছি।"

এই বাক্য অতি জটিল। সহজে বুঝা যায় না। কিন্তু ছোট ছোট বাক্যে ইহাকে বিভক্ত করিয়া লইলে কত সহজ হয় দেখ। "দিন দিন পল্লীগাম সকলের শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াইতেছে। যেরূপ শোচনীয় অবস্থায় দাঁড়াইতেছে, তাহাতে অল্পকাল মধ্যে অনেক পল্লীগাম জলহীন হইবে। পল্লীগাম সকল জলহীন হইলে কৃষিকার্যের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিবে। অনেক দেশহিতৈষী ব্যক্তি ইহা অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু অনুমান করিয়াও তাহারা ইহার প্রতিবিধানের যত্ন করেন না। ইহা দেখিয়া আমরা বড় দুঃখিত হইয়াছি।"

একটি বাক্যের স্থানে ছয়টি হইয়াছে। কিন্তু বুঝিবার আর কোন কষ্ট নাই।

৫। উদাহরণ। যেখানে স্থূল কথাটা বুঝিতে কঠিন, সেখানে উদাহরণ প্রয়োগে বড় পরিষ্কার হয়। এই গ্রন্থে সকল কথার উদাহরণ দেওয়া গিয়াছে, সুতরাং উদাহরণের আর পৃথক্ উদাহরণ দিবার প্রয়োজন নাই।

৬। সম্প্রসারণ। স্থূল বাক্যটি বড় সংক্ষিপ্ত হইলে অনেক সময়ে বুঝিবার কষ্ট হয়।

এমন স্থলে সম্প্রসারণ করিবে। অশ্বের উদাহরণ পূর্বে প্রথম অধ্যায়ে সপ্তম পাঠে দিয়াছি; তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারিবে।

“অশ্ব, শৃঙ্গহীন উদ্ভিদভোজী চতুষ্পদ বিশেষ।”

ইহাতে অনেক কথা বুঝিবার কষ্ট আছে। যাহা যাহা বুঝিবার কষ্ট, তাহা প্রথম অধ্যায়ে সপ্তম পাঠে সম্প্রসারিত বাক্যগুলিতে পরিষ্কার হইয়াছে। আর এক প্রকারের উদাহরণ দেখ।

মনে কর, এ বৎসর বৃষ্টি কম হইয়াছে। লোকে বলে “উন বর্ষায় দুনো শীত।” অর্থাৎ যে বার বৃষ্টি কম হয় সে বার শীত বেশী হয়। মনে কর, তুমি সে কথা জান না। এমন অবস্থায় ভাদ্র মাসে তোমাকে যদি কেহ বলে, “এ বৎসর শীত বেশী হইবে,” তাহা হইলে তুমি তাহার কথার মর্ম কিছুর বুঝিতে পারিবে না, হয়ত তাহাকে পাগল মনে করিবে। কিন্তু সে যদি নিজ বাক্যের সম্প্রসারণ করিয়া বলে, “যে যে বৎসর কম বর্ষা হইয়াছে, সেই সেই বৎসর বেশী শীত হইয়াছে দেখা গিয়াছে। এ বৎসর কম বর্ষা হইয়াছে, অতএব এ বৎসর বেশী শীত হইবে।” তাহা হইলে বুঝিবার কষ্ট থাকে না।

ন্যায়শাস্ত্রে ইহাকে “অবয়ব” বলে। ন্যায়শাস্ত্রে অবয়বের এইরূপ উদাহরণ দেয়, যথা—

“পর্ষতে আগুন লাগিয়াছে,

কেন না পর্ষতে ধূয়া দেখিতেছি।”

যেখানে যেখানে ধূয়া দেখা গিয়াছে, সেইখানে সেইখানে আগুন দেখা গিয়াছে।

এই পর্ষতে ধূয়া দেখা যাইতেছে,

অতএব ইহাতে আগুন লাগিয়াছে।

অনেক সময়ে এইরূপ লিখিলে রচনা বড় পরিষ্কার হয়।

চতুর্থ পাঠ

অলঙ্কার

অলঙ্কার ধারণ করিলে যেমন মনুষ্যের শোভা বৃদ্ধি পায়, অলঙ্কার ধারণ করিলে রচনারও সেইরূপ শোভা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অলঙ্কার প্রয়োগ বড় কঠিন। আর, সকল প্রকার রচনায় অলঙ্কারের সমাবেশ করা যায় না; বিশেষ, যাহারা প্রথম রচনা করিতে শিখে, তাহাদিগের পক্ষে অলঙ্কার প্রয়োগ বিধেয় নহে। অতএব অলঙ্কার সম্বন্ধে কিছুর লেখা গেল না।

তৃতীয় অধ্যায়

পত্রলিপি

পত্র লিখিতে জানা, সকলেরই পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। অন্য প্রকার রচনার ক্ষমতা, অনেকের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু পত্র লিখিবার ক্ষমতা সকলের পক্ষে প্রয়োজনীয়। এই জন্য পত্র লেখার পদ্ধতি বলিয়া দিবার জন্য একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় লিখিলাম। পত্র লেখা অতি সহজ। বাঙ্গালায় পত্র লেখার কয়েক প্রকার পাঠ প্রচলিত আছে।

পূজ্য ব্যক্তি, যাঁহাকে প্রণাম করিতে হয়, তাঁহাকে “সেবক” ও “প্রণাম” পাঠ লিখিতে হয়। যথা—

সেবক শ্রীরমানাথ দেবশর্মণঃ প্রণামাঃ শতসহস্রনিবেদনঃ বিশেষঃ। এই “দেবশর্মণঃ” শব্দ সম্বন্ধে একটা কথা বুঝিবার আছে। ব্রাহ্মণেরা সকলেই আপন নামের পর “শর্মা” বা “দেবশর্মা” লিখিতে বা বলিতে পারেন। রমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, মহাশয়ের নাম কি? তিনি উত্তর করিতে পারেন, “আমার নাম শ্রীরমানাথ শর্মা” অথবা “শ্রীরমানাথ দেবশর্মা”। কিন্তু দেখিবে পত্রের পাঠে লিখিত হইল “দেবশর্মণঃ”—“দেবশর্মা” নহে। ইহার কারণ এই যে, আসল শব্দটি “শর্মণ্”। প্রথমায় ইহা শর্মা হয়—“শর্মণঃ” ষষ্ঠ্যন্ত। শব্দ ষষ্ঠ্যন্ত হইলে সম্বন্ধ পদ হয়। অতএব “শর্মণঃ” কি “দেবশর্মণঃ” বলিলে

বিক্রম রচনাবলী

‘শর্মার’ ও ‘দেবশর্মার’ ব্দায়। উপরে যে পাঠ লেখা হইয়াছে, তাহার অর্থ এই যে, “আপনার সেবক শ্রীরমানাথ দেবশর্মার শতসহস্র প্রণাম ও নিবেদন।” ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতীয় লেখক হইলেও লেখকের নামটি ঐরূপ ষষ্ঠ্যন্ত হইবে, যথা—

“সেবক শ্রীরমানাথ দাস ঘোষস্য প্রণামাঃ শতসহস্রনিবেদনঃ বিশেষঃ”।

“সেবক শ্রীরামচন্দ্র সেন গুপ্তস্য প্রণামাঃ” ইত্যাদি।

“সেবক শ্রীরামনিধি দাস বসোঃ প্রণামাঃ” ইত্যাদি।

ব্রাহ্মণকন্যারা সকলেই আপনার নামের পর “দেবী” লিখিতে পারেন, শূদ্রকন্যাগণকে “দাসী” লিখিতে হয়। “দেবী” শব্দ ষষ্ঠ্যন্ত হইলে “দেব্যাঃ” হয়; “দাসী” শব্দ “দাস্যাঃ” হয়। এজন্য মোক্ষদা দেবী কি কৃষ্ণপ্রিয়া দাসী পত্র লিখিতে গেলে পাঠ লিখিবে,—

“মোক্ষদা দেব্যাঃ প্রণামাঃ” ইত্যাদি, “কৃষ্ণপ্রিয়া দাস্যাঃ প্রণামাঃ” ইত্যাদি।

এইরূপ ষষ্ঠ্যন্ত পদ পত্রের ভিতরে লিখিতে হয় বলিয়া এ দেশের লৌকিক আচারে একটা ঘোরতর ভ্রম প্রবেশ করিয়াছে। লোকের বিশ্বাস হইয়াছে যে, স্ত্রীলোকের নামই ব্দিক “দেব্যাঃ” ও “দাস্যাঃ”। সাধারণ লেখকেরা, কর্তৃকারকেও “দেব্যাঃ” লেখেন, কর্মকারকেও “দেব্যাঃ” লেখেন, অপাদান, সম্প্রদান, করণ, অধিকরণ, সর্বত্রই “দেব্যাঃ” ও “দাস্যাঃ”। ইহা বড় ভুল। “দেব্যাঃ” অর্থ “দেবীর”; “দাস্যাঃ” অর্থ “দাসীর”। সংস্কৃত ভিন্ন বাঙ্গালা লেখায় উহা ব্যবহৃত হইতে পারে না। পত্রের পাঠ সংস্কৃত, এই জন্য সে স্থানে ইহা ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃতেও সম্বন্ধ না ব্দাইলে ব্যবহৃত হইবে না।

সেইরূপ, “দেবশর্মণঃ”। আজিও এমন অনেক মূর্খ ব্রাহ্মণকুমার আছে যে, নাম বলিতে গেলে বলে, “আমার নাম শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ।” ইহা ভুল। ইহার অর্থ আমার নাম শ্রীঅমুক দেবশর্মার।” নাম বলিতে হইবে, “আমার নাম শ্রীঅমুক দেবশর্মা।”

এখন সেই “সেবক” পাঠ পুনর্বার পড়িয়া দেখ—

“সেবক শ্রীরমানাথ দেবশর্মণঃ

প্রণামাঃ শতসহস্রনিবেদনঃ বিশেষঃ”—এখন তোমার বিশেষ নিবেদন কি, তাহা সহজ বাঙ্গালায় লিখিবে, যথা—

“মহাশয়ের আজ্ঞাপত্র প্রাপ্ত হইয়া শিরোধার্য করিলাম। আপনি যেইরূপ লেখা পড়া ও আহারাদির নিয়ম বলিয়া দিয়াছেন, আমি সেই নিয়মানুসারেই চলিব। আমি জব্বরে কিছু কষ্ট পাইতেছি। চিকিৎসা করাইতেছি। ইতি, তারিখ সন ১২৮২। ২৭শে শ্রাবণ।”

এই “ইতি” শব্দের অর্থ, উপরে যে “নিবেদনঃ বিশেষঃ”—লিখিয়াছ, তাহার সঙ্গে। “নিবেদনঃ বিশেষঃ ইতি”, অর্থাৎ “এই আমার বিশেষ নিবেদন।”

উপরে লেখকের নাম আছে, পত্রের নীচে আর তোমার নাম লিখিতে হইবে না। কিন্তু অনেকে শেষে নাম লেখেন। তাঁহারা সেবক পাঠ উপরে না লিখিয়া নীচে লেখেন। যথা—

“প্রণামাঃ শতসহস্রনিবেদনঃ বিশেষঃ—

মহাশয়ের আজ্ঞাপত্র পাইয়া” ইত্যাদি লিখিয়া শেষে লেখেন, “ইতি, তারিখ সন ১২৮২। ২৭শে শ্রাবণ।

সেবক শ্রীরমানাথ দেবশর্মণঃ।”

উপরে “নিবেদনঃ” পদ আছে, এজন্য “দেবশর্মণঃ” লেখা হইল, “দেবশর্মার নিবেদন” ব্দাইল। নহিলে “দেবশর্মা” লিখিতে হইত।

এক্ষণে পত্র সমাপ্ত হইল। এখন পত্র মূড়িয়া তাহার উপরে শিরোনাম লিখিতে হইবে। যেমন পত্রের পাঠ আছে, তেমনই শিরোনামেরও পাঠ আছে। পূজ্য ব্যক্তি, যাঁহাকে সেবক পাঠ লিখিতে হয়, তাঁহাকে শিরোনামে “পরমপূজনীয়” লিখিতে হয়। নামের পর “শ্রীচরণেষু” বা “শ্রীচরণকমলেষু” কি এইরূপ অন্য কোন সম্মানসূচক পদ লিখিতে হয়। যথা—

“পরমপূজনীয়,

শ্রীযুক্ত বাবু মাধবচন্দ্র ঘোষাল

মাতুল মহাশয় শ্রীচরণকমলেষু।”

নীচে পত্রের ঠিকানা লিখিয়া দিবে, যথা—দেয়, (বা দেনা) মোং বর্দ্ধমান।

পূজ্য ব্যক্তিকে “প্রণাম” করিতে হয়, তুল্য ব্যক্তিকে “নমস্কার” করিতে হয়। এই জন্য তুল্য ব্যক্তিকে যে পত্র লেখা যায়, তাহার পাঠের নাম “নমস্কার” পাঠ। যথা—

“সবিনয় নমস্কারাঃ নিবেদনং বিশেষং” অথবা বাঙ্গালায়—

“বিনয় পূর্বেক নমস্কার নিবেদন।” অনেকে সংক্ষেপ করিয়া শুধু লেখেন—

“নমস্কার নিবেদন।”

আগে রীতি ছিল, লেখকের নাম পত্রের প্রথমে থাকিত, যথা—

“আজ্ঞাকারী শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মণঃ”। কিন্তু এখন “সেবক” পাঠ ভিন্ন সে পদ্ধতি প্রায় অপ্রচলিত হইয়াছে। ইংরাজী পত্রের নিয়মানুসারে, নাম শেষে লেখা হয়। শিরোনামে পূর্বে রীত্যানুসারে, “মদেকসদয়” বা “পোষ্ট্‌বর” কি এমনই একটি ঘনিষ্ঠতাসূচক পদ ব্যবহৃত হইত। এখন, সে সকল পদ তত ব্যবহৃত হয় না। “মান্যবর” কি “বিজ্ঞবর” কি এমনই অপর কোন নিঃসম্বন্ধ পদ ব্যবহৃত হয়। যথা—

“মান্যবর

শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়মাধব মিত্র

মহাশয় সমীপেষু।”

তবে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, “শ্রীযুক্ত বাবু” শিরোনামে এখনকার দিনে কখনও পরিত্যাগ করা যায় না। কেবল অধ্যাপক, গুরু, পুরোহিত প্রভৃতিকে লিখিতে “বাবু” শব্দ ত্যাগ করিতে হয়। স্ত্রীলোককে লিখিতে গেলে, সধবা বা কুমারীকে “শ্রীমতী” লিখিতে হয়। যথা—

“পরমপূজনীয়া

শ্রীমতী কৃষ্ণমোহিনী দেবী

মাতুলানী মহাশয়া শ্রীচরণকমলেষু।”

বিধবাকে “শ্রীযুক্তা” লেখা যায়।

মুসলমানকেও বাবু লেখা নিষিদ্ধ। মুসলমানকে “মৌলবী” বা “মুন্সী” লিখিতে হয়। নামের পর “সাহেব” লিখিতে হয়। যথা—

“মান্যবর

শ্রীযুক্ত মৌলবী লতাফাৎ হোসেন খাঁ

সাহেব বরাবরেষু।”

যাঁহাদের কোন উপাধি আছে, যথা রাজা, মহারাজা, রায় বাহাদুর, খাঁ বাহাদুর ইত্যাদি, তাঁহাদের সে উপাধি শিরোনামে লিখিতে হইবে। যথা—

“মহারাজাধিরাজ শ্রীলশ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাধিপতি

মহাতাপচন্দ বাহাদুর

প্রজাপালকবরেষু।”

“মহামান্য শ্রীযুক্ত অনরেবল সর্ আশ্‌লী ইডেন্, কে, সি, এস, আই

বরাবরেষু।”

তার পর, যাহারা সম্বন্ধে ছোট, তাহাদিগকে “আশীর্বাদ” পাঠ লেখা যায়। আশীর্বাদ পাঠ অনেক প্রকার আছে, যথা—

“পরমশুভাশীর্বাদ” ইত্যাদি

“শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু।”

কিন্তু অনেকেই এ সকল পরিত্যাগ করিয়াছেন। আত্মীয় ব্যক্তি হইলে, তাঁহারা “প্রিয়তমেষু” “প্রিয়বরেষু” এইরূপ লেখেন; বিশেষ আত্মীয়তা না থাকিলে শুধু “কল্যাণবরেষু” লিখিয়া থাকেন। শিরোনামে, “পরমকল্যাণীয়” বা “কল্যাণীয়া” পাঠ লিখিতে হয়। শেষে কিছু আশীর্বাদ বাক্য থাকা চাই। সকল স্থলে “শ্রীযুক্ত” পরিবর্তে “শ্রীমান্” শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা—

“পরমকল্যাণীয়

শ্রীমান্ বাবু রাধানাথ দাস

বাবাজীউ চিরজীবেষু।”

বিক্রম রচনাবলী

“কল্যাণীয়

শ্রীমান্ নিশিকান্ত ঘোষ

ভাইজীউ মঙ্গলাস্পদেষু।”

শুদ্ধকে পত্র লিখিতে গেলে, ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ পাঠ লেখাই উচিত। ব্রাহ্মণকে পত্র লিখিতে হইলে শুদ্ধের প্রণাম পাঠ লেখাই কর্তব্য। কিন্তু এখন অনেক শুদ্ধ ইহা মানেন না।

স্থূল কথা, এখন অনেক ইংরাজ পত্র লেখার প্রধানদ্বারায় লিখিতে হয়। তাহার দুই একটি উদাহরণ দিয়া ক্ষান্ত হইব।

১। “প্রিয়বর,

তোমার পত্র পাইলাম। যে টাকা পাঠাইয়াছি, তাহা সাবধানে খরচ করিও। তোমার বিষয়-কর্ম করূপ চলিতেছে সবিশেষ লিখিও। শারীরিক কুশলবাস্তা লিখিতে হ্রুটি করিও না। ইতি, তারিখ ১৮৮৩ সাল, ৭ই মার্চ।

নিতান্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শ্রীরাধানাথ ঘোষ।”

২। “পাণ্ডিত্যগণ্য শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত বিদ্যারত্ন

মহাশয় অশেষগুণালঙ্কৃতেষু।

পাণ্ডিতবর,

আপনার প্রণীত নূতন গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া যার পর নাই পরিতোষ লাভ করিয়াছি। ভরসা করি, আপনি নিত্য নূতন গ্রন্থ প্রচার পূর্বক স্বদেশকে চরিতার্থ করিবেন; ইতি, তারিখ ১২৮২ সাল, ২৭শে শ্রাবণ।

একান্ত বশংবদ
শ্রীহরিদাস দত্ত।”

গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক

পদ্যপনাটক

যুথিকা। এসো, এসো, প্রাণনাথ এসো; আমার হৃদয়ের ভিতর এসো; আমার হৃদয় ভরিয়া যাউক। কত কাল ধরিয়া তোমার আশায় উদ্ধারমুখী হইয়া বসিয়া আছি, তা কি তুমি জান না? আমি যখন কলিকাতা, তখন ঐ বৃহৎ আগুনের চাকা—ঐ ত্রিভুবনশুদ্ধকর মহাপাপ, কোথায় আকাশের পদ্বর্ষদিকে পড়িয়াছিল! তখন এমন বিশ্বপোড়ান মর্দুত্তিও ছিল না। তখন এর তেজের এত জ্বালাও ছিল না—হায়! সে কত কাল হইল! এখন দেখ, সেই মহাপাপ ক্রমে আকাশের মাঝখানে উঠিয়া, ব্রহ্মাণ্ড জ্বালাইয়া, ক্রমে পশ্চিমে হেলিয়া হেলিয়া, এখন বৃষ্টি অনন্তে ডুবিয়া যায়! যাক্! দূর হোক—তা তুমি এত কাল কোথা ছিলে প্রাণনাথ? তোমায় পেয়ে দেহ শীতল হইল, হৃদয় ভরিয়া গেল—ছি, মাটিতে পড়িও না! আমার বৃকে তুমি আছ, তাতে সেই পোড়া তপন আর আমাকে না জ্বালাইয়া তোমাকে কেমন সাজাইতেছে! সেই রৌদ্রবিশ্বে তুমি কেমন রত্নভূষিত হইয়াছ। তোমার রূপে আমিও রূপসী হইয়াছি—থাক, থাক, হৃদয়-শুদ্ধকর!—আমার হৃদয়ে থাক, মাটিতে পড়িও না।

টগর। (জনাস্তিকে কৃষ্ণকলির প্রতি) দেখ্ ভাই কৃষ্ণকলি,—মেয়েটার রকম দেখ্!

কৃষ্ণকলি। কোন্ মেয়েটার?

টগর। ঐ যুইটা। এত কাল মুখ বৃজে, ঘাড় হেঁট ক'রে, যেন দোকানের মর্দুর মত পড়িয়া ছিল—তার পর আকাশ থেকে বৃষ্টির ফোঁটা, নবাবের বেটা নবাব, বাতাসের ঘোড়ায় চ'ড়ে একেবারে মেয়েটার ঘাড়ের উপর এসে পড়িল। অর্নি মেয়েটা হেসে, ফুটে, একেবারে আটখানা! আঃ, তোর ছেলে বয়স! ছেলেমানুষের রকমই এক স্বতন্ত্র।

কৃষ্ণকলি। আ ছি! ছি!

টগর। তা দিদি! আমরা কি আর ফুটতে জানিনে? তা, সংসারধর্ম করিতে গেলে দিনেও ফুটতে হয়, দ্বপ্নরেও ফুটতে হয়, গরমেও ফুটতে হয়, ঠাণ্ডাতেও ফুটতে হয়, না ফুটলে চলবে কেন বহিন? আমাদেরই কি বয়স নেই? তা, ও সব অহংকার ঠেকার আমরা ভালবাসি না।

কৃষ্ণকলি। সেই কথাই ত বলি।

যুই। তা এত কাল কোথা ছিলে প্রাণনাথ! জান না কি যে, তুমি বিনা আমি জীবন ধারণ করিতে পারি না?

বৃষ্টিবিন্দু। দৃথ করিও না, প্রাণাধিকে! আসিব আসিব অনেক কাল ধরিয়া মনে করিতেছি, কিন্তু ঘটিয়া উঠে নাই। কি জান, আকাশ হইতে পৃথিবীতে আসা, ইহাতে অনেক বিঘ্ন। একা আসা যায় না, দলবল যুটিয়া আসিতে হয়, সকলের সব সময় মেজাজ মরজি সমান থাকে না। কেহ বাষ্পরূপ ভালবাসেন, আপনাকে বড় লোক মনে করিয়া আকাশের উচ্চ স্তরে অদৃশ্য হইয়া থাকিতে ভাল বাসেন; কেহ বলেন, একটু ঠাণ্ডা পড়ুক, বায়ুর নিম্ন স্তর বড় গরম, এখন গেলে শূকরাইয়া উঠিব; কেহ বলেন, পৃথিবীতে নামা, ও অধঃপতন, অধঃপাতে কেন যাইব? কেহ বলেন, আর মাটিতে গিয়া কাজ নাই, আকাশে কালামুখো মেঘ হ'য়ে চিরকাল থাকি, সেও ভাল; কেহ বলেন, মাটিতে গিয়া কাজ নাই, আবার সেই চিরকেলে নদী নালা বিল খাল বেয়ে সেই লোণা সমুদ্রটায় পড়িতে হইবে, তার চেয়ে এসো, এই উজ্জ্বল রৌদ্রে গিয়া খেলা করি, সবাই মিলে রামধনু হইয়া সাজি, বাহার দেখিয়া ভূচর খেচর মোহিত হইবে। তা সব যদি মিলিয়া মিশিয়া আকাশে ষোটপাট হুওয়া গেল, তবু জ্ঞাতিবর্গের গোলযোগ মিটে না। কেহ বলেন, এখন থাক্; এখন এসো, কালিমাময়ী কালী করালী কাদম্বিনী সাজিয়া, বিদ্যুতের মালা গলায় দিয়া, আমরা এইখানে বসিয়া বাহার দিই। কেহ বলে, অত তাড়াতাড়ি কেন? আমরা জলবংশ, ভুলোক উদ্ধার করিতে যাইব, অর্নি কি চুপি চুপি যাওয়া হয়?—এসো, খানিক ডাক-হাঁক করি। কেহ ডাক-হাঁক করে, কেহ বিদ্যুতের খেলা দেখে—মাগী নানা রঙ্গে রঙ্গিণী—কখন

বঙ্কিম রচনাবলী

এ মেঘের কোলে, কখন ও মেঘের কোলে, কখন আকাশপ্রান্তে, কখন আকাশমধ্যে, কখনও মিটি মিটি, কখনও চাঁকি চাঁকি—

যংই। তা তোমার যদি সেই বিদ্যতেই এত মন মজেছে, ত এলে কেন? সে হ'লো বড়, আমরা হলেম ক্ষুদ্র।

বৃষ্টিবিন্দু। আ ছি! ছি! রাগ কেন? আমি কি সেই রকম? দেখ, ছেলে ছোকরা হাল্কা যারা, তারা কেহই আসিল না, আমরা জন কত ভারি লোক, থাকিতে পারিলাম না, নামিয়া আসিলাম। বিশেষ তোমাদের সঙ্গে অনেক দিন দেখা শুন্য হয় নাই।

পদ্ম। (পদকুর হইতে) উঃ, বেটা কি ভারি রে! আয় না, তোদের মত দূ লাখ্ দশ লাখ্ আয় না—আমার একটা পাতায় বসাইয়া রাখি।

বৃষ্টিবিন্দু। বাছা, আসল কথাটা ভুলে গেলে? পদকুর পদরায় কে? হে পঙ্কজে, বৃষ্টি নহিলে জগতে পাকও থাকিত না, জলও থাকিত না, তুমি ভাসিতেও পাইতে না, হাসিতেও পাইতে না। হে জলজে, তুমি আমাদের ঘরের মেয়ে, তাই আমরা তোমাকে বৃকে করিয়া পালন করি,—নহিলে তোমার এ রূপও থাকিত না, এ সুবাসও থাকিত না, এ গর্ভও থাকিত না। পাপীয়সি! জানিস্ না—তুই তোর পিতৃকুলবৈরি সেই অগ্নিপিন্ডটার অনুরাগিণী!

যংই। ছি! প্রাণাধিক! ও মাগীটার সঙ্গে কি অত কথা করিতে আছে! ওটা সকাল থেকে মূখ খুলিয়া সেই অগ্নিময় নায়কের মূখপানে চাহিয়া থাকে, সেটা যে দিকে যায়, সেই দিকে মূখ ফিরাইয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে, এর মধ্যে কত বোলতা, ভোমরা, মোমাছি আসে, তাতেও লজ্জা নাই। অমন বেহায়া জলেভাসা, ভোমরা মোমাছির আশা, কাঁটার বাসার সঙ্গে কথা করিতে আছে কি?

কৃষ্ণকলি। বলি, ও যংই, ভোমরা মোমাছির কথাটা ঘরে ঘরে নয় কি?

যংই। আপনাদের ঘরের কথা কও দিদি, আমি ত এই ফুটলাম। ভোমরা মোমাছির জ্বালা ত এখনও কিছুর জানি না।

বৃষ্টিবিন্দু। তুমিই বা কেন বাজে লোকের সঙ্গে কথা কও! যারা আপনারা কলঙ্কিনী, তারা কি তোমার মত অমল ধবল শোভা, এমন সৌরভ দেখিয়া সহ্য করিতে পারে?

পদ্ম। ভাল রে ক্ষুদ্রে! ভাল! খুব বক্তৃতা কর্চিস্! ঐ দেখ, বাতাস আসচে!

যংই। সর্বনাশ! কি বলে যে!

। তাই ত! আমার আর থাকা হইল না।

থাক না!

বৃষ্টিবিন্দু। থাকিতে পারিব না। বাতাস আমাকে ঝরাইয়া দিবে।—আমি উহার বলে পারি না।

যংই। আর একটু থাক না।

[বাতাসের প্রবেশ]

বাতাস। (বৃষ্টিবিন্দুর প্রতি) নাম্।

বৃষ্টিবিন্দু। কেন মহাশয়!

বাতাস। আমি এই অমল কমল সুশীতল সুবাসিত ফুল্লকলিকা লইয়া ক্রীড়া করিব! তুই বেটা অধঃপতিত, নীচগামী, নীচবংশ—তুই এই সুখের আসনে বসিয়া থাকিবি! নাম্!

বৃষ্টিবিন্দু। আমি আকাশ থেকে এয়েছি।

বাতাস। তুই বেটা পার্থিবযোনি—নীচগামী—খালে বিলে খানায় ডোবায় থাকিস—তুই এ আসনে? নাম্।

বৃষ্টিবিন্দু। যুথিকে! আমি তবে যাই।

যংই। থাক না।

বৃষ্টিবিন্দু। থাকিতে দেয় না যে।

যংই। থাক না—থাক না—থাক না।

বাতাস। তুই অত ঘাড় নাড়িস কেন?

যংই। তুমি সর।

বাতাস। আমি তোমাকে ধরি, সুন্দরি!

[যুথিকার সরিয়া সরিয়া পলায়নের চেষ্টা]

বৃষ্টিবিন্দু। এত গোলযোগে আর থাকিতে পারি না।

যংই। তবে আমার যা কিছু আছে, তোমাকে দিই, ধুইয়া লইয়া যাও।

বৃষ্টিবিন্দু। কি আছে?

যংই। একটু সঞ্চিত মধু—আর একটু পরিমল।

বাতাস। পরিমল আমি নিব—সেই লোভেই আমি এসেছি। দে—

[বায়ুকৃত পদ্প প্রতি বল প্রয়োগ]

যংই। (বৃষ্টিবিন্দুর প্রতি) তুমি যাও—দেখিতেছ না ডাকাত!

বৃষ্টিবিন্দু। তোমাকে ছাড়িয়া যাই কি প্রকারে! যে তাড়া দিতেছ, থাকিতেও পারি না—
যাই—যাই— [বৃষ্টিবিন্দুর ভূপতন]

টগর ও কৃষ্ণকলি। এখন, কেমন স্বর্গবাসী! আকাশ থেকে নেমে এয়েচ না? এখন মাটিতে শোষ, নরদমায় পশ, খালে বিলে ভাস—

যংই। (বাতাসের প্রতি) ছাড়! ছাড়!

বাতাস। কেন ছাড়িব? দে পরিমল দে!

যংই। হায়! কোথা গেলে তুমি অমল, কোমল, স্বচ্ছ, সুন্দর, সূর্য্যপ্রতিভাত, রসময়, জলকণা! এ হৃদয় স্নেহে ভারিয়া আবার শূন্য করিলে কেন জলকণা! একবার রূপ দেখাইয়া, স্নিগ্ধ করিয়া, কোথায় মিশিলে, কোথায় শূন্যিলে প্রাণাধিক! হায়, আমি কেন তোমার সঙ্গে গেলেম না, কেন তোমার সঙ্গে মরিলাম না! কেন অনাথ, অস্নিগ্ধ পদ্পদেহ লইয়া এ শূন্য প্রদেশে রহিলাম—

বাতাস। নে, কান্না রাখ—পরিমল দে—

যংই। ছাড়; নহিলে যে পথে আমার প্রিয় গিয়াছে, আমিও সেই পথে যাইব।

বাতাস। যাস্ যাবি, পরিমল দে।—হং হুম্!

যংই। আমি মরিব।—মরি—তবে চলিলাম।

বাতাস। হং হুম্!

[ইতি যুথিকার বৃষ্টিচ্যুতি ও ভূপতন]

বাতাস। হং! হায়! হায়!

যবনিকা পতন

EPILOGUE

প্রথম শ্রোতা। নাটককার মহাশয়! এ কি ছাই হইল?

দ্বিতীয় ঐ। তাই ত, একটা যংই ফুল নায়িকা, আর এক ফোঁটা জল নায়ক। বড় ত
Drama!

তৃতীয় ঐ। হতে পারে, কোন Moral আছে। নীতিকথা মাত্র।

চতুর্থ ঐ। না হে—এক রকম Tragedy.

পঞ্চম ঐ। Tragedy, না একটা Farce?

ষষ্ঠ ঐ। Farce না—Satire—কাহাকে লক্ষ্য করিয়া উপহাস করা হইয়াছে।

সপ্তম ঐ। তাহা নহে। ইহার গুঢ় অর্থ আছে। ইহা পরমার্থবিষয়ক কাব্য বলিয়া আমার বোধ হয়। “বাসনা” বা “তৃষ্ণা” নাম দিলেই ইহার ঠিক নাম হইত। বোধ হয়, গ্রন্থকার ততটা ফুটিতে চান না।

অষ্টম ঐ। এ একটা রূপক বটে। আমি অর্থ করিব?

প্রথম ঐ। আচ্ছা, গ্রন্থকারই বলুন না কি এটা।

গ্রন্থকার। ও সব কিছুই নহে। ইহার ইংরাজি Title দিব—

“A true and faithful account of a lamentable Tragedy which occurred in a flower-plot on the evening of the 19th July 1885, Sunday, and of which the writer was an eye-witness!”

সংযুক্তা*

১। স্বপ্ন

১
নিশীথে শুইয়া, রজত পালকে
পদ্পগন্ধি শির, রাখি রামা অঙ্কে,
দেখিয়া স্বপন, শিহরে সশঙ্কে
মহিষীর কোলে, শিহরে রায়।
চর্মকি সুন্দরী নূপে জাগাইল
বলে প্রাণনাথ, এ বা কি হইল,
লক্ষ যোধ রণে, যে না চর্মকিল
মহিষীর কোলে সে ভয় পায়!

২
উঠিয়ে নূপতি কহে মৃদু বাণী
যে দেখিন্দু স্বপ্ন, শিহরে পরাণি,
স্বর্গীয়া জননী চোহনের রাণী
বন্য হস্তী তাঁরে মারিতে ধায়।
ভয়ে ভীত প্রাণ রাজেন্দ্রঘরণী
আমার নিকটে আসিল অর্মান
বলে পুত্র রাখ, মরিল জননী
বন্যহস্তি-শুণ্ডে প্রাণ বা যায় ॥

৩
ধরি ভীম গদা মারি হস্তিতুণ্ডে,
না মানিল গদা, বাড়াইয়া শূণ্ডে,
জননীকে ধরি, উঠাইলে মৃণ্ডে;
পড়িয়া ভূমেতে বধিল প্রাণ।
কুস্বপন আজি দেখিলাম রাণি,
কি আছে বিপদ কপালে না জানি
মত্ত হস্তী আসি বধে রাজেন্দ্রাণী
আমি পুত্র নারি করিতে দ্রাণ ॥

৪
শূনিয়াছি নাকি তুরস্কের দল
আসিতেছে হেথা, লঙ্ঘি হিমাচল
কি হইবে রণে, ভাবি অমঙ্গল,
বৃষ্টি এ সামান্য স্বপন নয়।
জননীরূপেতে বৃষ্টি বা স্বদেশ,
বৃষ্টি বা তুরস্ক মত্ত হস্তী বেশ,
বার বার বৃষ্টি এইবার শেষ।
পৃথ্বীরাজ নাম বৃষ্টি না রয় ॥

৫

শূনি পতিবাণী যুড়ি দুই পাণি
জয় জয় জয়! বলে রাজরাণী
জয় জয় জয় পৃথ্বীরাজে জয়—
জয় জয় জয়! বলিল বামা।
কার সাধ্য তোমা করে পরাভব
ইন্দ্র চন্দ্র যম বরুণ বাসব!
কোথাকার ছার তুরস্ক পহুব
জয় পৃথ্বীরাজ প্রথিতনামা ॥

৬

আসে আসুক না পাঠান পামর,
আসে আসুক না আরবি বানর,
আসে আসুক না নর বা অমর!
কার সাধ্য তব শকতি সয়?
পৃথ্বীরাজ সেনা অনন্ত মণ্ডল
পৃথ্বীরাজভূজে অবিজিত বল
অক্ষয় ও শিরে কিরীট কুণ্ডল
জয় জয় পৃথ্বীরাজের জয় ॥

৭

এত বলি বামা দিল করতালি
দিল করতালি গৌরবে উছলি,
ভূষণে শিঞ্জিনী, নয়নে বিজলি
দেখিয়া হাসিল ভারতপতি।
সহসা কঙ্কণে লাগিল কঙ্কণ,
আঘাতে ভাঙ্গিয়া খসিল ভূষণ,
নাচিয়া উঠিল দক্ষিণ নয়ন,
কবি বলে তালি না দিও সতি ॥

২। রণসজ্জা

১

রণসাজে সাজে চোহানের বল,
অশ্ব গজ রথ পদাতির দল,
পতাকার রবে পবন চঞ্চল,
বাজিল বাজনা—ভীষণ নাদ।
ধূলিতে পূরিল গগনমণ্ডল,
ধূলিতে পূরিল ষমুনার জল,
ধূলিতে পূরিল অলক কুন্তল,
যথা কুলনারী গণে প্রমাদ ॥

* পৃথ্বীরাজের মহিষী—কান্যকুব্জরাজার কন্যা। টডকৃত রাজস্থানের সংযুক্তার বৃত্তান্ত দেখ।

২
দেশ দেশ হতে এলো রাজগণ
স্থানেশ্বর পদে বধিতে যবন
সঙ্গে চতুরঙ্গ সেনা অগণন—
হর হর বলে যতেক বীর।
মদবার* হতে আইল সমর‡
আব্দ হতে এলো দুরন্ত প্রমর
আর্ষ্য বীরদল ডাকে হর! হর!
উছলে কাঁপিয়া কালিন্দী-নীর॥

৩
গ্রীবা বাঁকাইয়া চলিল তুরঙ্গ
শুঁড় আছাড়িয়া চলিল মাতঙ্গ
ধনু আক্ষালিয়া— শূন্যতে আতঙ্গ—
দলে দলে দলে পদাতি চলে।
বসি বাতায়নে কনোজনন্দিনী
দেখিলা অদূরে চলিছে বাহিনী
ভারত ভরসা, ধরম রক্ষণী—
ভাসিলা সুন্দরী নয়নজলে॥

৪
সহসা পশ্চাতে দেখিল স্বামীরে,
মুঁছিল অণ্ডলে নয়নের নীরে,
যুঁড়ি দুই কর বলে “হেন বীরে
রণসাজে আমি সাজাব আজ।”
পরাইল ধনী কবচকুণ্ডল
মুকুতার দাম বক্ষে বলমল
বলসিল রত্ন কিরীট মণ্ডল
ধনু হস্তে হাসে রাজেন্দ্ররাজ ॥

৫
সাজাইয়া নাথে ষোড় করি পাণি
ভারতের রাণী কহে মৃদু বাণী
“সুখী প্রাণেশ্বর তোমায় বাখানি
এ বাহিনীপতি চলিলা রণে।
লক্ষ যোধ প্রভু তব আঞ্জাকারী,
এ রণসাগরে তুমি হে কাণ্ডারী
মথিবে সে সিন্ধু নিয়ত প্রহারি
সেনার তরঙ্গ তরঙ্গসনে ॥

৬
আমি অভাগিনী জনমি কামিনী
অবরোধে আজি রহিন্দু বন্দিনী
না হতে পেলাম তোমার সঙ্গিনী,
অর্দ্ধাঙ্গ হইয়া রহিন্দু পাছে।

যবে পশি তুমি সমর-সাগরে
খেদাইবে দূরে ঘোরির বানরে
না পাব দেখিতে, দেখিবে ত পরে,
তব বীরপনা! না রব কাছে ॥

৭
সাধ প্রাণনাথ সাধ নিজ কাজ
তুমি পৃথ্বীপতি মহা মহারাজ
হানি শত্রুশিরে বাসবের বাজ
ভারতের বীর আইস ফিরে।
নহে যদি শম্ভু হয়েন নিন্দয়
যদি হয় রণে পাঠানের জয়
না আসিও ফিরে,— দেহ যেন বয়
রণক্ষেত্রে ভাসি শত্রুরুধিরে ॥

৮
কত সুখ প্রভু, ভুঞ্জিলে জীবনে!
কি সাধ বা বাকি এ তিন ভুবনে?
নয় গেল প্রাণ, ধর্মের কারণে?
চিরদিন রহে জীবন কার?
যুগে যুগে নাথ ঘোষিবে সে যশ
গোরবে পূরিত হবে দিক্ দশ
এ কান্ত শরীর এ নব বয়স
স্বর্গ গিয়ে প্রভু পাবে আবার ॥

৯
করিলাম পণ শূন হে রাজন
নাশিয়া ঘোরীরে, জিনি এই রণ
নাহি যতক্ষণ কর আগমন,
না খাব কিছু, না করিব পান।
জয় জয় বীর জয় পৃথ্বীরাজ,
লভ পূর্ণ জয় সমরেতে আজ
যুগে যুগে প্রভু ঘোষিবে এ কাজ
হর হর শস্ত্রো কর কল্যাণ ॥

১০
হর হর হর! বম্ বম্ কালী!
বম্ বম্ বলি রাজার দুলালি,
করতালি দিল— দিল করতালি
রাজরাজপতি ফুল্ল হৃদয়।
ডাকো বামা জয় জয় পৃথ্বীরাজ
জয় জয় জয় জয় পৃথ্বীরাজ—
জয় জয় জয় জয় পৃথ্বীরাজ
কর, দুর্গে, পৃথ্বীরাজের জয় ॥

বিক্রম রচনাবলী

১১

প্রসারিয়া রাজ
কমনীয় বপু,
পড়ে অশ্রুধারা
চুম্বিল সুবাহু চন্দ্রবদনে।
স্মারি ইস্টদেবে
মহাগজপৃষ্ঠে
মহিষীর চক্ষে
কে জানে এতই জল নয়নে!

১২

লুটাইয়া পিড়ি
তবু চন্দ্রাননী
জয় জয় বলে—
জয় জয় কথা না পায় ঠাই।
কবি বলে মাতা
কাঁদে যতক্ষণ
ও কান্না রহিবে
আজিও আমরা কাঁদি সবাই ॥

৩। চিতারোহণ

১

কত দিন রাত
না খাইল অন্ন
কি হইল রণে
মুখে বলে পৃথ্বীরাজের জয়।
হেন কালে দূত
রোদন উঠিল
কেহ নারে কারে
হায় হায় শব্দ! ফাটে হৃদয় ॥

২

মহারবে যেন
উঠিল রোদন
ভারতের রবি
প্রাণ ত গেলই, গেল যে মান।
আসিছে যবন
আর যোদ্ধা নাই
পৃথ্বীরাজ বীরে
এ ঘোর বিপদে কে করে দ্রাণ ॥

৩

ভূমিশয়া তাজি
সখীজনে ডাকি
সম্মুখ সমরে
গিয়াছে চলিয়া অনন্ত স্বর্গে।
উঠে চন্দ্রাননী,
বলিল তখনি,
বীরশিরোমণি

আমিও যাইব
বৈকুণ্ঠেতে গিয়া
পূরাও রে সাধ;
সাজা মোর চিতা সজনীবর্গে ॥
সেই স্বর্গপূরে,
পূজিব প্রভুরে,
দুঃখ যাক দূরে

৪

যে বীর পিড়িল
অনন্ত মহিমা
সে নহে বিজিত;
গায়িছে তাহার অনন্ত জয়।
বল সখি সবে
জয় জয় বলি
জ্বলন্ত চিতার
বল জয় পৃথ্বীরাজের জয় ॥
সম্মুখ সমরে
তার চরাচরে
অঙ্গরে কিম্বরে,
জয় জয় বল,
চিড়ি গিয়া চল
প্রচণ্ড অনল,

৫

চন্দনের কাষ্ঠ
কুসুমের হার
রতন ভূষণ
বলে যাব আজি প্রভুর পাশে।
আয় আয় সখি,
কি হবে রহিয়ে
আয় আয় সখি
যথা প্রভু মোর বৈকুণ্ঠবাসে ॥
এলো রাশি রাশি
যোগাইল দাসী
কত পরে হাসি

৬

আরোহিলা চিতা
চন্দনের কাষ্ঠে
সুগন্ধে পূরিল
মধুর মধুর সংযুক্তা হাসে।
বলে সবে বল
জয় জয় জয়
করি জয়ধ্বনি
চলি গেলা সতী বৈকুণ্ঠবাসে ॥
কামিনীর দল
জ্বলিল অনল
গগনমণ্ডল—

৭

কবি বলে মাতা
সন্তানে ফেলিয়া
এ চিতা অনল
দাহিল ভারত
সেই চিতানল,
আর না নিবিল
দাহিল ভারত
শতাব্দী শতাব্দী শতাব্দী পরে ॥
কি কাজ করিলে
নিজে পলাইলে,
কেন বা জ্বালিলে,
ভারতের চিতা, পাঠান ডরে।
দেখিল সকলে
ভারতমণ্ডলে
তেমনি অনলে

আকাঙ্ক্ষা

(সুন্দরী)

১

কেন না হইলি তুই, যমুনার জল,
রে প্রাণবল্লভ!
কিবা দিবা কিবা রাত, কলেতে আঁচল পাতি
শুইতাম শূনিবারে, তোর মৃদুরব ॥
রে প্রাণবল্লভ!

২

কেন না হইলি তুই, যমুনাতরঙ্গ,
মোর শ্যামধন!
দিবারাতি জলে পশি, থাকিতাম কালো শশি,
করিবারে নিত্য তোর, নৃত্য দরশন ॥
ওহে শ্যামধন!

৩

কেন না হইলি তুই, মলয় পবন,
ওহে ব্রজরাজ!
আমার অঞ্চল ধরি, সতত খেলিতে হরি,
নিশ্বাসে ষাইতে মোর, হৃদয়ের মাঝ ॥
ওহে ব্রজরাজ!

৪

কেন না হইলি তুই, কাননকুসুম,
রাধাপ্রেমাধার।
না ছুঁতেম অন্য ফুলে, বাঁধিতাম তোরে চুলে,
চিকণ গাঁথিয়া মালা, পরিতাম হার ॥
মোর প্রাণাধার!

৫

কেন না হইলে তুমি, চাঁদের কিরণ,
ওহে হৃষীকেশ!
বাতায়নে বিষাদিনী, বসিতে যবে গোপিনী,
বাতায়নপথে তুমি, লভিতে প্রবেশ ॥
আমার প্রাণেশ!

৬

কেন না হইলে তুমি, চিকণ বসন,
পীতাম্বর হরি।
নীলবাস তেরাগিয়ে, তোমারে পরি কালিয়ে,
রাখিতাম যত্ন করো হৃদয় উপরি ॥
পীতাম্বর হরি!

৭

কেন না হইলে শ্যাম, যেখানে যা আছে,
সংসারে সুন্দর।
ফিরাতেম আঁখি যথা, দেখিতে পেতেম তথা,
মনোহর এ সংসারে, রাধামনোহর।
শ্যামল সুন্দর!

(সুন্দর)

১

কেন না হইনু আমি, কপালের দোষে,
যমুনার জল।
লইয়া কম কলসী, সে জল মাঝারে পশি,
হাসিয়া ফুটিত আসি, রাধিকা-কমল—
যৌবনেতে চল চল ॥

২

কেন না হইনু আমি, তোমার তরঙ্গ,
তপননন্দিনি!
রাধিকা আসিলে জলে, নাচিয়া হিল্লোল ছলে,
দোলাতাম দেহ তার, নবীন নলিনী—
যমুনাজলহংসিনী ॥

৩

কেন না হইনু আমি, তোর অনুরূপী,
মলয় পবন!
ভ্রমিতাম কুতূহলে, রাধার কুস্তল দলে,
কহিতাম কানে কানে, প্রণয় বচন—
সে আমার প্রাণধন ॥

৪

কেন না হইনু হায়! কুসুমের দাম,
কণ্ঠের ভূষণ।
এক নিশা স্বর্গ সুখে, বঞ্চিতা রাধার বৃকে,
তাজিতাম নিশি গেলে জীবন যাতন—
মেখে শ্রীঅঙ্গচন্দন ॥

৫

কেন না হইনু আমি, চন্দ্রকরলেখা,
রাধার বরণ।
রাধার শরীরে থেকে, রাধারে ঢাকিয়ে রেখে,
ভুলাতাম রাধারূপে, অন্যজনমন—
পর ভুলান কেমন?

৬

কেন না হইনু আমি চিকণ বসন,
দেহ আবরণ।
তোমার অঙ্গেতে থেকে, অঙ্গের চন্দন মেখে,
অঞ্চল হইয়ে দলে, ছুঁতেম চরণ,—
চুম্বি ও চাঁদবদন ॥

বিশ্বকম্ব রচনাবলী

৭

কেন না হইনু আমি, যেখানে যা আছে,
সংসারে সুন্দর।
কে হতে না অভিলাষে, রাধা যাহা ভালবাসে,
কে মোহিতে নাহি চাহে, রাধার অন্তর—
প্রেম-সুখরসাকর?

অধঃপতন সঙ্গীত

১

বাগানে যাবি রে ভাই? চল সবে মিলে যাই,
যথা হুম্ম্য সুশোভন, সরোবরতীরে।
যথা ফুটে পাঁতি পাঁতি, গোলাব মল্লিকা জাঁতি,
বিগ্নোনিয়া লতা দোলে মৃদুল সমীরে ॥
নারিকেল বৃক্ষরাজ, চাঁদের কিরণে সাজ,
নাচিছে দোলায়ে মাথা ঠমকে ঠমকে।
চন্দ্রকরলেখা তাহে, বিজলি চমকে ॥

২

চল যথা কুঞ্জবনে, নাচিবে নাগরীগণে,
রাজা সাজ পেসোয়াজ, পরিশিবে অঙ্গে।
তম্বুরা তবলা চাটি, আবেশে কাঁপবে মাটি,
সারঙ্গ তরঙ্গ তুলি, সুদর দিবে সঙ্গে ॥
খিনি খিনি খিনি খিনি, ঝিনিকি ঝিনিকি ঝিনি
তান্ধিম্ তান্ধিম্ তেরে গাও না বাজনা!
চমকে চাহনি চারু, বলকে গহনা ॥

৩

ঘরে আছে পদ্মমুখী কভু না করিল সুখী,
শুধু ভাল বাসা নিয়ে, কি হবে সংসারে।
নাহি জানে নৃত্যগীত, ইয়ার্কিতে নাহি চিত,
একা বসি ভাল বাসা ভাল লাগে কারে?
গৃহধর্ম্মে রাখে মন, হিত ভাবে অনুক্ষণ,
সে বিনা দুঃখের দিনে অন্য গতি নাই!
এ হেন সুখের দিনে, তারে নাহি চাই ॥

৪

আছে ধন গৃহপূর্ণ, যৌবন যাইবে তুর্ণ,
যদি না ভুঞ্জিনু সুখ, কি কাজ জীবনে?
ঠুসে মদ্য লও সাতে, যেন না ফুরায় রাতে,
সুখের নিশান গাঢ় প্রমোদভবনে।
খাদ্য লও বাছা বাছা, দাড়ি দেখে লও চাচা,
চপ্ সুপ করি কোম্মা, করিবে বিচিহ্ন।
বাজালির দেহ রঙ্গ, ইহাতে করিও ষঙ্গ,
সহস্র পাদুকা স্পর্শে, হয়েছে পবিত্র।
পেটে খায় পিঠে সন্ন, আমার চরিত্র ॥

৫

বন্দে মাতা সুরধ্বনি, কাগজে মহিমা শ্বনি,
বোতলবাহিনি পুণ্যে একশ নন্দিনি!
করি ঢক ঢক নাদ, পুরাও ভকতসাধ,
লোহিতবরণি বামা, তারেতে বন্দিনি!
প্রণমামি মহানীরে, ছিপি়র কিরীটি শিরে,
উঠ শিরে ধীরে ধীরে যকুৎজননি!
তোমার কৃপার জন্য, যেই পড়ে সেই ধন্য
শয্যায় পতিত রাখ, পতিতপাবনি!
বাক্স বাহনে চল, ডজন ডজন ॥

৬

কি ছার সংসারে আছি, বিষয় অরণ্যে মাছি,
মিছা করি ভন্ডন্ড চাকরি কাঁটালে।
মারে জুতা সই সুখে, লম্বা কথা বলি মুখে,
উচ্চ করি ঘৃষ তুলি দেখিলে কাঙ্গালে ॥
শিখিয়াছি লেখা পড়া, ঠান্ডা দেখে হই কড়া,
কথা কই চড়া চড়া, ভিখারি ফকিরে।
দেখ ভাই রোখ কত, বাঙ্গালি শরীরে!

৭

পূর পাত্র মদ্য ঢালি, দাও সবে করতালি,
কেন তুমি দাও গালি, কি দোষ আমার?
দেশের মঙ্গল চাও? কিসে তার হৃদি পাও?
লেক্চরে কাগজে বলি, কর দেশোদ্ধার ॥
ইংরেজের নিন্দা করি, আইনের দোষ ধরি,
সম্বাদ পত্রিকা পড়ি, লিখি কভু তায়।
আর কি করিব বল স্বদেশের দায়?

৮

করেছি ডিউটির কাজ, বাজা ভাই পাখোয়াজ,
কামিনি, গোলাপি সাজ, ভাসি আজ রঙ্গে।
গেলাস পূরে দে মদে, দে দে দে আরো আরো দে,
দে দে এরে দে ওরে দে, ছাড়ি দে সারঙ্গে।
কোথায় ফুলের মালা, আইস্ দে না? ভাল জ্বালা,
“বংশী বাজায় চিকণ কালা?” সুদর দাও সঙ্গে।
ইন্দ্র স্বর্গে খায় সুধা, স্বর্গ ছাড়া কি বসুধা?
কত স্বর্গ বাঙ্গালায় মদের তরঙ্গে।
টলমল বসুধারা ভবানী হ্রুভঙ্গে ॥

৯

যে ভাবে দেহের হিত, না বৃষ্টি তাহার চিত,
আত্মহিত ছেড়ে কেবা, পরহিতে চলে?
না জানি দেশ বা কার? দেশে কার উপকার?
আমার কি লাভ বল, দেশ ভাল হলে?
আপনার হিত করি, এত শক্তি নাহি ধরি,
দেশহিত করিব কি, একা ক্ষুদ্র প্রাণী।
ঢাল মদ! তামাক দে! লাও ব্রান্ড পানি ॥

১০

মনুষ্যত্ব? কাকে বলে? স্পিচ দিই টোনহলে,
লোকে আসে দলে দলে, শূনে পায় প্রীতি।
নাটক নবেল কত, লিখিয়াছে শত শত,
এ কি নয় মনুষ্যত্ব? নয় দেশহিত?
ইংরেজি বাঙ্গালা ফেঁদে, পলিটিক্‌স লিখি কেঁদে,
পদ্য লিখি নানা ছাঁদে, বেচি সস্তা দরে।
অশিষ্টে অথবা শিষ্টে, গালি দিই অষ্টে পৃষ্ঠে,
তবু বল দেশহিত কিছুর নাহি করে?
নিপাত যাউক দেশ! দেখি বসে ঘরে॥

১১

হাঁ! চামেলি ফুলচম্পা! মধুর অধর কম্পা!
হাম্বীর কেদার ছায়ানট সন্মধুর!
হুক্কানা না দরস্ত বোলে! শের মে ফুল না ডোলে!
পিয়ালা ভর দে মদঝে! রঙ্ ভরপদুর!
সদপ্ চপ্ কটলেট, আন বাবা প্লেট প্লেট,
কুক্ বেটা ফাষ্টিরেট, যত পার খাও!
মাথামুণ্ড পেটে দিয়ে, পড় বাপু জমি নিয়ে,
জনমি বাঙ্গালিকুলে, সুখ করো যাও।
পতিতপার্বনি সুরে, পতিতে তরাও॥

১২

যাব ভাই অধঃপাতে, কে যাইবি আয় সাতে,
কি কাজ বাঙ্গালি নাম, রেখে ভূমণ্ডলে?
লেখাপড়া ভস্ম ছাই, কে কবে শিখেছে ভাই
লইয়া বাঙ্গালি দেহ, এই বঙ্গস্থলে?
হংসপুচ্ছ লয়ে করে, কেরাণির কাজ করে,
মুন্সেফ চাপরাশি আর ডিপুটী পিয়াদা।
অথবা স্বাধীন হয়ে, ওকালতি পাশ লয়ে,
খোশামুদি জুয়াচুরি, শিখিছে জিয়াদা!
সার কথা বলি ভাই, বাঙ্গালিতে কাজ নাই,
কি কাজ সাধিব মোরা, এ সংসারে থাকি,
মনোবৃত্তি আছে যাহা, ইন্দ্রিয় সাগরে তাহা
বিসর্জন করিয়াছি, কিবা আছে বাকি?
কেন দেহভার বয়ে, যমে দাও ফাঁকি?

১৩

ধর তবে গ্রাস আঁটি, জ্বলন্ত বিষের বাটি
শূন তবলার চাঁটি, বাজে খন্ খন্।
নাচে বিবি নানা ছন্দ, সুন্দর খামিরা গন্ধ,
গস্তীর জীমুতমন্দ হুককার গঞ্জমি॥
সেজে এসো সবে ভাই, চল অধঃপাতে যাই,
অধম বাঙ্গালি হতে, হবে কোন কাজ?
ধরিতে মনুষ্যদেহ, নাহি করে লাজ?

১৪

মর্কটের অবতার, রূপগুণ সব তার
বাঙ্গালির অধিকার, বাঙ্গালি ভূষণ!
হা ধরণি, কোন্ পাপে, কোন্ বিধাতার শাপে
হেন পদ্রগণ গর্ভে, করিলে ধারণ?
বঙ্গদেশ ডুবাবারে, মেঘে কিম্বা পারাবারে,
ছিল না কি জলরাশি? কে শোষিল নীরে?
আপনা ধবংসিতে রাগে কতই শক্তি লাগে?
নাহি কি শক্তি তত বাঙ্গালি শরীরে?
কেন আর জ্বলে আলো বঙ্গের মন্দিরে?

১৫

মরিবে না? এসো তবে, উন্নতি সাধিয়া সবে,
লভি নাম পৃথিবীতে, পিতৃ সমতুল!
ছাড়ি দেহ খেলা ধলা, ভাঙ বাদ্যভাণ্ডগুলা
মারি খেদাইয়া দাও, নর্তকীর কুল।
মারিয়া লাঠির বাড়ি, বোতল ভাঙ্গহ পাড়ি,
বাগান ভাঙ্গিয়া ফেল পুকুরের তলে।
সুখ নামে দিয়ে ছাই, দুঃখ সার কর ভাই,
কভু না মর্দিবে কেহ, নয়নের জলে,
যত দিন বাঙ্গালিকে লোকে ছি ছি বলে॥

সাবিত্রী

১

তমিস্রা রজনী ব্যাপিল ধরণী,
দেখি মনে মনে পরমাদ গণি,
বনে একাকিনী বসিলা রমণী
কোলেতে করিয়া স্বামীর দেহ।
আঁধার গগন ভুবন আঁধার,
অন্ধকার গিরি বিকট আকার,
দুর্গম কান্তার ঘোর অন্ধকার,
চলে না ফেরে না নড়ে না কেহ॥

২

কে শূনেছে হেথা মানবের রব?
কেবল গরজে হিংস্র পশু সব,
কখন খসিছে বৃক্ষের পল্লব,
কখন বসিছে পাখী শাখায়।
ভয়েতে সুন্দরী বনে একেশ্বরী,
কোলে আরও টানে পতিদেহ ধরি,
পরশে অধর অনুভব করি,
নীরবে কাঁদিয়া চুম্বিছে তার॥

বিক্রম রচনাবলী

৩

হেরে আচম্বিতে এ ঘোর সঙ্কটে,
ভয়ঙ্কর ছায়া আকাশের পটে,
ছিল যত তারা তাহার নিকটে
ক্রমে স্তান হয়ে গেল নিবিয়া।
সে ছায়া পশিল কাননে,—অমনি,
পলায় স্বাপদ উঠে পদধ্বনি,
বৃক্ষশাখা কত ভাঙ্গিল আপনি,
সতী ধরে শবে বৃকে আঁটিয়া ॥

৪

সহসা উজলি ঘোর বনস্থলী,
মহাগদাপ্রভা, যেন বা বিজলি,
দেখিলা সাবিত্রী যেন রত্নাবলী,
ভাসিল নিঝরে আলোক তার।
মহাগদা দেখি প্রণামিলা সতী,
জানিল কৃতান্ত পরলোকপতি,
এ ভীষণা ছায়া তাহারই মূর্তি,
ভাগ্যে যাহা থাকে হবে এবার ॥

৫

গভীর নিম্বনে কহিলা শমন,
থর থর করি কাঁপিল গহন,
পর্ষতগহ্বরে ধ্বনিল বচন,
চমকিল পশু বিবর মাঝে।
“কেন একাকিনী মানবনন্দিনী,
শব লয়ে কোলে ষাপিছ ষামিনী,
ছাড়ি দেহ শবে; তুমি ত অধীনী,
মম সঙ্গে তব বাদ কি সাজে ॥

৬

“এ সংসারে কাল বিরামবিহীন,
নিয়মের রথে ফিরে রাহি দিন,
যাহারে পরশে সে মম অধীন,
স্থাবর জঙ্গম জীব সবাই।
সত্যবানে আসি কাল পরশিল,
লতে তারে মম কিঙ্কর আসিল,
সাধবী অঙ্গ ছুঁয়ে লইতে নারিল,
আপনি লইতে এসেছি তাই ॥”

৭

সব হলো বৃথা না শুনিল কথা,
না ছাড়ে সাবিত্রী শবের মমতা,
নারে পরশিতে সাধবী পতিব্রতা,
অধর্মের ভয়ে ধর্মের পতি।
তখন কৃতান্ত কহে আর বার,
“অনিত্য জানিও এ ছার সংসার,
স্বামী পুত্র বন্ধু নহে কেহ কার,
আমার আলয়ে সবার গতি ॥

৮

“রত্নছত্র শিরে রত্নভূষা অঙ্গে,
রত্নাসনে বসি মহিষীর সঙ্গে,
ভাসে মহারাজা সুখের তরঙ্গে,
আঁধারিয়া রাজ্য লই তাহারে।
বীরদর্প ভাঙ্গি লই মহাবীরে,
রূপ নষ্ট করি লই রূপসীরে,
জ্ঞান লোপ করি গরাসি জ্ঞানীরে,
সুখ আছে শুধু মম আগারে ॥

৯

“অনিত্য সংসার পুণ্য কর সার,
কর নিজ কর্ম নিয়ত যে যার,
দেহান্তে সবার হইবে বিচার,
দিই আমি সবে করমফল।
যত দিন সতী তব আয়ু আছে,
করি পুণ্য কর্ম এসো স্বামী পাছে—
অনন্ত যুগান্ত হবে কাছে কাছে,
ভূঞ্জবে অনন্ত মহা মঙ্গল ॥

১০

“অনন্ত বসন্তে তথা অনন্ত যৌবন,
অনন্ত প্রণয়ে তথা অনন্ত মিলন,
অনন্ত সৌন্দর্যে হয় অনন্ত দর্শন,
অনন্ত বাসনা, তৃপ্তি অনন্ত।
দম্পতি আছয়ে, নাহি বৈধব্য-ঘটনা,
মিলন আছয়ে, নাহি বিচ্ছেদযন্ত্রণা,
প্রণয় আছয়ে, নাহি কলহ গঞ্জনা,
রূপ আছে, নাহি রিপু দুরন্ত ॥

১১

“রবি তথা আলো করে, না করে দাহন,
নিশি স্নিগ্ধকরী, নহে তিমির কারণ,
মৃদু গন্ধবহ ভিন্ন নাহিক পবন,
কলা নাহি চাঁদে, নাহি কলঙ্ক।
নাহিক কণ্টক তথা কুসুম রতনে,
নাহিক তরঙ্গ স্বচ্ছ কল্লোলিনীগণে,
নাহিক অর্শনি তথা সুবর্ণের ঘনে,
পঙ্কজ সরসে নাহিক পঙ্ক ॥

১২

“নাহি তথা মায়াবশে বৃথায় রোদন,
নাহি তথা ভ্রান্তিবশে বৃথায় মনন,
নাহি তথা রিপুবশে বৃথায় যতন,
নাহি শ্রমলেশ, নাহি অলস।
ক্ষুধা তৃষ্ণা তন্দ্রা নিদ্রা শরীরে না রয়,
নারী তথা প্রণয়িনী বিলাসিনী নয়,
দেবের কুপায় দিব্য জ্ঞানের উদয়,
দিব্য নেত্রে নিরখে দিক্ দশ ॥

১০

“জগতে জগতে দেখে পরমাণুদ্রাশি,
মিলিছে ভাসিছে পুনঃ ঘুরিতেছে আসি,
লক্ষ লক্ষ বিশ্ব গাড়ি ফেলিছে বিনাশি,
অচিন্ত্য অনন্ত কালতরঙ্গে।
দেখে লক্ষ কোটী ভানু অনন্ত গগনে,
বোড়ি তাহে কোটী কোটী ফিরে গ্রহগণে,
অনন্ত বর্তন রব শূন্যে শ্রবণে,
মাতিছে চিত্ত সে গীতের সঙ্গে ॥

১৪

“দেখে কৰ্মক্ষেত্রে নর কত দলে দলে,
নিয়মের জালে বাঁধা ঘুরিছে সকলে,
ভ্রমে পিপীলিকা যেন নেমীর মণ্ডলে,
নির্দিষ্ট দূরতা লিখিতে পারে।
ক্ষণকাল তরে সবে ভবে দেখা দিয়া,
জলে যেন জলবিম্ব যেতেছে মিশিয়া,
পুণ্যবলে পুণ্যধামে মিলিছে আসিয়া,
পুণ্যই সত্য অসত্য সংসারে ॥

১৫

“তাই বলি কন্যে, ছাড়ি দেহ মায়া,
তাজ বৃথা ক্ষোভ; তাজ পতিকায়,
ধর্ম আচরণে হও তার জায়া,
গিয়া পুণ্যধাম।
গৃহে যাও তাজি কানন বিশাল
থাক যত দিন না পরশে কাল,
কালের পরশে মিটিবে জঞ্জাল,
সিদ্ধ হবে কাম ॥”

১৬

শূনি যমবাণী জোড় করি পাণি,
ছাড়ি দিয়া শবে, তুলি মূখখানি,
ডাকিছে সাবিটী:—“কোথায় না জানি,
কোথা ওহে কাল।
দেখা দিয়া রাখ এ দাসীর প্রাণ,
কোথা গেলে পাব কালের সন্ধান,
পরশিয়ে কর এ সঙ্কটে দ্রাণ,
মিটাও জঞ্জাল ॥

১৭

“স্বামিপদ যদি সেবে থাকি আমি,
কায় মনে যদি পূজে থাকি স্বামী,
যদি থাকে বিশ্বে কেহ অন্তর্ভাগী,
রাখ মোর কথা।
সতীত্বে যদি থাকে পুণ্যফল,
সতীত্বে যদি থাকে কোন বল,
পরশি আমারে, দিয়ে পদে স্থল,
জুড়াও এ ব্যথা ॥”

১৮

নিয়মের রথ ঘোষিল ভীষণ,
আসি প্রবেশিল সে ভীম কানন,
পরশিল কাল সতীত্ব রতন,
সাবিটী সুন্দরী।
মহাগদা তবে চমকে তিমিরে,
শবপদরেণু তুলি লয়ে শিরে,
ত্যজে প্রাণ সতী অতি ধীরে ধীরে
পতি কোলে করি ॥

১৯

বরষিল পুষ্প অমরের দলে,
সুগন্ধি পবন বাহিল ভূতলে,
তুলিল কৃতান্ত শরীরিষদুগলে,
বিচিত্র বিমানে।
জনমিল তথা দিব্য তরুবর,
সুগন্ধি কুসুম শোভে নিরন্তর,
বোড়িল তাহাতে লতা মনোহর,
সে বিজন স্থানে ॥

আদর

১

মরুভূমি মাঝে যেন, একই কুসুম,
পূর্ণিত সুবাসে।
বরষার রাতে যেন, একই নক্ষত্র,
আঁধার আকাশে ॥
নিদাঘ সস্তাপে যেন, একই সরসী,
বিশাল প্রান্তরে।
রতন শোভিত যেন, একই তরণী,
অনন্ত সাগরে।
তেমনি আমার তুমি, প্রিয়ে, সংসার-ভিতরে ॥

২

চিরদারিদ্রের যেন, একই রতন,
অমূল্য, অতুল।
চিরবিরহীর যেন, দিনেক মিলন,
বিধি অনুকূল ॥
চিরবিদেশীর যেন, একই বাস্তু,
স্বদেশ হইতে।
চিরবিধবার যেন, একই স্বপন,
পতির পীরিতে।
তেমনি আমার তুমি, প্রার্থিকে, এ মহীতে ॥

বিক্রম রচনাবলী

৩

সদৃশীতল ছায়া তুমি, নিদাঘ সস্তাপে,
রম্য বৃক্ষতলে।
শীতের আগুন তুমি, তুমি মোর ছত্র,
বরষার জলে ॥
বসন্তের ফুল তুমি, তিরপিত আঁখি,
রূপের প্রকাশে।
শরতের চাঁদ তুমি, চাঁদবদনি লো,
আমার আকাশে।
কৌমুদীমধুর হাসি, দৃখের তিমির নাশে ॥

৪

অঙ্গের চন্দন তুমি, পাথার ব্যঞ্জন,
কুসুমের বাস।
নয়নের তারা তুমি, শ্রবণেতে শ্রুতি,
দেহের নিশ্বাস ॥
মনের আনন্দ তুমি, নিদ্রার স্বপন,
জাগ্রতে বাসনা।
সংসার সহায় তুমি, সংসার-বন্ধন,
বিপদে সান্ধনা।
তোমারি লাগিয়ে সই, ঘোর সংসার-ষাতনা ॥

বায়ু

১

জন্ম মম সূর্য্য-তেজে, আকাশ মন্ডলে।
যথা ডাকে মেঘরাশি,
হাসিয়া বিকট হাসি,
বিজলি উজলে ॥
কেবা মম সম বলে,
হৃদহৃৎকার করি যবে, নামি রণস্থলে।
কানন ফেলি উপাড়ি,
গুঁড়াইয়া ফেলি বাড়ী,
হাসিয়া ভাঙ্গিয়া পাড়ি,
অটল অচলে।
হাহাকার শব্দ তুলি এ সুখ অবনীতলে ॥

পর্ব্বতশিখরে নাচি, বিষম তরসে,
মাতিয়া মেঘের সনে,
পিঠে করি বহি ঘনে,
সে ঘন বরষে।
হাসে দামিনী সে রসে।
মহাশব্দে হ্রীড়া করি, সাগর উরসে ॥

৯৫২

মথিয়া অনন্ত জলে,
সফেন তরঙ্গদলে,
ভাঙ্গি তুলে নভস্থলে,
ব্যাপি দিগ্‌দশে।
শীকরে আঁধারি জগৎ, ভাসাই দেশ অলসে ॥

৩

বসন্তে নবীন লতা, ফুল দোলে তায়।
যেন বায়ু সে বা নহি,
অতি মৃদু মৃদু বহি,
প্রবেশি তথায় ॥
হেসে মরি যে লজ্জায়—
পুষ্পগন্ধ চুরি করি, মাখি নিজ গায় ॥
সরোবরে স্নান করি,
যাই যথায় সুন্দরী,
বসে বাতায়নোপরি,
গ্রীষ্মের জ্বালায় ॥
তাহার অলকা ধরি,
মুখ চুম্বি ঘর্ম্ম হরি,
অঞ্চল চঞ্চল করি,
শ্লিষ্ণ করি কায় ॥
আমার সমান কেবা যুবতীমন ভূলায় ?

৪

বেগুখণ্ড মধ্যে থাকি, বাজাই বাঁশরী।
রঞ্ধে রঞ্ধে যাই আসি,
আমিই মোহন বাঁশী,
সুরের লহরী ॥
আর কার গুণে হরি,
ভুলাইত বৃন্দাবনে, বৃন্দাবনেশ্বরী ?
চল চল চল চল,
চঞ্চল যমুনা জল,
নিশীথ ফুলে উজল,
কানন বল্লরী,
তার মাঝে বাজিতাম বংশীনাদ রূপ ধরি ॥

৫

জীবকণ্ঠে যাই আসি, আমি কণ্ঠস্বর !
আমি বাক্য, ভাষা আমি,
সাহিত্য বিজ্ঞান স্বামী,
মহীর ভিতর ॥

সিংহের কণ্ঠেতে আমিই হৃৎকার
ঋষির কণ্ঠেতে আমিই ওৎকার,
গায়ককণ্ঠেতে আমিই বাৎকার,
বিশ্ব-মনোহর ॥

আমিই রাগিণী আমি ছয় রাগ,
কামিনীর মূখে আমিই সোহাগ,
বালকের বাণী অমৃতের ভাগ,
মম রূপান্তর ॥

গুণ গুণ রবে ভ্রময়ে ভ্রমর,
কোকিল কুহরে বৃষ্কের উপর,
কলহংস নাদে সরসী ভিতর,
আমারি কিৎকর ॥

আমি হাসি আমি কান্না, স্বররূপে শাসি নর ॥

৬

কে বাঁচিত এ সংসারে, আমার বিহনে?
আমি না থাকিলে ভুবনে?
আমিই জীবের প্রাণ,
দেহে করি অধিষ্ঠান,
নিশ্বাস বহনে।

উড়াই খগে গগনে।*

দেশে দেশে লয়ে যাই, বহি যত ঘনে।
আনিয়া সাগরনীরে,
ঢালে তারা গিরিশিরে,
সিক্ত করি পৃথিবীরে,
বেড়ায় গগনে।

মম সম দোষে গুণে, দেখেছ কি কোন জনে?

৭

মহাবীর দেব অগ্নি জ্বালি সে অনলে।
আমিই জ্বালাই যাঁরে,
আমিই নিবাই তাঁরে,
আপনার বলে।
মহাবলে বলী আমি, মল্খন করি সাগর।
রসে সুদরসিক আমি, কুসুমকুলনাগর ॥
শিহরে পরশে মম কুলের কামিনী।
মজাইনু বাঁশী হয়ে, গোপের গোপিনী ॥
বাক্যরূপে জ্ঞান আমি স্বররূপে গীত।
আমারি কৃপায় ব্যক্ত ভক্তি দস্ত প্রীত ॥
প্রাণবায়ুরূপে আমি রক্ষা করি জীবগণ।
হৃদ হৃদ! মম সম গুণবান্ আছে কোন জন?

আকবর শাহের খোষ রোজ

১

রাজপদুরী মাঝে কি সুন্দর আজি
বসেছে বাজার, রসের ঠাট।
রমণীতে বেচে রমণীতে কিনে
লেগেছে রমণীরূপের হাট ॥
বিশালা সে পদুরী নবমীর চাঁদ,
লাখে লাখে দীপ উজলি জ্বলে।
দোকানে দোকানে কুলবালাগণে
খরিদার ডাকে, হাসিয়া ছলে ॥
ফুলের তোরণ, ফুল আবরণ

ফুলের স্তম্ভেতে ফুলের মালা।

ফুলের দোকান, ফুলের নিশান,
ফুলের বিছানা ফুলের ডালা ॥

লহরে লহরে ছুটিছে গোলাব,
উঠিছে ফুয়ারা জ্বলিছে জল।

তাঁধনি তাঁধনি নাচিতেছে নটী,
গায়িছে মধুর গায়িকা দল ॥

রাজপদুরী মাঝে লেগেছে বাজার,
বড় গুলজার সরস ঠাট।

রমণীতে বেচে রমণীতে কিনে
লেগেছে রমণীরূপের হাট ॥

কত বা সুন্দরী, রাজার দুলালী,
ওমরাহজায়া, আমীরজাদী।

নয়নেতে জ্বালা, অধরেতে হাসি,
অঙ্গেতে ভূষণ মধুর-নাদী ॥

হীরা মতি চুণি বসন ভূষণ
কেহ বা বোঁচিছে কেনে বা কেউ।

কেহ বেচে কথা নয়ন ঠারিয়ে
কেহ কিনে হাসি রসের ঢেউ ॥

কেহ বলে সখি এ রতন বোঁচি
হেন মহাজন এখানে কই?

সুপদুরুষ পেলে আপনা বোঁচিয়ে
বিনামূলে কেনা হইয়া রই ॥

কেহ বলে সখি পদুরুষ দরিদ্র
কি দিয়ে কিনিবে রমণীমণি।

চারি কড়া দিয়ে পদুরুষ কিনিয়ে
গৃহেতে বাঁধিয়ে রেখ লো ধনি ॥

পিঞ্জরেতে পদুরি, খেতে দিও ছোলা,
সোহাগ শিকলি বাঁধিও পায়।

অবোধ বিহঙ্গ পড়িবে আটক
তালি দিয়ে ধনি, নাচায়ো তায় ॥

* Vide Reign of Law, by Duke of Argyll, Chap. VII. Flight of Birds.

বিক্রম রচনাবলী

২

এক চন্দ্রাননী, মরাল-গামিনী,
সে রসের হাটে ভ্রমিছে একা।
কিছদ্ নাহি বেচে কিছদ্ নাহি কিনে,
কাহার(ও) সহিত না করে দেখা ॥
প্রভাত-নক্ষত্র জিনিয়া রূপসী,
দিশাহারা যেন বাজারে ফিরে।
কাণ্ডারী বিহনে তরণী যেন বা
ভাসিয়া বেড়ায় সাগরনীরে ॥
রাজার দুলালী রাজপদতবালা
চিতোরসম্ভবা কমলকলি।
পতির আদেশে আসিয়াছে হেথা,
সুখের বাজার দেখিবে বলি ॥
দেখে শুনে বামা সুখী না হইল—
বলে ছি ছি এ কি লেগেছে ঠাট।
কুলনারীগণে, বিকাইতে লাজ
বসিয়াছে ফেঁদে রসের হাট!
ফিরে যাই ঘরে কি করিব একা
এ রঙ্গসাগরে সাঁতার দিয়ে?
এত বলি সতী ধীরি ধীরি ধীরি
নির্গমের দ্বারে গেল চলিয়ে ॥
নির্গমের পথ অতি সে কুটিল,
পেঁচে পেঁচে ফিরে, না পায় দিশে।
হায় কি করিন্দু বলিয়ে কাঁদিল,
এখন বাহির হইব কিসে?
না জানি বাদশা কি কল করিল
ধরিতে পিঞ্জরে, কুলের নারী।
না পায় ফিরিতে নারে বাহিরিতে
নয়নকমলে বহিল বারি ॥

৩

সহসা দেখিল সমুখে সুন্দরী
বিশাল উরস পদরুশ বীর।
রতনের মালা দুর্লিতেছে গলে
মাথায় রতন জ্বলিছে স্থির ॥
ষোড় করি কর, তারে বিনোদিনী
বলে মহাশয় কর গো গ্রাণ।
না পাই যে পথ পড়েছি বিপদে
দেখাইয়ে পথ, রাখ হে প্রাণ ॥
বলে সে পদরুশ অমিয় বচনে
আহা মরি, হেন না দেখি রূপ।
এসো এসো ধনি আমার সঙ্কেতে
আমি আকস্মিক—ভারত-ভূপ ॥

সহস্র রমণী রাজার দুলালী
মম আজ্ঞাকারী, চরণ সেবে।
তোমা সমা রূপে নহে কোন জন,
তব আজ্ঞাকারী আমি হে এবে ॥
চল চল ধনি আমার মন্দিরে
আজি খোষ রোজ সুখের দিন।
এ ভারত ভূমে কি আছে কামনা
বলিও আমারে, শোখিব ঋণ ॥
এত বলি তবে রাজরাজপতি
বলে মোহিনীকে ধরিল করে।
যুথপতি বল সে ভুজবিটপে
টুটিল কঙ্কণ তাহার ভরে ॥
শুকাল বামার বদন-নলিনী
ডাকে গ্রাহি গ্রাহি গ্রাহি মে দুর্গে।
গ্রাহি গ্রাহি গ্রাহি বাঁচাও জননি!
গ্রাহি গ্রাহি গ্রাহি গ্রাহি মে দুর্গে ॥
ডাকে কালি কালি ভৈরবি করালি
কৌষিকি কপালি কর মা গ্রাণ।
অপর্ণে অম্বিকে চামুণ্ডে চাঁড়কে
বিপদে বালিকে হারায় প্রাণ ॥
মানুষের সাধ্য নহে গো জননি
এ ঘোর বিপদে রক্ষিতে লাজ।
সমর-রঙ্গিণি অসদুর-ঘাতিনি
এ অসদুরে নাশি, বাঁচাও আজ ॥

৪

বহুল পদ্যোতে অনন্ত শূন্যোতে
দেখিল রমণী, জ্বলিছে আলো।
হাসিছে রূপসী নবীনা ষোড়শী
মৃগেন্দ্র বাহনে, মূর্তি কালো ॥
নরমুণ্ডমালা দুর্লিতেছে উরসে
বিজলি ঝলসে লোচন তিনে।
দেখা দিয়া মাতা দিতেছে অভয়
দেবতা সহায় সহায়হীনে ॥
আকাশের পটে নগেন্দ্র-নন্দিনী
দেখিয়া যুবতী প্রফুল্ল মুখ।
হৃদি সরোবর পদুলকে উছলে
সাহসে ভরিল, নারীর বুক ॥
তুলিয়া মস্তক গ্রীবা হেলাইল
দাঁড়াইল ধনী ভীষণ রাগে।
নয়নে অনল অধরেতে ঘৃণা
বলিতে লাগিল নৃপের আগে ॥
ছিছি ছিছি ছিছি তুমি হে সন্ন্যাসী,
এই কি তোমার রাজধরম।
কুলবধু ছলে গৃহেতে আনিয়া
বলে ধর তারে নাহি শরম ॥

আকবর শাহের খোষ রোজ

বহু রাজ্য তুমি বলেতে লুটিলে,
বহু বীর নাশি বলাও বীর।
বীরপণা আজি দেখাতে এসেছ
রমণীর চক্ষে বহায়ে নীর?
পরবাহুবলে পররাজ্য হর,
পরনারী হর করিয়ে চুরি।
আজি নারী হাতে হারাবে জীবন
ঘুচাইব যশ মারিয়ে ছুরি॥
জয়মল্ল বীরে ছলেতে বধিলে
ছলেতে লুটিলে চারু চিতোর।
নারীপদাঘাতে আজি ঘুচাইব
তব বীরপণা, ধরম চোর!
এত বলি বামা হাত ছাড়াইল
বলেতে ধরিল রাজার অসি।
কাড়িয়া লইয়া, অসি ঘুরাইয়া,
মারিতে তুলিল, নবরূপসী॥
ধন্য ধন্য বলি রাজা বাখানিল
এমন কখন দেখিনে নারী।
মানিতোছি ঘাট ধন্য সতী তুমি
রাখ তরবারি; মানিন্দু হারি॥

৫

হাসিয়া রূপসী নামাইল অসি,
বলে মহারাজ, এ বড় রস।
রমণীর রণে হারি মান তুমি
পৃথিবীপতির বাড়িল যশ॥
দুলায়ে কুণ্ডল, অধরে অণ্ডল,
হাসে খল খল, ঈষৎ হেলে।
বলে মহাবীর, এই বলে তুমি
রমণীরে বল করিতে এলে?
পৃথিবীতে যারে, তুমি দাও প্রাণ,
সেই প্রাণে বাঁচে, বলে হে সবে।
আজি পৃথবীনাথ আমার চরণে
প্রাণ ভিক্ষা লও, বাঁচবে তবে॥
ষোড়ো হাত দুটো, দাঁতে কর কুটো
করহ শপথ ভারতপ্রভু।
শপথ করহ হিন্দুললনার
হেন অপমান না হবে কভু॥
তুমি না করিবে, রাজ্যেতে না দিবে
হইতে কখন এ হেন দোষ।
হিন্দুললনারে যে দিবৈ লাঞ্ছনা
তাহার উপরে করিবে রোষ॥
শপথ করিল, পরশিয়ে অসি,
নারী আঞ্জামত ভারতপ্রভু।

আমার রাজ্যেতে হিন্দুললনার
হেন অপমান না হবে কভু॥
বলে শুন ধনি হইয়াছি প্রীত
দেখিয়া তোমার সাহস বল।
যাহা ইচ্ছা তব মাগি লও সতি,
পুরাব বাসনা, ছাড়িয়া ছল॥
এই তরবারি দিন্দু হে তোমারে
হীরক-খচিত ইহার কোষ।
বীরবালা তুমি তোমার সে যোগ্য
না রাখিও মনে আমার দোষ॥
আজি হতে তোমা ভাগিনী বলিন্দু,
ভাই তব আমি ভাবিও মনে।
যা থাকে বাসনা মাগি লও বর
যা চাহিবে তাই দিব এখনে॥
তুষ্ট হয়ে সতী বলে ভাই তুমি
সম্প্রীত হইন্দু তোমার ভাষে।
ভিক্ষা যদি দিবা দেখাইয়া দাও
নির্গমের পথ, যাইব বাসে॥
দেখাইল পথ, আপনি রাজন্
বাহিরিল সতী, সে পুরী হতে।
সবে বল জয়, হিন্দুকন্যা জয়,
হিন্দুমতি থাক্ ধর্মের পথে॥

৬

রাজপুরী মাঝে, কি সুন্দর আজি
বসেছে বাজার রসের ঠাট।
রমণীতে কেনে রমণীতে বেচে
লেগেছে রমণীরূপের হাট॥
ফুলের তোরণ ফুল আবরণ
ফুলের স্তম্ভেতে ফুলের মালা।
ফুলের দোকান ফুলের নিশান
ফুলের বিছানা ফুলের ডালা॥
নবমীর চাঁদ বরষে চন্দ্রিকা
লাখে লাখে দীপ উজলি জ্বলে।
দোকানে দোকানে কুলবালাগণে
ঝলসে কটাক্ষ হাসিয়া ছলে॥
এ হতে সুন্দর, রমণী-ধরম,
আর্যনারীধর্ম, সতীত্ব রত।
জয় আর্য নামে আজ(ও) আর্যধামে
আর্যধর্ম রাখে রমণী যত॥
জয় আর্যকন্যা এ ভুবনে ধন্যা,
ভারতের আলো, ঘোর আধারে।
হায় কি কারণে, আর্যপুত্রগণে
আর্যের ধরম রাখিতে নারে॥

বঙ্কিম রচনাবলী

মন এবং সুখ

১

এই মধুমাসে, মধুর বাতাসে,
শোন লো মধুর বাঁশী।
এই মধু বনে, শ্রীমধুসুদনে,
দেখ লো সকলে আসি ॥
মধুর সে গায়, মধুর বাজায়,
মধুর মধুর ভাষে।
মধুর আদরে, মধুর অধরে,
মধুর মধুর হাসে ॥
মধুর শ্যামল, বদন কমল,
মধুর চাহনি তায়।
কনক নুপুড়, মধুকর যেন,
মধুর বাজিছে পায় ॥
মধুর ইঙ্গিতে, আমার সঙ্গেতে,
কহিল মধুর বাণী।
সে অবধি চিতে, মাধুরি হেরিতে,
ধৈর্য নাহিক মানি ॥
এ সুখ রঙ্গেতে পর লো অঙ্গেতে
মধুর চিকণ বাস।
তুলি মধুফুল, পর কানে দুল,
পূরাও মনের আশ ॥
গাঁথি মধুমাল্য, পর গোপবালা
হাস লো মধুর হাসি।
চল যথা বাজে, যমুনার কূলে,
শ্যামের মোহন বাঁশী ॥

২

চল যথা বাজে, যমুনার কূলে
ধীরে ধীরে ধীরে বাঁশী।
ধীরে ধীরে যথা, উঠিছে চাঁদনি,
স্থল জল পরকাশি ॥
ধীরে ধীরে রাই, চল ধীরে যাই,
ধীরে ধীরে ফেল পদ।
ধীরে ধীরে শুন, নাদিছে যমুনা,
কল কল গদ গদ ॥
ধীরে ধীরে জলে, রাজহংস চলে,
ধীরে ধীরে ভাসে ফুল।
ধীরে ধীরে বায়, বহিছে কাননে,
দোলায়ে আমার দুল ॥
ধীরে যাবি তথা, ধীরে কবি কথা
রাখিবি দোহার মান।
ধীরে ধীরে তার বাঁশিটি কাড়িবি,
ধীরেতে পূরিবি তান ॥

ধীরে শ্যাম নাম, বাঁশীতে বলিবি,
শুনিব কেমন বাজে।
ধীরে ধীরে চড়া কাড়িয়ে পরিবি,
দেখিব কেমন সাজে ॥
ধীরে বনমালা, গলাতে দোলাবি,
দেখিব কেমন দোলে।
ধীরে ধীরে তার, মন করি চুরি,
লইয়া আসিবি চলে ॥

৩

শুন মোর মন মধুরে মধুরে,
জীবন করহ সায়।
ধীরে ধীরে ধীরে, সরল সুপথে,
নিজ গতি রেখ তায় ॥
এ সংসার ব্রজ, কৃষ্ণ তাহে সুখ,
মন তুমি ব্রজনারী।
নিতি নিতি তার, বংশীরব শুন,
হতে চাও অভিসারী ॥
যাও যাবে মন, কিন্তু দেখ যেন,
একাকী যেও না রঙ্গে।
মাধুর্য্য ধৈর্য, সহচরী দুই,
রেখ আপনার সঙ্গে ॥
ধীরে ধীরে ধীরে, কাল নদীতীরে,
ধরম কদম্ব তলে।
মধুর সুন্দর, সুখ নটবর,
ভজ মন কুতূহলে ॥

জলে ফুল

১

কে ভাসাল জলে তোরে কানন-সুন্দরি!
বসিয়া পল্লবাসনে, ফুটেছিলে কোন্ বনে
নাচিতে পবন সনে, কোন্ বৃক্ষোপরি?
কে ছিঁড়িল শাখা হতে শাখার মঞ্জরী?

২

কে আনিল তোরে ফুল, তরঙ্গিণী-তীরে?
কাহার কুলের বালা, আনিয়া ফুলের ডালা,
ফুলের আঙ্গুলে তুলে ফুল দিল নীরে?
ফুল হতে ফুল খসি, জলে ভাসে ধীরে!

৩

ভাসিছ সলিলে যেন, আকাশেতে তারা।
কিম্বা কাদম্বিনী-গায়, যেন বিহঙ্গিনী প্রায়,
কিম্বা যেন মাঠে ভ্রমে, নারী পথহারা;
কোথায় চলেছ ধরি, তরঙ্গিণীধারা?

৪

একাকিনী ভাসি যাও, কোথায় অবলে!
তরঙ্গের রাশি রাশি, হাসিয়া বিকট হাসি,
তাড়াতাড়ি করি তোরে খেলে কুতূহলে?
কে ভাসাল তোরে ফুল কাল নদীজলে!

৫

কে ভাসাল তোরে ফুল, কে ভাসাল মোরে!
কাল স্নোতে তোর(ই) মত, ভাসি আমি অবিরত,
কে ফেলেছে মোরে এই তরঙ্গের ঘোরে?
ফেলিছে তুলিছে কভু, আছাড়িছে জোরে!

৬

শাখার মঞ্জরী আমি, তোরই মত ফুল।
বোঁটা ছিঁড়ে শাখা ছেড়ে, ঘুরি আমি স্নোতে পড়ে,
আশার আবর্ত বেড়ে, নাহি পাই কুল।
তোরই মত আমি ফুল, তরঙ্গে আকুল।

৭

তুই যাবি ভেসে ফুল, আমি যাব ভেসে।
কেহ না ধরবে তোরে, কেহ না ধরবে মোরে,
অনন্ত সাগরে তুই, মিশাইবি শেষে।
চল যাই দই জনে অনন্ত উদ্দেশে।

ভাই ভাই

(সমবেত বাঙ্গালিদিগের সভা দেখিয়া)

১

এক বঙ্গভূমে জনম সবার,
এক বিদ্যালয়ে জ্ঞানের সঞ্চার,
এক দৃষ্টিতে সবে করি হাহাকার,
ভাই ভাই সবে, কাঁদ রে ভাই।
এক শোকে শীর্ণ সবার শরীর,
এক শোকে বয় নয়নের নীর,
এক অপমানে সবে নতশির,
অধম বাঙ্গালি মোরা সবাই ॥

২

নাহি ইতিবৃত্ত নাহিক গৌরব,
নাহি আশা কিছু নাহিক বৈভব,
বাঙ্গালির নামে করে ছিঁছি রব,
কোমল স্বভাব, কোমল দেহ।

কোমল করেছে ধর কমলিনী,
কোমল শয্যাতে, কোমল শিঞ্জিনী,
কোমল শরীর, কোমল যামিনী,
কোমল পিরীতি, কোমল স্নেহ ॥

৩

শিখিয়াছ শব্দে উচ্চ চীৎকার!
“ভিক্ষা দাও! ভিক্ষা দাও! ভিক্ষা দাও!” সার
দেহি দেহি দেহ বল বার বার
না পেলে গালি দাও মিছামিছি।
দানের অযোগ্য চাও তবু দান,
মানের অযোগ্য চাও তবু মান,
বাঁচিতে অযোগ্য রাখ তবু প্রাণ,
ছিছি ছিছি ছিছি! ছি ছি ছি ছি ছি!

৪

কার উপকার করেছ সংসারে?
কোন্ ইতিহাসে তব নাম করে?
কোন্ বৈজ্ঞানিক বাঙ্গালির ঘরে?
কোন্ রাজ্য তুমি করেছ জয়?
কোন্ রাজ্য তুমি শাসিয়াছ ভাল?
কোন্ মারাথনে ধরিয়ছ ঢাল?
এই বঙ্গভূমি এ কাল সে কাল
অরণ্য, অরণ্য অরণ্যময় ॥

৫

কে মিলাল আজি এ চাঁদের হাট?
কে খুলিল আজি মনের কপাট?
পড়াইব আজি এ দৃষ্টির পাঠ,
শুন ছিঁছি রব, বাঙ্গালি নামে,
য়ুরোপে মার্কিনে ছিঁছি ছিঁছি বলে,
শুন ছিঁছি রব, হিমালয়তলে,
শুন ছিঁছি রব, সমুদ্রের জলে,
স্বদেশে, বিদেশে, নগরে গ্রামে ॥

৬

কি কাজ বহিয়া এ ছার জীবনে,
কি কাজ রাখিয়া এ নাম ভুবনে,
কলঙ্ক থাকিতে কি ভয় মরণে?
চল সবে মরি পশিয়া জলে।
গলে গলে ধরি, চল সবে মরি,
সারি সারি সারি, চল সবে মরি,
শীতল সলিলে এ জ্বালা পাসরি,
লুকাই এ নাম, সাগরতলে ॥

বঙ্কিম রচনাবলী

দুর্গোৎসব *

১

বর্ষে বর্ষে এসো যাও এ বাঙ্গালা ধামে
কে তুমি ষোড়শী কন্যা, মৃগেন্দ্রবাহিনী?
চিনিয়াছি তোরে দুর্গে, তুমি নাকি ভব দুর্গে,
দুর্গতির একমাত্র সংহারকারিণী ॥
মাটি দিয়ে গড়িয়াছি, কত গেল খড় কাছি,
সৃজিবারে জগতের সৃজনকারিণী।
গড়ে পিটে হলো খাড়া, বাজা ভাই ঢোল কাড়া,
কুমারের হাতে গড়া ঐ দীনতারিণী!
বাজা—ঠমকি ঠমকি ঠিকি, খিনিকি
ঝিনিকি ঠিনি ॥

২

কি সাজ সেজেছ মাতা রাজতর সাজে!
এ দেশে যে রাজই সাজ কে তোরে শিখালে?
সন্তানে রাজতা দিলে আপনি তাই পরিলে,
কেন মা রাজের সাজে এ বঙ্গ ভুলালে?
ভারত রতন খনি, রতন কাণ্ডন মণি,
সে কালে এদেশে মাতা, কত না ছড়ালে?
বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, আজি তুমি রাজতা পরা,
ছেঁড়া ধূতি রিপু করা, ছেলের কপালে?
তবে—বাজা ভাই ঢোল কাঁশি মধুর
খেমটা তালে ॥

৩

কারে মা এনেছ সঙ্গ, অনন্তরঞ্জিণি!
কি শোভা হয়েছে আজি, দেখ রে সবার!
আমি বেটা লক্ষ্মীছাড়া, আমার ঘরে লক্ষ্মী খাড়া,
ঘরে হতে খাই তাড়া, ঘরখরচ নাই ॥
হয়েছিল হাতে খড়ি, ছাপার কাগজ পড়ি,
সরস্বতী তাড়াতাড়ি, এলে বদ্বি তাই?
করো না মা বাড়াবাড়ি, তোমায় আমার ছাড়াছাড়ি,
চড়ে না ভাতের হাঁড়ি, বিদ্যায় কাজ নাই।
তাক্ তাক্ ধিনাক্ ধিনাক্ বাজনা
বাজা রে ভাই ॥

৪

দশ ভুঞ্জে দশায়ুধ কেন মাতা ধর?
কেন মাতা চাপিয়াছ সিংহটার ঘাড়ে?
ছুরি দেখে ভয় পাই, ঢাল খাঁড়া কাজ নাই,
ও সব রাখুক গিয়ে রামদীন পাঁড়ে।

সিংহ চড়া ভাল নয়, দাঁত দেখে পাই ভয়,
প্রাণ যেন খাবি খায়, পাছে লাফ ছাড়ে,
আছে ঘরে বাঁধা গাই, চড়তে হয় চড় তাই,
তাও কিছুর ভয় পাই পাছে সিঙ্গ নাড়ে।
সিংহপৃষ্ঠে মেয়ের পা! দেখে কাঁপ
হাড়ে হাড়ে ॥

৫

তোমার বাপের কাঁধে—নগেন্দ্রের ঘাড়ে
তুঙ্গ শঙ্কোপরে সিংহ—দেখ গিরিবালে!
শিমলা পাহাড়ে ধ্বজা, উড়ায় করিয়া মজা,
পিতৃ সহ বন্দী আছ, হর্যাক্ষের জালে।
তুমি যারে কৃপা কর, সেই হয় ভাগ্যধর—
সিংহেরে চরণ দিয়ে কতই বাড়ালে!
জনমি ব্রাহ্মণ কুলে, শতদল পদ্ম তুলে
আমি পুঞ্জে পাদপদ্ম পিড়িন্দু আড়ালে!
রুটি মাখন খাব মা গো! আলোচাল ছাড়ালে!

৬

এই শুন পুনঃ বাজে মজাইয়া মন,
সিংহের গভীর কণ্ঠ, ইংরেজ কামান!
দুড়ুম দুড়ুম দুম, প্রভাতে ভাঙ্গায় ঘুম,
দুপুরে প্রদোষে ডাকে, শিহরয় প্রাণ!
ছেড়ে ফেলে ছেঁড়া ধূতি, জলে ফেলে খুঙ্গী পুঁথি,
সাহেব সাজিব আজ ব্রাহ্মণ সন্তান।
লুচি মন্ডার মুখে ছাই, মেজে বসে মটন খাই,
দেখি মা পাই না পাই তোমার সন্ধান।
সোলা-টুপি মাথায় দিয়ে পাব জগতে সম্মান ॥

৭

এনেছ মা বিঘ্ন-হরে কিসের কারণে?
বিঘ্নময় এ বাঙ্গালা, তা কি আছে মনে?
এনেছ মা শক্তিধরে, দেখি কত শক্তি ধরে?
মেরেছ মা বারে বারে দুষ্টাসুদ্রগণে,
মেরেছ তারকাসুদ্র, আজি বঙ্গ ক্ষুধাতুর,
মার দেখি ক্ষুধাসুদ্র, সমাজের রণে?
অসুদ্রে করিয়া ফের, মায়ে পোয়ে মারলে ঢের,
মার দেখি এ অসুদ্রে, ধরি ও চরণে ॥
তখন—“কত নাচ গো রণে!” বাজাব
প্রফুল্ল মনে ॥

* এই কাব্যে ছন্দের নিয়ম পুনঃ পুনঃ লঙ্ঘিত হইয়াছে—ব্যাকরণের ত কথাই নাই।—লেখক।

৮

তোমার মহিমা মাতা বৃষ্টিতে নারিন্দু,
কিসের লাগিয়া আন কাল বিষধরে?
ঘরে পরে বিষধর, বিষে বঙ্গ জ্বর জ্বর,
আবার এ অজগর দেখাও কিঙ্করে?
হই মা পরের দাস, বাঁধি আঁট কেটে ঘাস,
নাহিক ছাড়ি নিশ্বাস কালসাপ ডরে।
নিতি নিতি অপমান, বিষে জ্বর জ্বর প্রাণ,
কত বিষ কণ্ঠ মাঝে, নীলকণ্ঠ ধরে;
বিষের জ্বালায় সদা প্রাণ ছটফট করে!

৯

দুর্গা দুর্গা বল ভাই দুর্গাপূজা এলো,
পূর্তিয়া কলার তেড় সাজাও তোরণ।
বেছে বেছে তোল ফুল, সাজাব ও পদমূল,
এবার হৃদয় খুলে পূর্জিব চরণ॥
বাজা ভাই ঢাক ঢোল, কাড়া নাগড়া গুণ্ডগোল,
দেব ভাই পাঁটার ঝোল, সোনার বরণ॥
ন্যায়রহু এসো সাজি, প্রতিপদ হল আজি,
জাগাও দেখি চণ্ডীরে বসায় বোধন?

১০

যা দেবী সর্বভূতেষু—ছায়া রূপ ধরে!
কি পুঁথি পড়িলে বিপ্র! কাঁদিল হৃদয়!
সর্বভূতে সেই ছায়া! হইল পবিত্র কায়া,
ঘর্চিবে সংসার মায়া, যদি তাই হয়॥
আবার কি শুনি কথা! শক্তি নাকি যথা তথা?
যা দেবী সর্বভূতেষু, শক্তিরূপে রয়?
বাস্তালি ভূতের দেহ— শক্তি ত না দেখে কেহ;
ছিলে যদি শক্তিরূপে, কেন হলে লয়?
আদ্যাশক্তি শক্তি দেহ! জয় মা চণ্ডীর জয়!

১১

পরিল এ বঙ্গবাসী, নতুন বসন,
জীবন্ত কুসুমসজ্জা, যেন বা ধরায়।
কেহ বা আপনি পরে, কেহ বা পরায় পরে,
যে যাহারে ভালবাসে, সে তারে সাজায়।
বাজারেতে হুড়াহুড়ি, আপসেতে তাড়াতাড়ি,
লুচি মণ্ডা ছড়াছড়ি ভাত কেবা খায়?
সুখের বড় বাড়াবাড়ি, টাকার বেলা ভাঁড়াভাঁড়ি,
এই দশা ত সকল বাড়ী, দোষিব বা কায়?
বর্ষে বর্ষে ভূগি মা গো, বড়ই টাকার দায়!

১২

হাহাকার বঙ্গদেশে, টাকার জ্বালায়।
তুমি এলে শুব্ধকরি! বাড়ে আরো দায়।
কেন এসো কেন যাও, কেন চাল কলা খাও,
তোমার প্রসাদে যদি টাকা না কুলায়।
তুমি ধর্ম্ম তুমি অর্থ, তার বৃষ্টি এই অর্থ,
তুমি মা টাকারূপিণী ধরম টাকায়।
টাকা কাম, টাকা মোক্ষ, রক্ষ মাতঃ রক্ষ রক্ষ,
টাকা দাও লক্ষ লক্ষ, নৈলে প্রাণ যায়।
টাকা ভক্তি, টাকা মতি, টাকা মনুষ্টি, টাকা গতি,
না জানি ভকতিস্তুতি, নমামি টাকায়?
হা টাকা যো টাকা দেবি, মরি যেন টাকা সেবি,
অন্তিম কালে পাই মা যেন রূপার চাকায়?

১৩

তুমিই বিষ্ণুর হস্তে সুদর্শন চক্র,
হে টাকে! ইহ জগতে তুমি সুদর্শন।
শুন প্রভু রূপচাঁদ, তুমি ভানু তুমি চাঁদ,
ঘরে এসো সোনার চাঁদ, দাও দরশন॥
আ মরি কি হেরি শোভা, ছেলে বড়ার মনোলোভা,
হৃদে ধর বিবির মৃন্ড, লতায় বেটন।
তব ঝন্ ঝন্ নাদে, হারিয়া বেহালা কাঁদে,
তম্বুরা মৃদঙ্গ বীণা কি ছার বাদন!
পশিয়া মরম-মাঝে, নারীকণ্ঠ মৃদু বাজে,
তাও ছার তুমি যদি কর ঝন্ ঝন্!
টাকা টাকা টাকা টাকা!

বাক্সতে এসো রে ধন।

১৪

তোর লাগি সর্বত্যাগী, ওরে টাকা ধন!
জনমি বাঙ্গালী-কুলে, ভুলিনু ও রূপে!
তেয়াগিন্দু পিতা মাতা, শত্রু যে ভাগিনী ভ্রাতা,
দেখি মরি জ্ঞাতি গোষ্ঠী, তোরে প্রাণ সুদে!
বৃষ্টিয়া টাকার মর্ম্ম, ত্যজিছি যে ধর্ম্ম কর্ম্ম,
করেছি নরকে ঠাই, ঘোর কৃমিকূপে॥
দুর্গে দুর্গে ডাকি আজ, এ লোভে পড়ুক বাজ,
অসুরনাশিনি চণ্ডি আয় চণ্ডিরূপে!
এ অসুরে নাশ মাত!
শুভে নাশিলে ষেরূপে!

১৫

এসো এসো জগন্মাতা, জগদ্ধাত্রী উমে!
হিসাব নিকাশ আমি, করি তব সঙ্গে।
আজি পূর্ণ বার মাস, পূর্ণ হলো কোন আশ?
আবার পূর্জিব তোমা, কিসের প্রসঙ্গে?

বাঁকম রচনাবলী

সেই ত কঠিন মাটি, দিবা রাত্রি দুখে হাঁটি,
সেই রোদ্র সেই বৃষ্টি, পীড়িতেছে অঙ্গে।
কি জন্য গেল বা বর্ষ? বাড়িয়াছে কোন হর্ষ?
মিছামিছি আয়ুঃক্ষয়, কালের ভ্রুভঙ্গে।
বর্ষ কেন গণি তবে, কেন তুমি এস ভবে,
পিঞ্জর যন্ত্রণা সবে বনের বিহঙ্গে?
ভাঙ্গ মা দেহ-পিঞ্জর! উড়িব মনের রঙ্গে।

১৬

ওই শব্দন বাজিতেছে গদম্ গাম্ গদম্
ঢাক ঢোল কাড়া কাঁশি, নোবত নাগরা।
প্রভাত সপ্তমী নিশি, নেয়েছে শঙ্করী পিসী,
রাঁধিবে ভোগের রান্না, হাঁড়ি মাল্শা ভরা।
কাঁদি কাঁদি কেটে কলা, ভিজায়োছি ডাল ছোলা,
মোচা কুমড়া আলু বেগুন,
আছে কাঁড়ি করা ॥
আর মা চাও বা কি? মট্‌কিভরা আছে ঘি,
মিহিদানা সীতাভোগ, লুচি মনোহরা!
আজ এ পাহাড়ে মেয়ের,
ভাল করে পেট ভরা।

১৭

আর কি খাইবে মাতা? ছাগলের মৃন্ড?
রুধিরে প্রবৃত্তি কেন হে শান্তিরূপিণি!
তুমি গো মা জগন্মাতা, তুমি খাবে কার মাথা?
তুমি দেহ তুমি আত্মা, সংসারব্যাপিনী!
তুমি কার কে তোমার, তোর কেন মাংসাহার?
ছাগলে এ তৃপ্তি কেন, সর্বসংহারিণি?
করি তোমায় কৃতাজলি, তুমি যদি চাও বলি,
বলি দিব সুখ দুঃখ, চিত্তবৃত্তি জিনি;
ছ্যাডাং ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাং!
নাচো গো রণরঙ্গিণি!

১৮

ছয় রিপু বলি দিব, শক্তির চরণে
ঐশিকী মানসী শক্তি! তীর জ্যোতির্ময়ি!
বলি ত দিয়াছি সুখ, এখন বলি দিব দুখ,
শক্তিতে ইন্দ্রিয় জিনি হইব বিজয়ী।
এ শক্তি দিতে কি পার? ঠুসে তবে পাঁটা মার,
প্রণমামি মহামায়ে তুমি ব্রহ্মময়ী।
নৈলে তুমি মাটির টিপি, দশমীতে গলা টিপি,
তোমায় ভাসিয়ে গাঁজা টিপি, সিদ্ধিরস্তু কই।
ঐটুকু মা ভাল দেখি, পূজি তোমায় মূময়ি!

* যথার্থ “গদ্য-পদ্য”। কেন না, পদ্যের কোন ছন্দ নাই।

১৯

মন-বোতলে ভক্তি-ধেনো রাখিয়াছি তারা,
এঁটেছি সন্দেহ-ছিপি বিদ্যার গালাতে।
শিখিয়াছি লেখা পড়া, দেবতায় মেজাজ কড়া,
হইয়াছি আধ পোড়া, সংসারজ্বালাতে।
সাহেবের হুকুম চড়া, গৃহিণীর নথনাড়া,
ঋণে করলে দেশ ছাড়া, পারি না পালাতে।
তাতে আবার তুমি এলে, টাকার হিসাব না করিলে,
এতে কি মা ভক্তি মেলে সংসার লীলাতে?
বোতলে এঁটেছি ছিপি!
পার কি তুমি খোলাতে?

২০

কাজ নাই সে কথায়; পূজা কর সবে।
দেশের উৎসব এ যে ঠেলিতে কে পারে?
কর সবে গুণ্ডগোল, দাও গোলে হরি বোল,
সাপর্দটি পাঁটার ঝোল ফিরি দ্বারে দ্বারে—
যাত্রার লেগেছে ধুম, ছেলে বড়ার নাহি ঘুম,
দেখ না জ্বলিছে আলো বঙ্গের সংসারে।
দেখ না বাজনা বাজে, দেখ না রমণী সাজে,
কুসুমিত তরু যেন কাতারে কাতারে!
তবু ত এনেছ সুখ মাতা বঙ্গ-কারাগারে।

২১

বর্ষে বর্ষে এসো মা গো, খাও লুচি পাঁটা,
ছোলা কলা কচু ঘেচু যা যোটে কপালে,
যে হলো দেশের দশা, নাই বড় সে ভরসা,
আসবে যাবে খাবে নেবে, সম্বৎসর কালে।
তুমি খাও কলা মূলো, তোমার সন্তানগুলো,
মারিতেছে ব্রান্ড পানি, মূর্গী পালে পালে।
দীন কবি আমি মাতা, পাতিয়া আঙ্গট পাতা,
তোমার প্রসাদ খাই, ঘৃত আলোচালে ॥
প্রসাদ প্রসাদ দুর্গে, প্রসাদ নগেন্দ্রবালে!

রাজার উপর রাজা*

গাছ পুঁতিলাম ফলের আশায়,
পেলাম কেবল কাঁটা।
সুখের আশায় বিবাহ করিলাম
পেলাম কেবল ঝাঁটা ॥
বাসের জন্য ঘর করিলাম
ঘর গেল পুড়ে।
বুড়া বয়সের জন্য পূজি করিলাম
সব গেল উড়ে ॥

চাকুরির জন্য বিদ্যা করিলাম,
ঘটিল উমেদারি।
যশের জন্য কীর্তি করিলাম
ঘটিল টিটকারি ॥
সুদের জন্য কর্জ দিলাম,
আসল গেল মারা।
প্রীতির জন্য প্রাণ দিলাম,
শেষে কেঁদে সারা ॥
ধানের জন্য মাঠ চাষিলাম
হলো খড় কুটো।
পারের জন্য নৌকা করিলাম,
নৌকা হলো ফুটো ॥
লাভের জন্য ব্যবসা করিলাম,
সব লহনা বাকি।
সেটাম দিয়া আদালত করিলাম,
ডিক্রীর বেলায় ফাঁকি ॥

তবে আর কেন ভাই, বেড়াও ঘুরে,
বেড়ে ভবের হাট।
ঘুর্ণী জলে নৌকা যেমন, ঝড়ের কুটো,
জ্বলন্ত আগুনের কাঠ ॥
মুখে বল হরিনাম ভাই,
হুদে ভাব হরি!
এ ব্যবসায় লোকসান নেই ভাই,
এসো লাভে ঘর ভরি ॥
এক গুণেতে শত লাভ,
শত গুণে হাজার।
হাজারেতে লক্ষ লাভ,
ভারি ফেলাও কারবার ॥
ভাই বল হরি, হরি বোল,
ভাঙ্গ ভবের হাট!
রাজার উপর হওগে রাজা
লাট সাহেবের লাট ॥

মেঘ

আমি বৃষ্টি করিব না। কেন বৃষ্টি করিব? বৃষ্টি করিয়া আমার কি সুখ? বৃষ্টি করিলে তোমাদের সুখ আছে। তোমাদের সুখে আমার প্রয়োজন কি?

দেখ, আমার কি যন্ত্রণা নাই? এই দারুণ বিদ্যুৎগ্নি আমি অহরহ হৃদয়ে ধারণ করিতেছি। আমার হৃদয়ে সেই সুহাসিনীর উদয় দেখিয়া তোমাদের চক্ষু আনন্দিত হয়, কিন্তু ইহার স্পর্শ মাত্রে তোমরা দক্ষ হও। সেই অগ্নি আমি হৃদয়ে ধরি! আমি ভিন্ন কাহার সাধা এ আগুন হৃদয়ে ধরে?

দেখ, বায়ু আমাকে সর্বদা অস্থির করিতেছে। বায়ু, দিগ্বিদিক্ বোধ নাই, সকল দিক্ হইতে বহিতেছে। আমি যাই জলভারগুরু, তাই বায়ু আমাকে উড়াইতে পারে না।

তোমরা ভয় করিও না, আমি এখনই বৃষ্টি করিতেছি—পৃথিবী শস্যশালিনী হইবে। আমার পূজা দিও।

আমার গর্জন অতি ভয়ানক—তোমরা ভয় পাইও না। আমি যখন মন্দগন্তীর গর্জন করি, বৃক্ষপত্র সকল কম্পিত করিয়া, শিখিকুলকে নাচাইয়া, মৃদু গন্তীর গর্জন করি, তখন ইন্দ্রের হৃদয়ে মন্দারমালা দুলিয়া উঠে, নন্দসুন্দরীশীর্ষকে শিখিপুচ্ছ কাঁপিয়া উঠে, পর্বত-গুহায় মুখরা প্রতিধ্বনি হাসিয়া উঠে। আর বৃষ্টিপাতকালে, বজ্রসহায় হইয়া যে গর্জন করিয়াছিলাম, সে গর্জন শুনিতে চাহিও না—ভয় পাইবে।

বৃষ্টি করিব বৈ কি? দেখ, কত নবযুথিকা-দাম আমার জলকণার আশায় উদ্ধর্মুখী হইয়া আছে। তাহাদিগের শূদ্র, সুবাসিত বদনমণ্ডলে স্বচ্ছ বারির্নিষেক, আমি না করিলে কে করে?

বৃষ্টি করিব বৈ কি? দেখ, তটিনীকুলের দেহের এখনও পুষ্টি হয় নাই। তাহারা যে আমার প্রেরিত বারিরাশি প্রাপ্ত হইয়া, পরিপূর্ণ হৃদয়ে, হাসিয়া হাসিয়া, নাচিয়া নাচিয়া, কল কল শব্দে উভয় কূল প্রতিহত করিয়া, অনন্ত সাগরাভিমুখে ধাবিত হইতেছে, ইহা দেখিয়া কাহার না বর্ষিতে সাধ করে?

আমি বৃষ্টি করিব না। দেখ, ঐ পািপষ্ঠা স্ত্রীলোক, আমারই প্রেরিত বারি, নদী হইতে কলসী পূরিয়া তুলিয়া লইয়া যাইতেছে, এবং “পোড়া দেবতা একটু ধরণ কর না” বলিয়া আমাকেই গালি দিতেছে। আমি বৃষ্টি করিব না।

দেখ, কৃষকের ঘরে জল পড়িতেছে বলিয়া আমায় গালি দিতেছে। নহিলে সে কৃষক কেন? আমার জল না পাইলে তাহার চাষ হইত না—আমি তাহার জীবনদাতা। ভদ্র, আমি বৃষ্টি করিব না।

বাঁশ্কম রচনাবলী

সেই কথাটি মনে পড়িল,

মন্দং মন্দং ন্দর্দতি পবনশ্চান্দক্দুলো যথা স্বাং
বামশ্চায়ং ন্দর্দতি মধুরশ্চাতকন্তে সগর্ষঃ।

কালিদাসাদি যেখানে আমার স্তাবক, সেখানে আমি বৃষ্টি করিব না কেন?

আমার ভাষা শেলি বৃষ্টিয়াছিল। যখন বলি, I bring fresh showers for the thirsting flowers, তখন সে গম্ভীরা বাণীর মর্ম্ম শেলি নহিলে কে বৃষ্টিবে? কেন জান? সে আমার মত হৃদয়ে বিদ্যুদাগ্নি বহে। প্রতিভাই তাহার বিদ্যুৎ।

আমি অতি ভয়ঙ্কর। যখন অন্ধকারে কৃষ্ণকরাল রূপ ধারণ করি, তখন আমার ভ্রুকুটি কে সহিতে পারে? এই আমার হৃদয়ে কাল্যাগ্নি বিদ্যুৎ তখন পলকে পলকে বলসিতে থাকে। আমার নিঃশ্বাসে, স্থাবর জঙ্গম উড়িতে থাকে, আমার রবে ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত হয়।

আবার আমি কেমন মনোরম! যখন পশ্চিম-গগনে, সন্ধ্যাকালে লোহিতভাস্করাঙ্কে বিহার করিয়া স্বর্ণতরঙ্গের উপর স্বর্ণতরঙ্গ বিক্ষিপ্ত করি, তখন কে না আমায় দেখিয়া ভুলে? জ্যোৎস্না-পরিপ্লুত আকাশে মন্দ পবনে আরোহণ করিয়া কেমন মনোহর মূর্ত্তি ধরিয়া আমি বিচরণ করি। শুন পৃথিবীবাসিগণ! আমি বড় সুন্দর, তোমরা আমাকে সুন্দর বলিও।

আর একটা কথা আছে, তাহা বলা হইলেই আমি বৃষ্টি করিতে যাই। পৃথিবীতলে একটি পরম গুণবতী কামিনী আছে, সে আমার মনোহরণ করিয়াছে। সে পর্ব্বত-গুহায় বাস করে, তাহার নাম প্রতিধ্বনি। আমার সাড়া পাইলেই সে আসিয়া আমার সঙ্গে আলাপ করে। বোধ হয়, আমায় ভাল বাসে। আমিও তাহার আলাপে মূগ্ধ হইয়াছি। তোমরা কেহ সম্বন্ধ করিয়া আমার সঙ্গে তাহার বিবাহ দিতে পার?

বৃষ্টি

চল নামি—আষাঢ় আসিয়াছে—চল নামি।

আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃষ্টিবিন্দু, একা এক জনে যুথিকাকালির শব্দক মূখও ধুইতে পারি না—মল্লিকার ক্ষুদ্র হৃদয় ভরিতে পারি না। কিন্তু আমরা সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি,—মনে করিলে পৃথিবী ভাসাই। ক্ষুদ্র কে?

দেখ, যে একা, সেই ক্ষুদ্র, সেই সামান্য। যাহার ঐক্য নাই, সেই তুচ্ছ। দেখ, ভাই সকল, কেহ একা নামিও না—অন্ধপথে ঐ প্রচণ্ড রবির কিরণে শূকাইয়া যাইবে—চল, সহস্রে সহস্রে, লক্ষে লক্ষে, অর্ধদে অর্ধদে, এই বিশেষিতা পৃথিবী ভাসাইব।

পৃথিবী ভাসাইব। পর্ব্বতের মাথায় চড়িয়া, তাহার গলা ধরিয়া, বৃকে পা দিয়া, পৃথিবীতে নামিব; নির্ঝরপথে স্ফাটিক হইয়া বাহির হইব। নদীকূলের শূন্যহৃদয় ভরাইয়া, তাহাদিগকে রূপের বসন পরাইয়া, মহাকল্লোলে ভীম বাদ্য বাজাইয়া, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ মারিয়া, মহারঙ্গে ক্রীড়া করিব। এসো, সবে নামি।

কে যুদ্ধ দিবে—বায়ু। ইস্! বায়ুর ঘাড়ে চড়িয়া দেশ দেশান্তরে বেড়াইব। আমাদের এ বর্ষায়ুদ্ধে বায়ু ঘোড়া মাত্র; তাহার সাহায্য পাইলে স্থলে জলে এক করি। তাহার সাহায্য পাইলে বড় বড় গ্রাম, অট্টালিকা, পোত মুখে করিয়া ধুইয়া লইয়া যাই। তাহার ঘাড়ে চড়িয়া, জানালা দিয়া লোকের ঘরে ঢুকি। যুবতীর যত্ননির্ম্মিত শয্যা ভিজাইয়া দিই—সুস্বপ্ন সুন্দরীর গায়ের উপর গা ঢালি। বায়ু! বায়ু ত আমাদের গোলাম।

দেখ ভাই, কেহ একা নামিও না—ঐক্যই বল—নহিলে আমরা কেহ নই। চল—আমরা ক্ষুদ্র বৃষ্টিবিন্দু—কিন্তু পৃথিবী রাখিব। শস্যক্ষেত্রে শস্য জন্মাইব—মনুষ্য বাঁচবে। নদীতে নৌকা চলাইব—মনুষ্যের বাণিজ্য বাঁচবে। তৃণ লতা বৃক্ষাদির পৃষ্টি করিব—পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ বাঁচবে। আমরা ক্ষুদ্র বৃষ্টিবিন্দু—আমাদের সমান কে? আমরাই সংসার রাখি।

তবে আর, ডেকে ডেকে, হেঁকে হেঁকে, নবনীল কাদম্বিনি! বৃষ্টিকুলপ্রসূতি! আর মা দিগ্‌মণ্ডলব্যাপিনী; সৌরতেজঃসংহারিণী! এসো, গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন কর, আমরা নামি! এসো ভার্গিনি সূচারুহাসিনি চণ্ডলে! বৃষ্টিকুলমূখ আলো কর! আমরা ডেকে ডেকে, হেসে হেসে, নেচে নেচে, ভূতলে নামি। তুমি বৃহ্মর্ম্মভেদী বজ্র, তুমিও ডাক না—এ উৎসবে তোমার মত

বাজনা কে? তুমিও ভূতলে পড়বে? পড়, কিন্তু কেবল গর্বেশ্বরের মস্তকের উপর পড়ও। এই ক্ষুদ্র পরোপকারী শস্যমধ্যে পড়ও না—আমরা তাহাদের বাঁচাইতে যাইতেছি। ভাঙ্গ ত এই পর্বতশৃঙ্গ ভাঙ্গ; পোড়াও ত ঐ উচ্চ দেবালয়চূড়া পোড়াও। ক্ষুদ্রকে কিছ্ বলও না—আমরা ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রের জন্য আমাদের বড় ব্যথা।

দেখ, দেখ, আমাদের দেখিয়া পৃথিবীর আহ্লাদ দেখ! গাছপালা মাথা নাড়িতেছে—নদী দুলিতেছে, ধান্যক্ষেত্র মাথা নামাইয়া প্রণাম করিতেছে—চাষা চাষিতেছে—ছেলে ভিজিতেছে—কেবল বেনে বউ আমসী ও আমসত্ত্ব লইয়া পলাইতেছে। মর্ পাঁপষ্ঠা! দুই একখানা রেখে যা না—আমরা খাব। দে, মাগীর কাপড় ভিজিয়ে দে।

আমরা জাতিতে জল, কিন্তু রঙ্গরস জানি। লোকের চাল ফুটা করিয়া ঘরে উর্কি মারি—দম্পতির গৃহে ছাদ ফুটা করিয়া টু দিই। যে পথে সুন্দর বোঁ জলের কলসী লইয়া যাইবে, সেই পথে পিছল করিয়া রাখি। মল্লিকার মধু ধুইয়া লইয়া গিয়া, ভ্রমরের অন্ন মারি। মর্ডিক মর্ডিকর দোকান দেখিলে প্রায় ফলার মাখিয়া দিয়া যাই। রামী চাকরাণী কাপড় শুকুতে দিলে, প্রায় তাহার কাজ বাড়াইয়া রাখি। ভণ্ড বামনের জন্য আচমনীয় যাইতেছে দেখিলে, তাহার জাতি মারি। আমরা কি কম পাত্র! তোমরা সবাই বল—আমরা রসিক।

তা যাক্—আমাদের বল দেখ। দেখ, পর্বতকন্দর, দেশ প্রদেশ ধুইয়া লইয়া, নতুন দেশ নিষ্কাশন করিব! বিশীর্ণা সুত্রাকারা তটিনীকে কুলপ্লাবিনী দেশমজ্জিনী অনন্তদেহধারিণী অনন্ত তরঙ্গিণী জলরাক্ষসী করিব। কোন দেশের মানুষ রাখিব—কোন দেশের মানুষ মারিব—কত জাহাজ বহিব, কত জাহাজ ডুবাইব—পৃথিবী জলময় করিব—অথচ আমরা কি ক্ষুদ্র! আমাদের মত ক্ষুদ্র কে? আমাদের মত বলবান্ কে!

খদ্যোত

খদ্যোত যে কেন আমাদের উপহাসের স্থল, তাহা আমি বুদ্ধিতে পারি না। বোধ হয়, চন্দ্র সূর্য্যাদি বৃহৎ আলোকাধার সংসারে আছে বলিয়াই জোনাকির এত অপমান। যেখানেই অল্পগুণবিশিষ্ট ব্যক্তিকে উপহাস করিতে হইবে, সেইখানেই বক্তা বা লেখক জোনাকির আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু আমি দেখিতে পাই যে, জোনাকির অল্প হউক, অধিক হউক, কিছ্ আলো আছে—কই, আমাদের ত কিছ্ই নাই। এই অন্ধকারে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া কাহার পথ আলো করিলাম? কে আমাকে দেখিয়া, অন্ধকারে, দুস্তরে, প্রান্তরে, দুর্দ্দিনে, বিপদে, বিপাকে বলিয়াছে, এস ভাই, চল চল, ঐ দেখ আলো জ্বলিতেছে, চল, ঐ আলো দেখিয়া পথ চল? অন্ধকার! এ পৃথিবী ভাই বড় অন্ধকার! পথ চলিতে পারি না। যখন চন্দ্র সূর্য্য থাকে, তখন পথ চলি—নহিলে পারি না। তারাগণ আকাশে উঠিয়া, কিছ্ আলো করে বটে, কিন্তু দুর্দ্দিনে ত তাহাদের দেখিতে পাই না। চন্দ্রসূর্য্যও সূর্দ্দিনে—দুর্দ্দিনে, দুঃসময়ে, যখন মেঘের ঘটা, বিদ্যুতের ছটা, একে রাগি, তাহাতে ঘোর বর্ষা, তখন কেহ না। মনুষ্যানির্মিত যন্ত্রের ন্যায় তাহারাও বলে—“*Hora non numero nisi serenas!*” কেবল তুমি খদ্যোত,—ক্ষুদ্র, হীনভাস, ঘৃণিত, সহজে হন্য, সর্বদা হত—তুমিই সেই অন্ধকার দুর্দ্দিনে বর্ষাবৃষ্টিতে দেখা দাও। তুমিই অন্ধকারে আলো। আমি তোমাকে ভাল বাসি।

আমি তোমায় ভাল বাসি, কেন না, তোমার অল্প, অতি অল্প আলো আছে—আমিও মনে জানি, আমারও অল্প, অতি অল্প আলো আছে—তুমিও অন্ধকারে, আমিও ভাই, ঘোর অন্ধকারে। অন্ধকারে সুখ নাই কি? তুমিও অনেক অন্ধকারে বেড়াইয়াছ—তুমি বল দেখি? যখন নিশীথমেঘে জগৎ আচ্ছন্ন, বর্ষা হইতেছে ছাড়িতেছে, ছাড়িতেছে হইতেছে; চন্দ্র নাই, তারা নাই, আকাশের নীলিমা নাই, পৃথিবীর দীপ নাই—প্রস্ফুটিত কুসুমের শোভা পর্য্যন্ত নাই—কেবল অন্ধকার, অন্ধকার! কেবল অন্ধকার আছে—আর তুমি আছ—তখন, বল দেখি, অন্ধকারে কি সুখ নাই? সেই তপ্ত রৌদ্রপ্রদীপ্ত ককর্ষণ স্পর্শপীড়িত, কঠোর শব্দে শব্দায়মান অসহ্য সংসারের পরিবর্তে, সংসার আর তুমি! জগতে অন্ধকার; আর মর্দিত কামিনীকুসুম জলনিষেকতরুণায়িত বৃক্ষের পাতায় পাতায় তুমি! বল দেখি ভাই, সুখ আছে কি না?

আমি ত বলি আছে। নহিলে কি সাহসে, তুমি ঐ বন্যাঙ্কারে, আমি এই সামাজিক

বিশ্বকম রচনাবলী

অন্ধকারে এই ঘোর দুর্দ্দিনে ক্ষুদ্র আলোকে আলোকিত করিতে চেষ্টা করিতাম? আছে—অন্ধকারে মাতিয়া আমোদ আছে। কেহ দেখিবে না—অন্ধকারে তুমি জ্বলিবে—আর অন্ধকারে আমি জ্বলিব; অনেক জ্বালায় জ্বলিব। জীবনের তাৎপর্য বৃদ্ধিতে অতি কঠিন—অতি গঢ়, অতি ভয়ঙ্কর—ক্ষুদ্র হইয়া তুমি কেন জ্বল, ক্ষুদ্র হইয়া আমি কেন জ্বলি? তুমি তা ভাব কি? আমি ভাবি। তুমি যদি না ভাব, তুমি সুখী। আমি ভাবি—আমি অসুখী। তুমিও কীট—আমিও কীট, ক্ষুদ্রাধিক ক্ষুদ্র কীট—তুমি সুখী,—কোন্ পাপে আমি অসুখী? তুমি ভাব কি? তুমি কেন জগৎসবিতা সূর্য্য হইলে না, এককালীন আকাশ ও সমুদ্রের শোভা যে সুধাকর, কেন তাই হইলে না—কেন গ্রহ উপগ্রহ ধূমকেতু নীহারিকা,—কিছু না হইয়া কেবল জোনাকি হইলে, ভাব কি? যিনি এ সকলকে সৃজন করিয়াছেন, তিনিই তোমায় সৃজন করিয়াছেন, যিনিই উর্হাদিগকে আলোক দিয়াছেন, তিনিই তোমাকে আলোক দিয়াছেন—তিনি একের বেলা বড় ছাঁদে—অন্যের বেলা ছোট ছাঁদে গাড়িলেন কেন? অন্ধকারে এত বেড়াইলে, ভাবিয়া কিছু পাইয়াছ কি?

তুমি ভাব না ভাব, আমি ভাবি। আমি ভাবিয়া স্থির করিয়াছি যে, বিধাতা তোমায় আমায় কেবল অন্ধকার রাত্রের জন্য পাঠাইয়াছেন। আলো একই—তোমার আলো ও সূর্য্যের—উভয়ই জগদীশ্বরপ্রেরিত—তবে তুমি কেবল বর্ষার রাত্রের জন্য; আমি কেবল বর্ষার রাত্রের জন্য। এসো কাঁদি।

এসো কাঁদি—বর্ষার সঙ্গে, তোমার আমার সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ কেন? আলোকময়, নক্ষত্রপ্রোজ্জ্বল বসন্তগগনে তোমার আমার স্থান নাই কেন? বসন্ত চন্দ্রের জন্য, সুখীর জন্য, নিশ্চিন্তের জন্য;—বর্ষা তোমার জন্য, দুঃখীর জন্য, আমার জন্য। সেই জন্য কাঁদিতে চাহিতে—ছিলাম—কিন্তু কাঁদিব না। যিনি তোমার আমার জন্য এই সংসার অন্ধকারময় করিয়াছেন, কাঁদিয়া তাঁহাকে দোষ দিব না। যদি অন্ধকারের সঙ্গে তোমার আমার নিত্য সম্বন্ধই তাঁহার ইচ্ছা, আইস, অন্ধকারই ভালবাসি। আইস, নবীন নীল কাদম্বিনী দেখিয়া, এই অনন্ত অসংখ্য জগন্ময় ভীষণ বিশ্বমন্ডলের করাল ছায়া অনুভূত করি; মেঘগজ্জর্ন শুনিয়া, সর্ব্বধ্বংসকারী কালের অবিশ্রান্ত গজ্জর্ন স্মরণ করি;—বিদ্যুন্দাম দেখিয়া কালের কটাক্ষ মনে করি। মনে করি, এই সংসার ভয়ঙ্কর ক্ষণিক,—তুমি আমি ক্ষণিক, বর্ষার জন্যই প্রেরিত হইয়াছিলাম; কাঁদিবার কথা নাই। আইস, নীরবে জ্বলিতে জ্বলিতে, অনেক জ্বালায় জ্বলিতে জ্বলিতে সকল সহ্য করি।

নাহিলে, আইস, মরি। তুমি দীপালোক বেড়িয়া বেড়িয়া পুড়িয়া মর, আমি আশারূপ প্রবল প্রোজ্জ্বল মহাদীপ বেড়িয়া বেড়িয়া পুড়িয়া মরি। দীপালোকে তোমার কি মোহিনী আছে জানি না—আশার আলোকে আমার যে মোহিনী আছে, তাহা জানি। এ আলোকে কত বার ঝাঁপ দিয়া পড়িলাম, কত বার পুড়িলাম, কিন্তু মরিলাম না। এ মোহিনী কি, আমি জানি। জ্যোতিষ্মান্ হইয়া এ সংসারে আলো বিতরণ করিব—বড় সাধ; কিন্তু হয়! আমরা খদ্যোত! এ আলোকে কিছুই আলোকিত হইবে না! কাজ নাই। তুমি ঐ বকুলকুঞ্জকিসলয়কৃত অন্ধকারমধ্যে, তোমার ক্ষুদ্র আলোক নিবাও, আমিও জলে হউক, স্থলে হউক, রোগে হউক, দুঃখে হউক, এ ক্ষুদ্র দীপ নিবাই।

মনুষ্য খদ্যোত।

বাল্যরচনা

[এই কবিতাগুলি লেখকের পঞ্চদশ বৎসর বয়সে লিখিত। লিখিত হওয়ার তিন বৎসর পরে মর্দিত ও প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত হইয়া বিক্রোতার আলমারীতেই পচে—বিক্রয় হয় নাই। তাহার পর আর এ সকল পুনর্মর্দিত করিবার যোগ্য বিবেচনা করি নাই, এখনও আমার এমন বিবেচনা হয় না যে, ইহা পুনর্মর্দিত করা বিধেয়। বাল্যকালে কিরূপ লিখিয়াছিলাম, তাহা দেখাইয়া বাহাদুরী করিবার ভরসা কিছুমাত্র নাই; কেন না, অনেকেই অল্প বয়সে এরূপ কবিতা লিখিতে পারে। যাহা অপাঠ্য, তাহা বালক-প্রণীত হউক বা বৃদ্ধপ্রণীত হউক, তুল্যরূপে পরিহার্য্য। অতএব কিছু পরিবর্তন না করিয়া “ললিতা” নামক কাব্যখানি পুনর্মর্দিত করিতে পারিলাম না। “মানস” নামক কাব্যখানিতে পরিবর্তন বড় সহজ নহে, এ জন্য সে চেষ্টা করিলাম না। তথাপি সামান্যরূপ পরিবর্তন করা গিয়াছে।]

ললিতা

ভৌতিক গল্প

“O Love! in such a wilderness as this.
Where transport with security entwine.
Here is the Empire of thy perfect bliss.
And here art thou a God indeed divine.”

Gertrude of Wyoming.

“But mortal pleasure, what art thou in truth!
The torrents’ smoothness ere it dash below.”

Ibid.

প্রথম সর্গ

১

মহারণ্যে অন্ধকার, গভীর নিশায়
নির্মল আকাশ নীলে, শশী ভেসে যায় ॥
কাননের পাতা ছাদ, নাচে শশিকরে ।
পবন দোলায় তায় সুমধুর স্বরে ॥
নীচে তার অন্ধকারে, আছে ক্ষুদ্র নদী ।
অন্ধকার, মহাস্তর, বহে নিরবাধ ॥
ভীম তরুশাখা যথা পিড়িয়াছে জলে,
কল কল করি বারি সুরবে উছলে ॥
আঁধারে অস্পষ্ট দেখি, যেন বা স্বপন !
কলিকান্তবকময় ক্ষুদ্র তরুগণ ॥
শাখার বিচ্ছেদে কভু, শশধরকর,
স্থানে স্থানে পিড়িয়াছে, নীল জলোপর ॥
ঘোর স্তর নদীতটে : শূন্য ক্ষণে ক্ষণে,
কোন কীট যায় আসে নাড়া দিয়ে বনে ॥
শূন্য অন্ধকার মাঝে, অলক্ষ্য শরীর !
কোন হিংস্র পশু ছাড়ে, নিশ্বাস গভীর ॥
অসংখ্য পত্রের শূন্য, ভীষণ মর্মর !
আর শূন্য শূন্য এক, সঙ্গীতের স্বর ॥
গভীর সঙ্গীত সেই! ভাসে নদী দিয়ে ।
ভাঙ্গিল গভীর স্তর স্বরে শিহরিয়া—

কখন কোমল স্থির করুণার স্বরে,
যেন কোন বিরহিণী কেঁদে কেঁদে মরে ॥
শূন্যে তা মনে হয়, ঈষৎ আভাস,
যেন কত সুখস্বপ্ন, হয়েছে বিনাশ;
কি কারণে দুঃখোদয় কিসের স্মরণে,
কিছুই বৃষ্টি না তবু, উচাটন মনে ॥
ফুলিয়ে উঠেছে ধ্বনি, স্থির শূন্য কেটে।
ইচ্ছা করে গগনেতে উঠে যাই ফেটে ॥
ছেঁড়ে হৃদয়ের ডোর গভীর যাতনে ।
ইচ্ছা করে গলি গিয়ে মিশি গান সনে ॥
আরে যদি সঙ্গীতের দেহ দেখা পাই!
যতনেতে আলিঙ্গিয়া, মোহে মরে যাই ॥

২

নদীতীরে বৃক্ষ নাহি ছিল এক স্থানে ।
দীর্ঘ তুণে চন্দ্রকর জ্বলিছে সেখানে ॥
ছোট গাছে তারামত ফুল্ল পুষ্পদলে ।
স্থির তার প্রতিরূপ স্থির নদীজলে ॥
সুখস্বপ্নে যেন তারা, নিদ্রাভরে হাসে ।
গগন গম্বুজে মরে, সুখময় বাসে ॥
সেই স্থানে বসি এক নারী একাকিনী।
ফুলহীন বনে যেন স্থলকর্মলিনী ॥

বিক্রম রচনাবলী

মিশেছে সে চন্দ্রকায়; ভাবে তায় চিত্ত
শুদ্ধ সে স্বপ্নের ছায়া, অসত্য অনিত্য ॥
যৌবন আশার সম ফুল্ল রূপ তার ।
দেখিয়া ফিরালে আঁখি, দেখি ফিরে বার ॥
স্থিরা ধীরা সুকোমলা বিমলা অবলা ।
সবে নব পদ্রিতেছে যৌবনের কলা ॥
মোহন সঙ্গীতে মন বেঁধেছে যতনে ।
প্রেম যেন শূন্যতেছে আশার বচনে ॥
বদনে ললিত রেখা কত হয়ে যায় ।
রক্তিম নীরদ যেন শারদ সন্ধ্যায় ॥
গলিল নয়নপদ্ম; মৃদ্ধ তার মন,
প্রাণ মন জ্ঞান ধন জীবন যৌবন,
সকল করেছে যেন গীতে সমর্পণ ॥
কোথা হতে আসে সেই সুমধুর গান?
কেন তাতে এত আশা? কে হরিল প্রাণ?

৩

ললিতা তাহার নাম—রাজার নন্দিনী ।
জননী না ছিল তার, বিমাতা বাঘিনী ।
রাজা বড় নিষ্ঠুর সতত দেয় জ্বালা;
গোপনে কতই কাঁদে মাতৃহীনা বালা ।
দুর্জনের সাথে তার বিবাহ সম্বন্ধ—
শূনে কেঁদে কেঁদে তার, চক্ষু যেন অন্ধ ।
মম্বথ নামেতে যুবা, সুঠাম সুন্দর,
বচনে অমিয় করে নারীমনোহর ।
মোহিল ললিতাচিত তার দরশনে ।
গোপনে বিবাহ হৈল মিলিল দুজনে ।
জানিল বিবাহবাস্তা দুরন্ত রাজন্ ।
কন্যারে ডাকিয়া বলে পরুষ বচন ॥
এ পুরী আঁধার কেন কর কলঙ্কিনী ।
শীঘ্র যাও দেশান্তরে না হতে যামিনী ॥
কাল যদি দেখি তোরে, বধিব পরাণ ।
ভয়ে বালা সেই দণ্ডে করিলা প্রস্থান ॥
মম্বথ লইয়া তারে তুলিল নৌকায় ।
ভয়ে ভীত দুই জনে নদী বেয়ে যায় ॥
পাথিমধ্যে দস্যুদল আসিয়া রোধিল ।
ললিতারে কাড়ি লয়ে বনে প্রবেশিল ॥
অলঙ্কার কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দিল তারে ।
ললিতা একাকী ফিরে নদী ধারে ধারে ॥
কোথায় মম্বথ গেল, তারি কোন ভিতে ।
রজনী গভীরা তবু ভয় নাই চিতে ।
এমন সময়ে শোনে সঙ্গীতের ধ্বনি ।
মম্বথ গাইছে গীত বদ্বিল অর্মানি ॥
বদ্বিল সঙ্কেত করে সেই প্রিয়জন,
নদীতীরে চন্দ্রালোকে বসিল তখন ।

৯৬৬

তীরেতে লাগিল তারি অতিদ্রুত হয়ে ।
দেখিতে দেখিতে দূরে দূরের হৃদয়ে ॥
কতই আদর করে, পেয়ে সোহাগিনী ।
কতই রোদন করে কাতরা কামিনী ॥

৪

তখন ললিতা কয়, “আর জ্বালা নাহি সর,
পাড়িয়া দস্যুর হাতে, যে দুঃখ হে পেয়েছি ।
কাড়ি নিল অলঙ্কার, লাঞ্ছনা কত আমার,
তীরে তীরে কেঁদে কেঁদে এতদূর এয়েছি ॥
দেখা হবে তব সাথ, হেন নাহি জানি নাথ,
দয়া করি কালী আজি রেখেছেন চরণে ॥”
পতি বলে “শূন্য প্রিয়ে, তোমা ধনে হারাইয়ে,
মরিব বলিয়ে আজি, প্রবেশিন্দু কাননে ॥
দেখিলাম দুই ধার, মহারণ্যে অন্ধকার,
নীরবে নিম্মলা নদী, তার মাঝে বহিছে ।
ভীষণ বিজন স্তম্ভ, নাহি জীব নাহি শব্দ,
তরুদলে ঢলে জলে, ঘুমাইয়া রহিছে ॥
যে স্থির অরণ্য নদী, যেন বা সৃজনাবধি,
কোন জীব কোন কীট, তথা নাহি নড়েছে ।
প্রথমে যে ছিল যথা, এখনও রয়েছে তথা,
মৃত্যুর ভীষণ ছায়া, সম্বন্ধানে পড়েছে ॥
ভয়েতে গগন পানে, চাহিলে ভুলিন্দু প্রাণে,
বিমল সুনীলাকাশে, শশী হেসে যেতেছে ।
ভাবিলাম প্রকৃতির, সকলি গভীর স্থির,
শুদ্ধ এ হৃদয় কেন, এত দুঃখ পেতেছে !
মরি যদি পারিতাম, গোলে জল হইতাম,
এ স্থির সলিলে মিশে, হৃদয় ঘুমাইত ।
তথা রিপু চিন্তাহীন, রহিতাম চিরদিন,
ললিতার দুঃখ তবে, কিসে হৃদে আইত ॥

৫

“ভাবি এ প্রকার, ছাড়িতে হৃৎকার,
কাঁপিল কানন স্তম্ভ ।
শিহরি অন্তরে, কি জানি কি ডরে,
কাঁপে হৃদি শূনি শব্দ ॥
হৃতাশ নাশিতে, সঙ্কেত বাঁশীতে,
গায়িলাম দুখ যত ।
বাজাইয়া তায়, মরি লো তোমায়,
সঙ্কেত করিছি কত !
একবার যাই, মুরলী বাজাই,
আপনি নয়ন ঝোরে ।
গলে হৃদি দুখে, এক মাত্র সুখে;
বাঁশী কি মোহিল মোরে ।
গাই পরস্ফণে, দেখি নিশাবনে,
একাকিনী রূপবতী ।

হয়ে চমকিত, তরি এই ভীত,
লইলাম শীঘ্রগতি ॥
কে জানে কেমনে, আশা এলো মনে,
আমারি ললিতা হবে।
কত ভাগ্য ধনি, পাই হারা মণি,
আর ছাড়া নাহি হবে?"

৬

ললিতা

“নারে প্রাণ নারে, আর হে তোমারে,
আঁখি ছাড়া করিব না।
রহিব দুজনে, গোপন কাননে,
দেখিবে না কোন জনা ॥
কাজ নাই দেশে, তথা শূদ্র ঘেষে,
হেন প্রেম নাশ করে।
গঙ্গন যন্ত্রণা, কলঙ্ক রটনা,
মিলন না হয় ডরে ॥
যেখানে প্রণয়, হৃদয়ে না রয়,
যেখানে তোমা না পাই।
সে দেশ কি দেশ, সে গৃহে বিদ্বেষ,
কখন যেন না যাই ॥
এখানে মন্মথ, প্রণয়ের পথ,
কলঙ্কের কাঁটা হীন।
হেরি তব মুখে, নিরমল সুখে,
স্বর্গসুখে হব লীন ॥
জ্বালা পৃথিবীর, সব হবে স্থির,
শূদ্র সুখময় মন।
লইয়ে মন্মথ, যাহা মনোমত,
করিব সকল ক্ষণ ॥”

মন্মথ

“হে বিধি হে বিধি, কর কর বিধি,
এই কপালে আমার।
বল তার চেয়ে, স্বর্গপদ পেয়ে,
কি সুখ আছে হে আর ॥
বিচ্ছেদ যাতনা, দিব না দিব না,
এ জনমে প্রেমসীরে।
কাল পূর্ণ হলে, সুখে তব কোলে,
মরে যাব ধীরে ধীরে ॥”

দ্বিতীয় সর্গ

১

মরি প্রেম যার মনে, সে কি চায় রাজ্যধনে,
প্রিয়মুখ ত্রিসংসার তায়।
হৃদে তার যে রতন, আলো করে ত্রিভুবন,
অন্য মণি নিবায় বিভায় ॥

এক মোহে সদা মত্ত, না জানে আপনি মর্ত্য,
যাহা দেখে তাই প্রেমাকুল।
রবি শশী তারাকাশ, পয়োদ পবনশ্বাস,
সাগর শিখর বনফুল ॥
যেন লক্ষ বিদ্যাধরে, সদা কণ্ঠে গান করে,
কি মধুর শব্দহীন ভাষা।
হেরিয়ে সামান্য কলি, নয়ন সলিলে গলি,
উছলে অন্তরে ভালবাসা ॥
প্রেমে যার মন বাঁধা, না পারে দিবারে বাধা,
সমুদ্র শিখর নদী বনে।
তবে যদি করে বিধি, চির বিরহের বিধি,
তবু স্বর্গ মনের মিলনে ॥
কলঙ্ক বিপদ ক্রেশ, ঝটিকার ধরি বেশ,
শিরোপরি গরজয়ে যত।
আশ্রয় করিয়া আশা, প্রণয়ীতে ভালবাসা,
প্রণয়ীর প্রাণে বাড়ে তত ॥
জ্বালা সয় নিরবিধি, সেও ভাল পায় যদি,
একবার আঁখির মিলন।
দুঃখের গভীর বনে, সেই স্বপ্নে সুখ মনে,
প্রেম রীতি কে জানে কেমন ॥

২

চলিল চরণে চন্দ্রবদনী।
ঢলিয়ে ঢলিয়ে মন্দচরণী।
উষার প্রথর তারকা ধনী।
চলিল গজেশগামিনী ॥
উভয়ে মরেছে হৃদি যাতনে।
উভয়ে পেয়েছে প্রাণরতনে।
কাঁধে কাঁধে ধরি চলে কাননে।
গভীর নীরব যামিনী ॥
শিরোপরে শাখা বিনান ঘন।
আসিবে কেমনে শশিকিরণ।
তরল তিমির ভীষণ বন।
দেখিয়া শিহরে কামিনী।
আঁধার আকাশে নক্ষত্রাবলি।
তেমনি কাননে কুসুম কলি।
আমোদে হৃদয়ে যেতেছে গলি।
সে নব নীরদ দামিনী ॥
ভীষণ তিমিরে ভীষণ স্থির।
মাঝে মাঝে খসে পত্র শাখীর।
ধীরে ধীরে ঝরে নিব্বর নীর।
আঁধারে নিরখে রঞ্জিনী ॥
লাগিয়া নিব্বরে ঈষৎ আলো।
দেখে ফুলময় সে জল কালো।
আঁধারে কুসুম পরশে গাল।
শিহরে সরোজ অঙ্গিনী ॥

বঙ্কিম রচনাবলী

যেতে পতি সনে চন্দ্রবদনী
মরি কি সঙ্গীত শুনিল ধনী।
ললিত মোহন গভীর ধনি।
নির্ঝর নিনাদ সঙ্গিনী॥
নীরব কানন উঠে শিহরি।
শিহরে দৃজনে দৃজনে ধরি।
হৃদয়ে হৃদয়ে গাঁথিল মরি।
বাঁধিল মনঃকুরঙ্গিনী॥

৩

শুক বনে অঙ্ককারে, ভেসে ভেসে চারি ধারে
মোহে তায় দুই জনে, আপনাকে ভুলিল।
দৃজনার মুখ চেয়ে, দৃজনারে বৃকে পেয়ে,
প্রেম আর সেই গানে, এক হয়ে মিলিল॥
জ্ঞান পেয়ে কহে কেন, এ গহনে ধনি হেন,
এ ধনি দেবের যেন, চল দেখি যাইয়ে।
আ মরি! কহিছে ধনী, শূনি নাই হেন ধনি,
হরিল কানন ভয়, হৃদয় নাচাইয়ে॥
বনমাঝে যায় যত, ধনি সূনিকট তত,
দেখে শেষে তরু কত, কুঞ্জ এক ঘেরেছে।
স্থির শোভা কিবা তার, বৃঝি প্রেম আপনার,
সাধের প্রমোদাগার, তার মাঝে করেছে॥

৪

এ কুঞ্জ হইতে যেন আসিছে সঙ্গীত।
হেন ভাবি দুই জনে আইল ত্বরিত॥
নিকুঞ্জ প্রবেশ মাত্র থামিল সে ধনি।
কানন পূর্বে মত নীরব অমনি॥
আশ্চর্য হইয়া দোঁহে রহিলেক স্থির।
দেখিতেছে শোভা কুঞ্জ গগন শশীর॥
কহে নাই বন কিম্বা গগন ভিতর।
তথ্যপি কেমনে এলো এ মধুর স্বর॥
ললিতার জ্ঞান হলো প্রবেশ সময়।
যেন কোন স্বপ্ন-দৃষ্ট মত শোভাময়
দুই মনোরম রূপ নারী নরাকারে,
দেখিল চকিত মত নিকুঞ্জের ধারে॥
মন্মথ মোহিনী প্রতি কহিছে হে প্রিয়ে।
দেখি কালিকার দিন এখানে রহিয়ে॥
আজিকার মত যদি কালিকায় হবে।
দেব কি মানব যক্ষ জানা যাবে তবে॥
আজিকার মত এসো রই এই স্থানে।
এমন মোহন স্থান পাবে কোন্‌স্থানে॥

৫

মোহিনী মন্মথ সনে মনোমত স্থলে।
এমন যামিনী ষাপে এমন বিরলে॥

এমন বিপদহীন বিজন কানন।
এমন বিরল প্রেম গভীর এমন॥
কে জানে সে সত্য কি না স্বপন নিশার।
বনে এলে কে জানিত হেন হবে তার॥
রবে না এমন সুখ মানব কপালে।
ভাবিয়ে বিচল চিত্ত এ সুখের কালে॥
এই ভয় মনোমাঝে হয় আর যায়।
যেন কোন মেঘ-ছায়া পড়িছে ধরায়॥
এই মত গেল নিশি নিকুঞ্জ মন্দিরে।
সে দিন কাটালে সুখে নিশি এলো ফিরে॥

৬

কাননে যামিনী পরকাশে, নিরমল নীলে শশী
ভাসে।
নিশীথে নিদ্রিত বন, নিদ্রা যায় মেঘগণ,
নিদ্রা যায় বাতাস আকাশে॥
উঠিল নীরবে আর্চস্বিত, প্রেমময় ললিত সঙ্গীত।
স্থির শূন্যে ভেসে যায়, গগন গহন তায়,
শিহরিছে পূলক পূরিত॥
যেন কেহ বিরহের জ্বরে, প্রেমময়ী পরশে শিহরে।
নাথহৃদে ছিল ধনী, গলিল শূনিয়ে ধনি,
মোহে মিশে প্রাণে প্রাণেশ্বরে॥
গভীর নিশ্বাসে থামে গান, অবকাশে তারা পায়
জ্ঞান।

জানিল সে কালিকার, সেই ধনি পূর্নস্বর,
হেথা হতে গেছে অন্য স্থান॥
প্রেমসীরে কহিছে মন্মথ, ধনি যে জুড়ায়
শ্রুতিপথ।

এখানে গেয়েছে কাল, কার্মিনী লো কি কপাল!
আজ ধনি অন্য স্থান গত॥
আজি গীত গাইছে যথায়, চল মোরা যাইব তথায়।
কে গায় কিসের তরে, কেন গায় স্থানান্তরে,
করি চল যাহে জানা যায়॥
নাথ সনে লক্ষ্য করি ধনি, চলে বনে শশাঙ্কবদনী।
ঘন গাঁথা তরুদলে, ঘন তম তার তলে,
ভয়ঙ্কর নীরব কেমনি॥
পূর্নস্বর নিকুঞ্জ মন্ডলে, আসিল সে প্রেমিক
যুগলে।
পূর্নস্বর স্বপ্নসম, দুই রূপ নিরূপম,
যথা হইতে দ্রুত গেল চলে॥

৭

কাঁপিয়ে বিষম ভয়ে বলে হাঁ রে বিধি।
এমন সুখেতে কেন হেন কর বিধি॥
পৃথিবীতে কোন স্থান সুখের কি নয়?
কানন বাসেও কি গো বিপদ নিশ্চয়॥

দেবতা কুপিত বলি দ্বজনাতে ভীত ।
কি হবে তৃতীয় রাতে দেখিতে চিস্তিত ॥
তৃতীয় নিশিথে গীত আর এক স্থানে ।
পূর্বমত তথা গিয়া ভয়ে মরে প্রাণে ॥
সেই মত পেলে ভয় চতুর্থ রজনী ।
পঞ্চম রজনীযোগে কোথায় সে ধর্নি ?

৮

তমিমা পঞ্চম নিশা, গগন মণ্ডলে ।
ভীষণ আঁধার বাসি, ঘন বনতলে ॥
নীরব নিম্পন্দ তম, সঙ্গীতের আশে ।
সময় হইল তবু, সে ধর্নি না আসে ॥
বিকট আননে ভয়, ঘুমায় কাননে ।
দেখে স্তব্ধ ম্পন্দহীন, যত তরুগণে—
পাপাক্র-তিমিরময়, যেন কার মন,
নীরবে করাল কার্য, করিছে কল্পন ॥
শুদ্ধ শুদ্ধ পাতা খসি, মাঝে মাঝে পড়ে ।
যথা পড়ে তথা পচে, নাহি আর নড়ে ॥
পাইয়া অলক্ষ্য লক্ষ্য, কুসুমের বাস ।
আমোদে আঁধার দেহ, না ছাড়ে নিশ্বাস ॥
পত্র-চন্দ্রাতপ তলে, ক্ষুদ্র খাল চলে ।
নাহি দেখা যায় ভাল, নাহি শব্দ জলে ॥
ঘুমায়ে পড়িয়ে জলে, পুষ্পবৃক্ষাবলী ।
আঁধারে কলিকাগুচ্ছ, নিরখি কেবলি ॥
নীরবে ঝরিয়া ফুল, স্তব্ধে ভেসে যায় ।
পতিহীনা বিরহীর, প্রেম আশা প্রায় ॥
শুদ্ধ ফল খসি জলে, পড়ে একবার ।
অর্নি চমকে বুক, মন্থমথ বামার ॥
অন্ধকার মাঝে আলো, দুয়ের বদন ।
বরষার শশী যেন, মেঘে আচ্ছাদন ॥
ভীম স্তব্ধে ভয়ে ভীত, বাসি তারা তথা ।
উড়ু উড়ু করে প্রাণ, নাহি সরে কথা ॥
ভাবে আজি কেন, এত কাঁদিছে অন্তর ।
বলিতে বলিতে নারে, হৃদি গরগর ॥
সুখের কাননে আজি, কেন কাল ভাব ।
ভীষণ স্বপন যেন, দেখিছে স্বভাব ॥
আপনি নয়ন কেন, ঝরে অকারণ ।
বুঝি আজি ছেড়ে যাবে, জীবন রতন ॥
হৃদে ধরি পরস্পরে, মৃথপানে চায় ।
কেঁদে যেন কি বলিবে, বলিতে না পায় ॥
ললিতা লুকাল মাথা, প্রাণনাথ কোলে ।
কাঁদিয়ে মূছায় পতি, প্রিয়া আঁখিজলে ॥

৯

এখনো এলো না কেন সঙ্গীতের ধর্নি ।
ভীষণ নীরব! হা রে! আছে কি ধরণী?

অকস্মাৎ কোথা হয় গভীর গজ্জর্ন ।
কাঁপিল গভীর বন কাঁপিল দ্বজন ॥
অশ্রুত নিনাদ উড়ে যায় বন দিয়ে ।
অন্ধকার ভীমতর হইল আসিয়ে ॥
ভীমতর নাদে যেন কাঁপে নভ হৃদি ।
কাঁদিয়া উঠিল দোঁহে, “হা বিধি! হা বিধি!”

১০

গভীর জলদ নাদ, গড়ায় আকাশ ছাদ,
থেকে থেকে উচ্চতর স্বনে ।
পবন করিছে জোর, যেন সাগরের সোর,
হৃৎকারে গরজে প্রাণপণে ॥
বারেক চঞ্চলাভায়, দেখি নীল মেঘ গায়,
কটা মাথা নাড়ে ক্ষিপ্তবন ।
পাতা উড়ে ঢাকে ঘনে, পড়িতেছে ঘোর স্বনে,
বড় বড় মহীরুহগণ ॥
ঘোরতর চীৎকার, লক্ষ লক্ষ অনিবার,
মানুষ চিবায় ভূতগণে ।
সমুদ্র সমান সোরে, বরিষা আছাড়ে জোরে
রেগে রেগে গজ্জর্ন বায়ু সনে ॥
উপরি উপরি ধর্নি, আছাড়ে সহস্রাশনি,
খণ্ডে খণ্ডে ছেঁড়ে বা গগন ।
বিদারিয়ে বিটপীরে, বজ্রাঘ্নি পোড়ায় শিরে,
কাঁদে যত সিংহ ব্যাঘ্রগণ ॥

১১

ভীষণ নীরব! যেন মরেছে ধরণী ।
হে ধাতঃ কাঁপালো স্তব্ধ আবার কি ধর্নি ॥
বলিছে গভীর স্বরে, “রে নরষুগল ।
দেবের নিকুঞ্জ এসে পাও কর্মফল ॥”
ফিরে বার ঘর ঘর, গরাজিল জলধর,
মাতিল মরুৎ ফিরে বার ।
চেচায় অর্শনি ঘন, ভীমবলে তরুগণ,
মত্ত শির নাড়িছে আবার ॥

১২

থামিল ঝটিকারণ, হলো নিশাশেষ ।
শ্বেতমেঘময়াকাশে, উঁদিল নিশেষ ॥
জলে করে জলময়, কানন নিকুঞ্জ ।
তরু লতা তৃণ ভূম, পুষ্পলতা পুঞ্জ ॥
ফুলময় ছোট খাল বিমল চঞ্চল ।
ছায়াকারী শাখা হতে ঝরে বিন্দুজল ॥
উজ্জ্বল পর্দালিনতলে ম্লান তারা মত্ত ।
মরিষে রয়েছে ঝড়ে ললিতা মন্থমথ ॥

বিক্রম রচনাবলী

মানবের কি কপাল! সংসার কি ছার!
 বহিতে জীবন ভার কে চাহিবে আর?
 নাথভুজে মাথা দিয়ে পড়েছে মোহিনী।
 মৃখে মৃখে কাঁদে যেন দুটি সরোজনী ॥
 ললিতার মৃখশশী ভিজে বরষায়।
 সরোজ শিশির মাথা মাটিতে লোটার ॥
 শীতল ললাটে জলে জ্বলে শশধর।
 জলে ভিজে পড়ে আছে অলকানিকর ॥
 ফুটায় কবরী চারু, দীর্ঘ তৃণোপরে।
 মম্মথ রয়েছে তবু নাহি তুলে ধরে ॥
 এখনো সুস্থির মৃখ রূপের ছায়ায়।
 প্রাণ গেল তবু রূপ নাহি ছাড়ে তায় ॥
 সেরূপ ঘুমায় যেন, সন্ধ্যা ধরাপরে;
 ভয়ে প্রকৃতির যেন নিশ্বাস না সরে ॥
 স্থির শ্বেত ভাল সেই, নহে নিরমল।
 দেখিলে শিহরি হয় শরীর বিকল ॥
 পড়ি তায় মরণের, ভয়ঙ্কর ছায়া।
 চন্দ্রিকায় যেন কালো, কাদম্বিনী কায়া ॥
 যেন চন্দ্রকরে স্থির বারিধি বিস্তার।
 পড়ে তায় শিখরীর ছায়া অন্ধকার ॥
 কোমল পল্লব নীল মৃদেছে নয়ন।
 এরি কি কটাক্ষে ছিল সুখের স্বপন?
 এখনি কেঁদেছে কত কাঁদবে না আর।
 সফরী সমান নাহি নাচিবে আবার ॥
 বৃষ্টি তার প্রিয় তারা মম্মথ বদনে।
 চাহিতে চাহিতে বৃষ্টি মৃদেছে মরণে ॥
 মানবের কি কপাল! এই সে হৃদয়।
 কোথা তার প্রেম মোহ কোথা আশা ভয়!
 বিবাস বিমল পড়ি শশীর কিরণে।
 ভিতরে নিম্পন্দ যেন জগৎ এক্ষণে ॥
 এক বৃন্তে দুটি ফুল মৃখে মৃখ দিয়ে।
 সে হৃদি কুসুমাসনে পড়েছে ছিঁড়িয়ে ॥
 তেমনি একাক্ষে এরা থেকে চিরকাল।
 মরিল অধরাধরে কি সুখ কপাল ॥
 যার লাগি ছিল বেঁচে পারিত বাঁচতে।
 তারি সনে মরে গেল তাহারি হৃদিতে ॥
 সুখের কপাল! কত সংসার যাতনা।
 বিকার বিয়োগ শোক সহিতে হলো না ॥
 ছিঁড়িয়াছে ভীম ঝড়ে একই প্রহারে।
 কাটে নি ক্রমশঃ কীট, প্রাণের সদ্বাসরে ॥

গভীর গোপনগামী দুখ-স্রোতোপরে।
 পড়ে নাই ভেসে ভেসে ডুবিতে সাগরে ॥
 যা হবার হইয়াছে এই মাত্র স্থির।
 এই আছে অবশেষ, সে প্রেমশশীর ॥
 ওইখানে দেহাম্বুজ মাটি হয়ে যাবে।
 জানিবে কে? দেখিবে কে? কেঁদে কে ভিজাবে?

চন্দ্রিকার নীলাকাশ গায়, দুটি দেবদারু দেখা যায়।
 ভীম বনে তলে তার, অতি শুদ্ধ অনিবার,
 কাল যেন প্রহরী তাহার ॥
 সেই নদী সেই তরুবরে, দুখময় তর তর স্বরে,
 বারেক না ক্লান্ত আছে, নক্ষত্রমণ্ডলী কাছে,
 অদ্যাপি বিলাপ কেন করে ॥
 গভীর সে ধ্বনি নিরবধি, যেন বা সন্ধ্যায় শরমদী।
 শুনিলে শিহরি স্মরি, মেধার মারুতোপরি,
 জানিনে যেতোছি কি জলধি ॥
 শ্যামলা গুণ্ধিনী চির নব, ব্যাপিয়াছে সেই
 স্থান সব।
 তারাফুল তারা ধরে, অনন্ত আমোদ করে,
 সুধাপানে শিহরিছে নভ ॥
 এ কাননে গভীর এমন, কে করে রে বাঁশরী বাদন।
 অনিবার নিশাভাগে, যেন কার অনুরাগে,
 গায় সাধে মনের যাতন ॥
 মোহমন্ত্রে তায় স্থির বন, শোনে ধ্বনি-বিহীন
 স্পন্দন।
 পত্রটি নাহিক সরে, যেতে যেতে শূনে স্বরে,
 নাহি সরে নীরধরগণ ॥
 চন্দ্রিকার শূন্য কুঞ্জোপরে, মোহন সপ্নজ শোভাধর।
 কারা যেন শূনে তায়, উড়ে নীল নভ গায়,
 মর্ম্মরিত প্রচুর অম্বর ॥
 তাহে কত সুধাবাস ঝরে, কুসুম বরিষে কুঞ্জোপরে।
 ভাঙ্গে স্বপ্ন উষা আসি, অমনি নীরব বাঁশী,
 গল্যে যায় সে রূপ নিকরে ॥
 ধূলি হয়ে এই কুঞ্জবনে মম্মথ-মোহিনী নাথ সনে।
 প্রতি নিশি এই মত, হয় যথা নিদ্রাগত,
 ললিতা মম্মথ দুই জনে ॥

মানস

ফলানি মূলানি চ ভঙ্কয়ন্ বনে
গিরীংশ্চ পশ্যান্ সরিতঃ সরাংসি চ।
বনং প্রবিশ্যেব বিচিহ্নপাদপং
সুখী ভবিষ্যামি তবাস্তু নিবর্তিতঃ ॥
বাণ্মীকি।

There is pleasure in the pathless woods,
There is a rapture on the lonely shore.

Childe Harold

হা ধরণি ধর কি রে হৃদয়মন্ডলে,
ধর কি কোথাও মম, মনোমত স্থলে?
কি আছে সংসারে আর বাঁধবারে মোরে।
যে কালে কেটেছে কাল ভরসার ডোরে ॥
মনে করি কাঁদিব না রব অহঙ্কারে।
আপনি নয়ন তবু ঝরে ধারে ধারে ॥
গোপনে কাঁদিবে প্রাণ সকলি আঁধার।
জীবন একই স্রোতে চলিবে আমার ॥
আঁধার নিকুঞ্জে যেন নীরবেতে নদী।
একাকী কুসুম তায় চলে নিরবধি ॥
কারে নাহি বাসি ভাল, কেহ নাহি বাসে।
হৃদে চাপা প্রেমাগুন, হৃদয় বিনাশে ॥
সংসার বিজন বন, অন্তরে আঁধার।
দেখিতে অপ্রেমী মুখ, না পারি রে আর ॥
বিজন বিপিনময় দ্বীপে একা থাকি।
ভাবিয়া মনের দুঃখ ভ্রমিব একাকী ॥
দেখিব দ্বীপের শোভা মোহিত নয়নে।
বিপিন বারিধি নীল বিশাল গগনে ॥
চারি পাশে গরজিবে ভীষণ তরঙ্গে।
শ্বেত ফেনা শিরোমালা নাচাইব রঙ্গে ॥
শিরে মন্তু সমীরণ, শব্দ মিশে তার।
থেকে থেকে রেগে রেগে ছাড়িব হৃৎকার।
নিরাখিব নীরধারে, ভীষণ ভূধর।
ফুলায়ে বিশাল বক্ষ জলধি উপর ॥
তুলিয়া ললাট ভীম প্রবেশে গগনে।
গরজে গভীর স্বরে নব মেঘগণে ॥
পদে তার আছাড়িবে প্রমত্ত তরঙ্গ,
বদকে তার প্রহারিবে পাগল পবন।
মহীধর মানিবে না অধমের রঙ্গ,
ললাটের রাগে করি ভয় প্রদর্শন ॥
কর্কশ সানুতে তার বিহরি বিজনে।
আ মরি এসব কবে হেরিব নয়নে ॥
মোহে মন মজাইবে প্রকৃতি মোহিনী।
জীবন যাইবে যেন স্বপনে ষামিনী ॥

আলো মাখা কালো বাস উষা পরে যবে।
শুনিব সে তরতর জলনিধিরবে ॥
দেখিব বিশাল বক্ষ মিলিছে আকাশে।
শ্বেত শশিছায়া নীলে ধীরে ধীরে ভাসে ॥
শিহরিবে হৃদি মোর, সে স্নিগ্ধ সমীরে।
পাশে কুঞ্জ লতা ফুল নাচাবে সুধীরে ॥
নিরাখিব শশী শ্বেত গগনমন্ডলে।
কত মেঘ বায়ুভরে শ্বেতাকাশে চলে।
গিরিপরে সুখ-তারা নেচে নিবে ষায়।
যেন শেষ মন আশা নিরাশা নিবায় ॥
নাচাইবে কর তার জলের ভিতর।
তাহারি পানেতে চেয়ে রব নিরন্তর ॥
শুনিব সুরব মৃদু সমীরণ করে।
সুধার শিশির মাখা নিকুঞ্জ নিকরে ॥
পুলকে দেখিব আমি লোহিত আকাশে।
পয়োধির পাশ থেকে তপন প্রকাশে ॥
তরল তরঙ্গ মেঘ অনল সাগরে।
রবি নিজে নভরাজ দেখাইবে করে।
চঞ্চল সুনীল জলে তরুণ তপন,
চিকিমিকি চিকিমিকি নাচাইবে কর।
তরুলতা তুণ মাঝে করিবে তখন,
ঝিকিমিকি ঝিকিমিকি নীহারনিকর ॥
দ্বিপ্রহরে ঘননীল বিমল অম্বরে,
রাগিয়া রহিলে রবি অনলসাগরে,
শ্বেত মেঘ অগ্নি মেখে ফিরিয়া বেড়ায়,
রব তবে অন্ধকার নিকুঞ্জ মাঝায় ॥
দীর্ঘ ভীম তরুগণ আচ্ছাদে আধার,
করিবেক চারুলতা স্নিগ্ধ চারি ধার ॥
নীরব নিশ্চল দ্বীপে রহিবে সকল।
স্পন্দহীন পত্র আর কুসুমের দল ॥
শুনিব গরজে ঘোর তরঙ্গনিকরে।
অথবা বিদরে বন এক পিকম্বরে ॥
তরুলতা মাঝে দিয়া বিমল গগন।
কিম্বা জলে রবিকর হবে দরশন ॥

বিক্রম রচনাবলী

কালো জলে ঢাকা দিলে প্রদোষ আঁধার—
 অনিবার তরতর বিশাল বিস্তার—
 সেই দুঃখস্বরে হৃদি, শিহরি চঞ্চল,
 কাঁদবে; না জানি কেন আঁখিময় জল!
 মনে হয় যেন কোন সুখের সঙ্গীত।
 নাচাইয়ে হৃদি ডোরে জাগে আচম্বিত ॥
 আপনি ভাসিবে আঁখি দর দর ধারে।
 অনন্ত স্মরিব চেয়ে পয়োঁধির পারে ॥
 নবীনা রূপসী একা কাঁপে এক তারা,
 যেন নব প্রণয়িনী প্রণয়সাগরে।
 ছেড়ে গেছে কর্ণধার একা পথহারা,
 কত আশা কত ভয়ে কাঁপিছে অন্তরে ॥
 যখন সন্ধ্যায় শ্বেত অঙ্ক শশধরে
 ধীরে ধীরে ভেসে যাবে নীলের সাগরে
 আকাশ বারিধি সনে করি পরশন
 চারি পাশে ধরিবেক বিঘোর বসন
 বারেক ভাবিব সেই রমণীরতন
 রেখোঁছিল বেঁধে যার প্রেমমোহে মন ॥
 যবে ভাসি অঙ্ক শশী তারাময়াকাশে
 স্বপ্নভূমি সম ধরা অস্পষ্ট প্রকাশে
 ঝঝর বাতাস বয় ক্ষীণালোকে যবে
 ধাইবে সমুদ্র স্থির অনিবার রবে
 অনিবার সর সর উদ্বেগ তরুগণ
 দেখিব মিশিবে শূন্যে রমণীরতন ॥
 আঁখি আর নীলাকাশ মাঝে তার ছায়া।
 আলোময় বেশে সেই ফুলময় কায়া।
 নিবিড় কুস্তল দাম খেলিছে পবনে।
 মৃদু স্থির মোহময় প্রণয় বদনে ॥
 দেখিতে দেখিতে মোহে হারাব চেতন।
 চেয়ে রব; জানিব না মিলাল কখন ॥
 পূর্ণ শশী মোহমন্ত্রে চন্দ্রিকায় যবে
 গিরি বারি বনাকাশ নির্দ্রিত নীরবে ॥
 মনঃসুখে মনোদুখে মোহিত হৃদয়ে।
 তার মাঝে বেড়াইব চারু তরি লয়ে ॥
 ভাসিবে নিবিড় নীলে একা শশধর।
 দেখিব জ্বলিছে স্থির নক্ষত্রনিকর ॥
 পাশে নীল জল স্থির রব অনিবার।
 যেমন স্বপনে কথা যৌবনে আশার ॥
 একবার পরিশিবে মলয়সমীরে।
 যেমন সে পরশিত ভাগীরথীতীরে ॥
 ধূমেতে আকাশে মিশে তরুদলতীরে।
 পরস্পর গায় পড়ে ঢলে ধীরে ধীরে ॥
 প্রেমমোহ ভরে যেন, আবেশের রঙ্গে।
 প্রণয়ী ঢুলিয়া পড়ে প্রণয়ীর অঙ্গে ॥
 ভীম স্থির মাঝে কোন রব শূনিব না।
 তবে যদি নিরুপমা স্বর্গীয় ললনা

শূন্যভরে শশিকরে স্বপ্নসম মিশে,
 বাজায় মৃদলী মৃদু মনোমোহ ভরে,
 প্রকাশিয়ে যত জ্বালা প্রণয়ের বিবে,
 গভীর কোমল ধীর যাতনার স্বরে ॥
 মনোসাধে মজে তায় ভাবিবেক মন,
 স্বপনে নিরাশা সঙ্গে আশার মিলন ॥
 মরি রে মোহিত মনে শূনিব সে স্বরে,
 মোহভরে মৃখ পানে চেয়ে রব তার।
 হা বিধাতঃ বল বল বারেক বল রে;
 হবে কি এমন দিন কপালে আমার ॥
 অথবা দেখিব স্তম্ভ লতিকার কুঞ্জে।
 জ্বলে যথা শশিকর স্থির পাতাপুঞ্জ ॥
 নবীন কুসুম হাসি ছাড়িছে সুবাস।
 যেন তৃণ লতা মাঝে নক্ষত্র প্রকাশ ॥
 দেবের ললনা দলে নাচে মাঝে তার।
 চন্দ্রের কিরণে যেন চম্পকের হার ॥
 শত বীণা স্বর্গসুরে অসুরে বাজায়।
 শত গান এক সুরে শূন্যেতে মিশায় ॥
 ঝরে ফুল জ্বলে মণি দেহের বর্তনে।
 কতই তরঙ্গ বয় আলোক বসনে ॥
 তারা গেলে হবে কুঞ্জ বিজন আঁধার।
 একাকী কাঁদিব দেখে ঝরা ফুলহার ॥
 নিমিষে ঘুঁচিবে স্বপ্ন বিজনমন্ডলে।
 সেই ফুল সেই লতা ধীরে ধীরে দোলে ॥
 কাননে সাগরে যবে অমাবস্যা বসি—
 কালো মেঘে ঢাকা শির ভীষণ রাক্ষসী—
 গিরিগুহা মাঝে গজ্জর্ ফ্রোথ ঝটিকার।
 শূনে তাহে মিশাইব, অংশ হব তার ॥
 ভীমরণে প্রাণপণে পাগল পবন।
 ঘুরিয়া ঘুরিয়া রাগে করে গরজন ॥
 গরজিবে রেগে রেগে অসংখ্য তরঙ্গ।
 তমোমাঝে শ্বেত ফেনা আছাড়িবে অঙ্গ ॥
 শূনিব গভীর ধীর জলধরধ্বনি।
 ফাটাবে গগন হৃদি চেচায় অর্শনি ॥
 উপরি উপরি রেগে ছিড়িবে শিখর।
 পর্ষতে পর্ষতে যেন হতেছে সমর ॥
 ভয়ঙ্কর ভূতগণ, নেচে নেচে ঝড়ে,
 উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিবেক ঝড়নাদ সঙ্গে।
 বিকট বদন ভঙ্গী গিরি পরি চড়ে,
 ভীম শ্বেত দস্তাবলী দেখাইবে রঙ্গে ॥
 পরেতে গভীর স্থির জগৎসংসার।
 কাঁদিয়া ঘুমালো যেন নবীন কুমার ॥
 যেন তাঁর করুণার প্রতিমা প্রকাশ।
 পূজিব গভীর মোহে, বিগত বিলাস ॥
 সর্পিণী জীবন মন, যৌবন রতন।
 এমন সুধীর মনে হইবে পতন ॥

ভাবিব কাটিকা মত ছিল মম মন।
এ গভীর স্থির মত হয়েছে এখন ॥
কারো অনুরাগী নই বিনা সনাতন।
জপিয়া পবিত্র নাম হইব পতন ॥

অনন্ত মহিমা স্মরি ছাড়িব এ দেহ।
জানিবে না শুনবে না কাঁদিবে না কেহ ॥
অনিবার জলরব কাঁদিবে কেবল।
আছে কি পৃথিবী হেন বিমোহন স্থল!

পদ্যকাকারে অপ্রকাশিত বাল্যরচনা

[সংবাদ পত্র ও সাময়িক পত্র হইতে]

পদ্য

(হৃদয়লী কলেজে ছাত্রাবস্থায় লিখিত)

চন্দ্রাস্য সহস্য করে, উষাকালে সতী।
প্রিয়করে করি করে, কহে পতি প্রতি ॥
প্রিয়া প্রতি পতি তার, করিছে উত্তর।
চরণে চরণে দেয়, উত্তর সত্তর ॥

স্ত্রীং। কোথায় যাইছে সব, মধুকরগণ।
পং। বদন কমল তব, করে অবেষণ ॥
—‘সংবাদ প্রভাকর’, ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫২

প্রথম চরণে স্ত্রীর উক্তি দ্বিতীয় চরণে পতির উত্তর

পয়ার

স্ত্রীং। কহ না কি হেতু, কান্ত, শশী অস্ত্রে চলে।
পং। তব মদুখে মদুক হোয়ে, চলে অস্ত্রাচলে ॥
স্ত্রীং। দর্শদিগ্ কেন প্রাণ, প্রকাশিত হয়।
পং। তব মদুখ আলোকেতে, হয় প্রভাময় ॥
স্ত্রীং। কি হেতু কোকিলকুল, কুহু কুহু করে।
পং। তোমার মধুর স্বর, পাইবার তরে ॥
স্ত্রীং। সে রবে কি হেতু প্রাণ, হোয়েছে বিকল।
পং। আমারে নিন্দয় বোলে, পাও প্রতিফল ॥
স্ত্রীং। গন্ধবহ গন্ধ বহে, ভ্রমে কি কারণ।
পং। তব মদুখ পদ্মগন্ধ, করিবে গ্রহণ ॥
স্ত্রীং। অনিল অনল সম, কেন হয় জ্ঞান।
পং। পরস্পর সখা তারা, জান না কি প্রাণ ॥
স্ত্রীং। সখা হোলে একাঙ্গ কি, হয় গুণমণি।
পং। ভাবের এমনি ভাব, এভাব এমনি ॥
স্ত্রীং। তবে কেন তুমি আমি, এক অঙ্গ নই।
পং। দেহে যদি নই, কিন্তু, অন্তরেতে হই ॥
স্ত্রীং। কেন পতি, দীনপতি, উঠিছে গগনে।
পং। ওমদুখ নলিনী ফুল্ল, করণ কারণে ॥

বিরলে বাস

শ্রীযুক্ত দর্পণ সম্পাদক মহাশয় বরাবরেষু।

অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার কএক পংক্তি আপনকার
দর্পণে প্রকাশ করিতে আঞ্জা হয়।

বিষয়ে বিরক্ত হয়ে, স্নিগ্ধ কুঞ্জবনে।
যেই জন বাস করে সুখী সেই জনে ॥
সেই নিষ্কর্ন বটে কিন্তু একা নয়।
নিত্য প্রেম সঙ্গে কথা নিত্য নিত্য কয় ॥
কতমত কাণাকাণি রাজার গোচরে।
ভালকে অবজ্ঞা যাহে মন্দে শ্রদ্ধা করে ॥
তাহাতে সুমিষ্ট মিষ্ট, পক্ষির বিলাপ।
বিয়োগিনী পক্ষিণীর, কঠোর সন্তাপ ॥
তুচ্ছ মান হতে জন্মে, যে প্রশংসা বায়।
তাহা হতে মলয়জে, মিষ্ট বলা যায় ॥
আর মিষ্ট নবপদুপে সুগন্ধি পবন।
ধন বিষ হতে মিষ্ট, নদীর জীবন ॥
চাতুরী আশঙ্কা দুঃখে পূর্ণিত সংসার।
সত্য সুখ বনে, শুদ্ধ ছায়া সহকার ॥*

শ্রীবিষ্ণুমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

—‘সমাচার দর্পণ’, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫২

* ‘সমাচার দর্পণে’ মদুগকালে কবিতাটিতে কয়েকটি মারাত্মক ভুল হইয়াছিল। বিষ্ণুমচন্দ্র ১০ মার্চ ১৮৫২ তারিখের ‘সংবাদ প্রভাকরে’ এই ভুলগুলি সংশোধন করিয়া একখানি পত্র লেখেন (‘শনিবারের চিঠি’, ১০৩৮, পৃ. ২৮৯-৯১ দ্রষ্টব্য)। এই কবিতাটিতে ভুলগুলি সংশোধন করা হইয়াছে।

জীবন ও সৌন্দর্য্য অনিত্য

চৌপদী

যামিনী যামেক যায়, সেবিত্তে শীতল বায়,
সঙ্গে করি ললনায়, রসময় বসিয়া।
বসি নিশাকর করে, ধরিয়ে প্রেমসীকরে,
প্রেম আলাপন করে, সরসেতে বসিয়া॥
শুন ওলো প্রাণেশ্বর, তব মৃথ রূপ ধরি,
ওই কি গগনোপরি, রূপে মনো হরে লো।
বৃষ্টি বা সে শশী হবে, বৃষ্টিলাম অনুভবে,
নাহিলে কে আর তবে, হেন রূপ ধরে লো॥
কিস্বা তব মৃথ ছায়া, ধরি তব মৃথ কায়া,
গগনে শোভিল গিয়া, আলো করি করে লো।
তা নয় তা নয় সখি, উহাতে কলঙ্ক লখি,
কলঙ্ক তো না নিরখি, ও মৃথ উপরে লো॥
যদি তব মৃথোপরে, সে কলঙ্ক না বিহরে,
রবে তো কেমন কোরে, ছায়ার ভিতরে লো।
দেখ লো নয়ন তারা, গগনে যতেক তারা,
কত শোভা করি তারা, সুখেতে বিহরে লো॥
যেন তব নেত্রবর, তারা হেন দীপ্তকর,
আহা কিবা মনোহর, অন্তর শীহরে লো।
কিন্তু দেখ হয় হয়, চপল চপলা প্রায়,
তারা এক খসি যায়, কি দুখের তরে লো।
বৃষ্টিছ বৃষ্টি লো প্রিয়ে, তব নেত্র নিরখিয়ে,
হইয়ে ব্যথিত হিয়ে, লুকালো অন্তরে লো।
কিন্তু বিপরীত হয়, গগনের তারা যায়,
দেখিয়ে পলায়ে যায়, অভিমান ভরে লো।
তায় করি দরশন, মম নেত্র তারাগণ,
অভিমাণে পলায়ন, না করে না করে লো।
কিন্তু যত দেখে তায়, যত আরো, দৃঢ় চায়,
কুমুদিনী যেন পায়, পতি শশধরে লো॥
যতেক বলিল পতি, না শুনিল রসবতী,
চাহিয়ে গগন প্রতি, স্থির নেত্রে রহিল।
পল্লব নাহিক সরে, বঙ্গমাঞ্চে ভাব ভরে;
এক দৃষ্টে দৃষ্ট করে, অন্য দিক্ নাহিল॥
তবে মৃথ অধোকরে, অতিশয় দুঃখভরে,
কম্পাইয়ে পয়োধরে, দীর্ঘশ্বাস বহিল।
তখন নয়ন তার, উজ্জ্বল হীরকাকার,
ফেলিলেক অশ্রুধার, দুঃখে পতি করিল॥
ওলো প্রাণ প্রেমাধার, সহে না সহে না আর,
এই বিন্দু অশ্রুধার, প্রাণে নাহি সহিল।
শূন্যেছি প্রবলানল, জলে করে সূশীতল,
কিন্তু তব অশ্রুজল, মোরে আরো দহিল॥
চন্দ্রমুখী কর তায়, দেখ সখা হয় হয়,
এখনি দেখিন্দু যায়, গগন উপরি হে।

এই দেখি যে তারায়, প্রজ্বলিত স্বর্ণ প্রায়,
অপরূপ শোভা পায়, কতবার ধরি হে॥
মৃহুর্ভেকে মধ্য তায়, কেহ না দেখিতে পায়,
কোথা গেল হয় হয়, স্থান পরিহারি হে।
কোথা তার এ সময়, মনোহর অঙ্গ রয়,
কোথা রয় করচয়, মরি মরি মরি হে॥
কিন্তু তো তাহারি সম, জীবন যৌবন মম,
তবে কেন তার তম, মিছামিছি করি হে।
যৌবন লাভ্য নিয়ে, তোমার হইয়ে প্রিয়ে,
আজি আছি বিনাশিয়ে, কাল যাব মরি হে।

—‘সংবাদ প্রভাকর’, ২৮ মে, ১৮৫২

হেমন্ত বর্ণনাছলে স্ত্রীর সহিত পতির কথোপকথন

পতি

লঘু চৌপদী

রাখ রাখ প্রিয়ে, বসনে ঢাকিয়ে,
জলদ চাঁচর চয়।
দেখে জলধর, ভয়ে শশধর,
হুতাশেতে ম্লান হয়॥
আরো মোর প্রাণ, ভয়ে ম্লিয়মাণ,
দেখে নিজ প্রাণ শশী।
কুমুদিনী সতী, ম্লান প্রাণপতি,
বিষাদিত জলে পশি॥
পেয়ে মনস্তাপ, দেয় অভিশাপ,
যে সতিনী তব কোলে।
যে সতিনী তার, তাহারি প্রকার,
ডুবিয়ে মরিবে জলে॥
তাহে এই ভয়, পাছে সিদ্ধি হয়,
সে পাপ কুমুদিনীর।
সতিনী তাহার, নয়নে তোমার,
পাছে সখি বহে নীর॥
তাই লো সুখদে, জলদ জলদে,
কর কর আচ্ছাদন।
নিশাপতি তবে, ভীত আর নবে,
শাপ হবে বিমোচন॥

নারী

যেছিল তপন, ধর বিলক্ষণ,
যখন শরদ দিবা।
এ যে দিনপতি, তেজে ক্ষীণ অতি,
তাহার কারণ কিবা॥

পতি

দ্বাদশ তপন, বিহারি গগন,
বিতারিত খর কর।
কিন্তু খসি পরে, দশ দিবাকরে,
গেল তব নখোপর ॥
এক রবি খসি, তব ভালে পশি,
সিন্দূর বিন্দুর রূপে।
দ্বাদশ দিনেশ, এক অবশেষ,
উজ্জ্বল হবে কি রূপে ॥

নারী

কেন হে কমল, তাজিল কমল,
হেমস্তের আগমনে।
পাছে বা পলায়, প্রাণ পদ্ম তায়,
এ ভয় তা দরশনে ॥

পতি

করাল মরাল, মনে জানি কাল,
কমল কমল হরি।
ভয় যুক্ত হিয়ে, রহে পলাইয়ে,
তোমারে আশ্রয় করি ॥
হেরিয়ে নখরে, পতি দিবাকরে,
তাহার নিকটে যায়।
তোমার গমন, হংস নিদর্শন,
দেখিলেক সে তথায় ॥
ভয়ে হয়ে ভীত, পলাতে চিন্তিত,
গ্রাণ স্থানে নিরুপায়।
হইয়ে অগতি, তাজে বসুমতী,
শেষেতে পলায়ে যায় ॥

নারী

শরদ স্বভাব, তাজিব স্বভাব,
ধরিল মলিন ভাব।
অতি মনোহর, পদার্থ নিকর,
হইলেক রসাভাব ॥
বিধুমলান অতি, দীন দিনপতি,
নলিনী মলিনী হয়।
আর তরুদলে, ফল নাহি ফলে,
পূর্ণ পঙ্ক পত্রচয় ॥

পতি

না লো প্রাণ সখি, বিটপি নিরখি,
হেমস্তে তোমায় প্রাণ।
নব পল্লবিত, ফলে সুশোভিত,
তুমি তরু করি জ্ঞান ॥

অধরেতে তব, নবীন পল্লব,
পল্লবিত তরু তাই।
সেই তরুফল, ও দুই শ্রীফল,
তোমাতে দেখিতে পাই ॥

নারী

কেন কেন কান্ত, হয়েছে একান্ত,
নীরব কোকিলকুল।
কি হেতু বল না, না করে কলনা,
হিমে কেন প্রতিকূল ॥

পতি

শুন প্রাণ বলি, কোকিল কাকলী,
বেহেতু হইল হারা।
মধুস্বরে তব, হইয়ে নীরব,
তোমারে শাপিছে তারা ॥
তব বিধুমুখ, হইবেক মুক,
যেমন তাহারা হয়।
তাই বদ্বি প্রাণ, যবে কর মান,
ও মুখ নীরবে রয় ॥

নারী

কেন ফণিবর, প্রবেশি বিবর,
পাতালে গমন করে।

পতি

বেণী লো তোমারি, দেখিতে না পারি,
পলাইল বিষধরে ॥
যদি বল ধনি, দূর হলে ফণি,
অবনী মন্ডল হতে।
আর ধরাতল, কিছু হলাহল,
রহিবে না কোনমতে ॥
তা নয় তা নয়, বহু বিষ রয়,
তোমার নয়নে প্রাণ।
সে গরল পারে, সংহার সংসারে,
করিবারে সমাধান ॥
কিন্তু চমৎকার, সর্প বিষাধার,
সবে তাজে ষড় করি।
নয়ন গরলে, যতনে সকলে,
বাঞ্ছা করে ডুবে মরি ॥
গরল অহির, শব্দ কলহির,
ইচ্ছাক্রমে হয় পান।
নয়ন গরল, প্রেমিকে কেবল,
পান করে ওরে প্রাণ ॥
কিন্তু চমৎকার, বিষনাশকার,
অমৃত বিঘেরি কাছে।

বিক্রম রচনাবলী

কেন রে এ বিধি, নয়ন সন্নিধি,
অধরে অমৃত আছে ॥
বদ্বোধি কারণ, একত্রে স্থাপন,
যেহেতু গরলামৃত ।
সর্পের দংশনে, ছিল ওঝাগণে,
গরলে করিতে মৃত ॥
নয়ন গরল, করিতে বিফল,
অবনীতে কেহ নাই ।
মুখ সদ্বাধার, নিকটে তাহার,
নাশার্থ রয়েছে তাই ॥

নারী

তাড়িয়ে মলয়, কাল হিমালয়,
এলো কোথা হোতে বল ।
হয় অনুমান, জনমের স্থান,
সে গিরি অতি শীতল ॥

পতি

মোর বোধ হয়, এলো হিমালয়,
কুচ গিরি হোতে তোর ।
কেন না সে স্থল, বড়ই শীতল,
স্নিগ্ধ কর হৃদি মোর ॥

নারী

কোথায় মলয়, এমন সময়,
রহিলেক লুকাইয়ে ।
হেরি হিমালয়ে, বোধ হয় ভয়ে,
সে গেল বা পলাইয়ে ॥

পতি

হিমালয় ভয়ে, দ্বিভুবন ময়ে,
আর তার স্থান নাই ।
পায় তব পাশে, আশ্রয় নিশ্বাসে,
এ সৌরভ তথা তাই ॥

নারী

কেন হে নীহার, বর্ষে অনিবার,
গগনে রজনীভাগে ।
কিবা শোভা মরি, সদা ইচ্ছা করি,
রাখিব নয়ন আগে ॥

পতি

পতি শশধরে, দরশন করে,
রজনী মলিন ভাব ।
বলে কেন নাথ, হেরি অকস্মাৎ,
হোলে হাস্যরসাভাব ॥

করি অপরাধ, দিয়েছে বিষাদ,
বদ্বি এই অভাগিনী ।
কাতরে নাথরে, এ মিনতি করে,
শেষে কাঁদে সে রজনী ॥
সে রোদন ছলে, নয়নের জলে,
নীহার বর্ষণ করে ।
এই সে কারণ, নীহার বর্ষণ,
কহে যত মূঢ় নরে ॥
কিন্তু আমি বলি, সে মিথ্যা কেবলি,
সত্য যাহা আমি কই ।
শশাঙ্ক গগনে, ও মুখ দর্শনে,
মলিন কাঁদেছে ওই ॥
যত তারাগণে তোমার নয়নে,
কাঁদিতেছে অবিরত ।
নয়নের জলে, নীহারের ছলে,
পতন করিতে রত ॥

নারী

হয়েছে শীতল, দেখিতেছি জল,
পুন শীত কি কারণ ।

পতি

বদ্বি কি কারণে, কুরঙ্গ নয়নে,
কেঁদেছিলে প্রাণধন ॥
সেই অশ্রুজল, বহি বক্ষস্থল,
কুচ হিমালয় শৈল ॥
সে গিরি পর্শনে, নয়ন জীবনে,
অতিশয় হিম হৈল ॥
সেই বিন্দু জল, পড়িয়ে ভূতল,
জলে গিয়ে মিশাইল ।
অশ্রু পরশনে, জল সেইক্ষণে,
অতি শীতল হইল ॥

—‘সংবাদ প্রভাকর’, ১০ জানুয়ারি, ১৮৫৩

শিশির বর্ণনাহলে স্ত্রী-পতির কথোপকথন

লঘুলালিত

স্ত্রী। হইয়াছে জল, বড়ই শীতল,
ছুইলে বিকল, হইতে হয় ।
আর্গে যে জীবন, জুড়াত জীবন,
সে বন এখন, নাহিক সয় ॥
সুখদ মলয়, হইলেক লয়,
এলো হিমালয়, শীতল অতি ।

পদার্থ সকল, সমীরণ জ্বল,
কি কাল শীতল, হলো সম্প্রতি ॥
সকল শীতল, করয় বিকল,
কিন্তু অপরূপ, নির্নিখ তায়।
সমস্ত শীতল, প্রতপ্ত কেবল,
বোধ হয় প্রাণ, তোমার গায় ॥

পতি। মোরে নিরন্তর, তব নেত্রকর,
পাবক প্রথর, দাহন করে।
মম দেহোপর, বহি খর তর,
তাই উষ্ণভাব, এ দেহ ধরে ॥

স্ত্রী। কেন বিভাবরী, দীর্ঘ দেহ ধরি,
ধরায় বিহারি, রহে এখন।
তাজিতে ধরণী, না চায় রজনী,
বল গুণমণি, শূনি কারণ ॥

পতি। নয়ন মৃদিয়ে, থাক ঘুমাইয়ে,
তখনি হেরিয়ে, তোমার মৃদুখ।
সতী বিভাবরী, শশী জ্ঞান করি,
হেরি প্রাণপতি, পায় কি সুখ ॥
আছে যতক্ষণ, শশী প্রাণধন,
পাইয়ে রতন, না ত্যজে তায়।
তাই বিভাবরী, পতি বোধ করি,
বহুক্ষণ ধরি, রয় ধরায় ॥
কিন্তু লো যেক্ষণে, নিদ্রার ভঞ্জে,
চাহিয়া নয়নে, উঠ প্রভাতে।
হেরি ও নয়নে, নিশা ভাবি মনে,
কুমুদী সতিনী, পালায় তাতে।

স্ত্রী। অতিশয় ঘন, বল কি কারণ
নির্নিখ প্রভাতে, এ কুমুদিকা।
কেন সব হয়, ধূমাকার ময়,
কি ধূম হইল, ধরা ব্যাপিকা ॥

পতি। এবে আর দর্প, না করে কন্দর্প,
তাহার কারণ, শূন ইহার।
তব নিকেতন, আসিল মদন,
আপন যাতন, দিতে তোমায় ॥
কিন্তু তব স্থান, হরের সমান,
যে বহি নয়নে, সে ভস্ম হয়।
তাই ধনি তার, শক্তি সে প্রকার,
অবনীতে আর, নাহিক রয় ॥
ভস্ম হৈল শর, তার কলেবর,
প্রবল দহনে, দাহন হয়।
দাহনে ধূম, ব্যাপে নভোভূম,
ভ্রমেতে কুআশা, লোকে কর ॥

স্ত্রী। কি কারণ প্রাণ, শঙ্কর সমান,
মোরে কর জ্ঞান, উন্মত্ত প্রায়।
কোথায় কি মম, হের হর সম,
তোমাতে বৃদ্ধাতে, হইল দায় ॥

পতি। বিবেচনা করি, তোরে প্রাণেশ্বরী,
বলি ত্রিপুত্রারি, প্রলাপ নয়।
হরের ভূষণ, সব বিলক্ষণ,
তোমার অঙ্গেতে, তুলনা হয় ॥
হরের ইন্দুর, সমান সিন্দুর,
শিরে লো তোমার, কি শোভা পায়।
সদা, শিরোপরি, আছ সিঁথিপরি,
তিন ধারা ধরি, গঙ্গা খেলায় ॥
স্কন্ধ শিরোপরে, হরের বিহরে,
সদা ফণিবরে, ভীষণ অতি।
বেণী ফণিবর, তব নিরন্তর,
স্কন্ধ শিরোপরে, রয় তেমতি ॥
যেইমত হরে, কণ্ঠে বিষধরে,
তেমতি গরল, তুমিও ধর।
কিন্তু কণ্ঠে নয়, কিছু অধো রয়,
বিশেষিয়া বলি, ও পয়োধর ॥
যে গরল হরে, কণ্ঠদেশে ধরে,
কাছে না এনে সে নাশিতে নারে।
কিন্তু পয়োধরে যে গরল ধরে,
দূর হইতেই, মানবে মারে ॥
যদি বল প্রিয়ে, কণ্ঠে না রহিয়ে,
অধোভাগে কেন, গরল রয়।
কণ্ঠে রৈলে তবে, মৃদু কাছে রবে,
মৃদুখামৃতে বিষ, নিস্তেজ হয় ॥

স্ত্রী। কি মৃদু মানব কোলে নিজ সব,
দূরন্ত পাবক, লয়েছে টানি।
বিশ্বাসঘাতক, সেই সে পাবক,
করিবে দহন, তাহা না জানি ॥

পতি। দোষ দাও পরে, নিজ দোষোপরে,
দৃষ্টি নাহি কর, কি অপরূপ।
আপনি কেমনে আপন নয়নে,
রেখেছো অনল, কহ স্বরূপ ॥

স্ত্রী। তবে প্রেমাধার রাখিব না আর,
নয়নে আমার, কাল অনল।
দেখ প্রাণ ধন, মৃদিয়া নয়ন,
তাড়াই আগুন, শয্যায় চল ॥

পতি। যদি তুমি প্রাণ নাহি দিলে স্থান,
কোথায় অনল, যাইবে আর।
পৃথিবীতে আর, স্থান নাহি তার,
তাহে বলী শীত, বিপক্ষ তার ॥
যাইবে যথায়, যাইবে তথায়,
দূরন্ত শারব, শীত ধাইয়ে।
এমতে ধরায়, নাহি স্থান পায়,
শেষে জলে যায়, রয় ভুবিয় ॥

বিক্রম রচনাবলী

তাই দেখ কাল, নিশা শেষকাল,
উঠে জল হোতে, ধূমের রাশি।
তাই বলি প্রিয়ে, স্থান না পাইয়ে,
হয়েছে অনল, সলিল বাসি ॥
—‘সংবাদ প্রভাকর’, ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৩

দূরদেশ গমনের বিদায়

পতি

ললিত

একবার দেখি আর, দেখি দেখি এইবার,
দেখি ফিরে বিধুমুখ, দেখি আঁখি ভরি লো।
আজিকার নিশি ভোরে লয়ে যাবে কোথা মোরে,
কত দিন তোমা বিনে রহিব কি করি লো ॥
বিদরে বিদরে বৃক, হেরিব না বিধুমুখ,
বিধুমুখ হাসি ভরা, রব স্বপ্নে স্মরি লো।
আসি কি না আসি ফিরে, হেরি কি না প্রেয়সীরে,
জানি নে জানি নে কিছুর, বাঁচি কি না মরি লো ॥
হেরি কি না হেরি আর, শশিমুখে ফিরে বার,
জনমের মত তাই হেরি ভাল করি লো।
সেই শেষ সুখ মরি, বিধি বৃকি লয় হরি,
বৃকি নিশি পোহাইল, তাই হৃদে ডরি লো ॥
কি শূনি কি শূনি ধনি কুহু কুহু করি ধনি,
হৃদয়ে শিহরি মরি, যে শূনেছি কাণে রে।
বৃকোছি বৃকোছি মরি, পোহাইল বিভাবরী,
পোহাইল পোহাইল, মন তা না মানে রে ॥
হা রজনী একবার, রহ রহ রহ আর,
একবার চাহি আমি, চন্দ্রমুখী পানে রে।
মুখ পানে চেয়ে রই, নয়নে নয়নে হই,
একবার দীর্ঘশ্বাস, সলিল নয়নে রে ॥
একবার মরি মরি, হৃদয়ে হৃদয়ে করি,
অধরে অধর ধরি, জুড়াইব প্রাণে রে।
ধরি হৃদি হৃদি পরে, কত দিবসের তরে,
জনমের মত কি না, কে জানে কে জানে রে ॥
না লো না লো মিছে বলি, যামিনী গিয়াছে চলি,
ফিরিবে না, ফিরিবে না, ফিরিবার নয় লো।
ওই দেখ নীল নিশি, মৃদু আলো সনে মিশি,
কিরিছে বিঘোর আলো, চারিদিক ময় লো ॥
অসীম আকাশে পশি, নাহি রবি নাহি শশী,
গগনে নিভেছে যেন, যত তারাচয় লো।
কি বলি গগনোপরে, একাকী মধুর করে,
প্রভাতের সুখতারা, কিবা শোভা হয় লো ॥
এখনি আকাশোপরে, প্রকাশবে স্ত্রুভাকর,
এখনি যাইব কোথা, ভেবে হৃদি দয় লো।
আসি লো আসি লো প্রিয়ে আসি লো বিদায় নিয়ে,
চলিলাম কতদূরে কি কপালে রয় লো ॥

যথা যাব তথা রব, প্রেমডোরে বাঁধা তব,
অন্তরে অন্তরে বাঁধা, প্রণয়ের পাশে লো।
স্বপনে নয়নে মনে, হেরিব সে চন্দ্রাননে,
হেরিব সে বিধুমুখ, মৃদু মৃদু হাসে লো ॥
তোমা চিন্তা সর্বক্ষণে, শয়নে স্বপনে মনে,
এক আশে রবে প্রাণ, ফিরি দেখা আশে লো।
সুখ শশী হলে হারা, একা প্রভাতের তারা,
হবে মোর অন্ধকার, হৃদয় আকাশে লো ॥

স্ত্রী

ত্রিপদী

কেন আরে বিভাবরি, পোহাইল মরি মরি,
পোহাইল দিবারে যাতনা।
কেন রে যামিনী ভাগে, স্বপ্নে জানিবার আগে,
কেন কেন মরণ হলো না ॥
জেনেছি জেনেছি আগে, যখন যামিনী ভাগে,
হৃদি মোর হইল চঞ্চল।
তখনি জেনেছি মনে, পাইব প্রাণের জনে
যাবে মোর যা আছে সকল ॥
তখনি ভেবেছি মনে, কেন কেন কি কারণে,
হৃদি মোর চঞ্চল বিকল।
কেন রে অস্থির হিয়া, ক্ষণে উঠি শিহরিয়া,
কেঁদে কেঁদে উঠিছে কেবল ॥
প্রাণনাথ হৃদি পরে, হৃদি পরিশিলা পরে,
অস্থির হৃদয় হব স্থির।
স্বর্গসুখ সম হিয়ে, তদুপরে হৃদি দিয়ে,
কত সুখে ঘুমাই গভীর ॥
মরি মরি সে প্রকার, যাইতে পাব না আর,
নিদ্রা তব হৃদির উপর।
হৃদিপরে হৃদি দিয়ে, পয়োধরে পরিশিয়ে,
জুড়াব না কাতর অন্তর ?
সেখানে যতক জ্বালা, নাহি করে ঝালাপালা,
শুধু যত সুখের স্বপন।
আর কি মধুরাকার, হেরিব না ফিরে বার,
শশধর সমান বদন ॥
নয়নে নয়নে করি, অধর অধরোপরি,
করিব না কি আর চুম্বন।
আর কি হে করে করে, মিলাব না পরস্পরে,
স্কন্ধে কর করিয়ে ধারণ ॥
না হে না হে সুখকাল, হয়েছে অতীত।
বিরহ বারিধি মাঝে, হয়েছি পতিত ॥
জানি জানি সেই জ্বালা, অহরহ ঝালা পালা,
করিবে আমারে মনে মনে।
না দেখে প্রিয়ের মুখ, একেলা দহিবে বৃক,
মনাগুনে গোপনে গোপনে ॥

শুধু প্রাণনাথ আশা, রবে এক হৃদে আশা,
সপ্রবল শয়নে স্বপনে।
আসা দিন অনুরাগী, রব প্রাণে তার লাগি,
শুধু সেই দিন আসামনে ॥
যেন যবে বিভাবরী, তমসা বসন পরি,
শশধর না করে প্রকাশ।
যদ্যপি তাহারোপরে, ভয়ঙ্কর জলধরে,
তাহা সহ ঢাকয়ে আকাশ ॥
নিবিড় তিমিরময়, শুধু দরশন হয়,
শশী তারা নাহিক আকাশে।
শুধু ভেদি জলধর, যদি হয় ক্ষীণ কর,
এক তারা একাকী বিকাসে ॥
তেমতি আমার বদকে, অক্ষকার দৃখে দৃখে,
গেছে যত আশা যত সুখ।
শুধু প্রাণনাথ আসা তারি প্রাণ ভরা আশা,
একাকী বিহরে মোর বদক ॥
সে মুখ বাসর কবে, বল বল কবে হবে,
কবে হবে ফিরে দরশন।
করি তাহা জপমালা, ভুলিব বিরহ জ্বালা
যদি পারি ভুলিতে রতন ॥

পতি

চৌপদী

যদি দেহে প্রাণ ধরি আসিব হে ত্বরা করি,
তোরে ফেলে প্রাণ মরি, রহে না লো রহে না।
অন্তরে প্রণয় ডোরে, যে দৃঢ় গেথেছে মোরে,
প্রাণেতে ত্যজিতে তোরে, সহে না লো সহে না।
কিন্তু লো তরুণ করে, প্রকাশিল প্রভাকরে,
আর কথা পরস্পরে কহে না লো কহে না।
তবে যাই স্নানয়নি, যাইলো হৃদয় মণি,
যাই কিন্তু পদ ধনি, বহে না লো বহে না ॥

—‘সংবাদ প্রভাকর’, ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৩

কামিনীর প্রতি উক্তি

(রূপক)

তোমাতে লো ষড় ঋতু

পয়ার

অপরূপ দেখ এঁকি, শরীরে তোমার।
একঠাই ষড় ঋতু, করিছে বিহার ॥
নিদাঘ, বরষা, আর, শরদ হেমন্ত।
নিরখি শিশির আর, দরুন্ত বসন্ত ॥
এ সবার সেনা আদি, তোমাতে বিহরে।
গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরদাদি, কহি পরে পরে ॥

গ্রীষ্ম

তপন সিন্দূর বিন্দু, অতি খরতর।
ক্রোধভরে করে কর, বসি মুখোপর ॥
সে রবি রক্তিম রাগে, শুন হেতু তার ॥
নিরখিল নিজ প্রিয়া, চরণে তোমার ॥
প্রফুল্লিতা কর্মালিনী, প্রেমভরে বসি।
নখরের ছলে কোলে, উপপতি শশী ॥
নলিনী শশাঙ্ক সহ, করিতেছে বাস।
প্রভাকর করে তাই, প্রকোপ প্রকাশ ॥
অতি ক্রোধযুক্ত রবি, হোয়েছে এবার।
তাই লো আরক্ত ছবি, দেখিতেছি তার ॥
ঠেকে শিখে দিবাকর, রমণীর রীতি।
সামালিতে অন্য নারী, ধাইল ঝটিতি ॥
তোমার পঙ্কজ মুখ, প্রাণের রমণী।
আগলিতে আগে ভাগে, আইল অমনি ॥
বদন সরোজ কোলে, সিন্দূর তপন।
বিশেষ কারণ তার, বদ্বোছি এখন ॥
পতিরে পাইয়া কোলে, সুখে আনন্দিত।
তোমার বদন পশ্ম, হোলো বিকসিত ॥
প্রবল প্রভাবে ঘন, বহে সমীরণ।
তোমা হেরে দীর্ঘশ্বাস, ছাড়িছে পবন ॥
যে অনল নিদাঘেতে, দহে গ্নিভুবনে।
সে অনল আছে ওই, তোমার নয়নে ॥
গ্রীষ্ম ভয়ে হরি সহ, বাস করে করী।
তাহাও তোমাতে সখি, দরশন করি ॥
করিয়াছে স্থিতি তব, কটিতে কেশরী।
আছে কুম্ভ জাগাইয়া, কক্ষোপরি করী ॥
গ্রীষ্মে তরু সুশোভিত, ফলে অহরহ।
তুমি তরু শোভিতেছ দুই ফল সহ ॥
এ সবেতে পরাভব, নিদাঘ পলায়।
আইল ম্বদল সহ, বরষা তথায় ॥

বর্ষা

নিরন্তর, নীরধর, নিরখি চাঁচরে।
হাসি ছলে সৌদামিনী, নাচিছে অধরে ॥
হানিছে তাহারা সদা, অশনি আমায়।
হৃদয় বিদরে তায়, জর জর কায় ॥
যে সময়ে ঘাম বারি, ও দেহে নিরখি।
বরষার বারিধারা, তারে বলি সখি ॥
ঘোমটায় যবে ঢাকো, মুখ শশধরে।
বরষায় শশী ঢাকা, যেন জলধরে ॥
ধরিতে আমার কর, মর্দিয়াছ করে।
কমল মর্দিত যেন বরষার ডরে ॥
উপরে ধোরেছে কালো, তব পয়োধর।
গিরিশিরে শোভে যেন, নব পয়োধর ॥

বঙ্কিম রচনাবলী

বিধুমুখি তাহে এই, বিনতি হে করি।
 চাতক হইতে মোরে, দেহ প্রাণেশ্বরী ॥
 বরষায় মনোহর, তরু শোভাকর।
 দাঁড়িম্ব দেখি লো ধনি, তব পয়োধর ॥
 গিরি পরি নব লতা, শোভে এ সম্বর।
 সে গিরি তোমার কুচ, হার লতা হয় ॥
 এ সবেতে পরাভব, বরষা পলায়।
 আইল স্বদল সহ, শরদ তথায় ॥

শরদ

শরদের সুধাকরে, সুধা করে কত।
 সে ভাব নিরখি তব, মুখে অবিরত ॥
 কিন্তু যে কলঙ্ক কালী, থাকে শশধরে।
 সে কলঙ্ক নাহি তব, মুখের ভিতরে ॥
 যদিও নাহিক মৃগ, আছে কিছুর তার।
 মৃগের নয়ন করে, বদনে বিহার ॥
 বসন বারিদ পুন, হইয়াছে দূর।
 পুনরায় প্রকাশিত, তপন সিন্দূর ॥
 কর কমলিনী সदा, আছে বিকসিত।
 কঙ্কণের নাদে অলি, গায় সুর্লালিত ॥
 শরদে মরাল কুল, সুখে কোঁল করে।
 তোমাতে মরাল ভাব, গমনের তরে ॥
 চন্দ্রিকা হোয়েছে প্রিয়ে, অতি পরিষ্কার।
 নিরখি তাহার আভা, বরণে তোমার ॥
 প্রফুল্লিতা কুমুদিনী, চন্দ্র মনোহরা।
 হেঁরি তব নয়নেতে, বিষামৃত ভরা ॥
 যদি বল চন্দ্রকোলে, আছে কুমুদিনী।
 দূর ঘুচে একগ্নিত, অপদূর্বা কাহিনী ॥
 তার হেতু ইন্দীবর, তোমার নয়নে।
 শরণ লোয়েছে গিয়ে, পতি নিকেতনে ॥
 এ সবেতে পরাভব, শরদ পলায়।
 আইল স্বদল সহ, হেমন্ত তথায় ॥

হেমন্ত

... .. [অঙ্গপট]
 কখনো সদয় হও, কভু মান কর ॥
 নিদাঘ, শরদ, বর্ষা, এই ঋতু চয়।
 বিশেষ বসন্ত কাল, হয় রসময় ॥
 এই হেতু ধনি এই, ষড় ঋতুগণ।
 তোমার সরস ভাব, করিছে বর্ণন ॥
 কিন্তু তাহে বর্ণিত, না হবে, তব মান।
 সে মান বর্ণিতে আমি, হই স্নিয়মাণ ॥
 এ কথা যদিও পি তুমি, কহ সুলোচনা।
 হেমন্ত, শিশির ছলে, মানের রচনা ॥
 ফলত ঘটিল তাই, আমার কপালে।
 মান করি নিজ দেহে, হিম দেখাইলে ॥

বিরস হোয়েছে তব, মুখ সুধাকর।
 মুদিত হোয়েছে দেখি, আঁখি ইন্দীবর ॥
 এখন কমল কর, নহে বিকসিত।
 সিন্দূর রবির ছবি, নহে প্রভান্বিত ॥
 নীহার নয়ন নীর, নিরবাধ বহে।
 যে জল শীতল অতি, সে আমারে দহে ॥
 শীতের স্বভাবে বারি, হোয়েছে শীতল।
 কিন্তু তব অশ্রুরূপে, দহে মোরে জল ॥
 শীতের প্রতাপে বহি, তাপহীন হয়।
 মানে তাই জ্যোতিহীন, তব নেত্রধর ॥
 এ সবেতে পরাভব, হেমন্ত পলায়।
 আইল স্বদল সহ, শিশির তথায় ॥

শিশির

নয়নের দীপ্তি হর, ঘন ঘোরতর।
 কুআশায় ঢাকিয়াছে, রবি শশধর ॥
 ঘোমটা কুআশা ঘোর, করি দরশন।
 মুখ শশী, ভালে রবি, করে আচ্ছাদন ॥
 থর থর কলেবর, শীতে যে প্রকার।
 সেরূপ কাঁপিছে দেহ, পরশে তোমার ॥
 হইতেছে রোমাঞ্চিত, বিকল শরীর।
 উহু উহু, ভীম-হিম, করিছে অস্থির ॥
 যেমন শিশিরে, কালো, স্নিগ্ধ হয় জল।
 তেমনি তোমার অঙ্গ, কালো, সুশীতল ॥
 জল হোতে উঠে ধূম, অনল সমান।
 তোমার নিশ্বাসে ধূম, যদি কর মান ॥
 এ সবেতে পরাভব, শিশির পলায়।
 আইল স্বদল সহ, বসন্ত তথায় ॥

বসন্ত

সরস বসন্ত করে, মুগ্ধ ত্রিভুবন।
 তুমিও স্বরূপে মুগ্ধ, করিছ তেমন ॥
 সুচারু, বিমল শশী, তোমার বদন।
 ইন্দীবর, নেত্রবর, প্রফুল্ল এখন ॥
 কমলে কমল কত, কমল কাননে।
 হাতে পায় পদ্ম, পদ্ম, হৃদয় বদনে ॥
 প্রকটিত ফুলকুল, সৌরভ কি কব।
 কিন্তু সে সৌরভ পাই, মুখপদ্মে তব ॥
 ভ্রমর ভ্রমণ করে, শূনি গুণ গুণ।
 বুকোঁছি নুপূর তব, করে রুণ রুণ ॥
 কিবা কুহু কুহু করে, কোকিল কলাপ।
 বুকোঁছি সে রব তব, মধুর আলাপ ॥
 তোমার সুগন্ধ বসন্ত, কমল বদন।
 তাহা হোতে আসিতেছে, মৃদু স্বাস ঘন ॥
 মুখের সৌরভ লোয়ে, আসিছে নিশ্বাস।
 না বুকোঁছি কাঁহিছে লোক, দক্ষিণ বাতাস ॥

বসন্ত বৃষ্টির ডালে, নবীন পল্লব।
তাহার প্রমাণ দেখি, অধরেতে তব ॥
বসন্তে প্রকাশ পায়, স্মরণধনু শর।
তা হেরি কটাঙ্কে তব, ভ্রূযুগ উপর ॥
কিন্তু প্রাণ তব স্থানে, নিজে নাই স্মর।
কেবল রোয়েছে তার, ধনু আর শর ॥
বুঝেছি কারণ সখি, যাহে নাই স্মর।
পলায়েছে মনসিজ, হেরে কুচ হর ॥
শক্ত নহে শিব সহ, করিবারে রণ।
ধনুর্বাণ ফেলে দিয়ে, পলালো মদন ॥
দেখ দেখ বিধুমুখি, ঈশ্বর কোশল।
স্থাপিত কোরেছে ঋতু, তোমাতে সকল ॥

—সংবাদ প্রভাকর, ১৮ মার্চ, ১৮৫৩

চন্দ্রদূত

(রূপক)

ত্রিপদী

দ্বিধাম যামিনী যায়, আ মরি কি শোভা তার,
নিরখি নির্মল নদী তীরে।
নিরমল নীলাকাশ, সীমা বিনা সুপ্রকাশ,
মাঝে হেরি মধুর শশিরে ॥
যেন কোন নব বালা, পাইয়া বিরহ জ্বালা,
মলিনতা মধুর বদনে।
গগন গহন বনে, মনোদুখে মরি মনে,
ভ্রমিতেছে গজেশ গমনে ॥
সেই রূপ মনোহর, রূপ ধরি শশধর
আলো করে ধরণী আকাশ।
গগনের যত তারা, হইয়াছে কর হারা,
অল্প তারা আকাশ প্রকাশ ॥
মাঝে মাঝে শশধরে ঢাকে ক্ষীণ জলধরে,
মরি যেন নাথ দরশনে।
রহি গুরুজন মাঝে, মোহিনী মহিলা লাজে,
ঢাকা দেয় বদন বসনে ॥
চন্দ্রিকা বসন পরা, গভীর নিশীথে ধরা,
মোহ মন্ত্রে যেন নিদ্রা যায়।
ঘোর স্তম্ভ ত্রিভুবন, দেখিয়া চাহিছে মন,
আরাধিতে অচিন্ত্য স্রষ্টায় ॥
শব্দ হয় শব্দ তার, পরশি নিকুঞ্জ গায়,
চলিছে সমীর মৃদু স্বরে।
পূর্ণ নদী স্থির নীরে, শব্দ শব্দ ধীরে ধীরে,
মধুর মলয় মন্দ করে ॥
আহা মরি মরি কি রে, এমন নদীর তীরে,
কে রে শত শোভা ধরি বসি।

বুঝি এ বিরহ লাগি, প্রণয়িনী অনুরাগী
যুবক জনেক যেন শশী ॥
তুণের কুসুম কুঞ্জ, ললিত লতিকা পুঞ্জ,
ঘেরি তারে বারি ধারে রয়।
যেমন মলিন শশী, মলিন বদনে বসি,
দীর্ঘশ্বাসে বিদরে হৃদয় ॥
আঁখি হতে বারে বারে, ধারা বহে ধারে ধারে,
তাহাতে কতই শোভা ধরে।
যেন সে নয়ন জলে, শশী পশি ছায়া ছলে,
চুম্বন গণ্ডেতে তার করে ॥
নিরখি নয়ন ভরি, মধুর চন্দ্রমাপরি,
শেষে শশী সম্বোধিয়া কয়।
আরে মনোহর শশী, গগন মণ্ডলে পশি
পার যেতে ত্রিভুবন ময় ॥
তাই বলি শশধর, আমার বচন ধর,
যাও সেই মোহিনীর কাছে।
যার তরে আশা পথে আরোহিয়া মনোরথে,
আগে মোর পরাণ গিয়াছে ॥

পয়ার

কিন্তু রে কি হেরি তোর, হৃদয় মাঝায়।
কি রে সে কালীর রেখা, লেখা দেখা যায় ॥
বুঝি মম মনোরমা, ভাবিয়া আমায়।
আসিবার কথা লিখে, দেছে তোর গায় ॥
না রে আর কেন মজি, মিছার স্বপনে।
জানি ভাল ভাবে না সে, অনুগত জনে ॥

ত্রিপদী

বুঝি মোর দুখে দুখী, নাই দেখি বিধুমুখী,
বুঝি চাঁদ করেছ রোদন।
হৃদয়ের রেখাচয়, আঁখি ধারা চিহ্ন রয়,
ও যে নহে কলঙ্ক কখন ॥
বুঝি তারি দেখা তরে, আকাশ রোদন করে,
তারারূপ সহস্র নয়নে।
নীরহার নয়ন ধারা, ফেলিছে যতেক তারা,
শত শত বিন্দু বরিষণে ॥
তাই বলি নিশাপতি, রতনে যতনে অতি,
ঝটিতি কর হে দরশন।
এই ভাষা কহ গিয়ে, আশা বিনে ফাটে হিরে,
তার লাগি মলো একজন ॥

পয়ার

শশি হে বসিয়ে আর, বিলম্ব না কর।
এমন অচল কেন, রও শশধর ॥
বুঝেছি বুঝি হে তব, যেই ভাব মনে।
যে কারণে যেতে নারো, নারী নিকেতনে ॥

বাঁকম রচনাবলী

মোহিনীর মৃথ রূপ, করি দরশন।
কত লাজ কত জ্বালা, পেয়েছ তখন ॥
তত আর নাহি মৃথ, তার অদর্শনে।
সুখেতে আকাশ মাঝে, প্রকাশ আপনে ॥
সাধেতে সাধিতে বাদ, আপনার প্রতি।
যাবে না যামিনীনাথ, ষথায় যুবতী ॥
ইহা যদি নিশানাথ, না মান আপনি।
আদি অন্ত জানি আমি, বলিব এখনি ॥

চৌপদী

ললনা লপনে লাজ, পেয়ে মানে দ্বিজরাজ,
লুকালে মেঘের মাঝ, ঘোমটা ধরিয়া রে।
এই কথা মৃঢ়ে কয়, তাই অমানিশা হয়,
কেহ কহে তাহা নয়, গিয়াছে মরিয়া রে ॥
মহিলার মৃথাকারে, অভিমানে আপনারে,
একেবারে নাশিবারে, গমন করিয়া রে।
মহেশ ললাট স্থলে, ধিকি ধিকি বহি জ্বলে,
ঝাঁপ দিলে সে অনলে, পরাণ হরিয়া রে ॥
বিমল বারিধি জলে, দুর্বোঁছলে কেহ বলে,
মৃঢ়ে বলে বারি তলে, ছায়া সে পড়িয়া রে।
ভয় এই পাছে তায়, কামিনী তথায় যায়,
ছিলে কম্পমান কায়, সলিলে লভিয়া রে ॥
পরেতে জানিয়া ভাল, করিছে বিরহ কাল,
কামিনী বদন কাল, তাই ফিরে আইলে।
ফিরে এলে সিদ্ধ হতে, বলে নর শতে শতে,
যে তুমি এমনি মতে, সমুদ্রে জন্মাইলে ॥
বিধু মৃথ মহিলার, দেখ নাহি ফিরে বার,
নাহি দেখি শোভা তার, আজো না পলাইলে।
যেতে বলি যতবার, তত কর অস্বীকার,
বুঝিছি কারণ তার, জ্বালা পাবে যাইলে ॥

পয়ার

নাহি ডর শশধর, ধর হে বচন।
চরণে শরণ তার, করিও গ্রহণ ॥
প্রমদার পদতলে, পড়ি নিরস্তর।
তোমার সদৃশ আছে, দশ শশধর ॥
বিশেষত পদে যদি, না পড়ি প্রথমে।
মৃথের সম্মুখে কথা, কহ যদি তমে ॥
তখনি ঘটিবে কুহু, যেন নিশাকর।
ললনা ললাটে আছে, সিদ্ধুর ভাস্কর ॥

ত্রিপদী

তাহে যদি বল তবে, কেন দিন-পাতি রবে,
ললনার ললাট উপর।
প্রিয়সীর পদদ্বয়, সদা কিবা শোভা হয়,
যুগল কমল মনোহর ॥

নখর নিকর তায়, শশী সম শোভা পায়,
কমলের কোলে শশধর।
ক্রোধে রক্ত দিবাপতি, জানিল অসতী অতি,
পদরূপা নলিনী নিকর ॥
ঠেকে শিখে নারী রীতে, আর পদ্ম আগলিতে,
বদন কমল কামিনীর।
সিন্দুর বিন্দুর রূপ, নারী মৃথে অপরূপ,
দিনেশ বসিল হয়ে স্থির ॥
যদি বল কি প্রকারে, চিনিবে তুমি হে তারে,
দেখ নাই আগে তো সে জনে।
জান যদি আপনার, কুমুদিনী প্রেমাধার,
তারে তবে চিনিবে নয়নে ॥

চৌপদী

যাও যাও সুধাকর, কেন হে বিলম্ব কর,
একবার শশধর, যাও যাও যাও রে।
প্রাণের প্রিয়সী পাশে, বল গিয়ে যদি আসে,
ধরিব পরাণ আশে, বিধিও না তাও রে ॥
নহে রহ এই স্থলে, অহরহ কোন ছলে,
যেও না হে অন্তাচলে, এই ভিক্ষা দাও রে।
মোহিনীর মৃথ তোরে, জ্ঞান করি প্রেম ডোরে,
বাঁধিয়া বাঁচাব মোরে, যেও না কোথাও রে ॥
মনে হয় সে রজনী, যখন রমণী মণি,
অধরে অধরে ধনী, ধরিল আমায় রে।
সে কি এই নদী তীরে, এই সে নিকুঞ্জ কি রে,
তোরি তরে কলঙ্কী রে, দেখিছি কি তায় রে ॥
হা নিকুঞ্জ মনোহর, হা মধুর শশধর,
হে তটিনী স্থিরতর, ধরি সবে পায় রে।
ফিরে দেখা একবার, মোহিনী মধুরাকার,
একবার দেখা আর, হৃদি ফেটে যায় রে।
ফিরে দরশন করি, তটিনীর তটোপরি,
চম্পকের শাখা ধরি, আমা পানে চায় রে।
কি শূনি কি শূনি মরি, মোহন স্বরেতে করি,
কে রে মোর নাম ধরি, ডাকিল কোথায় রে ॥
বুঝি মোর প্রাণেশ্বরী, এহো অনুগতে স্মরি,
রাখি গে হৃদয়োপরি, আঁখি আঁখি করি রে।
না রে মিছে কেন আর, স্বপ্ন দেখে বারে বারে,
যজি সুখে মিছে কার, যাতনায় মরি রে ॥
নাহিক কপাল তার, প্রাণেশ্বরী পাইবার,
এত আশা অভাগার, সর্বার সর্বার রে।
যত সুখ আশা আর, সব করি পরিহার,
শেষ আসা আশা সার, তা কিসে পারি রে ॥
যদিও জানি 'রে মনে, পাইব না প্রিয়জনে,
গোপনেতে প্রাণপণে, তবু আশা ধরি রে।
যদ্যপি স্বপ্নে বা ভ্রমে, ছায়া সুখে কোন ক্রমে,
পাই যদি প্রিয়তমে, হৃদয় ভিতরি রে ॥

দারুণ বিধির বিধি, চেতনে হরিল নিধি,
জ্বালা জ্বালাইল বিধি, মরি মরি মরি রে।
কিন্তু আশা পাছে পাছে, তাই চাঁদ তোর কাছে,
যেতে বলি যথা আছে, আমার সুন্দরী রে ॥

—‘সংবাদ প্রভাকর’, ৩০ মার্চ, ১৮৫৩

বসন্তের নিকট বিদায়

ত্রিপদী

হা বসন্ত মনোহর, হা মোহন রূপধর,
হা রে হৃদি বিচঞ্চলকর।
লইয়ে রূপের ভার, কেন কর পরিহার,
এ মহী মণ্ডল মনোহর ॥
আর কিছুর দিন ওরে, রহ রে ধরণী পরে,
বিদায় তোমারে নারি দিতে।
জানি জানি মরি মরি, এ পাপ পৃথিবী পরি,
নারো আর দিনেক রহিতে ॥
যতেক তোমার শোভা, মোহকর মনোলোভা,
উড়ে যায় নহে স্থিরতর।
খর দিনকর করে, ক্রমেতে মলিন করে,
মোহকর সে শোভা নিকর ॥
তাপিত কুসুম ফুলে, মাথা তুলে দলে দলে,
মৃদু রবে মরুতেরে কয়।
“পাপ তাপে দহে দেহ, বসন্ত আনিয়া দেহ,
মরি সে কি ফিরিবার নয় ॥”
না কুসুম সুন্দরী রে, আসিবে আসিবে ফিরে,
সাধের বসন্ত মনোহর।
কিন্তু সে আসিলে ফের, তোরা তো পারি নে টের,
আজি যাবে পড়িয়া ভূপর ॥
আ মরি অর্মানি দুখে, বিদরে আমার বৃকে,
এ অসার সংসারে রহিয়ে।
ফুলের বসন্ত মত, আশার যতন যত,
যে সকল সুখের লাগিয়ে ॥
আশা মোর সে বসন্ত, বৃষ্টি আমি হলে অন্ত,
তবে আসি হবে রে ঘটনা।
প্রথর দুখের রবি, চিরদিন বৃষ্টি রবি,
অভাগারে দিবারে যন্ত্রণা ॥
মরি আরে কেন আর, কেঁদে মরি এ প্রকার,
মানবের এমন কপাল।
ইহ লোকে চির দীন, হৃদি রবে সুখহীন,
মনোদুখে কাটাইবে কাল ॥
পরিণামে নিত্য নামে, পাবে সেই নিত্য ধামে,
নিত্যই বসন্ত বিকসিত।
যাই তথা যাই তুর্গ, পরম প্রণয় পূর্ণ,
পরমেশে প্রেমে করি প্রীতি ॥

কি ছার মিছার আর, মৃখাম্বুজ মহিলার,
মোহ ভরে করি নিরীক্ষণ।
তেমতি মোহিত মতি, সে প্রীতি প্রকৃতি প্রতি,
রাখিবেক করিয়া যতন ॥
হা মলয় কেন তুমি, উন্মাদের প্রায়।
বেগ ভরে যাও দ্রুত, যথায় তথায় ॥
প্রাণের প্রণয়েশ্বরী, কুসুমের কুলে।
নাহিক নিরখি নেত্রে, জ্ঞান গেছ ভুলে ॥
না রে চল ধীরে ধীরে, আসিবে বসন্ত ফিরে,
ফিরে আসি ফুটাইবে ফুল।
ফিরে ফুটাইলে ফুলে, লইও সৌরভ তুলে,
চুম্বিয়া সে কুসুমের কুল ॥
কিন্তু রে কভু কি আর, আছে আশা ফিরিবার,
মানবের যৌবন বসন্ত।
ফুটায় প্রণয় ফুলে, মানবেরে দিবে তুলে,
সুখ রূপী সৌরভ অনন্ত ॥
নারে সে কখনো আর, নহেকো রে ফিরিবার,
গেলে কাল আর নাহি ফেরে।
কেবলি চলিবে কাল, যদি না ধরে কাল,
ছাড়ায়ে মায়ার যত ফেরে ॥
আসিবে সে দিন যবে, কি সুখ দিবারে রবে,
যৌবন যুবতী প্রেম সুখ।
শুধু তারা দেবে জ্বালা, মন হবে ঝালাপালা,
ভাবিয়া পাপের যত দুখ ॥
তাই বলি পরিণামে, অধরেতে ধরি নামে,
ঈশ্বরে অন্তরে ভাবে যেই।
পরমেশ প্রেমাম্বুজ, লাভ করি মোক্ষপদ,
নিত্যই বসন্ত পাবে সেই ॥

—‘সংবাদ প্রভাকর’, ২৮ এপ্রিল, ১৮৫৩

বিচিত্র নাটক

(তিন মিত্রের কথোপকথন)

প্রথম মিত্র

কি বিষাদে মৃখখানি, হাসি-ভরা নাই।
বেণা-বনে বোসে কেন, উঠ উঠ ভাই ॥

দ্বিতীয় মিত্র

দেখিয়া দেশের গতি, কেঁদে মরি মনে।
সে দুখে বসিয়া আছি, বিরস বদনে ॥

তৃতীয় মিত্র

সখা রে কখন ধর, মিছা দুখ পরিহর,
নিজ সুখে সুখী হও ভাই ॥

বিশ্বকম রচনাবলী

দ্বিতীয় মিত্র

নিজ সুখ এ সংসারে, বন বন বল করে,
আমি তো সে সুখ দেখি নাই ॥

তৃতীয় মিত্র

না জেনে কহিছ ভাই, সংসারে সে সুখ নাই,
জান না তো কার কাছে পাবে।
রাখ রে মানস পুরী, প্রমদার প্রেমে পুরি,
কত সুখে তোমারে মজাবে ॥
পদে পদে প্রেম পথে, মজাইবে মনোরথে,
মহিলার মোহন বদনে।
মোহ মন্ত্রে রবে বাঁধা, মানিবে না কোন বাধা,
কত সুখে রবে মনে মনে ॥

প্রথম মিত্র

এ কথাটি ভাল বটে, রটে ধরাময়।
পরম পদকপ্রদ, প্রমদা প্রণয় ॥
বিশেষতঃ কত তাহে, ধর্মের সঞ্চার।
বিবাহ বিশেষ তাই, বিধি বিধাতার ॥
নর নারী উভয়েতে, হইয়া মিলিত।
আরাধনে করিবেক, পরমেশে প্রীত ॥

দ্বিতীয় মিত্র

ছিছি ছিছি কেন ছার, মদুখাম্বুজে মহিলার,
মরিয়াছ মোহিত হইয়া।
জানি জানি যত জ্বালা, দেয় প্রণয়িনী বালা,
হারিয়াছি বারেক ঠেকিয়া ॥
সবে তার এক দিন, হই আমি প্রেমাদীন,
নাকে কাণে খং দি হে তার।
আদরে ভাঙ্গাতে মান, হইয়াছি অপমান,
না ভাঙ্গিল আমার কথায় ॥

প্রথম মিত্র

সব তার সহিলাম, কত কথা কহিলাম,
মধুর মিনতি কত করি।
রামায়ণ আদি নিয়া, সব কথা কাটাইয়া,
তবু মানে রহিলা সুন্দরী ॥
সামান্য রতন নহে, রমণী রূপসী।
তার না ভাঙ্গিবে মান, বেণা-বনে বসি ॥
তাই বলি উঠ ভাই, পরিহারি দুখ।
বল তুমি বল করে, পৃথিবীর সুখ ॥

দ্বিতীয় মিত্র

অনিত্য সকল সুখ, নিত্য করে বলি।
সকল সংসার সুখ, স্বপনে কেবলি ॥

পৃথিবীতে আছে সুখ, কেবলি স্বপনে।
স্বপ্ন বিনে আর সুখ, নাহি জানি মনে ॥
স্বপনে স্বকরে পাই, সংসার মণ্ডল।
স্বপনে নারীর দেখি, লপন কমল ॥
ভারত জনম ভূমি, সতীত্ব অঙ্গনা।
শশিমুখী সরস্বতী, আর কত জনা ॥

তৃতীয় মিত্র

সে সব স্বপন ভাই, শ্রবণে তোমার।
শ্রবণে প্রবেশ করে, শত সুধাধার ॥
কবি দেখ ছেলে দেখ, দেখ গিয়া মেয়ে।
স্বপনে জিনেছ ভাই, সকলের চেয়ে ॥
মধুর সরল ভাষে, মদুক্ষ কর মন।
করুণায় ভেসে যায়, নীরেতে নয়ন ॥
বিশেষ রসিক তুমি, জানি ইহাতেই।
স্বপ্ন দরশনে দেখ, সতীত্ব নিজেই ॥

প্রথম মিত্র

এখন হে জানিলাম, স্বপ্নে যত সুখ।
এসো মিত্র স্বপ্নে মোরা, ঘুচাইব দুখ ॥

তৃতীয় মিত্র

স্বপনে আমার ভাই, মন নাহি ভজে।
আসল পাইলে বল, নকলে কে মজে ॥
বিশেষ একেতে আমি, ডরি হে কতক।
একেবারে তাড়াবো না, দেশের রক্ষক ॥

প্রথম মিত্র

ওই দোষে চিরকাল, মরিয়া রে তুই।
ভাল কথা তোর মদুখে, শুনি নে কভুই ॥

তৃতীয় মিত্র

তুমিও তো ওই রসে, মজিয়াছ ভাই।
সে কথা শুনোছি ভাল, কামিনীর ঠাই ॥
চতুর জামাই হও, শ্বশুরের ঘরে।
ফুল খেলা কত জানো, বাগান ভিতরে ॥
কিন্তু আহা মরি মরি, কামিনীর রূপ।
কি মোহন মন্ত্র দিয়ে, বর্ণেছ স্বরূপ ॥
মধুর মোহন ভাষে, মোহিনী বর্ণন।
বুঝি হে কখনো আর, ভুলিবে না মন ॥

এই সময়ে এগ্যামাচন্দ্র বিশ্বদাস ও গদুপ্ত নামক কয়েক
জন পদলিস সংক্রান্ত শাস্ত্রধারী আসিয়া কহিল যে

চোর চোর ধর চোর, এই জন চোর।
পর ধন কর চুরি, এত সাধ্য তোরা ॥

তৃতীয় মিত্র

বাহারে! এ যে হে বড়, বাহারে চাতুরী।
বল দেখি কার কিবা, করিয়াছি চুরি ॥

গদ্য

কার কি করেছে চুরি, এ তো নাহি জানি।

বিশ্বদাস

বলেছে তোমারে চোর, শৃঙ্খল অন্তর্মানি ॥

তৃতীয় মিত্র

ভাল ভাল এত বৃদ্ধি, প্রশংসার বটে।
না জানিয়া চোর বলা, সর্বদৃষ্টিতে ঘটে ॥

শ্যামাচন্দ্র

না জানিয়া তোরে কভু, চোর বলি নাই।
তাহার কারণ তবে, শুন মোর ঠাই ॥
সে কালের কালী বাবু, বড় ধনবান।
পোরেছিল ছ পাড়ের, ধৃতি একখান ॥
তুমিও তো ছ পাড়ের, ধৃতি পরিয়াছ।
তাই বলি তার ধৃতি, চুরি করিয়াছ ॥

তৃতীয় মিত্র

বটে বটে দিব্য আছে, এই পৃথিবীতে।
দু খানি ছপেড়ে ধৃতি, নারিবে জন্মিতে ॥

শ্যামাচন্দ্র

চোপ্ চোপ্ চোপ্ রহ, মৎ কর সোর।
পুলিসের ম্যাজিস্ট্রেট, পদ আছে মোর ॥
আমি বলিতেছি তুই, চুরি কোরেছিস্।
আমার কথায় হয়, ডিক্ৰী বা ডিসমিস্ ॥

তৃতীয় মিত্র

যো হুকুম খোদা-বন্দ, হইল ইয়াদ্।
বল দেখি কত দিন, খাটিব মিয়াদ ॥

গদ্য

মানিলাম নাহি তুমি, করিয়াছ চুরি।
তবু দোষ দেখাইতে, পারি ভূরি ভূরি ॥

প্রথম মিত্র

কেবলি দেখায়ে দোষ, কি লাভ তোমার।

গদ্য

দোষ দেখানো হে বাপু, ব্যবসা আমার ॥
তোমারো সহস্র দোষ, দেখাইতে পারি।
বিশ্বদাস তাহে মোর, আছে সহকারী ॥

প্রথম মিত্র

ভাল ভাল সাধু সাধু, কি নাম তোমার।
অসার সংসারে শৃঙ্খল, তুমি প্রশংসার ॥

গদ্য

গদ্য রাখিলাম বাপু, নামটি আমার।
গদ্য আছে প্রথমে তার মধ্যেতে পকার ॥

তিন জন পুলিস প্রহরী।

কথার গতিক বড়, উত্তম না ঘটে।

স্বস্থানে প্রস্থান করা, যুক্তি মত বটে ॥

ইংহারা প্রস্থান করুন ॥

তৃতীয় মিত্র

সময় হোতেছে নাশ, যাই নিজ নিজ বাস,
কি করিব ভেবে দেখি মনে।
তুমি যাও এই বেলা, কর গিয়া ফুল খেলা,
যামিনীতে কামিনীর সনে ॥
তুমি ত্যজিবে না বনে, ভাবো গিয়ে নিজ মনে,
আজিকে দেখিবে কি স্বপন।
আমি বাড়ী গিয়ে ভাই, মনসুখে নিদ্রা যাই,
স্বপন কি, না জানি কখন ॥
তবে গো বিদায় হই, প্রণয়েতে যেন রই,
এই আশা করে মোর মন।
যদি কোন কথা মোর, হয়ে থাকে অতি জোর,
then beg you pardon.

—‘সংবাদ প্রভাকর,’ ২৭ মে, ১৮৫৩

বর্ষা বর্ণনাছলে দম্পতির রসালোপ

কামিনী

ত্রিপদী

দেখি কি হে ভয়ঙ্কর, গরজিয়ে গর গর,
ব্যাপিল গগনে নবঘনে।
নবনীল নিরুপম, অর্দ্ধ তমস্বিনী সুম,
দলিছে দামিনী ক্ষণে ক্ষণে ॥
ঘন ঘোর গরজনে, বিদারে গগনে বনে,
তীক্ষ্ণ তীর সম বরিষয়।
বল বল প্রাণনাথ, কেন কেন অকস্মাৎ,
গরজন বরিষণ হয় ॥

পতি

প্রাণেশ্বর শুন শুন, যে কারণে পদন পদন,
গরজন বরিষণ হয়।
অতিশয় দম্ভভরে, বর্ষা আগমন করে,
সঙ্গে সব সহচর হয় ॥

বিক্রম রচনাবলী

ভেবেছিল যুবরাজ, নাহি ভুবনের মাঝ,
রূপবান তাহার সমান।

সে গর্ব হইল নাশ, হারিল তোমার পাশ,
বরষার পূর্ণ অপমান ॥

নিবিড় চাঁচর তব, তাহে কাদম্বিনী নব,
রূপেতে কিরূপে তোমা সমা।

তব মৃদু হাসি স্থানে, পদে পদে অপমানে,
দুখিনী দামিনী নিরুপমা ॥

মরি কি সুন্দর পশি, মৃদিতা সুন্দরাবসি,
কোমল কমল কলি জলে।

তাহে পরাজিত করে, তোমার হৃদয়োপরে,
নব কুচ কলিকা যুগলে ॥

বর্ষার পল্লব নব, তাহতে অধর তব,
শতগুণে সুকোমল শোভা।

নদ নদী জলে টলে, তাহতে ঘোঁবন জলে,
তব দেহ কিবা মনোলোভা ॥

আরো দেখ করিবরে, বরষায় মত্ত করে,
দ্বিগুণ উন্মত্ত তুমি কর।

হেরিয়া তোমার করে, হেরি তব পয়োধরে
চিৎকার করিছে কুঞ্জর ॥

যে দাড়িম্ব বরষার, সকল গর্বে'র সার,
তব কুচে পূর্ণ মান নাশ।

মেঘে রবি ঢাকা ঢাকি, কেশেতে সিন্দুর মাখি,
তাহা হতে লাবণ্য প্রকাশ ॥

পদে পদে এইরূপে, হারিয়া তোমার রূপে,
কত অপমান বরষার।

এত দুখ সহিবারে, বরষা নাহিক পারে,
রোদন করিছে অনিবার ॥

সে রোদনে অনিবার, পড়ে বৃষ্টিধার তার,
ঘননাদ দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

তাই প্রাণ নিরন্তর, বরষিছে জলধর,
তাই মেঘ গর্জে অনিবারে ॥

কামিনী

বিঘোর নীরদোপরে, কত হাব ভাব ভরে,
চপলা চঞ্চলা চমকায়।

কেন কেন ক্ষণপ্রভা, ক্ষণেক প্রকাশি প্রভা,
ক্ষণ পরে বারিদে লুকায় ॥

পতি

গিরির শিখর পরে, থাকে যত জলধরে,
দেখিল তোমার কুর্চগিরি।

পরিহারি সে ভূধরে, রৈতে পয়োধর পরে,
আসিতে লাগিল ধিরি ধিরি ॥

এসে দেখে হায় হায়, নীলবস্ত্র মেঘে তায়,
বসিয়াছে মনের পদলকে।

কুঞ্জে মেঘ নাহি রঞ্জে, অগ্নিশিখে উঠে চঞ্জে,
তাই সখি বিদ্যুৎ চমকে ॥

জলধর ক্রোধমনে, আদেশিল সমীরণে,
উড়াইতে বৃকের বসন।

তাই বায়ু আসে ডেকে, যাবে বৃক খুলে রেখে,
ধরিয়ে রাখিবে কতক্ষণ ॥

কামিনী

আগে ছিল সুধাকর, বিমল কোমল কর,
নিরমল গগন মণ্ডলে।

এমন কেন গো শশী, গগন মণ্ডলে পশি,
ঢাকিয়াছে জলদ সকলে ॥

পতি

তোমার সমান হতে, শশধর বিধমতে,
বাঞ্ছা করে আকাশে থাকিয়া।

দেখে তুমি কর মান, জেনে সে মানের মান,
মুখমেঘ বসনে ঢাকিয়া ॥

বৃষ্টিধারে ধীরে ধীরে, ফেলিয়া অশ্রুর নীরে,
ম্লানমুখে করিয়াছে মান।

হলো কিনা তোমা মত, দেখিবারে অবিরত,
ক্ষণে ক্ষণে হয় দৃশ্যমান ॥

কামিনী

খর কর ধরি রবি, মেঘে ঢাকা দেখে ছবি,
নহে প্রকাশিত প্রভাকর।

না হেরি পতির মুখে, নয়ন মৃদিয়া দুখে,
কমলিনী কতই কাতর ॥

সাধে কি সকলে কয়, পুরুষ পরস ময়,
কি কঠিন তাদের হৃদয়।

এই দেখ দিনকর, কেমন নিদয়ান্তর,
রমণীরে কেমন নিন্দর ॥

কমলিনী যার তরে, সতত বিলাপ করে,
মৌনমুখী মৃদিত নয়ন।

দয়া করি সেও তায়, ফিরিয়া নাহিক চায়,
সদা করে প্রাণে জ্বালাতন ॥

পতি

গুণমাণি দিনমাণি, কেন লো রমাণি মাণি,
না বৃঝিয়ে দোষ দিবাকরে।

নলিনীর পেয়ে দোষ, দিনেশ করেছে রোষ,
তার সনে দেখা নাহি করে ॥

তব মুখে কমলিনী, কোলে ধরে বিনোদিনী,
সিন্দুরের বিন্দু প্রভাকর।

কোলে অন্য দিবাকর, কমলিনী কলেবর,
দেখিয়ে ম্লান দিনেশ ঈশ্বর ॥

মনে জানিলেন দড়, নালিনী অসতী বড়,
নাহি করে মৃথ দরশন।
গুণমণি, দিনমণি, কেন লো রমণি মণি,
না জানিয়া দোষ লো তপন ॥

কামিনী

এ সময় মধুকরে, কি জাবলায় জ্বলে মরে,
মৃদিত সকল শতদল।
যদি কোন পদ্ম পায়, অপ্রফুল্ল দেখে তায়,
মধুহীন যতন বিফল ॥
ভ্রমে ভ্রমি সে ভ্রমরে, যদ্যপি গমন করে,
অন্য কমলিনী নিকেতন।
মৃগাল কণ্টকে লেগে, ছিন্ন অঙ্গ হয়ে রেগে,
অন্য পদ্মে করিলো গমন ॥
অপ্রকাশ্য সেই কলি, বাতাস লাগিল বলি,
হেলে দলে ফেরে তাহা হতে।
নিরুপায় নিরাশায়, শেষে মধুকর যায়,
কলিকা উপরে স্থান লতে ॥

পতি

আ মরি লো এ অধীনে, সেই মত এক দিনে,
ঘটাইলে প্রাণের রতন।
তুমি লো কমলবন, ছয় পদ্ম সুশোভন,
কর পদ হৃদয় বদন ॥
যবে প্রিয়ে মান করি, মজাইলে প্রাণেশ্বরি,
লক্ষ্য করি মৃথ শতদল।
গিয়ে তায় মধুপানে, তৃপ্ত করিবারে প্রাণে,
অপ্রফুল্ল দেখি সে কমল ॥
তাহাতে বর্ণিলে ছলে, যাই কর শতদলে,
হাতে ধরে ঘুচাইতে মান।
গহনা মৃগালে কাঁটা, অঙ্গুলি যাইল কাটা,
পরে পাদ পদ পড়ি প্রাণ ॥
হেলে দলে সে কমলে, লুটাইয়া শতদলে,
ফিরাইলে প্রাণের ললনা।
শেষে যাই কলিপরে, শোভিছে যা হৃদিপরে,
দূরে গেল মানের ছলনা ॥

কামিনী

বল বল তারাচয় কেন কেন ম্লান হয়,
ছিল কিবা শোভাকর কর।

পতি

যামিনী কামিনী সতী, লইয়ে যামিনী পতি,
বিলাসিছে মেঘের ভিতর ॥

পাছে বা দেখিতে পাই, নিভাইয়ে দেছে তাই,
আকাশের দীপ তারাগণে।
তবুও তো নিরন্তর, স্থির নহে শশধর,
উর্ধ্বক মেরে দেখে ক্ষণে ক্ষণে ॥

কামিনী

পেয়ে নীরধর নীর, পূর্ণাকার ধরে নীর,
আহা মরি শোভা তার কত।
জলপূর্ণ সরোবর, যদ্যপি হে মোহকর,
কমলিনী বিনে শোভা হত ॥

পতি

না লো প্রাণ মনোহর, দেখিতেছি সরোবর,
সরোজিনী সহ শোভা পায়।
ধরণী সলিলাবৃত্তা, যেন সরো সুশোভিতা,
তুমি প্রাণ কমলিনী তায় ॥

কামিনী

এর বা কারণ কিবা, এই বরষার দিবা,
দীর্ঘ দেহ করেছে ধারণ।
কমে গেছে তমস্বিনী, তবু তাহে বিষাদিনী,
বিরহিণী বিনোদিনী গণ ॥

পতি

সুমেয় শিখর আর, ও কুচ ভূধরাকার,
এ তিন শিখর নিরখিয়া।
হইল তপন ব্যস্ত, কোন্টায় যাবে অস্ত,
তাই ভাবে বিলম্ব করিয়া ॥
ঘন ঘোর ঘন অতি, ঢেকেছে যামিনী পতি,
বিরহিনী বিষাদে রজনী।
কেঁদে কেঁদে বুক ফাটি, দুখে দেহ করে মাটি,
যৌবনেই মরে গেল ধনী ॥

—‘সংবাদ প্রভাকর’ ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৩

কালেজীয় কবিতার মারামারি*

বিষম “বিচিত্র নাটক”

অর্থাৎ

কবিদের মজলিশ এবং ঐ নাটক দর্শন

দলমল বলমল, শত দীপ সচঞ্চল,
নিশাযোগে অট্টালিকা মাঝে।
সে আলোর কিবা নিভা, চন্দ্রকার দিবা বিভা,
যেন তথা মিশিয়ে বিরাজে ॥

* শূন্যতে পাই প্রভাকরে না কি দূটো বীর আসিয়া বড় যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে? একটি না কি আবার আশে পাশে কামড় মারিতে আরম্ভ করিয়াছে, বেশ আর্মিও একবার এই সময় সাহেবদের সেলাম ঠুকিয়া যাই, কিন্তু নিজে বীর নাহি, যুদ্ধ করিব না, চড়টা চাপড়টা মারামারিই ভাল।

বঙ্কিম রচনাবলী

কোটী দীপ কাঁচ মাঝে, কোটী তারা সুবিরাজে,
 জ্বলে যেন হিরাময় বাসে।
 কতই কুসুম তায়, বলমল শোভা পায়,
 প্রভাময় সকলি প্রকাশে।
 ঝক্‌মক্‌ বলমল, আলো মাঝে সচঞ্চল,
 নৃত্যকীর বসন ভূষণ।
 ঝকমোকে বেশ ধরি, বসেছে বিরাজ করি,
 কবীশ্বর পাশে কবিগণ ॥
 ধীরে ধীরে বীণা বাজে, ধীরে ধীরে নিশি মাঝে,
 মৃদু মৃদু গায় বামাস্বরে।
 বিদ্যা আর অবিদ্যার, নৃত্য হবে দুজনার,
 কে ছোট কে বড় জানিবারে ॥

বিদ্যার নাচ

নাচে শশিমুখী, গজেশ গতি।
 ললনা নলিতা, লাভণ্যবতী ॥
 কোমল কুসুম, কলিকা প্রায়।
 কনক ভূষণ, কনক কায় ॥
 নিবিড় নিতম্ব, যৌবন ভার।
 হাব ভাব হেলা, কত প্রকার ॥
 হেলিয়ে দুর্লিয়ে, নাচিছে ঘুরে।
 ভূষা বলমল, কুসুম ঝুরে ॥
 প্রেমময় নীল, কোমল আঁখি।
 স্থির রাখিয়াছে, ধরায় রাখি ॥
 বঙ্কিম নয়নে, বারেক চায়।
 বিদ্যুৎ সমান, তখনি যায় ॥
 ঝাণ্টার মাঝে, বদন চাঁদ।
 আশে পাশে ফেরে, বসন ফাঁদ ॥
 হাব ভাব কত লাভণ্যে মাখা।
 কেমন নাচিছে, কেমন বাঁকা ॥
 ফিরিয়ে ফিরিয়ে, ফিরিয়ে ফেরে।
 চলিয়ে চলিয়ে, চলিয়ে ধীরে ॥
 কখন কি রূপে, কোথায় আছে।
 সমীরে সরোজী, যেমন নাচে ॥
 কিরূপ কি ভাব, কেমন ছবি।
 দেখে গেল গলে, যতেক কবি ॥
 যন্ত্র মৃদু সবে, অচল আঁখি।
 বিদ্যা চলে গেল, তাদের রাখি ॥

অবিদ্যার নাচ

আইল অবিদ্যা তবে, দেখে কাঁপে বুক।
 ঢেঙ্গা মাগী পেটমোটা, হাঁড়ি পানী মৃখ ॥

বরণে হাঁড়ির তলা, ঝক্‌ মেয়ে যায়।
 দীর্ঘ চুল দীর্ঘ দাঁত, সাঁচিপান খায় ॥
 বসন মলিন অতি, পচা গন্ধ গায়।
 তিনি ফের নাচিবেন, নমস্কার পায় ॥
 ধূপ্‌ ধাপ্‌ কোরে নাচে, মেঝে করে চুর।
 পাঁকেতে নাফান যেন, ব্যাঙ্গ বাহাদুর ॥
 কবিগণ হেসে মরে, বলে এ কি পাপ।
 পলাতে পারিলে বাঁচি, বাপ্‌ বাপ্‌ বাপ্‌ ॥

অবিদ্যার প্রতি কবিদের রহস্যোক্তি

অবিদ্যা এতেক বিদ্যা, শিখিল কোথায়।
 মোহিত হইয়া মোরা, জিজ্ঞাসি তোমায় ॥
 পরিচয় দাও ধনি, কেন এত বিদ্যা।
 আ মরি সুন্দরি তুমি, কাহার অবিদ্যা ॥

অবিদ্যা

“প্রবল প্রতাপশালী, অসভ্য রাজন।
 সসাগরা ধরা নিজে, করিল শাসন ॥
 তাঁহার সখের মোরা, দুই পাট রাণী।
 প্রথমা অবিদ্যা আমি, দ্বিতীয় দুর্বারাণী ॥”
 পুত্র এক পেয়ে মেনে, পরাণে বেঁচেছি।
 কিন্তু আগে বল সবে, কেমন নেচেছি ॥

কবিগণ

এমন সুন্দর নাচ, কভু দেখি নাই।
 তাই এক অভিলাষ, করেছি সবাই ॥
 সুখী হব পুত্র তব, দেখিবারে পেলো।
 কে জানে সে কতদুর্লি, তোমার তো ছেলো ॥

কুবিদ্যা*

ছেলের গুণের কথা, কি কহিব আর।
 রূপেতে আমারি মত, বাছা বাঁচা ভার ॥
 ভাল যাত্রা করে সে, যে, নিজে অধিকারি।
 নাচিতে গাহিতে বাছা, স্বরূপ আমারি ॥
 কিন্তু আজ পারে কি না, নাহি যায় বলা।
 কেবল ঝক্‌ড়া কোরে, ভাঙ্গিয়াছে গলা ॥
 সতিনী পালিত পুত্র, আছে এক ছোঁড়া।
 সেই কালোমুকো হলো, ঝক্‌ড়ার গোড়া ॥
 এক দিন তারে দেখে, আমার তনয়।
 মাই ধোরে কোলে বোসে, মৃদু মৃদু কয় ॥
 “ওমা ওমা হেঁদে দেখ, দাদার এখন।
 রাজ ভোগ খেয়ে দেহ, ফুলেছে কেমন ॥

* কুবিদ্যা ও অবিদ্যা এক জনেরই নাম বিবেচনা করিতে হইবে, অবিদ্যা শব্দের অন্য অর্থ আছে
 এজন্য তাহা ব্যবহার করা উচিত বোধ হইতেছে না, তাহার হেতু পরে জানা যাইবে।

আমি কহিলাম উহা, বলো না রে আর।
ওপোড়া কপালে কাল, হয়েছে তোমার ॥
সব কথা শুনিতো না, পেয়ে কবি ভালো।
মনে মনে কাল অর্থে করিলেন কালো ॥”
হইল বিষম মনে, অভিমান বোধ।
বারে বারে কটু বোলে, দেয় প্রতিশোধ ॥
তাই তারে গালি দিল, কুমার আমার।
সে দ্বন্দ্ব মেরেছে হুড়ো, বৃষ্টি কাকে আর ॥
দুজনের সনে দ্বন্দ্ব, এ আর কেমন।
একা গাই দুই ষাঁড়, সে জ্বালা যেমন ॥

কবি ঈশ্বর

সে তোমার পুত্র নয়, ভাল জানি আমি।
তা হইলে হবে কেন, বিদ্যাপথগামি ॥
বিদ্যালয়ে থাকে ছেলে, বিদ্যা অনুরাগী।
তোমার ছেলে হবে কেন, দূর বড়ো মাগী ॥

কুবিদ্যা

তুই চুপ্ কর্ মেনে, সে ছেলে আমার।
তাই পরিচয় দেছে, আপনি কুমার ॥
সে কথা শুনছে সবে, জগৎ সংসারে।
প্রভাকর সাক্ষ্য আছে, জিজ্ঞাসহ তারে ॥

কবিগণ

যাহা হোক্ ডাক তারে, শুনিব গো গান।
ছেলের মধুর গীত, অমৃত সমান ॥

কুবিদ্যার ছেলে ডাকা

আয় যাদু আয় যাদু, আয় ঝপ কোরে।
মহা গুণি কবি যত, ডাকিতেছে তোরে ॥
গু নি তে ডাকিছে তোরে, পারি রে খাবার।
আয় আয় আয় বাবা যাদু রে আমার ॥
গাহিবে সন্তোষ মনে, খাবে যাহা দিবে।
এতেকবিমল মধুরে, মিষ্টদে খাইবে ॥ *
আয় আয় ধনমণি, মধুর রাখ্ মার।
আমার হোস্ গো তুই, সর্ব্ব ধন সার ॥

ছেলে আসিতে আসিতে বলিতেছে

মাকো তোর চাবালেরে, ডাক্ দিলি ক্যান্।
যাতে নার্লাম মাগো, হাঁ—

মিত্র কবি

—Walk up man.

কবীশ্বর।

কও রে কি নাম তোর, বাস কি নগর।

ছেলে

নাম বুনো অধিকারী, বেণাবনে গরু ॥

মিত্র কবি

মাপ কর রাখ বাপু, দুটো দিশি বোলে।
বল্ দেখি কিসে আলো, উপরেতে ঝোলে ॥

বুনো

চাতালেতে ওড়া বৃষ্টি, ডোমেতে বা বেচে।
ক্যাঁচের দোচনাওলা, জোলাইয়া দেচে ॥

চটু

বল দেখি সাদা কেন, ঘরের দেয়াল।
মহা ব্যাধি হয়েছে কি, তোলা গেছে ছাল ॥

বুনো

বৃষ্টি বা এ ভারে, পারে দোষে চিতাইচে।
কি কাওয়ারে দৈবাৎ, কয়ে হাগাইচে ॥ †

মিত্র

চটু এর ভাষা এ যে, বোঝা হোলো দায়।
অনুবাদ কোরে বল, তবে বোঝা যায় ‡

কুবিদ্যা

ভেকো হোলে কেন বাছা, কথা কও দড়।
মিছে কেন খাটো হও, জোরে হও বড় ॥
দাঁড়িয়ে কি কর, গালি, দেও যথোচিত।
না হয় গানেতে কর, সবারে মোহিত ॥

বুনোর গীত

রাগিণী ঝিঝিট্। তাল খেমটা।

হব সন্ন্যাসী এবার। হব সন্ন্যাসী এবার ॥
কোণের ভিতর শুকুনো নাড়ী, সইতে নারি আর।
তোম্ সনে লো পিরীত কোরে,

শিবের পূজা গেল ঘুরে,

অধিকারী নামটি ধোরে, ঘণ্টা নাড়া সার ॥

কেমন গেয়েছি সবে, কও তো বিশেষ।

* এতেক বিমল মধুরে মিষ্ট দেখাইবে।

† অর্থাৎ বৃষ্টি বা এটাকে পাড়িয়া ধরিয়া চিত্র করিয়াছে, কিম্বা কাক্কে দই ভাত খাওয়াইয়া হাগাইয়াছে।

‡ তাই কবি।

বাংকম রচনাবলী

সব কবি

বেশ বেশ বেশ বুনো, বেশ বেশ বেশ ॥

চট্ট

গাও ভাই ফিরে গাও, আর একবার।
শুনিয়ে জুড়াই ফের, শ্রবণের দ্বার ॥
অথবা শুনিয়ে তুমি, কবি মহাগুণী।
একটি কবিতা ভাল, পড় দেখি শূনি ॥
স্বপ্ন বা ধর্মের ক্রেশ, ফেলে দেও জলে।
কহ তো প্রেমের গুণ, কবিতা কোঁশলে ॥

বুনোর কবিতা পাঠ

প্রেম সবে কর সার, প্রেমময় এ সংসার,
আকাশ পাতাল মহীতলে।
সত্য ত্রেতা দ্বাপরাদি, প্রগাঢ় প্রণয়ে বাঁধি,
ভাসিয়েছে সুখেতে সকলে ॥
প্রেম তরে কত লোক, হয়ে গেল পরলোক,
শিবের হইল ধ্যান ভঙ্গ।
সমুদ্র মন্থন কালে, মোহিনীর প্রেমজালে,
গিরীশের ঘটিল কি রঙ্গ ॥
শ্রীরাম প্রেমের তরে, কতই রোদন করে,
দেশে দেশে উদ্দেশিয়া নারী।
জ্বালা পায় কতবার, শেষেতে সে প্রেমে তার,
হইল বানর অধিকারী ॥
দ্বারকানাথ গো আর, গোপাল মাঝেতে তার,
মন বাঁধা গরু রাধিকার।
দ্বারকায় লাজ খেয়ে, বরিল বানরী মেয়ে,
দাস জাম্বুবানের কথায় ॥

যিনি নিজে রামেশ্বর, রসিকের মণি।
ছিল তাঁর কত আর, রসিকা রমণী ॥
রুক্মিণী রূপসী রামা, সত্যভামা সতী।
দ্বারকা স্বর্গের সম, ছিল শোভাবতী ॥
সে শোভা এখন কোথা, কোথা সেই হরি
মোহিনী মন্ডল কোথা, সব গেছে মরি ॥
যত ছার পশু পক্ষী, বাসা করে তার।
শৃগাল কুঙ্করে হাগে, দ্বারকার গায় ॥
তাইতে হইল মোর, কবিতার শেষ।

সব কবি

বেশ বেশ বেশ বুনো, বেশ বেশ বেশ ॥

কবীশ্বর

ভাল বটে দেখি তব, কবিতার ছটা।
পরে গালি দিতে তবে, এত কেন ঘটা ॥

কেহ হোলো অসভ্যের, বল সেনাপতি।
কেহ বা যুদ্ধের মন্ত্রী, নিজে সাধু অতি ॥
পর দোষে দেও হাত, নিজ দোষ ঢাকি।
তুমি তো বোসেছ হোয়ে, নিজে জয়ঢাকী ॥

বুনো-কবি

না প্রভু নাহিক আমি, অসভ্যের কেহ।
পালিত হোয়েছে শূদ্ধ, তাঁর অন্নে দেহ ॥
ভাল কোরে গালাগালি, দিতে যারে তারে।
আশ্রয় লয়েছি এসে, অসভ্য আগারে ॥
কত লোক দিছে কত, মুখে চুণ কালি।
তবু যারে তারে দিই, দোহাতিয়া গালি ॥
কিন্তু অসভ্যের ছেলে, পাছে কেউ কয়।
পরকে বলেছি তাই, অসভ্য তনয় ॥
চট্ট ভাবে দিছে গালি, আমি নহি পটু।
তাকেও বলেছি তার, গোটা-দুই কটু ॥
গেলের বাজারে নাম, লিখেছি রাখিয়া।
চট্ট মিত্র মোর গাল, গিয়াছে খাইয়া ॥
কোন মূঢ় বলে ওরে, গালে আমি কম।
তারা জানে গাল মোর, শক্ত কি নরম ॥
কিন্তু ভয় করে, পাছে, ফিরে গালি খাই।
হাতে পায় ধোরে মানা, করিয়াছি তাই ॥

চট্ট

বুঝেছি চতুর বট, বুদ্ধি ঢের ঘটে।
গালি দিয়ে মুখ চাপা, যুক্তিমত বটে ॥
আঙ্গুর হইল টক্, পেলে না নাগাল।
ভয় খেয়ে সভ্য হলে, লিখবে না গাল ॥
যেমন নবোঢ়া হয়ে, রতিরসে বালা।
দুদিন ঠেকিয়ে শিখে, তার যত জ্বালা ॥
দিন দুই ঘরে গিয়ে, স্বামিঘর ছাড়ে।
যত আরো পতি সাধে, তত আরো বাড়ে ॥
কোলেতে বসায় পতি, উঠে যায় কেঁদে।
সেই রঙ্গ দাদা ভাই, বসিয়াছে ফেঁদে ॥
ছোঁড়াও তেমন নয়, ধোরে এনে জোরে।
বুক পুরে মনোরথ, লবে পূর্ণ কোরে ॥

বুনোকবি

তুমি যে হে বোলোছিলে, কটু কহিবারে।
আমি নাকি পারিনেকো, দেখ এই বারে ॥

চট্টো

বটে বটে খুব গালি, মিত্রে দেছ ভাই।
“মলমূত্র” আহারাতি, কিছু বাকি নাই ॥
এক জোর ঘায়ে সব, করিয়াছ শেষ।
পাগল বুনোর ঘায়ে, যাব কোন দেশ ॥

যেমন জনেক মূর্খ, রমণীর স্থান।
 অরসিক বোলে কত, হৈল অপমান ॥
 পিরীতে রমণী দিল, কাণ মূলে তার।
 মূর্খ বলে রসিকতা, শিখেছি এবার ॥
 কত রস শিখিয়াছি, এই দেখ রামা।
 কসালো ছুঁড়ির ঘাড়ে, বারো ইঁপ্তি ঝামা ॥
 সেই রঙ্গ হলো তব, শুন ভাই বুনো।
 কবিহে বাড়ালে তুমি, গালি দিয়ে দুনো ॥
 কেবল তোমার মূখে, গালি না যুয়ায়।
 কিন্তু হে একটি কথা, জিজ্ঞাসা তোমায় ॥
 কটুতে অপটু তুমি, বলিয়াছি বটে।
 তুমি তা জানিলে বলো, কাহার নিকটে ॥

বুনোকবি

যে হোক না কেন তাতে, কি কাষ তোমার।
 আগে বল দিছি গালি, কেমন এবার ॥
 তোমারে যা বলিয়াছি, বদ্বৈছ ত সব।
 গোপনে বলেছি ঢের কর অনুভব ॥

চট্টো

গাল দেছ দড় দড়, হলো বাহাদুরি বড়,
 বাড়িবেক যশ অবিরত।
 আমরা শূনিয়া তায়, এসেছি কৃতজ্ঞতায়,
 সেলাম বাজাতে গোটাকত ॥
 “নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে”
 সুবুদ্ধি মহৎ তুমিও ত।
 তাই সব নমস্কার, ফিরিয়ে দিবে না আর,
 সুবুদ্ধি মহৎ জন মত ॥
 কি সুবুদ্ধি সূক্ষ্ম তব, লোকে করে অনুভব,
 যায় কি না যায় দেখা কিছুর।
 কেহ বলে কই কই, কেহ বলে, আছ ওই
 কেহ বলে দাড়ি বাঁধো পিছুর* ॥
 হে উত্তরে মহল্লোক, একবার তেজে শোক,
 সম্বোধিও নীচে মূখ ফুটে।
 মনসুখে সব স'ব, কিছুর মাত্র নাই কব,
 অঙ্গীকার করি করপুটে ॥

মিত্র কবি

গালি দিলে প্রতিফল, অবশ্য পাইবে।
 যেই মতি, সেই গতি, কেন না হইবে ॥

বুনোকবি

এ মতি আমার নাই, ছিল এত কাল।
 কুবিদ্যা কুমতি দিয়ে, ঘটালো জঞ্জাল ॥

সুবিদ্যা সুমাতা ছেড়ে, এসে তার কাছে।
 এই মতি এই গতি, শেষ ঘটিয়াছে ॥

কুবিদ্যা

আমি তোমার মাতা নাই, সে তোমার মাতা।
 সে তোমার প্রিয় হলো, খেলি মোর মাতা ॥
 আমি চলে যাই দেখি, কে কি করে তোমার।
 এখন করিবি তুই, কোন্ মা'র জোর ॥

কুবিদ্যা প্রস্থান ও বিদ্যা পুনরাগমন করিলেন

বিদ্যা

কেন বাছা তোরা সবে, কলহ করহ।
 ভাই ভাই ভাবে সদা, ভাই ভাই রহ ॥
 সকলে একত্রে মোরে, আরাধনা কর।
 সকলেই উপদেশ, দেন কবীশ্বর ॥
 সদাই সম্ভাবে তবে, কেন না চলহ।
 কি কারণ কর সবে, কেবল কলহ ॥

মিত্র

তাই আমি কতবার, বদ্বায়ে লিখেছি।
 তার ফল গালাগালি, কেবল দেখেছি ॥

অধিকারী

আমি ত দিই নে গালি, ওদের দুজনে।
 শূদ্ধ কবিশ্রেষ্ঠ আমি, জেনে মনে মনে ॥
 করিলাম অপরাধ, স্বপন রচনা।
 জগতেরে জানাবারে, নিজ গুণপনা ॥

বিদ্যা

কিসে তুমি শ্রেষ্ঠ কবি, নিজ মনে লাগে।
 কবিতা কাহাকে বলে, বল দেখি আগে ॥

অধিকারী

যে জন মিলায় শব্দ, সুকোমল ভাষে।
 সেই ত সুকবি বলি, আপনা প্রকাশে ॥

বিদ্যা

তা নয় কবিতা বাছা, তা নয় তা নয়।
 রামায়ণ পোড়ে তত, সুকবি না হয় ॥
 মূদ্ধ যদি, প্রকৃতির, মোহন বদন।
 যেই মনোমত ভাবে, করে দরশন ॥
 সুখ দুখ রিপু রসে, হৃদয় মাঝার।
 প্রকৃতির মোহসনে, জন্মে যে বিকার ॥

* অর্থাৎ বুদ্ধি।

বিক্রম রচনাবলী

যেই ভাষে সেই ভাব, স্বরূপ প্রকাশে।
যে ভাষে আপনা সনে, হৃদয় সন্তাষে ॥
যথার্থ কবিতা সেই, সদা মোহময়।
শুধু রাম রাম বলা, কবিতা তো নয় ॥
কিন্তু রামনাম তুমি, ছাড়িবে না দেখি।
বতে প করিলে কবি, কয় যত ঢেঁকি ॥
সত্য কবিতায় রাখ, যতন বিশেষ।
কবি ঈশ্বরের ঠাই, লহ উপদেশ ॥

—‘সংবাদ প্রভাকর’, ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৫০

বর্ষার মানভঞ্জন

নায়কের উক্তি

ত্রিপদী

বিধুমুখি করে মান, কিরূপ দেখালে প্রাণ
হেরিতোছি অপরূপ ভাব।
বরষার আবির্ভাবে, প্রফুল্ল সরস ভাবে
রহিয়াছে সকল স্বভাব।
বন উপবন চয়, রসময় সমুদয়
রসপূর্ণ যত জীবগণ।
কিন্তু কি আশ্চর্য্য কব, এ সবার মাঝে তব
কেন প্রিয়ে বিরস বদন।
বদ্বোঁছ কারণ তার, দোষ দিব কি তোমার
বরষাকালেতে সব করে;
সুধাকর এই কালে, জড়িত জলদ জালে
স্বভাবে মলিন ভাব ধরে।
গগনের শশধরে, যদি এই ভাব ধরে
শোভাহীন হয়ে সদা রয়;
তব মুখচন্দ্র তবে, কেন বল নাহি হবে
সেরূপ বিরূপ অতিশয়।
আকাশেতে জলধর, মনোহর নিশাকর
ঢাকি আছে দিবস যামিনী;
কেন না তোমার তবে, শশীমুখ ঢাকা রবে
অম্বর অম্বরে বিনোদিনী।
মান ভাঙ্গিবার তরে, ধরিলাম দুই করে
মুখ-পদ্মে কর পদ্ম দিলে;
বৃষ্টি এই ভাব তার, আগমানে বরষার
কর্মলিনী মৃদিতা সলিলে।
এ কালের প্রতিকূল, কাননে কোকিলকুল
কুহু কুহু কাকলি না করে।
কোকিল বাদিনী বৃষ্টি, তাই আছে মুখ বৃজি
মৌনবতী বরষার ডরে।
গগনের যত তারা, বরষা কালেতে তারা
সদা কাল নহে প্রকটিত;

তাই বৃষ্টি জ্যোতিহারা, তোমার নয়ন-তারা
অভিমনে রোয়েছে মৃদিত।
বরষার অনুরূপ, বারিধারা বরিষণ
বারে বারে ধরা পূর্ণ তায়;
তাই বৃষ্টি নিরন্তর, তব নেত্র-নীরধর
নীর-ধারে ফেলিছে ধরায়।

নায়িকার উক্তি

পয়ার

শুনিয়া শেষের শ্লেষ কুপিল কামিনী,
বিধুমুখে মৃদুরবে কহিল মানিনী।
বরষার ধর্ম যদি বারি বরিষণ,
তবে কেন বলহীন তোমার নয়ন।
দুঃখিনীর দুঃখতাপে হইয়া সদয়,
তোমার নয়নে কেন বৃষ্টি নাহি হয়।

নায়কের উক্তি

ত্রিপদী

চেও না চেও না আর, অধীনের অশ্রুধার
এক বিন্দু নাহি প্রাণধন,
তোমার মিলন ছেদে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া খেদে
নীর-হীন করেছি নয়ন।
নাহি আর জলধার, কোথা বল পাব ধার
প্রেমাধার, ধার বটে ধারি;
প্রাণের সম্বল বল, দুই এক ফোঁটা জল
যদি থাকে, দিতে নাহি পারি।
যে হেতু যখন পুনঃ, তোমার নয়নাগুন
করিবেক দহন আমারে;
নিবারিতে সে অনল, তখন না পেলে জল
প্রাণান্ত হইবে একেবারে।

পয়ার

শুনিল শুনিল না ভামিনী কামিনী,
পূর্ববৎ মৌনভাব রহিল মানিনী।
ঘোমটা টানিয়া দিল মুখের উপরে,
বারিদে বসনে বিধু আচ্ছাদন করে।

নায়কের পুনরুক্তি

ত্রিপদী

থাক থাক, মানে থাক, বদনে বসন রাখ
ঢাক ঢাক শশী ঢাক মেঘে,
দীর্ঘশ্বাস বায়ু মোর, এখনি করিয়া জোর
জলদে উড়াবে অতি বেগে।

পয়ার

তবু না কহিল কথা মানিনী রমণী,
হাসিয়া কহিছে শুন কান্ত গুণমণি।

ত্রিপদী

এ কি বিপরীত ভাব, হোলে বর্ষা আবির্ভাব
সতত চপলা চমকায়,
তোমার অধরে আর, হাস্যাকার চপলার
চমক নাহিক হয় হয়।

পয়ার

দ্বিগুণ বাড়ায় মান যত পতি সাধে,
ফলতঃ বাহিরে সেটা সাধে বাদ সাধে।
পরে নিজ গাঢ় মান জানাবার তরে,
ঘর ছেড়ে ছলেতে বাহিরে যাত্রা করে।
মধুভাষে বন্ধু কহে কি কর ললনা,
যেও না যেও না ধনি, বাহিরে যেও না।

ত্রিপদী

প্রণয়িনী মান পালা, ঘোর কাল মেঘমালা
ঝালাপালা করিল আমারে;

শত ফিরে ফিরে চাও, মাথা খাও ঘরে যাও
দোহাই দোহাই বারে বারে।
দূরস্ত অবোধ মন, ঢাকিতেছে ঘন ঘন
গগন শোভন শশধরে;
কি জানি যদ্যপি পুন, প্রকাশিয়া নিজগুণ
তব মদুখশশী গ্রাস করে।
তাহা হ'লে আর প্রাণ, আমার চকোর প্রাণ
রহিবে না শরীর-পিঞ্জরে;
তাই বলি প্রাণপ্রিয়ে, বাঁচাও ঘরেতে গিয়ে
এসো এসো ধরি দুই করে।

পয়ার

নিবিড় নীরদ নব নিরিখি নয়নে,
বাহিরেতে গিয়া ধনি ভাবিতেছে মনে।
ঘন ঘন ঘননাদ, গভীরা যামিনী,
পলকে পলকে তার নলকে দামিনী।
মানে মানে মান হরি মানিনী ভামিনী,
গরবেতে গৃহে যায় গজেন্দ্রগামিনী।
মানের নিগূঢ় ভাব শেষে গেল বোঝা,
সুখেতে বঙ্কিমচন্দ্র হইলেন সোজা।

—‘সাহিত্য’, শ্রাবণ, ১৩০১

গল্প

ছাত্র হইতে প্রাপ্ত

গগনমণ্ডলে বিরাজিতা কাদম্বিনী উপরে কম্পায়মানা শম্পা সঙ্কাশ ক্ষণিক জীবনের অতিশয় প্রিয় হওত মৃঢ় মানবমণ্ডলী অহংরহঃ বিষয় বিষার্ণবে নির্মজ্জিত রহিয়াছে। পরমেশ প্রেম পরিহার পুরঃসর প্রতিক্ষণ প্রমদা প্রেমে প্রমত্ত রহিয়াছে। অম্বুবিস্বপ্ন জীবনে চন্দ্রাকর্ষ সদৃশ চিরস্থায়ী জ্ঞানে বিবিধ আনন্দোৎসব করিতেছে, কিন্তু ভ্রমেও ভাবনা করে না যে, সেসব উৎসব শব হইলে কি হইবে এবং পরম নিধি প্রিয় পিতা পরাৎপরের প্রতি প্রীতি প্রভাবের অভাব করে, বিবেচনা করে না যে তাঁহার সমীপে উত্তরকালে কি উত্তর করিবে। কদাপিও মৃঢ় মানব-মণ্ডলী মনোমধ্যে মূহুর্ত্তেকও বিবেচনা করে না যে, তাহারা কি অনিত্য পদার্থ প্রযত্ন পুরঃসর প্রতিপালন করিতেছে। এখন যে দেহে ধূলিকণা পতনে পাষণ প্রহার প্রায় বোধ হয়, আশু সেই দেহ স্বসমূহের করাল পদাঘাতে বিদীর্ণ হইবেক, এখন যাহার রাজীব রাজী বিরাজিত শয্যাতেও নিদ্রা হয় না, জীবনাশ্তে সে ধূলি কন্দর্ম অস্থিকণা কীর্ণ লক্ষ লক্ষ রক্ষা, যক্ষ, ভূত প্রেতাদির বাসস্থান শ্মশানে চিরনিদ্রিত হইবেক। এবং যে অঙ্গ কোমল কমল স্পর্শনে বিশীর্ণ হয় সে অঙ্গে গৃধিনী চণ্ড আঘাতে খণ্ড খণ্ড করিবেক। যে লপনেন্দু শতশ শশধর শোভা পাইতেছে, সে বদন কন্দর্ম মণ্ডিত হওত মৃন্মণ্ডলে পতিত থাকিবেক। যে নয়নে অণুরেণু অসি অনুমান হয় বায়স বায়সী নখাঘাতে সে নয়নোৎপাটন করিবেক। যে রসনা প্রমদাধর রস না পান করিয়া অন্য রস পান করে না, সে ওষ্ঠ নষ্ট হইয়া লোষ্ট্র ভক্ষণে কষ্ট পাইবেক। যে নাসিকা স্থলে চন্দনও বন্দনা পায় না, সে নাসিকা দুর্গন্ধ কীটাদি এবং গলিত শব-মাংসের ঘ্রাণ গ্রহণে বাধ্য হইবেক, যে শ্রবণ কামিনী কাকলী শ্রবণে সন্তোষ প্রাপ্ত হয় না, সে শ্রবণ শিবাগণের চীৎকার শ্রবণ করণে বাধ্য হইবেক, দিবাকর কর প্রকাশে মধুকর নিকর যে করে কর্মালিনী ভ্রমে মকরন্দ লোভে ভ্রমিত সে কর কদম্ব কীট নিকরে ব্যাপ্ত হইবেক। যে পদ কখন বিপদগ্রস্ত হয় নাই, এবং যে পদ কখন সম্পদ সংরক্ষণেও ধূলি সহ সাক্ষাৎ করে নাই, সে পদ স্বপদ পরিত্যাগ

বাঁকম রচনাবলী

পদ্রুঃসর ধূলি হইয়া যাইবেক। ধরাবাসিদগের এই ধারা দর্শনে অশ্রু ধারা ধারে ধারে ধারণ হয় অতএব হে মানবগণ অনিত্য যত্নে ক্ষান্ত হও।

—‘সংবাদ প্রভাকর’, ২৩ এপ্রিল, ১৮৫২

(গদ্যাকর জনসহ সাক্ষাদভিলাষে নিরাশ জনস্য বিরচিত)

বর্ষাঋতু

স্বনাথ শশধর বিরহিণী বিঘোর তমসাম্বরাবৃত্তা গভীরা নিশীথিনী সঙ্কাশ নিবিড় জলধারমাল গগনমণ্ডলে নিয়ত নিরীক্ষণ করিতেছি। মন্মথোন্মথিত জনরাজী হৃদয় বিদারক ঘোরঘন নির্যোষ নিনাদ শ্রবণে চর্মকিতচিত্ত চাপল্য প্রাপ্ত হইতেছে। নিবিড় নীলাঙ্গিণি যমুনা-পূর্নিলনে শ্রীরাধা চাতকী নীরদ কদম্ববিহারি শ্যাম শরীরোপরি তরলিত বিকচ বিমল বনমালা তুলিয়া নীলজলধরোপরি শম্পা কম্পায়মানা হইতেছে, কর্ণকুহর-বিদারক ভীষণাশনি নিনাদে ভুবন চর্মকিত হইতেছে, কাদম্বিনী বর্ষিত বারি বিন্দু বিশালবেগে ধরাতলে পতিত হইতেছে। চিরাশাবলম্বিনী চাতকী ধরাধর বর্ষিত জলকণা পানে প্রাণ প্রাপ্ত হইতেছে, বিঘোর সজল জলদাবলী সন্দর্শনে শিখাবল শত শত নীল নিশাকর বিরাজিত পুচ্ছবিস্তারিত পদ্রুঃসর নৃত্য করিতেছে, নিদারুণ প্রখর কর ধর বিভাকর বিশালজীমূত জালাচ্ছন্ন রহিয়াছে, ললিত লপনা ললনা করাশ্চোজ স্বরূপা বিমলা কমলিনী ম্লানমুখে মর্দিতা হইল মনোমোহিনী মহিলা মালা মুখচ্ছায়া কনক চক্রাকার চারুচন্দ্রমালা জলধর জালাচ্ছন্ন রহিয়াছে, নিশাম্বর শোভনতারকা মণ্ডলী অদৃশ্য হইল।

নিদাঘীয় প্রখর প্রভাকর প্রতাপে ম্লান স্বভাবাচ্ছিন্না বিপুল লাবণ্যবতী হইল মহীরুহরাজী নবদলমালায় ঝলমলায়মান হইতেছে। বিদ্যুৎস্পন্দিতা তুলিতা নবীনা কুমারী মাতুরঙ্কাবলম্বন সদৃশ নব লতিকামালা মহামহীরুহরাজীকে অবলম্বন করিতেছে বৃক্ষলতা সুশোভিতা বসুন্ধরা সুন্দরী, বহুল কনকালঙ্কারমণ্ডিতা চন্দ্রলপনাসঙ্কাশ প্রেক্ষণীয়া হইয়াছে, জলধর রস প্রাপনে পূর্ণ যৌবনা, বিশাল বেগবতী, ভীষণ কল্লোলোন্মত্তা, তরল তরঙ্গ রঞ্জিণী, স্রোতস্বতী, স্বনাথ সাগরে শরীর সমর্পণ করিতেছে, হে নয়ন যুগল! এতন্মনোরম পদার্থপুঞ্জ সন্দর্শন সার্থক হও।

—‘সংবাদ প্রভাকর’, ১০ই জুলাই, ১৮৫২

অসম্পূর্ণ রচনা

রাজমোহনের স্ত্রী

মধুমতী নদীতীরে রাধাগঞ্জ নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। প্রভূত ধনসম্পন্ন ভূস্বামী-দিগের বসতি-স্থান বলিয়া এই গ্রাম গণ্ডগ্রামস্বরূপ গণ্য হইয়া থাকে। একদা চৈত্রের অপরাহ্নে দিনমণির তীক্ষ্ণ কিরণমালা ম্লান হইয়া আসিলে দুঃসহ নৈদাঘ উত্তাপ ক্রমে শীতল হইতেছিল; মন্দ সমীরণ বাহিত হইতে লাগিল; তাহার মৃদু হিল্লোল ক্ষেত্রমধ্যে কৃষকের ঘর্ম্মাক্ত ললাটে স্বেদবিন্দু বিশুদ্ধ করিতে লাগিল, এবং সদ্যশয্যোখিতা গ্রাম্য রমণীদিগের স্বেদবিজড়িত অলকপাশ বিধৃত করিতে লাগিল।

ত্রিংশৎবর্ষবয়স্কা একটি রমণী একটি সামান্য পর্ণকুটীর অভ্যন্তরে মাধ্যাহ্নিক নিদ্রা সমাপনান্তে গাত্রোথান করিয়া বেশভূষায় ব্যাপ্তা হইলেন। স্ত্রীজাতির এই বৃহৎ ব্যাপার সম্পাদনে রমণীর কালবিলম্ব হইল না; একটু জল, একখানি টিনে-মোড়া চারি আঙ্গুল বিস্তার দর্পণ, সেইরূপ দীর্ঘকায় একখানি চিরুণির দ্বারা এ ব্যাপার সুসম্পন্ন হইল। এতদ্ব্যতিরেকে কিছু সিন্দুরের গুঁড়ায় ললাট বিশোভিত হইল। পরিশেষে একটি তাম্বুলের রাগে অধর রঞ্জিত হইল। এইরূপে জগদ্বিজয়িনী রমণী জাতির একজন মহারথী সশস্ত্র হইয়া কলসীকক্ষে যাত্রা করিলেন, এবং কোনও প্রতিবাসীর বংশ-রচিত দ্বার সবলে উন্মোচিত করিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্টা হইলেন।

যে গৃহমধ্যে ইনি প্রবেশ করিলেন, তাহার মধ্যে চারিখানি চালা ঘর—মাটির পোতা—ঝাঁপের বেড়া। কুটীরমধ্যে কোথাও দারিদ্র্যলক্ষণ দৃষ্ট হইতেছিল না—সর্বত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চতুষ্কোণ উঠানের চারিদিকে চারিখানি ঘর। তিনখানির দ্বার উঠানের দিকে—একখানির দ্বার বাহিরের দিকে। এই ঘরখানি বৈঠকখানা—অপর তিনখানি চতুষ্পার্শ্বে আবরণ বিশিষ্ট হইয়া অন্তঃপুরস্থ প্রাপ্ত হইয়াছিল। সদর বাটীর মণ্ডপ সম্মুখে সুকর্ষিত ভূমিখণ্ডে কিছু বাগীচ শাকাদি জন্মিয়াছিল। চারিপার্শ্বে নলের বেড়া; দ্বারে ঝাঁপের আগড়; সুতরাং অবলা অনায়াসে গৃহে প্রবেশ করিল।

বলা বাহুল্য যে, লক্ষপ্রবেশা প্রথমেই অন্তঃপুরাভিমুখে চলিলেন। পুরবাসী বা পুরবাসিনী-বর্গ মাধ্যাহ্নিক নিদ্রা সমাপনান্তে স্ব স্ব কার্য্যে কে কোথায় গিয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। কেবলমাত্র তথায় দুই ব্যক্তি ছিল; একটি অষ্টাদশবর্ষীয়া তরুণী বস্ত্রোপরে কারুকার্য্য ব্যাপ্তা ছিলেন, আর একটি চারি বৎসরের শিশু খেলায় মগ্নচিত্ত ছিল। তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পাঠশালায় যাইবার সময় জানিয়া শুনিয়া মস্যাদার ভুলিয়া গিয়াছিল। শিশু সেই মসীপাত্র দেখিতে পাইয়া অপর্ষ্যাপ্ত আনন্দ সহকারে সেই কালি মুখে মাখিতেছিল; পাছে দাদা আসিয়া দোয়াত কাড়িয়া লয়, বাছা যেন এই ভয়ে সকল কালিটুকু একেবারে মাখিয়া ফেলিতেছিল। অভ্যাগতা, কারুকার্য্যকারিণীর নিকট ধরাসনে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি করিতেছি স্ত্রী?”

সম্ভোষিতা রমণী হাসিয়া উত্তর করিলেন, “আজ যে দিদি, বড় অনুগ্রহ; না জানি আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম।”

অভ্যাগতা হাসিয়া কহিল, “আর কার মুখ দেখে উঠবে? রোজ যার মুখ দেখে উঠ আজও তার মুখ দেখে উঠেছি।”

এই কথা শুনিয়া তরুণীর মুখমণ্ডল ক্ষণেকের জন্য মেঘাচ্ছন্ন হইল; অপরা নারীর অধর-মূলে হাস্য অঙ্কুপ্রকটিত রহিল। এই স্থলে উভয়ের বর্ণনা করি।

অভ্যাগতা যে ত্রিংশৎবর্ষবয়স্কা এ কথা পুঙ্খবহি বলিয়াছি। সে শ্যামবর্ণা—কাল নয়—কিন্তু তত শ্যামও নয়। মুখকান্তি নিন্তান্ত সুন্দর নয়, অথচ কোন অংশ চক্ষুর অপ্রিয়কর নয়; তন্মধ্যে ঈষৎ চঞ্চল মাধুরী ছিল, এবং নয়নের ‘হাসি হাসি’-ভাবে সেই মাধুরী আরও মধুর হইয়াছিল। দেহময় যে অলঙ্কারসকল ছিল, তাহা সংখ্যার বড় অধিক না হইবে, কিন্তু একটি মুঠের বোঝা বটে। যে শঙ্খবর্ণিক সেই বিশাল শঙ্খ নিষ্কাশন করিয়াছিলেন, তিনি বিশ্বকর্মা

বিশ্বকম রচনাবলী

অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র সন্দেহ নাই। আভরণময়ীর স্কুলক্ষে একখানি মোটা শাটী ছিল; শাটীখানি বৃদ্ধি রজকের উপর রাগ করিয়াছিল, তাই সে পথে অনেক কাল গতিবিধি করে নাই।

অষ্টাদশবর্ষীয়ার কোমল অঙ্গে এতাদৃশ অলঙ্কার বেশী ছিল না। বস্তুতঃ তাহার বাক্যালাপে পূর্ববঙ্গীয় কোনরূপ কণ্ঠবিকৃতি সংলক্ষিত হইত না; ইহাতে স্পষ্ট অনুভূত হইতে পারে যে, এই সর্বাঙ্গসুন্দর রমণীকুসুম মধুমতী-তীরজ নহে—ভাগীরথী-কূলে রাজধানী সন্নিহিত কোনও স্থানে জাতা ও প্রতিপালিতা হইয়া থাকিবেক। তরুণীর আরক্ত গৌরবর্ণছটা মনোদঃখ বা প্রগাঢ় চিন্তাপ্রভাবে কিঞ্চিৎ মলিন হইয়াছিল; তথাচ যেমন মধ্যাহ্ন রবির কিরণে স্থলপশ্চিমী অর্দ্ধ প্রোজ্জ্বল, অর্দ্ধশুদ্ধ হয়, রূপসীর বর্ণজ্যোতি সেইরূপ কমণীয় ছিল। অতিবিকৃত কেশজাল অযত্নশিথিল গ্রন্থিতে স্কন্ধদেশে রুদ্ধ ছিল; তথাপি অলককুস্তল সকল বন্ধন দশায় থাকিতে অসম্মত হইয়া ললাট কপোলাদি ঘিরিয়া বসিয়াছিল। প্রশস্ত পূর্ণায়ত ললাটতলে নিন্দেদাষ বিশ্বকম ব্রহ্মদুগল ব্রীড়াবিকম্পিত; নয়নপল্লবাবরণে লোচনদুগল সচরাচর অর্দ্ধাংশমাত্র দেখা যাইত; কিন্তু যখন সে পল্লব উদ্ধেবাখিত হইয়া কটাক্ষ স্ফূরণ করিত, তখন বোধ হইত যেন নৈদাঘ মেঘমধ্যে সৌদামিনী-প্রভা প্রকটিত হইল। কিন্তু সে যৌবনমদমত্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিক্ষেপে চিন্তাকুলতা প্রতীত হইত; এবং তথায় ক্ষুদ্র ওষ্ঠাধর দেখিলেই বুঝা যাইত, সে হৃদয়তলে কত সুখ দঃখ বিরাজ করিতেছে। তাহার অঙ্গসৌষ্ঠব ও নিৰ্ম্মাণ-পারিপাট্য, শারীরিক বা মানসিক ক্রেশে অনেক নষ্ট হইয়াছিল; তথাচ পরিধেয় পরিষ্কার শাটীখণ্ডমধ্যে যাহা অর্দ্ধ দৃষ্ট হইতেছিল, তাহার অনুরূপ শিল্পকর কখনও গড়ে নাই। সেই সুঠাম অঙ্গ প্রায় নিরাভরণ, কেবলমাত্র প্রকোষ্ঠে 'চুড়ি' ও বাহুতে 'মুড়কিমাদুলি'; ইহাও বড় সুগঠন।

তরুণী হস্তস্থিত সূচ্যাদি একপার্শ্বে রাখিয়া অভ্যাগতার সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। অভ্যাগতা কথোপকথনকালে নিজ গৃহযন্ত্রণা-বর্ণনে বিস্তর সদ্বক্তৃত্ব প্রকাশ করিলেন; দোষের মধ্যে এই, যে যন্ত্রণাগূর্লিন বর্ণনা করিলেন, তাহা প্রায় কাল্পনিক। বক্তৃত্বী নিজ কন্দমময় বস্ত্রাঞ্জলের অগ্রভাগ লইয়া পুনঃ পুনঃ চক্ষে দিতে লাগিলেন; বিধাতা তাহাকে যে চক্ষুদুগল দিয়াছিলেন সে কিছু এমত অবস্থার যোগ্য নয়; কিন্তু কি হবে?—অবস্থা বিশেষে শালগ্রামেরও মৃত্যু ঘটে। চক্ষুর ঘটে নাই, যতবার কাপড়খানা এসে ঠেকে ততবার চক্ষু দুইটি কামধেনুর মত অজস্র অশ্রু বর্ষণ করে। বক্তৃত্বী-চুড়ামণি অনেকবার অশ্রুবৃষ্টি করিয়া একবার জাঁকাইয়া কাঁদিবার উদ্যোগে ছিলেন; কিন্তু ভাগ্যক্রমে কথিত চক্ষু দুইটি সেই সময় সেই শিশুটির কালিময় মুখের উপর পড়িল; শিশুটি মসীপাত্র শূন্য করিয়া অন্ধকারময় মূর্ত্তি লইয়া দণ্ডায়মান ছিল, বালকের এই অপরূপ অঙ্গরাগ দেখিয়া গৃহযন্ত্রণাবাদিনী কাঁদিতে গিয়া হাসিয়া ফেলিলেন; রসের সাগর উথলিয়া যন্ত্রণাদি ভাসাইয়া দিল।

রোদনাদির ব্যাপার সমাপ্ত হইলে, সূর্য্যদেবকে সত্য সত্যই অন্তাচলে যাইবার উদ্যোগী দেখিয়া বক্তৃত্বী তরুণীকে জল আনিতে যাইবার আমন্ত্রণ করিলেন। বস্তুতঃ এই আমন্ত্রণের জন্যই এত দূর আসা। নবীনা বারি-বাহনার্থ যাইতে অস্বীকৃতা হইলেন; কিন্তু তাহার সঙ্গিনী বিশেষ উত্তেজনা করিতে লাগিলেন। নবীনা কহিলেন, “মধুমতীতে বড় কুমীর, গেলে কুমীরে খাবে।”

ইহা শুনিয়া সঙ্গিনী যে ঘোর হাস্য করিল, নবীনা তাহাতেই বৃদ্ধিলেন,—তাঁহার আপত্তি গ্রাহ্য হইল না। তিনি পুনরায় কহিলেন, “যদি কখন লা কনক, আর কি বেলা আছে?” “এখনও দুপুর বেলা” বলিয়া কনক অঙ্গুলী নিন্দেদাষে দেখাইলেন যে, এ পর্য্যন্ত সূর্য্যকর বৃক্ষোপরে দীপ্তমান্ রহিয়াছে।

নবীনা তখন কিঞ্চিৎ গাভ্রীয্য সহকারে বলিলেন, “তুই জানিস্ ত কনক দিদি, আমি কখন জল আনিতে যাই না।”

কনক কহিল, “সেই জন্যই ত যাইতে কহি, তুই কেন সারাদিন পিঞ্জরেতে কয়েদ থাকবি? আর বাড়ীর বউমানুষে জল আনে না?”

নবীনা গর্ষিত বচনে কহিলো, “জল আনা দাসীর কর্ম্ম।”

“কেন, কে জল এনে দেয় লো? দাসী চাকর কোথা?”

“ঠাকুরবি জল আনে।”

“ঠাকুরবি যদি দাসীর কর্ম্ম করিতে পারে, তবে বৌ পারে না?”

অসম্পূর্ণ রচনা—রাজমোহনের স্ত্রী

তখন তরুণী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ স্বরে কহিল, “কথায় কাজ নাই কনক! তুমি জান আমার স্বামী আমাকে জল আনিতে বারণ করিয়াছেন। তুমি তাঁহাকে চেন ত?”

কনকময়ী কোনও উত্তর না করিয়া সর্চকিত কটাক্ষে চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করিলেন, যেন কেহ আসিতেছে কি না দেখিলেন। কোথাও কেহ নাই দেখিয়া সম্ভাব্যহারিণীর মূখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন, যেন কিছু বলিতে বাসনা আছে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আশঙ্কাপ্রযুক্ত কথনেচ্ছা দমন করিয়া অধোদৃষ্টি করত চিন্তা করিতে লাগিলেন। তরুণী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি ভাবিতেছিস?”

কনক কহিল, “যদি—যদি তোর চোখ থাকত—”

নবীনা আর না শুনিয়া ইঙ্গিতের দ্বারা নিষেধ করিয়া কহিল, “চুপ্ কর, চুপ্ কর—বুঝিয়াছি।”

কনক বলিল, “বুঝিয়া থাক ত কি করবে এখন?”

তরুণী কিয়ৎক্ষণ স্থব্ধ হইয়া রহিলেন, ঈষৎ অধরকম্পে এবং অল্প ললাট-রক্তিমায় প্রকাশ পাইতে লাগিল যে, যুবতীর মনোমধ্যে কোন চিন্তা প্রবল। তাদৃশ ঈষৎ দেহকম্পনে আরও দেখা গেল যে, সে চিন্তায় হৃদয় অতি চঞ্চল হইতেছে। ক্ষণেক পরে কহিলেন, “চল যাই, কিন্তু ইহাতে কি পাপ আছে?”

কনক হাসিতে হাসিতে কহিল, “পাপ আছে! আমি ভুঁড়ে ভট্টাচার্য্য নহি, শাস্ত্রের খবরও রাখি না; কিন্তু আমার আড়াই কুড়ি মিন্‌সে থাকিলেও যাইতাম।”

“বড় বুদ্ধের পাটা” বলিয়া হাসিতে হাসিতে যুবতী কলসী আনিতে উঠিল; “পণ্ডাশটা! হাঁলো, এতগুলো কি তোর সাধ?”

কনক দৃঃখের হাসি হাসিয়া কহিল, “মুখে আনিতে পাপ; কিন্তু বিধাতা যে একটা দিয়াছেন, পণ্ডাশটাও যদি তেমনই হয়, তবে কোটীখানেকেই বা কি ক্ষতি? কাহারও সঙ্গে যদি দেখা সাক্ষাৎ না হইল তবে আমি কোটী পুরুষের স্ত্রী হইয়াও সতী সাধবী পতিব্রতা।”

“কুলীনে কপাল” বলিয়া তরুণী চঞ্চল পদে পাকশালা হইতে একটি ক্ষুদ্র কলসী আনয়ন করিলেন। যেমন বারিবাহিনী তেমনই কলসী। তখন উভয়ে প্রবাহিণী অভিগ্নুখে যাত্রা করিলেন। কনক হাসিতে হাসিতে কহিল, “এখন এস দেখি মোর গৌরবিণী, হাঁ-করাগুলোকে একবার রূপের ছটাটা দেখাইয়া আনি।”

“মর্ পোড়ার বাঁদর” বলিয়া কনকের সম্ভাব্যহারিণী অবগুণ্ঠনে সলজ্জ বদন আচ্ছন্ন করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অপনীত সূর্য্যকর নারিকেলাদি বৃক্ষাগ্রভাগ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে; কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত নিশা ধরাবাসিনী হয় নাই। এমন সময় কনক ও তাহার সম্ভাব্যহারিণী কলসীকক্ষে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছিল। পৃথিপার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র উদ্যান ছিল; পূর্ব্ববঙ্গ মধ্যে তদ্রূপ উদ্যান বড় বিরল। সুশোভন লৌহ রেইলের পরিধি মধ্য হইতে অসংখ্য গোলাপ ও মল্লিকার কলি পৃথিকার নেত্রমোদন করিতেছিল। পূর্ব্বতন পদ্ধতিমত চতুষ্কোণ ও অন্ডাকার বহুতর চান্কার মধ্যে পরিষ্কার ইষ্টকচূর্ণ পথ সূর্য্যচিত ছিল। উদ্যানমধ্যে একটি পুষ্করিণী। তাহার তীর কোমল তৃণাবলিতে সুসজ্জিত; একদিকে ইষ্টকনির্ম্মিত সোপানাবলী। ঘাটের সম্মুখে বৈঠকখানা। বৈঠকখানার বারান্ডায় দাঁড়াইয়া দুই ব্যক্তি কথোপকথন করিতেছিল।

বয়োধিক যে ব্যক্তি, তাহার বয়স ত্রিশ বৎসরের উদ্ধর হইবে; দীর্ঘ শরীর, স্থূলাকার পুরুষ। অতি স্থূলকায় বলিয়াই সুগঠন বলা যাইতে পারিল না। বর্ণ কঠোর শ্যাম; কান্তি কোনও অংশে এমত নহে যে, সে ব্যক্তিকে সুপুরুষ বলা যাইতে পারে; বরং মুখে কিছু অমধুরতা ব্যক্ত ছিল। বস্তুতঃ সে মুখাবয়ব অপর সাধারণের মুখাবয়ব নহে; কিন্তু তাহার বিশেষত্ব কি যে, তাহাও হঠাৎ নিশ্চয় করা দুঃস্বপ্ন। কটিদেশে ঢাকাই ধুতি, লম্বা লম্বা পাকান ঢাকাই চাদরে পাগড়ি বাঁধা। পাগড়িটির দৌরাণ্ডে, যে দুই এক গাছি চুল মাথায় ছিল, তাহাও দেখিতে পাওয়া ভার। ঢাকাই মলমলের পিরহাণ গায়ে;—সুতরাং তদভ্যন্তরে অন্ধকারময় অসীম

বিক্রম রচনাবলী

দেহখানি বেশ দেখা যাইতেছিল;—আর সঙ্গে সঙ্গে সোনার কবচখানিও উর্ধ্বকর্কশ মারিতোছিল। কিন্তু গলদেশে যে হেলেহার মন্দর পর্ষতে বাসুকির ন্যায় বিরাজ করিতোছিল, সে একেবারে পিরহাণের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। পিরহাণে সোনার বোতাম, তাহাতে চেন্ লাগান; প্রায় সকল আঙ্গুলেই অঙ্গুরীয়; হস্তে যমদণ্ডতুল্য পিচের লাঠি। বামনদেবের পাদপদ্মতুল্য দুইখানি পায়ে ইংরাজি জুতা।

ইহার সমাভিব্যাহারী পরম সুন্দর, বয়স অনুমান বাইশ বৎসর। তাহার সুবিমল স্নিগ্ধ বর্ণ, শরীরিক ব্যায়ামের অসম্ভাবেই হউক, বা ঐহিক সুখ সম্ভোগেই হউক, ঈষৎ বিবর্ণ হইয়াছিল। তাহার পরিচ্ছদ অনতিমূল্যবান,—একখানি ধূতি, অতি পরিপাটী একখানি চাদর, একটি কোম্বিকের পিরাণ; আর গোরার বাটীর জুতা পায়। একটি আঙ্গুলে একটি আংটি; কবচ নাই, হারও নাই।

বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি অপরকে কহিল, “তবে মাধব, তুমি আবার কলিকাতা ধরিয়ছ! আবার এ রোগ কেন?”

মাধব উত্তর করিলেন, “রোগ কিসে? মথুর দাদা, আমার কলিকাতার উপর টান যদি রোগ হয়, তবে তোমার রাধাগঞ্জের উপর টানও রোগ।”

মথুর জিজ্ঞাসা করিল, “কিসে?”

মাধব। নয় কিসে? তুমি রাধাগঞ্জের আমবাগানের ছায়ায় বয়স কাটাইয়াছ, তাই তুমি রাধাগঞ্জ ভালবাস; আমি কলিকাতার দুর্গক্ষে কাল কাটাইয়াছি, আমিও তাই কলিকাতা ভালবাসি।

মথুর। শুধু দুর্গক্ষে! ডেরেনের শুকো দই; তাতে দুটা একটা পচা ইন্দুর, পচা বেরাল উপকরণ—দেবদুল্লভ।

মাধব হাসিয়া কহিল, “শুধু এ সকল সুখের জন্য কলিকাতায় যাইতেছি না, আমার কাজও আছে।”

মথুর। কাজ ত সব জানি।—কাজের মধ্যে নতুন ঘোড়া নতুন গাড়ি—ঠক্ বেটাদের দোকানে টো টো করা—টাকা উড়ান—তেল পুড়ান—ইংরাজিবিধ ইয়ার বক্শিকে মদ খাওয়ান—আর হয়ত রসের তরঙ্গে ঢলাঢল্। হাঁ করিয়া ওঁদিক কি দেখিতেছ? তুমি কি কখন কনকিকে দেখ নাই? না ওই সঙ্গে ছুঁড়িটা আস্‌মান থেকে পড়েছে?—তাই ত বটে! ওর সঙ্গে ওঁট কে?

মাধব কিঞ্চৎ রক্তিমকান্তি হইলেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎ ভাবান্তর প্রকাশ করিয়া কহিলেন, “কনকের কি স্বভাব দেখেছ? কপালে বিধাতা এত দুঃখ লিখেছেন, তবু হেসে হেসে মরে।”

মথুর। তা হউক—সঙ্গে কে?

মাধব। তা আমি কেমন করিয়া বলিব, আমার কি কাপড় ফুড়ে চোখ চলে? ঘোমটা দেখিতেছ না?

বস্তুতঃ কনক ও তাহার সঙ্গিনী কলসীকক্ষে প্রত্যাবর্তন করিতোছিল। কনককে সকলেই চিনিত; কিন্তু দ্বিতীয় কুলকামিনীর প্রতি পদসপ্তারে যে অনির্ধ্বচনীয় লাভ্য বিকাশ হইতোছিল, তাহার বস্ত্র ভেদ করিয়া যে অপর্ষ্য অঙ্গসৌষ্ঠব দেদীপ্যমান হইতোছিল, তাহাতে প্রথমে মাধবের, পশ্চাৎ মথুরের দৃষ্টি মুগ্ধ হইল; এবং উভয়ে সঙ্গীতধ্বনিদর্শিত কুরঙ্গের ন্যায় অবহিত মনে তৎপ্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

শেষ লিখিত কয়েকটি কথা যে সময়ে মাধবের মুখ হইতে নির্গত হইল, সেই সময় একবার মন্দ সমীরণ-হিল্লোল রমণীদিগের শিরোপরে বাহিত হইল; এই সময় তরুণী স্বীয় কক্ষস্থিত কলসী অনভ্যস্ত কক্ষে উত্তমরূপে বসাইবার জন্য অবগুষ্ঠন হইতে হস্ত লইবার সময়, দৃষ্ট সমীরণ অবগুষ্ঠনটি উড়াইয়া ফেলিল। মুখ দেখিয়া মাধব বিস্মিতের ন্যায় ললাট আকুণ্ঠিত করিলেন। মথুর কহিল, “ওই দেখ—তুমি ওকে চেন?”

“চিনি।”

“চেন? তুমি চেন, আমি চিনি না; অথচ আমি এঁুখানে জন্ম কাটাইলাম, আর তুমি কয়দিন! চেন যদি, তবে কে এঁটি?”

“আমার শ্যালী।”

“তোমার শ্যালী? রাজমোহনের স্ত্রী?”

“হাঁ।”

অসম্পূর্ণ রচনা—রাজমোহনের স্ত্রী

“রাজমোহনের স্ত্রী, অথচ আমি কখন দেখি নাই?”

“দেখিবে কিরূপে? উনি কখন বাটীর বাহির হয়েন না।”

মথুর কহিল, “হয়েন না, তবে আজ হইয়াছেন কেন?”

মাধব। কি জানি।

মথুর। মানুষ কেমন?

মাধব। দেখিতেই পাইতেছ—বেশ সুন্দর।

মথুর। ভবিষ্যৎকাল গণকঠাকুর এলেন আর কি! তা বলিতেছি না—বলি, মানুষ ভাল?

মাধব। ভাল মানুষ কাহাকে বল?

মথুর। আঃ কলেজে পড়িয়া একেবারে অধঃপাতে গিয়াছ। একবার যে সেখানে গিয়া রাজমুখোর শ্রাদ্ধ মন্ত্র পড়িয়া আসে, তাহার সঙ্গে দুটো কথা চলা ভার। বলি ওর কি—?

মাধবের বিকট ভ্রূভঙ্গ দৃষ্টে মথুর যে অশ্লীল উক্তি করিতে চাহিতোছিলেন তাহা হইতে ক্ষান্ত হইলেন।

মাধব গর্ষিত বচনে কহিলেন, “আপনার এত স্পষ্টতার প্রয়োজন নাই; ভদ্রলোকের স্ত্রী পথে যাইতেছে, তাহার সম্বন্ধে আপনার এত বক্তৃতার আবশ্যিক কি?”

মথুর কহিল, “বলিয়াছি ত দু’ পাত ইংরাজি উল্টাইলে ভায়ারা সব অগ্নি-অবতার হইয়া বসেন। আর ভাই, শ্যালীর কথা কব না ত কাহার কথা কব? বসিয়া বসিয়া কি পিতামহীর যৌবন বর্ণনা করিব? যাক্ চুলায় যাক্; মুখখানা ভাই, সোজা কর—নইলে এখনই কাকের পাল পিছনে লাগিবে। রাজমুহুরে গোবর্দ্ধন এমন পদ্মের মধু খায়?”

মাধব কহিল, “বিবাহকে বলিয়া থাকে সুরতি খেলা।”

এইরূপ আর কিঞ্চিৎ কথোপকথন পরে উভয়ে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কনকময়ী এবং তৎসঙ্গিনী নীরবে গৃহাভিমুখে চলিলেন। লোকের সম্মুখে কথা কহিতে কনকের সহচরী অতি লজ্জাকর বোধ করিতে লাগিলেন। তাহাকে নীরব দেখিয়া কনকও নীরব। কিন্তু এমন লোকালয়মধ্যে রসনারূপিণী প্রচণ্ডা অশ্বিনী যে নিজ প্রার্থ্যাদি গুণ দেদীপ্যমান করিতে পারিল না, কনকের ইহাতে বড় মনোদুঃখ রহিল। তাহারা আপনাপন গৃহ-সান্নিধ্যে আসিলেন; তথায় লোকের গতিবিধি অধিক না থাকায় কনকময়ী কথোপকথন আরম্ভ করিলেন; বলিলেন, “কি পোড়া কপালে বাতাস দিদি, আমাকে কি নাস্তানাবুদই করিল।”

কনক হাসিয়া কহিল, “কেন তোমার ভগ্নীপতি কি কখন তোমার মুখ দেখে নাই?”

কনকময়ী। আমি ত তাহার জন্য বলিতেছি না—অন্য একজন যে কে ছিল।

কনক। কেন, সে যে মথুরবাবু; তাহাকে কি কখন দেখে নাই?

কনকময়ী। কবে দেখিলাম?—আমার ভগ্নীপতির জ্যেষ্ঠাত ভাই মথুরবাবু?

কনক। সে না ত কে?

কনকময়ী। কি লজ্জা বোন, কাহারও সাক্ষাতে বলিস্ না।

কনক। মরণ আর কি! আমি লোকের কাছে গল্প করিতে যাইতেছি যে, তুমি জল আনিতে ঘোমটা খুলে মুখ দেখাইয়াছিলে।

এই বলিয়া কনক মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। তরুণী সরোষে কহিল, “তুমি ভাগাড়ে পড় না কেন? কথার রকম দেখ। এমত জানিলে কি আমি তোমার সঙ্গে আসিতাম?”

কনক পুনরায় হাস্য করিতে লাগিল; যুবতী কহিলেন, “তোমার ও হাসি আমার ভাল লাগে না—স্বর্বাশ! দুর্গা যা করেন।”

এই বলিয়া নবীনা গৃহাভিমুখে নিরীক্ষণ করিয়া কম্পিতকলেবরা হইল। কনকময়ীও সেই দিকে নিরীক্ষণ করিয়া এই আকস্মিক ভীতির হেতু অনুভূত করিলেন। তাহারা প্রায় গৃহ-সান্নিধ্যে উপনীতা হইয়াছিলেন। কনক দেখিতে পাইল যে, দ্বারে অগ্নিবিচ্ছুরিত নয়নে কালমূর্ত্তির ন্যায় রাজমোহন দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সঙ্গিনীর কর্ণে কর্ণে সে কহিল,—“আজ দেখিতেছি মহাপ্রলয়; আমি তোমার সঙ্গে যাই, যদি অকালে কাণ্ডারী হইতে পারি।”

বাঁকম রচনাবলী

রাজমোহনের স্ত্রী তদ্রূপ মৃদুস্বরে কহিল, “না, না, আমারও সহ্য আছে—তুমি থাকিলে হয়ত হিতে বিপরীত হবে, তুমি বাড়ী যাও।”

ইহা শুনিয়া কনক পথান্তরে নিজ গৃহে গমন করিল। তাঁহার সহচরী যখন নিজ গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন রাজমোহন কিছুই বলিল না। তাহার স্ত্রী জলকলসী লইয়া পাকশালায় রাখিলেন। রাজমোহন নিঃশব্দে সঙ্গে সঙ্গে পাকশালায় যাইলেন। স্ত্রী কলসীটি রাখিলে রাজমোহন কহিল, “একটু দাঁড়াও।” এই বলিয়া জলের কলসী লইয়া আঁস্তাকুড়ে জল ঢালিয়া ফেলিলেন। রাজমোহনের একটি প্রাচীনা পিসী ছিল। পাকের ভার তাঁরই প্রতি; তিনি এইরূপ জলের অপচয় দেখিয়া রাজমোহনকে ভৎসনা করিয়া কহিলেন, “আবার জলটা অপচয় করিতেছিহু কেন রে? তোর ক’গন্ডা দাসী আছে যে, আবার জল আনিয়া দিবে?”

“চুপ কর্ মাগী হারামজাদী” বলিয়া রাজমোহন বারিশূন্য কলসীটা বেগে দূরে নিক্ষেপ করিল; এবং স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া অপেক্ষাকৃত মৃদু অথচ অন্তর্জর্বালাকর স্বরে কহিল, “তবে রাজরাণী, কোথায় যাওয়া হইয়াছিল?”

রমণী অতি মৃদুস্বরে দাঢ্য সহকারে কহিল, “জল আনিতে গিয়াছিলাম।”

যথায় স্বামী তাঁহাকে দাঁড়াইতে বলিয়াছিল তিনি তথায় চিত্তাৰ্পিত পুত্তলিকার ন্যায় অস্পন্দিতকায় দাঁড়াইয়া ছিলেন।

রাজমোহন ব্যঙ্গ করিয়া কহিল, “জল আনিতে গিয়াছিলে! কাকে বলে গিছেল ঠাকুরাণি?”

“কাহারেও বলে যাই নাই।”

রাজমোহন আর ক্রোধপ্রবাহ সম্বরণ করিতে পারিল না, চিৎকার স্বরে কহিল, “কারেও বলে যাও নাই—আমি দশ হাজার বার বারণ করেছি না?”

অবলা পূর্ষমত মৃদুভাবে কহিল, “করেছ।”

“তবে গেলি কেন হারামজাদি?”

রমণী অতি গর্ষিত বচনে কহিল, “আমি তোমার স্ত্রী।” তাঁহার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। কণ্ঠস্বর বদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল।

“গেলে কোন দোষ নাই বলিয়া গিয়াছিলাম।”

অসমসাহসের কথা শুনিয়া রাজমোহন একেবারে অগ্নিসম হইয়া উঠিলেন; বজ্রনাদবৎ চিৎকারে কহিলেন, “আমি তোকে হাজার বার বারণ করেছি কি না?” এবং ব্যাঘ্রবৎ লম্ফ দিয়া চিত্রপুত্তলিসম স্থিররূপিনী সাধবীর কোমল কর বজ্রমুণ্ডে এক হস্তে ধরিয়া প্রহারার্থ দ্বিতীয় হস্ত উত্তোলন করিলেন।

অবলাবালা কিছু বুঝিলেন না; প্রহারোদ্যত হস্ত হইতে একপদও সরিয়া গেলেন না, কেবল এমন কাতর চক্ষে স্ত্রী-ঘাতকের প্রতি চাহিয়া রহিলেন যে, প্রহারকের হস্ত যেন মন্দ্রমুদ্র রহিল। ক্ষণেক নীরব হইয়া রহিয়া রাজমোহন পত্নীর হস্ত ত্যাগ করিল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ পূর্ষমত বজ্রনির্নাদে কহিল, “তোরে লাথিয়ে খুন করব।”

তথাপি তিরস্কৃত্য কোন উত্তর করিল না, কেবল চক্ষে অবিরল জলধারা বিগলিত হইতেছিল। ঈদৃশী মানসিক যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করিতে দেখিয়া নিষ্ঠুর কিঞ্চিৎ আদ্ৰ হইল। সহধর্মিণীর আচলা সাহসুতা দৃষ্টে প্রহারোদ্যমে বিতথপ্রযত্ন হইলেন বটে, কিন্তু রসনাগ্রে অবাধে বজ্রতাড়ন হইতে লাগিল। সে মধুমাখা শব্দাবলী এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকের কণ্ঠ পীড়ন করা অবিধেয়। ধীরা সকলই নীরবে সহ্য করিল। ক্রমে রাজমোহনের প্রচণ্ডতা খর্ব হইয়া আসিল; তখন প্রাচীনা পিসীর একটু সাহস হইল। তিনি ধীরে ধীরে দ্রাতুষ্পুত্র-বধূর কর ধারণপূর্ষক তাঁহার গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গেলেন; এবং যাইতে যাইতে দ্রাতুষ্পুত্রকে দই এক কথা শুনাইয়া দিলেন; কিন্তু তাহাও সাবধানে, সাবধানে—সাবধানের মার নাই। যখন দেখিলেন যে, রাজমোহনের ক্রোধ মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে, তখন বর্ষীয়সী একেবারে স্বীয় কণ্ঠকূপ হইতে প্রচণ্ড তিরস্কার-প্রবাহ ছাড়িয়া দিলেন, দ্রাতুষ্পুত্র যতগুলিন কুকথা মূর্খনির্গত করিয়াছিল, প্রায় সকলগুলিরই উপযুক্ত মূল্যে প্রতিশোধ দিলেন। রাজমোহন তখন নিজের ক্রোধ লইয়া ব্যস্ত, পিসীর মূর্খ-নিঃসৃত ভাষালালিত্যের বড় রসাম্বাদন করিতে পারিলেন না; আর পূর্ষ সে রস অনেক আম্বাদন করা হইয়াছিল, সুতরাং তিনি এক্ষণে তাহা অপূর্ষ বলিয়া বোধ করিলেন না। দই

অসম্পূর্ণ রচনা—রাজমোহনের স্ত্রী

জনে দুই দিকে গেলেন; পিসী বধুকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। রাজমোহন কাহার মাথা ভাঙ্গিবেন ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এক্ষণে পাঠক মহাশয়ের সহিত যাঁহাদিগের পরিচয় হইল, তাঁহাদিগের পুঙ্খ বিবরণ কথনে প্রবৃত্ত হই।

পুঙ্খাঙ্কলে কোন ধনাঢ্য ভূস্বামীর আলায়ে বংশীবদন ঘোষ নামে এক ভৃত্য ছিল। এই ভূস্বামীর বংশ ও নাম এক্ষণে লোপ হইয়াছে, কিন্তু পুঙ্খ তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি প্রতিপত্তি ছিল। বৃদ্ধকাল পর্যন্ত সন্তানের মুখাবলোকন না করিয়া শেষ বয়সে তিনি দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করিলেন। কিন্তু বিধির নিষেধ কে খণ্ডাইতে পারে? দ্বিতীয় পত্নীও সন্তানরত্নপ্রসাবিনী হইলেন না। না হউন, বাক্যক্যে তরুণী স্ত্রী একাই এক সহস্র। সত্য বটে মধ্যে মধ্যে দুই সপত্নীতে কিছুর গোলযোগ উপস্থিত করিতেন; কখন কখন কর্তার নিকট আসিয়া উভয়ে চীৎকারের মহলা দিতেন; কখন বা কনিষ্ঠা জ্যেষ্ঠার কাপড় টানিয়া ছিঁড়িতেন; জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠার চুল টানিয়া ছিঁড়িতেন। এমনও কখন হইয়াছে যে, ছেঁড়া ছিঁড়ি নাক কাণ পর্যন্ত উঠিয়াছে। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইলেই প্রায় উলু খাকড়ার প্রাণ বধ হইয়া থাকে,—বৃদ্ধ সহধর্মিণীদিগের সমর সময়ে নিকটে থাকিলেই লাথিটা গুঁতাটায় বণ্ডিত হইতেন না; কনিষ্ঠার পদাঘাত পাইলেই মনে করিতেন,—এইবার পুঙ্খপুরুষেরা স্বর্গে উঠিলেন; এমনই লাথির জোর। জ্যেষ্ঠা সর্বদা বলিতেন, “বড়র বড়, ছোটর ছোট।” শেষে করাল কাল মধ্যস্থ হইয়া “বড়র বড়, ছোটর ছোট” বলিয়া বড়কে আগে অন্তর্হিত করিল।

বয়োধিকা পত্নীর মৃত্যু দেখিয়া প্রাচীন মনে করিলেন, “ঘুটে পোড়ে গোবর হাসে; আমাকেও কোন্ দিন ডাক পড়ে এই। মরি তাতে ক্ষতি নাই, বার ভূতে বিষয়টা থাকে।

প্রেয়সী যুবতীর সাক্ষাতে মনের কথা বলিলে প্রেয়সী বলিলেন, “কেন আমি আছি, আমি কি তোমার বার ভূত?” বৃদ্ধ কর্তা কহিলেন, “তুমি যেখানে এক বিঘা জমি স্বহস্তে দান বিক্রয় করিতে পারিবে না, সেখানে তুমি আর বিষয় ভোগ করিলে কি?” চতুরা কহিল, “তুমি মনে করিলে সব পার; বিষয় বিক্রয় করিয়া আমায় নগদ টাকাটা দাও না।” তথাস্তু বলিয়া ভূস্বামী ভূমি বিক্রয় করিয়া অর্থসমুদয়ে মন দিলেন। স্ত্রীর আজ্ঞা এমনই ফলবতী যে, যখন বৃদ্ধ লোকান্তরে গমন করিল, তখন তাহার বিপুল সম্পত্তি প্রায় স্বর্ণরৌপ্যরাশিতেই ছিল—ভূমি অতি অল্প ভাগ। করুণাময়ী বড় বুদ্ধিমতী; তিনি মনে মনে ভাবিলেন, “এখন ত সকলই আমার; ধন আছে, জন আছে, যৌবনও আছে। ধন জন যৌবন সকলই বৃথা; যত দিন থাকে তত দিন ভোগ করিতে হয়।”

ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র অবতारे যখন জানকী বিচ্ছেদে কাতর হন, তখন কি করেন, সীতার একটি সুবর্ণ প্রতিমূর্ত্তি গঠন করিয়া মনকে আশ্বাস দিয়াছিলেন। করুণাময়ীও সেইরূপ স্বামীর কোনও প্রতিমূর্ত্তির মুখ নিরীক্ষণ করিয়া এ দুঃসহ বিরহ যন্ত্রণা নিবারণ না করেন কেন? আরও ভাবিলেন, রামচন্দ্র ধাতুময় প্রতিমূর্ত্তিতে হৃদয় স্নিগ্ধ করিতেন; নিজীব ধাতুতে যদি মনোদুঃখ নিবারণ হয়, তবে যদি একটা সজীব পতিপ্রতিনিধি করি তাহলে আরও সুখদ হইবে সন্দেহ কি? কেন না সজীব প্রতিনিধিতে কেবল যে চক্ষুর তৃপ্তি হইবে এমত নহে, সময়ে সময়ে কার্ষ্যোদ্ধারও সম্ভাবনা। অতএব একটা উপ-স্বামী স্থির করা আবশ্যিক। পতি এমন পরম পদার্থ যে, একেবারে পতিহীন হওয়া অপেক্ষা একটা উপপতি রাখাও ভাল; বিশেষ শ্রীরামচন্দ্র যাহা করিয়াছেন তাহাতে কি আর কিছু আছে?

এইরূপ বিবেচনা করিয়া করুণাময়ী স্বামীর সজীব প্রতিমূর্ত্তি কহাকে বরণ করিবে ভাবিতে ভাবিতে বংশীবদন ঘোষ খানসামার উপর নজর পড়িল; বংশীবদনকে আর কে পায়? ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ লইয়া সংসার, তাহার মধ্যে ধর্ম আদৌ, কাম মোক্ষ—পশ্চাৎ। এই তিনকে যদি করুণাময়ী ভূত্যের শ্রীচরণে সমর্পণ করিতে পারিল, রহিল অর্থ। অর্থ আর কয়দিন বাকি থাকে? খানসামা বাবু অতি শীঘ্র সদর নায়েব হইয়া বসিলেন। কালে সকলের লয়,—কালে প্রণয়ের লয়—কালে প্রণয়ীর লয়,—প্রণয়ময়ী অতি শীঘ্রই খানসামাকে ত্যাগ করিয়া প্রেমাস্পদ মৃত স্বামীর অন্তর্ভুক্ত হইলেন।

বঙ্কিম রচনাবলী

প্রথমে করুণাময়ীর অতি সামান্য জ্বর হয়; জ্বরটা অকস্মাৎ বৃদ্ধি পায়। লোকে বংশী-বদনের নানামত নিন্দা করিতে লাগিল; কেহ কেহ এমনও কহিল যে, সে ধনসম্পত্তি আত্মসাৎ করণায় করুণাময়ীকে বিষপান করাইয়াছিল। যাহাই হউক করুণাময়ী প্রাণত্যাগ করিলেন।

বংশীবদন প্রণয়িনী বিয়োগের মনোদুঃখেই হউক, অথবা “যঃ পলায়তি স জীবতি” বলিয়াই হউক, তৎক্ষণাৎ চাকরি স্থান পরিত্যাগ করিয়া বাটী আসিলেন।

করুণাময়ীর বিপুল অর্থরাশি যে তাহার সঙ্গে আসিল, তাহা বলা বাহুল্য। অপৰ্যাপ্ত ধনের অধিপতি হইয়াও বংশীবদন, পাছে অসম্ভব ব্যয় ভূষণ করিলে বিপদগ্রস্ত হইতে হয় এই আশঙ্কায় অতি সাবধানে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তিনি পরলোক গমন করিলে তাহার পুত্রেরা তাদৃশ সাবধানতা আবশ্যিক বিবেচনা করিলেন না; এবং দীর্ঘকাল গতে নিশ্চিত হইয়া ভূসম্পত্তি ক্রয় করিলেন, অট্টালিকা ও ক্রীড়া-হস্ত্যাদি নিৰ্ম্মাণ করিলেন, এবং পৈতৃক ধনরাশির উপর উপযুক্ত ঐশ্বর্য্য বিস্তার করিয়া কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

জ্যেষ্ঠ রামকান্ত অতি বিষয়কার্য্যদক্ষ ছিলেন। তাহার দক্ষতার ফলে তাহার অংশ দ্বিগুণাধিক সম্বদ্ধিত হইল।—রামকান্ত এই সম্বদ্ধিত সম্পত্তি নিজ দক্ষতার পুত্র মথুরমোহনের হস্তে সমর্পণ করিয়া পরলোক গমন করেন।

রামকান্তে দৃঢ় সংস্কার ছিল যে, ইংরাজি স্কুল ইত্যাদি যে সকল স্থান বিদ্যাভ্যাস জন্য অধুনা সংস্থাপন হইতেছিল, তৎসমুদায়ই কেবল খ্রীষ্টান ধর্ম্ম প্রচারের জন্য জাল বিস্তার মাত্র;—সুতরাং মথুরমোহনের কখন ইংরাজি বিদ্যালয় দর্শন করা হয় নাই। বাল্যাবধি বিষয়কার্য্য সম্পাদনে পিতৃসহযোগী হইয়া তদ্বিষয়ে তাহার বিশেষ পারদর্শিতা জন্মিয়াছিল; প্রজাপীড়ন, তণ্ডকতা ও অর্থ সংগ্রহ প্রভৃতি বিদ্যাতে বিশেষ নিপুণতা অর্জিত হইয়াছিল।

বংশীবদনের দ্বিতীয় পুত্র রামকানাই অন্যপথাবলম্বী হইল। তিনি স্বভাবতঃ সাতিশয় ব্যয়শীল ছিলেন; এজন্য অল্পকালেই অতুল ঐশ্বর্য্য বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিল। মধ্যম বাবুর যেমন বাটী, মধ্যম বাবুর যেমন বাগান, মধ্যম বাবুর যেমন আসবাব, এমন কোন বাবুরই নয়। কিন্তু মধ্যম বাবুর জমিদারীও সর্ব্বাপেক্ষা লাভশূন্য; এবং মধ্যম বাবুর ধনাগারও তদ্রূপ অপদার্থ। শেষে কতিপয় শঠ চাটুকার তাহাকে কোন বাণিজ্যাদি ব্যাপারে সংলিপ্ত করিল। কলিকাতায় থাকিয়া ব্যবসায় ঈদৃশ অপারিসীম অর্থলাভের সঙ্কল্প করিতে লাগিল যে, সরলচিত্ত ভূস্বামী-পুত্র দুরাশাগ্রস্ত হইয়া কলিকাতায় গেলেন; এবং বাণিজ্যোপলক্ষে ধূর্ত চাটুকারদিগের করে পতিত হইয়া হতসর্ব্বস্ব হইলেন। পরিশেষে ঋণ পরিশোধার্থ তাবৎ ভূসম্পত্তি বিক্রীত হইয়া গেল।

রামকানাই বাণিজ্য উপলক্ষে কলিকাতায় আসায় এক উপকার হইয়াছিল,—রাজধানীবাসীদিগের পদ্ধতি অনুসারে নিজ পুত্র মাধবকে দেশীয় ও বিদেশীয় বিদ্যায় শিক্ষিত করিয়াছিলেন। আরও মনুষ্যজন্মের সাধ মিটাইয়া উপযুক্ত পাত্রীর সহিত মাধবের পরিণয় ঘটাইয়াছিলেন।—কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোনও গ্রামে এক দরিদ্র কায়স্থ বাস করিত। জগদীশ্বর যেমন কাহাকে সর্ব্বাংশে সুখী করেন না, তেমনই কাহাকেও সর্ব্বাংশে দুঃখী করেন না। কায়স্থের দুঃস্তর দুঃখসাগরতলে অমূল্য দুই রত্ন জন্মিয়াছিল,—তাঁহার দুই কন্যাতুল্যা অনিন্দিত সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী অথবা অকলুষিতচরিত্রা আর কোন কামিনী তৎপ্রদেশে ছিল না। কিন্তু রূপেই বা কি করে, চরিত্রেই বা কি করে,—ললার্টালিপদোষে হউক বা যে কারণেই হউক, সচরাচর দেখা যায়, বঙ্গদেশসম্ভূত কত রমণীরই শূকরদন্তে দলিত হয়,—কায়স্থের জ্যেষ্ঠা কন্যা মাতঙ্গিনীর অদৃষ্টের তদ্রূপ হইল—নীচস্বভাব রাজমোহন তাঁহার স্বামী হইল।

রাজমোহন কস্মিৎ, কোনও উপায়ে সংসার প্রতিপালন করিয়া থাকে; তাহার বাটীও নিকটে। এজন্য কন্যাকর্ত্তার ও কন্যাকর্ত্তীর পাত্র বড় মনোনীত হইল,—রাজসিংহাসনের যোগ্যা কন্যা মাতঙ্গিনী দৃষ্টের দাসী হইলেন। কনিষ্ঠা হেমাজিনীর প্রতি বিধাতা প্রসন্ন,—মাধবের সহিত তাঁহার পরিণয় হইল।

মাধবের অধ্যয়ন সমাপ্ত হইবার কিছু পূর্বে রামকানাই লোকান্তরে গমন করিলেন। মাধব পিতৃপরলোকের পর প্রায় দারিদ্র্যগ্রস্ত হইতেন, কিন্তু অদৃষ্ট প্রসন্ন। বংশীবদন ঘোষের কনিষ্ঠ পুত্র রামগোপাল, জ্যেষ্ঠের ন্যায় ধনসম্পত্তিশালী না হইলেও দ্বিতীয়ের ন্যায় হতভাগ্য ছিলেন না। রামগোপাল, রামকানাইয়ের পরই পীড়াগ্রস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার সন্তান-সন্ততি ছিল না। তিনি এই মর্মে উইল করিলেন যে, মাধব তাঁহার তাবৎ সম্পত্তির অধিকারী

অসম্পূর্ণ রচনা—রাজমোহনের স্ত্রী

হইবেক, বিধবা স্ত্রী যত দিন মাধবের ঘরে বাস করিবেন তত দিন তাহার নিকট গ্রাসাচ্ছাদন পাইবেন মাত্র।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পিতৃবিয়োগের পরেও মাধব বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন-শেষ পর্য্যন্ত রহিলেন। তাহার অনুপস্থিতি-কালে তাহার কার্য্যকারকেরা বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল। পাঠ সমাপ্ত হইলে হেমাঙ্গিনীকে সঙ্গে লইয়া রাধাগঞ্জে গমনোদ্যত হইয়া শ্বশুরালয়ে আগমন করিলেন।

মাতঙ্গিনী তৎকালে পিত্রালয়ে ছিলেন, এবং রাজমোহনও তথায় উপস্থিত ছিলেন। রাজমোহন সময়ের সুযোগ বুঝিয়া মাধবের নিকট নিজের দুঃখকাহিনী প্রকাশ করিলেন; বলিলেন, “পূর্বে কোনরূপে দিন যাপন করিয়াছি, কিন্তু এক্ষণে কাজকর্ম প্রায় রহিত হইয়াছে; আমাদের সহায় মুরদুর্ধ্ব মহাশয় ব্যতীত আর কেহ নাই। মহাশয় কুবেরতুল্য ব্যক্তি, অনুগ্রহ করিলে অনেকের কাছে বলিয়া দিতে পারেন।”

মাধব জানিতেন যে, রাজমোহন অতি দুর্নীতিস্বভাব, কিন্তু সরলা মাতঙ্গিনী তাহার গৃহিণী হইয়া যে গ্রাসাচ্ছাদনের ক্লেশ পাইতেছিলেন, ইহাতে মাধবের অন্তঃকরণে রাজমোহনের উপর মমতা জন্মাইল। তিনি বলিলেন, “আমার পূর্বাধি মানস যে, কোন বিশ্বস্ত আত্মীয় ব্যক্তির হস্তে বিষয়কর্মের কিয়দংশ ভার ন্যস্ত করিয়া আপনি কতকটা ঝঞ্জাট এড়াই, তা মহাশয় যদি এ ভার গ্রহণ করেন তবে ত উত্তমই হয়।”

রাজমোহন মনে মনে বিবেচনা করিল যে, মাধব যে প্রস্তাব করিতেছিলেন তাহাতে রাজমোহনের আশার অতিরিক্ত ফল হইতেছে; কেন না, সে যদি মাধবের জমিদারীর একজন প্রধান কর্মকারক হইতে পারে, তাহা হইলে তাহার উপার্জনের সীমা থাকিবে না। কিন্তু এক দোষ যে, দেশ ছাড়িয়া যাইতে হইবে। রাজমোহন উত্তর করিল, “আমার প্রতি মহাশয়ের দয়া যথেষ্ট; কিন্তু যদি মহাশয়ের সহিত যাইতে হয়, তাহলে পরিবার কাহার কাছে রাখিয়া যাই?”

মাধব বলিলেন, “সে চিন্তায় প্রয়োজন কি? একই সংসারে দুই ভাগিনী একত্র থাকিবেন, মহাশয়ও আমার বাটীতে যেমন ভাবে ইচ্ছা তেমনই ভাবে থাকিবেন।”

এই শুনিয়া রাজমোহন ভ্রূভঙ্গ করিয়া মাধবের প্রতি চাহিয়া সক্রোধে বলিল,—“না মহাশয়, প্রাণ থাকিতে এমন কখনও পারিব না।”

এই বলিয়া রাজমোহন তন্দ্রাভেদেই শ্বশুরালয় হইতে প্রস্থান করিল।

পরদিন প্রাতে রাজমোহন প্রত্যাগমন করিল, এবং মাধবকে পুনরায় কহিল, “মহাশয়, সপরিবারে দূরদেশে যাওয়া আমি পারৎপক্ষে স্বীকার নাই, কিন্তু কি করি, আমার নিতান্ত দুর্দর্শা উপস্থিত, সুতরাং আমাকে যাইতেই হইতেছে; কিন্তু একটা পৃথক্ ঘর-দ্বারের বন্দোবস্ত না হইলে যাওয়া হয় না।”

যাচকের যাচ্চার ভঙ্গী পৃথক্, নিয়মকর্তার ভঙ্গী পৃথক্। মাধব দেখিলেন, রাজমোহন যাচক হইয়া নিয়মকর্তার ন্যায় কথাবার্তা কহিতেছেন; কিন্তু মাধব তাহাতে রুষ্ট না হইয়া বলিলেন, “তাহার আশ্চর্য্য কি? মহাশয় যাইবার পর পক্ষমধ্যে প্রস্তুত বাটী পাইবেন।”

রাজমোহন সম্মত হইল; এবং মাতঙ্গিনীর সহিত মাধবের পশ্চাতে রাধাগঞ্জে যাত্রা করিল।

রাজমোহনের এইরূপ অভিপ্রায় পরিবর্তনের তাৎপর্য্য কি, তাহা প্রকাশ নাই। ফলতঃ এমত অনেকের বোধ হইয়াছিল যে, রাজমোহন এক্ষণে বাটী থাকিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক হইয়াছিল; অনিচ্ছার কারণ কি, তাহাও প্রকাশ নাই।

রাধাগঞ্জে উপস্থিত হইয়া মাধব রাজমোহনকে কার্য্যের নামমাত্র ভার দিয়া অতি সুন্দর বেতন নিষ্কারণ করিয়া দিলেন; গৃহ নিষ্কার্ণ করিতে নিষ্কর ভূমি প্রদান করিলেন, এবং নিষ্কার্ণ-প্রয়োজনীয় তাবৎ সামগ্রী আহরণ করিয়া দিলেন।

রাজমোহন বিনা নিজ ব্যয়ে নিজোপযুক্ত পরিপাটী গৃহ স্বল্পকাল মধ্যে নিষ্কার্ণ করিলেন। সেই গৃহের মধ্যেই এই আখ্যায়িকার সূত্রপাত।

রাজমোহন যদিও উচ্চ বেতন-ভোগী হইলেন, কিন্তু মাধব সন্দেহ করিয়া কোনও গুরুতর কার্য্যের ভার দিলেন না।—প্রতিপালনার্থ বেতন দিতেন মাত্র। রাজমোহনের কালক্ষেপণের

বঙ্গীয় রচনাবলী

উপায়াভাব প্রযুক্ত মাধব তাহাকে কৃষকের দ্বারা কৰ্ণগাথ বহু ভূমি দান করিলেন; রাজমোহন প্রায় এই কাৰ্য্যই ব্যাপ্ত থাকিতেন।

এইরূপে মাধবের নিকট শোধানাতীত উপকার প্রাপ্ত হইয়া রাজমোহন কোন অংশে কখন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন না। রাধাগঞ্জ আসা অবধি রাজমোহন, মাধবের প্রতি অপ্রীতিসূচক এবং অপ্রীতিজনক ব্যবহার করিতে লাগিলেন; উভয়ে সাক্ষাৎ সম্ভাবনাদি অতি কদাচিৎ সংঘটন হইত। এইরূপ আচরণে মাধব কখন দৃক্পাত করিতেন না—দৃক্পাত করিলেও তদ্ব্যতিরিক্ত বা বদান্যতার লাবণ্য জন্মাইত না। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, মাতঙ্গিনী ও হেমঙ্গিনী পরস্পর প্রাণতুল্য ভালবাসিতেন, তথাপি তাহাদের প্রায় সাক্ষাৎ হইত না। হেমঙ্গিনী কখন কখন স্বামীকে অনুরোধ করিয়া অগ্রজা সন্নিধানে শিবিকা প্রেরণ করিতেন; কিন্তু রাজমোহন প্রায় মাতঙ্গিনীকে ভাগিনীগৃহে গমন করিতে দিতেন না। হেমঙ্গিনী মাধবের স্ত্রী হইয়াই বা কিরূপে রাজমোহনের বাটীতে আসেন?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এক্ষণে আখ্যায়িকার সদর পুনঃগ্রহণ করা যাইতেছে। পুস্তকাদ্যান হইতে মাধব বাটীতে প্রত্যাগমন করিলে একজন পত্র-বাহক তাহার হস্তে একখানি লিপি প্রদান করিল। লিপির শিরোনামার স্থলে “জরুরি” এই শব্দ দৃষ্টে মাধব ব্যস্ত হইয়া পত্রপাঠে নিযুক্ত হইলেন। সদর মোকামে যে ব্যক্তি তাহার মোক্তার নিযুক্ত ছিল, সেই ব্যক্তি এই পত্র প্রেরণ করিয়াছিল। পত্রের মর্ম নিম্নে উদ্ধৃত হইলঃ—

“মহিমার্গবেষ—

অধীন এ মোকামে থাকিয়া হুজুরের মোকদ্দমা জাতের তদ্বিষয়ে নিযুক্ত আছে, এবং তাহাতে যেমত যেমত আবশ্যিক তাহা সাধ্যমত আমলে আনিতেছে। ভরসা করি সর্বত্র মঙ্গল ঘটনা হইবেক। সম্প্রতি অকস্মাৎ যে এক গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে তাহা হুজুরের গোচরে নিবেদন করিতে অধীনের সাহসাত্মক। হুজুরের শ্রীমতী খুড়ী ঠাকুরাণীর উকিল হুজুরের নামে অদ্য এ মোকামের প্রধান সদর আর্পিল আদালতে এই দাবিতে মোকদ্দমা রুজু করিয়াছেন যে, রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের উইলনামা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও তথ্যক,—হুজুর কর্তৃক জাল উইল প্রস্তুত হইয়া বিসয়াদি হইতে তেঁহ বেদস্ত হইয়াছেন। অতএব সমেৎ ওয়াশিলাত তাবৎ বিষয়ে দখল পাওয়ার ও উইল রদের দাবি ইত্যাদি।”

পত্রী মাধবের হস্তস্থলিত হইয়া ভূপতিত হইল। মনে যে তাহার কিরূপ ক্রোধবির্ভাব হইল তাহা বর্ণনা করা দুষ্কর। বহুক্ষণ চিন্তার পর পত্রী মৃত্যুক হইতে উত্তোলন করিলেন, এবং ললাটের স্বেদস্রুতি করদ্বারা বিলম্ব করিয়া পুনঃপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। যথা—

“ইহার ছলাদার কে, তাহা অধীন এ পর্য্যন্ত জানিতে পারে নাই; কিন্তু অধীন অনেক অনুসন্ধান করিতেছে ও করিবেক। ফলে এমত বোধ হয় না যে, বিনা ছলা স্ত্রীলোক এরূপ নালিশ উত্থাপন করিবেন। অধীন অদ্য পরস্পরায় শ্রুত হইল যে, কোনও অতি প্রধান ব্যক্তির কুপরামর্শমতে এ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে।”

মাধব মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, এমত ব্যক্তি কে, যে কুপরামর্শ দিয়াছে? মাধব অনেক ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কখন একজন প্রতিযোগী প্রতিবাসীর প্রতি সন্দেহ, কখনও বা অপরের প্রতি সন্দেহ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোনও সন্দেহ সমূলক বলিয়া বোধ হইল না।

পত্রপাঠে পুনঃপ্রবৃত্ত হইলেনঃ—

“অধীনের বিবেচনায় হুজুরের কোনও শঙ্কা নাই, কেন না, ‘যতো ধর্মঃ ততো জয়’। কিন্তু যেরূপ বিপক্ষের সহায় দেখা যাইতেছে, তাহাতে সতর্কতার আবশ্যিক।—বাবুদিগের এক্ষণে ওকালতনামা দেওয়া আবশ্যিক—পশ্চাৎ সময়ে সময়ে সদর হইতে উকীল কোন্সিলী আনান কর্তব্য হইবেক। তৎপক্ষে হুজুরের যেমন মর্জি। আজ্ঞাধীন প্রাণপণে হুজুরের কাৰ্য্য নিযুক্ত রহিল—সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিবেক না। ইতি তারিখ—

আজ্ঞানবত্তী শ্রীহরিদাস রায়।”

অসম্পূর্ণ রচনা—রাজমোহনের স্ত্রী

“পুনশ্চ নিং—

আপাততঃ মোকদ্দমার খরচ প্রায় হাজার টাকার আবশ্যক হইবেক। যে রূপ হুজুর বদ্বিবেন সেইরূপ করিবেন।”

পত্রপাঠ সমাপন মাত্র মাধব, খুল্লতাত-পত্নীর অননুসন্ধানে পুরমধ্যে চলিলেন। ক্রোধে কলেবর কম্পিত হইতেছিল, অতি তরল পদবিক্ষেপে গমন করিতে লাগিলেন;—তাঁহাকে খুল্লতাত-পত্নী কোন মূখে জাল সাজ বালিয়া বিচারাগারে ব্যক্ত করিয়াছেন, এ কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, এবং তৎক্ষণাৎ খুড়ীকে গৃহবাহিনীকৃত করিয়া দিবেন স্থির করিলেন।

পুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, সন্ধ্যাকাল পাইয়া অন্তঃপুরবাসিনীরা যে হট্টগোল উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে কণ্ঠপাত করাই কষ্ট, কথার উত্তর পাওয়া দূরে থাকুক। কোথাও কোন রূপসী—একে স্থূলাকার তাহাতে মেঘের বর্ণ—নানামত চিৎকার করিয়া এটা ওটা সেটা চাহিতেছে, এবং নানামত মূখভঙ্গী অঙ্গভঙ্গী করিতেছে,—যেন একটা ক্ষুদ্র হস্তিনী কেলি করিতেছে। কোথাও একটি পরিচারিকা তদ্রূপ বিশাল দেহ-পর্ষত লইয়া ব্যস্ত—প্রায় বিবসনা—গৃহ মার্জ্জন করিতেছে; এবং যেমন গ্রিশূলহস্তে অসুরবিজয়িনী প্রমথেশ্বরী প্রতিবার শূলাঘাতে অসুরদল দলিত করিয়াছিলেন, পরিচারিকাও করাল সম্মার্জ্জনী হস্তে রাশি রাশি জঞ্জাল, ওজলা, তরকারির খোসা প্রভৃতি দলিত করিতেছিল, এবং যে আঁটকুড়ীরা এত জঞ্জাল করিয়াছিল তাহাদিগের পতিপুত্রের মাথা মহাসূখে খাইতেছিল। কোথাও অপরা কিষ্করী আঁস্তাকুড়ে বসিয়া ঘোররবে বাসন মাজিতেছিল,—পাচিকার অপরাধ, সে কেন কড়া বগুনায় পাক করিয়াছিল?—তাই কিষ্করীর এ গুরুতর কৰ্ম্মভোগ; যেমন মার্জ্জনা-কার্যে তাহার বিপুল করযুগল ঘর্ ঘর্ শব্দে চলিতেছিল, রসনাখানিও তদ্রূপ দ্রুতবেগে পাচিকার চতুর্দশ পুরুষকে বিষ্ঠাদি ভোজন করাইতেছিল। পাচিকা স্বয়ং তখন স্থানান্তরে, গৃহিণীর সহিত ঘৃত লইয়া মহা গোলযোগ করিতেছিলেন, আঁস্তাকুড়ে যে তাহার পূর্ব-পুরুষের আহারাদির পক্ষে এমন অন্যায় ব্যবস্থা হইতেছিল, তাহা কিছুমাত্র জানিলেন না—ঘৃতের বিষয়ে একেবারে উন্মত্ত। গৃহিণী পাকার্থ যতটুকু ঘৃত প্রয়োজন ততটুকু দিয়াছেন, কিন্তু পাচিকা তাহাতে সন্তুষ্ট নহেন। তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, যতটুকু পাকার্থ আবশ্যিক তাহার দ্বিগুণ ঘৃত কোন সূযোগে লওয়াই যুক্তি; কারণ, অর্দ্ধেক পাক হইবে, অর্দ্ধেক আত্মসেবার জন্য থাকিবে।

কোথাও বা দারুণ বণ্টীর আঘাতে মৎস্যকুল ছিন্নশীর্ষ হইয়া ভূমিতে লুটাইতেছিল, কোথাও বা বালক-বালিকার দল মহানন্দে ক্রীড়া করিতেছিল। পুরসুন্দরীরা কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে প্রদীপ-হস্তে যাতায়াত করিতেছিলেন; মলের শব্দ কোথাও ঝগাৎ ঝগাৎ, কোথাও রুগ্ রুগ্, কোথাও বা ঠুগ্ ঠুগ্; যার যেমন বয়স তার মলও তেমনই বাজিতেছিল। কখন বা বামা-সুরে রামী বামী শ্যামীর ডাক পড়িতেছিল। পাড়ার গোটা দুই অধঃপেতে ছেলে নিজ নিজ পৌরুষ প্রকাশের উপযুক্ত সময় পাইয়া মল্লযুদ্ধ উপলক্ষে উঠানে চুল ছেঁড়াছিঁড়ি করিতেছিল। কতকগুলি বালিকা কলরব করিয়া আগডুম বাগডুম খেলিতেছিল।

মাধব এই সমস্ত দেখিয়া শূন্য হতাশ হইলেন; এ ঘোর কলরবের মধ্যে যে কেহ তাহার কথা শুনিত পাইবে, এমত ভরসা রহিল না। তিনি অষ্টমে উঠিয়া চীৎকার করিয়া বালিলেন, “বালি, মাগীরা একটু থামবি।” এই বালিয়া উঠানে গিয়া মল্লযোদ্ধা-বালকদ্বয়ের মধ্যে একজনকে কেশাকর্ষণ করিয়া দুই-চারি চপেটাঘাত করিলেন।

একেবারে আগুনে জল পড়িল;—ঘোরতর কোলাহল পলকমধ্যে আর নাই, যেন ভোজবাজিতে সকলই তিরোহিত হইল। যে স্থূলাঙ্গিনী আকাশকে সম্বোধন করিয়া বিবিধ চীৎকার ও মূখভঙ্গি করিতেছিলেন, তাহার কণ্ঠ হইতে অর্দ্ধনির্গত চীৎকার অর্ধনির্গত হইয়া গেল, হস্তিনীর ন্যায় আকারখানি কোথায় যে লুপ্ত হইল, তাহা আর দেখিতে পাওয়া গেল না; সম্মার্জ্জনী-হস্তে যিনি বিবসনে বিষম ব্যাপার করিতেছিলেন, তিনি অর্ধনির্গত ভীম প্রহরণ দূরে নিক্ষেপ করত রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন আরম্ভ করিলেন, কিন্তু প্রায়-বসনহীন মাংসরাশি কোথায় লুকাইবেন স্থান না পাওয়ায় এ কোণ ও কোণ করিতে লাগিলেন, দূর্ভাগ্যক্রমে মেঝেতে কে জল ফেলিয়াছিল—পরিচারিকা দ্রুতপদে বিবসন শরীর লইয়া যেমন পলাইবেন, অর্ধনির্গত পা পিছলাইয়া চীৎপাত হইয়া ভূ-শায়িনী হইলেন; যিনি পাত্রাদি মার্জ্জনে হাত মূখ দুই ঘুরাইতে ঘুরাইতে পাচিকার পিতৃপুরুষের পিণ্ডাদির ব্যবস্থা করিতেছিলেন, তাহার একটা লম্বা গালির ছড়া

বাঁকম রচনাবলী

আধখানা বই বলা হইল না—হাত ঘুরিতে ঘুরিতে যেমন উঁচু হইয়াছিল তেমনই উঁচু রহিয়া গেল; মৎস্যদল-দলনী বারেক নিস্তর হইলেন, পশ্চাৎ কার্য্যারম্ভ করিলেন বটে, কিন্তু আর তাদৃশ ঘটাই রহিল না; রক্ষনশালার কথী যে ঘূতের কারণ বক্তৃতা আরম্ভ করিয়াছিলেন, অকস্মাৎ তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া পলায়নতৎপরা হইলেন—অন্যমনস্কপ্রযুক্তই হউক, আর তাড়াতাড়িতে বিবেচনার অভাববশতই হউক, পাঁচকা পলায়নকালে পূর্ণভাণ্ড ঘূত লইয়া চলিয়া গেল—পাঁচকা ইতিপূর্বে কেবল অর্দ্ধভাণ্ড মাত্র ঘূতের প্রার্থিতা ছিলেন; যে পূর-সুন্দরীরা প্রদীপহস্তে কক্ষে কক্ষে গমনাগমন করিতেছিলেন, তাঁহারা সকলে গ্রস্তে পলাইয়া লুক্কায়িত হইলেন, পলায়নকালে মলগর্দল একেবারে ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল—হস্তের দীপসকল নিবিয়া গেল।

যে শিশু মল্লযোদ্ধাটি মাধবের চপেটাঘাত খাইয়াছিলেন, তিনি বীরত্বের এমত নূতনতর পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ রণস্থলী হইতে বেগে প্রস্থান করিয়াছিলেন—দ্বিতীয় যোদ্ধাও সময়ের গতিক তাদৃশ সুবিধাজনক নয় বুঝিয়া রণে ভঙ্গ দিলেন, কিন্তু যেমন ঘটোৎকচ মৃত্যুকালেও পিতৃবৈরী নষ্ট করিয়াছিলেন, ইনিও তেমনই পলায়নকালে বিপক্ষের উরুদেশে একাট পদাঘাত করিয়া গেলেন। যে বালিকাগণ কলরব-সহকারে খেলিতেছিল, তাহারা খেলা ত্যাগ করিয়া পলায়নতৎপর বীরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল—ভয় হইয়াছে, কিন্তু হাসিটা একেবারে থামিল না। যে অন্তঃপুর এতক্ষণ অতি ঘোর কোলাহলপরিপূর্ণ ছিল, তাহা এক্ষণে একেবারে নীরব। কেবল মাত্র গৃহিণী—অবিকৃত কান্তিমতী হইয়া—বাবুর সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন।

মাধব তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “কি মাসী, আমার বাড়ীতে বাজার!”

মাসী মৃদুহাস্য করিয়া কহিলেন, “বাছা, মেয়ে মানুষের স্বভাব বকা।”

মাধব কহিলেন, “খুড়ী কোথা, মাসী?”

উত্তর—“আমিও তাই ভাবিতেছিলাম, আজ সকাল বেলা হ’তে কেহই তাঁহাকে দেখে নাই।”

মাধব বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, “সকাল অর্বাধ নাই! তবে সকলই সত্য!”

মাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি সত্য বাপু?”

মাধব। কিছুর না—পশ্চাৎ বলিব। খুড়ী তবে কোথায়? কাহারও সঙ্গে কি তাঁহার আজও দেখা হয় নাই?

গৃহিণী ডাকিয়া কহিলেন, “অম্বিকা, শ্রীমতী! তোরা কেহ দেখেছিস?”

তাহারা সকলে সমস্বরে উত্তর করিল, “না।”

মাধব কহিলেন, “বড়ই আশ্চর্যের কথা।”

পরে অন্তরাল হইতে একজন স্ত্রীলোক মৃদুস্বরে কহিল, “আমি নাবার বেলা বড় বাড়ীতে তাঁকে দেখেছিলাম।”

মাধব অধিকতর বিস্ময়বিষ্ট হইয়া কহিলেন, “বড় বাড়ীতে? মথুর দাদার ওখানে!”

তাঁহার মনোমধ্যে এক নূতন সিদ্ধান্ত উপস্থিত হইল। ভাবিলেন, “তবে কি মথুর দাদার কর্ম্ম? না, না, তা হ’তে পারে না—আমি অন্যায় দোষ দিতেছি।” পরে প্রকাশ্যে কহিলেন, “করুণা, তুই বড় বাড়ীতে যা,—খুড়ীকে ডেকে আন; যদি না আসেন, তবে কেন আসবেন না, জিজ্ঞাসা করিস্।”

সপ্তম পরিচ্ছেদ

এদিকে মাতঙ্গিনী স্বামীকৃত তিরস্কারের পর স্বশ্রুতস্বসা কর্তৃক নিজ শয়নকক্ষে আনীত হইলে কক্ষের দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া মনের দুঃখে শয্যাবলম্বন করিলেন। রাগে পাকাদি সমাপন হইলে স্বশ্রুতস্বসা তাঁহাকে আহ্বারার্থে ডাকিলেন, কিন্তু মাতঙ্গিনী শয্যা ত্যাগ করিলেন না। নন্দা কিশোরী আসিয়া পিতৃস্বসার সংযোগে অনেক অনুনয় সাধনাদি করিলেন; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। অবশেষে তাঁহারা নিরস্ত হইলেন,—মাতঙ্গিনী অনশনা রহিলেন।

মাতঙ্গিনী শয্যায় শুইয়া আপন অদৃষ্টের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। মাতঙ্গিনীর প্রতি রুষ্ট হইলে রাজমোহন প্রায় শয়নাগারে আসিত না, সুতরাং অদ্য রাগে যে আসিবে না, ইহা মাতঙ্গিনী উত্তমরূপে জানিতেন।

ক্রমে রজনী গভীরা হইল। একে একে গৃহস্থ সকলে নিদ্রামগ্ন হইলেন। সর্বত্র নীরব

অসম্পূর্ণ রচনা—রাজমোহনের স্ত্রী

হইল। মাতঙ্গিনীর শয়নকক্ষে প্রদীপ ছিল না। গবাক্ষরন্ধের আচ্ছাদনীয় পার্শ্ব হইতে চন্দ্রালোক আসিয়া কক্ষতলে পড়িয়াছিল; তদ্ব্যতীত কক্ষের অংশবিশেষ ঈষৎ আলোকিত হইয়াছিল। তদ্ব্যতীত সর্বত্র অন্ধকার।

প্রকৃত অপরাধে অপমানের যন্ত্রণা সততই এত তীক্ষ্ণ যে, যতক্ষণ না তৎসম্বন্ধীয় বিষয়ই স্মৃতি বিলোপিত হয়, ততক্ষণ মানবদেহে নিদ্রা অনুভূত হইতে পারে না। গ্রীষ্মাতিশয্যপ্রযুক্ত বক্ষঃস্থল হইতে অণ্ডল পদতলে প্রক্ষিপ্ত করিয়া উপাধান-ন্যস্ত বাম ভূজোপরে শিরঃ সংস্থাপন করিয়া মাতঙ্গিনী অশ্রুপূর্ণ লোচনে গৃহতলশোভিনী চন্দ্রপাদরেখা প্রতি দৃষ্টি করিতেছিলেন। কেন? সে অমৃত শীতল কিরণ দৃষ্টি কত যে পূর্বসুখ স্মৃতিপথগামী হইল, তাহা কে বর্ণনা করিতে পারে? কৈশোরে কত দিন প্রদোষকালে হেমাঙ্গিনীর সহিত গৃহ-প্রাঙ্গণে এক শয্যায় শায়িনী হইয়া শিশু-মনোরঞ্জনী উপকথা কথন বা শ্রবণ করিতে করিতে নীলাম্বরবিহারী এই নিশানাথ প্রতি চাহিয়া থাকিতেন, তাহা মনে পড়িল। নীলাম্বর হইতে এই মৃদুল জ্যোতিঃ বর্ষিত হইয়া কত যে হৃদয়-তৃপ্ত জন্মাইত, এক বৃত্তোৎপন্ন কুসুমযুগলবৎ কণ্ঠলগ্না দুই সহোদরা তখন কত যে আন্তরিক সুখে উচ্চহাস্য হাসিতেন, তাহা স্মরণপথে পড়িতে লাগিল।

সেই এক দশা, আর এই এক দশা। সে উচ্চহাস্য আর কাহার কণ্ঠে? সেই সকল প্রিয়জনই বা কোথায়? আর কি তাঁহাদের মুখ দেখিতে পাইবেন? আর কি তাঁহাদের সেই স্নেহপূর্ণ সম্বোধন কণ্ঠকুহরে সুধাবর্ষণ করিবে? মনঃপীড়াপ্রদান-পটু স্বামীর হস্তজদালিত কালাগ্নি অন্তর্দাহ ব্যতীত আর কিছুর কি অদৃষ্ট আছে?

এই সকল দুঃখ চিন্তার মধ্যে একটি গঢ় বৃত্তান্ত জাগিতেছিল। সে চিন্তা অনুতাপময়ী হইয়াও পরম সুখকরী। মাতঙ্গিনী এ চিন্তাকে হৃদয়-বহিস্কৃত করিতে যত্ন করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। এই গঢ় ব্যাপার কি, তাহা কনক ব্যতীত আর কেহ জানিত না।

দুঃখ-সাগর মনোমধ্যে মন্থন করিয়া তৎস্মৃতিলাভে মাতঙ্গিনী কখন মনে করিতেন, রত্ন পাইলাম; কখন বা ভাবিতেন, হলাহল উঠিল। রত্নই হউক, আর গরলই হউক, মাতঙ্গিনী ভাবিয়া দেখিলেন, তাঁহার কপালে কোন সুখই ঘটিতে পারে না। চক্ষুর্দ্বয় বারিপ্রাবিত হইল।

ক্রমে গ্রীষ্মাতিশয্য দুঃসহ হইয়া উঠিল; মাতঙ্গিনী গবাক্ষ-রন্ধ মূক্ত করিবার অভিপ্রায়ে শয্যা ত্যাগ করিয়া তদভিমুখে গমন করিলেন। মূক্ত করেন, এমত সময়ে যেন কেহ শনৈঃ পদ-সঙ্গারে সেই দিকে অতি সাবধানে আসিতোঁছিল—এমত লঘু শব্দ তাঁহার কণ্ঠপ্রবিষ্ট হইল।

জানেলাটি যেমত সচরাচর এরূপ গৃহে ক্ষুদ্র হয়, তদ্রূপই ছিল,—দুই হস্ত মাত্র দৈর্ঘ্য, সার্কেক হস্ত মাত্র বিস্তার। এ প্রদেশে চালাঘরে মৃত্তিকার প্রাচীর থাকে না, দরমার বেটনীই সর্বত্র প্রথা। রাজমোহনের গৃহেও সেইরূপ ছিল; এবং জানেলার ঝাঁপ ব্যতীত কাষ্ঠের আবরণী ছিল না।

পার্শ্ব যে ছিদ্র দিয়া গৃহমধ্যে জ্যোৎস্না প্রবেশ করিয়াছিল, পদসঙ্গার শ্রবণে ভীতা হইয়া মাতঙ্গিনী সেই ছিদ্র দিয়া বহির্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে যত্ন করিলেন, কিন্তু নীলাম্বরস্পর্শী বৃক্ষশ্রেণীর শিরোভাগ ব্যতীত আর কিছুরই দেখিতে পাইলেন না।

মাতঙ্গিনী জানিতেন, যে দিক্ হইতে পদসঙ্গার শব্দ তাঁহার কণ্ঠগত হইল, সে দিক্ দিয়া মনুষ্য যাতায়াতের কোন পথ নাই; সুতরাং আশঙ্কা জন্মান বিচিত্র কি? মাতঙ্গিনী নিস্পন্দ শরীরে কর্ণোত্তোলন করিয়া তথায় দণ্ডায়মানা রহিলেন।

ক্রমশঃ পদক্ষেপণ শব্দ আরও নিকটাগত হইল; পরক্ষণেই দুই জন কর্ণে কর্ণে কথোপকথন করিতেছে শুনিতে পাইলেন। দুই-চারি কথায় মাতঙ্গিনী নিজ স্বামীর কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিলেন; তাঁহার হাস ও কৌতূহল দুই সম্বন্ধিত হইল। যথায় মাতঙ্গিনী গৃহমধ্যে দণ্ডায়মানা ছিলেন, আর যথায় আগসুক ব্যক্তির বিরলে কথোপকথন করিতেছিল, তন্মধ্যে দরমার বেটনীমাত্র ব্যবধান ছিল। সুতরাং মাতঙ্গিনী তৎকথোপকথনের অনেক শুনিতে পাইলেন; আর যাহা শুনিতে পাইলেন না, তাহার মর্মার্থ অনুভবে বুঝিতে পারিলেন।

এক ব্যক্তি কহিতোঁছিল, “অতঃবড় বড় করিয়া কথা কহ কেন? তোমার বাড়ীর লোকে যে শুনিতে পাইবে।”

দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর করিল, “এত রাতে কে জাগিয়া থাকিবে?”

মাতঙ্গিনী কণ্ঠস্বরে বুঝিলেন, এ কথা রাজমোহন কহিল।

বিক্রম রচনাবলী

প্রথম বক্তা কহিল, “কি জানি যদি কেহ জাগিয়া থাকে, আমাদের একটু সরিয়া দাঁড়াইলে ভাল হয়।”

রাজমোহন উত্তর করিল, “বেশ আছি; যদি কেহ জাগিয়াই থাকে, তবে এ ছেঁচের ছায়ার মধ্যে কেহ আমাদের গায়ে ঠাণ্ডা পাবে না, বরং সরিয়া দাঁড়াইলে দেখিতে পাবে।”

প্রথম বক্তা জিজ্ঞাসা করিল, “এ ঘরে কে থাকে?”

দ্বিতীয় বক্তা রাজমোহন উত্তর করিল, “সে কথায় দরকার কি?”

প্র. ব। বলিতেই বা ক্ষতি কি?

দ্বি. ব। এ আমার ঘর, আমার স্ত্রী ভিন্ন আর কেহ এখানে থাকেন না।

প্র. ব। তুমি ঠিক জান ত, তোমার স্ত্রী ঘুমাইয়াছে?

দ্বি. ব। বোধ করি ঘুমাইয়াছে, কিন্তু সেটা ভাল করিয়া জানিয়া আসিতেছি, তুমি এখানে ক্ষণেক দাঁড়াও।

মাতঙ্গিনী পুনরায় পদক্ষেপণ শব্দ শুনিতে পাইলেন; বুকিলেন, রাজমোহন বাটীর ভিতর আসিতেছে। মাতঙ্গিনী নিঃশব্দে গবাক্ষ সন্নিধান হইতে সরিয়া শয্যা আসিলেন; এবং এমত সাবধানে তদুপরি আরোহণ করিলেন যে, কিঞ্চিৎমাত্র পদশব্দ হইল না। তথায় নিম্নীলিত নেত্রে শয়ন করিয়া একান্ত নিদ্রাভূতার ন্যায় রহিলেন।

রাজমোহন আসিয়া দ্বারে মৃদু মৃদু করাঘাত করিল। পত্নী আসিয়া দ্বারোন্মুখাটন করিল না। তখন রাজমোহন মৃদুস্বরে মাতঙ্গিনীকে ডাকিতে লাগিল; তথাপি দ্বারোন্মুখাটন হইল না। রাজমোহন বিবেচনা করিল, মাতঙ্গিনী নিদ্রিতা। তথাপি কি জানি যদি এমনই হয় যে, মাতঙ্গিনী সন্ধ্যাকালের ব্যাপারে অভিমানিনী হইয়া নীরব আছেন, এই সন্দেহে রাজমোহন কৌশলে কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে যত্ন করিল। পাকশালায় গমন করিয়া তথাকার প্রদীপ জ্বালিয়া আনিল; দ্বারের নিকট প্রদীপ রাখিয়া এক হস্তে একখানা কপাট টানিয়া রাখিয়া এক পদে দ্বিতীয় কবাট ঠেলিয়া ধরিল;—এইরূপে দুই কবাটমধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশের সম্ভাবনা হইলে, দ্বিতীয় হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিল যে, মাতঙ্গিনী, রাজমোহন স্বেচ্ছামত শয়নাগারে প্রবেশ করিতে পারে, এই অভিপ্রায়ে কেবলমাত্র কাঠের “খিল” দিয়া দ্বার বন্ধ করিয়াছিলেন। রাজমোহন অনায়াসে “খিল” বাহির হইতে উন্মুখাটন করিল, এবং প্রদীপহস্তে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

রাজমোহন দেখিল যে, মাতঙ্গিনীর মুখকান্তি যথার্থ সুস্বপ্ন-সুস্থিরের ন্যায় রহিয়াছে। বার কয়েক তাহাকে ডাকিল; কোন উত্তর পাইল না। যদি পত্নী অভিমানে নিরন্তরা থাকে তবে অভিমান ভঞ্জনার্থ দুই চারিটা মিষ্ট কথা কহিল; তথাপি মাতঙ্গিনী নিঃশব্দে রহিয়াছেন, ও ঘন ঘন গভীর শ্বাস বহিতেছে দেখিয়া মনে নিশ্চিত বিবেচনা করিল, মাতঙ্গিনী নিদ্রিতা। সে নিদ্রার ছল করিবে কেন? অতঃপর নিঃসন্দেহমনে পূর্বে কৌশলে দ্বার বন্ধ করিয়া অন্য কক্ষদ্বারে গমন করিল। দ্বারে দ্বারে সকলকে মৃদুস্বরে ডাকিল, কেহই উত্তর দিল না; সুতরাং সকলেই নিদ্রামগ্ন বিবেচনায় রাজমোহন প্রদীপ নিৰ্ব্বাপিত করিয়া আগন্তুক ব্যক্তির নিকট গমন করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মাতঙ্গিনী পুনর্বার নিঃশব্দে পদসঞ্চারে শয্যা ত্যাগ করিয়া গবাক্ষসন্নিধ্যে গমন করিলেন; এবং নিম্নোক্ত মত কথোপকথন শ্রবণ করিলেন।

সকলেই নিদ্রিত, এ সংবাদ রাজমোহন প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া আগন্তুক কহিল, “তুমি আমাদের এ উপকার করিতে তবে স্বীকার আছ?”

রাজমোহন কহিল, “বড় নহি—আমি কিন্তু তা বলিয়া ভালমানুষের বড়াই করিতেছি না; তবু নৈমকহারামি; আমি লোকটাকে দুঃক্ষে দেখিতে পারি না বটে, কিন্তু আমার উপকার অনেক করিয়াছে।”

অপরিচিত ব্যক্তি কহিল, “উপকার করিয়াছে, তবে দেখিতে পার না কেন?”

রাজ। উপকার করেছে, কিন্তু মন্দও করেছে। আমার ভাল কর, কর—না কর, না কর,—সে তোমার ইচ্ছা; কিন্তু আমার যে দুঃখ দেয়, সে শত উপকার করিলেও তার মাপ নাই।

অপরিচিত। তবে আর নৈমকহারামি কি? আমাদের কাজে লাগিবে?

রাজ। লাগি, যদি যা চাই, তাই দাও। আমার ইচ্ছা এখনকার বাস উঠাই—ওর কাছে না থাকিতে হয়। কিন্তু যাই কি নিয়ে—হাত খালি; দেশে গেলে বাঁচি কি মরি। তাই আমি এমন এক হাত মারিতে চাই যে, সেই টাকায় অন্যত্র আমার কিছুকাল গুজরাণ হয়। যদি তোমাদের এ কস্ম্ম এমন হাত মারিতে পারি, তা হলে লাগিব না কেন? লাগিব।

অপ। আচ্ছা, কি নেবে বল?

রাজ। তুমি আগে বল দেখি আমায় কি করিতে হইবে?

অপ। যাহা বরাবর করেছ তাহাই করিবে; মাল বই করিয়া দিবে। এইবার মনে করিতেছি যে, নগদ ছাড়া যা কিছু পাইব তা তোমার কাছে রেখে যাব।

রাজ। বুঝেছি, আমি নইলে তোমার কাজ চলিবে না। তোমরা বেশ বুঝেছ যে, এত বড় বাড়ীতে একটা কস্ম্ম হইলে এ দিকেও বড় গোলযোগ হইয়া উঠিবে; রাঁড়ী বাল্টির বাড়ী নয় যে, দারোগা বাবু কিছু প্রণামী লইয়া স্বচ্ছন্দে দেখনহাসির বাড়ীতে বসিয়া ইয়ারকি মারিবে। একটা তল্লাস তাগাদার বড় রকম স্কমই হইয়া উঠিবে; তাহা হইলে সোণা কোলে করিয়া বসিয়া থাকিলে ত হইবে না। তাই তোমরা চাও যে, যত দিন না লেঠাটা মিটে তত দিন আমার কাছে সব থাকে। তা বড় মন্দ মতলব নয়; আর আমারও এমত যত বরাত আছে যে, কোন শালা খড়্কে গাছটিও টের পাবে না। বিশেষ আমি ভায়রা ভাই, আমাকে কোন শালা শোবে করবে? অতএব আমার দ্বারা যে কাজ হবে, আর কাহারও দ্বারা তেমনটি হবে না। কিন্তু আমার সঙ্গে বনিয়া উঠা ভার।

অপ। যদি ভাই এতই বুঝিতেছ, তবে কেন বনাইয়া লও না।

রাজ। আমি দশ কথা পাঁচ কথার মানুষ নই; প্রাণ চায় দাও—না হয়, আপনার কস্ম্ম আপনি কর,—সিকিভাগ চাই।

দস্যু ভালরূপ জানিত যে, রাজমোহনের এ বিষয়ে কাজে কথায় এক, অপহৃত দ্রব্যের চতুর্থাংশের ন্যূন সে সহায়তা করিতে স্বীকার হইবে না; অতএব বাক্যব্যয় বৃথা। কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল, “আমি সম্মত হইলাম। তাদের একবার জিজ্ঞাসার আবশ্যিক; তা তারা কিছু আমার মত ছাড়া হবে না।”

রাজমোহন উত্তর করিল, “তাতে সন্দেহ কি? কিন্তু আর একটা কথা আছে। যা আমার কাছে থাকিবে, তার আমরা একটা মোটামুটি দাম ধরিব; ইহারই সিকি তোমরা আমাকে নগদ দিয়া যাবে; তার পর মহাজনে কম দেয় আমি কস্ম্মতির সিকি ফেরত দিব, আর বেশী দেয় তোমরা আমাকে বেশীটা দেবে।”

দস্যু। তাই হবে; কিন্তু আমারও আর একটি কথা আছে। তোমাকে আর একটি কাজ করিতে হইবে।

রাজ। আর এক মুঠো টাকা।

দস্যু। তা ত বটেই। আমরা মাধব ঘোষের যথাসম্বল লুঠিব, সে কেবল আমাদের আপনাদেরই জন্য; কিন্তু পরের একটা কাজ আছে।

রাজমোহন কোঁতহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কি কাজ?”

দস্যু। তাহার খুড়ার উইলখানা চাই।

রাজমোহন কিছু চমকিয়া কহিল, “হুঁ।”

দস্যু কহিল, “হুঁ, কিন্তু উইলখানা কোথায় আছে আমরা তা জানি না। আমরা ত সমস্ত রাণি কেবল কাগজ উট্কাইয়া বেড়াইতে পারব না। কোথায় আছে সে খবরটা তুমি অবশ্য জান।”

রাজ। জানি; কিন্তু কাহার জন্য উইল চাই?

দস্যু। তাহা কেন বলিব?

রাজ। কেন, আমাকেও বলিবে না?—আমার কাছে লুকাইবার আবশ্যিক?

দস্যু। তোমাকেও বলিতে বারণ।

রাজ। মথুর ঘোষ?

দস্যু। যেই হউক—আমাদের বাদশার মুখ নিয়ে কাজ। যেই হউক, কিছু মজুরি দেবে, আমরা কাজ তুলে দেব।

বিশ্বকম রচনাবলী

রাজ। আমারও ঐ কথা।

দস্যু। উইল পাব কোথায়?

রাজ। আমায় কি দিবে বল?

দস্যু। তুমিই বল না।

রাজ। পাঁচ শত খানি দিও; তোমরা পাবে ঢের, দিলেই বা।

দস্যু। এটা বড় জিয়াদা হইতেছে; আমরা মোটে দুই হাজার দক্ষিণা পাইব, তার মধ্যে সিকি দিই কেমন করে।

রাজ। তোমাদের ইচ্ছা।

দস্যু পুনর্বার চিন্তা করিয়া কহিল, “আচ্ছা, তাই সই; আমার ঢের কাজ আছে, আমি কাগজ হাটিকিয়া বেড়াইলে চলিবে না। নয়ত কোনও ছোঁড়া ফোঁড়ার হাতে পাড়িবে, আর পড়াইয়া ফেলিবে—পাঁচ শতই দেব।”

রাজ। মাধবের শূইবার খাটের শিয়রে একটা নতুন দেরাজ-আলমারি আছে; তাহার সব নীচের দেরাজের ভিতর একটা বিলিতী টিনের ছোট বাক্সতে উইল, কবালা, খত ইত্যাদি রাখিয়া থাকে; আমার গোপন খবর জানা আছে।

দস্যু। ভাল কথা; যদি এ লেঠা চুকিল, তবে চল জুড়ি গিয়া। কর্ম্ম হইয়া গেলে যেখানে আসিয়া তোমার সঙ্গে দেখা করিব, তাহা সকলে থেকে স্থির করা যাইবে। এস, আর দেরি করে কাজ নেই; চাঁদনি ডুবিলে কর্ম্ম হবে—এখনকার রাত ছোট।

এই কহিয়া উভয়ে ধীরে ধীরে গৃহের ছায়াবরণ হইতে বনের দিকে প্রস্থান করিল। মাতঙ্গিনী বিস্মিতা ও ভীতি-বিহ্বলা হইয়া ভূতলে বসিয়া পড়িলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

মাতঙ্গিনী অন্তরালে থাকিয়া তাবৎ শূনিয়াছিলেন। এই বিষম কু-সঙ্কল্পকারিদিগের মূখ-নির্গত যতগর্দলিন শব্দ তাহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, ততগর্দলিন বজ্রাঘাত তাহার বোধ হইয়াছে। যতক্ষণ না কথোপকথন সমাপ্ত হইয়াছিল, ততক্ষণ বসন্ত-বাতাহত অশ্বখ পত্রের ন্যায় তাহার ভীতি-কম্পিত তনু কোন মতে দণ্ডায়মান ছিল; কিন্তু কথা সমাপ্ত হইবামাত্র মাতঙ্গিনী আত্ম-বিবশা হইয়া ভূতলে বসিয়া পড়িলেন।

প্রথমতঃ কিয়ৎক্ষণ গ্রাস ও উৎকট মানসিক যন্ত্রণার আধিক্য প্রযুক্ত বিমূঢ়া হইয়া রহিলেন; ক্রমে মনঃস্থির হইলে দৈব-প্রকাশিত এই বিষম ব্যাপার মনোমধ্যে পরিচালনা করিতে লাগিলেন। এ পর্য্যন্ত তিনি নিজ ভর্তাকে সম্পূর্ণরূপে চিনিতেন না; আজ তাহার চক্ষুরুন্মীলিত হইল। চক্ষুরুন্মীলনে যে করাল মর্ন্তি দেখিলেন, তাহাতে মাতঙ্গিনীর শরীর রোমাঞ্চিত হইল। এ পর্য্যন্ত মনে ভাবিতেন যে, বিধাতা তাহাকে ক্রোধ-পরবশ দূনীত ব্যক্তির পাণিগৃহীতী করিয়াছেন; আজ জানিলেন যে, তিনি দস্যুপত্নী—দস্যু তাহার হৃদয়-বিহারী।

জানিয়াই বা কি? দস্যু-স্পর্শ হইতে পলাইবার উপায় আছে কি? স্ত্রী-জাতি—পতিসেবা-পরায়ণা দাসী—পতিত্যাগের শক্তি কোথায়? চিরদিন দস্যুপদে দেহ-রত্ন অর্পিত হইবে—গরলোদ্গীর্ণমান বিষধর হৃদয়-পথে আসীন থাকিবে, পাছে সে আন্দোলনে আসনচ্যুত হয় বলিয়া কখন দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে পারিবে না। ইহা অপেক্ষা আর কি ভয়ঙ্কর ললাট-লিপি বিধাতার লেখনী হইতে নির্গত হইতে পারে?

মাতঙ্গিনী ক্ষণেক কাল এইরূপ চিন্তা করিলেন; পরক্ষণেই যে দস্যুদল-সঙ্কলিত দারুণ-প্রমাদ ঘটনা হইবে তাহাই মনোমধ্যে প্রথর তেজে প্রদীপ্ত হইতে লাগিল। আর কাহারই বা এই সর্বনাশ ঘটনা হইবে? হেমাজিনীর সর্বনাশ, মাধবের সর্বনাশ! মাতঙ্গিনীর শরীর রোমাঞ্চিত,—শোণিত শীতল হইতে লাগিল, মস্তক বিঘর্ণিত হইতে লাগিল। যখন ভাবিলেন যে, যে প্রিয় সহোদরা এক্ষণে এই নিষ্কর্ন নিশীথে হৃদয়বল্লভের কণ্ঠলগ্না হইয়া নিশ্চিন্ত মনে সুস্বপ্ন সুখানুভব করিতেছে, সে মনেও জানে না যে, দারিদ্র্যরাক্ষসী তাহার পশ্চাতে মূখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে, এখনই গ্রাস করিবে; হয়ত ধনহানির সঙ্গে মানহানি, প্রাণহানি পর্য্যন্ত হইবে, তখনই মাতঙ্গিনীর নিজ সম্বন্ধীয় মর্ম্মব্যথক ভূত ভবিষ্যৎ চিন্তা অন্তর্হিত হইল। মনে মনে

অসম্পূর্ণ রচনা—রাজমোহনের স্ত্রী

স্থির বুদ্ধিলেন যে, আমি না বাঁচাইলে হেমাঙ্গিনী ও মাধবের রক্ষা নাই, যদি প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়া তাহাদের রক্ষা করিতে পারি, তবে তাহাও করিব।

মাতঙ্গিনী প্রথমোদ্যমে মনে করিলেন, গৃহস্থ সকলকে জাগরিত করিয়া সকল ঘটনা বিবৃত করেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে ভাব অন্তর্হিত হইল; ভাবিলেন, তাহাতে কোন উপকার হইবে না। কেন না, রাজমোহনের আত্মপরিবার এমত অশ্রুতপূর্ষ সংবাদ বিশ্বাস করিবেক না; বিশ্বাস করিলেও মাধবের উপকারার্থ রাজমোহনের বিরুদ্ধাচারী হইবেক না। বরং লাভের মধ্যে তাহারা রাজমোহনের নিকট মাতঙ্গিনীকে এতদ্বিষয়ের সংবাদ-দাত্রী বলিয়া পরিচিত করিলে মাতঙ্গিনীর মহাবিপদ সম্ভাবনা।

পশ্চাৎ বিবেচনা করিলেন যে, কেবল কনককে জাগৃত করিয়া তাহাকে সকল সংবাদ অবগত করান; এবং যাহা উচিত হয় পরামর্শ করেন। তদাভিপ্রায়ে মাতঙ্গিনী শয্যাভ্যাগ করিয়া বাটীর বাহিরে আসিলেন। কনকের গৃহ সন্নিহিত। মাতঙ্গিনী ধীরে ধীরে কনকের গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রালোকে পৃথিবী প্রফুল্লিতা। মাতঙ্গিনী কনকের গৃহ-দ্বারে উপনীতা হইয়া ধীরে ধীরে করাঘাত করিলেন। কনকের নিদ্রাভঙ্গ হইতে না হইতে কনকের মাতা কহিল, “কে, রে?”

সর্বনাশ! কনকের মাতা অতিশয় মুখরা, মাতঙ্গিনীর এ কথা স্মরণই ছিল না। মাতঙ্গিনী ভয়ে নিঃশব্দ রহিলেন। কনকের মাতা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে রে?” “কে রে?”

মাতঙ্গিনী সাহস করিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল, “আমি গো।”

কনকের মাতা কোপযুক্ত স্বরে কহিল, “কে?—রাজুর বৌ বুদ্ধি, এত রাত্রে তুমি এখানে কেন গা?”

মাতঙ্গিনী মৃদুস্বরে বলিলেন, “কনককে একটা কথা বলিব।”

কনকের মাতা বলিল, “রাত্রে কথা কি আবার একটা? সারাদিন কথা কয়ে কি আশ মেটে না? ভালমানুষের মেয়েছেলে রাত্রে এ-বাড়ী ও-বাড়ী কি গা? বউ-মানুষ, এখনই এ সব ধরেছ?—চল দেখি তোমার পিশেসের কাছে।”

মাতার তর্জনে গর্জনে কনকের নিদ্রাভঙ্গ হইল; বৃত্তান্ত বুদ্ধিয়া কনক কহিল, “মা, দুয়ারটা খুলে দাও, শুনাই না কি বলে।”

কনকের মাতা গর্জনে করিয়া বলিল, “দেখ্ কনক, এমন মূড়ো ঝাঁটা তোর কপালে আছে।”

কনক নিস্পন্দ ও নিৰ্ব্বাক্ হইল। মাতঙ্গিনী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং পুনরায় গভীর চিন্তায় অভিভূত হইলেন। ভাবিলেন, “কি করি? কেমন করে তাদের রক্ষা হয়? কে সংবাদ দিবে?—কে এ রাত্রে যাইবে? আমি আপনাই যাই, এ ছাড়া অন্য উপায় নাই।” পরক্ষণে ভাবিলেন,—“কেমন করিয়া যাইব? লোকে কি বলিবে? মাধব কি মনে করিবে? শূন্য তাহাই নহে, স্বামী জানিতে পারিলে প্রমাদ ঘটিবে। তাহা হউক—লোকে যাই বলুক—মাধব যাহা হয় মনে করুক—স্বামী যাহা করে করুক, তজ্জন্য মাতঙ্গিনী ভীতা নহে।”

কিন্তু মাতঙ্গিনী যাইতে সাহস করিলেন না। এ গভীর নিশীথকালে, এই নিস্তন্ধ বনান্ত পথ, তাহাতে আবার একাকিনী অবলা, নবীন বয়সী, বাল্যকালার্ধি ভৌতিক উপন্যাস শ্রবণে হৃদয়মধ্যে ভৌতিক-ভীতি বিষম প্রবলা। পথ অতি দুর্গম। তাহাতে আবার দস্যুদল কোথায় জটলা করিয়া আছে; যদি তাহাদের করকবলিত হইলেন? এই কথা স্মৃতিমাত্র ভয়ে মাতঙ্গিনীর শরীর রোমাঞ্চিত হইল। যদি দস্যুদলমধ্যে মাতঙ্গিনী স্বামীর দৃষ্টিপথে পতিতা হইলেন? এই ভয়ে মাতঙ্গিনী পুনঃ পুনঃ রোমাঞ্চিত হইতে লাগিলেন।

স্বভাবতঃ মাতঙ্গিনীর হৃদয় সাহস-সম্পন্ন। যে অন্তঃকরণে স্নেহ আছে, প্রায় সে অন্তঃকরণে সাহস বিরাজ করে। প্রিয়তমা সহোদরা ও তৎপতির মঙ্গলার্থ মাতঙ্গিনী প্রাণ পর্যন্ত দিতে উদ্যত হইলেন। যেমন উপস্থিত বিপত্তির বিকট মূর্তি পুনঃ পুনঃ মনোমধ্যে প্রকটিত হইতে লাগিল, অমনি মাতঙ্গিনীরও হৃদয়গ্রন্থি দৃঢ়বদ্ধ হইতে লাগিল—তখন অগাধ প্রণয়-সলিলে ভাসমান হইয়া বলিলেন, “এ ছার জীবন আর কি জন্য? যদি এ সঙ্কল্পে প্রাণ রক্ষা না হয়, তাতেই বা ক্ষতি কি? এ গুরুভার বহন করা আমার পক্ষে কষ্টকর হইয়াছে। কাজেই এ দেহ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে। যাহারা প্রাণাধিক তাহাদের মঙ্গল সাধনে এ প্রাণ ত্যাগ না করি কেন? আমার ভয় কি? প্রাণনাশাধিক বিপদও ঘটিতে পারে; জগদীশ্বর রক্ষাকর্তা।”

বিক্রম রচনাবলী

কিন্তু মাধবের বাটীতে এ নিশীথে একাকিনী কি প্রকারেই যান? মাতঙ্গিনীর চিন্তাকুলতা সহনাতীত হইল।

কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া মাতঙ্গিনী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া চিন্তাসম্বন্ধিত গ্রীষ্মাতিশয্যের প্রতীকার হেতু জালরন্ধ্র সন্নিধানে গিয়া জালাবরণী উত্তোলন করিলেন। দেখিলেন যে, বিটপী শ্রেণীর ছায়া এক্ষণে দীর্ঘাকৃত হইয়াছে—অস্তাচলাভিমুখী নিশাললাটরঙ্গ প্রায়-দিগন্তব্যাপী বৃক্ষশিরোরাজির উপরে আসিয়া নিৰ্ব্বাণেশ্মুখ আলোক বর্ষণ করিতেছেন। আর দুই চারি দণ্ড পরে সে আলোক একেবারে নিৰ্ব্বাপিত হইবে; তখন আর হেমাঙ্গিনীকে রক্ষা করিবার সময় থাকিবে না। বিপদ একেবারে সম্মুখে দেখিয়া মাতঙ্গিনী আর বিলম্ব করিলেন না।

মাতঙ্গিনী বাটীতে এক খণ্ড শয্যোত্তরচ্ছদে আপাদমস্তক দেহ আবারিত করিলেন, এবং কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যে কোশলপ্রভাবে ক্ষণপূৰ্ব্ব রাজমোহন বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিলেন, মাতঙ্গিনীও তদ্রূপ করিলেন।

গৃহের বাহিরে দণ্ডায়মানা হইয়া যখন মাতঙ্গিনী উদ্বেব অসীম নীলাম্বর, চতুর্দিকে বিজন বন-বৃক্ষের নিঃশব্দ নিম্পন্দ শিরঃশ্রেণী নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তখন পুনর্বার সাহস দ্রবীভূত হইয়া গেল—হৃদয় শঙ্কাকম্পিত হইল—চরণ অচল হইল। মাতঙ্গিনী অঞ্জলিবদ্ধ করে ইষ্টদেবের স্তব করিলেন। হৃদয়ে আবার সাহস আসিল; তিনি দ্রুতপাদবিক্ষেপে পথ বহিয়া চলিলেন।

বনময় পথ দিয়া যাইতে প্রভাতবাতাহত পদ্মের ন্যায় মাতঙ্গিনীর শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। সর্বত্র নিঃশব্দ; মাতঙ্গিনীর পাদবিক্ষেপশব্দ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল; স্থানে স্থানে নিবিড় ছায়াঙ্ককারে অন্তঃকরণ শিহরিতে লাগিল। যত বৃক্ষের গুঁড়ি ছিল প্রত্যেককে করালবদন পৈশাচ মূর্তি বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল। বৃক্ষে বৃক্ষে, শাখায় শাখায়, পরে পরে নরঘ্ন প্রেত লুঙ্কায়িতভাবে মাতঙ্গিনীকে লক্ষ্য করিতেছে তাহা তাহার প্রতীতি হইতে লাগিল। যে যে স্থলে তমসা নিবিড়তর, সেই সেই স্থানে দুরন্ত ভূতযোনি বা দস্যুর প্রচ্ছন্ন শরীরের ছায়া মাতঙ্গিনীর চক্ষুজ্বালা উৎপাদন করিতে লাগিল। বাল্যকালে যত ভৌতিক উপন্যাস শ্রুত হইয়াছিল, নিশীথ পান্থের গহনমধ্যে বিকট পৈশাচ দংশন ভঙ্গী সন্দর্শনে ভীতি-বিহ্বল হইয়া প্রাণত্যাগ করার যে সকল উপকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন, সকলই একেবারে তাহার স্মরণপথে আসিতে লাগিল।

যদি কোথাও শাখাচ্যুত শূকপত্র-পতন শব্দ হইল, যদি কোনও শাখারূঢ় নৈশ বিহঙ্গ পক্ষপন্দ করিল, যদি কোথাও শূকপত্রমধ্যে কোন কীট দেহ সঞ্চালন করিল, অর্থাৎ মাতঙ্গিনী ভয়ে চমকিয়া উঠিতে লাগিলেন; তথাপি দৃঢ় সংকল্প-বিবদ্ধা সাহসিকা তরুণী, কখন বা ইষ্টদেব নামজপ কখন বা প্রিয়জনগণের বিপত্তি চিন্তা করিতে করিতে চঞ্চলপদে উদ্দিষ্ট স্থানাভিমুখে চলিলেন।

ভয়সঙ্কুল নিবিড় তমসাচ্ছন্ন পথের এক পাশ্বে বৃহৎ আশ্রয়-কানন, অপর পাশ্বে এক দীর্ঘকার পাহাড়। বন্য উচ্চভূমিখণ্ডমধ্যে পথ অতি সংকীর্ণ; তদুপরি দীর্ঘকার উপর প্রকাণ্ডাকার কতিপয় বটবৃক্ষের ছায়ায় চন্দ্রালোকের গতি নিরুদ্ধ হইয়াছিল, সুতরাং এই স্থানে পথান্ধকার নিবিড়তর। দীর্ঘকার পাহাড়ের বটবৃক্ষতল বহুতর লতাগুল্ম কণ্টক বৃক্ষাদিতে সমাচ্ছন্ন।

মাতঙ্গিনী ভীতি-চকিতনেত্রে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আশ্রয়-কাননের মধ্যে একটা প্রচণ্ড আলোক প্রদীপ্ত হইতেছিল, এবং অক্ষয়টম্বরে বহু ব্যক্তির কথোপকথনের শব্দও মাতঙ্গিনীর কর্ণগোচর হইল।

মাতঙ্গিনী বুঝিলেন, যাহা ভয় করিয়াছিলেন তাহাই ঘটিল। এই আশ্রয়-কাননের মধ্যে দস্যুদল জটলা করিতেছে। দূঃসময়ে বিপদ এক প্রকারে কেবল উপস্থিত হয় না;—পৃথিমধ্যে একটা কুকুর শয়ন করিয়াছিল, নিশাকালে পৃথিক দেখিয়া উচ্চরব করিতে লাগিল। আশ্রয়-কাননের কথোপকথন তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইল। মাতঙ্গিনী বুঝিতে পারিলেন যে, কুকুর-শব্দে দুরাত্মারা লোক-সমাগত অনভূত করিয়াছে; অতএব শীঘ্রই তাহারা কাছে আসিবে। আসন্নকালে মাতঙ্গিনী নিঃশব্দ গমনে দীর্ঘকার জলের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। আশ্রয়-কানন বা পথ হইতে তাহাকে কেহ দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা রহিল না। কিন্তু যদি দস্যুরা দীর্ঘকার তটরোহণ করিয়া

অসম্পূর্ণ রচনা—রাজমোহনের স্ত্রী

পাথকের অন্বেষণ করে, তাহা হইলে মাতঙ্গিনী তৎক্ষণাৎ দৃষ্টিপথে পতিত হইবেন। নিকটে এমত কোন ক্ষুদ্র বৃক্ষলতাদি ছিল না যে, তদন্তরালে লুক্কায়িত হইতে পারেন। কিন্তু আসন্ন বিপদে মাতঙ্গিনীর ধৈর্য ও কর্তব্যতৎপরতা বিশেষ স্ফূর্তিপ্ৰাপ্ত হইয়া উঠিল।

ক্ষণমধ্যে মাতঙ্গিনী জলতীরস্থ এক খণ্ড গুরুভার আর্দ্র মৃৎখণ্ড উত্তোলন করিয়া অঙ্গস্থ শয্যোত্তরচ্ছদের মধ্যে রাখিয়া গ্রন্থিবন্ধন করিলেন। অনায়াস-গোপনযোগ্য পরিধেয় শাটীমাত্র অঙ্গে রাখিয়া কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। এক্ষণে পুষ্করিণীর পাহাড়ের অপর দিকে মনুষ্যকণ্ঠস্বর স্পষ্ট শ্রুতিগোচর হইল; এবং মনুষ্যপদসংগলনশব্দও নিঃসন্দেহে শ্রুত হইল। মাতঙ্গিনী ঈদৃশ সাবধানতার সহিত শয্যোত্তরচ্ছদ জলমগ্ন করিলেন যে, জলশব্দ না হয়। বস্ত্রখণ্ড মৃৎখণ্ডের গুরুভারে তলস্পর্শ করিয়া অদৃশ্য হইল। মাতঙ্গিনী এক্ষণে ধীরে ধীরে জলমধ্যে অবতরণ করিয়া অন্ধকারবর্ণ স্বচ্ছ সরোবর-বক্ষে যথায় কথিত বর্টাবটপীর ছায়ায় প্রগাঢ়তর অন্ধকার হইয়াছিল, তথায় অধর পর্যন্ত জলমগ্ন হইয়া রহিলেন। তাঁহার মূখমণ্ডল ব্যতীত আর কিছু জলের উপর জাগিতোছিল না। তথাপি কি জানি, যদি সেই মূখমণ্ডলের উজ্জ্বলবর্ণ সে নিবিড় অন্ধকার মধ্যে কেহ লক্ষ্য করে, এই আশঙ্কায় মাতঙ্গিনী নিজ কবরীবন্ধনী উন্মোচন করিয়া কোমলাকৃণ্ডত কুণ্ডলজাল মূখের উপর লম্বিত করিয়া দিলেন। অতঃপর সেই ঘনান্ধকারবর্ণ সরসীজলের উপরে, ঘনতর বৃক্ষ-ছায়াভ্যন্তরে যে নিবিড় কেশদাম ভাসিতোছিল, তাহা মনুষ্য কর্তৃক আবিষ্কৃত হওয়া অসম্ভব। পরক্ষণেই কথোপকথনকারীরা দীর্ঘিকা-তট অবতরণ করিয়া অর্দ্ধপথ আসিল। মাতঙ্গিনী তাহাদের কেবলমাত্র কণ্ঠস্বর ও পদশব্দ শ্রুতিতে পাইলেন। তাহাদের পানে যে চাহিয়া দেখিবেন, এমত সাহস হইল না।

আগন্তুকদের মধ্যে একজন অর্দ্ধস্ফূট বাক্যে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে কহিল, “এ ত বড় তাঞ্জব! আমি সঠিক বলিতেছি, আমি বেশ দেখিয়াছিলাম, এই পথের উপর একটা মানুষ চাদর মর্দি দিয়া যাইতেছিল; বাগানের বেড়ার ফাঁক দিয়া আমি দেখিয়াছিলাম।”

দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল, “গাছপালা দেখে তোর ধাঁধা লেগে থাকবে; অপদেবতা টেবতাই বা দেখে থাকবে। এত গর্মিতে মানুষে কাপড় মর্দি দিয়ে বেড়াবে কেন?”

“হবে” বলিয়া পুনশ্চ উভয়ে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল; আশঙ্কার মূল কারণ যে ভীতিবিহ্বলা অবলা, তাঁহাকে তাহারা দেখিতে পাইল না।

দস্যুরা কিছু দেখিতে না পাইয়া চলিয়া গেল। যতক্ষণ তাহাদের প্রত্যাবর্তন-শব্দ কর্ণগোচর হইতে লাগিল ততক্ষণ মাতঙ্গিনী জলমধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। যখন বিবেচনা হইল যে, আর তাহাদের দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা নাই, তখন জল হইতে উঠিয়া গমনোদ্যোগিনী হইলেন।

মাতঙ্গিনী যে পথে গমনকালীন এরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন, শঙ্কাক্রমে এবার সে পথ ত্যাগ করিলেন। পুষ্করিণীর তীর পরিবেষ্টন করিয়া অপর দিকে আর এক পথে উঠিলেন। মধুমতী যাইতে মাতঙ্গিনীর নিবেদন ছিল বটে, কিন্তু পুষ্করিণী নিষিদ্ধ ছিল না, এবং মধ্যে মধ্যে আঁহিক স্নানাদি ক্রিয়ার্থ এই জলে আসিতেন। সুতরাং এ স্থানের সকল পথ উত্তমরূপে চিনিতেন। পুষ্করিণীর অন্য এক পাহাড়ে উঠিয়া অন্য এক পথ অবলম্বন করিলে যে পূর্বাভিলম্বিত পথে পড়িতে হয়, অথচ আশ্রয়-কাননের ধারে যাইতে হয় না, ইহা এই সময়ে মাতঙ্গিনীর স্মরণ হইল। বৃক্ষলতাকণ্টকাদির প্রাচুর্যবশতঃ এই পথ অতি দুর্গম, কিন্তু মাতঙ্গিনীর পক্ষে কণ্টকাদির বিঘ্ন, তুচ্ছ বিঘ্ন। অলঙ্কৃত পরিবর্তে কণ্টক-বেধবাহিত রক্তধারা চরণদ্বয় রঞ্জিত করিতে লাগিল। এক দিকে গুরুতর সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য উৎকণ্ঠা, অপর দিকে দস্যু-হস্ত হইতে পরিচরণের জন্য ব্যগ্রতা; এই উভয় কারণে মাতঙ্গিনী তিলাঙ্ক বিলম্ব না করিয়া কণ্টকলতাদি পদদলিত করিয়া চলিলেন। কিন্তু এক নূতন ব্যাঘাত উপস্থিত হইবার উপক্রম হইল;—মাতঙ্গিনী রাধাগঞ্জ আসিয়া অর্ধি দুই তিনবার মাত্র সহোদরাবল্লভ মাধবের আলয়ে আগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু পদব্রজে একবারও গমন করেন নাই। সুতরাং এদিকের পথ তাঁহার তেমন জানা ছিল না। এক্ষণে মাতঙ্গিনী চতুর্দিকবাহী পথ-সন্নিধানে উপনীতা হইয়া কোন্ পথে যাইবেন, তাহা অবধারণে অক্ষম হইলেন। মাতঙ্গিনী পাগলিনীর ন্যায় ইতস্ততঃ চাহিতে লাগিলেন। ভাগ্যক্রমে মাধবের অট্টালিকার সম্মুখ-রোপিত দেবদারু-শ্রেণীর শিরোমালা নয়নগোচর হইল। দৃষ্টিমাত্র হর্ষিতচিত্তে তদভিমুখে চলিলেন; এবং সত্বর অট্টালিকার সমীপ-

বিশ্বকম রচনাবলী

বর্তিনী হইয়া খিড়কির দ্বারে উপস্থিত হইলেন। তথাপি মাতঙ্গিনীর ক্রেশের চূড়ান্ত হইল না। এ নিশীথে বাটীর সকলেই নিদ্রিত, কে দ্বার খুলিয়া দিবে? অনেকবার করাঘাত করিয়া মাতঙ্গিনী পদকিঙ্করী করুণাকে নিদ্রোথিতা করিলেন। নিদ্রাভঙ্গে করুণা অপ্রসন্ন হইয়া ভীষণ গজ্জন করিয়া কহিল, “এত রেতে কে রে দোর ঠেঙ্গায়?”

মাতঙ্গিনী উৎকণ্ঠা-তীর স্বরে কহিলেন, “শীঘ্র—শীঘ্র—করুণা, দ্বার খোল।” নিদ্রাভঙ্গকরণ-অপরাধ অতি গুরুতর; এমন সহজে ক্ষমা সম্ভাবনা কি? করুণার ক্রোধোপশম হইল না, পদ্বর্ষবৎ পরুষ বচনে কহিল, “তুই কে যে তোকে আমি তিন পর রেতে দোর খুলে দেব?”

মাতঙ্গিনী সম্পূর্ণ আপন নাম ডাকিয়া কহিতে পারেন না, অথচ শীঘ্র গৃহ-প্রবেশ জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন; অতএব পুনরায় সবিনয়ে কহিলেন, “তুমি এস, শীঘ্র এস গো, এলেই দেখতে পাবে।”

করুণা সম্বন্ধিত রোষে কহিল, “তুই কে বল না, আ মরণ!”

মাতঙ্গিনী কহিলেন, “ওগো বাছা, আমি চোর ছ্যাঁচড় নই, মেয়ে মানুষ।”

তখন করুণার স্থূল বুদ্ধিতেও একটু একটু আভাস হইল যে, চোর ছ্যাঁচড়ের কণ্ঠস্বর এত সুমধুর প্রায় দেখা যায় না। অতএব আর গণ্ডগোল না করিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। এবং মাতঙ্গিনীকে দেখিবামাত্র সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, “এ কি! তুমি! তুমি ঠাকুরাণী!”

মাতঙ্গিনী কহিলেন, “আমি একবার হেমের সঙ্গে দেখা করিব—বড় দরকার; শীঘ্র আমাকে হেমের কাছে লইয়া চল।”

নিশীথ রাক্ষসীর কাহিনী

প্রথম পরিচ্ছেদ

“ভাল, সারি, সত্য বল দেখি, তোমার বিশ্বাস কি? ভূত আছে?”

বরদা, ছোট ভাই সারদাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিল। সন্ধ্যার পর, টেবিলে দুই ভাই খাইতেছিল—একটু রোস্ট মটন প্লেটে করিয়া, ছুরি কাঁটা দিয়া তৎসহিত খেলা করিতে করিতে জ্যেষ্ঠ বরদা এই কথা কনিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিল।

সারদা প্রথমে উত্তর না করিয়া এক টুকরা রোস্টে উত্তম করিয়া মাষ্টার্ড মাখাইয়া, বদনমধ্যে প্রেরণপদ্বর্ষক, আধখানা আলুকে তৎসহবাসে প্রেরণ করিয়া, একটি রুটি ভাজিয়া বাম হস্তে রক্ষাপদ্বর্ষক, অগ্রজের মুখ পানে চাহিতে চাহিতে চর্ষণ কার্য সমাপন করিল। পরে, এতটুকু সেরি দিয়া, গলাটা ভিজাইয়া লইয়া, বলিল, “ভূত? না।”

এই বলিয়া সারদাকৃষ্ণ সেন পরলোকগত এবং সুসিদ্ধ মেষশাবকের অবশিষ্টাংশকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিলেন।

বরদাকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ অপ্রসন্ন হইয়া বলিল, “rather laconic.”

সারদাকৃষ্ণের রসনার সহিত রসাল মেষমাংসের পুনরালাপ হইতেছিল, অতএব সহসা উত্তর করিল না। যথাবিহিত সময়ে অবসর প্রাপণান্তর তিনি বলিলেন, “Laconic? বরং একটা কথা বেশী বলিয়াছি। তুমি জিজ্ঞাসা করিলে ‘ভূত আছে’—আমার বলিলেই হইত ‘না।’ আমি বলিয়াছি, ‘ভূত? না।’ ‘ভূত?’ কথাটা বেশী বলিয়াছি। কেবল তোমার খাতিরে।”

“অতএব তোমার ভ্রাতৃভক্তির পুরস্কারস্বরূপ, এই স্বর্গপ্রাপ্ত চতুষ্পদের খণ্ডান্তর প্রসাদ দেওয়া গেল।” এই বলিয়া বরদা, আর কিছু মটন কাটিয়া ভ্রাতার প্লেটে ফেলিয়া দিলেন। সারদা অবিচলিতচিত্তে, তৎপ্রতি মনোভিনিবেশ করিল।

তখন বরদা বলিল, “seriously সারি, ভূত আছে বিশ্বাস কর না?”

সারি। না।

বরদা। কেন বিশ্বাস কর না?

সারদা। সেই প্রাচীন ঋষির কথা—প্রমাণাভাবাৎ। কপিল প্রমাণ-অভাবে ঈশ্বর মানিলেন না—আর আমি প্রমাণ-অভাবে ভূত মানিব?

অসম্পূর্ণ রচনা—ভিক্ষা

এই বলিয়া সারদা এক গেলাস সেরি মেবের সংকারার্থ আপনার উদরমধ্যে প্রেরণ করিল। বরদাকৃষ্ণ চাটীয়া উঠিল—বলিল, “কোথাকার বাঁদর? ভূত নাই!—ঈশ্বর নাই! তবে তুমিও নেই, আমিও নেই?”

সারি। তাই বটে। তোমার মটন রোস্ট ফুরাইল, দেখিয়া, আমি নেই। আর আমার আহারের ঘটা দেখিয়া, বোধ হয় তুমিও নেই।

বরদা, “কই, খেলি কই?” এই বলিয়া অবশিষ্ট মাংসটুকু কাটীয়া ভাইয়ের প্লেটে সংস্থাপিত করিয়া, গ্লাসে সেরি ঢালিয়া দিলেন। সারদা যতক্ষণ মাংসের ছেদন, বিক্ৰন, মুখে উত্তোলন, এবং চর্ষণ ইত্যাদি কার্যে নিযুক্ত ততক্ষণ বরদা চুপ করিয়া রহিল, পরে অবসর পাইলে, সারদা জ্যেষ্ঠকে বলিল, “তুমি নাই, আর আমি নাই—ইহা প্রায় philosophically true—কেন না আমরা “mere permanent possibilities of sensation.” আর এই যে আহার করিলাম, ইহাও না করার মধ্যে জানিবে,—কেবল সেই possible sensationগুলার মধ্যে কতকগুলো sensation হইল মাত্র।

বরদা। সেই কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, ভূত দেখা, ভূতের শব্দ শুন্য, এ সব possible sensation নহে?

সারদা। ভূত থাকিলে possible.

বর। ভূত নাই?

সার। তা ঠিক বলিতেছি না—তবে প্রমাণ নাই বলিয়া ভূতে বিশ্বাস নাই, ইহাই বলিয়াছি।

বর। প্রত্যক্ষ কি প্রমাণ নহে?

সার। আমি কখন ভূত প্রত্যক্ষ করি নাই।

বর। টেম্‌স্ নদী প্রত্যক্ষ করিয়াছ?

সার। না।

বর। টেম্‌স্ নদী আছে মান?

সার। যাহাদের কথায় বিশ্বাস করা যায়, এমন অনেক লোক প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

বর। ভূতও এমন লোক প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

সার। বিশ্বাসযোগ্য এমন কে? এক জনের নাম কর দেখি?

বর। মনে কর, আমি।

এই কথা বলিতে বরদার মুখ কালো হইয়া গেল—শরীর রোমাঞ্চিত হইল।

সার। তুমি?

বর। তা হইলে বিশ্বাস কর।

সার। তুমি একটু imaginative, একটু sentimental—রজ্জ্বকে সর্প ভ্রম হইতে পারে।

বর। তুমি দেখিবে?

সার। দেখিব না কেন?

বর। আচ্ছা তবে আহার সমাপ্ত করা যাউক।

—‘নারায়ণ’, বৈশাখ ১৩২২, পরিশিষ্ট।

ভিক্ষা

আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিয়াছি, এ যাত্রা ভিক্ষা করিয়া কাটাইব। আমাদের দেশ—ভাল দেশ, ভিক্ষায় বড় মান; যে নিষেধ, সে পরিশ্রম করুক, আমি ভিক্ষা করিব।

কেহ মনে করিবেন না যে, আমি অন্ধ, কি খঞ্জ, কি বধির, কি পীড়িত, কি দীনদুঃখী। এ দেশে ভিক্ষা করিতে সে সব আড়ম্বরের প্রয়োজন কি? ভিক্ষা করিলেই হইল।

কে ভিক্ষা না করে? দীন-হীন, ধনবানের নিকট ভিক্ষা করে, ধনবানও দীন-হীনের নিকট ভিক্ষা করে। বড় বড় প্রকান্ডাদের জমীদারেরা দুঃখী প্রজাদের কাছে ভিক্ষা করেন; আজ পিতৃশ্রদ্ধা কাল পুত্রের যজ্ঞোপবীত, তার পরদিন কন্যার বিবাহ। প্রজার নিকট ভিক্ষা না করিলে এ সব কর্ম্ম মান থাকে কই? বড় বড় কুলীন, তাঁহারা স্ত্রীর কাছে ভিক্ষা করিয়া

বিক্রম রচনাবলী

উদর পরিপূরণ করেন, নহিলে নবধা কুললক্ষণ উজ্জ্বল হয় না। বড় বড় অধ্যাপক আচার্য্য গোস্বামীরা ভিক্ষা করেন, নহিলে পরকালের কাজ হয় না। তাঁহারা একান্ত পরহিতৈষী সন্দেহ নাই।

কে ভিক্ষা না করে? আমাদের দেশে সকলেই ভিক্ষা করে, কেবল ভিক্ষুক বিশেষে আর ভিক্ষার সময় বিশেষে, ভিক্ষার বিশেষ বিশেষ নাম আছে মাত্র। জমীদারের ভিক্ষার নাম মাস্তন, তাঁহাদের অনুচরদিগের ভিক্ষার নাম পাম্বর্গী, ভব-পারাবারের দ্রাণকর্তা গদরুবর্গের ভিক্ষার নাম প্রণামী, আত্মীয় সমতুল্য ব্যক্তির ভিক্ষার নাম বিদায়। বরযাত্রীর ভিক্ষার নাম গণ, বরের বাপের ভিক্ষার নাম পণ, যে গ্রামে বিবাহ সে গ্রামের ভদ্রলোকদিগের ভিক্ষার নাম ডেলাভাঙ্গানি, আর তাহাদের যুবতীদিগের—অবলাবালাদিগের ভিক্ষার নাম—সেজতোলানি। নাছোড়বন্ধ ব্রাহ্মণ ভিখারীর ভিক্ষার নাম বার্ষিক। যাঁহার বাড়ীতে ঠাকুরদেবতা আছেন, তাঁহার ভিক্ষার নাম দর্শনী। রাজরাজড়ার ভিক্ষার নাম নজর; কেবল অন্ধ খঞ্জ দীন দুঃখীর ভিক্ষার নাম ভিক্ষা। না হবেই বা কেন? তাহারা যে পরের ধন চাহিয়া লইবার বাসনা করে, তাহাদের এত বড় যোগ্যতা!

ভিক্ষা আমাদের সংস্কার। সকল জাতির একটা একটা বিশেষ সংস্কার থাকে; আমাদের সংস্কার ভিক্ষা। জন্মগ্রহণ করিয়াই ভিক্ষা পাই, তারে বলি যৌতুক। তার পর অন্নপ্রাশন; অন্নপ্রাশনেও যৌতুক। ব্রাহ্মণের তার পর উপনয়ন; উপনয়নে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে না করিলে ব্রাহ্মণ হয় না। পরে বিবাহ, তখন সোণায় সোহাগা, নববধুর চাঁদমুখ দেখাইয়া ভিক্ষা লই। শেষ মৃত্যু; সে ব্যাপারটায় বড় বাঁধাবাঁধি,—যম ছেড়ে দেয় না, সুতরাং পুত্র গলায় কাচা বাঁধিয়া আমাদের জন্য ভিক্ষায় বাহির হয়।

আমাদের চক্ষে ভিক্ষাবৃত্তির অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ বৃত্তি নাই। সেই জন্য আমাদের পূজ্য—দেবতামধ্যে প্রধান—মহাদেবকে ভিখারী সাজাইয়াছি। আর বিষ্ণু বামন-অবতারে ভিক্ষা করিয়া ত্রিলোক রক্ষা করিলেন। এখনও কোন দেবমূর্ত্তি দর্শন করিতে গেলে ঠাকুরকে পয়সাটি না দিলে দর্শন মঞ্জুর হয় না। যখন বর্ণবিভাগ বন্ধমূল হইল, তখন ইতর বর্ণ ইতর বৃত্তি অবলম্বন করিল; যথা,—বৈশ্যে বাণিজ্য, ক্ষত্রিয়ে রাজত্ব, শ্রেষ্ঠ বর্ণ ব্রাহ্মণের বৃত্তিও শ্রেষ্ঠ হইল,—তিনি ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলেন। অতএব ইহা স্থির যে, এ সংসারে ভিক্ষাই সার পদার্থ।

ভিক্ষায় আর এক সুখ আছে,—আদায়ের সুখ। খাতক যদি আমার কজ্জ শোধ না দেয়, তবে মহাকষ্ট; তাহার নামে নালিশ করিতে হয়। প্রভু যদি বেতন না দেয়, তবে আরও জঞ্জাল; উপায় নাই বলিলেই হয়। কিন্তু আমাদের দেশে এমনই সুনীতি যে, ভিক্ষা আদায়ের নানা শাসন আছে। প্রজা যদি জমীদারকে ভিক্ষা না দেয়, জরিমানা কর—মিথ্যা নালিশ কর—চাল কাটিয়া উঠাইয়া দাও। শিষ্যযজমান যদি ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা না দেয়, অভিসম্পাত কর—বেটার সবংশে নিস্বংশ দাও; তাহাতেও না দেয়, পইতা ছেঁড়—আর একটা পইতা কিনিয়া পরিও; ইচ্ছা হয় তেরাণি কর, পার যদি ত লুকাইয়া লুকাইয়া কিছু কিছু আহার করিও; উনানে পা পুঁরিও, কিন্তু দেখো, উনানে যেন আগুন না থাকে। আর যদি ব্রাহ্মণ না হইয়া জাতি-ভিখারী হও, তবে ধন্বা দিও, মারে কাটে দ্বার ছেঁড়ো না। শ্রাদ্ধের সময় ভিক্ষা করিতে গেলে, যার শ্রাদ্ধ তার নরক দেখাইতে ভুলিও না। পশ্চিম দেশে আর একটা প্রথা আছে, সেইটা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল,—তাহারা কাঁটা মারিয়া ভিক্ষা করে; পার ত দাতাকে প্রথমে সেইরূপ সমাদারসূচক অভ্যর্থনা করিও।

ব্রাহ্মণ-ভিখারী! তোমাকে আরও দুই একটা পরামর্শ দিবার আছে। তুমি ভিক্ষুক—পূজ্য ব্যক্তি, যাহার দান লইবে, তাহার সহিত একাসনে বসিও না—উচ্চাসনে বসিও; সে ব্যক্তি দাতা বহিত নয়, তোমার সমানস্পর্শী? দাতার যদি সহজে মন না ভিজে, তাহার মাথায় শ্রীচরণখানি তুলিয়া দিও; ইহাতে কোন ক্রমেই সঙ্কোচ করিও না। ভিখারীর পাদপদ্ম কখন কখন কাদা, গোবর ও বিষ্ঠায় পরিপূর্ণ থাকে—তুথ্যাপি দাতার মাথায় দোণার কিরীট থাকিলেও তাহার উপর পদ স্থাপন করিতে সঙ্কোচ করিও না। তাহাতে কার্ষ্যাকার না হয়, ভ্রূভঙ্গী করিও—ফিরিয়া দাঁড়াইও; আগে বলিও, “দেবে না কেন?” তাহাতেও না দেয়, অভিসম্পাত করিও; পুত্রগুলির অমঙ্গলটা আগে দেখাইও। তবু কিছু না দেয়, বাপ চৌদ্দপুরুষকে গালি দিয়া

চলিয়া আসিও। কার্যোদ্ধারের আর এক উপায় আছে,—ডিপে-হাতে বৈদ্য, কি পাঁজি-হাতে দৈবজ্ঞ ইত্যাদি লোকের দেখা পাইলে দুই চারিটি উদ্ভট কবিতা শিখিয়া রাখিও; কণ্ঠ করিয়া অর্থ শিখিবার প্রয়োজন নাই। প্রথমে আসন গ্রহণ করিয়াই দুই একটা কবিতা ছাড়িও; পরে উপস্থিত কথার সহিত সংলগ্ন বা অসংলগ্ন যা হোক একটা অর্থ করিয়া দিও। তসর কাপড়খানা আর ফোঁটার আড়ম্বরটা চাই, আর যখন যেমন তখন তেমনি দাঁও ফাঁদিয়া বসিও। স্নদের স্নদ ছাড়িও না,—শাস্ত্রসম্মত দানটা হইলে দক্ষিণাটা না এড়ায়। যদি শূন্যতে পাও যে, অমুক বাবুদের বাড়ী একটা বড় ক্রিয়া, সেই সময় সময় কালে গোহালের গরুগুলা বাহিরে বাঁধিয়া তথায় টোল ফাঁদিয়া বসিও; মামাত পিসিতত ভাইগুলাকে সাধিয়া পাড়িয়া দিন দুই তথায় পড়িও। পরে পত্রখানা জুড়িটলে সভায় উপস্থিত হইও। দেখ, গ্রামের বার্ষিক সামাজিকগুর্লিন যেন না ফস্কায়; সেটায় বড় মান। ফলাহারে কামাই দিও না; ফলাহার করিতে বসিয়া পাত হইতে গোটাকতক সন্দেশ চুরি করিয়া রাখিও; বিদ্যাটি ছেলেগুর্লিকে শিখাইও। দেখো, চিড়ে দইয়ের ফলাহারে নুন মাখিতে ভুলে যেও না। কণ্ঠায় কণ্ঠায় ফলাহারের সমাপ্ত করিয়া আচমনের পর খড়িকা খাইতে খাইতে বলিও, “এত কপালে ছিল, পাষাণ্ড বেটার বাড়ী আহা করিতে হইল।” এমন কথা দুটা একটা না বলিলে পাছে লোকে বলে তুমি পেটের দায়ে ফলাহার করিতে গিয়াছিলে।

—‘বঙ্কিম-জীবনী’, ৩য় সং, পৃ. ৩৬৫-৬৮।

নাটিকা

DRAMATIS PERSONÆ

রামধন—রামকৃষ্ণ—কলাবতী—দিবা—নিশা

প্রথম অঙ্ক

SCENE I

প্রতাপনগরের রাজবর্ষ

রামধন—রামকৃষ্ণ

রামধন। কিসের এত গোল?

[নেপথ্যে বহু লোকে “জয় জয় কলাবতী”

ও কিসের জয়ধ্বনি?

রামকৃষ্ণ। জান না রাণী কলাবতী স্নান করিয়া যাইতেছেন।

রামধন। রাণী স্নান করিয়া যাইতেছেন, তার এত জয়ধ্বনি কেন?

[নেপথ্যে “জয় জয় রাণীজিকি জয়”

ঐ শুন।

রামকৃষ্ণ। তুমি বিদেশী তাই অবাক হইতেছ। রাণী কলাবতীকে এ নগরের লোক বড় ভক্তি করে। বড়ই ভালবাসে।

রামধন। কেন রাণীর কিছু বিশেষ গুণ আছে?

রামকৃষ্ণ। তা আছে—রাণী অতিশয় দানশীলা আর বড় প্রজাবৎসলা। যার যে দুঃখ থাকে, রাণীকে জানাইতে পারিলেই—হইল—তার দুঃখ ঘুঁচবে।

[নেপথ্যে “জয় জয় মা কলাবতীর জয়”]

ঐ শোন সকলেই রাণীকে ম্ণ বলিতেছে, তিনি প্রজন্মান্বয়েরই মা'র মত। তাঁর গুণেই এখানকার প্রজারা এত সুখী।

রামধন। বটে! তবে রাজার এত সুখ্যাতি কেন?

রামকৃষ্ণ। রাণীর গুণে।

বঙ্কিম রচনাবলী

রামধন। তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়? তিনি কি প্রাচীনা?
রামকৃষ্ণ। না, তিনি বড় অপবয়স্কা তবে সকলের মা বলিয়া সকলকেই দেখা দেন। চল না
আমরা মাতৃ-দর্শনে যাই।
রামধন। চল। [উভয়ে নিষ্ক্রান্ত]

SCENE II

রাজার অন্তঃপুর

রাজা রাজেন্দ্র একা

রাজা। কে না জানে আকাশে মেঘ উঠে? তবে কেন এত ভাবি—মেঘ উঠে মেঘ ছাড়ে। এ মেঘও
উড়িয়া যাইবে—তবে কেন এত চিন্তা করি? মনে করিয়াছিলাম এ নিম্নল আকাশে কখনও
বৃষ্টি মেঘ উঠিবে না, আমি মূর্খ তাই এত ভাবি। হায়! কোথা হইতে আবার এ প্রবল
শত্রু দেখা দিল?

(কলাবতীর সঞ্জিতা সখীদিগের প্রবেশ)

তোরা কেন গো? এত সাজগোজ যে।

দিবা। আমরা নাচব।

রাজা। খানখা নাচবে কেন গো?

নিশা। রাণী কলাবতীর হুকুম। [নৃত্য আরম্ভ]

রাজা। কেন নাচের হুকুম কেন?

দিবা। আগে নাচি। [নৃত্য]

রাজা। আগে বল্।

নিশা। আগে নাচি।

রাজা। আ মর! তোর পা যে থামে না—জোর করে নেচে যাবি নাকি—আমি দেখিব না—
এই চোক বদ্বিজিলাম। [চোখ বদ্বিজিয়া]

দিবা। দেখুন মহারাজ! আপনাকে মুখ ভেঙ্গাচ্ছে।

নিশা। দেখুন মহারাজ, আপনাকে কলা দেখাচ্ছে।

রাজা। মরণে যা তোরা! আমি চোক চাব না।

নিশা। আচ্ছা কান তো খোলা আছে।

(করতালি দিয়া গীত)

নয়ন মূদিয়া, দেখিনু সজনী,

কানুর কুটিল রূপ।

গলেতে বাঁধিয়া পিরীতি কলসী

সাগরে দিনু যে ডুব

রাজা। শুনবো না। [কর্ণে হস্তার্পণ]

দিবা। তবে ফুলের ঘ্রাণ নিন।

(কবরী হইতে পুষ্প লইয়া রাজার নাসিকার নিকট ধারণ)

রাজা। নিঃশ্বাস বন্ধ করিলাম।

নিশা। চক্ষু কর্ণ নাসিকা বন্ধ। রসনা বাকি আছে—চল ভাই রান্নামহলে খবর দিই।

রাজা। মুখ বদ্বিজিয়া থাকিব।

নিশা। তবে বড় মা ঠাকুরাণীকে ডেকে দিই।

রাজা। কেন সে ভয়ঙ্কর ব্যাপার কেন?

নিশা। ইন্দিয়ের মধ্যে আপনার বাকি আছে পিটের চামড়া।

(কলাবতীর প্রবেশ)

কলা। আ মলো, তোরা বড় বাড়ালি, দূর হ!

[সখীদ্বয় নিষ্ক্রান্ত]

রাজা। দেখত কলাবতী, তোমার লোকজন আমায় কিছুর মানে না আমার উপর বড় অত্যাচার
করে!

অসম্পূর্ণ রচনা—নাটিকা

কলা। কি অত্যাচার করেছে মহারাজ? ঐকটু হাসিয়েছে? সেটা আমারই অপরাধ। তোমার মুখে কয় দিন হাসি দেখি নাই বলিয়া আমি ওদের পাঠাইয়া দিয়াছিলাম।

রাজা। আমার মাথায় পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে—আমি হাসিব কি?

কলা। কি পাহাড় মহারাজ! আমায় ত কিছু বল নাই। যা ইচ্ছা করিয়া বল নাই—তা সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করি না। কি পাহাড় মহারাজ! পড়িলে তোমার একার ঘাড়ে পড়িবে না।

রাজা। পাহাড় আর কিছু নয়—খোদ দিল্লীশ্বর ঔরঙ্গজেব। এই ক্ষুদ্র রাজ্যের উপর নজর পড়িয়াছে, বাদশাহের যাহাতে নজর পড়ে তাহা তিনি না লইয়া ছাড়েন না।

কলা। এ সম্বাদ কোথা পাইলেন?

রাজা। আত্মীয়লোকে দূতমুখে বলিয়া পাঠাইয়াছে। বিশেষ, ঢাকায় সুবাদার অনেক সৈন্য জমা করিতেছেন। লোকে বলে প্রতাপনগরের জন্য।

কলা। কেন আমরা কি অপরাধ করিয়াছি?

রাজা। অপরাধ বিস্তর। প্রতাপনগরের ধনধান্য পূর্ণ—লোক এখানে দারিদ্র্যশূন্য—আর আমরা হিন্দু! হিন্দুর ঐশ্বর্য বাদশাহের চক্ষুশূল।

কলা। যদি এ সম্বাদ সত্য হয়, তবে আমরাও যুদ্ধের উদ্যোগ না করি কেন?

রাজা। তুমি পাগল! দিল্লীশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধ কি আমার সাধ্য! জয় কি হইবে?

কলা। না তবে বিনা যুদ্ধে মরিব কেন?

রাজা। দেখি যদি বিনা যুদ্ধে কার্য্যোদ্ধার হয়। আমার ইচ্ছা একবার ঢাকায় যাই। আপনি সুবাদারের মন বুঝি, কোন ছলে যদি বশীভূত করিতে পারি করি।

কলা। এমন কর্ম্ম করিও না—ঔরঙ্গজেবের নায়েবকে বিশ্বাস কি? আর আসিতে দিবে না।

রাজা। সম্ভব—কিন্তু তাহাতে তাহার লাভ হইবে কি?

কলা। রাজহীন রাজ্য সহজে হস্তগত করিবে।

রাজা। আমি গেলে তুমি রাজ্যের রক্ষক থাকিবে।

কলা। ছি! স্ত্রীলোকের বাহুতে বল কি?

রাজা। এখানে বাহুবলের কাজ নয়। বুদ্ধিবলই ভরসা। প্রতাপনগরে বুদ্ধিবল তুমি একা।

কলা। মহারাজ, আপনাকে যাইতে দিতে আমার মন সরিতেছে না।

রাজা। থাকিলেই কোন মঙ্গল! যুদ্ধেই কোন মঙ্গল!

কলা। মারহাটা যুদ্ধ করিতেছে—আমরা কি মানুষ নই?

রাজা। না আমরা মানুষ নই। শিবাজীর কাজ কি আমার দ্বারা সম্ভবে? আমি যাওয়াই স্থির করিতেছি। এখন শয়নঘরে চলিলাম। [নিশ্চিন্ত]

কলাবতী। (স্বগত) বিধাতা, যদি আমায় স্ত্রীলোক করিয়াছিলে তবে আমায়—দূর হোক সে কথায় এখন আর কাজ কি? হায়! আমি রাণী কিন্তু রাজা কই? রাজা অভাবে প্রতাপনগর রক্ষা হইবে না। হায়! রাণী হইলাম ত রাজা পাইলাম না কেন?

(দিবার প্রবেশ)

(চক্ষু মূছিয়া) কি লো দিবি?

দিবা। এই কাগজটুকু কুড়িয়ে পেয়েছি। [এক পত্র দিল]

কলা। (পড়িলেন) “আমি রাজা রাজেন্দ্রের আজিও প্রবল শত্রু—প্রতাপনগর ধ্বংস করিয়া তোমাকে গ্রহণ করিব। নইলে ভালোয় ভালোয় এসো।”

এ পত্র কোথায় পাইলি?

দিবা। আজ্ঞে আমি কুড়িয়ে পেয়েছি।

কলা। তোকে ফাঁস দিব। আবশ্যিক হইলে আমি হুকুম দিই, তা তুই জানিস?

দিবা। জানি—তা আমি কুড়িয়ে না পেলুম ত কোথা পেলুম?

কলা। কোথা পেলি? তুই হাতে হাতে নিয়েছিস!

দিবা। মাইরি রাণীমা, আমি হাতে হাতে নিই নে।

কলা। তবে কোথাক পেলি বল, নইলে ফাঁস দিব।

বিক্রম রচনাবলী

দিবা। আমি পায়রার গলায় পেয়েছি।

কলা। সে পায়রা কোথায়?

দিবা। পায়ে দাঁড় দিয়ে বেঁধে রেখেছি।

কলা। কারি কলম নিয়ে আয়—জবাব লেখ।

দিবা। কারি কলম আছে—কি লিখিব?

কলা। লেখ “আমি তোমার পরম শত্রু—তোমায় ধ্বংস করিয়া প্রতাপনগর রক্ষা করিব।”

লেখা হইল?

দিবা। লিখেছি—পায়রার গলায় বেঁধে দিয়ে আসি?

কলা। দে গিয়ে।

দিবা। হাঁ রাণীমা এ কে মা—

কলা। চুপ! কথা মুখে আনিলে মাথা মর্দিয়ে ঘোল ঢেলে দিব।

[দিবা নিশ্চিন্ত]

কলা। পায়ে কাঁটা ফর্টিলে কাঁটা দিয়ে বাহির করিতে হয়, বর্দি আমাকে তাহাই করিতে হইবে।

SCENE III

রাজার অন্তঃপুর

দিবা—নিশা

দিবা। রাজা ঢাকায় চলিল কেন ভাই?

নিশা। তোর জন্য ঢাকাই কাপড় আনতে।

দিবা। আমি ত এমন হুকুম দিই নে, আমার যে ঢাকাই কাপড় আছে।

নিশা। তবে তোর বর আনতে।

দিবা। কেন এ দেশে কি বর পাওয়া যায় না?

নিশা। এ দেশে তেমন দাঁড় পাওয়া যায় না—তাকে একটা নেড়ে বর এনে দেবে।

দিবা। তা তার জন্য আর রাজার নিজে যাবার দরকার কি? আমায় বললে আমি একটা খুঁজে পেতে নিতুম। না হয় গোবিন্দ বখশীকে একটা পরচুলো দাঁড় পরিয়ে ঘরে নিয়ে আসতুম।

নিশা। আচ্ছা বখশী মশাইকে বলে রাখব।

দিবা। দূর হ পাঁপিষ্ট—তোর কাছে কোন কথাই বলবার যো নাই। তা যাক—সত্য সত্য রাজা ঢাকায় চলল কেন?

নিশা। কি জানি কেন—রাজা রাজড়ার মন তুমি আমি কি বুঝব।

দিবা। তা, রাজা কি ফিরবে না নাকি?

নিশা। সে কি কথা? অমন কথা মুখে আনতে আছে!

দিবা। রাণী কলাবতী অত কেঁদে কেঁদে চোখ ফর্দিয়েছে কেন?

নিশা। স্বামী বিদেশে গেলে একটু কাঁদতে হয়।

দিবা। দূর! স্বামী ছেড়ে স্বামীর বাবার জন্য আমি কাঁদি নে।

নিশা। তোর সাত পুরুষের ভিতর স্বামী নাই তুই আবার কাঁদবি কার জন্যে? বরং রাজার জন্য একটু কাঁদিস ত কাঁদ।

দিবা। না ভাই তা পারিব না। বরং মনের দুঃখে বসে বসে লুচি মন্ডা খাই গে চল।

নিশা। তাও মন্দ নয়।

দ্বিতীয়াক

SCENE I

সুবাদার—রাজা

রাজা। আমার কি অপরাধ? কি জন্য দিল্লীশ্বর আমার উপর পীড়ন করিতে উদ্যত?

সুবা। আপনি মুসলমানের শ্বেষক। পাদশাহ মুসলমানের ধর্মরক্ষক। সুতরাং বাদশাহ—

অসম্পূর্ণ রচনা—নাটিকা

- রাজা। আমি কিসে মুসলমানের দ্বेषক? আমার রাজ্যে হিন্দু মুসলমান তুল্য—
- সুবা। প্রতাপনগরে একটি মসজীদ নাই—মুসলমানে নমাজ করিতে পায় না।
- রাজা। আমি মসজীদ প্রস্তুত করিয়া দিব।
- সুবা। প্রতাপনগরে একটি কাজি নাই—মুসলমানের বিচার কি হিন্দুর কাছে হয়?
- রাজা। আমি কাজি নিযুক্ত করিব।
- সুবা। মহারাজ—আপনি যদি বাদশাহের এরূপ বশ্যতাপন্ন হন, তবে বাদশাহ কেন আপনাকে রাজ্যচ্যুত করিবেন? কিন্তু আসল কথা এখনও বাকি আছে—প্রতাপনগরে মুসলমানে জবাই করিতে পায় না—তার কি হইবে?
- রাজা। গোরু ভিন্ন অন্য জবাইয়ে আপত্তি করিব না।
- সুবা। কিন্তু গোরুই আসল কথা।
- রাজা। হিন্দু হইয়া গোহত্যা করিতে দিব কি প্রকারে?
- সুবা। তবে হিন্দুয়ানি ত্যাগ করুন।
- রাজা। ধর্মত্যাগ করিব? ইহকাল পরকাল খোওয়াইব? এ কথাও কানে শুনিতে হইল।
- সুবা। ইহকাল নষ্ট হইবে না। আপনি ইসলামের ধর্ম গ্রহণ করিলে বরং ইহকালে সুখী হইবেন। রাজ্য বজায় থাকিবে বরং আরও বাড়াইয়া দিব। আর পরকালও যাইবে না। ইসলামই সত্য ধর্ম—দেখুন কত বড় বড় হিন্দু এখন মুসলমান হইতেছে। তাহারা কি না বলিয়া ধর্মত্যাগ করিতেছে? বরং আপনার যদি সন্দেহ থাকে, তবে আমি ভাল ভাল মোল্লা মুফতি আপনার কাছে পাঠাইয়া দিতেছি। তাদের সঙ্গে বিচার করুন—বিচারে যদি ইসলাম সত্য ধর্ম বলিয়া বোধ হয়, তবে গ্রহণ করিবেন ত?
- রাজা। ইচ্ছা হয় মোল্লা মুফতি পাঠাইবেন। কিন্তু কিছু ফলোদয় সম্ভাবনা নাই। সম্প্রতি আমি যাহা নিবেদন করিলাম, অনুগ্রহ করিয়া বাদশাহের নিকট জানাইবেন। গোহত্যা ভিন্ন আর সকলেই আমি সম্মত—বার্ষিক কর দিতেও সম্মত। আজ আমি বিদায় হইব—যে হুকুম হয় অনুগ্রহ করিয়া জানাইবেন।
- সুবা। কোথা যাইবেন?
- রাজা। অনেক দিন আসিয়াছি, স্বদেশে যাইব।
- সুবা। সে কি? আপনার শূভাগমনের সম্বাদ আমি দিল্লীতে এত্তেলা করিয়াছি। সেখান হইতে খেলওয়াত আসিবে—তাহা না গ্রহণ করিয়া কি যাওয়া হয়।
- রাজা। বড় অনুগ্রহীত হইতেছি কিন্তু আমার অবর্তমানে রাজ্য বিশৃঙ্খল হইতেছে।
- সুবা। নাচার—আপনাকে অবশ্য অবশ্য অপেক্ষা করিতে হইতেছে। আপনার ফৌজ সকল বিদায় দিন।
- রাজা। সে কি আমাকে কয়েদ রাখিতে চাহেন?
- সুবা। ও সব কথা কেন? তবে দিনকত আপনাকে এখানে থাকিতে হইবে। দিল্লীর হুকুম না আসিলে ছেড়ে দিতে পারিব না।
- রাজা। (স্বগত) হায়! কলাবতী তুমি যা বলিয়াছিলে তাহাই হইল। (সুবাদারকে) যাহা হুকুম হয় তাহাই তালিম করিব।
- সুবা। তছলীম।
- রাজা। কয়েদই ত হইলাম। প্রমথ—প্রমথ—

[সুবাদার নিষ্ক্রান্ত]

(প্রমথের প্রবেশ)

- আমার আজকাল ফিরিয়া যাওয়া হইতেছে না, তুমি প্রতাপনগরে এই সম্বাদ লইয়া যাও।
- প্রমথ। যাইব কি প্রকারে? সকল পথে পাহারা—আমাদের কয়েদ করিয়াছে।
- রাজা। আমার শিপাহী সব কোথা?
- প্রমথ। নবাবের লোকে তাহাদের হাঁতিয়ার কাড়িয়া লইয়াছে—তাহাদিগকে প্রতাপনগর ফিরিয়া যাইবার হুকুম হইয়াছে।
- রাজা। ভাল, তাহারাই গিয়া সম্বাদ দিবে।
- প্রমথ। দিলেই বা কি হইবে।

SCENE II

কলাবতী—নিশা

কলা। আজ একুশ দিন হইল মহারাজ ঢাকায় গিয়াছেন, আজও কই কোন সম্বাদ ত পাইলাম না।

নিশা। হাঁ রাণীমা, রাজরাণীতেও কি এমনি করে দিন গণে?

কলা। কই আমি দিন গণিলাম?

নিশা। কাঁদ কেন মা, আমি ত এমন কিছুর বলি নাই।

কলা। নিশা, তুই একবার শহরের ভিতর একটা শিয়ানা লোক পাঠাইতে পারিস্—অবশ্য কেহ কোন সম্বাদ শুনিয়েছে, কেন না ঢাকায় ঢের লোক যায় আসে। আমি এত লোক পাঠাইলাম, কেহ ত ফিরিল না। বোধ হয়, মন্দ সম্বাদই আসিয়েছে—লোকে সাহস করিয়া আমার সাক্ষাতে বলিতে পারিতেছে না।

নিশা। আপনাকে ব্যস্ত দেখিয়া আমি আপনার বুদ্ধিতেই শহরে অনুসন্ধান করিতে লোক পাঠাইয়া দিলাম—কিন্তু—

কলা। কিন্তু কি?

নিশা। লোকে বলে যে মহারাজকে সুবাদার আটক করেছে—অমন কর কেন মা! এই জন্য ত বলি নাই। একটু শোও আমি বাতাস করি। উড়ো কথায় বিশ্বাস কি?

(কলার শয়ন)

কলা। বিশ্বাস সম্পূর্ণ। আমি আগেই বলিয়াছিলাম যে গেলে তাঁকে আটক করিবে। নিশা! এখন আমার দশা কি হইবে! (রোদন)

নিশা। কাঁদিলে কি হবে মা। আমাদের সকলেরই ত এক দশা হইবে। আমরাও নিরাশ্রয় হইলাম—এখন মুসলমানের হাতে জাতি মান প্রাণ সব যাবে।

কলা। কি বলিলি সবার এক দশা? তোদের যে রাজা মাত্র—আমার যে স্বামী। তুই কি জানিস স্বামী কি ধন!

নিশা। তা বটে। রাজ্য যায় তবু প্রাণটা থাকিলে আমরা বজায় থাকিব। ভাল মা, এক কাজ কর না কেন? রাজার কাছে কেন লোক পাঠাও না যে সুবাদারকে রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া আসুন—আমরা না হয় তাঁকে গহনা পত্র বিক্রয় করিয়া খাওয়াইব। কাঁদ কেন মা এ কথায়?

কলা। তুই কেন আমায় অপমান করিস্? কি! আমার স্বামীকে আমি রাজ্যত্যাগ করিয়া প্রাণ বাঁচাইতে বলিব! নিশা—তোদের ভয় হইয়া থাকে তোরা চলিয়া যা—আমার স্বামী রাজা—তিনি রাজার কাজ করিবেন।—কিসের গোল ঐ?

[নেপথ্যে বহু লোকে “জয় মা কলাবতীর জয়”]

আজিকার দিনে কে বলে কলাবতীর জয়?

(দিবার প্রবেশ)

দিবা। মহারাণী! নগরের সকল প্রজা আসিয়া রাজবাড়ী ঘেরিল।

কলা। কি হয়েছে?

দিবা। সকলে বলিতেছে ঢাকার সুবাদার রাজাকে কয়েদ করিয়াছে।

কলা। তার পর প্রজারা কি বলে। [নেপথ্যে “মহারাণী কলাবতীর জয়”]

ওরা কি চায় দিবা?

দিবা। আপনি স্বকর্ণে শুনুন।

কলা। প্রজারা আমার পুত্র, আমার [নিকট] অব্যাহতদ্বার। প্রধানদিগকে আমার কাছে ডাকিয়া আন।

(দিবার প্রস্থান। কতিপয় নগরবাসীর সহিত পুনঃপ্রবেশ)

প্রজাবর্গ। জয় কলাবতীর জয়।

কলা। কি চাও বাবা তোমরা?

১ম প্রজা। মা, আমাদের রাজা কোথায়?

২য় প্রজা। মা, আমাদের রাজাকে নাকি দুষ্ট যবন কয়েদ করিয়াছে? মা, আমাদের বাহুতে কি বল নাই যে বাপের উদ্ধার করি?—বঙ্গীয়-কণিকা, পৃ. ১-২২।

সংযোজনী

বিরহিণীর দশ দশা

১

প্রথম দশা দিনে, বোরি বোরি রোওল,
শেজে পাড়ি কাঁদে ভূমি লুটি।
দ্বিতীয় দশা দিনে, আঁখি মেলি হেরল,
শেজ ছাড়ি গা ভাঙ্গিল উঠি ॥

২

তৃতীয় দশা দিনে মৃদু মৃদু হাসিল,
বলে কোথা গেলে প্রাণনাথ।
চতুর্থ দশা দিনে, সিনান করি আওল,
হাঁড়ি পাড়ি খাওল পাস্তা ভাত ॥

৩

পঞ্চম দশা দিনে, বান্ধি চারু কবরী,
ঢাকাই শাড়িতে দিল ফের।
ষষ্ঠম দশা দিনে, পিঠা পুঁলি বানাওল,
কাঁদিতে তার গিলিল তিন সের ॥

৪

সপ্তম দশা দিনে, সজিনা খাড়া রাঁধিল,
বলে প্রাণ বন্ধু কোথা গেলে।
যে খাড়া রেধেছি ভাই, তুমি বন্ধু কাছে নাই,
যদি পেট ফাঁপে একা খেলে ॥

৫

অষ্টম দশা দিনে, বিরহ বিষাদিনী,
মন দুঃখে কিনিল ইলিশ।
তিতিয়া নয়ন জলে, ভাজায় ঝোলে অম্বলে,
খায় ধনী খান বিশ দ্বিশ ॥

৬

নবম দশা দিনে, পেট ফেঁপে ঢাক হলো,
আইল কানাই কবিরাজ।
সই বলে কর্মভোগ, এ ঘোর বিরহ রোগ,
কবিরাজে নাহি ইথে কাজ ॥

৭

দশম দশা দিনে, বিরহিণী মরে নরে,
আই টাই বিছানায় পড়ি।
কাতরে কহিছে সতী, কোথা পাব প্রাণপতি,
কোথা পাব পাচকের বড়ি ॥

৮

বিরহীর দশ দশা, পন্ পন্ করে মশা,
মাছি উড়ে ছেলে কাঁদে কোলে।
চাকরাণীর চাঁৎকার, সইসঙ্গতির টিট্কার,
খেদে কবি ছন্দোবন্ধ ভোলে ॥

—বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন, ১২৭৯

ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা

অনুষ্ঠান পত্র

“জ্ঞানাৎ পরতরো নহি”

১। বিশ্বরাজ্যের আশ্চর্য ব্যাপার সকল স্থিরচিত্তে আলোচনা করিলে অন্তঃকরণে অদ্ভুত রসের সঞ্চার হয়, এবং কি নিয়মে এই আশ্চর্য ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছে, তাহা জানিবার নিমিত্তে কোতূহল জন্মে। যদ্বারা এই নিয়মের বিশিষ্ট জ্ঞান হয়, তাহাকেই বিজ্ঞানশাস্ত্র কহে।

২। পূর্বকালে ভারতবর্ষে বিজ্ঞানশাস্ত্রের যথেষ্ট সমাদর ও চর্চা ছিল, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। বর্তমান কালে বিজ্ঞানশাস্ত্রের যে সকল শাখা সম্যক উন্নত হইয়াছে, তৎসমুদায়ের মধ্যে অনেকগুলির প্রথম বীজরোপণ প্রাচীন হিন্দু ঋষিরাই করেন। জ্যোতিষ, বীজগণিত, মিশ্রগণিত, রেখাগণিত, আয়ুর্বেদ, সামুদ্রিক, রসায়ন, উদ্ভিদতত্ত্ব, সঙ্গীত, মনোবিজ্ঞান, আত্মতত্ত্ব প্রভৃতি বহুবিধ শাখা বহুদূর বিস্তারিত হইয়াছিল। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, এক্ষণে অনেকেরই প্রায় লোপ হইয়াছে, নামমাত্র অবশিষ্ট আছে।

৩। এক্ষণে ভারতবর্ষীয়দিগের পক্ষে বিজ্ঞানশাস্ত্রের অনুশীলন নিতান্ত আবশ্যিক হইয়াছে; তন্নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা নামে একটি সভা কলিকাতায় স্থাপন করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। এই সভা প্রধান সভারূপে গণ্য হইবে, এবং আবশ্যিক মতে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ইহার শাখা-সভা স্থাপিত হইবে।

৪। ভারতবর্ষীয়দিগকে আহ্বান করিয়া বিজ্ঞান অনুশীলন বিষয়ে প্রোৎসাহিত ও সক্ষম করা এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য; আর ভারতবর্ষ সম্পর্কীয় যে সকল বিষয় লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, তাহা রক্ষা করা (মনোরম ও জ্ঞানদায়ক প্রাচীন গ্রন্থ সকল মূদ্রিত ও প্রচারিত করা) সভার আনুষ্ঠানিক উদ্দেশ্য।

৫। সভা স্থাপন করিবার জন্য একটী গৃহ, কতকগুলি বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক ও যন্ত্র এবং কতকগুলি উপযুক্ত ও অনুরক্ত ব্যক্তি বিশেষের আবশ্যিক। অতএব এই প্রস্তাব হইয়াছে যে কিছু ভূমি ক্রয় করা ও তাহার উপর একটি আবশ্যিকানুরূপ গৃহ নিৰ্মাণ করা, বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক ও যন্ত্র ক্রয় করা এবং যাহারা এক্ষণে বিজ্ঞানানুশীলন করিতেছেন, কিম্বা যাহারা এক্ষণে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়াছেন, অথচ বিজ্ঞানশাস্ত্র অধ্যয়নে একান্ত অভিলাষী, কিন্তু উপায়াভাবে সে অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিতেছেন না, এরূপ ব্যক্তিদিগকে বিজ্ঞানচর্চা করিতে আহ্বান করা হইবে।

৬। এই সমুদায় কার্য সম্পন্ন করিতে হইলে অর্থই প্রধান আবশ্যিক, অতএব ভারতবর্ষের শুল্কানুধ্যায়ী ও উন্নতীকৃত জনগণের নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি যে, তাহারা আপন আপন ধনের কিয়দংশ অর্পণ করিয়া উপস্থিত বিষয়ের উন্নতি সাধন করুন।

৭। যাহারা চাঁদা গ্রহণ করিবেন, তাহাদের নাম পরে প্রকাশিত হইবে, আপাততঃ যাহারা স্বাক্ষর করিতে কিম্বা চাঁদা দিতে ইচ্ছা করিবেন, তাহারা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণ করিলে সাদরে গৃহীত হইবে।—অনুষ্ঠাতা, শ্রীমহেন্দ্রলাল সরকার।

অনুষ্ঠান পত্রের সাতটি ধারা ক্রমে গ্রহণ করিয়া প্রত্যেক ধারা সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য, তাহা বলিব।

১। “বিশ্বরাজ্যের আশ্চর্য ব্যাপার সকল স্থিরচিত্তে আলোচনা করিলে অন্তঃকরণে অদ্ভুত রসের সঞ্চার হয়।”

নিদাঘ ঋতুতে নিশানাথহীনা নিশাকালে উচ্চ প্রাসাদোপরি উপবিষ্ট হইয়া একবার গ্রহ নক্ষত্র তারকা বিকীরিত মন্দাকিনী মধ্য প্রবাহিত গগনপ্রাঙ্গণে দৃষ্টি উৎক্লিপ্ত কর। সেই অমল নীলিমা, সেই অনন্তবিস্তৃতি, সেই অসংখ্য জ্বলন্ত বিন্দুপাতোজ্জ্বলীকৃতা শোভা, সেই অক্ষুণ্ণ শ্বেত কলেবরা স্বর্গ মন্দাকিনী, এই সকল শোভা শোভিত দিগ্বলয় ব্যাপী সেই মহাগর্ভ ব্রহ্মাণ্ড কটাহ দেখিলে বিস্ময় পরিপূর্ণিত মনে আপনা আপনি জিজ্ঞাসা করিবে, এগুলি কি? কোথা হইতে আসিল? কি নিয়মে আকাশে বিচরণ করিতেছে?

আধুনিক বিখ্যাতনামা দার্শনিকেরা বলেন, তোমার প্রথম প্রশ্নের অর্থ নাই। ঈশ্বরবাদীরা বলেন, তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন আন্তিকতার মূলসূত্র। তোমার শেষ প্রশ্ন যে বিজ্ঞান প্রবৃত্তিলতার প্রথমাঙ্কুর, তদ্বিষয়ে দুইমত নাই।

ভূমি ভাবিতে লাগিলে, কি নিয়মে ইহারা আকাশেতে বিচরণ করিতেছে। ভাবিতে ভাবিতে এক দিনে, দুই দিনে, এক মাসে, দুই মাসে দেখিতে দেখিতে জানিতে পারিলে যে, ঐ আকাশে সকল নক্ষত্রই ভ্রমণশীল, কেবল একটীই স্থির। এই স্থির তারটি ধুবনক্ষত্র। সেটি সর্বদাই উত্তরে আছে। এত দিনে

ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা

তুমি একটী সামান্য জ্যোতিষ নিয়ম পরিজ্ঞাত হইলে; সামান্য নিয়মপরিজ্ঞানেই কত মহৎ উপকার দর্শিতে পারে। দিগ্ভ্রাস্ত পৃথিবীর পক্ষে এই সামান্য সত্যটি অঙ্ককার রাত্রিতে কত উপকার সাধন করে। এক্ষণে জটিল নিয়মে সকলের বিশিষ্ট জ্ঞান হইলে কত ফল দর্শিতে পারে।

কত ফল ফলিতেছে, তাহা ত আমরা এক্ষণে অহরহ প্রত্যক্ষ করিতেছি। কোন পূজ্যপাদ ব্যক্তি বিজ্ঞানবেত্তার সহিত রাবণ রাজার তুলনা করিয়া বিজ্ঞানের ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন, মহর্ষি বাল্মীকি দোন্দুদ দশাননের অসীম প্রতাপ বর্ণনজন্য কবিকুশল কল্পনাবলে অমরগণকে তাঁহার দাসত্বে নিযুক্ত করিয়া লঙ্কাধিপতির প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু বিজ্ঞানবেত্তার প্রভুত্ব এই কল্পনা-প্রসূত রাবণের প্রতাপ অপেক্ষা সমাধিক শ্লাঘনীয়। সত্য বটে, দশানন কোন দেবকে মালাকার কার্যে, কাহাকেও বা অশ্বসেবক কৰ্মে, কাহাকেও বা গৃহপরিষ্কারক দাসে, নানা কার্যে নানা দেবগণকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু বিজ্ঞানবেত্তা কি করিতেছেন? তিনি বাষ্পরূপী ইন্দ্রদেবকে মহায়সশকট-চালনে নিযুক্ত করিয়াছেন। দেবকন্যা ক্ষণপ্রভা তাঁহার প্রভা লুকাইয়া বিদ্বানের সম্বাদবাহিনীভাবে অবিবর্ত সম্বাদ বহন করিতেছেন। অসীমতেজা প্রভাকর অন্তরালে থাকিয়া নিজকরে সহধর্মিণী ছায়ার সাহায্যে বৈজ্ঞানিক সমক্ষে লিপিকর কার্যে ব্যাপৃত আছেন। পৃথিবী দেবী, দিকপাল বরুণ, পবনরাজ, সকলকেই তিনি দাসত্বে আবদ্ধ রাখিয়াছেন। তাঁহারা কখন বিদ্বানের ক্ষুণ্ণবৃত্তি জন্য ময়দা ভাস্কিতেছেন, কখন শীত নিবারণ জন্য বস্ত্র বয়ন করিতেছেন, কখন কাগজ প্রস্তুত করিতেছেন, কখন ঔষধ প্রস্তুত করিতেছেন। কভু বা বিজ্ঞানবিৎকে স্কন্ধে করিয়া স্বর্গলোকে লইয়া যাইতেছেন। কখন পুস্তক মৃদিত করিয়া আনিয়া বিদ্বানকে উপঢৌকন দিতেছেন। কখন বা তাঁহার প্রমোদভবনে, রাজবর্ষে আলো জ্বালিতেছেন। কি বিদ্যালয়ে কি গৃহকার্যে কি বিচারালয়ে কি ধর্মমন্দিরে একাকী, সজন, অমরগণ, সকল কালেই সকল অবস্থাতেই বিজ্ঞানবিতের ক্রীতদাস। হরিদ্বারসাগর প্রবাহিতা ভাগীরথীকে ভাগীরথ তাঁহার জন্যই অবনীতলে আনিয়াছিলেন। সেই ভাগীরথী তাঁহার জল পরিচারিকা, তাঁহার অভ্যর্থনা জন্য অগস্ত্য মূনি বিক্ষাচলকে অবনত করিয়া থাকিতে বলিয়া গিয়াছেন। হিমাচল বিদ্বানের জন্যই স্বকীয় আগারে তুষার ভাণ্ডার রক্ষা করিতেছেন। বনস্পতিগণ তাঁহার জন্য ফলভার বহন করে। খনি তাঁহার জন্য উদরে করিয়া বহু মূল্য ধাতু ধারণ করে।

এখন “রত্নাকর হয়েছেন দাস, কুবের তাঁর আজ্ঞাকারী”—। দশানন সমরক্ষেত্রে দেবগণের সহায়তা পান নাই। বিদ্বানের সমরক্ষেত্রে স্বয়ং অগ্নিদেব লৌহগোলক বাহনে বিপক্ষদলে মহামার উৎপাদন করিতেছেন। তাহাতেই বলি কল্পিত রাবণাপেক্ষা আধুনিক বিদ্বানের প্রভুত্ব অধিকতর শ্লাঘনীয়। কবিগুরু বাল্মীকি কলিকালে পুনঃপ্রাদুর্ভূত হইয়া স্বয়ং বিদ্বানের নিকটে রামায়ণ পাঠ করিতেছেন। ভাষাবিজ্ঞান বলে বৈজ্ঞানিক মীনরূপী ভগবানের ন্যায় আবার বেদোদ্ধার করিতেছেন। বৈজ্ঞানিক ঈশ্বরের অবতার। রাবণগোরবলোপী, প্রতাপশালী—শিবিকর্ণ সদৃশ পরপোকারী পরমযোগীর ন্যায় দূর নিবিষ্ট, সর্বদাই হৃষ্ট ও সকল অবস্থাতেই সন্তুষ্ট।

এই বিজ্ঞান বলেই আধুনিক ইউরোপীয়গণ এই পৃথিবীতে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। দেখুন, বিলাতে খাদ্য সামগ্রী অতি দুর্মূল্য, শ্রমোপজীবীগণ “আমার” বলিতে পারে, “আমার পূর্বপুরুষের” বলিতে পারে, এমন বাসস্থান তাহাদের অনেকেরই নাই; বিলাতে কার্পাসতুলা এক ছটাক পরিমিত উৎপন্ন হয় না; হয় আমেরিকা নয় ভারতবর্ষ হইতে বিলাতীয়েরা তুলা আমদানি করেন। অথচ যন্ত্র বিজ্ঞানের এমনি ক্ষমতা, মাণ্ডেটের তন্তুবায়েরা লঙ্কাহীনা ভারতের লঙ্কা নিবারণ করিতেছে। লাঙ্কাশায়ারে দুর্ভিক্ষ হইল, আর যে দেশে ঢাকা আছে, শান্তিপুর শিমলে কলমে আছে, বালুচর বাণারস আছে, মুঙ্গের পাটনা আছে, কালিকট কাশ্মীর আছে, মহীসূর অম্বর সহর আছে—সেই দেশে, যেখানে লক্ষ লক্ষ মণ তুলা প্রতি বর্ষে উৎপন্ন হয়, যেখানে তন্তুবায়কে লিপিকর ভাস্কর বা সূত্রধার অপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধা করে, সেই দেশে, যে দেশের তন্তুজাত রোম সন্ন্যাসের রাজপরিচ্ছদ ছিল, যে দেশের সহিত বস্ত্রবাণিজ্য ব্যবসায়ে ব্রতী থাকিয়া মধ্যকালে বিনিসনগর সমৃদ্ধিশালী হয়—সেই দেশে লাঙ্কাশায়ারে দুর্ভিক্ষ হইল বলিয়া হা বস্ত্র যো বস্ত্র শব্দে কর্ণ বধির হইয়া যাইতে লাগিল।

হা অদৃষ্ট! বিজ্ঞান অবহেলার এই ফল। বিজ্ঞানের সেবা করিলে বিজ্ঞান তোমার দাস, যে বিজ্ঞানকে ভজে, বিজ্ঞান তাহাকে ভিজবে। কিন্তু যে বিজ্ঞানের অবমাননা করে, বিজ্ঞান তাহার কঠোর শত্রু। মনে করুন, কোথাকার অন্নকণ্ঠে কোথায় পরিচ্ছদকণ্ঠ হইল। ঐন্দ্রজালিক বিজ্ঞান স্বীয় অবমাননা জন্য এইরূপে বৈরসাধন করিল। এখন ভুক্তভোগী লোক শিক্ষাগ্রহণ কর।

অনেকে বলেন, ইউরোপীয়েরা কেবল বাহুবলে এই ভারতবর্ষে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। বাহুবলেই বলুন, আর যাহা বলুন সে কথা কতক দূর সত্য, তাহার অণুমাণ সন্দেহ নাই। কিন্তু একথাটিও অত্যাঙ্গি দোষে দূষিত কখনই বলা যাইতে পারে না যে ইউরোপীয়েরা বিজ্ঞানবলে এই ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন, বিজ্ঞান বলেই ইহা রক্ষা করিতেছেন। বিজ্ঞানেই সতত চালনা করিয়াই বিদেশীয় বণিকদিগকে ভারততীরে আনয়ন করেন, বিজ্ঞানেই নানা ষড়্ধে সহায়তা করিয়াছিলেন—এখনও

বিশ্বকম রচনাবলী

বিজ্ঞান মহায়সশকট বাহনে, তড়িৎতার সঞ্চালনে, কামান সন্ধানে, অয়োগোলক বর্ষণে এই বীরপ্রসু, ভারত-ভূমি হস্তামলকবৎ আয়ত্ত করিয়া শাসন করিতেছে। শুধু তাহাই নহে। বিদেশীয় বিজ্ঞানে আমাদের দাস হইত, বিদেশী হইয়া আমাদের প্রভু হইয়াছে। আমরা দিন দিন নিরুপায় হইতেছি। অতিথিশালায় আজীবনবাসী অতিথির ন্যায় আমরা প্রভুর আশ্রমে বাস করিতেছি। এই ভারতভূমি একটি বিস্তীর্ণ অতিথিশালা মাত্র।

দ্বিতীয় ধারার কথার প্রমাণার্থ তদুল্লিখিত শাস্ত্র সকলের কি প্রকার সমালোচনা ছিল, দেখা যাউক। জ্যোতিষ। জ্যোতিষ বিজ্ঞানশাস্ত্র বটে, কিন্তু প্রাচীন বেদাঙ্গ। সুতরাং ইহার প্রাচীনত্বে সন্দেহ করা ধৃষ্টতা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? ব্রহ্মদেশীয় চন্দ্র সূর্য গ্রহণ তালিকা পঞ্জিকার প্রাচীনত্ব বিষয়ে ফরাসী ও বিলাতি পণ্ডিতগণের মধ্যে নানা বাগ্বিতণ্ডা হইয়াছে। অনেক বিদেশীয় পণ্ডিত, হিন্দুরা অতি প্রাচীন জাতি স্বীকার করা, স্বজাতির গৌরব হানিকর বিবেচনা করেন।

হিন্দুজাতি অথবা আর্যেরাই যে জ্যোতিষগণের প্রথম পর্যবেক্ষক, নিয়মানুসন্ধানক ও তত্ত্বোদ্ভাবক, তাহা ভাষাবিজ্ঞানবিৎগণের অবশ্য স্বীকার্য। যে সম্পর্ষির উল্লেখ পুর্বে করিয়াছি, তাহাকে ইয়ুরোপীয়গণ উর্ষ মেজর বা বৃহৎ ভল্লুক বলেন। প্রাচীন বেদেও সম্পর্ষি শব্দের স্থলে ঋক্ষ (ভল্লুক) শব্দ ব্যবহার আছে। কেবল সংস্কৃত ভাষায় দেখা যায় যে ঋচ্ ধাতুর অর্থ দ্যুতি। ঐ তারা কয়টি অতিশয় উজ্জ্বল। উজ্জ্বলতা দেখিয়া দ্যুতিবাচক কোন নাম দিয়া পরে সেই নামের অর্থ ক্রমে ভল্লুক বোধ করা ও আকার সাদৃশ্য উপলব্ধি করা অত্যন্ত সঙ্গত বোধ হয়। ও এইরূপ করা কেবল আর্যগণেরই সম্ভব হইতে পারে।

হিন্দুরা দূরবীক্ষণ, অণুবীক্ষণ, আলোকবীক্ষণ প্রভৃতি কাঁচ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত জ্যোতিষ চালনা করিয়া যে সফলতা লাভ করিয়াছিলেন তাহা ভাবিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। সামান্য নবদ্বীপপঞ্জিকা সেই বিজ্ঞানের ধ্বংসাবশেষ মাত্র।

দিবামান, রাত্রিমান, তিথিমান নির্ণয়, চন্দ্রসূর্যের উদয়াস্ত নিরূপণ—গ্রহ নক্ষত্র সঞ্চার ক্রিয়া স্থির করা, অয়ন গ্রহণ ও সংক্রমণ গণনা—সে সকল এখন অতি ভ্রমসঙ্কুল হইক না কেন, লুপ্তবিজ্ঞানের ধ্বংস চিহ্ন তাহার আর সন্দেহ নাই। এখন জীবিতবিজ্ঞান নাই, তাহার স্থানে কতকগুলি অকৃতজ্ঞ পিতৃমাতৃ-শূন্য দুর্বল সংকেত আছে মাত্র। বিজ্ঞান বলে আর্যভট্ট পৃথিবীর অক্ষরেখার তির্ষিকভাব অবধারণ করিয়াছিলেন ও তাহার পরিমাণ সাদৃশ্য তেইশ অংশ নিরূপণ করেন। আর এখনকার জ্যোতিষবিজ্ঞানভি-মানীরা সামান্য সূর্য গ্রহণ গণনায় এক দণ্ড বা দুই দণ্ড ভ্রম করিয়া বিজ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিলেন। যদি বাপুদেব শাস্ত্রী না থাকিতেন, ত কি লজ্জার কথা হইত! ইচ্ছা ছিল, পুর্বেল্লিখিত বিজ্ঞানগুলি ক্রমে ক্রমে গ্রহণ করিয়া একে একে সকলগুলির বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করি, প্রবন্ধের দৈর্ঘ্যভয়ে তাহা করিতে পারিলাম না। সংক্ষেপে দুই চারি কথা লেখা যাইতেছে।

বীজগণিত। কি করা কর্তব্য, স্থির করিতে না পারিয়া লোকে সচরাচর যে বলিয়া থাকে, “আমি অস্থিরপণে পড়িয়াছি।” সেই অস্থিরপণ বীজগণিতান্তর্গত এক প্রকার অঙ্ক। যে অঙ্ক প্রাচীন বীজ-গণিতে অতি শীঘ্র সমাধা হইতে পারে। আর যে অঙ্ক য়ুনানী দেশে দ্যোফান্ত প্রথম উদ্ভাবন করেন, ও সেইজন্য যাহাকে দ্যোফান্তীন বলে, যাহা সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রথম সিদ্ধ হয়, তাহাও হিন্দুবীজগণিত মধ্যে আমরা শুনিয়াছি। যে দেশে দ্যোফান্তের বহু পুর্বে দ্যোফান্তীন কুট সাধ্য হইত, সেই দেশীয় শৌভঙ্করিক বীরগণ সামান্য ভগ্নাংশে “এক পর্বতপ্রমাণ দেউল” দেখিয়া শ্লোকোক্ত বীর তাহা ভাঙিতে সমর্থ হওয়া দূরে থাকুক, উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া পলায়নপর হইলেন। (*) তথাপি আশা করিবার অনেক স্থল আছে, কেননা আবার সেই দেশেই দেখিতেছি যে দিল্লী কলেজে সুবিখ্যাত অধ্যাপক রামচন্দ্র স্বীয় অপুর্ব গ্রন্থ “গরিমা লঘিমা” প্রচার দ্বারা বিলাতীয় বিখ্যাতনামা ডিমরগণ বৈজ্ঞানিকেরও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছেন। ও ভূয়ো প্রশংসাবাদ আকর্ষণ করিয়া লইয়াছেন। ভরসা এই, যদি মরুভূমি মধ্যে আমরা এরূপ বটবৃক্ষ দেখিতে পাইলাম, তাহা হইলে কর্ষিত ক্ষেত্রে উৎসাহবারি সেচনে ভারতভূমি কম্পতরু বা কম্পলতাই উৎপাদন করিবে।

মিশ্রগণিত। মিশ্রগণিতে অজ্ঞতানিবন্ধন কত অনর্থ হইতেছে, তাহা কে গণনা করিতে পারে? আমরা উদাহরণের জন্য একটি সামান্য অনর্থের উল্লেখ করিতেছি। মানদণ্ডের (পাল্লার দাঁড়) উভয়

- (*) আছিল দেউল এক পর্বত প্রমাণ।
ফ্রোধ করি ভাঙ্গে তাহা পবন নন্দন ॥
অন্ধক পঙ্কেতে তার তেহাই সলিলে।
দশম ভাগের ভাগ সেবালার দলে
উপরে বায়ান্ন গজ দেখ বিদ্যমান।
করহ সুবোধ সবে দেউল প্রমাণ ॥

সীমা মধ্যরঞ্জ হইতে সমান ব্যবধানে স্থিত না থাকিলে মানদণ্ড জলতলের সহিত সমানান্তরাল হইবে না, অর্থাৎ এক দিক অন্য দিক অপেক্ষা কিছু ঝোঁকা হইবে। এইরূপ স্থলে যে দিক উচ্চ হইয়াছে, সেই দিকে পাত্রে কিছু ভার দেওয়া অর্থাৎ পাষণ ভাঙ্গিয়া ওজন দেওয়ার প্রথা আছে, কখন ফেরে, ফেরে অর্থাৎ দুই সের দ্রব্য দিতে হইলে এক সের ঝোঁকা দিকে ওজন করিয়া আর এক সের উচ্চ দিকে ওজন করিয়া দ্রব্য দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু এরূপ ফেরে ফেরে মাপে সর্বদাই বিক্রেতার ক্ষতি হইয়া থাকে। একথাটি মিশ্রগণিতের একটি সামান্য সত্য। মহাজনগণ যখন ঝরতি-পড়তি শূন্য বলিয়া মান ন্যূনতার সমাধা করিবেন, তখন বিজ্ঞান অবহেলাকে কিছু অংশ দিলে সত্যবাদীর কার্য করেন।

রেখাগণিত। লীলাবতী গ্রন্থই রেখাগণিত চর্চার প্রচুর প্রমাণ। লীলাবতী ভারতের গৌরবও বটে, ভারতের কলঙ্কও বটে। কোহিনূর হীরক মুসলমান সম্রাটগণের গৌরব চিহ্নও বটে, কলঙ্কমণিও বটে। লীলাবতী নামোল্লেখে আমাদের একটি কথা মনে পড়িয়াছে, আমরা সেইটি এই স্থানে বলিয়া পাঠককে হাসিতে বা কাঁদিতে অনুরোধ করি না। এক দিন, দীনবন্ধু বাবুর লীলাবতী নাটকের কথা হইতছিল। বাঙ্গালি, যিনি পিরান গায়ে দেন, তিনিই সমালোচক। একজন বিজ্ঞ সমালোচক একজন আগন্তুককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “এই খনার স্ত্রী লীলাবতী বড় (Mathematician) ছিলেন; দীনবন্ধু বাবু তাঁর বিষয়ে নাটক লিখেছেন। এই পাঁচটা মিষ্টি কথাবার্তা আর কি?” আমরা উপস্থিত ছিলাম; হাসি কাঁদি নাই। তাহাতেই কাহাকেও হাসিতে বা কাঁদিতে বলি না। হা দীনবন্ধো! ভাস্করাচার্য্য! লীলাবতী! নাটক! কাব্য! সত্য! সমালোচনা! তোমাদের এই দশা হইল! কলঙ্কনী লীলাবতী যদি না থাকিত, তাহা হইলে আমাদেরকে কখনই লজ্জাকর সমালোচন শুনিত হইত না।

আয়ুর্বেদ, রসায়ন, উদ্ভিদতত্ত্ব। এগুলি মনুষ্যের কেবল শরীরধারণ পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় ও প্রাচীন ভারতে এগুলির বিশেষ সমাদর ছিল। অনুষ্টাতা বাবু মহেন্দ্রলাল সরকারের সাময়িক আয়ুর্বেদ পত্রে তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। অন্য প্রমাণ অনুসন্ধানের প্রয়োজন কি, এত যে অধঃপাতে গিয়াছে—ইয়ুরোপীয় অতি পারদর্শী চিকিৎসকেরা পুরাতন রোগ চিকিৎসায় বৈদ্যদিগের সমকক্ষ হইতে পারিতেছেন না। তৈল চিকিৎসা যে অতি আশ্চর্য্য পদ্ধতি, তাহাও স্বীকার করিতে হয়। সামান্য বর্ণকবিপণিতে এক পাত অষ্টাদশ মূল পাচনে দেখিবেন, কত বিভিন্ন ধর্ম্মের বিভিন্ন প্রদেশের মূল একত্রিত থাকে। কোন বিশেষ রোগের প্রতীকার জন্য সেইগুলি একত্রিত করিতে প্রাচীন পণ্ডিতগণের কত অধ্যবসায় এবং কত সময় লাগিয়াছে। কিন্তু যেরূপ তাড়িত গতিতে সমস্ত লোপ পাইতেছে, বোধ হয়, এইরূপে চলিলে পরে আর কিছুদিন কপিরাজ ও কবিরাজ শব্দে কেবল বর্ণগতও নয়, অর্থগতও অনেক সাদৃশ্য হইবে।

সঙ্গীত। সঙ্গীতের ক্রিয়াসিদ্ধির উৎকর্ষ দেখিয়া ও সুক্ষ্মরূপে আলোচনা করিয়া আমাদের বিশ্বাস যে, ভারতবর্ষে মুসলমানদিগের সময়ে অতি উন্নত সঙ্গীতবিজ্ঞান ছিল। সোমেশ্বর, কাণামাঘ, হনুমত প্রভৃতি মতভেদ দেখিলে বিজ্ঞানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ হয় বটে, কিন্তু শ্রীরাগে ও ভৈরবে কেহই সাদৃশ্য স্থাপন করেন নাই। করেন নাই কেন? বিজ্ঞান তৎসমুদায়কে পৃথক্ করিয়া দিয়াছিল, বিজ্ঞানবাক্য অলঙ্ঘনীয়। বৈজ্ঞানিক ভিন্ন এই প্রশ্নের কেহই উত্তর দিতে পারেন না। আধুনিক সঙ্গীত শাস্ত্র-জ্ঞানভিমানদিগের মধ্যে আমরা অনেককে জিজ্ঞাসা করিয়াছি যে কেন এগুলিকে বিশুদ্ধ ও অন্যগুলিকে জঙ্গলা বলেন? বাহা সুক্ষ্ম জ্ঞানী তাহাদের উত্তরের তাৎপর্য্য এই যে, এরূপ ভেদনির্দেশ আপ্তো-দেশমূলক মাত্র। ইহা বৈজ্ঞানিকের উত্তর নহে। বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞান ভিন্ন কাহাকেও ওস্তাদ স্বীকার করেন না। মানবীয় ওস্তাদের দোহাই দেখিয়া অত্যন্ত আক্ষেপের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে যে পূর্ব্বতন অতি উন্নত সেই বিচিত্র সঙ্গীতবিজ্ঞান একবারে লুপ্ত হইয়াছে।

আত্মতত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞান। বেদান্তের সুক্ষ্ম গূঢ় ঈশ্বরতত্ত্ব (Theology) ও মায়াদাদমূলক অপূর্ব্ব সংসারতত্ত্ব (Sensational Cosmology), কার্পল সাংখ্যের বেদান্তবিরোধী প্রকৃতিবাদ (Materialism), অক্ষপাদ গোতমের আন্বীক্ষিকী দর্শন ও ন্যায় শাস্ত্র (Inductive Philosophy and Logic) এবং কণাদের পদার্থ-বিচার (Categorical analysis) এগুলি এক এক বিষয়ের চূড়ান্ত সীমা বলিলেও অত্যাঙ্গি হয় না। প্রতিনিধি ডাইরেক্টর উড্রো সাহেব নবদ্বীপস্থ ন্যায়-শিষ্যগণের বিতণ্ডাস্মরণ করিয়া লিখিয়াছেন, “আহা, এই বিচারশক্তি কেবল ব্যাপ্তি অব্যাপ্তি অন্যান্য্যভাব বিতণ্ডার পরিচারিকা না হইয়া যৌদিন বস্তুবিচারের সহধর্ম্মিণী হইবে সেদিন কি শুভ দিন হইবে!” যে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আশীর্বাদ করিতেছেন, তাহাকে কে না নমস্কার করবে? বিশেষতঃ উড্রো সাহেবকে বাঙ্গালির শূভানুধ্যায়ী বলিয়া সকলেই জানিতেন। আমরা তাহাকে নমস্কার করি।

এতিস্তম্ভ আরো কত বিজ্ঞান ছিল, এখন লোপ পাইয়াছে। সামান্য ভূতের ওঝারা যে এক স্থানে শব্দ করিয়া, সেই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন স্থানাগত শব্দের ন্যায় অনুভূত করাইতে পারে, একথা প্রায় সকলেই জানেন। কতক দূর শব্দবিজ্ঞান (Acoustics) জ্ঞান ব্যতীত এই শব্দানুকরণ বিদ্যার (Ventriloquation) আলোচনা অত্যন্ত দূর হইয়া বোধ হয়। হয়ত শব্দবিজ্ঞানের কোন স্থূল সত্য উদ্ভাবিত

বিশ্বকম রচনাবলী

হইয়া থাকিবে। কিন্তু এসকল ছিল, চর্চা ছিল, মহা মহা পণ্ডিত সকল ছিলেন, এখন কি? এখন আক্ষেপের বিষয় এই যে আমাদের আলস্য দোষে, পারতন্ত্র্য দোষে, নানা দোষে, অনেকগুণেরই “প্রায় লোপ হইয়াছে নামমাত্র অবশিষ্ট আছে।” জিজ্ঞাসা করি, আর কত কাল এভাবে যাইবে?

৩। পূর্বেই বলা হইয়াছে, বিজ্ঞান অবহেলা জন্য আমরা দিনে বিদেশীয় জাতিগণের আয়ত্তাধীন হইতেছি; বস্তুবিচারে অক্ষম হইয়া কদম্ব ভোজনে, অপেয় পানে, অপরিশুদ্ধ বায়ু সেবনে দিন দিন দুর্বল হইতেছি। চিকিৎসাশাস্ত্রে নিতান্ত অজ্ঞ হওয়ায় বৈদেশিক প্রথাগত চিকিৎসকগণের হস্তে পতিত হইয়া সর্বদাই জ্বর জ্বালায় কাতর থাকিতে হয়। বিজ্ঞানের ক্রমেই লোপ সম্ভাবনা। “সুতরাং এক্ষণে ভারতবর্ষীয়দের পক্ষে বিজ্ঞানশাস্ত্রের অনুশীলন করা নিতান্ত আবশ্যিক হইয়াছে। ও তন্নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা নামে একটি সভা কলিকাতায় স্থাপন করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। এই সভা প্রধান সভারূপে গণ্য হইবে এবং আবশ্যিক মতে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ইহার শাখা-সভা স্থাপিত হইবে।” আমরা এই প্রস্তাবের কায়মনোবাক্যে অনুমোদন করিতেছি। অনুষ্ঠাতার মঙ্গল হউক, অনুষ্ঠান সফল হউক।

৪। “ভারতবর্ষীয়দিগকে আহ্বান করিয়া বিজ্ঞান অনুশীলন বিষয়ে প্রোৎসাহিত ও সক্ষম করা এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য।” উদ্দেশ্য অতি মহৎ, তার আর সন্দেহ কি? “আর ভারতবর্ষ সম্পর্কীয় যে সকল বিষয় লুপ্তপ্রায় হইয়াছে” বা হইতেছে “তাহা রক্ষা করা” (“যথা মনোরম ও জ্ঞানদায়ক প্রাচীন গ্রন্থ সকল মূদ্রিত ও প্রচারিত করা” ইত্যাদি) সভার আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্য।” কেবল পুস্তক মূদ্রণ ব্যতীত লুপ্তপ্রায় বিষয়ের অন্যবিধ রক্ষা করা আবশ্যিক বোধে আমরা অনুষ্ঠানপত্রের অর্থাৎ শব্দের স্থানে যথা ও পরে ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করিলাম। উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে; যেমন বারাগসীন্দু মানমন্দিরের বৈজ্ঞানিক সংস্কার অথবা প্রাচীন যন্ত্র সকল বা যন্ত্রখণ্ড সকল সংগ্রহ করা, প্রাচীন মূদ্রা, দানফলক বা আদেশফলক সকল সংগ্রহ করা, লুপ্ত বিষয়ের রক্ষার জন্য এগুলি সকলই আবশ্যিক। কিন্তু এতদ্বিন্ন আরো অনেকগুলি আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্য হইতে পারে, ও হওয়া উচিতও বোধ হইতেছে। ভারতবর্ষীয়দিগকে বিজ্ঞানে যত্নশীল করিতে হইবে, ও তাঁহারা যত্ন করিতেছেন কি না তাহা সর্বদা দেখিতে হইবে। আর (কথাটা বলিতে কিন্তু লজ্জা হয়) তাঁহারা বিজ্ঞানে যত্ন করিয়া কিছু আর্থিক উপকার পাইতেছেন কি না, তাহাও দেখিতে হইবে। সে বিষয়ে আমাদের যাহা বক্তব্য সমাজ স্থাপিত হইলে বলিব।

৫। এই সমুদায় কার্য সম্পন্ন করিতে হইলে অর্থই প্রধান আবশ্যিক, অতএব ভারতবর্ষের শুলভানুধ্যায়ী, ও উন্নতীকৃত জনগণের নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা, “যে তাঁহারা আপন আপন ধনের কিয়দংশ অর্পণ করিয়া উপস্থিত বিষয়ের উন্নতিসাধন করেন।”

৬। অনুষ্ঠাতা মহেন্দ্র বাবু চাঁদা বা স্বাক্ষরকারিদিগের নাম সাদরে গ্রহণ করিতেছেন।

এই অনুষ্ঠানপত্র আজ আড়াই বৎসর হইল প্রচারিত হইয়াছে, এই আড়াই বৎসরে বঙ্গসমাজ ৪০ চল্লিশ সহস্র টাকা স্বাক্ষর করিয়াছেন। মহেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন যে, এই তালিকাখানি একটি আশ্চর্য্য দলিল। ইহাতে যেমন কতকগুলি নাম থাকিতে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে, তেমন কতকগুলি নাম না থাকিতে উজ্জ্বলীকৃত হইয়াছে। তিনি আর কিছু বলিতে ইচ্ছা করেন না।

আমরা উপসংহারে আর গোটা দুই কথা বলিতে ইচ্ছা করি। বঙ্গধনীগণ, আপনারা মহেন্দ্র বাবুর ঈশৎ বক্রোক্তি অবশ্যই বুঝিয়া থাকিবেন। তবে আর কলঙ্কভার শিরে কেন বহন করেন? সকলেই অগ্রসর হউন। যিনি এক দিনে লক্ষ মূদ্রা ব্যয় করেন, তিনি কেন পশ্চাতে পড়েন? পুত্রকন্যার বিবাহে যাঁহারা লক্ষ লক্ষ মূদ্রা ব্যয় করেন, তাঁরা কেন নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকেন? উভ্রো সাহেব ভয়ানক বিজ্ঞানগুণ-অস্বীকারদোষ বঙ্গসমাজ-মস্তকে আরোপ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। একবার মূদ্রা হস্তে দান করিয়া সমাজ স্থাপন করিয়া স্বীয় ভ্রম দূর করুন। বঙ্গীয় যুবকগণের অবস্থার উন্নতি সাধন করুন; বঙ্গের শিল্পবিদ্যার পুনরুদ্ধার করুন। মহাত্মা উভ্রো সাহেবকে বলি, তিনি কাম্বেল সাহেবকে চিঠিতে যা বলিয়াছেন, তাহার কথায় আমাদের কাজ নাই, তিনি কেন একবার স্বজাতীয়গণকে এই মঙ্গলকর কার্যের সাহায্য করিতে বলুন না। যদি তালিকাতে একটিও শ্বেতাঙ্গের নাম না প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে কত আক্ষেপের বিষয় হইবে।

—‘বঙ্গদর্শন,’ ভাদ্র ১২৭৯

পরিশিষ্ট

প্রথম ভাগ

লোকরহস্য

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন

লোকরহস্যের দ্বিতীয় সংস্করণে অর্ধেক পুরাতন ও অর্ধেক নতন। সতেরটি প্রবন্ধের মধ্যে আটটি নতন, আটটি পুরাতন; এবং একটি (রামায়ণের সমালোচন) পুরাতন হইলেও নতন করিয়া লিখিত হইয়াছে। সকলগুলিই বঙ্গদর্শন ও প্রচার হইতে পুনর্মুদ্রিত।

কমলাকান্ত

প্রথম বারের বিজ্ঞাপন

কমলাকান্তের দপ্তর বঙ্গদর্শন হইতে পুনর্মুদ্রিত করা গেল। বঙ্গদর্শনে যে কয় সংখ্যা প্রকাশ হইয়াছে, তাহার মধ্যে “চন্দ্রালোকে,” “মশক” এবং “স্ত্রীলোকের রূপ” এই তিন সংখ্যা আমার প্রণীত নহে, এই জন্য ঐ তিন সংখ্যা পুনর্মুদ্রিত করিতে পারিলাম না।

বঙ্গদর্শনে কমলাকান্তের দপ্তর সমাপ্ত হয় নাই। এই জন্য এই গ্রন্থের নামকরণে “প্রথম খণ্ড” লেখা হইল।

শ্রীবাণীকমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিজ্ঞাপন

এই গ্রন্থ কেবল “কমলাকান্তের দপ্তরের” পুনঃ সংস্করণ নহে। “কমলাকান্তের দপ্তর” ভিন্ন ইহাতে “কমলাকান্তের পত্র” ও “কমলাকান্তের জীবনবন্দী” এই দুইখানি নতন গ্রন্থ আছে।

কমলাকান্তের দপ্তরেও দুইটি নতন প্রবন্ধ এবার বেশী আছে। “চন্দ্রালোকে,” এবং “স্ত্রীলোকের রূপ” এই দুইটি প্রবন্ধ কমলাকান্তের দপ্তরের প্রথম সংস্করণে পরিত্যাগ করা গিয়াছিল। তাহার কারণ এই যে, ঐ দুইটি আমার প্রণীত নহে। “চন্দ্রালোকে” আমার প্রিয় সূত্র শ্রীমান্ বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকারের রচিত; এবং “স্ত্রীলোকের রূপ” আমার প্রিয় সূত্র শ্রীমান্ বাবু রাজকৃষ্ণ মদুখোপাধ্যায়ের রচিত। উহারা স্ব স্ব রচনার সঙ্গে ঐ প্রবন্ধদ্বয় পুনর্মুদ্রিত করিবেন, এই ইচ্ছায় আমি কমলাকান্তের দপ্তরের প্রথম সংস্করণে ঐ দুইটি পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। এক্ষণে লেখকদিগের নিকট জানিয়াছি যে, তাঁহারা ঐ দুইটি প্রবন্ধ নিজে নিজে পুনর্মুদ্রিত করিবার কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব, তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে ঐ দুইটি প্রবন্ধ কমলাকান্তের দপ্তরের দ্বিতীয় সংস্করণ-ভুক্ত করা গেল।

কমলাকান্তের পত্র তিনখানি মাত্র বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। তিনখানি ভাঙ্গিয়া এখন চারিখানি হইয়াছে। “বুড়া বয়সের কথা” যদিও বঙ্গদর্শনে কমলাকান্তের নামযুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই, তথাপি উহার মর্ম কমলাকান্তি বলিয়া উহাও “কমলাকান্তের পত্র” মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছি। মোটে পাঁচখানি।

“কমলাকান্তের জীবনবন্দী” সমেত সর্বশুদ্ধ আটটি নতন পুনর্মুদ্রিত করা গেল। গ্রন্থের আকার অনেক বাড়িয়াছে বলিয়া এবং অন্যান্য কারণেও গ্রন্থের মূল্যও বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছি।

শ্রীবাণীকমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন

“চৈকি” শীর্ষক প্রবন্ধটি ভুলক্রমে পূর্বসংস্করণভুক্ত হয় নাই। উহাও বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু এই প্রথম পুনর্মুদ্রিত হইল।

মদুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত

বিজ্ঞাপন

পাঠকদিগকে বলিয়া দেওয়া আবশ্যিক যে, এই গ্রন্থ কোন ব্যক্তিবিশেষ বা শ্রেণীবিশেষের লোককে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হয় নাই। সাধারণ সমাজ ভিন্ন কাহারও প্রতি ইহাতে ব্যঙ্গ নাই। ইহাতে পাঠক

বিক্রম রচনাবলী

যেরূপ মনুষ্যচরিত্র দেখিবেন, সেরূপ মনুষ্যচরিত্র সকল সমাজে, সকল কালেই বিদ্যমান। আধুনিক বাঙ্গালী সমাজ, এই গ্রন্থের বিশেষ লক্ষ্য বটে; কিন্তু তৎস্থিত কোন ব্যক্তিবিশেষ বা শ্রেণীবিশেষ তাহার লক্ষ্য নহে। যদি কেহ বিবেচনা করেন যে, তিনিই ইহার লক্ষ্য, তবে ভরসা করি, তিনি কথাটা মনে মনেই রাখিবেন। প্রকাশে তাহার গৌরব বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখি না।

দ্বিতীয় ভাগ

বিবিধ প্রবন্ধ

প্রথম ভাগ। বিজ্ঞাপন

ইতিপূর্বে কতকগুলি প্রবন্ধ “বিবিধ সমালোচনা” নামে আর কতকগুলি “প্রবন্ধ পুস্তক” নামে প্রকাশিত করা গিয়াছিল। এক্ষণে উভয় গ্রন্থই অপ্রাপ্য।

দুইখানি পৃথক্ সংগ্রহ নিষ্পয়োজন বিবেচনায়, এক্ষণে ঐ প্রবন্ধগুলি এক পুস্তকে সংকলন করিয়া “বিবিধ প্রবন্ধ” নাম দেওয়া গেল। যে সকল প্রবন্ধ পূর্বে “বিবিধ সমালোচনা” এবং “প্রবন্ধ পুস্তকে” প্রকাশিত করা গিয়াছিল, তাহার মধ্যে কোন কোন প্রবন্ধ এবার পরিত্যাগ করা গিয়াছে।

এই সকল প্রবন্ধ অনেক বৎসর পূর্বে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। কোন কোন বিষয়ে এক্ষণে আমার মত পরিবর্তিত হইয়াছে; কোন কোন স্থানে ভ্রম সংশোধন করা গিয়াছে। কিন্তু অনেক স্থানে বিশেষ কারণবশতঃ প্রবন্ধ যেমন ছিল, তেমন রাখিতে হইয়াছে।

দ্বিতীয় ভাগ। বিজ্ঞাপন

যে সকল প্রবন্ধ এই সংগ্রহে পুনর্মুদ্রিত হইল, তাহার অধিকাংশ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল; অল্পভাগ প্রচারে।

১২৭৯ সালে আমি বঙ্গদর্শন প্রকাশ আরম্ভ করি। চারি বৎসর আমি উহার সম্পাদকতা নিৰ্বাহ করি। ঐ চারি বৎসরের বঙ্গদর্শন আর পাওয়া যায় না। কিন্তু ঐ চারি বৎসরের বঙ্গদর্শন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে—যেমন সামান্যই হউক, একটু স্থান লাভ করিয়াছে। এজন্য অনেকে উহা পাইবার অভিলাষ করেন। অনেকে আমাকে সে জন্য পত্র লেখেন; কিন্তু যাহা নাই, তাহা আমি দিতে পারি না। অনেকে পরামর্শ দেন যে, বঙ্গদর্শন পুনর্মুদ্রিত কর। কিন্তু বঙ্গদর্শনের আমি একমাত্র লেখক ছিলাম না। অন্যের রচনা আমি কি প্রকারে পুনর্মুদ্রিত করিব? যাহা পারি, তাহা করিয়াছি। আমার নিজের রচনার অধিকাংশই ইতিপূর্বে পুনর্মুদ্রিত করিয়াছি। যাহা বাকি ছিল, তাহার মধ্যে কতকগুলি এই প্রবন্ধে পুনর্মুদ্রিত করিলাম।

সকলগুলি পুনর্মুদ্রিত করিবার যোগ্যও নহে। যাহা এ পর্যন্ত পুনর্মুদ্রিত হয় নাই, তাহা হইতে বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটি মাত্র পুনর্মুদ্রিত করিলাম। ইহার সঙ্গে প্রচার নামক পত্রে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধও পুনর্মুদ্রিত করিলাম। অবশিষ্ট প্রবন্ধগুলি পুনর্মুদ্রিত করিব কি না, তাহা এক্ষণে বলিতে পারি না।

যাহা পুনর্মুদ্রিত হইল, তাহার মধ্যে কতকগুলি পুনর্মুদ্রিত করা উচিত হইয়াছে কি না, এ বিষয় বিচারের স্থল। “বঙ্গদেশের কৃষক” তাহার মধ্যে একটি। যে সকল কারণে ঐ প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত করিলাম, তাহা ঐ প্রবন্ধের শিরোভাগে কতক কতক লিখিয়াছি। কিন্তু ঐখানে সকল কথা লিখিবার স্থান করিতে পারা যায় নাই। আমি সেখানে স্বীকার করিয়াছি যে, ঐ প্রবন্ধে অর্থশাস্ত্রবিষয়িত বিচারে কতকগুলি ভ্রম আছে। ভ্রমগুলি সংশোধিত না করিয়া প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত করার একটি কারণ সেইখানে লিখিয়াছি। আর একটি কারণ নির্দিষ্ট করিবার উপযুক্ত স্থান এই। ঐ প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শনে যেমন বাহির হইয়াছিল, তেমনই পুনর্মুদ্রিত করিতে চাই। যে মানুষ খ্যাতি লাভ করে, তাহার দোষ গুণ আমরা দুই দেখিতে ইচ্ছা করি। এই প্রবন্ধটিও খ্যাতি লাভ করিয়াছিল; অনেক পাঠক ঐ প্রবন্ধটিও দোষ গুণ সমেত দেখিতে ইচ্ছা করিতে পারেন।

এরূপ বিবেচনা করিয়াও বহুবিবাহবিষয়ক প্রবন্ধটি অখণ্ড পুনর্মুদ্রিত করিতে পারিলাম না। বিদ্যাসাগর মহাশয় এক্ষণে স্বর্গারূঢ়, তাঁর সমালোচনার তাহার আর কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কিন্তু তাহার জীবদ্দশায় কলিকাতার তাহার গ্রন্থ যেরূপ তাঁর সহিত সমালোচনা করিয়াছিলাম, এখন আর তাহা পারা যায় না। কেন না, এখন তাহার শোকে আমরা সকলেই কাতর। যাহার জন্য সকলেই রোদন করিতেছি, তাহার কোন চরিত্রের সমালোচনা এ সময়ে সাধারণ সমীপে উপস্থিত করিতে পারা যায় না। অতএব ঐ প্রবন্ধটি তাহার গ্রন্থের সমালোচনা, এবং যাহা মিলিখিত প্রবন্ধের তীরাংশ, তাহা পরিত্যাগ

করিয়াছি। যাহা পুনর্মুদ্রিত করিলাম, তাহা যাহারাই রাজব্যবস্থার দ্বারা অথবা প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের বিচারের দ্বারা সমাজসংস্কার বা সমাজবিপ্লব উপস্থিত করিতে চাহেন, তাহাদের সকলের পক্ষেই খাটে। তাহাদের দল এখনও অপরািজিত ও অক্ষুণ্ণ। সেই সম্প্রদায়ভুক্ত খ্যাতি বা অখ্যাতির জন্য লালায়িত মালাবরী নামে একজন পারসী সে দিন একটা হুলস্থূল উপস্থিত করিয়াছিল। অতএব স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি সম্পন্ন হইয়াও এ প্রবন্ধের সম্পূর্ণ বিলোপও করিতে পারিলাম না।

বঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হইল, তাহার দর বড় বেশী নয়। এক সময়ে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, বঙ্গালার ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়া, একখানি বঙ্গালার ইতিহাস লিখিব। অবসরের অভাবে, এবং অন্যের সাহায্যের অভাবে সে অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। অন্যকে প্রবৃত্ত করিবার জন্য বঙ্গদর্শনে বঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। বঙ্গদর্শনের দ্বারা সর্বাঙ্গসম্পন্ন সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টায় সচরাচর আমি এই প্রথা অবলম্বন করিতাম। যেমন কুলি মজুর পথ খুলিয়া দিলে, অগম্য কানন বা প্রান্তরমধ্যে সেনাপতি সেনা লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন, আমি সেইরূপ সাহিত্যসেনাপতিদিগের জন্য সাহিত্যের সকল প্রদেশের পথ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতাম। বঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে আমার সেই মজুরদারির ফল এই কয়েকটি প্রবন্ধ। ইহার প্রণয়নজন্য অবসরবশতঃ এবং অন্যান্য কারণে ইচ্ছানুরূপ অনুসন্ধান ও পরিশ্রম করিতে পারি নাই। কাজেই বলিতে পারি না যে, ইহার দর বেশী। দর বেশী হউক বা কম হউক, ইহা পরিত্যাগ করিতে পারি না। যে দরিদ্র, সে সোনা রূপা জুটাইতে পারিল না বলিয়া কি বনফুল দিয়া মাতৃপদে অঞ্জলি দিবে না? বঙ্গালিতে বঙ্গালার ইতিহাস যে যাহাই লিখুক না কেন,—সে মাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি। কিন্তু কৈ, আমি ত কুলি মজুরের কাজ করিয়াছি—এ পথে সেনা লইয়া কোন সেনাপতির আগমনবার্তা ত শুনিলাম না।

বলিতে কেবল বাকি আছে “মনুষ্য কি?” ইতি শীর্ষক প্রবন্ধ, জন্ ষ্টুয়ার্ট্ মিলের জীবনচরিতের সমালোচনার ভগ্নাংশ মাত্র। ধর্মতত্ত্ব নামক গ্রন্থে যে অনুশীলনধর্ম বঝাইয়াছি, তাহার বীজ ইহাতে আছে। “রামধন পোদ” ইতি শীর্ষক প্রবন্ধের অন্য নাম ছিল।

সাম্য

বিজ্ঞাপন

এই প্রবন্ধের প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম পরিচ্ছেদ বঙ্গদর্শনের সাম্যশীর্ষক প্রবন্ধ। তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঐ পত্রে প্রকাশিত “বঙ্গদেশের কৃষক” নামক প্রবন্ধ হইতে নীত। কৃষকের কথা যে আধুনিক সামাজিক বৈষম্যের উদাহরণস্বরূপ লিখিত হইয়াছে, এমত নহে। প্রাচীন বর্ণ-বৈষম্যের ফলস্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। পাঠক যেন এই কথাটি স্মরণ রাখেন।

সাম্যনীতি নতন তত্ত্ব নহে, কিন্তু ইউরোপীয়েরা যে ভাবে ইহার বিচার করেন, আমি তাহা করি নাই। আমি সাম্যনীতি যেমন মোটামুটি বঝিয়াছি—সেইরূপ লিখিয়াছি। অতএব ইউরোপীয় নীতিশাস্ত্রের সহিত প্রভেদ দেখিলে, কেহ রাগ করিবেন না। আরও, স্বদেশীয় সাধারণজনগণকে এই তত্ত্বটি বঝাইবার জন্য লিখিয়াছি। সুশিক্ষিত যদি ইহাতে কিছু পঠিতব্য না পান, আমি দুঃখিত হইব না। অশিক্ষিত পাঠকদিগের হৃদয়ে এই নীতি অঙ্কুরিত হইলে আমি চরিতার্থ হইব।

শ্রীবাংকমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

তৃতীয় ভাগ

কৃষকচরিত্র

প্রথম বারের বিজ্ঞাপন

ধর্ম সম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার আছে, তাহার সমস্ত আনুপূর্ব্বিক সাধারণকে বঝাইতে পারি, এমন সম্ভাবনা অল্পই। কেন না, কথা অনেক, সময় অল্প। সেই সকল কথার মধ্যে তিনটি কথা, আমি তিনটি প্রবন্ধে বঝাইতে প্রবৃত্ত আছি। ঐ প্রবন্ধ তিনটি দৃষ্টান্তে সাময়িক পত্রে ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হইতেছে।

বিশ্বকম রচনাবলী

উক্ত তিনটি প্রবন্ধের একটি অনূশীলন ধর্মবিষয়ক; দ্বিতীয়টি দেবতত্ত্ব বিষয়ক; তৃতীয়টি কৃষ্ণচরিত্র। প্রথম প্রবন্ধ “নবজীবনে” প্রকাশিত হইতেছে; দ্বিতীয় ও তৃতীয় “প্রচার” নামক পত্রে প্রকাশিত হইতেছে। প্রায় দুই বৎসর হইল এই প্রবন্ধগুলি প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু ইহার মধ্যে একটিও আজ পর্যন্ত সমাপ্ত করিতে পারি নাই। সমাপ্ত দূরে থাকুক, কোনটিও অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। তাহার অনেকগুলি কারণ আছে। একে বিষয়গুলি অতি মহৎ, অতি বিস্তারিত সমালোচনা ভিন্ন তন্মধ্যে কোন বিষয়েরই মীমাংসা হইতে পারে না; তাহাতে আবার দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ লেখকের সময়ও অতি অল্প; এবং পরিশ্রম করিবার শক্তিও মনুষ্যের চিরকাল সমান থাকে না।

এই সকল কারণের প্রতি মনোযোগ করিয়া, এবং মনুষ্যের পরমায়ুর সাধারণ পরিমাণ ও আপনার বয়স বিবেচনা করিয়া আমি, আমার বক্তব্য কথা সকলগুলি বলিবার সময় পাইব, এমন আশা পরিত্যাগ করিয়াছি। যে দেবমন্দির গঠন করিবার উচ্চাভিলাষকে মনে স্থান দিয়া, দুই একখানি করিয়া ইন্টক সংগ্রহ করিতেছি, তাহা সমাপ্ত করিতে পারিব, এমন আশা আর রাখি না। যে তিনটি প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়াছি, তাহাও সমাপ্ত করিতে পারিব কি না, জগদীশ্বর জানেন। সকলগুলি সম্পূর্ণ হইলে তাহা পুনর্মুদ্রিত করিব, এ আশায় বসিয়া থাকিতে গেলে, হয়ত সময়ে কোন প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হইবে না। কেন না, সকল কাজেরই সময় অসময় আছে। এই জন্য কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম খণ্ড এক্ষণে পুনর্মুদ্রিত করা গেল। বোধ করি এইরূপ পাঁচ ছয় খণ্ডে গ্রন্থ সমাপ্ত হইতে পারে। কিন্তু সকলই সময় ও শক্তি এবং ঈশ্বরানুগ্রহের উপর নির্ভর করে।

আগে অনূশীলন ধর্ম পুনর্মুদ্রিত হইয়া তৎপরে কৃষ্ণচরিত্র পুনর্মুদ্রিত হইলেই ভাল হইত। কেন না, “অনূশীলন ধর্ম” যাহা তত্ত্ব মাত্র, কৃষ্ণচরিত্রে তাহা দেহবিশিষ্ট। অনূশীলনে যে আদর্শ উপস্থিত হইতে হয়, কৃষ্ণচরিত্র কর্মক্ষেত্রস্থ সেই আদর্শ। আগে তত্ত্ব বুঝাইয়া, তার পর উদাহরণের দ্বারা তাহা স্পষ্টীকৃত করিতে হয়। কৃষ্ণচরিত্র সেই উদাহরণ; কিন্তু অনূশীলন ধর্ম সম্পূর্ণ না করিয়া পুনর্মুদ্রিত করিতে পারিলাম না। সম্পূর্ণ হইবারও বিলম্ব আছে।

শ্রীবিশ্বকমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন

কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম সংস্করণে কেবল মহাভারতীয় কৃষ্ণকথা সমালোচিত হইয়াছিল। তাহাও অল্পাংশ মাত্র। এবার মহাভারতে কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় কথা যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা সমস্তই সমালোচিত হইয়াছে। তা ছাড়া হরিবংশে ও পুরাণে যাহা সমালোচনার যোগ্য পাওয়া যায়, তাহাও বিচারিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া উপক্রমণিকাভাগ পুনর্লিখিত এবং বিশেষরূপে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহা আমার অভিপ্রেত সম্পূর্ণ গ্রন্থ। প্রথম সংস্করণে যাহা ছিল, তাহা এই দ্বিতীয় সংস্করণের অল্পাংশ মাত্র। অধিকাংশই নূতন।

এত দূরও যে কৃতকার্য হইতে পারিব, পূর্বে ইহা আশা করি নাই। কিন্তু সম্পূর্ণ কৃষ্ণচরিত্র প্রকাশ করিয়াও আমি সুখী হইলাম না। তাহার কারণ, আমার চিত্তেই হউক, আর দূরদৃষ্ট বশতই হউক, মদ্রাঙ্কনকার্যে এত ভ্রম প্রমাদ ঘটিয়াছে যে, অনেক ভাগ পুনর্মুদ্রিত করাই আমার কর্তব্য ছিল। নানা কারণবশতঃ তাহা পারিলাম না। আপাততঃ একটা শূন্যপত্র দিলাম। যেখানে অর্থবোধে কষ্ট উপস্থিত হইবে, অনুগ্রহপূর্বক পাঠক সেইখানে শূন্যপত্রখানি দেখিয়া লইবেন। শূন্যপত্রেও বোধ হয়, সব ভুল ধরা হয় নাই। যাহা চক্ষে পড়িয়াছে, তাহাই ধরা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয় যথাস্থানে লিখিতে ভুল হইয়া গিয়াছে। তাহা তিনটি ক্রোড়পত্রে সন্নিবিষ্ট করা গেল। পাঠক ৭ পৃষ্ঠার [৮ পংক্তির] পর ক্রোড়পত্র (ক), দ্বিতীয় খণ্ডের দশম পরিচ্ছেদের [১০৯ পৃষ্ঠা, ১২ পংক্তির] পর (খ) এবং ১৩৬ পৃষ্ঠার [১৭ পংক্তির] পর (গ) ও [২২২ পৃষ্ঠার ফুট নোটে] ক্রোড়পত্র (ঘ) পাঠ করিবেন।

আমি বলিতে বাধ্য যে, প্রথম সংস্করণে যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছিলাম, এখন তাহার কিছু কিছু পরিত্যাগ এবং কিছু কিছু পরিবর্তিত করিয়াছি। কৃষ্ণের বাল্যলীলা সম্বন্ধে বিশিষ্টরূপে এই কথা আমার বক্তব্য। এরূপ মতপরিবর্তন স্বীকার করিতে আমি লজ্জা করি না। আমার জীবনে আমি অনেক বিষয়ে মতপরিবর্তন করিয়াছি—কে না করে? কৃষ্ণবিষয়েই আমার মতপরিবর্তনের বিচিত্র উদাহরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বঙ্গদর্শনে যে কৃষ্ণচরিত্র লিখিয়াছিলাম, আর এখন যাহা লিখিলাম, আলোক অন্ধকারে যত দূর প্রভেদ, এতদুভয়ে তত দূর প্রভেদ। মতপরিবর্তন, বয়োবৃদ্ধি, অনুসন্ধানের বিস্তার, এবং ভাবনার ফল। যাহার কখন মত পরিবর্তন হয় না, তিনি হয় অপ্রাস্ত দৈবজ্ঞানবিশিষ্ট, নয় বুদ্ধিহীন এবং জ্ঞানহীন। যাহা আর সকলের ঘটিয়া থাকে, তাহা স্বীকার করিতে আমি লজ্জাবোধ করিলাম না।

এ গ্রন্থে ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মত অনেক স্থলেই অগ্রাহ্য করিয়াছি, কিন্তু তাহাদের নিকট সন্মান ও সাহায্য না পাইয়াছি এমত নহে। Wilson, Goldstucker, Weber, Muir—ইহাদিগের নিকট আমি ঋণ স্বীকার করিতে বাধ্য। দেশী লেখকদিগের মধ্যে আমাদের দেশের মদুখোজ্জ্বলকারী শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, C. I. E., শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামগ্রামী, এবং মৃত মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্তের নিকট আমি বাধ্য। অক্ষয় বাবু উত্তম সংগ্রহকার। সর্বাপেক্ষা আমার ঋণ মৃত মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের নিকট গুরুতর। যেখানে মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন হইয়াছে, আমি তাহার অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়াছি। প্রয়োজনমতে মূলের সঙ্গে অনুবাদ মিলাইয়াছি। যে দুই এক স্থানে মারাত্মক ভ্রম আছে বুঝিয়াছি, সেখানে নোট করিয়া দিয়াছি। প্রয়োজনানুসারে, স্থানবিশেষ ভিন্ন, গ্রন্থের কলেবরবৃদ্ধি ভয়ে মহাভারতের মূল সংস্কৃত উদ্ধৃত করি নাই। হরিবংশ ও পুরাণ হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, মূল উদ্ধৃত করিয়াছি, এবং তাহার অনুবাদের দায় দোষ আমার নিজের।

পরিশেষে বক্তব্য, কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। তাহার মানবচরিত্র সমালোচন করাই আমার উদ্দেশ্য। আমি নিজে তাহার ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করি;—সে বিশ্বাসও আমি লুকাই নাই। কিন্তু পাঠককে সেই মতাবলম্বী করিবার জন্য কোন যত্ন পাই নাই।

শ্রীবাণীকমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ধর্মতত্ত্ব

ভূমিকা

গ্রন্থের ভূমিকায় যে সকল কথা বলিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহা সকলই আমি গ্রন্থের মধ্যে বলিয়াছি। যাহারা কেবল ভূমিকা দেখিয়াই পুস্তক পাঠ করা না করা স্থির করেন, তাহাদিগের এই গ্রন্থ পাঠ করার সম্ভাবনা অল্প। এজন্য ভূমিকায় আমার অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই।

বিশেষ, গ্রন্থের প্রথম দশ অধ্যায়ই একপ্রকার ভূমিকা মাত্র। আমার কথিত অনুশীলনতত্ত্বের প্রধান কথা যাহা, তাহা একাদশ অধ্যায়ে আছে। অন্য ভূমিকায় কোন ফল নাই।

এই দশ অধ্যায় নীরস, এবং মধ্যে মধ্যে দুরূহ, এই দোষ স্বীকার করাই আমার এই ভূমিকার উদ্দেশ্য। সপ্তম অধ্যায় বিশেষতঃ নীরস ও দুরূহ। শ্রেণীবিশেষের পাঠক, সপ্তম অধ্যায় পরিত্যাগ করিতে পারেন।

প্রধানতঃ, শিক্ষাপ্রাপ্ত পাঠকদিগের জন্যই এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, এজন্য সকল কথা সকল স্থানে বিশদ করিয়া বুঝান যায় নাই। এবং সেই জন্য স্থানে স্থানে ইংরাজি ও সংস্কৃতের অনুবাদ দেওয়া যায় নাই।

এই গ্রন্থের কিয়দংশ 'নবজীবনে' প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহারও কিছু কিছু পরিবর্তিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভগবৎগীতা

ভূমিকা

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি প্রণীত গীতার ভাষ্য ও টীকা থাকিতে গীতার অন্য ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। তবে ঐ সকল ভাষ্য ও টীকা সংস্কৃত ভাষায় প্রণীত। এখনকার দিনে এমন অনেক পাঠক আছেন যে, সংস্কৃত বুঝেন না, অথচ গীতা পাঠে বিশেষ ইচ্ছুক। কিন্তু গীতা এমনই দুরূহ গ্রন্থ যে, টীকার সাহায্য ব্যতীত অনেকেই বোধগম্য হয় না। এই জন্য গীতার একখানি বাঙ্গালা টীকা প্রয়োজন।

বাঙ্গালা টীকা দুই প্রকার হইতে পারে। এক, শঙ্করাদি-প্রণীত প্রাচীন ভাষ্যের ও টীকার বাঙ্গালা অনুবাদ দেওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয়, নতুন বাঙ্গালা টীকা প্রণয়ন করা যাইতে পারে। কেহ কেহ প্রথমোক্ত প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। বাবু হিতলাল মিশ্র নিজকৃত অনুবাদে, কখন শঙ্করভাষ্যের সারাংশ, কখন শ্রীধরস্বামিকৃত টীকার সারাংশ সংকলন করিয়াছেন। পরম বৈষ্ণব ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ দত্ত নিজকৃত অনুবাদে, অনেক সময়ে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রণীত টীকার মর্মার্থ দিয়াছেন। ইহাদিগের নিকট বাঙ্গালী পাঠক তত্ত্বজন্য বিশেষ ঋণী। প্রিয়বর শ্রীযুক্ত বাবু ভূধরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গীতার আর একখানি সংস্করণ প্রকাশে উদ্যত হইয়াছেন; বিজ্ঞাপনে দেখিলাম, তাহাতে শঙ্করভাষ্যের অনুবাদ থাকিবে। ইহা বাঙ্গালী পাঠকের বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয়।

• শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন দ্বিতীয় প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি নিজকৃত অনুবাদের সহিত "গীতাসন্দীপনী" নামে একখানি বাঙ্গালা টীকা প্রকাশ করিতেছেন। ইহা সূত্বের বিষয় যে, "গীতা-

বঙ্গীয় রচনাবলী

সন্দীপনীতে গীতার মর্ম পূর্বাভিত্তেরা যেরূপ বর্ণনাছিলেন, সেইরূপ বর্ণনা হইতেছে। বাঙ্গালী পাঠকেরা শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বাবুর নিকট তজ্জন্য কৃতজ্ঞ হইবেন সন্দেহ নাই।

এই সকল অনুবাদ বা টীকা থাকাতেও মাদৃশ ব্যক্তির অভিনব অনুবাদ ও টীকা প্রকাশে প্রবৃত্ত হওয়া বৃথা পরিশ্রম বলিয়া গণিত হইতে পারে। কিন্তু ইহার যথার্থ প্রয়োজন না থাকিলে, আমি এই গুরুতর কার্যে হস্তক্ষেপ করিতাম না। সে প্রয়োজন কি, তাহা বঝাইতেছি।

এখনকার পাঠকদিগের মধ্যে প্রায় অধিকাংশই “শিক্ষিত”-সম্প্রদায়ভুক্ত। যাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, তাঁহাদিগেরই সচরাচর “শিক্ষিত” বলা হইয়া থাকে; আমি প্রচলিত প্রথার বশবর্তী হইয়াই তদর্থে “শিক্ষিত” শব্দ ব্যবহার করিতেছি। কাহারও শিক্ষা বেশী, কাহারও শিক্ষা কম, কিন্তু কম হউক, বেশী হউক, এখনকার পাঠক অধিকাংশই “শিক্ষিত” সম্প্রদায়ভুক্ত, ইহা আমার জানা আছে। এখন গোলযোগের কথা এই যে, এই শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রাচীন পণ্ডিতদিগের উক্তি সহজে বর্ণনাতে পারেন না। বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া দিলেও তাহা বর্ণনাতে পারেন না। যেমন টোলের পণ্ডিতেরা, পাশ্চাত্যদিগের উক্তির অনুবাদ দেখিয়াও সহজে বর্ণনাতে পারেন না, যাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, তাঁহারা প্রাচীন প্রাচ্য পণ্ডিতদিগের বাক্য কেবল অনুবাদ করিয়া দিলে সহজে বর্ণনাতে পারেন না। ইহা তাঁহাদিগের দোষ নহে, তাঁহাদিগের শিক্ষার নৈসর্গিক ফল। পাশ্চাত্য চিন্তা-প্রণালী প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের চিন্তা-প্রণালী হইতে এত বিভিন্ন যে, ভাষার অনুবাদ হইলেই ভাবের অনুবাদ হৃদয়ঙ্গম হয় না। এখন আমাদের “শিক্ষিত” সম্প্রদায়, শৈশব হইতে পাশ্চাত্য চিন্তা-প্রণালীর অনুবর্তী, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়া চিন্তা-প্রণালী তাঁহাদিগের নিকট অপরিচিত; কেবল ভাষান্তরিত হইলে প্রাচীন ভাব সকল তাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম হয় না। তাঁহাদিগকে বঝাইতে গেলে পাশ্চাত্য প্রথা অবলম্বন করিতে হয়, পাশ্চাত্য ভাবের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। পাশ্চাত্য প্রথা অবলম্বন করিয়া পাশ্চাত্য ভাবের সাহায্যে গীতার মর্ম তাঁহাদিগকে বঝান, আমার এই টীকার উদ্দেশ্য।

ইহার আরও বিশেষ প্রয়োজন এই যে, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে যে সকল সংশয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, পূর্বাভিত্তদিগের কৃত ভাষ্যাদিতে তাহার মীমাংসা নাই। থাকিবারও সম্ভাবনা নাই; কেন না, তাঁহারা যে সকল পাঠকের সাহায্য জন্য ভাষ্যাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মনে সে সকল সংশয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনাই ছিল না। এই টীকায় যত দূর সাধ্য, সেই সকল সংশয়ের মীমাংসা করা গিয়াছে।

অতএব যে সকল পণ্ডিতগণ গীতার ব্যাখ্যা বাঙ্গালায় প্রচার করিয়াছেন বা করিতেছেন, আমি তাঁহাদিগের প্রতিযোগী নহি; যথাসাধ্য তাঁহাদিগের সাহায্য করি, ইহাই আমার ক্ষুদ্রাভিলাষ। আমিও যত দূর পারিয়াছি, পূর্বাভিত্তদিগের অনুগামী হইয়াছি। আনন্দগিরি-টীকা-সম্বলিত শঙ্করভাষা, শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা রামানুজভাষা, মধুসূদন সরস্বতীকৃত টীকা, বিশ্বনাথ চক্রবর্তীকৃত টীকা ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই টীকা প্রণয়ন করিয়াছি। তবে ইহাও আমাকে বলিতে হইতেছে যে, যে ব্যক্তি পাশ্চাত্য সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং দর্শন অবগত হইয়াছে, সকল সময়েই যে, সে প্রাচীনদিগের অনুগামী হইতে পারিবে, এমন সম্ভাবনা নাই। আমিও সর্বত্র তাঁহাদের অনুগামী হইতে পারি নাই। যাঁহারা বিবেচনা করেন, এদেশীয় পূর্বাভিত্তেরা যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলই ঠিক এবং পাশ্চাত্যগণ জাগতিক তত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা সকলই ভুল, তাঁহাদিগের সঙ্গে আমার কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই।

টীকাই আমার উদ্দেশ্য, কিন্তু মূল ভিন্ন টীকা চলে না, এই জন্য মূলও দেওয়া গেল। অনেক পাঠক অনুবাদ ভিন্ন মূল বর্ণনাতে সক্ষম নহেন, এজন্য একটা অনুবাদও দেওয়া গেল। বাঙ্গালা ভাষায় গীতার অনেক উৎকৃষ্ট অনুবাদ আছে। পাঠক যেটা ভাল বিবেচনা করেন, সেইটা অবলম্বন করিতে পারেন। সচরাচর যাহাতে অনুবাদ অবিকল হয়, সেই চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু দুই এক স্থানে অর্থব্যক্তির অনুরোধে এ নিয়মের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।

কলিকাতা।

১২৯৩ সাল।

শ্রীবাংকমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চতুর্থ ভাগ

রচনা শিক্ষা

ADVERTISEMENT.

It is a standing reproach against the educated Bengali that he cannot write in his mother tongue. The reproach has perhaps an application still more

forcible in the case of those who receive only an elementary education in the vernacular schools than in the case of their more educated brethren turned out of the colleges. But the Bengali student labours under a serious disadvantage in this respect; there exist no rules for his guidance, none at least which an ordinary teacher is able to prescribe for his study. The compiler of this little primer on *Composition* has endeavoured to collect in it some rules derived from the practice of the best writers in the language and from his own experience in Bengali composition. He has tried to render it suited to the capacity of beginners and to be as brief as well as clear as possible.

The first chapter of this primer seeks nearly to teach the beginners to form words into sentences and then to collect sentences into little essays. In the second chapter he has explained the existing practice of the best writers under three heads, (1) Correctness, (2) Precision, and (3) Perspicuity. He has entered into no elaborate discussions, but has simply laid down rules easily understood. In the third chapter he has explained the existing practice regarding that particular species of composition, with which, of all others, every person, in whatever rank of life, is required to be most conversant—I mean letter-writing, the most useful of all forms of composition. He wished to add a chapter teaching the drawing up of ordinary legal instrument, such as leases and bonds. But he prefers to wait to see the reception which the little work meets with, before adding further to its bulk. The same consideration, viz.—a wish to avoid adding to the size and therefore to the cost of a primer which ought to be in every beginner's hand, has led him to content himself with a limited number of illustrations and examples under each head. More can be easily supplied by the teacher.

In conclusion he begs to say that this little primer is based on the English model, and that the only two terms used by English writers on the subject which he has rendered into Bengali are *Subject* (বিষয়) and *Predicate* (বক্তব্য)।

পঞ্চম ভাগ

গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক

বিজ্ঞাপন

যে কয়েকটি ক্ষুদ্র কবিতা, এই কবিতাপুস্তকে সন্নিবেশিত হইল, প্রায় সকলগুলিই বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। একটি—“জলে ফুল” ভ্রমরে প্রকাশিত হয়। বাল্যরচনা দুটি কবিতা, বাল্যকালেই পুস্তকাকারে প্রচারিত হয়।

বাঙ্গালা সাহিত্যের আর যে কিছু অভাব থাকুক, গীতিকাব্যের অভাব নাই। বিদ্যাপতির সময় হইতে আজ পর্যন্ত, বাঙ্গালী কবিরা গীতিকাব্যের বৃষ্টি করিয়া আসিতেছেন। এমন সময়ে এই কয়খানি সামান্য গীতিকাব্য পুনর্মুদ্রিত করিয়া বোধ হয় জনসাধারণের কেবল বিরক্তিই জন্মাইতেছি। এ মহা-সমুদ্রে শিশিরবিন্দুনিষেকের প্রয়োজন ছিল না। আমারও ইচ্ছা ছিল না। ইচ্ছা ছিল না বলিয়াই এতদিন এ সকল পুনর্মুদ্রিত করি নাই।

তবে কেন এখন এ দুষ্কর্মে প্রবৃত্ত হইলাম? একদা বঙ্গদর্শন আপিসে এক পত্র আসিল—তাহাতে কোন মহাত্মা লিখিতেছেন যে, বঙ্গদর্শনে যে সকল কবিতা প্রকাশ হইয়াছিল, তাহার মধ্যে কতকগুলি পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। তিনি সেই সকল পুনর্মুদ্রিত করিতে চাহেন। অন্যে মনে করিবেন যে, রহস্য মন্দ নহে। আমি ভাবিলাম, এই বেলা জপনার পথ দেখা ভাল, নহিলে কোন দিন কাহার হাতে মারা পড়িব। সেই জন্য পাঠককে এ যন্ত্রণা দিলাম। বিশেষ, যাহা প্রচারিত হইয়াছে, ভাল হউক, মন্দ হউক, তাহার পুনঃপ্রচারে নতুন প্লাপ কিছুই নাই। অনেক প্রকার রচনা সাধারণসমীপস্থ করিয়া আমি অনেক

বাংকম রচনাবলী

অপরাধে অপরাধী হইয়াছি; শত অপরাধের যদি মাঞ্জনা হইয়া থাকে, তবে আর একটি অপরাধেরও মাঞ্জনা হইতে পারে।

কবিতাপুস্তকের ভিতর তিনটি গদ্য প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। কেন হইল, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি ভাল করিয়া বুঝাইতে পারিব না। তবে, এক্ষণে যে রীতি প্রচলিত আছে যে, কবিতা পদ্যই লিখিতে হইবে, তাহা সঙ্গত কি না, আমার সন্দেহ আছে। ভরসা করি, অনেকেই জানেন যে, কেবল পদ্যই কাব্য নহে। আমার বিশ্বাস আছে যে, অনেক স্থানে পদ্যের অপেক্ষা গদ্য কাব্যের উপযোগী। বিষয়বিশেষে পদ্য কাব্যের উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু অনেক স্থানে গদ্যের ব্যবহারই ভাল। যে স্থানে ভাষা ভাবের গৌরবে আপনা আপনি ছন্দে বিন্যস্ত হইতে চাহে, কেবল সেই স্থানেই পদ্য ব্যবহার্য। নাহিলে কেবল কবিনাম কিনিবার জন্য ছন্দ মিলাইতে বসে এক প্রকার সং সাজিতে বসে। কাব্যের গদ্যের উপযোগিতার উদাহরণ স্বরূপ তিনটি গদ্য কবিতা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিলাম। অনেকে বলিবেন, এই গদ্যে কোন কবিত্ব নাই। সে কথায় আমার আপত্তি নাই। আমার উত্তর যে, এই গদ্য যেরূপ কবিত্বশূন্য, আমার পদ্যও তদ্রূপ। অতএব তুলনায় কোন ব্যাঘাত হইবে না।

অন্য কবিতাগুলি সম্বন্ধে যাহাই হউক, যে দুইটি বাল্যরচনা ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছি, তাহার কোন মাঞ্জনা নাই। ঐ কবিতাদ্বয়ের কোন গুণ নাই। ইহা নীরস, দুরূহ, এবং বালকসুলভ অসার কথায় পরিপূর্ণ। যখন আমি কলেজের ছাত্র, তখন উহা প্রথম প্রচারিত হয়। পড়িয়া উহার দুরূহতা দেখিয়া, আমার একজন অধ্যাপক বলিয়াছিলেন, “ওগুর্লি হিয়ালি।” অধ্যাপক মহাশয় অন্যায় কথা বলেন নাই। ঐ প্রথম সংস্করণ এখন আর পাওয়া যায় না—অনেক কাপি আমি স্বয়ং নষ্ট করিয়াছিলাম। এক্ষণে আমার অনেকগুলি বন্ধু, আমার প্রতি স্নেহবশতঃ ঐ বাল্যরচনা দেখিতে কোতুললী। তাহাদিগের তৃপ্ত্যর্থই এই দুইটি কবিতা পুনর্মুদ্রিত হইল।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন

বাঙ্গালা কবিতা পুনর্মুদ্রিত করিবার জন্য পাঠকের কাছে ক্ষমা চাহিতে হয়। তবে সাহিত্য সম্বন্ধে অনেকে অনেক অপরাধ করিতেছেন, সে সকল পাঠক যদি ক্ষমা করেন, আমার এ অপরাধও ক্ষমা করিবেন।

ক্ষমার একটু কারণ এই আছে যে, এবার একটি গদ্য প্রবন্ধ নূতন দেওয়া গেল। “পুষ্পনাটক” প্রথম “প্রচারে” প্রকাশিত হইয়াছিল, এই প্রথম পুনর্মুদ্রিত হইল।

“দুর্গোৎসব” “বঙ্গদর্শন” হইতে, এবং “রাজার উপর রাজা” “প্রচার” হইতে পুনর্মুদ্রিত করা গেল।

“কবিতাপুস্তক” অপেক্ষা “গদ্য পদ্য” নামটি এই সংগ্রহের উপযোগী, এই জন্য এইরূপ নামের কিছু পরিবর্তন করা গেল।

